আল-মুকাদ্দিমা প্রথম খণ্ড

ইবনে খালদুন

অনুবাদ। গোলাম সামদানী কোরায়শী

আল-মুকাদ্দিমা

[প্রথম খণ্ড]

দিব্য প্রকাশ

আল-মুকাদ্দিমা

[প্রথম খণ্ড]

ইবনে খালদুন

গোলাম সামদানী কোরায়শী
অনূদিত

তৃতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ২০১২
প্রথম দিব্যপ্রকাশ সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৭
প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৮২

আল্ মুকাদ্দিমা (১ম খণ্ড)
ইবনে খালদুন

প্রকাশক
দিব্যপ্রকাশ
৩৮/২ক বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১২১৫৭৪
dibyaprakashbooks@gmail.com

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মঈনুল আহসান সাবের

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন, ঢাকা

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

অনলাইনে বই পেতে
www.rokomari.com

মূল্য : ৬৫০ টাকা US $ 30

AL-MUQADDIMAH-VOL. I : Bengali translation of Ibn Khaldun's 'Al-Muqaddima' from 'Kitabul Ibar' by Ghulam Samdani Quraishy. First Published in Bengali 1982. First Dibyaprakash edition : February 2007. Cover design : Moinul Ahsan Saber. Price Tk. 650

ISBN 984 483 259 4

বিষয়সূচি

আল্লামা ইবনে খালদুন ১৩
আল-মুকাদ্দিমা : আলোচনা ৪৮
অনুবাদ প্রসঙ্গ ৫৮
প্রারম্ভ স্তুতি ৬৫
ইতিহাস প্রসঙ্গ ৬৭
উৎসর্গ ৭৪

ভূমিকা

ইতিহাসের বিষয় গুরুত্ব, তাঁর বিভিন্ন পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ এবং ইতিহাসবিদদের সম্ভাব্য ত্রুটি-বিচ্যুতির বিবরণ ও কারণ; বনি ইসরাইলের সৈন্যসংখ্যা; তুব্বা রাজন্যবর্গের দিগ্বিজয়; ইরাম নগরীর কাহিনী; বরমেকীদের পতন; আকসামের মদ্যপান; মামুনের প্রেম; উবায়দী বংশধারা; ইদরিসী বংশধারা; আল মেহেদীর বংশধারা; ঐতিহাসিকদের দায়িত্ব; শিক্ষকতা প্রসঙ্গ; বিচারক প্রসঙ্গ; ভুল বর্ণনা পদ্ধতি; প্রতিবর্ণীকরণ সমস্যা; প্রাথমিক বক্তব্য। ৭৫

প্রাথমিক বক্তব্য ১১৩

প্রথম অধ্যায়

[সমগ্র মানব সভ্যতা এবং তৎসংশ্লিষ্ট কতিপয় প্রস্তাবনা] ১২৩

প্রথম প্রস্তাবনা ১২৫
দ্বিতীয় প্রস্তাবনা : সভ্যতা অধ্যুষিত ভূভাগ এবং তন্মধ্যস্থ সমুদ্র, নদনদী ও বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে ১৩০
দ্বিতীয় প্রস্তাবনার সংযোজন : পৃথিবীর দক্ষিণ চতুর্থাংশ অপেক্ষা উত্তর চতুর্থাংশের জনবসতির আধিক্য ও তার কারণ ১৩৬
ভূচিত্রের বিশদ বিবরণ[২৩] : প্রথম অঞ্চল; দ্বিতীয় অঞ্চল; তৃতীয় অঞ্চল, চতুর্থ অঞ্চল; পঞ্চম অঞ্চল; ষষ্ঠ অঞ্চল; সপ্তম অঞ্চল ১৪০
তৃতীয় প্রস্তাবনা : নাতিশীতোষ্ণ ও শীতোষ্ণ অঞ্চলসমূহ; মানুষের গাত্রবর্ণ ও তাদের অন্যবিধ বহু অবস্থার উপর বায়ুর[৮৪] প্রভাব সম্পর্কে ১৭৫
চতুর্থ প্রস্তাবনা : মানব চরিত্রের উপর বায়ুর প্রভাব সম্পর্কে ১৮০
পঞ্চম প্রস্তাবনা : মানব সভ্যতায় খাদ্যের প্রাচুর্য ও ক্ষুধাজনিত বিভিন্ন অবস্থা এবং মানবদেহ ও চরিত্রের উপর তৎসৃষ্ট প্রভাব সম্পর্কে ১৮২

ষষ্ঠ প্রস্তাবনা : স্বাভাবিকভাবে অথবা সাধনার দ্বারা অদৃশ্য জগৎকে উপলব্ধিকারী মানুষের প্রকারভেদ এবং তৎপূর্বে আলোচ্য প্রত্যাদেশ ও স্বপ্নদর্শন সম্পর্কে ১৮৭

নবুয়তের তাৎপর্য ব্যাখ্যা : মানবীয় জীবাত্মার প্রকারভেদ; ওহী; ইন্দ্রজাল; স্বপ্ন দর্শন; অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান; ভবিষ্যদ্বক্তা; বাহলুল গোষ্ঠী; বালুকা লিখন; নীম গণনা ১৯৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

[যাযাবরী জীবন, বর্বর জাতি ও উপজাতি, তাদের জীবনান্তর্গত বিভিন্ন অবস্থা এবং এতদসম্পর্কীয় কতিপয় পরিচ্ছেদ ও বিশদ বিবরণ] ২২৭

প্রথম পরিচ্ছেদ : যাযাবরী ও নাগরিক জীবন উভয়েই স্বাভাবিক ২২৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আরব[১] বেদুইন জীবন সৃষ্টির দিক থেকে স্বাভাবিক ২৩১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : যাযাবরী জীবন নাগরিক জীবন অপেক্ষা প্রাচীন ও পূর্ববর্তী এবং প্রান্তর সভ্যতা ও জনপদের ভিত্তি ও সঞ্চয়াগার ২৩৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : প্রান্তরবাসীরা নগরবাসীদের অপেক্ষা সততায় অধিকতর নিকটবর্তী ২৩৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : নগরবাসিগণ হতে প্রান্তরবাসীরা শৌর্যবীর্যে অধিকতর নিকটবর্তী ২৩৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : নীতিনিয়মের সহায়তা নগরবাসীদের সংগ্রামমুখিতা ও প্রতিরোধ ক্ষমতা বিলোপ করে ২৪০

সপ্তম পরিচ্ছেদ : একমাত্র গোত্রপ্রীতির অধিকারী গোত্রগুলোই প্রান্তরে বসবাস করতে সক্ষম ২৪৩

অষ্টম পরিচ্ছেদ : গোত্রপ্রীতি একমাত্র রক্তসম্পর্ক ও তার সমস্থানীয় সম্বন্ধ থেকেই অস্তিত্বে আসতে পারে ২৪৫

নবম পরিচ্ছেদ : সুস্পষ্ট বংশধারা কেবল তৃণশূন্য প্রান্তরবাসী বন্য প্রকৃতির আরব বেদুইন এবং তাদের সমস্থানীয় অন্যান্যের মধ্যে পাওয়া যায় ২৪৭

দশম পরিচ্ছেদ : বংশধারায় মিশ্রণ কীভাবে ঘটে ২৪৯

একাদশ পরিচ্ছেদ : নেতৃত্ব সর্বদা গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন বংশের একটি বিশেষ অংশেই বিরাজ করে ২৫১

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন অংশের নেতৃত্ব তাদের বংশ ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয় ২৫২

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : গোত্রপ্রীতির অধিকারীদের জন্যই বাস্তব কৌলীন্য ও যথার্থ বংশমর্যাদার অবকাশ আছে এবং অন্যদের বেলায় তার স্বরূপ আলংকারিক ও রূপক ২৫৫

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : আশ্রিত পোষ্য ও অনুগতদের কৌলীন্য ও মর্যাদা তাদের প্রভুদের অনুরূপ বিষয়াদি অনুসারেই হয়ে থাকে; তাদের নিজেদের বংশধারা অনুসারে নয় ২৫৮

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : একই বংশধারায় বংশমর্যাদার স্থায়িত্ব মাত্র চার পুরুষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ২৬০

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : বর্বর জাতিগুলোই প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাবান ২৬৩

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : গোত্রপ্রীতির শেষ লক্ষ্য হল রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ২৬৫
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে বাধাসমূহের অন্যতম হল কোন গোত্রের বিলাসব্যসন ও প্রাচুর্যের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া ২৬৭
উনবিংশ পরিচ্ছেদ : রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে বাধাসমূহের অন্যতম কোন গোত্রের হীনমন্যতা ও অপরের প্রতি আনুগত্য ২৬৮
বিংশ পরিচ্ছেদ : রাজ্যশক্তির নিদর্শনসমূহের মধ্যে সৎচরিত্রের প্রতিযোগিতা অন্যতম এবং এর বিপরীত অবস্থা ২৭১
একবিংশ পরিচ্ছেদ : বর্বর জাতিগুলোর সাম্রাজ্য সীমাই অধিকতর বিস্তৃত হয়ে থাকে ২৭৪
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : কোন বংশের মধ্যে গোত্রপ্রীতি অক্ষুণ্ন থাকলে তার একটি শাখা থেকে রাজ্য চলে গেলেও পুনরায় অন্য একটি শাখায় ফিরে আসবে ২৭৫
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ : বিজিত সর্বদাই বিজয়ীর বৈশিষ্ট্য, পরিচ্ছদ, পেশা এবং অন্যান্য যাবতীয় অবস্থা ও অভ্যাসের অনুসরণ করে থাকে ২৭৭
চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ : কোন জাতি পরাজিত হয়ে অন্যের অধীনস্থ হলে তার বিলুপ্তি দ্রুততর হয় ২৭৯
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ : আরব বেদুইনরা কেবল প্রান্তরীয় অঞ্চলগুলোতেই প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে ২৮১
ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ : আরব বেদুইনরা যে জনপদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তার বিনষ্টি দ্রুততর হয় ২৮২
সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ : সাধারণভাবে আরব বেদুইনরা কোন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য যেমন নবী বা পুণ্যাত্মার স্মৃতি অথবা মহান ধর্মীয় ঐতিহ্যের মাধ্যম ব্যতীত রাজ্য লাভে সক্ষম হয় না ২৮৪
অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ : আরব বেদুইনরা রাজ্য শাসনের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক অনুপযুক্ত ২৮৫
উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : প্রান্তরবাসী গোত্র ও সম্প্রদায়গুলোর জীবন পল্লীবাসীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে ২৮৭

তৃতীয় অধ্যায়

[সাধারণ সাম্রাজ্য, রাষ্ট্রশক্তি, খেলাফত ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কীয় বিভিন্ন পদমর্যাদা এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিচিত্র অবস্থা। এতে নীতিমালা ও পরিপূরক গুণাবলি সম্পর্কীয় আলোচনা বিদ্যমান] ২৮৯
প্রথম পরিচ্ছেদ : সাধারণ সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রশক্তি একমাত্র গোত্রশক্তি ও গোত্রপ্রীতির সাহায্যেই লাভ হয়ে থাকে ২৯১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : যখন কোন সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিন্যস্ত হয়, তখন গোত্রপ্রীতির প্রয়োজনীয়তা ফুরায় ২৯২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত গোত্রের কোন অংশের পক্ষে গোত্রপ্রীতি ব্যতীতই সাম্রাজ্য স্থাপন কখনও কখনও সম্ভব হয়ে ওঠে ২৯৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বিস্তৃত সাম্রাজ্য ও বৃহৎ শাসন ক্ষমতার ভিত্তি হল নবুয়ত অথবা সত্য প্রচারজনিত ধর্মমত ২৯৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যের প্রাথমিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় ধর্মমত তার জনসংখ্যার অনুপাতে লব্ধ গোত্রপ্রীতিকে এক নতুন শক্তি দান করে থাকে ২৯৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ধর্মমত প্রচার ও গোত্রপ্রীতির সাহায্য ব্যতীত সম্পূর্ণ হয় না ৩০০
সপ্তম পরিচ্ছেদ : প্রতিটি সাম্রাজ্যের জন্যই অঞ্চল ও স্থানের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে, তা অপেক্ষা বেশি হয় না ৩০৪
অষ্টম পরিচ্ছেদ : যে কোন সাম্রাজ্যের আয়তন, বিস্তার ও স্থায়িত্ব তার জনশক্তির স্বল্পতা ও আধিক্যের অনুপাতে হয়ে থাকে ৩০৬
নবম পরিচ্ছেদ : অধিক গোত্র ও গোত্রশক্তিবিশিষ্ট অঞ্চলগুলোতে সাম্রাজ্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা খুব কমই হয়ে থাকে ৩০৮
দশম পরিচ্ছেদ : রাজ্যশক্তির স্বভাব হল যাবতীয় গৌরব নিজের জন্য কুক্ষিগত করা ৩১১
একাদশ পরিচ্ছেদ : রাজ্যশক্তির স্বভাব হল বিলাসব্যসনে লিপ্ত হওয়া ৩১৩
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : রাজ্যশক্তির স্বভাব হল স্থিরতা ও শান্তি কামনা ৩১৪
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : যখন রাজ্যশক্তির স্বভাব একক গৌরব, বিলাসব্যসন ও স্থিরতায় সুদৃঢ় হয়, তখনই সাম্রাজ্যে ক্ষয় দেখা দেয় ৩১৫
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যও ব্যক্তির ন্যায় স্বাভাবিক জীবনকালের অধীন ৩১৮
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যের প্রান্তরীয় অভ্যাস হতে নাগরিক সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হওয়া ৩২১
ষোড়শ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যের প্রথমদিকে বিলাসব্যসন তাতে নতুন শক্তি সঞ্চারিত করে থাকে ৩২৫
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যের বিভিন্ন পর্যায় ও তার অবস্থাসমূহের বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন পর্যায়ে অধিবাসীদিগের চরিত্রগত পরিবর্তন ৩২৬
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : প্রতিটি সাম্রাজ্যের মৌলশক্তির অনুপাতেই স্মৃতি নিদর্শন স্থাপিত হয়ে থাকে ৩২৯
উনবিংশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যের অধিকারী আশ্রিতপোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাহায্যে স্বীয় জাতি ও গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর উপর ক্ষমতা বিস্তার করে থাকে ৩৩৯
বিংশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যে আশ্রিতপোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অবস্থা ৩৪১
একবিংশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যে অনেক সময় সম্রাটকে রাজকীয় ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত রাখা এবং তাঁর উপর অন্যায্য প্রভাব বিস্তারের ঘটনা দেখা দেয় ৩৪৩
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : সম্রাটের উপর অন্যায্য প্রভাব বিস্তারকারীরা তাঁর রাজকীয় উপাধিতে হস্তক্ষেপ করে না ৩৪৫
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ : রাজ্যশক্তির তাৎপর্য ও তার প্রকার বৈচিত্র্য ৩৪৭
চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ : অতিরিক্ত কঠোরতা রাজশক্তির পক্ষে ক্ষতিকর এবং অনেক সময় তার বিলুপ্তির কারণ হয়ে থাকে ৩৪৯
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ : খেলাফত ও ইমামতের অর্থ ৩৫১
ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ : খেলাফতের পদমর্যাদা ও শর্তাদি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে প্রচলিত মতপার্থক্য ৩৫৩
সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ : ইমামত সম্পর্কে শিয়া সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতামত ৩৬২
অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ : খেলাফতের রাজশক্তিতে পরিণত হওয়া ৩৭০
উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : আনুগত্য-শপথের তাৎপর্য ৩৮০
ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্ধারণ ৩৮২
একত্রিংশ পরিচ্ছেদ : খেলাফতের ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ ৩৯৪

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ : আমীরুল মোমেনীন উপাধিটি খেলাফতের একটি নিদর্শন এবং খলিফাদের সময় থেকে তা সৃষ্টি হয়েছে ৪০৫
ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ : খ্রিস্টধর্মের 'পোপ' ও 'পেট্রিআর্ক' উপাধি এবং ইহুদিদের 'কোহেন' নামের ব্যাখ্যা ৪১১
চতুঃত্রিংশ পরিচ্ছেদ : রাজ্যশক্তি ও সরকারি বিভিন্ন পদমর্যাদা এবং তাদের পদবী ৪১৭
পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন সাম্রাজ্যে অসি ও মসি বিভাগের মর্যাদার পার্থক্য ৪৪৬
ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : রাজ্যশক্তির নিদর্শন ও শাসন ব্যবস্থার বিশেষ প্রতীক ৪৪৮
সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ : যুদ্ধ এবং যুদ্ধ সংঘটনে বিভিন্ন জাতির অনুসৃত প্রক্রিয়া ৪৬৫
অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ : রাজকোষ এবং তার সমৃদ্ধি ও বিনষ্টির কারণ ৪৭৬
উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থায় শুল্ক ধার্য করা হয় ৪৭৮
চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : সম্রাটের বাণিজ্যে অংশগ্রহণ প্রজাদের জন্য ক্ষতিকর এবং রাজকোষের জন্য সঙ্গতি বিনাশক ৪৮০
একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : সম্রাট ও তাঁর সভাসদদের সমৃদ্ধি লাভ সাম্রাজ্যের মধ্যভাগেই ঘটে থাকে ৪৮৩
দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : সম্রাট প্রদত্ত প্রাপ্যাদির সংকোচন রাজকোষের অসঙ্গতির পরিচয় বহন করে ৪৮৭
ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : উৎপীড়ন সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনে ৪৮৮
চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যগুলোতে কী করে সম্রাটের সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় এবং তাদের অবক্ষয়ের সময় তা সর্বাধিক বৃদ্ধি পায় ৪৯৪
পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : একটি সাম্রাজ্যের দুইভাগে বিভক্ত হওয়া ৪৯৬
ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যে একবার অবক্ষয় দেখা দিলে তার আর নিবৃত্তি হয় না ৪৯৯
সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : কি করে সাম্রাজ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয় ৫০১
অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : প্রতিটি সাম্রাজ্য প্রথমে তার সীমা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিস্তৃত হয় এবং পরে পর্যায়ক্রমে সংকুচিত হয়ে বিনাশ ও ধ্বংস হয়ে যায় ৫০৫
উনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যের নবায়ন ও নবপ্রতিষ্ঠা কী করে ঘটে ৫০৮
পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : নবোত্থিত রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে অধ্যবসায়ের পরিচয় দেয়; হঠাৎ আক্রমণ করে না ৫০৯
একপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্যের শেষের দিকে জনবসতির প্রাচুর্য এবং অধিক মাত্রায় মহামারী ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ৫১৩
দ্বিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : মানুষের সামাজিক বিষয়াদির শৃঙ্খলা বিধানের জন্য শাসননীতির প্রয়োজন ৫১৫
ত্রিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : ফাতেমী সাম্রাজ্য, এ সম্পর্কে মানুষের মতামত এবং তার রহস্য উদ্‌ঘাটন ৫২৭
চতুঃপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্য ও জাতি সম্পর্কে পূর্বাভাস এবং তদন্তর্গত ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনা ও দিব্যজ্ঞান সম্পর্কে রহস্যোদ্‌ঘাটন ৫৫৩

চতুর্থ অধ্যায়

[বিভিন্ন দেশ ও নগরী; সমগ্র মানব সভ্যতা এবং তাতে ক্রিয়াশীল আগত ও অনাগত অবস্থাসমূহ] ৫৭১

প্রথম পরিচ্ছেদ : সাম্রাজ্য শহর-নগরের পূর্ববর্তী এবং এগুলোর রাজশক্তির দ্বিতীয় ফসল ৫৭৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রাজশক্তি নাগরিক জীবনের দিকে আকর্ষণ করে ৫৭৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : একমাত্র সমৃদ্ধ রাজশক্তিই বিরাট নগরী ও সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করতে সক্ষম ৫৭৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বৃহৎ ও ব্যাপক সৌধকীর্তি স্থাপন কোন একক সাম্রাজ্যের পক্ষে সম্ভব নয় ৫৭৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : নগর পরিকল্পনায় যে সকল বিষয় লক্ষ রাখা দরকার এবং তৎপ্রতি উদাসীনতা যে পরিণামের সৃষ্টি করে ৫৮০
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : মসজিদ ও পৃথিবীর মহান সৌধরাজি ৫৮৪
সপ্তম পরিচ্ছেদ : আফ্রিকিয়া ও মাগরিবে শহর-নগরের সংখ্যা খুবই কম ৫৯৬
অষ্টম পরিচ্ছেদ : ইসলামের নিজস্ব সাম্রাজ্যশক্তি এবং তার পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলোর তুলনায় তার স্থাপত্য ও নির্মাণ শিল্প অত্যন্ত কম ৫৯৮
নবম পরিচ্ছেদ : আরবদের নির্মিত সৌধাবলির অল্পসংখ্যক ব্যতীত সমুদয়ই অতি সত্বর ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে ৫৯৯
দশম পরিচ্ছেদ : শহর-নগরে অবক্ষয়ের লক্ষণ কী করে প্রকাশ পায় ৬০০
একাদশ পরিচ্ছেদ : শহর-নগরের সমৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক তৎপরতার শ্রেষ্ঠত্ব তাদের অধিবাসীদের সংখ্যার আধিক্য এবং স্বল্পতা অনুসারেই হয়ে থাকে ৬০১
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : নগরসমূহের দ্রব্যমূল্য ৬০৫
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : প্রান্তরবাসীদের পক্ষে জনবসতিবহুল নগরীতে বসবাস করা অসুবিধাজনক ৬০৮
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : সমৃদ্ধি ও দারিদ্র্যের দিক থেকে বিভিন্ন অঞ্চল ও নগর জীবন একই প্রকার ৬০৯
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : নগর পরিবেশে কৃষিখামার ও ভূসম্পত্তি সংগ্রহ এবং তার উপকারিতা ও উৎপাদন ৬১২
ষোড়শ পরিচ্ছেদ : নগরের পুঁজিপতিদের জন্য জাঁকজমক ও প্রতিরোধ শক্তি থাকা প্রয়োজন ৬১৪
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : নাগরিক সভ্যতা সাম্রাজ্যেরই অবদান এবং তার ধারাবাহিতকা ও দৃঢ়তাতেই সভ্যতার সমৃদ্ধি ৬১৫
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : নগর সংস্কৃতি সভ্যতার শেষ পর্যায়, এর আয়ুষ্কালের অন্তিম এবং এর বিকৃতির লগ্ন নির্দেশক ৬১৯
উনবিংশ পরিচ্ছেদ : যে নগরগুলো রাজশক্তির কেন্দ্র হিসাবে বিরাজ করে, সাম্রাজ্যের পতন ও অবক্ষয়ে তারা ধ্বংসের সম্মুখীন হয় ৬২৪
বিংশ পরিচ্ছেদ : কোন কোন নগর অন্য নগর অপেক্ষা বিশেষ শিল্পকর্মের দ্বারা চিহ্নিত হয় ৬২৮
একবিংশ পরিচ্ছেদ : নগর জীবনে গোত্রপ্রীতির অস্তিত্ব এবং নগরবাসীর কতকাংশের অপর কতকাংশের উপর প্রাধান্য বিস্তার ৬২৯
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : নগরবাসীদের ভাষা ৬৩১

অবতরণিকা

আল্লামা ইবনে খালদুন
আল-মুকাদ্দিমা ও অনুবাদ প্রসঙ্গ

আল্লামা ইবনে খালদুন

['হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে']

সর্বকালের স্মরণীয় প্রতিভা ও ঐতিহাসিক দর্শনের জনক আল্লামা ইবনে খালদুন তিউনিসের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ৭৩২ হিজরির ১ রমজান (২৭ মে, ১৩৩২ খ্রি:) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম ওলী উদ্দিন আবু যায়েদ আবদুর রহমান ইবনে মুহম্মদ ইবনে খালদুন আল-হাযরামী। এ নামের মধ্যে 'ওলী উদ্দিন' তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদত্ত উপাধি; যার অর্থ হল 'ধর্মের অভিভাবক'। আবু যায়েদ তাঁর ডাকনাম; মূল নাম আবদুর রহমান এবং তাঁর পিতার নাম মুহম্মদ। তাঁর পিতামহের নামও ছিল মুহম্মদ। ইবনে খালদুন তাঁর পারিবারিক নাম আর এ নামেই তিনি সর্বত্র পরিচিত। এর মূলে 'খালদুন' পরিবারের সর্বব্যাপী সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি ক্রিয়াশীল ছিল। দীর্ঘকাল ধরে এ পরিবার স্পেনে ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় উচ্চ রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে ও খ্যাতি ও প্রতিপত্তি গড়ে তুলেছিলেন। তবে ইবনে খালদুনের পূর্বপুরুষ 'খালদুন' নামীয় এ ব্যক্তিটি ঠিক কত পুরুষ পূর্বে সশরীরে বর্তমান ছিলেন, সে সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। এমনকি এ খালদুনই দক্ষিণ আরবের হাদ্রামাত থেকে স্পেনে এসেছিলেন কিনা, তাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়নি। তবু এ কথা ঠিক যে, ইবনে খালদুনের পূর্বপুরুষরা একসময়ে দক্ষিণ আরবের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁর 'আল-হাযরামী' উপাধির মধ্যে সে ইতিহাসেরই ইঙ্গিত বিদ্যমান। সম্ভবত তাঁর এ বংশগত পরিচয়ের কল্যাণেই তিনি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার আরব-বেদুইন গোত্রগুলোর উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তারের অধিকারী হন।

যদ্দুর জানা যায়, খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে স্পেন বিজয়ের সময় ইবনে খালদুনের পূর্বপুরুষ ভাগ্যান্বেষণে স্পেনে গিয়ে উপস্থিত হন। স্পেনীয় ঐতিহাসিক ইবনে হজমের মতে খালদুনের এ পূর্বপুরুষের নাম ছিল 'খালেদ' এবং এ খালেদ শব্দটিই 'খালদুন' উচ্চারিত হয়ে শেষ পর্যন্ত 'খালদুন'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য ইবনে খালদুন স্বয়ং তাঁর আত্মজীবনীতে এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলেননি। বরং তিনি যেভাবে খালদুন বংশের প্রতিষ্ঠাতা পূর্বপুরুষ থেকে নিজেকে অধস্তন দশম পুরুষ ধরে সংখ্যা গণনা করেছেন, তা সন্দেহের উদ্রেক করে। কারণ আল-মুকাদ্দিমায় এ সম্পর্কে তাঁর নিজের বর্ণিত নিয়ম অনুসারে এক শতাব্দীতে তিন পুরুষ ধরলেও এ সংখ্যা নিতান্তই কম বলে মনে হয়।

সে যাই হোক, স্পেনে আসার পর খালদুনের সেই স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ 'কারমোনা'তে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তখন এ পরিবারটির সদস্যরা ভাগ্যান্বেষণের কোন্ পর্যায়ে ছিলেন তা জানা না গেলেও খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ দিকে কুরাইব ইবনে খালদুনের আবির্ভাবে এ পরিবারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইনি তৎকালীন উমাইয়া শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শেভিলায় একটি অর্ধস্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। প্রায় একদশক রাজ্য শাসনের পর ৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে উক্ত কুরাইব নিহত হলেও বলতে গেলে এ অর্ধস্বাধীন নরপতিই খালদুন পরিবারের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা। কারণ, এর পরে উক্ত পরিবার বিভিন্ন সময়ে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েও তাদের খ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হয়। এ সময় থেকেই এ পরিবারের সদস্যরা শুধু রাজনীতি নয়, জ্ঞানগুণের চর্চাতেও সুনাম অর্জন করতে থাকেন। এ জন্যই দেখা যায় খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে শেভিলার কর্তৃত্ব বলতে গেলে এ খালদুন পরিবারকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। অবশ্য তাদের এ প্রকার প্রভাব-প্রতিপত্তির ধারাবাহিক কোন ইতিহাস নেই। এর কারণ হিসাবে খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খালদুন পরিবারের স্পেনের বাস্তুত্যাগকে দায়ী করা হয়। এ সময় আতঙ্কগ্রস্ত খালদুন পরিবারের অনেক ঐতিহ্যচিহ্নই বিনষ্ট হয়েছে।

তবে একথা সত্য যে, তৎকালীন নিয়মানুসারে নগর কর্তৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ক্ষমতা ছিল অপরিহার্য। এজন্য ধারণা করা যায় যে, খালদুন পরিবারে বহু ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁরা শিক্ষা-দীক্ষায় সমসাময়িককালে সকলের আদর্শস্থানীয় যে ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। একাদশ শতাব্দীতে আমরা খালদুন পরিবারের এমনি একজন স্বনামধন্য ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই। ইনি আবু মুসলিম আমর ইবনে আহমদ ইবনে খালদুন। ৪৪৯ হিজরিতে শেভিলায় তাঁর মৃত্যু হয়। ইনি বিখ্যাত বিজ্ঞানী মাসলামা আল মাজরিতীর শিষ্য ছিলেন এবং এতদ্বিষয়ে তাঁর নিজেরও খ্যাতি ছিল। ইবনে খালদুন তাঁর এ পূর্বপুরুষের নাম শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করেছেন। ইনি বিখ্যাত কুরাইব ইবনে খালদুনের ভ্রাতা মুহম্মদের ষষ্ঠ অধস্তন পুরুষ ছিলেন।

এমনিভাবে প্রায় সুদীর্ঘ পাঁচশত বছরের ঐতিহ্য বহন করে খালদুন পরিবার যখন সর্বত্র সুপরিচিত ও সম্মানিত এবং শেভিলার নগরজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন তথাকার আলমোহেদ শাসনের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। খ্রিস্টানদের অগ্রাভিযান ক্রমশ স্পেনের মুসলিম শাসনকে সংকুচিত করে আনতে থাকে। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে খালদুন পরিবার উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার নিরাপদ পরিবেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। অবশ্য সেখানেও তাঁরা অপরিচিত ছিলেন না। তদুপরি তাদের এক আত্মীয় ইবনুল মুহতাসিব ছিলেন আফ্রিকার এ অঞ্চলেরই অধিবাসী। তিনি এক সময়ে তথাকার হেফসী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়াকে একটি ক্রীতদাসী উপহার দিয়েছিলেন। কালক্রমে এ ক্রীতদাসীই সম্রাটের কতিপয় সন্তানের জননী হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে উক্ত ইবনুল মুহতাসিব সম্রাট পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন। খালদুন পরিবার ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় আশ্রয় গ্রহণকালে এ ঘনিষ্ঠতা যথেষ্ট সহায়ক হয়। এ

ছাড়া স্পেনে অবস্থানকালে তাঁদের পারিবারিক কৃতিত্ব এ ভিন্ন পরিবেশেও তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা লাভকে সহজ করে তুলে। সুতরাং খালদুন পরিবার আফ্রিকায় এসেও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথেই বসবাস করতে আরম্ভ করেন।

তদুপরি শুধু এক খালদুন পরিবারই নয়, বরং স্পেনের বহু গণ্যমান্য পরিবার একই কারণে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। বস্তুত তাদের আগমনের ফলে স্পেনের সভ্যতা-সংস্কৃতির এক ব্যাপক প্রভাব উক্ত অঞ্চলের জনজীবনে অনুভূত হতে থাকে। ইবনে খালদুন তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় এ সম্পর্কে বারংবার উল্লেখ করেছেন। এর ফলে একদিকে যেমন তৎকালীন আফ্রিকার শিক্ষা-দীক্ষায় নতুন চৈতন্যের সৃষ্টি হয়, তেমনি অন্যদিকে এরই কল্যাণে এ স্পেনীয় মুসলিমরা আফ্রিকার রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন। সম্ভবত এ কারণেই উক্ত আশ্রয় গ্রহণের ঘটনার প্রায় একশ বছর পরে জন্মগ্রহণ করেও ইবনে খালদুন স্পেনের এ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর জন্মভূমি আফ্রিকা হলেও মূলত ইবনে খালদুন ছিলেন স্পেনের মানস সন্তান। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে স্পেনের অধিকতর আধিপত্যই এর কারণ। তদুপরি তুলনামূলকভাবে খালদুন পরিবারের স্পেনে বসবাসের দীর্ঘকালীন ঐতিহ্যও এর সাথে যুক্ত হয়েছে। এর ফলেই ইবনে খালদুনের সত্তার দ্বিধাবিভক্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে। সে যাহোক, তবে একথা সত্য যে, তাঁর এহেন দৈহিক ও মানসিক দ্বিধাবিভক্তি তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে এক অদ্ভুত বৈচিত্র্য দান করেছে। হয়ত এর জন্যই তিনি আফ্রিকার সম্রাটদের দরবারে উচ্চ রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত থেকেও তাকে তার নিজের কর্তব্য বলে ভাবতে পারেননি; বরং সর্বদাই তার এ প্রকার কর্মে নিয়োগকে নিতান্ত চাকরি বলে মনে করেছেন এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় আনুগত্যের অধিক কোনো প্রকার দায়িত্ববোধে নিজকে জড়িত করেননি। তদুপরি আফ্রিকার সাথে তাঁর এ প্রকার মানসিক বিচ্ছিন্নতা তাঁকে তাঁর চোখের সম্মুখে আবর্তিত ঘটনাবলিকে অনেকটা নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে সাহায্য করেছে। এমনকি যে সকল ব্যাপারে তিনি স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেছেন, সেখানেও তাঁর নিরাসক্তি লুক্কায়িত থাকেনি। এর ফলেই ইবনে খালদুন কখনো আফ্রিকা, কখনো স্পেন এবং জীবনের শেষকাল মিশরে অতিবাহিত করেছিলেন।

স্পেন ত্যাগ করে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় এসেছিলেন ইবনে খালদুনের পিতামহের পিতামহ হাসান ইবনে মুহম্মদ। তিনি এখানে এসে প্রথমদিকে কিছুকাল সিওটায় বসবাস করেন। সম্ভবত এ নতুন পরিবেশের অবস্থা যাচাই করে মনস্থির করার প্রয়োজন ছিল। শেষ পর্যন্ত হেফসী সম্রাট আবু জাকারিয়ার দরবারে যোগ দিতে মনস্থ করেন। মক্কায় হজ্বব্রত সমাপন করে হাসান ইবনে মুহম্মদ 'বন'-এ সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হলে সম্রাট তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী একটি জায়গীরও দান করেন। এভাবে হেফসী সম্রাটদের সাথে খালদুন পরিবারের সখ্যতার সূত্রপাত হয় এবং কালক্রমে তাঁদের খ্যাতি ও সমৃদ্ধি দেখা দেয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও উক্ত পরিবারের সদস্যরা শান্তিতে বসবাস করতে পারেননি। ইবনে খালদুনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পূর্বপুরুষের অনেকেই এ হেফসী সম্রাটদের মধ্যকার বিদ্রোহ বিপ্লবে বিপর্যস্ত হয়েছে। তবু তাঁদের মধ্যে বিজয়ী পক্ষের সাথে যুক্ত থাকার একটা অভ্যাস ছিল বলে এ প্রকার সাময়িক

বিপর্যয়ের পর আবার সুদিন ফিরে এসেছে। পারিবারিক ঐতিহ্যের এ বিশেষ দিকটি আমরা ইবনে খালদুনের মধ্যেও লক্ষ করব।

ইবনে খালদুনের পিতামহের পিতামহ হাসান সম্রাট আবু জাকারিয়ার শাসন আমলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর পুত্র আবু বকর উচ্চ রাজকীয় পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন 'সাহিবে আশগাল' বা অর্থমন্ত্রী। কিন্তু হেফসী সম্রাটদের বিরুদ্ধে আমীর আবু উমারার বিদ্রোহের সময় তিনি ধৃত ও নিহত হন। এ দুর্ঘটনা যতই মর্মান্তিক হোক, এর থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, উক্ত আবু বকর খালদুন পরিবারের অন্যান্য সদস্য অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী ছিলেন। অন্যদিকে শুধু রাজনীতি নয়, জ্ঞানের চর্চাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি সরকারি লেখকদের রীতিনীতি সম্পর্কীয় একটি পুস্তিকাও রচনা করেন। তাঁর এ পুস্তিকার বিষয়বস্তু যতই সীমাবদ্ধ হোক না কেন, স্বয়ং ইবনে খালদুনের বর্ণনা অনুসারে মনে হয়, তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের এ রচনা থেকে প্রভূত অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

খালদুন পরিবার রাজকার্যের প্রয়োজনে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে বসবাস করতে বাধ্য হলেও তিউনিসেই তাদের স্থায়ী নিবাস গড়ে তুলেছিলেন। এখানেই উক্ত আবু বকর ধৃত ও নিহত হন। তাঁর পুত্র অর্থাৎ ইবনে খালদুনের পিতামহের নাম ছিল মুহম্মদ। তিনি 'নায়েবে হাজেব' বা সহকারী দ্বাররক্ষীর একটি সাধারণ পদমর্যাদায় সন্তুষ্ট ছিলেন। তথাপি তাঁর পৌত্রের বর্ণনা অনুসারে বোঝা যায়, এ ধরনের একটি সামান্য পদে অবস্থান করলেও হেফসী সম্রাটরা তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতেন এবং এ কারণে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব ছিল অসামান্য। এর ফলশ্রুতি হিসাবে শেষ জীবনে তাঁকে উচ্চতর পদমর্যাদা দান করা হয়; কিন্তু তিনি নিজেই তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। সম্ভবত তাঁর পিতার করুণ পরিণতি তাঁকে উচ্চপদ লাভের লোভ সংবরণ করতে উৎসাহিত করে থাকবে। এর ফলে তিনি শান্তিতে অবসর জীবন-যাপন করার সুযোগ পান এবং ধর্মে কর্মে মনোযোগ দেন। ৭৩৭ হিজরিতে পরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

বস্তুত ইবনে খালদুনের এ শান্তিপ্রিয় সম্মানিত পিতামহের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানেই তাঁর পিতা মুহম্মদ পাণ্ডিত্য অর্জনে উৎসাহিত হয়েছিলেন। তিনি কোরান ও ধর্মীয় শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং আরবি ব্যাকরণ ও সাহিত্যেও তাঁর দক্ষতা ছিল। এ কারণেই রাজকীয় পদমর্যাদা বা রাজনীতির প্রতি তিনি নিরাসক্ত ছিলেন। ১৩৪৮—৪৯ খ্রিস্টাব্দের সর্বগ্রাসী প্লেগ মহামারীতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র ইবনে খালদুনের বয়স তখন সতের বছর। পরবর্তীকালে ইবনে খালদুন তাঁর আত্মজীবনীতে পিতার গুণগ্রাম সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। বস্তুত এ মন্তব্যের মধ্যে শুধু পিতার প্রতি পুত্রের আবেগের বহিঃপ্রকাশ নয় ঐতিহাসিক সত্যও বিদ্যমান। কারণ, পিতার আনুকূল্য ও আগ্রহেই ইবনে খালদুন তাঁর মেধা বিকাশের সহায়ক পরিবেশ লাভ করেছিলেন। তৎকালীন প্রথা অনুসারে প্রতিটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্তাই স্বীয় সন্তান-সন্ততির জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসা পোষণ করতেন। কিন্তু ইবনে খালদুনের পিতা শুধু অনুসন্ধিৎসু ছিলেন না, তিনি নিজেও পুত্রদের শিক্ষাদানে অংশগ্রহণ করেছেন।

সম্ভবত এর ফলেই পিতামহ ও পিতার এ পুণ্য প্রভাব ইবনে খালদুনের জীবনে এমন সুফল প্রসব করেছে; তিনি এমনভাবে অতুলনীয় পাণ্ডিত্য ও রাজকীয় পদমর্যাদার যে গুণাবলিতে বিভূষিত হয়ে উঠতে পেরেছেন। পরিবারের প্রভাব কীভাবে বংশধরদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, ইবনে খালদুনের মধ্যে আমরা তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লাভ করতে পারি।

পারিবারিক ঐতিহ্যগত প্রভাবের কথা বলছি এ কারণে যে, তৎকালীন যুগ পরিবেশে শিক্ষা-দীক্ষার যে প্রচলন ও প্রতিপত্তি ছিল, তা ছিল একান্তই ক্ষয়িষ্ণু। বিশেষ করে খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগের প্লেগ মহামারীর তাণ্ডবলীলা সে ক্ষয়কে আরো অবধারিত করে এনেছিল। ইবনে খালদুন তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় এ সম্পর্কে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ বর্ণনা দান করেছেন এবং জনবসতির অভাবে কীভাবে সর্বপ্রকার শিল্পকর্মও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তারও উদাহরণ উপস্থিত করেছেন। সুতরাং উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার জনজীবনে যে এর প্রভাব পড়েছিল, সেকথা উল্লেখ না করলেও চলে। তবু ইবনে খালদুনের সৌভাগ্য বলতে হবে যে, তিনি এ বিলীয়মান শিক্ষাদীক্ষা থেকেও নিজের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। একারণেই তাঁর পিতার নিকট শিক্ষালাভের সৌভাগ্য অর্জন ও তাঁর পুণ্য প্রভাবকে নিজের জীবনে গ্রহণ করেও ইবনে খালদুন তাঁর অন্যান্য শিক্ষকদের কথাও সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। কারণ, তৎকালে ধর্মীয় বিধান দান ও অন্যান্য ব্যাপারে মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের এ পরিচিতির একটি প্রথাগত ব্যাপক মূল্য ছিল। যে কোনো বিষয়ে মন্তব্য প্রদানের সূত্র হিসাবে এ শিক্ষকদের কথা উল্লেখ করতে হত। এ কারণে ইবনে খালদুনও সে প্রথাকে যথাযথ অনুসরণ করেছেন। তবু তাঁর শিক্ষকদের বিবরণ দানের ক্ষেত্রে স্পেনীয় কিংবা তৎসংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা যে ধরনের ধারাবাহিক উল্লেখের মর্যাদা পেয়েছেন, অন্যরা তেমনটি পাননি। এর কারণ ইতিপূর্বেও একবার উল্লেখ করেছি; ইবনে খালদুন মনন ও মানস প্রক্রিয়ার দিক থেকে স্পেনের সাথেই অধিকতরভাবে যুক্ত ছিলেন।

ইবনে খালদুনের প্রাথমিক শিক্ষার ধারা প্রথাগতভাবেই আরম্ভ হয়। তিনি মুহম্মদ ইবনে সাদ ইবনে বোর্রাল-এর তত্ত্বাবধানে কোরান ও কোরান সম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানার্জনে ব্রতী হন। আরবি ভাষার শিক্ষক হিসাবে প্রথমেই তাঁর পিতার নাম উল্লেখ করতে হয়। তিনি ছাড়াও এ ব্যাপারে তাকে আরো বহু শিক্ষকের সহায়তা লাভ করতে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ ইবনে আল আরবি আল হাসায়রী, মুহম্মদ ইবনে আশ্‌শাওয়াশ আজ্জারজালী, আহমদ ইবনে আল আস্‌সার এবং মুহম্মদ ইবনে বাহর প্রমুখ জ্ঞানীদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত শিক্ষক ইবনে খালদুনকে আরবি কাব্যেও পাঠদান করেছিলেন। সম্ভবত তাঁর আগ্রহাতিশয্যেই ইবনে খালদুন কাব্য রচনা ও কাব্য সমালোচনার দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর আল-মুকাদ্দিমার শেষ অধ্যায়ে আমরা তাঁর কাব্য সমালোচনার পরিচয় লাভ করি। তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর কাব্যসাধনার পরিচয় থাকলেও আল-মুকাদ্দিমায় এর কোন উদ্ধৃতি নেই। এখানে তিনি তাঁর সমসাময়িক বহু কবির কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন; কিন্তু নিজের কবিতার উদ্ধৃতি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। তাঁর এ সংযম আমাদেরকে শুধু বিস্মিত করে না, তাঁর বিচক্ষণতারও পরিচয় বহন করে।

ইবনে খালদুনের সমসাময়িককালে হাদিসশাস্ত্র ও ফেকাহশাস্ত্র অত্যন্ত পরিণত বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। এতদুভয় বিষয়ের বিস্তার ও ব্যাপ্তি বিচিত্র শাখা-প্রশাখায় আচ্ছন্ন হয়ে জটিল আকার ধারণ করেছিল। আল-মুকাদ্দিমায় এ সকল বিষয়ের আলোচনায় ইবনে খালদুন এ জটিলতার পরিচয় তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে মালেকী মজহাব সম্পর্কে তাঁর আলোচনা সবিস্তারে উপস্থিত হয়েছে। কারণ তিনি নিজেও এ মজহাবের অনুসারী ছিলেন। এ কারণেই পূর্বোক্ত বিষয়াবলি অপেক্ষা এ দুটি বিষয়ে ইবনে খালদুনের শিক্ষকদের পরিচয় তুলনামূলকভাবে অধিকতর খ্যাতিযুক্ত। হাদিসশাস্ত্রের ইবনে খালদুনের শিক্ষক ছিলেন শামসউদ্দিন মুহম্মদ ইবনে জাবির ইবনে সুলতান আলওয়াদিওয়ালী এবং ফেকাহশাস্ত্রে তাঁকে শিক্ষাদান করেছিলেন মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আজ্জাইয়ানী, মুহম্মদ আল কাশীর ও বিখ্যাত মুহম্মদ ইবনে আবদুস্ সালাম আলহাওয়ারী (১২৭৮-১৩৪৮ খ্রি:)।

কিন্তু ইবনে খালদুনের শিক্ষালাভের এ ধারাবাহিকতা খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ একান্তই অশান্ত হয়ে উঠে। ইবনে খালদুনের জন্মের পূর্বকাল থেকে আরম্ভ করে শৈশবকাল পর্যন্ত প্রায় অস্থিতিশীল হেফসী সাম্রাজ্য বারংবার ভাঙাগড়ার সম্মুখীন হয়েও কোনো প্রকারে টিকে ছিল; এ সময়ে তা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। তিউনিসের বুক থেকে তা বলতে গেলে নিশ্চিহ্নই হয়ে যায়। ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে ফেজের মারিনী সম্রাট আবুল হাসান তিউনিস অধিকার করেন। তিনি ১৩৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিলমিসানের আবদুল ওয়াদিদ রাজ্যের শাসক হিসাবে শক্তি সঞ্চয় করে আসছিলেন। কিন্তু এ বিজয়ের পরবর্তী বছরই কায়রোয়ানের আরব বেদুইনদের হাতে পরাজিত হয়ে আবুল হাসান তিউনিসের অধিকারও ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হন। এর ফলে তথাকার হেফসী শাসনের ভাগ্যে পরিবর্তন দেখা দিলেও তা তার দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মারিনী সম্রাট আবুল হাসানের পুত্র আবু ইনান ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় তিউনিস বিজয় করতে সক্ষম হন। অবশ্য তাঁর এ বিজয়ও ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। কারণ তখন হেফসী সাম্রাজ্য নতুন শক্তিতে জাগ্রত হবার চেষ্টা করছে। এরই ফলে আবু ইনানের মৃত্যুর পর হেফসী সাম্রাজ্যের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের পথে সামান্য বাধাবিপত্তি ছাড়া খুব বড় কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হয়নি।

অবশ্য ইবনে খালদুনের জীবনে এ প্রকার রাজনৈতিক উত্থান-পতনের চাইতেও বেশি প্রভাব বিস্তার করে সেই সর্বনাশা মহামারী, যার কথা আমরা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি। এ মহামারীতে তিনি তাঁর সুযোগ্য অভিভাবক পিতাকে হারান। তাঁর মাতাও এ মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তদুপরি এ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে তাঁর অধিকাংশ শিক্ষক ইহলোক ত্যাগ করেন। এভাবে তাঁর চতুর্দিকের সম্পূর্ণ পৃথিবীই এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। সুতরাং এমতাবস্থায় ইবনে খালদুনের শিক্ষার ধারাবাহিকতা যে ব্যাহত হবে, এ আর বিচিত্র কি!

বস্তুত শৈশবকালীন শিক্ষা যে কোনো শিশুমনে একটা পরোক্ষ প্রভাবই সৃষ্টি করে থাকে। সে তখন একান্ত অনুকরণপ্রিয়। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রভাব গ্রহণের যে যোগ্যতা, তা আসে অনেক পরে। বিশেষ করে মননশীলতার যে পর্যায় মানুষের

জীবনকে স্বনিয়ন্ত্রিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে, এর জন্য আমরা তার বয়সের একটি বিশেষ সন্ধিকালকে চিহ্নিত করতে পারি আর এ হল তার পনেরো থেকে পঁচিশ বছরকালীন বয়ঃক্রম। এ সময়েই সে শিক্ষাদীক্ষা শেষ করে জীবিকা অর্জনের পথে অগ্রসর হয়। এবং তার ভবিষ্যৎ জীবনধারা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিশেষ খাতের সৃষ্টি করে। এ কারণেই এ সময়ে তার শিক্ষা জীবন বা জীবন পরিবেশে অশান্তির মাত্রা বেশি থাকলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি জীবন সংগ্রামেও তার নিজস্ব পরিমণ্ডল বেছে নিতে অপারগতা দেখা দেয়। এদিক থেকে ইবনে খালদুনের বিষয়টি বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাব তাঁর এ বিশেষ বয়ঃক্রম ১৩৪৭ থেকে ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পড়েছে। আর আমরা এ-ও লক্ষ্য করেছি যে, এ সময় তাঁর জীবন পরিবেশ ছিল একান্তই অশান্ত ও বেদনাহত। তবু এমনি সর্বনাশা পরিবেশের অশুভ প্রভাবকে ইবনে খালদুন কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করেছেন। তিনি যদি সাধারণ হতেন, তা হলে এ প্রভাবের দুর্বহ যাতনা থেকে মুক্তি পাওয়া তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হত না। কিন্তু তিনি অসাধারণ ছিলেন বলেই এ মরুসদৃশ পরিবেশ থেকেও তাঁর উদগ্র জ্ঞানপিপাসা জীবনরস সংগ্রহ করে নিয়েছে।

১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে মারিনী সম্রাট আবুল হাসানের তিউনিস বিজয়ের সময় অনেক স্বনামধন্য পণ্ডিত ব্যক্তিই তাঁর সাথে তিউনিসে এসে প্রবেশ করেছিলেন। বিজয়ের পরবর্তী পর্যায়ে ইবনে খালদুন তাঁদের সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করেন এবং সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের অনেকের পাণ্ডিত্যই তাঁকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এর থেকে মনে হয় তাদের মধ্যে পাণ্ডিত্যের একটি আকর্ষণীয় দিক ছিল! কিন্তু এখানে-সেখানে তাদের সামান্য উল্লেখ ছাড়া তাদের যোগ্য কোনো রচনার সন্ধান পরবর্তীকালে পাওয়া যায়নি। তবু ইবনে খালদুন যাঁদের কাছে একান্ত সক্রিয় আগ্রহে শিক্ষালাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মুহম্মদ ইবনে সুলায়মান আসসাতী, আব্দুল মোহাইমিন ইবনে মুহম্মদ আল-হাযরামী এবং বিশেষভাবে মুহম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আল-আবিলীর (১২৮৩-১৩৫৬ খ্রি:) নাম উল্লেখযোগ্য। এ শেষোক্ত শিক্ষককে ইবনে খালদুন তাঁর প্রধান শিক্ষক বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর এ সুযোগ্য শিক্ষকের পাণ্ডিত্যে এতদূর মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, মনে হয়, তাঁর মাতৃভূমি তিউনিস ত্যাগের পশ্চাতে এ শিক্ষকের প্রভাব বিদ্যমান। বস্তুত এ ক্ষেত্রে তিনি এ মান্যবর শিক্ষকের পদাংক অনুসরণ করেছেন। তাঁর তিউনিস ত্যাগ তাঁর প্রিয় শিষ্যের মনেও জন্মভূমি ত্যাগের বাসনা জাগিয়ে তুলেছে।

উপরোক্ত জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তিরা ছাড়াও সম্রাট আবুল হাসানের সঙ্গে আরো অনেক জ্ঞানীগুণী তিউনিসে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ ইবনে রেদোয়ান আল মালাকী ছিলেন ইবনে খালদুনের প্রায় সমবয়সী। অন্যান্যের মধ্যে মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ ইবনে সাব্বাগ এবং মুহম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মারজুক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন। এ শেষোক্ত জনের সঙ্গে ইবনে খালদুনের খুব একটা সৎভাব ছিল না। অবশ্য এঁদের কাউকেই তিনি শিক্ষক বলে উল্লেখ করেননি।

সে যাহোক, সাময়িকভাবে এমনি ধরনের জ্ঞানীগুণী শিক্ষকদের সান্নিধ্য লাভ করে ইবনে খালদুনের জ্ঞানার্জনের পিপাসার নিবৃত্তি হয়নি। তিনি আরো অনেকের কাছ থেকে

আরো অনেক কিছু জেনে নেবার জন্য ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হয়ে উঠেন। বস্তুত তিউনিসের পরিবেশ আর তাঁর আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল না। পিতা-মাতা নেই; বড় ভাই মাহম্মদ পরিবারের কর্তা হলেও তাঁদের স্থান পূরণ করতে পারছিলেন না। তদুপরি হেফসী সাম্রাজ্যের পতিত অবস্থা পরিবেশকে আরো বেদনাতুর করে তুলেছিল। ইবনে খালদুন কোনোক্রমেই এ অবস্থার পরিবর্তন কল্পনা করতে পারেননি; যদি তিনি তা করতে পারতেন এবং তাঁর সংগৃহীত জ্ঞানের পুঁজি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন, তাহলে তিউনিসে থেকেই তিনি এ বেদনাহত পরিবেশের অনিবার্যতাকে কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করতেন। হয়ত বা খ্যাতিমান খালদুন পরিবারের এক সুযোগ্য সন্তান হিসাবে তিউনিসের সম্রাটদের সভাসদরূপে তাঁর জীবন কাটিয়ে দিতেন। আর তা হলে তাঁর পক্ষে বাইরের পৃথিবীর বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ ও আল-মুকাদ্দিমার ন্যায় মহৎগ্রন্থ রচনা কোনোকালেই সম্ভব হয়ে উঠত না।

সম্রাট আবুল হাসান তিউনিসের অধিকার ত্যাগ করার পর দুর্বল হেফসী সম্রাটরা ইবনে তাফরাজীন নামীয় এক সামন্তের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছিলেন। ইবনে খালদুন পারিবারিক প্রথা অনুসারে এ সামন্তের দরবারেই একটি সামান্য পদে যোগদান করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বিশ বছর। তাঁর এ পদটির নাম ছিল 'সাহিবে আলামা'; অর্থাৎ সরকারি পত্রাদির প্রথমে তিনি বড় বড় অক্ষরে 'আল্ হামদু লিল্লাহ্' এবং শেষে 'আশ্‌শুকরু লিল্লাহ্'—এ বাক্য দুটি লিখতেন। বস্তুত এ পদটির তেমন কোনো কার্যকর গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু এর সহায়তায় তিনি প্রায় প্রতিটি রাজকীয় গোপনীয়তায় অংশগ্রহণ করতে পারতেন এবং প্রয়োজনে পরামর্শ দেবার সুযোগও পেতেন। এদিকের প্রতি লক্ষ করলে বলতে হয়, এ পদটির একটি বিশেষ তাৎপর্য ছিল এবং এর মাধ্যমে ইবনে খালদুন ইচ্ছা করলে বৃহত্তর রাজনৈতিক সুবিধা সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু কোনো কিছুই ইবনে খালদুনের তৎকালীন মানসিক অস্থিরতাকে দূর করতে পারেনি; এমনকি বড় ভাই মুহম্মদের প্রলোভন বাক্যও তাঁকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়নি। নতুনতর পদমর্যাদার প্রলোভন, বড় ভাইয়ের অসন্তুষ্টি আর জন্মভূমির মায়া সকল কিছুর বাধা এড়িয়ে ইবনে খালদুন ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময়ে তিউনিস ত্যাগ করে চলে যান।

তখন তিউনিসের হেফসী সম্রাটদের এক প্রতিদ্বন্দ্বী কুস্তানতুনিয়ার জনগণের প্ররোচনায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর এ বিদ্রোহ দমনে তিউনিস থেকে যে সৈন্যদল প্রেরিত হয়, তার সাথে ইবনে খালদুনও ছিলেন। সৈন্যদলের অগ্রযাত্রার হৈ-হুল্লোড়ের মাঝে সুযোগ বুঝে তিনি পালিয়ে যান এবং খালদুন পরিবারের খ্যাতির কল্যাণে এমনিভাবে পলায়ন করেও তিনি যোগ্য ব্যক্তিদের সহায়তা লাভে সক্ষম হন। কিছুদিন তিনি আবার আলমোরারিতী শায়খদের সান্নিধ্যে কাটান। সেখান থেকে সিওটা ও কাফসা হয়ে বিস্করায় উপস্থিত হন। এ সময়েই বিভিন্ন আরব বেদুইন গোত্রের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। কিন্তু এ ধরনের উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ তাঁর মনকে ক্রমশ অস্থির করে তুলে। ফলে তিনি স্থায়ী আশ্রয়ের জন্য ফেজের মারিনী সম্রাট আবু ইনানের দরবারে উপস্থিত হন। যদ্দুর মনে হয়, তাঁর এ প্রথম সাক্ষাৎ তেমন ফলপ্রসূ হয়নি; যার

ফলে ইবনে খালদুন সামন্ত ইবনে আবু আমরের সাথে বগিতে চলে যেতে বাধ্য হন। ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকাল পর্যন্তই তিনি বগিতে কাটান। এ সময়েই সামন্ত ইবনে আবু আমরের মাধ্যমে ইবনে খালদুন সম্রাট আবু ইনানের আমন্ত্রণলিপি লাভ করেন। এতে তাঁকে মারিনী সম্রাটের দরবারী জ্ঞানীগুণীদের একজন হয়ে যোগদান করতে বলা হয়। ইবনে খালদুন এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন এবং যথাসময়ে ফেজের রাজকীয় দরবারে উপস্থিত হন।

রাজকীয় দরবারের অন্যতম জ্ঞানী হিসাবে ফেজে ইবনে খালদুনের সময় ভালভাবেই কাটছিল। এখানে তিনি আরো অনেক জ্ঞানীগুণীর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁর জ্ঞানের পিপাসা মিটিয়ে নিতে সক্ষম হন। এখানেই তিনি বিশিষ্ট কোরানবিদ মুহম্মদ ইবনে আস্‌সাফফার-এর সাক্ষাৎ পান এবং এখানেই তিনি বিখ্যাত পণ্ডিত মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ আল-মাক্কারীর সান্নিধ্যে আসেন। এ শেষোক্ত গুণী অন্য আরো অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির ন্যায় নিজের জন্মতারিখ প্রকাশ করাকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। তাঁর মতে প্রকৃত জ্ঞানীর জন্ম ও মৃত্যু বলে কিছু নেই। এ বিশিষ্ট জ্ঞানী ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ অথবা ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে তাঁর মরদেহ ত্যাগ করেন। যাহোক, এখানে ইবনে খালদুন বিশিষ্ট পণ্ডিত মুহম্মদ ইবনে আহমদ আলবীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। জনশ্রুতি অনুসারে ইনি ইবনে খালদুনের তিউনিসের বিশিষ্ট শিক্ষক মুহম্মদ ইবনে আব্দুস্ সালামকে দর্শনবিজ্ঞানের ন্যায় বিতর্কমূলক বিষয়ে শিক্ষাদান করেছিলেন। এ ছাড়া স্বল্প পরিচিত কাজী মুহম্মদ ইবনে আবদুর রাজ্জাক এবং মুহম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া আল বারজীও এ সকল জ্ঞানীগুণীর মধ্যে ছিলেন। স্পেনের ইবনে খত্তিবের অনুরোধে এ সময়ে ইবনে খালদুন আল বারজীর কবিতার একটি সংকলন সেখানে পাঠান এবং সেটি ইবনে খত্তিব রচিত গ্রানাডার ইতিহাসে কবিদের পরিচিতি অধ্যায়ে সংযোজিত হয়।

ফেজে অবস্থানকালে ইবনে খালদুন আরো যে সকল জ্ঞানীর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্র বিশারদ ইব্রাহিম ইবনে জারজারও ছিলেন। ১৩৬৪ সনে পুনরায় এ বিশিষ্ট পণ্ডিতের সঙ্গে শেভিলার পেড্রো দি ক্রয়েলের দরবারে ইবনে খালদুনের দেখা হয়। ফেজে তিনি মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে শরীফ মুহম্মদ ইবনে আহমদ আসসবতীকে (১২৯৪-১৩৫৯) দেখতে পান এবং ১৩৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মতো তাঁর বিশিষ্ট শিক্ষক আবুল বরকাত মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ আল বালফিফীর সান্নিধ্যে আসেন। এ বিশিষ্ট জ্ঞানীর কথা ইবনে খালদুন তাঁর আল মুকাদ্দিমায় বারংবার শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করেছেন। এ প্রথম সাক্ষাতে ও পরবর্তীকালে ১৩৬১ খ্রিস্টাব্দে ইবনে খালদুন তাঁর নিকট ইমাম মালেকের 'মুয়াত্তা' গ্রন্থের পাঠ গ্রহণ করেন এবং তাঁর মিশরীয় শিষ্য ইবনে হজর আস্কালানীর বর্ণনা অনুসারে ইবনে খালদুন তাঁর এ বিশিষ্ট শিক্ষককে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন।

এ সকল বিশিষ্ট জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সান্নিধ্যের কথা আরো ব্যাপকভাবে উল্লেখের প্রয়োজন এ জন্য যে, ইবনে খালদুনের প্রতিভা বিকাশে এঁদের সকলেরই কিছু না কিছু অবদান রয়েছে। আজকের দিনেও আমরা যেমন সাধারণভাবে দেখতে পাই, যে কোনো

জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিত ব্যক্তির ছাত্রাবস্থা কখনো শেষ হয় না; ইবনে খালদুনের সমসাময়িককালেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। বরং তখনকার অবস্থা অনুসারে এ সান্নিধ্যের প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। কারণ তখন পুস্তকাদির এমন ব্যাপক প্রচলন ছিল না। এজন্যই জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিত ব্যক্তিরা যোগ্য কোনো ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভ করতে পারলে তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করতে দ্বিধা করতেন না। তেমনি প্রয়োজন মনে করলে তাঁর যোগ্যতর সহপাঠীদের সাহচর্যেও অবস্থান করতেন। এতে নিন্দনীয় কিছুই ছিল না এবং ইবনে খালদুন নিজে সর্বত্র এ প্রথার যথেচ্ছ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজেও তাঁর সহপাঠীদের সাহচর্যে এসে জ্ঞানের তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন। ১৩৬৩ থেকে ১৩৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গ্রানাডায় তাঁর অবস্থানকাল এজন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এমনকি তাঁর সর্বাপেক্ষা অনিশ্চিত সময়, যখন তিনি ১৩৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দের দিকে বিস্করায় অবস্থান করছেন, তখনও জ্ঞানীদের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ তিনি হাতছাড়া করেননি। তথাকার জনৈক জ্ঞানীর নিকট প্রাপ্ত বিবরণ তিনি তাঁর মুকাদ্দিমায় ব্যবহার করেছেন।

দেশ ভ্রমণ ও বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ যে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিকে প্রসারিত করে এবং তার সংকীর্ণতা দূর করতে সহায়ক হয়, ইবনে খালদুন তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সুতরাং তাঁর নিজের মধ্যে এরই প্রতিফলন আমরা লক্ষ করব। তবু এ কথা হয়ত বলা যায় যে, ফেজে সম্রাট আবু ইনানের দরবারে অবস্থানকালেই ইবনে খালদুনের গঠনমূলক শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে। বস্তুত তাঁর সতের বছর বয়ঃক্রমের পর থেকেই তাঁর শিক্ষা লাভের ধারাকে কোনো প্রকারেই সুবিন্যস্ত বলা যায় না। বরং বলতে হয়, তখন থেকেই তিনি যেখানে যা পেয়েছেন কুড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মানস গঠনের দিকে লক্ষ্য করলেও এ প্রকার অবিন্যস্ত শিক্ষার প্রভাবই দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠে। এ কারণেই সম্ভবত তিনি কোনো একটি বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতে পারেননি। বস্তুত ইবনে খালদুন সম্পর্কে তাঁর শত্রুদের প্রচারিত অভিযোগের কথা বাদ দিয়েও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি তৎকালে প্রচলিত কোনো বিষয়েই মৌলিক কিছু যোগ করার চেষ্টা করেননি। অন্তত তাঁর বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ কীর্তি আল-মুকাদ্দিমায় আমরা এর কোনো নিদর্শন খুঁজে পাই না। কিন্তু কোনো একটি বিষয়ে মৌলিক কিছু যোগার করলেও সকল বিষয়কে একত্র করে জীবন সংগ্রামের গভীর রহস্য অনুধাবনে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল একান্ত বিশিষ্ট ও মৌলিক। এ ক্ষেত্রেই তিনি সকলকে অতিক্রম করে তাঁর নিজস্ব চেতনাকে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর এ অন্তর্দৃষ্টিই ঐতিহাসিক দর্শনের ভিত্তিকে সুসংস্থাপিত করেছে।

ফেজো সম্রাট আবু ইনানের দরবারে ইবনে খালদুন পণ্ডিতবর্গের মধ্যেই অবস্থান করছিলেন। সম্রাটের সঙ্গে জুম্মা ও ঈদের নামাজেও তিনি উপস্থিত থাকতেন। তাঁর এ প্রকার বিশেষ সাহচর্যের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সম্রাট তাঁকে রাজকীয় দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু ইবনে খালদুন সম্মতি দিতে ইতস্তত করেন। কাজটি ছিল সম্রাটের নিকট আগত বিভিন্ন আবেদনপত্রে সম্রাটের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা। ইবনে খালদুন উক্ত কাজ থেকে এ বলে পিছিয়ে যাচ্ছিলেন যে, তাঁর পূর্বপুরুষের কেউই এ ধরনের কোনো কাজ করেননি। পদটির গুরুত্ব যাই হোক, আসলে এটি কেরানীর কাজ;

অথচ খালদুন পরিবারের সদস্যরা সর্বদা মন্ত্রণা, প্রশাসন এবং তুলনামূলকভাবে অন্যবিধ উচ্চ রাজকীয় পদ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেননি। এমনকি তিউনিসের রাজদরবারে ইবনে খালদুনের সেই 'সাহিবে আলামা'র পদটিও তুলনামূলকভাবে এর চাইতে গুরুত্ব বহন করত। তদুপরি তিনি তখন জ্ঞানেগুণে অধিকতর খ্যাতিমান হয়ে উঠেছেন। তেইশ-চব্বিশ বছরের একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী গুণী যুবকের জন্য এ ধরনের একটি পদ কিছুতেই যোগ্য নয়। সুতরাং সম্রাট আবু ইনান বাহ্যত তাঁর প্রতি যত সম্মানই প্রদর্শন করুন না কেন, তাঁর মূল্যায়নের এ তাচ্ছিল্যে ইবনে খালদুন মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। অনিচ্ছায় এ পদটি গ্রহণে বাধ্য হয়ে তাঁর বিরক্তি আরো গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠে।

ইতিপূর্বে মারিনী সম্রাট আবু ইনান বগির হেফসী বংশীয় সামন্ত আমীর আবু আবদুল্লাহ্‌কে পরাজিত করে তাঁর রাজ্যপাট অধিকার করে নিয়েছিলেন। আমীর আবু আব্দুল্লাহ্ নজরবন্দী হিসাবে ফেজেই অবস্থান করছিলেন। ইবনে খালদুনের সাম্প্রতিক বিরক্তি তাঁকে উক্ত আবু আব্দুল্লাহ্‌র সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে উৎসাহিত করে। পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে তাঁদের এ বন্ধুত্ব ক্রমশ গাঢ় ও স্থায়ী হয়ে উঠে। এর ফলে সম্রাট আবু ইনান ইবনে খালদুনের আনুগত্যে সন্দিহান হয়ে পড়েন। আর এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারি ইবনে খালদুন কারারুদ্ধ হন। তাঁর এ প্রকার কারাবরণের কিছুকাল পরেই সম্রাট আবু ইনান তিউনিস বিজয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। যদ্দুর মনে হয়, এ অভিযান পরিচালনার পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবেই হেফসী সম্রাটদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন একজন তিউনিসীকে কারারুদ্ধ করা আবু ইনান একান্ত অপরিহার্য মনে করেছিলেন। বিশেষ করে ইবনে খালদুনের শক্তিমত্তা এ পরিপ্রেক্ষিতে যথার্থই ভয়ের কারণ ছিল।

সম্ভবত এ কারণেই তিউনিসের পতনের পরও আবু ইনান তাঁকে মুক্তি দিতে সাহসী হননি। ইবনে খালদুন বারবার তাঁর মুক্তির জন্য আবেদন জানিয়েছেন, দীর্ঘ কবিতা রচনা করে সম্রাটের দরবারে পাঠিয়েছেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। এর ফলে তাঁর কারাবাস প্রায় দুবছরকাল স্থায়ী হয়। সম্রাট আবু ইনানের মৃত্যুর পর ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর তিনি মুক্তি পান। একজন উদীয়মান জীবনশিল্পীর জন্য এ প্রকার দীর্ঘকালের কারাবাস খুবই ক্ষতিকর, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ এর ফলে ইবনে খালদুনের মন ও মননে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এতদসঙ্গে এর অন্য একটি দিকও ছিল আর সেটিই তাঁর এ ক্ষতিকে পুষিয়ে দিয়েছে। বস্তুত এমনি বাধ্যতামূলক নির্জন বাসে অবস্থান করে তিনি জীবন ও জগতের প্রতি এক নতুন দৃষ্টিতে তাকাবার সুযোগ পেয়েছেন। আর এ দৃষ্টিই তাঁকে ইতিহাসের গভীর অরণ্যে জীবনের গতিপথ নির্ধারণে সহায়তা করেছে। সুতরাং যত বেদনাদায়কই হোক না কেনো, এ কারাবাস তাঁকে পরিণামে লাভবান করেছে।

সম্রাট আবু ইনানের মৃত্যুর পর মারিনী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তি তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। পরবর্তী পর্যায়ে মাত্র কয়েক বছরের জন্য একবার একজন উদ্যোগী যুবকের অধীনে এ মক্তির পুনর্জাগরণ ঘটেছিল; নতুবা বলতে গেলে তখন থেকেই মারিনী রাজশক্তি এমন এক দুর্ভাগ্যের শিকারে পরিণত হয়, যা ইবনে খালদুন তাঁর

আলমুকাদ্দিমায় বারংবার ও বিশেষ গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করেছেন। অযোগ্য মারিনী সম্রাটরা প্রধানমন্ত্রীর ক্রীড়নকে পরিণত হন। পরিবেশ এমন বিশৃঙ্খল হয়ে উঠে যে, গোত্রশক্তির অধিকারী যে কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মারিনী পরিবারের যে কোনো একজন সদস্যকে সম্মুখে রেখে রাজ্য বিস্তার ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার খেলায় মেতে উঠেন। স্বয়ং ইবনে খালদুনও অবস্থার চাপে পড়ে এবং তাঁর কারাবাসের সেই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আগ্রহে এ খেলায় যোগ দিতে বাধ্য হন। এখানে একথা বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না যে, রাজনীতির এ পাশা খেলায় তিনি অন্যান্যের চাইতে কম দক্ষ ছিলেন না। পরবর্তী জীবনে ইবনে খালদুন তাঁর ভাগ্যবিপর্যয় ও বাস্তুবিপর্যয়ের জন্য মানুষের ষড়যন্ত্রকে দায়ী করেছেন। এজন্য আমরা এ মহৎ প্রতিভাধরের প্রতি একান্ত সঙ্গত কারণেই সহানুভূতিশীল হতে পারি; তবুও একান্ত শ্রদ্ধার সাথে একথা স্বীকার করে নিতে হবে যে, এ সকল ষড়যন্ত্রের বীজ তিনি নিজেই বপন করেছিলেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে বীজের তিক্ত ফসলই তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে।

সম্রাট আবু ইনান তাঁর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। তখন তিনি তাঁর ভাই আবু সলিমসহ পরিবারের অন্য অনেককে স্পেনে নির্বাসিত করেন। আবু ইনানের মৃত্যুর পর তাঁর প্রধানমন্ত্রী হাসান ইবনে উমর নির্ধারিত উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনে না বসিয়ে সম্রাটের এক শিশুপুত্রকে বসান এবং সমুদয় ক্ষমতা নিজের কুক্ষিগত করে নেন। এ সময় নির্বাসিত আবু সলিম সিংহাসনের দাবি নিয়ে ফিরে আসেন এবং ইবনে খালদুন তাঁর পক্ষ সমর্থন করেন। আবু সলিম ঘামোরার জনগণের সহায়তায় এবং ইবনে খালদুনের সক্রিয় সহযোগিতায় ক্ষমতা হস্তগত করতে সমর্থ হন। পুরস্কার স্বরূপ ইবনে খালদুনকে তাঁর রাজ্যসচিব করে নেন। আবু সলিমের শাসনকালের শেষ পর্যায়ে ইবনে খালদুন 'মাজালিম' বিভাগের দায়িত্বে সমাসীন ছিলেন। এ বিভাগটি মূলত সেসব অন্যায় অবিচারের প্রতিকার করত, যা সরাসরি ধর্মীয় বিধানের আওতায় পড়ে না। তবু এটিই ইবনে খালদুনের প্রথম আইন-আদালত সম্পর্কীয় পদমর্যাদা।

এ সময় ইবনে খালদুন রাজকীয় পদমর্যাদার প্রভাব ছাড়াও গদ্য ও পদ্য রচনার ক্ষেত্রে সুখ্যাতি অর্জন করেন। স্পেনের ইবনে খতিব তাঁর এ সময়কার রাজকীয় ও ব্যক্তিগত পত্রাবলির ভাষা ও বক্তব্যের প্রশংসা করেছেন। এ সময়ে তিনি বহু কসিদা বা দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। নানাদিক থেকে তাঁর জ্ঞান ও গুণের সুখ্যাতি দেখা দেয়। এর ফলে তিনি যেমন অনেক বন্ধু লাভ করেন তেমনি অনেক শত্রুরও সৃষ্টি হয়। সম্রাট আবু সলিমের অন্য এক মন্ত্রী ইবনে মারজুক ইবনে খালদুনের প্রভাব প্রতিপত্তিতে বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেন। অন্যদিকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তখন অন্য এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং এরই ফলশ্রুতি হিসাবে সামরিক ও বেসামরিক লোকদের এক সফল অভ্যুত্থানে আবু সলিম ১৩৬১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগে নিহত হন।

ইতিমধ্যে এ কয়েক বছরের ব্যবধানে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার রাজনৈতিক পট পরিবর্তন অনেক দূর অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন। তিলমিসানে আব্দুল ওয়াদিদ বংশীয়রা পুনরায় ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। আরো পূর্বদিকে বগি, কুস্তানতুনিয়া ও তিউনিসে

হেফসী সম্রাটরা আবার তাঁদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করে এনেছিলেন। অথচ এ সময়ে ফেজের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। আবু সলিমের মৃত্যুর পর বিশৃঙ্খল রাজনীতির আবর্ত আবার উথলে উঠেছিল। ইবনে খালদুন এ আবর্তে পরে ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। বিজয়ীদের পক্ষে থাকার চেষ্টা সত্ত্বেও দিন দিন তিনি আশঙ্কাকাতর হয়ে পড়ছিলেন। অবশেষে তিনি ফেজ ত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পরিবেশে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু ফেজের তৎকালীন শাসকরা ইবনে খালদুনকে ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না। কারণ তাদের ভয় ছিল যে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা সম্পর্কে ইবনে খালদুন যে প্রগাঢ় জ্ঞান রাখতেন, তা শত্রুদের হাতে পড়লে মারাত্মক ফলাফলের সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু ইবনে খালদুন একান্তই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর এ প্রকার আগ্রহের জয় হল এবং ফেজের শাসকদের সাথে তিনি চুক্তিবদ্ধ হতে রাজি হলেন। চুক্তির বিষয় ছিল, তিনি ফেজ ত্যাগ করে সোজা স্পেনে চলে যাবেন; উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার অন্য কোথাও বসবাস করতে চেষ্টা করবেন না। এ চুক্তি অনুসারে ইবনে খালদুন সিওটা হয়ে ১৩৬২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর স্পেনের তৎকালীন একমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র গ্রানাডায় গমন করেন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে খালদুন তাঁর আত্মজীবনীতে সর্বপ্রথম পরিবার-পরিজনের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদিগকে শ্যালকের নিকট কুস্তানতুলিয়ায় পাঠিয়ে দেন। অবশ্য তাঁর স্ত্রীর পরিচয় বা সন্তানাদির সংখ্যা সম্পর্কে তিনি কোনো কথাই বলেননি। এমনকি তিনি কখন বিয়ে করেছিলেন, সে সম্পর্কেও তিনি অদ্ভুতভাবে নীরব। তবে ধারণা করা হয় যে, ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে তিউনিস ত্যাগের পর তিনি বিয়ে করেন। হেফসী সম্রাটদের একজন বিশিষ্ট সেনাপতি ও সমরমন্ত্রী মুহম্মদ ইবনে হাকিম ছিলেন তাঁর শ্বশুর। ফেজে তিনি এ ইবনে হাকিম তনয়াকে নিয়েই বিবাহিত জীবন-যাপন করেন।

ইতিপূর্বে আমরা ইবনে খালদুনের পিতা-মাতার মৃত্যুর পর বড় ভাই মুহম্মদকে পরিবারের কর্তা হতে দেখেছি। ইনি ছাড়াও ইবনে খালদুনের আরো ভাই ছিলেন। তবে সকলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ভাই ইয়াহিয়া তুলনামূলকভাবে খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি কয়েকবারই উচ্চ রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ইবনে খালদুন প্রসঙ্গক্রমে তাঁর পিতা ও ভাইদের কথা তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করলেও তাঁর ব্যক্তিগত পরিবার-পরিজনদের কথা তেমন গুরুত্বসহকারে ও বিস্তৃত আকারে কোথাও তুলে ধরেননি। সুতরাং একথাও জানার উপায় নেই যে, পূর্বোক্ত ইবনে হাকিমের কন্যা ছাড়া তাঁর অন্য কোনো স্ত্রী ছিল কিনা। তবে তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনিই যে ইবনে খালদুনের প্রধানা স্ত্রী ছিলেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গক্রমে ইবনে খালদুনের এক পুত্রের জন্মের কথা আমরা জানতে পারি। ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে এ ঘটনাটি ঘটে। তবে উক্ত পুত্রের জননী যে উক্ত ইবনে হাকিম তনয়া, একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অবশ্য অনুরূপ ধারণা পোষণ করার বিরুদ্ধেও কোনো প্রমাণ উপস্থিত নেই। অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যায়, ইবনে খালদুনের স্ত্রী ও পাঁচটি কন্যা সন্তান নৌকাডুবিতে মারা যায়। ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিউনিস থেকে মিশরে আসার সময় এ

দুর্ঘটনা ঘটে। শুধু তাঁর দুই পুত্র মুহম্মদ ও আলী মিশরে পৌঁছতে সক্ষম হয়। অবশ্য ইবনে খালদুন স্বয়ং তাঁর আত্মজীবনীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করেননি। সুতরাং অন্যসূত্রে প্রাপ্ত উপরোক্ত দুর্ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হয়ত সর্বাংশে সত্য নয়। তবু তাঁর একমাত্র স্ত্রীর উল্লেখ থেকে মনে হয়, ইনিই হয়ত সেই পূর্বোক্ত ইবনে হাকিম তনয়া; ইনিই নৌকাডুবিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সম্ভবত পরবর্তীকালে মিশরে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। এ সম্পর্কে ইতিবাচক যে বিবরণটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তা ইবনে খালদুনের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কীয় একটি ধারণামাত্র। এ কারণেই এর প্রামাণিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। অবশ্য সম্রাট তৈমুরের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ই ইবনে খালদুন মিসরে অবস্থানরত তাঁর পরিবার পরিজনের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ পরিবার বলতে স্ত্রী-পুত্রাদি সকলকে না-ও বোঝাতে পারে। তবু অনুরূপ ধারণা পোষণ করার বিরুদ্ধেও কোনো প্রমাণ নেই। কারণ তাঁর পক্ষে পুনরায় বিয়ে করা অসঙ্গত বা অসম্ভব ছিল না।

ইবনে খালদুন মৃত্যুকালে কোনো সন্তান রেখে গিয়েছিলেন কিনা, এ ব্যাপারেও নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। বিশেষ করে তারা যদি পুত্র সন্তান হত, তা হলে কোনো না কোনো দিক থেকে তাঁদের সন্ধান মিলতই। কিন্তু তেমন কোনো প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। ইবনে খালদুনের আত্মজীবনীর বর্ণনা অনুসারে তাঁর এক পুত্র মরক্কোর সুলতানের অধীনে চাকরিরত ছিল। কিন্তু উক্ত বর্ণনাটির দ্ব্যর্থবোধকতা এ সংবাদটিকেও অনিশ্চিত করে তুলেছে।

বস্তুত ইবনে খালদুনের ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন সম্পর্কে এটুকুই আমাদের জ্ঞানের পুঁজি এবং যে কোনো পাঠকের জন্য তাঁর ন্যায় মহৎ প্রতিভার ব্যক্তিগত জীবনের এ সংক্ষিপ্ত সংবাদ একান্তই অতৃপ্তিদায়ক। আমরা একথা জানি যে, যে-কোনো মহৎ শিল্পীর শিল্পকর্মই তাঁর প্রকৃত জীবন-কাহিনী এবং আমরা একথাও জানি যে, ইবনে খালদুন তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষী জীবনচর্চার প্রতিকৃতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন; তবু তাঁর ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের আনন্দ-বেদনাকে জানার লোভ আমাদের যায় না, আমরা জানতে চাই তাঁর মহৎ ব্যক্তিত্ব পারিবারিক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ লীলা-বিলাসকে কীভাবে গ্রহণ করেছে; কীভাবে তার আশা নিরাশায় আন্দোলিত হয়েছে। কিন্তু ইবনে খালদুন এ ব্যাপারে আশ্চর্যভাবে নিশ্চুপ, উদাসীন; কারণ তাঁর এ সংক্ষিপ্ত পারিবারিক সংবাদও তাঁর আত্মজীবনীর ঘটনাবহুল বর্ণনার মধ্যে একান্ত আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত। যেন তিনি তাঁর জীবনের বৃহৎ ও মহৎ অভিজ্ঞতাগুলোর বর্ণনা প্রসঙ্গে নিতান্ত অনিচ্ছায় এ প্রকার সংক্ষিপ্ত সংবাদ তুলে ধরেছেন।

এ প্রকার অনীহা ও উদাসীনতার কারণ কী? তবে কি ইবনে খালদুন তাঁর পারিবারিক জীবনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না? তাইবা কী করে বলা যায়; যদি প্রকৃত অবস্থা এমনিই হত তাহলে তাঁর ভাগ্যবিপর্যয়ে তাঁর পরিবারবর্গ বিপদের সম্মুখীন হতেন না। অনেক সময়েই তাদেরকে ইবনে খালদুনের প্রতি হিংসাপরায়ণ শাসকের হাতে নজরবন্দী থাকতে হয়েছে। নৌকাডুবির দুর্ঘটনার সকল বিবরণ সত্য না হতে পারে, কিন্তু এর ফলে ইবনে খালদুন যে ব্যথিত ও বিবাগী হয়ে উঠেছিলেন, এ তথ্য কিছুতেই

অস্বীকার করা যায় না। ফলে আমাদের যদ্দুর মনে হয়, পরিবারের প্রতি অনুরক্ত থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে তাদের সাহচর্য থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলেই এমন এক নির্লিপ্ততার সৃষ্টি হয়েছে। ফেজ থেকে স্পেনে গমনকালেই এ প্রকার বিচ্ছিন্নতার শুরু এবং মাঝে মাঝে স্বল্পকালের সাহচর্য ছাড়া জীবনের শেষ কাল পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল।

ইবনে খালদুনের গ্রানাডায় যাবার সংবাদ পেয়েই তথাকার তৎকালীন শাসক পঞ্চম মুহম্মদ ও তদীয় প্রধানমন্ত্রী বিখ্যাত পণ্ডিত ইবনে খতিব তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন করেছিলেন। এর কারণ ইবনে খালদুনের সঙ্গে তাঁদের পূর্বের ঘনিষ্ঠতা। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, সম্রাট আবু ইনান সিংহাসন অধিকারের সময় তাঁর ভাই আবু সলিমকে স্পেনে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। তখন আবু সলিম বস্তুত এ গ্রানাডায় সম্রাট পঞ্চম মুহম্মদের আশ্রয়েই ছিলেন। পরে তাঁর সক্রিয় সহায়তা ও ইবনে খালদুনের সহযোগিতায় তিনি ফেজের সিংহাসন অধিকার করেন এবং ইবনে খালদুনকে তাঁর সচিব করে নেন। এ সময় সম্রাট পঞ্চম মুহম্মদেরও ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে এবং তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রী ইবনে খতিবসহ ফেজে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তখনো তাঁদেরকে সম্রাট আবু সলিম ও ইবনে খালদুন রাজকীয় সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন এবং বস্তুত তাঁদের সহায়তায় সম্রাট পঞ্চম মুহম্মদ আবার সিংহাসন ফিরে পান। সুতরাং সম্রাট আবু সলিম না থাকলেও ইবনে খালদুনের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না এবং তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল এ রাজকীয় সম্বর্ধনায়। ফলে সম্রাট পঞ্চম মুহম্মদের দরবারে ইবনে খালদুন সসম্মানে বরিত হলেন এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রী ইবনে খতিবের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব নতুন সজীবতায় পূর্ণ হয়ে উঠল।

গ্রানাডার সিংহাসন পুনরুদ্ধারের সময় সম্রাট পঞ্চম মুহম্মদ কাস্টিলার খ্রিস্টান সম্রাট 'পেড্রো দি ক্রুয়েলের' নিকট থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি চুক্তি হবার কথা ছিল। সম্রাট মহম্মদ ইবনে খালদুনকে এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য দূত হিসাবে কাস্টিলায় পাঠালেন। ১৩৬৪ খ্রিস্টাব্দে ইবনে খালদুন উপরোক্ত দায়িত্ব নিয়ে শেভিলায় যান। সম্রাট পেড্রো তাঁকে সসম্মানে বরণ করেন। উক্ত চুক্তি সম্পাদনে ইবনে খালদুন অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। এমনকি সম্রাট পেড্রো দি ক্রুয়েল পর্যন্ত তাঁর পাণ্ডিত্য ও কূটনৈতিক আরণে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ইবনে খালদুনকে শেভিলার রাজদরবারে যোগ্য পদে থেকে যাবার আবেদন জানান এবং খালদুন পরিবারের যাবতীয় সম্পত্তি তাঁর নিকট প্রত্যর্পণের আশ্বাস দেন। ইবনে খালদুন সম্রাটের এহেন সমাদরে অভিভূত হয়েছিলেন। আর তা হবারই কথা। কারণ এ শেভিলাই তাঁর পিতৃপুরুষদের দীর্ঘকালীন লীলাভূমি। তবু গ্রানাডার সম্রাটের বদান্যতা স্মরণ করে ইবনে খালদুনের পক্ষে সম্রাট পেড্রোর এ সাদর আমন্ত্রণে সাড়া দেয়া সম্ভব হয়নি।

গ্রানাডার সু-সংস্কৃত পরিবেশে ইবনে খালদুন অনেকটা নিরাপত্তা অনুভব করেছিলেন। এজন্যই কুস্তানতুনিয়া থেকে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনকে এখানে আনিয়ে নেন এবং একটি গ্রামের জায়গীর লাভ করে শান্তিতে বসবাস করতে থাকেন। এখানে তাঁর প্রকাশ্য কোনো শত্রু ছিল না সত্যি; কিন্তু গোপন শত্রুর অভাব ছিল না।

বিশেষ করে সে শত্রুতার উপাদান তিনি নিজের মধ্যেই বহন করে ফিরছিলেন আর তা ছিল তাঁর সাধারণ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। এর ফলে সম্রাটের দরবারে তাঁর প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়ছিল এবং তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করছিলেন যে, তাঁর বন্ধুশ্রেষ্ঠ ইবনে খতিবও ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠছেন। ফলে সম্রাটের ব্যবহারেও কিছুটা উদাসীনতা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও ইবনে খালদুনের পক্ষে তাঁর বন্ধুর সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল না এ কারণে তাঁদের বাইরের বন্ধুত্ব আপাতদৃষ্টিতে অটুট রইল বটে, কিন্তু ভিতরের আদান-প্রদানে বারংবার বাধার সৃষ্টি হতে লাগল। এ এক মারাত্মক অস্বস্তিকর অবস্থা; প্রকাশ্য শত্রুতার চাইতেও এর অশান্তি অধিকতর মর্মপীড়াদায়ক। তবু ইবনে খালদুন তাঁর এ বন্ধুটিকে বন্ধু বলেই উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর সাহিত্যিক কৃতিত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সম্ভবত গ্রানাডার এ সাহচর্য ছাড়া আর একবার মাত্র ইবনে খালদুন ইবনে খতিবকে দেখতে পেয়েছিলেন আর তা ঘটেছিল শেষোক্তের বিপর্যস্ত অবস্থায় ফেজে পুনরায় আশ্রয় গ্রহণের সময়। ১৩৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি এখানেই নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন।

যাহোক গ্রানাডায় ইবনে খালদুনের এ ক্রমবর্ধমান মানসিক অস্বস্তির সময় তিনি তাঁর পুরাতন বন্ধু হেফসী পরিবারের আবু আবদুল্লাহ্‌র নিকট থেকে একটি সাদর আমন্ত্রণ লাভ করেন। আবু আদুল্লাহ্ ১৩৬৪ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় বগির শাসনক্ষমতা অধিকার করেছিলেন। তাঁর বন্ধুত্বের জন্যই ইবনে খালদুন ফেজে দীর্ঘদিন কারাবাস করেছিলেন, একথা আমীর আবু আবদুল্লাহ্ ভুলেননি। তাই তিনি ইবনে খালদুনকে বগিতে এনে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন। ইবনে খালদুন একান্ত আগ্রহের সাথে এ আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিলেন। ১৩৬৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে গ্রানাডা ত্যাগের প্রস্তুতির সময় ইবনে খালদুন সম্রাট পঞ্চম মুহম্মদের তরফ থেকে ইবনে খতিবের লিখিত একটি অতিশয় প্রশংসাসূচক ও আপ্যায়নমূলক পত্র লাভ করেন। কিন্তু এ পত্রের ভাষা বা বক্তব্য কোনোটাই তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তিনি পরবর্তী মাসেই বগিতে চলে আসেন এবং রাজকীয় সমারোহে বরিত হন। ইবনে খালদুন তাঁর আত্মজীবনীতে এ অভ্যর্থনার মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন।

ইবনে খালদুন বগির শাসক আবু আবদুল্লাহর 'হাজেব' তথা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিন্যস্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হেফসী সাম্রাজ্যের ভাগ্যোন্নয়নের বিধিলিপি তখন নির্ধারিত হয়েছিল আমীর আবু আবদুল্লাহ্‌র জ্ঞাতি ভাই আবুল আব্বাসের জন্য। এ কারণেই কুস্তানতুনিয়ায় তিনি দিন দিন শক্তিতে ও সম্পদে অপরাজেয় হয়ে উঠেছিলেন। আবু আব্দুল্লাহ্‌র পক্ষে সামরিক শক্তি দিয়ে তাঁর এ ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি রোধ করা সম্ভব ছিল না। এজন্যই সম্মুখ সমরে একবার পরাজিত হবার পরই তাঁর অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। তবু ইবনে খালদুন তাঁর এ বন্ধুস্থানীয় শাসকের আশা ত্যাগ করেননি। তিনি মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে বগির পাহাড়ী অঞ্চলের বারবার গোত্রগুলো থেকে কর আদায় করে প্রয়োজনীয় সম্পদের দ্বারা আবু আব্দুল্লাহ্‌র শক্তিকে সতেজ করে তুলতে সচেষ্ট হন। এ কাজে তাঁর কনিষ্ঠ ভাই ইয়াহিয়া ইবনে খালদুনও তাঁকে সাহায্য করেছিলেন; কারণ তখন তিনিও আমীর আবু

আব্দুল্লাহ্‌র অধীনে চাকরিরত ছিলেন। কিন্তু কিছুতেই শেষ রক্ষা হয়নি। ১৩৬৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আমীর আবু আব্দুল্লাহ্ অকালে মারা যান। তাঁর পরিবার-পরিজন একান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হয়। ইবনে খালদুনের নিকট তাদের অবস্থার পরিবর্তন কিংবা নিজের আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনের কোনো পথই খোলা ছিল না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেকে রক্ষা করার জন্যই আবুল আব্বাসের পক্ষে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

বস্তুত এ সময়ের আট-নয়টি মাস ইবনে খালদুনের অস্থির জীবনে মারাত্মক দুশ্চিন্তা বহন করে আনে। তিনি তাঁর জীবন সম্পর্কে সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়েন। কারণ, আমীর আবু আব্দুল্লাহ্‌র পক্ষে তিনি যে ধরনের আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছিলেন, তা শত্রুর মনে প্রতিহিংসা জাগিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট ছিলো। এ সময়ে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার রাজনীতিতে তাঁর অনেকটা স্বাধীন বিচরণ সুযোগ পেলে ভিন্ন পথ গ্রহণ করতে পারতো; অন্তত মৃত আবু আব্দুল্লাহ্‌র কোনো সন্তানকে সম্মুখে দাঁড় করিয়ে তিনি ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি কিছুই করেননি; করার উপায় ছিলো না। তবু আবুল আব্বাসের পক্ষে যোগ দিয়েই তিনি বুঝতে পারেন যে, এখানে তাঁর অবস্থান খুব সুবিধাজনক হবে না। সুতরাং কৌশল অবলম্বন করে তিনি আবুল আব্বাসের কিছুটা অসম্মতি সত্ত্বেও তাঁর পক্ষ থেকে রিয়াহ-ওয়াদিয়া বেদুইনদের মধ্যে কাজ করার জন্য বিস্করা চলে যেতে সক্ষম হন।

ইতিপূর্বেও আমরা লক্ষ করেছি যে, বেদুইনদের মধ্যে ইবনে খালদুনের পরিচিতি ও প্রভাব ছিল অসামান্য। বারবার বা আরব যে কোনো বেদুইন গোত্রে তিনি অবলীলাক্রমে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবের ফলে তাদের মতামতে পরিবর্তন সাধন করতে পারতেন। বস্তুত তাঁর এ প্রকার পরিচয় ও প্রভাব আমাদেরকে তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অমায়িকতা ও সারল্যের সে বৈশিষ্ট্য না থাকলে বেদুইনদের মধ্যে এ ধরনের প্রভাব বিস্তার তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। আসলে এ প্রভাবের সূত্রপাত হয় ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর তিউনিস ত্যাগের সময়। তখন তিনি বিস্করা, সিওটা ও বগির বিভিন্ন বেদুইন গোত্রে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। এ কারণেই বর্তমানেও মূলত আশ্রয় লাভের জন্য তিনি তাদের মধ্যে ফিরে আসেন। কিন্তু বিস্করায় পৌঁছেই তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর ছোট ভাই ইয়াহিয়াকে আবুল আব্বাস নজরবন্দী করে রেখেছেন। ইবনে খালদুন চলে আসার সময় তাঁর এ প্রকার বিপদ হবে কল্পনা করতে পারেননি; কিন্তু এখন আর তাঁর পক্ষে ছোট ভাইকে উদ্ধার করার জন্য ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। বস্তুত ইয়াহিয়ার নজরবন্দী অবস্থা থেকে ইবনে খালদুন যেমন তাঁর প্রতি আবুল আব্বাসের আশঙ্কার কথা বুঝতে পেরেছিলেন, তেমনি একথাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, এ হেফসী সম্রাটের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতির সহজ কোনো পথ নেই। সুতরাং ইবনে খালদুন অনন্যোপায় হয়ে বিস্করার বেদুইন গোত্রগুলোর মধ্যে বসবাস করতে লাগলেন।

এ সময়ে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার রাজনৈতিক অবস্থা এমন জটিল কিছু ছিল না। একটা সরল প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে তিউনিস, তিলমিসান, বাগ ও কুস্তানতুনিয়ার

ক্ষমতাধারীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছিলেন। বিশেষ করে ইবনে খালদুনের অবস্থান সংশ্লিষ্ট এলাকায় আবুল আব্বাস ও আবু হাম্মুর প্রতিযোগিতা দিন দিন লক্ষগোচর হয়ে উঠছিল। কিন্তু এ সকল শক্তির কোনটিরই এমন কোন প্রাধান্য ছিল না যে, অন্যগুলোকে অবলীলায় কুক্ষিগত করে নিতে পারে। একমাত্র শক্তির এ ভারসাম্য বিনষ্ট হতে পারত বেদুইন গোত্রগুলোর সক্রিয় সহযোগিতা দিয়ে; বস্তুত তাদের যে কোনো একপক্ষে যোগদান অন্যপক্ষের পরাজয়কে সুনিশ্চিত করে তুলত। আর বলাবাহুল্য যে, ভাগ্য নির্ধারণকারী বেদুইনদের এ শক্তি ও সহায়তার উপর ইবনে খালদুনের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

বিষ্করায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি মেলে ইবনে খালদুন যখন সময় কাটাচ্ছিলেন, তখন তিনি তিলমিসানের শাসক আবু হাম্মুর নিকট থেকে একটি আমন্ত্রণলিপি লাভ করেন। এ আবু হাম্মুর ইবনে খালদুনের পূর্বতন বন্ধু ও প্রভু বগির শাসক আবু আব্দুল্লাহ্‌র এক কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। সেই সুবাদে তিনি ইবনে খালদুনকে নিজের পক্ষে টানতে চেষ্টা করলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল তাঁর শ্বশুর আবু আদুল্লাহ্‌র এককালের রাজ্যপাট বগি জয় করা এবং এক্ষেত্রে ইবনে খালদুন বেদুইনদের শক্তিকে তাঁর পক্ষে সংহত করে অনায়াসে তাঁকে সফল করে তুলতে পারেন। ইবনে খালদুন এ সাদর আমন্ত্রণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বিশেষ করে তাঁর তৎকালীন অনিশ্চিত অবস্থায় এ আবেদন এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছিল। কিন্তু তবু এ আবেদনে সাড়া দিতে ইবনে খালদুন ইতস্তত করছিলেন। খুব সম্ভব আবু হাম্মুর অনিশ্চিত অবস্থাই এর কারণ ছিল। এজন্য দেখতে পাই ১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মসে আবু হাম্মুর তাঁকে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পুনরায় যে প্রশংসাপূর্ণ পত্র লিখেন, তাতেও ইবনে খালদুন বিচলিত হননি। তবে অবস্থা পর্যালোচনার জন্য তিনি তাঁর ছোট ভাই ইয়াহিয়াকে আবু হাম্মুর নিকট পাঠিয়েছিলেন। ইয়াহিয়া ইতিপূর্বে আবুল আব্বাসের কয়েদখানা থেকে মুক্তি পেয়ে এখানে এসে ভাইয়ের সাথে বাস করছিলেন।

আবু হাম্মুর এ ধরনের সাদর আমন্ত্রণে সাড়া না দেবার কারণ হিসাবে আমরা ইতিপূর্বে তাঁর অনিশ্চিত অবস্থার কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু ইবনে খালদুন স্বয়ং এর যে কারণ উল্লেখ করেছেন, তা হল এ যে, রাজনীতির অনিশ্চয়তা ও উচ্চপদের স্থায়িত্বহীনতা তাঁর মন-মানসকে উত্যক্ত করে তুলেছিল। তদুপরি এ সবের মায়াজালে জড়িয়ে দীর্ঘদিন ধরে তিনি তাঁর জ্ঞানের পিপাসাকে অতৃপ্ত করে রেখেছিলেন। বস্তুত ইবনে খালদুনের জীবনে এ কয়টি বছরের রাজনৈতিক তিক্ত অভিজ্ঞতা, যাকে তিনি বিপদসংকুল জলাভূমিতে বিচরণের সাথে তুলনা করেছেন, তা নানাদিক থেকে তাৎপর্যবহ। এর ফলশ্রুতি হিসাবেই পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানার্জনের জন্য শান্ত পরিবেশ ও স্বস্তির প্রতি তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষার কথা বারংবার তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখিত হয়েছে। কারণ ইবনে খালদুন যথার্থই বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজনীতির উচ্চমঞ্চে একবার সমাসীন হলে, তার থেকে নেমে নিরাপদ আশ্রয়ে বেরিয়ে আসা খুবই কষ্টকর; বরং অনেকাংশে অসম্ভব। এ কারণেই খুব সামান্য কিছু সময় ছাড়া তিনি রাজকীয়

পদমর্যাদার এ আবর্ত থেকে নিজেকে কখনোই সরিয়ে আনতে সক্ষম হননি। বস্তুত তিনি যে ধরনের বিশেষ ক্ষমতা, জ্ঞান ও গুণের অধিকারী ছিলেন, রাজ্য চালনায় তার চাহিদা ছিল সর্বত্র। এর সাথে মিশেছিল তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার এক অদ্ভুত আবেগ। এজন্যই দেখা যায়, যখন তাঁর রাজকীয় পদমর্যাদা বিপদের সম্মুখীন হয়েছে, কেবল তখনি তিনি শান্তি ও স্বস্তির কথা বলেছেন। অন্যথায় সময় ও সুযোগ দেখা দিলে উচ্চপদের আহ্বানে তিনি স্থির থাকতে পারেননি; তাঁর জীবন সংগ্রামের স্পৃহা তখন নতুনভাবে উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে। এজন্যই আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে আবু হাম্মুর সাদর আমন্ত্রণে সাড়া না দেবার কারণকে তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ বলে উল্লেখ করেছিলাম। বস্তুত পরবর্তী ঘটনাবলির দ্বারা তাঁর এ দূরদৃষ্টি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

এ সময়ে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার রাজনীতিতে এক নতুন শক্তির অভ্যুদয় ঘটে। উদ্যোগী ও বীর্যবান মারিনী যুবক আবদুল আজিজের নেতৃত্বে পুনরায় এ সাম্রাজ্যের জাগরণ দেখা দেয়। তিনি ফেজের নতুন শাসকরূপে ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দে তিলমিসান আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এর ফলে আবু হাম্মুর অবস্থা সাময়িকভাবে শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। উক্ত সনের এপ্রিল মাসে শেষ পর্যন্ত ইবনে খালদুন কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বেদুইনকে সঙ্গে নিয়ে আবু হাম্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আবদুল আজিজের ক্রমবর্ধমান শক্তির বিস্তার রোধ করা আবু হাম্মুর পক্ষে সম্ভব হবে না এবং পরিণামে তা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ইবনে খালদুনের অবস্থানকে অসম্ভব করে তুলবে। পূর্বতন মারিনী সম্রাট আবু সলিমের মৃত্যুর পর ফেজ ত্যাগ করার সময় মারিনীদের সঙ্গে ইবনে খালদুনের সম্পর্কের মধ্যে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়, তাতে করে মারিনী শাসকদের অভ্যুদয়ে তাঁর শঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। এজন্যই তিনি পুনরায় স্পেনে আশ্রয় গ্রহণ করার উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু তাঁর এ প্রচেষ্টা সফল হয়নি। বনি সায়েফ ও নিমারার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হুনাইন বন্দরে তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় দেরি করতে বাধ্য হন। এ সময়ে সম্রাট আবদুল আজিজের একদল সৈন্যের হাতে ইবনে খালদুন ধরা পড়েন। মারিনী সম্রাট নিজের প্রয়োজনেই তাঁর গতিবিধির উপর লক্ষ রেখেছিলেন এবং তাঁর স্পেনে যাবার উদ্যোগ যথার্থই আবদুল আজিজকে বিচলিত করে তুলেছিল। কারণ এর ফলে তথাকার রাজশক্তির উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা আক্রমণের পরিকল্পনা ত্বরান্বিত হবে। বস্তুত তৎকালে ফেজ ও গ্রানাডার মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। সুতরাং আবদুল আজিজের আশঙ্কা অমূলক ছিল না।

যাহোক ধৃত ও নিগৃহীত ইবনে খালদুন সম্রাট আবদুল আজিজের দরবারে উপস্থিত হতে বাধ্য হলেন। সেখানে তাঁকে মারিনীদের সাথে পূর্ববর্তী তিক্ততার কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যাদান করতে হল এবং আবদুল আজিজের মনতুষ্টির জন্য বুঝিয়ে বলতে হল যে, বগি জয় করা তাঁর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার হবে। অবশ্য এ সত্ত্বেও ইবনে খালদুন মারিনী দরবার ত্যাগ করার কালে তাঁর জীবন সম্পর্কে সংশয়মুক্ত হতে পারেননি। সুতরাং তাঁর এ প্রকার অন্তরীণাবস্থা যখন মাত্র একরাত্রি স্থায়ী হল এবং পরদিন সকালেই তিনি মুক্তি পেলেন, তখন তিনি যথার্থই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তথাপি প্রথম সুযোগেই তিনি তিলমিসানের নিকটবর্তী 'আল-উব্বাদ'-এ গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে

বিখ্যাত সাধক শায়ক আবু মাদায়েনের মাজার বিদ্যমান। ইবনে খালদুন সেখানে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় কাটিয়ে দিতে মনস্থ করলেন।

কিন্তু সম্রাট আবদুল আজিজের কবল থেকে এত সহজে মুক্তি পাওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে, কয়েক সপ্তাহ পরেই তাঁর কাঠোর নির্দেশ গিয়ে পৌঁছল যে, ইবনে খালদুনকে মারিনী সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয় রাজকীয় পদমর্যাদা গ্রহণ করতে হবে। ইবনে খালদুন এ নির্দেশ অমান্য করার সাহস পাননি। আসলে আবদুল আজিজ বেদুইনদের মধ্যে ইবনে খালদুনের সেই অনন্য প্রভাবকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইবনে খালদুন কিঞ্চিৎ চেষ্টা করলেই তাদেরকে মারিনী সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করে দিতে পারেন। সুতরাং তাঁকে যখন এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হল, তখন তিনি সানন্দে তা বরণ করে নিলেন। কারণ ইবনে খালদুনও মনে মনে মারিনীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান থেকে দূরে কোনো মুক্ত অঞ্চলে যাবার ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। তাই ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দের ৪ আগস্ট তিনি বিস্করায় গিয়ে পৌঁছান এবং আবার আরব বেদুইনদের রাজনীতিতে নিজকে জড়িত করে নেন। অবশ্য এবারকার তাঁর এ তৎপরতায় পূর্বেকার সেই উত্তাপ আর ছিল না। তবু সেখানে তাঁকে পূর্ণ দুটি বছর কাটাতে হয়।

এ সময় তিনি সম্রাট আবদুল আজিজের তরফ থেকে ফেজে চলে আসার জন্য একটি নির্দেশ পান। কিন্তু তাঁর ফেজে পৌঁছার আগেই আবদুল আজিজের মৃত্যু হয়। ১৩৭২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে তিনি ফেজের উদ্দেশ্যে বিস্করা ত্যাগ করেছিলেন; সাথে তাঁর পরিবার-পরিজনও ছিল। সুতরাং যাত্রার কয়েকদিন পরেই সম্রাটের এ মৃত্যু সংবাদ ইবনে খালদুনকে মানসিক দিক থেকে বিচলিত করে তুলেছিল। কারণ, এ ধরনের পরিস্থিতিতে যে বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয়, এতে অনেক সময় বন্ধুও শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। ফেজের অবস্থা তাঁর জানা ছিল না; সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে, তাও তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর এ প্রকার আশঙ্কাকে বাস্তব করে তোলার জন্য পথিমধ্যেই বিপদ ওৎ পেতে ছিল। আবু হাম্মুর নিয়োজিত একদল বেদুইন তাঁকে অনুসন্ধান করে ফিরছিল। তিনি তাদের হাতে ধরা পড়তে পড়তে কোনো প্রকারে বেঁচে যান এবং অনেক কষ্টে নভেম্বর মাসে ফেজে গিয়ে উপস্থিত হন। শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই তিনি তখন বিপর্যস্ত।

ফেজের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন একান্তই অস্থির এবং এ অস্থিরতা গ্রানাডার সাথে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটায় আরো বিপদসংকুল হয়ে দাঁড়ায়। সিংহাসনে সমাসীন নতুন সম্রাট ও তদীয় প্রধানমন্ত্রী ইবনে গাজী এর ফলে এক ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হন। ইবনে খালদুন এ ইবনে গাজীর সহায়তা লাভ করেছিলেন এবং জ্ঞানানুশীলনে নিজকে সমর্পণ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর পতনে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একাই নিরাশ হয়ে পড়েন। নতুন সম্রাট আবুল আব্বাস আহমদ ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী ইবনে উসমানের বিরূপতায় তাঁর এ নিরাশা আরো বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে ইবনে গাজীর পতনের মূলে যে কারণটি ছিল, তা ইবনে খালদুনের মন-মানসকে নিতান্তই বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

এ কারণটি ইবনে খালদুনের পুরাতন বন্ধু গ্রানাডার বিখ্যাত সাহিত্যিক ও এককালের প্রধানমন্ত্রী ইবনে খতিবের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। ইবনে খালদুন ফেজে আসার পূর্বেই তিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গ্রানাডার নতুন শাসক ইবনে আহমর উক্ত ইবনে গাজীকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন ইবনে খতিবকে তাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে; কিন্তু তিনি তা করেননি। এর ফলেই গ্রানাডার ষড়যন্ত্রে তাঁর পতন ঘটে। ইবনে খালদুন এসব জানা সত্ত্বেও ফেজের বিরূপ পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গ্রানাডায় আশ্রয় নিতে সচেষ্ট হয়ে উঠেন। তাঁর ধারণা ছিল ইবনে খতিবের স্থলে নিয়োজিত নতুন প্রধানমন্ত্রী ইবনে জামরাক হয়ত তাঁর প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে পারবেন। কারণ, ইনিও বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং সম্রাট আবু সলিমের সময় ইবনে খতিবের সাথে ফেজে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তখনই ইবনে খালদুনের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। সুতরাং গ্রানাডার এ বিদ্বান প্রধানমন্ত্রীর অধীনে তাঁর জ্ঞানানুশীলনের কাজ নির্বিঘ্নে সমাধা হতে পারবে। কিন্তু তাঁর যাবার আগ্রহ থাকলেও ফেজের নতুন শাসকরা কিছুতেই তাঁকে ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না। তাঁদের পক্ষে যতটুকু বাধা দেবার, তা তাঁরা দিয়েছিলেন; তবু ১৩৭৪ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সময়ে ইবনে খালদুন গ্রানাডায় যাবার অনুমতি লাভ করেন। অবশ্য এ অনুমতি শুধু তাঁর একার জন্যই ছিল, তাঁর পরিবার-পরিজনের অন্য কাউকে যাবার অনুমতি দেয়া হয়নি।

গ্রানাডায় যাবার পথেই সমুদ্র বন্দরে ইবনে জামরাকের সাথে ইবনে খালদুনের সাক্ষাৎ হয়। ইবনে জামরাক তখন ইবনে খতিবের বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য ফেজে আসছিলেন। ইবনে খালদুনের গ্রানাডা গমনকে তিনি স্বাগত জানান এবং ফেজের শাসককে তাঁর পরিবার-পরিজন গ্রানাডায় পাঠিয়ে দেবার জন্য সুপারিশ করবেন কথা দেন। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হয়নি। কারণ এর কিছুদিন পরেই ইবনে খালদুন জানতে পারেন যে, ইবনে খতিব নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছেন। কৌশলে তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয় এবং অশেষ নির্যাতন করে তাঁকে হত্যা করা হয়। গ্রানাডার এ বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক কবরের অধিকারটুকুও পাননি; তাঁর মরদেহকে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল।

ইবনে খালদুনের এ প্রকার মানসিক অবস্থায় গ্রানাডার রাজদরবারে ফেজের একটি আবেদন গিয়ে পৌঁছে। তারাও ইবনে খালদুনকে তাদের হাতে ফিরিয়ে দেবার জন্য গ্রানাডার শাসককে অনুরোধ জানান। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইবনে খতিবের ন্যায় তাঁকেও নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। কিন্তু গ্রানাডার শাসক ইবনে খালদুনের প্রতি এতটা নিষ্ঠুর হতে পারেননি। তারা তাঁকে ফেজের শাসকদের হাতে না দিয়ে আফ্রিকায় ফেরত পাঠান। ভগ্নমনোরথ ও বিপর্যস্তদেহ ইবনে খালদুন হুনাইন বন্দরে অবতরণ করে উদ্দেশ্যহীন ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করতে থাকেন। এ সময় তাঁর পূর্বতন বন্ধু বনি আরিফের গোত্রপ্রধান মুহম্মদ ইবনে আরিফের সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর সহায়তায় শেষ পর্যন্ত তিনি আবু হাম্মুর কাছে যাবার সুযোগ লাভ করেন। আবু হাম্মুর তখন পুনরায় তিলমিসানের শাসনক্ষমতা অধিকার করেছিলেন। ইবনে খালদুন তাঁর অনুমতি নিয়ে তিলমিসানের পার্শ্ববর্তী 'আল উব্বাদ'-এ এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। ১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে তাঁর পরিবার-পরিজনও এখানে এসে তাঁর সাথে মিলিত হন।

এভাবে ইবনে খালদুন আবু হাম্মুর আশ্রয়লাভ করলেও তাঁর মনে শান্তি ছিল না। গত কয়েক বছর ধরে রাজনীতির যে লীলা তিনি অবলোকন করেছিলেন এবং যেভাবে এর সাথে জড়িত হয়ে নিজকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তা তাঁর মন-মানসকে ক্রমশ বিষিয়ে তুলেছিল। বিশেষ করে তাঁর বন্ধু ইবনে খতিবের করুণ পরিণতি তাঁকে এ খেলার নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিল। এজন্যই আবু হাম্মুর সাথে ইতিপূর্বেকার তিক্ত সম্পর্ক সহজ হয়ে আসায় তিনি আরো শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, যে কোনো সময়ে আবু হাম্মু তাঁকে রাজকীয় কার্যে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাতে পারেন এবং অনুরূপ পরিস্থিতিতে তাঁর পক্ষে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। তদুপরি ইবনে খালদুনের ছোট ভাই ইয়াহিয়া পূর্ব থেকেই আবু হাম্মুর অধীনে কর্মরত ছিলেন। সুতরাং নানা দিক থেকে দুশ্চিন্তায় তাঁর মানসিক অবস্থা বারবার বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছিল।

এমনি অবস্থায় আবু হাম্মু তাঁকে তাঁর পক্ষ থেকে 'দাওয়াইয়া' আরব বেদুইন গোত্রে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। রাজকীয় পদ থেকে মুক্তি পাওয়ার এ সুযোগ ইবনে খালদুন হাতছাড়া হতে দেননি। তিনি অতি সত্বর তিলমিসান ত্যাগ করেন এবং সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে অবস্থিত যুগানা গোত্রের এক শক্তিমান শাখা বনি আরিফের আশ্রয়ে গিয়ে উপস্থিত হন। ইতিপূর্বে এ বনি আরিফেরই গোত্রপ্রধান মুহম্মদ ইবনে আরিফ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন; এবারও তিনি সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁর মধ্যস্থতার ফলেই আবু হাম্মুর সম্ভাব্য বিরূপতা স্তিমিত হয়ে আসে এবং খালদুন সপরিবারে বনি আরিফের আশ্রয়ে বসবাস করার সুযোগ পান।

ইবনে খালদুনের প্রতি বনি আরিফের এ সহায়তা ও আশ্রয়দান ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার নগর পরিবেশ ও রাজদরবারগুলো যা পারেনি বনি আরিফ তা সম্ভব করে তুলেছিল। বস্তুত তাদের এ প্রকার নিরাপদ আশ্রয় না পেলে খালদুনের পক্ষে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি আল-মুকাদ্দিমা রচনা করা হয়ত সম্ভব হয়ে উঠত না। মুহম্মদ ইবনে আরিফের সাথে ইবনে খালদুনের বন্ধুত্বের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। যদ্দুর মনে হয়, ইবনে খালদুনের পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা থেকেই এ বন্ধুত্বের সূত্রপাত। সুতরাং এবার যখন ইবনে খালদুন সেই পাণ্ডিত্য ও এর ফলশ্রুতি সম্পর্কে তাঁর এ বেদুইন বন্ধুকে বোঝাতে সক্ষম হলেন, তখন সর্বপ্রকারের সুযোগ তাঁর জন্য অবারিত হয়ে উঠল। এক সময়ে মারিনী সম্রাট আবু ইনান বনি আরিফের সহায়তায় মুগ্ধ হয়ে তাদেরকে গ্রামসহ একটি দুর্গ দান করেছিলেন। ইবনে খালদুন সপরিবারে সেই দুর্গ 'কেলাতু ইবনে সালামা'য় বসবাস করার সুযোগ লাভ করলেন। বস্তুত এমন শান্তিপূর্ণ নিরাপদ পরিবেশ ইবনে খালদুন ইতিপূর্বে আর কোথাও পাননি।

প্রায় দুই যুগ পূর্বে মারিনী সম্রাট আবু ইনানের দরবারে থাকাকালে ইবনে খালদুন তাঁর গঠনমূলক শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি টেনেছিলেন। এরপর জীবন সংগ্রামের বিচিত্র লীলা দেখতে দেখতে এবং আবর্তমান ইতিহাসের নিকট থেকে অনেক কিছু শিখতে শিখতে তাঁর সময় কেটেছে। এরই মধ্যে সময় পেলেই তিনি তাঁর লেখনীর তৃষ্ণা মিটিয়েছেন। কিন্তু জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি বহন করবে যে কীর্তি, তাকে ভাষাদান করার কোনো সুযোগই তিনি পাননি। তাই এবার এ কেলাতু ইবনে

সালামার নির্জন নিরুপদ্রব পরিবেশে তাঁর সেই তিল তিল সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি পৃথিবীর ইতিহাস—'কিতাবুল ইবার' লিখতে বসলেন। কী গভীর আবেগ ও ঐকান্তিক প্রেরণা এ সময়ে তাঁর সমগ্র চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এর পরিচয় তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, 'এক সর্বগ্রাসী মহৎ অনুপ্রেরণায় বুঁদ হয়ে আমি আমার পরিকল্পিত ইতিহাসের ভূমিকা শেষ করেছি এবং এটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত অদ্ভুতভাবে সে নিজেই তার শব্দ ও অর্থের যোগান দিয়ে গেছে।' এ ভূমিকাই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'আল-মুকাদ্দিমা'; ৭৭৯ হিজরি বা ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি এটি সমাপ্ত করেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পিত ইতিহাস সমাপ্ত করতে তাঁকে আরো চার বছর পরিশ্রম করতে হয় এবং এ সময়ে তিনি তিউনিসের গ্রন্থাগারগুলোর সাহায্য গ্রহণ করতে সমর্থ হন।

ইবনে খালদুন তাঁর আত্মজীবনী, আল-মুকাদ্দিমা কিংবা তাঁর ইতিহাসের কোথাও এ কথার উল্লেখ করেননি যে, তিনি আল-মুকাদ্দিমার পূর্বে অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশ করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে আমরা শুধু জানতে পেরেছি যে, বিভিন্ন উপলক্ষে তিনি বহু দীর্ঘ কবিতা ও পত্রাদি রচনা করেছেন। তাঁর আত্মজীবনীতে এসবের অনেক উদ্ধৃতিও বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে তাঁর ভাষাজ্ঞান ও বাক্‌বৈদগ্ধের যে পরিচয় রয়েছে, তা যে কোনো বিচারে সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর স্থান নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে। এমন কি তিনি যদি আল-মুকাদ্দিমা ও ইতিহাস রচনা নাও করতেন, তা হলেও সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হত। কিন্তু এ সকল গদ্য ও পদ্যের কোনো সংকলনও তিনি ইতিপূর্বে প্রকাশ করেননি। তাঁর আত্মজীবনীতে শুধু একটি রচনার কথাই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখিত হয়েছে, যা তিনি ১৪০১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট তৈমুরলঙের নির্দেশে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ভূগোল সম্পর্কীয় দীর্ঘ বিবরণ তাঁর পাণ্ডিত্যের কোনো বিশেষ পরিচয় বহন করে না। যদ্দুর মনে হয়, এটি ইবনে খালদুনের একান্তই অনিচ্ছাকৃত রচনা; তদুপরি এটি কখনো প্রকাশিতও হয়নি। অথচ এর তুলনায় বহুগুণ বেশি জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা ইবনে খালদুনের ছিল। তিনি প্রথম জীবনে বহু পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন। আমরা তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও বন্ধু ইবনে খতিবের বর্ণনা থেকে এ সংবাদ জানতে পারি।

ইবনে খতিব ইবনে খালদুনের যে সকল গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে 'কসিদা বুরদা' সম্পর্কীয় তাঁর একটি টীকা, যার মধ্যে তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য ও বহু বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় তুলে ধরেছিলেন। তিনি ইবনে রুশদের বহু রচনার সার-সংক্ষেপও তৈরি করেন। যুক্তিবিদ্যা অধ্যয়নকালে ইবনে খালদুন তৎকালীন শাসকের জন্য এর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি রচনা করেন এবং এর মধ্যেও তাঁর বিষয় অনুধাবনের গভীরতা প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম ফখরুদ্দিন রাযীর 'আল-মুহাসসাল' গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্তসারও ইবনে খালদুন রচনা করেন এবং ইবনে খতিবের সঙ্গে প্রথম পরিচয়কালে এ নিয়ে তাঁরা আলোচনাও করেন। ইবনে খতিবের লেখা ফেকাহশাস্ত্র সম্পর্কীয় একটি 'রেয়াজ' পদ্যের একটি বিস্তারিত ভাষ্য রচনা করেছিলেন ইবনে খালদুন। ইবনে খতিবের মতে এটি তাঁর শাস্ত্র সম্পর্কীয় গভীর পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধে

পরিপূর্ণ। এ ছাড়া ইবনে খালদুন হিসাবশাস্ত্র সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধরনের গ্রন্থও রচনা করেন। ইবনে খতিব এগুলোর বাইরেও তাঁর গদ্য ও পদ্য রচনা এবং রাজকীয় নথিপত্রের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তাঁর কবিত্ব শক্তি সম্পর্কেও ইবনে খতিবের শ্রদ্ধাবোধ ছিল। আর এসব কিছুই ছিল আল-মুকাদ্দিমা রচনার পূর্বকালীন তাঁর লেখনীর তৎপরতা।

বস্তুত যে কোনো একজন সাধারণ লেখকের জন্য জীবনের প্রথম ত্রিশ বছরে উল্লেখিত রচনাবলির অধিকারী হওয়া লেখক হিসাবে স্বীকৃতি লাভের জন্য যথেষ্ট ছিল। অবশ্য ইবনে খালদুনের অসাধারণ প্রতিভার জন্য এ ধরনের স্বীকৃতি একান্তই মূল্যহীন। কারণ, এর কোনোটিই তাঁর প্রতিভার যথার্থ পরিচয় বহন করে না; কেননা আমরা একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাব যে, এ সকল রচনার অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তক; তাও প্রায় সর্বাংশেই মৌলিকত্ব বর্জিত। তদুপরি ইবনে খালদুন তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় যে কোনো রচনার সংক্ষিপ্তসারকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক স্বরূপ বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এসব কিছু মিলিয়েই তিনি তাঁর প্রথম জীবনের রচনাবলির উল্লেখ কোথাও করেননি। এতে আমরা কিঞ্চিৎ বিস্ময়বোধ করলেও এ কথা অবশ্যই স্বীকার করব যে, তাঁর মহৎ প্রতিভার তুলনায় এ সকল রচনার মূল্যমান নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বস্তুত আল-মুকাদ্দিমাই তাঁর কালজয়ী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং এজন্যই তিনি শুধু ঐতিহাসিক দর্শনের জনক নন, সর্বকালের স্মরণীয় ও বরণীয় মনীষা হিসাবেও স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

ইবনে খালদুনের এ মহৎ সৃষ্টি সম্পর্কে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবার চেষ্টা করব। কিন্তু এখানে বিস্তারিত কিছু বলবার না থাকলেও একটি কথা আমাদেরকে বলতে হবে যে, তাঁর এ মহৎ সৃষ্টিই তাঁর অন্যান্য অনেক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকে অবহেলার বিষয় করে তুলেছে। যে ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে তিনি এ আল-মুকাদ্দিমা রচনা করেছিলেন, স্বয়ং সে ইতিহাসই এর ছায়ায় নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। এজন্যই যদ্দুর মনে হয়, তাঁর ইতিহাসের অন্যান্য অংশের প্রতি এ পর্যন্ত খুব সুবিচার করা হয়নি। অন্তত কিতাবুল ইবারের প্রতি এ পর্যন্ত যে ধরনের কটুকাটব্য করা হয়েছে, তা সর্বাংশে সত্য নয়। এ সকল বিরূপ মন্তব্যের অধিকাংশের জন্যই আমরা তাঁর শত্রুতায় আচ্ছন্ন সমালোচকদেরকে দায়ী করতে পারি। অবশ্য বিরূপ মন্তব্য প্রকাশের এ কাজটি আরম্ভ করেছিলেন ইবনে খালদুনের সুযোগ্য মিশরীয় শিষ্য ইবনে হজর আস্কালানী। তিনি সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন যে, ইবনে খালদুনের ইতিহাসে পূর্বদেশীয় সাম্রাজ্যগুলোর যে বিবরণ বিদ্যমান, তাতে এমন কোনো বিশেষত্ব নেই, যা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। বস্তুত ইবনে হজরের এ মন্তব্যটি অনেকাংশে সত্য হলেও এমন কোনো বিশেষ জ্ঞানের সন্ধান দেয় না। কারণ এ সম্পর্কে ইবনে খালদুন নিজেই তাঁর ভূমিকায় উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর ইতিহাসটিকে মূলত বারবারদের বিবরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন। কারণ তিনি যেভাবে এ ইতিহাস রচনা করতে চান, তাতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন; অথচ পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে তাঁর এ প্রকার অভিজ্ঞতার একান্তই অভাব। এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে মাসউদীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার

কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। সুতরাং পূর্বদেশীয় সাম্রাজ্যগুলোর বিবরণ যে, বৈশিষ্ট্যহীন চর্বিত চর্বণে পর্যবসিত হবে, এ সম্পর্কে স্বয়ং ইবনে খালদুন অবহিত ছিলেন। তবু ইতিহাস রচনার পূর্বাপর ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য তাঁকে এ সকল বিবরণ সন্নিবেশ করতে হয়েছে। অবশ্য এ সত্ত্বেও এ সকল বিবরণে ইবনে খালদুনের নিজ পরিবেশন বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক সংযোজনের পরিচয়ও বিদ্যমান। তবু তুলনামূলকভাবে তাঁর ইতিহাসে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার বিবরণাবলিই অধিকতর মনোজ্ঞ ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এর কারণও আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি; এক্ষেত্রে ইবনে খালদুনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। এজন্যই তাঁর এ বিবরণ উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে এখনো অপরিহার্য উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়।

অবশ্য আধুনিক সমালোচকেরা ইবনে খালদুনের ইতিহাস সম্পর্কে ভিন্নদিক থেকে সমালোচনা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হল, ইবনে খালদুনের ইতিহাস তাঁর আল-মুকাদ্দিমার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিবেচিত হয়নি। ভূমিকায় তিনি যে নতুন আশাবাদে পাঠককে উজ্জীবিত করেছিলেন, তাঁর ইতিহাসের বিবরণ সে তুলনায় অনেকখানি নিরাশাব্যঞ্জক। এ মন্তব্য যত কঠোরই হোক না কেন, এতে সত্য আছে। তবে এর সঙ্গে একথাও অবশ্যই আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, সমালোচকরা ইবনে খালদুনের সীমাবদ্ধ অবস্থার প্রতি সর্বাংশে দৃষ্টি দেননি। কারণ আল-মুকাদ্দিমার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সমগ্র ইতিহাসকে বিচার করতে হলে যাযাবর নাগরিক নির্বিশেষে সমুদয় জীবন পরিবেশের যে বাস্তব বিবরণ সম্মুখে থাকা দরকার, তা ইবনে খালদুনের আয়ত্তে ছিল না। এমনকি পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষেত্রেও একথা তুলনামূলকভাবে প্রযোজ্য। বস্তুত ইবনে খালদুন কোনো কোনো প্রতিভাধরের পক্ষেই এর প্রয়োজনীয় সামগ্রিক বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তদুপরি তৎকালীন পরিবেশের সীমাবদ্ধতাকেও আমাদের স্মরণ করা উচিত। এমনিতেই তাঁর শত্রুর অভাব ছিল না; এক্ষেত্রে আল-মুকাদ্দিমার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সমগ্র ইতিহাসকে শুধরে নেবার চেষ্টা করলে, সে শত্রুতা আরো মারাত্মক হয়ে উঠত এবং ঐতিহাসিকসহ তাঁর ইতিহাসকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করত না। এর একটি সামান্য উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। আল-মুকাদ্দিমায় ইবনে খালদুন আরবীয় সাম্রাজ্যের বিকাশ, তার সংস্কৃতি চেতনা ও স্থাপত্য কীর্তি সম্পর্কে যে বাস্তব ও কঠোর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন, এর সত্যতা অস্বীকার করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। তবু এরই ফলে আরবীয় জগৎ তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিল। মিশরে অবস্থানকালে তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতার যে বিষাক্ত চক্র গড়ে উঠে, এর মূলে তাঁর এ প্রকার মন্তব্যের বিরূপ প্রতিক্রিয়া অনেকখানি উৎসাহ যুগিয়েছিল।

সুতরাং ইবনে খালদুনের পক্ষে যা সম্ভব ছিল না, তা নিয়ে তাঁকে দোষারোপ করে লাভ নেই; বরং তিনি যে তাঁর ঐতিহাসিক মানবিক দৃষ্টিকোণকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে পেরেছিলেন, এ আমাদের পরম লাভ। তিনি নিজেই তাঁর এ সীমাবদ্ধতাকে ভাষা দিয়ে বলেছেন যে, কোনো নতুন বিষয়ের উদ্ভাবকের পক্ষে কখনোই তার সামগ্রিক বা প্রায়োগিক সম্পূর্ণতা বিধান করা হয় না; উত্তরসূরিরাই সে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

সময়ের ব্যবধানে হলেও পরবর্তীকালে সে দায়িত্ব নানা স্থানে নানাভাবে পালিত হয়েছে এবং আমাদের মনে হয়, অনেক দেরিতে হলেও আমাদের এদেশেও সে দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

সে যাহোক, কেলাতু ইবনে সালামায় ইবনে খালদুন তাঁর ইতিহাসের ভূমিকা শেষ করার পর পুনরায় স্বভাবতঃই চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে তাঁর ন্যায় একজন সাহচর্যপ্রিয়, অস্থির কর্মী পুরুষের জন্য দীর্ঘদিন এমনি এক নির্জন পরিবেশে আবদ্ধ থাকা ক্রমশ অসহ্য বলে মনে হচ্ছিল। সুতরাং তিনি সে স্থান ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ার জন্য সুযোগ খুঁজছিলেন। তদুপরি তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের সম্পূর্ণতার জন্যও এ স্থান ত্যাগ করার প্রয়োজন ছিল। কারণ এখানে শান্তি থাকলেও প্রয়োজনীয় বই পুস্তক ও জ্ঞানীগুণীর সাহচর্যের অভাব ছিল। সেজন্যই ইবনে খালদুন তিউনিসে ফিরে যাবার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। কারণ তাঁর জানা মতে এক মাত্র তথাকার গ্রন্থাগারগুলোই তাঁকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে পারে।

কিন্তু নিজের জন্মভূমি তিউনিসে প্রবেশ করাও তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। তখন সেখানে শাসক ছিলেন হেফসী সম্রাট আবুল আব্বাস। এ আবুল আব্বাস সেই ব্যক্তি, এখন থেকে এগার বছর পূর্বে ইবনে খালদুন যার পক্ষাবলম্বন করে পরে দূরে সরে গিয়েছিল। কাজেই তিউনিসে প্রবেশ করতে হলে তাঁর অনুমতি গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল। ইবনে খালদুন একজন গবেষকের জ্ঞান সাধনার প্রয়োজন উল্লেখ করে তাঁর কাছে তিউনিসে আসার অনুমতি দেবার জন্য আবেদন জানালেন। সম্রাট আবুল আব্বাস খালদুন পরিবারের ঐতিহ্য ও ইবনে খালদুনের পাণ্ডিত্যের প্রতি মোটামুটি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। এজন্যই শেষ পর্যন্ত তাঁকে তিউনিসে ফিরে আসতে অনুমতি প্রদান করেন। ইবনে খালদুন ১৩৭৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে সপরিবারে তিউনিসে ফিরে আসেন।

এ তিউনিস ইবনে খালদুনের জন্মস্থান ও আকৈশোরের লীলাভূমি, এখানে তাঁর পিতৃপুরুষ তথা পিতামাতার কবর অবস্থিত এবং এখানেই খালদুন পরিবারের প্রায় শতাব্দীকালীন স্থায়ী আবাসগৃহ ছিল; সুতরাং দীর্ঘদিন পরে তিনি এখানে ফিরে এসে খুবই স্বস্তি অনুভব করছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, এখানেই তিনি জীবনের অবশিষ্ট অংশ কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু তার সে ইচ্ছা ফলবতী হয়নি। এ ক্ষেত্রে তাঁর নিজের দোষ কতটুকু ছিল, তা জানার উপায় নেই; তবে আমরা ইতিপূর্বেই একবার বলেছি যে, তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও গুণপনাই তাঁর শত্রু সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট ছিল। তৎকালীন কোনো পরিবেশই তাঁর এ সর্বজয়ী প্রভাবে আতঙ্কিত না হয়ে পারেনি। যদ্দুর মনে হয়, বর্তমানেও আমরা সেই প্রভাবেরই অমোঘ ফল তাঁর তিউনিস ত্যাগের মধ্যে লক্ষ করব।

সম্রাট আবুল আব্বাস ইবনে খালদুনকে তিউনিসে আগমনের অনুমতি দিলেও সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত হতে পারেননি; অবশ্য তাঁর ব্যবহারের মধ্যে সে সংশয়ের কোনো চিহ্ন ছিল না। অথচ ইবনে খালদুনের প্রতি তাঁর এ প্রকার সাধারণ ব্যবহারই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছিল। বিশেষ করে যারা আবুল আব্বাসের সঙ্গে ইবনে খালদুনের পূর্ববর্তী তিক্ত সম্পর্কের কথা জানতেন, তারা আপাত দৃশ্যমান এ সহজ সম্পর্কের মধ্যেই ইবনে খালদুনের প্রভাবের সূত্রপাত কল্পনা করে নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। এজন্যই এরপর আবুল আব্বাস এক সামরিক অভিযান পরিচালনাকালে

তারা ইবনে খালদুনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পরামর্শ দেন। তারা সম্রাটকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, ইবনে খালদুন তিউনিসে থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারেন। সুতরাং সম্রাট তাঁকে অভিযানের সঙ্গী হতে নির্দেশ দেন। কিন্তু ইবনে খালদুন এ ধরনের রাজকীয় অভিযানের সঙ্গী হবার উৎসাহ উদ্দীপনায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই একান্ত অনিচ্ছা ও উদাসীনতার সাথে তিনি এতে যোগদান করেন। সম্রাটের নিকট তাঁর এ প্রকার অনিচ্ছা লুক্কায়িত থাকেনি এবং স্বার্থান্বেষীরাও এর মধ্যে নিজেদের ধারণার সত্যতা আবিষ্কার করে উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। ইবনে খালদুন নিজেও এ সকল চক্রান্ত সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। এ কারণেই তিনি তাঁর ইতিহাসের একটি পাণ্ডুলিপি সম্রাট আবুল আব্বাসের নামে উৎসর্গ করেন। তাঁর ধারণা ছিল, এর মধ্য দিয়ে সম্রাটের প্রতি তাঁর আনুগত্য সম্পর্কে সংশয়ের অবসান ঘটবে। কিন্তু প্রচলিত প্রথা অনুসারে এ পাণ্ডুলিপির শেষে সম্রাট ও তাঁর শাসনকালের গুণকীর্তন সংবলিত কোনো অধ্যায় ছিল না; অবশ্য ইবনে খালদুন একটি দীর্ঘ কবিতায় সে কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। তথাপি স্বার্থান্বেষীরা তাঁর এ প্রকার আচরণের মধ্যেও আনুগত্যের অভাব আবিষ্কার করেছিল। ফলে দরবারী চক্রান্তকারীরা অনবরত ইবনে খালদুনের বিরুদ্ধে তাদের হীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার উৎসাহে মেতে উঠেছিল।

অথচ ইবনে খালদুন তখন মনে প্রাণে শান্তি কামনা করছিলেন। কারণ তাঁর উপর তখন তাঁর পরিকল্পিত ইতিহাসটি সর্বাঙ্গসুন্দর করে সম্পূর্ণ করার মতো গুরুদায়িত্ব চেপে বসেছিল। এ কারণেই সাময়িকভাবে দরবার বা দরবারী মর্যাদার প্রতি তাঁর লোভ ছিল না বললেই চলে। সম্ভবত এজন্যই তিনি তিউনিসে এসেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য শিক্ষার্থীদের ভীড় জমতে থাকে। এভাবে অতি অল্প দিনেই তিনি তিউনিসের শিক্ষা পরিবেশে নিজের বিশিষ্টতা সপ্রমাণ করতে সক্ষম হন। ফলে এখানেও শত্রুতার আবির্ভাব ঘটে। তাঁর এ প্রকার প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ইবনে আরফা বিদ্বেষী হয়ে উঠেন এবং নানাভাবে ইবনে খালদুনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় যোগ দেন। এর কারণ হিসাবে যতটুকু জানা যায়, ইবনে খালদুন তাঁর চেয়ে বয়সী এ পণ্ডিতের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাপোষণ করতে অসমর্থ হন। তদুপরি তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ইবনে আরাফার শিক্ষার্থীদেরকেও আকর্ষণ করে এনে এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। এ সকল কারণে তিউনিসের এ প্রধান বিচারক দারুণভাবে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেন। ফলে তাঁর এ প্রকার শত্রুতার মনোভাব জীবনের শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। এজন্যই অনেক পরে, যখন ইবনে খালদুন মিশরে প্রধান বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত, তখন ইবনে আরাফা হজ্জে গমনকালে তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, প্রধান বিচারকের পদটিকে তিনি একটি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পদ বলেই জানতেন; কিন্তু তাতে ইবনে খালদুনের ন্যায় এক ব্যক্তির অধিষ্ঠান দেখে সে সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। বস্তুত তার এ প্রকার মন্তব্য ইবনে খালদুনের তৎকালীন মিশরীয় শত্রুদেরকে যথেষ্ট উত্তেজিত করেছিল। সুতরাং বর্তমানে তিনি যে তিউনিসের পরিবেশকে ইবনে খালদুনের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন, একথা বলাই বাহুল্য।

এভাবে ইবনে খালদুন দুদিক থেকেই আক্রান্ত হয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে ক্রমশ সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং পুনরায় যখন সম্রাট আবুল আব্বাস অন্য একটি সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন, তখন ইবনে খালদুন তাতে তাঁর যোগদান সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে দেশত্যাগের প্রস্তুতি নিলেন। এছাড়া তাঁর পক্ষে অন্য কিছু করার উপায় ছিল না; স্বদেশ যদি শত্রুতায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠে, তাহলে বিদেশে আশ্রয় নেয়া ছাড়া গত্যন্তর কি! কাজেই তিনি সম্রাটের নিকট হজ্জব্রত পালনের জন্য অনুমতি চাইলেন। এ ব্যাপারে সম্রাটের পক্ষ থেকে অনুমতি দেবার কোনো বাধা ছিল না; তবু সতর্কতাবশত তিনি সপরিবারে যাবার অনুমতি দেননি। কারণ, ইবনে খালদুন হজ্জব্রত পালন করুন আর না করুন, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার অন্য কোথাও গিয়ে বসবাস করতে চাইলে সম্রাট তাঁর পরিবার-পরিজনকে নজরবন্দী করে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন। কিন্তু এর আর প্রয়োজন হয়নি; ইবনে খালদুন তাঁর অবশিষ্ট জীবনে আর উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় ফিরে আসেননি।

১৩৮২ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে ইবনে খালদুন তাঁর জন্মভূমির শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলের নিকট বিদায় নিয়ে তিউনিস ত্যাগ করেন। বন্দরে এ সময়ে বহুলোক উপস্থিত হয়েছিলেন। সকলের সঙ্গেই এ তাঁর শেষ দেখা; এমনকি তাঁর পরিবার-পরিজনের সঙ্গেও। পূর্বদিকেই তিনি যাত্রা করেছিলেন; কিন্তু আপাতত হজ্জব্রত উদযাপন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় মিশরের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে যে সপ্রশংস মনোভাব প্রকাশ করেছেন তা শুধু মুখের কথা নয়, তাঁর অন্তরেও এদেশটির প্রতি এ গভীর আকর্ষণ বিরাজ করছিল। তিনি সেখানেই আশ্রয় নেবার চেষ্টা করলেন। অথচ সেখানে যাবার জন্য তাঁর ন্যায় মহৎ ব্যক্তির পক্ষেও হজ্জব্রতের অজুহাত সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। কারণ মিশরের কথা বললে তিনি অনুমতি পেতেন কিনা সন্দেহ। তবে এ ব্যাপারে ইবনে খালদুন শুধু একা নন; এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাঁর পূর্বসূরি অনেকেই অনুরূপ অজুহাতে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এক্ষেত্রে ইবনে খালদুন তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন মাত্র।

সে যাহোক, প্রায় চল্লিশ দিন সমুদ্র যাত্রার পর ইবনে খালদুন আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে অবতরণ করেন। পরে সেখান থেকে ১৩৮৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি কায়রো যেতে সমর্থ হন। সেখানে পৌঁছেই তাঁর মনে হয়, তিনি যেন এক নতুন জগতে প্রবেশ করেছেন। কায়রো সম্পর্কে তাঁর যে ধারণা ছিল, তা তিনি দূর থেকে জানা ও লোক মুখে শোনা বিষয়াদির দ্বারা গড়ে তুলেছিলেন; কিন্তু বাস্তব উপস্থিতি সে ধারণাকে ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ও স্পেনের বহু নগরী তিনি দেখেছেন; কিন্তু কায়রোর সাথে এদের কারোর কোনো তুলনাই চলে না। এর বিস্তৃত জনবহুল পথঘাট, এর সুদৃশ্য আকাশচুম্বী সৌধমালা, এর পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ বিপণিকেন্দ্র, এর শিক্ষার্থীমুখর বিচিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি নীলনদের বদান্যতায় সৃষ্ট এর মনোরম প্রাকৃতিক শোভা ইবনে খালদুনের মনে এক অদ্ভুত আবেগের সৃষ্টি করেছিল। ফলে তিনি এখানেই জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটিয়ে দেবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন।

কিন্তু কায়রো তাঁর হৃদয়কে যতই আকৃষ্ট করুক, এখানে নিজের যোগ্য স্থান লাভ করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার খালদুন পরিবারের সর্বব্যাপী পরিচিত এবং তদসংশ্লিষ্ট বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তায় যে সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, এখানে তার কোনোটাই তেমনভাবে উপস্থিত ছিল না। অবশ্য একথা সত্য যে, তৎকালে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার অনেক ভাগ্যান্বেষী নানা কাজে ব্যাপৃত হয়ে মিশরে অবস্থান করছিল এবং ইবনে খালদুনের নিজের ও তাঁর বংশের খ্যাতি স্বল্প পরিমাণে হলেও সেখানে এসে পৌঁছেছিল; তবু শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও গুণপনাই তাঁকে এ অপরিচিত পরিবেশে তাঁর যোগ্য মর্যাদা লাভে সহায়তা করেছে। এরই কল্যাণে তিনি কায়রো পৌঁছার পরই আলাউদ্দিন তিঙ্গুগা জাওয়ানী নামে এক প্রভাবশালী তুর্কি আমীরের সাথে পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। বস্তুত এ আমীরই তাঁকে কায়রোর তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে পরিচিতি লাভের প্রাথমিক সুযোগ করে দেন এবং তাঁরই মাধ্যমে মিশরের তৎকালীন শাসক সম্রাট মালীক জহীর বারকুকের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে।

ইবনে খালদুনের মিশরে পৌঁছার কিছুদিন পূর্বেই এ নতুন সম্রাট ক্ষমতায় এসেছিলেন। সুতরাং তিনি স্বভাবতঃই তাঁর সভাসদদের গুণগত মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নতুন মনীষা ও নতুন ব্যক্তিত্বের অনুসন্ধানে ছিলেন। ইবনে খালদুনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাই তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বস্তুত ইবনে খালদুনের প্রতি তাঁর এ প্রকার মুগ্ধাবস্থা সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং তাঁরই বদান্যতায় তিনি ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপনা ও প্রধান বিচারকের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। এমনিভাবে ইবনে খালদুন কায়রোতে তাঁর জীবনের শেষ তেইশটি বছর কাটিয়ে দেবার সময় যে ধরনের অযাচিত বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন, তেমনটি তাঁর ভাগ্যে অন্য কোথাও ঘটেনি। প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পরিবেশে এ প্রকার বন্ধুত্ব লাভ ছিল তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্যেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি। আবার এরই ফলে তাঁর বিরুদ্ধে একটি মারাত্মক শত্রুচক্রও গড়ে উঠেছিল, যা তাঁর ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে বারংবার প্রতিহত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। সাময়িকভাবে শত্রুদের এ চেষ্টা সাফল্যলাভ করলেও তা স্থায়ী হয়নি এবং বন্ধুদের আশ্বাস ও সহায়তা সর্বদাই ইবনে খালদুনকে নবীন উদ্যমে আশাবাদী করে তুলেছে। নতুবা ইবনে খালদুনের পক্ষে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কায়রোতে অবস্থান করা সম্ভব হত না। তিনি অন্যান্য স্থানের মতো এখান থেকেও অন্য কোথাও পাড়ি জমাতেন।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মিশরে স্বল্প পরিমাণে হলেও ইবনে খালদুনের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এসে পৌঁছেছিল। বিশেষ করে তাঁর আল-মুকাদ্দিমার ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়বস্তুর সুখ্যাতি ও নিন্দা উভয়েই কায়রোর শিক্ষিত সমাজকে ইতিপূর্বেই কিয়ৎ পরিমাণে উৎসাহী করে রেখেছিল। সুতরাং স্বয়ং লেখকের কায়রো উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মধ্যে সাহচর্যের আগ্রহ সৃষ্টি করে। ইবনে খালদুন তাঁর আত্মজীবনীতে এ আগ্রহের মনোজ্ঞ বর্ণনা তুলে ধরেছেন। তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে, তাঁদের সর্বপ্রকার চাহিদা পূরণ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এজন্যই তাঁর

বক্তৃতামালায় অনেকেই যেমন নিরাশ হয়েছেন, তেমনি অনেকেই নতুন আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছেন। বস্তুত ইবনে খালদুন তাঁর নিজের বিষয় পরিধিতে একান্তই অসাধারণ ছিলেন এবং তাঁর বিষয়বস্তু প্রকাশের ওজস্বিতা ছিল সর্বতোভাবে আকর্ষণীয়। তাঁর এ গুণটি না থাকলে কায়রোর বিদ্বজ্জন পরিবেশে তাঁর অবস্থান খুব স্থায়ী হতে পারত না। কারণ, তৎকালীন সীমাবদ্ধতা অনুসারে তাঁর কোনো রচনারই প্রচুর অনুলিপি প্রস্তুত করে আগ্রহী পাঠকদের ঔৎসুক্য পূরণ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং একান্ত সঙ্গত কারণেই আগ্রহী ব্যক্তিরা শ্রোতা হিসাবে লেখকের সান্নিধ্যে এসেছেন এবং শিষ্য, শ্রোতা নির্বিশেষে সকলেই একথা স্বীকার করেছেন যে, ইবনে খালদুন অতুলনীয় বাগ্মিতার অধিকারী ছিলেন।

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরেই তাঁর এ বাগ্মিতা জ্ঞানপিপাসু গুণীজনের শ্রুতিগোচর হয়। তাঁর এ প্রকার জনপ্রিয়তার প্রভাব লক্ষ করেই সম্রাট বারকুক তাঁকে ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে কৌমিয়া মাদ্রাসার মালেকী ফেকাহশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। উক্ত পদে যোগদানকালে ইবনে খালদুন যে উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন, তা তাঁর আত্মজীবনীতে উদ্ধৃত রয়েছে। কায়রোর প্রায় সর্বশ্রেণীর মানুষ তাঁর এ সারগর্ভ ভাষণ শোনার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর বিষয় বিন্যাস, ওজস্বিতা ও ভাষার কারুকার্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এ ধরনের আরো দুটি ভাষণ সম্পর্কে খালদুন তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। এর একটি জাহিরিয়া মাদ্রাসা ও অন্যটি সারগাতমিশিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনায় যোগদানকালে তিনি প্রদান করেন। এ সকল ভাষণে সমসাময়িক ইতিহাসের উপাদান ছাড়া তৎকালীন শিক্ষাদান প্রণালীর বিশেষ বিবরণ লাভ করা যায়। এভাবে ইবনে খালদুন কায়রোর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজের অধীত ও অর্জিত জ্ঞান বিতরণের সুযোগ লাভ করেন।

অবশ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কায়রোর উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইবনে খালদুন যে সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য নিয়োজিত হয়েছিলেন, তার মধ্যে হাদিস ও ফেকাহশাস্ত্রই প্রধান। আল-মুকাদ্দিমায় তিনি যে নতুন বিষয়ের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন কিংবা সাধারণভাবে তাঁর ইতিহাসে যে সকল বিষয়ের বিবরণ বিদ্যমান, তা নিয়ে প্রথাগত অধ্যাপনার কোনো সুযোগই তিনি পাননি। এতে করে তৎকালীন জ্ঞানচর্চার সীমাবদ্ধতার কথা যেমন আমরা বুঝতে পারি, তেমনি যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যস্থানে প্রতিষ্ঠাদানের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত পরিবেশের এ সীমাবদ্ধতা ও সুযোগের অভাবেই ইবনে খালদুন তাঁর নিজস্ব বিষয়ে যথার্থ অধ্যাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনায় আল-মুকাদ্দিমার বিষয়বস্তু উপস্থাপনে বাধা ছিলো না, হয়তো ইবনে খালদুন স্বেচ্ছায় এ সম্পর্কে পৃথক আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করে থাকবেন; কিন্তু বাস্তবে এর কোনোটিই আমাদের উদ্দিষ্ট উত্তরসূরি গঠনে সাহায্য করতে পারে না। এজন্যই একান্ত দুঃখের সাথে আমরা লক্ষ করব যে, ইবনে খালদুনের এ ঐতিহাসিক দর্শনের যেমন কোনো পূর্বসূরি নেই, তেমনি কোনো উত্তরসূরিও ছিল না।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা যায়, আর তা হল এ যে, খালদুন পরিবারে ইবনে খালদুনই সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি, যিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

ইতিপূর্বে তাঁর পরিবারের অন্য অনেকেই এ জ্ঞান বিতরণে অগ্রসর হয়ে এসেছেন; কিন্তু সে ছিল তাঁদের পেশা নয়, নেশা। এর বিনিময়ে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট কোনো অর্থই তাঁরা গ্রহণ করেননি। ইবনে খালদুন তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় শিক্ষকতার এ পেশাগত পরিবর্তন এবং এর বাস্তব ফলশ্রুতির কথা বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি নিজেই এর শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। অবশ্য এছাড়া তাঁর উপায়ও ছিল না; এ ভিন্ন পরিবেশে জীবিকা অর্জনের জন্য অন্য কী উপায়ই বা তিনি গ্রহণ করতে পারতেন। অন্যদিকে তাঁর এ পেশায় হয়ত তাঁর ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য সামাজিক মর্যাদা সহজলভ্য ছিল; তবু মনে হয়, পেশাগত শিক্ষকতার এ হীনতা থেকে নিজকে দূরে সরিয়ে নেবার জন্যই তিনি প্রধান বিচারকের পদ গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন।

কৌমিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপনায় নিযুক্ত হওয়ার কয়েক মাস পরেই সম্রাট বারকুক ইবনে খালদুনকে মিশরের মালেকী মজহাবের প্রধান বিচারকের পদে যোগদানের জন্য আহ্বান জানান। ইবনে খালদুন প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করলেও পরে সাগ্রহে এ নতুন পদমর্যাদা গ্রহণ করেন। এতে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এ ধরনের প্রতিপত্তি লাভের দিকে ইবনে খালদুনের আসক্তি ছিল সর্বাধিক। আমরা তাঁর উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার জীবনে বারংবার এর বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করেছি। কিন্তু ইতিহাস আরম্ভ করার পর তিনি একান্ত প্রয়োজনেই সে আসক্তি থেকে নিজকে মুক্ত করে নিতে চেয়েছিলেন। কারণ শান্ত জীবনের ছত্রচ্ছায়ায় বসতে না পারলে তাঁর আরাদ্ধ কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। এজন্যই তিউনিসে অবস্থানকালেই তিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপনাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং এখানে এসেও সে ধারাই অনুসরণ করেছিলেন। খুব সম্ভব পেশাগত শিক্ষকতার হীনতা ও সম্রাট বারকুকের নিকট থেকে এ অযাচিত আহ্বান তাঁর সেই সুপ্ত আসক্তিকে জাগিয়ে দিয়েছিল। নতুবা বারবার এ পদ থেকে চ্যুত হয়েও তিনি এটিকে আঁকড়ে ধরে থাকবার চেষ্টা করতেন না। অবশ্য এর সাথে আমরা তাঁর শত্রুকে পরাজিত করার এক অনমনীয় চেতনাকেও যোগ করতে পারি। তবু ইবনে খালদুনের ন্যায় এমন একজন মহৎ প্রতিভাধর ও পরিণত বয়সী ব্যক্তির নিকট থেকে এ ধরনের একগুয়েমি কেমন যেন বেখাপ্পা বলে মনে হয়। কারণ, তিনি তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় একথা স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেছেন যে, যে কোনো প্রকার পদমর্যাদার স্থায়িত্ব, শক্তির বিস্তার ও প্রতিষ্ঠালাভ গোত্রপ্রীতির সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া ফলপ্রসূ হয় না। অথচ এক্ষেত্রে তিনি প্রধান বিচারক হিসাবে যে ধরনের সংস্কারের কাজ আরম্ভ করেছিলেন, এর পিছনে কোনো প্রকার গোত্র শক্তির সহায়তা ছিল না। এ কারণেই শত্রুদের চক্রান্তে তিনি বারবার বিপর্যস্ত হয়েছেন। তবু তাঁর সৌভাগ্য বলতে হবে যে, শেষ পর্যন্ত তিনি এ প্রধান বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত থেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইবনে খালদুন তাঁর আত্মজীবনীতে এ প্রধান বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের অযোগ্যতা, দুর্নীতি, গোষ্ঠীপ্রীতি ও ঘুষ প্রথাকে কঠোর হস্তে দমন করতে চেয়েছিলেন। এর ফলে শুধু মিশরীয় নয়, মিশরে অবস্থানকারী তাঁর স্বদেশীয় বহুলোকও তাঁর বিরোধী হয়ে উঠে। বস্তুত তৎকালীন মিশরে এ সকল

ব্যাপার প্রথাগতভাবে স্থায়ী হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এর সঙ্গে সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও জড়িত ছিলেন। ফলে, একজন বিদেশী, তিনি যত জ্ঞানীগুণীই হোন না কেন, প্রধান বিচারকের পদে সমাসীন হয়ে দীর্ঘদিনের প্রথাকে পরিবর্তন করে ফেলবেন, এ বিষয়টি তারা সহ্য করতে পারেননি। কাজেই এক বছর যেতে না যেতেই তাঁদের চক্রান্তের ফলে ইবনে খালদুন উক্ত পদ থেকে বিচ্যুত হন।

এ সময়ের আরো একটি দুর্ঘটনা তাঁর মানসিক অবস্থা বিপর্যস্ত করে দেয়। নৌকাডুবির এ দুর্ঘটনার কথা আমরা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি। কৌমিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেই ইবনে খালদুন তিউনিস থেকে তাঁর পরিবার পরিজনকে এখানে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর অনুরোধে ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সম্রাট বারকুক তিউনিসের সম্রাট আবুল আব্বাসের নিকট এ প্রসঙ্গে একটি পত্র পাঠান। এর উত্তরে আবুল আব্বাস মিশরীয় সম্রাটের জন্য কতিপয় অশ্বের উপঢৌকনসহ ইবনে খালদুনের পরিবারবর্গকে মিশরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু যে জাহাজটি তাদেরকে বহন করে এনেছিল, আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের নিকটে তা ঝড়ের মুখে পড়ে ডুবে যায় এবং আরোহীদের সকলেই নিহত হয়। এ মর্মান্তিক সংবাদে ইবনে খালদুন একান্তই বিরাগী হয়ে পড়েছিলেন এবং সবকিছু ত্যাগ করে কিছুদিনের জন্য নির্জনবাস অবলম্বন করেন।

কিন্তু সম্রাট বারকুকের আবেদন ও বন্ধুস্থানীয়দের উপদেশ আবার তাঁকে নব প্রতিষ্ঠিত জহীরিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপনায় যোগ দিতে বাধ্য করে। এ মাদ্রাসাটি সম্রাট জহীর বারকুক তাঁর নিজের নামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে যোগদান করার পর ইবনে খালদুন, সম্ভবত মানসিক শান্তি কামনায় তাঁর বহুদিনের পরিত্যাক্ত হজ্জব্রত পালনের ইচ্ছাকে এবার পূরণ করতে সচেষ্ট হন এবং সম্রাটের অনুমতিক্রমে ১৩৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি সে উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। দীর্ঘ আট মাস কাল মক্কা, মদিনার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে এবং বহু জ্ঞানীগুণীর সাহচর্য লাভ করে তিনি পুনরায় কায়রোতে ফিরে আসেন। এর কয়েক মাস পরে ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে তাঁকে সারগাতমিশিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয় এবং কিছুদিন পরে একই সঙ্গে তিনি 'বাইবার' মাদ্রাসার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দে আলোপ্পার শাসক আমীর ইয়াল বুগা নাসিরীর নেতৃত্বে সম্রাট বারকুকের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় এবং এতে সাময়িকভাবে সম্রাট তাঁর সিংহাসন থেকে বিচ্যুত হন। কিন্তু ১৩৯০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকেই তিনি বিজয়ীর বেশে কায়রোতে প্রবেশ করে তাঁর সিংহাসন অধিকার করেন। সম্রাট বারকুকের এ অনুপস্থিতির সময় কায়রোর ধর্মশাস্ত্রবিদরা তাঁর বিরুদ্ধে একটি ফতোয়া জারী করেছিলেন। এতে ইবনে খালদুনের দস্তখত ছিল। এর ফলে সাময়িকভাবে সম্রাট বারকুকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। অবশ্য পরে প্রমাণিত হয় যে, বিরোধী শক্তির চাপে পড়ে একান্ত অনিচ্ছায় তিনি উক্ত ফতোয়ায় দস্তখত দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এর মধ্যেই শত্রুপক্ষের চক্রান্তে তিনি 'বাইবার' মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদ থেকে অপসারিত হন। তবু সম্রাট ও ইবনে খালদুনের মধ্যকার সম্পর্ক যে মোটামুটি

অক্ষত ছিল, এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর অধ্যাপনার পদটি অক্ষত থাকায়। দীর্ঘদিন তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় প্রধান বিচারকের পদে যোগ দেন এবং এর কিছুদিন পরেই সম্রাট বারকুকের মৃত্যু হয়।

সম্রাট বারকুকের পর মিশরের সিংহাসনে বসেন তাঁর দশ বছর বয়স্ক বালকপুত্র নাসির-আল-ফেরাজ। এ পরিবর্তনেও ইবনে খালদুনের পূর্বতন পদমর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে। তিনি নবীন সম্রাটের সঙ্গী হয়ে দামেস্ক পরিভ্রমণ করেন এবং তাঁর অনুমতিক্রমে ফিলিস্তিন, জেরুজালেম, বেথলেহেম, হিব্রুন প্রভৃতি নগরীর দর্শনীয় পুণ্যস্থানগুলো ঘুরে বেড়ান। কিন্তু মিশরে ফিরে এসেই বুঝতে পারেন যে, তাঁর প্রধান বিচারকের পদের বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত তার অনুপস্থিতির সুযোগে দানা বেঁধে উঠেছে এবং শেষ পর্যন্ত এ চক্রান্তের ফলেই ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে তিনি প্রধান বিচারকের পদ থেকে বিচ্যুত হন।

এ সময়ে সংবাদ এসে পৌঁছায় যে, সম্রাট তৈমুরলঙ্গের নেতৃত্বে তাতারী সৈন্যদল আলেপ্পো জয় করে দামেশ্‌কের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মিশরীয় সম্রাট শত্রুদের এ অগ্রাভিযান প্রতিহত করার জন্য সসৈন্যে দামেশ্‌কে যাত্রা করেন। ইবনে খালদুন তখন গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদে অধিষ্ঠিত না থাকলেও সৈন্যদলের সঙ্গে যাবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। এ ধরনের অভিযানের তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর প্রচুর এবং বস্তুত এরই হাত এড়াবার জন্য তিনি এক সময়ে জন্মভূমি ত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁর পক্ষে তেমন কিছু করার উপায় ছিল না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তিনি সৈন্যদলের সঙ্গী হন এবং ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে দামেশ্‌কে পৌঁছান। মিশর থেকে আরো বহু জ্ঞানীগুণী ধর্মশাস্ত্রবিদ এ সৈন্যদলের সঙ্গে গিয়েছিলেন। তাঁরা শহরেই অবস্থান করতে থাকেন। ইত্যবসরে মিশরীয় সৈন্যরা শহরের উপকণ্ঠে কয়েকটি যুদ্ধে তাতারীদেরকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এ সময়ে কায়রো থেকে সংবাদ এসে পৌঁছায় যে, সেখানে সিংহাসন অধিকারের একটি ষড়যন্ত্র চলছে। এ সংবাদে ব্যস্তসমস্ত সম্রাট নাসির আল-ফেরাজ তাতারীদের হাতে দামেশকের ভাগ্যকে ছেড়ে দিয়ে মিশরে প্রত্যাবর্তন করেন। ইবনে খালদুনসহ সকল জ্ঞানীগুণী দামেশ্‌কেই অবস্থান করতে বাধ্য হন এবং অচিরেই তাতারী সৈন্যদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় নগরীর অধিবাসীরা তদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্ত্রস্ত হয়ে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু সৈন্যরা এক্ষেত্রে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এদিকে প্রতিদিনই আতঙ্কের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত জ্ঞানীগুণীরা ইবনে খালদুনের নেতৃত্বে সম্রাট তৈমুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে খালদুনের আত্মজীবনীর বর্ণনা অনুসারে দেখা যায়, তাঁরা লুকিয়ে ইবনে খালদুনসহ অন্য কয়জন ধর্মীয় নেতাকে নগরীর প্রাচীর থেকে নিচে নামিয়ে দিতে সমর্থ হন। ইবনে খালদুন নগর তোরণের কাছে অবস্থানরত তাতারী সৈন্যদের নিকট নিজের উদ্দেশ্য খুলে বলেন এবং তারা তাঁকে সম্রাট তৈমুরের নিকট নিয়ে যায়। সেখানে তিনি সসম্মানে তাঁর সাথে মিলিত হন এবং তাঁদের মধ্যে নগরীর আত্মসমর্পণ সম্পর্কীয় বিষয় ছাড়াও অন্য অনেক বিষয়ে আলাপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সম্রাট তৈমুর তাঁর

পাণ্ডিত্য ও নির্ভীকতায় মুগ্ধ হন এবং তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে নগরীর অধিবাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার অঙ্গীকার করেন। কিন্তু পরিণামে আত্মসমর্পণে দেরি করার অজুহাত দেখিয়ে তাতারীরা তাদের এ অঙ্গীকার রক্ষা করেনি। তারা নগরীতে প্রবেশ করে যথেষ্ট লুটতরাজ, অগ্নি সংযোগ ও রক্তপাত ঘটায়। ইবনে খালদুন তৈমুরের আশ্রয়ে নগরীর বাইরে বসে এ সকল সংবাদ শুনে খুবই মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে এর প্রতিকার করার কোন উপায়ই ছিল না। তদুপরি সম্রাট তৈমুর তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ভূগোল ও অন্যান্য বিষয় সংবলিত একটি বিবরণ লিখে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেটি নিয়েও তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। সেজন্য অন্য জ্ঞানীগুণীরা-যথা সময়ে সম্রাট তৈমুরের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেও ইবনে খালদুন এখানেই অবস্থান করছিলেন।

ইবনে খালদুন দীর্ঘকাল ধরে তাঁর জন্মভূমি থেকে দূরে বিদেশে বসবাস করছিলেন। সেখানে ফিরে যাবার ইচ্ছা আর তাঁর ছিল না। সম্ভবত এ কারণেই জন্মভূমি ত্যাগকালে এর প্রতি যে বিতৃষ্ণা তাঁর মনে জাগ্রত ছিল, তা পরবর্তীকালে ক্রমশ দূর হয়ে তার স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এজন্যই দেখা যায়, মিশরে আসার পর তিনি নানাভাবে মিশর ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার শাসকদের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তদুপরি এমনি রাজকীয় ও সাধারণ আদান-প্রদানের মাধ্যমে তাঁর ইতিহাসে সংযোজনযোগ্য আধুনিক উপাদান সংগ্রহ করে নেয়াও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। জন্মভূমির যে ইতিহাস তিনি রচনা করেছিলেন, তা যেন তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করে, সেদিকেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। জন্মভূমির প্রতি বিতৃষ্ণা থাকলে দূর বিদেশে বাস করে এভাবে সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা তিনি করতেন না। সুতরাং সম্রাট তৈমুরের তাঁবুতে বসে সেই জন্মভূমির বিবরণ লিখতে তাঁর মন খুব একটা সায় দেয়নি। তবু নির্দেশ তাঁকে পালন করতে হয়েছিল এবং একটি দীর্ঘ বিবরণই তিনি সম্রাট তৈমুরকে উপহার দিয়েছিলেন। মঙ্গল ভাষায় এটি অনুবাদ করে শোনার পর সম্রাট তৈমুরও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করেছিলেন। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ইবনে খালদুন সম্রাটের নিকট থেকে সসম্মানে ও নিরাপদে মিশরে ফিরে আসার অনুমতি লাভ করেন। কিন্তু জন্মভূমির বিবরণ একজন দিগ্বিজয়ী শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে আসার বেদনা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেননি। তাই মিশরে এসে তিনি উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার মারিনী সম্রাটের নিকট তৈমুর ও তাঁর সৈন্যদল সম্পর্কে একটি দীর্ঘ ও বাস্তব বিবরণ লিপিবদ্ধ করে পাঠান। যদ্দুর মনে হয়, এর মাধ্যমে তিনি তাঁর মানসিক যাতনা উপশমের উপায় খুঁজে নিয়েছিলেন।

যাহোক, মিশর থেকে দীর্ঘ ছয় মাস দূরে অবস্থান করার পর ইবনে খালদুন ১৪০১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে পুনরায় সেখানে ফিরে আসেন। এরপর তিনি আরো পাঁচ বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে কয়েক বার প্রধান বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হওয়া ও তা থেকে বিচ্যুত হওয়া ছাড়া তাঁর জীবনের অন্য কোনো বিশেষ সংবাদ জানা যায় না। ১৪০১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি তৃতীয় বার প্রধান বিচারক হন এবং ১৪০২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে পদচ্যুত হন। পুনরায় ঐ বছরেরই জুলাই মাসে চতুর্থবার উক্তপদে যোগদান করেন এবং ১৪০৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে পদচ্যুত করা হয়।

পুনরায় ১৪০৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি পঞ্চম বার ঐ পদে যোগ দেন এবং তিন মাস পরে পদচ্যুত হন। তার শেষ বা ষষ্ঠ বার উক্ত প্রধান বিচারকের পদে যোগদানের সময় ছিল ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস এবং এ যোগদানের কয়েকদিন পরেই এ বিরল মনীষার অধিকারী সংগ্রামী কর্মী পুরুষ ১৭ মার্চ, ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে লোকান্তরিত হন।

বস্তুত জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইবনে খালদুন তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তার অনমনীয় সংগ্রামী চরিত্রের পরিচয় রেখে গেছেন এবং প্রধান বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত থেকে তাঁর মৃত্যুবরণ একথাই প্রমাণ করেছে যে, তিনিই জয়ী। তাঁর এ বিজয় শত্রুদের সর্বপ্রকার চক্রান্ত ধূলিস্মাৎ করে দেহ থেকে দেহহীন মননের রাজ্যে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে; সেখানে তিনি সর্বকালের প্রধান বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত। আর এরই স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন তাঁর কালজয়ী সৃষ্টি আল-মুকাদ্দিমায়। এবার আমরা অতি সংক্ষেপে তাঁর সেই অমর কীর্তি সম্পর্কে আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

আল-মুকাদ্দিমা

['হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত']

আল-মুকাদ্দিমা আল্লামা ইবনে খালদুনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কিন্তু সাধারণভাবে যে কোনো সাহিত্যিক, শিল্পী ও গবেষকের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলতে যা বোঝায়, আল-মুকাদ্দিমা শুধু তা নয়; বরং তার চাইতেও অধিকতর মর্যাদার অধিকারী। বস্তুত মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসে এ এক নতুন দৃষ্টি এবং এমন এক দৃষ্টি, যার ফলে ইতিহাসের বহু চেনা-জানা-শোনা উপাদান যেমন অচেনা হয়ে যায়, তেমনি বহু অখ্যাত অবজ্ঞাত উপাদানও নতুন পরিচয়ের মর্যাদায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে। আমরা ইতিপূর্বে এ দৃষ্টিকেই তাঁর ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছি এবং একথাও বলেছি যে, এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে খালদুনের যেমন যথার্থ কোনো পূর্বসূরি নেই, তেমনি তাঁর কোনো যথার্থ উত্তরসূরিও গড়ে উঠেনি। একান্তভাবে আধুনিককালে আমরা সমাজতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের যে ধারার সাক্ষাৎ লাভ করি, তা হয়ত ইবনে খালদুনের অন্তর্দৃষ্টিকেই আরো সমৃদ্ধ আকারে উপস্থিত করেছে; কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, এ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ খালদুনী অন্তর্দৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত নয়। কারণ যে বস্তুবাদী আবহ আজকের এ সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উপস্থিত তা সর্বাংশে ইবনে খালদুনের সত্তায় বিধৃত ছিল না। তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সরল বাস্তবতা নিয়ে একান্তভাবেই ভাববাদী।

ইবনে খালদুনের জীবনকাল খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী। এ সময়ে তাঁর জীবন পরিবেশে যে সীমাবদ্ধতা বিরাজ করছিল, সে সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এজন্যই আমরা দেখতে পাব তিনি ইবনে রুশদের বিরোধিতা করেছেন এবং দার্শনিক জীবন চেতনায় তিনি বরং ইমাম গাজ্জালীর সাথে একাত্মতা অনুভব করার দিকে এগিয়ে গেছেন। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে তিনি দর্শন ও কিমিয়াশাস্ত্রের অসারতা প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তবু একথা সত্য যে, তিনি ইমাম গাজ্জালীর অনুসারী নন। এ ক্ষেত্রেও ইবনে খালদুন তাঁর নিজস্ব বিশিষ্টতায় সমুজ্জ্বল। তদুপরি ইতিহাস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি যে বাস্তব কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁর এ বিশিষ্টতাকে আরো সুদূর প্রসারী করে তুলেছে।

ইসলামী জগতে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার ধারা একান্ত প্রাথমিক পর্যায়েই আরম্ভ হয়েছিল। এক্ষেত্রে গ্রিক ঐতিহ্যের সমৃদ্ধির কথা বাদ দিলে সমগ্র পৃথিবীতে মুসলিম মনীষার অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়। ইবনে খালদুনের জীবনকাল পর্যন্ত ব্যাপক বিস্তৃতিসহকারে ইতিহাস রচনার এ ধারা অনুসৃত হয়ে এসেছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে অন্য

কেউ ইতিহাসের বাস্তবতাকে এমন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। এমন কি গ্রিক ঐতিহ্যেও এর অনুপস্থিতি সমভাবে লক্ষণীয়। বস্তুত ইবনে খলদুনই সর্বপ্রথম এর প্রয়োজনীয়তাকে ভাষা দিয়েছেন। এর কারণ তাঁর সম্মুখে লীলায়িত বাস্তব জগৎ ও ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যে তিনি একটা প্রচণ্ড বিরোধ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি নিজে সক্রিয়ভাবে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে বিরোধিতাকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁর পূর্বসূরি বা সমকালীন আর কারোর মধ্যেই জীবন সংগ্রামের এ ব্যাপকতা ছিল না। এজন্য মনে হয়, এ বিরোধের উপলব্ধি—জীবনের এ বাস্তব অভিজ্ঞতা সবকিছু মিলিয়েই ইবনে খলদুনকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপনে উৎসাহিত করেছে। বস্তুত তাঁর ইতিহাসের ভূমিকায় এ প্রকার বিরোধ ও অভিজ্ঞতার বিচিত্র পরিচয় বিদ্যমান।

এক্ষেত্রে ভূমিকা বলতে আমরা তাঁর ইতিহাসের যথার্থ ভূমিকার প্রতিই ইঙ্গিত করেছি। কারণ 'আল-মুকাদ্দিমা' শব্দের অর্থ যদিও বা ভূমিকাই, তথাপি এ আল-মুকাদ্দিমা এবং আমাদের উদিষ্ট সেই ভূমিকার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য বুঝবার জন্য আমাদেরকে তাঁর ইতিহাসের সমগ্র বিষয় পরিধি উল্লেখ করতে হবে। ইবনে খলদুন তাঁর ইতিহাসটিকে তিনটি গ্রন্থে ও সাতটি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। এ ব্যাপক পরিকল্পনার ভূমিকায় তিনি ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব, ঐতিহাসিকদের ভ্রান্তি, এর কারণ ও ফলশ্রুতি এবং তাঁর ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। মূলত তাঁর এ ভূমিকার বিস্তৃতি তেমন কিছু নয়; অবশ্য এর মধ্যেই তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এরপর তিনি তাঁর ইতিহাসের গ্রন্থে এ ভূমিকার পরিপূরক বিচিত্র বিষয় সন্নিবেশ করেছেন। মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট ও তৎকালে প্রচলিত এমন কোনো বিষয় নেই, যা তিনি এতে সংগ্রহ করেননি। পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত এ প্রকার প্রতিটি বিষয়কেই তিনি সমাজ প্রগতির সাথে সংশ্লিষ্ট করে এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করেছেন। এ কারণেই তাঁর এ ব্যাপক সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ একদিকে গ্রন্থটিকে যেমন একটি বিশ্বকোষ জাতীয় রচনায় পরিণত করেছে, অন্যদিকে তেমনি এটি তাঁর ভূমিকারই বিষয় বিস্তার বলে পরিগণিত হয়েছে। এর ফলে শুধু বর্তমানে নয়, ইবনে খলদুনের জীবনকালেই তাঁর ভূমিকা ও প্রথম গ্রন্থ 'আল-মুকাদ্দিমা' বা ভূমিকা নামে পরিচিত লাভ করে। ইবনে খলদুন স্বয়ং তাঁর আত্মজীবনীতেও আল-মুকাদ্দিমাকে এভাবে উল্লেখ করেছেন।

ইতিপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইবনে খলদুনের এ প্রথম গ্রন্থটি একটি বিশ্বকোষ জাতীয় রচনা। মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির যে বিচিত্র উপাদানের আলোচনা তিনি এতে তুলে ধরেছেন, তার বিস্তারিত মূল্যায়ন এখানে সম্ভব নয়; তবু আমরা এর বিশেষ কয়টি দিক নিয়ে তাঁর বিশিষ্টতার পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করব। এ প্রকার চেষ্টার সীমাবদ্ধতা সহজেই অনুমেয়।

ইবনে খলদুনের আল-মুকাদ্দিমায় প্রবেশ করলে যে বিষয়টি সর্বাপেক্ষা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তা হল তাঁর সামগ্রিক বিষয় বিন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুরূপে মানুষের

অধিষ্ঠান। বস্তুত মানুষের শ্রম ও চিন্তার ফসল রূপেই সভ্যতা-সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদান গড়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিরূপতা ও সহায়তাই মানুষকে এ সকল উপাদান সৃষ্টির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কারণ কোন একক মানুষের পক্ষে যেহেতু জীবনের সামগ্রিক চাহিদা মিটিয়ে টিকে থাকা সম্ভব নয়, সেজন্যই মানুষ স্বেচ্ছায় সমাজবদ্ধ জীবন-যাপন করতে উৎসাহিত হয়েছে এবং পরস্পরের সহায়তায় জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে নিয়েছে।

অন্যদিকে মানুষের এ প্রকার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সামাজিক বিকাশ সর্বত্র সমানভাবে হয়নি। এর কারণ প্রকৃতির বিরূপতা। এ প্রসঙ্গে ইবনে খলদুন গ্রিক ও সমকালীন ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, এ সামাজিক বিকাশ পৃথিবীর মধ্যবর্তী সমভাবাপন্ন অঞ্চলেই অধিকতর ঘটেছে। এ তুলনায় তৎসন্নিহিত অসমভাবাপন্ন উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলগুলোতে এর বিকাশ নিম্ন পর্যায়ের এবং সর্ব উত্তরে অত্যধিক শৈত্য ও সর্ব দক্ষিণে অত্যধিক উষ্ণতার জন্য ও বিকাশ সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুরূপ বিকাশের তারতম্যে প্রকৃতির এ প্রকার বিরূপতা ও সহায়তা এক প্রধান স্থান অধিকার করে আছে।

অবশ্য সভ্যতা সংস্কৃতির বিনির্মাণে এভাবে সামাজিক শক্তি ও প্রকৃতির উপস্থিতিকে প্রাধান্য দেয়া সত্ত্বেও ইবনে খলদুন অতীন্দ্রিয় শক্তিতে বিশ্বাস করেন। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে তিনি একত্ববাদের ধারণাকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ আকারে উপস্থাপিত করেছেন এবং যাদু, ইন্দ্রজাল ইত্যাদি সম্পর্কীয় ধ্যান-ধারণা পোষণেও তিনি নিস্পৃহ নন। অনেক ক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁকে এ সকল সংস্কার সম্পর্কে ইতিবাচক বক্তব্য রাখতে উৎসাহিত করেছে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে ইবনে খলদুন তৎকালীন জীবন পরিবেশে আধ্যাত্মবাদ ও অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদের যে ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল, তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি।

তবু তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি তথা ইতিহাসের যে বাস্তব পর্যালোচনা তিনি উপস্থিত করেছেন, তাতে এ প্রকার অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রভাব একান্তই সীমিত। এজন্যই তিনি, এমন কি ইসলামের অভ্যুদয় ও বিকাশের পশ্চাতেও মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তির সক্রিয়তাকে অনুধাবন করেছেন। তিনি তৎকালীন আরবের উপর 'মুজার' তথা কোরায়েশ গোত্রের অসামান্য প্রভাব এবং ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তারে সে প্রভাবের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। অনুরূপভাবে মানুষের সামাজিক বিকাশ ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্য নবুয়তের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কীয় যে যুক্তি সাধারণভাবে ইসলামী জগতে বিদ্যমান, ইবনে খলদুন সে যুক্তির ধারাকে অস্বীকার করে একান্তভাবে মানুষের স্বভাবসুলভ প্রয়োজন ও সংঘবদ্ধ সামাজিক শক্তির সক্রিয়তাকে সম্মুখে নিয়ে এসেছেন। চিন্তাশক্তির বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মানুষ যে প্রাণিজগতেরই অধীন এবং এ বৈশিষ্ট্যের কল্যাণেই যে তথাকথিত ধর্মহীন জাতিগুলোর মধ্যেও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে, এ তথ্যকেও তিনি তার যুক্তির সমর্থনে উল্লেখ করেছেন। এমনকি যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের মধ্যে অতীন্দ্রিয় শক্তির এ উপস্থিতির যে ধারণা সাধারণভাবে বিদ্যমান, তাকেও তিনি সফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক যে

সবলতা ও দুর্বলতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ধরনের আরো উদাহরণ তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় বিদ্যমান। এ সকল দিক থেকে লক্ষ করলে ইবনে খলদুনের এ প্রকার দৃষ্টিকোণকে একান্তই ঐহিকতা মণ্ডিত বলে মনে হবে; কিন্তু সামগ্রিকভাবে তা ঐহিকতার ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ নয়। যদ্দুর ধারণা করা যায়, ইবনে খলদুন মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতির বিকাশে অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রভাবের গুণগত নয়, বরং পরিমাণগত সম্পর্ক স্থাপনের উপরই অধিকতর জোর দিয়েছেন।

এ কারণেই শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে বলতে হয় যে, ইবনে খলদুনের মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। সমগ্র প্রাণিজগতে তাঁর বিশিষ্টতার মৌল কারণ যে চিন্তাশক্তি, তা আল্লাহ্‌রই দান; অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এজন্যই অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করি গ্রিক ও ইসলামী দর্শনের এক সম্মিলিত প্রভাব ইবনে খলদুনের মানসপ্রক্রিয়াকে পরিচালিত করেছে এবং এর ফলে একদিকে তিনি যেমন সভ্যতা-সংস্কৃতিতে অতীন্দ্রিয়তার প্রায় সকল কুহেলিকা নস্যাৎ করতে এগিয়ে গেছেন, অন্যদিকে তেমনি সামান্য পরিমাণে হলেও অতীন্দ্রিয় শক্তির অধীনতাপাশে আবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। বস্তুত তাঁর ঐতিহাসিক দর্শনে এ প্রকার বৈপরীত্য বা সহাবস্থানের প্রচেষ্টা তাঁর জীবন পরিবেশেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি। ইবনে খলদুন তাঁর বলিষ্ঠতা সত্ত্বেও একে সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারেননি। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বেও একাধিকবার উল্লেখ করেছি।

এভাবে অতীন্দ্রিয় শক্তির বদান্যতাধন্য মানুষ যখন তাদের চিন্তাশক্তির আকর্ষণে পরস্পরের সহায়তা লাভে এগিয়ে গেছে এবং সম্মিলিত প্রয়াসে পৃথিবীর বুকে অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে, তখনই 'উমরান' বা সভ্যতার জন্ম হয়েছে। ইবনে খলদুন তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় আলোচিত এ নতুন বিষয়ের নামকরণে এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অবশ্য শব্দটি একমাত্র এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়নি; আল-মুকাদ্দিমার অন্যত্র তিনি একে 'জনবসতি' অর্থেও প্রয়োগ করেছেন। এ উমরান শব্দটির ধাতুগত অর্থ নির্মাণ করা; আবাদ করা। সুতরাং এ শব্দটি ইবনে খলদুনের বক্তব্য উপস্থাপনের লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তদুপরি এর সঙ্গে ব্যবহৃত অন্য একটি শব্দের অর্থ মিলিয়ে নিলে তাঁর বক্তব্যের সমগ্র ধারাটিই আমাদের সম্মুখে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। সে শব্দটি হল, 'এজতেমাউল বশরী' বা মানব সমাজ। অর্থাৎ সহজ কথায় সভ্যতা-সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায়, তা হল এ মানব সমাজেরই বিনির্মিত কীর্তিমালা।

কিন্তু মানব সমাজ বা এ জনশক্তির প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উপরোক্ত কীর্তিমালা সর্বত্র সমানভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। অনুরূপ বৈচিত্র্যের কারণ হিসাবে প্রাকৃতিক প্রভাবের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। ইবনে খলদুন এ প্রকার বহির্গত কারণ ছাড়াও সমাজশক্তির অন্তর্গত একটি কারণও অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এ কারণটিকে তিনি নাম দিয়েছেন 'আসাবিয়া' বা গোত্রপ্রীতি। এ প্রীতির শক্তি যে পরিমাণে সংঘবদ্ধ ও সক্রিয় হয়েছে, সভ্যতা বিনির্মাণে তাঁর প্রভাবও হয়েছে ততোই স্থায়ী ও দর্শনীয়। বস্তুত এ গোত্রপ্রীতি থেকেই মানুষের গোত্রবদ্ধ জীবনের বিকাশ এবং এটি মানুষের সমাজ বিকাশের প্রাথমিক স্তর। ইবনে খলদুন একেই 'বদোয়া' বা

যাযাবরী জীবন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ যাযাবর গোত্রশক্তিই আরো সংঘবদ্ধ হয়ে রাজ্য স্থাপন করেছে, নগর গড়ে তুলেছে এবং এরই ফলশ্রুতি হিসাবে নাগরিক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। এমন কি রাজ্য বিস্তারের তারমত্য ও তার স্থায়িত্বের বৈচিত্র্যের মধ্যেও ইবনে খলদুন এ গোত্রপ্রীতির অমোঘ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া লক্ষ করেছেন। ফলত সমাজ বিকাশের সর্বত্র তিনি এ গোত্রশক্তির প্রবল প্রতাপ সম্পর্কে অতিমাত্রায় সোচ্চার।

ইবনে খলদুনের চতুর্দশ শতকীয় জীবন পরিবেশ হয়ত বা এ গোত্রপ্রীতির ধারণা সম্পর্কে সহনশীল মনোভাব পোষণ করত; হয়ত এর বাস্তবতা তারা জীবনের অনিবার্য অভিজ্ঞতা থেকে স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবকালে এবং পরবর্তী ইসলামী চিন্তাধারাতেও এ 'আসাবিয়া' বা গোত্রপ্রীতিকে সুনজরে দেখা হয়নি। ইসলাম এ যাযাবরী গোত্রপ্রীতির বাধা অপসারিত করেই সমগ্র আরবকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছিল। তখন এ সংঘটনশীল সামগ্রিক ঐক্যকে যারা গোত্রের প্রতি আসক্তির দ্বারা প্রতিহত করতে চেয়েছে, তারা তাদের এ প্রকার আচরণের জন্য নিন্দনীয় হয়েছে। এরই ফলে গোত্রপ্রীতি মাত্রেই নিন্দার বিষয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামের সেই ধর্মীয় ঐক্য অটুট থাকেনি; খেলাফতের স্তর পেরিয়ে সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটেছে এবং গোত্রপ্রীতির অমোঘ প্রতিক্রিয়া তার প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে লক্ষগোচর হয়ে উঠেছে। তথাপি ইসলামী চিন্তাধারায় গোত্রপ্রীতির এ শক্তিকে সর্বাংশে স্থান দেয়া হয়নি; শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অশুভ প্রভাবের সৃষ্টি না করলে তার উপস্থিতিকে মেনে নেয়া হয়েছে। সম্ভবত ইবনে খলদুনই সর্বপ্রথম গোত্রপ্রীতি সম্পর্কে এ প্রকার নেতিবাচক মনোভাব ত্যাগ করে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তার ইতিবাচক অনিবার্য ভূমিকাকে তুলে ধরেছেন এবং এর মধ্য দিয়েই তিনি বলতে গেলে, সমাজ প্রগতির মৌলশক্তিকে আবিষ্কার করেছেন। বস্তুত এজন্যই তিনি, বলতে পেরেছেন যে, শুধু রাজ্যবিস্তার নয়, ধর্ম তথা যে কোনো সংস্কারমূলক কার্যক্রমের জন্য এ গোত্রপ্রীতি বা সংঘবদ্ধ শক্তির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এর প্রমাণ হিসাবে ইতিহাস থেকে তিনি বহু ঘটনা ও দুর্ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

তথাপি আমরা লক্ষ করব, এ প্রকার বলিষ্ঠ ইতিবাচক বক্তব্য তুলে ধরা সত্ত্বেও ইবনে খলদুন গোত্রপীতির সংকীর্ণতাকে সর্বত্র পরিহার করে চলেছেন। বস্তুত সমাজ প্রগতির নিয়ামকরূপে ঐক্যবদ্ধ জনশক্তি সম্পর্কীয় তাঁর এ ধারণা এক সর্বজনীন প্রেক্ষাপটে বিন্যস্ত। এক্ষেত্রে তিনি ইসলামের সেই সত্যপ্রীতি ও সামাজিক ন্যায়কেই অধিকতর বাস্তবতার সাথে ভাষা দিয়েছেন। এজন্যই তিনি নিজে দক্ষিণ আরবের সাথে সম্পর্কযুক্ত 'হাযারামী' উপাধি ব্যবহার করলেও আরবীয় সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সংস্কৃতি চেতনা সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য বিচার করে যথাযথ মন্তব্য উপস্থাপনে দ্বিধান্বিত হননি। তাঁর এ প্রকার কঠোর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এমনকি তাঁর জন্মভূমির বারবার জীবন পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েও তিনি তাদের বীরত্বের যেমন প্রশংসা করেছেন, তেমনি তাদের সংকীর্ণতাকেও সমান বাস্তবতায় তুলে ধরেছেন। ইসলামী সংস্কৃতি বিনির্মাণে অনারব মনীষার অবদান যে সর্বাপেক্ষা অধিক এ সত্য উচ্চারণ করতেও তিনি ইতস্তত করেননি। এরই ফলে

সভ্যতা-সংস্কৃতির নিয়ামক এ জনশক্তির অন্তর্গত দুর্বলতাকে তিনি আশ্চর্য নিপুণতায় ভাষা দিতে পেরেছেন।

বস্তুত সভ্যতার অগ্রগতি সাধনে নিয়োজিত জনশক্তির মধ্যে একান্ত স্বাভাবিক কারণেই অনুরূপ দুর্বলতার প্রকাশ ঘটে। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্র মিলিত হয়ে উক্ত জনশক্তি গড়ে তোলে, তাদের সকল অংশই সমমর্যাদা নেতৃত্বদানের সুযোগ পায় না; বরং সেখানেও সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী গোত্রটিই এ দুর্লভ সম্মানে ভূষিত হয়। এভাবে তাদের দ্বারা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটলে সেই নেতৃত্বদানকারী গোত্রটির নেতৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ পর্যায়েই এ সম্মিলিত জনশক্তির মধ্যে প্রথম অনৈক্যের সূত্রপাত হয়। যে ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, তিনি তার গোত্র বা সন্তান-সন্ততির জন্য সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হন এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী জনশক্তির অন্যান্য অংশগুলোকে পদাবনত করার কৌশল অবলম্বন করেন। ফলে রাজত্ব ও রাজকোষ সম্রাটের পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং এ পারিবারিক স্বার্থসংরক্ষণের জন্য তিনি তার অধীনে নিয়োজিত কর্মচারী, সৈনিক ও সেবকের সমবায়ে একটি আজ্ঞাবহ জনশক্তি গড়ে তোলেন। এভাবে দুর্বলতার প্রাথমিক পর্যায় সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে সাম্রাজ্যের অনুষঙ্গী বিলাসব্যসনের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। কারণ সম্রাট তার স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনেই প্রজাসাধারণের মধ্যে সমীহের ভাব উদ্রেককারী জাঁকজমকের সৃষ্টি করতে বাধ্য হন। পরিণামে সম্রাটের সেবকবৃন্দ এবং প্রজাদের মধ্যেও এ জাঁকজমক তথা বিলাসিতার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে একদিকে যেমন জনশক্তির সংগ্রামী মনোভাব নষ্ট হয়, অন্যদিকে তেমনি জীবন যাপনে ব্যয়বাহুল্য ঘটে। আর এ ক্রমবর্ধমান ব্যয় সংকুলানের জন্য অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের উপায় উদ্ভাবন করতে হয়। এক্ষেত্রে সম্রাটের পক্ষে অতিরিক্ত কর ধার্য করা ব্যতীত অন্য উপায় থাকে না। এখানেই দুর্বলতার তৃতীয় পর্যায়ের আরম্ভ এবং পরিণামে করভারে জর্জরিত কৃষক, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ বৃত্তির প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। এভাবে সাম্রাজ্য তথা সভ্যতা নির্মাণকারী জনশক্তির পতন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়।

ইবনে খলদুন সভ্যতা নির্মাণকারী জনশক্তির এ প্রকার উত্থান-পতনের আধার হিসাবে 'দওলত' বা সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, সাম্রাজ্যের বিস্তার ও স্থায়িত্ব উক্ত জনশক্তির অনুপাতেই ঘটে থাকে এবং যে সাম্রাজ্য যত শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়, সভ্যতা-সংস্কৃতির অগ্রগতি সাধনে তার অবদান ততই দর্শনীয় হয়ে উঠে। অবশ্য এতদসত্ত্বেও ইবনে খলদুন এ সাম্রাজ্যেরও বয়ঃসীমা নির্ধারণ করেছেন। তাঁর মতে যে কোনো সাম্রাজ্য সজীব সক্রিয় অবস্থায় তিন পুরুষের অধিক টিকে থাকে না; এরপরও তার স্থায়িত্ব অবক্ষয়ের অধীন জীবন্মুক্ত অবস্থার নামান্তর মাত্র। আধুনিক রাষ্ট্র বলতে যা বোঝায়, আল-মুকাদ্দিমায় তার কোনো সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই; অনেক স্থলেই রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য একই পরিণতির অধীন। ইবনে খলদুনের বিশ্লেষণে গোত্রপ্রীতির আকর্ষণে সংঘবদ্ধ জনশক্তিই ক্ষমতার উৎস এবং তাদের পতন ও

পরিবর্তনে তাই সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠে আর এ পরিবর্তনে শুধু সাম্রাজ্যের সীমা ও শক্তিমত্তারই পরিবর্তন ঘটে না; বরং তাঁর চরিত্রও ভিন্নতর হয়ে দেখা দেয়। অবশ্য এ সত্ত্বেও ইবনে খলদুন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি বিবেচনা করেছেন এবং অত্যন্ত বাস্তব উদাহরণসহ বিজয়ী ও বিজিতের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

এভাবে ইবনে খলদুনের মানুষ আদিম যাযাবর গোত্রজীবন থেকে যাত্রা শুরু করে পরিণামে নাগরিক সভ্যতার রূপকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দীর্ঘ যাত্রাপথে শ্রমই হল তার মূল পুঁজি এবং এ শ্রমকে সে কখনো অস্ত্রে, কখনো শাস্ত্রে, কখনো উৎপাদনে ব্যবহার করে এগিয়ে এসেছে। বস্তুত এ শ্রম দিয়ে যেমন সে তার জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মিটিয়েছে তেমনি উদ্বৃত্ত শ্রমের সাহায্যে গড়ে তুলেছে বিরাট নগর, বিলাসী শিল্পকলা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র সম্ভার। শ্রমের এ প্রকার নিয়োগ ও প্রাপ্তির স্তর পরম্পরা বিশ্লেষণে ইবনে খলদুন আশ্চর্যভাবে অতীন্দ্রিয়তার প্রভাব মুক্ত। এ কারণেই তিনি তৎকালে প্রচলিত শ্রমবিমুখ জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতিকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। তাঁর এ আক্রমণ থেকে তাই জ্যোতিষশাস্ত্র, কিমিয়াশাস্ত্র, গুপ্তধন সন্ধান ও ভাগ্য গণনার বিচিত্র নিয়ম-কানুন কোনো কিছুই রেহাই পায়নি। তিনি সোজা ভাষায় বলেছেন যে, যারা পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জনের সহজ পথ ত্যাগ করেছে তারাই এ সকল শ্রমবিমুখ শাস্ত্রাদির উপর নির্ভর করে প্রতারণার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। অবশ্য পরিণামে তারা নিজেরাই প্রতারিত হয়েছে। কারণ সভ্যতার ভিত্তি প্রতারণা নয় পরিশ্রম। এজন্যই ইবনে খলদুনের মতে শ্রমের প্রতি অবহেলা অন্যায় এবং শ্রমের যথাযথ মূল্য না দিয়ে তার ফল ভোগ করা সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য অবিচার। ফলত এ ধরনের অন্যায় অবিচারের মাত্রাধিক্য থেকেই সভ্যার অগ্রগতি ব্যাহত হয় ও তার অবলুপ্তি অনিবার্য হয়ে উঠে।

ইবনে খলদুনের মতে নাগরিক সভ্যতাই সভ্যতার শেষ পর্যায়। কারণ জীবন বিকাশের স্বাভাবিক আকর্ষণে মানুষের অগ্রগতি এখানে এসেই স্থিতি লাভ করে এবং পুনরায় সে তার পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। এ প্রকার চক্রবৎ পরিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে শ্রমের প্রতি আগ্রহ এবং শেষ পর্যায়ে তৎপ্রতি অবহেলা বিরাজ করে। ইবনে খলদুন এ উভয় আচরণের স্বাভাবিক কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, এছাড়া মানুষের গত্যন্তর নেই। মানুষের জীবনের যেমন বিকাশ ও সমাপ্তি আছে, তেমনি তার প্রচেষ্টারও বিকাশ ও সমাপ্তি বিদ্যমান।

আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, আমাদের এ প্রকার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ইবনে খুলদুনের সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। আমরা শুধু তাঁর ইতিহাসের তথ্যাদি বিশ্লেষণে উপস্থাপিত সভ্যতা-সংস্কৃতি বিনির্মাণের মূল সূত্রটির উপর আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছি এবং আমরা লক্ষ করেছি যে, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে সভ্যতা-সংস্কৃতি তথা ইতিহাসের মূল নিয়ামক শক্তিকে অবলোকন করতে সমর্থ হয়েছে। আধুনিক দৃষ্টিতে তাঁর এ প্রকার অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ যত প্রাথমিক স্তরেরই হোক না কেন, চতুর্দশ শতাব্দীর জীবন পরিবেশে এ ছিল এক বিপ্লবাত্মক বিষয়। এজন্যই তিনি লিখেছেন,

"নানা কারণে এটা একটি সম্পূর্ণ নতুন বিষয়। আমি এ বিষয়ের আলোচনা কোথাও খুঁজে পাইনি। জানি না, এটা কি তাঁদের উদাসীনতার ফল কিংবা এ ব্যাপারে তাঁদের কোনো ধারণাই ছিল না; অথবা হয়ত তারা এ বিষয় নিয়ে প্রচুর লিখেছেন, কিন্তু আমাদের নিকট তা এসে পৌঁছায়নি। কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়াদির সীমা-পরিসীমা নেই এবং মানব সমাজে জ্ঞানীগুণীর সংখ্যাও অপরিমিত। আমরা উত্তরাধিকার হিসাবে যা পেয়েছি, অপ্রাপ্তির পরিমাণ তদপেক্ষা অনেক বেশি। পারসিকদের সেই জ্ঞান কোথায় যা পারস্য বিজয়কালে হজরত উমর (রাঃ) নিশ্চিহ্ন করে দিতে বলেছিলেন! কোথায় কেলাদিয়ান, সিরিয়ান ও ব্যাবিলনবাসীদের জ্ঞানের ঐতিহ্য! তাদের মধ্যে তার যে নিদর্শন বিদ্যমান ছিল, যে ফলশ্রুতি ঘটেছিল, তা কোথায় বিলুপ্ত হল! কোথায় গেল তাদের কিবতী ও পূর্ববর্তীদের জ্ঞানের ঐশ্বর্য! আমাদের নিকট শুধু একটি জাতির জ্ঞান-গুণই এসে পৌঁছেছে, তাঁরা হলেন গ্রিক। এটাও সম্ভব হয়েছে সম্রাট মামুনের জন্য। তিনি কষ্ট স্বীকার করে, বহু লোককে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে এবং বহুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তা সম্ভব করে তুলেছেন। কিন্তু এ একটি জাতি ব্যতীত অন্যান্য জাতির জ্ঞানের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না!"

এ উদ্ধৃতি থেকে আমরা ইবনে খলদুনের জ্ঞানস্পৃহার ব্যাপকতা সম্পর্কে যেমন অবহিত হতে পারি, তেমনি তাঁর এ 'নতুন বিষয়'-এর পরিবেশ সম্পর্কেও আমাদের ধারণা করে নিতে অসুবিধা হয় না। সম্ভবত এ কারণেই তৎকালীন যুগমানস তাঁর এ নতুন বিষয়ে বিন্যস্ত অন্তর্দৃষ্টির সম্যক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি।

ইবনে খলদুন মিশরে জীবনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময় কাটিয়েছেন। এ সময়ে তিনি শিক্ষকতার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর পূর্বেও তিউনিসে ও অন্যত্র তিনি এ কাজে ব্যাপৃত হয়েছেন। তাঁর এ প্রকার শিক্ষকতায় যত সীমাবদ্ধতাই থাক না কেন, নিশ্চয়ই তিনি তাঁর এ নতুন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত রেখেছিলেন। মিশরে তাঁর দুজন শিষ্য ইবনে হজর ও আল মাকরিজী পরবর্তীকালে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁদের শিষ্য আস্‌সাখাবী ও ইবনে খলদুনের স্বদেশের আল-মাক্কারী সকলেই ইতিহাস চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই ইবনে খলদুনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন ও তাঁর ঋণও স্বীকার করেছেন; কিন্তু গুরুর এ কালজয়ী অন্তর্দৃষ্টির কোন অনুসরণ বা বিস্তার তাঁদের মধ্যে লক্ষ করা যায় না। এর কারণ আমরা তৎকালীন যুগ পরিবেশের মধ্যেই খুঁজে পাব। জীবন বিমুখী যে অবক্ষয়ী চিন্তাধারা সে কালের গণমানসকে আবৃত করে রেখেছিল, তা থেকে এ সকল জ্ঞানীগুণী কেউই মুক্ত হতে পারেননি। আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, স্বয়ং ইবনে খলদুনও এর থেকে মুক্ত ছিল না। এ কারণেই তাঁর প্রায় শতাব্দীকাল পরবর্তী ইতালীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভেলীর 'প্রিন্স' গ্রন্থে সমকালীন জীবন পরিবেশের যে বাস্তব বিবরণ আমরা দেখতে পাই ইবনে খলদুনের আল-মুকাদ্দিমায় অনুরূপ কোনো বাস্তবতার পরিচয় নেই। সমকালীন রাজনীতিতে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর অভিজ্ঞতাও ছিল প্রচুর; কিন্তু কী ইতিহাসের তথ্য বিচার, কী রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনের কার্যকারণ বিশ্লেষণে; কোথাও তিনি তাঁর এ অভিজ্ঞতাকে ভাষা দেননি। বরং তাঁর অধিকাংশ উদাহরণ ও দৃষ্টান্তই অতীতের ব্যাপার। সুতরাং তাঁর উত্তরসূরি শিষ্য-প্রশিষ্যরা যে আরো বেশি মাত্রায় এ প্রকার সীমাবদ্ধতার দ্বারা পীড়িত হয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

অবশ্য একথা সত্য যে, আল-মুকাদ্দিমার সঙ্গে প্রিন্সের কোনো তুলনাই চলে না। প্রিন্স যতই বাস্তবানুগ হোক না কেন, আল-মুকাদ্দিমায় বিস্তৃত পরিসর তার মধ্যে নেই। সে একটি মাত্র বিষয় রাজনীতি নিয়েই তার আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। এমন কি এ নির্দিষ্ট বিষয়েও প্রিন্সের বর্ণনার দ্বারা বিশেষ করে শাসকের গুণাবলি সম্পর্কীয় মারি অরি পারি যে কৌশলে'র কূটনীতি আল-মুকাদ্দিমায় নেই। এজন্য অনেক সমালোচক রহস্য করে বলেছেন যে, প্রিন্সের গুণাবলি ইবনে খলদুনের জীবনে কিছুটা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর অবদান এ থেকে মুক্ত। বস্তুত প্রিন্স অপেক্ষা আল-মুকাদ্দিমার বিষয়বিন্যাস আরো ব্যাপক, আরো সুদূরপ্রসারী। এ প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, ইবনে খলদুন সভ্যতা-সংস্কৃতির তৎকালে প্রচলিত, সর্বপ্রকার উপাদান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছেন। এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ বিষয়েই তাঁর মৌলিক কোন সংযোজন নেই; বরং তিনি যেখানে যা পেয়েছেন সযত্নে কুড়িয়ে এনে তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকে ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহার করেছেন। অনেকস্থলে বিষয়টির উপস্থিতিই তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করে তুলেছে; অনেক স্থলে তিনি একটি বাক্য বা কোরানের একটি আয়াত ব্যবহার করে তীর্যকভাবে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করেছেন। বস্তুত এভাবে তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিচিত্র বিষয়ের সংগ্রহ ও বিন্যাসে ইবনে খলদুন আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

তবু এর ফলেই তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় আমরা এমন কিছু ত্রুটির সন্ধান পাই, যা অনিবার্যভাবে এ বিচিত্র বিষয়ের অনুষঙ্গী হয়ে এতে প্রবেশ করেছে। প্রথমেই যে ত্রুটিটি যে কোন সচেতন পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, তা হল এ যে ইবনে খলদুন বহুবারই একই বিষয়ের বর্ণনাগত পুনরাবৃত্তি করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলাকে তিনি একবার শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে এবং পুনর্বার জীবিকার মাধ্যম হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের পুনরাবৃত্তি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় হলেও আধুনিক পাঠকের নিকট আকর্ষণীয় বলে মনে হয় না। বরং একথাই মনে হবে যে, ইবনে খলদুনের এ ধরনের পুনরাবৃত্তিকে সঙ্কুচিত করে তাঁর আল-মুকাদ্দিমার বিস্তৃতি প্রায় অর্ধেক কমিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু পাঠক যদি চতুর্দশ শতকীয় বিষয় বর্ণনার ধারা ও শিক্ষাদান প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি দেন, তাহলে এ প্রকার পুনরাবৃত্তিমূলক বর্ণনাকে অনায়াসে সহ্য করে নিতে পারবেন। বস্তুত আল-মুকাদ্দিমার বর্ণনা বক্তৃতার ভঙ্গিতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিস্তারিত হয়েছে। এ কারণেই এর ভাষা যথাসম্ভব বিশ্লেষণ বাহুল্যবর্জিত সরলতায় বিশিষ্ট। তাঁর আকর্ষণীয় বাগ্মিতা ভাষার এ সারল্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

ইবনে খলদুন তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় বিচিত্র বিষয় সংগ্রহ করলেও যেখানে যা পেয়েছেন, হুবহু তাই গ্রহণ করেননি; বরং যথাসম্ভব সংক্ষেপে নিজের প্রয়োজন অনুসারে নিজের ভাষাতেই তা বিন্যস্ত করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর এ প্রকার সংক্ষিপ্তকরণ কিছুটা দুর্বোধ্যতা ও আড়ষ্টতার সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে বিষয়গত পরিভাষার ক্ষেত্রেও সর্বত্র সমতা রক্ষা হয়নি; এমনকি বর্ণনার ভাষাতেও এরই ফলে বিষয়ানুসারী বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। যে কোন সচেতন পাঠক তাঁর সমগ্র আল-মুকাদ্দিমা পাঠ করে একথা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, ইবনে খলদুনের মূল ভূমিকাটিই সর্ববিষয়ে এর শ্রেষ্ঠ অংশ। বস্তুত এ ভূমিকাতে ইবনে খলদুন তাঁর ভাষাজ্ঞান, বর্ণনাশৈলী ও যুক্তি বিন্যাসের

এক অপূর্ব নিদর্শন তুলে ধরেছেন। তাঁর আল-মুকাদ্দিমার অন্যান্য অংশ সে তুলনায় অনেকখানি নিষ্প্রভ। এর কারণও আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি; সংগৃহীত বিষয়ের অনুসারী হয়েই এ সকল ত্রুটি আল-মুকাদ্দিমায় প্রবেশ করেছে। পরিবেশের ন্যায় পরিবেশনের এ বাধ্যবাধকতা থেকেও ইবনে খলদুন নিজকে মুক্ত করতে সক্ষম হননি।

অবশ্য তাঁর বিরাট অবদানের তুলনায় এ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি একান্তই নগণ্য। সূর্যের ন্যায় তাঁর অন্তর্দৃষ্টির প্রখর ঔজ্জ্বল্য তাঁর সমস্ত কলঙ্ক রেখাকে অবলীলায় নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এ কারণেই ইবনে খলদুন আজ সারা বিশ্বে ঐতিহাসিক দর্শন ও সমাজতত্ত্বের অবিসংবাদিত জনকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। পাশ্চাত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদ আর্নল্ড টেয়েনবি বলেছেন যে, ইবনে খলদুনের ঐতিহাসিক দর্শন জ্ঞানের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত অনতিক্রান্ত সৃষ্টির মর্যাদায় বিভূষিত হয়ে আছে। জর্জ মারটনও বলেছেন যে, কেবলমাত্র মধ্য যুগেই নয়, প্রাচীন ঐতিহাসিকদের সময় থেকে ম্যাকিয়াভেলী পর্যন্ত ইতিহাসতত্ত্ব ও মানবিক অভিজ্ঞতার দর্শনের রাজ্যে ইবনে খলদুনের সমকক্ষ আর কেউ জন্মগ্রহণ করেননি। বলা বাহুল্য এ স্বীকৃতি, এ সাধুবাদ ইবনে খলদুনের যথার্থই প্রাপ্য। তবু একথা উল্লেখের প্রয়োজন আছে যে, যতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের ইতিহাস চেতনায় তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকে বিধৃত করতে না পারব, যতদিন একান্ত বাস্তব প্রয়োজনে তাঁর প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে দেখতে না পরব, ততদিন তাঁর যথার্থ মূল্যমান আমাদের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব হবে না।

অনুবাদ প্রসঙ্গ

['যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না।']

অনুবাদ একটি দুরূহ শিল্প। কারণ এ 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'র সৃষ্টি নয়; বরং প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টিকে অনুসরণের বাধ্যবাধকতায় সীমাবদ্ধ এক সৃজনকর্ম। এজন্যই এক্ষেত্রে সহজ সাবলীল হওয়া একান্তই দুরূহ ব্যাপার। তদুপরি অনুবাদের বিষয় ও অনুবাদকের মধ্যে যদি কালগত ব্যবধান দীর্ঘ হয়, তাহলে সে দুরূহতা আরো বৃদ্ধি পায়। কারণ যথার্থ অনুবাদের জন্য, গৃহীত বিষয়, তার যুগ-পরিবেশ ও লেখকের মানস প্রক্রিয়া অনুধাবন করা একান্তই প্রয়োজন। কালের ব্যবধান এক্ষেত্রে অনেক সময়েই প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। সম্ভবত এ কারণেই সফল অনুবাদ কর্মের সংখ্যা এত বিরল।

বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে আল্লামা ইবনে খলদুনের কালজয়ী মহৎসৃষ্টি আল-মুকাদ্দিমার অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণকালে যে ধরনের একটি ব্যাপক আগ্রহ আমাদের উৎসাহিত করেছিল, আজ সে কাজ সম্পন্ন করে মনে হচ্ছে, হয়ত উপরোক্ত বাধা আমরা সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারিনি। বস্তুত ইবনে খলদুনকে আরো নিবিড়ভাবে জানার আগ্রহেই এ দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছিলাম; কিন্তু যতটুকু জানতে পেরেছি, তা নিজের ভাষায় পাঠককে জানাতে পেরেছি কি না, সে সন্দেহই এ মুহূর্তে মনকে পীড়িত করছে। অনুবাদ প্রসঙ্গে কিছু বলার প্রাক্কালে তাই পাঠকের সমীপে আমাদের এ দুর্বলতার কথা সবিনয়ে নিবেদন করে রাখলাম।

প্রথমেই 'আল-মুকাদ্দিমা' শব্দটির কথা বলব, এটি অনুবাদ নয়, প্রতিবর্ণীকরণ; মূল গ্রন্থের নামকরণে ব্যবহৃত এ শব্দটিকে আমরা যথাযথ বহাল রেখেছি। কারণ ইবনে খলদুনের অমর সৃষ্টি এ নামেই সারা বিশ্বব্যাপী পরিচিত। অবশ্য শব্দটির উচ্চারণে কিছুটা বিতর্কের অবকাশ আছে। অনেকে শব্দটিকে 'আল-মুকাদ্দিমা' বলেও উচ্চারণ করে থাকেন; আবার অনেকে 'আল' তথা নির্দেশক প্রত্যয়টি বাদ দিয়ে শুধু 'মুকাদ্দিমা' বা 'মুকাদ্দম' উচ্চারণের পক্ষপাতী। এ ক্ষেত্রে আমরা কর্তৃবাচ্যে 'আল' যুক্ত অর্থাৎ 'আল-মুকাদ্দিমা' শব্দটিই বেছে নিয়েছি। অবশ্য কর্মবাচ্যের 'আল-মুকাদ্দিমা' গ্রহণেও অসুবিধা নেই; তবে এ ধরনেরই একটি 'আল' হীন শব্দ আমরা 'মামলা-মকদ্দমা'য় ব্যবহার করে থাকি। সুতরাং এ সহজ পরিচিতি থেকে গ্রন্থের নামটিকে কিছুটা দূরে রাখাই আমাদের অনুরূপ নির্বাচনের উদ্দেশ্য।

আল-মুকাদ্দিমা চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা হলেও বহির্জগতে এর পরিচিতি লাভ ঘটেছে অনেক পরে। এর কারণ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে পাশ্চাত্য জগতে ইবনে রুশদ, ইবনে সিনা, আল-ফারাবী প্রমুখ মনীষীদের রচনাবলি অনুবাদের যে প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়, ইবনে খলদুন পরবর্তীকালের হওয়ার জন্য তাঁদের সাথে অনূদিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন নি। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে

পাশ্চাত্যজগৎ এ কালজয়ী প্রতিভার সন্ধান পায়নি। তখন থেকেই ইবনে খলদুনের জীবন ও সৃষ্টি কর্মের আলোচনা বিভিন্ন ভাষায় দেখা দিতে থাকে। কিন্তু তাঁর আল-মুকাদ্দিমার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় তুর্কি ভাষায় ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে। পীরজাদা আফেন্দী এ অনুবাদকার্যটি সম্পন্ন করেন। পরবর্তীকালে ডি. স্লেনকৃত একটি ফরাসি অনুবাদ ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সাম্প্রতিককালে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা থেকে ফ্রেঞ্জ রোজেনথাল কৃত একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাভাষায় ইতিপূর্বে আল-মুকাদ্দিমার অংশবিশেষের অনুবাদ প্রকাশিত হলেও পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ এ প্রথম।

বর্তমান অনুবাদের জন্য বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার থেকে প্রাপ্ত আল-মুকাদ্দিমার যে সংস্করণটি আমরা ব্যবহার করেছি, তা ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এ যে, এ সংস্করণটি সুসম্পাদিত হয়নি। উস্তাদ ইউসুফ হাসান দাগের নামে এক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী অত্র সংস্করণের বিষয়সূচি ও নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করেছেন; কিন্তু সংস্করণটির উৎস কি, সে সম্পর্কে উক্ত বিশেষজ্ঞ বা প্রকাশক কেউই কোনো প্রকার সন্ধান দেননি। তবে অনুবাদকার্যে ব্যবহার করতে গিয়ে আমাদের যদ্দুর মনে হয়েছে, এ সংস্করণটির সাথে নসর আল-হোয়ায়রিনী সম্পাদিত 'বুলাক' সংস্করণটির যথেষ্ট মিল আছে। এ সত্ত্বেও এতে প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনীর যেমন অভাব, তেমনি অসম্পূর্ণতাও বিদ্যমান। এ কারণেই আমরা মূল গ্রন্থের এ প্রকার-ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে অনুবাদটিকে যথাসম্ভব পূর্ণতা দানের জন্য ফ্রেঞ্জ রোজেনথালকৃত ইংরেজি অনুবাদটির সাহায্য গ্রহণ করেছি।

ফ্রেঞ্জ রোজেনথাল তাঁর এ অনুবাদটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে তুরস্কের বহু গ্রন্থাগার ঘেঁটে একাধিক সংস্করণ মিলিয়ে মূল গ্রন্থের একটি যৌগিক পাঠ তৈরি করে তার অনুবাদ করেছেন। এর সঙ্গে তাঁর ভূমিকা, টীকা-টিপ্পনী ও নির্ঘণ্ট বিন্যাস যে কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য। বস্তুত এ অনুবাদটি আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আমরা এ অনুবাদ থেকে আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থের পরিত্যক্ত কয়েকটি প্রয়োজনীয় পাঠ উদ্ধার করে আমাদের বর্তমান অনুবাদে ব্যবহার করেছি এবং আমাদের মূল গ্রন্থের ব্যতিক্রমধর্মী বা তদতিরিক্ত পাঠকে অনুবাদের মাধ্যমে টীকায় তুলে দিয়েছি। এর ফলে বর্তমান অনুবাদটি মূল গ্রন্থের বিভিন্ন পাঠ সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করাতে সক্ষম হবে বলে আমরা মনে করি। কারণ এ ছাড়া আমাদের গত্যন্তর ছিল না। স্বাধীনভাবে ইবনে খলদুনের আল-মুকাদ্দিমার একাধিক সংস্করণ মিলিয়ে যৌগিক পাঠ তৈরির সুযোগ আমাদের নেই। সুতরাং আমাদের এ প্রাথমিক অনুবাদ প্রচেষ্টা যাতে কিছুটা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, সে উদ্দেশ্যেই এ প্রকার সাহায্য গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য হয়েছি।

অবশ্য এ সত্ত্বেও আমাদেরকে একথাও স্বীকার করতে হচ্ছে যে, ফ্রেঞ্জ রোজেনথালের অনুবাদে ব্যবহৃত যৌগিক পাঠেও বর্জনযোগ্য প্রক্ষেপ বিদ্যমান। তিনি একটিমাত্র পাণ্ডুলিপি পাদটীকায় একটি পাঠ পেয়েছিলেন; সম্ভবত বিষয়বস্তুর আকর্ষণেই এদিকে মূলপাঠে সংযোজিত করার লোভে সংবরণ করতে পারেননি। আমরা আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে এ পাঠটি পাইনি এবং প্রক্ষেপ বলে মনে হওয়ায় টীকায় অন্যান্য অতিরিক্ত পাঠের ন্যায় এর অনুবাদও সংযোজন করিনি। পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থে ও আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে আমরা আলোচ্য পাঠটির অনুবাদ নিম্নে তুলে ধরছি।

"এখানে এ কথা হয়ত বলা যেতে পারে যে, বংশধরদের অনুরূপ সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাকৃতিক নিয়মে অসম্ভব হলেও এটা বনি ইসরাইলের প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ তাদের অনুরূপ প্রবৃদ্ধি অলৌকিক ক্রিয়ারই ফলশ্রুতি। যেমন হাদিসে এসেছে—'আল্লাহ্ বনি ইসরাইলের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের নিকট প্রত্যাদেশ পাঠিয়ে বলেছিলেন যে, তিনি তাঁদের বংশধারা ততক্ষণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে যাবেন, যতক্ষণ না তা পৃথিবীর বালুকণা ও আকাশের তারকা অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ্ তাঁর সেই প্রতিশ্রুতি পালন করে তাঁদের বংশধরদের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের প্রতি তাঁর অসাধারণ কৃপা প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুরূপ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে না এবং এর বিরুদ্ধে কারো কিছু বলবারও অবকাশ নেই।

কেউ উপরোক্ত হাদিসটির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে বলতে পারে যে, অনুরূপ বৃদ্ধির এ বিষয়টি কেবলমাত্র তৌরাত গ্রন্থেই উল্লেখিত হয়েছে এবং এটা সকলেরই জানা আছে যে, এ তৌরাত গ্রন্থটি উহুদীদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। তার প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে, তৌরাতের অনুরূপ পরিবর্তনের কথা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই স্বীকার করেন না এবং অনুরূপ পরিবর্তন বলতে ঠিক কী বোঝায়, তাও সুস্পষ্ট নয়। তদুপরি যে কোন জাতির দ্বারা তাঁদের মধ্যকার প্রত্যাদেশ সংরক্ষিত গ্রন্থাদির পরিবর্তন সাধন সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী। ইমাম বোখারী তাঁর বিশুদ্ধ হাদিস সংকলনেও তা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বনি ইসরাইলের বংশধারা বৃদ্ধির ব্যাপারটি একটি অলৌকিক ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কিছু নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের বিষয়টি কেবলমাত্র অন্যান্য জাতির বেলাতেই প্রযোজ্য।

এ কথা সত্য যে, এ ধরনের একটি বিপুল সংখ্যক সৈন্যদলের সুসমন্বিত যুদ্ধ প্রচেষ্টা একান্তই দুরূহ ব্যাপার; তবে এ ক্ষেত্রে কোন যুদ্ধই অনুষ্ঠিত হয়নি এবং বাস্তবে এর প্রয়োজন ছিল। এ কথাও সত্য যে, প্রতিটি সাম্রাজ্যই তার ক্ষমতা অনুযায়ী সৈন্যদল গঠন করেছে; কিন্তু বনি ইসরাইল প্রাথমিক পর্যায়ে অনুরূপ কোন সৈন্যদলে রূপান্তরিত হয়নি এবং তাদের কোন সাম্রাজ্যও ছিল না। তাদের এ প্রকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি এ জন্যই ঘটেছিল যে, যাতে তারা কেনানের উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কারণ এ সেই দেশ, যার আধিপত্য লাভের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছিলেন—এবং তন্নিমিত্ত উক্ত অঞ্চলকে পবিত্রও করেছিলেন। সুতরাং এতদসম্পর্কীয় সমুদয় ব্যাপারই অলৌকিক ক্রিয়া হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ই সত্যের পথ দেখান।"

প্রসঙ্গের সাথে উদ্ধৃত এ পাঠটি মিলিয়ে দেখলেই পাঠক আমাদের মন্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। ঐতিহাসিকদের প্রান্তিক আলোচনায় ইবনে খলদুন বনি ইসরাইলের সৈন্য সংখ্যার অতিরঞ্জিত বর্ণনা প্রসঙ্গে যে সকল যুক্তি দিয়েছিলেন, কোনো যোগ্য ব্যক্তি অলৌকিকত্বের আশ্রয় গ্রহণ করে সে সকল যুক্তি খণ্ডনের অপচেষ্টা করেছেন এবং অবলীলাক্রমে তা ইবনে খলদুনের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। বস্তুত অলৌকিকত্বের এ যুক্তিই যদি ইবনে খলদুনের শেষ বক্তব্য হয়, তাহলে অতিরঞ্জনের ভ্রান্তি হিসাবে সমস্ত বিষয়টি উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ একান্তই প্রহসন বলতে হবে; এর আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না।

অনুরূপভাবে আরো একটি, প্রক্ষেপ নয়, পাঠ পরিবর্তনের ঘটনা আমরা আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে লক্ষ করেছি। ইবনে খলদুন নবুয়তের তাৎপর্য বর্ণনায় জড়জগৎ,

বৃক্ষজগৎ ও প্রাণিজগতের পর্যায়ক্রমিক বিকাশের যে বিবরণ তুলে ধরেছেন, তাতে মানুষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্তর হিসাবে বানর জগতের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এর মূল শব্দটি হল 'আরমুল কেরাদত'; কিন্তু কোন যোগ্যব্যক্তি একে পরিবর্তন করে 'আলমুল কুদরত' বা 'মহিমা জগৎ' করে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য যে, প্রসঙ্গের সাথে এর কোনো মিল নেই। তবে সুখের বিষয় এ যে, উক্ত যোগ্য ব্যক্তিটি আল-মুকাদ্দিমার শেষের দিকে বর্ণনাগত পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে উপস্থিত মূল শব্দটির পরিবর্তন সাধন করতে পারেননি। ফলে আমাদের পক্ষে অতি সহজেই মূল শব্দটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এবং রোজেনথালের অনুবাদেও এর সমর্থন বিদ্যমান।

এ ধরনের প্রক্ষেপ ও পরিবর্তন হয়ত আরো ঘটেছে, (হয়ত আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থের উৎসর্গ অংশটি এমনি এক প্রক্ষেপের নিদর্শন) তবে তা একান্ত স্থূল না হলে আমাদের এ সীমাবদ্ধ প্রচেষ্টায় তা খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। কারণ প্রক্ষেপ ও পরিবর্তন বিচারে যে ধরনের ব্যাপক পাঠ বিশ্লেষণের প্রয়োজন, তা বর্তমানে আমাদের সাধ্যের বাইরে এবং আমরা এ-ও লক্ষ করেছি যে, রোজেনথাল আমাদের অপেক্ষা বহুগুণ অধিক সুযোগ লাভ করেও এক্ষেত্রে আমাদেরকে সাহায্য করতে অক্ষম। বস্তুত এ ব্যাপারে উপরোক্ত অলৌকিকত্বের একটি উদাহরণই আমাদের অনুরূপ ধারণার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং ভবিষ্যতে অধিকতর সুযোগ লাভ অথবা যোগ্যতর কোনো গুণীজনের উদ্যোগের প্রতীক্ষা ছাড়া বর্তমানে এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কিছু নেই। তবে এ ধরনের একটি উদ্যোগ গ্রহণের যে প্রয়োজন আছে, সে কথাটিও অত্যন্ত সবিনয়ে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই। কারণ যে পরিবেশে ইবনে খলদুনের এ মহৎ গ্রন্থটি সংরক্ষিত ও লিপিকৃত হয়েছে, সেখানে এ ধরনের প্রক্ষেপ ও পরিবর্তনের অবকাশ ছিল প্রচুর এবং বাস্তব অবস্থা সাক্ষ্য দেয় যে, এখনো তা দূর হয়নি।

ইবনে খলদুনের আল-মুকাদ্দিমার ভাষা খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকীয় প্রাচীন আরবি। আমরা ইতিপূর্বে এ ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং বিষয়ানুসারী বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করেছি। নানা কারণে আমাদের পক্ষে এ ভাষার আক্ষরিক অনুবাদ সম্ভব হয়নি; আমরা ভাবানুবাদের দ্বারস্থ হয়েছি। তবে এক্ষেত্রে যাতে মূলকে অতিক্রম করার স্বেচ্ছাচারিতা দেখা না দেয়, তজ্জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। বাংলা ভাষায় মূলের বোধগম্য স্বরূপ ফুটিয়ে তোলাই আমাদের লক্ষ ছিল। তথাপি পাঠক দেখতে পারেন যে, মূল ভাষার আড়ষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা আমাদের এ অনুবাদেও সংক্রমিত হয়েছে। এর কারণও আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং আমাদের পক্ষে মূল ভাষা ও বিষয়ের এ বাধ্যবাধকতাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে 'ভূগোল' ও 'যায়েরজা' সম্পর্কীয় বর্ণনায় এ ত্রুটি লক্ষ করা যাবে।

আমরা ইতিপূর্বে একথাও উল্লেখ করেছি যে, ইবনে খলদুন তাঁর আল-মুকাদ্দিমায় বিচিত্র বিষয় সংগ্রহ করলেও বিষয়ানুসারী পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বত্র সমতা রক্ষা করেননি। কারণ বিষয়ের জন্য তিনি বিষয়ের আলোচনা করেননি; বরং তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূরণের জন্যই এ বিচিত্র আলোচনা টেনে এনেছেন। কাজেই পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের প্রতি গুরুত্ব দেয়া তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয়নি। এর ফলে অনুবাদের ক্ষেত্রেও আমরা সে সমতা রক্ষা করতে পারিনি। অবশ্য ইবনে খলদুন তাঁর নিজস্ব বিষয়ে এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। বিশেষ করে তাঁর 'উমরান' (সভ্যতা ও

জনবসতি), 'আসাবিয়া' (গোত্রপ্রীতি), 'বদোয়া' (যাযাবরী জীবন) ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার সে সচেতনতার সাক্ষ্য বহন করছে।

ইবনে খলদুনের আল-মুকাদ্দিমায় বিচিত্র বিষয়ের সঙ্গে অজস্র নাম উল্লেখিত হয়েছে; আমরা যথাসম্ভব এসব নামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি টীকায় তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। বলা বাহুল্য যে, এর অধিকাংশই রোজনথালের অনুবাদের টীকা থেকে নেয়া। কারণ আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থটি এ ব্যাপারে খুব একটা সহায়ক হয়নি; তবে এতে ব্যবহৃত শব্দার্থের টীকাগুলো আমাদের খুব কাজে লেগেছে। আরো একটি বিষয় রোজেনথালের অনুবাদ থেকে আমাদেরকে গ্রহণ করতে হয়েছে, সেটি হল, তৎকালীন পৃথিবীর মানচিত্র। আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে এটি নেই। রোজেনথালও তাঁর অনুবাদের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, আল-মুকাদ্দিমার অনেক সংস্করণেই অঙ্কনের দুরূহতার জন্য এ মানচিত্রটি পরিত্যক্ত হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থটিও অনুরূপ কোন সংস্করণেরই পরিচয় বহন করছে।

বর্তমান অনুবাদে আমরা ইবনে খলদুনের জীবনের একটি রেখাচিত্র ও আল-মুকাদ্দিমার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সংযোজন করেছি। এক্ষেত্রেও রোজেনথাল অন্য অনেকের নিকট থেকে আমরা ঋণ গ্রহণ করেছি। সকলের কথা উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ ইনান রচিত 'ইবনে খলদুনের জীবন ও অবদান' নামীয় পুস্তকটির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। পুস্তকটি ইবনে খলদুনের ষষ্ঠশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মিশরে রচিত হয়। পরে লাহোরের শাহ মুহম্মদ আশরাফ এর একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এ পুস্তকটিতে মিশরীয় অভিভাবকত্বের ছাপ থাকলেও তা আমাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

বস্তুত আল্লামা ইবনে খলদুনের আল-মুকাদ্দিমার ন্যায় বিশ্বকোষ জাতীয় একটি গ্রন্থের অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করতে গিয়ে আমাদেরকে নানাভাবেই নানাজনের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়েছে। অনেকেই এক্ষেত্রে অযাচিতভাবে উৎসাহ প্রদান করে সহায়তা করেছেন। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, পাঠ্যপুস্তক বিভাগের পরিচালক জনাব আব্দুল হক, উপপরিচালক জনাব নুরুলহুদা ও জনাব মুহম্মদ ইব্রাহিম এবং বিভাগীয় অফিসার কবি আসাদ চৌধুরীর আন্তরিক ও সক্রিয় সহানুভূতি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। ময়মনসিংহের অধ্যাপক বশির উদ্দিন, অধ্যাপক যতীন সরকার, অধ্যাপক আবদুল কাদির খান ও শ্রী আশুতোষ পালের উদ্দীপনা দান একান্তই উল্লেখযোগ্য। এমনিভাবে আরো অনেকের সোৎসাহ সহযোগিতা না পেলে আমার ন্যায় অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে এ দুরূহ কর্ম সম্পন্ন করা হয়ত সম্ভব হত না।

আমরা দুর্বলতার কথা ইতিপূর্বেই পাঠকের সমীপে নিবেদন করেছি। সুতরাং আর বাগবিস্তার না করে ইবনে খলদুন স্বীয় ইতিহাস রচনা প্রসঙ্গে যে উক্তি রেখে গেছেন, তা দিয়েই বক্তব্যের ইতি টানছি।

> 'সুধীমণ্ডলীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাই আমার জ্ঞানের পুঁজি এবং
> অক্ষমতার স্বীকৃতিই মুক্তিপ্রাপ্তির একমাত্র পথ।"

বিনীত

গোলাম সামদানী কোরায়শী

আকুয়া, ময়মনসিংহ
১৬ জৈষ্ঠ, ১৩৮৫

আল-মুকাদ্দিমা

[প্রথম খণ্ড]

'কিতাবুল ইবার' নামক
বিশ্ব ইতিহাসের ভূমিকা

প্রারম্ভ স্তুতি

[পরম করুণাময়—দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে—]

অপরিসীম দয়ার অধিকারী মহান প্রভুর কৃপা ভিখারী বান্দা আবদুর রহমান ইবনে মুহম্মদ ইবনে খলদুন হাযরামী (আল্লাহ্ তার সহায় হউন) বলছে ...

সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সকল সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ক্ষমতার অধীশ্বর এবং পবিত্র নাম ও গুণাবলি সমস্তই তাঁর। তিনি সর্বজ্ঞতা, গুপ্ত বাসনা ও সুপ্ত কামনা সকলই তাঁর গোচরীভূত। তিনি পরম ক্ষমতাবান, আকাশ-পৃথিবীর সমুদয় বস্তু ও বিষয় তাঁর আয়ত্তাধীন।

তিনি পৃথিবী থেকে আমাদিগকে প্রাণীর আকারে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাদিগকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি পৃথিবীর বুকে আমাদের জন্য আহার্য ও জীবিকার পথ সুগম করেছেন। তাঁরই অনুগ্রহে আমরা মাতৃজঠর ও আবাসগৃহে আশ্রয় লাভ করেছি এবং তাঁরই প্রদত্ত খাদ্যসম্ভার ও জীবিকা আমাদের জীবন ধারণের সহায় হয়েছে। তাঁরই ইচ্ছায় কালচক্রের আবর্তন আমাদিগকে ধ্বংস করছে এবং তাঁরই ইঙ্গিতে আমাদের জন্য মৃত্যুর সময় নির্ধারিত হয়ে আছে। অথচ একমাত্র তিনিই অবিনশ্বর, স্থিতিবান—তাঁর জরা নেই, মৃত্যু নেই।

আমাদের নেতা, আমাদের পথপ্রদর্শক আরবদেশবাসী নিরক্ষর নবী হজরত মুহম্মদের (সঃ) উপর অশেষ শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি সেই পয়গম্বর, যাঁর কথা তৌরাত, ইঞ্জিলে বর্ণিত হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে শনিবারের পরে রবিবারের আগমনের পূর্বেই তাঁর অস্তিত্ব সংস্থাপিত হয়েছে।[১] তিনি তখনও অস্তিত্বময়, যখন শনিগ্রহ ও পৃথিবীর ধারণকারী মৎস্য ইয়াহামুত পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি।[২] আর তিনিই সেই রসূল, যাঁর সত্যতা সম্পর্কে কবুতর ও মাকড়সা সাক্ষ্য প্রদান করেছে।[৩]

---

১. এখানে সময় সৃষ্টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তদুপরি ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ শনি ও রবিবারকে মর্যাদার চোখে দেখে বলে, এতে তাদের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ শেষ নবী হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সৃষ্টি সকলের অগ্রগামী। এ মর্মে একটি হাদিসও বিদ্যমান—'আওয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরী'—আল্লাহ্ সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। ইসলামী ঐতিহ্যে এ তত্ত্বটি আধ্যাত্মবাদের দান ও পরবর্তী সংযোজন।

২. সেমেটিক পুরাণ অনুসারে সর্বপ্রথম সবকিছু জলময় ছিল এবং তার উপর ভাসমান ছিল প্রভুর সিংহাসন। অতঃপর তিনি পর্যায়ক্রমে আলো, আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদি সৃষ্টি করলেন। এর পর আকাশ ও পৃথিবী বিচ্ছিন্ন হল। সপ্তাকাশের উপর শনিগ্রহ এবং সপ্ততল পৃথিবীর নিচে সমুদয়ের ভারবহনকারী মৎস্য 'ইয়াহামুত'—একটি অতি প্রাচীন ধারণা।

৩. মদিনায় হিজরত করবার সময় মুহম্মদ (সঃ) যে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার প্রবেশ-পথে কবুতর বাসা বেঁধে ডিম দিয়েছিল অথবা মাকড়সা জাল তৈরি করেছিল। কোরেশগণ

শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বংশধর ও সঙ্গীদের উপর, যাঁরা তাঁর সংসর্গ লাভ ও আদর্শ অনুসরণ করে খ্যাতিমান হয়েছেন; যাঁরা তাঁর সাহায্য-সহায়তার জন্য সর্বদা ঐক্যবদ্ধ রয়েছেন এবং তাঁর শত্রুদের সমস্ত শক্তি বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হে আল্লাহ্! তুমি শান্তি বর্ষণ কর হজরত মুহম্মদ (সঃ) ও তাঁর অনুসারী-অনুগামীদের উপর যতদিন ইসলাম তার সৌভাগ্য-মহিমা পরিব্যপ্ত করে রাখবে এবং ইসলাম বিরোধী শক্তির ঐক্যরজ্জু বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে।

শান্তি বর্ষণ কর, প্রচুর এবং অবারিত শান্তি।

হজরতের অনুসরণ করে তা দেখতে পায় এবং ফিরে আসে। বিশেষজ্ঞদের মতে উক্ত ঘটনা সংশয়মুক্ত নয়।

ইতিহাস প্রসঙ্গ

অতঃপর ইতিহাস এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা বিশ্বের সকল জাতি ও গোত্রের নিকট সমভাবে আদরণীয়। এর জন্য দেশভ্রমণের কষ্ট স্বীকার করতেও তারা দ্বিধা করে না। বুদ্ধিমান-নির্বোধ নির্বিশেষে সকলেই একে ভালবাসে। রাজন্যবর্গ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এর প্রতি সমধিক আগ্রহী। পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী এর মধ্যে উপদেশ অনুসন্ধান করে।

কেননা ইতিহাস বাহ্যত অতীতকালের ঘটনাবলি ও রাষ্ট্রসমূহের বিবরণ মাত্র। তাও সে এমন উদাহরণ ও বক্তব্যসহ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে, যাতে আমরা অতি সহজেই এ সকল বিষয়কে আমাদের আলোচনা ও দৃষ্টান্ত দানের মধ্যে ব্যবহার করতে পারি। আমরা বুঝতে পারি যে, কালচক্রের আবর্তন সকল বিষয় এবং বস্তুকেই নিয়ত পরিবর্তন করছে। একটি রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব ঘটছে, তার ব্যাপক বিস্তৃতি পৃথিবীর সমৃদ্ধি আনয়ন করছে, আবার কালের অমোঘ বিধানে তার পতন আসন্ন হচ্ছে এবং পরিণামে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু ইতিহাসের অন্তর্নিহিত শক্তি এ বাহ্য বিবরণের তুলনায় অধিকতর ব্যাপক ও তাৎপর্যমণ্ডিত। এটা আমাদের সম্মুখে বিষয় ও ঘটনাবলির কারণ এবং বিকাশ ও বিনাশের মৌলিক উপাদানসমূহকে উদ্‌ঘাটিত করে। এ কারণেই ইতিহাস যথার্থভাবে বিজ্ঞানের[৪] অন্তর্ভুক্ত এবং তাকে বিজ্ঞানের বিষয় হিসাবে গণ্য করা উচিত।

বস্তুত বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এ সত্যকে সম্মুখে রেখেই ঘটনাবলির বিবরণ সংগ্রহ ও তা গ্রন্থাকারে বিন্যস্ত করে গেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেকেই উক্ত ঘটনাবলির সাথে মিথ্যা কাহিনী ও কল্পিত বর্ণনার সংযোজন করেছেন। বিচার-বিশ্লেষণের পরিবর্তে ধারণা ও শ্রুতিনির্ভর কল্পনা ইতিহাস বর্ণনায় তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। পরবর্তীকালের ইতিহাসবিদগণ ক্রমশ এ ধারাকেই অক্ষুণ্ন রেখেছেন এবং তাদের এ কল্পিত ও অতিরঞ্জিত বিবরণই আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে। এতে অনুসন্ধানের চেষ্টা নেই। বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে কলুষমুক্ত করবার কোন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় না। এর ফল দাঁড়িয়েছে যে, তারা অন্ধ বিশ্বাসের শিকারে পরিণত হয়েছেন এবং বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন লোকদিগের বিবরণের উপর

---

৪. মূলে 'হিকমত' আছে। ইংরেজি অনুবাদক রোজেনথাল এটা 'দর্শন' অর্থে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য এক সময়ে দর্শন ও বিজ্ঞান একীভূত ছিল, ইবনে খলদুন সেই সময়ের লোক। তবু আমরা একে বিজ্ঞান অর্থে ব্যবহার করলাম। কারণ পরবর্তীকালে আরবিতেও হিকমত ও ফিলসফা পৃথকভাবে উল্লেখিত হয়েছে এবং অধুনা ইতিহাসের এ দিকটি সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। এ কারণেই সাধারণ মানুষের মধ্যে অন্ধ বিশ্বাসের এমন ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। কিন্তু সত্য কখনও লুক্কায়িত থাকে না এবং বিচক্ষণ জ্ঞানীর নিকট মিথ্যার মুখোস খসে পড়তে দেরি হয় না। সুতরাং ঐ সকল ইতিহাস রচকদের বর্ণনা যতই রসঘন ও মুখরোচক হোক না কেন, দূরদর্শীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার অন্তর্নিহিত অসারতাকে সহজেই আবিষ্কার করে সত্যকে উদ্ধার করতে সক্ষম।

এজন্যই অসংখ্য লোক রচনায় আত্মনিয়োগ করলেও এবং তাদের বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব সমাজ সম্পর্কীয় বর্ণনা বিরাট আকৃতির হলেও, যাঁরা ইতিহাসবিদ হিসাবে যথার্থই খ্যাতি ও বিশ্বস্ততার অধিকারী, তাঁদের সংখ্যা একান্তই নগণ্য—আঙুলে গণনা করা যায় ও আরবি স্বরবর্ণ অপেক্ষা অধিক নেই। যেমন ইবনে ইসহাক, তাবারী, ইবনুল কালবী, মুহম্মদ ইবনে উমর আল-ওয়াকেদী, সাইফ ইবনে উমর আল-আসাদী, আল-মাসউদী প্রমুখ বিশিষ্ট ও বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ।[৫]

অবশ্য মাসউদী ও ওয়াকেদীর গ্রন্থসমূহে আপত্তিকর বর্ণনা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান। বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিকট তা সুপরিচিত। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁদের বিবরণ সাধারণ মানুষের গ্রহণযোগ্য হয়েছে এবং ইতিহাস বর্ণনায় ও গ্রন্থ রচনায় তাঁরা তাঁদের আদর্শকে অনুসরণ করেছে। কিন্তু বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ দৃষ্টির সম্মুখে এটা সুস্পষ্ট যে, তাঁদের বর্ণনার কোন অংশ গ্রহণযোগ্য এবং কোন অংশ বর্জনীয়। কারণ সভ্যতার বিভিন্ন স্তর ও ঘটনার সাথে জড়িত জীবনবিধানের বর্ণনাই ঐতিহাসিক সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে। এতদ্‌ব্যতীত সাধারণ ঘটনাবলির বর্ণনা মাত্রই যথেষ্ট নয়।

এ সকল ঐতিহাসিকের অধিকাংশ গ্রন্থই সাধারণভাবে প্রণিধানযোগ্য। কেননা তাঁরা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থা এবং উমাইয়া ও আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সমকালীন বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। সাম্রাজ্যের সুবিধার জন্যই তাঁরা গ্রহণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে পেরেছেন। তাঁদের মধ্যে মাসউদীর ন্যায় অনেকেই প্রাক্ ইসলামিক জাতি ও রাষ্ট্রসমূহ এবং তাদের সাধারণ অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

এদের পরবর্তীকালে যাঁরা ইতিহাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তাদের অনেকেই বিস্তারিত বর্ণনার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে ফেলেছেন এবং কতকাংশে প্রাচীন ও অসংলগ্ন বিষয়াদির সংক্ষিপ্তকরণের মাধ্যমে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন। আবার অনেকে

---

৫. * মুহম্মদ ইবনে ইসহাক বিখ্যাত 'সিরাত' গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ১৫০/১৫১ (৭৬৭/৭৬৮ খ্রি:) হিজরিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

* মুহম্মদ ইবনে জাবির আত্তাবারী, বিখ্যাত ইতিহাস রচয়িতা। জীবনকাল ২২৪/২২৫-৩১০ (৮৩৯/৯২৩ খ্রি:) হি:।

* হিশাম ইবনে মুহম্মদ ইবনুল কালবী। মৃত্যু ২০৪/২০৬ (৮১৯/৮২১ খ্রি:) হি:।

* মুহম্মদ ইবনে উমর আল-ওয়াকেদী ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস ও হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর জীবনী রচয়িতা। জীবনকাল ১৩০-২০৭ (৭৪৭-৮২৩ খ্রি:) হি:।

* সাইফ ইবনে উমর আল-আসাদী। মৃত্যু ১৮০ (৭৯৬-৭৯৭ খ্রি:) হি:।

* আলী ইবনে আল-হোসাইন আল-মাসউদী। মৃত্যু ৩৪৫/৩৪৬ (৯৫৬.৯৫৭ খ্রি:) হি:। ইবনে খলদুনের মিশরীয় শিষ্য ইবনে হজরের মতে মাসউদী শিয়া ও মোতাজিলা সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অলীক অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে।

সমসাময়িক ইতিহাসের বিবরণ দিতে গিয়ে নিজ দেশ, রাষ্ট্র বা অঞ্চলবিশেষের বর্ণনার উপর ইতিহাসকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন। যেমন স্পেনের ইতিহাস লেখক ইবনে হাইয়ান।[৬] তিনি শুধু স্পেন ও তথাকার উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিবরণদানের মধ্যেই ইতিহাস রচনার দায়িত্ব পালন করেছেন। আফ্রিকিয়ার[৭] ইতিহাস রচনাকারী ইবনে রফিকও আফ্রিকিয়া ও নিজ রাষ্ট্র কায়রোয়ানের বাইরে দৃষ্টিপাত করেননি।

অতঃপর এমন একদল ইতিহাস লেখকের আবির্ভাব ঘটল, যারা মানসিকতার দিক থেকে সংকীর্ণ এবং বিশ্বাসের দিক থেকে সম্পূর্ণ অন্ধ ও অবিবেচক। তাঁরা পূর্বসূরিদের পদাংক অনুসরণ করে তাঁদের বর্ণনার পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। কালচক্রের আবর্তন কীভাবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় এবং তদ্দরুন মানবচরিত্র ও সমাজ প্রগতি কিভাবে বিবর্তিত হয়, তার কার্যকারণ তাঁরা আদৌ উপলব্ধি করতে পারেননি। সুতরাং তাঁরা অতীতের ঘটনাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়েছেন এবং অসতর্ক ও উদাসীনভাবে সংগৃহীত তাঁদের সমসাময়িক ও প্রাচীন সঞ্চয়ের সমুদয় অংশই সমর্থনের অযোগ্য হয়ে রয়েছে। এর ফল এ দাঁড়িয়েছে যে, তাঁদের বর্ণনা মাত্রই, তার ভিত্তি জানা যায়নি; তাঁরা কতকগুলো পৃষ্ঠা সাজিয়েছেন, যাতে বিষয় গুরুত্ব বলতে কিছু নেই। প্রাচীন ও নবীন সমুদয় ঘটনার বর্ণনাতেই তাঁদের মূর্খতা দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে।

ফলত তাঁদের সংগৃহীত বিবরণ ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টির অভাবে সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে। তাঁরা কোন রাষ্ট্রের বিবরণ দিতে গিয়ে একান্তই যান্ত্রিকভাবে বাহ্যজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছেন। তার উত্থান-পতন, সুবিধার-অসুবিধার বিবরণে কার্যকারণ বিশ্লেষণের কোন প্রকার চেষ্টা করেননি। এ কারণে তাঁদের সংগৃহীত ইতিহাস পাঠককে শুধু রাষ্ট্রশক্তির প্রারম্ভ অথবা বিনাশের কথাই জ্ঞাপন করায়; একটি রাষ্ট্রশক্তি কীভাবে অন্য একটি শক্তির স্থলাভিষিক্ত হয়—কীভাবে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে; সে সম্পর্কে কোন ধারণাই দেয় না। বস্তুত এ সকল ঐতিহাসিকের জন্য পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ অপেক্ষা এ কার্যকারণের বিশ্লেষণের উপর অধিকতর দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন ছিল; কিন্তু তা হয়নি। আমার ভূমিকায় উপরোক্ত বিশ্লেষণের প্রতি মনোনিবেশ করব।

এর পর এমন একদল ঐতিহাসিকের আবির্ভাব ঘটল, যাঁরা সংক্ষিপ্তকরণকেই তাঁদের মূল লক্ষ্য করলেন। ফলে তাঁদের সংগৃহীত ইতিহাস শুধু সম্রাটদের নামের তালিকায় রূপান্তরিত হয়েছে। এতে বংশলতিকার বিবরণ বা বিস্তারিত কোন বর্ণনাই নেই। রাজত্বের উত্থান-পতনের কালকেও তাঁরা শুধু সংখ্যা দ্বারা বর্ণনা করেছেন। ইবনে রশিক[৮] তাঁর 'মিজানুল আমল' গ্রন্থে এবং তাঁর অনুসারীগণ স্ব স্ব সংকলনে অনুরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। ঐতিহাসিকদের চিরাচরিত পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে এদের বর্ণনা একান্তই অনির্ভরযোগ্য ও উদ্ধৃতিদানের অতীত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণেই উপরোক্ত গ্রন্থাবলি ইতিহাস নামেরও অযোগ্য।

---

৬. ইবনে হাইয়ান ইবনে খলফ। জীবনকাল ৩৭৭-৪৬৯ (৯৮৭-৯৮৮-১০৭৬ খ্রি:) হি:।

৭. আফ্রিকিয়া—আফ্রিকার রোমান শাসিত একটি প্রদেশের নাম। ইবনে খলদুন তাঁর ইতিহাসে এই নামটি বারবার ব্যবহার করেছেন।

৮. হাসান ইবনে রশিক। জীবনকাল ৩৯০-৪৫৬/৪৬৩ (১০০০-১০৬৪/১০৭০ খ্রি:) হি:।

এ সকল ঐতিহাসিক গ্রন্থের বিবরণ পর্যালোচনা করে আমি যখন ঐগুলোকে মৌলিক তত্ত্বের আলোকে বিচার করতে লাগলাম, তখনই আমার মনে হল, আমি যেন ক্রমাগত আলস্য-নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে উঠছি। শেষ পর্যন্ত আমি নিজেই একখানি ইতিহাস রচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। আমার অক্ষমতা অনুভব করা সত্ত্বেও একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে অতীত ঘটনাবলির রহস্য উদ্‌ঘাটনে প্রবৃত্ত হলাম। এ উদ্দেশ্যে তাকে আমি বিবরণ-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নানা অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। এতে আমি রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভবের কারণগুলোকে যথাযথভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।

আমার আলোচনা মূলত দুটি জাতির বিবরণকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। এ দুটি জাতির লোক বর্তমানেও 'মাগরিব'[৯] ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল এবং শহরগুলোতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছি। তাদের সাম্রাজ্য প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কোন রাজ্যের কথাই আমি পরিত্যাগ করিনি এবং সম্রাট ও অমাত্যবর্গের কথাও তুল্য গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করেছি। এ দুটি জাতি আরব ও বারবার। এরা দীর্ঘকাল যাবত মাগরিবে আধিপত্য বিস্তার করে আছে এবং তার ব্যাপকতা এত অধিক যে, উক্ত অঞ্চলে এ দুই জাতি ব্যতীত অন্যদের অস্তিত্ব ধারণা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

আমি উক্ত দুই জাতির কথা ও গৃহীত অন্যান্য বিবরণকে যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ আকারে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছি। অতঃপর তা বিদ্বান ও বুদ্ধিমানের বিবেচনার জন্য তাঁদের সম্মুখে তুলে ধরেছি। আর এটা করতে গিয়ে আমি সম্ভাব্য সকল পন্থার মধ্যে একটি অভিনব পন্থা গ্রহণ করেছি এবং তদনুযায়ী গ্রন্থটিতে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। আমি সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কার্যকারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতির মৌল উপাদানগুলো বর্ণনা করেছি। মানব সমাজের প্রগতি ও বিবর্তনের ক্ষেত্রে যে সকল অন্তর্গত ও বহির্গত শক্তি কার্যকরী হয়ে থাকে, তাও যথাযথভাবে তুলে ধরেছি। এর ফলে অন্ধবিশ্বাস ও শ্রুতিনির্ভরতা হতে পাঠক মুক্তি লাভ করতে পারবে এবং অতীতের ঘটনাবলি বিশ্লেষণের আলোকে ভবিষ্যতের চিত্রও নিজের চোখের সম্মুখে দেখতে পাবে।

আমি এ ইতিহাসকে একটি ভূমিকা ও তিনটি গ্রন্থে বিভক্ত করেছি।

ভূমিকা (আল-মুকাদ্দিমা)

এতে ইতিহাসের বিষয় গুরুত্ব বর্ণনা ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পদ্ধতি বিশ্লেষণ এবং ইতিহাসবিদদের ভুল-ভ্রান্তির বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রথম গ্রন্থ

এতে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবরণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপাদান—যেমন দেশ ও রাষ্ট্র, জীবিকা ও উপার্জন, কৃষ্টি ও শিল্প, জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রভৃতি তাদের অন্তর্নিহিত কার্যকারণসহ বর্ণিত হয়েছে।

---

৯. এখানে মাগরিব অর্থে পাশ্চাত্য নয়। এতে সাধারণভাবে আরব দেশের ও আফ্রিকার পশ্চিম অঞ্চল বিশেষকে বোঝানো হয়েছে। বর্তমানে এর সাধারণ নাম মধ্যপ্রাচ্য।

দ্বিতীয় গ্রন্থ

এতে সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে আরবীয় জাতি, গোত্র ও রাষ্ট্রসমূহের বর্তমানকাল পর্যন্ত অবস্থার বিবরণ দেয়া হয়েছে। এতদ্‌সঙ্গে তাদের সমসাময়িক[১০] বিভিন্ন বিখ্যাত জাতি ও রাষ্ট্রের, যেমন নাবাতী,[১১] সিরীয়, পারসিক, বনি ইসরাইল, কিবতী, গ্রিক, বাইজেন্টাইন, তুর্কি ও ফিরিঙ্গী (ইউরোপীয় জাতি)-দের সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিক বর্ণনা বিদ্যমান।

তৃতীয় গ্রন্থ

এতে বারবার জাতি ও তাদের সমগোত্রীয় 'জানাতা' এবং তাদের বংশাবলির প্রাথমিক অবস্থা থেকে আরম্ভ করে মাগরিবে অবস্থানকারী গোত্রগুলো ও রাষ্ট্রসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

অতঃপর বর্ণনার ধারা পূর্বদিকের আলোর সন্ধানে অগ্রসর হয়েছে, তওয়াফ ও জিয়ারতের[১২] মাধ্যমে ফরজ ও সুন্নত আদায় করেছে এবং তার স্মৃতিগ্রন্থ ও স্মৃতিক্ষেত্রসমূহে বিচরণ করে ফিরেছে। আর এটা করতে গিয়ে তৎসংশ্লিষ্ট অনারব রাষ্ট্রগুলোর বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছে এবং বিশেষভবে পূর্বের ধারা অনুসরণ করে তুর্কি আধিপত্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরেছে।

এ সকল বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও যাতে পাঠকের উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে এবং প্রতিটি সংবাদ ও বর্ণনার উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আমার বিশ্বাস—বর্তমান ইতিহাস গ্রন্থে পৃথিবীর ইতিহাস সামগ্রিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের বিবরণসমূহ তার কার্যকারণ বিশ্লেষণ এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে এর পাঠক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে যুগপৎ অবহিত থাকতে পারে। ফলত এ গ্রন্থ জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অপূর্ব সংগ্রহ।

যেহেতু আমরা এ গ্রন্থে আরব ও বারবার জাতির নাগরিক ও যাযাবরী জীবনের বর্ণনা, তাদের সমসাময়িক বিভিন্ন রাষ্ট্রের আনুপূর্বিক বিবরণ এবং বিচিত্র উপদেশ ও তথ্যাবলি সংগৃহীত হয়েছে, এজন্য আমি এর নামকরণ করেছি—

আরব, অনারব ও বারবার জাতিসমূহের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণসহ তাদের সমসাময়িক বৃহৎ রাষ্ট্রমণ্ডলীর তথ্যাদি ও উপদেশাবলির পুস্তক।[১৩]

যতদূর সম্ভব, আমি এ গ্রন্থে প্রাচীন জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের প্রারম্ভিক ঘটনাবলির বিস্তারিত, বিবরণ, তাদের পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের কার্যকারণ এবং আনুষঙ্গিক ত্রুটি-

---

১০. সমসাময়িক বলতে এটাই বুঝায় যে, আরবীয় গোত্রগুলো সৃষ্টির প্রারম্ভ হতেই বিদ্যমান ছিল।

১১. আরবীয় ধারণা অনুসারে ইরাকের প্রাচীন জাতিবিশেষ। এদিক হতে প্রাচীন সিরীয় ও মেসোপটেমীয়দেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সম্ভবত প্রাচীন বাবেলোনীয় সভ্যতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন 'কিবতী' শব্দের দ্বারা মিশরীয় সভ্যতাকে বোঝানো হয়েছে।

১২. তওয়াফ—কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ ও জিয়ারত—হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সমাধি পরিদর্শন। প্রথমটি হজের অংশ বিশেষ, এই কারণে ফরজ—অবশ্য কর্তব্য এবং দ্বিতীয়টি সুন্নত প্রথাগত দায়িত্ব।

১৩. গ্রন্থের মূল আরবি নামটি নিম্নরূপ—
কিতাবুল ইবার ফি দিওয়ানিল্ মুবতাদা ওল খবর ফি আইয়ামিল্ আরব ওল্ আজম ওল্ বারবার ও মান আসারাহুম্ মিন্ যাবিস্ সুলতানিল্ আকবার।

বিচ্যুতির বর্ণনা বিশদভাবে করেছি। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদান যেমন ধর্ম ও রাষ্ট্র, নগর ও গ্রাম, মর্যাদা ও অমর্যাদা, সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যালঘুতা, জ্ঞান ও শিল্প, শ্রম ও বিলাসিতা এবং সর্বোপরি তাদের নাগরিক ও যাযাবরী জীবনের পরিবর্তমান গতিপ্রকৃতি ও ঘটনাবলির সমুদয় বিবরণ তুলে ধরেছি। ফলত এতে সংঘটিত ও সংঘটিতব্য উভয়বিধ তথ্যের ইঙ্গিত বিদ্যমান।

আমার বিশ্বাস, যদিও এ গ্রন্থ দুষ্পাপ্য ও অপূর্ব জ্ঞানের এবং সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাদির দ্বারা সুসজ্জিত; তথাপি আমার পক্ষে স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ও জ্ঞানের স্বল্পতার কথা সবিনয়ে স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। বিচক্ষণ ও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী মনীষীদের সমীপে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁরা যেন একে প্রশংসার দৃষ্টিতে না দেখে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেন এবং এর মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও স্খলন-পতন পরিলক্ষিত হলে মার্জনা করেন। সুধীমণ্ডলীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাই আমার জ্ঞানের পুঁজি এবং অক্ষমতার স্বীকৃতিই মুক্তি প্রাপ্তির একমাত্র পথ। আমি সমকালীন ভ্রাতৃবর্গের সদিচ্ছা কামনা করি এবং পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র প্রার্থনা—তিনি যেন স্বীয় দয়ায় এ অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস গ্রহণ করেন। কেননা তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট এবং একমাত্র তিনিই উত্তম সহায়।[১৪]

১৪. কোরান—৩, ১৭৩।

উৎসর্গ[১৫]

যখন আমি আরব্ধ গ্রন্থের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করলাম, চক্ষুষ্মানদের জন্য তার জ্ঞান-প্রদীপকে উজ্জ্বল করে তুললাম এবং সমুদয় বিষয়বস্তুকে সুবিন্যস্ত করে তত্ত্বের রাজ্যে এক নতুন পথ ও তথ্যের জগতে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র আবিষ্কার করলাম, তখন এ গ্রন্থকে উৎসর্গ করবার ইচ্ছা আমার মনে উদয় হল।

আমি একটি গ্রন্থ ধর্মযোদ্ধাদের অগ্রনায়ক, বিশ্বাসীদের শাসক মহামান্য সম্রাট আবুল ফারিস আবদুল আজিজ ইবনে মওলানা আস্ সুলানুল মুয়াজ্জম—আবু সালিম ইব্রাহিম ইবনে মওলানা আস্ সুলতানুল মুকাদ্দস আমীরুল মুমেনীন আবুল হাসান মারিনীর গ্রন্থাগারে অর্পণ করলাম।

বস্তুত তিনি বাল্যকাল থেকেই পরম ধর্মনিষ্ঠা ও ধর্মভীরুতার দুর্লভ অলংকারে বিভূষিত। মার্জিত রুচি, প্রশংসনীয় উন্নত চরিত্র ও চিন্তাধারার তিনি জ্বলন্ত প্রতীক। তিনি প্রাচীন ও আধুনিককালের সর্ব মর্যাদার উত্তরসূরি—সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের অমূল্য ভূষণ—শ্রেষ্ঠ সম্মান ও গুণের আকর। নানাবিধ জ্ঞান ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের সাথে জড়িত থেকে শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টায় তিনি ব্রতী। তিনি মানবীয় গুণাবলির দ্বারা অলংকৃত এবং বাস্তব ও ফলপ্রসূ মাতমত জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ ধীশক্তিসম্পন্নদিগের অগ্রনায়ক। তিনি ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, আল্লাহ্‌তায়ালার সপ্রভ দীপ্তি ও আশীর্বাদের আকর। তিনি পার্থিব কঠোরতায় করুণা অভিষিক্ত এবং বিদ্রোহ দমনে বিজয়ী। তিনি বিশৃঙ্খল অবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবিন্যস্ত করতে মহাপুরুষ।

তিনি পারিবারিক জীবনের সন্দিগ্ধ ধারণা বিদূরিত করে তাকে নবজীবনের নবীন আভরণে ভূষিত করবার জন্য খোদাদত্ত এমন শক্তির অধিকারী, যা বিরুদ্ধচারীদের প্রতিকূলতা ও বিপথগামীদের বৈরিতা কখনও অবদমিত করতে পারেনি। বনি মরিয়ম বংশের এমন সকল খ্যাতিমান মহান রাজপুরুষের সাথে তাঁর রক্ত সম্পর্ক বিদ্যমান, যাঁরা

---

১৫. ইবনে খলদুনের বিখ্যাত ইংরেজি অনুবাদকে ফ্রেঞ্জ রোজেনথাল তাঁর অনুবাদে এই অংশটির কোন অনুবাদ দেননি। পাদটীকায় বলেছেন, মূল পাণ্ডুলিপির কোন কোন সংস্করণে এই অংশটি বিদ্যমান। বর্তমান বাংলা অনুবাদের জন্য ব্যবহৃত মূল গ্রন্থের বৈরুত সংস্করণে এ 'উৎসর্গ' অংশটি থাকায় আমরা এর অনুবাদ সন্নিবেশিত করলাম। এতে মধ্যযুগীয় গ্রন্থ উৎসর্গ সম্পর্কে একটি বহুল প্রচলিত রীতি পরিচয় পাওয়া যাবে। তদুপরি ফেজের মারিনী সম্রাট আবুল ফারিস আবদুল আজিজের (১৩৬৬-৭২ খ্রি:) প্রতি উচ্চারিত স্তুতি বাক্যের মধ্যে সমসাময়িক ইতিহাসের জটিলতার ইঙ্গিতও বিদ্যমান। নতুবা ইবনে খলদুনের ন্যায় বিচক্ষণ জ্ঞানীর পক্ষে এ ধরনের স্তুতি উচ্চারণ সম্ভবপর হত না (ইবনে খলদুনের জীবনী দ্র:)। অন্যদিকে তাঁর ইতিহাস রচনার সময়কাল বিবেচনা করলে এ 'উৎসর্গ' অংশটি সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

ধর্মকে সজীব রেখেছেন এবং সৎপথ অন্বেষণকারীদের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ মানব জাতিকে তাঁর শান্তিময় ছত্রছায়াতলে আশ্রয়দান করুন এবং তাঁর জন্য ইসলামে সুসংবাদ প্রদানের আশা পূর্ণ করুন।

সকল যুগের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকারীদের জন্য উৎসর্গ করে এ গ্রন্থ কেন্দ্রীয় শাসনের রাজধানী মহানগরীর গ্রন্থাগারে প্রদত্ত হল। এ নগরী সৎপথ প্রদর্শন ও অনুসরণের চিরপবিত্র পীঠস্থান, শিক্ষার সজীব উদ্যান ও আল্লাহ্তালার গূঢ় তত্ত্বজ্ঞান আহরণের মহিমান্বিত ক্ষেত্র। আবুল ফারিসের সুমহান শাসন ব্যবস্থার সুযোগ্য দৃষ্টিকে এ গ্রন্থ নিশ্চয়ই আকর্ষণ করবে এবং তাঁর গুণগ্রাহিতার অমর স্পর্শ লাভ করে স্থায়িত্ব ও প্রতিষ্ঠার সাক্ষ্য বহন করতে সক্ষম হবে। কেননা সকল গ্রন্থকারের জ্ঞানভাণ্ডার স্বরূপ গ্রন্থাবলি তাঁরই সান্নিধ্যে এসে উৎসর্গীকৃত হয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বাহন এখানে উপনীত হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করে।

আমাদিগকে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর মহান দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার ক্ষমতা এবং তাঁর সহৃদয় সান্নিধ্য লাভের অফুরন্ত সুযোগ দান করুন। আমরা যেন সর্বদা তাঁর সেবাকার্যে নিয়োজিত থাকতে পারি এবং তাঁর চরণে আত্মদানকারীদের মধ্যে আমাদের স্থান যেন প্রথম সারিতে নির্ধারিত হয়। তাঁর আশ্রিত রাজনীতিজ্ঞ ও ধর্মনিষ্ঠদিগকে যেন আল্লাহ্ সর্বদা তাঁর শাসনব্যবস্থার সহায়রূপে সম্মানিত রাখেন।

পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। তিনি যেন আমাদের কার্যাবলি সকল কলুষ কালিমা ও দ্বিধাসন্দেহ মুক্ত করে যথার্থ সদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত রাখেন। কেননা তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সহায়।

ভূমিকা[১৬]

[ইতিহাসের বিষয় গুরুত্ব, তার বিভিন্ন পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ এবং ইতিহাসবিদদের সম্ভাব্য ত্রুটিবিচ্যুতির বিবরণ ও কারণ।]

ইতিহাস অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের অন্যতম। এর উপাদানগুলো যেমন উপকারী, তেমনি এর উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ। ইতিহাস আমাদিগকে মানব জাতির অতীত কার্যাবলি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অবহিত করায়। ইতিহাস পাঠে আমরা প্রেরিত পুরুষদের মহৎ জীবনকাহিনী জানতে পারি। এটা আমাদের রাজন্যবর্গের শাসনব্যবস্থা ও তাঁদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে। এর ফলে আমরা পারলৌকিক ও ইহলৌকিক কল্যাণের পথ অনুসরণ করতে এবং নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী উপদেশ গ্রহণ করতে সক্ষম হই।

এজন্যই ইতিহাস রচনায় বহুবিধ সূত্র, জ্ঞান ও বিস্তর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রয়োজন। ইতিহাসবিদকে অবশ্যই মননশীলতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হতে হবে। মাত্র এ দুটি গুণ ইতিহাস রচয়িতাকে সত্যের অনুসারী ও স্খলন-পতন-ত্রুটি থেকে মুক্তি করতে পারে। কোন ঐতিহাসিক লব্ধ বিবরণকে মানব জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, রাষ্ট্রনীতির মৌলিক তাৎপর্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উপাদানগত বৈচিত্র্য এবং সর্বোপরি পরোক্ষকে প্রত্যক্ষের ও অবিদ্যমানকে বিদ্যমানের মাপকাঠিতে বিচার না করে তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে তুলে ধরেন, তাহলেই তাঁর স্খলন-পতন ও সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া বিচিত্র নয়। এ কারণেই বহু ইতিহাস রচয়িতা, কোরানের ভাষ্যকার ও ঐতিহ্য বিশারদগণ তাদের বর্ণিত কাহিনী ও ঘটনাবলিতে ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকারে পরিণত হয়েছেন। কারণ তাঁরা প্রাপ্ত বিবরণকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। তাকে বাস্তব মৌলিকত্ব, সমতুল্য বিষয়াদির সাথে সমতুল্য বিধান, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধান, মানব জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেননি। এর ফলে তাঁরা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে মিথ্যার দিশাহীন প্রান্তরে ঘুরে মরেছেন। বিশেষ করে সম্পদ ও সৈন্যসংখ্যার পরিমাণ বর্ণনায় তাদের অবাস্তব ধারণা মিথ্যাকেও অতিক্রম করেছে। এ ব্যাপারে তাঁদের উচিত ছিল বাস্তব মৌলিকতা ও নিয়ম-নীতির সহায়তা গ্রহণ করা; কিন্তু পরিতাপের বিষয় এ যে, তাঁরা আদৌ তা করেননি।

---

১৬. বস্তুত এই 'ভূমিকাই' যথার্থ আল-মুকাদ্দিমা। কিন্তু বিষয়বস্তুর গুণে ইবনে খলদুনের ইতিহাসের প্রথম গ্রন্থও আল-মুকাদ্দিমার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে ও পরিচিতি লাভ করেছে।

বনি ইসরাইলের সৈন্যসংখ্যা

মাসউদী ও অন্য অনেক ইতিহাস রচয়িতা বনি ইসরাইলের সৈন্যসংখ্যা বর্ণনায় অনুরূপ ভ্রান্তির কবলে পতিত হয়েছেন। তাঁদের মতে হজর মুসা (আঃ) মরু প্রান্তরে অবস্থানরত সৈন্যদলকে গণনা করছিলেন। তাদের মধ্যে যারা অস্ত্র বহন করতে পারে, এমন বিশ বছর বয়স্ক ও তদূর্ধ্ব বয়সের লোকের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষেরও অধিক। এ বিপুল সংখ্যা বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ মিশর ও সিরিয়ার[১৭] সঙ্গতির কথা বিবেচনা করেননি। যে-কোন দেশের জন্যই এমন নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য থাকা বাঞ্ছনীয়, যা তার আয়তন, ব্যয়ভার বহন ও সামর্থ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। অন্যথায় তা অবাস্তব হতে বাধ্য। বাস্তব অবস্থা ও সুপরিজ্ঞাত রীতিনীতির সাথে মিলিয়ে বিবেচনা করলেই উপরোক্ত বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

তদুপরি এরূপ একটি বিপুল সংখ্যক সৈন্যদলের যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হওয়াও অবাস্তব ঘটনা। কারণ সংশ্লিষ্ট দেশ বা প্রান্তরে তার স্থান সংকুলান সম্ভব নয়। অন্যদিকে এ বিপুল সংখ্যক সৈন্য সারিবদ্ধ অবস্থায় দণ্ডায়মান হলে দৃষ্টি সীমার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ অথবা বহুগুণ দূরে অবস্থান করবে। এমতাবস্থায় এরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কী করে যুদ্ধ করতে পারে কিংবা একদল অন্য দলের উপর জয়ী হতে পারে! কারণ এ বিরাট সৈন্যদলের এক অংশ অন্য অংশের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হবার সুযোগই পাবে না। বর্তমানকালেও অনুরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়। বস্তুত এক বিন্দু জল যেমন অন্য এক বিন্দু জলের অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে, তেমনি বর্তমানও আমাদের সম্মুখে অতীতের সম্ভাবনাকে পরিস্ফুট করে তোলে।

বনি ইসরাইলের রাজ্য অপেক্ষা পারস্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল অনেকগুণ বেশি। তাঁদের উপর 'বখতেনসরে'র[১৮] বিজয় লাভই এ মন্তব্যের সাক্ষ্য বহন করে। তিনি শুধু জয়ীই হননি, বরং বনি ইসরাইলের সকল শহর দখল করে আধিপত্য বিস্তার করেছেন এবং তাঁদের তীর্থভূমি ও রাজধানী জেরুজালেমকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। অথচ এ বখতেনসর ছিলেন পারস্য সাম্রাজ্যের একটি অঙ্গরাজ্যের কর্মকর্তা মাত্র। অনেকের মতে তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তীয় এক বিশিষ্ট গোত্রপতি ছিলেন। বস্তুত এ সাম্রাজ্য ইরাকে আরব, ইরাকে আজম, খোরাসান, মাওরায়ান্নাহার ও আবোয়াব[১৯] পর্যন্ত বিস্তৃত এবং বনি ইসরাইলের অধিকৃত এলাকা অপেক্ষা বহুগুণ বৃহৎ ছিল। তথাপি পারস্য সম্রাটদের সৈন্যসংখ্যা কোন প্রকারেই উপরোক্ত পরিমাণে উপনীত হয়নি। তাঁদের যে বৃহত্তম সৈন্যবাহিনীকে কাদেসিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করা হয়েছিল, তার সৈন্য সংখ্যাও এক লক্ষ বিশ হাজারের বেশি নয়। অবশ্য ঐতিহাসিক সাইফের[২০] মতে উক্ত সৈন্যদল তাদের অনুসারীসহ দুই লক্ষের অধিক হতে পারে। কিন্তু হজরত আয়েশা

---

১৭. মূলে 'শাম' শব্দটি আছে। কথিত আছে, এটা হজরত নূহের পুত্র সামের নামানুসারে পরিচিত হয়।

১৮. নেবুচাডনেজার।

১৯. মাওরায়ান্নাহার—ট্রান্সওক্সানিয়া ও আবোয়াব—কাস্পিয়ানসাগর তীরবর্তী দারবন্দ।

২০. বিখ্যাত ঐতিহাসিক সাইফ ইবনে উমর আল-আসাদী (৫ নং টীকা দ্র:)।

(রাঃ) ও ইমাম জুহরীর[২১] বক্তব্য অনুসারে কাদেসিয়ার প্রান্তরে সেনাপতি সাদের[২২] বিরুদ্ধে রুস্তমের[২৩] সৈন্যসংখ্যা অনুসারীসহ ছিল মাত্র ষাট হাজার।

এতদ্ব্যতীত বনি ইসরাইলের সৈন্যসংখ্যা উল্লেখিত পরিমাণ অধিক হলে তাঁদের সাম্রাজ্যের বিস্তার আরও ব্যাপক হত এবং শাসন ব্যবস্থাও তদনুযায়ী বিস্তৃতি লাভ করত। বস্তুত রাষ্ট্রের আয়তন ও ক্ষমতা অনুযায়ীই কর্মচারী ও সৈন্যসংখ্যা অল্পাধিক হয়ে থাকে। আমরা এ ব্যাপারে প্রথম গ্রন্থের 'রাষ্ট্র' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ও ফলত যে জাতির রাজ্যসীমা সিরিয়ার ফিলিস্তিন, জর্ডান ও হিজাজের মদিনা এবং খয়বরের বাইরে কখনও বিস্তৃতি লাভ করেনি, তাঁদের বিষয়ে বিবেচনা প্রয়োজন।

বিশেষজ্ঞদের মতে হজরত মুসা (আঃ) ও হজরত ইয়াকুব (ইসরাইল)-এর মধ্যে মাত্র চার পুরুষের ব্যবধান।[২৪] হজরত মুসার পিতা এমরাম, এমরামের পিতা ইয়াসহর, ইয়াসহরের পিতা কাহাস বা কাহিস, কাহাসের পিতা লেবী এবং লেবীর পিতা ইসরাইল। তৌরাত গ্রন্থেও তাঁদের বংশ পরিচয় অনুরূপভাবে লিখিত হয়েছে। মাসউদীর মতে ইসরাইলের নিজ পরিবারবর্গসহ মিশরে তৎপুত্র ইউসুফের নিকট আগমনের সময় তাদের সংখ্যা ছিল সত্তর জন এবং মুসার সাথে বনি ইসরাইলের মিশর ত্যাগের কাল পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ছিল দুইশ বিশ বছর। এ দুইশ বছর বনি ইসরাইল বিভিন্ন ফেরাউন নামধারী সম্রাটের অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয়। সুতরাং এ চার পুরুষে জনসংখ্যার অনুরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্তি কোন বিবেচনাতেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।

যদি ধরে নেয়া হয় যে, উক্ত সংখ্যা হজরত সুলায়মানের সময়কার, তাহলেও যুক্তির বিচারে অসম্ভব বলে ধারণা জন্মায়। কারণ হজরত সুলায়মান ও হজরত ইসরাইলের মধ্যে মাত্র এগার পুরুষের ব্যবধান। হজরত সুলায়মানের পিতা হজরত দাউদ (আঃ), দাউদের পিতা যেশা, যেশার পিতা অবেদ, অবেদের পিতা বুয়াজ, বুয়াজের পিতা সালমন, সালমনের পিতা নাহশুন, নাহশুনের পিতা আমিনাদব, আমিনাদবের পিতা রাম, রামের পিতা হাজরুন, হাজরুনের পিতা বারেস, বারেসের পিতা যিহুদা ও যিহুদার পিতা ইয়াকুব। এ এগার পুরুষেও উক্ত জনসংখ্যা তাঁদের ধারণামতে ছয় লক্ষে[২৫] উপনীত হতে পারে না। অবশ্য শতক কিংবা সহস্রের কোঠায় পৌঁছা অসম্ভব নয়; কিন্তু এর উপরে গেলেই অবাস্তব হতে বাধ্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান সুপরিচিত হার অনুসারে গণনা করলেই এ সকল ঐতিহাসিকের বর্ণনার মিথ্যা ও অবাস্তব দিকটি সম্যকরূপে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়বে।

---

২১. মুহম্মদ ইবে মুসলিম আজ্জুহরী। মৃত্যুকাল ১২৩-১২৫ (৭৪০-৭৪২/৪৩ খ্রি:) হিজরির মধ্যবর্তী।

২২. সাদ ইবনে আবি ওক্কাস, বিখ্যাত সাহাবী।

২৩. পারস্য সেনাপতি। ইনি শাহনামার সেই কিংবদন্তী খ্যাত রুস্তম নয়।

২৪. বাইবেলে তিন পুরুষের নাম উল্লেখিত হয়েছে—যেমন ইয়াকুবের পুত্র লেবী, লেবীর পুত্র কহাৎ, কহাতের পুত্র অম্রম ও অম্রমের পুত্র মোশি বা মুসা। ইংরেজি অনুবাদক রোজেনথাল তিন পুরুষের কথা লিখেছেন। পাদটীকায় তিনি বলেছেন যে, মূলগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে চার পুরুষই ছিল, পরে ইবনে খলদুন তা শুদ্ধ করেন। আমাদের ব্যবহৃত বৈরুত সংস্করণে চার পুরুষ বিদ্যমান। অবশ্য বাইবেলে তিন পুরুষের কথা উল্লেখিত হলেও সময়ের ব্যবধানে হল চারশ [illegible] বছর।

২৫. বাইবেলে ৬০৩৫৫০ জন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বনি ইসরাইলের ঐতিহ্যগত বর্ণনা অনুসারে হজরত সুলায়মানের সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র বার হাজার। তাঁর রাজধানীর বিভিন্ন ঘাঁটিতে এক হাজার চারশ অশ্বারোহী সর্বদা অপেক্ষমান থাকত। এটাই সত্য বিবরণ। সুতরাং অন্যবিধ অসার, অবাস্তব ও অতিরঞ্জিত বর্ণনার প্রতি দৃষ্টিপাত করবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ সুলায়মানের শাসনকালই বনি ইসরাইলের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধি ও রাজ্য বিস্তৃতির সময়।

এভাবে সমসাময়িক বহুলোকের মধ্যেও অনুরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা যখন নিজ নিজ রাষ্ট্রের বা নিকট অতীতের কিংবা মুসলমান ও খ্রিস্টানদের সৈন্যসংখ্যা বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন অথবা কোন রাষ্ট্রের রাজস্ব, ব্যয়ভার, সৌভাগ্যশালীদের ধনসম্পদ এবং বিলাসীদের বিলাসব্যসনের বিবরণ দিতে যান, তখনই তাঁরা অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন ও মাত্রাজ্ঞানের সমস্ত সীমা অতিক্রম করেন। পাঠক যদি সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের নথিপত্র অনুসন্ধান করে সৈন্যসংখ্যার পরিমাণ জেনে নিতে পারেন, ধনাঢ্যদের সম্পদ ও সৌভাগ্যের হিসাব করতে পারেন এবং বিলাসীদের বিলাসব্যসনের ব্যয়ভার সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন, তাহলে দেখতে পাবেন তাঁদের বর্ণনার এক-দশমাংশও সেখানে বিদ্যমান নেই। এটা আর কিছু নয়, অস্বাভাবিকের প্রতি মানব-প্রকৃতির সাধারণ আকর্ষণ, জিহ্বার সহজ বিলাসিতা এবং পূর্বাপর বিবেচনাহীন কথা বলবার বদভ্যাস। এর ফলে মানুষ আত্মসমালোচনা করতে ভুলে যায়, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বলে বা লিখে ফেলা বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে আলস্যবোধ করে এবং তজ্জন্য যথার্থ সূত্র বা ক্ষেত্র অনুসন্ধান করতে অপারগ হয়। এ প্রকার ঐতিহাসিকগণ জিহ্বার বল্গা শিথিল করে তাকে মিথ্যার চারণভূমিতে ইতস্তত বিচরণ করতে সুযোগ দেয় এবং আল্লাহ্ নির্দেশিত সত্যকে অবহেলা করে। তাঁরা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করবার জন্য মিথ্যার বেসাতি করে ফিরে।[২৬] এটা অতিশয় দুঃখজনক ব্যাপার।[২৭]

তুব্বা রাজন্যবর্গের দিগ্বিজয়

আরব উপদ্বীপ ও ইয়ামেনের তুব্বা রাজগণ সম্পর্কেও ঐতিহাসিকগণ অনুরূপ ভিত্তিহীন কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। কথিত হয় যে, তুব্বা রাজগণ তাঁদের আবাসভূমি ইয়ামেন থেকে বের হয়ে আফ্রিকার ও মাগরিবের বারবারদের অঞ্চলগুলো জয় করেন। তাঁদের প্রাথমিক শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গের মধ্যে আফ্রিকাশ ইবনে কায়েস ইবনে সাইফী অন্যতম। তিনি হজরত মুসার সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তীকালের। তিনি আফ্রিকিয়ায় অভিযান পরিচালনা করে বারবারদিগকে পরাজিত করেন এবং তিনিই তাদেরকে ঐ নামে অভিহিত করেন। আফ্রিকাশ বারবারদের ভাষা শুনে বলেছিলেন, এটা কী ধরনের

২৬. কোরান ৩১, ৬।

২৭. এর পর ইংরেজি অনুবাদক রোজেনথাল তিনটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছেন, যেগুলো তাঁর পাদটীকার স্বীকৃতি অনুযায়ী মূল গ্রন্থের টীকা হতে গৃহীত হয়েছে। বস্তুত এ বক্তব্য ইবনে খলদুনের নয়। কারণ এতে বনি ইসরাইলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর অলৌকিকত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এটা পূর্ব যুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী।

বর্বরতা! এ উক্তি থেকেই বর্তমানকাল পর্যন্তও তারা বারবার নামে আখ্যায়িত হয়ে রয়েছে। মাগরিব থেকে আফ্রিকাশের প্রত্যাবর্তনের সময় সেখানে হিমিয়ারদের কিছু গোত্রকে তিনি রেখে আসেন। তারা সেখানে বসবাস করতে থাকে এবং কালক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে মিশে যায়। এদেরই মিশ্রিত জনগোষ্ঠীর নাম হল 'মিনহাজা' ও 'কুতামা'। এ সূত্র থেকে তাবারী, জুরজানী[২৮], মাসউদী ইবনুল কালবী, বায়হকী[২৯] প্রমুখ ইতিহাসবিদগণ বলেছেন যে, মিনহাজা ও কুতামা হিমিযার[৩০] গোত্রের অন্তর্গত। কিন্তু বারবার বংশতালিকা বিশারদগণ এ বক্তব্য অস্বীকার করেছেন এবং তাঁদের এ অস্বীকৃতিই যথার্থ।

মাসউদী আরও লিখেছেন যে, হজরত সুলায়মানের সমসাময়িক জুল আযআর নামীয় একজন তুব্বা সম্রাট আফ্রিকাশের পরবর্তী[৩১] সময়ে মাগরিব অধিকার করে তাকে দগ্ধ করেন। এভাবে তৎপুত্র ইয়াসের সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, তিনি মাগরিব জয় করে তথাকার 'বালুকা প্রান্তর'[৩২]-এর নিকটে উপনীত হন এবং বালুকার জন্য অগ্রসর হতে অপারগ হয়ে ফিরে আসেন।

অনুরূপভাবে শেষ তুব্বারাজ আসাদ আবু কারের সম্পর্কেও ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, তিনি পারস্যের কায়ানী সম্রাট ইস্তাসেফের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি মোশেল ও আজরবাইজান অধিকার করেন। তিনি তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে বিপুল পরিমাণে হত্যা করেন। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার তাদের মধ্যে ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাঁর তিনপুত্র পর্যায়ক্রমে পারস্য সাম্রাজ্য, মাওরায়ান্নাহারের তুর্কি গোত্রভুক্ত সগদিয়ানদের এলাকা এবং বাইজেন্টাইন রাজ্যে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। প্রথমজন সমরকন্দ পর্যন্ত অধিকার ও মরু অঞ্চল অতিক্রম করে চীনদেশে গিয়ে উপনীত হন এবং সেখানে দ্বিতীয় ভ্রাতা, যিনি সগদিয়ানদিগকে[৩৩] পরাজিত করে পূর্বাহ্নেই সেখানে পৌঁছেছিলেন, তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেন। অতঃপর দুই ভ্রাতা একত্র হয়ে চীনে অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিসহ স্বদেশে ফিরে আসেন। তাঁরা চীনে[৩৪] কিছু সংখ্যক হিমিয়ার গোত্রকে রেখে আসেন, যারা অদ্যাবধি সেখানে বসবাস করছে। তৃতীয় ভ্রাতা কনস্টান্টিনোপল বিধ্বস্ত করে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য পদানত করেন এবং স্বদেশে ফিরে আসেন।

---

২৮. আলী ইবনে আবদুল আজিজ। মৃত্যুকাল—৩৯২ (১০০২ খ্রি:) হিজরি।

২৯. মূল গ্রন্থে 'আল বেইলী' বিদ্যমান। রোজেনথাল ইংরেজি অনুবাদে 'বায়হকী' লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থের নাম কিতাবুল কামায়েম। তাঁর নাম আলী ইবনে জায়েদ। জীবনকাল ৮৯৯-৫৬৫ (১১০৬-১১৬৯ খ্রি:) হিজরি।

৩০. হিমিয়ার শব্দটি হজরত নুহের পুত্র হামেয় নামানুসারে তার বংশাবলির জন্য গৃহীত হয়েছে বলে কথিত।

৩১. মূল গ্রন্থে 'কাবলা আফ্রিকাশ'—আফ্রিকাশের পূর্বে—আছে। যতদূর সম্ভব মুদ্রণ প্রমাদ।

৩২. 'ওয়াদিউর রমল'—রোজেনথাল একে কিংবদন্তীখ্যাত 'বালুকা নদী' বলে উল্লেখ করেছেন। উক্ত নদীতে জলের মতই বালুকা স্রোত প্রবাতি হয়।

৩৩. মূল গ্রন্থে 'সমরকন্দ' শব্দটি আছে। এটাও মুদ্রণপ্রমাদ ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

৩৪. মূলে চীন দেশ আছে। রোজেনথালের অনুবাদে 'তিব্বতের' নাম উল্লেখিত হয়েছে। সম্ভবত তিনি তাঁর অনুবাদে ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিতে তিব্বতের নাম পেয়ে থাকবেন।

এ সকল বিবরণের সমুদয় অংশই অবাস্তবতায় পরিপূর্ণ। এটা কল্পনাপ্রসূত ভিত্তিহীন ধারণা মাত্র। ইতিহাস অপেক্ষা গল্পকারদের কল্পিত কাহিনীর সাথেই এর সাদৃশ্য সমধিক। কারণ তুব্বার রাজন্যবর্গ আরব উপদ্বীপের অধিবাসী। তাঁদের রাজধানী ছিল ইয়ামেনের সানা শহর। আরব উপদ্বীপ তিন দিক হতেই সমুদ্র বেষ্টিত। এর দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বদিকে ভারত মহাসাগর থেকে বসরা পর্যন্ত বিস্তৃত পারস্য উপসাগর এবং পশ্চিম দিকে ভারত মহাসাগর থেকে মিশরের সুয়েজ পর্যন্ত বিস্তৃত লোহিত সাগর।[৩৫] যে-কোন পাঠক মানচিত্রে তা লক্ষ করতে পারেন। ইয়ামেনের সানা থেকে মাগরিবে যেতে হলে সুয়েজ ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই। লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরের[৩৬] মধ্যকার দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রায় দুইদিন সময় লাগে। এ দীর্ঘ দূরত্ব বিস্তৃত অঞ্চলকে নিজের আয়ত্তাধীনে না এনে কোন দিগ্বিজয়ী সম্রাটের পক্ষে স্বীয় সৈন্যদলসহ তা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। এটা স্বাভাবিক ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। উপরোক্ত অঞ্চলে আমালেকাগণ বাস করত, সিরিয়ায় ছিল কেনানীগণ এবং মিশর ছিল কিবতীদের অধীনে। পরবর্তীকালে আমালেকগণ মিশর অধিকার করে এবং সিরিয়া বনি ইসরাইলের দখলে চলে যায়। যাহোক কোথাও এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, তুব্বা সম্রাটগণ উপরোক্ত জাতিগুলোর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন কিংবা ঐ সকল অঞ্চলের কোন অংশ দখল করেছিলেন।

তদুপরি সমুদ্র উপকূল থেকে মাগরিব অঞ্চলের ব্যবধান বেশ ব্যাপক এবং সৈন্যদলের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ সামগ্রী ও আসবাবপত্রের পরিমাণও বিপুল। সুতরাং সৈন্যদলসহ উপরোক্ত অঞ্চলগুলো অতিক্রম করবার সময় শস্য, পশু ও অন্যান্য সামগ্রী লুণ্ঠন ব্যতীত রসদ সংগ্রহের অন্য পথ নেই। দিগ্বজয়ী যে কোন সৈন্যদল স্বাভাবিকভাবে উক্ত কাজ করে থাকে। যদি ধরে নেয়া যায় যে, তাঁরা সমগ্র রসদ সামগ্রী নিজ দেশ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন; তথাপি উক্ত বিপুল পরিমাণ রসদ পরিবহনের জন্য বিরাট সংখ্যক বাহনের প্রয়োজন। তার সংগ্রহ ও পরিচালনা যেমন ধারণার অতীত, তেমনি গমন পথের সমগ্র অঞ্চল নিজেদের অধীনে আনয়ন ব্যতীত এ বিপুল বাহিনীসহ অগ্রসর হওয়াও প্রায় অসম্ভব। অন্যদিকে এরূপ ধারণা করাও ঠিক নয় যে, উক্ত সৈন্যদল পথিমধ্যের রাজ্যগুলোর সাথে কোন প্রকার বিবাদে প্রবৃত্ত না হয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাঁদের রসদ সামগ্রী সংগ্রহ করেছিল। তৎকালীন রাষ্ট্রীয় অবস্থা অনুসারে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মানতে হয়। সুতরাং ঐ সকল বিবরণ ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

তাঁদের উল্লেখিত 'বালুকা প্রান্তর', যা সৈন্যদলের অগ্রগমনে বাধার সৃষ্টি করেছিল, তার কথাও মাগরিবে কখনও শোনা যায়নি। অথচ সুদূর অতীত থেকে মাগরিবের যত্রতত্র গমনাগমনকারী পরিব্রাজক ও অভিযাত্রীদের সংখ্যা বহু। তাঁরা যুগে যুগে এর পথঘাটের বিবরণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। সুতরাং তাঁদের বর্ণিত প্রান্তর মূলত অবাস্তব মুখরোচক গল্পের উপাদান ছাড়া অন্য কিছু নয়। মানুষ স্বভাবতঃই এগুলো বলতে ভালবাসে।

---

৩৫. মূলে আছে 'বাহরুস্ সুয়েস'—সুয়েজ সাগর।
৩৬. মূলে আছে 'বাহরুস্ শামী—শাম সাগর।

অনুরূপভাবে তাঁদের পূর্বদেশীয় রাজ্য ও তুর্কি অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ বিজয় সম্পর্কেও বলা যায়। সুয়েজ অঞ্চলের পথঘাট অপেক্ষা যদিও উক্ত অঞ্চলগুলোর পথঘাট প্রশস্ততর ও সুগম, তথাপি দূরত্বের পরিমাণ অনেকগুণ অধিক। তদুপরি তাদের পূর্বেই পারস্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ভূমি অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু তাঁরা কোথাও বর্ণনা করেনি যে, সম্রাটগণ পারস্য বা রোমান সাম্রাজ্য দখল করেছিলেন। অবশ্য এঁরা পারস্যবাসীদের সাথে ইরাক সীমান্তে, বাহরাই ও হীরার মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং আরব উপদ্বীপের দজলা ও ফুরাত নদীর মধ্যবর্তী এলাকাগুলোতে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। এটাও সংঘটিত হয়েছে তুব্বা সম্রাট জুল আযআর ও কায়ানীরাজ কায়কাউস এবং আবু কারেব ও ইস্তাসেফের[৩৭] মধ্যে। এর পরেও কায়ানী ও সাসানী সম্রাটদের সাথে সংঘর্ষের বিবরণ বিদ্যমান। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এটা কখনই সম্ভব হয়নি যে, তাঁরা পারস্য সম্রাটদিগকে পরাজিত করে তুর্কি অঞ্চল ও তিব্বত[৩৮] অধিকার করেছিলেন। এ প্রকার ধারণা পোষণ করা বাস্তবের সম্পূর্ণ বিপরীত। অন্যদিকে সৈন্যদলের রসদ সামগ্রী সংগ্রহ ও পরিবহনের বিষয়টি পূর্বেই সবিস্তারে আলোচনা করেছি। অধিকতর দূরত্বের জন্য তা এ প্রসঙ্গে অধিকতর প্রযোজ্য। এজন্যই এ সকল বিবরণ ভিত্তিহীন প্রক্ষেপের সমতুল্য। যদিও মেনে নেয়া যায় যে, এগুলোর বর্ণনাসূত্র যথার্থই শুদ্ধ, তবু বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটা সন্দেহমুক্ত নয়। কাজেই সমগ্র বিষয়টিই তখন সন্দেহযুক্ত হয়ে দাঁড়ায় এবং সত্য থেকে দূরে সরে যায়।

ইবনে ইসহাকও ইয়াসরব[৩৯] এবং আউস ও খাজরাজ গোত্রের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে তুব্বা রাজন্যবর্গ কর্তৃক পূর্বদেশ অভিযানের কথা উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তাতে পূর্বদেশ বলতে ইরাক ও পারস্যকে বোঝান হয়েছে, তিব্বত ও তুর্কি অঞ্চল নয়। কারণ উক্ত অঞ্চলদ্বয়ে অভিযানের অসম্ভাব্যতা পূর্বেই যুক্তি-প্রমাণসহ বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং পাঠকের নিকট অনুরূপ কোন বর্ণনা এসে পৌঁছলে, তা গ্রহণ করবার পূর্বে তিনি যেন গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং বিশুদ্ধ রীতি-নীতির আলোকে তাকে বিশ্লেষণ করে দেখেন। কেবল এভাবেই তিনি সত্যের সন্ধান পেতে পারেন। আমাদিগকে সত্যের অনুসারী করুন।

ইরাম নগরীর কাহিনী

উপরোক্ত কল্পিত বর্ণনাদ্বয় অপেক্ষাও ভিত্তিহীন অলীক বিবরণ কোরানের ভাষ্যকারগণ সূরায়ে 'আল ফজর'[৪০] সম্পর্কে প্রদান করেছেন। তাঁরা কোরানের এ উক্তি—'তুমি কি দেখনি, তোমার প্রভু আদ গোত্রের প্রতি কী ব্যবহার করেছেন—স্তম্ভধারী ইরাম' তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, ইরাম বিরাট বিরাট স্তম্ভধারী সৌধের একটি নগরীর

৩৭. এই নামটি নানাভাবে উল্লেখিত হয়েছে—ইস্তাসেফ, বিস্তাসেফ, গুস্তাসেফ ইত্যাদি।

৩৮. মূলে আছে 'তুব্বত।'

৩৯. মদিনার প্রাচীন নাম ইয়াসরব। হযরত (সঃ) ইয়াসরবে হিজরত করবার পর এর নামকরণ হয় মদিনাতুন্নবী।

৪০. কোরান; ৮৯, ৬-৭।

নাম। তাঁদের মতে আদ ইবনে আউস ইবনে ইরামের দুই পুত্র ছিল, তাদের নাম শাদিদ ও শাদ্দাদ। তাঁরা উভয়েই পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। অতঃপর শাদিদের মৃত্যু হলে শাদ্দাদ সমগ্র রাজ্যের অধিকারী হন। সমসাময়িক সকল রাজন্য তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন। শাদ্দাদ একদিন স্বর্গের সৌন্দর্যের বর্ণনা শুনে নিজেই অনুরূপ একটি স্বর্গ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এডেনের প্রান্তরে তিনশ বছরে এ স্বর্গপুরী নির্মিত হয়। শাদ্দাদ নয়শ বছর জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

এ স্বর্গপুরীর সৌধগুলো মণি-মানিক্য খচিত, এর চতুর্দিকে বৃক্ষাদির দ্বারা সুশোভিত এবং সদা উৎক্ষেপমান ফোয়ারার দ্বারা বিভূষিত ছিল। এভাবে এ স্বর্গপুরীর সৌন্দর্যবিন্যাস সমাপ্ত হলে শাদ্দাদ তাঁর সভাসদবর্গসহ তাতে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক হলেন। কিন্তু তা থেকে একদিন এক রাত্রের দূরত্বে উপনীত হতেই আল্লাহ্‌র আকাশ থেকে তাদের উপর বজ্রপাত করলেন এবং তারা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হল।

এ কাহিনী তাবারী সালাবী,[৪১] জমখমরী[৪২] ও অন্যান্য কোরান ব্যাখ্যাতাগণ তাবেয়ী আব্দুল্লাহ ইবনে কেলাবা থেকে বর্ণনা করেছেন। উক্ত তাবেয়ীর একটি উট হারিয়ে গেলে তার অনুসন্ধানে বের হয়ে উক্ত স্বর্গপুরীতে গিয়ে উপস্থিত হন এবং তথা থেকে প্রচুর মণি-মানিক্য বহন করে আনেন। আমীর মাবিয়ার নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি তাঁকে ডাকিয়ে আনেন এবং তাঁর নিকট সমুদয় ঘটনা জানতে পারেন। মাবিয়া কাব-আল আহবারকে[৪৩] এ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, এটাই স্তম্ভধারী ইরাম নগরী! তিনি আরও বলেন যে, আমীর মাবিয়ার সমসাময়িক কোন মুসলমান, যার গাত্রবর্ণ ধূসর লাল, দেখতে খর্বকায় এবং যার ভ্রূ ও স্কন্ধে তিল বিদ্যমান—উক্ত ব্যক্তি তাঁর উট অনুসন্ধান করতে গিয়ে সেখানে প্রবেশ করবে। অতঃপর মুখ ফিরিয়ে আবদুল্লাহ্ ইবনে কেলাবাকে[৪৪] দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন—'আল্লাহ্‌র কসম, এ সেই ব্যক্তি।'

অথচ এ পর্যন্ত উক্ত শহরের কোন চিহ্ন পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায়নি। যেখানে এ নগরী নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়, সেই এডেন প্রান্তর ইয়ামেনের মধ্যভাগে অবস্থিত। তাতে আবহমানকাল ধরে জনবসতি চলে আসছে। পরিব্রাজকগণ তার সমস্ত পথঘাট বিচরণ করে ফিরেছেন; কিন্তু উক্ত নগরীর কোন সংবাদ কেউ দেননি। প্রত্নবিশারদগণও কোথাও এর উল্লেখ করেননি, সাধারণ মানুষের মুখেও এর কথা শোনা যায় না। বর্ণনাকারীগণ যদি বলতেন যে, উক্ত নামের একটি শহরের অস্তিত্ব এক সময়ে বিদ্যমান ছিল, পরে কালক্রমে অন্যান্য ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীর মতই তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তা হলেও মানাত। কিন্তু তাঁরা সুস্পষ্টভাবে এ কথাই বলছেন যে, উক্ত নগরীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। অনেকে দামেশ্‌ক নগরীকে ইরাম বলে মনে করেন। কারণ

---

৪১. আহমদ ইবনে মুহম্মদ : মৃত্যু ৪২৭ (১০৩৫ খ্রি:) হি:।
৪২. মুহম্মদ ইবনে উমর : ৪৬৭-৫৩৮ (১০৭৫-১১৪৪ খ্রি:) হি:।
৪৩. ইবনে মতি আল-হুমায়রী : মৃত্যু ৩২-৩৪ (৬৫৪-৬৫৬ খ্রি:) হি:।
৪৪. আবদুল্লাহ্ ইবনে জায়েদ ইবনে আমর আল জুরামী, তাঁর ডাক নাম ছিল আবু কেলাবা। তিনি তাবেয়ী অর্থাৎ সাহাবীদিগকে দেখেছেন মাত্র, হজরত মুহম্মদ (সঃ)-কে দেখেননি।

দামেশ্‌ক এক সময়ে আদ জাতির দখলে ছিল। আবার অনেকে বর্ণনায় রহস্যজাল বিস্তার করে বলেন যে, উক্ত নগরী চর্মচক্ষে দৃশ্যমান নয়। একমাত্র যোগসাধনাকারী ও যাদুকরগণই তার সৌন্দর্য অবলোকন করতে পারেন। এ সকল ধারণার সমুদয় অংশই কল্পনার মায়াজাল মাত্র।

কোরানের ভাষ্যকারগণকে যে বিষয়টি উক্ত কাহিনী বর্ণনায় উৎসাহিত করেছে, তাহল আরবি ব্যাকরণের কলাকৌশল। 'জাতেল ইমাদ' (স্তম্ভধারী) শব্দটিকে ইরামের বিশেষণ ধরাতেই এ প্রকার বিপত্তি ঘটেছে। তাঁরা ইমাদের অর্থ করেছেন স্তম্ভ। এর ফলে স্তম্ভধারী সৌধের কল্পনা মূর্তিমান হয়ে উঠেছে। হযরত ইবনে জুবায়ের[৪৫] থেকে 'আদ'কে ইরামের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে কোরানের যে পাঠ প্রচলিত আছে, তা তাঁদেরকে আরও বেশি অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ফলে তাঁরা ইরাম নগরীর আদ জাতি সম্পর্কে এ সকল কাহিনীর অনুসন্ধান করেছেন। বস্তুত এ সকল কাহিনী অবাস্তব, ভিত্তিহীন এবং হাস্যরস উৎপাদনকারী স্বকপোলকল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

প্রকৃতপক্ষে ইমাদ অর্থ তাঁবুর খুঁটি, স্তম্ভ নয়। যদি এর অর্থ স্তম্ভও ধরা হয়, তথাপি এর দ্বারা বিশেষ কোন অট্টালিকা বা নগরীর কল্পনা করা উচিত হয়। বরং এর অর্থ হবে সাধারণভাবে বহু সৌধ বা স্তম্ভের নির্মাণকারী। শাদ্দাদ যেহেতু মহা প্রতাপশালী সম্রাট ছিলেন, সেই কারণেই তিনি ও আদবংশীয় অন্যান্য সম্রাট বহু অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। আর যদি ইবনে জুবায়েরের পাঠ অনুসারে আদকে ইরামের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে অর্থ করা হয়, তাহলে ইরামের আদ জাতি বোঝাবে। যেমন বলা হয় কেনানার কোরায়েশ, মুজারের ইলিয়াস ও নেজারের রাবিয়া। এর দ্বারা বিশেষ গোত্রভুক্তির কথা বোঝানো হয়। অথচ এ সহজ অর্থ ত্যাগ করে এ প্রকার ভিত্তিহীন অবাস্তব কাহিনী চয়ন করায় যে পরিমাণ অনুসন্ধিৎসা ব্যয় হয়েছে, তা একান্তই অর্থহীন। এটা শুধু মিথ্যার কলুষ-কালিমায় আল্লাহ্‌র কোরানকে বিকৃত করেছে মাত্র।

বরমেকীদের পতন

ঐতিহাসিকদের এ প্রকার ভিত্তিহীন কাহিনী বর্ণনার আরও একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল বরমেকীদের উপর আব্বাসী সম্রাট হারুনুর রশীদের বিরাগের কারণস্বরূপ জাফর ইবনে ইয়াহিয়া ও আব্বাসার প্রেম কাহিনী রচনা। আব্বাসা হারুনুর রশিদের ভগ্নি এবং জাফর ছিলেন তাঁর প্রধান অমাত্য। তাঁদের মতে সম্রাট ইতিপূর্বে জাফরের সাথে তদীয় ভগ্নির বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি দিলেও দৈহিক মিলনের কথা বারণ করে দিয়েছেন। সম্রাটের ইচ্ছা ছিল, তাঁরা উভয়েই যেন তাঁর মদ্যপানের আসরে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন। এভাবে সুযোগ দেয়ার ফলে আব্বাসা জাফরের প্রতি অতিশয় আসক্তা হয়ে পড়লেন। এবং তাঁর সাথে গোপনে মিলিত হওয়ার জন্য কলাকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করলেন।[৪৬] যথা সময়ে সেই সুযোগ দেখা দিল এবং ঐতিহাসিকদের মতে

---

৪৫. আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়ের, বিখ্যাত সাহাবী। হজরত আয়েশার ভগ্নি হজরত আসমার পুত্র।

৪৬. আব্বসার এই কলাকৌশলের দীর্ঘ বর্ণনা মাসউদী তাঁর 'মারুজুজ্ জাহাব' গ্রন্থে প্রদান করেছেন। এই বিষয়ের উপর আরবি ভাষায়—'আব্বাসা' নামে একটি উপন্যাস বিদ্যমান।

আব্বাসা সুরাসক্ত অবস্থায় জাফরের অঙ্কশায়িনী হলেন। এর ফলে আব্বাসা নাকি গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং সম্রাট এ সংবাদ শুনতে পেয়ে জাফর তথা বরমেকীদের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেন।

একান্ত পরিতাপের বিষয় এ যে, এ কাহিনী রচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ সম্রাট ভগিনী আব্বাসের ধর্মবোধ, বংশমর্যাদা ও চরিত্র-গৌরবের প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃক্‌পাত করেননি। আব্বাসা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের প্রদৌহিত্রী। তাঁদের উভয়ের মাত্র চার পুরুষের ব্যবধান এবং তাঁরা সকলেই আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের পরে ধর্মের নেতা ও সমাজের পুরোধা ছিলেন। আব্বাসের পিতা হলেন মুহম্মদ আল মাহদী, তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ্ আবু জাফর আল-মনসুর, তাঁর পিতা মুহম্মদ আস্‌সাজ্জাদ, তাঁর পিতার সম্রাটদের জনক আলী, তাঁর পিতা কোরানের ব্যাখ্যাতা[৪৭] আব্দুল্লাহ্ এবং তাঁর পিতা হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর পিতৃব্য হজরত আব্বাস (রাঃ)। আব্বাসা সম্রাটের কন্যা ও সম্রাটের ভগ্নি এবং তাঁর ভাগ্যে যুগপৎ রাষ্ট্রীয় মহিমা ও নবুয়তের প্রতিনিধিত্বের মর্যাদার সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ রসূলের সংসর্গ লাভের সৌভাগ্যে গৌরবান্বিত এবং তাঁর পিতৃব্য হওয়ার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। আব্বাসা জন্মগতভাবে ইসলামের এমন সকল মনীষীর সাথে সম্পর্কযুক্ত, যাঁরা সকলেই নিষ্ঠাবান ধর্ম প্রবক্তা, স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের জ্যোতি ও স্বর্গীয় দূতগণের অবতরণস্থল হিসাবে খ্যাতিমান। তাঁর জীবৎকালে বেদুইন জীবনের কঠোরতা ও ধর্মীয় কৃচ্ছ্রসাধনার যুগ অন্তর্হিত হয়নি; তখনও বিলাসব্যসন ও চরিত্রহীনতার আচরণ এমন ব্যাপক হয়ে উঠেনি।

সুতরাং এ আব্বাসা যদি সতীত্ব ও চরিত্র হারিয়ে বসেন, তাহলে আর কার মধ্যে পাওয়া যাবে? তাঁর গৃহ থেকেই যদি পবিত্রতা ও শালীনতা অন্তর্হিত হয়, তবে তা আর কোথায় প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে? বস্তুত জাফর ইবনে ইয়াহিয়ার সাথে তাঁর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন কী করে সম্ভব হতে পারে! কী করে তিনি আরবীয় বংশমর্যাকে একজন অনারব মুক্ত ক্রীতদাসের পদতলে ন্যস্ত করতে পারেন। একজনের পূর্বপুরুষ রসূলের পিতৃব্য ও কোরায়েশ বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যজনের পিতৃপুরুষ অনারব পারস্যবাসী! আব্বাসীয়রাই বরমেকীদিগকে ক্রীতদাসের কলংক থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন করেছিলেন। এমতাবস্থায় স্বীয় উচ্চ মর্যাদা ও পিতৃপুরুষগণের গৌরব ভুলে গিয়ে একজন অনারব মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের সাথে নিজ ভগ্নির বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন সম্রাট হারুনুর রশীদের পক্ষেই বা কি করে সম্ভব হয়! যদি কোন চিন্তাশীল পাঠক এ ব্যাপারটিকে যথাযথ বিবেচনা করেন এবং আব্বাসাকে একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সম্রাটের সাধারণ আত্মসচেতন ভগ্নি বলে মনে করেন, তাহলে তাঁর বিবেক এ কথা কিছুতেই সমর্থন করবে না যে, আব্বাসা নিজ বংশের দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত একজন ক্রীতদাসের সাথে এ প্রকার গর্হিত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন। বরং নিজের যুক্তিতেই এ ঘটনা মিথ্যা অপবাদ বলে প্রত্যাখ্যান করবেন। পরিতাপের বিষয়, কোথায় আব্বাসা ও হারুনুর রশীদের মর্যাদা আর কোথায় সাধারণ মানুষের অবস্থা!

---

৪৭. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসা; তিনিই কোরানের ব্যাখ্যা অর্থাৎ 'তফসির' রচনার পথিকৃৎ।

প্রকৃতপক্ষে বরমেকীদের পতনের যথার্থ কারণ সাম্রাজ্যের ব্যাপারে তাঁদের অযথা হস্তক্ষেপের মধ্যে নিহিত ছিল। তাঁরা যেভাবে সাম্রাজ্যের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করে রাজকোষকে নিজেদের আওতাধীন করে ফেলেছিলেন, তাতে স্বয়ং সম্রাট হারুনুর রশীদকেও সামান্য অর্থের জন্য তাঁদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হত। বস্তুত তারা রাষ্ট্রের সর্ব বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করে রাষ্ট্র পরিচালনায় সম্রাটের অংশীদার হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত সম্রাটের পক্ষে কোন কাজ করা সম্ভব ছিল না। এভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাঁদের কুক্ষিগত হয়ে পড়লে তাঁদের খ্যাতি দূর-দূরান্তে বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ ও মর্যাদা স্বভাবতঃই তাঁদের কবলে পতিত হয়। তাঁরা এ সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে মন্ত্রিত্ব, সচিবত্ব, সেনাপৈত্য ও দ্বারবানী—এক কথায় অসি ও মসী সংক্রান্ত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে বসেছিলেন। এতে অন্য কারও কোন কিছু বলবার বা করবার অবকাশ ছিল না। বলা হয় যে, একই সময়ে সম্রাটের প্রাসাদে ইয়াহিয়া ইবনে খালিদ বরমেকীর বংশধরদের মধ্য থেকে পঁচিশ জন অমাত্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এতে অন্যান্য অমাত্যবর্গ ও সভাসদদের প্রতাপ খর্ব হয়ে পড়েছিল এবং তাঁরা বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

এ সর্বগ্রাসী প্রভাবের অন্যতম কারণ, জাফরের পিতা ইয়াহিয়া একাধারে হারুনের শিক্ষক ও অভিভাবক ছিলেন। বলতে গেলে তাঁরই স্নেহের ছায়ায় রশীদ লালিত হয়ে সম্রাট হিসাবে অভিষিক্ত হন। এর ফলেই ইয়াহিয়া তাঁর উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই হারুন তাঁকে 'পিতা' বলে সম্বোধন করতেন এবং বরমেকী পরিবারকে তাঁর সাম্রাজ্য পরিচালনায় অবাধ অধিকার দান করেছিলেন। এর ফল এ দাঁড়াল যে, তাঁদের ক্ষমতা ও মর্যাদা অতিদ্রুত বেড়ে গেল এবং সকলের দৃষ্টি তাঁদের দিকে আকৃষ্ট হল। উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সকলেই তাঁদেরকে মান্য করত, বদান্যতার জন্য সর্বশ্রেণীর লোক তাঁদের দ্বারস্থ হত এবং দূর-দূরান্ত থেকে রাজন্যবর্গের উপঢৌকন ও অমাত্যবর্গের উপহার তাদের সমীপে এসে পৌঁছত। রাজকোষের অর্থ যথেচ্ছা ব্যবহারের ফলে তাঁদের ধনভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠত এবং তাঁরা নিজেদের আত্মীয়বর্গ ও শিয়া[৪৮] সম্প্রদায়ের লোকজনের মধ্যে অবাধ ধন বিতরণ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা সম্ভ্রান্ত বংশীয় নিঃস্বদের জন্য জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করে দিলেন এবং বন্দীদিগকে যথেচ্ছা মুক্তি দিতে লাগলেন। এর ফলস্বরূপ তাঁদের উদ্দেশ্যে এমন প্রশংসা বাণী উচ্চারিত হতে আরম্ভ করল, যা স্বয়ং সম্রাটের জন্যও উচ্চারিত হয়নি। বস্তুত বরমেকীগণ তাঁদের উদ্দেশ্যে আগত সকল প্রার্থীকেই দান-ধ্যানের দ্বারা বশীভূত করে নিলেন এবং এভাবে গ্রামে-গ্রামান্তরে, নগরে-বন্দরে রাজ্যের সর্বত্র তাঁদের প্রভাব অপ্রতিহত হয়ে উঠল।

অনতিবিলম্বে এর প্রতিক্রিয়াও দেখা দিল। সম্রাটের অন্তরঙ্গ সভাসদগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন; বিচক্ষণ বুদ্ধিমানগণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন এবং উচ্চপদস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট হয়ে পড়লেন। হিংসা বিদ্বেষ ও কুৎসা রটনা আপন মূর্তি পরিগ্রহ করল

৪৮. শিয়া বলতে এখানে হজরত আলী (রাঃ)-র বংশধরদেরকে বোঝানো হয়েছে। বস্তুত তাঁদের সাথে আব্বাসীয়দের সম্পর্ক ভাল ছিল না।

এবং ষড়যন্ত্রের বৃশ্চিক রাজ্যের কোমল শয্যাগুলোতে তাদের আসন সংস্থান করে নিল। এমন কি জাফরের মাতুল গোত্র বনি-কাহতাবা পর্যন্ত এ ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান অংশীদার হয়ে উঠল। আত্মীয়তার বন্ধন ও রক্তের সম্পর্ক কোন কিছুই তাঁদের অন্তর্নিহিত বিদ্বেষ প্রকাশে বাধার সৃষ্টি করতে পারল না। এর ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্বেষের কারণগুলো তাদের প্ররোচনায় বৃহৎ হয়ে উঠল এবং বৃহৎগুলো মারাত্মক শত্রুতায় পরিণত হল। উদাহরণ স্বরূপ ইয়াহিয়া ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালেবের ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। ইনি 'নফসে যাকিয়া' (পবিত্রাত্মা) মুহম্মদ আল মাহদীর ভ্রাতা এবং ইনিই সম্রাট মনসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। অথচ এ ইয়াহিয়াকে পত্রযোগে সম্রাট হারুনুর রশীদের নির্ভয় দানের ফলে প্রাগুক্ত জাফরের ভ্রাতা ফজল ইবনে ইয়াহিয়া দায়লম অঞ্চল থেকে রাজধানীতে নিয়ে আসেন। তাবারীর বর্ণনা মতে ফজল তাঁর জন্য হাজার হাজার দিরহাম ব্যয় করেছিলেন।

যাহোক, সম্রাট হারুন উক্ত ইয়াহিয়াকে[৪৯] জাফরের হাতে অর্পণ করে নিজ গৃহে অন্তরীণ অবস্থায় আবদ্ধ রাখতে আদেশ দেন। জাফর তাঁকে নিজ গৃহে কিছুদিন আবদ্ধ রাখবার পর নবী বংশীয়দের রক্তের মর্যাদার অজুহাতে সম্রাটের আদেশ ছাড়াই গোপনে মুক্ত করে দেন। এর ফলে সম্রাটের বিরোধিতা ও রাষ্ট্রের কাজে অযথা হস্তক্ষেপের এ বিষয়টি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে। সম্রাট জাফরকে ডেকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এ অভিযোগ স্বীকার করে ফেললেন। এর উত্তরে প্রকাশ্যে সম্রাট যদিও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু তাঁর অন্তরের গভীরে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল। এভাবে জাফর নিজের জন্য ও নিজ পরিবারবর্গের জন্য নিজ কৃতকর্মের দ্বারা ধ্বংসের পথ রচনা করেছিলেন। অবশেষে সত্যিই একদিন তাঁদের পতন অনিবার্য হয়ে উঠল, তাঁদের মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়ল এবং তাঁদের অস্তিত্ব ও গৃহাদি ধূলিস্মাৎ হয়ে গেল। তাঁদের গৌরবগাঁথা অতীতের কাহিনী ও অনাগত ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টান্তস্থল হয়ে দাঁড়াল।

যে কোন চিন্তাশীল পাঠক, যিনি বরমেকীদের কার্যকলাপ বিবেচনা করবেন এবং তার সাথে তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি বিচার করে দেখবেন, তাঁর নিকট তাদের পতনের কারণগুলো অতি সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হবে। পাঠক! সম্রাট হারুন, তাঁর পিতামহর পিতৃব্য দাউদ ইবনে আলীর সাথে বরমেকীদের পতন সম্পর্কে যে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন যা ইবনে আবাদ রাব্বিহির[৫০] বর্ণনায় প্রকাশ পেয়েছে, তৎপ্রতি লক্ষ করুন এবং এর সাথে কিতাবুল ইক্দের কবিদের অধ্যায়ে বর্ণিত হারুন ও ফজল ইবনে ইয়াহিয়ার সাথে আসমাইর[৫১] খোশগল্পের কথা মিলিয়ে দেখুন; তাহলে অতি সহজেই বুঝতে পারবেন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অন্যায় হস্তক্ষেপের ফলে সম্রাটের মনে যে বিদ্বেষ জমে উঠেছিল, তাই তাঁদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এভাবে

৪৯. কারবালার ঘটনাকে সম্মুখে রেখেই আব্বাসীয়রা ক্ষমতা দখল করছিলেন; কিন্তু উক্ত ঘটনার নায়ক হোসেনের বংশধরদের প্রতি তাঁরা সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। ইয়াহিয়ার দৃষ্টান্ত তার সামান্য একটি অংশ মাত্র।

৫০. আহমদ ইবনে মুহম্মদ। জীবনকাল ২৪৬-৩২৮ (৮৬৩-৯৪০ খ্রি:) হিজরি।

৫১. আবু সাইদ আবদুল মালেক ইবনে কুরায়েব; ১২৩-২১১ (৭৪৩-৮৩১ খ্রি:) হি:।

সম্রাটের অন্তরঙ্গ সভাসদগণ তাঁদের বিরুদ্ধে সম্রাটের অন্তরে লুক্কায়িত বিদ্বেষবহ্নি যাতে তীব্রভাবে জ্বলে উঠে, তজ্জন্য গায়কদের মুখে নিম্নের কাব্যাংশটি[৫২] তুলে দিয়েছিল।

হায়, হিন্দা যদি নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করত
এবং আমাকে এ মর্মবেদনা থেকে মুক্তি দিত!
অবশ্য একবার আত্মনির্ভরশীল হবার সুযোগ ঘটেছিল;
সেইতো দুর্বল, যে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে না।

তাঁদের ইচ্ছা ছিল, সম্রাট এটা শুনে আত্মসচেতন হয়ে উঠবেন। ঘটলও তাই। সম্রাট এটা শুনামত্র বলে উঠলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমিই সেই দুর্বল ব্যক্তি। এভাবে তাঁরা তাঁর অন্তর্নিহিত বিদ্বেষকে জাগিয়ে তুলল এবং প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে বরমেকীদের ধ্বংসকে বাস্তবায়িত করল। আল্লাহ্ আমাদিগকে মানুষের ষড়যন্ত্র ও তাদের দুরবস্থা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

ঐতিহাসিকগণ সম্রাট হারুনের সুরাসক্তি ও অন্তরঙ্গদের সাথে সুরাপানের আসর বসাবার যে অবমাননার কাহিনী বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, তাঁর সম্পর্কে অনুরূপ দুর্মতির কোন জ্ঞানই আমাদের নেই। খেলাফতের উত্তরসূরি, ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতিভূ সম্রাট হারুনের পক্ষে এটা কি করেই বা সম্ভব! তিনি সর্বদা জ্ঞানী-গুণী ও অধ্যাত্মবিদ মনীষীদের সাহচর্যে থাকতেন। ফজি ইবনে আয়াজ,[৫৩] ইবনে সামাক,[৫৪] উমরীর[৫৫] ন্যায় গুণী ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করতেন এবং সুফীয়ান সউরীর[৫৬] ন্যায় মনীষীর সাথে তাঁর পত্রালাপ চলত। তাঁদের ধর্মকথা শুনে তিনি ক্রন্দন করতেন এবং হজের সময় কাবা প্রদক্ষিণরত অবস্থায় এ প্রকার দুর্মতি থেকে বেঁচে থাকতে প্রার্থনা করতেন। তাঁর উপাসনার প্রতি নিষ্ঠা ও নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায়ের আগ্রহ, বিশেষ করে ফজরের নামাজ আদায়ে তাঁর দীর্ঘকালীন সময়ানুবর্তিতা এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। তাবারী ও অন্যান্য ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে তিনি প্রতিদিন একশ রাকাত নফল নামাজ পড়তেন এবং এক বছর হজব্রত পালন ও অন্য বছর ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। তিনি তাঁর বয়স্য রহস্যপ্রিয় ইবনে আবি মরিয়মকে কোরান ও নামাজ সম্পর্কে মাত্রাজ্ঞানহীন উক্তির জন্য ভর্ৎসনা করেছিলেন। সম্রাট একদিন নামাজে কোরানের এ আয়াতটি পাঠ করছিলেন—"আমার কি হল যে, আমি তাঁর উপাসনা করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।"[৫৭] তাঁর পিছনে দণ্ডায়মান ইবনে আবি মরিয়ম এটা শোনা মাত্রই বলে উঠল, "আল্লাহ্‌র কসম, জানি না কেন?" সম্রাট

---

৫২. এই কাব্যাংশটির রচয়িতা উমর ইবনে আবি রাবিয়া, ইনি ৭০০ খ্রি: পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

৫৩. ১৮৭ (৮০৩ খ্রি:) হিজরিতে মৃত্যু বরণ করেন।

৫৪. মুহম্মদ ইবনে সাবিহ, ১৮৩ (৭৯৯/৮০০ খ্রি:) হিজরিতে মৃত্যু ঘটে।

৫৫. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আজিজ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব, ইনি ১৮৪ (৮০০/৮০১ খ্রি:) হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

৫৬. সুফিয়ান নামে দুজন বিখ্যাত ছিলেন, একজন সউরী, অন্যজন ইবনে উয়ায়না, এখানে সম্ভবত শেষের জনের কথা বলা হয়েছে। ইনি ১০৭-১৯৮ (৭২৫/৭২৬-৮১৪ খ্রি:) হিজরি পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

৫৭. কোরান; ৩৬, ২২ : ১।

এটা শুনে হাসি সংবরণ করতে পারলেন না সত্য, কিন্তু পর মুহূর্তেই ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "হে ইবনে আবি মরিয়ম, নামাজের মধ্যেও ঠাট্টা করতে আরম্ভ করলে? সাবধান, রঙ্গরস আর যা নিয়েই কর, কোরান ও নামাজ সম্পর্কে তোমার জিহ্বাকে সংযত রেখ।"

তদুপরি সম্রাট হারুন জ্ঞান ও ধর্মচর্চায় বিশিষ্ট সারল্যের অধিকারী ছিলেন। কারণ তাঁর সময় পূর্বসূরি পুণ্যাত্মাদের প্রভাব নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তিনি তাঁর পিতামহ আবু জাফর আল মনসুরের মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুব বেশি নয়। তিনি হারুনকে বালক অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে ও পরে মনসুরের ধর্ম সম্পর্কীয় জ্ঞান ছিল দৃষ্টান্তমূলক। তিনিই 'মুয়াত্তা'[৫৮] গ্রন্থ সংকলনের জন্য ইমাম মালিককে বলেছিলেন, "হে আবু আব্দুল্লাহ, বর্তমানে পৃথিবীতে আমার ও তোমার ন্যায় জ্ঞানী আর কেউ নেই। আমাকে সাম্রাজ্যের কর্তব্য পালনে ব্যাপৃত থাকতে হচ্ছে; সুতরাং মানুষের যাতে উপকারে আসে তেমনই করে তুমি একটি গ্রন্থ সংকলন কর। এতে ইবনে আব্বাসের নম্রতা ও ইবনে উমরের[৫৯] কঠোরতা, উভয়কেই পরিহার করে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মানুষের কাছে এটা উপস্থিত কর।" ইমাম মালিক এ উক্তির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেছিলেন, বস্তুত আবু জাফর এর মাধ্যমে তৎকালে আমাকে গ্রন্থ সংকলনের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন।

সম্রাট হারুনের পিতা আল মাহদী তাঁর পিতা আল মনসুরকে বয়তুল মাল থেকে নিজ পরিবারবর্গের জন্য নতুন পোশাকাদির ব্যয় গ্রহণ করতে ইতস্তত করতে দেখেছেন। তিনি একদিন তাঁর পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলেন, তিনি পরিবারবর্গের পুরাতন কাপড় জোড়াতালি দিয়ে পরিধানের উপযোগী করবার ব্যাপারে দরজীদের সাথে পরামর্শ করছেন। এতে মাহদী বিরক্তিবোধ করে বললেন, "হে আমীরুল মোমেনীন,[৬০] এ বছর পরিবারের পোশাকিদের দায়িত্ব আমি নিজে গ্রহণ করলাম। আমার প্রাপ্য ভাতা থেকে তার বন্দোবস্ত করব।" মনসুর তাঁর পুত্রকে এ দায়িত্ব পালনে বাধা দেননি। কিন্তু কোন প্রকারেই বয়তুল মাল থেকে অর্থব্যয়ের বিষয়টি সমর্থন করেননি। সম্রাট হারুন এমনই এক পুণ্যাত্মার দৌহিত্র।

এ যদি অবস্থা হয়, তাহলে হারুনের পক্ষে তাঁর পিতা ও পিতামহের নৈকট্য ও ধর্মজ্ঞানের প্রভাব বিসর্জন দিয়ে কী করে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুসারে সুরাসক্তি ও তজ্জন্য প্রকাশ্যে আসর বসানো সম্ভব! অথচ আমরা জানতে পারি যে, প্রাক্-ইসলামী বেদুইন জীবনেও সম্ভ্রান্ত লোকদের সুরাসক্তি দূষণীয় ব্যাপর বলে বিবেচিত হত। অধিকন্তু যে আঙুরের রস চোলাই করে মদ্য প্রস্তুত হয়ে থাকে, তাও তাদের অঞ্চলে জন্মায় না। এ কারণে আরবের অধিকাংশ লোক মদ্যপানকে ঘৃণার চক্ষে দেখত। বস্তুত সম্রাট হারুন ও তাঁর পিতৃপুরুষগণ ধর্মনিষ্ঠায় ও শালীনতায় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক

---

৫৮. হাদিসের সংকলন।

৫৯. উভয়ের নামই আব্দুল্লাহ্। প্রথম জনের জন্য ৪৭ নং টীকা দ্র: এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর, হজরত উমরের পুত্র, তিনি ৭৩/৭৪ (৬৯২/৯৩ অথবা ৬৯৩/৯৪ খ্রি:) হিজরিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৬০. হে বিশ্বাসীদের নেতা।

সকল ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা সদজ্ঞান ও সৎস্বভাব অর্জনে বেদুইন জীবনের সারল্যকে অনুসরণ করতেন।

তাবরী ও মাসউদী সম্রাট হারুনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক জিব্রাইল ইবনে বখতেশোর[৬১] সাথে জড়িত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। একদিন সম্রাট হারুনের দস্তরখানে অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে মাছও পরিবেশিত হয়েছিল। বখতেশো সম্রাটকে তা খেতে বারণ করলেন এবং খানসামাকে উক্ত মাছ তাঁর কক্ষে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। সম্রাটের নিকট চিকিৎসকের এ ব্যবহার কেমন রহস্যজনক মনে হল। তিনি গোপনে তাঁর এক দাসকে এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে আদেশ দিলেন। সে যথাস্থানে গিয়ে দেখতে পেল যে, বখতেশো উক্ত মাছ আহার করছেন।

চিকিৎসক বখতেশোর নিকট ও সম্রাটের এ অনুসন্ধান অজ্ঞাত রইল না। তিনি তাঁর ত্রুটি সংশোধনের জন্য তিন টুকরো মাছ সংগ্রহ করে তার এক টুকরোর সাথে ঔষধযুক্ত মাংস, মসলাযুক্ত সব্জী ও স্নিগ্ধ মিষ্টান্ন মিশ্রিত করলেন। দ্বিতীয় টুকরোটির উপর কিঞ্চিৎ বরফের জল ঢেলে দিলেন এবং তৃতীয়টির সাথে মিশালেন বিশুদ্ধ মদ্য। এভাবে তিন টুকরো মাছ তিনটি পাত্রে স্থাপন করে খানসামাকে বললেন, প্রথম ও দ্বিতীয়টি সম্রাটের জন্য, তাতে মাছের সাথে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত থাকুক বা না থাকুক এবং তৃতীয়টি কেবল মাত্র আমার জন্য। সম্রাট নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে বখতেশোকে ডেকে পাঠালে খানসামা তাঁর সাথে উক্ত মাছের তিনটি পাত্র উপস্থিত করল। তখন দেখা গেল যে, মদ্য মিশ্রিত মাছটি ছিন্নভিন্ন হয়ে তরলাকৃতি ধারণ করেছে এবং অন্য দুটিও বিকৃত হয়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এতে বখতেশো এ কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সম্রাট যে খাদ্য গ্রহণ করতে উৎসাহ বোধ করছেন, তা অতি অল্প সময়ে নষ্ট হয়ে যায়।

যাহোক, এ ঘটনা থেকে এ একটি কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মদ্যপান সম্পর্কে সম্রাটের অনাসক্তি তাঁর অন্তরঙ্গ সহচর ও পরিচারকদের নিকট সুপরিচিত ছিল। এ ঘটনাও তো প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, সম্রাট হারুন অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য কবি আবু নাওয়াসকে কারারুদ্ধ করে রাখেন এবং অনুতপ্ত হয়ে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তাকে মুক্তি দেননি। পাঠকগণ এ সকল ঘটনা বিবেচনা করতে পারেন।

অবশ্য সম্রাট হারুন ইরাকবাসীদের[৬২] মতানুসারে আঙুরের রস পান করতেন। এ বিষয়ে তাঁদের বিধান সর্বজন বিদিত। কিন্তু এ জন্য তাঁর প্রতি মদ্যপানের দোষারোপ করা ঠিক নয় এবং এ উদ্দেশ্যে মিথ্যা কাহিনী বর্ণনাও অনুচিত। কারণ যে মদ্যপান সকলের নিকট মহাপাপ বলে বিবেচিত হয়, সম্রাট হারুনের ন্যায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি কী করে সেই মহাপাপের অনুষ্ঠান করতে পারেন! বস্তুত তাঁর বংশাবলি তথা জাতির সকলেই বেদুইন জীবনের সারল্য ও ধর্মনিষ্ঠার ফলে তাঁদের আহার-বিহার ও ভূষণ-ব্যসনে অমিতাচার ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রাচুর্য লাভের পরও

---

৬১. জিব্রাইল, অত্র রাজত্বের প্রাথমিক বিখ্যাত চিকিৎসকদের অন্যতম। মৃত্যু ২১৩ (৮২৮/২৯ খ্রি:) হিজরি।

৬২. ইমাম আবু হানিফার মতে আঙ্গুরের রস অর্থাৎ 'নাবিজ' পান করায় কোন দোষ নেই। তিনি ইরাকবাসী ছিলেন।

এর পরিবর্তন ঘটেনি। সুতরাং তাঁদের পক্ষে শালীনতা থেকে অশালীনতা ও সিদ্ধ থেকে নিষিদ্ধের প্রতি আগ্রহী হওয়ার বিষয়টি সর্বদাই বিবেচনাযোগ্য।

তাবারী, মাসউদী ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, উমাইয়া ও আব্বাসী যুগের প্রাথমিক সম্রাটদের সকলেই তাঁদের অশ্বারোহণের সময় সামান্য পরিমাণ রৌপ্যখচিত কোমরবন্দ, তরবারী, লাগাম ও জিনপোষ ব্যবহার করতেন। সম্রাট হারুনের পরবর্তী অষ্টম আব্বাসী সম্রাট মুতাজ ইবনে মুতাওয়াক্কিল সর্বপ্রথম আসবাবপত্রে স্বর্ণ ব্যবহারের প্রবর্তন করেন। বস্তুত যুগের ধারা অনুসারে তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদেও সেই সারল্য বিদ্যমান ছিল। এমতাবস্থায় আপনি নিজেই অনুমান করতে পারেন তাঁদের আহার্য-পানীয়ের অবস্থা কী ছিল! আপনি যদি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রাথমিক সারল্য ও বেদুইন চরিত্রের কথা স্মরণ রাখেন, তাহলে উপরোক্ত আলোচনা থেকে সমগ্র বিষয়টিই আপনার নিকট পরিষ্কার হয়ে উঠবে। এ ব্যাপারে আমরা আমাদের প্রথম গ্রন্থে আরও আলোচনা করব। আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করুন।

আকসামের মদ্যপান

ঐতিহাসিকগণের প্রায় সকলেই সম্রাট মামুনের কাজী ও সহচর ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম[৬৩] সম্পর্কে যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তাও উপরোক্ত কাহিনীগুলোর মতই বা প্রায় ভিত্তিহীন। তাঁরা বলেছেন যে, কাজী আকসামের মদ্যপানের প্রতি এতদূর আসক্তি ছিল যে, এক রাতে তিনি অতিরিক্ত মদ্যপানে অচৈতন্য হয়ে পড়েন এবং তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদেরকে চৈতন্য লাভের জন্য সুবাসিত পানীয় জলের পাত্রে ডুবিয়ে রাখা হয়। চৈতন্যপ্রাপ্তির পর কাজী আকসাম নিম্নলিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করেন :

> হে আমার নেতা! হে সমগ্র মানব জাতির কর্ণধার।
> যে আমাকে পানীয় দিয়েছিল, সে অবশ্যই তাঁর বিচারে অন্যায় করেছে
> আমি পরিবেশনকারীর প্রতি অমনোযোগী ছিলাম বলেই
> সে আমাকে ধর্ম ও বিবেকশূন্য করে ফেলেছে।

এ ব্যাপারে মামুন ও কাজী আকসামের বিষয়টি সম্রাট হারুনের অনুরূপ। তাঁরা সকলেই আঙুরের রস পান করতেন এবং তা তাঁদের বিচারে নিষিদ্ধ ছিল না। তাঁরা মদ্যপানে অচেতন হয়ে পড়তেন বলে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা সর্বৈব মিথ্যা। সম্রাট মামুন ও কাজী আকসামের মধ্যে যে বন্ধুত্ব ছিল, তা একান্তই ধর্মীয় সম্পর্ক। এমন কি জানা যায়, তাঁরা একই কক্ষে রাত্রিতে শয়ন করতেন। সম্রাট মামুনের সদগুণ ও অমায়িক ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি একরাত্রে তৃষ্ণার্ত হয়ে জেগে উঠেন এবং পাছে বন্ধু আকসামের ঘুম ভেঙে যায়, এজন্য অতি সন্তর্পণে পানির কুঁজা অন্বেষণ করে ফিরেন। তাঁরা উভয়ে এক সঙ্গে জামাতে ফজরের নামাজ আদায় করতেন। এর সঙ্গে মদ্যপানের বিষয়টির সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন হয়ে পড়ে।

---

৬৩. মৃত্যুকাল ২৪২/২৪৩ (৮৪৬ খ্রি:) হিজরি।

অন্যদিকে কাজী আকসাম ছিলেন একজন বিশিষ্ট হাদিস শাস্ত্রবিদ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল[৬৪] ও কাজী ইসমাইল[৬৫] উভয়েই তাঁর প্রশংসা করেছেন। তিরমিজী[৬৬] তাঁর সূত্রে স্বীয় সংকলনে হাদিস বর্ণনা করেছেন। হাদিস বিশারদ আল মুজনী[৬৭] বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম বুখারী[৬৮] তাঁর বিখ্যাত সহি সংকলনের বাইরে অন্যত্র কাজী আকসামের নিকট থেকে হাদিস গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তাঁর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ উপরোক্ত সকলের প্রতি মিথ্যা দোষারোপের সমতুল্য।

অনুরূপভাবে অবিবেচক লোকেরা বালকদের প্রতি কাজী আকসামের আসক্তির দুর্নাম রটিয়েছে। এটা করতে গিয়ে তারা আল্লাহ্‌র উপর দোষারোপ ও ধর্মীয় জ্ঞানীদের উপর মিথ্যা অপবাদ দানের ন্যায় গর্হিত অন্যায় করেছে। তারা কাজী আকসামের শত্রুদের নিকট থেকে এ সকল মিথ্যা কাহিনী সংগ্রহ করেছে। কারণ সম্রাটের বন্ধুত্ব ও স্বীয় গুণগত বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁকে অনেকেই হিংসা করত। অথচ তাঁর শাস্ত্রীয় জ্ঞানের বিশিষ্টতা স্বীকার করে নিয়ে এ প্রকার মিথ্যা অপবাদের কোন অবকাশ থাকে না।

কাজী আকসামের প্রতি এরূপ মিথ্যা অপবাদের কথা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের নিকট বর্ণিত হলে তিনি বলেছেন, "সোবহানাল্লাহ্, সোবহানাল্লাহ্।[৬৯] কে এ কথা বলে?" তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এটা অস্বীকার করেন। কাজী ইসমাইল কাজী আকসামের প্রশংসা করায় তাঁকে উক্ত অপবাদের কথা জানান হল এবং এর উত্তরে বললেন, "আল্লাহ্ রক্ষা করুন, কোন বিদ্রোহী বা বিদ্বেষীর কথায় কি তাঁর ন্যায় ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতা ধূলিস্মাৎ হতে পারে!" তিনি আরও বললেন, "তাঁর নামে বালকদের প্রতি আসক্তির যে অপবাদ দেয়া হয়ে থাকে, তা হতে, আল্লাহ্ জানেন, ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম সম্পূর্ণ পবিত্র। আমি তাঁর অন্তরঙ্গ সংবাদ অবগত আছি। আমি তাঁকে অত্যন্ত খোদাভীরু বলেই জানি। কিন্তু তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও হাসিখুশি ভাবের জন্যই লোকে এ প্রকার দোষারোপ করতে সাহসী হয়েছে।" ইবনে হিব্বান[৭০] তাঁকে বিশ্বস্তদের অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে কাজী আকসামের উপর আরোপিত এ সকল অপবাদের দিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন নেই। কারণ এর কোনটিই যুক্তি বিচারে প্রমাণিত হয়নি।

মামুনের প্রেম

এ ধরনের ভিত্তিহীন কাহিনীর মধ্যে অন্য একটি হল 'ইকদ' রচয়িতা[৭১] ইবনে আবদে রাব্বিহির বর্ণিত 'ঝোলার' কাহিনী। সম্রাট মামুনের সাথে হাসান ইবনে সহলের কন্যা

---

৬৪. আহমদ ইবনে মুহম্মদ ইবনে হাম্বল, হাম্বলী মজহাবের প্রতিষ্ঠাতা। জীবনকাল ১৬৪-২৪১ (৭৮০-৮৫৫ খ্রি:) হিজরি।

৬৫. ইসমাইল ইবনে ইসহাক, মালেকী মজহাবের কাজী ছিলেন।

৬৬. মুহম্মদ ইবনে ইসা; মৃত্যু (৮৯২ খ্রি:) হিজরি।

৬৭. রোজেনথাল তাঁর অনুবাদে 'মিজাই' বলেছেন। ইনি ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান, জীবনকাল ৬৫৪-৭৪২ (১২৫৬-১৩৪১ খ্রি:) হিজরি।

৬৮. সর্বাগ্রগণ্য হাদিসশাস্ত্রবিদ, সহি বোখারীর সংকলন মুহম্মদ ইবনে ইসমাইল; জীবনকাল ১৯৪-২৫৬ (৮১৩-৮৭০ খ্রি:) হিজরি।

৬৯. আল্লাহ্ পবিত্র, আল্লাহ্ পবিত্র; বিস্ময় প্রকাশের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়।

৭০. জীবনকাল ২৭৪-৩৫৪ (৮৮৭—৮৮/৯৬৫ খ্রি:) হিজরি।

৭১. গ্রন্থটির নাম 'ইকদুল্ ফরিদ'—৫০ নং টীকা দ্র:।

'বোরান'-এর বিবাহের কারণ প্রসঙ্গে উক্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বলা হয় যে, এক রাতে মামুন তাঁর অনুগামীসহ বাগদাদের পথে পথে বিচরণ করেছিলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টিতে পড়ল, কোন অট্টালিকার গবাক্ষ পথ থেকে রেশম রজ্জুতে আবদ্ধ চরকিসহ একটি ঝোলা দুলছে। তিনি কৌতূহল সংবরণ করতে না পেরে তাতে উঠে বসলেন এবং রজ্জু আকর্ষণ করতেই তা চলতে আরম্ভ করল। ক্রমে এ ঝোলা তাঁকে একটি সভাকক্ষে নিয়ে গেল। অতঃপর আবদে রব্বিহি উক্ত কক্ষের দৃষ্টি বিমোহন ও মনোমুগ্ধ শয্যার সৌন্দর্য, স্থাপত্যের সৌন্দর্য ও দৃশ্যাবলির সৌসাদৃশ্যের বর্ণনা করেছেন। হঠাৎ সেই সভাকক্ষে সম্রাট মামুনের সম্মুখে পর্দার অন্তরাল থেকে অতুলনীয় সুষমা ও মহিমার রানী এক রূপসী এসে উপস্থিত হল। সে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে তার সাহচর্যে অবস্থানের জন্য আহ্বান করল। সম্রাট তার সাথে প্রভাতকাল পর্যন্ত মদ্যপান করে কাটালেন। অতঃপর প্রভাতে তিনি বাইরে অপেক্ষমান অনুগামীদের নিকট ফিরে আসলেন। উক্ত রূপসীর সাহচর্য তাকে এতদূর মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি তাঁর পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাতে বাধ্য হলেন।

অথচ ধর্মশিক্ষা ও জ্ঞানান্বেষা সম্পর্কে সম্রাট মামুনের যে পরিচিতি বিদ্যমান, তার সাথে এ সকল ঘটনার সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়। তিনি তাঁর পিতৃপুরুষদের নিকট থেকে 'খুলাফায়ে রাশেদীনে'[৭২] রীতি-নীতি এবং জাতির আদর্শস্থল উক্ত চার খলিফার চরিত্র অনুসরণের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জ্ঞানীদের সাথে তর্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন এবং নামাজ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-নিষেধকে যথাযথভাবে মেনে চলতেন। সুতরাং তাঁর চরিত্রে রাত্রির অভিসারযাত্রা, যত্র-তত্র ভ্রমণের স্বেচ্ছাচারিতা, গল্প-কাহিনীর নায়কসুলভ আচরণ ও বেদুইন প্রেমের লীলা-বিলাস কী করে সম্ভব হতে পারে! কিংবা এটা হাসান ইবনে সহলের কন্যা সম্পর্কেও কী করে বিবেচনা করা যায়। তাঁর পিতৃগৃহের কৌলিন্য ও সম্ভ্রান্ত পরিবেশের মধ্যে এ প্রকার শিথিল আচরণের কথা কল্পনাও করা যায় না।

ঐতিহাসিকদের গ্রন্থাবলিতে অনুরূপ মুখরোচক কাহিনী প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এ সকল কাহিনী রচনা ও বর্ণনায় তাঁদেরকে নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি সাধারণ আকর্ষণ ও অহেতুক অপরের ছিদ্রান্বেষণই অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ, তাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অনুরূপ লীলা-বিলাসকে অতীতের ঘটনাবলির আলোকে যাচাই করে নেয় এবং এ কারণেই, পাঠক হয়ত লক্ষ করে থাকবেন, তারা সমতুল্য ঘটনার অনুসন্ধানে গ্রন্থাবলি পৃষ্ঠা হাতড়িয়ে ফিরে। অথচ তারা যদি এর পরিবর্তে পূর্বসূরিদের অন্যবিধ অবস্থা, তাঁদের চরিত্রের পরিপূর্ণতা ও দৃঢ়তার সুখ্যাতিকে অনুসরণ করতে পারত, তাহলে তা তাদের জন্য কতই না ভল হত।[৭৩] হায়, তারা যদি এটা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারত।[৭৪]

---

৭২. বিশ্বস্ত প্রতিনিধিবৃন্দ; হজরত মুহম্মদ (দঃ)-এর পরবর্তী চার খলিফাকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

৭৩. কোরান ৩, ১১০; ৪, ৪৬, ৬৬; ৪৭, ২১; ৪৯, ৫।

৭৪. কোরান ২, ১০২, ১০৩; ১৬, ৪১; ২৯, ৪১, ৬৪; ৬৮, ৩৩।

আমি একদা সম্রাট তনয় কোন অমাত্যকে সঙ্গীত ও বাদ্যের প্রতি তাঁর অতিরিক্ত আসক্তির জন্য তিরস্কার করে বলেছিলাম, তোমার পদমর্যাদা ও সুখ্যাতির জন্য এটা ক্ষতিকর। এর উত্তরে সে বলল, আপনি কি ইব্রাহীম ইবনে আল মাহদীর[৭৫] কথা জানেন না। তিনি তো এ শিল্পে নেতৃস্থানীয় এবং সমসাময়িক সঙ্গীতজ্ঞদের শিরোমণি ছিলেন। আমি তাকে বললাম, সোবহানাল্লাহ্! হায়, তুমি যদি তাঁর পিতা বা ভ্রাতার আদর্শ অনুসরণ করতে কিংবা উক্ত গুণের ফলে ইব্রাহীম পিতৃপুরুষের পদমর্যাদা থেকে কত দূরে পতিত হয়েছেন, তা যদি বিচার করে দেখতে! আমার এরূপ ভর্ৎসনার জন্য সে আর কোন কথা বলল না এবং মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন।[৭৬]

উবায়দী বংশধারা

কায়রোয়ান ও কায়রোর উবায়দী বংশীয় শিয়া সম্রাটদের সম্পর্কেও অনুরূপ ভিত্তিহীন কাহিনী অধিকাংশ ইতিহাসবিদদের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা একদিকে যেমন তাঁদেরকে নবী বংশের অন্তর্গত বলে স্বীকার করেননি, তেমনই তাঁদের সাথে ইমাম ইসমাইল ইবনে জাফর সাদেক-এর রক্ত সম্পর্ক নিয়েও নানা প্রকার কুকথা বলেছেন। তাঁরা এ সকল বর্ণনা তাঁদের গ্রন্থসমূহে সন্নিবেশ করতে গিয়ে দুর্বল আব্বাসী সম্রাটের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁদের বিরুদ্ধবাদীদের উদ্দেশ্যে রচিত এবং শত্রুদের নিমিত্ত কথিত সর্বপ্রকার অপবাদ ও মিথ্যা দোষারোপের উপর নির্ভর করেছেন। যাহোক, আমার উবায়দী সম্রাটদের বিবরণদানের সময় বর্তমান গ্রন্থের অনুরূপ কিছু কাহিনী উদ্ধৃত করব। বস্তুত ঐতিহাসিকগণ এ সকল বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে ঘটনাবলির সাক্ষ্য ও বাস্তব অবস্থার প্রমাণ বিবেচনায় উদাসীনতা প্রদর্শন করেছেন। নতুবা তাঁরা অবশ্যই বুঝতে পারতেন যে, তাঁদের দাবি সর্বৈব মিথ্যা এবং কোন অবস্থাতেই তা গ্রহণযোগ্য নয়।

তাঁরা সকলেই শিয়া সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রারম্ভ সম্পর্কে একই ধরনের বিবরণ প্রদান করেছেন। যখন আবু আব্দুল্লাহ্ আল মুহতাসিব[৭৭] কুতামাদিগকে নবী বংশীয়দের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বললেন, এ সংবাদ প্রচারিত হল এবং উবায়দুল্লাহ্ আল মেহেদী ও তৎপুত্র আবুল কাশেমের প্রতি তাঁর আগ্রহের কথা সকলেই জানতে পারল, তখন শেষোক্ত দুজন প্রাণভরে আব্বাসী সাম্রাজ্যের অধীন পূর্বাঞ্চল থেকে পলায়ন করলেন। তারা বণিকের ছদ্মবেশে মিশর হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া ছাড়িয়ে গেলেন। তাঁদের পলায়নের খবর যথারীতি মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার তৎকালীন শাসনকর্তা ইসা আন্ নওশেরীর নিকট প্রেরণ করা হল। তিনি তৎক্ষণাৎ একদল অশ্বারোহীকে তাঁদের অনুসন্ধান করতে

---

৭৫. সম্রাট আল মাহদীর পুত্র। জীবনকাল ১৬২-২২৪ (৭৭৯-৮৩৯ খ্রি:) হিজরি। সামান্য সময়ের জন্য কোন কোন গোত্র তাঁকে সম্রাট হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

৭৬. আল্লাহ্ ... এই বাক্যটির অনুবাদ রোজেনথালে নেই।

৭৭. এর সাহায্যেই ফাতেমী বংশীয়রা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তার করে। ইনি বসরায় মুহাতাস্বি (ক'তায়অল) হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

পাঠালেন। কিন্তু অনুসরণকারীগণ ছদ্মবেশের দরুন তাঁদের সাক্ষাৎ পেয়েও চিনতে পারল না। সুতরাং তাঁরা অতি সহজেই মাগরিবে পলায়ন করতে পারলেন।

কিন্তু আব্বাসী সম্রাট আল মুতাজিদ[৭৮] ইতিমধ্যে আফ্রিকিয়ার কায়রোয়ানের শাসক 'আগালেবা' এবং সিজিলামাসার শাসক 'বনি মেদরার'কে উক্ত পলাতকদের অনুসন্ধান করতে ও তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে আদেশ করেছিলেন। এর ফলে সিজিলামাসার শাসক বনি মেদরারের—'আল ইসায়া' নিজ শহরে তাঁদেরকে খুঁজে বের করলেন এবং আব্বাসী সম্রাটের সন্তুষ্টি সম্পাদনের জন্য বন্দী করে রাখলেন। এ ঘটনা কায়রোয়ানস্থ আগালেবাদের মধ্যে শিয়া মতবাদ প্রসারের পূর্বে ঘটেছিল। অতঃপর তাঁদের শিয়া মতবাদের আহ্বান মাগরিব ও আফ্রিকিয়ায় বিস্তৃতি লাভ করল এবং ক্রমশ তা ইয়ামেন, আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর, সিরিয়া ও হেজাজে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। এর ফলে তাঁরা আব্বাসীদের অধিকৃত মুসলিম সাম্রাজ্যকে সরাসরি দুভাগে ভাগ করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সর্বত্র তাঁদের অধিকার ও প্রভাবকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে এনেছিলেন। এমন কি দায়লমস্থ তাঁদের অনুগামী আমীর আল-বুসাসিরির সহায়তায় বাগদাদ ও ইরাকে শিয়া মতবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। উক্ত আমীর অনারব সামন্তবর্গের[৭৯] সাথে তার বিধানের সূত্র ধরে আব্বাসীদের উপর অধিকার বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর ফলে বাগদাদের মসজিদগুলোতে এক বছরকাল খোতবা পাঠে শিয়া সম্রাটদের নাম উল্লেখিত হয়।

এ সকল ঘটনার মধ্যদিয়ে বিস্তৃত শিয়া প্রভাব আব্বাসীদেরকে সর্বদা উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল এবং সাগরপারের স্পেন থেকে উমাইয়া সম্রাটগণ শিয়াদের কার্যকলাপে উৎকণ্ঠিত ও তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। এ সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে নবীবংশের সাথে তাঁদের রক্তসম্পর্কের দাবি মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করা সম্ভব নয়। তদুপরি উবায়দীদের দাবি কারামতীদের[৮০] দাবির সাথে মিলিয়ে দেখলেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে পড়ে। বস্তুত কারামতীদের দাবি ছিল মিথ্যা। এ কারণে অতি অল্পদিনেই তাদের চক্রান্তজাল ছিন্ন হয়ে যায় এবং তাঁদের অনুসারীগণ বিক্ষিপ্ত হয়ে তাদেরকে অশুভ পরিণামের দিকে ঠেলে দেয়। তারা যথার্থই তাদের অপকর্মের ফল ভোগ করতে বাধ্য হয়। যদি উবায়দীদের অবস্থাও তাদের অনুরূপ হত তাহলে কিছুটা দেরিতে হলেও তা প্রকাশ হয়ে পড়ত। কবি বলেছেন—[৮১]

> 'লোকের স্বভাব থাকুক যতই সংগোপনে।
> পড়বে ধরা লোকের চোখে লোকের মনে ॥'

---

৭৮. যতদূর সম্ভব তাঁর উত্তরাধিকারী আল মুকতাফির সময়ে এই ঘটনা ঘটে—সময় ২৯৩ (৯৩৫/৬ খ্রি:) হিজরি।

৭৯. সলজুক সম্রাট তুগরিল বেগের সময় ১০৫৮-১০৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই বিরোধ দেখা দেয়।

৮০. এরা খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দির শেষার্ধে শিয়া মতবাদের আশ্রয়ে ও বাবেকের নেতৃত্বে আর্মেনিয়ার পার্বত্য অঞ্চল হতে বের হয়ে সর্বত্র ত্রাসের সঞ্চার করত। ৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসী সম্রাট আল মুতসিমের তুর্কি সেনাপতির হাতে বাবেক নিহত এবং ৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে আল মুতাজাদের হাতে এরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

৮১. ছত্র দুটির রচয়িতা জুহায়ের ইবনে আবি সলমা—প্রাচীন আরবি কবি।

অন্যদিকে তাঁদের সাম্রাজ্যকাল দুইশত সত্তর বছর পর্যায়ক্রমে স্থায়ী হয়েছিল এবং তাঁরা হজরত ইব্রাহিমের দাঁড়াবার ও প্রার্থনা করবার স্থান, হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর জন্মভূমি ও সমাধি হজ্বব্রত পালনকারীদের অপেক্ষা করার স্থান ও স্বর্গীয় দূতদের অবতরণস্থল প্রভৃতির ন্যায় পবিত্র স্থানগুলো[৮২] দীর্ঘদিন তাঁদের অধিকারে রেখেছিলেন। অতঃপর তাঁদের আধিপত্যের কাল শেষ হল। অথচ এ সময়ে তাঁদের অনুসারীগণ তাঁদের প্রতি যথার্থ ভক্তি ও ভালবাসা! প্রদর্শন করেছে এবং ইমাম ইসমাইল ইবনে জাফর সাদিকের সাথে তাঁদের রক্ত সম্পর্কে গভীর বিশ্বাস পোষণ করেছে। এ কারণে উবায়দী সাম্রাজ্যের পতন ও তার প্রতিপত্তি নিশ্চিহ্ন হবার পরও এ সকল অনুসারীরা একাধিকবার তাঁদের বিশেষ মতবাদ প্রচার করতে এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততির নামে মানুষের আনুগত্য লাভ করতে উদ্যোগী হয়েছে। তারা উবায়দী বংশীয়দিগকেই একমাত্র খেলাফতের যোগ্য বিবেচনা এবং বংশানুক্রমে পূর্ববর্তী ইমামদের নিকট থেকে এ উত্তরাধিকার লাভের কথা গভীরভাবে বিশ্বাস করেছে। তারা যদি তাঁদের বংশধারা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করত, তাহলে তাঁদেরকে সাহায্য করতে গিয়ে এমনভাবে বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিত না। কারণ কোন সাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি কখনও নিজের কর্তব্য সম্পর্কে দ্বিধা পোষণ করে না, তার সাম্প্রদায়িক চেতনাতেও ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে না এবং নিজের বিশ্বাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার মত কোন কাজও সে করতে পারে না।

আরও আশ্চর্যের বিষয় এ যে, কাজী আবু বকর আল বাকিল্লানীর[৮৩] ন্যায় ইলমে কালামবিদ ও তর্কচূড়ামণি ব্যক্তি ও উবায়দীদের বংশধারা সম্পর্কীয় এ বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছেন এবং বিরোধী বক্তব্যকে অত্যন্ত দুর্বল বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর এ সমর্থন যদি এ কারণে হয়ে থাকে যে, তিনি শিয়া মতবাদের অনুসারী হয়ে উবায়দীদের ন্যায় ধর্মের সনাতন পথ পরিত্যাগ করেছিলেন, তাহলেও তাঁর মতবাদ উবায়দীদের উত্থান সম্পর্কিত প্রচারণা এবং বংশধারা সম্পর্কিত দাবির বিরোধী হতে পারে না। কারণ তাঁরা নিজেরা বিপথগামী হতে পারেন কিন্তু তজ্জন্য আল্লাহ্‌র নিকট তাঁদের রক্ত সম্পর্ক মিথ্যা হবে কি করে!

এ কারণে আল্লাহ্ হজরত নুহকে পুত্রের সম্পর্কে বলেছেন, হে নুহ, সে তোমার পরিবারের কেউ নয়; যথার্থই এটা একটি অপকর্ম। সুতরাং তুমি এমন কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করো না যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই।[৮৪] হজরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁর কন্যা ফাতেমাকে বলেছিলেন, হে ফাতেমা, সৎকাজ কর আল্লাহ্‌র নিকট আমি তোমার কোন উপকারে আসব না। বস্তুত যখন কোন ব্যক্তি কোন বিষয় জানতে পারে ও তার সত্যতা সম্পর্কে তার বিশ্বাস জন্মায়, তখন তার তা প্রকাশ করে বলা উচিত। আল্লাহ্‌ই সত্য কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন।

---

৮২. অর্থাৎ মক্কা ও মদিনা।

৮৩. মুহম্মদ ইবনে অত্ তৈয়ব, মৃত্যুকাল ৪০৩ (১০১৩ খ্রি:) হিজরি। ইবনে খলদুনের মতে মালিকী মজহাবের এক শ্রেষ্ঠ প্রতিভা।

৮৪. কোরান, ১১, ৪৬। ৮৫ কোরান, ৩৩, ৪।

উবায়দীগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির সন্দেহে তাড়িত হয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শিয়া মতবাদের ব্যাপক বিস্তৃতির ফলে তাঁদের সমগোত্রীয়দের বিদ্রোহমূলক অত্যাচার তাঁরা সহ্য করেছেন। এতদসত্ত্বেও তাঁরা দূর-দূরান্তে তাঁদের আহ্বান জানাতে চেষ্টা করেছেন। এবং বারবার বিদ্রোহের সূত্রপাত করেছেন। এ কারণে তাঁরা সর্বদা আত্মগোপন ও ছদ্মবেশে অবস্থান করতেন এবং এর ফলেই তাঁদের পরিচয় অদ্যাবধি রহস্যাবৃত হয়ে রয়েছে। কবি বলেছেন :

কালের কাছে জিগাও যদি বলবে না সে আমার নাম,
বলবে না সে কোথায় ছিল, কোথায় আছে, আমার ধাম।[৮৬]

এজন্যই উবায়দুল্লাহ্ আল মেহেদীর পিতামহ ও ইমাম ইসমাইলের পুত্র মুহম্মদকে গুপ্ত ইমাম বলা হয়ে থাকে। তাঁকে এ উপাধি তাঁর অনুসারীরাই দান করেছে। কারণ তাদের ধারণা, শক্তিশালী শত্রুদের ভয়ে তিনি আত্মগোপন করেছেন। আব্বাসীদের অনুসারীরা ফতেমা বংশীয়দের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার সময় এ বিষয়টিকে কাজে লাগিয়েছে। বস্তুত উবায়দীদের বংশধারায় কলঙ্ক আরোপ করে তারা দুর্বল আব্বাসী সম্রাটদিগকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছে। এটা তাঁদের অনুসারী ও অমাত্যবর্গে নিকট খুবই উত্তম বলে বিবেচিত হয়েছে। বিশেষ করে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সেনাপতিরা এর মধ্যে তাঁদের অক্ষমতার লজ্জা ঢাকবার এবং সম্রাটকে রক্ষা করবার উপকরণ খুঁজে পেয়েছিলেন। তথাপি উবায়দীদের অনুসারী বারবার-কুতামা সৈনিকদের হস্ত থেকে তাঁরা সিরিয়া, মিশর ও হেজাজ রক্ষা করতে পারলেন না। অতঃপর বাগদাদের কাজীরা ফতোয়া জারী করে তাঁদের বংশধারায় কলঙ্ক আরোপ করলেন। শহরের গণ্যমান্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা সকলেই এতে যোগ দিলেন। তাঁদের মধ্যে আশ্ শরীফ আল্ রাজী[৮৭] ও তাঁর ভ্রাতা আল মুরতাজা[৮৮] ইবনুল বতহাবী[৮৯] এবং ধর্মশাস্ত্রবিদদের মধ্যে আবু হামেদ আল-আইসফারায়নী[৯০] , আল কুদুরী[৯১], আস-সইমারী[৯২], ইবনুল আকফানী[৯৩], আল আবী ওয়ারদী[৯৪] ও শিয়া শাস্ত্রবিদ আবু আব্দুল্লাহ্ ইবনে নুমান[৯৫] প্রমুখ বিখ্যাত জ্ঞানীরা ছিলেন। তাঁরা আব্বাসী সম্রাট আল কাদিরের শাসন আমলে ৪৬০ (১০৬৮ খ্রি:) হিজরির[৯৬] এক উৎসব মুখর[৯৭] দিনে বাগদাদের জনসমক্ষে এ ঘোষণা প্রকাশ করেন। এর ভিত্তি ছিল বাগদাদের সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত ও প্রসারিত জনশ্রুতি। আবার

---

৮৬. সূত্র দুটি কবি আবু নাওয়াসের (২৪ পৃষ্ঠা দ্র:)।
৮৭. মুহম্মদ ইবনে আল হোসাইন, জীবনকাল ৩৫৯-৪০৬ (৯৬৯/৭০-১০১৫ খ্রি:) হি:।
৮৮. আলী ইবনে আল হোসাইন, জীবনকাল ৩৫৫-৪৩৬ (৯৬৬-১০৪৪/৪৫ খ্রি:) হি:।
৮৯. ইবনে আসিরের মতে তিনি শিয়া সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবিদ ছিলেন।
৯০. আহমদ ইবনে মুহম্মদ, জীবনকাল ৩৪৫-৪০৬ (৯৫৬/৫৭-১০১৬ খ্রি:) হি:।
৯১. আহমদ ইবনে মুহম্মদ, জীবনকাল ৩৬২-৪২৮ (৯৭২/৭৩-১০৩৭ খ্রি:) হি:।
৯২. আবু আব্দুল্লাহ্ আল হোসাইন ইবনে আলী, জীবনকাল ৩৫১-৪৩৬ (৯৬২/৬৩-১০৪৫ খ্রি:) হি:।
৯৩. আবু মুহম্মদ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুহম্মদ, জীবনকাল ৩১৬/২০-৪০৫ (৯২৮/৩২-১০৪৫ খ্রি:) হি:।
৯৪. আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহম্মদ, মৃত্যু ৪২৫ (১০৩৪ খ্রি:) হি:।
৯৫. মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ ইবনে আল মুয়াল্লিম, ৪১৩ (১০২২ খ্রি:) হি:।
৯৬. রোজেনথালের অনুবাদে ৪০২ (১০১১ খ্রি:) হি: উল্লেখিত হয়েছে।
৯৭. মূলে আছে 'ইয়াওমুম্ মাশহুদ'; রোজেনথাল এর অনুবাদ করেছেন 'স্মরণীয় দিবস'।

এ সাধারণদের অধিকাংশই ছিল আব্বাসীদের অনুগত এবং উবায়দীদের বংশধারায় কলঙ্ক আরোপকারী। ঐতিহাসিকগণ যেমন শুনেছেন ও স্মরণ রেখেছেন, সেরূপ বর্ণনা করে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু বাস্তব সত্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমনকি আব্বাসী সম্রাট আল মুতাজিদ উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে কায়রোয়ানের বনি আগলাব ও সিজিলামাসার বনি মেদরারের নিকট যে পত্র লিখেছিলেন, তাতেও উবায়দী বংশধারার সত্যতার যোগ্য ও মনোজ্ঞ প্রমাণ বিদ্যমান। বস্তুত আল মুতাজিদ নবী বংশের ধারা সম্পর্কে অন্য যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর অবহিত।

রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য এ পৃথিবীর এক বিরাট পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র। এখানে জ্ঞানীদের জ্ঞান ও শিল্পীদের শিল্পকর্ম এসে উপনীত হয়। এখানে লুপ্ত ঐতিহ্য ও গুপ্ত মনীষার অনুসন্ধান করা হয়। এখানে এসে গল্প ও ইতিহাস তাদের বাহন থামায়। সুতরাং এখানে যে বস্তুর চাহিদা বিদ্যমান, তার চাহিদা সর্বত্র। রাষ্ট্র যদি এ ব্যাপারে সর্বপ্রকার অন্যায়, কুসংস্কার, দুর্বলতা ও কপটতা পরিহার করে সৎপ্রথা ও সাবলীল পন্থা অবলম্বন করে, তাহলে তার বিক্রয় কেন্দ্রে বিশুদ্ধ স্বর্ণ-রৌপ্যের চাহিদাই বড় হয়ে উঠে। কিন্তু যখন এটা স্বার্থপরতা ও বিদ্বেষের দ্বারা পরিচালিত এবং অত্যাচার ও অন্যায়ের কবলে নিপতিত হয় তখন সেখানে নিকৃষ্ট ও অবিশুদ্ধ মুদ্রারই জয়-জয়কার। বিচক্ষণ ব্যক্তির তখনই পরীক্ষার সময়; তিনি একে দেখেন, তাকে পরখ করেন; অতঃপর তাদের মধ্য থেকে নিজের বিবেচনা মত একটিকে সংগ্রহ করেন।

ইদরিসী বংশধারা

উপরোক্ত কাহিনীর অনুরূপ কিংবা এটা থেকেও জঘন্যতর কাহিনী হল ইদরিস ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালেবের (আল্লাহ্ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) জন্ম সম্পর্কে কুৎসা রটনাকারীরা যা কানে কানে বলে থাকে। এ ইদরিস তাঁর পিতার পরবর্তীকালে মরক্কোর[৯৮] ইমাম নির্বাচিত হন। শত্রুরা বিদ্বেষবশত অনুমান করে যে প্রথম ইদরিসের মৃত্যুর সময় তাঁর স্ত্রীর গর্ভাবস্থা তাঁর দ্বারা সংঘটিত হয়নি বরং এটা তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস রশীদের। সুতরাং দ্বিতীয় ইদরিস রশীদের ঔরসজাত সন্তান। আল্লাহ্ এ প্রকার কুৎসা রটনাকারীদেরকে সর্বদা হেয় করুন এবং তাঁদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিন। এদের মূর্খতা কী অদ্ভুত। এরা কি জানে না যে প্রথম ইদরিস বারবারদের মধ্যে বিবাহ করেছিলেন। তিনি মাগরিবে পদার্পণ করে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বারবার বেদুইনদের মধ্যে জীবন কাটিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে বেদুইন জীবনে কোন গোপনীয়তার স্থান নেই। কারণ তাদের পরিবেশে এমন কোন গুপ্ত স্থান নেই, যেখানে অনুরূপ গর্হিত কাজ সম্পন্ন হতে পারে। তাদের সকল অবস্থাই প্রতিবেশীগণ দেখতে পারে এবং প্রতিবেশীগণ জানতে পারে। কারণ তাদের গৃহের প্রাচীর পরস্পর সংলগ্ন এবং একই ছাদের নিচে কোন প্রকার দূরত্ব ব্যতীতই তারা বসবাস করে। রশীদ তাঁর মালিকের মৃত্যুর পরে তদীয় পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেছিল এবং তার

৯৮. মূলে আছে 'মাগরিবে আকসা'—সুদূর মাগরিব; রোজেনথালও এর অনুবাদ মরক্কো লিখেছেন।

মালিকের বন্ধু-বান্ধবদের ও অনুসারীদের দৃষ্টির সম্মুখেই সে তার দায়িত্ব পালন করেছিল। প্রথম ইদরিসের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দ্বিতীয় ইদরিসের নেতৃত্বের প্রতি মরক্কোর সমুদয় বারবার গোত্রই বশ্যতা স্বীকার করে। তাদের এ বশ্যতা স্বীকার ছিল সম্পূর্ণ অকুণ্ঠ ও স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তারা রক্তাক্ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে তাঁর প্রাণ রক্ষার্থে মৃত্যুর সাগর অতিক্রম করতে প্রস্তুত ছিল। যদি তাদের আত্মা ঘুণাক্ষরে অনুরূপ সন্দেহের কথা জানতে পারত, যদি কোন প্রতিশোধকামী শুক্র ও সন্দেহ পোষণকারী কপটের নিকট থেকেও অনুরূপ কিছু তাদের কর্ণে প্রবেশ করত, তাহলে তারা সকলে না হোক, কিছু সংখ্যক লোক হলেও আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম, তা হয়নি। সুতরাং একমাত্র বনি আব্বাসের যুদ্ধবাজ সেনানী এবং বনি আগলাবের মধ্যকার তাঁদের কর্মচারীদের মুখ থেকেই এ কুৎসা জন্মলাভ করেছে। বনি আগলাব তৎকালে আব্বাসীদের পক্ষ থেকে আফ্রিকিয়া শাসন করছিল।

ঘটনাটি ছিল এ যে, যখন প্রথম ইদরিস বলখের[৯৯] যুদ্ধের পর মাগরিবের দিকে পলায়ন করলেন, তখন আল হাদি বনি আগলাবকে তাঁর অনুসন্ধান করতে ও তাঁর প্রতি লক্ষ রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সতর্কতা কোন কাজে লাগেনি। ইদরিস মাগরিবে পৌঁছতে সক্ষম হলেন। সেখানে তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ হল এবং তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করল। এর ফলে সম্রাট হারুনুর রশীদ আলেকজান্দ্রিয়ায় নিযুক্ত তাঁদের দ্বারা মুক্ত ক্রীতদাস ও কর্মচারী ওয়াজিহকে[১০০] দোষী সাব্যস্ত করলেন। তাঁর প্রতি শিয়া মতবাদ গ্রহণ ও মাগরিবে পলায়নের ক্ষেত্রে ইদরিসকে সাহায্য করার অভিযোগ আরোপ করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল। অতঃপর সম্রাট রশীদ তাঁর পিতা আল মাহদী কর্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের মধ্য থেকে আশ্ শামাখকে ইদরিসের হত্যার জন্য নিযুক্ত করলেন। সে প্রকাশ্য পথ ত্যাগ করে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করল। মাগরিবে পৌঁছে ইদরিসের সাথে মিলিত হয়ে বনি আব্বাসের সঙ্গে তার সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করল। ইদরিসও সরল বিশ্বাসে তাকে গ্রহণ করলেন। এর পর সুযোগ মত নির্জনে শামাখ তাঁকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করতে সক্ষম হল। ইদরিসের মৃত্যু সংবাদ বনি আব্বাস খুব আনন্দের সাথে উপভোগ করলেন। তাঁদের ধারণা জন্মিল, এর ফলে মাগরিবে শিয়া মতবাদ প্রচারের সমস্ত উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যাবে এবং তার মূল উৎপাটিত করা সম্ভব হবে। কিন্তু যখন ইদরিসের স্ত্রীর গর্ভাবস্থার কথা তাঁরা শুনতে পেলেন, তখন, আল্লাহ্‌র কসম, কুৎসা রটান ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর রইল না। অতঃপর যখন মাগরিবে শিয়া মতবাদের প্রচার ও প্রসার দীপ্তিমান হয়ে উঠল এবং ইদরিস ইবনে ইদরিসের নেতৃত্বে শিয়া সাম্রাজ্য নতুন শক্তি লাভ করল, তখন এটা তাঁদের বুকে মৃত্যুবাণের অপেক্ষাও অধিক আঘাত হেনেছে। দুর্বলতা ও শৈথিল্য তখন আব্বাসী সাম্রাজ্যকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।

---

৯৯. রোজেনথাল লিখেছেন 'ফেক্কা'—মক্কার নিকটবর্তী একটি অঞ্চল, এখানে শিয়াদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। আমরা মূল গ্রন্থের অনুকরণ করলাম।

১০০. ইবনে আসিরের মতে ওয়া 'জহের হত্যাকারী রশীদ না হাদি, তা নিশ্চিত নয়। ওয়াজিহ মিশরে ডাকবিভাগ ও চরদের মূল দায়িত্ব পালন করতেন।

সীমান্ত অঞ্চলগুলো নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পর্যন্ত লোপ পেয়েছিল। সুতরাং মাগরিবের দূর প্রান্তে অবস্থানরত ও বারবারদের দ্বারা সুরক্ষিত প্রথম ইদরিসকে হত্যা করবার জন্য সম্রাট হারুনুর রশীদের পক্ষে কৌশলে বিষ প্রয়োগ ব্যতীত অন্য পথ ছিল না। কাজেই উক্ত শিয়া রাষ্ট্রের পুনরুত্থান তাঁদেরকে বিচলিত করে তুলল। তাঁরা আফ্রিকিয়াস্থ তাদের সাহায্যকারী বনি আগলাবকে তাদের সীমান্ত সুরক্ষিত করে এ বিস্তারমান শক্তির আক্রমণ থেকে আব্বাসী সাম্রাজ্যকে রক্ষার নির্দেশ দিল। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যাতে এ শক্তি অধিক দূর বিস্তৃত হবার পূর্বেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—এ বক্তব্য মামুন ও তৎপরবর্তী আব্বাসী সম্রাটগণ সকলেই বনি আগলাবের নিকট উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু বনি আগলাব মরক্কোবাসী বারবারদের তুলনায় একান্তই দুর্বল ছিল। মূলত এ দুর্বলতা কেন্দ্রীয় আব্বাসী শাসন থেকে উৎসারিত হচ্ছিল। কেননা তাঁরা তখন অনারব মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের কবলে পতিত হয়েছেন। তারা সম্রাটদের উপর এমন আধিপত্য বিস্তার করেছে যে, সাম্রাজ্যের সমুদয় বিষয়ই তাদের স্বার্থপরতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। তারা রাজকোষ, রাজকর্মচারী ও রাজ অমাত্যবর্গের উপর প্রভাব বিস্তার করে সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১০১]

সম্রাট পিঞ্জরাবদ্ধ ওয়াসীফ ও বুগার মাঝে,
তারা যা বলায়, তাই বলেন তিনি তোতার সাজে।

সুতরাং বনি আগলাবের অমাত্যবর্গ সর্বদাই সম্ভাব্য আক্রমণের ভয় করতেন এবং নিজেদের অক্ষমতা ঢাকবার জন্য অজুহাতের আশ্রয় গ্রহণ করতেন। কখনও তাঁরা মাগরিব ও তদঞ্চলবাসী বারবারদিগকে তুচ্ছ করে কথা বলতেন; আবার কখনও ইদরিসের শক্তিমত্তা ও তাঁর অনুসারীদের দোর্দণ্ড প্রভাবের ভয় দেখাতেন। তারা আব্বাসীদেরকে জানাতেন যে ইদরিস দলবলসহ তাঁদের রাজ্যসীমা অতিক্রম করেছে এবং তার প্রমাণস্বরূপ তারা নিজেদের প্রেরিত উপঢৌকন ও রাজস্বে ইদরিসী মুদ্রা জুড়ে দিতেন। এরূপ করবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যাতে বনি আগলাব আব্বাসী সম্রাট কর্তৃক তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন। এ কারণে তারা কখনও ইদরিসের আক্রমণের ভয় দেখাতেন, আবার কখনও তাদের উপর অত্যধিক চাপ আরোপ করলে ইদরিসীদের পক্ষাবলম্বন করবেন বলে জানাতেন। অন্যদিকে সুযোগ বুঝে তারা আবার ইদরিসীদের বংশধারায় কলঙ্ক আরোপ করতেন এবং দূরত্বের সুবিধার জন্য সত্যমিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ের ভয় তাদের ছিল না। আর বনি আব্বাসের দুর্বল সম্রাটরা তখন এমন অবস্থায় উপনীত যে, তাঁরা ও তাঁদের অনুসারী অনারব অমাত্যবর্গ সকলেই বিনা বিচারে সর্বপ্রকার জনশ্রুতি গ্রহণ করতেন। বনি আগলাবের ক্ষমতার শেষদিন পর্যন্ত তারা অনুরূপভাবেই আব্বাসীদেরকে প্রতারণা করে গেছেন।

এজন্যই বিনা বাধায় ইদরিসী বংশধারায় আরোপিত এ জঘন্য কুৎসা জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করতে পেরেছে। সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তিরা এ কুৎসার পুঁজি নিয়ে ইদরিসীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করেছে। আল্লাহ্ এদের

১০১. মাসউদী এই সূত্র দুটি উদ্ধৃত করেছেন। কবির নাম অজ্ঞাত। এতে বর্ণিত সম্রাট আল মুস্তাইন তুর্কি সেনাপতি ওয়াসীফ ও বুগার হাতে ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিলেন।

পরিণতিও জঘন্য করুন। হায়, এরা কী করে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সনাতন পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে বাস্তব সত্য ও জল্পনা-কল্পনার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবার মানসিকতা হারিয়ে ফেলল!

বস্তুত ইদরিস তাঁর পিতার ঔরসজাত সন্তান এবং সন্তান ঔরসের জন্যই নির্ধারিত।[১০২] নবী বংশের উপর থেকে অনুরূপ কলঙ্ক-কালিমা দূর করা বিশ্বাসীদেরই অন্যতম কর্তব্য। আল্লাহ পবিত্র, তিনি তাঁদের উপর থেকে সকল কলুষ দূর করে তাঁদেরকে যথানিয়মে পবিত্র রেখেছেন। কাজেই ইদরিসের পিতৃপরিচয় এ সকল কলুষ ও কুৎসা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এটাই কোরানের নির্দেশ। যদি কেউ এর বিপরীত ধারণা পোষণ করে, তবে সে নিজেই তার পাপের জন্য দায়ী হবে এবং পথভ্রষ্টতার অভিশাপ ডেকে আনবে।

আমি উপরোক্ত কুৎসার বিরুদ্ধে আলোচনা কিছুটা দীর্ঘায়িত করেছি। কারণ এর দ্বারা আমি এ সন্দেহের মূলোৎপাটন করতে চাই এবং বিদ্বেষপরায়ণদের মুখ বন্ধ করতে ইচ্ছা করি। কেননা আমি ইদরিসীদের প্রতি হিংসাপরায়ণ ও তাদের বংশধারায় কুৎসা আরোপকারী কোন এক ব্যক্তির মুখ থেকে স্বকর্ণে এ অপবাদ শুনেছি। সে তার ধারণা অনুসারে মাগরিবেরই কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে এর উদ্ধৃতি দিচ্ছিল। সম্ভবত সে ঐতিহাসিক সেই স্বল্পসংখ্যক লোকের অন্তর্গত, যারা ইদরিসীদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ এবং তাদের পূর্ব পুরুষদের স্মৃতির প্রতি অকৃতজ্ঞ। নতুবা মূল বিষয় সম্পূর্ণ সন্দেহের ঊর্ধ্বে ও পবিত্র। কারণ যে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই, তার সন্দেহ দূর করতে যাওয়াও এক প্রকার ত্রুটি বৈকি। তবুও আমি তাঁদের জন্য ইহজগতে বাক্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হলাম, এ আশায় যে, তাঁরাও কিয়ামতের দিন আমার হয়ে তর্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন।

আরেকটি কথা জেনে রাখা ভাল যে, যারা ইদরিসী বংশের কুৎসা রটনা করছে, তাদের অধিকাংশই ইদরিসের সন্তান-সন্ততির প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ কারণ, তারা নিজেরাও নবী বংশের অন্তর্গত কিংবা দাবিদার। কেননা এ মহান বংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া পৃথিবীর সকল জাতি ও গোত্রের নিকট অতীব মর্যাদার বিষয়। এজন্যই এর উপর এত অপবাদের আঘাত এসেছে। ফেজ ও সমগ্র মাগরিবে বসবাসকারী এ বনি ইদরিস খ্যাতি ও সম্মানের এমন এক উচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত, অন্য কারও পক্ষে তার নিকটবর্তী হওয়ার কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। কারণ তা পর্যায়ক্রমে পূর্বসূরি জাতি ও গোত্রের নিকট থেকে বর্তমান উত্তরসূরিদের নিকট এসে পৌঁছেছে। তাঁদের পিতামহ এবং ফেজের প্রতিষ্ঠাতা ও সমৃদ্ধির নায়ক ইদরিসের গৃহ তাঁদের গৃহের মাঝখানে অবস্থিত। তাঁদের মহল্লা ও পথের সম্মুখভাগেই তাঁর মসজিদ বিদ্যমান। তাঁদের শহরের উচ্চতম মিনারায় তাঁর তরবারী ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এমনি ধরনের আরও বহু স্মৃতিচিহ্ন বিরাজমান, যার সংবাদ বারংবার পর্যায়ক্রমে বর্ণিত হয়ে এতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে তা যেন চাক্ষুষ দৃষ্ট বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং নবীবংশের অন্য সকলে যখন ইদরিসীদের আল্লাহ দত্ত এ খ্যাতি ও সম্মানের দিকে তাকায়, তখন তাদের মধ্যে নবী বংশের গৌরব ও রাজকীয় মহিমার এমন কিছুই দেখতে পায় না, যা

---

১০২. এটা একটি হাদিস; ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের একটি সূত্রও বটে।

তাদের পূর্ব পুরুষগণ এ মাগরিবে অর্জন করেছেন। কাজেই তারা নিজেদেরকে নিঃস্ব ভাবতে থাকে এবং ইদরিসীদের কারও সমকক্ষ হতে পারবে না বলে নিরাশ হয়ে পড়ে।

বস্তুত নবী বংশের রক্তধারার অন্যান্য অংশীদার, যাদের ভাগ্যে এখনও অনুরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ ঘটেনি, তাঁদের উচিত নিজেদের অবস্থার উন্নতি বিধান করা। কারণ মানুষ তাঁদের বংশধারার সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাসী। অবশ্য জ্ঞান ও অনুমান, বিশ্বাস ও ধারণার মধ্যে সর্বদাই পার্থক্য বিদ্যমান।

এরূপ নিঃস্ব অবস্থার কথা যখন কেউ জানতে পারে, তখন তার নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এজন্য তাদের অধিকাংশের মধ্যে এহেন ইচ্ছা জাগ্রত হয় যে, যদি কোন প্রকার ইদরিসীদেরকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে আনা যেত! এ ইচ্ছা তাদের বিদ্বেষপ্রসূত এবং এর আকর্ষণেই তারা হিংসার শিকারে পরিণত হয়ে অপবাদের দ্বারস্থ হয়। এভাবেই বক্ষ্যমান জঘন্য কুৎসা ও মিথ্যা দোষারোপ তাদের মধ্যে জন্মলাভ করে। এর উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, নিজেদের ধারণা ও অনুমানকে অপরের উপর প্রয়োগ করে সব কিছুই সম্ভব বলে মনে করা। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

বস্তুত মাগরিবে এ সম্ভ্রান্ত নবীবংশের এমন অন্য কেউ নেই, যার বংশধারা ইদরিসীদের ন্যায় সত্য ও খ্যাতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এ সম্মান হাসানের বংশধরদেরই প্রাপ্য। বর্তমানে ফেজে এ বংশের সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত গোত্র বনি ইমরান। তাঁরা ইয়াহিয়া আল হোতী ইবনে মুহম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া আল আওয়াম ইবনে আল কাসেম ইবনে ইদরিস ইবনে ইদরিসের বংশধর। তাঁরা এ অঞ্চলে নবীবংশের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত হিসাবে তাঁদের পিতৃপুরুষ ইদরিসের গৃহে বাস করছেন। বস্তুত তাঁরাই সমগ্র মাগরিবের একচ্ছত্র নেতৃত্বের অধিকারী। যাহোক, আমরা ইদরিসীদের ইতিহাস বর্ণনার সময়, আল্লাহ্ চাহেত, তাঁদের কথা উল্লেখ করব।[১০৩]

আল মেহেদীর বংশধারা

এ সকল জঘন্য অপবাদ ও মিথ্যা মতবাদের অনুরূপ আরও একটি মতবাদ হল ইমাম আল-মেহেদীর বিরুদ্ধে প্রচারণা। আল মোহেদ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এ কীর্তিমান পুরুষ যখন আল্লাহ্র একত্ববাদ প্রচার ও পূর্ববর্তীদের অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করতে আরম্ভ করলেন, তখন মাগরিবের দুর্বল ধর্মশাস্ত্রবিদগণ তাঁর প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে তাঁর সমুদয় দাবিকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করলেন। এমন কি তাঁর অনুসারীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত নবী বংশের সাথে তাঁর সম্পর্ক নিয়েও তারা কটাক্ষ করেছেন। বস্তুত তাঁর উন্নততর অবস্থাই এ সকল ধর্মশাস্ত্রবিদদের মনে তাঁর প্রতি হিংসার জন্ম দিয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে প্রচারণার ইন্ধন যুগিয়েছে। প্রথম দিকে তারা তাঁকে নিজেদের ধারণা অনুসারে ধর্মীয় ব্যাপারে জ্ঞান ও বিচারের ক্ষেত্রে তাদের সমকক্ষ মনে করতেন। কিন্তু ক্রমশ আল-মেহেদী তাদেরকে অতিক্রম করে গেলেন; তাঁর নেতৃত্ব সকলে মেনে নিল।

---

১০৩. এর পর রোজেনথাল বনি ইমরানের বংশধারা ও তার তৎকালীন নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের মূল গ্রন্থে এটা নেই।

এতেই তারা হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠলেন এবং তাঁর সমস্ত দাবি ও ধর্মীয় মতামতকে মিথ্যা বলে প্রচার করতে লাগলেন।

এর আরও একটি কারণ হল, এ সকল ধর্মশাস্ত্রবিদ আল-মেহেদীর শত্রু লামতুনা সম্রাটদের নিকট থেকে যে প্রকার সম্মান ও সুবিধা লাভ করতেন, তা আর কারও নিকট পাবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ লামতুনা সম্রাটগণ খুবই সরল প্রকৃতির ধর্মভীরু লোক ছিলেন। তাঁদের দরবার জ্ঞানীগুণীদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকত। তাঁরা তাদের নিকট থেকে সদুপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। এ বিষয়ে প্রতি অঞ্চলের গণ্যমান্য লোকেরাই তাঁদের নিকট যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করতেন। যাহোক, এ সম্মান ও সুবিধার জন্য ধর্মশাস্ত্রবিদগণ লামতুনা সম্রাটদের ঘনিষ্ঠ অনুসারী এবং তাঁদের শত্রুদের শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে আল-মেহেদীর বক্তব্য ও সমালোচনায় পীড়িত হয়ে তাঁর উপর আক্রমণ চালালেন এবং লামতুনা সম্রাটদের সন্তুষ্টি বিধানে ও তাদের সাম্রাজ্য সংরক্ষণে এ বিরোধিতাকে কাজে লাগালেন।

অথচ আল-মেহেদীর মর্যাদা ও অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি তাদের বিশ্বাসাদির সাথেও একমত পোষণ করতেন না। পাঠক, আপনি কি ধারণা করতে পারেন যে, তিনি কিরূপ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন; যার ফলে একটি সাম্রাজ্যের বিরোধিতা এবং তদাশ্রিত ধর্মশাস্ত্রবিদদের অন্যায় আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হন! তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে ধর্মযুদ্ধের জন্য আহ্বান জানালেন এবং একটি সাম্রাজ্যের বিরাট শক্তি, অপরিমিত ঐশ্বর্য ও অগণিত সাহায্যকারী থাকা সত্ত্বেও তাকে সমূলে উৎপাটিত করে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করলেন। এ সকল যুদ্ধবিগ্রহে তাঁর অনুসারীরা কি পরিমাণ নিহত হয়েছিল, তার সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। তারা আমৃত্যু তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিল এবং তাদের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে তাঁকে রক্ষা করেছিল। তারা তাঁর মতবাদ প্রচার ও তাঁর বিশ্বাসকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্যই সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করেছিল। এর ফলে তাঁর মতবাদ সর্বাগ্রে স্থান লাভ করে সাগরের উভয় তীরে[১০৪] সাম্রাজ্য বিস্তারে সহায়ক হয়েছিল। অথচ এতদসত্ত্বেও আল-মেহেদী আমৃত্যু কৃচ্ছ্রতা; কৌমার্য ও বিপদে ধৈর্যধারণকারী এবং সম্পদ সম্ভোগে নিস্পৃহ ছিলেন। মৃত্যুর সময় তিনি কোন প্রকার পার্থিব সম্পদই রেখে যাননি। এমনকি যে সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে মানুষ মোহগ্রস্ত হয়, তাও তাঁর ছিল না। কাজেই আমার জানতে ইচ্ছে হয় যে, যদি তাঁর এ সাধ্য-সাধনার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধান না হয়, তবে তাঁর অন্য কি উদ্দেশ্য ছিল! যেহেতু এটা তাঁকে কোন পার্থিব সম্পদেরই অধিকারী করেনি। তদুপরি তাঁর উদ্দেশ্য যদি বিশুদ্ধ না হত, তাহলে তা কখনও পূর্ণতা লাভ করত না এবং তাঁর মতবাদেরও এমন ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটত না। এটাই আল্লাহ্র নিয়ম, যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে।[১০৫]

ধর্মশাস্ত্রবিদরা যে আল-মেহেদীর ফাতেমী বংশীয় হওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন, বস্তুত এর জন্য তাঁরা কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেননি। যদি মনে করা হয় যে,

১০৪. উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা ও স্পেন।
১০৫. কোরান, ৪০, ৮৫।

তিনি তা দাবি করে ফাতেমী বংশের সাথে রক্তসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন, তথাপি যেহেতু সকলেই তাঁর দাবি মেনে নিয়েছে, কাজেই তা বাতিল করবার যোগ্য প্রমাণ কোথায়! যদি তাঁরা বলেন যে, নেতৃত্ব স্ববংশীয় লোক ব্যতীত অন্যের উপর ন্যস্ত হতে পারে না, যেমন তার সত্যতা সম্পর্কে আমরা বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করব, তাহলেও এ কথা বোঝা দরকার যে, এ ব্যক্তি সমগ্র মাসমোদা গোত্রের নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন, তাঁর প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাস ও বশ্যতা স্বীকারে কোন প্রকার ত্রুটি ছিল না, এমন কি তাঁর নিজস্ব গোত্র হরগার নির্দেশও তারা মেনে চলেছে এবং এভাবেই আল্লাহ্ তাঁর মতবাদ প্রচারের ইচ্ছাকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, এ নেতৃত্ব লাভের ব্যাপারে আল-মেহেদী কখনও তাঁর ফাতেমী বংশধারার উপর নির্ভর করেননি এবং মানুষও তাঁকে এ কারণে মেনে নেয়নি; বরং হরগা-মাসমোদা গোত্রের মধ্যে তাঁর অসামান্য প্রভাব ও তাদের নিজস্ব লোক বলেই তারা তাঁকে অনুসরণ করেছে। ফাতেমী বংশের কথা মানুষ ভুলে গিয়েছিল এবং তার স্মৃতিও নিশ্চিহ্ন হয়েছিল, শুধু তাঁরাই তাঁদের মধ্যে বংশপরম্পরায় তার স্মৃতি বহন করছিলেন। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে, তাঁদের পূর্ব পরিচয় রূপান্তরিত হয়ে অনুসারীদের পরিচয়ে পরিচিত হয়েছিল। এর ফলে গোত্রপ্রীতির ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ব পরিচয় কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করেনি। সংশ্লিষ্ট গোত্রগুলোর নিকট তা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। পূর্ব পরিচয় গুপ্ত থাকবার ফলে এ প্রকার বহু ঘটনাই ঘটেছে।

এ ক্ষেত্রে বাজিলার[১০৬] নেতৃত্ব নিয়ে আরফাজা ও জরিরের মধ্যকার মতানৈক্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কীভাবে আরফাজা আখদ গোত্রের অন্তর্গত হয়েও বাজিলাদের মধ্যে মিশে গিয়েছিলেন এবং তারই দাবিতে জরিরের সাথে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় হজরত উমর (রাঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন, তা যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে। এটা হতেও পাঠক সত্যের স্বরূপ বুঝে নিতে পারবেন। বস্তুত আল্লাহ্ই সত্যের পথ প্রদর্শন করে থাকেন।

ঐতিহাসিকদের দায়িত্ব

ঐতিহাসিকদের এ সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য থেকে বহু দূরে সরে এসেছি। অবশ্য এর প্রয়োজনও ছিল। কারণ এভাবেই বহু বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও বিশ্বস্ত তথ্যবিশারদ ব্যক্তি বর্ণনায় ও মতামত প্রকাশে পদস্খলিত হয়েছেন। অতঃপর তাঁদের বর্ণিত বিষয়কে সর্বপ্রকার বিবেকবর্জিত উদাসীন প্রকৃতির লোকেরা অনুসরণ ও অনুকরণ করেছে। অবশ্য তাঁরা নিজেরাও এ সকল তথ্য বর্ণনার সময় কোন প্রকার বিচার-বিবেচনা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেননি। ফলে যেমন পেয়েছেন, তেমনভাবেই তাঁদের সঞ্চয় ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠেছে। বস্তুত এ কারণেই ইতিহাসকে কল্পকাহিনী ও বিভ্রান্তিকর বিষয়ের আধার বলে মনে করা হচ্ছে এবং তার পাঠকগণও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকারে পরিণত হচ্ছেন। ইতিহাস যেন সাধারণ মানুষের প্রতি সাধারণ সম্পত্তি!

---

১০৬. একটি গোত্রের নাম। এই ঘটনার বিবরণ পরে দেয়া হয়েছে।

অথচ একজন ইতিহাসবিদকে রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়মাবলি, সৃষ্টজগতের বিচিত্র প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি, চরিত্র, প্রথা, মত, পথ ও অন্যান্য সকল বিষয়ের দিক থেকে স্থান-কাল-পাত্রের পার্থক্যের বিষয়টি যথার্থভাবে জেনে নিতে হয়। এ সকল বিষয়ে তাঁর বর্তমানের জ্ঞান ব্যাপক ও গভীর হওয়া প্রয়োজন। যাতে তাঁর পক্ষে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে প্রাপ্ত উপকরণের সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্যের ভিত্তিতে তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হয়। কোন কোন বিষয়ে সামঞ্জস্যের কারণ ও অন্যান্য বিষয়ে অসামঞ্জস্যের কারণ তাঁকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। বিভিন্ন রাষ্ট্র ও ধর্মীয় মতবাদের ভিত্তি, তাদের প্রকাশের প্রাথমিক অবস্থাসমূহ, বিকাশ ও অনুপ্রেরণার কারণগুলো এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট মানবগোষ্ঠী ও তাদের পর্যাপ্ত তথ্যাদি জেনে নিতে হবে। ইতিহাসবিদ এ অনুসন্ধান এমনভাবে করবেন, যাতে প্রতিটি ঘটনা ও বিষয়ের উৎসমূল এবং উৎপত্তিগত কারণ সম্পর্কে তিনি অবহিত হতে পারেন। এর পর তিনি তাঁর নিজস্ব সম্পদ ব্যয় করেছিলেন, তাঁরাও গত হয়েছেন। ক্ষমতা এখন অনারবদের হাতে; যেমন পূর্বদিকে তুর্কি, পশ্চিমে বারবার ও উত্তরে ফিরিঙ্গীদের কবলিত। আরবদের সঙ্গে তাদের জীবনধারাও অনেকাংশে চলে গেছে, অবস্থা ও প্রথারও পরিবর্তন ঘটেছে। তাদের শৌর্যবীর্য বিস্মৃত হয়েছে ও তাদের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়েছে।

প্রাচীন মনীষীগণ একমাত্র এ দিক থেকে বিচার করেই ইতিহাসকে মহৎ বিষয় বলে মেনে নিয়েছিলেন। তাবারী, বোখারি ও তাঁদের পূর্বে ইবনে ইসহাক এবং তাঁদের তুল্য যোগ্য জ্ঞানীগণ এ বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকই এ বিশেষ তত্ত্বটি সম্পর্কে অবহিত নন, ফলে তাঁদের উক্ত বিষয়ে আত্মনিয়োগ মূর্খতার পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে ইতিহাস অত্যন্ত সহজ বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ, এমন কি যাদের উক্ত বিষয়ে কোন গভীর জ্ঞান নেই, তারাও ইতিহাসের পঠন-পাঠন, আহরণ, অনুসন্ধান ও অনুকরণে ব্যাপৃত হয়েছে। এর ফলে ভালর সাথে মন্দ, মজ্জার সাথে খোসা ও সত্যের সাথে মিথ্যা মিশে একাকার হয়ে গেছে। অবশ্য আল্লাহ্‌র হাতেই সমস্ত বিষয়ের শেষ পরিণাম।[১০৭]

ইতিহাসের আরও একটি গোপন ত্রুটি হল, সময় ও যুগের পরিবর্তনে জাতি ও গোত্রগুলোর মধ্যে যে অনিবার্য পরিবর্তন দেখা দেয়, তৎপ্রতি উদাসীনতা। অবশ্য এটা দৃষ্ট ক্ষতের ন্যায় অত্যন্ত সংগোপনে অবস্থান করে এবং দৃশ্যমান হতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। এজন্যই এটা অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত অন্য সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

এটা এ যে, পৃথিবী ও মানব সমাজের অবস্থা, তাদের অভ্যাস ও গোত্র চেতনা কখনও একই আকৃতি ও নির্দিষ্ট প্রকৃতিতে অবস্থান করে না। সময় ও যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে এরাও পরিবর্তিত হয়; এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় উপনীত হয়ে থাকে। এটা ব্যক্তি, যুগ ও নাগরিক জীবনের জন্য যেমন সত্য, তেমনি বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল, কাল ও সাম্রাজ্যের জন্যও বাস্তব। এটাই আল্লাহ্‌র নিয়ম, যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে এসেছে।[১০৮]

---

১০৭. কোরান, ৩১, ২২।
১০৮. কোরান, ৪০, ৮৫।

প্রাচীন পারসিক, সিরিয়ান, নেবতী, তুব্বা, বনি ইসরাইল ও কিবতী জাতিগুলো এক সময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। তারা তাদের দেশ, রাজ্য, শাসন ব্যবস্থা, শিল্পকর্ম, ভাষা, পরিভাষা ও অধীনস্থ লোকদের প্রতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ধারা ও অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। তাদের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলি থেকেই আমরা পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে তাদের অবদানের কথা জানতে পারি। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় পারসিক, বাইজেন্টাইন ও আরব জাতি তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। এর ফলে পূর্বোক্ত অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং জীবনধারা পূর্বের ন্যায় বা অনুরূপ ও তদপেক্ষা ভিন্ন আকৃতি বা প্রকৃতিতে বিশ্লিষ্ট হয়ে দেখা দেয়। এর পর মুজার সাম্রাজ্য বিস্তারে ইসলামের আবির্ভাব হয় এবং এ সকল অবস্থার সমুদয় অংশই এক বিরাট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়ায়, যার অধিকাংশ নিদর্শন বর্তমানকালেও পাওয়া যায়। উত্তরসূরিগণ এটা পূর্বসূরিদের নিকট থেকে লাভ করেছে। এর পর আরব সাম্রাজ্যও তার ঐশ্বর্যের যুগসহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যারা এ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় নিজেদের শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করেছিলেন, তারাও গত হয়েছেন। ক্ষমতা এখন অনারবদের হাতে; যেমন পূর্বদিকে তুর্কি, পশ্চিমে বারবার ও উত্তরে ফিরিঙ্গীদের কবলিত। আরবদের সঙ্গে তাদের জীবনধারাও অনেকাংশ চলে গেছে, অবস্থা ও প্রথার পরিবর্তন ঘটেছে। তাদের শৌর্যবীর্য বিস্তৃত হয়েছে ও তাদের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়েছে।

অবস্থা ও অভ্যাসের পরিবর্তনের যে কারণটি সর্বজনবিদিত, তাহল এ যে প্রতিটি গোত্রের অভ্যাস তাদের সম্রাটের অভ্যাসকে অনুসরণ করে থাকে। যেমন, প্রবাদে বলা হয় : মানুষ শাসকের ধর্ম অনুসরণ করে। সম্রাটগণ যখন কোন রাজ্য বা ক্ষমতা অধিকার করেন, তখন তাঁরা বাধ্য হয়ে পূর্বসূরিদের অভ্যাস গ্রহণ করেন। ক্রমশ তাঁরা এর কতকাংশ ত্যাগ করে নিজেদের অভ্যাসগুলোকেও এর সাথে মিশ্রিত করেন। এর ফলে রাজ্যের অনুসৃত অভ্যাসসমূহ পূর্বসূরিদের অভ্যাসের দরুন কিছুটা বিরোধিতা দেখা দেয়। এর পর যদি অন্য রাজ্যের উদ্ভব ঘটে, তাহলে নুতন অভ্যাসগুলোও এর সাথে মিশ্রিত হয়ে বিরোধের সূত্রপাত ঘটায় এবং প্রাচীনতর অভ্যাসগুলোর সাথে এ বিরোধ চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে মিশ্রণ ও বিরোধের ফলে অভ্যাসের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়। যতদিন মানবগোষ্ঠী রাজ্য ও ক্ষমতা বিস্তারে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকবে ততদিন অবস্থা ও অভ্যাসের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত ঘটবেই।

দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান ও তুলনামূলক বিচার মানুষের একটি অতি পরিচিত প্রবৃত্তি, অবশ্য এগুলো ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। উদাসীনতা ও বিস্মৃতির আকর্ষণে এগুলো মানুষকে তার উদ্দেশ্য ও গন্তব্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। অনেক সময় এমন দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি অতীত ঘটনাবলির অনেক কিছু শুনছে, অথচ ইতিমধ্যে এতে যে পরিবর্তন এসেছে, তা বুঝতে চেষ্টা করেনি; ফলে সে তার অসম্পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা দ্বিধাহীন চিত্তে বর্তমানকে বিচার করতে বসে এবং ভুল করে। অনেক সময় অতীত ও বর্তমানের মধ্যে পার্থক্য ব্যাপক হওয়ায় তার ভুলের মাত্রাও সেই পরিমাণে ব্যাপক হয়ে দাঁড়ায়।

শিক্ষকতা প্রসঙ্গ

এ প্রসঙ্গে একটি তুলনামূলক ভুলের আলোচনা করা যায়। ঐতিহাসিকগণ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের[১০৯] অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, তাঁর পিতা ইউসুফ একজন শিক্ষক ছিলেন। যদিও বর্তমানকালে শিক্ষকতা জীবিকা অর্জনের জন্য নিয়োজিত অন্যান্য পেশার ন্যায় একটি পেশা মাত্র। এর সাথে গোত্র চেতনার কোন সম্পর্ক নেই বললেও চলে। ফলে, শিক্ষকরা দুর্বল, অসহায় ও ভিত্তিহীন শ্রেণীতে পরিণত হয়েছেন। অথচ এতদসত্ত্বেও জীবিকা অর্জনের পেশায় নিয়োজিত বহু দুর্বল ব্যক্তি ও শিল্পকর্মী এমন মর্যাদার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হন, যা লাভ করবার যোগ্যতা তাঁদের নেই। তাঁদের ধারণা, ইচ্ছা করলেই তাঁরা তা পেতে পারেন। ফলে আশার ছলনায় ভুলে তাঁরা অগ্রসর হন এবং এমন একটি রজ্জু অবলম্বন করতে চেষ্টা করেন, যা অনেক সময় তাঁদের হাত থেকে ফসকিয়ে যায় ও তাঁরা ধ্বংসের পাথারে নিপতিত হন। তাঁরা এটা বুঝতে চান না যে, এ মর্যাদা লাভের যোগ্য তাঁরা নন। কারণ তাঁরা জীবিকা অর্জনের পেশায় নিয়োজিত কর্মী ও শিল্পী মাত্র। তাঁরা এটাও চিন্তা করেন না যে, ইসলামের প্রারম্ভকালে এবং উমাইয়া ও আব্বাসী শাসন আমলে শিক্ষার অবস্থা এরূপ ছিল না। শিক্ষাকে তখন আদৌ পেশা হিসাবে গ্রহণ করা হত না। বরং শিক্ষা ছিল ধর্মপ্রবর্তকের মুখ নিঃসৃত বাণী ও ধর্মের বিস্মৃত জ্ঞান পুনরুদ্ধারের এক প্রচারমূলক প্রচেষ্টা। তৎকালে সম্ভ্রান্ত বংশীয়, গোত্রচেতনাসম্পন্ন ও জাতির কর্ণধার ক্ষমতাবান ব্যক্তিরাই আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর সুন্নতের শিক্ষাদান করতেন। এটা কোন পেশাধারী শিক্ষা ছিল না, বরং ধর্ম প্রচারের মানসেই তাঁরা এতে উদ্যোগী হতেন। কারণ, কোরান তাঁদেরই মধ্যকার একজন রসূলের উপর অবতীর্ণ পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, তাঁদের অনুপ্রেরণার উৎস এবং ইসলাম তাঁদের ধর্মমত। এর জন্যই তাঁরা যুদ্ধ করেছেন ও শহীদ হয়েছেন। এরই ফলে তাঁরা সকল জাতির মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। সুতরাং এর শিক্ষা বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার বাসনা তাঁদের মধ্যেই জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। এজন্যই এ কাজে তাঁরা কোন প্রকার অহমিকার গ্লানি ও ভর্ৎসনার পীড়া অনুভব করেননি। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ, হজরত মুহম্মদ (সঃ) আরবের গোত্র প্রতিনিধিদের সাথে তাঁর শ্রেষ্ঠ সহচরদেরকে পাঠাতেন, যাঁতে তাঁরা ধর্মের বিধি-নিষেধ ও ইসলামের সৌন্দর্যকে যথাযথভাবে তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর দশজন সহচরকে[১১০] এবং অতঃপর আরও অনেককে পাঠিয়েছিলেন।

এর পর ইসলাম যখন স্থায়িত্ব লাভ করল, তার প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত হয়ে পড়ল এবং দূরদূরান্তের বিভিন্ন জাতি এসে আরবদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করল, তখন এ ধর্মমতকে ভুলভ্রান্তি থেকে রক্ষা করবার প্রয়োজন দেখা দিল। কারণ কালচক্রের আবর্তনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল এবং বিভিন্ন ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি

---

১০৯. উমাইয়া শাসন আমলে ইরাকের বিখ্যাত প্রাদেশিক শাসনকর্তা।

১১০. এরা স্বর্গলাভের সুসংবাদপ্রাপ্ত বলে খ্যাত। প্রথম চারজন খলিফা, তালহা, জুবায়ের, আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সাদ ইবনে আবি ওক্কাস, সায়িদ ইবনে জায়েদ ও আবু ওবায়দা ইবনে আল্ জাররাহ (রাঃ)।

সমাধানের জন্য কোরান ও হাদিস থেকে সূত্র বের করবার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছিল। সুতরাং জ্ঞানার্জন তখন এমন একটি বিষয়, যার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন এবং তারই আকর্ষণে তা ক্রমশ শিল্পকর্ম ও পেশায় পরিণত হল। আমরা বর্তমান গ্রন্থের শিক্ষা ও শিক্ষাদান অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করব।

অন্যদিকে গোত্রপ্রধানরা তখন একমাত্র সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসনে মনোনিবেশ করলেন এবং জ্ঞানদানের বিষয়টি অন্যদের জন্য ছেড়ে দিলেন। ফলে শিক্ষাদান অতি সহজেই জীবিকা অর্জনের পেশায় পরিণত হল। সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও রাজ্যপরিচালকগণ শিক্ষাদানকে হেয় জ্ঞান করতে আরম্ভ করলেন। সুতরাং তা দুর্বলদের করতলগত হল এবং শিক্ষাদানের সাথে শিক্ষাদানকারী ও গোত্রপ্রধান ও রাজ্যপ্রধানদের নিকট হেয় বিবেচিত হতে লাগলেন। কাজেই এ অবস্থার সাথে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের তুলনা করা চলে না। কারণ তাঁর পিতা বনি সফিকের নেতৃস্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং বনি সফিক যে গোত্রপ্রীতি ও মর্যাদার দিক থেকে কোরায়েশদের সমতুল্য বিবেচিত হত, পাঠকের তা অবশ্যই জানা আছে। তাঁর শিক্ষাদানও এ যুগের ন্যায় জীবিকা অর্জনের পেশা ছিল না, বরং তা ছিল, আমরা যেমন বর্ণনা করেছি, সেই ইসলামের প্রাথমিক যুগের ধারা অনুসারী।

বিচারক প্রসঙ্গ

অনুরূপ প্রসঙ্গে ইতিহাস পাঠক ও সমালোচকদের আরও একটি ভুল সিদ্ধান্তের আলোচনা করছি। তাঁরা অতীতকালের কাজীদের অবস্থা সম্পর্কে শুনতে পান যে, তাঁরা রাজ্য পরিচালনায় প্রভাব বিস্তার করে যুদ্ধ ও সৈন্য পরিচালনায় পর্যন্ত অংশগ্রহণ করতেন। এর ফলে তাঁদের নিজেদেরও অনুরূপ ক্ষমতা লাভের বাসনা জাগ্রত হয়। তাঁরা অতীত ও বর্তমানের কাজীদের অবস্থা একই সমান বিবেচনা করতে থাকেন। যখন তাঁরা শুনেন যে, সম্রাট হিশামের[১১১] উপর প্রভাব বিস্তারকারী তাঁর দেহরক্ষী ইবনে আবু আমেরের[১১২] পিতা এবং শেভিলার রাজন্যবর্গের অন্যতম ইবনে আব্বাসের পিতা কাজী ছিলেন, তখন তাঁরা তাঁদেরকে বর্তমানকালের কাজীদের ন্যায় মনে করেন। তাঁরা ভেবে দেখেন না যে, ইতিমধ্যে কাজীদের পদমর্যাদায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আমরা বর্তমান ইতিহাসের প্রথম গ্রন্থে এ সম্পর্কে যথাবিহিত আলোচনা করব।

বস্তুত ইবনে আবু আমের ও ইবনে আব্বাস স্পেনের উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী আরবীয় গোত্রগুলোর প্রভাবধন্য সুপরিচিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা নেতৃত্ব ও রাজ্য পরিচালনার মর্যাদা কাজী পদের প্রভাবে লাভ করেননি এবং বর্তমানের কাজী পদের সাথে তার তুলনা করাও চলে না। কারণ তৎকালে রাজ্য পরিচালনায় অংশগ্রহণকারী গোত্র ও তদীয় অনুসারীদের মধ্যেই উক্ত পদ দেয়া হত। যেমন বর্তমানে মাগরিবে মন্ত্রিত্বের বেলায় প্রযোজ্য হচ্ছে। তাঁদের যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ পালনের প্রতি পাঠক লক্ষ করুন; এটা কি গোত্রচেতনার যথেষ্ট

---

১১১. স্পেনের উমাইয়া সম্রাট।

১১২. আল মনসুর ইবনে আবু আমের, মৃত্যু ৩৯২ (১০০২ খ্রি:) হি:।

প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যতীত সম্পন্ন হতে পারত। সুতরাং শ্রোতৃবৃন্দ শোনামাত্রই যে ধারণা পোষণ করতে থাকে, তাতে বাস্তব বিচার-বিবেচনার লেশমাত্রও নেই।

বর্তমান স্পেনের আরবীয় গোত্রগুলোর দূরদর্শী বংশধরেরা অনুরূপ ভুলের কবলে পতিত হচ্ছে। আরবীয় সাম্রাজ্য ও তৎসংশ্লিষ্ট গোত্রচেতনা যেখানে বহুকালপূর্বে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এমন কি তারা বারবার গোত্রচেতনার প্রভাব থেকেও মুক্তি লাভ করেছে; এর ফলে তাদের আরবীয় বংশধারাই শুধু অবশিষ্ট আছে; কিন্তু যে গোত্রচেতনা ও পরস্পর সহযোগিতার দ্বারা খ্যাতি ও মর্যাদা অর্জন করা যায়, তার চিহ্নমাত্রও নেই। বস্তুত বর্তমানে তারা নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হয়ে অতি সাধারণ প্রজায় পরিণত হয়েছে। অথচ এতদ্‌সত্ত্বেও তারা ধারণা করে যে, তাদের বংশধারার গৌরব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাথে মিলিত হলেই তারা জয়ী ও প্রভাবশালী হয়ে উঠবে। এ কারণেই তাদের মধ্যকার বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কর্মী ও শিল্পীরা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে মর্যাদা লাভের জন্য গলদঘর্ম হচ্ছে। ফলত যে ব্যক্তি পশ্চিমের এ সমুদ্রতীরে গোত্র, গোত্রচেতনা ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অবস্থানসমূহ বিবেচনা করবে এবং বিভিন্ন জাতির সাথে প্রতিযোগিতায় ক্ষমতা লাভের সূত্রটিকে বিশ্লেষণ করবে, তার পক্ষে অনুরূপ ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা খুবই সামান্য।

ভুল বর্ণনা পদ্ধতি

অনুরূপ ভ্রান্তির আরও একটি উদাহরণ ঐতিহাসিকদের সাম্রাজ্য ও সম্রাটের ধারাবাহিকতা বর্ণনায় অনুসৃত পদ্ধতি। তা করতে গিয়ে তাঁরা সম্রাটের নাম, বংশপরিচয়, পিতার নাম, মাতার নাম, সম্রাজ্ঞীদের নাম, উপাধি, অঙ্গুরীয় এবং তৎকর্তৃক নিয়োজিত কাজী, দেহরক্ষী ও মন্ত্রীদের নাম বর্ণনা করে থাকেন। এটা উমাইয়া ও আব্বাসী যুগের ঐতিহাসিকদের অন্ধ অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাঁরা তৎকালীন যুগ-প্রয়োজনকে বিবেচনা করে দেখেন না। তৎকালে ঐতিহাসিকগণ সম্রাট ও তদীয় পুত্রকন্যার জন্য ইতিহাস রচনা করতেন। যাতে তাঁরা তাদের পূর্বসূরিদের অবস্থা ও আচরণ জানতে পেরে নিজেদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে পারেন এবং তজ্জন্য তাঁরা তা জানতে আগ্রহীও ছিলেন। সুতরাং কীভাবে পূর্ববর্তী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে জড়িত লোকদিগকে কাজে লাগাতে হবে, কীভাবে নিজেদের দাস ও অনুসারীদের মধ্যে পদ ও মর্যাদা বণ্টন করতে হবে—তার কথাও ঐতিহাসিকরা সবিস্তারে বর্ণনা করতেন। কাজীদের কথাও সেখানে থাকত। কারণ, তাঁরাও উজিরদের মতোই গোত্রচেতনার অংশীদার ছিলেন। যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। কাজেই তখন এ সকল বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু এর পর বহু বিচিত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং কালের ব্যবধানও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন শুধু রাষ্ট্রনায়কদের পরিচয়, বিভিন্ন রাষ্ট্রের শক্তি ও সংঘর্ষজনিত সম্পর্ক এবং কে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে ও কে পারবে না, তাই ঐতিহাসিক উপাদানের মূল চাহিদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বর্তমানকালের ইতিহাস রচনাকারীর পক্ষে ঐ সকল অতীত রাষ্ট্রের সম্রাট তনয়, সম্রাজ্ঞী, অঙ্গুরীয়, উপাধি, কাজী, মন্ত্রী,

দেহরক্ষী প্রভৃতির বিস্তৃত পরিচয় দানের দ্বারা কারও উপকার করবার সম্ভাবনা নেই। কারণ তাঁরা নিজেরাই এ সকল বস্তু ও ব্যক্তির শক্তির উৎস, গোত্র পরিচয় ও পদমর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন। একমাত্র প্রাচীন ইতিহাসবিদদের বর্ণনার অন্ধ অনুকরণ ও তাঁদের উদ্দেশ্যের প্রতি উদাসীনতাই তাঁদেরকে এ সকল বর্ণনার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। এর ফলে তাঁরা ইতিহাস রচনার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।

অবশ্য এমন মন্ত্রীবর্গের কথা বর্ণনা করা যেতে পারে, যাঁরা সম্রাটদের উপর তাঁদের অপরিসীম প্রভাব-প্রতিপত্তির নিদর্শন রেখে গেছেন। যেমন হাজ্জাজ, বনি মুহাল্লাব, বরমেকা, বনি সহল ইবনে নওবখত, কাফুর আল ইখশিদী, ইবনে আবু আমের ও তাঁদের ন্যায় খ্যাতিমান অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ। বস্তুত তাঁদের পিতৃপরিচয় ও অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কখনই দূষণীয় নয়। কেননা রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁরা সম্রাটদেরই অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী।

আমরা এ স্থানে আরও একটি প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করে আমাদের এ অধ্যায়ের বক্তব্য শেষ করব। তা এ যে, ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে একটি বিশেষ যুগ বা গোত্রের বিবরণ মাত্র। অবশ্য তাতে যে বিভিন্ন অঞ্চল, গোত্র ও যুগের সাধারণ অবস্থার বর্ণনা সন্নিবেশিত করা হয়; কারণ তার উপরেই ঐতিহাসিক তাঁর রচনার ভিত্তি স্থাপন করেন, তার মধ্যেই তাঁর অধিকাংশ উদ্দেশ্যের প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব হয় এবং তা থেকেই তাঁর বিবরণ দানের সূত্রগুলো বের হয়ে আসে। বস্তুত শুধু এ বিষয় নিয়েও অনেকে ইতিহাস রচনা করেছেন; যেমন মাসউদী তাঁর 'মরুজুজ্জাহাব' নামক গ্রন্থ লিখেছেন। তাতে তিনি তাঁর সমসাময়িক তিনশ ত্রিশের[১১৩] পূর্ব ও পশ্চিমের বিভিন্ন জাতি ও অঞ্চলের ব্যাপক বিবরণ প্রদান করেছেন। তিনি তাদের ধর্মমত, অভ্যাস, নগর, পর্বত, সমুদ্র, রাষ্ট্র, সাম্রাজ্য এবং আরব ও অনারব গোত্রগুলোর বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিয়েছেন। এভাবে তিনি ঐতিহাসিকদের নেতা এবং তাঁর গ্রন্থ তাঁদের ইতিহাস জ্ঞানের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা এর সাহায্যে ঐতিহাসিক বিবরণের সত্যতা যাচাই করে থাকে।

অতঃপর আল বকরী[১১৪] এ ধারায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি পূর্বসূরির সমুদয় বিষয়ের সাথে বিশেষভাবে বিভিন্ন রাজ্য ও পথ-ঘাটের বিবরণ সংযোজন করেন। কারণ তাঁর সময়ে জাতি ও গোত্রসমূহের অবস্থার মধ্যে তেমন বৃহৎ কোন পরিবর্তন ও ব্যাপক কোন বৈচিত্র্য দেখা দেয়নি। অবশ্য বর্তমানকালে, এ অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে মাগরিবের অবস্থা, আমরা যেমন দেখছি, সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। পঞ্চম শতাব্দীতে আগত আরবীয় গোত্রগুলো মাগরিবের আদিম অধিবাসী বারবারদিগকে শক্তি ও সংখ্যায় পরাজিত করে তাদের স্থান গ্রহণ করছে। তারা বারবারদেরকে অধিকাংশ রাজ্য থেকে উৎখাত করেছে এবং যেগুলো এখনও অবশিষ্ট আছে, সেখানেও অংশীদার হয়ে উঠেছে। এ অবস্থা চলাকালে অষ্টম শতাব্দীর[১১৫] মধ্যভাগে পূর্ব ও পশ্চিমের সর্বত্র

---

১১৩. ৩৩০ (৯৪০ খ্রি:) হিজরি।

১১৪. প্রখ্যাত ভূগোলবিদ্ আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মদ। জীবনকাল ৪৩২-৪৮৭ (১০৪০/৪১-১০৯৪ খ্রি:) হি:।

১১৫. খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দি।

প্লেগ এক মারাত্মক মহামারীরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। এর আক্রমণে জাতিগুলো বিনষ্ট ও গোত্রগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এটা সভ্যতার বহু মূল্যবান অবদান গ্রাস করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এ বিপদ সাম্রাজ্যগুলোতে এমন এক সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল, যখন ঐগুলো অনেকাংশে শিথিল হয়ে পড়েছে এবং তাদের স্বাভাবিক স্থিতিকাল শেষ হয়ে এসেছে। সুতরাং এ অতর্কিত আক্রমণ তাদেরকে শক্তির দিক থেকে আরও শিথিল, প্রভাবের দিক থেকে আরও খর্ব এবং শাসন ক্ষমতাকে আরও দুর্বল করে দিয়েছে। এদের অবস্থা ক্রমান্বয়ে পতনোন্মুখ ও বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছে এবং জনসংখ্যা হ্রাসের ফলে সভ্যতার গতি স্তিমিত হয়ে পড়েছে। বস্তুত নগর ও সৌধ উজাড় হয়ে গেছে, রাস্তাঘাট ও নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হয়েছে, আবাসভূমি ও গৃহ শূন্য হয়েছে এবং সাম্রাজ্য ও গোত্র দুর্বল হয়েছে। সমগ্র জনঅধ্যুষিত পৃথিবীই বদলে দিয়েছে। মনে হয় পূর্বাঞ্চলও এ মহামারীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, তবে অবশ্যই তা পশ্চিমের তুলনায় জনবসতির অনুপাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারে। এটা এমনই অকল্পনীয় যে, মনে হয় যেন পৃথিবীর অস্তিত্বই নিজের বিনষ্ট ও সংকোচের দিকে আহ্বান জানিয়েছিল এবং সে নিজেই তাতে সাড়াও দিয়েছে। আল্লাহ্ই সমগ্র জগৎ ও তার অন্তর্গত সমুদয়ের উত্তরাধিকারী।

যখন এভাবে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, তখন মনে হয়, সৃষ্টিই যেন আমূল পরিবর্তিত হয়েছে এবং পৃথিবী তার ভিত্তিসহ পাল্টে গেছে। এটা যেন এক নবীন সৃষ্টি, ভিন্ন জীবন ও অভিন্ন জগৎ। সুতরাং এ যুগের জন্য এমন একটি ঐতিহাসিকের প্রয়োজন, যিনি সৃষ্টির সামগ্রিক অবস্থা, বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রের বিবরণ, তাদের পরিবর্তিত অভ্যাস ও ধর্মমতের বর্ণনা দিতে গিয়ে মাসউদীর পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন এবং তাঁর যুগের জন্য ইতিহাসের এমন একটি ভিত্তি প্রস্তুত করে যাবেন, যাতে তাঁর পরে আগমনকারী ঐতিহাসিকগণ তাকে অনুসরণ করে অগ্রসর হতে পারেন।

আমি আমার এ গ্রন্থে মাগরিব অঞ্চলের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে যতদূর সম্ভব বিশদভাবে অথবা তার বিবরণের সাথে সংশ্লিষ্ট আকারে ও ইঙ্গিতে উপরোক্ত বিষয়াদির আলোচনা করব। কেননা আমার ইচ্ছা, আমি এ গ্রন্থটিকে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল[১১৬] অপেক্ষা বিশেষ করে মাগরিবে জাতি ও গোত্রগুলোর অবস্থা এবং রাজ্য ও সাম্রাজ্যসমূহের বিবরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। কারণ পূর্বাঞ্চলের জাতিগুলো ও তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ কোন জ্ঞান নেই এবং আমি তা যেভাবে বর্ণনা করতে মনস্থ করেছি, তাতে অপরের নিকট থেকে গৃহীত পরোক্ষ জ্ঞান কোন কাজে আসবে না। অবশ্য মাসউদীর পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল, কারণ তাঁর গ্রন্থের বর্ণনা মতে তিনি এ উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্তের অঞ্চল ও নগরগুলো ভ্রমণ করেছিলেন। তথাপি তিনি মাগরিব অঞ্চলের বর্ণনা করতে গিয়ে তার সামগ্রিক অবস্থা তুলে ধরতে পারেননি। একমাত্র তিনিই সকল জ্ঞানী অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী।[১১৭] আল্লাহ্ই সমুদয় জ্ঞানের শেষ

---

১১৬. কিন্তু কার্যত ইবনে খলদুন এ বক্তব্য অক্ষুণ্ন রাখেননি। তিনি পূর্বাঞ্চলের ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করেছেন।

১১৭. কোরান ১২, ৭৬।

আশ্রয়। মানুষ দুর্বল ও সীমাবদ্ধ এবং এ সীমাবদ্ধতার স্বীকৃতি নির্ধারণ অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ্ যার সহায়তা করেন, তার পথ সুগম এবং তার উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করে। গ্রন্থ রচনার যে উদ্দেশ্য আমার মনের মধ্যে পোষণ করছি, তার সফল বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ্র অপার সাহায্য প্রার্থনা করি। কারণ তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী ও পথপ্রদর্শক। তাঁরই উপর নির্ভর করছি।

প্রতিবর্ণীকরণ সমস্যা

শেষ করবার পূর্বে আরও একটি দায়িত্ব আমাদেরকে পালন করতে হবে। এখানে বর্তমান গ্রন্থে ব্যবহৃত অনারব ভাষার শব্দাবলির প্রতিবর্ণীকরণ সম্পর্কে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

এটা জ্ঞাত সত্য যে, আমাদের উচ্চারণে যে সকল বর্ণ ব্যবহৃত হয়, যেমন পরে এর বিশদ বিবরণ আসছে, মূলত কণ্ঠনালী নিঃসৃত ধ্বনিসমূহের বিচিত্র অবস্থা মাত্র। এ ধ্বনি কণ্ঠস্থিত আল জিহ্বা, মূর্ধা, জিহ্বার বিভিন্ন পার্শ্ব, দন্তমূল, এমন কি ওষ্ঠদ্বয়ের সাথে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কম্পনের মাধ্যমে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে এবং শ্রবণে বিশ্লিষ্ট হয়ে ধরা দেয়। মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্য গঠনে আমরা এ সকল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ধ্বনিই ব্যবহার করি। পৃথিবীর সকল জাতি একইভাবে এ সমস্ত বর্ণ উচ্চারণ করে না। অনেক জাতির মধ্যে এমন বর্ণ বিদ্যমান, যা অন্য জাতির মধ্যে নেই। পাঠক জানেন, আরবি ভাষাভাষীরা যে বর্ণসমষ্টি উচ্চারণ করে, তার সংখ্যা মাত্র আটাশ। হিব্রু ভাষায় এমন কিছু বর্ণ আছে, যা আমাদের ভাষায় নেই এবং আমাদের ভাষায় এমন কিছু বর্ণ আছে, যা তাদের ভাষায় নেই। এমনিভাবে অনারব ফিরিঙ্গী, তুর্কি, বারবার প্রভৃতি ভাষার কথা বলা যায়।

আরবের লিপিবিশারদগণ[১১৮] তাদের উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টির প্রতিটির জন্য একটি ধ্বনি প্রতীক বা বর্ণলিপির জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছিলেন, যেমন আলিফ, বে, জিম, রে, তা ইত্যাদি আটাশটি বর্ণ। এর পর তাঁদের নিকট যখন এমন শব্দ এসে উপস্থিত হত, যার বর্ণের অনুরূপ বর্ণ তাঁদের ভাষায় নেই, তখন তাঁরা তাকে লিখতে বা বর্ণনা করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতেন। অনেক সময় অনেক লিপিকর তাকে আমাদের নিজ ভাষার অনুরূপ বা প্রায় সমোচ্চারিত বর্ণের দ্বারা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এতে আগত বর্ণটির স্বরূপ প্রকাশিত হয়নি; বরং তার দ্বারা বর্ণটির মূল পরিচয় বিকৃত করা হয়েছে।

যেহেতু আমাদের এ গ্রন্থে বারবার ও অন্য অনেক অনারব জাতির বিবরণ প্রদান করা হবে, সেজন্য তাদের নাম ও শব্দাবলিতে আমরা এমন সমস্ত বর্ণের সম্মুখীন হব, যা আমাদের ভাষায় নেই। আমি এক্ষেত্রে আমাদের ধ্বনিসমষ্টির জন্য নির্ধারিত বর্ণ ব্যবহার করতে চাই না, বরং আগত বর্ণটিকে যথাসম্ভব তুলে ধরতে চাই। কারণ আমরা পূর্বেই

---

১১৮. মূলে 'আহলে কিতাব' শব্দটি আছে, এর অর্থ প্রাক্-ইসলামী, ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ও হতে পারে। কেননা আরবিলিপি বহিরাগত। রোজেনথালও পাদটীকায় এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

বলেছি যে, আমাদের বর্ণ ব্যবহারে আগত বর্ণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় না। এ উদ্দেশ্যে আমরা বর্তমান গ্রন্থে অনারব বর্ণসমূহকে উপস্থাপনের একটি বিশেষ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছি। তা এ যে, আমাদের ভাষা থেকে উক্ত বর্ণের সাদৃশ্যযুক্ত দুটি বর্ণ গ্রহণ করা হবে এবং উভয়ের অংশবিশেষ ব্যবহার করে এমন নির্দেশ দেয়া হবে, যাতে পাঠক উক্ত দুটি বর্ণের মাঝামাঝি উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা আগত বর্ণটির স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন।[১১৯]

আমি এ পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে গিয়ে কোরানের ধ্বনি ও পাঠবিশারদগণের গৃহীত পদ্ধতি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছি। তাঁরা অস্পষ্ট ধ্বনির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন; যেমন 'সেরা' শব্দ উচ্চারণে ইমাম খলফ[১২০] এর প্রথম 'সোয়াদ' বর্ণটিকে অনারব উচ্চারণের ধাঁচে 'সোয়াদ' ও 'যে' বর্ণ দুটির মাঝামাঝি উচ্চারণ করেছেন এবং লিপিতে এ উচ্চারণের পরিচয় দিতে গিয়ে 'সোয়াদ' বর্ণটির উপর 'যে' বর্ণের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ সংযোজন করেছেন। এর দ্বারা তিনি এ কথাই বোঝাতে চান যে, উক্ত বর্ণটি 'সোয়াদ' ও 'যে'-র মাঝামাঝি উচ্চারিত হবে। আমিও অনুরূপভাবেই আমাদের ভাষার দুটি বর্ণের সাহায্যে আগত বর্ণের ধ্বনিরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছি। যেমন বারবারদের দ্বারা উচ্চারিত 'কাফ'; তা আমাদের ভাষার 'কাফ' ও 'জিম' বা 'ক্বাফ' বর্ণের মাঝামাঝি উচ্চারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ 'বুলুক্কীন' শব্দটিকে নেয়া যায়। এর 'কাফ' বর্ণের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে আমি আমাদের ভাষার 'কাফ' বর্ণটির নিচে 'জিম'-এর ফোটা বা এর উপরে 'ক্বাফে'-র দুই ফোটা অথবা উভয়টিই ব্যবহার করেছি। এর দ্বারা আমি বোঝাতে চেয়েছি যে, উক্ত বর্ণটি কাফ ও জিম যা ক্বাফের মাঝামাঝি উচ্চারিত হবে। এ বর্ণটিই বারবারদের ভাষায় অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটা ছাড়া অন্যান্য যে সকল বর্ণ এসেছে, তাদের জন্যও আমি পূর্বোক্তভাবে আমাদের ভাষা থেকে দুটি বর্ণের ব্যবহার করে মাঝামাঝি উচ্চারণের নিদর্শন প্রস্তুত করেছি। যাতে পাঠক তা সহজে বুঝতে পারেন এবং যথার্থভাবে উচ্চারণ করেন। আমরা মূল অনারব বর্ণটির স্বরূপ রক্ষার্থেই এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। যদি এটা না করে আমরা তাকে আমাদের ভাষারই সাদৃশ্যমুক্ত কোন একক বর্ণের দ্বারা প্রকাশ করতাম, তাহলে আগত বর্ণটির পরিচয় বিকৃত করা হত মাত্র এবং এক ধ্বনিমূল থেকে অন্য ধ্বনিমূলে ঠেলে দেয়া হত। এ তত্ত্বটি বুঝে নেয়া দরকার। আল্লাহ্‌ই তাঁর অনুগ্রহে ও দয়ায় সত্যের দিকে নিয়ে যান।

---

১১৯. ইবনে খলদুনের বর্ণনায় বর্ণ ও ধ্বনির মধ্যকার পার্থক্য সর্বদা রক্ষিত হয়নি।

১২০. খলফ ইবনে হিশাম, সাতজন কোরান পাঠবিশারদ (ক্বারী)-এর অন্যতম; মৃত্যু ২২১ (৮৪৩/৪৪ খ্রি:) হি:।

প্রাথমিক বক্তব্য

জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন যে, ইতিহাস যথার্থ অর্থে মানুষের সামাজিক জীবন তথা মানব সভ্যতার বিবরণ দান করে। এটা সেই সভ্যতার প্রকৃতি গঠনে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন উপাদান যথা, বর্বরতা ও সামাজিকতা, গোত্রচেতনা ও মানুষের পারস্পরিক প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবহিত করে। অনুরূপ প্রচেষ্টা হতে উৎপন্ন রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য এবং বিভিন্ন পদমর্যাদা সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়। মানুষ এভাবে তার পরিশ্রম ও কর্মের দ্বারা যে উপার্জন, জীবিকা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা অর্জন করে থাকে এবং এভাবে সভ্যতার প্রকৃতিগত আকর্ষণে যে নতুন নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়, তৎসমুদয় সম্পর্কেই ইতিহাস আলোচনা করবার প্রয়াস পায়।

সম্ভবত এ কারণেই অনুরূপ বিবরণ ও আলোচনায় মিথ্যা এসে মিশ্রিত হয়। বস্তুত এমন অনেক কারণ বিদ্যমান, যদ্দরুন মিথ্যাকে পরিহার করা আয়াসসাধ্য হয়ে উঠে। তার মধ্যে একটি হল, বিশেষ মত ও পথ সম্পর্কে পক্ষপাতিত্ব। মানুষের বিবেক যখন সংবাদ গ্রহণে সাম্যাবস্থায় বিরাজ করে, তখন সে সংবাদটি সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। কিন্তু যখন তাকে কোন মত বা পথের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আচ্ছন্ন করে রাখে, তখন তার পক্ষে বিচার-বিবেচনার অবকাশ থাকে না, তার মনোঃপুত হলেই বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে। এরূপ আচ্ছন্ন ভাব ও পক্ষপাতিত্ব অবশ্যই তার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণমূলক দূরদৃষ্টির জন্য প্রতিবন্ধকস্বরূপ। সুতরাং সে এর প্রভাবে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ ও বিবরণ দানে বাধ্য হয়।

মিথ্যার অন্য একটি কারণ হল বর্ণনাকারীদের উপর অকুণ্ঠ নির্ভরতা। অবশ্য এ ব্যাপারে বিচার-বিবেচনা করতে হলে বর্ণনাসূত্রটির বিশ্বস্ততা ও দুর্বলতা পরীক্ষা করে দেখতে হয়।[১]

অনুরূপ আরও একটি কারণ, ঘটনা ও বিবরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীনতা। অনেক বর্ণনাকারীই তার দৃষ্ট ঘটনা বা শ্রুত বিবরণের উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হন না, ফলে তার নিজের ধারণা ও বিশ্বাস অনুসারে বিবরণ দিতে গিয়ে মিথ্যার কবলে পতিত হন।

---

১. ইতিহাস রচনার প্রাচীন পদ্ধতি ছিল ব্যক্তি পরম্পরায় গৃহীত ও শ্রুত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা। একে 'সনদ' বা সূত্র বলা হয়ে থাকে। এটা বিভিন্ন ব্যক্তির সমষ্টি, সুতরাং এর যথার্থতা বিচার করতে হলে সূত্রান্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তির চরিত্র বিচার করতে হয়। ইবনে খলদুন একেই 'জরহ ও তাদিল' বলে উল্লেখ করেছেন।

অন্য একটি হল, অহেতুক সত্য বলে ধারণা করা এবং এর উদাহরণ প্রচুর। এটা মূলত বর্ণনাকারীদের প্রতি দ্বিধাহীন নির্ভরতা থেকেই জন্মলাভ করে।

আরও একটি, সম্ভাব্য বাস্তবতার সাথে ঘটনার সামঞ্জস্য বিধানের অজ্ঞানতা। কারণ বহু ঘটনার বিবরণ বিকৃত ও অতিরঞ্জিত হয়ে থাকে। অথচ বর্ণনাকারী তার আনুপূর্বিক বিবেচনা না করেই লিখে ফেলে। কিন্তু বিবরণটি এর ফলে সত্য হয় না, পূর্বানুরূপ মিথ্যাই থাকে।

আরও এ যে, মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও পদমর্যাদার অধিকারী লোকদের নৈকট্য লাভের জন্য প্রশংসা ও স্তুতি প্রয়োগ করে থাকে। এর দ্বারা তারা উক্ত ব্যক্তিবর্গের অসামান্যতা ও সুখ্যাতি প্রচার করতে প্রয়াস পায়। এর ফলে প্রকৃত বিবরণ অতিরঞ্জিত হয়ে অবাস্তব প্রচারণায় পরিণত হয়। মানুষ স্বভাবতঃই প্রশংসা কাতর, তারা পৃথিবীর দিকে অতিমাত্রায় আগ্রহী এবং তার মর্যাদা ও ঐশ্বর্যের জন্য একান্তভাবে লালায়িত। তাদের অধিকাংশই সদ্‌গুণের অনুশীলনে বিমুখ এবং সৎব্যক্তিদের প্রতিও অনুরূপভাবে উদাসীন।

ইতিহাসের বিবরণে মিথ্যার অনুপ্রবেশের আরও একটি অনিবার্য ও পূর্ববর্ণিত সকল কারণ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক কারণ হল, সভ্যতার অন্তর্গত বিভিন্ন অবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা। কারণ প্রতিটি ঘটনা, তা মৌল উপাদান অথবা প্রতিক্রিয়া—যার ফলেই উৎপন্ন হোক না কেন, তার সাথে এমন একটি প্রকৃতি বিদ্যমান, যা তাকে তার মৌল উপাদান এবং ক্রিয়াশীল অবস্থার সাথে বিশ্লিষ্ট করে দেয়। সুতরাং বিবরণের শ্রোতা যদি বস্তুজগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও অবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত হয় এবং প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন করতে পারে; একমাত্র তাহলেই, তার পক্ষে বিবরণের যথার্থতা বিবেচনা করে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণ করা সম্ভব। বিচার-বিশ্লেষণে এ প্রক্রিয়ার প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন প্রক্রিয়া অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী হয়ে থাকে।

অনেক সময় শ্রোতৃবৃন্দ এমন অনেক অবাস্তব ঘটনার বিবরণ গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং তার বর্ণনাও দিয়ে থাকেন, যা একমাত্র তার বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততার জন্যই সত্য বলে মনে হয়। যেমন মাসউদী আলেকজান্ডার সম্পর্কে একটি ঘটনার বর্ণনা করেছেন। সম্রাট আলেকজান্ডার কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়া নগরী নির্মাণের সময় একটি সামুদ্রিক জীব[২] এসে বাধার সৃষ্টি করত। তিনি তার অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য কাষ্টনির্মিত সিন্দুকের ভিতর রক্ষিত স্ফটিকের একটি আধারে নিজেকে আবৃত করে সমুদ্রে নিমজ্জিত হন এবং তার তলদেশে উপনীত হয়ে সেই ভয়ঙ্কর জীবটিকে দেখতে পান এবং তার চিত্র এঁকে নিয়ে আসেন। অতঃপর সেই চিত্র অনুসারে জীবটির ধাতব মূর্তি প্রস্তুত করিয়ে নির্মাণ কার্যের সম্মুখভাগে স্থাপন করেন। এর ফলে সেই জীবটি ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে ভয়ে পালিয়ে যায় এবং নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়।

---

২. তা একটি সর্প বা ড্রাগন।

বিচিত্র অবাস্তব উপাদানের মিশ্রণে রচিত সে এক দীর্ঘ কাহিনী এবং নানা কারণে তা সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস্য। বলা হয়েছে যে, সম্রাট একটি স্ফটিকের সিন্দুকে নিজেকে আবৃত করে এবং সমুদ্রের তরঙ্গমালাকে উপেক্ষা করে তাতে নিমজ্জিত হন। বস্তুত এটা কোন সম্রাটের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সম্রাটগণ অনুরূপ বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করতে কখনও এগিয়ে আসেন না। যদি কেউ এরূপ করেন, তাহলে তিনি নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনবেন, প্রজাবৃন্দকে বিদ্রোহ করতে উৎসাহ দিবেন এবং তাঁর পরিবর্তে অন্যকে সিংহাসনে আরোহণের আহ্বান জানাবেন। কেননা এভাবে নিমজ্জন তাঁর ধ্বংসেরই নামান্তর। প্রজাবৃন্দ এ ব্যাপারে এত সুনিশ্চিত যে, তারা তাদের সম্রাটের সেই বিপজ্জনক অভিযান থেকে ফিরে আসার জন্য মুহূর্তকালও অপেক্ষা করবে না।

অন্যদিকে জিন, দৈত্য, পরীদের নির্দিষ্ট কোন আকার-আকৃতি আছে বলে জানা যায় না। বরং তারা ইচ্ছামত যে-কোন আকার ধারণ করতে পারে। আর তাদের একাধিক মস্তকের কথা যা বলা হয়েছে, তার দ্বারা তাদের ভয়ঙ্করতা ও জঘন্যতাই বোঝায়, বাস্তব অবস্থা নয়।

এ সকল দিক ঘটনাটির অবাস্তবতাই প্রমাণ করে। তদুপরি তাতে জীবের অস্তিত্ব বিনষ্টকারী এমন এটি উপাদান বিদ্যমান, যা কাহিনীর অসম্ভাব্যতা পূর্বোক্ত সকল যুক্তি অপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট করে তোলে। যদি কোন ব্যক্তি এরূপ স্ফটিকের সিন্দুকে ঢুকে সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়, তাহলে সে অচিরেই স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় বায়ুর অভাববোধ করবে এবং তার আত্মা[৩] উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। সুতরাং ঐ ব্যক্তি তার ফুসফুস ও হৃদশক্তি পরিচালনার উপযুক্ত শীতল বায়ুর অভাবে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করবে। এ কারণেই তপ্তজলের স্নানাগারে আবদ্ধ অবস্থায় শীতল বায়ুর অভাবে বহুলোকের মৃত্যু ঘটে থাকে। এভাবে গভীর কূপ ও গর্তাদিতে অবতরণকারী ব্যক্তিরা বিপদের সম্মুখীন হয়। সেখানকার আবদ্ধ বায়ু দুর্গন্ধে উত্তপ্ত হয়ে উঠে এবং বাইরের বায়ু প্রবেশ করে তাকে পরিবর্তিত করতে না পারায় সেই মুহূর্তে তাদের মৃত্যু ঘটে। অনুরূপভাবে জল থেকে বাইরে আগত মৎস্যাদির মৃত্যু হয়। কারণ স্থলভাগের উত্তপ্ত বায়ু তার ফুসফুস সহ্য করতে পারে না। জলে সে শীতল বায়ু সেবন করেছে এবং তাতেই সে অভ্যস্ত। এখন যেখানে সে এসেছে, তার উত্তপ্ত বায়ু জীবনশক্তি[৪]কে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আকস্মিক মৃত্যু ও অনুরূপ অন্যান্য মৃত্যুর মধ্যে এ সকল কারণ বিদ্যমান।

অসম্ভাব্য বিবরণের মধ্যে মাসউদী বর্ণিত আরও একটি বিবরণ হল এক প্রকার ময়না পাখির প্রতিমূর্তির গল্প। এ প্রতিমূর্তিটি রোমে অবস্থিত। বছরের নির্দিষ্ট দিনে রাজ্যের সমস্ত ময়না জলপাই বহন করে তার চারদিকে সমবেত হয় এবং রোমবাসীগণ

---

৩. মূলে 'রুহ' শব্দটি আছে। কিন্তু একটু পরেই তা কখনও হৃদশক্তি; কখনও জীবশক্তিতে পরিণত হয়েছে।

৪. গ্রিক জালিনুস (গ্যালেন) ও মুসলিম চিকিৎসাশাস্ত্রবিদদের মতে তা হৃদযন্ত্রের বাম গর্ত হতে উৎপন্ন হয়।

এ জলপাই থেকে তৈল সংগ্রহ করে। লক্ষ করুন, তৈল সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত স্বাভাবিক প্রক্রিয়া থেকে তা কতই না অসম্ভব ও অবাস্তব!

অনুরূপ অসম্ভাব্য কাহিনীর মধ্যে আল বকরী বর্ণিত 'তোরণ নগরী'[৫]র বর্ণনাকে ধরা যায়। এটা ত্রিশ দিন ভ্রমণযোগ্য দূরত্বের তুল্য বিস্তৃত ও দশ সহস্র তোরণের অধিকারী। নগরী নির্মাণের উদ্দেশ্যে দুর্গাদির দ্বারা সুরক্ষিত অঞ্চল গড়ে তোলা, যেমন সম্মুখে এর বর্ণনা আসবে; কিন্তু উপরোক্ত নগরী এরূপ সুরক্ষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ তাকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও দুর্গাদির দ্বারা সুরক্ষিত কিছুতেই সম্ভব নয়।

অনুরূপ আরও একটি মাসউদী বর্ণিত 'তাম্র নগরী'। এটা সিজিলামাসার প্রান্তরে শুধুমাত্র তাম্র ধাতুর দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে। মুসা ইবনে নুসাইর[৬] মাগরিব অভিযানে তা অধিকার করেন। উক্ত নগরীর সমস্ত তোরণ অর্গলাবদ্ধ। যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবার জন্য তার সোপান অতিক্রম করে প্রাচীরে উঠে, সে হাততালি দিতে দিতে নিম্নে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর ফিরে আসে না, এটাও গল্পকারদের রূপকথা তুল্য অবিশ্বাস্য। সিজিলামাসার সমগ্র প্রান্তর পর্যটক ও পথপ্রদর্শকরা ভ্রমণ করেছেন। তাঁরা কোথাও অনুরূপ কোন নগরীর সন্ধান পাননি। তদুপরি এতে বর্ণিত সকল অবস্থাই বিরোধী এবং কোন নগরীর নির্মাণ পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যবিহীন। অন্যদিকে ধাতব পদার্থের সম্ভাব্য পরিমাণ তৈজসপত্র ও গৃহাদির আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য যথেষ্ট হতে পারে; কিন্তু তদ্বারা কোন নগরীর সমুদয় নির্মাণকার্য সম্পন্ন করা, পাঠক নিশ্চয় লক্ষ করবেন, সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অকল্পনীয়।

এ ধরনের উদাহরণ প্রচুর। এদের বিচার-বিশ্লেষণের জন্য সভ্যতার প্রকৃতি সম্পর্কীয় জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বস্তুত বিচারের ক্ষেত্রে উক্ত জ্ঞানের প্রয়োগ সর্বোত্তম ও নির্ভরযোগ্য প্রক্রিয়া। তার দ্বারা অতি সহজে বিবরণের বিশ্লেষণ করে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণ করা যায়। বর্ণনার সূত্র বিচার অপেক্ষাও এটা কার্যকরী। কারণ, সূত্র বিচারের পূর্বেই দেখতে হবে ঘটনাটি সম্ভব কিংবা অসম্ভব। যদি অসম্ভব হয়, তাহলে সূত্রান্তর্গত ব্যক্তিচরিত্র বিচার করবার প্রয়োজন নেই। সে বিবরণের বিষয় বাহ্যিক অর্থেই অসম্ভব এবং এর তাৎপর্য বুদ্ধির অগম্য, বিশেষজ্ঞগণ তাকে সর্বদাই সন্দেহযুক্ত বলে গণ্য করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় বিবরণাদির বিশুদ্ধি নির্ণয়ে সূত্র বিচারের প্রয়োজন হয়ে থাকে। কারণ ধর্মের সমুদয় অংশই পালনীয় বিধিনিষেধের সমষ্টি। ধর্মপ্রবর্তক তাকে অবশ্য কর্তব্যরূপে প্রচার করেছেন। সুতরাং সূত্র বিচার করে তার সত্যতা যাচাই করে নেয়া দরকার। বর্ণনাকারীদের ন্যায়নিষ্ঠা ও গ্রহণ শক্তির ভিত্তিতেই উক্ত সত্যতা নির্ধারিত হতে পারে।

কিন্তু ঘটনাবলির বিবরণের ক্ষেত্রে তার বিষয়বস্তুর বাস্তবানুগ সত্যতা ও বিশুদ্ধতা প্রয়োজন। এ কারণে এর সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ সূত্র বিচার অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রাধিকারের দাবি রাখে। বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে তার সম্ভাব্যতা বিচারের অধিকার

---

৫. মাসউদীর বর্ণনায় তা একটি গ্রামের নাম। অন্যত্র 'ব্রোঞ্জ নগরী' বলেও উল্লেখিত হয়েছে।

৬. মহান সেনাপতি, যিনি মুসলমানদের পাশ্চাত্য বিজয় সমাপ্ত করেন। জীবনকাল (৬৪৩-৭১৬/১৭ খ্রি:)।

আমাদের নেই, তার সূত্র বিচার করেই তার সত্যতা জেনে নিতে হয়। কিন্তু ঘটনাবলির বিবরণ অনুরূপ নয়, তার বাস্তবানুগ সম্ভাব্যতার দ্বারাই তার গ্রহণ বর্জন নির্ধারণ করতে হবে।

অবস্থা যদি এ হয়, তাহলে বিবরণের সত্য-মিথ্যা পরীক্ষার ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা অসম্ভাব্যতার ভিত্তিতে আমাদিগকে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করতে হবে। এর জন্য মানুষের সামাজিক জীবন তথা, মানব সভ্যতার দিকে আমাদেরকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং তার সত্ত্বাগত ও প্রকৃতিগত, সম্ভাব্য বহিরাগত ও অসম্ভাব্য অনাগত অবস্থাসমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে। আমরা যদি এটা করতে পারি, তাহলে বিবরণের বাস্তবতা, সম্ভাব্যতা, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণের জন্য এমন একটি স্বাভাবিক নিয়ম আমাদের আয়ত্তে এসে পড়বে, যার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এর পর যখনই আমরা মানব সভ্যতার বিভিন্ন ঘটনাবলির বিবরণ শুনতে পাব, তখন যথার্থই তাদের গ্রহণ-বর্জন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সমর্থ হব। আমরা এর মধ্য দিয়ে এমন একটি যথার্থ মাপকাঠি নির্ধারণ করতে সক্ষম হব, যদ্বারা ঐতিহাসিকগণ তাঁদের গৃহীত বিবরণে সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে পারবেন। আমাদের প্রথম গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য এটাই।

এটা যেন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয়। এর আলোচ্য একটি, তাহল মানব সভ্যতা ও মানুষের সামাজিক আচরণ। এর সমস্যা বহু—তাহল মানব সভ্যতার সত্তাগত ও বহিরাগত অবস্থানসমূহের পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার অবস্থাই এ, সে শাখা প্রথাগত হোক বা চিন্তাগত হোক।

জানা প্রয়োজন যে, এ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত আলোচনা বিষয়ের দিক থেকে অভিন্ন, অসাধারণ ও অত্যন্ত উপকারী। এতে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের অবকাশ অতিশয় অধিক। এটা বাগ্মিতা[৭] নয়, যা যুক্তিবিদ্যার একটি শাখা মাত্র এবং যাতে অমোঘ অব্যর্থ শব্দাবলি চয়ন করে জনসাধারণের মতকে কোন বিশেষ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট অথবা বিশ্লিষ্ট করে তোলা হয়। এটা পৌরবিজ্ঞানও নয়, কারণ পৌরবিজ্ঞানের দ্বারা কোন আবাসস্থল বা নগরীর জীবনধারাকে সুশৃঙ্খল মার্জিত করে তোলা হয়। যাতে সাধারণ মানুষ এমনভাবে জীবনযাপন করতে পারে, যেন তদ্বারা তাদের অস্তিত্ব স্থিতিশীল ও সংরক্ষিত হয়। উক্ত দুটি বিষয়ের কোনটির সাথে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মিল নেই, যদিও বিষয়বস্তুর দিক থেকে অনেক সময় অনুরূপ বলে মনে হতে পারে।

নানা কারণে এটা একটি সম্পূর্ণ নতুন বিষয়। কিন্তু আমি এ বিষয়ের আলোচনা কোথাও খুঁজে পাইনি। জানিনা, এটা কি তাঁদের উদাসীনতার ফল কিংবা এ ব্যাপারে তাঁদের কোন ধারণাই ছিল না; অথবা হয়ত তারা এ বিষয় নিয়ে প্রচুর লিখেছেন, কিন্তু আমাদের নিকট তা এসে পৌঁছায়নি। কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়াদির সীমা পরিসীমা নেই এবং মানব সমাজে জ্ঞানীগুণীর সংখ্যাও অপরিমিত। আমরা উত্তরাধিকার হিসাবে যা পেয়েছি, অপ্রাপ্তির পরিমাণ তদপেক্ষা অনেক বেশি। পারসিকদের সেই জ্ঞান কোথায়, যা পারস্য বিজয়কালে হজরত উমর (রাঃ) নিশ্চিহ্ন করে দিতে বলেছিলেন।[৮]

---

৭. মূলে আছে 'ইলমুল খেতাবা'।

৮. হজরত উমরের এই নির্দেশের কথা পরে পুনরায় বর্ণিত হয়েছে।

কোথায় কেলাদিয়ান, সিরিয়ান ও ব্যাবিলনবাসীদের জ্ঞানের ঐতিহ্য! তাদের মধ্যে তার যে নিদর্শন বিদ্যমান ছিল, যে ফলশ্রুতি ঘটেছিল, তা কোথায় বিলুপ্ত হল। কোথায় গেল কিবতী ও তাদের পূর্ববর্তীদের জ্ঞানের ঐশ্বর্য! আমাদের নিকট শুধু একটি জাতির জ্ঞান-গুণই এসে পৌঁছেছে, তাঁরা হলেন গ্রিক। এটাও সম্ভব হয়েছে সম্রাট মামুনের জন্য। তিনি কষ্ট স্বীকার করে, বহু লোককে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে এবং বহুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তা সম্ভব করে তুলেছিলেন। কিন্তু এ একটি জাতি ব্যতীত অন্যান্য জাতির জ্ঞানের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না।

যেহেতু প্রতিটি তাত্ত্বিক বিকাশ প্রকৃতির দিক থেকে নিজের সত্তার সাথে কিছু পরিমাণ বহিরাগত উপাদান বহন করে, সেই জন্য প্রতিটি বোধগম্য তত্ত্বকে আলোচ্য বিষয় হিসাবে গণ্য করা উচিত। কিন্তু জ্ঞানীগণ সম্ভবত তার ফলাফলের দিকে লক্ষ করেছেন। আর ফলাফল বলতে, পাঠক যেমন লক্ষ করেছেন, ঘটনার বিবরণ মাত্র। কারণ এর আলোচ্য সমস্যাগুলো যদিও সত্তাগত ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি তার ফলশ্রুতি যেহেতু বিবরণাদির বিশুদ্ধিকরণ মাত্র, সেজন্য তাকে দুর্বল মনে করে তাঁরা পরিত্যাগ করেছেন। আল্লাহ্ই উত্তম জ্ঞাতা। 'তোমাদেরকে অতি অল্পই জ্ঞান দান করা হয়েছে।'[৯]

যে বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তাতে এমন সকল সমস্যা বিদ্যমান, যা সাধারণভাবে জ্ঞানীরা তাঁদের সংশ্লিষ্ট আলোচনায় প্রমাণসহ উল্লেখ করেছেন। বিষয় ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে এ সকল সমস্যার সাথে তাঁদের বর্ণিত সমস্যার মিল আছে। যেমন নবুয়তের প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করতে গিয়ে জ্ঞানী-গুণীরা উল্লেখ করেছেন যে, মানুষ যেহেতু তাদের অস্তিত্বের জন্য পরস্পরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী, সেজন্য তারা একজন বিচারক ও শৃঙ্খলা বিধায়কের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। যেমন শাস্ত্রীয় আইনের সূত্র আলোচনায় ভাষার প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করতে গিয়ে তাঁরা বলেন, মানুষ স্বভাবতঃই পরস্পরের সাহায্য প্রাপ্তি ও সমাজজীবন যাপনের জন্য নিজের মনোভাব প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করে এবং এর সাহায্যে তাদের জীবনযাত্রা সাবলীল হয়ে উঠে। যেমন, ধর্মশাস্ত্রবিদরা শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, ব্যভিচার বংশধারা নষ্ট করে এবং মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে। অনুরূপভাবে হত্যাকাণ্ডও অস্তিত্ব বিনষ্টকারী। উৎপীড়ন সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনে ও মানুষের অস্তিত্ব দুর্বল করে ফেলে। এ ধরনের আরও বহু শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের উদ্দেশ্য তাঁরা বর্ণনা করে থাকেন। এ সকল বর্ণনার প্রত্যেকটিই সভ্যতার সংরক্ষণ ও শৃঙ্খলা বিধানে নিয়োজিত হয়। এ কারণেই তার দৃষ্টি সভ্যতার ক্রিয়াশীল উপাদানের উপর নিপতিত হয়ে থাকে। এ সকল তুলনীয় সমস্যার আলোচনায় এ গ্রন্থে নিয়োজিত আমাদের বক্তব্য আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এভাবে পৃথিবীর বিচক্ষণ জ্ঞানীদের বিচ্ছিন্ন বক্তব্য থেকেও আমরা এ সকল সমস্যার উপর আলোকপাত ঘটতে দেখি, যদিও তাঁরা তা সম্পূর্ণ করেনি। যেমন মাসউদী

---

৯. কোরান, ১৭, ৮৫।

মোবেজানের[১০] বাণীর উল্লেখ করেছেন, তিনি পেচকের কাহিনীতে সম্রাট বাহরাম ইবনে বাহরামকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "হে সম্রাট। যে-কোন রাজ্যের সম্মান তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে, যখন তা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে তাঁর উপাসনা ও বিধি-নিষেধের সাহায্যে পরিচালিত হয়। আবার রাজ্যের সাহায্য ব্যতীত আল্লাহ্‌র ধর্মও স্থিতি লাভ করে না। অন্যদিকে রাজ্যের সম্মান লাভও মানুষ ছাড়া হয় না। মানুষের সাহায্য পেতে হলে সম্পদের প্রয়োজন। সম্পদ সমৃদ্ধি ব্যতীত লাভ হয় না। সমৃদ্ধি ন্যায়বিচারের মুখাপেক্ষী। ন্যায় বিচার এমন একটি তুলাদণ্ড, যা স্বয়ং প্রভু মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তার জন্য একজন পরিদর্শক নিযুক্ত করে দিয়েছেন—তিনিই সম্রাট।'

যেমন এরই অনুরূপ সম্রাট নওশেরোয়াঁর[১১] বাণী—'সৈনদল ছাড়া রাজ্য হয় না। সম্পদ ছাড়া সৈন্যদল গড়ে উঠে না। সম্পদের জন্য রাজস্বের প্রয়োজন আর রাজস্বের জন্য সমৃদ্ধির। সমৃদ্ধি আসে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পায় কর্মচারীদের উন্নতিবিধানে। কর্মচারীদের উন্নতি মন্ত্রীদের দায়িত্ব পালনের উপর নির্ভরশীল। আবার সকল কিছু নির্ভর করে সম্রাটের স্বচক্ষে প্রজাদের অবস্থা পরিদর্শন ও তাদেরকে শিক্ষাদানের উপর। এর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে শাসন করেন, নতুবা তারা সম্রাটকে শাসন করে থাকে।'

এরিস্টটলের নামে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে পুস্তকটি সকলের মধ্যে পরিচিত,[১২] তাতে এ প্রসঙ্গে একটি ভাল আলোচনা বিদ্যমান। যদিও তিনি তাকে পূর্ণতা দেননি ও যথাযোগ্য প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত করেননি। তদুপরি তার সাথে অন্য বিষয়ও মিশ্রিত রয়েছে। তিনি উক্ত গ্রন্থে ঐ সকল বাণীর তুল্য বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা আমরা মোবেজান ও নওশেরোয়াঁ থেকে উদ্ধৃত করেছি। তিনি ঐ বক্তব্য একটি অদ্ভুত বৃত্তের মধ্যে দীর্ঘায়িত করেছেন। তাঁর বক্তব্যটি এ—'পৃথিবী একটি উদ্যান, তার বেষ্টনী রাজ্য। রাজ্য একটি শক্তি, যদ্বারা জীবনধারণ প্রণালী নির্ধারিত হয়। জীবনধারণ প্রণালী একটি শাসনব্যবস্থা, যা সম্রাট প্রবর্তন করে থাকেন। সম্রাট একটি শৃঙ্খলা, যা সৈন্যদল রক্ষা করে। সৈন্যদল একটি সহায়তা, যা সম্পদ দ্বারা অর্জিত হয়। সম্পদ একটি আহার্য, যা প্রজাকুল সঞ্চয় করে। প্রজাবৃন্দ একটি দাসত্ব, যা ন্যায়বিচার প্রতিপালন করে। ন্যায়বিচার একটি ঐক্য, যদ্বারা পৃথিবী স্থিতিশীল হয়। পৃথিবী একটি উদ্যান' ... পুনরায় শুরু থেকে বাক্যগুলো আবর্তিত হতে থাকে।

এ সেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিচক্ষণতার পরিপূর্ণ আটটি বাক্য, যা পরস্পর, পরস্পরের সাথে গ্রথিত। পুচ্ছের সাথে তার শীর্ষকে মিলিয়ে এমন একটি বৃত্ত প্রস্তুত করা হয়েছে, যার প্রান্তদেশ খুঁজে পাওয়া যায় না। অনুরূপ বক্তব্যের অব্যর্থতা ও তার ব্যাপক উপকারিতা সম্পর্কে কথক গৌরব বোধ করতে পারেন।

---

১০. শব্দটি বহুবচন, একবচন 'মোবেজ' পারসিক পুরোহিতের উপাধি।

১১. বিখ্যাত সাসানী সম্রাট প্রথম খসরু (৫৩১-৫৭৯ খ্রি:)।

১২. পুস্তকটির নাম 'সিক্রেটাম সিক্রেটোরাম।' তার তৃতীয় অধ্যায়ে ন্যায়পরায়ণতা বর্ণনা প্রসঙ্গে উক্ত অনুচ্ছেদটি বিদ্যমান।

পাঠক! আপনি যখন বর্তমান গ্রন্থের রাষ্ট্রশক্তি ও সাম্রাজ্য অধ্যায়ে আমাদের বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দিবেন এবং যথাযোগ্য বিবেচনার সাথে বুঝতে চেষ্টা করবেন, তখন দেখতে পাবেন যে, আমরা এ বাক্যগুলোর ব্যাখ্যাই সেখানে তুলে ধরেছি। এখানে যা সংক্ষিপ্ত ছিল, তাকেই আমরা পরিপূর্ণ বিশদ বর্ণনা এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদির দ্বারা বিশ্লেষণ করেছি। এরিস্টটলের শিক্ষা ও মোবেজানের উপদেশ ছাড়াই আল্লাহ্ আমাদেরকে এটা দান করেছিলেন।

পাঠক! এরূপ আপনি ইবনে আল-মুকাফ্ফার[১৩] আলোচনাতেও দেখতে পাবেন। তিনি তাঁর পুস্তকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কীয় আমাদের গ্রন্থের অনুরূপ অনেক বক্তব্যই তুলে ধরেছেন। কিন্তু আমরা যেভাবে তাকে প্রমাণ সহযোগে বর্ণনা করেছি, তিনি তা করেননি। তিনি এ সকল বক্তব্যকে মনোজ্ঞ বর্ণনা ও আলংকারিক বাণীর নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

এভাবে কাজী আবু বকর আত্তারতুশী[১৪] তার 'সিরাজুলমুলক' নামক গ্রন্থেও আমাদের অনুরূপ বিষয় আলোচনা করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থকে যে সকল অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন এবং যে সকল সমস্যা আলোচনা করেছেন, তাও আমাদের গ্রন্থের সাথে তুলনীয়। কিন্তু তিনি যথার্থই এরূপ উদ্যোগের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা বুঝতে পারেননি এবং সমস্যার সম্পূর্ণ বিবরণ দান ও প্রমাণসহ প্রতিষ্ঠিতকরণের চেষ্টাও করেননি। একটি সমস্যার জন্য অধ্যায়ের সূচনা করেই তিনি তাতে প্রচুর পরিমাণে হাদিস ও মহাজনবাণী উদ্ধৃত করেছেন। সেখানে পর্যায়ক্রমে পারসিক জ্ঞানী যেমন বরজসমেহের[১৫] মোবেজান; ভারতীয় জ্ঞানী, দানিয়াল ও হারমিশ থেকে বর্ণিত বাণী এবং পৃথিবীর অন্যান্য জ্ঞানীগুণীদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। কিন্তু সমস্যাটিকে বিশ্লেষণের দ্বারা পরিস্ফুট এবং স্বাভাবিক প্রমাণাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেননি। তা শুধুই পর্যায়ক্রমিক বিবরণ, যা ধর্মীয় উপদেশের সাথে তুলিত হতে পারে। যেন তিনি উদ্দেশ্য স্থির করেছিলেন, কিন্তু তা পূর্ণ করেননি, তাঁর ইচ্ছাকে পরিস্ফুট করেননি এবং তাঁর সমস্যাবলিকে পূর্ণতা দিতে চাননি।

কিন্তু আমরা এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্র অনুগ্রহে অনুপ্রাণিত হয়েছি। তাঁর অশেষ জ্ঞানের দয়ায় আলোচ্য বিষয়ের সত্যতা উদ্‌ঘাটন করতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। যদি তার সমস্যাগুলোকে পূর্ণতা দান করে থাকতে পারি, যদি অন্যান্য শিল্পবিদ্যা থেকে তার পার্থক্যকে বিশদাকারে পরিস্ফুট করে থাকতে পারি, তাহলে তা আল্লাহ্র দান ও তাঁর পথ নির্দেশ। কিন্তু যদি তা না হয়ে আমার বিচ্যুতি ঘটে থাকে, যদি তার সমস্যাগুলো বর্ণনায় শিথিলতা ও অন্যায্যতা কিছু এসে থাকে, তবে বিচক্ষণ সমালোচকের নিকট অনুরোধ, তিনি যেন তা পরিশুদ্ধ করেন। অবশ্য তথাপি প্রথম অভিযাত্রীর গৌরব

---

১৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে আলা মুকাফ্ফা, মৃত্যু ৪১২ (৭৫৯/৬০ খ্রি:) হি:।

১৪. মুহম্মদ ইবনে আল ওলিদ। জীবনকাল ৪৫১-৫২০/২৫ (১০৫৯-১১২৬/৩১ খ্রি:) হি:।

১৫. সম্রাট নওশেরোয়াঁর মন্ত্রী।

আমারই থাকবে, কেননা আমিই এর পথ প্রদর্শক। বস্তুত আল্লাহ্ তাঁর আলোর দ্বারা যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করে থাকেন।[১৬]

এখন আমরা এ গ্রন্থে মানুষের সামাজিক জীবনে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন উপাদানের বর্ণনা তুলে ধরব। এর রাজ্য, উপার্জন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকর্ম প্রভৃতিকে এমনভাবে যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে বিশ্লেষণ করব, যাতে সাধারণ ও বিশেষের পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠে এবং সকল প্রকার দ্বিধা সন্দেহ দূরীভূত হয়। আমাদের বক্তব্য:

মানুষ কতিপয় বিশেষ গুণের দ্বারা সমগ্র প্রাণিজগতে বিশিষ্ট হয়ে আছে। এর মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা তাদের চিন্তার ফসল। এর দ্বারা তারা অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক এবং সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে। তাদের গুণাবলির মধ্যে অন্য একটি হল একজন শৃঙ্খলা বিধায়ক ও শক্তিধর শাসকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব। এটা ব্যতীত যেমন তাদের অস্তিত্ব সংরক্ষণ সম্ভব নয়, তেমনি এ অনুভবের সাথে অন্য কোন প্রাণীর মিল নেই। অবশ্য মধুমক্ষিকা ও পঙ্গপালের ব্যাপারে অনুরূপ গুণের উল্লেখ করা হয়। কিন্তু অনুরূপ হলেও তা তাদের সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না মাত্র, চিন্তা ও মননের ফসল নয়। উপরোক্ত গুণাবলির মধ্যে জীবিকার অন্বেষণ এবং তা করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও উপায় উপকরণের সদ্ব্যবহার করে থাকে। যেহেতু আল্লাহ্ তাদেরকে জীবনধারণ ও সংরক্ষণের জন্য আহার্যের মুখাপেক্ষী করেছেন এবং তার অন্বেষণ ও উপার্জনের পথ নির্দেশ করে দিয়েছেন; সুতরাং তাঁর বাণী : আল্লাহ্ প্রতি বস্তুকে তার সৃজন স্বভাব দান করে পুনরায় পথ নির্দেশ করেছেন।[১৭] উক্ত গুণাবলির মধ্যে সভ্যতার সৃষ্টি। তার অর্থ প্রতিবেশীর সদ্ভাব ও সহযোগিতার মাধ্যমে জীবনধারণের প্রয়োজনীয়তা পূরণের উদ্দেশ্যে কোন নগর বা সংরক্ষিত অঞ্চলে একত্র বসবাস করা। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃই জীবিকার জন্য পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আমরা এ সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করব। আবার এ সভ্যতার একটি অংশ হল যাযাবরী জীবন। দূর প্রান্তদেশীয়, পার্বত্য, বালুকাময় ও দুর্গম প্রান্তরস্থ সংরক্ষিত চারণভূমি অঞ্চলে এ ধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এরই অন্য একটি অংশ নাগরিক জীবন, যা নগর, গ্রাম, শহর ও পল্লীতে দুর্গাদি ও প্রাচীরবেষ্টিত হয়ে লীলায়িত হয়। যাহোক তার জন্য এ প্রতিটি অবস্থাতেই এমন কিছু বিষয় বিদ্যমান, যা সমাজবদ্ধতার দিক থেকে সত্তাগতভাবে তার মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। এ কারণে বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়সমূহকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা দূষণীয় হবে না বলে মনে করি।

প্রথম : সামগ্রিক মানব সভ্যতা, তার বিভিন্ন অংশ ও তৎসংশ্লিষ্ট ভূ-ভাগ।
দ্বিতীয় : যাযাবরী সভ্যতা, গোত্রসমূহ ও বর্বর জাতিগুলোর বিবরণ।
তৃতীয় : সাম্রাজ্য, খেলাফত, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রশক্তির বিভিন্ন পদমর্যাদার বর্ণনা।
চতুর্থ : নাগরিক সভ্যতা, নগর ও দেশসমূহ।
পঞ্চম : শিল্পকলা, জীবিকা এবং তৎসমুদয় অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি।
ষষ্ঠ : জ্ঞান-বিজ্ঞান, তার অর্জন ও শিক্ষাদান।

---

১৬. কোরান ২৪, ৩৫।
১৭. কোরান ২০, ৫০।

আমি যাযাবরী সভ্যতাকেই প্রথমে বর্ণনা করেছি, কারণ তাই সকলের অগ্রগামী। আমরা পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করব। অনুরূপভাবে নগর ও দেশসমূহের পূর্বে রাষ্ট্রের বর্ণনা এসেছে। অবশ্য জীবিকার বর্ণনা পূর্বে আসবার কারণ এ যে, জীবিকা স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় বিষয় এবং জ্ঞানার্জন পরিপূর্ণতা ও প্রয়োজনের সৃষ্টি। স্বাভাবিক প্রয়োজন সর্বদাই সৃষ্ট প্রয়োজন অপেক্ষা অগ্রগামী। উপার্জনের সাথে শিল্পকলাকে এনেছি এজন্য যে, তা কোন কোন দিক থেকে এবং সভ্যতার প্রয়োজনে উপার্জনের মাধ্যম। পরে এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। আল্লাহ্ ঠিক পথের সহায় ও সাহায্যকারী।

প্রথম অধ্যায়

সমগ্র মানব সভ্যতা এবং তৎসংশ্লিষ্ট কতিপয় প্রস্তাবনা

প্রথম প্রস্তাবনা

মানুষের জন্য সামাজিক জীবন অত্যাবশ্যকীয়। জ্ঞানীগণ এ প্রয়োজনকে লক্ষ করেই বলেছিলেন, মানুষ স্বভাবতঃই সামাজিক জীব। অর্থাৎ তার জন্য সমাজবদ্ধতা, যাকে তাদের পরিভাষায় নাগরিকত্ব[১] বলা হয়, তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর সভ্যতার অর্থও এটাই। এর বর্ণনা এ যে, পবিত্র আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং এমন একটি আকৃতি দান করেছেন যে, তার জীবনধারণ ও সংরক্ষণ আহার্য ব্যতীত সম্ভব নয়। আল্লাহ্ যদিও স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে উক্ত আহার্য অন্বেষণের পথ নির্দেশ এবং তা লাভ করবার শক্তি প্রদান করেছেন, তথাপি কোন একজন মানুষের পক্ষে একা তার প্রয়োজনীয় ও জীবনধারণ উপযোগী আহার্য সংগ্রহ করা একান্তই অসম্ভব। যত সামান্য আহার্যের কথাই ধরা যাক না কেন, যেমন একদিনের আহারোপযোগী গম, তাও তাকে পেষণ, মন্থন, রন্ধন প্রভৃতি একাধিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে পেতে হবে। আবার উক্ত প্রত্যেকটি কার্যের জন্য নির্দিষ্ট যন্ত্রের সাহায্য নেয়া দরকার এবং এ সকল যন্ত্র কর্মকার, সূত্রধর, কুম্ভকার প্রমুখ শিল্পীর শিল্পকর্ম ব্যতীত লাভ করা সম্ভব নয়। ধরে নেয়া হোক যে, ঐ ব্যক্তি উক্তরূপ প্রস্তুতি ছাড়াই শুদ্ধ গম চিবিয়ে খাবে, তবুও তাকে তা পেতে হলে উপরোক্ত কার্যাদি অপেক্ষাও অধিক কার্যের শরণাপন্ন হতে হবে। তজ্জন্য বীজ বপন, শস্যকর্তন, শীষ সংযুক্ত খোসা থেকে মর্দনের সাহায্যে গমের পৃথকীকরণ ইত্যাকার নানাবিধ কাজ এবং এ সকল কাজ করতে পূর্বাপেক্ষা অধিক যন্ত্রপাতি ও শিল্পকর্মের প্রয়োজন দেখা দিবে। যে-কোন একজন মানুষের পক্ষে এ সমস্ত কাজের সমুদয় বা তার কতকাংশও সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সুতরাং বাধ্য হয়ে তাকে জনশক্তির সম্মিলন ঘটাতে হবে এবং তার মাধ্যমে নিজের ও অন্যানের আহার্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। পরস্পরের এরূপ সহযোগিতায় শুধু তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় আহার্যই উৎপাদন করবে না, বরং প্রাচুর্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

অনুরূপভাবে প্রতিটি মানুষ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যও স্বজাতির সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। কারণ, পবিত্র আল্লাহ্ যখন প্রাণিকুলকে প্রকৃতির দ্বারা সুসজ্জিত করলেন এবং তাদের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনে উদ্যোগী হলেন, তখন বহু ভাষাহীন প্রাণী তাঁর নিকট থেকে মানুষ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা লাভ করল। যেমন একটি অশ্বের শক্তি

---

১. মূলে আছে 'মদিনিয়াতন'; এটা হতেই 'তামাদ্দুন' শব্দের উৎপত্তি। কারণ সভ্যতার সাথে নগরজীবনের সম্পর্ক অতি গভীর।

মানুষের শক্তি অপেক্ষা অনেকগুণ বেশি। অনুরূপভাবে গাধা ও গরুর শক্তি। সিংহ ও হাতির শক্তির আরও বহুগুণ অধিক। জীবের মধ্যে আক্রমণ করার স্বভাব যেহেতু প্রকৃতিদত্ত, সেজন্য প্রত্যেককে আল্লাহ্ এমন একটি অঙ্গ দিয়েছেন, যদ্বারা সে অপর জীবের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। এর পরিবর্তে মানুষকে দিয়েছেন চিন্তা করবার শক্তি ও হাত। চিন্তার নির্দেশে হাত বিচিত্র শিল্পসম্ভার গড়ে তুলতে সক্ষম। আর সেই শিল্পই তাকে দিয়েছে অজস্র হাতিয়ার, যা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে প্রাণীদের আঘাতকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। ক্ষতসৃষ্টিকারী শৃঙ্গের স্থলে তীর, তীক্ষ্ণ নখরের স্থলে তরবারী, পুরু চর্মের স্থলে দুর্ভেদ্য ঢাল এ প্রকার আরও অনেক। মনীষী গ্যালেন তাঁর 'ডি ইউজু পার্টিয়াম'[২] গ্রন্থে এর অনেক কিছুই বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং যে কোন একটি মানুষের পক্ষে শক্তির সাহায্যে যে কোন একটি প্রাণী, বিশেষ করে হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। সে কিছুতেই ঐ ভাষাহীন বন্য প্রাণীর সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে না। অন্যদিকে তাঁর চিন্তার ফসল, প্রতিরোধের হাতিয়ারও সে একা লাভ করতে পারবে না। কারণ তার সংখ্যা অনেক এবং তা প্রস্তুত করতে বিচিত্র সব শিল্পকর্মের সাহয্যের প্রয়োজন। এ কারণেই বাধ্য হয়ে তাকে স্বজাতির সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। বস্তুত এভাবে পরস্পরের সহযোগিতা না হলে তার আহার্য লাভ করবার অন্য কোন পথ নেই। আর যেহেতু আল্লাহ তার জীবনধারণের জন্য তাকে আহার্যের মুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন, সেজন্য তা ব্যতীত তার জীবনও পরিপূর্ণতা লাভ করবে না। অস্ত্রব্যতীত আক্রমণ প্রতিরোধ করাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে হিংস্র প্রাণীদের শিকারে পরিণত হয়ে অকালে জীবন ত্যাগ করবে। এভাবে মানব জাতি পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু পরস্পরের সহযোগিতা সম্ভব হলে তার আহার্যও জুটবে, আক্রমণ প্রতিরোধের অস্ত্রও হাতে আসবে এবং মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও সমৃদ্ধি সাধনের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্র মহান উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করবে। এ কারণেই মানুষের জন্য এ সমাজবদ্ধ জীবন অত্যন্ত আবশ্যকীয়। অন্যথায় তাদের অস্তিত্ব পূর্ণতা লাভ করবে না এবং আল্লাহ্ তাঁর প্রতিনিধিত্ব প্রদানের মাধ্যমে তাদের দ্বারা পৃথিবীর সমৃদ্ধি বিধানের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, তাও বাস্তবায়িত হবে না। এটাই সভ্যতার অর্থ এবং একেই আমরা আমাদের বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়রূপে নির্বাচন করেছি।

উপরোক্ত আলোচনায় আলোচ্য বিষয়ের অস্তিত্বের এমন একটি প্রমাণ বিদ্যমান যা স্বয়ং আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত। যদিও কোন বিষয়ের অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়া আলোচকের অবশ্য কর্তব্য নয়। যেমন যুক্তিবিদ্যায় নির্ধারিত হয়েছে যে-কোন বিষয়ের আলোচনাকারীর জন্য উক্ত বিষয়ের আলোচ্যের অস্তিত্ব[৩] সপ্রমাণ করবার প্রয়োজন

২. মূলে আছে 'কিতাবু মানাফেউল আযা' অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপকার সম্পর্কীয় গ্রন্থ।

৩. জ্ঞান-বিজ্ঞানে এমন অনেক মৌলিক উপাদান আছে, যা স্বতঃসিদ্ধ। যেমন গণিতের সংখ্যা, পদার্থবিজ্ঞানের বস্তু। ইবনে খলদুনের বিষয়টি হল সভ্যতা বা মানব সমাজ।

নেই। অবশ্য তা নিষিদ্ধও নয়। সুতরাং তার প্রমাণ করা একান্তই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ব্যাপার। আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহে সহায় হোন।

অতঃপর মানুষ যখন সমাজ জীবনের প্রতিষ্ঠা করল, যেমন আমরা বর্ণনা করেছি, সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হল, তখন তাদের জন্য এমন একজন শৃঙ্খলা বিধায়কের প্রয়োজন, যিনি সামাজিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। কারণ মানুষ স্বভাবতঃই পাশবিক আচরণ ও উৎপীড়নে অভ্যস্ত। ভাষাহীন প্রাণীর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তারা যে সকল অস্ত্র নির্মাণ করেছে, তদ্বারা তাদের স্বজাতির আক্রমণ ঠেকানো সম্ভব নয়। কারণ তা তাদের সকলেরই আছে। কাজেই অন্য এমন কিছু প্রয়োজনীয়, যা তাদের পরস্পরের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়। তা অবশ্যই অন্য প্রাণীদের মধ্য থেকে হওয়া সম্ভব নয়; কেননা তাদের মধ্যে মানবোচিত অনুভূতি ও অনুপ্রেরণার একান্তই অভাব। সুতরাং উক্ত শৃঙ্খলা বিধায়ক তাদের মধ্য থেকেই এমন একজনকে হতে হবে, যিনি তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার, শক্তি ও দৌর্দণ্ড প্রতাপে পরস্পরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হবেন। এটাই রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এ আলোচনায় পাঠকের নিকট এটা অবশ্যই পরস্ফুট হয়েছে যে, এ ব্যবস্থা স্বভাবতঃই মানুষের জন্য বিশিষ্ট এবং প্রয়োজনীয়। কখনও এটা ভাষাহীন প্রাণীদের মধ্যেও পাওয়া যায়, যেমন জ্ঞানীরা মধুমক্ষিকা ও পঙ্গপাল সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যেও নির্দেশ আনুগত্য ও অনুসরণের স্বভাব লক্ষ্য করা গেছে। তারা নিজেদের মধ্য থেকেই বিশেষ চরিত্র ও দেহের অধিকারী কাউকে নেতা হিসাবে মেনে থাকে। কিন্তু মানুষ ব্যতীত অন্য প্রাণীদের মধ্যকার এ স্বভাব তাদের সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না মাত্র। শুধু মানুষই একে শাসন ও চিন্তার ফসল হিসাবে গ্রহণ করেছে। তিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার সৃজনস্বভাব দিয়েছেন, অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন।[৪]

দার্শনিকগণ নবুয়তের অস্তিত্ব স্বপ্রমাণ করবার জন্য যুক্তিবিচারের দ্বারস্থ হয়ে উক্ত আলোচনা অপেক্ষা অধিক বর্ণনা করে থাকেন। তাঁরা বলেন, এটা স্বভাবতঃই মানুষের জন্য বিশিষ্ট। অতঃপর উপরোক্ত আলোচনার পুনরুল্লেখ করে বলেন, মানুষের জন্য একজন শৃঙ্খলা বিধায়কের অস্তিত্ব অবশ্য প্রয়োজনীয়। এর পর বলেন, অবশ্য এ ব্যবস্থা ধর্মীয় নির্দেশের দ্বারা স্থিরীকৃত হবে এবং আল্লাহ্র নিকট থেকে কোন ব্যক্তিবিশেষ তা লাভ করবেন। ঐ ব্যক্তি অবশ্যই তাদের মধ্যে বিশিষ্ট হবেন। কারণ, আল্লাহ্ তাঁর মধ্যে পথ নির্দেশের এমন গুণাবলি অর্পণ করে থাকেন, যদ্বারা তিনি অতি সহজেই মান্য ও গৃহীত হতে পারেন। সুতরাং তাঁর চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত মানুষ স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আল্লাহ্র বিধি-নিষেধকে তাঁদের জীবনে গ্রহণ করে থাকে।

পাঠক, লক্ষ করে থাকবেন, জ্ঞানীদের এ আলোচনা একান্তই যুক্তিহীন। কারণ মানুষের অস্তিত্ব ও জীবন এটা ছাড়াও পরিপূর্ণতা লাভ করে থাকে। কোন প্রশাসক

---

৪. কোরান ২০, ৫০।

নিজেই তার ব্যবস্থা করতে পারেন অথবা গোত্রচেতনার মাধ্যমে মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে তাঁকে অনুসরণ করতে বাধ্য করতে পারেন। বস্তুত গ্রন্থধারী নবীর অনুসারীদের সংখ্যা গ্রন্থহীন মুজসী[৫]দের অপেক্ষা অনেক কম। এ বিশ্বের অধিবাসীদের অধিকাংশই তারা। অথচ এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের মধ্যে শুধু জীবন নয়, সাম্রাজ্য ও ঐতিহ্যও বিদ্যমান। বর্তমানকালেও তারা অনুরূপভাবে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের শীতোষ্ণ অঞ্চলগুলোতে জীবনযাপন করছে। তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাহীন নৈরাজ্য বিরাজ করছে, এটা ধারণা করাও অসম্ভব।

পাঠক! এটা দ্বারা আপনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে, নবুয়তের অনিবার্যতার জন্য তাঁরা যে যুক্তি বিচারের প্রয়োগ করেছিলেন, তা একান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ। বস্তুত নবুয়ত যুক্তির দ্বারা প্রমাণের বিষয় নয়। তা যথার্থই ধর্মীয় বিশ্বাসের ফসল। প্রাচীন মনীষিগণের এটাই অভিমত। আল্লাহ্‌ই সহায়তা ও পথ নির্দেশের অধিকারী।

---

৫. মজুসী বলতে সাধারণভাবে জরাস্থপন্থীদেরকে বুঝায়। ইসলামের প্রাথমিক ধারণায় এদেরকে পৌত্তলিক মনে করা হত। কিন্তু পরে তাদের নবী আছে কিন্তু গ্রন্থ নেই—এ ধারণা পোষণ করা হয়। ইবনে খলদুন এ শব্দের দ্বারা সাধারণভাবে পৌত্তলিকদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন।

১. দক্ষিণ	৪১. মকরান
২. পশ্চিম	৪২. কিরমান
৩. উত্তর	৪৩. ফারেস
৪. পূর্ব	৪৪. বাহলুস
৫. উষ্ণতার জন্য বিষুব রেখার বাইরের শূন্য ভূমি।	৪৫. আজর বাইজান
৬. বিষুব রেখা	৪৬. মরুভূমি
৭ লামলাম অঞ্চল	৪৭. খোরাসান
৮. মেগজাওয়া অঞ্চল	৪৮. খোয়ারজম
৯. কানেম	৪৯. পূর্ব ভারত
১০. বরনো	৫০. তাশখন্দ
১১. গাওগাও	৫১. সোগাদ
১২. জাগাই	৫২. চীন
১৩. তাজুইন	৫৩. তাগুজগুজ
১৪. নুবিয়া	৫৪. গাসকুনিয়া
১৫. আবিসিনিয়া	৫৫. বরতানিয়া
১৬. ঘানা	৫৬. কালব্রিয়া
১৭. লামতা	৫৭. ফ্রান্স
১৮. সুস	৫৮. ভেনিস
১৯. মরক্কো	৫৯. জার্মানি
২০. তাঞ্জিয়ার	৬০. মেসিডোনিয়া
২১. সিনহাজা	৬১. বহেমিয়া
২২. দরআ	৬২. জাসুলিয়া
২৩. আফ্রিকিয়া	৬৩. জারমানিয়া
২৪. ফেজ্জান	৬৪. বায়লাকান
২৫. জারিদ	৬৫. আর্মেনিয়া
২৬. কাওয়ার	৬৬. তাবারিস্তান
২৭. বারনিশ মরুভূমি	৬৭. আলান
২৮. মধ্য ওয়েসিস	৬৮. বশখির
২৯. উর্ধ্ব মিশর	৬৯. বুলগার
৩০. মিশর	৭০. ওয়েখনাক
৩১. বেজা	৭১. মুস্তেনা
৩২. হেজাজ	৭২. উজার ভূমি
৩৩. সিরিয়া	৭৩. মাজুজ
৩৪. ইয়ামেন	৭৪. গোজ
৩৫. ইয়ামামা	৭৫. তুরকিশ
৩৬. বসরা	৭৬. আধকিশ
৩৭. ইরাক	৭৭. খাওলক
৩৮. শিহর	৭৮. ইয়াজুজ
৩৯. উম্মান	৭৯. কিরমাক
৪০. পশ্চিম ভারত	৮০. শৈত্যের জন্য উত্তরে অবস্থিত শূন্য ভূমি।

দ্বিতীয় প্রস্তাবনা

[সভ্যতা অধ্যুষিত ভূভাগ এবং তন্মধ্যস্থ সমুদ্র, নদনদী ও বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে]

এটা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, পৃথিবীর অবস্থা পর্যবেক্ষণকারী জ্ঞানীদের গ্রন্থাবলিতে[৬] এটা গোলাকার বলে বর্ণিত হয়েছে। এটা চতুর্দিক থেকে জলীয় উপাদান দ্বারা বেষ্টিত এবং একটি আঙুরের ন্যায় জলের উপর ভাসমান।

আল্লাহ্ যখন পৃথিবীর উপর প্রাণিকুল সৃষ্টি করতে মনস্থ করলেন এবং মানব জাতিকে সমগ্র সৃষ্টির উপর তাঁর প্রতিনিধিত্ব দান করে তার সমৃদ্ধি বিধানে তৎপর হলেন, তখন পৃথিবীর অনেক অংশ থেকে জল সরিয়ে নেয়া হল। এর ফলে অনেকে ধারণা করেন যে, জল পৃথিবীর নিম্নে অবস্থান করছে; কিন্তু এটা সঠিক নয়। পৃথিবীর স্বাভাবিক নিম্ন বলতে তার অভ্যন্তরস্থ তল ও ভূগোলকের মধ্যভাগকে বোঝায়; তাই এর কেন্দ্রস্থল এবং প্রতিটি বস্তু তার ভারানুসারে তার দিকে আকর্ষিত হচ্ছে। এই কেন্দ্র ব্যতীত সকল কিছুই এর প্রান্ত ভাগ। সুতরাং যে জলরাশি পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে, তা তার উপরিভাগে অবস্থান করছে। যদিও পৃথিবীর যে-কোন অংশকে তার বিপরীত দিকের সাথে তুলনা করেই জল তার নিম্নে আছে বলে বলা হয়ে থাকে।

পৃথিবীর যে অংশ থেকে জল সরিয়ে নেয়া হয়েছে, তা ভূ-পৃষ্ঠে অর্ধাংশ জুড়ে বৃত্তাকারে অবস্থান করছে। তার চতুর্দিকে যে জলীয় উপাদান পরিবেষ্টন করে আছে, তাকে 'পরিবেষ্টনকারী সাগর' বলে অভিহিত করা হয়। একে দ্বিতীয় লামের উচ্চারণ গাঢ় করে 'লাবল্যায়া'[৭]ও বলা হয়ে থাকে। এর অন্য নাম 'উকিয়ানুস'। সকলই অনারব নাম। আবার একে বলা হয় 'সবুজ সাগর' ও 'কৃষ্ণ সাগর'।

জল নিষ্কাশিত পৃথিবীর যে অংশে মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তাতে জনবসতিপূর্ণ এলাকা অপেক্ষা জনবিরল এলাকাই অধিক। আবার এ জনবিরলতা উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকেই অধিকতর দেখা যাচ্ছে। জনবসতিপূর্ণ এলাকাটি একটি সমতল বৃত্তাকারে দক্ষিণ থেকে ক্রমশ উত্তর দিকে ভূ-বিষুর রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে। উত্তর দিকে

---

৬. এ প্রস্তাবনায় প্রদত্ত সমুদয় বিবরণ মুহম্মদ আল ইদরিসীর (১০৯৯/১১০০-১১৬২ খ্রি:) গ্রন্থ 'নূজহাতুল মুশতাক' হতে গৃহীত। সিসিলীর শাসক দ্বিতীয় রোজারের (১১২৯-১১৫৪ খ্রি:) জন্য এ গ্রন্থটি রচিত হয়। এজন্য ইবনে খলদুন বারবার এ গ্রন্থকে 'রোজার' গ্রন্থ নামে উল্লেখ করেছেন।

৭. এ শব্দটিকে বিকৃত বলে মনে করা হয়। এর মূল 'আল আবশ্যায়া' হতে পারে বলে অনেকের মত এবং এটা 'আটলান্টা' শব্দের বিকৃতি। কিন্তু উক্ত ধারণার সপক্ষে কোন যুক্তি নেই। রোজেনথাল একে রোমান শব্দ 'আল মারে' হতে ব্যুৎপন্ন বলে ধারণা করেন।

একটি বৃত্ত রেখার নিকট তা যেখানে শেষ হয়েছে, তার পশ্চাতে উক্ত রেখা ও বেষ্টনকারী জলীয় উপাদানের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে এক পর্বতশ্রেণী এবং তাদের মধ্যেই ইয়াজুক-মাজুজের প্রাচীর বিদ্যমান। এ পর্বতশ্রেণী ক্রমশ পূর্বদিকে বিস্তৃত হয়ে গেছে এবং তা পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে জনবসতি বেষ্টনকারী বৃত্তরেখার দুটি অংশে জলীয় উপাদানের সাথে মিলিত হয়েছে।

জ্ঞানীরা বলেন, জল নিষ্কাশিত পৃথিবীর এ অংশ ভূগোলের অর্ধেক কিংবা তদপেক্ষা কম এবং তার এক-চতুর্থাংশ মাত্র জনবসতিপূর্ণ। তা সাতটি অঞ্চলে বিভক্ত। ভূ-বিষুব রেখা এ পৃথিবীকে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে দুভাগে ভাগ করেছে। তাই পৃথিবীর দৈর্ঘ্য-এ ভূগোলকের দীর্ঘতম রেখা। যেমন ক্রান্তিবৃত্ত ও খ-বিষুব বৃত্ত আকাশের দীর্ঘতম বৃত্ত। ক্রান্তিবৃত্ত তিনশ ষাটটি অংশে বিভক্ত এবং প্রতিটি অংশ পৃথিবীর দূরত্ব অনুসারে পশ্চিম ফরসং[৮] বিস্তৃত। প্রতিটি ফরসং বার হাজার হাত অর্থাৎ তিন মাইল[৯]। কেননা প্রতিটি মাইলের দৈর্ঘ্য চার হাজার হাত এবং হাতের পরিমাণ চব্বিশ অঙ্গুলি। একটি অঙ্গুলির পরিমাণ হল, ছয়টি যবের দানাকে পেট ও পিঠে পরস্পর মিলিয়ে যে দূরত্বের সৃষ্টি হয়, তা।

যে খ-বিষুব রেখা আকাশকে দুইভাগে ভাগ করেছে এবং যা ভূ-বিষুব রেখার সমান্তরাল, তা থেকে মেরুদ্বয়ের প্রত্যেকটির দূরত্ব নব্বই অংশ। কিন্তু ভূ-বিষুব রেখার উত্তরদিকস্থ জনবসতি অঞ্চল মাত্র চৌষট্টি অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর অবশিষ্ট অংশ অতিরিক্ত শীত ও জড়তার জন্য জনবসতিশূন্য। যেমন তার দক্ষিণদিকস্থ অঞ্চল সম্পূর্ণটাই অতিরিক্ত উষ্ণতার জন্য জনবসতিহীন। আল্লাহ্ চাহেত আমরা এ সম্পর্কে যথাস্থানে বর্ণনা করব।

উক্ত জনঅধ্যুষিত অঞ্চল ও তার সীমা এবং তন্মধ্যস্থ গ্রাম, নগর, পর্বত, সমুদ্র, নদী, প্রান্তর ও বালুকাময় মরু সম্পর্কে টলেমী[১০] তাঁর ভূগোল গ্রন্থে ও পরবর্তীকালে 'রোজার' গ্রন্থ[১১] প্রণেতা তাঁর গ্রন্থে সংবাদ প্রদান করেছেন। তাঁরা উক্ত জনবসতিকে সাতভাগে ভাগ করে প্রতি ভাগকে 'একলিম' (অঞ্চল) নামকরণ করেছেন। তাঁরা উক্ত সপ্তাঞ্চলের যে সীমা নির্ধারণ করেছেন, তা কাল্পনিক। এ অঞ্চলগুলো সমান প্রস্থ ও অসমান দৈর্ঘ্যসহ পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। প্রথম অঞ্চলটির পরবর্তী অঞ্চল অপেক্ষা ও দ্বিতীয়টি তৃতীয়টি অপেক্ষা বৃহৎ এবং এভাবে শেষ পর্যন্ত। সুতরাং সপ্তম অঞ্চলটি সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ভূ-গোলকের জল নিষ্কাশিত বৃত্তাকার ভূমি সংস্থানের জন্যই এরূপ হয়েছে। তাঁদের মতে এ অঞ্চলসমূহের প্রতিটি আবার পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বিস্তৃত পরস্পর সন্নিহিত দশটি অংশে বিভক্ত। এর প্রতিটি অংশের জন্য জনবসতি ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংবাদ বিদ্যমান।

---

৮. মূলে 'ফরসখ' আছে। এর ফারসি উচ্চারণ ফরসং, আমরা এটাই গ্রহণ করলাম।

৯. ইংরেজি মাইলের সাথে এর মিল নেই। ঐ অনুপাতে প্রায় সোয়া মাইল। এক ক্রোশের অর্ধেক।

১০. সপ্ত অঞ্চলের এ বিভাগ টলেমীর গ্রন্থে নেই বা তিনিই এটা প্রথম করেননি। এটা গ্রিক মনীষার দান।

১১. ৬নং টীকা দ্রষ্টব্য।

সমুদ্র

তাঁরা বর্ণনা করেছেন যে, পৃথিবী বেষ্টনকারী সমুদ্র থেকে চতুর্থ অঞ্চলের পশ্চিম দিক দিয়ে বিখ্যাত রোম সাগর বের হয়ে এসেছে। এটা তাঞ্জিয়ার ও তারিকের মধ্যবর্তী 'যুকাক' (জিব্রাল্টার) নামক প্রায় বার মাইল প্রশস্ত প্রণালী থেকে আরম্ভ হয়ে ক্রমশ পূর্বদিকে ছয়-সাত মাইল প্রশস্ত হয়েছে এবং চতুর্থ অঞ্চলে চতুর্থ অংশের শেষ প্রান্তে এসে সমাপ্ত হয়েছে। প্রারম্ভস্থল থেকে এর শেষ প্রান্তের দূরত্ব এক হাজার একশ ষাট মাইল। এখানে সিরিয়ার তীরভূমি অবস্থিত। এর দক্ষিণ দিকে মাগরিবের তীরভূমি; এর প্রথম প্রণালী তীরবর্তী 'তাঞ্জিয়ার', এর পর 'আফ্রিকিয়া', এর পর 'বুরকা' ও 'আলেকজান্দ্রিয়া'। এর উত্তরে প্রণালী তীরবর্তী 'কনস্টান্টিনপোল'। এর পরে ভেনিস, রোম, ফ্রান্স ও স্পেন—তাঞ্জিয়ারের বিপরীত জিব্রাল্টার সন্নিকটবর্তী 'তারিফ'। একে রোম ও সিরিয়া সাগর বলা হয় (ভূমধ্যসাগর)। এতে অনেকগুলো জনবসতিপূর্ণ বৃহৎ দ্বীপ বিদ্যমান। যেমন—ক্রীট, সাইপ্রাস, সিসিলী, মেজোরেশ সার্দানিয়া ও দানিয়া।[১২]

তাঁরা বলেছেন যে, উক্ত ভূমধ্যসাগর থেকে উত্তর দিক দিয়ে দুটি প্রণালীর মাধ্যমে আরও দুটি সাগর বের হয়ে গেছে। উক্ত প্রণালী দুটির একটি কনস্টান্টিনপোলের বিপরীত দিকে অবস্থিত। তা উক্ত সাগর থেকে এক তীর নিক্ষেপের সমতুল্য প্রশস্ত প্রণালীর দ্বারা আরম্ভ হয়ে ক্রমশ তিনদিনের পথ অতিক্রম করেছে এবং কনস্টান্টিনপোলের সাথে মিলিত হয়েছে। অতঃপর চার মাইল প্রশস্ত হয়ে ষাট মাইল দূরত্ব অতিক্রম করেছে। এর এ অংশকে কনস্টান্টিনপোল প্রণালী বলা হয়। এর পর তা ছয় মাইল প্রশস্ত একটি মুখ নিয়ে কৃষ্ণসাগর[১৩] পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তথা থেকে এ সাগর পূর্বদিকে গমন করে হিরাক্লিয়া অঞ্চলে (বিথীনিয়া) পৌঁছেছে এবং 'খাজারদের' দেশে গিয়ে শেষ হয়েছে। মুখ থেকে এ স্থানের দূরত্ব এক হাজার তিনশ মাইল। এর উভয় তীরে বাইজেন্টাইন, তুর্কি, বুলগার ও রুশ জাতির লোকেরা বাস করছে।

ভূমধ্যসাগরের প্রণালীদ্বয়ের একটি থেকে দ্বিতীয় যে সাগরটি বের হয়েছে তা ভেনিস সাগর। এটা বাইজেন্টাইন অঞ্চলের উত্তর প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং পর্বতের সন্নিকটবর্তী হয়ে পশ্চিম দিকে ভেনিস অঞ্চল অভিমুখে ফিরে গেছে। এটা 'এ্যাকুইলিয়া' অঞ্চলে গিয়ে শেষ হয়েছে। এর প্রারম্ভ স্থল থেকে শেষ প্রান্তের দূরত্ব এক হাজার একশ মাইল। এর দুই তীরে বাইজেন্টাইন, ভেনিস ও অন্যান্য জাতি বাস করে। একে ভেনিস উপসাগর বলা হয় (এ্যাড্রিয়াটিক সাগর)।

তাঁরা বলেছেন যে, উক্ত বেষ্টনকারী সাগর থেকে পূর্বদিকে এবং ভূ-বিষুব রেখার ভেতর অংশ উত্তরে এক বিরাট ও প্রশস্ত সাগর বিদ্যমান। এটা কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হয়ে প্রথম অঞ্চলে পৌঁছেছে এবং পুনরায় পশ্চিম দিকে এসে উক্ত অঞ্চলের পঞ্চমাংশে আবিসিনিয়া ও নিগ্রোদের দেশ স্পর্শ করেছে। প্রারম্ভ স্থল থেকে বাবেল মান্দব পর্যন্ত এর দূরত্ব চার হাজার পাঁচশ ফরসং। একে চীন, ভারত ও আবিসিনিয়া সাগর (ভারত মহাসাগর) বলা হয়। এর দক্ষিণ দিকে নিগ্রো এবং বারবারদের দেশ, যার কথা

---

১২. দাপিয়া বলে কোন দ্বীপের অস্তিত্ব নেই। এজন্য রোজেনথালের অনুবাদে এটা বাদ পড়েছে।

১৩. মূলে আছে 'বছরু পিতাশ'।

কবি ইমরুল কায়েস তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এ বারবারগণ মাগরিব অঞ্চলের বারবার নন। অতঃপর এ সাগরের তীরে 'মগাদিশু', 'সুফালা' ও 'ওয়াক ওয়াক'[১৪] দেশ এবং অন্যান্য অনেক জাতি বর্তমান। এর পরে জনবসতিহীন প্রান্তর। উক্ত সাগরের উত্তর দিকে প্রারম্ভ স্থলে চীন, পরে ভারত, সিন্ধু (পশ্চিম ভারত) এবং এর পরে ইয়ামেনের তীরভূমিস্থ আল আহকাফ ও জবিদ প্রভৃতি শহর এর শেষের দিকে নিগ্রোদের দেশ এবং এর পরে আবিসিনিয়া অবস্থিত।[১৫]

তাঁরা বলেছেন যে, উক্ত আবিসিনিয়া সাগরের (ভারত সাগরের) বাবেল মান্দবস্থ শেষ প্রান্ত থেকে আরও একটি সাগর সংকীর্ণ আকারে বের হয়ে উত্তর ও কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং দ্বিতীয় অঞ্চলের পঞ্চমাংশে অবস্থিত 'আল কুলযুম' শহরে শেষ হয়েছে। প্রারম্ভ থেকে এর দূরত্ব এক হাজার চারশ মাইল। একে কুলযুম ও সুয়েজ সাগর (লোহিত সাগর) বলা হয়। এর ও মিশরের 'ফুসতাত' শহরের মধ্যকার দূরত্ব তিন দিবসের পথ। এ সাগরের পূর্ব তীরে ইয়ামেন, হেজাজ, জেদ্দা ও এর শেষ প্রান্তে মাদায়েন আয়লা ও ফারান অবস্থিত রয়েছে। এর পশ্চিম তীরে সাইদ, আয়জাব, সুয়কিন ও যায়লা এবং এর পরে প্রারম্ভ স্থলের নিকট আবিসিনিয়া ও শেষ প্রান্তে রোম সাগরের আবিশের দিকে 'কুলযুম' বর্তমান। উক্ত দুই সাগরের মধ্যকার ব্যবধান ছয় দিবসের পথ। ইসলাম ও ইসলাম পূর্ববর্তী বহু সম্রাটই এ উভয় সাগরের মধ্যবর্তী স্থলভাগকে খনন করবার ইচ্ছা পোষণ করেছেন, কিন্তু তা সমাপ্ত হয়নি।

উক্ত আবিসিনিয়া সাগর (ভারত সাগর) থেকে সিন্দুদেশ ও ইয়ামেনের আল-আহকাফের নিকটে আরও একটি সাগর বের হয়েছে; তাকে সবুজ সাগর বলা হয়। এটা ক্রমশ উত্তর ও কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হয়ে দ্বিতীয় অঞ্চলের ষষ্ঠাংশে অবস্থিত বসরার উবলাতীর ভূমিতে শেষ হয়েছে। প্রারম্ভস্থল থেকে এর শেষ প্রান্তের দূরত্ব চারশ চল্লিশ ফরসং। একে পারস্য সাগর বলা হয়। এর পূর্বতীরে সিন্ধু, মকান, কেরমান, ফারেস ও শেষপ্রান্তে উবুলা এবং এর পশ্চিম তীরে বাহরাইন, ইয়ামামা, উম্মান, আশ্‌শিহর ও তার প্রারম্ভস্থলে আল-আহকাফ অবস্থিত। উক্ত সাগর ও কুলযুম সাগরের মধ্যস্থলে আরব উপদ্বীপ বিদ্যমান। তা যেন ক্রমশ সাগরে প্রবেশ করেছে। এ কারণেই তার দক্ষিণদিকে আবিসিনিয়া সাগর, পশ্চিমে কুলযুম সাগর ও পূর্বে পারস্যসাগর বিদ্যমান। এ উপদ্বীপের অন্য প্রান্ত সিরিয়া ও বসরার মধ্যবর্তী এক হাজার পাঁচশ মাইল বিস্তৃত ভূ-ভাগে ইরাকের সাথে মিলিত হয়েছে। এ অঞ্চলেই কুফা, কাদেসিয়া, বাগদাদ, খসরুর দরবার ও হীরা অবস্থিত। এর পরবর্তী অঞ্চলে অনারব জাতি, যেমন তুর্কি, খাজার প্রভৃতির লোকেরা বাস করে। আরব উপদ্বীপের পশ্চিমাংশে হেজাজ, পূর্বাংশে ইয়ামামা, বাহরাইন, উম্মান ও দক্ষিণাংশে ইয়ামেন অবস্থিত এবং ইয়ামেনের তীরভূমি আবিসিনিয়া সাগর সংলগ্ন।

---

১৪. এর অর্থ খুব পরিষ্কার নয়; এতে আফ্রিকার সমগ্র পূর্ব উপকূল, মাদাগাস্কার, সুমাত্রা, এমনকি জাপানকেও বুঝাতে পারে।

১৫. রোজেনথাল আবিসিনিয়া স্থলে 'বেয়া'র কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে 'হাবশা' বর্তমান।

তাঁরা বলেছেন যে, জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে দায়লাম দেশের উত্তরে অন্যান্য সাগর থেকে বিচ্ছিন্ন একটি সাগর বিদ্যমান। তাকে জুরজান ও তাবারিস্তান সাগর (কাস্পিয়ান সাগর) বলা হয়। তা দৈর্ঘ্যে এক হাজার ও প্রস্থে ছয়শ মাইল বিস্তৃত। তার পশ্চিমে আজর বাইজান ও দায়লাম, পূর্বে তুরস্ক ও খোয়ারজিন, দক্ষিণে তাবারিস্তান এবং উত্তরে খাজার ও আলানদের দেশ।

এটাই ভূগোলবিদগণ কর্তৃক বর্ণিত সাগরসমূহের সমুদয় বিবরণ।

নদী

তাঁরা বলেছেন যে, এ জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে বহু নদনদী বিদ্যমান। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ চারটি হল নীল, ফুরাত (ইউফ্রেটিস), দজলা (টাইগ্রিস) এবং বলখের নদী, যাকে জাইহুন (অক্সাস) নদী বলা হয়।

নীলনদ ভূ-বিষুব রেখার পশ্চাদবর্তী প্রথম অঞ্চলের চতুর্থাংশের দিকে ষোল অংশে অবস্থিত একটি বৃহৎ পর্বত থেকে বের হয়েছে। উক্ত পর্বতের নাম 'কুমার'।[১৬] পৃথিবীতে তার ন্যায় উচ্চ পর্বত আর নেই। তা থেকে প্রচুর ঝর্ণা নির্গত হয়ে কতকাংশ একটি স্থানীয় হ্রদে এবং কতকাংশ অন্য একটি হ্রদে পতিত হয়েছে। অতঃপর উক্ত দুটি হ্রদ থেকে নদনদী উৎপন্ন হয়ে ভূ-বিষুব রেখার নিকটবর্তী একটি হ্রদে এসে মিশেছে। উক্ত পর্বত থেকে এ হ্রদের দূরত্ব দশ দিবসের পথ। এ হ্রদ থেকে দুটি নদী বের হয়েছে। এর একটি উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে প্রথমে নুবা এবং পরে মিশর দেশ অতিক্রম করেছে। মিশর অতিক্রম করবার সময় এটা একাধিক সন্নিহিত শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং উক্ত প্রতিটি শাখাকে 'খাল' বলা হয়ে থাকে। উক্ত সকল খালই আলেকজান্দ্রিয়ার নিকটে রোম সাগরে পতিত হয়েছে। এ নদকে মিশরীয় নীল বলা হয়। এর পূর্ব তীরে সাইদ ও পশ্চিম তীর ওয়েসীস। অন্য নদটি ক্রমান্বয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে বেষ্টনকারী সাগরে পতিত হয়েছে। একে সুদান নদী[১৭] বলা হয় এবং তার তীরাঞ্চলে সুদানী জাতির লোকেরা বাস করে।

ফুরাত নদী পঞ্চম অঞ্চরের ষষ্ঠাংশে অবস্থিত আর্মেনিয়া থেকে উৎপন্ন হয়ে ক্রমশ দক্ষিণ দিকে রোম (আনাতোলিয়া), মালটায়া, মানবিজ, সিফিফন, 'আর্‌রুক্কা,' কুফা অতিক্রম করত বসরা ও ওয়াসিতের মধ্যবর্তী জলাভূমিতে এসে উপনীত হয়েছে এবং সেথাস থেকে আবিসিনিয়া সাগরে এসে পড়েছে। গমনপথে বহু উপনদী এর সাথে মিলিত হয়েছে এবং তা থেকে বহু শাখানদী বের হয়ে দজলাতে পতিত হয়েছে।

দজলা নদীও আর্মেনিয়ার 'খেলাত' অঞ্চলের ঝর্ণাধারায় উৎপন্ন হয়েছে এবং গতিপথে মোশেল, আজর বাইজান, বাগদাদ ও ওয়াসিত হয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এখানে উক্ত নদী বহু খালে বিভক্ত হয়ে বসরা হ্রদে পড়েছে এবং সেখান থেকে পারস্য সাগরে এসে পতিত হয়েছে। পূর্বদিকে এটা ফুরাতের ডান পার্শ্বে প্রবাহিত হয়েছে এবং চতুর্দিক থেকে বহু বৃহৎ উপনদী তার সাথে মিলিত হয়েছে। দজলা ও

---

১৬. টলেমী 'কমর' বলেছেন, যার অর্থ চন্দ্র।

১৭. একে সুদানীয় নীলও বলা হয়।

ফুরাতের মধ্যবর্তী অঞ্চল, তার প্রারম্ভ স্থল থেকে ফুরাতের উভয় তীরস্থ সিরিয়া এবং দজলার তীরস্থ আজরবাইজানের সম্মুখ ভাগ পর্যন্ত মোশেল উপদ্বীপ নামে খ্যাত।

জাইহুন নদী তৃতীয় অঞ্চলের অষ্টমাংশে অবস্থিত বলখের একাধিক ঝর্ণার স্রোতধারা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর গতিপথে বহু বৃহৎ উপনদী এর সাথে এসে মিশেছে। এটা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে প্রথমে খোরাসান ও পরে পঞ্চম অঞ্চলের অষ্টমাংশে অবস্থিত খোয়ারজিমে উপনীত হয়েছে। সেখানে থেকে এটা জুরজান শহরের পাদদেশে অবস্থিত জুরজান (আরল) হ্রদে এসে পড়েছে। এটা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে একমাসের পথ সমতুল্য দূরত্বে বিস্তৃত এবং এতে তুরস্কদেশ থেকে উৎপন্ন ফরগানা ও আশ্‌শাশ (তাসখণ্ড) নদী[১৮] এসে পতিত হয়েছে। জাইহুন নদীর পশ্চিম তীরে খোরাসান ও খোয়ারজিম এবং পূর্ব তীরে বুখারা, তিরমিজ ও সমরকন্দ। এর পরবর্তী অঞ্চলে তুরস্ক, ফরসানা ও খাজরজ (খাকুল) এবং অন্যান্য অনারব জাতির বাস।

বাতলিমুস (টলেমী) তাঁর ভূগোলে ও আশ্‌শরীফ (আল-ইদরিসী) তাঁর রোজার গ্রন্থে এতদ্‌সম্পর্কে প্রচুর বর্ণনা দান করেছেন। তাঁরা জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর পর্বত, সমুদ্র ও প্রান্তরসমূহের সচিত্র ও পরিপূর্ণ ভৌগোলিক বিবরণ তুলে ধরেছেন। এদের অধিকাংশেই আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। বস্তুত আমাদের প্রয়োজন বারবারদের আবাসভূমি মাগরিব এবং আরবদের আবাসস্থল পূর্বাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। আল্লাহ্‌ই সহায়ক।

---

১৮. এর বর্তমান নাম 'শির দরিয়া'।

দ্বিতীয় প্রস্তাবনার সংযোজন

[পৃথিবীর দক্ষিণ চতুর্থাংশ অপেক্ষা উত্তর চতুর্থাংশের জনবসতির আধিক্য ও তার কারণ।]

আমরা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্বস্ত বিবরণের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে, জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়টি অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বসতি বিরল। উক্ত অঞ্চলদ্বয়ে যে পরিমাণ বসতি বিদ্যমান, তাও শূন্যভূমি, প্রান্তর ও মরুভূমির দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এর পূর্বদিকে ভারত সাগর অবস্থিত। উক্ত অঞ্চলের জনসংখ্যা যেমন অল্প তেমনি তার গ্রাম ও শহরের সংখ্যাও নগণ্য। কিন্তু তৃতীয়, চতুর্থ ও তৎপরবর্তী অঞ্চলসমূহের অবস্থা অনুরূপ নয়। তাতে প্রান্তর কম এবং মরুভূমিও অনুরূপ বা নেই বললেও চলে। এখানে জাতি ও জনসংখ্যা উভয়েই সীমা অতিক্রম করেছে এবং তার গ্রাম ও নগর উভয়েই সংখ্যার দিক থেকে অগণিত। তৃতীয় অঞ্চল থেকে ষষ্ঠ অঞ্চল পর্যন্ত জনবসতির অবস্থা একই প্রকার। দক্ষিণ দিক সম্পূর্ণ প্রাণিশূন্য। জ্ঞানীগণ এর কারণ স্বরূপ বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত অঞ্চল অত্যধিক উষ্ণ এবং সূর্য অতি অল্পই তার মধ্য থেকে অপসৃত হয়ে থাকে। আমরা প্রমাণসহ এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা করব। এর ফলে উত্তরদিগস্থ তৃতীয় ও চতুর্থ অঞ্চল থেকে পঞ্চম ও সপ্তম[১৯] অঞ্চল পর্যন্ত জনবসতির প্রাচুর্যের রহস্যটি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, উত্তর ও দক্ষিণ আকাশের ধ্রুবনক্ষত্র যখন দিগ্বলয়ের উপর বিরাজমান হয়, তখন সেখানে একটি বৃহৎ বৃত্তের সৃষ্টি হয়ে আকাশকে দুইভাগে ভাগ করে। বস্তুত এটা একটি বৃহত্তম বৃত্ত, যা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে আবর্তন করে থাকে এবং একে বলা হয় খ-বিষুব বৃত্ত। জ্যোতির্বিজ্ঞানে যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, ঊর্ধ্বাকাশ আহ্নিক গতিতে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে আবর্তন করবার ফলে তার সাথে তার অভ্যন্তরস্থ সমুদয় আকাশই আবর্তন করতে বাধ্য হয়। এ গতি অনুভবযোগ্য। এরূপভাবে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, সমুদয় নক্ষত্রই তাদের আকাশে (কক্ষপথে) উক্ত গতির বিপরীত পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে আবর্তন করে থাকে। নক্ষত্রের গতির দ্রুততা ধীরতার জন্য তাদের আবর্তনকালের মধ্যে তারতম্য ঘটে থাকে। নক্ষত্রসমূহের স্ব স্ব আকাশমণ্ডলে আবর্তনের সমান্তরালে ঊর্ধ্বাকাশে এমন একটি বৃহৎ বৃত্ত বিদ্যমান, যা তাকে দুইভাগে ভাগ করে থাকে। এটাই ক্রান্তি বৃত্ত এবং এটা বারটি রাশিতে বিভক্ত। তা, যেমন যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে, রাশিসমূহের বিপরীত দুটি বিন্দুতে খ-বিষুব

---

১৯. ষষ্ঠ অঞ্চলের কথা সম্ভবত ভুলে বাদ পড়েছে।

রেখাকে ছেদ করে। উক্ত বিন্দু দুটির একটি মেষরাশির আরম্ভস্থলে অবস্থিত। এভাবে খ-বিষুব রেখাও ক্রান্তি বৃত্তকে দুইভাগে ভাগ করে। এর একটি অংশ খ-বিষুব বৃত্ত থেকে উত্তর দিকে মেষরাশির আরম্ভ থেকে কন্যা রাশির শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং অন্যটি এর দক্ষিণ দিকে তুলারাশির প্রারম্ভ থেকে মীনরাশির শেষাংশ পর্যন্ত প্রসারিত। যখন পৃথিবীর সর্ব প্রান্তীয় দিগ্বলয়ের উপর ধ্রুবতারকা দুটি বিরাজমান হয়, তখন ভূ-পৃষ্ঠের উপর এমন একটি রেখা কল্পিত হয়ে থাকে, যা খ-বিষুব রেখার বিপরীতে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে প্রসারিত। একে ভূ-বিষুব রেখা বলা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ধারণা করেন যে, উক্ত রেখা সপ্ত অঞ্চলের প্রথমটির প্রারম্ভ দেশের উপর দিয়ে প্রসারিত হয়ে গেছে। তার উত্তর দিকেই সমগ্র জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল।

উত্তর ধ্রুবনক্ষত্র যখন এ জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের দিগ্বলয়ে ক্রমাগত উদিত হয়ে চৌষট্টি অংশে উপনীত হয়, সেখানেই জনবসতির শেষ এবং তাই সপ্তম অঞ্চলের শেষাংশ। যখন উক্ত নক্ষত্র আরও উদিত হয়ে নব্বই অংশে উপনীত হয় এবং এটাই ধ্রুবনক্ষত্র ও খ-বিষুব রেখার মধ্যকার যথার্থ দূরত্ব, তখন ধ্রুবনক্ষত্র খ-মধ্যে ও খ-বিষুব রেখা দিগ্বলয়ে বিরাজ করে উত্তরদিগস্থ ছয়টি রাশি দিগ্বলয়ের উপরে ও দক্ষিণদিগস্থ ছয়টি রাশি দিগ্বলয়ের নিম্নে অবস্থান করতে থাকে। উপরোক্ত চৌষট্টি অংশ থেকে নব্বই অংশ পর্যন্ত স্থানে জনবসতি সম্ভব নয়। কেননা এতদুভয়ের মধ্যে সময়ের দূরত্বের জন্য শৈত্য ও উষ্ণতার মধ্যে কোন প্রকার মিশ্রণ সম্ভব হয়ে উঠে না এবং প্রাণের বিকাশও এ কারণে অসম্ভব।

সূর্য মেষ ও তুলারাশির প্রারম্ভভাগে ভূ-বিষুব রেখার উপর খ-মধ্যে অবস্থান করে। অতঃপর এটা খ-মধ্য থেকে কর্কট ও মকররাশির প্রারম্ভের দিকে নেমে যায়। খ-বিষুব রেখা থেকে সূর্যের এ আয়তনের শেষ সীমা হল চব্বিশ অংশ। এর পর যখন উত্তর ধ্রুবনক্ষত্র দিগ্বলয়ের উপরে উঠতে থাকে, তখন তার উত্থানের সমপরিমাণে খ-বিষুব রেখাও খ-মধ্য থেকে সরে যেতে থাকে। দক্ষিণ ধ্রুবনক্ষত্রও অনুরূপভাবে ত্রয়ীর[২০] গতির সমতা রক্ষা করে নিম্নগামী হয়। এটাই সময় নির্ধারকদের নিকট স্থানীয় অক্ষাংশ বলে অভিহিত হয়। খ-বিষুব রেখা যখন খ-মধ্য থেকে সরে যেতে থাকে, তখন তার কর্কটরাশির প্রারম্ভভাগে উপনীত হওয়া পর্যন্ত উত্তর রাশিসমূহ খ-মধ্যে উঠে আসে এবং দক্ষিণ রাশিসমূহ অনুরূপভাবে দিগ্বলয়ের নিচে মকর রাশির প্রারম্ভ ভাগ পর্যন্ত নেমে যায়। কারণ, আমরা যেমন পূর্বেই বলেছি যে, এ রাশিগুলো ভূ-বিষুব রেখার দিগ্বলয়ে উত্তরে ও দক্ষিণে সরে গিয়ে থাকে।

অতঃপর উত্তর দিগ্বলয় ক্রমশ উপরে উঠে উত্তর দিকের মেষ প্রান্তে খ-মধ্যে কর্কট রাশির প্রারম্ভভাগে এসে উপনীত হয়। এটাই সেই অবস্থা, যাতে আরবের হেজাজ ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের অক্ষাংশ চব্বিশ অংশ হয়ে থাকে। এটাই সেই অয়ন, যদ্বারা কর্কট রাশির প্রারম্ভ খ-বিষুব রেখা থেকে ভূ-বিষুব রেখার দিগ্বলয়ে উত্তর ধ্রুবনক্ষত্রের উত্থানের অনুপাতে উত্থিত হয়ে খ-মধ্যে উপনীত হয়। যখন ধ্রুবনক্ষত্র চব্বিশ অংশের অধিক উপরে উঠে আসে, তখন সূর্য খ-মধ্য থেকে সরে যায় এবং তার এ অয়ন ধ্রুবের চৌষট্টি

২০. ত্রয়ী বলতে উত্তর ধ্রুবনক্ষত্র, খ-বিষুব রেখা ও দক্ষিণ ধ্রুবনক্ষত্র বুঝাচ্ছে।

অংশে উপনীত হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। এভাবে সূর্য যতটা নিচে নামে, দক্ষিণ ধ্রুবনক্ষত্রও সেই অনুপাতে দিগ্বলয়ের নিচে অবতরণ করে। এর ফলে অত্যধিক শৈত্য ও জড়তার জন্য এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য উক্ত অবস্থার সাথে উষ্ণতার মিশ্রণ না ঘটবার ফলে প্রাণের বিকাশ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

সূর্য খ-মধ্যে ও তৎসন্নিহিত অবস্থায় থাকাকালে পৃথিবীর উপর সমকোণে রশ্মি বিকিরণ করে থাকে এবং অন্যান্য অবস্থায় এ বিকিরণস্থল ও সূক্ষ্মকৌণিক হয়ে পড়ে। সুতরাং সমকৌণিক বিকিরণের ফলে সূর্যরশ্মির তাপ ও প্রসার সূক্ষ্মকোণ ও স্থূলকোণ অপেক্ষা অধিক হয়। এর ফলে সূর্যের খ-মধ্যে ও তৎসন্নিহিত অবস্থায় থাকাকালে অন্যান্য অবস্থা অপেক্ষা উষ্ণতার আধিক্য ঘটে। কারণ এ সূর্যকিরণই তাপ ও শুষ্কতার কারণ। সূর্য ভূ-বিষুব রেখার উপরে মেষ ও তুলারাশির প্রারম্ভভাগে খ-মধ্যে বছরে দুইবার অবস্থান কলে। তা থেকে সূর্যের অয়ন খুব দূরবর্তী হয় না। তার কর্কট ও মকররাশির প্রারম্ভভাগের দিকে অয়ন ও সেখান থেকে খ-মধ্যে প্রত্যাবর্তনকালে উষ্ণতার মধ্যে কোন প্রকার সাম্য পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং সূর্যের সমকোণে বিকিরিত রশ্মিমালা দিগ্বলয়ের উপর অধিক মাত্রায় পতিত হয়ে দীর্ঘস্থায়ী অথবা চিরস্থায়ী হয়ে উঠে। এর ফলে বায়ু উষ্ণতায় জ্বলতে থাকে এবং এর আধিক্য দেখা দেয়। অনুরূপভাবে সূর্য যখন ভূ-বিষুব রেখার পরে চব্বিশ অক্ষাংশের মধ্যে দুইবার অবস্থান করে, তখনও দিগ্বলয়ে বিকিরিত সূর্যের উত্তাপ ভূ-বিষুব রেখার অবস্থানের সমতুল্য হয়ে থাকে। এর ফলে বায়ু শুষ্কতায় তীব্র হয়ে উঠে এবং প্রাণের বিকাশকে অসম্ভব করে তোলে। কারণ অত্যধিক উষ্ণতায় জল ও অন্যবিধ আর্দ্রতা শুষ্ক হয়ে যায় এবং ধাতবপদার্থ, বৃক্ষলতা ও জীবজন্তুর সজীবতা নষ্ট করে দেয়। বস্তুত আর্দ্রতা ব্যতীত প্রাণের বিকাশ কখনই সম্ভব নয়।

যখন কর্কটরাশির প্রারম্ভ খ-মধ্য থেকে পঁচিশ অংশে নেমে যায় এবং ক্রমাগত নামতে থাকে, তখন সূর্য ও খ-মধ্য থেকে ঢলে পড়ে। এর ফলে উষ্ণতার মধ্যে একটা সমতা বা তদনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং প্রাণের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠে। এ অবস্থা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলে সূর্যকিরণের স্বল্পতার জন্য অত্যধিক শীত দেখা দেয়। সূর্যরশ্মির স্থূলকৌণিক বিকিরণের জন্যই এরূপ ঘটে এবং এর ফলে প্রাণের বিকাশ নষ্ট হয় বা হ্রাস পায়। অবশ্য অত্যধিক উষ্ণতার ফলে প্রাণের বিনষ্টি অত্যধিক শৈত্য অপেক্ষা সর্বদাই অধিক হয়ে থাকে। কারণ উষ্ণতা শুষ্কাবস্থা সৃষ্টিতে শৈত্যজনিত জড়তা অপেক্ষা অধিক তৎপর। এর জন্যই প্রথম ও দ্বিতীয় অঞ্চলে জনবসতির স্বল্পতা এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অঞ্চলে মধ্যাবস্থা। কারণ, সূর্যরশ্মির স্বল্পতার জন্য সেখানে উষ্ণতার মধ্যে একটি সাম্যাবস্থা বিরাজমান। ষষ্ঠ ও সপ্তম অঞ্চলে জনবসতি অধিক। কারণ সেখানে উষ্ণতার স্বল্পতা বর্তমান। শৈত্য প্রথমাবস্থায় উষ্ণতার তুল্য প্রাণের বিকাশকে নষ্ট করে না। কারণ তাতে শুষ্কতা নেই। অবশ্য অতিরিক্ত হওয়ার ফলে তার মধ্যেও এক প্রকার অনার্দ্রতা দেখা দেয়, যেমন সপ্তম অঞ্চলের পরে হয়ে থাকে। এ সকল কারণেই পৃথিবীর উত্তর চতুর্থাংশে জনবসতির আধিক্য ও প্রাচুর্য বিদ্যমান। আল্লাহ্ই উত্তম জ্ঞাতা।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ সকল কারণ সম্মুখে রেখে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ভূ-বিষুব রেখা ও তৎপরবর্তী অঞ্চল জনবসতিশূন্য। কিন্তু পর্যবেক্ষণ ও বিশ্বস্ত সংবাদাদি তাঁদের এ সিদ্ধান্তের বিপরীত, তাতে জনবসতি আছে বলে ধারণা জন্মায়। তাহলে তাঁরা অনুরূপ সিদ্ধান্ত কি করে গ্রহণ করলেন? প্রকাশ থাকে যে, তাঁরা সম্পূর্ণ জনবসতিশূন্যতার কথা বলতে চাননি। যুক্তি প্রমাণ তাঁদেরকে এ কথাই বলাতে চেয়েছে যে, অত্যধিক উষ্ণতার জন্য সেখানে প্রাণের বিকাশ বিঘ্নিত হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণেই তাতে জনবসতি অসম্ভব বা প্রায় অসম্ভব বলা যায়। অবস্থা এরূপই। ভূ-বিষূব রেখা ও তার পরবর্তী অঞ্চলে, যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, যদি জনবসতি থেকেও থাকে, তবে তা খুবই নগণ্য।

ইবনে রুশদ[২১] ধারণা পোষণ করেন যে, ভূ-বিষুব রেখাস্থ অঞ্চল সমভাবাপন্ন এবং তার পরবর্তী দক্ষিণ উত্তরাঞ্চলের ন্যায়। সুতরাং তাতে উত্তরাঞ্চলের সমতুল্য জনবসতি বিদ্যমান। তাঁর এ ধারণা প্রাণের বিকাশ বিঘ্নিত হওয়ার দিক থেকে অসম্ভব বলে মনে হয়। ভূ-বিষুব রেখার দক্ষিণ দিকে জনবসতিশূন্যতার কারণ এই যে, উক্ত অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠে জলীয় উপাদান দ্বারা আচ্ছাদিত। এটা উত্তরাঞ্চলের প্রাণের বিকাশযোগ্য ভূ-ভাগের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। যেহেতু সমভাবাপন্ন অঞ্চলেই অতিরিক্ত জল প্রাণের বিকাশকে বিঘ্নিত করে, সুতরাং অন্যান্য অঞ্চল এর অনুরূপই হবে। কারণ জনবসতি পর্যায়ক্রমিকভাবে হয়ে থাকে এবং এর পর্যায়ক্রম অস্তিত্বের সম্ভাব্যতার দিক থেকেই বিচার করা হয়, অসম্ভাব্যতার দিক থেকে নয়। ভূ-বিষুব রেখার সন্নিহিত অঞ্চলে প্রাণের বিকাশ অসম্ভব বলে তিনি যে মত পোষণ করেন, তাও বিশ্বস্ত সংবাদাদির দ্বারা খণ্ডিত হয়। আল্লাহ্ই উত্তম জ্ঞাতা।

উপরোক্ত আলোচনার পর আমাদের ইচ্ছা, রোজার গ্রন্থ প্রণেতার অনুরূপ একটি ভূ-চিত্র অংকন করা এবং অতঃপর তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা তুলে ধরা।[২২]

---

২১. মুহম্মদ ইবনে আহমদ ইব্নে রুশদ, জীবনকাল ৫২০-৫৯৫ (১১২৬-১১৯৮ খ্রি:) হি:।

২২ আমাদের ব্যবহৃত বৈরুত সংস্করণে এর পর 'ইলা আখিরিহি' অর্থাৎ 'এর শেষ পর্যন্ত' লেখা আছে। সুতরাং মূল গ্রন্থে এর পরও বক্তব্য ছিল এবং তার প্রমাণ মিলছে রোজেনথালের অনুবাদ হতে। তিনি উক্ত ভূ-চিত্রের প্রতিলিপি ও তার বিবরণ প্রদান করেছেন। অবশ্য তিনিও একটিমাত্র সংস্করণে এর সন্ধান পেয়েছেন। সম্ভবত তার অংকনের অসুবিধার জন্য অন্যান্য সংস্করণে পরিত্যাক্ত হয়েছে। আমরা গ্রন্থের সম্পূর্ণতার জন্য রোজেনথালের অনুবাদ হতে এটা গ্রহণ করলাম।

ভূ-চিত্রের বিশদ বিবরণ[২৩]

এতে প্রদত্ত বিবরণ দুই প্রকারের; একটি বিশদ বিবরণ এবং অন্যটি সাধারণ বিবরণ।

বিশদ বিবরণে পৃথিবীর জন-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর দেশ, পর্বত, সাগর ও নদ-নদীর প্রত্যেকটি সম্পর্কে আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হবে। এ বিবরণ পরবর্তী পরিচ্ছেদে পাওয়া যাবে।

সাধারণ বিবরণে পৃথিবীর জনবসতিপূর্ণ এলাকাকে সাতটি ভাগে ভাগ করা, এ সকল ভাগের অক্ষাংশীয় প্রসারতা ও তাদের দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এটাই আমাদের বর্তমান পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু।

আসুন, আমরা এ সকল বিষয় বিশ্লেষণ করে দেখি। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, পৃথিবী জলীয় উপাদানের উপর আঙুরের ন্যায় ভাসমান ছিল। আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাণের বিকাশ ও সভ্যতার আবির্ভাবের জন্য তার একাংশ থেকে জল সরিয়ে নেয়া হল। জল নিষ্কাশিত এ অংশ পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের অর্ধেক ভাগ জুড়ে আছে বলে মনে করা হয় এবং জনবসতিপূর্ণ এলাকা এর এক-চতুর্থাংশ। অবশিষ্টাংশ জনবসতিহীন। কিন্তু অন্য একটি মতে জনবসতিপূর্ণ এলাকা পৃথিবীর মাত্র এক-ষষ্ঠমাংশ। জল নিষ্কাশিত ভূ-ভাগের জনবসতিহীন এ অংশ পৃথিবীর উত্তরে ও দক্ষিণে অবস্থিত। জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলো আকার ও ধারাবাহিকতায় পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বিস্তৃত। উক্ত দুই দিকে জনবসতিপূর্ণ এলাকা ও বেষ্টনকারী সমুদ্রের মধ্যভাগে জনবিরল অংশ নেই বললেই চলে।

তাঁরা আরও বলেছিলেন যে, জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলোর ঐ সমস্ত অংশে, যেখানে দুটি ধ্রুবনক্ষত্র দিগ্বলয়ে বিরাজমান, সেখানে একটি কাল্পনিক রেখা পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে খ-বিষুব রেখার বিপরীতে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। এ রেখা থেকেই সভ্যতার আরম্ভ এবং তথা থেকে তা ক্রমশ উত্তর দিকে প্রসারিত হয়ে গেছে।

টলেমী বলেছেন যে,[২৪] প্রকৃতপক্ষে এ রেখার বাইরে দক্ষিণ দিকেও মানবসভ্যতা বিদ্যমান। তিনি অক্ষাংশীয় প্রসারতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যেমন পরে বর্ণিত হবে।

---

২৩. এ শিরোনামটি রোজেনথালের অনুবাদ হতে গৃহীত। আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে মুদ্রিত শিরোনামটি নিম্নরূপ :
'তফসিলুল কালামে আলা-বদ্‌এজ্ জুগ্রাফিয়া'; এর অর্থ তিন প্রকার হতে পারে যথা ভূগোল শাস্ত্রের আরম্ভ, ভূ-আকৃতির আরম্ভ অথবা ভূ-বিবরণের আরম্ভ সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা। কিন্তু ইবনে খলদুনের স্বীকৃতি অনুসারে (৬৭ পৃষ্ঠার শেষ দ্র:) এটা আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি; বরং সংশ্লিষ্ট ভূ-চিত্রের ব্যাখ্যা হিসাবেই আমরা এই বিবরণকে গ্রহণ করেছি।

২৪. পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে বিস্তৃত বিবরণ দ্র:।

ইসহাক ইবনে আল হামান আল খাজিনী[২৫] এ মত প্রকাশ করেছেন যে, সপ্তম অঞ্চলের বাইরেও একটি সভ্যতা বিরাজমান। তিনিও অক্ষাংশীয় প্রসারতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আমরা পরে এ সম্পর্কে বর্ণনা করব। খাজিনী উক্ত বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ জ্ঞানী।[২৬]

এটা জ্ঞাত হোক যে, জ্ঞানীগণ পৃথিবীর জনবসতিপূর্ণ এলাকাকে উত্তরে দক্ষিণে সাতটি ভাগে ভাগ করেছেন, যেমন তার বর্ণনা পূর্বে দেয়া হয়েছে। এ সপ্তভাগের প্রতিটিকে তাঁরা 'একলিম' বা অঞ্চল নামে অভিহিত করেছেন। পৃথিবীর জনবসতিপূর্ণ এলাকার সমুদয় অংশই এ সপ্তাঞ্চলে বিভক্ত এবং দৈর্ঘ্যে এরা পশ্চিম হতে পূর্বদিকে বিস্তৃত। এর প্রথম অঞ্চলটি ভূ-বিষুব রেখার সাথে তার দক্ষিণ সীমা স্পর্শ করে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে প্রসারিত হয়ে রয়েছে। এর পিছনে দক্ষিণ দিকে প্রান্তর ও মরুভূমি ব্যতীত আর কিছু নেই। যদি কোন লোকালয় আছে বলেও প্রমাণিত হয়, তবে তাকেও জনবসতি না বলাই শ্রেয়। উক্ত প্রথম অঞ্চলের সন্নিহিত উত্তর দিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঞ্চলের অবস্থান এবং অনুরূপভাবে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অঞ্চল বিন্যস্ত রয়েছে। উত্তর দিক থেকে উক্ত সপ্তম অঞ্চলই জনবসতির শেষ সীমা। উক্ত অঞ্চলের পরে প্রান্তর ও শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই। এটাও এ দিক থেকে প্রথম অঞ্চলের পশ্চাদবর্তী দক্ষিণের অনুরূপ এবং বেষ্টনকারী সাগর পর্যন্ত একই অবস্থায় বিরাজমান। অবশ্য উত্তর দিকের জনবসতিহীন অঞ্চল দক্ষিণ দিকের অনুরূপ অঞ্চল অপেক্ষা অনেকগুণ অধিক ক্ষুদ্র।[২৭]

---

২৫. এ আল-খাজিনী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইনি আবু জাফর আল-খাজিন নন, যার বর্ণনা পরে আসছে। যতদূর মনে হয়, তাঁর মন্তব্য পাদটীকায় সংযোজিত হয়েছিল। পরে কোন সংস্করণে তা মূল পাঠের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রোজেনথালও এরূপ উল্লেখ করেছেন।

২৬. এর পর আমরা আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থের পাঠ অনুসরণ করব। এর সাথে রোজেনথালের গৃহীত পাঠের স্থানে স্থানে কিছুটা ব্যতিক্রম বিদ্যমান। আমরা পাদটীকায় উক্ত ব্যতিক্রমধর্মী পাঠের অনুবাদ তুলে ধরব।

২৭. এর পর রোজেনথালের অনুবাদে নিম্নের অংশটি বিদ্যমান—

দিবসের দৈর্ঘ্য ও অক্ষাংশ সম্পর্কে এটা জেনে রাখা ভাল যে, আকাশের দুটি ধ্রুবনক্ষত্র ভূ-বিষুব রেখার দিকে পশ্চিমে পূর্বে দিগ্বলয়ে বিরাজমান এবং সূর্য তার খ-মধ্যে অবস্থান করছে; এ অবস্থায় আমরা যদি পৃথিবীর জনবসতিপূর্ণ এলাকা ক্রমশ উত্তর দিকে অতিক্রম করতে থাকি, তাতে উত্তর ধ্রুবনক্ষত্র ক্রমান্বয়ে উপরে উঠবে ও দক্ষিণ ধ্রুবনক্ষত্র নিম্নে নেমে যাবে। তদুপরি সূর্য খ-বিষুব রেখা হতে একটি সমানুপাতিক দূরত্ব অতিক্রম করে থাকে। এ তিনটি দূরত্ব পরস্পর সমান। তাদের প্রত্যেকটিকে ভৌগোলিক অক্ষাংশ বলা হয় এবং এটা সময় নির্ধারণকারীদের নিকট অতিশয় পরিচিত।

জ্ঞানী ব্যক্তিরা পৃথিবীর অক্ষাংশীয় প্রসার ও অঞ্চলসমূহের অক্ষাংশীয় প্রসার সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। টলেমী বলেন যে, পৃথিবীর সমগ্র জনবসতিপূর্ণ এলাকার অক্ষাংশীয় প্রসার ৭৭$\frac{১}{৪}$। ভূ-বিষুব রেখার বাইরে দক্ষিণ দিকে জনবসতিপূর্ণ এলাকার অক্ষাংশীয় প্রসার ১১°। এভাবে উক্ত রেখার উত্তরাংশে অবস্থিত জনবসতির মোট অক্ষাংশীয় প্রসার ৬৬$\frac{১}{২}$। তাঁর মতে প্রথম অঞ্চল ১৬°, দ্বিতীয় ২০°, তৃতীয় ২৭°, চতুর্থ ৩৩°, পঞ্চম ৩৮°, ষষ্ঠ ৪৩$\frac{১}{৩}$ এবং সপ্তম ৪৮° পর্যন্ত প্রসারিত। এরপর তিনি পৃথিবীর উপরিভাগের দূরত্বের পরিমাপ অনুসারে আকাশের অংশ নির্ধারণ করে তা ৬৬$\frac{২}{৩}$ মাইলে পরিণত করেন। এতে প্রথম অঞ্চল দক্ষিণে উত্তরে ১০৬৭ মাইল। দ্বিতীয় ২৩৩৩ মাইল, তৃতীয় ২৭৯০ মাইল, চতুর্থ ২১৮৫ মাইল, পঞ্চম ২০২০ মাইল, ষষ্ঠ ২৮৪০ মাইল এবং সপ্তম অঞ্চল ৩১৫০ মাইল প্রশস্ত।

এ সকল অঞ্চলের দিনরাত্রির দৈর্ঘ্যে পার্থক্য হয়ে থাকে। সূর্যের খ-বিষুব রেখা থেকে অয়ন ও উত্তর ধ্রুবনক্ষত্রের দিগ্বলয়ে উত্থিত হওয়ার কারণে দিবারাত্রির বৃত্তচাপের মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি হওয়ার ফলে এটা ঘটে থাকে। প্রথম অঞ্চলের শেষাংশ দিবারাত্রির দৈর্ঘ্য সমপরিমাণে বিরাজ করে। সূর্যের মকর রাশির প্রারম্ভে আগমনে রাত্রি এবং কর্কট রাশির প্রারম্ভে আগমনের দিন। এ উভয়ের দৈর্ঘ্য তের ঘণ্টা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে তার সন্নিহিত উত্তরের দ্বিতীয় অঞ্চলের শেষাংশেও সূর্যের কর্কট রাশির আগমনে দিবসের দৈর্ঘ্য সাড়ে তের ঘণ্টা হয়। বস্তুত তা সূর্যের গ্রীষ্মকালীন আবর্তন (উত্তরায়ন)। এরূপভাবে সূর্যের শীতকালীন আবর্তনে (দক্ষিণায়নে) মকররাশির প্রারম্ভে উপনীত হওয়ায় ঐ অঞ্চলে রাত্রির দৈর্ঘ্যও দিবসের অনুরূপ হয়। দিবারাত্রির সমুদয় সময়, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সাড়ে তের ঘণ্টা বাদে অবশিষ্টাংশ খর্ব দিন-রাত্রির জন্য নিরূপিত হয় এবং এতে আকাশের একটি আবর্তন সম্পূর্ণ হয়। এরূপভাবে তৃতীয় অঞ্চলের শেষাংশে চৌদ্দ ঘণ্টা, চতুর্থ অঞ্চলের শেষাংশে সাড়ে চৌদ্দ ঘণ্টা, পঞ্চম অঞ্চলের শেষাংশে পনের ঘণ্টা, ষষ্ঠ অঞ্চলের শেষাংশে সাড়ে পনের ঘণ্টা এবং সপ্তম অঞ্চলের শেষাংশে দিবা-রাত্রির দৈর্ঘ্য ষোল ঘণ্টা হয়ে থাকে। এখানেই জনবসতির শেষ। সুতরাং এ সকল অঞ্চলে দিবারাত্রির দৈর্ঘ্যের তারতম্য প্রতিটি অঞ্চলের জন্য মাত্র অর্ধ ঘণ্টা। এটা প্রথম অঞ্চলের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে ক্রমশ দূরত্বের পর্যায় অনুসারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে শেষ অঞ্চলের উত্তর প্রান্তে এসে শেষ হয়।

[২৮] এ সকল অঞ্চলের অক্ষাংশের অর্থ হল, সংশ্লিষ্ট স্থানের প্রারম্ভের বিপরীত ভূ-বিষুব রেখার প্রারম্ভের বিপরীতে অবস্থিত খ-বিষুব রেখার মধ্যকার দূরত্ব। উক্ত দূরত্বের

---

২৮. এর পূর্বে রোজেনথালের অনুবাদের নিম্নের অংশটি সংযোজিত হয়েছে :

ইসহাক ইবনে আল হাসান আল-খাজিনী মনে করেন যে, ভূ-বিষুব রেখার বাইরে জনবসতির অক্ষাংশীয় প্রসার ১৬°২৫″ এবং সেখানকার দিবারাত্রির দৈর্ঘ্য তের ঘণ্টা। প্রথম অঞ্চলের অক্ষাংশীয় প্রসার ও দিবারাত্রিও উক্ত এলাকার অনুরূপ। দ্বিতীয় অঞ্চলের প্রসার ২৪° এবং এর প্রান্তীয় অংশের দিবারাত্রির দৈর্ঘ্য সাড়ে তের ঘণ্টা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তৃতীয় অঞ্চলে ৩০° ও চৌদ্দ ঘণ্টা। চতুর্থ অঞ্চলে ৩৬° ও সাড়ে চৌদ্দ ঘণ্টা। পঞ্চম অঞ্চলে ৪১° ও পনের ঘণ্টা, ষষ্ঠ অঞ্চলে ৪৫° ও সাড়ে পনের ঘণ্টা এবং সপ্তম অঞ্চলে সাড়ে ৪৮° ও ষোল ঘণ্টা হয়ে থাকে। সপ্তম অঞ্চলের পরে অক্ষাংশীয় প্রসার ৬৩° অংশ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে এবং সেখানে দিবারাত্রির সর্বাপেক্ষা দৈর্ঘ্য বিশ ঘণ্টা।

ইসহাক খাজিনী ব্যতীত এ বিষয়ে অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তির ধারণা এই যে, ভূ-বিষুব রেখার বাইরে জনবসতির অক্ষাংশীয় প্রসার ১৬°২৭″। প্রথম অঞ্চল ২০°১৫″, দ্বিতীয় অঞ্চল ২৭°১৩″, তৃতীয় অঞ্চল ৩৩°২০″, চতুর্থ অঞ্চল ৩৮$\frac{১}{২}$, পঞ্চম অঞ্চল ৪৩°, ষষ্ঠ অঞ্চল ৪৭°৫৩″—অন্য এক মতে ৪৬°৫০″ এবং সপ্তম অঞ্চল ৫১°৫৩″ অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। সপ্তম অঞ্চলের পরে জনবসতি ৭৭° অংশ পর্যন্ত প্রসারিত রয়েছে।

আবু জাফর আল-খাজিনী এ বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ জ্ঞানী, তাঁর ধারণা এই যে, প্রথম অঞ্চলের অক্ষাংশীয় প্রসার ১° হতে ২০°১৩″, দ্বিতীয় অঞ্চলের ২৭°১৩″, তৃতীয় অঞ্চলের ৩৩°৩৯″, চতুর্থ অঞ্চলের ৩৮°২৩″, পঞ্চম অঞ্চলের ৪২°৫৮″, ষষ্ঠ অঞ্চলের ৪৭°২″ এবং সপ্তম অঞ্চলের ৫০°৪৫″ অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

বিভিন্ন অঞ্চলের মাইলে প্রদত্ত প্রস্থ অনুসারে তাদের অক্ষাংশীয় প্রসার ও দিবারাত্রির দৈর্ঘ্য সম্পর্কে এটাই আমার নানাবিধ মতবাদের জ্ঞান। আল্লাহ্ সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাদের পথ নির্দেশ করেছেন।'

অনুপাতে দক্ষিণ ধ্রুবনক্ষত্র সংশ্লিষ্ট স্থানের দিগ্বলয়ের নিম্নে নেমে যায় এবং উত্তর ধ্রুবনক্ষত্র উপরে উঠে আসে। এ তিনটি সমপরিমাণ দূরত্বের নামই অক্ষাংশ, যেমন তার বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে।

ভূগোল সম্পর্কে বক্তব্য প্রদানকারী জ্ঞানীদের এ সপ্ত অঞ্চলের প্রতিটিকে পশ্চিম থেকে পূর্বে বিস্তৃত দৈর্ঘ্যানুযায়ী সমান দশভাগে ভাগ করেছেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট প্রতিটি অংশের নগর, গ্রাম, পর্বত, নদী ও তৎসমুদয়ের মর্ধবর্তী পথের দূরত্বের বর্ণনা করেছেন। আমরা এখন বক্তব্য সংক্ষেপ করে উক্ত প্রতিটি অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট বিখ্যাত নগর, নদী, সমুদ্র, প্রভৃতির বিবরণ দান করব। এ প্রসঙ্গে আমরা আল-উলুবী, আল-ইদরিসী, আল-হামুদী প্রণীত 'নুজহাতুল মুশতাক' নামক গ্রন্থের বিবরণকে অনুসরণ করব। তিনি সিসিলী দ্বীপের খ্রিস্টান সম্রাট রোজার ইবনে রোজারের জন্য এটা প্রণয়ন করেছিলেন। ইদরিসী পরিবার মালগার শাসনভার ত্যাগ করার পর তিনি সিসিলীতে রোজারের দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট হন। এ গ্রন্থ প্রণয়নের কাল হিজরি ষষ্ঠ (দ্বাদশ খ্রি:) শতাব্দীর মধ্যভাগ। আল-ইদরিসী উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে বহু পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করেছেন; যেমন মাসউদী ইবনে খুরদাজবিয়া[২৯], আল-হাওকলী[৩০], আল-কুদুরী[৩১], ইবনে ইসহাক আল মুনজ্জিম[৩২], বাতলিমুস (টলেমী) প্রমুখ মনীষীবৃন্দের পুস্তকাদি। আমরা এখন প্রথম অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে শেষ অঞ্চল পর্যন্ত বর্ণনা করব। আল্লাহ্ই পবিত্র এবং উন্নত, তিনি স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

প্রথম অঞ্চল

এর পশ্চিম দিকে এমন কতকগুলো চিরকালীন দ্বীপ বিদ্যমান, যেখান থেকে টলেমী এ অঞ্চলের দ্রাঘিমা আরম্ভ করেছেন। বস্তুত এ দ্বীপগুলো উক্ত অঞ্চলের ভূখণ্ডের অন্তর্গত নয়। এগুলো বেষ্টনকারী সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত। দ্বীপের সংখ্যা অনেক হলেও তন্মধ্যেও বৃহৎ মাত্র তিনটি। বলা হয় যে, এগুলো (ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ) জনবসতিপূর্ণ। আমরা জানতে পেরেছি যে,[৩৩] বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে কতকগুলো খ্রিস্টান জাহাজ এ সমস্ত দ্বীপে পৌঁছে অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারা তাদের আবাসস্থল লুণ্ঠন করে, তাদেরকে বন্দী করে এবং তাদের অনেককে এনে মরক্কোতে বিক্রয় করে দেয়। তারা ক্রীতদাস হিসাবে সেখানকার শাসকের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। তারা আরবি ভাষা শিক্ষা করবার পরে তদের দ্বীপপুঞ্জের অবস্থা বর্ণনা করে। তারা বলে যে, তারা শস্য উৎপাদনের জন্য শৃঙ্গের দ্বারা জমি চাষ করে। তাদের দ্বীপে লৌহের ব্যবহার নেই। তারা যবের রুটি খায় এবং গৃহপালিত পশু হিসাবে ছাগল পালন করে। তারা পিছন দিকে পাথর ছুড়ে যুদ্ধ করে। উদয়কালে তারা সূর্যের উপাসনা করে থাকে। তারা কোন ধর্মের

---

২৯. উবায়দুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে খুরদাজবিয়া; জীবনকাল খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দির প্রথমাংশ।

৩০. আবুল কাশেম ইবনে হাওকল, খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দি।

৩১. মূল গ্রন্থে আল-কুদূরী লেখা আছে। রোজেনথাল একে আল-উদরী লিখেছেন। ইনি আহমদ ইবনে উমর আল-উদরী, জীবনকাল ৩৯৩-৪৭৮ (১০০৩-১০৮৫ খ্রি:) হি:।

৩২. তাঁর খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দির জীবনকাল যথার্থভাবে প্রমাণিত হয়নি।

৩৩. উক্ত ঘটনা যতদূর সম্ভব ইবনে খলদুনের সমসাময়িক।

কথা জানে না এবং তাদের নিকট ধর্মের কোন বাণীও পৌঁছেনি। আকস্মিকভাবে গিয়ে না পৌঁছলে ইচ্ছে করে এ সকল দ্বীপে যাওয়া সম্ভব নয়। কেননা সমুদ্রপথে বায়ু ও স্রোতের গতির উপর জাহাজের চলাচল নির্ভর করে। সুতরাং কোন স্থান থেকে জাহাজ চালনা করতে হলে স্রোতের গতি ও বায়ুর প্রবাহ পথ জেনে নিতে হয়। একটি নির্দিষ্ট বায়ু প্রবাহ কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাবে এবং যদি তাতে পরিবর্তন ঘটে, তাহলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার অনুকূল প্রবাহ কোথায় পাওয়া যাবে, তৎসমুদয় জানা দরকার। সমুদ্রপথে জাহাজ চালনায় অভিজ্ঞ নাবিকগণ এ বিষয়ে যে নীতি-নিয়ম নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার সাথে পরিচিত হয়েই জাহাজে পাল তুলতে হয়, যাতে তা গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারে। রোম সাগরের মধ্যভাগে ও তার তীরে যে সকল শহর বিদ্যমান, তৎসমুদয়ের অবস্থানগত ও পর্যায়ক্রমিক বিবরণ একটি পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। এতে বিভিন্ন বায়ু এবং তাদের গতিপথও লিখিত আছে। তারা এর নামকরণ করেছেন 'কম্পাস'। তারা সমুদ্রযাত্রায় এরই উপর নির্ভর করেন। বস্তুত বেষ্টনকারী সমুদ্র সম্পর্কে এ সকল জ্ঞানের একান্ত অভাব। এজন্যই জাহাজ তাতে প্রবেশ করে না। কারণ একবার সমুদ্রতীর থেকে তাতে অন্তর্হিত হলে পুনরায় তীরে ফিরে আসবার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। তদুপরি উক্ত সমুদ্রের উপরিভাগে ও তার পৃষ্ঠদেশে এমন ঘন কুয়াশা বিদ্যমান, যা জাহাজ চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে। দূরত্বের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের প্রতিবিম্বিত সূর্যকিরণ তাতে প্রতিফলিত হতে পারে না এবং এজন্য তা দূরও হয় না। সুতরাং এ সকল দ্বীপের পথনির্দেশ কষ্টকর এবং তার সংবাদ সংগ্রহ করা অতিশয় কঠিন।

অত্র অঞ্চলের প্রথম অংশে নীলনদের অববাহিকা বিদ্যমান। এটা, যেমন পূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি, কুমার পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং এটাকে সুদানী নীল বলা হয়। এটা বেষ্টনকারী সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়ে 'আঞ্চলিক[৩৪] দ্বীপের নিকট তাতে পতিত হয়েছে। এরই তীরে 'সীলা', 'তাকরুর' ও 'ঘানা' শহর অবস্থিত। এ সবগুলো বর্তমানে সুদানী জাতির অন্তর্গত মালির[৩৫] সম্রাটের অধীন। মরক্কোর বণিকদল তাদের এ শহরগুলোতে যাতায়াত করে থাকে।

এরই সন্নিহিত উত্তর দিকে 'লামতুনা'দের দেশ এবং অন্যান্য আবৃত বারবার গোত্র (সিনহাজা) ও তাদের বিচরণস্থল মরু অঞ্চল বিদ্যমান। এ নীলনদের দক্ষিণ দিকে সুদানীদের একদল লোক বাস করে, যাদেরকে 'লামলাম' বলা হয়। তারা ধর্মবিশ্বাসী নয়। তারা মুখমণ্ডলে ও গণ্ডদ্বয়ে দাগ দিয়ে থাকে। ঘানা ও তাকরুরবাসীরা তাদেরকে মাগরিবে নিয়ে আসে এবং সেখানে তারা সাধারণ ক্রীতদাসে পরিণত হয়। এদের পশ্চাৎভাগে দক্ষিণ দিকে এমন কোন জনবসতি নেই, যাদেরকে সভ্য হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। ঐ সকল লোক মানুষ অপেক্ষা জীবজন্তুর সাথে অধিকতর তুলনীয়। এরা কুঁড়ে ও গুহায় বাস করে এবং অসিদ্ধ শাকসব্জী ও শস্যাদি খেয়ে থাকে। অনেক সময় এরা নিজেরাই একে অপরকে আহার করে ফেলে। এদেরকে মানুষ বলে গণ্য করা যায় না।

---

৩৪. ব্যাঙ্কা অন্তরীপের নিকট অবস্থিত আরগুইন দ্বীপ।

৩৫. মান্ডিংগো জাতি। রোজেনথাল সুদানী অর্থে সর্বত্র লিখেছেন।

সুদানের সমস্ত ফলমূল মাগরিবের সুরক্ষিত মরু গ্রাম, যেমন 'তোহাত', 'তাকদারারিন',[৩৬] 'ওরগালান' প্রভৃতি থেকে এসে থাকে। বলা হয় যে, ঘানায় উলুবীদের একটি রাজ্য ছিল। তারা বনি সালেহ হিসাবে পরিচিত। রোজার গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন যে, এদের পূর্বপুরুষ এ সালেহ, আব্দুল্লাহ্ ইবনে হাসান ইবনে হাসানের পুত্র। কিন্তু আব্দুল্লাহ্ ইবনে হাসানের বংশে সালেহ বলে কারও নাম জানা যায় না। যাহোক বর্তমানে উক্ত রাজ্য আর নেই এবং ঘানা মালির সম্রাটের অধীন।

এ এলাকার পূর্বদিকে অত্র অঞ্চলের তৃতীয়াংশে সেখানকার কোন পর্বত থেকে উৎপন্ন এক নদীর তীরে 'গাওগাও'[৩৭] নামে একটি এলাকা বিদ্যমান। উক্ত নদী পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে অত্র অঞ্চলের দ্বিতীয়াংশের মরুভূমিতে বিলীন হয়েছে। গাওগাও এলাকার সম্রাট স্বাধীন ছিল। অতঃপর মালির সম্রাট তাকে পরাজিত করে উক্ত অঞ্চল তার অধীনে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু বর্তমানে তা পুনরায় সেখানকার কিছু গোলযোগের দরুন বের হয়ে গেছে। আমরা বারবারদের ইতিহাস বর্ণনার সময় যথাস্থানে মালির সম্রাটদের বিবরণ দান প্রসঙ্গে এর আলোচনা করব। গাওগাও এলাকার দক্ষিণ দিকে এক সুদানী গোত্র 'কানিম'দের অঞ্চল। এর পর নীলের উত্তর তীরে 'ওয়াঙ্গার' অবস্থিত।

উক্ত কানিম ও ওয়াঙ্গার, এলাকার পূর্বে 'জাগাওয়া' ও 'তাজেরা'[৩৮] এলাকা রয়েছে। শেষোক্তটি অত্র অঞ্চলের চতুর্থাংশে অবস্থিত 'নোবা' ভূমির সন্নিহিত। এতে মিশরীয় নীলনদ তার ভূ-বিষুব রেখার সন্নিকটস্থ উৎসস্থল থেকে উত্তর দিকে রোম সাগরের অভিমুখে প্রবাহিত হচ্ছে। উক্ত নীল ভূ-বিষুব রেখার উপরে ষোল অংশে অবস্থিত 'কুমার' পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এ পর্বতের নাম হিসাবে ব্যবহৃত শব্দটি নিয়ে জ্ঞানীদের মধ্যে মতানৈক্য বিদ্যমান। কেউ কেউ একে 'কাফ' ও মীরের হ্রস্ব অ-কারসহ 'কমর' উচ্চারণ করেছেন। এর অর্থ চন্দ্র। উক্ত পর্বতের শুভ্র রং ও তীব্র আভার দরুন এরূপ ধারণা করেছেন। ইয়াকুত তাঁর 'মুশতারিক' নামক গ্রন্থে 'কাফের' উ-কার ও 'মীমের' হসন্তসহ—'কুম্‌র' উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এটা ভারতীয় কোন গোত্রের নাম।[৩৯] ইবনে সাইদও[৪০] অনুরূপ উচ্চারণের পক্ষপাতী।

উক্ত পর্বত থেকে দশটি ঝর্ণা নির্গত হয়ে তার পাঁচটি একটি হ্রদে ও অবশিষ্ট পাঁচটি অন্য একটি হ্রদে পতিত হয়েছে। উক্ত দুটি হ্রদের মধ্যকার ব্যবধান ছয় মাইল। এতদুভয় থেকে তিনটি করে নদী বহির্গত হয়ে সবগুলো একটি নিম্ন প্রান্তরে একত্র হয়েছে। এর প্রান্তদেশে একটি পর্বত অবস্থিত এবং উক্ত পর্বত তার উত্তর নিম্ন প্রান্তের গতিধারাকে দুইভাগে ভাগ করেছে। এর ফলে তা থেকে দুটি নদের উৎপত্তি ঘটেছে। তার পশ্চিম দিগস্থ নদটি পশ্চিম দিকে সুদান দেশ অতিক্রম করে বেষ্টনকারী সমুদ্রে

৩৬. রোজেনথাল এর উচ্চারণ লিখেছেন 'তাগ্‌উরারিন'।

৩৭. মূলে আছে 'কাওকাও'।

৩৮. জাগাই; রোজেনথাল বলেছেন কোন কোন সংস্করণে, নাকি এ উচ্চারণ বিদ্যমান। 'তাজিরা' শব্দটির 'য়ে' ইবনে খলদুনের সংযোজন। ইদরিসীর বর্ণনায় তাজিয়া উচ্চারণ বিদ্যমান।

৩৯. ইয়াকুতের বর্ণনায় ভারতীয় গোত্রের কথা উল্লেখিত হয়নি। সম্ভবত এটা ইবনে খলদুনের নিজের ধারণা। তদুপরি ইয়াকুত 'কুমর দেশে'র কথা বলেছেন, পর্বতের কথা নয়।

৪০. ত্রয়োদশ শতাব্দির ঐতিহাসিক; ইবনে খলদুন বহু স্থানে তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন।

পতিত হয়েছে। পূর্বদিগস্থ নদটি উত্তর দিকে আবিসিনিয়া ও নোবা এবং তন্মধ্যস্থ ভূ-ভাগের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। মিশরের উচ্চভূমিতে উপনীত হয়ে এটা একাধিক শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এর তিনটি শাখা 'আলেকজান্দ্রিয়া', 'রশিদা' ও 'দিমিয়াতা'র নিকটে রোম সাগরে পতিত হয়েছে। অন্য একটি শাখা সমুদ্রে পড়বার পূর্বে অত্র অঞ্চলের মধ্যভাগে লবণ হ্রদে এসে মিশেছে।

এ নীলনদের তীরে 'আবিসিনিয়া', 'নোবা' ও 'আলওয়াহাত' (ওয়েসিস)-এর বহু এলাকা 'আসোয়ান' পর্যন্ত বিস্তৃত। নোবার বর্তমান শহরের নাম দাঙ্কালা। তা নীলের পশ্চিম তীরে এবং তার পরেই 'আলোয়া'[৪১] ও বুলাক[৪২] অবস্থিত। এরপর বুলাক থেকে ছয়দিনের পথের দূরত্বে উত্তরদিকে জলপ্রপাতের পর্বত বিদ্যমান। উক্ত পর্বত মিশরের দিক থেকে উচ্চ ও নোবার দিক থেকে নিম্ন হয়ে গেছে। নীলনদ এতে প্রবেশ করে এক ভয়ানক প্রপাতের সৃষ্টি করে বহুদূর প্রবাহিত হয়েছে। এ কারণে এতে নৌ-চলাচল অসম্ভব। সুদানী নৌকার মালামাল পশুপৃষ্ঠে সেখান থেকে সাইদের রাজধানী আসোয়ানে বহন করা হয়। অনুরূপভাবে সাইদের নৌকার মালামাল জলপ্রপাতের উপর তোলা হয়। আসোয়ান ও জলপ্রপাতের মধ্যকার দূরত্ব বারদিনের পথ। আল-ওয়াহাতের পশ্চিম দিকে নীলনদের তীরভূমি অবস্থিত। ওয়াহাত ধ্বংসাবশেষ মাত্র। তাতে বহু প্রাচীন জনবসতির চিহ্ন বিদ্যমান।

প্রথম অঞ্চলের মধ্যভাগে তার পঞ্চমাংশে আবিসিনিয়া অবস্থিত। তার মধ্য দিয়ে ভূ-বিষুব রেখার অপর দিক থেকে আগত একটি নদী নোবা পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং সেখানে এটা মিশরগামী নীলনদে পতিত হয়েছে। এর উৎপত্তি সম্পর্কে বহুলোক অদ্ভুত ধারণা পোষণ করে যে, তা কুমার পর্বতে উৎপন্ন নীলের অংশ। টলেমী তাঁর ভূগোলে এ নদী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এটা এ নীলনদের অংশ নয়। আলোচ্য অঞ্চলের মধ্যভাগে পঞ্চমাংশে চীনের প্রান্ত থেকে প্রবেশকারী ভারত সাগর শেষ হয়েছে। এটা অত্র অঞ্চলের পঞ্চমাংশের সমুদয় এলাকা আবৃত করে রেখেছে। এ কারণেই অভ্যন্তরস্থ দ্বীপসমূহ ব্যতীত অন্যত্র জনবসতি নেই। এ দ্বীপের সংখ্যা অনেক এবং এটা প্রায় সহস্রের নিকটবর্তী। অবশ্য উক্ত সাগরের দক্ষিণ তীরে জনবসতি বিদ্যমান এবং তাই দক্ষিণ দিকের জনবসতির শেষ সীমা। যেমন, তার উত্তর তীরে জনবসতি বিদ্যমান। এ সকল তীরভূমির মধ্যে কেবল চীনের পূর্বাংশের সামান্য এলাকাই প্রথম অঞ্চলে পড়েছে এবং ইয়ামেনের সমুদয় এলাকা আলোচ্য অঞ্চলের ষষ্ঠাংশে অবস্থিত।[৪৩]

আলোচ্য অঞ্চলের ষষ্ঠাংশে উক্ত ভারত সাগর থেকে দুটি সাগর উত্তর দিকে বের হয়ে গেছে, তাদের একটি লোহিত সাগর ও অন্যটি পারস্য সাগর। এদের মধ্যভাগে আরব উপদ্বীপ অবস্থিত। এর পূর্ব প্রান্তে ভারত সমুদ্র তীরে ইয়াসেন ও শিহর এলাকা

---

৪১. বর্তমান খার্তুমের নিকটবর্তী একটি প্রাচীন শহর।

৪২. এর উচ্চারণ 'বিলাক' ও বিদ্যমান।

৪৩. এখানে মূল পাঠে সম্ভবত ভুল আছে এবং শুদ্ধ পাঠ নির্ধারণের উপকরণ আমাদের সম্মুখে নেই। এস্থলে আমরা রোজেনথালের সাহায্য গ্রহণ করেছি।

বিদ্যমান। এর মধ্যস্থ হেজাজ, ইয়ামাসা ও তার সন্নিহিত এলাকা দ্বিতীয় অঞ্চলে অবস্থিত, যেমন আমরা অচিরেই এর ও পরবর্তী বিষয়ের বর্ণনা করব।

যাহোক, উক্ত ভারত সাগরের পশ্চিম তীর আবিসিনিয়ার অন্তর্গত প্রান্তীয় এলাকা 'জালা', আবিসিনিয়ার উত্তর দিগস্থ সাইদের উচ্চভূমির অন্তর্গত আল্লাকী পর্বত ও ভারত সাগর থেকে উৎপন্ন লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী 'বেজার' প্রান্তর। জালার নিম্নভাগে উত্তর দিকে এ অংশে 'বাবেল মান্দিব' প্রণালী অবস্থিত। মান্দিব পাহাড়ের ফলে এখানে সাগরের বিস্তার অনেকখানি কমে গেছে। কারণ এখানে উক্ত পাহাড়টি ভারত সাগরের মধ্যভাগের অভিমুখে ইয়ামেনের তীরভূমির সাথে তাল রেখে দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে দৈর্ঘ্যে বার মাইল এগিয়ে এসেছে। এর ফলে সাগরের বিস্তার সেখানে মাত্র তিন মাইল বা তার কাছাকাছি। এর ফলে সাগরের বিস্তার সেখানে মাত্র তিন মাইল বা তার কাছাকাছি। তাকে বাবেল মান্দিব বলা হয় এবং তার মধ্য দিয়েই ইয়ামেনের জাহাজ মিশরের সন্নিকটে সুয়েজ তীরে গিয়ে উপনীত হয়। এ বাবেল মান্দিবের নিম্নভাগেই 'সুয়াকীন' ও 'দহলক' দ্বীপ বিদ্যমান এবং তার সম্মুখ ভাগে পশ্চিম দিকে বেজা নামক সুদানী গোত্র অধ্যুষিত প্রান্তর, যেমন পূর্বেই বর্ণনা করেছি। র পূর্বদিকে এ অংশেই ইয়ামেনে তেহামা এলাকা ও তারই তীরভূমিতে 'আলী ইবনে ইয়াকুব' অবস্থিত। 'জালা' এলাকার দক্ষিণ দিকে এ সমুদ্রের পশ্চিম তীর ধরে বারবার গ্রামাঞ্চল একটির পর একটি বিদ্যমান। এটা আলোচ্য অঞ্চলের ষষ্ঠাংশের শেষ সীমা পর্যন্ত ভারত সাগরের দক্ষিণ তীর ধরে অগ্রসর হয়ে গেছে।

এরই সন্নিহিত পূর্বদিক থেকে 'জঞ্জ' এলাকা আরম্ভ হয়েছে।[৪৪] এরপর উক্ত সাগরের দক্ষিণ তীরে আলোচ্য অঞ্চলের সপ্তমাংশে অবস্থিত 'সুফালা' এলাকা। এ দক্ষিণ তীরেই সুফালার পর পূর্বদিকে 'ওয়াক ওয়াক' এলাকর বিস্তার শুরু হয়েছে। এটা অনবরত অগ্রসর হয়ে বেষ্টনকারী ভারত সাগরের প্রবেশস্থলে আলোচ্য অঞ্চলের দশমাংশের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছে।

ভারত সাগরের দ্বীপের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সরন্দ্বীপ (সংহল)। এর আকৃতি গোল এবং এতে একটি বিখ্যাত পর্বত বিদ্যমান। বলা হয় যে, পৃথিবীতে তার তুল্য উচ্চ পর্বত আর নেই। এটা সুফালার বিপরীত দিকে অবস্থিত। অতঃপর কুমার দ্বীপ (জাভা)। এটা অতিশয় দীর্ঘ। এটা সুফলার বিপরীত দিক থেকে আরম্ভ করে অধিকাংশ উত্তর দিক ঘেঁষে পূর্বদিকে চীনের উচ্চ তীরভূমির নিকটে গিয়ে পৌঁছেছে। ভারত সাগরে এ দ্বীপমালার দক্ষিণ দিকে ওয়াক ওয়াক দ্বীপপুঞ্জ এবং এর পূর্বদিকে সিনান (কোরিয়া) দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য বহু দ্বীপ একে বেষ্টন করে রেখেছে। ভারত সাগরে আরও অসংখ্য দ্বীপ বিদ্যমান। এতে নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য ও মসলা পাওয়া যায়। বলা হয় যে, এগুলোতে স্বর্ণ ও মণি-মানিক্যের খনি আছে। অধিবাসীদের অধিকাংশই মজুসী[৪৫] ধর্মে দীক্ষিত। তাদের মধ্যে একাধিক রাজা বিদ্যমান। এ সকল

৪৪. এরপর রোজেনথালের অনুবাদ—মগাদিশু শহর ও তার যাযাবর অধিবাসীর কথা বলা হয়েছে। আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই।

৪৫. ৫ নং টীকা দ্র: (প্রথম প্রস্তাবনা)।

দ্বীপে মানব সভ্যতার বহু অদ্ভুত নিদর্শন বিদ্যমান। ভূগোলবিদগণ তার বিবরণ দান করেছেন।

ভারত সাগরের উত্তর তীরে প্রথম অঞ্চলের ষষ্ঠমাংশে ইয়ামেনের সমুদয় এলাকা অবস্থিত। লোহিত সাগরের দিক থেকে জাবিদ, আল-মাহজাম ও ইয়ামেনের তেহামা। এরপর জায়েদী ইমামদের আবাসভূমি 'সাআদা'। এটা দক্ষিণ দিকের ও পূর্ব দিকের সাগর থেকে বহু দূরে অবস্থিত। এতে তার পর 'এডেন' শহর এবং এরপরে উত্তর দিকে 'সান্‌আ' শহর বিদ্যমান। উক্ত দুটি শহর থেকে পূর্ব দিকে 'আহকাফ' ও 'জুফার' এলাকা বিস্তৃত। এরপর হাদ্রামাত এবং এরপরে দক্ষিণ সাগর ও পারস্য সাগরের মধ্যভাগে 'শিহর' এলাকা বিদ্যমান।

আলোচ্য অঞ্চলের মধ্যভাগীয় অন্যান্য অংশের মধ্যে ষষ্ঠাংশের এটাই এমন একটি ভূখণ্ড, যা সমুদ্রের দ্বারা আবৃত নয়। এরপরে সপ্তমাংশের অতি সামান্য ভূখণ্ডই সমুদ্রের বাইরে বিদ্যমান। অবশ্য দশমাংশের যে বৃহৎ ভূখণ্ড সমুদ্র সীমার বাইরে আছে, তা হল চীনের উচ্চভূমি এলাকা। তার প্রসিদ্ধ শহরগুলোর মধ্যে একটি হল 'খানকু' (ক্যানটন)। তার সম্মুখভাগে পূর্ব দিকে সিলান (কোরিয়া) দ্বীপপুঞ্জ। তার বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। প্রথম অঞ্চল সম্পর্কে এটাই আমাদের শেষ কথা। আল্লাহ্ পবিত্র ও উন্নত, তিনিই তাঁর দয়ায় ও অনুগ্রহে সহায়তার অধিকারী।

দ্বিতীয় অঞ্চল

এটা উত্তর দিক থেকে প্রথম অঞ্চলের সন্নিহিত। এর পশ্চিম দিকের সম্মুখ ভাগে বেষ্টনকারী সাগরে দুটি চিরকালীন দ্বীপ বিদ্যমান, যার বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। অত্র অঞ্চলের প্রথম ও দ্বিতীয়াংশের উচ্চ পার্শ্বে 'কানুরিয়া' দেশ এবং এরপরে পূর্ব দিকে ঘানার উচ্চভূমি। এরপর 'জাগাওয়া' প্রান্তর সুদানের অন্তর্গত এবং এদের নিম্ন পার্শ্বে 'নিস্তর' মরুভূমি। এটা ক্রমান্বয়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বিস্তৃত। এর দীর্ঘ বিস্তৃত পথে বণিকদল মাগরিব ও সুদানের মধ্যে যাতায়াত করে থাকে। আবৃত বারবার সিনহাজাদের প্রান্তর এর মধ্যে অবস্থিত। তারা বহু শাখায় বিভক্ত, তন্মধ্যে 'কাজ্জুলা', 'লামতুনা', 'মাসরাতা', 'লামাতা' ও 'ওরিকা' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সকল প্রান্তরের পূর্ব দিকে 'ফাজ্জান' দেশ এবং এরপরে বারবার গোত্র 'আযকার'দের প্রান্তর। এটা পূর্ব দিকে তৃতীয়াংশের উচ্চভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে। এরপর আলোচ্য অংশের সুদানী গোত্রভুক্ত 'কাওয়ার'রেদ এলাকা। অতঃপর 'বাজুইন'দের দেশের ভূ-খণ্ড অবস্থিত। এর পর অত্র তৃতীয়াংশের নিম্নে উত্তর দিকে 'ওদ্দানে'র অবশিষ্ট ভূমি এবং তার বিপরীতে পূর্ব দিকে অবস্থিত 'সেন্তারিয়া' এলাকা, যাকে মধ্য ওয়াহাত (ওয়েসিস) বলা হয়।

আলোচ্য অঞ্চলের চতুর্থাংশের উচ্চ দিকে 'বাজুইন'দের অবশিষ্ট এলাকা বিদ্যমান। এরপর এ অংশের মধ্যভাগে 'সাইদ'[৪৬] এলাকা। তা প্রথম অঞ্চলে উৎপন্ন ও প্রবাহিত হয়ে সাগরে পতিত নীলনদের তীরভূমি ধরে অবস্থিত। উক্ত নীল এ অংশের দুই বাধা

৪৬. রোজেনথাল একে 'উচ্চ মিশর' বলে উল্লেখ করেছেন।

সৃষ্টিকারী পর্বতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এর একটি পশ্চিম দিকে 'ওয়াহাত' পর্বত এবং অন্যটি পূর্ব দিকের 'মুকাত্তাম' পর্বত। এ অংশেরই উপরিভাগে 'আসনা' ও 'আরমানাত' এলাকা বিদ্যমান। এমনিভাবে এ তীরভূমিতে পরু পর 'আসিয়ুথ' ও 'কাউস' এবং এরপরে 'সউল' অবস্থিত। এখানে এসে নীল দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এর দক্ষিণ ভাগ এ অংশের 'লাহুন' এলাকায় ও এর বাম ভাগ 'দেলাস' এলাকায় এসে শেষ হয়েছে। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী এলাকায় মিশরের উচ্চভূমির অবস্থান।

মুকাত্তাম পর্বতের পূর্ব দিকে আলোচ্য অঞ্চলের পঞ্চমাংশের মধ্য দিয়ে সুয়েজ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত 'আইযাব' মরুভূমি। সুয়েজ সাগরকেই কুলসুম (লোহিত) সাগর বলা হয় এবং এটা ভারত সাগর থেকে দক্ষিণে উত্তরে প্রসারিত। তারই পূর্ব তীরে এ অংশে 'ইয়ালাম লাম' পর্বত থেকে 'ইয়াসরাব'[৪৭] এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হেজাজ প্রদেশ। হেজাজের মধ্যভাগে আল্লাহ্ কর্তৃক সম্মানিত নগরী মক্কা এবং সাগরতীরে অবস্থিত 'জেদ্দা' শহর। তা সাগরের পশ্চিম তীরের আইযাব এলাকার বিপরীত দিকে অবস্থিত।

আলোচ্য অঞ্চলের ষষ্ঠমাংশের পশ্চিম দিকে 'নজদ' এলাকা এবং এর দক্ষিণ দিকের শেষ প্রান্তে 'তাবালা' ও 'জরশ' এলাকা উত্তরে 'উকাজ' পর্যন্ত বিস্তৃত। নজদের নিম্নদিকে অত্র অংশের মধ্যে হেজাজের অবশিষ্ট ভূমি বিদ্যমান। এর বিপরীত দিকে পূর্বাভিমুখে 'নজরান' ও 'খয়বর' এলাকা। এর নিম্নভাগে ইয়ামামা এলাকা এবং নজরানের বিপরীত দিকে পূর্বে 'সাবা' ও 'মারাব' ভূমি। এরপর 'শিহর' নামীয় ভূ-খণ্ড পারস্য সাগর পর্যন্ত প্রসারিত। এটা ভারত সাগর থেকে উত্তর দিকে বহির্গত দ্বিতীয় সাগর, যেমন পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। এটা এ অংশে পশ্চিমদিকে ফিরে গিয়ে এর পূর্বদিক ও অভ্যন্তর ভাগে ত্রিকোণাকার একটি ভূ-খণ্ডের সৃষ্টি করেছে, যার উপরিভাগে শিহরের তীর ভূমিতে 'কালহাত' অবস্থিত। এর নিম্নভাগে তীর ভূমিতে উম্মান এলাকা। এরপর 'বাহরাইন' এবং এর 'হাজার' এলাকা ষষ্ঠাংশের সীমান্ত।

এর সপ্তমাংশের পশ্চিম শেষ প্রান্তে পারস্য সাগরের খণ্ডবিশেষ বিদ্যমান। এটা ষষ্ঠাংশের অনুরূপ খণ্ডের সন্নিহিত। ভারত সাগর এ অংশের উপরিভাগ আবৃত করে রেখেছে। এরই তীরে এখানে 'মাকরান' পর্যন্ত বিস্তৃত সিন্ধু এলাকা এবং এর সম্মুখভাগে 'তওবরান' এলাকা সিন্ধুরই অন্তর্গত। সুতরাং এ অংশের সমগ্র পশ্চিম ভাগে সিন্ধু এলাকা বিস্তৃত রয়েছে এবং এ এলাকা ও হিন্দ ভূ-ভাগের মধ্যে প্রান্তরের ব্যবধান বিদ্যমান। এর উপর দিয়ে হিন্দ থেকে আগত একটি নদী প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ দিকে ভারত সাগরে পতিত হয়েছে। ভারত সাগরের তীর থেকে হিন্দ এলাকার আরম্ভ এবং এর পূর্বদিকে 'বলহারা' এলাকা বিদ্যমান। তার নিম্নভাগে তাদের পূজ্য বিরাট মূর্তির দেশ মুলতান। অতঃপর সিন্ধুর নিম্নভাগ ও এর উচ্চভাগে 'সিজিস্তান' এলাকা বিস্মৃত।

আলোচ্য অঞ্চলের অষ্টমাংশের পশ্চিম দিকে হিন্দের 'বলহারা'[৪৮] এলাকার অবশিষ্ট ভূ-ভাগ। এর পূর্বদিকে 'কান্দাহার' এবং এর পরে 'মনিবার' (মালাবার) অবস্থিত। ভারত

---

৪৭. বর্তমান মদিনার প্রাচীন নাম।

৪৮. এটা কি কোন রাজার নাম? 'বল্লভ রায়' শব্দের অপভ্রংশ?

সাগরের তীরভূমির উপরের দিকে ও তার[৪৯] নিচে নিম্নের দিকে 'কাবুল' এবং এর পরে পূর্বদিকে বেষ্টনকারী সাগর পর্যন্ত 'কনৌজ' এলাকা। এটা মধ্য-কাশ্মীর ও বহিঃকাশ্মীরের মধ্য দিয়ে এ অংশের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত।

এর নবমাংশে পশ্চিম দিকে হিন্দের দূরপ্রান্ত এবং পূর্ব দিকে এটা দশমাংশের সাথে উপরিভাগে এসে মিশেছে। এর নিম্নভাগে চীনের সামান্য একটি ভূ-খণ্ড অবস্থিত, যাতে 'সাইগুন' শহর বিদ্যমান। দশমাংশের অন্য সব এলাকা জুড়ে বেষ্টনকারী সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত চীনদেশ। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই উত্তম জ্ঞাতা। পবিত্র তিনি, তাঁর সহায়তাই যথার্থ এবং তিনিই দয়া ও অনুগ্রহের অধিকারী।

তৃতীয় অঞ্চল

এটা উত্তর দিক থেকে দ্বিতীয় অঞ্চলের সন্নিহিত। এর প্রথমাংশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ উচ্চভূমি জুড়ে 'দরন' (এটলাস) পর্বত অবস্থিত। এটা পশ্চিম দিকে বেষ্টনকারী সাগর থেকে আরম্ভ করে পূর্বদিকে উক্ত অংশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। এ পর্বতে বসবাসকারী বারবার জাতির লোকসংখ্যা শুধু তাদের স্রষ্টাই বলতে পারেন। অচিরেই এদের বর্ণনা আসছে। উক্ত পর্বত, দ্বিতীয় অঞ্চল ও বেষ্টনকারী সাগরের মধ্যবর্তী ভূ-খণ্ডের 'রারাতমাশা' অবস্থিত। এরই সন্নিহিত পূর্বদিকে 'সুস' ও 'নওল' এলাকা। ঐদিকেই এর পূর্বদিকে 'দরআ', এর পর 'সিজিলামাশা' এবং এর পর নিস্তর মরুভূমির একটি ভাগ, যার কথা দ্বিতীয় অঞ্চলে বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত পর্বত এ অংশের উক্ত সমুদয় এলাকার উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এর পশ্চিম প্রান্তে গিরিপথ ও রাস্তা নেই বললেই চলে। এটা যেখানে মালবিয়া জলপ্রবাহের সাথে মিলিত হয়েছে, সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত প্রচুর গিরিপথ ও রাস্তা বিদ্যমান। এর এ প্রান্তে 'মাসমুদা' জাতির বাস। এরা ক্রমান্বয়ে হিনতাতা,' 'তায়নাম্লাকা' 'কাদ্মেওয়া,' 'শামকুরা' প্রভৃতি গোত্রে বিভক্ত এবং শেষোক্তটি মাসমুদাদের শেষ গোত্র। অতঃপর 'সিনহাকা' এবং এরাই সিনহাজা গোত্র। এ অংশের শেষ প্রান্তে কতিপয় 'জানাতী' গোত্র বাস করে। উক্ত পর্বতের মধ্যভাগে এখানে এসে 'আউরাস' পর্বত মিলিত হয়েছে। এটা কুতামার পর্বত। এর পর অন্যান্য বারবার জাতি, তাদের কথা যথাস্থানে বর্ণনা করব।

উক্ত দরন (এটলাস) পর্বত পশ্চিম দিক থেকে মরক্কোর উপর মাথা তুলেছে এবং তা তার সানুদেশে অবস্থিত। তার দক্ষিণ প্রান্তে 'মারাকেশ,' 'আগমাতা' ও 'তাদালা' এলাকা এবং বেষ্টনকারী সাগরের তীরে 'রাবাত আসফা' ও 'সালা' শহর। মারাকেশের মধ্যভাগের দিকে 'ফাস,' 'মেকনাসা,' 'তাজা' ও 'কাসরু কুতামা' এলাকা অবস্থিত। এ এলাকাকে স্থানীয় অধিবাসীরা 'দূর মাগরিব' বলে অভিহিত করে থাকে। এর বেষ্টনকারী সাগরতীরে 'আসিলা' (আরসিলা) ও 'আল-আরায়েশ' (লারসা) এলাকা বিদ্যমান। এ সকল এলাকার দিকে পূর্বে মধ্য-মাগরিবের এলাকা অবস্থিত ও তার রাজধানী

৪৯. এখানে 'তার' বলতে আলোচ্য অংশ বুঝাবে। রোজেনথাল এখানে যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা মূলের সাথে মিলে না। আমরা আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থের অনুসরণ করলাম।

'তেলেসমান'। এর পর রোম সাগর তীরবর্তী 'হুনাইন,' 'ওহরান,' 'আল-জাজায়ের' (আলজিরিয়া) এলাকা। কেননা এ রোম সাগর বেষ্টনকারী সাগর হতে চতুর্থাংশের পশ্চিম প্রান্তে 'তুনজা' (তাঞ্জিয়ার) প্রণালী দিয়ে বের হয়ে এসেছে এবং পূর্ব দিকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সংকীর্ণ প্রণালী দিয়ে এটা কিছুদূর আসবার পর দক্ষিণে উত্তরে বিস্তৃত হয়ে তৃতীয় ও পঞ্চম অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। এ জন্যই এর তীরে তৃতীয় অঞ্চলের বহু এলাকা বিদ্যমান।[৫০] যাহোক, এর পর আলজিরিয়ার পূর্বদিকে সাগরতীরে 'বেজায়া' (বগি) এলাকা। এর পর এর পূর্বে 'কুস্তান্‌তিনা' (কনস্টান্টাইন)। প্রথম অংশে শেষ প্রান্তে, এ সকল এলাকার দক্ষিণে সাগর থেকে এক দিনের পথ দূরত্বে ও মধ্য-মাগরিবের দক্ষিণ দিকে উত্থিত 'আশির' এলাকা এবং এর পর 'মাসিলা' ও 'যাব' এলাকা বিদ্যমান। এর রাজধানী 'বস্করা' দরন পর্বত সন্নিহিত আওয়াসের পাদদেশে স্থাপিত। এর বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে এবং এটা উক্ত অংশের পূর্বদিগস্থ শেষ প্রান্তে অবস্থিত।

আলোচ্য অঞ্চলের দ্বিতীয়াংশ প্রায় প্রথম অংশের অনুরূপ। দরন পর্বতের দক্ষিণ দিকের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এর মধ্য দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে একে দুইভাগে ভাগ করেছে। এর উত্তর দিকের একটি খণ্ড রোম সাগরের দ্বারা আবৃত। দরন পর্বতের দক্ষিণে এর যে ভূ-খণ্ডটি বিদ্যমান, তার পশ্চিমাংশ সবটুকুই প্রান্তর এবং তার পূর্বাংশে 'গাদামস' এলাকা। এরই পূর্বে ওদ্দানে ভূমিখণ্ড, যার অবশিষ্টাংশ দ্বিতীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। তার বর্ণনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। উক্ত দরন পর্বতের সানদেশে রোম সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এর যে ভূখণ্ড বিদ্যমান, যার পশ্চিমে আওরস পর্বত—তাতে 'তাবেস্‌সা' ও 'আল-আওবস' (লারিবাস) অবস্থিত। এর পর সাগরতীরে 'বোনা' এলাকা বিদ্যমান। এর পর এ সকল এলাকার দিকে পূর্বে 'আফ্রিকিয়া' এলাকা এবং সাগরের তীরে তিউনিস শহর অবস্থিত। এর পর 'সোসা' এবং এর পর 'আল-মাহদিয়া' এলাকা। এ সকল এলাকার দক্ষিণে দরন পর্বতের নিচে 'আল-জারিদ', 'তুযাব', 'কাফসা' ও 'নাফ্‌জাওয়া' এলাকা বিদ্যমান। এদের ও সাগরের তীরভূমির মধ্য-ভূভাগে 'কায়রোয়ান' শহর এবং 'ওসলাত' ও 'সুবাইতিলা' পর্বত। এ সকল এলাকার সবগুলোর পূর্বদিকে রোম সাগরের তীরে 'তারাবলিস' এলাকা এবং এর সম্মুখে দক্ষিণ দিকে 'হাওয়ারা' গোত্রাদির পর্বত 'দুমার' ও 'নাক্কারা', যা দরন পর্বতের সাথে সংযুক্ত ও পূর্বে উল্লেখিত দক্ষিণ ভূখণ্ডের শেষ প্রান্তের অন্তর্গত গাদামস-এর বিপরীত দিকে অবস্থিত। এ অংশের পূর্বপ্রান্তে সমুদ্রতীরে 'সুয়াইকা ইবনে মাশকুরা' এবং এর দক্ষিণ দিকে ওদ্দানের অন্তর্গত আরবদের মরু প্রান্তর।[৫১]

এ অঞ্চলের তৃতীয় অংশেও দরন পর্বত বিদ্যমান। অবশ্য এটা তার শেষ প্রান্তে উত্তর দিকে ঘুরে সম্মুখ ভাগে অগ্রসর হয়ে রোম সাগরে প্রবেশ করেছে এবং তাকে 'আন' অন্তরীপ বলা হয়। রোম সাগর উত্তর দিকে এ অংশের অনেকখানি গ্রাস করেছে। এর ফলে তার ও দরন পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান সংকীর্ণ হয়ে গেছে। উক্ত পর্বতের পশ্চাতে

৫০. রোজেনথালের অনুবাদে এস্থানে—'তাঞ্জিয়ার কসরে সগীর পর্যন্ত এর পর 'বদিস' এলাকা ও 'গাদামস' অবস্থিত। আমরা আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে এটা পাইনি।

৫১. এটা সম্ভবত পশ্চিম আফ্রিকায় বসবাসকারী আরবীয় গোত্রাদির বিচরণভূমি।

দক্ষিণে ও পশ্চিমে এ অংশের যে ভূ-খণ্ড বিদ্যমান, তাতে উদ্যানের অবশিষ্ট ও আরবদের প্রান্তর রয়েছে। এর পর 'জাওয়াইলা ইবনে আল-খাত্তাব' এবং এ অংশের পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত এর পর মরু প্রান্তর ও জনশূন্য ভূমি বিদ্যমান। উক্ত পর্বত ও সাগরের মধ্যবর্তী স্থানে তীরভূমিতে 'সুরতা' এলাকা এবং এর পর জনবসতিহীন প্রান্তর ও মরু, যাতে আরবগণ ঘুরে বেড়ায়। এর পর 'আজদাবিয়া' পর্বতের বাঁকে 'বুরকা' ও এখানে সাগরতীরে 'তালমাসা' অবস্থিত। অতঃপর পর্বতের বাঁকের পূর্বদিকে 'হাইয়েব' ও 'রাওয়াহা' প্রান্তর এ অংশের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত।

আলোচ্য অঞ্চলের চুতর্থ অংশের ঊর্ধ্বভাগের পশ্চিম প্রান্তে 'বরকিক' মরুভূমি এবং এর নিম্নভাগে 'হাইয়েব' ও 'রাওয়াহা' এলাকা। এর পর রোম সাগর এ অংশে প্রবেশ করে এর দক্ষিণ দিকে কিছু ভূ-খণ্ড গ্রাস করে এর ঊর্ধ্বভাগ পর্যন্ত পৌঁছেছে। সাগর ও এ অংশের শেষ প্রান্তের মধ্যে শুধু প্রান্তর, যার মধ্যে আরবরা বিচরণ করে। এরই পূর্বদিকে 'ফাইয়ুম' এলাকা। এটা নীলনদের শাখাদ্বয়ের একটির অববাহিকায় অবস্থিত। এ শাখা দ্বিতীয় অঞ্চলের চতুর্থ অংশে অবস্থিত 'সাইদ' এলাকা থেকে 'লাহুন' এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফাইয়ুম হ্রদে এসে পড়েছে। এরই পূর্বদিকে মিশর ও তার বিখ্যাত নগরী (কায়রো) অবস্থিত। নীলনদের যে শাখাটি দ্বিতীয় অংশের 'সাইদ' এলাকা থেকে 'দেলাস'-এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, তারই তীরে এটা স্থাপিত। মিশরের নিম্নভাগে এসে এ শাখাটি পুনরায় 'সম্ভুফ' ও 'যুপতি'র নিকটে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এর দক্ষিণ শাখাটি পুনরায় 'কুরমুত'-এর নিকট দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে এবং এ সকল শাখা প্রবাহিত হয়ে রোম সাগরে পতিত হয়েছে। এ শাখাসমূহের পশ্চিম অববাহিকায় 'আলেকজান্দ্রিয়া', মধ্য অববাহিকায় 'রশিদা' ও পূর্ব অববাহিকায় 'দিমিয়াতা' অবস্থিত। মিশর ও কায়রো এবং এ সকল সমুদ্রতীরবর্তী নিম্ন ভূ-ভাগের মধ্যে মিশরের পল্লী এলাকা বিদ্যমান। এর সমগ্র এলাকাই জনবসতি ও কৃষির দিক থেকে সমৃদ্ধ।

এ অঞ্চলের পঞ্চমাংশে সিরিয়ার অধিকাংশ, যেমন আমি বর্ণনা করব। কারণ কুলযুম সাগর তার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে সুয়েজের নিকট শেষ হয়েছে। এটা ভারত সাগর থেকে উত্তর দিকে বের হয়ে কিছুটা পশ্চিম দিকে ঘুরে গেছে। এজন্যই এর বাঁক নেয়ার ফলে এ অংশে একটি দীর্ঘ ভূ-খণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে, যার পশ্চিম প্রান্ত সুয়েজে গিয়ে পৌঁছেছে। এ ভূখণ্ডেই সুয়েজের পরে 'ফারান', তার পরে তুর পর্বত, তার পরে মাদায়েনের 'আয়লা' এবং শেষ প্রান্তে 'হাওয়ারা' অবস্থিত। এখান থেকে তা তীরভূমি ধরে মোড় নিয়ে দক্ষিণে হেজাজের দিকে ফিরেছে, যেমন দ্বিতীয় অঞ্চলের পঞ্চমাংশে বর্ণিত হয়েছে। এ অংশের উত্তর প্রান্তে রোম সাগরের একটি খণ্ড তার পশ্চিম দিকের অধিকাংশ ভূ-ভাগ গ্রাস করেছে এবং এরই উপর 'আল ফরমা' ও 'আল আরিশ'। উক্ত সাগরের শেষ প্রান্ত কুলযুম এলাকার নিকটে এসে পৌঁছেছে। এর ফলে সেখানে তাদের মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ খুবই সংকীর্ণ, একটি দ্বারের তুল্য হয়ে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছে। এ দ্বারের পশ্চিমে 'তীহ' প্রান্তর, অনুর্বর, যাতে কিছুই জন্মে না। মিশর থেকে বহির্গত হওয়ার পর সিরিয়ায় প্রবেশের পূর্বে তা চল্লিশ বছর ধরে বনি ইসরাইলের বিচরণভূমি ছিল, যেমন কোরানে বর্ণিত হয়েছে।[৫২] রোম সাগরের এ খণ্ডে এ অংশের মধ্যে 'কব্‌রস'

৫২. দ্র: কোরান ৫, ২৬।

(সাইপ্রসা) দ্বীপের কিছু অংশ পড়েছে। তার বাকি অংশ চতুর্থ অঞ্চলে অবস্থিত। আমরা অচিরেই তা বর্ণনা করব। উক্ত সাগরের এ খণ্ডের তীরে সুয়েজ সাগরের দিকে একটি সংকীর্ণ ভূভাগে 'আল আরিশ' অবস্থিত। তা মিশরের শেষ প্রান্ত এবং তার সাথে 'আস্কালান' এলাকা বিদ্যমান। এদের মধ্যে উক্ত সাগরের প্রান্তভূমি এবং এর পর উক্ত সগার খণ্ড মোড় ঘুরে 'তারাবলাস' (ত্রিপলী) ও 'গাজার' নিকটে চতুর্থ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। এখানে রোম সাগর তার পূর্বপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। এ সাগর খণ্ডের উপরেই সিরিয়ার অধিকাংশ তীরভূমি। এর পূর্বে 'গাজা', এর পরে 'আস্কালান' এবং তা থেকে সামান্য মোড় ঘুরে উত্তর দিকে 'কায়সরিয়া' (সিজারিয়া) এলাকা অবস্থিত। এর পর এভাবে 'উকা', 'সুর' ও 'সাইদা' এলাকা বিদ্যমান। এর পর সাগর উত্তর দিকে মোড় ঘুরে চতুর্থ অঞ্চলে পৌঁছেছে।

এ অংশের এ সাগর খণ্ডের তীরবর্তী এলাকাসমূহের বিপরীতে কুলযুম সাগরের তীরবর্তী আয়লা থেকে একটি বিরাট পর্বত মাথা তুলেছে এবং তা উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে পূর্বদিকে মোড় নিয়ে এ অংশকে অতিক্রম করে গেছে। একে 'লুক্কাম' (আমানাস) পর্বত বলা হয়। তা যেন মিশর ও সিরিয়ার মধ্যে প্রাচীরের আকারে দাঁড়িয়ে আছে। এরই 'আয়লার' নিকটস্থ প্রান্তে 'আল আকাবা' অবস্থিত, যা অতিক্রম করে হাজীগণ মিশর থেকে মক্কা গমন করে থাকেন। এর পর উত্তর প্রান্তে 'সারা' পর্বতে হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর সমাধিস্থল। তা উপরোক্ত লুক্কাম পর্বতের সাথে আল-আকবার উত্তরদিকে মিলিত হয়ে পূর্বদিকে চলে গেছে। এর পর সামান্য মোড় ঘুরেছে। এর পূর্বদিকে এখানে 'আল হিজর', সামুদ জাতির দেশ, তাইমা এবং হেজাজের নিম্নভাগ 'দওমাতুল জন্দল' এলাকা বিদ্যমান। তার উপরিভাগে 'রেদোয়া' পর্বত এবং দক্ষিণে 'খয়বর' দুর্গাদি। সারা পবর্ত ও কুলযুম সাগরের মধ্যবর্তী স্থানে 'তবুক' মরুভূমি অবস্থিত। সারা পর্বতের উত্তর দিকে লুক্কাম পর্বতের সন্নিকটে 'কুদসী' (জেরুজালেম) শহর। এর পর 'উর্দুন' (জর্ডন) এবং এর পর 'তাবারিয়া'। এর পূর্বদিকে 'আখরিয়াত' পর্যন্ত 'গোর' এলাকা বিদ্যমান এবং এরই পূর্বদিকে হেজাজের শেষপ্রান্ত 'দওমাতুল জন্দলে' এ অংশের শেষ। এ অংশের শেষ প্রান্তে লুক্কাম পর্বতের উত্তরদিকে মোড় ঘুরবার স্থানে 'দামেস্ক' শহর অবস্থিত। এটা 'সাইদা' ও সমুদ্র তীরবর্তী বৈরুতের বিপরীত দিকে এবং এদের মধ্যবর্তী এলাকায় লুক্কাম পর্বত বিদ্যমান। দামেস্কের অভিমুখে পূর্বদিকে 'বালাবাক্কা' এর পর এ অংশের শেষ প্রান্তে উত্তর দিকে লুক্কাম পর্বতের শেষাংশে 'খেমাস' (এমেসা) শহর অবস্থিত। বালাবাক্কা ও খেমাসের পূর্বদিকে 'তাদ্দামুর (পামীরা) ও জঙ্গলাকীর্ণ প্রান্তর এ অংশের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত।

আলোচ্য অঞ্চলের ষষ্ঠাংশের উপরিভাগে আরব বেদুইনদের মরুপ্রান্তর নজদ ও ইয়ামাসার নিম্নদিকে 'আল আরয' ও 'সাব্বান' পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকা থেকে বাহরাইন ও পারস্য সাগরের তীরবর্তী 'হিজর' পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অংশের নিম্নভাগে মরু প্রান্তরের দিকে 'হীরা', 'কাদেসিয়া' ও ফুরাতের জলাভূমি এলাকা বিদ্যমান। এর পরবর্তী পূর্বদিকে 'বসরা' শহর। এ অংশেই পারস্য সাগর, এর উত্তর নিম্নভাগে 'আবদান' ও 'উবুল্লা'র নিকটে এসে শেষ হয়েছে। আবাদানের নিকটে দজলা নদী বহু খালে বিভক্ত

হয়ে উক্ত সাগরে পতিত হয়েছে। ফুরাত নদী থেকে বহু শাখা এসে এর সাথে মিলিত হয়েছে এবং সবগুলো একত্র হয়ে আবাদানের নিকট পারস্য সাগরে পড়েছে। সাগরের এ অংশটি উপরিভাগে প্রশস্ত ও শেষ প্রান্তে পূর্বদিকে সংকীর্ণ এবং এর শেষ সীমায় ও উত্তর সীমায়ও সমানভাবে সংকীর্ণ। এর পশ্চিম তীরে বাহরাইনের নিম্নভূমি, 'হিজর' ও 'আল আহ্সা'। এর পশ্চিম দিকে 'আখতাব', 'সাম্মান' ও ইয়ামামা'র অবশিষ্ট ভূমি। এর পূর্বদিকে পারস্যের তীরভূমির উপরিভাগ। এটা এ অংশের পূর্ব প্রান্তের এমন একটি সংকীর্ণ ভূ-খণ্ড যা এ সাগর থেকে ক্রমশ পূর্বদিকে বিস্তৃত হয়ে গেছে। এরই পশ্চাতে এ অংশের দক্ষিণ দিকে কিরমানের অন্তর্গত 'আল কফ্স' পর্বত এবং হরমুজের নিম্ন সাগর তীরে 'সিরাফ' এলাকা ও 'নজিরাম' অবস্থিত। এ অংশের শেষে পূর্বদিকে ও হরমুজের নিম্নভাগে 'ফারেস' এলাকা। এর মধ্যে 'সাবুর', 'দারআবজরদ', 'নাসা', ইস্তাখার', 'শাহজান' ও 'সিরাজ' এবং এটাই এ সবগুলোর রাজধানী। ফারেস এলাকার নিম্নভাগে উত্তর দিকে সমুদ্রের নিকটে খুজিস্তান এলাকা এবং এতে 'আওয়াজ', 'তুস্তার', 'সদী', 'সাবুর',[৫৩] 'সুস', 'রামহরমুজ' ও অন্যান্য শহর বিদ্যমান। 'আরজান' ফারেস ও খুজিস্তানের মধ্যসীমায় অবস্থিত। খুজিস্তানের পূর্বদিকে 'কুর্দী' পর্বতমালা ইস্পাহান সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। কুর্দীরা এতে বসবাস করে এবং এর পশ্চাতে ফারেস এলাকায় বিচরণ করে থাকে। তাদেরকে 'আর্‌রসুম'[৫৪] বলা হয়।

এ অঞ্চলের সপ্তমাংশের উপরিভাগে পশ্চিম দিকে 'কফস' পর্বতের অবশিষ্ট ভাগ অবস্থিত। এ পর্বতের দক্ষিণে ও উত্তরে এর সন্নিহিত 'কিরমান' ও 'মকরান' এলাকা বিদ্যমান। এদের শহরগুলো হল 'রওদান', 'শরজান', 'জিরফ্ত', 'ইয়াজদাশির' ও 'বাহওয়াজ'। কিরমান এলাকার নিম্নভাগে উত্তর দিকে ইস্পাহানে সীমান্ত পর্যন্ত 'ফারেস' এলাকার অবশিষ্ট ভূমি বিদ্যমান। এ অংশের পশ্চিম উত্তর দিকের মধ্যবর্তী প্রান্তে ইস্পাহান নগরী অবস্থিত। এর পর কিরমান ও ফারেস এলাকার পূর্বদিকে 'সিজিস্তান' ও 'কুহিস্তান'। সিজিস্তান দক্ষিণে ও কুহিস্তান উত্তরে বিদ্যমান। এ অংশের মধ্যভাগে সিজিস্তান, কুহিস্তান কিরমান ও ফারেসের মধ্যবর্তী এলাকায় এক বিরাট মরুভূমি, যার মধ্যে দুর্গমতার জন্য পথ-ঘাট নেই বললেই চলে। সিজিস্তানের শহর হল 'বস্তু' ও 'তাক' এবং কুহিস্তান বস্তুত খুরাসানের অন্তর্গত। এর অন্যতম বিখ্যাত এলাকা 'সিরখস' এবং কুহিস্তান এ অংশের শেষপ্রান্ত।

এর অষ্টমাংশের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে তুর্কি জাতীয় 'জুলহা' (খালাজ)দের প্রান্তর। এটা পশ্চিম দিক থেকে সিজিস্তান ও দক্ষিণ দিক থেকে হিন্দের কাবুল এলাকার সাথে সন্নিহিত। উক্ত প্রান্তরের উত্তর দিকে 'গোর' পর্বত ও এলাকা এবং তার রাজধানী গজনী অবস্থিত। এটাই হিন্দে প্রবেশের দ্বারপথ। গোরের শেষ প্রান্তে উত্তর দিকে 'অস্তারাবাদ' এলাকা এবং এ অংশের শেষ প্রান্তে উত্তর-পশ্চিম দিকে খুরাসানের মধ্যবর্তী 'হিরাত' এলাকা বিদ্যমান। এতে 'আস্ফারায়ন', 'কাশান', 'বুশন্জ', 'মারবুজ্জোদ', 'তালিকান' ও

---

৫৩. মূল গ্রন্থে 'সদী ও সাবুর' বিদ্যমান। রোজেনথালে এর স্থলে 'জন্দিশাবুর' লিখা হয়েছে। এটাই ঠিক বলে মনে হয়।

৫৪. আমাদের ব্যবহৃত মূল পাঠে এইরূপ আছে। রোজেনথালে 'আজ্জমুম' লিখা হয়েছে।

'জুরজান' এবং এখানে খুরাসান জাইহুন নদী (অক্সাস) পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। খুরাসানের অন্তর্গত এ নদীতীরে পশ্চিম দিকে 'বলখ' শহর ও পূর্বদিকে 'তিরমিজ' শহর অবস্থিত। এ বলখ এক সময়ে তুর্কি সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। এ জাইহুন নদী হিন্দের সাথে বদখশানের সন্নিহিত এলাকা 'ওজ্জার' (ওয়াখান) থেকে এ অংশের দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে পূর্বদিকে এর শেষাংশে ঘুরে গিয়ে এর মধ্যভাগে পৌঁছেছে। এখানে একে 'খরনাব' নদী বলা হয়। এখানে পুনরায় বাঁক নিয়ে উত্তর দিকে খুরাসানে গিয়ে উপনীত হয়েছে। এটা ঐদিকেই ক্রমশ অগ্রসর হয়ে পঞ্চম অঞ্চলের 'খোয়ার্জিম' (আরল) হ্রদে পতিত হয়েছে। তার বর্ণনা পরে আসছে। এ অংশের মধ্যভাগে উক্ত নদীর দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে বাঁক নেবার স্থানে অন্য আরও পাঁচটি বৃহৎ নদী এর সাথে মিলিত হয়েছে। এরা পূর্বদিকের 'খুত্তাল' ও 'ওয়াঘ্‌শব' এবং অন্যান্য নদী পূর্বদিকের 'বুত্তাম' পর্বত ও তার মধ্য এলাকা থেকে এসে এর সাথে মিলিত হওয়ার ফলে উক্ত নদী এতদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে যে, তার তুলনা নেই বললেই চলে। এর উক্ত পাঁচটি নদীর একটি হল 'ওখশাব' নদী। এটা এ অংশের পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত তিব্বত এলাকা থেকে বের হয়ে পশ্চিম দিক থেকে উত্তর দিকে ঘুরে এ অংশের উত্তরদিগস্থ স্থান দিয়ে নবম অংশে প্রবাহিত হয়েছে। এর প্রবাহপথে একটি বিরাট পর্বত বাধা সৃষ্টি করেছে। এ পর্বত এ অংশের দক্ষিণদিকের মধ্যভাগ থেকে উত্থিত হয়ে পূর্বদিকে গিয়ে উত্তর দিকে মোড় নিয়েছে এবং এ অংশের উত্তর দিকের নিকট দিয়ে নবম অংশে বের হয়ে গেছে। এর ফলে তিব্বত এলাকার দক্ষিণ পূর্বের একটি ভূখণ্ড এ অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং উক্ত পর্বত তুর্কি ও খুত্তাল এলাকার মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে। উক্ত পর্বতের এ অংশস্থিত পূর্বদিকের মধ্যভাগে অবস্থিত একটিমাত্র গিরিপথ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। ফজল ইবনে ইয়াহিয়া[৫৫] তাতে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরের ন্যায় একটি প্রাচীর নির্মাণ করিয়ে তাতে একটি দ্বারের সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তিব্বত থেকে বহির্গত 'ওখশাব' নদী উক্ত পর্বতের নিকট পৌঁছে তার নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দীর্ঘ এলাকার পরে 'ওয়াখশ' এলাকায় প্রবেশ করেছে এবং বলখের সীমান্তে জাইহুন নদীতে পতিত হয়েছে। অতঃপর এটা (জাইহুন) উত্তর দিকে 'তিরমিজ' হয়ে 'জুরজান' পর্যন্ত পৌঁছেছে। 'গোর' এলাকার পূর্বদিকে তার ও জাইহুনের মধ্যস্থলে খুরাসানের 'নাসান' এলাকা বিদ্যমান। এখানে নদীর পূর্বতীরে 'খুত্তাল' এলাকা অবস্থিত। এর অধিকাংশই পর্বতময়। এর পর 'ওয়াখশ' এলাকা। এদের উত্তর সীমায় 'বুত্তাম' পর্বত, যা খুরাসানের পশ্চিম প্রান্তে 'জাঁইহুন নদী থেকে উত্থিত হয়ে পূর্বদিকে বিস্তৃত হয়েছে এবং তিব্বতের সম্মুখ ভাগের বিরাট পর্বতমালার সাথে মিলিত হয়েছে। এরই নিম্ন দিয়ে 'ওখশব'[৫৬] নদী প্রবাহিত হচ্ছে—যেমন পূর্বে বলেছি এবং এটা ফজল ইবনে ইয়াহিয়ার দ্বারের নিকট উক্ত পর্বতের সঙ্গে এসে মিশেছে। এ সকল পর্বতের মধ্যদিয়ে জাইহুন প্রবাহিত হবার কালে অন্য বহু নদী এর সাথে মিলেছে। 'ওয়াখশ' এলাকায় উৎপন্ন নদী পূর্বদিক থেকে

---

৫৫. ফজল ইবনে ইয়াহিয়া বরমেকী?

৫৬. এর অর্থ 'ওয়াখ্‌শের জলধারা', এটা আমদরিয়া জলপ্রবাহের একটি অংশ। সম্ভবত এটা হতে গ্রিকগণ 'অক্সাস' শব্দটি গ্রহণ করেছেন। জাইহুনকে অক্সাস বলা হয়।

তিরমিজের উত্তর দিকে নিম্নভাগে এর মধ্যে পতিত হচ্ছে। বলখ নদী জুরজানের নিকট বুত্তাম পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিম দিক থেকে এতে পড়েছে। এ নদীরই পশ্চিম তীরে খুরাসানের 'আমেদ' এলাকা বিদ্যমান। আবার এরই পূর্বতীরে এখানে তুর্কিদের এলাকাভুক্ত 'সোগদ' ও 'আরশোনা' অবস্থিত। এর পূর্বে এ অংশের পূর্ব প্রান্তে 'ফরানা' এলাকা এবং অন্যান্য তুর্কি এলাকা, যাকে উত্তর দিক থেকে বুত্তাম পর্বত অতিক্রম করে গেছে।

আলোচ্য অঞ্চলের নবমাংশের পশ্চিম দিকে এর মধ্যভাগ পর্যন্ত তিব্বত দেশ, এর দক্ষিণে হিন্দের এলাকা এবং এর পূর্বদিকে এ অংশের শেষ পর্যন্ত চীন দেশ অবস্থিত। এ অংশের নিম্নভাগে তিব্বত এলাকার উত্তরে তুর্কিদের 'খজলাজিয়া' (খারুক) এলাকা, যা এ অংশের পূর্ব-উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অংশের পূর্ব প্রান্তে এর সাথে পশ্চিম দিক থেকে ফারগানার ভূমিও এসে মিলিত হয়েছে এবং এ অংশের পূর্বদিকে তুর্কি তাগারগুরদের[৫৭] এলাকা, যা এ অংশের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে।

এ অঞ্চলের দশমাংশের দক্ষিণ দিকে চীনের অবশিষ্ট সমুদয় এলাকা এবং তার নিম্নভাগে উত্তর দিকে 'তাগারগুর'দের এলাকার অবশিষ্ট ভাগ বিদ্যমান। এর পর এদের পূর্বদিকে তুর্কি 'কিরগীজ'দের এলাকা যাহ। এ অংশের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। কিরগীজ এলাকার উত্তর দিকে তুর্কি 'কিতমান'দের এলাকা। এরই সম্মুখে বেষ্টনকারী সাগরে 'ইয়াকুত' (পদ্মরাগ মণি) দ্বীপ অবস্থিত। তার মধ্যভাগে একটি গোলাকার পর্বত বিদ্যমান, যাতে উঠবার কোন পথঘাট নেই। বাইর থেকে এর চূড়ায় আরোহণ করা একান্তই দুঃসাধ্য। উক্ত দ্বীপ বিষধর সর্পে ও পদ্মরাগ মণির খণ্ডাদিতে পরিপূর্ণ। এ ভূখণ্ডের অধিবাসীরা এ সকল মণি-মানিক্য সংগ্রহের জন্য আল্লাহ্‌র প্রদত্ত নানাবিধ কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকে। খুরাসানের ও পর্বতমালার পশ্চাদ্বর্তী এ বিস্তৃত এলাকার অধিবাসীদের সকলেই তুর্কি গোত্রভুক্ত। এখানেই তারা বিচরণ করে ফিরে। তাদের সংখ্যা অগণিত। তারা যাযাবরী জীবনধারার মধ্য দিয়ে খাদ্য, বাহন ও প্রজননের জন্য উট, ছাগল, গরু-ঘোড়া প্রভৃতি পশু পালন করে থাকে। তাদের গোত্র সংখ্যার অবধি নেই, একমাত্র তাদের স্রষ্টাই তা বলতে পারেন। তাদের মধ্যে জাইহুন নদীর তীরভাগে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা মুজসী[৫৮] ধর্মাবলম্বী অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে থাকে এবং বন্দীদিগকে তাদের প্রতিবেশীদের নিকট বিক্রয় করে দেয়। তারা এ সকল ক্রীতদাসকে খুরাসান, হিন্দ ও ইরাকে পাঠায়।

চতুর্থ অঞ্চল

এটাও উত্তর দিক থেকে তৃতীয় অঞ্চলের সন্নিহিত। তার প্রথমাংশের পশ্চিম দিকে দক্ষিণ থেকে উত্তরে বিস্তৃত বেষ্টনকারী সাগরের একটি দীর্ঘ খণ্ড বিদ্যমান। এরই উত্তর-দক্ষিণ দিকে 'তাঞ্জা' (তাঞ্জিয়ার) শহর। তাঞ্জার নিম্নে উক্ত সাগর খণ্ড থেকে রোম সাগর পর্যন্ত

৫৭. রোজেনথালে 'তাগুকগুজ' লিখা হয়েছে।

৫৮. এখানেও মজুসী জরা জরাস্কু ধর্মাবলম্বী নহে, বরং সাধারণ পৌত্তলিক ও অন্য ধর্মাবলম্বী বুঝাইতেছে।

বার মাইল প্রশস্ত একটি সংকীর্ণ প্রণালী, তার উত্তরে 'তারিফ' ও 'আলখাজরা' (আলজেসিরাস) দ্বীপ এবং এর দক্ষিণে 'কসরুল মাজাজ' ও 'সিবতা' (সিওটা) অবস্থিত। এ প্রণালী পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে অত্র অঞ্চলের পঞ্চমাংশে গিয়ে পৌঁছেছে। এটা তার প্রবাহপথে ক্রমশ বিস্তৃতিলাভ করে অত্র অঞ্চলের প্রথম চারটি অংশ ও পঞ্চমাংশের অধিকভাগ আবৃত করেছে এবং তার দুই পার্শ্বে তৃতীয় ও পঞ্চম অঞ্চলের বেশ কিছু ঢেকে রেখেছে, যা অচিরেই আমরা বর্ণনা করব। এ সাগরকে 'সিরিয়া' সাগরও বলা হয়। এতে বহু দ্বীপ বিদ্যমান। তাদের মধ্যে পশ্চিম দিকে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ 'ইয়াবেনা', 'সায়ারকা', 'মায়নরকা, 'সারদানিয়া' প্রভৃতি এর পরে এবং 'সিসিলী' এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এর পর বিলুনুস (পিলোপনিস), 'আক্রিতাস' (ক্রীট), 'কবরস' (সাইপ্রাস)। আমরা এদের সাধারণ ও বিশদ বিবরণ যথাস্থানে প্রদান করব।

আলোচ্য অঞ্চলের তৃতীয়াংশের শেষ প্রান্তে ও পঞ্চম অঞ্চলের তৃতীয়াংশের মধ্যে রোম সাগর থেকে 'বানাদেকা' (ভেনিস) প্রণালী বের হয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং অত্র অংশের মধ্যভাগে মোড় ঘুরে পশ্চিম দিকে পঞ্চম অঞ্চলের দ্বিতীয়াংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। চতুর্থ অংশের শেষ প্রান্তে পঞ্চম অঞ্চলের পূর্ব দিকে এ রোম সাগর থেকে 'কুস্তানতেনিয়া' (কনস্টান্টিনপোল) প্রণালীও বের হয়েছে। এটা এক তীর নিক্ষেপের অনুরূপ প্রশস্ত আকারে উত্তর দিকে এ অঞ্চলের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। অতঃপর ষষ্ঠ অঞ্চলের চতুর্থ অংশের দিকে অগ্রসর হয়ে মোড় ঘুরে পূর্বদিকে নিতাশ (কৃষ্ণ) সাগরের মধ্য দিয়ে সমগ্র পঞ্চম অংশ ও ষষ্ঠ অঞ্চলের ষষ্ঠাংশের অর্ধেক ভাগ পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ সম্পর্কে আমরা যথাস্থানে বর্ণনা করব।

রোম সাগর যেখানে বেষ্টনকারী সাগর থেকে তাঞ্জা প্রণালী দিয়ে বের হয়ে তৃতীয় অঞ্চলের দিকে প্রসারিত হয়েছে, সেখানে এ অংশের একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড বিদ্যমান, যার উপর দুই সাগর সঙ্গমে তাঞ্জা শহর অবস্থিত। অতঃপর রোম সাগরের তীরে 'সিবতা' (সেওটা) শহর, এর পর 'কাতাউন' (তিতিয়ান) ও এর পর 'বাদিস'। এর পর এ অংশের সমুদয় পূর্বভাগ রোম সাগর দ্বারা আবৃত। এর পর সাগর তৃতীয় অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে। এ অংশের সমগ্র জনবসতির অধিকাংশ এর উত্তর দিকে ও প্রণালীর উত্তর দিকে বিরাজমান। এর সমুদয় অংশই পশ্চিম আন্দালুসের (স্পেনের) এলাকা এবং বেষ্টনকারী সাগর ও রোম সাগরের মধ্যবর্তী এরই অন্তর্গত প্রথম এলাকার দুই সাগর সঙ্গমে 'তারিফ'। এর পূর্বদিকে রোম সাগরের তীরে 'আলখাজরা' দ্বীপ। এর পর 'মালাকা, 'আল মানকার' ও 'আলমারিয়া'। এর নিম্ন দিকে পশ্চিম ভাগেও বেষ্টনকারী সাগরের সন্নিকটে 'শরিশ' (ডিলা ফ্রন্টেরা), 'লাবলা' (নিবলা) ও এদের সম্মুখ ভাগে 'কাদিশ' দ্বীপ। শরিশ ও লাবলার পূর্ব দিকে 'আশবেলিয়া' (সেভিলা), 'আস্তজা' (এসিজা), 'কুর্তবা' ও 'দিলা' (মার্বেলা) এবং এরপর 'গরনাতা' (গ্রানাডা), 'জিয়ান,' 'উব্বাদা,' 'ওদিয়াশ' (গতিক্স) ও 'বস্তা' (বাজা) অবস্থিত। এ সকল শহরের পশ্চিম দিকে বেষ্টনকারী সাগরের তীরে 'শান্তামারিয়া' ও 'শেলবা'। এদের পূর্বদিকে বাতলিমুস' (বাদাজজ), 'মারেদা' ও ইয়াবেরা এবং এরপর গাফিক,' 'বরঘালা; (ট্রিজিলো) ও 'কেলাতরিয়াহ' (কেলাট্রবা)। এদের নিম্নভাগে পশ্চিম দিকে বেষ্টনকারী সাগরতীরে বাজা

(তাজু) নদীর উপর আশবুনা (লিসবন) এবং উক্ত নদীর তীরে এর পূর্ব দিকে 'শান্তারিন' ও 'মুযিয়া' (কোরিয়া)। এর পর 'কান্তারাতুস্ সাইফ' (আল কান্তার) আশবুনার সম্মুখ ভাগেই পূর্ব দিকে 'শারাত' (ডিগাডাররমা) পর্বত। এটা এখানেই পশ্চিম দিক থেকে আরম্ভ হয়ে পূর্বে এ অংশের উত্তরে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এটা অত্র অংশে মধ্যভাগ অতিক্রম করে 'সালেম' শহর (মেডিনাসেলি) পর্যন্ত গেছে। এ পর্বতের সানুদেশে 'ফেরেনা'র (কোরিয়া)[৫৯] পূর্বভাগে 'তালাবিরা'. 'তুলাইতিলা' (টলিভো), 'ওদিউল্ হেজারা' (গোয়াদাজারা) ও মদিনাতুসালেম (মেডিনাসেলি) অবস্থিত। উক্ত পর্বতের প্রথম ভাগে তার ও আশবুনার মধ্যভাগে 'কালমরিয়া' (কোয়েমব্রা) এলাকা পশ্চিম আন্দালুসের অন্তর্গত।

পূর্বে আন্দালুসের মধ্যে রোম সাগরের তীরে আল মারিয়ার পরে 'করতাজান্না,' 'লাপতা' (ঐলিকেন্টি), 'দানিয়া,' 'বেলানসিয়া' ও এ অংশের শেষ পূর্ব প্রান্তে 'তারতুশা' (ট্যারগোনা)। এদের নিম্নভাগে উত্তর দিকে 'লিউরাকা', 'শাককুরা'—পশ্চিম আন্দালুসের 'বস্তা' ও 'কেলাতুরিয়াহে'র সন্নিহিত। এরপর পূর্ব দিকে 'মসিংয়া' ও বেলানসিয়ার উত্তরে নিম্নভাগে 'শাতেবা' এবং এরপর 'শকার,' 'তারতুশা,' 'তারকুনা' এ অংশের শেষ প্রান্ত। এদের নিম্নভাগে উত্তরে 'মেঞ্জালা' ও 'রিদা' ভূভাগ পশ্চিম দিক থেকে 'শাককুরা' ও 'তুলাইতিলা'র সন্নিহিত। এর পর তারতুশার নিম্নভাগে পূর্ব ও উত্তর দিকে 'আফরাগা'। মদিনাতুসালেমের পূর্বে 'কেলাতুআইউব,' 'সারকুস্তা' ও 'লারেদা' এবং এটাই এ অংশের পূর্ব ও উত্তর দিকের শেষ প্রান্ত।

আলোচ্য অঞ্চলের দ্বিতীয়াংশে একটি ভূখণ্ড ব্যতীত অন্য সমুদয় ভূভাগ পানির নিচে আবৃত রয়েছে উক্ত ভূখণ্ড তার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এবং 'বারনাত' পর্বতের একাংশ এর অন্তর্গত। উক্ত পর্বতের নামের অর্থ হল 'পথঘাটের পর্বত'। এটা পঞ্চম অঞ্চলের প্রথম অংশের প্রান্ত থেকে এ অংশে এসেছে। এ অংশের উত্তর ও দক্ষিণ শেষ প্রান্তের বেষ্টনকারী সাগরসীমা থেকে এর আরম্ভ এবং এটা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে পূর্ব দিকে মোড় ঘুরে এ চতুর্থ অঞ্চলের প্রথম অংশ থেকে দ্বিতীয় অংশে প্রবেশ করেছে। এর ফলে উক্ত পর্বতের একটি অংশ এতে পড়েছে এবং এর সকল পথই মূল ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত। একে 'গাসকুনিয়া' এলাকা বলা হয়। এতেই 'খরিদা' (গ্যারোনা) ও 'কারকাশোনা' শহর বিদ্যমান। এ ভূখণ্ডের রোম সাগরের তীরে 'বারশেলোনা' ও আরবোনা (নারবোনি) শহর অবস্থিত। অতঃপর ঐ সাগর খণ্ড, যা এ অংশের অন্য সমস্ত ভূভাগ গ্রাস করেছে, তাতে অনেকগুলো দ্বীপ আছে। এদের অধিকাংশই ক্ষুদ্রতার জন্য জনবসতিহীন। এর পশ্চিম দিকে 'সারদানিয়া' দ্বীপ ও এর পূর্ব দিকে দিগন্ত বিস্তৃত 'সাকিলিয়া' (সিসিলী) দ্বীপ, যার পরিধি সাতশ মাইল বলে মনে করা হয়। এতে অনেকগুলো শহর, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সারকুসা,' বালরামু', 'তারাবেগা' (ট্রেপানী) ও 'মেসেনী'। এ সকল দ্বীপ আফ্রিকিয়ার বিপরীত দিকে অবস্থিত। এদের মধ্যে 'আগদোশ' (গাজো) ও 'মালতা' দ্বীপ বিদ্যমান।

---

৫৯. 'ফোরেনা' ও এর পূর্বে শান্তারিনের সাথে 'মুযিয়া' এই উভয় স্থলে রোজেনথালে 'করিয়া' লিখা হয়েছে। আমরা এই ক্ষেত্রে মূল পাঠের অনুসরণ করলাম।

এ অঞ্চলের তৃতীয়াংশও সাগরের জলে আবৃত। শুধু তার উত্তর কোণে তিনটি ভূখণ্ড বিদ্যমান। এর পশ্চিম খণ্ডটি 'কলোরিয়া', মধ্যম খণ্ডটি 'আবিকরদা' (ল্যাম্বার্দী) এবং পূর্ব খণ্ডটি 'বানাদেকা' (ভনিস) এলাকার অন্তর্গত।

এ অঞ্চলের চতুর্থ অংশও সাগরের নিচে, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। এতে অনেক দ্বীপ বিদ্যমান। কিন্তু এর অধিকাংশই তৃতীয়াংশের ন্যায়[৬০] জনবসতিহীন। জনঅধ্যুষিত দ্বীপের মধ্যে এর পশ্চিম উত্তর কোণে বিলুনুস (পিলোপনিস) অবস্থিত এবং এ অংশের মধ্য থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে দীর্ঘ প্রলম্বিত দ্বীপ 'আক্রিতাস' (ক্রীট) বিদ্যমান।

আলোচ্য অঞ্চলের পঞ্চমাংশের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের মধ্যবর্তী একটি বিরাট ত্রিকোণ ভূভাগ সাগর জলের দ্বারা আচ্ছাদিত। এর পশ্চিম পার্শ্বটি উত্তর দিকে অত্র অংশের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এর দক্ষিণ পার্শ্বটি এ অংশের দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গেছে। এর ফলে এ অংশের পূর্ব পার্শ্বে প্রায় এক-তৃতীয়াংশের অনুরূপ একটি ভূখণ্ড অবশিষ্ট রয়েছে। এর উত্তর পার্শ্বটি সাগরের সাথে পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে এগিয়ে গেছে, যেমন আমরা এ সম্পর্কে বলেছি। এর দক্ষিণ অর্ধেকে সিরিয়া এলাকার নিম্নভাগ এবং এর মধ্যভাগ দিয়ে লুক্কাম পর্বত উত্তর দিকে সিরিয়ার শেষ সীমা পর্যন্ত গেছে। এখানে এটা মোড় ঘুরে পূর্ব-উত্তর দিকে চলে গেছে এবং মোড় ঘুরবার পরবর্তী পর্বতের এ অংশটিকে 'সেলসেলা' (শৃঙ্খল) পর্বত বলা হয়। এটা তথা থেকে পঞ্চম অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়েছে। এটা মোড় ঘুরবার সময় উত্তর দিকের 'আল-জজিরা' এলাকার একটি ভূখণ্ড অতিক্রম করেছে এবং এর উক্ত মোড় ঘুরবার স্থানে পশ্চিম দিকে এমন একটি পরস্পর সন্নিবদ্ধ পর্বতশ্রেণী বিদ্যমান, যার একটি প্রান্ত রোম সাগরের একটি খাঁড়ির সাথে মিলিত হয়েছে। যা এ অংশের উত্তরে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে। এ সকল পর্বতের মধ্যকার গিরিপথকে বলা হয় 'দুব' এবং এরা 'আরমান' (আর্মেনিয়া) এলাকা পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ পর্বত শ্রেণী ও 'সেলসেলা' পর্বতের মধ্যভাগে একটি ভূখণ্ড এ অংশে পড়েছে।

পূর্বে যে দক্ষিণ পার্শ্বের কথা বলা হয়েছে, যাতে 'শামের' (সিরিয়ার)[৬১] নিম্নভাগ অবস্থিত এবং যাতে লুক্কাস পর্বত এ অংশের প্রান্ত ও রোম সাগরের মধ্যে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রসারিত, সেইখানে এ অংশের প্রথম ভাগে দক্ষিণ দিকে সাগর তীরে 'আনতারতুস' এলাকা বিদ্যমান। তৃতীয় অঞ্চলের সাগর তীরে 'গাজা, ও 'তারাবলুস' (আরকা ও ত্রিপলী)-র সাথে এর সীমান্ত মিলিত হয়েছে। এর উত্তরে ক্রমাগত 'জাবালা', 'লাজেকিয়া', 'ইস্কান্দরোনা', 'সলোকিয়া' ও এর পরে উত্তরে রোম (বাইজেন্টাইন) এলাকা। এ অংশের শেষ প্রান্ত ও সাগরের মধ্য ভাগে প্রসারিত লুক্কাম পর্বত সিরিয়ায় অবস্থিত তার প্রান্ত দ্বারা এ অংশের উপরিভাগে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের 'আলহাওয়ানী' দুর্গের সাথে মিলিত হয়েছে। এ দুর্গ ইসমাইলী হাশিশীনদের এবং বর্তমানে তাদেরকে 'কিদাবিয়া' বলা হয়। এ দুর্গটিকে 'মেসিয়াফ'ও বলা হয় এবং এটা 'আনতারতুসে'র

৬০. সম্ভবত তৃতীয় নয়, দ্বিতীয়; তাতে এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

৬১. আমাদের ব্যবহৃত মূল পাঠে সর্বত্র 'শাম' শব্দটি আছে। আমরা ইতিপূর্বে একে সিরিয়া বলে উল্লেখ করেছি এবং অতঃপর 'শাম' ও 'সিরিয়া' উভয় শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে।

বিপরীত দিকে অবস্থিত। এ দুর্গের বিপরীত দিকে পর্বতের পূর্বে 'সালামিয়া' এলাকা, এটা 'খেমাসে'র উত্তরে পড়েছে। মেসিয়াফের উত্তরে পর্বত ও সাগরের মধ্যবর্তী স্থানে 'এন্তাকিয়া' এলাকা এবং এর বিপরীত পর্বতের পূর্ব দিকে 'মাআরা'। এর পূর্বে 'মারাগা' এবং এন্তাকিয়ার উত্তরে ক্রমান্বয়ে 'মাসিসা', 'আয্না' ও শামের শেষ প্রান্তে 'তারমুস'। এন্তাকিয়ার সম্মুখ ভাগে পর্বতের পশ্চিমে 'কিন্নাসরিন' ও এর পরে 'আইনুযর্বা'। কিন্নাসরিনের বিপরীতে পর্বতের পূর্বদিকে 'হলব' এবং আইনুয্রাবার বিপরীতে শামের শেষ প্রান্তে 'মিম্বাদ'। পূর্বে উল্লেখিত দুরুবের ডান দিকে তার ও রোম সাগরের মধ্যস্থলে রোম (বাইজেন্টাইন) এলাকা। এটা বর্তমানে 'তুর্কেম্যান'দের অধীনে এবং এর শাসক ইবনে উসমান।[৬২] এ এলাকার সাগর তীরে 'এন্তাকিয়া' ও 'আলিয়া' ভূভাগ বিদ্যমান। দুরুব পর্বত ও সেলসেলা পর্বতের মধ্য 'আরমান' এলাকায় ক্রমাগত 'মারআশ', 'মাল্তিয়া ও এ অংশের উত্তর প্রান্তে 'মাআর্রা।[৬৩]

পঞ্চম অংশের আরমান এলাকায় পূর্ব দিকে 'জিহান' ও 'সিহান' নামে দুটি নদী বের হয়েছে। জিহান দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে দূরে অতিক্রম করেছে এবং ক্রমান্বয়ে 'তারসুস', 'মাসিসা' হয়ে উত্তর দিকে নেমে পশ্চিম দিকে মোড় নিয়ে 'সলোকিয়া'র দক্ষিণে রোম সাগরে পতিত হয়েছে। সিহান নদীও জিহানের সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে 'মাআরা', 'মারআশে'র মধ্য দিয়ে দুরুব পর্বত অতিক্রম করে শাম এলকায় পৌঁছেছে। এরপর 'আইনুযরবা'র মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে 'জিহান' থেকে দূরে সরে গেছে। এরপর উত্তর-পশ্চিম দিকে মোড় ঘুরে মাসিসার নিকট পশ্চিম দিকে জিহানের সাথে মিলিত হয়েছে।

লুক্কাম পর্বতের মোড় থেকে সেলসেলা পর্বত দ্বারা বেষ্টিত 'জজিরা' এলাকার দক্ষিণে ক্রমান্বয়ে 'আর্রাফেজা', 'আর্রুক্কা', 'হার্রান', 'সুরুজ', 'আর্রুহা' (এডেসা), 'নসিবিন', 'সুমিসাতা' ও সেলসেলা পর্বতের সানুদেশে 'আমোদ' এলাকা বিদ্যমান। এটা উত্তর দিক থেকে এবং পূর্ব দিক থেকেও এ অংশের শেষ প্রান্ত। পঞ্চম অঞ্চল থেকে বহির্গত ফুরাত ও দজলা নদী এ ভূখণ্ডের মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ দিকে আরমান এলাকায় পৌঁছে সেলসেলা পর্বত অতিক্রম করেছে। এর পর ফুরাত সুমিসাতা ও সরুজের পশ্চিম পার্শ্বে প্রবাহিত হয়ে পূর্বদিকে মোড় নিয়েছে এবং আর্রাফেজা ও আর্রক্কার নিকট দিয়ে অগ্রসর হয়ে ষষ্ঠ অংশের দিকে বের হয়ে গেছে। দজলা আমেদের পূর্ব পার্শ্বে প্রবাহিত হয়ে খুব নিকটেই পূর্বদিকে মোড় ঘুরেছে এবং এর খুব নিকটেই ষষ্ঠ অংশে গিয়ে পৌঁছেছে।

আলোচ্য অঞ্চলের ষষ্ঠাংশের পশ্চিম দিকে 'আলজজিরা' এলাকা। এর পূর্ব দিকে 'ইরাক' এলাকা ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে এ অংশের শেষ প্রান্তের নিকটে পৌঁছেছে। ইরাকের শেষ প্রান্তে এখানে এ অংশের দক্ষিণ দিক থেকে ইস্পাহান পর্বত দেখা দিয়ে পশ্চিম দিকে ঘুরে গেছে। এ পর্বত এ অংশের উপর প্রান্তের মধ্য ভাগে পৌঁছে পশ্চিম দিকে মোড় নিয়ে ষষ্ঠ অংশ ছাড়িয়ে গেছে এবং ঐ দিকেই অগ্রসর হয়ে পঞ্চম অংশের

---

৬২. তৎকালে তার শাসক ছিলেন উসমানী সম্রাট প্রথম মুরাদ ইবনে ওরকান।

৬৩. রোজেনথালে এই স্থলে 'আক্কারা' উল্লেখিত হয়েছে।

'সেলসেলা' পর্বতের সাথে মিলিত হয়েছে। এর ফলে এ ষষ্ঠ অংশ দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এর একটি পশ্চিম ভাগ ও অপরটি পূর্ব ভাগ। পশ্চিম ভাগের দক্ষিণ দিকে পঞ্চম অংশ থেকে ফুরাত নদী ও এর উত্তর দিকে দজলা নদী বের হয়ে এসেছে। ফুরাত নদী ষষ্ঠাংশে প্রবেশ করে প্রথমেই 'কেরকেসিয়া' অতিক্রম করেছে। এখানে উক্ত নদী থেকে একটি শাখা উত্তর দিকে বের হয়ে আলজজিরা এলাকায় প্রবেশ করেছে এবং তার প্রান্তরে মিশে গেছে। ফুরাত কেরকেসিয়া থেকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ দিকে বাঁক নিয়েছে এবং প্রবাহিত হয়ে 'রহবা'র পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে 'খাবুরে'র নিকট গিয়ে পৌঁছেছে। এখানে তা থেকে একাধিক শাখা বের হয়েছে। একটি 'সিফ্‌ফিন'কে পশ্চিমে রেখে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে পূর্ব দিকে মোড় নিয়েছে এবং একাধিক শাখায় বিভক্ত হয়েছে। এদের কতকাংশ 'কুফা' ও কতকাংশ 'কসুর ইবনে-হুবাইরা' ও 'জামে আন' (আলহিল্লা)-এর দিকে গেছে। অতঃপর এ সবগুলো এ অংশের দক্ষিণ দিক দিয়ে তৃতীয় অঞ্চলের দিকে বের হয়ে গেছে। এবং ঐস্থানে 'হীরা' ও 'কাদেসিয়া'র পূর্বভাগে মিশে গেছে। ফুরাত নদী 'রহবার নিকট পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে 'হীত'কে উত্তরে এবং 'জাব'[৬৪] ও 'আনবার'কে দক্ষিণে রেখে বাগদাদের নিকট দজলার সাথে এসে মিলিত হয়েছে।

দজলা নদী পঞ্চম অংশ থেকে এ অংশে প্রবেশ করে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং 'ইরাক' পর্বতের সাথে সন্নিহিত সেলসেম পর্বতের বিপরীত দিকে অগ্রসর হয়ে উত্তর দিকে 'জজিরা ইবনে উমরে' প্রবেশ করেছে। এভাবে 'মোশেশ', 'তাকরিত' হয়ে 'আল হাদিসা'য় পৌঁছেছে। এখানে 'আল হাদিসা', বৃহৎ ও ক্ষুদ্র 'যাব'কে পূর্ব দিকে রেখে সে দক্ষিণ দিকে বাঁকিয়েছে এবং একই দিকে কাদেসিয়াকে পশ্চিমে রেখে বাগদাদে পৌঁছে ফুরাতের সাথে মিলিত হয়েছে। তথা থেকে দক্ষিণ দিকে 'জরজরায়া' এলাকার পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এ অংশ ত্যাগ করে তৃতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। এখানে তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে এবং পুনরায় একত্র হয়ে আবাদানের নিকট পারস্য সাগরে এসে পতিত হয়েছে। বাগদাদে মিলিত হবার পূর্ব পর্যন্ত দজলা ও ফুরাতে মধ্যবর্তী এলকার নাম 'আল-জজিরা'। দজলা নদী বাগদাদ ত্যাগ করবার পর তার সাথে উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে প্রবাহিত একটি নদী এসে মিশেছে। এটা বাগদাদের সম্মুখ ভাগে পূর্ব দিকে 'নাহরোয়ান'-এর নিকট পৌঁছে দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়েছে এবং তৃতীয় অঞ্চলে বের হয়ে যাবার পূর্বে দজলার সাথে মিলিত হয়েছে। এ নদী ও 'ইরাক' ও 'আজম'[৬৫] (কুর্দিস্তান) পর্বতের মধ্যবর্তী স্থলে শুধু 'জলুলা' এলাকা এবং এর পূর্বে পর্বতের নিকটে 'হলোয়ান' ও 'সমিরা' এলাকা বিদ্যমান।

এ অংশের পশ্চিম ভূভাগটির মধ্যদিয়ে উক্ত 'আজম' পর্বত থেকে বহির্গত একটি পর্বত পূর্ব দিকে এ অংশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছে। একে 'শহরজোর' পর্বত বলা হয় এবং এটা এ ভূভাগকে দুইখণ্ডে বিভক্ত করেছে। তার একটি খণ্ডের দক্ষিণ দিকে ও

৬৪. রোজেনথাল এর অন্য একটি বিকল্প উচ্চারণ 'আর্‌বার' বলে উল্লেখ করেছেন।
৬৫. মূলে আছে 'আলআজেম' বহুবচন। রোজেনথাল 'কুর্দীপর্বত' বলে উল্লেখ করেছেন।

ইস্পাহানের উত্তর-পশ্চিম কোণে 'খুনজান' এলাকা এবং এ খণ্ডটিকে 'আলহালুস'দের[৬৬] দেশ বলা হয়। এর মধ্যভাগে 'নাহাওন্দ' ও তার উত্তরে দুই পর্বতের সঙ্গমস্থলে পশ্চিমে 'শহরজোর' এলাকা বিদ্যমান। এ অংশের শেষ পূর্ব প্রান্তে দায়নুর অবস্থিত। অন্য খণ্ডটিতে 'আরমিনিয়া'র একটি ভূভাগ এবং তার রাজধানী 'মারাগা'। এর বিপরীতে ইরাক পর্বতের যে অংশটি বিদ্যমান তাকে 'বারিয়া' বলা হয়। এটা কুর্দিদের আবাসভূমি। দজলার তীরবর্তী বৃহৎ ও ক্ষুদ্র 'যার' এর পশ্চাতে অবস্থিত। এ খণ্ডের পূর্ব প্রান্তে 'আজরবাইজান' এলাকা এবং তারই অন্তর্গত 'তাবরিজ' ও 'বন্দাকান'। এ অংশের উত্তর-পূর্ব কোণে 'নিতাশ' সাগরের একটি খণ্ড বিদ্যমান। তাকে 'খাজার'দেশ সাগর বলা হয়।

এ অঞ্চলের সপ্তম অংশের পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে 'আরহালু'দের অধিকাংশ এলাকা পড়েছে। এতেই 'হামদান' ও 'কাজবিন' অবস্থিত এবং এর অবশিষ্ট ভাগ তৃতীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। সেখানেই ইস্পাহান এলাকা। তাকে দক্ষিণ দিক থেকে একটি পর্বত বেষ্টন করেছে, যা পশ্চিম দিক থেকে বের হয়ে তৃতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। অতঃপর তার ষষ্ঠাংশে মোড় নিয়ে চতুর্থ অঞ্চলে এসেছে এবং ইরাক পর্বতের পূর্বদিকে তার সাথে মিলিত হয়েছে। এর বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। এ পর্বত পূর্বদিক থেকে 'আলহালুস' এলাকাকে বেষ্টন করেছে। ইস্পাহানকে বেষ্টনকারী এ পর্বত তৃতীয় অঞ্চল থেকে উত্তরদিকে নেমেছে এবং এ সপ্তম অংশে বের হয়ে পূর্বদিক থেকে 'আলহালুস' এলাকাকে বেষ্টন করেছে। এখানে এরই সানুদেশে 'কাশান' ও এর পরে 'কুম'। এ পর্বত তার অর্ধেক পথের প্রায় মধ্যভাগে সামান্য পশ্চিম দিকে মোড় নিয়ে অতঃপর চক্রাকারে পূর্বদিকে ও পরে উত্তর দিকে ফিরে পঞ্চম অঞ্চলে চলে গেছে। তার এ চক্রাকারে ঘোরা ও মোড় নেওয়ার স্থলে 'রায়' এলাকা তার পূর্বদিকে অবস্থিত। এস্থল থেকে অন্য একটি পর্বত বের হয়ে এ অংশের পশ্চিমে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গেছে। সেইখানে তারই দক্ষিণ দিকে 'কাজবিন'। তার উত্তর পার্শ্ব ও তার সন্নিহিত 'রায়' পর্বতের পার্শ্বে, যা পূর্ব-উত্তর দিকে অত্র অংশের মধ্য পর্যন্ত প্রসারিত ও পঞ্চম অঞ্চলে বিস্তৃত এ মধ্যস্থলে—এ পর্বতসমূহের ও তারাবিস্তান (কাস্পিয়ান) সাগরে খণ্ডের মধ্যভাগের 'তাবারিস্তান' এলাকা অবস্থিত। এ সাগর পঞ্চম অঞ্চল থেকে এ অংশের পশ্চিমে-পূর্বে বিস্তৃত প্রায় মধ্যভাগে প্রবেশ করেছে এবং রায় পর্বতের নিকট বিস্তৃত হয়েছে। এর পশ্চিমদিকে মোড় নিবার স্থলে সন্নিহিত অন্য একটি পর্বত বিদ্যমান, যা পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে ঘুরেছে এবং পশ্চিম দিক থেকে অষ্টম অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। রায় পর্বত ও উক্ত পর্বতের আরম্ভ স্থলের মধ্যভাগে দুই পর্বতের সানুদেশে একমাত্র 'জুরজান' এলাকা অবস্থিত এবং তারই অন্তর্গত 'বুস্তাম'। এ পর্বতের পিছনে এ অংশের একটি ভূখণ্ড বিদ্যমান, যাতে 'ফারেস' ও 'খুরাসানের' মধ্যবর্তী প্রান্তরের অবশিষ্ট খণ্ড বিস্তৃত। এটা 'কাশানের' পূর্বে এবং এর শেষাংশে পর্বতের নিকটে 'আন্তারাবাদ' এলাকা। এ অংশের শেষপ্রান্তে উক্ত পর্বতের সানুদেশে খুরাসানের 'নিশাপুর' এলাকা। এটা পর্বতের দক্ষিণে

৬৬. এটা আলবাহলুস<আল পাহলবী শব্দের বিকৃত রূপ। প্রাচীন ভূগোলে 'আল বাহলবী' বিদ্যমান (রোজেনথাল)।

ও উক্ত প্রান্তরের পূর্বে অবস্থিত এবং এর পর 'মার্বে শাহীজান'—এ অংশের শেষ প্রান্ত। এর উত্তরে ও জুরজানের পূর্বে যথাক্রমে 'মহরজান', 'খাজরুন' ও এ অংশের পূর্ব প্রান্তীয় 'তুস' এলাকা। এদের সবগুলোই পর্বতের নিম্নভাগে অবস্থিত। এদের উত্তরে 'নাসা' এলাকা', তাকে দুটি অংশের উত্তর-পূর্ব কোণের দিক থেকে অনুর্বর প্রান্তর ঘিরে রেখেছে।

এ অঞ্চলের অষ্টম অংশের পশ্চিম দিকে জাইহুন নদী দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এর পশ্চিম তীরে খুরাসানের 'রামু' ও 'আমুল' এবং খোয়ারজিম এলাকার 'জাহেরিরা'[৬৭] ও 'জুরজানিয়া' অবস্থিত। এর পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ 'আন্তারাবাদ' পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। এ পর্বত এর সম্মুখ ভাগে সপ্তম অংশে বিস্তৃত হয়ে পশ্চিম দিক থেকে এ অংশে প্রবেশ করেছে এবং উক্ত কোণটিকে বেষ্টন করে রেখেছে। এতে 'হিরাত' এলাকার অবশিষ্ট ভূখণ্ড বিদ্যমান। হিরাত ও জুরজানের মধ্য দিয়ে উক্ত পর্বত তৃতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করে 'বুত্তাম' পর্বতের সাথে মিশেছে। যেমন যথাস্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য অংশের নদীর পূর্ব-দক্ষিণ দিকে যথাক্রমে 'বুখারা' ও 'সোগদ' এলাকা এবং তার রাজধানী 'সমরকন্দ'। এর পর 'আশরোশানা' এবং এর অন্তর্গত অত্র অংশের পূর্ব প্রান্তীয় 'খাজনদা' এলাকা। সমরকন্দ ও আশরোশানার উত্তরে 'ইলাক' ভূমি। ইলাকের পরে অত্র অংশের পূর্ব প্রান্তে 'শাশ' ভূমি (তাশকন্দ)। এটা নবম অংশের এমন একটি ভূখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত, যার দক্ষিণে ফরগানার অবশিষ্ট ভূভাগ বিদ্যমান। নবম অংশের উক্ত ভূখণ্ড থেকে শাশ নদী[৬৮] বহির্গত হয়ে এ অংশে প্রবাহিত হয়েছে এবং একে ত্যাগ করে পঞ্চম অঞ্চলে যাবার স্থলে উত্তর দিকে জাইহুন নদীতে পতিত হয়েছে। ইলাকের ভূমিতে এর সাথে তৃতীয় অঞ্চলের নবম অংশে অবস্থিত তিব্বতের সীমান্ত থেকে উৎপন্ন অন্য একটি নদী এসে মিশেছে। নবম অংশ ত্যাগ করবার পূর্বে এর সাথে 'ফরগানা' নদী মিলিত হয়েছে। শাশ নদীর দিকে 'জবরাগুণ' পর্বত বিদ্যমান। এটা পঞ্চম অঞ্চল হতে আরম্ভ হয়ে পূর্ব দিকে মোড় ঘুরে, কিছুটা দক্ষিণ দিকে ফিরে 'শাশ' ভূমিকে বেষ্টন করে নবম অংশে প্রবেশ করেছে। অতঃপর নবম অংশে মোড় ঘুরে শাশ ও ফরগানাকে বেষ্টন করে দক্ষিণ দিকে এসেছে এবং তৃতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। শাশ নদী ও এ অংশের মধ্যবর্তী উক্ত পর্বতের প্রান্তে 'ফারাব' এলাকা। এর এবং বোখারা ও খোরাজিমের মধ্যে অনুর্বর প্রান্তর বিরাজ করছে। এ অংশের উত্তর-পূর্ব কোণে 'খাজন্দা' ভূমি এবং 'ইস্তাজাব্' ও 'তীরাজ' এলাকা এর মধ্যে অবস্থিত।

আলোচ্য অঞ্চলের নবম অংশ, তার পশ্চিম দিকে ফরগানা ও শাশ ভূমির পরে দক্ষিণে 'খজলাজিয়া' ও উত্তরে 'খিজিলিয়া' এলাকা এবং পূর্বে এ অংশের সমস্ত এলাকাই কিমাকদের এলাকা নামে খ্যাত। এ সবগুলো অংশের পূর্ব প্রান্তে দশম অংশের 'কাউকিয়া' পর্বতের সাথে সন্নিহিত এবং এখানে বেষ্টনকারী সাগরের একটি খণ্ডও বিরাজমান। একে ইয়াজুজ-মাজুজের পর্বত বলা হয়। এ অংশের সমুদয় লোকই তুর্কি জাতীয়।

---

৬৭. রোজেনথাল এর উচ্চারণ 'তাহেরিয়া' করেছেন। আমরা মূলের অনুসরণ করলাম।
৬৮. তাশকন্দ নদী—শিরদরিয়া।

পঞ্চম অঞ্চল

এর প্রথম অংশের অধিকাংশ ভূভাগ জলের দ্বারা আবৃত। শুধু তার দক্ষিণ ও পূর্বদিকের কিছু খণ্ড অবশিষ্ট আছে। কারণ বেষ্টনকারী সাগর, ভূ-ভাগের পার্শ্বে চক্রাকারে অবস্থানের জন্য পশ্চিম দিক থেকে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। এর ফলে মুক্ত দক্ষিণের ভূখণ্ডটি ত্রিকোণাকৃতিবিশিষ্ট। এটা সেখানে আন্দালুসের সন্নিহিত এবং এর অবশিষ্টও তার সাথে সংযুক্ত। সাগর একে দুইদিক থেকে বেষ্টন করেছে। তা যেন দুটি বাহু, একটি ত্রিভুজের কোণকে বেষ্টন করে রেখেছে। এতে পশ্চিম আন্দালুসের অবশিষ্ট ভাগ—'সাইউর' (মন্টিমেয়র) দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এ অংশের প্রারম্ভে সমুদ্র তীরে অবস্থিত। এর পূর্বদিকে 'সালামনাকা' ও এর অভ্যন্তরে 'সাম্মুরা' এবং শেষ দক্ষিণ প্রান্তে সালামানকার পূর্বে 'আবেলা'। এর পূর্বে 'কশতালা' ভূভাগ এবং এতে 'শাকুনিয়া' শহর বিদ্যমান। এর উত্তরে 'লিউন' ও 'বরগাশতা' এলাকা এবং এর পশ্চাতে উত্তর দিকে অত্র ভূখণ্ডের কোণায় 'জালিকিয়া' অবস্থিত। এতে পশ্চিম বাহুর শেষ প্রান্তে বেষ্টনকারী সাগরের উপর 'খান্তিয়াকু' এলাকা, যার অর্থ ইয়াকুব।[৬৯] এতে এ অংশে দক্ষিণ প্রান্তের নিকট ও 'কশতালা'র পূর্ব দিকে পূর্ব আন্দালুসের শহর 'শাতিলা' বিদ্যমান এবং এর উত্তর-পূর্বদিকে 'ওয়াশকা' ও এরই উত্তর-পূর্ব দিকে 'ইয়াম্‌বলুনা'। ইয়াম্‌বলুনার পশ্চিমে যথাক্রমে কশতালা এবং এর পর 'বরগাশতা' ও এর মধ্যভাগে 'তাজিরা'। এ ভূখণ্ডের মধ্যভাগে একটি বিরাট পর্বত প্রসারিত রয়েছে। এটা সাগর ও উত্তর-পূর্ব বাহুর দিকে মুখ করে উক্ত বাহু ও সাগরের সাথে পূর্ব দিকে প্রায় এসে মিশেছে। যেমন আমরা চতুর্থ অঞ্চলের দক্ষিণ দিকে রোম সাগরের সাথে এর মিলনের কথা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এটা পূর্ব দিক থেকে আন্দালুসের জন্য প্রাচীর স্বরূপ। এর পথগুলো দ্বারতুল্য, যা ফিরিঙ্গীদের[৭০] অধীনস্থ 'গাস্‌কোনিয়া' এলাকার সাথে সংযুক্ত। এর অন্তর্গত চতুর্থ অঞ্চলে রোম সাগরের তীরে অবস্থিত 'বরশেলোনা' ও 'আরবোনা' এবং এদের পশ্চাতে উত্তর দিকে 'খরিদা' ও 'কারকাশোনা'। এর মধ্যে পঞ্চম অঞ্চলে খরিদার উত্তরে 'তাল্লুশা'।

এ অংশের পূর্ব দিকে জলমুক্ত অন্য একটি ভূখণ্ডও ত্রিকোণাকৃতিবিশিষ্ট। এর কোণ দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়ে পূর্বদিকে 'বারনাতে' প্রবেশ করেছে। এ ভূখণ্ডের শিরোভাগে, যেখানে তার সাথে বারনাত পর্বত মিলিত হয়েছে, সেখানে বেষ্টনকারী সাগরের তীরে 'নাবোনা' এলাকা অবস্থিত। এ ভূখণ্ডের শেষ প্রান্তে অত্র অংশের উত্তর-পূর্ব কোণে এর শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত ফিরিঙ্গীদের অধীনস্থ 'বনতু' এলাকা। দ্বিতীয় অংশের[৭১] পশ্চিম কোণে 'গাসকোনিয়া' ভূমি এবং এর উত্তরে 'বনতু' ও 'বরাশতা' এলাকা, যেমন পূর্বে বর্ণনা করেছি। গাসকোনিয়া এলাকার পূর্ব-উত্তরে রোমসাগরের একটি খণ্ড বিদ্যমান, যা দাঁতের মতো কিঞ্চিৎ পূর্ব দিকে বেঁকে এ অংশে প্রবেশ করেছে। এর ফলে গাসকোনিয়া এলাকা, এর পশ্চিম দিকের একটি অংশ সাগরে প্রবেশ করেছে। উক্ত ভূখণ্ডের

---

৬৯. সম্ভবত সেন্টইয়াকুব>সান্তিয়াকু হয়েছে।

৭০. মূলে 'আফরঙ্গ—বহুবচন বিদ্যমান—এর অর্থ ইউরোপীয় খ্রিস্টান জাতিসমূহ।

৭১. এ অঞ্চলের দ্বিতীয় অংশের বর্ণনা এখানে আরম্ভ হয়েছে। মূলেও এরূপভাবে আছে।

শিরোভাগে উত্তর দিকে 'জেনাওয়া' (জেনেভা) এলাকা এবং তারই উত্তরে 'নিতাজুন' (আল্পস) পর্বত অবস্থিত। এর উত্তরে ও এরই দিকে 'বরগুনা (বরগাণ্ডী) ভূমি। রোম সাগরের যে প্রান্তটি জেনাওয়ার দিকে এগিয়ে গেছে, তার পূর্বদিকে অনুরূপ একটি প্রান্ত সাগর থেকে বের হয়ে এসেছে। এতদুভয়ের মধ্য ভাগে একটি ভূখণ্ড সাগরে প্রবেশ করেছে। এর পশ্চিম ভাগে 'নিস' (নিসা) এবং পূর্ব ভাগে রোম মহানগরী। এটা ফিরিঙ্গী রাজ্যের রাজধানী ও পোপ আর্কবিশপের[৭২] বাসস্থান। এতে ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিরাটাকার অট্টালিকা, বিশাল বপু স্মৃতিসৌধ ও সুবৃহৎ গির্জা বিদ্যমান। এর অদ্ভুত বস্তুসমূহের মধ্যে একটি হল তার মধ্যদিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত নদী, যার নিম্নভাগ তাম্রপাত দ্বারা আচ্ছাদিত। এতে হজরত ইসা (আঃ)-এর অনুসারীদের মধ্যে 'বতরস' (পিটার) ও 'বুলস' (পল)-এর গির্জা বিদ্যমান, যাতে তাঁদেরকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

রোম এলাকার উত্তর দিকে অত্র অংশের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত 'আকরিন সিসা' (লম্বার্দী) এলাকা সাগরের সেই প্রান্ত, যার দক্ষিণ তীরে রোম অবস্থিত, তার পূর্ব পার্শ্বে 'নাবেল' (নেপলস) এলাকা। এটা ফিরিঙ্গীদের অন্য একটি এলাকা 'কলোরিয়ার' সাথে সন্নিহিত। এর উত্তরে 'বানাদেকা' (ভেনিস) প্রণালীর একটি খণ্ড তৃতীয় অংশ থেকে এ অংশে এসে প্রবেশ করে এ অংশের উত্তর দিকের সমান্তরালে পশ্চিম দিকে প্রসারিত হয়েছে এবং প্রায় এর এক-তৃতীয়াংশে পৌঁছে শেষ হয়েছে। এতে বানাদেকা এলাকার বহু ভূভাগ, যা উক্ত প্রণালী খণ্ড ও বেষ্টনকারী সাগরের মধ্যভাগে অবস্থিত তা দক্ষিণ দিক থেকে এ অংশে এসে প্রবেশ করেছে। এর উত্তরে ষষ্ঠ অঞ্চলের 'আলকেলায়া' (এ্যাকুইলিয়া) এলাকা বিদ্যমান।

এ অঞ্চলের তৃতীয় অংশের পশ্চিম দিকে 'বানাদেকা' প্রণালী ও রোম সাগরের মধ্যবর্তী স্থলে 'কলোরিয়া' এলাকা অবস্থিত। রোম সাগর একে পূর্ব দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। চতুর্থ অঞ্চলের অন্তর্গত এর একটি ভূখণ্ড রোম সাগর হতে উত্তর দিকে এ অংশের দিকে বহির্গত দুটি প্রান্তের মধ্যে প্রবেশ করেছে। কলোরিয়া (কেলাব্রিয়া) এলাকার পূর্বদিকে বানাদেকা প্রণালী ও রোম সাগরের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে 'আনকিরদা' (লম্বার্দীদের) এলাকা। এ অংশের একটি ভূভাগ উপদ্বীপ আকারে রোম সাগরে ও চতুর্থ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। রোম সাগর থেকে বহির্গত বানাদেকা প্রণালী উত্তর দিকে অগ্রসর হবার স্থলে একে পূর্বদিক থেকে বেষ্টিত করেছে এবং অতঃপর এটা পশ্চিম দিকে মোড় ঘুরে এ অংশের উত্তর প্রান্তের সমান্তরালে অগ্রসর হয়েছে। চতুর্থ অঞ্চল থেকে এরই সমান্তরালে একটি বৃহৎ পর্বত এরই সাথে উত্তর দিকে এগিয়ে গেছে। অতঃপর এরই সাথে পশ্চিম দিকে মোড় ঘুরে ষষ্ঠ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে এবং আলমানী(জার্মানি)দের এলাকা আনকেলায়া (এ্যাকুইলিয়া)-তে উক্ত প্রণালীর উত্তরে বিপরীত দিকে গিয়ে শেষ হয়েছে। আমরা এ সম্পর্কে পরে বর্ণনা করব। এ প্রণালী ও উক্ত পর্বতের একসঙ্গে উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়া পর্যন্ত এতদুভয়ের মধ্যবর্তী ভূভাগ 'বানাদেকা' এলাকা এবং এদের মোড় ঘুরে পশ্চিম দিকে যাওয়া পর্যন্ত উভয়ের মধ্যবর্তী ভূভাগ 'হাওয়ারায়'। এরপর প্রণালীর প্রান্তভাগে উক্ত আলমনীদের এলাকা বিদ্যমান।

---

৭২. রোজেনথাল এর অনুবাদ করেছেন 'আড্রিয়াটিক সাগর'। মূলে আছে 'খালিজে বানাদেকা'। কিন্তু কিছু পরেই তিনি এই শব্দের অর্থ প্রণালী করেছেন।

আলোচ্য অঞ্চলের চতুর্থ অংশে রোম সাগরের একটি খণ্ড বিদ্যমান, যা দন্তপাটির মধ্যবর্তী ব্যবধানের আকারে চতুর্থ অঞ্চল থেকে এতে প্রবেশ করেছে। এটা উত্তর দিকে বের হয়ে এসেছে এবং প্রতি দুটি দাঁতের মধ্যে সাগরের অংশবিশেষ থাকায় তাদের মধ্যবর্তী ভূভাগ উপদ্বীপের আকার ধারণ করেছে। এ অংশের শেষ পূর্ব প্রান্তে সাগরের কতিপয় খণ্ড বিদ্যমান। এটা থেকে উত্তর দিকে কুস্তানতুনিয়া (কনস্টান্টিনপোল) প্রণালী বের হয়ে গেছে। এটা এ দক্ষিণ প্রান্ত থেকে বের হয়ে সোজা উত্তর দিকে গিয়ে ষষ্ঠ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। এটা সেখানে খুব নিকটেই পূর্বদিকে মোড় ঘুরে ষষ্ঠ অঞ্চলের চতুর্থ অংশের কতকভাগ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংশে অবস্থিত 'নিতাস' (কৃষ্ণ) সাগরে পৌঁছেছে, যেমন আমরা পরে বর্ণনা করব। এ প্রণালীর পূর্বে এ অংশের শেষ উত্তর প্রান্তে 'কুস্তানতুনিয়া' এলাকা বিদ্যমান। এটা একটি বিরাট নগরী। এককালে এটা রোম সম্রাটদের রাজধানী ছিল। এতে এমন সকল বিরাটাকার অট্টালিকা ও স্থাপত্যের নিদর্শন বিদ্যমান, যার বহু কাহিনী প্রচারিত হয়েছে। রোম সাগর ও কুস্তানতুনিয়া প্রণালীর মধ্যভাগে এ অংশে যে ভূখণ্ডটি বিদ্যমান, এতেই 'মেকদোনিয়া' এলাকা বিরাজিত। এটা এককালে ইউনানী(গ্রিক)দের ছিল এবং এখান থেকেই তাদের রাজ্য বিস্তারের আরম্ভ। উক্ত প্রণালীর পূর্ব দিকে এ অংশের শেষ প্রান্তে 'বাতুস' নামে একটি ভূখণ্ড বিদ্যমান। ধারণা করি, তা বর্তমানে তুর্কেমানদের বিচরণ ভূমি প্রান্তর। এতে ইবনে উসমান (তুর্কি)দের রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছে এবং এর রাজধানী 'বোরসা'। এটা পূর্বে রোমের অধীনে ছিল। পরে বিভিন্ন জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে তুর্কেম্যানদের হাতে এসেছে।

এ অঞ্চলের পঞ্চম অংশের পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে 'বাতুস' (আনাতোলিয়া) এলাকা অবস্থিত। এর উত্তর দিকে এ অংশের শেষ প্রান্তে 'আমোরিয়া' এবং আমোরিয়ার পূর্বদিকে 'কাবাকের' (তঘমাসু) নদী, যা ফুরাত নদীতে গিয়ে পতিত হয়েছে। এটা স্থানীয় কোন পর্বতে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং ফুরাত নদী এ অংশ ত্যাগ করে পুনরায় এতে প্রবেশ[৭৩] করবার পূর্বে তার চতুর্থ অঞ্চলে গমনপথে তার সাথে মিলিত হয়েছে। এখানে এ অংশের শেষ প্রান্তে পশ্চিম দিকে যথাক্রমে সিহান নদী ও তার পশ্চিমে জিহান নদীর উৎসস্থল এবং তারা ঐদিকেই অগ্রসর হয়ে গেছে, যেমন তাদের বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। এখানে এর পূর্ব দিকে দজলা নদীর উৎসভূমি এবং তাও ঐদিকে এর সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে বাগদাদে এর সাথে মিলিত হয়েছে। যে পর্বত থেকে দজলা উৎপন্ন হয়েছে, তার পশ্চাতে এ অংশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 'মায়াফারেকিন' এলাকা বিদ্যমান। যে 'কাবাকেব' নদীর কথা পূর্বে বর্ণনা করেছি, তা এ অংশকে দুই ভাগে ভাগ করেছে। এর একটি হল পশ্চিম দক্ষিণ ভাগ, তাতে, যেমন পূর্বে বলেছি, 'বাতুস' ভূমি অবস্থিত এবং তা নিম্নদিকে এ অংশের উত্তরে শেষ প্রান্তে ও উক্ত কাবাকের নদীর উৎস পর্বতটির পশ্চাতে, যেমন পূর্বে বলেছি 'আমোরিয়া' এলাকা বিদ্যমান। দ্বিতীয় ভাগটি পূর্ব-উত্তরে ত্রিকোণাকার, যার দক্ষিণে দজলা ও ফুরাতের

৭৩. এ স্থানে মূলে 'সানি' শব্দটি এরূপ অর্থের দিকে নিয়ে গেছে। রোজেনথালে 'পুনরায় এতে প্রবেশ' বাক্যাংশটি নেই।

উৎসভূমি। উত্তর দিকে কাবাকেব নদীর উৎস পর্বতের পশ্চাতে আমোরিয়ার সন্নিহিত 'বায়লাকান' এলাকা। এটা বহুদূর প্রসারিত এবং এর শেষ প্রান্ত ফুরাতের উৎসস্থলের নিকটে 'খরশনা' এলাকা। এর উত্তর-পূর্ব কোণে নিতাস সাগরের একটি খণ্ড বিদ্যমান, যাতে কুস্তানতুনিয়া প্রণালী পতিত হয়েছে।

আলোচ্য অঞ্চলের ষষ্ঠ অংশের দক্ষিণ-পশ্চিমে 'আরমিনিয়া' এলাকা বিদ্যমান। এটা পূর্বদিকে এ অংশের মধ্যভাগ ছাড়িয়ে বিস্তৃত। এতে দক্ষিণ-পশ্চিমে 'উরদুন' (আরজান), উত্তরে 'তাফলিম' ও 'দূবাইল' এবং উরদুনের পূর্বে যথাক্রমে 'খিলাত' ও 'বরদাআ' শহর। এর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ পূর্বদিকে 'আরমিনিয়া' শহর অবস্থিত। এখানে এসে আরমিনিয়া চতুর্থ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে এবং তাতে সেখানে কুর্দীদের পর্বতের পূর্বদিকে 'মারাগা' এলাকা। এ পর্বতকে 'আরমা'ও বলা হয়, যেমন এর বর্ণনা চতুর্থ অঞ্চলের ষষ্ঠ অংশে পূর্বে করা হয়েছে। এ অংশে ও চতুর্থ অঞ্চলে আরমিনিয়া এলাকা তার সম্মুখ ভাগে পূর্বদিকে 'আজরবাইজান' এলাকার দ্বারা বেষ্টিত এবং এর শেষ ভাগে এ অংশের পূর্বদিকে 'তাবারিস্তান' (কাস্পিয়ান) সাগরের একটি খণ্ডে তীরে 'আরদাবিল' এলাকা। এ সাগর খণ্ডটি সপ্তম অংশ থেকে পূর্ব কোণে এসে প্রবেশ করেছে এবং একে 'তাবারিস্তান' সাগর বলা হয়। এরই তীরে উত্তর দিকে এ অংশে 'খাজার'দের এলাকার একটি ভূখণ্ড বিদ্যমান। এরা তুর্কেম্যানদের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত সাগর খণ্ডের উত্তর দিকের নিকট থেকে একটি পর্বতমালা আরম্ভ হয়ে পরস্পর সন্নিহিত অবস্থায় পশ্চিম দিকে পঞ্চম অংশে বিস্তৃত হয়েছে এবং সেখানে মোড় ঘুরে 'মায়াফারেকিন' এলাকাকে বেষ্টন করেছে। এটা আমাদের নিকট চতুর্থ অঞ্চলে অগ্রসর হয়ে শামের নিম্নভাগে সেলসেলা পর্বতের সাথে মিলিত হয়েছে এবং সেখানে লুক্কাম পর্বতের সাথেও মিলেছে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ অংশের উত্তর দিকে বিস্তৃত এ সকল পর্বতে উভয় দিক থেকে প্রবেশযোগ্য দ্বারের ন্যায় বহু গিরিপথ বিদ্যমান। এর দক্ষিণ দিকে 'আবোয়াব' (দ্বারসমূহ) এলাকা তাবারিস্তান সাগর পর্যন্ত পূর্বদিকে বিস্তৃত। এতে 'বাবুল আবোয়ার' (দ্বারসমূহের দ্বার) শহর অবস্থিত। আবোয়াব এলাকা পশ্চিমে দক্ষিণ কোণের দিক থেকে আরমিনিয়া এলাকার সাথে মিলিত হয়েছে। পূর্বদিকে এদের মধ্যবর্তীস্থল ও আজরবাইজানের দক্ষিণ এলাকার মধ্যে তাবারিস্তান সাগর পর্যন্ত প্রসারিত 'আয্যাব' (আর্‌রা)[৭৪] এলাকা বিদ্যমান। উক্ত পর্বতমালার উত্তরে এ অংশের একটি ভূখণ্ড বিদ্যমান, যার পশ্চিমে উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে 'সবির' রাজ্য বিরাজিত। এ অংশের সমুদয় ভূভাগের কোণেও নিতাশ সাগরের একটি খণ্ড রয়েছে। যার সাথে কুস্তানতুনিয়া প্রণালী মিলত হয়েছে, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ সাগরখণ্ডের সাথে 'সরির' এলাকা সংযুক্ত এবং এরই তীরে উক্ত এলাকার 'আতরাবা যুয়ায়দা' বিদ্যমান। সরির এলাকা 'আবোয়াব' পর্বত ও এ অংশের উত্তর পার্শ্বের মধ্যবর্তী স্থল ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হয়ে পূর্বদিকে এমন একটি পর্বতের সাথে মিলিত হয়েছে, যা তার ও খাজারদের ভূভাগের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে। এরই শেষ প্রান্তে 'সোল' শহর। উক্ত ব্যবধান

৭৪. মূলে 'আয্‌মাব' শব্দটি সম্ভবত ভুল। কারণ বৃহৎ ক্ষুদ্র যাবের বর্ণনা আলজরিয়ার সঙ্গে গেছে।

সৃষ্টিকারী পর্বতের পশ্চাতে খাজারদের একটি ভূখণ্ড এ অংশের উত্তর-পূর্ব কোণে তাবারিস্তান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এটাই এ অংশের উত্তর শেষ প্রান্ত।

এ অঞ্চলের সপ্তম অংশের সমগ্র পশ্চিম ভাগই তাবারিস্তান সাগরের তলে নিমজ্জিত। এর দক্ষিণ দিক থেকে চতুর্থ অঞ্চলে যে সাগর খণ্ডটি বের হয়ে গেছে, যেমন পূর্বে বলেছি, সেখানে তার তীর তাবারিস্তান এলাকা এবং কাজবিন পর্যন্ত বিস্তৃত দায়লাম পর্বতমালা। উক্ত খণ্ডের পশ্চিম দিকে তার সাথে চতুর্থ অঞ্চলের ষষ্ঠাংশে অবস্থিত খণ্ডটি এসে মিলেছে। এর সাথে উত্তর দিকে ষষ্ঠ অংশের সাগর খণ্ডটিও পূর্বদিক থেকে মিশেছে। এ অংশের উত্তর-পশ্চিম কোণে জলমুক্ত একটি ভূখণ্ড বিদ্যমান, যার উপর দিয়ে 'আসল' নদী (ভলগা) সাগরে এসে পড়েছে। এ অংশের পূর্ব কোণে অন্য একটি সাগরজল মুক্ত ভূখণ্ড বিদ্যমান, যা তুর্কি গোত্রভুক্ত 'গোজ'দের বিচরণ প্রান্তর। দক্ষিণ দিক থেকে এ খণ্ডটিকে একটি পর্বত বেষ্টন করে অষ্টম অংশে চলে গেছে। এ পর্বত উক্ত অংশের মধ্যভাগ পর্যন্ত গিয়ে উত্তর দিকে মোড় ঘুরে তাবারিস্তান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এবং তার সন্নিবেশিত অবস্থায় অগ্রসর হয়ে উক্ত পর্বতের অবশিষ্ট ভাগ ষষ্ঠ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। সেখানে পুনরায় মোড় ঘুরে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং সেখানে একে 'সিয়াহ্' পর্বত বলা হয়। এর পর উক্ত পর্বত পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ষষ্ঠ অঞ্চলের ষষ্ঠ অংশে প্রবেশ করেছে এবং পুনরায় দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়ে পঞ্চম অঞ্চলের ষষ্ঠাংশে ফিরে এসেছে। এটাই তার সেই প্রান্তভাগ, যা 'সরির' ও খাজারদের ভূমির মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে রেখেছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম অংশে খাজারদের এলাকার সঙ্গে এ পর্বতের যে নিম্নভাগ মিলিত হয়েছে, তাই 'সিয়াহ' নামে খ্যাত, যেমন তার বর্ণনা আসছে।

পঞ্চম অঞ্চলের অষ্টম অংশের ভূভাগই তুর্কি গোত্রভুক্ত 'গোজ'দের বিচরণ প্রান্তর। এর দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে 'খোয়ারজিম' (আরল) হ্রদ যাতে জাইহুন (অক্সাস) নদী পতিত হচ্ছে। এর পরিধি তিনশ মাইল। এতে এ সকল প্রান্তর থেকে বহু নদী এসে পড়ছে। এর উত্তর-পূর্ব পার্শ্বে 'আরউন (গোরগুন) হ্রদ অবস্থিত।[৭৫] তার পরিধি চারশ মাইল এবং তার জল সুপেয়। এ অংশের উত্তর কোণে 'মেরগার' পর্বত বিদ্যমান, যার অর্থ বরফের পর্বত। কারণ তার বরফ গলে না। এটা এ অংশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। 'আরউন' হ্রদের দক্ষিণে নিরেট পাথরের একটি পর্বত বিদ্যমান, যাতে কোন কিছু জন্মায় না। এটা আরউন নামে খ্যাত এবং হ্রদটিও এ নামে নামাঙ্কিত। এ পর্বত ও মেরগার পর্বত থেকে অসংখ্য নদী উক্ত হ্রদের উভয় পার্শ্ব দিয়ে তাতে পতিত হচ্ছে।

এ অঞ্চলের নবম অংশে গোজদের এলাকার পশ্চিম দিকে ও 'কিমাক'দের এলাকার পূর্ব দিকে তুর্কি গোত্রভুক্ত 'আরাকসা'দের এলাকা। এ অংশের শেষ প্রান্তে পূর্বদিকে এ এলাকার সাথে 'কাউকিয়া' পর্বতের নিম্নভাগ মিলিত হয়েছে। উক্ত পর্বত ইয়াজুজ-মাজুজকে ঘিরে রেখেছে। এটা এ স্থানে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে বিস্তৃত হয়ে দশম অংশে প্রবেশের প্রারম্ভে ঘুরে গেছে। এটা এ অংশের বিপরীতে অবস্থিত চতুর্থ অঞ্চলের দশম অংশের শেষ প্রান্ত দিয়ে এতে প্রবেশ করেছিল এবং এ অংশের শেষ প্রান্তে উত্তর

৭৫. এটা কি 'কারাকুম' হ্রদ।

দিকে তার নিম্নভাগ দিয়ে বেষ্টনকারী সাগরের সাথে মিলিত হয়েছে। অতঃপর পশ্চিম দিকে মোড় ঘুরে চতুর্থ অঞ্চলের দশমাংশের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। এটা তার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত কিমাকদের এলাকাকে বেষ্টন করেছে এবং অতঃপর পঞ্চম অঞ্চলের দশমাংশের দিকে বের হয়ে গেছে। তাতে এটা তার শেষ পর্যন্ত পশ্চিম দিকে প্রসারিত হয়েছে। এর দক্ষিণ দিকে এ অংশের পশ্চিম দিকে দীর্ঘায়িত একটি ভূখণ্ড কিমাকদের এলাকার শেষ প্রান্তের বিপরীত দিকে অবস্থিত। অতঃপর এ পর্বত নবম অংশের পূর্বদিকে ও তার উপরিভাগে অগ্রসর হয়েছে এবং খুব নিকটেই উত্তর দিকে মোড় নিয়েছে। অতঃপর ঐদিকেই ষষ্ঠ অঞ্চলের নবমাংশের দিকে এগিয়ে গেছে। এখানে এর মধ্যে সেই প্রাচীর, যা অচিরেই বর্ণনা করব। এর ঐ ভূখণ্ডটি শুধু অবশিষ্ট, যাকে এ অংশের উত্তর-পূর্ব কোণের নিকট কাউকিয়া পর্বত বেষ্টন করেছে এবং যা দক্ষিণ দিকে দীর্ঘায়িত হয়ে রয়েছে। এটাই ইয়াজুজ ও মাজুজদের এলাকা।

এ অঞ্চলের দশমাংশে ইয়াজুজ ও মাজুজদের এলাকা। এটা তার সমুদয় এলাকা ধরে ক্রমান্বয়ে বিস্তারিত হয়েছে। শুধু বেষ্টনকারী সাগরের একটি খণ্ড এর পূর্বদিকে দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রসারিত রয়েছে। অবশ্য অন্য একটি সাগর খণ্ডও, যাকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে তাতে প্রবেশের দ্বারা কাউকিয়া পর্বত বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এ ছাড়া আর সমুদয় ভূভাগই ইয়াজুজ ও মাজুজদের এলাকা। আল্লাহ্ পবিত্র ও উন্নত, তিনিই সর্বজ্ঞাতা।

ষষ্ঠ অঞ্চল

এ অঞ্চলের প্রথম অংশের অর্ধেকেরও বেশি ভূভাগ সাগরের জলে আবৃত। সাগর এ অংশের উত্তর কোণের সঙ্গে পূর্বদিকে ঘুরে পুনরায় পূর্ব কোণের সাথে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে এবং দক্ষিণ কোণের নিকটে গিয়ে শেষ হয়েছে। এর ফলে এ অংশের একটি ভূখণ্ড জলমুক্ত অবস্থায় দুটি জলীয় প্রান্তের মধ্যে অবস্থিত হয়েছে এবং বেষ্টনকারী সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি উপদ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। এটা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বিস্তৃত এবং এর সমুদয় ভূভাগই 'বরতানিয়া'(ব্রিটেন)র এলাকা। উক্ত দুই জলীয় প্রান্তের মধ্যে দ্বারতুল্য স্থান ও এ অংশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের মধ্যবর্তীস্থলে 'সাকিস' (সীস) এলাকা এবং এর সন্নিহিত 'বেনতু' (পর্টিও) এলাকা, যার কথা পঞ্চম অঞ্চলে প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে।

এ অঞ্চলের দ্বিতীয় অংশে বেষ্টনকারী সাগর পশ্চিম ও উত্তর দিক থেকে প্রবেশ করেছে। এটা পশ্চিম দিকে একটি দীর্ঘায়িত সাগর খণ্ড, যা প্রথম অংশে অবস্থিত বরতানিয়া এলাকার পূর্বভাগে এর উত্তর অর্ধাংশ অপেক্ষা বৃহৎ। এর সাথে উত্তর দিকে অন্য একটি সাগর খণ্ড পশ্চিম-পূর্বে বিস্তৃত আকারে সম্মিলিত হয়েছে এবং এর পশ্চিম অর্ধাংশে কতকাকারে প্রসারিত হয়েছে। এখানে এ অংশে 'ইনকালতারা' (ইংল্যান্ড) দ্বীপের একটি খণ্ড বিদ্যমান। এটা একটি বিরাট প্রশস্ত দ্বীপ এবং এতে বহু শহর অবস্থিত। এটা একটি শক্তিশালী রাজ্য। এর অবশিষ্ট ভাগ সপ্তম অঞ্চলের অন্তর্গত। এ সকল সাগরখণ্ড ও তার দ্বীপের দক্ষিণ দিকে এ অংশের পশ্চিম অর্ধভাগে 'আরমান্দিয়া'

(নরমাণ্ডী) এলাকা অবস্থিত এবং 'আফলাদশ' (ফ্লেন্ডার্স) এলাকা এর সন্নিহিত। অতঃপর এ অংশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে 'আফরানসিসা' (ফ্রান্স) এলাকা এবং এর পূর্বে 'বরগহুনিয়া' (বরগান্ডী) এলাকা। এ সবগুলোই ফিরিঙ্গী জাতির অধীনে। এ অংশের পূর্ব অর্ধভাগে আলমানী(জার্মানি)দের এলাকা। এর দক্ষিণে যথাক্রমে 'আনকেলায়া' (এ্যাকুলিয়া), উত্তরে 'বরগুনিয়া' (বরগান্ডী) এবং এর পর 'লাহুইকা' (লোরিন) ও 'শাতুনিয়া' (সেক্সনী) এলাকা। উত্তর-পূর্ব কোণের বেষ্টনকারী সাগরখণ্ডের উপরে 'আফরিরা' (ফ্রিসিয়া) এলাকা বিদ্যমান। এসবগুলো আলমানীদের অধীনে।

এ অঞ্চলের তৃতীয় অংশের পশ্চিম কোণে দক্ষিণ দিকে 'মারাতিয়া' (বোহেমিয়া) এলাকা এবং উত্তরে 'শাতুনিয়া' এলাকা। পূর্ব কোণে দক্ষিণ দিকে 'আনকুইয়া' (হাঙ্গেরী) এবং উত্তর দিকে 'বালুনিয়া' (পোল্যান্ড) এলাকা অবস্থিত। শেষোক্ত দুটির মাঝখানে চুতর্থ অংশ থেকে প্রবেশকারী 'বালুয়াথ' (কার্পেথিয়ান) পর্বত প্রসারিত এবং এটা পশ্চিম দিক হয়ে ক্রমশ উত্তর দিকে মোড় নিয়েছে ও পশ্চিম অর্ধাংশের শেষ প্রান্তে শাতুনিয়া এলাকায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে।

চতুর্থ অংশের দক্ষিণ কোণে জাসুলিয়া এলাকা এবং এর নিম্নভাগে 'রূশিয়া' (রাশিয়া) এলাকা। এদের মধ্যে এ অংশের প্রথম থেকে এর পূর্ব অর্ধভাগ পর্যন্ত প্রসারিত 'বালুয়াথ' পর্বত ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। জাসুলিয়ার পূর্বদিকে 'জারমানিয়া' এলাকা।[৭৬] দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কুস্তানতুনিয়া ভূমি এবং রোম সাগর থেকে বহির্গত প্রণালীর প্রান্তভাগে তার শহর অবস্থিত, যেখানে উক্ত প্রণালী নিতাশ সাগরের সঙ্গে মিশেছে। এর ফলে এ অংশের পূর্ব কোণের উচ্চভূমিতে উক্ত সাগরের একটি ক্ষুদ্র খণ্ড পড়েছে। এর সাথে উক্ত প্রণালীটি সংযুক্ত রয়েছে এবং তাদের মধ্যবর্তী কোণায় 'মসিনা' এলাকা বিদ্যমান।

ষষ্ঠ অঞ্চলের পঞ্চম অংশের দক্ষিণ কোণায় নিতাশ সাগর চতুর্থ অংশের শেষপ্রান্তে প্রণালীর সাথে মিলিত হয়েছে। এ সাগর ঐদিক থেকে বের হয়ে পূর্বদিকে অত্র অংশের সমুদয় ভূভাগ এবং ষষ্ঠ অংশের কতক ভাগ গ্রাস করেছে। আরম্ভ হতে এর দৈর্ঘ্য তেরশ মাইল ও প্রস্থ ছয়শ মাইল। এ সাগরের পশ্চাতে এ অংশের দক্ষিণ কোণে পশ্চিম থেকে পূর্বে বিস্তৃত একটি দীর্ঘ ভূখণ্ড বিদ্যমান, এর পশ্চিম ভাগে নিতাশ সাগরের তীরে ও পঞ্চম অঞ্চলের বায়লকান ভূমির সাথে সংলগ্ন 'হিরাকলিয়া' অবস্থিত। এর পূর্বে 'লামী'(এলান)দের এলাকা ও তার রাজধানী নিতাশ সাগরের তীরে সাওতলী (সিনুপ)। নিতাশ সাগরের উত্তরে এ অংশের পশ্চিম ভাগে 'তরখান' (বুরজান—বুলগার) এবং পূর্বদিকে রূশিয়া দেশ। এদের সকলই এ সাগরের তীরে অবস্থিত। রুশিয়া দেশ এ তরখান এলাকাকে এ অংশের পূর্বদিক, সপ্তম অঞ্চলের পঞ্চম অংশে উত্তর দিক এবং এ অঞ্চলের চতুর্থ অংশে পশ্চিম দিক থেকে ঘিরে রেখেছে।

ষষ্ঠ অংশের পশ্চিম ভাগে নিতাশ সাগরের অবশিষ্ট অংশ তা উত্তর দিকে সামান্য ঘুরেছে এবং সেখানে তার ও এ অংশের শেষ প্রান্তের মধ্যে উত্তর দিকে 'কুমানিয়া' এলাকা। এর দক্ষিণ দিকে উক্ত সাগর প্রসারিত হয়ে উত্তর দিকে মোড় ঘোরা অবস্থায়

৭৬. এটা পূর্বোক্ত আলমানীদের এলাকা 'জারমানি' বা 'জারমানিয়া' নয়।

'লীনী'দের অবশিষ্ট এলাকা বিদ্যমান, যা পঞ্চম অংশে তার দক্ষিণ শেষ প্রান্ত ছিল। এ অংশের পূর্ব কোণে 'খাজার'দের ভূমি সন্নিহিত এবং তার পূর্বে 'বরতাস' ভূমি অবস্থিত। পূর্ব-উত্তর কোণে 'বুলগার' ভূমি এবং পূর্ব-দক্ষিণ কোণে 'বেলজার' (বেলানজার) ভূমি। এখানে 'সিয়াহ' পর্বতের একটি খণ্ড তার সাথে এসে একত্র হয়েছে, যা পরে 'খাজার' সাগরের সাথে ঘুরে সপ্তম অংশে প্রবেশ করেছে। উক্ত সাগরের সাথে বিচ্ছিন্ন হবার পর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে এ অংশের এ খণ্ডের মধ্যে দিয়ে পঞ্চম অঞ্চলের ষষ্ঠ অংশে গিয়ে পৌঁছেছে। সেখানে তা 'আবোয়াব' পর্বতের সাথে মিলিত হয়েছে এবং সেখানে খাজারদের এলাকার একটি কোণ বিদ্যমান।

এ অঞ্চলের সপ্তম অংশের দক্ষিণ কোণে সেই ভূভাগ বিদ্যমান, যা সিয়াহ পর্বত তাবারিস্তান সাগর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর অতিক্রম করেছে। এটা এ অংশের শেষ পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত খাজারদের এলাকার একটি খণ্ড। এর পূর্বে তাবারিস্তান সাগরের একটি খণ্ড রয়েছে, যার পূর্বে ও উত্তর দিক দিয়ে উক্ত পর্বত অতিক্রম করেছে। সিয়াহ পর্বতের পশ্চাতে ও উত্তর কোণে 'বরতাস' ভূমি এবং এ অংশের পূর্ব কোণে 'শহরব' (বশখির) ও 'ওয়েখনাক'দের[৭৭] এলাকা। তারা তুর্কি জাতির অন্তর্ভুক্ত।

অষ্টম অংশের দক্ষিণ কোণের সমগ্র ভূভাগই তুর্কি গোত্রভুক্ত 'খওলখ'দের এবং পশ্চিম-উত্তর কোণে 'মুস্তেনা'(দুর্গন্ধযুক্ত) ভূমি। এর পূর্বভাগ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, প্রাচীর নির্মাণের পূর্বে ইয়াজুজ ও মাজুজ (গগ ও মেগগ)রা তা ধ্বংস করে ফেলেছিল। এ 'মুস্তেনা ভূমিতে পৃথিবীর বৃহৎ নদনদীর অন্যতম 'আসল' (ভলগা) নদীর উৎসস্থল। তার প্রবাহ তুর্কি এলাকায় এবং তার পতন পঞ্চম অঞ্চলের সপ্তম অংশে অবস্থিত তাবারিস্তান সাগরে। তাতে অসংখ্য বাঁক এবং তা মুস্তেনা ভূমির তিনটি স্রোতধারা একত্র হয়ে এক নদীরূপে বের হয়ে এসেছে। তা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে এ অঞ্চলের সপ্তম অংশে উপনীত হয়েছে। তা এভাবে চলে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে মধ্যভাগে সপ্তম অংশের শেষ প্রান্তে পৌঁছে মোড় ঘুরে উত্তর দিকে সপ্তম অঞ্চলের সপ্তম অংশ থেকে ষষ্ঠ অংশে বের হয়ে এসেছে। এর খুবই নিকটে পশ্চিম দিকে চলে পুনরায় দ্বিতীয়বার দক্ষিণ দিকে ঘুরেছে এবং ষষ্ঠ অঞ্চলের ষষ্ঠ অংশের দিকে ফিরে গেছে। তা থেকে একটি শাখা পশ্চিম দিকে বের হয়ে ঐ অংশেরই নিতাশ সাগরে পড়েছে। মূল নদী পূর্ব ও উত্তর দিকের মধ্যভাগে বুলগারদের একটি ভূখণ্ড অতিক্রম করে ষষ্ঠ অঞ্চলের সপ্তম অংশে বের হয়ে এসেছে। পুনরায় তা তৃতীয়বার দক্ষিণ দিকে ফিরে সিয়াহ পর্বতে প্রবেশ করেছে। খাজারদের এলাকা অতিক্রম করে পঞ্চম অঞ্চলের পঞ্চম অংশে বের হয়ে এসেছে। ঐখানে ঐ অংশের যে ভূখণ্ডটি জলমুক্ত ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দিকে, সেখানে তাবারিস্তান সাগরে পতিত হয়েছে।

এ অঞ্চলের নবম অংশের পশ্চিম দিকে তুর্কি 'খফশাখ' গোত্রের এলাকা। তাদেরকে 'কফজাক'ও বলা হয়। তুর্কি 'সরকাশ'(তুর্গিশ)দের এলাকাও এ দিকে বিদ্যমান। এর পূর্ব দিকে ইয়াজুজদের এলাকা এবং তাদের মধ্যে বেষ্টনকারী 'কাউকিয়া' পর্বত

৭৭. 'পেখেনেগ' এবং এটাই পরে সপ্তম অঞ্চলের সপ্তম অংশে 'ইয়াকনাক' রূপে উচ্চারিত হয়েছে। 'শহরব' হয়েছে 'সোহরাব'।

ব্যবধানের সৃষ্টি করে রেখেছে, যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্বত চতুর্থ অঞ্চলের পূর্ব দিকে বেষ্টনকারী সাগর হতে আরম্ভ হয়ে তার সঙ্গে উত্তর দিকে অঞ্চলের শেষ পর্যন্ত গেছে এবং তাকে ত্যাগ করে পশ্চিম দিকে ঘেষে পঞ্চম অঞ্চলের নবম অংশে প্রবেশ করেছে। অতঃপর তা তার প্রথম দিকেই ফিরে এসেছে এবং এ অঞ্চলের নবম অংশে দক্ষিণ হতে উত্তর দিকে পশ্চিম ঘেঁষে প্রবেশ করেছে। এখানে তার মধ্যভাগে সেই প্রাচীরটি বিদ্যমান, যা ইসকান্দর (আলেকজান্ডার) নির্মাণ করেছিলেন। অতঃপর উক্ত পর্বত তার দিকে বের হয়ে সপ্তম অঞ্চলের নবম অংশে প্রবেশ করেছে এবং দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে বেষ্টনকারী সাগরের সাথে তার উত্তরে মিলিত হয়েছে। পুনরায় তার সাথে সেখান হতে মোড় নিয়ে পশ্চিম দিকে সপ্তম অঞ্চলের পঞ্চম অংশে পৌঁছেছে। এখানে বেষ্টনকারী সাগরের একটি খণ্ডের সাথে তার পশ্চিমে মিলেছে। এ নবম অংশের মধ্যভাগে সেই প্রাচীর বিদ্যমান, যা ইসকান্দর নির্মাণ করিয়েছিলেন, যেমন পূর্বে বলেছি। 'এটা ঠিক, কোরানে তার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে খুরদাজবিয়া তাঁর ভূগোল গ্রন্থে লিখেছেন, ওয়াসিক একরাত্রে স্বপ্নে দেখলেন, প্রাচীরটি যেন খুলে গেছে। তিনি ভয় পেয়ে জেগে উঠলেন এবং পথ প্রদর্শক সালামকে সংবাদ নিতে পাঠালেন। তিনি গিয়ে তা দেখলেন ও তার সংবাদ নিয়ে আসলেন। এক দীর্ঘ কাহিনীতে তিনি তার বর্ণনা দিয়েছেন; তা আমাদের গ্রন্থের বিষয়াদির অন্তর্গত নয়।'[৭৮]

এ অঞ্চলের দশম অংশে মাজুজদের এলাকা। এটা এ অংশের শেষপ্রান্ত বিস্তৃত হয়ে ঐখানে বেষ্টনকারী সাগরের একটি খণ্ডের সাথে মিলিত হয়েছে এবং উক্ত সাগর খণ্ড তাকে পূর্ব ও উত্তর দিকে ঘিরে রেখেছে। এ খণ্ডটি উত্তর দিকে দীর্ঘায়িত এবং পূর্ব দিকে কতকাংশে প্রশস্ত।

সপ্তম অঞ্চল

বেষ্টনকারী সাগর এর অধিকাংশ ভূভাগকে উত্তর দিকে পঞ্চম অংশের মধ্যভাগ পর্যন্ত গ্রাস করে রেখেছে। উক্ত পঞ্চম অংশে তা ইয়াজুজ ও মাজুজদের এলাকা বেষ্টনকারী কাউকিয়া পর্বতের সাথে মিলিত হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ সাগরের নিচে, শুধু 'ইনকালতারা' (ইংল্যান্ড) দ্বীপ, যার অধিকাংশ দ্বিতীয় অংশে পড়েছে। প্রথম অংশে তার একটি প্রান্ত মাত্র, যা উত্তর দিক ঘেষে ঘুরে গেছে। এর অবশিষ্ট ভাগ তার চতুর্দিকে একটি গোলাকার সাগর খণ্ডসহ ষষ্ঠ অঞ্চলের দ্বিতীয়াংশে পড়েছে, যেমন যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে। তার থেকে মূল স্থলভাগের দিকে অতিক্রমযোগ্য জলভাগের (চ্যানেলের) বিস্তার বার মাইল। উক্ত দ্বীপের পশ্চাতে দ্বিতীয় অংশে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে দীর্ঘায়িত 'রাসালিন্দা' দ্বীপ।[৭৯]

তৃতীয় অংশ এ অঞ্চলের তার অধিকাংশ ভূভাগ জলাবৃত; শুধু দক্ষিণ দিকে একটি দীর্ঘায়িত ভূখণ্ড, যা পূর্বভাগে বিস্তৃত হয়েছে এবং এখানে তা ফালুনিয়া (পোল্যান্ড)[৮০]

---

৭৮. 'এটা ঠিক—নয়' পর্যন্ত অংশটি কোন কোন সংস্করণে নেই।

৭৯. রাসালিন্দা বলতে আইসল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের কোন অংশকে বুঝাতে পারে।

৮০. পূর্বে এটাই 'বালুনিয়া' রূপে উচ্চারিত হয়েছে।

এলাকার সাথে সন্নিহিত, যার কথা ষষ্ঠ অঞ্চলের তৃতীয় অংশে বর্ণিত হয়েছে। তা এর উত্তরে অবস্থিত এবং এ অংশের ভূভাগ গ্রাসকারী সমুদ্র খণ্ডের মধ্যে পশ্চিম পার্শ্বে বিস্তৃত চক্রাকারে বিদ্যমান। তা একটি দ্বারতুল্য ভূভাগ (যোজকের) দ্বারা মূল ভূমির সাথে সংযুক্ত, যা ফালুনিয়া এলাকার দিকে চলে গেছে। তার উত্তর দিকে 'বউকা' (নরওয়ে) দ্বীপ, উত্তর দিক পশ্চিমে পূর্বে দীর্ঘায়িত।

এ অঞ্চলের চতুর্থ অংশের উত্তর ভাগ পশ্চিমে পূর্বে বেষ্টনকারী সাগর দ্বারা আবৃত এবং তার দক্ষিণ ভাগ জলমুক্ত। তার পশ্চিম দিকে তুর্কি 'কিমাযাক' ভূমি (ফিনল্যান্ড?) এবং তার পূর্ব দিকে 'তস্ত' এলাকা। এরপর এ অংশের পূর্ব শেষ প্রান্ত পর্যন্ত 'রাসালিন্দ্র' এলাকা (এস্তোনিয়া?)। এটা সর্বদা বরফাচ্ছাদিত এবং জনবসতি খুবই সামান্য। এটা ষষ্ঠ অঞ্চলের চতুর্থ ও পঞ্চম অংশে অবস্থিত রুশিয়া এলাকার সাথে সন্নিহিত।

এ অঞ্চলের পঞ্চম অংশের পশ্চিম কোণে রুশিয়া এলাকা এবং তা উত্তর দিকে বেষ্টনকারী সাগরের এমন একটি খণ্ডের নিকটে শেষ হয়েছে, যার কাউকিয়া পর্বত সংযুক্ত এবং যার কথা পূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। তার পূর্বকোণে এটা ষষ্ঠ অঞ্চলের ষষ্ঠ অংশে অবস্থিত নিতাশ সাগরের তীরের 'কমানিয়া' এলাকার সাথে সংযুক্ত এবং এ অংশের 'তরমী' হ্রদে গিয়ে শেষ হয়েছে। এ হ্রদের জল সুপেয় এবং উত্তর দক্ষিণের পর্বতাদি থেকে বহু নদী এসে এতে পতিত হচ্ছে। এ অংশের পূর্ব কোণের উত্তরে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত তুর্কেম্যান তাতারীদের এলাকা।

ষষ্ঠ অংশের দক্ষিণ পশ্চিম কোণ 'কমানিয়া' এলাকার সাথে সংযুক্ত। তার মধ্যভাগে 'আসুর' হ্রদ। এর জল সুপেয় এবং কোণের পর্বতাদি থেকে বহু নদী এতে এসে পড়েছে। এটা সর্বদাই অতিরিক্ত শীতের দরুন জমে থাকে; শুধু গ্রীষ্মকালে সামান্য গলে। 'কমানিয়া' এলাকার পূর্বে রুশিয়া এলাকা, যা ষষ্ঠ অঞ্চলের পঞ্চমাংশের পূর্ব-উত্তর কোণ থেকে আরম্ভ হয়েছে। এ অংশের পূর্ব দক্ষিণ কোণে বুলগারদের এলাকার অবশিষ্ট ভাগ, যা ষষ্ঠ অঞ্চল থেকে শুরু হয়েছে—তার ষষ্ঠ অংশের পূর্ব-উত্তর কোণে এবং বলুগার ভূমির এ ভূখণ্ডের মধ্যভাগে 'আসল' (ভলগা) নদীর বাঁক অবস্থিত। প্রথম ভূখণ্ডটি দক্ষিণ দিকে, যেমন বর্ণিত হয়েছে।[৮১] এ ষষ্ঠ অংশের উত্তর শেষ প্রান্তে কাউকিয়া পর্বত পশ্চিমে-পূর্বে তার সাথে সংযুক্ত।

এ অঞ্চলের সপ্তম অংশের পশ্চিম দিকে তুর্কি গোত্রভুক্ত 'ইয়াকনাক'দের এলাকার অবশিষ্ট ভূমি। এটা পূর্বে ষষ্ঠ অংশের উত্তর-পূর্ব কোণ এবং এ অংশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে আরম্ভ হয়েছে। এ অংশের উপরিভাগ দিয়ে ষষ্ঠ অঞ্চলের দিকে বের হয়ে গেছে। এ অংশের পূর্ব কোণে 'সোহরাব' ভূমির অবশিষ্ট ভাগ এবং এর পর 'মুন্তেনা' ভূমির অবশিষ্ট ভাগ এ অংশের শেষ পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অংশের শেষ উত্তর প্রান্তের সাথে পশ্চিমে পূর্ব বেষ্টনকারী কাউকিয়া পর্বত সংযুক্ত।

এ অঞ্চলের অষ্টম অংশের পশ্চিম দক্ষিণ দিক মুন্তেনা ভূমির সাথে সন্নিহিত। এর পূর্ব ভাগে 'মাহফুরা' (খাত) ভূমি অবস্থিত। এটা এক অদ্ভুত এলাকা। এটা পৃথিবীর এক

৮১. এখানে প্রথম ভূখণ্ডটি বলতে সম্ভবত বুলগারদের এলাকার অবশিষ্ট ভাগ বুঝিয়েছে। রোজেনথালেও এর অনুবাদ স্পষ্ট নয়।

বিরাট ফাটল, দিগন্ত বিস্তৃত ও সুগভীর; এর তলদেশ পাওয়া যায় না। এতে দিনের বেলা ধূম্র নির্গত হতে এবং রাতের বেলা অগ্নি জ্বলতে ও নির্বাপিত হতে দেখা যায়। এর ফলে মনে হয়, এলাকাটি জনবসতিপূর্ণ। অনেক সময় তাতে একটি নদীর অস্তিত্ব দেখা যায়, যা তাকে উত্তরে দক্ষিণে দুইভাগে ভাগ করে থাকে। এ অংশের পূর্ব কোণে প্রাচীর সংলগ্ন সেই বিধ্বস্ত এলাকা এবং এর শেষ উত্তর দিকে পূর্ব-পশ্চিমে সংযুক্ত কাউকিয়া পর্বত।

এ অঞ্চলের নবম অংশের পশ্চিম পার্শ্বে 'খফশাখ'দের এলাকা। এদেরকে 'কফজাক'ও বলা হয়। এ এলাকাকে কাউকিয়া পর্বত বেষ্টনকারী সাগরের নিকটে উত্তর থেকে মোড় নিবার কালে অতিক্রম করেছে। এটা এ এলাকার মধ্যভাগে পূর্বদিকে ঘেষে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং ষষ্ঠ অঞ্চলের নবম অংশে বের হয়ে গেছে। সেখানে এটা বিস্তৃত হয়েছে এবং ঐখানে এর মধ্যভাগে ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীর, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এ অংশের পূর্ব কোণে কাউকিয়া পর্বতের পশ্চাতে সাগরের তীরে ইয়াজুজ ভূমি, সামান্য প্রশস্ত, দীর্ঘায়িত—পূর্ব ও উত্তর দিক থেকে এ অংশকে ঘিরে রেখেছে।[৮২]

দশম অংশের সমুদয় এলাকাই সাগর জলে আবৃত।

এটাই ভূগোল ও তার সপ্ত অঞ্চল সম্পর্কে শেষ বক্তব্য। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিবারাত্রির আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন বিদ্যমান।[৮৩]

---

৮২. এ স্থানে 'সামান্য প্রশস্ত দীর্ঘায়িত' বিশেষণদ্বয় সাগরখণ্ডের হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।

৮৩. এটা কোরানের দুইটি আয়াতের সংমিশ্রণ। দ্র: কোরান ২, ১৬৪; ৩, ১৯০; ৪৫, ৩-৫।

তৃতীয় প্রস্তাবনা

[নাতিশীতোষ্ণ ও শীতোষ্ণ অঞ্চলসমূহ; মানুষের গাত্রবর্ণ ও তাদের অন্যবিধ বহু অবস্থার উপর বায়ুর[৮৪] প্রভাব সম্পর্কে]

আমরা বর্ণনা করেছি যে, পৃথিবীর এ জলমুক্ত অংশে জনবসতিপূর্ণ এলাকা হল তার মধ্যভাগ। কারণ তার দক্ষিণ দিক অতিশয় উষ্ণ এবং তার উত্তর দিক অতিরিক্ত শীতপ্রধান। যেহেতু তার উভয় পার্শ্ব উত্তর ও দক্ষিণ শীত ও উষ্ণতার দিক থেকে পরস্পর বিরোধী, সেজন্য উক্ত উভয় পার্শ্ব থেকে অবস্থা পর্যায়ক্রমে হ্রাস পেয়ে মধ্যভাগ সমভাবাপন্ন হয়েছে। সুতরাং চতুর্থ অঞ্চল সর্বাপেক্ষা সমভাবাপন্ন জনবসতিপূর্ণ এলাকা এবং তার সীমান্তবর্তী তৃতীয় ও পঞ্চম অঞ্চল সমভাবাপন্ন অবস্থার অধিকতর নিকটবর্তী। এদের পরবর্তী দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ অঞ্চল সমভাবাপন্ন অবস্থা থেকে দূরে এবং প্রথম ও সপ্তম অঞ্চল অধিকতর দূরে অবস্থিত। এ কারণেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, স্থাপত্য, পরিচ্ছদ, খাদ্য, ফলমূল, এমনকি জীবজন্তু ও অন্য সকল বস্তু, যা মধ্যভাগের এ তিনটি অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে থাকে, তৎসমুদয়ই সমভাবাপন্নতার দ্বারা বিশিষ্ট। এ সকল অঞ্চলের অধিবাসী মানবগোষ্ঠীও দেহ, বর্ণ, চরিত্র, ধর্মবোধ প্রভৃতির দিক থেকে অধিকতর সমভাবাপন্ন। এমনকি নবুয়তও; এটা শুধু এ অঞ্চলগুলোতেই অধিকতর পাওয়া যায়। আমরা দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্তীয় অঞ্চলগুলোতে নবী প্রেরণের কোন সংবাদ জানতে পারিনি। এর কারণ এ যে, নবী ও রসূলগণ মানব জাতির মধ্যে দৈহিক গঠন ও চরিত্রের দিক থেকে অধিকতর পরিপূর্ণতার দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে থাকেন। আল্লাহ্ বলেন, তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, মানুষের জন্য বহির্গত হয়েছে। কারণ এর ফলে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নবীগণ যা নিয়ে আসেন, তা সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলোর অধিবাসীরা এ সমভাবাপন্নতার অস্তিত্বের জন্য অধিকতর পরিপূর্ণতার অধিকারী।[৮৫]

এ কারণেই দেখা যায়, তারা তাদের গৃহ, পরিচ্ছদ, খাদ্য ও শিল্পকর্মে অতিশয় মধ্যপন্থী। তারা প্রস্তর নির্মিত ও শিল্পকলায় সুশোভিত সুদৃঢ় গৃহ তাদের আবাসস্থল হিসাবে গ্রহণ করে, তারা অস্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র আবিষ্কারে পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং তাতে চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করে থাকে। তাদের নিকট স্বভাবজ ধাতব পদার্থ, যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, সীসা ও টিন পাওয়া যায় এবং তারা আদান-

---

৮৪. বায়ু বলতে ইবনে খলদুন সর্বত্র 'জলবায়ু'কে বুঝিয়েছেন।

৮৫. 'এমনকি নবুয়তও অধিকারী' পর্যন্ত অংশটি রোজেনথাল পাদটীকায় সংযোজন করেছেন। কোরানের আয়াতটির জন্য ৩, ১১০ দ্র:।

প্রদানে দুটি উত্তম ধাতুর[৮৬] মুদ্রা ব্যবহার করে। তারা সর্বাবস্থায় অসহিষ্ণুতা থেকে দূরে থাকে। এ সকল মানবগোষ্ঠী মাগরিব, সিরিয়া, হেজাজ, ইয়ামেন, দুই ইরাক, হিন্দু, সিন্ধু ও চীনের অধিবাসী। অনুরূপভাবে আন্দালুস ও তৎসন্নিহিত ফিরিঙ্গী, জিল্লাকী, রোম, গ্রিক এবং এ সকল সমভাবাপন্ন অঞ্চলে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ও নিকটবর্তী অন্যান্য জনগোষ্ঠী। এ জন্যই সিরিয়া ও ইরাক এদের মধ্যে অধিকতর সমভাবাপন্ন। কারণ এ দুটি দেশ সর্বদিক থেকেই মধ্যভাগে অবস্থিত।

যে সকল অঞ্চল এ সমভাবাপন্ন অবস্থা থেকে দূরে অবস্থিত, যেমন প্রথম ও দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম, তাদের অধিবাসীরাও তাদের সর্বাবস্থায় সমভাব থেকে অধিকতর দূরবর্তী। তাদের গৃহ মাটি ও বাঁশের তৈরি, তাদের খাদ্য 'জুর্রা'[৮৭] ও শাক্‌সব্জী এবং তাদের পরিচ্ছদ গাছের পাতায় সেলাই করা পরিধেয় অথবা চামড়া। তাদের অধিকাংশেরই পরিচ্ছদহীন উলঙ্গ অবস্থা। তাদের এলাকার ফলমূল ও মসল্লাপাতি সমস্তই অদ্ভুত ধরনের এবং প্রায় চরমভাবাপন্ন। তাদের আদান-প্রদান দুটি সম্ভ্রান্ত ধাতু ছাড়াই নিষ্পন্ন হয়। তারা তামা, লোহা অথবা চামড়াকে তাদের বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে নির্ধারণ করে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের চরিত্র ভাষাহীন প্রাণীদের প্রায় সমতুল্য। এমনকি প্রথম অঞ্চলের সুদানী(নিগ্রো)দের অধিকাংশ সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা গৃহ ও ঝুপড়ীতে বাস করে, লতাপাতা খায় এবং তারা সম্প্রীতির পরিবর্তে পশুসুলভ বিচ্ছিন্নতায় বাস করে একে অপরকে আহার করে। 'সাকালী' (শ্লাভ)-রাও অনুরূপ। এর কারণ এ যে, সমভাবাপন্ন অবস্থা হতে দূরে অবস্থানের ফলে তাদের মানসিকতা ও চরিত্রের গড়ন ভাষাহীন পশুদের অনুরূপ গড়নের নিকটবর্তী হয়ে থাকে এবং সেই অনুপাতে তারা মনুষ্যত্ব থেকে দূরে সরে যায়। ধর্ম সম্পর্কেও তাদের অবস্থা একইরূপ; তারা নবুয়ত কাকে বলে জানে না, কোন প্রকার ধর্মীয় বিধান তারা পালন করে না। শুধু তাদের মধ্যে যারা সমভাবাপন্ন অবস্থার নিকটবর্তী, তাদের মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়; যদিও তা খুবই কম ও নগণ্য। যেমন ইয়ামেনীদের প্রতিবেশী হাবশীরা তারা প্রাক্-ইসলাম যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমানকাল পর্যন্ত খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করে রয়েছে। যেমন মাগরিবের অধিবাসীদের প্রতিবেশী মালী, কাউ কাউ ও তাক্‌রের জনগোষ্ঠী, তারা বর্তমানে ইসলাম ধর্ম পালন করছে। বলা হয়, তারা সপ্তম (ত্রয়োদশ খ্রি:) শতাব্দীতে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এরূপ উত্তর দিকের সাকালী (স্লাভ), ফিরিঙ্গী ও তুর্কিদের মধ্যে যারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। এদের ছাড়া উত্তরে দক্ষিণের এ অসমভাবাপন্ন অঞ্চলগুলোর অধিবাসীদের মধ্যে ধর্ম অজ্ঞাত, জ্ঞান-বিজ্ঞান অবলুপ্ত; তাদের সমুদয় অবস্থাই মনুষ্য সমাজ থেকে দূরে, ভাষাহীন প্রাণীদের নিকটবর্তী। তিনি এমন অনেক কিছুই সৃষ্টি করেন, যার জ্ঞান তোমাদের নেই।[৮৮]

উপরোক্ত বক্তব্যের উপর, ইয়ামেন, হাদ্রামাত, আহকাফ, হেজাজ, ইয়ামামা ও আরবের অন্যান্য সন্নিহিত এলাকার প্রথম ও দ্বিতীয় অঞ্চলে অবস্থানের জন্য কোন

---

৮৬. স্বর্ণ ও রৌপ্য।

৮৭. জোয়ার বা বাজরা জাতীয় খাদ্য।

৮৮. কোরান ১৬, ৮।

প্রকার আপত্তি উত্থাপন ঠিক হবে না। কারণ আরব উপদ্বীপ তিন দিক থেকেই সাগর দ্বারা বেষ্টিত, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এ জন্য সামুদ্রিক আর্দ্রতা তার বায়ুতে প্রভাব বিস্তার করে শুষ্কতা ও উত্তাপজনিত অসমভাবের হ্রাস ঘটায় এবং সামুদ্রিক আর্দ্রতার ফলেই তাতে কিছুটা সমভাবাপন্নতা দেখা দেয়।

কোন কোন বংশ তালিকাবিশারদ, যাদের সৃষ্টজগতের স্বভাবাদি সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই, তারা এমন ধারণা পোষণ করেন যে, সুদানী(নিগ্রো)রা হজরত নুহের পুত্র হামের বংশধর। হামকে তার পিতা যে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তারই প্রভাবস্বরূপ তাদের গাত্রবর্ণ কাল হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ তাদের উপর দাসত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন। তারা এ সম্পর্কে গল্পকারদের এক কল্পিত কাহিনী বর্ণনা করে থাকেন। হজরত নুহ কর্তৃক পুত্র হামকে অভিশাপ দানের কথা তৌরাত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে; সেখানে কাল বর্ণের কথা নেই। তদুপরি তাঁর অভিশাপ ছিল, হামের পুত্ররা যেন তার ভাইদের বংশাবলির দাসে পরিণত হয়, অন্যদের নয়। গাত্রবর্ণ কাল হওয়ার ব্যাপারটি হামের সাথে সম্পর্কযুক্ত করার মধ্যে শীত-গ্রীষ্মের প্রকৃতি এবং বায়ু ও জীবন বিকাশের উপকরণের উপর তাদের প্রভাবের প্রতি উদাসীনতাই বিরাজ করছে।

এর কারণ এ যে, গাত্রবর্ণের এ কাল রং দক্ষিণের অত্যধিক উষ্ণতাজনিত বায়ুর বিশেষ প্রভাব থেকেই প্রথম ও দ্বিতীয় অঞ্চলের আধিবাসীরা সাধারণভাবে লাভ করেছে। সূর্য বছরে দুইবার তাদের উপরে খ-মধ্যে অবস্থান করে। এ অবস্থান দুটি নিকটবর্তী হওয়ার ফলে প্রায় সর্ব ঋতুতেই খ-মধ্যে অবস্থানের কাল দীর্ঘায়িত হয়। তদ্দরুন অতিরিক্ত রশ্মিপাত ও তাঁদের উপর তীব্র তাপ বিকিরিত হয়ে উষ্ণতার সৃষ্টি করে এবং এর ফলে গাত্রবর্ণ কাল হয়ে যায়। এ দুটি অঞ্চলের দৃষ্টান্ত অনুসারে তাদের বিপরীত দিকে সপ্তম ও ষষ্ঠ অঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণভাবে উত্তরের অতিরিক্ত শৈত্যজনিত বায়ুর বিশেষ প্রভাবে সাদা গাত্রবর্ণের অধিকারী হয়ে থাকে। কারণ সূর্য সর্বদাই তাদের দিগন্তে দৃক্‌চক্রবাল অথবা তার নিকটে অবস্থান করে। তা কখনই খ-মধ্য বা তার নিকটবর্তী হয় না। সুতরাং সেখানে তাপ হ্রাস পায় এবং প্রায় সর্ব ঋতুতে শীতের আধিক্য হয়ে থাকে। এর ফলে তাদের গাত্রবর্ণ সাদা এবং তাদের দেহ লোমহীন হয়ে দাঁড়ায়। অত্যধিক শীতের প্রভাব অনুসরণ করেই তাদের চক্ষুর বর্ণ নীল, তাদের ত্বকে তিলের দাগ ও তাদের চুলের রং বাদামী হয়।

এ দুই বিপরীতের মধ্যভাগে তিনটি অঞ্চল—পঞ্চম, চতুর্থ ও তৃতীয় অবস্থিত। এ কারণেই এদের ভাগে মধ্যম অবস্থার বৈশিষ্ট্য সমভাবাপন্নতার একটি বিরাট অংশ পড়েছে। এদের মধ্যে আবার চতুর্থ অঞ্চল সমভাবাপন্নতার দিক থেকে সর্বাপেক্ষা চরম। কারণ এটা সর্বাপেক্ষা চূড়ান্ত মধ্যভাগে অবস্থিত, যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং এর অধিবাসীদের দৈহিক গঠন ও প্রকৃতিতে পরিবেশগত বায়ুর মেজাজ অনুসারেই সমভাবাপন্নতা দেখা দিয়েছে। দুই পার্শ্ব থেকে তৃতীয় ও পঞ্চম তাকে অনুসরণ করেছে; যদিও এরা চরম মধ্যম অবস্থায় পৌঁছতে পারেনি। কারণ এদের একটি উষ্ণ দক্ষিণের দিকে এবং অন্যটি শীতল উত্তরের দিকে কিঞ্চিৎ ঝুঁকে আছে। কিন্তু তথাপি এরা অসমভাবাপন্নতার দিকে পৌঁছায়নি। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট চারটি অঞ্চল

অসমভাবাপন্ন। তাদের অধিবাসীদের দৈহিক গঠন ও প্রকৃতিও তদনুরূপ। প্রথম ও দ্বিতীয় তাদের উষ্ণতা ও কৃষ্ণতার জন্য এবং সপ্তম ও ষষ্ঠ তাদের শৈত্য ও শুভ্রতার জন্য।

দক্ষিণের প্রথম ও দ্বিতীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের নামকরণ করা হয়েছে হাবশী, জঞ্জ ও সুদানী(নিগ্রো)। এগুলো কৃষ্ণকায় জাতিসমূহের একার্থবাচক নাম। তথাপি হাবশী বলতে ঐসকল লোককে বোঝায়, যারা মক্কা ও ইয়ামেনের বিপরীত দিকে বাস করে এবং জঞ্জ বলতে বোঝায়, যারা ভারত সাগরের বিপরীত দিকে বাস করে। কোন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি, সে হাম বা অন্য যে কেউ হোক, তার বংশধর বলে তাদেরকে ঐ সকল নামে আখ্যায়িত করা হয়নি। আমরা দেখতে পাই, দক্ষিণের অধিবাসী সুদানীদের মধ্যে যারা সমভাবাপন্ন চতুর্থ অঞ্চলে অথবা অসমভাবাপন্ন সাদা গাত্রবর্ণের অধিকারী সপ্তম অঞ্চলে বসবাস করছে, তাদের বংশধরদের গাত্রবর্ণ কালক্রমে সাদা হয়ে উঠছে। এর বিপরীত চতুর্থ অঞ্চল অথবা উত্তর দিকের যারা দক্ষিণে বসবাস করছে, তাদের সন্তানদের দেহের বর্ণ কাল হয়ে যাচ্ছে। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, গাত্রবর্ণ বায়ুর বৈশিষ্ট্যের অনুসারী। ইবনে সীনা তাঁর চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কীয় 'রেজায' পদ্যে বলেন :[৮৯]

> জঞ্জদের দেহে উষ্ণতা পরিবর্তন এনেছে, তাদের বর্ণ কাল হয়ে গেছে;
> স্লাভগণ পেয়েছে শুভ্রতা, এমনকি তাদের ত্বক কোমল হয়ে গেছে।

উত্তর দিকের অধিবাসীরা অবশ্য গাত্রবর্ণের অনুসারে নামাঙ্কিত হয়নি। কারণ যারা ঐসকল নামের ভাষা নির্ধারণ করেছিলেন, তাঁদের গাত্রবর্ণ ছিল সাদা। এজন্য তাঁরা তার মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব পাননি, যদ্বারা তা নামকরণের জন্য বিবেচ্য হতে পারে। কারণ তা তাদের নিকট অসমঞ্জস ও অস্বাভাবিক কিছু নয়। উত্তরের অধিবাসী—তুর্কি, সাকালী (স্লাভ), 'তাগুরগুর,' 'খাজার,' লানী (এলান), ফিরিঙ্গীদের বহু গোত্র ও ইয়াজুজ-মাজুজদের মধ্যে আমরা বিভিন্ন নাম এবং অগণিত গোত্রের বিচিত্র অভিধা দেখতে পাই।

মধ্যভাগের তিনটি অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ, তারা তাদের আকৃতি, প্রকৃতি ও চরিত্রে সমভাবাপন্ন। সভ্যতার সমুদয় স্বাভাবিক উপকরণ—জীবিকা, আবাস, শিল্পকলা, জ্ঞানবিজ্ঞান, নেতৃত্ব ও সাম্রাজ্য—সবকিছুই তাদের মধ্যে বিদ্যমান। এ জন্যই তাদের মধ্যে নবুয়ত, রাজ্য-সাম্রাজ্য, ধর্মীয় বিধান, জ্ঞান-বিজ্ঞান, নগর, গ্রাম, স্থাপত্য, বুদ্ধিমত্তা, মনোরম শিল্পকলা এবং যাবতীয় সমভাবাপন্ন অবস্থার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ সকল অঞ্চলের অধিবাসী, যাদের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা অবহিত হয়েছি, তারা হল—আরব, রোম, পারস্য, বনি ইসরাইল, গ্রিস, সিন্ধু, হিন্দ ও চীন দেশে অন্তর্ভুক্ত।

বংশ তালিকাবিশারদগণ যখন এ সকল জাতির মধ্যে তাদের বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন অনুসারে বিভিন্নতা দেখতে পেলেন, তখন তাঁরা ভাবলেন এ সবকিছুই বংশধারার ফল। এর ফলে তাঁরা দক্ষিণের অধিবাসী সকলকেই হামের বংশধর সুদানী(নিগ্রো) বলে

---

৮৯. 'রেজায' আরবি কাব্যের উনিশটি ছন্দের অন্যতম।

অভিহিত করলেন এবং তাদের গাত্রবর্ণ সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হলেন। এ কারণেই তারা এ সকল ভিত্তিহীন কাহিনী সংগ্রহের কষ্ট স্বীকার করেছেন। তারা উত্তরের অধিবাসী সকলকে কিংবা অধিকাংশকে ইয়াফতের সন্তান এবং সমভাবাপন্ন জাতি ও মধ্যভাগের অধিবাসীর অধিকাংশ, যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ধর্মসম্প্রদায়, ধর্মীয় বিধান, শাসন ব্যবস্থা ও রাজত্বের অধিকারী, তাঁদেরকে সামের সন্তান বলে নির্ধারিত করেছেন। তাঁদের এ বংশধারা নির্দেশের ধারণা হয়ত বা সত্যের অনুসারী হতে পারে, তথাপি তা যথেষ্ট যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়; বরং তা শুধুমাত্র ঘটনার বিবরণ। এর অর্থ এ নয় যে, দক্ষিণের অধিবাসীদের সুদানী ও হাবশী নামকরণ কোন কৃষ্ণকায় হামের বংশধারার জন্য হয়েছে। তাদের এ প্রকার ভ্রমে পতিত হওয়ার একমাত্র কারণ, তাদের বিশ্বাস এ যে, কেবল বংশধারার ফলেই জাতিগুলোর মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এরূপ নয়। কোন জাতীয় বা গোত্রীয় বৈশিষ্ট্য অনেকের মধ্যে বংশধারার জন্য হয়, যেমন আরব, বনি ইসরাইল ও পারস্যবাসীদের মধ্যে; অনেকের মধ্যে দিক ও চিহ্নের জন্য হয়, যেমন জঙ্গ, হাবশী, সাকালী ও সুদানীদের মধ্যে; অনেকের মধ্যে অভ্যাস, চালচলন ও বংশানুক্রমনের জন্য হয়, যেমন আরবদের মধ্যে এবং এতদ্ব্যতীতও বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্রপূর্ণ অবস্থার জন্য হয়ে থাকে। সুতরাং কোন এক কালে পূর্বপুরুষের মধ্যে প্রাপ্ত ধর্মমত, রং বা চিহ্নের নিদর্শন আবিষ্কার করে উত্তর বা দক্ষিণের মত নির্দিষ্ট কোন দিকের অধিবাসীদিগকে সেই বিখ্যাত পূর্বপুরুষের বংশধর বলে আখ্যায়িত করা এমন এক প্রকার ভুল, যা সৃষ্ট জগৎ ও ভৌগোলিক দিকের স্বভাব সম্পর্কে উদাসীনতার জন্যই সংঘটিত হয়। কারণ এর সবকিছুই বংশধারার মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। অন্তত এর চিরস্থায়িত্বের কোন সম্ভাবনাই নেই।

(এটাই) আল্লাহ্‌র প্রথা তাঁর বান্দাদের মধ্যে এবং তুমি আল্লাহ্‌র প্রথার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না।[৯০] আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাঁর অদৃশ্য সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাতা ও সুদৃঢ়। তিনিই অনুগ্রহকারী বন্ধু, পরম করুণাময় দয়ালু।

---

৯০. দ্র: কোরান ৩৩, ৬২; ৩৫, ৪৩; ২৮, ২৩। পরের অংশটির অনুবাদ রোজেনথালে নেই।

চতুর্থ প্রস্তাবনা

[মানব চরিত্রের উপর বায়ুর প্রভাব সম্পর্কে]

আমরা সুদানী(নিগ্রো)দের চরিত্রে প্রত্যক্ষ করেছি যে, তারা সাধারণভাবে লঘুত্ব, আবেগ ও অত্যধিক উল্লাসপ্রবণ হয়ে থাকে। যে কোন উপলক্ষে আপনি তাদেরকে নৃত্য করতে দেখতে পাবেন। এজন্য সর্বত্র তাদেরকে বোকা বলে মনে করা হয়।

এর যথার্থ কারণ এ : বিজ্ঞানের আলোচনায় এটা যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, উল্লাস ও আনন্দের স্বভাব হল সজীবতার বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তি এবং বিপদের প্রকৃতি এর ঠিক বিপরীত। তাতে সজীবতা সংকুচিত ও কেন্দ্রিভূত হয়ে পড়ে। এটাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, উষ্ণতা বায়ুকে ব্যাপ্তি দান করে এবং বাষ্পকে সূক্ষ্মতা দান করে তাদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এজন্যই মদ্যপায়ী এবং এমন আনন্দ-উল্লাসের অধিকারী হয়, যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এর কারণ এ যে, মদের শক্তি তার বিশেষ মিশ্রণের দ্বারা তার সজীবতার মধ্যে যে তাপের সৃষ্টি করে, তদ্বারা সজীবতার বাষ্প অন্তঃকরণে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং সজীবতার ব্যাপ্তি ঘটে ও উল্লাসের জন্ম দেয়। এরূপ উষ্ণ স্নানাগার বিলাসীদের মধ্যে হয়ে থাকে। তারা যখন তার উষ্ণ বায়ুর মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, তখন বায়ুর উষ্ণতা তাদের সজীবতায় প্রবেশ করে তাকে ব্যাপ্তি দান করে এবং আনন্দ উৎপাদন করে। অনেক সময় তাদের অনেকেই গান গাইতে আরম্ভ করে। কারণ এ আনন্দ থেকেই গানের জন্ম।

অতএব, সুদানীরা যেহেতু উষ্ণ অঞ্চলের অধিকারী, এজন্য উষ্ণতা তাদের মানসিকতা ও গঠনের উপর অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। তাদের দেহ ও পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে তাদের সজীবতায় উষ্ণতার পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে। এজন্য তাদের সজীবতায় সঞ্চিত উষ্ণতা ও তার ব্যাপ্তি চতুর্থ অঞ্চলের অধিবাসীদের তুলনায় অত্যধিক হয় এবং এ কারণেই তারা অতিদ্রুত 'আনন্দ-উল্লাসে'র কবলে পতিত হয় ও অত্যধিক আনন্দিত হয়ে উঠে। তাদের আবেগপ্রবণতা এরই প্রভাবজাত। এ ব্যাপারে সমুদ্রতীরবর্তী এলাকার অধিবাসীদের সাথে তাদের সামান্য মিল আছে। কারণ সেখানে সমুদ্রপৃষ্ঠে প্রতিবিম্বিত সূর্যরশ্মি ও তার কিরণ বায়ুর মধ্যে অত্যধিক উষ্ণতার সৃষ্টি করে। এর ফলে তারা শীতল পাহাড়ী ও পার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের অপেক্ষা অধিক উষ্ণতাজনিত আনন্দ ও লঘুত্বের অধিকারী হয়ে থাকে। এর কিছুটা উদাহরণ আমরা 'আলজজিরা'[৯১] এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে পেতে পারি।

---

৯১. রোজেনথাল লিখেছেন 'জরিদ'।

তৃতীয় অঞ্চলের এ এলাকাটি সমুদ্রতীর ও পার্বত্য এলাকার দক্ষিণে অবস্থিত হওয়ার ফলে তার পরিবেশ ও বায়ুতে উষ্ণতার আধিক্য বিদ্যমান। মিশরের অধিবাসীদিগকেও এ দিক থেকে বিবেচনা করা যায়। কারণ, তারাও আলজজিরা কিংবা তার নিকটবর্তী অক্ষাংশে বসবাস করে। তাদের মধ্যে আনন্দ, লঘুত্ব ও পরিণামদর্শিতার কী প্রসার! এমন কি তারা বছর বা মাসের জন্যও তাদের খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করে রাখে না। অধিকাংশ খাদ্য তারা বাজার থেকে ক্রয় করে খায়। অথচ মাগরিবের ফাস (ফেজ) এলাকা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাকে চুতর্দিক থেকে শীতল পাহাড়ী এলাকা ঘিরে রাখার ফলে তা স্থলভাগের মধ্যে অবস্থিত। এ জন্য দেখা যায়, এর অধিবাসীরা যেন বিষাদের প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং পরিণামদর্শিতায় তারা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। তাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি তার দুই বছরের আহার্য গম সঞ্চয় করে রাখে। এতদ্‌সত্ত্বেও সে প্রত্যহ বাজার থেকে খাদ্য কিনে খায়, যাতে তার সঞ্চিত শস্য ব্যয় হয়ে না যায়। পাঠক, আপনি যদি বিভিন্ন অঞ্চল ও এলাকায় এভাবে মানব চরিত্র অনুসন্ধান করেন, মানব চরিত্রের উপর বায়ুর প্রভাবের বিচিত্র অবস্থা দেখতে পাবেন। আল্লাহ্‌ই সর্বস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞাতা।[৯২]

মাসউদী সুদানীদের এ প্রকার লঘুত্ব, আবেগ ও অত্যধিক উল্লাসের কারণ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি প্রায় কিছুই উপস্থিত করতে পারেননি। শুধু জালিনুস (গ্যালেন) ও ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আলকিন্দীর[৯৩] বরাত দিয়ে বলেছেন যে, তার একমাত্র কারণ তাদের মস্তিষ্কের দুর্বলতা এবং এর ফলেই তাদের বুদ্ধির মধ্যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। এ বক্তব্যের কোন ফলশ্রুতি নেই, কোন প্রমাণও নেই। 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন, সরল পথ দেখিয়ে থাকেন'।[৯৪]

---

৯২. কোরান ১৫, ৮৬; ৩৬, ৮১।
৯৩. খ্রি: নবম শতাব্দির বিখ্যাত দার্শনিক।
৯৪. কোরান; ২, ১৪২, ২১৩।

পঞ্চম প্রস্তাবনা

[মানব সভ্যতায় খাদ্যের প্রাচুর্য ও ক্ষুধাজনিত বিভিন্ন অবস্থা এবং মানদেহ ও চরিত্রের উপর তৎসৃষ্ট প্রভাব সম্পর্কে]

জেনে রাখুন যে, এ সকল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে সর্বত্রই খাদ্যের প্রাচুর্য আছে, এমন নয়। এমনকি তাদের অধিবাসীরা সকলেই স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে জীবনযাপন করে না। বরং তাদের কোন কোন অঞ্চলের উদ্ভিজ্জ উপযোগী উর্বরভূমি ও জনবসতির প্রাচুর্যের জন্যই অধিবাসীরা শস্য, মসল্লাদি, গম ও ফলমূলের প্রাচুর্য ভোগ করে থাকে। তাদের মধ্যে এমন উত্তপ্ত ভূমিও আছে যাতে কোন ফসল, ঘাস-পাতা কিছুই জন্মায় না। এ সকল স্থানের অধিবাসীরা খুবই অসচ্ছল জীবনযাপন করে থাকে। যেমন হেজাজ ও দক্ষিণ ইয়ামেনের অধিবাসীরা; যেমন বারবার ও সুদানীদের মধ্যবর্তীস্থলে মাগরিবের প্রান্তর ও মরুভূমিতে বিচরণকারী 'আবৃত' সিনহাজা গোত্রের লোকেরা। তারা শস্য বা মসল্লা কোনোটিই ভোগ করতে পারে না। তাদের পুষ্টি ও আহার্য সকল কিছুই দুগ্ধ ও মাংসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মরুপ্রান্তরচারী আরবদের অবস্থাও অনুরূপ। তারা যদিও পাহাড়ী এলাকা থেকে শস্য ও মসল্লাদি সংগ্রহ করে থাকে, কিন্তু এটাও সময়ে সময়ে এবং ঐ সকল এলাকা রক্ষীদের দৃষ্টির সম্মুখে। তাদের সঙ্গতির অভাবেই তারা যা সংগ্রহ করে, তার পরিমাণ খুবই সামান্য। তদ্বারা তারা স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য সৃষ্টি করা ত দূরের কথা, তাদের প্রয়োজন মিটাতে তারা সমর্থ হয় না। এজন্য পাঠক, আপনি দেখতে পাবেন তারা অনেক অবস্থাতেই শুধু দুধের উপর নির্ভর করে এবং তা তাদের জন্য গমের উত্তম বিকল্প হিসাবে পরিগণিত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও দেখা যায় যে, এ সকল শস্য ও মসল্লাদি বিরহিত প্রান্তরচারীরা পাহাড়ী এলাকার প্রাচুর্য বিলাসীদের অপেক্ষা দেহ ও চরিত্রের দিক থেকে উত্তম অবস্থায় বিরাজ করছে। তাদের গাত্রবর্ণ অধিকতর পরিষ্কার, তাদের দেহ অধিকতর মার্জিত এবং তাদের আকৃতি অধিকতর সুঠাম ও সুন্দর। তাদের চরিত্র অসহিষ্ণুতা থেকে অনেক দূরবর্তী এবং তাদের মেধাজ্ঞানও অনুভূতির ক্ষেত্রে অধিকতর তীক্ষ্ণ। এটা এমন একটি বিষয়, অভিজ্ঞতা তাদের প্রতিটি গোত্রেই এর সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারে। অবশ্য এ সকল বিষয় আরব ও বারবারদের মধ্যে অধিক মাত্রায় পাওয়া যায়। 'আবৃত' যাযাবর ও পাহাড়ীদের মধ্যেও যদি কেউ অনুসন্ধান করে দেখে, এটা পেতে পারে।

এর কারণ, আল্লাহ্ই ভাল জানেন[৯৫] অতিরিক্ত আহার্য ও অতিরিক্ত পচনশীল মিশ্রিত খাদ্যরস দেহের মধ্যে অতিরিক্ত মেদের সৃষ্টি করে। এর ফলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসমঞ্জসরূপে বেড়ে উঠে এবং এর প্রতিক্রিয়ায় মেদবাহুল্যতার ফলে বিবর্ণতা ও গঠনের বিকৃতি দেখা দেয়; যেমন পূর্বে বলেছি। এ অতিরিক্ত খাদ্যরস থেকে উত্থিত দূষিত বায়ু মেধা ও মননের উপর আচ্ছন্নতার সৃষ্টি করে এবং এরই ফলশ্রুতি হিসাবে নির্বুদ্ধিতা উদাসীনতা ও সমভাবাপন্নতা থেকে দূরে সরে যাওয়ার স্বভাব জাগ্রত হয়। এ ক্ষেত্রে প্রান্তর ও শুষ্ক এলাকার প্রাণী, যেমন হরিণ, উটপাখি, বনগরু, জিরাফ বন্যগাধা, গরু প্রভৃতির সাথে পাহাড়ী, সমুদ্র তীরবর্তী ও শ্যামল চারণভূমির অনুরূপ পশুদের তুলনা করা যায়। এর ফলে তাদের মধ্যে চামড়ার সৌন্দর্য, গঠন ও অবয়বের সৌকর্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌসাদৃশ্য এবং অনুভূতির তীব্রতার দিক থেকে প্রচুর পার্থক্য দেখা যাবে। হরিণ ছাগলের ভাই, জিরাফ উটের ভাই এবং গাধা ও গরু অন্য গাধা ও গরুর ভাই। কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে, পাঠক, নিশ্চয়ই তা লক্ষ করেছেন। এর কারণ অন্য কিছুই নয়, পাহাড়ী এলাকার প্রাচুর্য তাদের শরীরে অতিরিক্ত মেদ ও পচনশীল আর্দ্রতার সৃষ্টি করেছে এবং তাদের দেহের উপরিভাগে তারই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। আর ক্ষুধা প্রান্তরের প্রাণীগুলোকে সুঠাম দেহ ও গঠন-সৌকর্য দান করেছেন। মানবগোষ্ঠীর মধ্যেও এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা যায়। বস্তুত আমরা দেখতে পাই যে, শস্য, দুগ্ধ, মসল্লাদি ও ফলমূলের আধিক্যের ফলে খাদ্য প্রাচুর্যের অঞ্চলগুলোর অধিবাসীরা অধিকাংশ স্থলে মেদাশক্তির দুর্বলতা ও দৈহিক গঠনের স্থূলতার দ্বারা পরিচিত হয়ে থাকে। এমনই অবস্থা সেই সকল বারবার গোত্রের, যারা গম ও মসল্লাদির প্রাচুর্যের মধ্যে রয়েছে। তাদে সাথে জীবন-যাপনে অসচ্ছলতার অধিকারী, শুধুমাত্র যব ও 'জুর্রা' ভক্ষণকারী বারবারদের তুলনা করা যায়। যেমন মাসমুদা বারবার গোত্র, 'গেমারা' ও সোসের অধিবাসীরা। আপনি শেষোক্তদের মধ্যে অধিকতর বুদ্ধি ও দৈহিক সৌন্দর্য দেখতে পাবেন। এরূপ মাগরিবের অধিবাসীদের অবস্থা; তারাও মসল্লাদি ও উত্তম গমের প্রাচুর্যের মধ্যে বিরাজমান। তাদের সাথে আন্দালুসবাসীদের তুলনা করা যায়। সেখানে মাখন ত পাওয়াই যায় না, শুধু জুর্রা খেয়ে তারা জীবন ধারণ করে। অথচ আন্দালুসবাসীদের মধ্যেই আপনি বুদ্ধিমত্তার প্রাচুর্য ও দৈহিক গঠনের সৌকর্য অধিকতর দেখতে পাবেন। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তাদের তুলনা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। একই অবস্থা লক্ষ করা যায় মাগরিবের প্রত্যন্ত এলাকাবাসীদের সাথে তার পল্লী ও নগরবাসীদের তুলনার ক্ষেত্রে। পল্লীবাসীরা যদিও তাদের[৯৬] মতই অতিরিক্ত মসল্লা ব্যবহার ও খাদ্যের প্রাচুর্য ভোগ করে তথাপি এটা তারা রন্ধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যান্য বস্তুর সাথে মিশিয়ে মার্জিত করে নেয়। এর ফলে উক্ত খাদ্যের গুরুত্ব কমে যায় ও শক্তি হ্রাস পায়। তাদের সাধারণ খাদ্য হল ভেড়া ও মোরগের মাংস। তারা তাতে স্বাদহীনতার জন্য মসল্লাদির সাথে মাখন বেশি মিশায় না। এ কারণে তাদের খাদ্যদ্রব্যে

৯৫. রোজেনথাল এ স্থলে লিখেছেন—এর কারণ পরীক্ষামূলকভাবে নির্দেশ করা যায় যে—কিন্তু আমরা মূলে এর কোন উৎস খুঁজে পাইনি।

৯৬. এখানে 'তাদের' বলতে প্রত্যন্ত এলাকাবাসীদের বুঝতে হবে।

আর্দ্রতা কম থাকে এবং ঐ সকল উপাদান হ্রাস পায়, যা তাদের দেহে অতিরিক্ত মেদ সৃষ্টি করতে পারত। এ কারণে পল্লীবাসীদের দৈহিক গঠন প্রান্তরবাসী কঠোর জীবন-যাপনকারীদের দেহের তুলনায় ক্ষীণ হয়ে থাকে। এভাবে অনাহারে অভ্যস্ত প্রান্তরবাসীদের দেহে গুরু বা লঘু কোন প্রকার অতিরিক্ত মেদ পাওয়া যায় না।

জেনে রাখুন যে, এরূপ প্রাচুর্যের ফলে দেহ ও তার বিভিন্ন অবস্থার উপর যে প্রভাব বিস্তারিত হয়, ধর্ম ও উপাসনার ক্ষেত্রেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এজন্য আমরা দেখতে পাই, কঠোর জীবন-যাপনের অভ্যস্ত প্রান্তরবাসী কিংবা নগরবাসী, যারা অনাহার ও উপাদেয় ভোজ্যাদি গ্রহণ না করায় অভ্যস্ত, তারাই সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য বিলাসীদের অপেক্ষা ধর্মীয় ব্যাপারে উত্তর ও উপসনাদিতে অধিকতর আগ্রহী হয়ে থাকে। বরং পল্লী ও নগরবাসীদের মধ্যে ধার্মিক লোকের সংখ্যা খুবই অল্প। কারণ অতিরিক্ত মাংস, মসল্লা ও উত্তম গম আহারের ফলে তাদের মধ্যে কাঠিন্য ও উদাসীনতা দেখা দেয়। এজন্যই আহার্যের অনটনে অভ্যস্ত প্রান্তরবাসীদের মধ্যেই বিশিষ্ট উপাসক ও সাধকের সংখ্যা বেশি। অনুরুপভাবে একই নগরীর অধিবাসীদের মধ্যেও সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের তারতম্যের ফলে অবস্থার ইতরবিশেষ ঘটে থাকে। এমনিভাবে দেখতে পাই, প্রান্তর, নগর ও পল্লীর প্রাচুর্য বিলাসী ও সমৃদ্ধিতে মগ্ন লোকেরা যখন দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়, ক্ষুধার জ্বালায় অন্যলোক অপেক্ষা অতিদ্রুত আক্রান্ত ও বিপন্ন হয়ে পড়ে। যেমন মাগরিবের বারবার ফাস ও মিশরের অধিবাসীদের কথা আমরা শুনে থাকি। প্রান্তর ও মরুভূমির অধিবাসী আরবরা এরূপ নয়। খেজুর উৎপাদক দেশের অধিবাসীরা, যাদের প্রধান খাদ্য খেজুর তারাও নয়। বর্তমানকালে আফ্রিকিয়ার অধিবাসী, যাদের প্রধান খাদ্য যব ও জলপাই তেল, তারাও নয়। আন্দালুসের অধিবাসীরাও নয়, যাদের প্রধান খাদ্য 'জুর্রা' ও জলপাই তেল। এদের সম্মুখে যদি দুর্ভিক্ষ ও আকাল উপস্থিত হয়, তা হলেই এরা তাদের মত বিপন্ন হয়ে পড়ে না। ক্ষুধাজনিত মৃত্যু এদের মধ্যে খুব বেশি ঘটে না; বরং খুবই বিরল।

এর কারণ, আল্লাহ্ই ভাল জানেন এ যে, বিশেষ করে প্রাচুর্যে মগ্ন ও মসল্লাদি ঘৃতে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের পাকস্থলী তার স্বাভাবিক পাচকরস অপেক্ষা অধির রসের অধিকারী হয় এমন কি অনেক সময় তা সীমা ছাড়িয়ে যায়। অতঃপর যখন খাদ্যের অভাবে তার অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটে এবং মসল্লাদিও অভ্যস্ত আহার্যের অনটন দেখা দেয়, তখন অতিদ্রুত তাতে শুষ্কতা ও সংকোচন এসে পড়ে। বস্তুত পাকস্থলী অতিশয় দুবর্ল একটি অঙ্গ। এর ফলে তা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং অতিদ্রুত তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু ঘটায়। সুতরাং দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণকারীদের মৃত্যু তাদের অতীতের তৃপ্তিদায়ক অভ্যাসেরই ফল, নবাগত ক্ষুধার প্রতিক্রিয়া নয়। যারা মসল্লাদি ও মাখনের পরিবর্তে দুগ্ধ পানে অভ্যস্ত, তাদের পাকস্থলীর জারকরস বৃদ্ধি না পেয়ে স্বাভাবিক অবস্থাতেই বিরাজ করে। তা স্বাভাবিক যে কোন খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং খাদ্যের পরিবর্তনে তাদের পাকস্থলীতে শুষ্কতা বা অসহিষ্ণুতা দেখা দেয় না। এজন্য তারা প্রাচুর্যবিলাসী ও খাদ্যে অধিক মসল্লা গ্রহণকারীদের অপেক্ষা খুব কম বিপন্ন হয়।

এ সব কিছুর মূল উৎস হল এটা জেনে রাখা যে, খাদ্যদ্রব্য, তার গ্রহণ ও বর্জন সকলই অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি কোন একটি বিশেষ খাদ্য গ্রহণ করে, তা

তার সহ্য হয় এবং তাতে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠে; তার পক্ষে সেই অভ্যাস ত্যাগ বা পরিবর্তন করা রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়—যদি না উক্ত খাদ্য, খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেয়। যেমন বিষ, ক্ষার পদার্থ[৯৭] ও অন্যান্য উত্তেজক দ্রব্য। সুতরাং যার মধ্যে খাদ্যগুণ ও সহজপাচ্যতা পাওয়া যায়, তাই খাদ্য হিসাবে স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়। মানুষ যখন গমের পরিবর্তে দুধ ও সব্জী গ্রহণে উদ্যোগী হয়ে ক্রমশ তাকে অভ্যাসে পরিণত করে, তখন তাই তার আহার্য এবং তাই তাকে গম ও অন্য শস্যের প্রয়োজনীতা থেকে নিঃসন্দেহে মুক্ত করে দেয়। এরূপ অবস্থা হয় যারা ক্ষুধায় ধৈর্য ও আহার্যে অনাসক্তির দ্বারা অভ্যস্ত হয়ে উঠে, তাদেরও; যেমন যোগসাধকদের কথা শোনা যায়। আমরা তাদের ব্যাপারে এমন সব অদ্ভুত কাহিনী শুনে থাকি, অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে তার সত্যতা অস্বীকার করা বিচিত্র নয়।

এ সমুদয়ের একমাত্র কারণ অভ্যাস। মানুষের জৈবিক শক্তি যখন কোন বস্তুকে প্রিয় হিসাবে গ্রহণ করে, তখন তাই তার স্বভাব ও প্রকৃতির অন্তর্গত হয়ে পড়ে। বস্তুত মানব প্রকৃতি একান্তই বহুরূপী। সুতরাং সে যখন ক্রমান্বয়ে সাধনার দ্বারা অনাহারে অভ্যস্থ হয়ে উঠে তখন তাই তার অভ্যাস ও প্রকৃতি হয়ে দাঁড়ায়। চিকিৎসকরা যে ধারণা পোষণ করেন যে, ক্ষুধা মৃত্যুর কারণ ঘটায়, তা একমাত্র হঠাৎ জৈবিক শক্তির উপর অনাহার চাপিয়ে দিলে কিংবা আহার্য সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলে সম্ভব হয়। তখনই পাকস্থলী স্বাভাবিক কার্যকারিতা হারিয়ে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুকে ডেকে আনে। কিন্তু যদি উক্ত ব্যাপারটি ধীরে ধীরে সাধনার দ্বারা অল্প অল্প করে খাদ্য কমিয়ে করা হয়, যেমন সূফি সাধকরা করে থাকেন; তা হলে আর মৃত্যুর ভয় থাকে না। এ পর্যায়ক্রমিক অভ্যাসটি খুবই প্রয়োজনীয়, এমন কি এ প্রকার সাধনা থেকে ফিরতে হলেও এটা করতে হবে। তা না করে যদি হঠাৎ পূর্বের আহারে ফিরে আসে, তা হলেও মৃত্যুর ভয় থাকে। এজন্য পূর্বের আহারে ফিরতে হলেও সাধনার মতই পর্যায়ক্রমে ফেরা দরকার। আমরা এমন ব্যক্তিকেও দেখেছি, যিনি একাদিক্রমে চল্লিশ দিন ও তদপেক্ষা বেশিকাল অনাহারে থেকেছেন। আমাদের উস্তাদগণ সুলতান আবুল হাসানের দরবারে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে 'আলখাজরা' (আলজেসিরাস) দ্বীপ ও 'রান্দা' থেকে আগত দুটি মেয়েলোককে হাজির করা হয়, যারা দুই বছর ধরে সম্পূর্ণ আহার ত্যাগ করে বেঁচে আছে। তাদের এ বিষয়টি প্রচারিত হলে তাদেরকে পরীক্ষা করা হয় এবং উক্ত বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণিত হয়। তারা এভাবে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন-যাপন করে গেছে। আমাদের সমকালীন অনেককে একমাত্র ছাগ দুগ্ধের উপর নির্ভর করতে দেখেছি। তারা দিনের কোন এক সময়ে অথবা ইফতারের সময় তা দোহন করে পান করতেন এবং এতেই তাদের আহার্যের কাজ চলত। তারা এভাবে পনের বছর পর্যন্ত জীবন কাটিয়েছেন এবং অনেকে আরও বেশি কাল। এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, অনাহার অতিরিক্ত আহার অপেক্ষা সর্বদিক থেকেই দেহের জন্য অধিকতর উপযোগী; যদি কোন ব্যক্তি তার অভ্যাস বা খাদ্য কমাতে সমর্থ

৯৭. জোলাপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মূলে 'ইয়াতু' আছে।

হয়। কারণ এর ফলে দেহের সুস্থতা ও বুদ্ধিবৃত্তির সুষ্ঠুতার উপর অনুকূল প্রভাব পড়ে; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের দ্বারা দেহের উপর যে বিচিত্র প্রভাব পড়ে, তদ্বারাও এটা বিবেচনা করা যায়। আমরা দেখেছি যে, যারা বিরাটাকার শক্তিমান পশুর মাংস আহার করে থাকে, তাদের বংশাবলিও তেমনি হয়ে উঠে। নগরবাসী ও প্রান্তরবাসীদের মধ্যে তুলনা করলেও এটা দেখতে পাওয়া যায়। এমনিভাবে যারা উটের মাংস ও দুধ আহার করে, তাদের চরিত্রেও ধৈর্য, স্থৈর্য ও উটের ন্যায় ভার বহনের ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। তাদের পাকস্থলীও উটের পাকস্থলীর ন্যায় সুস্থতা অসুস্থতার অভ্যাস গড়ে তোলে। ফলে দুর্বলতা ও অক্ষমতা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। অন্যদের ন্যায় খাদ্যের অপকারিতা তাদের পাকস্থলীকে দুর্বল করে না। তারা কোন প্রকার মিশ্রণ ছাড়াই জোলাপের জন্য ক্ষার জাতীয় পদার্থ গ্রহণ করতে পারে। যেমন অপক্ব 'হাজ্জাল', 'দেরিয়াস' ও 'কার্বিউন'[৯৮] এগুলোতে তাদের পাকস্থলীর কোন ক্ষতি হয় না। এগুলো যদি কোন নগরবাসী, যার পাকস্থলী সুপাচ্য আহার্য গ্রহণের ফলে কোমল হয়ে গেছে, গ্রহণ করত, তা হলে চক্ষের পলকে তার মৃত্যু ঘটত। কারণ এসবগুলোতে বিষাক্ত পদার্থ বিদ্যমান।

দেহের উপর খাদ্যদ্রব্যের প্রভাব সম্পর্কে আরও একটি উদাহরণ, যা কৃষ্টিবিশারদগণ বর্ণনা করেছেন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা লক্ষ করেছেন, তা এ যে, যদি কোন মুরগিকে উটের নাদ মিশ্রিত রাঁধা শস্য খাওয়ানো যায় এবং উক্ত মুরগির ডিম তাপ দিয়ে বাচ্চা ফুটানো হয়, তা হলে বাচ্চাগুলো যথাসম্ভব বড় হবে। অনেকে মুরগিকে খাওয়ানো ও শস্য রাঁধার ঝামেলা না পোহায়ে যদি তাপ দেয় ডিমের উপর কিছু নাদ ছড়িয়ে রাখে, তা হলেও বাচ্চা বড় আকারের হয়ে থাকে। এ প্রকার আরও উদাহরণ আছে। এ সবের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, দেহের উপর খাদ্যদ্রব্য প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সুতরাং ক্ষুধাও যে দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করে এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা দুটি পরস্পর বিরোধী সত্তা প্রভাব বিস্তার করা ও না করার ক্ষেত্রে একই পন্থা অবলম্বন করে থাকে। কাজেই অনাহার যেমন দূষিত রক্ত ও দেহমনের ক্ষতিকর জৈবিক রস থেকে দেহকে পরিষ্কার রাখে, তেমনি আহার্যও দেহের অস্তিত্ব রক্ষায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আল্লাহ্ই সমগ্র জ্ঞানের আধার।

---

৯৮. বোখারী দ্র:।

ষষ্ঠ প্রস্তাবনা

[স্বাভাবিকভাবে অথবা সাধনার দ্বারা অদৃশ্য জগতকে উপলব্ধিকারী মানুষের প্রকারভেদ এবং তৎপূর্বে আলোচ্য প্রত্যাদেশ ও স্বপ্নদর্শন সম্পর্কে]

জেনে রাখুন যে, পবিত্র আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে অনেককে তাঁর বাণী বহনের মর্যাদা দিয়ে নির্বাচিত করেছেন। তাঁকে জানবার জন্যই তিনি তাঁদেরকে জীবন দিয়েছেন। তাঁর ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে মাধ্যম হিসাবে তাঁদেরকে গড়ে তুলেছেন। তাঁরা মানব জাতির কল্যাণ কিসে, তা জানেন; তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে উৎসাহিত করেন এবং তাঁদেরকে দোজখের অগ্নি থেকে রক্ষা করে থাকেন। এভাবে তাঁরা মানুষকে মুক্তির পথ দেখান। তিনি তাদেরকে যা অর্পণ করেছেন, তন্মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান বিদ্যমান এবং তাঁদের ভাষার মধ্যদিয়ে তিনি অস্বাভাবিক ঘটনাবলি ও এমন এক অদৃশ্য জগতের সংবাদ প্রদান করেছেন, তাঁদের মধ্যস্থতা ব্যতীত মানুষের পক্ষে তৎসম্পর্কীয় জ্ঞানলাভ করার জন্য অন্য কোন পথ নেই। তারা কেবলমাত্র আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁদেরকে প্রদত্ত শিক্ষার মাধ্যমেই তা জানতে পারে। হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, বস্তুত আল্লাহ্ আমাকে যা জানিয়েছেন, তদ্ব্যতীত আমি আর কিছুই জানি না। জেনে রাখুন যে, এ ব্যাপারে তাঁদের প্রদত্ত তথ্যাদি স্বাভাবিকভাবে ও প্রয়োজন অনুসারে সত্য হতে বাধ্য। নবুয়তের তাৎপর্য আলোচনার সময় এটা আপনার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মানবজাতির মধ্যে এ শ্রেণীর লোকের নিদর্শন এ যে, তাঁদের উপর প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হবার সময় তাঁরা উপস্থিত লোকজনের মধ্যেই এক অদৃশ্য ভাবে বিভোর হয়ে পড়েন এবং তাঁদের গলায় এক ধরনের শব্দ হতে থাকে। দৃশ্যত মনে হবে তাঁরা যেন সংজ্ঞাহীন বা মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু বাস্তবে তাঁর কোনটাই নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা তাঁদের যোগ্য উপলব্ধির মাধ্যমে আত্মিক জগতে মগ্ন হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এ উপলব্ধি সাধারণ মানুষের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে। অতঃপর তাঁরা সাধারণ মানুষের উপলব্ধির জগতে ফিরে আসেন। হয় বোধগম্য কোন বাণীর রেশ শুনতে পান অথবা কোন ব্যক্তির আকারে কেউ আল্লাহ্র নিকট থেকে আনীত বাণী তাঁদের নিকট উচ্চারণ করে। এর পর তাঁদের পূর্বাবস্থা কেটে যায় এবং তাঁদের উপর অবতীর্ণ বাণী তাঁরা স্মরণ করতে পারেন। হজরত মুহম্মদ (সঃ)-কে প্রত্যাদেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, কখনও এটা আমার নিকট আসে ঘণ্টাধ্বনির মত এবং এটাই অতিশয় কষ্টদায়ক। অতঃপর তা সরে যায় এবং আমি তার সমুদয় বক্তব্য স্মরণ করতে পারি। কখনও ফেরেশতা মানুষের আকারে এসে আমার নিকট উপস্থিত হয় ও কথা বলে এবং

আমি তার বক্তব্য মনে রাখি।[৯৯] এ অবস্থায় তাঁর উপর যে চাপের সৃষ্টি হয় ও কষ্ট দেখা দেয়, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। একটি হাদিসে আছে, তিনি প্রত্যাদেশ অবতরণের যাতনা সম্পর্কে দুশ্চিন্তা পোষণ করতেন। হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, অত্যন্ত শীতের দিনেও তাঁর উপর প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলে তা সমাপ্তির পর তাঁর কপাল বেয়ে ঘাম পড়তে থাকত।[১০০] আল্লাহ্ বলেন, আমরা তোমার উপর গুরুভার বাণী অর্পণ করব।[১০১] প্রত্যাদেশ অবতরণকালীন এ প্রকার অবস্থার দরুন পৌত্তলিকরা নবীগণকে পাগল বলে দোষারোপ করত এবং তারা বলত, লোকটির কোন সহচর বা জিন অনুগামী আছে। তারা এ সকল অবস্থার বাহ্য দিকটি দেখেই এরূপ বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়েছিল। বস্তুত 'আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই।'[১০২]

নবীদের নিদর্শনাবলির মধ্যে এটাও যে প্রত্যাদেশ আগমনের পূর্বেই তাঁদের মধ্যে সৎচরিত্র, বুদ্ধিমত্তা এবং সর্বপ্রকার দূষণীয় কলুষ থেকে দূরে থাকবার অভ্যাস দেখা যাবে। এটাই পবিত্রতার অর্থ। দূষণীয় কাজ ও ঘৃণ্য ব্যাপার থেকে পবিত্র থাকাই যেন তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি। যেন এসকল কাজ তাঁর প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী। বিশুদ্ধ হাদিসে আছে, বাল্যকালে মুহম্মদ (সঃ) তাঁর চাচা আব্বাসের সাথে কাবাঘর নির্মাণের জন্য স্বীয় পরিহিত জামায় পাথর বহন করেছিলেন। এর ফলে তাঁর গুপ্তস্থান অনাবৃত হয়ে যায় এবং তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন। তাঁর গুপ্তস্থান আবৃত না করা পর্যন্ত তাঁর মূর্ছা ভঙ্গ হয়নি। তাঁকে এক বিবাহ মজলিসে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেখানে প্রচুর আমোদ-প্রমোদ ছিল। তিনি এমন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন যে, সূর্য না উঠা পর্যন্ত তাঁর ঘুম ভাঙ্গল না। তিনি উপস্থিত লোকদের কোন অবস্থাই জানতে পারলেন না। বরং বলা যায়, আল্লাহ্ স্বয়ং তাঁকে এ সকল বিষয় থেকে মুক্ত রেখেছেন। এমন কি তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি গুণেই তিনি অপছন্দনীয় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকতেন। হজরত মুহম্মদ (সঃ) কখনও পিঁয়াজ-রসুন খেতেন না। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, আমি এমন একজনের সাথে সংগোপনে কথা বলি, যার সাথে তোমরা বল না।[১০৩]

পাঠক, লক্ষ করুন, হজরত মুহম্মদ (সঃ) যখন ওহী আসার প্রথম অভিজ্ঞতা হজরত খাদিজা (রাঃ)-র নিকট বর্ণনা করলেন, তখন তিনি পরীক্ষা করবার জন্যই বলেছিলেন, আমাকে আপনার কাপড়ের নিচে স্থান দিন। নবী তা করবার ফলে তা দূরীভূত হল। তখন খাদিজা (রাঃ) বললেন, তা ফেরেশতাই ছিল—শয়তান নয়। অর্থাৎ তা নারীর নিকটে আসে না। তিনি নবীকে আরও জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ওহী অবতরণের সময় তিনি কোন্ রঙের কাপর পড়তে ভালবাসেন। তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন, সাদা ও সবুজ। এটা শুনে খাদিজা (রাঃ) বললেন, তা ফেরেশতাই। অর্থাৎ সাদা ও সবুজ রং কল্যাণ ও ফেরেশতার নিদর্শন এবং কাল অকল্যাণ ও শয়তানের। এ প্রকার আরও উদাহরণ বিদ্যমান।

---

৯৯. বোখারী দ্র:।
১০০. বোখারী দ্র:। ১০১, কোরান ৭৩, ৫।
১০১. কোরান ১৩, ৩৩; ৩৯, ২৩, ৩৬; ৪০, ৩৩।
১০২. বোখারী দ্র:।
১০৩. বোখারী দ্র:।

তাঁদের নিদর্শনাবলির মধ্যে ধর্ম ও উপাসনা—প্রার্থনা, দান ও পবিত্রতার দিকে আহ্বান করাকে ধরা হয়। হজরত খাদিজা (রাঃ) হজর মুহম্মদ (সঃ)-এর সত্যতা সম্পর্কে এর দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করেছিলেন। এরূপ হজরত আবু বকরও (রাঃ)। তাঁরা এ ব্যাপারে তাঁর অবস্থা ও চরিত্রের বাইরে কোন প্রমাণের মুখাপেক্ষী হননি। বিশুদ্ধ হাদিসে আছে, হিরাক্লিয়াস যখন ইসলাম গ্রহণের আহ্বান সংবলিত নবী (সঃ)-এর পত্র পেলেন, তখন তিনি তাঁর এলাকায় অবস্থানরত কোরায়েশ বংশীয়দের ডেকে পাঠালেন, যাতে নবী সম্পর্কে সংবাদ নিতে পরেন। সেখানে আবু সুফিয়ানও ছিলেন। হিরাক্লিয়াস যে সব কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তার মধ্যে ছিল, তোমাদেরকে কী করতে বলেন? আবু সুফিয়ান উত্তরে বললেন, নামাজ, জাকাত, আত্মীয়তা ও পবিত্রতা পালন করতে আদেশ দেন। তিনি প্রশ্নের উত্তরে আরও অনেক কিছু বলেছিলেন। পরে হিরাক্লিয়াস বললেন, তুমি যা বলছ, তা যদি সত্য হয়, তা হলে তিনি আমার এ পদদ্বয়ের নিচের ভূমি পর্যন্ত অধিকার করে নিবেন।[১০৪] যে পবিত্রতার দিকে হিরাক্লিয়াস ইঙ্গিত করেছিলেন, তাই পাপ শূন্যতা। পাঠক লক্ষ করুন, কী ভাবে হিরাক্লিয়াস এবং ধর্ম ও উপাসনার দিকে তাঁর আহ্বান থেকে তাঁর নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন! তিনি কোন অলৌকিক ঘটনার প্রয়োজন অনুভব করেননি। সুতরাং এর দ্বারা এগুলো যে নুবয়তের নিদর্শন, তা বোঝা যায়।

তাঁদের নিদর্শনাবলির মধ্যে এটাও একটি যে, তাঁরা তাঁদের জাতির মধ্যে মর্যাদার অধিকারী হন। বিশুদ্ধ হাদিসে আছে, আল্লাহ্ প্রত্যেক জাতির গণ্যমান্য লোকদের মধ্য থেকে নবী প্রেরণ করেছেন। অন্য একটি বর্ণনায়—ধনসম্পদের অধিকারীদের মধ্য থেকে। এটা বিশুদ্ধ দুটি হাদিস সংকলনের মধ্যে 'হাকেম'[১০৫] কর্তৃক সংযোজিত হয়েছে। যেমন বিশুদ্ধ হাদিসের অন্তর্গত আবু সুফিয়ানের প্রতি হিরাক্লিয়াসের প্রশ্ন, তোমাদের মধ্যে তাঁর অবস্থা কী? আবু সুফিয়ান উত্তর দিলেন, তিনি আমাদের মধ্যে মর্যাদাশালী। হিরাক্লিয়াস এর উত্তরে মন্তব্য করলেন, নবীগণ জাতির মর্যাদাবান ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই প্রেরিত হয়ে থাকেন। এর অর্থ তাঁর জন্য অনুসারী ও মর্যাদা থাকবে, যা তাঁকে ধর্মবিরোধীদের অপকার থেকে রক্ষা করবে। যাতে তাঁর দ্বারা প্রেরিতত্বের কাজ সম্পন্ন হয় এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্য অনুসারে ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায় গঠনের দায়িত্ব সম্পূর্ণ হতে পারে।

তাঁদের নিদর্শনাবলির মধ্যে তাঁদের সত্যতা নির্দেশকারী অস্বাভাবিক ঘটনাবলিও রয়েছে। এ সকল কাজ সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে বলেই এদেরকে অলৌকিক বলা হয়েছে। এটা মানুষের কার্যক্ষমতার পরিধির মধ্যে নয় এবং তাদের আয়ত্তের বাইরেই তা সংঘটিত হয়ে থাকে। এ সকল ঘটনা সংঘটন ও তা দ্বারা নবীদের সত্যতা প্রমাণের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে নানাবিধ মতানৈক্য বিদ্যমান। কালামশাস্ত্রবিদগণ[১০৬]

---

১০৪. আবু আব্দুল্লাহ্ মুহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ আলহাকেম আননিসাবুরী; জীবনকাল ৩২১-৪০৫ (৯৩৩-১০১৪ খ্রি:) হি:।

১০৫. বোখারী দ্রষ্টব্য।

১০৬. 'কালাম' অর্থে ইসলামী ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তর্গত সৃষ্টিতত্ত্ব ও অদৃশ্য বিষয়াদির তাত্ত্বিক আলোচনা।

'স্বেচ্ছামূলক কর্তৃত্বে'র ভিত্তিতে বলে থাকেন যে, এগুলো আল্লাহ্‌র মহিমা দ্বারা সংঘটিত হয়, নবীর কর্মের দ্বারা নয়। মুতাজিলাদের নিকট যদিও যাবতীয় ক্রিয়া বান্দার নিজস্ব, তবু অলৌকিক কার্যাদি তাদের ক্রিয়াকলাপের সমগোত্রীয় নয়। সকল কালামশাস্ত্রবিদের নিকট নবী একমাত্র ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারাই তাঁর সত্যতা প্রমাণ করতে সক্ষম এবং তাও আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়। তিনি এর দ্বারা কোন বিষয়কে সংঘটিতব্য বলে তাঁর দাবির সত্যতা প্রমাণ করতে পারেন। যখন সেই বিষয়টি সংঘটিত হয়, তখন তাই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রকাশ্য ঘোষণার মত হয়ে দাঁড়ায় যে, নবী সত্যবাদী। এ সময়ে তার দ্বারা সত্যতা প্রমাণই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। বস্তুত অলৌকিক বলতে সর্বপ্রকার অস্বাভাবিক ঘটনা ও ভবিষ্যদ্বাণীকে বুঝিয়ে থাকে। এ জন্যই ভবিষ্যদ্বাণী তারই একটি অংশ। কালামশাস্ত্রবিদগণ যে তাকে 'স্বগুণে বিভূষিত' বলে থাকেন, তার অর্থ একই। কারণ তাকেই তাঁরা সত্তার অন্তর্গত বলে মনে করেন।

ভবিষ্যদ্বাণী অলৌকিকত্ব এবং বিভূতি ও ইন্দ্রজালের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে থাকে। কারণ শেষোক্ত দুটিতে সত্যতা প্রমাণের কোন ভূমিকা নেই। সুতরাং ভবিষ্যদ্বাণী কোন ধারাবাহিক কর্ম নয়, তা হঠাৎ সংঘটিত হয়ে থাকে। যাদের নিকট বিভূতির সম্ভাব্যতা স্বীকৃত যদি তাদের মাঝে কেউ বিভূতির সাথে ভবিষ্যদ্বাণীকে সংযুক্ত করেন এবং তা বাস্তবায়িত হয়, তা হলে তা শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাধুতাই প্রমাণ করবে আর সাধু ব্যক্তি মাত্রেই নবী নন। এ জন্যই উস্তাদ আবু ইসহাক[১০৭] ও অন্যান্য সুধী বিভূতি হিসাবে অস্বাভাবিক ঘটনার কথা অস্বীকার করেছেন। কারণ তাঁদের মতে যে কোন সাধু ব্যক্তির ভবিষ্যদ্বাণী সফল হলে তাতে নবুয়ত দাবির প্রতারণা লুক্কায়িত থাকতে পারে। কিন্তু আমরা পূর্বে দেখিয়েছি যে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ ওলীর ভবিষ্যদ্বাণী ও নবীর ভবিষ্যদ্বাণী একই উদ্দেশ্যে ও বিষয়ে নিয়োজিত হয় না। কাজেই বিভ্রান্তির কোন কারণ নেই। তদুপরি উস্তাদের বক্তব্য খুব স্পষ্ট নয়। অনেক সময় এটা দ্বারা ওলীদের পক্ষে, নবীদের জন্য নির্ধারিত অস্বাভাবিক ঘটনা সম্ভব নয় বলে বুঝায়। কারণ তাদের উভয় সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ বিশেষ অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ বিদ্যমান। কিন্তু মুতাজিলাদের নিকট বিভূতি অস্বীকৃতির কারণ ভিন্ন। তাঁদের মতে এটা কোন অবস্থাতেই মানুষের কর্ম নয়। কেননা মানুষের কর্ম স্বভাববদ্ধ। অতএব উভয় বক্তব্যের উদ্দেশ্য একই।

কোন মিথ্যাবাদীর দ্বারা অলৌকিকত্বের প্রতারণা সম্পাদন অসম্ভব। 'আশআরী[১০৮]গণের নিকট এর কারণ এ যে অলৌকিকত্বের মূল লক্ষ্য হল সত্যতা নির্ধারণ ও পথ প্রদর্শন। যদি এর বিপরীত কিছু হয়, তা হলে প্রমাণ সন্দেহে, পথ প্রদর্শন পথভ্রষ্টতায় এবং সত্যতা মিথ্যাচারে পরিণত হবে। এর তাৎপর্য বদলে গিয়ে এর যথার্থ লক্ষ্যই ব্যাহত হয়ে পড়বে। অন্যদিকে এরূপ অসম্ভব সম্ভব হবার কথা হয়ত ধারণা করা যায়; কিন্তু বাস্তবে তা কখনও হয় না। এ ক্ষেত্রে মুতাজিলাদের মত হল এ

---

১০৭. ইব্রাহিম ইবনে মুহম্মদ আল-ইসফারাইনী; মৃত্যু ৪১৮ (১০২৭ খ্রি:) হি:।

১০৮. কালামশাস্ত্রবিদদের একটি শাখা, এরা 'স্বেচ্ছামূলক কর্তৃত্বে' বিশ্বাসী। বান্দা ইচ্ছা করে আল্লাহ তা পূরণ করেন।

যে, যেহেতু প্রমাণ সন্দেহে ও পথপ্রদর্শন পথভ্রষ্টতায় পরিবর্তিত হওয়া গর্হিত কাজ, সুতরাং তা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে হওয়া সম্ভব নয়।

দার্শনিকদের নিকট অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ নবীর নিজেরই, যদিও তার সংঘটন তাঁর ক্ষমতার বাইরে হয়ে থাকে। সত্তাগত সম্ভাব্যতার দিক থেকেই তাঁরা এ মত পোষণ করেন। ঘটনাবলি পরস্পর কার্যকারণ সাপেক্ষে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাতে আগত পরিবর্তমান শর্তাবলি সর্বদাই সর্বপ্রকার ক্রিয়াকে শেষ পর্যায়ে অবশ্যম্ভাবী সত্তাগত কর্তৃত্বের সাথে যুক্ত করে, স্বেচ্ছামূলক কর্তৃত্বের সাথে নয়। তাঁদের নিকট নবুয়তের অস্তিত্বে কতিপয় সত্তাগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তন্মধ্যে এরূপ অস্বাভাবিক কার্যাবলি সংঘটিত হওয়া এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের তৎপ্রতি অনুগত হওয়া। তাঁদের নিকট নবীর পক্ষে সৃষ্ট জগতের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব। আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতার বলেই তিনি তাতে বিশেষ দৃষ্টিদান ও তাকে কেন্দ্রীভূতকরণের শক্তি অর্জন করে থাকেন। তাঁদের মতে নবী ভবিষ্যদ্বাণী প্রয়োগ করেন বা না করেন, অস্বাভাবিক ঘটনা তাঁর জন্য সংঘটিত হয়েই থাকে। তা তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে। কারণ নবী প্রকৃতির উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তারের দ্বারা নবুয়তের সত্তাগত বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করে তোলেন। কাজেই তা প্রকাশ্য ঘোষণার আকারে তাঁর সত্যতা প্রমাণে উপস্থিত না হলেও কিছু যায়-আসে না। এ জন্যই দার্শনিকের নিকট কালামশাস্ত্রবিদদের ন্যায় অলৌকিকত্বের প্রমাণ অকাট্য নয়। ভবিষ্যদ্বাণীও তাদের নিকট অলৌকিকত্বের অংশ নয় এবং তার ও বিভূতি ইন্দ্রজাল প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্যও যথার্থ নয়। বরং তাঁরা মনে করেন যে, নবী যেহেতু সত্তাগতভাবে কাজ করেন ও মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকেন; সুতরাং তাঁর কার্যের দ্বারা মন্দের উৎকর্ষ সাধন হতে পারে না। কিন্তু ইন্দ্রজাল এর বিপরীত, ঐন্দ্রজালিকের সমস্ত কর্মই মন্দ অথবা মন্দের উদ্দেশ্যে পরিচালিত। তাঁদের মতে বিভূতির সাথে নবুয়তের পার্থক্য এ যে, নবীর অস্বাভাবিক ঘটনাবলি নির্ধারিত, যেমন আকাশে আরোহণ নিরেট দেহাদিতে অনুপ্রবেশ, মৃতের জীবন দান, ফেরেশতাদের সাথে কথোপকথন বায়ুতে ভাসমান হওয়া। ওলীদের কাজ ভিন্ন প্রকার, যেমন অল্পকে অধিক করা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন কথা বলা এবং এ ধরনের এমন অনেক কাজ, যাতে নবীর সমান প্রকৃতিকে বাধ্য করার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ নেই। নবী তাঁর সমুদয় অস্বাভাবিক ঘটনাই সংঘটিত করতে পারেন। কিন্তু ওলীর পক্ষে নবীর জন্য নির্ধারিত কোন ঘটনা ঘটান সম্ভব নয়। সুফীদের তত্ত্ব গ্রন্থাদিতে এ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান এবং অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ তথ্যাদি রয়েছে।

এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আরও জেনে রাখা প্রয়োজন যে, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, উন্নত ও সুস্পষ্ট অলৌকিক হল আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ কোরান শরীফ। অধিকাংশ অস্বাভাবিক ঘটনাই ওহী অপেক্ষা ব্যতিক্রমধর্মী হয়ে থাকে। কারণ নবী ওহীই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে লাভ করেন এবং অলৌকিকত্ব এর সত্যতা প্রমাণের জন্য এসে উপস্থিত হয়। কোরান এ ওহীই সমষ্টি এক দাবি এবং নিজেই এক অস্বাভাবিক অলৌকিক বিষয়। তার জন্য কোন ব্যতিক্রমধর্মী, কোন ওহীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত অলৌকিক প্রমাণের প্রয়োজন নেই। সে নিজেই নিজের সাক্ষী। প্রমাণ ও

প্রামাণ্য উভয়ের একত্র হওয়ার ফলে তার আবেদন অত্যন্ত সুস্পষ্ট। হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর নিম্নলিখিত বাণীর অর্থও এটাই। তিনি বলেছেন, আল্লাহ প্রত্যেক নবীকেই নিদর্শনাবলি দিয়েছেন, যদ্বারা মানুষ তাদেরকে বিশ্বাস করেছে। কিন্তু আমি শুধু ওহীই লাভ করেছি। সুতরাং আমি আশা করি, কিয়ামতের দিন আমার অনুসারীর সংখ্যা তাঁদের অপেক্ষা অনেক বেশি হবে।[১০৯] এর দ্বারা তিনি এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন যে, যখন অলৌকিকত্ব সুস্পষ্টতা ও আবেদন সৃষ্টির ক্ষেত্রে ওহীর ন্যায় প্রকাশ্য বিষয়ের উপর স্থাপিত হয়, তখন তা অধিকতর সত্য বলে প্রতীতি জন্মে এবং এরই ফলশ্রুতি হিসাবে সত্য স্বীকারকারী বিশ্বাসী তথা অনুসারী ও সম্প্রদায় বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।[১১০]

---

১০৯. বোখারী দ্র:।

১১০. এর পর রোজেনথাল কয়েকটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছেন। এটা তিনি 'রাগিবপাশা' নামাঙ্কিত একটি পাণ্ডুলিপিতে পেয়েছেন। আমরা আমাদের ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিগুলোর সংস্করণে এটা পাইনি। তথাপি পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল নিবারণার্থে উক্ত অনুচ্ছেদগুলোর অনুবাদ নিম্নে সন্নিবেশিত করলাম।

আল্লাহ্‌র জন্যই সমস্ত প্রশংসা, তিনিই উত্তম জ্ঞাতা।

এ সকল বর্ণনা হতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সকল অবতীর্ণ গ্রন্থের মধ্যে কোরানই একমাত্র গ্রন্থ যা আমাদের নবী ভাষা ও বাক্যাবলিসহ সরাসরি প্রাপ্ত হয়েছেন এং ঐ অবস্থাতেই তা বিদ্যমান। এদিক থেকে এটা তৌরাত, ইঞ্জিল ও অন্যান্য অবতীর্ণ গ্রন্থ অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক। নবীগণ উক্ত গ্রন্থাদিকে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির সময় ভাবের আকারে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর মানবিক উপলব্ধির জগতে প্রত্যাবর্তন করে তাঁরা উক্ত ভাবকে নিজেদের সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থে অননুকরণীয়তার ঐশ্বর্য নেই। এটা শুধু কোরানেই আছে। অন্যান্য নবী যেভাবে প্রত্যাদেশ লাভ করেছেন, আমাদের নবীও অনুরূপভাবে বহু ভাববস্তু লাভ করেছেন, যা পরে তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হতে প্রাপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন এবং হাদিসের আকারে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু কোরান তিনি সরাসরি তার বাক্‌বিন্যাসসহ প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর এই প্রাপ্তির প্রমাণ রয়েছে আল্লাহ্‌র বাণীতে। তিনি বলেছেন, তা দ্রুত আয়ত্ত করবার জন্য তোমার জিহ্বাকে অতিরিক্ত সঞ্চালন করো না; কেননা আমরাই একে একত্র করব ও পাঠ করব।

এই শ্লোক অবতীর্ণ হবার উপলক্ষ এই যে, হজরত মুহাম্মদ (সঃ) আয়াতগুলো দ্রুত আয়ত্ত করবার জন্য চেষ্টা করছিলেন, যাতে তা যে ধরনের বর্ণনাসহ অবতীর্ণ হয়েছিল, তাই তাঁর স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারেন। কারণ তাঁর ভয় হচ্ছিল যে, তিনি এটা ভুলে যাবেন। আল্লাহ্ তাঁকে অভয় দিয়ে তা স্বয়ং সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, অতঃপর তা আমরা পুনরায় বর্ণনা করব এবং তা সংরক্ষণ করব। এ সংরক্ষণের ব্যাপারটি কোরানের একটি বৈশিষ্ট্য। এর অর্থ, সাধারণ মানুষ যা মনে করে তা হতে অনেক দূরে অবস্থিত।

অনেক আয়াতেই এটা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ ভাষাসহ সরাসরি এ কোরাণ অবতীর্ণ করেছেন। এর প্রতিটি অধ্যায়ই অননুকরণীয়। আমাদের নবী কোরাণ অপেক্ষা বড় অন্য কোন অলৌকিক বিষয় লাভ করেননি এবং বস্তুত এর ফলে তিনি সমগ্র আরবকে এক সূত্রে গ্রন্থিত করতে পেরেছিলেন।

'তুমি যদি সমগ্র জগতের ধন-সম্পদ ব্যয় করতে, তথাপি তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে পারতে না, বরং আল্লাহ্‌ই তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেছেন।'

এটা জেনে রাখা দরকার, এটা ভেবে দেখা প্রয়োজন। কেবল তা হলেই এটা আমাদের বর্ণনা অনুসারে সত্য বলে মনে হবে। এ সঙ্গে যে-কোন লোকের পক্ষে এটাও ভেবে দেখা দরকার যে, আমাদের নবী হজরত মুহম্মদ (সঃ) কোন্ গুণে অন্য সকল নবী হতে শ্রেষ্ঠ এবং বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

নবুয়তের তাৎপর্য ব্যাখ্যা

[আমরা এখন বিশেষজ্ঞদের ধারা অনুসরণ করে নবুয়তের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করব। অতঃপর ইন্দ্রজাল ও স্বপ্নদর্শনের তাৎপর্য এবং এর পর তত্ত্বজ্ঞানীদের অবস্থা ও অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভের বিভিন্ন মাধ্যম বর্ণনা করব]

জেনে রাখুন, আল্লাহ্ আমাদিগকে এবং আপনাকেও সৎপথ প্রদর্শন করুন—আমরা এ পৃথিবী এবং তন্মধ্যস্থ সমগ্র সৃষ্টিকে একটি পর্যায়ক্রমিক ধারায় ও সুনিবদ্ধ গ্রন্থনায় দেখতে পাই। এর কার্যকারণ পরস্পর সুগ্রথিত, এর সৃজনশীলতা পরস্পর সুবিন্যস্ত। এর বস্তু নিয়ে একে অপরের মধ্যে পরিবর্তিত হচ্ছে—এর এ রহস্যলীলার বুঝি অন্ত নেই এবং এর গন্তব্যেরও বুঝি শেষ নেই! এ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগৎ নিয়েই আরম্ভ করছে এবং সর্বপ্রথম দৃশ্যমান উপাদান; তা কীভাবেই না ক্ষিতি থেকে অপে, অপ্ থেকে মরুতে, মরুৎ থেকে তেজে পরস্পর সন্নিবদ্ধ হয়ে ঊর্ধ্বে উত্থিত হচ্ছে। এদের প্রতিটি ঊর্ধ্বে বা অধে তার সন্নিহিত পরবর্তীটির মধ্যে পরিবর্তিত হবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে এবং কখনও বা পরিবর্তিতও হয়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে উত্থীয়মানটি পূর্ববর্তীটি অপেক্ষা সূক্ষ্মতর হয়ে ব্যোম পর্যন্ত পৌঁছেছে। তা সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম এবং স্তর পরম্পরায় সন্নিবদ্ধ হয়ে এমন এক অবস্থায় বিরাজ করছে, ইন্দ্রিয়ের পক্ষে যার গতি ব্যতীত অন্যকিছু উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এ গতির সাহায্যেই বহুলোক তার পরিধি ও অবস্থান অবগত হয়ে থাকে। এমনকি তার পরবর্তী সত্তাসমূহের অস্তিত্ব ও উক্ত গতির উপর তাদের প্রভাব দ্বারা জানতে পারা যায়।

অতঃপর সৃষ্টি জগতের দিকে লক্ষ করুন, কীভাবে খনিজ পদার্থ থেকে আরম্ভ করে এক অপূর্ব ধারাবাহিকতায় উদ্ভিদ ও প্রাণী পর্যন্ত সুবিন্যস্ত রয়েছে। খনিজ পদার্থের শেষ দিক উদ্ভিদের প্রথম দিকের সাথে সংযুক্ত, যেমন ঔষধি ও বীজহীন গুল্ম; উদ্ভিদের শেষ দিক, যেমন খেজুর গাছ ও আঙুর লতা; প্রাণীর প্রথম দিকের সাথে সংযুক্ত, যেমন শামুক ও ঝিনুক—এদের কেবল স্পর্শশক্তিই বিদ্যমান। এ সৃষ্টি জগতের পরস্পর সংযুক্তির অর্থ হল তাদের যে কোন একটির শেষ দিক পরবর্তীটির প্রথম দিকে পরিবর্তিত হবার জন্য অদ্ভুতভাবে উন্মুখ হয়ে রয়েছে। অতঃপর, প্রাণিজগত বিস্তৃতিলাভ করে বহু শাখায় বিভক্ত হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমিক সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে মনন ও দর্শনের অধিকারী মানুষে এসে উপনীত হয়েছে। মানুষের এ পর্যায় সেই বানর জগত[১১১] থেকে উন্নীত

১১১. আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে এ স্থলে 'আলমুল কুদরত' বা 'মহিমা জগত' লিখিত রয়েছে। অথচ পাদটীকায় শব্দটি যে, 'কুদরত' নয় বরং 'কেরাদত' অন্যান্য সংস্করণে তা বিদ্যমান, তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রোজেনথালের অনুবাদেও এর সমর্থন বিদ্যমান। অন্যদিকে কেরাদত বা

হয়েছে, যে জগতে অনুভূতি ও উপলব্ধি একত্র হয়েছিল কিন্তু বাস্তব, মনন ও দর্শনে পৌঁছতে পারেনি। এর পর মানুষের প্রথম দিকের আরম্ভ এবং এটাই আমাদের অভিজ্ঞতার শেষ পর্যায়।

অতঃপর আমরা এ বহুধাবিভক্ত জগতের উপর নানাবিধ প্রভাব দেখতে পাচ্ছি। ইন্দ্রিয়ানুভূতির জগতে ব্যোম ও উপাদানের গতির প্রভাব বিদ্যমান এবং সৃজনশীল জগতে বৃদ্ধির ও উপলব্ধির গতির প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এ সবগুলোই সাক্ষ্য দিচ্ছে, যে দেহাদির উপর প্রভাবশীল একটি ভিন্ন শক্তির অস্তিত্ব বিদ্যমান, তাই আত্মিক শক্তি। এটা সৃষ্ট বস্তুপুঞ্জের পরস্পর সংযুক্তির অস্তিত্বের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এটাই উপলব্ধি ও গতির অধিকারী জীবাত্মা। সুতরাং এর উপরে অন্য একটি শক্তির অস্তিত্বের প্রয়োজন, যা তাকে গতি ও উপলব্ধি প্রদান করে থাকে এবং তার সাথে সংযুক্তও রয়েছে। এ শক্তির সত্তা শুধুমাত্র উপলব্ধি ও মনন। তাই ফেরেশতা জগৎ। সুতরাং জীবাত্মার জন্য এটা অবশ্যম্ভাবী যে, সে মানবীয় সত্তা থেকে ফেরেশতীয় সত্তায় রূপান্তরিত হবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে। যাতে কোন সময়ে একটি বিশেষ মুহূর্তে সে কার্যত ফেরেশতীয় সত্তায় পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। তা কার্যত তার নিজ আত্মিক সত্তার পরিপূর্ণতার পরেই সম্ভব, যেমন পরে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করব। এখন সে তার পরবর্তী দিকের সাথে সংযুক্ত থাকবে, যেমন বস্তুজগতের ধারাবহিকতায় আমরা বর্ণনা করেছি। তা ঊর্ধ্ব ও অধঃ দুই দিক থেকেই সংযুক্তি লাভ করতে পারে। তা অধের দিকে দেহের সাথে সংযুক্ত এবং এর মাধ্যমে সে ইন্দ্রিয়ানুভূতির এমন একটি পর্যায় লাভ করেছে যা কার্যত তাকে মনন শক্তির অধিকারী করছে। অন্যদিকে সে ঊর্ধ্বের দিক থেকে ফেরেশতীয় দিকের সাথে সংযুক্ত এবং তার দ্বারা সে জ্ঞান অর্জন ও অদৃশ্য উপলব্ধির পর্যায় লাভ করছে। বস্তুত এ ফেরেশতীয় মননের মধ্যে পরিবর্তমান জগতের সমুদয় কিছু কালগত পরিধি ব্যতীতই বর্তমান। এটাই আমাদের পূর্ব বর্ণিত সত্তাগত সংযুক্তির মাধ্যমে অস্তিত্বের সুদৃঢ় ধারাবাহিকতা, যা তৎসৃষ্ট শক্তিসমূহকেও পরস্পর গ্রথিত করছে।

অতঃপর, মানবীয় জীবাত্মা চর্মচক্ষে দৃশ্যমান নয়, কিন্তু তার প্রভাব দেহের উপর আমরা দেখতে পাই। তা যেন তার একীভূত ও বিক্ষিপ্ত সমুদয় অংশসহ জীবাত্মা ও তার শক্তিসমূহের অন্তস্বরূপ। তার মধ্যে কতকাংশ কর্তৃবাচক, যেমন হাতের ধরা, পায়ের চলা, জিহ্বার বলা এবং প্রতিরোধে সমগ্র দেহের গতি চঞ্চল হয়ে উঠা। এর কতকাংশ উপলব্ধিকারক, যদিও উপলব্ধির এ শক্তিগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে তার ঊর্ধ্বস্থিত শক্তি ও মননশীল শক্তি, যাকে যুক্তিবাদী শক্তি বলা হয়, তার দিকে উত্থিত হচ্ছে, তথাপি প্রকাশ ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমাদির সাহায্যেই তা উপলব্ধি করে থাকে। যেমন কর্ণ, চক্ষু এবং অন্য সমুদয় ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি অভ্যন্তরীণ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এর প্রথম স্তর মিশ্র অনুভূতি। তা এমন একটি শক্তি, যা অনুভূতি বিষয়াদিকে দর্শন, শ্রবণ স্পর্শন ইত্যাদির সাহায্যে একক অবস্থায় সংগ্রহ করে এবং এর ফলে প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে পৃথক

বানর না হলে ইবনে খলদুনের সমুদয় বক্তব্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। এজন্য আমরা 'বানর জগতের' পাঠ গ্রহণ করলাম। ৫৩৩ পৃষ্ঠার ১৫২ নং টীকা দ্র:।

হয়ে দাঁড়ায়। কারণ অনুভূত বিষয়াদি একই সময়ে তার উপর চেপে বসে না। ফলে এ মিশ্রশক্তি অনুভূতিকে ধারণায় পরিণত করে। এ ধারণা এমন এক শক্তি, যা অনুভূত বিষয়টিকে তার বাহ্যিক উপাদানের বাইরে সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায় মূর্ত করে তোলে। উক্ত দুটি শক্তি মস্তিষ্কের প্রথমভাগে তাদের তৎপরতা চালিয়ে থাকে। এর প্রথমটির জন্য সম্মুখ ভাগ ও দ্বিতীয়টির জন্য পশ্চাৎভাগ নির্ধারিত। অতঃপর, ধারণা-কল্পনা ও স্মৃতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কল্পনা শক্তি ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাৎপর্যাদি উপলব্ধি করে, যেমন জায়েদের শত্রুতা উমরের সত্যবাদিতা, পিতার স্নেহ, নেকড়ের ভয় ইত্যাদি। স্মৃতিশক্তি ধারণার অন্তর্গত ও ধারণাতীত সমুদয় উপলব্ধ বিষয়কে সংরক্ষণ করে। তা যেন ভাণ্ডারের মত তৎসমুদয়কে গচ্ছিত রাখে এবং প্রয়োজনের সময় ফিরিয়ে দেয়। এ দুটি শক্তি তাদের অস্ত্র হিসাবে মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগকে ব্যবহার করে। প্রথমটির জন্য সম্মুখভাগ এবং দ্বিতীয়টির জন্য তার পশ্চাৎভাগ নির্ধারিত। অতঃপর এ সমুদয় শক্তিই মনন শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং তার অস্ত্র হল মস্তিষ্কের মধ্য ভাগ। এটা এমনই একটি শক্তি, যার সাহায্যে পর্যবেক্ষণ ও চিন্তনে গতি সঞ্চারিত হয় এবং এর দ্বারা জীবাত্মা সদা গতিময় হয়ে উঠে। কেননা জীবাত্মা সর্বদাই এ মানবীয় শক্তি ও যোগ্যতার উপলব্ধি থেকে মুক্তির জন্য সচেষ্ট রয়েছে এবং সেই জন্য সে তার ক্রিয়ার মধ্যে সেই ঊর্ধ্ব আত্মিক স্তরের সাথে সাদৃশ্য রক্ষা করে চলে। এর ফলে সে আত্মিক পর্যায়াদির প্রথম দিকে উপস্থিত হয়ে দৈহিক ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যম ব্যতীতই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। সে অনবরত সেই দিকেই গতিময় ও সেই অভিমুখেই স্পন্দমান থাকে। কখনও সে সম্পূর্ণভাবে তার মানবীয় গণ্ডি ও তার আত্মিক পরিধি অতিক্রম করে ঊর্ধ্ব স্তরের ফেরেশতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এ অবস্থান্তরের জন্য তার কোন বাহ্যিক মাধ্যমের সহায়তার প্রয়োজন হয় না, বরং আল্লাহ্ তাঁর প্রকৃতি ও প্রথম স্বভাবে যে গতির সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তারই আকর্ষণে সে অগ্রসর হয়ে যেতে পারে।

মানবীয় জীবাত্মার প্রকারভেদ

মানবীয় জীবাত্মা তিন প্রকার। এক প্রকার প্রকৃতিগতভাবেই আত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে দুর্বল। সুতরাং তার সমস্ত প্রচেষ্টা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধি ও তজ্জনিত ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে নিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করে। সে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় স্মৃতিশক্তি ও কল্পনা শক্তির নিকট থেকে তাৎপর্যাদি গ্রহণ করতে পারে এবং একটা বিশেষ ধারাবাহিকতায় দৈহিক মননজনিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানলাভ করে উপকৃত হতে পারে। কিন্তু এর সবকিছুই ধারণাজাত পরিধিতে সীমাবদ্ধ। কারণ এটা আরম্ভ থেকে প্রাথমিক স্তরগুলো পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, কিন্তু তাকে অতিক্রম করতে পারে না। যদি ভ্রষ্ট হয়, তা হলে তার পরবর্তী সব কিছুই ভ্রষ্টতা দোষে দুষ্ট হয়ে উঠে। অধিকাংশ স্থলে এটাই মানুষের দৈহিক উপলব্ধির পরিধি। এখানেই জ্ঞানীদের উপলব্ধির শেষ এবং এর উপরেই তাঁরা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

অন্য এক প্রকার, যাঁরা ঐ দৈহিক মননজনিত গতিকেই আত্মিক উপলব্ধির দিকে ধাবিত করেন এবং এমন এক উপলব্ধির অধিকারী হন যাতে দৈহিক মাধ্যমগুলোর সাহায্যের প্রয়োজন হয় না; কারণ তাতেই এ উপলব্ধি গ্রহণের প্রস্তুতি বিদ্যমান। এর ফলে তাঁদের উপলব্ধির পরিধি প্রাথমিক স্তরগুলোকে অতিক্রম করে বিস্তৃত হয় এবং এভাবে মানবীয় উপলব্ধির প্রথম পরিধি ব্যাপ্ত হয়ে তাদেরকে অন্তর-পর্যবেক্ষণের প্রান্তরে উপনীত করে। এর সমস্তই স্বজ্ঞান; আরম্ভ থেকেও এর কোন পরিধি নেই, শেষ থেকেও তথৈবচ—এটাই ওলী-আল্লাহ্‌দের আধ্যাত্মবাদী স্বর্গীয় জ্ঞানের অধিকারীদের উপলব্ধির জগৎ। মৃত্যুর পরে 'আলমে বরযখে'[১২২] পুণ্যবানরা এ উপলব্ধির অধিকারী হন।

অন্য এক প্রকার, যাঁরা দৈহিক ও আত্মিক উভয় দিক থেকেই সম্পূর্ণভাবে ঊর্ধ্বস্তরের ফেরেশতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হবার জন্মগত যোগ্যতা রাখেন, তাঁদের জন্য এ কারণেই কোন এক বিশেষ মুহূর্তে কার্যত ফেরেশতা হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাদের চেতনার দিগন্তেই তাঁরা ঊর্ধ্বস্তরের শক্তিসমূহকে অবলোকন ও আত্মিকবাণী শ্রবণ এবং বিশেষ মুহূর্তে তাঁরা আল্লাহ্‌র বক্তব্যও শুনতে পারেন।

ওহী

তাঁরাই আল্লাহ্‌র নবী—তাঁদের উপর আল্লাহ্‌র দয়া ও শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ্ তাঁদেরকে এ বিশেষ মুহূর্তে মানবীয় গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবার ক্ষমতা দিয়েছেন। এ মুহূর্তটিই ওহী অবতরণের সময়। এ অবস্থা তাঁদের স্বভাব, যার উপর আল্লাহ্ তাঁদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে এ প্রবৃত্তিকে মূর্তিমান করে তুলেছেন। তিনি তাঁদেরকে, মানবীয় দেহ ধারণের ফলে যে বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন তাঁরা হতে পারেন, তা থেকেও মুক্তি দিয়েছেন। তিনি তাঁদের প্রকৃতির মধ্যেই এমন ইচ্ছা ও নিষ্ঠার দৃঢ়তা গ্রথিত করেছেন যদ্বারা তাঁরা সেই গন্তব্যের দিকে প্রধাবিত হতে পারেন। তাঁদের অভ্যাসের মধ্যে তিনি উপাসনার প্রতি এমন এক আগ্রহ কেন্দ্রীভূত করেছেন, যা তাঁদেরকে সর্বদিক থেকে সরিয়ে নিয়ে কেবলমাত্র সেই বিশেষ দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে উদ্যোগী করে। এ জন্য তাঁরা যখন ইচ্ছা করেন, সেই ফেরেশতীয় দিকে রূপান্তরিত হয়ে যান। এভাবে রূপান্তর লাভের ক্ষমতা তাদের জন্মগত স্বভাবের অন্তর্গত। বস্তুত এটা তাদের পরিশ্রম বা সাধনার ফসল নয়।

এভাবে তাঁরা যখন একাগ্র হয়ে মানবীয় গণ্ডি অতিক্রম করেন, তখনই ঊর্ধ্বস্তর থেকে যা কিছু শিখবার শিখে ফেলেন এবং পুনরায় সমুদয় শক্তিসহ মানবীয় গণ্ডিতে ফিরে আসেন যাতে তাঁদের দ্বারা লব্ধ বাণী প্রচারের কাজ সম্পন্ন হতে পারে। তাঁদের কেহ কখনও শব্দের রেশ শুনতে পান, যেন ইঙ্গিতময় কোন ভাষা; তা থেকেই তাঁর উপর অবতীর্ণ বাণীর স্বরূপ ধরতে চেষ্টা করেন এবং সেই রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই সকলই সংগ্রহ হয়ে যায় ও বোধগম্যও হয়ে উঠে। কখনও যে ফেরেশতা বাণী বহন করে আসেন, তিনি কোন ব্যক্তির আকারে তাঁর সাথে কথা বলেন এবং নবী তাঁর

---

১২২. মৃত্যু পরবর্তী কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত আত্মজগৎ। তুলনীয় প্রেতপুরী।

উপর অবতীর্ণ বাণী সঞ্চয় করে নেন। ফেরেশতার শিক্ষাদান, মানবীয় গণ্ডিতে নবীর প্রত্যাবর্তন এবং অবতীর্ণ বাণী হৃদয়ঙ্গমকরণ—এ সকলই যেন এক মুহূর্তের কাজ, এমন কি প্রায় চক্ষের পলকে সংঘটিত হয়ে থাকে কেননা এটা কোনকালে বিস্তৃত হয় না, বরং সমগ্রটাই একসঙ্গে নেমে আসে। এজন্যই তা এত দ্রুত বলে মনে হয়। এ কারণেই এর নামকরণ হয়েছে ওহী। কারণ অভিধানে ওহীর অর্থই হল দ্রুততা।

জেনে রাখুন, প্রথমটি অর্থাৎ শব্দের রেশ শোনার যে অবস্থা, তা বিশেষজ্ঞদের মতে নবীদের পর্যায়, রসূলদের নয়।[১১৩] দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ফেরেশতার মানুষের আকারে এসে কথা বলা, এটাই রসূলদের পর্যায়। এজন্যই এটা পূর্বটি অপেক্ষা পূর্ণতর। এটাই সেই হাদিসের মর্মার্থ, যার মধ্যে হজরত মুহম্মদ (সঃ) জিজ্ঞাসিত হয়ে ওহীর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। হারেস ইবনে হিশাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কীভাবে আপনার নিকট ওহী আসে? উত্তরে তিনি বললেন, অনেক সময় তা আমার নিকট আসে ঘণ্টাধ্বনির মতো এবং এটাই অতিশয় কষ্টদায়ক। অতঃপর তা শেষ হয় এমন অবস্থায় যে, আমি সমস্ত বক্তব্য স্মরণ করে ফেলেছি। অনেক সময় ফেরেশতা মানুষের আকার ধারণ করে আমার নিকট আসে ও কথা বলে এবং আমি সকল কথাই স্মরণ করতে পারি।

প্রথম অবস্থাটি এজন্যই অতিশয় কষ্টদায়ক যে, এটা সেই সংযুক্তির পথে শক্তি থেকে ক্রিয়ায় অবতরণের প্রথম পর্যায়। সুতরাং কতকাংশে কষ্টদায়ক বৈকি! আর এ কারণেই তিনি যখন মানবীয় উপলব্ধিতে ফিরে আসলেন, তখন দেখা গেল একমাত্র শ্রুতিশক্তিই মাধ্যম হয়েছে। এটা ছাড়া অন্যগুলো সম্ভব নয়নি। আবার যখন বারবার ওহী আসতে লাগল, শিক্ষার পরিমাণ বাড়ল, তখন উর্ধ্বস্তরের সাথে সংযুক্তি সহজ হয়ে উঠল। অতঃপর নবী যখন মানবীয় উপলব্ধিতে ফিরে আসলেন তখন দেখা গেল সমস্ত মাধ্যমেই বিশেষ করে সর্বাপেক্ষা স্পষ্টতম মাধ্যম দৃষ্টির সম্মুখে তা এসে উপস্থিত হয়েছে।

উপরোক্ত হাদিসের প্রথম অবস্থায় 'আমি স্মরণ করে ফেলেছি' অতীত ক্রিয়াপদ এবং দ্বিতীয় অবস্থায় 'আমি স্মরণ করতে পারি' বর্তমান ক্রিয়াপদ প্রয়োগের বিষয়টি অলংকারশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বস্তুত হাদিসের বক্তব্য ওহীর দুটি অবস্থার দৃষ্টান্ত হিসাবে এসেছে। প্রথমটিতে অবস্থার স্বরূপ হল শব্দের রেশ, যাকে পরিচিত নিয়মে বক্তব্য বলা যায় না। এজন্যই জানানো হল যে, হৃদয়ঙ্গম ও স্মরণ করা তার শেষ হতে না হতেই অস্তিত্বে এসেছে। সুতরাং উক্ত অবস্থার শেষ হবার চিত্রটির সাথে সঙ্গতি রাখেই অতীত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে সমাপ্তি ও বিযুক্তিকেই নির্দেশ করে। দ্বিতীয়টিতে অবস্থার স্বরূপ হল মানুষের আকারে এসে কথা বলছে। এখানে বক্তব্য ও স্মরণ উভয়েই সমান্তরালে অবস্থান করছে। এজন্যই তার সাথে সঙ্গতি রেখে বর্তমান ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে, যা বস্তুত পুনঃ পুনঃ নবায়নের ইঙ্গিত বহন করে।

জেনে রাখুন, এ স্মরণ করার অবস্থাটি সম্পূর্ণ কষ্টকর ও কষ্টদায়ক। কোরান এর দিকেই ইঙ্গিত করেছে। আল্লাহ্ বলেন, আমরা অচিরেই তোমার উপর গুরুভার বাণী

---

১১৩. নবী অর্থ বার্তাবাহী এবং রসূল অর্থ প্রেরিত পুরুষ। এই প্রেরিতত্বের দিক হতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

অর্পণ করব। হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, তিনি ওহী অবতরণের কষ্টের জন্য দুশ্চিন্তা পোষণ করতেন। তিনি আরও বলেছেন, অত্যন্ত শীতের দিনে তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হত এবং অতঃপর এমন অবস্থায় শেষ হত যে, তাঁর কপাল বেয়ে ঘাম পড়তে থাকত।[১১৪] এ জন্যই উক্ত অবস্থায় তাঁর মধ্যে বিভোরতা ও তাঁর কণ্ঠে অতি পরিচিত শব্দ শোনা যেত। এর কারণ, যেমন আমরা পূর্বে স্থির করেছি, ওহী হল মানবীয় গণ্ডি পরিত্যাগ করে ফেরেশতীয় গণ্ডিতে অতিক্রম ও আত্মিক বাণী শ্রবণ। এতে নিজের সত্তার এ স্বস্থান থেকে বিচ্যুতি ও নিজের দিক থেকে অন্যের দিকে গমনের মধ্যে কষ্ট রয়েছে। এটাই সেই চাপের অর্থ, যা ওহী অবতরণের প্রাথমিক অবস্থায় বর্ণিত হয়েছে। হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, ফেরেশতা আমার উপর চাপের সৃষ্টি করলেন, এতে আমি শ্রান্তি অনুভব করলাম। অতঃপর আমাকে মুক্ত করে বললেন, পাঠ কর। আমি বললাম, আমি পাঠ করতে জানি না। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার, যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

এ অবস্থা ধীরে ধীরে কেটে গিয়ে বিষয়টি যখন অভ্যস্ত হয়ে উঠে, তখন পূর্বের তুলনায় তাতে সহজভাব দেখা দেয়। এ কারণেই তাঁর মক্কায় অবস্থানকালে কোরানের যে সকল আয়াত, সূরা ও শ্লোক অবতীর্ণ হয়েছে, তা মদিনায় অবতীর্ণ অনুরূপগুলো থেকে সংক্ষিপ্ত। লক্ষ করুন, তবুকের যুদ্ধে অবতীর্ণ সূরা 'বারাআত' সম্পর্কে বলা হয়েছে, উক্ত সূরার সম্পর্কে অথবা অধিকাংশটাই সেখানে একসঙ্গে অবতীর্ণ হয় অথচ হজরত মুহম্মদ (সঃ) অত্যন্ত সহজভাবেই তাঁর উটনীর উপর বসেছিলেন। কিন্তু এর পূর্বে মক্কায় সংক্ষিপ্ত সূরাগুলোও কিছু অংশ এক সময়ে ও অবশিষ্ট অংশ অন্য সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এভাবে মদিনায় অবতীর্ণ শেষ সূরা, যাতে 'ধর্মের আয়াত' বিদ্যমান[১১৫] তা খুবই দীর্ঘ। এর পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলো, যেমন, 'আররহমান' 'সারিয়াত, 'মুদাস্‌সির', 'দোহা', 'ফলক'[১১৬] ও অনুরূপ অন্যান্যের সাথে তুলনীয়। এর দ্বারা আপনি মক্কা ও মদিনায় অবতীর্ণ সূরা ও আয়াতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। আল্লাহ্‌ই সঠিক পথ নির্দেশকারী।

এটাই আমাদের নবুয়ত সম্পর্কীয় আলোচনার ফল।

ইন্দ্রজাল

এখন ইন্দ্রজাল; এটাও মানবীয় জীবাত্মার একটি বৈশিষ্ট্য। এর বর্ণনা, যেমন পূর্বে আমাদের আলোচনায় দেখা গেছে, মানবীয় জীবাত্মার মধ্যে তার মানবীয় গণ্ডি পরিত্যাগ করে ঊর্ধ্বস্থিত আত্মিক জগতের সাথে সংযোগ স্থাপনের সঙ্গতি বিদ্যমান। এটা নবীদের জন্য চক্ষের পলকে সঙ্ঘটিত হয়ে থাকে। কেননা মানবীয় গণ্ডিতেই জন্মগতভাবে তাঁদের এ যোগ্যতা রয়েছে। এর মধ্যে একথাও স্থিরীকৃত হয়েছে যে, তাঁরা এ প্রকার অবস্থা, কোন সাধনা, ইন্দ্রিয় মাধ্যম, পরোক্ষ জ্ঞান দৈহিক ক্রিয়া যেমন বাক্য, গতি এবং

---

১১৪. ৯৯, ১০০, ১০১ টীকা দ্র:।
১১৫. কোরান ৫, ৩।
১১৬. ৫৫, ৫১, ৭৪, ৯৮, ৯৬ ইত্যাদি সংখ্যক সূরা দ্র:।

অন্য যে কোন ধরনের বিষয়ের সাহায্য-সহায়তা ব্যাতিরেকেই লাভ করে থাকেন। এটা শুধুই মানবীয় গণ্ডি থেকে ফেরেশতীয় গণ্ডিতে মুহূর্তে বা প্রায় চক্ষের পলকে রূপান্তরিত হওয়া।

অবস্থা যখন এ যে, এ যোগ্যতা মানবীয় প্রকৃতিতে বিদ্যমান, তখন এর বুদ্ধিগ্রাহ্য বিভাগও সম্ভব। এর ফলে এখানে এমন একশ্রেণীর মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যারা প্রথম শ্রেণীর তুলনায় একান্তই অসম্পূর্ণ। এ অসম্পূর্ণতা পরিপূর্ণতার বিপরীতে অবস্থিত। সেইখানের সাহায্যহীনতার বিপরীতে এখানে সাহায্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান। বস্তুত এতদুভয়ের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য রয়েছে। এজন্য এ অপর শ্রেণীর মানুষ, যাদের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, যখন তাদের প্রকৃতিদত্ত বুদ্ধিবৃত্তি তার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মননশক্তিকে গতিময় করে তোলে, তখন তা উর্ধ্বাস্থিত শক্তির সাথে সংযোগ স্থাপনে স্বভাবগত কারণেই অসম্পূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। এ কারণেই তার স্বভাবগত দুর্বলতা তাকে একান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও শুধু অনুভূতিসজ্জাত অথবা ধারণালব্ধ আংশিক বিষয়ের অধিকারী করে থাকে। যেমন, স্বচ্ছদেহ পশুর অস্থি, ছন্দোবদ্ধ বাক্য ও পশুপাখির গতিবিধি তাদের এ অনুভূতি বা ধারণা তাদেরকে আত্মিক শক্তিতে রূপান্তরণের ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে; বরং তা যেন তাদের অনুসারী হয়ে উঠে। তাদের উপলব্ধির প্রারম্ভে এ যে শক্তিক্রিয়াশীল হয়ে দেখা দেয়, তাকেই ইন্দ্রজাল বলা হয়।

এ সকল জীবাত্মা জন্মগতভাবে অসম্পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতার অভাবজনিত ত্রুটিতে বিদ্যমান বলে তারা সার্বিক অপেক্ষা অধিকাংশ আংশিক বিষয়াদিই উপলব্ধি করতে পারে। এ জন্যই তাদের ধারণা শক্তি অত্যন্ত ক্ষমতাবান; কেননা এটা আংশিক উপলব্ধিরই হাতিয়ার। সুতরাং নিদ্রায় অথবা জাগরণে তারা এ ধারণা শক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যেতে পারে। এর ফলে তখন তাদের মধ্যে এমন একটি চেতনা অস্তিত্ববান হয়ে উঠে, যা উদ্দিষ্ট বিষয়কে এনে উপস্থিত করে। তা যেন একটি দর্পণের ন্যায়। তাতে তারা সর্বদা দৃষ্টিপাত করে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও ঐন্দ্রজালিক বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়াদির সার্বিক উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়। কারণ তাদের অন্তর প্রেরণা একান্তই শয়তানী কর্ম।

এ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যারা ছন্দোবদ্ধ ও সমিল বাক্যাদি—মন্ত্রের সাহায্য নিয়ে থাকে, তাদের অবস্থাই উন্নততর। এ মন্ত্রের সাহায্যে তারা অনুভূতির মাধ্যম অতিক্রম করে আত্মিক যোগাযোগের অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টায় কিছুটা শক্তি সঞ্চার করতে পারে। এর ফলে তাদের অন্তরে যে গতি অনুভূত হয় এবং বহিরাগত যে শক্তি তাকে সহায়তা করে, তাদের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ায়—তাদের জিহ্বায় কিছু বক্তব্য এসে উপস্থিত হয়। তা অনেক সময় সত্য ও বাস্তবের অনুসারী হয় এবং অনেক সময় মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তারা নিজেদের উপলব্ধিগত ত্রুটিকে বহিরাগত ভিন্নধর্মী ও অশোভন এক শক্তির সাহায্যে অতিক্রম করতে চায়। এজন্য তাদের উপলব্ধিতে সত্যমিথ্যা একসঙ্গে এসে দেখা দেয় এবং তা তাদের বিশ্বস্ততা কমিয়ে দেয়। অনেক সময় তারা ধারণার বশবর্তী হয়ে কল্পনা ও অনুমানের সাহায্যে সত্যোপলব্ধির দিকে এগিয়ে যায় এবং জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদেরকে প্রতারিত করে থাকে।

এ মন্ত্রশক্তির অধিকারী ব্যক্তিদেরকেই বিশেষভাবে 'কাহেন' বা মন্ত্রসিদ্ধা বলা হয়ে থাকে। ঐন্দ্রজালিক শ্রেণীর মধ্যে এরাই উন্নততর অবস্থার অধিকারী। এদের প্রতি লক্ষ করেই হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, "এটা মন্ত্রসিদ্ধার ছন্দোবদ্ধ কথা।" এতে তিনি মন্ত্রকে সম্বন্ধ কারকের সাহায্যে তাদের জন্য বিশিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি ইবনে সাইয়াদকেও তার অবস্থা জানবার জন্য বলেছিলেন, "এ বিষয় তোমার নিকট কীভাবে আসে?" সে বলল, "এটা আমার নিকট সত্য ও মিথ্যা দুই রূপেই আসে।" এর উত্তরে তিনি বললেন, "বিষয়টি তোমার মধ্যে মিশ্রিত হয়ে পড়েছে।"[১১৭] অর্থাৎ নবুয়তের বৈশিষ্ট্যই হল সত্য, কোন অবস্থাতেই তার মধ্যে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটতে পারে না। কারণ, তা নবীর মানবীয় সত্তার উর্ধ্ব জগতের সাথে কোন প্রকার অনুসারী ও বহিরাগত সহায়তা ছাড়াই সংযোগ স্থাপন। কিন্তু ঐন্দ্রজালিকেরা যেহেতু তাদের উপলব্ধির ক্ষেত্রে বহিরাগত পরোক্ষ জ্ঞানের সহায়তা লাভ করে, সেজন্য তাদের উপলব্ধিতেও তারা অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং তাদের উদ্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে নিয়োজিত উপলব্ধিতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এভাবেই তা মিশ্রিত হয়ে উঠে এবং মিথ্যার বাহন হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই তা নবুয়ত হতে পারে না।

আমরা যে এ ছন্দোবদ্ধ বাক্যাদি তথা মন্ত্রকে ঐন্দ্রজালিকদের উন্নততর অবস্থার পরিচায়ক বলে মন্তব্য করেছি; কারণ এ মন্ত্র, দর্শনের ও শ্রবণের অতীত সমস্ত অদৃশ্য মাধ্যম থেকে অধিকতর লঘু এবং এর লঘুত্বই আত্মিক উপলব্ধি ও সংযোগের ক্ষেত্রে নৈকট্যের প্রমাণ বহন করে। এতে নানাবিধ দুর্বলতা থেকে মুক্তির ইঙ্গিতও বিদ্যমান।

অনেক লোকের ধারণা, নবুয়তের সময় থেকে এ ইন্দ্রজাল শেষ হয়ে গেছে। হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর আবির্ভাবের সময় শয়তানদেরকে আকাশস্থ সংবাদাদি সংগ্রহ থেকে বিরত রাখবার জন্য তাদের প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপের যে ঘটনা কোরানে বর্ণিত হয়েছে[১১৮] তা থেকেই এ ধারণা পোষণ করা হচ্ছে। কারণ ঐন্দ্রজালিকগণ একমাত্র শয়তানের নিকট থেকেই আকাশের সংবাদ জানতে পারে। সুতরাং ঐ সময় থেকেই ঐন্দ্রজাল বিনষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এ ধারণার জন্য উক্ত প্রমাণ খুব দৃঢ় নয়। কারণ ইন্দ্রজালিকদের এ বিদ্যাটি যেমন শয়তানের নিকট থেকে অর্জন করা হয়, তেমনি তাদের নিজ আত্মশক্তিতেও তা সম্ভব, যেমন আমরা পূর্বে স্থির করেছি। সুতরাং কোরানের আয়াতটি আকাশ থেকে সংগ্রহযোগ্য এক প্রকার সংবাদ থেকে তাদেরকে বিরত রাখার দিক নির্দেশ করছে। তা নবী প্রেরণের সংবাদ সম্পর্কীয়। অন্যান্য সংবাদ থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়নি। তদুপরি যদি সার্বিক অর্থেও হয় তথাপি এটা কেবল নবুয়তের সমসাময়িককালেই ছিল। পরে এটা পুনরায় নিজের পূর্বাবস্থায় ফিরে এসেছে। এটাই বাস্তব অবস্থা। কারণ এ সকল মাধ্যমের সবগুলো নবুয়তের সময় ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিল, যেমন সূর্যের আবির্ভাবে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র ও দীপাবলি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। কারণ নবুয়ত স্বয়ং এমন এক প্রোজ্জ্বল জ্যোতি, যার প্রভাবে সকল জ্যোতি নিষ্প্রভ অথবা বিলীন হয়ে যায়।

---

১১৭. বোখারী ২য় দ্র:। ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মনে হয় ইনি ইসলাম গ্রহণ করে ৬৩ (৬৮২) হিজরিতে মারা যান।

১১৮. কোরান।

দার্শনিকদের অনেকের ধারণা, এ ইন্দ্রজাল শুধু নবুয়তের পূর্বাহ্নেই অস্তিত্ববান ছিল। এর পর তা নষ্ট হয়ে গেছে। এরূপ অবস্থা প্রত্যেক নবুয়তের প্রাক্কালেই সংঘটিত হয়েছে। কারণ নবুয়তের অস্তিত্বের জন্য নক্ষত্রবলয়ের বিশেষ প্রভাবের প্রয়োজন। এ বলয়ের সম্পূর্ণতার দ্বারা তার প্রভাবে নবুয়তও সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। যদি এ বলয় অসম্পূর্ণ থাকে, তা হলে যে প্রভাব সে বিস্তার করতে চায়, তার অসম্পূর্ণতার দরুন কিছু সংখ্যক অসম্পূর্ণ সত্তার আবির্ভাব ঘটে। এটাই ঐন্দ্রজালিকের তাৎপর্য, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং এ বলয় সম্পূর্ণ হবার পূর্বে বহু অসম্পূর্ণ বলয়ের প্রভাব দেখা দেয়। এর ফলে এক বা একাধিক ঐন্দ্রজালিকের অস্তিত্ব মূর্তিমান হয়ে উঠে। অতঃপর যখন এ বলয় সম্পূর্ণ হয়, নবীর অস্তিত্বও পরিপূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং পূর্বের অসম্পূর্ণ বলয়গুলোর প্রভাবজাত সত্তারও পরিসমাপ্তি ঘটে, তাদের বিন্দুমাত্রও খুঁজে পাওয়া যায় না। এ যুক্তির ভিত্তি হল এই যে, কোন কোন নক্ষত্রবলয় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এটা গৃহীত যুক্তি নয়। হতে পারে উক্ত বলয় কোন বিশেষ অবস্থায় উক্ত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।-তা যদি অসম্পূর্ণ থাকে, তা হলে সেই বিশেষ অবস্থাটি সৃষ্টি না হওয়ার ফলে বিশেষ প্রভাবও দেখা দিবে না। সুতরাং দার্শনিকের বক্তব্য অনুসারে যা বোঝায় যে, তা অসম্পূর্ণ অবস্থায়ও প্রভাব বিস্তার করে, তা ঠিক নয়।

অতঃপর ঐ সকল ঐন্দ্রজালিক, যারা নবুয়তের সমসাময়িককালে জীবিত ছিল, তারা নবীর সত্যতা ও তাঁর অলৌকিকত্বের তাৎপর্য বুঝত। কারণ তাদের মধ্যেও নবুয়ত সাদৃশ্য স্বজ্ঞানের কিছু অংশ বিদ্যমান ছিল, যেমন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নিদ্রার বিষয়টি আছে। এ তুলনার বুদ্ধিগ্রাহ্য দিকটি নিদ্রিতের অপেক্ষা ঐন্দ্রজালিকের সত্তায় অধিকতর দেদীপ্যমান। এটা যেমন তাদের একান্ত প্রাপ্য তেমনি এটাই তাদেরকে নবুয়তের লোভে মিথ্যাচারের দিকে নিয়ে গেছে। এ কারণেই তার হিংসার বশবর্তী হয়েছে। যেমন উমাইয়া ইবনে আবিস্ সেলত,[১১৯] তারও নবী হওয়ার লোভ ছিল। এমনি অবস্থা হয়েছিল ইবনে সাইয়াদ, মুসাইলেমা[১২০] ও অন্যান্য ব্যক্তিদের। অতঃপর যখন তাদের বিশ্বাসের অবস্থা প্রাধান্য পেয়েছে তখন হিংসা ত্যাগ করে বিশ্বাস করবার মতই বিশ্বাস করেছে। যেমন তুলাইহা আল-আসাদী ও সওয়াদ ইবনে কারেবের অবস্থা। তাঁরা ইসলামী আমলে যুদ্ধজয়ে যে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন, তার মধ্যেই তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় বিদ্যমান।

স্বপ্ন দর্শন

স্বপ্ন দর্শনের তাৎপর্য হল যুক্তিবাদী আত্মার তার আত্মিকসত্তার মধ্যে ক্ষণিকের জন্য ঘটনাবলির কোন আকৃতি প্রত্যক্ষ করা। যদি এ দর্শন আত্মিক হয়, তা হলে তাতে দৃষ্ট ঘটনাবলির আকৃতি বাস্তবেও অস্তিত্ববান হবে। যেমন প্রতিটি আত্মিক সত্তারই এ অবস্থা হয়ে থাকে। এটা দৈহিক উপাদান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধি থেকে মুক্ত হয়েই আত্মিক হয়। কখনও নিদ্রায় থাকার দরুন মুহূর্তের জন্য তার প্রাপ্তি ঘটে থাকে, যেমন আমরা

১১৯. হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সমসাময়িক বিখ্যাত আরবি কবি।

১২০. এদের প্রায় সকলেই অল্প বেশি মিথ্যা নবুয়তের দাবি করেছিল।

পরে বর্ণনা করব। এর ফলে আত্মা তার উদ্দিষ্ট সঙ্ঘটিতব্য ঘটনাবলির জ্ঞানলাভ করে এবং তা সহ উপলব্ধির জগতে ফিরে আসে। এমতাবস্থায় তার এ জ্ঞান যদি দুর্বল হয়, কোন কাহিনী, দৃষ্টান্ত ও ধারণার সংমিশ্রণে যদি অস্পষ্ট হয়, তা হলে এ কাহিনী ইত্যাদির জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দেয়। অবশ্য কোন সময় এ জ্ঞান কোন কাহিনীর মিশ্রণ ছাড়াই অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে লাভ হয়। তখন দৃষ্টান্ত বা ধারণার অনুপস্থিতির দরুন কোন প্রকার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

আত্মার জন্য এরূপ মুহূর্ত লাভের কারণ এই যে তা শক্তির দিক থেকে আত্মিক সত্তার অধিকারী এবং এ সত্তা তার দেহ ও তৎসংশ্লিষ্ট উপলব্ধির মাধ্যমগুলোর সাহায্যে পরিপূর্ণতা লাভের প্রয়াসী। আবার এ পরিপূর্ণতার প্রয়াসই তাকে দৈহিক বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়,[১২১] এমনকি সে একান্তই বুদ্ধিগ্রাহ্য শুদ্ধ সত্তায় রূপান্তরিত হয়ে যায় আর তখনই কার্যত তার সত্তা সম্পূর্ণ হয়ে উঠে। তখন সে এমন এক উপলব্ধিশীল আত্মিক সত্তায় পরিণত হয়, যা দৈহিক কোন মাধ্যম ছাড়াই ক্রিয়া করতে সমর্থ হয়। অবশ্য এ ধরনের আত্মিক শক্তি এতদ্‌সত্ত্বেও ঊর্ধ্বস্তরের ফেরেশতাদের সমকক্ষ নয়। কারণ তারা এর মত দৈহিক বা অন্য মাধ্যমের সাহায্যে সত্তার পরিপূর্ণতা বিধান করে না। অন্যদিকে দেহের মধ্যে অবস্থানকাল পর্যন্ত আত্মার এ যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। এ যোগ্যতার একটি বিশেষ রূপ আছে, তা ওলী আল্লাহ্‌দের জন্য এবং এর সাধারণ রূপটি সর্বসাধারণের জন্য। এটাই স্বপ্ন দর্শনের ব্যাপার।

আর যে রূপটি নবীদের জন্য, তা হল মানবীয় গণ্ডি থেকে আত্মিক সর্বোচ্চস্তর শুদ্ধ—ফেরেশতীয় গণ্ডিতে অতিক্রমণ করা। ওহী অবতরণের সময় তাদের এ যোগ্যতা বারবার প্রকাশিত হয়ে থাকে। তা যখন দৈহিক উপলব্ধি থেকে ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়, তখন তাতে এমন একটি উপলব্ধিগত অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাকে প্রকাশ্যভাবে নিদ্রার সাথে তুলনা করা যায়; যদিও নিদ্রা তা অপেক্ষা খুবই নিম্নস্তরের। তবুও এ তুলনার জন্যই ধর্মপ্রবর্তক স্বপ্নদর্শনকে নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ বলে বর্ণনা করেছেন[১২২]। অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে তেতাল্লিশ ভাগের এক ভাগ। অন্য একটিতে বলা হয়েছে, সত্তর ভাগের এক ভাগ। এখানে সর্বত্র সংখ্যাটির যথার্থতা প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। এর দ্বারা এ প্রকার অবস্থার বহুবিধ পর্যায়ের কথাই বোঝান হয়েছে। এর প্রমাণ এই যে, কোন কোন হাদিসে সত্তরের কথা এসেছে এবং এ সংখ্যাটি আরবদের নিকট আধিক্যের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেকে ধারণা করেন যে, হাদিসে ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ বলা হয়েছে, তাই যথার্থ। কারণ প্রথম দিকে ওহী আরম্ভ হয়েছিল ছয়মাস ব্যাপী স্বপ্ন দর্শনের মাধ্যমে। এটা এক বছরের অর্ধেক। মক্কা ও মদিনার সমস্ত সময় মিলিয়ে নবুয়তের কালপরিধি হল তেইশ বছর। সুতরাং অর্ধেক বছর তার ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। কিন্তু এ ধারণা যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কারণ উক্ত স্বপ্নদর্শন আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জন্যই ঘটেছে। কাজেই তাকে কি করে আমরা অন্যান্য নবীর ক্ষেত্রে

---

১২১. মূল গ্রন্থে এ স্থানে অসুবিধা থাকায় এ বাক্যটি যোগ করতে হয়েছে। অবশ্য বৈরুত সংস্করণের মূল পাদটীকায় এর স্বীকৃতি আছে।

১২২. বোখারী (৪র্থ) দ্র:।

প্রয়োগ করে সাধারণভাবে বলি! অন্যদিকে তার এ কাল পরিধি নবুয়তের সময় থেকে দেয়া হয়েছে, অথচ স্বপ্ন দর্শনকে মর্যাদা দেয়া হয়নি।

আমাদের পূর্ব বর্ণনায় এ বিষয়টি যদি পরিষ্কার হয়ে থাকে, তা হলে পাঠক, আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে, এর অর্থ হল, সাধারণ মানুষের সংযুক্তিগত যোগ্যতার সাথে নবীদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ জন্মগত যোগ্যতার তুলনা—আল্লাহ্‌র শান্তি তাঁদের উপর বর্ষিত হোক। বস্তুত সাধারণ যোগ্যতা তা সকল মানুষের জন্য যতই সাধারণ হোক, তদ্রুপ ঘনিষ্ঠ নয়। তদুপরি তা কার্যকরী হবার পথে প্রচুর বাধা-বিপত্তি বিদ্যমান। এর সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হল প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়ানভূতি। সুতরাং আল্লাহ্ তাদের এ বাধা দূর করবার জন্য তাদের মধ্যে নিদ্রার সৃষ্টি করেছেন। তা তাদের প্রকৃতিগত। সুতরাং উক্ত নিদ্রার সাহায্যে বাধা অপসারিত হলে আত্মা তার উদ্দিষ্ট সত্য জগতের জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। কোন সময় ক্ষণিকের জন্য সে এমন উপলব্ধির অধিকারী হয়, যাতে উদ্দিষ্ট সফল হয়ে উঠে। এ জন্যই ধর্মপ্রবর্তক তাকে সুসংবাদের পর্যায়ে ফেলে বলেছেন, নবুয়তের মধ্যে সুসংবাদ ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট নেই। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সুসংবাদ কী? তিনি বললেন, "তা সৎ স্বপ্ন, কোন সৎ ব্যক্তি তা দেখে অথবা তাকে দেখানো হয়।"[১২৩]

নিদ্রার সাহায্যে এ বাধা অপসারিত হওয়ার কারণ, যা আমরা এখন বর্ণনা করছি, তা এই যে, যুক্তিবাদী আত্মার সমুদয় উপলব্ধি ও কার্য দৈহিক জীবশক্তির সাহায্যেই সঙ্ঘটিত হয়। তা এক প্রকার সূক্ষ্ম বাষ্প। তার কেন্দ্রস্থল হৃদপিণ্ডের বামপার্শ্বস্থিত গহ্বর, যেমন জালিনুস ও অন্যান্যের শারীরবিদ্যা গ্রন্থে বিদ্যমান। এটা রক্তের সাথে শিরা ও ধমনীসমূহে প্রসারিত হয় এবং দেহের মধ্যে অনুভূতি, গতি ও সমুদয় ক্রিয়ার শক্তি প্রদান করে। এর সূক্ষ্মতর অংশটি মস্তিষ্কে উপনীত হয়, সেখানে মস্তিষ্কের শৈত্যে সমতা লাভ করে এবং তার অভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের ক্রিয়াদিকে পূর্ণতা দান করে। যুক্তিবাদী আত্মা এ বাষ্পশক্তির সাহায্যেই উপলব্ধি ও মননশীল হয়ে থাকে। সৃষ্টিবিধানের ইচ্ছা অনুযায়ী এ আত্মা তার সাথে সম্পর্কিত। কারণ সেই অনুসারে কোন সূক্ষ্ম বস্তুই স্থূল বস্তুর উপ প্রভাব বিস্তার করে না। অতএব যখন এ জীবশক্তি দৈহিক উপাদানের মধ্যে সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছে, তখন তা এমন এক সত্তার প্রভাবস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা দৈহিক দিক থেকে ভিন্ন এবং এটাই যুক্তিবাদী আত্মা। এ জীবশক্তির মাধ্যমেই যুক্তিবাদী আত্মার প্রভাব দেহের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকে।

আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, এর এ উপলব্ধি দুই প্রকার। একটি প্রকাশ্য উপলব্ধি, তা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সংঘটিত হয় এবং অন্যটি গোপন উপলব্ধি, তা মস্তিষ্ক শক্তির সহায়তায় অস্তিত্বে আসে। এ উপলব্ধি তাকে তার পূর্ববর্তী উপলব্ধি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে তার উপরিস্থিত আত্মিক সত্তাসমূহের সাথে মিলিত করে। কেননা তা জন্মগতভাবেই এ যোগ্যতার অধিকারী। যেহেতু প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি দৈহিক, সেজন্য তা শ্রান্তি ও অবসাদের দরুন দুর্বল ও শিথিল হয়ে পড়ে এবং অতিরিক্ত

১২৩. বোখারী (৪র্থ) দ্র:।

তৎপরতার সাহায্যে আত্মশক্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এ কারণে আল্লাহ্ তার স্বভাবের মধ্যে বিশ্রাম লাভের স্পৃহা সৃষ্টি করেছেন, যাতে উপলব্ধি পুনরায় নবতর পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এটা শুধু তখনই হতে পারে, যখন জীবশক্তি প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি সকল বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে গোপন অনুভূতির দিকে ফিরে আসে। এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য রাত্রিকালীন দেহের উপর পতিত শৈত্যানুভূতি প্রভূত সাহায্য করে থাকে। এর ফলে দেহের স্বাভাবিক তাপ তার গভীরে প্রবেশ করে এবং বহির্দেশ থেকে অন্তর্দেশে এগিয়ে যায়। তা এভাবে তার বাহন জীবশক্তিকে অন্তর্দেশে পরিচালিত করে। এজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাত্রিকালেই মানুষ নিদ্রাভিভূত হয়।

এভাবে আত্মশক্তি যখন প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতির বন্ধনমুক্ত হয়ে তার অন্তর্শক্তিগুলোর নিকট ফিরে আসে এবং জীবাত্মার উপর অনুভূতির প্রভাব ও বাধাগুলো শিথিল হয়ে পড়ে, তখন তা স্মৃতিশক্তির নিকট ফিরে এসে সেখান থেকে মিশ্রণ ও বিশ্লেষণের সাহায্যে কাল্পনিক চিত্রাদির অস্তিত্বকে সম্ভব করে তোলে। এ সকল চিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভ্যস্ত চিত্র মাত্র। কারণ আত্মশক্তি অতি অল্পকাল পূর্বেই চিরাচরিত উপলব্ধি থেকে সরে এসেছে। অতঃপর উক্ত শক্তি এ চিত্রগুলোকে প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতিজাত মিশ্র অনুভূতির সম্মুখে প্রেরণ করে, যাতে এগুলো প্রকাশ্য পঞ্চেন্দ্রিয়ানুভূতির ধারায় উপলব্ধ হতে পারে। কখনও জীবশক্তি তার অন্তর্শক্তিগুলোর সাথে সমতা রক্ষা করে তার আত্মিক শক্তির দিকে ধাবিত হয় এবং আত্মিক উপলব্ধির সাহায্যে তাকে উপলব্ধি করে। কেননা এটাই তার জন্মগত স্বভাব। এর ফলে সে তৎকালে তার সত্তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদির চিত্র চয়ন করে নেয়। অতঃপর ধারণা শক্তি এ সকল উপলব্ধ চিত্রকে যথার্থ অথবা রূপক হিসাবে চিরাচরিত কাঠামোতে রূপ দেয়। এর মধ্যে রূপকগুলোর জন্যই ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আত্মার এ প্রকার উপলব্ধির আলোকে উদ্ভাসিত হবার পূর্বেই যে সকল চিত্র মিশ্রণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্মৃতিশক্তির দ্বারস্থ হয়, তাই 'বিশৃঙ্খল স্বপ্ন' নামে আখ্যাত।[১২৪]

বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, নবী (সঃ) বলেছেন, স্বপ্ন তিন প্রকার। আল্লাহ্র নিকট থেকে স্বপ্ন, ফেরেশতার নিকট থেকে স্বপ্ন এবং শয়তানের নিকট থেকে স্বপ্ন।[১২৫] এ তিন প্রকার স্বপ্নের বিবরণ আমাদের পূর্ব বর্ণনার সাথে মিলে। সুস্পষ্ট স্বপ্ন আল্লাহ্র দান, ব্যাখ্যাযোগ্য রূপকগুলো ফেরেশতাদের এবং বিশৃঙ্খল যা কিছু সকলই শয়তানের কাজ। কারণ, এগুলোর কোন অর্থ নেই এবং শয়তান অর্থহীনতার উৎস।

এটাই স্বপ্নদর্শনের তাৎপর্য এবং একে কার্যকারণ সংবলিত ও সাহায্য করে নিদ্রা। এটা এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা সাধারণভাবে সকল মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায়। তাদের এমন কেউ নেই, যাকে এ থেকে মুক্ত বলা যেতে পারে। বরং প্রতিটি মানুষই একবার নয়, একাধিকবার নিদ্রার মধ্যে এমন কিছু দেখেছে, যা জাগরণে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ থেকে তার এ ধারণাই যথার্থভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে, জীবশক্তি নিদ্রায় অদৃশ্যকে উপলব্ধি করতে পারে এবং এটা তার প্রয়োজনীয়ও। সুতরাং নিদ্রায় যদি এ অবস্থার সত্যতা

১২৪. মূল শব্দটি 'আযগামু' আহলামীন; কোরান ১২, ৪৪; ২১, ৫।
১২৫. কিন্তু বোখারীতে দুই প্রকার।

স্বীকার করে নেয়া যায়, তা হলে অন্যান্য অবস্থাতেও এটা হতে পারে। কারণ উপলব্ধিবান সত্তা একটিই এবং তার বৈশিষ্ট্য সর্বাবস্থায় সাধারণ। আল্লাহ্ তাঁর দয়ায় ও অনুগ্রহে সত্যের দিকে পথপ্রদর্শনকারী।

অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান

এ ব্যাপারে মানুষ সাধারণভাবে যে সকল ঘটনার সম্মুখীন হয়ে থাকে, তা তাদের স্বেচ্ছাজনিত নয়। কারণ স্বপ্নদর্শনের উপর মানুষের কোন হাত নেই। হয়ত জীবাত্মার মধ্যে এরূপ কোন বিষয়ের প্রতি উৎসুক্য সৃষ্টি হয়ে থাকতে পরে, তার কারণেই সে সেই ক্ষণিক সংযুক্তির মাধ্যমে নিদ্রায় তা লাভ করে থাকে। এটা উক্ত ঘটনা দেখবার জন্য তার স্বেচ্ছাপ্রণোদনের ফল নয়। আলগায়াত[১২৬] ও যোগসাধনাকারীদের অন্যান্য গ্রন্থে এমন কিছু নামের (মন্ত্রের) উল্লেখ আছে, যা নিদ্রার সময় উচ্চারণ করলে স্বপ্নে উৎসুক্য অনুযায়ী বিষয়াদি দেখা যায়। তারা এ নামগুলোকে (মন্ত্রকে) 'স্বপ্নদর্শন মন্ত্র' নামকরণ করেছেন। তা থেকে 'মাসলামা' আল-গায়াত নামক পুস্তকে একটি স্বপ্নদর্শন মন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, যার নাম দিয়েছেন তিনি 'পূর্ণ প্রকৃতির স্বপ্নদর্শন মন্ত্র।' তার কোন ব্যক্তির চিন্তামুক্ত হয়ে একাগ্রচিত্তে নিদ্রার সময় এ কয়টি অনারব শব্দ উচ্চারণ করা— 'তামাগস্‌বাদা আন্ ইয়াস্‌ওয়ান্দা ওয়া গাদাস্ নওফানা গাদিস্।'[১২৭] সে তখন তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবে, তা হলে নিদ্রায় সে যা চায়, তা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি কয়েক রাত্রি আহার্যের ব্যাপারে কৃচ্ছ্র সাধনার পর এটা উচ্চারণ করেছিল। অতঃপর তার সম্মুখে একটি মানুষের আকৃতি উপস্থিত হয়ে বলল, "আমি তোমার পূর্ণ প্রকৃতি।" তখন সে তাকে তার উদ্দিষ্ট জিজ্ঞাসা করলে সে তার উৎসুক্য পূরণ করেছিল। বহুবার আমি (ইবনে খলদুন) এ মন্ত্র থেকে অদ্ভুত ফল পেয়েছি এবং ব্যক্তিগত অবস্থার এমন অনেক কিছু জানতে পেরেছি, যার প্রতি আমার উৎসুক্য ছিল। কিন্তু এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, ইচ্ছাই স্বপ্ন দর্শন সংঘটিত করতে পারে। এ স্বপ্নদর্শন মন্ত্রগুলো জীবাত্মাকে স্বপ্ন দর্শনের জন্য প্রস্তুত করতে পারে মাত্র। সুতরাং প্রস্তুতি যখন সুসম্পন্ন হয়, তখন প্রস্তুতির উদ্দিষ্ট বস্তু লাভ ঘটে থাকে। যে কোন ব্যক্তি তার প্রস্তুতির জন্য পছন্দমত অনেক কিছুই গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু এতে তার উদ্দিষ্ট বিষয় সংঘটিত হবেই এমন কোন প্রমাণ নেই। প্রস্তুতির ক্ষমতা কোন প্রকারেই কোন বিষয় সংঘটিত করবার ক্ষমতার নামান্তর হতে পারে না। এটা ভাল করে জেনে রাখুন এবং অনুরূপ বিষয় বা ঘটনা আপনার সম্মুখে আসলে তৎসম্পর্কে বিবেচনা করুন। আল্লাহ্ই বিচক্ষণ ও সর্বজ্ঞ।[১২৮]

ভবিষ্যদ্বক্তা

অতঃপর আমরা মানব সমাজে এমন অনেক লোকের দেখা পাই, যাঁরা অনুষ্ঠিত হবার পূর্বেই বহু ঘটনার কথা বলতে পারেন। তাঁদের বিশেষ প্রকৃতিই তাঁদেরকে মানুষের

---

১২৬. স্পেনের দার্শনিক মাসলামা ইবনে আহমদ আলমাজরিতীর গ্রন্থ 'আলগায়াতুল হাকিম।'

১২৭. সম্ভবত আরমেয়িক ভাষা; অর্থ—কথোপকথনে তুমি কুহক উচ্চারণ কর আর নিদ্রায় তাই ঘটে (?)।

১২৮. কোরান ৬, ১৮, ৭৩; ৩৪, ১।

মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণী বলে চিহ্নিত করে। এরূপ করতে তাঁরা কোন প্রকার সাধনা নক্ষত্রপুঞ্জের প্রভাব বিচার কিংবা অন্য কোন মাধ্যমের দ্বারস্থ হন না। তাঁরা জন্মগতভাবেই বিশেষ প্রকৃতির সহায়তায় এ সকল উপলব্ধি প্রকাশ করে থাকেন বলেই আমরা দেখতে পাই। এঁদের মধ্যে দৈবজ্ঞরা, যারা স্বচ্ছ বস্তু যেমন দর্পণ, জলপূর্ণ পাত্র এবং জীবজন্তুর হৃদপিণ্ড, যকৃৎ ও অস্থির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপের সহায়তা গ্রহণ করেন। অনেকে পশু-পাখির ডাক ও গতিবিধি বিবেচনা করেন। অনেক নুড়ি পাথর, গমের দানা ও খেজুরের আঁটি চালনা করেন। এ সকল কিছুই মানব সমাজে বিদ্যমান; এগুলোকে অস্বীকার বা তুচ্ছ করবার সাধ্য কারও নেই। এরূপ ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিরা তাদের জিহ্বার উপর শব্দাবলি নিক্ষিপ্ত হয় ও তারা সংবাদ প্রদান করেন। এরূপ ঘুমন্ত ও মৃত ব্যক্তিরা নিদ্রার প্রারম্ভে ও মুমূর্ষু অবস্থায় অদৃশ্যের সংবাদ দিয়ে থাকে। এরূপ সুফীদের মধ্যকার যোগসাধকদের অদৃশ্য তথ্য উপলব্ধির বিভূতি সর্বত্র পরিচিত।

আমরা এখন এ সকল উপলব্ধির উপর কথা বলব। আমরা প্রথমে ইন্দ্রজাল সম্পর্কে আলোচনা করব। পরে একের পর এক শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করব। এর পূর্বে মানুষের জীবাত্মা কীভাবে আমাদের পূর্ব বর্ণিত বিষয়সমূহে উপলব্ধির যোগ্যতা অর্জন করে, তৎসম্পর্কে একটি ভূমিকা দেয়া প্রয়োজন। তা এই যে, জীবাত্মা একটি আত্মিক শক্তি হিসাবে অন্যান্য আত্মিক শক্তির মধ্যে বিরাজমান, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সে শক্তি থেকে দেহ ও তার বিভিন্ন অবস্থার মাধ্যমেই বাস্তবে আগমন করে। এ বিষয়টি প্রত্যেকেরই উপলব্ধিযোগ্য। এখন যে বস্তু শক্তিতে অস্তিত্ববান, তার জন্য অবশ্যই একটি গঠন ও উপাদান বিদ্যমান। এ জীবাত্মার সেই গঠন, যা দ্বারা তা পরিপূর্ণতা লাভ করে, তা হল উপলব্ধি ও মননের নামান্তর মাত্র। তা প্রথমে এমন একটি শক্তি হিসাবে বিরাজ করে, যা উপলব্ধি গ্রহণে এবং বিষয়াদির সার্বিক ও আংশিক চিত্র অনুধাবনে সক্ষম। এরপর তা দেহের সান্নিধ্যে এসে কার্যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অস্তিত্ববান হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। এখানে সে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে বাস্তব উপলব্ধিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে এবং উক্ত উপলব্ধিসমূহ হতে একের পর এক আগত সার্বিক ধারণার সাহায্যে আকারাদি মননের শক্তি অর্জন করে। এভাবে তার বাস্তব উপলব্ধি ও মনন তার সত্তাকে পরিপূর্ণ করে তোলে। তখন জীবাত্মার অবস্থা হয় একটি আধারের ন্যায়, যার উপর উপলব্ধির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে একের পর এক আকারাদি প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এজন্য শিশুকে তার জাত অবস্থায় তার সহজাত উপলব্ধিতে অক্ষম দেখা যায়। সে নিদ্রা, দিব্যদৃষ্টি বা অন্য কোন উপায়ে উপলব্ধি অর্জন করতে পারে না। কারণ তার যে গঠন অমিশ্র উপলব্ধি ও মননের সত্তা হিসাবে বিরাজমান, কখনও তা সার্বিকতার ধারণা অর্জনে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়নি। অতঃপর তার সত্তা যখন বাস্তবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে, তখন দেহের মধ্যে অবস্থান পর্যন্ত তার দুই প্রকারের উপলব্ধি লাভ হয়ে থাকে। একটি উপলব্ধি সম্পূর্ণ দেহজাত, দেহযন্ত্রের সাহায্যেই সে তার সাথে পরিচিত হয় এবং অন্যটি একান্তই সত্তাজাত, তাতে কোন মাধ্যমের অবকাশ নেই। বরং দেহ ও তার পঞ্চেন্দ্রীয়, তাদের তৎপরতার দ্বারা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কারণ ইন্দ্রিয়গুলো তাদের প্রকৃতিগত স্বভাবের জন্য সর্বদা তাকে প্রকাশ্য দেহজ উপলব্ধির দিকেই আকর্ষণ করতে থাকে।

কখনও সে বহির্দেশ থেকে অন্তর্দেশের দিকে মগ্ন হয় আর তখনই ক্ষণিকের জন্য দেহের আবরণ ছিন্ন হয়ে যায়। কখনও এটা হয় মানুষের সর্বসাধারণ বৈশিষ্ট্য নিদ্রার মাধ্যমে আবার কখনও কতক লোকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য যাদু চালনা বা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সুফী সাধাকদের সাধনার মাধ্যমে এ সময় জীবাত্মা তার উর্ধ্বস্তরস্থিত সত্তাসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে সমর্থ হয়। কারণ, আমরা যেমন পূর্বে বলেছি, উক্ত জীবাত্মা ও উর্ধ্বস্তরের দিকের মধ্যে সংযুক্তি বিদ্যমান। এ সকল সত্তা একান্তই আত্মিক। তারা অমিশ্র উপলব্ধি ও বাস্তব মনন। তাদের মধ্যেই বাস্তব জগতের আকারাদি ও তাৎপর্যাদি বর্তমান, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং জীবাত্মা সেখান থেকে ঐসকল আকারাদির কোন কিছু অবলোকন করে এবং তৎসম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে ফেলে। কখনও এ সকল উপলব্ধ আকৃতিকে ধারণা শক্তির উপর ন্যস্ত করা হয় এবং সে তাকে একটা অভ্যস্ত কাঠামোতে রূপ দেয়। অতঃপর অনুভূতি এ উপলব্ধ বিষয়কে নিয়ে ফিরে আসে—কখনও বিমূর্ত আবার কখনও বা সমূর্ত এবং তার সংবাদ প্রদান করে। এটাই জীবাত্মার সেই অদৃশ্য সংবাদ প্রদানের যোগ্যতার বিশ্লেষণ। এখন আমরা আমাদের পূর্ণদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এর বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে বর্ণনা দানে ফিরে আসছি।

এদের মধ্যে যারা স্বচ্ছ পদার্থ যেমন দর্পণ, জলপূর্ণ পাত্র, কিংবা জীবজন্তুর হৃদপিণ্ড, যকৃৎ, অস্থিতে দৃষ্টিপাত করে কিংবা নুড়ি ও আঁটি চালনা করে, তারা সকলেই ঐন্দ্রজালিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য এরা জন্মগত দিক দিয়ে এ ব্যাপারে নিম্ন মর্যাদার অধিকারী। কারণ যথার্থ ঐন্দ্রজালিকের অনুভূতির আবরণ ছিন্ন করতে খুব একটা সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। অথচ এরা সমগ্র দেহজ অনুভূতিকে একটি মাত্র অংশের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করার সাহায্য গ্রহণ করে এবং এর মধ্যে দৃষ্টিশক্তিই তাদের বিচারে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। সে এর সাহায্যেই গভীর দৃষ্টিতে নিমগ্ন হয়, যতক্ষণ না তার উদ্দিষ্ট উপলব্ধি দেখা দেয় এবং সে তার সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করতে পারে। অনেক সময় ধারণা করা হয় যে, এ সকল ঐন্দ্রজালিক যা দেখতে পায়, তা বুঝি দর্পণের মধ্যে দৃষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু বিষয়টি তদ্রূপ নয়। বরং তারা অনবরত দৃষ্টিপাত করতে করতে দর্পণ দৃষ্টিসীমা থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। দর্পণও তাদের মধ্যে তখন সাদা মেঘের ন্যায় একটি আস্তরণ দেখা দেয়, যার উপরে তাদের উদ্দিষ্ট উপলব্ধিগুলো আকার ধারণ করে, এগুলোই তাদের উদ্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে হ্যাঁ বা না বোধক ইঙ্গিত প্রদান করে থাকে। অতঃপর তারা তাদের উপলব্ধির অবস্থা অনুসারে সংবাদ প্রদান করে। এ দর্পণ এবং তার উপরে যে আকৃতি দেখা দেয়, তাকে তারা সেই অবস্থাতেই উপলব্ধি করে না। বরং এর দ্বারা তারা অন্য একটি উপলব্ধির মধ্যে নীত হয়। তা একান্তই জীবাত্মা সম্পর্কীয়, দৃষ্টিশক্তিজাত নয়। বরং তা থেকেই জীবাত্মীয় উপলব্ধি অনুভূতিকে রূপ দেয়, যেমন তা সর্বজন পরিচিত। এমনিভাবে যারা জীবজন্তুর হৃদপিণ্ড বা যকৃতের উপর দৃষ্টি দেয়, কিংবা যারা জলে বা জলপূর্ণ পাত্রে দৃষ্টিপাত করে, কিংবা এ ধরনের অন্য যা কিছু আছে, তাদের সকলের একই অবস্থা। এদের মধ্যে অনেককে দেখেছি, যারা ধোঁয়ার সাহায্যে অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে পুনরায় প্রস্তুতির জন্য ইচ্ছা শক্তিকে ব্যবহার করে এবং উপলব্ধি অনুযায়ী সংবাদ প্রদান করে। তাদের ধারণা, তারা বায়ুর মধ্যে এমন সব

আকৃতি দেখতে পায়, যেগুলো দৃষ্টান্ত ও ইঙ্গিতের সাহায্যে তাদের উদ্দিষ্ট উপলব্ধির অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে। এদের বাহ্য অনুভূতি থেকে দূরে সরে যাওয়ার ব্যাপারটি পূর্বোক্ত অন্যান্যের তুলনায় অনেকটা লঘু প্রকৃতির। এ পৃথিবী সকল প্রকার অদ্ভুত ব্যাপারের জনক।

পশুপাখির গতিবিধি সম্পর্কীয় শাকুনবিদ্যা এমন একটি উপলব্ধি যা কোন বিশেষ পাখি বা পশুর আগমনে হঠাৎ কোন কোন লোকের মধ্যে অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ প্রদানের শক্তি জাগ্রত করে এবং সংশ্লিষ্ট পশু বা পাখির অন্তর্ধানের পর এ সম্পর্কে চিন্তা এনে দেয়। বস্তুত এটা জীবাত্মারই এমন একটি শক্তি, যা আগ্রহ ও চিন্তার মাধ্যমে শ্রুত বা দৃষ্ট কোন শাকুন চরিত্র বিচারের ফলে আলোড়িত হয়ে উঠে। আমরা যেমন পূর্বে বলেছি, এদের কল্পনা শক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়ে থাকে। সুতরাং এরা এদের দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়ের প্রতি এ শক্তিকে নিয়োজিত করে। এটা তাকে সেই উপলব্ধির জগতে পৌঁছে দেয়, যা নিদ্রায় কল্পনা শক্তি করে থাকে। নিদ্রায় যখন ইন্দ্রিয়গুলো অভিভূত, তখন কল্পনা শক্তি জাগ্রত অবস্থায় অনুভূত—দৃষ্ট বিষয়গুলোকে মাধ্যম করে এমন একটি বোধগম্য অবস্থার সৃষ্টি করে, যার ফলে স্বপ্ন দর্শন বাস্তব হয়ে উঠে।

ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিষয়টি এই যে, তাদের দেহের সাথে যুক্তিবাদী আত্মার সম্পর্ক খুবই দুর্বল। কারণ তাদের দেহস্থ সজীবতা বিনষ্ট হয়ে পড়েছে। সুতরাং তাদের এ দৈহিক ত্রুটি ও রোগগ্রস্ততার যাতনার জন্য জীবাত্মা ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে নিবিষ্ট বা মগ্ন হতে পারে না। অনেক সময় এর সূত্র ধরে তার উপর অন্য কোন দৃষ্ট আত্মা এসে ভর করে বসে এবং দুর্বলতার জন্য তা সে প্রতিরোধ করতে পারে না। ফলে সে ভূতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বস্তুত এভাবে তার সত্তার দুর্বলতার জন্য দেহের সজীবতা নষ্ট হওয়ার ফলে কিংবা তার দুর্বলতার সুযোগে অন্য কোন দুষ্ট আত্মা এসে ভর করায় যখন সে ভূতগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন সে অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে যায়। এ সময় তার উপলব্ধি আত্মিক জগতে ধাবিত হয়, সেখান থেকে কিছু আকৃতি বহন করে আনে এবং কল্পনা শক্তি তাকে কাজে লাগায়। কখনও এ অবস্থায় তার ইচ্ছা না থাকলেও কেউ যেন তার জিহ্বা দিয়ে কথা বলে যায়।

এ সকল শ্রেণীর লোকের উপলব্ধিতে সত্যের সাথে মিথ্যা মিশ্রিত থাকে। কারণ অনুভূতির অতীত হয়েও তারা বহিরাগত পরোক্ষ শক্তির সাহায্য ব্যতীত আত্মিক সংযোগ ঘটাতে সমর্থ হয় না। সুতরাং ঐ উৎস থেকেই তাদের উপলব্ধিতে মিথ্যা এসে উপস্থিত হয়, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। দৈবজ্ঞরাও এ উপলব্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত, তারাও সেই আত্মিক সংযোগের অধিকারী নয়। তারা উদ্দিষ্ট বিষয়ে চিন্তা শক্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। বস্তুত তারা এ ব্যাপারে অনুমান ও ধারণার বশবর্তী হয় এবং একেই সংযোগ ও উপলব্ধির প্রাথমিক অবস্থা বলে মনে করে। এর ফলে তারা অদৃশ্য জগতের জ্ঞানের দাবিদার হয়ে উঠে। কিন্তু যথার্থ অবস্থা এর বিপরীত।

এটাই এ সকল বিষয়ের ফলশ্রুতি। মাসউদী তাঁর 'মরুজুজ জাহাব' (বিগলিত স্বর্ণ) গ্রন্থে এ বিষয়ের উপর কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি যথার্থ বিশ্লেষণ উপস্থিত করতে

পারেননি। তাঁর বক্তব্য দৃষ্টে মনে হয়, এসকল তত্ত্বকথায় তাঁর তেমন গভীরতা ছিল না। এ কারণেই তিনি যোগ্য-অযোগ্য নির্বিশেষে সকলের নিকট থেকেই এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন।

যে সকল উপলব্ধির কথা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, তার প্রত্যেকটিই মানব সমাজের মধ্যে বিদ্যমান। আরবীয়রা বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে জানবার জন্য ঐন্দ্রজালিকদের দ্বারস্থ হত এবং তাদের যুদ্ধবিগ্রহে সত্য কোন পক্ষে, তা জানবার জন্য তাদের অদৃশ্য জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করত। সাহিত্যিকদের রচনায় এর ভুরিভুরি প্রমাণ বিদ্যমান। এদের মধ্যে প্রাক ইসলামী যুগে শিক্ক ইবনে আনমার ইবনে নজার এবং সাতিই ইবনে মাজেন ইবনে গাস্‌সান[১২৯]—এ দুইজন খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। শেষোক্ত জনের দেহকে কাপড়ের ন্যায় ভাঁজ করা যেত; কেননা তার দেহে মাথার খুলি ব্যতীত অন্য কোন হাড় ছিল না। এদের প্রসিদ্ধ কাহিনীর মধ্যে রবিয়া ইবনে মুজারের স্বপ্ন ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য। এরা তাকে হাবশীদের ইয়ামেন দখল, তাদের পরে মুজার গোত্রের রাজ্যলাভ এবং কোরায়শ গোত্রে মোহাম্মদী নবুয়তের আত্মপ্রকাশ সম্পর্কেও সংবাদ দিয়েছিল। সাতিহ মোবেজানের স্বপ্নেরও ব্যাখ্যা দিয়েছিল। পারস্য সম্রাট আব্দুল মসিহকে এ উদ্দেশ্যে তার নিকট পাঠালে, সে নবীর আবির্ভাব ও পারস্য সাম্রাজ্যের বিনাশের কথা বলেছিল। এ সকল সংবাদ খুবই সুপরিচিত। এভাবে আরবে দৈবজ্ঞের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। তাদের কাব্যে এদের কথা বর্ণিত হয়েছে। কবি বলেন,[১৩০]।

> আমি ইয়ামামার দৈবজ্ঞকে বললাম, আমাকে আরোগ্য কর,
> যদি আমাকে আরোগ্য করতে পার, তা হলে তুমি যথার্থই একজন চিকিৎসক।

অন্য এক কবি বলেন,

> আমি ইয়ামামার দৈবজ্ঞকে তার ইচ্ছামত দিবার কথা বলেছি
> এবং নজদের দৈবজ্ঞকেও যদি তারা আমাকে নিরোগ করতে পারে।
> তারা বলল, আল্লাহ্ তোমাকে নিরোগ করুন, আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের
> সাধ্য নেই তুমি তোমার দেহের মধ্যে স্বেচ্ছায় যে রোগ বহন করছে।
> ইয়ামামার দৈবজ্ঞ রাবাহ ইবনে ইজলা এবং নজদের দৈবজ্ঞ আল আবলক
> আল আসাদী।

এরূপ অদৃশ্যের সংবাদ উপলব্ধির একটি হল, অনেক লোকের জাগরণ থেকে বিচ্যুত হয়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ার সময় বাক্‌স্ফূর্তি হওয়া। তাদের যে বিষয়ে ঔৎসুক্য থাকে এবং যা জানতে ইচ্ছা করে, এ সময়ে সেই অদৃশ্য চমকিত হয়ে উঠে। এটা ঘুমের প্রারম্ভে জাগরণ থেকে বিচ্যুত হওয়া ও বাক্‌শক্তি লোপ পাওয়ার মুহূর্ত ছাড়া সংঘটিত হয় না। তখন সে কথা বলতে থাকে, যেন সে কথা বলতে বাধ্য এবং তা এ পর্যায়ে পৌঁছে যে, তা শোনা ও বোঝা যায়। এমনিভাবে হন্যমান ব্যক্তিদের দেহ থেকে

---

১২৯. শিক্ক ও সাতিহের এ গোত্র পরিচয় সন্দেহমুক্ত নয়। ইবনে খলদুন মাসউদীর নিকট হতে এটা বর্ণনা করেছেন।

১৩০. কবির নাম—উরুয়া ইবনে হিজাম আল উদরী। পরের কবিও তিনিই।

মস্তক বিচ্যুত হওয়ার সময় তাদের বাক্‌স্ফূর্তি ঘটে। অনেক নিষ্ঠুর অত্যাচারীদের কথা জানতে পেরেছি, তারা বন্দীদের মধ্যে অনেককে এজন্যই হত্যা করত, যাতে হননের সময় তাদের বক্তব্য হতে নিজেদের ব্যক্তিগত পরিণাম সম্পর্কে জানতে পারে। কিন্তু তা সন্তোষজনক হত না। মাসলামা তাঁর 'আল গায়াত' নামক গ্রন্থে অনুরূপ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। যদি কোন ব্যক্তিকে তিল তৈলপূর্ণ একটি পিপায় আবদ্ধ করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শুধুমাত্র ডুমুর ও বাদাম খেতে দেয়া হয়, তা হলে তার দেহের ধমনী ও করোটি ছাড়া সমুদয় মাংস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অতঃপর তাকে তেল থেকে উঠিয়ে বাতাসের সংস্পর্শে শুষ্ক হতে দিলে এবং এ সময় তার নিকট বিশেষ সাধারণ সর্ববিষয়ের পরিণাম জিজ্ঞাসা করলে সে তার সংবাদ দিতে সমর্থ হবে। এটা যাদু সম্পর্কীয় একটি গর্হিত প্রক্রিয়া, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ থেকে বুঝতে পারা যায় যে, মানব সমাজে কত অদ্ভুত বিষয়েরই না অস্তিত্ব রয়েছে।

অনেক লোক সাধনার জন্য এ অদৃশ্য উপলব্ধি লাভের প্রয়াস পেয়ে থাকে। তারা প্রচেষ্টার দ্বারা দৈহিক সমস্ত শক্তিকে নিশ্চল করে কৃত্রিম মৃত্যুর সৃষ্টি করে এবং জীবাত্মা যদ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, এমন সমুদয় বিষয় নিশ্চিহ্ন করে দেয়। অতঃপর জীবাত্মাকে শুধু তপজপের সাহায্যে তার শক্তি বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত করা হয়। এ শক্তি কেন্দ্রীভূত চিন্তা ও দীর্ঘস্থায়ী অনাহারের ফলে ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। এটা নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত যে, দেহে যখন মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, তখন অনুভূতি ও তজ্জনিত আবরণ ছিন্ন হয়ে যায় এবং জীবাত্মা তার সত্তা ও জগৎ সম্পর্কে অবহিতি লাভ করে। এজন্য তারা সাধনার দ্বারা সেই অবস্থার সৃষ্টি করে, যাতে মৃত্যুর পরে তারা যা লাভ করত, তা যেন মৃত্যুর পূর্বেই লাভ করতে পারে। এর ফলে জীবাত্মা অদৃশ্যের জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। এদের মধ্যে একশ্রেণীর যাদু সাধক রয়েছে, যারা উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় সাধনা করে অদৃশ্যের সংবাদ জ্ঞাপন এবং সৃষ্টি জগতের উপর প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা চালায়। এদের অধিকাংশই উত্তরে দক্ষিণের অসমভাবাপন্ন অঞ্চলগুলোতে বিদ্যমান। বিশেষ করে এরা হিন্দের অধিবাসী। সেখানে এদেরকে 'যোগী' বলে ডাকা হয়। এই সাধনার রীতি-নীতি সংকলিত তাদের বহুগ্রন্থ বিদ্যমান এবং তাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কীয় সংবাদাদি যথার্থই অদ্ভুত।

অবশ্য সুফী সাধকদের সাধনা মূলত ধর্মীয় এবং এ সকল অপবিত্র উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত। তাঁরা তাঁদের সকল আগ্রহ ও ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত ও নিয়োজিত করেন। যাতে তা দ্বারা তাঁরা অধ্যাত্মা ও একত্ববাদীদের রহস্য পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারেন। তাঁদের সাধনার মধ্যে একাগ্রতা ও অনাহারের মাধ্যমে নামজপের পরিমাণকে বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং এভাবেই তাঁদের সাধনার উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে। কারণ জীবাত্মা নামজপের আহার্য পেয়ে বেড়ে উঠলে, অতি সহজেই আল্লাহ্‌তত্ত্বের নৈকট্য লাভ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু এ সাধনাকেই নামজপ থেকে বিচ্যুত করলে তা শয়তানী কর্ম হয়ে দাঁড়ায়। অদৃশ্যের সংবাদ জানা ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করার যে সকল শক্তি সুফী সাধকদের মধ্যে দেখা যায়, তা একান্তই আকস্মিক। কারণ সাধনার

প্রারম্ভে এরূপ কোন শক্তি লাভের উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না। যদি এরূপ কোন উদ্দেশ্যে তাঁদের সাধনা নিয়োজিত হয়, তবে তা ত আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হল না। বরং তা প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার ও অদৃশ্যের উপর অবহিতি লাভের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত। এরূপ হলে সম্পূর্ণ ব্যাপারটিই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় এবং এরূপ করা প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থাপনের মতই গর্হিত। কোন এক সুফী সাধক বলেছেন, "যে তত্ত্বজ্ঞানের জন্যই তত্ত্বজ্ঞানের সাধনা করে, সে দ্বিতীয় কোন কিছুর কথাই বলে। কারণ তাদের সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য উপাস্য, অন্য কিছু নয়। সুতরাং এ সাধনার পথে আকস্মিকভাবে যদি কিছু তাঁদের লাভ হয়, তা আকস্মিক লভ্যই, মূল উদ্দেশ্যগত নয়। তাঁদের অনেকেই এ আকস্মিক লভ্য থেকে দূরে সরে থাকেন এবং তৎপ্রতি দৃষ্টি দেন না। তাঁরা আল্লাহ্‌কেই চান, অন্য কিছু নয়। অবশ্য তাঁদের এ আকস্মিক লব্ধশক্তি সকলের নিকট পরিচিত। এরূপ অদৃশ্য বিষয় ও মনের গোপন কথা বলবার শক্তিকে তাঁরা 'মনোজ্ঞান' ও 'দিব্যজ্ঞান' বলে থাকেন এবং প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতাকে বলেন 'বিভূতি'। এগুলোর কোনটাই তাঁদের জন্য অন্যায্য নয়। উস্তাদ আবু ইসহাক আল ইসফারায়নী ও আবু মুহম্মদ ইবনে আবু জায়েদ আল মালেকী।[১৩১] অন্যান্যের মধ্যে এ সকল শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চেয়েছেন। তাঁরা অলৌকিকত্বের সাথে বিভ্রান্তি সৃষ্টির ভয়েই এরূপ করেছেন। কিন্তু কালাম শাস্ত্রবিদদের বিশ্লেষণে ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা তাদের মধ্যে যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে, তাই যথেষ্ট। বিশুদ্ধ হাদিসে প্রমাণিত হয়েছে যে, হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে দিব্য কথক বিদ্যমান, উমর তাদেরই একজন।" সাহাবীদের মধ্যে অনুরূপ পরিচিত বহু ঘটনা ঘটেছে, যদ্বারা এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন হজরত উমর (রাঃ)-এর বাক্য—"হে সারিয়া, পাহাড়।" ইনি সারিয়া ইবনে যুনাইম, বিজয়াভিযানকালে ইরাক যুদ্ধরত এক মুসলিম সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। পৌত্তলিকদের সাথে এ যুদ্ধে পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি পশ্চাদপসারণের কথা চিন্তা করছিলেন। তাঁর নিকটেই একটি পাহাড়, সেইদিকে যাওয়াই তাঁর ইচ্ছে; এমন সময় বিষয়টি হজরত উমর (রাঃ)-এর দৃষ্টিগোচর হল। তিনি তখন মদিনায় মিম্বরের উপরে দাঁড়িয়ে খোতবা পাঠ করছিলেন, জোরে চিৎকার করে বললেন, "হে সারিয়া, পাহাড়!" সারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে থেকেই তা শুনতে পেলেন এবং হজরত উমর (রাঃ)-কেও দেখতে পেলেন। এ কাহিনী সর্বজন পরিচিত।

অনুরূপ একটি ব্যাপার হজরত আবু বকরের তৎকন্যা হজরত আয়েশা (রাঃ)-কে অন্তিম উপদেশ দানের সময় ঘটেছিল। তিনি আয়েশাকে তাঁর খেজুরের বাগান থেকে কয়েক ওসক[১৩২] পরিমাণ খেজুর দান করেছিলেন। পুনরায় এ অংশ অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের অপেক্ষা বিশিষ্ট হওয়ায় তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "তারা তোমারই দুইভাই ও দুইবোন"। আয়েশা বললেন, বোন ত শুধু আসমা, অপরটি কে? তিনি বললেন, "বিনতে খারেজার গর্ভে যে শিশুটি রয়েছে, তাকে আমি কন্যা রূপেই দেখছি।" পরে কন্যাই হয়েছিল।

---

১৩১. আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু জায়েদ' জন্মকাল ৩১৬-৩৮৬ (৯২৮-৯৯৬ খ্রি:) হি:।

১৩২. একটি পরিমাণ। এক 'ওসক'=ষাট 'সা' এবং এক সা = ২৩৪ তোলা।

এরূপ ঘটনা তাঁদের মধ্যে আরও বহু ঘটেছে, এমনকি তাঁদের পরবর্তী পুণ্যাত্মা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যেও দেখা গেছে। অবশ্য সুফী সাধকগণ বলে থাকেন যে, নবুয়তের সময় এরূপ ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। কারণ নবীর উপস্থিতিতে সাধকদের দিব্য অবস্থা অবশিষ্ট থাকে না। এমনকি, তাঁরা বলেন, কোন সাধক যদি নবীর মদিনায় আসেন, তা হলে সেখান থেকে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর দিব্য অবস্থা অন্তর্হিত থাকে। আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথ দান করুন এবং সত্যের দিকে আমাদেরকে পরিচালিত করুন।

বাহলুল গোষ্ঠী

এসকল অধ্যাত্মবাদী সুফী সাধকদের মধ্যে 'বাহলুল' নামে পরিচিত একটি গোষ্ঠী বিদ্যমান। তাঁরা অনেকটা নির্বোধ প্রকৃতির, বুদ্ধিমানদের অপেক্ষা ভূতগ্রস্তদের সাথেই তাদের মিল অধিক। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁদের জন্য ওলীর মর্যাদা ও সত্য সাধকের অবস্থা নিশ্চিত বলে বিবেচনা করা হয়। এ ব্যাপারে অধ্যাত্মপন্থীদের মধ্যে যাঁরা তাদের অবস্থা বুঝেন, তাঁরাই এ ধারণা পোষণ করে থাকেন। কিন্তু তথাপি এ বাহলুলপন্থীরা ধর্মীয় বিধিনিষেধের আওতাভুক্ত নন। তাঁরা অদৃশ্যের ব্যাপারে অদ্ভুত সংবাদ পরিবেশন করে থাকেন। কারণ তাঁরা কোন বিষয়ে বাধ্যবাধকতার অন্তর্ভুক্ত নন। এজন্য তাঁরা এ ব্যাপারে যথেচ্ছা কথা বলেন এবং অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। অনেক সময় ধর্মশাস্ত্রবিদরা তাঁদের আধ্যাত্ম মর্যাদা সম্পর্কে অস্বীকৃতি জ্ঞান করেন। কেননা তাঁরা ধর্মীয় বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত নন। কারণ যথাবিহিত উপাসনা ব্যতীত ওলী হওয়া সম্ভব নয় বলে তাঁরা ধারণা করেন। বস্তুত এরূপ ধারণা করা ভুল। কারণ, 'আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন।'[১৩৩] এজন্য ওলী হওয়া উপাসনা বা অন্যকোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। যখন মানবীয় জীবাত্মা অস্তিত্ববান, তখন আল্লাহ্ তাকে যে-কোন অনুগ্রহের দ্বারা বিশিষ্ট করে তুলতে পারেন। এ বাহলুল গোষ্ঠীর যুক্তিবাদী আত্মা ভূতগ্রস্তদের মত বিনষ্ট বা বিকৃত হয়নি। শুধু তাদের মধ্যে সেই বুদ্ধি নেই, যদ্বারা তাঁরা ধর্মীয় বিধিনিষেধের আওতাভুক্ত হতে পারেন। এটা জীবাত্মার একটি বিশেষ গুণ। বস্তুত এ বুদ্ধি কতিপয় প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বাহন; যদ্বারা মানুষের দৃষ্টি গভীর হয়, তার জীবিকার অবস্থাগুলো সে বুঝতে পারে এবং সংসারধর্ম পালন করতে সক্ষম হয়ে উঠে। কাজেই যখন সে তার জীবিকা অন্বেষণে পার্থক্য বিবেচনা করতে এবং সংসারধর্ম পালন করতে সক্ষম হয়, তখন তার পক্ষে ধর্মীয় বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত থেকে আপত্তি উত্থাপনের কোন অবকাশই থাকে না। কারণ, এ ব্যাপারে তাকে পরকালের দায়িত্বমুক্ত হতেই হবে। কেননা, সে ত এমন ব্যক্তি নন, যার এ বিশেষ গুণ কোন কারণে রহিত হয়েছে, অথচ তার জীবাত্মাগত অস্তিত্ব বিদ্যমান।

---

১৩৩. কোরান ৫, ৫৪; ৫৭, ২১; ৬২, ৪।

সুতরাং পূর্বোক্ত বাহলুলের অবস্থা হল এই যে, তাঁর জীবাত্মাগত অস্তিত্ব বিদ্যমান, কিন্তু সেই বুদ্ধি নেই, যদ্বারা তিনি ধর্মীয় বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত হতে পারেন অর্থাৎ তাঁর সংসারী হয়ে জীবিকা অর্জনের জ্ঞান নেই। এমন হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে কাউকেও ধর্মীয় বিধি-নিষেধ পালনের বিবেচনার উপর নির্ভর করে অধ্যাত্মশক্তি দান করেন না। যদি এ বক্তব্য শুদ্ধ হয়, তা হলে জেনে রাখুন, অনেক সময় তাঁদেরকে ভূতগ্রস্ত বলে ভুল করা হয়; অথচ তাঁরা তা নন। কারণ ভূতগ্রস্তদের যুক্তিবাদী আত্মা বিনষ্ট হয়ে তাদেরকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে। আপনার জন্য তাদের পার্থক্য বিবেচনার কতিপয় নিদর্শন বিদ্যমান। একটি হল, এ বাহলুলরা একটি উদ্দেশ্য পোষণ করেন এবং তাঁরা নামজপ ও উপাসনা থেকে বিরত নন। অবশ্য তাঁদের এ উপাসনায় ধর্মীয় শর্তাদির কোন স্থান নেই। কারণ তাঁরা ধর্মীয় বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত নন, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। কিন্তু ভূতগ্রস্তদের মোটেও কোন উদ্দেশ্য নেই। অন্য একটি হল, তাঁরা জন্মগতভাবেই নির্বোধ হয়ে এসেছেন। কিন্তু ভূতগ্রস্তদের মধ্যে সুস্থ অবস্থায় জীবনের একটা অংশ কাটাবার পর সম্পূর্ণ দৈহিক ও প্রকৃতিগত কারণে ভূতগ্রস্ততা দেখা দিয়েছে এবং এর ফলে তাঁদের যুক্তিবাদী আত্মা বিনষ্ট হয়ে তাঁরা উন্মাদ হয়ে গেছে। অন্য একটি হল, এ বাহলুলরা মানুষের ভাল-মন্দের ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপরতা দেখিয়ে থাকেন। কারণ তাঁরা ধর্মীয় বিধি-নিষেধের অধীন নন বলে এ ব্যাপারে তাঁদের কোন অনুমতি প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ভূতগ্রস্তদের এরূপ কোন তৎপরতা নেই। এ পরিচ্ছেদে আমাদের বক্তব্য এখানেই শেষ হল। আল্লাহ্ সঠিক পথ দেখান।

বালুকা লিখন

অনেক লোকের ধারণা, অনুভূতি বিরহিত না হয়েও অদৃশ্য উপলব্ধি করা সম্ভব। তাদের মধ্যে জ্যোতিষীরা জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা বলে থাকেন। আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের ইচ্ছা, উপাদানের উপর তাদের প্রভাব, তাদের পরস্পর দৃষ্টিপাতের ফলে প্রকৃতিসমূহের মধ্যকার প্রতিক্রিয়া এবং তজ্জনিত বায়ুর বিশেষ অবস্থা প্রভৃতি বিচারের ফলে তা সম্ভব হয়ে উঠে। এ সকল জ্যোতিষী প্রকৃত প্রস্তাবে অদৃশ্যের কোন কিছু জানেন না। তাদের কার্যটি মূলত নক্ষত্রের প্রভাব ও তজ্জনিত বায়ুর বিশেষ অবস্থার উপর বিশেষ ধারণা ও প্রকাশ্য অনুমানপ্রসূত। এরই উপর বিশেষ বিবেচনা প্রয়োগ করে জ্যোতিষিগণ জগতের বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর বিস্তারিত সংবাদ প্রদান করে থাকেন, যেমন বাতলিমুস (টলেমী) এ সম্পর্কে বলেছেন। আমরা আল্লাহ্ চাহে ত যথাস্থানে এর অন্যায্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করব। যদি এর ন্যায্যতা প্রমাণও হয়, তথাপি এটা ধারণা ও অনুমান মাত্র, আমাদের পূর্ব বর্ণিত বিষয়াদির কোন কিছু নয়।

এদের মধ্যে সাধারণ একদল লোক আছেন, যাঁরা বিশেষ প্রক্রিয়ায় অদৃশ্যের সংবাদ জ্ঞাপন ও সৃষ্টিজগতের রহস্য বিশ্লেষণ করে থাকেন। তাঁরা তার নাম দিয়েছেন

'বালুকা লিখন'। তাঁদের কার্যধারার সাথে তুলনা করেই এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার মর্ম হল এই যে, তাঁরা বিন্দুর সাহায্যে চারস্তরবিশিষ্ট কতিপয় ছক নির্মাণ করেছেন, যেগুলো বিন্দু সংখ্যার এককত্ব, যুগ্মত্ব ও এতদুভয়ের মধ্যে সমত্বের দরুন বিভিন্ন হয়ে থাকে।

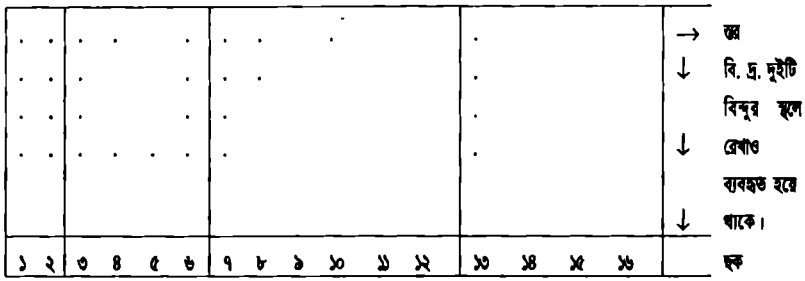

এভাবে ষোলটি ছক গঠিত হয়[১৩৪]। কেননা এদের মধ্যে সবগুলো একক বিন্দু হতে পারে অথবা যুগ্ম বিন্দু হতে পারে। এর ফলে দুটি ছক পাওয়া যায়। যদি এদের মধ্যে একটি স্তরে মাত্র একক বিন্দু থাকে তা হলে চারটি ছক পাওয়া যায়। যদি দুটি স্তরে একক বিন্দু হয়, তবে ছয়টি ছক পাওয়া যেতে পারে। যদি তিনটি স্তরে একক বিন্দু হয়, তা হলেই আরও চারটি ছক লাভ হয়। এভাবে ষোলটি ছক নির্মাণ করে তারা এদের প্রতিটির পৃথক নামকরণ এবং শুভাশুভের দিক থেকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করেছেন। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব সম্পর্কেও তাঁরা তাঁদের ধারণামত ষোলটি স্বাভাবিক ঘর নির্ধারণ করেছেন। তারা যেন কক্ষস্থিত বারটি রাশি ও চারটি দিক। তাঁরা প্রতিটি ছকের জন্য একটি ঘর, কিছু রেখা এবং জাগতিক মৌল উপাদানগুলোর উপর তাদের বিশেষ নির্দেশের ব্যবস্থা করেছেন। এভাবে তাঁরা এমন একটি বিদ্যা গড়ে তুলেছেন, যাকে তাঁরা জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুরূপ বিচার-বিবেচনার অধিকারী বলে মনে করেন। কিন্তু বাতলিমুসের ধারণা অনুসারে জ্যোতিষশাস্ত্র নক্ষত্রবলয়ের বিশেষ প্রভাবজাত। অথচ বালুকা লিখন বিশারদ্‌দের শাস্ত্রটি একান্তই প্রথাগত গঠন ও আকস্মিম ধারণানির্ভর। এর সত্যতা সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই।[১৩৫]

---

১৩৪. এ ছকসমূহের নকশাটি রোজনথাল হতে দেয়া হল। তিনি বালুকা লিখনকে 'জিউমেনমী' বলে উল্লেখ করেছেন।

১৩৫. এর পর ইবনে খলদুনের সংযোজন বলে স্থিরীকৃত কয়েকটি অনুচ্ছেদের অনুবাদ রোজেনথালে বিদ্যমান। আমরা আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে এটা পাইনি। তথাপি বিষয়ের অনুরোধে ও সম্পূর্ণতার তাগিদে এর অনুবাদ নিম্নে তুলে দিলাম।

"অবশ্য বাতলিমুস শুধু জন্ম ও সংকট সংক্রান্ত বিষয়াদিই আলোচনা করেছেন, যা তাঁর মতে পৃথিবীর মৌল উপাদানের উপর নক্ষত্র ও নক্ষত্রবলয়ের প্রভাবের ফলে সংঘটিত হয়। পরবর্তী জ্যোতিষশাস্ত্রীরা যদিও বহুবিধ সমস্যার কথা আলোচনা করেছেন, তাঁরা এর গভীরে প্রবেশ করে প্রতিটি প্রভাবকে নির্দিষ্ট নক্ষত্র বলয়ের সাথে বিশ্লিষ্ট করেছেন এবং তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছেন। এর ফলে তাঁরা যে সকল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তা ফলাফলের দিক হতে বাতলিমুসের নির্দেশের অনুরূপ।

বালুকা লিখনবিদরা ধারণা করেন যে, এ শাস্ত্র জগতের প্রাচীনকালীন নবুয়তের অন্তর্গত। কখনও তাঁরা একে হজরত দানিয়াল (আঃ) ও হজরত ইদরিস[১৩৬] (আঃ)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করেন, যেমন প্রতিটি শিল্পকর্ম সম্পর্কে করা হয়ে থাকে। কখনও একে ধর্মানুমোদিত বলে দাবি করে হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর এ বাক্য প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করেন। তিনি বলেছিলেন, কোন এক নবী লিখতেন যার লিখন তার সাথে মিলবে, তা তাই। এ হাদিসে বালুকা লিখন সম্পর্কে কোন ধর্মীয় বিধান নেই; যারা এ বিষয়ে অজ্ঞ তারাই এরূপ প্রমাণের উপর বিশ্বাস করে থাকে। কারণ হাদিসটির অর্থ হল, কোন এক নবী লিখতেন, অতঃপর তাঁর লিখনের সময় ওহী এসে উপস্থিত হত। এটা অসম্ভব নয় যে, কোন কোন নবীর ওহী অবতরণকালীন সময়ের এরূপ অভ্যাস ছিল। সুতরাং যার লিখন ওই নবীর সাথে মিলবে, তা তাই হবে। অর্থাৎ এটা শুদ্ধ হবে, যদি লিখনের সাথে ওহী এসে তার শক্তি বৃদ্ধি করে। কারণ ঐ নবীরও এরূপই অভ্যাস ছিল, লিখনের সময় তাঁর নিকট ওহী এসে উপস্থিত হত। কিন্তু ওহী থেকে বিচ্যুত করে শুধু লিখনকে গ্রহণ করলে তা হতে পারে না। এটাই হাদিসের অর্থ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

যখন[১৩৭] তাদের ধারণামত তারা অদৃশ্যের সংবাদ জানার জন্য আগ্রহী হয়, তখন কোন কাগজখণ্ড, বালুকা বা আটা নিয়ে তাতে চারটি স্তর অনুসারে সারিবদ্ধভাবে

এটা জেনে রাখুন যে, জীবাত্মা সম্পর্কীয় গুহ্যতত্ত্ব জাগতিক উপাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। সুতরাং উক্ত জীবাত্মা কোন প্রকার নক্ষত্র বা নক্ষত্রবলয়ের প্রভাবাধীন নয় এবং তারাও এর সম্পর্কে কোন প্রকার ইঙ্গিত প্রদান করে না। নক্ষত্র ও নক্ষত্রবলয় সম্পর্কীয় সমস্যাদি জ্যোতিষশাস্ত্রে এজন্যই আলোচিত হয়েছিল, যাতে তা হতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। কিন্তু ব্যাপার এই যে, তারা তাদের যথাস্থানে ব্যবহৃত হচ্ছে না।

এরপর বালুকা লিখনবিদ্দুদের আবির্ভাব ঘটল। কিন্তু তাঁরা নক্ষত্র ও নক্ষত্রবলয়ের প্রভাব বিচারের ধারা অক্ষুণ্ন রাখতে পারলেন না। কারণ তা করতে গেলে তাঁদেরকে যন্ত্রাদির দ্বারা নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করতে হয় এবং অংক করে তার প্রভাবের হ্রাস-বৃদ্ধি সংযোজন করে নিতে হয়। এটা খুবই কঠিন কাজ। সেইজন্য তাঁরা এ বিন্দু সংখ্যার ছক আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা ধারণা করেন যার রাশি ও দিক চতুষ্টয় মিলিয়ে ষোলটি ঘর বিদ্যমান এবং তাঁরা এগুলোকে শুভ, অশুভ ও গ্রহাদির ন্যায় মিশ্রিত অবস্থা বিশিষ্ট বলে ভাগ করেছেন। তাঁরা এগুলো জন্মসংক্রান্ত ব্যাপারেই ব্যবহার করে থাকেন। তাঁরা এখানে বিন্দু সংখ্যার ছক মিলিয়ে বিবেচনা করেন, যেমন অন্যত্র সমস্যাদির নির্দেশ অনুসরণ করে বিচার করা হয়। কিন্তু এ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার্য উপাদানগুলো স্বাভাবিক নয়, যেমন পূর্বে আমরা এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছি।

বহু নগরবাসী, যাদের কোন কাজ নেই, তারা জীবিকা উপার্জনের উপায় হিসাবে বালুকা লিখনবিদ্যার অভ্যাস করে থাকেন। তাদের দ্বারাই বালুকা লিখন বিদ্যার ভিত্তি ও তার রীতি-নীতি সম্পর্কে বহু পুস্তক লিখিত হয়েছে। আবু আবদুল্লা মুহম্মদ (ইবনে উসামন?) আজ জানাতী ও অন্যরা এ বিষয়ে কাজ করেছেন।

অনেক বালুকা লিখনবিদ তাঁদের নির্মিত ছকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অতি মানবিক উপলব্ধি লাভের চেষ্টা করেছেন। এর ফলে তাঁরা তেমনি ধরনের কিছুটা সঙ্গতি অর্জন করেছেন, যেমন সঙ্গতি অধ্যাত্ম উপলব্ধির জন্য জন্মগতভাবে অনেকের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা পরে এ সম্পর্কে বর্ণনা করব। এ সকল লোক বালুকা লিখনবিদদের মধ্যে অনেকখানি উন্নত অবস্থার অধিকারী।

১৩৬. দানিয়াল বাইবেলে উল্লেখিত পুণ্যবান ব্যক্তি। হজরত ইদরিস কোরানে নবী হিসাবে উল্লেখিত হয়েছেন। তিনি খুব সম্ভব বাইবেলে উল্লেখিত ইনোস (?)।

১৩৭. এর পূর্বে রোজেনথাল পূর্বের অনুচ্ছেদটির সাথে মিশ্রিতভাবে আরও কয়েকটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছেন। আমরা ব্যতিক্রমী অংশের অনুবাদ নিম্নে সন্নিবেশিত করছি।

'আল্লাহ্ বলেন, আমরা আমাদের প্রেরিত পুরুষদেরকে একে অপরের উপর বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছি। কারণ, তাঁদের মধ্যে অনেকের নিকট কোন প্রকার ইচ্ছা বা আগ্রহ ব্যতিরেকেই প্রত্যাদেশসহ ফেরেশতা এসে কথা বলেছে। অন্য অনেকের মধ্যে একটা মানবিক স্পৃহা ছিল; তাঁরা মানব সমাজে বিচরণ করবার সময় অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন, অনেক বাধ্যবাধকতা দেখা দিয়েছে। সুতরাং তাঁদের অন্তরসত্তা এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য অলৌকিক সত্তার প্রতি উন্মুখ হয়েছে এবং আল্লাহ্ তাঁদেরকে প্রত্যাদেশের অনুগ্রহ দানে ধন্য করেছেন। সুতরাং এ দিক হতে বিষয়টিকে ভাগ করা যায়, তাঁদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা প্রত্যাদেশের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না, অথচ তাঁদের নিকট প্রত্যাদেশ এসেছে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আবার অনেকে প্রস্তুতি নিবার পর তাঁদের নিকট প্রত্যাদেশ এসে পৌঁছেছে। ইসরাইলীদের কাহিনীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন নবী প্রত্যাদেশের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সুস্বর শোনার অভ্যাস করতেন। যদিও বিবরণটি প্রমাণসিদ্ধ নয়, তথাপি তার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। কারণ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বিশেষ গুণের দ্বারা নবুয়তের অনুগ্রহ প্রদান করে থাকেন। এক বিখ্যাত সুফী সাধকের কথা আমরা জানতে পেরেছি, যিনি আত্মিকভাবে বিভোর হওয়ার জন্য সঙ্গীত শ্রবণ করতেন। এর ফলে তিনি তাঁর আত্মিক জগৎ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে পড়েন। কারণ তিনি যে পর্যায়ে অবস্থান করছিলেন, তা নবুয়ত অপেক্ষা অনেকখানি নিম্ন মর্যাদার এবং আমাদের মধ্যে এমন কেহ নেই, যার জন্য একটি নির্দিষ্ট অবস্থান নেই।

যদি এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, কিছু সংখ্যক বালুকা লিখনবিদ তাদের বিন্দু সংখ্যার প্রতি নিবিষ্টচিত্ত অদৃশ্য উপলব্ধির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে, তা হলে তারা হয়ত বা অনুভূতির জগৎ বিচ্যুত হয়ে আত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে পৌঁছতেও পারে। এর মাধ্যমে তারা দৈহিক অনুভূতিসীমা অতিক্রম করতে পারে, যেমন পূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। এ ক্ষেত্রে একে ইন্দ্রজালের একটি অংশ মনে করতে হবে এবং এর তুলনা হবে অদৃশ্য উপলব্ধির জন্য অস্থি, জল, দর্পণ প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ন্যায়। এর ফলে বালুকা লিখনবিদরা সেই সকল লোক হতে পৃথক হয়ে পড়বে, যারা বাহ্যানুভূতি বিলুপ্তি ব্যতীতই শুধু অনুমান ও চিন্তার দ্বারা অদৃশ্য উপলব্ধির চেষ্টা করে থাকে।

নবীদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত এ লিখনের মাধ্যমে আত্মিক যোগ স্থাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকতে পারেন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও অনেকে বাহ্যানুভূতি রহিত হওয়ার জন্য উক্ত প্রক্রিয়ার শরণাপন্ন হতে পারে। কিন্তু এর ফলে যে ফলাফল লাভ হবে, তাতেও পার্থক্য থেকে যাবে। বালুকা লিখনবিদরা এ আত্মিক সংযোগের মাধ্যমে যা লাভ করবে, তা আত্মিক সংবাদ মাত্র। কিন্তু নবীরা তার মাধ্যমেই ফেরেশতার আগমন ও প্রত্যাদেশ লাভে ধন্য হবেন।

বালুকা লিখনবিদদের প্রক্রিয়ার সাথে কোন নবীর কোন সম্পর্ক নেই। কারণ এরূপ ধারণা ও চিন্তাপ্রসূত কার্যের দ্বারা তাঁর কোন সহায়তা হবে না। সুতরাং এরূপ কার্যাদিকে তিনি কখনও ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন না। এটাও বলতে পারেন না যে, সর্বসাধারণ যে কেহ উক্ত প্রক্রিয়া গ্রহণ করলে আত্মিক সংযোগ লাভ করতে পারবে। হাদিসের বর্ণনায় যেমন আছে, যার লিখন তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, তা তাই; এর অর্থ এই যে, তার লিখন তখনই শুদ্ধ হবে, যখন তার সাথে নবীর অনুরূপ প্রত্যাদেশ এসে যুক্ত হবে। কারণ উক্ত নবী, তাঁর এ লিখন প্রক্রিয়ার সময়ই তাঁর নিকট প্রত্যাদেশ এসে উপস্থিত হবে। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, উক্ত নবী এই প্রকার বালুকা লিখন পদ্ধতির মাধ্যমেই এমন এক আত্মিক স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন, যদ্বারা এ প্রক্রিয়ার বাহ্যিক ব্যবহার ছাড়াই এমন সকল সংবাদ প্রদান করতেন, যা প্রদান করবার জন্য বালুকা লিখনবিদরা চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু নবীসুলভ প্রত্যাদেশের সংযুক্তি হতে শুধু লিখন পদ্ধতিকে বিচ্যুত করে নিলে, তার মধ্যে সেই যথার্থতা অবশিষ্ট থাকে না। এটাই হাদিসটির অর্থ। আল্লাহ্ই অধিকতর উত্তম জ্ঞাতা।

বিন্দুগুলো সাজায়। পুনরায় তাকে চারবার পর পর সাজালে ষোলটি সারি দেখা দেয়। অতঃপর তারা যুগ্ম বিন্দুগুলোকে ছড়িয়ে দেয় এবং প্রত্যেক সারি থেকে যুগ্ম-অযুগ্ম যা কিছুই অবশিষ্ট থাকে, তা স্তরানুসারে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে রাখে। এর ফলে চারটি ছক দেখা দেয় এবং তাদেরকে পর পর আগত সারিতে বিন্যস্ত করে। পরে এগুলো থেকে পূর্বের ছকগুলোর পার্শ্বে প্রতিটি স্তর, বিপরীতমুখী ছকের অবস্থান ও তদন্তর্গত যুগ্ম-অযুগ্ম বিন্দুর বিবেচনায় আরও চারটি ছকের জন্ম দেয়। এভাবে এক সারিতে আটটি ছক সজ্জিত হয়ে উঠে। অতঃপর এ ছকগুলো থেকে প্রতি দুটির নিচে উক্ত ছকদ্বয়ের প্রতিটি স্তরের যুগ্ম-অযুগ্ম বিন্দুর অনুপাতে একটি করে ছক বিন্যস্ত করে এবং এভাবে পূর্বোক্ত আটটি ছকের আরও চারটি ছকের জন্ম হয়। পুনরায় তারা শেষোক্ত চারটির প্রতি দুটির নিচে অনুরূপভাবে আরও দুটি ছক বিন্যাস্ত করে এবং শেষোক্ত দুটির নিচে আরও একটি ছকের জন্ম দেয়। পুনরায় এ পঞ্চদশ ছকটি থেকে প্রথম ছকটির সাথে আরও একটি ছক তৈরি করে ষোলটি ছক পূর্ণ করে।[১৩৮] অতঃপর তারা উক্ত ছকগুলোর লিখন অনুসারে তাদের আকৃতিগত শুভাশুভের প্রকৃতি বিচার করে এবং সৃষ্ট জগতের বিভিন্ন বস্তুর উপর তাদের দৃষ্টি, অনুপ্রবেশ, মিশ্রণ ও ইঙ্গিতের ধারা নির্ধারণ করে। সে এক অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ।

মানব সমাজে এ বিদ্যার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। এ সম্পর্কে নানা প্রকার পুস্তক লিখা হয়েছে এবং পূর্ব ও উত্তরসূরিদের মধ্যে বহু জ্ঞানী ব্যক্তি এ বিদ্যায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। পাঠক আপনি যেমন দেখেছেন, এটা নির্দেশনা ও কপোল কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যথার্থ কথা হল, যে বিষয়টি আপনার চিন্তায় সর্বদা জাগরুক থাকা প্রয়োজন, তা এ যে, অদৃশ্যের সংবাদ কোন প্রকার বিদ্যার দ্বারা কখনই জানা যায় না।

হাদিসে উক্ত বালুকা লিখন পদ্ধতির ধর্মানুমোদিত হওয়ারও কোন ইঙ্গিত নেই। কিংবা এটাও নেই যে, এ প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হলে আত্মিক সংযোগ স্থাপন সম্ভবপর, যেমন নগরবাসী কিছু সংখ্যক বালুকা লিখনবিদ করে থাকে। অনেকে এ হাদিসের মর্মানুসারে এ ধারণা পোষণ করতে পারে যে, যেহেতু হাদিসে তা নবীর কার্য বলে উল্লেখিত হয়েছে, সুতরাং তা ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য। কেননা শাস্ত্রবিদদের অনেকেই এ মত পোষণ করেন যে, পরবর্তীদের ধর্মীয় বিধি-বিধান উত্তরাধিকাররূপে আমাদের পালনীয়রূপে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু এ মতকেও এখানে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কারণ পূর্ববর্তী নিয়মাবলি তখনই গৃহীত হয়ে থাকে, যখন প্রত্যেক জাতির মধ্যে আবির্ভূত নবীগণ তাকে গ্রহণীয় বলে মত প্রকাশ করেন। এই হাদিসে এ ধরনের কোন বক্তব্য নেই, এতে যা আছে, তা মোটের উপর এই যে, লিখন প্রণালীটি কোন নবীর অভ্যাস মাত্র ছিল। কিন্তু তা যে উক্ত নবীর সময়ে ধর্মীয় বিধানে পরিণত হয়েছিল, এমন কোন কিছু নেই। সুতরাং একে না ঐ নবীর অনুসারীদের জন্য ধর্মীয় বিধান বলে মনে করা যায়, না তাকে সর্বসাধারণের জন্য পরবর্তীকালেও পালনীয় বলে গৃহীত হতে পারে। হাদিসের অর্থ এই যে, এ বিশেষ প্রণালীটি উক্ত নবীর সময়ে একটি অভ্যাস হিসাবে হয়ত অস্তিত্ববান, কিন্তু তজ্জন্যই এটা সমগ্র মানব সমাজের জন্য পালনীয় বিধান বলে গণ্য হতে পারে না। এটাই আমাদের সমুদয় বক্তব্য, যা আমার এ উপলক্ষে বিষয়টি পরিষ্কার করবার জন্য তুলে ধরলাম। আল্লাহ্ই যথার্থ অনুপ্রেরণা প্রদান করেন।

১৩৮. এ ছকগুলোর একটি নকশা আমরা রোজেনথাল হতে নিম্নে প্রদান করছি।

এটা জানবার একমাত্র উপায় হল, ঐ সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হওয়া, যাঁরা জন্মগতভাবে অনুভূতির জগৎ থেকে আত্মিক জগতের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। এ জন্যই জ্যোতিষশাস্ত্রবিদরা এ দলের সকলকেই 'শুক্রপন্থী' বলে আখ্যায়িত করেন। কারণ তাদের ধারণামতে শুক্রগ্রহের প্রভাবজাত বলে এ সকল ব্যক্তি অদৃশ্য সংবাদ জানবার ক্ষমতা অর্জন করেছে। সুতরাং এ বিদ্যার লিখন ও অন্য যা কিছু আছে, যদি তাতে দৃষ্টিপাতকারী ঐ বিশেষ স্বভাবের হয় এবং এ সকল বিষয় তথা বিন্দু, অস্থি কিংবা অন্য কিছুকে অনুভূতির জগৎ থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য ব্যবহার করে জীবাত্মাকে যে কোন প্রকার আত্মিক সংযোগের দ্বারস্থ করতে পারে, তা হলে তা নুড়ি চালনা, পশুর হৃদপিণ্ড, দর্পণ ইত্যাদি স্বচ্ছ পদার্থের প্রতি দৃষ্টি স্থাপনের সাথে তুলনীয়, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। যদি এরূপ কোন কিছু না হয়, বরং সে এটা দ্বারা অদৃশ্য সংবাদ জানতে ইচ্ছা করে এবং ভাবে যে, তা তাকে উপকৃত করবে, তা হলে এরূপ কথা ও কার্য থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন।[১৩৯]

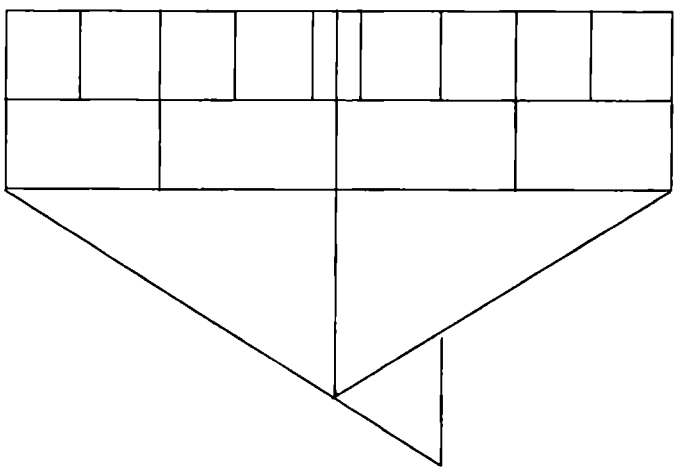

যাঁরা জন্মগতভাবে অদৃশ্য উপলব্ধি প্রকৃতিতে সুসজ্জিত, তাঁরা যখন বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য জানতে আগ্রহী হন, তখন তাঁদের মধ্যে সাধারণ অবস্থা থেকে দূরে সরে যাওয়ার চিহ্নাদি প্রকাশ পায়; যেমন তাঁরা হাই তোলেন, হাত-পা ছড়িয়ে দেন এবং অনুভূতির জগতে বের হয়ে যান। এ বিষয়ে তাঁদের শক্তি ও দুর্বলতা অনুসারে উক্ত অবস্থাদির তারতম্য ঘটে থাকে। যার মধ্যে এ অবস্থার কোন কিছু পাওয়া যায় না, তার সাথে অদৃশ্য উপলব্ধির কোন সম্পর্ক নেই। সে শুধু তার নিজের মিথ্যাকে সম্প্রসারিত করতে সচেষ্ট রয়েছে।

---

১৩৯. কোরান ২, ১৪২, ২১৩।

নীম গণনা

এদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা অদৃশ্য উপলব্ধির জন্য এমন সকল নিয়ম নীতি নির্ধারণ করেছেন, যার সাথে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় জীবাত্মার আত্মিক উপলব্ধির কোন সঙ্গতি নেই। কিংবা বাতলিমুসের ধারণা অনুযায়ী নক্ষত্রের প্রভাবাদির উপর নির্ভরশীল কোন অনুমানচিন্তার ব্যাপারও নয়; এমনকি দৈবজ্ঞরা যে ধরনের কল্পনা ও অনুমানের উপর নির্ভর করেন, এগুলো তাও নয়; বস্তুত ঐ সকল নিয়ম-নীতি কতকগুলো অলীক কল্পনা মাত্র, যদ্বারা দুর্বল বুদ্ধির লোকদেরকে ফাঁদে ফেলা হয়। আমি এ সকল বিষয়ের ততটুকুই বর্ণনা করব, যা গ্রন্থকারগণ লিখেছেন এবং বিশিষ্ট লোকেরা তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।

এ সকল নিয়ম-নীতির মধ্যে একটি হল এক বিশেষ গণনারীতি, যাকে তারা 'নীম গণনা' আখ্যা দিয়েছেন। এটা আরস্তু (এ্যারিস্টটল)-এর নামে প্রচলিত 'কিতাবুস্ সিযাসতে'র[১৪০] শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে। এটা দ্বারা যুদ্ধরত রাজন্যবর্গের মধ্যে বিজয়ী ও বিজিতের সংবাদ জানা যায়। এটা গণনার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী উভয়ের নামের বর্ণগুলোর সংখ্যা মান 'আবজদ' হিসাবের[১৪১] নির্ধারিত সূত্র অনুযায়ী বের করতে হয়। এ সূত্রে একক, দশক, শতক, সহস্র এবং এক থেকে সহস্র পর্যন্ত বর্ণভিত্তিক সংখ্যা দেয়া আছে। এভাবে একজনের নামের বর্ণগুলোর সংখ্যা বের করে যোগ করতে হবে এবং অন্যজনেরও অনুরূপ যোগফল বের করে যে মোট দুটি সংখ্যা হবে, তা থেকেই পৃথকভাবে নয় নয় করে বাদ দিতে হবে। এর পর উভয় সংখ্যার অবশিষ্ট যা থাকে, তার মধ্যে পৃথকভাবে লক্ষ করে দেখতে হবে। এতে যদি উভয় সংখ্যা বিভিন্ন হয় এবং এটা সত্ত্বেও উভয়েই যুগ্ম হয় অথবা উভয়েই অযুগ্ম হয়, তা হলেই কম মানের সংখ্যার অধিকারী বিজয়ী হবে। আর যদি তার একটি সংখ্যা যুগ্ম এবং অন্যটি অযুগ্ম হয়, তা হলে অধিক মানের সংখ্যার অধিকারী বিজয়ী হবে। অন্যদিকে যদি উভয় সংখ্যা সমান হয় এবং যুগ্ম হয়, তা হলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বিজয়ী হবে। অন্যথায় উভয় সংখ্যা অযুগ্ম হলে জিজ্ঞাসাকারী বিজয়ী হবে। এ ব্যাপারে দুই ছত্র পদ্য উল্লেখ করা হয়, যা মানুষের মধ্যে বহুল প্রচারিত। ছত্র দুটি নিম্নরূপ :

যদি দেখি যুগ্ম ও অযুগ্ম সমান, তা হলে অল্পমান
ও বেশি মান বিভিন্নতায় বিজয়ী হবে।
জিজ্ঞাসিত জয়ী যদি যুগ্ম সমান হয়,
এবং অযুগ্ম সমান হলে জিজ্ঞাসাকারী বিজয়ী হবে।

---

১৪০. 'সেক্রেটাম সেক্রেটোরাম' নামীয় গ্রন্থটি এ্যারিস্টটলের বলে ধারণা করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কীয় এ গ্রন্থে এ বিষয়টি বর্তমান। অবশ্য আব্দুর রহমান বদবী কর্তৃক এর আরবি সংস্করণে এবং রোজার বেকনের ইংরেজি অনুবাদে নীম গণনার কোন উল্লেখ নেই।

১৪১. 'আবজদ' শব্দটি আরবি বর্ণমালার প্রথম দিকের চারটি বর্ণের সমষ্টি। উক্ত বর্ণমালার প্রতিটির জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যামান নির্ধারিত রয়েছে। তাকেই সাধারণভাবে আবজদ হিসাব বলে উল্লেখ করা হয় (পরবর্তী টীকা দ্র:)।

অতঃপর তারা নয় দ্বারা বিভক্ত হওয়ার পর অবশিষ্ট সংখ্যার বর্ণগুলোর অবস্থা জানার জন্য একটি বিশেষ নিয়মের প্রবর্তন করেছেন, যা 'নয় বাদ' নামে তাদের নিকট পরিচিত। এর রূপ এ যে, তারা সমস্ত একক সংখ্যাকে চারটি স্তরে স্থাপন করেছেন। যেমন—'আলিফ' (আ) একক বোঝাবে, 'ইয়া' (ই) দশক বোঝাবে ও এটা দশকাদির স্তরে একক, 'ক্বাফ' (ক) শতক বোঝাবে ও এটা শতকাদির স্তর একক এবং 'শিন' (শ) সহস্র বোঝাবে ও এটা সহস্রাদির স্তরে একক। সহস্রের পরে সংখ্যা বোঝাবার জন্য আর কোন বর্ণ নেই। কারণ 'শিন'ই—'আবজদ' হিসাবের শেষ বর্ণ। অতঃপর তাঁরা উক্ত চারটি বর্ণকে পর্যায়ক্রমে সাজিয়েছেন; এর ফলে চার বর্ণবিশিষ্ট একটি শব্দ তৈরি হয়েছে। তা হল 'আইক্বশ'। পুনরায় তাঁরা এভাবে দুই সংখ্যা নির্দেশকারী বর্ণগুলোকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন এবং সহস্রের স্তরটি ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ সহস্রবোধক বর্ণটিই আবজদের শেষ বর্ণ। এর ফলে তিন স্তরের দুই বোধক বর্ণের সংখ্যা মোট তিনটি। তারা হল, 'বে' (ব) এককের স্তরে দুই বোধক, 'কাফ' (ক) দশকের স্তরে দুই বোধক অর্থা বিশ এবং 'রে' (র) শতকের স্তরে দুই বোধক অর্থাৎ দুইশ। এ তিনটি বর্ণ পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে তাঁরা 'বকর' তৈরি করেছেন। এভাবে তাঁরা তিন বোধক শব্দ সাজিয়ে 'জলস' করেছেন এবং এভাবে আবজদের শেষ বর্ণটি পর্যন্ত সাজিয়ে মোট নয়টি শব্দ তৈরি হয়েছে, যদ্বারা সমস্ত একক সংখ্যা শেষ হয়েছে। এ শব্দগুলো হল, আইক্বশ, বকর, জলস, দমত, হনছ, ওযখ, ঝআদ, হ্বফয ও তুদ্বগ[১৪২]। এরা সংখ্যার ক্রমানুসারে সজ্জিত। প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক বর্ণগুলো একই স্তরের সংখ্যাবোধক। যেমন একের জন্য আইক্বশ, দুইয়ের জন্য বকর, তিনের জন্য জলস এবং এভাবে নয়ের জন্য 'ত্বদ্বগ' ও এর স্তরও নয়। তাঁরা যখন নামের বর্ণ সংখ্যা অনুসন্ধান করেন তখন দেখেন উক্ত বর্ণটি এ সকল শব্দের মধ্যে কোনটিতে পড়ে; সুতরাং সেই শব্দের মান অনুযায়ী সংখ্যা গ্রহণ করে সমুদয় সংখ্যাকে নামের পরিবর্তে একত্র করেন। এতে যদি নয়ের অপেক্ষা বেশি হয়, তা হলে নয়ের অতিরিক্ত অবশিষ্ট সংখ্যাটি গ্রহণ করেন। নতুবা যেমন আছে তেমনই। অতঃপর অন্য নামটির জন্য অনুরূপ প্রক্রিয়া অনুসরণ

---

১৪২. আবজদ হিসাবের মধ্যে অঞ্চল বিশেষে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। যেমন :

১ নং হিসাব—এটা ইবনে খলদুন কর্তৃক উল্লেখিত মাগরিব অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। এটা নিম্নরূপ—

আলিফ, বে, জিম, দাল, হে, ওয়াও, ঝে, হ্বে, ত্বয়, ইয়া, কাফ, লাম, মিম, নুন, যোয়াদ,

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ২০ ৩০ ৪০ ৫০ ৬০

আইন, ফে, দ্বোয়াদ, কফ, রে, সিন, তে, ছে, খে, যাল, য্বয়, গাইন, শিন।

৭০ ৮০ ৯০ ১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০ ৫০০ ৬০০ ৭০০ ৮০০ ৯০০ ১০০

২ নং হিসাব—এটা পূর্বাঞ্চল মিশর, ইরাক সিরিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচলিত। এটা নিম্নরূপ :

আলিফ, বে, জি, দাল, হে, ওয়াও, ঝে, হ্বে, ত্বয়, ইয়া, কাফ, লাম, মিম, নুন, সিন,

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ২০ ৩০ ৪০ ৫০ ৬০

'আইন, ফে, যোয়াদ, কাফ, রে, শিন তে, ছে, খে, যাল, দ্বোয়াদ, য্বয়, গাইন।

৭০ ৮০ ৯০ ১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০ ৫০০ ৬০০ ৭০০ ৮০০ ৯০০ ১০০০

উপরোক্ত উভয় হিসাব জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ ও ঐতিহাসিকরাও ঘটনাবলি ও জন্ম-মৃত্যুর তারিখ বর্ণনায় ব্যবহার করে থাকেন। এতে তারিখের সংখ্যা হতে স্মরণযোগ্য শব্দ তৈরি হয়। যেমন ইবনে খলদুনের জন্ম তারিখ হল 'ফলব' (শসলব)।

করেন এবং আমরা পূর্বে যেমন বলেছি, তেমনিভাবে নয়ের অবশিষ্ট সংখ্যা দুটিকে মিলিয়ে দেখেন।

এ নিয়মের রহস্য খুবই সাধারণ। তা এ যে, ক্রমানুপাতে সজ্জিত শব্দগুলোর বর্তমান নয়ের দ্বারা বিভক্ত হবার পর ক্রমানুসারে একই হয়। এটা যেন স্তরানুসারে দশের গুণিতকের জন্যই বিশেষভাবে নিয়োজিত। এর ফল এ দাঁড়ায় যে, এ দুই, বিশ, দুইশ ও দুই হাজারের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কারণ প্রতিটির ভাগ শেষ দুই। এভাবে তিন, ত্রিশ, তিনশ ও তিন হাজার—এদের প্রত্যেকটির ভাগাবশেষ তিন। পরপর এ শব্দগুলো সাজাবার উদ্দেশ্যই হল দশের গুণিতককে প্রকাশ করা, অন্য কিছু নয়। এভাবে তাঁর প্রতি শব্দের বর্ণগুলোকে পর্যায়ক্রমে একক, দশক, শতক ও সহস্রের জন্য নির্ধারিত করেছেন। পরবর্তী শব্দের বর্ণগুলো অনুরূপভাবে একক, দশক, শতক যাই হোক না কেন পরবর্তী সংখ্যা নির্দেশ করবে। এভাবে নামের বর্ণগুলোর পরিবর্তে সংখ্যা গ্রহণ করে তাকে একত্র করেন, যেমন পূর্বে বলেছি।

এটাই সেই প্রক্রিয়া, যা বহু প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। আমাদের উস্তাদদের মধ্যে অনেককে দেখেছি, তাঁরা মনে করেন, অনুরূপভাবে সাজানো অন্য আরও নয়টি শব্দ আছে, যা অধিকতর শব্দ। সেখানে অনুরূপভাবে মোট সংখ্যা থেকে নয়কে বারবার বাদ দেয়া হয়। ঐগুলো হল, আরব ইসক্বক, জঝলত্ব, মদওষ, হফ, তহ্বযন, আশ, খগ ও তদ্বয্—সংখ্যার অনুপাতে সাজানো নয়টি শব্দ। এদের প্রতিটি শব্দ তার পর্যায় অনুসারে সংখ্যার অধিকারী। এদের মধ্যে তিন বর্ণ, চারবর্ণ ও দুইবর্ণবিশিষ্ট শব্দ বিদ্যমান। এতে দেখা যায়, এগুলো কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়মের অধীন নয়। কিন্তু আমাদের উস্তাদগণ এটা মাগরিবের বিশিষ্ট গণনাশাস্ত্রবিদ, বর্ণতত্ত্ব বিশারদ ও জ্যোতিষশাস্ত্রী আবুল আব্বাস ইবনে বান্নার।[১৪৩] নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বরাত দিয়ে বলেছেন যে, নীম গণনায় এ সকল শব্দ 'আইকশ' ইত্যাদি থেকে অধিকতর শুদ্ধ ফল দেয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন, কী করে তা সম্ভব হয়।

এদের এ সবগুলোই অদৃশ্য উপলব্ধির জন্য ব্যবহৃত ভিত্তিহীন ও তাৎপর্যহীন প্রক্রিয়া মাত্র। যে গ্রন্থটিতে নীম গণনা পাওয়া গেছে, তাকে আরস্তুর (এ্যারিস্টটল) সাথে সম্পর্কযুক্ত করা—যথার্থ নয়। কারণ তাতে এমন বিষয় আছে, যা যথার্থতা বা প্রমাণ কোনটিরই অনুসারী নয়। পাঠক যদি কিছুটা দৃঢ় চিত্তের অধিকারী হন, তা হলে উক্ত গ্রন্থের বিষয় বিচার করে দেখলেই উপরোক্ত বক্তব্যের প্রমাণ পাবেন।

অদৃশ্য উপলব্ধির জন্য ব্যবহৃত এ সকল নিয়মনীতি সংবলিত বিদ্যার মধ্যে অন্য একটি হল, যায়েরজা,[১৪৪] যাকে পৃথিবীর যায়েরজা বলে আখ্যায়িত করা হয়। এটা মাগরিবের শ্রদ্ধেয় সুফী সাধক আবুল আব্বাস আহমদ আস্ সবতীর[১৪৫] নামের সাথে

---

১৪৩. আহমদ ইবনে মুহম্মদ; জীবনকাল (১২৮৫-১৩২১ খ্রি:)। ইবনে খলদুন অন্যত্র তাঁকে গণিতবিদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

১৪৪. এর মূল সম্ভবত ফারসি 'যায়েচা' যার অর্থ কোষ্ঠী; 'র'টি বর্ণাগম বলে মনে করা হয়।

১৪৫. তাঁর নামের সাথে 'সিদি' যোগ করে সিদি আহমদও বলা হয়। অবশ্য এতে আহমদ ইবনে জাফর (৫৪০-৬০১ হিজরির) এর সাথে গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সংযুক্ত। তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে আল-মোহেদ সম্রাট আবু ইয়াকুব আল-মনসুরের শাসন আমলে মারাকেশে জীবিত ছিলেন। এ প্রক্রিয়াটি শিল্পকর্ম হিসাবে অদ্ভুত। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তার হেঁয়ালীপূর্ণ সুপরিচিত পদ্ধতির সাহায্যে রহস্য উদ্‌ঘাটনে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। এর ফলে তাঁরা এ পদ্ধতির রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিত ও গুহ্যতত্ত্বকে উন্মোচন করবার জন্য অত্যধিক উৎসাহবোধ করেন।

যে প্রক্রিয়ায় তাঁরা এতে নিয়োজিত হন, তার গঠন প্রকৃতি হল এই যে, এতে একটি বৃহদাকার বৃত্তের অন্তর্গত সমদূরত্বে অবস্থিত আরও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্ত থাকে। এগুলো কক্ষপথ, মৌল উপাদান, বস্তুজগৎ, আত্মাজগৎ এবং সৃষ্টিজগতের অন্যান্য বিষয় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রতিটি বৃত্ত তার কক্ষের বিভাগ অনুসারে হয় রাশিচক্র নয় মৌল উপাদান ও অন্যান্য বিষয়ের দিক থেকে বিভক্ত। এদের প্রতিটি ভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখাকেন্দ্রের দিকে গমন করছে, এগুলোকে তাঁরা 'তন্তু' নামে আখ্যায়িত করেন। প্রতিটি তন্তুর উপর পর্যায়ক্রমিক বর্ণাদি নির্ধারিত রয়েছে। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক বর্তমানকালে মাগরিবে গণনা ও পুথিপত্র সংরক্ষকদের কার্যে ব্যবহৃত সংখ্যার আকৃতি, যাকে 'রসুমুয যিমাম' বলা হয়ে থাকে এবং কিছু সংখ্যক যায়েরজার ভিতরে 'রুসমুল গুবার' নামে সুপরিচিত হয়।[১৪৬] এ বৃত্তগুলোর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের নাম ও সৃষ্ট বস্তুর স্থান লিপিবদ্ধ থাকে। এ সকল বৃত্তের অপর পৃষ্ঠায় একটি নকশা বিদ্যমান, যাতে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে পরস্পর সংলগ্ন বিভক্ত বহু ঘর রয়েছে। এগুলো প্রস্থের দিক থেকে সংখ্যায় পঞ্চান্ন এবং দৈর্ঘ্যের দিক থেকে একশ একত্রিশ। এ নকশার পার্শ্বস্থিত ঘরগুলো কোথাও বিভিন্ন সংখ্যা, আবার কোথাও বিভিন্ন বর্ণের দ্বারা পরিপূর্ণ এবং কোথাও বা ঘরগুলো শূন্য। এ সকল সংখ্যার বিশেষ স্থানে অবস্থান এবং এ সকল পূর্ণ ঘর ও শূন্যঘরের জন্য নির্দিষ্ট অংশাদি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। যায়েরজার নিম্নভাগে আকারবিশিষ্ট 'লামে'র অন্ত্যমিলে রচিত কিছু সংখ্যক পদ্যছত্র বিদ্যমান যাতে উক্ত যায়েরজা থেকে উদ্দিষ্ট বিষয় বের করবার নির্দেশাদি রয়েছে। কিন্তু এর সবগুলোই স্পষ্টতা ও সরলতার পরিবর্তে হেঁয়ালীতে পরিপূর্ণ। যায়েরজার কোন কোন কোণে মাগরিবের বিশিষ্ট ভবিষ্যবিশারদের নামযুক্ত কবিতার ছত্র বিদ্যমান। যেমন লামতুনা সাম্রাজ্যকালীন সেভিলার বিশিষ্ট জ্ঞানী মারেক ইবনে ওয়াহিবের[১৪৭] পদ্যাংশ। তা নিম্নরূপ :

> একটি বিরাটকার তোমার মধ্যে বহন করছে, অতএব সংরক্ষণ কর
> উত্থাপিত সমুদয় সন্দেহ, যা শুধু অধ্যবসায়ই সহজ করতে পারে।

এ যায়েরজা ও অনুরূপ অন্যান্য প্রক্রিয়ায় প্রশ্নের উত্তর বের করতে এ পদ্যাংশটি তাদের মধ্যে খুবই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাঁরা যখন জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলির মধ্য থেকে কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সচেষ্ট হন, তখন তাঁরা উক্ত প্রশ্নটিকে লিখে তার বর্ণ

---

১৪৬. রসুমূল গুবার—ভারতীয় গাণিতিক প্রতীক।
১৪৭. জীবনকাল ৪৫৩-৫২৫ (১০৬১-১১৩১ খ্রি:) হি:।

বিশ্লেষণ করেন। এর পর উক্ত সময়ে উদীয়মান রাশি ও তার অবস্থান নির্ণয় করেন। অতঃপর যায়েরজার অন্তর্গত উক্ত উদীয়মান রাশির সন্নিহিত তন্তু, যা তার প্রারম্ভ থেকে কেন্দ্রের দিকে গেছে, তা খুঁজে বের করেন। এর পর উক্ত উদীয়মান রাশির সম্মুখভাগস্থ বেষ্টনকারী বৃত্ত দেখেন। পরে উক্ত তন্তুর উপর আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণাদি এবং তন্তু ও বৃত্তের মধ্যবর্তী সংখ্যাগুলো গ্রহণ করেন। এর সবগুলোকে আবজদের হিসাব অনুসারে বর্ণাদিতে পরিণত করে থাকেন। কখনও তাতে একককে দশকে ও দশককে শতকে এবং তার বিপরীত প্রক্রিয়ায় যেমনভাবে তাদের নিয়মাবলি অনুমোদন করে, তেমনভাবে পরিবর্তিত করেন। এভাবে সংগৃহীত বর্ণাদিকে প্রশ্নের বর্ণের সাথে স্থাপন করে তার সাথে উদীয়মান রাশির দিক থেকে পর্যায়ক্রমে তৃতীয় রাশির সন্নিহিত তন্তুর উপরে লিখিত সমুদয় বর্ণ ও সংখ্যা যোগ করেন এবং এ যোগের ক্ষেত্রে উক্ত তন্তুকেই আরম্ভ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত অনুসরণ করা হয়, তার সম্মুখস্থ বেষ্টনকারী বৃত্তকে নয়। এ স্থানেও পূর্বানুরূপ সংখ্যাগুলোকে আবজদের হিসাবে বর্ণে পরিণত করা হয় এবং অপর বর্ণগুলোর সাথে এগুলোকে যোগ করা হয়। অতঃপর তাদের প্রক্রিয়ার ভিত্তি ও নিয়ম সংবলিত সেই পদ্যাংশটির বর্ণগুলোকে বিশ্লেষণ করে বের করেন। এটা পূর্বোল্লেখিত মালেক ইবনে ওয়াহিবের পদ্য। এভাবে বিশ্লেষিত বর্ণগুলোকে এক পার্শ্বে রাখেন। অতঃপর উদীয়মান রাশির অবস্থানের সংখ্যাটির সাথে তার ভিত্তি সংখ্যাকে গুণ করেন। এখানে ভিত্তি বলতে তাদের নিকট অবস্থান স্তরের শেষ থেকে রাশির দূরত্বকে বোঝায়। কিন্তু এটা গণনাবিদদের শাস্ত্রে উক্ত ধারণার বিপরীত অবস্থান স্তরের আরম্ভ থেকে ধরা হয়। যাহোক, উক্ত গণিত সংখ্যাকে পুনরায় অন্য একটি সংখ্যার দ্বারা গুণ করা হয়, তাকে তারা বৃহৎ ভিত্তি ও মূলচক্র বলে অভিহিত করে থাকেন। এর পর এভাবে গুণের দ্বারা সংগৃহীত সংখ্যা সমষ্টিকে তাঁরা নির্দিষ্ট নিয়মে, উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় ও নির্ধারিত চক্রে, যা তাদের নিকট সুপরিচিত, উক্ত নকশার ঘরগুলোতে অনুপ্রবিষ্ট করান এবং তা থেকে কিছু সংখ্যকের বর্ণ বের করেন ও অন্য কিছু সংখ্যক পরিত্যাগ করেন। অতঃপর সংগৃহীত বর্ণগুলোকে তাদের নিকট রক্ষিত পদ্যাংশের বর্ণগুলোর সাথে তুলনা করেন এবং তথা থেকে একটি নির্দিষ্ট বর্ণ সংখ্যাকে প্রশ্নের ও তার সংশ্লিষ্ট বর্ণাদির সাথে মিশ্রিত করেন। এর পর একটি নির্দিষ্ট বর্ণ সংখ্যার দ্বারা, যাকে তাঁরা চক্র বলে থাকেন, উক্ত বর্ণগুলোকে ভাগ করেন এবং প্রতিটি চক্র যে বর্ণের নিকট শেষ হয়, তাকে বের করে আনেন। এভাবে তাঁদের নিকট নির্ধারিত চক্র সংখ্যার দ্বারা একে বার বার আবর্তিত করা হয়। এ প্রক্রিয়ার শেষ কতকগুলো বিভিন্ন বর্ণ বের হয়ে আসে এবং এগুলো পর পর সাজিয়ে কিছু সংখ্যক শব্দ একটি পয়ারে রূপান্তরিত হয়, যা ছন্দ ও অন্ত্যমিলের দিক থেকে পূর্বোক্ত মালেক ইবনে ওয়াহিবের পদ্যাংশের সাথে তুলনীয়। আমরা এর অবশিষ্ট বিশদ বর্ণনা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধ্যায়ে 'যায়েরজা' অনুশীলনের তথ্যাদি পরিবেশনের সময় প্রদান করব।

আমরা এমন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখেছি, যাঁরা অদৃশ্য সংবাদ সংগ্রহের জন্য উপরোক্ত প্রক্রিয়ার উপর ব্যগ্রতার সাথে ঝুঁকে পড়েন এবং তাঁরা মনে করেন যে, প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে বর্ণনার দিক থেকে যে সামঞ্জস্য দেখা যায়, তা যথার্থই বাস্তবের সাথে

সামঞ্জস্যের নামান্তর। কিন্তু তা ঠিক নয়। কেননা, পাঠক, আপনি লক্ষ করেছেন যে, কোন প্রকার শিল্পকৌশল দ্বারা অদৃশ্যকে উপলব্ধি করা যায় না। এর মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তরের ক্ষেত্রে যে সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়, তা উভয়ের বর্ণনার মধ্যকার সামঞ্জস্য ও বোধগম্যতা মাত্র, যার ফলে উত্তর প্রশ্নের ধারা অনুসারে সরল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। এটাও এ শিল্পকর্মের মধ্যে প্রশ্ন ও তত্ত্বর অন্তর্গত বর্ণসমূহের বিশ্লেষণ, কাল্পনিক সংখ্যাগুলোর গুণফলকে নকশার ঘরসমূহে সংস্থাপন, ঘরগুলো থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যা বের করা ও ভাগ করা, নির্দিষ্ট সংখ্যক চক্রের সাহায্যে তাকে বারবার আবর্তিত করা এবং লব্ধ সমুদয় বর্ণকে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে পদ্যাংশের সাথে তুলনা করার মাধ্যমে হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ার সততা সম্পর্কে অস্বীকার করবার উপায় নেই। অনেক সময় অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনুরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা সামঞ্জস্য বিধান করে অনেক অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হতে পারেন। এস্থলে অজ্ঞাতকে জানার জন্য জ্ঞাত বিষয়াদির নিজের মধ্যেই তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তুলনা বিদ্যমান থাকে এবং তাকে লাভ করবার পথও সেই তুলনামূলক অনুপাত থেকে বের হয়ে আসে। বিশেষভাবে সাধনাকারীদের পন্থার উল্লেখ করা যায়। তাতে বুদ্ধিকে অনুমান গ্রহণের জন্য শক্তিশালী করা হয় এবং চিন্তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এ বিষয়ের বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে বহুবার এসেছে।

সম্ভবত এ কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ যায়েরজা সম্পর্কীয় ব্যাপারটিকে সাধকদের সাথে সংযুক্ত করা হয়। যেমন আস্‌সবতীর কথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এর অন্য একটি রূপও দেখতে পেয়েছি, যা সহল ইবনে আব্দুল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত।[১৪৮] আমার জীবনের শপথ, এটা কি আশ্চর্য প্রক্রিয়া, কি অদ্ভুত হেঁয়ালী! এতে নির্গলিত উত্তরের মধ্যে তাকে পদ্যাকারে উপস্থিত করার রহস্যটির মধ্যেই বুঝতে পেরেছি, তা উক্ত পদ্যাংশের বর্ণাদির সাথে তুলনা করার প্রচেষ্টা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। এ জন্যই উক্ত পদ্যটি প্রক্রিয়ার পদ্যাংশের অনুরূপ ছন্দ ও অন্ত্যমিলে গঠিত হয়। আমরা তাদের মধ্যে প্রচলিত আরও একটি প্রক্রিয়ার কথা জানি, যাতে উক্ত পদ্যাংশের সাথে উত্তরকে তুলনা করা হয় না, সে কারণেই তা পদ্যও হয় না। এ সম্পর্কে যথাস্থানে আমাদের বর্ণনা পাঠক দেখতে পাবেন।

বহুলোক এ প্রক্রিয়ার সত্যতা ও তার উদ্দিষ্ট বিষয়ের সংবাদ দানের কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন, এগুলো অশুদ্ধ ব্যাপার এবং একান্তই স্বকপোল কল্পনা ও ধারণার সমষ্টি মাত্র। কারণ প্রক্রিয়ায় রত ব্যক্তি প্রশ্ন ও তত্ত্বর মধ্যকার বর্ণগুলোর সাহায্যে নিজের ইচ্ছা মতই পদ্য তৈরি করে থাকে এবং এরূপ প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য কোন প্রকার অনুপাত ও নিয়ম সুনির্দিষ্ট নেই। সে এভাবে পদ্য তৈরি করে মনে করে বিষয়টি যথার্থই সুদৃঢ় পন্থায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। অথচ এ মনে করা একান্তই একটা বিকৃত ধারণামাত্র। সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে তুলনামূলক জ্ঞানের অভাবই অনুরূপ ধারণার জন্ম দেয় এবং উপলব্ধি ও বুদ্ধির মধ্যকার পার্থক্যের অভাবও

---

১৪৮. সহল ইবনে আব্দুল্লাহ্ আওস্তরী—খ্রিস্টীয় নবম শতকের একজন বিখ্যাত সুফীসাধক।

এর সাথে যুক্ত হয়। কেননা উপলব্ধির যে কোন মাধ্যম যদি উপলব্ধির দিক থেকে ফলপ্রসূ না হয়, তা হলে তাকে অস্বীকার করাই বিধেয়। এ প্রক্রিয়া নস্যাৎ করার জন্য আমাদেরকে এর অন্তর্গত শিল্পকর্মটি বিচার করে দেখলেই চলবে। এটা একটি অকাট্য অনুমান; এর কার্যপ্রণালী সুদৃঢ় ও নির্দিষ্ট নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত; এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যে কোন ব্যক্তি, যিনি এ প্রক্রিয়া অনুশীলন করবেন তার মধ্যে যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণ মেধা ও অনুমান শক্তি থাকে, তা হলে তার পক্ষে এ বক্তব্য অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কারণ এমন অনেক সংখ্যাগত হেঁয়ালী আছে, যাদের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক বহু বিস্তৃত ও গুপ্ত হওয়ার জন্য অত্যন্ত সহজ হয়েও উপলব্ধির ক্ষেত্রে আয়াসসাধ্য হয়ে উঠে। সুতরাং, পাঠক! এ প্রক্রিয়ার অন্তর্গত অনুপাতের গোপনীয়তা এবং এর অদ্ভুত অবস্থিতি সম্পর্কে আপনি সহজেই ধারণা করতে পারেন বিষয়টি কি!

আমরা এ প্রসঙ্গে এমন একটি সংখ্যাগত ধাঁধাঁ ব্যাখ্যা করব, যাতে আপনার নিকট আমাদের উপরোক্ত বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তা হল, যদি আপনাকে বলা হয়, কিছু দিরহাম নিন, তার প্রতিটি দিরহামের বিপরীতে তিনটি করে 'ফলস্'[১৪৯] রাখুন; পুনরায় ফলস্‌গুলো একত্র করে একটি পাখি কিনুন এবং দিরহামগুলোর দ্বারা প্রথম পাখিটির মূল্যানুযায়ী আরও কয়েকটি পাখি কিনুন—এখন মোট পাখির সংখ্যা কত? এর উত্তর হবে নয়টি। কারণ আপনি জানেন যে, এক দিরহামে ফলসের পরিমাণ হল চব্বিশ। তিন তার এক-অষ্টমাংশ। সুতরা এ অষ্টমাংশের ধারা অনুসরণ করে সমুদয় অষ্টমাংশ একত্রে যোগ করলে আটটি পাখির মূল্য বের হয়ে আসবে। এর সাথে ফলসের দ্বারা কেনা একটি পাখি যোগ করুন, তা হলেই নয়টি পাখি হবে। কারণ আপনি পূর্বে যে ফলসগুলোর দ্বারা একটি পাখি ক্রয় করেছিলেন, তার পরিমাণ এক দিরহাম। এ ক্ষেত্রে আপনি দেখতে পেরেছেন, কেমনভাবে হেঁয়ালীটির অন্তর্গত সংখ্যার অনুপাত আপনাকে তার উত্তর বলে দিয়ে সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছে। আপনার ধারণায় কি একে বা অনুরূপ অন্যান্য হেঁয়ালীকে প্রথম দর্শনে এক রহস্যময় দুর্বোধ্য ব্যাপার বলে বোধ জন্মায় না? এর দ্বারা এ কথাই স্পষ্ট হয়েছে যে, একটি বিষয়ের অন্তর্গত অনুপাত বিচারই জ্ঞাত বিষয় থেকে অজ্ঞাত বিষয়ের সন্ধান দিয়ে থাকে। কিন্তু এটা শুধুমাত্র বস্তুপুঞ্জ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ের মধ্যেই সম্ভব।

কিন্তু অনাগত ভবিষ্যতের ঘটনাবলি, যার কার্যকারণ আপনার জানা নেই, যার সম্পর্কে কোন সত্য সংবাদও এসে পৌঁছেনি, তা একান্তই অদৃশ্য ব্যাপার। এভাবে আপনি তাকে উপলব্ধি করতে পারবেন না। এ বিষয়টি যদি আপনি ভাল করে বুঝে থাকেন, তা হলে যায়েরজার প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ করুন, তা প্রশ্নের শব্দাবলি অনুসারে উত্তর বের করা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। আপনি পূর্বে দেখেছেন যে, তাতে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় বর্ণাবলি বের করে পর্যায়ক্রমিকভাবে উপরোক্ত হেঁয়ালীর মতই সুসজ্জিত করা

১৪৯. মুদ্রা বিশেষ; দিরহাম, সিকি ও ফলস্, পয়সার সাথে তুলনীয়।

হয়। সুতরাং তার রহস্য হয় তার মধ্যকার অনুপাত, যাতে কতকাংশের দ্বারা অপর কতকাংশের জ্ঞান জন্মে। সুতরাং যে ব্যক্তি উক্ত অনুপাতটি জানতে পারবে তার পক্ষে ঐ সকল নিয়ম-নীতির দ্বারা উত্তর বের করে নেয়া সহজ হয়ে উঠবে। অবশ্য এ উত্তর অন্যত্র এর অন্তর্গত শব্দাবলির বিন্যাস ও পর্যায় অনুসারে প্রশ্নের হ্যাঁ বা না'র যে কোন একটি দিকের ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু এটা আমাদের পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ার নয়। বরং তাতে বাক্‌বিন্যাসের বাহ্য দিকের সাথে তুলনা করা হয়। বস্তুত এর দ্বারা অদৃশ্য জানবার কোন উপায় নেই। কারণ মানুষের জ্ঞান এ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। আল্লাহ্‌ই তাকে তাঁর জ্ঞানের দ্বারা আয়ত্ত করে রেখেছেন। আল্লাহ্‌ই জানেন, তোমরা জান না।[১৫০]

১৫০. কোরান ২, ২, ৬, ২৩২; ৩, ৬৬; ২৪, ১৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যাযাবরী জীবন, বর্বর জাতি ও উপজাতি, তাদের জীবনান্তর্গত বিভিন্ন অবস্থা এবং এতদসম্পর্কীয় কতিপয় পরিচ্ছেদ ও বিশদ বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

[যাযাবরী ও নাগরিক জীবন উভয়েই স্বাভাবিক]

জেনে রাখুন, জীবিকা অর্জনে বিচিত্র পন্থা অবলম্বনের জন্য মানবজাতির জীবন-যাপন প্রণালী বিভিন্ন হয়ে থাকে। তাদের একত্র বসবাস এ জীবিকা অর্জনে পরস্পরের সহায়তার নিমিত্তই সম্ভব হয়েছে। তারা একান্ত প্রয়োজনীয় হতে আরম্ভ করেছে এবং ক্রমশ সুবিধাজনক ও পরিপূর্ণতা বিধায়ক অবস্থার দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই কৃষিকর্মকে গ্রহণ করে শাকসব্জী ও শস্য উৎপাদন করছে; অনেকেই ভেড়া, গুরু, ছাগল প্রভৃতি পশু ও মৌমাছি, রেশম কীট প্রভৃতি প্রাণী পালন করে তাদের বংশ বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের উপর নির্ভর করছে। এ কৃষিকর্ম ও পশুপালনের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জন্য উন্মুক্ত প্রান্তরের প্রয়োজন। কেননা সেখানেই তাদের স্থান সংকুলান হতে পারে। তাদের কৃষিক্ষেত্র প্রশস্ত মাঠ ও পশুর চারণভূমি কোন নগর পরিবেশের মধ্যে হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং তাদের জন্য প্রান্তরবাসী হওয়ার ব্যাপারটি একান্তই প্রয়োজনীয়। এ সময়ে তাদের একত্রবাস, তাদের প্রয়োজন, জীবিকা ও অবস্থানের জন্য পরস্পরের সহযোগিতা তাদেরকে আহার্য, বাসস্থান ও পরিচ্ছদ সংগ্রহের এমন একটি পর্যায়ে রাখে, সেখানে শুধু জীবন রক্ষা ও জীবন ধারণই সম্ভব। তাদের দুর্বলতার জন্য তারা এর অধিক কিছু সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় না।

অতঃপর যখন এ সকল জীবিকা অর্জনকারীর অবস্থা কিছুটা সচ্ছল হয়ে উঠে এবং তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ ও সুযোগ হস্তগত করে, তখন তারা স্থায়ীভাবে বাস করতে চায় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রাচুর্যের জন্য পরস্পরের সহযোগিতায় তৎপর হয়। তারা অধিক আহার্য ও পরিচ্ছদ উৎপাদন করে এবং এগুলোতে পরিমার্জনার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। তারা বাসস্থান প্রশস্ত করে এবং পল্লী ও নগর গড়ে তোলে। অতঃপর তাদের দৃষ্টি বিলাসব্যসনের দিকে আকৃষ্ট হয়। এর ফলে তাদের মধ্যে চূড়ান্ত বিলাসিতার অভ্যাস দেখা দেয়। তারা খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীতে নব নব প্রক্রিয়া যোগ করে এবং পোশাক-পরিচ্ছদে রেশম, গরদ ইত্যাদি ব্যবহার করে উন্নতমানের সমুন্নত রুচির পরিচয় দেয়। তারা সুউচ্চ গৃহ ও স্তম্ভাদি নির্মাণ, তাদের ভিত্তি সুদৃঢ় ও পাকাপোক্ত করা এবং বিভিন্ন শিল্পকর্মের চরমরূপ তুলে ধরার জন্য সম্ভাব্য শক্তিকে বাস্তবায়িত করায় সচেষ্ট হয়। সুতরাং তারা প্রাসাদ ও অট্টালিকা তৈরি করে, তাতে ফোয়ারা প্রবাহিত করে এবং তাদের গম্বুজাদি উন্নত করতে ও তাদের স্থায়িত্ব সুদৃঢ় করতে এগিয়ে আসে। তারা তাদের নিত্যব্যবহার্য পরিচ্ছদ, বিছানাপত্র, বাসন-কোসন

ও আসবাবপত্রের নতুন নতুন সংস্কার সাধন করতে থাকে। এদেরকেই বলা হয় নাগরিক, যার অর্থ নগরে স্থায়ী বসবাসকারী। তারাই পল্লী ও শহর অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

তাদের মধ্যে অনেকেই শিল্পকর্মকে তাদের জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে এবং অনেকে ব্যবসায়কে। তাদের উপার্জন প্রান্তরবাসীদের অপেক্ষা পরিমাণে ও আরাম-আয়েশে অধিক হয়ে থাকে। কারণ তাদের অবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয় স্তর অতিক্রম করে এসেছে এবং জীবিকা নির্বাহের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণেই, আমরা পূর্বে যেমন বলেছি যাযাবরী ও নাগরিক জীবন উভয়েই স্বাভাবিক। এদের কোনটিকেই ত্যাগ করবার উপায় নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[আরব[১] বেদুইন জীবন সৃষ্টির দিক থেকে স্বাভাবিক]

আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি যে, প্রান্তরবাসী যাযাবররা তাদের জীবিকার জন্য স্বাভাবিকভাবে কৃষি ও পশুপালনের উপর নির্ভরশীল। তারা তাদের আহার্য, বাসস্থান ও পরিচ্ছদের ব্যাপারে একান্তভাবে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অধীন। তাদের অন্যান্য অবস্থা ও অভ্যাস সম্পর্কেও তারা কখনই প্রয়োজনের অতিরিক্ত অভাব বা পরিপূর্ণতার দিকে আকৃষ্ট হয় না। তারা পশুলোম, পশম, কাষ্ঠ, মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদির দ্বারা অপক্ব বাসস্থান নির্মাণ করে। এটা দ্বারা শুধু ছায়া ও আশ্রয়ই তাদের উদ্দেশ্য, অন্য কিছু নয়। কখনও তারা পাহাড়ের গুহা ও গহ্বরেও আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের আহার্যও খুব সহজেই তারা রন্ধন অথবা বিনা রন্ধনে শুধু অগ্নি স্পর্শ করে গ্রহণ করে থাকে। এদের মধ্যে যারা শস্য উৎপাদন ও কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল, তারা ভ্রাম্যমাণদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল অবস্থার অধিকারী। এরা ক্ষুদ্র বস্তি জনপদ ও পাহাড়ী এলাকায় বসবাস করে। এ শ্রেণীর লোকের মধ্যে অধিকাংশ বারবার অনারব জাতি বিদ্যমান।

এদের মধ্যে যারা পালিত পশু যেমন ভেড়া, গরু ইত্যাদি পালন করে জীবিকা নির্বাহ করে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের পশুর চারণভূমি ও পানীয় জলের জন্য ভ্রাম্যমাণ। কারণ তাদের বিচরণ করে ফিরাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। তাদেরকে পশুজীবী বলা হয়; এর অর্থ তারা ছাগল-গরুর উপর জীবন ধারণ করে। এর তৃণশূন্য প্রান্তরাদিতে উত্তম চারণ ভূমির অভাবে বেশি দূর অগ্রসর হয় না। এরা যেমন বারবার, তুর্কি ও তাদের সমগোত্রীয় তুর্কেম্যান ও সাকালী (স্লাভ)। অবশ্য যারা কেবল উট পালন করে জীবন-যাপন করে, তারা তৃণশূন্য প্রান্তরে অধিকতর দূর পর্যন্ত বিচরণ করে ফিরে। কারণ পাহাড়ী এলাকার গাছপালা উটের প্রয়োজনীয় আহার্য যোগাতে সক্ষম হয় না। এজন্য তাকে প্রান্তরের গুল্মাদি ও লবণাক্ত পানীয় জলের দিকে নিয়ে যেতে হয়। শীতকালেও অত্যধিক শীতের যাতনা থেকে দূরে থাকবার জন্য প্রান্তরের উত্তপ্ত পরিবেশ উটের জন্য প্রয়োজন। সেখানে সে ঐ তপ্ত বালুর উপর বাচ্চা প্রসব করে। কারণ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে উটের প্রসব অত্যধিক কষ্টদায়ক এবং এ জন্যই তার তপ্ত পরিবেশের প্রয়োজন সর্বাধিক। এ কারণে উটের উপর নির্ভরশীল বেদুইনরা প্রান্তরের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত বিচরণ করে ফিরে। অনেক সময় রক্ষীরা তাদেরকে পাহাড়ী এলাকা থেকে

---

১. আরব বলতে ইবনে খলদুন সর্বত্র বেদুইন বুঝিয়েছেন। আমরা উভয় শব্দ একত্র করে ব্যবহার করলাম। যেমন আছে—'এর চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন'।

তাড়িয়েও দেয়। সুতরাং এরা এ অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রান্তরের গভীর অঞ্চলে বসবাস করে। এসব কারণেই এরা মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বন্য প্রকৃতির। নগরবাসীদের সাথে তুলনা করলে এদেরকে এমন বন্য হিংস্র ও ভাষাহীন পশু বলে বোধ হবে যাদেরকে বশীভূত করা অসম্ভব। এরাই আরব-বেদুইন। এদেরই সমগোত্রীয় বারবার ও জানাতাদের ভ্রাম্যমাণ অংশ মাগরিবে এবং কুর্দি, তুর্কি ও তুর্কেম্যানরা পূর্বাঞ্চলে বিদ্যমান। অবশ্য শেষোক্তদের তুলনায় আরব বেদুইনরা অধিকতর দূর প্রান্তরবাসী ও প্রান্তরীয় চরিত্রের অধিকারী। কারণ এরা শুধু উটের উপর নির্ভরশীল। অন্যরা উটের সাথে ছাগল, গরু ইত্যাদিও পালন করে।

এ বর্ণনায় এ বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আরব-বেদুইন জীবন একান্তই স্বাভাবিক। মানব সভ্যতার জন্য এরও প্রয়োজন আছে। আল্লাহ্ পবিত্র ও উন্নত, সর্বাপেক্ষা উত্তর জ্ঞাতা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[যাযাবরী জীবন নাগরিক জীবন অপেক্ষা প্রাচীন ও পূর্ববর্তী এবং প্রান্তর সভ্যতা ও জনপদের ভিত্তি ও সঞ্চয়াগার]

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, প্রান্তরবাসীরা তাদের জীবন-যাপনের একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপরই নির্ভর করে। এর অতিরিক্ত কোন কিছু সংগ্রহ করা তাদের সাধ্যাতীত। অন্যদিকে নগরবাসীরা তাদের জীবন-যাপনে বিলাসব্যসন ও পরিপূর্ণতার জন্য পরস্পর সহায়তা এবং অভ্যাস গড়ে তোলে। এক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন সর্বদাই অতিরিক্ত অভাব ও পরিপূর্ণতা অপেক্ষা প্রাচীন ও তার পূর্ববর্তী। কারণ একান্ত প্রয়োজনই হল ভিত্তি এবং পরিপূর্ণতা তা থেকে উৎপন্ন বিশেষ অবস্থা মাত্র। এ জন্যই যাযাবরী জীবন নাগরিক ও শাহরিক জীবনের ভিত্তি এবং তার পূর্ববর্তী। কারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের প্রথম উদ্দেশ্য একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা এবং তা সংগ্রহ হয়ে গেলেই সে বিলাসব্যসন ও পরিপূর্ণতার দিকে দৃষ্টি দিতে পারে। সুতরাং যাযাবরী স্থূলতা নাগরিক শালীনতার পূর্বে দেখা দিয়ে থাকে। এ জন্যই আমরা সভ্যতার প্রথম ভিত্তি বেদুইন জীবনের মধ্যে দেখতে পাই এবং তা থেকে এটা প্রবাহিত হয়। শেষ পর্যন্ত প্রচেষ্টার মধ্যে তা থেকে দূরে সরে আসে। এভাবে যখন মানুষের জন্য প্রাচুর্য লাভ ঘটে ও এর ফলে বিলাসব্যসনে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠে, তখন স্থায়ী বসবাসের প্রশ্ন দেখা দেয় এবং নাগরিক জীবনের নিগড়ে সে বাঁধা পড়ে। এটাই প্রান্তরবাসী সকল গোত্রের অবস্থা। অথচ নগরবাসীরা একান্ত প্রয়োজন দেখা না দিলে কিংবা নাগরিক জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে না পড়লে, কখনও তারা যাযাবরী জীবন গ্রহণে অগ্রসর হয় না।

যে সকল বিষয় আমাদেরকে এ জ্ঞান দেয় যে, যাযাবরী জীবন নাগরিক জীবন অপেক্ষা পূর্বগামী তার মধ্যে একটি এ যে, আমরা যখন কোন জনপদের অধিবাসীদের পূর্বাবস্থায় অনুসন্ধান করি, তখন দেখতে পাই, তাদের অধিকাংশই এক সময়ে প্রান্তরবাসী ছিল এবং তাদের সমগোত্রীয়রা এখনও ঐ জনপদের কোথাও কোন বস্তিতে জীবন-যাপন করছে। তাদের অবস্থা সচ্ছল হবার পরই তারা জনপদে স্থায়ী বসবাসে প্রবেশ করেছে এবং নাগরিক জীবনের বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত হয়ে অবস্থার পরিবর্তন করেছে। এ বিষয়টি এরই প্রমাণ যে, নাগরিকত্বের অবস্থা যাযাবরত্ব থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং তাই এর ভিত্তি। এ অবস্থাটি উত্তমরূপে বুঝে নেয়া দরকার।

অতঃপর এ নগর ও প্রান্তর জীবনের প্রত্যেকটির মধ্যেই অবস্থার বিভিন্নতা আছে। বহু মানবগোষ্ঠীই অন্য মানবগোষ্ঠী থেকে, বহু গোত্রই অন্য গোত্র থেকে বৃহৎ এবং বহু

পল্লীই অন্য পল্লী থেকে ও বহু নগরই অন্য নগর থেকে জনবসতির দিক দিয়ে বিস্তৃততর। এরও কারণ একটিই, যা আমাদের বর্ণনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যাযাবরী জীবন থেকে ক্রমবিচ্যুতির ফলেই এরূপ বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। কেননা তাই এ বিস্তৃতির ভিত্তি। নগর ও পল্লী জীবনের বিলাসব্যসন ও স্থায়ী বসবাসের অভ্যাস তখনই সম্ভব, যখন মানুষ তার একান্ত প্রয়োজনের সামগ্রীর মধ্যে প্রাচুর্যের সৃষ্টি করতে পেরেছে। এজন্য নাগরিক অভ্যাস যাযাবরী অভ্যাসের পরে আবির্ভূত হয়েছে। আল্লাহ্ই উত্তম জ্ঞাতা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[প্রান্তরবাসীরা নগরবাসীদের অপেক্ষা সততায় অধিকতর নিকটবর্তী]

এর কারণ এ যে, জীবাত্মা তার জন্মগত প্রথম প্রকৃতিতে অবস্থানকালে তার উপর আপতিত বিষয় এবং ভাল-মন্দের প্রবৃত্তি গ্রহণে অধিকতর সক্রিয় থাকে। হযরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, প্রতিটি সন্তান তার স্বাভাবিক প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে; অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি বানায়, খ্রিস্টান বানায় এবং মজুমী হিসাবে গড়ে তোলে।[২] এভাবে যতই সে একটি প্রকৃতির নিকটবর্তী হয়, সেই পরিমাণে অন্যটি থেকে দূরে সরে যায় এবং তাতে পুনরায় অভ্যস্ত হওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সৎ ব্যক্তি যখন সদভ্যাসাদির দ্বারা জীবাত্মার মধ্যে সততার প্রবৃত্তি গড়ে তোলে, তখন সে অসৎ থেকে দূরে সরে যায় ও তার পথ তার নিকট দুর্গম হয়ে উঠে। এরূপ অসৎ ব্যক্তিও; যখন তার জীবাত্মা অসততার মধ্যে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

নাগরিকগণ সর্বপ্রকার আমোদ-প্রমোদ, বিলাসব্যসন, পার্থিব উন্নতি লাভের আশা ও তাকে ভোগ করবার স্পৃহার দ্বারা বেষ্টিত থাকে। এর ফলে তাদের জীবাত্মা অসৎ চরিত্র ও অন্যায় প্রসঙ্গের মধ্যে কলুষিত হয়ে উঠে। এভাবে তারা যতই তাতে নিমজ্জিত হয়, ততই সৎ পথ ও ন্যায় পন্থা থেকে দূরে সরে যায়। এমনকি এর ফলে তাদের মধ্যকার সংযমের আচার-আচরণও তাদের অবস্থাগুলোতে দুর্নিরীক্ষ হয়ে উঠে। তাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে, যারা সভা-সমিতিতে বয়োবৃদ্ধ ও গুরুজনদের সম্মুখেই অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে। এ ব্যাপারে তাদের সংযম কোন কাজেই আসে না। কারণ, তারা কথায় ও কাজে মন্দকে প্রকাশ করতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। প্রান্তরবাসীরাও যদি পার্থিব জীবনের প্রতি অতিমাত্রায় আগ্রহী হয়ে উঠে, তা হলে তাদের তুল্যই ব্যবহার করে। অবশ্য তা একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহেই। নগরবাসীদের ন্যায় আমোদ-প্রমোদ ও ভোগ-সম্ভোগের উপকরণের মধ্যে নয়। সুতরাং মন্দের ব্যাপারে তাদের অভ্যাস তাদের পরিবেশ ও সম্মতি অনুসারেই নগরবাসীদের তুলনায় একান্তই নগণ্য হয়ে থাকে। বস্তুত প্রান্তরবাসীরা জন্মগত প্রাথমিক স্বভাবেরই অধিকতর নিকটবর্তী এবং জীবাত্মার উপর অধিকতর বদভ্যাস ও কদাচারের যে কলুষ কালিমা আপতিত হয়, তা থেকে দূরে অবস্থিত। সুতরাং নগরবাসীদের অপেক্ষা তাদের সংশোধন অধিকতর সহজ এ সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। পরবর্তী বর্ণনা থেকে এটাও প্রকাশ পাবে যে, নগর জীবনই সভ্যতার শেষ পর্যায়, এর পর তাতে বিকৃতি দেখা দিবে এবং সৎ থেকে দূরে ও

---

২. বোখারী (১ম) দ্র:।

অসতের চরম সীমায় পৌঁছবে। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে প্রান্তরবাসীরা নগরবাসীদের অপেক্ষা সততার অধিকতর নিকটবর্তী। 'আল্লাহ্ ধর্মভীরুদেরকে ভালবাসেন।'[৩]

সহি বোখারীর নিম্নলিখিত হাদিস দ্বারা উপরোক্ত বক্তব্যের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা সম্ভব নয়। উক্ত হাদিসে হাজ্জাজ সলমা ইবনে আর্কুকে, শেষোক্তের প্রান্তরবাসী হওয়ার জন্য বলেছিলেন, তুমি কি পশ্চাদ্দিকে প্রত্যাবর্তন করেছ? বেদুইন হয়ে গেছ? তদুত্তরে সলমা বলেছিলেন, না, বরং রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে যাযাবর জীবনের অনুমতি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, ইসলাম আবির্ভাবের প্রথম দিকে মক্কাবাসীদের জন্য হিজরত অবশ্য কর্তব্য বলে নির্ধারিত ছিল। যাতে তারা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে সর্বস্থানে উপস্থিত থেকে তাঁকে সাহায্য, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও তাঁকে রক্ষা করতে পারে। হিজরত বেদুইনদের উপর অবশ্য কর্তব্য ছিল না। কারণ মক্কাবাসীরাই নবী (সঃ)-এর সাথে গোত্রপ্রীতিতে সম্পর্কযুক্ত ছিল। সুতরাং তাঁর সাহায্য ও সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রান্তরবাসী বেদুইনদের অপেক্ষা তাদেরই দায়িত্ব ছিল অধিক। এ জন্যই মোহাজেরগণ অনেক সময় বেদুইন জীবন থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। কারণ বেদুইন জীবনে হিজরত অবশ্য কর্তব্য ছিল না।

হজরত মুহম্মদ (সঃ) সাদ ইবনে আবু ওক্কাস বর্ণিত একটি হাদিসে, শেষোক্তের মক্কায় অসুস্থতা উপলক্ষে বলেছিলেন, হে আল্লাহ্, আমার সাহাবীদের হিজরত সফল হতে দাও, তাদেরকে পশ্চাদ্দিকে প্রত্যাবর্তন করিও না।[৪] এর অর্থ, তারা যেন সর্বদা মদিনায় থাকতে পারে এবং তথা থেকে অন্য কোথাও না যায়। যাতে তারা যে হিজরত আরম্ভ করেছে, তা থেকে প্রত্যাবর্তন না করে। কারণ এরূপ করা কোন না কোন দিক থেকে আবার পশ্চাদ্বর্তী হওয়ারই নামান্তর। অনেকে বলেন যে, এ অবস্থা মক্কা বিজয়ের পূর্বকালেই বিশেষভাবে বিরাজমান ছিল। কারণ তখন মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্প থাকায় হিজরতের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর যখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তারা শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে তাঁর নবীর সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করলেন, তখন হিজরতের কর্তব্য আর রইল না। কেননা হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। অনেকে বলেন, মক্কা বিজয়ের পর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, হাদিসের নির্দেশ অনুসারে তাদের হিজরতের দায়িত্ব রহিত হয়েছে। অনেকে বলেন, এর দ্বারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত করেছে, তাদের কর্তব্য শেষ হয়েছে বলে বোঝায়। যাহোক, এ সকল কিছুরই নির্গলিতার্থ হল হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর তিরোধানের পর হিজরতের দায়িত্ব রহিত হয়েছে। কারণ তখন থেকেই সাহাবীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে চুতর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছেন এবং মদিনায় একমাত্র হিজরত করে যাওয়ার পুণ্য ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি।

সুতরাং সালমা ইবনে আকু'র প্রান্তরবাসী হওয়ার ফলে হাজ্জাজের সেই মন্তব্য— তুমি কি পশ্চাদ্দিকে প্রত্যাবর্তন করেছ ও বেদুইন হয়ে গেছ? তা মদিনাবাস ত্যাগ করার প্রতি ভর্ৎসনা মাত্র। কারণ এখানে সর্বদা থেকে হিজরতকে সুসম্পন্ন করবার জন্য হজরত

৩. কোরান, ৭৬; ৯, ৪, ৭।
৪. বোখারী (১ম) দ্র:।

মুহম্মদ (সঃ) প্রার্থনা করেছিলেন, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। তা তাঁর সেই বাক্য—'তাদেরকে পশ্চাদ্দিকে প্রত্যাবর্তন করিও না।' হাজ্জাজের মন্তব্য—'বেদুইন হয়ে গেছ', এরই ইঙ্গিত কর যে, তুমি কি সেই বেদুইনদের দলে মিশেছ, যারা হিজরত করে না। কাজেই সলমা উক্ত দুটি অভিযোগ অস্বীকার করে উত্তর দিয়েছেন যে, নবী (সঃ) তাকে প্রান্তরবাসী হতে অনুমতি দিয়েছেন। এটা তার জন্যই বিশেষ নির্দেশ। যেমন খুজাইমার বিশেষ সাক্ষ্য দেয়া ও আবু বুরদার ছাগলছানা কোরবানী করা।[৫] এ জন্যই বলা যায়, হাজ্জাজ তাকে শুধু মদিনাবাস ত্যাগ করার জন্য ভর্ৎসনা করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে, হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর তিরোধানের পর হিজরতের দায়িত্ব রহিত হয়েছে। সালমাও তাঁকে সেই উত্তর দিয়েছেন যে, তার এ সুযোগ নবীর অনুমতির ফলেই ঘটেছে। যাহোক, এ হাদিসের উপরোক্ত অর্থ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও ভাল। কারণ হাজ্জাজ নগরজীবনকে প্রাধান্য দেননি বা তাকে বিশ্লিষ্টও করেননি; বরং তিনি যা জানতেন, সেই অনুসারেই কথা বলেছেন। যে কোন দিক থেকে দেখা যাক না কেন, তাঁর ঐ বক্তব্য—'বেদুইন হয়ে গিয়েছ'-এর মধ্যে বেদুইন জীবনের প্রতি কোন প্রকার কটূক্তি নেই। কারণ পাঠক যেমন দেখেছেন, হিজরতের ব্যাপারটি নবীর সাহায্য ও সংরক্ষণের জন্যই প্রবর্তিত হয়েছিল, বেদুইন জীবনকে মন্দ বলবার জন্য নয়। সুতরাং হাজ্জাজের ভর্ৎসনার মধ্যে হিজরত ত্যাগ করে বেদুইন জীবন গ্রহণের প্রতি কটাক্ষ আছে বটে, কিন্তু তা এজন্য নয় যে, বেদুইন জীবন মন্দ। আল্লাহ্ পবিত্র, তিনিই সর্বজ্ঞ এবং তাঁরই সাহায্য কাম্য।

---

৫. হজরত মুহম্মদ (সঃ) খুজাইমার সাক্ষ্যকে দুজনের সাক্ষ্যের সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং আবু বুরদার এক বছরের কম বয়স্ক ছাগল কোরবানী তিনি অনুমোদন করেছিলেন। এই উভয়ই বিশেষ অনুমতি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[নগরবাসিগণ থেকে প্রান্তরবাসীরা শৌর্যবীর্যে অধিকতর নিকটবর্তী]

এর কারণ এ যে, নগরবাসিগণ সুখ-সম্ভোগের শয্যায় শায়িত থেকে প্রাচুর্য ও বিলাস-ব্যসনের মধ্যে কালাতিপাত করছে। তারা তাদের নিজেদের ও তাদের ধনসম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব সহায়কদের উপর ন্যস্ত করেছে। নগরীর শাসনকর্তা এ ব্যাপারে রক্ষীবাহিনীর দ্বারা তাদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করেছেন। তদুপরি তাদের চতুর্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত এবং তাদের সম্মুখে প্রহরী নিয়োজিত। সুতরাং তারা সর্ব বিষয়ে নিরাপত্তা বোধ করে সুখনিদ্রায় শায়িত হয়। বাইরের কোন কোলাহল এর ব্যাঘাত ঘটায় না এবং ভাগ্যশিকারীও তাদেরকে ভয় দেখায় না। তারা পরিতৃপ্ত, শান্ত। তারা অস্ত্রশস্ত্রের বোঝা ত্যাগ করেছে। বংশানুক্রমে এভাবে চলে এসেছে। এর ফলে তারা বাড়ির কর্তার উপর নির্ভরশীল শিশু ও স্ত্রীলোকের ন্যায় হয়ে গেছে। এমন কি এটা তাদের এমন চরিত্র হিসাবে গড়ে উঠেছে, যাকে প্রকৃতি বলে অভিহিত করা যায়।

অথচ প্রান্তরবাসীরা, তারা সমাজবদ্ধ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, দূর-দূরান্তে বন্য প্রাণীর ন্যায় ভ্রমণ করাতে, রক্ষীদলের অত্যাচার থেকে দূরে সরে যাওয়াতে এবং সর্বোপরি প্রাচীর ও দ্বারাদির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়াতে নিজেদের প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিজেরাই করে থাকে। এর ভার তারা অন্য কারও উপর ন্যস্ত করে না; বরং বলা যায়, অন্য কাউকেও এ ব্যাপারে বিশ্বাস করে না। ফলে তারা সর্বদাই অস্ত্রশস্ত্র বহন করে থাকে এবং পথ চলতে চতুর্দিকে সতর্কদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। একমাত্র দলবদ্ধ অবস্থায়, লোক সমাবেশে এবং বাহনের পৃষ্ঠদেশে কিছুটা নিরাপত্তা বোধ করতে পারে। তথাপি তাদেরকে প্রতিটি অস্পষ্ট শব্দ ও কোলাহল অনুসন্ধান করে দেখতে হয়। তারা প্রান্তর ও নির্জন ভূমিতে একাকী বিচরণ করে এবং প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কাকাতর হয়েও দুর্যোগের আশঙ্কা তাদের চরিত্র হয়ে উঠেছে ও বীরত্ব তাদের গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখনই এ ব্যাপারে কোন আহ্বানকারী আহ্বান জানায়, কোন চিৎকারকারী তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, তারা বিনা দ্বিধায় অগ্রসর হয়ে যায়। নগরবাসীরা যখন তাদের সাথে প্রান্তরে মিলিত হয় কিংবা তাদের সাথে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয় তারা প্রান্তরবাসীদের উপরই নির্ভর করে এবং নিজেদের নিরাপত্তার কোন বিষয়ই নিজেদের হাতে রাখে না। এটা একান্ত বাস্তবদৃষ্ট অবস্থা। এমন কি দিক ও দিশা জানতে, পানীয় জলের সংবাদ নিতে এবং রাস্তাঘাটের বিবরণ সংগ্রহ করতে তারা প্রান্তরবাসীদের উপর নির্ভর করে থাকে। এর কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। এর মূল ভিত্তি হল মানুষ

অভ্যাসের, তার প্রিয় প্রবৃত্তির দাস; এক্ষেত্রে তার প্রকৃতি, তার মানসিকতা কোন কাজেই লাগে না। সুতরাং সে বিভিন্ন অবস্থায় যে বিষয়কে প্রিয়া করে তোলে, তাই তার চরিত্র, শক্তি, অভ্যাস, এমন কি আরও গভীরভাবে তার প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। পাঠক, আপনি যদি মানুষের মধ্যে এর দৃষ্টান্ত খুঁজতে যান, দেখতে পাবেন, এটা কত সত্য! আল্লাহ্ অনেক কিছুই ইচ্ছামত সৃষ্টি করেন।[৬]

৬. কোরান ৩, ৪৭; ৫, ১৭; ২৪, ৪৫; ২৮, ৬৮; ৩০, ৫৪; ৩৯, ৪; ৪২, ৪৯।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[নীতিনিয়মের সহায়তা নগরবাসীদের সংগ্রামমুখিতা ও প্রতিরোধ ক্ষমতা বিলোপ করে]

এটা এ যে, মানুষের মধ্যে সকলেই নিজের ব্যাপারে সর্বেসর্বা নয়। তাদের মধ্যে সর্দার, আমীর ও প্রভুদের সংখ্যা অন্যদের তুলনায় অল্প। সুতরাং সাধারণভাবে মানুষ অন্যের অধীনে বসবাস করে এবং এটা তাদের জন্য প্রয়োজনীয়। যদি এ প্রকার প্রভুত্ব বন্ধুভাবাপন্ন ও স্বাভাবিক হয়, যদি তার আদেশ-নিষেধ ও বাধা-বিপত্তির কঠোরতা না থাকে, তা হলে তার অধীনস্থ মানুষ নিজেদের রুচি অনুসারেই বীরত্ব বা কাপুরুষতা অবলম্বন করে থাকে। তারা বিধি-নিষেধের প্রবর্তনার প্রতি নিঃসংকোচ হয়ে এমনভাবে আত্মনির্ভরশীলতার অনুশীলন করে যে, তা তাদের প্রকৃতি হয়ে দাঁড়ায় এবং এটা ব্যতীত অন্য কিছু তারা বুঝে না।

কিন্তু প্রভুত্বটি না যদি এমন হয় যে তার বিধিনিষেধের মধ্যে কঠোরতা, প্রতাপ ও ভয় প্রদর্শনের ভাব থাকে, তখন মানুষের সংগ্রামী চেতনা বিনষ্ট হয় এবং তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পেয়ে থাকে। কারণ অত্যধিক নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা জীবাত্মার মধ্যে এক প্রকার শৈথিল্য দেখা দেয়, যেমন আমরা পরে বর্ণনা করব। হজরত উমর 'সাদ'কে অনুরূপ কঠোর হতে নিষেধ করেছিলেন। যহরা ইবনে জাবিয়া যখন জালেনুসের পরিত্যক্ত সামগ্রী গ্রহণ করেছিলেন, তখন এ ঘটনা ঘটেছিল। মূল ঘটনাটি হল, যহরা কাদেসিয়ার যুদ্ধের দিন জালেনুসের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে হত্যা করে তার পরিত্যক্ত সামগ্রী ছিনিয়ে নেন। এর মূল্য ছিল পঁচাত্তর হাজার স্বর্ণমুদ্রা। সেনাপতি সাদ ইবনে আবু ওক্কাস উক্ত লুণ্ঠিত সামগ্রী তার নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে বলেছিলেন, তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে তুমি আমার অনুমতির অপেক্ষা করলে না কেন? অতঃপর এ ব্যাপারে হজরত উমরের অনুমতি প্রার্থনা করে সাদ তাঁর নিকট পত্র লিখলেন। উত্তরে হজরত উমর লিখেছিলেন, "তুমি কি যহরা সম্পর্কে এ করতে চাও; অথচ সে যতটুকু জ্বলবার জ্বলেছে আর তোমারও যুদ্ধের যতটুকু বাকি রইবার রয়েছে। তার সাহস নষ্ট করে ফেলবে, তার অন্তর বিকৃত করে ফেলবে।" হজরত উমর তার লুণ্ঠিত সামগ্রী তাকে দিয়ে দিতে বললেন।

যদি বিধি-নিষেধগুলো শাস্তির আকারে দেখা দেয়, তা হলে সংগ্রামী চেতনা সমূলে নষ্ট হয়ে যায়। কারণ এ শাস্তি এমন ব্যক্তির উপর পতিত হচ্ছে, যার তা ফিরাবার ক্ষমতা নেই। এর ফলে তার মনে যে অপমান বোধ জন্ম নিবে, তাতে সংগ্রামী চেতনার

ধ্বংস অনিবার্য এবং সুনিশ্চিত। অন্যদিকে যদি বিধি-নিষেধসমূহ পরিমার্জনা ও শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং বাল্যকাল থেকেই তা প্রয়োগ করা হয়, তথাপি কিছুদূর পর্যন্ত তার প্রভাব বিস্তৃত হয়ে থাকে; যার ফলে সংশ্লিষ্ট বালক এক প্রকার ভীতি ও আনুগত্যের মধ্যে বেড়ে উঠে এবং তার সংগ্রামী চেতনা বিকশিত হয় না। এ জন্যই প্রান্তরবাসী বন্যপ্রকৃতির বেদুইনদেরকে দেখতে পাই, তারা বিধি-নিষেধের অধীন মানুষগুলো অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ় সংগ্রামী চেতনার অধিকারী। আমরা তাদেরকেও দেখতে পাই, যারা বিধিনিষেধের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং চরিত্র গঠন, শিক্ষা, শিল্পকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন ও ধার্মিকতা অনুশীলনে তার ছত্রচ্ছায়ায় অবস্থান করেন; এটা তাদের সংগ্রামী চেতনার অনেকখানিই নষ্ট করে ফেলে। ফলে তারা যে-কোন প্রকারে তাদের উপর আপতিত বিপদ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করবার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হন। এ অবস্থা হয় বিদ্যার্থীদের, যারা 'কেরাত' শিক্ষা করে, উস্তাদ ও ইমামদের নিকট থেকে পাঠ গ্রহণ করে এবং যারা চরিত্র গঠন ও শিক্ষার জন্য গাম্ভীর্য ও মর্যাদাপূর্ণ সমাবেশে অবস্থান করে। চিন্তা করবার ব্যাপার, এ সকল অবস্থা কীভাবে তাদের প্রতিরোধ শক্তি ও সংগ্রামী চেতনা বিলোপ করে দেয়!

অবশ্য সাহাবীদের ধর্মীয় বিধি-নিষেধ ও ধর্মচেতনা গ্রহণের মধ্যে এ ধরনের কোন বিকৃত প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। এতে তাদের সংগ্রামী চেতনার কোন ক্ষতি হয়নি; বরং তাঁরা অন্য মানুষ অপেক্ষা অধিকতর তীব্র সংগ্রামী চেতনার অধিকারী ছিলেন। কারণ ধর্ম প্রবর্তক (আল্লাহ্ তাঁর কল্যাণ করুন), যাঁর নিকট থেকে সরাসরি ধর্মমত গ্রহণ করে তাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন, তিনি তাঁদেরই একজন এবং তাঁদের মধ্যেই অবস্থান করছিলেন। তাঁর সেই শিক্ষা ছিল আকর্ষণ ও ভয় প্রদর্শনের ব্যাপার। তা কোন প্রকারেই শিল্পমূলক শিক্ষা ও শিক্ষামূলক চরিত্র গঠন ছিল না। বরং তা ছিল ধর্মের নির্দেশ ও পালনীয় দীক্ষার বিবরণ। যা অনুসারীরা স্বেচ্ছায় তাঁদের বিশ্বাস ও সত্যোপলব্ধির আকর্ষণে গ্রহণ করেছিলেন। এ জন্যই তাঁদের সংগ্রামী চেতনা সর্বদাই সুদৃঢ় ছিল। তাঁদের এ দৃঢ়তার মধ্যে চরিত্র গঠন প্রক্রিয়া ও নির্দেশ নখরাঘাত করতে সক্ষম হয়নি। হজরত উমর (রাঃ) বলেছেন, যাকে ধর্ম চরিত্রবান করতে পারেনি তাকে আল্লাহ্ও তার চরিত্র দান করেন না। তিনি এ বক্তব্যে এ আগ্রহই প্রকাশ করেছিলেন যে, প্রত্যেকেই নিজের আকর্ষণেই নিজকে সুগঠিত করে নিবে। কেননা তাঁর বিশ্বাস ছিল, ধর্মপ্রবর্তক অবশ্যই অনুসারীদের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে উত্তম জ্ঞাতা। এর পর যখন মানুষের মধ্যে ধর্মবোধে শৈথিল্য দেখা দিল এবং তারা দমনমূলক নির্দেশাদি প্রবর্তন করতে লাগল, তখন ধর্ম এমন একটি শাস্ত্র ও শিল্পকর্মে পরিণত হল যে, তা শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব। অন্যদিকে মানুষ তখন নগরজীবনে প্রবেশ করেছে এবং তাদের আনুগত্যের জন্য বিধি-নিষেধের নিগড় গড়ে তোলা হয়েছে। এ সব কিছু মিলিয়ে তাদের মধ্যকার সংগ্রামী চেতনাও ততদিনে ধ্বংস হয়ে গেছে।

এ কথা অবশ্যই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, রাজকীয় নির্দেশ ও শিক্ষামূলক নিয়ম-নীতি সংগ্রামী চেতনাকে বিকৃত করে দেয়। কারণ এস্থলে নিবর্তনমূলক বিষয়াদি সম্পূর্ণ বহিরাগত। কিন্তু ধর্মীয় বিধি-নিষেধ অনুরূপ নয়; কারণ সেখানে নিবর্তন একান্তই

সত্তার সাথে জড়িত। এ জন্যই এ সকল রাজকীয় নির্দেশ ও শিক্ষামূলক নিয়মনীতি নগরবাসীদের সত্তাগত দুর্বলতা ও শৌর্যবীর্য বিনষ্টের এক অন্যতম কারণ। কেননা তারা শিশুকাল থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত তারই ছত্রচ্ছায়ায় বসবাস করছে। কিন্তু প্রান্তরবাসীরা এ থেকে অনেক দূরে। কারণ তারা রাজকীয় নির্দেশ, শিক্ষাদান ও চরিত্র গঠনের নিয়ম-নীতি থেকে বহুদূরে অবস্থান করছে। এজন্যই মুহম্মদ ইবনে আবু জায়েদ তাঁর গ্রন্থের 'শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রতি' নির্দেশাবলিতে বলেছেন, কোন শিক্ষকের জন্য তাঁর বালক শিক্ষার্থীকে তিনবারের অধিক বেত্রাঘাত করা উচিত নয়। তিনি তা কাজী শুরাইহের[৭] নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে অনেকে প্রমাণ উপস্থিত করতে গিয়ে ওহী অবতরণের প্রথম দিকে চাপ দেয়ার যে বর্ণনা হাদিসে বিদ্যমান, তার কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ তাও তিনবারই ছিল। কিন্তু এ মতটি দুর্বল। কারণ চাপের ব্যাপারটি দিয়ে এ ধরনের প্রমাণ তৈরি করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা তা পরিচিত শিক্ষাপ্রণালী থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। আল্লাহ্ বিচক্ষণ ও সর্বজ্ঞ।[৮]

---

৭ তিনি খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দিতে জীবিত ছিলেন। হজরত উমর কর্তৃক কুফার কাজী নিযুক্ত হয়েছিলেন বলে কথিত হয়।

৮ কোরান ৬, ১৮, ৭৩; ৩৪, ১।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[একমাত্র গোত্রপ্রীতির অধিকারী গোত্রগুলোই প্রান্তরে বসবাস করতে সক্ষম]

জেনে রাখুন, পবিত্র আল্লাহ্ মানুষের প্রকৃতির মধ্যে ভাল এবং মন্দ উভয়কেই গেঁথে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, "এবং আমরা তাদেরকে দুটি পথ দেখিয়েছি"[৯] তিনি আরও বলেছেন, "তিনি তাদের মধ্যে অসংযম ও সংযম উভয়ের অনুপ্রেরণা দান করেছেন।"[১০] মন্দই মানুষের চরিত্রের অধিকতর নিকটবর্তী যদি সে অবাধে তাতে বিচরণ করবার অভ্যাস গড়ে তোলে এবং কোন প্রকার ধর্মবোধের অনুসরণ দ্বারা তাকে মার্জিত না করে। এ ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপরই অধিকাংশ লোকের অবস্থান। একমাত্র আল্লাহ্ যাঁদেরকে শক্তি দান করেছেন, তাঁরাই এ থেকে বেঁচে থাকতে পারেন।

মানুষের চরিত্রের মধ্যে অত্যাচার ও পরস্পর উৎপীড়ন অত্যন্ত বেশি মাত্রায় বিদ্যমান। যে ব্যক্তি তার ভ্রাতার সম্পদের প্রতি লোভ করল এবং তাকে ছিনিয়ে নিবার জন্য হাত বাড়াল, তা থেকে তাঁকে একমাত্র সংযমবোধই রক্ষা করতে পারে, যেমন কবি বলেছেন।[১১]

নগর ও পল্লীগুলোতে একে অপরকে উৎপীড়ন করা থেকে শাসক ও রাজ্যের ধারাই রক্ষা করে থাকে। কারণ তারা তাদের অধীনস্থ সমুদয় হস্তকেই অপরের প্রতি প্রসারিত হওয়া থেকে বিতর রাখে এবং উৎপীড়িত হতে দেয় না। এভাবে নগরবাসীরা কঠোর নির্দেশ ও প্রতাপের লাগামডোরে আবদ্ধ হয়ে একে অপরের উৎপীড়ন শিকারে পরিণত হয় না। অবশ্য স্বয়ং শাসক যদি উৎপীড়ন করে, তবে স্বতন্ত্র কথা। অন্যদিকে নগরের বাইরে থেকে যে সকল উৎপীড়ন এসে উপস্থিত হয়, তা নগর প্রাকারই অনেকাংশে প্রতিরোধ করে। এগুলো, রক্ষা ব্যবস্থার প্রতি উদাসীনতা, রাত্রিকালীন হঠাৎ আক্রমণ কিংবা দিবাভাগেই অক্ষমতার জন্য পশ্চাদপসারণের দরুন ঘটে থাকে। তদুপরি এ সকল বিপদ প্রতিরোধের জন্য রাজ্যের সহায়তাকারী এবং বিপদের সম্মুখীন হবার মত যোগ্যতাসম্পন্ন সৈন্যদলও বিদ্যমান।

কিন্তু প্রান্তরবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ প্রকার উৎপীড়ন প্রতিরোধের জন্য অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রতিটি গোত্রের সর্দার ও বয়োবৃদ্ধদের প্রতি সাধারণ মানুষের যে সমীহ ও শ্রদ্ধাবোধ আছে, তাই তাদের মধ্যে সংযমের সৃষ্টি করে এবং বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের

---

৯. কোরান ৯০, ১০।

১০. কোরান ৯১, ৮।

১১. আব্বাসীয় যুগের কবি আল মুতানবেবী।

জন্য গোত্রান্তর্গত বীর্যবত্তায় খ্যাতিমান যুবকদেরকে সমবায়ে রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়। তাদের এ প্রকার সংগঠন ও তদ্বারা কাম্য প্রতিরোধ তখনই সাফল্যলাভ করে, যখন তা গোত্রপ্রীতি ও বংশধারার সম্পর্কের উপর স্থাপিত হয়। কারণ একমাত্র এর মাধ্যমেই তাদের শৌর্য সুদৃঢ় হতে পারে এবং অপরের মনে তা সমীহের ভাব উদ্রেক করতে পারে। কেননা গোত্রপ্রীতি ও বংশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই গভীর আকর্ষণ বিদ্যমান। কারণ আল্লাহ্ প্রতিটি মানুষের অন্তরেই এমন কিছু প্রীতি ও মমতা প্রদান করেছেন, যা তাদের বংশ ও স্বজনের প্রতি গভীর আকর্ষণ হিসাবে প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে। এর দ্বারাই পরস্পরের সহানুভূতি ও সহায়তা লাভ করা সম্ভব এবং এর মাধ্যমেই শত্রুর মনে ভীতির উদ্রেক করা সম্ভব। হজরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের উক্তি হিসাবে কোরানে যা বর্ণিত হয়েছে, এ বক্তব্যের আলোকে তাকে বিবেচনা করুন। তারা তাদের পিতাকে বলেছিল, "যদি তাকে বাঘে খেয়ে ফেলে, অথচ আমরা একটি গোত্র, তা হলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হব।"[১২] এর অর্থ এ যে, তারা সকলে এক গোত্রের হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে কারও উপর অবিচার অনুষ্ঠিত হতে পারে না।

কিন্তু যারা বংশধারার ক্ষেত্রে একত্র সত্তার অধিকারী, তাদের মধ্যে সাথীদের প্রতি আকর্ষণ খুব অল্প মাত্রাতেই বিরাজ করে। সুতরাং যুদ্ধের যেদিনে শূন্যপ্রান্তর অকল্যাণে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে, তখন তারা চুপিসারে আত্মরক্ষার জন্য এবং একাকী অপদস্থ হবার ভয়ে সরে পড়ে। এজন্যই এ শ্রেণীর লোকের পক্ষে প্রান্তরে বসবাস করা সম্ভব হয়। কারণ তারা যে-কোন মুহূর্তে অন্য কোন দলের সহজ শিকারে পরিণত হতে পারে।

পাঠক, বসবাসের ব্যাপারে যখন এ বিষয়টি আপনার নিকট পরিস্ফুট হল যে এর জন্য প্রতিরোধ ও সহায়তা একান্ত প্রয়োজনীয়, তখন একে মানুষের অন্যান্য কর্তব্য, যেমন নবুয়ত প্রচার, রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও মতবাদের প্রসারের ক্ষেত্রেও আপনি একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করবেন। কারণ এ সকল বিষয়ের চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা যুদ্ধবিগ্রহ ব্যতীত কিছুতেই পূর্ণতা লাভ করে না। কেননা মানুষ স্বভাবতঃই প্রতিরোধকামী। এ জন্যই যুদ্ধবিগ্রহে গোত্রপ্রীতির প্রশ্নটি অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়, যেমন একটু পূর্বেই এ সম্পর্কে আমরা বর্ণনা করেছি। সুতরাং পাঠক, আপনি একে মুখ্য প্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করে আমাদের পরবর্তী আলোচনায় প্রবেশ করবেন। আল্লাহ্ই সত্যের জন্য সহায়তাকারী।

---

১২. কোরান ১২, ১৪।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[গোত্রপ্রীতি একমাত্র রক্তসম্পর্ক ও তার সমস্থানীয় সম্বন্ধ থেকেই অস্তিত্বে আসতে পারে।]

এর কারণ এ যে, খুব কম সংখ্যক লোক ব্যতীত মানুষের স্বভাবে রক্ত সম্পর্কের আকর্ষণ বিদ্যমান। এ আকর্ষণের অন্যতম ফলশ্রুতি হল স্বজন ও ঘনিষ্ঠের উপর যাতে কোন বিপদ আপতিত ও অবিচার অনুষ্ঠিত হতে না পারে, তাই কামনা করা। কারণ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের উপর কোন প্রকার আক্রমণ ও অত্যাচার হলে মানুষ স্বভাবতঃই বিক্ষুব্ধ হয়। এজন্য তারা ঐসকল বিপদ ও অত্যাচার এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে তা প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে। এটা এমন একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ, যা সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান।

সুতরাং পরস্পর সাহায্যকারী মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যদি এ বংশধারার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হয় তা হলে তা থেকে যে ঐক্য ও ঘনিষ্ঠতা জন্মলাভ করে, তাকে প্রকাশ্য সম্পর্ক বলা যেতে পারে। এর ফলে তার একক প্রভাব ও স্পষ্টতার জন্য ঐক্য সম্ভব হয়ে উঠে। কিন্তু যদি বংশ পরিচয় অনেকটা অঘনিষ্ঠ হয়, যেমন অনেক সময় তার কিছু অংশ বিস্মৃত ও কিছু অংশ মাত্র স্মৃতিতে বিরাজমান থাকে, তা হলে মানুষ এ ভেবেই এরূপ আত্মীয়কে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়, যাতে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তির উপর অত্যাচার হতে দেখে নিশ্চুপ থাকার লজ্জা সে দূর করতে পারে। এরূপভাবে আশ্রিত পোষ্য ও চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদের ব্যাপারেও মানুষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। কারণ এ ক্ষেত্রেও মানুষ সেই আকর্ষণ ও ঘনিষ্ঠতাই অনুভব করে থাকে, যার জন্য সে তার কোন প্রকারের আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিবেশীর স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর হয়। বস্তুত আশ্রিত পোষ্যের সাথে তার যে সম্পর্ক গড়ে উঠে, তা প্রায় বংশধারা বা তার তুল্যই। এ থেকেই হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর নিম্নলিখিত বাণীর তাৎপর্য বোঝা যায়। তিনি বলেন, "তোমাদের বংশধারা সম্পর্কে ঐ জ্ঞান লাভ কর, যা তোমাদের রক্তসম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে পারে।" এর অর্থ এ যে, বংশধারা সম্পর্কীয় জ্ঞানের একমাত্র উপকার হল, তা দ্বারা রক্ত সম্পর্ককে সুদৃঢ় করা যায় এবং তার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ঐক্য ও সহায়তার ভিত্তি গড়ে তোলা যায়। এতদ্ব্যতীত অন্য যা কিছু সকলই অতিরিক্ত। কারণ বংশধারা একটি কাল্পনিক বিষয় মাত্র, তার যথার্থতা বিশেষ কিছুই নেই। তার একমাত্র উপকার এ ঘনিষ্ঠতা ও ঐক্য সৃষ্টির মধ্যে নিহিত। সুতরাং এটা যদি স্পষ্ট ও প্রকাশ্য হয়, তা হলে তা মানুষকে তার প্রকৃতিগত আকর্ষণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেমন পূর্বে আমরা বলেছি। আর

যদি তা এমন হয় যে, একমাত্র বহুদূরে অবস্থিত সংবাদ থেকে জানা যায়, তা হলে তার সম্পর্কে মানুষের কল্পনাশক্তি দুর্বলতা অনুভব করে এবং তার উপকারিতাও সেইসঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায়। তখন তা এমন একটি বিষয়, যার মধ্যে তৎপর হওয়া অর্থহীন এবং নিষিদ্ধ খেলার ন্যায়ই তা পরিত্যাজ্য। এদিক থেকে বিচার করলে অনেকের সেই কথার অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠে, যাতে তারা বলেন, "বংশধারা এমন একটি বিদ্যা, যা উপকার করে না এবং তা না জানাতে কোন ক্ষতি হয় না।" এর অর্থ এ যে, বংশধারা যখন অস্পষ্ট হয়ে উঠে, তখন তা শাস্ত্র বলে গণ্য হতে পারে, কিন্তু মানুষের উপর তার প্রভাবে যে ধারণার সৃষ্টি হওয়া দরকার, তা থেকে সে বঞ্চিত হয়। তার মধ্যে সেই আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে না। যদ্বারা গোত্রপ্রীতির বন্ধন সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং এ অবস্থায় এতে কি লাভ! আল্লাহ্ই পবিত্র, উন্নত ও সর্বজ্ঞ।

নবম পরিচ্ছেদ

[সুস্পষ্ট বংশধারা কেবল তৃণশূন্য প্রান্তরবাসী বন্যপ্রকৃতির আরব-বেদুইন এবং তাদের সমস্থানীয় অন্যান্যের মধ্যে পাওয়া যায়]

এর কারণ, আরব বেদুইনরা তাদের জীবন-যাপনের দীনতা, অবস্থার কঠোরতা ও বাসস্থানের দুর্গমতার জন্য বিশিষ্ট। কেননা একটি প্রয়োজনই তাদেরকে এরূপ অবস্থার সম্মুখীন করেছে এবং তার নিকট তারা এর অধিক কিছু প্রত্যাশাও করতে পারে না। আর তা হল এ যে, তারা উট পালন ও তার বংশবৃদ্ধির জন্য চারণভূমি সংস্থানের মধ্য দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ উট তাদেরকে মরুপ্রান্তরের বন্যজীবনের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। কারণ সেখানেই উটের আহার্য গুল্মাদি বিদ্যমান এবং তার বালুকার উপরেই উট তার বাচ্চা প্রসব করে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মরুপ্রান্তর প্রকৃতির দিক থেকে কঠোর এবং আহার্যসামগ্রীর দিক থেকে নিঃস্ব। অথচ এ স্থানই তাদের জন্য প্রিয় ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে এবং তাতেই তারা বংশপরম্পরায় লালিত হচ্ছে। এমনকি এ জীবন-যাপন তাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে পড়েছে। বাইর থেকে কেউ তাদের এ স্বভাবজাত দুরবস্থায় অংশগ্রহণ করতে যায় না এবং অন্য কোন গোত্রও তাদের সাথে সম্প্রীতি স্থাপনে অগ্রসর হয় না। বরং তাদের মধ্যে কেউ যদি এ দুরবস্থা থেকে পলায়ন করতে চায় ও তা তার পক্ষে সম্ভব হয়, তা হলেও দেখা যাবে, সে অন্যত্রও এ মরুস্বভাব ত্যাগ করতে পারছে না। সুতরাং এ সকল কারণেই তাদের বংশধারা সর্বদা অমিশ্র ও অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে বলে বিশ্বাস করা যায়। পাঠক, এ বক্তব্যের সাথে কোরায়েশের মুজার, কেনানা, ছকিফ, বনি আসাদ, হুজাইল ও তাদের প্রতিবেশী খুজাআ গোত্রসমূহের অবস্থা বিবেচনা করুন। এরা সকলেই কঠোর জীবনের অধিকারী ও শস্য ও দুগ্ধহীন প্রান্তরের অধিবাসী ছিল। সিরিয়া ও ইরাকের শস্য ও মসল্লাদির খনি সবুজ অঞ্চল থেকে বহু দূরে ছিল এদের অবস্থান। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের বংশধারার প্রতি লক্ষ করুন, তা কত সুস্পষ্ট এবং মিশ্রণ হতে কত সুরক্ষিত! তাতে বিন্দুমাত্রও মিশ্রণের পরিচয় নেই।

অথচ যে সকল আরব-বেদুইন পাহাড়ী এলাকার জীবন ও চারণভূমির প্রাচুর্যের মধ্যে ছিল, যেমন হিমিয়ার ও কাহলানের লুখাম, জুযাম, গাস্ সান, তাই, কুজাআ ও ইয়াদ, তাদের বংশধারা মিশ্রিত হয়ে এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলে গেছে। তাদের প্রতি গৃহেই এ বিষয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান, যা মানুষের নিকট সুপরিচিত। তাদের এ মিশ্রণ অনারব গোত্রগুলোর সাথে মেলামেশা থেকেই এসেছে। তারা তাদের গৃহ ও

গোত্রশাখায় বংশধারা সংরক্ষণের ব্যাপারটিকে আদৌ গুরুত্ব দেয় না। ফলে এটা শুধু আরব বেদুইনদের জন্যই অবশিষ্ট রয়েছে। হজরত উমর (রাঃ) বলেছেন, "বংশধারার জ্ঞান আহরণ কর এবং গ্রামাঞ্চলের নবতীদের মত হইও না; তাদের কাউকেও জিজ্ঞাসা করলে যে, তার পরিচয় কি, সে বলে আমি অমুক বস্তির অধিবাসী।"

এটাই সেই অবস্থা, যা সবুজ প্রান্তরবাসী বেদুইনদের ভাগ্যে জুটেছে। তারা খাদ্য ও চারণভূমির প্রাচুর্যের মধ্যে উত্তম এলাকায় বাস করে মানুষের সাথে মিশে গেছে। তার ফলে তাদের মধ্যে অধিক মিশ্রণ ও বংশধারার জটিলতা দেখা দিয়েছে। ইসলাম আবির্ভাবের প্রথম দিকেও মানুষ পরিচয় দিবার সময় বাসস্থানের নাম উল্লেখ করত। যেমন বলা হত কিন্নাসরিনের দল, দামেশ্কের দল, আলআওয়াসেমের দল ইত্যাদি। পরবর্তীকালে এ রীতি স্পেনেও এসে পৌঁছায়। বাসস্থানের নামে এ পরিচয় দান এজন্য হয়নি যে, আরব বেদুইনরা তাদের বংশধারার ব্যাপারটি ত্যাগ করেছিল, বরং বিজয়ের পরে তারা স্থায়ী বসবাসের স্থান পেয়েছিল এবং তার দ্বারা পরিচয়ের সুবিধা লাভ করেছিল। এর ফলে উক্ত পরিচয় তাদের বংশ পরিচয়ের অতিরিক্ত একটি চিহ্ন হিসাবে সর্দারদের নিকট গৃহীত হত। কিন্তু এর পর নগরগুলোতে অনারব ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে বংশধারার অবাধ মিশ্রণ দেখা দিল এবং বংশধারা সম্পূর্ণভাবে বিকৃত হয়ে গেল। এর ফলে বংশধারার ফলশ্রুতি গোত্রপ্রীতি বিনষ্ট হওয়ায় তা পরিত্যক্ত হল এবং ক্রমে গোত্রগুলোর অস্তিত্ব লোপ ও তাদের সঙ্গে গোত্রপ্রীতিরও সমাধি রচিত হল। কিন্তু প্রান্তরে তা পূর্ববৎ অবশিষ্ট রয়েছে। আল্লাহ্ পৃথিবীর ও তদন্তর্গত সমুদয়ের অধীশ্বর।

দশম পরিচ্ছেদ

[বংশধারায় মিশ্রণ কীভাবে ঘটে]

জেনে রাখুন, এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, কখনও কোন বংশের কেউ অপর বংশের সাথে নানা কারণে সংযুক্ত হয়ে যায়। এ সংযুক্তি আত্মীয়তা, চুক্তি, আশ্রিত, পোষ্যপ্রথা অথবা সংশ্লিষ্ট গোত্র কোন অপকর্ম করে পলায়নের দরুন হতে পারে। এর ফলে যে সংযুক্ত গোত্রের বংশধারা দাবি করে এবং গোত্রগত অন্যান্য ফলাফল, যেমন প্রীতি, রক্তমূল্য ও তৎসম্পর্কিত দায়িত্ব বহন এবং অন্য সকল অবস্থায় তাদের একজন বলে গণ্য হয়। সুতরাং সে যখন সংশ্লিষ্ট গোত্রের সমুদয় অধিকার ভোগ করতে পারে তখন তাদের একজন হওয়ার মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকে না। কারণ কোন ব্যক্তির এ গোত্রের অথবা ঐ গোত্রের হওয়ার অর্থ একটিই, তা হল সে তাদের সমুদয় নির্দেশের অনুসারী এবং সমুদয় অবস্থার অধিকারী হবে। সে যেন তাদের সাথে একীভূত হয়ে গেছে। এর পর সময়ের ব্যবধানের জন্য তার পূর্ববংশের কথা সকলেই ভুলে যায় এবং যারা এটা জানত, তারাও তিরোহিত হয়। এভাবে তা অধিকাংশ স্থলে গুপ্ত হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবেই এক বংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে অনবরত নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে এবং প্রাক্ ইসলাম, ইসলাম, আরব ও অনারব আমলেও এক জাতি অন্য জাতির সাথে মিশ্রিত হয়েছে। পাঠক, আল মুনযির বংশ ও অন্যান্য গোত্র সম্পর্কে মানুষের মধ্যে মতানৈক্যের বিষয়টি লক্ষ করুন তা হলে উপরোক্ত বক্তব্যের অনেকখানি আপনার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ প্রসঙ্গে বাজিলা গোত্রের উদাহরণ দেয়া যায়। হজরত উমর যখন আরফাজা ইবনে হারসামাকে তাদের উপর শাসক নিযুক্ত করলেন, তখন তারা এ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করল এবং বলল, সে আমাদের মধ্যে বহিরাগত অর্থাৎ সে আমাদের মধ্যে বাইরে থেকে এসে নিজেকে সংযুক্ত করেছে। তারা জরিরকে তাদের শাসক নিযুক্ত করবার জন্য হজরত উমরের নিকট আবেদন জানাল। তিনি আরফাজাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, "হে বিশ্বাসীদের নেতা, তারা সত্যই বলেছে; আমি মূলত আজদ গোত্রের লোক। আমার নিজ বংশে আমি একটি খুন করে ফেলি এবং তার ফলে এদের সাথে এসে সংযুক্ত হই।" পাঠক, লক্ষ করুন, কীভাবে আরফাজা বাজিলা গোত্রে মিশে গিয়ে তাদের পরিচয় গ্রহণ করেছিল এবং উক্ত বংশধারার দাবি নিয়ে শাসক নিযুক্ত হতে অগ্রসর হয়েছিল। যদি বাজিলা গোত্রের অনেকের মধ্যে এর জ্ঞান না থাকত, যদি তারা

এ ব্যাপারে উদাসীনতা প্রকাশ করত এবং সময়ের ব্যবধান বেড়ে যেত, তা হলে সকলেই তা বিস্মৃত হত ও আরফাজা মত পথ সকল দিক থেকে তাদের একজন বলে গণ্য হত।

এ বিষয়টি বুঝে নিন এবং সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌র রহস্যকে অনুধাবন করুন। এ প্রকার ঘটনা বর্তমান যুগে এবং এর পূর্ববর্তী অন্যান্য যুগে প্রচুর সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর দয়ায়, অনুগ্রহে ও করুণায় সত্যের দিকে নিয়ে যান।

একাদশ পরিচ্ছেদ

[নেতৃত্ব সর্বদা গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন বংশের একটি বিশেষ অংশেই বিরাজ করে]

জেনে রাখুন, গোত্রগুলোর প্রতিটি শাখা ও প্রশাখা যদিও সাধারণ বংশধারার দিক থেকে একই গোত্রচেতনার অধীন, তথাপি তাদের মধ্যে বিশেষ বংশসম্পর্কের দরুন গোত্রপ্রীতির বিভিন্নতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত গোত্রপ্রীতিই সাধারণ বংশধারা চেতনা অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ় ঐক্যের জন্মদাত্রী। যেমন একটি পরিবার, একটি ঘর অথবা এক পিতার সন্তান। এদের সাথে ঘনিষ্ঠ বা অঘনিষ্ঠ চাচাতো ভাইদের তুলনা হয় না। কারণ পূর্বোক্তরা তাদের বংশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ। অথচ এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁরা অন্যান্য অনেকের সাথে সাধারণ বংশধারাগত গোত্রচেতনার অংশীদার। বংশধারার এ বিশেষ সম্পর্ক ও সাধারণ সম্পর্ক উভয়ের প্রতিই মানুষের আকর্ষণ আছে। তথাপি তা এ বিশেষ বংশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতার জন্য অধিকতর তীব্র হয়ে থাকে।

নেতৃত্ব যদি কোন বংশের হস্তগত হয়, তা হলে তা বংশের বিশেষ একটি অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সমগ্রের মধ্যে নয়। আর নেতৃত্ব যেহেতু প্রাধান্য বিস্তারের ব্যাপার, সেজন্য উক্ত বিশেষ অংশটির গোত্রপ্রীতি অন্য সকল অংশ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হতে হবে। যাতে তদ্বারা প্রাধান্য বিস্তার সম্ভব হয় এবং নেতৃত্ব পরিপূর্ণতা লাভ করে। তারা যদি এ বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে, তা হলে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, নেতৃত্ব সর্বদাই এ বিশেষ অংশের মধ্যে তাদের প্রাধান্য বিস্তারের ফলে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি এটা বের হয়েও যায় এবং অন্য কোন গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন এমন গোষ্ঠীর হাতে পড়ে, যারা প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে পূর্বোক্তদের অপেক্ষা হীন, তা হলে তাদের নেতৃত্ব পূর্ণতা লাভ করবে না। সুতরাং নেতৃত্ব ঐ বিশেষ অংশেই সর্বদা বিরাজ করে তাদের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় বিস্তৃত হবে এবং এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাখাটিই তা লাভ করবে। এর কারণও আমাদের পূর্বকথিত সেই প্রাধান্য বিস্তার। কেননা মানব সমাজ ও গোত্রপ্রীতির ব্যাপারটিকে সৃষ্টির অভ্যন্তরীণ মিশ্রণের সাথে তুলনা করা যায়। উক্ত মিশ্রণ কখনই সুসম্পন্ন হয় না, যদি সম্মিলিত উপাদানগুলো সমশক্তির অধিকারী হয়। তাদের মধ্যে যে কোন একটির প্রাধান্য বিস্তার অবশ্যম্ভাবী; নতুবা সৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করবে না। গোত্রপ্রীতির মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারের শর্ত আরোপের রহস্য এটাই এবং এ থেকেই উক্ত বিশেষ অংশে নেতৃত্বের স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত হয়ে থাকে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

[গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন অংশের নেতৃত্ব তাদের বংশ ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়]

এর কারণ এ যে, নেতৃত্ব প্রাধান্য বিস্তার ব্যতীত সম্ভব নয় এবং প্রাধান্য বিস্তার গোত্রপ্রীতি ছাড়া সম্ভব হয়ে উঠে না, যেমন পূর্বে বর্ণনা করেছি। কোন জাতির উপর নেতৃত্ব করতে হলে এমন একটি গোত্রপ্রীতির অধিকারী হতে হবে, যা তদন্তর্গত সমুদয় গোত্রপ্রীতির উপর একের পর এক প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। কারণ প্রতিটি গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠী যখন সর্দারের গোত্রপ্রীতির প্রাধান্যের কথা বুঝতে পারবে, তখনই তারা অনুগত ও বাধ্য হয়ে উঠবে। যে ব্যক্তি অন্য বংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে, তার পক্ষে সংশ্লিষ্ট বংশান্তর্গত গোত্রপ্রীতির সহায়তা লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ সে সংযুক্ত ও বহিরাগত। তার গোত্রত্ব আশ্রিত পোষ্য ও চুক্তির পর্যায়ে উপনীত হতে পারে; কিন্তু তাতে তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করা কিছুতেই সম্ভব নয়। যদি ধরে নেয়া যায় যে, সে তাদের সাথে এক হয়ে মিশে গেছে, তার সংযুক্তির সেই প্রাথমিক সময়ের কথা সকলে বিস্মৃত হয়েছে এবং তাদের গোত্রপরিচয় গ্রহণ করে সে তার দাবি করছে, তা হলেও এ একীভূত হওয়ার পূর্বে তার জন্য বা তার কোন পূর্বপুরুষের জন্য কি করে নেতৃত্ব লাভ করা সম্ভব! অথচ নেতৃত্ব কোন জাতির মধ্যে একটি উৎস থেকেই উৎসারিত হয়, যে উৎসের জন্য গোত্রপ্রীতির সাহায্যে প্রাধান্য বিস্তার নিশ্চিত হয়ে আছে। সুতরাং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এ সংযুক্তি ব্যক্তিটির প্রাচীনত্বের দাবি এমন একটি সময়ে তা সংঘটিত হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে, যখন তার সংযুক্তির পরিচয়ের মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহ ছিল না এবং নিয়ম অনুসারে এ সংযুক্তি তখন তার নেতৃত্বের পথে অবশ্যই বাধার সৃষ্টি করেছিল। কাজেই সেই সংযুক্তির অবস্থায় কী করে নেতৃত্ব বংশানুক্রমিকভাবে আবর্তিত হতে পারে? কারণ নেতৃত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে একমাত্র গোত্রপ্রীতির অধিকারী যোগ্য পূর্বপুরুষ থেকেই লাভ করা যায়, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

অথচ এতদসত্ত্বেও বহু গোত্রসর্দার ও গোত্রপ্রীতির অধিকারী ব্যক্তিরা এমন সব বংশধারার প্রতি নিজেদের রক্ত সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হন, যাতে কোন এক সময়ে বীরত্ব, দানশীলতা, সুখ্যাতি ইত্যাদির একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। তারা এ বিশেষ গোত্রের সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করেন এবং তার একটি শাখা হিসাবে পরিচয় তুলে ধরে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করেন। অথচ তারা জানেন না যে, এর ফলে তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র, তাদের নেতৃত্ব ও তাদের কৌলীন্যের উপর কিরূপ আঘাত আসে! বর্তমান যুগে

বহুলোকের মধ্যেই এ অভ্যাস দেখা যায়। এরই একটি উদাহরণ, সমগ্র জানাতা গোত্রই নিজেদেরকে আরব বেদুইন বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। অনুরূপভাবে 'যুগাবা'র একটি শাখা বনি আমেরের অন্তর্গত রাব্বাবের বংশধররা, যারা হেজাজী বলে পরিচিত, তারা দাবি করে যে, তারা বনি সুলাইম তথা শরিদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের পূর্বপুরুষ বনি আমেরের সাথে শবাধার তৈরিকারক—সূত্রধর হিসাবে সংযুক্ত হয়েছিল। এভাবে তাদের সাথে একীভূত হয়ে তাদের গোত্র পরিচয় গ্রহণ করে শেষ পর্যন্ত তাদের সর্দার হয়ে উঠেছিল। তারা তাকে 'হেজাজী' বলে ডাকত। এরূপ বনি আব্দুল কাবি ইবনে আল আব্বাস ইবনে তওজীনের দাবি যে, তারা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর। উক্ত মহান বংশের সাথে তাদের নাম যুক্ত করবার লোভে তারা আব্দুল কাবির পিতা আব্বাস ইবনে আতিয়ার নামের মধ্যে এ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। অথচ কোন আব্বাস বংশীয়ের মাগরিবে প্রবেশের কথা কখনও জানা যায়নি। কারণ মাগরিব অঞ্চল আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রথম থেকেই তাদের শত্রু আলী বংশীয় উবাইদী ও ইদরিসীদের করতলগত ছিল। এ দিক থেকে একজন আব্বাসীর পক্ষে আলী বংশীয়দের অনুসারী হওয়ার কথা কী করে ধারণা করা যায়?

অনুরূপভাবে বনি আব্দুল ওয়াহেদের অন্তর্গত যাইয়ানের বংশধর—তালিমিসানের রাজন্যবর্গ দাবি করেন যে, তাঁরা কাসেম ইবনে ইদরিসের বংশধর। এর উৎস এ যে, তাঁদের বংশ পরিচয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে, তাঁরা কাসেমের বংশধর। সুতরাং তাঁরা তাদের জানাতী ভাষায় বলে, 'আন্তেল কাশেম' অর্থাৎ বনি কাশেম। এর পর তারা পরিচয় তুলে ধরে যে, এ কাসেম কাসেম ইবনে ইদরিস অথবা কাসেম ইবনে মুহম্মদ ইবনে ইদরিস। যদি এটা সত্যও হয়, তথাপি উক্ত কাসেমের চরম পর্যায় এ হতে পারে যে, তিনি তাঁর রাজ্য থেকে পলায়ন করে তাদের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন মাত্র। এমতাবস্থায় ঐ প্রান্তরে তাদের মধ্যে তাঁর পক্ষে নেতৃত্ব লাভ করা কী করে সম্ভব হতে পারে? প্রকৃতপক্ষে এটা কাসেম নামেরই একটি বিভ্রান্তি। কারণ এ নাম ইদরিসীদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এতেই তাদের ধারণা জন্মেছে যে, তাদের কাসেমও এ বংশেরই অন্তর্গত। অথচ যাঁরা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁদের আদৌ এতে প্রয়োজন নেই। তাঁরা রাজ্য ও সম্মান উভয়ই লাভ করেন তাঁদের গোত্রপ্রীতির জোরে; এতে উলূবী, আব্বাসী বা অন্য কোন বংশধারার কোন কৃতিত্ব নেই। এটা একান্তভাবে রাজন্যবর্গের নৈকট্যপ্রয়াসী ব্যক্তিদের কলহ-বিবাদ ও ধর্মমতের ফল। তাদের দ্বারাই এ বংশ পরিচয় প্রকাশিত হয় এবং ক্রমশ প্রচারিত হয়ে প্রতিবাদের সীমা অতিক্রম করে যায়। আমি যাইয়ানী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াগমারাসিন ইবনে যাইয়ান থেকে শুনেছি, তাঁর নিকট এ বংশ পরিচয়ের ব্যাপারটি উত্থাপিত হলে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর জানাতী ভাষায় এ মন্তব্যই করেছিলেন যার অর্থ হল, 'পার্থিব সম্পদ ও রাজ্যত আমরা তরবারীর সাহায্যেই লাভ করেছি, এতে বংশধারার কোন হাত নেই। অবশ্য বংশধারার জন্য যদি পরকালে কোন উপকার পাওয়া যায়, তা আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে।' এভাবে তিনি উক্ত বংশ পরিচয়ের নৈকট্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

অনুরূপভাবে যগবার অন্তর্গত বনি ইয়াজিদের সর্দার বনি সাদ দাবি করেন যে, তাঁরা হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর বংশধর, তওজীনের অন্তর্গত বনি

ইয়াদলালতুনের সর্দার বনি সালামার দাবি, তাঁরা সুলাইম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং রিয়াহের সর্দার যাবেদীগণের দাবি, তাঁরা বারামেকীদের অধস্তন পুরুষ। এমনিভাবে আমরা জানতে পেরেছি যে, পূর্বাঞ্চলে তাই গোত্রের সর্দার বনি মাহনাও বারামেকীদের বংশধর বলে দাবি করছে। এ প্রকার উদাহরণ প্রচুর। তাঁদের নিজ জাতির মধ্যে তাঁদের নেতৃত্ব এ সকল দাবির অসারতা প্রতিপন্ন করে; এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। বরং তাঁদের এ নেতৃত্ব এ কথারই প্রমাণ দেয় যে, তাঁরা সংশ্লিষ্ট জাতিরই অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁদের গোত্রপ্রীতির শক্তিশালী অংশীদার। পাঠক, এ বিষয়টি বিবেচনা করুন এবং বিভ্রান্তি থেকে দূরে সরে থাকুন। আলমোহেদদের অন্তর্গত মেহেদীর আলী বংশের দাবিকে এ পর্যায়ে ফেলবেন না। কারণ আল মেহেদী তাঁর নিজ জাতি হারসামার নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন না। তিনি তাঁর জ্ঞানগুণ ও ধর্মমত প্রকাশ পাবার পরই তাদের নেতৃত্বে বরিত হয়েছেন এবং এর ফলেই তাঁর ডাকে মাসমুদা গোত্র সাড়া দিয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও গোত্রগত অবস্থানের দিক থেকে তাঁর পরিবার মধ্যম শ্রেণীর নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্ অদৃশ্য ও দৃশমান সকল কিছুই জানেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

[গোত্রপ্রীতির অধিকারীদের জন্যই বাস্তব কৌলীন্য ও যথার্থ বংশমর্যাদার অবকাশ আছে এবং অন্যদের বেলায় তার স্বরূপ আলংকারিক ও রূপক]

এর কারণ, বস্তুত কৌলীন্য ও বংশমর্যাদা ব্যক্তি চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। কৌলীন্যের অর্থ কোন ব্যক্তি এমন কুলে জন্মগ্রহণ করা, যাতে পূর্বপুরুষগণ মর্যাদা ও খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। এর ফলে সে তাদের সন্তান হিসাবে ও বংশধারা উত্তরাধিকারী হওয়ার গৌরবে সমসাময়িক অন্যদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। কারণ মানুষ তার পূর্বপুরুষদের সৎচরিত্র ও পুণ্য মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। প্রকৃতপক্ষে মানুষ তার জীবন-যাপনে ও বংশধারা সংরক্ষণে সম্ভাবনাময়। হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছিলেন, "মানুষ সম্ভাবনার খনি। যারা জাহেলী যুগে শ্রেষ্ঠ ছিল, তারা ইসলামী যুগেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে—যদি তারা বুদ্ধিমান হয়।"

বংশমর্যাদার ব্যাপারটি বংশের সাথে যুক্ত। আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, বংশধারার ফসল ও তার উপকারিতা একমাত্র পরস্পর আকর্ষণ ও সাহায্যের নিমিত্ত গোত্রপ্রীতি সৃষ্টির মধ্যেই নিহিত। সুতরাং যেখানে গোত্রপ্রীতি শ্রদ্ধেয় ও সম্ভ্রমপূর্ণ এবং তার উৎস যেখানে পবিত্র ও সুরক্ষিত, সেখানেই বংশধারার সর্বাধিক স্পষ্টতা ও তার ফলশ্রুতির সারবত্তা বিদ্যমান। পিতৃপুরুষদের মধ্যকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা গণনা সেই ক্ষেত্রেই শুধু সোনার উপর সোহাগা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। সুতরাং কৌলীন্য ও বংশমর্যাদা মূলত বংশধারার ফলশ্রুতি গোত্রপ্রীতির সাথে সংযুক্ত এবং এর পার্থক্যের দরুন পরিবারে পরিবারে বংশমর্যাদার ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দিয়ে থাকে। কেননা এ মর্যাদা বস্তুত গোত্রপ্রীতিরই মহিমা।

এ দিক থেকে বিচার করলে পল্লীর অধিবাসী একক ব্যক্তিবর্গের জন্য কৌলীণ্য শুধু আলংকারিক অর্থেই সত্য হতে পারে। যদি তারা কৌলীন্যের কোন ধারণা পোষণ করেন, তবে তা জাঁকজমকপূর্ণ দাবি বলেই মনে করতে হবে। পাঠক, আপনি যদি বংশমর্যাদার দিক থেকে পল্লীবাসীদেরকে বিবেচনা করতে বসেন, তা হলে দেখতে পাবেন, তাদের এ দাবির অর্থ হল—তাদের প্রত্যেকেই নিজের পূর্বপুরুষকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী, চরিত্রবানদের সাহচার্য অবস্থানকরী এবং যতদূর সম্ভব সততার প্রতীক বলে মনে করে থাকে। এটা বংশধারার ফলশ্রুতি, গোত্রপ্রীতির মহিমার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং পূর্বপুরুষদের সংখ্যা গণনার নামান্তর মাত্র। এ জন্যই একে কৌলীন্য ও বংশমর্যাদা বলা একান্তই আলঙ্কারিকভাবে সত্য। কেননা এতে এ সত্যটি প্রকটিত হয়

যে, পূর্বপুরুষদের অনেকেই পর্যায়ক্রমে একই সততার ধারা ও পথ অতিক্রম করে গেছেন। কিন্তু এটা যথার্থ অর্থে ও সাধারণভাবে বংশমর্যাদা নয়। যদি এরূপ প্রমাণ উপস্থিত করা হয় যে, বংশমর্যাদা উক্ত উভয় দিক থেকেই আভিধানিক অর্থে যথার্থ, তা হলেই তা এমন একটি সংশয়াচ্ছন্ন বিষয় হয়ে দাঁড়াবে, যা অনেক ক্ষেত্রে উত্তম বলে বিবেচিত হয়।[১৩]

কখনও কোন পরিবারের জন্য গোত্রপ্রীতি ও চরিত্র মাহাত্ম্যের বলে প্রথম দিকে কৌলীন্য লাভ হতে পারে। কিন্তু এর পর তার নগরবাসী হওয়ার ফলে তা থেকে দূরে সরে গেছে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে তারা গোত্রহীন সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে গেলেও তাদের হৃদয়ে বংশমর্যাদার একটি আপাত মধুর স্মৃতি বিদ্যমান এবং এর কল্যাণেই তারা নিজেদেরকে গোত্রপ্রীতির অধিকারী সম্ভ্রান্ত ঘরানার সদস্য বলে মনে করে। অথচ এ গোত্রপ্রীতি সার্বিকভাবেই তাদের এ প্রকার ধারণা সম্পূর্ণ অবাস্তব। পল্লীবাসীদের মধ্যে এমন অনেক পরিবারই আছে, যারা তাদের প্রাথমিক যুগে আরব অথবা অনারব বংশাবলির মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছিল, তারাই নিজেদেরকে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত করতে তৎপর হয়।

এ ক্ষেত্রে বনি ইসরাইলের মধ্যেই উক্ত আপাত মধুর ধারণার অধিকতর দৃঢ়তা দেখা যায়। উৎসের দিক থেকে তাদের কৌলীন্য একদা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কৌলীন্যসমূহের অন্যতম ছিল। প্রথমত তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে হজরত ইব্রাহীম থেকে আরম্ভ করে তাদের ধর্মের প্রবর্তক ও জাতির সংগঠন হজরত মুসা পর্যন্ত বহু নবীরসূলের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং দ্বিতীয়ত তাদের সেই গোত্রপ্রীতি, যার কল্যাণে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুত সাম্রাজ্যের অধিকারী করেছিলেন। এর পর তারা তা থেকে সম্পূর্ণ সরে এসেছে এবং ফলস্বরূপ তাদের ভাগ্যে জুটেছে অপমান ও দারিদ্র্য। তারা পৃথিবীর সকল স্থান থেকে বিতারিত হয়েছে এবং হাজার হাজার বছর ধরে বিধর্মীদের দাসত্ব বরণ করে নিয়েছে। অথচ এতদ্‌সত্ত্বেও উপরোক্ত আপাত মধুর ধারণা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করেনি। এখনও তাদেরকে বলতে শোনা যায়—ইনি হারুন বংশীয়, ইনি ইউশার বংশধর, ইনি কালেবের সন্তান, ইনি যিহুদার অধস্তন পুরুষ। অথচ বাস্তব অবস্থা হল, সুদীর্ঘকাল ধরে তাদের মধ্যে গোত্রপ্রীতির অস্তিত্ব নেই এবং অপমান ও অসম্মান তাদের অবিচলিত ভাগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পল্লীবাসী ও অন্যান্য অঞ্চলের অনেকেই যাদের বংশধারায় গোত্রপ্রীতির কোন বালাই নেই, তারাও এমনি ধরনের অসার কথাবার্তা বলে থাকে।

আবুল ওলীদ ইবনে রুশদ এ ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে ভুল করেছেন। তিনি 'প্রথম শিক্ষক'[১৪] নামাঙ্কিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বাগ্মিতা অধ্যায়ে বংশমর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, বংশমর্যাদা হল কোন জাতির কোন নগরীতে বসবাস করার প্রাচীনত্ববোধক একটি বিষয়। তিনি, আমরা যে সকল বিষয় বর্ণনা করেছি, তার উল্লেখও করেননি। আক্ষেপ এ যে, যদি ঐ জাতির মধ্যে এমন কোন

১৩. যেমন সন্দেহযুক্ত পানি ছাড়া অন্য পানি না পাওয়া গেলে তা দ্বারাই অজু করা বিধেয়।
১৪. আরবীয় জ্ঞানীদের প্রদত্ত এ্যারিস্টটলের উপাধি। তাঁদের মতে ফারাবী দ্বিতীয় শিক্ষক।

প্রীতিবন্ধন না থাকে, যদ্বারা তাদের প্রতি সমীহের ভাব উদ্রেক হয় এবং অন্যরা তাদের প্রভাবকে স্বীকার করে, তা হলে নগরবাসের এ প্রাচীনত্ব তাদের কোন্ উপকারে লাগবে? তিনি যেন বংশমর্যাদাকে শুধুমাত্র পিতৃপুরুষের সংখ্যা গণনার মধ্যেই ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ বাগ্মিতা এমন একটি বিষয়, যদ্বারা একমাত্র দণ্ডমুণ্ডের কর্তাগণই মানুষের ভাবধারাকে প্রভাবিত করতে পারেন। যাদের এ প্রকার কোন ক্ষমতা নেই, তাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। তারা যেমন অন্যকে প্রভাবিত করতে সমর্থ হয় না, তেমনি তাদের সে সুযোগও দেয়া হয় না। নগর জীবনের অধিকারী বিভিন্ন পল্লীবাসীর অবস্থা এর সাথে তুলনীয়। অবশ্য ইবনে রুশদ এমন এক গোত্রে ও অঞ্চলে প্রতিপালিত হয়েছেন, যেখানে গোত্রপ্রীতিকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হয় না এবং তার অবস্থার সাথেও তারা পরিচিত নয়। সুতরাং তাদের নিকট তা অতি সাধারণভাবে পরিচিত পিতৃপুরুষের সংখ্যা গণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। কৌলীন্য ও বংশমর্যাদার ক্ষেত্রে গোত্রপ্রীতির তাৎপর্যকে তারা সৃষ্টি জগতের সাথে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেননি। আল্লাহ্ সকল বিষয়েই অবগত।[১৫]

১৫. কোরান ২, ২৯।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

[আশ্রিত পোষ্য ও অনুগতদের কৌলীন্য ও মর্যাদা তাদের প্রভুদের অনুরূপ বিষয়াদি অনুসারেই হয়ে থাকে; তাদের নিজেদের বংশধারা অনুসারে নয়]

এর কারণ, আমরা যেমন পূর্বে বলেছি, মর্যাদা বাস্তব বংশধারার এবং যথার্থভাবে গোত্রপ্রীতিসম্পন্নদেরই প্রাপ্য। সুতরাং যখন এরূপ গোত্রপ্রীতির অধিকারী কোন জনগোষ্ঠী অপর কোন বংশের লোককে অনুসারী করে নেয় অথবা দাস ও আশ্রিত পোষ্যদেরকে গ্রহণ করে নিজেদের সাথে একীভূত করে নেয়, তখন আমরা যেমন বলেছি, এ সকল আশ্রিত পোষ্য ও অনুসারীরা তাদের বংশান্তর্গত গোত্রপ্রীতির সাথে জড়িত বলে গণ্য হয় এবং তাদের পরিচয়েই পরিচিত হয়ে থাকে। তারা যেন তাদেরই গোত্রান্তর্ভুক্ত এবং তাদের বংশের গোত্রপ্রীতির ধারা অনুসরণ করেই তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করে। যেমন হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, "কোন জাতির পোষ্য, তাদের অন্তর্ভুক্ত।"[১৬] সে পোষ্যতা দাসত্বের কারণে অথবা কর্মে নিয়োগ ও চুক্তির কারণেও হতে পারে। কিন্তু যে কারণেই হোক, পোষ্যের জন্মবংশ এ গোত্রপ্রীতির ক্ষেত্রে কোন উপকারেই আসে না। কারণ এটা ঐ বংশধারার সম্পূর্ণ বিরোধী। যেহেতু এ পোষ্য তার বংশ ছেড়ে অন্য একটি বংশে এসে মিশ্রিত হয়েছে, সুতরাং সেই সঙ্গে তার বংশের মহিমা গোত্রপ্রীতিও নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং নিজের গোত্রপ্রীতির আশ্রয় ত্যাগ করে সে সংশ্লিষ্ট বংশের একজন ও তাদের অন্তর্গত বলে গণ্য হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে যখন এ শেষোক্ত বংশের পিতৃপুরুষের গণনা আসবে, তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাদের আশ্রয় ও অনুসরণের অনুপাতেই এর কৌলীন্য ও মর্যাদালাভ করবে। কিছুতেই তা আশ্রিত বা অনুসারীদের জন্য অতিক্রমণীয় হতে পারে না; বরং তারা সর্বাবস্থায় এ বংশের অন্যদের অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়েই অবস্থান করবে।

যে কোন রাজ্যে আশ্রিত ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের এটাই সাধারণ অবস্থা। তাদের যা কিছু মর্যাদা, তা তাদের আশ্রয় ও কর্তব্যের দৃঢ়তার সাথে জড়িত এবং এ ব্যাপারে নিয়োজিত পিতৃপুরুষদের সংখ্যা গণনার মাধ্যমেই তারা এ দৃঢ়তার পরিমাপ করে থাকে। পাঠক, আব্বাসী সাম্রাজ্যে তুর্কি আশ্রিতদের অবস্থা বিবেচনা করতে পারেন। এদের পূর্বে বারমেকীরাও ছিল। নওবখত বংশীয়দেরও একই অবস্থা। এরা সকলেই সংশ্লিষ্ট বংশের মধ্যে নিজেদের আশ্রয়ের দৃঢ়তা ও কর্তব্যকর্মের প্রতি নিষ্ঠার অনুপাতেই মর্যাদা ও কৌলীন্য লাভ করেছে। এজন্যই জাফর ইনে ইয়াহিয়া ইবনে

---

১৬. বোখারী (৪র্থ) দ্র:।

খালিদ সেই সম্রাট হারুনুর রশীদের আশ্রয় ও তাঁর বংশের পোষ্যতা অনুসারে সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে মর্যাদা ও কৌলীন্যের অধিকারী হয়েছিল। এ ব্যাপারে তাদের পারস্য বংশের আভিজাত্য কোন কাজেই আসেনি। এরূপ প্রতিটি রাজ্যের আশ্রিত পোষ্যদের এবং কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অবস্থা। তাদের জন্য কৌলীন্য ও মর্যাদা সবকিছুই তাদের আশ্রয় সম্পর্কের দৃঢ়তা এবং তাদের কর্তব্যনিষ্ঠার যথার্থতা থেকে লাভ হয়ে থাকে। এ কারণেই তাদের পূর্ববর্তী বংশ সম্পর্ক প্রায় বিস্মৃত হয়ে উঠে এবং বর্তমান বংশধারার কতৃত্বাধীনে তাদের অবস্থার বাস্তবতা ও পর্যায় নির্ধারণে তাকে মোটেও গণ্য করা হয় না। এতে একমাত্র তার পোষ্যতা ও কর্তব্যনিষ্ঠাকেই বিচার করা হয়; কারণ এগুলোর মধ্যেই গোত্রপ্রীতির সেই মহিমা বিদ্যমান, যদ্বারা, কৌলীন্য ও বংশমর্যাদা অর্জিত হয়ে থাকে। সুতরাং তাদের মর্যাদা তাদের আশ্রয়দাতাদের মর্যাদা থেকে উৎসারিত এবং তাদের ভিত্তির উপরেই তার ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। তাদের জন্ম বংশ কোন কাজেই আসে না। একমাত্র সাম্রাজ্যের অধিকারী বংশের আশ্রয়, তাদের নিকটতর কর্তব্য সম্পাদন ও শিক্ষা গ্রহণই এ সকল লোকের মর্যাদা বাড়িয়ে থাকে। কখও হয়ত তাদের বংশ সম্পর্ক গোত্রপ্রীতি ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়ে থাকতে পারে; কিন্তু এর পর চলে যাওয়ায় এবং তারা আশ্রিত ও কর্মে নিয়োজিত হয়ে অন্য বংশে চলে আসায়, পূর্বের সেই গোত্রপ্রীতিহীন বংশমর্যাদা কোন কাজেই আসে না; বরং তারা বর্তমান বংশের গোত্রপ্রীতির দ্বারাই উপকৃত হয়ে থাকে। বারমেকীদের অবস্থা ঠিক এমনই। শোনা যায়, তারা এক সময়ে পারস্যের অগ্নিমন্দিরগুলোর পুরোহিত হিসাবে কৌলীন্যের অধিকারী ছিল। কিন্তু তারা আব্বাসী সাম্রাজ্যের আশ্রিত হয়ে পড়লে সেই পূর্ব মর্যাদা একান্তই নগণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের যা কিছু মর্যাদা লাভ হয়েছে, তা একমাত্র উক্ত সাম্রাজ্যে তাদের আশ্রিত হিসাবে অবস্থান এবং কর্তব্যনিষ্ঠার ফলেই সম্ভব হয়েছে। এটা ব্যতীত আর যা কিছু, সকলই ধারণা মাত্র, যার আপাতঃমধুর আকর্ষণে অপরিশীলিত জীবাত্মারাই চঞ্চল হয়ে উঠে; এ চাঞ্চল্য অর্থহীন। বরং বাস্তব অবস্থা তাই, যা আমরা বলেছি। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিকতর মর্যাদাবান, যে অধিকতর ধর্মভীরু।[১৭] আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই অধিকতর অবগত আছেন।

---

১৭. কোরান ৪৯, ১৩।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

[একই বংশধারায় বংশ মর্যাদার স্থায়িত্ব মাত্র চার পুরুষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়]

জেনে রাখুন, এ পৃথিবীর মৌল উপাদানের জগতে অবিরাম সৃষ্টি ও ধ্বংস চলছে। এটা যেমন বস্তুসত্তার জন্য সত্য, তেমনই তার আপতিত অবস্থানসমূহের জন্যও সত্য। পাঠক, আপনি লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন খনিজদ্রব্য, বৃক্ষলতা, সমস্ত প্রাণী, এমনকি মানুষ এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এ সৃজন ও ধ্বংসের লীলা বিস্মৃত রয়েছে। এরূপ সত্তার উপর আপতিত অবস্থাসমূহও; বিশেষ করে মনুষ্যত্ব। জ্ঞান-বিজ্ঞানও বিকাশ পায়, লুপ্ত হয়; এমনিভাবে শিল্পকর্ম ও অন্যান্য বিষয়। বংশমর্যাদাও মানুষের বিশেষ একটি অবস্থা; সুতরাং এটাও সৃষ্টি ও ধ্বংসের অধীন, সন্দেহ নেই। পৃথিবীর মানব সমাজে এমন কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই, যার বংশমর্যাদা হজরত আদম (আঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে পূর্বপুরুষদের মধ্যে দিয়ে অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় চলে এসেছে। অবশ্য হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর কথা স্বতন্ত্র। কারণ তা তাঁর জন্য বিশেষ মর্যাদা ও এর মধ্যেই তাঁর নবুয়ত ও চরিত্র মাহাত্ম্যের রহস্য নিহিত। যেমন বলা হয়, প্রতিটি বংশমর্যাদার প্রাথমিক অবস্থা এর বিপরীত। এ বৈপরিত্ব হল নেতৃত্ব ও মর্যাদার অভাবহীনতা, অসম্মান ও অসম্ভ্রম। এর নির্গলিতার্থ হল, প্রতিটি বংশমর্যাদা ও কৌলীন্যের পূর্ববর্তী অবস্থা তার অস্তিত্বহীনতা। প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর এটাই চরিত্র।

অতঃপর একে চারিপুরুষে সীমাবদ্ধ করবার কারণ এ যে, মর্যাদার প্রতিষ্ঠাতা অবশ্যই জানেন কিসের সাহায্যে তিনি এর প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তার সম্ভাবনার উপকরণ ও স্থায়িত্বের উপাদানগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে সেজন্য যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তাঁর পুত্র তাঁর পরে এসে তাতে অংশীদার হয় এবং তাঁর নিকট থেকে শ্রুতির সাহায্যে উক্ত সবকিছু গ্রহণ করে। এর ফলে পুত্রের শক্তিতে কিছুটা ক্রটি দেখা দেয়। এ ক্রটি শ্রুতি ও চাক্ষুষ দর্শনের পার্থক্যজাত। এর পর পৌত্র এসে শুধুমাত্র অনুসরণ ও অনুকরণের দায়িত্ব পালন করে। এর ফলে আরও ক্রটি দেখা দেয়। বস্তুত এ ক্রটি গবেষণাকারী ও অনুসরণকারীর মধ্যকার পার্থক্যের মতোই ব্যাপক। অতঃপর প্রপৌত্র এসে সম্পূর্ণভাবে ক্রটির মধ্যেই পতিত হয় এবং তাদের বংশমর্যাদার সংরক্ষণকারী বৈশিষ্ট্যগুলোকে সম্পূর্ণ হারিয়ে বসে ও তাকে হেয় করে তোলে। তারা ধারণা করে যে, এ বংশমর্যাদার ব্যাপারটি কোন প্রকার প্রচেষ্টা ও কোন কিছুর সাহায্য ছাড়াই আজন্মকাল ধরে তাদের উদ্দেশ্যে প্রবাহিত হয়ে আসছে। এর জন্য কোন প্রকার গোত্রপ্রীতি বা চরিত্র গঠনের প্রয়োজন নেই। মানুষের উপরে তার প্রভাবটুকুই তাদের

দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এ প্রভাব কীভাবে কখন সৃষ্টি হয়েছিল, তার কোন কথাই তারা জানে না। এ কারণেই তারা মনে করে, তা বংশধারারই গুণ, অন্য কিছু নয়। এর ফলে তারা গোত্র সম্পর্কের কোন তোয়াক্কাই করে না; বরং স্ববংশীয়দের তাদের প্রতি আনুগত্যকে তারা দৃঢ়ভাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণজাত বলে ভাবতে থাকে। তারা চিন্তাও করে না যে, কোন্ চরিত্রগুণ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য এ প্রকার আনুগত্য লাভে একসময় সক্রিয় হয়েছিল এবং অপরের অন্তর জয় করতে পেরেছিল। ফলে তারা স্ববংশীয়দেরকে তুচ্ছ ভাবতে থাকে। এর ফল স্বরূপ তারা এহেন বংশ কৌলীন্যের অধিকারীদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। প্রতিশোধ হিসাবে তাদেরকেও হেয় করে দেয় এবং এ বংশধারারই অন্য কোন অংশকে ক্ষমতা লাভে সাহায্য করে। এ উদ্যোগে তারা সাধারণভাবে বংশের শাখা-প্রশাখাগুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকে। এর কারণও আমাদের সেই পূর্ব কথিত গোত্রপ্রীতির প্রতি অনুগত থাকার ফল। অবশ্য এ পরিবর্তন করতে গিয়ে তারা ক্ষমতায় উদীয়মান গোত্রটির মধ্যে তাদের প্রিয় চরিত্রগুলোকেই অনুসন্ধান করে এবং এটা লাভ করবার পর এ নতুন শাখাটির শক্তি বৃদ্ধি পায় ও পূর্ব শাখাটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাদের বংশমর্যাদাজনিত প্রতাপের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। এটা অবশ্য রাজন্যবর্গের ব্যাপার। কিন্তু বেদুইন গোত্র, তার আমীরদের মর্যাদা ও সাধারণ গোত্রপ্রীতির ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। পল্লীবাসীদিগের মধ্যে এটা লক্ষ করা যায় যে, সেখানে একটি ঘরানার পতন ঘটলে সেই বংশেরই অন্য ঘরানার শক্তি বৃদ্ধি পায়। 'তিনি যদি চান তোমাদেরকে বিলুপ্ত করতে পারেন এবং নতুন সৃষ্টির অভ্যুদয়ও তাঁর ইচ্ছাধীন। এ প্রকার কিছু করা আল্লাহ্‌র জন্য কঠিন নয়।[১৮]

বংশমর্যাদার আবির্ভাব ও তিরোভাবের মধ্যে চারপুরুষের এ সীমাবদ্ধতা আরোপ, তা অধিকাংশের অবস্থা লক্ষ করেই করা হয়েছে। নতুবা অনেক ক্ষেত্রে এর অপেক্ষা কম পুরুষেও বংশমর্যাদা বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও বিনষ্ট হয়ে যায়। আবার কখনও তা পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষে এসেও চলতে থাকে। অবশ্য তখন বংশমর্যাদা একান্তই পতনোন্মুখ ও ক্ষীয়মান। অন্যদিকে চারপুরুষের এ সীমা নির্দেশ চারটি বাস্তবতার পরিচায়ক— প্রতিষ্ঠাতা, তার সমসাময়িক অংশীদার, অন্ধ অনুসারী ও বিনষ্টকারী। বাস্তবতার ক্ষেত্রে এ সংখ্যাটিই সর্বাপেক্ষা কম বলে মনে করা যায়। প্রশংসার ক্ষেত্রেও অনেক সময় এরূপ চারপুরুষের কথা উল্লেখ করা হয়। যেমন হজরত মুহম্মদ (সঃ) বংশমর্যাদার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "অবশ্যই সম্ভ্রান্তের পুত্র সম্ভ্রান্ত—ইব্রাহিমের পুত্র ইসহাকের পুত্র ইয়াকুবের পুত্র ইউসুফ (আঃ)"।[১৯] বংশমর্যাদার একটা চরম সীমার কথাই তিনি এখানে ইঙ্গিত করেছেন। তৌরাতে যেমন আছে, যার অর্থ হল—আমি আল্লাহ্ তোমার প্রভু, ক্ষমতাবান, প্রতিহিংসুক এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত পিতৃপুরুষের পাপ সন্তান-সন্ততির মধ্যে সংক্রমণের অনুসন্ধানকারী। এ স্থলেও এ কথারই প্রমাণ বিদ্যমান যে, বংশমর্যাদার সীমা অধস্তন চারপুরুষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে।

---

১৮. কোরান ১৪, ১৯।

১৯. বোখারী (২য়) দ্র:।

'কিতাবুল আগানী'র 'উজায়েফুল গাওয়ানী'র[২০] সংবাদে বর্ণিত হয়েছে যে, খসু নুমানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আরবেও কি এক গোত্র অন্য গোত্র থেকে অধিকতর মর্যাদার অধিকারী?" এর উত্তরে নুমান বললেন, হ্যাঁ। খসুর বললেন, কোন্ দিক থেকে? উত্তরে নুমান বললেন, যার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে পর্যায়ক্রমে তিনজন নেতৃস্থানীয় লোক বিদ্যমান এবং এর পর চতুর্থ পুরুষের গুণপনা এর সাথে যুক্ত হয়। এ অবস্থায় বংশমর্যাদা বলতে যা বোঝায়, তা এ গোত্রের জন্যই। খসরু এর অনুসন্ধান করলে মাত্র কতিপয় গোত্রের মধ্যে এরূপ যোগাযোগ পাওয়া গেল। তাদের মধ্যে ফয়েস গোত্রের অন্তর্গত হুজাইফা ইবনে বদর আল-ফেজায়ীর পরিবার, শায়বান গোত্রের যুলজেদ্দাইনের পরিবার, কান্দার আল আস্ আছ ইবনে কয়েসের পরিবার এবং বনি তমীমের হাজেব ইবনে যুরারার পরিবার ও কয়েস ইবনে আসিম আল মুনকারীর পরিবার। এ সকল পরিবারকে তাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীসহ একত্র করা হল এবং খসরুর দরবারে বিচারক ও শাস্ত্রবিদদের সম্মুখে উপস্থিত করা হল। সেখানে হুজাইফা ইবনে বদর উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পর আল আস্ আছ ইবনে কয়েস—কেননা তাঁর সাথে নুমানের আত্মীয়তা ছিল। তাঁর পর বিস্তাম ইবনে কয়েস ইবনে শায়বান; তাঁর পর হাজেব ইবনে যুরারা এবং তাঁর পর কয়েস ইবনে আসিম। তাঁরা সকলেই বক্তৃতা করলেন। সমস্ত শুনে খসরু বললেন, এদের প্রত্যেকেই স্ব-স্ব স্থানের যোগ্য সর্দার। এ পরিবারগুলো বনি হাশেমের পরেই আরবের সর্বত্র খুবই জনপ্রিয় ছিল। এদের সঙ্গে বনি যূবিয়ানের বনি হারেস ইবনে কাব আল ইয়ামেনীকে যোগ করা যায়। এসব বিবরণ এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, বংশমর্যাদার সীমা পুরুষানুক্রমে চার পুরুষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে। আল্লাহ্ই উত্তম জ্ঞাতা।

---

২০. রোজেনথালে এর উচ্চারণ 'আওয়ায়েফুল কাওয়াফী' করা হয়েছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

[বর্বর জাতিগুলোই প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাবান]

জেনে রাখুন, প্রান্তরে বসবাস করা যেহেতু শৌর্যবীর্যের কারণ, যেমন আমরা তৃতীয় প্রস্তাবনায়[২১] বলেছি, সুতরাং বর্বর গোত্রগুলোর অন্যান্য গোত্র অপেক্ষা অধিকতর শৌর্যের অধিকারী হওয়া অন্যায্য কিছু নয়। তারা প্রাধান্য বিস্তারে অধিকতর ক্ষমতাশালী এবং অন্যদের নিকট যা কিছু আছে, তা ছিনিয়ে নিতে অধিকতর পারঙ্গম। বরঞ্চ এ সকল গোত্রের অবস্থাও সময়ের ব্যবধানে বিচিত্র ধরনের হয়ে থাকে। যখনই তারা সবুজ প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হয়, প্রাচুর্যের সাথে পরিচিত হয় এবং স্বচ্ছলতার মধ্যে জীবনের ভোগ সম্ভোগে লিপ্ত হয়, তখনই তাদের প্রান্তর বাস ও বন্য প্রকৃতি হ্রাস পাওয়ার অনুপাতে তাদের শৌর্যবীর্যও হ্রাস পেয়ে থাকে। পাঠক, আপনি একে ভাষাহীন প্রাণীদের মধ্যেও বিবেচনা করে দেখতে পারেন। যেমন মরু প্রান্তরের হরিণ, বন্য গরু ও গাধা; যখন মানুষের সাথে মেলামেশার ফলে এদের বন্যতা দূর হয়ে যায় ও আহারে প্রাচুর্য আসে তখন কীভাবে তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে! তাদের ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতায়, এমনকি তাদের চলার ও চামড়ার সৌন্দর্যে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বন্য মানুষও প্রায় অনুরূপভাবে পোষ ও বশ মানলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার অধীন হয়। এর কারণ এ যে, মানুষের চরিত্র ও প্রকৃতি গঠনের ক্ষেত্রে প্রিয় বস্তু ও অভ্যাস যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। জাতিসমূহের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারের ব্যাপারটি যেহেতু ক্ষিপ্রতা ও দুঃসাহসের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং এদের মধ্যে যারা প্রান্তর চারিতা ও বন্যতার দিক থেকে অধিকতর দৃঢ়, তারাই প্রাধান্য বিস্তার শক্তির অধিকতর নিকটবর্তী। এদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংখ্যা, শক্তি ও গোত্রপ্রীতির সমতা দেখা দিলেও অধিকতর বন্যরাই জয়ী হয়ে থাকে।

পাঠক, এ দিক থেকে মুজার গোত্রের প্রতি লক্ষ করুন। এদের সাথে পূর্ববর্তী রাজ্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী হিমিয়ার ও কাহলানদের অবস্থা এবং ইরাকের সবুজ প্রান্তর ও প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাসকারী রাবিয়া গোত্রের অবস্থার তুলনা করুন। দেখতে পাবেন, মুজার যখন প্রান্তরে কৃচ্ছ্রতা সাধন করছে, তখন অন্যরা তাদেরকে ছাড়িয়ে জীবনের প্রাচুর্য ও বিলাসব্যসনের সম্ভোগের মধ্যে এগিয়ে গেছে। অথচ এ প্রান্তর বাস তাদের

---

২১. তৃতীয় প্রস্তাবনায় এই সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই; বরং দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ বিদ্যমান।

শক্তিকে প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে কী প্রচণ্ডই না করে তুলেছে। তারা তার ফলে অন্যদের উপর প্রাধান্য বিস্তার কি করে তাদের করতলগত সকল কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে। এটাই তাদের পরবর্তীকালে বনি তাই, বনি আমের ইবনে সাআসাআ ও বনি সুলাইম ইবনে মনসুরের অবস্থা। যেহেতু তারাও সমস্ত মুজার ও ইয়ামেনী গোত্রগুলো অপেক্ষা দীর্ঘদিন প্রান্তরে বসবাস করেছে এবং পার্থিব প্রাচুর্যের দিকে ফিরেও তাকায়নি। সেই জন্য কী প্রচণ্ডভাবেই না এ প্রান্তর বাস তাদের গোত্রপ্রীতির শক্তিকে বৃদ্ধি করেছে এবং ভোগ সম্ভোগের প্রাচুর্য থেকে দূরে রেখেছে। এর ফলে এ সকল গোত্রই পরবর্তীকালে প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্য সকলকে অতিক্রম করে গেছে। এমনিভাবে আরব বেদুইনদের প্রতিটি গোত্র, যারা যতবেশি সম্পদ, প্রাচুর্য ও বিলাসব্যসনের অধিকারী হয়েছে, তারা সেই পরিমাণে অন্যদের অপেক্ষা শক্তিতে হীন হয়ে পড়েছে। যদিও তারা সংখ্যায় ও শক্তিতে সমান হয়, তথাপি প্রান্তরবাসী গোত্রগুলোই প্রাধান্য ও ক্ষমতা বিস্তারের ক্ষেত্রে অগ্রণী হবে। এটাই সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রথা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

[গোত্রপ্রীতির শেষ লক্ষ হল রাজ্য প্রতিষ্ঠা]

এর কারণ হল, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, গোত্রপ্রীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহায্য, প্রতিরোধ ও পরস্পর চাহিদা পূরণ এবং এর ফল সবকিছুর সম্মিলিত একটি ঐক্য। আমরা এটাও বর্ণনা করেছি যে, মানুষ যে কোন সমাজবদ্ধ জীবনে স্বভাবতঃই একজন শাসকের প্রত্যাশী, যিনি তাদের মধ্যে একটি সংযত শৃঙ্খলাবোধের সৃষ্টি করবেন। এরূপ একজন শাসকের জন্য গোত্রপ্রীতির মাধ্যমে প্রাধান্য বিস্তার একান্ত প্রয়োজনীয়, নতুবা তার পক্ষে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা লাভ করা সম্ভব নয়। এ প্রাধান্য বিস্তারই হল রাজ্য, এটা নেতৃত্বের অতিরিক্ত একটি বিষয়। কারণ নেতৃত্ব শুধু অনুসরণীয় হওয়ার একটি মর্যাদা, যার ফলে মানুষ নেতাকে মান্য করে থাকে। কিন্তু নেতার নেতৃত্বে তাদের উপর বিধি-নিষেধের কোন প্রতাপ থাকে না। রাজ্য এরূপ নয়, সেখানে রাজ্যাধিকারীকে প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে বিধি-নিষেধের প্রতাপকে সক্রিয় করে তুলতে হয়। গোত্রপ্রীতি ধন্য কোন ব্যক্তি যখন কোন একটি বিশেষ মর্যাদালাভ করেন, তখন তিনি অন্য একটির জন্য ইচ্ছুক হন। সুতরাং তার জন্য যখন নেতৃত্ব ও অনুসরণীয় হওয়ায় সৌভাগ্যলাভ হয়, তখনই তিনি ক্ষমতার প্রাধান্য বিস্তারের দ্বারা প্রতাপশালী হয়ে উঠেন। এটা তাঁর পক্ষে ত্যাগ কা সম্ভব নয়; কেননা জীবাত্মার ধর্মই এ। এক্ষেত্রে এরূপ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ভিত্তি হল গোত্রপ্রীতি, যার জন্য সেই ব্যক্তি প্রথমে অনুসরণীয় হয়েছিলেন। কাজেই, পাঠক, আপনি লক্ষ করেছেন যে, গোত্রপ্রীতির শেষ লক্ষ হল রাজ্য ক্ষমতা লাভ।

অতঃপর কোন গোত্রে যদি একাধিক পরিবার ও একাধিক গোত্রপ্রীতির উৎস থাকে, তা হলে তাদের মধ্যে যে কোন একটির গোত্রপ্রীতি এমন সুদৃঢ় হবে, যাতে অপর সবগুলোর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে সকলকে নিজের বাধ্য করে নিতে পারে। এভাবে সে সকলের গোত্রপ্রীতিকে গ্রাস করে একটি সর্ববৃহৎ গোত্রপ্রীতিতে পরিণত হবে। অন্যথায়, তাদের মধ্যে কলহ ও মতানৈক্যের জন্য বিচ্ছিন্নতা দেখা দিতে বাধ্য। 'আল্লাহ্ যদি মানব সমাজের কতকাংশকে দিয়ে অপর কতকাংশকে দমন না করতেন, তা হলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত।[২২]

এভাবে এ বৃহৎ গোত্রপ্রীতির সাহায্যে যখন স্বীয় জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তারের কাজ সমাপ্ত হল, তখন এ ক্ষমতাবান স্বাভাবিক গতিতেই দূরস্থিত অপর গোত্রাদির উপর

---

২২. কোরান : ২, ২৫১।

প্রাধান্য বিস্তারে অগ্রসর হন। ঐ সকল গোত্র ক্ষমতায় সমান হলে বা বাধা দিলে যুদ্ধ ও কলহ অনিবার্য হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে যে দল স্বীয় জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তারে অধিকতর দৃঢ় ও সর্বজনীন, তারাই জয়ী হবে। এটাই পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন গোত্র ও দলের অবস্থা। এভাবে যে দল জয়ী হবে, বিজিত দল তাদের অনুগত ও তাদের সাথে একীভূত হয়ে নতুন শক্তি বৃদ্ধি করবে। এ নব উত্থিত শক্তি প্রাধান্য বিস্তারের পথ ধরে আরও বৃহত্তর শক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকবে এবং পূর্বাপেক্ষা আরও বহুগুণ বিস্তৃত জনসমাজের উপর নিজেদের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করবে। অনুরূপভাবে সর্বদা অগ্রসর হয়ে তা সাম্রাজ্যের সমতুল্য শক্তির অধিকারী হয়ে উঠবে। এর পর যদি সে দেখে যে, কোন সাম্রাজ্য তার অন্তিম দশায় উপস্থিত হয়েছে এবং তার সাহায্যকারীদের মধ্যে এমন শক্তি নেই যে যোগ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে, তা হলে এ নবোত্থিত শক্তি তার উপর চড়ে বসবে এবং তার সমুদয় ক্ষমতা ছিনিয়ে নিবে। এভাবে সকল রাজ্যই তার কুক্ষিগত হয়ে পড়বে।

অবশ্য পূর্বোক্ত সেই সাম্রাজ্য তার অন্তিম দশায় নাও পৌঁছতে পারে, বরং তা তার শক্তির শেষ সীমায় উপনীত হয়েছে মাত্র। এমতাবস্থায় তার মধ্যে যে অসুবিধা দেখা দিয়েছে, তা হল গোত্রপ্রীতিগত ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ এবং এর অভাবেই তারা আশ্রিত সাহায্যকারীদের হাতে রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত করতে বাধ্য হয়েছে। বস্তুত গোত্রপ্রীতির সাহায্যে প্রাথমিক যুগে সাম্রাজ্যের অধীশ্বররা যা করেছে, এখন অন্যদের সাহায্যে সেই উদ্দেশ্যই তারা পূরণ করতে থাকে। এটাও এক ধরনের ক্ষমতা লাভের ব্যাপার; কিন্তু এতে পূর্বোক্ত সেই সর্বস্ব ছিনিয়ে নেয়ার ব্যাপারটি নেই। যেমন আব্বাসী সাম্রাজ্যে তুর্কি সেনাপতিদের অবস্থা, যেমন কুতামাদের মধ্যে সিনহাজা ও জানাতাদের ক্ষমতা লাভ এবং যেমন আব্বাসী ও উলুবী শিয়া রাজন্যবর্গের উপরে প্রভাব বিস্তারকারী বনি হামদানের শাসন পরিচালনা।

সুতরাং এটা প্রতিষ্ঠিত হল যে, গোত্রপ্রীতির শেষ লক্ষ রাজ্য প্রতিষ্ঠা। এটা যখন তার চরম সীমায় পৌঁছে, তখনই একটি গোত্রের জন্য একটি রাজ্যের জন্ম হয়। কখনও অপরের সর্বস্ব ছিনিয়ে নেয়া, আবার কখনও অপরের উপর প্রয়োজনীয় প্রভাব বিস্তার করা—স্থান-কাল ও সুযোগ-সুবিধা অনুসারে তা সংঘটিত হয়ে থাকে। এভাবে ক্ষমতা লাভের পথে যদি বাধা-বিপত্তি মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, যেমন আমরা পরে বর্ণনা করব, তা হলে তা চরম রূপ ধারণ না করে মাঝপথেই থেমে যায় এবং সেইখানেই আল্লাহ্ তার সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত প্রকাশ না করা পর্যন্ত অবস্থান করে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

[রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে বাধাসমূহের অন্যতম হল কোন গোত্রের বিলাসব্যসন ও প্রাচুর্যের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া]

এর কারণ এ যে, কোন গোত্র যখন গোত্রপ্রীতির সাহায্যে কিছুদূর পর্যন্ত প্রাধান্য বিস্তারে সক্ষম হয়, তখন তারা সেই অনুপাতে প্রাচুর্যেরও অধিকারী হয়ে থাকে এবং প্রাচুর্যবিলাসীদের সাথে মিলিত হয়ে তারাও প্রাচুর্য ও বিলাসব্যসনে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। অবশ্য এক্ষেত্রে তারা ততটুকুরই অধিকারী, যতটুকু কোন সাম্রাজ্যের উপর তাদের প্রাধান্য ও প্রভাব বিস্তারে অনুমতি দেয়। সাম্রাজ্য যদি এ পরিমাণ শক্তিশালী হয় যে, তার ক্ষমতা ছিনিয়ে নিবার বা তার অংশীদার হবার সুযোগ কাকেও না দেয়, তা হলে উক্ত প্রভাবশালী গোত্র, তার আশ্রিত হওয়ার, তার প্রাচুর্যে তৃপ্তিলাভ করার এবং ধনসম্পদে অংশীদার হয়ে থাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তার আকাঙ্ক্ষা কখনও ক্ষমতা হস্তগত করবার বা তার কারণসমূহ উদ্ভাবন করবার দিকে পরিচালিত হয় না। বরং তাদের একমাত্র উচ্চাভিলাষ হল সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে প্রাচুর্যের অনুসন্ধান করা। এমনিভাবে তারা ধন-সম্পদ, জীবিকার প্রাচুর্য, উপার্জন, আরাম-আয়েশ, রাজন্যবর্গ, সুলভ গৃহ, পরিচ্ছদ, তার প্রাচুর্য ও অলংকরণ এবং সেই অনুপাতে যোগ্য বিলাসব্যসন ও তার আনুষঙ্গিক কর্তব্যাদিতে ব্যাপৃত হয়ে থাকে। এর ফলে তাদের প্রান্তরবাসের দৃঢ়তা দূর হয়ে যায় এবং গোত্রপ্রীতি ও সাহসিকতা দুর্বল হয়ে পড়ে। তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রাচুর্যকে নিজেদের ক্ষমতার শেষসীমা মনে করে। তাদের সন্তান-সন্ততি ও বংশধররাও সাম্রাজ্যের আনুগত্য থেকে উচ্চ পদ লাভের আকাঙ্ক্ষাকেই উন্নতির চরম সীমা বলে ভাবে। এভাবে তারা গোত্রপ্রীতির সমুদয় প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোকে নষ্ট করে ফেলে। অবশেষে এরূপ প্রাচুর্য বিলাসিতাই তাদের চরিত্র ও প্রকৃতিতে পরিণত হয় এবং তাই তাদের গোত্রপ্রীতির ধারাকে, তাদের সাহসিকতার ঐতিহ্যকে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে মূল্যহীন করে তোলে। ফলে এক সময় তাদের ইচ্ছাতেই গোত্রপ্রীতি সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায়। এভাবে যতই তারা বিলাসব্যসনে ও প্রাচুর্যে জড়িয়ে পড়ে, ততই তাদের শক্তি ক্ষয় পেতে থাকে; তখন রাজ্য প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা তাদের অস্তিত্বই বিনাশের সম্মুখীন হয়। কারণ তারা প্রাচুর্যের মধ্যে তৃপ্তিলাভ করে ও বিলাসব্যসনে নিমজ্জিত হয়ে প্রাধান্য বিস্তারের মূল শক্তি গোত্রপ্রীতিকেই হারিয়ে বসেছে। সুতরাং কোন গোত্রের যদি এ অবস্থা হয়, তা হলে তারা পরস্পরকে সাহায্য করতে ও প্রতিরোধ করতেই সমর্থ হয় না, তাদের পক্ষে কোন কিছু দাবি করা তো অসম্ভব। পরিণামে তারা অপরের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। এতে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, বিলাসব্যসন রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে বাধাস্বরূপ। 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর রাজ্য দান করে থাকেন।'[২৩]

---

২৩. কোরান ২, ২৪৭।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

[রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে বাধাসমূহের অন্যতম কোন গোত্রের হীনমন্যতা ও অপরের প্রতি আনুগত্য]

এর কারণ, হীনমন্যতা ও আনুগত্য গোত্রপ্রীতির তীব্রতা ও তার ব্যাপকতা বিনষ্ট করে। কারণ যে কোন গোত্রের হীনমন্যতা ও আনুগত্যই প্রমাণ করে যে, তাদের মধ্যে গোত্রপ্রীতি অস্তিত্বহীন। যারা হীনমন্যতাকে লালন করে, তাদের মধ্যে প্রতিরোধ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং যারা প্রতিরোধ শক্তিতে অক্ষম, তারা যে স্বনির্ভরতা ও আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে দুর্বল হবে, তাতে আর বিচিত্রতা কী!

এর একটি সুন্দর উদাহরণ বনি ইসরাইলের কাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান। হজরত মুসা (আঃ) যখন তাদেরকে ইরাকের দিকে আহ্বান করলেন এবং এমনও বললেন যে, আল্লাহ্ তাদের জন্য সেখানে রাজ্য নির্ধারিত করে রেখেছেন, তখন তারা কী শোচনীয়ভাবেই না সাড়া দিতে ব্যর্থ হল। প্রত্যুত্তরে তারা বলল, "ঐ স্থানে উৎপীড়ক একটি জাতি বিদ্যমান, তারা বের হয়ে না গেলে আমরা কিছুতেই সেইখানে প্রবেশ করব না।"[২৪] অর্থাৎ আমাদের গোত্রপ্রীতিগত শক্তির সাহায্যে নয়, বরং আল্লাহ্ তাঁর মহিমার দ্বারা তাদেরকে সেখান হতে বের করে দিন, যাতে তা তোমার জন্য একটি অলৌকিক বিষয় হতে পারে, হে মুসা! তিনি যখন তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করলেন, তখন তারা আরও ভেঙে পড়ল এবং আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করে বলল, "যাও, তুমি ও তোমার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ কর।"[২৫] এর একমাত্র কারণ যেমন পূর্বোক্ত কোরানের আয়াতে বোঝা যায় এবং বিশ্লেষণ করলেও বের হয়ে পড়ে, তারা তাদের মধ্যে শক্তি ও আকাঙ্ক্ষার কোন উদ্দেশ্যই খুঁজে পায়নি। কারণ তারা দীর্ঘকাল ধরে কিবতীদের অনুগত থেকে একান্তই হীনমন্য হয়ে পড়েছিল। এর ফলে গোত্রপ্রীতি তাদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়। অন্যদিকে তারা এ কথা যথার্থভাবে বিশ্বাস করতে পারে নি যে, মুসা কথিত ইরাক সত্যই তাদের অধিকারে আসবে এবং আরিহা(জেরিকো)য় অবস্থানরত আমালেকীরা আল্লাহ্র নির্দেশ মতই তাদের বশীভূত হবে। এ জন্যই তারা আহ্বানে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এ অক্ষমতাকে তাদের অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষাহীনতা ও চারিত্রিক হীনমন্যতার ফসল বলে মনে করেছে। আর এরই ফলশ্রুতি হিসাবে তাদের নবীর প্রদত্ত সুসংবাদেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেনি এবং তাঁর আদেশ অমান্য

---

২৪. কোরান ৫, ২২।
২৫. কোরান ৫, ২৪।

করতেও দ্বিধা করেনি। সুতরাং আল্লাহ্ তাদেরকে তীহ প্রান্তরে অবস্থানের শাস্তি দিলেন।[২৬] অর্থাৎ তারা ইরাক ও মিসরের মধ্যবর্তী মরু প্রান্তরে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে ঘুরে বেড়িয়েছে। এ সময়ে তারা কোন জনবসতির আশ্রয় পায়নি, কোন জনপদে যায়নি এবং অন্যকোন মানবগোষ্ঠীর সাথে মেলামেশার সুযোগ লাভ করেনি। কোরানে তা বর্ণিত হয়েছে। এ সময়ে ইরাকে ছিল আমালেকীরা এবং মিসরে ছিল কিবতীরা। এরা উভয়ে ছিল শক্তিমান, অন্তত তাদের ধারণামতে এ উভয় শক্তিকে অতিক্রম করার কোন ক্ষমতাই তাদের মধ্যে ছিল না।

কোরানের বর্ণনাধারায় ও তার তাৎপর্য থেকে এটাই মনে হয় যে, ঐ তীহ প্রান্তরে অবস্থানের রহস্যটি হল, বনি ইসরাইলের যে জনগোষ্ঠী হীনমন্যতা, উৎপীড়ন ও শক্তির প্রভাব থেকে মুক্তি পেয়ে এখানে এসেছিল, তাদের তিরোধান। কেননা তারা দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফলে তাদের গোত্রপ্রীতিকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলেছিল। সুতরাং তাদের দ্বারা নয়, বরং তাদের মধ্যেই অন্য এক পুরুষ জন্ম নিবে, যারা এ সকল বিধি-নিষেধ, উৎপীড়ন ও হীনমন্যতার কথা জানেন না, কেবল তাদের দ্বারাই সেই হৃত গোত্রপ্রীতি উদ্ধার করা সম্ভব। এর ফলে এ নবীন পুরুষের মধ্যে গোত্রপ্রীতির সেই শক্তি জাগ্রত হবে, যদ্বারা প্রাধান্য বিস্তার ও ক্ষমতা লাভ সম্ভব হবে। এতে এ কথাটিও আপনার জন্য পরিষ্কার হয়ে উঠবে, হে পাঠক, যে, একটি পুরুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে অন্য একটি নবীন পুরুষের অভ্যুদয়ের জন্য চল্লিশ বছরের প্রয়োজন। পবিত্র তিনি, অতিশয় বিচক্ষণ ও সর্বজ্ঞ।'

এ ঘটনাতে গোত্রপ্রীতির মহিমার সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। তাই সেই শক্তি, যদ্বারা প্রতিরোধ, স্বনির্ভরতা, সহায়তা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়ে থাকে। যে জাতি তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তার পক্ষে এ সকল গুণের কোনটিই লাভ করা সম্ভব নয়।

এ পরিচ্ছেদের বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে মাথট ও কার প্রদানের বিষয়টিও এসে পড়ে। এটাও যে কোন গোত্রের পক্ষে হীনমন্যতার পরিচায়ক। কারণ কোন গোত্রই হীনমন্যতা স্বীকার না করে মাথট প্রদান করতে পারে না। বস্তুত এ মাথট ও কর প্রদানের মধ্যে এমন একটি অপমানজনক অবস্থা বিদ্যমান, যা যে কোন আত্মনির্ভরশীল গোত্রের পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব নয়। একমাত্র হত্যা ও ক্ষয়ক্ষতির দ্বারা তাকে পর্যুদস্ত করতে পারলেই তার পক্ষে এ মেনে নেয়া সম্ভব হতে পারে। কারণ তখন তার গোত্রপ্রীতি খুবই দুর্বল থাকে; তার পক্ষে সাহায্য বা প্রতিরোধ কোনটাই তখন সম্ভব নয়। সুতরাং যার গোত্রপ্রীতি তাকে অপমান থেকেই বাঁচাতে পারে না, তার জন্য স্বনির্ভর ও স্বাধিকারের প্রশ্ন তো বাতুলতা মাত্র। সুতরাং হীনমন্যতা ব্যতীত তার অন্যকোন পথ নেই এবং হীনমন্যতা একটি বিরাট বাধা, যেমন পূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।

এ প্রসঙ্গে হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর একটি বাণী উদ্ধৃত করা যায়। তিনি আনসারদের কারও ঘরে লাঙ্গলের ফলা দেখে বলেছিলেন, "এটা যাদের ঘরে প্রবেশ করেছে, সেখানে হীনমন্যতাও প্রবেশ করেছে।" কৃষি সম্পর্কীয় এ উক্তিতে এ কথারই প্রমাণ বিদ্যমান যে, মাথট প্রদানকারীর জন্য হীনমন্যতা অবশ্যম্ভাবী। এর সঙ্গে এ প্রকার

২৬. কোরান ৫, ২৬।

কর ও মাথট প্রদানকারীদের মধ্যে ধোঁকা ও প্রতারণার যে চরিত্র গড়ে উঠে, তাও উল্লেখযোগ্য।[২৭] কারণ দাপটের অত্যাচারেই তারা এরূপ করতে বাধ্য হয়। কাজেই পাঠক, আপনি যখন এমন কোন জাতিকে দেখতে পাবেন, যারা কর ও মাথট প্রদানের মাধ্যমে হীনমন্যতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, তা হলে এটা নিশ্চিত ধরে নিতে পারেন যে, তাদের জন্য কোন কালেই কোন রাজ্য লাভ সম্ভব নয়।

এ থেকেই আপনার জন্য এ ভুল ধারণাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে, যা অনেকেই পোষণ করে থাকে যে, জানাতারা পূর্বে মাথট প্রদানকারী পশুজীবী ছিল এবং তারা এর মাধ্যমে তৎকালীন রাজন্যবর্গের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। এটা যে একান্তই ভুল, তা আপনি অবশ্যই লক্ষ করেছেন। যদি এটা বাস্তব হত, তা হলে তাদের পক্ষে কোন প্রকার রাজ্য লাভ ও সাম্রাজ্য বিস্তার সম্ভব হত না। লক্ষ করুন, 'বাব' (দরবন্দ) এর রাজা শহর বেজার আব্দুর রহমান ইবনে রাবিয়াকে কীভাবে এ সম্পর্কে বলেছিলেন। আব্দুর রহমান যখন তাঁর উপর জয়ী হলেন, তখন তিনি অনুগত থাকবার প্রতিশ্রুতিতে নিরাপত্তা চেয়ে বলেছিলেন, "অদ্য আমি আপনাদেরই একজন, আমার হাত আপনাদের হাতে ন্যস্ত—আমার অন্তর আপনাদের সাথে জড়িত। সুতরাং আপনাদেরকে স্বাগত জানাই, আল্লাহ্ আমাদেরকে ও আপনাদের সকলকে কল্যাণ দান করুন। আমাদের উপর আপনাদের বিজয়ই আমাদের মাথট প্রদান তুল্য। আপনারা যা ভাল মনে করেন, করতে পারেন; শুধু আমাদেরকে মাথট প্রদানে বাধ্য করে হীনমন্য করে তুলবেন না। তা হলে আমরা আপনাদের শত্রুদের চক্ষে হেয় বলে প্রতিপন্ন হব।" পাঠক, আপনি এ উক্তিকে আমাদের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে দেখুন। যথার্থই এটা যথেষ্ট।

---

২৭. এ স্থলে রোজেনথাল একটি হাদিসের উল্লেখ করেছেন—হজরত মুহাম্মদ (সঃ) কর প্রদান পছন্দ করতেন না। এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেছিলেন, কর প্রদানকারী কথা বললে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে। আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে এটা নেই।

বিংশ পরিচ্ছেদ

[রাজ্যশক্তির নিদর্শনসমূহের মধ্যে সৎ চরিত্রের প্রতিযোগিতা অন্যতম এবং এর বিপরীত অবস্থা]

যেহেতু রাজ্য প্রতিষ্ঠা মানুষের স্বভাবগত ব্যাপার, কেননা সমাজবদ্ধ জীবন তার স্বভাবের অন্তর্গত, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি, সুতরাং সে জন্মগত স্বভাবের তাড়নায় ও চিন্তাশীল বিবেচনা শক্তির কল্যাণে অসৎ চরিত্র থেকে সৎ চরিত্রের অধিকতর নিকটবর্তী হয়ে থাকে। কারণ অসৎ চরিত্র মূলত তার মধ্যকার পাশবিক শক্তিগুলো থেকে আবির্ভূত হয়। কিন্তু মানুষ হিসাবে সে সৎ চরিত্রের নিকটবর্তী হতে বাধ্য। রাজ্য ও শাসনব্যবস্থা উভয়েই তার মনুষ্যত্বের অবদান। কারণ এ অবদান একমাত্র মানুষের পক্ষেই সম্ভব, পশুর পক্ষে নয়। সুতরাং তার মধ্যকার একমাত্র সৎ চরিত্রই শাসন ব্যবস্থা ও রাজ্যের অনুকূল। বস্তুত সৎ চরিত্রই একমাত্র সুশাসনের উপযোগী।

আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, মর্যাদার একটি ভিত্তি বিদ্যমান, যার উপরে তা সংস্থাপিত হয় এবং যদ্বারা তার অস্তিত্ব বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। তা হলে গোত্রপ্রীতি ও পরিবারবর্গ। মর্যাদার কিছু শাখা-প্রশাখাও রয়েছে, তার সাহায্যেই তা স্থিতিশীল হয় ও পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং তা হল চরিত্র। গোত্রপ্রীতির লক্ষ যদি রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়, তা হলে তার শাখা-প্রশাখা ও পরিপূর্ণতার উপকরণও তার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাকেই চরিত্র বলা যেতে পারে। কারণ তার পরিপূর্ণতা বিধায়ক উপকরণসমূহ ব্যতীত তার অস্তিত্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তিত কোন ব্যক্তির তুল্য অথবা জনসমাবেশে উলঙ্গ হয়ে কোন ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের মতোই বিসদৃশ। যদি কোন পারিবারিক ঐতিহ্যে ও বংশ মর্যাদায় সৎ চরিত্রের অনুশীলনহীন গোত্রপ্রীতি দূষণীয় বলে বিবেচিত হয়, তা হলে রাজ্যাধিপতিদের সম্পর্কে, পাঠক, আপনার কী ধারণা! তা ত সকল গৌরবের চরম পর্যায় এবং সকল বংশমর্যাদার গন্তব্যস্থল!

তদুপরি রাজ্য ও শাসনব্যবস্থা উভয়েই সৃষ্টির প্রতিপালন এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে তাঁর বিধি-নিষেধ প্রবর্তনের জন্য তাঁর প্রতিনিধিত্ব। সৃষ্টির মধ্যে ও মানব সমাজে আল্লাহ্‌র সমুদয় বিধি-নিষেধ হল কল্যাণধর্মী ও যোগ্যতার অনুসারী, যেমন তৎসম্পর্কে সকল ধর্মমতই সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। অন্যদিকে মানুষের[২৮] বিধি-বিধান একান্তই মূর্খতা ও শয়তানের কাজ। কারণ তাতে আল্লাহ্‌র মহিমা ও তাঁর সত্যাসত্য নির্ধারণের

---

২৮. রোজেনথাল লিখেছেন, 'অসৎ বিধি-বিধান'; একটি পাঠে এটা বিদ্যমান।

বিরোধিতাই প্রকট। বস্তুত আল্লাহ্ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সৎ ও অসৎ উভয়কেই ক্রিয়াশীল করেছেন। কারণ তিনি ব্যতীত আর কোন কর্তা নেই। সুতরাং যে ব্যক্তির ভাগ্যে আল্লাহ্র মহিমায় প্রতিপালনধর্মী গোত্রপ্রীতির মর্যাদা জুটল এবং যার চরিত্রে মানব সমাজে আল্লাহ্র বিধি-বিধান প্রবর্তনের উপযোগী কল্যাণধর্মী সততা দেখা দিল, বুঝতে হবে, সেই যথার্থ প্রতিনিধিত্ব ও প্রজা পালনের যোগ্য এবং তার মধ্যেই এদের উপযুক্ত সঙ্গতি বিদ্যমান।

এ যুক্তি-প্রমাণ পূর্ববর্তীটি অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ় ও শুদ্ধতর ভিত্তির উপর স্থাপিত। এটা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তির গোত্রপ্রীতি লাভ হয়েছে, তার মধ্যে সৎ চরিত্র দেখা গেল, তা রাজ্যের অস্তিত্বেরই দ্যোতক বলে বুঝতে হবে। এদিক থেকে আমরা যখন গোত্রপ্রীতিধন্য জাতিগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি এবং চুতর্দিকে বিভিন্ন জাতির উপর তাদের প্রাধান্য বিস্তারের রহস্য অনুসন্ধান করতে বসি, দেখতে পাই তারা সততা ও সৎচরিত্রের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তাদের মধ্যে ভদ্রতা, ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি ক্ষমা, দুর্বলের প্রতি সহনশীলতা, অতিথি বাৎসল্য, দুস্থের সেবা, নিঃস্বের জীবিকা দান, বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ, প্রতিশ্রুতি পালন, সম্ভ্রম রক্ষার্থে অর্থব্যয়, ধর্মের প্রতি সমীহ ভাব, ধর্মীয় জ্ঞানীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁদের নির্ধারিত বিধি-নিষেধের প্রতি আস্থা স্থাপন, তাঁদের প্রতি সৎ ধারণা পোষণ, ধর্মীয় নেতাদের প্রতি বিশ্বাস, তাঁদের পুণ্য সাহচর্য কামনা, তাঁদের আশীর্বাদের প্রতি আগ্রহ, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও উস্তাদগণের সম্মুখে লজ্জা, তাঁদের প্রতি সমীহ ও সম্মানের ভাব, সত্য ও তৎপ্রতি আহ্বানকারীর প্রতি আনুগত্য, অক্ষমের প্রতি সুবিচার, তাদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন, তাদের অধিকারের স্বীকৃতিদান ও তাদের প্রতি বিনয় প্রদর্শন; অভিযোগকারীদের অভিযোগ শ্রবণ, ধর্মের বিধি-নিষেধ পালন ও উপাসনাদিতে অংশগ্রহণ, ধর্ম ও তার উপকরণাদিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ, বিশ্বাসঘাতকতা—চক্রান্ত-প্রতারণা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও ইত্যাকার অন্যান্য বিষয় থেকে দূরে অবস্থান প্রভৃতির ন্যায় গুণাবলি বিদ্যমান। এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি, এ সকলই শাসন-ব্যবস্থার অপরিহার্য গুণাবলি, যা তারা অর্জন করেছেন এবং এর মাধ্যমেই তাদের অধীনস্থ প্রজাদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তা সর্বজনীন আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এটাই সেই কল্যাণধর্মিতা, যা আল্লাহ্ তাদের গোত্রপ্রীতি ও প্রাধান্য বিস্তারের উপযোগী করে তাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। এ সকল গুণাবলি তাদের মধ্যে অহেতুক বা অনর্থক নয়। বস্তুত এরই কল্যাণে রাজ্য তাদের গোত্রপ্রীতির জন্য সর্বোচ্চ মর্যাদা ও কল্যাণের আকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই জন্য বুঝতে পারি, সত্যই আল্লাহ তাদেরকে রাজ্য পরিচালনার অনুমতি দিয়েছেন এবং তার দায়িত্বভার তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

অন্যদিকে এর বিপরীত কিছু দেখা গেলে বুঝতে পারি, আল্লাহ্ যখন কোন জাতির নিকট থেকে রাজ্য কেড়ে নিতে মনস্থ করেন, তখন তাদের মধ্যে দুষ্কর্ম, মন্দ স্বভাব ও বিপথগমনের ব্যবস্থা করে দেন। ফলে তাদের মধ্য থেকে শাসন ব্যবস্থার উপযোগী গুণাবলি সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। এভাবে রাজ্য ও অনবরত বিচ্যুতির পথে চলে একসময়ে সম্পূর্ণভাবে তাদের ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। তাদের স্থলে অন্যরা এসে উপস্থিত হয় এবং আল্লাহ্ এক সময়ে তাদের হাতে যে রাজ্যশক্তি ও কল্যাণধর্মিতা তুলে দিয়েছিলেন, তা ছিনিয়ে নিতে তাদেরকে শিক্ষা দেন। 'আমরা যখন কোন জনবসতিকে ধ্বংস করে

দিতে ইচ্ছা করি, তখন তদন্তর্গত প্রাচুর্য বিলাসীদেরকে আদেশ করে, তারা সেখানে অপকর্মে লিপ্ত হয়। অতঃপর সেই কথাই সত্য হয় এবং আমরা তাকে সমূলে বিনষ্ট করে ফেলি।'[২৯] পাঠক, এটা গভীরভাবে অনুধাবন করুন এবং প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে এর অনুসন্ধান করুন; আমরা যেরূপ বলেছি ও বর্ণনা করেছি, তার প্রচুর নিদর্শন সেখানে দেখতে পাবেন। বস্তুত আল্লাহ্ যা ইচ্ছা হয়, সৃষ্টি করেন এবং নির্বাচনও করেন।[৩০]

জেনে রাখুন, যে সকল পরিপূর্ণতা বিধায়ক চরিত্র নিয়ে গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীগুলো প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং যা তাদের রাজ্য ক্ষমতা লাভের সাক্ষ্য বহন করে, তা হল জ্ঞানী, পুণ্যবান, সম্ভ্রান্ত, কুলীন, ব্যবসায়ী ও দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সর্বশ্রেণীর মানুষকে তার যোগ্য মর্যাদা দান। কেননা নিজ গোত্র, গোত্রপ্রীতিতে অংশীদার ব্যক্তিবর্গ, পরিবার—যারা কৌলীন্যে তাদের প্রতিযোগী, গোত্রপ্রীতি ও পারিবারিক ঐতিহ্যে তাদের সমধর্মী এবং গৌরব অর্জনে তাদের অংশীদার, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। গৌরবের অত্যধিক আকর্ষণ, সম্মানিত লোকদের সম্পর্কে ভীতিভাব অথবা তাদের নিকট থেকে অনুরূপ মনোভাবের কামনাই এ স্বভাবকে সক্রিয় করে থাকে। কিন্তু পূর্বোক্ত ঐ সকল ব্যক্তি, যাদের সাথে ভীতিপ্রদ গোত্রপ্রীতিগত কোন সম্পর্ক নেই এবং আশাপ্রদ গৌরবজনিত কোন সংযোগ নেই, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সন্দেহ দূরীভূত হয়ে এ আকাঙ্ক্ষাই বলবতী হয়ে উঠে যে, সংশ্লিষ্ট রাজন্যবর্গ যথার্থই মর্যাদা অর্জনে, চরিত্রের পরিপূর্ণতা বিধানে ও সামগ্রিকভাবে শাসন ব্যবস্থার সৌকর্য সাধনে তৎপর রয়েছেন। কারণ শাসনব্যবস্থার বিশেষ পরিধিতে সমশ্রেণীর গোত্র ও তুল্য ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন একান্ত প্রয়োজনীয়। অন্যদিকে তেমনি বহিরাগত বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সাধারণ শাসনব্যবস্থার পূর্ণতা বিধায়ক। এ জন্যই ধর্মীয় বিধি-নিষেধ ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদির প্রতিষ্ঠাদানের উদ্দেশ্যে পুণ্যাত্মা ও জ্ঞানীদের প্রতি সমীহ ভাব প্রদর্শন সম্পদের প্রাচুর্য ও উপকারিতার জন্য ব্যবসায়ীদেরকে উৎসাহ দান এবং বহিরাগত অতিথিদের প্রতি যোগ্য সদাচারের ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে প্রতিটি লোককে তার যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার নামই সদ্ব্যবহার, যার অন্য নাম ন্যায়পরায়ণতা। এ সকল গুণ কোন গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা গেলে বুঝতে হবে তারা সাধারণ শাসন ব্যবস্থার উপযোগী হয়েছে এবং এরই নাম রাজ্য। আল্লাহ্ এ ব্যাপারে তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, কারণ তার নিদর্শনগুলো তাদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে, এ কারণেই তিনি যখন কোন রাজ্যাধিপতি জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিবার ইচ্ছা করেন, তখন প্রথমেই উপরিউক্ত জনসমাজের প্রতি তাদের সম্মান প্রদর্শনের ধারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। পাঠক, আপনি যখন কোন জাতির মধ্যে এ বিলুপ্তির লক্ষণ দেখতে পাবেন, তখন বুঝবেন তাদের গৌরব অস্তমিত হওয়ার পথে। আপনি অচিরেই তাদের রাজ্য বিনাশের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন। 'যখন আল্লাহ্ কোন জাতির অকল্যাণ কামনা করেন, তখন তার প্রতিরোধের কোন উপায়ই থাকে না।'[৩১] আল্লাহ্ উন্নত ও সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।

---

২৯. কোরান ১৭, ১৬।

৩০. কোরান ২৮, ৬৮।

৩১. কোরান ১৩, ১১।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

[বর্বর জাতিগুলোর সাম্রাজ্য সীমাই অধিকতর বিস্তৃত হয়ে থাকে]

এর কারণ, তারা প্রাধান্য বিস্তার ও আগ্রাসনে অধিকতর সক্ষম, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। তারা বিভিন্ন গোত্রকে তাদের যুদ্ধ ক্ষমতার সাহায্যে পদানত করতে অধিকতর সক্রিয় হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে তাদের অগ্রাভিযান হিংস্র ভাষাহীন পশুদের আক্রমণের মতোই ভয়ঙ্কর। এরা আরব-বেদুইন, জানাতা এবং তাদের সমশ্রেণীর কুর্দী, তুর্কেম্যান ও আবৃত বেদুইন সিনহাজা গোত্র। এদের ভয়ঙ্করত্বের অন্য একটি কারণ, তারা প্রায় বন্য প্রকৃতির, নির্দিষ্ট কোন আবাসস্থল নেই—যেখানে স্বস্তি লাভ করতে পারে, কোন অঞ্চল নেই—যেখানে আশ্রয় নিতে পারে; সুতরাং যে কোন দিক, যে কোন দেশ হোক না কেন, সকলই তাদের নিকট সমান। এ কারণেই তারা নির্দিষ্ট কোন আবাসভূমি ও তার চুতস্পার্শ্বস্থ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে না, যে কোন অঞ্চলের দিগন্ত পার হয়ে থমকে দাঁড়ায় না; বরং দূরদূরান্তের দেশ জয় করে ও বিচিত্র জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে অগ্রসর হয়। পাঠক, এ ব্যাপারে হজরত উমর (রাঃ)-র একটি উক্তি প্রণিধান করুন। তিনি খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর ইরাক বিজয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবার মানসে বলেছিলেন, "হেজাজ তোমাদের বিচরণ ভূমি ছাড়া স্থায়ী কোন আবাস নয়। এখানে বিচরণ করে তোমাদের শক্তি অর্জনের কোন পথ নেই। হিজরতকারীদের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিশ্রুত সেই আবাসভূমি কোথায়? তোমরা পৃথিবীতে সেই ভূমির অনুসন্ধান কর, আল্লাহ্ যার উত্তরাধিকার তোমাদেরকে অর্পণ করবেন বলে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, যাতে এ ধর্মমত সকল ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে, যদিও পৌত্তলিকরা তা পছন্দ করে না।[৩২]

পাঠক, এ বিষয়টি প্রাচীন আরব গোত্রগুলোর সম্পর্কেও বিবেচনা করতে পারেন। যেমন তুব্বা ও হিমিয়ার। কী অদ্ভুতভাবে তারা কখনও ইয়ামেন থেকে মাগরিব পর্যন্ত, কখনও ইরাকের দিকে, আবার কখনও হিন্দে অভিযান চালিয়েছে। আরব-বেদুইন ব্যতীত অন্য কোন জাতির পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। মাগরিবের আবৃত বেদুইন গোত্রগুলোরও একই অবস্থা। তারা যখন রাজ্য শক্তিতে উঠে দাঁড়াল, প্রথম অঞ্চলের সমুদয় অংশ, সুদানের পার্শ্ববর্তী তাদের বিচরণভূমি প্রভৃতি অতিক্রম করে চুতর্থ ও পঞ্চম অঞ্চলের আন্দালুস পর্যন্ত কোন প্রকার ব্যতিক্রম ছাড়াই এগিয়ে গেল। এটাই এ সকল বর্বর জাতির অবস্থা এবং এ জন্যই এদের সাম্রাজ্য ধারাবাহিকতায় বিস্তৃততর হয়ে দেখা দেয়। তাদের কেন্দ্রভূমি থেকে বহু দূর-দূরান্তে ছাড়িয়ে যায়। 'আল্লাহ্ রাত্রি দিনকে নির্ধারিত করেন।'[৩৩] তিনি একক, পরাক্রান্ত ও তাঁর কোন অংশীদার নেই।

---

৩২. কোরান ৯, ৩৩; ৬১, ৯।

৩৩. কোরান ৭৩, ২০।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

[কোন বংশের মধ্যে গোত্রপ্রীতি অক্ষুণ্ন থাকলে তার একটি শাখা থেকে রাজ্য চলে গেলেও পুনরায় অন্য একটি শাখায় ফিরে আসবে]

এর কারণ এ যে, প্রাধান্য বিস্তারের শক্তি অর্জন ও অন্যান্য সকল জাতির আনুগত্য লাভের মাধ্যমেই তাদের রাজ্য বিস্তার সম্ভব হয়ে থাকে। এ উদ্যোগ-আয়োজনে সকলে অংশগ্রহণ করলেও কিছু সংখ্যক লোকের জন্য বিষয়টির বাস্তবায়ন ও রাজ্য পরিচালনের দায়িত্ব নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। কারণ সকলের জন্য এটা সম্ভব নয়। কেননা সকলেই এতে অংশগ্রহণ করতে চাইলে স্থান সংকুলান হবে না। তদুপরি সিংহাসন আরোহণের মর্যাদা লাভের ব্যাপারটিতে শক্তিমানের প্রাধান্যের দ্বারা অন্য অনেকেরই আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্ত থাকে। এভাবে যখন কিছু সংখ্যক লোকের জন্য এ দায়িত্ব নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তখন তারা সাম্রাজ্যের অধিপতি হিসাবে ঐশ্বর্যের দ্বারা বেষ্টিত এবং বিলাসব্যসন ও প্রাচুর্যের সাগরে নিমজ্জিত হয়। এর ফলে তারা বংশান্তর্গত অন্যান্য শাখাকে কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করে এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন ও পরিচালনের ভার তাদের হাতে ন্যস্ত করে। অথচ ঐ সকল লোক যারা একসময় সিংহাসনের দায়িত্ব পালন থেকে বঞ্চিত হয়েছিল এবং এক বংশধারার অন্তর্গত হয়েও সাম্রাজ্যের অংশীদার হিসাবে শুধু তার ছত্রচ্ছায়ায় লালিত-পালিত হচ্ছিল, তারা কিন্তু বিলাসব্যসন ও তার উপকরণাদি থেকে দূরে থাকায় কোন প্রকার অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয় না। অন্যদিকে সময় তখন পূর্ববর্তী ক্ষমতাবানদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে, তাদের সবুজ রং ধূসর হয়ে উঠছে, সাম্রাজ্য তাদেরকে পরিপাক করে ফেলছে এবং কালচক্রের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া তাদেরকে আহার্য ও পানীয় হিসাবে ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়েছে। কেননা ঐশ্বর্যের পরিমার্জনা তাদেরকে কোমল করে ফেলেছে এবং বিলাসব্যসনের অমোঘ প্রতিক্রিয়া তাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে। তারা মনুষ্য স্বভাবের শেষ পর্যায় নাগরিকত্ব ও শাসন ব্যবস্থার প্রাধান্য বিস্তারের তুঙ্গে আরোহণ করছে। কবি বলেন :[৩৪]

> তারা রেশম পোকার মত গুটি নির্মাণ করে, অতঃপর
> সেই গুটির অভ্যন্তর ভাগেই নিঃশেষ হয়ে যায়।

অথচ এরা নিঃশেষ হলেও অন্যান্যের গোত্রপ্রীতি তখনও পরিপূর্ণ, প্রাধান্য বিস্তারের তেজবীর্য অটুট এবং তাদের নিদর্শনাবলি বিজয়ের পরিচয়বাহী। সুতরাং এক সময়ে তাদেরই গোত্রপ্রীতিধন্য যাদের প্রাধান্যের ফলে তারা বিশেষ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত

---

৩৪. এ কবির নাম সম্ভবত আবুল ফতেহ আলবুস্তী।

হয়েছিল, এখন তা লাভ করবার জন্য তাদের বাসনা চঞ্চল হয়ে উঠে। কলহ এসে তাদের জয়ের পথকে সুগম করে দেয় এবং তারা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে পড়ে। এভাবে রাজ্য তাদের হাতে চলে আসে। পুনরায় অনুরূপভাবে তারাও জাতির অন্যান্য অংশ যারা বিশেষ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত রয়েছে, তাদের নিকট পরাজয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করে। এমনি করে অনবরত রাজ্যশক্তি এ জাতির এক অংশ থেকে অন্য অংশে হস্তান্তরিত হতে থাকে—যতক্ষণ না তাদের গোত্রপ্রীতি সমূলে বিনষ্ট হয় এবং জাতির সকল অংশ বিনাশ হয়ে যায়। এটাই পার্থিব জীবনে আল্লাহ্‌র বিধান। 'তোমার প্রভুর নিকট পারলৌকিক কল্যাণ একমাত্র ধর্মভীরুদের জন্য।'[৩৫]

পাঠক আরব দেশের ঘটনাবলির সাথে একে বিবেচনা করুন। আদবংশীয়দের রাজ্যক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে তাদের ভ্রাতা সামুদদের হাতে আসল। তাদের পরে দেখা দিল তাদেরই সমগোত্রীয় আমালেকীরা। তাদের পরে তাদেরই ভ্রাতৃতুল্য হিমিয়াররা ক্ষমতা দখল করল। তাদের পরে এ হিমিয়ার তুব্বা রাজন্যবর্গের কাল এবং তাদের পরে 'আজওয়া'দের সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করেছিল। অতঃপর মুজার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করল। পারস্যের অবস্থা একই। কায়ানীদের পতনের পর সামানীরা আবির্ভূত হল এবং এর পর তাদের সকল কিছু আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে ইসলামের অধীনস্থ হল। গ্রিকদের অবস্থাও অনুরূপ; তাদের পতনের পর রাজ্য রোমের করায়ত্ত হল। মাগরিবের বারবারদের মধ্যেও একই অবস্থা দেখা যায়। যখন তাদের প্রাথমিক শাসকবৃন্দ 'মেগরাওয়া' ও 'কুতমাদের' পতন ঘটল, তখন রাজ্যশক্তি আসল সিনহাজাদের হাতে। অতঃপর আবৃত বেদুইন ও তাদের পরে মাসমুদাদের নিকট এবং তাদের পরে জানাতাদের অন্যান্য শাখা-প্রশাখায়। মানব সমাজ ও সৃষ্টি জগতে আল্লাহ্‌র নিয়ম এমনি।

এ সকল কিছুর মূল হল এ যে, এটা একমাত্র গোত্রপ্রীতির মাধ্যমেই লাভ হয়ে থাকে এবং এ গোত্রপ্রীতি গোত্র বিশেষে বিভিন্ন হয়ে দেখা দেয়। রাজ্যশক্তিকে বিলাসব্যসনই দুর্বল করে এবং নিশ্চিহ্ন করে ফেলে, যেমন আমরা পরে বর্ণনা করব।[৩৬] সুতরাং কোন সাম্রাজ্য যখন পতনের সম্মুখীন হয়, তখন তাকে তারাই গ্রহণ করতে সক্ষম, যাদের গোত্রপ্রীতি উক্ত সাম্রাজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং সর্বত্র তার প্রতি মান্যতা ও আনুগত্য বিদ্যমান। এ ক্ষেত্রে অন্যদের গোত্রপ্রীতির উপর তাদের অবশ্যই প্রাধান্য থাকতে হবে এবং একমাত্র বংশধারার নিকটবর্তী অংশের দ্বারাই এটা সম্ভব। কারণ গোত্রপ্রীতির মধ্যে বংশ সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ও অঘনিষ্ঠতার অনুপাতে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে। রাজ্য হস্তান্তরের এ ধারাটি এভাবেই চলতে থাকে, যতক্ষণ না পৃথিবীতে কোন ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। যেমন কোন জাতির আমূলে পরিবর্তন কিংবা কোন জনবসতির বিলুপ্তি অথবা আল্লাহ্ তাঁর মহিমায় যা কিছু ঘটান, তেমন কিছু ঘটনা। এমনি অবস্থায় রাজ্যশক্তি এ জাতি থেকে বের হয়ে এমন এক জাতির করায়ত্ত হবে, যাকে আল্লাহ্ এ পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন। যেমন মুজারের জন্য ঘটেছিল। তারা সমুদয় জাতির ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য জয় করে পৃথিবীর উপর তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। অথচ এর পূর্বে তারা সুদীর্ঘকালব্যাপী এ ক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল।

---

৩৫. কোরান ৪৩, ৩৫।

৩৬. এটা পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

[বিজিত সর্বদাই বিজয়ীর বৈশিষ্ট্য, পরিচ্ছদ, পেশা এবং অন্যান্য যাবতীয় অবস্থা ও অভ্যাসের অনুসরণ করে থাকে]

এর কারণ এ যে, জীবাত্মা সর্বদাই তার উপর প্রাধান্য বিস্তারকারীর পরিপূর্ণতা সম্পর্কে বিশ্বাস করে এবং তার অনুসরণ করে থাকে। এ ব্যাপারে হয় সে স্বভাবত পূর্ণতার গুণাবলির জন্য তার মধ্যে যে সমীহের ভাব আছে, তার অথবা সে ভুল করে বিজয়ীর প্রতি তার আনুগত্যকে স্বাভাবিক প্রাধান্য বিস্তারের ফল নয়, রবং বিজয়ীর পূর্ণতর গুণের আকর্ষণ—এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়। সুতরাং এ শেষোক্ত ভুলটি যখন সে করে বসে ও তার সাথে মিলিত হয়, তখন তা তার বিশ্বাসে পরিণত হয়ে বিজয়ীর সমস্ত মত ও পথ গ্রহণে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। এটাই অনুসরণ নামে খ্যাত। অথবা এমনও হতে পারে, আল্লাহ্ই ভাল জানেন, সে দেখতে পায়, বিজয়ীর প্রাধান্য বিস্তার কোন গোত্রপ্রীতি ও সংগ্রাম শক্তির ফল নয়, বরং এটা একান্তই তার অভ্যাস ও ধর্মীয় বিশ্বাসাদির কারণে সংঘটিত হয়েছে; তখন প্রাধান্য বিস্তার সম্পর্কে আবারও ভুল করে এবং এ ভুল তার পূর্বোক্ত প্রথম ধারণার দিকেই ফিরে যায়। পাঠক, সম্ভবত এ কারণেই আপনি দেখতে পান যে, বিজিত সর্বদাই বিজয়ীর অনুকরণ করে থাকে। এ অনুকরণ পোশাক-পরিচ্ছদ, যানবাহন, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতির নির্মাণ ও আকৃতির মধ্যে, এমনকি সামগ্রিক অবস্থার মধ্যে লক্ষ করা যায়। এটা আপনি সন্তান-সন্ততির মধ্যে পিতৃপুরুষের প্রতি তাদের আনুগত্যেও লক্ষ করতে পারেন। তারা কী অদ্ভুতভাবেই না সর্বদা তাঁদের অনুরকণ করে থাকে। এটা একমাত্র ঐ পিতৃপুরুষগণের পূর্ণতার ধারণাজাত। পৃথিবীর যে কোন দিকে তাকিয়ে দেখুন না কেন, দেখতে পাবেন, তাদের উপর রক্ষীদলের পোশাক পরিচ্ছদ ও সৈন্যদলের আচার-আচরণ কী দারুণ প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। কারণ তারাই সেখানে বিজয়ী। এমনকি কোন জাতি যখন অন্য জাতির প্রতিবেশী হয়ে বাস করে এবং তাদের উপর শেষোক্তদের প্রাধান্য বিস্তারের কোন কারণ থাকে, তখন দেখা যায় তাদের মধ্যে অনুকরণ ও অনুসরণের একটা বিরাট অংশ সংক্রমিত হয়েছে। যেমন বর্তমানকালে আন্দালূসবাসীদের মধ্যে আপনি এটা দেখতে পাবেন। তারা তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, এমনকি অধিকাংশ অভ্যাস ও অবস্থায় প্রতিবেশী জেল্লাকীদের অনুকরণ করে থাকে। এ অনুকরণ বিস্তৃত হয়ে তাদের প্রাচীরগাত্রে, শিল্পকর্মে ও গৃহাদির চিত্রাংকনে পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করেছে। যে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি যদি এটা বিশ্লেষণ করে দেখেন, তা হলে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হবেন যে, এটা প্রাধান্য

বিস্তার ব্যতীত অন্য কিছু নয়। সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্‌র হাতে।[৩৭] এখানে আপনি সেই প্রবচনটির কথা চিন্তা করতে পারেন, সেখানে বলা হয়েছে সাধারণ মানুষ শাসকের ধর্মই অনুসরণ করে। এটাও সেই পর্যায়েই পড়ে। কারণ শাসক তার অধীনস্থদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী। প্রজাসাধারণ সর্বদাই তার পূর্ণতর গুণাবলির বিশ্বাসে, পুত্র যেমন পিতাকে, শিক্ষার্থী যেমন শিক্ষককে অনুসরণ করে, তেমনিভাবে অনুসরণ করে থাকে। আল্লাহ্ যথার্থই সর্বজ্ঞ ও বিচক্ষণ। তিনিই পবিত্র ও উন্নত এবং তিনিই সহায়ক।

৩৭. কোরান ১৩, ৩১; ৩০, ৪; ৮২, ৯১।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

[কোন জাতি পরাজিত হয়ে অন্যের অধীনস্থ হলে তার বিলুপ্তি দ্রুততর হয়]

এর কারণ এ যে, আল্লাহই ভাল জানেন যখন তাদের উপর অন্যরা আধিপত্য বিস্তার করে, তারা অন্যদের দাসত্ব স্বীকার করে ক্রীড়নকে পরিণত এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তখন তাদের মধ্যে এক প্রকার শৈথিল্য দেখা দেয়, যাতে তাদের বাসনা-কামনার হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে এবং বংশবিস্তারের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখা দেয়। জীবনের বিকাশ একান্তভাবে বাসনার উপর নির্ভরশীল এবং এ কামনা-বাসনা থেকে জীবনী শক্তিগুলোর সজীবতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। সুতরাং সেই কামনাই যদি শৈথিল্যের ফলে হ্রস্ব হয়ে যায়, তা হলে তজ্জনিত অন্যান্য অবস্থাও সেই অনুপাতে হ্রাস পেয়ে থাকে। অপরের প্রাধান্য বিস্তারের ফলে তাদের গোত্রপ্রীতি পূর্বেই লুপ্ত হয়েছে; এখন তাদের জীবন বিকাশের আকাঙ্ক্ষা কমতে থাকে, তাদের জীবিকা অর্জন ও অন্যবিধ প্রচেষ্টা বিলুপ্ত হতে আরম্ভ হয়। তারা প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে বসে। কারণ অপরের প্রাধান্য তাদের শৌর্যশক্তি বিনষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং তারা এখন প্রতিটি প্রভাবেরই অনুগত এবং প্রতিটি আগ্রাসনেরই শিকারে পরিণত হয়। তাদের উপর রাজ্যশক্তি পরিপূর্ণরূপে বিস্তৃত হোক বা না হোক, এটাই তাদের ভাগ্য হয়ে দাঁড়ায়।

এক্ষেত্রে, আল্লাহই ভাল জানেন, আরও একটি রহস্য বিদ্যমান। তা এ যে, মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের যে গুণ বর্তমান, তাতে সে নিজেই একজন নেতা। সুতরাং এ নেতা যখন অপরের অধীনস্থ হয়ে পড়ে ও তার আত্মনির্ভরের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়, তখন একান্তই নিরাশ হয়ে পড়ে এমন কি ক্ষুধা-তৃষ্ণাও তার নিকট বাহুল্য মনে হয়। মানুষের এটাই স্বভাব। অনেক সময় এরই দৃষ্টান্ত দেখা যায় হিংস্র প্রাণীদের মধ্যে। তারা মানুষের হাতে বন্দী অবস্থায় যৌন মিলনের কথাও বিস্মৃত হয়ে যায়। অন্যের অধীনস্থ গোত্রগুলোরও প্রায় একই অবস্থা, তারাও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে এক সময়ে বিলুপ্ত হয়। স্থায়িত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই।

এ বিষয়টি পারসিকদের অবস্থা দিয়ে, পাঠক, বিচার করতে পারেন। এক সময়ে তারা সংখ্যাধিক্যের জোরে সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত স্থিত। আরবদের অধীনস্থ হওয়ায় যখন তাদের আত্মরক্ষার শক্তি বিলুপ্তি হল, তখনও তাদের সংখ্যা ছিল প্রচুর অপেক্ষাও প্রচুর। কথিত হয়, সাদ[৩৮] মাদায়েনের অপর দিকে তাদের সংখ্যা গণনা করেছিলেন।

---

৩৮. সাদ ইবনে আবু ওক্কাস।

তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার এবং তন্মধ্যে সাঁইত্রিশ হাজার ছিল পরিবারের কর্তা। অতঃপর তাদের উপর আরব আধিপত্য যখন দৃঢ় হল এবং নানাভাবে তার প্রতাপ বৃদ্ধি পেল, তখন তাদের সংখ্যা হ্রাস পেল এবং বিলুপ্ত হয়ে এমন অবস্থায় দাঁড়াল যে, যেন কোন কালে তাদের অস্তিত্ব ছিল না। কোনক্রমেই এ কথা ভাববার কারণ নেই যে তাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছিল কিংবা তারা কোন আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়েছিল। কারণ, পাঠক, ইসলামী শাসনের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে আপনি অবশ্যই অবগত আছেন। বরং এটা মানুষের সেই চিরন্তন চরিত্র—সে যখন অপরের অধীন হয় আত্মমর্যাদা হারিয়ে অপরের ক্রীড়নকে পরিণত হয় তখন হ্রাস পেয়ে থাকে। এ কারণেই তাদের মনুষ্যত্বের ত্রুটির জন্য সুদানীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাসত্ব স্বীকার করে নেয়। কারণ তারা এদিক থেকে ভাষাহীন পশুদের নিকটবর্তী, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। অথবা এমনও হয় যে অনেকে এ দাসত্ব স্বীকার করে কোন প্রকার মর্যাদা, সম্পদ অথবা শক্তি লাভের কামনা করে। যেমন পূর্বাঞ্চলে তুর্কিরা এবং আন্দালুসে জেল্লাজী পৌত্তলিক ও ফিরিঙ্গীরা। এ প্রকার লোকেরা নিজেদেরকে সাম্রাজ্যের অংশ বলে মনে করে। এ কারণেই তারা দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করে না। কারণ তাদের ধারণা অনুগত থাকলে সাম্রাজ্য তাদেরকে উচ্চপদ ও মর্যাদা দান করবে। আল্লাহ্ মহান, পবিত্র ও সর্বজ্ঞ এবং তিনিই সহায়।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

[আরব-বেদুইনরা কেবল প্রান্তরীয় অঞ্চলগুলোতেই প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে]

তা এ যে, তাদের বন্য প্রকৃতির দরুন, তারা কেবল লুটপাট ও ধ্বংস করতেই সক্ষম। তারা কোন প্রকার আধিপত্য বিস্তার বা বিপদের ঝুঁকি নিবার চেষ্টা না করে সুযোগ মতো যথেষ্ট লুটপাট করে নিয়ে যায়। তারা যা পায় তা নিয়ে নিজেদের প্রান্তরীয় বিচরণ ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে। একান্ত বাধ্য না হলে তারা সংঘর্ষ বা যুদ্ধের সম্মুখীন হয় না। তারা প্রতিটি দুরূহ ও বিপজ্জনক পরিস্থিতিকে এড়িয়ে সহজের অনুসন্ধান করতেই অভ্যস্ত। তেমন অসুবিধাজনক কিছু দেখলে তারা ফিরেও তাকায় না। যে সকল জাতি পর্বতবেষ্টিত অবস্থায় বিদ্যমান, তারা আরব-বেদুইনদের ধ্বংস ও লুটপাট থেকে সুরক্ষিত কারণ তারা পার্বত্য এলাকায় কোন প্রকার অভিযান পরিচালনা করে না। কারণ সেখানে আক্রমণ করলে যে পরিমাণ বিপদের ঝুঁকি ও কষ্ট স্বীকার করা প্রয়োজন, তাতে তারা অভ্যস্ত নয়। অবশ্য প্রান্তরীয় সমতল অঞ্চল, যেখানে রক্ষীদলের কোন ঝামেলা নেই কিংবা কোন সাম্রাজ্য যার অন্তিম দশা উপস্থিত হয়েছে, ঐগুলোই তাদের সহজ শিকার ও লুটতরাজের বস্তুতে পরিণত হয়। এগুলোর উপরই তারা বারংবার আক্রমণ করে, লুট করে ও ধ্বংস করে। কারণ এগুলোই তাদের পক্ষে সহজসাধ্য। এভাবে উপর্যুপরি আক্রমণের মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলসমূহের অধিবাসীরা তাদের বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত তারা তৎপর থাকে। অতঃপর উক্ত জনগোষ্ঠীকে তাদের নেতৃত্বের মতানৈক্যে ও শাসন-ব্যবস্থার অসমভাবাপন্নতায় ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ক্রমান্বয়ে উক্ত জনগোষ্ঠী বিলুপ্ত হতে থাকে। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির উপর ক্ষমতাবান। তিনি একক ও পরাক্রান্ত তিনি ব্যতীত আর কোন প্রভু নেই।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

[আরব-বেদুইনরা যে জনপদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তার বিনষ্টি দ্রুততর হয়]

এর কারণ এ যে, এরা জাতি হিসাবে বন্য প্রকৃতির। বন্যতার অভ্যাস ও তার উপকরণগুলো এদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত থাকায় এগুলো তাদের চরিত্র ও প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে। এ জন্য এদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু হল যে কোন প্রকার আদেশের বা নিষেধের অধীনতা অস্বীকার করা এবং শাসন ব্যবস্থার আনুগত্য থেকে বিরত থাকা। এ প্রকার চরিত্র সভ্যতার বিরোধী এবং তার উন্নতির পরিপন্থী। তাদের সমুদয় অবস্থার চরম পর্যায় হল বিচরণ ও প্রাধান্য বিস্তার। বস্তুত এ অবস্থা স্থিরতা তথা সভ্যতার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অবস্থানের জন্য ক্ষতিকারক ও বিরোধী। যেমন ধরা যাক পাথর, তা তাদের ডেকচি বসাবার ইঁটের জন্য প্রয়োজন; সুতরাং গৃহের গাঁথুনি থেকে খসাইয়া হলেও তা তারা ঐ কাজে ব্যবহার করবে। যেমন কাঠ, তা তাদের তাঁবু টানাবার ও ঘরের খুঁটি বানাবার জন্য দরকার; সুতরাং ছাদ নষ্ট করেও তারা এটা সংগ্রহ করবে। এজন্য তাদের এ প্রকার চরিত্র স্থাপত্যের সম্পূর্ণ বিরোধী, অথচ এটা ছাড়া সভ্যতার বিকাশ সম্ভব নয়। এমনিই তাদের সাধারণ অবস্থা।

তদুপরি, তাদের চরিত্র হল মানুষের নিকট যা কিছু আছে, ছিনিয়ে নেয়া। কারণ তাদের জীবিকা বর্শার ছায়ায় লুক্কায়িত। মানুষের সম্পদ লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে তাদের নিকট পরিচিত এমন কোন সীমারেখা নেই, যেখানে তারা থামতে পারে। বরং যখনই তাদের চোখে কোন সম্পদ, আসবাবপত্র ও দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তু ভাল লাগে, তারা ছিনিয়ে নেয়। সুতরাং যখন তাদের প্রাধান্য বিস্তারের ফলে কোন রাজ্যের শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে আসে, তখন জনগণের সম্পদ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার ব্যাপারে তা একেবারেই ভেঙে পড়ে এবং সভ্যতার বিনাশ সাধিত হয়।

এ ছাড়াও তারা শিল্পী ও কর্মীদের কাজের ক্ষতি করে থাকে। তারা এদের দ্বারা কাজ করায়, কিন্তু কোন প্রকার পারিশ্রমিক বা মূল্য দিবার চেষ্টাও করে না। পরিশ্রম, যেমন আমরা অচিরেই বর্ণনা করব, জীবিকার ভিত্তি ও তার সত্তা। যখন এ পরিশ্রম মূল্যহীন ও অনর্থক হয়ে দাঁড়ায়, তখন মানুষ পরিশ্রম করবার এবং তদ্বারা জীবিকা অর্জনের আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। কাজের হাত শিথিল হয়ে আসে। হাতের পিছনের ব্যক্তিটি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এর মধ্য দিয়ে সভ্যতার বিনাশ সাধিত হয়।

এ ছাড়াও এ বেদুইনরা আদেশ-নিষেধের কোন পরোয়া করে না মানুষকে ধমক দিয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত করা বা একের অত্যাচার থেকে অপরকে রক্ষা করার ধারে

কাছেও তারা যায় না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল লুট করে বা করধার্য করে সম্পদ সংগ্রহ করা। সুতরাং তারা এর সুযোগ পেলে এবং তদ্বারা সম্পদ লাভ হলে অন্যদিকে ফিরেও দেখে না। কিসে মানুষের সচ্ছলতা আসবে, কিসে তাদের উপকার হবে এবং একে অপরকে অত্যাচার করা থেকেই বা কী করে বিরত করা যাবে, তৎসম্পর্কে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। অনেক সময় তারা মানুষকে শাস্তি দিয়ে থাকে; কিন্তু এর উদ্দেশ্যও একটিই, তাদের নিকট থেকে অন্যায় সুবিধা লাভ ও তাদের ধনভাণ্ডারে হস্তক্ষেপ করা। এ ব্যাপারে তারা বাড়াবাড়িও করে থাকে, যেমন তাদের স্বভাব। কিন্তু এ শাস্তিবিধান দুষ্কর্ম দূরীকরণে বা দুস্কৃতিকারীর লোভ দমনে কোন সাহায্যই করে না। বরং এটা তাদের দুষ্কর্মকে আরও বাড়িয়ে দেয়। কারণ তারা অত্যধিক করের বোঝা লাঘব করার জন্য দুষ্কর্ম করে বেড়ায়। সুতরাং তাদের শাসন ব্যবস্থায় প্রজারা অরাজকতার শিকারে পরিণত হয়। এ অরাজক অবস্থা মনুষ্যত্বের জন্য ক্ষতিকর এবং সভ্যতার সর্বনাশকারী। যেহেতু আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, রাজ্য ব্যবস্থার উদ্ভব মানুষের বিশেষ স্বভাবের ফলেই হয়েছে, সুতরাং তাদের অস্তিত্ব, তাদের সমাজ তার স্থায়িত্ব ব্যতীত সম্ভব নয়। আমরা প্রাথমিক পরিচ্ছেদগুলোতে এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছি।

এতদ্ব্যতীত আরও একটি কারণ এ যে, আরব-বেদুইনরা নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় উন্মাদ। তারা খুব কমই একে অপরের নির্দেশ মেনে থাকে। সে নির্দেশকারী তার পিতা, ভাই বা পরিবারের বয়োবৃদ্ধ যে কেউই হোক না কেন। যদি কখনও মেনেও নেয়, তাও একান্ত অনিচ্ছায় ও চক্ষুলজ্জায় এবং এ প্রকার ঘটনা খুবই বিরল। সুতরাং তাদের মধ্যে শাসক ও নেতৃবৃন্দের ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটে এবং প্রজাদের উপর নির্দেশ প্রদান ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠনের কাজটিও বিভিন্ন হাতের দ্বারা সাধিত হতে থাকে। সুতরাং সভ্যতার বিকৃতি দেখা দেয় ও হ্রাস পায়।

সম্রাট আব্দুল মালেকের দরবারে এক আরব-বেদুইন প্রতিনিধি উপস্থিত হলে সম্রাট তাকে হাজ্জাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন বেদুইন হয়ত হাজ্জাজের সভ্যতা ও শাসনের কথা উল্লেখ করে প্রশংসা করবে। কিন্তু উত্তরে সে বলল, "মানুষের উপর অত্যাচার করবার জন্য আমি তাকে একাই রেখে এসেছি।"

পাঠক, আপনি নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, তারা যে সকল স্থান দখল ও যে সকল জনপদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, কীভাবে তার সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং জনপদ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তা যেন ভিন্ন এক পৃথিবী। ইয়ামেন, তাদের বসতিস্থল, কিছু সংখ্যক পল্লী ছাড়া সমুদয়ই বিনষ্ট হয়েছে। ইরাকে আরবের একই অবস্থা, সেখানে পারসিকদের যে সভ্যতা ছিল, তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমান সময়ে সিরিয়ার অবস্থাও তথৈবচ। আফ্রিকিয়া ও মাগরিবেও বনি হেলাল ও বনি সুলাইম পঞ্চম শতাব্দী(একাদশ)র প্রথম দিকে এসে প্রবেশ করেছে এবং তদবধি সাড়ে তিনশ বছর ধরে তারা এ অঞ্চলে জীবন যাপন করছে। ইতিমধ্যে তার সমতল অঞ্চলগুলোর প্রায় সমুদয় অংশই উজাড় হয়ে গেছে। অথচ একসময়ে সুদান ও রোম সাগরের মধ্যবর্তী এ বিরাট এলাকার সমুদয় অংশই জনবসতিপূর্ণ ছিল। এ সম্পর্কে তথাকার নিদর্শনাবলি, স্থাপত্যের চিহ্নাদি, গ্রাম ও বস্তির রেখাসমূহ প্রচুর প্রমাণ উপস্থিত করে থাকে। 'আল্লাহ্ এ পৃথিবী ও তদুপরি সমুদয় মানব গোষ্ঠীর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তিনিই সর্বোত্তম'।[৩৯]

---

৩৯. কোরান ২১, ৮৯।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

[সাধারণভাবে আরব-বেদুইনরা কোন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য যেমন নবী বা পুণ্যাত্মার স্মৃতি অথবা মহান ধর্মীয় ঐতিহ্যের মাধ্যম ব্যতীত রাজ্য লাভে সক্ষম হয় না]

এর কারণ এ যে, তাদের মধ্যে যে বন্য প্রকৃতি বিদ্যমান, তা আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে রয়েছে। স্থূলবুদ্ধি, হিংসা, অনুদারতা, নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা প্রভৃতির জন্য তারা একে অন্যের আনুগত্য স্বীকার করতে পারে না এবং তাদের বাসনা-কামনা খুব কমই ঐক্যবদ্ধ হয়। সুতরাং তাদের মধ্যে যদি কোন নবী বা ওলীর মাধ্যমে ধর্মীয় বোধ জাগ্রত হয়, তা হলে একটা সংযমের মনোভাব তাদের নিজেদের মধ্যেই জন্ম নেয় এবং অহংকার ও প্রতিযোগিতা দূর হয়ে তাদের আনুগত্য ও একত্রীভবন সহজ হয়ে উঠে। কারণ ধর্ম তার আদর্শের দ্বারা তাদের মধ্য থেকে স্থূলতা ও হিংসা দূর করে এবং তাদের প্রতিহিংসা ও প্রতিযোগিতার মধ্যে সংযমের ভাব আনতে সক্ষম হয়। সুতরাং তাদের মধ্যে যদি কোন নবী বা ওলী থাকেন, তা হলে তিনি তাদেরকে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করবার জন্য উৎসাহিত করতে পারেন। এর ফলে তাদের মধ্যকার দূষণীয় চরিত্র দূর হয়ে সৎ চরিত্র দেখা দেয় এবং তারা সত্যকে প্রতিষ্ঠা দানের জন্য তৎপর হয়ে উঠে। এভাবে তাদের ঐক্য পূর্ণতা লাভ করে এবং রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য বিস্তার তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে থাকে।

এতদ্‌সত্ত্বেও সত্য ও সৎপথ গ্রহণে তারা সর্বাপেক্ষা দ্রুত সাড়া দিতে সক্ষম। কেননা সাধারণত তাদের স্বভাবে বক্রতার পরিমাণ কম এবং অসততা থেকে তারা প্রায় মুক্ত। শুধু বন্যতাই যা কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করে থাকে। তবে একে বাগে আনা যায় এবং কল্যাণের পথে পরিচালনার জন্য প্রস্তুত করা সম্ভব। কারণ এদের এ বন্যতা প্রাথমিক স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত এবং জীবাত্মার উপরে যে সকল দুষ্ট অভ্যাস ও মন্দ প্রবৃত্তি শিকড় গেড়ে বসে, তা থেকে মুক্ত। কেননা 'প্রত্যেক সন্তানই তার স্বভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে'—যেমন হাদিসে এসেছে এবং পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।[৪০]

---

৪০. চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্র:।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

[আরব-বেদুইনরা রাজ্য শাসনের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক অনুপযুক্ত]

এর কারণ এ যে, এরা সকল জাতি অপেক্ষা অধিক প্রান্তরপ্রিয় এবং মরুভূমির অধিকতর দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিচরণকারী। তাদের জীবন-যাপনে কৃচ্ছ্রতা ও স্থূলতার আধিক্য থাকায় পাহাড়ী এলাকা ও তার শস্যাদি সম্পর্কে উদাসীন। এজন্য তারা অন্যলোকের মুখাপেক্ষী নয় এবং এরূপ স্বাবলম্বন তাদের প্রিয় হওয়ায় ও বন্যতার আধিক্য থাকায় তারা একে অপরের আনুগত্য স্বীকার করতে পারে না। সুতরাং তাদের সর্দার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ শক্তির উৎস গোত্রপ্রীতির জন্য তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। একই কারণে তাদেরকে কঠোর শাসনে রাখতে অপারগ হয় এবং সর্বদা তাদের বিরোধিতাকে সতর্কভাবে এড়িয়ে চলে। কারণ অনুরূপ কোন পরিস্থিতি দেখা দিলে গোত্রপ্রীতি নষ্ট হয়ে যাবে এবং সর্দার ও গোত্র উভয়েই ধ্বংস হবে। অথচ কোন রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ও প্রতাপ সর্বদাই এটা কামনা করে যে, তার শাসক কঠোরতার সাথে শৃঙ্খলা বিধান করবে। অন্যথায় উক্ত শাসন ব্যবস্থা কখনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

এটা ছাড়াও তাদের চরিত্রের মধ্যে মানুষের সম্পদ ছিনিয়ে নিবার প্রবৃত্তি বিদ্যমান, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি এবং এটা ব্যতীত তাদের মধ্যে অন্য কোন প্রকার বিধি-নিষেধ প্রবর্তন ও একে অপরের উপর অত্যাচার-নিবর্তন থেকে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। সুতরাং তারা যখন কোন জাতির শাসনভার লাভ করে, তখন তাদের একমাত্র কর্তব্য হয় তাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া এবং তাদেরকে কোন প্রকার বিধি-নিষেধের অধীন না করে অরাজক অবস্থায় ছেড়ে দেয়া। অনেক সময় তারা রাজকোষের অর্থ সংগ্রহ ও অন্যবিধ সুবিধা লাভের জন্য তাদেরকে অন্যায়ভাবে শাস্তিদান করে। কিন্তু এ শাস্তিদান কোন প্রকার শৃঙ্খলার সৃষ্টি ত করেই না, উপরন্তু এতে মানুষের দুষ্কর্মের মনোভাবকে আরও জাগিয়ে দেয়া হয় এবং তারা এ প্রকার শাস্তির অপমান থেকে আত্মরক্ষার জন্য আরও বহুবিধ দুষ্কর্মে জড়িয়ে পড়ে। এভাবে দুষ্কৃতি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরিণামে সভ্যতার সর্বনাশ ঘটে। বস্তুত তাদের শাসন-ব্যবস্থা মানুষকে একে অপরের উপর উৎপীড়নরত এক অরাজক অবস্থায় নিক্ষেপ করে। এতে সভ্যতার কখনও কোন উন্নতি হয় না। কারণ অরাজক অবস্থা অতিদ্রুত সর্বনাশ ডেকে আনে, যেমন আমরা পূর্বে এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছি।

এ সকল কারণেই আরব-বেদুইনদের স্বভাবের মধ্যে রাজ্যশাসন ব্যবস্থার যোগ্যতার অভাব। তারা একমাত্র এ স্বভাবের পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমেই তাতে প্রবেশ

করতে পারে। এ পরিবর্তনের জন্য যে কোন একটি ধর্মমতের প্রয়োজন, যাতে তার সাহায্যে তাদের নিজেদের মধ্যেই শৃঙ্খলাবোধের জন্ম সম্ভব হয় এবং মানুষের মধ্যে একে অপরকে উৎপীড়ন করা থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে তারা উৎসাহী হয়ে উঠে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। পাঠক, আপনি এ বক্তব্যকে তাদের ধর্মাশ্রিত সাম্রাজ্যের সাথে মিলিয়ে দেখুন। যখন ধর্ম তাদেরকে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণধর্মী শাসন-ব্যবস্থা প্রদান করল, তখনই এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। একের পর এক খলিফা আবির্ভূত হলেন এবং সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করল ও শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। রুস্তম মুসলমানদেরকে নামাজের জন্য সমবেত হতে দেখে বলে উঠেছিল, হায়, উমর আমার কলিজা ছিঁড়ে ফেলেছে, সে এ কুকুরগুলোকেও সদাচার শিক্ষা দিয়েছে।[৪১]

অতঃপর তাদের মধ্যে বহু পুরুষ যাবত সাম্রাজ্য শক্তি বিলুপ্ত হয়েছে। তারা ধর্মকে ত্যাগ করে শাসনক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে এবং পুনরায় তাদের শূন্য প্রান্তরে ফিরে এসেছে। তারা গোত্রপ্রীতির মহিমা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে এবং আনুগত্যহীন ও করহীন তাদের অবস্থা কোন প্রকার রাজ্যশাসনের কথা আর স্মরণ করায় না। তারা তাদের সেই পূর্বের বন্য প্রকৃতির অধীন হয়ে পড়েছে এবং তাদের মধ্যে রাজ্যশাসন ক্ষমতার কোন চিহ্নই নেই; কেবল এ একটি পরিচয়ই আছে যে, তারা এককালীন খলিফাদের বংশধর ও গোত্রের লোক। কারণ সেই খেলাফতের কোন চিহ্নই তাদের মধ্যে নেই এবং সেই ক্ষমতার কোন অংশই তারা ধরে রাখতে পারেনি। ফলে তাদের সকল কিছুর উপর অনারব জনগোষ্ঠী প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তারা সকল কিছু থেকে বিচ্যুত হয়ে তাদের সেই শূন্য প্রান্তরে বসবাস করছে। তারা আর রাজ্য বা শাসন ব্যবস্থার কোন ধার ধারে না, বরং তাদের অধিকাংশের এ জ্ঞানও নেই যে, এক সময়ে তারা রাজ্যক্ষতার অধিকারী ছিল। তারা জানে না যে, প্রাচীনকালে তাদের পূর্বপুরুষদের তুল্য রাজ্য আর কোন জাতির ছিল না। আদ, সামুদ, আমালেকা, হিমিয়ার, তুব্বা রাজন্যবর্গের সাম্রাজ্য বিস্তার এর সাক্ষ্য বহন করছে। অতঃপর ইসলামের আবির্ভাবের পর মুজারের ক্ষমতা বিস্তার এবং বনি উমাইয়া ও বনি আব্বাসের শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু তাদের সেই শাসন ক্ষমতার স্মৃতি বর্তমানে সুদূর অতীতের ব্যাপার এবং ইতিমধ্যে তারা ধর্মকে ভুলে পুনরায় তাদের সেই শূন্য প্রান্তরে ফিরে আসছে। এতদসত্ত্বেও কখনও কখনও তারা দুর্বল রাজ্যগুলোর উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়, যেমন বর্তমানে মাগরিবে ঘটছে। কিন্তু এ প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্য ও পরিণতি একটিই, সেই সম্পদ ছিনিয়ে অরাজকতার সৃষ্টি করে ধ্বংস সাধন করা, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর রাজ্য দান করেন।[৪২]

---

৪১. রুস্তম, পারস্য সেনাপতি এবং উমর, হজরত উমর (রাঃ)। ঘটনাটি কাদেসিয়ার যুদ্ধের।
৪২. কোরান ২, ২৪৭।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[প্রান্তরবাসী গোত্র ও সম্প্রদায়গুলোর জীবন পল্লীবাসীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে]

আমরা পূর্বে বলেছি যে, প্রান্তরীয় জীবনধারা নগর ও পল্লী অপেক্ষা সর্বদাই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে। নগর ও পল্লীতে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যে সকল বিষয় বিদ্যমান, তার প্রায় কোনটিই প্রান্তরে পাওয়া যায় না। একমাত্র তাদের মধ্যে কৃষিব্যবস্থাই দেখা যায়; কিন্তু তারও উপকরণের অভাব। বিশেষ করে তৎসম্পর্কিত শিল্পকর্ম তাদের নিকট নেই বললেই চলে। যেমন সূত্রধর, দরজী, লোহার প্রভৃতি শ্রেণীর লোক, যাদের পরিশ্রমের দ্বারা সাধারণ জীবনের ও কৃষিকর্মের বহু প্রয়োজনীয় অভাব দূর হয়ে থাকে। এমনিভাবে দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহামও (রৌপ্যমুদ্রা) তাদের নিকট নেই। তাদের নিকট এ সকল মুদ্রার বিনিময়ে লভ্য শস্য, পশু এবং তা থেকে উৎপন্ন দুধ, পশম, লোম, চামড়া ইত্যাদিই কেবলমাত্র বিদ্যমান। পল্লীবাসীরা দিনার ও দিরহামের বিনিময়ে ঐগুলো তাদের নিকট থেকে সংগ্রহ করে থাকে। অবশ্য প্রান্তরবাসীরা একান্ত প্রয়োজনের তাগিদে পল্লীবাসীদের নিকট আসতে বাধ্য হয়; কিন্তু সেই তুলনায় পল্লীবাসীদের তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষার প্রয়োজন একান্তই সাচ্ছন্দ্য ও পরিপূর্ণতা বিধায়ক। এ জন্যই বলা যায়, তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বাভাবিক তাগিদেই পল্লীবাসীদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে বাধ্য।

এভাবে তারা যতদিন প্রান্তরে বাস করে, পল্লীবাসীদের উপর তাদের রাজ্যক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের কোন সুযোগই ঘটে না। বরং তারাই নিজেদের প্রয়োজনে পল্লীবাসীদের নিকট গমন করে, তাদের কাজকর্ম করে দেয় এবং প্রয়োজনের সময় তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। যদি পল্লীতে কোন শাসক থাকে, তা হলে তাদের আনুগত্য ও মান্যতা সেই শাসককে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকে। যদি সেখানে শাসক না থাকে, তবে এমন কোন নেতৃত্ব বা প্রতাপ নিশ্চয়ই আছে, যা না থাকলে জীবনধারণই অসম্ভব হয়ে উঠে। এমতাবস্থায় সেই সর্দারই তাদেরকে তাঁর প্রয়োজনে ও প্রচেষ্টায় ব্যবহার করে থাকে। কখনও অর্থের বিনিময়ে এবং এর ফলে তারা অর্থের বিনিময়ে পল্লী থেকে জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করে সচ্ছলতা আনতে পারে। আবার কখনও বাধ্য করে যদি এটা সেই সর্দারের পক্ষে সম্ভব হয়। এজন্য প্রয়োজন হলে সে প্রান্তরবাসীদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে। এর ফলে একটি পক্ষের সহায়তায় অন্য পক্ষটিকে আয়ত্তে রাখতে সুবিধা হয় এবং পরিণামে জীবনের সাচ্ছন্দ্যের জন্য তারা সকলেই সর্দারের বাধ্য হয়ে

উঠে। কারণ খুব কমই প্রান্তরবাসীরা বিশেষ অঞ্চল ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। কেননা যে দিকেই যেতে চাক না কেন, সেখানে পূর্ব থেকেই অন্য প্রান্তরবাসীরা বিদ্যমান, তারা উক্ত স্থান দখল করে অন্যদের অনুপ্রবেশের পথে বাধার সৃষ্টি করে রেখেছে। সুতরাং এদের পক্ষে অন্যত্র আশ্রয়লাভ সম্ভব নয় বলে পরিণামে পল্লীবাসীদের বশ্যতা স্বকারে ফিরে আসে। অতএব প্রান্তরবাসীরা একান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই পল্লীবাসীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। 'আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর পরাক্রান্ত'[৪৩] এবং তিনি এক, একক ও মহা পরাক্রমশালী।

৪৩. কোরান ৬, ১৮; ৬১।

তৃতীয় অধ্যায়

সাধারণ সাম্রাজ্য, রাষ্ট্রশক্তি, খেলাফত ও শাসনব্যবস্থা
সম্পর্কীয় বিভিন্ন পদমর্যাদা এবং
তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিচিত্র অবস্থা এখানে নীতিমালা ও
পরিপূরক গুণাবলি সম্পর্কীয় আলোচনা বিদ্যমান

প্রথম পরিচ্ছেদ

[সাধারণ সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রশক্তি একমাত্র গোত্রশক্তি ও গোত্রপ্রীতির সাহায্যেই লাভ হয়ে থাকে]

কারণ আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে[১] বর্ণনা করেছি যে, প্রাধান্যবিস্তার ও প্রতিরোধ ক্ষমতা একমাত্র গোত্রপ্রীতির সাহায্যেই লাভ হয়ে থাকে। কারণ তার মধ্যেই আকর্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও একের জন্য অন্যের মৃত্যুবরণের মতো মনোভাব বিদ্যমান। অতঃপর রাজ্যশক্তি এমন একটি উন্নত ও আকর্ষণীয় পদমর্যাদা, যাতে পার্থিব কল্যাণ, দৈহিক ভোগেচ্ছা ও আত্মিক সম্ভোগ বাসনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ জন্যই এতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা দেখা দেয় এবং পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে কেউ কারও প্রাধান্য মেনে নিতে চায় না। এর ফলে কলহের সূত্রপাত হয় এবং তা ক্রমশ যুদ্ধবিগ্রহে পরিণত হয়ে প্রাধান্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত করে। এ সমস্ত ব্যাপারের কোনটিই গোত্রপ্রীতি ব্যতীত সম্ভব নয়, যেমন আমরা পূর্বেই বলেছি।

অথচ সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারটি কিছুতেই বুঝতে চায় না এবং বুঝলেও ভুলে যায়। কারণ তারা সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রাথমিক অবস্থার কথা ভুলে বসে। তাদের নগর জীবনের কাল দীর্ঘ হওয়ার ফলে এবং পুরুষাণুক্রমে এখানে বসবাস করবার জন্য তারা জানতে পারে না যে, সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে আল্লাহ্‌র সাহায্যে কি ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল। তারা জানে যে, তারাই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর; তাদের বিশিষ্টতা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাদের প্রতি আনুগত্য সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এ জন্যই তাদের ক্ষমতা প্রকাশের জন্য আর গোত্রপ্রীতির প্রয়োজন নেই। সুতরাং সাম্রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাকালে কি অবস্থা ছিল এবং প্রাথমিক প্রতিষ্ঠাকারী এজন্য কি বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন—এর কিছুই তাঁরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না।

বিশেষভাবে আন্দালুসবাসীদের অবস্থা এ উপলক্ষে স্মরণীয়। তারা দীর্ঘদিন ধরে এ গোত্রপ্রীতির কথা ও তার নিদর্শনাদি ভুলে গেছে। কারণ তারা নিজ জন্মভূমি ও গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে গোত্রপ্রীতিতে তাদের আর কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ সকল কিছুর উপরই শক্তিধর এবং তিনি সকল বিষয় সম্পর্কেই উত্তম জ্ঞাতা। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম সহায়ক।

---

১. প্রথম পরিচ্ছেদ বলতে সম্ভবত পূর্বের পরিচ্ছেদসমূহ বুঝিয়েছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[যখন কোন সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিন্যস্ত হয়, তখন গোত্রপ্রীতির প্রয়োজনীয়তা ফুরায়]

এর কারণ এ যে, সাধারণ সাম্রাজ্যগুলো প্রতিষ্ঠার সময় এর অভিনবত্বের জন্যই মানুষের পক্ষে তাকে মেনে নেয়া বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং তার জন্য যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। কারণ মানুষ তার শাসনের সাথে পরিচিত নয় এবং তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেনি। অতঃপর যখন প্রতিষ্ঠাতা বংশের একটি বিশেষ অংশে সাম্রাজ্যের আধিপত্যগত নেতৃত্ব নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং একের পর এক অনেকেই তার উত্তরাধিকার লাভ করে পর্যায়ক্রমিক সাম্রাজ্যের একটি দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলে, তখন প্রাথমিক অবস্থার কথা আর মানুষের স্মরণ থাকে না। তখন ঐ অংশের জন্য নেতৃত্বের বিশিষ্টতা সুদৃঢ় হয়ে গেছে এবং মানুষের হৃদয়ে তাদের আনুগত্য ও মান্যতার ব্যাপারটি অঙ্কিত হয়ে গেছে। তারা এ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরদের জন্য বহু অভিযানে অংশগ্রহণ করেছে এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের দৃঢ় আস্থা নিয়ে তাদের পক্ষে যুদ্ধ করেছে। এমতাবস্থায় তাদের আর খুব বেশি নিজেদের গোত্রগত ঐক্যের উপর নির্ভর করতে হয় না। বরং মনে হয় তাদের প্রতি আনুগত্য যেন আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত, যার কোন পরিবর্তন নেই, বিরুদ্ধাচরণ নেই। এ ব্যাপারে আমরা, আমাদের আলোচনার শেষের দিকে ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তর্গত 'ইমামত' সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছি। এ বিশ্বাসকেও ঐ পর্যায়ে ফেলা যায়। এরূপ অবস্থায় সাম্রাজ্যের অধীশ্বরগণ অন্যদের দ্বারাই তাদের বিশিষ্ট ক্ষমতা ও শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকেন। এ জন্যই তারা তাদের আশ্রিত ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, যারা গোত্রপ্রীতি ও অন্যান্য সম্প্রীতির আয়ত্তে লালিত হয়েছে কিংবা তাদের গোত্র বা বংশের বাইরে থেকে এসে তাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছে, তাদেরকে ব্যবহার করে থাকেন।

বনি আব্বাসের ব্যাপারে অনুরূপ ঘটনাই দেখা গেছে। তাদের গোত্রপ্রীতি আলমুতাসিম ও তৎপুত্র ওয়াসিকের সময় বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তৎকালে তাদের ক্ষমতা বহিঃপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম ছিল অনারব আশ্রিত ব্যক্তিরা। এরা তুর্কি, দায়লম, সলজুক প্রভৃতি জাতির অন্তর্গত। অতঃপর এ অনারব প্রাদেশিক শাসকরাই বিভিন্ন দিকে প্রাধান্য বিস্তার করে সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়া থেকে মুক্তি লাভ করেছিল। তখন তারা আর বাগদাদের কর্মচারী বলে অভিহিত হত না। এমনকি এক সময়ে দায়লমগণ বাগদাদেও প্রাধান্য বিস্তার করে তা দখল করে ফেলেছিল এবং মানুষ তাদের শাসন

মেনে নিয়েছিল। এরপর তাদের ক্ষমতার অবসান ঘটলে সলজুকীদের অভ্যুদয় ঘটে এবং শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে চলে যায়। অতঃপর তারাও ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং শেষের দিকে তাতায়রা এসে খলিফাকে হত্যা করে ও সাম্রাজ্যের নাম-নিশানা মিটিয়ে ফেলে।

মাগরিবের সিনহাজাদেরও একই অবস্থা। তাদের গোত্রপ্রীতিও পঞ্চম শতাব্দী (একদাশ) কিংবা তারও পূর্ব থেকে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তবু তারা কর্তিত ছত্রচ্ছায়া হিসাবে 'মাহদিয়া', 'বেজা' (বগি), 'কেলআ'[২] ও আফ্রিকিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে তাদের সাম্রাজ্য ধারণ করেছিল। অনেক সময় এ সকল সীমান্ত এলাকায় রাজ্যপিপাসু প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রাধান্য বিস্তার করেছে, তথাপি তাদের সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়নি। এমনি অবস্থায় চলবার পর আল্লাহ্ তাদের সাম্রাজ্য বিনাশের ইঙ্গিত দিলেন এবং মাসমুদাদের গোত্রপ্রীতিতে সমৃদ্ধ আলমোহেদরা প্রচণ্ড শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল।

আন্দালুসে বনি উমাইয়াদের সাম্রাজ্যের অবস্থাও অনুরূপ। তাদের আরবীয় গোত্রপ্রীতি বিনষ্ট হবার পর ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ তাদের ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের সমুদয় অঞ্চল নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এভাবে তারা সমস্ত সাম্রাজ্যই খণ্ড খণ্ড করে তাদের অধীনস্থ অঞ্চলের অধীশ্বর হয়ে বসে। আব্বাসী সাম্রাজ্যে অনারবদের প্রাধান্য বিস্তারের সংবাদ তারা পেয়েছিল। সতুরাং তারা নিজেদেরকে রাজ্যাধিপতিসুলভ উপাধিতে ভূষিত করে যোগ্য পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করল। কেউ তাদের এ অবস্থার পরিবর্তন করবে কিংবা ক্ষমতা ছিনিয়ে নিবে, এমন আশঙ্কাও তাদের হৃদয়ে ছিল না। কারণ আন্দালুস গোত্র বা গোত্রপ্রীতির দেশ নয়, যেমন অচিরেই আমরা বর্ণনা করব। সুতরা তাদের এ অবস্থা স্থায়ী হয়ে উঠল। ইবনে মরফ[৩] বলেছেন,

> আন্দালুসে মুতাসিম ও মুতাজিদ নাম নিতে আমার করুণা হয়,
> অস্থানে অধীশ্বরের উপাধি, বিড়াল ফুলে যেন বাঘ হয়ে গেছে।

তারা তাদের সাম্রাজ্য ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য আশ্রিত, কর্মে নিয়োজিত এবং বহিরাগত জনশক্তির সাহায্য গ্রহণ করল। এ সকল লোক সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের বারবার জানাতা প্রভৃতি গোত্রগুলো থেকে আন্দালুসে এসেছিল। এটা করতে গিয়ে তারা উমাইয়া সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থায় তাদেরকে ব্যবহার করার সেই আদর্শই গ্রহণ করেছিল। যখন আরবীয় গোত্রপ্রীতি দুবর্ল হয়ে পড়ল এবং ইবনে আবু আমের সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তার করল, তখন এ অবস্থাই ঘটেছিল। আগন্তুকরা আন্দালুসের একেকটি দিকে বিরাট বিরাট রাজ্য গড়ে তুলল এবং তাদের অধীনস্থ অংশ তৎকর্তৃক বিভক্ত সাম্রাজ্যের অনুরূপ অংশ অপেক্ষা বৃহৎ ছিল। এভাবে তারা তাদের শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছিল। অবশেষে তাদের উপর লামতুনাদের গোত্রপ্রীতি সমৃদ্ধ শক্তিমান মোরাবী জনসমুদ্র এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটল, স্ব স্ব কেন্দ্র

---

২. মাসিলার উত্তর-পূর্ব কোণে বনি হাম্মাদের প্রাচীন রাজধানী।

৩. মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ, মৃত্যু ৪৬০ (১০৬৭/৬৮ খ্রি:) বি:। অবশ্য কাব্য ছত্রটি ইবনে রশিকের।

থেকে নবাগতদের দ্বারা তারা বিতাড়িত হল এবং পরিণামে তাদের আর কোন চিহ্নই রইল না। তারা গোত্রপ্রীতির অভাবে নবাগতদের সম্মুখে দাঁড়াতেই পারল না।

এটাই সেই গোত্রপ্রীতি, যদ্বারা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও তার সহায়ক শক্তি গড়ে তোলা সম্ভব হয়। অথচ আত্তারতুশীর ধারণা এ যে, সাম্রাজ্যের সহায়ক শক্তি হল নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে গঠিত যোগ্য সৈন্যদল। তিনি তাঁর 'সিরাজুল মুল্‌ক' নামীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সেখানে তাঁর বক্তব্য সাধারণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্যোগ সম্পর্কে নীরব। তা শুধুমাত্র সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, তার পরিচালনার দায়িত্বে গোত্রবিশেষের স্থায়িত্ব এবং তাদের বৈশিষ্ট্য সুদৃঢ় হওয়ার পর শেষ অবস্থা সম্পর্কেই প্রযোজ্য। ঐ ব্যক্তি (আত্তারতুশী) উক্ত সাম্রাজ্যকে তার অন্তিম দশাতেই দেখেছেন। তখন তার সজীবতা নষ্ট হয়ে গেছে এবং তার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ তখন আশ্রিত ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দ্বারাই হচ্ছে। এর পর তাদের পিছনে আগত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে প্রতিরোধের জন্য নিয়োজিত সেবকদলের হাতে শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে। বস্তুত তিনি ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের রাজ্যগুলোই দেখতে পেয়েছেন। তা উমাইয়া সাম্রাজ্য পতনের মুখে যাবার পরই আবির্ভূত হয়েছিল। তখন তার আরবীয় গোত্রপ্রীতি নষ্ট হয়ে গেছে এবং প্রত্যেক আমীর তার একেকটি অংশ দখল করে নিয়েছে। তিনি সারকুস্তার শাসক আলমুস্তাইন ইবনে হুদ ও তৎপুত্র আল-মুজাফফরের সময়ে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তখন তাদের মধ্যে গোত্রপ্রীতির কোন চিহ্ন নেই। কারণ আরব গোত্রগুলোর উপর সুদীর্ঘ তিনশ বছর ধরে বিলাসব্যসনের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায় তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং তিনি গোত্রচ্যুত জবরদখলকারী শাসকদেরকেই দেখেছেন। এ জবরদখল উমাইয়া সাম্রাজ্যের সময় থেকে গোত্রপ্রীতির কতকাংশ অবশিষ্ট থাকতেই আরম্ভ হয়েছিল। এজন্যই তাদের এ ক্ষমতা দখলকে বাঁধা দিবার কেউ ছিল না। সুতরাং এ সকল ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ তাদের শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োজিত পেশাধারীদের উপরই নির্ভর করত। আত্তারতুশী তাঁর দৃষ্ট এ অবস্থাকেই সাধারণভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্যোগ সম্পর্কে কোন চিন্তা করেননি। কিন্তু পাঠক, আপনাকে সেই সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র মহিমাকে উপলব্ধি করতে হবে। বস্তুত আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে রাজ্য দান করেন।[৪]

---

৪. কোরান ২, ২৪৭।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত গোত্রের কোন অংশের পক্ষে গোত্রপ্রীতি ব্যতীতই সাম্রাজ্য স্থাপন কখনও কখনও সম্ভব হয়ে উঠে]

এটা এ যে, কোন গোত্রপ্রীতি যখন বহু জাতি ও গোত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়, তখন এর বাহক হিসাবে দূর-দূরান্তের মানুষও সক্রিয় হয়ে উঠে এবং সাম্রাজ্যের অনুগত ও বাধ্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় উক্ত প্রভাবশালী গোত্রের কেউ যদি নিজ শক্তির কেন্দ্র ও মর্যাদার উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথকভাবে কিছু করতে চায়, তখন সাধারণ মানুষ তার এ বিষয়টিকে নতুন উদ্যোগ হিসাবে গ্রহণ করে তার প্রতিষ্ঠানের জন্য তৎপর হয়। তারা তাকে সাহায্য করে এবং রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা ন্যায্য প্রাপ্য আদায়ের বিষয়টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এতে তাকে তার পিতৃপুরুষের বৃহৎ প্রভাববলয় থেকে দূরে সরিয়ে নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসার একটি প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাও কাজ করে। কারণ এর পরিবর্তে তারা কামনা করে যে, এ নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের সাহায্যের জন্য তাদেরকে মন্ত্রী, সেনাপতি অথবা সীমান্তের প্রদেশপাল হিসাবে উচ্চ রাজকীয় পদে নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তারা তার রাজ্যক্ষমতায় কোন প্রকার অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। এটা তাদের সেই মৌল গোত্রপ্রীতি এবং পৃথিবীব্যাপী তার সুদৃঢ় প্রভাবেরই ফলশ্রুতি। এটাই অনুসারীদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাদের আনুগত্যকে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কাজেই তারা যদি এর ব্যতিক্রম করে শক্তিতে অংশগ্রহণ বা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নকরণের কাজে লিপ্ত হত, 'তা হলে পৃথিবী তার সমগ্র সম্ভাবনাসহ কেঁপে উঠত।'[৫]

উপরোক্ত বক্তব্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে দূর মাগরিবে ইদরিসীদের অবস্থা এবং আফ্রিকিয়া ও মিশরে উবাইদীদের অবস্থার কথা উল্লেখ করা যায়। আবু তালেবের বংশধারা যখন এ দূরান্তে এসে উপস্থিত হল এবং খেলাফতের প্রভাবাধীন এলাকা এড়িয়ে বনি আব্বাসের নিকট থেকে এ দূরান্ত অঞ্চল বিচ্ছিন্ন করতে মনস্থ করল, তখন অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছিল। ইতিপূর্বে আবদে মন্নাফের বংশধরদের প্রভাব সুদৃঢ় হয়ে গেছে। প্রথমে বনি উমাইয়াদের মধ্য দিয়ে এবং তাদের পরে বনি হাশেমের উত্থানের ফলে তা দূর-দূরান্তে বিস্তৃত হয়েছে। আবু তালেবের বংশধররা এরই সূত্র ধরে মাগরিবের এ দূরপ্রান্তে এসে উপস্থিত হল এবং নিজেদের পার্থক্যের দাবি উত্থাপন করল। বারবার গোত্রগুলো একাধিকবার তাদের এ দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হল।

---

৫. কোরান ৯৯, ১।

আউরুবা ও মগিলা গোত্র ইদরিসীদের জন্য এবং কুতামা, মিনহাজা ও হাওআরা গোত্র উবাইদীদের জন্য উঠে দাঁড়াল এবং তাদের গোত্রপ্রীতির সাহায্যে পূর্বোক্তদের দাবির প্রাধান্য ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে তুলল। এমনিভাবে সমগ্র মাগরিব আব্বাসী সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং এর পরে আফ্রিকিয়াও উক্ত পথ অনুসরণ করল। এভাবে আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রভাব অনবরত হ্রাস পাচ্ছিল এবং উবাইদীদের প্রভাব বিস্তৃত হচ্ছিল। এমনকি এক সময়ে তারা মিশর, সিরিয়া ও হেজাজ দখল করে ইসলামী সাম্রাজ্যকে দুইভাগে ভাগ করে ফেলেছিল। এ সকল বিজয়াভিযানের সর্বত্র এ বারবার গোত্রগুলোই প্রাধান্য বিস্তার করেছে; কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও উবাইদীদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ও তাদের প্রতি আনুগত্যে অপূর্ব নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে। তারা বনি হাশেমের এ সুদূরপ্রসারী প্রভাবকে মেনে নিয়ে শুধুমাত্র পদমর্যাদার জন্য প্রতিযোগিতা করেছে। কারণ কোরায়েশ ও মুজার গোত্রগুলোর প্রাধান্য বিস্তারের দ্বারা এ প্রভাব সকল জাতির মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই আরবীয় সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাদের বংশধরদের মধ্যেই তার ধারাবাহিকতা বিরাজ করছে। 'আল্লাহ্ নির্দেশ দেন এবং তাঁর নির্দেশ অমান্যকারী কেউ নেই।'[৬]

৬. কোরান ১৩, ৪১।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[বিস্তৃত সাম্রাজ্য ও বৃহৎ শাসন ক্ষমতার ভিত্তি হল নবুয়ত অথবা সত্য প্রচারজনিত ধর্মমত।]

এটা এ যে, রাজ্য একমাত্র প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে থাকে এবং এ প্রাধান্য বিস্তারের জন্য গোত্রপ্রীতি ও মতামতের ঐক্যের মাধ্যমে উদ্দীপনার প্রয়োজন। সকল অন্তরকে একত্র করে এক সূত্রে গাঁথা একমাত্র ধর্মমত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়। আল্লাহ্ বলেন, "তুমি যদি পৃথিবীর সমুদয় কিছু ব্যয় কর, তথাপি তাদের অন্তঃকরণ এক সূত্রে গাঁথতে পারবে না।"[৭] এর গূঢ়ার্থ এ যে, মানুষের অন্তরকে যখন অন্যায্য প্রবৃত্তির দিকে ও পার্থিব উন্নতির প্রতি আকর্ষণ করা হয়, তখন তার মধ্যে প্রতিযোগিতা ও মতানৈক্যের ভাব জেগে উঠে। কিন্তু এটার পরিবর্তে যদি পার্থিব উন্নতি ও মিথ্যাকে পরিত্যাগ করে সত্যের দিকে আকর্ষণ করা যায়, তা হলে তা আল্লাহ্র দিকে ফিরে আসে এবং তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হয়ে উঠে। এর ফলে প্রতিযোগিতা, মতানৈক্য কমে গিয়ে উত্তম সহায়তা ও সহযোগিতা দেখা দেয়। আল্লাহ্র নির্দেশের পথ প্রশস্ত হয়ে উঠে এবং সাম্রাজ্য আকৃতিতে বিস্তার লাভ করে। পবিত্র ও মহান আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা পরে এ সম্পর্কে আপনাদের অবগতির জন্য বর্ণনা করব। তিনিই আমাদের সহায় এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন প্রভু নেই।

---

৭. কোরান ৮, ৬৩।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যের প্রাথমিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় ধর্মমত তার জনসংখ্যার অনুপাতে লব্ধ গোত্রপ্রীতিকে এক নতুন শক্তি দান করে থাকে]

এর কারণ, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য গোত্রপ্রীতির মধ্যকার প্রতিযোগিতা ও প্রতিহিংসাকে দূরীভূত করে এবং সত্যের প্রতি সকলের উদ্দেশ্যকে একত্র করে। তাদের কর্তব্যে এ চেতনার সঞ্চার করে যে, এতে বিরোধের কিছু নেই; যেহেতু উদ্দেশ্য এক এবং প্রাপ্যও একই, সুতরাং তারা তাদের কর্তব্য সাধনে মৃত্যুবরণ করতেও দ্বিধান্বিত হয় না। তারা যে সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়, যদিও সেই সাম্রাজের জনসংখ্যা তাদের অপেক্ষা অনেক বেশি, তথাপি তাদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। একদল সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দিতে উৎসাহী আর অন্যদল মিথ্যার মোহে মৃত্যুভয়ে হীনমন্য। এ জন্য সংখ্যায় অধিক হলেও তাদের পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। বরং ঐ নতুন শক্তিই বিজয়ী হয় এবং অন্যরা তাদের বিলাসব্যসন ও হীনমন্যতাসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

ইসলামের প্রাথমিক দিকে আরবদের জন্য অনুরূপ অবস্থাই দেখা দিয়েছিল। কাদেসিয়া ও ইয়ারমুকের প্রতিটি যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ত্রিশ হাজারের কিছু বেশি ছিল এবং পারস্যের সৈন্যদল কাদেসিয়ায় ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার ও হিরাক্লিয়াসের সৈন্যদল ওয়াকেদীর বক্তব্য অনুসারে ছিল চার লক্ষ।[৮] কিন্তু কোন পক্ষই আরবদের সাথে পেরে উঠেনি। তারা সকলকেই পরাজিত করে তাদের সমুদয় বিষয়বস্তুর উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল।

এ বিষয়টি লামতুনা ও আলমোহেদদের সাম্রাজ্য বিস্তারেও বিবেচনা করা যায়। মাগরিবে এমন বহু গোত্রই বিদ্যমান ছিল, যারা গোত্রপ্রীতি ও সংখ্যার দিক থেকে তাদের বিরোধী হতে পারত এবং তাদেরকে পরাভূতও করতে পারত। কিন্তু ধর্মীয় ঐক্য লামতুনা ও আলমোহেদদের গোত্রপ্রীতির শক্তিকে দ্বিগুণিত করে তুলেছিল এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মৃত্যুকেও তুচ্ছজ্ঞান করতে শিখিয়েছিল। সুতরাং তাদের পথে কোন কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি।

পাঠক, বিষয়টিকে অন্যভাবেও বিবেচনা করুন। যখন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য শিথিল ও বিকৃত হয়ে পড়ে তখন শক্তির গুরুত্ব কমে যায়। তখন একমাত্র গোত্রপ্রীতির অনুপাতেই বিজয়লাভ ও প্রাধান্য বিস্তার হয়ে থাকে। এজন্যই দেখা যায় যে, একই

---

৮. 'ফতুহুশ্‌শাম' গ্রন্থে এ সংখ্যার নিকটবর্তী হয় এমন একটি বর্ণনা বিদ্যমান।

সাম্রাজ্যের সমঅংশীদার যে গোত্র এরই ছত্রচ্ছায়ায় বসবাস করছিল, তারাই গোত্রপ্রীতির সমশক্তি বা অধিক শক্তির অধিকারী হয়ে সাম্রাজ্য শাসনে প্রাধান্য বিস্তার করে বসে। অথচ এরাই এক সময়ে গোত্রপ্রীতি ও প্রান্তর চরিত্রের অধিকারী অধিকতর শক্তিশালী দলকে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যগত বিশেষ শক্তির সাহায্যে পরাভূত করতে পেরেছিল।

জানাতা গোত্রের সাথে আলমোহেদদের সংঘর্ষের মধ্যে এটা লক্ষ করা যায়। জানাতীরা মাসমুদা গোত্র অপেক্ষাও অধিক প্রান্তরীয় ও বন্য চরিত্রের অধিকারী ছিল। অন্যদিকে মাসমুদাদের ছিল সত্য প্রচারের শক্তি। তারা আল-মেহেদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঐ বিশেষ ধর্মমতে দীক্ষিত হয়েছিল এবং এক নতুন শক্তিতে তাদের গোত্রপ্রীতিকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। এর ফলে তারা প্রথম দিকে জানাতীদের উপর বিজয়ী হতে সমর্থ হয়। যদিও জানাতীরা তাদের অপেক্ষা বহুগুণ অধিক প্রান্তরীয় চরিত্র ও গোত্রপ্রীতির অধিকারী ছিল। কিন্তু পরে যখন মাসমুদারা এ ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করল, তখন চতুর্দিক থেকে তাদের উপর জানাতীরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাদেরকে পরাজিত করল এবং তাদের সবকিছু ছিনিয়ে নিল। 'আল্লাহ্ সকল বিষয়ে বিজয়ী'।[৯]

৯. কোরান ১২, ২১।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[ধর্মমত প্রচার ও গোত্রপ্রীতির সাহায্য ব্যতীত সম্পূর্ণ হয় না]

তা, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, যে কোনো বিষয়ে সর্বসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে গোত্রপ্রীতির সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। যেমন বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহ্ প্রত্যেক নবীকেই তাঁর জাতির প্রতিরোধ শক্তিসম্পন্ন গোত্রের মধ্যে প্রেরণ করেছেন। যদি নবীদের জন্যই এ ব্যাপার হয়, অথচ তাঁরা অস্বাভাবিক কর্ম সংঘটনে মানুষের মধ্যে যোগ্যতম, তা হলে, পাঠক, অন্যদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কী! তাঁরা কি গোত্রপ্রীতির সহায়তা ছাড়াই অসম্ভব সম্ভব করে তুলতে পারবে!

সুফি সম্প্রদায়ের উস্তাদ ও 'খলউন্ নালাইন' নামীয় সুফীতত্ত্বের গ্রন্থপ্রণেতা ইবনে কেসী[১০] সম্পর্কে এ প্রকার একটি ঘটনা বিদ্যমান। তিনি আল মেহেদীর ধর্মমত প্রচারের কিছুকাল পূর্বে আন্দালুসে সত্য প্রচারকরূপে আবির্ভূত হন। তাঁর অনুসারীদিগকে 'মোরাবিতী' বলে ডাকা হত। কিন্তু তাঁর প্রচার খুব ভাল জমল না। কারণ লামতুনা গোত্র তখন আলমোহেদ আন্দোলনে ব্যতিব্যস্ত ছিল। সেখানে এমন কোনো গোত্র বা গোত্রপ্রীতির ধারক জনগোষ্ঠী ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে। সুতরাং পরিশেষে তিনি, আলমোহেদরা মাগরিবের উপর আধিপত্য বিস্তার করলে তাদের দলে ঢুকে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করলেন। তিনি তাঁর আস্তানা 'আরকশ' (ডি লা ফ্রন্টেরা) দুর্গ থেকে বের হয়ে তাদের অনুসরণ করলেন এবং তার সীমান্ত অঞ্চল তাদের হাতে ছেড়ে দিলেন। তিনিই আলমোহেদদের পক্ষ থেকে আন্দালুসে প্রথম সত্য প্রচারকারী। তাঁর অভিযানকে মোরাবিতীদের অভিযান বলা হয়।

এরূপভাবে সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে দুষ্কৃতি উচ্ছেদে আত্মোৎসর্গকারী কর্মী ও ধর্মশাস্ত্রবিদদের কথাও এখানে আলোচনা করা যায়। বহু ধার্মিক ও অধ্যাত্মপন্থী সাধক অত্যাচারী আমীরদের উপর প্রভাব বিস্তার করে অসৎ কর্ম উচ্ছেদের অভিযান পরিচালনা করেন। মানুষের মধ্যে সৎকর্মে লিপ্ত ও অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রচার করে তাঁরা আল্লাহ্‌র নিকট তৎপরিবর্তে পুণ্যের আশা করেন। ক্রমশ তাঁদের অনুসারীর দল বেড়ে ওঠে এবং যুগপ্রিয় ফেরেববাজ লোকেরা তাঁদের অনুকরণে অগ্রসর হয়। এর ফলে তাঁরা নানাবিধ বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েন এবং তাদের অধিকাংশই এভাবে ধ্বংস হয়ে যান। পরিণামে তাঁদের কাঁধে নানাবিধ দুষ্কর্মের বোঝাই চাপতে দেখা যায়, পুণ্যের বোঝা নয়। কারণ পবিত্র আল্লাহ্ তাঁদের জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য করেননি।

---

১০ আহমদ ইবনে কেসী, মৃত্যু ৫৪৬ (১১৫১ খ্রি:) হি:।

বরং সম্ভাব্য স্থানেই এরূপ শক্তি প্রয়োগের কথা তিনি বলেছেন। হযরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অন্যায় হতে দেখে, তা হলে সে যেন হাতের দ্বারা তা বন্ধ করে। যদি এতে সমর্থ না হয়, তা হলে জিহ্বার দ্বারা এবং যদি এতেও শক্তি না পায়, তা হলে অন্তরের দ্বারা।" বস্তুত শাসনব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যগুলোর অবস্থা অত্যন্ত সুদৃঢ় শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাকে আন্দোলিত করতে বা ধ্বংস করতে হলে এমন সংঘবদ্ধ শক্তির আক্রমণ প্রয়োজন, যার পশ্চাতে গোত্রপ্রীতি ও পারিবারিক সম্প্রীতি ও সহায়তা বিদ্যমান, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

নবীদের অবস্থা এ প্রকারই ছিল, আল্লাহ্ তাঁদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। তাঁরা গোত্র ও পরিবারের শক্তি নিয়েই আল্লাহ্র পথে আহ্বান করতেন। অথচ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এ ছাড়াও তাঁদেরকে সর্বপ্রকার কার্য সম্পাদনের শক্তি দিতে পারতেন। কিন্তু স্বভাব অনুযায়ী সমস্ত বিষয় সংঘটিত করবার জন্য এরূপ করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ অতিশয় বিচক্ষণ ও সর্বজ্ঞ।

সুতরাং কোনো সাধারণ মানুষ যদি এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়ে যায় এবং সে সত্যবাদী হয় তা হলেও গোত্রপ্রীতির অভাব তার এ প্রচেষ্টাকে খর্ব করে তুলবে এবং পরিণামে সে ধ্বংসের আবর্তে পতিত হবে। আর যদি এর ছদ্মবেশে সে নেতৃত্ব লাভের ইচ্ছা পোষণ করে, তা হলেও তার পথে বাধার সীমা নেই এবং পরিণামে তাঁর ধ্বংসপ্রাপ্তি অনিবার্য। কারণ এটা আল্লাহ্র ব্যাপার, তাঁর সন্তুষ্টি ও সাহায্য ছাড়া পূর্ণ হতে পারে না। এ বিষয়ে অগ্রসর হলে সদিচ্ছা পোষণ করতে হবে এবং মুসলমানদের কল্যাণ কামনাই হবে এর লক্ষ্য। কোনো মুসলমানই এতে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না এবং কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তিই এতে দ্বিমতের অধিকারী হতে পারে না।

বাগদাদের জনসমাজে এ ধরনের আন্দোলন প্রথম শুরু হয় তাহেরের গোলযোগের সময়। তখন আমীন নিহত হন এবং মামুন খোরাসান থেকে ইরাকে আসতে দেরি করতে থাকেন। অতঃপর হজরত হোসাইনের বংশধর আলী ইবনে মুসা আয়রেজাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। এর ফলে বনি আব্বাস তাঁর প্রতি বিরক্ত হয় এবং এর প্রতিরোধ করার জন্য মামুনের আনুগত্য ত্যাগ করে পরিবর্তন কামনা করে। তারা ইব্রাহিম ইবনে আলমাহদীকে সিংহাসনে বসায়। এর ফলে বাগদাদে ভীষণ গোলযোগ দেখা দেয়। সৎ ও নিরীহ নাগরিক বা খুনী লুটেরাদের শিকারে পরিণত হয়। পথেঘাটে ছিনতাই আরম্ভ হয়। এরা লুণ্ঠিত ধনসম্পদে বাড়িঘর পূর্ণ করে ফেলে এবং প্রকাশ্য বাজারে তারা লুটের মাল বিক্রয় করতে আরম্ভ করে। বাগদাদের নাগরিকরা শাসকদের নিকট আবেদন জানিয়েও কোনো সাড়া পায়নি। কেউ এর প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসেনি। অতঃপর ধার্মিক ও পুণ্যবান ব্যক্তিরা দুষ্কৃতিকারীদেরকে প্রতিরোধ করার এবং তাদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ সময় খালেদ আদ্দুরীয়ুস নামে এক ব্যক্তি সাধারণ নাগরিকবৃন্দকে সৎকর্মের আদেশ ও অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আহ্বান জানান। মানুষ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে দুষ্কৃতিকারীদের উপর আক্রমণ চালায় এবং তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। ফলে খালেদ তাদেরকে পিটিয়ে ও নানাবিধ শাস্তি দিয়ে দমন করতে সক্ষম হন।

তার পর বাগদাদের গ্রামাঞ্চল থেকে সহল ইবনে সালামা আল আনসারী নামে পরিচিত অন্য এক ব্যক্তি আবির্ভূত হন, তাঁর ডাক নাম ছিল আবু হাতেম। তিনি গলায় কোরান ঝুলিয়ে মানুষকে সৎকর্মের আদেশ ও অসৎ কর্মের নিষেধের দিকে এবং আল্লাহ্‌র কেতাব ও নবীর সুন্নত পালনের প্রতি আহ্বান করেন। তাঁর ডাকে সম্ভ্রান্ত ও ইতর নির্বিশেষে বনি হাশেম থেকে নিম্নস্তরের লোক পর্যন্ত সকলেই সাড়া দেয়। তিনি তাহের প্রাসাদে উপনীত হয়ে দরবার বসান এবং বাগদাদের পথে পথে ঘুরে বেড়ান। তিনি রাস্তাঘাটের নিরাপত্তায় বিঘ্নসৃষ্টিকারীদিগকে বের করে দেন এবং লুটেরাদের অত্যাচারের পথ বন্ধ করতে সক্ষম হন। খালেদ আদ্‌দুরীয়ুস তাঁকে বলেন যে, তিনি সম্রাটের কোনো দোষ দেখেন না। কিন্তু এর উত্তরে সহল তাঁকে বললেন যে, তিনি এমন যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, যে আল্লাহ্‌র কেতাব ও রসূলের সুন্নতের বিরুদ্ধাচরণ করবে; সে যে কোনো স্তরের লোক হোক না কেন। সুতরাং ইব্রাহিম ইবনে আল মাহদী তার বিরুদ্ধে সৈন্যদল সুসজ্জিত করলেন এবং তাঁকে পরাজিত করে বন্দী করলেন। অচিরেই তাঁর প্রভাব হ্রাস পেল এবং তিনি পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচলেন।

অতঃপর এ ব্যাপারে আরও বহু ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা মনের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠার একটা অসার ধারণাই পোষণ করতেন; অথচ তাকে বাস্তবায়িত করতে হলে যে গোত্রপ্রীতির প্রয়োজন, তার সম্পর্কে কোনো খোঁজই রাখতেন না। তাঁরা তাদের কাজের বাধাবিপত্তি দূর করা এবং তাদের বাস্তব উদ্দেশ্যের কোনো খেয়ালই করতেন না। এঁদের সম্পর্কে যে বিষয় অবলম্বন করা দরকার, তা হল চিকিৎসা, যদি তারা পাগল হয়ে থাকেন; নতুবা শাস্তি আর পিটুনি, যদি তারা গোলযোগ সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হন। অথবা এসব কিছু না করে তাদেরকে ভাঁড় মনে করে তাদের সমুদয় বক্তব্য হাসি তামাশায় উড়িয়ে দেয়া উচিত।

কখনো কেউ কেউ নিজেকে 'অপেক্ষিত ফাতেমী' বলে পরিচয় দেন, কখনও তাঁর প্রতি আহ্বানকারী হিসাবে নিজের দাবি উপস্থিত করেন। অথচ তারা ফাতেমীর ব্যাপারে বলতে গেলে প্রায় কিছুই জানেন না, এমনকি তিনি কে, তাও নয়। পাঠক, এ ব্যাপারে উদ্যোগীদের অধিকাংশকে আপনি দেখতে পাবেন, হয় তারা অসার কল্পনার বশীভূত, নয় বদ্ধ উন্মাদ অথবা তারা তাঁর ধর্মমত প্রচারে সাহায্য গ্রহণ করে ছদ্মবেশে নেতৃত্বলাভের প্রয়াসী। এ নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা তাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, অথচ স্বাভাবিক পন্থায় তা লাভ করার শক্তি তাদের নেই। কাজেই তারা ধারণা করে, তাদের ঈপ্সিত বিষয় লাভ করার এটাই যথার্থ মাধ্যম। কিন্তু একবারও ভেবে দেখে না যে, এতে কি মহাবিপদের সম্মুখীন তারা হতে পারে। সুতরাং গোলযোগ সৃষ্টির জন্য অতিদ্রুত তারা নিহত হয় এবং তাদের প্রতারণার অশুভ পরিণাম লাভ করে।

এ শতাব্দীর প্রথম দিকে 'আত্তুবজরী' নামে এক সুফীসাধক 'সুস'-এ আবির্ভূত হন। তিনি মাসার সমুদ্রতীরবর্তী মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে স্থানীয় জনসাধারণকে প্রতারণা করে নিজেকে অপেক্ষিত ফাতেমী বলে পরিচয় দেন। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে ফাতেমীর আগমন এবং উক্ত মসজিদ থেকে ধর্মমত প্রচারের যে ধারণা বিদ্যমান, তারই সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন। ফলে সাধারণ বারবারদের কয়েকটি দল তাঁর উপর

পতঙ্গের ন্যায় এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বারবার সর্দারগণ এদের এ আচরণে গোলযোগের সম্ভাবনায় ভীত হয়ে উঠেন। সুতরাং তৎকালীন মাসমুদা গোত্রপ্রধান উমর আস্‌সিকসিবী গোপনে একজন লোককে পাঠিয়ে দেন, যে তাঁকে শায়িত অবস্থায় হত্যা করে।

এমনভাবে এ শতাব্দীর প্রথম দিকে 'গোমারা'তেও আব্বাস নামে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হয়। সেও পূর্বানুরূপ দাবি উত্থাপন করেছিল। উক্ত অঞ্চলে গোত্রগুলোর কিছু সংখ্যক নির্বোধ নিম্ন শ্রেণীর লোক তার একান্ত অনুসারী হয়ে পড়ে। সে দলবলসহ গেমারার অন্যতম শহর 'বাদিসে' জোরপূর্বক প্রবেশ করে। কিন্তু তার দাবি প্রকাশের চল্লিশ দিন পরে সে নিহত হয় এবং পূর্ববর্তী এভাবে নিহতদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

এ ধরনের উদাহরণ প্রচুর। এ সব ঘটনার মধ্যকার মারাত্মক ভুলের দিকটি হল এ যে, এরা এ ব্যাপারে গোত্রপ্রীতির কথা আদৌ বিবেচনা করে না। অন্যদিকে ব্যাপারটি যদি প্রতারণা হয়, তা হলে এরূপ ব্যক্তির সাফল্য লাভ কিছুতেই উচিত নয় বরং তাকে তার পাপের শাস্তি ভোগ করতে দেয়া উচিত, এটাই অত্যাচারীদের প্রতিদান।[১১] আল্লাহ্ পবিত্র ও মহান সকল কিছুই অবগত। তিনিই সহায়, তিনি ব্যতীত অন্যকোনো প্রভু নেই এবং তিনি ব্যতীত অন্যকোনো উপাস্য নেই।

---

১১. কোরান ৫, ২৯ : ৫৯, ১৭।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[প্রতিটি সাম্রাজ্যের জন্যই অঞ্চল ও স্থানের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে, এটা অপেক্ষা বেশি হয় না]

এর কারণ এ যে, প্রতিটি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় ও তার বিন্যাস ব্যবস্থায় জাতির যে জনশক্তি নিয়োজিত হয়, তাদের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য ক্ষমতা অনুসারেই উক্ত সাম্রাজ্য বিভিন্ন অঞ্চল ও সীমান্ত এলাকায় বিভক্ত হওয়া প্রয়োজন। যাতে তারা তার উপর প্রভাব বিস্তার করে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করতে, এতে সাম্রাজ্যের আইন-কানুন প্রবর্তন করতে এবং খাজনাপত্র আদায়, প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ও অন্যবিধ কার্যাদি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। এভাবে গোত্রশক্তি যখন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল ও সীমান্ত এলাকায় নিয়োজিত হয়ে যায় তখন অবশ্যই তাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট হওয়া দরকার। এ সময়ে সাম্রাজ্য এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে, যাকে সীমান্তসহ বিভিন্ন অঞ্চলের কেন্দ্রের সাথে সুগ্রথিত ও সুবিন্যস্ত অবস্থা বলা যায়। সাম্রাজ্য এর পর যদি তার আয়ত্তাধীন অঞ্চল অপেক্ষা অধিক বিস্তৃতি লাভের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়, তা হলে তার অধিকৃত অতিরিক্ত অঞ্চল অসংরক্ষিত এবং শত্রু ও প্রতিবেশীর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়াবে। এর পরিণাম সাম্রাজ্যের জন্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। কারণ এতে একদিকে যেমন শত্রুদের উৎসাহ বাড়বে, অন্যদিকে তেমনি সাম্রাজ্য শক্তির ভীতির প্রভাবকে ধ্বংস করে ফেলবে।

যদি গোত্রশক্তি আরো পরিপূর্ণ হয় এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল ও সীমান্তে বিভক্তির অনুপাতে তা নিঃশেষ হয়ে না যায়, তা হলে সাম্রাজ্যের মধ্যে তার আপাত আয়ত্তাধীন সীমা ছাড়িয়েও বিস্তৃতি লাভের শক্তি বিদ্যমান থাকে এবং তা আরো বিস্তৃত হয়ে তার সীমায় পৌঁছতে পারে। এতে স্বাভাবিক কার্যকারণের উৎস হল গোত্রপ্রীতি যা স্বাভাবিক শক্তিসমূহের মধ্যে এর জন্য অধিকতর প্রয়োজনীয়। প্রতিটি শক্তি থেকেই বিশেষ একটি কার্যের উদ্ভব ঘটে এবং তার মধ্যেই উক্ত শক্তির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এ দিক থেকে সাম্রাজ্য তার প্রান্ত ও বিন্যস্ত অঞ্চল অপেক্ষা কেন্দ্রেই অধিকতর শক্তিশালী হয়ে থাকে। সুতরাং বিন্যাসের ধারা অনুসরণ করে তার কেন্দ্রস্থিত শক্তি যখন একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে, তখন অধিক অগ্রসর হবার আর ক্ষমতা থাকে না। যেমন কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত আলো ও কিরণের ব্যাপ্তি এবং জলের উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপের ফলে উত্থিত তরঙ্গবৃত্তের প্রসার। এর পর যখন সাম্রাজ্যে ক্ষয় ও দুর্বলতা দেখা দেয়, তখন তা তার প্রান্তগুলো থেকেই আরম্ভ হয় এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশে সমগ্র সাম্রাজ্য ধসে না পড়া

পর্যন্ত তা কেন্দ্রস্থলে সুরক্ষিত থাকে। সর্বশেষেই কেন্দ্রের বিলুপ্তি ঘটে। কিন্তু এর বিপরীতে যদি কেন্দ্রই পরাজিত হয়ে পড়ে, তা হলে তার বিন্যস্ত অঞ্চল ও সীমান্ত তাকে রক্ষা করতে পারে না, সমুদয় এক সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়। এ কেন্দ্রটি মানবদেহের হৃদপিণ্ডের মতোই, যা থেকে আত্মশক্তি সমগ্র দেহে বিস্তৃত হয়। সুতরাং এ হৃদপিণ্ড আক্রান্ত বা আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই অসাড় হয়ে পড়ে।

পাঠক, পারস্য সাম্রাজ্যে এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন। তার কেন্দ্র ছিল মাদায়েন। সুতরাং মুসলমানরা যখন তা অধিকার করে নিল, সমস্ত পারস্য সাম্রাজ্যই ধসে পড়ল। ফলে ইয়াজদার্গিদের আয়ত্তাধীন অন্যান্য অবশিষ্ট অঞ্চল কোনো কাজেই আসল না। এর বিপরীতে রোম সাম্রাজ্যের অধীন সিরিয়ার অবস্থা। যেহেতু তাদের কেন্দ্র ছিল কনস্টান্টিনপোল, সুতরাং মুসলমানরা সিরিয়া অধিকার করে নিলে তারা কেন্দ্রে সমবেত হল এবং তাদের ক্ষমতা থেকে সিরিয়ার বিচ্যুতিকে তারা প্রায় কোনো ক্ষতি বলেই মনে করল না। কেন্দ্রে তাদের এ সাম্রাজ্য শক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশে বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বহুদিন টিকে ছিল। পাঠক, এ ব্যাপারে আপনি ইসলামের প্রথম যুগের আরবীয় শক্তির প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারেন। তখন তাদের গোত্রশক্তি পরিপূর্ণ। সেই কারণেই তারা কত দ্রুত তাদের প্রতিবেশী অঞ্চল সিরিয়া, ইরাক ও মিশরকে অধিকার করে নিয়েছিল। এর পর তারা উক্ত সীমা অতিক্রম করে সিন্ধু, আবিসিনিয়া, আফ্রিকিয়া, মাগরিব ও পরে আন্দালুস জয় করেছে। এভাবে যখন তাদের গোত্রশক্তি বিভিন্ন অঞ্চল ও সীমান্তের সংরক্ষণে বিভক্ত হয়ে পড়ল এবং এ সকল অংশ অনুপাতে তাদের শক্তি নিঃশেষ হল, তখন তাদের পক্ষে আর অধিক বিজয় লাভ সম্ভব হয়নি। ইসলামের শক্তির এখানেই শেষ। সে এ সীমা আর অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি; এবং ক্রমশ কেন্দ্রের দিকেই ফিরে এসে আল্লাহ্‌র নির্দেশে শেষ হয়ে গেছে।

পরবর্তীকালের অন্যান্য সাম্রাজ্যের একই অবস্থা। প্রত্যেকটিই তার অন্তর্গত জনশক্তির সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যালুতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন এ জনশক্তি অঞ্চল ও সীমান্তের শৃঙ্খলাবিধানে নিঃশেষিত হয়ে যায়, তখন আর তাদের পক্ষে বিজয় লাভ ও প্রাধান্য বিস্তার সম্ভব হয় না। সৃষ্টির মধ্যে এটাই আল্লাহ্‌র প্রথা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[যে কোনো সাম্রাজ্যের আয়তন, বিস্তার ও স্থায়িত্ব তার জনশক্তির স্বল্পতা ও আধিক্যের অনুপাতে হয়ে থাকে]

এর কারণ এ যে, রাজ্য একমাত্র গোত্রপ্রীতির সাহায্যেই স্থাপিত হয়। গোত্রের অন্তর্গত জনশক্তিই বিভিন্ন দিকে ও অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে এবং তার দায়দায়িত্বকে ভাগ করে নেয়। সুতরাং কোনো রাজ্যের এ জনশক্তি ও গোত্রশক্তি যদি অধিক হয়, তা হলে তা সেই অনুসারে অধিক শক্তিশালী, অধিক অঞ্চল ও স্থানের অধিকারী এবং অধিক বিস্তৃতি লাভ করে থাকে।

পাঠক, ইসলামী সাম্রাজ্য সম্পর্কে এ বিষয়টি বিবেচনা করুন। আল্লাহ্ যখন ইসলামের ঐক্যসূত্রে আরব জাতিকে একত্র করলেন তখন হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর শেষ যুদ্ধ তবুকের ময়দানে মুসলমান সৈন্য সংখ্যা ছিল এক লক্ষ দশ হাজার। এ সংখ্যা মুজার ও কাহতানের পদাতিক ও অশ্বারোহীর সাথে হজরতের তিরোধান পর্যন্ত তবুক পরবর্তী ইসলাম গ্রহণকারী জনসংখ্যা মিলে আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। এজন্য তারা যখন অন্যান্য জাতির আয়ত্তাধীন রাজ্য অধিকার করতে ইচ্ছুক হল, তখন তাদের সম্মুখে সৈন্য বা দুর্গের কোনো বাধাই স্থায়ী হয়নি। এর ফলে তৎকালীন পৃথিবীর দুটি বৃহৎ সাম্রাজ্য পারস্য ও রোম তাদের পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। পূর্বদিকে তুর্কিরা, পশ্চিম দিকে মাগরিবে ফিরিঙ্গী ও বারবাররা এবং আন্দালুসে গহরা তাদের অধিকারে আসল। হেজাজ থেকে সুদূর 'সুস' ও ইয়ামেন থেকে তুর্কি অঞ্চলের সুদূর উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত তারা সপ্তাঞ্চলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করল।

এর পর পাঠক, সিনহাজা, আলমোহেদ ও তাদের পূর্বের উবাইদীদের সাম্রাজ্যের ব্যাপারগুলো লক্ষ করুন। যেহেতু উবাইদীদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কুতামাদের সংখ্যা সিনহাজা ও মাসমুদাদের অপেক্ষা অধিক ছিল, সেজন্য তাদের সাম্রাজ্যের পরিধিও বিস্তৃততর হয়েছিল। তারা আফ্রিকিয়া, মাগরিব, সিরিয়া, শির ও হেজাজ দখল করেছিল। এর পর, পাঠক, জানাতীদের সাম্রাজ্যের দিকে লক্ষ করুন। তাদের সংখ্যা যেহেতু মাসমুদাদের অপেক্ষা কম ছিল, এজন্য তাদের সাম্রাজ্যও ক্ষুদ্রতর হয়েছিল। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় মাসমুদাদের অপেক্ষা কম থাকায় আলমোহেদ সাম্রাজ্য থেকে তাদের সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র হয়। এর পর, পাঠক, বর্তমান সময়ে জানাতীদের দুটি সাম্রাজ্যের কথা বিবেচনা করুন। এর একটি বনি মারীনের ও অন্যটি বনি আবদেল ওয়াদের। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় যেহেতু বনি মারীনের জনশক্তি বনি আবদেল ওয়াদের অপেক্ষা

বেশি ছিল, এজন্য তাদের সাম্রাজ্যটি তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী ও বিস্তৃততর বিন্যাসের অধিকারী। এজন্য মারিনীরা বারবার তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। বলা হয় যে, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় মারিনীদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার এবং বনি আবদেল ওয়াদের ছিল মাত্র একহাজার। অবশ্য পরে তারা সাম্রাজ্যে অন্তর্গত সহজ জীবন যাপন ও প্রচুর অনুসারীদের কল্যাণে তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলেছে।

এভাবে অনুপাত বিচার করলে দেখা যায়, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকালে জনশক্তি অনুসারেই তার শক্তি ও বিস্তৃতি নির্ধারিত হয়ে থাকে। এমন কি সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বও এ অনুপাত অনুযায়ীই দেখা দেয়। যে কোনো নবীন সৃষ্টির স্থায়িত্ব নির্ভর করে তার উপাদানের মিশ্রণ শক্তির উপর এবং সাম্রাজ্যের মিশ্রণ শক্তি হল গোত্রপ্রীতি। সুতরাং গোত্রপ্রীতি শক্তিশালী হলে মিশ্রণ শক্তি তার অনুগামী হয় এবং তার জীবনকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়। আর গোত্রপ্রীতির শক্তি সংখ্যার আধিক্য ও পরিপূর্ণতার দ্বারাই সম্ভব, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। এর যথার্থ কারণ এ যে, যে কোনো সাম্রাজ্যের ক্ষয় সাধারণত তার প্রান্তগুলো থেকেই আরম্ভ হয়। কাজেই তার অঞ্চল যদি অধিক হয়, তা হলে সেগুলো কেন্দ্র থেকে অনেকখানি দূরে দূরে অবস্থিত হবে। এভাবে বিস্তৃত অঞ্চলে ক্ষয় দেখা দেয়ার জন্য সময়ের প্রয়োজন। কাজেই অঞ্চল বেশি হওয়ার জন্য ক্ষয়ের সময়ও বেশি হবে। এভাবে প্রতিটি অঞ্চলে ক্ষয় ও তজ্জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের অনুপাত হিসাব করলে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব দীর্ঘই হয়ে দাঁড়াবে।

পাঠক, এ বিষয়টি আরবের ইসলামী সাম্রাজ্যের মধ্যে লক্ষ করুন। কীভাবে তাদের মধ্যকার কেন্দ্রের অধিকারী বনি আব্বাস এবং আন্দালুস বিজয়ী বনি উমাইয়াদের সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বকাল অন্যান্য সকল সাম্রাজ্য থেকে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর পরে ছাড়া কারো সাম্রাজ্যে ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দেয়নি। উবাইদীদের সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বকাল প্রায় দুইশ আশি বছর। সিনহাজাদের সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বকাল তাদের অপেক্ষা কম। এর আরম্ভ মুয়েজ্জুদৌলা কর্তৃক বুলুক্কীন ইবনে যিরীর উপর তিনশ আটান্ন হিজরিতে আফ্রিকিয়ার শাসনভার ন্যস্ত করা হত এবং পাঁচশ সাতান্ন হিজরিতে আলমোহেদগণ কর্তৃক 'কেলআ' ও 'বেজা' অধিকার করা পর্যন্ত এর শেষ। বর্তমানকালে আলমোহেদ সাম্রাজ্য প্রায় দুইশ সত্তর বছর স্থায়ী হয়েছে। বিভিন্ন সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের ব্যাপারটি এভাবেই তার প্রতিষ্ঠাকারীদের সংখ্যা অনুপাতে হয়ে থাকে। এটাই আল্লাহ্‌র প্রথা, যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।[১২]

---

১২. কোরান ৪০, ৮৫।

নবম পরিচ্ছেদ

[অধিক গোত্র ও গোত্রশক্তিবিশিষ্ট অঞ্চলগুলোতে সাম্রাজ্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা খুব কমই হয়ে থাকে]

এর কারণ হল মত ও প্রবৃত্তির বিভিন্নতা এবং প্রতিটি মত ও প্রবৃত্তির পশ্চাতে গোত্রপ্রীতির এমন একটি শক্তি বিদ্যমান, যা অন্যটিকে বাধা প্রদান করে। সুতরাং সাম্রাজ্য গোত্রপ্রীতির অধিকারী হলেও তদন্তগত প্রতিটি গোত্রপ্রীতি সম্পন্ন জনগোষ্ঠীই ধারণা করে যে, শক্তি ও প্রতিরোধে তারাও কম নয়, এর ফলে গোলযোগের আধিক্য ঘটে এবং সময়ে সময়ে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

পাঠক, আফ্রিকিয়া ও মাগরিবে এ ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যা ঘটেছে তৎপ্রতি লক্ষ করুন। এ সকল স্থানের বারবাররা বিভিন্ন গোত্র ও গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত। এর ফলে তাদের মধ্যে ইবনে আবিসরার প্রাথমিক প্রাধান্য বিস্তার কোনো কাজে আসেনি। বারবার ও ফিরিঙ্গীরা এর পর বারংবার উত্থান ও প্রতিরোধের দিকে অগ্রসর হয়েছে। মুসলমানরা তাদের উপর হত্যার তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে, তথাপি তারা বিশেষ কোনো ধর্মমত প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে সঙ্গে বারংবার উত্থান ও বিদ্রোহের দারস্থ হয়েছে এবং বিদ্রোহীদের ধর্মমত গ্রহণ করেছে। ইবনে আবি যায়েদ বলেছেন, মাগরিবের বারবাররা দ্বাদশ বার ধর্ম ত্যাগ করেছে। মুসা ইবনে নুসাইর ও তাঁর পরবর্তীকাল ছাড়া তাদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের বাণী দৃঢ় ভিত্তি লাভ করেনি। হজরত উমর থেকে যা বর্ণনা করা হয়, তার অর্থ এটাই। তিনি বলেছেন, আফ্রিকিয়া তার অধিবাসীদের অন্তঃকরণ বিচ্ছিন্নকারী। এতে তার বিচিত্র গোত্রপ্রীতি ও গোত্রশক্তির আনুগত্যহীনতা ও অবাধ্যতার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তৎকালে ইরাক ও সিরিয়ার অবস্থা তদ্রূপ ছিল না। কারণ এ স্থানগুলোর সংরক্ষণকারী প্রায় সকলে ছিল পারসিক ও রোমীয় এবং তারা নির্বিশেষে পল্লী ও শহরের অধিবাসী। সুতরাং মুসলমানরা যখন তাদের উপর জয়ী হয়ে তাদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিল, তখন সেখানে আর বাধাদানকারী ও বিরোধী কেউ ছিল না। কিন্তু মাগরিবে বারবারদের অবস্থা এর বিপরীত, তাদের গোত্রসংখ্যা অগণিত। আবার এদের প্রতিটিই প্রান্তরবাসী একাধিক গোত্রপ্রীতি ও পরিবার সম্পন্ন। সুতরাং যখনই এদের একটি ধ্বংস হয়েছে, তৎক্ষণাৎ অন্য একটি এর স্থান গ্রহণ করে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। এ জন্যই আরবীয়দের পক্ষে মাগরিব ও আফ্রিকিয়ায় সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে।

বনি ইসরাইলের সময়ে শিরিয়ার অবস্থাও অনুরূপ ছিল। সেখানে একাধিক ফিলিস্তিনী কেনানী, বনি ইসু, বনি মদিয়ান, বনি লুত, রোমীয়, গ্রিক, আমালেকী, আক্রিকশ, নবতী প্রভৃতি এবং জজিরা ও মোশেলের দিকে প্রায় অগণিত গোত্র ও বিচিত্র গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল। এ জন্যই বনি ইসরাইলের জন্য সাম্রাজ্য স্থাপন ও শাসনব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের ব্যাপারটি কঠিন হয়ে পড়ে এবং বারংবার তাদের রাজ্যে শক্তি রূপ বদলাতে বাধ্য হয়। এ মতানৈক্য তাদের চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল; ফলে তাদের রাষ্ট্রশক্তি বারবার আন্দোলন ও বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছে। বস্তুত তারা তাদের সমগ্র শাসনকালব্যাপী কোনো সুসংবদ্ধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এমনিভাবে চলে তারা পারসিকদের নিকট, পুনরায় গ্রিকদের নিকট, আবার রোমীয়দের নিকট পরাজিত হয়ে শেষ পর্যায়ে বিতাড়িত হয়েছে। 'আল্লাহ তার ব্যাপারে সর্বজয়ী।'[১৩]

এর বিপরীত দিকে যে সকল স্থান একাধিক গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠী মুক্ত, তাতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সহজ এবং শাসনব্যবস্থাও গোলযোগ ও মতবিরোধের অভাবে অধিকতর সুশৃঙ্খল হয়ে থাকে। সেখানে সাম্রাজ্য খুব একটা গোত্রপ্রীতিজনিত শক্তিরও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। যেমন বর্তমানকালে মিশর ও সিরিয়ার অবস্থা। কারণ উক্ত স্থানগুলোতে গোত্র বা গোত্রপ্রীতির আধিক্য নেই, এমনকি কোনকালে সেখানে যে এগুলোর অস্তিত্ব ছিল, এও বলা যায় না, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। মিশর রাজ্য শান্তিপূর্ণ ও সুদৃঢ়; কারণ সেখানে বিদ্রোহী ও গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর সংখ্যাল্পতা। তাতে শুধুই সম্রাট ও প্রজা এবং তাদের রাজ্যব্যবস্থা তুর্কি শাসক ও তাদের গোত্রশক্তির দ্বারা একের পর এক পরিচালিত হচ্ছে। তাদের ক্ষমতা একই পরিধির মধ্যে এক উৎস থেকে অন্য উৎসে সংক্রমিত হচ্ছে মাত্র। খেলাফত নামে মাত্র আব্বাসী বংশধারার সাথে সংযুক্ত রয়েছে।

বর্তমানকালে আন্দালুসের অবস্থাও একই। তার বর্তমান সম্রাট ইবনুল আহমারের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকালীন গোত্রপ্রীতির শক্তি খুব বেশি ছিল না, এমন কি তা পর্যায়ক্রমিকভাবে সুদৃঢ়ও নয়। এটা শুধু আরবীয় একটি ঘরানার ও উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত জনশক্তির একটি সামান্য অংশ। এর ব্যাপারটি এ যে, যখন আন্দালুসবাসীদের উপর থেকে আরবীর সাম্রাজ্যের প্রভাব অপসৃত হল এবং বারবারদের লামতুনা আলমোহেদরা তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করল তখন তাদের নিকট তা খারাপ লাগত এবং তারা আনুগত্য স্বীকার করতে অসুবিধার সম্মুখীন হল। এর ফলে তাদের মনে প্রতিহিংসাপরায়ণতা জেগে উঠতে লাগল। আলমোহেদ নেতৃবৃন্দ তাদের শাসন আমলের শেষদিকে মারাকেশ নগরী অধিকারে আনার জন্য এবং ঐ সকল বিদ্রোহী জনগোষ্ঠীর প্রভাব বিস্তারের নিমিত্ত তাদের হাতে অনেকগুলো দুর্গ ছেড়ে দিলেন। এর ফলে সেখানে অবশিষ্ট আরবীয় ঘরানার গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীগুলো একত্র হতে সংযোগ পেল। এ জনগোষ্ঠী কিছুকাল পর্যন্ত নগর ও পল্লী জীবন থেকে

১৩. কোরান ১২, ২১।

সম্পূর্ণ দূরেই অবস্থান করছিল এবং গোত্রপ্রীতির মধ্যে তাদের একটা দৃঢ়তা বর্তমান ছিল। যেমন ইবনে হুদ, ইবনুল আহমার, ইবনে মর্দানীশ প্রমুখ ও অন্যান্য ব্যক্তি। সুতরাং ইবনে হুদ এ ব্যাপারে উদ্যোগী হলেন এবং পূর্বাঞ্চলে আব্বাসী সাম্রাজ্যের নামে মানুষের প্রতি আহ্বান জানালেন। এর ফলে সাধারণ মানুষ আলমোহেদদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং তাদের আনুগত্য ত্যাগ করে তাদেরকে বের করে দিল। এভাবে ইবনে হুদ আন্দালুসে স্বাধীন শাসক হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর পর ইবনুল আহমার এ ব্যাপারে উঠে দাঁড়ালেন এবং ইবনে হুদের বিরোধিতা করে আফ্রিকিয়ার আলমাহেদ নৃপতি ইবনে আবি হেফসের নামে লোকজনকে ডাক দিলেন। তিনি এ ব্যাপারে তাঁর কিছু সংখ্যক আত্মীয়, যাদেরকে 'সর্দার' নামে ডাকা হত, তাদের সহায়তায় সাফল্যলাভ করলেন। প্রাধান্য বিস্তারের জন্য খুব বেশি সংখ্যার প্রয়োজন হত না। কারণ আন্দালুসে গোত্রপ্রীতির শক্তি খুব বেশি কিছু ছিল না। তাঁদের অবস্থা ছিল সম্রাট ও প্রজার। অতঃপর ইবনুল আহমার সাগরের অপর পার হতে আগত জানাতী বিদ্রোহীদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চেষ্টা করলেন। এর ফলে তারা তাঁর অনুসারী হয়ে সীমান্ত অঞ্চল ও রাজ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থায় যোগ দিল। এমন সময় মাগরিবের জানাতী শাসকদের মধ্যে আন্দালুস বিজয়ের ইচ্ছা জেগে উঠলে পূর্বোক্ত জানাতীরা ইবনুল আহমারের পক্ষ হয়ে তাতে বাধাপ্রদান করল। এর ফল এ দাঁড়াল যে, ইবনুল আহমারের ভিত্তি দৃঢ় হল এবং মানুষ তাঁর প্রতি সদয় হয়ে উঠল। সুতরাং অন্য কারো পক্ষে তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণের সম্ভাবনা রইল না এবং এ জন্য বর্তমানকালেও তাঁর সন্তান-সন্ততিরা উক্ত সাম্রাজ্যের অধিকার ভোগ করছে। পাঠক, তাই বলে মনে করবেন না যে, এর পশ্চাতে গোত্রশক্তির কোনো দান নেই; বরং তাও আছে। যত কমই হোক না কেন, এ সাম্রাজ্যের প্রারম্ভে গোত্রশক্তির প্রভাব বিদ্যমান। কারণ আন্দালুসে গোত্রশক্তি ও গোত্রপ্রীতির স্বল্পতা থাকায় অল্প সংখ্যার দ্বারা প্রাধান্য বিস্তার সম্ভব হয় এবং গোত্রপ্রীতি খুব একটা ব্যাপক না হলেও চলে। 'আল্লাহ্‌র সমগ্র পৃথিবীতেও কোনো প্রয়োজন নেই।'[১৪]

১৪. কোরান ৩, ৯৭।

দশম পরিচ্ছেদ[১৫]

[রাজ্যশক্তির স্বভাব হল যাবতীয় গৌরব নিজের জন্য কুক্ষিগত করা]

এটা এ যে, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, রাজ্যশক্তি গোত্রপ্রীতির মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে এবং একই বংশের মধ্যে বহু গোত্রপ্রীতি পরস্পর মিলিত অবস্থায় বর্তমান থাকে। এদের মধ্যে যে কোনো একটি অন্য সবগুলো হতে শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। যাতে তা অন্যগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করে, বিজয়ী হয়ে অন্য সবগুলোকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে একক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। বস্তুত এ শক্তির সাহায্যেই মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে ওঠে।

এর অন্তর্নিহিত রহস্য এ যে, কোনো গোত্রের সাধারণ গোত্রপ্রীতি কোনো বস্তুর উপাদানগত মিশ্রণের সাথে তুলনীয়। এ মিশ্রণ উপাদানেরই সমষ্টি। যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, উপাদানগুলো যদি সমধর্মী হয় তা হলে মিশ্রণ আদৌ সংঘটিত হয় না। বরং তাদের মধ্যে একটি উপাদান প্রাধান্য বিস্তার করে অন্য সকলকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে মিলিয়ে একটি মাত্র গোত্রশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে উঠবে। অন্য সকল শক্তি তার অধীনে তারই মধ্যে বিরাজ করবে। এরূপ বৃহৎ গোত্রপ্রীতি যে-কোনো জাতির একটিমাত্র পরিবার ও নেতৃত্বের মধ্যেই ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে যে কোনো এক ব্যক্তি সকলের উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী নেতৃস্থানীয় হবে। এর মধ্যে গোত্রশক্তির সমগ্র উৎসের নেতৃত্ব বিরাজ করে। যখন এভাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্য নেতৃত্ব নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন জীব চরিত্রের অমোঘ বিধানে তার মধ্যে অহংকার ও আত্মশ্লাঘার ভাব জন্ম নেয়। এর ফলে সে তার অনুসারীদের সাথে আচার-আচরণে নিজের এ গৌরবের কোনো অংশ দিতে বা তাদেরকে শাসন ত্রাসনে সম অংশীদার ভাবতে অপমান মনে করে। এ সময়ে তার মধ্যে মানুষের স্বভাবগত একাধিপত্যের ভাব এসে শাসকের এককতার সাথে মিশে যায়। কারণ শাসক একক শক্তিসম্পন্ন না হলে সকল কিছুই নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। 'যদি তাদের মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো প্রভু থাকত, তা হলে তারা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেত'।[১৬]

এর ফলেই অন্যান্য গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের উচ্চাশাকে দমন করা হয় এবং রাজ্য পরিচালনার একক গৌরবের মধ্যে অন্য কারো অংশীদারিত্বের চেষ্টাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। ফলে তাদের মধ্যকার গোত্রপ্রীতি অনুরূপ আশা পোষণ করতে বিরত

---

১৫. রোজেনথাল এ একটি পরিচ্ছেদেই একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদের বর্ণনা একত্র করেছেন।

১৬. কোরান ২১, ২২।

থাকে। শাসক যতদূর সম্ভব সমুদয় শক্তি নিজের মধ্যে সংহত করে, সকল কিছু কুক্ষিগত করে নেয় এবং তাদের জন্য একটি উট বা উটনীও ছেড়ে দেয় না। এভাবে সে রাজ্যশক্তির সমস্ত গৌরব নিজের মধ্যে বহন করে এবং অন্যকে এর মধ্যে অংশগ্রহণে বাধা দেয়। কখনো এ অবস্থা সাম্রাজ্যের প্রথম শাসকের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করে, আবার কখনও বা গোত্রশক্তির প্রভাব ও প্রতিপত্তির তারতম্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শাসকের জন্য সম্ভব হয়। অবশ্য এটা এমন একটি বিষয়, সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য যার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। এটাই আল্লাহ্‌র প্রথা, যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। আল্লাহ্ উন্নত ও সর্ববিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী।

একাদশ পরিচ্ছেদ

[রাজ্যশক্তির স্বভাব হল বিলাসব্যসনে লিপ্ত হওয়া]

এটা এ যে, কোনো জাতি যখন অন্য জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তাদের অধীনস্থ সমুদয়ের উপর অধিকার লাভ করে, তখন তাদের ভোগ ও আরাম-আয়েশ বৃদ্ধি পেয়ে কিছু অভ্যাসের সৃষ্টি করে। তারা জীবনের প্রয়োজনীয় একান্ত ও স্থূল উপকরণ থেকে অপ্রয়োজনীয়, সুরুচিপূর্ণ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত উপকরণের দিকে অগ্রসর হয়। তারা এ ব্যাপারে পূর্বসূরিদের অবস্থা ও অভ্যাসের অনুকরণ করে থাকে। ফলে এ সকল অপ্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ ও ভোগ করতে কিছু সংখ্যক অভ্যাস গড়ে তুলতে হয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আহার্য, পরিচ্ছদ, শয্যা, বাসনকুশন প্রভৃতির সূক্ষ্মতা ও কোমলতা সৃষ্টি করে অহংকার প্রকাশ করতে অভ্যস্ত হয়। তারা অন্যান্য জাতির এ সকল বিষয়ে উত্তম আহার্য, চমৎকার পরিচ্ছদ, দুর্লভ বাহন প্রভৃতিতে অহংকার প্রকাশের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। তাদের পরবর্তী বংশধররাও সাম্রাজ্যের শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে পূর্বসূরিদের ধারা অনুসরণ করে। অবশ্য তাদের এ সকল ভোগসম্ভোগ রাজ্যশক্তির অনুপাতেই হয়ে থাকে। এভাবে তাদের বিলাসব্যসন সাম্রাজ্যের শক্তি অনুযায়ী শেষ সীমায় উপনীত হয়। তারা তাদের সামর্থানুসারে এ ব্যাপারে পূর্বসূরিদের অভ্যাসগুলো আত্মস্থ করে থাকে। এটাই বান্দাদের মধ্যে তাদের আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্ উন্নত ও সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

[রাজ্যশক্তির স্বভাব হল স্থিরতা ও শান্তি কামনা]

এটা এ যে, যে কোনো জাতির পক্ষে অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টা ব্যতীত রাজ্য লাভ হয় না এবং এ প্রচেষ্টার শেষ পর্যায় হল প্রাধান্যবিস্তার ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা। সুতরাং যে কোনো ব্যাপার শেষ পর্যায়ে পৌঁছলে তার জন্য সংগ্রামের তীব্রতা হ্রাস পায়। কবি বলেন,[১৭]

আমার ও তার মধ্যে সময়ের দ্রুততায় বিস্মিত হয়েছি;
অথচ আমাদের সম্পর্ক যখন চুকিল, সময়ও শান্ত হল।

সুতরাং যখন তারা রাজ্য লাভ করে, তখন তার জন্য এক সময়ে তারা যে কষ্ট স্বীকার করেছিল, তা আর করতে চায় না। বরং তার পরিবর্তে শান্তি, স্বস্তি ও স্থিরতাকে প্রাধান্য দেয় এবং রাজ্যাধিপতি হওয়ার ফল ভোগের জন্য সৌধ, বাসগৃহ ও পরিচ্ছদাদি তৈরিতে মনোনিবেশ করে। তারা প্রাসাদ তৈরি করে, জলের ফোয়ারা বহায়, উদ্যান রচনা করে এবং পার্থিব জীবনের সম্ভোগে লিপ্ত হয়। এভাবে পরিশ্রমের উপর বিশ্রামকে প্রাধান্য দিয়ে যথাসম্ভব পরিচ্ছদ, আহার্য, আসবাবপত্র ইত্যাদির ব্যাপারে পরিমার্জনায় প্রয়াসী হয়। তাদের উত্তরসূরিরাও এ অবস্থাকেই প্রিয় বলে মনে করে এ প্রাধান্য দেয়। এভাবে এটা তাদের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। বস্তুত তিনি যথার্থই উত্তম নির্দেশ প্রদানকারী। আল্লাহ্ই উন্নত ও সর্ববিষয়ে জ্ঞাতা।

---

১৭. কবি সপ্তম শতাব্দির আবু শকর আবদুল্লাহ ইবনে সলম আল হুজালী।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

[যখন রাজ্যশক্তির স্বভাব একক গৌরব, বিলাসব্যসন ও স্থিরতায় সুদৃঢ় হয়, তখনই সাম্রাজ্যে ক্ষয় দেখা দেয়]

এর বর্ণনায় কতিপয় কারণের উল্লেখ করা যায়।

প্রথম কারণ, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি, রাজ্যশক্তি একক গৌরবের অধিকারী হয়। অথচ এ গৌরব সমগ্র গোত্রশক্তিরই সম্পদ ছিল এবং তা অর্জন করতে তারা এক হয়ে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তারে ও অপরের আক্রমণ থেকে স্বার্থ সংরক্ষণে তারা আদর্শায়িত সংগ্রাম ও সংঘবদ্ধ শক্তির পরিচয় দিয়েছিল। তাদের সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল গৌরব লাভ। তারা এ গৌরবের ভিত্তি স্থাপনে মৃত্যুকে তুচ্ছ করেছে এবং তাকে নষ্ট হতে দেয়া অপেক্ষা নিজেদের ধ্বংস কামনা করেছে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে কেউ একজন যদি গৌরবের দাবিদার হয়ে বসে, তা হলে তাদের গোত্রপ্রীতি নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং তাদের শক্তি খর্ব হয়ে যায়। তদুপরি ঐ একক গৌরবের অধিকারী যখন সমস্ত সম্পদ নিজের কুক্ষিগত করে নেয়, তখন তারা যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রহণের শক্তি হারিয়ে ফেলে, তাদের উৎসাহ কমে যায় এবং তারা হীনমন্যতা ও দীনতার ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করে। তাদের পর দ্বিতীয় পুরুষও অনুরূপ মনোভাবেরই অধিকারী হয়। সম্রাটের দিক থেকে প্রদত্ত দানাদিকে তারা তাদের সাহায্য-সহায়তার পারিশ্রমিক বলে মনে করে। কারণ তাদের বুদ্ধিতে এর অধিক কিছু আসে না। এজন্য তাদের মধ্যে খুব অল্পই পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে সম্মত হয়। এ অবস্থা সাম্রাজ্যের জন্য নৈরাশ্য ও এর বীর্যবত্তার অভাবের প্রতিই ইঙ্গিত করে। এর ফলে তা ধীরে ধীরে দুর্বলতা ও ক্ষয়ের অধীন হতে থাকে এবং তার গোত্রপ্রীতি নষ্ট হওয়ার দরুন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোত্রশক্তি থেকে সংগ্রামের মনোভাব দূর হয়ে যায়।

দ্বিতীয় কারণ, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, রাজ্যশক্তি স্বভাতত বিলাসব্যাসনে লিপ্ত হয়ে থাকে। এর ফলে তাদের অভ্যাস বৃদ্ধি পায় এবং তাদের আয় থেকে ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে ওঠে। তারা যা পায়, তাতে তাদের কুলায় না, তাদের মধ্যে যারা নিঃস্ব, তারা মৃত্যুর সম্মুখীন হয় এবং যারা সম্পদশালী, তারা বিলাসব্যসনে তাদের প্রাচুর্য ব্যয় করে। তাদের পরবর্তী পুরুষগুলোতে এ অভ্যাস আরো বৃদ্ধি পায়, এমন কি এক সময়ে তারা সমগ্র আয়কেই বিলাসব্যসনের জন্য ব্যয় করে বসে। এমনি অবস্থায় যখন প্রয়োজন দেখা দেয়, তাদের সাম্রাজ্য যখন আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধবিগ্রহের ব্যয়ভার বহন

করতে তাদেরকে আহ্বান জানায়, তখন আর তারা পথ খুঁজে পায় না। তখনই তাদের মনে অত্যধিক করারোপের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা জেগে ওঠে। তারা অধিকাংশের নিকট থেকে সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে তা ভোগ করার ব্যাপারে নিজেদেরকে কিংবা নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও সাম্রাজ্যের কর্মীদিগকে প্রাধান্য দেয়। এভাবে তারা সাধারণ মানুষকে জীবনযাপনে দুর্বল করে ফেলে এবং পরিণামে তাদের দুর্বলতা সাম্রাজ্যের শক্তিকেই দুর্বল করে তোলে।

তদুপরি যখন কোনো সামাজ্যে বিলাসব্যসনের পরিমাণ বেড়ে যায়, তখন তাদের আয় অপেক্ষা ব্যয় ও খরচাদি অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। সাম্রাজ্যের অধিপতি তথা সম্রাট অতিরিক্ত আয়ের পথ খুঁজতে বের হয়, যাতে তাঁর প্রয়োজন মিটে এবং অস্বাভাবিক চাহিদা পূরণ হয়। অথচ প্রতিটি সাম্রাজ্যের করাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট, তা বাড়েও না, কমেও না। যদি নতুন কর ধার্য করে একে বাড়িয়েও দেয়া যায়, তথাপি এ বৃদ্ধিসহও তার একটা সীমা নির্ধারিত রয়েছে। এভাবে করাদির দ্বারা রাজকোষের অবস্থা বৃদ্ধি পেয়ে সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য কর্মচারীদের আর্থিক চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। কারণ তাদের জীবনেও বিলাসব্যসনজনিত খরচাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং তারা প্রয়োজনমত তা না পেলে বিরূপ হয়ে ওঠে এবং করারোপের পূর্বকালীন সহায়তা থেকে তারা দূরে সরে যায়। এভাবে ক্রমান্বয়ে বিলাসব্যসন বাড়ে এবং করারোপের পরিমাণও বাড়তে থাকে। এর প্রতিক্রিয়া সহায়ক শক্তি করতে থাকে। এভাবে তৃতীয় বার, চতুর্থ বার কমে সাম্রাজ্যের সৈন্যদল স্বল্পসংখ্যক হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রতিরক্ষা শক্তি ভেঙে পড়ে। সাম্রাজ্যের এ শক্তি হ্রাসের ফলে প্রতিবেশী অন্যান্য রাজ্য এর উপর চড়াও হয়ে বসে কিংবা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন গোত্রশক্তি ও গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠী ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় তৎপর হয়। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির জন্য ধ্বংসের যে বিধান রেখেছেন, তা এ সাম্রাজ্যের জন্যও সত্য হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে বিলাসব্যসন চরিত্রের মধ্যে নানাপ্রকার দোষ, শৈথিল্য ও বদভ্যাসের জন্ম দেয়; যেমন নগর সংস্কৃতি সম্পর্কীয় পরিচ্ছেদে এর বর্ণনা আসবে। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে সেই সচ্চরিত্র অন্তর্হিত হয়, যা একসময়ে তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠার যোগ্য গুণ ও নিদর্শন হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। তা ত্যাগ করে তারা যখন অসৎচরিত্রে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে, তখন স্বভাবতই ক্ষয় ও দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। আল্লাহ্র সৃষ্টিতে এ নিয়মই বিদ্যমান। ফলে সাম্রাজ্যে ধ্বংসের প্রারম্ভ সূচিত হয়ে তার অবস্থা বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে ক্ষয়ের সেই সুপ্রাচীন ব্যধি দেখা দেয়, যাতে মৃত্যু ঘনিয়ে আসে।

তৃতীয় কারণ, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি সাম্রাজ্যের স্বভাব হল স্থিরতা। যখন তারা শান্তি ও স্বস্তিকে প্রিয় চরিত্র হিসাবে গ্রহণ করে, তখন তা তাদের স্বভাব ও প্রকৃতির অন্তর্গত হয়ে পড়ে। সকল অভ্যাস ও প্রিয় বস্তুর এটাই পরিণাম। তাদের পরবর্তী অন্যান্য পুরুষ বংশধরও জীবনের প্রাচুর্য ও বিলাসের শান্তিময় শয্যায় শায়িত হয়ে বেড়ে ওঠে। তারা তাদের সেই বন্য জীবন, সেই প্রান্তরীয় অভ্যাসের অমোঘ সংগ্রামী শক্তি, যার কল্যাণে রাজ্যলাভ হয়েছিল, তাতে পরিবর্তন ঘটায় ও ভুলে যায়। সেই হিংস্রতার অভ্যাস, সেই দিগন্তহীন বিচরণ, সেই নির্জনতার গন্তব্য অন্বেষণ—সকল

কিছুই তাদের স্মৃতি থেকে অপসারিত হয়। তাদের মধ্যে আর নগরবাসী জনসাধারণের মধ্যে বৈভব ও ভূষণাদি ব্যতীত অন্য কোনো প্রভেদ থাকে না। এভাবে তাদের সহায়ক শক্তি দুর্বল হয়, সংগ্রামী চেতনা বিনষ্ট হয় এবং তাদের শৌর্য ধ্বংস হয়ে যায়। এর সমস্ত প্রতিক্রিয়াই সাম্রাজ্যের উপর পতিত হয়ে তাকে ক্ষয় করে আনতে থাকে। অথচ এ অবস্থাতেও তাদের বিলাসব্যসন, নগর জীবনের অভ্যাস, শান্তি, স্বস্তি এবং সামগ্রিক অবস্থায় সূক্ষ্ম রুচিবোধের কারুকার্য সৃষ্টির নিবৃত্তি হয় না। তারা এতেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে প্রান্তরীয় জীবনের স্থূলতা ও সারল্য থেকে দূরে সরে যায়। তারা সেই বীর্যবত্তার কথা ভুলে যায়, যা দিয়ে এক সময়ে সহায়তা ও প্রতিরোধ সম্ভব হয়েছিল। এ পর্যায়ে তারা সম্ভব হলে অন্যদের সাহায্য-সহায়তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পাঠক, আপনার পঠিত গ্রন্থাদিতে যে সকল সাম্রাজ্যের বিবরণ বিদ্যমান, তার সাথে আমাদের বক্তব্য মিলিয়ে দেখুন। আশাকরি নিঃসন্দেহে এটা সত্য বলে অনুভব করবেন।

অনেক সাম্রাজ্যেই এরূপ ঘটে যে, বিলাসব্যাসন ও স্বস্তির ফলে তার মধ্যে যখন ক্ষয় দেখা দেয়, তখন সাম্রাজ্যের অধিপতি অন্যজাতির লোকদের মধ্য থেকে সাহায্যকারী ও অনুসারী গ্রহণ করেন। তারা স্বভাবতই কঠোর জীবনের অধিকারী হয়। তাদেরকে সৈন্য হিসাবে নিয়োগ করলে যুদ্ধক্ষেত্রে ধৈর্য এবং বিপদ-আপদ ও অনাহারে অধিকতর স্থৈর্যের পরিচয় দিয়ে থাকে। এ ব্যবস্থা, আল্লাহ্‌র অন্যরূপ ইচ্ছা না হলে সাম্রাজ্যের উপর আপতিত ক্ষয়রোধের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ চিকিৎসার মতোই সুফল প্রসব করে। পূর্বাঞ্চলের তুর্কি সাম্রাজ্যে এটাই ঘটেছে। তাদের সৈন্যদলের অধিকাংশই তুর্কি আশ্রিত জনগোষ্ঠী। সুতরাং সম্রাটগণ ঐসকল ক্রীতদাসদের মধ্য থেকে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য গ্রহণ করেছেন, যাদেরকে নানাভাবে তাঁদের নিকট আনা হয়েছে। ফলে এরা যুদ্ধক্ষেত্রে অধিকতর ধৈর্য ও বিপদে-আপদে অধিকতর স্থৈর্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে। এদের পূর্বে উক্ত কাজে নিয়োজিত সম্রাটদের বংশধরেরা, যারা প্রাচুর্য ও সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে এ গুণাবলি লোপ পেয়েছিল। আফ্রিকিয়ার আলমোহেদ সাম্রাজ্যের অবস্থাও অনুরূপ। সেখানেও সম্রাটগণ জানাতী ও আরব-বেদুইনদের মধ্য থেকে অধিকতর সৈন্য সংগ্রহ করে থাকেন এবং সাম্রাজ্যের অধিবাসীদিগকে তাদের বিলাসব্যসনের অভ্যাসের জন্য এ কার্যে নিয়োগ করা হতে বিরত থাকেন। এর ফলে সাম্রাজ্যের মধ্যে ক্ষয়রোধক নতুন জীবনীশক্তির সঞ্চার হয়। আল্লাহ্ পৃথিবী এবং তার উপরিস্থিত সমুদয় কিছুর উত্তরাধিকারী।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যও ব্যক্তির ন্যায় স্বাভাবিক জীবনকালের অধীন]

জেনে রাখুন, চিকিৎসাবিদ ও জ্যোতিষীদের ধারণা অনুসারে মানুষের স্বাভাবিক জীবনকাল একশ বিশ বছর। এ সময় পরিধি জ্যোতিষীদের নিকট বৃহৎ চান্দ্র বছর বলে পরিচিত। মানব বংশধারার প্রতি পুরুষেই যুগসন্ধিক্ষণের অনুপাতে জীবনকালের তারতম্য ঘটে থাকে। এর ফলে উপরোক্ত সময় থেকে অধিকও হয়, আবার কমও হয়ে থাকে। কোনো কোনো যুগসন্ধিক্ষণে জীবনযাপনকারীদের বয়ঃসীমা একশ বছর, কারো পঞ্চাশ কারো আশি অথবা সত্তর বছর হয়। যুগসন্ধিক্ষণের প্রমাণাদি বিচার করে যে কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তি এ সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। এ জাতির বয়ঃসীমা ষাট থেকে সত্তর বছর, যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। স্বাভাবিক জীবনকাল একশ বিশ বছরের অধিক খুবই বিরল। বিশেষ ক্ষেত্রে নক্ষত্রবলয়ের বিশেষ প্রভাবের ফলেই এ প্রকার ব্যতিক্রমের সৃষ্টি হয়, যেমন হজরত নূহের ব্যাপারে হয়েছিল এবং আদ ও সামুদ জাতির খুব কম লোকের মধ্যেই এ ব্যতিক্রম লক্ষ করা গিয়েছিল।

কোনো সাম্রাজ্যের জীবনকালও একই। যদিও তাতে যুগসন্ধিক্ষণের অনুপাতে তারতম্য ঘটে থাকে, তথাপি তা সাধারণভাবে তিন পুরুষের অধিক স্থায়ী হয় না। এক পুরুষের জীবনকাল যে কোনো ব্যক্তির মাঝারি বয়ঃসীমার অনুরূপ। তা তার দৈহিক বৃদ্ধি ও পরিপূর্ণতার শেষ সীমা চল্লিশ বছর। আল্লাহ্ বলেন, যতক্ষণ না সে যথার্থভাবে শক্তিমান হয়ে ওঠে এবং চল্লিশ বছরে পৌঁছে।[১৮] এ জন্যই আমরা এক পুরুষের জীবনকাল এক ব্যক্তির বয়ঃসীমা বলে ধরেছি। এ ব্যাপারে তীহ প্রান্তরে বনি ইসরাইলের অবস্থান সম্পর্কে আমরা যে যৌক্তিকতা তুলে ধরেছি, তাতে কিছুটা সাহায্য পাওয়া যাবে। সেখানে চল্লিশ বছর অবস্থানের কারণ ছিল জীবিত একটি পুরুষের তিরোধন এবং তাদের স্থলে নতুন একটি পুরুষের আবির্ভাব, যারা হীনমন্যতা থেকে দূরে অবস্থিত ও তৎসম্পর্কে অনভিজ্ঞ। এর ফলেই আমাদের একব্যক্তির জীবনকাল হিসাবে একটি পুরুষের জীবনসীমা নির্ধারণ এর সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হয়েছে।

আমরা যে বলেছি কোনো সাম্রাজ্যের জীবনকাল তিন পুরুষের অধিক স্থায়ী হয় না, এর কারণ এ যে, প্রথম পুরুষ তাদের প্রান্তরীয় জীবনের স্থূলতা, বন্যতা, কঠোরতা, সাহসিকতা ও হিংস্রতার অভ্যাস পুরোপুরি ত্যাগ করতে সমর্থ হয় না এবং রাজ্যশক্তির গৌরবের মধ্যেও সকলের অংশীদারিত্বের পর্যায় তখনও কিছুটা অবশিষ্ট থাকে। এর

---

১৮. কোরান ৪৬, ১৫।

ফলে তাদের গোত্রপ্রীতির তেজবীর্য অটুট থাকে এবং তাদের ধার তীক্ষ্ণ, তাদের ভার ভীতিপ্রদ ও মানুষ সহজে তাদের বাধ্য হয়ে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষে এ অবস্থা পরিবর্তিত হয়। সেখানে রাজ্যশক্তি ও আরাম-আয়েশ তাদেরকে প্রান্তরীয়তা থেকে নাগরিকতায়, কঠোরতা থেকে বিলাস ও প্রাচুর্যে এবং গৌরবের অংশীদারিত্ব থেকে একক মর্যাদার দিকে নিয়ে যায়। অন্যরা এ ব্যাপারে উদাসীন হয়ে ওঠে, ফলে তারা সম্মানের দীর্ঘতা থেকে হীনমন্যতার হ্রস্বতায় নেমে যেতে থাকে। এর ফলে তাদের গোত্রপ্রীতি কিছুটা হ্রাস পায় এবং তাদের মধ্যে হীনতা ও দীনতা প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে। অবশ্য এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের মধ্যে পূর্বাবস্থার অনেক কিছুই বাকি থাকে। কারণ তারা প্রথম পুরুষের নিকটবর্তী হওয়ায় তাদের গৌরব অর্জনের প্রচেষ্টা, তাদের কষ্ট স্বীকার, তাদের সহায়তা ও প্রতিরোধের অনেক কিছুই স্বচক্ষে দেখেছে। সুতরাং তাদের পক্ষে পূর্বাবস্থা সম্পূর্ণ ত্যাগ করা সম্ভব হয় না। অবশ্য যা যাওয়ার, তা যায়ই। বরং তারা মনে মনে পূর্বপুরুষের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং অনেক সময় তারা সেই অবস্থায় আছে বলেও ধারণা করে। কিন্তু তৃতীয় পুরুষ, তারা সেই প্রান্তরীয় জীবনের স্থূলতা এমনভাবে ভুলে যায়, যেন তা কোনো কালে তাদের মধ্যে ছিল না। তারা গোত্রপ্রীতি ও আত্মমর্যাদার মধ্যে যে দাপটের ভাব বিদ্যমান, তার স্বাদ হারিয়ে ফেলে। প্রাচুর্য ও আরাম-আয়েশের মধ্যে অতিরিক্ত জড়িয়ে থাকার ফলে বিলাসব্যসন তাদের মধ্যে চরম সীমায় উপনীত হয়। তারা সাম্রাজ্যের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয় এবং নারী ও শিশুদের ন্যায় তার আশ্রয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে ওঠে। গোত্রপ্রীতি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। তারা পরস্পর সহায়তা, প্রতিরোধ ও অধিকারের কথা আর স্মরণ করতে পারে না। তারা মানুষের মধ্যে রাজকীয় বৈভব, পরিচ্ছদ, সংস্কৃতি ও অশ্বারোহণের ছদ্মবেশ ধারণ করে ঘুরে বেড়ায় মাত্র; অথচ যথার্থ অর্থে তাদের অধিকাংশই ভীরুতায় স্ত্রীলোকেরও অধম। যখন তাদের নিকট অধিকারের দাবি এসে উপস্থিত হয়, তা প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয় না। এমনি অবস্থাতেই সাম্রাজ্যাধিপতিরা তাদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য নবাগতদের দ্বারস্থ হয়। তারা আশ্রিতের সন্ধান করে এবং এমন জনগোষ্ঠীকে কর্মে নিয়োজিত করে যারা অন্তত কিয়ৎ পরিমাণে তার শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে। এভাবেই একদিন আল্লাহ্‌র নির্দেশে তার অন্তিমকাল এসে উপস্থিত হয় এবং সাম্রাজ্য তার সমস্ত বোঝাসহ ডুবে যায়। পাঠক, এ হল সেই তিন পুরুষ, যাদের মধ্যদিয়ে সাম্রাজ্য জীবন নিঃশেষ হয়, আপনি অবশ্যই লক্ষ করেছেন।

উপরোক্ত কারণেই বংশমর্যাদাও চতুর্থ পুরুষে এসে শেষ হয়, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, বংশগৌরব ও মর্যাদা চারপুরুষেই সীমাবদ্ধ থাকে। পাঠক, এ ব্যাপারে আমরা স্বাভাবিক, যথেষ্ট, সুস্পষ্ট এবং আমাদের পূর্ববর্তী প্রস্তাবনাসমূহের বর্ণনার প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থিত করেছি। আপনি যদি ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী হয়ে থাকেন, তবে অবশ্যই সত্যকে স্বীকার ও তৎসম্পর্কে চিন্তা করবেন।

এটাই সেই তিন পুরুষ, যাদের বয়সের সমষ্টি একশ বিশ বছর, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সাম্রাজ্য এ বয়ঃসীমার সামান্য অগ্র-পশ্চাৎ ব্যতীত একে খুব একটা অতিক্রম করে না; যদি না তাতে অধিকার চেতনার অভাবজনিত অন্য কোনো প্রভাব এসে পতিত

হয়। তখন তার ক্ষয় বাইরে হতে এসে তার উপর চড়ে বসে কেউ তাকে ডেকে আনে না। এমন কি যদি কেউ তা নিয়ে উপস্থিতও হয়, তা হলেও সাম্রাজ্যের মধ্যে কোনো প্রতিরোধকারী খুঁজে পাবে না। যখন তাদের অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসে, তখন এক ঘণ্টাও অগ্র-পশ্চাৎ করার শক্তি কারও থাকে না।[১৯]

এটাই ব্যক্তির বয়ঃসীমার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সাম্রাজ্যের জীবনকাল। এটা বৃদ্ধি পায়, স্থিতি লাভ করে এবং পুনরায় কমতে থাকে। এজন্য মানুষের মধ্যে এ একটি কথা অত্যন্ত সুপরিচিত যে, সাম্রাজ্যের বয়স এক শতাব্দী। এর একই অর্থ। পাঠক, একে বিবেচনা করুন এবং এটা থেকে একটি নিয়ম গড়ে তুলুন, যা দিয়ে আপনি যে কোনো বংশতালিকার ত্রুটি সংশোধন করতে পারেন। যদি কোনো বংশতালিকায় পুরুষের সংখ্যা নিয়ে আপনি সন্দেহে পতিত হয়ে থাকেন কিংবা তার মাধ্যমে অতীতের কোনো কাল পরিধিকে জানতে চান, তা হলে বংশের আরম্ভকাল থেকে প্রতি শতাব্দীর জন্য তিন পুরুষ হিসাবে গণনা করুন। যদি বর্তমানকাল পর্যন্ত এভাবে পুরুষের কাল বণ্টনে সমস্ত পুরুষ নিঃশেষ হয়ে যায়, তা হলে বুঝতে হবে তালিকাটি শুদ্ধ। আর যদি এক পুরুষ কম হয়, তা হলে বুঝতে হবে বংশ তালিকাটিতে ভুলে এক পুরুষ বাড়ান হয়েছে। অন্যদিকে যদি অনুরূপভাবে অধিক হয়, তা হলে এক পুরুষ পরে গেছে। এভাবে তাদের হিসাব থেকে আপনার পক্ষে বছরের হিসাবও বের করা সম্ভব হবে, যদি মোটামুটি তার পরিধি জানা থাকে। সুতরাং এভাবে বিবেচনা করে দেখুন, মনে হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুদ্ধ ফল পাওয়া যাবে। আল্লাহ্ দিবা-রাত্রির নির্ধারণ করে থাকেন।[২০]

---

১৯. কোরান।

২০. কোরান ৭৩, ২০।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যের প্রান্তরীয় অভ্যাস থেকে নাগরিক সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হওয়া]

জেনে রাখুন, এ সকল পর্যায়ে যে-কোনো সাম্রাজ্যের জন্য স্বাভাবিক। যে প্রাধান্য বিস্তারের ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়, তা একমাত্র গোত্রপ্রীতির মাধ্যমেই সম্ভব। কেননা তার মধ্যেই তীব্র সংগ্রামী চেতনা ও অভ্যস্ত হিংস্রতার অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং তার জন্য সাধারণভাবে প্রান্তরীয় জীবনের প্রয়োজন। এজন্যই সাম্রাজ্যের প্রাথমিক অবস্থা প্রান্তরীয় জীবন সংলগ্ন। অতঃপর যখন রাজ্যশক্তি স্থাপিত হয়, তখন তাকে অনুসরণ করে শান্তি ও সচ্ছলতা এসে দেখা দেবে। বস্তুত নাগরিক সংস্কৃতি বলতে বিলাসব্যসনের বৈচিত্র্য সম্পাদনকেই বোঝায়। তাতে নানা প্রয়োজনে, পথ ও মতের আকর্ষণে রন্ধন, পরিচ্ছদ, গৃহ, শয্যা, নির্মাণকার্য এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য প্রথা ও অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিল্পকর্মের উন্নতি বিধান করা হয়। অন্যদিকে তাদের প্রতিটির মধ্যে নতুনত্ব সৃষ্টি ও সূক্ষ্মতা বিধানের জন্য এমন অনেক শিল্প বিদ্যমান, যা পর্যায়ক্রমে একের পর এক এসে উপস্থিত হয়ে থাকে। মানুষের প্রবৃত্তি, রুচি ও বিলাসব্যসনের সম্ভোগের ক্ষেত্রে বিভিন্নতার জন্য এগুলো ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় এবং তৎসম্পর্কিত বিচিত্র অভ্যাসেরও জন্ম দেয়। এজন্যই সাম্রাজ্যে প্রান্তরীয় জীবনের সাথে সাথে নাগরিক সংস্কৃতির সূচনা অনিবার্য হয়ে ওঠে। কারণ রাজ্যশক্তির জন্য শান্তি ও স্বস্তির অবস্থা অবশ্যম্ভাবী।

সাম্রাজ্যের অধিকারীরা এ নাগরিক সংস্কৃতির ব্যাপারে সর্বদা পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যের অবস্থা-ব্যবস্থার অনুসরণ করে থাকে। তাদের অবস্থা এরই সাক্ষ্য প্রদান করে এবং এটা এ যে, পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে গ্রহণ করে। আরবীয়দের জন্য এটাই ঘটেছিল। তারা যখন জয়ের পর জয়ের মাধ্যমে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের অধিকারী হল এবং তাদের নারী-পুরুষকে নিজেদের অধীনস্থ করে নিল, তখনো তাদের মধ্যে নগর সংস্কৃতির কোনো বোধ জন্মায়নি। বর্ণিত হয় যে, তাদের সম্মুখে মিহি রুটি উপস্থিত করা হলে তারা তাকে ন্যাকড়া বলে ভেবেছিল এবং খসরুর রাজভাণ্ডারে কর্পূর পেয়ে তারা তাকে লবণ হিসাবে রুটির মধ্যে ব্যবহার করেছিল। এ প্রকার বহু উদাহরণ বিদ্যমান।

অতঃপর যখন তারা তাদের পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলোর অধিবাসীদিগকে নিজেদের দাসে পরিণত করল এবং তাদের ঘরদ্বারে তাদেরকে কর্মে নিয়োজিত করল, তখন তাদের মধ্য থেকে নগর সংস্কৃতিতে অভিজ্ঞরা তাদের কর্তব্য সম্পাদনের মধ্যদিয়ে

তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলল। সুতরাং তারা ঐ সকল অভ্যাসে, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিন্যাসে নিজেদের সচ্ছল অবস্থার সাথে মিলিয়ে বিচিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করল। এক সময়ে তারাও এ সকল ব্যাপারে চরম সীমায় উপনীত হল। তারাও নগর সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বিলাসব্যসনের চূড়ান্ত অবস্থাকে আয়ত্ত করে নিয়েছিল। নতুন নতুন আহার্য, পানীয়, পরিধেয়, নির্মাণকার্য, অস্ত্রশস্ত্র, শয্যা, বাসনপত্র এবং গৃহস্থালীর অন্য যাবতীয় তৈজসপত্র সৃষ্টিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এমনিভাবে উৎসবের দিনে, বিবাহ মজলিসে ও বাসর রাত্রে তাদের বিলাসিতা আশ্চর্য ঔজ্জ্বল্যে বিকশিত হয়ে উঠত। এ ব্যাপারে তারাও সীমা অতিক্রম করেছিল।

পাঠক, আলহাসান ইবনে সহলের কন্যা বুরানের সাথে সম্রাট আল মামুনের বিবাহ সম্পর্কে মাসউদী ও তাবারী এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ যে বর্ণনা দান করেছেন, তৎপ্রতি লক্ষ করুন। মামুন যখন নৌকায় করে সভাসদসহ বুরানের পিত্রালয়ে 'ফামুসসুল্হ' নামক স্থানে বিবাহের প্রস্তাব জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন আলহাসান তাদের জন্য কি পরিমাণ ব্যয় করেছিলেন। বুরানের বিবাহের সময়ইবা কত কি খরচ হয়েছিল এবং মামুনই বা তাকে কি দান করেছিলেন ও বাসররাত্রে কি দিয়েছিলেন। এ সব কিছু জানলে আপনি নিঃসন্দেহে বিস্মিত হবেন। তন্মধ্যে বিবাহের দিন আলহাসান ইবনে সহল মামুনের সভাসদদের জন্য একটি ভোজের ব্যবস্থা করেন। তাতেও তিনি প্রথম শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে উদ্যান ও সম্পত্তির দানপত্রে মিশক আম্বরের টুকরা জড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাদের ভাগ্য অনুসারে যার হাতে যা পতিত হয়েছিল তারই তিনি মালিক হয়েছিলেন। আলহাসান দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে দিনারের তোড়া বিতরণ করেছিলেন। তার প্রত্যেকটিতে দশ হাজার করে দিনার ছিল। তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে অনুরূপ দিরহামের তোড়া বিলিয়ে দেন। তদুপরি মামুন তাঁর গৃহে অবস্থানকাল পর্যন্ত তিনি এটা অপেক্ষাও বহুগুণ বেশি ব্যয় করেছিলেন।

ঐ বর্ণনায় আছে যে, মামুন বুরানকে বিবাহের যৌতুক হিসাবে বাসর রাত্রে একহাজার পদ্মরাগ মণি দিয়েছিলেন এবং আম্বারের যে মোমবাতিগুলো জ্বালিয়ে বাসর আলোকিত করেছিলেন, তাদের প্রতিটির ওজন ছিল একশ মণ। একমণ এক সমস্ত তিনভাগের দুই রিতলের[২১] সমান। তাকে এমন একটি শয্যা দিয়েছিলেন, যার আচ্ছাদনে স্বর্ণসূত্রের বুনট এবং মোতি ও চুনির কারুকার্য ছিল। মামুন তা দেখে বলেছিলেন, আল্লাহ্ আবু নাওয়াসকে ধ্বংস করুন। সে কি এ শয্যা দেখেই মদের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছিল!

তার ক্ষুদ্র বৃহৎ বুদ্বুদগুলো যেন, সোনার জমিনে ছড়ানো মুক্তমালা।

মামুন বিবাহ রাত্রির ভোজের জন্য যে পরিমাণ লাকড়ি রন্ধনশালায় সংগ্রহ করেছিলেন, তা মোট একশ চল্লিশটি খচ্চর পূর্ণ একটি বছর ধরে দিনে তিন বার বহন করে এনেছিল। এ সমুদয় লাকড়ি দুই রাত্রিতে শেষ হয়ে যায়। শেষে খেজুর শাখায় তেল ঢেলে রন্ধন করতে হয়েছিল। বাগদাদ থেকে বিশেষ অতিথিদিগকে যাতে দজলা

২১. একরিতল আধা সেরের সমান।

নদী পার করে আলমামুন নগরে সম্রাটের প্রাসাদে ভোজসভায় পৌঁছান যায়, তজ্জন্য মাঝিমাল্লাদিগকে নৌকা প্রস্তুত রাখতে আদেশ দেয়া হয়েছিল। এর ফলে নৌকার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ত্রিশ হাজার। এ সকল নৌকা সারাদিন ধরে লোক পারাপার করেছিল। এরূপ আরও বহু কাহিনী বিদ্যমান। তলিতেলার (টলেডো) আলমামুন ইবনে সিনুনের কাহিনীও অনুরূপ। ইবনে বাসসাম[২২] তাঁর 'আলযখিরা' নামক গ্রন্থে এবং ইবনে হেব্বান উক্ত কাহিনী বর্ণনা করেছেন। অথচ এরা সকলেই প্রান্তরীয় জীবনের প্রথম পর্যায়ে এ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অপারগ ছিল। কারণ তাদের জীবন যাপনের বিশেষ কৃচ্ছ্রতা ও সারল্যের অবস্থায় এ সকল উপকরণ এবং তৎসম্পর্কীয় শিল্পকর্মের কোনো অবকাশ ছিল না।

বর্ণিত আছে যে, হাজ্জাজ তাঁর কোনো সন্তানের খাৎনা করানোর সময় একটি ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানে কিছু গ্রাম্য সর্দার উপস্থিত হয়েছিল। তিনি তাদেরকে পারস্যবাসীদের ভোজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন, পারস্যের একটি বিরাট ভোজে উপস্থিত থাকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর। তখন সেই গ্রাম্য সর্দারদের একজন বলল, হ্যাঁ, হে সর্দার! আমি খসরুর প্রাদেশিক শাসকদের কোনো কোনো ভোজে উপস্থিত হয়েছি। তারা পারস্যবাসীদের জন্য ভোজের ব্যবস্থা করে সেখানে রৌপ্যনির্মিত দস্তরখানে স্বর্ণের বাসনে খাদ্য পরিবেশন করত। তাদের প্রত্যেকটিতে চারটি করে বাসন থাকত এবং চারজন পরিচারিকা তা বহন করে আনত। তাতে চারজন করে মেহমান অংশগ্রহণ করতেন এবং আহারের শেষে প্রত্যেকেই নিজ ব্যবহৃত বাসন ও পরিচারিকাসহ বিদায় হতেন। এটা শুনে হাজ্জাজ বললেন, হে বান্দা! গুটিকয় উট জবেহ করে ফেল এবং লোকজনকে খাওয়াও। এতে এ কথাই জানা গেল যে, তার পক্ষে অনুরূপ বিলাসিতা সম্ভব নয় এবং অবস্থা তাই ছিল।

এ প্রসঙ্গে বনি উমাইয়াদের দান ধ্যানাদির কথা উল্লেখ করা যায়। তারা আরবের ও প্রান্তরীয় জীবনের প্রথা অনুসরণ করে উটই ব্যবহার করতেন। অতঃপর বনি আব্বাস ও উবাইদী সম্রাটদের সময়, যেমন পাঠক জানতে পেরেছেন, প্রচুর ধনসম্পদ, পোশাকাদি এবং জিনিপোষসহ অশ্বাদি দান করা হত। আফ্রিকিয়ায় আগলাবীদের সাথে কুমাতাদেরও অনুরূপ অবস্থা ছিল। মিশরের বনি তুগাজের, আন্দালুসে ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের সাথে লামতুনাদের ও আলমোহেদদের এবং অনুরূপভাবে আলমোহেদদের সাথে জানাতীদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। একই অবস্থায় আরও অনেকের।

বস্তুত এভাবেই নগর সংস্কৃতি পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলো থেকে পরবর্তীগুলোতে সংক্রমিত হয়ে থাকে। পারস্যের সংস্কৃতি আরবীয় বনি উমাইয়া ও বনি আব্বাসের মধ্যে এবং আন্দালুসের বনি উমাইয়াদের সংস্কৃতি এ যুগে মাগরিবের আলমোহেদ ও জানাতীদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। বনি আব্বাসের সংস্কৃতি দায়লামীদের মধ্যে, তুর্কিদের মধ্যে, সলজুকীদের মধ্যে, মিশরের তুর্কি মামলুকদের মধ্যে এবং দুই ইরাকের তাতারীদের মধ্যে অনুসৃত হয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের আয়তন অনুসারেই এ

২২. আলী ইবনে বাস্‌সাম, মৃত্যুকাল ৫৪২ (১১৪৭/৪৮ খ্রি.) হি.।

সাংস্কৃতিক উপাদানের বিকাশ সাধিত হয়ে থাকে। কারণ নগর সংস্কৃতি বিলাসব্যসনকে অনুসরণ করেই গড়ে ওঠে এবং বিলাসিতার জন্য সম্পদ ও প্রাচুর্যের প্রয়োজন। সম্পদ ও প্রাচুর্য রাজ্য ছাড়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সম্রাটদের আধিপত্যের পরিধিই বৈশিষ্ট্যের নিয়ামক। কারণ এর অনুপাতেই সবকিছু ঘটে থাকে। পাঠক, এটা বিবেচনা করুন; চিন্তা করে দেখুন, সভ্যতায় এর উদাহরণ সত্য বলেই পাবেন। আল্লাহ্ পৃথিবী এবং তার সমুদয় কিছুর উত্তরাধিকারী এবং তিনিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যের প্রথমদিকে বিলাসব্যসন তাতে নতুন শক্তি সঞ্চারিত করে থাকে]

এর কারণ এ যে, যে কোনো গোত্রের জন্য যখন রাজ্যশক্তি ও বিলাসব্যসনের উপকরণ হস্তগত হয়, তখন তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক, সন্তানাদি ও সাধারণ অবস্থা বেড়ে যায়। এর ফলে গোত্রশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং আশ্রিত পোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত অনুসারীদের সংখ্যাও বহুগুণিত হয়। তাদের অধীনস্থ বিভিন্ন গোত্র শান্তি ও বিলাসের পরিবেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে তাদের শক্তিতে নতুন শক্তির সঞ্চার করে। কেননা এ সময়ে গোত্রশক্তির অন্তর্গত জনসংখ্যার অনুপাতেই শক্তির পরিমাণ নির্ধারিত হয়ে থাকে। অতঃপর যখন প্রথম পুরুষ ও দ্বিতীয় পুরুষ অতিবাহিত হয় এবং অনিবার্যভাবে সাম্রাজ্যের শক্তিতে ক্ষয় দেখা দেয়, তখন এ সকল আশ্রিত পোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিরা কিছুতেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়করণ ও সংস্থাপনের দিকটি রক্ষা করতে পারে না। কারণ এ ব্যাপারে তাদের কোনো হাত নেই। তারা একমাত্র সেই ভিত্তির উপর নির্ভরশীল সাহায্যকারী হিসাবেই এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। সুতরাং ভিত্তিই যখন দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে, তখন তার শাখা-প্রশাখায় সেই দুর্বলতা সংক্রমিত হয় এবং ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। সাম্রাজ্যের পূর্বশক্তি অটুট থাকে না।

পাঠক, আরবের ইসলামী সম্রাজ্যের ঘটনাবলির সাথে এ বক্তব্য বিবেচনা করুন। নবুয়ত ও খেলাফতের সময়, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি, মুজার ও কাইতানের সম্মিলিত আরবের জনসংখ্যা ছিল একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার বা তার প্রায় নিকটবর্তী। অতঃপর যখন তাদের সাম্রাজ্যে বিলাসব্যসন চরম সীমায় পৌঁছল, তখন জনসংখ্যার বৃদ্ধিও তার অনুপাতেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এর সঙ্গে সম্রাটগণ আশ্রিত, পোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন। ফলে এ সংখ্যা আরো বহুগুণিত হয়ে দেখা দিল। বলা হয়, সম্রাট আলমুতাসিম আমুরিয়া বিজয় করে সেখানে প্রবেশকালে তাঁর সাথে জনসংখ্যা ছিল নয় লক্ষ। তাঁদের সাম্রাজ্যের নিকট ও দূরের সীমান্তে অবস্থানরত, রাজধানী রক্ষার কাজে ব্যাপৃত এবং আশ্রিত পোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর হিসাব ধরলে এ সংখ্যা অসম্ভব বলে মনে হয় না। মাসউদী বলেন, সম্রাট মামুনের সময় মতামতের ঐক্যের প্রয়োজনে বনি আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরদের সংখ্যা গণনা করা হয়েছিল। তারা নারী-পুরুষ মিলিয়ে ত্রিশ হাজার হয়েছিল। পাঠক, লক্ষ করুন, দুইশ বছরের কম সময়ে তারা এ সংখ্যায় পৌঁছেছিল এবং জেনে রাখুন, এর কারণ সাম্রাজ্য লাভের ফলে তাদের মধ্যে যে প্রাচুর্য ও আরাম আয়েশ দেখা দিয়েছিল, তার মধ্যে পুরুষ পরম্পরায় লালিত হয়ে এরূপ বেড়ে উঠেছিল। তা না হলে বিজয়াদির প্রথম দিকে আরবীয়দের সংখ্যা এরূপ ত নয়ই, এমনকি এর ধারে-কাছেও ছিল না। আল্লাহ্ই সর্বস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞাতা।[২৩]

---

২৩. কোরান ৯৫, ৮৬; ৩৬, ৮১।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যের বিভিন্ন পর্যায় ও তার অবস্থাসমূহের বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন পর্যায়ে অধিবাসীদের চরিত্রগত পরিবর্তন]

জেনে রাখুন, যে কোন সাম্রাজ্য বিভিন্ন পর্যায় ও নব নব অবস্থার মধ্য দিয়ে জীবনকাল অতিক্রম করে। তার অধিবাসীরা প্রত্যেক পর্যায়ে সেই পর্যায়ের অবস্থা অনুসারে বিশেষ চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকে এবং অন্য কোনো পর্যায়ের সাথে এর কোনো মিল থাকে না। কারণ চরিত্র সর্বদাই অবস্থা বিশেষের মেজাজ অনুসারে নিজের স্বভাব গড়ে তোলে। সাধারণভাবে যে কোনো সাম্রাজ্যের পর্যায় ও অবস্থাসমূহ পাঁচটি স্তরে ভাগ করা যায়।

প্রথম পর্যায়, বিদ্রোহের দ্বারা বিজয়। সমস্ত প্রতিরোধ-প্রতিবন্ধকের উপর প্রভাব বিস্তার করে রাজ্যের উপর আধিপত্য স্থাপন এবং পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যের সমুদয় কিছুর অধিকার নিজেদের কুক্ষিগত করা। এ পর্যায়ে রাজ্যাধিপতি তাঁর গোত্রের আদর্শস্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃত হন। কেননা তাঁরাই নেতৃত্বে তাদের জন্য গৌরব, ধনভাণ্ডার, প্রতিরোধ ও সহায়তার একটি বিশেষ অবস্থা লাভ হয়েছে। এ পর্যায়ে গোত্রপ্রীতির অমোঘ আকর্ষণে সকলেই এ বোধের অংশীদার হয়। সম্রাটও এর অন্যথা করেন না। কারণ এ গোত্রপ্রীতির সাহায্যেই বিজয় সম্ভব হয়েছে। এ পর্যায়ে গোত্রপ্রীতির জমজমাট অবস্থা বিদ্যমান থাকে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্রাট স্বগোত্রীয়দের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এককভাবে সাম্রাজ্য গৌরবের অধিকারী হতে চান এবং অন্যদেরকে তার সমভাগিত্ব ও অংশীদারিত্ব থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। এ পর্যায়ে সম্রাট আশ্রিতপোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সহায়তা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন এবং তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে স্বগোত্রীয়দের প্রাধান্য বিস্তারের পথ, বংশ গৌরবের অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টা ও রাজ্যশক্তিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা রুদ্ধ করেন। তিনি তাদেরকে বৈষয়িক ব্যাপারে বাধা দেন, সুযোগ-সুবিধা লাভে বঞ্চিত করেন এবং তাদেরকে তাঁর প্রতি আনুগত্যের বিষয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর হন। ফলে সাম্রাজ্যের সকল গৌরব তাঁর পরিবারে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তাঁকেই এ গৌরবের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করা হয়। এর ফল এ দাঁড়ায় যে, সম্রাট স্বগোত্রীয়দের প্রতিরোধ করতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকালীন শক্তি অপেক্ষাও অধিক শক্তি ব্যয় করে থাকেন। কারণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকালে তাঁর পূর্বসূরিরা একত্র হয়ে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তখন সমস্ত গোত্রের সহায়তা তাদের পশ্চাতে ছিল। আর

ইনি স্বীয় গোত্র ও নিকট আত্মীয়দেরকেই প্রতিরোধ করেন এবং তাঁর পশ্চাতে দূরাগত কিছু সংখ্যক লোক সহায়ক হিসাবে দাঁড়ায়। সুতরাং এ ব্যাপারটি অতিশয় কঠিন হয়ে দেখা দেয়।

তৃতীয় পর্যায় শান্তি ও সচ্ছলতার যুগ। কারণ সাম্রাজ্যের ফসল তখন উঠতে আরম্ভ করেছে এবং মানব-প্রকৃতির অমোঘ বিধানে সম্পদ সংগ্রহ ও তার নিদর্শন স্থাপনের কাল আরম্ভ হয়েছে। রাজ্যশক্তির কথা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে, ধনভাণ্ডারে প্রশস্ততা দেখা দিয়েছে, আয়-ব্যয়ের যথার্থতা সংরক্ষিত হচ্ছে এবং ব্যয়ের পরিধি ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তখনই বৃহৎ দরবারকক্ষ, বিরাট অট্টালিকা, প্রশস্ত নগরী ও বিপুলায়তন স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সময়। এ সময়ে বিভিন্ন জাতি থেকে আগত সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দকে উপঢৌকন এবং গোত্রপতিদেরকে দান ধ্যান করার প্রয়োজন দেখা দেয়। সৎ ব্যক্তিদেরকে উৎসাহ দান, কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি ও সভাসদদেরকে ধন-সম্পদ ও সম্মান-সৌভাগ্যের অধিকারী করা এবং সৈন্যদলকে যথানিয়মে দেখাশোনা ও তাদের রুজি বৃদ্ধি করার দরকার হয়। এভাবে তাদের সকলের প্রতি মাসে যথানিয়মে বেতনাদি প্রদান করায় উক্ত সম্পদের নিদর্শন তাদের আচার-আচরণ ও পোশাকাদিতে ফুটে ওঠে। বিশেষ করে উৎসবের দিনে তাদের এ প্রদর্শনী শান্তিপ্রিয় অন্যান্য সাম্রাজ্যের মনে হিংসার উদ্রেক এবং যুদ্ধপ্রিয় সাম্রাজ্যের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। অবশ্য সম্রাটের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার এটাই শেষ পর্যায়। কারণ এ পর্যায়ের সমস্তকাল জুড়েই সম্রাটগণ নিরঙ্কুশ মতামত প্রকাশ, গৌরব বৃদ্ধি ও পরবর্তীদের জন্য আদর্শ স্থাপনের সুযোগ লাভ করে থাকেন।

চতুর্থ পর্যায় সন্তুষ্টি ও স্বস্তির কাল। কারণ এ পর্যায়ে সম্রাট তাঁর পূর্বসূরিরা তাঁর জন্য যে গৌরবের অবদান রেখে গেছেন, তৎপ্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ এবং তাঁর প্রতি বিভিন্ন রাজ্যের সমীহভাবের ফলে একটা স্বস্তির মনোভাব পোষণ করেন। এর ফলেই এ পর্যায়ে পূর্বসূরিদের আনুগত্য বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন কাজে সম্রাট যথাযথভাবে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে থাকেন। এরূপ করতে গিয়ে তাঁদের প্রদর্শিত পথকে সৎপথ এবং তার অন্যথাকে সাম্রাজ্যের হানিকর বলে ধারণা করেন। কারণ, সম্রাট ভাবেন, যারা এ গৌরবের প্রতিষ্ঠা করেছেন; তাঁরা অবশ্যই তার শুভাশুভ বিবেচনা করেছেন।

পঞ্চম পর্যায় অপচয় ও অপব্যয়ের কাল। এ পর্যায়ে সম্রাট তাঁর পূর্বসূরিদের সঞ্চিত সম্পদ প্রবৃত্তির তাড়নায়, আপাত মধুর প্রলোভনে, অনুগত ও সভাসদদের মধ্যে দান-ধ্যানে এবং উচ্ছৃঙ্খল ও অসৎচরিত্র বন্ধু-বান্ধবের আকর্ষণে অমিতব্যয়ের অনুসারী হয়ে ওঠেন। এ পর্যায়ে সম্রাটগণ এমন বিরাট বিরাট কাজে হাত দেন, যার ব্যয় বহন করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। এরূপ কাজে তাঁদের কি লাভ বা ক্ষতি হবে, সেই বোধও তাঁরা হারিয়ে ফেলেন। এর ফলে তাঁদের সহায়ক বয়োবৃদ্ধরা বিরক্ত হন ও নিষ্ঠাবান কর্মীরা ত্যাক্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরা সম্রাটগণকে ঘৃণা করতে থাকেন এবং তাদের সহায়তা করতে তাঁরা লজ্জাবোধ করেন। এর ফলে সৈন্যদলের নিয়মিত বেতন প্রদান না করার ফলে তাদের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দেয়। কারণ সম্রাট নিজ খেয়ালখুশি চরিতার্থ করতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন, তদ্দরুন প্রয়োজনীয় ব্যয় সংকোচ অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং

কর্মী ও সৈন্যদলের নিকট মুখ রক্ষা করার মত অবস্থা আর থাকে না। এমনভাবে সম্রাট তাদের সাহচর্য হারান এবং পূর্বসূরিরা যে ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন, তা ধ্বংস করতে থাকেন ও সমগ্র সৌধই ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এ পর্যায়েই সাম্রাজ্যের ক্ষয় দেখা দেয় এবং তাতে সেই প্রাচীন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে, যা থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই। কারণ তা ক্রমশ বৃদ্ধিই পেতে থাকে এবং এক সময়ে সমূলে ধ্বংস ডেকে আনে। আমরা পরবর্তী পর্যায়ে এর সাথে সংশ্লিষ্ট অবস্থাদি বর্ণনার সময় এ সম্পর্কে আলোচনা করব। আল্লাহ্‌ই উত্তম উত্তরাধিকারী।[২৪]

২৪. কোরান, ২১, ৮৯।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

[প্রতিটি সাম্রাজ্যের মৌল শক্তির অনুপাতেই স্মৃতি নিদর্শন স্থাপিত হয়ে থাকে]

এর কারণ এ যে, স্মৃতি নিদর্শন শক্তির অনুপাতেই হয় এবং যে শক্তির দ্বারা সাম্রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল, তাই এ অনুপাতের নিয়ামক। এ থেকেই সাম্রাজ্যের বিরাট অট্টালিকা এবং বিপুলায়তন সৌধাদি নির্মিত হয়ে থাকে এবং তার আকৃতিই সাম্রাজ্যের মৌল শক্তির পরিচয় বহন করে। কারণ এ প্রকার নির্মাণ কাজে অধিক সংখ্যক কর্মী ততোধিক সহায়তা ও সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নয়। সুতরাং সাম্রাজ্য যদি সুবিস্তৃত হয়, বহু দেশ ও অঞ্চল থাকে, তা হলে তাতে কর্মীর সংখ্যাও অধিক হয়ে থাকে। তারা চতুর্দিক থেকে এসে সমবেত হয় এবং একযোগে বৃহৎ নির্মাণাদির কাজ সুসম্পন্ন করে তালে।

পাঠক, আপনি কি আদ ও সামুদ জাতির নির্মাণ কাজ দেখতে পান না? কোরান তাদের কথা বর্ণনা করেছে। খসরুর দরবার গৃহের প্রতি লক্ষ করুন, পারস্যবাসীরা তার মধ্যে কী দর্শনীয়ভাবেই না তাদের শক্তির পরিচয় রেখে গেছে! এমনকি সম্রাট হারুনুর রশীদ তা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি তা নিশ্চিহ্ন করার কাজ আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু দুর্বলতা এসে তার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে ইয়াহিয়া ইবনে খালিদের সাথে তাঁর পরামর্শের কাহিনী সকলেরই জানা আছে। কীভাবে একজাতি যা নির্মাণ করেছিল, অন্যজাতির পক্ষে তা ভেঙে ফেলাও সম্ভব হল না। অথচ নির্মাণ করা থেকে ধ্বংস করা যে সহজতর, তা অবধারিত সত্য এবং এ থেকেই দুটি সাম্রাজ্যের পার্থক্যও দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। পাঠক, দামেশকে অবস্থিত ওলিদের প্রাসাদ; কর্ডোভায় অবস্থিত বনি উমাইয়াদের জামে মসজিদ ও তার নদীর উপরিস্থিত সেতু; এরূপ কার্থেজে জল সরবরাহের জন্য নির্মিত স্তম্ভাদিসহ পয়ঃপ্রণালী; মাগরিবের 'শেরশাল' (চার্চিল) স্মৃতিচিহ্নসমূহ এবং মিশরের পিরামিডের প্রতি লক্ষ করুন। এরূপ আরো বহু নিদর্শন বিদ্যমান, যা দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে থাকে। আপনি তা থেকে যে-কোনো সাম্রাজ্যের শক্তি ও দুর্বলতার পরিচয় লাভ করতে পারবেন।

জেনে রাখুন, প্রাচীনকালের এ সকল কীর্তি একমাত্র স্থাপত্যকৌশল, কর্মীর সম্মিলন ও অত্যধিক শ্রমের বিনিময়েই সম্ভব হয়েছে। এভাবেই তারা এ সকল বিরাট সৌধ ও অট্টালিকা গড়ে তুলেছেন। আপনি কখনই অনুরূপ ধারণা পোষণ করবেন না, যেমন সাধারণ মানুষ পোষণ করে থাকে যে, তাঁদের দেহের আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি বিরাট হওয়ার জন্যই তাঁরা এ সকল কর্ম সম্পাদন করতে পেরেছেন। অট্টালিকা ও সৌধাদির স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে যে ধরনের পার্থক্য দেখা যায়, মানুষের দৈহিক আকৃতিতে অনুরূপ

কোনো বিরাট পার্থক্য নেই। একমাত্র গল্পকাররাই এ ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহ দেখিয়ে অতিরঞ্জনের প্রয়াস পেয়েছে। তারা আদ, সামুদ ও আমালেকীদের সম্পর্কে এ ব্যাপারে জঘন্য মিথ্যার বর্ণনাদান করেছে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত হল উজ ইবনে উনাকের বর্ণনা। এ ব্যক্তি আমালেকীদেরই একজন, যাদেরকে বনি ইসরাইলরা সিরিয়াতে হত্যা করেছিলেন। তাদের ধারণা, এ উজ এত দীর্ঘ ছিল যে, সে সমুদ্র থেকে মাছ ধরে সূর্যের দিকে তা বাড়িয়ে ধরে তার তাপ থেকে ভেজে নিত। এতে তারা মানুষের অবস্থা সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে মূর্খতা বিদ্যমান, তাকেই গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থা সম্পর্কে তাদের মূর্খতার সাথে মিলিয়ে বাড়িয়ে তুলেছে মাত্র। তাদের ধারণা, সূর্যের উত্তাপ আছে এবং তার যত নিকটবর্তী হওয়া যায়, ততই উত্তাপ বাড়ে। তারা জানে না যে, সূর্যের উত্তাপ হল তার কিরণ এবং এ কিরণ পৃথিবীর উপর পতিত হয়ে প্রতিবিম্বিত হওয়ার ফলেই উত্তাপ দেয়। কিন্তু শুধু কিরণ এরূপ নয়। বরং যতই পৃথিবীর নিকটবর্তী হয়, ততই প্রতিবিম্বনের জন্য উত্তাপ বহুগুণিত হয়ে ওঠে। যখন এ কিরণমালা প্রতিবিম্বহীন অবস্থায় বিকিরিত হয়, তখন সেখানে কোনো উত্তাপ থাকে না; বরং শৈত্য দেখা দেয়। এ জন্য সেখানে মেঘমালা ঘুরে বেড়াতে পারে। বস্তুত সূর্য নিজে উত্তপ্তও নয়, শীতলও নয়; বরং অমিশ্র জ্যোতির্ময় বস্তুপুঞ্জ মাত্র, যাতে কোনো মিশ্রণের প্রভাব নেই।

অনুরূপভাবে উজ ইবনে উনাক সম্পর্কে তারা যে বর্ণনা দিয়েছে যে, সে আমালেকী অথবা কেনানীদের অন্তর্গত ছিল, যারা বনি ইসরাইলের শিকারে পরিণত হয়। অথচ বনি ইসরাইলের দীর্ঘতম ব্যক্তি ও তাদের দৈহিক গঠন সেকালে আমাদেরই অনুরূপ ছিল। এ ব্যাপারে বয়তুল মুকাদ্দসের প্রবেশদ্বারগুলোই সাক্ষ্য দেয়। এগুলো যদিও বহুবার নষ্ট হয়েছে এবং পুনরায় নির্মাণ করা হয়েছে, তথাপি তা তাদের পূর্ব গঠন ও পরিমাপ অনুযায়ীই করা হয়েছে। সুতরাং উজ ও তার সমসাময়িক লোকদের মধ্যে এতদূর বিরাট পার্থক্য কি করে সৃষ্টি হতে পারে! এ ব্যাপারে তাদের ভুল হবার একমাত্র কারণ, তারা প্রাচীনকালের কর্মটিকেই বিরাট বলে ভেবেছে, কিন্তু তা সম্পন্ন করতে সাম্রাজ্য শক্তির যে সম্মিলন ও সহায়তা ক্রিয়াশীল ছিল, তৎসম্পর্কে মোটেও চিন্তা করেনি। তদুপরি তাতে যে স্থাপত্য কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে, যার ফলে এমন বিরাট কর্ম সুগঠিতভাবে শেষ হয়েছে, তাও ভাবেনি। সুতরাং তারা সবকিছু দৈহিক বিরাটত্ব ও তার শক্তির প্রাচুর্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। অথচ প্রকৃত অবস্থা এর বিপরীত।

মাসউদীও অনুরূপ ধারণা পোষণ করে দার্শনিকদের মত উল্লেখ করেছেন। তাতে শুধু একটা ধারণাই প্রকাশ পেয়েছে, যার কোনো ভিত্তি নেই; বরং তা একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত মাত্র। তা এ যে, যে সকল স্বাভাবিক উপাদান দৈহিক গঠনে ক্রিয়াশীল, যখন আল্লাহ্ সৃষ্টি কার্য আরম্ভ করেছিলেন, তখন তারা পূর্ণস্থিতি ও শক্তিতে বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই তৎকালীন জীবনকাল দীর্ঘতম এবং দেহাদি এ স্বভাবের কারণেই অত্যন্ত সুগঠিত ছিল। কারণ মৃত্যু হল এ সকল স্বাভাবিক শক্তির শৈথিল্যের প্রতিক্রিয়া। সুতরাং এ সকল উপাদান যদি শক্তিশালী হয়, তা হলে জীবনকালও দীর্ঘ হবে। কাজেই পৃথিবী তার প্রথম সৃষ্টিকালে পূর্ণজীবন ও পরিপূর্ণ দেহের অধিকারী ছিল। অতঃপর এ সকল

উপাদানের শক্তি হ্রাসের ফলে ক্রমাগত কমে বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে এবং এভাবে হ্রাস পেতে পেতে একদিন তা পৃথিবীর সাথে বিনাশপ্রাপ্ত হবে।

এটা এমন একটি মত, পাঠক, নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, যার কোনো কারণ নেই; বরং তা একটি সাধারণ ধারণা মাত্র। এর কোনো স্বাভাবিক কার্যকারণ নেই, কোনো প্রামাণ্য হেতু নেই। আমরা প্রাচীন জনসমাজের নির্মিত অট্টালিকা, সৌধ, বসতি ও আবাসস্থলে তাদের বসবাসের স্থান, দ্বার ও পথ দেখতে পাই; যেমন পর্বতের নিরেট পাথর কেটে তৈরি সামুদ জাতির আবাসস্থল, তার গৃহগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং প্রবেশদ্বার সংকীর্ণ। হজরত মুহম্মদ (সঃ) এগুলোকেই তাদের আবাসস্থল বলে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি তার পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং ঐ পানির দ্বারা যে আটা গোলা হয়েছিল, তা ফেলে দিতে বলেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন, যারা স্বীয় আত্মার প্রতি অবিচার করেছে, তোমরা তাদের ঘরের দ্বারে প্রবেশ করো না।[২৫] অবশ্য অশ্রুপাত করতে করতে যেতে পার, যেন তাদের উপরে আপতিত বিপদ তোমাদের উপরে না আসে। এরূপ আদ, মিশর, সিরিয়া এবং পূর্ব-পশ্চিমে সমগ্র পৃথিবীর অবস্থা। সত্য তাই, যা আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি।

সাম্রাজ্যের নিদর্শনাবলির মধ্যে বিবাহ ও উৎসবাদিতে তাদের ব্যয়ও ধরা যায়। যেমন আমরা বোরানের বিবাহ ভোজ, হাজ্জাজের উৎসব ও ইবনে যুন্নুনের কথা বলেছি। এ সকলের বর্ণনা পূর্বে গত হয়েছে।

এ নিদর্শনাবলির মধ্যে দান-ধ্যানাদিও বর্তমান এবং তা সাম্রাজ্যের শক্তির অনুপাতেই হয়ে থাকে। তাতে ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিলেও এ ব্যাপারে তাদের শক্তির চিহ্ন প্রকাশ পায়। কারণ সম্রাটদের ইচ্ছাগুলো তাদের সাম্রাজ্য শক্তি ও মানুষের উপর প্রাধান্য বিস্তারের অনুপাতেই হয়ে থাকে এবং এ বাসনা-কামনা সাম্রাজ্যের অন্তিমকাল পর্যন্ত তাদের সঙ্গী হয়। পাঠক, এ ব্যাপারে কোরায়েশ প্রতিনিধিদলের প্রতি প্রদত্ত ইবনে মি ইয়ামেনের উপঢৌকনাদির কথা বিবেচনা করতে পারেন। কেমন করে তিনি তাদের প্রত্যেককে দশ রিতল স্বর্ণ, রৌপ্য এবং দশটি করে দাস ও দাসী দান করেছিলেন। তদুপরি প্রত্যেককে একপাত্র করে মিশকে আম্বর দেন। আব্দুল মুত্তালিবকে এর দশগুণ অতিরিক্ত প্রতিটি বস্তুই দান করেছিলেন। অথচ তাঁর রাজ্যটি তখন শুধু ইয়ামেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং পারস্য সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। এ কাজে তাঁর নিজের সাহসই তাঁকে পথ দেখিয়েছে। কারণ তাঁর জাতি তুব্বাদের একসময়ে পৃথিবীর উপর আধিপত্য এবং দুই ইরাক, হিন্দ ও মাগরিবের বিভিন্ন জাতির উপর প্রভুত্ব ছিল। আফ্রিকিয়াতে সিনহাজাদের অবস্থাও এরূপ তারাও তাদের নিকট আগত জানাতী সর্দারদের প্রতিনিধিদলকে বোঝা বোঝা ধনসম্পদ, পেটরাভর্তি পোশাকাদি ও উত্তম জাতের অনেকগুলো ঘোড়া দান করেছিলেন। ইবনে রফীকের ইতিহাসে এ সম্পর্কে বহু ঘটনা বিদ্যমান। এরূপ বারমেকীদের দানধ্যান ও ব্যয়াদি সম্পর্কে বলা যায়। তারা যখন কোনো নিঃস্বকে দান করতেন, তার অর্থ একদিনে বা অর্ধদিনে ব্যয় হয়ে যায় এরূপ সম্পদ নয়; বরং তাদেরকে এমন সম্পদ ও প্রাচুর্য দান করতেন, যা জীবনের শেষ পর্যন্ত

২৫. বোখারী (২য়) দ্র:।

থাকত। এ ব্যাপারে তাঁদের বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং সাম্রাজ্যের শক্তি অনুপাতেই তা সংঘটিত হয়েছে। এ ব্যাপারে, জওহর আস্‌সক্‌লী আলকাতেব উবাইদী সৈন্যদলের সেনাপতি যখন মিশর বিজয়ে বহির্গত হলেন, তখন কায়রোয়ান থেকে হাজার বোঝা ধনসম্পদ নিয়ে এসেছিলেন, যা অদ্যাবধিও নিঃশেষ হয়নি।

সম্রাট মামুনের সময় বাগদাদের রাজকোষে আগত সম্পদের পরিমাণ।[২৬]

---

২৬. এ পরিমাণ বর্ণনায় রোজেনথালের অনুবাদে কিছুটা ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। আমরা পাঠকরা কৌতূহল নিবারণার্থে তার অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। প্রকাশ থাকে যে, আমরা আমাদের ব্যবহৃত মূল পাঠের অনুসরণ করেছি বলেই, অনুবাদে কিঞ্চিৎ আড়ষ্টতা ও দ্বিরুক্তি দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে এই আড়ষ্টতা সহজেই অতিক্রম করা সম্ভব। 'দুইবার' ও 'একবার' শব্দ দুইটি মূলের 'আলফ' (সহস্র) শব্দটির অবস্থান অথবা কিস্তিও বোঝাতে পারে। কারণ অনেক স্থলে এগুলো অনুপস্থিত।

'সওয়াদ' (দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া)	শস্য : ২৭,৭৮০,০০০ দিরহাম।
	অন্যান্য রাজস্ব : ১৪,৮০০,০০০ দিরহাম।
	নাজরানী জোব্বা : ২০০।
	মোহরাঙ্কনের মাটি : ২৪০ পাউন্ড।
'কসকর'	১১,৬০০,০০০ দিরহাম।
'দজলা অঞ্চল'	২০,৮০০,০০০ দিরহাম।
'হলুয়ান'	৪,৮০০,০০০ দিরহাম।
'আল আহওয়াজ'	২৫,০০০ দিরহাম।
	চিনি : ৩০,০০০ পাউন্ড।
'ফারস'	২০,০০০,০০০ দিরহাম।
	গোলাপ জল : ৩০,০০০ বোতল।
	কাল মুনাক্কা : ২০,০০০ পাউন্ড।
'কিরমান'	৪,২০০,০০০ দিরহাম।
	ইয়ামেনী কাপড় : ৫০০।
	খুরমা : ২০,০০০ পাউন্ড।
	জিরা : ১,০০০ পাউন্ড।
'মকবান'	৪,০০,০০০ দিরহাম।
পশ্চিম ভারত (সিন্ধু) এবং সন্নিহিত অঞ্চল	১১,৫০০,০০০ দিরহাম।
	সুগন্ধী কাষ্ঠ : ১৫০ পাউন্ড।
'সিজিস্তান'	৪,০০০,০০০ দিরহাম।
	চেক বস্ত্রাদি : ৩০০।
	মিশ্রি খণ্ড : ২০,০০০ পাউন্ড।
'খোরাসান'	২৮,০০০,০০০ দিরহাম।
	রৌপ খণ্ড : ,০০০।
	ভারবাহী পশু : ৪,০০০।
	দাসদাসী : ১,০০০ জন।
	পোশাক : ২৭,০০০।
	হরিতকী-বয়ড়া-আমলকী : ৩০,০০০ পাউন্ড।
'জুরজান'	১২,০০০,০০০ দিরহাম।
	রেশম : ১,০০০ খণ্ড।
'কুমিস'	১,৫০০,০০০ দিরহাম।
	রৌপ্য খণ্ড : ১, ০০০ খণ্ড

'তাবারিস্তান, আররুইয়ান ও নিহাওন্দ'	৬,৩০০,০০০ দিরহাম।
	তাবারী গালিচা : ৬০০ খণ্ড।
	জোব্বা : ২০০
	পোশাক : ৫০০
	রুমাল : ৩০০
	পানপাত্র : ৩০০
'আর্‌রায়'	১২,০০০,০০০ দিরহাম।
	মধু : ২০,০০০ পাউন্ড।
'হামদান'	১১,৮০০,০০০ দিরহাম।
	দাড়িম্ব জারক : ১,০০০ পাউন্ড।
	মধু : ১২,০০০ পাউন্ড।
'কুফা ও বসরার (!) মধ্যবর্তী অঞ্চল'	১০,৭০০,০০০ দিরহাম।
'মাসাবাধান ও আর্‌রায়ান'	৪,০০০,০০০ দিরহাম।
'শহরজোর'	৬,০০০,০০০ দিরহাম।
মোশেল ও সন্নিহিত অঞ্চল	২৪,০০০,০০০ দিরহাম।
	সাদা মধু : ২০,০০০ পাউন্ড।
'আজরবাইজান'	৪,০০০,০০০ দিরহাম।
'আল জজিরা ও সন্নিহিত ফুরাত অঞ্চল'	৩৪,০০০,০০০ দিরহাম।
'খারাজ'	৩০০,০০০ দিরহাম।
'জিলান'	৫,০০০,০০০ দিরহাম।
	দাসদাসী : ১,০০০ জন।
	মধু : ১২,০০০ থলি।
	বাজপাখি : ১০।
	পোশাক : ২০।
'আর্মেনিয়া'	১৩,০০০,০০০ দিরহাম।
	নকশাদার গালিচা : ২০।
	নানাবিধ কাপড় : ৫৮০ পাউন্ড।
	লবণাক্ত সুরমাহী মাছ : ১০,০০০ পাউন্ড।
	হেরিং মাছ : ১০,০০০ পাউন্ড।
	খচ্চর : ২০০।
	বাজ পাখি : ৩০।
'কিন্নাসরিন'	৪০০,০০০ দিনার।
	মুনাক্কা : ১,০০০ বোঝা।
'দামেশক'	৪২০,০০০ দিনার।
'জর্ডন'	৯৬,০০০ দিনার।
'প্যালেস্টাইন'	৩১০,০০০ দিনার।
	মুনাক্কা : ৩০০,০০০ পাউন্ড।
'মিশর'	১,৯২০,০০০ দিনার।
'বরকা'	১,০০০,০০০ দিরহাম।
'ইফ্রিকিয়া'	১৩,০০০,০০০ দিরহাম।
	গালিচা : ১২০।
'ইয়ামেন'	৩৭০,০০০ দিনার, বস্ত্রাদি ছাড়া।
'হেজাজ'	৩০০,০০০ দিনার। (তালিকা শেষ)।

এরূপভাবে আহমদ ইবনে মুহম্মদ ইবনে আব্দুল হামিদের কলমে মামুনের সময়কালীন বাগদাদের রাজকোষে বিভিন্ন দিক থেকে আগত সম্পদের একটি তালিকা পাওয়া যায়। আমি তা 'জেরাবুদ্দৌলত' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করলাম।

'শস্যপূর্ণ' গ্রামাঞ্চল' থেকে দুই কোটি সত্তর লক্ষ দিরহাম (দুইবার) এবং আট লক্ষ দিরহাম। নাজরানী কাপড় দুইশ থান এবং মোহরাঙ্কিত করার মাটি দুইশ চল্লিশ রিতল।

'কিনকর' থেকে এক কোটি দশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার) এবং ছয় লক্ষ দিরহাম।

'দজলা নদী অঞ্চল' থেকে দুই কোটি দিরহাম ও আটশ দিরহাম।

'হুল্‌য়ান' থেকে চল্লিশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার) এবং আট লক্ষ দিরহাম।

'আহওয়াজ' থেকে পঁচিশ হাজার দিরহাম (একবার)। চিনি ত্রিশ হাজার রিতল।

'পারস্য' থেকে দুই কোটি সত্তর লক্ষ দিরহাম। গোলাপ জল ত্রিশ হাজার রিতল। কাল তেল বিশ হাজার রিতল।

'কেরমান' থেকে চল্লিশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার) এবং দুই লক্ষ দিরহাম। ইয়ামেনী বস্ত্র পাঁচশ সংখ্যা। শুষ্ক খেজুর বিশ হাজার রিতল।

'মকরান' থেকে আট লক্ষ দিরহাম (একবার)।

'সিন্ধু ও সন্নিহিত অঞ্চল' থেকে এক কোটি দশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার) এবং পাঁচ লক্ষ দিরহাম। হিন্দী ধূপকাঠি একশ পঞ্চাশ রিতল।

'সিজিস্তান' থেকে চল্লিশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার)। চক্করদার কাপড় তিনশ সংখ্যা এবং 'ফানিদ' মিষ্টি বিশ রিতল।

'খোরাসান' হতে দুই কোটি আশি লক্ষ দিরহাম (দুইবার)। এক হাজার রৌপ্য ধাতু পিণ্ড। ভারবাহী পশু চার হাজার। ক্রীতদাস এক হাজার। বস্ত্রাদি বিশ হাজার। 'ইহলিলাজ' ফল ত্রিশ হাজার রিতল।

'জুরজান' থেকে এক কোটি বিশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার)। রেশম বস্ত্র এক হাজার খণ্ড।

'কোমাস' থেকে দশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার)। পাঁচলক্ষ রৌপ্য ধাতুপিণ্ড।

'তাবারিস্তান, রূবান ও নাহাওন্দ' থেকে ষাট লক্ষ (দুইবার) এবং তিন লক্ষ। তাবারী গালিচা ছয়শ খণ্ড। পোশাক দুইশত। বস্ত্রাদি পাঁচশ। রুমাল তিনশ। পানপাত্র তিনশ।

'রায়' থেকে এক কোটি বিশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার)। মধু বিশ হাজার রিতল।

'হামদান' থেকে এক কোটি দশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার) এবং তিন লক্ষ। দাড়িম্ব জারক এক হাজার রিতল। মধু বার হাজার রিতল।

'বসরা ও কুফার মধ্যবর্তী অঞ্চল' থেকে এক কোটি দিরহাম (দুইবার) এবং সাত লক্ষ দিরহাম।

'মাসেবজান ও দায়নার' থেকে চল্লিশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার)।

'শহরজুর' থেকে ষাট লক্ষ দিরহাম (দুইবার) এবং সাত লক্ষ দিরহাম।

'মোশেল ও সন্নিহিত অঞ্চল' থেকে দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার) এবং সাদা মধু দুই কোটি রিতল।

'আজরবায়জান' থেকে চল্লিশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার)।

'আলজজিরা ও সন্নিহিত ফুরাত এলাকা' থেকে তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার)। এক হাজার ক্রীতদাস। মধু বার হাজার থলি। বাজপাখি দশ। পোশাক বিশ।

'আর্মেনিয়া' থেকে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার)। ঔষধি কাঠ বিশ। 'যুকাম' চূর্ণ পাঁচশ ত্রিশ রিতল। সুরমা মালিশ দশ হাজার রিতল। সামুদ্রিক শুঁটকি মাছ দশ হাজার রিতল। খচ্চর দুইশ। অশ্বশাবক ত্রিশ।

'কিন্নাসরিন' থেকে চার লক্ষ দিনার। জলপাই তেল এক হাজার বোঝাই।

'দামেশক' থেকে চার লক্ষ দিনার ও বিশ হাজার দিনার।

'জর্ডন' থেকে সাতানব্বই হাজার দিনার।

'ফিলিস্তিন' থেকে তিন লক্ষ দিনার ও দশ হাজার দিনার। জলপাই তেল তিন লক্ষ রিতল।

'মিশর' থেকে এক কোটি দিনার, নয় লক্ষ দিনার ও বিশ হাজার দিনার।

'বরকা' থেকে এক কোটি দিরহাম (দুইবার)।

'আফ্রিকিয়া' থেকে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ দিরহাম (দুইবার)। গালিচা একশ বিশ।

'ইয়ামেন' থেকে বস্ত্রাদি ছাড়াই তিন লক্ষ দিনার ও সত্তর হাজার দিনার।

'হেজাজ' থেকে তিন লক্ষ দিনার।

আন্দালুস সম্পর্কে বিশ্বস্ত ইতিহাসবিদ ব্যক্তিরা যা বলেছেন, তা এ যে, আব্দুর রহমান আন্‌নাসের তাঁর মৃত্যুকালে রাজকোষে—সহস্র শব্দটিকে তিনবার ব্যবহার করে—পাঁচ সহস্র সহস্র সহস্র—অর্থাৎ পাঁচ হাজার কোটি দিনার রেখে গিয়েছিলেন।। তার সমগ্রের পরিমাণ কেন্তারের ওজনে পাঁচ লক্ষ কেন্তার ছিল। সম্রাট হারুনুর রশীদ সম্পর্কে বিভিন্ন ইতিহাসে দেখেছি, তাঁর সময়ে রাজকোষে প্রতি বছর সাত হাজার কেন্তার পাঁচশ কেন্তার পরিমাণ সম্পদ জড় হত।[২৭]

---

২৭. এর পর রোজেনথালের অনুবাদে সংযোজন বিদ্যমান। তা তিনি দুই-তিনটি পাণ্ডুলিপিতে পেয়েছেন। সম্পূর্ণতার জন্য আমরা তার অনুবাদ নিম্নে প্রদান করলাম।

উবাইদী সাম্রাজ্যের বর্ণনায় আমি ইবনে-খল্লিকনের ইতিহাসে পাঠ করেছি যে, সেনাপতি আফজল ইবনে বদর আল জামিলী যিনি মিশরে উবাইদী সম্রাটদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তার নিহত হওয়ার পর রাজকোষে ৬০০,০০০ দিনার এবং ২৫০ তোড়া দিরহাম পাওয়া গিয়েছিল। এর সাথে বহু মূল্যবান আংটিতে ব্যবহারযোগ্য পাথর, মুক্তা, পোশাক, গৃহস্থালী আসবাবপত্র এবং আরোহণের অশ্ব ও মালবাহী পশু ছিল।

আমাদের সমসাময়িক সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মিশরীয় তুর্কি সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য তুর্কি শাসক আল নাসির মোহাম্মদ ইবনে কুলাউল-এর সময়ে প্রাধান্য বিস্তার করতে আরম্ভ করে। তাঁর শাসনের প্রথম দিকে দুইজন তুর্কি আমীর—ভাইবার ও সাল্লার তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে। অল্পকাল পরেই আল নাসির ক্ষমতা ফিরে পেল। তিনি বাইবার ও সাল্লারকে অপসারিত করে তাদের সমুদয় সম্পদ ছিনিয়ে নেন। আমি উক্ত সম্পদের একটি তালিকা পেয়েছি এবং তা হতে নিম্নের বস্তুগুলোর নাম উদ্ধৃত করেছি :

হলুদ শম্বুক মণি ও পদ্মরাগ মণি ১$\frac{১}{২}$ পাউন্ড। মরকত মণি ১৯ পাউন্ড। হীরক ও আংটিতে ব্যবহারযোগ্য বিড়ালচক্ষু পাথর ৩০$\frac{১}{২}$০ বৃহৎ খণ্ড। বাঝাই করা আংটির পাথর ২ পাউন্ড। গোলাকার মোতি এক মিসকাল (১$\frac{১}{২}$ দিরহাম) হতে এক দিরহাম পর্যন্ত ওজনবিশিষ্ট ১,১৫০ খণ্ড।

পাঠক, এর দ্বারা এক সাম্রাজ্যের সাথে অন্য সাম্রাজ্যকে বিবেচনা করুন। যে ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা নেই কিংবা যা আপনার যুগে দেখা যায় না, তেমন বিষয় সরাসরি অস্বীকার করবেন না। তা হলে সম্ভাব্য বিষয়ের ক্ষেত্রে অহেতুক আপনি অনুদার বলে বিবেচিত হবেন। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলোর এ প্রকার সংবাদ শোনা মাত্রই অস্বীকার করে বসেন। এরূপ করা আদৌ সমীচীন নয়। কারণ সৃষ্টি জগৎ ও মানব সভ্যতার অবস্থার মধ্যে বৈচিত্র্য বিদ্যমান। যে ব্যক্তি তার নিম্নস্তর বা মধ্যস্তরে অবস্থান করছে, তার পক্ষে উপলব্ধি শক্তিকে সেখানেই সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক নয়। আমরা যখন আব্বাসী, উমাইয়া ও উবাইদী সাম্রাজ্য সম্পর্কে বর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনা করতে বসি এবং তন্মধ্যে যা সঠিক ও সন্দেহাতীত, তার সাথে বর্তমানকালের তদপেক্ষা ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যগুলোর অবস্থার তুলনা করি, তখনই তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখতে পাই। এর কারণ এ যে, তার মধ্যে মৌল শক্তি ও বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত সভ্যতার তারতম্য বিদ্যমান। কেননা, যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, সাম্রাজ্যের মৌল প্রতিষ্ঠা শক্তি থেকেই তার নিদর্শনাদি উৎসারিত হয়ে থাকে। এ কারণেই আমাদের পক্ষে এ সকল সংবাদ অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কেননা এ সকল অবস্থার অধিকাংশই অত্যন্ত সুপরিচিত ও সুস্পষ্ট। বরং তাদের মধ্যে এমনও আছে, যা অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সমৃদ্ধ এবং তাদের স্থাপত্য ও অন্যান্য নিদর্শন লোকচক্ষুর গোচরীভূত ও অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। সুতরাং, পাঠক, বর্ণিত অবস্থাসমূহ থেকে আপনি সংশ্লিষ্ট সাম্রাজ্যের শক্তি ও দুর্বলতা, বিরাটত্ব ও ক্ষুদ্রতা বিচার করতে পারেন। আমরা নিম্নে যে সরস কাহিনীটি আপনার সম্মুখে উপস্থিত করছি, তা থেকেও বিবেচনাযোগ্য জ্ঞান আহরণ করতে পারেন।

স্বর্ণমুদ্রা ১,৪০০,০০০ দিনার। খাঁটি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি গর্ত। দুইটি প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে ভরা থলি—তার সংখ্যা গণনা করা হয় নি। দিরহাম ২,০৭১,০০০। স্বর্ণালংকার ৪ শ ওজন। এর সঙ্গে বহু মূল্যবান পোশাক, গৃহস্থালীর আসবাবপত্র, অশ্বযান, ভারবাহী পশু, শস্যাদি, গরু, দাসদাসী এবং খামার।

এর পরেও আমরা মরক্কোতে মারিনী সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তাঁদের রাজকোষ সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী হাসান ইবনে বাওয়াক লিখিত একটি তালিকা আমি দেখেছি। সম্রাট আবু সাইদ রাজকোষে যে অর্থ রেখে গিয়েছিলেন, তার পরিমাণ ৭০০ শ ওজনের স্বর্ণ মুদ্রা। এ অনুপাতে তার অন্যান্য সম্পদও প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী সম্রাট আবুল হাসান এটা অপেক্ষা অধিক সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তিনি যখন 'তেল মেকন' অধিকার করেন, তখন তার সম্রাট আবদুল ওলাদীদ আবু তশফীনের রাজকোষে ৩০০ শ ওজন বিশিষ্ট স্বর্ণ মুদ্রা ও অলংকার এবং এ অনুপাতে অন্যান্য সম্পদ লাভ করেছিলেন।

আফ্রিকিয়ার আলমোহেদ (হাফসাইড) সাম্রাজ্যের নবম শাসক আবু বকরের সময়ে আমি ছিলাম। তিনি মুহম্মদ ইবনে আল হাকিম নামীয় তার এক সেনাপতিকে অপসারিত করে তাঁর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। সেখানে তিনি চল্লিশ শ ওজনের দিনার স্বর্ণমুদ্রা এবং একটি বড় থাল পূর্ণ আংটির মূল্যবান পাথর ও মুক্তা লাভ করেন। উক্ত সেনাপতির গৃহের গালিচার অভ্যন্তর হতে অনুরূপ সম্পদ প্রাপ্ত হন এবং এর অনুপাতে অন্যান্য সম্পত্তি ও আসবাবপত্র পেয়েছিলেন।

আমি মিশরের শাসক মালাক আজ্জহীর আবু সাইদ বারকুকের সময় সেখানে ছিলাম। তিনি 'কুলাউন' পরিবারের নিকট হতে ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং এ সময় তিনি তাঁর অভ্যন্তরীণ বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রী আমির মাহমুদকে গ্রেপ্তার করে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। এ বাজেয়াপ্তকরণের সাথে জড়িত ব্যক্তি আমাকে বলেছেন যে, এর ফলে রাজকোষে ১,৬০০,০০০ দিনার যোগ হয়। সেখানে এর সমানুপাতে পোশাকাদি, অশ্বতরী, ভারবাহী পশু, শস্যাদি ও পালিত পশু ছিল।

তা এ যে, মারিনী সম্রাট আবু ইনানের সময়ে মাগরিবে তাজ্জার উস্তাদস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম ইবনে বতুতা[২৮] নামে পরিচিত এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ইনি ইতিপূর্বে বিশ বছর পূর্বাঞ্চলে কাটিয়েছেন এবং ইরাক, ইয়ামেন ও হিন্দে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি হিন্দের প্রধান নগর দিল্লীতেও গেছেন। তখন সেখানকার সম্রাট ছিলেন মুহম্মদ শাহ[২৯] এবং বর্তমানে ঐ রাজ্যের অধিপতি ফিরুজজুহ (শাহ?)। ইবনে বতুতা সম্রাটের নিকট স্থান লাভ করেন এবং সম্রাট তাঁকে মালেকী মজহাব অনুসারে কাজীর পদে নিয়োগ করেন। অতঃপর তিনি মাগরিবে এসে সম্রাট আবু ইনানের আশ্রয় লাভ করেন। ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করতেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁর দৃষ্ট অদ্ভুত অবস্থাদির কথা বলতেন। তিনি অধিকাংশ সময় হিন্দাধিপতির রাজ্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতেন এবং এমন সকল বিষয় বর্ণনা করতেন, যা শ্রোতাদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হত। যেমন হিন্দের অধিপতি যখন কোথাও ভ্রমণে বের হতে মনস্থ করতেন, তখন তাঁর নগরীর আবাল বৃদ্ধ বনিতার হিসাব করে তাদেরকে ছয় মাসের আহার্য দিয়ে যেতেন এবং তাঁর নিজ সম্পদ থেকে তাদের প্রয়োজন মিটাবার নির্দেশ দিতেন। ভ্রমণ থেকে তাঁর ফেরার দিন বিরাট উৎসব হত। সমস্ত লোক ময়দানে সমবেত হয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করত। সম্রাটের দরবারের সম্মুখে ভারবাহী পশুর পৃষ্ঠে ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করা হত এবং সম্রাট দরবার থেকে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ না করা পর্যন্ত ঐ ক্ষেপণাস্ত্র থেকে দিরহাম ও দিনারের থলে উপস্থিত জনতার মধ্যে নিক্ষেপ করা হত। এ ধরনের নানা কাহিনী। মানুষ এটা শুনে মিথ্যা বলে কানাঘুষা করত।

এ সময়ে আমি একদিন সম্রাটের বিখ্যাত উজির ফারেস ইবনে ওয়ারদার সাক্ষাৎ পেয়ে এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম এবং মানুষের মধ্যে প্রচলিত এ সকল সংবাদের মিথ্যা হওয়ার ধারণার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। উজির তদুত্তরে আমাকে বললেন, সাবধান, যে সকল সাম্রাজ্যের অবস্থা তুমি স্বচক্ষে দেখনি, তা অস্বীকার করতে যেও না। তা হলে সেই উজির পুত্রের মতো হবে, যে কারাগারে লালিত হয়েছিল। ঘটনাটি এ, কোনো সম্রাট তাঁর উজিড়কে কারাবাসে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থানের ফলে তাঁর পুত্রও তাঁর সাথে ঐ কারাগারে লালিতপালিত হয়েছিল। বোঝার মতো বয়সে পৌঁছে একদিন উজির পুত্র পিতাকে আহার্য মাংস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। উজির বললেন, এটা ছাগ মাংস। পুত্র বলল, ছাগ কি? উজির তখন সবিস্তারে পুত্রের জন্য ছাগলের ছাগলত্ব বর্ণনা করলেন। সব শুনে পুত্র বলল, বুঝেছি পিতা, আপনি ইঁদুরের কথা বলছেন। পিতা অস্বীকার করে বললেন, না, না; কোথায় ছাগল আর কোথায় ইঁদুর! এভাবে উট ও গরুর মাংস সম্পর্কেও সে মন্তব্য করেছিল। কারণ তার জীবনে সে এক ইঁদুর ছাড়া অন্যকোনো প্রাণী দেখেনি। সুতরাং সে সকল প্রাণীকেই ইঁদুরের বংশধর বলে ভেবেছে।

এভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংবাদাদি সম্পর্কে মানুষ অনুমান করে থাকে। যেমন অন্যদিকে যে কোনো সংবাদকে অতিরঞ্জিত করে অদ্ভুত করে তোলার স্বভাবও তাদের

২৮. মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্', জীবনকাল ৭০৩-৭৭৯ (১৩০৪-১৩৭৭ খ্রি:) হি:।
২৯. শাসনকাল ১৩২৫-৫১ খ্রি:।

মধ্যে বিদ্যমান। আমরা এ সম্পর্কে পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং মানুষের উচিত যথার্থ নিয়মের দ্বারস্থ হওয়া। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই তাঁকে তার নিজের বিবেচনার উপর নির্ভর করতে হবে এবং সেই সঙ্গে সম্ভব অসম্ভবের ব্যাপারে যথার্থ বুদ্ধি ও স্বাভাবিক বিচারশক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে, যা সম্ভব বলে বোধ হবে, তা গ্রহণ করবে এবং যা বাইরে থাকবে, তাকে বর্জন করবে। এক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য একান্ত মননগ্রাহ্য—সম্ভাব্যতা নয়। কারণ তা অত্যন্ত ব্যাপক ব্যাপার; তাতে ঘটনাবলির সীমারেখা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হল প্রতিটি বস্তুর উপাদানগত সম্ভাব্যতা। আমরা যখন কোনো বস্তুর মৌল গোত্র, প্রকার, আকৃতির বিরাটত্ব ও শক্তি বিচার করতে সমর্থ হই, তখন সেই অনুপাতে তার বিচিত্র অবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। এ ক্ষেত্রে তার সম্ভাব্য সীমা থেকে যদি তা বের হয়ে যায়, তা হলে, অবশ্যই তাকে অসম্ভব বলে নির্দেশ করতে পারি। 'বল, হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর এবং তুমি সকল দয়ালু অপেক্ষা অধিক দয়ালু'।[৩০] আল্লাহ্ পবিত্র, উন্নত এবং সর্বজ্ঞ।

৩০. কোরান ২০, ১১৪।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যের অধিকারী আশ্রিতপোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সাহায্যে স্বীয় জাতি ও গোত্রপ্রীতি সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর উপর ক্ষমতা বিস্তার করে থাকে]

জেনে রাখুন, সাম্রাজ্যের অধিকারী ব্যক্তির প্রতিষ্ঠালাভ, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি, একমাত্র তাঁর জাতির দ্বারাই সম্ভব হয়। তারাই তাঁর গোত্রশক্তি এবং প্রয়োজনে তারাই তাঁর পশ্চাতে এসে দাঁড়ায়। তাদের সাহায্যেই বহিঃশত্রুর হাত থেকে সাম্রাজ্য সুরক্ষিত হয়। তারাই তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে, মন্ত্রিত্বে, রাজকোষ রক্ষায় এগিয়ে আসে। কারণ সাধারণত তারাই তাঁর সাহায্যকারী। তাঁর দায়িত্বে অংশগ্রহণ করে এবং সকল প্রয়োজনীয় কার্যে তাঁর সমভাগী হয়ে তারা সাম্রাজ্যের ভিত্তি গড়ে তোলে। এটাই সম্রাজ্যের প্রথম পর্যায়, যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হলে সাম্রাজ্যের অধিকারীরা স্বগোত্রীয়দের কবলমুক্ত হতে চেষ্টা করেন এবং সাম্রাজ্যগৌরব এককভাবে ভোগ করতে উদ্যোগী হন। তাঁরা তখন নিজেদের লোকদেরকে প্রতিরোধ করতে থাকেন এবং এর ফলে তারা তাঁদের শত্রু হয়ে ওঠে। সুতরাং এ জ্ঞাতিশত্রুতা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা ভিন্নজাতি ও গোত্রের লোকদেরকে সহায়ক হিসাবে গ্রহণ করেন। এদের সহায়তায় একদিকে যেমন জ্ঞাতিদেরকে সাম্রাজ্যগৌরবের অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত করেন, অন্যদিকে তেমনি তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন। এ জন্যই এ বহিরাগতরা সম্রাটের সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ সভাসদে পরিণত হয়। তারাই সম্রাটের নৈকট্যে ও কার্যে নিয়োজিত থাকে, তাঁর জন্য স্বার্থত্যাগে ও গৌরব বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এবং যে সহায়তা একসময়ে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর কর্তব্য ছিল, তাকেই প্রতিরোধ করতে তারা মৃত্যুকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে। ফলে যে সাম্রাজ্যগৌরব সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, তা সম্রাটের একক মর্যাদায় পরিণত হয়। সুতরাং সম্রাটকেও ঐ সকল বহিরাগত সাহায্যকারীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। তাদেরকে অধিকতর সম্মান ও প্রতিপত্তির সুযোগ দিতে হয় এবং যা মূলত তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠীর প্রাপ্য ছিল, তাই বহিরাগতরা লাভ করে। তারাই গুরুত্বপূর্ণ পদ, অঞ্চল শাসন, মন্ত্রিত্ব, সৈনাপত্য, রাজকোষ, এমনকি সম্রাটের প্রতিনিধিত্বের বিশিষ্ট গৌরব অর্জন করে। তাদেরকেই এমন সকল মর্যাদাপূর্ণ উপাধি দান করা হয়, যা জ্ঞাতি-গোষ্ঠীদের জন্য হওয়া উচিত ছিল। অথচ সম্রাট তখন তা দিতে বাধ্য; কারণ তখন তারাই তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও একান্ত পরামর্শদাতা।

সাম্রাজ্যের এ অবস্থা বস্তুত তার দুর্বলতার পরিচয় বহন করে এবং তার মধ্যে সেই প্রাচীন ব্যধির উদ্ভব হয়েছে বলে ধারণা জন্মায়। কারণ, প্রাধান্য বিস্তারের সেই অমোঘ

শক্তি গোত্রপ্রীতির বিনাশের ফলেই এরূপ অবস্থা দেখা দেয়। ফলে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে যে শত্রুতার বীজ উপ্ত হয়েছিল, তা ক্রমশ শাখাপল্লবে বিস্তৃত হতে থাকে। একটা অন্তর্গত তীব্র ঘৃণায় তারা সম্রাটের পতনের সম্ভাব্য পরিস্থিতি উদ্ভাবনের অপেক্ষা করতে থাকে। এর অশুভ প্রভাব সাম্রাজ্যের উপর এসে পড়ে এবং সম্রাটের পক্ষে এ রোগ থেকে মুক্তি লাভের কোনো পথ থাকে না, কারণ যা একবার হাতছাড়া হয়ে গেছে, তা ক্রমশ পুরুষাণুক্রমে দূর থেকে দূরে সরে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

পাঠক, এ বিষয়টি বনি উমাইয়াদের সাম্রাজ্য পরিচালনায় বিবেচনা করুন। তারা কী দর্শনীয়ভাবেই না তাদের যুদ্ধবিগ্রহে ও আঞ্চলিক শাসনে আরবের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্য গ্রহণ করেছিল! যেমন উমর ইবনে সাদ ইবনে আবি ওক্কাস, উবাইদুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ, ইবনে আবি সুফিয়ান, আল হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ, আলমুহাল্লার ইবনে আবি সফরা, খালেদ ইবনে আবদুল্লাহ আলকসরী, ইবনে হুবাইরা, মুসা ইবনে সুনাইর, বেলাল ইবনে আবি বুরদা ইবনে আবু মুসা আল আশআরী, নসর ইবনে সাইয়ার প্রমুখ বিশিষ্ট আরবীয় ব্যক্তিবর্গ। প্রথম দিকে বনি আব্বাসের অবস্থাও এরূপ ছিল, তারাও আরবীয় ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে ক্ষমতা বিস্তার করেছিল। অতঃপর যখন সম্রাট সাম্রাজ্য গৌরবকে নিজের কুক্ষিগত করতে চেষ্টা করলেন, তখন আরবীয় জ্ঞাতিত্বের শক্তি খর্ব করা হল এবং সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বভার অনারবদের হস্তে ন্যস্ত হল। আঞ্চলিক শাসন ও মন্ত্রিত্ব বারামেকী, বনি সহল ইবনে নওবখত, বনি তাহের, বনি বুইয়া, আশ্রিত তুর্কি সেনাপতি ওয়াসীফ ও বুগা, আতামেশ ও বাকনাক, ইবনে তুলুন ও তার সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য অনারব পোষ্য আশ্রিতদের কবলে পতিত হল। এভাবে সাম্রাজ্য গৌরব তাদের কুক্ষিগত হল, যারা এর প্রতিষ্ঠা করেনি এবং পদমর্যাদা তাদের অধিকারে গেল, যারা তার জন্ম দেয়নি। এটাই বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত আল্লাহ্‌র নিয়ম। আল্লাহ্ যথার্থই উন্নত ও সর্বজ্ঞ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যে আশ্রিত পোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অবস্থা]

জেনে রাখুন, সাম্রাজ্যের কর্মাদিতে নিয়োজিত ব্যক্তিরা তাদের প্রাচীনত্ব ও নবীনত্ব অনুসারে সম্রাটের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে। এর কারণ এ যে, গোত্রপ্রীতির উদ্দেশ্য প্রতিরোধ ও প্রাধান্য বিস্তার একমাত্র বংশ সম্পর্কের সাহায্যেই সম্ভব হয়। কেননা রক্ত সম্পর্কীয় জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক সহায়তার আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে। এজন্যই বহিরাগত ও দূর সম্পর্কীয়দেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে তারা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। চুক্তি বা দাসত্বের কারণে আশ্রয়লাভ ও সাহচর্য প্রাপ্তি অনেক ক্ষেত্রেই এ বংশ সম্পর্কের ধারায় উন্নীত হতে পারে। কেননা বংশ সম্পর্কের ব্যাপারটি যদিও স্বাভাবিক, তবুও তা কাল্পনিক বাস্তবতা সমন্বিত। এর একমাত্র উদ্দেশ্য পরস্পর সম্মিলন। এর মাধ্যমে গোত্রত্ব, প্রতিরোধ, দীর্ঘ সহ অবস্থান, সাহচর্য, সহমর্মিতা এবং জীবন ও মৃত্যুর সকল অবস্থায় ঐক্যবদ্ধ হতে না পারলে তা মূল্যহীন। কিন্তু উক্ত বিষয়াদির মাধ্যমে সম্মিলিত হতে পারলেই গোত্র চেতনা ও সহানুভূতির জন্ম হয়। এটা মানব জীবনের সর্বত্র দর্শনযোগ্য। এ বিষয়টিকে, পাঠক, কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বিবেচনা করুন। কর্তা ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির মধ্যে অনুরূপভাবে একটি সৌহার্দ গড়ে ওঠে, যা উপরোক্ত ঐক্য ও আত্মীয়তার পর্যায়ে উন্নীত হয়। এটা বংশ সম্পর্ক না হলেও তার ফলাফল এ ক্ষেত্রে লব্ধ হয়। সুতরাং এ সম্পর্ক যদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বেই স্থাপিত হয়ে থাকে, তা হলে তার স্থায়িত্বের গভীরতা, বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও সম্পর্কের সুস্পষ্টতা দেখা দেয়। এর দুটি কারণ বিদ্যমান। একটি এ যে, রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে স্থাপিত সম্পর্কের অধীন ব্যক্তিরা কর্তার সাথে একই পথের পথিক। তখন সাহায্যের প্রয়োজনে খুবই কম পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়; অনেক ক্ষেত্রে আদৌ সে প্রশ্ন উত্থিত হয় না। ফলে তারা এক বংশ ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর অন্তর্গত হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু রাজ্যলাভ করার পরে কর্মে নিয়োগ করার সম্পর্ক স্থাপিত হলে, তখন প্রভুর সম্রাট হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে ও নিয়োগকর্তার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা দেয় এবং ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও আশ্রিত ব্যক্তির মধ্যকার পার্থক্যও দর্শনীয় হয়ে থাকে। কারণ সাম্রাজ্যের মর্যাদা সর্বদাই তার অধীনস্থ সর্বপ্রকার মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য বিচার করে থাকে। এ কারণেই এ নবাগত আশ্রিতদের অবস্থা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তারা বহিরাগতই থেকে যায়। এর ফলে নিয়োগকর্তার সাথে তাদের সম্পর্ক দুর্বল এবং সহায়তার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে থাকে। সাম্রাজ্য পূর্ব সম্পর্ক অপেক্ষা এ সম্পর্ক খুবই দুর্বল।

দ্বিতীয় কারণ এ যে, সাম্রাজ্যের পূর্বে কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগকর্তার সাথে সংযুক্ত থাকার ফলে, তার এ সংযুক্তির মূল ভিত্তির কথা মানুষ ভুলে যায় এবং তাকে ঐ বংশের লোক বলেই গণ্য করে। তার ফলে তার গোত্রপ্রীতির শক্তি দৃঢ়তর হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যের পরের সম্পর্ক সকলের নিকট সুপরিচিত; সুতরাং সংযুক্তির কারণ ও বংশধারা থেকে তার পৃথকীকরণ সম্পর্কে সকলেই তৎপর থাকে। এর ফলে সাম্রাজ্যপূর্ব সম্পর্কের তুলনায় এতে গোত্রপ্রীতির শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। পাঠক, যে কোনো সাম্রাজ্য ও নেতৃত্বের ব্যাপারে অনুসন্ধান করলে আপনি এ পার্থক্যটি দেখতে পাবেন। দেখবেন যারা সাম্রাজ্য লাভের পূর্বে কর্মে নিয়োজিত হয়েছে, তারা নিয়োগকর্তার সাথে কত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ এবং কত ঘনিষ্ঠভাবেই না নিকটতর। যেন তারা তাঁর পুত্র, ভাই ও অন্যান্য রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তুল্য। অথচ সাম্রাজ্য লাভের পরে যারা এসেছে, তারা নিয়োগকর্তার সাথে পূর্ববর্তীদের ন্যায় এতটা ঘনিষ্ঠ ও সংযুক্ত নয়। এটা চাক্ষুষদৃষ্ট বিষয়। এমনকি সাম্রাজ্য তার শেষ দিকে যাদেরকে বাইরে থেকে নিজ ক্রোড়ে আশ্রয় দেয় ও কর্মে নিয়োজিত করে, তাদের জন্য পূর্ববর্তীদের সমান মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধাও দিতে পারে না। কারণ পূর্ববর্তীদের ঘনিষ্ঠতা সাম্রাজ্যের সুদিনে অনেক কিছুই লাভ করেছে; কিন্তু এ দুর্দিনে যারা এসে তার হাল ধরেছে, তাদেরকে দিবার মতো আর কিছু নেই। সুতরাং সাম্রাজ্যের দুর্গতির সঙ্গে সঙ্গে তারাও দুর্গতির শিকারে পরিণত হয়। কেননা সম্রাট এ পরবর্তীদেরকে শুধুমাত্র পূর্ববর্তীদের প্রভাবমুক্ত হবার জন্যই কর্মে নিয়োজিত করে থাকেন। সুতরাং ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই যথেষ্ট মনে করেন, তাদেরকে মর্যাদা দানের চিন্তা তাঁর মাথায় আসে না। কারণ তাঁর মাথায় তখন পূর্ববর্তীদের চিন্তা জট পাকাতে থাকে। যারা একসময়ে তাঁর পূর্বপুরুষদের সাথে মিশে সাম্রাজ্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেছিল, যারা তাঁকে দীর্ঘদিন থেকে জানে, যারা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মতোই তাঁকে দেখে, যারা তাঁর সম্পর্কে খুব একটা সমীহের ভাব পোষণ করে না এবং যাদের বিভিন্ন আচার আচরণ ক্রমশ একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে, তাদের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতেই সম্রাট পরবর্তীদেরকে কর্মে নিয়োজিত করেন। সুতরাং পূর্ববর্তীদের কবল হতে মুক্তিলাভ ও পরবর্তীদের নিয়োগের কাল খুবই নিকটবর্তী। এজন্যই নবাগতদের পক্ষে কোনোপ্রকার মর্যাদা লাভের সুযোগ ঘটে না। বরং তারা বহিরাগত হিসাবেই থেকে যায়। সকল সাম্রাজ্যেই শেষের দিকে এ অবস্থা দেখা দেয়। এজন্য কর্মী ও সহায়ক বলতে পূর্ববর্তীদেরকেই সাধারণভাবে বোঝানো হয়। আর এ নবাগতরা শুধুমাত্র সেবক ও উদ্ধারকারী। আল্লাহ্ই বিশ্বাসীদের যথার্থ সহায়ক।[৩১] তিনি সকল বিষয়ে একমাত্র নির্ভরযোগ্য।

---

৩১. কোরান ৩, ৬৮।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যে অনেক সময় সম্রাটকে রাজকীয় ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত রাখা এবং তাঁর উপর অন্যায্য প্রভাব বিস্তারের ঘটনা দেখা যায়]

সাম্রাজ্য যখন কোনো বংশের একটি বিশেষ অংশের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং প্রতিষ্ঠাতা গোত্রের একটি উৎস তার শক্তির কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ায়, তখন সংশ্লিষ্ট অংশ বা কেন্দ্র সমুদয় গোত্রকে বঞ্চিত করে নিজেরা এককভাবে গৌরবের অধিকারী হয়ে ওঠে। অতঃপর তাদের বংশধররা পর্যায়ক্রমে একের পর এক মনোনয়নের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করতে থাকে। এ অবস্থায় অনেক সময় তাঁদের উজির ও সভাসদরা সম্রাটের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার কারণ রাজশক্তির উৎস কর্তৃক মনোনীত বালক বা দুর্বল সম্রাটের অভিভাবক নিযুক্ত হওয়া। অনেক সময় পিতাই এভাবে পুত্রকে মনোনয়ন করেন আবার অনেক সময় কোনো দল ও সেবকরা তাকে অনুরূপভাবে সিংহাসনে বসায়। উভয় ক্ষেত্রে এটাই প্রকাশ পায় যে, সম্রাট রাজ্য পরিচালনার যোগ্য নয়। সুতরাং তাঁর অভিভাবক হিসাবে পিতার উজির, সভাসদ, আশ্রিত পোষ্য অথবা গোত্রীয় কোনো ব্যক্তি রাজ্য পরিচালনায় তাঁকে সাহায্য করে এবং এভাবেই অন্যায্য প্রভাবের পথ সুগম হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এ অবস্থাকেই রাজ্য পরিচালনার একটা মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে। বালক সম্রাটকে তাঁর প্রজাদের নিকট থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় এবং তাঁকে জীবনের ভোগ সম্ভোগে অভ্যস্ত হতে দেয়া হয়। এভাবে যতদূর সম্ভব তাঁকে বিলাসব্যসন ও ভোগবাসনার উচ্চমার্গে বিচরণ করার সুযোগ করে দেয়া হয় এবং ক্রমশ তিনি রাজকার্যাদির দায়িত্ব পালনের কথা ভুলে গিয়ে অন্যায্য প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দান করেন। তিনি এ প্রকার অভ্যাসে জড়িত হয়ে ভাবতে থাকেন যে, সম্রাটের কর্তব্য হল একমাত্র সিংহাসনে উপবেশন করা, পুরস্কার দেয়া, সভাসদদের সম্মুখে গম্ভীর স্বরে বক্তব্য রাখা এবং অবশিষ্ট সময় হারেমের অভ্যন্তরে স্ত্রীলোকের সাথে সময় কাটানো। এতদ্ব্যতীত সমস্যা সমাধান, প্রস্তুতি গ্রহণ, আদেশ-নিষেধ, রাজকার্যের বিভিন্ন দিক অবলোকন এবং সৈন্যদল, রাজকোষ ও সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণে দৃষ্টিদান—এ সমুদয়ই উজিরের কর্তব্য। এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে সম্রাট এ সকল দায়িত্ব উজিরের উপর এমনভাবে ন্যস্ত করেন, যাতে নেতৃত্ব ও অন্যায্য প্রভাব বিস্তারের সুযোগ ঘটে এবং উজির কৌশলে সাম্রাজ্য শক্তিকে কুক্ষিগত করে স্বীয় পরিবার ও বংশপরম্পরায় তা ভোগ করতে থাকে। যেমন পূর্বাঞ্চলে বনি বুইয়া, তুর্কি আমীর, কাফুর আল ইখসিদী ও অন্যান্যের বেলায় হয়েছে। আন্দালুসে মনসুর ইবনে আবু আমেরের জন্য অনুরূপ অবস্থা দেখা গেছে।

কখনও এরূপ ক্ষমতা বিচ্যুত প্রভাবাধীন সম্রাট নিজের দুরবস্থা বুঝতে পারেন এবং এ আচ্ছন্ন অবস্থা ও অন্যায্য প্রভাব থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করে থাকেন। তিনি সাম্রাজ্যশক্তিকে যথার্থ বংশধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য কখনো হত্যার দ্বারা আবার কখনো শুধুমাত্র পদচ্যুতির সাহায্যে অন্যায্য প্রভাব বিস্তারকারীদের গর্ব খর্ব করে থাকেন। অবশ্য এ প্রকার ঘটনা খুবই বিরল। কারণ সাম্রাজ্য কোনোপ্রকারে উজির ও সহায়কদের অন্যায্য প্রভাবের অধীনে একবার চলে গেলে তা ক্রমশ স্থায়ী রূপ লাভ করে এবং খুব অল্প সংখ্যকের পক্ষেই উক্ত প্রভাব থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব হয়। কারণ এরূপ অবস্থায় সম্রাটদের অধিকাংশকে এবং তাঁদের বংশাবলিকে বিলাসব্যসনে নিমজ্জিত থাকতেই দেখা যায়। তাঁরা পৌরুষের কথা ভুলে গিয়ে স্তন্যদাত্রী-ধাত্রীদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে এবং এর মধ্যে লালিতপালিত হতে থাকে। সুতরাং নেতৃত্বের প্রতি তাদের কোনোপ্রকার ঔৎসুক্য থাকে না এবং অন্যান্য প্রভাবের কুফলও তারা বুঝতে পারে না। তাদের একমাত্র চিন্তা ও সাধনা, কি করে আরো অধিক চাকচিক্য, অধিক ভোগসম্ভোগ এবং বিচিত্র বিলাসব্যসনের সৃষ্টি করা যায়।

আশ্রিত পোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দ্বারাও অনুরূপ অন্যায্য প্রভাব বিস্তৃত হয়। তা সাম্রাজ্যের অধিকারী গোত্র কর্তৃক বংশের অন্য সকলকে বঞ্চিত করে একক মর্যাদা লাভের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়ে থাকে। এ অবস্থা প্রতিটি সাম্রাজ্যের জন্যই অবশ্যম্ভাবী, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এ দুটি রোগ এমন সংক্রামক যে, তা থেকে খুব কম সাম্রাজ্যই রক্ষা পেয়ে থাকে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর রাজ্য দান করে থাকেন।[৩২] তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

৩২. কোরান ২, ২৪৭।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

[সম্রাটের উপর অন্যায্য প্রভাব বিস্তারকারীরা তাঁর রাজকীয় উপাধিতে হস্তক্ষেপ করে না]

এটা এ যে, রাজ্য ও শাসনক্ষমতা প্রথম প্রতিষ্ঠাতাদের জন্য প্রথম দিকেই গোত্রপ্রীতির কল্যাণে লাভ হয়ে থাকে এবং এটা একটি বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত তাদেরকে অনুসরণ করে; ফলে প্রতিষ্ঠাতা ও তদীয় জাতির জন্য রাজ্য ও প্রাধান্য বিস্তারের একটি বৈশিষ্ট্য দৃঢ়তা লাভ করে। এ বৈশিষ্ট্য সর্বদা অক্ষুণ্ন থাকে এবং এটাই সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্বের সহায়ক হয়। সুতরাং এ অন্যায্য প্রভাব বিস্তারকারী যদি সম্রাটের গোত্রভুক্ত হয়, অথবা আশ্রিত পোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কেউ হয়, তা হলে তার গোত্রপ্রীতি সম্রাটের অনুসারী ও তদন্তর্গত প্রভাবের অধীন হয়ে থাকে। তার মধ্যে রাজশক্তির কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে না। এ কারণেই সে তার অন্যান্য প্রভাব বিস্তারে কখনো প্রকাশ্যে রাজশক্তি ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে না। শুধুমাত্র তার আদেশ-নিষেধ, সমাধান-সংযোগ ও সৃজন-বিনাশের ক্ষমতাজনিত ফলাফলের প্রতিই তার লক্ষ থাকে। এর ফলে সম্রাটের মনে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করে যে, সে এ সকল কাজ তাঁর পক্ষ থেকেই করছে এবং পর্দার অন্তরাল হতে প্রদত্ত সম্রাটের নির্দেশ অনুসারেই তা নির্বাহ হচ্ছে। সুতরাং সে সর্বদাই সম্রাটের নিদর্শন, পরিচ্ছদ ও উপাধি গ্রহণ থেকে দূরে থাকে এবং তার উপর এরূপ কোনো সন্দেহ আরোপিত হোক, এটা সে কখনো কামনা করে না। কারণ তার অন্যায্য প্রভাব বিস্তারের রহস্যই হচ্ছে এ যে, সে একে গোপন করে রাখতে পেরেছে এবং এর জন্য সম্রাট স্বয়ং ও সাম্রাজ্যের পূর্বসূরিরা তাঁদের উপর স্থাপিত আবরণ দ্বারা সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাকে অভিভাবক নিযুক্ত করায় তা আরো বিভ্রান্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথাপি এ অন্যায্য প্রভাবশালী ব্যক্তি যদি এর অতিরিক্ত কিছু করতে যায়, তা হলে সম্রাটের গোত্র ও গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠী তাকে এটা করতে বাধা দিবে এবং তার বিরুদ্ধে সম্রাটের আনুগত্যকেই প্রাধান্য দিবে। কারণ তার জন্য রাজশক্তি লাভের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, যা দিয়ে সে তাদের আনুগত্য ও সমর্থন লাভ করতে পারে। সুতরাং এরূপ চেষ্টার প্রথম স্তরেই সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

আবদুর রহমান ইবনে নাসের[৩৩] ইবনে মনসুর ইবনে আবু আমের এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। সে সম্রাট হিশামের সাম্রাজ্যের অংশীদার হতে চেয়েছিল। তার পিতা

---

৩৩. রোজেনথালে 'ইবনে নাসের' নেই, পাদটীকায় তা উপাধি হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে; মৃত্যুকাল ৩৯৯ (১০০৯ খ্রি:) হি:।

ও ভ্রাতা সাম্রাজ্যের সর্ববিধ কার্য পরিচালনার যে ক্ষমতা লাভে সন্তুষ্ট ছিল, সে সেই পদাংক অনুসরণ করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। সে সম্রাটের নিকট সিংহাসনের দাবি করে তাকে ভাবী উত্তরাধিকারী নিযুক্তির চাপ সৃষ্টি করেছিল; সুতরাং তা যদি মারোয়ান ও সমগ্র কোরায়েশ গোত্রের নিকট অসহ্য মনে হল। তারা সম্রাট হিশামের চাচাতো ভাই মুহম্মদ ইবনে আবদুল জব্বার ইবনে আন্ নাসেরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। এর ফলে ইবনে আমেরীদের সাম্রাজ্যের পতন ঘটল এবং তাদের সম্রাট হিশাম আল মুয়াইয়াদ নিহত হন। তারা তাঁর স্থলে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বংশের কোনো না কোনো ব্যক্তিকে তার শেষ পর্যন্ত স্থলাভিষিক্ত করল এবং সাম্রাজ্যের রীতি রক্ষায় তৎপর হল। আল্লাহ, সর্বাপেক্ষা উত্তম উত্তরাধিকারী।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

[রাজশক্তির তাৎপর্য ও প্রকার বৈচিত্র্য]

রাজশক্তি একটি স্বাভাবিক মানবীয় সংগঠন। কারণ, আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, মানুষের পক্ষে সমাজবদ্ধভাবে পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতায় আহার্য ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ ব্যতীত আত্মরক্ষা ও জীবন-যাপন সম্ভবপর নয়। সুতরাং তাদের সমাজবদ্ধ অবস্থায় পরস্পরের প্রতি ব্যবহার ও অভাব পূরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাদের প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অন্যের সম্পদে হস্তক্ষেপ করে। কারণ প্রাণীর প্রকৃতিই হল পরস্পর অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মানবীয় প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা অনুসারেই অপরকে প্রতিহত করে থাকে। এভাবে কলহের সূত্রপাত হয়ে যুদ্ধবিগ্রহে পরিণত হয়। এর ফলে অসুবিধা, রক্তপাত ও প্রাণহানি দেখা দেয় এবং পরিণামে মানবজাতির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। অথচ পবিত্র সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে বেঁচে থাকতেই সৃষ্টি করেছেন। এ জন্যই তাদের পরস্পরকে অত্যাচারের কবল থেকে রক্ষাকারী একজন শাসক ব্যতীত অরাজক অবস্থায় তাদের জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ অনিবার্য কারণেই তারা একজন শৃঙ্খলা বিধায়কের মুখাপেক্ষী হয়ে ওঠে এবং ইনিই তাদের শাসক। মানুষের স্বভাবের প্রয়োজনেই শাসককে কঠোর ও নির্দেশকারী হতে হয়।

রাজশক্তির এ রূপ পরিগ্রহের জন্য গোত্রপ্রীতি অপরিহার্য, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। কারণ অধিকার আদায় ও প্রতিরোধ কোনোটাই গোত্রপ্রীতি ব্যতীত সম্পূর্ণ হয় না। পাঠক, আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে, এ রাজশক্তি একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ পদ। সুতরাং তার জন্য দাবির যেমন অন্ত নেই, তেমনি তাকে সুরক্ষিত করার জন্য প্রতিরোধেরও প্রয়োজন। অথচ এদের কোনোটিই গোত্রপ্রীতির সাহায্য ব্যতীত সম্পূর্ণ হতে পারে না, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। গোত্রপ্রীতি আবার এক প্রকার নয়। প্রতিটি গোত্রপ্রীতিরই তার বংশ ও জাতির অন্তর্গত অন্যান্য গোত্রপ্রীতির উপর প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব লাভের বেশি থাকে। সুতরাং রাজশক্তি প্রত্যেকটি গোত্রপ্রীতির করায়ত্ত হয় না। বস্তুত রাজশক্তি তারই ভাগ্যে জোটে, যার প্রজাদের উপর প্রভাব বিস্তার, সম্পদ সংগ্রহ, অভিযান প্রেরণ ও সীমান্ত সংরক্ষণের ক্ষমতা আছে এবং যার উপরে অন্য কারো ক্ষমতার হস্ত প্রসারিত নেই। এটাই রাজশক্তির প্রকৃত অর্থ ও সুপরিচিত তাৎপর্য। এ ক্ষেত্রে যদি কারো গোত্রপ্রীতি উপরোক্ত বিষয়ের কতকাংশ পূরণ করতে অক্ষম হয়, যেমন সীমান্ত সংরক্ষণ, রাজকোষ সংগঠন অথবা অভিযান প্রেরণ, তা হলে তার রাজশক্তি যথার্থ অর্থে পূর্ণতা লাভ করেনি।

এ প্রকার অপূর্ণ রাজশক্তি লাভের বহু ঘটনা আগলাবী সম্রাজ্যে কায়রোয়ানের বারবারদের মধ্যে এবং আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে অনারব রাজন্যবর্গের মধ্যে দেখা গেছে।

অনুরূপভাবে যার গোত্রপ্রীতি অন্যান্য গোত্রপ্রীতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে এবং সকল হস্তকে সংকুচিত করতে সমর্থ নয়; বরং তার উপর অন্যের কর্তৃত্ব বিদ্যমান, তেমন রাজশক্তিও অপূর্ণ ও অবিকশিত। এদের উদাহরণ দূরাঞ্চলের আমীর ও সীমান্তের বিভিন্ন সর্দার, যাদেরকে কোনো এক সাম্রাজ্য ছত্রচ্ছায়া দান করে থাকে। বহুদূর বিস্তৃত সাম্রাজ্যের এরূপ অপূর্ণ রাজশক্তির বাহুল্য দেখা যায়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে দূরাঞ্চলের এ ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে নিজ নিজ জাতির উপর শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকেন। অধীনে ও অন্যবার উবাইদী সম্রাটদের অধীনে জানাতী গোত্র। বনি আব্বাসদের সাম্রাজ্যে অনারব উবাইদী রাজন্যবর্গও এরূপ এবং ইসলাম পূর্বকালে ফিরিঙ্গী সম্রাটদের অধীনে বারবার আমীর ও রাজন্যবর্গের অবস্থাও তাদের সাথে তুলনীয়। যেমন আলেকজান্ডার ও গ্রিক জাতির অধীনে পারস্যরাজদের অবস্থা। এরূপ আরো বহু উদাহরণ বিদ্যমান। পাঠক, কিঞ্চিৎ বিবেচনা করলেই তা লাভ করতে পারেন। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর প্রতাপশালী।[৩৪]

৩৪. কোরান ৬, ১৮; ৬১।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

[অতিরিক্ত কঠোরতা রাজশক্তির পক্ষে ক্ষতিকর এবং অনেক সময় তার বিলুপ্তির কারণ হয়ে থাকে]

জেনে রাখুন, প্রজাদের কল্যাণ সম্রাটের সত্তা ও দেহের মধ্যে নয়; তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য, মুখচ্ছবির লাবণ্য, বিরাট আকৃতি, ব্যাপক কর্মক্ষমতা, সুন্দর হস্তাক্ষর বা অসাধারণ মেধা কোনোটাই তাদের মনোহরণ করে না। বরং তারা চায় সম্রাট তাদেরই একজন হবেন। কারণ রাজশক্তি ও শাসন ক্ষমতার ব্যাপারটিই এ সম্পর্কজনিত। তা দুটি সম্পর্কীয় পর্যায়ের মধ্যবর্তী অবস্থা। যথার্থ শাসন ক্ষমতার অর্থ হল সম্রাট প্রজাদের শাসক এবং তাদের সর্ববিধ কার্যের নিয়ামক। সম্রাট তিনিই যাঁর প্রজা আছে এবং প্রজা তারাই যাদের সম্রাট আছেন। বস্তুত প্রজাদের আপনজন হবার এই যে গুণ একেই রাজকীয় ক্ষমতা বলা হয়ে থাকে। এর দ্বারা সম্রাট তাদের শাসক হয়ে ওঠেন। সুতরাং এ ক্ষমতা ও তার অনুসারী গুণাবলি যদি সৎ হয়, তা হলে রাজকীয় শক্তি সর্বতোভাবে সার্থকতা লাভ করে। কারণ এ ক্ষমতা যত সুন্দর ও সৎ ততই প্রজাসাধারণের কল্যাণ। অন্যদিকে এটা অসৎ ও সংকীর্ণ হলে প্রজাদের সমূহ অনিষ্ট ও সর্বনাশ।

রাজকীয় শক্তির সৌন্দর্য হল সহানুভূতি। সম্রাট যদি কঠোরতা ও প্রতাপের অধিকারী হন; মানুষকে শাস্তি দিতে, তাদের গোপনীয়তা নষ্ট করতে এবং তাদের পাপাচারকে খুঁজে দেখতে তৎপর হন, তা হলে তারা ভীত ও অপমানিত হতে থাকে। এর ফলে তারা সম্রাটের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মিথ্যা, কৌশল ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাতেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এভাবে তাদের বিবেচনা শক্তি ও চরিত্র নষ্ট হয়। অনেক সময় যুদ্ধ ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তারা শৈথিল্য প্রদর্শন করে। ফলে ইচ্ছাশক্তির অভাবে সহায়তার কাজে বিঘ্ন ঘটে। অনেক সময় তারা একত্র হয়ে সম্রাটকে হত্যার পরিকল্পনা করে। এর ফলে সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যদি সম্রাটের এ প্রকার ব্যবহার ও কঠোরতা স্থায়ী হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে গোত্রপ্রীতি সমূলে বিনষ্ট হয়, যেমন পূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি এবং পরিণামে সহায়তার অভাবে সাম্রাজ্যের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। অন্যদিকে যদি সম্রাট তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হন, তা হলে তারা তাকে বিশ্বাস করে, তাঁর আশ্রয়ে নিরাপদ বোধ করে, তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণপণে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে সর্বদিক দিয়েই সাম্রাজ্য একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়।

রাজকীয় ক্ষমতার অনুসারী গুণাবলির মধ্যে প্রজাদের কল্যাণ কামনা ও রক্ষণাবেক্ষণ। প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের মধ্য দিয়েই রাজকীয় শক্তি যথার্থ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আর তাদের কল্যাণ কামনা ও তাদের প্রতি সদাচার অর্থে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং তাদের জীবন-যাপনে দৃষ্টি দেয়া বোঝায়। বস্তুত প্রজাদের প্রীতি বর্ধনে এটা একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। পাঠক, জেনে রাখুন, সচেতন ও অতিরিক্ত ধূর্ত শাসকদের মধ্যে সহৃদয়তার প্রবৃত্তি খুব কমই থাকে। এটা অধিকাংশ পাওয়া যায় উদাসীন ও ভাবুক প্রকৃতির শাসকের মধ্যে। সচেতন ব্যক্তিদের সহৃদয়তা কম হওয়ার কারণ এই যে, তাঁরা প্রজাসাধারণ থেকে অধিকতর দূরদর্শী হওয়ার ফলে তাদের উপর এমন বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করেন, যা তাদের বোধগম্য নয়। শাসক নিজে কার্যের আরম্ভেই তার পরিণাম জানতে সক্ষম হলেও প্রজাদের উপর তার এ প্রকার দূরদর্শিতা বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং অনেক সময় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ জন্যই হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যকার দুর্বলদের অনুপাতে পদচারণা করো।" এ দিক থেকেই ধর্মপ্রবর্তক শাসকের জন্য অধিক ধূর্ততার পরিচয় দিতে নিষেধ করেছেন। যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ানের[৩৫] ঘটনায় এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হজরত উমর (রাঃ) তাকে ইরাকের শাসকপদ থেকে বরখাস্ত করলে সে বলেছিল, হে বিশ্বাসীদের নেতা, আপনি কেন আমাকে পদচ্যুত করেছেন? এটা কি কোনোপ্রকার দুর্বলতা অথবা অসততার জন্য? এর উত্তরে উমর বলেছিলেন, আমি তোমাকে এর কোনোটির জন্যই পদচ্যুত করিনি; বরং সাধারণ মানুষের উপর তোমার বুদ্ধির দৌরাত্ম্য আমার ভাল লাগেনি। এটা থেকে এ শিক্ষাই গ্রহণ করা যায় যে, শাসকের পক্ষে যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান ও আমর ইবনে আসের মতো অতিরিক্ত ধূর্ত ও বুদ্ধিমান হওয়া ঠিক নয়। কেননা এতে তার চরিত্রে উৎপীড়ন ও অন্যায্যতার জন্ম হয় এবং এমন অনেক কিছুই অস্তিত্বে আসে যা স্বাভাবিক নয়। গ্রন্থের শেষ দিকে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ সর্বাপেক্ষা উত্তম শাসক।

এ আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হল যে, ধূর্ততা ও বুদ্ধিমত্তা শাসকের জন্য দোষের কারণ। কারণ এতে চিন্তাশক্তির আধিক্য প্রমাণ করে, যেমন নির্বুদ্ধিতা জড়তার ইঙ্গিত দেয়। মানবীয় গুণাবলিতে এ দুটি দিকই দূষণীয়। একমাত্র মধ্য পন্থাই শোভন। যেমন দানের ক্ষেত্রে একদিকে কার্পণ্য অন্যদিকে অপব্যয়। যেমন বীরত্বের ক্ষেত্রে একদিকে দুঃসাহস, অন্যদিকে কাপুরুষতা। এ প্রকার অন্যান্য মানবীয় গুণ। এজন্য অধিক বুদ্ধিমত্তাকে শয়তানের গুণ বলে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন বলা হয়, সে একজন শয়তান অথবা হবু শয়তান এবং এ প্রকার অনেক কিছু। আল্লাহ্ ইচ্ছা অনুযায়ী সৃষ্টি করেন।[৩৬] তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।

---

৩৫. ইনি সম্রাট মাবিয়ার সময় কুফার শাসনকর্তা ছিলেন; জীবনকাল ১-৫৩ হি:।

৩৬. কোরান ৩, ৪৭।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

[খেলাফত ও ইমামতের অর্থ]

যেহেতু রাজশক্তির তাৎপর্য হল মানবজাতির অত্যাবশ্যকীয় সমাজবদ্ধ অবস্থা এবং তার উদ্দেশ্য হল প্রাধান্য বিস্তার ও প্রতাপের প্রতিষ্ঠা, সেজন্য এ দুটি বিষয় অনেক সময় সমাজের জন্য অভিশাপ ও পাশবিকতার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায় এবং সম্রাটের বিধি-নিষেধ সত্য থেকে দূরে সরে যায়। তিনি তাঁর অধীনস্থ লোকদের পার্থিব বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করেন এবং তাদের উপর এমন সব উদ্দেশ্য ও স্বার্থ চাপিয়ে দেন, যা তাদের আনুগত্যের পরিপন্থী। এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের উদ্দেশ্য বিভিন্ন হওয়ায় তাদের সৃষ্ট অবস্থাও বিচিত্র হয়ে থাকে এবং সর্বসাকুল্য আনুগত্যকে কঠিন করে তোলে। সুতরাং গোত্রপ্রীতির অমোঘ তাড়নায় গোলযোগ ও হত্যাকাণ্ডের সৃষ্টি হয়। কাজেই এ ক্ষেত্রে অনিবার্য করুণ পরিণতিকে রোধ করার জন্য এমন কিছু সংখ্যক শাসনবিধি গ্রহণ করা অত্যাবশ্যকীয়, যা সকলের অনুমোদন লাভ করতে সমর্থ হয় এবং তার প্রতি সর্বজনীন আনুগত্য লাভ সহজ হয়ে ওঠে। যেমন পারসিক ও অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রচলিত শাসনবিধি। বস্তুত যখন কোনো সাম্রাজ্য অনুরূপ বিধি-নিষেধ থেকে মুক্ত হয়, তখন তার কার্যাদি সুশৃঙ্খল হয় না এবং তার প্রাধান্য বিস্তারিত পরিপূর্ণতা লাভ করে না। এটাই পূর্বগামীদের মধ্যে আল্লাহ্‌র বিধান।[৩৭]

এ সকল বিধি-নিষেধ যদি বিবেকবান বুদ্ধিমান সাম্রাজ্য প্রধানদের দ্বারা নির্ধারিত হয়, তা হলে তাকে বিবেকপ্রসূত শাসনবিধি বলা হয় এবং তা যদি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কোনো ধর্মপ্রবর্তকের দ্বারা নির্ধারিত ও প্রচলিত হয়, তা হলে তাকে ধর্ম নির্ধারিত শাসনবিধি বলা হয়ে থাকে। বস্তুত এ শেষোক্তটি মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় ক্ষেত্রেই উপকারী হয়ে থাকে। কেননা সৃষ্টির উদ্দেশ্য তাদের পার্থিব জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়। কারণ তা হলে সমগ্র ব্যাপারটাই অনর্থক মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায়। কেননা এর শেষ পরিণতি শুধু ধ্বংস ও মৃত্যু। এ জন্যই আল্লাহ্ বলেন, তোমরা কি এ ধারণা করেছ যে, তোমাদিগকে শুধুই অহেতুক সৃষ্টি করেছি![৩৮] সুতরাং তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, এমন পার্থিব জীবনের সৃষ্টি করা, যা তাদের পারলৌকিক মঙ্গল বিধানে সক্ষম হয়। এটাই পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পথ।[৩৯] এজন্যই ধর্ম মানুষকে তাদের

---

৩৭. কোরান ৩৮, ৩৮; ৬২।
৩৮. কোরান ২৩, ১৫।
৩৯. কোরান ৪২, ৫৩।

ব্যবহারিক ও উপাসনাগত কার্যাদিকে এ পথে পরিচালিত করার জন্য বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করে থাকে। এমন কি মানুষের স্বাভাবিক সমাজবদ্ধ জীবন তথা রাজশক্তিও এর আওতাভুক্ত হয়। যাতে সকল কার্যই ধর্মের পথে পরিচালিত হয়ে পরম শৃঙ্খলা বিধায়কের আয়ত্তাধীনে থাকে।

পূর্বোক্ত শাসনবিধির মধ্যে যা শুধু প্রাধান্য বিস্তার, প্রতাপের প্রতিষ্ঠা ও গোত্রপ্রীতির শক্তিকে যথেচ্ছা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রচিত হয়, তা অত্যাচার ও উৎপীড়নের নামান্তর এবং বিধাতার দৃষ্টিতে ও শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের দিক থেকেও দূষণীয়। অন্যদিকে শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নির্ধারিত বিধি-নিষেধও দূষণীয়; কেননা তাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশনার আলোক নেই এবং আল্লাহ্ যাকে কোনো আলোক দেননি, তার আলোক থাকে না।[৪০] কারণ ধর্মপ্রবর্তক তাদের সর্ববিধ বিষয়ে অধিকতর কল্যাণ সম্পর্কে জ্ঞাত। এমনকি তাদের অদৃশ্য পারলৌকিক জীবন সম্পর্কেও। কারণ মানুষের সর্ববিধ কার্য, তা রাজশক্তি বা অন্য যে কোনো বিষয় সংক্রান্ত হোক না কেন, সকলই পরলোকে তাদের নিকট ফিরে আসবে। হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, "এটা শুধুই তোমাদের কার্যাবলি, যা তোমাদের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হবে।" অথচ শাসন সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ শুধু পার্থিব জীবনের কল্যাণ বিধানেই সীমিত। তারা শুধু প্রকাশ্য ইহলৌকিক জীবনকেই জানে।[৪১] এজন্য ধর্মপ্রবর্তকের উদ্দেশ্য হল মানুষের পারলৌকিক মঙ্গলবিধান করা এবং এ উদ্দেশ্যেই সকল মানুষকে ধর্মীয় বিধিনিষেধের মাধ্যমে পার্থিব ও অপার্থিব সর্ববিধ কল্যাণের পথে পরিচালিত করা। এ পরিচালনার দায়িত্ব নবীদের উপর অর্পিত হয়েছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে যাঁরা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, তাঁরাই খলিফা বা প্রতিনিধি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পাঠকের নিকট খেলাফতের অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অতএব স্বাভাবিক রাজশক্তির উদ্দেশ্য হল সকল মানুষকে স্বার্থ ও প্রবৃত্তির বিশেষ তাড়নায় পরিচালিত করা, শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বিধিনিষেধের লক্ষ হল সকলকে বিবেকসম্মত পথে পরিচালিত করে পার্থিব জীবনের কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ দূর করা এবং ধর্মীয় প্রতিনিধিত্ব তথা খেলাফতের উদ্দেশ্য হল মানুষকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সমুদয় পারলৌকিক মঙ্গল ও ইহলৌকিক কল্যাণের দিক দর্শন করা। কারণ তাদের পার্থিব জীবনের সকল কার্যই পরলোকে তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। এজন্য ধর্মপ্রবর্তক সেই পারলৌকিক মঙ্গলের দিকে লক্ষ রেখেই সমুদয় পার্থিব কার্য নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন। সুতরাং খেলাফতের যথার্থ তাৎপর্য হল ধর্মপ্রবর্তকের প্রাতনিধিত্ব করে ধর্মের বিধি-নিষেধ সংরক্ষণ এবং পার্থিব শাসনের প্রতিষ্ঠা করা। পাঠক এ বিষয়টি বুঝে নিন এবং আপনার সম্মুখে উপস্থাপিত আমাদের পরবর্তী আলোচনায় একে বিবেচনা করুন। আল্লাহ্ যথার্থই বিচক্ষণ ও সর্বজ্ঞ।

---

৪০. কোরান ২৪, ৪০।

৪১. কোরান ৩০, ৭।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

[খেলাফতের পদমর্যাদা ও শতাব্দী সম্পর্কে মানুষের মধ্যে প্রচলিত মতপার্থক্য]

ইতিপূর্বে আমরা এ পদমর্যাদার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছি। তা এ যে, ধর্মপ্রবর্তকের প্রতিনিধি হয়ে ধর্মীয় বিধানকে সংরক্ষণ এবং তদনুসারে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা। একেই খেলাফত বা ইমামত বলা হয় এবং যিনি এ কার্য সম্পাদন করেন তাঁকে বলা হয় খলিফা বা ইমাম। অবশ্য ইমাম বলতে নামাজের জন্য প্রচলিত ইমামের সঙ্গেই তুলনীয় এবং তাঁর জন্য নির্ধারিত অনুসরণ ও আনুগত্য এস্থলে কাম্য বলে বোঝান হয়। এজন্যই তাঁকে বলা হয় 'মহান ইমাম'[৪২] খলিফা বলতে জাতির জন্য নবীর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধিকে বোঝায়। এটা অনেক সময় শুধু খলিফা এবং রসূলুল্লাহ্‌র খলিফা বলে উল্লেখ হয়। একে আল্লাহ্‌র খলিফা বলার ক্ষেত্রে মতভেদ বিদ্যমান। অনেকের নিকট এটা বৈধ; কেননা সকল মানুষই আল্লাহ্‌র খলিফা। যেমন আল্লাহ্‌তালার বাণীতে আছে, অবশ্যই আমি পৃথিবীর বুকে প্রতিনিধি স্থাপন করতে যাচ্ছি। অন্যত্র তাঁর বাণী, তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন[৪৩] কিন্তু অধিকাংশের মতে এটা ঠিক নয়। কারণ কোরানের শ্লোকের অর্থ অনুরূপ নয়। এজন্যই হজরত আবুবকর (রাঃ)-কে এরূপ সম্বোধন করায় তিনি অস্বীকার করে বলেছিলেন, আমি আল্লাহ্‌র খলিফা নই; বরং রসূলুল্লাহ্‌র খলিফা। তদুপরি প্রতিনিধিত্ব একমাত্র অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে করা যায়। কিন্তু যিনি উপস্থিত আছেন, তাঁর পক্ষ থেকে নয়।

অতঃপর ইমাম বা নেতা নির্ধারণ অবশ্য পালনীয়। কারণ তা সাহাবী ও তাবেয়ীদের সর্বসম্মতিক্রমে অবশ্য করণীয় বলে গৃহীত হয়েছে। এজন্যই হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর তিরোধানের পর তাঁর অনুসারীরা দ্রুত হজরত আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাঁদের সর্ববিধ কার্যে দৃষ্টিদানের ক্ষমতা মেনে নিয়েছিলেন। এর পর প্রত্যেক যুগেই এটা সংঘটিত হয়েছে এবং কোনোকালেই মানুষ অশাসক অবস্থায় থাকেনি। এটা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নেতৃত্ব নির্ধারণ সর্বসম্মতিক্রমেই অবশ্য পালনীয়। অনেকে অবশ্য এ মত পোষণ করেন যে, নেতৃত্বের অবশ্যকতার এ ব্যাপারটি বুদ্ধিপ্রসূত এবং এ বিষয়ে সর্বসম্মতি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত মাত্র। তাঁরা বলেন, মানুষের

---

৪২. এর পর নিম্নের এ অনুচ্ছেদটি রোজেনথালে বিদ্যমান।
পরবর্তীকালে ইমামকেই সুলতান বলা হয়। একে ত ইমামতের প্রার্থী অনেক, তদুপরি সময়ের দূরত্বও ব্যাপক। এক্ষেত্রে মানুষও ইমামতির শর্তাদি পালন করে না এবং যে কেউ ক্ষমতা দখল করে মানুষকে অনুগত হতে বাধ্য করে।

৪৩. কোরান ২, ৩০; ৩৬, ১৬৫; ৩৫, ৩৯।

সমাজবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনীয়তার জন্যই বুদ্ধি একে অবশ্য পালনীয় করে তুলেছে। কারণ তা ব্যতীত এককভাবে মানুষের পক্ষে সকল প্রয়োজন পূরণ করে জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়। আবার এ সমাজবদ্ধতাই মানুষের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ঘটিয়ে থাকে। সুতরাং তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবিধায়ক কোনো শাসকের অস্তিত্ব না থাকলে তারা এ সংঘাত ধ্বংসের সম্মুখীন হবে এবং মানবজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অথচ ধর্মীয় বিধানের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজাতির পরিবর্ধন।

দার্শনিকগণ নবুয়তের আবশ্যকতা সম্পর্কেও উক্তরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে এরূপ যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করেছি। তাঁদের বক্তব্যের একটি দিক এ যে, শৃঙ্খলা বিধান একমাত্র আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই সম্ভব এবং সকলকেই তা বিনাদ্বিধায় বিশ্বাস করতে ও মেনে নিতে হবে এটা ঠিক নয়। কারণ শৃঙ্খলা বিধান রাজশক্তির দাপটে ও ক্ষমতাবানদের প্রতাপের ফলেও সম্ভব হয়ে থাকে; সেখানে ধর্ম অনুপস্থিত। যেমন মজুসী ও অন্যান্য জাতি, যাদের মধ্যে কোনো গ্রন্থ নেই বা যাদের নিকট ধর্মীয় আহ্বান পৌঁছেনি। অথবা বিষয়টি এভাবেও বলতে পারি যে, তাদের মধ্যে বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবে কলহের জনক অত্যাচারকে নিষিদ্ধ করে শৃঙ্খলা বিধান করা সম্ভব। সুতরাং তাঁদের ঐ দাবি যে, একমাত্র ধর্মের উপস্থিতিই তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধান করবে এবং তার দ্বারাই নেতৃত্বের নির্ধারণ সম্ভব হবে, তা ঠিক নয়। বরং তা যেমন ইমামের দ্বারা হতে পারে, তেমনি ক্ষমতাবান আমীরদের দ্বারা অথবা মানুষের পরস্পর সম্মতিক্রমে অন্যায়-অবিচারের মূলোৎপাটন করেও হওয়া সম্ভব। কাজেই এ বক্তব্যে তাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রমাণটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। অতএব সিদ্ধান্ত এটাই যে, নেতৃত্ব নির্ধারণের অবশ্য করণীয় ধর্মের দ্বারাই উপলব্ধ এবং তার উপরেই সর্বসম্মতি বিদ্যমান, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

অবশ্য খুব অল্প সংখ্যক অনেকের এও মত যে, এ নেতৃত্ব নির্ধারণের আদৌ আবশ্যকতা নেই; বুদ্ধির দিক থেকেও নয়, ধর্মের দিক থেকেও নয়। মুতায়িলা সম্প্রদায়ের আল আসম,[৪৪] খারিজী সম্প্রদায়ের অনেকে এবং অন্য অনেক ব্যক্তি উপরোক্ত মত পোষণ করেন। কারণ অবশ্য করণীয় বলতে তাঁরা ধর্মীয় বিধানের প্রবর্তনকে মনে করেন। সুতরাং জাতি যদি ন্যায়পরায়ণতা ও আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধ প্রবর্তনে ঐকমত্য পোষণ করতে সমর্থ হয়, তা হলে ইমামের প্রয়োজন হয় না এবং তার নির্ধারণও অবশ্যকরণীয় নয়। অবশ্য তাদের এ মত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের দ্বারা সমর্থিত নয়। রাজশক্তির বিচিত্র অভ্যাস যথা দীর্ঘসূত্রিতা, অন্যায্য প্রভাব, পার্থিব সম্ভোগেচ্ছা প্রভৃতিই তাঁদেরকে অনুরূপ মত পোষণে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। কারণ তাঁরা দেখেছেন যে, ধর্মীয় বিধানে এ সকল বিষয়ের সমালোচনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি ভর্ৎসনা বিদ্যমান। সুতরাং তাদের সমুদয়কেই ত্যাগ করার প্রবৃত্তি তাঁদের মধ্যে জেগে উঠেছে।

জেনে রাখুন যে, ধর্ম রাজশক্তির সত্তাকে দূষণীয় এবং তার প্রতিষ্ঠাকে অবাঞ্ছিত মনে করে না। একমাত্র তা থেকে উৎপন্ন অনিষ্টকর প্রতাপ, অবিচার ও বিলাসব্যসনকেই

৪৪. মুতাযিলা সম্প্রদায়ের প্রথম যুগের বিশিষ্ট জ্ঞানী; জীবনকাল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দি।

দূষণীয় বলে জানে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ সকল অনিষ্টকর বিষয় নিন্দনীয় এবং তা রাজশক্তির একান্ত অনুসারী। যেমন ন্যায়পরায়ণতা, সাধুতা, ধর্মের নিদর্শনাদি প্রবর্তন ও তার পথের বাধা অপসারণ প্রভৃতি সম্পর্কে ধর্ম প্রশংসা করেছে এবং তাদের জন্য পুণ্যের ব্যবস্থাও রেখেছে। বস্তুত এগুলোও রাজশক্তির অনুসারী। সুতরাং রাজশক্তির একটি বিশেষ অবস্থার ব্যাপারেই ধর্মীয় নিন্দা রয়েছে সর্বাবস্থার জন্য নয়। এজন্য তার সত্তাকে নিন্দা করেনি এবং তাকে ত্যাগ করতেও বলেনি। যেমন ধর্ম প্রবৃত্তি ও ক্রোধের নিন্দা করেছে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, তাদেরকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হবে। কারণ তাদেরও প্রয়োজন আছে। বরং এ নিন্দার উদ্দেশ্য এ যে, মানুষ যেন এ দুটি বিষয়কে সত্যের অনুসারী করে তোলে।

হযরত দাউদ ও সালোয়মান (আঃ) এমন বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন, যা অন্যদের ছিল না। অথচ তাঁরা উভয়েই নবী এবং আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানিত ব্যক্তি। অতঃপর তাঁদের উদ্দেশ্যে বলি, আপনাদের এরূপ রাজশক্তি ও ইমাম নির্ধারণের আবশ্যকতা থেকে পলায়ন কোনো কাজেই আসবে না। কারণ আপনারা ধর্মীয় বিধি-নিষেধ প্রবর্তনের পক্ষপাতী এবং উক্ত ব্যাপারটি কিছুতেই গোত্রপ্রীতি ও প্রতাপ ব্যতীত সম্ভব নয়। আর গোত্রপ্রীতি তার স্বাভাবিক পরিণতিতে রাজশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং ইমাম নির্ধারণ না করলেও রাজ্য প্রতিষ্ঠা অনিবার্য এবং বিষয়টি পরিণামে তাই হল, যা থেকে আপনারা পলায়ন করেছিলেন।

কাজেই এটা যখন প্রমাণিত হল যে, সর্বসম্মতিক্রমে ইমাম নির্ধারণ অবশ্য পালনীয়, তখন তাকে সামাজিক কর্তব্য[৪৫] বলে গণ্য করতে হবে এবং তার দায়িত্ব সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপর বর্তাবে। তাঁরা ইমাম নির্ধারণ করবেন এবং সাধারণ মানুষ তাঁকে অবশ্য কর্তব্য হিসাবে অনুসরণ করবে। কারণ আল্লাহ বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্‌কে, তাঁর রসূলকে এবং তোমাদের মধ্যে কর্তাব্যক্তিকে অনুসরণ কর।[৪৬]

---

৪৫. মূলে আছে 'ফরজে কেফায়া' অর্থাৎ এমন কর্তব্য যা কিছু সংখ্যক লোক পালন করলে সকলে দায়িত্বমুক্ত হয় এবং না করলে সকলে পাপী হয়।

৪৬. কোরান ৪, ৫৯। এর পর রোজেনথালে কয়েকটি অনুচ্ছেদ বিদ্যমান, যা আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে নেই। সম্পূর্ণতার প্রয়োজনে আমরা নিম্নে তার অনুবাদ সন্নিবেশিত করলাম।

অবশ্য একই সময়ে দুইজন ইমামের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন সম্ভব নয়। ধর্মবিদ জ্ঞানীরা হাদিসে উল্লেখিত কতিপয় নির্দেশের ধারা অনুসরণ করে উপরোক্ত মত পোষণ করেন। হাদিসগুলো মুসলিম শরীফের 'কিতাবুল ইমারা' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। তাতে এ প্রকার নির্দেশ আছে বলে মনে হয়।

অন্য অনেকের মতে এই নিষেধাজ্ঞা শুধু একই অঞ্চলে দুইজন ইমামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাঁরা উভয়ে একত্রে অবস্থান করলেও এরূপ হতে পারে। কিন্তু যদি তাঁদের অধীনস্থ অঞ্চলের মধ্যে অত্যধিক দূরত্ব থাকে কিংবা একজনের পক্ষে এত বিস্তৃত অঞ্চল শাসন করা সম্ভব না হয়, তা হলে দুইজনে কোনো অসুবিধা নেই; বরং প্রজাসাধারণের সুবিধার জন্য আরো একজনকে ইমাম হিসাবে নিযুক্ত করা প্রয়োজন।

জ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা উপরোক্ত মত পোষণ করেন, তাঁদের মধ্যে আবু ইসহাক আল ইসফারায়নী, প্রসিদ্ধ ইলমে কালামবিদ এবং 'ইমামুল হারামাইন' আবুল মাআলী আব্দুল মালেক ইবনে আব্দুল্লাহ্ আল জুয়ায়নী—'কিতাবুল ইরশাদ' নামক গ্রন্থ রচয়িতার নাম উল্লেখযোগ্য আন্দালুস ও মাগরিবের জ্ঞানীদের বক্তব্যেও এটা প্রকাশ পায় যে, তাঁরা এ মত পোষণ করেন। আন্দালুসের বহু সংখ্যক ধর্মজ্ঞানী উমাইয়া সম্রাটদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন এবং উমাইয়া সম্রাট আবদুর রহমান

এ পদমর্যাদার শর্ত হল চারটি। জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণতা, যোগ্যতা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির সম্পূর্ণতা যাতে কর্ম সম্পাদনে ও মতামত প্রদানে প্রভাবশালী হতে পারে। পঞ্চম একটি শর্ত সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। তা হল কোরায়েশ বংশীয় হওয়া।

জ্ঞানের শর্তটিত খুবই সুস্পষ্ট ব্যাপার। একমাত্র জ্ঞানীর পক্ষেই আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করা সম্ভব। যে তা জানে না, তার জন্য এ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া ঠিক নয়। তদুপরি শুধু জ্ঞানী হলেই চলবে না, তাকে গবেষক হতে হবে। কারণ এ ব্যাপারে অন্যের অনুসরণ করা ত্রুটির ব্যাপার। অথচ ইমামতের দাবি হল সর্বাবস্থা ও সর্বগুণের পরিপূর্ণতা।

ন্যায়পরায়ণতার শর্ত এ কারণে যে এ পদমর্যাদাটি ধর্মীয় ব্যাপার এবং যেহেতু অন্যান্য পদমর্যাদাতেও এ গুণটিকে শর্ত হিসাবে গ্রহণ করা হয়, সুতরাং ধর্মীয় ব্যাপারে তা অধিকতর প্রযোজ্য। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম ও অনুরূপ বিষয়াদি সম্পাদন দ্বারা এ গুণে নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে কোনোপ্রকার মতভেদ নেই। অবশ্য অভিনব মতবাদ পোষণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য বিদ্যমান।

যোগ্যতার শর্তটি এ জন্য যে, ইমাম শান্তিবিধানে পারঙ্গম, যুদ্ধাদি পরিচালনায় সক্ষম ও তৎসম্পর্কে দূরদর্শিতার অধিকারী এবং মানুষকে এ ব্যাপারে নিয়োজিত করতে দায়িত্বশীল হবেন। গোত্রপ্রীতি সম্পর্কে অবহিত ও তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তন সম্বন্ধে অনুভবকারী এবং শাসন পরিচালনায় তার সাহায্য গ্রহণে সমর্থ হবেন যাতে তার সহায়তায় তিনি ধর্মের সহায়ক শক্তিতে পরিণত হতে পারেন। শত্রুনিপাতে, বিধি-নিষেধ প্রবর্তনে ও কল্যাণ প্রচেষ্টায় তিনি তৎপর হবেন।

আন্‌নাসেরকে ও তার বংশাবলিকে 'আমীরুল মুমেনীন' উপাধি দান করেছেন। এ উপাধিটি খেলাফতের একটি চিহ্ন, যেমন আমরা পরে বর্ণনা করব। কিছুকাল পরে মাগরিবের আলমোহেদরাও অনুরূপ কাজ করেছেন।

অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বসম্মত মতের উল্লেখ করে দুই ইমামের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু এই সর্বসম্মত মতের উল্লেখ কোনোপ্রকার প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে না। কারণ তথায় তেমন যোগ্য কিছু থাকলে উস্তাদ আবু ইসহাক ইসফারায়নী ও ইমামুল হারামাইন তার বিরোধিতা করতেন না। কারণ তাঁরা অন্য যে কোনো ব্যক্তি অপেক্ষা এই বিষয়ে অধিকতর জ্ঞাত। ইমাম আল মাজারী ও আননাওয়াই অবশ্য হাদিসের মর্মানুসারে তাঁদের উপরোক্ত মতের বিরোধিতা করেছেন। বর্তমানকালের অনেক বিদ্বান ব্যক্তি এই ইমামের ব্যাপারটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের যুক্তির ভিত্তি হল কোরানে উল্লেখিত দুই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। যেমন বলা হয়েছে, তাতে যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য থাকত, তা হলে আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। অবশ্য এই আয়াত হতে এ ধরনের কোনো যুক্তি বের করা সম্ভব নয়। কারণ তার এ যদি বিশিষ্ট বক্তব্যের সমস্তটাই একটা ধারণা মাত্র। আল্লাহ্ আমাদিগকে এই ধরনের একটি ব্যাপারের সম্ভাব্যতা বিচার করে দেখতে বলেছেন মাত্র, যাতে তার ফলাফল হতে তাঁর একত্ব সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হতে পারে। অথচ আমরা যা চাই, তার ক্ষেত্র একান্ত বাস্তব ইমামত। কেন একজন ইমামের স্থলে দুইজন হওয়া নিষিদ্ধ। তাই বাস্তব ভিত্তিতে খুঁজে দেখতে হবে। সুতরাং বিষয়টি সম্পূর্ণ ধর্মীয় বিধিবিধান ও বিচার-বিবেচনার অন্তর্গত। এই দিক হতে উপরোক্ত কোরানের আয়াতে সরাসরি কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, যতক্ষণ না আমরা এরূপ একটি বাস্তব ধারণার সৃষ্টি করব যে, দুইজনের উপস্থিতি ধ্বংসাত্মক কার্যাদির জন্ম দিবে এবং এটা হতে সিদ্ধান্ত করব যে, আমরা এমন কিছু গ্রহণ করতে পারি না, যা ধ্বংসাত্মক পরিণতির সৃষ্টি করতে পারে। শুধু এরূপ ধারণার বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হলেই তা হতে যুক্তি গ্রহণ করা যেতে পারে। আল্লাহ্‌ই উত্তম জ্ঞাতা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির সম্পূর্ণতার ব্যাপারটি এ যে, এগুলো ত্রুটিপূর্ণ বা অক্ষম হবে না। যেমন—উন্মত্ততা, অন্ধত্ব, বধিরত্ব ও বাক্‌হীনতা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যাপারে কার্যক্ষমতার অনুপযোগী হওয়া। যেমন—দুই হাত, দুই পা ও অণ্ডকোষবিহীন হওয়া। এ কারণেই সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্পূর্ণতা শর্ত হিসাবে আরোপ করা হয়েছে, যাতে তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। অন্যদিকে তা কার্যের অসুবিধা না হলেও দেখতে কুৎসিত, যেমন এ সকল ইন্দ্রিয়াদি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে কোনো একটি নষ্ট হয়ে যাওয়া। সুতরাং এক্ষেত্রে সম্পূর্ণতার অর্থ সব কিছুই যথাযথভাবে থাকা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অভাবে কার্যাদি সম্পাদনে যে অসুবিধা দেখা দেয়, তা দুই প্রকার। এক প্রকারের সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বস্থানে থাকা সত্ত্বেও অক্ষম হয়ে যেতে পারে। সুতরাং তা অঙ্গহীনতার মতোই অসুবিধার সৃষ্টি করে। যেমন বন্দী হয়ে বা অনুরূপভাবে আবদ্ধ থেকে স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশে অক্ষম হওয়া। অন্য প্রকারে এ ধরনের কিছু হয় না বটে তবে তাতেও অসুবিধা দেখা দেয়। যেমন ইমামের সহায়ক কোনো ব্যক্তির তাঁর উপর প্রভাবশালী হওয়া। কোনো প্রকার অন্যায্য ও গর্হিত কিছু না করেও সে এভাবে তাঁকে অক্ষম করে ফেলতে পারে। এতে সকলের দৃষ্টি ঐ প্রভাব বিস্তারকারীর উপর পড়বে। সে যদি ধর্ম, ন্যায়পরাণতা ও শাসনের ব্যাপারে সততা ও নিষ্ঠা দেখাতে পারে, তা হলে তার অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠবে না। নতুবা মুসলমানরা যেমন কোনো ব্যক্তির অনুসন্ধান করবে, যিনি তার কবল থেকে ইমামকে উদ্ধার করতে পারেন এবং তাঁর ত্রুটি দূর করতে সক্ষম হন। এর ফলে খলিফার দায়িত্ব পালন পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠবে।

কোরায়েশ বংশীয় হওয়ার ব্যাপারটি সম্পর্কে বক্তব্য এ যে, সকিফা দিবসে[৪৭] সাহাবীরা এ বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ঐদিন আনসারগণ সাদ ইবনে উবাদার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে উদ্যোগী হয়ে বলেছিলেন, "আমাদের মধ্য থেকে একজন সর্দার এবং তোমাদের মধ্য থেকে একজন সর্দার হবে।" কোরায়েশগণ তখন হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর এ বাণী—'ইমামগণ কোরায়েশদের মধ্য থেকে হবে'—এর দ্বারা উপরোক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁরা আরো বলেন, নবী (সঃ) আমাদেরকে উপকারকারীদের উপকার করতে এবং তাদের প্রতি অসদাচরণ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। যদি সর্দারী তোমাদের মধ্যেই থাকবে, তা হলে তিনি অন্তিম উপদেশে এ নির্দেশ দিতেন না। এভাবে তাঁরা আনসারগণকে যুক্তি-প্রমাণে সম্মত করিয়ে তাঁদের সেই প্রস্তাব—'আমাদের মধ্যে একজন সর্দার ও তোমাদের মধ্যে একজন সর্দার তা থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁরাও এ উদ্দেশ্যে সাদের প্রতি

৪৭. হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর তিরোধানের অব্যবহিত পরেই নেতৃত্বের প্রশ্নে সাহাবীরা বনু সাইদ গোত্রের দরবার কক্ষে সমবেত হন এবং সেইখানেই আনসারগণ উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই ক্ষেত্রে হজরত আবু বকর (রাঃ) কোরায়েশদের ইমামতের বাণীটি প্রথম উদ্ধৃত করেন এবং বহু বাকবিতণ্ডার পর হজরত উমর (রাঃ) অগ্রসর হয়ে হজরত আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে সকলকে আহ্বান জানালে এ বিতর্কের অবসান ঘটে। সকিফা শব্দের অর্থ দরবারকক্ষ। এই ঘটনার জন্য এটা সকিফা দিবস নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

আনুগত্য থেকে ফিরে এসেছিলেন।' বিশুদ্ধ হাদিসে আরো প্রমাণ আছে যে, এ বিষয়টি সর্বদাই কোরায়েশের কোনো গোত্রে অবস্থান করবে।[৪৮] এ প্রকার প্রমাণ অসংখ্য।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, যখন কোরায়েশদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল, তাদের গোত্রপ্রীতি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল এবং তারা বিলাসব্যসন ও প্রাচুর্যে নিমজ্জিত হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র সাম্রাজ্য লিপ্সায় ছড়িয়ে পড়ল, তখন তাদের পক্ষে খেলাফতের দায়িত্ব বহন করার আর শক্তি রইল না। সুতরাং তাদের উপর অনারবরা প্রাধান্য বিস্তার করে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসল। এ বিষয়টি বহু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে সন্দেহে ফেলেছে এবং তাঁরা কোরায়েশ বংশীয় হওয়ার শর্তটিকে বাতিল করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁরা হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর এ বাণীর—তোমাদের উপর যদি মুনাক্কার ন্যায় মাথাবিশিষ্ট একজন হাবশী ক্রীতদাসকে শাসক নিয়োজিত করা হয়, তা হলেও তার কথা শোন ও অনুগত হও।"[৪৯] তার ব্যবহার্য গ্রহণ করে প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। বস্তুত এ হাদীস দ্বারা এ বিষয়ে কোনো প্রমাণ উপস্থিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ এটা উদাহরণ থাকার উপর জোর দেয়া হয়েছে।

যেমন হজরত উমর (রাঃ) বলেছেন, হুজারফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম যদি জীবিত থাকত আমি তাকে শাসক নিযুক্ত করতাম। অথবা তার সম্পর্কে আমার কোনো আপত্তি থাকত না। এ উক্তি দ্বারাও প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। কারণ এটা সকলেরই জানা যে, সাহাবীর মত ও পথ দ্বারা কোনোকিছু প্রমাণ করা যায় না। তদুপরি কোনো জাতির মুক্ত ক্রীতদাস তাদেরই অন্তর্গত। এ দিক থেকে কোরায়েশের সাথে গোত্রপ্রীতিতে সালেমের সম্পর্ক বিদ্যমান। বংশ বিশেষের শর্ত আরোপ করার এটাই উপকারিতা। এ কারণে হজরত উমর (রাঃ) যখন খেলাফতের বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত হলেন এবং তাঁর ধারণা মতে তার শর্তাদি নিবষ্ট হওয়ার পথ বলে মনে হল, তখন তিনি সালেমের উদাহরণ উপস্থিত করলেন। কারণ, তাঁর মতে সালেমের মধ্যে এ সকল শর্তের পূর্ণতা বিরাজমান ছিল। এমন কি এ প্রসঙ্গে তিনি বংশের কথাও উল্লেখ করলেন। কারণ গোত্রপ্রীতির ক্ষেত্রে এ বংশের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক, যেমন আমরা পরে বর্ণনা করব। অবশ্য সালেমের ক্ষেত্রে প্রকাশ্য কোনো বংশমর্যাদা ছিল না। কিন্তু হজরত উমর একে জরুরি মনে করেননি। কারণ বংশধারার তাৎপর্য তার গোত্রপ্রীতির মধ্যে নিহিত এবং তা এখানে আশ্রিত পোষ্য হওয়ার মধ্য দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং তার উদাহরণ তুলে ধরে হজরত উমর (রাঃ) মুসলমানদেরকে এমন ব্যক্তি নিয়োগ ও তার আনুগত্যের প্রতি উৎসাহী করেছেন, যার উপর কোনো দুর্নাম আরোপিত কিংবা যার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অভিযোগ উত্থাপিত না হয়।

কোরায়েশ বংশীয় হওয়ার শর্তটি অস্বীকারকারীদের মধ্যে কাজী আবু বকর বাকেল্লানী অন্যতম। তিনি কোরায়েশদের গোত্রপ্রীতি বিনষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হতে দেখে এবং তাদের উপর অনারব রাজন্যবর্গের ঘটনা লক্ষ করে কোরায়েশ বংশীয় হওয়ার শর্তটি

---

৪৮. বোখারী ও অন্যান্য হাদিস সংকলন দ্র:।

৪৯. উক্ত হাদিস অনুসারে খারেজী সম্প্রদায়ের চরম মতও প্রকাশ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলমুত্তাকী রচিত 'কানজুল উম্মাল' দ্র:।

বিলোপ করে দিয়েছেন। যদিও এটা বাহ্যত খারিজীদের মতের অনুরূপ, তথাপি তাঁর সমকালীন যুগে তাদের অবস্থা দেখে তিনি এরূপ উক্তি করতে বাধ্য হয়েছেন, অধিকাংশ অবশ্য সেই শর্তের অনুকূলে রয়ে গেছেন এবং কোরায়েশ বংশীয় হওয়ার মধ্যে কোনো অসুবিধা দেখেননি। এমন কি তারা যদি মুসলমানদের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন, তথাপি। এ মতের বিরোধিতা করে বলা হয়েছে যে, তা হলে যোগ্যতার শর্ত অপূর্ণ থাকবে যা দিয়ে তিনি কার্য সম্পাদনের শক্তি পেয়ে থাকেন। কারণ গোত্রপ্রীতির মহিমা নষ্ট হয়ে গেলে কার্য নির্বাহের ক্ষমতাও সেই সঙ্গে অন্তর্হিত হবে। এভাবে যোগ্যতার অভাব দেখা দিলে তা জ্ঞান ও ধর্মের ক্ষেত্রেও সংক্রমিত হবে। এভাবে একের পর এক শর্তগুলো লোপ পেতে থাকলে সমগ্র বিষয়টিই সর্বসম্মত মতের বিরোধী হয়ে উঠবে।

আমরা এখন বংশমর্যাদাকে শর্ত হিসাবে গ্রহণ করা সম্পর্কে কথা বলব, যাতে উক্ত মতের মধ্যকার শুদ্ধ যুক্তির তাৎপর্য উদঘাটিত হয়ে পড়ে। সুতরাং আমাদের বক্তব্য এ যে, ধর্মীয় বিধি-বিধানের প্রতিটির জন্যই সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী নির্দেশ এবং তার প্রবর্তনার বিষয়টি থাকতে হবে। আমরা যখন কোরায়েশ বংশীয় হওয়ার শর্ত আরোপ এবং এ সম্পর্কে ধর্মপ্রবর্তকের উদ্দেশ্য আলোচনা করতে বসি, তখন তাকে সুপরিচিত ধারণা অনুসারে শুধুমাত্র নবী বংশের মর্যাদার সাথে যুক্ত হওয়ার উপলক্ষ বলে ক্ষান্ত হতে পারি না। যদিও উক্ত বংশের সাথে সংযুক্ত হওয়ার মধ্যে পুণ্যলাভের ব্যাপার আছে, তথাপি পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে এটাই ধর্মীয় বিধানের উদ্দেশ্য হতে পারে না। সুতরাং বংশমর্যাদার শর্তের জন্য অবশ্যই একটি উপযোগিতা বিদ্যমান, যাকে সম্মুখে রেখে এ বিধান দেয়া হয়েছে। আমরা যখন এ ব্যাপারে গভীরভাবে তলিয়ে দেখি, অনুসন্ধান করি, তখন এটাই দেখতে পাই যে, এ শর্ত আরোপের একমাত্র উদ্দেশ্য হল গোত্রপ্রীতি, যা দিয়ে সহায়তা ও অধিকার আদায় সম্ভব হয়ে থাকে। এ শক্তি যার আছে, তিনি স্বয়ং পদমর্যাদার অধিকারী হলে কোনো প্রকার মতভেদ ও দলাদলি থাকে না, জাতি ও বংশ তাঁর আশ্রয়ে নিরাপত্তা বোধ করে এবং সম্প্রীতির রজ্জু সকলকে একত্রে বেঁধে তুলতে পারে। বস্তুত কোরায়েশ মুজারের গোত্রপ্রীতির অধিকারী, তাদের ভিত্তি, এক প্রভাবশালী গোত্র ছিল। সমগ্র মুজারের উপর তারা বিশিষ্ট মর্যাদা, গোত্রপ্রীতি ও প্রাধান্যের অধিকারী ছিল। সমগ্র আরব তাদের এ মর্যাদাকে স্বীকার করত এবং তাদের প্রাধান্যকে মেনে নিত। কোরায়েশ ব্যতীত অন্যরা যদি নেতৃত্বের ভার নিত, তা হলে মতভেদ দেখা দিত এবং আনুগত্যের অভাব পড়ত। তারা ব্যতীত মুজারের অন্য কোনো গোত্র তাদের এ মতভেদ দূর করতে ও তাদেরকে এক সূত্রে আবদ্ধ করতে সমর্থ হত না। এর ফলে মতানৈক্য দেখা দিত এবং সমাজবদ্ধ জীবন ভেঙে পড়ত। ধর্মপ্রবর্তকের এটা কাম্য নয়, বরং তিনি তাদের মধ্যে ঐক্যের প্রতি লালায়িত এবং তাদের মধ্যে মতানৈক্য ও কলহ দূর করতে ইচ্ছুক। যাতে তাদের সংযোগ বৃদ্ধি পায়, গোত্রপ্রীতি দেখা দেয় এবং পরস্পর সহায়তার উদ্যোগ দেখা দেয়। একমাত্র কোরায়েশের পক্ষেই এটা সম্ভব ছিল। কারণ তারা তাদের প্রাধান্য বিস্তারের দ্বারা মানুষকে ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালনা করতে সমর্থ। এর ফলে কেউ তাদের বিরোধিতা করতে ও তাদের কথা অমান্য করতে সাহস পেত না। কারণ তারা তৎক্ষণাৎ তা দূর

করে মানুষকে যথাস্থানে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হত। এজন্য খেলাফতের ব্যাপারে কোরায়েশ বংশীয় হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছিল।

বস্তুত কোরায়েশ অত্যন্ত শক্তিশালী গোত্রপ্রীতির অধিকারী ছিল। সুতরাং তাদের হাতেই জাতির শৃঙ্খলা বিধান ও মতৈক্য সৃষ্টির ভার দেয়া হয়েছিল। কারণ তারা যখন নিজেদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করল তখন সমগ্র মুজার ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হল এবং সমগ্র আরব আনুগত্য নিয়ে এগিয়ে এল। তাদেরকে অনুসরণ করে অন্যান্য সকল জাতি মুসলমানদের নির্দেশ মানতে বাধ্য হল এবং তাদের সৈন্যদল পৃথিবীর দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে বিজয়াভিযানের ইতিহাস রচনা করল। এর পরও এ অভিযান দুটি সাম্রাজ্যের জন্ম দিয়ে ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসল এবং আরবের গোত্রপ্রীতি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। যে কোনো ব্যক্তি আরবজাতির ইতিহাস ও তাদের অবস্থাদি সম্পর্কে চিন্তা করবেন তার পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, মুজারের সকল গোত্রের মধ্যে কোরায়েশদের প্রভাব-প্রীতিপত্তি কত বেশি ছিল। ইবনে ইসহাক তাঁর চরিত্র গ্রন্থ প্রভৃতিতে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

যখন এটা স্থিরীকৃত হল যে, কোরায়েশ বংশের শর্ত আরোপ, তাদের গোত্রপ্রীতি ও প্রাধান্যের দ্বারা সর্ববিধ কলহ দূর করার জন্যই করা হয়েছিল, তখন তা থেকে আমরা এ কথাও জানতে পারলাম যে, বিধিপ্রণেতা এ নির্দেশাবলি বিশেষ কোনো গোত্র, কাল বা জাতিকে লক্ষ করে প্রদান করেননি। আরো জানতে পারলাম যে, তা একান্তই যোগ্যতার ব্যাপার; সুতরাং তাকে আমরা যোগ্যতা হিসাবেই গণ্য করব এবং তা থেকে সর্বজনীন কারণটি বের করে নেব—তা আর কিছুই নয় গোত্রপ্রীতি। এর ফলে আমরা এ শর্ত আরোপ করব যে, মুসলমানদের শাসনের দায়িত্ব তারাই গ্রহণ করবে, যারা নিজকালে ও পরিবেশে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী গোত্রপ্রীতি ও প্রাধান্য শক্তির অধিকারী। যাতে তাদের প্রভাবে সকলের আনুগত্য কেন্দ্রীভূত হয় এবং সকলের মধ্যে মতৈক্য গড়ে ওঠে। অবশ্য পৃথিবীর অন্য কোথাও কোরায়েশদের ন্যায় এ শক্তি অন্য কারো আছে বলে জানা যায় না। কারণ তাদের ধর্মের আহ্বান ছিল সর্বজনীন এবং তাদের গোত্রপ্রীতির শক্তি ছিল পরিপূর্ণ। এ জন্যই সকল জাতির আনুগত্য তারা সহজেই লাভ করেছিল।

এ যুগে উক্ত ব্যাপারটি এমন প্রত্যেক জাতির জন্য সম্ভব, যাদের মধ্যে একটি প্রভাবশালী গোত্রপ্রীতি বিদ্যমান। যদি কেউ খেলাফত সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বিশেষ উদ্দেশ্যকে অনুসন্ধান করে, তা হলে তার পক্ষে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ পবিত্র আল্লাহ্ এ খেলাফত তাঁর পক্ষ থেকে এজন্যই প্রদান করেছেন, যাতে তদ্বারা বান্দাদের বিষয়াদি সুশৃঙ্খলভাবে নিষ্পন্ন হয় এবং তাদেরকে অকল্যাণ থেকে বিরত রাখা সম্ভব হয়। খলিফার প্রতি আল্লাহ্‌র এটাই নির্দেশ এবং তিনি এমন ব্যক্তিকেই এ নির্দেশ দিবেন, যার এ দায়িত্ব পালনের শক্তি আছে। পাঠক, আপনি নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, ইমাম ইবনুল খাতিব[৫০] স্ত্রী জাতি সম্পর্কে কী বলেছেন। তিনি বলেছেন যে অধিকাংশ

৫০. ইবনে উমর, জীবনকাল ৫৪৩/৪৪-৬০৬ (১১৪৯/৫০-১২০৯ খ্রি.) হি:। সাধারণভাবে ফখরুদ্দিন ইমাম রাজী নামে পরিচিত।

ধর্মীয় বিধানেই স্ত্রীলোকদেরকে পুরুষের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশের অধীন করে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে প্রত্যক্ষ নির্দেশ দেয়া হয়নি; বরং অনুমানের দ্বারাই তা থেকে তাদের প্রতি প্রযোজ্য নির্দেশ বের করতে হয়। এর কারণ এ যে, স্ত্রীলোকেরা কোনো ব্যাপারেই প্রধান বলে স্বীকৃত নয়; বরং সর্বত্র পুরুষ তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে। অবশ্য উপাসনার ক্ষেত্রে এরূপ নয়। কারণ সেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ নির্দেশের অধীন, অনুমানের ব্যাপার নয়। কারণ উক্ত ব্যাপারে প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল।

তদুপরি এ ব্যাপারে বাস্তব অবস্থাই যথেষ্ট সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। কারণ কারো পক্ষেই সে ব্যক্তি বা গোত্র যাই হোক না কেন, প্রাধান্য বিস্তার ব্যতীত দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। বস্তুত ধর্মীয় বিধান খুব কমই বাস্তব অবস্থার বিরোধী হয়ে থাকে। আল্লাহ উন্নত ও সর্বজ্ঞ।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

[ইমামত সম্পর্কে শিয়া সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতামত]

জেনে রাখুন, শিয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ সহচর ও অনুসারী। প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মশাস্ত্রবিদ ও ইলমে কালামবিদদের নিকট এটা হজরত আলী (রাঃ) ও তাঁর পুত্র পৌত্রাদির অনুসারীদের নাম হিসাবে পরিচিত। তাঁদের সকলের মতে শিয়াদের মতাদর্শ হল, ইমামত সর্বশ্রেণী মানুষের কল্যাণ সাধনের কোনো ব্যাপার নয়, যা জাতির দৃষ্টিদানের অন্তর্গত হবে এবং তাদের নির্ধারণের মাধ্যমে উক্ত দায়িত্ব অর্পিত হবে। বরং তা ধর্মের অঙ্গ এবং ইসলামের পরিচালক শক্তি। কোনো নবীর পক্ষেই এ সম্পর্কে উদাসীন থাকা সম্ভব নয় এবং জাতির উপর তার ভার দেয়া উচিত নয়। বরং তাঁর উপরে জাতির জন্য ইমাম নির্ধারণ করে দেয়া অবশ্য কর্তব্য। সেই ইমাম সর্বপ্রকার ছোটবড় পাপ থেকে পবিত্র হবেন।

বস্তুত হজরত আলী (রাঃ) সেই ইমাম, যাঁকে হজরত মুহম্মদ (সঃ) নির্দিষ্ট করে দিয়ে গিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তারা বিশেষ দলিল প্রমাণ ও ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করে থাকে; এ সকল প্রমাণ ধর্মতত্ত্ববিদ ও ধর্মীয় বিধান বর্ণনাকারীদের নিকট সুপরিচিত নয়। বরং এদের অধিকাংশই মিথ্যা ও সূত্রানুযায়ী দুর্বল কিংবা তাদের অপব্যাখ্যার দরুন সম্পূর্ণ অবাস্তব। এ প্রমাণাদি তাদের নিকট দুইভাগে বিভক্ত—একভাগ প্রকাশ্য ও অন্যভাগ গুপ্ত। প্রকাশ্য প্রমাণ যেমন হজরতের বাণী, 'আমি যার কর্তা, আলীও তার কর্তা।' তারা বলে, এ কর্তৃত্ব আলী ব্যতীত অন্য কাউকেও দেয়া হয়নি। এজন্যই হজরত উমর (রাঃ) তাঁকে বলেছিলেন, "আপনিত প্রত্যেক বিশ্বাসী ও বিশ্বাসিনীর কর্তা হয়ে গেলেন।" হজরতের অন্য একটি বাণী, "তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ন্যায়বিচারক আলী।" ইমামতের অর্থও এভাবে আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধ জারি করার মধ্যদিয়ে ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা করা। আর এটাই আল্লাহ্‌র বাণীতে উল্লেখিত কর্তৃত্বের অর্থ, যার প্রতি আনুগত্য অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং তোমাদের মধ্যে কর্তাব্যক্তির অনুগত হও।"[৫১] এজন্য একমাত্র আলীই 'সকিফা' দিবসের গোলযোগে ন্যায়বিচারের জন্য দণ্ডায়মান হয়েছিল। এ প্রমাণের মধ্যে আরো একটি, হজরত বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রাণপণ করে আমার আনুগত্য স্বীকার করবে, সেই আমার পরে আমার উত্তরাধিকারী ও কর্মকর্তা হবে।" হজরতের প্রতি আলী ব্যতীত অন্য কেউ অনুরূপভাবে আনুগত্য প্রকাশ করেনি।

---

৫১. কোরান ৪, ৫৯।

তাদের গুপ্ত প্রমাণ এ যে, কোরানের সূরা 'বারাআত' অবতীর্ণ হলে হজরত মুহম্মদ (সঃ) আলীকে তা পাঠ করে শুনানোর জন্য হজ্জের মৌসুমে মক্কাতে পাঠান। ইতিপূর্বে তিনি এ ব্যাপারে আবু বকরকে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু ওহীর দ্বারা নির্দেশ আসে যে, তোমার কোনো ব্যক্তি অথবা তোমার জাতির কোনো ব্যক্তিকে এ কাজে পাঠাও। সুতরাং তিনি আলীকে পাঠক ও প্রচারক রূপে প্রেরণ করেন। তারা বলে, তাতে আলীর প্রাধান্য নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হচ্ছে। তদুপরি তিনি আলীর উপর কাউকেও প্রাধান্য দিয়েছেন এমন কথা জানা যায় না। বরং আবু বকর ও উমরের উপর দুটি যুদ্ধাভিযানে যথাক্রমে উসামা ইবনে সায়েদ ও আমর ইবনেল আসকে[৫২] প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এ সকল ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি আলীকেই খেলাফতের জন্য মনোনীত করেছিলেন, অন্যকে নয়। এ প্রসঙ্গে আরো এমন প্রমাণ বিদ্যমান, যা সুপরিচিত নয় এবং অন্য আরো কিছু প্রমাণ বিদ্যমান, যা তাদের ব্যাখ্যার দরুন সম্পূর্ণ অবাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অতঃপর তাদের মধ্যে একদলের মত হল এ যে, এ সকল প্রমাণ আলীর ব্যক্তিগত সত্তার মনোনয়নের উপর সাক্ষ্যদান করে এবং এভাবে তা তাঁর পরবর্তী বংশধরদের জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তেছে। এ দলকে বলা হয় 'ইমামিয়া।' তারা প্রথম দুই খলিফা সম্পর্কে ত্রুটির কথা বলে। যেহেতু তারা উপরোক্ত প্রমাণাদি অনুসারে আলীকে অগ্রাধিকার দেননি এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেননি, সুতরাং তারা তাঁদের খেলাফতকে কোনো প্রকার গুরুত্বই দেয় না। এ সকল গোঁড়া শিয়ার উক্ত দুই খলিফার প্রতি উচ্চারিত জঘন্য উক্তির দিকে লক্ষ করার প্রয়োজন নেই। কারণ তা আমাদের নিকট ও তাদের নিকট সমভাবে পরিত্যাজ্য।

তাদের মধ্যে অন্য একদলের মত হল, উপরোক্ত প্রমাণাদি গুণের দিকে লক্ষ রেখেই আলীকে মনোনীত করার যোগ্য বিবেচনা করেছিল, ব্যক্তিসত্তার দিক থেকে নয়। মানুষ এ গুণাবলিকে যথাস্থানে মর্যাদা না দেয়ার জন্যই ত্রুটির অধিকারী হয়েছে। এ দলকে বলা হয় 'যায়দিয়া'। তারা আলীকে শ্রেষ্ঠ বলা সত্ত্বেও প্রথম দুই খলিফাকে ত্রুটিপূর্ণ অথবা তাঁদের খেলাফতকে অগুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। বরং তারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও অশ্রেষ্ঠের খলিফা হওয়াকে সিদ্ধ বলে মত পোষণ করে।

অতঃপর এ শিয়া সম্প্রদায় হজরত আলীর পরবর্তীদের মধ্যে খেলাফতের উত্তরাধিকার সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে মতানৈক্যের অধীন হয়ে পড়েছে। তাদের অনেকেই একে হজরত ফাতেমার সন্তানদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে অকাট্যভাবে বর্তাবার পক্ষপাতী, যেমন পরে বর্ণিত হবে। এদেরকেই 'ইমামিয়া' বলা হয়। কারণ তারা ঈমানের শর্ত হিসাবে এ ইমামকে জানা ও নির্ধাতি করার মত পোষণ করে। বস্তুত এটাই তাদের নিকট ধর্মীয় কার্যাদির মূল ভিত্তি। আবার তাদের মধ্যে অনেকেই হজরত ফাতেমার সন্তানদের মধ্যে যোগ্যতার বিচারে ইমাম নির্ধারণের পক্ষপাতী। তাদের মতে ইমামকে অবশ্যই জ্ঞানী, ধর্মভীরু, দাতা, সাহসী ও তাঁর ইমামতের প্রতি আহ্বানকারী হতে হবে। এ মতবাদ পোষণকারী ব্যক্তির নাম অনুসারে তাদেরকে 'যায়দিয়া' বলা হয়। ইনি

৫২. হজরতের তিরোধানের অব্যবহিত পূর্বে উমামাকে একটি অভিযানের নেতা নিযুক্ত করেন, যা হজরত আবুবকর প্রথম পালন করেন এবং 'খাতুস সালামিল' অভিযানে আমার নেতা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইনের পুত্র আলীর পুত্র যায়েদ। ইনি তাঁর ভাই বাকেরকে ইমামের বিদ্রোহী হওয়ার শর্তে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলে শেষোক্ত জন তাঁকে এ বলে নিরস্ত্র করেছিলেন যে, এ দিক থেকে দেখতে গেলে তাঁদের উভয়ের পিতা আলী জয়নুল আবেদীনও ইমাম ছিলেন না। কারণ তিনিও বিদ্রোহ করেননি এবং বিদ্রোহের উৎসাহও দেননি। অবশ্য এ বিদ্রোহী মতবাদ ছাড়াও যায়েদকে শিয়ারা মুতাজিলা সম্প্রদায়ের লোক বলে দোষারোপ করত। তিনি নাকি ওয়াসিল ইবনে আতার কাছ থেকে এ ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে ইমামিয়া সম্প্রদায় যখন যায়েদের সাথে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে দেখতে পেল যে, ইনি প্রথম দুই খলিফার ইমামতকে মন্দ বলেন না এবং তাঁদের এতে কোনো ত্রুটি দেখেন না, তখন তারা তাঁকে পরিত্যাগ করল এবং ইমামদের মধ্যে গণ্য করা থেকে বিরত রইল। এজন্য তাদেরকে বলা হয় 'রাফেজী' বা পরিত্যাগকারী।

তাদের মধ্যে অন্য একদল মতভেদ সত্ত্বেও হজরত আলী ও তৎপুত্রদ্বয় হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর দৌহিত্রের পর তাঁদের ভাই মুহম্মদ ইবনেল হানাফিয়া এবং তাঁর পরে তাঁর সন্তানদের মধ্যে ইমামত বর্তাবার দাবি করে। তাদেরকে হজরত আলীর আশ্রিত পোষ্য কায়সানের নাম অনুসারে 'কায়সানিয়া' বলা হয়। এ সকল দলের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম।

এদের মধ্যে এমন একদল বিদ্যমান, যাদেরকে চরমপন্থী বলা হয়। তাদের ধারণা বুদ্ধি ও বিশ্বাসের সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়। তারা এ সকল ইমামের ঐশ্বরিক সত্তায় বিশ্বাস করে। অবশ্য তাঁরা দেখতে মানুষই, কিন্তু তাঁদের মধ্যে ঐশ্বরিক গুণাবলি বিদ্যমান কিংবা আল্লাহ্ তাঁদের মানসিক সত্তায় অবতরণ করেছে। এ অবতারত্বের দিক থেকে এটা খ্রিস্টানদের হজরত ঈসার প্রতি আরোপিত মতের সাথে মিলে। হজরত আলী স্বয়ং তাঁর সম্পর্কে অনুরূপ মত পোষণকারীদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছেন। মুহম্মদ ইবনেল হানাফিয়া সম্পর্কে মুখতার ইবনে আবু উবাইদ অনুরূপ মত পোষণ করলে প্রথমোক্ত জন তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং তার নিন্দা করে অনুরূপ গুণাবলি থেকে নিজের পবিত্রতা প্রচার করেন। এরূপ মতামত শোনার পর জাফর সাদেকও ভর্ৎসনা করেছেন। এদের মধ্যেই একটি শাখার মত হল, ইমামের গুণাবলি অন্য কারো হতে পারে না। এজন্য মৃত্যুর পর পরবর্তী ইমামের মধ্যে তাঁর আত্মা অনুপ্রবেশ করে। যাতে পরবর্তীদের মধ্যে এ গুণাবলির পূর্ণতা লাভ সম্ভব হয়। এটা জন্মান্তরবাদের অনুরূপ মত।

এদের মধ্যে একদল চরমপন্থী একজন ইমামের মধ্যেই সমস্ত বিশ্বাস সীমাবদ্ধ রাখে। কারণ তাদের মতে ইমাম একজনই হয় এবং তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকেও তারা ইমাম বলে স্বীকার করে না। এ কারণে তাদেরকে 'ওয়াকেফিয়া' অর্থাৎ অবস্থানকারী বলা হয়। এদের মধ্যে অনেকে বলে, ইমাম জীবিত, তাঁর মৃত্যু হয়নি। শুধু তিনি মানুষের দৃষ্টির অগোচরে আছেন। এ ব্যাপারে হজরত খিজিরের[৫৩] ঘটনা থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে। এ ধরনের কথা হজরত আলী সম্পর্কেও তারা বলে। তা এ যে, তিনি মেঘের উপরে আছেন। বজ্র-তাঁর শব্দ এবং বিদ্যুৎ তাঁর চাবুক। মুহম্মদ ইবনেল

৫৩. ইনি খোয়াজ খিজির নামে পরিচিত। তাঁর চিরজীবী হওয়া সম্পর্কে কিংবদন্তী বিদ্যমান।

হানাফিয়া সম্পর্কেও অনুরূপ ধারণা বিদ্যমান। তা এ যে, তিনি হেজাজের 'রাজোয়া' পাহাড়ে অদ্যাবধি বিদ্যমান আছেন।[৫৪] এদের কবি বলেন,

জেনে রাখ, ইমাম কোরায়েশ বংশ থেকেই হয়,
তাঁরা চারজন সত্যের অধিকারী, সমান।
আলী এবং তাঁর বংশধরের মধ্যে তিনজন,
তাঁরা দৌহিত্র[৫৫] ও তাঁদের সম্পর্কে কোনো রহস্য নেই।
একজন বিশ্বাস ও পুণ্যের মূর্তিমান দৌহিত্র,
অন্য এক দৌহিত্রকে কারবালা নিরুদ্দেশ করেছে।
অন্য এক দৌহিত্রের মৃত্যু হয়নি—এমনকি
তিনি নিশান উড়িয়ে সৈন্য পরিচালনা করেছেন।
অদৃশ্য হয়েছেন, বহুদিন তাঁকে দেখা যায়নি,
রাজেয়া পাহাড়ে, যেখানে মধু আর পানি আছে।

ইমামিয়া শাখার চরমপন্থীরাও অনুরূপ মত পোষণ করে। বিশেষ করে বার ইমামের দল, তারা তাদের ইমামদের দ্বাদশ ইমাম মুহম্মদ ইবনে আল হাসান আসকরী, যাকে তারা আল মেহেদী উপাধি দিয়েছে, তাঁর সম্পর্কে ধারণা পোষণ করে যে, তিনি তাদের গৃহের ভূ-কক্ষে এসে প্রবেশ করেন এবং হিল্লায় সেই স্থানে মায়ের সাথে অন্তরীণ অবস্থায় থাকাকালে অদৃশ্য হয়ে যান। তখন থেকে তিনি অদৃশ্য হয়ে আছেন এবং পৃথিবীর শেষ সময়ে আবির্ভূত হয়ে তাকে ন্যায়পরায়ণতায় পরিপূর্ণ করে তুলবেন। এর দ্বারা তারা তিরমিজীতে বর্ণিত আল-মেহেদী সম্পর্কীয় হাদিসের প্রতি ইঙ্গিত করে। তারা অদ্যাবধি তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করে আছে। এজন্য তাঁর নাম দিয়েছে 'প্রতীক্ষিত ইমাম'। তারা প্রতি রাত্রে মাগরিবের নামাজের পরে উক্ত ভূ-কক্ষের দ্বারে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে। তাঁর জন্য বাহন প্রস্তুত রেখে বের হয়ে আসার নিমিত্ত নাম ধরে ডাকে। তারকার রশ্মি স্তিমিত হয়ে আসা পর্যন্ত তারা এরূপ করে পরে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং পরবর্তী রাত্রির জন্য এ প্রচেষ্টা স্থগিত রাখে। তারা বর্তমানকাল পর্যন্ত এরূপ করছে।

এ ওয়াকেফী সম্প্রদায়ের অনেকে বলে ইমাম মৃত্যুমুখে পতিত হলেও তিনি পুনরায় পৃথিবীতে জীবিত অবস্থায় ফিরে আসবেন। তারা এ ব্যাপারে কোরানে বর্ণিত আসহাবে কাহাফের ঘটনা, কোন গ্রামের উপর দিয়ে অতিক্রমকারী সেই ব্যক্তি এবং বনি ইসরাইলের সেই নিহত ব্যক্তি, যাকে একটি হাড় দ্বারা আঘাত করার জন্য সংশ্লিষ্ট গোত্রকে গরু জবাই করতে আদেশ দেয়া হয়েছিল; এ সকল ঘটনা[৫৬] প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করে। এ ধরনের আরো বহু ঘটনা অলৌকিকত্ব প্রদর্শনের জন্য

৫৪. মীর মোশাররফ হোসেন প্রণীত বিষাদ সিন্ধুর শেষাংশে উক্ত ধারণার আভাস বিদ্যমান।

৫৫. দৌহিত্র হিসাবে মুহম্মদ, ইবনেল হানাফিয়াকে ধরা যায় না। অনেকে ফাতেমার তৃতীয় পুত্র মুহসনের কথা মনে করেন।

৫৬. কোরানে বর্ণিত বিখ্যাত কাহিনী 'আসহাবে কাহাফ' বা সাতজন গুহাবাসী নিদ্রিত ব্যক্তির ঘটনা। দ্বিতীয় ঘটনাটিও কোরানের ১৮ নং সূরায় বর্ণিত হয়েছে, যেখানে হজরত খিজির ও মুসার সাক্ষাৎকারের কথা বলা হয়। অন্যত্র এক ব্যক্তির পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করায় একশ বছর পরে জীবন লাভের একটি ঘটনা বিদ্যমান। তৃতীয় ঘটনাটির নাম অনুসারে সূরায়ে 'বাকারা'র নামকরণ করা হয়েছে। তার ২৫৯ নং আয়াত দ্র:।

অস্বাভাবিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এগুলোকে অন্যস্থানে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। এদের মধ্যে সৈয়দ আল-হুমাইরীও[৫৭] বিদ্যমান, যিনি তাঁর পদ্যে বলেন,

'মানুষের কাল চুল যখন ধূসর হয়ে আসে
এবং নাপিত তাকে খেজাবের পরামর্শ দেয়,
তখন জীবনের সজীবতা আর নেই, অতীত হয়েছে—
উঠ, হে বন্ধু, যৌবনের জন্য ক্রন্দন করি।
সেই দিনের কথা, যা মানুষের নিকট ফিরবে না।
এ পৃথিবীতে আর, শেষ হিসাবের দিনের পূর্বে।
কারণ যা যায়, তা আর ফিরে না—
কারো কাছে, সেই প্রত্যাবর্তনের দিন ছাড়া।
আমি বিশ্বাস করি, এটাই যথার্থ বিশ্বাস,
আমি পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ করি না।
এভাবে আল্লাহ্ এমন অনেক লোকের কথা বলেছেন,
যারা মাটিতে মিশিয়া যাওয়ার পর জীবিত হবে।

আমাদের জন্য এ সকল চরমপন্থী শিয়াদের মতামত সম্পর্কে তাদের ইমামদের মন্তব্যই যথেষ্ট। তাঁরা এ সকল কথা বলেন না এবং তাদের সমুদয় যুক্তি-প্রমাণই বাতিল বলে গণ্য করেন।

শিয়াদের 'কায়সানিয়া' সম্প্রদায় মুহম্মদ ইবনেল হানাফিয়ার পরে তৎপুত্র আবু হাশেমের ইমাম হওয়ার কথা বলে। তাদেরকে 'হাশেমিয়া' বলা হয়। এর পর তারা বিভক্ত হয়ে গেছে। এদের মধ্যে একদল আবু হাশেমের পুত্র আলী এবং তাঁর পুত্র হাসানের ইমাম হওয়ার দাবি পোষণ করে। অন্যরা ধারণা করে যে, আবু হাশেম সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে সার্রায় মুহম্মদ ইবনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে ইমামত সম্পর্কে অন্তিম নির্দেশ দিয়ে যান। অতঃপর মুহম্মদ তৎপুত্র ইব্রাহিম, যিনি ইমাম নামে পরিচিত, তাকে অন্তিম নির্দেশ দান করেন এবং ইব্রাহিম তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ্ ইবনেল হারেসিয়াকে অন্তিম উপদেশ দিয়ে যান। ইনিই পরে আস্সাফফাহ উপাধি ধারণ করেন এবং তাঁর ভাই জাফর আল মনসুরকে এ উত্তরাধিকার দিয়ে যান। সন্তান-সন্ততির মধ্যে একের পর এক শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এটাই বনি আব্বাসের সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হাশেমীদের মত। এদের মধ্যে আবু মুসলিম সুলায়মান ইবনে কাছীর, আবু সলমা আল খাল্লাল এবং অন্য আরো অনেক আব্বাসী শিয়া বিদ্যমান ছিলেন। অনেক সময় তারা এ যুক্তিকে শক্তিশালী করতে গিয়ে বলে যে, বস্তুত তাদের এ ইমামতের দাবি হজরত আব্বাস থেকে এসেছে। কারণ হজরত মুহম্মদ (সঃ)-র তিরোধানের সময় তিনি জীবিত ছিলেন। সুতরাং চাচা হিসাবে তিনি উত্তরাধিকারের অধিকতর যোগ্য।

যায়দিয়া সম্প্রদায় তাদের মতাদর্শ অনুযায়ী ইমামতের ব্যাপারটি নিষ্পন্ন করেছে এবং এতে তারা যোগ্যতা ও ক্ষমতাকেই প্রাধান্য দিয়েছে, কোনো বিশেষ নির্দেশকে

৫৭. ইসমাইল ইবনে মোহাম্মদ, মৃত্যু ১৭৮/৭৯ (৭৯৫/৯৬ খ্রি:) হি:।

নয়। তারা আলীর ইমামতের পরে তৎপুত্র হাসান, এর পরে তাঁর ভাই হোসাইন এবং হোসাইনের পুত্র আলী জয়নুল আবেদীনকে ইমাম হিসাবে গণ্য করে। অতঃপর জয়নুল আবেদীনের পুত্র যায়েদ ইমাম হন। তিনি কুফায় তাঁর ইমামতের দাবি জানিয়ে বিদ্রোহ করেন এবং নিহত হওয়ার পর তাঁর লাশ 'কানাসা'য় ঝুলিয়ে রাখা হয়। ইনিই এ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম। যায়দিয়াগণ তাঁর পরে তৎপুত্র ইয়াহিয়াকে ইমাম হিসাবে স্বীকার করেন। ইনি খুরাসানে যাওয়ার পর জুজ্জানে নিহত হন। সেখানে তিনি মুহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে হাসান ইবনে হাসানদৌহিত্রকে অন্তিম নির্দেশ প্রদান করেন। এ মুহম্মদ 'নফসে জাকিয়া' নামে খ্যাত এবং ইনি হেজাজে আল মেহেদী উপাধি গ্রহণ করে বিদ্রোহ করেন। সম্রাট আল মনসুরের সৈন্যদলের হাতে নিহত হন। তিনি তাঁর ভাই ইব্রাহিমকে উত্তরাধিকারী করে যান। ইনি বসরায় ইসা ইবনে যায়েদ ইবনে আলীসহ বসবাস করতে থাকেন। একসময়ে বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটলে আল মনসুর সৈন্যদল পাঠান এবং তাঁরা পরাজিত হয়ে উভয়ে নিহত হন। জাফর সাদেক তাঁদেরকে পূর্বাহ্নেই এ সকল ঘটনার কথা বলেছিলেন। এ ভবিষ্যদ্বাণীকে জাফর সাদেকের দিব্য জ্ঞানের পরিচয় বলি মনে করা হয়।

তাদের একটি শাখা এ মত পোষণ করে যে, মুহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ 'নফসে জাকিয়া'র পরে ইমাম হলেন মুহম্মদ ইবনে কাসেম ইবনে আলী ইবনে উমর। এ উমর হলেন যায়েদ ইবনে আলীর ভাই। উক্ত মুহম্মদ ইবনে কাসেম 'তালেকানে' বিদ্রোহ করেন এবং ধৃত হয়ে সম্রাট আল মুতাসিমের নিকট প্রেরিত হন। সেখানে বন্দী অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। যায়দিয়াদের অন্য এক শাখার ধারণা, ইয়াহিয়া ইবনে যায়েদের পরে তাঁর ভাই ইসা ইমাম হন। ইনি ইব্রাহিমের সাথে আল মনসুরের সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর পরে তাঁর বংশধরদের মধ্যে ইমামতের দায়িত্ব বর্তায় এবং জজ্জ(নিগ্রো)দের মধ্যে শিয়া মতবাদ প্রচারকারীরা নিজেদেরকে উক্ত ইসার বংশধর বলে উল্লেখ করেন। তাদের ইতিহাস বর্ণনার সময় আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করব।

যায়দিয়াদের অন্য একটি শাখা বলে, মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর পরে ইমাম হলেন তাঁর ভাই ইদ্রিস, যিনি মাগরিব অঞ্চলে পলায়ন করেছিলেন এবং সেইখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর দায়িত্ব পালন করেন তাঁর পুত্র ইদরিস এবং ফেজনগরীর ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর পরে তাঁর বংশধররা মাগরিবে সম্রাট হিসাবে বহুদিন রাজত্ব করেন। আমরা তাঁদের ইতিহাস বর্ণনায় এ সম্পর্কে আলোচনা করব।

এর পর যায়দিয়াদের ব্যাপারটি আর শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়নি। তাঁদের মধ্যে যে শিয়ামত প্রচারক তাবারিস্তান দখল করেন, তিনি হলেন হাসান ইবনে যায়েদ ইবনে মুহম্মদ ইবনে ইসমাইল ইবনে হাসান ইবনে যায়েদ ইবনে আলী ইবনে ইমাম হোসাইনদৌহিত্র এবং তাঁর ভাই মুহম্মদ ইবনে যায়েদ। তাদের মধ্য থেকে আন্‌নাসের উতরুশ দায়লমে শিয়া মতবাদ প্রচার আরম্ভ করেন এবং তাঁর নিকট দায়লমীরা মুসলমান হয়। ইনি হাসান ইবনে আলী ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে উমর এবং উমর যায়েদ ইবনে আলীর ভাই। তাঁর বংশধররা তাবারিস্তানে রাজ্য স্থাপন করেন এবং তাঁদের কল্যাণে দায়লমীরা

বাগদাদের খলিফার উপর রাজশক্তি বিস্তার ও অন্যায্য প্রভাব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। তাঁদের ইতিহাস বর্ণনার সময় এটা আলোচনা করব।

ইমামিয়া সম্প্রদায় হজরত আলী থেকে অন্তিম নির্দেশের মাধ্যমে তৎপুত্র হাসান, হাসানের ভাই হোসাইন, হোসাইনের পুত্র আলী জয়নুল আবেদীন, জয়নুল আবেদীনের পুত্র মুহম্মদ আল বাকের, বাকেরের পুত্র জাফর আস্‌সাদেক পর্যন্ত পৌঁছে ইমামত সম্পর্কে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একভাগ এর পর তৎপুত্র ইসমাইলের ইমাম হওয়ার কথা বলে এবং এদেরকেই 'ইসমাইলিয়া বলা হয়। অন্য ভাগ জাফর আস্‌সাদেকের অন্য পুত্র মুসা আল কাজেমের ইমামত দাবি করে। এরাই 'ইসনা আশারিয়া' বা বার ইমামের দল নামে খ্যাত। কারণ তাঁরাই দ্বাদশ ইমামের পৃথিবীর শেষ কাল পর্যন্ত অদৃশ্য থাকার কথা বলে, যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইসমাইলিয়ারা ইসমাইলের ইমামত সম্পর্কে বলে যে, তা তাঁর পিতার মনোনয়ন দানের মাধ্যমে এসেছে। কারণ তাদের নিকট এ মনোনয়নের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। নতুবা ইসমাইল তাঁর পিতার পূর্বেই মারা গেছেন। সুতরাং এর অর্থ বংশধরদের মধ্যে ইমামতের ধারা অব্যাহত রাখা। যেমন হজরত মুসা ও হারুনের কাহিনী আল্লাহ্ তাদেরকে শান্তি দিন। তারা বলে, অতঃপর ইমামত ইসমাইল থেকে তৎপুত্র মুহম্মদ আল মাকতুমের উপর বর্তেছে। ইনিই অদৃশ্য ইমামদের মধ্যে প্রথম। এর কারণ এ যে, তাদের মতে ইমাম কখনো ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন। ফলে তিনি অদৃশ্য থাকেন এবং প্রচারকবৃন্দ মানুষের নিকট তার অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ প্রচার কার্যাদি চালিয়ে যায়। পুনরায় যখন তাঁর ক্ষমতা ফিরে আসে, তিনি আত্মপ্রকাশ করেন এবং প্রচারও প্রকাশ্য হয়। তারা বলে, আলমাকতুমের পরে তৎপুত্র জাফর সাদেক এবং তাঁর পরে তাঁর পুত্র মুহম্মদ আল হাবিব। ইনিই অদৃশ্য ইমামদের শেষ প্রতিনিধি। তাঁর পর তৎপুত্র আবদুল্লাহ্ আল মেহেদী যার প্রচারকার্যে আবু আবদুল্লাহ্ আশ্‌শিয়ী কুতামা গোত্রে আত্মনিয়োগ করেন এবং মানুষ দলে দলে সাড়া দেয়। অতঃপর তারা তাঁকে সিজিলমাসার বন্দী দশা থেকে বের করে আনে তারা কায়রোয়ান ও মাগরিবের ক্ষমতা দখল করে। তাঁর পর তাঁর বংশধররা মিশরেরও অধিকারী হন। তাঁদের ইতিহাসে উপরোক্ত ঘটনাবলি সুপরিচিত।

ইমাম ইসমাইলের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য যেমন এদেরকে ইসমাইলিয়া বলা হয়, তেমনি গুপ্ত ইমামের ধারণা পোষণের জন্য এদেরকে 'বাতেনিয়া'ও বলা হয়ে থাকে। এদেরকে স্বধর্মত্যাগীও বলা হয়; কারণ তাদের মতবাদে প্রচলিত ধর্মমত ত্যাগের উপাদান বিদ্যমান। তাদের মতবাদের অনেকগুলো প্রাচীন এবং অনেকগুলো নবীন। হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে হাসান ইবনে সাবাহ এ মতবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন এবং সিরিয়া ও ইরাকের অনেকগুলো দুর্গ দখল করতে সমর্থ হন। তাঁর প্রচারকার্য এভাবে চলতে থাকে, অতঃপর মিশরের তুর্কি সম্রাট ও ইরাকের তাতারী সম্রাটগণ স্ব স্ব অঞ্চলে তাঁর কার্যকলাপ দমন করায় তা স্তিমিত হয়ে পড়ে। শহরস্তানীর[৫৮] বিখ্যাত গ্রন্থ 'আলমেলাল ওন্‌নেহালে' সাবাহ্‌র প্রচারকার্যের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

---

৫৮. মুহম্মদ ইবনে আব্দুল করিম, মৃত্যুকাল ৫৪৮ (১১৫৩ খ্রি.) হি.।

ইসনা আশারিয়াদিগের অনেককে তাদের পরবর্তীগণ ইমামিয়া বলে আখ্যায়িত করে। তারা জাফর সাদেকের পুত্র মুসা কাজেমের ইমামতের দাবি করে। কারণ বড়ভাই ইসমাইল পিতার পূর্বে মৃত্যুবরণ করায় তিনি এ মুসাকে ইমামতের মনোনয়ন দান করে যান। অতঃপর তাঁর পুত্র আলী আররেজা, যাকে সম্রাট মামুন উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। কিন্তু মামুনের পূর্বে মৃত্যু হওয়ায় তাঁর এ ব্যাপার সম্পূর্ণ হয়নি। তাঁর পর তৎপুত্র মুহম্মদ আত্‌তকী, তাঁর পর তৎপুত্র আলী আলহাদী, তাঁর পর তৎপুত্র হাসান আল আসকরী এবং তাঁর পর তৎপুত্র মুহম্মদ আল-মেহেদী, ইনিই প্রতীক্ষিত ইমাম ও তাঁর কথা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

শিয়াদের এ সকল মতবাদের প্রত্যেকটিতে প্রচুর মতানৈক্য বিদ্যমান। অবশ্য তাদের সুপরিচিত দলের সংখ্যা মোটামুটি এ। যিনি বিস্তারিতভাবে তাদের সংবাদ পাঠ করতে চান, তাকে ইবনে হজম,[৫৯] শহরস্তানী ও অন্যান্যের লেখা 'মেলাল ওন্‌নেহাল' নামীয় গ্রন্থাদি পাঠ করতে হবে। তাতে এর বিশদ বিবরণ বিদ্যমান। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন,[৬০] তিনিই উন্নত ও মহান।

৫৯. আলী ইবনে মুহম্মদ, জীবনকাল ৩৮৪-৪৫৬ (৯৯৩-১০৬৪ খ্রি.) হি.।
৬০. কোরান, ১৬, ৯৩; ৩৫, ৮; ৭৪, ৩১।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

[খেলাফতের রাজশক্তিতে পরিণত হওয়া]

জেনে রাখুন, রাজশক্তি গোত্রপ্রীতির এক স্বাভাবিক গন্তব্য। এটা ইচ্ছার দ্বারা হয় না, বরং অস্তিত্বের প্রয়োজনে ও তার ক্রমাগত শৃঙ্খলা স্থাপনে সংঘটিত হয়, যেমন ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। ধর্মীয় বিধান, তার অনুষ্ঠান এবং এমন প্রতিটি কাজ, যা সর্বসম্মতিক্রমে নিষ্পন্ন হয়, তাদের জন্য গোত্রপ্রীতি একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ অধিকার আদায়ের প্রশ্ন তার সহায়তা ব্যতীত নিষ্পত্তি হতে পারে না, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং জাতির জন্য গোত্রপ্রীতি একটি প্রয়োজনীয় শক্তি এবং তার দ্বারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পরিপূর্ণতা লাভ করে থাকে। বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, আল্লাহ্ প্রত্যেক নবীকেই তার জাতির গণ্যমান্য লোকদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন।

অথচ এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই, ধর্মপ্রবর্তক গোত্রপ্রীতির নিন্দা করেছেন এবং তা ত্যাগ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকে মূর্খতার যুগের কলুষ—পিতৃপুরুষের নামে অহংকারের মনোভাব দূর করেছেন। তোমরা আদমের সন্তান এবং আদম মাটির সৃষ্টি। আল্লাহ্ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত যে সর্বাপেক্ষা ধর্মভীরু।[৬১] অতঃপর আমরা এও পাই বে, ধর্মপ্রবর্তক রাজশক্তি ও রাজ্যাধিপতিদেরও নিন্দা করেছেন। তাদের ভোগসম্ভোগ, অহেতুক অপব্যয় ও আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুতির জন্য ভর্ৎসনা করেছেন। তিনি শুধু ধর্মের প্রয়োজনে সম্প্রীতি এবং অনৈক্য ও অসদ্ভাব দূর করতে উৎসাহ দিয়েছেন।

জেনে রাখুন, এ পৃথিবী ও তার সমুদয় অবস্থা-ব্যবস্থা ধর্মপ্রবর্তকের নিকট পরকালের বাহন মাত্র। যিনি এ বাহন হারিয়ে ফেলবেন, তার পক্ষে গন্তব্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। সুতরাং ধর্মপ্রবর্তক যা নিষেধ করেছেন, যে মানবীয় কার্যাবলির নিন্দা করেছেন কিংবা তা ত্যাগ করার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, তার অর্থ এ নয় যে, তা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে বা সমূলে উৎপাটন করতে হবে এবং যে শক্তি তার দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাকে বন্ধ করে দিতে হবে। তাঁর উদ্দেশ্য হল, তা যেন সত্যের উদ্দেশ্যে আনুগত্যের মনোভাব নিয়ে নিষ্পন্ন হয়, যাতে সমগ্র ব্যাপারটিই সত্যনিষ্ঠতা ও উদ্দেশ্যের ঐক্যে বাস্তব হয়ে ওঠে। যেমন হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছে, তা আল্লাহ্ ও তার রসূলের জন্যই এবং যে ব্যক্তির হিজরত

---

৬১. কোরান ৪৯, ১৩।

কোনো পার্থিব সম্পদ বা কোনো নারীর পাণি গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা ঐ উদ্দেশ্যের নিমিত্ত গণ্য হবে।[৬২] ধর্মপ্রবর্তক ক্রোধের নিন্দা এজন্য করেননি যে, তাকে মানুষের সত্তা থেকে নিষ্কাশিত করে ফেলতে হবে। কারণ তার মধ্য থেকে ক্রোধের শক্তি দূরীভূত হলে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও আল্লাহ্‌র বাণীকে উর্ধ্বে তুলে ধরবার জন্য জেহাদের মনোভাব লোপ পাবে। সুতরাং ধর্মপ্রবর্তক ক্রোধের সে রূপকে নিন্দা করেছেন, যা মানুষকে শয়তানী কার্যে ও অসৎ প্রবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। ক্রোধ যদি এ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, তা হলে অবশ্যই নিন্দনীয়। আর যদি তার শক্তি আল্লাহ্‌র পথে আল্লাহ্‌র জন্য ব্যয়িত হয়, তা হলে সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। বস্তুত এটাই হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর চরিত্র।

অনুরূপভাবে ধর্মপ্রবর্তক প্রবৃত্তির নিন্দা করেছেন। অথচ তার অর্থ সমূলে বিনাশ নয়। কারণ যার প্রবৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়, তার অধিকারচেতনা থাকে না। ধর্মপ্রবর্তকের উদ্দেশ্য উক্ত শক্তিকে সহজপথে কল্যাণের জন্য পরিচালিত করা। যাতে মানুষ স্বেচ্ছায় ঐশ্বরিক বিধিনিষেধের দাসানুদাসে পরিণত হতে পারে। এমনি গোত্রপ্রীতিকেও যেখানে নিন্দা করা হয়েছে, যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজেই আসবে না।[৬৩] এর অর্থ এ যে, এ প্রীতি সম্পর্ক যদি মিথ্যার জন্য হয়, যেমন মূর্খতার যুগে তার অবস্থা ছিল; তা হলে অবশ্যই নিন্দনীয়। যেমন শুধু তার জন্য কারো অহংকার, কারো উপর কিছু দাবি করা; কারণ এ ধরনের কাজ সর্বদাই বুদ্ধিমানের পক্ষে অশোভন এবং পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে তা কোনো উপকারেই আসবে না। আর যদি গোত্রপ্রীতি সত্যের জন্য, আল্লাহ্‌র রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য হয়, তা হলে তা একান্ত বাঞ্ছনীয় শক্তি। কারণ তা নষ্ট হয়ে গেলে ধর্মীয় বিধিবিধান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না, যেমন ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।

এরূপ রাজশক্তিও। ধর্মপ্রবর্তক তার সত্যের জন্য প্রাধান্য বিস্তার, ধর্মের জন্য সর্বজনীন প্রভাবের সৃষ্টি ও কল্যাণের জন্য তার প্রচেষ্টার নিন্দা করেননি। তার মিথ্যার প্রতাপ সৃষ্টি এবং অন্যায্য উদ্দেশ্য ও কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষের আনুগত্যকে ব্যবহার করার নিন্দা করেছেন, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। সুতরাং রাজশক্তি যদি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে নিয়োজিত হয়, যদি তাদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকারে এবং শত্রুদের বিনাশ সাধনে সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তা হলে তাতে নিন্দনীয় কিছু থাকে না। এজন্যই হজরত সুলায়মান (আঃ) প্রার্থনা করেছেন, হে প্রভু, আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান কর, যা আমার পরে আর কারো জন্য সম্ভব না হয়।[৬৪] কারণ তিনি জানতেন যে, তাঁর মধ্যে নবুয়ত ও রাজশক্তি একত্র হওয়ায় তা কখনো মিথ্যার পথ অনুসরণ করবে না।

হজরত উমর ইবনে আলখাত্তাব (রাঃ) যখন সিরিয়ায় উপস্থিত হয়ে হজরত মাবিয়াকে রাজশক্তিসুলভ বৈভব ও ভূষণ এবং সভাসদ ও অনুষদের মধ্যে দেখতে

---

৬২. বোখারী (১ম) দ্র:।
৬৩. কোরান ৬০, ৩।
৬৪. কোরান ৩৮, ৩৫।

পেলেন, তখন তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন, এটা কি পারস্য রাজ্যের বেশভূষা নয়, হে মাবিয়া? মাবিয়া এর উত্তরে বলেছিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আমি শত্রুদের সন্নিকটে সীমান্ত অঞ্চলে বসবাস করি এবং তাদের সাথে তাল রেখে আমাদেরকে যুদ্ধ ও জেহাদের জন্য শক্তি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে হয়। এটা শুনে হজরত উমর (রাঃ) নিশ্চুপ হয়েছিলেন[৬৫] এবং এ সাজসজ্জার মধ্যে ধর্ম ও সত্যের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য দেখে তাকে আর ত্রুটি বলে মনে করেননি। যদি তিনি রাজশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করতে উৎসুক হতেন, তা হলে ঐ শক্তির অনুরূপ সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে উপরোক্ত উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারতেন না; বরং সম্পূর্ণভাবে তা থেকে বের হয়ে আসার জন্যই নির্দেশ দিতেন। হজরত উমর পারস্যরাজসুলভ বেশভূষা বলতে পারস্য সম্রাটগণের মিথ্যাচার, অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং রাজকীয় ক্ষমতার সাথে সম্পর্কযুক্ত ধর্মহীনতার কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। মাবিয়াও তা বুঝতে পেরে উত্তর দিয়েছেন যে, এতে পারস্যরাজ্যের অনুরূপ অহমিকা বা মিথ্যাচার নেই; বরং এর দ্বারা আল্লাহ্‌র সত্য প্রতিষ্ঠাই উদ্দেশ্য। এর ফলেই হজরত উমর নিশ্চুপ হয়েছেন। বস্তুত সাহাবীদের মধ্যে রাজশক্তি ও তার অবস্থা অভ্যাসের প্রতি এরূপ একটি বিতৃষ্ণার মনোভাব ছিল। কারণ তার দ্বারা মিথ্যার সহায়তা ও অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয়া হত।

হজরত মুহম্মদ (সঃ) যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়ে হজরত আবুবকরকে ইমামতি করার জন্য তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং নামাজ ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হওয়ায় সকলেই তাঁকে খলিফা হিসাবে মনোনীত করলেন, তখন সমগ্র ধর্মীয় বিধানের প্রতিষ্ঠার দায়িত্বই তাঁর উপর বর্তাল। অথচ তখনো তাঁদের কেউ রাজশক্তির ব্যাপারে কোনো কথা বলেননি। কারণ তা তখনো ধর্মবিরোধী ও শত্রুদের সহায়ক শক্তি হিসাবে বিরাজমান। সুতরাং আবুবকর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব তাঁর পূর্বসূরি সহচরের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পালন করেন। তিনি ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং তাঁর প্রচেষ্টায় সমগ্র আরব আবার ইসলামের ছত্রচ্ছায়ায় একত্র হল।

অতঃপর আবুবকর উমরকে উত্তরাধিকারী করে গেলেন এবং শেষোক্তজন পূর্বসূরির পদাংক অনুসরণ করলেন। তিনি আরবদিগকে বিভিন্ন জাতির অধিকারভুক্ত সম্পদ ও সম্পত্তি ছিনিয়ে নিতে আদেশ দিলেন। এর ফলে তারা প্রাধান্য বিস্তার করে সকল কিছু ছিনিয়ে নিল। অতঃপর দায়িত্ব উসমান এবং পরে আলীর উপর বর্তাল—আল্লাহ্ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। অথচ তাঁদের সকলেই তখনো রাজশক্তি থেকে দূরে এবং তার পন্থা অনুসরণ হতে নিজেদেরকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখলেন।

বস্তুত ইসলামের যে সজীবতা ও বেদুইন জীবনের কৃচ্ছ্রতা তাঁদের মধ্যে বিরাজমান ছিল, তার ফলেই তাঁদের পক্ষে অনুরূপ চিন্তা হয়নি। কারণ তারা সকল মানুষ অপেক্ষা পার্থিব ভোগ-বিলাস থেকে দূরে অবস্থান করতেন। এর কারণ এ নয় যে, তাঁদের ধর্মমত তাঁদেরকে প্রাচুর্যের মধ্যে কৃচ্ছ্রতা সাধন করতে উপদেশ দিত এবং তা এজন্যও নয় যে, তাঁদের আবাসস্থলের বেদুইন পরিবেশ অনুরূপ বিষয়ে উৎসাহিত করত; বরং তাঁরা যে

৬৫. বোখারীর 'কিতাবুল আনসার ওল আশরাফ' দ্রঃ।

জীবন যাপনে কৃচ্ছ্রতা ও অল্পে তুষ্টিতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, তাই তাঁদের পক্ষে ত্যাগ করা সম্ভবপর হচ্ছিল না।

বস্তুত মুজারের ন্যায় অসচ্ছল জীবনের অধিকারী আর কোনো জাতি ছিল না। তারা হেজাজের এমন একটি অঞ্চলে বাস করত, যেখানে না ছিল শস্য, না ছিল দুগ্ধ। সবুজ প্রান্তরগুলোতে তাদের যাওয়া নিষিদ্ধ। একে ত দূরের পথ, তদুপরি তা রাবেয়া ও ইয়ামেনের অধিকারভুক্ত। এর ফলে তারা কখনও প্রাচুর্য অঞ্চলের অভিলাষী হয়নি। তাদের আহার্যের তালিকায় অধিকাংশ স্থান জুড়ে থাকত কাঁকড়া ও গুবরে পোকা। তারা 'ইলহিজ' খেতে গর্ববোধ করত। এটা উটের লোমকে পাথর দ্বারা চূর্ণ করে উটের রক্তে মিশিয়ে রাঁধা এক প্রকার সামগ্রী। তাদের প্রায় অনুরূপ আহার্য ও বাসস্থানের অবস্থা ছিল কোরায়েশদের।

অতঃপর যখন সমগ্র আরবের গোত্রপ্রীতি ধর্মের সূত্রে একত্র গ্রথিত হল এবং হজরত মুহম্মদ (সঃ)-কে নবুয়ত দিয়ে আল্লাহ্ তাদেরকে সম্মানিত করলেন, তখন তারা পারস্য ও রোমের বিভিন্ন জাতির সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হল। আল্লাহ্ তাদেরকে যে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করার সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তারা দাবি করল। তারা তাদের রাজ্য অধিকার করল এবং তাদের পার্থিব সম্পদ কুক্ষিগত করে নিল। এর ফলে তাদের সম্মুখে প্রাচুর্যের সাগর উথলিয়ে উঠল। এটা এ পর্যন্ত পৌঁছল যে কোনো একটি যুদ্ধে একজন অশ্বারোহীর ভাগে পড়েছিল ত্রিশ হাজার বা প্রায় অনুরূপ স্বর্ণমুদ্রা। এভাবে তারা এত সম্পদের অধিকারী হয়েছিল যে, তা গণনায় আনা সম্ভব নয়। অথচ এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের জীবন ছিল অত্যন্ত স্থূলসাধারণ। হজরত উমর তাঁর জোব্বায় চামড়ার ফিতার গিঁট দিয়ে পরতেন। হজরত আলী বলতেন, হে রৌপ্য হে স্বর্ণ, অন্যদেরকে উজ্জ্বল কর, আমাকে নয়। আবু মুসা মুরগির মাংস খেতে পারতেন না। কারণ তা কম থাকায় আরবরা তা খেতে অভ্যস্ত ছিল না। তৎকালে আরবদের মধ্যে চালনির কোনো প্রচলই ছিল না। তারা খোসা শুদ্ধই গম খেত। অথচ এটা সত্ত্বেও তাদের তৎকালীন উপার্জন পৃথিবীর যে কোনো জাতি অপেক্ষা অধিক ছিল।

মাসউদী বলেন, হজরত উসমানের সময় সাহাবীরা সম্পদ ও সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। হজরত উসমান নিহত হওয়ার সময় তাঁর খাজাঞ্চীর হাতে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দিনার ও দশ লক্ষ দিরহাম ছিল। ওয়াদীউল কুরা, হুনাইন ও অন্যত্র তাঁর সম্পত্তির মূল্য ছিল এক লক্ষ[৬৬] দিনার। এটা ছাড়াও তিনি প্রচুর উট ও ঘোড়া রেখে গিয়েছিলেন। হজরত যুবায়েরের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশের পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ হাজার দিনার। তিনি এক হাজার ঘোড়া ও এক হাজার দাসী রেখে গিয়েছিলেন। হজরত তালহার ইরাক থেকে প্রতিদিনের আয় ছিল এক হাজার দিনার এবং সারা অঞ্চল থেকে ছিল এরও বেশি। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফের আস্তাবলে এক হাজার ঘোড়া ছিল। এটা ছাড়াও তাঁর এক হাজার উট ও দশ হাজার ছাগল ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পদের এক-চতুর্থাংশের পরিমাণ ছিল চৌরাশি হাজার। হজরত যায়েদ

---

৬৬. কোনো কোনো সংস্করণে দুই লক্ষ।

ইবনে সাবেত গাঁতি দিয়ে টুকরা করা বহু স্বর্ণ-রৌপ্য ছাড়াও যে সম্পদ ও সম্পত্তি রেখে যান, তার মূল্য ছিল এক লক্ষ দিনার। হজরত যুবায়ের বসরায় তার গৃহ নির্মাণ করেন; অনুরূপভাবে মিশর, কুফা ও আলেকজান্দ্রিয়ায়ও তাঁর বসতবাটী ছিল। এরূপ হজরত তালহাও কুফায় গৃহ নির্মাণ করেন এবং মদিনায় তাঁর গৃহটি মজবুত করে তৈরি করেন। তিনি প্রলেপ, ইট ও সেগুন কাঠ ব্যবহার করেন। হজরত সাদ ইবনে আবি ওক্কাস মদিনার আকিকে তাঁর গৃহ নির্মাণ করেন। তিনি উক্ত গৃহটিকে উচ্চ ছাদ, ব্যাপকভাবে প্রশস্ত এবং তার চূড়ায় ক্ষুদ্র স্তম্ভাদি বিশিষ্ট করেন। আলমেকদাদ মদিনায় তাঁর গৃহ নির্মাণ করে তার ভিতর-বাইর প্রলেপযুক্ত করেন। ইয়ালা ইবনে মুনাব্বিহ[৬৭] মৃত্যুর পর পঞ্চাশ হাজার দিনার, সম্পত্তি ও অন্যান্য অনেক কিছু রেখে যান, যার মূল্য তিন লক্ষ দিরহাম। মাসউদীর বর্ণনার উদ্ধৃতি এ খানেই শেষ।

পাঠক, তৎকালে জাতির উপার্জনের বহর এ থেকে আপনি বুঝতে পারবেন। এটা তাঁদের ধর্মমতে ভর্ৎসনাযোগ্য ছিল না। কারণ এ সকল দ্রব্য ও সম্পদ তাঁরা যুদ্ধে লুণ্ঠিত সম্পদের বৈধ অংশ হিসাবে পেয়েছিলেন। তাঁরা এর দ্বারা অপব্যয়ের পথ প্রশস্ত করেননি; বরং সর্বদাই তাঁদের মধ্যে মিতাবস্থায় বিদ্যমান ছিল, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং তা তাঁদের জন্য সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়নি। যদিও অতিরিক্ত পার্থিব সম্পদ সংগ্রহ দূষণীয়; তবু তা একমাত্র ঐ অপব্যয় ও মিতাবস্থা থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্যই হয়ে থাকে, আমরা ইতিপূর্বেই এ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছি। যখন তাঁদের মধ্যে মিতাবস্থা ছিল তাদের ব্যয় ছিল সত্যের পথে ও তার মতাদর্শ প্রচারে, সেই জন্য এ প্রাচুর্য তাদের সত্য সাধনায় ও পরকালের কল্যাণে সহায়কই হয়েছিল। অতঃপর যখন তাঁদের বেদুইন জীবন ও কৃচ্ছ্রতার আদর্শ স্তিমিত হয়ে আসল, তখন গোত্রপ্রীতির স্বাভাবিক পরিণতিতে তাঁদের মধ্যে রাজশক্তি প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করল, যেমন আমরা পূর্বেই বলেছি। এর ফলে প্রাধান্য ও প্রতাপ দেখা দিল। তবু এ রাজশক্তির বিষয়টি তাঁদের কাছে আরাম-আয়েশ ও সম্পদের প্রাচুর্যের মতোই ছিল। এ জন্যই একে তাঁরা অন্যায়ের পথে ব্যবহার করেননি এবং এর দরুন তাঁরা ধর্মের উদ্দেশ্য ও সত্যের আদর্শ থেকেও দূরে সরে যাননি।

গোত্রপ্রীতির অনিবার্য আকর্ষণে যখন মাবিয়া ও আলীর মধ্যে গোলযোগ আরম্ভ হল, তখন এও সত্যের অনুসরণ ও অনুসন্ধানের জন্যই হয়েছিল। তাঁদের কেউই কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে, মিথ্যার আকর্ষণে বা হিংসার তাড়নায় এটা করেননি। যেমন অনেক সময় অনেকে এরূপ ধারণা করেন এবং স্বধর্মত্যাগীরা এ ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করে। তাঁদের সাধ্যানুসন্ধানের মধ্যেই এ পার্থক্য দেখা দিয়েছিল এবং তাঁরা একে অপরের দৃষ্টিকোণকে সত্য লাভের পথের ভ্রান্ত ধারণা করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যদি আলী এক্ষেত্রে একমাত্র সত্যের অধিকারী হতেন, তা হলে মাবিয়া কখনও মিথ্যার পক্ষে আঁকড়িয়ে ধরে থাকতেন না। বস্তুত মাবিয়া সত্যকে অনুসন্ধান করতে গিয়েই ভুল করেছেন। তাঁরা উভয়েই উদ্দেশ্যের দিক থেকে সত্যের অনুসারী ছিলেন।

---

৬৭. কোনো কোনো সংস্করণে মুনিয়া, উমিয়াও আছে। আল মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ ৩৩ (৬৫৩/৫৪ খ্রি.) হিজরিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ উভয়েই তুলনামূলকভাবে কম পরিচিত।

অতঃপর রাজশক্তির স্বাভাবিক গতি একক মর্যাদা এবং একের নির্দিষ্টকরণের দিকে এগিয়ে গেছে। মাবিয়ার পক্ষে এ শক্তিকে নিজের তরফ থেকে বা জাতির তরফ থেকে বাধা দেবার কোনো কারণই ছিল না। কারণ গোত্রশক্তির অমোঘ ও স্বাভাবিক আকর্ষণেই তা এসে ধরা দিয়েছে। এমন কি বনি উমাইয়াদের মধ্যে যারা কোনোপ্রকার সত্যের অনুসন্ধানে ছিল না, তারাও একে প্রাধান্য দিয়েছে এবং মাবিয়ার চতুর্দিকে জড় হয়েছে। তারা তাঁর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল। এমতাবস্থায় মাবিয়া যদি ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন এবং একক মর্যাদা লাভের পথে বনি উমাইয়াদের বিরোধিতা করতেন, তা হলে ঐক্যের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিত। অথচ তাকে সঙ্ঘবদ্ধ করে গেঁথে তোলাই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর তুলনায় এর সমালোচনা তেমন বৃহৎ কিছু নয়। কাসেম ইবনে মুহম্মদ ইবনে আবুবকরকে দেখে উমর ইবনে আবদুল আজিজ বলেছিলেন, যদি এ ব্যাপারে আমার কোনো শক্তি থাকত, তা হলে আমি তাকে খলিফা বানাতাম। অবশ্য তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তা হলে তা করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি বনি উমাইয়ার শক্তিধর গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে ভয় করতেন। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং তাঁর পক্ষে এ ব্যাপারে কোনো পরিবর্তন সাধন করা সাধ্যের বাইরে ছিল। কারণ তাতে শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হত।

এ সমুদয়ই গোত্রপ্রীতির অনিবার্য আকর্ষণে রাজশক্তির পরিণতি হিসাবে দেখা দিয়েছে। সুতরাং রাজশক্তি লাভের পর যদি ধরে নেই যে, কোনো এক ব্যক্তি তার সমস্ত মর্যাদা কুক্ষিগত করেছে এবং তাকে সত্যের আদর্শ ও তার বৈচিত্র্য সম্পাদনে নিয়োগ করেছে, তা হলে তাকে এজন্য দোষীসাব্যস্ত করা যায় না। হজরত সুলায়মান ও তাঁর পিতা দাউদ (আঃ) বনি ইসরাইলের মধ্যে রাজশক্তির একক মর্যাদা লাভ করেছিলেন এবং রাজশক্তির অনিবার্য স্বাভাবিক কারণেই এটা হয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও পাঠক জানেন যে, তাঁরা নবুয়ত ও সত্যের অধিকারী ছিলেন। অনুরূপভাবে মাবিয়ার তৎপুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী করার ব্যাপারটি দেখতে হবে। কেননা এর অন্যথা কিছু করলে বনি উমাইয়ার ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যেত। তারা অন্যদের ব্যাপার কিছুতেই মেনে নিত না। যদি অন্য কাউকেও উত্তরাধিকারী করা হত, তা হলে তারা বিরোধিতা করত। তদুপরি তারা ইয়াজিদ সম্পর্কে ভালো ধারণাই পোষণ করত। এ ব্যাপারে কাউকেও সন্দেহ করার কিছু নেই এবং মাবিয়াকেও অন্যরূপ মনে করা যায় না। তিনি যদি ইয়াজিদের দুর্মতির কথা জানতে পারতেন তা হলে কখনও তাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করতেন না। মাবিয়ার প্রতি জেনে-শুনে এরূপ করার দোষ, খোদা না করুন, আরোপ করা যায় না।

এরূপ মারোয়ান ইবনেল হুকম ও তাঁর পুত্র। তাঁরা রাজশক্তির অধিকারী হলেও তাঁদের রাজত্বের আদর্শ মিথ্যাচারী ও অত্যাচারীদের ন্যায় ছিল না। তাঁরা সর্বদাই সত্যের জন্য তাঁদের প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করতেন। অবশ্য অনেক সময় অনিবার্য প্রয়োজনে অনেক কিছু করতে হয়েছে, যা একমাত্র ঐক্যের বিনষ্টের ভয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কারণ এ একতার শক্তি তাঁদের নিকট সকল কিছুর উর্ধ্বে স্থান পেত। তাঁদের অনুগত ও অনুসারীর সংখ্যাই এর প্রমাণ দেয় এবং পূর্ববর্তীগণ তাঁদের অবস্থা ও

উদ্দেশ্যের যে সংবাদ বর্ণনা করেছেন, তাতেও তা পাওয়া যায়। ইমাম মালেক তাঁর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে আবদুল মালেকের কার্যের দ্বারা প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। মারোয়ান তাবেলীদের মধ্যে প্রথম স্তরের ছিলেন। তাঁদের ন্যায়নিষ্ঠা সুপরিচিত। অতঃপর আবদুল মালেকের বংশধরদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব বর্তেছে। তাঁরও পূর্বসূরিদের ন্যায় ধর্মকে অনুসরণ করেছেন। তাঁদের মাঝখানে উমর ইবনে আবদুল আজিজ সম্পূর্ণ প্রথম চার খলিফা ও সাহাবীদের আদর্শ অনুসরণে নিজের প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছিলেন। অতঃপর পরবর্তীতে দেখা দিল, তাদের মধ্যে রাজশক্তি তার পার্থিব প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করল। তারা পার্থিব লালসায় ভুলে তাদের পূর্বসূরিদের সত্যপ্রীতি ও আদর্শনিষ্ঠার কথা বিস্মৃত হল। এর ফলেই মানুষ তাদের কার্যাবলির নিন্দা করে আব্বাসীদের প্রচারণায় সহায়তা করেছিল।

সুতরাং আব্বাসী রাজপুরুষরা দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁরা ন্যায়নিষ্ঠায় যথার্থ ছিলেন এবং রাজশক্তিকে যতদূর সম্ভব সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালনা করেছিলেন। অতঃপর হারুনুর রশীদের বংশধররা এল। তাদের মধ্যে ভালোমন্দ উভয়েই ছিল। এর পর তাদের সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্ব অর্পিত হল। ততদিনে রাজশক্তি তার বিলাসব্যসনে প্রাচুর্য সৃষ্টি করেছে; তারা তাতে নিমজ্জিত হল এবং পার্থিব জীবন ও মিথ্যার প্রলোভনে ধর্মকে পশ্চাতে ঠেলে দিল। সুতরাং আল্লাহ্ তাদের অন্তিম দশার নির্দেশ দিলেন। ক্রমে সমগ্র আরবের হাত থেকেই শক্তির দণ্ড খসে পড়ল এবং তাদের স্থান অন্যরা এসে দখল করল। 'আল্লাহ্ কারো উপর রেণু পরিমাণ অত্যাচারও করেন না।'[৬৮]

যে ব্যক্তি এ সকল খলিফা এবং রাজন্যবর্গের চরিত্র ও সত্যানুসন্ধানে তাঁদের মতানৈক্য সম্পর্কে চিন্তা করবেন, তিনি আমাদের বক্তব্যের সত্যতা বুঝতে পারবেন। মাসউদী আবু জাফর আল মনসুর থেকে বনি উমাইয়াদের সম্পর্কে অনুরূপ একটি উদাহরণ বর্ণনা করেছেন। তাঁর সম্মুখে তাঁর চাচারা বনি উমাইয়াদের কথা উঠালেন তিনি বলেছিলেন, তাদের মধ্যে আবদুল মালেক অত্যাচারী ছিল; সে তার কৃতকর্মের জন্য কোনোপ্রকার চিন্তা করত না। সুলায়মান তার পেট ও পিঠ নিয়েই ব্যস্ত ছিল। উমর এ অন্ধদের মধ্যে একমাত্র কানাব্যক্তি। তাদের মধ্যে যথার্থ পুরুষ ছিল হিশাম। তিনি আরো বললেন, বনি উমাইয়ারা তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছিল এবং আল্লাহ্র প্রদত্ত দানকে সংরক্ষণ করে ভোগ করছিল। তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়েছিল, অথচ তুচ্ছ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ করেনি। এভাবে দায়িত্ব তাদের ভোগবিলাসী বংশধরদের উপর ন্যস্ত হল। তারা প্রবৃত্তির তাড়নায় সম্ভোগের আকর্ষণে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করল। তারা তাঁর অপেক্ষাকরণ ও পাপীর প্রতি আচরণের কোনো ধারণাই পোষণ করত না। অথচ এ দিকে তারা খেলাফতকে কলুষিত করে তুলল, রাজশক্তির দায়িত্বকে গুরুত্ব দিতে ভুলে গেল এবং শাসনব্যবস্থাকে শিথিল করতে লাগল। সুতরাং আল্লাহ্ তাদের গৌরব ছিনিয়ে নিলেন, তাদেরকে অসম্মানের ভূষণে সজ্জিত করলেন এবং তাদের ভোগ-সম্ভোগকে বিদূরিত করলেন।

---

৬৮. কোরান ৪, ৪০।

অতঃপর মনসুরের সম্মুখে আবদুল্লাহ্ ইবনে মারোয়ান উপস্থিত হয়ে 'নোবা' সম্রাটের সাথে তার সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করল। আব্বাসী খলিফা আস্‌সাকফাহ্‌র সময় প্রাণভয়ে পালিয়ে সে উক্ত রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সে বলল, আমি সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তাদের সম্রাট এসে উপস্থিত হলেন। আমি তাঁর জন্য মূল্যবান আসন পেতে রেখেছিলাম, কিন্তু তিনি তাতে না বসে মাটির উপর বসে পড়লেন। আমি তাঁকে বললাম, কী ব্যাপার, আমাদের শয্যায় আপনার বসায় অসুবিধার কারণ কি? তিনি উত্তরে বললেন, আমি একজন সম্রাট; প্রত্যেক সম্রাটের উচিত আল্লাহ্‌র মহত্ত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। কারণ তার দানেই আমার এ গৌরবপ্রাপ্তি। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, তোমরা মদ্যপান করতে কেন? অথচ তা তোমাদের ধর্মগ্রন্থে নিষিদ্ধ। আমি বললাম, এটা আমাদের দাস ও অনুসারীদের অজ্ঞতাজনিত দুঃসাহস। তিনি বললেন তোমরা তোমাদের পশু দিয়ে কেন শস্যাদি বিনষ্ট করতে? অথচ তা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। আমি বললাম, এও আমাদের দাস ও অনুসারীরা অজ্ঞতার দরুন করেছে। তিনি বললেন, তা হলে তোমরা গরদ, স্বর্ণ ও রেশমী পোশাক কেন পরিধান করতে? তাও তো তোমাদের ধর্মগ্রন্থে নিষেধ রয়েছে। আমি বললাম, আমাদের রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ায় আমরা অনারবদের সাহায্য গ্রহণ করেছিলাম। তারা আমাদের ধর্ম গ্রহণ করে আমাদের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও এগুলো পরিধান করেছে। আমার উত্তর শুনে তিনি মাথা নিচু করে আঙুল দিয়ে মাটিতে দাগ কাটতে কাটতে বললেন, আমাদের দাস, আমাদের অনুসারী এবং অনারবরা আমাদের ধর্মে প্রবেশ করেছিল। অতঃপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, ব্যাপার তুমি যা বর্ণনা করেছ তা নয়। বরং তোমরাই আল্লাহ্ কর্তৃক তোমাদের উপর নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধ করেছি এবং যা করার ছিল না, তাই করেছ। তোমাদের অধীনস্থদের উপর অত্যাচার করেছ। সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদের গৌরবের ভূষণ ছিনিয়ে নিয়ে তোমাদেরকে অমর্যাদার সাজে সজ্জিত করেছেন। এটা তোমাদের পাপের ফল। আল্লাহ্‌র এ প্রতিশোধ গ্রহণ এখনো তোমাদের মধ্যে শেষ হয়নি। আমি ভয় করেছি, তোমাদের উপর তাঁর শাস্তি আমাদের এ অঞ্চলে আপতিত হবে এবং আমরাও তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ব। আতিথ্য মাত্র তিনদিন। সুতরাং তোমাদের পাথেয় হিসাবে যা কিছু প্রয়োজন, তা নিয়ে আমাদের এ অঞ্চল ত্যাগ কর। মনসুর এ বক্তব্য শুনে অবাক হলেন ও ভাবতে লাগলেন।

পাঠক, আপনি নিশ্চয় বুঝে নিয়েছেন, কীভাবে খেলাফত রাজশক্তিতে পরিণত হয়েছে। সম্পূর্ণ বিষয়টি প্রথম দিকে ছিল খেলাফত এবং তাতে প্রত্যেকের শৃঙ্খলাবিধায়ক শক্তি ছিল ধর্ম। তারা তখন পার্থিব স্বার্থের উপর ধর্মের মূল্যকে স্থান দিতেন। এতে সকলের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ রেখে ব্যক্তিগতভাবে তারা ক্ষতির সম্মুখীন হতেও দ্বিধা করতেন না। হজরত উসমানকে দেখুন, যখন তিনি তার গৃহে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন, তখন তাঁকে উদ্ধার করতে ইমাম হাসান, হোসাইন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর, ইবনে জাফর এবং তাঁদের আরো অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে মুসলমানদের মধ্যে তরবারী উন্মুক্ত করা হতে বিরত করলেন। তাঁর ভয় হল, এর ফলে

সেই সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে, যার উপর ধর্মের ঐক্য দাঁড়িয়ে আছে এবং একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হবে। অথচ তিনি তাঁর বিপদের গুরুত্ব ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন।

হজরত আলীকেই দেখুন, মুগিরা তাঁকে খেলাফতের প্রথম দিকে যুবাইর, মাবিয়া ও তালহাকে নিজ নিজ প্রশাসক পদে বহাল রাখতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, যাতে সকল মানুষ তাঁর আনুগত্যে একত্র হতে পারে এবং ঐক্যবোধ দৃঢ় হয়ে ওঠে। এর পর তিনি তাঁর ইচ্ছামত সবকিছু করতে পারবেন। রাজ্য শাসনের দিক থেকে এ পরামর্শের তুলনা ছিল না। কিন্তু হজরত আলী এর মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী প্রতারণা আবিষ্কার করে অস্বীকার করলেন। পরে একদিন মুগিরা তাঁর কাছে এসে বলেছিলেন, সেইদিন আপনাকে যে পরামর্শ দিয়েছিলাম, তা আপনি জানেন; কিন্তু পরে আমার মনে হয়েছে তা ঠিক ছিল না, বরং আপনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তাই যথার্থ। এর উত্তরে আলী বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম, আমি জানি আপনি সেইদিনই আমাকে সুপরামর্শ দিয়েছিলেন, বরং আজ প্রতারণা করছেন। কিন্তু একমাত্র সত্যের তাগিদেই আপনার সেই ইঙ্গিত আমি পূরণ করতে পারিনি। এভাবেই তাঁরা তাঁদের পার্থিব স্বার্থ নষ্ট করে ধর্মের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন।—আর আমরা?

ধর্মের জামা ছিঁড়ে দুনিয়ার জামায় তালি লাগাই,
এতে ধর্মও থাকে না, তালি দেয়া জামাও থাকে না।[৬৯]

পাঠক, আপনি নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, কীভাবে বিষয়টি রাজশক্তিতে পরিণত হয়েছে। তাতে খেলাফতের তাৎপর্য হিসাবে ধর্মের সংরক্ষণ, তার আদর্শ স্থাপন ও সত্যের পন্থা অনুসরণই শুধু অবশিষ্ট আছে। এর শুধু একটি শক্তিতেই পরিবর্তন ঘটেছে, তা এ যে, আগে শৃঙ্খলাবিধায়ক শক্তি ছিল ধর্ম, এখন তার স্থলে গোত্রপ্রীতি ও তরবারী। এভাবেই মাবিয়া মারোয়ান, তাঁর পুত্র আবদুল মালেক এবং আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে হারুনুর রশীদ ও তাঁর কোনো পুত্রের আমল পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অতঃপর খেলাফতের এ তাৎপর্যও আর থাকেনি, শুধু তার নামটিই বাকি ছিল এবং সম্পূর্ণ বিষয়টিই তখন রাজশক্তির সাধারণ রূপে পরিণত হল। প্রাধান্য বিস্তার তার স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করল। তার স্বার্থের মধ্যে ভোগ-সম্ভোগের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে লাগল। আবদুল মালেকের সন্তান-সন্ততির জন্য এবং হারুনুর রশীদের পরবর্তী আব্বাসী সম্রাটদের জন্য অবস্থা অনুরূপই ছিল। তখনও তাদের মধ্যে খেলাফতের নাম বাকি আছে, কারণ তখনও আরব গোত্রপ্রীতি বিরাজমান। বস্তুত খেলাফত ও রাজশক্তি দুটি পর্যায় মাত্র, পরস্পর সংগ্রথিত। অতঃপর আরবীয় গোত্রপ্রীতি বিনষ্টের ফলে, তাদের বংশধারা ও অবস্থা-ব্যবস্থা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ায় খেলাফতের নিদর্শনাদিও লোপ পেল। তখন তা শুধুমাত্র রাজশক্তি, যেমন পূর্বাঞ্চলের অনারব জাতিগুলোর মধ্যে রাজশক্তি ছিল। তারা একমাত্র পুণ্যলাভের জন্যই খলিফাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে। এছাড়া রাজশক্তি অনুসারেই তাদের উপাধি ও গুণাবলি নির্ধারিত হয়। এতে খলিফার কোনো হাত নেই। এভাবে মাগরিবে জানাতী সম্রাটগণ

৬৯. এ কাব্যাংশটি কবি আবুল আতাহিয়ার বলে মনে করা হয়।

আচরণ করেছেন। যেমন উবাইদীদের সাথে সিনহাজারা এবং আন্দালুসের উমাইয়াদের সাথে এবং কায়রোয়ানের উবাইদীদের সাথে মেগরাওয়া ও বনি ইয়াফরানের ব্যবহার।

এর ফলে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে যে, খেলাফত প্রথম দিকে রাজশক্তির মিশ্রণ ছাড়াই অস্তিত্বে আসে; অতঃপর তাদের তাৎপর্য মিশ্রিত হয়ে ওঠে এবং একে অন্যের সাথে মিলে যায়। এর পর রাজশক্তি একক হয়ে দাঁড়ায়। এখানেই তার গোত্রপ্রীতি খেলাফতের অনুরূপ শক্তি থেকে পৃথক হয়। আল্লাহ্ দিবারাত্রি নির্ধারণ করে থাকেন;[৭০] তিনি একক ও পরাক্রমশালী।

৭০. কোরান ৭৩, ২০।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[আনুগত্য-শপথের তাৎপর্য]

জেনে রাখুন, আরবি 'বায়আত' শব্দের অর্থ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ। শপথ গ্রহণকারী তাঁর সর্দারকে এ বলে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, সে নিজের জন্য ও মুসলমানদের জন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিবে এবং কোনো ব্যাপারে তাঁর সাথে কলহে প্রবৃত্ত হবে না। এতদ্ব্যতীত সর্দার তাকে যে দায়িত্ব পালন করতে দিবেন, তা ভাল হোক বা মন্দ হোক, সে তা পালন করবে। এভাবে তারা যখন কোনো সর্দারের আনুগত্য স্বীকার করে শপথ গ্রহণ করে, তখন বিষয়টিতে গুরুত্ব সৃষ্টির জন্য তাঁর হাতে তাদের হাত ন্যস্ত করে। তা যেন ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কের মতো হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই তাকে 'বায়আত' বলা হয়। তা 'বাআ' শব্দের ক্রিয়াবিশেষ্য এবং বায়আতের অর্থ হয় করমর্দন। এটাই ধর্মীয় বিধান ও অভিধানের দিক থেকে এর সুপরিচিত তাৎপর্য। হাদিসে উল্লেখিত আকাবায়[৭১] রাত্রিবেলা সেই বৃক্ষের নিকটে হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর প্রতি বায়আত, অথবা যেখানেই এ শব্দটি পাওয়া যাক না কেন তার অর্থ একই। এটাই খলিফাদের প্রতি বায়আতের অর্থ এবং এটা থেকেই বায়আতের 'আয়মান' শব্দটির তাৎপর্য নির্গত হয়েছে। খলিফাগণ তাদের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণকালে তাকে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি হিসাবে গণ্য করতেন। এজন্যই এ সামগ্রিক আনুগত্যের ব্যাপারটিকে বায়আতের প্রতিশ্রুতি বলে নামকরণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণভাবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে জবরদস্তি বিদ্যমান। এ কারণে ইমাম মালেক (রাঃ) যখন জবরদস্তিমূলক প্রতিশ্রুতির অন্যায্যতা সম্পর্কে ধর্মীয় বিধান দিলেন, তখন তা শাসকগণ প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা এর মধ্যে বায়আতের প্রতিশ্রুতির সমালোচনা লক্ষ করেছিল। এজন্য ইমাম মালেক যথেষ্ট নিগৃহীত হয়েছিলেন।

বর্তমানকালে বায়আতের সুপরিচিত সংজ্ঞা হল পারসিক সম্রাটদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ধারা অনুসারে মাটিতে, হাতে-পায়ে অথবা পরিধেয় বস্ত্রের আঁচলে চুমা দেয়া। রূপকভাবে তার উপর প্রকৃত বায়আত বা আনুগত্য শপথের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ তার মধ্যে যে নম্রতা ও শিষ্টাচার বিদ্যমান, তা আনুগত্য ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদিরই পরিচায়ক। তা এভাবেই প্রধান হয়ে উঠেছে এবং একটি সর্বজনসম্মত তাৎপর্যে বিশিষ্ট হয়েছে। এজন্যই তার প্রকৃত স্বরূপ করমর্দনের বিষয়টি পরিত্যক্ত হয়েছে। কারণ তাতে নেতৃত্বের ও রাজকীয় পদমর্যাদার পরিপন্থী এক প্রকার নমনীয়তা

---

৭১. হিজরতের পূর্বে মদিনাবাসীদের সাথে এটা সংঘটিত হয়।

ও হেয়তা বিদ্যমান। অবশ্য এতদ্‌সত্ত্বেও অল্প কিছু সংখ্যক শাসকের ক্ষেত্রে বিনয় প্রকাশের জন্য এর ব্যবহার দেখা যায়। তাঁরা গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত লোক ও বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ প্রজাদের সাথে করমর্দন করে থাকেন।

পাঠক, সর্বজনসম্মত এ বায়আতের স্বরূপ বুঝে নিন। কারণ মানুষের পক্ষে তার স্বরূপ উপলব্ধি করা কিছুটা অসুবিধাজনক। অথচ এর সাহায্যেই সম্রাট বা ইমামের প্রতি তার দায়িত্ব বর্তিয়ে থাকে। সুতরাং বুঝে-শুনে তাতে অগ্রসর হওয়া উচিত, যাতে তার কার্যাবলি অনর্থক ও ক্ষতিকর না হয়ে দাঁড়ায়। পাঠক, রাজন্যবর্গের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনার কর্তব্যকেও এর সাথে বিবেচনা করুন। আল্লাহ্ শক্তিমান ও পরাক্রান্ত।[৭২]

৭২. কোরান ১১, ৬৬; ৪২, ১৯।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্ধারণ]

জেনে রাখুন, ইতিপূর্বে আমরা ইমামত ও তার ধর্মীয় বিধি-নিষেধ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তাতে কল্যাণধর্মিতা বিদ্যমান। বস্তুত তার স্বরূপ হল জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দেয়া। কেননা ইমাম তাদের অভিভাবক, তাদের বিশ্বাসের পাত্র, যিনি জীবিতাবস্থায় তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন এবং মৃত্যুর পরও তাদের প্রতি তাঁর দৃষ্টিদান অব্যাহত থাকবে। তিনি তাদের জন্য এমন একজনকে অভিভাবক নিযুক্ত করে যাবেন, যেমন অভিভাবক তিনি নিজে ছিলেন এবং পরবর্তীজনকেও মানুষ তেমনি বিশ্বাস করবে, যেমন পূর্ববর্তীজনকে করেছেন। ধর্মীয় বিধান অনুসারে সর্বসম্মতভাবে এরূপ দায়িত্ব প্রদান ও অনুষ্ঠানের ব্যাপারে জাতির জন্য বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে। হজরত আবুবকর তাঁর শাসনকালে সাহাবীদের সম্মুখে হজর উমরের প্রতি অনুরূপ দায়িত্ব অর্পণ করেন। সাহাবীরা তাকে বৈধ বলে স্বীকার করেছেন এবং হজরত উমরের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশকে অবশ্য কর্তব্য বলে ভেবেছেন। আল্লাহ্ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

এরূপ হজরত উমরও সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের অবশিষ্ট ছয়জনের[৭৩] পরামর্শের উপর উত্তরাধিকারী নির্ধারিত করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তারা সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের নেতা নির্বাচিত করতে গিয়ে একে অপরের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দেন। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আবদুর রহমান ইবনে আউফের উপর বর্তায়। তিনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও মুসলমানদের সাথে আলোচনা করে বুঝতে পারেন যে, তারা মোটামুটি উসমান ও আলীর ব্যাপারে একমত। অতঃপর তিনি এ ব্যাপারে হজরত উসমানকে প্রাধান্য দেন এবং পূর্ববর্তী দুইজন খলিফার আদর্শ অনুসরণ ও যতদূর সম্ভব সব বিষয়ে তাঁদের অনুপাত থাকার অঙ্গীকারে তাঁর হাতে বায়আত করেন। এভাবে হজরত উসমানের বিষয়টি স্থিরকৃত হয় এবং সকলের জন্য তাঁর নেতৃত্বে আনুগত্য জ্ঞাপন অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রথম ও দ্বিতীয় উত্তরাধিকার নির্ধারণে সাহাবীদের বিরাট অংশ উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা কেউই এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেননি। সুতরাং এটা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, তাঁরা সকলেই এ ব্যাপারে একমত ছিলেন এবং তাঁরা তার ধর্মীয় বিধানগুলো সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। তাঁদের এ সর্বসম্মতি প্রমাণ হিসাবে সুপরিচিত।

---

৭৩. এরা হলেন হজরত উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, সাদ ইবনে আবু ওক্কাস ও আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)।

এভাবে কোনো ইমাম যদি তাঁর পিতা বা পুত্রকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করেন, তা হলে তাঁর দোষারোপ করা যায় না। কারণ যাকে সকলে জীবৎকালে তাদের বিষয় সম্পাদনে বিশ্বাস করেছে, তিনি মৃত্যুর পর তাদের ক্ষতি করবেন, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। অনেকে অবশ্য পিতা ও পুত্র এবং পিতা ব্যতীত শুধু পুত্রের ভাবী দায়িত্বের ভারার্পণকে দূষণীয় মনে করেন। এ দিক থেকে দেখলে তাকে আপত্তি করার কিছু থাকে না। তদুপরি অনুরূপ উত্তরাধিকার নির্ধারণে যদি কোনোপ্রকার প্রয়োজনীয়তা, যেমন কোনো বিশেষ কল্যাণের প্রতিষ্ঠা বা অকল্যাণের প্রতিরোধ দেখা দেয় তা হলেও আপত্তির কোনো অবকাশই থাকে না। যেমন মাবিয়ার তৎপুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণের ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে যদিও মাবিয়ার কার্য প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার মত জনমত তাঁর পক্ষে ছিল, তথাপি তিনি মানুষের মধ্যের ঐক্য রক্ষার মতো বিশেষ কল্যাণধর্মীতার আকর্ষণেই অন্যকে না করে তাঁর পুত্রকে উত্তরাধিকারী করেছিলেন। কারণ বনি উমাইয়ার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একতার শক্তি সকলের ঐক্যকে সুদৃঢ় করার পক্ষে তখন যথেষ্ট ছিল। কেননা বনি উমাইয়া তখন তাদের মধ্য থেকে কাউকে ব্যতীত অন্যকে উত্তরাধিকারী করতে রাজি হত না। বস্তুত তাঁরা তখন কোরায়েশের গোত্রশক্তি, জাতির সকলের আনুগত্য ও সকলের উপর প্রাধান্য বিস্তারের অধিকারী। এ কারণেই অন্যদের যাকে অধিকতর উপযুক্ত মনে হয়েছিল, তাকে ত্যাগ করে তারা নিজেদের একজনকে প্রাধান্য দিয়েছে। এটা করতে গিয়ে তারা শ্রেষ্ঠকে রেখে অশ্রেষ্ঠের মনোনয়নকে বেছে নিয়েছে। কারণ এরূপ করার মধ্যেই ধর্মপ্রবর্তকের মহান উদ্দেশ্য, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার একমাত্র পথ ছিল। সুতরাং মাবিয়া সম্পর্কে যদি অনুরূপ কিছু বিবেচনা না করা হয়, তা হলে তাঁর সাহচর্যের মর্যাদা ও ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ অবশ্যই এ ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করত।

তদুপরি মান্যবান সাহাবীদের উপস্থিত ও তাঁদের নীরব সম্মতি এ ব্যাপারে সন্দেহকে দূর করার জন্য যথেষ্ট। তাঁদেরকে সত্যের মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে অকর্মণ্য মনে করার কোনো কারণ নেই। এবং স্বয়ং মাবিয়াও এমন ছিলেন না, যাকে কোনোপ্রকার মর্যাদার প্রলোভন সত্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে। তাঁদের প্রত্যেকেই এরূপ ধারণা থেকে বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা এর পরিপন্থী ছিল। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর যে এটা থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন, তার কারণ তিনি কোনো ব্যাপারেই জড়িত থাকতে ভালোবাসতেন না; যে ব্যাপার ন্যায় বা অন্যায় যাচাই হোক না কেন। তাঁর এ চরিত্রের কথা সকলের নিকট সুপরিচিত। সুতরাং এ উত্তরাধিকারের ব্যাপারে একমাত্র ইবনে যুবায়ের ব্যতীত আর সকলেই একমত ছিলেন। এ ব্যাপারে মতানৈক্যের স্বল্পতা সকলের নিকটই পরিচিত।

অতঃপর মাবিয়ার পরবর্তীকালে বহু খলিফাই অনুরূপ উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা সকলেই সত্যকে ভালোবাসতেন এবং তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেষ্টিত হতেন। যেমন বনি উমাইয়ার আবদুল মালেক ও সুলায়মান এবং বনি আব্বাসের আস্‌সাফ্‌ফাহ, আলমনসুর, আলমাহদী, আররশীদ প্রমুখ খলিফাগণ। তাঁদের ন্যায় আরো অনেকের কথাই বলা যায়, যাদের ন্যায়পরায়ণতা, মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা ও সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে প্রচেষ্টার বিষয় সর্বজন পরিচিত। উত্তরাধিকারের ব্যাপারে নিজ পুত্র বা ভাইকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য তাঁদেরকে দোষী করা যায় না এবং এমন

কথাও বলা যায় না যে, তারা প্রথম চার খলিফার আদর্শ ত্যাগ করেছেন। কারণ তাঁদের অবস্থার সাথে পরবর্তীদের অবস্থার কোনো মিল নেই। কেননা তাঁরা এমন এক পরিবেশে ছিলেন, যেখানে রাজশক্তির স্বভাব দেখা দেয়নি। তাঁদের মধ্যকার শৃঙ্খলাবিধায়ক শক্তি ছিল ধর্ম এবং প্রত্যেকেই এ শক্তির দ্বারা পৃথকভাবে নিয়ন্ত্রিত হতেন। সুতরাং তাঁরা তাঁকেই উত্তরাধিকারী করতেন, যাকে ধর্মীয় বিধান অনুমতি দিত এবং এ ক্ষেত্রে তাকেই সকলের উপর প্রাধান্য দিতেন ও অন্যদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের নিজ নিজ ধর্মমতই সংযত করে রাখত। কিন্তু তাঁদের পরবর্তীকালে মাবিয়ার সময় থেকে গোত্রশক্তির প্রভাব রাজশক্তিকে আকর্ষণ করে এনেছিল এবং ধর্মের সংযম দুর্বল হয়ে পড়ায় রাজ্যশাসন ও গোত্রশক্তির প্রভাব বিস্তারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। সুতরাং এ পরিস্থিতিতে যদি গোত্রপ্রীতির সন্তুষ্টির বাইরে কাউকেও উত্তরাধিকারী করা হত, তা হলে তার প্রতিবাদ উঠত, অতিদ্রুত শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ত এবং ঐক্যের স্থলে মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।

এক ব্যক্তি হজরত আলীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, মুসলমানদের কী হল যে, তারা আপনার সম্পর্কে মতানৈক্য পোষণ করে; অথচ আবুবকর ও উমর সম্পর্কে তাদের কোনো মতভেদ নেই! আলী উত্তরে বলেছিলেন, কারণ আবুবকর ও উমর আমার মত লোকদের শাসক ছিলেন আর আমি তোমার মত লোকদের শাসক নিযুক্ত হয়েছি। এর দ্বারা তিনি ধর্মীয় সংযমের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। পাঠক, সম্রাট মামুনের ব্যাপারটি লক্ষ করুন না, তিনি যখন আলী ইবনে মুসা ইবনে জাফর সাদেককে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করলেন এবং তাঁর উপাধি দিলেন 'আররেজা', তখন আব্বাসীরা কীভাবে তার বিরোধিতা করেছিল! তাঁরা মামুনের আনুগত্য ত্যাগ করে তাঁর চাচা ইব্রাহীম ইবনে আলমাহদীর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিল। এর ফলে বাগদাদে গোলযোগ, মতানৈক্য, চুরি-ডাকাতি, লুটপাট ও ক্ষমতা দখলের চেষ্টা এত বৃদ্ধি পায় যে, সাম্রাজ্যের ভিত্তি কেঁপে ওঠে। তাড়াতাড়ি মামুনকে খোরাসান থেকে এনে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হয়। সুতরাং উত্তরাধিকারী নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবশ্যই এ বিষয়টিকে বিবেচনা করতে হবে। যুগ বিভিন্ন হয়ে থাকে এবং এর এ বিভিন্নতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে গোত্র, গোত্রপ্রীতি ও অন্যান্য বিষয় প্রাধান্য বিস্তার করে। সর্বত্রই কল্যাণধর্মিতা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রতিটি যুগের জন্যই বিশেষ নিয়মনীতির প্রয়োজন। এটাই বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌র লীলা।

অবশ্য এ উত্তরাধিকার নির্ধারণের উদ্দেশ্য যদি সম্পদের উত্তরাধিকার সাব্যস্তকরণ হয়, তা হলে তার সাথে ধর্মের কোনো সংশ্রব নেই। তা একটি বিশেষ স্বভাব, যা আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছামতো অনেকের মধ্যে সৃষ্টি করে থাকেন। তথাপি সেই ক্ষেত্রেও উত্তরাধিকার সম্পর্কে শুভ পরিণামের কামনা করা দরকার এবং ধর্মের দিক থেকে যাতে তা অহেতুক পদমর্যাদার ব্যাপার না হয়ে দাঁড়ায়, তৎসম্পর্কেও সম্যক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কারণ সাম্রাজ্য আল্লাহ্‌র, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।[৭৪]

---

৭৪. কোরান ২২, ৫৬। অনুরূপ বক্তব্য বিদ্যমান।

এস্থলে এমন কতগুলো বিষয় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন।

প্রথম : ইয়াজিদের মধ্যে তাঁর শাসনকালে কী দুর্মতি দেখা দিয়েছিল। পাঠক, সাবধান এটা মনে করবেন না যে, হজরত মাবিয়া (রাঃ) ইয়াজিদের এ ব্যাপারে অবগত ছিলেন। কারণ তিনি এরূপ ব্যাপার থেকে অনেক বেশি ন্যায়পরায়ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। বরং তিনি তাকে জীবৎকালে সঙ্গীত শ্রবণ সম্পর্কে ভর্ৎসনা করেছিলেন এবং তা থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন। অবশ্য এর পরিমাণও ছিল খুব সামান্য। অন্যদিকে এ ব্যাপারে তাঁদের মতামতও ছিল বিভিন্ন। সুতরাং ইয়াজিদের মধ্যে যখন দুর্মতি দেখা দিল, তখন সাহাবীরা তার ব্যাপারে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তার আনুগত্য ত্যাগ করতে মত দিলেন। যেমন হজরত ইমাম হুসাইন ও আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) এবং তাঁদের অনুসারিগণ। আবার অনেকে তাকেই ঠিক রাখতে বললেন। কারণ তাঁর বিরোধিতার মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি ও প্রাণহানির যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। অথচ তাকে তাঁরা পুরোপুরি মেনেও নিতে পারছিলেন না। তথাপি ইয়াজিদের ক্ষমতার ভয় তাঁদের ছিল। কারণ তার পশ্চাতে বনি উমাইয়াদের সমস্ত গোত্রশক্তি এবং কোরায়েশের নেতৃস্থানীয় অধিকাংশ লোকের সমর্থন বিদ্যমান। এটা মুজারের সমগ্র গোত্রপ্রীতিকেই আকর্ষণ করার শক্তি রাখে। বস্তুত তা যে-কোনো ক্ষমতা থেকে অধিকতর শক্তিমান এবং তার সম্মুখীন হবার শক্তি তাঁদের মধ্যে নেই। এজন্যই তাঁরা ইয়াজিদ সম্পর্কে নিশ্চেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা তার সুমতির জন্য প্রার্থনা ও তার কবল থেকে মুক্তির জন্য আন্তরিক কামনা পোষণ করছিলেন। সমগ্র মুসলিম সমাজের অবস্থা তখন এরূপ। তাদের প্রত্যেকেই সত্যকে অনুসরণ করছিলেন এবং এ উভয় দলের মধ্যে কারো সম্পর্কে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাদের পুণ্যাসক্তি ও সত্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্য সকলের নিকট সুপরিচিত। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাদের আদর্শ অনুসরণের শক্তি দিন।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর উত্তরাধিকারী নির্ধারণের স্বরূপ এবং এ প্রসঙ্গে হজরত আলীকে তৎকর্তৃক মনোনয়ন দানের ব্যাপার সম্পর্কীয় শিয়াদের দাবি। বস্তুত এ বিষয়টি সিদ্ধ হয়নি এবং ঐতিহ্যবিদগণের কেউই এটা বর্ণনা করেননি। বিশুদ্ধ হাদিসে[৭৫] যা আছে, তা এ যে, তিনি কাগজ-কালি চেয়েছিলেন তাঁর অন্তিম উপদেশ লিখিয়ে যাওয়ার জন্য; কিন্তু হজরত উমর নিষেধ করেন। সুতরাং এতে বোঝা যায় যে, ব্যাপারটি অনুষ্ঠিত হয়নি। এরূপ হজরত উমরকে যখন উত্তরাধিকার সম্পর্কে নিন্দা করে জিজ্ঞাসা করা হল, তখন তিনি বলেছিলেন, যদি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে, ক্ষতি নেই; কারণ আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তা করেছেন অর্থাৎ হজরত আবুবকর এবং যদি না করি, তাতেও ক্ষতি নেই; কারণ আমার অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তা করেননি অর্থাৎ হজরত মুহম্মদ (সঃ)। এরূপ হজরত আলী (রাঃ) ও হজরত আব্বাস (রাঃ)-কে বলেছিলেন। শেষোক্তজন তাঁকে হজরতের নিকট থেকে উত্তরাধিকারী নির্ধারণের ব্যাপারটি জেনে নিতে বললে তিনি তা অস্বীকার করে বলেছিলেন, যদি তিনি

৭৫. বোখারী দ্র:।

এ ব্যাপারে আমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হলে এ জীবনে আর তার অধিকার পাব না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আলীকে যে অন্তিম নির্দেশ দেয়া হয়নি, তা তিনি স্বয়ং জানতেন এবং অন্যকে যে দেয়া হয়নি, তাও ঠিক। শিয়া ইমামিয়া সম্প্রদায়ের এরূপ সন্দেহ হওয়ার কারণ তাদের সেই ধারণা থেকে জ্ঞাত, যাতে ইমামতকে ধর্মের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু এটা তদ্রূপ নয়। বস্তুত এটা এক সর্বজনীন কল্যাণমূলক দায়িত্ব, যা নির্ধারণের ভার সকলের উপর ন্যস্ত। যদি তা ধর্মের ভিত্তি হত, তা হলে তার অবস্থা নামাজের ন্যায় সুস্পষ্ট হত এবং তাতে তিনি অবশ্য উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে যেতেন, যেমন নামাজের ইমামতির জন্য আবুবকরকে উত্তরাধিকার দিয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং এ ব্যাপারটিও নামাজের ব্যাপারের মতোই সকলের নিকট সুপরিচিত হয়ে উঠত।

বস্তুত হজরত আবুবকরের খেলাফতের জন্য সাহাবীদের নামাজের উপর অনুমান করে এ বলে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যেহেতু আমাদের ধর্মের ব্যাপারে তাঁকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন, সুতরাং আমরা কি আমাদের দুনিয়ার ব্যাপারে তাঁকে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করব না; এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, অন্তিম নির্দেশের কোনো ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়নি। এতে এ বিষয়েরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইমামত ও উত্তরাধিকারী নির্ধারণের ব্যাপারটি তৎকালে আজকের মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। অন্যদিকে ঐক্য ও অনৈক্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি হিসাবে গোত্রপ্রীতির অবস্থাও বর্তমানের ন্যায় ছিল না। কারণ ধর্ম ও ইসলামের সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই অস্বাভাবিক ঘটনাবলির মাধ্যমে মানুষের মনে এমন একটা সম্প্রীতির ভাব জাগ্রত করেছিল যে, তারা তার জন্য মৃত্যুর সম্মুখীন হতেও দ্বিধা করত না। এর কারণও ছিল; কেননা তখন তারা ফেরেশতাদের সাহায্যে আসমানী বাণীর অনবরত আগমন এবং প্রতিটি ঘটনায় আল্লাহ্‌র নির্দেশ লাভের মতো অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করছেন। এর ফলে মানুষের মধ্যে যে আনুগত্য ও বশ্যতার ভাব দেখা দিয়েছিল, তার জন্যই গোত্রপ্রীতির প্রয়োজন আপাতত রহিত ছিল। কারণ তাদের মন অস্বাভাবিক-অলৌকিক ঘটনাবলি ও ঐশ্বরিক শক্তির পর্যায়ক্রমিক বিকাশে আচ্ছন্ন হয়েছিল এবং ফেরেশতাদের আগমনের মত ঘটনার বাস্তবতায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যথার্থভাবে বলতে গেলে এ সকলের ধারাবাহিকতায় তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। সুতরাং খেলাফত, রাজশক্তি, উত্তরাধিকার ও গোত্রপ্রীতি এবং এপ্রকার অন্যান্য বিষয়, সকলেই একসঙ্গে মিশ্রিত হয়ে একটি অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, যা তৎকালে অত্যন্ত বাস্তব ছিল।

অতঃপর যখন অলৌকিক কার্যাবলির অনুপস্থিতির দরুন এরূপ সাহায্য সীমিত হয়ে আসল এবং যারা এর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তাঁরাও অন্তর্ধান করলেন, তখন অবস্থার ঐ বিশেষত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে লাগল। অস্বাভাবিক ঘটনাবলির প্রভাব কমে যাওয়ার ফলে পুনরায় পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসল। তখন গোত্রপ্রীতি ও অভ্যাসসমূহকে স্বাভাবিক ধারায় কল্যাণ-অকল্যাণের নিয়ামক শক্তি হিসাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন দেখা দিল। সুতরাং খেলাফত ও রাজশক্তির ব্যাপারে তাদের ধারণা মতো উত্তরাধিকারী নির্ধারণের প্রশ্নটি অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করল, যা পূর্বে অনুরূপ ছিল না।

পাঠক, নবী (সঃ)-এর সময়ে খেলাফতের কি অবস্থা ছিল, লক্ষ করুন। তিনি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে যাননি। অতঃপর খলিফাদের সময়ে তার গুরুত্ব কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেল। কারণ তখন পরস্পর সহায়তা, সংগ্রাম, বিদ্রোহ দমন ও বিজয়াভিযানের যুগ। অথচ তখনও তাঁরা এ ব্যাপারে কিছু করা বা না করার ইচ্ছার স্বাধীনতা ভোগ করছেন, যেমন আমরা হজরত উমরের বক্তব্য বর্ণনা করেছি। অতঃপর বর্তমান যুগে তা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কারণ উত্তরাধিকারী নির্ধারণ ব্যতীত পরস্পর সহায়তার ঐক্য ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সুতরাং এখন গোত্রপ্রীতিকে শক্তি হিসাবে বিবেচনা করার সময় এসেছে। কারণ এখন তাই একমাত্র অকল্যাণ ও অনৈক্য দূর করে সম্প্রীতি ও একতা গড়ে তুলতে পারে এবং তাকেই ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধন ও বিধি-বিধানের প্রতিষ্ঠার নিয়ামক হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

তৃতীয় বিষয়টি হল, সাহাবী ও তাবেয়ীনদের মধ্যে অনুষ্ঠিত ইসলামী যুগের বিভিন্ন যুগের স্বরূপ। জেনে রাখুন, তাঁদের মতানৈক্য একমাত্র ধর্মীয় ব্যাপারেই দেখা দিয়েছে এবং তাও বিশুদ্ধ প্রমাণাদি ও যথার্থ উপলব্ধি থেকেই জন্মেছে। বস্তুত সত্যানুসন্ধানীরা যখন মতানৈক্যে উপনীত হন, তখন যদিও আমরা বলে থাকি যে, এ সকল অনুসন্ধেয় বিষয়ে সত্য যে কোনো এক পক্ষে বিদ্যমান এবং যে পক্ষ তার লক্ষ ভেদ করতে ব্যর্থ হবে, সেই ভুলের অধিকারী; তথাপি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে সত্যের সেই পক্ষ অনির্ধারিত। সুতরাং তাতে যেমন উভয় পক্ষের সত্যের অনুসারী হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি ভুলের পক্ষও অনির্ধারিত থেকে যাচ্ছে এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারেই তাদের কোনো পক্ষেরই কোনো পাপ নেই। যদি আমরা এ কথা বলতে পারি যে, তাদের প্রত্যেকেই সত্যের অনুসারী হতে পারে এবং প্রত্যেক সত্যানুসন্ধানীই সঠিক পথে পদচারণা করছে, তা হলে আমাদের এ বক্তব্যই তাদের ভুল ও পাপের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। যথার্থভাবে দেখতে গেলে সাহাবী ও তাবেয়ীনদের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল, তা মূলত ধর্মীয় বিষয়াদি সম্পর্কে ধারণাজাত সত্যানুসন্ধানী মতানৈক্য এবং তার বিধান হল এই।

ইসলামী যুগে মতানৈক্যের যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, তা মোটামুটি এ মাবিয়া, যুবায়ের, আয়েশা ও তালহার সাথে আলীর ঘটনা, ইয়াজিদের সাথে হোসাইনের ঘটনা এবং আবদুল মালেকের সাথে ইবনে যুবায়েরের ঘটনা।

আলীর ঘটনাটি এই যে, উসমানের নিহত হওয়ার সময় মানুষ বিভিন্ন শহরে ছড়িয়েছিল, তারা আলীর বায়আতে উপস্থিত হয়নি। যারা উপস্থিত ছিল, তাদের মধ্যেও অনেকে বায়আত করেছে। আবার অনেকে অন্যান্য লোকের আগমনের জন্যও ইমামতের ব্যাপারে তাদের একতার জন্য অপেক্ষা করেছে। যেমন—সাদ, সায়িদ, ইবনে উমর, উসামা ইবনে যায়েদ, মুগিরা ইবনে শুবা আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম, কুদামা ইবনে মাজউন, আবু সাইদ খুদরী, কাব ইবনে উজযা, কাব ইবনে মালেক, নুমান ইবনে বশির, হাসমান ইবনে সাবেত, মুসাল্লামা ইবনে মুখাল্লাদ, ফুজালা, ইবনে উবাইদ ও অনান্য বিশিষ্ট সাহাবী অপেক্ষা করেন। বিভিন্ন শহরে যাঁরা অবস্থান করছিলেন, তারাও উসমানের রক্তের প্রতিশোধ দাবি করে বায়আত থেকে দূরে রইলেন। এর ফলে

পরিস্থিতি অরাজক হয়ে উঠল এবং মানুষ কাউকে শাসক নিযুক্ত করা যায়, তৎসম্পর্কে মুসলমানদের পরামর্শসভা ডাকার জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল। তারা আলীকে উসমানের সাহায্যের ব্যাপারে ও হত্যাকারীদের সম্পর্কে চুপ থাকা সম্পর্কে দোষী করল বটে; কিন্তু কিছুতেই তাঁর তাতে অংশগ্রহণের দোষারোপ করেনি। আল্লাহ্ না করুন তিনি তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন। এমন কি মাবিয়াও যখন তাঁর উপর দোষারোপ করলেন, তাও শুধুমাত্র চুপ থাকার ব্যাপারেই ছিল। অতঃপর তাঁরা বিভক্ত হয়ে পড়লেন। আলী মত প্রকাশ করলেন যে, তাঁর বায়আত অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং নবী (সঃ) এর আবাসভূমি, সাহাবীদের বাসস্থান মদিনায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাই এ ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেছেন। সুতরাং অন্য যাঁরা দেরি করছেন, তাঁদের জন্য তাঁর প্রতি আনুগত্য জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উসমানের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণে তিনি এজন্য দেরি করলেন, যাতে সকল মুসলমান একত্র হয়ে শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তখন উক্ত ব্যাপার সহজে সম্পন্ন করা যাবে। অন্যরা মনে করলেন যে, তাঁর বায়আত অনুষ্ঠিত হয়নি। কারণ নেতৃস্থানীয় সকল সাহাবী তখন বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিলেন। তাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই মদিনায় উপস্থিত ছিলেন। বস্তুত নেতৃস্থানীয় সকলের ঐকমত্য ব্যতীত বায়আত অনুষ্ঠিত হতে পারে না এবং যারা বায়আত করেছে তাদেরও এপ্রকার অল্পসংখ্যক সাহাবীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বায়আত অন্যদের উপর জরুরি নয়। মুসলমানগণ তখন অরাজক অবস্থার অধীন; তারা প্রথমে উসমানের রক্তের প্রতিশোধ দাবি করল এবং পরে ইমাম নির্ধারণ করতে ঐকমত্য হতে চাইল। এ দাবির প্রতি সমর্থন জানালেন মাবিয়া, আমর ইবনে আলআস, উম্মুল মোমেনীন আয়েশা, যুবায়ের ও তৎপুত্র আবদুল্লাহ্, তালহা ও তৎপুত্র মুহম্মদ, সাদ সাইদ, নুমান ইবনে বশির, মাবিয়া ইবনে খুদাইজ এবং অন্যান্য সাহাবী, যাঁরা মদিনায় থেকেও আলীর বায়আত হতে দূরে থাকেন, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। অবশ্য তাঁদের পরবর্তী পুরুষের প্রায় সকলেই আলীর বায়আত অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে একমত ছিলেন এবং সকল মুসলমানের জন্য তা জরুরি বলেও মনে করতেন। তাঁরা আলীর মতকেই সঠিক ভাবতেন এবং মাবিয়া ও তৎপক্ষীয় অন্য সকলের মতকে ভুল বলে জানতেন। বিশেষ করে তালহা ও যুবায়ের, যাঁরা আলীর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেও ফিরে যান বলে কথিত হয়। অবশ্য এতদসত্ত্বেও তাদের কোনোপক্ষের উপরেই পাপ বর্তায় না। কারণ সত্যানুসন্ধানীদের অবস্থাই এরূপ। কারণ হজরত আলীর ব্যাপারটি প্রথম যুগের দুটি মতের একটির উপর দ্বিতীয় যুগের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বলেই সকলের নিকট পরিচিত। হজরত আলীকে জমল ও সিফ্ফিন যুদ্ধের নিহতদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল; উত্তরে তিনি বলেছিলেন, যার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ, এদের মধ্যে মৃত প্রতিটি লোক, যার অন্তর পরিষ্কার, সে বেহেশতী হবে। তিনি উভয় পক্ষের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তাবারী ও অন্যরা এটা বর্ণনা করেছেন। পাঠক, তাঁদের কারো ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে সন্দেহ করার বা তাদের সম্পর্কে সমালোচনা করার কিছু নেই। তাঁরা, যেমন আপনি জানেন এবং তাঁদের কথাবার্তা ও কাজকর্ম সকলই প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত। তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা আহলে সুন্নতের নিকট সর্বদা গ্রাহ্য বলে বিবেচিত।

অবশ্য যারা আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদের সম্পর্কে মুতাজিলাদের একটি মত বিদ্যমান, কিন্তু সত্যনিষ্ঠরা তার প্রতি দৃষ্টি দেননি এবং তাকে গুরুত্বপূর্ণও মনে করেননি।[৭৬]

পাঠক আপনি যদি সুবিচারের দৃষ্টিতে দেখেন, তা হলে হজরত উসমানের ব্যাপারে মানুষের মতভেদ এবং পরবর্তীকালে সাহাবীদের বিভিন্ন মতানৈক্য সম্পর্কে অবশ্যই ক্ষমার হেতু খুঁজে পাবেন। বুঝতে পারবেন যে, আল্লাহ্ জাতিকে পরীক্ষা করার জন্যই এ বিপদ আপতিত করেছিলেন। তারা এমন সময়ে, যখন চারদিকে আল্লাহ্ তাদের শত্রু বিনষ্ট করেছেন, শত্রুদের ভূমি ও গৃহাদির উপর তাদেরকে আধিপত্য দিয়েছেন এবং তারা সীমান্তবর্তী শহর বসরা, কুফা, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ এ সকল শহরে যে সকল আরব উপস্থিত হয়েছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল অমার্জিত; তারা নবী (সঃ)-এর সাহচর্য পায়নি বললেই চলে। তারা তাঁর চরিত্র, নম্রতা প্রভৃতির প্রভাবে সংশোধিত হয়নি এবং তাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি। এর ফলে তাদের মধ্যে মূর্খতার যুগের স্থূলতা গোত্রপ্রীতি, অহংকার ও বিশ্বাসজনিত স্থৈর্যের অভাব রয়ে গিয়েছিল। তদুপরি ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করার পর তা প্রধানত মোহাজের ও আনসারদের নেতৃত্বাধীনে থেকে যায়। তাঁরা কোরায়েশ, কেনানা, সকিফ, হুজাইল প্রভৃতি গোত্র এবং হেজাজ ও ইয়াসরাবের অন্তর্গত। তাঁরাই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করে প্রাধান্য লাভ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী মুসলমানদের মনে তাঁদের এরূপ অবাধ নেতৃত্ব ভালো লাগল না এবং তারা হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে লাগল। কারণ তারা দেখল যে, বংশমর্যাদার দিক থেকে তারা প্রাচীন, সংখ্যায় তারা অধিক এবং পারস্য ও রোমীয়দের পরাজিত করতে তারাই অগ্রণী ছিল। তারা বকর ইবনে ওয়ায়েল, আবদে কায়স ইবনে বাবিয়া, কেন্দা, ইজদ, তমিম, কায়স প্রভৃতি ইয়ামেন ও মুজারের গোত্রাবলি। তারা স্বভাবতই কোরায়েশের প্রতি হিংসাপরায়ণ ও বিতৃষ্ণ হয়ে উঠল। এর ফলে তাদের আনুগত্যে শৈথিল্য দেখা দিল এবং তারা এর হেতু হিসাবে তাদের প্রতি অন্যায়-অবিচারের অভিযোগ তুলল। তারা কোরায়েশদিগকে অসাম্যের দোষে দোষী করে সম্পদ বণ্টনে অসমতার অভিযোগে অভিযুক্ত করল।

এ সকল কথা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল এবং মদিনায় এসে পৌঁছতে লাগল। পাঠক, আপনিত তাঁদেরকে জানেন, তাঁরা একে খুবই গুরুত্ব দিলেন এবং হজরত উসমানের নিকট উপস্থিত করলেন। তিনি এ সম্পর্কে যথার্থ সংবাদ আনবার জন্য বিভিন্ন শহরে লোক পাঠালেন। আমর ইবনে আস, মুহম্মদ ইবনে মাসলামা, উসামা ইবনে যায়েদের ন্যায় অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এ কাজে নিয়োজিত হলেন। তাঁরা যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে শাসকদের মধ্যে অন্যায্য কিছু দেখতে পেলেন না এবং ভর্ৎসনাযোগ্যও কিছু সেখানে ছিল না। সুতরাং তাঁরা ফিরে এসে যথারীতি তাঁদের অভিজ্ঞতা খলিফার নিকট বর্ণনা করলেন। কিন্তু বিভিন্ন শহরের অভিযোগ দূর হল না এবং বিচিত্র সব কথাবার্তা ক্রমশ বাড়তেই লাগল।

---

৭৬. মুতাজিলাদের সাধারণ ধারণা অবশ্য উভয় পক্ষই ভ্রান্ত ছিল।

কুফার শাসক ওলিদ ইবনে উকবার বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ উত্থাপিত হল এবং তথাকার একদল লোক তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। হজরত উসমান তাকে শাস্তি দিলেন ও পদচ্যুত করলেন। এর পর শহরবাসীরা বিভিন্ন শাসকের পদচ্যুতি দাবি করে মদিনায় আসতে লাগল এবং তারা হজরত আয়েশা, আলী, যুবায়ের, তালহা প্রমুখ সাহাবীদের নিকট অভিযোগ করল। হজরত উসমান তাদের দাবি অনুসারে অনেক শাসককেই পদচ্যুত করলেন। কিন্তু তাদের মুখ বন্ধ হল না। বরং কুফার শাসক সাইদ ইবনে আস মদিনায় প্রতিনিধিত্বের কার্যে আসার পরে কুফায় ফিরে যেতে চাইলে তাঁকে পথিমধ্যে বাধা দেয়া হল এবং তাকে পদচ্যুত করে ফেরত পাঠান হল।

এর পর মদিনার অন্যান্য সাহাবী ও হজরত উসমানের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। তাঁরা হজরত উসমানের সমালোচনা করতে লাগলেন, কেননা তিনি আর অধিক শাসককে পদচ্যুত করতে অস্বীকার করেছিলেন। কারণ কোনো সুস্পষ্ট কারণ ব্যতীত শুধু দাবির মুখে এটা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু অন্যান্য সাহাবীরা নিরস্ত্র হলেন না, তাঁরা অন্যান্য কার্যেও খুঁত ধরতে লাগলেন। অথচ হজরত উসমান এ প্রকার সমালোচনার মুখেও নিজের সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টিকে আঁকড়িয়ে ধরেছিলেন। সাহাবীরাও অনুরূপভাবে সত্যনিষ্ঠা প্রকাশ করছিলেন।

অতঃপর একদল হুযোগপ্রিয় লোক মদিনায় এসে উপস্থিত হল। প্রকাশ্যে তারা হজরত উসমানের নিকট সুবিচারও চাইতে এসেছিল, কিন্তু তাদের অন্তরে ছিল তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা। এদের মধ্যে বসরা, কুফা ও মিশরের বহু লোক ছিল। এরা হজরত আয়েশা, আলী, যুবায়ের, তালহা প্রমুখ সাহাবীদের সমর্থন লাভ করতে পেরেছিল এবং তাঁরাও এদের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করে হজরত উসমানের মত পরিবর্তন করত অবস্থার শান্তি আনতে চেয়েছিলেন। সুতরাং তাদের দাবির মুখে হজরত উসমান মিশরের শাসককে পদচ্যুত করলেন। তারা ফিরে গেল, কিন্তু কিছু দূরে গিয়েই আবার ফিরে এল। এবার তাদের হাতে গোলযোগপূর্ণ একটি পত্র। তারা এটা পথিমধ্যে এক বাহকের নিকট থেকে উদ্ধার করেছে এবং এতে মিশরের শাসকের প্রতি তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ রয়েছে। হজরত উসমান এরূপ পত্রের বিষয় শপথ করে অস্বীকার করলেন। তারা বলল, আমরা আপনার লেখক মারোয়ানকে চাই। মারোয়ানও শপথ করলেন। হজরত উসমান বললেন, নিয়মমত এটা অপেক্ষা বেশি কিছু করার নেই। কিন্তু তারা মানল না, তাঁর বাসস্থান অবরোধ করল এবং এক সতর্ক মুহূর্তে রাত্রিবেলা আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করল। গোলযোগের দ্বার উন্মুক্ত হল।

তাঁদের প্রত্যেকেরই জন্য উক্ত ঘটনায় হেতু খোঁজার অবকাশ আছে এবং তাঁরা প্রত্যেকেই ধর্মীয় ব্যাপারকে এ প্রসঙ্গে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা তার কোনো একটি দিকও নষ্ট করতে চাননি এবং এর ফলে সকলেই নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যানুসন্ধান করেছেন। আল্লাহ্ তাঁদের সকল অবস্থা সম্পর্কেই অবহিত ও জ্ঞাত। আমরা তঁদের ব্যাপারে কল্যাণ কামনাই করি। কারণ তাঁদের অবস্থা এরই সাক্ষ্য দেয় এবং মহান সত্যবাদীর বাণীও এর নির্দেশক।

হুসাইন ইবনে আলীর হত্যাকাণ্ড

হুসাইন সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, ইয়াজিদের দুর্মতি সেই যুগের সকলের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়লে কুফার শিয়া সম্প্রদায় ইমাম হুসাইনের জন্য লোক পাঠাল, যাতে তিনি সেইখানে গিয়ে তাদের শাসনব্যবস্থায় নেতৃত্ব দিতে পারেন। হুসাইন তখন চিন্তা করে দেখলেন যে, যার পক্ষে শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব, তারই উচিত ইয়াজিদের দুর্মতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং তিনি নিজেও নিজেকে এরূপ শক্তি ও যোগ্যতার অধিকারী বলে ধারণা করেছিলেন। যদি যোগ্যতার কথা বলতে হয়, তা হলে বলব, তিনি যেমন ধারণা করেছেন, তা অপেক্ষাও তিনি বেশি ছিলেন। কিন্তু শক্তির ব্যাপারে তিনি ভুল করেছিলেন; আল্লাহ্ তাঁকে শান্তি দিন। কারণ মুজারের গোত্রপ্রীতি কোরায়েশেই অধিক ছিল এবং এ কোরায়েশী গোত্রপ্রীতির উৎস হল আবদে মন্নাফ পরিবার। সাধারণ মানুষ ও কোরায়েশের সকলেই জানত যে, এ আবদে মন্নাফ পরিবারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বনি উমাইয়া। এটা কারো পক্ষে অস্বীকার করার উপায় নেই। অবশ্য ইসলামের প্রথম দিকে সকলেই এটা ভুলে গিয়েছিল। কারণ তখন অস্বাভাবিক ঘটনাবলি, ওহীর অবতরণ ও ফেরেশতাদের মুসলমানদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা সকলের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সুতরাং তারা অভ্যাসজনিত বিষয়াদি সম্পর্কে উদাসীন, মূর্খতার যুগের গোত্রপ্রীতি ও তার কলহ বিবাদ সম্পর্কে বিস্মৃতির অধিকারী হয়ে উঠেছিল। তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিক সম্প্রীতি ও তজ্জনিত সহায়তা ও প্রতিরোধ ছাড়া অন্যকিছু ছিল না। এর কল্যাণেই তাঁরা ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সক্ষম হয়েছিল। ধর্মবোধই তাঁদেরকে নিয়ন্ত্রিত করতে ছিল এবং অভ্যাসের প্রভাব শিথিল হয়ে পড়েছিল। এর পর যখন নব্যুয়তের কাল শেষ হল এবং বিহ্বলকারী অস্বাভাবিক ঘটনাবলি আর দেখা দিল না, তখন অনেক বিষয়েই পূর্ব স্বভাব এসে স্থান গ্রহণ করল। সুতরাং গোত্রপ্রীতি আবার তার শক্তি ও আধার নিয়ে ফিরে এল। মুজার পুনরায় পূর্বের ন্যায় বনি উমাইয়ার প্রভাবাধীন হয়ে পড়ল।

পাঠক, আপনি অবশ্যই হুসাইনের ভুল বুঝতে পেরেছেন। অবশ্য এটা তাঁর পার্থিব বিষয় সম্পর্কিত ভুল, যা কোনো দোষের উদ্রেক করে না। কিন্তু ধর্মীয় দিক থেকে তিনি ভুলের অধিকারী নন। কারণ নিজের ধারণা অনুসারে এটাই তাঁর কর্তব্য ছিল এবং সেই কর্তব্য পালনের শক্তিও তার ছিল। ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের, ইবনে উমর, ইবনেল হানাফিয়া—তাঁর ভাই এবং আরো অনেকে তাঁকে কুফা যাওয়ার পথে বাধা দিয়েছিলেন এবং তাঁরা তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি ফিরলেন না; বরং তাই হল, যা আল্লাহ্ ইচ্ছা করেছিলেন।

হুসাইন ছাড়া অন্যান্য সাহাবী যাঁরা হেজাজে এবং ইয়াজিদের সাথে সিরিয়া ইরাকে ও তাঁর অনুসারী হয়েছিলেন, তাঁদের মত ছিল এই যে, ইয়াজিদের দুর্মতি সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অবকাশ নেই। কারণ এতে ব্যাপক গোলযোগ দেখা দিবে ও রক্তপাত বৃদ্ধি পাবে। এজন্য তাঁরা এ ব্যাপারে নিজেদেরকে অক্ষম মনে করে হুসাইনের অনুসরণ করেননি। অবশ্য তাই বলে তাঁরা তাঁকে অস্বীকার বা পাপী বলে ঘৃণা করেননি। কারণ হুসাইন সত্যানুসন্ধানী এবং সত্যানুসন্ধানীদের আদর্শই এরূপ।

পাঠক, আপনার পক্ষে এ সকল সাহাবী ও অন্যলোক, যারা হুসাইনের বিরোধিতা করেছেন ও তাঁকে সহায়তা করতে এগিয়ে যাননি, তাদেরকে পাপী বলে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না। কারণ সাহাবীদের মধ্যে তাঁদের সংখ্যাই অধিক; তাঁরা ইয়াজিদের সঙ্গে ছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অমত প্রকাশ করেছিলেন। এমন কি হুসাইনও কারবালায় যুদ্ধরত অবস্থায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যনিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁদেরকে সাক্ষী করেছেন। তিনি বলতেন, যাও, যাবের ইবনে আবদুল্লাহ্, আবু সাইদ খুদরী, আনাস ইবনে মালেক, সহল ইবনে সাইদ, যায়েদ ইবনে আরকাম এবং তাঁদের তুল্য সকলকে জিজ্ঞাসা কর। তিনি তাঁকে সাহায্য না করার জন্য তাঁদের প্রতি কোনোপ্রকার কটূক্তি বা দোষারোপ করেননি। তিনি জানতেন যে, তা তাঁদের সত্যানুসন্ধানের ব্যাপারে, যেমন তিনি নিজেও সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছেন।

পাঠক, এরূপ আপনি ইমাম হোসাইনের হত্যাকেও এ সত্যানুসন্ধানের পরিণতি বলে সঠিক বলার ভুল করতে পারেন না। কারণ তিনি নিজেও এ সত্যানুসন্ধানের কাজই করেছিলেন। ব্যাপারটি তা হলে তেমনই হবে, যেমন শাফেয়ী ও মালেকীরা হানাফীদের আঙুরের রস পানের ব্যাপারটিকে শাস্তিযোগ্য বলে মনে করে। জেনে রাখুন, বিষয়টি আদৌ তেমন নয়। তাঁর বিরোধিতা তাঁদের সত্যানুসন্ধান হলেও তাঁর হত্যাকে কখনও এর অন্তর্গত করা যায় না। বরং তাঁকে হত্যার ব্যাপারে ইয়াজিদ ও তার সহচররাই দায়ী। আপনার পক্ষে এটা বলাও ঠিক হবে না যে, তাঁরা ইয়াজিদের দুর্মতি সত্ত্বেও তার বিরোধিতা করতে যেহেতু মত দেননি, সুতরাং তাঁরা তার সমুদয় কাজ শুদ্ধ বলে বিবেচনা করতেন। আরো জেনে রাখুন কোনো দুর্মতিসম্পন্ন শাসকের ঐ সকল কাজই গ্রহণযোগ্য হয়, যা ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী। তাঁদের মতে কোনো বিদ্রোহীকে হত্যা করা তখনই সঠিক হবে, যখন সে কোনো ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এ বিষয়টি বর্তমানে আমাদের আলোচ্য সমস্যায় নেই। সুতরাং ইয়াজিদের সাথে হুসাইনকে হত্যা করা যেমন ঠিক নয়, তেমনই একা ইয়াজিদের পক্ষেও হুসাইনকে হত্যা করা ঠিক নয়। বরং এটা ইয়াজিদের জঘন্য দুর্মতিপরায়ণ কার্যাবলিরই অন্তর্গত এবং হুসাইন এ ক্ষেত্রে পুণ্যবান শহীদ। তিনি তাঁর সত্যানুসন্ধানে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সাহাবীদের মধ্যে যারা ইয়াজিদের পক্ষে ছিলেন, তাঁরাও তাঁদের সত্যানুসন্ধানে ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

এ ব্যাপারে কাজী আবু বকর ইবনেল আরবি আল-মালেকী[৭৭] ভুল করেছেন। তিনি তাঁর 'আল আওয়াসিম ওল কাওয়াসিম' নামক গ্রন্থে যা বলেছে, তার অর্থ এই যে, হুসাইন তাঁর মাতামহের নীতি অনুসারেই নিহত হয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল; তাঁকে এ ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ ইমামের শর্তের প্রতি উদাসীনতাই অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। অথচ ইমাম হুসাইনের ন্যায়পরায়ণ সেই যুগে আর কে ছিল এবং ইমামত ও পূতচরিত্রের দিন থেকে বিভিন্ন মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার যোগ্যতাই বা আর কার ছিল।

ইবনে যুবায়েরও ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে ইমাম হুসাইনের অনুরূপ ধারণা পোষণ করেছিলেন। অবশ্য শক্তির দিক থেকে তাঁর ভুল তদপেক্ষা আরো বিরাট। কারণ বনি

৭৭. মুহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, জীবনকাল ৪৬৯-৫৪৩ (১০৭৬/৭৭-১১৪৮ খ্রি:) হি:।

আসাদ না মূর্খতার যুগে, না ইসলামের যুগে, কখনই বনি উমাইয়ার সাথে এঁটে উঠতে পারেনি। তদুপরি বিরোধী পক্ষের ক্ষেত্রে ভুলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যেমনটি আলীর সাথে মাবিয়ার ব্যাপারে পাওয়া যায়, তারো এ স্থলে কোনো উপায় নেই। কারণ সেই সময়ে অধিকাংশের সিদ্ধান্ত আমাদেরকে পথ দেখিয়েছে; কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। অবশ্য ইয়াজিদের ব্যাপারটি তার দুর্মতির জন্যই নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আবদুল মালেক প্রতিদ্বন্দ্বী ইবনে যুবায়েরের সহচর এবং ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে মানুষের মধ্যে বিশিষ্ট। পাঠক, তাঁর পুতচরিত্রের প্রমাণ হিসাবে ইমাম মালেকের তাঁর কাজের দ্বারা প্রমাণ উপস্থিত করাই আপনার জন্য যথেষ্ট হবে। তদুপরি ইবনে যুবায়েরের সাথে হেজাজে থেকেও ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাসের আব্দুল মালেকের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ এ কথারই প্রমাণ দেয়। সম্ভবত এ কারণেই অধিকাংশ সাহাবীর মত ছিল যে, ইবনে যুবায়েরের বায়আত অনুষ্ঠিত হয়নি। কারণ তাতে মারোয়ানের বায়আতের ন্যায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন না। অথচ ইবনে যুবায়েরের ধারণা ছিল এর বিপরীত। তাঁদের প্রত্যেকেই এক্ষেত্রে সত্যানুসন্ধানে রত এবং প্রকাশ্যে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, যদিও সত্য কোনো পক্ষে, তা স্থিরীকৃত হয়নি। আমাদের উপরোক্ত আলোচনার সাথে মিলিয়ে দেখলে ইবনে যুবায়েরের নিহত হওয়ার বিষয়টি ধর্মীয় বিধিবিধান অনুসারে বিচারসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর ইচ্ছা ও সত্যনিষ্ঠা অনুসারে পুণ্যবান শহীদের মর্যাদাপ্রাপ্ত।

এ সেই মানদণ্ড, যা দিয়ে পূর্বসূরি সাহাবী ও তাবেয়ীনদের কার্যাবলি বিচার করে দেখতে হয়। তাঁরা জাতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য। যদি তাঁদেরকেই আমরা আমাদের সমালোচনার শিকারে পরিণত করি, তা হলে আর কাকে ন্যায়পরায়ণতায় বিশিষ্ট করব। নবী (সঃ) বলেছেন, সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ আমার যুগ; তার পর যারা তার সন্নিহিত—দুইবার অথবা তিনবার এবং এর পর মিথ্যার বিস্তৃতি ঘটবে।[৭৮] তিনি শ্রেষ্ঠত্ব বলতে এ ন্যায়পরায়ণতাকে বুঝিয়েছেন, যা প্রথম যুগ ও তার সন্নিহিত যুগের সাথে বিশিষ্ট। সুতরাং পাঠক, সাবধান, তাঁদের কারো সম্পর্কে আপনার চিত্ত বা আপনার জিহ্বাকে কলুষিত করবেন না এবং তাঁদের দ্বারা সংঘটিত বিষয়গুলোতে কোনোপ্রকার সন্দেহ আপনার মনে স্থান দিবেন না। যতদূর সম্ভব তাঁদেরকে সত্যের অনুসারী ও সৎপথের পথিক বলে ভাবুন। কারণ তাঁরাই এ সকল গুণের জন্য অধিকতর যোগ্য। তাঁদের মতানৈক্য বিনা প্রমাণে হয়নি; তাঁদের কলহ ও তাঁদের নিহত হওয়া সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং সত্য প্রকাশের জন্যই হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এ বিশ্বাস পোষণ করুন যে, তাঁদের মতানৈক্য জাতির পরবর্তীদের জন্য শান্তির বার্তা বহন করে এনেছে। কারণ প্রত্যেকেই তাঁদের অনুসরণে সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করতে পেরেছে এবং নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী একেকজনকে ইমাম, পথপ্রদর্শক ও প্রামাণ্য সূত্র হিসাবে গ্রহণ করেছে। সুতরাং এ বিষয়টি সম্যকরূপে উপলব্ধি করুন, তা হলে সৃষ্টি ও বস্তুপুঞ্জের মধ্যে আল্লাহ্‌র মহিমা অবলোকন করতে পারবেন। জেনে রাখুন, তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান এবং তাঁরই সন্নিধানে আমাদের গন্তব্য ও প্রত্যাবর্তনস্থল। যথার্থই আল্লাহ্ উন্নত ও সর্বজ্ঞ।

---

৭৮. বোখারী (২য়) দ্র:।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[খেলাফতের ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ]

যখন এ কথাটি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, খেলাফত অর্থ হল ধর্মের সংরক্ষণ ও পার্থিব শৃঙ্খলা বিধানের জন্য ধর্মপ্রবর্তকের প্রতিনিধিত্ব করা, তখন তার স্বরূপ বুঝে নেয়া প্রয়োজন। ধর্মপ্রবর্তক দুটি বিষয়ে তৎপর হন; একটি হল ধর্মীয় বিধিনিষেধের যথাবিহিত প্রচারণা এবং মানুষকে তৎসম্পর্কে কর্তব্য পালনের জন্য উৎসাহিত করা। অন্যটি হল মানব জীবনের কল্যাণকে সম্মুখে রেখে পার্থিব শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মানুষের এ সমাজবদ্ধ জীবন একান্ত প্রয়োজনীয়; তেমনই তার কল্যাণ সাধনও একান্ত জরুরি ব্যাপার। কারণ এ ব্যাপারে শৈথিল্য দেখা দিলে সমাজ জীবন বিনষ্ট হয়ে যায়। আমরা পূর্বে এও বলেছি যে, রাজশক্তি ও তার প্রতাপ সমাজ জীবনের এ কল্যাণ সাধনের জন্য যথেষ্ট। তবে হ্যাঁ, তার পূর্ণতর বাস্তবায়নের জন্য ধর্মীয় বিধি-নিষেধের প্রয়োজন। কারণ একমাত্র ধর্মপ্রবর্তকই এ কল্যাণের বিষয়টি সর্বাধিক অবগত। সুতরাং উক্ত খেলাফত যদি ইসলামী হয়, তা হলে তার মধ্যে রাজশক্তি মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এবং কখনো তার অনুসারীও হয়। কিন্তু তা যদি ইসলামী জবন ব্যবস্থার বহির্ভূত হয়, তা হলে তা রাজশক্তিই হয়ে দাঁড়ায়। যাহোক, যে কোনো অবস্থায় তাতে জনসেবার বিভিন্ন পর্যায় ও তার আনুষঙ্গিক কর্তব্যাদি বিদ্যমান। এগুলোর জন্য নির্দিষ্ট অংশ আছে এবং এ সকল অংশগত বিভাগে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তব্যরত থাকেন। এ সকল ব্যক্ত সংশ্লিষ্ট প্রাধান্য বিস্তারকারী রাজশক্তির নির্দেশ অনুসারে তাদের কর্তব্যাদি পালন করে থাকেন। এর ফলে কাজটি সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং শাসন ব্যবস্থার সাথে তার সুসামঞ্জস্য দেখা দেয়। খেলাফতের পদমর্যাদার সাথে যদি রাজশক্তি মিশ্রিত থাকে, তা হলে তার কর্তব্য পালনও আমাদের পূর্ব বর্ণনা অনুসারেই হয়ে থাকে। অবশ্য ধর্মীয় ব্যাপারে তাতে এমন কতগুলো পদমর্যাদা ও বিভাগ বিদ্যমান, যা ইসলামী খলিফাগণ ব্যতীত অন্য কোনো শাসক তা পরিচালনা করেন না। আমরা এস্থলে খেলাফতের সাথে বিশিষ্ট কতিপয় বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করব এবং পরে রাজশক্তি পরিচালিত শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আমাদের আলোচনায় ফিরে আসব।

জেনে রাখুন, ধর্মীয় বিধি-নিষেধ সম্বলিত বিভাগগুলো হল নামাজ, ফতোয়া, বিচার, জেহাদ ও বাজার পরিদর্শন। এর সবগুলোই প্রধান ইমামত অর্থাৎ খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত। এটা যেন মুখ্য নেতৃত্ব এবং সংবদ্ধ উৎসমূল। এ সকল বিভাগই তা থেকে উৎসারিত ও তাতে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে থাকে। কারণ খেলাফত সামগ্রিকভাবে জাতির ধর্মীয় ও পার্থিব অবস্থাদির পর্যবেক্ষণ এবং তৎসম্পর্কীয় ধর্মীয় বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করে।

নামাজের ইমামতি

তা এ সকল বিভাগীয় কর্তব্যের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং রাজশক্তি খেলাফতের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকলে তার মর্যাদা এ শক্তি অপেক্ষাও উন্নত। কারণ এটা দ্বারা সাহাবিগণ হজরত আবু বকরের খেলাফত সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর নামাজের ইমামতির প্রতিনিধিত্বকে তাঁরা শাসন ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা হিসাবে তুল ধরে বলেছিলেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁকে আমাদের ধর্মের ব্যাপারে সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিয়েছেন, আমরা কি তাঁকে আমাদের পার্থিব ব্যাপারে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করব না? সুতরাং নামাজ যদি শাসন ব্যবস্থা থেকে উন্নততর না হত, তা হলে এরূপ অনুমান করা শুদ্ধ হত না। যখন এটা স্থিরীকৃত হল, তখন জেনে রাখুন যে, নগরীর মসজিদগুলো দুই প্রকার। এক প্রকার বৃহদাকারের, যাতে বেশিসংখ্যক মুসল্লী হয় এবং সর্বপ্রকার নামাজের জন্য তা প্রস্তুত রাখা হয়। অন্যগুলো তদ্রূপ নয়, কোনো জাতি বা মহল্লার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তাতে সর্বসাধারণ নামাজ পড়তে যায় না। বৃহদাকারের মসজিদগুলোর বিষয় ব্যবস্থা দেখার ব্যাপারটি খলিফার উপর ন্যস্ত কিংবা তিনি যদি কোনো শাসক, উজির বা কাজীকে তার দায়িত্বভার অর্পণ করে থাকেন, তা হলে উক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর। তিনি তার পাঁচ অক্তের নামাজ এবং জুম্মা, দুই ঈদ, সূর্য-চন্দ্র গ্রহণ ও বৃষ্টির জন্য নামাজের নিমিত্ত ইমাম ঠিক করে দিবেন। কারণ এরূপ করে দেয়াই ব্যবস্থার দিক থেকে অধিকতর উত্তম এবং এর ফলে প্রজাসাধারণের কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। অনেকে একে অবশ্য কর্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন এবং এটা তাদেরই বক্তব্য, যারা জুম্মার নামাজের ব্যবস্থাকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন। সুতরাং তার নিমিত্ত ইমামের ব্যবস্থা করাও অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হবে।

অন্যদিকে যে সকল মসজিদ কোনো জাতি বা মহল্লার সাথে সংশ্লিষ্ট, তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রতিবেশীদের উপর বর্তায়। তাতে খলিফার দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন নেই কিংবা তৎকর্তৃক নিয়োজিত কোনো শাসন কর্তৃপক্ষেরও তাতে হাত দেবার দরকার পড়ে না। এর ব্যবস্থাপনা ও সংশ্লিষ্ট শর্তাদি এবং পরিচালন দায়িত্ব সম্পর্কীয় বিধিবিধান ধর্মীয় নীতিশাস্ত্রে বিদ্যমান। মাওয়ারদী[৭৯] ও অন্যান্যের লিখিত প্রশাসনিক আইনকানুন সম্পর্কীয় গ্রন্থাদিতে তা সবিস্তারে লিখিত রয়েছে। আমরা তার বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত রইলাম।

প্রথম খলিফাগণ নামাজের এ ইমামতির ব্যাপারে অন্য কারো উপর দায়িত্ব অর্পণ করতেন না। পাঠক, লক্ষ করুন অনেক খলিফাই এ নামাজের আজানের সময় মসজিদে আহত হয়েছেন এবং আততায়ীরা তা সুনির্দিষ্ট বলেই তাঁদের জন্য উক্ত স্থানে অপেক্ষা করেছেন। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা নিজেরাই এ ব্যাপারে জড়িত ছিলেন এবং অন্য কাউকেও এজন্য স্থলাভিষিক্ত করেননি। তাঁদের পরবর্তীকালে উমাইয়া সাম্রাজ্যের রাজপুরুষরাও এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তার মর্যাদাকে গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছেন।

---

৭৯. আলী ইবনে মুহম্মদ, ৯৮৫-১০৫৮ খ্রি.। গ্রন্থটির নাম 'আল-আহকামুস্ সুলতানিয়া।'

সম্রাট আবদুল মালেক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর দ্বাররক্ষীকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে আমার দ্বাররক্ষার ব্যাপারে নিয়োজিত করেছি সকলকে বাধা দেবার জন্য; কিন্তু তিনটি বিষয় সম্পর্কে নয়। একটি হল আহার্যদ্রব্যের পরিচারক, তাকে বাধা দিলে আহার্যসামগ্রী নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে; দ্বিতীয় হল নামাজের প্রতি আহ্বানকারী, কারণ সে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন ও তৃতীয় হল সংবাদের ডাক, তা আসতে দেরি হলে দূরদূরান্তের বিষয়াদি বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে।

অতঃপর যখন রাজশক্তির স্বাভাবিক অবস্থা দেখা দিল এবং তার আনুষঙ্গিক স্থূলতা, অহংকার ও মানুষের মধ্যে ধর্মকর্মে অসাম্য এসে উপস্থিত হল, তখন তাঁরা নামাজে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে লাগলেন। অবশ্য কখনো কখনো তাঁরা নিজেরাও নামাজের ইমামতিতে উপস্থিত হতেন এবং বিশেষ করে দুই ঈদ ও জুম্মার নামাজে আড়ম্বর ও জাঁকজমক প্রদর্শনের জন্য তাঁরা উপস্থিত থাকতেন। বনি আব্বাসের বহু খলিফা এবং উবাদইদীগণ তাঁদের সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে এরূপ করেছেন।

ফতোয়া

এর ব্যাপারে জ্ঞানীদেরকে পরীক্ষা করে, নির্দেশ দিয়ে যোগ্য লোককে নিয়োজিত করা এবং তাঁকে সাহায্য করা খলিফার দায়িত্ব। যারা অযোগ্য, তাদেরকে বিরত রাখা এবং শাসন করাও এ দায়িত্বের অন্তর্গত। কারণ এও ধর্মের ব্যাপারে মুসলমানদের কল্যাণ কামনার সাথে জড়িত রয়েছে। সুতরাং এ দায়িত্ব অবশ্য পালনীয়, যাতে অযোগ্য ব্যক্তিরা এতে প্রবেশ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সুযোগ না পায়। শিক্ষকরা এ বিষয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচিও প্রচারের ব্যবস্থা করবেন এবং এজন্য তাঁরা মসজিদে বসতে পারেন। সংশ্লিষ্ট মসজিদ যদি বৃহদাকার, শাসকের তত্ত্বাবধানে এবং যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তার ইমাম নিয়োগের দায়িত্ব শাসকের উপর বর্তায়, তা হলে এজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায়, সাধারণ মসজিদ হলে এরূপ অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। ফতোয়াদানকারী ও শিক্ষক, প্রত্যেককেই নিজের সম্পর্কে বিবেচনা করে এমন বিষয় থেকে বিরত থাকা উচিত, যার যোগ্যতা তার নেই এবং এমন বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত হওয়া ঠিক নয়, যাতে সুপথের ইচ্ছুক বিভ্রান্ত হয় ও দিশা অন্বেষণকারী আরো বেদিশা হয়ে ওঠে। হাদিসে এসেছে, তোমাদের মধ্যে বেপরোয়া ফতোয়াদানকারী বেপরোয়াভাবেই দোজখের দিকে এগিয়ে যায়। সুতরাং শাসকের উচিত তাঁদের ব্যাপারে দৃষ্টি দেয়া এবং অবস্থা বুঝিয়ে তাঁদেরকে অনুমতি দেয়া বা নিষেধ করা তাঁর কর্তব্য।

বিচারকার্য

তা খেলাফতেরই অধীনস্থ একটি কর্তব্য। কারণ এটা দ্বারা মানুষের মধ্যকার বিভিন্ন কলহ তাদের দাবি ও আপোষমীমাংসার ভিত্তিতে দূর করা হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে কোরান ও হাদিস দ্বারা নির্ধারিত বিধিনিয়ম অনুসৃত হয়ে থাকে। এ জন্যই এটা খেলাফতের কর্তব্যাবলির অন্তর্গত বলে সাধারণভাবে ধরা হয়। ইসলামের প্রথমদিকের খলিফাগণ

নিজেরাই এ দায়িত্ব পালন করতেন এবং এ ব্যাপারে অন্যকে নিয়োগ করতেন না। প্রথম যিনি এ ব্যাপারে অন্যকে নিযুক্ত ও তার উপর সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করলেন, তিনি হজরত উমর (রাঃ)। তিনি মদিনায় তাঁর পক্ষ থেকে আবু দারদাকে,[৮০] বসরায় শুরাইহ্‌কে এবং কুফায় আবু মুসা আল আশআরীকে কাজী নিযুক্ত করেছিলেন। শেষোক্তজনকে তিনি উক্ত দায়িত্ব সম্পর্কে একটি পাত্র লিখেন, যা বিচার সম্পর্কীয় বিধিনিষেধের উৎস হয়ে রয়েছে এবং এ ব্যাপারে তা যথেষ্ট। তিনি বলেন,

অতঃপর বিচার একটি অপরিহার্য কর্তব্য এবং অনুসৃত প্রথা। তোমার উপর এ সম্পর্কে কোনো দায়িত্ব আসলে, ভালো করে তার গুরুত্ব বুঝে নিবে। কারণ এতদ্ব্যতীত সত্য সম্পর্কে কথা বলা বা তার প্রতিষ্ঠা দান করা সম্ভব নয়। তোমার চেহারা, দরবার ও ন্যায়নিষ্ঠার দ্বারা মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার করো। যাতে কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তোমার পক্ষপাতিত্বের আশা এবং কোনো দরিদ্র ব্যক্তি তোমার অবিচারের ভয় না করে। ফরিয়াদীর উপর প্রমাণ উপস্থিত করার দায়িত্ব এবং অস্বীকারকারী আসামীর উপর শপথ গ্রহণই যথেষ্ট। মুসলমানদের আপোষমীমাংসা বৈধ; অবশ্য এমন মীমাংসাগত চুক্তি নয়, যা বৈধকে অবৈধ করে এবং অবৈধকে বৈধ করে। গতকল্য যে বিচার তুমি করেছ, তার পুনর্বিচারে অসুবিধা নেই। আজ আবার তুমি তোমার বুদ্ধিকে তজ্জন্য ব্যবহার কর, যাতে তোমার সম্মুখে সত্য প্রকাশিত হয় এবং সত্যের দিকে বিনা দ্বিধায় ফিরে যেতে পার। কারণ সত্যই প্রাচীন এবং মিথ্যাকে আঁকড়াইয়া থাকা অপেক্ষা সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই শ্রেয়। বুদ্ধি খাটাও, বুদ্ধি খাটাও তোমার অন্তরে যে সমস্যা আবর্তিত হয়েছে, তৎসম্পর্কে এবং যার জন্য কোনো নির্দেশ কোরান-হাদিসে নেই। অতঃপর তুলনীয় ও অনুরূপ বিষয়াদি জেনে নাও এবং সমস্যাকে তার দৃষ্টান্তের উপর অনুমান কর। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত সত্যের দাবি করে অথবা তজ্জন্য প্রমাণ উপস্থিত করতে সমর্থ নয়, তাকে একটা নির্দিষ্ট সময় দান কর। ইতিমধ্যে সে যদি প্রমাণ উপস্থিত করে, তা হলে তার দ্বারা তার সত্য উদ্ধার কর। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে রায় দিতে তোমার কোনো অসুবিধা নেই। কারণ এটাই অধিকতর সন্দেহ দূর করে এবং অজ্ঞতাকে বিনাশ করে। মুসলমানরা একে অপরের সাক্ষী হতে পারে; অবশ্য বিধানমত শাস্তিপ্রাপ্ত, মিথ্যা সাক্ষ্যদানে নিন্দিত এবং আত্মীয়তা ও চুক্তির ফলে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা সম্ভব নয়। পবিত্র আল্লাহ্ শপথ গ্রহণকারীকে ক্ষমা করেন এবং প্রমাণ উপস্থিতকারীর ব্যাপারটি স্থগিত রাখেন।[৮১] সাবধান, বাদীবিবাদীকে ক্লান্ত, বিরক্ত ও বিমুখ করা থেকে বিরত থেকো। মনে রেখ, সত্যকে তার যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার বিনিময়ে আল্লাহ্ বৃহৎ পারিশ্রমিক ও মহৎ খ্যাতি দান করেন। ইতি—(হজরত উমরের পত্র এখানেই শেষ)।

বিচারের ব্যাপারটি খলিফাদের দায়িত্ব হলেও তাতে তাঁরা, শাসন ব্যবস্থার সাধারণ ও ব্যাপক ব্যস্ততার দরুন অন্যকে নিয়োগ করতেন। কারণ তাঁদেরকে যুদ্ধ, বিজয়াভিযান, সীমান্ত রক্ষা এবং কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষার ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকতে হত। এ

---

৮০. তাঁর নাম সম্ভবত উয়াইমির ইবনে যায়েদ।

৮১. যতদূর মনে হয়, আপাত সত্য বলে মনে হলেও মিথ্যা সাক্ষী ও প্রমাণের ব্যাপারে এটা প্রযোজ্য হতে পারে। অবশ্য কাজীর জন্য এটাকেই গুরুত্ব দিয়ে বিচারকার্য সমাধা করতে হবে।

সকল কাজ অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে অন্যের দ্বারা তা সম্ভব হত না। মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপারে বিচারের গুরুত্ব স্বীকার করেও তাঁরা একমাত্র নিজেদের ব্যস্ততা সীমিত করার জন্যই এ ব্যাপারে অন্যদেরকে নিয়োগ করতেন। অথচ এতদসত্ত্বেও তাঁরা একমাত্র স্ববংশীয় ও আশ্রিত পোষ্যদেরকেই এ দায়িত্ব অর্পণ করতেন এবং অঘনিষ্ঠদেরকে এ ব্যাপারে নিয়োগ করতেন না।

এ পদের নিয়ম-কানুন ও শর্তাদি যে-কোনো শাস্ত্রীয় গ্রন্থে সুপরিচিত এবং বিশেষ করে 'আহকামুস সুলতানিয়া' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। অবশ্য খলিফাদের সময়ে কাজীর দায়িত্ব ছিল শুধু বাদী ও বিবাদীর মধ্যে বিষয় নিষ্পত্তি করা। অতঃপর তাঁদের দায়িত্বে আরো বহু বিষয় ক্রমান্বয়ে অর্পণ করা হয়েছে এবং খলিফাদেরও রাজশক্তির শাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব ব্যাপক হওয়ার সাথে সাথে এটা বৃদ্ধি পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত কাজীর এ পদমর্যাদার দায়িত্ব এভাবে স্থিরীকৃত হয়েছে যে, তা বাদীবিবাদীর মধ্যকার কলহ নিষ্পত্তি ব্যতীতও মুসলমান সর্বসাধারণের কতিপয় বিশেষ অধিকার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে। যেমন অক্ষম তথা উন্মাদ, অনাথ, দেউলিয়া, নির্বোধ প্রভৃতির সম্পত্তি দেখাশোনা, মুসলমানদের হেবা ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থা করা এবং সংশ্লিষ্ট মতামত অনুসারে অনাথ বালিকাদের বিবাহ দেয়া। এটা ছাড়াও রাস্তাঘাট ও গৃহাদি নির্মাণের ব্যাপারে লক্ষ রাখা, সাক্ষী, আমিন ও নায়েবদের যোগ্যতা পরীক্ষা করে দেখা এবং তাদের সম্পর্কে যথাবিহিত সূত্রাদি বিচার করে পরিপূর্ণ সংবাদ ও জ্ঞানলাভ করত নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। এভাবে উপরোক্ত সমুদয় কার্যই উক্ত কাজী পদের অন্তর্ভুক্ত ও অনুসারী কর্তব্য হিসাবে বিবেচনা করা হত।

পূর্বের খলিফারা কাজীকে অন্যায় অবিচার পরিদর্শনের কাজেও নিয়োজিত করতেন। এটা একটি বিশিষ্ট কর্তব্য; এতে শাসকের প্রতাপ ও বিচারকের দায়িত্ব উভয়ই মিশ্রিত ছিল। এর জন্য একটি শক্তিশালী হাত ও বৃহৎ প্রতাপের প্রয়োজন, যাতে উভয় পক্ষের মধ্যে অত্যাচারীকে নিরস্ত্র করা সম্ভব হয় এবং অন্যায়কারীকে শাসিয়ে দেয়া যায়। তা যেন কাজী বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যা করতে পারেননি, তাই করা। এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাজ হবে প্রমাণ ও বক্তব্য পরীক্ষা করা, আলামত ও নিদর্শন বিচার করা, সত্য প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা, বাদীবিবাদীকে আপোষ মীমাংসার দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সাক্ষীদেরকে শপথের দ্বারা সতর্ক করা। এ দায়িত্ব কাজীর কর্তব্য থেকে অনেকখানি ব্যাপক।

প্রথমদিকের খলিফারা আব্বাসী সম্রাট আল-মুহতাদী পর্যন্ত নিজেরাই এ দায়িত্ব পালন করতেন। কখনো কখনো এ ব্যাপারে অন্যদেরকে ব্যবহার করতেন। যেমন হজরত উমর[৮২] (রাঃ) তাঁর কাজী আবু ইদ্রিস আল খাওলানীকে[৮৩] উপরোক্ত দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যেমন সম্রাট মামুন ইয়াহিয়া ইবনে আকসামকে এবং সম্রাট আলমুতাসিম আহমদ ইবনে আবু দাউদকে[৮৪] এ দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। কখনো তাঁরা

৮২. কোনো কোনো সংস্করণে হজরত আলী (রাঃ)।
৮৩. তাঁর নাম সম্ভবত আয়াজুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ।
৮৪. মৃত্যুকাল ২৪০ (৮৫৪ খ্রি.) হি.।

কাজীদেরকে যুদ্ধে গ্রীষ্মকালীন সৈন্য পরিচালনার দায়িত্বও অর্পণ করতেন। সম্রাট মামুনের সময় ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম গ্রীষ্মকালীন সৈন্য নিয়ে রোমের দিকে অভিযানে যেতেন। আন্দালুসের বনি উমাইয়া সম্রাট আব্দুর রহমান আন্‌নাসেরের কাজী মুনজির ইবনে সায়িদ[৮৫] অনুরূপ দায়িত্বে নিয়োজিত হতেন। এ দায়িত্বের একমাত্র অধিকারী ছিলেন খলিফারা অথবা তাঁরা যদি উজিরকে এ কার্যে নিয়োজিত করতেন এবং কোনো প্রাধান্য বিস্তারকারী শাসক যদি এ ব্যাপারে দায়িত্ব নিতেন, তা হলে তারাই তা সম্পন্ন করতেন।

দুর্নীতি সম্পর্কে লক্ষ রাখা ও বিভিন্ন প্রকার শাস্তি বিধান করা, যা মূলত রক্ষী প্রধানের[৮৬] কাজ, তাও আব্বাসী সাম্রাজ্য, আন্দালুসের উমাইয়া সাম্রাজ্য, মাগরিব ও মিশরের উবাইদী সাম্রাজ্যে ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। এ সকল সাম্রাজ্যে এ বিভাগটিও ধর্মীয় বিভাগগুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে কাজীদের দায়িত্ব অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ব্যাপক তৎপরতার প্রয়োজন হত। এটা সন্দেহজনক ব্যক্তিকে বিচারের সম্মুখীন করা, দুর্নীতিমূলক কার্যাদি অনুষ্ঠিত হবার পূর্বেই দমনমূলক শাস্তি প্রয়োগ করা, যথানিয়মে প্রদত্ত শাস্তি কার্যকর করা, খুনজখমের বিনিময়ে নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করা এবং যারা দুষ্কর্ম ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক, তাদের ব্যাপারে নিবর্তন ও শিক্ষামূলক শাস্তি প্রদান করার দায়িত্ব পালন করা।

অতঃপর যে সকল সাম্রাজ্যে খেলাফতের অবস্থা লোপ পায়, সেখানে এ দুটি দায়িত্বও পৃথকভাবে রক্ষিত হয়নি। খলিফার তরফ থেকে দায়িত্ব অর্পিত হোক না হোক অন্যায় অবিচার পরিদর্শনের কাজটি শাসকের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। রক্ষী প্রধানের দায়িত্বটি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তার একটি ভাগের দায়িত্ব হল দুষ্কর্মের সন্দেহ লক্ষ করা, শাস্তি কার্যকর করা এবং সুনির্দিষ্ট খুন ও রাহাজানির তদন্ত করা। এগুলোর জন্য এ সকল সাম্রাজ্যে একজন শাসক নিযুক্ত হতেন, যিনি ধর্মীয় অনুশাসন নয়, বরং শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুসারে বিচার করতেন। তাঁকে কখনো 'ওয়ালী' আবার কখনো 'শুরতা' বলে ডাকা হত। অন্য ভাগটির মধ্যে নিবর্তনমূলক শাস্তি এবং ধর্মীয় বিধান অনুসারে নির্দিষ্ট দুষ্কর্মের জন্য শাস্তি প্রদানের দায়িত্বই অবশিষ্ট ছিল। সুতরাং তাকে পূর্বে বর্ণিত কাজীর অন্যান্য দায়িত্বের সাথে একত্র করা হল এবং এগুলো তাঁর কর্তব্যের ও দায়িত্বের অনুসারী হয়ে উঠল। বর্তমানকালে এর অবস্থা অনুরূপভাবে বিদ্যমান।

অন্যদিকে এ দায়িত্ব পালনও সাম্রাজ্যের গোত্রপ্রীতি সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর কবল থেকে দূরে সরে গেছে। কারণ সাম্রাজ্য যখন ধর্মীয় খেলাফত ছিল এবং এ দায়িত্বগুলোও ধর্মীয় অনুশাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন তাঁরা গোত্রপ্রীতিধন্য আরববাসী, তাঁদের সাথে চুক্তি, দাসত্ব বা কর্মে নিয়োগের দ্বারা সংযুক্ত—এমন ব্যক্তিদেরকেই এ সকল দায়িত্বে নিয়োজিত করত, যাদের যোগ্যতা ও নির্ভরতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না। যখন খেলাফতের এ পর্যায়গত স্বরূপটি লোপ পেল এবং ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে রাজশক্তি ও সাম্রাজ্যে পরিণত হল, তখন এ ধর্মীয় বিভাগগুলোও অনেকাংশে তাদের গুরুত্ব হারিয়ে বসল। কারণ তার মধ্যে রাজশক্তিসুলভ কোনো উপাধি বা নিদর্শন নেই।

---

৮৫. জীবনকাল ২৭৩-৩৫৫ (৮৮৬-৯৬৬ খ্রি.) হি.।

৮৬. 'সাহিবে শুরতা।'

অতঃপর সম্পূর্ণ ব্যাপারটিই আরবদের হাত থেকে চলে গেল এবং তাদের ব্যতীত অন্যান্য তুর্কি ও বারবারদের হাতে রাজশক্তিতে পরিণত হল। তখন এ সকল দায়িত্ব গোত্রপ্রীতি ও ধর্মীয় পরিবেষ্টনী থেকে আরো দূরে সরে গেল। কারণ আরবরা ধর্মীয় বিধানকেই তাদের শাসনতন্ত্র মনে করত এবং ভাবত যে, নবী (সঃ) তাঁদেরই একজন। তাঁর প্রবর্তিত বিধি-নিষেধ ও ধর্মীয় বিধান সকল জাতির মধ্যে তাঁদের বিশিষ্ট ধর্মমত ও জীবন পথ। কিন্তু অন্যান্য জাতির এটা ভাববার বা মনে করবার অবকাশ নেই; বরং তারা এটাকে তাদের এ জাতির অন্তর্গত হওয়ার ফলে লব্ধ একটি বিশেষ সম্মান হিসাবেই মনে করে। সুতরাং তারা এ সকল দায়িত্বকে গোত্রশক্তি বহির্ভূত পূর্ববর্তী খলিফাদের আমলের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের উপরই ন্যস্ত করে থাকে। অথচ এ সকল যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত শত শত বছরের বিলাসব্যসনের ঐতিহ্যে লালিত হয়ে প্রান্তর জীবনের কৃচ্ছ্রতা ও সারল্যকে ভুলে গেছেন এবং তাদের অভ্যাস ও অনুভূতিতে নগর জীবনের সৌখিনতাকে গ্রহণ করেছেন এর ফলে তাদের মধ্যে প্রতিরোধ শক্তির অতি সামান্যই অবশিষ্ট আছে। খলিফাদের পরবর্তীকালে রাজশক্তি পরিচালিত সাম্রাজ্যগুলোতে উপরোক্ত দায়িত্ব এ সকল পল্লীবাসী দুর্বল ব্যক্তির উপরই ন্যস্ত হয়েছে। তাদের নগর জীবন গ্রহণ ও বংশধারার শক্তি থেকে বিচ্যুতির ফলে এ সকল যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির সম্মান বলতে বিশেষ কিছু নেই। তাদের ভাগ্যে তাই জুটেছে, নগর জীবনের বিলাসব্যসনে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের ভাগ্যে যে হেয়তা জুটে থাকে। তারা সাম্রাজ্যের গোত্রশক্তির মর্যাদা হারিয়ে এখন তার সহায়তার মুখাপেক্ষী পোষ্য শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। সাম্রাজ্যে তাদের যেটুকু মূল্য দেয়া হয়, তা এজন্য যে, তার পত্তন এ জাতির দ্বারা হয়েছিল ও তা এখনও ধর্মীয় বিধি-নিষেধ মান্য করে থাকে এবং যেহেতু তারাই উক্ত বিধি-নিষেধ এখনো বহন ও অনুসরণ করছে। অথচ এ ব্যাপারে তাদের প্রাণপণ সাধনা এখন আর সাম্রাজ্যের সম্মান বাড়ায় না। বরং সম্রাটের দরবারের শোভা বর্ধনের জন্যই তাদের ডাক পড়ে। কেননা এখনও ধর্মীয় পদমর্যাদার কিঞ্চিৎ সম্মান অবশিষ্ট আছে। কিন্তু এ পর্যন্তই; এর উর্ধ্বে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ব্যাপারে তাদের কোনো হাত নেই। তারা সেই দরবারে যখন উপস্থিত হন, তখন তা প্রথাগত উপস্থিতি বলেই মনে হয়, তার পশ্চাতে বিশেষ কোনো তাৎপর্য থাকে না। কারণ নেতৃত্ব লাভ একমাত্র শক্তিমানের পক্ষেই সম্ভব হয়। যার কোনো শক্তি নেই, তার ভাঙারও কিছু নেই, গড়ারও কিছু নেই। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, তারা ধর্মীয় বিধি-বিধান দিতে পারেন এবং নির্দেশমত ফতোয়াও জারি করতে পারেন। ব্যস এটুকুই। আল্লাহ্ই সহায়ক।

অনেক সময়ে অনেকে বলেন, যথার্থ অবস্থা এর বিপরীত হওয়া উচিত। রাজশক্তির অধিকারীরা যে ধর্মশাস্ত্রবিদ ও কাজীদেরকে পরামর্শ সভার বাইরে রাখেন, এটা দূষণীয়। কেননা হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, জ্ঞানীগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। জেনে রাখুন, বিষয়টি তাদের ধারণা মত নয়। কারণ রাজশক্তি ও রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারটি সমাজ জীবনের স্বাভাবিক চাহিদা অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়। অন্যথায় তা শাসনব্যবস্থা থেকে দূরে সরে যাবে। সমাজ জীবনে অনুরূপ কিছুর মোটেও চাহিদা নেই। কারণ পরামর্শ ও

নেতৃত্ব একমাত্র গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর পক্ষেই সম্ভব; কেননা তারাই শুধু ভাঙতে গড়তে ছাড়তে ও ধরতে পারে। অন্যদিকে যার এ শক্তি নেই, সে এর ভিতরেও থাকতে পারে না এবং বের হতে ও এর সহায়তা করতে পারে না। সে ত অপরের উপর নির্ভরশীল পোষ্যমাত্র। সুতরাং পরামর্শ সভায় যাওয়ার তার অধিকার কোথায় অথবা তাকে উক্ত সভার প্রয়োজনীয় অংশ মনে করারই কারণ কোথায়? অবশ্য, হ্যাঁ, তার ধর্মনীতি সম্পর্কে যে জ্ঞান আছে, তার পরামর্শ নেয়া যেতে পারে এবং ফতোয়ার মধ্য দিয়ে নেয়াও হচ্ছে। কিন্তু শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ দেবার যোগ্যতা তার নেই। কারণ সে গোত্রপ্রীতি থেকে বহু দূরে সরে গিয়ে শুধু তার অবস্থা-ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানই লাভ করেছে। সুতরাং তাঁদের প্রতি রাজ্যাধিপতি ও নেতৃস্থানীয়দের সম্মান প্রদর্শন এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁরা এখনও ধর্মে বিশ্বাস করেন এবং যারা কোনো না কোনো দিক থেকে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাদের প্রতি এ সকল ব্যক্তির একটা সমীহের ভাব আছে।

আর হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সেই বাণী জ্ঞানীগণ নবীদের উত্তরাধিকারী; জেনে রাখুন যে, ধর্মশাস্ত্রবিদরা বর্তমান যুগে ও অতীতেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মীয় বিধিনিষেধের বাহক, তার বিভিন্ন কর্তব্যাকর্তব্যের কথক এবং বিচিত্র সমস্যায় তার পথ নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করেছেন। যারা এ সকল বিষয়ে তাঁদের নিকট জানতে গেছে, তাদের প্রতিই নির্দেশ দিয়েছেন। জ্ঞানীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়দেরও একই অবস্থা এবং তাঁদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক ও খুব কম ক্ষেত্রেই ঐসকল গুণে নিজেদেরকে গুণান্বিত করেছেন। অথচ পূর্বসূরিরা, আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, তাঁরা ধর্ম ও সদাচারের প্রতিমূর্তি হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে বিচরণ করতেন এবং সকল গুণে গুণান্বিত হয়ে সকল মতাদর্শের যথার্থতা সম্পাদনে সচেষ্ট থাকতেন। সুতরাং যাঁরা ধর্মীয় জ্ঞানের শুধুমাত্র বর্ণনাকারী না হয়ে বরং তাকে নিজ সত্তার সাথে গুণ ও অবস্থায় সংযুক্ত করেছেন, তাঁরা যথার্থই উত্তরাধিকারী। তাঁদের কথাই আল-কুশাইরীর[৮৭] পুস্তিকায় বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত যার মধ্যে এ দুটো বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী এবং তিনিই উত্তরাধিকারের যোগ্য। যেমন তাবেয়ীন পূর্বসূরি ধর্মশাস্ত্রবিদগণ, চার ইমাম এবং তাঁদের আদর্শ ও ধারা অনুসরণকারী অন্যান্য জ্ঞানীবৃন্দ। এসকল ইমাম ও নেতৃস্থানীয় জ্ঞানীদের মধ্যে যারা শুধু একটি বিষয়কে অবলম্বন করেছেন, তাঁদের মধ্যে সাধক শাস্ত্রবিদ অপেক্ষা উত্তরাধিকারের যোগ্য। কারণ সাধক অন্তত একটি দিক থেকে নিজ সত্তাকে গুণান্বিত করেছেন। কিন্তু যে শাস্ত্রবিদের মধ্যে সাধনার কোনো স্বাক্ষর নেই, তাঁর মধ্যে বস্তুত কিছুই নেই। তিনি কতগুলো বক্তব্যের সমষ্টিমাত্র; বিভিন্ন সমস্যায় তা থেকে আমরা নির্দেশ গ্রহণ করি মাত্র। আমাদের বর্তমান যুগে অধিকাংশ ধর্মশাস্ত্রবিদেরই এ অবস্থা। 'অবশ্য যারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকাজ করেছে এবং খুব অল্প সংখ্যক তারা।'[৮৮]

---

৮৭. আবদুল করিম ইবনে হাওয়াজিন; ৩৭৬-৪৬৫ (৯৮৬-১০৭২ খ্রি.) হি.।
৮৮. কোরান ৩৮, ২৪।

আদালত

এটা একটি ধর্মীয় কর্তব্য, বিচারের অনুসারী এবং তার নিয়মাদি প্রবর্তনার সাথে সংশ্লিষ্ট। এ কর্তব্যের স্বরূপ হল কাজীর অনুমতিক্রমে মানুষের পক্ষে ও বিপক্ষে সাক্ষ্য দান করা। এতে নিয়োজিত ব্যক্তি সাক্ষ্য গ্রহণের সময় তা গ্রহণ করবে, বিরোধের ক্ষেত্রে তার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করবে এবং নথিপত্রে সকল বিষয় লিখে রাখবে, যাতে মানুষের স্বত্ব, ধনসম্পদ, ঋণ ও অন্যান্য সকল বিষয় যথাযথ সংরক্ষিত হতে পারে।[৮৯] এ কর্তব্যের শর্ত হল ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী সততা ও ত্রুটিমুক্ত চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। নিয়োজিত ব্যক্তিকে অবশ্যই যথানিয়মে নথিপত্র লিখন ও বিন্যস্তকরণ জানতে হবে এবং এগুলোকে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ ও তার ধারা অনুসারে সাজাতে হবে। এ দিক থেকে তাকে ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান রাখা দরকার। এ সকল শর্ত পালন, তাদের প্রয়োজনীয় অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অনেকাংশে সততার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং যাঁরা এ কর্তব্য পালনে নিয়োজিত হন, মনে হয় তাঁরাই যেন সততার দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তা নয়; বরং এ দায়িত্ব অর্পণের সময় তাদের সততা পরীক্ষা করে দেখা হয়।

সুতরাং কাজীর উচিত তাদের অবস্থা বিচার করে দেখা, তাদের আচার-আচরণ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া, যাতে তাদের সততার শর্তটি সংরক্ষিত হয়। কারণ তাদেরকে মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নিয়োজিত করা হয়ে থাকে; এ জন্য এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন ঠিক নয়। কারণ এ পদের সকল দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত থাকে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি প্রাপ্তির ব্যাপারে তারই উপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং উপরোক্ত শর্ত মতে যখন তাদের নিয়োগ নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তখন তারা অতি সহজেই যোগ্য সততার অধিকারী লোকদেরকে বের করে দিতে পারে। কারণ নগর জীবনের বিশালতা ও অবস্থার বিভিন্নতার জন্য কাজীর পক্ষে সততার সন্ধান পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। কারণ বিরোধী পক্ষের মধ্যে বিষয় নিষ্পত্তির জন্য অনেক সময় কাজীরা খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হন এবং তখন তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ শ্রেণীর লোকের উপর নির্ভর করে থাকেন। প্রতি শহরেই এ শ্রেণীর লোকের দোকান ও তৎসংলগ্ন আসনাদি বিদ্যমান, যার উপর তারা বসে অপেক্ষা করে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যথাযথ লেখার জন্য মানুষ তাদের শরণাপন্ন হয়।

এদিক থেকে এ দায়িত্বের বিশেষ শর্তটির নামে তার নামকরণ হয়েছে এবং এর ধর্মীয় বিধানসম্মত সততার সাথে তা মিশ্রিত রয়েছে, যার অপর দিকের নাম অসততা। কখনো তারা এক সঙ্গেই থাকে আবার কখনো পৃথক হয়ে দেখা দেয়। আল্লাহ্ উন্নত ও সর্বজ্ঞ।

বাজার পরিদর্শন ও মুদ্রা

বাজার পরিদর্শনও একটি ধর্মীয় কর্তব্য। এটাকে সৎকার্যে আদেশ ও অসৎ কার্যে নিষেধের পর্যায়ে ফেলা যায়, যা বস্তুত মুসলমান জনসাধারণের জন্য নিয়োজিত প্রত্যেক

---

৮৯. এর পর রোজেনথালে একটি অনুচ্ছেদ বিদ্যমান, যাতে কাজীর অনুমতির প্রয়োজন বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শাসকের উপরই অবশ্য পালনীয়। এক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিকেই নিয়োগ করা দরকার। তার ফলে সেই অবশ্য পালনীয় কর্তব্যটি তার উপর ন্যস্ত হবে। সে এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য অন্য ব্যক্তিকেও নিয়োগ করতে পারে। যে অন্যায়সমূহের বিবেচনা করবে, মাত্রা অনুযায়ী নিবর্তন ও শিক্ষামূলক শাস্তি দিবে এবং মানুষকে সর্বসাধারণের কল্যাণের প্রতি উৎসাহিত করবে। যেমন সে রাস্তা-ঘাটের প্রতিবন্ধকতা দূর করবে; বোঝা বহনকারী ও নৌকার মাঝিদেরকে অধিক বোঝা বহন করতে নিষেধ করবে; পুরাতন বাড়ি-ঘর, যা পথচারীদের উপর ভেঙে পড়তে পারে, তা ভেঙে ফেলতে বলবে এবং প্রয়োজন হলে অনুরূপ অসুবিধাজনক বস্তুকে নিজে দূর করবে। সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মক্তবে গিয়ে ছাত্রদিগকে অত্যধিক প্রহার করতে দেখল শিক্ষকগণকে বাধা দিবে। যেকোনো প্রকার কলহ-বিবাদের ক্ষেত্রেও তার যাবার অধিকার আছে এবং যখনই সে এ সম্পর্কে শুনবে, উপস্থিত হয়ে বিবেচনা করতেও নির্দেশ দিবে। অবশ্য কোনো দাবি পূরণের ক্ষেত্রে তার নির্দেশ দেবার কোনো অধিকার নেই। বরং সে আহার্য ও অন্যবিধ সামগ্রীতে ভেজাল, ওজন ও সংখ্যায় কারচুপি, ঋণ প্রদানের গড়িমসি এবং এ প্রকার অন্যান্য ব্যাপার, যাতে প্রমাণ গ্রহণ বা আইনানুগ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয় না, তাতে যথাবিহিত নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।

তা যেন এমন কিছু বিধি-নিষেধ, যা সাধারণ ও সহজ উদ্দেশ্যপূর্ণ হওয়ায় কাজী এগুলোকে সংশ্লিষ্ট কর্তব্যে নিয়োজিত ব্যক্তির নিকট অর্পণ করেছেন। সুতরাং এদিক থেকে এ বিষয়টি তার ধরন অনুসারে সম্পূর্ণভাবে বিচার বিভাগের অধীন। অনেকগুলো ইসলামী সাম্রাজ্যে, যেমন মিশর ও মাগরিবে উবাইদী এবং আন্দালুসে উমাইয়াদের অধীনে এ বিষয়টি কাজীর তত্ত্বাবধানেই নিয়োজিত ছিল। তিনি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী এতে লোক নিয়োগ করতেন, অতঃপর যখন খেলাফতের ধারা শেষ হয়ে সাম্রাজ্য একক হয়ে উঠল, তখন সম্রাটের পক্ষে সকল বিষয়ে দৃষ্টিদান প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াল এবং এ বিষয়টিও ভিন্ন বিভাগে রাজশক্তির অধীনে স্বতন্ত্র হয়ে দেখা দিল।

মুদ্রার বিষয়টি হল, মানুষের মধ্যে প্রচলিত মুদ্রা যাতে জাল হওয়া বা অন্য ত্রুটির অধীন হয়ে না পড়ে, তৎপ্রীতি লক্ষ রাখা এবং প্রচলিত মুদ্রার সংখ্যা বা তার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় স্বত্ব সংরক্ষণ করা। এটা ছাড়াও এ সকল মুদ্রায় সম্রাটের বিশেষ নিদর্শন অঙ্কিত করা এবং এ উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ ও নতুন মুদ্রা ছাঁচে ঢালাই করা। সম্রাটের নিদর্শন অংকনের জন্য এমন একটি লোহার সীলমোহর ব্যবহার করা, যাতে বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক চিহ্নাদি বিদ্যমান। দিনারের উপর এ সীলমোহর রেখে হাতুড়ীর দ্বারা এমনভাবে পিটাতে হবে, যাতে উক্ত নকশা মুদ্রার গায়ে যথাযথভাবে অঙ্কিত হয়ে যায়। এভাবে সুনির্দিষ্ট আকৃতি, পরিমাণ ও নকশাসহ নতুন মুদ্রা তৈরি হবে, যা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত এবং মুদ্রা তৈরিকারকদের নিকট সুপরিচিত। কারণ মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতুর ঢালাই ও বিশুদ্ধতার কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। বরং প্রয়োজন অনুসারে নতুন অনুসন্ধান ও নির্ধারণের অনুসারী। যখন কোনো অঞ্চল বিশেষ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে উপনীত হয়, তখন সাময়িকভাবে তাকেই বিনিময়ের মাধ্যম এবং যাবতীয় লেনদেনের পরিমাণ হিসাবে গ্রহণ করে। ফলে এটাই সাধারণভাবে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য মুদ্রামান হিসাবে বিবেচিত হয় এবং এর কম হলে তাকে বিধিবহির্ভূত বলে মনে করা হয়।

উপরোল্লেখিত সমুদয় বিষয়ে লক্ষ রাখাই মুদ্রা বিভাগের কাজ। তা ধর্মীয় বিধানসম্মত বলেই খেলাফতের অধীনে মনে করা হয়। এটা সাধারণভাবে কাজী পদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে বর্তমান যুগের ন্যায় তা স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হয়েছে, যেমন বাজার পরিদর্শনের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করেছি।

খেলাফতের অধীনস্থ কর্তব্যাবলির আলোচনা এখানেই শেষ। বর্তমানে তার মধ্যে কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে, অথচ তার অন্তর্গত দায়িত্বশীল শক্তির পরিবর্তন ঘটেছে এবং অন্যগুলো সম্পূর্ণ সাম্রাজ্য শক্তির অধীন হয়ে পড়েছে। যেমন আমীর, উজির, যুদ্ধ পরিচালক ও খাজনা আদায়কারীর পদ সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যের অধীন। ধর্মযুদ্ধের পরে যথাস্থানে আমরা তার আলোচনা করব। ধর্মযুদ্ধের ব্যাপারটিও একই কারণে কর্তব্য হিসাবে পরিত্যক্ত হয়েছে। অবশ্য খুব অল্পসংখ্যক সাম্রাজ্য তার ব্যবস্থা রেখেছে এবং সাধারণভাবে তার বিধি-নিষেধকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলেই তারা মনে করে।

অনুরূপভাবে বংশধারা সংরক্ষণ বিভাগ, যাঁরা খেলাফতের উত্তরাধিকার ও রাজকোষের প্রাপ্যাদি সম্পর্কে বিবেচনা করা হত, তাও খেলাফতের অভাবের ফলে পরিত্যক্ত হয়েছে। মোটামুটিভাবে বর্তমান যুগে খেলাফতের যাবতীয় কর্ম বিভাগ ও কর্তব্যাবলি রাজশক্তি ও শাসন ব্যবস্থার অধীন হয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ যেভাবে ইচ্ছা করেন বিষয়াদির গতি পরিবর্তন করে দেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[আমীরুল মোমেনীন উপাধিটি খেলাফতের একটি নিদর্শন এবং খলিফাদের সময় থেকে তা সৃষ্টি হয়েছে]

বিষয়টি এই যে, যখন হজরত আবুবকর (রাঃ) এর বায়আত অনুষ্ঠিত হল, তখন সাহাবী ও অন্য সকল মুসলমান তাঁকে 'রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর খলিফা' বা প্রতিনিধি বলে ডাকতেন। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ব্যাপারটি এ প্রকারই ছিল। অতঃপর যখন হজরত উমর (রাঃ)-এর বায়আত অনুষ্ঠিত হল, হজরত আবুবকরের উত্তরসূরি হিসাবে তাঁকে সকলে 'রসূলুল্লাহ্র খলিফার খলিফা' বলে ডাকতে লাগলেন। ফলে, উপাধিটিতে শব্দ বেশি হওয়ায় ও সম্বন্ধকারকের আধিক্য থাকায় তার উচ্চারণ ক্রমশ কঠিন ও দুরূহ হয়ে উঠল। অনেক সময় দ্রুত উচ্চারণকালে তার মধ্যেকার একাধিক সম্বন্ধকারকের ব্যাপারটি স্পষ্ট হত না এবং তার অর্থও অস্পষ্ট থেকে যেত। সুতরাং সাহাবীরা তার অনুরূপ বা সমার্থবোধক অন্যান্য শব্দ এস্থলে ব্যবহার করে এ অসুবিধা দূর করতে চেষ্টা করতেন। যেমন তাঁরা অভিযান পরিচালনাকারীকে 'আমীর' বলতেন। শব্দটি 'ইমারত' (নেতৃত্ব) শব্দের তমবাচক বিশেষণ। মূর্খতা যুগের লোকেরা নবী (সঃ)কে মক্কার আমীর বা হেজাজের আমীর বলে ডাকত। সাহাবীরা সাদ ইবনে আবিওক্কাসকে তাঁর কাদেসিয়ার যুদ্ধ পরিচালনার জন্য আমীরুল মোমেনীন বলে ডাকতেন এবং তাঁরাই তৎকালে মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন।

ঘটনাক্রমে হজরত উমর (রাঃ)কেও কোনো কোনো সাহাবী আমীরুল মোমেনীন বলে ডাকতে আরম্ভ করেন। সকলেই একে ভালো মনে করলেন, সঠিক বলে রায় দিলেন এবং ঐ উপাধিতে সম্বোধন করলেন। বলা হয়, প্রথম যিনি এ নামে তাঁকে সম্বোধন করেছিলেন, তিনি হলেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে জহশ।[৯০] বলা হয়, আমর ইবনেল আস, মগিরা ইবনে শুবা। আরও বলা হয়, যুদ্ধ জয়ের সংবাদ নিয়ে একজন দূত মদিনায় পৌঁছে হজরত উমরকে খুঁজছিল এবং বলতে ছিল, আমীরুল মোমেনীন কোথায়? হজরত উমরের সহচরদের নিকট এ সম্বোধন খুব ভালো লাগল; তাঁরা বললেন, আল্লাহ্র কসম, তুমি তাঁকে যথার্থ নামেই ডেকেছ। আল্লাহ্র কসম, তিনিই যথার্থ আমীরুল মোমেনীন। অতঃপর তাঁরা এ নামেই তাঁকে ডাকতে আরম্ভ করলেন এবং এ উপাধিই মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়ে উঠল। তাঁর পর অন্যান্য খলিফারা একটি বিশেষ নিদর্শন হিসাবে এ

---

৯০. আব্দুল্লাহ্ ইবনে জহশ কি অহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন?

উপাধি ব্যবহার করেছেন। খলিফা ব্যতীত অন্য কেউ এ উপাধি ব্যবহার করেনি। বনি উমাইয়াদের সকলেই এটা অনুসরণ করেছেন।

শিয়ারা হজরত আলী (রাঃ)কে ইমাম বলে বিশিষ্ট করেন; কারণ ইমামত খেলাফতেরই সমমর্যাদার বিষয়। এ নামকরণে তাদের এ উদ্দেশ্যও প্রচ্ছন্ন ছিল যে, হজরত আবু বকর (রাঃ) অপেক্ষাও তিনি নামাজের ইমামতির জন্য যোগ্য ছিলেন। কারণ এটাই তাদের অভিনব মতাদর্শ। সুতরাং তারা তাঁকে এ উপাধির দ্বারা বিশিষ্ট করেছে এবং পরবর্তীকালে যারা তাঁর খেলাফতের অধিকারী হয়েছেন, তাদেরকেও এ উপাধিতেই ভূষিত করেছেন। বস্তুত এ ইমামগণ যতক্ষণ গোপনে অবস্থান করেছেন, ততক্ষণই তাঁরা ইমাম; কিন্তু প্রাধান্য বিস্তার করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেই পরবর্তীদের মধ্যে ঐ আমীরুল মোমেনীন উপাধি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বনি আব্বাসের শিয়ারা; তারা ইব্রাহিম পর্যন্ত সকলকেই ইমাম বলে ডেকেছে। এ ইব্রাহিম প্রথম প্রকাশ্যে আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং যুদ্ধের জন্য পতাকা উত্তোলন করেন। তাঁরা মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী আস্‌সাফফাহকে তারা আমীরুল মোমেনীন উপাধি দেয়। এরূপ আফ্রিকিয়ার রাফেজী সম্প্রদায়ও। তারা তাদের ইসমাইল বংশীয় নেতৃবৃন্দকে ইমাম বলেই ডাকত; এমনকি এ নেতৃত্ব উবাইদুল্লাহ্ আল মেহেদী পর্যন্ত পৌঁছলেও এ ইমাম ডাক অব্যাহত ছিল। তাঁর পুত্র আবুল কাসেমও এ নামেই অভিহিত হতেন। অতঃপর তাদের পক্ষে ক্ষমতা লাভ সম্ভব হল, তখন তাদেরকে আমীরুল মোমেনীন উপাধিতে ভূষিত করল। এরূপ মাগরিবের ইদরিসীগণ, তারাও ইদরিসকে ইমাম বলত এবং তাঁর পুত্র ইদরিসকে বলত ছোট ইমাম। এভাবেই তাদের সকলের অবস্থা আবর্তিত হয়েছে।

খলিফাগণ একে অপরের নিকট থেকে এ আমীরুল মোমেনীন উপাধির উত্তরাধিকার লাভ করেছেন। তাঁরা একে হেজাজ, সিরিয়া ও ইরাকের অধিপতিদের জন্য একটি বিশেষ নিদর্শন হিসাবে ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে যারা আরবদের আবাসভূমি, সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল এবং জাতি ও বিজয়াভিযানের উৎসকে নিজেদের অধীনস্থ রেখেছেন, তারা এটা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে এর ব্যবহার প্রথম দিকে বৃদ্ধি পেলে, তারা আরো এমন কিছু উপাধি গ্রহণ করলেন, যা দিয়ে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হতে পারে। কেননা আমীরুল মোমেনীন উপাধি তখন সকলের মধ্যে সাধারণ হয়ে গেছে। এ নতুন উপাধির প্রথম ধারা স্থাপন করল বনি আব্বাস। এর উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তাদের আসল নাম সাধারণের দ্বারা উচ্চারিত হয়ে সহজ ও সাধারণ হয়ে না দাঁড়ায়। এ জন্য তারা আস-সাফফাহ, আল-মনসুর, আল-মাহদী, আল-হাদী, আর-রশীদ প্রভৃতি উপাধি সাম্রাজ্যের শেষ অবধি গ্রহণ করেছিল। আফ্রিকিয়ার ও মিশরের উবাইদীগণ তাদের এ ধারা অনুসরণ করে। অথচ তাদের পূর্বে পূর্বাঞ্চলীয় বনি-উমাইয়ারা এটা থেকে দূরে ছিল। কারণ তখনো তাদের মধ্য থেকে বেদুইন জীবনের স্থূলতা ও সারল্য দূরীভূত হয়নি। তারা তখনো জীবনধারায় আরবীয় বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে পুরোপুরি নাগরিক হয়ে উঠতে পারেনি। অবশ্য আন্দালুসী বনি উমাইয়াদের অবস্থা ভিন্ন প্রকার। তারা তাদের পূর্বসূরিদেরকেই অনুসরণ করেছে; তথাপি যেহেতু তারা হেজাজ তথা জাতি ও বেদুইন জীবনের কেন্দ্রভূমির অধিকারী ছিল না এবং গোত্রপ্রীতির কেন্দ্রস্থল

খেলাফতের রাজধানী থেকে দূরে ছিল, এজন্য উপাধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থাকে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করত। কারণ বহুদূরে অবস্থিত নেতৃত্বের কল্যাণেই তারা বনি আব্বাসের আগ্রাসী ধ্বংসলীলা থেকে মুক্তি পেয়েছিল। অতঃপর চতুর্থ শতাব্দী হিজরির প্রথম দিকে তাদের শেষ আব্দুর রহমান (আদ্দাখেল)-এর কাল এসে উপস্থিত হল (ইনি আন্নাসের ইবনে মুহম্মদ ইবনে আমীর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহম্মদ ইবনে আবদুর রহমান মধ্যম) এবং পূর্বাঞ্চলীয় খেলাফতের উপর আশ্রিতপোষ্যদের অন্যান্য হস্তক্ষেপ ও প্রভাব বিস্তারের কথা সর্বত্র প্রকাশ পেল। বস্তুত তখন উক্ত খলিফাগণকে অনারব সেনাপতিরা ইচ্ছামতো পদচ্যুত, পরিবর্তন, হত্যা ও অন্ধ করছে। এ সময়ে উক্ত শেষ আব্দুর রহমান পূর্বাঞ্চলীয় ও আফ্রিকিয়ার খলিফাদের ধারা অনুসরণ করে নিজেকে আমীরুল মোমেনীন খেতাবে ভূষিত এবং আন্নাসের লেদীনেল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র ধর্মের সাহায্যকারী) উপাধি গ্রহণ করলেন। তখন থেকে এ বিষয়ে একটি ধারা তাঁর পরবর্তীদের মধ্যে অনুসৃত হতে দেখা গেল, যা তাঁর পিতৃপুরুষ ও পূর্বসূরিদের মধ্যে ছিল না।

অবস্থা এভাবেই চলছিল। এর পর আরবের গোত্রপ্রীতি নিঃশেষ হল এবং খেলাফতের ধারাও অবলুপ্ত হল। আশ্রিতপোষ্যরা বনি আব্বাসের উপর প্রভাব বিস্তার করল এবং কায়রোতে কর্মচারীরা উবাইদীদের উপর প্রাধান্য লাভ করল। আফ্রিকিয়ার আমীরদের উপর সিনহাজাদের এবং মাগরিবে জানাতীদের আধিপত্য দেখা দিল। আন্দালুসে ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ বনি উমাইয়াদের ক্ষমতা আচ্ছন্ন করে বলল এবং সাম্রাজ্যকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিল। ইসলামের ঐক্য আর রইল না। পূর্ব-পশ্চিমে রাজশক্তির মতাদর্শ বিচিত্র হয়ে দেখা দিল। তারা বিশেষ উপাধি গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচিত্র মানসিকতার পরিচয় দিতে লাগল। একমাত্র উপাধি সুলতান ব্যবহারের ক্ষেত্রে সকলেরই সাধারণ একটা আকর্ষণ ছিল।

পূর্বাঞ্চলে অনারব রাজশক্তির অধিকারীদের জন্য খলিফা বিভিন্ন সম্মানসূচক উপাধি বিতরণ করতেন। এর দ্বারা তাদের নিজেদের খেলাফতের প্রতি আনুগত্য ও সুধারণা যেমন বোঝাত, তেমনি নিজেদের পদমর্যাদাকেও সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হত। যেমন, শারফুদ্দৌলা, আজদুদ্দৌলা, রুকনদ্দৌলা, মুয়েজ্জুদ্দৌলা, নাসিরুদ্দৌলা, নেজামুলমূলক, বাহাউদ্দৌলা, যখিরাতুল মুলক[৯১] এবং এ প্রকার আরো উপাধি। উবাইদীরাও এ প্রকার উপাধি দ্বারা সিনহাজা আমীরদেরকে বিশিষ্ট করতেন। তারা যখন খেলাফতের উপর অন্যায্য প্রভাব বিস্তার করেছিল, তখন এ সকল উপাধি নিয়েই তাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। তারা খেলাফতের প্রতি সম্মান রক্ষার্থে ও তার অধিকারের হস্তক্ষেপের সন্দেহ দূর করতে তার সাথে বিশিষ্ট কোনো উপাধি গ্রহণ করতে সর্বদাই ইতস্তত করেছে। কারণ অন্যায্য প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তারকারীদের অবস্থা সকল সময়ে এরূপই হয়ে থাকে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

---

৯১. উপাধিগুলোর অর্থ—যথাক্রমে সাম্রাজ্য, গৌরব, সাম্রাজ্য মহাবাহু, সাম্রাজ্যস্তম্ভ, সাম্রাজ্য অলংকার, সাম্রাজ্য সহায়, রাজ শৃঙ্খলা, সাম্রাজ্য ভূষণ ও রাজখনি।

পূর্বাঞ্চলের পরবর্তী অনারব রাজশক্তিগুলো, যখন তাদের রাজশক্তি হিসাবে অধিকার সাব্যস্ত হল, সাম্রাজ্য ও সুলতান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের পথে আর কোনো বাধা রইল না, তখন তারা রাজশক্তিসুলভ উপাধি গ্রহণ করতে লাগল। কারণ খেলাফতের গোত্রশক্তি তখন নিশ্চিহ্ন প্রায় এবং সম্পূর্ণরূপে বিলীন হওয়ার সম্মুখীন। সুতরাং তারা তাদের পূর্ববর্তী উপাধিগুলোর সাথে আন্‌নাসের, আল-মনসুর ধরনের এমন সব উপাধি গ্রহণ করতে লাগল, যা তাদের আশ্রিত পোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত হবার সূত্রকে ছিন্ন করার কথাই বোঝাত। তারা এভাবে 'দীন' শব্দের সম্বন্ধ স্থাপন করে সালাহুদ্দিন, আসাদুদ্দিন, নুরুদ্দিন[৯২] প্রভৃতি উপাধিও ব্যবহার করতে আরম্ভ করল।

আন্দালুসের ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ অবশ্য খেলাফতের জন্য বিশিষ্ট উপাধিগুলোই তাদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। কারণ তাদের গোত্রপ্রীতি ও যোগ্যতা প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যে শক্তির জন্ম দিয়েছিল, তাতেই তাদের পক্ষে এরূপ কথা সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং তারা বিনা দ্বিধায় আন্‌নাসের, আল-মনসুর, আল-মুতামিদ, আল-মুজাফফর ও এ প্রকার অন্যান্য উপাধি গ্রহণ করেছিল। কবি ইবনে (আবি) শরফ[৯৩] এর স্বরূপ দেখেই তাদের প্রতি ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন,

> আন্দালুস ভূখণ্ডে আমার সর্বাপেক্ষা দ্বিধার ব্যাপার
> মুতামিদ ও মুতাজিদ উপাধি উচ্চারণ করা।
> এগুলো সাম্রাজ্যের উপাধি, অস্থানে পড়ে আছে,
> বিড়াল ফুলে যেন সিংহের আকৃতি ধারণ করেছে।

সিনহাজারা উবাইদী খলিফাদের দেয়া উপাধি, যেমন নাসিরুদ্দৌলা, মুয়েজ্জুদ্দৌলা প্রভৃতির উপরই সতর্কতার জন্য সন্তুষ্ট রয়েছে। অতঃপর উবাইদীদের পক্ষ ত্যাগ করে আব্বাসীদের পক্ষে আন্দোলন আরম্ভ করলেও উপাধি গ্রহণের এ ধারা অব্যাহত রেখেছে। এর পর খেলাফত ও তাদের মধ্যকার ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা তার যুগ ভুলে যাওয়ার সাথে সাথে ঐ সকল উপাধিও ভুলে গেছে ও কেবল সুলতান উপাধি ব্যবহার করেছে। মাগরিবের মেগারাওয়া রাজন্যবর্গেরও একই অবস্থা; তারাও এ সকল উপাধি ব্যবহার না করে কেবল সুলতান শব্দের দ্বারা তাদের প্রান্তর জীবনের সারল্য ও মতাদর্শের পরিচয় দিয়েছে।

যখন খেলাফত নিশ্চিহ্ন হল ও তার ক্ষমতা লোপ পেল, তখন মাগরিবের বারবার গোত্রাদির মধ্য থেকে লামতুনারাজ ইউসুফ ইবনে তাশেফীন উভয় তীরের অধিকারী হলেন। বস্তুত তিনি নেতৃত্ব ও কল্যাণের প্রতিভূ ছিলেন। এ কারণে তিনি খলিফার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর ধর্মীয় রীতি রক্ষার জন্য ইচ্ছুক হন। এ উদ্দেশ্যে তিনি শেভিলার উস্তাদদের মধ্যে বিখ্যাত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আল আরাবী ও তৎপুত্র কাজী আবু বকরকে[৯৪] আব্বাসী খলিফা আল-মুস্তাজহেরের[৯৫] নিকট প্রেরণ করেন। তাঁরা খলিফার

---

৯২. অর্থ যথাক্রমে—ধর্মকল্যাণ, ধর্মসিংহ ও ধর্মজ্যোতি।
৯৩. যথার্থ নাম ইবনে শরফ।
৯৪. এই অধ্যায়ের ৭৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।
৯৫. ১০৯৪-১১১৮ খ্রি.।

নিকট লামতুনা সম্রাটের বায়আত পৌঁছে তাঁর জন্য মাগরিবের নেতৃত্ব ও অভিভাবকত্ব প্রার্থনা করেন। অতঃপর তাঁরা তাঁর জন্য মাগরিবের উপর খেলাফতের অধিকার ও পরিচ্ছদ পদমর্যাদার তদনুরূপ নিদর্শন ব্যবহারের অনুমতি নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। এ অনুমতিতে তাঁকে সম্মান হিসাবে আমীরুল মোমেনীন সম্বোধন করা হয় এবং তিনি তা পরে উপাধি হিসাবে গ্রহণ করেন। অনেকে বলে, তাঁকে এর পূর্ব থেকেই আমীরুল মোমেনীন ডাকা হত এবং এটা তাঁর খলিফাসুলভ মর্যাদার জন্যই করা হত। কারণ তিনি নিজে এবং তাঁর জাতি আল-মুরাবেতীগণ সকলেই ধর্ম ও রীতিনীতির অনুসারী ছিলেন।

আল-মেহেদী তাদেরই ধারা অনুসরণ করে সত্যের দিকে আহ্বান জানান। তিনি 'আশায়েরী' মতাদর্শ গ্রহণ করে মাগরিববাসীদেরকে তা ত্যাগ করার জন্য ভর্ৎসনা করেন। কারণ পূর্বসূরিদের আদর্শ অনুসরণ করে ধর্মীয় বিধানের বাচ্যার্থের রূপক বিশ্লেষণকে তারা ত্যাগ করেছিল। এ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল আল্লাহ্‌র দেহবিশিষ্ট হওয়া। দেহের এ বর্ণনা রূপক হওয়ার ব্যাপারটি আশায়েরীদের একটি পরিচিত মতবাদ।[৯৬] সুতরাং এ ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করেই আল-মেহেদী তাঁর অনুসারীদের নাম রাখলেন আল-মোহেদ বা একেশ্বরবাদী। তিনি আলীর বংশধরদের 'ইমাম মাসুম' হওয়ার মতও প্রচার করেন এবং তাঁর মতে প্রত্যেক যুগেই একজন ইমাম থাকা অত্যাবশ্যকীয়, যার দ্বারা সমগ্র জগতের শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়ে থাকে। সুতরাং অনুসারীরা তাঁকেও ইমাম বলে সম্বোধন করত, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি যে, এটা শিয়ামত অনুসারে তাদের খলিফাদের উপাধি। 'মাসুম' বলতে তারা ইমামতের পূতপবিত্রতার প্রতি ইঙ্গিত করেছে, এটাও শিয়া মতবাদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আল-মেহেদী তাঁর অনুসারীদিগকে আমীরুল মোমেনীন উপাধি থেকে বিরত রাখেন। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন শিয়ামতের অনুসরণ করেন। অন্যদিকে এতে পূর্ববর্তী খলিফাদের বংশধর, বর্তমানের অযোগ্য ও অর্বাচীন পূর্বাঞ্চলীয় খলিফাদের উপাধির সাথে একাত্মতা ঘোষণার অসুবিধাও বিদ্যমান ছিল। অবশ্য তাঁর উত্তরাধিকারী আবদুল মোমেন পরে এ আমীরুল মোমেনীন উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর এ ধারায় বনি আবদুল মোমেন ও তাদের পরে আবু হেফসের বংশধররা এ উপাধি অব্যাহত রাখেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের বংশধারা ব্যতীত অন্য কাউকেও এ উপাধি ব্যবহার করতে দেননি। কারণ তাদের মান্যবান পূর্বপুরুষ আল-মেহেদী আন্দোলন করে এ উপাধি ব্যবহারের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করেছেন। সুতরাং তিনিই এর অধিকারী এবং তাঁর বন্ধুস্থানীয় সহচরগণ তাঁর পরে এটা ব্যবহারের যোগ্য, অন্যরা নয়। অন্যদিকে কোরায়েশ গোত্রপ্রীতি তখন আর অবশিষ্ট নেই। কাজেই এটা তাদের একটি প্রথা হয়ে দাঁড়ায়।

অতঃপর মাগরিবে রাজশক্তির পতন ঘটলে তা জানাতীদের করতলগত হল। তাদের প্রথম দিককার রাজন্যবর্গ প্রান্তর জীবনের স্থূলতা ও সারল্যের অধিকারী হওয়ায়

---

৯৬. কোরানে আল্লাহ্‌র হাত, চেহারা ইত্যাদির উল্লেখ রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আমীরুল মোমেনীন উপাধি ব্যবহারে লামতুনাদের অনুসরণ করেননি। কারণ তাঁরা প্রথমে বনি আব্দুল মোমেনের অধীনে এবং পরে বনি আবু হেফসের অধীনে থাকায় খলিফাদের প্রতি সম্মানের জন্যও এটা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরে তাঁদের পরবর্তীরা এ উপাধি গ্রহণ করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত রাজশক্তির আকাঙ্ক্ষা, মতাদর্শ ও নিদর্শনকে পূর্ণতা দান করার চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ্ তাঁর বিষয় সম্পর্কে সর্বত্র ক্ষমতাবান।[৯৭]

৯৭. কোরান ১২, ২১।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[খ্রিস্টধর্মের 'পোপ' ও 'পেট্রিআর্ক' উপাধি এবং ইহুদিদের 'কোহেন' নামের ব্যাখ্যা]

জেনে রাখুন, যে কোনো জাতির জন্য তাদের নবীর তিরোধানের পর এমন একজন অভিভাবকের প্রয়োজন, যিনি ধর্মীয় বিধি-নিষেধ ও নিয়মনীতির ব্যাপারে তাদেরকে পথপ্রদর্শন করতে পারেন। তিনি তাদের মধ্যে নবীর বাণী প্রচারের দায়িত্বে তাঁর প্রতিনিধিতুল্য হবেন। মানব জাতির জন্যও ঠিক তেমনি, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তাদের সমাজবদ্ধ জীবনের শাসনের প্রয়োজনে এমন এক ব্যক্তির বিদ্যমানতা অবশ্যম্ভাবী, যিনি তাদেরকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করবেন এবং প্রতাপের দ্বারা তাদেরকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখবেন। এরই নাম রাজশক্তি।

ইসলাম ধর্মে যেহেতু জেহাদের প্রবর্তনা আছে এবং এরই উদ্দেশ্য হল সকলের প্রতি উক্ত ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানানো ও সকলকে তার দিকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পরিচালিত করা, সেজন্য খেলাফত ও রাজশক্তি তাতে একত্র হয়ে ধর্মযোদ্ধাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে এবং উভয় দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তুলেছে।

কিন্তু ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মে তা গ্রহণের আহ্বান সর্বজনীন নয় এবং একমাত্র প্রতিরোধ ছাড়া ধর্মযুদ্ধও তাদের মধ্যে প্রবর্তিত হয়নি। সুতরাং ঐ সকল ধর্মের প্রচারকদের জন্য রাজশক্তির দিক থেকে সাহায্য প্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। তাদের মধ্যে যারা রাজশক্তির অধিকারী হয়েছেন, তা সম্পূর্ণ আকস্মিক ও ধর্ম ভিন্ন অন্য কোনো প্রক্রিয়ার ফল মাত্র। কারণ তা তাদের মধ্যকার গোত্রপ্রীতির আকর্ষণে তার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই দেখা দিয়েছে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। কারণ ইসলাম ধর্মের ন্যায় অন্য জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তারের নির্দেশ তাদের প্রতি দেয়া হয়নি। তাদেরকে একমাত্র তাদের ধর্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ করা হয়েছে।

এ কারণে হজরত মুসা ও ইউশা (রাঃ)-র পরে বনি ইসরাইল চারশ বছর[৯৮] ধরে কোনোপ্রকার রাজশক্তি স্থাপনের পথে অগ্রসর হয়নি। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের প্রতিষ্ঠা। এ ব্যাপারে উদ্যোগ-আয়োজনকারীকে তারা 'কোহেন' বলত। তিনি হজরত মুসার স্থলাভিষিক্তরূপে তাদের নামাজ ও কোরবানীর বিষয়ে নির্দেশাদি প্রদান করতেন। তাঁকে হজরত হারুনের বংশধর থেকে হত; কারণ হজরত মুসার কোনো সন্তান ছিল না। অতঃপর সমাজ জীবনের প্রয়োজন অনুসারে শাসন ব্যবস্থার জন্য তারা

---

৯৮. ইবনে খলদুন তাঁর ইতিহাসের ২য় গ্রন্থে তিনশত বছর উল্লেখ করেছেন।

সত্তর জন বয়োবৃদ্ধকে শাসক নিযুক্ত করে, যারা শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশাদি দিতেন এবং ধর্মীয় ব্যাপারে কোহেনই তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি শাসন ব্যবস্থায় কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করতেন না। সামাজিক অবস্থা এভাবে চলতে থাকার পর তাদের মধ্যে গোত্রপ্রীতি দৃঢ় হয়ে উঠল এবং রাজশক্তিসুলভ শৌর্যবীর্যের প্রাদুর্ভাব ঘটল। ফলে তারা কেনানীদেরকে পরাভূত করে জেরুজালেম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল অধিকার করে ফেলল। এ ভূমিরই উত্তরাধিকার আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছিলেন এবং হজরত মুসাও তার প্রতিশ্রুতির কথা বর্ণনা করেছিলেন। এর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাদেরকে ফিলিস্তিন, কেনান, আরমান, জর্ডন, উম্মান, মারেব প্রভৃতি অঞ্চলের জাতিগুলোর সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং এ সময়ে তাদের নেতৃত্ব সেই বয়োবৃদ্ধদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। এভাবে তারা চারশ বছর কাটিয়ে দিয়েছে এবং তখনো তাদের মধ্যে সাম্রাজ্যসুলভ কোনো প্রতিপত্তি গড়ে ওঠেনি। এর ফলে বনি ইসরাইল বিভিন্ন জাতির আক্রমণের মুখে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল এবং তারা তাদের নবীদের অন্যতম সামুয়েলের মাধ্যমে এমন এক ব্যক্তিকে তাদের রাজা করার প্রার্থনা জানাল, যিনি তাদের উপর নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। ফলে তালুত (শৌল) তাদের রাজা হলেন। তিনি অন্যান্য জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করলেন এবং ফিলিস্তিনের রাজা জালুত (গোয়লিয়থ)-কে হত্যা করলেন।[৯৯] তাঁর পর হজরত দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) তাদের রাজা হলেন। তাঁর রাজ্য সমৃদ্ধিলাভ করল এবং হেজাজ পর্যন্ত বিস্তৃত হল। পরে ইয়ামেনের বহু অঞ্চল এবং রোমের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর আধিপত্য বিস্তার লাভ করল। অতঃপর হজরত সুলায়মানের পরবর্তী গোত্রগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং গোত্রপ্রীতির অমোঘ তাড়নায় পৃথক পৃথক সাম্রাজ্যে বিভক্ত হল, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এদের একটি সাম্রাজ্য দশটি গোত্রের অধীনে আল-জজিরা ও মোশেলে[১০০] অবস্থিত ছিল এবং অন্যটি বনি যিহুদা ও বনি ইয়ামিনের জন্য বয়তুল মুকাদ্দস ও সিরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

অতঃপর ব্যবিলনের সম্রাট বখতেনসর (নেবুচাডনেজার) তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাদের সমুদয় অঞ্চল দখল করে নিলেন। তিনি প্রথমে দশ গোত্রের অধীনস্থ ভূভাগ এবং পরে যিহুদা বংশ ও বয়তুল মুকাদ্দস অধিকার করেন। এভাবে বনি ইসরাইলের হাজার বছরব্যাপী সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। বখতেনসর তাদের মসজিদগুলো ধ্বংস করেন, তাদের তৌরাত পুড়িয়ে দেন এবং তাদের ধর্মের বহু ক্ষতি সাধন করে তাদেরকে ইস্পাহান ও ইরাকের দিকে তাড়িয়ে দেন। তাদের এভাবে বিতাড়িত হওয়ার সত্তর বছর পরে পারস্যের কায়ানী সম্রাটদের কেউ পুনরায় তাদেরকে বায়তুল মুকাদ্দসে ফিরিয়ে আনেন। তখন তারা পুনরায় তাদের মসজিদ নির্মাণ করে এবং পূর্বের ধারা অনুসরণ করে শুধুমাত্র ধর্মের নির্দেশাদি প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়। তারা কোহেনের পদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে; কিন্তু সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল পারস্য।

---

৯৯. শৌল যে গোয়ালিয়থকে হত্যা করেননি, এ সম্পর্কে ইবনে খলদুন তাঁর ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন।

১০০. দশ গোত্রের রাজ্য 'নেবালক' অঞ্চলে অবস্থিত ছিল, যার রাজধানী 'সামারিয়া' (সাবাস্তিয়া) : রোজেনথালে এর উল্লেখ আছে।

এর পর সম্রাট আলেকজান্ডার ও গ্রিকরা পারস্যবাসীদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং ইহুদিরা তাদের অধীনস্থ হয়। এক সময়ে গ্রিকদের অবস্থা দুর্বল হয়ে আসে এবং গোত্রপ্রীতির জোরে ইহুদিরা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে ও তাদের প্রভাবমুক্ত হতে সমর্থ হয়। তখন তাদের আন্দোলনে নেতৃত্বদান করেন বনি হশমনাই কোহেনগণ। তাদের সম্মিলিত আক্রমণে গ্রিকরা পর্যুদস্ত হয় এবং তাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। অতঃপর ইহুদিদের উপর রোমীয়রা জয়ী হয় এবং ইহুদিরা তাদের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। রোমানরা অতঃপর বয়তুল মুকাদ্দসের দিকে অগ্রসর হয়। সেখানে তখন বনি হশমনাইয়ের আত্মীয় বনি হিরোদাসের রাজত্বের অবশেষ প্রতিষ্ঠিত ছিল। রোমানরা তা অবরোধ করে এবং বল প্রয়োগ করে তার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ফলে ইহুদিদের উপর হত্যা, ধ্বংস ও জ্বালানোর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। রোমানরা বয়তুল মুকাদ্দসকে ধ্বংস করে ইহুদিদেরকে রোম ও তদপশ্চাদ্বর্তী অন্যান্য অঞ্চলে বিতাড়িত করে। এটাই বয়তুল মুকাদ্দসের দ্বিতীয়বার ধ্বংস হওয়া এবং এটাকে ইহুদিরা 'বিরাট নির্বাসন' বলে অভিহিত করে। এর পর ইহুদিরা তাদের গোত্রপ্রীতি হারিয়ে ফেলার ফলে আর রাজশক্তির সাক্ষাৎ পায়নি। তারা এবং তাদের পরবর্তী বংশধররা রোমানদের অধীনে বসবাস করতে থাকে। তাদের ধর্মের ব্যাপারে তখনো তারা কোহেনের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

অতঃপর হজরত ঈসা (আঃ)-এর আগমন হয়। তিনি নতুন ধর্মমত প্রচার করেন এবং তৌরাতের কিছু সংখ্যক নিয়মকে বাতিল করেন। তাঁর মধ্যে নানা প্রকার অলৌকিক অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটনের ক্ষমতা দেখা দেয়। যেমন পঙ্গু ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্যকরণ,[১০১] মৃতকে জীবনদান ইত্যাদি। তাঁর চতুর্দিকে বহুলোক জড় হয় ও তাঁকে বিশ্বাস করে। তাঁদের অধিকাংশই 'হাওয়ারী' (সাধু) শ্রেণীর এবং তাঁরা সংখ্যায় বারজন। তিনি তাঁদেরকে তাঁর ধর্মমতের প্রতি আহ্বান জানানোর জন্য চতুর্দিকে প্রেরণ করেন। এ সকল ঘটনা প্রথম রোমান সম্রাট অগাস্তাসের শাসন আমলে এবং ইহুদি শাসক হিরোদসের সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত হিরোদস হশমনাইদের নিকট থেকে আত্মীয়তার সূত্রে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। সুতরাং ইহুদিরা হজরত ঈসাকে মিথ্যাবাদী বলে তাঁর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। হিরোদস তাদের সম্রাট রোমান অগাস্তাসের নিকট পত্র লিলে হজরত ঈসার বিরুদ্ধে তাঁকে উত্তেজিত করে তোলে। কাজেই সম্রাট তাদেরকে ঈসাকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর কোরানে যা বর্ণিত হয়েছে, তা সংঘটিত হয়।[১০২]

এর পর হাওয়ারীগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁদের অধিকাংশ খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য রোমের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবেশ করেন। তাঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ পিটার রোম নগরীতে উপনীত হন। এটা তখন রোমান সম্রাটদের রাজধানী। সেখানে তাঁরা হজরত ঈসার উপর অবতীর্ণ ইঞ্জিল কিতাব লিপিবদ্ধ করেন। তাঁদের বর্ণনার তারতম্যের জন্য তার চারটি সংস্করণ প্রস্তুত হয়। মথি তাঁর ইঞ্জিল গ্রন্থ বয়তুল মুকাদ্দসে

১০১. রোজেনথালে 'পঙ্গু' ও কুষ্ঠ'-এর স্থলে আছে উন্মাদ।
১০২. কোরান ৪, ১৫৭।

হিব্রু ভাষায় লিখেন। তাঁদের মধ্যে ইউহানা (জন) ইবনে যবদী তাকে লাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁদের অন্যতম লুক লাটিন ভাষায় তার ইঞ্জিল রচনা করেন। এটা কতিপয় উচ্চপদ মর্যাদার অধিকারী রোমানদের জন্য করা হয়। তাঁদের মধ্যকার ইউহানা ইবনে যবদী তাঁর ইঞ্জিল রোমান ভাষায় লিখেন। পিটার তাঁর ইঞ্জিল গ্রন্থ লাটিন ভাষায় লিখে তাঁর শিষ্য মারকাস (মার্ক) এর নামে প্রচারিত করেন। ইঞ্জিলের এ চারটি সংস্করণই নানাভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তদুপরি তার সবটুকু প্রত্যাদেশ নয়; এবং তার মধ্যে হজরত ঈসা ও হাওয়ারীগণের বাণী মিশ্রিত রয়েছে। অন্যদিকে এর সমস্তটাই উপদেশ ও কাহিনী। বিধি-নিষেধ খুবই কম। বর্তমানকালে খ্রিস্টীয় সাধু-সন্তরা রোমে একত্র হয়ে খ্রিস্টধর্মের নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করেছেন এবং তার সমস্ত দায়িত্ব পিটারের শিষ্য ক্লিমেন্টের হাতে ন্যস্ত করেছেন। বস্তুত এটা কতগুলো পুস্তকের তালিকা, যেগুলো গ্রহণ করা ও তদনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদন অবশ্য পালনীয়।

ইহুদিদের প্রাচীন ধর্মীয় সংবিধান সংবলিত গ্রন্থাদির মধ্যে তৌরাত-এর পাঁচটি পুস্তক : ইউশার (যশোয়ার) পুস্তক, বিচারকদের পুস্তক, রাউছের (রোখের) পুস্তক, ইহুসার (জডিসের) পুস্তক ও চার সম্রাটের পুস্তক। বনি ইয়ামীনের (ক্রনিকল) পুস্তক; ইবনে করিউনের (গরিউনের) রচিত মাক্কাবীদের তিনটি গ্রন্থ; ইমাম ইজরার গ্রন্থ; উশিরের (ইস্তারের) গ্রন্থ ও হামানের কাহিনী; হজরত আইউব সত্যনিষ্ঠের গ্রন্থ; হজরত দাউদের সঙ্গীতাবলি এবং তাঁর পুত্র সুলায়মানের পাঁচটি গ্রন্থ। ষোলটি বড় ও ছোট নবীদের নব্যুয়ত সম্পর্কীয় পুস্তিকা। হজরত সুলায়মানের উজির ইয়াশো (জেসাস) ইবনে শারেখ (সিরা)-এর গ্রন্থ।

হজরত ঈসার ধর্মবিধান সম্পর্কীয় গ্রন্থাদি, যা হাওয়ারী(সাধু)গণ দীক্ষা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, তার সংখ্যা চারটি। ক্যাথলিকদের সাতটি পুস্তিকা এবং অষ্টমটি রসূলদের কাহিনী সংবলিত ইব্রিক্সিস (প্রেক্সিস) পলের চৌদ্দটি পুস্তিকা। ইকলিমেন্তাস (ক্লিমেন্ট)-এর বিধি-নিষেধ সংবলিত গ্রন্থ। আবু গালেমসিস (এ্যাপোকালেপসি)-র গ্রন্থ, যাতে ইউহানা ইবনে যবদীর স্বপ্নদর্শন বিদ্যমান।

রোমান সম্রাটগণ উক্ত ধর্মমত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচিত্র মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কখনো তাঁরা তা গ্রহণ করেছেন এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। আবার তাকে ত্যাগ করে ধর্মাধিকারীদের প্রতি দুর্ব্যবহার ও তাদেরকে হত্যা করেছেন। সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন না আসা পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজ করেছে এবং তিনি তা গ্রহণ করার পর আর পরিবর্তন হয়নি।

এ খ্রিস্টধর্মের বিধিবিধান যিনি নিয়ন্ত্রণ করতেন, তাঁকে পেট্রিআর্ক বলা হত। তিনি তাঁদের নিকট ধর্মীয় ব্যাপারে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং মসিহের (ঈসার) প্রতিনিধি। তিনি দূরদূরান্তে অবস্থানরত খ্রিস্টানদের মধ্যে তাঁর প্রতিনিধি ও মনোনীত ব্যক্তিকে প্রেরণ করতেন এবং তাঁদেরকে বলা হত 'উস্কুপ' (বিশপ) অর্থাৎ তাঁরা পেট্রিআর্কের স্থলাভিষিক্ত। যে ব্যক্তি তাদের প্রার্থনা পরিচালনা করতেন ও ধর্মীয় বিধান দিতেন, তাঁকে বলা হত 'কেসিস' (প্রীস্ট) এবং যিনি সংসার ত্যাগ করে নির্জন বাস অবলম্বন করতেন, তাঁকে বলা হত রাহেব (মঙ্ক)। শেষোক্ত ব্যক্তি সাধারণত গির্জাতেই বাস করতেন।

সেন্ট পিটার হওয়ারীদের নেতা ও ঈসার শিষ্যদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি রোমে খ্রিস্টধর্মের প্রচার প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত ছিলেন। রোমান সম্রাট পঞ্চম নিরো অন্যান্য অনেক পেট্রিআর্ক ও বিশপসহ[১০৩] তাঁকে হত্যা করেন। রাজধানীতে অতঃপর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন আরিয়ুস। মার্কাস (মার্ক) আল ইঞ্জিলী (ইভানজেলিস্ট) আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর ও মাগরিবে খ্রিস্টধর্মের প্রচারকার্যে সাত বছর অতিবাহিত করেন। তাঁর পরে 'হাননিয়া' (আননিয়াস) উক্ত অঞ্চলের প্রথম পেট্রিআর্ক নিযুক্ত হন এবং তাঁর সাথে আরো বারজন প্রীস্ট নিযুক্ত করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল যাতে উক্ত পেট্রিআর্কের তিরোধানের পর তাদের একজন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন এবং সাধারণ ধর্ম বিশ্বাসীদের মধ্য থেকে অন্য একজনকে প্রীস্টের স্থলাভিষিক্ত করা যায়। এভাবে পেট্রিআর্কের পদটি প্রীস্টদের দ্বারা পূরণ করার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর যখন তাদের ধর্মের নিয়মাবলি ও বিশ্বাসাদির মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা দিল, তখন কনস্ট্যান্টাইনের সময়ে নিকিয়া(নিসিয়া)-র তারা সত্যধর্ম উদ্ধারের জন্য সমবেত হন। তাদের মধ্যে তিনশ আঠার জন বিশপ ধর্মের একটি বিশেষ মতে ঐক্যবদ্ধ হন। তাঁরা এ মত সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করে তাকে 'ইমাম' (ক্রীড) নামকরণ করেন এবং সর্বাবস্থায় এর প্রমাণকে গ্রহণযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেন। তাঁরা লিপিবদ্ধ করেন যে, পেট্রিআর্কের জন্য প্রীস্টদের মনোনয়নের কোনো প্রয়োজন নেই এবং মার্কাসের শিষ্য হাননিয়া (আনানিয়াস) যে পদ্ধতিতে পেট্রিআর্ক নির্বাচিত করতেন, তা বাতিল বলে গণ্য হয়। তারা সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নির্বাচনের উপর জোর দেন এবং উক্ত বিষয়টি এভাবেই স্থিরীকৃত হয়। এর পর যদি তাঁরা ধর্মীয় নীতি নিয়মের মতভেদের দরুন একাধিক সভায় মিলিত হন; কিন্তু কখনো উক্ত পেট্রিআর্ক নির্বাচনের ব্যাপার সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দেয়নি। উক্ত ব্যাপার পূর্বানুরূপ থাকে এবং তার সাথে বিশপ মনোনয়নের বিষয়টি সংযুক্ত করা হয়।

বিশপগণ পেট্রিআর্ককে সম্মানের জন্যই 'পিতা' বলে ডাকতেন।[১০৪] এটা বহুদিন যাবত ব্যবহৃত হওয়ার ফলে উক্ত সম্বোধনের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। একাধারে পেট্রিআর্ক ও 'ফাদার' শব্দ ব্যবহার করার শেষ নিদর্শন হল আলেকজান্দ্রিয়ার পেট্রিআর্ক হিরাক্লে। অতঃপর বিশপ ও পেট্রিআর্কের সম্বোধনের ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি করে শেষোক্তকে 'পোপ' ডাকতে আরম্ভ করেন, যার অর্থ পিতৃগণের পিতা। জর্জিস ইবনে আল-উমাইদ[১০৫]-এর ইতিহাসে বর্ণিত ধারণা অনুসারে এ নতুন নাম প্রথমে মিশরে প্রবর্তিত হয়। অতঃপর একে রোমের প্রধান কেন্দ্রের পেট্রিআর্কের প্রতি আরোপিত হয়। কেননা রোম সেন্টপিটারের সমাধিস্থল হওয়ার ফলে খ্রিস্টানদের নিকট খুবই মর্যাদার অধিকারী, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সেই সময় থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত তা সেভাবেই প্রচলিত আছে।

---

১০৩. রোজেনথালে সংশোধিত পাঠে 'অন্যান্য অনেক পেট্রিআর্ক ও বিশপসহ' বাক্যাংশটি নেই। কারণ তখন এ পদগুলোর সৃষ্টি হয়নি।

১০৪. সংশোধিত পাঠে এস্থলে এই বাক্যটি সংযোজনের প্রয়োজন—এবং প্রীস্টগণ বিশপদিগকেও পিতা বলতেন। রোজেনথালে এটা বিদ্যমান।

১০৫. আল-মকীন—জীবনকাল (১২০৫-১২৭৩ খ্রি.)।

এর পর খ্রিস্টানগণ তাঁদের ধর্মমতের ব্যাপারে পুনরায় বিরোধের সম্মুখীন হয়েছেন। আল-মসীহ-এর উপর বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে মতভেদ দেখা দিয়ে তাঁরা বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এদের মধ্যে খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্যে প্রতিটি দলই একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করেছে এবং এর ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলের প্রাধান্য দেখা গেছে। সর্বশেষে তাদের মধ্যে তিনটি দলের অস্তিত্ব সর্বজন স্বীকৃত বলে গৃহীত হয়েছে। এরা হচ্ছে 'মালাকিয়া', ইয়াকুবিয়া ও নেস্তুরিয়া। এরা ব্যতীত অন্যান্য দলগুলো সম্পর্কে কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় না।

এর পর প্রতিটি দলই তাদের পেট্রিআর্ক নিযুক্ত করেছেন। রোমের পেট্রিআর্ক বর্তমানে মালাকিয়া সম্প্রদায়ের এবং তাঁকে 'পোপ' বলা হয়। রোম বর্তমানে ফিরিঙ্গীদের অধীনে এবং তাদের রাজ্যও ঐ অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত। মিশরের খ্রিস্টান প্রজাদের পেট্রিআর্ক ইয়াকুবিয়া মতের অনুসারী এবং তিনি তাদের মধ্যেই বসবাস করেন। আবিসিনিয়ার খ্রিস্টানরা তাঁকেই অনুসরণ করে। মিশরের পেট্রিআর্কের তরফ থেকে তাদের মধ্যে বিশপ নিযুক্ত আছেন, তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে পেট্রিআর্কের স্থলাভিষিক্ত হন। 'পোপ' শব্দটি রোমের পেট্রিআর্কের উপাধি হিসাবেই বিদ্যমান। মিশরের ইয়াকুবিয়া সম্প্রদায় তাদের পেট্রিআর্ককে ঐ নামে সম্বোধন করেন না। এ পোপ বা 'আলবাবা' শব্দটির উচ্চারণগত স্বরূপ হল 'আল'-এর পরে দুটিই নিচের 'নুকতা' বিশিষ্ট 'বে'; তবে প্রথমটি একক ও দ্বিতীয়টি যুক্ত অর্থাৎ এর উচ্চারণ 'বাব্বা' বা 'পাপ্পা'। ফিরিঙ্গীদের নিকট পোপের আদর্শ হল, তিনি তাদেরকে কোনো এক রাজশক্তির অধীনে থাকতে আদেশ দিবেন, তাদের মতবিরোধ ও মতৈক্য সর্বাবস্থায় তারা তাঁর নির্দেশের মুখাপেক্ষী হবে। যাতে ধর্মের ঐক্য বিনষ্ট না হয় এবং এর মাধ্যমে গোত্রপ্রীতির শক্তিকে কেন্দ্র করে তারা সকলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। তারা এ রাজশক্তিকে 'ইম্বার যোর' (এম্পায়ারার) বলে সম্বোধন করে। শব্দটি 'য' বর্ণটির উচ্চারণ 'যাল' ও 'য়য়' বর্ণ দুটির মাঝামাঝি। পোপ স্বয়ং এ এম্পায়ারারের শিরোপরে মুকুট স্থাপন করেন, যাতে তদ্বারা তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট বলে তাকে মনে করা যায়। এ জন্যই এম্পায়ারারকে 'মুকুট পরিহিত' বলা হয়; সম্ভবত এটাই এম্পায়ারার শব্দটির অর্থ।

কোহেন ও পোপ উপাধিদ্বয়ের ব্যাখ্যা সম্পর্কে এটাই আমাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সুপথ দেখান।[১০৬]

---

১০৬. কোরান ১৬, ৯৩; ৩৫, ৮; ৭৪, ৩১।

চতুঃত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[রাজশক্তি ও সরকারি বিভিন্ন পদমর্যাদা এবং তাদের পদবী]

জেনে রাখুন, শাসক নিজে খুবই দুর্বল, সে একটি গুরুদায়িত্ব বহন করে; সুতরাং তার জন্য সমসাময়িক জনগোষ্ঠীর সাহায্যের প্রয়োজন। সে যখন নিজের সাধারণ জীবিকা নির্বাহ ও পরিশ্রমাদির ক্ষেত্রে অপরের উপর নির্ভরশীল, তখন, পাঠক, তার শাসনভার ও তার উপর প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের যে দায়িত্ব আল্লাহ্ অর্পণ করেছেন, তা কি সে একা বহন করতে পারবে? এ কারণে সে সকলের সহায়তার মুখাপেক্ষী, যাতে এর দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির বদান্যতায় তারা শত্রুর কবল থেকে বাঁচতে পারে, তেমনি নিজেদের মধ্যেও একে অপরের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে পারে। এজন্য শাসক তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধায়ক বিধিবিধান প্রয়োগ করবেন এবং জীবিকা অর্জনে তাদের পথ সুগম করে তাদের ধনসম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। তিনি তাদেরকে শুভকর্মে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং তাদের দৈনন্দিন কার্যে ব্যবহৃত বিষয়াদি, যেমন খাদ্যদ্রব্য, ওজন ও পরিমাণ ইত্যাদির ব্যাপারে যথাযোগ্য পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করবেন, যাতে কোনো প্রকার ত্রুটি দেখা না দেয়। তিনি মুদ্রার ব্যাপারে দৃষ্টি দিবেন, যাতে মানুষের বিনিময় মাধ্যমে কোনো জাল-জুয়াচুরি প্রশ্রয় না পায়। তিনি তাদেরকে এমনভাবে শাসন করবেন, যাতে তারা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তাদের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত সমুদয় বিধিব্যবস্থার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। এর মধ্য দিয়ে রাজশক্তির সমস্ত গৌরব তাঁর কুক্ষিগত হবে এবং এটা অর্জন করতে গিয়ে তাঁকে চরমভাবে অপরের সহানুভূতির উপর নির্ভর করতে হবে। অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, একটি পর্বতকে তার স্বস্থানচ্যুত করা হয়তো সম্ভব হতে পারে; কিন্তু মানুষের সহানুভূতি অর্জন করা তদপেক্ষা কঠিন ব্যাপার।

অতঃপর এ সহানুভূতি-সহায়তার ব্যাপারটি যদি বংশধারার অন্তর্গত আত্মীয়-পরিজন এবং সহপাঠিতা ও প্রাচীনকাল থেকে কর্মে নিয়োগের সখ্যতার দ্বারা অর্জিত হয়, তা হলে তা সাম্রাজ্যের ব্যাপারে পূর্ণতা লাভ করে থাকে। কারণ এ সকল ক্ষেত্রে শাসকের চরিত্রের সাথে তাদের চরিত্রের একটি মধুর সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকে। সুতরাং সহানুভূতি তার পরিপূর্ণ আকৃতি ধারণ করতে সমর্থ হয়। আল্লাহ্ কোরানে বলেন, (মুসা বললেন) আমার বংশ থেকে আমার জন্য একজন উজির নিযুক্ত কর, আমার ভাই হারুনকে এবং তার দ্বারা আমার শক্তিবৃদ্ধি কর ও তাকে আমার কর্তব্য কার্যে অংশীদার করে দাও।"[১০৭]

---

১০৭. কোরান ২০, ২৮-৩২।

এভাবে শাসক যাদের সহায়তা কামনা করেন, তারা হয় তরবারি, কলম, মতামত, জ্ঞানগুণ কিংবা তাঁর নিকট থেকে লোকজনকে দূরে সরিয়ে রেখে তাঁকে সাহায্য করে থাকে। এর ফলে তিনি প্রজা সাধারণের বিষয়গুলো পর্যালোচনা থেকে মুক্তি পান এবং কখনো রাজ্য পরিচালনার সমগ্র দায়িত্বই অন্য লোকের উপর ন্যস্ত করেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততাই শাসককে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে। সুতরাং এ সহায়তা কখনো এক ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব হয়, আবার কখনো একাধিক ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত হতে দেখা যায় এবং কখনো প্রতিটি দায়িত্বই বহু শাখায় সম্প্রসারিত হয়। যেমন কলম; এ সম্পর্কীয় বিভাগটিতে পত্র ও নির্দেশাদি, দান ও চুক্তিপত্রাদি, হিসাবরক্ষণ প্রভৃতি উপবিভাগ বিদ্যমান এবং এগুলো রাজকোষ, দানধ্যান ও সৈন্যদলের নথিপত্র সংরক্ষণকারীদের দায়িত্বে বর্তায়। এমনিভাবে তরবারী সম্পর্কীয় বিভাগ, তাতে যুদ্ধের সেনাপতি, অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষক, ডাকবিভাগীয় কর্মকর্তা এবং সীমান্ত রক্ষকের দায়িত্ব বর্তমান।

অতঃপর জেনে রাখুন, শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কীয় যাবতীয় পদমর্যাদা ইসলামী সাম্রাজ্যে খেলাফতের অধীনে ন্যস্ত থাকে। কারণ খেলাফত ইহলৌকিক ও পারলৌকিক যাবতীয় ব্যাপারেই শৃঙ্খলাবিধানে তৎপর হয়, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং উপরোক্ত সকল বিভাগেই ধর্মীয় বিধি-নিষেধ বিদ্যমান। তা পার্থিব অপার্থিব সকল ব্যাপারেই নির্দেশাদি প্রদান করে। কারণ মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রই ধর্মীয় অনুশাসনের আওতাধীন। কাজেই ধর্মশাস্ত্রবিদ রাজশক্তি ও শাসকের পদমর্যাদা অনুসারে এবং তার শর্তাদি সাপেক্ষেই এ সকল বিধানের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে শাসক খেলাফতের উপর অন্যায্য প্রভাব বিস্তার করে রাজকীয় মর্যাদায় বিভূষিত হতে পারেন এবং এটাই শাসকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। অথবা তাঁর রাজকীয় প্রভাব খর্ব করে অন্যের প্রভাবাধীন হতে পারেন এবং এটাই সম্ভবত তাদের মতে উজিরের কর্তব্য, যেমন এর বর্ণনা আসছে। কাজেই এ সকল ক্ষেত্রে ধর্মশাস্ত্রবিদকে বিধি-নিষেধ, সম্পদ-সম্পত্তি ও অন্যান্য শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ অথবা শর্তাধীন বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে এবং প্রয়োজন দেখা দিলে পদচ্যুতির ব্যাপারেও তার দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করতে হবে। এভাবে রাজশক্তি ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কীয় যাবতীয় সমস্যার ক্ষেত্রেই তাদের করণীয় সম্পর্কে ধর্মশাস্ত্রবিদ নির্দেশ দেন এবং যাবতীয় রাজকীয় ও শাসনতান্ত্রিক বিভাগ—রাজকোষ, মন্ত্রিত্ব ও প্রাদেশিক শাসন সম্পর্কীয় বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন।

ইসলামী সাম্রাজ্যে রাজশক্তি ও শাসনব্যবস্থা ধর্মীয় বিধানের আওতাধীন বলে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, ধর্মশাস্ত্রবিদকে এ সকল বিষয়ের সমুদয় সম্পর্কে দৃষ্টি দান করতে হয়। কিন্তু পাঠক, আমাদের বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য তা নয়, যেমন আপনি ইতিপূর্বে তৎসম্পর্কে অবগতি লাভ করেছেন। আমরা যাবতীয় রাজকীয় ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কীয় পদাদির বর্ণনা মানুষের অস্তিত্ব ও তাদের সমাজবদ্ধ জীবনের স্বাভাবিক প্রবর্তনা অনুযায়ী তুলে ধরে। এতে বিশেষ কোনো ধর্মমতের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হবে না। এ জন্যই আমরা ধর্মীয় বিধি-বিধানের বর্ণনায় কালক্ষেপণ করতে চাই না এবং এতে আমাদের প্রয়োজনও কম। এ সকল বিষয় অন্যত্র সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। যেমন

বিশিষ্ট ধর্মশাস্ত্রবিদ কাজী আবুল হাসান মাওয়ারদী ও অন্যান্য অনেকের গ্রন্থে এর বর্ণনা বিদ্যমান। পাঠকদের মধ্যে যারা ধর্মীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে বিশদ জানতে ইচ্ছুক, তাদেরকে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করতে হবে। আমরা খেলাফত ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে এ জন্যই আলোচনা করেছি, যাতে তার এবং রাজকীয় ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কীয় বিধি-বিধানের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়। ধর্মীয় বিধি-বিধানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ বা তার বিশদীকরণ আমাদের গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। আমরা এখানে মানুষের অস্তিত্ব ও তার সমাজবদ্ধ জীবনের স্বাভাবিক প্রবর্তনা অনুসারেই আমাদের আলোচনা উপস্থিত করব। আল্লাহ্ই শক্তিদাতা।

উজারত (মন্ত্রিত্ব)

এটা শাসনব্যবস্থা সম্পর্কীয় যাবতীয় বিভাগ এবং রাজকীয় সকল পদমর্যাদার জননী। কারণ তার নামকরণের মধ্যেই সার্বিক সহায়তার ভাব বিদ্যমান। কেননা উজারত শব্দটি হয় 'মুয়াযারাত' থেকে অথবা 'বিসরুন' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমটির অর্থ সহায়তা এবং দ্বিতীয়টির অর্থ বোঝা; উজির যেন তার নিয়োগকারীর সকল বোঝা ও ভার বহন করে থাকেন। এর মধ্যেও সার্বিক সহায়তার ভাব বিদ্যমান।

আমরা অত্র পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে বলেছি যে, শাসকের অবস্থা ও তাঁর ক্ষমতা চারটি বিষয়ের বাইরে সাধারণত যায় না। এর মধ্যে তাঁর সার্বিক সহায়তার জন্য ও তৎসম্পর্কীয় কার্যকারণের ক্ষেত্রে দৃষ্টি দানের নিমিত্ত যিনি সৈন্যদল, অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধবিগ্রহ এবং সামগ্রিক দায়িত্ব ও অধিকারের পদে নিযুক্ত থাকেন, তিনিই পূর্বাঞ্চলীয় সাম্রাজ্যগুলোতে উজির নামে খ্যাত। বর্তমানকালে মাগরিবেও এ পদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। অন্যদিকে শাসক যদি স্থান ও কালগত দূরত্বে অবস্থানকারী কাউকে সম্বোধন করতে চান কিংবা তার উপর স্বীয় নির্দেশ কার্যকরী করতে উদ্যোগী হন, তা হলে যিনি শাসকের উপরোক্ত মনোভাব লিপিবদ্ধ করেন, তিনি 'কাতেব' (লেখক)। পুনরায় রাজকোষের অর্থের আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষা এবং যাতে এ ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতি না দেখা দেয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা; যিনি এ কাজে অর্থাৎ রাজকোষের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত, বর্তমানকালে পূর্বাঞ্চলে তাঁকেই উজির বলা হয়। সর্বোপরি শাসককে অর্থ প্রত্যার্থীদের সাক্ষাৎকারের চাপ থেকে মুক্ত রেখে তাঁর দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেয়া দরকার; এ ব্যাপারে তাঁকে যিনি সাহায্য করেন, তিনি দ্বাররক্ষী 'হাজেব'। এভাবে দেখতে গেলে শাসকের অবস্থা মোটামুটি এ চারটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ করা যায় এবং রাজকীয় ও শাসন সংক্রান্ত এমন কোনো বিভাগ নেই বা পদমর্যাদা নেই যা এগুলোর অধীনে পড়ে না। অবশ্য এর মধ্যে সর্বোচ্চ হল সেই সার্বিক সহায়তা, যা শাসকের সকল কর্তৃত্বকেই বহন করে এবং তা সম্পাদনের জন্য সর্বক্ষণ শাসকের সংসর্গে থাকতে হয় ও তাঁর সর্বপ্রকার দায়িত্ব পালনে অংশগ্রহণ করতে হয়। অন্যদিকে এ সহায়তা যদি কোনো বিশেষ দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যেমন সীমান্ত রক্ষা, বিশেষ রাজকোষের তত্ত্বাবধান, পানাহারের ব্যবস্থা করা, মুদ্রা ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি দান, তা হলে তা স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ দায়িত্ব পালন অপেক্ষা মর্যাদায় হীন হবে। কারণ উপরোক্ত

বিষয়ের সবগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ এবং এর ক্ষমতাও সেই অনুপাতে সংকুচিত। সুতরাং এগুলো সর্বদা সাধারণ তত্ত্বাবধানের অধীন এবং তার উপরিভাগে পরিণত হবে।

ইসলাম পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলোতে অবস্থা এভাবেই চলতে ছিল। অতঃপর ইসলামের আবির্ভাবে সাম্রাজ্য খেলাফতে পরিণত হল এবং উপরোক্ত বিভাগ উপরিভাগের অস্তিত্ব লোপ পেল। কারণ এগুলো সাম্রাজ্যেরই অপরিহার্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল। অবশ্য যা একান্ত স্বাভাবিক, সেই পরামর্শ বা মন্ত্রণা তখনো বিদ্যমান ছিল। কারণ এ বিষয়টি একান্ত প্রয়োজনীয় বিধায় তা লোপ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। হজরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁর সহচরদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং সাধারণ ও বিশেষ ব্যাপারে তাঁদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করতেন। অবশ্য অনেক বিষয়ে হজরত আবু বকরের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। এর ফলে আরবের যারা রোম, পারস্য ও আবিসিনিয়ার সাম্রাজ্য ব্যবস্থার সাথে পরিচিত ছিল, তারা তাঁকে হজরত মুহম্মদের উজির বলে ভাবে। যদিও উজির শব্দটি মুসলমানদের মধ্যে পরিচিত হয়নি। কারণ ইসলামের সারল্য রাজশক্তির মর্যাদাকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। এভাবে হজরত উমর হজরত আবু বকরের, হজরত উসমান ও আলী হজরত উমরের পরামর্শদাতা ছিলেন। রাজকোষ, আয়-ব্যয় ও হিসাব সংরক্ষণের ব্যাপারগুলো তাদের নিকট খুব গুরুত্ব লাভ করেনি। কারণ জাতি বেদুইন হওয়ায় ও পুঁথিগত শিক্ষার অভাবে লেখাপড়া ও হিসাব রক্ষার কাজে তেমন পটু ছিল না। এ জন্য তাঁরা এ ব্যাপারে আহলে কিতাব[১০৮] অথবা অনারবদের মধ্যে যাদেরকে ভালো মনে করতেন, দায়িত্ব দিতেন। অবশ্য তাদের সংখ্যাও নগণ্য ছিল। কারণ তাদের মধ্যেও উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা এ বিষয়ে খুব অল্পই জ্ঞান রাখতেন। বরং বলতে গেলে, পুঁথিগত বিদ্যার অভাবেই তাঁদের এমন এক বৈশিষ্ট্য ছিল, যা দিয়ে তাঁরা পরিচিত হতেন। এমনিভাবে পত্রাদি লেখা ও নির্দেশাদি প্রেরণ করার ব্যাপারটিও তাঁরা তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন না। একে ত পুঁথিগত বিদ্যার অভাব, তদুপরি যথাস্থানে নির্দেশ বহন করে নিয়ে গিয়ে যথাযথ পৌঁছানোর ব্যাপারে বিশ্বস্ততার অভাব তখনো মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এর ফলে শাসন ব্যবস্থায় কোনো প্রকার গোলযোগের সম্ভাবনা তাঁরা মনের মধ্যে পোষণ করতেন না। কারণ খেলাফত ছিল একান্তই ধর্মীয় ব্যাপার; রাজকীয় শাসনের সাথে এর কোনো সংশ্রব ছিল না। অন্যদিকে লেখা-পড়ার ব্যাপারটি তখনো শিল্প হয়ে ওঠেনি যে, তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ জ্ঞানীকে খলিফার সহায়তায় নিযুক্ত করতে হবে। বরং তাদের মধ্যে সকলেই যথাযথভাবে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে পারতেন। একমাত্র লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারটিরও অভাব ছিল। এ ক্ষেত্রে খলিফা প্রয়োজন হলে যোগ্য দেখে যে কোনো একজনকে নিয়োগ করতেন। আর অভাবী দর্শন প্রার্থীদেরকে প্রতিরোধ করার ব্যাপারটি ত ধর্মীয় বিধানেই লিপিবদ্ধ ছিল; সুতরাং তাঁদের দ্বারে দ্বারবান নিযুক্তির প্রশ্নই ওঠে না।

অতঃপর খেলাফত যখন রাজশক্তিতে পরিণত হল, তখন শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কীয় রীতিনীতি আবার ফিরে এল। এর ফলে সর্বপ্রথম যে পরিবর্তন দেখা দিল, তা হল দ্বারদেশে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা। কারণ তাঁরা খারেজী

১০৮. অর্থাৎ গ্রন্থধারী, সাধারণভাবে ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বোঝায়।

সম্প্রদায়[১০৯] ও অন্যান্যের অতর্কিত আক্রমণের ভয়ে তখন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ইতিপূর্বে হজরত উমর, আলী, মাবিয়া, আমর ইবনেল আস এবং আরো অনেকে এ আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। তদুপরি অবারিত দ্বার হওয়ার ফলে সাধারণের ভিড়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পাদনে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছিল। সুতরাং তাঁরা দ্বারে রক্ষী নিযুক্ত করলেন এবং তার নাম রাখলেন 'হাজেব' বা প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী। কথিত আছে যে, খলিফা আবদুল মালেক তাঁর দ্বারে রক্ষী নিযুক্ত করে তাকে বলেছিলেন, তোমাকে আমার দ্বারদেশে প্রতিবন্ধক সৃষ্টির জন্য নিযুক্ত করেছি; কিন্তু তিনটি বিষয়ের জন্য নয়। নামাজের প্রতি আহ্বানকারী; কারণ সে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান জানাচ্ছে। ডাক বহনকারী; কারণ সে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এসেছে। খাদ্যদ্রব্য আনয়নকারী; কারণ তার আগমনে বিলম্ব ঘটলে তা নষ্ট হয়ে যাবে।

অতঃপর সাম্রাজ্যের পরিধি আরো বৃদ্ধি পেল এবং বিভিন্ন গোত্র, জনগোষ্ঠী সম্পর্কে সম্প্রীতি বৃদ্ধির জন্য পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারীর প্রয়োজন দেখা দিল। এরূপ সাহায্যকারীর নাম দেয়া হল উজির। হিসাব সংরক্ষণের ব্যাপারটি আশ্রিত পোষ্য ও জিম্মীদের হাতেই রয়ে গেল। নথিপত্র সংরক্ষণ ও লেখার জন্য একজন বিশেষ লেখক নিযুক্ত হলেন, যিনি সম্রাটের গোপন তথ্যাদি সযত্নে রক্ষা করতেন। কারণ তা প্রকাশ হয়ে গেলে, জাতির মধ্যে শাসন ব্যবস্থায় গোলযোগ দেখা দিতে পারে। অবশ্য মর্যাদার দিক থেকে লেখক উজিরের সমান ছিলেন না। কারণ তাঁর প্রয়োজন ছিল শুধু লিখন ও লিপিবদ্ধকরণের জন্যই; ভাষার উপর তাঁর কোনো হাত ছিল না। কেননা শাসকদের মনোভাব প্রকাশের নিজস্ব ভাষাজ্ঞান তখনো বিকৃত হয়ে পড়েনি। এজন্য তৎকালে উজিরের পদমর্যাদা ছিল সর্বোচ্চ। বনি উমাইয়া সাম্রাজ্যের শেষ পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজমান ছিল। সুতরাং উজিরের দায়িত্ব তৎকালে সামগ্রিক বিষয়াদির সাথে জড়িত ছিল। তিনি যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা, দায়িত্ব অর্পণ, সহায়তা প্রদান ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে দৃষ্টিদান করতেন। এরই অনুসরণে সৈন্যদলের প্রতি লক্ষ রাখা, যোগ্যতা বিচার করে প্রাপ্য প্রদান এবং এ প্রকার আরো বহু দায়িত্ব উজিরকে পালন করতে হত।

এর পর আব্বাসী সাম্রাজ্যের কাল দেখা দিল। এতে রাজশক্তি ও তার পদমর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেল, উন্নত হল। সেই অনুপাতে উজিরের মর্যাদাও সুপ্রতিষ্ঠিত। সকলের চেহারা তাঁকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং সকলের মাথা তাঁর সম্মুখে অবনত হয়। হিসাব সংরক্ষণের ব্যাপারেও তাঁকে দৃষ্টি দিতে হয়, কারণ সৈন্যদের প্রাপ্য বণ্টনের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত। এ কারণে রাজকোষের সঞ্চয় ও ব্যয় বৈচিত্র্যের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন এবং এ দায়িত্ব তাঁর কর্তব্যের মধ্যে গণ্য। এর পর লেখনী ও পত্রাদি রচনার ব্যাপারেও তাঁর দৃষ্টি দানের প্রয়োজন দেখা দিল। কারণ সম্রাটের গোপনীয়তা রক্ষার সমস্যা যেমন তখন দেখা দিয়েছে, তেমনি ভাষায় অলংকরণের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। কেননা সর্বসাধারণের ভাষাজ্ঞান তখন বিকৃত হয়ে গেছে। অনুরূপ সতর্কতার জন্যই রাজকীয় নথিপত্রের বিকৃতি ও পরিবর্তনের গতিরোধ করার জন্য তাতে মোহরাঙ্কিত করার অঙ্গুরীয় প্রস্তুত হল এবং তাও উজিরের দায়িত্বে দেয়া হল। এক কথায় তৎকালে

১০৯. হজরত আলীর দলত্যাগী জনগোষ্ঠী।

উজির লেখনী ও তরবারী তথা সার্বিক সহায়তার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হলেন। এ জন্যই সম্রাট হারুনুর রশীদের সময় উজির জাফর ইবনে ইয়াহিয়াকে তাঁর সাম্রাজ্যের ব্যাপারে সার্বিক দৃষ্টিদান ও পরিচালনার জন্য 'সুলতান' বলে ডাকা হত। বস্তুত তাঁর দায়িত্বে একমাত্র দ্বারবানির কার্য ছাড়া অন্য সকল বিষয়ই স্থাপিত হয়েছিল। শুধু দ্বার রক্ষীর কাজের হেয়তার জন্যই তা তাঁর দায়িত্ব থেকে বাদ পড়েছিল।

অতঃপর আব্বাসী সাম্রাজ্যে অন্যায্য প্রভাব বিস্তারের যুগ দেখা দিল। এর ফলে খলিফা কখনো উজিরের দ্বারা আবার কখনো শাসকের দ্বারা পরিচালিত হতেন। উজিরের অন্যায্য প্রভাব বিস্তারের কালে সর্ববিষয়ে খলিফার অনুমতির প্রয়োজন হত, যাতে ধর্মীয় বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিনিধিত্ব প্রমাণ করা উজিরের পক্ষে যথাবিহিত হয়, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এর ফলে তৎকালে উজারতের পদটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ত। এর একটি হল স্বনির্ভর উজারত, যাতে কোনো শাসকের স্বাবলম্বী হয়ে কাজ করার স্বরূপ ফুটে ওঠে এবং দ্বিতীয়টি হল মনোনয়ন নির্ভর উজারত, যা উজিরের প্রভাব[১১০] বিস্তারের কথাই বোঝায়। এভাবে অন্যায্য প্রভাবের ধারা চলতে থাকায় এক সময়ে বিষয়টি অনারব রাজন্যবর্গের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে এবং খেলাফতের সকল চিহ্ন লোপ পায়। অবশ্য এ সকল প্রাধান্য বিস্তারকারী রাজন্য কখনো খেলাফতের কোনো উপাধি ব্যবহার করত না এবং এ ব্যাপারে উজিরদের সাথেও তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কারণ উজিররা প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের কর্মচারীই ছিল। বরং তারা নিজেদেরকে 'আমীর' অথবা 'সুলতান' নামে পরিচিত করাতো। সাম্রাজ্যের উপর অন্যায্য প্রভাব বিস্তারকারী সাধারণত 'আমীরুল উমায়া'[১১১] অথবা সুলতান উপাধি গ্রহণ করত। এ ক্ষেত্রে খলিফা তাদেরকে যে উপাধি দিতেন, তাই তারা গ্রহণ করত, যেমন পাঠক তাদের উপাধির আলোচনায় দেখতে পাবেন। তারা খলিফার ব্যক্তিগত কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিকেই উজির বলে ডাকত। সাম্রাজ্যের শেষ পর্যন্ত এ অবস্থাই চলছিল। ইতিমধ্যে ভাষার বিকৃতি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং তা কিছু সংখ্যক লোকের শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে। ফলে তার ব্যবহার মর্যাদাহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং উজিররা এ ব্যাপারে নিয়োজিত হতে গিয়ে হীনমন্যতাবোধে পীড়িত হচ্ছে। কারণ তারা অনারব এবং তাদের ভাষায় এ অলংকরণের কোনো প্রচেষ্টাও নেই। কাজেই নানা শ্রেণীর লোক এতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করল এবং উক্ত বিষয় তাদের বৈশিষ্ট্য রূপে দেখা দিল। এর ফলে উক্ত বিষয়ে নিয়োজিত ব্যক্তি উজিরের কর্মচারীরূপে গণ্য হতে লাগল। আমীর উপাধিটি যুদ্ধ পরিচালনাকারী সেনাপতি ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াদির উপর কর্তৃত্বের জন্য ব্যবহৃত হল। অথচ এতদ্‌সত্ত্বেও সকল পদমর্যাদার উপর তার প্রভাব বিস্তৃত হল এবং সর্বব্যাপারে তার নির্দেশ প্রতিপালিত হতে লাগল। এ ক্ষেত্রে সে কখনো শাসকের প্রতিনিধি আবার কখনো অন্যায্য প্রভাব বিস্তারকারীরূপে দেখা দিত। এভাবে এ সকল বিষয় স্থায়ী হয়ে উঠল।

---

১১০. এ বাক্যটির শেষে রোজেনথালের অনুবাদে দুই ইমামের অনুরূপ দুই উজির নিয়োগের সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১১১. আমীরদের আমীর—প্রধান সর্দার।

এর পর শেষের দিকে মিশরে তুর্কি সাম্রাজ্যের আবির্ভাব ঘটল। তখন তারা দেখতে পেলেন যে, উজিরের পদটি এ সকল অন্যায্য প্রভাব বিস্তারকারীর হস্তক্ষেপে এবং অবরুদ্ধ খলিফার একান্ত সহচরে পরিণত হওয়ার ফলে নিতান্তই সাধারণ হয়ে পড়েছে। বস্তুত উজিরের স্থান আমীরের বহু পিছনে এবং নেতৃত্বের ব্যাপারেও এটা ত্রুটিপূর্ণ। সুতরাং উক্ত সাম্রাজ্যের উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারীরা উজির উপাধি গ্রহণ করাটা হেয় মনে করলেন। কাজেই বর্তমানকালে তাদের মধ্যে সৈন্যদল সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যাপারে দৃষ্টিদানকারীকে বলা হয় 'নায়েব' (প্রতিভু)। শুধু হাজেরের উপাধিটি তার স্বস্থানে বিদ্যমান।[১১২] রাজকোষের ব্যাপারে যিনি তত্ত্বাবধান করেন, তাঁকে বলা হয় উজির।

অবশ্য আন্দালুসের উমাইয়া সাম্রাজ্যে প্রথম থেকে উজির উপাধি যথা নিয়ম ব্যবহার করে আসছে। অতঃপর তাঁরা তাকে কতিপয় ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের জন্য একজন করে উজির নিযুক্ত করেছিলেন। যেমন সম্পদের হিসাবাদি সংরক্ষণের উজির, পত্রাদি রচনার উজির, অত্যাচারিতদের প্রয়োজনে দৃষ্টিদানের উজির ও সীমান্ত এলাকার অবস্থাদি পর্যবেক্ষণের উজির। তাঁরা সকলে একটি সুসজ্জিত গৃহের গালিচায় একত্রে বসতেন এবং শাসক কর্তৃক তাঁদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আলোচনা করতেন। তাঁদের মধ্যে একজন শাসক ও উজিরদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপারে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। সম্রাটের সাথে সর্বদা থাকার ফলে তাঁর মর্যাদা কিছুটা ভিন্ন হত এবং তিনি তাঁদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চাসনে উপবেশন করতেন। তাঁকে বলা হত 'হাজেব'। এভাবে উক্ত সাম্রাজ্যের পদমর্যাদার অবস্থা শেষ অবধি বিদ্যমান ছিল। হাজেবের পদটিকে সকলের উপরে স্থান দেয়া হত। অতঃপর ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ এসে আবির্ভূত হল এবং তাদের অধিকাংশই হাজেব উপাধি গ্রহণ করেছিল, যেমন আমরা পরে বর্ণনা করব।

এর পর আফ্রিকিয়া ও কায়রোয়ানে শিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। এর প্রতিষ্ঠাতারা প্রান্তর জীবনের সাথে অধিকতর পরিচিত হওয়ায় প্রথম দিকে এ সকল দায়িত্ব সম্পর্কে কোনো গুরুত্ব দেননি এবং এ সকল উপাধিও ব্যবহার করেননি। এর পর যখন তাদের মধ্যে নগর জীবনের সমৃদ্ধি দেখা দিল, তখন তারা পূর্ববর্তী দুটি সাম্রাজ্যের পদমর্যাদা ও উপাধি ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন, যেমন তাদের সাম্রাজ্যে তথ্যাদি আলোচনায় পাঠক দেখতে পাবেন।

এর পর আল-মোহেদ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারাও তাদের প্রান্তরীয় চরিত্রের জন্য প্রথম দিকে এ বিষয়ে দৃষ্টি দেননি। অতঃপর তারাও এ সকল উপাধি ও নাম গ্রহণ করেছেন। তাঁরা উজিরের উপাধিকে যথাস্থানেই প্রয়োগ করেন। পরে অবশ্য তারা উমাইয়া সাম্রাজ্যের অনুকরণ করে শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন করত 'হাজেব'কেই উজির বলতে আরম্ভ করেন। তখন তার দায়িত্ব হয় দরবারে সুলতানের প্রতিরক্ষা, তাঁর সমীপে আগত প্রতিনিধি ও অন্যান্য লোকের তত্ত্বাবধান, তাদেরকে স্বাগত জানান ও তাদের প্রতি ভাষণদান এবং সুলতানের সম্মুখে পালনীয় অন্যান্য আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ রাখা। আল-মোহেদরা হাজেবের এ পদটিকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেন। এভাবে তাদের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে বর্তমানকাল পর্যন্ত চলে এসেছে।

---

১১২. রোজেনথালে এই বাক্যটি নেই।

অবশ্য পূর্বাঞ্চলের তুর্কি সাম্রাজ্যে এ ধরনের পদমর্যাদার অধিকারী, যিনি সুলতানের দরবারে আগত লোকের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন, তাদের জন্য স্বাগত ভাষণদান এবং প্রতিনিধি দলকে সুলতানের সম্মুখে পেশ করার দায়িত্ব পালন করেন, তাঁকে 'দাবিদার' বলা হয়। ইনি সুলতানের গোপন তথ্যাদির লেখকের দায়িত্বও পালন করেন। তদুপরি সুলতানের প্রয়োজনে নিকটে ও দূরে সংবাদ বহনকারীদের তত্ত্বাবধানও তাঁর দায়িত্বে ন্যস্ত থাকে। বর্তমানকালেও তাদের মধ্যে এ অবস্থা প্রচলিত। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন, তার সকল বিষয়ে সহায়ক হন।

হেজাবত (দ্বাররক্ষা)

আমরা পূর্বে বলেছি যে, এ পদবীটি উমাইয়া ও আব্বাসী সাম্রাজ্যে একটি বিশেষ পদমর্যাদার জন্য নির্ধারিত ছিল। যিনি সাধারণ মানুষ ও সম্রাটের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে সময়মত দ্বার বন্ধ ও উন্মুক্ত করবার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন, তাঁকেই এ পদবীতে ভূষিত করা হত। এ বিভাগটি তৎকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসাবে গণ্য করা হত না এবং অন্য বিভাগের অধীনে ন্যস্ত থাকত। কারণ উজির প্রয়োজন মনে করলে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন। আব্বাসী সাম্রাজ্যের শেষ অবধি এর অবস্থা এরূপ ছিল এবং এখনো এ অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। মিশরে এটা 'নায়েব' নামীয় উচ্চপদমর্যাদার অধীনে ন্যস্ত একটি উপবিভাগ মাত্র।

অবশ্য আন্দালুসের উমাইয়া সাম্রাজ্যে 'হাজেব' বলতে তাঁকেই বোঝাত, যিনি সম্রাটের দর্শনার্থী বিশেষ সাধারণ নির্বিশেষে সকলকে নিয়ন্ত্রণ এবং সম্রাট ও উজিরদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। সুতরাং এ পদটি তাদের সাম্রাজ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিল, যেমন তাদের ইতিহাস বর্ণনাকালে, পাঠক, এটা লক্ষ করতে পারবেন। ইবনে হাদিদ[১১৩] ও অন্যরা এ হাজেবের পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর সাম্রাজ্যের উপর অন্যায্য প্রভাব দেখা দিলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মর্যাদার জন্যই এ হাজেব উপাধি গ্রহণ করতেন। আল মনসুর ইবনে আবি আমের ও পুত্রগণ এ উপাধি ব্যবহার করেছেন। এর পরে রাজশক্তির আবির্ভাব ঘটিয়ে তার চালচলন প্রবর্তন করলেও ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ এ উপাধি ত্যাগ করেননি এবং তাঁরা এর ব্যবহারকে সম্মানের বিষয় বলে মনে করতেন। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজন্যও রাজকীয় উপাধি ও নাম ব্যবহার করার পর 'হাজেব' এবং 'জুল উজারতাইন' (দুই উজারতের অধিকারী) পদবী দুটি গ্রহণ করতেন। এর প্রথমটির দ্বারা সম্রাটের দর্শনপ্রার্থী বিশেষ ও সাধারণকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বোঝাত এবং দ্বিতীয়টির দ্বারা অসি ও মসী—এ উভয় বিভাগের উপর সার্বিক অধিকার বোঝাত।

এর পর মাগরিব ও আফ্রিকিয়ার সাম্রাজ্যগুলোতে প্রান্তরীয় জীবনবোধের প্রাধান্যের জন্য এ পদবীটির কোনো উল্লেখ দেখা যায় না। কখনো কখনো মিশরের উবাইদী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির সময় এ পদবীটি ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু তার পরিমাণ খুবই নগণ্য।

---

১১৩. রোজেনথালে 'ইবনে হুদাইর'। আবুল আসবাগ ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ৩২০ (৯৩২ খ্রি:) হি.।

আল-মোহেদ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরও তাতে এ সকল উপাধি ও পদবী ব্যবহারযোগ্য সমৃদ্ধি না আনা পর্যন্ত এগুলো ব্যবহৃত হয়নি এবং এ কারণে এরূপ ব্যবহার দেখা যায় না। তারা উজিরের পদটিকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন এবং প্রথম দিকে উজির বলতে বিশেষভাবে সম্রাটের অন্তরঙ্গ লেখক সহচরকেই বোঝাতেন। যেমন ইবনে আতিয়া ও আব্দুস্‌সালাম আলকুমী।[১১৪] এতদ্‌সঙ্গে আয়ব্যয়ের হিসাব ও আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে দৃষ্টিদান তার দায়িত্বের মধ্যে গণ্য ছিল। অতঃপর উজির বলতে সাম্রাজ্যাধিপতি বংশের অর্থাৎ আল-মোহেদদের মধ্যে যিনি উক্ত দায়িত্বে নিযুক্ত হতেন, তাকে বোঝাত; যেমন ইবনে জামি[১১৫] ও অন্যরা। তৎকালে হাজেব পদবীটি তাদের মধ্যে পরিচিত ছিল না।

আফ্রিকিয়ার বনি আবু হেফ্‌সদের সাম্রাজ্যে প্রথম থেকেই এ সকল পদবীর ব্যবহার ছিল এবং তারা মন্ত্রণা ও পরামর্শের জন্য উজিরের পদটিকে প্রাধান্য দিতেন। তারা একে 'শায়খুল মুয়াহ্‌হেদীন' (একেশ্বরবাদীদের নেতা) বলে বিশিষ্ট করেছিলেন। ইনি নিয়োগ ও পদচ্যুতি, সৈন্য পরিচালনা এবং যুদ্ধাদির ব্যাপারে লক্ষ রাখতেন। নথিপত্র ও আয়ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের বিষয়টি একটি পৃথক পদ হিসাবে বিরাজমান ছিল। এর অধিকারীকে 'সাহেবে আশগাল' (বিষয় কর্তা) বলে ডাকা হত। তিনি আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে সার্বিক দৃষ্টি রাখতেন, সম্পদের হিসাব নেয়া, তার আদায়ের ব্যবস্থা করা এবং অনাদায়ে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারটিও তার দায়িত্বে ছিল। এ পদের একটি শর্ত এই ছিল যে, তাকে আল-মোহেদদের একজন হতে হবে। লেখনীর ব্যাপারটি তাদের মধ্যে গোপন তথ্যাদি সম্পর্কে বিশ্বস্ত এমন একজনের উপর ন্যস্ত হত, যিনি এ ব্যাপারে ভালো জ্ঞান রাখেন। কারণ তাদের মধ্যে এর প্রচলন এবং তাদের ভাষায় পত্রাদি রচনারও কোনো ধারা ছিল না। এজন্যই এ ব্যাপারে বংশের শর্তটি আরোপ করা হয়নি। তদুপরি সুলতান তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও পোষ্যবর্গের আধিক্যের জন্য রাজপ্রাসাদে এমন একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্তির প্রয়োজন অনুভব করতেন, যিনি পোষ্যদের মধ্যে যথাযোগ্য শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন এবং তাদের আহার্য, প্রাপ্য, পরিচ্ছদ, রন্ধনশালার ব্যয় ও আস্তাবলের খরচ ইত্যাদির যথাবিহিত ব্যবস্থা করবেন। তিনি ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধান এবং রাজকোষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দের নির্দেশ প্রদান করবেন। তাঁরা এ পদটিকে 'হাজেব' বলতেন। অনেক সময় তাঁর দায়িত্বে নথিপত্রে রাজকীয় চিহ্নাদি ব্যবহারের কাজটিও অর্পণ করা হত। অবশ্য এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাঁর দক্ষতাই এ যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল; নতুবা চিহ্নগুলো প্রদানের কাজটি অন্য কারো উপর ন্যস্ত করা হত।

অবস্থা এভাবেই চলছিল। সুলতান নিজেই নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেন। এ অবস্থায় হাজেব সম্রাট ও অন্যান্য সকল পদমর্যাদাধারীদের মধ্যে মাধ্যম হিসাবে কাজ করতেন। সাম্রাজ্যের শেষ দিকে তার দায়িত্বে তরবারী ও যুদ্ধের ব্যাপারটিও যোগ করা

---

১১৪. ইবনে আতিয়া; মৃত্যু ৫৫৩ (১১৫৮ খ্রি.) হি.। আলকুমী; খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে জীবিত ছিলেন।

১১৫. খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সক্রিয় ছিলেন।

হয় এবং এক সময়ে তার পরামর্শ ও মতামতও সুলতানকে গ্রহণ করতে দেখা যায়। এর ফলে এ পদটি অন্য সকল পদমর্যাদা থেকে উন্নত ও সার্বিক হয়ে দাঁড়ায়। এর পর উক্ত সাম্রাজ্যের দ্বাদশ সুলতানের[১১৬] পরে সাময়িকভাবে অন্যায্য প্রভাবের যুগ আরম্ভ হয়। কিন্তু সুলতানের পৌত্র সুলতান আবুল আব্বাস পুনরায় সকল ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। অন্যায্য প্রভাবের সোপান হাজেব পদটি উঠিয়ে দেয়ার ফলে সকল প্রকার অন্যায্য প্রভাব ও অবরুদ্ধ অবস্থার অবসান ঘটে। সুলতান নিজেই সমস্ত কাজকর্মের দেখাশোনা আরম্ভ করেন এবং বর্তমানকালেও অবস্থা অনুরূপভাবেই চলছে।

মাগরিবের জানাতী সাম্রাজ্য, তার মধ্যে সর্ববৃহৎটি হল বনি মারিনের। তাদের মধ্যে হাজেব পদের কোনো চিহ্ন নেই। সেখানে যুদ্ধ ও সৈন্যদলের নেতৃত্বের ব্যাপারটি উজিরের দায়িত্বে ন্যাস্ত। হিসাব-নিকাশ ও পত্রাদি রচনার লেখনী সংক্রান্ত বিষয়টি তৎসম্পর্কে যোগ্য লোকের হাতে অর্পিত এবং এ পদে তাদের সাম্রাজ্যের কর্মে নিয়োজিত কিছু সংখ্যক পরিবারের মধ্যে তা প্রায় সীমাবদ্ধ। অবশ্য অনেক সময় বাইরের লোককেও এ ব্যাপারে নিয়োগ করা হয়। সুলতানের দ্বার ও তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ব্যাপারটিও তাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ। এ পদে নিয়োজিত ব্যক্তিকে বলা হয় 'মিযবার', এর অর্থ প্রধান অর্থাৎ ইনি সম্রাটের প্রাসাদে নিযুক্ত 'জান্দার' রক্ষীদের উপর কর্তৃত্বকারী। এ রক্ষীদল সম্রাটের নির্দেশ কার্যকরী করা, তাঁর দ্বারা প্রদত্ত শাস্তি প্রয়োগ করা, তাঁর শৌর্যবীর্য প্রকাশ করা এবং তাঁর কারাগারে আবদ্ধ বন্দীদের প্রতি দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ রক্ষীদলেরও একজন নেতা আছেন, রাজপ্রাসাদের নিরাপত্তা তার হাতে ন্যস্ত। রাজদরবারে আগত সাধারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও তাঁর এবং তিনিই তাদের যথাযোগ্য মর্যাদায় বিন্যস্ত করেন। তা যেন উজারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

কিন্তু বনি আবদেল ওয়াদ সাম্রাজ্যে এ সকল পদমর্যাদার কোনো চিহ্ন নেই এবং তাদের প্রান্তরীয় জীবনবোধ ও সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্রাকৃতির জন্য পদমর্যাদার বিশিষ্টতা নেই বললেই চলে। অনেক সময় তারা সুলতানের প্রাসাদের ব্যাপারে তত্ত্বাবধানকারীকে 'হাজেব' বলে থাকে; যেমন বনি আবু হেফ্সের সাম্রাজ্যে ছিল। কখনো এর সাথে হিসাব-নিকাশ ও নথিপত্র সংরক্ষণের দায়িত্বও যোগ করা হয়, যেমন পূর্বোক্তটির মধ্যে দেখা গেছে। এরূপ হওয়ার কারণ এ যে, তারা এক সময়ে পূর্বোক্ত সাম্রাজ্যের অধীনে তাদের মতবাদ নিয়েই আন্দোলনে নেমেছিল এবং এখন স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভের পরও তাদেরকেই অনুসরণ করছে।

বর্তমানকালে আন্দালুসবাসীদের মধ্যে সুলতানের বিশেষ সহকারী, হিসাব-নিকাশের তত্ত্বাবধায়ক এবং আর্থিক যাবতীয় লেনদেনের বিষয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিকে বলা হয় 'উকিল'। উজিরের পদটি উজিরের তুল্যই; অবশ্য অনেক সময় তার সাথে পত্রাদি রচনার ব্যাপারও যোগ করা হয়। তাদের মধ্যে সুলতান নিজেই নথিপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করেন। এজন্য সেইখানে অন্যান্য স্থানের ন্যায় রাজকীয় নথিপত্রে চিহ্নাদি প্রদানকারীর কোনো পদ নেই।

---

১১৬. আবু বকর; ১৩১৮-১৩৪৬ খ্রি.।

মিশরের তুর্কি সাম্রাজ্যে হাজেব বলতে তুর্কি গোত্রভুক্ত প্রতাপশালী শাসককে বোঝায়, যিনি শহরাঞ্চলের নাগরিকদের মধ্যে বিধি-নিষেধ কার্যকরী করে থাকেন। তাঁদের সংখ্যা অনেক। তাদের নিকট এ পদটি নায়েবের পদের নিম্নে অবস্থিত। কারণ নায়েব সাম্রাজ্যের সাধারণ সকল ব্যাপারেই নির্দেশাদি প্রদানের ক্ষমতাধারী। অনেক সময় নায়েব বিভিন্ন দায়িত্বে লোক নিয়োগ ও পদচ্যুত করার ক্ষমতাও রাখেন। তিনি সামান্য পরিমাণ বেতনাদি মওকুফ ও মঞ্জুর করারও দায়িত্ব পালন করেন। সুলতানী নির্দেশের মতোই তাঁর অন্যান্য নির্দেশ প্রতিপালিত হয়ে থাকে। বস্তুত তিনি সম্রাটের সার্বিক বিষয়ে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য। কিন্তু হাজেবরা শুধু সাধারণ মানুষের উপরই নির্দেশ প্রদান করতে পারেন, অবশ্য সৈন্যদের সম্পর্কে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে, সে ক্ষেত্রেও তারা নির্দেশ দানের অধিকারী। যদি কোনো নাগরিক তাদের নির্দেশ অমান্য করে, তেমন পরিস্থিতিতে তারা বলপ্রয়োগেরও অধিকারী। পদমর্যাদার দিক থেকে তারা নায়েবের নিচে অবস্থান করে।

তুর্কি সাম্রাজ্যে উজির রাজকোষের আয়ব্যয় সম্পর্কে তত্ত্বাবধান করেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার কর; যেমন রাজস্ব, শুল্ক ও মাথট আদায় এবং তা সুলতানের নিজস্ব ও সাধারণ খাতে ব্যয় করার দায়িত্ব বহন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি উক্ত বিভাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল কর্মচারীর নিয়োগ ও পদচ্যুতির ক্ষমতা রাখেন এবং তাদের পদমর্যাদা ও প্রকারভেদে নির্দেশাদি প্রদান করেন। তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে প্রচলিত প্রথা হল, উক্ত উজির মিশরীয় কিবতীদের মধ্য থেকে হবেন। কারণ তারা বহু প্রাচীনকাল থেকে মিশরের রাজকোষ ও হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে দক্ষতার অধিকারী। সুলতান অনেক সময় প্রয়োজন মনে করলে প্রতাপশালী কোনো তুর্কিকে অথবা তাঁর সন্তান-সন্ততিকে এ পদে নিয়োগ করে থাকেন। আল্লাহ্ তাঁর বিচক্ষণতার সাথে সমুদয় বিষয়ের সংগঠন ও পরিবর্তন করে থাকেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের তিনিই প্রতিপালক।

সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব ও রাজকোষ দপ্তর

জেনে রাখুন এ দায়িত্বটি রাজকীয় দায়িত্বাবলির মধ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটা রাজকোষ সম্পর্কীয় যাবতীয় তৎপরতার পরিচালনা করা, আয়ব্যয়ে সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষা করা এবং সৈন্যদলের নাম লিপিবদ্ধ করত যথাবিহিত বেতনাদি নির্ধারণ করা ও যথাসময়ে তা প্রদান করা। এ ব্যাপারে যে নিয়মাবলি পালন করতে হয়, তা এ সকল তৎপরতার পরিচালকগণ এবং সাম্রাজ্যের পারিবারিক অধ্যক্ষগণ ধারাবাহিকভাবে রচনা করেছেন। এর সমুদয় নিয়ম আয়-ব্যায়ের হিসাব ও গণিতের একটা বৃহৎ অংশসহ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উক্ত তৎপরতার সাথে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ব্যতীত এগুলো সম্পর্কে অন্যদের কিছু করার নেই। এ নিয়মাবলি সংবলিত গ্রন্থটিকে 'দেওয়ান' বলা হয় এবং উক্ত তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা যে গৃহে একত্রে বসে, তাকেও এ নামে ডাকা হয়। বলা হয় যে, এ নামকরণের উৎস হল পারস্যরাজ খসরু একদিন তাঁর দরবার কক্ষে হিসাব-নিকাশকারীদেরকে দেখলেন, তারা গভীর মনোযোগের সাথে

এমনভাবে হিসাব করছে যেন তারা আপন মনে কথা বলছে। তিনি এটা দেখে বলে উঠলেন, 'দেওয়ানা' অর্থাৎ ফারসি ভাষায় এর অর্থ পাগল। অতঃপর তাদের ঐ বসবার স্থানটিকে ঐ নামে ডাকা হতে লাগল। শব্দটির শেষ আকারটি অত্যধিক ব্যবহারের দরুন লোপ পেয়েছে এবং সহজ উচ্চারণে এটা দেওয়ানে পরিণত হয়েছে। এর পর এ শব্দটি হিসাব-নিকাশ ও রাজকোষ সম্পর্কীয় তৎপরতার নিয়মাবলি সংবলিত গ্রন্থের নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অনেকে বলেন, ফারসি ভাষায় এ শব্দটির অর্থ শয়তান এবং এর দ্বারা এ জন্যই নামকরণ করা হয়েছে যে, এ তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অতিদ্রুত এ সকল বিষয় বুঝতে পারে এবং তার প্রকাশ্য ও গোপন তত্ত্বাদি জানতে পারে। এভাবে এর বিচ্ছিন্ন ও বিরল দৃষ্টান্তগুলোও তারা সত্বর একত্র করতে সক্ষম। অতঃপর এ শব্দটিই তাদের বসবার স্থানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ জন্য এ শব্দটি একাধারে পত্রাদি লিপিবদ্ধ করার বহি এবং সুলতানের প্রাসাদে বসবার স্থানকে বোঝাচ্ছে, যেমন পরে আমরা বর্ণনা করব।

কখনও রাজকোষ সম্পর্কীয় এ তৎপরতার জন্য সার্বিকভাবে একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হত এবং কখনো তার প্রতিটি অংশের জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক থাকত। যেমন অনেক সাম্রাজ্যে পূর্বসূরিদের ধারা ও প্রয়োজনের তাগিদে সৈন্যদল, তাদের জায়গীর ও বেতনাদির হিসাব নিকাশের জন্য একজন পৃথক তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত থাকত। জেনে রাখুন যে, এ বিভাগটি যে কোনো সাম্রাজ্যে তখনি দেখা দিয়েছে, যখন তার প্রাধান্য বিস্তার ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত, তার বিভিন্ন স্বার্থ বিবেচিত এবং গঠনমূলক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

ইসলামী সাম্রাজ্যে হজরত উমর (রাঃ) সর্বপ্রথম এ দেওয়ানের প্রতিষ্ঠা করেন। এর কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, হজরত আবু হোরায়রা বাহরাইন থেকে ধনসম্পদ নিয়ে এলে তার পরিমাণ এত অধিক হয়ে দাঁড়ায় যে, তার বণ্টনের ব্যবস্থা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ফলে সাহাবীরা সম্পদের গণনা এবং তৎসম্পর্কিত প্রাপ্য ও স্বত্বের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হন। এ সময় খালেদ ইবনে ওলিদ দেওয়ানের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন যে, সিরিয়ায় আমি রাজন্যবর্গকে দেখেছি, তারা 'দেওয়ান' সংরক্ষণ করেন। এর ফলে হজরত উমর তা গ্রহণ করেন। আরো বলা হয় যে, বরং এ সম্পর্কে হরমুজান'[১১৭] তাঁকে ইঙ্গিত দেয়। কারণ সে দেখতে পায় যে, কোনো প্রকার দেওয়ান সরংক্ষণ ব্যতীতই বিভিন্ন দিকে অভিযান প্রেরণ করা হচ্ছে। সুতরাং তাঁকে বলা হয়, সৈন্যদলের মধ্য থেকে কেউ যদি সরে পড়ে, তা হলে তা জানার উপায় কি? কারণ তার পশ্চাতে যে আছে, সে তার স্থান পূর্ণ করে ফেলবে। শুধু একটি বইই এ হিসাব সংরক্ষণ করতে পারে। এভাবে দেওয়ানের উৎপত্তি ঘটে। হজরত উমর (রাঃ) দেওয়ান নামের তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং তার ব্যাখ্যা তাঁকে দেওয়াও হয়েছিল। যখন তিনি তা স্থাপন করতে মনস্থ করলেন, তখন আকিল ইবনে আবু তালেব[১১৮], মাহরামা ইবনে নওফেল[১১৯]

---

১১৭. আহওয়াজের শাসক, ইরাক বিজয়ের সময় ধৃত হন।

১১৮. হজরত আলীর বড় ভাই; ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

১১৯. রোজেনথালে 'মার্কারামা'; মৃত্যুকাল ৫৪ (৬৭৪ খ্রি.) হি.।

জুবায়ের ইবনে মুতয়েম[১২০] প্রমুখ কোরায়েশ বংশীয় লেখকদেরকে এ সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। তাঁরা ইসলামী সৈন্যদলের দেওয়ান লিপিবদ্ধ করলেন। এক্ষেত্রে হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর আত্মীয়তার সূত্র ধরে পর্যায়ক্রমে ঘনিষ্ঠ থেকে অঘনিষ্ঠদের নাম তালিকাভুক্ত করা হল। এভাবেই সৈন্যদলের দেওয়ানের আরম্ভ হয়েছিল। সাইদ ইবনেল মুসাইয়ের[১২১] থেকে ইমাম আয্যুহরী[১২২] বর্ণনা করেছেন যে, এটা বিশ হিজরির মোহররম মাসে আরম্ভ হয়।

রাজস্ব ও রাজকোষের দেওয়ান ইসলামের আবির্ভাবের পরেও তার পূর্বের ন্যায়ই ছিল। ইরাকের দেওয়ান ফারসি ভাষায় এবং সিরিয়ার দেওয়ান রোমান ভাষায় লেখা হত। এ সকল দেওয়ানের লেখকরা এতদুভয় অঞ্চলের প্রজাদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত হত। এর পর আবদুল মালেক ইবনে মারোয়ানের সময় রাজশক্তির আবির্ভাব ঘটল। জাতি তখন প্রান্তরীয় সারল্য ত্যাগ করে নাগরিক জীবনের চাকচিক্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে এবং নিরক্ষরতার স্থূলতা থেকে লিপি চাতুর্যের সূক্ষ্মতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। আরব ও তাদের আশ্রিত পোষ্যরা এ বিষয়ে দক্ষতা লাভ করেছে। আবদুল মালেক তাঁর সময়ের জর্ডনের শাসক সুলায়মান ইবনে সাইদকে সেখানকার দেওয়ান আরবি ভাষায় লিপিবদ্ধ করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি নির্দেশ মত আরম্ভ করার দিন থেকে এক বছরের মধ্যে এটা শেষ করেন। আবদুল মালেকের লেখক 'সারজুন'[১২৩] এর সংবাদ জানতে পেরে রোমান ভাষার লেখকদেরকে বলেছিলেন, তোমরা এ শিল্প ছাড়া অন্য শিল্পকর্মে তোমাদের জীবিকা অন্বেষণ কর। কারণ আল্লাহ্ এটাও তোমাদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন।

ইরাকের দেওয়ান সম্পর্কে আল হাজ্জাজ তাঁর লেখক সালেহ ইবনে আবদুর রহমানকে অনুরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি পূর্ববর্তী লেখক 'যাদান ফাররুখের' শিক্ষা অনুসারে আরবি ও ফারসি উভয় ভাষাতে লিখতেন। অতঃপর যখন 'যাদান' আবদুর রহমান ইবনেল আসআদ্-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হলেন,[১২৪] তখন হাজ্জাজ এ সালেহকে তার স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং দেওয়ানকে ফারসি থেকে আরবি ভাষায় রূপান্তরিত করতে নির্দেশ দিলেন। সালেহ ফারসি ভাষার লেখকদের বিরোধিতা সত্ত্বেও এ কাজ শেষ করেছিলেন। এজন্য আবদুল হামিদ ইবনে ইয়াহিয়া বলতেন, সালেহ অদ্ভুতকর্মা লোক ছিলেন, লেখকদের উপর তার অবদানের প্রতিক্রিয়া কী গভীরভাবেই না অনুভূত হচ্ছে।

অতঃপর আব্বাসী সাম্রাজ্যে এ পদটি যিনি এ ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করতেন, তার দায়িত্বের সাথে যুক্ত করা হয়। যেমন বনি বারমেক, বনি সহল ইবনে নওবখত এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য উজিরগণ এ দায়িত্ব পালন করেছেন।

---

১২০. তাঁর মৃত্যুকাল ৫৬-৫৯ (৬৭৬-৬৭৯ খ্রি.) হিজরির মধ্যবর্তীকাল।
১২১. মৃত্যুকাল প্রায় হিজরি প্রথম শতাব্দীর দিকে।
১২২. ১২নং পৃষ্ঠার ২১ নং টীকা দ্র:
১২৩. রোজেনথালে 'মারহুন'; মূল গ্রিক সার্জিয়াম।
১২৪. যুদ্ধটি ৮৫ (৭০৪ খ্রি.) হিজরিতে অনুষ্ঠিত হয়।

এ পদটির সাথে ধর্মীয় বিধিনিষেধের যে সম্পর্ক বিদ্যমান, বিশেষ করে সৈন্যদল, রাজকোষের আয়-ব্যয়, সন্ধি ও বিজয় অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলের পার্থক্য নির্ধারণ, এ সকল ব্যাপারে তত্ত্বাবধানকারীর বিশেষ মতাদর্শ ও তৎসম্পর্কিত অন্য শর্তাবলি লেখক ও হিসাব-নিকাশের নিয়মসমূহ—এ সমুদয়ই শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কীয় গ্রন্থাদিতে বিদ্যমান[১২৫] এবং তজ্জন্য সেখানকার বিস্তারিত বিবরণ অনুসরণ করতে হবে। আমাদের বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য এগুলো বর্ণনা করা নয়; বরং আমরা রাজশক্তির সেই স্বাভাবিক অবস্থা বর্ণনা করব, যে উদ্দেশ্যে আমাদের আলোচনা আরম্ভ করেছি।

এ পদটি রাজশক্তির একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ অংশ; বরং বলা যায় এটা সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলের এক-তৃতীয়াংশ। কারণ প্রত্যেক রাজশক্তির জন্যই সৈন্যদল, রাজকোষ এবং দূরস্থিত ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে। এজন্য রাজ্যাধিকারী তরবারি, লেখনী ও রাজকোষের ব্যাপারে সাহায্যকারীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। সুতরাং এ পদগুলোর অধিকারী ব্যক্তিরা রাজশক্তির একটা বিশেষ অংশের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব লাভ করেন।

আন্দালুসের বনি উমাইয়া সাম্রাজ্য এবং তৎপরবর্তী ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের আমলে উক্ত পদের অনুরূপ অবস্থাই বিরাজমান ছিল।

আল-মোহেদ সাম্রাজ্যে উক্ত পদের অধিকারী আল-মোহেদদের মধ্য থেকেই নিয়োজিত হতেন এবং তিনি স্বাধীনভাবে রাজস্ব আদায়, সঞ্চয়, সংরক্ষণ এবং তৎসম্পর্কীয় কর্মচারী ও অন্যান্য পদ সম্বন্ধে বিবেচনার দায়িত্ব পালন করতেন। যথাসময়ে রাজকোষের যথাবিহিত ব্যয়াদিও তার জিম্মায় থাকত। তার পরিচয় ছিল 'সাহেব আশগাল' বা কর্মাধিকারী অনেক সময় এ পদ আল-মোহেদ ব্যতীত দক্ষ অন্য লোকেরও করতলগত হত।

বনি আবু হেফস আফ্রিকিয়ার ক্ষমতা দখল করার সময় আন্দালুসে নির্বাসন পর্ব চলছে। ফলে বাস্তুত্যাগী বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার আফ্রিকিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন, যারা আন্দালুসে উপরোক্ত পদমর্যাদায় নিয়োজিত ছিলেন। যেমন গ্রানাডার পার্শ্ববর্তী আলকেলআর অধিকারী বনি সাইদ[১২৬] যারা বনি আবুল হাসান নামেই অধিকতর পরিচিত। বনি আবু হেফস তাদেরকে উক্ত পদে নিয়োজিত করে আন্দালুসের মতোই কর্মাধিকারী করলেন। এভাবে তারা কখনো বনি আবুল হাসানকে, আবার কখনো আল-মোহেদদেরকে এ রাজকোষের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত করেছিলেন। অতঃপর তা আল-মোহেদদের আয়ত্তাধীন থেকে বহির্গত হয়ে লিপি ও হিসাবে সুদক্ষ ব্যক্তিদের হস্তে ন্যস্ত হয়। এর পর হাজেবের পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলে এবং সাম্রাজ্যের সকল ব্যাপারে তার নির্দেশ কার্যকরী হতে আরম্ভ করলে, এ ধারার অপমৃত্যু হয়। উক্ত পদমর্যাদার অধিকারী হাজেবের অধীনস্থ হয়ে পড়েন এবং তার অবস্থা রাজকোষ সম্পর্কীয় অন্যান্য কর্মচারীর সমতুল্য বিবেচিত হয়। সাম্রাজ্যে তার যে বিশেষ পদমর্যাদা ছিল, তা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়।

---

১২৫. 'আহকাম মুস্ সুলতানিয়া'।

১২৬. বিখ্যাত ঐতিহাসিকের বংশ; ৭২ পৃষ্ঠার ৪০ নং টীকা দ্র.।

বর্তমানকালে বনি মারিন সাম্রাজ্যে প্রাপ্যাদি বণ্টন ও রাজস্ব আদায়ের হিসাব-নিকাশ একই ব্যক্তির দায়িত্বে ন্যস্ত। তিনিই সর্বপ্রকার হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করে থাকেন। সুলতান অথবা উজিরের পরেই দেওয়ান ও তৎসম্পর্কীয় তত্ত্বাবধানে তার স্থান এবং প্রাপ্যাদি ও রাজস্ব সম্পর্কীয় হিসাব-নিকাশে তার স্বাক্ষর প্রামাণ্য বলে গণ্য করা হয়।

শাসন ব্যবস্থায় এগুলোই গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক পদমর্যাদা ও দায়িত্ব এবং এগুলোর ব্যাপকতা ও সুলতানের সাথে এগুলোর সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার জন্যই সমুন্নত মর্যাদা বলে মনে করা হয়।

তুর্কি সাম্রাজ্যে এ পদমর্যাদাগুলো বিভিন্ন ধরনের। বেতনাদির দেওয়ানের অধিকারীকে সৈন্যদলের তত্ত্বাবধায়ক বলা হয়। সম্পদের তত্ত্বাবধায়কের নাম উজির; ইনি রাজকোষের সামগ্রিক ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করেন। সম্পদ সম্পর্কীয় সকল পদমর্যাদার মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ। কারণ সম্পদ সম্পর্কীয় তত্ত্বাবধানের পদ তাদের অধীন বহু এবং সাম্রাজ্যের বিস্তার ও তার বিরাটত্বের জন্যই এরূপ হয়েছে। বস্তুত তার ব্যাপক সম্পদ ও রাজকোষের তত্ত্বাবধান কোনো একব্যক্তির পক্ষে, তার ক্ষমতা যত বেশিই হোক না কেন, সম্ভব নয়। এ জন্য সকল পদাদির উপর সাধারণ দৃষ্টিদানের দায়িত্বই উজিরকে দেয়া হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও উজির সুলতানের আশ্রিতপোষ্য, গোত্রপ্রীতির অধিকারী ও সাম্রাজ্যের তরবারীর উপর ক্ষমতাবান যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষা হীন মর্যাদার অধিকারী। তার ক্ষমতা ঐ ব্যক্তির ক্ষমতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তার অনুসরণেই উজির নিজের তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। এরূপ ক্ষমতাবান ব্যক্তিকে তারা 'উস্তাদুদ্দৌলা'[১২৭] বলে থাকেন। ইনি সাম্রাজ্যের ক্ষমতাবান সৈন্যদলের আমীরদের অন্যতম এবং তরবারি শক্তির অধিকারী।

তাদের মধ্যে প্রচলিত আরো কিছু সংখ্যক পদ, যা মূলত সম্পদ ও হিসাব সম্পর্কিত, উজিরের তত্ত্বাবধানের অধীন। এদের কতক বিশেষ ব্যাপারের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমন 'নাজিরখাম।'[১২৮] ইনি সুলতানের আর্থিক সঙ্গতি—তাঁর সম্পত্তি, রাজস্বের মধ্য থেকে তাঁর অংশ এবং রাজস্বের অধীন এমন সকল অঞ্চল, যা সাধারণ মুসলমানের সম্পত্তি নয়—এ সমুদয়ের তত্ত্বাবধান করে থাকেন। ইনি আমীর 'উস্তাদেদার'-এর অধীন। অবশ্য উজির যদি সৈন্যদলের কেউ হন, তা হলে তিনি আর উস্তাদেদারের অধীন হন না। নাজিরখাম সুলতানের আশ্রিতপোষ্য ও তাঁর খাজাঞ্চীর অধীনে থাকেন। উক্ত খাজাঞ্চীকে, তার বিশেষ দায়িত্ব তথা সুলতানী সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'খাজিনদার'[১২৯] বলা হয়।

পূর্বাঞ্চলের তুর্কি সাম্রাজ্যে আলোচ্য পদের এটাই বিবরণ। ইতিপূর্বে আমরা মাগরিবে এর অবস্থার কথা বর্ণনা করেছি। আল্লাহ্‌ই বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন; তিনিই একমাত্র প্রতিপালক।

---

১২৭. 'সাম্রাজ্য শিক্ষক'; এ উপাধি অন্যত্র 'উস্তাদেদার' রূপে দেখা দিয়েছে, যার অর্থ গৃহশিক্ষক। 'রোজেনথালে উস্তাদুদ্দৌলা' নেই।

১২৮. বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক।

১২৯. ভাণ্ডারী।

পত্রাদি ও লিপি সংক্রান্ত দপ্তর

এ বিভাগটি তেমন প্রয়োজনীয় নয়। কারণ অনেক সাম্রাজ্য আদৌ এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। যেমন সে সকল সাম্রাজ্যের প্রান্তরীয় জীবনবোধ দূর হয়ে নাগরিকত্বের পরিমার্জনা ও তদসম্পর্কীয় শিল্পজ্ঞান দেখা দেয়নি, তাদের মধ্যে এর অস্তিত্ব নেই। ইসলামী সাম্রাজ্যে আরবি ভাষার উন্নত অবস্থা ও মনোভাব প্রকাশে অলংকরণের তাগিদেই এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় পত্রের ভাষা মুখের ভাষা অপেক্ষা প্রয়োজনীয় মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী হয়েছে। এর গুরুত্বের জন্য শাসকের 'কাতেব' তাঁর বংশ ও গোত্রের অন্তর্গত কেউ হতেন। যেমন সিরিয়া ও ইরাকের খলিফা ও আমীর সাহাবীদের জন্য এরূপ লেখক নিযুক্ত থাকতেন। কারণ তাদের বিশ্বস্ততা ও গোপন তথ্যাদি সম্পর্কে আন্তরিকতার জন্যই এর প্রয়োজন হত। অতঃপর ভাষায় বিকৃতি দেখা দিলে বিষয়টি শিল্পকর্মে রূপান্তরিত হয় এবং তখন দক্ষ ব্যক্তিরাই এ কার্যে নিয়োজিত হতেন। আব্বাসী সাম্রাজ্যে কাতেবের পদমর্যাদা উন্নত ছিল। তিনি নথিপত্রের শেষে নিজের নাম স্বাক্ষর করে সুলতানের মহোরাঙ্কিত করতেন। এ সীলমোহরটি ঢালাই করা হত, যাতে সুলতানের নাম অথবা অন্য নিদর্শন থাকত। কাতেব এ সীলমোহর দ্বারা সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত এক প্রকার লাল মাটির উপর ছাপ দিতেন। পত্রাদির গোপনীয়তা রক্ষার জন্য উক্ত মাটির কাদা প্রস্তুত করে পত্রের ভাজ ও মিলনস্থলের উভয় দিকে সীলমোহর করা হত। এ মাটিকে সীলমোহরের মাটি বলত।

অতঃপর নথিপত্র সুলতানের নামেই জারি করা হত। কাতেব তার সম্মুখে বা পিছনে যথাস্থানে যথা নিয়মে নিজের চিহ্ন[১৩০] প্রদান করতেন। এর পর এ পদমর্যাদাটির গুরুত্ব হ্রাস পেল। সুলতানের নিকট অন্য পদমর্যাদার অধিকারীর স্থান বড় হয়ে উঠল কিংবা সামগ্রিকভাবে কোনো উজির অন্যায্য প্রভাব বিস্তার করে বসল। সুতরাং কাতেবের চিহ্ন সংশ্লিষ্ট শাসকের চিহ্নাদির অনুসারী এবং তাঁর নির্দেশের অনুযায়ী হত। বস্তুত কাতেবের স্বাক্ষর একটা প্রথা হিসাবেই বিদ্যমান ছিল এবং তাই বোঝাত। নির্দেশের মালিক ছিলেন সংশ্লিষ্ট শাসক। যেমন হেফসিয়া সাম্রাজ্যের শেষের দিকে যখন হাজেবের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেল এবং তার নির্দেশ কার্যকরী হতে লাগল ও অন্যান্য প্রভাবের আবির্ভাব ঘটল, তখন কাতেবের জন্য নির্দিষ্ট চিহ্নাদির ব্যবহার মূল্যহীন হয়ে দাঁড়াল। অবশ্য এতদসত্ত্বেও তার ধারা অব্যাহত ছিল এবং এর একমাত্র কারণ প্রাচীন প্রথার অনুবর্তন। হাজেব স্বয়ং কাতেবকে পত্রাদির বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ দিতেন এবং তার ইচ্ছা অনুযায়ীই পত্রাদির লিপি ও ধারা নির্ধারিত হত। কাতেব তার নির্দেশ পালন করতেন এবং প্রথা অনুযায়ী চিহ্নাদি ব্যবহার করতেন। কখনো সুলতান স্বয়ং এ ব্যাপারে অগ্রসর হতেন। অবশ্য এ অবস্থায় তাঁকে স্বাবলম্বী ও নিজস্ব প্রতাপের অধিকারী হতে হত এবং তিনি অনুরূপভাবে কাতেবকে বিষয়বস্তুর নির্দেশ দিতেন ও চিহ্নাদি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করতেন।

---

১৩০. 'আলামত'।

কাতেবের কার্যাদির মধ্যে একটি ছিল তত্তকি[১৩১] অর্থাৎ তিনি, সুলতানের দরবারে বিচার বা আলোচনা চলাকালে সেখানে উপস্থিত থেকে বক্তব্যের দ্বারা অনুসরণ করতেন এবং আলোচ্যমান বিষয়ে যে সকল মন্তব্য, নির্দেশ ও মীমাংসা আসত, তা লিপিবদ্ধ করতেন। কখনো এটা সুলতানের সংক্ষিপ্ত ও অলংকৃত বাক্যের ধারাতেই প্রকাশ পেত; আবার কখনো আবেদনকারীর পত্রের উপর লিখিত মন্তব্যের মধ্য দিয়ে কাতেব নিজে প্রকাশ করতেন। এজন্য 'তত্তকি' লেখককে অলংকারশাস্ত্রের কিছু জ্ঞান রাখতে হত, যাতে তার কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। সম্রাট হারুনুর রশীদের সময় জাফর ইবনে ইয়াহিয়া এরূপ 'তত্তকি' লিখতেন এবং আবেদনপত্রের শেষে তাঁর লিখিত মন্তব্যসহ তা আবেদনকারীকে ফেরত দিতেন। অলংকারশাস্ত্রবিদরা আগ্রহের সাথে এ সকল মন্তব্যের উদাহরণ সংগ্রহ করতেন, কেননা এগুলোতে অলংকারের বিভিন্ন প্রকার ও বিষয়াদির সুচারু দৃষ্টান্ত থাকত। বলা হয় যে, এরূপ বিবরণের শেষে লিখিত মন্তব্যগুলোর প্রত্যেকটি এক এক দিনারের বিনিময়ে বিক্রয় হত। এমনি ছিল সাম্রাজ্যের অবস্থা।

জেনে রাখুন, এ পদমর্যাদার জন্য উচ্চ শ্রেণীর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অমায়িক লোক নির্বাচন করা দরকার। তিনি গভীর জ্ঞান ও অলংকারশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের অধিকারী হবেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন মৌল বিষয় সম্পর্কে অধিকার থাকা প্রয়োজন, কেননা সম্রাটের দরবারে এর যে কোনোটিই আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং তার উপর মন্তব্য, নির্দেশ ও ইত্যাকার ক্ষমতা প্রকাশের প্রয়োজন হতে পারে। এতদসঙ্গে তাঁকে সুলতানী দরবারের আদব-কায়দা, সচ্চরিত্র ও সংশ্লিষ্ট গুণাবলির অধিকারী হতে হবে। যাতে উদ্দেশ্য বুঝে ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পত্রাদি রচনা ও বাক্যাদি গঠনের আলংকারিক যোগ্যতা তাঁর কুক্ষিগত হয়।

অনেক সময় কোনো কোনো সাম্রাজ্যে এ পদটি তরবারির অধিকারীদের দায়িত্বে ন্যস্ত হয়। কারণ সেখানে গোত্রপ্রীতির অধিকার সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি দেয়ার ফলে জ্ঞানের সাহায্যকে অগুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। সাম্রাজ্যের প্রয়োজনেই সুলতান সকল দায়িত্ব নিজের গোত্রান্তর্গত লোকদের মধ্যে বিতরণ করেন এবং সম্পদ, তরবারী ও লিপির জন্য তাঁর নিজের লোকদেরকেই ব্যবহার করেন। অবশ্য তরবারীর জন্য জ্ঞানের তেমন প্রয়োজন নেই; কিন্তু সম্পদ ও লিপির জন্য তার দরকার আছে। প্রথমটির জন্য হিসাব-নিকাশ ও দ্বিতীয়টির জন্য অলংকারশাস্ত্র। এজন্য সম্রাট এ শ্রেণীর লোকদের মধ্য থেকে প্রয়োজনের সময় কাউকে নির্বাচিত করেন এবং তার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে গোত্রান্তর্গত অন্য একজন উক্ত পদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকে এবং পদাধিকারীর দৃষ্টিকোণ তার দৃষ্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন বর্তমানকালের পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কি সাম্রাজ্যে এ অবস্থা বিদ্যমান। সেখানে লিপির ব্যাপারটি যদিও 'সাহেবে ইনশা'[১৩২] নামক পদাধিকারীর অধীন, তথাপি তার উপর তত্ত্বাবধানের জন্য গোত্রান্তর্গত 'দাবিদার' নামক একজন আমীর রয়েছেন। সুলতান উক্ত আমীরকেই বিশ্বাস এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার উপরই নির্ভর করেন। আমীরের অধীন উক্ত সাহেবে

১৩১. বাক্যার্থ ঘটনার বিবরণ।

১৩২. রচনা লেখক।

ইনশার নিকট থেকে শুধু আলংকারিক ভাষা, মনোভাব প্রকাশ যোগ্য বর্ণনা, গোপন তথ্যাদি সংরক্ষণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে সততা প্রত্যাশা করেন।

সে সকল সুপ্রচলিত শর্তাদির মাধ্যমে সুলতান উক্ত পদে লোক নিয়োগ করে থাকেন, তার সংখ্যা বহু। বস্তুত এগুলো সুলতানকে বিচিত্র শ্রেণীর লোকের মধ্য থেকে যোগ্য লোক নির্বাচনে ও তার পরিমার্জনা সাধনে সাহায্য করে। কাতেব আবদুল হামিদের[১৩৩] লিখিত একটি পত্রে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এ সবগুলোকে একত্র করা হয়েছে। অন্যান্য কাতেবদের উদ্দেশে লিখিত তাঁর পত্রটি নিম্নরূপ।

অন্যান্য লেখকের উদ্দেশে লেখক আবদুল হামিদের পত্র

অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে রক্ষা করুন, হে লিপি শিল্পীবৃন্দ! তিনি তোমাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করুন, শক্তি দিন এবং সৎপথে পরিচালিত করুন। অবশ্যই আল্লাহ্ মহান, সম্মান ও গৌরবের অধিকারী; নবী ও রসূলদের উপর তাঁর বিপুল শান্তি ও কল্যাণ আপতিত হোক এবং তাঁদের পরে মহামহিম রাজন্যবর্গ রয়েছেন। বস্তুত এভাবে আল্লাহ্ সকল মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যদিও তারা প্রকৃত প্রস্তাবে সমান। তিনি তাদেরকে বিভিন্ন শিল্পকর্ম ও বিচিত্র পেশার অধীন করেছেন, যাতে তারা তাদের জীবিকা ও আহার্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। হে লেখকবৃন্দ! তিনি তোমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ দিকে নিয়োজিত করেছেন। তোমরা বিনয়, অমায়িকতা, জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধির অধিকারী। তোমাদের সাহায্যে খেলাফতের সৌন্দর্য বিকশিত হয় এবং তার বিষয়াদি সুনিয়ন্ত্রিত হয়। তোমাদের সদুপদেশে আল্লাহ্ শাসন ব্যবস্থাকে জনকল্যাণমুখী করেন এবং নগরগুলোকে সমৃদ্ধি দান করেন। কোনো রাজশক্তিই তোমাদের সহায়তা ত্যাগ করতে পারে না এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তাও কেবল তোমাদের নিকটেই পেতে পারে। রাজশক্তির সাথে তোমাদের সম্পর্কের তুলনা হল, তোমরা তার কর্ণ, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে; তোমরা তার চক্ষু, যা দিয়ে সে অবলোকন করে; তোমরা তার জিহ্বা, যা দিয়ে সে মনোভাব প্রকাশ করে এবং তোমরা তার হস্ত যা দিয়ে সে স্পর্শ করে। আল্লাহ্ এভাবে শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে তোমাদেরকে যে সৌভাগ্য দান করেছেন, তা যেন তোমরা ভোগ করতে পার এবং তিনি যেন তোমাদের মধ্য থেকে তাঁর সম্পদের এ প্রাচুর্যকে উঠিয়ে না নেন। কোনো শিল্পীর জন্যই তোমাদের ন্যায় এত ব্যাপক সৎগুণাবলি ও বিচিত্র সুচরিত্রের অধিকারী হওয়ার প্রয়োজন নেই।

হে লেখকবৃন্দ! তোমরা যদি এ পত্রে উল্লেখিত গুণাবলির অধিকারী হতে! বস্তুত যে কোনো লেখকের পক্ষে নিজের দিক থেকে এবং যিনি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁর দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ সকল ব্যাপারের যোগ্য হওয়া প্রয়োজন। সে গাম্ভীর্যের সময় গম্ভীর, বিচারের সময় বুদ্ধিমান, অগ্রগতির সময় সাহসী, সংশয়ের সময় ধীরগামী এবং সততা ন্যায় ও সদাচারের ক্ষেত্রে আন্তরিক হবে। যা গোপন রাখার, তা গোপন রাখবে, বিপদে আপদে ধৈর্য ধারণ করবে এবং অনাগত সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কেও অবহিত

---

১৩৩. ইবনে 'ইয়াহিয়া, তাঁর পৃষ্ঠপোষক উমাইয়া সম্রাটের সাথে ১৩২ (৭৫০ খৃ:) হিজরিতে নিহত হন।

থাকবে। তার কর্তব্য হবে বিষয়াদিকে যথাস্থানে সংস্থাপন করা এবং দুর্ভাগ্যকে যথাযথ বিশ্লেষণ করে দেখা। জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে বিচরণ করবে এবং গভীরতা লাভ করবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জ্ঞান অবশ্যই সংগ্রহ করে নিবে। সে তার প্রবল কাণ্ডজ্ঞান, সযত্ন বিনয় ও সুচারু অভিজ্ঞতার দ্বারা যা অনাগত, তার সম্ভাবনা জেনে নিবে এবং যা আগত, তার পরিণাম চিন্তা করবে। এভাবে প্রতিটি বিষয়ের জন্য যথার্থ প্রস্তুতি গ্রহণ ও আগ্রহ পোষণ করবে এবং তিনি কার্যকারণকে তার প্রকৃত স্বরূপ ও অভ্যাসের মধ্যে বিন্যস্ত করবে।

হে লেখকবৃন্দ! সর্বপ্রকার বিনয় অবলম্বনে তোমরা পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও। ধর্মকে হৃদয়ঙ্গম কর। মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র গ্রন্থ নিয়ে জ্ঞানার্জন আরম্ভ কর। উত্তরাধিকার আইন কণ্ঠস্থ কর। আরবি ভাষা শিখ; তাই তোমাদের ভাষার সুমার্জিত রূপ। এর পর হস্তাক্ষর সুন্দর কর; কারণ তা তোমাদের গ্রন্থের অলংকার। কাব্য পাঠ কর; তা বিরল গুণ ও তাৎপর্য অনুধাবন কর। আরব ও অনারবদের যুগপরম্পরা এবং তাদের কাহিনী ও চরিত্র জেনে নাও। এ সকলই তোমাদের মহান উদ্দেশ্যের সহায়ক হবে হিসাবশাস্ত্র সম্পর্কে অনবহিত থেক না; কেননা এটাই রাজস্ব লেখকদের ভিত্তি।

প্রলোভন থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখ, তা ভালোই হোক, বা মন্দই হোক; বোকামি ও হেয়তা যেন তোমাদেরকে স্পর্শ করতে না পারে। কারণ এতে শির অবনত হয় ও লেখকদের সম্মানের হানি ঘটে। তোমাদের শিল্পকর্মে যেন হীনমন্যতা ঠাঁই না পায়; পরনিন্দা ও কুৎসা রটনা থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখ; কেননা এগুলো একান্তই মূর্খদের স্বভাব। সাবধান অহংকার, উন্নাসিকতা ও আত্মশ্লাঘাকে স্থান দিও না; কেননা এগুলো কোনো কারণ ছাড়াই শত্রুতার জন্ম দেয়। মহান ও গৌরবময় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানে তোমরা তোমাদের শিল্পকর্মকে ভালোবাস এবং পূর্বসূরিদের মর্যাদা, ন্যায় ও গৌরবের ধারা অনুসরণ করে পরস্পরকে যোগ্যতর উপদেশ দান কর। যদি তোমাদের কাউকে সময় উৎপীড়ন করে, তা হলে তাকে সহায়তা করার জন্য তার প্রতি সহানুভূতিশীল হও, যাতে সে পুনরায় সচ্ছল অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে পারে এবং তার বৈষয়িক সুস্থতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি তোমাদের কেউ বার্ধক্যের জন্য জীবিকা অর্জন থেকে বিচ্যুত হয়ে বন্ধু-বান্ধবের সংসর্গ ত্যাগ করে গৃহে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তা হলে তাকে দেখতে যাও, পরামর্শ দাও এবং তার অভিজ্ঞতার মূল্য ও প্রাচীনত্বের গৌরব প্রকাশ কর। যাতে ঐ ব্যক্তি তার প্রয়োজনের সময় শিল্পকর্মের সাথী ও গৌরবের অংশীদার তোমাদেরকেই তার ভাই ও পুত্র অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় মনে করে।

তোমাদের মধ্যে কারো কার্যে যদি প্রশংসার কিছু থাকে, তা হলে তা যথার্থ প্রাপককেই প্রদান করো এবং যদি নিন্দার কিছু বের হয়ে যায়, তা হলে তাও যথাস্থানে সীমাবদ্ধ রেখ। অবস্থার পরিবর্তনে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও বিরক্তি প্রকাশ থেকে বিরত থেক। কারণ যে কোন প্রকার ত্রুটি কেরাত বিশারদগণ[১৩৪] অপেক্ষা, হে লেখকবৃন্দ, তোমাদের জন্য অধিকতর সহজ এবং তুলনামূলকভাবে অধিকতর ক্ষতিকর। তোমরা ত জানই, যে

১৩৪. মূলে 'আল কুর্রা' আছে, এর কেরাত (কোরান পাঠ) বিশারদ ও সাধারণ শিক্ষিত—উভয়ই বুঝায়।

ব্যক্তি তোমাদের সাহচর্যে এসে তোমাদের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছে, তার প্রতি তোমাদের কর্তব্য কী! তোমার উচিত তার প্রতিদান, কৃতজ্ঞতা, দায়িত্ব গ্রহণ, কল্যাণ কামনা, সদুপদেশ, গোপনীয়তা রক্ষা, কার্য কুশলতা প্রভৃতির মাধ্যমে তার প্রাপ্য আদায় করা। তার প্রয়োজনের সময় তোমার কার্যই এগুলোকে সত্য বলে প্রমাণ করবে এবং তার অস্থিরতা এর কল্যাণে দূরীভূত হবে। তোমরা এর গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করো। সম্পদে বিপদে, বঞ্চনায় বদান্যতায়, অনুগ্রহে ও সুখে-দুঃখে আল্লাহ্ তোমাদেরকে কর্তব্য পালনের শক্তি দান করুন। এগুলোই উত্তম চরিত্র এবং এ উন্নত শিল্পকর্মীদের এটাই নিদর্শন। যখন তোমাদের কারো উপর দায়িত্ব অর্পিত হয় অথবা আল্লাহ্র সৃষ্টির কল্যাণ কামনার কোনো কর্তব্যে নিয়োজিত হও, তখন মহান ও গৌরবান্বিত আল্লাহ্র দৃষ্টিকে স্মরণ রেখো। তাঁর প্রতি তোমার কর্তব্য পালন যেন দুর্বলের জন্য তোমাকে বন্ধু ও উৎপীড়িতের জন্য সুবিচার হিসাবে গড়ে তোলে। কারণ সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবার-পরিজন, তাদের মধ্যে সেই তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়, যে সর্বাপেক্ষা সহানুভূতিশীল।

তোমাদের প্রত্যেকের উচিত ন্যায়ের শাসক, সম্ভ্রান্তের পরিপোষক, প্রাপ্যাদির পরিপূরক, দেশের সমৃদ্ধি বিধায়ক, প্রজাদের মনোরঞ্জক ও তাদের দুর্গতিনাশক হওয়া। দরবারে যেন তোমরা বিনীত ও গম্ভীর হও এবং রাজস্ব সম্পর্কীয় নির্দেশাদিতেও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে বন্ধুতুল্য হতে পারে।

যদি কোনো ব্যক্তির[১৩৫] সাচহর্য লাভ তোমাদের ঘটে, তা হলে তার চরিত্রাদির অনুসন্ধান করো। তার ভালো-মন্দ জানবার পর যা ভালো, তদসম্পর্কে তাকে সাহায্য কর এবং মন্দ থেকে তাকে ফেরাবার সূক্ষ্ম কৌশল ও সুন্দর মাধ্যম অবলম্বন কর। তোমরা ত জান, কোন পশুর সাহস যদি বিচক্ষণ হয়, তবে সে পশুটির অভ্যাসাদির খোঁজ নিতে চেষ্টা করবে। যদি দেখা যায় তার দ্রুতগতিতে দৌড়ের অভ্যাস আছে, তা হলে আরোহণের সময় তাকে উত্তেজিত করবে না। যদি দেখা যায় তার সামনের দুটি পাও উঠিয়ে ফেলার অভ্যাস আছে, তা হলে সম্মুখের দিক থেকেই তাকে প্রতিরোধ করতে হবে। যদি তার কামড়ানোর অভ্যাস আছে বলে ভয় হয়, তা হলে তার মাথার পার্শ্ব দিয়েই আড় সৃষ্টি করে রক্ষা পেতে হবে। যদি দেখা যায় তার গতি মন্থর, তা হলে মৃদু আঘাতের দ্বারা তার গতি বাড়িয়ে তুলতে হবে। যদি এতেও তার ধীরগতি দূর না হয় তা হলে লাগাম টেনে তাকে কিঞ্চিৎ পার্শ্বে ফিরিয়ে তা ঢিলা করে দিতে হবে। এ সকল অভ্যাসাদিতে শাসনের এমন সব প্রমাণ বিদ্যমান, যা মানুষের শাসনের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয়। যারা তাদেরকে কর্মে নিয়োজিত করতে, তাদের পরীক্ষা নিতে ও তাদের মধ্যে প্রবেশ করতে চান, তাদের জন্য এতে শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

বস্তুত লেখক তার পাণ্ডিত্যের গৌরবে, শিল্পকর্মের মর্যাদায়, সূক্ষ্ম কৌশল ও ব্যবহারে মানুষের মধ্যে স্থান করে নিবে; যাতে মানুষ তার সংসর্গ ভালোবাসে ও তার প্রতীক্ষা করে এবং তার নিকট থেকে কিছু বুঝে নিতে ও তার প্রতাপকে ভয় করতে শেখে। এজন্য তার উচিত তার সহচরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং তাকে উপলব্ধি করে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করা। কারণ এক্ষেত্রে সে একটি পশু অপেক্ষা

১৩৫. এ স্থলেও অন্যত্র সহচর অর্থে নিয়োগকারী।

অধিক সহানুভূতির দাবি করতে পারে। কেননা পশু উত্তর দিতে পারে না, যথার্থতা জানে না ও কোনো বক্তব্য বুঝতে পারে না। অবশ্য সহিস যদি তাকে কিছু বোঝার যোগ্য করে তুলতে পারে, তা হলে স্বতন্ত্র কথা। অতএব সহানুভূতিশীল হও, আল্লাহ্ তোমাদের দৃষ্টির মধ্যে শান্তি বর্ষণ করুন। তোমরা যতদূর সম্ভব চিন্তা ও বিচক্ষণতার সাথে কাজ কর এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমাদের সহচরদের প্রতি কর্কশ ব্যবহার, চাপ সৃষ্টি ও তাদের বিরক্তি উৎপাদন থেকে বিরত থাক। তারা যদি তোমাদের সাথে সহযোগিতা করে, তা হলে তোমরাও তাদেরকে ভাই হিসাবে গ্রহণ কর এবং আল্লাহ্ চান ত, তাদের প্রতি সদয় হও।

তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার দরবার, পরিচ্ছদ, বাহন, আহার্য পানীয়, আবাস, ভৃত্য ও অন্য অনেক বিষয় এবং অধিকারের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম না করে। কারণ তোমার আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিল্পকর্মের যে গৌরব দান করেছেন, তার কল্যাণে সকলের সেবক, সুতরাং তোমাদের সেবায় যেন কোনো প্রকার ত্রুটি দেখা না দেয়। তোমরা হলে সকলের স্বার্থরক্ষক; সুতরাং তোমাদের কাজে যেন কোনো অপব্যয় ও অপচয়ের চিহ্ন না থাকে। আমি যে সকল কথা তোমাদের নিকট বলেছি ও যে সকল উদাহরণ তুলে ধরেছি, তাদের সকল কিছুতেই সততার দ্বারা সাহায্য গ্রহণ কর। অপব্যয়ের আপাত মাধুর্য ও বিলাসব্যসনের অশুভ পরিণাম থেকে দূরে সরে থাকে। কারণ এ দুটি দোষ দরিদ্রতা আনয়ন করে শির অবনত করে ও তাদের অধিকারীকে অপদস্থ করে ছাড়ে এবং লেখক ও জ্ঞানীদের জন্য এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

প্রতিটি বিষয় সম্পর্কেই দৃষ্টান্ত বিদ্যমান; তাদের একটি অপরটির প্রমাণ স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা তোমাদের অভিনব কার্যাদির উপর প্রমাণ গ্রহণ কর। অতঃপর প্রচেষ্টার পথ অনুসরণ করে তাকে দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্টতর, প্রমাণের দ্বারা সত্যতর এবং পরিণতির ইঙ্গিতে সুন্দরতর করে তোল। জেনে রাখ, প্রচেষ্টার পথে কিছু প্রিয় বাধা আছে, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তার চিন্তা ও দূরদর্শিতা প্রয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই যেন দরবারে বসে সংযত বাক্ হও এবং বক্তব্য উপস্থাপনে ও উত্তর দানে সংক্ষিপ্তির দ্বারস্থ হও। তোমাদের বক্তব্যে যেন যুক্তি-প্রমাণের ধারা অনুসৃত হয়। কেননা এর দ্বারা তোমাদের কার্যকে কেবল সুচারুরূপে সম্পন্ন এবং তোমার অধিক কথনের দোষকে নিশ্চিহ্ন করতে পার। তোমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ্র নিকট সাহায্য-সহায়তার আকুল প্রার্থনা জানাও, যাতে সত্যের অনুসারী হতে পার এবং তোমার দেহ বুদ্ধি ও শিক্ষার ক্ষতিকর কোনো ভুলের মধ্যে জড়িয়ে না পড়। কেননা তোমাদের কেউ যদি এ ধারণা পোষণ করে এবং কেউ যদি এ মন্তব্য উচ্চারণ করে যে, তার শিল্পকর্মে যে সৌন্দর্য ও তার তৎপরতায় যে ক্ষমতার চিহ্ন বিদ্যমান, তা সুনিশ্চিতভাবে একমাত্র তার কর্মকুশলতা ও সযত্ন প্রচেষ্টার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে তা হলে সে তার এ সুন্দর ধারণা ও বক্তব্যের দ্বারা মহান ও গৌরবান্বিত আল্লাহ্র উপর নির্ভরতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করল। সুতরাং এটা তার জন্য কখনোই যথেষ্ট নয় এবং চিন্তাশীলের নিকট এর স্বরূপ কখনই অস্পষ্ট নয়। তোমাদের মধ্যে কেউ যেন এরূপ না বলে যে, সে সর্ববিষয়ে অতিশয় বিচক্ষণ এবং শিল্পকর্মে বান্ধবদের অপেক্ষা কষ্টসহিষ্ণু

ও সেবাধর্মে সহচরদের অপেক্ষা আন্তরিক। কারণ বিচক্ষণদের নিকট দুইজন লোকের মধ্যে সেই অধিকতর বুদ্ধিমান, যার অসাক্ষাতে মানুষ তার বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আলোচনা করে। অথচ সে নিজে এ মত প্রকাশ করে যে, তার সহচররাই তার অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান এবং কর্মধারায় অধিকতর সুচারু। যাহোক এ উভয় দলের জন্যই পরম প্রশংসিত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের স্বীকারোক্তি থাকা প্রয়োজন। কোনো পক্ষই যেন তার মতের অব্যর্থতা ও আত্মার অপাপবিদ্ধতার গৌরব না করে এবং তার ভাই, বয়স্য, সহচর ও পরিজনের প্রতি প্রাচুর্যের অহংকার না দেখায়। আল্লাহ্‌র প্রশংসা সকলের অবশ্য কর্তব্য এবং তা তাঁর মহত্ত্বের সম্মুখে বিনয়ের সাথে, তাঁর পরাক্রমের সম্মুখে হীনতার সাথে ও তাঁর অনুগ্রহের সম্মুখে কৃতজ্ঞতার সাথে করতে হবে।

আমি আমার এ পত্রে তাই বলেছি যা এ প্রবাদের মধ্যে বিদ্যমান—যে ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করে, সে তদনুযায়ী কার্যও করে থাকে। এটাই এ পত্রের মূল বক্তব্য ও তার আলোচনার মধ্যমণি। অবশ্য এর পূর্বে মহান ও গৌরবময় আল্লাহ্‌র স্মরণকে স্থান দিতে হবে। এ জন্যই আমি তাকে শেষে স্থান দিয়েছি এবং তার দ্বারা শেষ করেছি।

হে বিদ্যার্থী ও লেখকবৃন্দ! আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং তোমাদেরকেও পূর্বসূরিদের সেই সৌভাগ্য ও সৎপথের জ্ঞানের অধিকারী করুন। কারণ তা তাঁর দিকেই, তাঁর ক্ষমতার মধ্যেই আমাদেরকে নিয়ে যাবে। তোমাদের উপর আল্লাহ্ শান্তি, দয়া ও কল্যাণ বর্ষণ করুন।

শুরতা (রক্ষী)

আফ্রিকিয়ায় বর্তমানকালে এ পদের প্রধানকে 'হাকিম' বলা হয়, আন্দালুস সাম্রাজ্যে 'সাহেবে মদিনা' (নগরপাল) এবং তুর্কি সাম্রাজ্যে 'ওয়ালী' (অধিকারী)। এ পদটি সাম্রাজ্যের তরবারির অধিকারীর অধীনে ন্যস্ত; অবশ্য অনেক সময় রক্ষী প্রধানও তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এর প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় আব্বাসী সাম্রাজ্যে; এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পদের অধিকারী প্রথমে বিভিন্ন দুষ্কর্মের তদন্ত এবং পরে তার শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতেন। কারণ দুষ্কর্মের এমন অনেক সন্দেহজনক অবস্থা আছে, যাতে ধর্মীয় বিধানের শাস্তিদান ব্যতীত অন্য কিছু করার নেই; অথচ সাধারণের স্বার্থে শাসন ব্যবস্থার এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন হয় এবং শাসক তার কার্যকারণ ও প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করে এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বীকারোক্তি সংগ্রহ করেন। সুতরাং কাজী যে বিষয়কে তাঁর আওতাধীন নয় বলে ত্যাগ করতেন, তাকে যিনি তদন্তের সাহায্যে প্রমাণ করে তার প্রাপ্য শাস্তি প্রদান করতেন, তাঁকে বলা হত 'সাহেবে সুরতা'। অনেক সময় তাঁর দায়িত্বে শাস্তি প্রদান ও খুন-খারাবির তদন্তের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়া হত এবং কাজীর এতে করার কিছুই ছিল না। এভাবে এ পদমর্যাদাটিকে সাব্যস্ত করে তা আব্বাসী সম্রাটগণ তাঁদের আশ্রিত পোষ্য বিশেষ সভাসদ ও সেনাপতির হস্তে ন্যস্ত করতেন। তারা সর্বসাধারণের উপর কোনো কর্তৃত্ব রাখতেন না; বরং তাদের কর্তৃত্ব ছিল দুষ্কৃতকারী সন্দেহজনক ব্যক্তি ও অপকর্মে লিপ্ত আইন অমান্যকারীদের উপর।

অতঃপর এ পদের কর্তৃত্বের পরিধি আরো বৃদ্ধি পায় এবং আন্দালুসের বনি উমাইয়া সাম্রাজ্যে এটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে বৃহৎ রক্ষী ও ক্ষুদ্র রক্ষীতে পরিণত হয়। বৃহৎ রক্ষীকে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাধারণের উপর ক্ষমতা দেয়া হত এবং তিনি শাসন ব্যবস্থায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, তাদের অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার ও তাদের সম্ভ্রান্ত আত্মীয়স্বজনের অনুরূপ আচরণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করতেন। ক্ষুদ্র রক্ষী শুধুই সর্বসাধারণের ব্যাপারে নিযুক্ত থাকতেন। বৃহৎ রক্ষীর জন্য সম্রাটের প্রাসাদদ্বারে একটি আসন থাকত, তাতে তিনি উপবেশন করতেন এবং তাঁর সম্মুখে কিছু সংখ্যক লোক প্রস্তুত হয়ে বসে থাকত। তাঁর নির্দেশ ব্যতীত তারা ঐ স্থান ত্যাগ করতে পারত না। তাঁরা এ পদটি রাজপুরুষদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্নরাই লাভ করতেন এবং একে হাজেব ও উজির পদে উন্নীত হওয়ার সোপান মনে করা হত।

মাগরিবের আল-মোহেদ সাম্রাজ্যে এ পদটির ব্যাপক পরিচিতি থাকলেও তার দায়িত্ব তেমন ব্যাপক ছিল না। তাতে আল-মোহেদদের ক্ষমতাবান ব্যক্তিরাই নিযুক্ত হতেন। শাসন ব্যবস্থায় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের উপর তাদের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। অতঃপর ইদানীং এ পদটির ক্ষমতা আরো লুপ্ত হয়েছে এবং তা আল-মোহেদদের আওতা বহির্ভূত হয়ে অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অধিকারে চলে গেছে।

বর্তমানকালে পূর্বাঞ্চলের বনি মারিন সাম্রাজ্যে এ পদটি তাদের আশ্রিত পোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অধীনে স্থাপিত হয়েছে। পূর্বাঞ্চলের তুর্কি সাম্রাজ্যে তা তুর্কি রাজপুরুষ অথবা তাদের পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যের অধিকারী কুর্দীদের বংশধরদের হাতে ন্যস্ত। এ ব্যাপারে তাদের কঠোরতা ও বিধি-নিষেধ কার্যকরী করার দক্ষতার জন্যই তাদেরকে নিয়োজিত করা হয়। দুষ্কর্মের উপাদান নিশ্চিহ্ন করা, অন্যায়ের পথ রোধ করা, তাদের আড্ডা ভেঙে দেয়া ও সঙ্ঘ শক্তিকে পর্যুদস্ত করাই এ পদের উদ্দেশ্য। এর সাথে শাসনতান্ত্রিক ও ধর্মীয় শাস্তি প্রয়োগ এবং সর্বসাধারণের কল্যাণের অনুসারী নগর জীবনের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিও জড়িত থাকে। আল্লাহ্ দিন-রাত্রির পরিবর্তন করে থাকেন এবং মহাপরাক্রান্ত ও পরাক্রমশালী। উন্নত আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞাতা।

নৌবিভাগ পরিচালনা[১৩৬]

এটা মাগরিব ও আফ্রিকিয়ার সাম্রাজ্যগুলোর বিশেষ পদমর্যাদা ও দায়িত্বের অন্তর্গত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা সেনাপতির অধীনে ও তার নির্দেশের অনুসারী হয়ে থাকে। সাধারণত এ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে তাদের প্রথা অনুযায়ী, 'আল মালান্দা[১৩৭] বলা হয়। এতে 'লাম' বর্ণটির উচ্চারণে জোর দেয়া হয় এবং ফিরিঙ্গী ভাষা থেকে গৃহীত একটি শব্দ, যা ঐ পদের নাম হিসাবে সেখানে ব্যবহৃত হয়। এ বিশেষ পদটি আফ্রিকিয়া ও মাগরিবের জন্য নির্দিষ্ট হবার কারণ এই যে, মূলত এ উভয় এলাকা প্রায় সর্বাংশে রোম সাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এরই দক্ষিণ তীরাঞ্চলে সিবতা থেকে আলেকজান্দ্রিয়া ও

১৩৬. মূলে আছে, 'কিয়াদাতুল আসাতিল' রণতরী পরিচালনা।

১৩৭. রোজেনথাল এ শব্দটি মূলত আরবি গৃহীত শব্দের বিকৃতরূপ বলে মনে করেন। বস্তুত 'এডমিরাল' শব্দটিও 'আমীরুল বাহর'—সমুদ্রাধিপতি—শব্দের বিকৃতরূপ।

সিরিয়া পর্যন্ত বারবার এলাকা বিদ্যমান। উত্তর তীরে আন্দালুস, ফিরিঙ্গী, সাকলী (শ্লাভ), রোম হয়ে সিরিয়া পর্যন্ত নানা দেশ বিস্তৃত। রোম সাগর (ভূমধ্যসাগর)-কে এর তীরাঞ্চলের দিকে লক্ষ করে শাম (সিরিয়া) সাগরও বলা হয়। এ সাগরের উভয় তীরের সন্নিকটে ও পার্শ্বে অবস্থানকারী জাতিগুলো তাদের অবস্থা-ব্যবস্থার জন্য সমুদ্রের সাথে যতটুকু জড়িত, অন্যান্য সামুদ্রিক জাতি ততটা নয়। রোমান, ফিরিঙ্গী ও গথ তথা এ সমুদ্রের উত্তর তীরে বসবাসকারী জাতিগুলোর যুদ্ধবিগ্রহ ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই নৌকার উপর নির্ভর করত। এর ফলে তারা নৌ-আরোহণ ও নৌ-যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে যারা অন্যান্য জাতির নিকটবর্তী হবার জন্য দক্ষিণ তীরে এসেছে, যেমন রোমানরা আফ্রিকিয়ায় ও গথরা মাগরিবে, তারা এ নৌকার সাহায্যেই এসেছে। তারা সেখানে এসে বারবারদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং তাদের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে। সেখানে তাদের জনবসতিপূর্ণ বহু নগর ছিল, যেমন করতাজ্না (কার্থেজ), সেবতিলা, জালুলা, মুরনাক, শেরশাল (চার্চিল) ও তাঞ্জা (তাঞ্জিয়ার)। তাদের পূর্বকালের কার্থেজ সম্রাট রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য ও সমরোপকরণপূর্ণ রণতরী পাঠাতেন। সুতরাং উক্ত বিষয় এ সাগরের উভয় তীরের অধিবাসীদের মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিক উভয়কালেই অত্যন্ত সুপরিচিত।

মুসলমানরা মিশর অধিকার করার পর হজরত উমর আমর ইবনেল আস (রাঃ)-কে লিখে পাঠালেন যে, আমাকে সমুদ্রের কথা জানাও। আমর এর উত্তরে লিখেছিলেন, "সমুদ্র এক বিরাট ব্যাপার, তার উপর যারা ভাসমান হয় তারা যেন কাষ্ঠখণ্ডের উপর কীটতুল্য।" সুতরাং ঐ সময়ে তিনি মুসলমানদেরকে সমুদ্রাভিযানে অনুমতি দেননি। আরবদের মধ্যে প্রায় কেউই অতঃপর সমুদ্রাভিযানে অংশগ্রহণ করেনি অথবা যারা করেছে, তারা হজরত উমরের অনুমতি ব্যতিরেকেই এরূপ দুঃসাহস দেখিয়েছে এবং জানবার পর তজ্জন্য শাস্তিও পেয়েছে। যেমন বাজিলা সরদার আরফাজা ইবনে হারসামা আল-আজদী। ইনি উস্মানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে নৌযুদ্ধেও ব্যাপৃত হয়েছিলেন এবং হজরত উমর এটা জানতে পেরে বিরক্তি প্রকাশ ও তার দায়িত্ব অস্বীকার করেন। সুতরাং অবস্থা এরূপই ছিল। এর পর হজরত মাবিয়ার সময়ে মুসলমানদেরকে সমুদ্রাভিযানে অংশগ্রহণ করতেও ধর্মযুদ্ধে রণতরী ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করেন। এর কারণ এ যে, আরবরা প্রথম দিকে তাদের প্রান্তরীয় অভ্যাসের জন্য এ ব্যাপারে পালনীয় আচার-আচরণ ও নৌ-আরোহণে তেমন কোনো দক্ষতা পোষণ করত না। অথচ তাদের তুলনায় রোমান ও ফিরিঙ্গীরা সামুদ্রিক অবস্থার সাথে পরিচয়, তার মধ্যে প্রতিপালন ও তার যানবাহনে অভ্যস্ত থাকার ফলে সমুদ্রবিদ্যায় ও সমুদ্রাচারে পারদর্শী হয়ে উঠেছিল।

অতঃপর যখন আরবদের সাম্রাজ্যে স্থায়ী বিস্তৃতি লাভ করল, তখন বহু অনারব জাতি তাদের কর্মচারী ও প্রজায় পরিণত হল। তাদের জন্য প্রত্যেক শিল্পকর্মী নিজ নিজ শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় নিয়ে এগিয়ে এল। অনেক জাতিকে তারা সামুদ্রিক প্রয়োজনে নৌকার মাঝি-মাল্লারূপে নিয়োগ করল এবং এভাবে সমুদ্রের সাথে তাদের পরিচয় ও তৎসম্পর্কীয় আচার-আচরণে তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেল। তাদের মধ্যেও দক্ষ নাবিকের

জন্ম হল এবং তারা যুদ্ধবিগ্রহে সমুদ্রের সাহায্য গ্রহণে অগ্রসর হল। তারা সমুদ্রোপযোগী, নৌকা ও জাহাজ তৈরি করল এবং রণতরী সৈনিকে ও অস্ত্রশস্ত্রে পূর্ণ করে তুলল। তারা সশস্ত্র সৈন্য ও যোদ্ধাদের দ্বারা রণতরী পূর্ণ করে সমুদ্র তীরবর্তী বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করল। এ ব্যাপারে তারা সমুদ্র তীরবর্তী ও সীমান্ত এলাকার লোকদেরকেই বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছিল। যেমন সমুদ্রোপকূলের সিরিয়া, আফ্রিকিয়া, মাগরিব ও আন্দালুসের অধিবাসীরা। সম্রাট আব্দুল মালেক আফ্রিকিয়ার শাসক হাস্‌সান ইবনে নুমানকে[১৩৮] তিউনিসে একটি শিল্পাগার গড়ে তুলতে নির্দেশ দিলেন। এর দ্বারা ধর্মযুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য সমুদ্রোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এ প্রকার অভিযানের মধ্যে প্রথম যিয়াদতুল্লাহ্ ইবনে ইব্রাহিম ইবনে আল আগলাব-এর সময়ে প্রধান মুফতী আসাদ ইবনেল ফুরাত[১৩৯] কর্তৃক 'সাকলিয়া' (সিসিলি) বিজয় অন্যতম। এ সময়ে 'কাওসরা' (পোটালারিয়া)ও বিজিত হয়। অথচ ইতিপূর্বে মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের সময় মাবিয়া ইবনে হুদাইজ[১৪০] সাকলিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন; কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বিজয় লাভ তখন সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত তা ইবনেল আগলাবের সেনাপতি আসাদ ইবনেল ফুরাতের হাতে সম্ভব হয়। এর পর আন্দালুসের উমাইয়া সাম্রাজ্যের ও আফ্রিকিয়ার উবাইদী সাম্রাজ্যের সময় তাদের রণতরীগুলো পরস্পরের বিরুদ্ধে গোলযোগ সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তারা পরস্পরের এলাকা আক্রমণ করে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলোর ধ্বংস সাধন করেছে।

আন্দালুসের উমাইয়া সম্রাট আব্দুর রহমান আন্‌নাসেরের সময় সাম্রাজ্যের রণতরীর সংখ্যা দুইশ বা তার নিকটবর্তী এক সংখ্যায় পৌঁছেছিল। আফ্রিকিয়ার রণতরীর সংখ্যাও অনুরূপ ছিল। আন্দালুসের রণতরীর পরিচালক ছিলেন ইবনে রেমাহিস এবং এদের আগমন-নির্গমনের ঘাঁটি ছিল 'বেজায়া' (পেচিনা) ও 'আল-মারিয়া'। সমগ্র সাম্রাজ্য থেকে রণতরী এসে এ স্থানগুলোতে একত্র হত। যে সকল অঞ্চলে নৌকার ব্যবহার ছিল, তার প্রত্যেকটি থেকে একটি করে রণতরী আসত এবং তা নৌ-বিভাগের পরিচালক ও যুদ্ধ, অস্ত্র ও সৈন্যাদির অধিকারীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত থাকত। এ সকল রণতরীর অন্য এক পরিচালক তাদের পরিচালনার ব্যাপারে বায়ুর গতি অথবা দাঁড়ের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা তত্ত্বাবধান করতেন। তিনি তাদের নোঙ্গর করার ব্যাপারটিও দেখতেন। এভাবে যখন কোনো অভিযানের উদ্দেশ্যে অথবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ সুলতানী প্রয়োজনে সমস্ত রণতরী তাদের নির্দিষ্ট ঘাঁটিতে একত্র হত, তখন সম্রাট তাঁর দলবল, উৎকৃষ্ট সেনানী ও আশ্রিত পোষ্যদের দ্বারা ঐগুলোকে পূর্ণ করে তুলতেন এবং তাঁর সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ আমীরদের মধ্যে একজনকে এগুলোর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করতেন। প্রত্যেকেই উক্ত সর্বাধিনায়কের নেতৃত্বে পরিচালিত হত। অতঃপর সম্রাট যথা

১৩৮. ৮০ হিজরিতে মৃত্যু হয়। শিল্পাগার—মূলে 'দারুস্‌সিনা', এটা হতে ইংরেজি 'আর্সেনাল' শব্দটির উৎপত্তি।

১৩৯. ১৪২-২১৩ (৭৬০-৮১৮ খ্রি:) হি.।

১৪০. ৫২ হিজরিতে মৃত্যু হয়।

উদ্দেশ্যে তাদেরকে বিদায় জানাতেন এবং বিজয় লাভ করে লুণ্ঠিত সম্পদ তাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করে থাকতেন।

ইসলামী সাম্রাজ্যগুলোর সময়ে মুসলমানরা এ সমুদ্রকে তার সকল দিক থেকে অধিকার করে রেখেছিল। তাতে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। খ্রিস্টান জাতিগুলোর পক্ষে তাদের মোকাবিলায় কোনো দিকেই কোনো কিছু করার ছিল না। তারা সকল সময়ে বিজয়ের নিশান উড়িয়ে এর তরঙ্গমালা অতিক্রম করেছে। এর ফলে তাদের বিজয় ও লুণ্ঠনের বহু সুপ্রচলিত কাহিনী গড়ে উঠেছে। তারা তীরভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন এর সমুদয় দ্বীপাঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। যেমন 'মিউরাকা', 'মনোরাকা', 'ইয়াবেসা', 'সারদানিয়া', 'সাকলিয়া', 'কাওসারা', 'মালতা', 'আক্রিতাশ' (ক্রীট), 'কবরস' (সাইপ্রাস) এবং অন্যান্য রোমান ও ফিরিঙ্গী অঞ্চল। আবুল কাসেম আশ্‌শিয়ী[১৪১] ও তাঁর পুত্ররা আল-মাহাদিয়া থেকে তাদের রণতরী পরিচালনা করে 'জানোয়া' দ্বীপ আক্রমণ করতেন এবং বিজয় ও লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলোসহ প্রত্যাবর্তন করতেন। ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের অন্যতম 'দানিয়ার' শাসক মুজাহিদ আল-আমেরী তার রণতরীর সাহায্যে চারশ পাঁচ হিজরিতে (১০১৪/১৫ খ্রিস্টাব্দে) 'সারদানিয়া' জয় করেন। পরবর্তী পর্যায়ে খ্রিস্টানরা পুনরায় তা জয় করে নেয়। ইতিমধ্যে মুসলমানরা এ সাগরের অধিকাংশ এলাকায় তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। তাদের রণতরীগুলো এর উপর দিয়ে অবিরাম যাতায়াত করত এবং মুসলমান সৈনিকরা এ সকল রণতরীতে আরোহণ করে সিসিলি থেকে তার সম্মুখভাগে অবস্থিত উত্তর তীরভূমির বৃহৎ অঞ্চলগুলোতে অভিযান পরিচালনা করত। তারা ফিরিঙ্গীদের দেশ আক্রমণ করে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করত। যেমন সিসিলির সম্রাট বনি আল হুসাইনদের সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারা উক্ত দ্বীপাঞ্চলে উবাইদী মতাদর্শ প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন। তাদের এ প্রকার তৎপরতার ফলে খ্রিস্টান জাতিগুলো তাদের রণতরীসহ সমুদ্রের উত্তর-পূর্ব কোণের দিকে সরে যায় এবং ফিরিঙ্গী, স্লাভ অধ্যুষিত তীরভূমি ও রোমান অধিকৃত দ্বীপাঞ্চলের বাইরে তারা আসত না। কারণ মুসলমানদের রণতরীগুলো তাদের উপর সিংহবিক্রমে আপতিত হত। তদুপরি মুসলমানরা উক্ত সাগরের উন্মুক্ত জলভাগকে তাদের রণসম্ভার ও সংখ্যার দ্বারা প্রায় পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। তারা যুদ্ধ ও শান্তি উভয় উদ্দেশ্যে তার যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতো। এর ফলেই এ সমুদ্রভাগে খ্রিস্টানদের কোনো রণতরীর বিচরণ সম্ভম হয়ে উঠত না।

অতঃপর যখন উবাইদী ও উমাইয়া সাম্রাজ্যে শৈথিল্য ও ক্ষয় দেখা দিল এবং তাদের শক্তি হ্রাস পেল তখন খ্রিস্টানরা হস্ত প্রসারিত করে পূর্বদিগস্থ দ্বীপগুলো, যেমন—সিসিলি, ক্রীট, মালটা প্রভৃতি অধিকার করতে সমর্থ হল। এর পর তারা অনুরূপ স্বভাব নিয়ে সিরিয়া উপকূলের দিকে অগ্রসর হল এবং 'তারাবলিস' (ত্রিপলী), 'আস্কালন', সোর (তাইর) ও 'উক্কা' অধিকার করল। এভাবে সমগ্র সিরিয়া উপকূলীয় সীমান্ত তাদের হস্তগত হল। তারা 'বয়তুল মুকাদ্দস' অধিকার করল এবং সেখানে তারা ধর্মপ্রচার ও

---

১৪১. আল কায়েম, ২য় ফাতেমী সম্রাট, ৯৩৪-৪৬ খ্রি:, অভিযান ৯৩৪/৩৫ খ্রি:।

উপাসনার জন্য গির্জা স্থাপন করল। তারা বনি খয়রুনের অধিকৃত 'তারাবলিস' (ত্রিপলীটানিয়া), কাবেস (গেবস) ও 'সাফাকেশ' (স্ফক্স) দখল করল এবং তাদের উপর মাথট ধার্য করল। এর পর তারা বুলুক্কীন ইবনে ঘিরীর বংশধরদের নিকট থেকে উবাইদী সম্রাটদের রাজধানী আলমাহদিয়া অধিকার করে নিল। হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে সমুদ্রের এ অঞ্চলে তাদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। মিশর ও সিরিয়া সাম্রাজ্যের রণতরীগুলোর অবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়ে এক সময়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বর্তমানে তাদের সাহায্য গ্রহণ করার মত আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ইতিপূর্বে উবাইদী সাম্রাজ্যের আমলে তারা এরই সাহায্যে সীমা অতিক্রম করেছিল, যেমন তাদের ইতিহাসে সুপরিচিত হয়ে রয়েছে। সুতরাং এ পদমর্যাদার এখানেই ইতি। শুধু আফ্রিকিয়া ও মাগরিব এ ব্যাপারে এখনো বিশিষ্টতার দাবিদার। সমুদ্রের পশ্চিম দিক বর্তমানকালেও রণতরীতে পূর্ণ ও তাদের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ঐ অঞ্চলে কোন শত্রুর অনুপ্রবেশ এখনো সম্ভব হয়নি এবং তাদের সেই শক্তিও নেই। বর্তমানে উক্ত অঞ্চলে রণতরীর পরিচালক লামতুনা সাম্রাজ্যের অধীন 'বাদেস' দ্বীপের নেতৃবৃন্দের অন্যতম বনি মায়মুন। তাদের হাত থেকেই তা তাদের সম্মতি ও আনুগত্যের কল্যাণে সম্রাট আবদুল মোমেন[১৪২] গ্রহণ করেছেন। উভয় তীরের রণতরীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় একশতে পৌঁছেছে।

হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন আল-মোহেদ সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করল এবং সমুদ্রের উভয় তীরের উপর আধিপত্য স্থাপিত হল, তখন তারা নৌ-বিভাগের এ ব্যাপারটি, যতদূর জানা যায় সর্ববৃহৎ ও সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। তখন তাদের রণতরীর পরিচালক ছিল আহমদ সাকলী। এ ব্যক্তি মূলত সার্ডিকাশ গোত্রের শাখা সগদীয়ানের অন্তর্ভুক্ত এবং 'জেব্রা' দ্বীপে বাস করত। খ্রিস্টানরা তাকে সেখান থেকে বন্দী করে আনে এবং তাদের মধ্যেই সে প্রতিপালিত হয়। তাদের হাত থেকে তাকে সিসিলির অধিপতি মুক্ত করেন ও আশ্রয় দেন। অতঃপর তাঁর মৃত্যু হলে তৎপুত্র সিংহাসনে আরোহণ করার পর কোনো কারণে তিনি আহমদের উপর বিরক্ত হন। এর ফলে আহমদ তার প্রাণের ভয়ে তিউনিসে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে বনি আবদুল মোমেনের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য লাভ করেন। পরে সেখান থেকে মারাকাশে পৌঁছান। সেখানে সম্রাট ইউসুফ ইবনে আবদুল মোমেন তাকে অত্যন্ত সম্মান ও হৃদ্যতার সাথে গ্রহণ করেন। তাকে বহু পুরস্কার দিয়ে তাঁর রণতরীর অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করেন। ইনি অতঃপর খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ পরিচালনায় অশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। আল-মোহেদ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে তাঁর কীর্তি, কাহিনী ও বিচিত্র শৌর্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ সময়ে মুসলমানদের রণতরী সংখ্যায় ও নতুনত্বে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যা ইতিপূর্বে বা অতঃপর আর আমরা জানতে পারিনি।

যখন মিশর ও সিরিয়ার অধিপতি সালাহউদ্দীন ইউসুফ ইবনে আইউব খ্রিস্টানদের অধীনতা থেকে সিরিয়ার সীমান্ত অঞ্চল উদ্ধারের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হলেন এবং বয়তুল মুকাদ্দসের পবিত্রতা বিধানের চেষ্টা আরম্ভ করলেন, তখন বয়তুল মুকাদ্দসের দিকের নিকট সমুদ্র থেকে সমস্ত রণতরী এসে খ্রিস্টানদেরকে সাহায্য করতে লাগল। কারণ

১৪২. রাজত্বকাল ১১৬৩-৮৪ খ্রি:।

বয়তুল মুকাদ্দস তখন তাদের অধীনে। সুতরাং তারা খ্রিস্টানদেরকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করে সাহায্য করল। আলেকজান্দ্রিয়ার রণতরীগুলো তাদের সাথে এঁটে উঠতে পারল না। কারণ পূর্ব থেকেই তারা সমুদ্রের এ পূর্বাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। তদুপরি তাদের রণতরীর সংখ্যাও ছিল বেশি এবং মুসলমানরা দীর্ঘকাল ধরে তাদের এ আধিপত্য বিস্তারে কোনো বাধার সৃষ্টি করেনি, যেমন এ সম্পর্কে আমরা পূর্বে ইঙ্গিত করেছি। সুতরাং সালাহউদ্দীন তাঁর সমসাময়িক মাগরিবের আল-মোহেদ সম্রাট আবু ইয়াকুব আল-মনসুরের নিকট দূত পাঠালেন। 'শায়জারে'র বনি মুনকিয-এর আবদুল করিম ইবনে মুনকিয[১৪৩] এ দূত হিসাবে সেখানে গিয়েছিলেন। সালাহউদ্দীন 'শায়জার' অধিকার করলেও বনি মুনকিযের হাতেই তার শাসনভার ন্যস্ত করে রেখেছিলেন। যাহোক আবদুল করিম তাঁর পক্ষ থেকে মাগরিবের সম্রাটের নিকট রণতরীর আবেদন নিয়ে পৌঁছলেন। যাতে উক্ত অঞ্চলের রণতরীগুলো এসে সিরিয়া উপকূলে খ্রিস্টানদের রসদ সরবরাহে রত আগন্তুক রণতরীগুলোকে বাধা প্রদান করতে পারে। এ সম্পর্কে তিনি একটি পত্রও বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ পত্রটি রচনা করেছিলেন তালফাজেল আলবায়সানী[১৪৪] এর প্রারম্ভে ছিল, আল্লাহ্ আমাদের সর্দারের জন্য সফলতা ও সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত করুন। আল-এমাদুল ইস্পাহানী[১৪৫] তার গ্রন্থ 'ফতলুল কুদসী'তে একে এভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আল-মনসুর এ দূতদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কারণ তাঁকে 'আমীরুল মোমেনীন' সম্বোধন না করায় তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন। অবশ্য এ বিরক্তি তিনি প্রকাশ করেননি এবং দূতদেরকে যথারীতি হৃদ্যতা ও সম্মানের সাথে গ্রহণ করে প্রেরকের নিকট ফেরত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রয়োজনে তিনি সাড়া দেননি। যাহোক এ পত্রে এ কথার প্রমাণ বিদ্যমান যে, তৎকালে মাগরিব পূর্বাঞ্চলে খ্রিস্টান রণতরীর শক্তির ন্যায় অনুরূপ শক্তিতে বিশিষ্ট ছিল এবং মিশর ও সিরিয়া সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে এর পূর্বে বা পরে রণতরী শক্তির ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

আবু ইয়াকুব আল-মনসুরের মৃত্যুর পর আল-মোহেদ সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ল এবং জাল্লাফীরা আন্দালুসের অধিকাংশ অঞ্চল অধিকার করে বসল। তারা মুসলমানদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে বিতাড়িত করল। ফলে তারা রোম সমুদ্রের পশ্চিমাঞ্চলীয় দ্বীপগুলো অধিকার করে আবার সমুদ্রাঙ্গনে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করল। তাদের প্রতাপ ও সেই অনুপাতে রণতরীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল। এক্ষেত্রে মুসলমানদের শক্তি আবার খ্রিস্টানদের সমতুল্য অবস্থায় ফিরে এল। যেমন মাগরিবের জানাতী সম্রাট আবুল হাসানের[১৪৬] সময় তাঁর ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত রণতরী সংখ্যায় ও সাজসজ্জায় খ্রিস্টানদের রণতরীর সমতুল্য ছিল।

অতঃপর রণতরীর এ শক্তি থেকে মুসলমানদের অবস্থা মুখ ফিরিয়ে নিল। কারণ সাম্রাজ্যের দুর্বলতার জন্য তারা সমুদ্রের বিচরণ অভ্যাস ভুলে যাচ্ছিল। মাগরিবের

---

১৪৩. দূতের যথার্থ নাম সম্ভবত আবুল হারিস আবদুর রহমান ইবনে মুহম্মদ ইবনে মুনকিয, ৫২৩-৬০০ (১১২৯-১২০৩ খ্রি:) হি.। উক্ত ঘটনা ৫৮৫ (১১৯০ খ্রি:) হিজরিতে ঘটে। (রোজেনথালে, ২য় বালাম, ৪৪ পৃ. দ্র.)।

১৪৪. আবদুর রহমান ইবনে আলী, ৫২৬-৯৬ (১১৩৫-১২০০ খ্রি:) হি.।

১৪৫. মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ, ৫১৯-৯৭ (১১২৫-১২০১ খ্রি:) হি.।

১৪৬. শাসনকাল ১৩৩১-৫১ খ্রি:।

প্রান্তরীয় জীবনের প্রভাব এবং আন্দালুসীয় জীবনবোধ থেকে বিচ্যুতিও এর কারণ। খ্রিস্টানরা আবার সমুদ্রে তাদের পূর্বের আদর্শ নিয়ে ফিরে এল; তারা তাতে বিচরণ, সার্বক্ষণিক তৎপরতা ও বিচিত্র অবস্থার অভিজ্ঞতা আবার কাজে লাগাল। তারা তার অধিকাংশ অঞ্চলের জাতিগুলোর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তাদের নৌ-শক্তির নিয়ন্ত্রণ লাভ করল। মুসলমানগণ আবার সমুদ্রের বিষয়ে অপরিচিতের স্থান গ্রহণ করল। শুধু সমুদ্র তীরের কিছু লোক এখনো এ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেনি। তারা এখনো সমুদ্রে নৌচালনার ব্যাপারে আগ্রহী। যদি তারা অধিক অঞ্চল ও সাহায্যকারীর সহায়তা লাভ করত কিংবা কোনো সাম্রাজ্যশক্তি যদি তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসত, তা হলে তাদের এ আগ্রহ হয়ত বা পথ খুঁজে বের করতে পারত। বর্তমানকালে নৌ-বিভাগের এ পদ এখনো পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে বিদ্যমান। এখনো সেখানে রণতরীর ব্যবহার তার নির্মাণ ও আরোহণের প্রক্রিয়া সুপরিচিত। কারণ কখন এ সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলো থেকে প্রয়োজনের আহ্বান আসবে, তার নিশ্চয়তা নেই। যদি আসে, তা হলে মুসলমানরা আবার অধর্ম ও বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সমুদ্রের বুকে পাল তুলবে। মাগরিবে এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী বহু গ্রন্থ-পুস্তকে ছড়িয়ে আছে যে, মুসলমানরা আবার খ্রিস্টানদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে সমুদ্রের পরপারের দেশগুলো জয় করবে। এটা অবশ্যই ঘটবে এ সামুদ্রিক রণতরীর সহায়তায়। 'আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের অভিভাবক।'[১৪৭] তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম নির্ভরস্থল।

১৪৭. কোরান ৩, ৬৮।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[বিভিন্ন সাম্রাজ্যে অসি ও মসী বিভাগের মর্যাদার পার্থক্য]

জেনে রাখুন, অসি এবং মসী উভয়টিই সাম্রাজ্যাধিপতির হাতিয়ার স্বরূপ। তিনি এগুলোর দ্বারা তার তৎপরতায় সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। অবশ্য সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে, যখন তার অধিপতিরা ক্ষমতা বিন্যস্ত করতে থাকেন, তখন মসী অপেক্ষা অসির প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক হয়ে থাকে। কারণ মসী তথা লেখনী এ অবস্থায় শুধুই সেবক, সুলতানী নির্দেশের পথে বিচরণকারী এবং তরবারী তাঁর কর্মতৎপরতার অংশীদার। সাম্রাজ্যের শেষের দিকেও এমনি অবস্থা। যখন গোত্রপ্রীতির শক্তি, যেমন আমরা বর্ণনা করেছি হ্রাস পায় এবং তার অধিকারীদের সংখ্যা, যেমন পূর্বে বলেছি, অবক্ষয়ের দরুন কমতে থাকে, তখন আবার তরবারীর প্রয়োজন পড়ে। সাম্রাজ্যাধিপতি তখন তরবারীর সাহায্যে নিজের শক্তি প্রকাশ করতে এবং অগ্রসরমান বিপদকে প্রতিরোধ করতে অসি-ধারীদের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। যেমন সাম্রাজ্যের পত্তনকালে দেখা গিয়েছিল, এ দিক থেকে সাম্রাজ্যের দুই ধারেই অসি মসী অপেক্ষা অধিক সুবিধা ভোগ করে। এ সময়ে অসিধারীদের জাঁকজমক ব্যাপকতর, প্রাচুর্য সমৃদ্ধতর ও সুবিধা ভোগ উন্নততর হয়ে দেখা দেয়। সাম্রাজ্যের মধ্যভাগে সম্রাট অসির কবল থেকে অনেকাংশে মুক্তিলাভ করেন। কারণ তখন সাম্রাজ্যের পত্তন শেষ হয়েছে। সুতরাং তখন তাঁর উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যের ফসল ভোগের দিকে ধাবিত; রাজকোষের বিন্যাস, অন্যান্য সাম্রাজ্যের সাথে জাঁকজমকে প্রতিযোগিতা এবং বিধি-নিষেধের সুপ্রতিষ্ঠাই তাঁর কাম্য। এ ক্ষেত্রে একমাত্র কলমই তাঁকে সাহায্য করতে পারে। সুতরাং কলমের প্রয়োজনীয়তা তখন বৃদ্ধি পায় এবং তরোয়াল তার খাপের সুখশয্যায় পরিত্যক্ত হয়। যতক্ষণ না কোনো বিপদ এসে উপস্থিত হয় কিংবা কোন ফাঁক পূরণের প্রয়োজন দেখা দেয়, ততক্ষণ তার দিকে কেউ ফিরে তাকায় না। এ সময়ে মসিধারীদের প্রয়োজনীয়তা তাদের জাঁকজমককে বিপুলতর, মর্যাদাকে উন্নততর, প্রাচুর্য ও সচ্ছলতাকে ব্যাপকতর করে তোলে। তারা সম্রাটের সাহচর্যে নিকটতর, তাঁর সাথে উঠা-বসায় নিস্তর এবং তাঁর গোপন পরামর্শে অন্তরঙ্গতর হয়ে দেখা দেয়। কারণ তখন সম্রাটের হাতিয়ার একমাত্র কলম, তার সাহায্যেই তিনি সাম্রাজ্যের ফলভোগ করতে উদ্যোগী হন। তখন তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের বিচিত্র বিচক্ষণতায় তার বিভিন্ন দিকের সংস্কার নিষ্ঠায় ও তার জাঁকজমকের সুপ্রতিষ্ঠায়

একে নিয়োজিত করেন। এ সময়ে উজিরগণ ও তরবারীর অধিকারীরা কিছুটা নিষ্প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েন। তারা সম্রাটের অন্তরঙ্গ জগতের সংবাদ থেকে দূরে এবং তাঁর বিচিত্র মনোভাব সম্পর্কে সতর্ক অবস্থায় নিজেদেরকে রক্ষা করেন।

সম্ভবত এ অবস্থার কথা বর্ণনা করেই আবু মুসলিম সম্রাট আলমনসুরকে পত্র লিখেছিলেন। মনসুর তাকে আসতে বললে তিনি উত্তরে লিখেন, "অতঃপর পারসিক জ্ঞানীদের উপদেশ থেকে যা স্মরণে আছে তা এই যে, সাধারণ মানুষ যখন শান্ত অবস্থায় থাকে, তখনই উজিরদের সর্বাপেক্ষা দুঃসময়।" এটাই আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে তাঁর নিয়ম। পবিত্র ও উন্নত আল্লাহ্‌ই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী।

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[রাজশক্তির নিদর্শন ও শাসন ব্যবস্থার বিশেষ প্রতীক]

জেনে রাখুন, সুলতানের এমন কিছু নিদর্শন ও অবস্থা আছে, যা জাঁকজমক ও আড়ম্বরের তাগিদেই সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং এগুলো বিশেষভাবে গ্রহণ করে তিনি প্রজাসাধারণ, অন্তরঙ্গ সভাসদ ও সাম্রাজ্যের নেতৃস্থানীয় সকলের মধ্যে পৃথকরূপে বিবেচিত হন। আমাদের জ্ঞানমত যতদূর সম্ভব আমরা এগুলোর মধ্যে সুপরিচিত কিছু অংশের বর্ণনা করব। 'প্রত্যেক জ্ঞানী অপেক্ষা তিনি অধিকতর জ্ঞানী।[১৪৮]

সজ্জা (আলা)

রাজশক্তির নিদর্শনাবলির মধ্যে সাজসজ্জা অন্যতম। পতাকা ও রণধ্বজা উত্তোলন, ঢোলক বাজান এবং ভেঁপু ও শিঙ্গা বাজান এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। রাজনীতি সম্পর্কে আরস্তু (এ্যারিস্টটল)-এর প্রতি আরোপিত গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর রহস্য হল রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে সন্ত্রস্ত করা। কারণ ভয়ংকর শব্দাবলি মানুষের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আমার জীবনের শপথ, এটা এমন একটি আবেগপ্রবণ বিষয়, যা যুদ্ধের ময়দানে প্রতিটি মানুষ উপলব্ধি করতে পারে। তা সেই কারণ যা আরস্তু বর্ণনা করেছেন, অবশ্য যদি সত্যই তা তিনি বলে থাকেন, তা হলে তা একাধিক বিবেচনায় অবশ্যই শুদ্ধ। যদিও এর যথার্থ তাৎপর্য হল এই যে, মানবাত্মা সূর ও বাদ্য শুনে নিঃসন্দেহে আনন্দ ও পুলক অনুভব করে। এর ফলে আত্মশক্তি এমন একটা সজীবতা লাভ করে, যদ্দরুন কঠিন ও সহজ বলে মনে হয় এবং উদ্দিষ্টের জন্য মৃত্যুবরণ করতেও দ্বিধা করে না। এ বিষয়টি বাক্‌হীন প্রাণিজগতেও বিদ্যমান। পাঠক, আপনি অবশ্যই জানেন, উট 'হুদী' শুনে উত্তেজিত হয় এবং অশ্ব শিস ও চিৎকারে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এ স্বরগ্রাম যদি সুসমন্বিত হয়, তা হলে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে আরো সক্রিয় হয়ে থাকে; যেমন সঙ্গীত। সঙ্গীত শ্রবণে শ্রোতার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তৎসম্পর্কে পাঠক নিশ্চয় অবগত আছেন। এ কারণেই অনারবগণ রণাঙ্গনে ঢোলক বা শিঙ্গা নয়; বরং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে। গায়করা সুলতানকে ঘিরে তাদের বাদ্যযন্ত্রসহ গীত গাইতে থাকে এবং বিচিত্র সুরলহরীর মাধ্যমে বীরদিগকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আরব বেদুইনদের যুদ্ধে দেখেছি, গায়ক সৈন্যব্যূহের সম্মুখে বাদ্য বাজিয়ে কবিতা আবৃত্তি

---

১৪৮. কোরান ১২, ৭৫।

করতে থাকে এবং তার বিষয়ের উত্তেজনায় বীর সৈন্যদের মনোবৃত্তি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। তারা রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং একে অপরের অনুসরণ করে বীর্যবত্তা প্রকাশ করে। এরূপ মাগরিবের জানাতী জনগোষ্ঠী; তাদের সৈন্যসারির সম্মুখে কবি এগিয়ে যায় এবং সুরের মাদকতায় এমন উত্তেজনার সৃষ্টি করে, যাতে সুদৃঢ় পর্বতও বিচলিত হয়ে ওঠে। এমন ব্যক্তিও তখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ছুটে ইতিপূর্বে যে এর কল্পনাও করতে পারত না। এ সঙ্গীতকে তারা 'তাসুকাইত' বলে ডাকে। এর মূল হল তদ্বারা এমন একটি পুলক শিহরণ অনুভূত হয়, যা বীর্যবত্তাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। যেমন মদ্যপানে অনুরূপ পুলক ও সজীবতা দেখা দেয়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

পতাকার সংখ্যা, বর্ণ ও দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করার মধ্যে কিছুটা ভয়ঙ্করত্ব সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। এটা অনেক সময় মানুষের মনোভাবের মধ্যে একটা আগ্রাসনের ভাব সৃষ্টি করে। মানবাত্মা ও তার বহুরূপিত্ব সত্যই অদ্ভুত। 'আল্লাহ্ নিশ্চিতভাবে সর্বস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞ।'[১৪৯]

অতঃপর রাজন্যবর্গ ও সাম্রাজ্যসমূহ এ প্রকার নিদর্শন গ্রহণে বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়ে থাকে। তাদের মধ্যে অনেকে অধিক গ্রহণ করে অনেকে অল্প; সাম্রাজ্যের বিস্তার ও ক্ষমতার সাথে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। পতাকার ব্যাপারে বলতে গেলে তা সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই যুদ্ধের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সকল জাতিই তা তাদের যুদ্ধবিগ্রহে ও অভিযান পরিচালনায় উত্তোলন করেছে। হজরত মুহম্মদ (সঃ) এবং পরবর্তী খলিফাদের সময়েও তা ছিল। অবশ্য ঢোল ও শিঙ্গা বাজানোর ব্যাপারটি মুসলমানরা তাদের সংঘশক্তির প্রথম দিকে পরিহার করে চলেছে। কারণ তারা তখন রাজশক্তির স্থূলতা ও তার জাঁকজমকের অসারতা থেকে দূরে এবং তার সামগ্রিক অবস্থাকে পরিত্যাগ করার মানসিকতায় অবস্থান করছিল। এর পর যখন খেলাফত রাজশক্তিতে পরিণত হল, তখনই এটা পার্থিব আড়ম্বর ও প্রাচুর্যের আকর্ষণ অনুভব করতে লাগল। পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলো থেকে পারসিক ও রোমানরা এসে তাদের সাথে মিশ্রিত হল এবং তাদের পোষ্য হিসাবে তাদেরকে আড়ম্বর ও বিলাসব্যাসনের অভ্যাসগুলো সম্পর্কে শিক্ষা দিতে লাগল। এর মধ্যে তাদের যা ভালো মনে হল, তারা তা সজ্জা হিসাবে গ্রহণ করল এবং সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয় প্রতাপের জন্য তাদের কর্মচারীদিগকেও তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীমান্তের শাসক ও সেনাপতিরা, বিশেষভাবে আব্বাসী ও উবাইদী সম্রাটদের সময়ে পতাকা বহনের অনুমতি লাভ করেছিল। তারা কোনো অভিযানে যেতে, সম্রাটের দরবারে কর্তব্য পালনে উপস্থিত হতে কিংবা, নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে তাদের সহচরসহ সাজসজ্জা করেও পতাকা উড়িয়ে যেত। এ ক্ষেত্রে তাদের ও সম্রাটের বাহিনীর মধ্যে পতাকার অল্পাধিক্য ও বর্ণবৈচিত্র্য ব্যতীত অন্য কোনো পার্থক্য ছিল না। যেমন আব্বাসী সম্রাটগণ কালবর্ণের পতাকা ব্যবহার করতেন। বনি উমাইয়া কর্তৃক হাশেম বংশীয়দের হত্যাকাণ্ডের প্রতি শোক প্রকাশের নিমিত্তই পতাকার এ কাল বর্ণ গ্রহণ করা হয়েছিল। এ জন্য তাদেরকে কাল পতাকাধারী বলা হত।

---

১৪৯. কোরান ১৫, ৮৬; ৩৬, ৮১।

এর পর যখন হাশেমীদের বিষয়টি পৃথক হয়ে গেল এবং আবু তালেবের বংশধররা প্রত্যেক ক্ষেত্রে ও প্রত্যেক সময়ে আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে আরম্ভ করল, তখন তারা এক্ষেত্রেও আব্বাসীদের বিরোধিতা করে সাদা বর্ণের পতাকা গ্রহণ করল। এজন্য তাদেরকে সাদা পতাকাধারী বলা হত। উবাইদী সম্রাটদের সমস্ত শাসন আমল ধরে এ রং ব্যবহৃত হয়েছিল। বর্তমানকালেও পূর্বাঞ্চলে আবু তালেবের যে বংশধররা বিদ্রোহ করেছে, যেমন তাবারিস্থানে ও সাআদা'য় শিয়া মতবাদ প্রচারকারীরা অথবা অন্যান্য যারা অভিনব রাফেজী মতবাদের দিকে আহ্বান জানিয়েছে, যেমন কারামতীরা—তারা সকলেই এ সাদা বর্ণবিশিষ্ট পতাকা ব্যবহার করেছে ও করছে।

সম্রাট মামুন তাঁর শাসন আমলে কাল বর্ণের পতাকা ও অন্যান্য প্রতীক পরিবর্তন করে সবুজ বর্ণের পতাকা গ্রহণ করেছিলেন।

পতাকার আধিক্যের ব্যাপারে বলতে গেলে তার কোনো সীমা ছিল না। উবাইদী সম্রাটদের সময় সজ্জার অবস্থা এ ছিল যে, আল আজিজ যখন সিরিয়া বিজয়ে অগ্রসর হন, তখন তাঁর সাথে পাঁচশ পতাকা ও পাঁচশ ভেঁপু গিয়েছিল।

মাগরিবের সিনহাজা ও অন্যান্য গোত্রের বারবার রাজন্যবর্গের ব্যবহৃত পতাকার নির্দিষ্ট কোন রং ছিল না। তারা রেশমের রঙ্গিন জমিনের উপর সোনালী কারুকার্য খচিত পতাকা ব্যবহার করতেন। তাঁরা কর্মচারীদের জন্যও অনুরূপ পতাকা ব্যবহারের অনুমতি অব্যাহত রাখেন। অতঃপর আল-মোহেদ সাম্রাজ্য ও তাদের পরবর্তী জানাতীরা এ সজ্জার ব্যাপারটি ঢোলক ও পতাকাসহ সম্রাটের জন্য সীমিত করে ফেলেন। অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। তারা সম্রাটের জন্য একটি বিশেষ বাহিনীর সৃষ্টি করেন, যা তাঁর গমনাগমনে তাঁকে অনুসরণ করত এবং এটাকে 'সাঁকা' বা পশ্চাদ্বাহিনী বলা হত। তারা পতাকার সংখ্যার ব্যাপারে প্রতিটি সাম্রাজ্যের মতাদর্শ অনুযায়ী অল্পাধিকের অধিকারী। তাদের অনেকে সাত সংখ্যার শুভ প্রভাবের ধারণা অনুসারে পতাকার সংখ্যা সাতটি করেছেন, যেমন আল-মোহেদ ও আন্দালুসের বনি আল আহমার সম্রাটরা। আবার অনেকে দশটি ও বিশটি পতাকাও ব্যবহার করেছেন, যেমন জানাতী রাজন্যবর্গ। সম্রাট আবুল হাসানের সময়, যেমন আমরা দেখতে পেয়েছি, ছোট-বড় মিলিয়ে ঢোলকের সংখ্যা একশ ও পতাকার সংখ্যাও একশ হয়েছিল। তারা আঞ্চলিক শাসক, কর্মচারী ও সেনাপতিদেরকে মসীনা সূত্র নির্মিত সাদা কাপড়ের একটি ক্ষুদ্র পতাকা ও একটি ক্ষুদ্র ঢোলক ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। কেউ এর অতিরিক্ত কোন কিছু ব্যবহার করতে পারত না।

বর্তমানকালে পূর্বাঞ্চলের তুর্কি সাম্রাজ্যে প্রথমে একটি বৃহদাকার পতাকা ব্যবহৃত হয়। তার শিরোদেশে চুলের একটি বৃহৎ ঝুঁটি বিদ্যমান। তারা একে 'শালিশ' ও 'চিতর' নামকরণ করেছেন।[১৫০] এটা তাদের নিকট সম্রাটের নিদর্শন। এর পর আরো অনেকগুলো পতাকা থাকে, তাকে বলা হয় 'সানাজেক'। এর একবচন 'সঞ্জক'; তাদের ভাষায় এর অর্থ পতাকা। ঢোলকের ক্ষেত্রে তারা আধিক্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন এবং

১৫০. রোজেনথালে এর পর—"এটা সাধারণ সৈন্যদল ব্যবহার করে। এর সম্রাটের জন্য একটি পতাকা বিদ্যমান, যাকে 'ইসবাহ' বা 'সাতফাহ' বলা হয়।"

এর সমষ্টিকে বলেন 'কাওসাত'। তারা প্রত্যেক আমীর ও সেনাপতিকে এগুলোর মধ্যে যা ইচ্ছে গ্রহণ করতে অনুমতি দেন। শুধু 'চিতর' ছাড়া; তা সম্রাটের জন্য নির্দিষ্ট।

বর্তমানে আন্দালুসের ফিরিঙ্গী জাতির অন্তর্ভুক্ত জাল্লাকীরা খুব অল্প পতাকা ব্যবহার করে। তাদের পতাকা খুব উর্ধ্বে উত্তোলন করা হয়। এর সাথে তারা তানপুরা জাতীয় তারের বাদ্য ও ভেঁপু জাতীয় বংশীধ্বনি ব্যবহার করে। তারা সঙ্গীতের নিয়ম ও ধারা অনুসরণ করে এগুলোসহ রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়। তাদের পশ্চাদ্বর্তী অন্যান্য অনারব জাতিগুলো সম্পর্কেও প্রায় অনুরূপ তথ্যাদি আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে। "এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। অবশ্যই এগুলোর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন বিদ্যমান।"[১৫১]

সিংহাসন (সরির)

সিংহাসন, বেদী, কৌচ, কেদারা প্রভৃতি কাষ্ঠনির্মিত ও সুসজ্জিত আসন, যাতে সম্রাটগণ সোজা হয়ে অথবা হেলান দিয়ে উপবেশন করেন। এটা দরবারের অন্যান্য আসন অপেক্ষা উচ্চস্থানে অবস্থিত থাকে, যেন অন্যান্যদের সাথে সমান না হয়ে পড়ে। প্রাক্-ইসলাম যুগেই এটা সম্রাটদের নিদর্শন হিসাবে গৃহীত হয় এবং অনারব সাম্রাজ্যগুলোতে ব্যবহৃত হতে থাকে। কখনো তারা স্বর্ণনির্মিত সিংহাসনেও উপবেশন করেছে। হজরত সুলায়মান ইবনে দাউদ (আঃ)-এর হাতির দাঁতের স্বর্ণমণ্ডিত কেদারা ও সিংহাসন ছিল। অবশ্য যে কোনো সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি ও বিলাসব্যসনের যুগেই এরূপ হয়ে থাকে এবং জাঁকজমকের অবস্থাই এই, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। কিন্তু সম্রাজ্যের প্রথম দিকে প্রান্তরীয় জীবনবোধের প্রাধান্য থাকায় এর প্রতি কোনোপ্রকার আগ্রহ জন্মায় না।

ইসলামী সাম্রাজ্যে সর্বপ্রথম মাবিয়া এ সংহাসনের প্রবর্তন করেন। তিনি মানুষের নিকট এর অনুমতি চাইতে গিয়ে বলেছিলেন, "আমি বেশ মোটা হয়ে গেছি।" সুতরাং তারা তাঁকে অনুমতি দিয়েছিল। তিনি সিংহাসন স্থাপন করায় পরবর্তী ইসলামী রাজন্যবর্গ তাঁকে অনুসরণ করেন এবং এটা জাঁকজমকের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ ইতিপূর্বে আমর ইবনেল আসও মিশরে তাঁর প্রাসাদে আরব বেদুইনদের সাথে এক সমতলে মাটিতে উপবেশন করতেন। এ অবস্থায় 'আল-মাকুকাস' তাঁর সাথে প্রাসাদে সাক্ষাৎ করতে আসতেন এবং তার পশ্চাতে লোকজন একটি স্বর্ণনির্মিত সিংহাসন বহন করে এনে সেই প্রাসাদে বসার জন্য পেতে দিত। মাকুকাস আমর ইবনেল আসের সম্মুখেই তাতে উপবেশন করতেন। অবশ্য এতে আরবরা কিছুই মনে করত না। একে ত মাকুকাসের রাজশক্তিসুলভ আচার-আচরণে হস্তক্ষেপ না করার চুক্তি হয়েছিল; তদুপরি আরবরা রাজশক্তির এ আড়ম্বরকে একান্ত হেয় মনে করত। কিন্তু এর পরে আব্বাসী ও উবাহদী সম্রাটগণসহ পূর্বে পশ্চিমের সকল ইসলামী সাম্রাজ্যে এমন সিংহাসন, বেদী ও কৌচ দেখা দিল, যা পারস্য ও রোমান সম্রাটরাও ধারণায় আনতে পারেননি। 'আল্লাহ্' দিন-রাত্রির পরিবর্তন করে থাকেন।[১৫২]

---

১৫১. কোরান ৩০, ২২।

১৫২. তুল, কোরান ২৪, ৪৪।

টাকশাল (সিক্কা)

এটা মানুষের মধ্যে প্রচলিত দিনার ও দিরহামে মোহরাঙ্কিত করার প্রক্রিয়া। এ মোহর বা ছাপের জন্য এমন একটি লোহার ছাঁচ ব্যবহার করা হয়, যাতে কোনো নকশা বা কথা বিপরীতভাবে বিদ্যমান এবং তার দ্বারা দিনার ও দিরহামের উপর ছাপ দেয়া হয়। এর ফলে তাদের উপরিভাগে উক্ত নকশাটি সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এর পূর্বে একাধিকবার ঝালাই করে মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতুর বিশুদ্ধতা নিরূপণ করা হয়। এভাবে মুদ্রারূপে ব্যবহৃত দিনার দিরহামের পরিমাণ সঠিক ও সুনির্দিষ্ট হলে, এর সংখ্যার অনুপাত বিনিময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে; অন্যথায় অনির্দিষ্ট পরিমাণের মুদ্রা লেনদেনে ব্যবহারের জন্য ওজন করে নিতে হয়।

'সিজ্জা' শব্দটি প্রথমে ছাঁচ অর্থে ব্যবহৃত হত এবং তা এ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য লোহার দ্বারা তৈরি যন্ত্র বিশেষ। পরে এ শব্দটি দিনার ও দিরহামের উপর অঙ্কিত ছাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পুনরায় সিক্কা অর্থে এ ছাপ তথা মুদ্রার কার্যপরিচালনা এবং তার প্রয়োজন ও শর্তাদি পূরণের তত্ত্বাবধানকে বোঝাতে থাকে। এটাই বস্তুত মুদ্রা সম্পর্কীয় দায়িত্ব বা পদ এবং পরে এটা এ পদমর্যাদা অর্থে সমস্ত সাম্রাজ্যে প্রচলিত হয়েছে। এটা রাজশক্তির জন্য একটি অতীব প্রয়োজনীয় দায়িত্ব। কারণ এর দ্বারাই মানুষের বিনিময় মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত মুদ্রার বিশুদ্ধতা এবং অবিশুদ্ধতার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়। এ উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য তাদের উপরিভাগে শাসকের পরিচিত নকশা অঙ্কিত করে দেয়া হয়। অনারব সম্রাটরা এ মুদ্রার জন্য নির্দিষ্ট নকশা চিত্র ব্যবহার করতেন। যেমন সংশ্লিষ্ট আমলের শাসকের চিত্র, কোন দুর্গের চিত্র, কোন প্রাণী, শিল্পকর্ম কিংবা অন্য কিছুর চিত্র। আরবরা অনুরূপভাবেই রাজশক্তির শেষ পর্যায় পর্যন্ত মুদ্রা তৈরির কাজ চালিয়ে গেছে।

ইসলামের আবির্ভাবের পর ধর্মীয় সারল্য ও আরবদের প্রান্তরীয় জীবনবোধের জন্য এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়নি। তারা সোনা-রূপা ওজন করে বিনিময়ের কাজ চালাত। পারস্যের দিনার ও দিরহাম তাদের সম্মুখে ছিল; তাও তারা ওজনের মাধ্যমে বিনিময়ে ব্যবহার করত এবং একে অপরের নিকট থেকে গ্রহণ করত। সুতরাং রাজশক্তি এর প্রতি দৃষ্টি না দেয়ায় এগুলো ক্রমশ অবিশুদ্ধ হয়ে পড়ে। সাইদ ইবনে মুসাইয়েব ও আবু যযিনাদ[১৫৩] বর্ণনা মতে সম্রাট আবদুল মালেক আল হাজ্জাজকে দিরহাম তৈরি এবং বিশুদ্ধ মুদ্রা অবিশুদ্ধ মুদ্রা থেকে পৃথক করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এটা চুয়াত্তর হিজরি (৬৯৩/৯৪ খ্রি:)-তে অনুষ্ঠিত হয়। আল-মাদায়েনীর[১৫৪] মতে পঁচাত্তর হিজরিতে এবং ছিয়াত্তর হিজরিতে সমস্ত অঞ্চলে তা প্রচলনের নির্দেশ দেন। তখন এ সকল দিরহামের উপর লেখা ছিল, 'আল্লাহু আহাদ আল্লাহুস্ সামাদ'[১৫৫] (আল্লাহ্ এক আল্লাহ অভাবশূন্য)।

অতঃপর ইয়াজিদ ইবনে আবদুল মালেকের সময় ইবনে হুবাইরা ইরাকের শাসক নিযুক্ত হয়ে তার উন্নতি বিধান করেন। তাঁর পর খালেদ আল কসরী টাকশালের উন্নয়নে

---

১৫৩. আবদুল্লাহ ইবনে দাকোয়ান, মৃত্যু ১৩০-৩২ (৭৪৮-৫০ খ্রি:) হি.। সাইদ—১২১ নং টীকা দ্র.।
১৫৪. আলী ইবনে মুহম্মদ ১৩২-২২৫ (৭৫০-৮৪০ খ্রি:) হি.।
১৫৫. কোরান ১১২, ১-২।

উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালান এবং তাঁর পরে ইউসুফ ইবনে উমরের হাতে এর উন্নতি সাধিত হয়। বলা হয় যে, সর্বপ্রথম যিনি ইরাকে দিনার ও দিরহাম তৈরি করেন, তিনি হলেন মুসয়েব ইবনে যুবাইর। ইনি সত্তর হিজরিতে, তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ, যিনি হেজাজ অধিকার করেছিলেন, তাঁর আদেশে এ কার্য সম্পাদন করেন। এ মুদ্রার এক পৃষ্ঠায় 'বরকতুল্লাহ্' (আল্লাহ্র দয়া) এবং অন্য পৃষ্ঠায় ছিল 'ইসমুল্লাহ্' (আল্লাহ্র নাম)। এর এক বছর পরেই হাজ্জাজ তার পরিবর্তন সাধন করে পৃষ্ঠায় নিজের নাম অঙ্কিত করেন এবং হজরত উমরের সময়ে তার যে পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছিল, তা প্রবর্তন করেন।

এটা এই যে, ইসলামের প্রথম দিকে দিরহামের ওজন ছিল ছয় 'দনক' এবং এক 'মিকাল' এক সমস্ত সাতভাগের তিন দিরহামের হত। এর ফলে দশ দিরহাম সাত মিসকালের সমান ছিল। এর কারণ এ যে, পারস্য সাম্রাজ্যের সময় দিরহামের ওজন বিভিন্ন ধরনের ছিল। তারা মিসকালের ওজনে বিশ 'কিরাত', বার কিরাত ও দশ কিরাতের হত। অতঃপর জাকাতের ব্যাপারে তার পরিমাণ নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দিলে মধ্যমটি অর্থাৎ বার কিরাত গ্রহণ করা হয়। এর ফলে এক মিসকাল এক সমস্ত সাতভাগের তিন দিরহাম হয়ে দাঁড়ায়। বলা হয় যে তার মধ্যে একটির নাম ছিল 'বগলী', তা আট 'দনক' হত, 'তবরী' নামক অন্য একটি চার দনক এবং 'মাগরিবী' আট দনক ও 'ইয়ামনী' ছয় দনকের ছিল। হজরত উমর এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রচলিত দিরহামগুলো খুঁজে বের করতে নির্দেশ দেন। ফলে বগলী ও তবরী মিলিয়ে বার দনক হয় এবং এর অর্ধেক ছয় দনকের দিরহাম প্রচলন করা হয়। এর সাথে সাত ভাগের তিন দিরহাম যোগ করলে এক মিসকাল এবং মিসকাল থেকে দশ ভাগের তিন কমালে এক দিরহাম হয়। সম্রাট আবদুল মালেক যখন মানুষের লেনদেনে ব্যবহৃত মুদ্রা দুটির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য তাদেরকে নতুন করে তৈরি করলেন তখন দিরহামের ওজন হজরত উমর (রাঃ)-র সময়ে নির্ধারিত পরিমাণে প্রচলিত হল। তিনি লোহার ছাঁচ তৈরি করিয়ে তাতে শব্দের নকশা কাটালেন, চিত্রের নয়। কারণ আরবদের নিকট বাক্য ও তার অলংকার সর্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণীয় ও বোধগম্য ছিল। তদুপরি ধর্মীয় বিধান চিত্রাদি সম্পর্কে নিষেধ করত। এটা এভাবে সম্পন্ন হবার পর সকল সময়ে মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়ে রইল। এ সকল দিনার ও দিরহামের আকৃতি ছিল গোল এবং এদের প্রান্ত ভাগের সীমা ব্যাপীয়া গোল রেখা থাকত। এদের এক পৃষ্ঠায় 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ও 'আলহামদু লিল্লাহ্'র নিয়ম অনুসারে আল্লাহ্র প্রশংসা এবং হজরত মুহম্মদ (সঃ) ও তাঁর বংশের উপর দরুদ লিখা থাকত। অন্য পৃষ্ঠায় তারিখ ও খলিফার নাম থাকত। আব্বাসী, উবাইদী ও উমাইয়াদের সাম্রাজ্যকালে এ ধারাই প্রচলিত ছিল।

সিনহাজারা একেবারে শেষের দিকে এসে মুদ্রার প্রচলন করে। 'বেজা'র শাসক মনসুর এর প্রবর্তন করেন। ইবনে হাম্মাদ[১৫৬] তাঁর ইতিহাসে এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আল-মোহেদ সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটলে আল-মেহেদী তাদের যে সকল প্রথার প্রবর্তন করেন, তন্মধ্যে একটি হল চতুষ্কোণ দিরহামের প্রচলন। দিনারের গোলাকৃতির

১৫৬. মুহম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাম্মাদ ৬১৭ (১২২০ খ্রি:) হিজরির দিকে গ্রন্থটি লিখেন।

মধ্যভাগে একটি চতুষ্কোণ রেখা অঙ্কিত করে তাতেও পূর্ববৎ আল্লাহর একত্ব ও প্রশংসা লিপিবদ্ধ করা হত এবং অন্য পৃষ্ঠায় বর্তমান শাসকের নাম ও তার পরবর্তী শাসকদের নাম সারিবদ্ধভাবে লেখা থাকত। আল-মোহেদ সম্রাটরা এরূপই করেছেন এবং বর্তমানকালে তাদের মুদ্রার আকৃতি অনুরূপভাবে বিদ্যমান। আল-মেহেদী সম্পর্কে তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে যে সকল কথা বলা হত, তন্মধ্যে একটি এ ছিল যে, তিনি চতুষ্কোণ দিরহাম প্রবর্তন করবেন। ভবিষ্যৎ ঘটনা বর্ণনাকারীরাই তাঁকে এই বিশেষণে বিশেষিত করতে এবং তাঁর আগমনের পূর্বেই যাদুকররা তাঁর সাম্রাজ্যের সংবাদ দিয়েছিল।

বর্তমানকালে পূর্বাঞ্চলীয়দের মুদ্রার ওজন নির্ধারিত নেই। তারা দিনার ও দিরহাম ওজন করে বিনিময়ে ব্যবহার করে থাকে এবং এটা নির্ধারিত ওজনের ধারা অনুসরণ করে এত মুদ্রার পরিবর্তে এত মুদ্রা—এ হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তারা মুদ্রার পৃষ্ঠায় মাগরিববাসীদের মতো আল্লাহ্‌র নাম, প্রশংসা ও সম্রাটের নাম অঙ্কিত করেননি।[১৫৭] এটা পরম পরাক্রান্ত ও চরম জ্ঞাতার নির্ধারণ।[১৫৮]

আমরা ধর্মীয় বিধান অনুসারে দিনার ও দিরহামের যথার্থ স্বরূপ এবং তাদের ওজনের তাৎপর্য বর্ণনা করে মুদ্রা সম্পর্কীয় আমাদের এ আলোচনার ইতি টানব।

ধর্মীয় বিধান অনুসারে দিনার ও দিরহামের ওজন

এটা এ যে, দিনার ও দিরহাম দুটি মুদ্রা আকৃতি ও ওজনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। এদের এ বৈচিত্র্য পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান। ধর্মীয় বিধানে এদের সম্পর্কে যেমন আলোচনা এসেছে তেমনি এদের সাথে সম্পর্কিত জাকাত, বিবাহ, শাস্তি প্রভৃতিতে বিধি-নিষেধও রয়েছে। সুতরাং ধর্মীয় বিধানে এদের অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যমান, যার উপর ভিত্তি করে উপরোক্ত বিষয়াদির বিধি-নিষেধ প্রচলিত হবে এবং ধর্মীয় বিধান বহির্ভূতগুলো এ ক্ষেত্রে পরিত্যাক্ত হবে।

জেনে রাখুন, ইসলামের প্রথম দিক থেকেই, সাহাবী ও তাবেয়ীদের সময়ে সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী দিরহামের ওজন হল তার দশটি সাত মিসকাল সোনার সমান। উকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমতুল্য। এদিক থেকে তা এক দিনারের দশভাগের সাত ভাগ। এক মিসকাল স্বর্ণের ওজন হল বাহাত্তরটি যবের দানার সমান এবং যে দিরহাম এর দশভাগের সাত ভাগ, তা পঞ্চাশ সমস্ত পাঁচ ভাগের দুটি দানার সমতুল্য। এ সকল ওজনের সব কয়টিই সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারিত। মূর্খতার যুগে তাদের মধ্যে প্রচলিত দিরহাম বিভিন্ন প্রকার ছিল। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভালো 'তবরী', তা চার দনকের সমান; 'বগলী', তা আট দনকের সমান এবং ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত দিরহাম এ দুটির মধ্যবর্তী ছয় দনক। জাকাত নির্ধারণের ক্ষেত্রে একশ বগলী এবং একশ তবরী দিরহামের মাঝখানে পাঁচ দিরহাম নির্ধারিত হত।

---

১৫৭. রোজেনথালে 'করেন'।

১৫৮. কোরান ৬, ৯৬; ৩৬, ৩৮; ৪১, ১২।

মানুষের মধ্যে এ ব্যাপারে মতানৈক্য বিদ্যমান যে, নির্ধারণের এ বিষয়টি কি আব্দুল মালেকের সময় থেকে হয়েছে এবং মানুষ পরে এর উপর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এ প্রকার একটি মত আল খেতাম 'মা আলেমুস্‌সুনান[১৫৯] গ্রন্থে এবং আল মাওয়ারদী আল আহকামুস্ সুলতানিয়া' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী বিশেষজ্ঞগণ এ মতটি অস্বীকার করেছেন। কারণ এটা মেনে নিয়ে, সাহাবী ও তাঁদের পরবর্তীকালে ধর্মীয় বিধান অনুসারে নির্ধারিত দিরহামের ওজন অপরিচিত ছিল বলে মনে করতে হয়। অথচ তখন জাকাত, বিবাহ, শাস্তি ও অন্যান্য ব্যাপারে দিরহামের প্রয়োজনীয়তা ছিল, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি।

এ ব্যাপারে যথার্থ বক্তব্য এই যে, ঐ সময়েও দিরহামের ধর্মীয় বিধিসম্মত ওজন সকলের জানা ছিল। কারণ বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন হত। কিন্তু প্রকাশে এ ওজনের কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবহার ছিল না। শুধুমাত্র ধর্মীয় বিধান অনুসারে তার পরিমাণ ও ওজন দ্বারা প্রচলিত দিনার-দিরহামের বিনিময় ব্যবস্থার সাথে তারা সকলেই পরিচিত ছিলেন। পরে যখন ইসলামের বিস্তৃতি ঘটল এবং সাম্রাজ্য ব্যাপক হয়ে উঠল, তখন অবস্থার চাপেই তাদের ধর্মীয় বিধিসম্মত পরিমাণ ও ওজনকে বাস্তবে রূপ দিয়ে বিনিময়ের অন্তর্গত অসুবিধাকে দূর করবার প্রয়োজন দেখা দিল। সম্রাট আবদুল মালেকের সময় এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল বলেই তিনি তাদের সম্পর্কে জ্ঞাত ধারণা থেকে তাদের পরিমাণ ও ওজনকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা দেন। তিনি এদের উপরিভাগে 'দুটি বিশ্বাসে'র সাক্ষ্যের পরে নিজের নাম ও তারিখের ছাপ অঙ্কিত করেন। মূর্খতার যুগের সকল মুদ্রা বাতিল ঘোষিত হয় এবং তাদেরকে বিশুদ্ধ করে নতুনভাবে মোহরাঙ্কিত করায় ঐগুলোর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এটাই যথার্থ বক্তব্য, যা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এর পরবর্তীকালে মানুষের সম্মুখে এ ধর্মীয় বিধিসম্মত মুদ্রার বিরোধিতা করার সুযোগ দেখা দিল এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যের ইচ্ছা অনুযায়ী চতুর্দিকে দিনার ও দিরহামের রূপ বিচিত্র হয়ে উঠল। মানুষ আবার সেই ইসলামের প্রাথমিক যুগের ন্যায় ধর্মীয় বিধিসম্মত ওজন ও পরিমাণকে মনে মনে ধারণা করতে আরম্ভ করল। আবার প্রতিটি সাম্রাজ্যের মানুষ তাদের ধারণাগত ধর্মীয় বিধিসম্মত ওজনের দ্বারা প্রচলিত মুদ্রা থেকে ধর্মীয় দায়িত্বাদি নির্বাহের ব্যবস্থা করতে লাগল।

মধ্যম ধরনের বাহাত্তরটি যবের দানার সমান দিনারের ওজন, যা বিশেষজ্ঞরা বর্ণনা করেছেন, তার উপর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অবশ্য ইবনে হজম এর বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন, এর ওজন চৌরাশি দানা। বস্তুত এটা কাজী আব্দুল হকের[১৬০] বর্ণনায় তাঁর মত বলে উল্লেখিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এর প্রতিবাদ করেছেন এবং তারা একে ভুল ও ধারণাপ্রসূত বলে মনে করেন। এ মতই সঠিক। 'আল্লাহ্ তাঁর বক্তব্য দ্বারা সত্যকে যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।'[১৬১]

---

১৫৯. রোজেনথালে 'খাত্তাবী'—হামদ ইবনে মুহম্মদ ৩১৯-৮৮ (৯৩১-৯৮ খ্রি:) হি.।

১৬০. ইবনে আবদুর রহমান আল ইশবিলী ৫১০-৮১ (১১৬-৮৫ খ্রি:) হি.।

১৬১. কোরান ৮, ৭; ১০, ৮২; ৪২, ২৪।

এরূপভাবে পাঠক, জেনে রাখুন যে, ধর্মীয় বিধিসম্মত উকিয়াও মানুষের মধ্যে সুপরিচিত নয়। কারণ যা পরিচিত আছে, তা অঞ্চল অনুসারে বিভিন্ন। কিন্তু ধর্মীয় বিধিসম্মত উকিয়ার মধ্যে ধারণাগত কোনো বিরোধ নেই। 'আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে যথার্থ নির্ধারিত করে দিয়েছেন।'[১৬২]

সীলমোহর (খাতম)

এটাও শাসন ব্যবস্থারই একটি অংশ এবং রাজশক্তিরই একটি দায়িত্ব। পত্র ও সনদের উপর মোহরের ছাপ দেয়ার রীতি প্রাক্ ইসলাম যুগেও রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং পরেও আছে। বোখারী ও মুসলিমের হাদিসে প্রমাণ আছে যে, হজরত মুহম্মদ (সঃ) রোম সম্রাটের পত্র লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁকে বলা হয়েছিল, অনারব রাজন্যবর্গ মোহরাঙ্কিত পত্র ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করে না। সুতরাং তিনি রূপার একটি সীলমোহর গ্রহণ করেন এবং অঙ্কিত ছিল 'মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ' (মুহম্মদ আল্লাহ্র রসূল)।

বোখারী বলেন, তিনি তিনটি শব্দকে তিনটি সারিতে বসিয়ে মোহর তৈরি করান এবং তা দিয়ে ছাপ দেন। আরো বলেন, তাঁর ন্যায় এ সীলমোহরের নকশা আর কেউ তৈরি করেননি। আরো বলেন, এটা দ্বারা হজরত আবু বকর, উমর ও উসমান (রাঃ) মোহরের কাজ চালিয়েছেন। অতঃপর হজরত উসমানের হাত থেকে এটা 'আরিসে'র কুয়ায় পড়ে যায়। তাতে অল্পই[১৬৩] পানি ছিল; কিন্তু পরে আর তার তল পাওয়া যায়নি। এর ফলে হজরত উসমান খুবই দুঃখিত হন এবং দুর্ঘটনাটিকে একটি অশুভ চিহ্ন বলে মনে করেন। তিনি পরে উক্ত মোহরের অনুরূপ একটি তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন।

মোহরের নকশা তৈরি এবং তা দ্বারা ছাপ দেয়ার ব্যাপারে কতিপয় বিষয় জানার আছে। তা এই যে, এ 'খাতম' বলতে সেরূপ মোহরকে বোঝায়, যা আঙুলে পরা হয়। এটা থেকে 'তাখাত্তামা' ক্রিয়াপদটির উৎপত্তি, যার অর্থ হল 'সে আংটি পরেছে।' তা দিয়ে শেষ ও পূর্ণতাও বোঝানো হয়। এ থেকে বলা হয়, 'খাতামতুল আম্‌রা' অর্থাৎ বিষয়টি শেষ করেছি। 'খাতামতুল্ কোরআনা' অর্থাৎ কোরান শেষ করেছি। এটা থেকেই খাতমুন্নবীঈন[১৬৪] (নবীদের শেষ) ও 'খাতমুল আমর' (বিষয়টির শেষ) বোঝায়। এটা থেকে বোতল ও পাত্রাদির মুখ বন্ধ করার ছিপিকেও বোঝায়। বলা হয় এতে 'খেতাম' অর্থাৎ ছিপি আছে। এটাই কোরানে বলা হয়েছে, 'খেতামুহুমিসকুন' অর্থাৎ তার ছিপি মিশকের।[১৬৫] যারা এ শব্দের ব্যাখ্যা শেষ ও পূর্ণতা করেছেন, তারা ভুলে পতিত হয়েছেন। তারা বলেন, অর্থাৎ তারা তাদের পানীয়ের শেষাংশে মিশকের গন্ধ পাবেন। কিন্তু যথার্থ অর্থ এটা নয়। বরং তা ঐ 'খেতাম', যার অর্থ হল ছিপি। কারণ সাধারণ মদের পাত্রাদির মুখ বন্ধ করতে মাটি ও পিচ ব্যবহার করা হয়, যাতে তা সুরক্ষিত হয়ে স্বাদ ও গন্ধ বৃদ্ধি পায়। বেহেশতী মদের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য তার

---

১৬২. কোরান ২৫, ২।
১৬৩. রোজেনথালে 'অধিক'। বোখারী দ্রঃ।
১৬৪. কোরান ৩৩, ৪০।
১৬৫. কোরান ৮৩, ১৬।

ছিপি মৃগনাভির বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তা যথার্থই পার্থিব জীবনে ব্যবহৃত মাটি ও পিচের ছিপি থেকে অধিকতর সুগন্ধ সুরুচির পরিচায়ক।

যখন 'খাতম' অর্থে উল্লেখিত সকল কিছু বোঝাবার বিষয়টি পরিষ্কার হল, তখন তা দ্বারা তার ফলে উৎপন্ন চিহ্ন বোঝাতে অসুবিধা কোথায়! তা এ যে, মোহরে যখন কিছু শব্দ বা নকশার আদল অঙ্কিত করে কাদামাটি বা কালির মধ্যে ডুবিয়ে কাগজের উপর ছাপ দেয়া হয়, তখন কাগজের পৃষ্ঠায় তার ছাপ অঙ্কিত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মোমের ন্যায় নরম কোন বস্তুতে ছাপ দিলেও এ শব্দ বা নকশার চিহ্ন তাতে রেখায়িত হয়ে ওঠে। যদি মোহরে শব্দ থাকে এবং তা ডানদিক থেকে খোদিত হয়ে থাকে, তা হলে কাগজের পৃষ্ঠার ছাপটিকে বামদিক থেকে পড়তে হবে। যদি নকশাটি বামদিক অঙ্কিত হয়ে থাকে, তা ছাপটিকে ডানদিক থেকে পড়তে হবে। কারণ মোহরে অঙ্কিত নকশাটি ডান, বাম যে দিক থেকেই অঙ্কিত করা হোক না কেন, তা ছাপ দেবার সময় নকশাটিকে উল্টিয়ে দেয়। যাহোক, এভাবে মোহরটি কাদামাটি বা কালিতে ডুবিয়ে কাগজের পৃষ্ঠায় ছাপ দেয়ার ফলে যে চিহ্নাদি ফুটে ওঠে, তা দ্বারা এ কথাই বোঝানো হয় যে, বিষয়টি শেষ হল বা পূর্ণতা লাভ করল অর্থাৎ এ পত্রের বিষয়টি যথার্থ ও কার্যকর। যেন পত্রের বিষয়টিকে এভাবে চিহ্নিত করলেই তার কার্যকারিতা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং এর অন্যথা হলে তা অসম্পূর্ণ ও অশুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। কখনো মোহরের এ ছাপটি পত্রের লেখার শেষের দিকে থাকে; আবার কখনো প্রথম দিকেই তা আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতাবোধক সূচয়িত কিছু শব্দের সাথে ব্যবহৃত হয়। অথবা তার সঙ্গে সুলতানের নাম; আমীর বা লেখকের নাম অর্থাৎ যা যুক্তিযুক্ত হয়, তাই থাকে। কখনো তার সাথে প্রেরকের কিছু গুণকীর্তণও সন্নিবেশিত হয়। এর দ্বারা পত্রটির বিশুদ্ধতা ও তার কার্যকারিতার নিদর্শনই প্রকাশ পায়। এরূপ নাম লেখাকে সাধারণভাবে 'আলামত' বা স্বাক্ষর বলা হয় এবং মোহরের ক্ষেত্রে এ ছাপটিকে মোহর বলা হয়; কেননা তা 'আসেফী' মোহরের ধারা অনুসরণ করে নকশাবিশিষ্ট করা হয়েছে। এটা থেকেই কাজীর মোহর, যা বাদীবিবাদীর নিকট পাঠানো হয়; অর্থাৎ তাঁর স্বাক্ষরও লেখা যদ্বারা বিধি-নিষেধ কার্যকরী হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে সম্রাট বা খলিফার মোহর অর্থাৎ তাঁদের স্বাক্ষর।

সম্রাট হারুনুর রশীদ যখন ফজলকে বদলে তার ভাই জাফরকে উজির করতে মনস্থ করলেন, তখন তাদের পিতা ইয়াহিয়া ইবনে খালেদকে বলেছিলেন, "হে পিতা, আমি আমার মোহরটি ডানদিক থেকে বামদিকে নিতে চাই।" তিনি মোহরকে উজারতের রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। কারণ তাঁদের আমলে পত্র ও ফরমানাদির উপর মোহরাঙ্কিত করার দায়িত্ব উজিরদের উপর ন্যস্ত ছিল।

অনুরূপভাবে মোহরের গুরুত্বের বিষয়টি তাবারীর ঐ বর্ণনা থেকেও শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়, যাতে তিনি বলেছেন, মাবিয়া ইমাম হাসানের সাথে সন্ধি স্থাপনে সম্মত হয়ে একটি সাদা কাগজের নিচে সীলমোহর দিয়ে লিখেছিলেন, "তুমি, নিচে মোহরাঙ্কিত সংশ্লিষ্ট কাগজটিতে তোমার ইচ্ছামত শর্তাদি লিখে নিতে পার; তা তোমার প্রাপ্য বলে বিবেচিত হবে।" এ ক্ষেত্রে মোহরের অর্থ হল কোনো পত্রের নিচের স্বাক্ষর; তা লেখনী বা অন্য যে কোন বস্তুর দ্বারাই দেয়া হোক না কেন।

কখনো এর দ্বারা বোঝায় যে, মোহরটি কোনো নরম পদার্থের উপর চেপে ধরে তাতে তার ছাপ সৃষ্টি করতে হবে এবং তা পত্রের বাঁধুনি সুতার উপর স্থাপন করতে হবে। কখনো সংরক্ষণযোগ্য বিষয়াদির উপরও এ মোহর দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে তার অর্থ সেই ছিপি, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যাহোক, উভয় দিক থেকেই তা মোহরের চিহ্ন; এজন্য তাকেই মোহর বলা হয়েছে।

সর্বপ্রথম যিনি মোহরকে পত্রে ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ স্বাক্ষররূপে, তিনি হজরত মাবিয়া। কারণ তিনি তাঁর কুফার শাসক যিয়াদের নিকট আমর ইবনে যুবাইরকে একলক্ষ দেবার নির্দেশ দিয়ে একটি পত্র লিখেছিলেন। পত্রটি পথিমধ্যে খুলে এক লক্ষকে দুই লক্ষে পরিবর্তিত করা হয়। পরে যিয়াদ হিসাব দাখিল করলে মাবিয়া এটা অস্বীকার করেন। তিনি অতিরিক্ত এক লক্ষের জন্য আমরকে দায়ী করে বন্দী করে রাখেন। পরে আমরের ভাই আবদুল্লাহ্ উক্ত এক লক্ষ পরিশোধ করে তাকে মুক্ত করেন। এ সময় থেকেই মাবিয়া মোহরের একটি দপ্তর স্থাপন করেন; তাবারী এটা বর্ণনা করেছেন। অন্যরা বলেছেন যে, এ সময় থেকে পত্রকে সুতার দ্বারা বাঁধার নিয়ম প্রচলিত হয়। কারণ এর পূর্বে এভাবে বাঁধা হত না। মাবিয়া এভাবে তার উপর ছিপি লাগিয়ে দেন। মোহরের দপ্তরের অর্থ হল, এমন কিছু সংখ্যক লেখক, যারা সম্রাটের পত্রাদি লিখে মোহরাঙ্কিত করে তাকে স্বাক্ষর অথবা সূত্রের দ্বারা সুরক্ষিত অবস্থায় পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। অবশ্য কখনো দেওয়ান বা দপ্তর অর্থে তাদের বসবার স্থানকেও বোঝায়, যেমন আমরা কর্মীদের দেওয়ানের বেলায়ও বর্ণনা করেছি।

পত্রাদি গাঁথবার জন্য পৃষ্ঠা ছিদ্র করে সুতা ব্যবহার করা হয়, যেমন মাগরিবে দেখা যায় কিংবা তা ভাঁজ করে তার একটি দিক আঠা লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়, যেমন পূর্বাঞ্চলের লেখকরা করে থাকেন। কখনো ছিদ্র বা মিলনস্থলে এমন চিহ্ন প্রয়োগ করা হয়, যাতে পত্রটি খোলা বা তার পাঠ করা থেকে সংরক্ষিত থাকতে পারে। মাগরিববাসীরা ছিদ্রের স্থানে এক খণ্ড মোম ব্যবহার করে এবং তার উপর নির্দিষ্ট চিহ্নবিশিষ্ট সীলমোহরের ছাপ দেয়। এতে মোমের উপর উক্ত চিহ্নটি ফুটে ওঠে। পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলোয় পত্রের আঠা লাগিয়ে বন্ধ করার স্থানে এক প্রকার মাটির উপর সীলমোহর দেয়া হত। এ মাটির রং লাল এবং তা এ উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হত। এর উপর মোহরের নকশার ছাপ অঙ্কিত হত। আব্বাসী সাম্রাজ্যে এটা মোহরের মাটিরূপে পরিচিত ছিল এবং 'সিরাফ'[১৬৬] থেকে তা আনা হত। এ থেকে প্রকাশ পায় যে, তা এ উদ্দেশ্যেই বিশিষ্ট ছিল।

এটাই ঐ সীলমোহর, যা পত্রাদির চিহ্ন অথবা ছিপির নকশা হিসাবে ব্যবহৃত হত। সুতার দ্বারা বাঁধার ব্যাপারটি পত্রাদি বিভাগের সাথে বিশেষভাবে সংযুক্ত ছিল। আব্বাসী সাম্রাজ্যে এ বিভাগের দায়িত্ব উজিরের উপর ন্যস্ত ছিল। অতঃপর এর প্রচলন বিচিত্র হওয়ায় পত্রাদি ও রচনা বিভাগের দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ত থাকত, তিনিই সীলমোহরের ভার বহন করতেন। এর পর মাগরিব অঞ্চলে সম্রাটের সজ্জা ও নিদর্শন হিসাবে আঙুলে পরিধানযোগ্য সীলমোহর গ্রহণ করা হত। তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে স্বর্ণের দ্বারা প্রস্তুত করে

---

১৬৬. ২০৭ পৃষ্ঠা দ্র.।

রুবি, ফিরুজা, মরকত প্রভৃতি মণি-মুক্তার দ্বারা তাকে কারুকার্যমণ্ডিত করা হত। সম্রাট এটাকে সাম্রাজ্যের নিদর্শন হিসাবে ব্যবহার করতেন। যেমন আব্বাসী সাম্রাজ্যে চাদর ও লাঠির নিদর্শন ছিল[১৬৭] এবং উবাইদী সাম্রাজ্যে ছত্র ব্যবহার করা হত। আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশে বিষয়াদির পরিবর্তন করে থাকেন।

'তিরায' (রাজকীয় পরিচ্ছদ)

এটা রাজশক্তি ও শাসন ব্যবস্থার আড়ম্বরের অন্তর্ভুক্ত এবং এ ব্যাপারে সাম্রাজ্যগুলোর প্রথা হল, তাঁদের নাম কিংবা তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু নিদর্শন কাপড়ের উপর অঙ্কিত করে রাজকীয় পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা। এ উদ্দেশ্যে রেশম, গরদ অথবা সাদা রেশম ব্যবহার করা হয় এবং উপরোক্ত লিখনগুলো সোনালি সুতার দ্বারা তাতে যথানিয়মে বয়ন করে দেয়া হয়। কখনো সোনালী সুতার পরিবর্তে কাপড়ের রঙের বিপরীতধর্মী কোন রঙ্গিন সুতা ব্যবহার করা হয়। বিষয়টি এ ব্যাপারে দক্ষ কারিগর ও বয়নশিল্পীদের নির্ধারণ ও সংবচনের উপর নির্ভরশীল। এভাবে রাজকীয় পরিচ্ছদ এ সকল চিহ্নাদির দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। এতে সাধারণ পরিচ্ছদের সাথে এর পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। সম্রাট এটা নিজে পরিধান করে, কাউকে সম্মানিত করতে চাইলে, তাকে দান করে কিংবা তাঁর সাম্রাজ্যের কোনো পদমর্যাদায় নিয়োজিত কর্মচারীকে তা পরিধানের অনুমতি দিয়ে সাধারণের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করেন।

প্রাক্-ইসলাম যুগের অনারব সম্রাটরা নিজেদের ছবি ও আকৃতি কিংবা উক্ত উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট অন্য কোনো ছবি ও আকৃতি ব্যবহার করে রাজকীয় পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাতেন। কিন্তু পরে ইসলামী সম্রাটগণ এ প্রথাকে দূর করে তদস্থলে তাদের নামের সাথে কল্যাণবোধক কোনো বাক্য বা কথা মুদ্রিত করাতেন। দুটি সাম্রাজ্যে এটাই রাজকীয় আড়ম্বর ও সম্মানের পরিচ্ছদ ছিল। তাদের প্রাসাদের এক দিকেই এ সকল পরিচ্ছদ বয়নের নির্দিষ্ট গৃহ ছিল, যাকে 'তিরায ঘর' বলা হত এবং যারা এ ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করতেন, তাদেরকে বলা হত 'তিরায কর্তা'। তারা রং, যন্ত্রপাতি ও বয়নের বিষয়টি তদারক করতেন এবং উক্ত কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের বেতন, তাদের যন্ত্রপাতির সহজীকরণ ও তাদের কার্যের উন্নতিবিধানের প্রতি লক্ষ রাখতেন। সম্রাটগণ তাদের সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত ব্যক্তি ও তাঁদের আশ্রিতপোষ্যদেরকে এ পদে নিয়োগ করতেন। আন্দালুসের বনি উমাইয়া সাম্রাজ্যে এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। পরবর্তী ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ, মিশরের উবাইদী সম্রাটগণ এবং তাদের সমসাময়িক পূর্বাঞ্চলের অনারব সম্রাটরাও এ অবস্থা অনুসরণ করেছেন। অতঃপর যখন এ ব্যাপারে বিলাসিতা ও বৈচিত্র্য সৃষ্টির ক্ষমতা লোপ পেল এবং সাম্রাজ্যগুলোর বিন্যাস ও প্রাধান্য বিস্তারের ধারা ব্যাহত হয়ে বহু সাম্রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ল, তখন অধিকাংশ সাম্রাজ্য থেকে এ পদমর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হল।

হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে বনি উমাইয়াদের পরে মাগরিবে আল-মোহেদ সাম্রাজ্যের উদ্ভব হলে, তারা প্রথমদিকে এ সকল আড়ম্বর গ্রহণ করেনি। কারণ তখনো

---

১৬৭. রোজেনথালে এ চাদর ও লাঠিকে হজরত মুহম্মদের বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাদের মধ্যে তাদের ইমাম মুহম্মদ ইবনে তুমারত আল-মেহেদীর দীক্ষার ফলে ধর্মানুভূতি ও সারল্য বিদ্যমান। তারা এ কারণে রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণ ব্যবহার করা থেকে দূরে সরে ছিল। কিন্তু তাদের বংশধররা পরবর্তীকালে যে ধরনের বিলাসব্যসনে নিমগ্ন হয়েছে, তা পূর্বসূরিদের মধ্যে ছিল না। বর্তমানে মাগরিবে আমরা মারিনী সাম্রাজ্যের উন্মেষ ও সমৃদ্ধির পর্যায়ে উক্ত আড়ম্বরের প্রচুর নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি। তারা এটা সমসাময়িক আন্দালুসের ইবনেল আহমারের সাম্রাজ্য থেকে শিখেছে এবং উক্ত সাম্রাজ্য তা ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের অনুসরণে প্রবর্তন করেছিল। এর ফলে তাদের পরস্পরের প্রভাবের একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়।

বর্তমানকালে মিশর ও সিরিয়ার তুর্কি সাম্রাজ্যে তিরাযের ব্যাপারটি প্রচুর পরিমাণে অনুসৃত হচ্ছে। অবশ্য তা তাদের রাজশক্তি ও নাগরিক সমৃদ্ধির অনুপাতে প্রচলিত রয়েছে। এতদসত্ত্বেও তিরাযের জন্য তাদের সাম্রাজ্যে নির্দিষ্ট কোনো গৃহ বা প্রাসাদে অবস্থিত কোনো অঙ্গন নেই এবং তার তত্ত্বাবধানের কোনো পদও দেখা যায় না, তারা এ ব্যাপারে দক্ষ শিল্পীদের কাছে ফরমায়েশ দিয়ে তা প্রস্তুত করিয়ে নেয়। শিল্পীরা রেশম ও খাঁটি স্বর্ণের দ্বারা এ পরিচ্ছদ তৈরি করে থাকে। তাদেরকে 'মুযরকশ' বলা হয়। এটা একটি অনারব শব্দ। এর উপর তারা সম্রাট বা আমীরের নাম অঙ্কিত করে এবং অন্যান্য আরো অনেক কিছু, যা সাম্রাজ্যের যোগ্য, তৎসম্পর্কেও তারা বিচিত্র শিল্পকর্মের অনুসরণ করে। 'আল্লাহ্ দিন-রাত্রির পরিবর্তন করে থাকেন। আল্লাহ্ই যথার্থ উত্তরাধিকারী'।[১৬৮]

ফুস্তাত ও সিরাজ (রাজকীয় তাঁবু ও আচ্ছাদন)

জেনে রাখুন, রাজশক্তির নিদর্শন ও বিলাসব্যসনের অঙ্গ হিসাবে তাঁবু ও আচ্ছাদন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলো মসীনাসূতা, পশম ও কার্পাসের দ্বারা তৈরি হয় এবং এগুলো টানাতে মসীনা ও কার্পাসের দড়ি ব্যবহার করা হয়। সম্রাটগণ ভ্রমণে বের হলে এগুলোর দ্বারা জাঁকজমক প্রদর্শন করেন। এ সকল তাঁবু ও চাঁদোয়া নানা বর্ণের এবং সাম্রাজ্যের সচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির অনুপাতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হয়ে থাকে। এগুলো গ্রহণের ব্যাপারে যে বিষয়টি কাজ করে থাকে, তা হল এই যে রাজশক্তি লাভের পূর্বে এবং তার প্রথম দিকে তারা যে ধরনের গৃহগুলোতে বসবাস করেছে, তারই এক আনুপূর্বিক অভ্যাস। বনি উমাইয়া সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাটদের সময়ে আরবরা চামড়া ও পশমের নির্মিত তাঁবু গৃহে বাস করত। তখন পর্যন্তও অধিকাংশ আরব বেদুইনরা তাদের প্রান্তর জীবনের ধারা অনুসরণ করছে। সুতরাং তারা যখন কোনো অভিযানে বের হত ও যুদ্ধক্ষেত্রে যেত, তখন তাদের যাবতীয় সাংসারিক আসবাবপত্র ও স্ত্রী-পুত্রাদি পোষ্যদেরকে সঙ্গে নিত, যেমন বর্তমানকালেও তারা অনুরূপ করে থাকে। এর ফলে তাদের সৈন্যদলে পরিবারের সংখ্যা থাকত বহু এবং তারা দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় গোত্রানুসারে অগ্রসর হত। আরবদের অভ্যাস অনুসারেই তাদের একদলের অবস্থান থেকে অন্যদলের অবস্থান দেখা যেত না। এ কারণে সম্রাট আব্দুল মালেক এক

১৬৮. তুল, কোরান ৭৩, ২০ এবং ২১, ৮৯।

পশ্চাদ্বাহিনী সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করেন, যারা তাঁর ভ্রমণকালে সৈন্য দলকে তাঁর পিছনে পিছনে যাওয়ার জন্য বাধ্য করত। বর্ণিত আছে যে, এ ব্যাপারে সম্রাটকে প্রথম রুহ ইবনে যিম্বা[১৬৯] পরামর্শ দিয়েছিল এবং সম্রাট হাজ্জাজকে এ পদে নিয়োজিত করেছিলেন। পরে একদিন সম্রাট ভ্রমণে বের হলে উক্ত রুহ ইবনে যিম্বা অগ্রসর হতে দেরি করায় হাজ্জাজ তার দায়িত্ব পালনের প্রথম কীর্তি হিসাবে তার তাঁবু পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ কাহিনী সকলের নিকট সুপরিচিত এবং এটা থেকে আরব বেদুইনদের মধ্যে হাজ্জাজের প্রতাপ সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়। কারণ তাদেরকে কুচ করতে বাধ্য করা একমাত্র সেই ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যাকে সরল বেদুইনরা সহসা আক্রমণ করতে সাহস করবে না। কেননা সে তাদের জন্য ভীতিপ্রদ গোত্রপ্রীতির অধিকারী। এ কারণেই আব্দুল মালেক হাজ্জাজকে এ পদে নিয়োজিত করেন। কেননা তিনি জানতেন যে, সে তাঁর গোত্রপ্রীতি ও তেজবীর্যের দ্বারা এ দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

অতঃপর যখন আরবি সাম্রাজ্য নাগরিকত্ব ও আড়ম্বরের ব্যাপারে বৈচিত্র্য অর্জন করল, তারা নগর ও শহরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে তাঁবু ত্যাগ করে প্রাসাদের অধিবাসী হল এবং উটের পিঠ ছেড়ে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করল, তখন তারা ভ্রমণকালে মসীনার তৈরি আচ্ছাদন ব্যবহার করত। তা থেকে তারা বিভিন্ন আকার ও নির্দিষ্ট প্রকারের গৃহ, যেমন—গোল, দীর্ঘ ও চতুষ্কোণ প্রভৃতি নির্মাণ করত এবং এগুলোতে তারা দর্শনীয়ভাবে সকল সৌন্দর্যসহ আসর জমাত। তাদের মধ্যে সেনাপতি আমীর তার বৃহৎ তাঁবুর চতুর্দিকে মসীনার তৈরি বেষ্টনী ব্যবহার করত, যাকে মাগরিবের সৈন্যদলের নিজস্ব বারবার ভাষায় 'আফরাক' বলা হত। এতে শেষ বর্ণ 'ক'-এর উচ্চারণ আরবি 'কাফ' ও 'ক্বাফের' মধ্যবর্তী। এরূপ বৈশিষ্ট্য এ অঞ্চলের সুলতানের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল; অন্য কেউ তা ব্যবহার করত না।

কিন্তু পূর্বাঞ্চলে এটা সুলতান ছাড়াও প্রত্যেক সেনাপতি ব্যবহার করে থাকেন। এর পর নগরে তাদের স্থায়ী বসবাস তাদের স্ত্রী-পুত্রাদির প্রাসাদে বা অন্যত্র সুরক্ষিত গৃহে অবস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে এবং এর ফলে তাদের বোঝা নেমে গেছে। ফলে এখন সৈন্য দলের অবস্থানগত দূরত্ব হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং এখন সম্রাট ও সৈন্যদল একই ঘাঁটিতে অবস্থান করেন এবং যে কোনো ব্যক্তির একক দৃষ্টিই তাদের বর্ণ বৈচিত্র্যের আকর্ষণীয় দৃশ্যকে এক সঙ্গে অবলোকন করতে পারে। ফলে বিভিন্ন সাম্রাজ্যে বিলাসব্যসন ও আড়ম্বরের এ প্রথা দীর্ঘস্থায়ী রূপ ধারণ করেছে।

আল-মোহেদ ও জানাতী সাম্রাজ্য, যার ছায়া আমাদের উপর পতিত হয়েছে, তার অধিকারীরাও প্রথম দিকে ঐ সকল আবাস ব্যবহার করত, সাম্রাজ্যের পূর্বে যাতে তারা অভ্যস্ত ছিল; যেমন সাধারণ তাঁবু ও নিদ্রার জন্য ব্যবহৃত আচ্ছাদন। অতঃপর যখন তাদের সাম্রাজ্যেও বিলাসব্যসন ও প্রাসাদ জীবন সুদৃঢ় হল, তখন তারাও বৃহৎ তাঁবু রাজকীয় আচ্ছাদন ব্যবহার করল এবং এ ব্যাপারে তাদের সাজসজ্জা তাদের ধারণাকেও অতিক্রম করে আবাসস্থলের চূড়ান্ত বিলাসিতায় পরিণত হয়েছিল।

---

১৬৯. সম্রাট আব্দুল মালেকের পরামর্শদাতাদের অন্যতম; মৃত্যু: ৮৪ (৭০৩ খ্রি.) হি.।

অবশ্য এর ফলে সৈন্যদলের অবস্থা কিছুটা অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, তারা একত্র অবস্থান করার ফলে একসঙ্গে নৈশকালীন আক্রমণের শিকারে পরিণত হতে পারে এবং একটি মাত্র চিৎকার তাদের সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলার জন্য যথেষ্ট। তদুপরি তাদের সাথে স্ত্রী-পুত্রাদি না থাকার ফলে তাদের নিরাপত্তার জন্য মৃত্যুবরণের ইচ্ছাও তাদের মধ্যে ততটা দৃঢ় হতে পারে না। এ জন্য তাদের নিরাপত্তার জন্য অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন। 'আল্লাহ্ শক্তিমান ও পরাক্রান্ত'।[১৭০]

নামাজের বেষ্টনী ও খোতবার প্রার্থনা

এগুলো খেলাফতের বিষয় এবং রাজশক্তির নিদর্শনের অন্তর্গত। ইসলামী সাম্রাজ্য ছাড়া অন্যত্র এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সম্রাটের নামাজের জন্য মসজিদের অভ্যন্তরে যে বেষ্টনীর সৃষ্টি করা হয়, তা মূলত মিম্বরের চারদিকে একটি পর্দার দ্বারা ঘেরাও তৈরি করা, যাতে মিম্বর ও তৎসন্নিহিত স্থান পরিবেষ্টিত হয়। সর্বপ্রথম মাবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এটা গ্রহণ করেন; কারণ ইতিপূর্বে তিনি খারেজীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। এ ঘটনা সর্বজন পরিচিত। বলা হয়, সর্বপ্রথম মারোয়ান ইবনেল হকম জনৈক ইয়ামেনীর দ্বারা[১৭১] আক্রান্ত হয়ে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর তাদেরকে অনুসরণ করে অন্যান্য সম্রাটরাও এর ব্যবস্থা করেছেন এবং সাধারণ নামাজী ও সম্রাটের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির জন্য এটা এক প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এও সাম্রাজ্যের বিলাসব্যসন ও সমৃদ্ধি আসার পরই দেখা দিয়েছে; যেমন সর্বপ্রকার আড়ম্বরের অবস্থাই এ রূপ। সমগ্র ইসলামী সাম্রাজ্যে এ ব্যাপারে একই অবস্থা বিরাজ করেছে। আব্বাসী সাম্রাজ্যের বিভক্তি ও পূর্বাঞ্চলে বহু রাজ্যের উদ্ভবের সময় এবং অনুরূপ আন্দালুসে উমাইয়া সাম্রাজ্যের অবসানে ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের অভ্যুদয়েও এর ব্যতিক্রম হয়নি। মাগরিবের বনি আগলাব কায়রোয়ানে এবং উবাইদী সম্রাটগণ ও তাদের শাসক মাগরিবের সিনহাজারা, ফেজের বনি বাদিস ও কেল আর বনি হাম্মাদ নিজ নিজ স্থানে এ ব্যবস্থা প্রচলিত করেছিল। এর পর আল-মোহেদরা সমগ্র মাগরিব ও আন্দালুসের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাদের প্রান্তরীয় জীবনের সারল্যের নিদর্শন হিসাবে উপরোক্ত প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেন। অতঃপর যখন সাম্রাজ্য সমৃদ্ধি লাভ করল তার বিলাসব্যসনের যুগ দেখা দিল, তখন তাদের তৃতীয় সম্রাট আবু ইয়াকুব আল-মনসুর পুনরায় এ বেষ্টনীর ব্যবস্থা করেন। পরে তা মাগরিব ও আন্দালুসের সকল সম্রাটের জন্য পালনীয় প্রথা হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য সাম্রাজ্যের অবস্থাও একই ছিল। এটাই বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রবর্তিত প্রথা।

মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে খোতবায় প্রার্থনা জানানোর ব্যাপারটি প্রথম দিকে নামাজের ইমামতির দায়িত্ব পালনকারী খলিফাগণের উপরই ন্যস্ত ছিল। তাঁরা নামাজের পরে হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর উপর দরুদ পাঠ করে তাঁর সহচরদের প্রতি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি প্রার্থনা করতেন। আমর ইবনেল আস সর্বপ্রথম মিশরে তাঁর মসজিদ নির্মাণের পর

---

১৭০. কোরান ১১, ৬৬; ৭২, ১৯।

১৭১. এ ঘটনা ৪৪ (৬৬৪/৬৫ খ্রি:) হিজরির।

তাতে মিম্বর তৈরি করেন। ইবনে আব্বাস সর্বপ্রথম মিম্বরে দাঁড়িয়ে খলিফার জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি হজরত আলীর পক্ষ থেকে বসরায় শাসক থাকাকালে তাঁর জন্য এ প্রার্থনা জানান। এতে তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহ্, তুমি আলীকে সত্যের জন্য সাহায্য কর।" অতঃপর এরূপ প্রার্থনার বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত হয়।[১৭২]

আমর ইবনেল আসের মিম্বর তৈরির সংবাদ হজরত উমর ইবনেল খাত্তাবের কাছে পৌঁছলে তিনি এক পত্রে তাঁকে লিখেন, "অতঃপর আমার নিকট সংবাদ এসেছে যে, তুমি মুসলমানদের ঘাড়ের উপর দাঁড়াবার জন্য একটি মিম্বর নির্মাণ করেছ। তোমার জন্য কি এটা যথেষ্ট নয় যে, তুমি দণ্ডায়মান এবং মুসলমানরা তোমার পায়ের গোড়ালির নিকট বসে আছে? আমি তোমাকে এ নির্দেশই দেই যে তুমি তা ভেঙে ফেল।'

অতঃপর যখন জাঁকজমক দেখা দিল এবং খলিফাদের নামাজ ও খোতবা পড়ার পথে বাধার সৃষ্টি হল, তখন তারা এ উভয় কার্যে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে লাগলেন। সুতরাং খোতবা পাঠকারী মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খলিফার নাম উচ্চারণ করে তার জন্য প্রার্থনা জানাত। কারণ আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টির কল্যাণ কামনার যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা এরূপ প্রার্থনার যোগ্য। অন্যদিকে এ সময়ে প্রার্থনা কবুল হওয়ার ধারণাও বিদ্যমান এবং পূর্বসূরিদের নিকট থেকে এ বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে তারা বলতেন, যদি কারো কল্যাণ প্রার্থনা করার অভ্যাস থাকে, তবে সে যেন তা সম্রাটের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে। এক্ষেত্রে এককভাবে শুধু সম্রাটের কথাই বলা হয়েছে।

এর পর যখন অবরুদ্ধ অবস্থা ও অন্যায্য প্রভাবের যুগ এল এবং অনুরূপ প্রভাব বিস্তারকারীর সংখ্যা সাম্রাজ্যগুলোতে বেড়ে গেল, তখন তারা সম্রাটের নামের সাথে নিজেদের নাম যোগ করে উপরোক্ত প্রার্থনার মধ্যে অংশগ্রহণ করতে লাগল। অবশ্য এ সকল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে এরূপ অংশীদার হওয়ার ব্যাপারটির ইতি হয়েছে। এর পর একমাত্র সম্রাটের নামেই মিম্বরের প্রার্থনা নির্দিষ্ট হয়েছে; তাতে অন্য কারো কোনো অধিকার নেই। সম্রাটের সাথে অন্য কারো এ ব্যাপারে অংশীদার হওয়া বা তার দাবি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অনেক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাই প্রথম দিককার সারল্য এবং প্রান্তরীয় জীবনের স্থূলতা ও কৃচ্ছ্রতার জন্য এ বিষয়টি সম্পর্কে উদাসীন থাকেন। তারা মুসলমানদের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির প্রতি সংক্ষেপে ও অনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত কল্যাণ কামনাতেই সন্তুষ্ট হন। কোনো খোতবায় যখন এভাবে শাসকদের প্রতি কল্যাণ কামনা করে প্রার্থনা জানান হয়, তখন তাকে 'আব্বাসী খোতবা' বলা হয়। এরূপ নামকরণের কারণ এই যে, প্রাচীন প্রথা অনুসারে এটা দ্বারা আব্বাসী খলিফাদিগকে মনে করা হয়। সুতরাং তাতে কোনো নির্দিষ্ট নাম বা তার প্রকাশ্য ঘোষণা থাকে না।

বর্ণিত আছে যে, আমীর আবু যাকারিয়া ইয়াহিয়া ইবনে আবু হেফস যখন বনি আব্দুল ওয়াদ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ইয়াগমারাসিন ইবনে যাইয়ানের নিকট থেকে 'তেলমিসান' এলাকা ছিনিয়ে নিয়ে পুনরায় তা কতিপয় শর্তসাপেক্ষে ফেরত দেন, তখন অন্যতম একটি শর্ত ছিল যে, উক্ত এলাকায় পঠিত খোতবায় আমীরের নাম উল্লেখ

---

১৭২. রোজেনথালে ঘটনা দুটি বর্ণনার কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ আছে।

করতে হবে। ইয়াগমারাসিন এর উত্তরে বলেছিলেন, এ কাষ্ঠখণ্ডগুলো তাদেরই, তার উপর দাঁড়িয়ে তারা যে কোনো লোকের নাম উচ্চারণ করতে পারে। অনুরূপভাবে মারিনী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াকুব ইবনে আব্দুল হকের নিকট তিউনিসের বনি আবু হেফসের তৃতীয় সম্রাট আল মুস্তানসিবের[১৭৩] দূত উপস্থিত হলে কোনো এক শুক্রবারে তিনি জানতে পারলেন যে, খোতবায় তাদের সম্রাটের নাম না থাকায় উক্ত দূত নামাজে উপস্থিত হয়নি। সুতরাং মারিনী সম্রাট খোতবায় আল-মুস্তানসিবের জন্য প্রার্থনার অনুমতি দেন। সম্ভবত এ কারণেই তারা পরবর্তীকালে তাদের মতাদর্শ প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। সকল সাম্রাজ্যেরই প্রথম দিকে প্রান্তরীয় জীবনের সারল্য থাকায় অনুরূপ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু অতঃপর যখন তাদের শাসন দৃষ্টি প্রসারিত হল, রাজকীয় প্রভাব-প্রতিপত্তির ব্যবস্থা বিবেচনায় এল এবং তারা নাগরিক জীবনের বিলাস ও আড়ম্বরকে পূর্ণতা দান করতে আরম্ভ করলেন, তখন এ সকল রাজকীয় নিদর্শন ও তার আনুষঙ্গিক বৈচিত্র্য তাদের মধ্যে দেখা দিল। তারা এ সকল ব্যাপারেও চরম সীমায় উপনীত হয়ে অন্যকে তাদের কোনো কার্যে অংশীদার করা বা কোনোপ্রকার প্রভাব বিস্তারের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দিলেন। পৃথিবী একটি উদ্যান। 'আল্লাহ্ সকল বিষয়ে জাগ্রত দৃষ্টি।[১৭৪]

---

১৭৩. রাজত্বকাল (১২৪৯-৭৭ খ্রি:)।

১৭৪. তুল, কোরান ৩৩, ৫২।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[যুদ্ধ এবং যুদ্ধ সংঘটনে বিভিন্ন জাতির অনুসৃত প্রক্রিয়া]

জেনে রাখুন, যুদ্ধ ও অন্যান্য কলহ-বিবাদ সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। এর মৌল কারণ হল একে অপরের প্রতিশোধ গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে গোত্রপ্রীতি প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে। সুতরাং যখন দুটি দল একই উদ্দেশ্যে পরস্পরের সম্মুখীন হয় এবং তাদের একটি প্রতিশোধ গ্রহণ ও অন্যান্য প্রতিরোধ করলে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তখনই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটা মানব সমাজের একটি স্বাভাবিক বিষয়; কোনো জাতি বা গোত্র এর অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ প্রতিশোধ স্পৃহার কারণ হল, হয় প্রতিহিংসা ও প্রতিযোগিতা, শত্রুতা, আল্লাহ্ ও তাঁর ধর্মের জন্য ক্রোধের অভিব্যক্তি; অথবা রাজশক্তির উত্তেজনা ও রাজ্যপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। এদের প্রথমটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিবেশী গোত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবারগুলোর মধ্যে দেখা যায়। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ শত্রুতা, এও অনেক সময় বন্য ও প্রান্তরবাসী জাতিগুলোর মধ্যে পাওয়া যায়; যেমন আরব বেদুইন, তুর্কি, তুর্কেম্যান, কির্দী এবং তাদের সমতুল্য অন্যরা। কারণ তাদের বর্শার অগ্রভাগেই তাদের আহার্য এবং অন্যদের হাতে তাদের জীবিকা। যারা তাদেরকে তা ভোগ করতে বাধা দেয়, তাদের সাথেই তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এটা ব্যতীত তাদের এ প্রচেষ্টায় কোনো প্রকার মর্যাদা বা রাজ্য লাভের কোনো বাসনা নেই। তাদের একমাত্র ইচ্ছা ও একান্ত লক্ষ হল মানুষের হাতে যা আছে, তা প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে ছিনিয়ে নেয়া। তৃতীয় কারণটিকে ধর্মীয় বিধান অনুসারে 'জেহাদ' বলা হয়। চতুর্থটি সাম্রাজ্য শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী এবং তার আনুগত্য অস্বীকারকারীদের সাথে যুদ্ধ।

যুদ্ধবিগ্রহের এ চারটি প্রকার। এর প্রথম দুটি বিরোধ ও গোলযোগের ব্যাপার এবং শেষের দুটি জেহাদ ও ন্যায়ের যুদ্ধ। অন্যদিকে যুদ্ধের যে ধরন মানব সমাজের উদ্ভবকাল থেকে বিরাজমান, তা দুই প্রকার; একটি সারিবদ্ধভাবে মোকাবিলা এবং অন্যটি আক্রমণ ও পশ্চাদপসারণ[১৭৫] সারিবদ্ধভাবে মোকাবেলার বিষয়টি সর্বদাই অনারবদের মধ্যে বংশপরম্পরায় প্রচলিত এবং আক্রমণ ও পশ্চাদপসারণের ধারাটি আরব বেদুইন ও মাগরিবের বারবারদের মধ্যে সুপরিচিত।

সারিবদ্ধ মোকাবেলা আক্রমণ ও পশ্চাদপসারণ থেকে অধিকতর তীব্র ও দৃঢ়মূল যুদ্ধরীতি। এর কারণ এই যে, সারিবদ্ধ রীতিতে সৈন্যদলকে সারিবদ্ধ হতে হয় এবং

---

১৭৫. সম্ভবত এটাই বর্তমানকালে 'গেরিলা' পদ্ধতি নামে অভিহিত হয়।

তারা পেয়ালার সারি অথবা নামাজীদের পঙ্‌ক্তির ন্যায় সমদূরত্বে অবস্থান করে। এভাবে সারিবদ্ধ হয়ে তারা শত্রুর দিকে অগ্রসর হয়। এর ফলে আক্রমণের ক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনায় এবং শত্রুর মনে ভীতি উৎপাদনে তারা অধিকতর দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারে। কেননা তা যেন একটি সঞ্চরণশীল প্রাচীর ও বিস্তারমান দুর্গ, যা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

কোরান শরীফে আছে, অবশ্যই আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা সারিবদ্ধভাবে তাঁর পথে যুদ্ধ করে যেন তারা একটি দৃঢ় সংবদ্ধ সৌধ।[১৭৬] অর্থাৎ তারা পরস্পর দৃঢ়তায় গেঁথে রয়েছে। হাদিস শরীফে আছে, "এক বিশ্বাসীর সাথে অন্য বিশ্বাসী মিলিয়ে একটি সৌধতুল্য, যার একাংশ অপরাংশের সাথে দৃঢ় সংবদ্ধ।" পাঠক, এটা থেকেই আপনি দৃঢ়তার সাথে অবস্থানের অবশ্য পালনীয়তা ও সারিবদ্ধ অবস্থা থেকে পলায়নের নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবেন। যুদ্ধে সারিবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য হল শৃঙ্খলা রক্ষা করা, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি সারি ত্যাগ করে শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল, সে যদি পরাজয় দেখা দেয়, তা হলে তার সমস্ত পাপ নিজের স্কন্ধে তুলে নিল; যেন সে নিজে এ পরাজয় মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিল এবং শত্রুকে এটা লাভ করতে সুযোগ দিল। সুতরাং এ আচরণের ফলাফলের ব্যাপকতা এবং ধর্মীয় ঐক্যের সর্বনাশের দিকে লক্ষ রেখেই এটাকে মহাপাপ বলে গণ্য করা হয়েছে। এ সকল প্রমাণ থেকে এও প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সারিবদ্ধ যুদ্ধ ধর্মপ্রবর্তকের নিকট অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

আক্রমণ ও পশ্চাদপসারণের রীতিতে যুদ্ধের মধ্যে সারিবদ্ধ যুদ্ধের ন্যায় প্রচণ্ডতা যেমন নেই, তেমনি তাতে পরাজয় থেকে নিরাপত্তা বোধেরও অভাব। অবশ্য অনেক সময় এ আক্রমণ ও পশ্চাদপসারণের রীতিতেও পশ্চাদভাগে সারিবদ্ধ সৈন্যদল অবস্থান করে, যাতে তারা প্রয়োজনের সময় অগ্রগামীদেরকে আশ্রয় দিতে পারে এবং এর সারিবদ্ধ আক্রমণের মোকাবেলা করতে পারে, যেমন আমরা পরে বর্ণনা করছি।

বিস্তৃত অঞ্চল ও বিপুল সৈন্যের অধিকারী প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলো তাদের সৈন্যবাহিনীকে নানা ভাগে বিভক্ত করত। তারা এর প্রতিটি অংশকে বলত 'কুর্দুস' (দল) এবং প্রতিটি কুর্দুসের সমসংখ্যক সৈন্য সারি ছিল।[১৭৭] এরূপ করার কারণ এ যে, যখন তাদের সৈন্যসংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেল এবং সাম্রাজ্যের প্রতি অঞ্চল থেকে সৈন্য এসে যোগ দিল, তখন স্বভাবতই তাদের পরস্পরের পরিচয়ের অভাব দেখা দিল। বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে এ বিরাট বাহিনী পরিচয়ের অভাবে নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হল। সুতরাং তারা এ বিরাট সৈন্যদলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে তাদের মধ্যকার পরিচয়কে সুদৃঢ় করে তুলল। তারা এ সকল দলকে স্বাভাবিক পর্যায়ক্রমে চারদিকে স্থাপন করল। সমগ্র বাহিনীর নেতৃত্বে সম্রাট বা পরিচালককে মধ্যভাগে স্থান দিল। এ পর্যায়ক্রমকে তারা যুদ্ধকালীন পর্যায়ক্রম বলে অভিহিত করত। পারস্য, রোম ও ইসলামের প্রাথমিক দুই সাম্রাজ্যের

১৭৬. কোরান ৬১, ৪।
১৭৭. এই বাক্যটি রোজেনথালে নেই।

ইতিহাসে এ সম্পর্কে বিবরণ বিদ্যমান। তারা সম্রাটের সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে একটি পৃথক সৈন্যদল তার পৃথক সেনাপতি, পতাকা ও নিদর্শনসহ স্থাপন করত। এ দলকে বলা হত অগ্রবাহিনী। পুনরায় অন্য একটি সৈন্যদল সম্রাটের অবস্থানের দক্ষিণ দিকে স্থাপন করত এবং তাকে বলত দক্ষিণ বাহিনী। বাম দিকে অনুরূপ অবস্থানরত সৈন্যদলকে বলা হত বাম বাহিনী এবং সমগ্র সৈন্যদলের পিছনে অবস্থানকারী দলকে বলা হত পশ্চাতবাহিনী। সম্রাট ও তাঁর সহচরবৃন্দ এ চার বাহিনীর মধ্যখানে থাকতেন এবং তাদের অবস্থানকে মধ্যভাগ[১৭৮] বলা হত। যখন তাদের জন্য এ পর্যায়ক্রমিক দৃঢ় বিন্যাস সমাপ্ত হত, তখন তার বিস্তৃতি এক দৃষ্টি সীমার মধ্যে অথবা ব্যাপক ব্যবধানের মধ্যে হতে পারত। অবশ্য এ ব্যবধান সৈন্যসংখ্যার অল্পাধিক্য লক্ষ করে দুই বাহিনীর মধ্যে একদিন বা দুইদিনের পথের বেশি হত না। এভাবে বিন্যস্ত হবার পরই সারিবদ্ধ আক্রমণের পালা আসত।

পাঠক এ ব্যাপারটি ইসলামের বিজয় অভিযান ও প্রথম দুটি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে লক্ষ করুণ। সম্রাট আবদুল মালেকের সময় কেমন করে এ বিরাট ব্যবধানের পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসের দরুন সৈন্যদলের অগ্রযাত্রা বিভিন্ন হয়ে দেখা দিত। যার ফলে এমন একজনকে নিয়োগ করার প্রয়োজন দেখা দিল, যিনি পশ্চাদ্দিক থেকে তাদের অগ্রগমনকে ত্বরান্বিত করতে পারেন। সম্রাট এজন্য হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে নিয়োগ করেছিলেন, যেমন আমরা তৎপ্রতি ইঙ্গিত করেছি[১৭৯] এবং ইতিহাসেও এর বিবরণ সুপরিচিত।

আন্দালুসের উমাইয়া সাম্রাজ্যেও এক সময়ে এ প্রকার অধিকসংখ্যক সৈন্য ছিল। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে প্রায় কিছুই জানি না। কারণ আমরা যে সকল সাম্রাজ্য পেয়েছি, তাদের সৈন্যসংখ্যা খুবই অল্প। যুদ্ধের অঙ্গনে এদের মধ্যে অপরিচয়ের কোনো অসুবিধা ছিল না। বরং অধিকাংশ সৈন্যদলের উভয় পক্ষকে একটি ঘাঁটি বা নগরের পরিধিই স্থান দিতে পারত এবং তারা যুদ্ধের প্রচণ্ডতার সময়ও প্রত্যেকেই নিজ সাথীকে নাম ও উপাধি ধরে উচ্চস্বরে ডাকাডাকি করত। এ জন্যই এ সময়ে পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসের কোনো প্রয়োজন ছিল না।

সৈন্যদলের পশ্চাতে সারিবদ্ধ প্রতিরোধ

আক্রমণ ও পশ্চাদপসারণের রীতিতে যুদ্ধ পরিচালনাকারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের পশ্চাতে কোনো বস্তু বা বাকহীন প্রাণীর দ্বারা একটি প্রতিরোধ সারি গড়ে তোলে, যাতে তাদের অশ্বারোহী সৈন্যরা পশ্চাদপসারণের সময় এর পিছনে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। এর দ্বারা তারা যুদ্ধের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে সৈন্যদলকে বিজয়লাভে উৎসাহিত করে। কখনো সারিবদ্ধ রীতিতে যুদ্ধকারীরাও তাদের অবস্থান আরো সুদৃঢ় করার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

---

১৭৮. মূলে আছে 'কালবুন'—হৃদয়।

১৭৯. ৩০১ পৃষ্ঠা দ্র:।

সারিবদ্ধ যুদ্ধরীতিতে অভ্যস্ত পারস্যবাসীরা এ ব্যাপারে যুদ্ধক্ষেত্রে হাতি ব্যবহার করত। তারা হস্তীর উপর দুর্গের ন্যায় কাষ্ঠনির্মিত কক্ষ বহন করত এবং এগুলো সৈন্য, যুদ্ধাস্ত্র ও রণধ্বজার দ্বারা সুসজ্জিত থাকত। তারা এ হস্তীযুথকে সৈন্যদলের পশ্চাতে স্থাপন করত, যেন এগুলো দুর্গ এবং তাদের আড়ালে থেকে আত্মরক্ষা ও যুদ্ধের দৃঢ়তা বৃদ্ধি করত। পাঠক, কাদেসিয়া রণাঙ্গনে এ ব্যাপারে যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তৎপ্রতি লক্ষ করুন। পারস্যবাসীরা যুদ্ধের তৃতীয় দিনে এ হস্তীযুথের দ্বারা মুসলমানদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করল এবং মুসলমান পদাতিকরাও পালটা প্রচণ্ড আক্রমণে তাদের ব্যূহভেদ করে ফেলল। তারা তরবারীর আঘাতে হস্তীশুণ্ড কেটে ফেলতে আরম্ভ করলে, তারা ভয় পেয়ে পিছন দিকে মাদায়েনে অবস্থিত ঘাঁটির উদ্দেশ্যে পলায়ন করতে লাগল। সুতরাং এর ফলে পারস্য সৈন্যদল নিরাশ্রয় হয়ে চতুর্থ দিনে পরাজয় বরণ করল।

রোমান, আন্দালুসের গথ ও অন্যান্য অনারব জাতি এ উদ্দেশ্যে সিংহাসন ব্যবহার করত। তারা যুদ্ধের অঙ্গনে সম্রাটের সিংহাসন স্থাপন করে তার চারদিকে তাঁর সেবক, সভাসদ ও সৈন্যদের মধ্য থেকে তাদেরকে স্থান দিত যারা এ সিংহাসনের জন্য মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত। তারা এ সিংহাসনের পায়ার সাথে বেঁধে পতাকা উড়িয়ে দিত এবং এর চারদিকে তীরন্দাজ ও পদাতিকদের আরো একটি বেষ্টনী তৈরি করত। এভাবে সিংহাসনের প্রতিরোধ বিরাট হয়ে দাঁড়াত এবং তা আক্রমণকারীদের দুর্গ ও আক্রমণ শেষে পশ্চাদপসারণকারীদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠত। পারস্যবাসীরা কাদেসিয়ার রণাঙ্গনে এ আয়োজনও প্রদর্শন করেছিল। রুস্তম এরূপ একটি সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু পারস্য সৈন্যদল বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ায় আরবরা এ সিংহাসনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং রুস্তম পলায়নরত অবস্থায় ফুরাতের কূলে নিহত হন।

আক্রমণ ও পশ্চাদপসারণের রীতিতে অভ্যস্ত আরব বেদুইন ও প্রান্তরবাসী অধিকাংশ যাযাবর জাতি এ ব্যাপারে তাদের উট ও ভারবাহী পশু ব্যবহার করে থাকে এবং তাদের প্রতিরোধ সারিই তাদের আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ায়। একে তারা 'মাজবুযা' (আকর্ষণ স্থল) বলে। প্রত্যেক জাতিই যুদ্ধক্ষেত্রে এ প্রতিরোধ সারি ব্যবহার করে থাকে। কারণ, পাঠক আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, তা কীভাবে তাদের আক্রমণে দৃঢ়তা এবং পরাজয় ও ধ্বংসলীলা থেকে নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। বস্তুত এটা একটি পরীক্ষিত সত্য।

বর্তমানকালে সকল সাম্রাজ্যই এ বিষয়টি ত্যাগ করেছে। এ স্থলে তারা ভারবাহী পশু ও পশ্চাদ্বাহিনীর তাঁবু ইত্যাদি স্থাপন করে থাকে। কিন্তু এটা কিছুতেই হস্তীযূথ বা উষ্ট্র সারীর সমতুল্য নয়। এজন্য সৈন্যদল পরাজয়ের শিকারে পরিণত হয় এবং তারা সর্বদা সুরক্ষিত ঘাঁটির দিকে পলায়ন করতে উদগ্রীব থাকে।

ইসলামের প্রথম দিকে সকল যুদ্ধই সারিবদ্ধ রীতিতে অনুষ্ঠিত হয়। অথচ আরবরা একমাত্র আক্রমণ ও পশ্চাদপসারণের রীতিতেই অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু ইসলামের প্রথম যুগে দুটি কারণে তারা এ যুদ্ধরীতি অবলম্বন করে। একটি এই যে, তাদের শত্রুরা সারিবদ্ধ রীতিতে অভ্যস্ত। সুতরাং তাদেরকেও বাধ্য হয়ে এ রীতি গ্রহণ করতে হয়। অপরটি হল, তারা এ জেহাদে মৃত্যুপণ করে অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ তাদের বিশ্বাসের

দৃঢ়তা এক অপার ধৈর্যের সৃষ্টি করেছিল। এ জন্যই সারিবদ্ধ রীতিতে দৃঢ়তার সাথে তারা মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পেরেছিল।

সর্বপ্রথম মারোয়ান ইবনেল হকম, খারেজী যাহ্হাক এবং পরে আল হুবাইবীর[১৮০] সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে এ সারিবদ্ধ রীতি পরিত্যাগ করে কুর্দুস বিন্যাস গ্রহণ করেন। আল হুবাইরীর যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তাবারী বলেন, খারেজীরা তাদের নেতা হিসাবে শায়বান ইবনে আব্দুল আজিজ আল ইউশকরীকে মনোনীত করে এবং তার ডাক নাম ছিল 'আবুষ্ষলফা'। এর পর মারোয়ান তাদের বিরুদ্ধে কুর্দুস রীতির যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং তখন থেকে সারিবদ্ধ রীতি পরিত্যক্ত হয়। এভাবে সারিবদ্ধ রীতি পরিত্যক্ত হবার ফলে তারা তার ধারা ভুলে যায় এবং সৈন্যদলের পশ্চাতে প্রতিরোধ সারিও বিলাসব্যসনের আধিক্যের ফলে ক্রমশ বিস্মৃতিতে তলিয়ে যায়। কারণ তারা যতক্ষণ প্রান্তরীয় জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ ছিল, ততক্ষণ তাদের আবাসস্থল ছিল তাঁবু এবং তারা কোথাও যেতে হলে প্রচুর উট ও গোত্রন্তর্গত তাদের সকল পোষ্য স্ত্রী-পুত্রের বসবাসযোগ্য উপকরণাদি সঙ্গে নিয়ে যেত। অতঃপর রাজশক্তির বিলাসব্যসন দেখা দিল এবং তারা নগরে প্রাসাদে বসবাস করতে আরম্ভ করল, তারা প্রান্তরীয় জীবনের অভ্যাস ত্যাগ করল। পূর্বের ন্যায় উট আর পরিবারবর্গ নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি তাদের নিকট কষ্টদায়ক বলে মনে হতে লাগল। সুতরাং তারা স্ত্রী-পুত্রাদিকে ভ্রমণে যাওয়ার সময় পিছনে রেখে যেতে আরম্ভ করল। তদস্থলে রাজশক্তির বিলাসের পরিচায়ক বৃহৎ তাঁবু ও আচ্ছাদন ব্যবহার করতে লাগল এবং প্রয়োজনীয় বোঝা ও আসবাবপত্র বহনের জন্যই তারা কিছু সংখ্যক ভারবাহী পশু সঙ্গে নিত। যুদ্ধেও তাদের এ অবস্থার ব্যতিক্রম হত না। এর ফলে তাদের মধ্যে পূর্বের সেই স্ত্রী-পুত্রাদি ও পশুসম্পদ রক্ষার জন্য মৃত্যুপণ যুদ্ধের ইচ্ছা আর অবশিষ্ট রইল না। তাদের ধৈর্যের ভাব শিথিল হয়ে আসল এবং শত্রুর রণহুংকার তাদেরকে বিচলিত করতে লাগল। তাদের সারিবদ্ধ অবস্থায় পূর্বের দৃঢ়তা হ্রাস পেতে আরম্ভ করল।

অনুচ্ছেদ

সৈন্যদলের পশ্চাদভাগে একটি প্রতিরোধ সারি স্থাপন এবং আক্রমণ ও পশ্চাদপসারণ রীতিতে তার অনিবার্যতার যে বিষয়টি আমরা বর্ণনা করেছি, তার ধারা অনুসরণ করে মাগরিবের রাজন্যবর্গ ফিরিঙ্গিদের একটি দলকে সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করতেন। তাদেরকে এরূপ প্রতিরোধ সারি হিসাবে ব্যবহার করার কারণ এই যে, বারবাররা স্বভাবত আক্রমণ ও পশ্চাদপসারণের রীতিতে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত; অথচ সুলতান তাঁর সম্মুখ ভাগের আক্রমণকারী সৈন্যদের আশ্রয়ের জন্য পশ্চাতে একটি প্রতিরোধ সারির প্রয়োজন অনুভব করতেন। সুতরাং এ পশ্চাতের সারিতে যারা থাকবে, তারা সারিবদ্ধ যুদ্ধরীতিতে অভ্যস্ত ও দৃঢ়তার অধিকারী হবে। অন্যথায় তারাও যদি সম্মুখ ভাগের সৈন্যের ন্যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হতে থাকে, তা হলে সম্রাট ও সৈন্যদলের পরাজয়ের সমূহ

---

১৮০. রোজেনথালে 'আল-খয়বরী' এবং তিনি বর্ণিত খলিফার নাম ২য় মারোয়ান বলে মনে করেন।

সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এ কারণেই মাগরিবের রাজন্যবর্গের জন্য এ উদ্দেশ্যে এমন একদল সৈন্য ব্যবহার করা দরকার, যারা ফিরিঙ্গিদের ন্যায় সারিবদ্ধ রীতিতে দৃঢ়তার অধিকারী। এজন্য তাঁরা এ সৈন্যদলের দ্বারা একটি সুদৃঢ় পশ্চাতের প্রতিরোধ সারি গড়ে তুলতেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বিধর্মীদের দ্বারা যুদ্ধে সাহায্য গ্রহণের প্রশ্নটি জড়িত। কিন্তু একান্ত প্রয়োজনে এটা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। যেমন আমরা পূর্বে পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরেছি যে সৈন্যদলের বিক্ষিপ্ত অবস্থার মধ্যে একটি সুদৃঢ় পশ্চাৎ সারি গড়ে তোলার জন্যই এর প্রয়োজন হত। ফিরিঙ্গীরা এ কাজের উপযোগী ছিল। কারণ, সারিবদ্ধ রীতিতে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে তারা এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিত। সুতরাং অন্যদের অপেক্ষা এ ব্যাপারে তারা অধিকতর শক্তিশালী বলে বিবেচিত হত। কিন্তু এ প্রকার সাহায্য গ্রহণ শুধু মাগরিবের বার বার ও আরব বেদুইনদের সাথে যুদ্ধে ও বিদ্রোহ দমনে সংশ্লিষ্ট রাজন্যবর্গ গ্রহণ করতেন। ধর্মযুদ্ধে এরূপ সাহায্যের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কারণ এক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি তাদের সম্ভাব্য দুর্ব্যবহারের জন্য তা গ্রহণ করা হত না। বর্তমানকালে মাগরিবে এ রীতি প্রচলিত এবং আমরা তার কারণও বর্ণনা করেছি। 'আল্লাহ্ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত।'[১৮১]

অনুচ্ছেদ

আমরা জানতে পেরেছি যে, বর্তমানকালে তুর্কি জাতির লোকেরা তীর ছুঁড়ে যুদ্ধ করে থাকে। তারা সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধের সৈন্যবিন্যাস করে। তারা সমগ্র সৈন্যদল তিনটি সারিতে ভাগ করে একের পর অন্যকে বিন্যস্ত করে। তারা অশ্ব থেকে নেমে তীর নিক্ষেপের সরঞ্জামাদি তাদের সম্মুখে রাখে এবং বসে তীর চালনা করে। এভাবে প্রতিটি সারিই তার সম্মুখস্থ সারির জন্য প্রতিরোধ স্বরূপ কাজ করে এবং যাতে শত্রু তাদেরকে বিব্রত না করতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখে। এভাবে যে কোনো এক পক্ষ জয়ী না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। এ সেনাবিন্যাস বিরল ও সুদৃঢ়।

অনুচ্ছেদ

প্রাচীন জাতিগুলো যুদ্ধের সময় পরিখা খনন করার রীতি পালন করত। তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরস্পরের সম্মুখীন হলে সেনাদলের অবস্থানের চারদিকে পরিখা খনন করত, যাতে রাতের বেলা অতর্কিত আক্রমণ না ঘটে। কারণ রাত্রিকালীন এরূপ আক্রমণ অন্ধকার ও হিংস্রতার জন্য সৈন্যদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে এবং অন্ধকারের আবরণে গা-ঢাকা দিয়ে সৈন্যরা পলায়ন করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। সুতরাং এভাবে সৈন্যদলের মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিলে পরাজয় বাস্তব আকার ধারণ করে। এ কারণেই তারা সৈন্যদলের অবস্থান তথা শিবিরের চারদিকে পরিখা খনন করত এবং সৈন্যদলের রাত্রিবাসের বিন্যাসও চারদিকে গোলাকার করে করা হত, যাতে শত্রুরা সহসা আক্রমণ করে তাদেরকে পর্যুদস্ত করতে না পারে। প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলোর এ ব্যাপারের উপযোগী শক্তি

---

১৮১. কোরান ২, ২৯; ২৩১।

ছিল এবং এ কাজে প্রয়োজনীয় লোক নিয়োগ তারা করতে পারত। তারা সমস্ত অঞ্চল থেকে এ নিমিত্ত লোক সংগ্রহ এবং সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও জনবসতির ব্যাপকতার জন্য এটা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। অতঃপর জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল, সৈন্যসংখ্যা কমে গেল এবং প্রয়োজনীয় কর্মীর অভাব দেখা দিল। সুতরাং এ রীতিও সকলে বিস্মৃত হল, যেন তার অস্তিত্বই কখনো ছিল না। আল্লাহ্ শক্তিমানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম।

সিফ্‌ফিনের রণাঙ্গনে হজরত আলীর স্বীয় সহচরদের প্রতি উৎসাহব্যাঞ্জক বাণী ও উপদেশ

পাঠক, সিফ্‌ফিন দিবসে হজরত আলী তদীয় সহচরদের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও উপদেশের দিকে লক্ষ করুন। তাতে আপনি যুদ্ধবিদ্যার প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয় দেখতে পাবেন। বস্তুত এ ব্যাপারে তাঁর ন্যায় বিচক্ষণ আর কেই বা ছিলেন।

তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, তোমরা একটি সুদৃঢ় সৌধের ন্যায়[১৮২] তোমাদের সারিগুলোকে সমান কর। তোমাদের মধ্যে সশস্ত্রদেরকে সম্মুখে এবং নিরস্ত্রদেরকে পশ্চাতে স্থান দাও। দাঁতের মারি চেপে ধর, এতে তরবারীর আঘাত দৃঢ়তর হবে। বর্শাগ্রে কোন কিছু জড়িয়ে রাখ, তাতে তার ধারের তীক্ষ্ণতা অটুট থাকবে। দৃষ্টি নিম্নমুখী কর, এর ফলে মনোবল বাড়বে ও হৃদয়ে শান্তি পাবে। উচ্চরোল তুল না; কেননা নিম্নকণ্ঠ শৈথিল্য দূর করে ও আত্মমর্যাদা বাড়ায়। তোমাদের পতাকা সোজা রাখ; তাকে হেলিও না এবং তা বীর পুরুষ ব্যতীত অন্যের হাতে দিও না। সততা ও ধৈর্যের সাহায্য গ্রহণ কর; কেননা ধৈর্যের অনুপাতেই বিজয় লাভ সংঘটিত হয়।

এ উপলক্ষেই আল-আশতার[১৮৩] আজদ গোত্রকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা দাঁতের মারি জোরে চেপে ধর এবং শত্রুদের মুখোমুখি আক্রমণ কর। তোমরা সেই সমস্ত লোকের ন্যায় শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পর, যারা তাদের পিতা ও ভাইদের প্রতিশোধ গ্রহণে বঞ্চিত থাকার পর তার সুযোগ লাভ করেছে এবং তারা মৃত্যুপণ করে অগ্রসর হয়েছে, যাতে খালি হাতে ফিরতে না হয় এবং পৃথিবীর সম্মুখে লজ্জা পেতে না হয়।

আন্দালুসবাসী লামতুনা কবি আবুবকর আস্‌সাইরাফী তাশেফীন ইবনে আলী ইবনে ইউসুফের[১৮৪] প্রশংসাসূচক একটি কবিতায় উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। ইনি তাশেফীনকে যুদ্ধক্ষেত্রে যে দৃঢ়তার পরিচয় দিতে দেখেছেন, তার প্রশংসা উপলক্ষে যুদ্ধ সম্পর্কে বহু উপদেশ ও সতর্কবাণীর উল্লেখ করেছেন। পাঠক, আপনি তাতে যুদ্ধব্যবস্থা সম্পর্কীয় অনেক কিছুই অবহিত হতে পারবেন। কবি বলেন,

---

১৮২. তুল, কোরান ৬১, ৪।

১৮৩. হজরত আলীর সেনাপতিদের অন্যতম; তার নাম মালিক ইবনে হারিস; মৃত্যু ৩৭ (৬৫৮ খ্রি:) হি.।

১৮৪. আল মোরাবিতী সম্রাট; তিনি ৫৩৩ (১১৩৮ খ্রি:) হি. হতে তিন বছর রাজ্য পরিচালনা করেন। সাইরাফী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

ওহে আবরণধারী[১৮৫] জনগোষ্ঠী!
তোমাদের মধ্যে উদ্দীপনাময় সাহসী সম্রাট কে?
কে সেই ব্যক্তি, যাকে শত্রুরা অন্ধকারে আক্রমণ করেছিল,
সকলেই ছত্রভঙ্গ হল; কিন্তু তিনি তখনো অবিচল।
অশ্বারোহী ও তরবারিধারীদের আঘাত প্রতিরোধ করলেন,
তাঁর প্রতি আনুগত্যের আকর্ষণ তখন ফিরে এল।
রাত তার অন্তর্গত শিরস্ত্রাণের ঔজ্জ্বল্যে যেন
সৈন্যদের শিরোপরি ভোরের আভা বহন করেছিল।
হে বনি সিনহাজা! তোমরা কোথায় পলায়নপর?
তোমরা কি সন্ত্রস্ত হয়ে ভয়ের মধ্যে প্রবেশ করছিলে।
চক্ষের মণি, তোমাদের দিক থেকে তার প্রতি কোন
বেদনা পৌঁছেনি, একটি হৃদয় বুকের মধ্যে রেখেছিলেন।
অথচ তোমরা তাশেফীনকে পরিত্যাগ করেছিলে,
তিনি চাইলে তজ্জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন।
তোমরা ত গভীর অরণ্যে সিংহতুল্য,
তোমাদের প্রত্যেকেই প্রতিটি বিপদ সম্পর্কে অবহিত।
হে তাশেফীন! তোমার সৈন্যদলের রাত্রির অক্ষমতা
দূর কর। অবশ্য সে অক্ষমতার কোনো প্রতিবিধান নেই।

(উক্ত কবিতায় যুদ্ধ ব্যবস্থা সম্পর্কে)

যুদ্ধের এমন কিছু রীতিনীতি তোমাকে উপহার দিচ্ছি,
যার সম্পর্কে তোমার পূর্বেকার পারস্য সম্রাটগণ আগ্রহী ছিলেন।
এমন নয় যে, এ সম্পর্কে আমার কোনো অভিজ্ঞতা আছে,
বরং কিছু উপদেশ, বিশ্বাসীদেরকে উজ্জীবিত করে ও উপকার দেয়।
বহুভাঁজ এমন বর্মগুলো পরিধান কর, যা
তুব্বা রাজন্যবর্গের শিল্পকুশলতার উত্তরাধিকার বহন করে।
এবং সুতীক্ষ্ণ ভারতীয় ছুরিকা সঙ্গে রাখ, যা
জয় ও পরাজয়ে সমান দক্ষতায় বর্মাদি ভেদ করে থাকে।
দ্রুতগামী অশ্বাদিতে আরোহণ কর, যেগুলো
সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করবে এবং বুহ্য ভেদ করবে।
শিবিরের চতুর্দিকে পরিখা খনন করো, এর ফলে
এমন একটি দুর্গ গড়ে উঠবে, যা ভেদ করা যায় না।
নদী পার হইও না; বরং তার তীরে শিবির স্থাপন কর,
তা তোমার সৈন্যদল ও শত্রুর মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করবে।
অপরাহ্নে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও; তোমার সৈন্যদলের পিছনে
এমন একটি গিরিবর্ত্ম থাকবে, যা প্রতিরোধ গড়ে তোলে।
যদি সংকীর্ণ রণাঙ্গনে সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হয়,
তা হলে বর্শার আঘাতই সর্বাপেক্ষা সমীচীন।
প্রথম মুহূর্তেই প্রতিপক্ষকে আঘাত কর, ইতস্তত করো না;
কারণ তোমার দ্বিধান্বিত ভাব সুযোগ নষ্ট করে ফেলবে।
শক্তিমানকে তোমার সৈন্য প্রহরায় নিযুক্ত করো,
যাদের মধ্যে সততা আছে, প্রতারণা করবে না।
মিথ্যাবাদীদের হঠকারী সংবাদে কান দিও না, কারণ
মিথ্যাচারিতার জন্যই তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয় না।

---

১৮৫. সিনহাজাদের বিশেষণ।

এ কবিতায় কবির বক্তব্য : 'প্রথম মুহূর্তেই প্রতিপক্ষকে আঘাত কর, ইতস্তত করো না'—প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ সম্পর্কে মানুষের সাধারণ ধারণার বিরোধী।

কেননা হজরত উমর আবু উবাইদ ইবনে মাসুদ আস্‌সকফীকে ইরাক ও সিরিয়ার যুদ্ধ পরিচালক নিযুক্ত করে বলেছেন, নবী (সঃ) সহচরদের কথা শুনো ও মান্য করে চলো এবং তাদেরকে এ বিষয়ে অংশীদার করো। যতক্ষণ না সকল বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সাড়া দিও না। কারণ এটা যুদ্ধ; এতে একমাত্র ধৈর্যশীল সেই ব্যক্তিই যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারে, যার মধ্যে সুযোগের সদ্ব্যবহার ও সংযমের পরিমিত জ্ঞান আছে। অন্যত্র তাকে উদ্দেশ্য করেই তিনি বলেছেন, আমি সালিতকে[১৮৬] শুধু তার দ্রুততার জন্যই নেতৃত্ব দেইনি। বস্তুত সকল বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠবার পূর্বে যুদ্ধে দ্রুততা ক্ষতির কারণ হয়। আল্লাহ্‌র শপথ, এ ব্যাপারটি না থাকলে আমি তাকে নেতৃত্ব প্রদান করতাম। কিন্তু যুদ্ধে একমাত্র ধৈর্যশীল ব্যক্তিই যোগ্য।

হজরত উমরের এ বক্তব্যে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধে প্রয়োজনীয় অবস্থা সুস্পষ্ট হয়ে না ওঠা পর্যন্ত হঠাৎ কিছু করে বসা অপেক্ষা ধীরস্থিরভাবে অগ্রসর হওয়া ভালো। এটা সাইরাফীর বক্তব্যের বিরোধী; অবশ্য তাতে যদি এ কথাটি যোগ করে নেয়া যায় যে, একমাত্র অবস্থা সুস্পষ্ট হওয়ার পরই এরূপ তৎপরতা দেখাতে হবে, তা হলে হতে পারে। 'আল্লাহ্ উন্নত ও সর্বজ্ঞ'।

যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র ও সৈন্যদল থাকলেও বিজয় এদের উপরই নির্ভর করে না; বরং বিজয় ও প্রাধান্য অনেকাংশেই আকস্মিক ও ভাগ্য নির্ভর। এর তাৎপর্য এই যে, প্রাধান্য বিস্তারের বাহ্যিক উপাদান সামগ্রিকভাবে সৈন্যদল ও তার সংখ্যাধিক্য, প্রচুর সমরাস্ত্র ও তার নতুনত্ব এবং বীরপুরুষের আধিক্য ও প্রতিরোধ সারির বিন্যাস। এদের সাথে আন্তরিক যুদ্ধ পরিচালনা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপারকেও যোগ করা যায়। অন্যদিকে এর অভ্যন্তরীণ উপকরণ হল, প্রতারণা ও আক্রমণগত কৌশল, শত্রুপক্ষের মনোবল ভেঙে দেবার জন্য প্রচারণা এবং সুবিধাজনক উচ্চস্থান থেকে আক্রমণ পরিচালনা, যাতে নিম্নে অবস্থানকারী শত্রুসৈন্য সহজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। তদুপরি গোপন স্থান, জঙ্গল, সুরক্ষিত আড়াল ও পার্বত্য এলাকায় শত্রুর চোখে ধুলা দিয়ে এমনভাবে অবস্থান করা, যাতে হঠাৎ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। এতে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়বে এবং পালিয়ে প্রাণ রক্ষার উপায় খুঁজবে। এ প্রকার আরো বহু কৌশল বিদ্যমান। কিন্তু এ সকল অভ্যন্তরীণ উপকরণও অনেকটাই দৈবী ব্যাপার। আকস্মিক যোগ না ঘটলে মানুষের পক্ষে এর কোনোটাই পরিকল্পিতভাবে করা সম্ভব নয়। এমনকি এ সকলের ফলে শত্রুর মনে ভীতির সঞ্চারও হঠাৎ জন্মায় এবং এর ফলেই তাদের কেন্দ্রশক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে ও পরাজয় দেখা দেয়। অধিকাংশ সময় দেখা যায়, এ অভ্যন্তরীণ কৌশলের অভাবেই পরাজয় ঘনিয়ে আসে। কারণ উভয় পক্ষই প্রাধান্য বিস্তারের জন্য এ কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকে; সুতরাং তাদের মধ্যে যে কোনো একটি দলের এ ব্যাপারে কৃতকার্যতা লাভ হয়। সম্ভবত এ জন্যই হজরত মুহম্মদ

১৮৬. সালিত ইবনে ফয়েস এবং পূর্ব বর্ণিত আস্‌সকফী উভয়েই উক্ত অভিযানের প্রথম দিকে নিহত হন।

(সঃ) বলেছেন, যুদ্ধ প্রতারণা মাত্র। আরবদের প্রবাদেও আছে অনেক কৌশল গোত্রশক্তি অপেক্ষাও উপকারী। এতে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, যুদ্ধে জয়লাভ এ বাহ্যিক উপকরণ অপেক্ষা অভ্যন্তরীণ কৌশলের উপরই সাধারণত নির্ভরশীল। এ গোপন কার্যকারণগুলোর সফলতাই ভাগ্যের অর্থ, যেমন যথাস্থানে তা প্রমাণিত হয়েছে। পাঠক এটাকে বিবেচনা করুন এবং বুঝে নিন। দৈবী সাহায্যের মাধ্যমে প্রাধান্য বিস্তারের ব্যাপারটিও অনুরূপ, যেমন আমরা বিশ্লেষণ করেছি। হজরতের এ কথার—'আমি এক মাসের পথের ব্যবধান থেকে ভীতির সাহায্যে জয়ী হয়েছি'—এর অর্থ হল অনুরূপ প্রভাব। তাঁর জীবদ্দশাতে স্বল্প সংখ্যার সাহায্যেই এভাবে পৌত্তলিকদের উপর জয়ী হয়েছিলেন এবং তাঁর পরে মুসলমানদের বিজয়াভিযানেও অনুরূপ বিষয় দেখা গেছে। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীর জন্য বিধর্মীদেরকে সন্ত্রস্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে তাদের অন্তঃকরণে এক ভীতির ভাব প্রাধান্য পেয়েছিল এবং তারা পরাজয়বরণ করেছিল। এও হজরত মুহম্মদের (সঃ) অলৌকিকত্বের একটি নিদর্শন এবং এর প্রভাব শত্রুদের অন্তকরণে প্রবেশ করার ফলেই সকল ইসলামী বিজয়াভিযান সাফল্যলাভ করেছিল। অবশ্য এর কোনো চাক্ষুষ নিদর্শন কোথাও ছিল না।

আত্তুরতুশী বর্ণনা করেছেন যে, দুই পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের সাথে অধিক সংখ্যক বিখ্যাত অশ্বারোহী বীরদের অবস্থান এ প্রাধান্য বিস্তারের কারণ হয়ে থাকে। যেমন এক পক্ষে দশ অথবা বিশজন অনুরূপ বীর বিদ্যমান এবং অন্যপক্ষে আট অথবা ষোলজন। অনুরূপ ক্ষেত্রে একজন বীরের আধিক্যও বিজয়ের কারণ হতে পারে। তিনি এ কারণটি বারংবার ও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এটা আমাদের পূর্ব বর্ণিত সেই বাহ্যিক উপকরণের দিকে ইঙ্গিত করে এবং এ জন্যই সঠিক নয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে যা বিবেচনাযোগ্য, তা হল গোত্রপ্রীতি অবস্থা। যদি কোনো পক্ষে একটি নিরেট গোত্রপ্রীতির শক্তি থাকে এবং অন্যপক্ষে একাধিক গোত্রপ্রীতির অস্তিত্ব দেখা যায়, তা হলে একাধিক গোত্রপ্রীতির অধিকারীদের মনোবল সহজেই ভেঙে পড়ে, যেমন গোত্রপ্রীতিহীন একক জনসমষ্টির বেলায় হয়ে থাকে। যদি সকল গোত্রপ্রীতি মিলে একটি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তা হলে একাধিক গোত্রপ্রীতির অধিকারী পক্ষ এ ঐক্যের বিরুদ্ধে কিছুতেই এঁটে উঠবে না। পাঠক, এটা বুঝে নিন।

জেনে রাখুন, আত্তুরতুশীর বক্তব্যের ধারা অনুসরণ করলে উপরোক্ত মন্তব্যই আমাদের নিকট শুদ্ধতর বলে মনে হয়। কিন্তু তিনি এ গোত্রপ্রীতির কোনো উল্লেখ করেননি। কারণ তার আবাসস্থল ও দেশে এর কোনো অস্তিত্বই নেই। তারা প্রতিরোধ, সহায়তা ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে একক শক্তিকেই একত্র করে জনগোষ্ঠী গড়ে তোলে। তাদের মধ্যে গোত্রপ্রীতি বা বংশধারার কোনো প্রভাব বিবেচনা করা হয় না। আমরা গ্রন্থের প্রথম দিকেই এ ব্যাপারে বর্ণনা করেছি। অথচ এতদ্‌সত্ত্বেও এটা ও এটার অনুরূপ অন্যান্য উপকরণের শুদ্ধতা মেনে নিলেও এগুলো একান্তই বাহ্যিক উপকরণ মাত্র। যেমন সশস্ত্র সৈন্যদল, আন্তরিক যুদ্ধ পরিচালনা ও সমরাস্ত্রের আধিক্য এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের একত্র সমাবেশ। কিন্তু একমাত্র এগুলোকে প্রাধান্য বিস্তারের নিয়ামক কী করে বলা যায়? পাঠক, আমরা ইতিপূর্বে আপনার সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করেছি

যে, এদের কোনোটিই অভ্যন্তরীণ উপকরণ, যেমন কৌশল ও প্রতারণা এবং দৈবী প্রভাব ও হীনমন্যতাবোধের স্থান গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং আপনাকে এটা বুঝে নিতে হবে এবং সৃষ্ট জগতের অবস্থাদি সম্পর্কেও চিন্তা করতে হবে। বস্তুত আল্লাহ্ই দিন রাত্রির পরিবর্তন করে থাকেন।[১৮৭]

অনুচ্ছেদ

যুদ্ধ সম্পর্কীয় প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তার অভ্যন্তরীণ ও অস্বাভাবিক উপকরণের সাথে খ্যাতি ও যশের ব্যাপারটিও যোগ করা যায়। অবশ্য এটা খুব কম ক্ষেত্রেই যথাস্থানে প্রযোজ্য হতে দেখা যায়। রাজন্যবর্গ, জ্ঞানী, পুণ্যাত্মা ও সদাচারের অধিকারী সকলের সম্পর্কেই এ কথা বলা যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যাদের অখ্যাতি দূর-দূরান্তে ব্যাপ্ত হয়েছে, তারা মূলত তদ্রূপ নয়। এমন অনেক ব্যক্তিও আছেন, যাঁরা কোনো খ্যাতির অধিকারী হননি, অথচ তাঁরা যথার্থই এর যোগ্য ছিলেন। আবার অনেক সময় যথার্থ আধারেই খ্যাতি স্থাপিত হয় এবং তা অধিকারীর বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দেয়।

এর কারণ এই যে, খ্যাতির এ ব্যাপারটি শ্রুতির মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করে এবং এক্ষেত্রে বর্ণনাকারীরা ক্রমশ তার উদ্দেশ্য ভুলে যায়। এর ফলে তাতে আতিশয্য ও অতিরঞ্জন দেখা দেয়; নানাবিধ কল্পনা এবং যথার্থ ঘটনার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের অভাবে মূর্খতা প্রাধান্য বিস্তার করে। কারণ বর্ণনাকারী বুঝতেও পারে না যে, তাতে কারুকার্য ও বিভ্রান্তি বিদ্যমান। অন্যদিকে পার্থিব জীবনের স্বার্থে প্রতাপশালী ও ক্ষমতাবানদের স্তুতি ও চাটুকারিতার জন্যও এরূপ আতিশয্য দেখা দেয়। যা নেই তারই প্রশংসা করে এবং শোভন অবস্থার উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রচারকার্যে লিপ্ত হয়। মানুষ স্বভাবতই প্রশংসাকাতর এবং পার্থিব সম্মান ও সম্পদ লাভে একান্ত আগ্রহী। এ কারণে তারা সৎগুণ অবলম্বন বা সৎলোকের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব খুব কমই পোষণ করে। সুতরাং তাদের এ সদাচারের প্রশংসার সাথে তাদের বাস্তব অবস্থার কোনো মিল নেই। এ খ্যাতি তার অভ্যন্তরীণ উপকরণগত শক্তির ক্ষেত্রে অবাস্তব বলে প্রমাণিত হয় এবং সত্য থেকে দূরে সরে যায়। এ কারণেই অভ্যন্তরীণ গুপ্তকার্যকারণের সমন্বয়ে যা বাস্তব হয়ে ওঠে, তাকেই ভাগ্য বলে মনে করা হয়, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ এবং তিনিই সহায়।

---

১৮৭. তুল, কোরান ৭৩, ২০।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[রাজকোষ[১৮৮] এবং তার সমৃদ্ধি ও বিনষ্টের কারণ]

জেনে রাখুন, সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে রাজকোষের ভিত্তিগত করের পরিমাণ কম থাকে; কিন্তু অধিক আদায়ের জন্য তার সমষ্টি অধিক হয় এবং শেষের দিকে করের পরিমাণ বেশি কিন্তু অনাদায়ের ফলে তার সমষ্টিগত পরিমাণ হ্রাস পায়। এর কারণ এ যে, সাম্রাজ্য যদি ধর্মীয় বিধান অনুসরণ করে গড়ে ওঠে, তা হলে তা ধর্মীয় নীতির অনুসারী করাদি, যেমন জাকাত, রাজস্ব, মাথট প্রভৃতি ধার্য করে থাকে। এরূপ করের পরিমাণ কম। পাঠক, আপনি জানেন যে, সম্পদের জাকাত পরিমাণের দিক থেকে খুবই কম। এভাবে শস্য ও পশুসম্পদের জাকাত এবং মাথট, রাজস্ব ও অন্যান্য ধর্মীয় বিধি নির্ধারিত করের অবস্থাও অনুরূপ। এগুলোর নির্দিষ্ট সীমা আছে, যা অতিক্রম করা যায় না। অন্যদিকে সাম্রাজ্য যদি প্রাধান্য বিস্তারের রাজকীয় ধারাকে অনুসরণ করে এবং গোত্রপ্রীতির উপর নির্ভরশীল হয়, তা হলেও প্রথম দিকে তার প্রান্তরীয় জীবনের প্রভাব পরিত্যাগ করতে পারে না, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ প্রান্তরীয় জীবনবোধের সারল্যের ফলেই অপরের প্রতি সমীহ ও সম্মানের ভাব এবং নমনীয়তা ও অপরের সম্পদের প্রতি বিতৃষ্ণা বিদ্যমান থাকে। খুব কম ক্ষেত্র ব্যতীত সাধারণভাবে তৎপ্রতি উদাসীনতাই দেখা যায়। এ কারণেই পদাদি যেমন কম থাকে, তেমনি কর আদায়ের ব্যবস্থাও তেমন সক্রিয় থাকে না, যদ্বারা সম্পদ একত্র হতে পারে। সুতরাং এভাবে প্রজাদের উপর পদাদির চাপ ও করের বোঝা কম তাকায় তারা কাজকর্মে উৎসাহী ও আগ্রহী হয়ে ওঠে। জনবসতি বাড়তে থাকে এবং শুল্ক-করাদির অভাবে তাদের আয় বৃদ্ধি পায়। এভাবে জনবসতি বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ ব্যয় নির্বাহের জন্য পদ ও করের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করে এবং তার একত্রীকরণে রাজকোষের সমৃদ্ধি দেখা দেয়। সুতরাং এভাবে যখন সাম্রাজ্য স্থায়ী হয়ে ওঠে ও একটা ধারাবাহিকতার সৃষ্টি হয় এবং একের পর এক সম্রাটের আবির্ভাব ঘটতে থাকে, তখন তাঁরা অনেকাংশে মার্জিত হয়ে ওঠেন। বেদুইন জীবনের বদভ্যাস, সারল্য, বিতৃষ্ণা ও কৃচ্ছ্রতা দূর হয় এবং রাজকীয় শক্তির দম্ভ ও নাগরিক জীবনের অমোঘ আকর্ষণ পরিমার্জনার আবির্ভাব ঘটায়। সাম্রাজ্যের অধিবাসীরাও তখন চালাক ও চতুর হয়ে ওঠে এবং প্রাচুর্য ও বিলাসব্যসনে অতি মাত্রায় নিয়োজিত থাকার ফলে তাদের অভ্যাস ও প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে সম্রাটগণ প্রজাদের উপর তথা কৃষি কর্মী, কৃষক ও অন্যান্য করদাতাদের উপর করের পরিমাণ

---

১৮৮. মূলে আছে 'জেবায়ত'; আমরা এর অনুবাদ 'রাজকোষ' করেছি। রোজেনথালে 'কর নির্ধারণ'।

বৃদ্ধি করেন এবং এভাবে পদ ও কর ইত্যাদির অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে রাজকোষের অবস্থা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তারা ক্রয়-বিক্রয়ের উপরও কর বসান, যেমন আমরা পরে এ সম্পর্কে বর্ণনা করছি।

অতঃপর এভাবে এক পরিমাণের সাথে অন্য পরিমাণ যুক্ত হয়ে ক্রমশ কর বৃদ্ধি পায়। কারণ সাম্রাজ্যের বিলাসব্যসনের চাহিদাও তখন তার অভ্যাস অনুসারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রয়োজন ও তদনুযায়ী ব্যয়ের হার বেড়েছে। এর ফলে এক সময়ে এ করভার প্রজাদের কাঁধে ভারী হয়ে ওঠে এবং তারা তার নিচে পড়ে নিষ্পেষিত হতে থাকে। এ কর আদায়ের ব্যাপারটি তখন একটি বাধ্যতামূলক অভ্যাসে পরিণত হয়। কারণ এ পরিমাণ বৃদ্ধির ব্যাপারটি অল্পে অল্পে সংঘটিত হয়েছে। এ জন্য কেউই লক্ষ করেনি যে, কোন সময় তা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এ বোঝাকে চাপিয়ে দিয়েছে। বরং তা শেষ পর্যন্ত একটি বাধ্যতামূলক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এর পরেও এরূপ কর বৃদ্ধির গতি এক সময় সাধারণ সহ্যসীমা অতিক্রম করে। এর ফলে প্রজাসাধারণের মধ্যে আয়ের অভাবজনিত নিরাশা দেখা দেয় এবং তার পরিণাম হিসাবে কর্মস্পৃহা বিনষ্ট হয়ে থাকে। কারণ তারা তখন তাদের লাভ ও কর, ফসল ও তজ্জনিত উপকারিতার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পায় না। এর ফল এ দাঁড়ায় যে, জনসাধারণের অধিকাংশই কর্মস্পৃহা হারিয়ে ফেলে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় কর আদায়ের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় রাজকোষও দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। রাজকোষের এইপ্রকার দুরবস্থা দূর করার জন্য অনেক সময় শুল্ককরাদি আরো বাড়িয়ে দেয়া হয়, যাতে এ ক্ষতি পূরণ করা যায়। এর ফলে এ সকল কর ও শুল্ক এমন একটা সীমায় পৌঁছে, যার পরে আর কোনো লাভজনক বা সুবিধাজনক স্তর নেই। কারণ তখন সাম্রাজ্যের ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে কর নির্ধারণের বিষয়টিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, জনসাধারণ তার দ্বারা উপকার পাবার আর আশা করতে পারে না। সুতরাং রাজকোষের সমৃদ্ধি হ্রাস পেতেই থাকে এবং তার ক্ষতিপূরণের জন্য করের বোঝাও বেড়ে চলে। এক সময়ে জনবসতির কর্মোদ্যম সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তার প্রতিক্রিয়া সাম্রাজ্যের জন্য মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়; যেমন জনসাধারণের সমৃদ্ধি তার সমৃদ্ধির কারণ হয়।

পাঠক, যদি এ বিষয়টি বুঝে থাকেন, তা হলে আপনি এটা নিশ্চয় জানতে পেরেছেন যে, জনগণের সমৃদ্ধির সর্বাপেক্ষা শক্তিমান উপকরণ হল যতদূর সম্ভব তাদের করভার লাঘব করা। কারণ এর ফলে মানুষ নানাবিধ কর্মোদ্যমে নিজেকে নিয়োজিত করে সুখী হবার কামনা করতে পারে। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সর্ব কর্মের অধীশ্বর এবং তাঁর হাতেই সর্ব বিষয়ের ক্ষমতা।[১৮৯]

---

১৮৯. তুল. সূরা ইয়াসীনের শেষাংশ।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থায় শুল্ক ধার্য করা হয়]

জেনে রাখানু, সাম্রাজ্য শক্তি তার প্রথমাবস্থায় প্রান্তরীয় চরিত্রের অধিকারী হয়, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। এ জন্য বিলাসব্যসন ও তার অভ্যাসের অভাবে প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের ধারণা কম থাকে। এর ফলে ব্যয়ের মাত্রাও কম হয় এবং রাজকোষে আয়ের মাত্রা বেশি হয়ে বহুগুণ উদ্বৃত্ত অবস্থা বিরাজ করে। কিন্তু এ অবস্থা বেশি দিন থাকে না। নাগরিক জীবনের বিলাস ও তার আচার-অনুষ্ঠান দেখা দিয়ে এ শক্তিও পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলোর ধারা অনুসরণ করতে তৎপর হয়ে ওঠে। এর ফলে সাম্রাজ্যাধিকারীদের খরচের মাত্রা বেড়ে যায়। বিশেষ করে সম্রাটের নিজের ব্যয় ও তদীয় সভাসদ ও অমাত্যবর্গের মধ্যে দানধ্যানের প্রাচুর্য ব্যয়ের মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং রাজকোষ আর এর যোগান দিতে সমর্থ হয় না। কাজেই সম্রাটের এ নিজস্ব ব্যয় ও সহায়ক শক্তির জন্য দানধ্যানের প্রয়োজনে রাজকোষের সমৃদ্ধি সাধন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এর ফলে প্রথমে রাজস্ব ও করের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হয়, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। আবার এর প্রভাবেই ব্যয়, প্রয়োজন ও বিলাসব্যসনের পর্যায়ক্রমিক অভ্যাস বৃদ্ধি পায় এবং সাম্রাজ্যের সহায়ক শক্তি ও তাদের প্রাপ্যাদির ক্ষেত্রও উক্ত প্রভাবের অধীন হয়ে ক্রমশ সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ী চরিত্র ফুটে উঠতে থাকে। তার রাজকোষের আর্থিক সঙ্গতি বিধানে কর্মচারী ও দূরদূরান্তে অবস্থিত অঞ্চলগুলো অপারগ হয়ে ওঠে। সুতরাং রাজকোষের শক্তি কমতে থাকে এবং বিলাসব্যসনের অভ্যাস বাড়তে থাকে। আর এর অনিবার্য প্রভাবে সৈন্যদলের বেতন ও পুরস্কার বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় সম্রাটের পক্ষে রাজকোষের শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার কর ধার্য করা, বিশেষ করে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর শুল্ক ধার্য করার মত নতুন উপায় খুঁজতে হয়। এ ক্ষেত্রে বাজারের ক্রয়-বিক্রয় মূল্যের উপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কর এবং নগরের সিংহদ্বারগুলো দিয়ে যাতায়াতকারী পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করা হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এ পরিমাণেরও কোনো স্থিরতা থাকে না। কারণ মানুষের জীবন-যাপনে বিলাসের প্রবণতা থাকায় পুরস্কারাদি যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি সহায়ক শক্তি ও সৈন্যদলের প্রয়োজনও অত্যধিক হয়ে ওঠে। অনেক সময় সাম্রাজ্যের শেষ পর্যায়ে এগুলোর পরিমাণ একটা চরম সীমায় উপনীত হয়। ফলে নিরাশায় বাজারগুলো ছেয়ে যায় এবং এর প্রভাব জনবসতির উপর ছড়িয়ে পড়ে। এর অনিবার্য পরিণতি সাম্রাজ্যের দুর্বলতাকে প্রকট করে তোলে এবং এ বৃদ্ধি ক্রমাগত স্থায়ী হয়ে তার বিনাশ ডেকে আনে।

এ প্রকার বহু ঘটনা পূর্বাঞ্চলের আব্বাসী ও উবাইদী সাম্রাজ্যের ব্যয়ভার বহনের জন্য সংঘটিত হতে দেখা গেছে। হজের মওসুমে হাজীদের উপরও তাঁরা কর ধার্য করেছেন। অতঃপর সম্রাট সালাহউদ্দিন আইউব এসে এগুলো বাতিল করেন এবং সাম্রাজ্য ব্যবস্থায় একটা কল্যাণধর্মিতার প্রবর্তনে উদ্যোগী হন। ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের সময়ে আন্দালুসেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছিল। পরে আলমোরাবেতী সম্রাট ইউসুফ ইবনে তাশেফীন এসে এ প্রকার কর প্রথার বিলোপ সাধন করেন। বর্তমানকালে আফ্রিকিয়ার আল-জারিদ অঞ্চলের নগরগুলোতেও তাদের নেতৃবৃন্দের অন্যায্য প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অনুরূপ কর বৃদ্ধির ধারা অনুসৃত হচ্ছে।[১৯০] মহান আল্লাহ্ই সব কিছু জানেন।

---

১৯০. আবুহেফস বংশীয় আবুবকর হতে আবুল আব্বাস কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণ পর্যন্ত সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[সম্রাটের বাণিজ্যে অংশগ্রহণ প্রজাদের জন্য ক্ষতিকর এবং রাজকোষের জন্য সঙ্গতি বিনাশক]

পাঠক, জেনেছেন যে, যখন বিলাসব্যসন ও তার বিচিত্র অভ্যাসের দরুন রাজকোষ অপর্যাপ্ত ঠেকে, যেমন পূর্বে বর্ণনা করেছি এবং এতদসম্পর্কীয় ব্যয়ভার বহন করতে ও প্রয়োজন মেটাতে তা অক্ষম হয়, তখন স্বভাবতই অধিক সম্পদ সংগ্রহ করে তার সঙ্গতি বাড়াবার চেষ্টা করা হয়। তা কখনো ক্রয়-বিক্রয়ের উপর শুল্ক ধার্য করে, আবার কখনো প্রতিষ্ঠিত শুল্ক ব্যবস্থার উপর নতুন নামের বৈচিত্র্য সাধন করে অর্জিত হয়ে থাকে। কখনো এর জন্য কর্মচারী ও শুল্ক আদায়কারীদের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাদের মেদমজ্জা শোষণ করা হয়। কারণ দেখা যায় যে, তারা এরূপ শুল্ক ব্যবস্থার কল্যাণে এমন সম্পদ কুক্ষিগত করেছে, যা হিসাব-নিকাশে ধরা পড়ে না। কখনো রাজকোষের সমৃদ্ধির নামে সম্রাটের পক্ষ থেকে ব্যবসা ও কৃষিকার্যের ব্যবস্থা করা হয়। এরও কারণ হল এ যে, ব্যবসায়ী ও কৃষকরা অতি সামান্য পুঁজি ব্যবহার করে অধিক মুনাফা ও ফসল লাভ করছে; সুতরাং সম্রাটের পক্ষ থেকে যদি অধিক পুঁজি ব্যবহার করা যায়, তা হলে আরো অধিক সম্পদ রাজকোষে সঞ্চিত হতে পারে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সম্রাটের পক্ষ থেকে পশুসম্পদ ও শস্যক্ষেত্রের উপর পুঁজি বিনিয়োগ এবং তার উৎপন্ন দ্রব্য বাজারজাতকরণে মনোনিবেশ করা হয়। তাদের ধারণা, এতে রাজকোষের সমৃদ্ধি ও সম্পদ সংগ্রহে অধিকতর উপকার লাভ করা সম্ভব হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা একান্তই ভ্রমাত্মক এবং এর ফলে অনেক দিক থেকেই প্রজাসাধারণের ক্ষতির ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

প্রথমত কৃষক ও ব্যবসায়ীরা পশুসম্পদ ও পণ্যাদি ক্রয়ের ব্যাপারে পুঁজির অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং এ ব্যাপারে তাদের সঙ্গতির অভাব দেখা দেয়। কারণ প্রজারা এ ব্যাপারে একে অন্যের সমতুল্য এবং সুবিধার ক্ষেত্রে পরস্পরের নিকটবর্তী হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে তাদের প্রতিযোগিতা একটা বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত পরস্পরকে অনুসরণ করে তাদের সঙ্গতি ও নৈকট্য অনুসারে অবস্থানে করে। সুতরাং এ অবস্থায় যদি সম্রাট তাঁর বিরাট পুঁজির ক্ষমতা নিয়ে সেখানে আবির্ভূত হন, তা হলে অন্য কারো পক্ষে তাঁর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এর ফলে মানুষের মনে বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা দেখা দেয়।

তদুপরি সম্রাটের পক্ষে এ সকল পণ্যদ্রব্যের অধিকাংশকেই বাধ্যতামূলকভাবে অথবা স্বল্পমূল্যে কুক্ষিগত করা সম্ভব হয়। এর ফলে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতার অভাবে তাদের মূল্য হ্রাস পায় এবং বিক্রেতার উপর এর প্রভাব পড়ে।

অন্যদিকে সম্রাটের পরিচালিত কৃষিকর্ম থেকে যখন শস্য, রেশম, মধু, চিনি ও অন্যবিধ পণ্য উৎপন্ন হয় এবং নানা প্রকারের বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্য তাঁর কুক্ষিগত হয়, তখন তাকে যথারীতি বাজারজাতকরণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের চাহিদার প্রতি তাঁর কর্মচারীরা লক্ষ করে না। কারণ এরূপ করতে গেলে সাম্রাজ্যের অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা; সুতরাং তারা এ সকল পণ্যের ক্রেতা কৃষক ও ব্যবসায়ীর উপর এগুলো ক্রয় করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে এবং তজ্জন্য তাদের নির্ধারিত ও অতিরিক্ত মূল্য দিতে বাধ্য করে। এর ফলে ক্রেতাদের নগদ মূলধনের সমস্তই তাদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে এ সকল পণ্যদ্রব্য ক্রেতাদের হাতে অচল মজুদ হিসাবে স্থায়ী হয়ে ওঠে এবং এগুলোর মধ্য দিয়ে তারা তাদের জীবিকা ও আয়ের যে ইচ্ছা পোষণ করত, তার পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। অনেক সময় তারা বাধ্য হয়ে আর্থিক প্রয়োজনে তাদের মজুদ মালের কতকাংশ মন্দা বাজারে কম মূল্যে বিক্রয় করে দেয়। এভাবে কৃষক ও ব্যবসায়ীরা বারবার অনুরূপ লোকসানের সম্মুখীন হওয়ার ফলে তাদের পুঁজি বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তারা বসে পড়ে। এ অবস্থা বারবার ঘুরে-ফিরে আসতে থাকে। এর ফলে প্রজাদের মধ্যে অসুবিধা, অসঙ্গতি ও অলাভের হতাশা ছড়িয়ে পড়ে এবং এ ব্যাপারে তাদের তৎপরতাকে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দেয়। এর পরিণতিতে রাজকোষের অসঙ্গতি বেড়ে ওঠে। কারণ রাজকোষের অধিকাংশ অর্থ আসে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের উপর ধার্যকৃত কর থেকে এবং বিশেষভাবে অনুরূপ করাদি ধার্য করার পর এ অবস্থা আরো বাস্তব হয়ে দেখা দেয়। সুতরাং কৃষকরা যখন কৃষিকাজ বন্ধ করে এবং ব্যবসায়ীরা যখন ব্যবসা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, তখন রাজকোষের সমৃদ্ধি ভেঙে পড়ে বা তার মধ্যে মারাত্মক ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দিয়ে থাকে।

অতএব সম্রাট যদি তাঁর ধার্য করের দ্বারা রাজকোষের সঙ্গতির সাথে তৎকর্তৃক পরিচালিত কৃষি ও ব্যবসার লাভের তুলনামূলক বিচার করেন, তা হলে দেখতে পাবেন, তা সেই তুলনায় একান্তই নগণ্য। তদুপরি তা লাভজনক হলেও তা তাঁর রাজকোষের এমন একটা বিরাট অংশ গ্রাস করবে, যা তিনি ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ধার্য কর থেকে পেতে পারতেন। কারণ তাঁর পরিচালিত কৃষি ও ব্যবসাতে অনুরূপ কর ধার্যের কথা চিন্তাও করা যায় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে অন্যরা থাকলে তাদের উপর ধার্যকৃত সমস্ত করের আয় রাজকোষে আসত। তদুপরি এর ফলে জনবসতির উপর অন্যায্য চাপ সৃষ্টি হয় এবং তাদের এরূপ অসুবিধা সাম্রাজ্যের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ প্রজারা যদি তাদের সম্পদকে কৃষি ও ব্যবসার মাধ্যমে ফলবান করতে না পারে, তা হলে তা ব্যয়ের দ্বারা অচিরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এতে তারা দুরবস্থার সম্মুখীন হবে। পাঠক, এটা বুঝে নিন।

পারস্যবাসীরা সম্রাটের বংশধর ব্যতীত অন্য কাউকেও সম্রাট হিসাবে গ্রহণ করত না। তদুপরি তাকে মর্যাদা, ধর্ম, বিনয়, দান, বীরত্ব, ভদ্রতা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হতে হত। এর উপরে তারা ন্যায়পরায়ণ হওয়ার শর্ত আরোপ করত। তিনি কোনো

শিল্পকর্ম গ্রহণ করতে পারবেন না; কেননা এতে প্রতিবেশীর ক্ষতির সম্ভাবনা এবং তিনি কোনো ব্যবসায় অবলম্বন করবেন না; কারণ এতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা অত্যধিক। তিনি কোনো ক্রীতদাসকে চাকর হিসাবে গ্রহণ করতে পারবেন না; কারণ সে তাঁকে কোনো প্রকার সৎ ও কল্যাণধর্মীয় পরামর্শ দিতে সমর্থ নয়।

পাঠক, জেনে রাখুন, বস্তুত সম্রাটের সম্পদ বৃদ্ধি ও তাঁর আনুপূর্বিক সমৃদ্ধি একমাত্র রাজকোষের মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব এবং রাজকোষের সঙ্গতি বৃদ্ধিও কেবলমাত্র ধনাঢ্য ব্যক্তিদের প্রতি যথাযথ ব্যবহার ও তাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দানের মাধ্যমেই হতে পারে। এর ফলে তাদের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের অধীনস্থ সম্পদকে ফলবান ও বর্ধমান করতে তাদের চিত্ত প্রসারতা লাভ করবে। পরিণামে সম্রাটের রাজকোষ তা দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। কিন্তু এ পন্থা ব্যতীত তাঁর পরিচালিত কৃষি ও ব্যবসা তা প্রজার আশু ক্ষতিকারক, রাজকোষের বিনাশক এবং জনবসতির সংহারক মাত্র। কখনো অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, বিভিন্ন অঞ্চলে এ সকল প্রাধান্য বিস্তারকারী আমীর শ্রেণীর কৃষক ও ব্যবসায়ীরা মন্দা বাজারের সুযোগ গ্রহণ করে তাদের নিকট আগত পণ্যাদির যথেচ্ছা মূল্য নির্ধারণ করে ক্রয় করে এবং এ সকল পণ্য আবার তাদের ইচ্ছামত মূল্যে প্রজাদের নিকট বিক্রয় করে থাকে। এটা পূর্বেরটির অপেক্ষাও অধিকতর জঘন্য এবং এর ফলে প্রজাদের অবস্থা-ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হয়। অনেক সময় সম্রাটকে এ শ্রেণীর লোকেরা অর্থাৎ কৃষক ও ব্যবসায়ীরা উপরোক্ত বিষয়ে উৎসাহিত করে এবং তাদের হাবভাবে মনে হয় যে সম্রাট এ কাজের জন্যই নিয়োজিত হয়েছেন। এভাবে তারা তাঁকে লভ্যাংশের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রদান করে অতিদ্রুত সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তৎপর হয়। কারণ তাদের এ ব্যবসার জন্য সম্রাটকে কোনো প্রকার কর বা শুল্ক প্রদান করে না। এর ফলে তাদের সম্পদ খুব দ্রুত বেড়ে ওঠে এবং অতিরিক্ত ফল দান করতে থাকে। কিন্তু এর অন্তরালে সম্রাটের রাজকোষের যে ক্ষতি সাধিত হয়, তা কেউই বুঝতে চায় না। সুতরাং সম্রাটের জন্য এমনি ধরনের সকল প্রচেষ্টা ত্যাগ করা উচিত, যাতে তাঁর রাজকোষ ও সাম্রাজ্যের ক্ষতি হতে পারে। আল্লাহ্ আমাদের সৎপথ প্রাপ্তির ইঙ্গিত প্রদান করে থাকেন এবং আমাদেরকে সৎকার্যে উদ্বুদ্ধ করে উপকৃত করেন। মহান আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানের আধার।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[সম্রাট ও তাঁর সভাসদদের সমৃদ্ধি লাভ সাম্রাজ্যের মধ্য ভাগেই ঘটে থাকে]

এর কারণ এ যে, সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে রাজকোষ সাম্রাজ্যাধিপতির বংশ বা গোত্রের সহায়তা ও গোত্রশক্তির অনুপাতে তাদের মধ্যে বণ্টিত হয়ে থাকে। কারণ তখন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ করার জন্য তাদের প্রয়োজন সর্বাধিক; যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। এ জন্যই সাম্রাজ্যাধিপতি তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে রাজকোষ সম্পর্কে সংযমের পরিচয় দেন এবং এর মাধ্যমে তাদের উপর প্রভাব বিস্তারের কাজ সম্পূর্ণ করেন। এ অবস্থায় সম্রাট যেমন নিজ গোত্রের শ্রদ্ধা লাভ করেন, ঠিক তেমনি তার প্রতিষ্ঠাকে স্থায়ী করার জন্য তাদের সহায়তারও প্রয়োজন হয়। কাজেই রাজকোষ থেকে তাদের সকলের প্রয়োজন মিটিয়ে তিনি অতি অল্পই গ্রহণ করেন। পাঠক, এ সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখতে পাবেন, সম্রাটের অন্তরঙ্গ পারিষদ এবং উজির, লেখক, আশ্রিত পোষ্য প্রমুখ সভাসদদের অবস্থা তেমন ভালো নয়। কারণ তাদের মর্যাদা তখন গোত্রান্তর্গত প্রভুদের মর্যাদার দ্বারা খণ্ডিত এবং ক্ষমতার বিন্যাস তখন গোত্রশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

অতঃপর যখন সাম্রাজ্যের প্রকৃতি বিস্তার লাভ করে এবং জাতির উপর সাম্রাজ্যাধিপতির প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ হয় তখন সম্রাট প্রতিষ্ঠাতা গোত্রের সহায়তা ও সেবার অনুপাতে ন্যায্য প্রাপ্যাদি ব্যতীত অন্য সকল সুবিধা খর্ব করে আনেন এবং সাম্রাজ্যের ব্যাপারে তাদের প্রয়োজনের স্বল্পতার জন্যই রাজকোষে তাদের অধিকার হ্রাস পায়। তখন আশ্রিত পোষ্য ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিরা সাম্রাজ্যের শক্তি সংগঠন ও দায়িত্ব পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে এবং সম্রাট সমগ্র রাজকোষ অথবা তার অধিকাংশের উপর একক আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি সমস্ত সম্পদের উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে রাজশক্তির সঙ্গতি বর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে তা ব্যয় করেন। এভাবে তাঁর আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধি পায়, তার ধনভাণ্ডার পূর্ণতা লাভ করে, তাঁর মর্যাদার বিন্যাস ব্যাপক এবং সমগ্র জাতির মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং তাঁর অন্তরঙ্গ পারিষদ ও উজির, লেখক, প্রতিহারী, পোষ্য, রক্ষী প্রমুখ সভাসদদের প্রয়াজনীয়তা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তারা সম্পদ ও ঐশ্বর্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

অতঃপর যখন সাম্রাজ্যে অবক্ষয় দেখা দেয় এবং তার প্রতিষ্ঠাতা গোত্রশক্তি ও গোত্রপ্রীতির ক্ষমতা হ্রাস পায়, তখন আবার সম্রাটের জন্য সাহায্যকারী ও সহায়ক জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে ওঠে। কারণ তখন বিদ্রোহ দমন বিবাদ-ভাজন

ও সীমান্ত সংরক্ষণ একান্ত বাস্তব প্রয়োজন এবং এর অভাবে সাম্রাজ্যের ভারসাম্য নাশের সম্ভাবনা। সুতরাং সম্রাট তখন তাঁর সহায়ক শক্তির জন্যই ব্যয় করতে তৎপর। তারা গোত্রপ্রীতি ও তরবারীর শক্তির অধিকারী জনগোষ্ঠী। তাদেরকে সম্মুখে রেখে সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সম্রাটের সঞ্চিত ধনভাণ্ডার তখন নিঃশেষিত হয়। তদুপরি, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, এ সময় অধিক দানধ্যান ও ব্যয়ের জন্য রাজকোষের প্রসারও অনেকখানি সংকুচিত হয়ে আসে। রাজস্ব কমে যায় এবং সাম্রাজ্য অর্থের অনটনে জড়িয়ে পড়ে। সুতরাং অন্তরঙ্গ সভাসদ তথা প্রতিহারী, লেখক প্রমুখ পাত্রমিত্রদের মর্যাদা হ্রাস পাবার ফলে তাদের প্রতি সম্রাটের বিলাসী বদান্যতায় ভাঁটা পড়ে। ফলে সাম্রাজ্যাধিপতির অন্তরঙ্গ শক্তির বিন্যাস সংকীর্ণ হয় এবং তাঁর সম্পদের প্রয়োজন আরো তীব্র আকার ধারণ করে। সুতরাং অন্তরঙ্গ পারিষদ ও পাত্রমিত্ররা বংশানুক্রমে যে সম্পদ কুক্ষিগত করেছিল, তাও ব্যয় করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলে এ পাত্রমিত্ররা তাদের পূর্বপুরুষের অর্জিত সম্পদকে এমন এক পথে অর্থাৎ সম্রাটের সহায়তায় ব্যয় করতে বাধ্য হয়, যে জন্য এগুলো সঞ্চিত হয়নি এবং এ সঙ্গে তারা নিজেরাও পিতৃপুরুষের সদিচ্ছার পথ ত্যাগ করে। অন্যদিকে সম্রাট মনে করেন যে তাঁর পূর্বপুরুষের ছত্রচ্ছায়ায় যে ঐশ্বর্য তারা সঞ্চয় করেছে, তার উপর তাঁর অধিকার সর্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং তিনি অল্প অল্প করে একের পর এক এর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন। এ ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের প্রতি তাদের মনোভাব এবং মর্যাদা অনুসারেই তিনি অগ্রসর হন। ফলে সাম্রাজ্যের অন্তরঙ্গ পারিষদ ও পাত্রমিত্ররা তাদের ঐশ্বর্যসহ অন্তর্হিত হওয়ার দরুন তার শক্তিকেন্দ্রের ক্ষয় দেখা দেয়। বস্তুত সম্রাট এভাবে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা বহু শক্তিকেই তাদের সমৃদ্ধি ও সমুন্নতি বিধানের পর পুনরায় নিঃস্ব করে ফেলেন।

পাঠক এ ব্যাপারে আব্বাসী সাম্রাজ্যের উজিরদের বেলায় যা ঘটেছে, তৎপ্রতি লক্ষ করুন। তাদের মধ্যে বনি কাহতাবা, বনি বারমেক, বনি সহল, বনি তাহের এবং অনুরূপ অন্যরা ছিল। আন্দালুসে উমাইয়া সম্রাজ্যের শেষের দিকে ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের সময়ে বনি শহীদ, বনি আবু আবদা, বনি হুদাইরা, বনি বুরদ এবং সমতুল্য অন্যান্য অনেকের ব্যাপারে এটা দেখা গেছে। বর্তমানকালে আমরা যে সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ পেয়েছি, তাতেও এর অন্যথা হয়নি। আল্লাহ্‌র বিধান, যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।

অনুচ্ছেদ

যখন সাম্রাজ্যের সভাসদরা অনুরূপ কোনো উৎপীড়নের আশঙ্কা করে, তখন তাদের অধিকাংশই পদমর্যাদা ত্যাগ করে এবং সম্রাটের অধীনতা পাশ থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্য নিয়ে সঞ্চিত সম্পদসহ কোনো দূরাঞ্চলে পালিয়ে যেতে তৎপর হয়। তাদের ধারণা এটা তাদের জন্য অত্যন্ত সহজ এবং তাদের সঞ্চিত সম্পদ ভোগ করা এভাবেই অধিকতর নিরাপদ হতে পারে। কিন্তু এরূপ ধারণা একান্তই ভুল এবং তাদের জীবন ও জীবিকার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

পাঠক, জেনে রাখুন, একবার সাম্রাজ্যের নাগপাশে জড়িয়ে পড়লে তা থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন ও দুঃসাধ্য। এমনকি এরূপ পলায়নে ইচ্ছুক ব্যক্তিটি যদি স্বয়ং সম্রাট হন, তথাপি প্রজাসাধারণ এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রপ্রীতির অধিকারীরা তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও অনুরূপ কিছু করার অবকাশ দিবে না। যদি এমন কিছু তাঁর আচরণে প্রকাশ পায়, তা হলে তা তাঁর সাম্রাজ্য ও নিজ জীবনের ধ্বংসই ডেকে আনবে। স্বভাবত এটাই হয়ে থাকে এবং এ কারণে রাজশক্তির নাগপাশ এড়িয়ে যাওয়া একান্তই দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিশেষ করে সাম্রাজ্য যখন বিস্তৃতি লাভ করে তার অন্তর্গত শক্তির বিন্যাসকে সংকুচিত করে তোলে এবং তা ক্রমশ সদাচার জনিত গৌরব থেকে অন্যায় বিলাসের পথে অগ্রসর হয়, তখন একান্তই অসম্ভব।

অন্যদিকে এরূপ পলায়নের ইচ্ছা যদি অন্তরঙ্গ পারিষদ, সভাসদ ও সম্রাটের মর্যাদাবান কোনো পাত্রমিত্রের মধ্যে দেখা দেয়, তা হলে বলতে গেলে তার জন্য এরূপ করার কোনো পথই খোলা থাকে না। কারণ প্রথমত সম্রাট তাঁর অন্তরঙ্গ পাত্রমিত্র সভাসদ বরং সমগ্র প্রজাকেই নিজের আশ্রিত পোষ্য বলে মনে করেন এবং তাদের সকল গোপন রহস্য জানার অধিকার দাবি করেন। এমতাবস্থায় তাদের যেকোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্রাটের অধীনতাপাশ ছিন্ন করার গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে তাঁর আশ্রিত পোষ্যের দ্বারা অন্য কেউ তাঁর গোপনীয়তা অবহিত হোক এবং সে অন্য কোনো ব্যক্তির সেবায় নিয়োজিত হোক, এও তিনি স্বাভাবিক হিংসার বশেই কামনা করতে পারেন না। অনুরূপ কারণের জন্যই আন্দালুসের বনি উমাইয়া সম্রাটরা তাদের সভাসদদিগকে হজের কর্তব্য পালনে বাইরে যেতেও অনুমতি দিতেন না। কারণ তাঁদের আশঙ্কা ছিল, এর ফলে তাঁরা আব্বাসীদের আয়ত্ত হয়ে পড়বে। এর ফলে তাঁদের সাম্রাজ্যকালে সভাসদরা হজব্রত পালন করতে পারেননি। উমাইয়া সাম্রাজ্য শেষ হয়ে ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের কাল না আসা পর্যন্ত আন্দালুসের রাজ সভাসদদের জন্য হজব্রত পালন বৈধ বলে বিবেচিত হয়নি।

দ্বিতীয়ত সম্রাট যদি এরূপ পলায়নপর কোনো সভাসদকে ছেড়েও দেন, তথাপি সম্পদ নিয়ে যাবার সুযোগ তাকে কোনো মতেই দিবেন না। কারণ সম্রাট মনে করেন যে, এ সম্পদ তাঁরই সম্পদ এবং তা তাঁর সাম্রাজ্যেরই অংশ। কেননা এ সম্পদের অধিকারী সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়াতলে থেকে তার পদমর্যাদা ব্যবহার করেই তা অর্জন করেছে। সুতরাং উক্ত সম্পদকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তার একা ভোগ করার কোনো অধিকার নেই। অতএব তা এ সাম্রাজ্যেই থাকবে এবং তার দ্বারা সম্রাটগণ উপকৃত হবেন। অন্যদিকে যদি ধরেও নেয়া যায় যে, কোনো ব্যক্তি এরূপ সম্পদ নিয়ে অন্যত্র সরে পড়তে সক্ষম হল; যদিও এটা খুবই বিরল, তথাপি তা সে ভোগ করতে পারবে না। কারণ ঐ অঞ্চলের রাজশক্তির দৃষ্টি তার উপর পড়বে এবং তারা তা আকার-ইঙ্গিতে ভয় দেখিয়ে বা প্রকাশ্যে জোর করে তার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিবেই। কেননা তারা জানে যে, এ সম্পদ অন্য সাম্রাজ্যের রাজকোষেরই অংশবিশেষ; সুতরাং তা গুরুত্বপূর্ণ কাজেই ব্যয় হওয়া দরকার। সম্রাটদের চক্ষু বিচিত্র জীবিকার দ্বারা অর্জিত সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দিকেই বিস্ফারিত হয়ে ওঠে; আর এটাত অন্য কোনো রাজকোষ বা

সাম্রাজ্যেরই অংশ; কাজেই এর উপর স্বভাবত ও ধর্মত হস্তক্ষেপ করার অধিকার তাদের আয়ত্তাধীন।[১৯১]

নবম কিংবা দশম হেফসী সম্রাট আফ্রিকিয়ার আবু ইয়াহিয়া জাকারিয়া ইবনে আহমদ আল-লেহিয়ানী[১৯২] রাজশক্তির দায়িত্বমুক্ত হয়ে মিশরে গমন করেছিলেন। তিনি পশ্চিম সীমান্তের শাসক তিউনিস অভিযানকারীর ভয়ে তারাবলিস সীমান্তে গমনের ছলে পলায়ন করেন। সেখান থেকে জাহাজে আরোহণ করে আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছান। যাবার কালে তার সাথে সাধারণ ধন-ভাণ্ডারের যাবতীয় সম্পদ এবং হেফসী রাজপরিবারের সকল সঞ্চিত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও মণিমুক্তা বিক্রয় করে প্রচুর ঐশ্বর্য নিয়ে যান। তিনি এ সকল ঐশ্বর্যসহ হিজরি অষ্টম শতাব্দীর সতের সনে[১৯৩] মিশরের সম্রাট আন্‌নাসের মুহম্মদ ইবনে কালাউনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্রাট তাকে খুব সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন এবং দরবারে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। অতঃপর ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে তার সমুদয় সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বসেন। শেষ পর্যন্ত আল-লেহিয়ানী তার জন্য নির্ধারিত বৃত্তিই শুধু পেতেন। এভাবে উক্ত শতাব্দীর আটাশ সনে তাঁর মৃত্যু হয়, যেমন আমরা তাঁর ইতিহাসে বর্ণনা করব।

এ প্রকার ও এর অনুরূপ আরো বহু কুমন্ত্রণা বিদ্যমান, যদ্বারা সম্পদশালীরা তাদের সম্রাটের উৎপীড়নের ভয়ে পলায়ন করতে গিয়ে প্রতারিত হন। তারা যা পারেন, তা হল তাদের নিজেদের মুক্ত করা। কিন্তু সম্পদের পাথেয় সঙ্গে নেবার ধারণাটি একান্তই ভুল ও বিভ্রান্তিকর। তারা সাম্রাজ্যের দায়িত্ব পালনে যে খ্যাতি ও দক্ষতা লাভ করেছেন, তাই তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য যথেষ্ট। এর দ্বারা তারা যে কোনো সম্রাটের নিকট বৃত্তিলাভ করতে পারেন কিংবা তাদের মর্যাদার অনুসারী কোনো ব্যবসা বা কৃষিকর্মের পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। তাদের জানা উচিত সাম্রাজ্যগুলোর পরস্পর বংশ সম্পর্কের ন্যায় সংগ্রথিত; তথাপি

> মানবাত্মা উচ্চাভিষাণী, যদি তাকে প্রলোভিত করা যায়
> আর অল্পে সন্তুষ্ট থাকার দিকে আকর্ষণ করলে, সে তাও মেনে নেয়।[১৯৪]

পবিত্র আল্লাহ্‌ই আহার্যদাতা। তিনিই স্বীয় অনুগ্রহে ও দয়ায় সহায়তাকারী। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

---

১৯১. রোজেনথাল এর পর জাবালার উজিরের বিদ্রোহ, বাগদাদে পলায়ন ও লুণ্ঠিত হওয়ার একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে এটা নেই।

১৯২. শাসনকাল ১৩১১-১৭ খ্রিস্টাব্দ।

১৯৩. রোজেনথাল, ৭১৯ (১৩১৯ খ্রি:) হি.।

১৯৪. এটা হিজরি সপ্তম শতাব্দির কবি আবু যুয়েবের রচনা বলে অনুমান করা হয়।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[সম্রাট প্রদত্ত প্রাপ্যাদির সংকোচন রাজকোষের অসঙ্গতির পরিচয় বহন করে]

এর কারণ এ যে, সাম্রাজ্য ও শাসন ব্যবস্থা বলতে গেলে এ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বাজার এবং এ স্থান থেকেই সভ্যতার উপকরণ সংগৃহীত হয়। সুতরাং সম্রাট যদি সম্পদ ও রাজকোষ নিজের কুক্ষিগত করে রাখেন কিংবা তা যদি সংকুচিত হয়ে যথাস্থানে ব্যয়িত না হয়, তখন তাঁর অন্তরঙ্গ পারিষদ ও সহায়ক শক্তির হাতের পুঁজি কমে যায়। এর ফলে তাদের নিকট থেকে যারা এ সম্পদ লাভ করত, তাদের ভাগ্যও শূন্যে ঝুলতে থাকে এবং তাদের ব্যয় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। অথচ তারাই বলতে গেলে ক্রেতা হিসাবে অধিকাংশ স্থান জুড়ে থাকে এবং তাদের ব্যয় থেকেই বাজারের প্রাণশক্তি সঞ্চালিত হয়। সুতরাং তারা হাত গুটালে বাজারে বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়; ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভ অন্তর্হিত হয় এবং এটারই পরিণতিতে রাজস্বের পরিমাণ কমে যায়। কারণ রাজস্ব ও রাজকোষের ব্যাপারটি শুধুমাত্র জনবসতির আধিক্য, তাদের লেনদেন, বাজারের তেজীভাব এবং মানুষের লাভ ও উপকারিতার প্রাচুর্য থেকেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং বাজারের দুরবস্থা রাজকোষের আয় রাজস্বের ব্যবস্থা সংকুচিত করে সম্রাটের সঙ্গতি ঘটিয়ে সাম্রাজ্যের বিপত্তি ডেকে আনে। কারণ সাম্রাজ্য, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি, এক বিরাট বাজারতুল্য; বরং সকল বাজারের উৎস এবং আমদানি-রপ্তানির ভিত্তি ও উৎপত্তিস্থল। সুতরাং তাতেই যদি মন্দা দেখা দেয় ও তার লেনদেন কমে যায়, তা হলেই তার সংশ্লিষ্ট অন্য সকল বাজারেও মন্দাভাব আরো ব্যাপক ও তীব্র হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সম্পদ বলতে যা বোঝায়, তা হল যা সম্রাট ও প্রজার মধ্যে বারবার আবর্তন করে থাকে—সম্রাটের নিকট থেকে প্রজাদের মধ্যে এবং প্রজাদের মধ্য থেকে সম্রাটের নিকট। সুতরাং সম্রাট যদি তা কুক্ষিগত করে বসেন, তা হলে প্রজারা আর তার সাক্ষাৎ পায় না। এটাই বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র বিধান।

ত্রয়োচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[উৎপীড়ন সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনে]

পাঠক, জেনে রাখুন, সম্পদের ব্যাপারে মানুষের উপর উৎপীড়ন করলে, তা সম্পদ উপার্জন ও সংগ্রহে তাদের আকাঙ্ক্ষাকে খর্ব করে ফেলে। কারণ তারা এটাই ভাবে যে, তাদের উপার্জন ও সঞ্চয়ের চরম পরিণতি হল লুণ্ঠিত হওয়া। সুতরাং সম্পদ উপার্জন ও সংগ্রহে তাদের আকাঙ্ক্ষা কমে গেলে তারা আর তার জন্য প্রচেষ্টা চালায় না এবং এরূপ নিস্পৃহ অবস্থা প্রজাদের উপর উৎপীড়নের পরিমাণ অনুসারেই দেখা দিয়ে থাকে। কাজেই উৎপীড়ন যদি জীবিকা অর্জনের সকল ক্ষেত্রেই ব্যাপক আকারে দেখা দেয়, তা হলে উপার্জন ও সঞ্চয়ের অনিচ্ছাও সকল কিছুর মধ্যে ব্যাপকতর হয়ে প্রবেশ করে। আবার এ উৎপীড়ন যদি সামান্য হয়, তা হলে জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে তার প্রভাবও সেই অনুপাতে পড়ে থাকে।

বস্তুত জনবসতি ও তার প্রাচুর্য, বাজারের তেজীভাব ইত্যাদি মানুষের আগমন নির্গমন তথা তাদের উপার্জন ও উপকারিতার ব্যাপক তৎপরতার মাধ্যমেই দেখা দিয়ে থাকে। সুতরাং মানুষ যদি জীবিকা অর্জনে নিশ্চেষ্ট হয় এবং ধনোপার্জনে হাত গুটিয়ে ফেলে, তা হলে বাজারে মন্দা দেখা দেয়, অবস্থা-ব্যবস্থা সংকুচিত হয়ে আসে এবং মানুষ জীবিকার উদ্দেশ্যে তাদের আশ্রয়স্থল ও বিন্যাস ব্যবস্থা ত্যাগ করে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এভাবে জনবসতি হ্রাস পায়, দেশ উজাড় হয় এবং নগর-বন্দর শূন্য হয়ে যায়। এ শূন্যতা সম্রাট ও তাঁর সাম্রাজ্যকেও শূন্য করে তোলে। কারণ জনগণই সাম্রাজ্যের প্রকৃত উপাদান; সুতরাং তাদের অভাবে সভ্যতা তথা সামাজ্যের অবশ্যম্ভাবী ক্ষতি দেখা দেয়।

পাঠক এ ব্যাপারে পারস্য সম্রাটদের কাহিনী হিসাবে তাদের ধর্মীয় গুরু মোবেজানের নিকট থেকে মাসউদী যা বর্ণনা করেছেন, তৎপ্রতি লক্ষ করুন। ঘটনাটি বাহরাম ইবনে বাহরামের সময়কার এবং উক্ত সম্রাট তাঁর শাসন আমলে উৎপীড়ন, উদাসীনতা ও তজ্জনিত সাম্রাজ্যের অসুবিধার কথা অস্বীকার করেছিলেন। মোবেজান একটি পেচকের কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে এর সত্যতার উদাহরণ তুলে ধরেছিলেন। একদিন সম্রাট একটি পেচকের কণ্ঠ শুনে মোবেজানকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তা বুঝতে পারেন কিনা। উত্তরে ধর্মগুরু বললেন, হ্যাঁ পারেন এবং তার বক্তব্য তুলে ধরে বললেন, একটি পেচক একটি পেচকিনীকে বিবাহের প্রস্তাব দিতেছে। এর উত্তরে পেচকিনী তাকে যৌতুক হিসাবে এমন বিশটি গ্রাম দিতে বলছে, যেগুলো বাহরামের রাজত্বকালে

উজাড় হয়ে গেছে। পেচক তা মেনে নিয়েছে এবং আরো বলেছে যে, সম্রাট যদি এভাবে তাঁর সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন, তা হলে এক হাজার উজাড় গ্রাম দিতেও তার খুব বেগ পেতে হবে না। সম্রাট এ বক্তব্য শুনে সতর্ক হলেন এবং মোবেজানকে নির্জনে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁর এ বক্তব্যের তাৎপর্য জানতে চাইলেন। উত্তরে মোবেজান বললেন,

হে সম্রাট! ধর্মীয় বিধান ছাড়া রাজত্বের মর্যাদা পূর্ণতা লাভ করে না। তা করতে হলে আল্লাহ্‌র আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করতে হয় এবং তাঁর বিধি-নিষেধকে কার্যকরী করে তুলতে হয়। আবার এ ধর্মীয় বিধানও রাজশক্তি ব্যতীত সম্ভব নয়। রাজশক্তির জন্য জনশক্তির প্রয়োজন এবং জনশক্তি সম্পদ ছাড়া হয় না। সম্পদ পেতে হলে জনবসতির দরকার এবং ন্যায়পরায়ণতাই জনবসতির প্রাচুর্য আনয়ন করে। ন্যায় একটি নিক্তি, যা সৃষ্টির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। প্রতিপালক একে প্রতিষ্ঠা করে তার জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছেন এবং ইনিই হলেন সম্রাট। আপনি হে সম্রাট! কৃষিখামারগুলোকে তাদের যথার্থ মালিকের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। তারা তাকে আবাদ করত এবং তারা রাজস্ব প্রদান করত। বস্তুত তাদের নিকট থেকেই আপনার সম্পদ এসে থাকে। অথচ তাদের নিকট থেকে তা নিয়ে আপনি আপনার সভাসদ, সেবক ও পাত্রমিত্রকে জায়গীর হিসাবে প্রদান করেছেন। তারা এ সকল কৃষিভূমি আবাদ করে না, তার পরিণাম সম্পর্কে ভাবে না, তার প্রয়োজনীয়তা বুঝে না এবং সম্রাটের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতার জন্য তারা রাজস্বও দেয় না। সুতরাং অন্য যারা রাজস্ব আদায় করছে এবং কৃষিভূমি আবাদের ধারা অব্যাহত রেখেছে তাদের উপর করের বোঝা চাপিয়েছে। এ জন্য তারা এ সকল কৃষিভূমি ত্যাগ করে, জনবসতি উজার করে দুর্গম স্থানের কৃষি জমিতে আশ্রয় নিচ্ছে এবং সেখানে বসবাস করছে। এর ফলে আবাদ কমেছে কৃষিজমি পতিত হয়েছে, সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে এবং সৈন্যদল ও প্রজাসাধারণ ধ্বংসের মুখে পতিত হচ্ছে। সুতরাং পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিবেশী সম্রাটগণ তার অবস্থা বুঝতে পেরে তার প্রতি লালসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। কারণ তারা জানে, যে সকল উপাদান ব্যতীত সাম্রাজ্য স্থায়ী হয় না, এ স্থলে তার অভাব বিদ্যমান।

সম্রাট এ বক্তব্য শোনার পর তাঁর সাম্রাজ্যের ব্যাপারে দৃষ্টি দিলেন এবং কৃষিভূমি সভাসদ অমাত্যদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আবার মালিকদের নিকট ফেরত দিলেন। তাদেরকে পূর্বের ন্যায় চলবার সুযোগ প্রদান করলেন। সুতরাং তারা উদ্যমের সাথে জমি আবাদ করল এবং দুর্বলরা আবার সবল হয়ে উঠল। আবার জনবসতি দেখা দিল, এলাকাগুলো সবুজ হয়ে উঠল, সম্পদ বৃদ্ধি পেল এবং রাজস্বের পরিমাণও বেড়ে গেল। সৈন্যদল শক্তিশালী হওয়ার ফলে শত্রুদের প্রলোভন দমিত হল এবং সীমান্ত সুরক্ষিত হয়ে উঠল। সম্রাট সকল কাজ নিজে তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন। তাঁর শাসনকাল সৌন্দর্যমণ্ডিত হল এবং তাঁর সাম্রাজ্য স্থায়ী হল। এ কাহিনী থেকে এ কথাই জানা যায় যে, উৎপীড়ন জনবসতির উচ্ছেদ সাধন করে এবং এ প্রকার উচ্ছেদের ফলে সাম্রাজ্যের ক্ষতি ও সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে।

এস্থলে এরূপ যুক্তি উপস্থিত করা ঠিক হবে না যে, অনেক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিরাট বিরাট জনবসতিপূর্ণ নগরগুলোতে উৎপীড়ন থাকা সত্ত্বেও কখনো কোনো প্রকার

ক্ষতিকর কিছু দেখা যায় না। পাঠক, জেনে রাখুন, এটা নগরের জনসংখ্যা ও উৎপীড়নের অনুপাতে সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং যেখানে নগরের পরিধি বিরাট, তার জনসংখ্যা প্রচুর ও তার অবস্থার মধ্যে সীমাহীন ব্যাপকতা বিরাজ করে, সেখানে উৎপীড়ন ও অবিচারের দ্বারা অতি অল্পই ক্ষতি সাধিত হয়। কেননা উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে দেখা দিয়ে থাকে। সুতরাং নগরীর অবস্থা বৈচিত্র্য ও তার কর্মপ্রবাহের ব্যাপকতার ফলে এ প্রতিক্রিয়া একটা বিশেষ সময়ের ব্যবধানেই বাস্তব রূপ লাভ করে। কখনো এ উৎপীড়ক শাসনভার নগরীর জীবন বিধ্বস্ত হবার পূর্বেই সমূলে উৎপাটিত হয় এবং তদস্থলে অন্য সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটে। কাজেই এ নবীন শাসন তার সংশোধন করে নগর জীবনের অন্তর্গত ত্রুটিকে দূর করে দেয়। এর ফলে তা প্রায় বোঝাই যায় না। অবশ্য এরূপ ঘটনা খুব কমই ঘটে থাকে।

এ আলোচনার নির্গলিতার্থ এই যে, উৎপীড়ন অবিচারে জনবসতির ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি এবং এর পরিণামে সাম্রাজ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পাঠক, কখনো এ কথা মনে করবেন না যে, কোনো প্রকার হেতু ও বিনিময় ব্যতীত কারো সম্পদ ও সম্পত্তি ছিনিয়ে নেয়াই উৎপীড়ন, যেমন সাধারণভাবে এ ধারণা পোষণ করা হয়; বরং উৎপীড়ন এটা থেকেও ব্যাপক। যে কেউ অপরের অধিকারে, তার কর্ম প্রবর্তনায় হস্তক্ষেপ করল এবং তার নিকট অন্যায়ভাবে কিছু দাবি করল কিংবা ধর্মীয় বিধানের বাইরে তার উপর কোনো দাবি প্রতিষ্ঠিত করল, সে উৎপীড়ক। সুতরাং কোনো প্রকার ন্যায় ভিত্তি ছাড়া কর আদায়কারীরা উৎপীড়ক; এজন্য জবরদস্তিকারীরা উৎপীড়ক এবং এ উদ্দেশ্যে মানুষের সম্পদ ছিনতাইকারীরা উৎপীড়ক। যারা অপরের ন্যায্য দাবি পূরণ করে না, তারাও উৎপীড়ন করে এবং সাধারণভাবে যে কোনো অধিকার হরণকারীকেই উৎপীড়ক বলে মনে করতে হবে। এর সমস্ত প্রতিক্রিয়াই সাম্রাজ্যের জনবসতির ক্ষতি সাধন করে এবং জনগণের মধ্যে সভ্যতার মৌল উপাদান আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সমূলে ধ্বংস করে।

পাঠক, জেনে রাখুন, ধর্মপ্রবর্তক কর্তৃক উৎপীড়ন নিষিদ্ধ করার এটাই যথার্থ উদ্দেশ্য। কারণ উৎপীড়ন জনবসতির ক্ষতি সাধন করে তার কামনা-বাসনাকে ধ্বংস করে এবং পরিণাম, এর দ্বারা মানব জাতির বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়। এজন্য ধর্মীয় বিধান এর বিরোধিতা করে সমগ্র জীবনের উপর পাঁচটি দিক থেকে সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করেছে, তা হল ধর্ম, জীবাত্মা, বুদ্ধিমত্তা, বংশধারা ও সম্পদ সংরক্ষণ। সুতরাং, পাঠক, আপনি যেমন দেখেছেন, উৎপীড়ন জনসমাজের ক্ষতি সাধন করে তার অস্তিত্বকেই বিলুপ্ত করে দিতে চায়, অতএব তা নিষিদ্ধ হওয়াই যুক্তিযুক্ত এবং এ নিষেধাজ্ঞা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোরান ও হাদিসে এ সম্পর্কে প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান এবং এর অধিকাংশই সংযম ও সংকোচের নীতি শিক্ষা দিয়ে থাকে।

যদি প্রত্যেকেই উৎপীড়ন করতে সমর্থ হত, তা হলে অন্যান্য সমাজবিরোধী অপকর্মের ন্যায় এর জন্যও কঠিন শাস্তি নির্ধারিত হত। যেমন অন্যান্য মানব অস্তিত্ববিরোধী অন্যায়, ব্যভিচার, নরহত্যা, মদ্যপান ইত্যাদির জন্য শাস্তি নির্ধারিত

আছে এবং তা যেকোনো ব্যক্তির পক্ষে করা সম্ভব। কিন্তু উৎপীড়নযোগ্য লোক ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না। এ জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা শক্তিমান ও শাসন ব্যবস্থার অধিকারীর দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সুতরাং ধর্মপুস্তকে তার নিন্দা ও পারলৌকিক শাস্তির কথা বার বার উল্লেখিত হয়েছে। যাতে তার বিরোধী ও সংযম শক্তি শক্তিমানের নিজের মধ্যেই জন্ম নেয়। 'তোমার প্রভু ত বান্দাদেরকে কখনো উৎপীড়ন করেন না'।[১৯৫]

পাঠক, আপনার পক্ষে এ কথা বলা সঠিক নয় যে, ধর্মীয় বিধানে রাহাজানির শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে এবং তা শক্তিমানের উৎপীড়ন ভিন্ন অন্য কিছু নয়। কারণ অন্য সময় না হোক, অন্তত রাহাজানি করার সময় তাকে অবশ্যই শক্তিমান বলতে হবে। এর উত্তর দুইভাবে দেয়া যেতে পারে; একটি হল এটা বলা যায় যে, শাস্তির ব্যাপারটি অধিকাংশের মতে জীবাত্মা বা সম্পদের ক্ষতির উপরই নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং এটা অনুরূপ ক্ষতি করার ক্ষমতা ও তদনুযায়ী অন্যায় অনুষ্ঠানের পরেই শুধু সম্ভব হয়। এজন্যই শুধু রাহাজানির জন্য কোনো প্রকার শাস্তি নির্ধারিত নেই। অপরটি হল এরূপ বলা যায় যে, রাহাজানিকারীর এমন কোনো ক্ষমতা নেই, যেমন আমরা উৎপীড়কের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। তা এমন একটি ক্ষমতা, যা প্রতিরোধ করার শক্তি কারো নেই। এ কারণে তা ধ্বংস ডেকে আনে। কিন্তু রাহাজানিকারীর ক্ষমতা হল মাত্র ভয় প্রদর্শন, যাকে সে সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে এবং তাকে প্রতিরোধ করার শক্তি ধর্ম ও শাসন ব্যবস্থার দিক থেকে সকলের হাতেই বিদ্যমান। সুতরাং তাকে সেই ধ্বংসাত্মক শক্তি বলে মনে করা যায় না। আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সকল বস্তুর উপর শক্তিমান।

অনুচ্ছেদ

সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক সমাজবিরোধী উৎপীড়ন হল অন্যায়ভাবে শ্রমিক নির্যাতন এবং প্রজাদের উপর কর্তব্যের ভার চাপিয়ে দেয়া। কেননা শ্রম, বলতে গেলে, শ্রমিকের পুঁজি স্বরূপ, যেমন আমরা আহার্যের অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বর্ণনা করব। বস্তুত আহার্য ও উপার্জন, তা মানব সভ্যতার শ্রমেরই ফসল। সুতরাং তাদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম সামগ্রিকভাবে তাদের পুঁজি ও উপার্জনের ভিত্তি। এটা ব্যতীত তারা জীবিকা অর্জনে সক্ষম হয় না। যে সকল প্রজা সভ্যতা নির্মাণে তাদের শ্রম প্রদান করে, তাদের জীবিকা ও উপার্জন তারই উপর নির্ভরশীল। সুতরাং তাদেরকে যদি অন্যভাবে শ্রম দিতে বাধ্য করা হয় এবং তাদের জীবিকার ভিত্তিকে অন্যত্র নিয়োগ করা হয়, তা হলে তাদের উপার্জন হ্রাস পায় ও তারা শ্রমের বিনিময় থেকে বঞ্চিত হয়। যেহেতু এটাই তাদের পুঁজি, কাজেই এরূপ ব্যবহারের ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাদের জীবিকার একটা বিরাট অংশ নষ্ট হয়ে যায়; বরং বলা যায়, তাদের জীবিকাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। এরূপ ব্যবহার বারবার দেখা দিলে সভ্যতা বিনির্মাণে তাদের কামনা-বাসনা লোপ পায়

১৯৫. কোরান, ৪১, ৪৬; তুল, কোরান, ৩, ১৮২, ৮, ৫১; ২২, ১০; ৫০, ২৯।

এবং তারা সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা ত্যাগ করে বসে পড়ে। এতে সভ্যতার সংকোচ ও ক্ষতি সাধিত হয়। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞাতা এবং তিনিই একমাত্র সহায়।

মজুদ্দারী

জনবসতির ও সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধনে এটা থেকেও মারাত্মক ধরনের উৎপীড়ন হল মানুষের পণ্যদ্রব্য স্বল্পমূল্যে ক্রয় করে তার উপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং পুনরায় অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করে তা বিক্রয় করা। এ উভয় ক্ষেত্রে জবরদস্তি ও ডাকাতির অনুরূপ ব্যবহার প্রয়োগ করা হয়। অনেক সময় তাদেরকে সহজ কিস্তিতে ও দেরিতে মূল্য প্রদানের সুযোগ দিয়ে অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা হয়। ক্রেতারা তাদের আপাত দৃশ্যমান ক্ষতিকে এ বলে মেনে নেয় যে, হয়তো এ অধিক মূল্যে ক্রীত পণ্যদ্রব্যের বাজারে তেজীভাব দেখা দিবে এবং তারা লাভবান হতে পারবে। কিন্তু মূল্য প্রদানের জন্য তারা কম মূল্যেই পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য হয় এবং এ উভয় দিকের ক্ষতি তাদের মূলধনের উপর আঘাত হানে। কখনো এটা নগরে বসবাসকারী, সেখানে আগত ও বাজারে সর্বপ্রকার ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে সাধারণ হয়ে দেখা দেয়। ফলমূল ও খাদ্যদ্রব্যের দোকানী, এমনকি শিল্পপতিরাও যন্ত্রপাতি ও সহায়ক দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে এ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ফলে এটা সকল শ্রেণী ও স্তরে ছড়িয়ে যায় এবং ঘণ্টায় ঘণ্টায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। এটা মূলধনের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে এবং মূলধনের অভাবে বাজার থেকে বের হয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কারণ লাভের দ্বারা তার পুনঃসংস্থাপনের কোনো আশা নেই। বিভিন্ন দিক থেকে আগত ব্যবসায়ীরা এর ফলে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। সুতরাং বাজার ধ্বংস হয়ে যায় এবং প্রজাদের জীবিকা অর্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। কারণ এর অধিকাংশই ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নির্ভরশীল কাজেই বাজারের মন্দা অবস্থা তাদের জীবিকার দুরবস্থা ডেকে আনে এবং সম্রাটের রাজকোষের অবস্থাও মন্দ অথবা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ সাম্রাজ্যের মধ্যাবস্থায় এটা থেকেই তার সমৃদ্ধি আসে এবং শেষের দিকে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ধার্যকৃত শুল্ক তার স্থান পূরণ করে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এর পরিণামে সাম্রাজ্যের বিনাশ ও নাগরিক জীবনের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে। অবশ্য এরূপ ক্ষতি ধীরে ধীরে সংঘটিত হয় এবং এ জন্য তা প্রায় বোঝাই যায় না।

এ পরিণতি অনুরূপভাবে ও পর্যায়ে মানুষের সম্পদের উপর অন্যায় আধিপত্য বিস্তারের ফলে দেখা দেয়। কিন্তু এ আধিপত্য যদি সরাসরি এবং মানুষের সম্পদ, পরিবার, জীবন, গোপনীয়তা ও সম্মানের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপের ফলে বিস্তৃত হয়, তা হলে সেই মুহূর্তেই ত্রুটি ও ক্ষতি বাস্তব হয়ে ওঠে। এর ফলে ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতায় যে গোলযোগ দেখা দেয়, তা সাম্রাজ্যের আশু বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এ সকল দোষত্রুটির কারণেই ধর্মীয় বিধান অনুরূপ সমুদয় বিষয়কেই নিষিদ্ধ করেছে। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ শাস্ত্রসম্মত হলেও অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ কুক্ষিগত করার বিষয়টি সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ কেননা এর ফলে এমন সমস্ত

অবিচার সংঘটিত হয়, যা পরিণামে মানুষের জীবিকা অর্জনের পথ রুদ্ধ করে এবং সভ্যতার বিনাশ ডেকে আনে।

পাঠক, জেনে রাখুন, এ সকল উৎপীড়ন একমাত্র সাম্রাজ্য ও শাসকের অতিরিক্ত সম্পদ আহরণের লোভেই সংঘটিত হয়। কারণ তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হওয়ার ফলে তাদের ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং আইনানুগ স্বাভাবিক পদ্ধতিতে লভ্য আয়ের দ্বারা এ বিপুল ব্যয়ের সংকুলান হয় না। সুতরাং তারা নতুন নতুন ধারা ও খাত তৈরি করে তা দিয়ে অতিরিক্ত ব্যয়ের অনুপাতে রাজকোষের সঙ্গতি বাড়াতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু বিলাসব্যসন ক্রমশ বেড়ে চলে এবং সেই অনুপাতে খরচের মাত্রাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কাজেই মানুষের সম্পদ কুক্ষিগত করার প্রয়োজনও তীব্র হয়ে ওঠে। এভাবে সাম্রাজ্যের বিন্যাস মুছে শিথিল হয়ে ক্রমশ সীমা অতিক্রম করে এবং এক সময়ে তার নিদর্শনাদি মুছে ফেলার জন্য নতুন কোনো শক্তিকে বিজয়ী করে তোলে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞাতা।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যগুলোতে কী করে সম্রাটের সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় এবং তাদের অবক্ষয়ের সময় তা সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়]

জেনে রাখুন, যে কোনো সাম্রাজ্য তার প্রথম দিকে রাজশক্তির বৈভব থেকে দূরে অবস্থান করে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। কারণ তখন তার জন্য সেই গোত্রশক্তির প্রয়োজন, যা দিয়ে তার প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য পূর্ণতা লাভ করবে। বস্তুত প্রান্তরীয় জীবনবোধই গোত্রপ্রীতির পরিচয় বহন করে। তদুপরি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা যদি ধর্মীয় অনুভূতির মাধ্যমে হয়, তা হলে তাতে রাজকীয় বৈভবের চিহ্নমাত্রও থাকে না। অন্যদিকে শুধুমাত্র প্রাধান্য বিস্তারের পরাক্রমে তার প্রতিষ্ঠা হলেও, যে প্রান্তরীয় জীবনবোধ প্রাধান্য বিস্তারকে সক্রিয় করে তোলে, তার মধ্যেও রাজশক্তির বৈভব ও তার রীতি-বৈচিত্র্যের লক্ষণ দেখা যায় না। কাজেই সাম্রাজ্য যেহেতু তার উষালগ্নে প্রান্তরীয় জীবনবোধে উদ্দীপ্ত থাকে, সেজন্য তার শাসক সরল, সহজ, মানুষের নিকটবর্তী এবং অনায়াসলভ্য অবস্থায় বিরাজ করেন।

অতঃপর যখন তাঁর পরাক্রম স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পায় ও তিনি একক মর্যাদায় বিভূষিত হয়ে ওঠেন, তখন সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ পারিষদবর্গের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিভৃত আলোচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ তখন তাঁর সভাসদদের সংখ্যা বেড়েছে; সুতরাং সাধারণের সঙ্গ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলাই তাঁর জন্য প্রয়োজনীয়। এজন্য তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও সহায়কদের মধ্যে যার সম্পর্কে সন্দেহ করার কিছু থাকে, তাকে প্রবেশ দ্বার অনুমতি গ্রহণ করতে হয় এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি দ্বারদেশে একজন প্রতিহারী নিযুক্ত করেন। ইনি দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য দ্বারদেশে অবস্থানের দায়িত্ব পালন করেন।

এর পর সাম্রাজ্য যখন আরো বিস্তৃতি লাভ করে এবং তাতে রাজকীয় বৈভব ও মতাদর্শ এসে উপস্থিত হয়, তখন সম্রাটের চরিত্রও তাকেই অনুসরণ করে পরিবর্তিত হয়। এ রাজকীয় চরিত্র অদ্ভুত ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যারা তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট, তাদেরকে আচার-ব্যবহারে এ বৈশিষ্ট্যের দিকে আবশ্যকীয় সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে হয়। অনেক সময় অনেক অন্তরঙ্গ পারিষদও এ ব্যাপারে যথার্থ জ্ঞানের অভাবে ভুল করে বসে, ফলে তাকে সম্রাটের বিরাগভাজন হতে হয় এবং বিরাগের পরিমাণ বেশি হলে অনেক সময় শাস্তিও পেতে হয়। সুতরাং এ সকল আদব-কায়দার সাথে একমাত্র সম্রাটের অন্তরঙ্গ পারিষদরাই অবহিত থাকে এবং তারাই বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদেরকে সম্রাটের সমীপে আসতে বাধা দেয়। কারণ সম্রাট যাতে অসন্তুষ্ট না হন, তজ্জন্য সর্বদা তারা

সতর্ক হয়ে চলে এবং সাধারণ মানুষ যাতে সম্রাটের ক্রোধের উদ্রেক করে শাস্তিপ্রাপ্ত না হয়, সে জন্যও তারা তৎপর থাকে।

এ ক্ষেত্রে সম্রাটের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে পূর্বের প্রতিবন্ধকতা অপেক্ষা বিশিষ্ট আরো একটি প্রতিবন্ধকতা তাদের সম্মুখে দেখা দেয়। প্রথমটি ছিল সাধারণ লোককে বাধা দিয়ে শুধু বিশিষ্টদেরকে সম্রাটের সাহচর্যে অবস্থানের অনুমতি দেয়া। কিন্তু এ দ্বিতীয়টি সম্রাটের অন্তরঙ্গ পারিষদদের মধ্যেও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে বিশেষ ও সাধারণের পার্থক্য গড়ে তোলে। এ প্রথম প্রতিবন্ধকতা সাম্রাজ্যের প্রথম দিকেই কার্যকর হয়; যেমন মাবিয়া, আবদুল মালেক ও বনি উমাইয়া সম্রাটের শাসন আমলে হয়েছে। তাঁদের এ দায়িত্ব পালনে যিনি প্রতিহারীর কাজ করতেন, তাঁকে 'হাজেব' বলা হত। শব্দটি 'হেজাব' তথা বাধা প্রতিবন্ধক ইত্যাদি অর্থের যথার্থ রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে।

এর পর আব্বাসী শাসনের আরম্ভ এবং তাতে বিলাসব্যসন ও পরাক্রম নতুন রূপ লাভ করেছিল, যা অত্যন্ত সুপরিচিত। তখনই রাজকীয় বৈভবের যথাযথ আবির্ভাব ঘটে। এর ফলে সেই দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয় এবং হাজেবের নামটি এ বিশেষ প্রতিবন্ধকতার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। আব্বাসী সম্রাটদের প্রাসাদে তখন দুটি দরবারে সৃষ্টি হয়; একটি দরবারে খাস ও অন্যটি দরবারে আম, যেমন তা তাঁদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।

অতঃপর সাম্রাজ্যগুলো তৃতীয় একটি প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয়, যা প্রথম দুটি থেকেও বিশিষ্ট এবং শাসকের উপর অন্যায্য প্রভাব বিস্তারের কালে এর উদ্ভব ঘটে। সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট সভাসদরাই অল্পবয়স্ক শাসক নিযুক্ত করে এরূপ প্রভাব বিস্তারের পথ প্রশস্ত করেন। যিনি এরূপ প্রভাব বিস্তারের কাজে ব্রতী হন, তাঁর প্রথম কর্তব্য হল শাসককে তাঁর পিতার অন্তরঙ্গ পারিষদ ও সভাসদদের নিকট থেকে সরিয়ে রাখা। তিনি এরূপ করতে গিয়ে এ ধারণাই প্রকাশ করেন যে, অবাধ মেলামেশার ফলে শাসকের প্রতি ভীতির ভাব থাকবে না এবং রাজকীয় আদব-কায়দারও বিচ্যুতি ঘটবে। তার এরূপ করার যথার্থ উদ্দেশ্য হল অল্পবয়স্ক শাসককে অন্যের সাথে মিলতে না দিয়ে একমাত্র তারই স্বভাব-চরিত্রের সাথে অভ্যস্ত হতে বাধ্য করা যাতে সে অন্য কাউকেও অন্যায্য প্রভাব বিস্তারকারীর স্থলাভিষিক্ত করতে সক্ষম না হয়। এভাবে শাসকের উপর তার প্রভাব সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এটা চলতে থাকে। বস্তুত অন্যান্য প্রভাব বিস্তারের প্রয়োজনেই এ তৃতীয় প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং অধিকাংশ সময় এটা সাম্রাজ্যের শেষের দিকেই দেখা যায়; যেমন আমরা শাসকের অবরুদ্ধ অবস্থা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছি। এটা দ্বারা বোঝা যায় যে, সাম্রাজ্যে অবক্ষয় ও তার শক্তিতে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে। এটা এমন একটি ব্যাপার, যার উদ্ভবের ভয় সকল সাম্রাজ্যই করে থাকে। কেননা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শক্তিই তার অবক্ষয়ের যুগে এরূপ প্রভাব বিস্তারে অগ্রসর হয়। সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীদের প্রাধান্য বিস্তারের শক্তি লোপ পেলেই এরূপ অন্যায্য প্রভাব স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায়। কারণ সকল মানুষের মধ্যেই রাজশক্তির প্রতিপত্তি লাভ করার প্রতি আকর্ষণ বিদ্যমান। বিশেষ করে তেমন কিছু করার সুযোগ যদি দেখা দেয় এবং কার্যকারণ ও তার প্রস্তুতি যদি অনুকূল হয়।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[একটি সাম্রাজ্যের দুইভাগে বিভক্ত হওয়া]

জেনে রাখুন, সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রথম অবক্ষয়ের যে লক্ষণ দেখা দেয়, তা হল তার বিভক্ত হওয়া। এর কারণ সাম্রাজ্য যখন বিস্তৃতিলাভ করে বিলাসব্যসন ও প্রাচুর্যের চরম সীমায় উপনীত হয়, তখন সম্রাট তার সমস্ত গৌরব কুক্ষিগত করে প্রধান হয়ে ওঠেন এবং অন্য কাউকেও তার অংশীদার হতে বাধা দেন। তিনি যথাসম্ভব এরূপ অংশীদারিত্বের সম্ভাব্য কারণগুলোকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যারা এ উচ্চমর্যাদার দাবিদার হতে পারেন, তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলেন। অনেক সময় অংশীদারগণ এরূপ বিপদের আশঙ্কা করে দূরে চলে যান এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যরা গিয়ে মিলিত হন। তাঁরাও এরূপ আশঙ্কার কারণেই পলায়ন করেন। ফলে সাম্রাজ্যের শক্তি বিন্যাসের মধ্যে সংকোচের ভাব দেখা দেয়। এরূপ দূরে অবস্থানকারীরা তখন ফিরে আসেন এবং সম্রাটের আত্মীয় এ প্রত্যাবর্তনকারীরা প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। এর ফলে তাদের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং সাম্রাজ্যের শক্তি বিন্যাসের প্রতিক্রিয়া হিসাবে তা বিভক্ত বা বিভক্তির সন্নিকটবর্তী হয়ে পড়ে।

পাঠক, এ বিষয়টি ইসলামী আরবি সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে লক্ষ করুন। যখন তার অবস্থা খুবই দৃঢ় ও তার শক্তির বিন্যাস ব্যাপক বিস্তৃত ছিল এবং বনি আবদে মনাফের গোত্রপ্রীতি সমগ্র মুজারের উপর একক প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল, তখন একমাত্র খারেজীদের হাঙ্গামা ছাড়া অন্য কোনো বিরোধী বক্তব্য কোথাও দেখা যায়নি। অবশ্য খারেজীরাও তাদের অভিনব মতাদর্শের জন্যই প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল মাত্র; তাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে সাম্রাজ্য বা নেতৃত্ব লাভের কোনো প্রলোভন ছিল না। অন্যদিকে তাও বৃহৎ গোত্রপ্রীতির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি।

অতঃপর বনি উমাইয়াদের হাত থেকে রাজশক্তি অন্তর্হিত হয়ে এককভাবে বনি আব্বাসের করতলগত হলে আরবি সাম্রাজ্য বিলাসব্যসন ও প্রাধান্য বিস্তারের শেষ সীমায় পৌঁছায় এবং তখন তা দূরস্থিত অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ দান করে। এর ফলে ইসলামী সাম্রাজ্য থেকে দূরে আন্দালুসে আব্দুর রহমান আন্দাখেল প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সেখানে তিনি একটি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে এক ইসলামী সাম্রাজ্যকেই দুইভাগে ভাগ করে ফেলেন। এর পর ইদরিস মাগরিবে উপস্থিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং তাঁর প্রচারণা চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর পুত্র আরোবা, মগিলা ও জানাতা গোত্রের বারবারদের সহায়তায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন এবং দুই

মাগরিবের[১৯৬] প্রান্তসীমায় প্রভাবশালী হয়ে উঠলেন। অতঃপর এ সাম্রাজ্য আব্বাসী সাম্রাজ্যের আরো অংশ বিচ্ছিন্ন করতে অগ্রসর হল এবং বনি আগলাব তার পথে বাধা সৃষ্টি করতে তৎপরতা দেখাল। এর পরে শিয়ারা আবির্ভূত হল এবং তাদের সমর্থনে কুতামা ও সিনহাজা গোত্রদ্বয় উদ্যোগী হয়ে আফ্রিকিয়া ও মাগরিবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করল। পরে মিশর, সিরিয়া, হেজাজও তাদের দখলে এল। তারা ইদারসীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এ সাম্রাজ্যকে আরো দুটি সাম্রাজ্যে ভাগ করে ফেলল। তখন আরবি সাম্রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হল। আরবের কেন্দ্রস্থলে বনি আব্বাসের সাম্রাজ্য; তাদের মূল ভিত্তি ইসলাম। আন্দালুসে বনি উমাইয়া সাম্রাজ্য; যা তাদের পূর্বাঞ্চলীয় পুরাতন সাম্রাজ্যেরই নবায়িত রূপ। মিশর, আফ্রিকিয়া, সিরিয়া ও হেজাজে উবাইদী সাম্রাজ্য। এ তিনটি সাম্রাজ্য এক সঙ্গেই অবস্থান করেছিল। অতঃপর তারা প্রায় কাছাকাছি সময়ে বা বলতে গেলে এক সঙ্গেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

অনুরূপভাবে আব্বাসী সাম্রাজ্যও আরো বহু সাম্রাজ্যে বিভক্ত হয়েছে।[১৯৭] মাওরায়ান্নাহার ও খুরাসানে বনি সামান, দায়লাম ও তাবারিস্তানে উলুবীগণ এবং এ শেষোক্ত বংশীয়রা দায়লামীদের সাহায্যে দুই ইরাক, বাগদাদ ও তার খলিফাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর পর সলজুকীরা এসে এর সমুদয় অংশও অধিকার করে নিয়েছিল। অতঃপর তাদের সাম্রাজ্যও বিস্তৃতি লাভের অন্তে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, যেমন তাদের ইতিহাসে এটা সুপরিচিত।

পাঠক, এরূপে এ বিষয়টিকে মাগরিব ও আফ্রিকিয়ার সিনহাজা সাম্রাজ্যের বেলায় বিবেচনা করুন। তা যখন বাদিস ইবনে আল মনসুরের সময় চরম সীমায় পৌঁছল, তখন তাঁর চাচা হাম্মাদ বিদ্রোহ করে তার পশ্চিমাঞ্চলে নিজের অধীন করে ফেললেন। আউরাস পর্বতের নিকট থেকে তিলমিসান ও মালবিয়া পর্যন্ত দখল করে মাসিলার নিকটবর্তী কুতামা পর্বতে 'আলকেলআ' নির্মাণ করলেন। সেখানে অধিষ্ঠিত হয়ে তাদের কেন্দ্রস্থল তাতারী পর্বতের উপরিস্থিত 'আশির'ও অধিকার করে নিলেন। এর ফলে বাদিস বংশের সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে একটি নতুন সাম্রাজ্যের জন্ম হল এবং বাদিস বংশীয়রা কায়রোয়ান ও তার সন্নিহিত অঞ্চল দখল করে রইলেন। এভাবে তাদের অবস্থা চলবার পর উক্ত উভয় সাম্রাজ্যই ধ্বংস হয়ে গেল।

অনুরূপভাবে আল-মোহেদ সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়া খণ্ডিত করে বনি আবু হেফস আফ্রিকিয়া দখল করে বসল এবং তাদের বংশাবলির জন্য তার এ অঞ্চলে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল। অতঃপর তাদের প্রতিষ্ঠা বিস্তৃত ও তাদের প্রাধান্য বিস্তার চরম সীমায় উপনীত হল পশ্চিমাঞ্চলে তাদের বংশধরদের মধ্য থেকেই আমীর আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়া বিদ্রোহ করলেন। ইনি তাদেরই চতুর্থ সম্রাট আবু ইসহাক ইব্রাহিমের পুত্র। এর ফলে বেজা, কুসান্‌তিনা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে একটি নতুন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল এবং আমীরপুত্ররা এর উত্তরাধিকার লাভ করল। এভাবে একটি

---

১৯৬. মরক্কো ও আলজিরিয়া।

১৯৭. রোজেনথালে এর পরে দুই-তিনটি বাক্য সংযোজিত হয়েছে, যাতে বনি হামদীন, বনি উকাইল, বনি তুলুন, বনি তুগাশ প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

সাম্রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল। অতঃপর তারা তিউনিসের সবুজ সিংহাসন অধিকার করল। এর পর তাদের বংশধরদের মধ্যে আবার সাম্রাজ্য বিভক্ত হল এবং পুনরায় তাদের প্রতিপত্তি ফিরে এল।

কখনো সাম্রাজ্যের এ বিভক্তি দুই ও তিন সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে এবং তাও মূল প্রতিষ্ঠাতা বংশ ব্যতীত অন্যদের মধ্যে ঘটেছে। যেমন আন্দালুসের ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ এবং পূর্বাঞ্চলের অনারব নরপতিরা। আফ্রিকিয়ার সিনহাজাদের অবস্থাও অনুরূপ। বস্তুত তাদের সাম্রাজ্যের শেষ দিকে আফ্রিকিয়ার প্রতিটি দুর্গেই একজন করে স্বাধীন নরপতির আবির্ভাব ঘটেছিল, যেমন তার বর্ণনা পূর্বে গেছে। বর্তমানকালের[১৯৮] কিছু পূর্ণ আফ্রিকিয়ার 'যাব' ও 'জরিদ'-এর অবস্থাও এরূপই ছিল, যেমন আমরা পরে বর্ণনা করব।

প্রতিটি সাম্রাজ্যের অনুরূপ অবস্থা অবশ্যম্ভাবী। বিলাস ও স্বস্তির অমোঘ আকর্ষণে তাতে অবক্ষয়ের নানাবিধ উপকরণ এসে উপস্থিত হয় এবং তার প্রাধান্যের ছত্রচ্ছায়া খণ্ডিত হয়ে পড়তে থাকে। মূল প্রতিষ্ঠাতা বংশ অথবা যারা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম, তারাই ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নেয় এবং সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ এ পৃথিবী এবং তার উপরিস্থিত সকলের উত্তরাধিকারী।

---

১৯৮. আবুল আব্বাস কর্তৃক হেফসী সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবনের পূর্বে।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যে একবার অবক্ষয় দেখা দিলে তার আর নিবৃত্তি হয় না]

আমরা ইতিপূর্বে অবক্ষয়ের বার্তাবাহী বিভিন্ন উপাদান ও কার্যকারণ একের পর এক বর্ণনা করেছি এবং আমরা এও বলেছি যে, সাম্রাজ্যে এগুলো স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। বস্তুত এ কার্যকারণের সবগুলোই স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং অবক্ষয় যেহেতু সাম্রাজ্যের একটি স্বভাবজ পরিণতি, কাজেই তা অন্যান্য স্বাভাবিক বিষয়ের ন্যায়ই অস্তিত্বে আসবে, যেমন প্রাণিদেহের মিশ্রণের মধ্যে অবক্ষয়ের আবির্ভাব ঘটে। এ কারণে অবক্ষয় একটি অতি প্রাচীন রোগ, যার কোনো ঔষধ নেই, আরোগ্য নেই। কারণ এটা স্বভাবের সৃষ্টি এবং প্রকৃতির স্বভাবের কোনো পরিবর্তন নেই। অনেক সময় শাসন ব্যবস্থায় সচেতন বহু ব্যক্তি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এ অবক্ষয়কে বুঝতে সক্ষম হন এবং তাঁরা তার কার্যকারণগুলো দূর করা সম্ভব বলে মনে করেন। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা তার ক্ষতিপূরণ ও তার প্রকৃতিগত মিশ্রণের সংশোধন করতে সচেষ্ট হন। কারণ তারা ভাবেন যে, এগুলো তাদের পূর্ববর্তী শাসকদের ত্রুটি ও উদাসীনতার ফলেই দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। বরং এগুলো সাম্রাজ্যের জন্য প্রকৃতিদত্ত ব্যাপার এবং রাজকীয় অভ্যাসাদি এর ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক স্বরূপ। কেননা এ অভ্যাসগুলো অন্যতর প্রকৃতি স্বরূপ। যেমন কোনো শাসক তাঁর পিতা বা বংশের অন্যদেরকে রেশম ও গরদ পরতে এবং অস্ত্র ও বাহনে স্বর্ণ ব্যবহার করতে দেখেছেন। তারা মানুষকে দর্শন দানে ও তাদের সাথে নামাজ আদায়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছেন। এ অবস্থায় উক্ত শাসকের পক্ষে কি তার পূর্বসূরিদের বিরোধিতা করে পোশাক ও আসবাবপত্রে স্থূলতা এবং মানুষের সাথে মেলামেশায় মুক্ত হওয়া সম্ভব! কারণ পূর্ববর্তীদের অভ্যাসই এরূপ করতে তাকে বাধা দিবে এবং তার এরূপ আচরণকে মন্দ বলে ভাবা হবে। যদি এ বাধা অতিক্রম করেও তিনি কিছু করতে যান, তা হলে তাকে তার পাগলামি এবং অভ্যস্ত জীবনধারা থেকে হঠাৎ বের হয়ে যাওয়ার মতো হঠকারিতা বলে বিবেচনা করা হবে। এর ফলে তার নিজের পরিণতি ও সাম্রাজ্যের পরিণাম উভয়ই অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে।

পাঠক, নবীদের এ সকল অভ্যাস অস্বীকার ও তাদের বিরোধিতার বিষয়টি লক্ষ করুন। যদি তাঁদের পক্ষে ঐশী সাহায্য ও দৈবী সহায়তা না থাকত, তা হলে তাঁদের অবস্থা কী হত! অন্যদিকে অনেক সময় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোত্রপ্রীতির প্রতি সমীহের ভাব চলে গিয়ে তদস্থলে মানুষের মনে এ আড়ম্বর এসে স্থান গ্রহণ করে। সুতরাং এ

অবস্থায় উক্ত আড়ম্বরকে বিদূরিত করলে গোত্রপ্রীতির প্রতিরোধের অভাবে প্রজাদের মনোভাব সাম্রাজ্যের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠতে পারে। এ কারণে সাম্রাজ্য তার শেষ পরিণতি লাভ না করা পর্যন্ত এ আড়ম্বরকেই যতদূর সম্ভব বর্ম হিসাবে ধারণ করে থাকে।

অনেক সময় সাম্রাজ্য এর শেষ অবস্থায় একটা নতুন শক্তি লাভ করে; মনে হয় যেন তার অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে। এটা যেন নিভে যাবার পূর্বে হঠাৎ জ্বলে ওঠা। যেমন প্রদীপের শিখার বেলায় ঘটে। তাও নির্বাপণের পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ বেশিমাত্রায় আলো বিকিরণ করতে থাকে। দেখলে মনে হয়, তা যেন নতুনভাবে প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা প্রজ্জ্বলন নয়, নির্বাপণ। পাঠক, এ বিষয়টি বিবেচনা করুন এবং মহান আল্লাহ্, তাঁর সৃষ্টির জন্য যে গন্তব্য নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার রহস্য ও বিচক্ষণতা অনুধাবন করতে তৎপর হোন। 'বস্তুত প্রতিটি সময়সীমাই লিপিবদ্ধ রয়েছে।[১৯৯]

১৯৯. কোরান, ১৩, ৩৮।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[কি করে সাম্রাজ্যে ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দেয়]

জেনে রাখুন যে, রাজশক্তির ভিত্তি হল দুটি বিষয় এবং তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এদের একটি শৌর্য ও গোত্রপ্রীতি; এটাকেই সৈন্যবাহিনী বলে ব্যাখ্যা করা হয়। অন্যটি হল সম্পদ, যা এ সৈন্যবাহিনীর প্রাণশক্তি এবং রাজত্বের বিভিন্ন দরকারী অবস্থা সৃষ্টির মৌল উপাদান। কোনো সাম্রাজ্যের যখন ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দেয়, তখন এ দুটি ভিত্তিতেই তা আঘাত হেনে থাকে। আমরা প্রথমে শৌর্য ও গোত্রপ্রীতিতে ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দেয়ার কথা বর্ণনা করব এবং পরে সম্পদ ও রাজকোষে তার আবির্ভাবের কথা বলব।

জেনে রাখুন, সাম্রাজ্যের আয়োজন ও পত্তন, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি, গোত্রপ্রীতির দ্বারা সংঘটিত হয়। তার জন্য এমন একটি বৃহৎ ও ব্যাপক গোত্রপ্রীতির প্রয়োজন, যা অন্য সকল গোত্রপ্রীতিকে গ্রাস করে বেড়ে উঠবে। তাই সাম্রাজ্যাধিপতির গোত্র ও পরিবার। অতঃপর যখন রাজকীয় বিলাসবৈভবের কাল দেখা দেয় এবং গোত্রপ্রীতির অধিকারীদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকার সময় আসে, তখন সম্রাট সর্বপ্রথমে নিজের আত্মীয়-স্বজন, তারা রাজকীয় বৈভবে তাঁর অংশীদার, তাদের নিকট থেকেই দূরে সরার ব্যবস্থা করেন। সুতরাং এ ব্যাপারে তিনি তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ীই তাদের প্রতি ব্যবহার করে থাকেন। তদুপরি তাদের উপর অন্য সকলের অপেক্ষা অধিকতর বিলাসব্যসনের প্রভাব বিস্তৃত হয়; কেননা তারা রাজকীয় প্রভাব ও পরাক্রমের অধিকারী শক্তি। সুতরাং তাদেরকে ঘিরে দুটি বিধ্বংসী চরিত্র—বিলাস ও পরাক্রম বিপুল আকৃতি ধারণ করতে থাকে। পরাক্রম শেষ পর্যন্ত তাদেরকে হত্যাকাণ্ডের দিকে এগিয়ে দেয়; কারণ সম্রাটের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পর তদ্দরুন তাদের অন্তঃকরণ ইতিমধ্যে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়টি উলটে গিয়ে সম্রাটের রাজ্যনাশের ভয়কে, উসকে দেয় মাত্র। সুতরাং সম্রাট তাদেরকে হত্যা, অপমান এবং তাদের অভ্যস্ত বিলাস ও প্রাচুর্যের বিনাশ সাধন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেন। তারা ধ্বংস হয়, তাদের সংখ্যা কমে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যাধিপতির গোত্রপ্রীতির শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তা সেই গোত্রপ্রীতি, যার ব্যাপক প্রভাব সমগ্র গোত্রপ্রীতিকে গ্রাস করে বেড়ে উঠেছিল। যখন তার দৃঢ়তা বিনষ্ট হয় এবং তার শক্তিমত্তা শিথিল হয়ে পড়ে, এ সময় সম্রাট তার পরিবর্তে সম্পদের জন্য আশ্রিত ও সদাচারের উদ্দেশ্যে কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের দ্বারা নতুন গোত্রপ্রীতির শক্তি গড়ে তোলেন। কিন্তু তা পূর্বেরটির ন্যায় দৃঢ় ও সুসংবদ্ধ হয় না। কারণ তাতে রক্ত ও আত্মীয়তার বন্ধন নেই। আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে,

গোত্রপ্রীতির মহিমা আত্মীয়তা ও রক্তসম্পর্কের দ্বারা সুদৃঢ় হয়ে থাকে। কারণ এটা আল্লাহ্‌দত্ত বন্ধন। এভাবে সাম্রাজ্যাধিপতি তাঁর স্বাভাবিক গোত্রশক্তি ও সহায়তা থেকে বঞ্চিত হন।

অনুরূপভাবে অন্য গোত্রশক্তিও তাদের অন্তর্গত ঈর্ষার প্রভাবে সম্রাট ও তাঁর পারিষদের প্রতি স্বভাবদত্ত বিমুখতা প্রদর্শন করে। সম্রাট তাদেরকেও হত্যা ও বিপর্যয় সাধনের মাধ্যমে ধ্বংস করেন। একের পর এক এটা সংঘটিত হয় এবং পরবর্তী জন পূর্ববর্তীকে এ বিষয়ে অনুসরণ করে অগ্রসর হয়। অথচ এইসঙ্গে তাদের মধ্যে বিলাস-ব্যসনের ক্ষয়িষ্ণুতা দেখা দিয়েছে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং বিলাসিতা ও হত্যাকাণ্ডে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। তারা গোত্রপ্রীতির শক্তি ও শৌর্যের কথা বিস্মৃত হয়ে তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে বসে। তখন তারা খণ্ডিত শক্তি মাত্র এবং তুলনামূলকভাবে অতিশয় হীন। এর ফলে বিভিন্ন দিকে ও সীমান্ত অঞ্চলে সংরক্ষিত শক্তিতে শৈথিল্য নামে, প্রজারা বিভিন্ন অঞ্চলে রাজকীয় বৈভবের প্রতি সন্দিহান হয়ে ওঠে এবং সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোত্র ও অন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব মাথাচাড়া দিতে থাকে। কারণ তখন তারা দূরস্থিত শক্তির সাহায্যে এবং প্রতিরোধকারী শক্তির অভাবে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে বলে মনে করে। এভাবে ক্রমশ তা বৃদ্ধি পায়, রাজকীয় শক্তির বিন্যাস সংকুচিত হয়ে আসে এবং বিদ্রোহী শক্তির তৎপরতা কেন্দ্রের সন্নিকটবর্তী অঞ্চলেও পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সাম্রাজ্য কখনো দ্বিধা ও ত্রিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তার শক্তির বিন্যাস অনুসারেই এটা হয়, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। তখন সাম্রাজ্যের এ বিভক্তি ও নবপত্তনে গোত্রপ্রীতি ভিন্ন অন্য শক্তি কাজ করে। এর কারণ গোত্রপ্রীতির সেই পূর্ব প্রভাব ও প্রতিপত্তির দিকে তাদের আনুগত্য তখনো বর্তমান।

পাঠক, এ বিষয়টিকে ইসলামী যুগের আরব সাম্রাজ্যের মধ্যে বিবেচনা করুন। এটা প্রথম দিকে সুদূর আন্দালুস, হিন্দ ও চীন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তখন বনি আবদে মনাফের গোত্রপ্রীতির সহায়তায় বনি উমাইয়ার প্রভাব সমগ্র আরবে কার্যকরী ছিল। এ অবস্থায় দামেশক থেকে সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালেক কর্ডোভায় আবদুল আজিজ ইবনে মুসা নুসাইরকে হত্যার নির্দেশ দিলেন। তিনি নিহত হলেন।[২০০] সুলায়মানের নির্দেশ অমান্য করার শক্তি কারো ছিল না। কিন্তু গোত্রপ্রীতির এ দাপট বেশি দিন টিকল না। বিলাসিতা তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলল।

তাদের পরে বনি আব্বাস এল। তারা হাশেমী বংশের শক্তি খর্ব করে আবু তালেব বংশীয়দেরকে হত্যা ও নির্বাসিত করল। বনি আবদে মনাফের গোত্রপ্রীতি সংকুচিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেল। আর তখন তাদের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করল। দূরস্থিত অঞ্চলগুলোতে অবস্থানকারী শক্তি তাদের বিরোধী হয়ে উঠল। যেমন আফ্রিকিয়ায় বনি আগলাব, আন্দালুসে তার অধিবাসীরা এবং অন্যান্য শক্তি-সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়ল। এর পর মাগরিবে বনি ইদরিস দেখা দিল এবং বারবাররা তাঁদের গোত্রপ্রীতির সেই পূর্ব

২০০. ৯৭ (৭১৬ খ্রি:) হিজরিতে এ ঘটনা ঘটে।

শক্তির প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তাঁদের পক্ষাবলম্বন করল। তারা এও বুঝতে পারল যে, সাম্রাজ্যের কোনো প্রতিরোধ বা সংগ্রামী শক্তি এখানে এসে হানা দিতে পারবে না।

সাম্রাজ্যের শেষের দিকে আরো বহু শক্তি বের হয়ে পড়ল। বিভিন্ন দিকে ও দূরাঞ্চলে তাদের প্রচারণা ও রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে সাম্রাজ্যকে আরো বিভক্ত করে তুলল। এভাবে সাম্রাজ্যের শক্তি বিন্যাস খণ্ডিত হতে হতে তা কেন্দ্রে এসে পৌঁছতে থাকে। এর পর পারিষদ শক্তি ও বিলাসব্যাসনের অমোঘ বিধানে প্রথমে দুর্বল ও পরে ধ্বংস হয়ে যায় এবং খণ্ডিত সকল সাম্রাজ্যই এর ফলে দুর্বল হয়ে পড়ে।

অনেক সময় গোত্রপ্রীতির অভাব সত্ত্বেও তার স্থায়িত্ব দীর্ঘ হয়। কারণ মূল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা গোত্রপ্রীতির প্রতি মানুষের আনুগত্যের নিষ্ঠা তখনো বিদ্যমান। তা একান্তই আনুগত্য ও মান্যতার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা বহুকাল যাবত মানুষের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। তার আরম্ভ কখন কীভাবে হয়েছে, তা কেউ জানে না; সুতরাং মানুষ সাম্রাজ্যাধিপতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ব্যতীত অন্য কিছু বোঝে না। এর জন্যই গোত্রপ্রীতির সহায়তা ছাড়াই রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। রাজ্যাধিপতি তার প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে খণ্ড খণ্ড সৈন্যদল ও বেতনভোগী জনসমষ্টিকে একত্র করে কার্যোদ্ধার করেন। এর সাথে সাধারণ মানুষের মধ্যকার সেই আনুগত্যের ভাব এসে যুক্ত হয়। ফলে কারো পক্ষে তাঁর নির্দেশ অমান্য করা অথবা তাঁর বিরোধী হওয়া সম্ভব হয় না। অবশ্য অধিকাংশ মানুষ যদি তাঁর বিরোধী হয়, তাঁকে অমান্য করে, তবে অন্য কথা; এ অবস্থায় কোনো চেষ্টাই কার্যকরী হয় না। কিন্তু অনেক সময় এরূপ বিরোধিতা থাকে না; ফলে সাধারণ মানুষের আনুগত্য ও মান্যতাকে সম্বল করে এরূপ সাম্রাজ্য কলহ ও বিদ্রোহ থেকে মুক্তি লাভ করে। এর ফলে সাধারণ মানুষের মনের উপর তার প্রভাব স্থায়ী হয়ে সর্বপ্রকার বিরোধিতা ও অমান্যতার ভাব দূর করে দেয়। এভাবে সাম্রাজ্য তার প্রতিষ্ঠাতা গোত্র বা বংশ থেকে যে বিরোধিতা ও গোলযোগের সম্মুখীন হতে পারত, তা থেকেও বেঁচে থাকে। কিন্তু এ শান্ত অবস্থাতেও তার অবক্ষয় রুদ্ধ হয় না; সে নিজের মধ্যে সংকুচিত হয়ে আসতে থাকে। যেমন দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ শক্তি, খাদ্য গ্রহণ না করলে তা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কার্যকরী থেকে নিস্তেজ হয়ে আসে। 'প্রতিটি সময়সীমাই লিপিবদ্ধ রয়েছে।'[২০১] প্রতিটি সাম্রাজ্যই নির্দিষ্ট সময়সীমার অধীন। 'আল্লাহ্ দিবারাত্রি নির্ধারণ করে থাকেন।'[২০২] তিনি একক ও পরাক্রান্ত।

সম্পদের মধ্যে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়, সেই সম্পর্কে জেনে রাখুন, প্রতিটি সাম্রাজ্যই তার প্রাথমিক অবস্থায় প্রান্তরীয় জীবনবোধের অধীন থাকে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ সময়ে তা প্রজাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, মিতব্যয়ী, সম্পদের প্রতি সংযমী এবং রাজকোষের সমৃদ্ধি সম্পর্কে উদাসীন থাকে। কারণ তখনো সম্পদ সঞ্চয়ের জন্য চাতুর্য ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন দেখা দেয়নি এবং হিসাব-নিকাশের জন্য কর্মচারীর প্রয়োজনও তীব্র হয়ে ওঠেনি। যেহেতু অপব্যয় করার কোনো উপলক্ষ এসে তখনো জোটেনি, সেজন্য সম্পদের প্রাচুর্য ও সাম্রাজ্যের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু এ অবস্থা বেশি দিন থাকে না; প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে ও সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও পূর্ণতায় পৌঁছে। বিলাসব্যসন

২০১. কোরান, ১৩, ৩৮।
২০২. কোরান, ৭৩, ২০।

এসে উপস্থিত হয় এবং তার সঙ্গে ব্যয়ের প্রাচুর্যও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। শুধু সম্রাটের নিজস্ব ব্যয় নয়, সাধারণভাবে সকলের ব্যয়ই বেড়ে যায়; এমনকি এটা পল্লী অঞ্চলেও অনুপ্রবেশ করে। এর ফলে সৈন্যদলের বেতন ও অন্যান্য কর্মীদের খোরাকী বাড়িয়ে দিতে হয়। পুনরায় এ অধিক লভ্যের ফলে বিলাসব্যসন বৃদ্ধি পায় এবং তদনুযায়ী খরচের পরিমাণও বাড়ে। সাধারণ প্রজারাও এ প্রভাবের বাইরে থাকে না। কারণ মানুষ তাদের শাসকের ধর্ম ও অভ্যাস অনুকরণ করে। তখন সম্রাট বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্যের উপর শুল্ক ধার্য করতে বাধ্য হন। যাতে বিলাসের প্রয়োজন অনুসারে রাজকোষের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ ব্যাপারে নাগরিক জীবনের বিলাসবহুল সাদৃশ্যই তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। তদুপরি তাঁর শাসনব্যবস্থার খরচ ও সৈন্যদলের বেতনের জন্যও এটার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিলাসের স্রোত এটাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়; শুল্কের বাঁধ তাকে রোধ করতে পারে না। সাম্রাজ্য তখন অধীনস্থ প্রজাদের উপর হস্ত সম্প্রসারিত করতে ও প্রতিপত্তির সুযোগ নিতে উদ্যত হয়। ফলে সে প্রজাদের সম্পদ থেকে শুল্ক, ব্যবসা প্রভৃতির মাধ্যমে এবং অনেক ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার অজুহাত সৃষ্টি করে কিংবা বিনা অজুহাতেই নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে থাকে। সৈন্যদলও এ সময়ে গোত্রপ্রীতির শৈথিল্যের দরুন সাম্রাজ্যের ঘাড়ে চড়ে বসতে চায়। সুতরাং তাদের এ স্বাভাবিক অগ্রাভিযানকে অর্থের প্রতিরোধ সৃষ্টি করে বাধা দিতে হয়। তাদের প্রাপ্য ও পুরস্কারের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং এটা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। এ অবস্থায় কর আদায়কারীরাও প্রভূত সম্পদের অধিকারী হয়ে ওঠে। কারণ রাজকোষের প্রাচুর্যের সমস্ত অর্থই তাদের হাত দিয়ে আসে। এর ফলে তাদের প্রতিপত্তি বেড়ে যায় এবং রাজকোষের উপর তার প্রভাব বিস্তার করে তারা সম্পদ হস্তগত করে। অন্যদিকে সম্পদ সংগ্রহের এ প্রতিযোগিতা ও প্রতিহিংসায় তাদের মধ্যে নিন্দার চর্চা হতে থাকে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে তারা পরস্পরের জন্য দুর্নাম ও দুষ্কৃতি ডেকে এনে একে একে সকলেই নিঃস্বতা ও দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। ফলে তাদের দ্বারা সাম্রাজ্যের যে আড়ম্বর ও শোভা বৃদ্ধি পেয়েছিল, তা লোপ পায়। তাদের সম্পদ গ্রাস করে সাম্রাজ্য তখন ধনাঢ্য অন্য প্রজাদের দিকে হাত বাড়ায়। অন্যদিকে সাম্রাজ্যের শৌর্যবীর্য তখন আরো শিথিল হয়ে পড়েছে এবং এ অন্যায্য হস্তক্ষেপ ও প্রতিপত্তিই তাকে দুর্বল করে ফেলেছে। রাজ্যাধিপতির তখন শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় অর্থ ব্যয়ের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তখন এ অর্থই তরবারীর শক্তি অপেক্ষা অধিকতর কার্যকর। সুতরাং শাসন খরচের জন্য, সৈন্যদলের প্রাপ্যাদি মিটানোর জন্য তাঁর অর্থের প্রয়োজন আরো বেড়ে চলে; কিন্তু কিছুতেই সংকুলান হয় না। সাম্রাজ্যের অবক্ষয় মূর্তিমান হয়ে ওঠে এবং সীমান্ত অঞ্চলে বিদ্রোহের ধ্বজা আন্দোলিত হতে আরম্ভ করে। সাম্রাজ্য তখন সর্বক্ষেত্রেই তার দৃঢ়তাকে হারিয়ে ক্রমশ ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলে। যে কোনো ভাগ্যান্বেষীরই তা তখন চারণভূমি এবং যে কোনো শক্তিমান তা প্রতিষ্ঠাতাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম। অবশ্য তখনো এটা হঠাৎ প্রতিরোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে পারে; কিন্তু তা তৈলহীন প্রদীপের সলিতা, নেভার পূর্বে জ্বলে ওঠে মাত্র। আল্লাহ্ সকল বিষয়ের অধিকারী এবং সকল বস্তুর ব্যবস্থাকারী। তিনি ভিন্ন অন্য উপাস্য নেই।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[প্রতিটি সাম্রাজ্য প্রথমে তার সীমা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিস্তৃত হয় এবং পরে পর্যায়ক্রমে সংকুচিত হয়ে বিনাশ ও ধ্বংস হয়ে যায়[২০৩]]

ইতিপূর্বে এ তৃতীয় অধ্যায়েরই খেলাফত ও রাজশক্তি সম্পর্কীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রতি সাম্রাজ্যের জন্যই দেশ ও অঞ্চলের এমন একটি নির্দিষ্ট ভাগ আছে, যার বেশি হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। পাঠক, এ বিষয়টিকে আপনি সাম্রাজ্যের গোত্রশক্তির বিভিন্ন দিক ও অঞ্চলের উপর সহায়ক হিসাবে অবস্থানের অনুপাতে বিবেচনা করতে পারেন। সুতরাং তা পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত হয়ে যেখানে শেষ হবে, সেখানেই ঐ সাম্রাজ্যের সীমান্ত এবং তা চক্রাকারে সাম্রাজ্যকে বেষ্টন করে থাকবে। কখনো এ সীমা প্রথম সাম্রাজ্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শক্তি আরো ব্যাপক হলে পূর্বাপেক্ষা সীমান্ত বিস্তৃততর হয়ে দেখা দেয়। এ সকল অবস্থা অবশ্য তখনই সম্ভব হয়, যখন সাম্রাজ্য প্রান্তরীয় জীবনবোধ সরল ও শৌর্যবীর্যে স্থূল হয়।

অতঃপর যখন পরাক্রম ও প্রাধান্য বিস্তৃত হয়, রাজকোষের সমৃদ্ধির ফলে সম্পদ ও সম্ভোগের প্রাচুর্য দেখা দেয় এবং বিলাসিতা ও নাগরিকতার সমুদ্র উথলিয়ে ওঠে, তখন পুরুষ পরম্পরায় তার মধ্যে লালিত-পালিত হওয়ার ফলে সহায়ক শক্তির চরিত্র কোমল ও পারিষদবর্গের মনোভাব আয়েশী হয়ে ওঠে। এর অমোঘ আকর্ষণে তাদের স্বভাবে ভীরুতা ও আলস্য জন্ম নেয়। কারণ তারা নাগরিক জীবনের নমনীয়তা অবলম্বন করে এবং প্রান্তরীয় জীবনের সারল্য ও স্থূলতা থেকে দূরে সরে গিয়ে পরাক্রম ও পৌরুষের সকল চিহ্ন অবলুপ্ত করে ফেলে। তারা তখন নেতৃত্বের স্থায়িত্ব ও তার আধিপত্য নিয়ে কলহে প্রবৃত্ত হয়। পরিণামে তারা একে অপরের দ্বারা নিহত হয়। সম্রাটও তাদের এ হানাহানি থামাতে গিয়ে তাদের নেতৃস্থানীয় বয়োবৃদ্ধদেরকে হত্যা করেন। এর ফলে নেতা ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অভাব দেখা দিয়ে শুধু অনুগত ও অধীনস্থদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। সাম্রাজ্যের তেজবীর্য ও সামর্থ্যের এতে ক্ষতি হয় এবং এভাবে সাম্রাজ্যে প্রথম ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দেয়। এটা প্রকৃত প্রস্তাবে সাম্রাজ্যের সহায়ক শক্তি ও সৈন্যদলেরই ত্রুটি, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এর সাথে রাজকীয় পরাক্রমের যোগ্য আড়ম্বরের জন্য অপব্যয়ও এসে যোগ দেয়। আহার্য, পোশাক, প্রাসাদ নির্মাণ, অস্ত্রশস্ত্রের নবায়ন ও অশ্বাদির প্রশিক্ষণের মধ্যে

---

২০৩. আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে এ পরিচ্ছেদটি সংখ্যাবিহীন অবস্থায় বিদ্যমান। যতদূর মনে হয়, এটা পরবর্তীকালের সংযোজন। আমরা গ্রন্থের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য অত্র পরিচ্ছেদটিকে সংখ্যায়িত করলাম, এর ফলে মূল অপেক্ষা পরিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল।

আতিশয্যের সৃষ্টি করে জাঁকজমক সীমা অতিক্রম করে। রাজকোষের আয়-ব্যায়ের সাথে তাল মেলাতে পারে না। সাম্রাজ্যে দ্বিতীয় ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা দেয়। এটা মূলত সম্পদ ও রাজকোষ সম্পর্কীয় ত্রুটি। এ দুটি ত্রুটির ফলে সাম্রাজ্যে দুর্বলতা ও সংকোচের প্রসার ঘটে। কখনো সাম্রাজ্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। এর ফলে তারা বিবাদকারী প্রতিবেশীদের সাথে এঁটে উঠতে ও প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় না; অনেক সময় বিভিন্ন দিকের ও সীমান্তের নেতৃবৃন্দ সাম্রাজ্যের দুর্বলতা অনুভব করে তাদের অধীনস্থ এলাকায় প্রাধান্য বিস্তার ও স্বাধীন হবার চেষ্টা করে। সাম্রাজ্যাধিপতির পক্ষে তাদেরকে আয়ত্তে আনা সম্ভব হয় না। ফলে সাম্রাজ্যের প্রাথমিক বিন্যাস যে সীমায় পৌঁছেছিল, তা থেকে সংকোচন দেখা দেয়। সুতরাং সাম্রাজ্য তার সামর্থ্যানুসারে পুনরায় শক্তির বিন্যাস করে সীমান্ত স্থাপন করে। অতঃপর এ দ্বিতীয় সীমান্ত বেষ্টনীতেও প্রথমটির ন্যায় গোত্রশক্তির দুর্বলতা ও আলস্য এবং সম্পদ ও রাজকোষের অসঙ্গতি দেখা দেয়। সুতরাং সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শক্তি তার অনুসৃত সৈন্য, সম্পদ ও শাসক সম্পর্কীয় রীতিনীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। যাতে তার আয়, ব্যয়, সহায়ক শক্তি, অঞ্চল/বিভাগ ও রাজকোষের সঙ্গতি অনুসারে প্রাপ্যাদি বণ্টনের মাধ্যমে একটা স্থায়ী অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে সকল বিষয়ই সাম্রাজ্যের পূর্বাবস্থায় লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনুমান ও বিবেচনা করা হয়।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও চারদিক থেকে অসুবিধা দেখা দিতে থাকে। এর ফলে পরবর্তী এ পর্যায়ে তাই দেখা দেয়, যা এর পূর্ববর্তী পর্যায়ে দেখা গিয়েছিল। সাম্রাজ্যাধিপতি পূর্বসূরির ন্যায় আবার বিবেচনা করতে বসেন এবং প্রথমটির পরিমাপ অনুসারে দ্বিতীয়টির সমুদয় অবস্থাকে জরিপ করেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রতিটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার ইচ্ছা করেন এবং তদনুসারে চতুর্দিকের অবস্থার পরিবর্তন করেন। ফলে সাম্রাজ্যশক্তির বিন্যাস পূর্বাপেক্ষা ভিন্নতর আকার ধারণ করে। কিন্তু এতেও পূর্ববর্তীটির ন্যায় অবস্থা দেখা দেয়। এভাবে তারা তাদের পূর্ববর্তী রীতিনীতি পরিবর্তন করতে থাকেন। ফলত তারা যেন নতুন সাম্রাজ্য ও ভিন্ন রাজশক্তির জন্ম দেন। অতঃপর একসময়ে তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে এবং তার পার্শ্ববর্তী জাতিগুলো তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে নতুন সাম্রাজ্যের পত্তন করে। তার উপরেও তাই আপতিত হয়, যা আল্লাহ্ নির্ধারিত করে রেখেছেন।

পাঠক, ইসলামী সাম্রাজ্যগুলোতে এ বিষয়টিকে বিবেচনা করুন। তার শক্তি বিন্যাস বিজয়াভিযান ও বিভিন্ন জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে কীভাবে বিস্তৃত হয়েছিল! অতঃপর সহায়ক শক্তি বেড়ে গেল এবং প্রাপ্য ও প্রাচুর্যের কল্যাণে তাদের সংখ্যা বহুগুণিত হয়ে উঠল। বনি উমাইয়ার কাল শেষ হয়ে বনি আব্বাসের যুগ দেখা দিল। এ সময়ে বিলাসব্যসন বাড়ল নাগরিক জীবন বাস্তব হয়ে উঠল এবং এদের আকর্ষণে ত্রুটিবিচ্যুতি উপস্থিত হল। সুতরাং শক্তির বিন্যাস আন্দালুস ও মাগরিবের দিক থেকে সংকুচিত হয়ে এল। সেখানে যথাক্রমে উমাইয়া মারোয়ান বংশীয় এবং আলী বংশীয়দের রাজ্য স্থাপিত হয়ে এ দুই সীমান্ত সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পরে সম্রাট হারুনুর রশীদের সন্তানদের মধ্যে কলহ দেখা দিল এবং চারদিকে আলী বংশীয়

রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবিতে প্রচারণা চলল ও রাজ্যও প্রতিষ্ঠিত হল। সম্রাট আল-মুতাওয়াক্কিল নিহত হলেন। আমীররা খলিফাদের উপর অন্যায্য প্রভাব বিস্তার করে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখল। বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকরা নিজ নিজ স্থানে স্বাধীন হয়ে উঠতে লাগল। ঐ সকল অঞ্চলের রাজস্ব বন্ধ হল; কিন্তু বিলাসের স্রোতে ভাঁটা পড়ল না। এর পর আল মুতাজিদ এসে শাসন ব্যবস্থার রীতিনীতি পরিবর্তন করলেন এবং যে সকল অঞ্চল অন্যায্য প্রভাবের অধীনে চলে গিয়েছিল তাদেরকে ত্যাগ করলেন। যেমন মাওরায়ান্নাহারে বনি সামান, ইরাক ও খুরাসানে বনি তাহের, সিন্ধু ও পারস্যে বনি সাফফার, মিশরে বনি তুলুন এবং আফ্রিকিয়ায় বনি আগলাব। এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে একসময়ে আরবীয় শক্তি শেষ হল এবং অনারব শক্তির প্রাধান্য দেখা দিল। বনি বুয়া ও দায়লামীরা ইসলামী সাম্রাজ্য কুক্ষিগত করে খলিফাদেরকে অবরুদ্ধ করল। মাওরায়ান্নাহারে বনি সামানের অধিকার পূর্ববৎ চলতে লাগল। ফাতেমী বংশীয়রা মাগরিব থেকে মিশর ও সিরিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে তা দখল করে নিলেন। এর পর তুর্কিদের মধ্য থেকে সলজুকীরা অগ্রসর হয়ে ইসলামী রাজ্যগুলো দখল করল এবং খলিফারা পূর্ববৎ অবরুদ্ধ অবস্থায় পড়ে রইলেন। এক সময়ে তাঁদের এ সীমাবদ্ধ সাম্রাজ্যও বিলুপ্ত হল।

সম্রাট আন্‌নাসেরের[২০৪] সময় থেকে অন্যায্য প্রভাবের বিস্তৃতির ফলে খলিফাগণ চন্দ্রবেষ্টনী অপেক্ষাও সংকীর্ণতর একটি অঞ্চলে তাঁদের আধিপত্য রেখেছিলেন। তা ইস্পাহান পর্যন্ত আরবীয় ইরাক, পারস্য ও বাহরাইন। এভাবে কিছুকাল চলার পর খেলাফতের বিষয়টি হালাকু ইবনে তুলী ইবনে দুশী খানের হাতে নিশ্চিহ্ন হল। মোঙ্গল ও তাতারীদের এ সম্রাট সলজুকীদের নিকট থেকে ইসলামী রাজ্যগুলো দখল করে নিলেন।

এভাবে প্রতিটি সাম্রাজ্যই শক্তির বিন্যাসের দিক থেকে তার পূর্ববর্তীটি অপেক্ষা সংকীর্ণতর হয়ে দেখা দেয়। পর্যায়ক্রমে এদের এ সংকোচন এক সময়ে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যায়। পাঠক, প্রতিটি সাম্রাজ্যে, তা বৃহৎ হোক বা ক্ষুদ্র হোক, এ বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন। সাম্রাজ্যগুলো সম্পর্কে এটাই আল্লাহ্‌র প্রথা যতক্ষণ না তাঁর দ্বারা নির্ধারিত স্বাভাবিক বিলুপ্তির কাল এসে পৌঁছায়। তাঁর মুখচ্ছবি ব্যতীত সমুদয় বস্তু নশ্বর।'[২০৫]

২০৪. আব্বাসী সম্রাট, শাসনকাল ১১৮০-১২২৫ খ্রি:।
২০৫. কোরান, ২৮, ৮৮।

ঊনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যের নবায়ন ও নবপ্রতিষ্ঠা কী করে ঘটে]

জেনে রাখুন, যে কোনো সাম্রাজ্য যখন অবক্ষয় ও বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়, তখন তাতে নতুন সাম্রাজ্যের জন্ম ও পত্তন দুইভাবে হতে পারে।

সাম্রাজ্যের দূরস্থিত অঞ্চলগুলোতে নিয়োজিত কর্মচারীরা তার ছত্রচ্ছায়া খণ্ডিত করে নিজ নিজ এলাকায় অন্যায্য প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের প্রত্যেকে একটি পৃথক রাজ্যের অধিকারী হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে তার জাতির শক্তি ও প্রাধান্য অনুসারে তার প্রতিষ্ঠা নির্ধারিত হয় এবং তার সন্তান-সন্ততি ও আশ্রিতপোষ্যরা তার উত্তরাধিকার লাভ করে থাকে। এরূপ রাজশক্তি উত্থান ক্রমান্বয়ে প্রচেষ্টার ফলে সংঘটিত হয়। কখনো এ প্রচেষ্টার সময় আরো প্রতিযোগী এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে টানাটানি করে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় কলহে প্রবৃত্ত হয়। এক্ষেত্রে তারই জয় হয়, যার হাতে তদীয় সাথী অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা বিদ্যমান এবং পরিণামে সে সঙ্গীকে পরাস্ত করে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম। যেমন আব্বাসী সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের যুগে দেখা গেছে। তাঁদের ছত্রচ্ছায়া দূরস্থিত অঞ্চলগুলোতে খণ্ডিত হয়ে পড়ায় বনি সামান মাওরায়ান্নাহারে, বনি হামদান মোশেল ও সিরিয়ায় ও বনি তুলুন মিশরে অন্যায্য প্রভাব বিস্তার করে বসল। আন্দালুসের উমাইয়া সাম্রাজ্যেও অনুরূপ অবস্থা দেখা দিয়েছিল। তাদের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োজিত কর্মচারীরাই ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ হয়ে বসল। তারা সাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড করে বহু রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল এবং তাদের পরে তাদের আত্মীয়-স্বজন ও আশ্রিতরা তার উত্তরাধিকার লাভ করল।

এরূপ প্রাধান্য বিস্তারে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যশক্তি ও নবোত্থিত রাজশক্তির মধ্যে কোনোপ্রকার যুদ্ধ বিগ্রহ হয় না। কারণ সাম্রাজ্যাধিপতিরা নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকেন; তাদের এ অধিকার কেড়ে নেবার জন্য কোনো শক্তি অগ্রসর হয় না। এটা কেবলমাত্র সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের দরুন তাঁদের ছত্রচ্ছায়া খণ্ডিত হয়ে পড়ে এবং এটা প্রতিরোধ করতে তাঁরা অসমর্থ হন।

দ্বিতীয় পন্থাটি হল, প্রতিবেশী কোনো জাতি বা গোত্র সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে তারা কোনোপ্রকার মতবাদ প্রচার করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, যেমন আমরা পূর্বে তৎপ্রতি ইঙ্গিত করেছি; অথবা এমন কোনো শৌর্য ও গোত্রপ্রীতি, যা ব্যাপকতায় তার গোত্রান্তর্গত প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী করে রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর করে দেয়। কখনো এটা প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে কেন্দ্র করে আবির্ভূত হয় এবং সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ী অবস্থা তাদের প্রাধান্য বিস্তারকে নিশ্চিত করে তোলে। তাদের দাবি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তারা সংগ্রাম করে এবং পরিণামে জয়ী হয়ে তেমনভাবে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়, যেমন সাধারণত হয়ে থাকে।[২০৬] পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা।

---

২০৬. রোজেনথালে এ অনুচ্ছেদটির পরে—'সবুক্তগীন ও তাঁর বংশধরের সাথে সলজুকীদের এবং আল-মোহেদদের সাথে মারিনী সম্রাটদের অনুরূপ অবস্থাই ঘটেছিল।'—বিদ্যমান।

পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[নবোত্থিত রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে অধ্যবসায়ের পরিচয় দেয়; হঠাৎ আক্রমণ করে না]

আমরা বর্ণনা করেছি যে, নবোত্থিত ও নবায়িত এ সাম্রাজ্য দুই প্রকারের হয়ে থাকে। একটি বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকদের দ্বারা; যখন সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়া তাদের উপর খণ্ডিত হয়ে পড়ে এবং তার শক্তি সংকুচিত হয়ে আসে, তখন এটা দেখা দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের দিক থেকে এ ব্যাপারে কোনো দাবি উত্থাপিত হয় না, যেমন আমরা বর্ণনা করেছি। কারণ যা তাদের হাতে আছে, তাতেই তারা সন্তুষ্ট এবং সেই অনুপাতেই তাদের শক্তি সীমাবদ্ধ থাকে। অন্যটি সাম্রাজ্যের প্রতি আহ্বানকারী ও বিদ্রোহী জনগোষ্ঠীর দ্বারা সম্পন্ন হয়। তারা এর দাবি উত্থাপন করে। কারণ এজন্য প্রয়োজনীয় শক্তি তাদের অধিকারে আছে। অবশ্য এও তাদের গোত্রপ্রীতি ও শৌর্যশক্তির বৈশিষ্ট্য অনুসারে দাবির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও কার্যকর হতে হয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য ও তাদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে যুদ্ধবিগ্রহ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এক সময়ে এগুলোর ফলাফল একত্র হয়ে তাদের প্রাধান্য ও জয়কে সম্ভব করে তোলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হঠাৎ আক্রমণ করে তারা জয়ী হয় না। এর কারণ, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, যুদ্ধের জয়-পরাজয় কতকগুলো কাল্পনিক আধিদৈবিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল। যদিও জনসংখ্যা, অস্ত্রবল ও পরিচালননিষ্ঠা বিজয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে, তথাপি এ সকল কাল্পনিক বিষয়াদি ব্যতীত তাও কার্যকর হয় না, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে এজন্যই যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা উপকারী ও সর্বাধিক ফলপ্রসূ কৌশল হল প্রতারণা। হাদিসে আছে যুদ্ধ প্রতারণা মাত্র।[২০৭]

প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যের অভ্যস্ত মনোভাব, যা একান্ত জরুরি ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দেয়, যেমন একাধিক স্থানে উল্লেখিত হয়েছে, তাই নবোত্থিত রাজশক্তির পথে বাধার সৃষ্টি করে এবং তার প্রভাবে তাদের অনুসারী ও অনুগামীদের শৌর্যেবীর্যে শৈথিল্য নেমে আসে। তার যদি সম্রাটের অন্তরঙ্গ পারিষদবর্গের অন্তর্গত এবং তাঁর আনুগত্য ও সহায়তার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়, তথাপি এর অন্যথা হয় না। সুতরাং অন্যদের ক্ষেত্রে এটা আরো বেশি করে দেখা দেয় এবং যেহেতু তাদের মধ্যে সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের এ বদ্ধমূল বিশ্বাসের ফলে শৈথিল্য দেখা দেয়, সুতরাং তারা ত্রুটি-বিচ্যুতির অধীন না হয়ে পারে না। এ কারণেই দেখা যায় নবোত্থিত রাজশক্তির

---

২০৭. ৩১৯ পৃ. দ্র.।

প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। এর ফলে তাদেরকে ধৈর্য ও প্রতীক্ষার দ্বারস্থ হয়ে সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের বহিঃপ্রকাশকে স্পষ্টতর হবার সুযোগ দিতে হয়। এর ফলে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যের মধ্যে শৈথিল্য আসে এবং নবোত্থিত রাজশক্তি তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার যথার্থ কার্যক্রম গ্রহণ করে। পরিণামে বিজয় ও প্রাধান্য তাদের করতলগত হয়।

এতদ্ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য অধিকতর ঐশ্বর্যের অধিকারী। এটা তাদের প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি ও ব্যাপক সুখ-সম্ভোগের ফসল। বিশেষভাবে তারা রাজকোষের সম্পদের সহায়তা গ্রহণ করেছে এবং তন্নিমিত্ত তাদের আয়ত্তে প্রশিক্ষিত অশ্বারোহী দল ও নবায়িত অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য দেখা দিয়েছে। তাদের রাজকীয় বৈভব তা দিয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তাদের ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় দান-ধ্যানাদি এমন বিপুল আকার ধারণ করেছে, যা দিয়ে তারা শত্রুদেরকে সন্ত্রস্ত করে তুলতে সমর্থ হয়। নবোত্থিত রাজশক্তির এসব কিছুই নেই। তারা তখনো প্রান্তরীয় জীবনবোধ, দারিদ্র্য ও অস্বচ্ছলতার অধীন। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের উল্লেখিত অবস্থা তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে এবং তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে ইতস্তত করতে থাকে। এজন্যই তাদের পক্ষে দীর্ঘসূত্রতার প্রয়োজন, যাতে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের অবক্ষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তার গোত্রশক্তি ও রাজকোষের ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃঢ়মূল হয়ে দাঁড়ায়। কেবল তখনই মাত্র নবোত্থিত রাজশক্তি তার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দীর্ঘদিনের অধিকার চেতনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। এটাই বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রথা।

অন্যদিকে নবোত্থিত রাজশক্তির প্রায় সকলেই প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনকারী। তাদের বংশধারা, অভ্যাস ও চরিত্র এটাকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তারা এর গৌরবের অংশীদার এবং এর উপর যথার্থ অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে এর সহায়তা পরিত্যাগকারী। এ কারণে তাদের উভয় শক্তির মধ্যে প্রকাশ্যে ও গোপনে একটি ব্যবধানের সৃষ্টি হতে থাকে। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের কোনো সংবাদ নবোত্থিত রাজশক্তির জন্য সহজলভ্য হয়ে ওঠে না। প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো দিক থেকেই তাদের মধ্যকার পরস্পরের পরিচয় লাভের সুযোগ থাকে না। এরূপ বিচ্ছিন্নতার জন্য তারা অধিকার দাবি করলেও একটা ইতস্তত ভাবের মধ্যে বিরাজ করে এবং হঠাৎ আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকে। যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের সময়সীমা শেষ হয়ে আসে এবং সবদিক থেকে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি পূর্ণতা লাভ করে, ততক্ষণ তারা অপেক্ষা করে। কেননা কেবল তখনি নবোত্থিত রাজশক্তির জন্য প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও বিলুপ্তির পূর্ণজ্ঞান লাভ সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে এর বিভিন্ন দিক ও অঞ্চল অন্যদের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার ফলে তাদের শক্তিও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এ সময়ে তাদের শক্তি কেন্দ্রীভূত আকাঙ্ক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হতে পারে। কারণ তখন তাদের ধারণার সেই ইতস্তত ভাব আর নেই। তাদের প্রতীক্ষা তার সীমায় পৌঁছেছে। কাজেই সক্রিয়তা তখন বিজয়ের অনুসারী।

পাঠক, এটাকে আব্বাসী সাম্রাজ্যের মধ্যে তুলনা করুন। তার আবির্ভাবকালে শিয়ারা দাবি উত্থাপন করেও দশ বছর কিংবা তারও অধিককাল খুরাসানে অবস্থান

করেছিল এবং নিজেদেরকে সংঘবদ্ধ করার কাজে ব্যাপৃত ছিল। কেবল এ অপেক্ষার পরই তাদের জন্য প্রস্তুতি শেষ হয়ে উমাইয়াদের উপর বিজয় লাভের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

অনুরূপভাবে তাবারিস্তানের উলুবীদের অবস্থা; তারাও দায়লামে তাদের দাবি প্রচার করতে আরম্ভ করে। অতঃপর দীর্ঘদিন প্রতীক্ষার পর এ অঞ্চলে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার উলুবীদের ক্ষমতা অন্তর্হিত হলে দায়লামীরা পারস্য ও দুই ইরাকের রাজশক্তি লাভ করে। এর পর তারাও দীর্ঘদিন প্রতীক্ষা করে এবং ইস্পাহানের বিচ্ছিন্নতার পর বাগদাদের খলিফার উপর তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এরূপ উবাইদী সম্রাটরাও। তাদের দাবি উত্থাপনকারী মাগরিবের আবু আব্দুল্লাহ আশ্‌শিয়ী বারবার গোত্র কুতামার মধ্যে দশ বছর কিংবা তারও অধিককাল প্রতীক্ষা করে অতঃপর আফ্রিকিয়া বনি আগলাবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হন এবং সমগ্র মাগরিবের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। অতঃপর তারা মিশর অধিকারে উদ্যোগী হন। কিন্তু তজ্জন্য ত্রিশ বছর অথবা অনুরূপ দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়। ইতিমধ্যে তার উদ্দেশ্যে সৈন্যদল ও রণতরী প্রেরণ অব্যাহত রাখেন। তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য বাগদাদ ও সিরিয়া থেকে জলে-স্থলে সাহায্য এসে পৌঁছত। তারা আলেকজান্দ্রিয়া, ফাইয়ুম ও সাইদ অধিকার করেন। তাদের দাবি অতঃপর হেজাজের দিকে প্রভাবিত হয় এবং মক্কা ও মদিনা দখলে আসে। এর পর তাদের সেনাপতি জওহর আল কাতেব সসৈন্যে মিশর নগরীতে অবতীর্ণ হন এবং তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেন। তিনি বনি তুগেজের সাম্রাজ্য শক্তি সমূলে উৎপাটিত করেন এবং কায়রো নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সম্রাট আল মুয়েজ্জুলেদীনেল্লাহ্ অতঃপর আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের প্রায় ষাট বছর পরে মিশরে এসে অবতীর্ণ হন।

অনুরূপভাবে তুর্কি রাজন্যবর্গ সলজুকীরা যখন বনি সামানের উপর প্রাধান্য বিস্তার করল এবং মাওরায়ান্নাহার অতিক্রম করে এল, তখনও তাদেরকে খুরাসানের বনি সবুক্তগীন সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য ত্রিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।[২০৮] এর পর অনেক দিনের ব্যবধানে তারা বাগদাদে অভিযান পরিচালনা করে এবং তা অধিকার করে খলিফাকে তাদের কুক্ষিগত করে নেয়।

এরূপ তাতারীরাও তাদের পরে প্রান্তর হতে ছয়শ সতের হিজরিতে বের হতে আরম্ভ করে; কিন্তু তাদের প্রাধান্য বিস্তার চল্লিশ বছরের প্রচেষ্টার পরে সম্পূর্ণতা লাভ করে।

অপরূপ মাগরিবের অধিবাসীরা। লামতুনা গোত্রের আল মোরাবেতীরা মেগরাওয়া সম্রাটদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয় এবং পরে তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এর পর আল-মোহেদরা লামতুনাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয় এবং দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বছর যুদ্ধ-বিগ্রহের পর তাদের রাজধানী মারাকেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

---

২০৮. সুলতান মাহমুদের পুত্র প্রথম মাসউদের সময় ৪৩১ (১০৪০ খ্রি:) হিজরিতে ঘটে।

অনুরূপভাবে জানাতী গোত্রের বনি মারিন আল-মোহেদদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় এবং প্রায় ত্রিশ বছরের যুদ্ধ-বিগ্রহের পর তারা ফাস অধিকার করে তাকে তাদের সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। অতঃপর আরো ত্রিশ বছর যুদ্ধাদি পরিচালনার পর তাদের রাজধানী মারাকেশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। আমরা এ সকল বিষয় সম্পর্কে উক্ত সাম্রাজ্যগুলোর ইতিহাসে বর্ণনা করব। নবোত্থিত রাজশক্তিগুলোকে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি ও তা বাস্তবায়নের জন্য অনুরূপভাবে অপেক্ষা করতে হয়। এটাই বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রথা এবং তুমি আল্লাহ্‌র প্রথার কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না।[২০৯]

ইসলামের বিজয়াভিযানে যা সংঘটিত হয়েছে, তা দিয়ে এ বক্তব্যের উপর আপত্তি উত্থাপন করা যায় না যে, তারা কীভাবে হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর তিরোধানের তিন কি চার বছরের মধ্যে পারস্য ও রোমের উপর আধিপত্য বিস্তার করল! পাঠক, জেনে রাখুন, এও আমাদের নবী (সঃ)-এর অলৌকিক কার্যাবলির অন্যতম। এর রহস্য হল, বিশ্বাসের অমোঘ আকর্ষণে মুসলমানরা শত্রুর বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে মৃত্যুপণ করে নেমেছিল এবং আল্লাহ্ তাদের শত্রুদের হৃদয়ে ভীতি ও হীনমন্যতা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং এ সকলই নবোত্থিত রাজশক্তির পক্ষে প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতীক্ষার স্বাভাবিক রীতির বিপরীত ছিল। যেহেতু এটা স্বভাবের বিপরীত, সেজন্য এটা অবশ্যই আমাদের নবী (সঃ)-এর অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের অন্তর্গত; ইসলামী জাতীয়তা প্রতিষ্ঠায় যার বহিঃপ্রকাশ সকলের নিকট সুপরিচিত। অলৌকিক ক্রিয়াদির সাথে স্বাভাবিক বিষয়বস্তুকে তুলনা করা যায় না এবং তার দ্বারা আপত্তি উত্থাপনও সমীচীন নয়। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা এবং তিনিই একমাত্র সহায়।

---

২০৯. কোরান, ৩৩, ৬২; ৩৫, ৪৩; ৪৮, ২৩।

একপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্যের শেষের দিকে জনবসতির প্রাচুর্য এবং অধিকমাত্রায় মহামারী ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়]

জেনে রাখুন, ইতিপূর্বে এ বর্ণনা আপনার সম্মুখে এসেছে যে, সাম্রাজ্য তার প্রথম দিকে অবশ্যই রাজকীয় শক্তিতে অমায়িক ও শাসন ব্যবস্থায় ন্যায়ানুগ হয়ে থাকে। এটা ধর্মের কারণে হতে পারে; যদি তার প্রতিষ্ঠার প্রচারণা ধর্মীয় হয়। অথবা সাধারণ সদাচার ও সৎগুণের জন্যও হতে পারে; যেহেতু সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক প্রান্তরীয় জীবনবোধ এটাই কামনা করে। সুতরাং রাজশক্তি বন্ধুভাবাপন্ন সদাচারী হলে প্রজাদের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং তারা জনবসতি বৃদ্ধির উপাদান ও কার্যকারণ অনায়াসে অনুসন্ধান করে। এর ফলে তা পূর্ণতা লাভ করে ও বংশধারা বেড়ে যায়।

যেহেতু এর সমস্ত কিছুই ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়, সেজন্য এর প্রভাব কমপক্ষে এক পুরুষ অথবা দুই পুরুষ পরে দর্শনীয় হয়ে থাকে। দুই পুরুষ পরে প্রতিটি সাম্রাজ্য তার স্বাভাবিক বয়ঃক্রমে উপনীত হয়। সুতরাং এ সময়ে জনবসতি তার বৃদ্ধি ও পূর্ণতার সীমায় পৌঁছে। পাঠক, এ কথা বলবেন না যে, ইতিপূর্বে আপনি জানতে পেরেছেন, সাম্রাজ্যের শেষের দিকে প্রজাদের নিগ্রহ ও রাজশক্তি দুর্ব্যবহার দেখা দেয়। অবশ্য এ কথা যথার্থ; কিন্তু এর দ্বারা আমাদের বক্তব্যের উপর আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। কারণ এ সময়ে যদিও প্রজা নিগ্রহ দেখা যায় এবং তজ্জন্য রাজকোষের হানি ঘটে; কিন্তু এর প্রভাবে জনবসতির সংকোচন একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে দেখা দেয়। কারণ স্বাভাবিক সবকিছুই ধীরে সংঘটিত হয়।

অতঃপর এ সময়ে সাম্রাজ্যের শেষের দিকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়ার কারণ এই যে, সাম্রাজ্যের শেষের দিকে সম্পদ সংগ্রহ ও রাজকোষের জন্য মানুষের উপর যে অবিচার অনুষ্ঠিত হয় তজ্জন্য তারা অনেক স্থলেই কৃষি কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। অনেক সময় গোলযোগ সৃষ্টি এবং সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের জন্য বিদ্রোহের আধিক্যও প্রজাদের উৎসাহে শৈথিল্যের জন্ম দেয়। ফলে ফলে সাধারণভাবে শস্যাদির মজুদ কমে যায়। শস্যের উৎপাদন ব্যবস্থা ও তার ফসলের মধ্যে কোনো গোপনীয়তা নেই এবং তা এক অবস্থায়ও থাকে না। স্বভাবতঃই পৃথিবীতে বৃষ্টি কখনো বেশি হয়, কখনো কম হয় এবং তার পতনের মধ্যে প্রাবল্য ও দৌর্বল্য, আধিক্য ও স্বল্পতা দৃষ্ট হয়ে থাকে। ফসল, ফলমূল ও দুগ্ধও সেই অনুপাতে জন্মায়। সুতরাং মানুষ সর্বদাই তাদের আহার্যের ব্যাপারে সঞ্চয়ের উপর নির্ভরশীল। কাজেই সঞ্চয় না থাকলে মানুষের জন্য দুর্ভিক্ষের

ভাবনা বড় হয়ে দাঁড়ায়। শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ তা ক্রয় করতে না পেরে ধ্বংস হয়। অনেক সময় এমনি ফসলহীনতা দেখা দেয় এবং মজুদও কিছু থাকে না, তখন সকল মানুষই অনাহারের অধীন হয়ে পড়ে।

মৃত্যুর আধিক্য সম্পর্কে বলতে গেলে তাও এ প্রকার দুর্ভিক্ষের কারণে সংঘটিত হয়, যেমন আমরা বর্ণনা করেছি। কিংবা সাম্রাজ্যের দুর্বলতার জন্য গোলযোগ বৃদ্ধি পায় এবং তদ্দরুন অসুবিধা ও হত্যাকাণ্ড দেখা দেয় অথবা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এর কারণ সাধারণভাবে জনবসতির আধিক্যের জন্য আবহাওয়া দূষিত হওয়া। কারণ ঘনবসতির জন্য দুর্গন্ধ ও দূষিত আর্দ্রতার সংস্পর্শে এসে জীবাত্মার আহার্য বায়ু বিকৃত হয়ে ওঠে। এরূপ বিকৃতির কারণ স্থায়ী হলে বায়ুর মিশ্রণ বিগড়ে যায়। সুতরাং এরূপ বিকৃতি মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছলে তা দিয়ে ফুসফুস রোগাক্রান্ত হয়। এর ফলেই ফুসফুস সংক্রান্ত বিভিন্ন মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটে। এমন কি বায়ুর বিকৃতি মারাত্মক পর্যায়ে না পৌঁছলেও তার অন্তর্গত দূষিত উপাদান বৃদ্ধি পেয়ে পরিবেশকে দূষিত করে এবং এর দরুন বিভিন্ন প্রকার জ্বর দেখা দেয়। দেহ রোগাক্রান্ত হয় ও ধ্বংস হয়ে যায়।

সাম্রাজ্যের শেষের দিকে জনবসতির বৃদ্ধিই এ প্রকার দুর্গন্ধ ও দূষিত আর্দ্রতার জন্ম দিয়ে থাকে। কারণ এর প্রথম দিকে রাজশক্তি অমায়িক, সদয় ও কম চাপ সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং জনসংখ্যার এরূপ বৃদ্ধি খুবই স্বাভাবিক। এজন্য বিজ্ঞানের[২১০] পুস্তকের যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, জনবসতির মধ্যে স্থানে স্থানে খোলা মাঠ ও শূন্যভূমি থাকা প্রয়োজন। যাতে বায়ুর প্রবাহ প্রাণিকুলের সংস্পর্শে দুর্গন্ধ ও পচনে দূষিত বায়ুকে দূর করে তদস্থলে বিশুদ্ধ বায়ু আনয়ন করতে পারে। অন্যদিকে সম্ভবত এ কারণে অধিক ঘনবসতিপূর্ণ নগরগুলোতে অন্যস্থান অপেক্ষা মৃত্যুর হার অনেক বেশি। যেমন পূর্বাঞ্চলে মিশর ও পশ্চিমাঞ্চলে ফাস। আল্লাহ্ যা ইচ্ছে নির্ধারণ করেন।

---

২১০. মূলে 'হিকমত'—তৎকালে দর্শন অর্থে ব্যবহৃত।

দ্বিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[মানুষের সামাজিক বিষয়াদির শৃঙ্খলা বিধানের জন্য শাসন নীতির প্রয়োজন]

জেনে রাখুন, আমরা ইতিপূর্বে একাধিক স্থানে দেখতে পেয়েছি যে, মানুষের জন্য সমাজবদ্ধ জীবন অত্যাবশ্যকীয়। এটাই আমাদের আলোচ্য সভ্যতার অর্থ। এ সামাজিক জীবনে এমন একজন শৃঙ্খলাবিধায়ক শাসকের প্রয়োজন, যার আশ্রয় ও নির্দেশে তা পরিচালিত হতে পারে। এটা কখনো আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অবতীর্ণ ধর্মমতের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় এবং প্রচারকের দ্বারা উপস্থাপিত বিষয়াদির পাপ-পুণ্যের প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে তার আনুগত্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে ওঠে। কখনো এটা বুদ্ধিগ্রাহ্য শাসননীতি মাত্র; মানুষের কল্যাণ অনুধাবনের পর শাসক কর্তৃক তার প্রয়োগের আশায় তারা এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। প্রথমটির দ্বারা মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধিত হয়; কেননা ধর্মপ্রবর্তক পারলৌকিক কল্যাণ সম্পর্কে অবহিত এবং তার অনুসরণে মানুষ পারলৌকিক মোক্ষ লাভ করে। কিন্তু দ্বিতীয়টির যা কিছু উপকার, তা একমাত্র ইহলোকের জন্য।

পাঠক, 'নগর শাসন'[২১১] সম্পর্কে আপনি যা শুনতে পান, তা এ পর্যায়ের নয়। কেননা দার্শনিকদের কাছে তার অর্থ উক্ত সমাজের প্রতিটি মানুষ এমন বিবেক ও চরিত্রের অধিকারী হবে, যাতে একান্তই শাসকের প্রয়োজন ফুরায়। এরূপ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ জীবনকে তারা 'আদর্শ নগরী' বলে অভিহিত করেন এবং তার জন্য অনুসরণীয় নীতিমালাকে 'নগর শাসন' বলা হয়। এর দ্বারা তারা ঐ শাসন নীতি বোঝান না, যা দিয়ে সমাজ জীবনের সাধারণ মানুষ নিয়ন্ত্রিত ও তাদের কল্যাণ সাধিত হতে পারে। বস্তুত এটা তদ্রূপ নয়। এ আদর্শ নগরী বলতে গেলে তাদের বিরল ও অবাস্তব ধারণা মাত্র। তারা তা ধরে নিয়ে ও অনুমান করে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

আমরা পূর্বে বুদ্ধিগ্রাহ্য যে শাসনব্যবস্থার কথা বলেছি, তা দুই প্রকারের হয়ে থাকে। তার একটি সর্বসাধারণের কল্যাণের অনুসারী এবং বিশেষভাবে সম্রাটের শাসন স্থায়িত্বের শুভাশুভ নির্ধারক। তাই পারস্যবাসীদের শাসননীতি যার ভিত্তি হল দার্শনিক বিষয়াদি। আল্লাহ্ ধর্মীয় জাতীয়তা ও খেলাফতের দ্বারা তা হতে আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। কেননা ধর্মীয় বিধান এ সাধারণ ও বিশেষ কল্যাণ এবং সংশ্লিষ্ট আদব-কায়দা সম্পর্কে পথ নির্দেশক। রাজকীয় বিধি-নিষেধও তার অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়টি সর্বাগ্রে সম্রাটের কল্যাণ তথা তাঁর পরাক্রম ও প্রতীক্ষার মাধ্যমে রাজশক্তির স্থায়িত্ব কিভাবে

---

২১১. পলিটিক্যাল অটোপরিনিজম (রোজেনথাল)।

আসবে, তৎসম্পর্কে মনোযোগী হয়। সাধারণ মানুষের কল্যাণ সেখানে এর অনুসারী। এটাই সেই শাসন নীতি, যা মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল সমাজবদ্ধ মানুষ অনুসরণ করে থাকে। অবশ্য মুসলমান নরপতিগণ তাকে যতদূর সম্ভব ধর্মীয় বিধিনির্দেশের অধীন করে থাকেন। এজন্য তাদের শাসন নীতি, ধর্মীয় বিধান, চারিত্রিক রীতি, সমাজ জীবনের স্বাভাবিক প্রথা এবং প্রয়োজনীয় গোত্রপ্রীতি ও শৌর্যবীর্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সমষ্টিতে পরিগণিত হয়। তাতে প্রথমে ধর্মীয় বিধানকে এবং পরে যথাক্রমে রীতিনীতির দার্শনিকগণকে ও চরিত্রাদিতে রাজন্যবর্গকে অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

এ বিষয়াদি সম্পর্কে অতিশয় সুন্দর ও ব্যাপক নির্দেশাদিসহ তাদের ইবনে হুসাইন তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ্ ইবনে তাহেরের জন্য একটি পত্র রচনা করছিলেন। সম্রাট মামুন শেষোক্তকে আররাক্কা, মিশর ও তাদের মধ্যবর্তী অঞ্চলের শাসক করে পাঠালে এ পত্রটি লেখা হয়। তার পিতা তাহের এ বিখ্যাত পত্রটিতে তাকে সাম্রাজ্য ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কীয় যাবতীয় ধর্মীয়, চরিত্রগত, শাসনতান্ত্রিক ও রাজকীয় নীতি বিষয়ে উপদেশ ও অঙ্গীকার প্রদান করেন এবং সদাচার ও সৎচরিত্রের নির্দেশ দেন। বস্তুত তা শাসক মাত্রেরই অনুসরণযোগ্য; এমনকি সাধারণ মানুষও তার দ্বারা উপকৃত হতে পারে। পত্রটির বক্তব্য নিম্নরূপ।[২১২]

পুত্র আবদুল্লাহ্‌র প্রতি তাহের ইবনে হুসাইনের পত্রের বিষয়

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। অতঃপর তোমার উচিত একক ও অংশীদারহীন আল্লাহ্‌কে মেনে চলা ও তাঁকে ভয় করা এবং তাঁর প্রবল পরাক্রান্ত দৃষ্টির প্রতি লক্ষ রাখা ও তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে দূরে থাকা। তোমার প্রজাবৃন্দকে রাত্রিদিন সংরক্ষণ কর এবং আল্লাহ্ তোমার মধ্যে সততার যে আদর্শ দিয়েছেন, তোমার পরিণাম স্মরণ করে তাকে অত্যাবশ্যকীয় করে নাও। কেননা এ বিষয়ই তোমার অবলম্বন হবে, এর উপরেই তুমি নির্ভরশীল হবে এবং এ সম্পর্কেই তুমি জিজ্ঞাসিত হবে। এর দ্বারা তোমার কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রিত করলে প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করবেন এবং মহাপ্রলয়ের দিনে তোমাকে তাঁর নিষ্করুণ শাস্তি ও প্রতিশোধ থেকে মুক্তি দিবেন। কারণ পবিত্র আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর বান্দাদের পরিচালনার ভার অর্পণ করে তোমার প্রতি সদাচার প্রদর্শন করেছেন এবং তোমার উপর করুণাকে অবশ্যপালনীয় করে তুলেছেন। তুমি তাদের মধ্যে ন্যায়কে অনুসরণ কর এবং তার অধিকার ও সীমাকে প্রতিষ্ঠা দাও। তাদের অধিকার হরণ এবং তাদের পরিজনও পদমর্যাদার হস্তক্ষেপ করা থেকে দূরে থেক। তাদের রক্ত ও তাদের সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করো; যাতে তারা শান্তিতে বসবাস করতে পারে। কারণ আল্লাহ্ তোমার অবশ্য কর্তব্য সম্পর্কে জবাবদিহি চাইবেন, তার জন্য দায়ী করবেন, তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন এবং তোমার পূর্বাপর সকল কৃতকার্যের জন্য পুণ্যও প্রদান করবেন। সুতরাং এর জন্য তোমার বুদ্ধি-বিবেক ও

২১২. পত্রটি তাবারীর ইতিহাস হতে উদ্ধৃত।

দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত কর এবং এক্ষেত্রে কোনো বাধাই যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে। কারণ এটাই তোমার দায়িত্বের শিরোদেশ এবং তোমার কর্তব্যের প্রাণশক্তি। সর্বপ্রথমে আল্লাহ্ যেন এ ব্যাপারেই তোমাকে সহায়তা দান করেন। তুমি প্রথমেই তোমার নিজের দিকে লক্ষ রেখে তোমার কর্তব্য পালন করবে এবং প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্ তোমার উপর যা অবশ্য পালনীয় বলে নির্দেশ করেছেন, তা বাস্তবায়িত করবে। পাঁচ অক্তের নামাজ সর্বদা পড়বে এবং তার জন্য স্বেচ্ছায় জামাতের অনুসারী হবে। তা যেন নির্ধারিত প্রথা অনুসারে পরিপূর্ণ অজু এবং প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্র স্মরণের দ্বারা সমাধা হয়। তোমার কোরান পাঠে ধীরতা অবলম্বন কর এবং রুকু, সেজদা ও দরুদ[২১৩] পাঠে স্থৈর্যের পরিচয় দাও। তাতে যেন তোমার ইচ্ছা ও চিন্তা নিয়োজিত থাকে। তোমার অধীনস্থ ও সহচরদের মধ্য থেকে এ ব্যাপারে একটি জামাত গঠন কর এবং তার রীতিনীতি প্রতিপালন কর। কারণ নামাজ যেমন প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্ বলেছেন, কুকথা ও কুকাজ থেকে বিরত রাখে।[২১৪]

অতঃপর এগুলো রসূলুল্লাহ্ (সঃ) প্রবর্তিত প্রথার অনুসরণ করে, তাঁর পূত চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে এবং তাঁর পরবর্তী পুণ্যাত্মা পূর্বসূরিদের আদর্শ মেনে পালন করবে। যদি তোমার সম্মুখে কোনো সমস্যা এসে উপস্থিত হয়, তা হলে ধর্মভীরুতার সূত্র ধরে তার কল্যাণ-অকল্যাণ বিবেচনা করবে এবং তজ্জন্য প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্ তাঁর গ্রন্থে আদেশ-নিষেধ বৈধ-অবৈধ প্রভৃতির যে নির্দেশ দিয়েছেন ও তার পরিপূরক হিসাবে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর যে সকল নির্দেশাদি বর্তমান রয়েছে, তাকে অবশ্যই মানবে। এর পর এ সম্পর্কে প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্র সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করবে এবং তোমার নিজের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ও মানুষের ঘনিষ্ঠতা-অঘনিষ্ঠতা কোনো কিছুই যেন তোমাকে ন্যায়ের পথ থেকে দূরে সরিয়ে না নেয়।

ধর্মশাস্ত্র ও শাস্ত্রবিদদিগকে এবং ধর্ম ও ধার্মিকদিগকে প্রাধান্য দিও। প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্র গ্রন্থে এবং তার নির্দেশের অনুসারীদিগকে মান্য করো। কারণ মানুষের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সৎগুণ ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান, তার অনুসন্ধান, তৎসম্পর্কে উৎসাহ প্রদান এবং প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের পরিচয় অর্জন করা। কেননা তা সার্বিক কল্যাণের বার্তাবাহী, তার দিকে পরিচালনাকারী, তার নির্দেশকারী এবং সর্ববিধ পাপ ও অন্যায় থেকে নিবৃত্তকারী। এর সাথে প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্র সহায়তা যুক্ত হলে মানুষ অধিকতরভাবে তাঁকে চিনতে, তাঁর মহিমা উপলব্ধি করতে এবং পারলৌকিক পরম মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে এ গুণ প্রকাশ পেলে তোমার দায়িত্বের প্রতি মানুষের সমীহের ভাব বৃদ্ধি পাবে তোমার শাসনকে ভয় করবে, তোমাকে ভালোবাসবে এবং তোমার ন্যায়-নিষ্ঠার উপর নির্ভর করবে।

সর্ববিষয়ে তোমাকে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। এর ন্যায় অধিকতর উপকারী, অধিকতর নিরাপদ ও অধিকতর গৌরবজনক পন্থা অন্য কিছু নেই। কেননা মধ্যপন্থা

---

২১৩. অজু-হস্তমুখাদি প্রক্ষালন; রুকু—হাঁটুর উপর হাত রেখে নত হওয়া; সেজদা—হাঁটু ও হাতের উপর ভর রেখে মাটিতে মাথা ঠেকানো; দরুদ—হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর উপর শান্তি বাণী পাঠ।

২১৪. কোরান, ২৯, ৪৫।

সৎপথ প্রদর্শন করে, সৎপথ দৈবী সহায়তার প্রতীক এবং এ সহায়তা সৌভাগ্যের দিকে আকর্ষণ করে। বস্তুত মধ্যপন্থার দ্বারাই ধর্ম ও সদাচারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাকে তোমার ইহলৌকিক সর্বকাজে গ্রহণ কর।

পারলৌকিক কল্যাণ, পুণ্য, সৎকাজ, সদাচার, সৎজ্ঞান ও তাদের সাহায্য গ্রহণ করতে উদাসীন হইও না। যদি প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তাঁর বান্ধবদিগের সাহচর্য তোমার কাম্য হয়, তা হলে প্রচুর পুণ্য এবং তার সংগ্রহ তৎপরতায় ব্যাপৃত হইও। মনে রেখো, পার্থিব ব্যাপারে মধ্যপন্থা সম্মানের সৃষ্টি করে ও পাপ লাঘব করে। এটা অপেক্ষা কোনো ব্যক্তির উপদেশে তুমি নিজকে তোমার অধিকতর আয়ত্তে রাখতে এবং তোমার কর্তব্যাবলিকে অধিকতর সুসংহত করতে পারবে না। সুতরাং তাকে গ্রহণ কর, তার দ্বারা পরিচালিত হও; তা হলে তোমার দায়িত্ব পালন সার্থক হবে, তোমার ক্ষমতা বাড়বে এবং তোমার সাধারণ ও বিশেষ সহচররা সুসমন্বিত হয়ে উঠবে। প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র প্রতি তোমার ধারণাকে সুন্দর কর; তোমার প্রজাপালন স্থায়ী হবে এবং সর্ববিধ কাজে তাঁর সহায়তা কামনা কর; তোমার সৌভাগ্য চিরস্থায়ী হয়ে উঠবে।

কোনো ব্যক্তিকে কোনো দায়িত্বে নিয়োজিত করলে তার বিষয়টি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি কুধারণা পোষণ করো না। কারণ নির্দোষী ব্যক্তির প্রতি কুধারণা পোষণ ত সন্দেহ করা পাপ এবং এ পাপ সন্দেহকারীর উপর বর্তায়। তোমার সহচরদের প্রতি সুধারণা পোষণ করাকে তোমার বৈশিষ্ট্য করো এবং তাদের সম্পর্কে সর্বপ্রকার কুধারণা দূর করে তাদেরকে মুক্তি দিও। এতে তোমার প্রতি তাদের আনুগত্য ও সাধনায় আন্তরিকতা দেখা দিবে। আল্লাহ্‌র শত্রু শয়তান শ্রেণীর লোককে তোমার ভরসাস্থল করো না। কেননা তারা তোমার অতি অল্প শ্রান্তি অপনোদন করবে এবং তাদের প্রতি কুধারণা পোষণের দুশ্চিন্তা তোমার মনে ঢুকিয়ে দেবে। এর ফলে তোমার জীবনের আনন্দ মাটি হয়ে যাবে। জেনে রাখ তুমি সুধারণা পোষণ করেই কেবলমাত্র শক্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পার এবং তার সাহায্যেই তোমার পছন্দনীয় কর্তব্যকে যথেষ্ট সুন্দরভাবে পালন করতে পার। তা তোমার দিকে মানুষকে আকর্ষণ করবে এবং তোমার সকল কাজে দৃঢ়তা আনয়ন করবে। সুতরাং তোমার সহচরদের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে এবং তোমার প্রজাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করতে কোনো কিছুই যেন তোমার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। অন্যদিকে এ দুটি গুণ যেন সমস্যার সমাধান ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে তোমাকে শিথিল না করে। তুমি সর্বদা সহচরদের কর্তব্যে, প্রজাদের আচরণে ও তাদের প্রয়োজনে দৃষ্টি রাখবে এবং তাদের যাতে সহায়তা হয় তা বিচার করবে। এটা অপেক্ষা সহজ পথ অন্য কিছু নেই। এটা ধর্মের পরিপোষক ও কর্মের উজ্জীবক।

এ সমুদয় ব্যাপারে তোমার ইচ্ছাকে আন্তরিক করবে। তোমার প্রবৃত্তিকে এমন একক্কভাবে দৃঢ় করবে, যাতে তুমি জান যে, তোমার কৃতকার্যের জন্য জবাবদিহি করতে হবে, তোমার সদাচারের জন্য পুরস্কৃত হবে এবং তোমার অন্যায়ের জন্য শাস্তি দেয়া হবে। কারণ প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্ ধর্মকে আশ্রয় ও শক্তি হিসাবে নির্ধারিত করেছেন এবং যে তাকে অনুসরণ ও তার দ্বারা শক্তি গ্রহণ করে, তাকে উন্নীত করেছেন।

তোমার অধীনস্থ ও শাসিত মানুষের সাথে ধর্মীয় ধারা ও তার ন্যায়ানুগ পন্থায় ব্যবহার কর। অন্যায়কারীদের মধ্যে তাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ কর। এতে বিলম্ব করো না, ক্লান্ত হইও না এবং অন্যায়ের যোগ্য প্রতিবিধান করতে দ্বিধান্বিত হইও না। কারণ এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন তোমার প্রতি মানুষের সদিচ্ছাকে নষ্ট করবে। বরং তোমার এতদসম্পর্কীয় দায়িত্ব পালনে সুপরিচিত পন্থায় দৃঢ়চিত্ত হও এবং অভিনব ও সন্দেহজনক পন্থা পরিহার কর। এতে তোমার ধর্ম রক্ষা পাবে এবং তোমার পৌরুষ পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

কোনো অঙ্গীকার করলে পূর্ণ কর এবং কোনো কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিলে প্রতিপালন কর। সদাচার গ্রহণ কর এবং তা দিয়ে প্রতিরোধ কর। তোমার প্রজাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি যথাসম্ভব না দেখতে চেষ্টা করো। মিথ্যা ও অসত্যের দ্বারা তোমার জিহ্বাকে কলুষিত করো না। নিন্দুককে প্রশ্রয় দিও না। কেননা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক যে কোনো ব্যাপারেই হোক না কেন, তোমার প্রথম বিচ্যুতি আসবে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দান ও তাকে শক্তিশালী করে তোলায়। কারণ মিথ্যায় পাপের আরম্ভ এবং দোষারোপ ও নিন্দায় তার পরিসমাপ্তি। কেননা নিন্দুক তার বন্ধুকেও রেহাই দেয় না। সুতরাং তার বক্তব্যে কারো উপকার ও কার্যসিদ্ধি হয় না। তুমি কল্যাণ ও সত্যের অনুসারীদিগকে গ্রহণ কর এবং সত্যপ্রিয় সম্ভ্রান্তদের মর্যাদা বাড়াও এবং দুর্বলদের সহায়তা কর। রক্তসম্পর্কের মর্যাদা দিও এবং তার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও তাঁর মহিমার সম্মান বাড়িও। এটা যেন তোমার পুণ্য বৃদ্ধি ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধন করে। অন্যায় প্রবৃত্তি ও অবিচার থেকে দূরে থেকো। তা যেন তোমার মতামতকে বিচলিত না করে। তোমার প্রজাদের কাছে তোমাকে তা থেকে মুক্ত বলে প্রকাশ কর। তাদের শাসনব্যবস্থাকে ন্যায়পরায়ণতার দ্বারা সৌভাগ্য করে তোল এবং তাদের মধ্যে সত্যকে প্রতিষ্ঠা কর। তাদের সম্মুখে সেই জ্ঞান তুলে ধর, যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ক্রোধের সময় আত্মহারা হইও না; তোমার উপর ধৈর্য ও গাম্ভীর্যকে প্রভাবশালী হতে দাও। সাবধান, কোনো কাজে উন্নাসিকতা, হঠকারিতা ও অহংকার দেখিও না।

সাবধান, কখনো এ কথা বলো না যে, আমি ক্ষমতাপ্রাপ্ত, যা ইচ্ছে করতে পারি। এতে মতামতের ত্রুটি দেখা দেয় এবং প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসে শৈথিল্য প্রকাশ পায়। আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তোমার ইচ্ছে ও তাঁর প্রতি তোমার বিশ্বাসকে আন্তরিক কর। মনে রেখো, রাজ্য একমাত্র পবিত্র ও মহান আল্লাহ্র; তিনি যাকে ইচ্ছে দান করেন, যার কাছ থেকে ইচ্ছে হয়, ছিনিয়ে নেন[২১৫] শাসনব্যবস্থা যারা তাঁর অনুগ্রহকে উপলব্ধি করে না, তাদের নিকট থেকে সৌভাগ্য ছিনিয়ে নিতে এবং তাদের উপর দুর্ভাগ্য আপতিত করতে তাঁর তুল্য তৎপর আর কাউকেও পাবে না। সাম্রাজ্যশক্তির ব্যাপকতায় যারা আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহের কথা অস্বীকার করে এবং যারা সেই প্রবল পরাক্রান্ত প্রভুর বদান্যতায় নিজেদেরকে অতিমানব মনে করে, তাদেরকে তিনি ক্ষমা করেন না।

---

২১৫. তুল, কোরান, ৩, ২৬।

তোমার প্রবৃত্তির লালসা ত্যাগ করো। তোমার সঞ্চয় ও পুঁজি, যা তুমি জমা করার চেষ্টা করবে, তা যেন পুণ্য ও ধার্মিকতা হয়। তাতে যেন প্রজাদের কল্যাণ কামনা, তাদের আঞ্চলিক সমৃদ্ধি, তাদের বিষয়াদির তত্ত্বাবধান, তাদের জীবনের নিরাপত্তা এবং উৎপীড়িতের প্রতি সহায়তা বিদ্যমান থাকে।

জেনে নাও, সম্পদ যখন সঞ্চিত ও ভাণ্ডারে সুরক্ষিত হয়ে পড়ে, তখন আর তা বাড়ে না। কিন্তু তা যদি প্রজাদের কল্যাণে, তাদের প্রাপ্যাদি প্রদানে ও তাদের দুঃখ দূরীকরণে নিয়োজিত হয়, তা হলে বাড়ে, পবিত্র হয় এবং তার দ্বারা সাধারণের অবস্থার সংসার হয়, বিভিন্ন অঞ্চলের সমৃদ্ধি আসে, সময় সুখের হয় উপকার ও সম্মানের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে ওঠে। সুতরাং তোমার ভাণ্ডারের পুঁজি যেন ইসলামের সমৃদ্ধি ও তার অনুসারীদের জন্য সম্পদ বণ্টন হয়। তা থেকে তুমি আমীরুল মোমেনীনের বন্ধু-বান্ধবকে যথেষ্ট পরিমাণে দাও এবং তাদের ন্যায্য প্রাপ্য প্রদান কর। যাতে তাদের বিষয়াদি ও জীবিকা সচ্ছল হয়, তজ্জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ কর। তুমি যদি এটা করতে পার, তা হলে তোমার সৌভাগ্য স্থায়ী হবে এবং মহান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আরো অধিক দাবি করতে পারবে। তুমি এর দ্বারা প্রজাদের রাজকোষ ও রাজস্বের উপর আরো অধিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। সুতরাং সকলেই যখন তোমার ন্যায়নিষ্ঠা ও বদান্যতার কথা বুঝতে পারবে, তখন তোমার প্রতি আনুগত্য আরো দৃঢ় হবে।

আমি যে সকল বিষয় তোমার মধ্যে দেখতে ইচ্ছে করেছি, তা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ কর এবং এ ব্যাপারে যা কিছু উজ্জ্বল করে তুলেছি, তার জন্য নিজকে প্রস্তুত কর। তাতে যেন তোমার অধিকার ব্যাপক হয়। সম্পদেরও ঐ অংশটুকুই অবশিষ্ট থাকবে, যা আল্লাহ্‌র পথে, তাঁর সত্য প্রতিষ্ঠায় ব্যয়িত হয়েছে। যারা কৃতজ্ঞ, তাদের প্রতিদান সম্পর্কে অবহিত হও এবং তাদের নিমিত্ত তা প্রতিষ্ঠা কর। সাবধান, পার্থিব জীবন ও তার প্রলোভন যেন তোমাকে পরকালের ভয়াবহতা সম্পর্কে উদাসীন করে না তোলে। তা হলে তৎকালে তোমার উপর আরোপিত দাবিকে তুমি তুচ্ছ বলে ভাববে। বস্তুত এরূপ তুচ্ছভাব শৈথিল্যের জন্ম দেয় এবং শৈথিল্য ধ্বংস ডেকে আনে। তোমার কর্তব্য যেন প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র জন্য, তাঁর উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়। তুমি তাঁর নিকট পুণ্যের প্রত্যাশী হও। কেননা পবিত্র আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণভাবে দান করেছেন। তুমি কৃতজ্ঞতার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তার উপর নির্ভরশীল হও। আল্লাহ্ তোমাকে আরো অধিক কল্যাণ ও অনুগ্রহ প্রদান করবেন। বস্তুত প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদের কৃতজ্ঞতা ও অনুগ্রহকারীদের অনুগ্রহ অনুপাতে প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

পাপকে তুচ্ছ মনে করো না, হিংসুকের সহায় হইও না, অন্যায়কারীকে দয়া দেখিও না, অকৃতজ্ঞকে আপন করো না, শত্রুকে তোষামোদ করো না, নিন্দুককে বিশ্বাস করো না, প্রতারককে প্রশ্রয় দিও না, ব্যভিচারীকে বন্ধু বানিও না, নির্বোধকে অনুসরণ করো না, কপটকে প্রশংসা করো না, মানুষকে হেয় ভাবিও না, নিঃস্ব প্রত্যর্থীকে বিমুখ করো না, মিথ্যাকে ভাল বলো না, রহস্যপ্রিয়কে গণ্য করো না, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না, অহংকার দেখিও না, ক্রোধ প্রকাশ করো না, আশা ভঙ্গ করো না, গর্বসহকারে পথ চলো

না, অজ্ঞানকে সংশোধন করতে যেও না, পরকাল অন্বেষণে ত্রুটি করো না, ছিদ্রান্বেষণে দৃষ্টি দিও না, অত্যাচারীকে ভয়ে বা ভাবনায় ত্যাগ করো না এবং পরকালের পুণ্য পার্থিব জীবনে চেও না।

শাস্ত্রবিদদের সাথে অধিকতর পরামর্শ করো; তোমার প্রবৃত্তিকে ধৈর্যের সাথে সক্রিয় করো; অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করো; তোমার পরামর্শ সভায় অমিতব্যায়ী ও কৃপণকে প্রবেশ করতে দিও না। এবং তাদের কোনো কথা শুনিও না। কারণ তাদের উপকার অপেক্ষা অপকার বেশি। প্রজাদের সম্পর্কে গৃহীত তোমার যেকোনো কর্মতৎপরতা কার্পণ্যের দ্বারা যত দ্রুত বিনষ্ট হতে পারে, অন্য কোনো কিছুর দ্বারাই তত নয়। মনে রেখো, তোমার মধ্যে লোভ দেখা দিলে তুমি বেশি গ্রহণ এবং অল্প ত্যাগ করবে। এরূপ অবস্থা হলে তোমার কার্যাবলির অতি অল্প অংশই তুমি সমাধা করতে পারবে। কারণ প্রজারা একমাত্র তোমার স্বভাব তথা তাদের সম্পদ সম্পর্কে নির্লোভ ও তাদেরকে উৎপীড়নে সংযত দেখেই তোমাকে ভালোবাসবে। তোমার বন্ধুদের মধ্যে যে আন্তরিকতার সাথে অগ্রসর হয়, তাকে অন্তরঙ্গ হিসাবে গ্রহণ কর এবং অনুগ্রহ প্রদর্শনে ও তার যোগ্য প্রাপ্যাদি প্রদানে তাকে প্রীত কর। অর্থ লোভকে প্রাধান্য দিও না। কারণ, এটা জেনে রেখো, মানুষ সর্বপ্রথম এর প্রলোভনেই তার প্রভুর নির্দেশ অমান্য করে। নির্দেশ অমান্যকারী অসম্মানিত হয়। এটাই প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র বাণীর অর্থ—যে সকল ব্যক্তি তাদের প্রবৃত্তির লালসা থেকে বাঁচতে পারে, বস্তুত তারাই সফলকাম হয়। সত্যের পথে তোমার দানধ্যানের মাত্রাকে সহজ কর। তোমার লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির মধ্যে যেন মুসলমানদের জন্য ন্যায় অংশও প্রাপ্য থাকে। বিশ্বাস কর, যথার্থই দানশীলতা মানুষের সকল তৎপরতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তাকে তোমার চরিত্রের অন্তর্গত করে নাও এবং আদর্শ ও কর্মে তার প্রতি সন্তুষ্ট থাক।

সৈন্যদলের নথিপত্র ও তাদের লিখনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর, তাদের প্রাপ্যাদি যথাসময়ে প্রদান কর এবং তাদের জীবন-যাপনকে সচ্ছল করে তোল। প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্ এটা দ্বারা তাদের অভাব দূর করবেন এবং তাদের তৎপরতাকে তোমার জন্য শক্তিপ্রদ করে দিবেন। এতে তাদের মধ্যে তোমার প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে এবং তোমার নির্দেশ পালনে তারা অকুণ্ঠচিত্তে এগিয়ে আসবে। সম্রাট তার সৈন্যদল ও প্রজাদের উপর ন্যায়বিচারে, প্রাপ্যাদি প্রদানে, সুবিবেচনায়, বদান্যতায়, অনুগ্রহে, পুণ্য কামনায় ও সচ্ছলতা আনয়নে যে পরিমাণ দয়া প্রদর্শন করেন, তাঁর সৌভাগ্যও সেই পরিমাণে বাস্তব হয়ে ওঠে। অতএব দুই বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যে যে কোনো একটির শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করে তাকেই অনুসরণ কর। তাকেই তোমার কর্তব্য পালনের সূত্র করে নাও। মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় অবশ্যই তুমি মোক্ষ, কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করবে।

জেনে রাখ, মহান আল্লাহ্‌র নিকট বিচার এমন একটি বিষয়, যার উপরে আর কিছু হতে পারে না। কেননা তা যথার্থভাবে আল্লাহ্‌র সেই তুলাদণ্ড, যা পৃথিবীর মানুষের অবস্থা যাচাই করার জন্য স্থাপন করা হয়েছে। এ জন্য বিচার ও কর্তব্যকর্মে ন্যায়পরায়ণতাকে অবলম্বন করলে প্রজাদের অবস্থা সংশোধিত হয়, পথঘাট নিরাপদ

হয়, নির্যাতিতের প্রতিবিধান হয়, মানুষের যথার্থ প্রাপ্য লাভ হয়, জীবন-যাপন সুখের হয়, আনুগত্যের যথার্থতা পালিত হয়, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে শান্তি ও স্বস্তির আগমন হয়, ধর্মের সুসার হয় এবং ধর্মীয় বিধান ও প্রথা তাদের যথাস্থানে প্রবর্তিত হয়। সুতরাং প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র বিষয়ে দৃঢ় হও, ছিদ্রান্বেষণ থেকে দূরে অবস্থান কর এবং যথাযথ শাস্তি প্রদানের জন্য তৎপর থাক। তাড়াতাড়ি করো না এবং ধমক ও তাচ্ছিল্য দেখিও না। শপথে সন্তুষ্ট হও, তোমার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাও, তোমার যথার্থতা সম্পর্কে সতর্ক হও, তোমার বক্তব্যে আন্তরিকতা দেখাও এবং পক্ষগুলোর প্রতি সদয় হও। সন্দেহ দেখা দিলে অপেক্ষা কর এবং প্রমাণের ব্যাপারে চূড়ান্ত পর্যায়ে যাও। তোমার প্রজাদের মধ্যে কারো সম্পর্কে যেন কোনো প্রকার সংস্কার, সুধারণা ও কোনো নিন্দুকের নিন্দা তোমাকে বিচলিত করতে না পারে। ধীর হও, সময় নাও, বিশ্লেষণ কর, দৃষ্টি দাও, চিন্তা কর, চেষ্টা কর ও বিবেচনা কর। তোমার প্রতিপালকের জন্য বিনীত হও এবং সকল প্রজার প্রতি সমদৃষ্টি রাখ। সত্যকে তোমার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে দাও। রক্তপাত করতে তাড়াতাড়ি করো না। কারণ প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র নিকট রক্তের মূল্য বড় বেশি। সুতরাং যথার্থ কারণ ব্যতীত রক্তপাত করো না।

যে রাজস্ব থেকে প্রজাদের অবস্থা সুদৃঢ় হয়, তৎপ্রতি লক্ষ রেখো। আল্লাহ্ একে ইসলামের জন্য সম্মান ও সমুন্নতি, মুসলমানদের জন্য সচ্ছলতা ও প্রতিরোধ, ইসলাম বিরোধীদের জন্য হেয়তা ও ক্রোধ এবং বিধর্মীদের জন্য পরিণামে নীচতা ও অপমান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং রাজস্ব আদায়কারীদের প্রতি তা সত্য, ন্যায়, সমতা ও সর্বজনীনতার মধ্য দিয়ে আরোপ কর। কোনো সম্ভ্রান্তের সম্ভ্রম ও কোনো ধনাঢ্যের ধন যেন এ ব্যাপারে তোমার হস্তকে সংকুচিত না করে। তোমার কোনো লেখক, কোনো পারিষদ ও সভাসদ যেন তা থেকে অব্যাহতি না পায়। সম্ভাব্যসীমার অতিরিক্ত কারো নিকট থেকে গ্রহণ করো না। এ ব্যাপারে তোমার নীতি যেন বিভিন্ন না হয়। সকল মানুষকেই একই সত্যের নীতিতে উদ্বুদ্ধ কর। কারণ একমাত্র এটাই তাদের সম্প্রীতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। সাধারণ মানুষের প্রীতিকে অবলম্বন কর।

মনে রেখো, তুমি তোমার শাসক পদের মাধ্যমে ভাণ্ডারি, রক্ষাকারী ও প্রহরী নিযুক্ত হয়েছ। তোমার শাসনাধীন লোকদেরকে এজন্যই 'রায়ত' (প্রহরাধীন) বলা হয়, কেননা তুমি তাদের প্রহরী এবং তাদের নিয়ামক। সুতরাং তাদের নিকট থেকে স্বেচ্ছাদত্ত সমৃদ্ধি অনুসারে গ্রহণ কর এবং তাদের প্রতিষ্ঠা, কল্যাণ ও প্রয়োজন পূরণে ব্যয় কর। তাদের উপর এমন ব্যক্তিকে কর্মচারী নিয়োগ কর, যার দূরদর্শিতা, কর্মক্ষমতা, অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানে গভীরতা, শাসনে ন্যায়নিষ্ঠা ও সততা বিদ্যমান। তাদের আহার্যের সচ্ছলতা বিধান কর। কেননা এটা সেই অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্গত যার দায়িত্ব তোমার উপর অর্পিত হয়েছে ও তুমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছ। সুতরাং এ ব্যাপারে যেন কোনো চিন্তা তোমাকে ব্যতিব্যস্ত না করে এবং কোনো বাধা তোমাকে বিরত না রাখে। তুমি যখনই তাকে প্রাধান্য দিবে এবং তৎসম্পর্কে তোমার যা করণীয়, তা করবে, তখনই তোমার প্রভুর নিকট থেকে অধিকতর সৌভাগ্যের প্রত্যাশী হতে পারবে। তোমার কর্মে নতুন সম্ভাবনা দেখা দেবে, তোমার প্রজাদের অধিকতর প্রীতি আকর্ষণ করবে এবং কল্যাণের

দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করতে পারবে। তোমার অঞ্চলে সচ্ছলতা আসবে, তোমার এলাকায় সমৃদ্ধি দেখা দেবে, তোমার শাসন স্থলে প্রাচুর্য প্রকাশ পাবে, তোমার রাজস্ব বেড়ে যাবে এবং তোমার সম্পদ পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। তুমি এর দ্বারা তোমার সৈন্যদলকে সন্তুষ্ট করতে পারবে এবং তোমার তরফ থেকে দানধ্যানাদির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সুখী করতে সক্ষম হবে। তুমি এ ব্যাপারে তোমার শত্রুর নিকটও সুশাসক ও ন্যায়নিষ্ঠ বলে পরিগণিত হবে। তোমার সকল কর্তব্যকর্মে তুমি ন্যায়, অস্ত্র, শক্তি ও প্রস্তুতির অধিকারী হবে। সুতরাং এ বিষয়েই তুমি প্রচেষ্টায় নিরত হও এবং তার উপর কোনো বিষয়কে অগ্রাধিকার দিও না। মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় পরিণামে তুমি প্রশংসার অধিকারী হতে পারবে।

তোমার অঞ্চলের প্রতিটি বিভাগে এমন একজন বিশ্বস্ত লোক নিয়োগ কর, যে তোমাকে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মচারীর সংবাদ জানাতে পারে। সে তাদের চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে তোমাকে লিখে জানাবে, এর ফলে, বলতে গেলে, তুমি প্রতিটি কর্মচারীর সাথে তার সকল ব্যাপার দেখে বেড়াবার মতো ক্ষমতা লাভ করবে। তুমি যদি তাদেরকে কোনো নির্দেশ প্রদান করতে চাও, তা হলে তার পরিণামফল চিন্তা করে দেখ। যদি তার ফলে শান্তি ও স্বস্তিই লভ্য বলে মনে কর এবং তা দিয়ে কোনো শুভ তৎপরতা ও প্রতিরোধ গড়ে উঠবে বলে আশা কর, তা হলে তা প্রদান কর। অন্যথায় তা স্থগিত রাখ এবং দূরদর্শী ও জ্ঞানীদের সাথে তা নিয়ে আলোচনা কর। অতঃপর এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ কর। কেননা অনেক সময় অনেক ব্যক্তি এমন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, যা তার ক্ষণিকের খেয়াল মাত্র। তা তাকে বিচলিত করে ও উত্তম বলে মনে হয়। কিন্তু তার পরিণামের দিকে সে যদি লক্ষ না করে, তা হলে তা তাকে ধ্বংস করে ফেলে এবং দায়িত্বজ্ঞানের ত্রুটি প্রকাশ পায়। সুতরাং তুমি যা কিছু করতে ইচ্ছে কর, তৎসম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত নাও এবং পরে প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র সাহায্য চেয়ে তাতে শক্তি প্রয়োগ কর। তোমার সর্ববিধ কাজে কল্যাণ-অকল্যাণ বিবেচনা করার শক্তি তোমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর।

প্রতিদিনের কাজ সেই দিনেই সমাধা করো; আগামী দিনের জন্য তুলে রেখো না। তার সাথে নিজকে ব্যাপৃত রাখ। কারণ আগামীকাল এমন অনেক বিষয় ও ঘটনা নিয়ে আসবে, যা তোমাকে আজকার বিলম্বিত কাজ করার সময়ই দেবে না। মনে রেখো, যে দিন যায়, তা তার সমস্ত সুযোগ নিয়েই অন্তর্হিত হয়। সুতরাং তুমি যদি তার কর্তব্যকে বিলম্বিত কর, তা হলে তোমার নিকট দুই দিনের কাজ জমা হয়ে উঠবে এবং তা তোমাকে এমনভাবে ব্যাপৃত রাখবে যে, তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে। সুতরাং প্রতিদিনের কাজ যদি যথাসময়ে সম্পন্ন করতে পার তা হলে তুমি তোমার দেহ ও মনকে বিশ্রাম দিতে পারবে এবং তোমার শাসনব্যবস্থা কাজকেও সুসংহত করতে সক্ষম হবে।

মানুষের মধ্যে স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত এমন ব্যক্তিদেরকে খুঁজে বের কর, যাদের আন্তরিকতাকে তুমি পরীক্ষা করেছ, তোমার প্রতি যাদের আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, যারা সদুপদেশ দেয় এবং তোমার দায়িত্বকে সংরক্ষণ করে। অতঃপর তাদেরকে অন্তরঙ্গ কর এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। এমন সকল সম্ভ্রান্ত পরিবার অনুসন্ধান কর, যারা

বর্তমানে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে; অতঃপর তাদের দুর্দশার ভার লাঘব কর এবং তাদের অবস্থার পরিবর্তন কর, যাতে তারা তাদের অন্তঃকরণে কোনোপ্রকার ঘৃণা পোষণ করতে না পারে। গরিব ও অসহায়দের জন্য নিজের একটা সময় ব্যয় কর। যারা অত্যাচারের কথা তোমাকে জানাতে পারে না, যারা নিজেদের অধিকারের দাবি উত্থাপন করতে জানে না, সেইসকল ক্ষুদ্র-তুচ্ছদের গোপন বেদনা জানতে চেষ্টা কর। তোমার কর্মচারীদের মধ্যে কল্যাণধর্মীদেরকে এরূপ লোকের অভাব ও প্রয়োজনের কথা তোমাকে জানাতে বল এবং তাদের দুরবস্থার প্রতিবিধান করতে দায়িত্ব নাও। লক্ষ রাখ, যেন যথার্থভাবে তাদের আল্লাহ্‌দত্ত প্রাপ্য তারা পায়। দুর্দশাগ্রস্ত অনাথ ও বিধবাদের খোঁজখবর নাও এবং আমীরুল মোমেনীনের অনুসরণ করে 'বয়তুল মাল' থেকে তাদের খোরাকীর ব্যবস্থা কর। মহান আল্লাহ্ তাঁকে যেভাবে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে ও আত্মীয়তুল্য ব্যবহার করতে শক্তি প্রদান করেছেন, তুমিও সেরূপ কর। এর ফলে একদিকে যেমন তাদের অবস্থার সুসার হবে, অন্যদিকে তেমন আল্লাহ্ তদ্দরুন তোমাকে পুণ্য ও প্রাচুর্য প্রদান করবেন। দুঃখীদেরকে বয়তুল মাল থেকে পারিশ্রমিক দাও। তাদের মধ্যে যারা কোরান পাঠ করতে পারে, যারা তা কণ্ঠস্থ করেছে, তাদেরকে এ ব্যাপারে অন্যান্যের অপেক্ষা অগ্রাধিকার ও অধিক প্রদান কর। মুসলিম রোগাক্রান্তদের জন্য গৃহাদির ব্যবস্থা কর, যেখানে তারা আশ্রয় নিতে পারে এবং তাদের সেবাযত্নের জন্য লোক নিয়োগ কর। তাদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক নিযুক্ত করে তাদের ইচ্ছা সেই পরিমাণে পূরণ কর, যাতে বয়তুল মালে অপব্যয়ের পরিস্থিতি দেখা না দেয়।

জেনে রাখ, মানুষের প্রাপ্যাদি পরিশোধ করলে ও তাদের সর্বোত্তম ইচ্ছাদি পূরণ করলেও তারা ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয় না, পরিতৃপ্তি লাভ করে না, যতক্ষণ না তাদের অভাবের কথা তারা শাসকের নিকট উপস্থিত করতে পারে। এর মাধ্যমে তারা আরো অধিক প্রাপ্য, আরো অধিক অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে থাকে। অনেক সময় এরূপ দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তি মানুষের অনুরূপ আবেদন-নিবেদনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। কারণ তার আধিক্য তার ধ্যান-জ্ঞান আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং তার জন্য তাকে বিরক্তি ও কষ্ট পোহাতে হয়। কিন্তু এ ব্যক্তিকে এ কারণে সেই ব্যক্তির ন্যায় মনে হয় না, যে ন্যায়-নিষ্ঠ হয়ে পার্থিব জীবনের প্রতিটি কাজের যথার্থতা অনুধাবন করে, পরকালে তন্নিমিত্ত প্রাপ্য পুণ্যের গৌরবকে বুঝতে পারে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে সহায়ক বিষয়কে স্বাধীনভাবে অনুসরণ করে এবং তাঁর নিকট তজ্জন্য করুণার প্রত্যাশা করতে সক্ষম হয়।

তোমার সমীপে প্রবেশ করতে মানুষকে বেশি মাত্রায় অনুমতি দাও এবং তাদেরকে দর্শন দান কর। তাদের বক্তব্য শুনতে তোমার মেজাজকে ঠাণ্ডা রাখ, তোমার নিজকে নমনীয় কর, তোমার মুখমণ্ডলকে সহাস্য রাখ, কথোপকথনে ও জিজ্ঞাসায় বিনয়ী হও এবং তাদের প্রতি তোমার অবারিত দান ও প্রতিদানের মহত্ত্ব প্রকাশ কর। যদি কাউকে কিছু দাও, তা হলে স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে দাও। তাতে যেন একটি উত্তম কাজ করার ও তজ্জন্য প্রতিদান পাবার অনুভূতি থাকে এবং কোন প্রকার আবিলতা ও গঞ্জনার ভাব

যেন তাকে আচ্ছন্ন না করে। এরূপ দান মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমার জন্য একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হবে।

তোমার পার্থিব জীবনে বর্তমান সকল সমস্যাকে পূর্ববর্তী শাসক, নেতা এবং অতীত যুগ ও জাতির অভিজ্ঞতার আলোকে বিবেচনা করে দেখো। অতঃপর তোমার সকল কর্তব্যকর্মে মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্যের রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। তাঁর ভালোবাসাকে যেন বুঝতে পার, তাঁর বিধান ও প্রথাকে যেন পালন করতে পার এবং তাঁর ধর্ম ও গ্রন্থকে যেন প্রতিষ্ঠা দিতে পার—সেভাবে অগ্রসর হইও। প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য থেকে যা কিছু তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে এবং তাঁর ক্রোধের উদ্রেক করে, তা পরিত্যাগ করো।

তোমার কর্মচারীরা যে সম্পদ সঞ্চয় করে, তার পরিচয় নিও এবং তারা যা ব্যয় করে, তাও দেখো। কখনো নিষিদ্ধের সঞ্চয় করো না এবং অপব্যায়ের দ্বারস্থ হইও না।

জ্ঞানীদের সাথে অধিকতর মেলামেশা করো, তাঁদের পরামর্শ চেয়ো এবং তাঁদের সাহচর্যে বসো। তোমার প্রবৃত্তি যেন সুপ্রথার অনুসরণ ও তার প্রতিষ্ঠা দানে তৎপর হয় এবং সচ্চরিত্রের অনুকরণ ও তার মহত্ত্বকে প্রাধান্য দেয়। তোমার সমীপে আগমনকারী ও অন্তরঙ্গতায় বিচরণকারী সেই সব ব্যক্তিকে সম্মান দেখিও, যারা কোনো ত্রুটি দেখে যেন তোমার ভয়ে তোমার নিকট গোপনে জানাতে বিরত না হয় এবং কোনো বিষয়ের অপূর্ণতা যেন তোমাকে বোঝাতে ইতস্তত না করে। বস্তুত এরূপ লোকই তোমার সর্বাপেক্ষা উত্তম বন্ধু ও সাহায্যকারী।

তোমার সম্মুখে যে সকল কর্মচারী ও লেখক বিদ্যমান, তাদের প্রতি লক্ষ রেখো। প্রতিদিন তাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় করে দিও, যখন তারা লিখন, আদিষ্ট কাজ, কর্মচারীদের প্রয়োজন, সাম্রাজ্যের বিষয়াদি ও প্রজাদের সমস্যাদি নিয়ে উপস্থিত হবে। অতঃপর তোমার সম্মুখে আনীত সমস্যাগুলো সম্পর্কে তোমার কান, চক্ষু, অনুভূতি ও বুদ্ধিকে নিয়োজিত কর। বারবার দেখ ও বারবার চিন্তা কর। যা কিছু সত্যের ও সুচিন্তার অনুসারী, তার অনুমতি দাও এবং তাতে কল্যাণ-অকল্যাণ বিবেচনার জন্য প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র সাহায্য চাও। আর যা কিছু সত্যের বিরোধী, তার জন্য প্রার্থনাকে রোধ কর এবং তা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখ। তোমার কোনো প্রজা বা অন্য কারো প্রতি কোনো সদয় ব্যবহারের জন্য গঞ্জনা দিও না এবং প্রতিদানে কৃতজ্ঞতা, দৃঢ়তা ও মুসলমানদের হিতার্থে সাহায্য ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করো না। এ উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে কোনো সৎকাজ করতে যেও না।

তোমার প্রতি লিখিত আমার পত্রকে বুঝতে চেষ্টা কর, তার প্রতি গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং তাকে কার্যকরী করে তোল। তোমার সকল কাজে আল্লাহ্‌র সাহায্য চেয়ো এবং কল্যাণ-অকল্যাণ বিবেচনার শক্তি প্রার্থনা করো। বস্তুত প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্ কল্যাণ ও কল্যাণকামীদের সাথে অবস্থান করেন। সুতরাং তোমার শ্রেষ্ঠ চরিত্র ও উত্তম আকাঙ্ক্ষা যেন প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিবিধান; তাঁর ধর্মের শৃঙ্খলা, তাঁর অনুসারীদের সম্মান ও নির্ভরতা এবং তোমার নিজ জাতি ও আশ্রিত জনগোষ্ঠীর প্রতি

সুবিচার ও কল্যাণের বাহক হয়। আমি প্রবল ও মহান আল্লাহ্‌র নিকট তোমার জন্য উত্তম সাহায্য, সহায়তা, সৎপথ ও আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ইতি—

ঐতিহাসিকরা বলেন, এ পত্রটি প্রকাশ পেলে ও তার বিষয়বস্তু প্রচারিত হলে মানুষ অবাক বনেছিল। সম্রাট মামুনের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে এবং তাঁর সমীপে তা পাঠ করা হলে তিনি বলেছিলেন, হে আবু তৈয়ব। অর্থাৎ তাহের এতে ত ইহকাল পরকালের যাবতীয় বিষয়, প্রচেষ্টা, দূরদর্শিতা, রাজনীতি, রাজকল্যাণ প্রজাদের অধিকার, শাসনব্যবস্থা প্রতিরক্ষা, খলিফার প্রতি আনুগত্য, খেলাফতের দৃঢ়তা প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত সুন্দর ও মনোজ্ঞভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। অতঃপর সম্রাট মামুন এর অনুলিপি প্রস্তুত করে সকল দিকের কর্মচারীদের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করলেন এবং তদনুযায়ী চলতে ও কাজ করতে নির্দেশ দিলেন। বস্তুত শাসন নীতি সম্পর্কে যা কিছু জেনেছি, তন্মধ্যে এ অত্যন্ত সুন্দর। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞাতা।

ত্রিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[ফাতেমী সাম্রাজ্য, এ সম্পর্কে মানুষের মতামত এবং তার রহস্য উদ্‌ঘাটন]

পাঠক, জেনে রাখুন যুগ যুগ ধরে সমগ্র মুসলমান সমাজের মধ্যে এটা সুপরিচিত রয়েছে যে, পৃথিবীর শেষকালে নবীবংশ থেকে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যিনি ধর্মকে শক্তিশালী ও ন্যায়নীতিকে প্রকাশ করবেন। মুসলমানরা তাঁর অনুসরণ করবে এবং তিনি সমগ্র ইসলামী সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করবেন। তাঁরই নাম আল-মেহেদী। দজ্জালের আত্মপ্রকাশ ও অন্যান্য যাবতীয় ঘটনা তাঁরই পরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত হবে। এগুলো মহাপ্রলয়ের শর্ত হিসাবে বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। মেহেদীর পরে হজরত ঈসা অবতীর্ণ হয়ে দজ্জালকে হত্যা করবেন কিংবা তাঁর সাথে একত্রে উক্ত হত্যাকাণ্ডে সাহায্য করবেন এবং তাঁর নামাজে মেহেদীকে ইমাম হিসাবে বরণ করে নিবেন।

মানুষ এ সকল বিষয়ের প্রমাণ হিসাবে এমন সকল হাদিস উপস্থিত করে, যা হাদিসবিদদের দ্বারা গৃহীত ও প্রকাশিত হলেও তাদের প্রামাণ্য অস্বীকারকারীর অভাব নেই এবং তারা কিছু সংখ্যক হাদিসের সাহায্যে এ মতামতের বিরোধিতা করে থাকে। পরবর্তীকালের সুফী মতাবলম্বীরা এ ফাতেমীর বিষয়ে ভিন্ন পথ ও অন্য প্রমাণ উপস্থিত করেন। অনেক সময় তাঁরা এ ব্যাপারে দিব্যজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করেন। বস্তুত এটাই তাঁদের সাধন মার্গের ভিত্তি।

আমরা এখন এ প্রসঙ্গে প্রামাণ্য হাদিসসমূহের উল্লেখ করব এবং তা অস্বীকারকারীদের সমালোচনা ও তার প্রামাণ্য ভিত্তি বর্ণনা করব। এর পর সুফীপন্থীদের বক্তব্য ও মতামত উদ্ধৃত করব। পাঠক, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এ বিষয়টি আপনার নিকট পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

আমাদের বক্তব্য এই যে, হাদিসশাস্ত্রবিদদের একটি দল[২১৬] মেহেদী সম্পর্কীয় বহু হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে তিরমিজী আবু দাউদ, বাজ্জাজ, ইবনে মাজা, হাকেম, তিবরানী, আবু ইয়ালা আল-মোশেলী প্রমুখ দ্যিমান। তারা একদল[২১৭] সাহাবীর

---

২১৬. তিরমিজী—২৫ পৃষ্ঠার ৬৬ নং টীকা দ্র:। আবু দাউদ—সুলায়মান ইবনে আশআস; ২০২-৭৫ (৮১৮-৮৯ খ্রি:)। রাজ্জাজ—আহমদ ইবনে আমর; মৃত্যু ২৯২ (৯০৫ খ্রি:) হি:। ইবনে মাজা-মুহম্মদ ইবনে ইয়াজিদ; ২০৯-৭০ (৮২৫-৮৭ খ্রি:) হি:। হাকেম—১১১ পৃষ্ঠা ১০৫ টীকা দ্র:। তিরবানী—সুলায়মান ইবনে আহমদ; ২৬০-৩৬০ (৮৭৩-৯৭১ খ্রি:) হি:)। আবু ইয়ালা আল মোশেলী—আহমদ ইবনে আলী; মৃত্যু ৩০৭ (৯২০ খ্রি:) হি.।

২১৭. ইবনে মাসউদ—আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ। আবু সাইদ খুদরী—সাদ ইবনে মালিক; মৃত্যু ৬৩-৬৫ (৬৮২-৮৫ খ্রি:) হি:। উম্মে হাবিবা—হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর স্ত্রী। উম্মে সলমা—হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর স্ত্রী। সউবান—সউবান ইবনে বজদুদ; মৃত্যু ৫৪ (৬৪৪ খ্রি:) হি:। কুর্রা ইবনে ইয়াস—মৃত্যু ৬৪ (৬৮৪ খ্রি:) হি.। আলী হেলালী—অজ্ঞাত (?)। আব্দুল্লাহ্ ইবনে হারেস—ইবনে জজ—মৃত্যু ৮৫-৮৮ (৭০৪-৭০৭ খ্রি:) হি:।

প্রতি এ সকল হাদিসের সূত্র নির্দেশ করেছেন; যেমন আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, তালহা, ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা, আনাস, আবুসাইদ খুদরী, উম্মে হাবিবা, উম্মে সলমা, সউবান, কুর্রা ইবনে ইয়াস, আলী হেলালী ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে হারেস ইবনে জজ। তাঁদের প্রতি নির্দেশিত সূত্রাদিতে অনেক সময়েই আপত্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে, যেমন আমরা পরে বর্ণনা করব। অবশ্য হাদিসশাস্ত্রবিদদের নিকট এটা সুপরিচিত যে, হাদিস বিচারের ক্ষেত্রে গুণগ্রাহিতা অপেক্ষা সমালোচনাকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। সুতরাং সূত্রটির কোনো কোনো ব্যাক্তির বিরুদ্ধে যদি উদাসীনতা, বিস্মৃতি, দুর্বলতা ও কুসংস্কারের আপত্তি উত্থাপিত হয়, তা হলে তা হাদিসটির বক্তব্য সম্পর্কে সন্দেহ জাগায় এবং তাকে মূল্যহীন করে তোলে। পাঠক, এ কথা বলবেন না যে, অনেক সময় এরূপ সন্দেহ বিশুদ্ধ দুটি সংকলনের সূত্রেও পাওয়া যায়। কারণ উক্ত দুটি সংকলনের বিষয় অনুসরণ ও তা কার্যকরীকরণ সম্পর্কে জাতির সর্বসম্মত মত বিদ্যমান। বস্তুত সর্বসম্মতি সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় সহায়তা ও সকল প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করে থাকে। কিন্তু উক্ত দুটি বিশুদ্ধ সংকলন ভিন্ন অন্যগুলোর জন্য এরূপ সুযোগ নেই। এ কারণেই শাস্ত্রবিদদের বর্ণনা অনুসারে আমরা এ সকল সংকলনের সূত্রাদির সমালোচনা করতে সক্ষম।

সুহায়লীর[২১৮] বর্ণনা অনুসারে আবুবকর ইবনে আবু খায়সামা[২১৯] তাঁর সংকলনে মেহেদী সম্পর্কীয় হাদিস সংগ্রহে কিছুটা আতিশয্য প্রদর্শন করেছেন। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিরল সূত্র হল 'ফাওয়ায়েদুল আখবার' নামক গ্রন্থে আবুবকর ইস্কাফের[২২০] বর্ণনা। এটা তিনি মালেক ইবনে আনাসের পূর্বে মুহম্মদ ইবনে মুনকাদির[২২১] ও তার পূর্বে জাবের[২২২] থেকে গ্রহণ করেছেন। উক্ত হাদিসে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন, "যে মেহেদীর বিষয়টি মিথ্যা বলবে, সে ধর্মচ্যুত হবে এবং যে দজ্জালের বিষয়টি মিথ্যা বলবে, সে মিথ্যাবাদী হবে।" পশ্চিমদিক থেকে সূর্যোদয়ের ক্ষেত্রেও এরূপ বলেছেন। আমার যতদূর মনে হয় এবং পাঠক, আপনারও মনে হবে, এটা অতিরঞ্জিত। মালেক ইবনে আনাস থেকে এরূপ হাদিসের সূত্র সম্পর্কে আল্লাহ্ই ভালো জানেন। কারণ আবুবকর ইস্কাফ হাদিসশাস্ত্রবিদদের কাছে সন্দেহজনক মিথ্যা হাদিস রচক।

তিরমিজী ও আবু দাউদ ইবনে আব্বাসের প্রতি নির্দেশিত সূত্র দ্বারা যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তা আসেম ইবনে আবু নজুদের[২২৩] ধারায়, যিনি সপ্ত কোরান পাঠ শাস্ত্রবিদদের অন্যতম, যর ইবনে হুবায়েশের[২২৪] প্রতি নির্দেশিত হয়েছে। ইনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন, "পৃথিবীর আয়ুষ্কাল শেষ

---

২১৮. আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ্; ৫০৮-৫৮১ (১১১৫-১১৮৫ খ্রি:) হি:।

২১৯. আহমদ ইবনে জুহায়ের; ১৮৫-২৭৯ (৮০১-৯৩ খ্রি:) হি:।

২২০. মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ ইবনে মালিক; ২৬৩-৩৫২ (৮৭৭-৯৫৩ খ্রি:)। অন্য কেউ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে।

২২১. জীবনকাল ৬০-১৩০ (৬৮০-৭৪৮ খ্রি:) হি:।

২২২. হয় জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্; মৃত্যু ৭৩ (৬৯৩ খ্রি:) হি: অথবা তাঁর সমসাময়িক জাবের ইবনে সামুরা।

২২৩. মৃত্যু ১২৭-২৮ (৭৪৪-৪৬ খ্রি:) হি:; পিতার নাম বাহদালা।

২২৪. মৃত্যু ৮০-৮৩ (৬৯৯-৭০৩ খ্রি:) হি:।

হয়ে যদি একটি দিনও অবশিষ্ট থাকে, তা হলেও আল্লাহ্ সেই দিনটিকে এত দীর্ঘ করবেন, যাতে তিনি এমন একজন লোককে প্রেরণ করতে পারেন, যে আমার অনুসারী কিংবা আমার বংশান্তর্গত হবে এবং যার নিজের নাম আমার নাম ও পিতার নাম আমার পিতার নামের অনুরূপ হবে।" এটা আবু দাউদের বর্ণনা এবং তিনি তার সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। অবশ্য তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তিকায় বলেছেন যে, তাঁর সংকলনে যে হাদিস সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে, তা ভালো। তিরমিজীর বর্ণনা হল, যতদিন না আরবের উপর আমার বংশান্তর্গত এমন একজন লোক আধিপত্য বিস্তার করবে, যার নাম আমার নামের ন্যায় হবে, ততদিন পৃথিবীর আয়ু শেষ হবে না। অন্য একটি বর্ণনায়, যতক্ষণ না আমার বংশান্তর্গত কোনো লোক আধিপত্য বিস্তার করবে এই উভয় বর্ণনায় হাদিসটি তিরমিজীর নিকট ভালো ও শুদ্ধ। তিরমিজী ও আবু দাউদ আবু হুরায়রা পর্যন্ত অপেক্ষিত অন্য একটি ধারায়ও এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাকেম বলেন, সউরী, শুবা, যায়েদ[২২৫] ও অন্যান্য মুসলিম শাস্ত্রবিদগণ আসেম থেকে এটা বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, আব্দুল্লাহ্ থেকে যর ও যর থেকে আসেম বর্ণিত সবগুলোর ধারাই শুদ্ধ। কারণ তিনি আসেম থেকে বর্ণিত বিভিন্ন হাদিস দ্বারা প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। এবং তাঁকে মুসলিম ধর্মশাস্ত্রবিদদের অন্যতম বলে মনে করেন।

অবশ্য আসেম সম্পর্কে আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, তিনি ভালো লোক ছিলেন; কোরান পাঠ শাস্ত্রবিদ, সদাচারী ও নির্ভরশীল। কিন্তু আমাশ[২২৬] তাঁর অপেক্ষাও অধিকতর স্মৃতিধর। হাদিস বিচারের ক্ষেত্রে শুবা আমাশকে তাঁর উপর প্রাধান্য দিতেন। আজলী[২২৭] বলেন, আসেমের বর্ণনায় যর ও আবু ওয়ায়েল[২২৮] সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। এটা দ্বারা তিনি উক্ত দুইজন থেকে বর্ণিত বিষয়ের দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মুহম্মদ ইবনে সাদ বলেন, তিনি নির্ভরশীল ছিলেন, যদিও তাঁর হাদিসে বহু ভুল বিদ্যমান। ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান[২২৯] বলেন, তাঁর হাদিসে অস্থিরতা রয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে আবু হাতেম[২৩০] বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম যে, আবু যুরআ[২৩১] আসেমকে নির্ভরশীল বলে মনে করেন। উত্তরে তিনি বললেন,[২৩২] তার মর্যাদা তদ্রূপ নয়। তার সম্পর্কে ইবনে উলাইয়া[২৩৩] সমালোচনা করে বলেছেন, আসেম নামীয় সকল ব্যক্তিই বিস্মৃতিপরায়ণ। আবু হাতেম বলেন, তার মর্যাদা আমার নিকট সত্য ও ভালো হাদিস বর্ণনাকারী হিসাবে গ্রহণযোগ্য হলেও তিনি তার জন্য প্রয়োজনীয়

২২৫. সউরী-সুফিয়ান ইবনে সাইদ; মৃত্যু ১৬১ (৭৭৮ খ্রি:) হি:। শুবা ইবনে হাজ্জাজ, মৃত্যু ১৬০ (৭৭৭ খ্রি:) হি:। যায়েদা ইবনে কুদামা; মৃত্যু ১৬০—৬৩ (৭৭৭-৮৩ খ্রি:) হি:।

২২৬. সুলায়মান ইবনে মেহরান; মৃত্যু ১৪৭/৪৮ (৭৬৪/৬৫ খ্রি:) হি:।

২২৭. আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালেহ; ১৮২-২৬০ (৭৯৯৮৭৪ খ্রি:) হি:।

২২৮. শকিক ইবনে সলিমা; (?)।

২২৯. মৃত্যু ২৭৭ (৮৯১ খ্রি:) হি:।

২৩০. জীবনকাল—২৪০-৩২৭ (৮৫৫-৯৩৯ খ্রি:) হি:।

২৩১. আবু হাতেম মুহম্মদ ইবনে ইদরিস আররাজী; মৃত্যু ২৭৭ (৮৯০ খ্রি:) হি:।

২৩২. উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল করিম; ২০০-২৬৪ (৮১৫-৮৭৪ খ্রি:) হি:।

২৩৩. ইসমাইল ইবনে ইব্রাহিম; ১১০-১১৩ (৭২৯-৮০৯ খ্রি:) হি:।

স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে নেসারীর[২৩৪] মত বিচিত্র। ইবনে হেরাশ[২৩৫] বলেন, তার হাদিসে ত্রুটি আছে। আবুজাফর উকাইলী[২৩৬] বলেন, তার মধ্যে স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা ব্যতীত অন্য কোনো ত্রুটি ছিল না। দারু কুতনী[২৩৭] বলেন, তার স্মৃতির ব্যাপারে বক্তব্য আছে। ইয়াহিয়া বাত্তান[২৩৮] বলেন, আমি আসেম নামীয় প্রতিটি ব্যক্তিকেই দুর্বল স্মৃতির অধিকারী পেয়েছি। তিনি আরো বলেন, আমি শুবাকে বলতে শুনেছি, আসেম ইবনে আবু নজুদ আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করতেন, অথচ মানুষ তার সম্পর্কে নানা কথা বলত। যাহাবী[২৩৯] বলেন, তিনি কোরান পাঠশাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য, কিন্তু হাদিসে তদ্রূপ নয়। তিনি সত্যবাদী, বুদ্ধিমান ও সুন্দর হাদিস বর্ণনাকারী।

যদি কেউ বলেন যে, তার নিকট থেকে বোখারী ও মুসলিম হাদিস বর্ণনা করেছেন, তা হলে তার উত্তর বলব, তারা অন্যের সাথে যুক্তভাবে তার হাদিস বর্ণনা করেছেন, এককভাবে নয় এবং আল্লাহ্ই সর্বোত্তম জ্ঞাতা।

মেহেদী সম্পর্কীয় অধ্যায়ে আবু দাউদ আলী (রাঃ) থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। ফিতর ইবনে খলিফা[২৪০] কাসেম ইবনে আবু মুর্রা[২৪১] থেকে ও কাসেম আবু তুফায়েল[২৪২] থেকে এর বর্ণনা দিয়েছেন। নবী (সঃ) বলেছেন, যদি সময়ের একটি দিনও অবশিষ্ট থাকে, তথাপি আল্লাহ্ আমার বংশ থেকে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন, যে এ পৃথিবীকে তেমনিভাবে ন্যায়ের দ্বারা পূর্ণ করবে, যেমন তা অন্যায়ের দ্বারা পূর্ণ ছিল। ফিতর ইবনে খলিফাকে যদিও আহমদ, ইয়াহিয়া ইবনে কাত্তান, ইবনে মুঈন[২৪৩], নেসারী ও অন্যরা নির্ভরযোগ্য বলে মত দিয়েছেন, তথাপি আজলী তাঁর সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি ভালো হাদিস বর্ণনা করেন এবং তাঁর মধ্যে কিঞ্চিৎ শিয়া প্রবণতা আছে। ইবনে মুঈন একবার বলেছেন ইনি নির্ভরযোগ্য শিয়া মতাবলম্বী। আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে ইউনুস[২৪৪] বলেছেন, আমরা ফিতরের নিকট গেলেও যেহেতু তিনি পরিত্যাক্ত, সেজন্য আমরা তার নিকট থেকে হাদিস লিখতাম না। অন্য একবার বলেছেন, আমি ফিতরের নিকট গেলেও তাকে কুকুরের ন্যায় পরিত্যাগ করতাম। দারুকুতনী বলেছেন, তাকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা যায় না। আবুবকর ইবনে আইয়াশ[২৪৫] বলেছেন, আমি একমাত্র তার খারাপ মতাদর্শের জন্যই তার নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা ত্যাগ করেছি। জুরজানা[২৪৬] বলেছেন, অস্থিরমতি নির্ভরযোগ্য নয়। শেষ।

---

২৩৪. প্রসিদ্ধ ছয়টি হাদিস সংকলনের অন্যতম সংকলক; আহমদ ইবনে আলী; ২১৫—৩০০ (৮৩০-৯১৫ খ্রি:) হি:।
২৩৫. আহমদ ইবনে হাসান; ১৮৩-২৪৩ (৮০০-৮৫৮ খ্রি:) হি:।
২৩৬. মুহম্মদ ইবনে আমর; মৃত্যু ৩২২ (৯৩৪ খ্রি:) হি:।
২৩৭. আলী ইবনে উমর; ৩০৬-৩৮৫ (৯১৯-৯৯৫ খ্রি:) হি:।
২৩৮. ইয়াহিয়া ইবনে সাইদ; ১২০-১৯৮ (৭৩৮-৮১৩ খ্রি:) হি:।
২৩৯. মুহম্মদ ইবনে আলী; ৬৭৩-৭৪৮ (১২৭৪-১৩৪৮ খ্রি;) হি:
২৪০. মৃত্যু ১৫৩ (৭৭০ খ্রি:) হি:।
২৪১. মৃত্যু ১১৪-১২৫ (৭৩০-৭৪৩ খ্রি:) হি:; ইবনে বাজ্জা।
২৪২. আমর ইবনে ওসিলা; মৃত্যু ১০০ (৭১৯ খ্রি:) হি:।
২৪৩. ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন; ১৫৮-২৩৩ (৭৭৫-৮৪৮ খ্রি:) হি:।
২৪৪. জীবনকাল ১৪৩-২২৭ (৭৬১-৮৪২ খ্রি:) হি:।
২৪৫. মৃত্যু ১৯২-৯৪ (৮০৭-১০ খ্রি:) হি:।
২৪৬. ইব্রাহিম ইবনে ইয়াকুব; মৃত্যু ২৫৯ (৮৭৩ খ্রি:) হি:।

আবু দাউদ আলী (রাঃ)-র প্রতি নির্দেশিত সূত্রে যথাক্রমে হারুন ইবনে মুগিরা, উমর ইবনে আবু কায়েস, শুয়ায়েব ইবনে আবু খালেদ, আবু ইসহাক সাবিয়ী[২৪৭] থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আলী তাঁর পুত্র হুসাইনের প্রতি তাকিয়ে বললেন, আমার এ পুত্র নেতা, যেমন তাকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এই নাম দিয়েছেন। অচিরেই তার বংশ থেকে এমন এক ব্যক্তি প্রকাশ পাবে, যার নাম তোমাদের নবীর নামের অনুরূপ হবে; সে তাঁর চরিত্র পাবে; কিন্তু দেহ পাবে না। সে পৃথিবীকে ন্যায়ের দ্বারা পূর্ণ করবে। হারুন বলেছে, উমর ইবনে আবু ফয়েস মুতরেফ ইবনে তরিফ[২৪৮] থেকে, সে আবুল হাসান থেকে সে হেলাল ইবনে উমর থেকে আমাদের নিকট হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে, আলীকে বলতে শুনেছি যে, নবী (সঃ) বলেছেন, মাওরায়ান্নাহার থেকে এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করবে, যার নাম হারেস এবং তার অগ্রবাহিনীতে এক ব্যক্তি থাকবে, যার নাম মনসুর; সে কষ্ট স্বীকার করবে অথবা আশ্রয়স্থল হবে নবী বংশের জন্য, যেমন কোরায়েশরা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর আশ্রয়স্থল হয়েছিল। প্রত্যেক বিশ্বাসীর উপর তাকে সাহায্য করা অথবা বললেন, তার ডাকে সাড়া দেয়া অবশ্য কর্তব্য হবে। আবু দাউদ এ হাদিসটি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। অন্যত্র তিনি হারুন সম্পর্কে বলেছেন, সে শিয়া সন্তান। সুলায়মানী[২৪৯] বলেছেন, তার বিষয়টি বিতর্কিত। আবু দাউদ উমর ইবনে আবু কয়েস সম্পর্কে বলেছেন, তার সম্পর্কে অসুবিধা নেই; কিন্তু তার হাদিসে ভুল আছে। যাহাবী বলেছেন, সত্যবাদী, তবে সন্দেহ আছে। আবু ইসহাক সাবিয়ী সম্পর্কে বলতে গেলে যদিও বিশুদ্ধ দুটি সংকলনে তার হাদিস বিদ্যমান, তথাপি এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, সে শেষ জীবনে গোলমাল করেছে এবং আলী থেকে তার হাদিসটি বিচ্ছিন্ন সূত্র। অনুরূপ হারুন ইবনে মুগিরা থেকে আবু দাউদের বর্ণনা। দ্বিতীয় সূত্রটির মধ্যে আবুল হাসান ও হেলাল ইবনে উমরের পরিচয় অজ্ঞাত। আবুল হাসান একমাত্র মুতরেফ ইবনে তরিফের হাদিসের মাধ্যমেই পরিচিত হয়েছে। শেষ।

আবু দাউদ আরো একটি এবং অনুরূপভাবে ইবনে মাজা ও হাকেম তাঁর 'আল-মুস্তাদরক' গ্রন্থে সলমা থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এটা আলী ইবনে নুফায়েলের[২৫০] ধারায় সাইদ ইবনে মুসাইয়ের থেকেও সে উম্মে সলমা থেকে বর্ণনা করেছে যে, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি; মেহেদী ফাতেমার সন্তান। হাকেমের বর্ণনা, আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে মেহেদীর বর্ণনা করতে শুনেছি; তিনি বলেছেন, "হ্যাঁ, সে সত্য; সে ফাতেমার সন্তান।" এ হাদিসটি সম্পর্কে শুদ্ধ বা অনুরূপ কোনো মন্তব্য করা হয়নি। আবু জাফর উকাইলী এটাকে দুর্বল বলে মত প্রকাশ করে বলেছেন, এ হাদিসের বর্ণনায় আলী ইবনে নুফায়েলকে অন্য কেউ অনুসরণ করেনি এবং তার পরিচয় এ স্থলেই সীমাবদ্ধ।

আবু দাউদ আরো একটি হাদিস উম্মে সলমা থেকে বর্ণনা করেছেন, যা যথাক্রমে সালেহ ইবনে খলিল,[২৫১] তার এক সঙ্গী এবং উম্মে সলমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

---

২৪৭. আমর ইবনে আব্দুল্লাহ্; মৃত্যু ১২৬-১২১ (৭৪৩-৭৪৭ খ্রি:) হি:।

২৪৮. মৃত্যু ১৪০-১৪৩ (৭৫৭-৭৬১ খ্রি:) হি:।

২৪৯. আহমদ ইবনে আলী ইবনে আমর; ৩১১-৪০৪ (৯২৪-১০১৪ খ্রি:) হি:।

২৫০. মৃত্যু ১২৫ (৭৪৭ খ্রি:) হি:।

২৫১. শুদ্ধ নাম সম্ভবত আবু খলিল সালেহ ইবনে আবু মারয়ম। কেননা পরে আবু খলিল বলে উল্লেখিত হয়েছে।

কোনো এক খলিফার মৃত্যুর সময় মতানৈক্য দেখা দিবে। তখন এক ব্যক্তি মদিনা থেকে মক্কার দিকে পলায়ন করবে। সেখানে মক্কাবাসীরা তাকে বিদ্রোহ করতে বলবে এবং তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা কাবার স্তম্ভ ও মকামে ইব্রাহিমের মধ্যবর্তী স্থলে তাঁর হাতে হাত রেখে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবে। সিরিয়া থেকে তাঁর বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করা হবে। তারা মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী প্রান্তরে ধ্বসে যাবে। মানুষ এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর তাঁর নিকট সিরিয়ার সাধু ব্যক্তিরা এবং ইরাকের বিভিন্ন গোত্র এসে আনুগত্যের শপথ নিবে। অতঃপর কোরায়েশ থেকে এক ব্যক্তি উত্থিত হবে যার মাতুল গোষ্ঠী বনি কেলাব। এর পর তাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করবে এবং তাদের উপর জয়ী হবে। এ অভিযান বনি কেলাবের এবং যারা বনি কেলাবের লুণ্ঠিত দ্রব্যের দর্শক না হবে, তারা সফল হতে পারবে না। সে সম্পদ বণ্টন করবে এবং মানুষের মধ্যে তাদের নবী (সঃ)-এর বিধান অনুসারে কাজ করবে। পৃথিবীতে ইসলামকে আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করবে। সে সাত বছর থাকবে। অনেকে বলেন,[২৫২] নয় বছর। অতঃপর আবু দাউদ এই হাদীসটি আবু খলিলের বর্ণনা হতে উদ্ধৃত করেছেন। আবু খলিল এটা আব্দুল্লাহ্ ইবনে হারেস[২৫৩] থেকে এবং সে উম্মে সলমা থেকে বর্ণনা করেছে। এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী সূত্রটির সঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এই সূত্রের ব্যক্তিবর্গ বিশুদ্ধ সংকলনদ্বয়ের মাপকাঠিতে গৃহীত। তাদের মধ্যে আপত্তিজনক ও রহস্যজনক কিছু নেই।

কখনো বলা হয় যে, এ হাদিসটি কাতাদার বর্ণনা। সে আবু খলিল থেকে এটা গ্রহণ করেছে। কাতাদা অবশ্য এটা শোনেনি; সে শুধু নির্দেশ করেছে। এরূপ সন্দেহজনক ব্যক্তির হাদিস তখনই গ্রহণ করা যায়, যখন তা শ্রুতির দ্বারা সমর্থিত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও উক্ত হাদিসটিতে মেহেদীর সুস্পষ্ট কোনো উল্লেখ নেই। শুধু আবু দাউদ তাকে এতদ্‌সম্পর্কীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ আরো একটি হাদিস আবু সাইদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁকে অনুসরণ করেছেন হাকেম। উক্ত হাদিসটি ইমরান কাত্তান[২৫৪] কাতাদা[২৫৫] থেকে, কাতাদা আবু বসরা[২৫৬] থেকে ও আবু বসরা আবু সাইদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, মেহেদী আমার বংশের, প্রশস্ত কপাল, উন্নত নাসা, পৃথিবীকে ন্যায় ও সুবিচারে পরিপূর্ণ করবে, যেমন তা অন্যায় ও অবিচারে পূর্ণ ছিল। সে সাত বছর রাজত্ব করবে। এটা আবু দাউদের বর্ণনা এবং তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। হাকেমের বর্ণনা—মেহেদী আমাদের বংশের, উন্নত নাসা, উন্নত, প্রশস্ত; পৃথিবীকে ন্যায় ও সুবিচারে পরিপূর্ণ করবে, যেমন তা অন্যায়-অবিচারে পূর্ণ ছিল। বাঁচবে এরূপ—তিনি তাঁর বাম হাত প্রসারিত করলেন এবং ডান হাতের বৃদ্ধা ও তর্জনী ব্যতীত অন্য তিনটি

---

২৫২. এটা হিশাম ইবনে উরুয়া হতে; মৃত্যু ১৪৫-৪৭ (৭৬২-৬৫ খ্রি:) হি:।
২৫৩. মৃত্যু ৭৯-৮৪ (৬৯৮-৭০৩ খ্রি:) হি:।
২৫৪. ইমরান ইবনে দোয়ার।
২৫৫. কাতাদা ইবনে দায়মা; মৃত্যু ১১৭ (৭৩৫ খ্রি:) হি:।
২৫৬. আবু নযরা (?); মুনযির ইবনে মালিক; মৃত্যু ১০৮/৯ (৭২৬/২৮ খ্রি:) হি:।

আঙুল গুটিয়ে রাখলেন। হাকেম বলেন, মুসলিমের শর্তানুসারে এটা শুদ্ধ হাদিস; যদি বোখারী ও মুসলিম এটা বর্ণনা করেননি। শেষ।

ইমরান কাত্তানের প্রামাণ্য সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। বোখারী তার হাদিস আলোচনার জন্য গ্রহণ করেছেন, বর্ণনার জন্য নয়। ইয়াহিয়া কাত্তান তার নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেননি। ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন বলেন, খুব দৃঢ় নয়। অন্যত্র বলেন, কোনো কিছুই নয়। আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, আশাকরি সে ভাল হাদীস বর্ণনা করবে। ইয়াজিদ ইবনে যুরাই[২৫৭] বলেন সে হারবিয়া[২৫৮] ছিল। মুসলমানদেরকে[২৫৯] হত্যা করা বৈধ মনে করত। নেসায়ী বলেন, দুর্বল। আবু উবাইদ আজুরী[২৬০] বলেন, আমি আবু দাউদকে তার সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম; তিনি বললেন, ভালো হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে অন্যতম। আমি তার ভালো ছাড়া মন্দ শুনিনি। অন্য একবার তাকে বলতে শুনেছি, দুর্বল; সে ইব্রাহিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসানের[২৬১] সময়ে বড় কঠোর ধর্মীয় বিধান দিত। তাতে রক্তপাত ছিল।

তিরমিজী, ইবনে মাজা ও হাকেম আবু সাইদ খুদরী থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যা যায়েদ আম্মীর[২৬২] ধারায় আবু সিদ্দিক নাজী[২৬৩] থেকে বর্ণিত হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী বলেছেন, আমরা কোনো কিছু ঘটার আশঙ্কা করে আল্লাহ্‌র নবী(সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে মেহেদী আত্মপ্রকাশ করবে এবং সে পাঁচ, সাত অথবা নয় জীবিত থাকবে। খুদরী বলেছেন, এরূপ সংখ্যায় সন্দেহ হলে আমরা বললাম, এগুলো কি? তিনি বললেন, বছর। আরো বললেন, তার নিকট কোনো একব্যক্তি এসে বলবে, হে মেহেদী আমাকে কিছু দাও! তিনি বললেন, তার কাপড়ে সে যে পরিমাণ বহন করতে পারে, ততটুকু ঢেলে দেবে। এটা তিরমিজীর বর্ণনা না এবং তিনি এটাকে ভালো হাদিস বলেছেন। আবু সাইদ ছাড়া অন্যদিক থেকেও নবী (সঃ) থেকে এটা বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজা ও হাকেমের বর্ণনা, আমার উম্মতের মধ্যে মেহেদী হবে এবং কম করে হলেও সাত কিংবা নয় বছর পর্যন্ত থাকবে। আমার উম্মত তার মধ্যে এমন সমৃদ্ধির সাক্ষাৎ পাবে, যা তারা আর কখনো পায়নি। পৃথিবী প্রচুর শস্য দিবে এবং তা কেউ সঞ্চয় করবে না। সম্পদ তখন স্তূপীকৃত। তখন কোনো একব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলবে, হে মেহেদী, আমাকে কিছু দাও। সে বলবে, নাও। শেষ।

যায়েদ আম্মী সম্পর্কে যদিও দারু কুতনী, আহমদ ইবনে হাম্বল ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন প্রমুখ জ্ঞানী বলেছেন যে, সে ভালো এবং আহমদ আরো বাড়িয়ে বলেছেন যে, সে ইয়াজিদ রাক্কাশী[২৬৪] ও ফজল ইবনে ইস।[২৬৫] থেকেও বেশি মর্যাদার অধিকারী, তথাপি তার সম্পর্কে আবু হাতেম বলেছেন, দুর্বল। তার হাদিস লেখা হয়; তিন্তু তা দিয়ে প্রমাণ

---

২৫৭. জীবনকাল ১০১—৮২ (৭২০—৯৯ খ্রি:) হি:।
২৫৮. খারেজী শিয়াদের একটি সম্প্রদায়।
২৫৯. খারেজী ব্যতীত অন্য মুসলমানদেরকে।
২৬০. মুহম্মদ ইবনে আলী।
২৬১. ইনি সম্রাট আল মনসুর আব্বাসীর সময় ১৪৫ (৭৬৩ খ্রি:) হিজরীতে নিহত হন। ২৩২ পৃষ্ঠা দ্র:।
২৬২. যায়েদ ইবনে হাওয়ারী।
২৬৩. বকর ইবনে আমর/কয়েস; মৃত্যু ১০৮ (৭২৮ খ্রি:) হি:।
২৬৪. ইয়াজীদ ইবনে আবান; মৃত্যু ১১০-১২০ (৭২৮-৭৩৮ খ্রি:) হি:।
২৬৫. উক্ত ইয়াজীদের ভাগিনেয়।

গ্রহণ করা হয় না। ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন অন্য একটি বর্ণনায় বলেছেন, কোনো কিছুই নয়। অন্য এক সময় বলেছেন, তার হাদিস লেখা হয় এবং সে দুর্বল। জুরজানী বলেন, নির্ভরশীল। আবু যুর্‌আ বলেন, দৃঢ় নয়; বাজে হাদিস বর্ণনাকারী, দুর্বল। আবু হাতেম বলেন, তদ্রূপ নয়; তার নিকট থেকে শুবা হাদিস বর্ণনা করেছেন। নেসায়ী বলেন, দুর্বল। ইবনে আদী[২৬৬] বলেন, খুব সাধারণ হাদিস বর্ণনা করে এবং যারা শুবা তার নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন বলে তার হাদিস গ্রহণ করে, তারা দুর্বল সম্ভবত শুবাও তার অপেক্ষা দুর্বল কারো নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেননি।

কখনো বলা হয়, মুসলিম তাঁর সংকলনে জাবের থেকে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তিরমিজীর হাদিসটি তার ব্যাখ্যা হিসাবে উপস্থিত হয়। জাবেন বলেছেন, রসূলুল্লাহ্‌ও বললেন, আমার উম্মতের শেষের দিকে এমন একজন খলিফা হবে, যে সম্পদ ঢেলে দিবে, তা কখনো গণনা করবে না। আবু সাইদের একটি হাদিসে আছে, তিনি বললেন, তোমাদের খলিফাদের মধ্যে এমন একটি খলিফা হবে, যে সম্পদ ঢেলে দিবে। উক্ত উভয়ের নিকট থেকে অন্য এক ধারায়, শেষ সময়ে এমন একজন খলিফা হবে, যে সম্পদ বন্টন করবে, অথচ তা গণনা করবে না। শেষ।

মুসলিমের হাদিসগুলোতে মেহেদীর কোনো বর্ণনা নেই এবং এমন কোনো প্রমাণও নেই যে, এগুলোর দ্বারা তাই উদ্দেশ্য ছিল। হাকেম আরো একটি হাদিস আউফ আরাবীর[২৬৭] ধারায় আবু সিদ্দিক নাজী হয়ে আবু সাইদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন। খুদরী বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, প্রলয় আসবে না, যতক্ষণ না পৃথিবী অন্যায়, অবিচার ও উৎপীড়নে পরিপূর্ণ হবে। অতঃপর আমার বংশ থেকে একব্যক্তি বের হবে, যে তাকে ন্যায় ও সুবিচারে পূর্ণ করবে, যেমন তা অবিচার-উৎপীড়নে পূর্ণ।

এ সম্পর্কে হাকেম বলেছেন, হাদিসটি বোখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে শুদ্ধ। অবশ্য তারা এ হাদিস বর্ণনা করেননি। হাকেম এটাকে সুলায়মান ইবনে উবায়েদের[২৬৮] ধারাতে ও আবু সিদ্দিক নাজী হয়ে আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমার উম্মতের শেষের দিকে মেহেদী বের হবে। আল্লাহ্ তাকে খুব বৃষ্টি দিবেন, পৃথিবী শস্যাদি দিবে, সম্পদ পরিপূর্ণ হবে, পশু সম্পদ বাড়বে এবং উম্মত বৃহদাকার হয়ে উঠবে। সে সাত কিংবা আট বাঁচবে, অর্থাৎ বছর। হাকেম বলেন, হাদিসের সূত্রটি শুদ্ধ; যদিও বোখারী ও মুসলিম তা বর্ণনা করেননি। এই সঙ্গে সুলায়মান ইবনে উবায়েদের হাদিস ছয়টি হাদিস সংকলনে কেউই বর্ণনা করেননি। অবশ্য ইবনে হাব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের মধ্যে গণ্য করেন এবং এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, কেউ তার সম্পর্কে কথা বলেছেন।

অতঃপর হাকেম এটাকে আসদ ইবনে মুসার[২৬৯] ধারাতেও যথাক্রমে হাম্মাদ ইবনে সলমা,[২৭০] মাতর ওয়ার্রাক[২৭১] ও আবু হারুন আবদী,[২৭২] আবু সিদ্দিক নাজী হয়ে আবু

---

২৬৬. আবদুল্লাহ্ ইবনে আদী; ২৭৭-৩৬৫ (৮৯১-৯৭৬ খ্রি:) হি:।
২৬৭. আউফ ইবনে আবু জামিলা; ৫৯-১৪৭ (৬৭৮-৭৬৪ খ্রি:) হি:।
২৬৮. এক বর্ণনায় পিতার নাম 'আবিদ'।
২৬৯. জীবনকাল ১৩২-২১২ (৭৫০-৮২৮ খ্রি:) হি:।
২৭০. মৃত্যু ১৬৭ (৭৮৪ খ্রি:) হি:।
২৭১. মাতর ইবনে রহমান; মৃত্যু ১৪০ (৭৬৮ খ্রি:) হি: (?)।
২৭২. উমারা ইবনে জোয়ান।

সাইদ থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, পৃথিবী অন্যায়-অবিচারে পূর্ণ হবে; তখন আমার বংশাবলি থেকে একব্যক্তি প্রকাশ পাবে, সে সাত অথবা নয় রাজত্ব করবে। সে পৃথিবীকে ন্যায় ও সুবিচারে পূর্ণ করবে, যেমন তা অন্যায়-অবিচারে পূর্ণ ছিল। হাকেম এতে বলেছেন, এ হাদিসটি মুসলিমের শর্তানুসারে শুদ্ধ ও ভালো। এর উপর মুসলিমের শর্তারোপের কারণ এই যে, তিনি এটা হাম্মাদ ইবনে সলমা ও তার উস্তাদ মাতর ওয়ার্রাকের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তার অন্য উস্তাদ আবু হারুন আবদীর নিকট থেকে মুসলিম হাদিস বর্ণনা করেননি। ইনি অনেক দুর্বল; মিথ্যার সন্দেহযুক্ত। তার দুর্বলতা প্রকাশ করার জন্য হাদিসশাস্ত্রবিদদের মতামতের বিস্তারিত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অবশ্য তার বর্ণনাকারী আসাদ ইবনে মূসা, যিনি 'আসাদুসসুন্না' (হাদিসসিংহ) নামে খ্যাত, হাম্মাদ ইবনে সলমা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তার সম্পর্কে যদিও বোখারী বলেছে, প্রসিদ্ধ হাদিসবেত্তা; তিনি তার বিশুদ্ধ সংকলনে আলোচনার জন্য তার হাদিস গ্রহণও করেছেন এবং আবু দাউদ ও নেসায়ী তার হাদিস দ্বারা প্রমাণ উপস্থিত করেছেন, তথাপি অন্য একসময় তিনি বলেছেন, নির্ভরযোগ্য, তবে তিনি গ্রন্থ রচনায় না গেলেই ভালো করতেন। তার সম্পর্কে মুহম্মদ ইবনে হযম[২৭৩] বলেছেন, অন্যায্য হাদিস বর্ণনাকারী।

তিবরানী এটাকে তার মধ্যম সংকলনে আবুল ওয়াসেল আবদুল হামিদ ইবনে ওয়াসেল থেকে বর্ণনা করেছেন। আবুল ওয়াসেল আবু সিদ্দিক নাজী থেকে, নাজী হাসান ইবনে ইয়াজিদ সাদী—বনি বাহদালাদের একজন থেকে এবং সাদী আবু সাইদ খুরদী থেকে গ্রহণ করেছেন। খুদরী বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মত থেকে এমন একব্যক্তি আবির্ভূত হবে, যে আমার বিধানের কথা বলবে; প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্ আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করাবেন; পৃথিবী তার প্রাচুর্য প্রকাশ করবে এবং পৃথিবী তার দ্বারা ন্যায় ও সুবিচারে পূর্ণ হয়ে উঠবে, যেমন তা অন্যায় ও অবিচারে পূর্ণ হয়েছিল। সে এই উম্মতের মধ্যে সাত বছর কাজ করবে এবং বয়তুল মুকাদ্দসে অবতীর্ণ হবে। তিররানী এর সম্পর্কে বলেন, হাদিসটি একদল লোক বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তাদের কেউই তার ও আবু সাইদের মধ্যে আবুল ওয়াসেল ব্যতীত অন্য কাউকেও আনেননি এবং ইনিই হাসান ইবনে ইয়াজিদ হয়ে আবু সাইদ বর্ণনা করেছেন। শেষ।

এই হাসান ইবনে ইয়াজিদ সম্পর্কে ইবনে আবু হাতেম উল্লেখ করেছেন এবং আবু সাইদ খুদরী থেকে বর্ণিত তার এ হাদিসের সূত্র ব্যতীত তার অতিরিক্ত কোনো পরিচয় তুলে ধরেননি। আবু সিদ্দিক ও আবু সাইদ থেকে বর্ণনা করেছেন। যাহাবী তাঁর 'মিজান' নামক গ্রন্থে বলেছেন, হাসান অপরিচিত; কিন্তু ইবনে হাববান তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য আবুল ওয়াসেল, যিনি আবু সিদ্দিক থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন, ছয়টি হাদিস সংকলনের কেউই তার হাদিস প্রকাশ করেননি। ইবনে হাববান তাকেও দ্বিতীয় স্তরের নির্ভরযোগ্যদের অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন।

---

২৭৩. বিখ্যাত স্পেনীয় জ্ঞানী; ২৩৪ পৃষ্ঠা, ৫৯ নং টীকা দ্র:।

তার সম্পর্কে আরো বলেছেন, ইনি আনাস থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং তার নিকট থেকে শুবা ও ইতাব ইবনে বিশর[২৭৪] হাদিস গ্রহণ করেছেন।

ইবনে মাজা তার 'কিতাবুস্‌সুনন' নামক সংকলনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এটা ইয়াজিদ ইবনে আবু যিয়াদের[২৭৫] ধারায় ইব্রাহিম[২৭৬] ও আলকামা[২৭৭] হয়ে আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ্‌র কাছে আছি, এমন সময় হাশেম বংশীয় একদল যুবক অগ্রসর হয়ে এল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাদেরকে দেখামাত্র তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হল ও তিনি বিবর্ণ হয়ে উঠলেন। আব্দুল্লাহ্ বলেন, আমি বললাম, আমরা এতক্ষণ আপনার মধ্যে কেমন একটা বিমর্ষভাব লক্ষ করেছি। তখন তিনি বললেন, আমাদের নবী বংশীয়দের জন্য আল্লাহ্ ইহকালের উপর পরকালকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমার বংশাবলি আমার পরে বিপদে পড়বে, নির্বাসিত হবে, বিতাড়িত হবে। এমন সময় পূর্বদিক থেকে একটি জাতি এগিয়ে আসবে, তাদের সাথে থাকবে কৃষ্ণ পতাকা। তারা কল্যাণ প্রার্থনা করবে; কিন্তু তা পাবে না। তখন তারা যুদ্ধ করবে, সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং যা চাইবে তাই দেয়া হবে; কিন্তু তারা গ্রহণ করবে না। অতঃপর তারা তাকে আমার বংশের একব্যক্তির নিকট প্রত্যার্পণ করবে এবং সে এটা সুবিচারে পূর্ণ করবে যেমন অবিচারে পূর্ণ ছিল। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার সাক্ষাৎ পায়, তবে যেন বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের নিকট আসে।

এ হাদিসটি হাদিসবেত্তাদের নিকট পতাকার হাদিস বলে পরিচিত। ইয়াজিদ ইবনে আবু যিয়াদ এর বর্ণনাকারী। শুবা এ হাদিস সম্পর্কে বলেছেন, এর বর্ণনাকারী যোগসূত্র স্থাপনকারী ছিলেন। অর্থাৎ ইনি যে হাদিস রসূলুল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছেনি, তাকে তাঁর সাথে সংযুক্ত করতেন। মুহম্মদ ইবনে ফুজায়েল[২৭৮] বলেছেন, ইনি শিয়াদের মহান নেতৃবৃন্দের অন্যতম। আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, তিনি হাদীস কণ্ঠস্থকারী ছিলেন না। অন্যত্র বলেছেন, তার হাদীস তদ্রূপ নয়। ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন বলেছেন, দুর্বল। আজলী বলেছেন, হাদীস গ্রহণ করা যায়। তবে শেষের দিকে তিনি হাদীস বুঝতে ছিলেন। আবু যুরআ[২৭৯] বলেছেন, নরম; তার হাদিস লিখা হয়, কিন্তু প্রমাণ হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। আবু হাতেম বলেছেন, দৃঢ় নয়। জুরজানী বলেছেন, আমি তাদেরকে তার হাদিসকে দুর্বল বলতে শুনেছিল। আবু দাউদ বলেছেন, আমি কাউকেও তার হাদিস ত্যাগ করেছে বলে জানি না। অবশ্য তার অপেক্ষা অন্যরা আমার নিকট অধিক প্রিয়। ইবনে আদী বলেছেন, ইনি কুফাবাসী শিয়াদের অন্তর্গত; দুর্বলতা সত্ত্বেও তার হাদিস লেখা হয়। মুসলিম তার নিকট থেকে অন্যের সাথে যুক্তভাবে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

---

২৭৪. মৃত্যু ১৮৮/৯০ (৮০/৬ খ্রি:) হি:।

২৭৫. জীবনকাল ৪৭-১৩৬ (৬৬৭-৭৫৩ খ্রি:) হি:।

২৭৬. আলকামার কাছ থেকে দুইজন ইব্রাহিম হাদিস বর্ণনা করেছেন; একজন হলেন ইব্রাহিম ইবনে মুয়ায়েদ এবং অন্যজন তদপেক্ষা বিখ্যাত ইব্রাহিম ইবনে ইরাজাদ নখলী। শেষোক্ত জন আলকামার ভাগিনেয় ও ৯৬ (৭১৫ খ্রি:) হিজরিতে মৃত্যু হয়।

২৭৭. আলকামা ইবনে কয়েস।

২৭৮. মৃত্যু ১৯৫ (৮১ খ্রি:) হি:।

২৭৯. হয় পূর্বোক্ত রাজী, না হয় দামেস্কী, আব্দুর রহমান ইবনে আমর; মৃত্যু ২৮২ (৮৯৫ খ্রি:) হি:।

মোটামুটি অধিকাংশই তার দুর্বলতার কথক। হাদিসবেত্তাগণ এ হাদিসটি, যা যথাক্রমে ইব্রাহিম, আলকামা ও আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তার দুর্বলতা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এটাই পতাকার হাদিস নামে খ্যাত। এর সম্পর্কে ওকি ইবনে জারাহ্[২৮০] বলেছেন, কোনো কিছুই নয়। অনুরূপভাবে আহমদ ইবনে হাম্বলও বলেছেন। আবু কুদামা[২৮১] বলেছেন, আমি আবু উসামাকে[২৮২] বলতে শুনেছি, ইব্রাহিম থেকে ইয়াজিদ কর্তৃক বর্ণিত পতাকার এ হাদিসটি সম্পর্কে সে যদি আমার নিকট পঞ্চাশটি দৃঢ় শপথও গ্রহণ করে, তথাপি আমি তাকে সত্য বলে মনে করব না। এটা কি ইব্রাহিমের মতাদর্শ? এটা কি আলকামার মতাদর্শ? এটা কি আবদুল্লাহ্র মতাদর্শ? উকাইলী এ হাদিসটিকে দুর্বলদের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। যাহাবী বলেছেন, শুদ্ধ নয়।

ইবনে মাজা আলী (রাঃ) থেকে ইয়াসীন আজলীর[২৮৩] বর্ণনায় ইব্রাহিম ইবনে মুহম্মদ ইবনে হানাফিয়া হয়ে তার পিতা ও পিতামহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আলী বলেছেন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, মেহেদী আমাদের বংশাবলির মধ্যে; আল্লাহ্ তার দ্বারা এক রাত্রিতে কল্যাণ সাধন করবেন। ইয়াসীন আজলী সম্পর্কে ইবনে মুঈন যদিও বলেছেন, কোনো অসুবিধা নেই; তথাপি বোখারীর মন্তব্য হল, তার সম্পর্কে বিরোধ আছে। তাঁর পরিভাষায় এই মন্তব্য অতিমাত্রায় দুর্বলতার সাক্ষ্য দেয়। ইবনে আদী তার গ্রন্থ 'কামেল' ও তাকে উদ্ধৃত করেছেন এবং যাহাবী তার 'মিজান' গ্রন্থে এ হাদিসটিকে তার প্রতি বিরূপ মন্তব্যের জন্য উল্লেখ করেছেন। তার সম্পর্কে বলেছেন যে, সে এর দ্বারাই পরিচিত।

তিব্রানী তার মধ্যম সংকলনে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রসূলুল্লাহ্! মেহেদী কি আমাদের মধ্যে হবে, না অন্যদের মধ্যে? তিনি বললেন, বরং আমাদের মধ্যে; আমাদের দ্বারাই আল্লাহ্ শেষ করবেন, যেমন আমাদের দ্বারা আরম্ভ করেছিলেন। আমাদের দ্বারাই তাদেরকে আল্লাহ্র অংশীদারিত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং আমাদের দ্বারাই প্রকাশ্য শত্রুতার পর তাদের অন্তঃকরণে সম্প্রীতি স্থাপন করবেন। যেমন আমাদের দ্বারা আল্লাহ্র অংশীদারিত্বের বিরোধের পর তাদের হৃদয়কে সংহত করেছিলেন। আলী বলেছিলেন, তারা বিশ্বাসী, না অবিশ্বাসী? তিনি বললেন, তারা গোলযোগ আক্রান্ত ও অবিশ্বাসী। শেষ।

এই সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে লাহিয়া[২৮৪] বিদ্যমান, সে দুর্বলতার জন্য সুপরিচিত। এতে উমর ইবনে জাবের হাজরামীও[২৮৫] রয়েছে, সে তার অপেক্ষাও দুর্বল। আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, জাবের থেকে অপরিচিত হাদিসই বর্ণনা করা হয়েছে এবং আমি জানতে পেরেছি যে, সে মিথ্যা বলত। নেসায়ী বলেছেন, দৃঢ় নয়। আরো বলেছেন,

---

২৮০. জীবনকাল ১৩১-৯৭ (৭৪৯-৮১২ খ্রি:) হি:।
২৮১. উবায়দুল্লাহ ইবনে সায়িদ; মৃত্যু ২৪১ (৮৫৬ খ্রি:) হি:।
২৮২. হাম্মাদ ইবনে উমাম; মৃত্যু ২০১ (৮১৭ খ্রি.) হি:।
২৮৩. ইয়াসীন ইবনে সায়বীন।
২৮৪. মৃত্যু ১৪৪ (৭৯১ খ্রি:) হি:।
২৮৫. মৃত্যু ১২০ (৭৩৮ খ্রি:) হিজরির পরে।

ইবনে লাহিয়া বৃদ্ধ, নির্বোধ ও অপরিপক্ব ছিল। সে বলত, আলী মেঘের উপর আছেন। সে আমাদের সঙ্গে বসা অবস্থায় কোনো মেঘ দেখলে বলত, এই যে আলী মেঘের সাথে চলে যাচ্ছেন। তিবরানী আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, শেষ সময়ে গোলযোগ দেখা দেবে। তাতে মানুষ এমনভাবে ধরা পড়বে, যেমন স্বর্ণ তার খনিতে বাঁধা পড়ে। তোমরা সিরিয়াবাসীদেরকে গালি দিও না; বরং তাদের মধ্যে দুষ্টমতিদেরকে গালি দাও। কেননা তাদের মধ্যে সাধু ব্যক্তি বিদ্যমান। আশঙ্কা হয়, সিরিয়াবাসীদের উপর আকাশ থেকে বিপদ নেমে আসবে, যাতে তাদের ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। এমন কি তাদের সাথে যদি তখন শৃগালেরাও যুদ্ধ করে, তা হলেও জয়ী হবে। এ সময় আমার বংশাবলি থেকে এক ব্যক্তি তিনটি পতাকাসহ আবির্ভূত হবে। কেউ অধিক বললে বলবে তাদের সংখ্যা পনের হাজার এবং কেউ অল্প বললে বলবে তাদের সংখ্যা বার হাজার। তাদের সংকেত হবে 'মার মার'। তারা সাতটি পতাকার সাক্ষাৎ পাবে। তাদের প্রতিটির নিচেই রাজ্যাকাঙ্ক্ষী বিদ্যমান। তারা সকলকেই হত্যা করবে। আল্লাহ্ মুসলমানদের মধ্যে তাদের সম্প্রীতি, সম্পদ, সীমান্ত ও পতাকা ফিরিয়ে দিবেন। শেষ।

এই সূত্রেও আবদুল্লাহ্ ইবনে লাহিয়া তার দুর্বলতার জন্য সুপরিচিত। হাকেম এ হাদিসটি তার গ্রন্থ 'মুস্তাদরক'-এ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, সূত্রের দিক থেকে শুদ্ধ। বোখারী ও মুসলিম তাঁদের বর্ণনায় গ্রহণ করেননি। অতঃপর হাশেমী আবির্ভূত হবে এবং আল্লাহ্ মানুষকে তাদের সম্প্রীতির দিক থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনাটির ধারায় ইবনে লাহিয়া নেই। তাই শুদ্ধ সূত্র, যেমন বর্ণনা করা হয়েছে। হাকেম তার মুস্তাদরকে আলী (রাঃ) থেকে আবু তুফায়েলের বর্ণনায় মুহম্মদ ইবনে হানাফিয়ার বক্তব্য বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন, আমরা আলী (রঃ)-র সমীপে ছিলাম, এমন সময় একব্যক্তি তাঁকে মেহেদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। আলী বললেন, দেখ; অতঃপর তিনি আঙুল দ্বারা সাত দেখালেন এবং এটা শেষ সময়ে এমন পরিবেশে আসবে, যখন কোনো ব্যক্তি 'আল্লাহ্, আল্লাহ্' বললে তাকে হত্যা করা হবে। আল্লাহ্ তার জন্য এমন প্রচুর লোক সৃষ্টি করবেন, যারা মেঘমালার মতো ছড়িয়ে থাকবে। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে সম্প্রীতি স্থাপন করবেন, ফলে তারা কাউকেও ভয় করবে না এবং তাদের মধ্যে কেউ প্রবেশ করলেও উল্লসিত হয়ে উঠবে না। তাদের সংখ্যা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ন্যায়; পূর্ববর্তীরা তাকে অতিক্রম করতে পারেনি এবং পরবর্তীরাও তার নাগাল পাবে না। তাদের সংখ্যা তালুতের[২৮৬] সাথে নদী অতিক্রমকারীদের সংখ্যার অনুরূপ। আবু তুফায়েল বলেছেন, ইবনে হানাফিয়া বললেন, তুমি কি তাকে চাও? বললাম, হাঁ! তিনি বললেন, সে এ দুই পাহাড়ের[২৮৭] মধ্যবর্তী স্থল থেকে বের হয়ে আসবে। বললাম, আল্লাহ্র কসম, অবশ্যই আমি তাকে আমার মৃত্যু পর্যন্ত ত্যাগ করব না। সে সেখানে অর্থাৎ মক্কায় মারা যাবে। হাকেম বলেন, এ হাদিসটি বোখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে শুদ্ধ। শেষ।

---

২৮৬. বাইবেলোক্ত মৌল; কোরান, ২, ২৪৯।
২৮৭. মক্কার নিকটবর্তী।

অবশ্য তা শুধু মুসলিমের শর্তেই শুদ্ধ। কেননা এই সূত্রে আম্মার দুহনী ও ইউনুস ইবনে আবু ইসহাক[২৮৯] বিদ্যমান। বোখারী তাদের নিকট থেকে হাদিস বর্ণনা করেননি। তাতে আমর ইবনে মুহম্মদ আনকাজীও[২৯০] রয়েছে, তার হাদিস বোখারী আলোচনার জন্য গ্রহণ করেছেন, প্রমাণের জন্য নয়। এতদ্‌সত্ত্বেও তাতে আম্মার দুহনীর শিয়া মতবাদের স্পর্শ আছে। তাকে যদিও আহমদ, ইবনে মুইন, আবু হান্মে, নেসায়ী ও অন্যরা নির্ভরযোগ্য বলেছেন, তথাপি আলী ইবনে মদিনী[২৯১] সুফিয়ান[২৯২] থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বিশার ইবনে মারোয়ান[২৯৩] তার পায়ের রগ কেটে দিয়েছিল। আমি বললাম, কেন? সুফিয়ান বললেন, সামনে তার শিয়ামতের জন্য।

ইবনে মাজা আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে সাদ ইবনে আব্দুল হামিদ ইবনে জাফরের[২৯৪] বর্ণনায় যথাক্রমে আলী ইবনে যিয়াদ ইয়ামামী[২৯৫] আকরামা ইবনে আম্মার[২৯৬] ও ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ্[২৯৭] হয়ে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তাতে আনাস বলেছেন আমি রসূলুল্লাহ্‌কে বলতে শুনেছি, আমরা আবদুল মুত্তালেবের সন্তান, জান্নাতবাসীদের নেতা। আমি, হামজা, আলী, জাফর[২৯৮] হাসান, হুসাইন ও মেহেদী। শেষ।

আকরামা ইবনে আম্মারের হাদিস যদিও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তবু তা অন্যের অনুসরণে মাত্র। তাকে অনেকে দুর্বল বলেছেন, অনেকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আবু হাতেম রাজি বলেছেন, সে সন্দেহজনক, শ্রুতির উল্লেখ না থাকলে গ্রহণযোগ্য নয়। আলী ইবনে যিয়াদ সম্পর্কে যাহাবী তার 'মিজান' গ্রন্থে বলেছেন, সে যে কে, তা বলতে পারি না। পুনরায় বলেছেন, এখানে শুদ্ধ আব্দুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ। সাদ ইবনে আব্দুল হামিদকে যদিও ইয়াকুব ইবনে আবু শায়ক[২৯৯] নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং যদিও ইবনে মুঈন তার সম্পর্কে বলেছেন, কোনো অসুবিধা নেই, তথাপি সউরী তার সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন। তাঁরা বলেন, তিনি তাকে ধর্মীয় বিধান দিতেও ভুল করতে দেখেছেন। ইবনে হাব্বান বলেছেন, সে এমন ব্যক্তিদের অন্তর্গত, যাদের দানে মাত্রাজ্ঞান নেই; সুতরাং সে প্রামাণ্য নয়। আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, সাদ ইবনে আব্দুল হামিদ দাবি করে, সে মালেকের পুস্তকাবলি উপস্থাপনের সময় তা শুনেছে। অথচ মানুষ তার দাবির সত্যতা অস্বীকার করে। সে এই বাগদাদেই আছে, হজ করেনি; সুতরাং সে শুনল কী রূপে? যাহাবী তাকে ঐ সকল লোকের মধ্যে গণ্য করেন, যাদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হলেও তার কোনো প্রভাব তাদের মধ্যে দেখা যায় না।

---

২৮৯. মৃত্যু ১৫২-৫৯ (৪৬৯-৭৫ খ্রি:) হি:।
২৯০. মৃত্যু ১৯৯ (৮১৫ খ্রি:) হি:।
২৯১. আলী ইবনে আবদুল্লাহ্; ১৬১-২৩৫ (৭৭৮-৮৫০ খ্রি:) হি:।
২৯২. সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না; ২২ পৃষ্ঠা ৫৬ নং টীকা দ্র:।
২৯৩. সম্ভবত উমাইয়া সম্রাট মারোয়ানের পুত্র (?)।
২৯৪. মৃত্যু ২০৯ (৮৩৪ খ্রি:) হি:।
২৯৫. শুদ্ধ আব্দুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ।
২৯৬. মৃত্যু ১৫৯ (৭৭৬ খ্রি:) হি:।
২৯৭. মৃত্যু ১২৭ (৭৫০ খ্রি:) হি:।
২৯৮. জাফর হজরত আলীর ভাই।
২৯৯. জীবনকাল ১৮২-২৬২ (৭৭৯-৮৭০ খ্রি:) হি:।

হাকেম তার মুস্তাদরক গ্রন্থে মুজাহেদের[৩০০] বর্ণনায় ইবনে আব্বাস থেকে তাঁর উপর আপেক্ষিত একটি হাদিস গ্রহণ করেছেন। মুজাহেদ বলেছেন, আমাকে ইবনে আব্বাস বললেন, যদি আমি না শুনতাম যে, তুমিও নবী বংশের অনুরূপ, তা হলে তোমার নিকট এ হাদিস বর্ণনা করতাম না। মুজাহেদ বলেছেন, তখন তিনি বললেন, এটা গোপনে থাকবে; আমি অপছন্দনীয় কারো কাছে এটা বর্ণনা করব না। মুজাহেদ বলেছেন, তখন ইবনে আব্বাস বললেন, আমাদের মধ্যে নবীর বংশে চারজন; আমাদের মধ্যে সাফফাহ, আমাদের মধ্যে মুনজির, আমাদের মধ্যে মনসুর ও আমাদের মধ্যে মেহেদী। মুজাহেদ বলেছেন, তখন তিনি বললেন, এ চারজনের ব্যাখ্যা করুন। ইবনে আব্বাস বললেন, সাফফাহ্ অনেক সময় তার সহায়কদিগকে হত্যা করবে এবং শত্রুকে ক্ষমা করবে। মুনজিরকে আমার মনে হয়, তিনি বললেন, সে বহু সম্পদ বণ্টন করবে, অথচ তজ্জন্য তার মনে কোনো গর্ববোধ থাকবে না এবং নিজের অধিকারের সামান্য অংশও সে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে। মনসুরকে তার শত্রুর বিরুদ্ধে সেই পরিমাণ সাহায্য করা হবে, যা রসূলুল্লাহ্‌র প্রতি প্রদত্ত সাহায্যের অর্ধেক। তার শত্রুরা দুইমাসের পথ দূর থেকে ভয়ে কাঁপত; মনসুরের জন্য এক মাসের পথ দূর থেকে ভয়ে কাঁপবে। মেহেদী সেই ব্যক্তি, সে পৃথিবীকে সুবিচারে পূর্ণ করবে, যেমন তা অবিচারে পূর্ণ ছিল। নিরীহ প্রাণী হিংস্র প্রাণীদেরকে ভয় করবে না। ভূমি তার কলিজার টুকরা বের করে দিবে। মুজাহেদ বলেছেন, আমি বললাম, তার কলিজার টুকরা কি? তিনি বললেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্তম্ভ সদৃশ কিছু। শেষ।

হাকেম বলেন, হাদিসটির সূত্র শুদ্ধ; অবশ্য বোখারী ও মুসলিম তা প্রকাশ করেননি। এটা ইসমাইল ইবনে ইব্রাহিম ইবনে মুহাজির তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। ইসমাইল দুর্বল। ইব্রাহিম, তার পিতার হাদিস যদিও মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তথাপি অধিকাংশের মতে সে দুর্বল। শেষ।

ইবনে মাজা সউবান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, তোমাদের ভাণ্ডারের নিকট তিনজন একে অন্যের সাথে যুদ্ধ করবে। তাদের প্রত্যেকেই খলিফার পুত্র। তাদের কারো তা হস্তগত হবে না। অতঃপর পূর্বদিক থেকে কাল পতাকার উদয় হবে এবং তাদেরকে এমনভাবে হত্যা করবে, যা কোনো জাতি কখনো করেনি। অতঃপর তিনি কিছু কথা বলেছিলেন, যা আমি স্মরণ রাখতে পারিনি। তিনি বললেন, যখন তোমরা তাকে দেখবে, তখন বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ কর। কারণ সেই হচ্ছে আল্লাহ্‌র খলিফা মেহেদী। শেষ।

এই সূত্রের ব্যক্তিবর্গ বোখারী ও মুসলিমের অনুরূপ। কিন্তু সেখানে আবু কেলাবা জরমী[৩০১] বিদ্যমান, যাহাবী ও অন্যরা যার সম্পর্কে বলেছেন সে সন্দেহজনক। এতে সুফিয়ান সউরীও রয়েছে, সে অশ্রুত হাদিস বর্ণনাকারী হিসাবে বিখ্যাত। তারা উভয়েই সূত্র নির্দেশ করেছে মাত্র; কিন্তু শোনার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেনি। সুতরাং

৩০০. ইবনে জবর; মৃত্যু ১০১-৪ (৭১৯-২৩ খ্রি:) হি:।
৩০১. আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ; মৃত্যু ১০৪-৭ (৭২২-২৬ খ্রি:) হি:।

গ্রহণযোগ্য নয়। এ সূত্রে আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মামও[৩০২] আছে; সে শিয়া মতবাদের জন্য বিখ্যাত শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে গোলমাল করেছে। ইবনে আদী বলেন, সে বিভিন্ন বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে এমন সব হাদিস বর্ণনা করেছে যা অন্য কারো সাথে মেলেনি। তারা তাকে শিয়া মতের অধিকারী বলে গণ্য করেছেন। শেষ।

ইবনে মাজা আব্দুল্লাহ্ ইবনে হারেস ইবনে জজ যুবাইদী থেকে ইবনে লাহিয়ার ধারায় যথাক্রমে আবু যুরআ, উমর ইবনে জাবের হাজরামী হয়ে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে হারেস ইবনে জজ বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, মানুষ পূর্বদিক থেকে নির্গত হয়ে মেহেদীর জন্য প্রতিষ্ঠা করবে, অর্থাৎ তার শাসনব্যবস্থা। তিবরানী বলে, ইবনে লাহিয়া এ হাদিস এককভাবে বর্ণনা করেছে। ইতিপূর্বে তিবরানী তার মধ্যম সংকলনে আলী থেকে যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তার আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে যে, ইবনে লাহিয়া দুর্বল এবং তার উস্তাদ উমর ইবনে জাবের তার অপেক্ষা দুর্বল।

বাজ্জার তার সংকলনে ও তিবরানী তার মধ্যম সংকলনে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিবরানীর বর্ণনা : আবু হুরায়রা বলেছেন, নবী (সঃ) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে মেহেদী হবে। যদি কম হয় তবে সাত, নতুবা আট কিংবা নয়। তার সময়ে আমার উম্মত এমন প্রাচুর্যের অধিকারী হবে, যা অন্য কখনো তার হয়নি। তাদের উপর আকাশ অনবরত বর্ষণ করবে এবং ভূমি কোনো শস্য সঞ্চয় করে রাখবে না। সম্পদ স্তূপীকৃত হয়ে থাকবে। কোনো এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলবে, হে মেহেদী, আমাকে দাও। সে বলবে, নাও। তিবরানী ও বাজ্জার বলেন, এটা মুহম্মদ ইবনে মারোয়ান আজলীর[৩০৩] এককভাবে বর্ণিত হাদিস। বাজ্জার আরো বলেন, কেউ তার অনুসরণ করেছে বলে জানি না। তাকে যদিও আবু দাউদ নির্ভরযোগ্য বলেছেন, ইবনে হাব্বান যদিও তাকে নির্ভরযোগ্যদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এবং ইবনে মুঈন যদিও তার সম্পর্কে বলেছেন, ভালো ও অন্য একবার বলেছেন, কোনো অসুবিধা নেই, তথাপি তার সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। আবু যুরআ বলেন, আমার নিকট তদ্রূপ নয়। আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল[৩০৪] বলেন, আমি মুহম্মদ ইবনে মারোয়ান আজলীকে হাদীস বর্ণনা করতে দেখেছি; আমি উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু হাদিস লেখেনি। আমরা ইচ্ছা করেই ছেড়ে দিতাম। আমাদের কোনো কোনো সঙ্গী তার নিকট থেকে লিখেছি। তিনি যেন তাকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন।

আবু ইয়ালা মোশেলী তার সংকলনে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমাকে আমার বন্ধু আবুল কাসেম (সঃ) বর্ণনা করলেন, প্রলয় সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার বংশ থেকে তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বের হবে। সে তাদেরকে সত্যের দিকে ফিরিয়ে না আসা পর্যন্ত আঘাত করবে। আবু হুরায়রা বলেছেন, বললাম, কতদিন রাজত্ব করবে? তিনি বললেন, পাঁচ ও দুই। আবু হুরায়রা বলেছেন, বললাম, পাঁচ ও দুই কি? তিনি বললেন, আমি জানি না। শেষ।

---

৩০২. জীবনকাল ১২৬-২১১ (৭৪৪-৮১৭ খ্রি:) হি:।

৩০৩. অথবা উকাইলী।

৩০৪. জীবনকাল ২১৩-৯০ (৮২৯-৯০৩ খ্রি :) হি:।

এই সূত্রে যদিও বশির ইবনে নাহিক বিদ্যমান আবু হাতেম বলেন, তথাপি তা দিয়ে প্রমাণ গ্রহণ করা যায় না। অবশ্য বোখারী ও মুসলিম তার দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন এবং মানুষ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছে। তারা আবু হাতেমের মন্তব্য—'প্রমাণ গ্রহণ করা যায় না'র প্রতি দৃষ্টিপাত করেনি। কিন্তু তাতে রেজা ইবনে আবু রেজা ইয়াশকুরী রয়েছে, যার সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। আবু যুরআ বলেন, নির্ভরযোগ্য। ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন বলেন, দুর্বল। আবু দাউদ বলেন, দুর্বল। অন্যত্র বলেন, ভাল। বোখারী তাঁর সংকলনে তার একটি মাত্র হাদিস গ্রহণ করেছেন।

আবুবকর বাজ্জার তার সংকলনে এবং তিবরানী তার বৃহৎ ও মধ্যম সংকলনে কুর্রা ইবনে ইয়াস থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। কুর্রা বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, পৃথিবী অবশ্যই অবিচার ও উৎপীড়নে পরিপূর্ণ হবে। যখন তা অবিচার ও উৎপীড়নে পূর্ণ হবে, তখন আল্লাহ্ আমার উম্মত থেকে এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন, যার নাম আমার নাম ও যার পিতার নাম আমার পিতার নাম হবে। সে এটাকে সুবিচার ও ন্যায়ের দ্বারা পূর্ণ করবে, যেমন তা অবিচার ও উৎপীড়নে পূর্ণ ছিল। আকাশ তার বৃষ্টিকে বিন্দুমাত্রও বাধা দিবে না এবং ভূমিও তার উদ্ভিদের কোনো কিছু সঞ্চয় করে রাখবে না। সে তোমাদের মধ্যে সাত, আট অথবা নয় থাকবে; অর্থাৎ বছর। শেষ।

এই সূত্রে দাউদ ইবনে মুজাব্বের ইবনে কাহজাম[৩০৫] তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছে। তারা উভয়েই অতিশয় দুর্বল।[৩০৬]

তিবরানী তার মধ্যম সংকলনে ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মুহাজির ও আনসারদের একটি দলের মধ্যে ছিলেন; আলী ইবনে আবু তালেব তাঁর বাম দিকে ও আব্বাস তাঁর ডান দিকে; এমন সময় আব্বাস ও আনসারদের একজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হল এবং আনসারীটি আব্বাসকে কটু কথা বলে ফেলল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আব্বাসের ও আলীর হাত ধরে বললেন, অচিরেই এর বংশ থেকে এমন যুবক জন্মাবে যার দরুন পৃথিবী অবিচারে-উৎপীড়নে পূর্ণ হবে এবং অচিরেই এর বংশ থেকে এমন যুবক জন্মাবে, যার দরুন পৃথিবী ন্যায় ও সুবিচারে পূর্ণ হবে। তোমরা যখন এটা দেখবে, তখন তোমাদের উচিত তমিমী যুবককে সাহায্য করা। সে পূর্বদিক থেকে আসবে, সেই মেহেদীর পতাকা বহনকারী। শেষ।

এই সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর উমরী[৩০৭] ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে লাহিয়া; তারা উভয়েই দুর্বল। শেষ।

তিবরানী তার মধ্যম সংকলনে তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, অচিরেই গোলযোগ দেখা দিবে, তাতে একপক্ষ নিশ্চুপ হলে

---

৩০৫. মৃত্যু ২০৬ (৮২১ খ্রি:) হি:।

৩০৬. এর পর রোজেনথাল দুইটি অনুচ্ছেদে তিবরানী কর্তৃক উম্মে হাবিবা হতে একটি হাদিস ও তার সূত্র বিচার বর্ণনা করেছেন। আমাদের ব্যবহৃত মূলগ্রন্থে এটা নেই। হাদিসটি এরূপ—রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, পূর্বদিক থেকে মানুষনবী বংশের এক ব্যক্তির জন্য আসবে। তারা প্রান্তরে উপস্থিত হলে সে তাদের সাথে অদৃশ্য হবে। যারা পিছনে থাকবে, তারাও তার সাথে মিলিত হবে এবং অনুরূপ পরিণাম লাভ করবে ইত্যাদি। সূত্রে সালামা ইবনে আব্বাস দুর্বল।

৩০৭. মৃত্যু ১৭৩ (৭৯০ খ্রি:) হি:।

অন্যপক্ষ উত্তেজিত হয়ে উঠবে। এমন সময় আকাশ থেকে কেউ ডেকে বলবে তোমার নেতা অমুক। শেষ।

এই সূত্রে মুসান্না ইবনে সাবা[৩০৮] বিদ্যমান, সে অতিশয় দুর্বল। হাদিসটিতে মেহেদীর কোনো সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। একমাত্র কিছুটা মিলের জন্যই সংশ্লিষ্ট অধ্যায় ও জীবনীতে তাকে বর্ণনা করা হয়েছে।

এগুলোই মেহেদীর অবস্থা ও শেষ সময়ে তার আবির্ভাব সম্পর্কে হাদিসবেত্তাগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদিস। পাঠক, আপনি দেখেছেন যে, সমালোচনায় এর মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক হাদিস টিকে থাকতে পেরেছে। অনেক সময় মেহেদীর বিষয়টি অস্বীকারকারীরা মুহম্মদ ইবনে খালেদ জুন্দী থেকে বর্ণিত একটি হাদিসকে দৃঢ়তার সাথে উপস্থিত করে। উক্ত হাদিসটি আব্বান ইবনে সালেহ ইবনে আবু আইয়াশ,[৩০৯] হাসান বসরী[৩১০] হয়ে আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী (সঃ) বলেছেন, মেহেদী ইসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীত অন্য কেউ নয়। মুহম্মদ ইবনে খালেদ জুন্দী সম্পর্কে ইবনে মুঈন বলেন, সে নির্ভরযোগ্য। বায়হকী[৩১১] বলেন, এটা মুহম্মদ ইবনে খালেদের একক বর্ণিত হাদিস। তার সম্পর্কে হাকেম বলেন, সে অপরিচিত ব্যক্তি। তার সূত্র সম্পর্কেও মতানৈক্য রয়েছে। কখনও পূর্বের ন্যায় বর্ণনার পরে এটাকে মুহম্মদ ইবনে ইদরিস শাফেয়ীর দিকে নির্দেশ করা হয় আবার কখনো মুহম্মদ ইবনে খালেদ, আব্বান, হাসান হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে নবী (সঃ) থেকে বর্ণিত হয়। বায়হকী বলেন, এতেও সেই মুহম্মদ ইবনে খালেদের বর্ণনার দিকে ফিরে আসে এবং সে অপরিচিত। আব্বান ইবনে আবু আইয়াশ পরিত্যক্ত। নবী (সঃ) থেকে হাসানের বর্ণনা বিচ্ছিন্ন। মোট কথা হাদিসটি দুর্বল ও অস্থির। কখনো এ কথা—মেহেদী ঈসা ভিন্ন অন্য কেউ নয়—সম্পর্কে বলা হয়, শব্দটি মেহেদী নয়, মাহদিয়া অর্থাৎ দোলনাধারী; সুতরাং হাদিসটির অর্থ দোলনায় ঈসা ভিন্ন অন্য কেউ কথা বলেনি।[৩১২] এভাবে অর্থের পরিবর্তন করে এর দ্বারা প্রমাণ গ্রহণের প্রতিবাদ করা হয়। অথবা উক্ত হাদিস ও অন্যান্য হাদিসের মধ্যকার বিরোধকে নিষ্পত্তি করা হয়। এটা জুরাইহ সম্পর্কে বর্ণিত হাদিস[৩১৩] ও অনুরূপ অন্য হাদিস দ্বারা অস্বাভাবিক ঘটনাবলির জন্য খণ্ডিত।

সুফী সাধকদের মধ্যে পূর্বসূরিরা এ প্রকার কোনো বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত হননি। তাঁরা কর্তব্যের সাধনা এবং তা থেকে লব্ধ অনুভূতি ও দশা নিয়েই কথা বলতেন। শিয়াদের মধ্যে ইমামিয়া ও রাফেজী সম্প্রদায় আলী (রাঃ)-র শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর নেতৃত্বের দাবি তজ্জন্য নবী (সঃ)-এর অন্তিম উপদেশ এবং আবু বকর ও উমর (রাঃ)-এর খেলাফত অস্বীকার

---

৩০৮. মৃত্যু ১৪৯ (৭৬৭ খ্রি:) হি:।
৩০৯. জীবনকাল ৬০-১১০ (৬৮০-৭২৯ খ্রি:) হি:।
৩১০. ইসলামী শাস্ত্রের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জ্ঞানী; মৃত্যু ১১০ (৭২৮ খ্রি:) হি:।
৩১১. আহমদ ইবনে হুসাইন; ৩৮৪-৪৫৮ (৯৯৪-১০৬৬ খ্রি:) হি:।
৩১২. তুল, কোরান, ৪, ৪৬; ৫; ১১০।
৩১৩. প্রসিদ্ধ ইহুদি সাধু জুরাইহ'কে এক বেশ্যা রমণী পথভ্রষ্ট করতে চেয়েছিল; কিন্তু ব্যর্থ হয়ে অন্য একটি লোকের দ্বারা গর্ভবতী হয় এবং ইহুদিরা এর দোষ সাধুর উপর আরোপ করলে তিনি প্রার্থনা করেন। ফলে নবজাত শিশু তার পিতৃ পরিচয় প্রদান করে।

করা নিয়েই বাক্‌বিতণ্ডা করত, যেমন আমরা তাদের মতাদর্শ বর্ণনায় উল্লেখ করেছি। অতঃপর তাদের মধ্যে পবিত্র ইমামের ধারণার সৃষ্টি হল এবং এই মতাদর্শে বহু রচনা প্রকাশ পেতে লাগল। তাদের মধ্যে ইসমাইলিয়া সম্প্রদায় এক প্রকার অবতারবাদের আশ্রয় নিয়ে ইমামের মধ্যে ঐশী ক্ষমতার দাবি করল। অন্যরা কিছুটা জন্মান্তরবাদের অনুসারে মৃত ইমামের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে মত প্রকাশ করল। অন্য অনেকে ইমামের মৃত্যুর ফলে যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে, তার পুনরুজ্জীবনের প্রতীক্ষা করতে লাগল। আবার অন্য অনেকে আমাদের পূর্ব বর্ণিত মেহেদী সম্পর্কীয় হাদিস ও অন্যবিধ প্রমাণের সাহায্যে সম্পূর্ণ বিষয়টি নবী বংশের মধ্যে ফিরে আসার প্রত্যাশা করতে আরম্ভ করল।

অতঃপর পরবর্তী সুফী সাধকদের নিকটেও বিষয়টি ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে দিব্যানুভূতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। তাঁদের অনেকের মুখ থেকে সাধারণভাবে অবতারবাদ ও সর্বাস্তিবাদ সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ পেতে লাগল। এতে তাঁরা ইমামিয়া ও রাফেজী সম্প্রদায়ের ইমামদের অবতারত্ব ও ঐশ্বরিক ক্ষমতার অনুরূপ মতামতে অংশ গ্রহণ করলেন। তাঁরা 'কুতুব' ও 'আবদাল'[৩১৪] এর কথাও বললেন। এটা যেন রাফেজী সম্প্রদায়ের ইমাম ও নকিবেরই অনুরূপ। তাঁরা শিয়া মতামতের মধ্যে ডুবে গেলেন এবং তাঁদের ধর্মানুভূতিতে শিয়া আদর্শ গ্রহণ করে আতিশয্যের সৃষ্টি করলেন। এমন কি তাঁদের প্রচলিত প্রথা হয়ে দাঁড়ালো 'খিরকা' পরিধান করা। আলী (রাঃ) হাসান বসরীকে এটা পরিধান করিয়ে 'তরিকায়' স্থির থাকার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং এটা একটি প্রথারূপে তাঁদের উদ্ভাদদের অন্যতম জুনায়েদ[৩১৪*] থেকে তাদের নিকট এসে পৌঁছেছে। অথচ কোনো শুদ্ধ মতেই তা আলীর সাথে সংশ্লিষ্ট হবার কোনো কারণ নেই। কারণ এরূপ প্রথা শুধু আলী (রাঃ)-র জন্যই বিশিষ্ট কোনো কিছু ছিল না; বরং সাহাবীরা সকলেই সৎপথ প্রদর্শনের ব্যাপারে আদর্শ স্বরূপ ছিলেন। সুতরাং তাঁদের সকলকে বাদ দিয়ে একমাত্র আলীর সাথে এর সংযুক্তির মধ্যে শিয়া মতবাদের গন্ধ বিদ্যমান। এটা থেকে ও অনুরূপ পূর্বে বর্ণিত বিষয়াদি থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, তারা শিয়া মতের অধীন হয়ে পড়েছিলেন এবং তার ধারা অনুসারে নিজেদেরকে সজ্জিত করে তুলেছিলেন।

তাঁদের মধ্য থেকে কুতুব সম্পর্কীয় ধারণাও প্রকাশ পেয়েছে। রাফেজী সম্প্রদায়ের ইসমাইলিয়া গোষ্ঠী ও পরবর্তী সুফী সাধকদের গ্রন্থাদিতে অনুরূপ ধারণার মতই প্রতীক্ষিত ফাতেমীর ধারণাও বিদ্যমান। তারা একে অপরকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন এবং একে অপরের নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। বস্তুত তা উভয় দলের মতো কতকগুলো অলীক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেক সময় অনেকে জ্যোতিষীদের সাদৃশ্যসূচক বিষয়াদি দিয়েও এ সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থিত করেন। তা এক ধরনের ভবিষ্যৎবাণী। এর পরবর্তী পরিচ্ছেদেই এ সম্পর্কে আলোচনা আসছে।

এ পরবর্তী সুফী সাধকদের মধ্যে যাঁরা সর্বাপেক্ষা অধিক ফাতেমীর ব্যাপারে আলোচনা করেছেন, তাঁরা হলেন ইবনে আরবি হাতেমী[৩১৫] তাঁর 'আনকা মুগরিব' নামক

---

৩১৪. কুতুব—ধ্রুব নক্ষত্র; অনুরূপ অমোঘ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এবং আবদাল—স্থলাভিসিক্ত অথবা ভ্রাম্যমাণ অলৌকিক পুরুষ।

৩১৪* জুনায়েদ ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ২৯৮ (৯১১ খ্রি:) হি:।

৩১৫. প্রখ্যাত সুফি সাধক মুহম্মদ ইবনে আলী; ৫৬০-৬৩৮ (১১৬৫-১২৪০ খ্রি:) হি:।

গ্রন্থে; ইবনে কেসী[৩১৬], তাঁর খালউ নালাইন' নামক গ্রন্থে; আবদুল হক ইবনে সাবইন[৩১৭] এবং তার শিষ্য ইবনে আবু ওয়াতিল 'খাল্উ নালাইন' গ্রন্থের ব্যাখ্যায়। এ ব্যাপারে তাদের অধিকাংশ আলোচনাই প্রহেলিকা ও রূপকধর্মী। খুব অল্পই তাঁরা সুস্পষ্টভাবে কিছু বলেছেন অথবা তাদের ব্যাখ্যাকাররা এরূপ সুস্পষ্টতার আশ্রয় নিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাদের মতাদর্শের সার কথা, যা ইবনে আবু ওয়াতিল বর্ণনা করেছেন, তা এই যে, নব্যুয়তের দ্বারাই ভ্রষ্টতা ও মূর্খতার পরে সত্য ও সৎপথ প্রকাশ পেয়ে থাকে। এর পর তাকে অনুসরণ করে খেলাফত এবং খেলাফতের শেষে দেখা দেয় রাজত্ব। এর ফলে আবার উৎপীড়ন, অহংকার ও মিথ্যা ফিরে আসে। তাঁরা বলেন, যেহেতু আল্লাহ্র বিধানে প্রচলিত প্রথা হল প্রতিটি বস্তুকে তার মূলের দিকে ফিরিয়ে আনা, সেজন্য নবুয়তের পুনরুজ্জীবন ও 'বেলায়েতে'র[৩১৮] সত্য প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। এর পর খেলাফত আসবে এবং তার পিছনে রাজশক্তি ও প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে মিথ্যা এসে উপস্থিত হবে। পুনরায় অধর্ম তার নিজ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। এই বক্তব্যের দ্বারা তারা নব্যুয়তের ব্যাপারে যা ঘটেছে এবং যেভাবে তার পর খেলাফত ও তার পর রাজত্ব দেখা দিয়েছে, তৎপ্রতি ইঙ্গিত করতে চান। এ তিনটি পর্যায়। অনুরূপভাবে উক্ত ফাতেমীর বেলায়েত, তার পশ্চাদ্বর্তী মিথ্যার দ্বারা তারা দজ্জালের আবির্ভাবকে বুঝিয়েছেন। এর পর অধর্ম দেখা দেবে। এ তিনটি পর্যায়ও পূর্ববর্তী তিনটি পর্যায়ের অনুরূপ।

তাঁরা বলেন, যেহেতু কোরায়েশদের খেলাফতের ব্যাপারটি ধর্মীয় বিধান অনুসারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের দ্বারা সমর্থিত এবং স্বল্পজ্ঞান মানুষের দ্বারা তার অস্বীকার একান্তই তাৎপর্যহীন, সেজন্য ইমামতের ব্যাপারটিও নবী (সঃ)-এর সাথে বিশিষ্ট কোরায়েশ বংশের মধ্যেই হবে। তা হয় প্রকাশ্যে, যেমন আবদুল মুত্তালেবের বংশধর; না হয় গোপনে, যারা যথার্থ অর্থে বংশধারার পরিচয়বাহী। এক্ষেত্রে বংশ বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝাবে, যার উপস্থিতি উক্ত বংশের অনুপস্থিতিকে দূর করতে সক্ষম।

ইবনে আরবি হাতেমী তাঁর রচনাবলির মধ্যে 'আনকা মুগরিব'[৩১৯] নামক গ্রন্থে ফাতেমীকে 'খাতামুল আউলিয়া' নাম দিয়েছেন এবং ডাকনাম দিয়েছেন 'লেবনাতুল ফেদ্দা' বা রৌপ্য ইট। এর দ্বারা তিনি বোখারী কর্তৃক 'খাতামুন্নবীঈন'[৩২০] অধ্যায়ে একটি হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। উক্ত হাদিসে নবী (সঃ) বলেছেন, পূর্ববর্তী নবীদের মধ্যে আমার তুলনা হল, যেমন এক ব্যক্তি একটি গৃহ তৈরি করে এমনভাবে শেষ করল যে, তাতে মাত্র একটি ইট ব্যবহারের স্থান অবশিষ্ট আছে; আমি সেই ইট। তাঁরা এ ইটের দ্বারা 'খাতামুন্নাবীঈনে'র ব্যাখ্যা করেন, যা একটি সৌধকে পূর্ণতা দান করে। এর অর্থ তিনি এমন একজন নবী, যার নব্যুয়ত পরিপূর্ণতার অধিকারী। তাঁরা এই নব্যুয়তের সাথে তুলনা করে বেলায়েতেরও পর্যায়গত পার্থক্য নির্দেশ করেন এবং

৩১৬. ৬৩১, পৃষ্ঠা ১০নং টীকা দ্র:।
৩১৭. আবদুল হক ইবনে ইব্রাহিম; ৬২৩/২৪-৬৬৯ (১২২৬/২৭-১২৭১ খ্রি:) হি:।
৩১৮. ওলীর মর্যাদা।
৩১৯. অদ্ভুত 'আনকা' বা কল্পিত অমর পক্ষী।
৩২০. নবীদেরকে অঙ্গুরীয় বা সীলমোহর—এই অর্থে শেষ নবী।

এক্ষেত্রে পরিপূর্ণতার অধিকারীকে 'খাতামুল আউলিয়া' বলে নামকরণ করেন। অর্থাৎ তিনি বেলায়েত সম্পূর্ণকারী মর্যাদার অধিকারী, যেমন 'খাতামুন্নাবীঈন' নব্যুয়ত সম্পূর্ণকারীর মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এ কারণেই ধর্মপ্রবর্তক এ মর্যাদাকে উল্লেখিত হাদিসের মধ্যে গৃহ সম্পূর্ণকারী শেষ ইট বলে অভিহিত করেছেন। এক্ষেত্রে তারা একই ধরনের এবং তুলনার ক্ষেত্রেও তারা একই ইট তুল্য। অবশ্য এ দুটি মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য নব্যুয়তকে বলা হয়েছে স্বর্ণ ইট ও বেলায়েতকে রৌপ্য ইট। বস্তুত স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। সুতরাং তাঁরা স্বর্ণ ইট বলতে নবী (সঃ)-কে বোঝান এবং রৌপ্য ইট বলতে এই ওলী ফাতেমী প্রতীক্ষিতকে বোঝান। তিনি 'খাতামুন্নাবীঈন' এবং ইনি 'খাতামুল আউলিয়া'।

ইবনে আবু ওয়াতিলের বর্ণনা মতে ইবনে আরবি বলেছেন, ইনি প্রতীক্ষিত ইমাম, নবীর বংশধর ও ফাতেমার সন্তান। তাঁর আবির্ভাব হিজরি সনের 'খে-ফে-জিম' যাবার পর ঘটবে। তিনি তিনটি হরফ ব্যবহার করে 'আবজদ' হিসাব অনুসারে তার সংখ্যা ধরে নিয়েছেন। উপরে এক বিন্দুবিশিষ্ট 'খে'র সংখ্যা ছয়শ, ক্বাফের বোনদ 'ফে'র সংখ্যা আশি এবং নিচে এক বিন্দুবিশিষ্ট জিমের সংখ্যা তিন। সব মিলিয়ে ছয়শত তিরাশি হিজরি। হিজরি সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ। কিন্তু এ সময় কেটে গেলেও যখন আবির্ভাব ঘটল না, তখন তাদের অনুগামী কিছু সংখ্যক লোক বলতে লাগল যে, এটা তাঁর জন্ম বছর। তারা তাঁর জন্মকেই আবির্ভাব বলে ব্যাখ্যা করল এবং তাঁর আত্মপ্রকাশ সাতশ দশ হিজরিতে ঘটবে বলে প্রচার করল। কারণ ইনিই মাগরিব অঞ্চলের ইমাম হয়ে দেখা দিবেন।

ইবনে আবু ওয়াতিল বলেন, তাঁর জন্ম যেহেতু ইবনে আরবির ধারণা অনুসারে ছয়শ তিরাশি (১২৮৪-৮৫ খ্রি:) হিজরিতে হবে, সুতরাং ইমাম হিসাবে আত্মপ্রকাশের সময় তাঁর বয়স হবে ছাব্বিশ বছর। তিনি বলেন, তারা অনুমান করেন যে, দজ্জালের আত্মপ্রকাশ সাতশ তেতাল্লিশ মুহম্মদী দিনে ঘটবে। হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর তিরোধান থেকে তারা এ মুহম্মদী দিন গণনা আরম্ভ করেন এবং এটা হাজার বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত চলবে। ইবনে আবু ওয়াতিল তাঁর 'খালউ নালাইন' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলেন, প্রতীক্ষিত ওলী, আল্লাহ্‌র দায়িত্ব বহনকারী, নির্দেশিত ব্যক্তি মুহম্মদ মেহেদী খাতামুল আউলিয়া। তিনি নবী নন; তিনি শুধু মাত্র ওলী। তাঁকে তাঁর আত্মা ও বন্ধু প্রেরণ করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, প্রত্যেক জাতির জ্ঞানী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নবীর তুল্য। তিনি আরো বলেছেন, আমার জাতির জ্ঞানীরা বনি ইসরাইলের নবীদের সমতুল্য। তাঁর সুসংবাদ মুহম্মদী দিনের প্রথম থেকেই পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পাচ্ছিল। এবং পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত উক্ত দিনের অর্ধেককাল অবধি অব্যাহত ছিল। এর পর তা আরো দৃঢ় হয়েছে, উস্তাদগণের দ্বারা তাঁর আগমন নিকটবর্তী হয়েছে বলে সুসমাচার প্রদত্ত হয়েছে এবং সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তার সম্ভাবনা ক্রমান্বয়ে দেখা দিয়েছে। ইবনে আবু ওয়াতিল বলেন, কিন্দী[৩২১] বর্ণনা করেছেন, ইনিই সেই ওলী, যিনি মানুষের সঙ্গে জোহরের নামাজ পড়বেন, ইসলামকে নতুন জীবন দিবেন, ন্যায়কে প্রকাশ করবেন,

৩২১. ১০৪ পৃষ্ঠা ৯০নং টীকা দ্র:।

আন্দালুস দ্বীপ জয় করবেন, রোমে পৌঁছে তা অধিকার করবেন, পূর্বদিকে গিয়ে তাও অধিকারে আনবেন, কনস্ট্যান্টিনপোল জয় করবেন এবং পৃথিবীর রাজস্ব তাঁর হবে। মুসলমানরা শক্তিশালী হবে, ইসলাম উন্নত হবে এবং সনাতন ধর্ম[৩২২] প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। জোহরের নামাজ থেকে আসরের নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে নামাজের অক্ত আছে। তিনি (সঃ) বলেছেন, এ দুটির মাঝখানে অক্ত আছে। কিন্দী আরো বলেছেন, নোক্তাবিহীন আরবি হরফ অর্থাৎ যেগুলোর দ্বারা কোরানের বিভিন্ন সূরা আরম্ভ হয়েছে, সেগুলোর মোট সংখ্যা মান সাতশ তেতাল্লিশ এবং সাত দজ্জালী। অতঃপর আসরের নামাজের সময় ঈসা অবতীর্ণ হবেন। পৃথিবী শুদ্ধ হবে এবং বাঘের সাথে ছাগল চড়বে। তাঁর সাথে তাদের ইসলাম গ্রহণের পর অনারব সাম্রাজ্য একশ ষাট বছর স্থায়ী হবে। এটা নোক্তাবিশিষ্ট ক্বাফ-ইয়া-নুনের সংখ্যা মানের সমান। তন্মধ্যে চল্লিশ বছর হবে ন্যায়ের রাজত্ব। ইবনে আবু ওয়াতিল বলেন, তাঁর বাণীর মধ্যে 'মেহেদী ঈসা ভিন্ন অন্য কেউ নয়' বলে যে কথা আছে তার অর্থ হল, মেহেদীর সমান বেলায়েত ও হেদায়েতের শক্তি ঈসা ভিন্ন অন্য কারো হবে না। বলা হয়, এর অর্থ দোলনায় ঈসা ভিন্ন অন্য কথা বলবে না। এটা জুরাইহ ও অন্যদের হাদিস দ্বারা খণ্ডিত। বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, তিনি বলেছেন এ ব্যাপার অনুরূপ থাকতে থাকতে কিয়ামত দেখা দিবে অথবা তাদের উপর বারজন খলিফা হবে অর্থাৎ কোরায়েশী। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় তাঁদের অনেকে ইসলামের প্রথম দিকে ছিলেন এবং অনেকে শেষের দিকে হবেন। তিনি বলেছেন, আমার পরে খেলাফত ত্রিশ, একত্রিশ অথবা ছত্রিশ। তার শেষ হাসানের খেলাফতে এবং মাবিয়ার ক্ষমতালাভের প্রথম দিকে। সুতরাং মাবিয়ার প্রথম দিককার অবস্থা প্রাথমিক যুগের নামানুসারে খেলাফতের অন্তর্গত এবং তিনি ষষ্ঠ খলিফা। সপ্তম খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ এবং অবশিষ্ট পাঁচজন তাঁরা নবী বংশের আলীর সন্তান। এটা তাঁর সেই বাণীর দ্বারা সমর্থিত, যাতে বলা হয়েছে অবশ্যই তুমি দুই প্রান্তের অধিকারী অর্থাৎ জাতির। তুমি তার প্রথম দিকে খলিফা হবে এবং তোমার বংশধর তার শেষের দিকে। অনেক সময় এর দ্বারা প্রত্যাবর্তনের মত পোষণকারীরাও প্রমাণ উপস্থিত করে। তাদের নিকট নির্দেশিত প্রথম ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের সময় আবির্ভূত হবে।

তিনি বলেছেন, পারস্য সম্রাট বিধ্বস্ত হলে তার পর আর পারস্য সম্রাট নেই এবং রোমান সম্রাট বিধ্বস্ত হলে তার পর আর রোমান সম্রাট নেই। আমার আত্মা যার হাতে, তাঁর শপথ, তোমরা তাদের ভাণ্ডার আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে। উমর ইবনে খাত্তাব পারস্য সম্রাটের ভাণ্ডার ব্যয় করেছেন এবং যিনি রোমান সম্রাটের ভাণ্ডার ব্যয় করবেন, তিনি হলেন এই প্রতীক্ষিত ব্যক্তি; কনস্টান্টিনপোল বিজয়ের সময় তা ঘটবে। তার নেতা অতি উত্তম নেতা এবং তার সৈন্যদল অতি উত্তম সৈন্যদল হবে। তিনি (সঃ) এরূপ বলেছেন, তার শাসনকাল বিজোড় সংখ্যক। বিজোড় সংখ্যা তিন থেকে নয়; বলা হয় দশ পর্যন্ত। চল্লিশের কথাও এসেছে; কোনো কোনো বর্ণনায় সত্তর। চল্লিশ বছর হল তাঁর ও তাঁর পরবর্তী বংশধরদের মধ্য থেকে তাঁর দায়িত্ব বহনকারী চারজন খলিফার

---

৩২২. মূল—'আদ্‌দীনুল হানিফিয়া'।

সময়কাল। তাঁদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইবনে আবু ওয়াতিল বলেন, জোতিষীরা বর্ণনা করেছেন, তাঁর ও তাঁর বংশধরদের শাসনকাল একশ পঁচানব্বই বছর স্থায়ী হবে। সুতরাং উক্ত শাসন খেলাফত ও ন্যায়ের ভিত্তিতে চল্লিশ অথবা সত্তর বছর থাকবে। অতঃপর অবস্থার বৈচিত্র্য দেখা দিয়ে তা রাজত্বে পরিণত হবে। ইবনে আবু ওয়াতিলের বক্তব্য এখানে শেষ।

ইনি অন্যত্র বলেছেন, ইসার অবতরণ মুহম্মদী দিনের তিন চতুর্থাংশ অতিবাহিত হবার পর আসরের নামাজের সময় হবে। ইনি বলেন, ইয়াকুব ইবনে ইসহাক কিন্দী তাঁর 'কিতাবুল জিফার' নামক গ্রন্থে, যেখানে তিনি রাশি সংযোগের কথা বলেছেন, সেখানে আছে, এই সংযোগ যখন দ্বোয়াদ-হ্বে—এই দুই হরফের সংখ্যামান অর্থাৎ ছয়শ আটানব্বই হিজরির প্রথম দিকে মেষ রাশিতে পৌঁছবে, তখন মসিহ অবতীর্ণ হবেন এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছামতো পৃথিবী শাসন করবেন। ইনি বলেন, হাদিসে এসেছে ঈসা দামেশকের পূর্বদিকে সাদা মিনারের নিকটে অবতরণ করবেন। তিনি দুই হলুদ বর্ণ বিশিষ্টের মাঝখানে অবতরণ করবেন। অর্থাৎ জাফরানী-হলুদবর্ণের দুটি পোশাক এবং তাঁর দুইহাত দুইজন ফেরেশতার কাঁধে ন্যস্ত থাকবে। তাঁর চুল লম্বা হবে; যেন তিনি কোনো গর্ত থেকে বের হয়ে এসেছেন। তিনি যখন মাথা নত করবেন, বৃষ্টি পড়বে এবং মাথা উন্নত করলে মোতির ন্যায় মণিমানিক্য ঝরবে। তাঁর মুখমণ্ডলে বহু তিলের দাগ থাকবে। অন্য এক হাদিসে আছে, দৃঢ় গঠন এবং সাদা লাল। অন্য একটি হাদিসে, তিনি 'গরব'-এ বিবাহ করবেন। 'গরব'-এর অর্থ বেদুইনদের এক প্রকার বালতি। অর্থাৎ তিনি বেদুইনদের মধ্যে বিবাহ করবেন এবং তাঁর স্ত্রী সন্তান প্রসব করবে। চল্লিশ বছর পরে তাঁর মৃত্যুর কথা বর্ণনা করেছেন। বলা হয়, সা মদিনায় মৃত্যুমুখে পতিত হবেন এবং উমর ইবনে খাত্তাবের পার্শ্বে তাঁকে কবরস্থ করা হবে। আবু বকর ও উমর দুইজন নবীর মাঝখানে পুনরুত্থিত হবেন।

ইবনে আবু ওয়াতিল বলেন, শিয়ারা বলে, ইনিই মসিহ, মুহম্মদী বংশের মসিহদের মসিহ।[৩২৩] আমি বললাম, অনেক সুফী সাধক এর উপরই সেই হাদিসটি—মেহেদী ঈসা ভিন্ন অন্য কেউ নয়—কে দাঁড় করিয়েছেন। অর্থাৎ সেই মেহেদী ব্যতীত অন্য কোনো মেহেদী হবে না, মুহম্মদী ধর্মবিধানের ব্যতিক্রমহীন যথাযথ অনুসরণের ক্ষেত্রে যাকে মুসাই ধর্মবিধানে আগত ঈসার সাথে তুলনা করা যায়।

এইপ্রকার ও অনুরূপ এমন বহু কথা আছে, যদ্বারা তারা নির্দিষ্ট সময়, ব্যক্তি ও স্থান নির্দেশ করে। এসব ব্যাপারে তাদের ব্যবহৃত প্রমাণাদি ভিত্তিহীন ও স্বকপোলকল্পিত। এ কারণে সময় অতিবাহিত হয়, কিন্তু তার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। আবার তারা আভিধানিক অর্থের পরিবর্তন করে কাল্পনিক বিষয় যোগ দিয়ে তাদের মতামত নবায়নে প্রয়াসী হয়। পাঠক, আপনি অবশ্যই তা লক্ষ করেছেন।

---

৩২৩. এ বর্ণনা হতে বিষয়টি আরো বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়েছে অর্থাৎ ঈসা, মসিহ, ফাতেমী, মেহেদী সবগুলো তালগোল পাকিয়ে গেছে। অন্যদিকে এ স্থলে ঈসা অর্থে যীশুখ্রিস্ট নয় (রোজেনথাল ২য় খণ্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা ৯৪৭নং টীকা দ্র:)।

যে সকল সুফীসাধক আমাদের সমসাময়িককালে বিদ্যমান, তাঁদের অধিকাংশই এমন এক সংস্কারকের আত্মপ্রকাশের কথা বলেন, যিনি ধর্মীয় বিধানের প্রতিষ্ঠা ও সত্যের উদ্ধার সাধন করবেন। তাঁরা তাঁর আবির্ভাবকে আমাদের যুগের নিকটবর্তী সময়েই নির্ধারিত করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে বলেন, তিনি ফাতেমার সন্তান হবেন এবং অনেকে এমন নির্দিষ্ট কিছু বলেন না। আমরা তাঁদের একটি দল থেকে অনুরূপ কথা শুনেছি এবং তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান হলেন মাগরিবের ওলীশ্রেষ্ঠ আবু ইয়াকুব বাদেসী। তিনি এই হিজরি অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন। তাঁর কথা আমাকে আমার সঙ্গী ও তাঁর পৌত্র আবু ইয়াহিয়া জাকারিয়া শুনিয়েছেন। ইনি তাঁর পিতা আবু মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ থেকে তাঁর পিতা উপরোক্ত ওলী আবু ইয়াকুবের কথা বর্ণনা করেছেন।

এটাই, শেষ পর্যন্ত, পাঠক, সুফীসাধকদের বক্তব্য সম্পর্কে যা আমরা জানতে পেরেছি বা যা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। হাদিস বর্ণনাকারীরা মেহেদী সম্পর্কীয় যে সকল সংবাদ দিয়েছেন, তাও আমরা আমাদের সাধ্যানুসারে তুলে ধরেছি। পাঠক এ পরিপ্রেক্ষিতে যে সত্য আপনার নিকট প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার, তা এই যে, ধর্মই বলুন আর রাজ্যই বলুন গোত্রপ্রীতির শৌর্য ব্যতীত তাদের কোনোটার প্রচারণাই পরিপূর্ণতা লাভ করে না। কেবলমাত্র ঐ শক্তিই একে প্রকাশ করে, তার বিরোধী শক্তিকে প্রতিরোধ করে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে তাকে পূর্ণতা দান করতে সক্ষম।

ইতিপূর্বে আমরা অকাট্য প্রমাণ দ্বারা যথাস্থানে পাঠক, আপনার সম্মুখে ঐ শক্তির কথা প্রতিষ্ঠিত করেছি। ফাতেমীদের গোত্রপ্রীতি এমনকি সমগ্র কোরায়েশের গোত্রপ্রীতি পৃথিবীর সর্বস্থান থেকে নির্মূল হয়ে গেছে। অন্যান্য জাতির গোত্রপ্রীতি কোরায়েশের অনুরূপ শক্তির উপর মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অবশ্য হেজাজের মক্কায় ও মদিনায় এখনও তার সামান্য অংশ বিদ্যমান। আবু তালেবের বংশধর বনি হাসান, বনি হোসাইন, বনি জাফর[৩২৪] প্রমুখ বেদুইনরা ঐ অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে এবং তার উপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। তারা যথার্থই বেদুইন গোত্রপ্রীতির অধিকারী; তাদের স্বভাব অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে, বিচিত্র নেতৃত্বে ও বিচ্ছিন্ন মতবাদে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। তাদের সংখ্যা অত্যধিক কয়েক সহস্র হবে। সুতরাং উক্ত মেহেদীর আবির্ভাব যদি সত্য হয়, তা হলে তা একমাত্র তাঁদের মধ্যেই হতে পারে। আল্লাহ্ তাদের অন্তঃকরণে সম্প্রীতি স্থাপন করে তাঁর অনুসরণে তাদেরকে সেই গোত্রপ্রীতির অধিকারী করবেন, যার শক্তিতে তাঁর বাণীর প্রচার ও মানুষকে তৎপ্রতি আকর্ষণ করার কাজে পূর্ণতালাভ করতে পারে। কিন্তু এটা ব্যতীত শুধু কোনো ফাতেমীয় আবির্ভূত হয়ে মানুষকে আহ্বান করা অর্থহীন। কেননা নবীবংশের হলেও গোত্রপ্রীতি ও শৌর্যহীন এ ব্যক্তির পক্ষে কোনো কার্যই সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। আমরা পূর্বে যে সকল বিশুদ্ধ প্রমাণ উপস্থিত করেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে তা একান্তই অবাস্তব।

জনসাধারণ ও নির্বোধ শ্রেণীর লোকেরা যা দাবি করে, তা ঐ পর্যায়ের নয়, যাতে কোনো প্রকার বুদ্ধির পরিচয় ও জ্ঞানের অভিজ্ঞতা আছে। তারা এ ব্যাপারে

---

৩২৪. হজরত আলীর ভ্রাতা জাফরের বংশধর।

কোনোপ্রকার স্থান ও কালের নির্দেশ ব্যতীতই সাধারণ ধারণা পোষণ করে মাত্র। তা ফাতেমীর আত্মপ্রকাশ সম্পর্কীয় প্রচারণার ফলশ্রুতি; তারা এর অধিক কোনো তাৎপর্য সম্পর্কে অনবহিত, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সকল দেশে ও দিকে তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে নির্দেশ করে; যেমন আফ্রিকিয়ার যাব ও মাগরিবের সুস অঞ্চল। অনেক অদূরদর্শী লোককে মাসায়[৩২৫] অবস্থিত তীর্থস্থানে যেতে দেখেছি। উক্ত তীর্থটি মাগরিবের আবৃত বেদুইনদের অন্তর্গত কুদালা গোত্রের সন্নিকটবর্তী। তাদের ধারণা ফাতেমী তাদের মধ্যে আসবে এবং তাদের জন্য দাবি উত্থাপন করবে। অবশ্য তাদের ধারণার কোনো যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই। শুধু মাত্র ঐ গোত্রগুলোর অভিনব জীবন-যাপন, তাদের প্রকৃত অবস্থা জানার উপায়হীনতাই এর জন্ম দিয়েছে। কারণ তাদের সংখ্যার আধিক্য বা অল্পতা, তাদের শক্তির প্রাবল্য ও দুর্বলতা কোনো কিছুই সঠিকভাবে জানা যায় না। কোনো প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের আয়ত্তে ও শক্তি বিন্যাসের মধ্যে তারা ধরা পড়ে না। সুতরাং তাদের ধারণায় এই সব গোত্রের মধ্যেই ফাতেমীর আবির্ভাবের নিশ্চয়তা সর্বাধিক। কারণ এদের সাহায্যে তিনি অতি সহজেই সাম্রাজ্যের অধীনতা ও তার কঠোর শাসন থেকে মুক্তিলাভ করতে পারবেন। কিন্তু এরূপ একটি সম্ভাবনা ছাড়া এ ধারণার আর কোনো ফলশ্রুতি তাদের মধ্যেও দেখা যায় না। কখনো উক্তস্থানে অনেক নির্বোধ এ উদ্দেশ্য নিয়েও যায় যে, তারা ঐ ধারণার সাহায্য নিয়ে নিজেদেরকে ফাতেমী হিসাবে চালিয়ে দেবে। কিন্তু এটা একান্তই দুরভিসন্ধি ও নির্বুদ্ধিতা। এর ফলে অনুরূপ অনেক ব্যক্তিই নিহত হয়েছে।

আমাদের ওস্তাদ মুহম্মদ ইবনে ইব্রাহিম আবেলী বলেছেন, অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে সুলতান ইউসুফ ইবনে ইয়াকুবের[৩২৬] সময়ে সুফী সাধক এক ব্যক্তি দাবি উত্থাপন করেছিল যে, সেই প্রতিক্ষিত ফাতেমী। তোজরা নামক স্থানের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে তাকে 'তোয়ায়জুরী' বলা হত। সুসবাসী বহুলোক, দ্বালা ও কাযোলা গোত্রের অনেকেই তাকে অনুসরণ করতে লাগল এবং তার ব্যাপারটি ক্রমশ বড় হয়ে দাঁড়ালো। মাসমুদা গোত্রের নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে আশঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং সাকসবী তাকে হত্যার জন্য একজন লোক নিয়োগ করলে, সে রাত্রে গোপনে তাকে হত্যা করল। এই সঙ্গে তার দাবিরও ইতি হল।

অনুরূপভাবে সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকের নয় দশকে গামারায় আব্বাস নামে এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে দাবি করল যে, সেই ফাতেমী। গামারায় সাধারণ মানুষ তাকে অনুসরণ করল। যে জোরপূর্বক ফাস-এ প্রবেশ করে তার বাজার জ্বালিয়ে দিল এবং মাজাম্মা অঞ্চলে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে তাকে প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করা হয় এবং তার কাজ অসম্পূর্ণই থেকে যায়। এই ধরনের বহু কাহিনী বিদ্যমান।

আমাদের পূর্বোল্লেখিত ওস্তাদ এ প্রসঙ্গে এ অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়েছেন। তিলমিশানের উপর ছায়া বিস্তারকারী পর্বতে শায়খ আবু মাদায়েনের[৩২৭] সমাধিস্থলে

---

৩২৫. ১৮৮ পৃষ্ঠা দ্র:।
৩২৬. মারনী সম্রাট; ১২৮৬-১৩০৭ খ্রি:।
৩২৭. মৃত্যুকালে ৫৯৪ (১২৯৮ খ্রি:) হি:।

'রাবাতুল উব্বাদ' নামে যে তীর্থস্থান আছে, হজে যাবার সময় তিনি সেখানে কারবালার অধিকারী নবীবংশীয় এক ব্যক্তির সাথী হয়েছিলেন। এ ব্যক্তির অনুগামীর সংখ্যা অনেক, বহু ছাত্র ও সেবক ছিল। তাঁর জন্মস্থানের অধিবাসীরা বিভিন্ন দেশে যাবার জন্য তাঁর খরচ বহন করত। ওস্তাদ বলেন, রাস্তায় তাদের সাথে আমার অবস্থান আরো ঘনিষ্ঠ হল এবং আমি তাদের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারলাম। তারা করবালার বাসস্থান ত্যাগ করে একমাত্র এ উদ্দেশ্যে ফাতেমীর মতবাদ প্রচারের জন্য মাগরিবে এসেছে। পরে তারা বনি মারিন সাম্রাজ্য ও ইউসুফ ইবনে ইয়াকুবের তৎকালীন তিলমিসানে অবস্থান দেখে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং উক্ত ব্যক্তি তাঁর সাক্ষীদিগকে লক্ষ করে বলেন, ফিরে চল; আমাদের ভুল প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এটা আমাদের উপযোগী সময় নয়। এ ব্যক্তির উক্ত কথা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, তিনি সময়োপযোগী গোত্রপ্রীতি ছাড়া যে অনুরূপ কাজ সম্পন্ন হবার নয়, তা বুঝতে পেরেছিলেন। সুতরাং তিনি যখন দেখলেন যে তিনি এ স্থানে একান্তই অপরিচিত, তার শৌর্য বলতে কিছু নেই এবং বনি মারিনের গোত্রপ্রীতির সমতুল্য কোনো শক্তি মাগরিবে করো মধ্যে দেখা যায় না, তিনি দমে গেলেন ও তাঁর লোভ ত্যাগ করে সত্যের দিকে ফিরে আসলেন। এখন শুধু একটি বিশ্বাসই তাঁর মধ্যে উৎপন্ন হতে বাকি আছে, তা এই যে, ফাতেমী ও কোরায়েশদের গোত্রপ্রীতির আর সুদিন নেই; বিশেষ করে মাগরিবে তা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কিন্তু তাঁর দাবির প্রতি তাঁর গোঁড়ামি হয়তো এ কথা বুঝতে সুযোগ দিবে না। 'আল্লাহ্ই জানেন এবং তোমরা জান না।'[৩২৮]

মাগরিবে সাম্প্রতিককালে সত্য ও ধর্মীয় জীবন প্রতিষ্ঠার প্রতি আহ্বান জানানোর একটা ধারা লক্ষ করা গেছে তাঁরা এ কাজে উদ্বুদ্ধ হন, তাঁরা ফাতেমী বা অন্য কারো সাথে একে যুক্ত করেন না। তাঁদের প্রত্যেকেই এককভাবে সময়ে সময়ে ধর্মীয় জীবন প্রতিষ্ঠা ও অধর্ম নাশের জন্য এগিয়ে আসেন। তারা এটা নিয়ে প্রচেষ্টা চালান ও তাদের অনুসারীর দল বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা রাস্তাঘাট নিরাপদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কারণ আরব বেদুইনদের অধিকাংশই এর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করায় নিয়োজিত। যেমন আমরা তাদের জীবিকা অন্বেষণের ব্যাপারে পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং তারা যতদূর সম্ভব এ অন্যায়কে দূর করতে চেষ্টা করেন। অবশ্য এতে তাদের মধ্যে ধার্মিকতার কোনো অনুভূতি দৃঢ়তা লাভ করে না। কারণ আরব বেদুইনদের অনুশোচনা ও ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তনের অর্থ হল লুটপাট ও ডাকাতি বন্ধ করা। বস্তুত তারা তাদের অনুশোচনা ও ধর্মে সুমতির ব্যাপারে এর অধিক কিছু বুঝতে সক্ষম নয়। কেননা এটাই তাদের একমাত্র পাপ, ধার্মিকতার পূর্বে যাতে তারা অবস্থান করছিল এবং এর জন্যই তাদের অনুশোচনা। এ জন্যই পাঠক, আপনি দেখতে পাবেন যে, এ সকল আপাত দৃশ্যমান ধর্মীয় আন্দোলনের উদ্গাতাদেরকে যারা অনুসরণ করে, তারা ধর্মীয় আনুগত্য ও অনুসরণের মধ্যে তেমন কোনো গভীরতা লাভ করতে সমর্থ হয় না। গোলযোগ, ডাকাতি ও পথঘাট অসুবিধা সৃষ্টি থেকে বিরত থাকা বা রাখাই তাদের উদ্দেশ্য। এর পর সাধ্যানুসারে তারা জীবিকা অর্জন ও পার্থিব সম্পদ আহরণের দিকেই দৃষ্টি দেয়। মানুষের ধর্মীয় জীবনে অনুপ্রাণিত করার পুণ্য এবং এ পার্থিব সম্পদের মধ্যে কতই না

---

৩২৮. কোরান, ২, ২১৬; ২৩২; ৩, ৬৬; ২৪, ১৯।

পার্থক্য! এ দুটি বিষয়কে কিছুতেই একত্র করা যায় না। এ জন্যই যেহেতু তাদের মধ্যে ধার্মিকতার অনুভূতি দৃঢ়তা লাভ করে না, সেই কারণে মিথ্যার প্রলোভন থেকে তাদের সার্বিক মুক্তিও সম্ভব হয়ে ওঠে না। এর অধিক কিছু করারও কথাই ওঠে না।

তদুপরি এরূপ ধর্মপ্রচারকারীদের নিজেদের মধ্যেও ধর্মনিষ্ঠা ও ধর্মীয় মর্যাদার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তাদের মৃত্যু হলে এ বিষয়টিও সেই সঙ্গে নষ্ট হয়ে যায় এবং তাদের সম্প্রদায়গত সম্প্রীতির কোনো চিহ্ন থাকে না। আফ্রিকিয়ায় সপ্তম শতাব্দীতে সুলাইমের অন্তর্গত কাব গোত্রের কাসেম ইবনে মুর্রা ইবনে আহমদ নামক এক ব্যক্তির ব্যাপারে অনুরূপ অবস্থা দেখা গেছে। তার পরে অন্য এক ব্যক্তিরও অনুরূপ অবস্থা হয়েছে। সে রিয়াহ্ বেদুইনদের একটি গোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং তার নাম মুসাল্লাম। তাকে সাআদা বলে ডাকা হত। সে প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিকতর ধার্মিক ও নিজের মতাদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তার অনুসারীদের অবস্থা সুবিধাজনক হয়নি, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। যাহোক সুলাইম ও রিয়াহ্ গোত্রের ইতিহাস বর্ণনার সময় যথাস্থানে এর আলোচনা আসবে।

এর পরও মানুষ অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্মপ্রচারে নেমেছে। তারা তাকে গোলমাল করে ধর্মীয় জীবন সংগ্রাম নাম দিয়েছে; কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক ব্যতীত অধিকাংশেরই এ উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি ছিল না। সুতরাং তাদের নিজেদের এবং পরবর্তী অনুসারীদের কারো আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। শেষ।

চতুঃপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্য ও জাতি সম্পর্কে পূর্বাভাস এবং তদন্তর্গত ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনা ও দিব্যজ্ঞান সম্পর্কে রহস্যোদ্‌ঘাটন]

জেনে রাখুন, মানব প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য হল তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের পরিণাম সম্পর্কে আগ্রহী হওয়া এবং জীবন, মৃত্যু, ভালো-মন্দ ইত্যাদি বিষয়ে ভবিষ্যতে যা ঘটবে, তা জেনে নেয়া। বিশেষ করে সাধারণ ঘটনাবলি, যেমন পৃথিবীর আয়ু কত দিন আছে, কোন্ সাম্রাজ্য কত দিন টিকবে এবং তাদের বয়সের পার্থক্যই বা কত দিন! বস্তুত এ প্রকার বিষয়াদি জানার আগ্রহ মানুষের সহজাত। সম্ভবত এ কারণেই বহু লোককে দেখা যায়, তারা স্বপ্নের মাধ্যমেও এ সমস্ত বিষয় জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। দৈবজ্ঞদের প্রদত্ত সংবাদের মাধ্যমেও এ সমস্ত বিষয় জানার আগ্রহ সম্রাট থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলের নিকট পরিচিত। নগরগুলোতে এমন অনেক লোক দেখা যায়, যারা এ পেশা অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করে। কারণ তারা জানে যে, মানুষ ভবিষ্যৎ জানার জন্য খুবই উৎসুক। সুতরাং তারা রাস্তার ধারে ও দোকানে আসর জমিয়ে অপেক্ষা করে এবং জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদেরকে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। সকাল-সন্ধ্যা তাদের নিকট নগরের স্ত্রীলোক; বালক ও নির্বোধ শ্রেণীর লোকেরা তাদের সর্বকর্মের পরিণাম জানার জন্য ভিড় জমায়। তারা তাদেরকে জীবিকা, সম্পদ, জীবন, দাম্পত্য সম্পর্ক, শত্রুতা ও এ প্রকারের আরো বহু বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয়। এ পেশার মধ্যে যারা বালুকা লিখন পদ্ধতির সাহায্য নেয়, তাদেরকে বলা হয় জ্যোতিষী; যারা নুড়ি ও শস্য চালনার সাহায্য নেয়, তারা গণক এবং যারা দর্পণ ও জলে দৃষ্টিপাতের সাহায্য নেয়, তারা 'মাণ্ডলিক'। এ পেশাটি নগর/পল্লীতে বিস্তৃত গর্হিত কার্যাদির অন্যতম। এ কারণে ধর্মীয় বিধানে এর নিন্দা করা হয়েছে। মানুষ সাধারণভাবে অদৃশ্যের সংবাদ জানতে পারে না। অবশ্য আল্লাহ্ যদি স্বপ্নে বা জাগরণে তা জানার ক্ষমতা কাউকেও দান করেন, তা হলে স্বতন্ত্র কথা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাঁরা এ পেশার সাহায্য গ্রহণ করেন ও তৎসম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন, তাঁরা হলেন রাজন্যবর্গ ও আমীর-উমরাহগণ। তাঁরা তাদের সাম্রাজ্যের আয়ুষ্কাল জানতে চান। এ জন্যই জ্ঞানীদের দৃষ্টিও এ বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এ সম্পর্কে দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষী ও সাধকদের বাণী বিদ্যমান। তাঁরা কোন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা আসন্ন, কোন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, কার সাথে যুদ্ধ ও ঝগড়ার সূত্রপাত হবে, কোন রাজ্য কতদিন টিকবে, কতজন রাজা হবেন এবং যতদূর সম্ভব তাদের নাম পর্যন্ত বলে দিতে চেষ্টা করেন। এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীকে বলা হয় 'পূর্বাভাস।'

আরবে বহু দৈবজ্ঞ ও ভবিষ্যদ্বক্তা ছিল, বেদুইনরা বিভিন্ন বিষয় জানার জন্য তাদের শরণাপন্ন হত। তারা আরবের আশু রাজশক্তির উদ্ভব ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অনেক সংবাদ দিয়েছে। যেমন ইয়ামেনের সম্রাট রাবেয়া ইবনে নসরের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছিল শক্ ও সাতিহ। তারা বলেছেন, হাবশীরা তাঁর রাজ্য দখল করবে এবং পুনরায় তা তাদের নিকট ফিরে আসবে। এর পর আরবদের রাজশক্তি ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে। এরূপ সাতিহ মোবেজানের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছিল। পারস্য সম্রাট খসরু এ ব্যাপারে তার নিকট আবদুল মসিহকে পাঠিয়েছিলেন। সে বলেছিল যে, অচিরেই আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এরূপ বারবার গোত্রের মধ্যেও দৈবজ্ঞ ছিল। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল বনি ইয়াফরানের মুসা ইবনে সালেহ। অনেকে বলে সে গামারার অন্তর্ভুক্ত। তাদের বাগ্‌ধারায় কবিতার আকারে তার বহু বাণী বিদ্যমান। এগুলোতে বহু বিষয়ের পূর্বাভাস আছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল মাগরিবে জানাতা গোত্রের রাজশক্তি ও সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া। তার এ সকল বাণী গোত্রগুলোতে খুবই প্রচলিত। তারা অনেক সময় বলে যে, তিনি ওলী ছিলেন; অনেক সময় বলে, দৈবজ্ঞ; আবার অনেক সময় তাদের মধ্যে এমন ধারণাও দেখা যায় যে, তিনি নবী। কারণ তাঁর জীবনকাল তাদের মতে হিজরতের বহু পূর্বেকার ব্যাপার। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

কখনো কোনো গোত্র এ ব্যাপারে নবীদের সংবাদ প্রদান দ্বারা প্রমাণ উপস্থিত করে। কারণ অনেক নবীই অনুরূপ সংবাদ দিয়েছেন। যেমন বনি ইসরাইলের মধ্যে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আগত নবীরা জিজ্ঞাসিত হলে অনুরূপ বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করতেন।

ইসলামী সাম্রাজ্যে এ প্রকার সংবাদের প্রাচুর্য রয়েছে। অবশ্য তার মধ্যে অনেকগুলো সাধারণভাবে পৃথিবীর বয়স ও তার স্থিতিকাল সম্পর্কীয় এবং অনেকগুলো বিশেষভাবে কোনো সাম্রাজ্য ও তার বয়সের ব্যাপারে। ইসলামের প্রথম দিকে এ ব্যাপারে সাহাবীদের নিকট থেকে বর্ণিত হাদিসের উপর নির্ভর করা হত। বিশেষ করে বনি ইসরাইল থেকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীরা; যেমন কাব আল-আহবার, ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ ও তাদের অনুরূপ। অনেক সময় বর্ণিত বিষয়গুলোর সাধারণ অর্থ ও তাদের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা থেকেও এ বিষয়ের উপাদান সংগ্রহ করা হত।

জাফর ও অন্যান্য নবী বংশীয়দের অনেক বাণী ও ঘটনা বিদ্যমান যারা তারা এই পেশার ভিত্তি নির্ধারণ করে। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন, দিব্যানুভূতির ব্যাপারটিত তাঁদের ওলী হওয়ার সাথে যুক্ত। কারণ এ ধরনের ব্যাপার তাঁদের পরবর্তী বংশাবলি ও অন্যান্য লোকের মধ্যেও ছিল এবং তাদের ওলী হওয়া সম্পর্কে অস্বীকারের কোনো কারণ নেই। তিনি (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে পূর্বাভাস দানকারী আছে। সুতরাং তৎবংশীয়রা এ মহান মর্যাদা ও দিব্যবিভূতি লাভের জন্য অধিকতর যোগ্য। অবশ্য জাতির প্রাথমিক অবস্থা অতিবাহিত হবার পর মানুষ যখন জ্ঞানবিজ্ঞান ও পরিভাষা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করল এবং দার্শনিকদের পুস্তকাবলি আরবি ভাষায় অনূদিত হল, তখন এ ব্যাপারে অধিকাংশ লোক জ্যোতিষীদের বাণীর উপর নির্ভর করত। তারা রাজশক্তি, সাম্রাজ্য, রাশি সংযোগের অধীন অন্যান্য সাধারণ বিষয় এবং জন্ম, অন্যান্য প্রশ্ন, রাশির উদয়ের

সাথে বিশেষভাবে জড়িত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আকাশমণ্ডলের অবস্থান অনুযায়ী সংবাদ প্রদান করত। আমরা এখন মহাজন বাণীর ব্যাপারটি আলোচনা করব এবং পরে যথারীতি জ্যোতিষীদের বিষয় আলোচনায় ফিরে আসব।

পৃথিবীর বয়স ও বিভিন্ন জাতির আয়ুষ্কাল সম্পর্কে মহাজন বাণী, যা সুহায়লীর গ্রন্থে তাবারী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তা এই যে, ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে পৃথিবী মাত্র পাঁচশ বছর স্থায়ী হবে। কিন্তু এটা মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে তাবারীর ভিত্তি হল ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত একটি বাণী পৃথিবী পারলৌকিক সপ্তাহগুলোর মধ্যে একটি সপ্তাহ মাত্র। কিন্তু তাবারী এর কোনো প্রমাণ বর্ণনা করেননি। এর তত্ত্ব আল্লাহ্ই ভালো জানেন, সম্ভবত এই যে, পৃথিবীকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির সময় অনুসারে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ঐ সময়ের পরিমাণ হল সাত দিন এবং প্রতি দিনের দৈর্ঘ এক সহস্র বছর। আল্লাহ্ বলেছেন, তোমার প্রভুর নিকট একটি দিন তোমাদের গণনার এক সহস্র বছরের তুল্য।[৩২৯] তাবারী বলেন বিশুদ্ধ সংকলনদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, পূর্ববর্তীদের তুলনায় তোমাদের আয়ুষ্কাল আসরের নামাজ থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তিনি (সঃ) বলেছেন, প্রেরিত আমি ও মহাপ্রলয় এরূপ—তিনি তর্জনী ও মধ্যমার দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন। আসরের নামাজ থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের পরিমাণ, যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায় প্রায় এক সপ্তমাংশের অর্ধেক এবং তর্জনী ও মধ্যমার পার্থক্যও অনুরূপ। সুতরাং উক্ত সময় সপ্তাহের এক-সপ্তমাংশের অর্ধেক অর্থাৎ পাঁচশ বছর হবে।[৩৩০]

এ পরিমাণ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর এ বাণীর দ্বারাও সমর্থিত হয়; তিনি বলেন, আল্লাহ্ এ উম্মতকে অর্ধেক দিন স্থায়ী করতে অসমর্থ নয়। এতে প্রমাণ হয় যে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবীর বয়স পাঁচ হাজার পাঁচশ বছর। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তা পাঁচ হাজার ছয়শ বছর অর্থাৎ অতীত কাব থেকে বর্ণিত হয়েছে, পৃথিবীর সাকুল্য সময় ছয় হাজার বছর[৩৩১] সুহায়লী বলেন, হাদিস দুটিতে তাদের বর্ণনা অনুসারে কোনো বিষয়ের কোনো প্রমাণ নেই। কারণ বাস্তব অবস্থা এর বিপরীত।

রসূলুল্লাহ্র সেই বাণী—আল্লাহ্ এ উম্মতকে অর্ধেক দিন স্থায়ী করতে অসমর্থ নয়—এতেই অর্ধেকের বেশি স্থায়ী হবার সম্ভাবনা নষ্ট হয় না। রসূলুল্লাহ্র বাণী—প্রেরিত আমি ও মহাপ্রলয় এরূপ—এতে উভয়ের নৈকট্যই বোঝাচ্ছে। অন্যদিকে তাঁর ও প্রলয়ের মাঝখানে অন্য কোনো নবী নেই এবং তাঁর ধর্মীয় বিধান ভিন্ন অন্য কোনো বিধান নেই।

অতঃপর সুহায়লী এ উম্মতের আয়ুষ্কাল নির্ধারণের জন্য অন্য একটি উপলব্ধির দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা যদি তাতে যথার্থ কিছু পাওয়া যায়। তা এই যে, তিনি কোরানের বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভের বিভিন্ন বর্ণমালাকে দ্বিরুক্তি বাদ দিয়ে একত্র করেছেন। তিনি বলেন, তা চৌদ্দটি বর্ণ এ সকল শব্দাবলিতে একত্র হয়েছে : আলম, ইস্তাআ, নস,

---

৩২৯. কোরান, ২২, ৪৭।

৩৩০. একদিন—এক হাজার বছর; তার অর্ধেক পাঁচশ বছর।

৩৩১. বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক উল্লেখিত বছরের সংখ্যা নিম্নরূপ হবে—ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ৬, ৫০০; মুনাব্বিহ—৬, ৬০০ এবং কাব—৭,০০০ বছর।

হবক্ব ও করহ। অতঃপর আবজাদের হিসাব অনুসারে এদের সংখ্যামান গ্রহণ করেছেন। এতে সাতশ তিন হয়েছে[৩৩২] এবং এর সাথে সহস্রাব্দের অবশিষ্ট বছরগুলো রসূলুল্লাহ্‌র আবির্ভাবের পূর্ববর্তীকাল থেকে যোগ করা হয়েছে। এটাই ইসলামের আয়ুষ্কাল। সুহায়লী বলেন, এ বর্ণমালার মধ্যে এরূপ একটি ইঙ্গিত থাকা তাদের অস্তিত্বের উপযোগিতার দিক থেকে অসম্ভব বলে মনে হয় না। আমি (গ্রন্থকার) বলি এ 'অসম্ভব মনে হয় না' কথাটি থেকে বোঝা যায়, এ বর্ণমালা অনুরূপ কোনো ইঙ্গিতের জন্য নয় এবং তাদের অনুরূপ ব্যাখ্যার অধীন করাও সমীচীন হতে পারে না।

এ ব্যাপারে যে বিষয়টি সুহায়লীকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে, তা হল ইবনে ইসহাক কর্তৃক 'কিতাব্‌স্‌সিয়রে' বর্ণিত ইহুদি রাব্বি আখতাবের দুই পুত্রের ঘটনা। উক্ত দুই পুত্রের নাম আবু ইয়াসের ও তার ভাই হাই। তারা কোরানের বিচ্ছিন্ন বর্ণমালার মধ্যে 'আলিফলামমিম'-এর কথা শুনতে পেয়ে আবজদের হিসাবে তাদের সংখ্যামান নির্ণয় করে ইসলামের আয়ুষ্কাল বলে ব্যাখ্যা করল। এতে মোট একাত্তর হল। তারা একে খুব কম সময় মনে করে হাই নবী (সঃ)-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, এ প্রকার আরো বর্ণ আছে? তিনি উত্তরে বললেন, আলিফ লাম মিম সোয়াদ। এর পর বর্ধিত করলেন, আলিফ লাম র। এর পর বর্ধিত করলেন, আলিফ লাম মিম রা। এর ফলে একাত্তর ও দুইশ হল এবং আয়ুষ্কাল বেড়ে গেল। হাই বলল, হে মুহম্মদ! আপনার বিষয়টি আমাদের কাছে কেমন দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে! আমরা বুঝতে পারছি না, আপনাকে কি বেশি দেয়া হয়েছে অথবা কম! অতঃপর তারা চলে গেল। আবু ইয়াসের তাদেরকে বলল, হয়তো তোমরা বুঝতে পারনি তাঁকে সংখ্যার সম্পূর্ণটাই দেয়া হয়েছে; তা নয়শ চার বছর[৩৩৩] ইবনে ইসহাক বলেন, এর পর আল্লাহ্‌র বাণী অবতীর্ণ হল—তার মধ্যে সুবোধ্য শ্লোকসমূহ বিদ্যমান, তাই গ্রন্থজনীন এবং অন্যগুলো দ্ব্যর্থবোধক।[৩৩৪] শেষ।

এই ঘটনা থেকে অনুরূপ সংখ্যা দ্বারা ধর্মের স্থায়িত্বের কোনো সময় নির্ধারণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ এ বর্ণমালার দ্বারা স্বভাব বা যুক্তি কোনো দিক থেকেই সংখ্যা বোঝায় না। এটা একমাত্র এগুলোর আবজদের হিসাবের ধারায় গণনার মধ্যে ধরে নিতে এরূপ কিছু একটা হতে পারে। আবজদের হিসাবটি সুপ্রসিদ্ধ ও প্রাচীন; এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো প্রথা প্রাচীন হলেই তা প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট নয়। আবু ইয়াসের ও তার ভাই হাইও এমন কোনো ব্যক্তি নয়, যাদের মতামত প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তারা ইহুদি রাব্বিও নয়। কারণ তারা হেজাজের বেদুইন জীবনের অধিকারী ছিল। জ্ঞান ও শিল্পকলা সম্পর্কে উদাসীন, এমন কি তাদের নিজ ধর্ম সম্পর্কেও তারা জ্ঞান রাখত না এবং তাদের সম্প্রদায় ও ধর্মগ্রন্থও ভালো করে বুঝত না। তারা এ ধরনের গণনা সম্পর্কে একটা ঔৎসুক্য পোষণ করত, যা প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই এক শ্রেণীর সাধারণ লোক পোষণ করে থাকে। সুতরাং সুহায়লী যে বিষয়টি নিয়ে দাবি উত্থাপন করেছেন, তা প্রমাণ হিসাবে তাকে কোনো সহায়তাই করছে না।

---

৩৩২. রোজেনথাল ৯০৩ উল্লেখ করেছেন।

৩৩৩. রোজেনথালে ৭০৪ বছর। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আবজদের হিসাবে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্নতা রয়েছে (১৩৭ পৃষ্ঠা ১৪২নং টীকা দ্র:)।

৩৩৪. কোরান, ৩, ৭।

এ ধর্মের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রামাণ্য কিছু মহাজন বাণী বিদ্যমান, যা সংক্ষেপে তার পূর্বাভাস প্রদান করেছে। এ সম্পর্কে আবু দাউদ হুজায়ফা ইবনে ইয়ামান[৩৩৫] থেকে, তার ওস্তাদ মুহম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া যাহাবীর[৩৩৬] ধারায় যথাক্রমে সাইদ ইবনে আবু মরিয়ম[৩৩৭], আবদুল্লাহ্ ইবনে ফররুখ[৩৩৮], উসামা ইবনে যায়েদ লায়সী[৩৩৯], আবু কুবায়সা ইবনে যুয়ায়ে,[৩৪০] তার পিতা হয়ে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। হুজায়ফা ইবনে ইয়ামান বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি বুঝতে পারি না আমার সাথীরা কি ভুলে গেছেন অথবা তারা ভুলবার ভান করছেন। আল্লাহ্‌র কসম, রসূলুল্লাহ্ পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত প্রতিটি দল যার অনুসারীর সংখ্যা তিনশ ও তার বেশি হতে পারে, তার পরিচালক, তার নাম, পিতার নাম এমন কি গোত্রের কথা পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ এ হাদিস সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তার পুস্তিকায় বলেছেন, যে হাদিসের উপর কোনো মন্তব্য নেই, তা ভালো। অবশ্য এ হাদিসটি শুদ্ধ বলে ধরে নিলেও সংক্ষিপ্ত। এ কারণে তার সংক্ষেপকে বিশদ করতে ও এর দুর্বোধ্যতাকে পরিস্ফুট করতে অন্য কিছু সংখ্যক ভালো সূত্রের বর্ণিত হাদিসের প্রয়োজন। আলোচ্য হাদিসটি 'সুনান' নামীয় সংকলনের বাইরে অন্যত্র এ সূত্রেই ভিন্নধারায় বর্ণিত হয়েছে। বিশুদ্ধ দুটি সংকলনে এটা হুজায়ফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদের মধ্যে বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে মহাপ্রলয় পর্যন্ত সংঘটিতব্য এমন কোনো বিষয় নেই, যা যথাস্থানে বর্ণনা করতে তিনি বাকি রেখেছেন। যাঁরা তাকে স্মরণ রেখেছেন, তাঁরা স্মরণ রেখেছেন এবং যাঁরা তাকে ভুলে গেছেন, তাঁরা ভুলে গেছেন। আমার এ সাথীরা সকলেই তা জানেন। শেষ।

বোখারীর বর্ণনা, মহাপ্রলয় পর্যন্ত সব কিছুই বর্ণনা করেছেন। তিরমিজীর গ্রন্থে আবু সাইদ খুরদী থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদের সাথে সকাল সকাল আসরের নামাজ পড়লেন। এর পর তিনি বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত সকল কিছুরই সংবাদ আমাদেরকে দিলেন। যারা তা স্মরণ রেখেছে, তারা স্মরণ রেখেছে এবং যারা ভুলে গেছে, তারা ভুলে গেছে। শেষ।

এ সবগুলো হাদিসই বিশুদ্ধ সংকলনদ্বয়ের আলোচ্য বিষয় অনুসারে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি ও কিয়ামতের শর্তাদি সম্পর্কে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। কেননা এগুলো ধর্ম প্রবর্তক (আল্লাহ্ তাঁর উপর শান্তি ও স্বস্তি বর্ষণ করুন) স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে অতি সাধারণ বিষয়াদি সম্পর্কে বলেছেন। সুতরাং এ ধারায় আবু দাউদ এককভাবে যে অতিরিক্ত বর্ণনা প্রদান করেছেন, তা বিরল ও অস্বীকৃত। তদুপরি হাদিসবেত্তাগণ তার হাদিসের সূত্রান্তর্গত ব্যক্তিদের সম্পর্কে মতানৈক্য পোষণ করেন। ইবনে আবু মরিয়ম ইবনে ফররুখ সম্পর্কে বলেন, তার সকল হাদিস অস্বীকৃত। বোখারী বলেন, তার হাদিস

---

৩৩৫. মৃত্যু ৩৬ (৬৫৭ খ্রি:) হি:।
৩৩৬. সুহলী (রঃ); মৃত্যু ২৫২-৫৭ (৮৬৬-৭৯) হি:।
৩৩৭. সাইদ ইবনে হকম; ১৪৪-২২৪ (৭৬২-৮৩৯ খ্রি:) হি:।
৩৩৮. ১১৫-৭৫ (৭৩৩-৯১ খ্রি:) হি:।
৩৩৯. ৮৩-১৫৩ (৭০২-১০ খ্রি:) হি:।
৩৪০. মৃত্যু ৮৬-৮৯ (৭০-৮ খ্রি:) হি:।

কখনো স্বীকৃত হয়, কখনো অস্বীকৃত। ইবনে আদী বলেন, তার সকল হাদিসই অসংরক্ষিত। উসামা ইবনে যায়েদ সম্পর্কে বলতে গেলে, যদিও তার হাদিস বিশুদ্ধ দুটি সংকলনে গৃহীত হয়েছে এবং ইবনে মুঈন তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন—তথাপি বোখারী তাঁর হাদিস আলোচনার জন্যই গ্রহণ করেছেন এবং ইয়াহিয়া ইবনে সাইদ ও আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁকে দুর্বল বলেছেন। আবু হাতেম বলেন, তাঁর হাদিস লেখা হত; কিন্তু প্রমাণ হিসাবে ব্যবহৃত হত না। আবু কুবায়সা ইবনে যোয়ায়েব অপরিচিত। সুতরাং আবু দাউদের হাদিসে বর্ণিত অংশ এ দিক থেকেও দুর্বল বলে প্রতিপন্ন হয়। তদুপরি পূর্ব বর্ণিত বিরলত্বও আছেই।

কখনো তারা সাম্রাজ্যের পূর্বাভাসে বিশেষভাবে 'কিতাবুল জিফর'কে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে এবং তারা ধারণা করে যে, তাতে মহাজন বাণী ও জ্যোতিষের ধারায় বর্ণিত সকল জ্ঞান একত্র করা হয়েছে। অথচ তারা তাদের এ পুস্তকের মূল উৎস ও ভিত্তি সম্পর্কে কিছুই জানে না। পাঠক, জেনে রাখুন, 'কিতাবুল জিফর'-এর মূল ভিত্তি হল এই যে, শিয়া যায়দিয়া সম্প্রদায়ের নেতা হারুন ইবনে সাইদ আজলীর[৩৪১] কাছে একটি পুস্তক ছিল, তা তিনি ইমাম জাফর সাদেকের বাণী থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। এতে সাধারণভাবে নবী বংশের উপর অচিরে আগামী বিপদ-আপদ এবং বিশেষভাবে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির অবস্থার কথা ছিল। এগুলো ইমাম জাফর ও তাঁর ন্যায়-অন্যায় ব্যক্তির জন্য দিব্যজ্ঞান ও বিভূতির কল্যাণে লব্ধ হয়ে থাকতে পারে। কারণ এটা আল্লাহ্‌র ওলীদের ক্ষমতার অন্তর্গত। এ বাণীগুলো একটি ক্ষুদ্র ভেড়ার চামড়ায় লিখিতভাবে ইমাম জাফরের নিকট ছিল। হারুন আজলী এগুলো তাঁর নিকট থেকে গ্রহণ করে লিপিবদ্ধ করেন এবং মূলের চামড়ার উপর লিপিবদ্ধ অবস্থাকে অনুসরণ করে তার নামকরণ করেন 'জিফর'। কেননা অভিধানে 'জিফর' অর্থ ক্ষুদ্র। পরে তারা এরূপ পূর্বাভাস প্রদানের বিদ্যাটিকেই 'জিফর' বলে অভিহিত করেন এবং তার উৎস হয়ে দাঁড়ায় এ পুস্তক। এতে কোরানের ব্যাখ্যাও ছিল এবং তার মধ্যে যে গূঢ় তত্ত্ব বিদ্যমান, তাও জাফর যাদেকের নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছিল। অবশ্য এ পুস্তকের বর্ণনার সূত্র সংবদ্ধ নয়, তার মূল ভিত্তিও জানা যায়নি; বরং এগুলো যুক্তি-প্রমাণহীন কতিপয় বিরল বাণী মাত্র। যদি জাফর সাদেকের সাথে এর সংযোগ শুদ্ধ হয়ে থাকে, তা হলে তা তাঁর নিজের দিক থেকে এবং তাঁর গোষ্ঠীর অন্যান্য লোকের দিক থেকে যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। কেননা তাঁদের প্রায় সকলেই বিভূতির অধিকারী ছিলেন।

জাফর সাদেক থেকে যা শুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা এই যে, তিনি অনেক সময় তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে পূর্বাহ্নে সতর্ক করে দিতেন এবং পরে দেখা যেত তাঁর সতর্কীকরণ সত্য হয়ে উঠেছে। তিনি তার চাচা যায়েদের পুত্র ইয়াহিয়াকে তার নিহত হওয়া সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা না মেনে বিদ্রোহ করেন ও নিহত হন। জুযজানে সংঘটিত এই ঘটনা সকলের নিকট পরিচিত। বিভূতি যখন অন্যদের মধ্যেও পাওয়া যায়, তা হলে, পাঠক, আপনি তাদের সম্পর্কে কি ভিন্নরূপ

---

৩৪১. ইনি ইব্রাহিম ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে হাসানের সহচর ছিলেন; ৩৫৩ পৃষ্ঠা ২৬১ টীকা দ্র:।

চিন্তা করতে পারেন! তাঁরা জ্ঞানে, ধর্মে ও নবুয়তের পদাঙ্ক অনুসরণে অন্যদের অপেক্ষা বিশিষ্ট। আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে তাঁদের সম্ভ্রান্ত উৎসই শাখা-প্রশাখার পবিত্রতার সাক্ষ্য বহন করে। নবীবংশের বিশেষ কারো প্রতি নির্দেশিত হওয়া ছাড়াই এ প্রকার বহু বাণী প্রচলিত রয়েছে। উবাইদী সাম্রাজ্য সম্পর্কেও এ প্রকার বহু বাণী বিদ্যমান।

পাঠক, উবায়দুল্লাহ্ মেহেদী ও তৎপুত্র মুহম্মদ হাবিবের সাথে আবু আবদুল্লাহ্ শিয়ীর সাক্ষাৎকার সম্পর্কে ইবনে রফিক যা বর্ণনা করেছেন, তৎপ্রতি লক্ষ করুন। তাঁরা আবু আবদুল্লাহ্‌কে কীভাবে বহু সংবাদ দিয়েছিলেন এবং কীভাবে তাকে ইয়ামেনের শিয়ামত প্রচারক ইবনে হাওশবের নিকট পাঠিয়েছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি আবু আবদুল্লাহ্‌কে মাগরিবে গিয়ে সেখানে শিয়ামত প্রচার জোরদার করতে বলেছেন। কারণ, তিনি বিশেষ দীক্ষার ফলে জানতে পেরেছিলেন যে, তাদের প্রচারকার্য সেখানে সফলকাম হবে।

আফ্রিকিয়ায় শিয়া সাম্রাজ্য বিস্তৃত হওয়ার পর উবায়দুল্লাহ্ মেহেদী যখন 'মাহদিয়া' নগরীর পত্তন করেন, তখন তিনি বলেছিলেন, ফাতেমীদেরকে দিনের ঘণ্টা খানিক সময়ের জন্য সুরক্ষিত করার নিমিত্ত এ নগরীর পত্তন করলাম। আমি এর প্রাঙ্গণে গর্দভারোহীর বিশ্রামস্থল তাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি। তাঁর পৌত্র ইসমাইল আল মনসুরের নিকটও এই বাণী পৌঁছেছিল। সুতরাং যখন গর্দভারোহী আবু ইয়াজিদ তাঁকে মাহদিয়ায় অবরুদ্ধ করে ফেলল[৩৪২] তখন তিনি তার বিশ্রামস্থল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তার সংবাদ এলে দেখতে পেলেন তাঁর পিতামহ উবায়দুল্লাহ্ যে স্থান নির্দেশ করেছিলেন, তা সত্য হয়েছে। সুতরাং আলমনসুর জয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে উঠলেন। তিনি শহর থেকে বের হয়ে তাকে পরাজিত করলেন এবং যাবের সীমান্ত পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করে তার উপর জয়ী হলেন ও তাকে হত্যা করলেন। এ প্রকার বহু কাহিনী তাদের নিকট বিদ্যমান।

জ্যোতিষশাস্ত্র

জ্যোতিষীরা সাম্রাজ্যের পূর্বাভাস সম্পর্কে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিধি-বিধানকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে, যেমন রাজশক্তির উদ্ভব ও সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ইত্যাদিতে তারা রাশি সংযোগের দ্বারা, বিশেষভাবে দুটি বৃহৎ গ্রহ শনি ও বৃহস্পতির মধ্যকার এই সংযোগ থেকে সংবাদ প্রদান করে। এ দুটি বৃহৎ গ্রহ প্রতি বিশ বছরে একবার সংযুক্ত হয়। পুনরায় এ সংযোগ এ ত্রিভুজ ক্ষেত্রের অন্য একটি রাশিতে দক্ষিণ ত্রিত্বে দেখা দেয়। এর পর আবার এটা অন্য একটি রাশিতে সংঘটিত হয়। এভাবে প্রতি ত্রিভুজ ক্ষেত্রে দ্বাদশবার সংযুক্ত হয়ে তিন রাশির ষাট বছর পূর্ণ হয়। পুনরায় অনুরূপভাবে দ্বিতীয় ষাট বছর এবং তৃতীয় ও চতুর্থ ষাট বছর হয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং প্রতিটি ত্রিভুজে দ্বাদশবার এবং চারটি আবর্তনে মোট দুইশ চল্লিশ বছর সময় লাগে। প্রতিটি রাশিতে এ সংযোগের আবর্তন দক্ষিণ ত্রিত্ব অনুসারে হয় এবং তা

৩৪২. এ ঘটনা ৩৩৩-৩৪ (৯৪৫ খ্রি:) হিজরির এবং ৩৩৬ (৯৪৭ খ্রি:) হিজরিতে আবু ইয়াজীদের মৃত্যু হয়।

এক ত্রিভুজ থেকে তার সন্নিহিত অন্য ত্রিভুজে গমন করে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী ত্রিভুজের শেষ রাশিটির সন্নিহিত পরবর্তী ত্রিভুজের রাশিতে আবর্তিত হয়ে থাকে। এ সংযোগ, যাকে বৃহৎ দুটি গ্রহের সংযোগ বলা হয়, তা বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও মধ্যম, এ তিনভাগে বিভক্ত হয়। বৃহৎ সংযোগ হল এ দুটি গ্রহের আকাশমণ্ডলের বিশেষ স্তরে নয়শ ষাট বছরে একবার ফিরে আসা। মধ্যম হল, উক্ত দুটি গ্রহের প্রতিটি ত্রিভুজ ক্ষেত্রে দ্বাদশ বার সংযুক্ত হওয়া এবং দুইশ চল্লিশ বছর পরে অন্য একটি ত্রিভুজে আবর্তন করা। ক্ষুদ্রটি হল উক্ত দুটি গ্রহের কোনো রাশির পর্যায়ে সংযুক্ত হওয়া এবং বিশ বছর পরে দক্ষিণ ত্রিত্ব অনুসারে অনুরূপ পর্যায় বা পলে অন্য রাশিতে সংযোগের অধীন হওয়া।

এর উদাহরণ এই যে, মেষ রাশির প্রথম পলে সংযোগ দেখা দিল, এর বিশ বছর পরে ধনু রাশির প্রথম পলে দেখা দিবে এবং আরো বিশ বছর পরে ধনু রাশির প্রথম পলে দেখা দিবে এবং আরো বিশ বছর পরে সিংহ রাশির প্রথম পলে আসবে। এর সবগুলোই আগ্নেয় এবং এর প্রতি সংযোগই ক্ষুদ্র। এর পর আবার এটা ষাট বছর পরে মেষ রাশির প্রথমে প্রত্যাবর্তন করবে। একে বলা হয় সংযোগ বলয় ও সংযোগ আবর্তন। দুইশ চল্লিশ বছর পরে আগ্নেয় থেকে মৃন্ময়ে আবর্তন করবে; কেননা তা পরবর্তী। এটাই মধ্যম সংযোগ। অতঃপর বায়বীয় ও এর পর জলীয় পর্যায়ে আবর্তন করবে এবং পুনরায় মেষ রাশির প্রথম দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। এটাই বৃহৎ সংযোগ।

বৃহৎ সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি যেমন রাজশক্তি ও সাম্রাজ্যের পরিবর্তন, একজাতি থেকে অন্য জাতির হস্তে রাজকীয় ক্ষমতা হস্তান্তর ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করে। মধ্যম সংযোগ রাজশক্তির উপর প্রাধান্য বিস্তার এবং তন্নিমিত্ত আন্দোলনকারীদের সংবাদ দেয়। ক্ষুদ্র সংযোগ মতবাদ প্রচারকারী ও বিদ্রোহী এবং নগরীর বিনাশ ও তার জনবসতির ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করে।

এ সকল সংযোগের মধ্যে প্রত্যেক ত্রিশ বছরে একবার কর্কট রাশিতে দুটি অশুভ গ্রহের সংযোগ দেখা দেয়। একে বলা হয় চতুর্থ। কর্কট রাশি পৃথিবীর উপর উদিত বিধায় তাতে শনির দশা ও মঙ্গলের দুর্যোগ দেখা দিয়ে থাকে। এর ফলে এ সংযোগ গোলযোগ, যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাত, বিদ্রোহ, সৈন্য সমাবেশ, সৈন্যদলের বিদ্রোহ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের হেতু নির্দেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। উক্ত দুটি গ্রহের সংযোগকালীন শুভাশুভ অনুসারে হেতু নির্দেশের ব্যবস্থায় এ সকল বিষয় স্থায়ী বা দূর হয়ে থাকে।

গণক জিরাস ইবনে আহমদ নিজামুল মুলকের[৩৪৩] জন্য প্রণীত তার গ্রন্থে বলেছেন, মঙ্গলের বৃশ্চিক রাশিতে প্রত্যাবর্তন ইসলাম ধর্মের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বহন করে; কেননা তাই এ ধর্মের হেতু নির্দেশক। বৃশ্চিক রাশিতে দুটি বৃহৎ গ্রহের সংযোগে নবী (সঃ)-র জন্ম হয়েছিল। সুতরাং তা পুনরায় ঐস্থলে এলে খলিফাদের মধ্যে গোলযোগ দেখা দেয়, ধার্মিক ও জ্ঞানীদের মধ্যে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং তাঁদের অবস্থার হানি হয়। অনেক সময় ধর্মীয় স্থান ধ্বংস হয়ে যায়। কখনো বলা হয়, আলী (রাঃ), বনি উমাইয়ার মারোয়ান ও বনি আব্বাসের আল-মুতাওয়াক্কিল নিহত হওয়ার সময় এ সংযোগ দেখা দিয়েছিল। সুতরাং এ সকল অভিজ্ঞতা সংযোগের নিয়ম-নীতির সাথে মিলিয়ে নিলে বিষয়টি খুবই দৃঢ় হয়।

---

৩৪৩. প্রসিদ্ধ সলজুকী উজির; মৃত্যু ৪৮৫ (১০৯২ খ্রি:) হি:।

শাজান বলখী[৩৪৪] বর্ণনা করেছিলেন যে, ইসলাম ধর্ম তিনশ বিশ বছর স্থায়ী হবে। তার এই বক্তব্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আবু মাশার বলেছিলেন, একশ পঞ্চাশ বছর পরে তাতে প্রচুর মতভেদ দেখা দিবে। তাও শুদ্ধ হয়নি। জিরাস বলে, পূর্ববর্তীদের গ্রন্থাবলিতে দেখেছি, জ্যোতিষীরা পারস্য সম্রাটকে আরব রাজশক্তি ও তাদের মধ্যে নবীর আবির্ভাবের সংবাদ দিয়েছিল। তাদের হেতু নির্দেশক গ্রহ হল শুক্র এবং তা তুঙ্গে অবস্থান করবে। সুতরাং তাদের রাজশক্তি চল্লিশ বছর স্থায়ী হবে। আবু মাশার[৩৪৫] 'কিতুব্বুল কেরানাত' গ্রন্থে বলেছেন, অংশ যখন মীন রাশির সাতাশ ভাগে পৌঁছবে, তখনই শুক্রের তুঙ্গাবস্থা এবং তার সাথে বৃশ্চিক রাশিতে সংযোগ দেখা দেবে। এটাই আরবের হেতু নির্দেশক। তখন আরব সাম্রাজ্য দেখা দিবে এবং তাদের মধ্যে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তাদের রাজশক্তি ও তার স্থায়িত্ব শুক্রের তুঙ্গীভবনের অবশিষ্ট এগার অংশ, যা মীন রাশির নৈকট্য লাভের জন্য প্রয়োজন, সেই অনুপাতে ছয়শ দশ বছর হবে। আবু মুসলিমের[৩৪৬] আত্মপ্রকাশ শুক্রের আবর্তনকালে ঘটে, অংশ তখন মেষ রাশির প্রথম দিকে এবং ভাগ্যাধিপতি বৃহস্পতি।

ইয়াকুব ইবনে ইসহাক কিন্দী বলেন, ইসলাম ধর্মের আয়ুষ্কাল ছয়শ তিরানব্বই পর্যন্ত স্থায়ী হবে। তিনি বলেন, কেননা শুক্র উক্ত ধর্মের উদ্ভব সংযোগে মীন রাশির আটাশ অংশ ও ত্রিশ পলে অবস্থান করছিল। সুতরাং তার অবশিষ্ট রইল এগার অংশ ও আঠার পল। এক অংশ ষাট পলে বিভক্ত। সুতরাং তা ছয়শ তিরানব্বই বছর হবে। তিনি বলেন, ধর্মের এ আয়ুষ্কাল সম্পর্কে দার্শনিকরা সকলে একমত এবং কোরানের সূরাগুলোর প্রথমে লিখিত বর্ণমালার দ্বিরুক্তি বাদ দিয়ে আবজাদের হিসাবে তাদের সংখ্যামান নির্ণয় করলেও এ মতের সমর্থন মিলে। আমি (গ্রন্থকার) বলি, এটা সেই হিসাব, যা সুহায়লী বর্ণনা করেছেন। যতদূর মনে হয়, পূর্বের এ মতটির ভিত্তি সুহায়লীই স্থাপন করেছেন, যেমন আমরা পূর্বে তার নিকট থেকে তা উদ্ধৃত করেছি।

জিরাস বলেন, হরমুজ জ্ঞানী আফ্রিদকে[৩৪৭] আর্দেশির, তার সন্তান-সন্ততি ও সাসানী সাম্রাজ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে তিনি বললেন, তার রাজ্যের হেতু নির্দেশক বৃহস্পতি। তা তুঙ্গে থাকার ফলে তাকে দীর্ঘ ও শুভ কাল চারশ সাতাশ বছর দেয়া হয়েছে। অতঃপর শুক্রের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। তা তুঙ্গে পৌঁছলে আরবদের হেতু নির্দেশক হয়ে দাঁড়াবে। তারা রাজ্যাধিপতি হবে; কেননা সংযোগের উদয় রাশি তখন তুলা এবং তার অধিপতি শুক্র। সংযোগের সময় তা তুঙ্গে ছিল। এর ফলে এটাই নির্দেশ করে যে, তারা এক হাজার ষাট বছর রাজত্ব করবে। পারস্য সম্রাট নওশেরোয়া তাঁর উজির দার্শনিক বুরজেচমেহেরকে রাজশক্তি পারস্য থেকে আরবের হাতে চলে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি উত্তরে বললেন যে, তার রাজ্যকালের পঁয়তাল্লিশ বছরে আরব সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জন্মগ্রহণ করবে এবং পূর্ব ও পশ্চিমের অধীশ্বর হবে। তখন বৃহস্পতি শুক্রের জন্য আধিপত্য ছেড়ে দেবে এবং সংযোগ বায়বীয় ত্রিভুজ থেকে

৩৪৪. পরবর্তী আবু মাশারের শিষ্য।
৩৪৫. জাফর ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ২৭২ (৮৮৬ খ্রি:) হি:।
৩৪৬. আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা পারস্য সেনাপতি, ১৩৭ (৭৫৫ খ্রি:) হিজরিতে নিহত।
৩৪৭. রোজেনথালে জ্ঞানী 'হরমুজাফ্রিদ'।

জলীয় বৃশ্চিক রাশিতে আবর্তন করবে। এটাই আরবদের হেতু নির্দেশক। এ সকল প্রমাণ থেকে এ কথাই নির্দেশিত হয়, উক্ত ধর্ম শুক্র বলয়ের সমান আয়ুষ্কাল লাভ করবে। তাই এক হাজার ষাট বছর।

পারস্য সম্রাট পারভেজ দার্শনিক উইলিয়ামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনিও বুরজেচমেহের-এর অনুরূপ উত্তর দিয়েছিলেন। বনি উমাইয়া শাসন আমলে রোমান জ্যোতিষী থিউফিলাস[৩৪৮] বলেছেন, ইসলাম ধর্ম বৃহৎ সংযোগের আয়ুষ্কাল নয়শ ষাট বছর স্থায়ী হবে। অতঃপর যখন সংযোগটি বৃশ্চিক রাশিতে আসবে, যেমন উক্ত ধর্মের আবির্ভাবের সময় ছিল এবং উক্ত ধর্মের উদ্ভব সংযোগের নক্ষত্রমণ্ডলীর অবস্থান বিপর্যয় ঘটবে, তখন তার কার্যকারিতা হ্রাস পাবে অথবা অনুরূপ ধারণার বিপরীতার্থক বিধি-নিয়মের নবায়ন সংঘটিত করতে হবে।

জিরাস বলেন, দার্শনিকরা একমত যে, পৃথিবীর ধ্বংস জল ও অগ্নির প্রাধান্যের ফলেই সংঘটিত হবে, যাতে সমগ্র সৃষ্টি বিনষ্ট হয়ে যাবে। সিংহ রাশির মধ্যভাগ চব্বিশ অংশ অতিক্রম করার কালে এটা ঘটবে। বস্তুত এটা মঙ্গলের সীমা এবং এটা নয়শ ষাট বছর অতিবাহিত হবার পর দেখা দেবে।

জিরাস বর্ণনা করেন, জবলস্তানের[৩৪৯] সম্রাট তার দার্শনিককে সম্রাট মামুনের নিকট পাঠিয়েছিলেন। যোবান নামক উক্ত দার্শনিক উপঢৌকনাদিসহ তাঁর দরবারে উপস্থিত হন। তার সংবাদাদির উপর নির্ভর করেই মামুন তাঁর ভ্রাতার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং তাহেরকে পতাকা বহন করতে দিয়েছিলেন। মামুন উক্ত দার্শনিকের জ্ঞানকে খুবই মর্যাদা দেন এবং তাকে তাঁদের সাম্রাজ্যের আয়ুষ্কাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি সম্রাটকে উক্ত সাম্রাজ্য তাঁর বংশধরদের হাত থেকে ভ্রাতৃ সন্তানদের মধ্যে চলে যাওয়ার সংবাদ দেন। অনারব দায়লমীরা সাম্রাজ্যের পঞ্চাশ বছরে খেলাফতের উপর অন্যায্য প্রভাব বিস্তার করবে এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছে অনুযায়ী অনেক কিছুই হবে। অতঃপর তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে। এর পর তুর্কিরা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে অগ্রসর হয়ে সিরিয়া, ফুরাত ও সাইহুন পর্যন্ত দখল করে নিবে। অচিরেই তারা রোম অঞ্চলও দখল করবে এবং আল্লাহ্ যা চান, তাই হবে। তখন মামুন তাকে বললেন, আপনি কীভাবে এগুলো জানলেন? তিনি বললেন, দার্শনিকদের পুস্তক থেকে এবং ভারতীয় সাসা ইবনে দাহিরের জ্যোতিষী বিধান থেকে; ইনিই দাবা খেলার প্রবর্তন করেন। আমি (গ্রন্থকার) বলি, দায়লমীদের পরে যে তুর্কিদের আত্মপ্রকাশের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তারা সলজুক এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকেই তাদের সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়ে গেছে।

জিরাস বলেন, জলীয় ত্রিভুজের মীন রাশি থেকে সংযোগের আবর্তন আটশ তেত্রিশ ইয়াজদাগিদ[৩৫০] বছরে অনুষ্ঠিত হবে। এর পরে তা বৃশ্চিক রাশির দিকে যাবে, যেখানে

---

৩৪৮. মূলে তওফিল অথবা নওফিল; ঐতিহাসিক আল কিফতীর মতে ইনি আব্বাসী সম্রাট আল-মাহদীর সমসাময়িক।

৩৪৯. গজনী।

৩৫০. ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে এর আরম্ভ।

তিপ্পান্ন সনে ইসলামের উদ্ভব সংযোগ বিরাজমান ছিল। জিরাস বলেন, মীন রাশিতে যা আছে, তাই প্রথম আবর্তন এবং যা বৃশ্চিক রাশিতে আছে, তা থেকেই ধর্মের হেতু নির্দেশগুলো বের হয়ে আসে। তিনি বলেন, প্রথম সংযোগ থেকে প্রথম বছর জলীয় ত্রিভুজগুলোতে আবর্তিত হবে রজব মাসের দ্বিতীয় দিনে আটশ পঁয়ষট্টি অব্দে।[৩৫১] কিন্তু অনুরূপভাবে কোনো কথাই সংঘটিত হয়নি।

কোনো সাম্রাজ্যের বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে জ্যোতিষীরা মধ্যম সংযোগ এবং তৎকালে আকাশমণ্ডলের বিশেষ অবস্থানকে ভিত্তি করে সংবাদ দিয়ে থাকেন। কারণ তাদের নিকট তা সাম্রাজ্যের পত্তন, জনবসতির অবস্থা, সাম্রাজ্যের সহায়ক জাতি, তার রাজন্যবর্গ, তাদের নাম, তাদের বয়স, তাদের রীতিনীতি, তাদের ধর্ম, তাদের অভ্যাস এবং তাদের যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে হেতু নির্দেশ করে থাকে। যেমন আবু মাশার তার 'কিতাবুল কেরানাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। কখনো এ সকল বিষয়ের সংবাদ ক্ষুদ্র সংযোগ থেকেও পাওয়া যায়, যেহেতু মধ্যম সংযোগও এদের হেতু নির্দেশক হিসাবে বিদ্যমান। এগুলো থেকে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

সম্রাট হারুনুর রশীদ ও মামুনের জ্যোতিষী ইয়াকুব ইবনে ইসহাক কিন্দী সম্ভাব্য সংযোগাবলি সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করে তার নাম দিয়েছিলেন 'আশ্‌শিয়াতু বিজ্জিফর'। এর এ নামকরণে তাদের প্রামাণ্য গ্রন্থ জাফর সাদেকের প্রতি আরোপিত সেই রচনার ইঙ্গিত বিদ্যমান। কিন্দী তার এ গ্রন্থে তথাকথিত আব্বাসী সাম্রাজ্যের বিষয়াদি সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান করেন। এ বিষয় তার শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তিনি তার ধ্বংস সম্পর্কেও ইঙ্গিত দেন। বাগদাদের উপর আগামী দুর্যোগ সম্পর্কে বলেন, তা সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সংঘটিত হবে। তার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মেরও অবসান ঘটবে।

আমরা এ গ্রন্থ সম্পর্কে কোনো সংবাদ পাইনি এবং এমন কাউকেও পাইনি, যিনি এর সম্পর্কে সংবাদ রাখেন। সম্ভবত তাতারী সম্রাট হালাকু খান বাগদাদ দখল করে যে সমস্ত পুস্তক দজলা নদীতে নিক্ষেপ করেছিল, তন্মধ্যে এ পুস্তকটিও তলিয়ে গিয়ে থাকবে। এ তাতারীরাই শেষ খলিফা আল-মুতাসিমকে হত্যা করে। মাগরিবে উক্ত পুস্তকের প্রতি নির্দেশিত একটি পুস্তিকা পাওয়া যায়, যার নাম ক্ষুদ্র 'জিকর'। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে তা বনি আবদুল মোমেনের জন্য তৈরি করা হয়েছে। কারণ তাতে পূর্ববর্তী আল-মোহেদ সম্রাটের বিস্তারিত আলোচনা বিদ্যমান। এতে অতীত সম্পর্কে প্রদত্ত পূর্বাভাসগুলোতে বাস্তব অবস্থার সামঞ্জস্য আছে; কিন্তু এর পরের সবগুলোই মিথ্যা।

আব্বাসী সাম্রাজ্যে কিন্দীর পরেও বহু জ্যোতিষী ছিলেন এবং পূর্বাভাস সম্পর্কে তাদের গ্রন্থাদিও বিদ্যমান। পাঠক, সম্রাট আল-মাহদীর ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে আব্বাসী সাম্রাজ্যের একজন অনুগত শিল্পী আবু বুদায়েলের বক্তব্য থেকে তাবারী যা তুলে ধরেছেন, তৎপ্রতি লক্ষ করুন। আবু বুদায়েল বলেন, রবি ও হাসান[৩৫২] রশিদের সাথে তাঁর পিতার শাসন আমলে একটি অভিযানে বের হয়ে আমার নিকট লোক

৩৫১. ইয়াজদাগির্দ সন দিয়ে বক্তব্য আরম্ভ হলেও তা হিজরি সন।

৩৫২. রাব ইবনে ইউসুফ উজির এবং হাসান হাজেব-প্রতিহারী ছিলেন।

পাঠিয়েছিলেন। আমি অধিক রাত্রিতে তাদের নিকট এলাম। সেখানে সাম্রাজ্যের পূর্বাভাস সম্পর্কীয় একটি গ্রন্থ তাদের নিকট দেখতে পেলাম। তাতে আল মাহদীর শাসনকাল দশ বছর লেখা ছিল। আমি বললাম, এ পুস্তকটি মাহদীর নিকট গোপন থাকবে না। অথচ তাঁর শাসনকালের যা অতীত হবার হয়েছে। সুতরাং তিনি এটা দেখতে পেলে, আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, একে নিজের মৃত্যু বলেই গ্রহণ করবেন। তাঁরা বললেন, উপায় কী? আমি তখন বুদায়েল বংশের লিপিবিশারদ আম্বাসাকে ডেকে পাঠালাম এবং সে আসলে তাকে বললাম, এ পৃষ্ঠাটি বদল করে দশের স্থানের চল্লিশ লিখে দাও। সে তা সম্পন্ন করল। আল্লাহ্‌র কসম আমি যদি নিজের চোখে এ পৃষ্ঠাটিতে দশ লেখা না দেখতাম, তা হলে চল্লিশ লেখার পর বলার উপায় ছিল না যে, তা ঐ স্থানে কখনো ছিল।

এর পর মানুষ সাম্রাজ্যের পূর্বাভাস সম্পর্কে গদ্যে-পদ্যে রেজায[৩৫৩] ছন্দে অনেক কিছুই লিখেছি এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় যা কিছু বলার বলেছি। বিভিন্ন হাতের বিচিত্র সেই সৃষ্টি প্রচুর। তাদেরকে ভবিষ্যদ্বাণী বলা হয়। এদের মধ্যে অনেকগুলো সাধারণভাবে ধর্ম সম্পর্কীয় এবং অনেকগুলো বিশেষভাবে সাম্রাজ্য সম্পর্কীয় রচনা। কিন্তু প্রতিটিই জগতের বিখ্যাত সকল লোকের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অথচ এ সকল সংবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট থেকে এগুলো যে যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা বিশ্বাস করার মত ভিত্তি কোথাও নেই।

ভবিষ্যদ্বাণী

মাগরিবে এ প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী সংবলিত ইবনে মুর্রানার একটি 'কসিদা'[৩৫৪] বিদ্যমান, যা 'তওবিল' ছন্দে ও 'রে' বর্ণের অন্ত্যমিলে রচিত এবং মানুষের মধ্যে বহুল প্রচলিত। সাধারণ মানুষ এটাকে সাধারণ পূর্বাভাস বলে মনে করে। সুতরাং তার অনেক বিষয়কেই তারা বর্তমান ও ভবিষ্যত্বের ব্যাপারে ব্যবহার করে থাকে। আমরা আমাদের উস্তাদবর্গের নিকট থেকে যা শুনেছি, তা এই যে, এগুলো লামতুনা সাম্রাজ্যের জন্যই নির্দিষ্ট। কেননা তার রচক উক্ত সাম্রাজ্যের কিছুকাল পূর্বেই বর্তমান ছিলেন। ইনি তাতে বনি হামুদের আশ্রিত পোষ্যদের নিকট থেকে বিচ্যুত করে সিবতা (সিউটা)-র উপর লামতুনদের প্রাধান্য বিস্তার[৩৫৫] এবং আন্দালুস তীরবর্তী অঞ্চলে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা বর্ণনা করেছেন।

মাগরিবের অধিবাসীদের নিকট এ প্রকার ভবিষ্যদ্বাণীর আরো একটি উদাহরণ 'তুব্বাইয়া' নামক একটি 'কসিদা', যার আরম্ভটি নিম্নরূপ :

আমি আনন্দিত, কিন্তু এটাকে আমার আনন্দ বলা যায় না;
কখনো পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গও আনন্দ প্রকাশ করে।
এটা আমার লীলাবৈচিত্র্য বলেও মনে হয় না,
বরং প্রয়োজনীয় কিছু কার্যকারণকে স্মরণ করার নিমিত্ত।

---

৩৫৩. আরবি ছন্দের অন্যতম।
৩৫৪. কসিদা—দীর্ঘ পয়ার; তওবিস—আরবি ছন্দ বিশেষ।
৩৫৫. ৪৭৬ (১০৮৩ খ্রি:) হিজরিতে ঘটে।

এতে প্রায় পাঁচশ অথবা বলা হয় এক হাজারের মত চরণ আছে। এতে আল-মোহেদ সাম্রাজ্য সম্পর্কেই অধিকাংশ বর্ণনা বিদ্যমান এবং ফাতেমী ও অন্যদের সম্পর্কেও ইঙ্গিত রয়েছে। প্রকাশ এই যে, এটা কৃত্রিম। মাগরিবে অনুরূপ অন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কীয় রচনা 'যজলী' নামীয় ক্রীড়া পদ্য। এটা কোনো ইহুদির রচনা বলে নির্দেশ করা হয়। সে তাতে তার সমকালীন দুটি বৃহৎ ও অশুভ গ্রহের সংযোগ এবং অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করেছে। ফাসে তার অপঘাত মৃত্যুর কথাও এতে বিদ্যমান। মানুষের ধারণা তা ঐরূপই হয়েছে। পদ্যটির আরম্ভ নিম্নরূপ :

এ নীলের বর্ণচ্ছটা, তার তুঙ্গাবস্থায় শুভ রয়েছে,
হে জাতি, এ ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম কর।
শনিগ্রহ এ নিদর্শনের সংবাদ দিয়েছে,
তার আকৃতি পরিবর্তন করেছে, এখন সে শান্তিময়।
একটি নীল 'শাশ' পাগড়ীর পরিবর্তে
এবং একটি নীল টুপি জোব্বার বিনিময়ে।

এর শেষাংশে সে বলে,

এ ছন্দোবদ্ধতা সমাপ্ত হল এক ইহুদির দ্বারা
সে ফাস নগরীতে শুলীবিদ্ধ হবে ঈদের দিন।
এমন কি প্রান্তরগুলো থেকে মানুষ তার দিকে আসবে
এবং সে নিহত হবে, হে জাতি এককভাবে।

এতে প্রায় পাঁচশ চরণ বিদ্যমান। এতে ঐ সকল গ্রহণযোগ্য বর্ণনা করা হয়েছে; যা আল-মোহেদ সাম্রাজ্যের হেতু নির্দেশ করে।

মাগরিব অঞ্চলে প্রচলিত ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে 'মুতাকারিব' ছন্দে ও 'বে' বর্ণের অন্ত্যমিলে রচিত অন্য একটি কসিদাও বিদ্যমান। এটা তিউনিসের আল-মোহেদ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বনি আবু হেফসের পূর্বাভাস সংবলিত এবং এর রচয়িতা হিসাবে ইবনে আব্বার-এর নাম উল্লেখিত। কনস্টান্টিনপোলের কাজী ও মহান বক্তা আবু আলী ইবনে বাদিস[৩৫৬] যিনি তাঁর বক্তব্য বিষয়ে বিচক্ষণ ও জ্যোতিষী সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বিদ্যমান, তিনি আমাকে বলেছেন, এই ইবনে আব্বার আন্দালুসের সেই ইবনে আব্বার নয়, যিনি হাদিসবেত্তা ও লেখক ছিলেন[৩৫৭] এবং আল মুস্তানসির যাকে হত্যা করেন। উক্ত ইবনে আব্বার তিউনিসের এক দরজী; ঘটনাক্রমে আন্দালুসী হাদিসবেত্তার সাথে তার নাম মিশে যাওয়ায় বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।

আমার পিতা, আল্লাহ্ তাঁকে শান্তি দিন, অনেক সময় ভবিষ্যদ্বাণীর অনেক পদ্য আমাকে আবৃত্তি করে শুনাতেন। তার কোনো কোনো অংশ আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। যেমন,

আমার অক্ষমতা এ জন্য যে, সময় পরিবর্তমান,
সে তার উজ্জ্বল দাঁত দেখিয়ে প্রতারণা করে।

---

৩৫৬. ইবনে খলদুনের সাথে ৭৬১ (১৩৫৯/৬০ খ্রি:) হিজরিতে ফেজে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।
৩৫৭. মুহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বার; ৫৯৫-৬৫৮ (১১৯৯-১২৬০ খ্রি:) হি:। তিউনিসে নিহত হন।

অন্যত্র :[৩৫৮]

তাঁর সৈন্যদল থেকে একজন নেতৃস্থানীয়কে পাঠাবেন,
সে ঐ স্থানে পর্যবেক্ষণে নিরত থাকবেন।
শায়খের নিকট তার সংবাদ এসে পৌঁছবে,
এবং তিনি রুগ্ন উটের ন্যায় অগ্রসর হবেন।
তাঁর ন্যায়পরায়ণতা থেকেই চরিত্র প্রকাশ পাবে,
এটাই ত সেই কৌশল, যা দিয়ে মানুষ আকৃষ্ট হয়।

অন্যত্র, সাধারণভাবে তিউনিসের অবস্থা বর্ণনায় :

তুমি কি দেখ না, সকল প্রথাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে,
পদমর্যাদাশালী ব্যক্তির অধিকার কেউ স্বীকার করে না!
সুতরাং তিউনিস থেকে বিদায় গ্রহণ কর এবং
তার পরিচিত স্থানগুলোকে বিদায় সম্ভাষণ জানাও ও যাও।
অচিরে তাতে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসবে;
তাতে দোষী-নির্দোষী সকলেই পতিত হবে।

আমি তিউনিসের এ বনি আবু হেফস সাম্রাজ্য সম্পর্কে মাগরিব অঞ্চলে প্রচলিত অন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষাৎ পেয়েছি। তাতে তাঁদের দশম শাসক বিখ্যাত সুলতান আবু ইয়াহিয়ার পর তাঁর ভাই মুহম্মদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। রচয়িতা বলেন,

এবং আবু আবদুল ইলার[৩৫৯] পরে তার ভাই,
যিনি ওয়াস্‌সাব নামে যথার্থ পদে অভিহিত হবেন।

কিন্তু ইনি তাঁর ভ্রাতার পরে সাম্রাজ্যের অধিকারী হননি। মনে মনে এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।

মাগরিব অঞ্চলে পরিচিত ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে হাওশনীর নামের সাথে জড়িত একটি ক্রীড়া পদ্যও বিদ্যমান। তা সাধারণ লোকের ভাষায় স্থানীয় ছন্দে রচিত। তার আরম্ভ :

হে আমার অশ্রু, আমাকে একাকী থাকতে দাও;
বৃষ্টি থেমে যায়, কিন্তু তুমি থামতে জান না!
সকল নদনদী পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে,
কিন্তু তুমি পূর্ণায়মান-বিস্তারমান জলাশয়।
সমুদয় অঞ্চল আর্দ্রতামণ্ডিত,
এবং তুমিত জান অবস্থা কত শোচনীয়!
গ্রীষ্ম গেল শীতও গেল,
বর্ষা ও বসন্ত সকলই দূরীভূত।
তারা বলে আমার এ দুঃখবোধ যথার্থ;
আমাকে কাঁদতে দাও, এটা আমার অক্ষমতা।
হায়, দেখ, এ সময়ে কে দেখ;
কী কঠিন, কী বিষণ্ন-মায়াহীন!

এটা দীর্ঘ এবং মরক্কো অঞ্চলের লোক স্মৃতিতে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত। যতদূর মনে হয়, এও কৃত্রিম। কারণ এটার একটি আভাসও বাস্তবায়িত হয়নি। এ কারণে সাধারণ

৩৫৮. রোজেনথালে এ স্থলে এ বাক্যটি সংযোজিত আছে—নবম আবু হেফস সম্রাট আল-লেহিয়ানী সম্পর্কে।

৩৫৯. ছন্দের জন্য আব্দুল্লাহ্‌কে আব্দুল ইলাহ্ করা হয়েছে।

মানুষের মধ্যে এর ব্যাখ্যার অন্ত নেই। যারা বিশেষভাবে এ পূর্বাভাসের পেশায় নিয়োজিত, তারা এর ব্যাখ্যায় আরো জটিলতার স্রষ্টা।

পূর্বাঞ্চলে আমি আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষাৎ পেয়েছি। এটা ইবনে আরবি হাতেমীর নামে প্রচলিত। এর দীর্ঘ প্রহেলিকা প্রায় বাণীর ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। রচনাটি মধ্যে মধ্যে গাণিতিক হেঁয়ালী, রহস্যময় ইঙ্গিত, জীবজন্তুর পূর্ণ ছবি, কর্তিত মস্তক এবং অদ্ভুত সব প্রাণীর আকৃতির দ্বারা সুসজ্জিত। শেষের দিকে 'লাম' বর্ণের অন্ত্যমিলে একটি কসিদা বিদ্যমান। যতদূর মনে হয়, তার সমস্তটাই অশুদ্ধ। কেননা তা কোনো যথার্থ বিদ্যা, যেমন জ্যোতিষশাস্ত্র বা অন্য কিছু হতে জাত নয়।[৩৬০] আমি শুনেছি, সেখানে নাকি ইবনে সিনা ও ইবনে উকারের নামে প্রচলিত আরো কিছু ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ঐগুলোতেও বিশুদ্ধতার কোনো প্রমাণ নেই। কারণ ঐগুলোও গ্রহ সংযোগের ফলাফল থেকে গৃহীত[৩৬১] পূর্বাঞ্চলের আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণী আমি দেখেছি; তা তুর্কি সাম্রাজ্যের পূর্বাভাসে রচিত এবং বাজেরিকী নামে এক সুফী সাধকের নামে প্রচলিত। এর সমস্তটাই বর্ণমালার প্রহেলিকা। তার আরম্ভ—

যদি তুমি জিফরের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চাও, হে প্রশ্নকর্তা!
সেই জিফরবিদ্যা, যা হাসানের পিতার[৩৬২] দ্বারা আদিষ্ট।
বুঝি নাও, গ্রহণ কর তার বর্ণ ও বাক্যাবলি,
তার গুণ হৃদয়ঙ্গম কর, যেমন বুদ্ধিমান বিচক্ষণের কাজ।
যা আমাদের সময়ের পূর্বেকার, তার বর্ণনা করব না,
কিন্তু আমি অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কথা বলব।
বেবিরাস মাসে অবশিষ্ট থাকবে তার পাঁচটির পরে
'হে' ও 'মিমে'র সাথে অস্থির, পর্বত গুহায় নিদ্রিত।
'শিন', তার নাভীর নিচে একটি নিদর্শন রয়েছে,
তার বিচার শক্তি, সেই বিচার যা চিন্তাশীল লোকের।
মিশর ও সিরিয়া ইরাকের ভূমিসহ তার
এবং আজরবাইজান ও তার রাজ্যে ইয়ামেন পর্যন্ত।

---

৩৬০. এর পরে রোজেনথালে নিম্নলিখিত সংযোজনটি বিদ্যমান—
আমি শুনেছি, মিশরের লোকেরা ইবনে আরবি হতে ভবিষ্যদ্বাণীর একটি চমৎকার নিদর্শন বর্ণনা করছে। সম্ভবত এটা পূর্ব বর্ণিত রচনাটির অন্তর্গত নয়। ইবনে আরবি কায়রো নগরীর একটি জন্ম পত্রিকা তৈরি করেছিলেন। তাতে তিনি উক্ত নগরীর আয়ু স্থির করেছেন ৪৬০ বছর। এতে আমরা তার সময়সীমা ৮৩০ (১৪২৬ খ্রি:) পর্যন্ত ধরতে পারি। কারণ আমরা যদি তার প্রদত্ত সৌর বছরকে চান্দ্র বছরে পরিবর্তন করার জন্য প্রতি শতাব্দিতে তিন বছর অতিরিক্ত যোগ করি, তা হলে আমরা অতিরিক্ত চৌদ্দ বছর পাই এবং আমাদের পূর্ববর্তী ৪৬০ + ১৪ = ৪৭৪ বছর হয়। এর সাথে ৩৫৮ (৯৬৯) বছর যোগ করলে ৮৩২ হিজরি পাই। সুতরাং বলা যায় যে কায়রো নগরী ৩৫৮ হিজরিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা ৮৩২ হিজরিতে ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য যদি ইবনে আরবির এ জন্ম পত্রিকা শুদ্ধ হয় এবং তাঁর জ্যোতিষী গণনা নির্ভুল হয়।

৩৬১. এর পর রোজেনথালে নিম্নের অনুচ্ছেদটি সংযোজিত হয়েছে—
ইবনে আবু উকারের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কীয় রচনাটি প্রামাণ্য নয়। কেননা ইবনে কির্রিয়ার জীবন কাহিনীতে ইবনে খল্লিকান। কিতাবুল আগানী হতে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আবু উকার তথা মুহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু উকার সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের সমতুল্য, যারা বাস্তবে খুবই পরিচিত, কিন্তু যথার্থ ভিত্তিহীন; যেমন মজনু লায়লা ও ইবনে কিরিয়া। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

৩৬২. হযরত আলী (রাঃ)।

অন্যত্র :

বোরানের বংশধর, যখন তারা তাহেরকে লাভ করল,
নির্ভীক, তীব্র ও শাখার দ্বারা সমর্থিত।
দুর্বল দন্ত 'সিন'কে উৎপাটিত করতে 'সিন' এসেছে,
নয়, যদিও সে উন্নীত এবং 'নুন' শতাব্দীর অধিকারী।
সাহসী জাতি, বুদ্ধি ও পরামর্শের প্রতিভূ
'হের সাথে স্থায়ী হবে এবং শাখার অধিপতির পরে কোথায়।

অন্যত্র :

একটি 'বে' বছরের পরে সে নিহত হবে—
রাজ্যের বাক্‌পটু 'মিমে'র পরামর্শ তার সন্নিহিত।

অন্যত্র :

এ সেই পঙ্গু কালবী, তার সাহায্য কামনা কর;
তার সময়েই দুর্যোগ, সেই দুর্যোগ সম্পর্কে সাবধান হও।
পূর্বদিক থেকে সৈন্যদলসহ সে অগ্রসর হয়ে আসবে,
'ক্বাফ' থেকে সে মুক্ত, অথচ 'ক্বাফ' দুর্যোগের দ্বারা আক্রান্ত।
হত্যায় সে 'দাল' এবং সিরিয়ার ন্যায় সমগ্র অঞ্চল
শোক প্রকাশ আরম্ভ করবে দেশবাসী ও দেশের জন্য।
যখন আসবে, কেঁপে উঠবে, হায়, সমগ্র মিশর
ভূ-কম্পনে এবং 'হ্বে' সর্বদা থাকবে বস্ত্রহীন।
ত্বয়, য়য় ও আইন তারা সকলেই বন্দী হবে
ধ্বংসোন্মুখ এবং অযথা সম্পদ ব্যয় করবে।
'ক্বাফ' ক্বাফকে প্রেরণ করবে তাদের নিকট,
তাকে সহজভাবে নাও; কেননা বাসস্থান হিসাবে দুর্গস্বরূপ।
তারা তার ভাইকে দাঁড় করাবে, সে তাদের মধ্যে ভালো,
সহস্রের সিঁড়ি 'সিন' এ জন্য নির্মাণ করেনি।
তাদের ক্ষমতা হ্বের সাহায্যে সম্পূর্ণ হবে এবং
কোনো কালেই কেউ রাজশক্তির নিকটবর্তী হতে পারবে না।

বলা হয় যে, রচয়িতা মালীক জহীর[৩৬৩] এবং তাঁর পিতা তাঁর নিকটে মিশরে আগমন সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছে।

তার পিতা তার নিকট আসবে দেশ ত্যাগের পর,
দীর্ঘ অদর্শন এবং কঠিন ও কদর্য জীবন-যাপন হতে।

কসিদাটির চরণ সংখ্যা বহু এবং যতদূর মনে হয় কৃত্রিম। প্রাচীনকালে এ প্রকার কৃত্রিম রচনার অভাব ছিল না এবং এগুলো বহুল প্রচলিতও ছিল।

ঐতিহাসিকগণ বাগদাদের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, সম্রাট আল-মুক্তাদিরের সময় সেখানে এক চতুর লিপিকর ছিল। মানুষ তাকে দানিয়ালী বলে ডাকত। সে কাগজ পুরাতন করে তাতে প্রাচীন লিপিতে সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের নাম সাংকেতিক বর্ণমালায় লিখত। এর দ্বারা সে প্রত্যেকের মনোগত উচ্চাশা ও পদমর্যাদার আকাঙ্ক্ষাকে আভাসে বর্ণনা করত। যেন এগুলো ভবিষ্যদ্বাণী এবং এগুলোর দ্বারা সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে পার্থিব ঐশ্বর্য লাভ করত। সে একবার তার এরূপ রচনায় 'মিম' বর্ণটি তিনবার ব্যবহার করে তাসহ সম্রাট আল-মুক্তাদিরের আশ্রিত পোষ্য

৩৬৩. কোন কোন সংস্করণে এ নামের সাথে 'বারফুক' শব্দটি যুক্ত হয়েছে।

মুফলেহ নামক অমাত্যের কাছে এল। মুফলেহ তখন সাম্রাজ্যের একটি উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। দানিয়ালী তাঁকে বলল, এই তিন মিমের দ্বারা আপনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর অর্থ 'মুফলেহ মওলা মুক্তাদির'; এর প্রথম বর্ণ থেকে তিনটি মিম নেয়া হয়েছে। এর সাথে সে মুফলেহের সাম্রাজ্যের পদমর্যাদা সম্পর্কীয় বাসনার কিছু বর্ণনাও যোগ করল এবং তাঁর পরিচিত অবস্থাদির কিছু নিদর্শনও এর সাথে মিশাল। ফলে অতি সহজেই মুফলেহ এ হেঁয়ালীতে ধরা পড়লেন এবং তার জন্য প্রচুর সম্পদ দান করলেন। অতঃপর দানিয়ালী উজির হাসান[৩৬৪] ইবনে কাসেম ইবনে ওহাব সম্পর্কেও এরূপ একটি ভবিষ্যদ্বাণী রচনা করে মুফলেহকে দেখাল। উজির তখন পদচ্যুত অবস্থায় ছিলেন। দানিয়ালী তাঁর অবস্থা বর্ণনা করতে পূর্বের ন্যায় বর্ণমালা ব্যবহার করল। তাতে তাঁর নাম ও অন্যান্য নিদর্শন দিল এবং এ কথাও বলল যে, ইনি অষ্টাদশ খলিফার উজির নিযুক্ত হবেন। তাঁর সময়ে সমস্ত বিষয় দৃঢ়তালাভ করবে এবং শত্রুরা ভয় পাবে। তাঁর সময় পৃথিবীতে সমৃদ্ধি দেখা দেবে। সে মুফলেহকেও এ সকল বিষয় অবগত থাকার কথা উল্লেখ করল। সে তাতে অন্যান্য সম্ভাব্য বিষয় এবং অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এ প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী যোগ করে দিল। এর পর সম্পূর্ণ বিষয়টি দানিয়ালের প্রতি নির্দেশ করে তা শেষ করল। মুফলেহ এটা দেখে বিস্মিত হলেন। তিনি সম্রাট আল-মুক্তাদিরকে এ ব্যাপারে অবহিত করলেন এবং এ সকল নিদর্শন ও অবস্থা সম্পর্কে ইবনে ওহাবের যোগ্যতার প্রতি সম্রাটকে আকর্ষণ করলেন। ফলে ইবনে ওহাব মন্ত্রিত্বের পদে বরিত হয়েছিলেন। অথচ এ কৌশলের সম্পূর্ণ ভিত্তিটাই ছিল মিথ্যা ও প্রহেলিকাজাত মূর্খতায় পরিপূর্ণ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কীয় যে রচনাটির সাথে বাজেরিকীর নাম যুক্ত হয়েছে, তাও এ প্রকার একটি অলীক সৃষ্টি।

মিশরের পল্লী অঞ্চলের অনারব হানাফীদের এক শায়খের পুত্র আকমাল উদ্দিনকে[৩৬৫] আমি এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী এবং যার প্রতি এগুলো আরোপিত হয়, সেই সুফী সাধক বাজেরিকী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এ ব্যক্তি তাদের মত ও পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রাখতেন। উত্তরে তিনি বললেন, বাজেরিকী কলন্দরিয়া তরিকার সাধক। এই তরিকার লোকেরা দাড়ি না রাখার এক অভিনব মতের অনুসারী। বাজেরিকী দিব্যানুভূতির দ্বারা ভবিষ্যতের অনেক কথা বলত এবং তার নিকট অবস্থানকারী নির্দিষ্ট লোকের প্রতি তার ইঙ্গিত প্রকাশ করত। উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বিষয়ে সে প্রহেলিকাময় বর্ণমালা দ্বারা কিছু বক্তব্য নির্ধারণ করত। অনেক সময় তার অভ্যাস অনুসারে তা পদ্যের আকারেও বের হয়ে আসত এবং অন্যেরা সেগুলো লিখে নিত। মানুষ এগুলো বোঝার জন্য পাগল হয়ে উঠত। সকলেই এগুলোকে ইঙ্গিতময় ভবিষ্যদ্বাণী বলে মনে করত। সুতরাং এ ব্যাপারে কৃত্রিম পেশাধারীরা প্রতিযোগেই এর মধ্যে প্রক্ষেপ যোগ করেছে এবং সাধারণ মানুষ এ প্রহেলিকার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গলদঘর্ম হয়েছে। অথচ এটা একান্তই অসম্ভব ব্যাপার। কারণ যে কোনো রহস্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য পূর্বাহ্নে তার নিয়মাবলি জানতে হয় এবং তা নির্ধারণ করতে হয়;

---

৩৬৪. কোন সংস্করণে 'হুসাইন' বিদ্যমান।

৩৬৫. মুহম্মদ ইবনে মাহমুদ; ৭১০-৭৮৬ (১৩১১-১৩৮৪ খ্রি:) হি:। ইনি সর্বাস্তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

যেমন এ পদ্যের বর্ণগুলো, এগুলোর জন্য পূর্বনির্ধারিত একটা অর্থ থাকা দরকার, যা সে অতিক্রম করবে না।

আমি দেখতে পেলাম, এ বিজ্ঞ ব্যক্তিটির বক্তব্যের মধ্যে এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আমার মনে যে একটি অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, তা নিরাময়ের এক মহৌষধি রয়েছে। 'আমরা কখনই সুপথ খুঁজে পেতাম না, যদি না আল্লাহ্ আমাদেরকে সুপথ দেখাতেন।[৩৬৬] পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জ্ঞাতা এবং তিনিই সহায়।[৩৬৭]

---

৩৬৬. কোরান, ৭, ৪৩।

৩৬৭. এর পরে রোজেনথালে নিম্নোক্ত সংযোজনটি বিদ্যমান। আমরা সম্পূর্ণতার জন্য এটা তুলে দিলাম। পরবর্তীকালে আমি দামেশকে ইবনে কাশিরের ইতিহাসটির সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পাই। আমি মিশরের সুলতানের সেনাবাহিনীর সাথে ৮০২ (১৪০০ খ্রি:) হিজরিতে সেখানে গিয়েছিলাম। তখন আমি মিশরে মালেকী মজহাবের কাজী পদে নিযুক্ত।

ইবনে কাসির তাঁর ইতিহাসে ৭২৪ (১৩২৪ খ্রি:) হিজরির ঘটনাবলি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বাজেরিকীর জীবন বৃত্তান্তে বলেছেন, সামসুদ্দিন মুহম্মদ বাজেরিকীকে এক অভিনব মতের অনুসারী 'বাজেরিকীয়া' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করা হয়। এ সম্প্রদায় স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। বাজেরিকীর পিতা জামালউদ্দিন আবদুর রহমান ইবনে উমর মোশেলী, ফাকেয়ী মজহাবের একজন ধার্মিক লোক ছিলেন। তিনি দামেশকেই শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পুত্র উক্ত মজহাবের ধারা অনুসারেই বর্ধিত হয় এবং সামান্য কিছু শিক্ষা-দীক্ষার পরই আধ্যাত্মতত্ত্বে জড়িয়ে পড়ে। একটি দল তাকে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে এবং তার অনুগামী হয়ে ওঠে। ফলে মালেকী মজহাবের কাজী তার আচার-আচরণের জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং সে পূর্বাঞ্চলে পলায়ন করতে সক্ষম হয়। সেখানে সে প্রমাণ করতে সক্ষম হয় যে, যারা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল, তাদের সাথে তার শত্রুতা ছিল। এর ফলে হাম্বলী মজহাবের কাজী তার পূর্ববর্তী দণ্ড মওকুফ করেন।

অতঃপর বাজেরিকী দামেশকের নিকটবর্তী কাবুলে বেশ কিছুদিন বসবাস করে। সে ৭২৪ হিজরির ১৬ রবিউস্‌সানী মোতাবেক ১২ এপ্রিল, ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে বুধবার রাত্রে মারা যায়।

ইবনে কাসির বলেন, বাজেরিকী 'জিফর' সম্পর্কে একটি পদ্য রচনা করেছে, যার আরম্ভটি নিম্নরূপ :

শোন এবং বর্ণমালা ও তাদের সংখ্যা মান হৃদয়ঙ্গম কর;
তার বিবরণ একজন বুদ্ধিমান চতুর লোকের ন্যায় বুঝে নাও।
সিরিয়া ও মিশরে কী হবে, আকাশের প্রভু তা বলবেন,
তাতে কল্যাণ আছে আর আছে সীমাহীন দুর্যোগ।
বেবিরাসকে একটি পানপাত্র দেয়া হবে পাঁচজনের পর পান করতে
এবং হ্বে ও মিম অস্থিরতার সাথে কোমল শয্যায় শায়িত।
হায়, দামেশকা তার ভূমিতে কী পতিত হচ্ছে—
তারা আল্লাহ্‌র গৃহ ধ্বংস করেছে, কী সুন্দর তার নির্মাণ!
এটা নিপাত যাক, ধর্মের বিরুদ্ধে কত কী, কতজনকে নিহত করেছে;
জ্ঞানী ও অভাজনদের কত রক্ত তারা পাত করেছে।
কত কোলাহল, কত বন্দী, কত লুটপাটের নির্মম দৃশ্য—
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড!
অস্তিত্ব অন্ধকার এবং দেশ বিষণ্ন জর্জর
এমন কি কবুতরগুলোর বৃক্ষশাখায় রোরুদ্যমান।
হায়, অসহায় সৃষ্টি! ধর্মের কি কোনো সহায় নেই!
উঠ এবং প্রান্তর ও পর্বত হতে সিরিয়ায় যাও।
ইরাক এবং উচ্চ ও নিম্ন মিশরের আরবেরা আসছে,
অধর্মের মৃত্যু ঘণ্টা বেজে উঠেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিভিন্ন দেশ ও নগরী
সমগ্র মানব সভ্যতা এবং
তাদের ক্রিয়াশীল আগত ও অনাগত অবস্থাসমূহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

[সাম্রাজ্য শহর-নগরের পূর্ববর্তী এবং এগুলো রাজশক্তির দ্বিতীয় ফসল]

এর বর্ণনা এই যে, স্থাপত্য ও সৌধশ্রেণী নির্মাণ একান্তভাবে নাগরিকত্বের লক্ষণ, যা বিলাসব্যসন ও সাচ্ছন্দ্যের দিকে আকর্ষণ করে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এটা প্রান্তরীয় জীবন এবং লক্ষণাদির পরবর্তী স্তর। তদুপরি নগর শহর স্বভাবত প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বিরাট সৌধ ও ব্যাপক স্থাপত্যের অধিকারী এবং এগুলো সর্বসাধারণের সম্পদ হিসাবেই গড়ে ওঠে; ব্যক্তিবিশেষের নয়। এজন্যই এগুলো নির্মাণে বহুলোকের শ্রম ও সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। অবশ্য এটা এমন প্রয়োজনীয় স্তরের নয়, যার অনস্বীকার্যতা সর্বজনীন এবং তার নির্মাণে সকলেই বাধ্য হয়ে সাড়া দেবে। বরং এগুলো নির্মাণ করতে তাদেরকে বাধ্য করতে হয়। রাজদণ্ড এ উদ্দেশ্যে তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় কিংবা প্রতিদান ও পারিশ্রমিকের প্রলোভন তাদেরকে আকর্ষণ করে। কেননা একমাত্র রাজশক্তির পক্ষেই এই উভয় কাজ করা সম্ভব। সুতরাং রাজশক্তির ও সাম্রাজ্যের জন্যই শহর পত্তন ও নগর পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।

অতঃপর যখন নগরীর পত্তন হল এবং প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিভঙ্গি, ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর প্রয়োজন অনুসারে তার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হল, তখন সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বই তার স্থায়িত্ব। সুতরাং সাম্রাজ্যের আয়ুষ্কাল যদি সংকীর্ণ হয়, তা হলে তার শেষ অবস্থায় নগরীর সমৃদ্ধি স্তিমিত হয়ে আসে ও তার জনবসতি সংকুচিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে যদি তার আয়ু দীর্ঘ ও পরিধি ব্যাপক হয়, তা হলে অনবরত তাতে নির্মাণকার্য চলতে থাকে, বিলাসবহুল গৃহাদির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও বাজারের বিন্যাস ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এমনকি এর ফলে নগরীর পরিধি বিস্তৃত হয়ে বিরাট আকার ধারণ করে এবং তার অঙ্গন প্রশস্ততর হয়ে ওঠে। যেমন বাগদাদ ও অনুরূপ অন্যান্য নগরীর বেলায় ঘটেছে।

খাতিব[১] তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, সম্রাট মামুনের সময় বাগদাদে সাধারণ স্নানাগারের সংখ্যা ছিল পঁয়ষট্টি হাজার। এর সংশ্লিষ্ট ও নিকটবর্তী উপশহর ও মহল্লার সংখ্যা চল্লিশকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এটা একক প্রাচীরবেষ্টিত নগরী ছিল না। কারণ জনসংখ্যার বিস্তৃতি তাতে অতিক্রম করেছিল। ইসলামী সাম্রাজ্যে কায়রোয়ান, কার্ডোভা ও মাহদিয়ার অবস্থা অনুরূপ ছিল। এর পরে বর্তমানে আমরা যতদূর জানতে পেরেছি মিশরের অবস্থাও এরূপ।

---

১. আহমদ ইবনে আলী; ৩৯২-৪৬৩ (১০০২-১০৭১ খ্রি:) হি:।

নগরী পত্তনকারী সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটলে, যদি উক্ত নগরীর উপকণ্ঠে ও নিকটবর্তী অঞ্চলে পর্বত, সমতল প্রান্তর থাকে, যে স্থান থেকে সর্বদা তার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেয়, তা হলে এ প্রকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারে এবং সাম্রাজ্যের পরেও তার আয়ুষ্কাল স্থায়ী হয়। যেমন, পাঠক, মাগরিবের ফেজ ও বগি এবং পূর্বাঞ্চলে ইরাকে আজমকে আপনি দেখতে পাবেন। পাহাড়ি অঞ্চলের লোক দ্বারা তাদের জনবসতি অটুট রয়েছে। কারণ প্রান্তরবাসীদের জীবন যখন উপার্জন ও স্বাচ্ছন্দ্যের সীমায় পৌঁছে, তখন তারা স্বস্তি ও শান্তির অন্বেষণ করে। কেননা এটাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সুতরাং তারা নগর ও শহরাঞ্চলে এসে তার জীবন গ্রহণ করে। কিন্তু যদি এ প্রকার নগরীর সন্নিহিত প্রান্তর জীবন থেকে তার প্রয়োজনীয় সহায়তার কোনো সম্ভাবনা না থাকে, তা হলে সাম্রাজ্যের পতন তার সুসংবদ্ধতা নষ্ট করে দেয়, তার সংরক্ষণ ভেঙে পড়ে, ধীরে ধীরে তার জনবসতি কমতে থাকে এবং একসময়ে তার অধিবাসীরা বিক্ষিপ্ত হয়ে তাকে উজাড় করে ফেলে। যেমন পূর্বাঞ্চলে মিশর,[২] বাগদাদ ও কুফা এবং পশ্চিমাঞ্চলে কায়রোয়ান, মাহদিয়া ও বনি হাম্মাদের কেলআ। এ প্রকার আরো নগরী বিদ্যমান; পাঠক, হৃদয়ঙ্গম করুন।

অনেক সময় নগরীর পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠাতারা অতীত হলেও তার বুকে অন্য রাজশক্তি, ভিন্ন সাম্রাজ্যের পদার্পণ ঘটে। তারা নতুন নগরীর পত্তন না করে এটাকে তাদের স্থায়ী নিবাস ও রাজধানী হিসাবে গ্রহণ করে। সুতরাং তারা এর সংস্থাপনকে রক্ষা করে এবং এর স্থাপত্য ও শিল্পকীর্তি বাড়িয়ে তোলে। এর ফলে এ সাম্রাজ্যের অবস্থার সমৃদ্ধি ও বিলাসের ব্যাপকতায় উক্ত নগরী আবার নতুন জীবন ফিরে পায়। যেমন বর্তমান সময়ে ফেজ ও কায়রোর ব্যাপারে ঘটেছে। আল্লাহ্ পবিত্র ও মহান, সর্ববিষয়ে জ্ঞাতা এবং তিনিই একমাত্র সহায়।[৩]

---

২. সম্ভবত 'ফুস্তত' নগরী।

৩. রোজেনথালে এ বাক্যটির পরিবর্তে—'এটা বুঝে নেয়া উচিত এবং সৃষ্টিতে আল্লাহ্র রহস্যলীলা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[রাজশক্তি নাগরিক জীবনের দিকে আকর্ষণ করে]

এটা এই যে, গোত্র ও গোত্রশক্তিগুলো যখন রাজশক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে, তখন দুটি কারণে তারা নাগরিক জীবনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে বদ্ধপরিকর হয়। এর একটি—রাজশক্তি তাদেরকে শান্তি-স্বস্তি ও দুঃসহভার নামিয়ে বিশ্রামের দিকে আকর্ষণ করে এবং প্রান্তরীয় জীবনে সভ্যতার যে ত্রুটি-বিচ্যুতি তাদের মধ্যে ছিল, তা দূর করে তাকে পরিপূর্ণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যটি হল—রাজশক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিযোগীদের সহিংস দৃষ্টি থেকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন তাদের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কারণ তাদের সীমান্তবর্তী যে সকল নগর-বন্দর আছে, সেগুলো অনেক সময়েই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের আশ্রয়স্থল এবং তাদের বিদ্রোহের উৎসভূমি হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত এরই সাহায্যে তারা তাদের হস্তচ্যুত রাজশক্তিকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা চালায়। এজন্যই রাজশক্তির অধিকারীরা নগরের সাহায্য গ্রহণ করে তাদেরকে পরাজিত করে। কারণ নগরের উপর আধিপত্য বিস্তার অত্যন্ত আয়াসসাধ্য ও কঠিন ব্যাপার। এদিক থেকেই নগর সশস্ত্র বাহিনীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। কেননা তাতে প্রাচীর ও অন্যান্য বাধাবিপত্তি এমন সুবন্দোবস্ত রয়েছে, যা প্রচুর সৈন্যসংখ্যা ও প্রভূত শৌর্যবীর্য ছাড়াই সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। কারণ এই শৌর্যবীর্য ও গোত্রশক্তির প্রয়োজন যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র দৃঢ়তার জন্যই দেখা দেয়। যেহেতু সেখানে একদল অন্য দলের উপর বারবার আক্রমণ পরিচালনা করে, সেই জন্য দৃঢ়তাই সেখানে সকলের কাম্য হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে নগরবাসীরা প্রাচীরের আশ্রয়ে সেই দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে থাকে। সুতরাং তাদের জন্য ব্যাপক গোত্রশক্তি ও বিরাট সৈন্যসংখ্যার প্রয়োজন হয় না। এদিক থেকে নগর দুর্গস্বরূপ। যারা এ দুর্গে সুসজ্জিত হয়ে ওঠে, অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই প্রতিদ্বন্দ্বী, রাজ্যকামী শক্তির তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় মনোবল ও প্রচেষ্টা ভেঙে পড়ে।

এ কারণেই রাজশক্তির অধিকারীরা তাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শহর-নগর থাকলে সম্ভাব্য পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তার উপর আধিপত্য বিস্তার করে বসে। যদি সেখানে তদ্রূপ কিছু না থাকে, তবে সর্বপ্রথম তারা তাদের সভ্যতার অগ্রগতির প্রয়োজনে তার বন্দোবস্ত করতে তৎপর হয় এবং তার নিশ্চিত আশ্রয়ে নিজের দুঃসহ বোঝা নামিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। অন্যদিকে এর ফলে রাজ্যকামী শক্তির পথে বাধার সৃষ্টি হয় এবং অন্তর্গত ও বহিরাগত বিদ্রোহ প্রতিরোধ সহজতর হয়ে ওঠে।

উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হল যে, রাজশক্তি নাগরিক জীবনে পদার্পণ ও তার উপর প্রাধান্য বিস্তারের প্রতি আকর্ষণ করে থাকে। আল্লাহ্ পবিত্র ও মহান; তিনি সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ এবং তিনিই একমাত্র সহায়। কেননা তিনি ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিপালক নেই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[একমাত্র সমৃদ্ধ রাজশক্তিই বিরাট নগরী ও সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করতে সক্ষম]

আমরা ইতিপূর্বে সাম্রাজ্যের নিদর্শন স্থাপত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছি। এগুলো তার শক্তির অনুপাতেই হয়ে থাকে। কেননা নগর-নগরীর প্রতিষ্ঠা বহু কর্মী ও বহুতর সহযোগিতার ফলেই সম্ভব হয়। সুতরাং কোনো সাম্রাজ্য যদি বৃহদাকার ও ব্যাপক পরিধির হয়, তা হলে দূর-দূরান্ত থেকে কর্মীরা এসে একত্র হতে পারে এবং তাদের সম্মিলিত প্রয়াসে আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। অনেক সময় এক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির সাহায্য গ্রহণ করা হয়, যাতে স্থাপত্যের উপযোগী ভার বহন সহজ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এগুলোর সাহায্য ছাড়া মানুষের শক্তিসামর্থ্য অনেক সময়েই এ প্রকার বিরাট কার্যের জন্য পর্যাপ্ত নয়। যেমন কপিকল ও এই ধরনের অন্যান্য যন্ত্র।

প্রাচীনকালের নিদর্শন ও বৃহৎ সৌধাবলি, যেমন খসরুর দরবারগৃহ, মিশরের পিরামিড, মাগরিব অঞ্চলের শেরশাল (চার্চিল) এবং মালগার (কার্থেজের) খিলানসমূহ দেখে বহুলোকেরই এ ধারণা জন্মায় যে, এগুলো তারা সম্মিলিত ও একক দৈহিক শক্তিতে নির্মাণ করেছিল। সুতরাং এগুলোর বিরাটত্ব অনুসারে তাদের বিরাট দেহের কল্পনা করা হয়; যাতে ঐ সকল দেহ দৈর্ঘ্যে শক্তিতে এ সমস্ত বৃহদাকার স্থাপত্যের নির্মাতা হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে তারা যন্ত্রপাতি, কপিকল ও জ্যামিতিক কলা-কৌশলের প্রয়োজনীয়তার কথা বিস্মৃত হয়।

যে সকল ব্যক্তি বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করে, তাদের অধিকাংশের পক্ষেই অনারব সাম্রাজ্যগুলোতে স্থাপত্য, তার জন্য প্রয়োজনীয় ভার বহনের কৌশল এবং অন্যান্য সাহায্য স্বচক্ষে দর্শন করা সম্ভব। এ অভিজ্ঞতা আমাদের বক্তব্যের চাক্ষুষ প্রমাণ হিসাবে কাজ করবে।

বর্তমানকালে প্রাচীন নিদর্শনাবলিকে সাধারণ মানুষ 'আদ' জাতির কীর্তি বলে মনে করে। এটা প্রাচীন একটি জাতির নাম। কারণ সাধারণ মানুষের ধারণা এ জাতির লোকেরা বিরাট দেহ ও বিপুল শক্তির অধিকারী ছিল বলেই তাদের নির্মিত সৌধাবলি এরূপ বিরাট হতে পেরেছে। অথচ বিষয়টি আদৌ তা নয়। কারণ আমরা এমন অনেক জাতির কীর্তি সৌধ আমাদের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি, যাদের দৈহিক আকৃতি সম্পর্কে আমরা অবহিত। এগুলো সেই প্রাচীন স্থাপত্যের সমতুল্য বিরাট কিংবা তদপেক্ষাও বৃহদাকার। যেমন খসরুর দরবারগৃহ, আফ্রিকিয়ার শিয়া সম্রাট উবাইদীদের সৌধাবলি

এবং সিনহাজা, যাদের কীর্তিমালা বনি হাম্মাদের 'কেলআ'র মিনারগুলোতে বর্তমানকাল পর্যন্ত দৃশ্যমান। এরূপ কায়রোয়ানের মসজিদে আগলাবীদের স্থাপত্য, রাবাতে আল-মোহেদদের নির্মাণ কৌশল এবং চল্লিশ বছর ধরে সুলতান আবু সায়িদের তিলমিসানের বিপরীত দিকে আল-মনসুরায় নির্মিত সৌধাবলি।[৪] এরূপভাবে কার্থেজের খিলানগুলোর কথা বলা যায়, যার মাধ্যমে ঊর্ধ্বগামী প্রণালীর দ্বারা অত্র এলাকার অধিবাসীরা নগরে পানীয় জল সরবরাহ করত। এগুলো বর্তমানকালেও আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছে। অনুরূপ দূর ও নিকটের অন্যান্য স্থাপত্য ও বৃহদাকার সৌধ, যাদের নির্মাতাদের সংবাদ আমাদের গোচরীভূত হয়েছে, তাতেই আমাদের বিশ্বাস জন্মেছে যে, তারা আদৌ বিরাট দেহের অধিকারী ছিল না। এটা একমাত্র আদ, সামুদ ও আমালেকাদের সম্পর্কে কাহিনী রচয়িতাদের উর্বর মস্তিষ্কের ধারণা।

বর্তমানকালেও আমরা পর্বতগাত্রে খোদিত সামুদ জাতির আবাসস্থল দেখতে পাই। বিশুদ্ধ হাদিসে প্রমাণিত হয়েছে যে, এগুলোই তাদের বাসস্থান ছিল এবং বহু বছর ধরে হজগামী কাফেলার লোকেরা এগুলো প্রত্যক্ষ করে আসছে। তারা অভ্যন্তর ভাগ, পরিধি ও উচ্চতায় কোনোক্রমেই অস্বাভাবিক নয়। সাধারণ মানুষ ধারণার বশবর্তী হয়েই এগুলো সম্পর্কে আতিশয্য প্রদর্শন করেছে। এমন কি তারা ধারণা পোষণ করে যে, উজ ইবনে ইনাক, আমালেকা গোত্রের একটি লোক এত দীর্ঘ ছিল যে, সে সমুদ্র থেকে তাজা মাছ ধরে তা সূর্যের মধ্যে ঝলসে নিয়ে আহার করত। এতে তাদের এ ধারণাও প্রকাশ পাচ্ছে যে, সূর্যের নিকটবর্তী স্থলে তা অত্যধিক উষ্ণ। কিন্তু তারা জানে না যে, সূর্যের উষ্ণতা আমাদের নিকটেই অধিক এবং তাও তার কিরণমালা ভূপৃষ্ঠ ও তার বায়ুতে প্রতিফলিত হয়েই সৃষ্টি করে। নতুবা সূর্য তার স্বরূপে উষ্ণও নয়, শীতলও নয়। তা অবিমিশ্র এক উজ্জ্বল নক্ষত্র মাত্র।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সম্পর্কে সামান্য আলোচনা বিদ্যমান। সেখানে আমরা বর্ণনা করেছি যে, সাম্রাজ্যের কীর্তিমালা তার মৌল শক্তির অনুপাতেই স্থাপিত হয়। আল্লাহ্ যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছে আজ্ঞা করেন।[৫]

---

৪. রোজেনথালে আবু সায়িদের পরিবর্তে আবুল হাসানের নাম বিদ্যমান। প্রথম জন (১৩১০-৩১ খ্রি:) পরবর্তীকালীন।

৫. কোরান, ৩, ৪৭।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[বৃহৎ ও ব্যাপক সৌধ কীর্তি স্থাপন কোনো একক সম্রাজ্যের পক্ষে সম্ভব নয়]

এর কারণ সম্পর্কে আমরা পূর্বে যা বর্ণনা করেছি, তা এই যে, স্থাপত্যের জন্য ব্যাপক সহযোগিতা ও মানবিক সামর্থ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রয়োজনীয়। অনেক সময় নির্মাণকার্য তার বিরাটত্বের জন্যই একক বা সম্মিলিত যন্ত্রপাতির সাহায্যেও নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছে না, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। বরং পরবর্তীকালে তার সম্পূর্ণতা বিধানের জন্য পর্যায়ক্রমিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রথম তার ভিত্তি স্থাপন করে এবং পরবর্তীকালে দ্বিতীয় ও তৃতীয় এসে তাতে যোগ দেয়। এদের প্রত্যেকেই সাধ্যানুসারে কর্মী ও শ্রমের একত্রীকরণের প্রচেষ্টা চালায়। ফলে সমগ্র প্রচেষ্টা একত্র হয়ে উদ্দেশ্য সাধিত হয় এবং নির্মাণকাজ পরিকল্পনা অনুসারে বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে যে কেউ একে দেখে মনে করে, তা একই সাম্রাজ্যের কীর্তি।

পাঠক, এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের বর্ণিত 'মারেব' বাঁধের প্রতি লক্ষ করুন। এ বাঁধের নির্মাণ কাজ সাবা ইবনে ইয়াশজুব আরম্ভ করেন এবং তিনি সত্তরটি নদীকে তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করতে সক্ষম হন। কিন্তু মৃত্যু এসে তার এ নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করতে বাধা দেয়। পরবর্তীকালে হিমিয়ার সম্রাটেরা তার পূর্ণতা সাধন করেন।

অনুরূপভাবে কার্থেজ ও তার উন্নত খিলানের উপর দিয়ে পানীয় জল বহনের প্রণালী নির্মাণ সম্পর্কেও বর্ণনা বিদ্যমান। বস্তুত যে কোনো বৃহদাকার নির্মাণকার্যের সাধারণ অবস্থাই এরূপ। এই বক্তব্যের প্রমাণ হিসাবে আমরা বর্তমানকালেও দেখতে পাই, হয়ত কোনো রাজশক্তি একটি বিরাট কাজ আরম্ভ করে তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা অনুসারে ভিত্তি স্থাপন করল। কিন্তু তার পরবর্তী সম্রাটগণ তার পরিপূর্ণতা সাধনে তৎপর না হওয়ার ফলে তা অনুরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই পড়ে থাকে। এক্ষেত্রে আমরা এও দেখতে পাই যে, এমন বহু প্রাচীন নির্মাণকীর্তি বিদ্যমান, যা ধ্বংস করে ফেলাও সাম্রাজ্য শক্তির পক্ষে সম্ভব হয় না। যদিও এ কথা স্বীকার্য যে, নির্মাণ অপেক্ষা ধ্বংস সাধন বহুগুণে সহজ। কারণ ধ্বংস তার প্রাথমিক অবস্থা, অস্তিত্বহীনতার দিকে প্রত্যাবর্তন করায় এবং নির্মাণ তার বিপরীত ধারায় একটি অস্তিত্বকে মূর্তিমান করে তোলে। সুতরাং আমরা যদি এমন কোনো নির্মাণকার্যের সাক্ষাৎ পাই, ধ্বংস করা সহজসাধ্য হওয়া সত্ত্বেও যার ধ্বংস সাধন সম্ভব হয় না, তা হলে আমরা এ কথাই বুঝতে সক্ষম হই যে, তার নির্মাতাগণ ব্যাপক শক্তির অধিকারী ছিল এবং একক কোনো সাম্রাজ্যের পক্ষে তার নির্মাণ সম্ভব হয়নি।

খসরুর দরবার গৃহের ব্যাপারে আরবরাই অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। সম্রাট হারুনুর রশীদ তা ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করেন। তিনি ইয়াহিয়া ইবনে খালিদের কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে পাঠান। ইয়াহিয়া তখন কারাগারে বন্দী; সেই অবস্থায় সম্রাটকে বলে পাঠান, আমীরুল মোমেনীন, এরূপ করবেন না; বরং তাকে দণ্ডায়মান থাকতে দিন। তা আপনার পিতৃপুরুষের শৌর্যের কথাই প্রকাশ করবে এবং মানুষের মনে এ ধারণারই সৃষ্টি করবে যে, যারা এরূপ বিরাট নির্মাণকার্যের অধিপতিদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে, তারা কতই না শক্তিশালী ছিল। কিন্তু সম্রাট তার এ পরামর্শে সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন, নিশ্চয় অনারবদের প্রতি সহানুভূতিই তাকে এ প্রকার পরামর্শ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাকে ধ্বংস করেই ছাড়ব। অতঃপর তিনি তাকে ভেঙে ফেলার জন্য বহু শ্রমিক নিয়োগ করলেন। তাকে আগুন দ্বারা উত্তপ্ত করে কুঠার ব্যবহার করালেন। কিন্তু ভেঙে ফেলা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত করার পর যখন অক্ষমতা প্রকাশ পেল, তখন তিনি অসম্মানের ভয়ে ভীত হয়ে উঠলেন। আবার ইয়াহিয়ার নিকট লোক পাঠালে তিনি তাঁকে ধ্বংস না করার পরামর্শ দিয়ে বললেন, আমীরুল মোমেনীন, আপনি এ ইচ্ছা ত্যাগ করুন। কারণ এর জন্য অধিককাল ব্যয় করলে মানুষ বলতে আরম্ভ করবে যে, আরবের সম্রাট আমীরুল মোমেনীন অনারবদের একটি নির্মাণ কীর্তি ভেঙে ফেলতেও সমর্থ হলেন না। সম্রাট এবার তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন এবং তার ধ্বংস সাধন থেকে বিরত হলেন।

এরূপ সম্রাট মামুনও মিশরের পিরামিড ভেঙে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এ উদ্দেশ্যে বহু শ্রমিক নিয়োগ করেন; কিন্তু দীর্ঘকালেও কিছু হয়নি। শ্রমিকরা তার গাত্রদেশে একটি সুড়ঙ্গ কাটতে সমর্থ হয় এবং তার দ্বারা বহির্প্রাচীর ও অন্তর্প্রাচীরের মধ্যবর্তী একটি উন্মুক্ত স্থানে পৌঁছতে সক্ষম হয়। ধ্বংস প্রচেষ্টার এটাই ছিল শেষ পরিণতি। বর্তমানকালেও নাকি এই সুড়ঙ্গটি বিদ্যমান। বহু লোকের ধারণা মামুন উক্ত প্রাচীরদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বহু ধনরত্ন লাভ করেছিলেন। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

বর্তমানকালে ঝুলন্ত খিলানগুলোর ব্যাপারেও অনুরূপ ঘটনা দেখা যাচ্ছে। তিউনিসের লোকেরা নির্মাণকার্যে পাথর ব্যবহার করে এবং কারিগররা ঐ সকল খিলানের পাথর উক্ত কাজে খুবই পছন্দ করে থাকে। এ জন্য দীর্ঘদিন যাবত তারা এগুলো ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু বহু ঘর্মপাত করার পরই শুধু তার সামান্য অংশ স্থানচ্যুত করতে সক্ষম হয়। এ কার্যে নিযুক্ত বহু দলের চেষ্টা সেখানে খুবই পরিচিত। আমিও বাল্যকালে তার বহু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছি। আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কার্যাবলিকে সৃষ্টি করেছেন।[৬]

---

৬. কোরান, ৯৬।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[নগর পরিকল্পনায় যে সকল বিষয় লক্ষ রাখা দরকার এবং তৎপ্রতি উদাসীনতা যে পরিণামের সৃষ্টি করে]

জেনে রাখুন, নগর এমন একটি আবাসস্থল, যা মানুষ তার বিলাসব্যসন ও তদানুষঙ্গিক ইচ্ছেগুলোর পরিপূরণের উদ্দেশ্যে অবলম্বন করে থাকে। তখন তারা শান্তি ও স্বস্তি চায় এবং তার জন্যই প্রয়োজনীয় গৃহাদি নির্মাণ করে। সুতরাং এ ব্যাপারটি যখন তারা বাসস্থান ও আশ্রয়ের জন্য গ্রহণ করে, তখন তাতে সম্ভাব্য অকল্যাণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা এবং উপকারিতা ও উপযোগিতার বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন।

অকল্যাণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা হিসাবে এটা লক্ষ রাখতে হবে, যাতে উক্ত নগরের বাসস্থানগুলো একটি প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে সুরক্ষিত হয়। উক্ত নগর এমন দুর্ভেদ্য স্থানে পত্তন করতে হবে, যেখানে সহজে অনুপ্রবেশ করা না যায়। যেমন কোনো দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল কিংবা সাগর বা নদীর দ্বারা বেষ্টিত কোনো এলাকা; যাতে কোনো সেতু বা বাঁধ ছাড়া প্রবেশ করা সত্যই দুঃসাধ্য হয়। এর ফলে শত্রুর পক্ষে তার উপর আধিপত্য বিস্তার দুরূহ এবং তার প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা দৃঢ়তর হয়ে উঠবে।

নগরকে পরিবেশগত অকল্যাণ তথা রোগ-শোকাদির প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা করার জন্য এটা লক্ষ রাখতে হবে, যাতে তার আবহাওয়া ভালো হয়। কারণ বায়ু যদি স্থির ও দূষিত হয় এবং দূষিত জলাশয়, দুর্গন্ধযুক্ত পয়ঃপ্রণালী অথবা স্যাঁতসেঁতে স্থানের নিকটবর্তী হয়, তা হলে এ সাহচর্যের ফলে বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে ওঠে এবং নিঃসন্দেহে সংশ্লিষ্ট জীবকুলকে রোগাক্রান্ত করে তোলে। এটা পর্যবেক্ষণের দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ যে সকল নগরে ভালো আবহাওয়ার বিষয়টি লক্ষ করা হয় না, সেখানে সাধারণভাবে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

মাগরিবের আফ্রিকিয়ার জারিদ অঞ্চল 'কাবেস' নগর এ ব্যাপারে বিখ্যাত। তাতে বসবাসকারী ও আগত কেউই এ কারণে এক প্রকার দূষিত জ্বরের আক্রমণ থেকে মুক্তি পায় না। বলা হয় যে, এর পাদুর্ভাব ইদানীং ঘটেছে; পূর্বে এরূপ ছিল না। এর কারণ হিসাবে আল বকরী বর্ণনা করেছেন যে, ঐ নগরে নাকি একটি গর্ত দেখা দেয় এবং তার মধ্যে তামার তৈরি একটি পাত্র পাওয়া যায়, যার মুখ সীসার দ্বারা ঢালাই করা ছিল। তার মুখের ছিপিটি খুলবার পর তা থেকে ধোঁয়া বের হয়ে বায়ুর সাথে মিশে গেছে। এর পর থেকেই সেখানে এরূপ জ্বর দেখা দিতে থাকে। সম্ভবত এ বক্তব্যের দ্বারা এটাই বোঝাতে চেয়েছে যে, উক্ত পাত্রে কোনো যাদু প্রক্রিয়ার দ্বারা রোগ-শোককে বন্দী করে

রাখা হয়েছিল, এখন তা ছুটে যাওয়ায় উক্ত নগরে রোগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে।

এ প্রকার একটি ধারণা সাধারণ লোকের সংস্কার এবং তাদের অলীক গল্পগুজবের বিষয় মাত্র। আলবকরী[৭] এমন কোনো পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতার অধিকারী ছিলেন না, যাতে তিনি এ ধারণার প্রতিবাদ বা তার দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারেন। সুতরাং তিনি যেমন শুনেছেন, তেমনই বর্ণনা করেছেন।

পাঠক, আপনার সম্মুখে যা সত্যকে প্রকাশ করবে, তা এই যে, দূষিত বায়ুর স্থিতাবস্থাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জীবদেহে দোষের অনুপ্রবেশ এবং জ্বরাদি রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়। সুতরাং এরূপ পরিবেশে যদি বায়ুস্রোত প্রবাহিত হয়ে ডানে-বামে প্রসারিত ও প্রধাবিত হয়, তা হলে তাতে জাত প্রাণিদেহের রোগ-শোকাদি অনেকাংশে দূরীভূত হয়ে যায়।

নগর যদি ঘন জনবসতিপূর্ণ হয় এবং মানুষের চলাচল বৃদ্ধি পায়, তা হলে বাতাস অবশ্যকীয় তরঙ্গাভিঘাত লাভ করে। বাইরের বায়ু তাতে প্রবেশ করে তার স্থিতাবস্থাকে দূর করে এবং এর বায়ুর চলাচল ও প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জনবসতি কমে গেলে বায়ু আর পূর্বানুরূপ চলাচল ও প্রবাহের সৃষ্টি করতে পারে না। তা স্থির ও নিশ্চল হওয়ার ফলে তার দূষিতাবস্থা বৃদ্ধি পায় এবং অকল্যাণের বাহক হয়ে ওঠে। এ কারেস শহর, আফ্রিকিয়ার নবীন জনসমাগমের সময় ঘনবসতিপূর্ণ এবং অধিবাসীদের চলাচলে তরঙ্গায়িত ছিল। এ কারণেই তার বায়ু স্রোতশীল, প্রবহমান এবং অকল্যাণ দূরীকরণে সহায়ক ছিল। সুতরাং তার দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা এবং রোগ-শোকের প্রাদুর্ভাব কম ছিল। অতঃপর তার জনবসতি হ্রাস পেলে তার দূষিত বায়ু স্থির হয়ে পানীয় জলকে দূষিত করে তোলে এবং পরিবেশ দূষিত হয়ে রোগের প্রকোপ ঘটায়। এটা ভিন্ন অন্য কোনো কারণ নেই।

আমরা এর বিপরীত অবস্থাও দেখতে পেয়েছি। এমন একটি শহর, যার পত্তনের সময় জলবায়ুর প্রতি খুব একটা দৃষ্টি দেয়া হয়নি; এ কারণে তার জনবসতি অল্প ছিল এবং রোগ-শোকের প্রকোপ ছিল বেশি। অতঃপর তার জনবসতি বৃদ্ধি পাওয়ায় এ প্রাথমিক অবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। এর উদাহরণ বর্তমানকালে রাজধানী ফেজ, যাকে 'নতুন শহর'[৮] বলে অভিহিত করা হয়। পৃথিবীতে অনুরূপ উদাহরণ প্রচুর। পাঠক, এর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করুন, তা হলে আমাদের বক্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

নগর পরিকল্পনায় সাধারণের উপকার ও সুযোগ-সুবিধা বিধানের জন্য কতিপয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা আবশ্যক। তন্মধ্যে পানীয় জল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুতরাং নগরটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত হবে কিংবা তার কাছে সুপেয় জলের একাধিক ঝর্ণা থাকবে। কারণ নগরের সন্নিকটে জলের ব্যবস্থা থাকলে তা অধিবাসীদের জলের প্রয়োজনকে সহজে পূরণ করতে সক্ষম। কেননা জল একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এর ফলে সাধারণ মানুষের জন্য তার নিকট অবস্থান এক ব্যাপক সুযোগের সৃষ্টি করবে।

---

৭. ৪৯ পৃ: দ্র:।

৮. এর পত্তনকাল ৬৭৪ (১২৭৬ খ্রি:) হি:।

নগরের জন্য অন্য লক্ষণীয় সুযোগের মধ্যে গৃহপালিত পশুদের চারণভূমি। কেননা প্রতিটি গৃহস্বামীর জন্যই প্রজনন, দুগ্ধ ও আরোহণের জন্য বিভিন্ন প্রকার পশু প্রতিপালন করা প্রয়োজন এবং তাদের উপযোগী চারণভূমিও দরকার। সুতরাং এরূপ চারণভূমি যদি উর্বর ও নিকটবর্তী হয়, তা হলে তা তাদের জন্য অধিক সুযোগ এনে দেয়। কেননা তার দূরাবস্থান একান্তই পীড়াদায়ক। অনুরূপভাবে নগরের জন্য কৃষিক্ষেত্রের প্রয়োজন। কেননা শস্যই আহার্যের প্রধান উপকরণ। সুতরাং নগরীর কৃষিক্ষেত্রগুলো যদি তার নিকটবর্তী হয়, তা হলে তা কর্ষণ এবং তা থেকে শস্যাদি আহরণ সহজতর হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে নির্মাণ কাজ ও রন্ধনের জন্য বৃক্ষাদির প্রয়োজন। কারণ রন্ধনকার্য ও অন্যান্য উত্তাপ সৃষ্টির জ্বালানি হিসাবে কাঠের প্রয়োজন খুবই সাধারণ ব্যাপার এবং ছাদের জন্যও এর আবশ্যকতা রয়েছে। এতদ্ব্যতীতও কাঠ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমাগ্রীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নগর পরিকল্পনায় আরো লক্ষণীয় ব্যাপার হল, যাতে তা সাগরের নিকটবর্তী স্থলে অবস্থিত হয়। এর ফলে দূর-দূরান্ত থেকে এতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আনয়নে সুবিধা হবে। অবশ্য এ প্রকার অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা পূর্বগুলো অপেক্ষা গৌণ। বস্তুত, প্রয়োজনের পার্থক্যের জন্যই তার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে অধিবাসীদের প্রয়োজনই সর্বাগ্রে স্থান পায়।

নগর পত্তনকারী অনেক সময় সুন্দর ও শোভন প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে উদাসীন থাকেন। অথবা তিনি তার নিজের চিন্তাধারা ও স্বজাতির প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখেই তার পরিকল্পনা করেন। তাতে অন্যের চিন্তা স্থান পায় না। যেমন ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবরা ইরাক ও আফ্রিকিয়ার নগর পত্তনে অবলম্বন করেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি, যেমন উটের চারণভূমি, তার উপযোগী বৃক্ষ-লতা ও লবণাক্ত পানীয়ের প্রতি লক্ষ রেখেছেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় পানীয় জল, কৃষিক্ষেত্র, বৃক্ষাদি, গৃহপালিত অন্যান্য পশুর চারণভূমি এবং অনুরূপ অন্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেননি। যেমন তাদের প্রতিষ্ঠিত কায়রোয়ান, কুফা, বসরা প্রভৃতি শহর। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি লক্ষ না রাখার ফলেই এগুলো অতি সহজে ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে।

সমুদ্র তীরবর্তী নগরগুলোতে যে বিষয়টি লক্ষ রাখা দরকার, তা এই যে, এগুলো যেন পার্বত্য এলাকায় অথবা ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকার মধ্যখানে স্থাপিত হয়। যাতে নগরের উপর কোনোপ্রকার বহিরাক্রমণের সূত্রপাত হলে তারা সমবেতভাবে প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে পারে। এর কারণ এই যে, কোনো নগর সমুদ্রতীরে যদি এমনভাবে অবস্থিত হয়, যার পার্শ্বে গোত্র ও গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনবসতি বিদ্যমান না থাকে এবং তারা দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল দ্বারা সংরক্ষিত না হয়, তা হলে তার উপর রাত্রিকালীন অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। সামুদ্রিক রণতরীগুলো অতি সহজেই এর উপর চড়াও হয়ে ক্ষতিসাধন করতে পারে। কারণ তারা বুঝতে পারে যে, সেখানে প্রতিরোধের তেমন কোনো সুবন্দোবস্ত নেই। কেননা নগর জীবনে অভ্যস্ত অধিবাসীরা স্বস্তির মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে যুদ্ধাভিযানের স্পৃহা থেকে দূরে সরে গেছে। এ প্রকার অবস্থা হয়েছে, পূর্বাঞ্চলের আলেকজান্দ্রিয়া ও পশ্চিমাঞ্চলের তারাবলিসের এবং 'বুনা' ও

'সালা'-কেও এ পর্যায়ে ফেলা যায়। কিন্তু যখন গোত্র ও গোত্রপ্রীতিসম্পন্ন জনবসতি এমনভাবে তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিরাজমান থাকে, যাতে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের বেলায় তারা সাড়া দিতে সমর্থ হয় এবং তার অবস্থান এমন দুর্গম পার্বত্য এলাকায় হয়, যাতে তা উক্ত এলাকার শীর্ষদেশে ও বেষ্টনীতে আক্রমণেচ্ছুদের কাছে দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে, তা হলে স্বভাবতঃই শত্রুরা এ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে নিরাশ হয়ে পড়ে। কারণ তারা জানে যে, আক্রমণ মাত্রই তারা তৎপর হয়ে উঠবে এবং প্রতিরোধের জন্য অন্য সকলে সাড়া দিয়ে ছুটে আসবে। এ অবস্থা দেখা যায় 'সেবতা', 'বেজা', এমন কি ক্ষুদ্র 'কেলো' নগরীতে।

পাঠক, এ বিষয়টি উত্তমরূপে বুঝে নিন এবং আলেকজান্দ্রিয়াকে আব্বাসী সাম্রাজ্যের সময় থেকে সীমান্ত নগর বলার কারণের মধ্যে একে বিবেচনা করুন। অথচ রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রচারণা একে অতিক্রম করে 'বরকা' ও আফ্রিকিয়ায় পৌঁছেছিল। একে এরূপ মনে করার একমাত্র কারণ এই যে, তার সহজ অবস্থানের জন্য সমুদ্র থেকে সম্ভাব্য ভীতির আশঙ্কা সর্বদা বিরাজ করত। সম্ভবত এ কারণেই—আল্লাহ্ ভালো জানেন—ইসলামী শাসন আমলেই আলেকজান্দ্রিয়া ও তারাবলিস বহুবার শত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। আল্লাহ্ মহান এবং সর্বজ্ঞ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[মসজিদ ও পৃথিবীর মহান সৌধরাজি]

জেনে রাখুন, পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ এ পৃথিবীর কিছু অংশকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে তাঁর মর্যাদার দ্বারা বিশিষ্ট করেছেন, তাঁর বান্দাদের উপাসনার স্থান হিসাবে নির্ধারিত করেছেন এবং সেখানে পুণ্য লাভের সুযোগকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর নবী ও রসূলদের মাধ্যমে আমাদেরকে অবহিত করেছেন যাতে তাঁর বান্দারা তাঁর অনুগ্রহের পথে সহজে গমন করে সৌভাগ্য লাভে ধন্য হতে পারে।

বিশুদ্ধ দুটি হাদিস সংকলনের[১০] বক্তব্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান হিসাবে তিনটি মসজিদ রয়েছে; এগুলো হল মক্কা, মদিনা ও বয়তুল মুকাদ্দস। মক্কার পবিত্র গৃহ, তা হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর নামের সাথে যুক্ত। আল্লাহ্ তাঁকে এ গৃহ নির্মাণ করতে এবং এর প্রতি মানুষকে হজের নিমিত্ত আহ্বান জানাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কোরানের বর্ণনা অনুসারে[১১] এটা তিনি ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আঃ) নির্মাণ করেন এবং তন্মধ্যে আল্লাহ্র নির্দেশ প্রতিপালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইসমাইল, তাঁর মাতা হাজেরা এবং সেখানে আগত জুরহুম গোত্রের সাথে বসবাস করতে থাকেন। আল্লাহ্র ইচ্ছামত মাতা-পুত্রের মৃত্যু হলে তাঁরা কাবার নিকটবর্তী 'হিজের' নামক স্থানে সমাহিত হন। হজরত দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) বয়তুল মুকাদ্দস নির্মাণ করেন। আল্লাহ্ তাঁদেরকে এর মসজিদ ও সৌধ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। হজরত ইসহাকের বংশের বহু নবী এর চতুষ্পার্শে সমাহিত হয়েছেন। মদিনা আমাদের নবী হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর হিজরতের স্থল। মহান আল্লাহ্ই তাঁকে ঐস্থানে হিজরত করতে এবং সেখানে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি সেখানে পবিত্র মসজিদের ভিত্তি পত্তন করেন এবং তাঁর মহান সমাধিও তার মাটিতে অবস্থিত। এ তিনটি মসজিদ মুসলমানের চক্ষের মণি, কলিজার টুকরা ও তাঁদের ধর্মের গৌরব। বহু হাদিসে এগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব, তাদের সাহচর্যে পুণ্যের প্রাচুর্য এবং উপাসনায় কল্যাণের আতিশয্যের কথা সুপরিচিত। আমরা এ স্থলে উক্ত তিনটি মসজিদের প্রাথমিক অবস্থা এবং ক্রমশ পরিপূর্ণতা লাভের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে তাদের আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করব।

মক্কার প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে বলা হয় যে, হজরত আদম (আঃ) তাকে 'বয়তুল মামুর'[১২]-এর বিপরীত দিকে নির্মাণ করেছিলেন। অতঃপর তাকে বন্যায় ধ্বংস করে

---

১০. বোখারী (১ম খণ্ড) দ্র:।

১১. কোরান, ২, ১২৫।

১২. সপ্তাকাশের উপরে অবস্থিত একটি উপাসনাস্থল। তুল, কোরান, ৫২, ৪।

ফেলে। এতে এমন কোনো প্রামাণ্য সংবাদ নেই, যার উপর নির্ভর করা চলে। এটা আল্লাহ্‌র সংক্ষিপ্ত বর্ণনা[১৩]—'যখন ইব্রাহিম এ গৃহের ভিত্তি স্থাপন করলেন এবং ইসমাইল', তা থেকে ব্যাখ্যাতারা সংগ্রহ করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ ইব্রাহিম (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন। তাঁর ও তাঁর স্ত্রী সারার সাথে হাজেরার মনোমালিন্যের বিষয় সকলের নিকটই সুপরিচিত। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর পুত্র ইসমাইল ও হাজেরাকে এ নির্জন স্থানে নির্বাসন দিতে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন। সুতরাং ইব্রাহিম তাদেরকে এ স্থলে রেখে চলে যান। এর পর কীভাবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তাঁরা 'জমজম কূপের' সাক্ষাৎ পান, কীভাবে জুরহুম গোত্রের সখ্যতা লাভ করেন এবং কীভাবে তারা তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁদের সাথে বসবাস করার জন্য জমজমের চতুষ্পার্শ্বে বসতি স্থাপন করে, তার সবকিছুই যথাস্থানে বর্ণিত রয়েছে। এ সময় ইসমাইল কাবার স্থানে একটি গৃহ নির্মাণ করে তাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি খেজুরের খুঁটি দিয়ে তাঁর ছাগলের জন্য উক্ত গৃহের পার্শ্বে একটি বেষ্টনী তৈরি করেন। ইব্রাহিম (আঃ) বহুবার তাঁকে দেখার জন্য সিরিয়া থেকে এ স্থানে আগমন করেন। অবশেষে তিনি এ বেষ্টনীস্থলে কাবাগৃহ নির্মাণের নির্দেশ লাভ করেন। তিনি এটা নির্মাণ করতে গিয়ে তাঁর পুত্র ইসমাইলের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন এবং এতে হজ করার জন্য মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। ইসমাইল এ স্থলেই বসবাস করতে থাকেন। তাঁর মাতা হাজেরার মৃত্যু ঘটে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সন্তান-সন্ততি তাদের মাতুল গোত্র জুরহুমের সাথে কাবার তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত থাকে। অতঃপর আমালেকারা এ দায়িত্ব গ্রহণ করে। এভাবেই কাবার বিধিব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলে।

পৃথিবীর সর্বশ্রেণীর মানুষ এই কাবার দিকে ছুটে আসত। শুধু বনি ইসমাইল বা অন্যান্য গোত্র নয়; বরং তার পার্শ্বে, তার পরিধি থেকে বহুদূরে যারা ছিল, তারাও আসতে দ্বিধা করত না। কথিত আছে, তুব্বা রাজন্যবর্গও কাবায় হজ্জব্রত পালন করতে আসতেন ও তাকে সম্মান করতেন। কোনো এক তুব্বারাজ[১৪] কাবাগৃহকে পর্দা ও ডোরাদার কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তাকে পরিষ্কার করে তার চাবিতালার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। এও বর্ণিত আছে যে, পারস্যবাসীরা এতে হজ্জব্রত পালন করত এবং তার জন্য উৎসর্গ নিয়ে আসত। আবদুল মোত্তালেব জমজম কূপ পুনঃ খননের সময় যে দুটি স্বর্ণ নির্মিত হরিণ পেয়েছিলেন, তাও তাদেরই সেই উপঢৌকন।

হজরত ইসমাইলের বংশের পরে জুরহুম গোত্রই তাদের মাতুল হওয়ার দাবিতে এর তত্ত্বাবধান করছিল। অতঃপর খুজাআ গোত্র বিদ্রোহ করে এ দায়িত্ব তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বহুদিন তা পালন করে। এর পর ইসমাইলের সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি পেয়ে নানা গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে কেনানা, কেনানা থেকে কোরায়েশ ও অন্যান্য গোত্রশক্তির আবির্ভাব ঘটে। খুজাআর দায়িত্ব পালন ত্রুটিপূর্ণ হয়ে উঠলে কোরায়েশরা তা গ্রহণ করে এবং তাদেরকে কাবার অঙ্গন থেকে বের করে দেয়। তদবিধ দায়িত্ব তাদের হাতেই ন্যস্ত আছে। এ দায়িত্ব গ্রহণকালে কোরায়েশের

১৩. কোরান, ২, ১২৭।
১৪. আবু রোয়েব (রোজেনথাল)।

গোত্রপ্রীতি কুসাই ইবনে কেলাব কাবাগৃহকে পুনঃনির্মাণ করেন এবং তার ছাদ তৈরিতে 'দোম' ও কাঠ ও খেজুর শাখা ব্যবহার করেন। আশা বলেন,[১৫]

আমি শপথ গ্রহণ করি দুই আচ্ছাদনের—গীর্জার পদরীর এবং
সেইঘর, যা কুসাই ও মাদাদ ইবনে জুরহুম নির্মাণ করেছে।

অতঃপর কাবাগৃহ বন্যায় ডুবে যায়। বলা হয়, আগুন লেগে ধ্বংস হয়। তারা একে পুনঃনির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের সম্পদ থেকে তার ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে। এ সময়ে জেদ্দার সমুদ্রতীরে একটি জাহাজ ভগ্ন হলে ছাদের জন্য তার তক্তাগুলো ক্রয় করে আনে। কাবার দেয়ালগুলো তখন দেহ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ ছিল। তারা তাকে আঠার হাত[১৬] উঁচু করে এবং পূর্বের ভূমি সংলগ্ন দ্বারকে দেহ সমান ভিত্তির উপর স্থাপন করে; যাতে তার মধ্যে বন্যার পানি প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু তাদের সঞ্চয়কৃত অর্থ-সামর্থ্য কম হওয়াতে তারা তার পূর্ব ভিত্তি থেকে সাড়ে ছয় হাত পরিমাণ স্থান ত্যাগ করে তাকে একটি অনুচ্চ বেষ্টনীর দ্বারা ঘিরে দেয়। কাবা প্রদক্ষিণকালে এ বেষ্টিত অংশের বাইরে দিয়ে পদচারণা করতে হয় এবং একেই 'হিজর' বলা হয়ে থাকে।

কাবাগৃহে, ইবনে জুবায়েরের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে মক্কাকে দুর্গ হিসাবে ব্যবহার করা পর্যন্ত অনুরূপ নির্মাণ ব্যবস্থার দ্বারাই সুসজ্জিত ছিল। এ সময়ে হুসাইন ইবনে নুমায়ের সকুনীর নেতৃত্বে ইয়াজীদ ইবনে মাবিয়ার সৈন্য এসে মক্কা অবরোধ করে এবং হিজরি চৌষট্টি সনে তারা কাবার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করায় তাতে আগুন ধরে যায়। বলা হয়, তারা 'নেপাথ' নামীয় যন্ত্র থেকে ইবনে জুবায়েরের উপর যে প্রস্তর বর্ষণ করে, তাতে কাবার দেয়ালগুলো ফেটে যায়। সুতরাং ইবনে জুবায়ের ঐগুলো ভেঙে ফেলে পুনরায় পূর্বাপেক্ষা সুন্দর করে কাবার নির্মাণকার্য সম্পন্ন করেন।

উক্ত নির্মাণকার্যে সাহাবীরা মতানৈক্যে পৌঁছলে ইবনে জুবায়ের হজরত আয়েশা থেকে বর্ণিত হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর একটি বাণীর দ্বারা প্রমাণ উপস্থিত করেন।[১৭] তিনি আয়শাকে লক্ষ করে বলেছিলেন, তোমার জাতি যদি অধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়ার ক্ষেত্রে নবীন না হত, তা হলে আমি অবশ্যই কাবাকে ইব্রাহিমের ভিত্তির উপর স্থাপন করতাম এবং তার জন্য পূর্ব-পশ্চিমে দুটি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতাম। সুতরাং ইবনে জুবায়ের কাবাকে ভেঙে ফেলে হজরত ইব্রাহিমের ভিত্তিমূল প্রকাশিত করেন এবং তা প্রত্যক্ষ করার জন্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে সেখানে একত্র করেন। ইবনে আব্বাস তাঁকে মানুষের কেবলা সম্পর্কে সতর্কতার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। সুতরাং ইবনে জুবায়ের আপাতত তার ভিত্তির উপর কাঠের বেষ্টনী প্রস্তুত করিয়ে তাকে আচ্ছাদন দ্বারা আবৃত করে কেবলার কাজ চলবার ব্যবস্থা করেন। তিনি সানা শহরে নির্মাণকার্যে ব্যবহারযোগ্য চুন ও অন্য দ্রব্যের জন্য প্রেরণ করে তা সংগ্রহ করেন এবং প্রাথমিক অবস্থায় ব্যবহৃত কাবার পাথরের আকার জেনে নিয়ে প্রয়োজনমত তাও একত্র করে রাখেন। অতঃপর তিনি হজরত ইব্রাহিমের ভিত্তির উপর তার নির্মাণকার্য আরম্ভ করান।

---

১৫. আরবের বিখ্যাত কবি আবুল বাসির মায়মুন ইবনে রেস; মৃত্যু ২ (৬২৬ খ্রি:) হি:।
১৬. মূলে আছে 'ফেরাউন'।
১৭. বোখারী (১ম খণ্ড) দ্র:।

তিনি তার প্রাচীরের উচ্চতা সাতাশ হাত পর্যন্ত বর্ধিত করেন এবং হাদিসের নির্দেশ অনুসারে ভূমি সংলগ্ন তার পূর্ব-পশ্চিমে দুটি দ্বার নির্গত করেন। তিনি কাবার মেঝে ও প্রাচীরগাত্রে মার্বেল পাথর ব্যবহার করেন এবং তার কপাট ও খিলে স্বর্ণ ব্যবহার করে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন।

অতঃপর সম্রাট আবদুল মালেকের সময় হাজ্জাজ এসে মক্কা অবরোধ করেন এবং 'মেঞ্জিনিক' থেকে গোলা বর্ষিয়ে কাবার দেয়ালগুলো ধ্বসিয়ে দেন। এর পর ইবনে জুবায়ের পরাজিত হলে আবদুল মালেকের সাথে ইবনে জুবায়েরের দ্বারা কাবাগৃহ নির্মাণ ও তার বর্ধিতকরণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। আবদুল মালেক তাকে নির্মূল করে পুনরায় কোরায়েশ গোত্রের ভিত্তির উপর স্থাপিত করতে নির্দেশ দেন। সুতরাং তা বর্তমানেও অনুরূপ অবস্থায় বিদ্যমান। বলা হয়, আবদুল মালেক ইবনে জুবায়ের কর্তৃক বর্ণিত হজরত আয়েশার হাদিসের বিশুদ্ধতার কথা পরে জানতে পেরে লজ্জিত হন এবং বলেন, খুবই ভালো হত যদি আবু হাবিবকে[১৮] এ কাবাগৃহ ও তার নির্মাণকার্যের ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিতে পারতাম।

হাজ্জাজ সম্রাটের নির্দেশ অনুসারে কাবাগৃহের সাড়ে ছয় হাত পরিমাণ অংশ ভেঙে ফেলে 'হিজর' নামক স্থানটি পৃথক করেন এবং তাকে কোরায়েশ গোত্রের নির্মাণ পরিধিতে পুনঃ স্থাপন করেন। তিনি পশ্চিম দ্বারটি বন্ধ করে দেন এবং পূর্ব দ্বারের নিচেকার অংশটি বর্তমানে যেমন আছে, তেমনভাবে রুদ্ধ করে সোপান সংলগ্ন করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় অংশই অপরিবর্তিত রয়েছে। সুতরাং বর্তমানকালে কাবাগৃহের নির্মাণকার্যের সমুদয় অংশ প্রায়ই ইবনে জুবায়ের কর্তৃক সম্পাদিত। তাঁর ও হাজ্জাজের নির্মাণকার্যের মধ্যে দেয়ালের একটি অংশে একটি দৃশ্যমান ফাঁক বিদ্যমান। তাতে যে জোড়া দেয়া হয়েছে, তা বোঝা যায়। উক্ত দুটি নির্মাণকার্যের মধ্যে এক অঙ্গুলি পরিমাণ একটি ফাটলের ন্যায় পার্থক্য সুস্পষ্ট ছিল। পরে তাকে জোড়া দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

এ স্থলে কাবা প্রদক্ষিণ সম্পর্কে ধর্মশাস্ত্রবিদরা যে সকল নির্দেশ প্রদান করেন, তার সাথে বিরোধের সম্ভাবনায় বেশ কিছু সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তাঁরা বলেন, প্রদক্ষিণকারী যদি কাবার ভিত্তি সংলগ্ন অনুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত স্থানটি, যাকে 'শাজরোয়াঁ' বলা হয়, তা ত্যাগ করে না চলে, তা হলে তার প্রদক্ষিণ কাবাগৃহের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়বে। কারণ কাবাগৃহ তার কিছু ভিত্তি ত্যাগ করে অবশিষ্টাংশের উপর স্থাপিত হয়েছে। উক্ত পরিত্যক্ত অংশকেই 'শাজরোয়াঁ' বলা হয়। অনুরূপভাবে 'হেজরে আসোয়াদ'কে চুম্বন প্রদানকারীরাও চুম্বন দানের পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্থান ত্যাগ করবে, যাতে তার প্রদক্ষিণ কাবার অভ্যন্তর ভাগে গিয়ে না পড়ে। এক্ষেত্রে কাবার দেয়ালগুলো যদি ইবনে জুবায়েরের নির্মাণকার্য হয়ে থাকে, যা হজরত ইব্রাহিমের ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছে, তা হলে ধর্মশাস্ত্রবিদদের এ সকল বক্তব্য কি করে সম্ভব হয়? এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার দুটি পথই খোলা আছে; এর একটি হল এই যে, হাজ্জাজ তার সমস্তটা ভেঙে ফেলে পুনঃনির্মাণ করেছেন, যেমন অনেকেই এ মত পোষণ করেন। কিন্তু

---

১৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়ের।

দুটি নির্মাণকার্যের মধ্যে জোড়া দেয়ার যে ব্যাপারটি চাক্ষুষ বিদ্যমান এবং দুটি নির্মাণকার্যের একটির উপরের দিকে অন্যটির পার্থক্যের সুস্পষ্টতা যেভাবে রয়েছে, তা এ মতের বিরোধিতা করে। অন্যটি হল এই যে, ইবনে জুবায়ের সম্পূর্ণ দিক থেকে কাবাকে হজরত ইব্রাহিমের ভিত্তির উপর পুনঃস্থাপন করেননি। তিনি শুধু 'হিজর' নামক স্থানটিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এ জন্য কাবাগৃহ বর্তমানে ইবনে জুবায়েরের নির্মাণকার্য হলেও তা হজরত ইব্রাহিমের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হয়নি। অথচ এটা অসম্ভব এবং এ দুটি পথ ভিন্ন অন্য গন্তব্যও নেই। মহান আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

কাবাগৃহের প্রাঙ্গণ, তাই মসজিদ এবং তাই প্রশিক্ষণকারীদের পরিক্রমণ পথ ছিল। হজরত মুহম্মদ (সঃ) এবং তাঁর পরবর্তী হজরত আবুবকরের সময় তার চারদিকে কোনো প্রাচীর ছিল না। অতঃপর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে হজরত উমর চতুষ্পার্শ্বস্থ গৃহগুলো ক্রয় করে উচ্ছেদের পর মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। তার চতুর্দিকে দেহ অপেক্ষা অনুচ্চ একটি প্রাচীরের বেষ্টনী নির্মাণ করলেন। এর পর হজরত উসমান, ইবনে জুবায়ের এবং ওলিদ ইবনে আবদুল মালেক পর্যায়ক্রমে এ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। উক্ত মসজিদকে মার্বেল পাথরের স্তম্ভাদি দ্বারা সুসজ্জিত করে তোলেন। অতঃপর সম্রাট মনসুর ও তৎপুত্র মাহদী এর সম্প্রসারণে উদ্যোগী হন। এ সময়ে এসে তার সম্প্রসারণ স্থিতিলাভ করে এবং বর্তমান অবস্থায় শেষ হয়।

আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত এ গৃহের মর্যাদা ও অনুগ্রহের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, তিনি একে প্রত্যাদেশ ও ফেরেশতাদের অবতরণস্থল এবং উপাসনার আগার করেছেন। তিনি তার নিকটে হজব্রত পালন ও উৎসর্গ প্রদানকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য করেছেন। তার পবিত্র অঙ্গনকে সমুদয় স্থান থেকে অধিক সম্মান ও অধিকার প্রদান করেছেন। যারা ইসলাম ধর্মের বিরোধী তাদেরকে এ পবিত্র অঙ্গনে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এ পবিত্র অঙ্গনে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক, তাকে অবশ্যই সেলাইবিহীন একটি তবন পরিধান করতে হবে। এতে আশ্রয় গ্রহণকারী নিরাপদ এবং এতে বিচরণকারী পশুপক্ষীও সকল বিপদ থেকে মুক্ত। এতে কাউকেও ভয় দেখানো যাবে না, কোনো পশুপক্ষী শিকার করা যাবে না এবং জ্বালানি হিসাবে কোনো বৃক্ষকে ব্যবহার করা যাবে না। এ পবিত্র অঙ্গন, যাকে অনুরূপ মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে, তার সীমা হল, মদিনার পথে 'তান্নিম' পর্যন্ত তিন মাইল, ইরাকের পথে 'মুনকাতা' পর্বতের গিরিবর্ত্ম পর্যন্ত সাত মাইল, 'জিরানা'র পথে 'শাইব' পর্যন্ত নয় মাইল, তায়েফের পথে 'বতনে নিমারা' পর্যন্ত সাত মাইল এবং জেদ্দার পথে 'মুনকাতা আশায়ের' পর্যন্ত সাত মাইল।

এটাই মক্কার মর্যাদা ও তার বিবরণ। এজন্যই তাকে 'গ্রাম জননী'[১৯] বলা হয়। কাবাকে তার উন্নত আকৃতির জন্য 'কাবা' বলা হয়[২০]। এটা 'কাব' শব্দজাত। মক্কাকে

---

১৯. কোরান, ৬, ৯২; ৪২, ৭।
২০. কাব অর্থ উন্নত।

'বাক্কা'ও বলা হয়। আসমাই[২১] বলেন, কারণ মানুষ একে অপরকে তার দিকে ঠেলে দেয়।[২২] মুজাহেদ বলেন,[২৩] মক্কা আসলে বাক্কা; উচ্চারণে 'বে'র স্থলে 'মিম' এসে গেছে। যেমন 'লাজিম' ও 'লাজিব' একই শব্দ। উক্ত বর্ণদ্বয়ের উচ্চারণস্থল সন্নিহিত বলেই এরূপ হয়েছে। নখঈ[২৪] বলেন, 'বে'র দ্বারা গৃহ এবং 'মিমে'র দ্বারা শহর বোঝায়। জুহরী[২৫] বলেন, 'বে'র দ্বারা সমগ্র মসজিদ এবং 'মিমে'র দ্বারা সমগ্র পবিত্র অঙ্গন বুঝিয়ে থাকে। সেই মূর্খতার যুগেও মানুষ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত এবং পারস্য সম্রাট ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ এর জন্য সম্পদ ও সামগ্রী প্রেরণ করতেন। জমজম কূপ খননের সময় আবদুল মোত্তালেব যে দুটি স্বর্ণের হরিণ ও তরবারী পেয়েছিলেন, সেই কাহিনী সকলের নিকট সুপরিচিত।

হজরত মুহম্মদ (সঃ) মক্কা বিজয়ের সময় কাবার একটি সুরক্ষিত আধারে সত্তর হাজার 'উকিয়ে' (আউন্স) স্বর্ণ পেয়েছিলেন। এটা রাজন্যবর্গের উপঢৌকন থেকে সঞ্চিত হয়েছিল। তার মূল্য ছিল সহস্র সহস্র দিনার এবং তার ওজন ছিল দুইশ 'কেন্তার' (শতকিয়া ওজন)। হজরত আলী ইবনে আবু তালেব বলেছিলেন, হে রসূলুল্লাহ্! আপনি যদি এ সম্পদের দ্বারা আপনার যুদ্ধে সাহায্য গ্রহণ করতেন! কিন্তু তিনি তা করেননি। অতঃপর আবু বকরের নিকটও তার উল্লেখ করেন; কিন্তু তিনিও তাকে নাড়াননি। আজরাকী[২৬] এ সকল কথা বর্ণনা করেছেন।

বোখারী তাঁর সূত্রে আবুওয়ায়েল[২৭] থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি শায়বা ইবনে উসমানের[২৮] নিকট বসেছিলাম, এমন সময় তিনি বললেন, কোনো এক সময়ে তিনি উমর ইবনে খাত্তাবের নিকট বসা ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, আমার ত ইচ্ছা হয় তাতে যত স্বর্ণ-রৌপ্য আছে সমুদয় মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেই। তখন তিনি বললেন, আপনি তা করতে পারেন না। উমর বলেছিলেন, কেন? শায়বা বললেন, কারণ আপনার পূর্বসূরি দুইজন তা করেননি। উমর বলেছিলেন, হ্যাঁ, তাঁদের দুইজনের আদর্শ অনুসরণযোগ্য। এ হাদিসটি আবু দাউদ ও ইবনে মাজাও বর্ণনা করেছেন।

এ সম্পদ কাবাতেই এভাবে অবস্থান করছিল। আল আফতাসের গোলযোগের সময় এর ব্যতিক্রম ঘটে। আল আফতাস হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আলী জয়নুল আবেদীন; ইনি হিজরি ১৯৯ সনে মক্কার উপর আধিপত্য বিস্তার করার সময় কাবার সঞ্চিত সম্পদ গ্রহণ করতে গিয়ে বলেন, কাবা এ সম্পদ দিয়ে কী করবে; এত অনর্থক এখানে পড়ে আছে! আমরা এর যথার্থ উত্তরাধিকারী। আমাদের যুদ্ধের

---

২১. ২২ পৃষ্ঠা ৫০নং টীকা দ্র:।
২২. বাক্কা শব্দের অর্থজাত।
২৩. ৩৫৮ পৃ: ৩০০ টীকা দ্র:।
২৪. ৩৫৫ পৃ: ২৭৬ টীকা দ্র:।
২৫. ১২ পৃ: ২১ টীকা দ্র:।
২৬. মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্, মৃত্যু ২৪৪ (৮৫৯ খ্রি:) হিজরির পরে।
২৭. ৩৫০ পৃ: ২২৮ টীকা দ্র:।
২৮. মৃত্যু ৫৯ (৬৭৯ খ্রি:) হি:।

প্রয়োজনে এ সম্পদের সাহায্য গ্রহণ করব। অতঃপর তিনি তা বের করে ব্যয় করেন। তখন থেকেই কাবার সঞ্চিত সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়।

বয়তুল মুকাদ্দসকেই দূরতম মসজিদ[২৯] বলা হয়। এটা প্রাথমিক অবস্থায় সিবিয়ানদের সময়ে 'শুক্র মন্দির'-এর স্থান হিসাবে পরিচিত ছিল। তারা তাদের উৎসর্গের নিয়ম অনুসারে সেখানকার একটি পর্বতগাত্রে তৈল উৎসর্গ করত। অতঃপর এই মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং বনি ইসরাইল বয়তুল মুকাদ্দস অধিকার করে তাকে তাদের নামাজের কেবলা হিসাবে গ্রহণ করে।

এর বিবরণ এই যে, হজরত মুসা যখন বনি ইসরাইলসহ মিশর থেকে বের হয়ে আসলেন, তখন বয়তুল মুকাদ্দস দখল করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কারণ আল্লাহ্, তাদের পিতৃপুরুষ ইসরাইল, তাঁর পিতা ইসহাক ও ইয়াকুবকে[৩০] এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা 'তীহ' প্রান্তরে অবস্থান করতে লাগলেন। আল্লাহ্ তখন মুসাকে 'সন্ত' কাঠের একটি তাঁবু নির্মাণ করতে নির্দেশ দিলেন এবং প্রত্যাদেশ দ্বারা তার পরিধি, গঠন, মূর্তি ও ছবি প্রভৃতির বিবরণ দান করলেন। তার অভ্যন্তরে একটি সিন্দুক, বাসনপত্রসহ দস্তরখান ও দীপাধারসহ দীপমালা রাখার নির্দেশ দিলেন। পশু উৎসর্গের জন্যও একটি স্থান নির্মিত হল। এর সমুদয় বিষয় তৌরাত গ্রন্থে বিশষদভাবে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর মুসা তাঁবু নির্মাণ করে তাতে প্রতিশ্রুত সিন্দুক স্থাপন করলেন। এ সিন্দুকেই দশটি আদেশ সংবলিত কাষ্ঠখণ্ড রক্ষিত আছে। মূল কাষ্ঠখণ্ডগুলো নষ্ট হয়ে যাবার ফলে তাদের অনুভূতি হিসাবে এগুলো নির্মিত হয়। তার পার্শ্বে পশু উৎসর্গের স্থানও তিনি নির্ধারিত করেন।

আল্লাহ্ মুসাকে এ নির্দেশ দেন যে, হারুন উৎসর্গাধিকারী হবেন। তারা উক্ত তাঁবুকে তীহ প্রান্তরে তাদের তাঁবু সারির মধ্যভাগে স্থাপন করে তার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতেন এবং তার সম্মুখে পশু উৎসর্গ করতেন। এরই সন্নিধানে প্রত্যাদেশের আশায় সমবেত হতেন। অতঃপর তারা সিরিয়া অধিকার করে বনি ইয়ামীন ও বনি ইক্রিম-এর মধ্যবর্তী কিলকাল নামীয় পবিত্র ভূমিতে উক্ত তাঁবু সন্নিবেশিত করেন। ঐস্থলে তা চৌদ্দ বছর থাকে; সাত বছর যুদ্ধকালীন এবং সাত বছর উক্ত অঞ্চল বিভক্তকরণের সময়। অতঃপর ইউশা (আঃ)-এর মৃত্যু হলে তা কিলকালের নিকটবর্তী শিশু অঞ্চলে স্থানান্তরিত করে তার চার দিকে প্রাচীর বেষ্টনী স্থাপন করেন। এ স্থলে তা তিনশ বছর অবস্থান করে এবং তার পর উক্ত তাঁবু বনি ফিলিস্তিনের অধিকারভুক্ত হয়, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।[৩১] তারা এর উপর আধিপত্য বিস্তার করার পর পুনরায় তা প্রত্যার্পণ করে এবং রাব্বি আলীর মৃত্যুর পর বনি ইসরাইল একে 'নওফ' নামক স্থানে নিয়ে যায়। অতঃপর তালুতের সময় তা বনি ইয়ামীনের অঞ্চলে কিনিউনে স্থানান্তরিত হয়। অতঃপর দাউদ (আঃ) সাম্রাজ্যের অধিকারী হলে উক্ত তাঁবু ও সিন্দুককে বয়তুল মুকাদ্দসে নিয়ে যান এবং তার জন্য একটি বিশেষ আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে তাকে

---

২৯. 'মসজিদুল আকসা'; কোরান, ১৭, ১।

৩০. এ স্থলে ইব্রাহিম হওয়া প্রয়োজন।

৩১. ৩য় অধ্যায়ের ৩৩শ পরিচ্ছেদ দ্র:।

পর্বতোপরি স্থাপন করেন। এভাবেই উক্ত তাঁবু পর্বতোপরি থাকাকালে বনি ইসরাইলের কেবলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। হজরত দাউদ উপরোক্ত স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু তা পূর্ণতা লাভ করেনি। তিনি তাঁর পুত্র সুলায়মানকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে যান। সুতরাং সুলায়মান তাঁর রাজত্বের চতুর্থ বছরে এবং হজরত মুসার মৃত্যুর পাঁচশ বছর পরে তার নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করেন। তিনি ব্রোঞ্জ দ্বারা তার স্তম্ভ, স্ফটিকের দ্বারা এর অঙ্গন[৩২] এবং তার দ্বারাদি ও প্রাচীরগাত্র স্বর্ণ দ্বারা সুসজ্জিত করেন। তিনি উক্ত তাঁবুর অন্তর্গত মূর্তি, ছবি, বাসনপত্র, দীপাধার, চাবি প্রভৃতি স্বর্ণমণ্ডিত করলেন। তিনি উক্ত মসজিদের মেঝের উপর একটি কবর নির্মাণ করে তাতে প্রতিশ্রুত সিন্দুক, যাতে কাষ্ঠফলক সংরক্ষিত ছিল, তা রাখার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর পিতার ভূমি সিহ্ন থেকে তা মসজিদ নির্মাণকালে আনয়ন করা হল। সকল গোত্র ও রাব্বিরা সমবেতভাবে তা বহন করে এনে উক্ত কবরে সংস্থাপন করলেন। মসজিদের অন্যান্য স্থানে যথানিয়মে তাঁবু, বাসনপত্র ও উৎসর্গস্থল সুরক্ষিত হল। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এভাবে বহুদিন কেটে গেল।

অতঃপর উক্ত মসজিদ নির্মাণের তিনশ বছর পরে বখতে নিসর (নেবুচাড-নেজার) তাকে ধ্বংস করে ফেলেন। তিনি তৌরাত ও লাঠি পুড়িয়ে, মূর্তিগুলো গলিয়ে সমস্ত প্রস্তরখণ্ড ইতস্তত ছড়িয়ে দেন। অতঃপর পারস্য সম্রাটগণ বনি ইসরাইলের প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিয়ে উক্ত মসজিদ গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। ইসরাইলের নবী উজাইর পারস্য সম্রাট বাহমনের সহায়তায় তার নির্মাণকার্য সম্পন্ন করেন। উক্ত সম্রাটের জন্মের সাথে বখতে নসর কর্তৃক বন্দী ইসরাইলদের সম্পর্ক ছিল। তিনিই সুলায়মান ইবনে দাউদের নির্মিত মসজিদের পরিধি অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর পরিধিতে তার সীমা নির্দিষ্ট করে দেন। উক্ত সীমা অতিক্রম করা হয়নি।

উক্ত মসজিদের নিচে খিলানযুক্ত যে সকল কুঠুরী বিদ্যমান, যেগুলো একের উপর অন্য বিন্যস্ত; নিম্নস্তরের খিলানের উপর স্তরের স্তম্ভ স্থাপিত অবস্থায় দুটি স্তরে শোভিত রয়েছে, এগুলোকে অনেকেই হজরত সুলায়মানের আস্তাবল বলে মনে করেন। কিন্তু আসলে তা নয়। এটা তাদের ধারণা অনুসারে বয়তুল মুকাদ্দসকে অপবিত্রতা থেকে সংরক্ষণের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। তাদের ধর্মবিধান অনুসারে অপবিত্রতা যদিও পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে বিদ্যমান এবং তার ও পৃথিবীর উপরিভাগের মধ্যে একটি মৃত্তিকা স্তর দ্বারা আচ্ছাদিত, তথাপি উক্ত উপরিভাগ ও অভ্যন্তরভাগের মধ্যে একটি সরল রেখায় স্থাপিত বস্তু উপরিভাগকে অপবিত্র করতে পারে বলে তাদের ধারণা। বস্তুত তাদের বিধানে ধারণা ও বাস্তব একই মূল্য বহন করে। সুতরাং তারা এভাবে এ সকল খিলানযুক্ত কুঠুরী নির্মাণ করেছে, যাদের নিম্নস্তরের স্তম্ভগুলো খিলানে এসে ঠেকেছে এবং উপর স্তরের স্তম্ভগুলো উক্ত খিলানের উপর স্থাপিত হওয়ায় সরল রেখার সম্ভাবনা নষ্ট হয়েছে। সুতরাং কোনোপ্রকার সরল রেখায় স্থাপিত বস্তুর দ্বারা অপবিত্রতা পৌঁছবার উপায় নেই। এভাবে উক্ত কাল্পনিক অপবিত্রতা থেকে উক্ত মসজিদকে পবিত্র রাখা হয়েছে; যাতে তার পবিত্রতা সম্পাদনে এ ব্যবস্থা চরম ও পরম বলে গণ্য হয়।

---

৩২. 'সুলায়মান ও শিবার রাণী' কাহিনীতে এর উল্লেখ আছে। রাণীকে পরীক্ষা করার জন্য এটা নির্মিত হয়। তুল. কোরান, ২৭, ৪৪।

অতঃপর গ্রিক, পারস্য ও রোমান সম্রাটগণ পর্যায়ক্রমে বনি ইসরাইলের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছেন। এ সময়ে তাদের রাব্বি বংশ বনি হাশমনাই সাম্রাজ্যের অধিকারী হয় এবং পরবর্তীকালে বৈবাহিক সূত্রে তাদের আত্মীয় হিরোদাস ও তাঁর সন্তান-সন্ততির নিকট উক্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। হিরোদাস সুলায়মান (আঃ)-এর ভিত্তির উপর বয়তুল মুকাদ্দসকে আবার গড়ে তোলেন। তিনি এটাকে সুসজ্জিত করে ছয় বছরে সম্পূর্ণ করেন। অতঃপর রোমান সম্রাট তিতাস এসে বনি ইসরাইলের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাদের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। তিনি বয়তুল মুকাদ্দস ও তার মসজিদ ধ্বংস করেন এবং উক্ত স্থানে চাষাবাদ করতে আদেশ দেন। এর পর রোম হজরত মসিহ (আঃ)-এর ধর্ম অবলম্বন করে উক্তস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে। কিন্তু এর পরও রোমান সম্রাটদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ ও বর্জনের বৈচিত্র্য দেখা দেয় এবং কনস্ট্যান্টাইন না আসা পর্যন্ত এটা চলে থাকে। তাঁর মাতা হেলেনা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাদের ধারাণামত যে যূপকাষ্ঠে ঈসাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, তার অনুসন্ধানে বয়তুল মুকাদ্দসে উপস্থিত হন। পাদরীরা তাঁকে সংবাদ দেন যে, উক্ত কাষ্ঠখণ্ড ভূমিতে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল এবং তার উপর বিষ্ঠা ও আবর্জনা নিক্ষেপ করা হত। হেলেনা উক্ত কাষ্ঠখণ্ড খুঁজে বের করেন এবং তদস্থলে একটি গির্জা স্থাপন করেন। তাকে 'কুমামা' গির্জা বলা হয়। তাদের ধারণামতে তা ঈসার কবরের উপর সংস্থাপিত। উক্ত হেলেনা বয়তুল মুকাদ্দস মসজিদের অবশিষ্টাংশও ধ্বংস করে উক্ত পর্বতের উপর আবর্জনা ও বিষ্ঠা নিক্ষেপ করতে নির্দেশ প্রদান করেন। এর ফলে উক্ত স্থানটি আবৃত হয়ে উক্ত মসজিদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এটা তিনি তাঁর ধারণা অনুসারে ঈসার কবরের প্রতি ইহুদিদের আচরণের প্রতিশোধ বলে মনে করেছিলেন। অতঃপর খ্রিস্টানরা কুমামা গির্জার বিপরীত দিকে 'বেথহেলেম' নির্মাণ করেন[৩৩]; এ গৃহেই ঈসা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

এভাবেই এতদসংক্রান্ত অবস্থা চলতে থাকে; ইতিমধ্যে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে এবং বিজয়াভিযানের সূত্রপাত হয়। বয়তুল মুকাদ্দস বিজয়ের সময় হজরত উমর স্বয়ং উপস্থিত হন। তিনি সেই পর্বতখণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে তা দেখিয়ে দেয়া হয়। তখন তার উপর আবর্জনা ও মাটি স্তূপীকৃত হয়েছিল, তিনি তা মুক্ত করে তার উপর প্রান্তরীয় ধারায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি তার প্রতি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে যথাসম্ভব সম্মান প্রদর্শন করেন। বস্তুত কোরান শরীফে[৩৪] এ সম্পর্কে যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

অতঃপর ওলিদ ইবনে আবদুল মালেক উক্ত মসজিদকে ইসলামী জগতের অন্যান্য মসজিদের ধারায় সুদৃঢ় করে আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করেন। তিনি মক্কার পবিত্র মসজিদ ও মদিনার নবীর মসজিদ অনুরূপভাবে সুসজ্জিত করেছিলেন। দামেশকের মসজিদও তাঁর দ্বারা নির্মিত হয়। আরবের লোকেরা একে 'ওলিদের চত্বর' বলে ডাকে। এ সকল মসজিদ নির্মাণের সময় ওলিদ রোমান সম্রাটকে প্রয়োজনীয় কর্মী

৩৩. ইবনে খলদুনের বর্ণনায় এটা স্থান নয়, স্মৃতিসৌধ।
৩৪. ১৭, ১।

ও সামগ্রী প্রদানের জন্য বাধ্য করেছিলেন; যাতে তারা এগুলোকে 'মোজাইক' কারুকার্যে ভূষিত করে। রোমান সম্রাট তাঁরা আজ্ঞা পালন করেন এবং সমস্ত বিষয় পরিকল্পনা অনুসারে সুসম্পন্ন হয়।

অতঃপর হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে খেলাফতের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়লে তা কায়রোর শিয়া সম্রাট উবাইদীদের অধিকারে ছিল। কিন্তু ক্রমশ তাদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায় এবং ফিরিঙ্গীরা এসে বয়তুল মুকাদ্দসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে। তারা এর অধিকার লাভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সিরিয়া সীমান্তেও তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়ে পড়ে। তারা উক্ত পর্বতের উপর একটি গির্জা নির্মাণ করে এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তার জন্য গর্ব অনুভব করতে থাকে। ইতিমধ্যে সালাহ উদ্দিন ইবনে আইউব কুর্দী মিশর ও সিরিয়ার রাজ্যপাট নিয়ে স্বাধীন হয়ে দাঁড়ান। তিনি মিশরে উবাইদীদের আধিপত্য ও অভিনব মতবাদ নিশ্চিহ্ন করে সিরিয়ার উপর অভিযান পরিচালনা করেন। সেখানকার ফিরিঙ্গীদের সাথে জেহাদে অবতীর্ণ হয়ে প্রাধান্য বিস্তার করেন এবং বয়তুল মুকাদ্দসসহ সমস্ত সিরিয়া সীমান্ত তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। হিজরি পাঁচশ আশি অব্দের নিকটবর্তী সময়ে এ ঘটনা ঘটে। তিনি উক্ত গির্জা ধ্বংস করেন এবং উক্ত পর্বতখণ্ডটিকে মুক্ত করে তদুপরি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যা এই বর্তমানকাল পর্যন্ত অনুরূপভাবে বিদ্যমান।

পাঠক, আশাকরি এ প্রসঙ্গে আপনার নিকট সেই সুপরিচিত সমস্যাটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে না, যা বিশুদ্ধ হাদিসে নবী (সঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁকে আল্লাহ্‌র ঘর প্রথম কোনটি নির্মিত হয়েছিল, সেই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, মক্কা। জিজ্ঞেস করা হল, অতঃপর কোনটি? বললেন, বয়তুল মুকাদ্দস। জিজ্ঞেস করা হল, এ দুটির মধ্যে কতদিনের পার্থক্য? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। কারণ মক্কা ও বয়তুল মুকাদ্দসের মসজিদ নির্মাণের মধ্যে যে সময়ের পার্থক্য তা প্রকৃত প্রস্তাবে হজরত ইব্রাহিম ও হজরত সুলায়মানের সময়ের ব্যবধানতুল্য। কারণ সুলায়মানই বয়তুল মুকাদ্দসের প্রকৃত নির্মাতা। এ দিক থেকে সময় হাজার বছরেরও অনেক বেশি।

জেনে রাখুন, হাদিসে নির্মাণ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা প্রকৃত নির্মাণকার্য নয়; বরং প্রথম কোন গৃহটি আল্লাহ্‌র উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, তাই বোঝান হয়েছে। এটা অসম্ভব নয় যে, বয়তুল মুকাদ্দস সুলায়মানের নির্মাণকার্যের পূর্বে অনুরূপ সময়ের পরে উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। কারণ এ কথা বর্ণিত হয়েছে যে, সিরিয়ানরা সেখানে শুক্রমন্দির নির্মাণ করেছিল। সম্ভবত তা পূর্ব থেকে উপাসনার স্থান ছিল বলেই তারা এ স্থলে মন্দির নির্মাণ করেছে। যেমন মূর্খতার যুগের লোকেরা কাবার চতুর্দিকে ও তার অভ্যন্তরে মূর্তি ও ছবি স্থাপন করেছিল। যে সিরিয়ানরা শুক্র মন্দির নির্মাণ করে, তারা হজরত ইব্রাহিমের সমসাময়িক। এজন্যই মনে হয়, মক্কা ও বয়তুল মুকাদ্দসের উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার মধ্যে চল্লিশ বছরের পার্থক্য হওয়া অসম্ভব নয়। যদিও সেখানে তখনও নির্মাণকার্য অনুষ্ঠিত হয়নি, যা সকলের নিকট সুপরিচিত। কারণ প্রথম যিনি বয়তুল মুকাদ্দস নির্মাণ করেন, তিনি হজরত সুলায়মান। পাঠক, এ বিষয়টি ভালো করে বুঝে নিন; কেননা এর মধ্যেই এ সমস্যার সমাধান বিদ্যমান।

প্রদীপ্ত নগরী মদিনার পূর্বনাম 'ইয়াসরব'। আমালেকাদের অন্তর্গত ইয়াসরব ইবনে মুহায়েল এ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার নামেই এর নামকরণ করা হয়। তাদের নিকট থেকে হেজাজের অন্যান্য অধিকারসহ এ নগরীও বনি ইসরাইলের করতলগত হয়। অতঃপর তাদের প্রতিবেশী গাস্সানের বনি কায়লা[৩৫] ইহুদির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে উক্ত নগরী ও তার দুর্গগুলো অধিকার করে নেয়। এর পর উক্ত নগরীর উপর আল্লাহ্র শুভ দৃষ্টি পতিত হওয়ায় তিনি তার দিকে হিজরত করার জন্য নবী (সঃ)-কে নির্দেশ দেন। তিনি সেখানে হিজরত করেন; তাঁর সাথে ছিলেন হজরত আবুবকর এবং অন্যান্য সাহাবীরাও পরে তাঁর অনুসরণ করেন। তিনি উক্ত নগরীতে পদার্পণের পর মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এমন একস্থলে তাঁর গৃহাদি গড়ে তোলেন, যা আল্লাহ্ কোন অনাদিকাল থেকে সম্মানিত করে তাঁর জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। কায়লার সন্তান-সন্ততিরা তাঁকে আশ্রয় দেন এবং সাহায্য করেন। এ জন্যই তাদেরকে বলা হয় 'আনসার' বা সাহায্যকারী। এ মদিনা থেকেই ইসলামের বাণী সম্পূর্ণ হয় এবং সকল ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তার, তাঁর জাতির উপর আধিপত্য লাভ, মক্কা বিজয় ও তার অধিকার অর্জনের মধ্যদিয়ে তা শেষ হয়। এ সময়ে আনসারদের মনে এ ধারণার উদ্ভব হয়েছিল যে, হয়ত তিনি এখন তাঁর নিজ শহরে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করবেন। এ ধারণা তাদের মধ্যে গুরুতর রূপ ধারণ করার ফলে হজরত মুহম্মদ (সঃ) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ও আশ্বস্ত করেছিলেন যে, তিনি স্থান পরিবর্তন করবেন না। এভাবেই তাঁর তিরোধানের পর তাঁর মহান সমাধি এ নগরীতেই স্থাপিত হয়।

এই নগরীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বিশুদ্ধ হাদিসে যা এসেছে, তাতে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা নেই। শুধু জ্ঞানীদের মধ্যে মক্কার উপরে এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। ইমাম মালেক মদিনার শ্রেষ্ঠত্বের উপর মত পোষণ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি রাফি ইবনে খুদাইজ[৩৬] থেকে একটি সুস্পষ্ট বক্তব্য যুক্ত হাদিসের প্রমাণ উদ্ধৃত করেন। উক্ত হাদিসে নবী (সঃ) বলছেন, মদিনা মক্কা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্য আরো কিছু হাদিসের সাহায্যার্থে, যেগুলো উক্ত বক্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে সমর্থন করে, এ হাদিসটি আবদুল ওহাব তাঁর 'মাউনা'[৩৭] গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ী উক্ত মতের বিরোধিতা করেছেন।

যাহোক, যে কোনো দিক থেকেই তা মক্কার পরবর্তী সম্মানের অধিকারী। চারদিক থেকে মুসলমানরা তাদের কলিজা দিয়ে এটাকে আবৃত করে রেখেছে। পাঠক, লক্ষ করুন, এ মহান মসজিদের শ্রেষ্ঠত্ব কীভাবে পর্যায়ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পূর্বাহ্নে নির্দিষ্ট আল্লাহ্র শুভ দৃষ্টিই তাকে এ পর্যায়ে নিয়ে গেছে। পাঠক, এর প্রতি লক্ষ করলে আপনি আল্লাহ্র সৃষ্টি ও পর্যায়ক্রমে তার প্রতিষ্ঠা লাভের রহস্যটি অনুধাবন করতে পারবেন। পার্থিব ও অপার্থিব সকল বিষয়েই এটা বিদ্যমান।

---

৩৫. যতদূর সম্ভব আউস ও খজরজ গোত্রদ্বয়ের মহিলা পূর্বপুরুষের নাম। এ দুই গোত্রের লোকদেরকেই আনসার বলা হয়।

৩৬. তাঁর মৃত্যু ৫৯-৭৪ (৬৭৮-৬৯৩ খ্রি:) হিজরী মধ্য ধারণা করা হয়।

৩৭. প্রসিদ্ধ মালেকী পণ্ডিত; তাঁর গ্রন্থের নাম 'মাউনা লেমজহাবে আলিমেল মদিনা'—'মদিনার ধর্মশাস্ত্রবিদদের মতাদর্শের সহায়ক'।

পৃথিবীতে এ তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্যকোনো উপাসনালয়ের কথা জানি না। অবশ্য ভারতীয় দ্বীপ সিংহলে হজরত আদমের মসজিদের[৩৮] কথা বলা হয়; কিন্তু তার জন্য নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ কোথাও নেই।

প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে এমন অনেক মসজিদের সন্ধান পাওয়া যায়, যাকে তারা ধর্মীয় অনুভবের প্রেরণায় সম্মান করত। তন্মধ্যে পারস্যবাসীদের অগ্নিমন্দির, গ্রিকদের মন্দিরসমূহ এবং আরব বেদুইনদের দেবগৃহগুলো, যা অভিযান পরিচালনার সময় নবী (সঃ) ধ্বংস করে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। মাসউদী এ প্রকার বহু গৃহের বর্ণনা করেছেন। আমরা এ সম্পর্কে কোনো আলোচনা উপস্থিত করতে চাই না। কারণ ধর্মীয় দিক থেকে এরূপ আলোচনা গর্হিত এবং যথার্থ ধর্মবোধ সম্পর্কেও তা পরিপন্থী। সুতরাং এরূপ আলোচনা এবং তাদের সংবাদাদির প্রতি কোন প্রকার গুরুত্বই দেয়া হয় না। এ ব্যাপারে ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে যা আলোচিত হয়েছে, তাই যথেষ্ট। যাঁরা এ সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করতে ঔৎসুক্যবোধ করেন, তাদেরকে ঐসকল গ্রন্থ পাঠ করতে হবে। 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে সুপথ প্রদর্শন করেন[৩৯]।' তিনিই পবিত্র।

---

৩৮. 'আদম' নামে একটি পর্বত বিদ্যমান।

৩৯. কোরান, ২, ১৪২, ২১৩।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[আফ্রিকিয়া ও মাগরিবে শহর-নগরের সংখ্যা খুবই কম]

এর কারণ এই যে, এ অঞ্চলগুলো বারবারদের অধীনে ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে হাজার হাজার বছর ধরে এ সকল স্থানের জনবসতি প্রান্তরীয় জীবনধারায় অভ্যস্ত ছিল। এখানে নাগরিক জীবন কখনো কোনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, যাতে তাদের জীবনধারা পূর্ণতা লাভ করতে পারে। ফিরিঙ্গী ও আরবদের যে সকল সাম্রাজ্য এখানে স্থাপিত হয়েছে, তাও এমন কোনো দীর্ঘকালব্যাপী ছিল না, যাতে নাগরিক জীবনবোধ দৃঢ়তা লাভ করতে পারে। সুতরাং প্রান্তরীয় জীবনধারা ও তার অবস্থা বৈচিত্র্যই সর্বদা এখানে প্রবাহিত হয়েছে এবং অধিবাসীরা তার সাথেই ঘনিষ্ঠতা লাভ করেছে। এ কারণেই স্থাপত্য ক্ষেত্রে তাদের অবদান খুবই নগণ্য। অন্যদিকে শিল্পনৈপুণ্য সম্পর্কে বারবারদের কোনো ধারণা নেই। কারণ তারা একান্তই যাযাবরী জীবনে অভ্যস্ত। বস্তুত শিল্পজ্ঞান নাগরিকত্বের অনুসারী। স্থাপত্যশিল্প তার গভীরতার দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যক হয়। বারবারদের মধ্যে যেহেতু এ বিষয়ে কোনোপ্রকার নৈপুণ্য নেই, সেজন্য স্থাপত্যের প্রতি তাদের আকর্ষণও সেই পরিমাণে কম। এক্ষেত্রে নগর নির্মাণের প্রশ্নই ওঠে না। তদুপরি তাদের সমাজবদ্ধ জীবন গোত্রপ্রীতি ও বংশধারার দ্বারা পরিচালিত এবং তাদের কোনো গোষ্ঠীই এটা থেকে মুক্ত নয়। অথচ গোত্রপ্রীতি ও বংশধারার গভীর আকর্ষণ প্রান্তরীয় জীবনের দিকেই সর্বাধিক।

শান্তি ও স্বস্তিই মানুষকে নগর জীবনের দিকে আকর্ষণ করে আনে এবং তার অধিবাসীরা নগররক্ষীদের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। পাঠক, এ কারণেই প্রান্তরবাসীদেরকে দেখতে পাবেন, তারা নগরবাস ও সেখানে অবস্থানকে ঘৃণার চোখে দেখে। কারণ একমাত্র সম্পদের প্রাচুর্য ও বিলাসব্যসনই তাদেরকে এ প্রকার জীবনের দিকে আকর্ষণ করতে পারে। অথচ তাদের মধ্যে এগুলোর একান্ত অভাব। এজন্যই আফ্রিকিয়া ও মাগরিবের সমুদয় জনবসতি অথবা তার অধিকাংশ প্রান্তরবাসী। তারা তাঁবু, কুঁড়ে, নিদ্রা তাঁবু ও পর্বতগুহায় বসবাস করে থাকে। অন্যদিকে অনারব দেশগুলোর অধিকাংশ অথবা সমুদয় জনবসতি গ্রাম, শহর ও মহল্লায় বাস করে। সিরিয়া, আন্দালুস, মিসর, ইরাক আজম ও এ প্রকার অন্য দেশের ক্ষেত্রে এ অভিজ্ঞতা লাভ করা যেতে পারে। কারণ অনারবরা সাধারণভাবে বংশধারার চেতনাশূন্য। তারা একে সংরক্ষণ করে, তার সুষ্ঠুতার জন্য গর্ব প্রকাশ করে এবং তার ঘনিষ্ঠতার জন্য

প্রচেষ্টা চালিয়ে খুব কম ক্ষেত্রেই জীবন অতিবাহিত করে। সুতরাং ঐস্থলেও দেখা যায় অধিকাংশ বংশ চেতনাসম্পন্ন মানুষ যাযাবরী ও জীবনের অধিকারী। কারণ, একমাত্র সেখানেই বংশগত চেতনার ঘনিষ্ঠতা স্পষ্টতর ও দৃঢ়তর হয়ে থাকে। গোত্রপ্রীতির আকর্ষণও একই পরিণতির দিকে আকর্ষণ করে। তার অধিকারীও যাযাবরী জীবনের দিকেই আকৃষ্ট হয় এবং ঐ নগর জীবন থেকে দূরে থাকে; যা তাদের বীর্যবস্তাকে ধ্বংস করে তাদেরকে অপরের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য করে। পাঠক, এ বিষয়টি বুঝে নিন এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে একে বিবেচনা করুন। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা এবং তিনিই সহায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[ইসলামের নিজস্ব সাম্রাজ্যশক্তি এবং তার পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যগুলোর তুলনায় তার স্থাপত্য ও নির্মাণ শিল্প অত্যন্ত কম।]

এর কারণ, বারবারদের প্রসঙ্গে যা বলেছি, ঠিক তাই। কারণ আরবরাও অনুরূপভাবে যাযাবরী জীবনবোধে অভ্যস্ত এবং নির্মাণ শিল্প থেকে দূরবর্তী। অন্যদিকে তারাও ইসলামের পূর্বে সাম্রাজ্যশক্তি তথা তাদের অধিকৃত সাম্রাজ্যগুলোর সাথে অপরিচিত ছিল। সুতরাং তারা সাম্রাজ্যশক্তি লাভ করার পর এমন কোনো দীর্ঘসময় পায়নি, যাতে তাদের নাগরিকত্ব পূর্ণতা লাভ করতে পারে। এ সঙ্গে অধিকৃত সাম্রাজ্যগুলোর স্থাপত্যও তাদেরকে এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছে। তদুপরি প্রথমদিকে ধর্মই গৃহগুলো নির্মাণের ব্যাপারে আতিশয্য প্রদর্শন ও সীমা অতিক্রমণের বিরোধী ছিল যেমন কুফা শহরে গৃহাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রস্তর ব্যবহারের অনুমতি চাইলে হজরত ওমর অনুরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে বাঁশ নির্মিত গৃহগুলোতে আগুন ধরে গেলে এ অনুমতি চাওয়া হয়। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন, নির্মাণ কর, তবে কখনই তিনটি গৃহের অধিক করো না। নির্মাণকার্যে একে অপরের উর্ধ্বে যাবার চেষ্টা করো না। তোমরা প্রবর্তিত প্রথাকে অনুসরণ কর, সাম্রাজ্যও তোমাদেরকে অনুসরণ করবে। তিনি প্রতিনিধিদলকে এ নির্দেশ দিয়ে মানুষকেও নিয়মের বাইরে নির্মাণকার্য পরিচালনা করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তখন তারা জিজ্ঞাসা করে, নিয়ম কি? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, যা অপব্যয়ের নিকটবর্তী হবে না এবং মধ্যপন্থার বাইরে যাবে না।

অতঃপর ধর্মের প্রভাব স্তিমিত হয়ে আসলে এ সকল বিষয়ে নতুন উদ্যম দেখা দিল এবং রাজশক্তি ও তার বিলাসব্যসন এসে উপস্থিত হল। আরবরা পারস্যবাসীদেরকে এ কাজে নিয়োজিত করে তাদের কাছ থেকে নির্মাণশিল্প ও স্থাপত্যের সহায়তা গ্রহণ করল। এ সময়ে শান্তি ও বিলাসের অমোঘ আকর্ষণে তারা অট্টালিকা নির্মাণ ও সৌধ স্থাপনে মনোনিবেশ করেছিল। কিন্তু তখন সাম্রাজ্যশক্তি প্রায় শেষ অবস্থায় উপনীত, সুতরাং অধিক নির্মাণ কাজ ও শহর-নগরের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য তারা অতি অল্প সময়ই পেয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য জাতির বেলায় তা হয়নি। পারস্যবাসীদের সাম্রাজ্যশক্তি হাজার হাজার বছর ধরে বিস্তৃত ছিল। অনুরূপভাবে কিবতী নাবাতী ও রোমানদের। এরূপ প্রথম যুগের আরব—আদি, সামুদ, আমালেকা ও তুব্বা রাজন্যবর্গের অবস্থা। তাদের সময় দীর্ঘ ছিল বলেই নির্মাণশিল্প তাদের মধ্যে সুদৃঢ় হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল এবং তাদের অট্টালিকা ও সৌধরাজি সংখ্যায় ও স্থায়িত্বে কালের বুকে স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিল। পাঠক, আপনি এ সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিকে প্রসারিত করলে আমাদের এ বক্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। আল্লাহ্ পৃথিবী ও তার উপরিস্থিত সমুদয়ের উত্তরাধিকারী।

নবম পরিচ্ছেদ

[আরবদের নির্মিত সৌধাবলির অল্পসংখ্যক ব্যতীত সমুদয়ই অতি সত্বর ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে]

এর কারণ প্রান্তরীয় জীবনবোধের প্রাধান্য ও নির্মাণ শিল্পের অনভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এজন্যই তাদের স্থাপত্য কীর্তি দৃঢ় ও স্থায়ী হতে পারেনি। এর, আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন, অন্য একটি কারণ বিদ্যমান এবং তা এক্ষেত্রে অধিকতর সক্রিয় বলে মনে হয়। এটা নগর পরিকল্পনায় তাদের সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতি যথাযথ দৃষ্টিদানের অভাব; যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। এক্ষেত্রে তারা স্থান, উত্তম আবহাওয়া, পানীয় জল, কৃষিক্ষেত্র ও চারণভূমির প্রতি লক্ষ রাখেনি। বস্তুত প্রাকৃতিক জনপরিবেশের ধারা অনুসারে এ সকল বিষয়ে পার্থক্যের ফলে নগর জীবনের মধ্যে ভালো-মন্দের পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। আরবরা এ ব্যাপারে উদাসীন। তারা শুধুমাত্র তাদের উটের চারণভূমির প্রতিই লক্ষ রাখে। পানীয় জল ভাল কি মন্দ, অল্প কি অধিক, তৎপ্রতি তারা ভ্রূক্ষেপ করে না। কৃষিক্ষেত্র, উদ্ভিদাঙ্গন ও জলবায়ুর প্রতিও তাদের ঔৎসুক্য নেই। কারণ তারা বিচরণশীল জাতি এবং সুদূর অঞ্চল থেকে শস্যাদি বহন করে আনতে তারা অভ্যস্ত। বায়ুর ব্যাপারে বলতে গেলে শূন্য প্রান্তরের সর্বত্রই তার চলাচলে বৈচিত্র্য বিদ্যমান এবং তাদের বিচরণ এর বিশুদ্ধতার জন্য দায়ী। কারণ বায়ু একমাত্র স্থায়ী বসবাস ও অধিক আবর্জনার ফলেই দূষিত হয়ে ওঠে।

পাঠক, তাদের কুফা, বসরা ও কায়রোয়ান নগর পরিকল্পনার প্রতি লক্ষ করুন। তারা তাতে তাদের উটের চারণভূমি ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়নি। তারা প্রান্তরের সন্নিকটে এবং বিচরণের জন্য খুবই উপযোগী। কিন্তু সেই তুলনায় নগরের যোগ্য প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে অনেক দূরে। ঐগুলোতে এমন কোনো উপকরণ নেই, যা তাদের পরেও এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি; বস্তুত এ প্রকার উপকরণ জনবসতির সংরক্ষণের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। এজন্যই এ সকল নগরের পরিবেশ বাসস্থানের জন্য স্বাভাবিক নয়। এমন কি অন্যান্য জাতির মধ্যস্থলেও এগুলো অবস্থিত নয়, যাতে তাদের দ্বারা আবাদ হতে পারে। সুতরাং যেই মুহূর্তে তাদের রাজ্যশক্তি ও তাদের গোত্রপ্রীতির অমোঘ আকর্ষণ, যা এই নগরগুলোর সমৃদ্ধি জিইয়ে রেখেছিল, বিনষ্ট হয়ে গেল, তখনি তাদের ধ্বংস ও বিচ্ছিন্নতা নেমে আসতে দেরি হয়নি; যেন ঐগুলো কোন সময় অস্তিত্বেই ছিল না। 'আল্লাহ্ নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাঁর নির্দেশের অবমাননাকারী কেউ নেই।"[৪০]

---

৪০. কোরান, ১৩, ৪৯।

দশম পরিচ্ছেদ

[শহর-নগরে অবক্ষয়ের লক্ষণ কী করে প্রকাশ পায়]

জেনে রাখুন, যে কোনো নগর পরিকল্পনার প্রথম দিকে তাতে গৃহগুলোর স্বল্পতা থাকে এবং নির্মাণকার্যে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি ও উপকরণেরও অভাব পরিলক্ষিত হয়। উপকরণের মধ্যে পাথর, চুন এবং দেয়াল সুসজ্জিত করার জন্য টালি, মার্বেল, মোজাইক, কাচ, খনিজ অঙ্গার, ঝিনুক তখন অপ্রতুল থাকে। সুতরাং এ সময়ের নির্মাণকার্য যাযাবরী ধারার অনুসারী হয় এবং তার উপকরণাদিও সহজে নষ্ট হয়ে যায়।

অতঃপর যখন শহরের জনবসতি বাড়তে থাকে, তার অধিবাসীর সংখ্যা স্ফীত হয়ে ওঠে, তখন কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উপকরণও পর্যাপ্ত পরিমাণের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এ সময়ে নির্মাণকুশলীর সংখ্যাও বেড়ে তাকে চরম সীমায় উপনীত করে; যেমন তার অবস্থা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এর পর যখন আবার তার জনবসতিতে ভাঁটা পড়ে, তার অধিবাসীর সংখ্যা কমে যায়, তখন এর অমোঘ ও ফলশ্রুতিতে নির্মাণকার্যের সংখ্যাও হ্রাস পেতে থাকে। নির্মাণকার্যে পূর্বের সেই নতুনত্ব, দৃঢ়তা এবং অলংকরণের আতিশয্য আর থাকে না। এর পর কর্মীর সংখ্যাও কমতে থাকে এবং অধিবাসীদের স্বল্পতার জন্য বাইরে থেকে পাথর, মার্বেল ইত্যাদি আনার পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এ সময়ে তারা নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত উপকরণই পুনরায় ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। তারা এক অট্টালিকা থেকে অন্য অট্টালিকায় তা স্থানান্তরিত করে। কারণ জনসংখ্যার স্বল্পতার জন্য তখন অধিকাংশ অট্টালিকা, সৌধ ও গৃহ শূন্য হয়ে পড়ে এবং তাদের পূর্বাবস্থা হতে বিচ্যুত হয়। এভাবে এক অট্টালিকা হতে অন্য অট্টালিকায়, এক গৃহ থেকে অন্য গৃহে স্থানান্তরিত হতে হতে তাদের অধিকাংশই সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। তখন তারা আবার যাযাবরী নির্মাণধারায় ফিরে আসে এবং পাথরের পরিবর্তে সাধারণ উপকরণ ব্যবহার করে। অট্টালিকার আর অলংকরণের আতিশয্য থাকে না। নগরের নির্মাণকার্য পল্লী ও বস্তির অনুরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তার উপর যাযাবরী জীবনের প্রভাব প্রকাশ পেতে থাকে। অতঃপর তা আরো হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে একান্ত ধ্বংসের সীমায় উপনীত হয়; অবশ্য যদি অনুরূপ কোনো ভাগ্য তার থাকে। এটাই সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত প্রথা।

একাদশ পরিচ্ছেদ

[শহর-নগরের সমৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক তৎপরতার শ্রেষ্ঠত্ব তাদের অধিবাসীদের সংখ্যার আধিক্য এবং স্বল্পতা অনুসারেই হয়ে থাকে]

এর কারণ এই যে, ইতিপূর্বে এটা জ্ঞাত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, একক কোনো ব্যক্তির পক্ষে তার জীবিকার প্রয়োজনীয় উপকরণ স্বাধীনভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এ জন্যই সমাজবদ্ধ জীবনে তারা পরস্পরকে সাহায্য করে থাকে। সে অভাব পূরণে একটি ক্ষুদ্র দল সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, তা দিয়ে তাদের অপেক্ষা বহু গুণ বেশি লোকের প্রয়োজন মিটে। আহার্যের জন্য গমের কথা ধরা যাক; কোনো এক ব্যক্তির পক্ষে তার ন্যায্য অংশ এককভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। বস্তুত ঐ অংশটুকু সংগ্রহ করতে তাকে ছয় অথবা দশজনের সাহায্য নিতে হবে। যন্ত্রপাতির জন্য কর্মকার ও সূত্রধর, পশুর জন্য পশুপালক, ভূমি কর্ষণের জন্য চাষী, শস্য কর্তনের জন্য কর্মী এবং অন্যান্য কৃষিকর্মীর সহায়তার প্রয়োজন। তাদের ভিন্ন ভিন্ন অথবা সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল ঐ পরিমাণ খাদ্য সংগৃহীত হওয়া সম্ভব। অন্যদিকে তাদের এ সম্মিলন তাদের সংখ্যা অপেক্ষা বহুগুণ বেশি লোকের আহার্যের সংস্থান করতে সক্ষম। উৎপাদন প্রচেষ্টার ফলে যে ফসল লাভ করা যায়, তা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের সংখ্যা ও প্রয়োজন মিটিয়ে সর্বদাই উদ্বৃত্ত হয়ে থাকে।

যে কোনো নগর ও শহরের অধিবাসীরা যখন তাদের অভাব ও প্রয়োজনের পরিমাণ অনুসারে উৎপাদন শ্রমকে বণ্টন করে নেয়, তখন অতি অল্প শ্রমেই কার্যসিদ্ধি হতে পারে এবং অবশিষ্ট শ্রম প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। তা বিলাস ও তার অভ্যাসাদি পরিপূরণে ব্যয়িত হয়। অন্যদিকে এ অতিরিক্ত শ্রমের ফসল দিয়ে অন্যান্য শহরবাসীর প্রয়োজন মিটে এবং তারা এটা বিনিময় ও মূল্যের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্থান থেকে সংগ্রহ করে থাকে। এভাবে অতিরিক্ত শ্রমের অধিকারীরা সম্পদ লাভ করে। পাঠক, অত্র গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের উপার্জন ও জীবিকা পরিচ্ছেদে এ কথা পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, উপার্জন শ্রমের মূল্য ব্যতীত অন্য কিছু নয়। সুতরাং শ্রম বিনিয়োগ যদি বেশি হয়, তা হলে তার মূল্যও তাদের মধ্যে বেশি হয়ে থাকে এবং তদনুপাতে অবশ্যই উপার্জন বৃদ্ধি পায়। এ বৃদ্ধি তাদেরকে সম্পদ ও সমৃদ্ধির অনিবার্য পরিণতি বিলাসব্যসন এবং গৃহ, পরিচ্ছেদ, যন্ত্রপাতি, বাসনপত্র প্রভৃতির সংস্কার ও অলংকরণের দিকে আকর্ষণ করে। তারা পরিচারক-পরিচারিকা ও যানবাহন সংগ্রহ করে। অনুরূপ সকল কার্যই আবার নতুন মূল্য বহন করে আনে, শিল্পীদেরকে উৎসাহিত করে এবং

তাদের স্থায়িত্ব অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ফলে শ্রম ও শিল্পের বাজারে তেজীভাব দেখা দেয়। শহরের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে যায়। এ সকল কার্যে নিয়োজিত কর্মীদের জীবনে সচ্ছলতা এসে তাদের শ্রমের মূল্য বাড়িয়ে দেয়।

এভাবে শহরের জনবসতি বৃদ্ধি পেলে শ্রমের বিনিয়োগও পুনরায় বেড়ে যায়। উপার্জনের বৃদ্ধি বিলাস, তার অভ্যাস ও প্রয়োজনকে বাড়িয়ে তোলে। তার চাহিদা পূরণের জন্য নিত্যনতুন শিল্পকর্ম আবিষ্কার করতে হয়। এর ফলে মূল্যমান বৃদ্ধি পায় এবং পুনরায় নগরের উপার্জন পরিধি প্রসার লাভ করে। শ্রমের বাজার পূর্বাপেক্ষাও তেজীভাব ধারণ করে। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার তাতে সমৃদ্ধি দেখা দেয়। কারণ অতিরিক্ত শ্রম সর্বদাই সম্পদ ও বিলাসকে আকর্ষণ করে আনে। কিন্তু জীবিকা অর্জনের জন্য নিয়োজিত মৌলিক শ্রমের অবস্থা অনুরূপ নয়। এ জন্যই কোনো শহর যদি মৌল প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রম বিনিয়োগকারী কোনো জনগোষ্ঠীর অধিকারী হয়, তা হলে তাদের জীবনে উপার্জন, সমৃদ্ধি এবং বিলাসব্যসন ও তার অভ্যাসাদির এমন প্রাচুর্য পাওয়া যাবে, যা অন্যকোন শহরে সুলভ নয়। সুতরাং যে শহর যত বেশি জনসম্পদের অধিকারী, তা তদপেক্ষা হীন শহরের একই ধারায় আবর্তিত জীবন থেকে অধিকতর বিলাস ও প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কাজীর সাথে কাজীর, ব্যবসায়ীর সাথে ব্যবসায়ীর, শিল্পীর সাথে শিল্পীর, দোকানীর সাথে দোকানীর, আমীরের সাথে আমীরের এবং রক্ষী প্রধানের সাথে রক্ষী প্রধানের তুলনা করা যায়।

পাঠক, মাগরিবে আপনি এ বিষয়টিকে বিবেচনা করে দেখতে পারেন। যেমন ফেজের সাথে তার অন্যান্য শহরের তুলনা করুন। বেজা, তেলমিসান, সেবতার কথাই ধরুন না কেন; তাদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে একটা বিরাট পার্থক্য লক্ষ করতে পারবেন। অতঃপর যদি বিশেষ ক্ষেত্রে দৃষ্টি দেন, তা হলে দেখতে পাবেন ফেজের কাজীর অবস্থা তেলমিসানের কাজীর অনুরূপ অবস্থা থেকে অনেকখানি প্রশস্ত। অন্যান্য পেশার লোকদের মধ্যে একই অবস্থা বিরাজ করছে। এভাবে তেলমিসানের সাথে 'ওহরান' ও আলজিরিয়ার তুলনা করতে পারেন এবং ওহরান ও আলজিরিয়ার সাথে তদপেক্ষা হীন শহরের। এভাবে তুলনার পর্যায় অতিক্রম করে আপনি সেই বস্তীবাসীদের মধ্যে পৌঁছবেন, যাঁরা তাদের শ্রমের দ্বারা শুধু জীবনের একান্ত প্রয়োজনই মিটিয়ে থাকে। অনেকস্থলে মৌলিক প্রয়োজন পূরণের অভাবও পরিলক্ষিত হবে। এ পার্থক্যের একমাত্র কারণ হল শ্রম বিনিয়োগের পার্থক্য। যেন তাদের সবগুলো শ্রমের বাজার। তার প্রতিটি বাজারে শ্রমের মূল্য অনুসারেই ব্যয় নির্ধারিত হয়। ফেজের কাজীর যে আয়, তা সেখানকার বাজারের ব্যয়ের জন্য সমমানের। এরূপ তেলমিসানের কাজীর কথাও বলা যায়। যে ক্ষেত্রে আয় ও ব্যয় বেশি, অধিবাসীদের অবস্থা সেখানে সমৃদ্ধতর। ফেজে এ দুটি বিষয় বেশি হওয়ার কারণ সেখানে বিলাসব্যসনের অনিবার্য তাগিদে শ্রমের বাজারমূল্য অধিক। সুতরাং অবস্থা-ব্যবস্থাও সেখানে বিরাট। অতঃপর এভাবে আপনি ওহরান, কুস্তানতুনিয়া, আলজিরিয়া, বস্করা প্রভৃতির অবস্থা বিচার করতে করতে এমন স্থলে পৌঁছলেন, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি, যেখানে শ্রম মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতেও অক্ষম। এ কারণেই এ সকল জনপদকে শহরের মধ্যে গণ্য করা হয় না; তারা

পল্লী ও বস্তীরই সমতুল্য। আর এ জন্যই আপনি এ সকল শহরের অধিবাসীদেরকে দারিদ্র্য ও অনটনের ক্ষেত্রে পরস্পর সংলগ্ন ও শোচনীয় অবস্থার অধিকারী হিসাবে দেখতে পাবেন। কারণ তাদের শ্রম তাদের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। তারা তাদের জীবিকাকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেনি, যাতে তার অতিরিক্ত উৎপাদন তাদের উপার্জন বৃদ্ধি করতে পারে। তারা এ কারণে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত। অবশ্য খুব কম ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।

পাঠক, এ বিষয়টি এমন কি দরিদ্র ও ভিক্ষুকদের অবস্থার মধ্যে বিবেচনা করতে পারেন। ফেজের ভিক্ষুকের অবস্থা তেলমিসান ও ওহরানের ভিক্ষুক অপেক্ষা ভালো। আমি ফেজের ভিক্ষুকদেরকে কোরবানীর সময় তাদের কোরবানীর মূল্য ভিক্ষা চাইতে দেখেছি। তাদেরকে এমন অনেক বিলাসদ্রব্য ও সুখাদ্য ভিক্ষা চাইতে দেখেছি, যেমন মাংস, ঘৃত, রন্ধনের মসল্লা, পরিচ্ছদ, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী, চালুনী, বাসনপত্র ইত্যাদি; যা তেলমিসান, ওহরানের কোনো ভিক্ষুক প্রার্থনা করলে, তাকে তা দিতে অস্বীকার, তজ্জন্য দুর্ব্যবহার করা এবং ধমক দেয়া হবে।

বর্তমানকালে আমরা কায়রো ও মিশরের সম্পদ, সমৃদ্ধি ও বিলাসব্যসনের যে সংবাদ পাচ্ছি, তা আমাদের নিকট বিস্ময়কর বলে মনে হয়। এ কারণে মাগরিবের বহু দরিদ্রলোক এ সমৃদ্ধির লোভে মিশর গমনে আকর্ষিত হচ্ছে। কারণ তারা শুনেছে যে, অন্য সকল অঞ্চল অপেক্ষা সেখানে অধিকতর সমৃদ্ধি বিদ্যমান। সাধারণ লোকের ধারণা, এ সমৃদ্ধির কারণ উক্ত অঞ্চলের লোকেরা সকল কিছুই নিজেদের জন্য কুক্ষিগত করে রেখেছে অথবা তারা গুপ্ত সম্পদের অধিকারী। এজন্যই তারা অন্য সকল শহর অপেক্ষা অধিকতর দানধ্যান করতে সক্ষম। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। বরং তার কারণ তাই, পাঠক, যা আপনি পূর্বে জানতে পেরেছেন যে, মিশর ও কায়রোর জনবসতি অন্য সকল অঞ্চল অপেক্ষা অনেকগুণ বেশি। এ কারণেই তাদের অবস্থাও বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবশ্য আয়-ব্যয়ের অবস্থা প্রায় প্রতি শহরেই তুল্য মূল্য। যখন আয় বেশি হয়, ব্যয়ও বেশি হয়ে থাকে এবং এর বিপরীতটিও লক্ষযোগ্য। সুতরাং আয়-ব্যয়ের মাত্রা বেড়ে গেলে অধিবাসীদের জীবনে সচ্ছলতা দেখা দেয় এবং শহরের পরিধি বেড়ে যায়।

পাঠক, এ প্রকার প্রাচুর্যের যে কোনো সংবাদ আপনি লাভ করেন না কেন, তাকে অস্বীকার করবেন না। এটাকে জনসম্পদের প্রাচুর্য দিয়ে বিবেচনা করুন। বস্তুত এর কল্যাণেই উপার্জনের আধিক্য এমন একটি সচ্ছলতার জন্ম দেয়, যা দান-ধ্যানকে অবারিত করে তোলে। পাঠক, এ বিষয়টিকে যে-কোনো একটি সমৃদ্ধ নগরের বাক্‌হীন পশু-পক্ষীদের বেলাতেও বিবেচনা করতে পারেন। দেখবেন তারা কেমন করে অঞ্চল বিশেষের ঘরবাড়িকে নিজেদের বিচরণক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেয় এবং অন্যগুলোকে পরিত্যাগ করে। সম্পদশালী, ধনাঢ্য ও সচ্ছলতার অধিকারী ব্যক্তিদের বাড়ির আঙ্গিনা ও আস্তাকুড় শস্যকণা ও উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ থাকে; এ কারণে সেখানে পিপীলিকা ও অন্যবিধ কীট-পতঙ্গের ভিড় দেখতে পাবেন। তাদের শস্য ভাণ্ডারের বৃহদাকারের ইঁদুর তাদের অনুসারী মার্জার কুল এবং তাদের বাড়ির আশেপাশে পাখিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে

বেড়ায়। এরা অনর্থক উড়ে না, উদ্দিষ্ট আহার্য লাভ করে পরিতৃপ্তও হয়। কিন্তু দরিদ্র ও অসচ্ছল লোকদের ঘরবাড়ির দিকে লক্ষ করুন; সেখানে কোনো কীটপতঙ্গ প্রবেশ করবে না, তার আশেপাশে কোনো পাখি উড়ে বেড়াবে না এবং তাদের ভাঁড়ারে কোনো ইঁদুর বা বিড়াল এসে আশ্রয় নিবে না। কবি বলেছেন[৪১]

পাখি সেখানেই নেমে আসে, যেখানে শস্যকণা ছিটিয়ে দেয়া হয়;
তারা এ জন্যই সম্ভ্রান্ত লোকদের বাড়িঘর ছাড়তে চায় না।

পাঠক, এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র লীলা অনুধাবন করুন। এ ক্ষেত্রে বাক্‌হীন প্রাণীদের সমাবেশের সাথে সবাক্ মানুষের আচরণের তুলনা করুন। উচ্ছিষ্ট খাদ্যকণার সাথে প্রাচুর্যের ফলে অতিরিক্ত সম্পদের বিষয়টি মিলিয়ে দেখুন। এর একমাত্র কারণ সম্পদের প্রাচুর্য তাদের জীবনযাত্রাকে এতটা সচ্ছল করে তুলেছে যে, তারা তা ছিটিয়ে-ছড়িয়ে ব্যয় করতে দ্বিধা করে না। সুতরাং এ কথা ভালো করে জেনে রাখুন যে, এ প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি একমাত্র নগর জীবনে জনসম্পদের প্রাচুর্যের অনুসারী। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞাতা। তিনিই নিখিল বিশ্বের মুখাপেক্ষী নন।[৪২]

---

৪১. কবির নাম বাশ্‌শার ইবনে বুরদ; মৃত্যু ১৬৭ (৭৮৬ খ্রি:) হি:।
৪২. কোরান, ৩, ৯৭।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

[নগরসমূহের দ্রব্যমূল্য]

জেনে রাখুন, প্রতিটি বাজারই মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান দিয়ে থাকে। তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক মৌলিক প্রয়োজনের অধীন; যেমন আহার্যের জন্য গম, যব এবং অনুরূপ খাদ্য শাকসব্জি, মটর কলায়, দাল ইত্যাকার যাবতীয় শস্য ও তাদের মসল্লা হিসাবে পিঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি। অন্যগুলো পরিপূর্ণতা বিধায়ক প্রয়োজনের সৃষ্টি; যেমন মসল্লা, ফলমূল, পরিচ্ছদ, দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী, যানবাহন এবং যাবতীয় শিল্পকর্ম ও স্থাপত্য। সুতরাং যখন নগরের পরিধি বিস্তারলাভ করে এবং তার অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন মৌলিক প্রয়োজনের আহার্যসামগ্রী ও তার অনুরূপ দ্রব্যাদির মূল্য সুলভ হয়। অন্যদিকে বিলাসসামগ্রী—যথা মসল্লা, ফলমূল ও অনুরূপ অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য মহার্ঘ হয়ে থাকে। আবার নগরের জনসংখ্যা কমে গিয়ে তার দুরবস্থা দেখা দিলে এ মূল্যানুপাত বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়।

এর কারণ এই যে, শস্য আহার্যের একটি অতীব প্রয়োজনীয় সামগ্রী। সুতরাং তা সংগ্রহের চাহিদা একান্তভাবে সাধারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ কোনো ব্যক্তিই তার নিজের বা তার পরিবার-পরিজনের আহার্যসামগ্রী একমাস বা একবছরের জন্য সংগ্রহ করে রাখতে দ্বিধা করে না। সুতরাং নগরের সমস্ত লোক কিংবা অধিকাংশ অধিবাসী অথবা তার নিকটতর একটি জনসংখ্যা এ সংগ্রহকার্যে ব্যাপৃত হয়। এভাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ খাদ্যসামগ্রী সঞ্চয় করার ফলে প্রত্যেকের নিজের খাদ্য ও পরিবার-পরিজনের আহার্য থেকে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্বৃত্ত হয় এবং তার দ্বারা শহরের অন্য আরো কিছু সংখ্যক অধিবাসীর প্রয়োজন মিটে। অনুরূপভাবে সমগ্র শহরে খাদ্যের একটা সাধারণ উদ্বৃত্তরূপ নিঃসন্দেহে ধারণা করা যায়। সুতরাং কোনো কোনো বছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের অসুবিধা ব্যতীত প্রায় সর্বদাই খাদ্যদ্রব্যের মূল্য সুলভ থাকে। যদি এরূপ দুর্যোগের আশঙ্কা করে মানুষ অনুরূপভাবে খাদ্যসামগ্রী সঞ্চয় করে না রাখত, তা হলে জনবসতির প্রাচুর্যের জন্য খাদ্যদ্রব্যের এত প্রতুলতা হত যে, তা কোনোপ্রকার বিনিময় ও মূল্য ব্যতীতই মানুষকে বিলিয়ে দিতে হত।

মসল্লা, ফলমূল ও ইত্যাকার ধরনের রুচিকর সামগ্রীগুলো সাধারণ চাহিদার বিষয় নয়। এটা সংগ্রহ করে রাখার বিষয়টি সমগ্র জনবসতির তৎপরতাকে আলোড়িত করে না। এমনকি অধিকাংশের মধ্যেও এর প্রতি আকর্ষণ দেখা যায় না। তদুপরি নগর পরিবেশ যখন ব্যাপক বিস্তৃত, জনসংখ্যাবহুল ও বিলাসব্যসনের প্রতি অতিমাত্রায়

উদ্যোগী হয়ে ওঠে, তখন তার সাথে সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধা লাভের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থা অনুসারে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এর ফলে এ সকল সামগ্রীর মজুদ প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে সম্পূর্ণ অপারগ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ বহু ব্যক্তিই এগুলো লাভ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু সামগ্রীর স্বল্পতাহেতু প্রয়োজনীয় যোগান দেয়া কিছুতেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। সুতরাং ইচ্ছুক ব্যক্তিদের এ ক্ষেত্রে ভিড় জমে যায় এবং স্বচ্ছল ও বিলাসী লোকেরা অন্যদের অপেক্ষা বহুগুণ বেশি মূল্য দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী দুর্মূল্যে সংগ্রহ করতে অপব্যয়ের দ্বারস্থ হয়। পাঠক, এ কারণেই এ সকল বিলাসী দ্রব্যে দুর্মূল্য দেখা দেয়, যেমন আপনি লক্ষ করে থাকেন।

জনবসতিপূর্ণ নগরগুলোতে শিল্পকর্ম ও শ্রমের মূল্যও বৃদ্ধি পায়। এর বৃদ্ধির কারণ তিনটি; প্রথমত: জনবসতি অধিক হওয়ায় বিলাসব্যসনের চাহিদা প্রচুর হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ত: নগরের আহার্যসামগ্রীর প্রাচুর্য কর্মীদের জীবনে সাধারণ সচ্ছলতার নিশ্চয়তা বিধানের নিমিত্ত তারা পরিশ্রম ও কর্মতৎপরতাকে অত্যধিক মূল্যবান মনে করে। তৃতীয়ত: আরামপ্রিয় লোকের সংখ্যা অধিক হওয়ায় তারা প্রয়োজনীয় কর্মের জন্য অন্যদেরকে নিয়োগ করতে বাধ্য হয় এবং শিল্পীদের উপর নিজের কর্তব্য ন্যস্ত করতে গর্ববোধ করে। সুতরাং তারা পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে শ্রমের যথার্থ মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য দিয়ে কর্মে নিয়োজিত করে। এর ফলে কর্মী, শিল্পী ও পেশাধারী ব্যক্তিরা নিজেদেরকে মূল্যবান মনে করতে থাকে এবং তদনুপাতে তাদের শ্রমের মূল্যও বেড়ে যায়। কাজেই এ সকল ব্যাপারে নগরবাসীদের ব্যয়বাহুল্য ঘটে।

অন্যদিকে স্বল্প জনসংখ্যাবিশিষ্ট ক্ষুদ্র শহরে শ্রমের ন্যূনতার জন্য আহার্যসামগ্রীর পরিমাণ কম থাকে। তদুপরি শহরের ক্ষুদ্র পরিবেশই তাদের মনে আহার্যসামগ্রীর অভাবে আশঙ্কা জাগিয়ে যতটুকু পাওয়া যায় তাই সঞ্চয় করে রাখতে উৎসাহিত করে। সুতরাং তার অস্তিত্ব তাদের নিকট দুর্লভ হয়ে ওঠে এবং একান্ত আগ্রহী ক্রয়েচ্ছুদের নিকট তা মহার্ঘ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বিলাস সামগ্রীর ক্ষেত্রে অধিবাসীদের স্বল্পতাজনিত দুরবস্থার দরুন তেমন কোনো চাহিদাই থাকে না। ফলে তার বাজার মন্দা হয়ে দাঁড়ায় এবং তার মূল্যমান একান্ত সুলভ হয়ে ওঠে।

কখনও কখনও খাদ্যসামগ্রীর মূল্যের মধ্যে শুল্ক, শাসকের নির্ধারিত অতিরিক্ত বাজার কর, শহরের উন্নয়ন কর এবং কর আদায়কারীদের নিজেদের জন্য বিক্রেতাদের উপর ধার্য কর প্রভৃতি এসে অনুপ্রবেশ করে। এর ফলে গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা শহরে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অধিক হতে দেখা যায়। কারণ শুল্ক, অতিরিক্ত কর, আরোপিত কর ইত্যাদির চাপ গ্রামবাসীদের উপর অতি অল্প অথবা নেই বললেও চলে। অথচ শহরে এর ঠিক বিপরীত; বিশেষ করে সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থায়। অনেক সময় খাদ্যসামগ্রীর মূল্যের মধ্যে চাষাবাদ-শ্রমের মূল্যও যোগ করা হয় এবং মূল্যমান নির্ধারণের সময় তার প্রতি লক্ষ রাখা হয়। যেমন বর্তমানকালে আন্দালুসে করা হচ্ছে। এর কারণ খ্রিস্টানরা মুসলমানদিগকে সমুদ্র তীরবর্তী অনুর্বর, অনাবাদী ও উদ্ভিদের অনুপযোগী ভূমির দিকে ঠেলে দিয়ে তারা নিজেরা উর্বর ও আবাদী অঞ্চলের অধিকারী হয়ে বসায় মুসলমানরা

বাধ্য হয়ে তাদের কৃষিকর্মে ভূমি সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করেছে। এ প্রচেষ্টায় তাদেরকে মূল্যবান শ্রম এবং সার ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হয়েছে, যা একান্তই ব্যয়সাপেক্ষ। এ কারণে তাদের কৃষিব্যয় আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং তাকে কৃষিপণ্যের মধ্যে যোগ না করে তারা পারেনি। এভাবে যেদিন থেকে সমুদ্র তীরবর্তী মুসলিম অধ্যুষিত ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলগুলোতে খ্রিস্টানরা চাষীদেরকে বিতাড়িত করেছে, তখন থেকেই আন্দালুসের দুর্মূল্য দেখা দিয়েছে।

মানুষ যখন ঐ সকল অঞ্চলের পণ্যাদির দুর্মূল্যের কথা শুনে, তারা ধারণা করে যে, এর কারণ সেখানকার শস্য ও আহার্যদ্রব্যের স্বল্পতা। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। বরং আমরা যতদূর জেনেছি, জনবসতির তুলনায় তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই স্থায়ীভাবে কৃষিকার্যে নিয়োজিত। তাদের মধ্যে শাসক থেকে আরম্ভ করে সাধারণ লোক পর্যন্ত প্রায় সকলেরই কৃষিভূমি, খামার ও শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। খুব অল্পসংখ্যক শিল্পকর্মী, শ্রমজীবী, যুদ্ধ ব্যবসায়ী ও ধর্মযোদ্ধাগণ ব্যতিরেকে সকলেই উক্ত কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। অথচ এতদসত্ত্বেও সুলতান তাদের বেতনাদি প্রদানের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্যে শস্য সরবরাহ করছেন। অর্থাৎ কৃষি পণ্য থেকে তাদের আহার্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিচ্ছেন। সুতরাং তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের দুর্মূল্যের কারণ, আমরা যেমন বর্ণনা করেছি, তাই।

অন্যদিকে বারবারদের ভূমি ব্যবস্থা যেহেতু তার সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে উর্বরতা ও উদ্ভিজ্জ উপযোগিতার দ্বারা বিশিষ্ট, সেজন্য তাদের কৃষি উৎপাদনে তার প্রাচুর্য ও সাধারণ সমৃদ্ধির জন্য ব্যয়ের মাত্রা বহুগুণে কম এবং এ কারণেই সেখানে আহার্যসামগ্রীর মূল্য একান্তই সুলভ। আল্লাহ্ দিবা-রাত্রি নির্ধারণ করে থাকেন।[৪৩] তিনি একক ও পরাক্রমশালী। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিপালক নেই।

৪৩. কোরান, ৭৩, ২০।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

[প্রান্তরবাসীদের পক্ষে জনবসতিবহুল নগরীতে বসবাস করা অসুবিধাজনক]

এর কারণ এই যে, নগর পরিবেশ সর্বদাই জনবহুল এবং বিলাসব্যসনে পরিপূর্ণ, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এ বিলাসের জন্যই সেখানকার অধিবাসীদের অভাব-অনটনের ধারণা অত্যধিক এবং এর প্রতি অমোঘ আকর্ষণের ফলেই তারা এগুলো পূরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। একসময়ে তাদের এ অভ্যাস অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে পরিণত হয় এবং তজ্জন্য শ্রম ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ক্রমশ মহার্ঘ হয়ে ওঠে। কারণ, বিলাসের আকর্ষণে সকলেই এগুলোর সংগ্রহকরণে ভিড় জমায়। তদুপরি শাসন ব্যবস্থার দিক থেকে বাজার, পণ্যদ্রব্য প্রভৃতির উপরে আরোপিত কর পণ্য মূল্য হিসাবে পরিগণিত হয়। এজন্য সেখানকার সুযোগ-সুবিধা, আহার্য ও শ্রম ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জনবসতির অনুপাতে নগরবাসীদের ব্যায়ের মাত্রা একটা চরম সীমায় উপনীত হয়। এ প্রকার ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সেখানে বসবাসকারীরা নিজেদের ও পরিবার-পরিজনের জীবনযাত্রা নির্বাহ ও অন্যান্য কর্ম নিষ্পত্তির জন্য প্রচুর অর্থের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে।

অথচ প্রান্তরবাসী কোনো লোকের আয়ই অধিক নয়। কারণ তারা এমন এক স্থানে বসবাস করে, যেখানে বাজারের মন্দাভাব ও শ্রমের স্বল্প মূল্য সর্বদাই বিরাজমান। বস্তুত শ্রমের মূল্যের উপরই উপার্জন নির্ভর করে এবং এ কারণে তাদের পক্ষে এমন উপার্জন বা সম্পদ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, যা দিয়ে বৃহৎনগরীর ব্যয়ভার সংকুলান হওয়া সম্ভব। সুতরাং তাদের পক্ষে নগর পরিবেশের সুযোগ-সুবিধার দুর্মূল্যতা ও অভাবের ব্যাপকতাকে এড়িয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই তারা সেই প্রান্তরীয় জীবনে স্বল্প পরিশ্রমে নিজের প্রয়োজনীয় অভাব পূরণেই ব্যাপৃত থাকে। সেখানে বিলাসব্যসনের অভ্যাস নেই এবং জীবন-যাপনেও ব্যয়ভারের কোনো চাপ নেই। এ জন্য সম্পদ সংগ্রহের প্রতিও তাদের কোনোপ্রকার লালসা নেই। এ কারণেই দেখা যায়, প্রান্তরবাসীদের মধ্যে যারা নাগরিক জীবন অবলম্বন করতে উৎসাহী হয়, অতি অল্পদিনের মধ্যে তাদের অক্ষমতা প্রকাশ পায় এবং তারা পদে পদে অপমানের সম্মুখীন হতে থাকে। অবশ্য কিছু সংখ্যক এমন লোককে এর ব্যতিক্রম ধরা যায়, যাদের সম্পদের সঙ্গতি আছে, প্রয়োজনে অতিরিক্ত ব্যয় করার সামর্থ্য আছে, কেবল তারাই স্বাভাবিক জীবন বিকাশের ধারায় বিলাস ও স্বস্তির প্রতি আকর্ষিত হয় এবং নগর জীবনে প্রবেশ করে নাগরিকদের বিলাসব্যসন ও অভ্যাস আচরণের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে সমর্থ হয়। এভাবেই নগর জীবন ধারার প্রাথমিক বিকাশ ঘটে। আল্লাহ্ সকল বিষয়কে বেষ্টন করে রয়েছেন।[৪৪]

---

৪৪. কোরান, ৪৯, ৫৪।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

[সমৃদ্ধি ও দারিদ্র্যের দিক থেকে বিভিন্ন অঞ্চল ও নগর জীবন একই প্রকার]

জেনে রাখুন, বিভিন্ন অঞ্চলের জনবসতি পূর্ণতা লাভ করলে, সেখানে বিভিন্ন জাতির উদ্ভব হয় ও অধিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সেই অনুপাতে তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে ও সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দেয়। তারা শহর-নগর নির্মাণ করে তাদের সাম্রাজ্য ও রাজশক্তির ব্যাপকতা সৃষ্টি করে। এ সকল কিছুর কারণ, আমরা যেমন বর্ণনা করেছি, শ্রমের অধিকতর বিনিয়োগ এবং সম্মুখেও তার বর্ণনা আসবে যে, এটাই ধনাঢ্যতার কারণ। কেননা যে কোনো অধিবাসীর পক্ষে যদি তার শ্রম বিনিয়োগ করে তার মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর পর উদ্বৃত্ত থাকে, তা হলে জনসম্পদের অনুপাতে সেই উদ্বৃত্ত এমন একটা জীবনমান নির্ধারণ করে দেয়, যার উপর মানুষ বিনা দ্বিধায় তাদের উপার্জনের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। যেমন আমরা এ সম্পর্কে পরে জীবনযাপন, আহার্য ও উপার্জন সম্পর্কীয় পরিচ্ছেদগুলোতে বর্ণনা করব। বস্তুত এর ফলেই সমৃদ্ধি দেখা দেয়, অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, বিলাসব্যসন ও প্রাচুর্য এসে উপস্থিত হয়। বাজারের তেজীভাবের জন্য রাজকোষের সমৃদ্ধি ঘটে, তার সম্পদ বৃদ্ধি পায় ও শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। তখন প্রাসাদ ও দুর্গ নির্মিত হয় এবং নগরের পরিকল্পনা ও শহরের পত্তন সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

পাঠক, এ বিষয়টি পূর্বাঞ্চলের দেশগুলোতে বিবেচনা করুন। যেমন মিশর, সিরিয়া, ইরাক আজম, হিন্দ, চীন; উত্তর দিকের সমস্ত এলাকা এবং রোম সাগরের অপর তীরস্থ অঞ্চল। কীভাবে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের মধ্যে সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দিয়েছে, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটেছে, শহর-নগরের সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানকালে আমরা মাগরিবের মুসলমানদের সন্নিধানে আগত খ্রিস্টান ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অবস্থায় যে সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতা দেখতে পাচ্ছি, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। পূর্বাঞ্চলে ব্যবসায়ীদের অবস্থাও একই প্রকার। তাদের অবস্থা-ব্যবস্থা সম্পর্কে যে সকল সংবাদ আমরা পেয়ে থাকি, তন্মধ্যে দূরতম প্রাচ্য ইরাক আজম, হিন্দ ও চীনের কথা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাদের ধনাঢ্যতা ও প্রাচুর্য সম্পর্কে ভ্রমণকারীরা যে সকল অদ্ভুত বিবরণ প্রদান করেছে, তা অনেক সময়েই অসম্ভব অবাস্তব বলে মনে হয়। সাধারণ লোকেরা এ সকল কাহিনী শুনে ধারণা করে যে, এর কারণ তাদের ঐশ্বর্যই অধিক অথবা স্বর্ণরৌপ্যের সকল খনিই তাদের এলাকায় বিদ্যমান অথবা প্রাচীন জাতিগুলোর সমুদয়

স্বর্ণ অন্যদেরকে বঞ্চিত করে তারাই ভোগ করেছে। অথচ প্রকৃত অবস্থা এর কোনটিই নয়। এ অঞ্চলে স্বর্ণের খনি সম্পর্কে আমরা যতদূর জানি, তা সুদানে অবস্থিত এবং তুলনামূলকভাবে মাগরিবের নিকটবর্তী। তদুপরি তাদের অঞ্চলের সমুদয় পুঁজিই তারা ব্যবসায় খাটিয়ে অন্যান্য অক্ষম থেকে মুনাফা অর্জন করে। যদি তাদের এলাকায় স্থায়ী সম্পদের কোনো পূর্ণ ভাণ্ডার থাকত, তা হলে এভাবে তারা পুঁজি নিয়োগ করে অন্যান্য দেশে ঘুরে বেড়াত না; বরং মানুষের সম্পদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজেদের গৃহেই বসে থাকত।

জ্যোতিষীরা পূর্বাঞ্চলের এরূপ অবস্থা দেখে এবং তাদের সম্পদ ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য অবগত হয়ে বিস্মিত হয়েছেন। তাদের ধারণা, পূর্বাঞ্চলের লোকদের জন্মলগ্নে নক্ষত্রের শুভ প্রভাব ও ভাগ্য লক্ষণ মাগরিবের লোকদের অপেক্ষা অনেক বেশি। এ ধারণা তখনই শুদ্ধ হয়, যখন তা জ্যোতিষশাস্ত্রের সাথে জাগতিক অবস্থাকে মিলিয়ে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে; যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। জ্যোতিষিরা এ বক্তব্যে শুধু জ্যোতিষশাস্ত্রীয় কারণটির কথা উল্লেখ করেছেন; কিন্তু জাগতিক কারণটি অবশিষ্ট রয়েছে। তা এই যে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, জনবসতির প্রাচুর্য এবং তা পূর্বাঞ্চল ও তার দিগ্‌দিগন্তে বিশেষভাবে বর্তমান। অধিকতর জনবসতি অধিকতর পরিশ্রমজাত উপার্জনের প্রাচুর্য বিধান করে। এ কারণে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা পূর্বাঞ্চলে অধিকতর সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছে। এটা শুধুমাত্র জ্যোতিষশাস্ত্রীয় নক্ষত্রের প্রভাবের ফল নয়। পাঠক, আমাদের পূর্ববর্তী বর্ণনা থেকে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে, নক্ষত্রের প্রভাব কখনও স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারে না। এ জন্য তার প্রভাব, পৃথিবীর জনবসতি ও তার গতি-প্রকৃতির সামঞ্জস্য বিধান হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

পাঠক, জনবসতির কল্যাণে সমৃদ্ধির এ বিষয়টিকে আফ্রিকিয়া ও 'বরকা' অঞ্চলে বিবেচনা করুন। যখন তাদের অধিবাসীর সংখ্যা কমে গিয়ে জনবসতি উজার হয়ে পড়ল, তখন কেমন করে তাদের অবস্থা-ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে অধিবাসীরা অসচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের সম্মুখীন হল। তাদের রাজকোষের সমৃদ্ধি হ্রাস পেল এবং সাম্রাজ্যশক্তি হীন হয়ে পড়ল। অথচ ইতিপূর্বে সেখানে শিয়া ও সিনহাজাদের সাম্রাজ্য ছিল এবং পাঠক, আপনি তাদের সমৃদ্ধি, রাজকোষের প্রাচুর্য এবং তাদের খরচপত্র ও দানধ্যানের আতিশয্যের কথা অবশ্যই শুনতে পেয়েছেন। এমন কি অধিকাংশ সময় মিশরাধিপতির সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যয় নির্বাহের জন্য এ কায়রোয়ান থেকে সম্পদ পাঠাতে হত। সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি এ পরিমাণ ছিল যে, জওহর আল কাতেব তাঁর মিশর জয়ের অভিযানে সৈন্যদের আহার্য, বেতন ও অন্যান্য খরচপত্রের প্রয়োজনীয় সম্পদ এখান থেকেই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রাচীনকালে মাগরিবের এ অঞ্চল যদিও আফ্রিকিয়ার তুলনায় ন্যূন ছিল, তথাপি সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে তার কোনরূপ অন্যথা ছিল না। আল-মোহেদদের সাম্রাজ্যকালে তার অবস্থা সমৃদ্ধ ও তার রাজকোষ পরিপূর্ণ ছিল। অথচ বর্তমানকালে তার জনবসতি হ্রাসের ফলে পূর্বাবস্থা অনেকগুণে কমে গেছে। তার মধ্য থেকে বারবারদের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী চলে গেছে এবং তার অভ্যস্ত জীবনধারায় ক্ষয়ের চিহ্ন অত্যন্ত প্রকট হয়ে

পড়েছে। তা যেন ক্রমশ আফ্রিকিয়ার অবস্থার দিকে ফিরে যাচ্ছে। অথচ ইতিপূর্বে তার জনবসতি রোম সাগর থেকে সুদান পর্যন্ত এবং দৈর্ঘ্যে দূরতম সুসম ও বরকা পর্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট ছিল। বর্তমানে তার অধিকাংশ স্থান জনবিরল প্রান্তর, শূন্যমাঠ ও মরুভূমি। শুধুমাত্র সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল ও তৎসন্নিহিত পাহাড়ী এলাকাগুলোতে পূর্বাবস্থা কিছুটা বিদ্যমান। আল্লাহ্ পৃথিবী ও তার উপরিস্থিত সমুদয়ের উত্তরাধিকারী এবং তিনিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

[নগর পরিবেশে কৃষিখামার ও ভূসম্পত্তি সংগ্রহ এবং তার উপকারিতা ও উৎপাদন]

জেনে রাখুন, নগর ও শহরবাসীদের জন্য কৃষিখামার ও ভূসম্পত্তি অধিকমাত্রায় সংগ্রহের ব্যাপারটি একবারে ও এককালে কখনই সংঘটিত হয় না। কারণ তাদের মধ্যে কারো পক্ষে এমন কোনো সম্পদের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়, যা দিয়ে সে সীমা অতিক্রমকারী মূল্যের কোনো সম্পত্তি হস্তগত করতে পারে। বাস্তবক্ষেত্রে তার সচ্ছলতা এক প্রকার চরম সীমায় উপনীত হলেও তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বরং তাদের এ প্রকার ভূসম্পত্তি সংগ্রহ পর্যায়ক্রমে হয়ে থাকে। হয় এটা সে পিতা-পিতামহ ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে এবং ঘটনাক্রমে বহুলোকের সমস্ত সম্পত্তি অথবা তার অধিকাংশ একব্যক্তির হাতে এসে জড় হয়; কিংবা বাজারমূল্যের অস্থিরতার জন্য এরূপ সম্পত্তি কারো অধিকারে চলে আসে। কারণ যখন একটি সাম্রাজ্য শেষ হয়ে আসে ও অন্যটির আরম্ভ হয়, তখন এ যুগসন্ধিক্ষণে সাম্রাজ্যের সহায়ক শক্তি ধ্বংস হয়, তার বিন্যাস দৃঢ়তা ভেঙে পড়ে এবং নগর পরিবেশের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এ সময়ে ভূসম্পত্তির উপযোগের অভাবে তার চাহিদা কমে যায়। কেননা সামগ্রিক অবস্থারই তখন পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং তার মূল্য সুলভ হওয়ার ফলে খুব অল্প সম্পদের বিনিময়েই তা লাভ করা সম্ভব হয়। এভাবে তা উত্তরাধিকারের মধ্যদিয়ে পরবর্তীদের অধিকারে চলে আসে। অবশ্য ইতিমধ্যে নগর পরিবেশ পরবর্তী সাম্রাজ্য শক্তির বদান্যতায় নতুন যৌবন ফিরে পেতে শুরু করেছে। পুনরায় এর বুকে এক নবীন শৃঙ্খলাবোধ সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করার উদ্যোগ নিয়েছে। এ সময়ে আবার কৃষি খামার ও ভূসম্পত্তির উপযোগিতা ফিরে আসায় তার চাহিদা বেড়ে যায় এবং তার মূল্যমান মহার্ঘ হয়ে ওঠে। বস্তুত তখন তার এমন একটি গুরুত্ব দেখা দেয়, যা প্রথম অবস্থায়ও ছিল না। একেই বাজার মূল্যের অস্থিরতা বলা হয়েছে। এর ফলে উক্ত সম্পত্তির অধিকারী শহরের সর্বাপেক্ষা ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়। অবশ্য এটা তার চেষ্টায় বা উপার্জনের দ্বারা হয় না। কারণ তার একক ক্ষমতা কোনো সময়েই এরূপ কিছু করতে পারে না।

কিন্তু এরূপ কৃষি খামার ও ভূসম্পত্তির উপকারিতার কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, তা কোনো সময়েই তার অধিকারীর জীবনের প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট নয়। কারণ, তার দ্বারা তার বিলাসব্যসন ও তার উপকরণের চাহিদা পূরণ হয় না। বড় জোর তা

থেকে তার সাধারণ প্রয়োজন ও জীবিকার চাহিদা মিটতে পারে। আমরা দেশের জ্ঞানীদের নিকট থেকে এ প্রসঙ্গে যা শুনতে পেয়েছি, তা এই যে, এইপ্রকার কৃষি খামার ও ভূসম্পত্তি অর্জনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল পরবর্তী দুর্বল সন্তান-সন্ততির অসহায়তার আশঙ্কা দূর করা। যাতে যতক্ষণ তারা উপার্জনক্ষম না হয়ে ওঠে, ততক্ষণ তার দ্বারা প্রতিপালিত, আহার্যপ্রাপ্ত এবং তার সহায়তায় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠ হতে পারে। এভাবে তারা উপার্জনশীল হয়ে উঠলে নিজেরাই নিজেদের দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম হবে। কখনো বংশধররা এমনও হয় যে, দৈহিক ত্রুটি অথবা বুদ্ধির স্বল্পতার জন্য তারা জীবন ধারণ উপযোগী সম্পদ উপার্জন করতে সমর্থ হয় না। এ পরিস্থিতিতে ভূসম্পত্তি তাদের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এ উদ্দেশ্যেই ভূসম্পত্তি অর্জন করে থাকেন।

এতদ্ব্যতীত কেউ যদি তার দ্বারা পুঁজি সংগ্রহ ও বিলাসী জীবনের উপকরণ লাভ করতে চায়, তা হলে বলতে হবে, অসম্ভব। অবশ্য অনেক সময় বাজারমূল্যের অস্থিরতার ফলে খুব কম ও বিরল হলেও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এও একমাত্র তার মূল্যমান এমন এক চরম সীমায় পৌঁছলেই সম্ভব হয়, যেখানে তার শ্রেণী ও মূল্য উভয়েই নগর পরিবেশে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী হবে। তবে এমন কিছু ঘটলে অনেক সময়েই আমীর ও শাসকদের দৃষ্টি তার উপর পতিত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা তা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে অথবা কিনে ফেলতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। ফলে তার মালিকরা বিপদ ও দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে বিজয়ী এবং তিনিই মহান আরশের অধিকারী।[৪৫]

৪৫. কোরানের দুইস্থানে বর্ণিত দুইটি বাক্য একত্র করা হয়েছে।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

[নগরের পুঁজিপতিদের জন্য জাঁকজমক ও প্রতিরোধ শক্তি থাকা প্রয়োজন]

এর কারণ এই যে, কোনো নাগরিকের পুঁজির প্রাচুর্য এবং কৃষি খামার ও ভূসম্পত্তির ব্যাপকতা ঘটে নগরীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদশালী হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠলে সকলের দৃষ্টি তার উপর পতিত হয়। তার বিলাসব্যাসন ও সচ্ছল অবস্থাজনিত বৈচিত্র্যের জন্য সে আমীর, অমাত্য ও রাজন্যবর্গের প্রতিবেশী হয়ে ওঠে এবং তারাও তার প্রতি হিংসা পোষণ করতে আরম্ভ করে। মানুষের স্বভাবেই যেহেতু উৎপীড়নের ভাব বিদ্যমান, সেই জন্য তার সম্পদ সৌভাগ্যের উপর তাদের লোভাতুর দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং তা ছিনিয়ে নেবার জন্য তারা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। তারা সকল প্রকার সম্ভাব্য কৌশলের দ্বারস্থ হয়ে তাকে শাসন ব্যবস্থার নির্দেশের অধীনে আনতে চেষ্টা করে এবং তা তার নিকট থেকে গ্রহণ করার একটি প্রকাশ্য অজুহাত তৈরি করে। সাধারণভাবে অধিকাংশ শাসন ব্যবস্থাই অত্যাচারী হয়ে থাকে। কারণ নির্ভেজাল ন্যায়বিচার একমাত্র ধর্মানুমোদিত খেলাফতেই পাওয়া সম্ভব; অথচ তা একান্তই স্বল্পকাল স্থায়ী। হজরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, খেলাফত আমার পরে ত্রিশ বছর; অতঃপর তা অত্যাচারী রাজশক্তিতে প্রত্যাবর্তন করবে। এ কারণেই জনবসতির মধ্যে সুপরিচিত সম্পদ ও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির জন্য এমন একটি সহায়ক শক্তির প্রয়োজন, যা তার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে এবং এমন একটি জাঁকজমক থাকা দরকার, যাকে লোকে সমীহ করতে বাধ্য হয়। এটা সম্রাটের আত্মীয়তা, অন্তরঙ্গতা অথবা এমন একটি গোত্রপ্রীতির সহায়তা হতে পারে, সম্রাট যার শ্রদ্ধাশীল। সে এর আশ্রয়ে থেকে তার উপর আগত অতর্কিত আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবে। অন্যদিকে যদি তার অনুরূপ কোনো প্রতিরোধের ব্যবস্থা না থাকে, তা হলে সে নানাবিধ কৌশল ও শাসনতান্ত্রিক নির্দেশের শিকারে পরিণত হবে। আল্লাহ্ নির্দেশ দান করেন এবং নির্দেশ অমান্যকারী কেউ নেই।[৪৬]

---

৪৬. কোরান, ১৩, ৪৯।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

[নাগরিক সভ্যতা সাম্রাজ্যেরই অবদান এবং তার ধারাবাহিকতা ও দৃঢ়তাতেই সভ্যতার সমৃদ্ধি]

এর কারণ এই যে, নাগরিক সভ্যতা এমন একটি স্বাভাবিক অবস্থা, যা মানব সভ্যতার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এর এ অতিরিক্ত অবস্থাটি সচ্ছলতা এবং জনসংখ্যার আধিক্য ও স্বল্পতার দরুন সীমাহীনভাবে বিচিত্র হয়ে থাকে। এও নানাপ্রকার ও আকারের শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে শিল্পকর্মের ন্যায় বিচিত্রধর্মীয় হয়ে ওঠে। এ কারণে এর প্রতিটি শাখাই নিজস্ব শিল্পী ও দক্ষ কারিগরের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এভাবে যতই তার শাখা-প্রশাখা বাড়তে থাকে ততই সংশ্লিষ্ট শিল্পীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিটি পুরুষ তার রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। অতঃপর সময়ের ধারাবাহিকতা এ শিল্পকলাকে বহন করার ফলে সংশ্লিষ্ট শিল্পীরা তার বিচিত্র দিক সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও দক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে কালের ব্যাপক পরিধি বারবার এ সকল শিল্পকলাকে পরীক্ষা করে দৃঢ় ও প্রভাবশীল করে তোলে।

অবশ্য এদের অধিকাংশই নগর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কারণ এখানে জনবসতি যেমন অধিক, তেমনি তারা যোগ্য সচ্ছলতারও অধিকারী। অন্যদিকে এর সমস্ত কিছুই সাম্রাজ্যের কল্যাণে উৎপন্ন হয়। কেননা সাম্রাজ্যই প্রজাদের সম্পদ একত্র করে তা তার অন্তরঙ্গ সহায়ক ও কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে। অবশ্য তাদের সচ্ছলতা যে পর্যায়েই থাকুক না কেন পদমর্যাদাই তাদেরকে অবস্থার পরিবর্তন সাধনে সাহায্য করে। এর ফলে প্রজাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত আয় সাম্রাজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের মধ্যে ব্যায়িত হয়। অতঃপর তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত নগরবাসীরাও এর অংশ পায়। এদের সংখ্যাই অধিক এবং এ কারণে তাদের ঐশ্বর্য বিরাট, তাদের সম্পদ প্রচুর এবং তাদের বিলাসব্যসন ও তার মতাদর্শ ব্যাপক হয়ে ওঠে। এর ফলে তৎসম্পর্কিত শিল্পকর্মের সকল প্রকার বৈচিত্র্য তাদের মধ্যে স্থায়ী হয়ে দাঁড়ায়। এটাই নাগরিক সভ্যতা।

সম্ভবত এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, সাম্রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত নগরগুলো যদিও জনসংখ্যায় পরিপূর্ণ থাকে, তথাপি তাদের অবস্থা অনেকাংশে যাযাবরী জীবনের ধারাবাহিক এবং সর্বপ্রকার মতাদর্শের দিক থেকেই নগর সভ্যতার সাথে বিভিন্ন। অথচ সাম্রাজ্যের মধ্যভাগে তার কেন্দ্র ও রাজধানী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত নগরে এর বিপরীত অবস্থাই পরিলক্ষিত হয়। এটা শাসকের সান্নিধ্য ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর সম্পদ বিতরণের ফলশ্রুতি ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। এটা যেন জলের স্রোত; এটা নিকটবর্তী

সকল ভূমিকেই তা সবুজ করে তোলে এবং তার নিকট থেকে ক্রমশ দূরবর্তী সকল কিছুর মধ্যেই আনুপাতিক শুষ্কতা বিরাজ করে। আমরা পূর্বে বলেছি যে, শাসক ও সাম্রাজ্য পৃথিবীর পণ্যকেন্দ্র বিশেষ। সুতরাং সমস্ত পণ্য এর মধ্যে ও সন্নিকটে স্তূপীকৃত হয় এবং যতই তা থেকে দূরে যাওয়া যায়, ততই পণ্যের স্বল্পতা দেখা দিয়ে এক সময়ে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে ওঠে। সুতরাং উক্ত সাম্রাজ্য যদি তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারে এবং তার শাসকবৃন্দ একের পর এক নগরীতে শাসন পরিচালনা করতে সমর্থ হয়, তা হলে নগরের সভ্যতা-সংস্কৃতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে স্থায়ী মর্যাদায় বিভূষিত হয়।

পাঠক, ইহুদিদের ব্যাপারে এ বিষয়টি বিবেচনা করুন। সিরিয়ায় তাদের সাম্রাজ্যকাল একহাজার চারশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এর ফলে কীভাবে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি দৃঢ়তা লাভ করেছে এবং জীবনধারা ও তার অভ্যাসসমূহের মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে। তারা উপাদেয় আহার্য, পরিধেয় বস্ত্রাদি এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য ক্ষেত্রে এমন শিল্প বৈচিত্র্যের পরিচয় রেখে গেছে, যা অদ্যাবধি অনুসৃত হচ্ছে। তদুপরি সিরিয়ার এ সভ্যতা-সংস্কৃতি শুধু তাদের দ্বারাই নয়, তাদের পরবর্তীকালে আরো ছয়শ বছর ধরে রোমান সাম্রাজ্যে তার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে এবং এভাবে তারা তার একটা চরম রূপ তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে।

অনুরূপভাবে কিবতীদের সম্পর্কেও বলা যায়; পৃথিবীতে তিন সহস্র বছরব্যাপী তাদের সাম্রাজ্য শাসন মিশরের নগর সভ্যতায় এক স্থায়ী অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে। তাদের পরবর্তীকালে গ্রিক ও রোমানদের রাজশক্তি তার উত্তরাধিকার লাভ করেছে। অতঃপর ইসলাম এসে সকল কিছুকে বাতিল করে দিয়েছে। অথচ এর পূর্বে মিশরের এ সভ্যতার একটা ধারাবাহিকতা রক্ষিত হচ্ছিল। অনুরূপভাবে ইয়ামেনেও সভ্যতার একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠা প্রাচীন আরব আমালেকা ও তুকা রাজ্য শাসনের ফলে দেখা দিয়েছিল এবং হাজার হাজার বছর ধরে অনুসৃত এ সভ্যতার পরবর্তী উত্তরাধিকারও লাভ করেছে, মুজার রাজশক্তি।

অনুরূপভাবে ইরাকেও সভ্যতা-সংস্কৃতির একটা ধারা নাবতী ও পারস্য শাসনের ফলে গড়ে ওঠে এবং কেলাদীয়, কায়ানী, সামানী ও আরবদের পর্যায়ক্রমিক প্রচেষ্টায় হাজার হাজার বছর ধরে তা অনুসৃত হতে থাকে। বস্তুত বর্তমানকাল পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে সিরিয়া, ইরাক ও মিশরবাসীদের ন্যায় সভ্যতার অধিকারী অন্য কোনো জাতি নেই। অনুরূপভাবে আন্দালুসেও সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি ধারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও স্থায়ী হয়ে ওঠে। কারণ গথদের রাজ্যশাসন সেখানে একটা ধারাবাহিকতা রক্ষা করে অগ্রসর হয়েছিল। পরবর্তীকালে বনি উমাইয়ারা তার উত্তরাধিকার লাভ করে এবং তাদের সম্মিলিত ধারাবাহিকতা সহস্র সহস্র হয়ে দাঁড়ায়। উক্ত দুটি সাম্রাজ্যই ছিল বৃহৎ এবং এর ফলে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার দরুন সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

কিন্তু আফ্রিকিয়া ও মাগরিবের অবস্থা তদ্রূপ নয়। সেখানে ইসলামের অনুপ্রবেশের পূর্বে তেমন কোনো বৃহৎ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। একমাত্র রোমান ও ফিরিঙ্গীরাই সমুদ্র অতিক্রম করে অফ্রিকিয়ায় পৌঁছেছিল এবং তীরাঞ্চলগুলোতে আধিপত্য বিস্তার

করেছিল। দূরদূরান্ত বিস্তারী বারবার গোত্রগুলোর আনুগত্য কখনই এ সকল সাম্রাজ্যের প্রতি দৃঢ়মূল হতে পারেনি। বস্তুত উক্ত আধিপত্যও দুর্গ ও সৈন্য ঘাঁটি ব্যতীত অন্যত্র বিস্তৃত হয়নি। এজন্য মাগরিব অঞ্চলে কোনো সাম্রাজ্যের ছায়াপাত কখনো ঘটেনি। একমাত্র গথদের প্রতি তারা সমুদ্রের এ তীরে থেকেই মাঝে মধ্যে আনুগত্যের শপথ প্রেরণ করেছে। অতঃপর আল্লাহ্ কর্তৃক ইসলামের আবির্ভাব ঘটলে এবং আরবরা আফ্রিকিয়া ও মাগরিবের উপর আধিপত্য বিস্তার করলেও প্রথম দিকে তা অল্পকালের জন্যই স্থায়ী হয়েছিল। অন্যদিকে আরবরা তখনও যাযাবরী জীবনধারায় অভ্যস্ত। তাদের মধ্যে যারা এ অঞ্চলে স্থায়ী হয়ে উঠেছিল, তারাও এমন কোনো সভ্যতার সাক্ষাৎ লাভ করেনি, যা পূর্ববর্তীদের নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অনুসরণ করতে পারে। কারণ বারবাররা সর্বদাই যাযাবরী জীবনের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। অতঃপর দূরতম মাগরিবের বারবাররা অতি অল্পকাল পরেই মায়সারা মুজাফফরীর নেতৃত্বে হিশাম ইবনে আবদুল মালেকের সময় সাম্রাজ্যের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে। এর পর আর তাদের মধ্যে আরব সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা প্রত্যাবর্তন করেনি। বরং তারা নিজেরাই স্বাধীনভাবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়। তারা ইদরিসের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেও তার ধরন আরবি ছিল না। কারণ বারবাররাই আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তাদের আরবদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। আফ্রিকিয়ার উপর আগালেবা ও তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট আরবরা প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিল। সম্ভবত এ কারণেই তাদের মধ্যে নাগরিক সভ্যতার কিছু কিছু নিদর্শন দেখা যায়। এও রাজশক্তির বিলাসব্যসন, ঐশ্বর্য এবং কায়রোয়ানের জনবসতির আধিক্যের জন্য সম্ভব হয়েছিল। তাদের কাছে এটা প্রথমে কুতামারা এবং পরে সিনহাজারা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। কিন্তু এ সমুদয় প্রচেষ্টাই অত্যন্ত স্বল্পকালের; সকল মিলিয়েও চারশ বছর হবে না। অতঃপর তাদের সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায় এবং এর সঙ্গে তাদের সদ্য প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার বর্ণও ধূসর হয়ে ওঠে। পুনরায় তার আরব বেদুইন হেলালীদের আধিপত্য বিস্তৃত হয় এবং তারা তা নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। শুধু নগর সভ্যতার একটি অতি গোপন ধারা তাদের মধ্যেই বিদ্যমান, যাদের পূর্বপুরুষরা এককালে কেলআ, কায়রোয়ান ও মাহদিয়ার অধিবাসী ছিলেন। পাঠক, আপনি তাদের আচার-আচরণ ও গৃহস্থালীর উপকরণের মধ্যে এমন অনেক নিদর্শন দেখতে পাবেন, যার মধ্যে নগর সভ্যতার সাথে অন্য বিষয় মিশ্রিত হয়ে রয়েছে। যে কোনো অভিজ্ঞ নাগরিকের পক্ষেই তার পার্থক্য বিচার করা সম্ভব। আফ্রিকিয়ার অধিকাংশ শহরেরই এ অবস্থা। কারণ সেখানে আগলেবাদের সময় থেকে শিয়া ও সিনহাজাদের সাম্রাজ্যকাল দীর্ঘ হয়েছিল। এ তুলনায় মাগরিবের সাম্রাজ্যকাল যেহেতু স্বল্পস্থায়ী, সেজন্য সেখানে নাগরিক সভ্যতার এরূপ গোপন নিদর্শনও বিদ্যমান নেই।

অবশ্য মাগরিবে আল-মোহেদদের আন্দালুস শাসনের সময় থেকে নাগরিক সভ্যতার একটি বিরাট অংশ স্থানান্তরিত হয় এবং তা তাদের অভ্যাসের মধ্যে স্থায়িত্বও লাভ করে। কারণ তারাই আন্দালুসের বিভিন্ন অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে তাকে শাসন করছিল। এর ফলে আন্দালুসবাসী বহুলোক ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মাগরিবে আগমন করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি-বিন্যাসের কথা পাঠক নিশ্চয়ই অবগত

আছেন; এর ফলে তাতে নাগরিক-সভ্যতার একটা ব্যাপক অংশ দেখা দেয় এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবশ্য এটা আন্দালুসীদের অনুকরণের ফলশ্রুতি মাত্র। অতঃপর পূর্ব আন্দালুসের অধিবাসীরা খ্রিস্টানদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে আফ্রিকিয়ায় আগমন করে। তারা সেখানে তার নগরগুলোতে সভ্যতার নিদর্শন রেখে যেতে সমর্থ হয়। এর অধিকাংশ ভাগ অবশ্য তিউনিসে এবং সেখানে তার সাথে মিশরীয় সভ্যতার মিশ্রণ ঘটেছিল। তদুপরি বিভিন্ন ভ্রমণকারীরাও এর মধ্যে মিশ্রণের উপাদান বহন করে এনেছিল। এভাবে মাগরিব ও আফ্রিকিয়ায় নগর সভ্যতার একটি বিরাট অংশ স্থায়ী হয়ে তার উপর থেকে পূর্বের আচ্ছাদন অপসৃত হয় এবং বংশপরম্পরায় অনুসৃত হতে থাকে। কিন্তু বারবাররা আবার তাদের সেই পূর্বের যাযাবরী জীবন ও স্থূলত্বের মধ্যে ফিরে যায়। এ সকল দিক লক্ষ করলে এ কথা অবশ্যই বলতে হয় যে, মাগরিব ও তার বিভিন্ন শহর অপেক্ষা আফ্রিকিয়ায় নগর সভ্যতার নিদর্শন তুলনামূলকভাবে অধিক। এর কারণ মাগরিব অপেক্ষা আফ্রিকিয়ায় সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব দীর্ঘতর এবং পরস্পরের মেলামেশার ফলে মিশরের সাথে এর সম্পর্ক ঘটিষ্ঠতর। পাঠক, এ বিষয়টি ভালো করে বুঝে নিন; কারণ বিষয়টি অনেকের নিকট অপরিচিত।

জেনে রাখুন যে, এ সভ্যতার ব্যাপারটি একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা মাত্র। এটা সাম্রাজ্যের সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি, কোনো জাতি বা পুরুষের লোকসংখ্যার বিস্তৃতি, শহর ও নগরের বিরাটত্ব এবং ঐশ্বর্য ও সচ্ছলতার প্রাচুর্যের সমাহার বিশেষ। কারণ সাম্রাজ্য ও রাজশক্তি মানুষের সমাজ ও সভ্যতার একটি মূর্ত প্রকাশ এবং এর অন্তর্গত সবকিছুই এর উপকরণ—প্রজা, নগর-পরিবেশ ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য অবস্থা। রাজকোষের সম্পদ তাদের কাছেই ফিরে আসে। তাদের সচ্ছলতা সাধারণত তেজী বাজার ও ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে এসে থাকে। শাসক তাঁর যে সম্পদ প্রজাদের মধ্যে বেতন ও দানধ্যানে ব্যয় করেন, তাই তাদের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি করে আবার তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করে এবং পুনরায় তার নিকট থেকে তাদের মধ্যে ফিরে যায়। প্রজারা এ কর ও রাজস্ব হিসাবে শাসককে প্রদান করে এবং শাসক বেতন হিসাবে আবার তাই তাদের মধ্যে ফিরিয়ে দেন। বস্তুত যে-কোনো সাম্রাজ্যের অবস্থা অনুসারেই প্রজাদের সাচ্ছন্দ্য দেখা যায় এবং প্রজাদের অবস্থা, এমনকি তাদের সংখ্যার অনুপাতেই সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য লাভ ঘটে। এর মূল ভিত্তি হল জনবসতি ও জনসংখ্যার ব্যাপকতা। পাঠক, এটাকে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রয়োগ করে বিবেচনা করুন এবং চিন্তা করে দেখুন; সত্য বলেই জানতে পারবেন। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দেন এবং তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘন করার মতো শক্তি কারো নেই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

[নগর সংস্কৃতি সভ্যতার শেষ পর্যায়, এর আয়ুষ্কালের অন্তিম এবং এর বিকৃতির লগ্ন নির্দেশক]

পাঠক, ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি যে, গোত্রপ্রীতির চরম পরিণতি রাজশক্তি ও সাম্রাজ্য স্থাপন এবং যাযাবরী জীবনের ক্রমবিকশিত গন্তব্য হল নগর সংস্কৃতি। এ সকল যাযাবরী, নাগরিক, রাজকীয় ও সাধারণ অবস্থার প্রতিটিরই একটি প্রত্যক্ষ জীবনকাল বিদ্যমান। যেমন সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তুর জন্যই একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। যুক্তি ও শ্রুতি উভয় ক্ষেত্রেই এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, একটি মানুষের জন্য তার বিকাশ ও শক্তি অর্জনের চরম সীমায় পৌঁছতে চল্লিশ বছর প্রয়োজন। সুতরাং সে যখন চল্লিশ বছরে পৌঁছায়, তখন তার প্রকৃতি বিকাশ ধারায় কিছু কালের জন্য থমকে দাঁড়ায় এবং এর পর বাঁচার দিকে অগ্রসর হয়ে যায়। কাজেই, পাঠক, এটা অবশ্যই জেনে রাখুন যে, সভ্যতাও একই অবস্থার অধীন; তারও একটি চরম পর্যায় আছে, যার পর সে আর বিকশিত হতে পারে না। কারণ কোনো জনবসতির জন্য যখন বিলাস ও ঐশ্বর্য আয়ত্তাধীন হয়, তখন তা স্বভাবতই তাদেরকে নগর সংস্কৃতি ও তৎসংশ্লিষ্ট অভ্যাসাদি সৃষ্টির দিকে আকর্ষণ করে। আর নগর সংস্কৃতি সম্পর্কে, পাঠক, আপনি যা জানেন, তা এই যে, তা অনিবার্যভাবে নানাবিধ বিলাসসামগ্রীর সৃষ্টি করে এবং অবস্থার মধ্যে নতুনত্বের ধারা বহন করে আনে যে শিল্প সামগ্রীতে কারুকার্য করা সম্ভব, সে তাতে নানা আকার ও প্রকারের উদ্ভাবন ঘটায়। যেমন রন্ধন শিল্প, পরিচ্ছদ শিল্প, স্থাপত্য শিল্প, শয্যা শিল্প, অথবা বাসন শিল্প এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য সমুদয় সামগ্রী। কারুকার্য বিধানের ফলে তাদের প্রতিটিতে এত বৈচিত্র্য বিদ্যমান, যা যাযাবরী জীবন ও কারুকার্যহীন অবস্থায় কখনই তেমন প্রয়োজনীয় বলে অনুভূত হয় না। যখন গৃহস্থালীর এ সকল অবস্থা একটা চরম কারুকার্যের অধীন হয়ে পড়ে, তখন তাকে অনুসরণ করার প্রবৃত্তিও সম্ভোগপ্রিয় হয়ে ওঠে। মানবাত্মা এর ফলে এমন সকল অভ্যাসের দ্বারা রঞ্জিত হয়ে ওঠে যে, তার চাহিদা পূরণে তার ধর্ম ও পার্থিব সম্পদ উভয়েই অপারগ হয়ে পড়ে। ধর্ম ব্যর্থ হয়; কারণ তার প্রবৃত্তিতে এ সকল অভ্যাস এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ায় যে, তাকে উচ্ছেদ করা কিছুতেই সম্ভব হয় না। পার্থিব সম্পদ অপারগ হয়; কারণ তার এ অভ্যাসের চাহিদা পূরণ করতে হলে যে পরিমাণ ব্যয় করা দরকার, তা তার উপার্জন কিছুতেই যোগান দিতে সমর্থ হয় না।

এর বর্ণনা এই যে, যে নগরী বিচিত্র সাংস্কৃতিক তৎপরতার অধিকারী, তার অধিবাসীদের ব্যয়ভার বিরাট আকার ধারণ করে। অন্যদিকে নগর সংস্কৃতি জনবসতি

অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং যে নগরীর জনসংখ্যা অধিক, তার সংস্কৃতিও সেই অনুপাতে পূর্ণতর রূপের অধিকারী। ইতিপূর্বে আমরা এ কথাও বর্ণনা করেছি যে, অধিক জনবসতিপূর্ণ নগর তার বাজার মূল্যে মহার্ঘতা এবং তার প্রয়োজন পূরণে অধিকতর মূল্য দিয়ে থাকে। তদুপরি এর উপর কর আরোপিত হয়ে তাকে আরো দুর্মূল্য করে তোলে। কারণ সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির শেষ পর্যায়েই ঘটে এবং এ সময়ই সাম্রাজ্যের ব্যায়ভার বেড়ে যাওয়ার জন্য করাদি আরোপ করা হয়, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ কর পণ্যসামগ্রীর দুর্মূল্যতা বাড়ায়। কারণ ব্যবসায়ী ও দোকানী সকলেই তাদের মজুদমাল ও পুঁজির উপর তাদের অন্যান্য ব্যয়, এমনকি নিজেদের পরিশ্রমের মূল্যকেও চাপিয়ে দেয়। এ কারণেই আরোপিত কর তারা বিক্রিত পণ্যের মূল্যের মধ্যে ধরে দেয়। এর ফলে নগরবাসীদের ব্যয়ের মাত্রা বেড়ে তা সুলভ অবস্থা ত্যাগ করে অপব্যয়ের দিকে এগিয়ে যায়। বিচিত্র অভ্যাস ও তাদের প্রতি আনুগত্যের ফলে তারা এটা থেকে মুক্তি পাবার পথ খুঁজে পায় না। তাদের আয়ের সকল অংশই এ ব্যায়ের গহ্বরে পতিত হয়। তারা একে একে অনাহার ও অসচ্ছলতার দিকে অগ্রসর হয় এবং দারিদ্র্য এসে তাদের উপর চেপে বসে। পণ্যাদি ক্রয়ের পূর্বের সেই মরিয়াভাব আর থাকে না। বাজারে মন্দাভাব দেখা দেয় এবং নগরীর পরিবেশ শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এমনিভাবে করুণ পরিণতির সকল উপকরণই নগর সংস্কৃতি ও তার বিলাসিতা ডেকে আনে এবং এরা পরিণামে অত্যন্ত সাধারণভাবে বাজার ও সভ্যতার ধ্বংস সাধন করে নগরীর বিলুপ্তি ঘটায়।

অবশ্য নগরবাসীদের নিজেদের মধ্যে একাদিক্রমে অবক্ষয়ের চিহ্নাদি পরিস্ফুট হওয়ার ব্যাপারটি এ সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে, এ সকল অভ্যাসের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে তারা যে পরিমাণ আয়াস ও কষ্ট স্বীকার করে, তাতেই তাদের প্রবৃত্তি কলুষ কালিমায় লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং মানবাত্মার স্বভাবসুলভ পথ ত্যাগ করার ফলে এ অনাচারের কুফল তাকে নিস্তেজ করে ফেলে। এজন্য ক্রমশ তার মধ্য থেকে দুষ্কর্ম, দুর্নীতি, প্রতারণা এবং জীবন-যাপনে কোনো না কোনো প্রকারের কূটকৌশল প্রকাশ পেতে থাকে। জীবাত্মা তার চিন্তায়, অন্বেষণে এবং তার জন্য যে কোনো অপকৌশল প্রয়োগে ব্যাপৃত হয়ে পড়ে। পাঠক, এ জন্যই আপনি তাদেরকে মিথ্যা, জুয়াজোচ্চুরি, প্রতারণা, চুরি, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ও পণ্যসামগ্রীতে ভেজাল মিশ্রণে নির্ভীক অবস্থায় দেখতে পান। অতঃপর আপনি অবশ্যই তাদেরকে বিলাসিতার ফলে ভোগ সম্ভোগের অনিবার্য তাড়নায় দুষ্কর্মের সকল মত ও পথ সম্পর্কে অধিকতর অবহিত দেখতে পাবেন। তারা এটা প্রকাশ্যে করতে এবং এর দাবি উত্থাপন করতেও দ্বিধা করে না। তারা এর অন্বেষণে লজ্জাশরমকে বিসর্জন দেয় এবং নিজেদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়পরিজন ও গুরুগুর্বীর সম্মুখেও মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। অথচ তাদের সম্মুখে অনুরূপ আচরণ প্রকাশে ও নির্লজ্জ হওয়ার ব্যাপারে যাযাবরী জীবনের অধিকারীরা কল্পনাও করতে পারে না। পাঠক, আপনি তাদেরকে কূটকৌশল ও প্রতারণায় অভিজ্ঞ দেখতে পাবেন; যাতে তারা এর সাহায্যে সম্ভাব্য ভর্ৎসনা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে এবং তাদের পক্ষে দুষ্কর্মের যথাযোগ্য শাস্তি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। এমনিভাবে এগুলো নগরবাসীদের

অধিকাংশের অভ্যাস ও চরিত্রে পরিণত হয়; অবশ্য আল্লাহ্ যাকে বাঁচান, সেই শুধু বাঁচে। নগরীর পরিবেশ এ প্রকার নিম্ন শ্রেণীর অসচ্চরিত্র লোকের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং সাম্রাজ্যের অধিপতি ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা এদের সংস্পর্শে এসে মলিন হতে থাকে। বিশেষ করে সাম্রাজ্য যাদের শাসনের ব্যবস্থা করেনি এবং যাদেরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ত্যাগ করেছে, তারা অনিবার্যভাবে সঙ্গী ও প্রতিবেশীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ ক্ষেত্রে বংশগত কৌলিন্য ও পারিবারিক ঐতিহ্য কোনো কাজেই লাগে না। কারণ মানুষ অনুকরণপ্রিয়। তারা একমাত্র চরিত্র, সদ্‌গুণ অর্জন এবং অসৎ স্বভাব বর্জনের মধ্য দিয়েই শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য লাভ করে থাকে। সুতরাং কারো মধ্যে যদি কোনো কারণে একবার অসৎ স্বভাব দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে, তা হলে সে সর্বপ্রকার সদ্‌গুণ হারিয়ে বসে এবং তখন তার বংশগত কৌলিন্য ও পারিবারিক ঐতিহ্য তাকে কোনো সাহায্যই করতে পারে না। এ কারণেই পাঠক, দেখতে পাবেন যে, বহু সম্ভ্রান্ত বংশীয়, সৎ পরিবার ও রাজকীয় ঘরানার সন্তানেরা নিচু শ্রেণীর লোকদের সাথে মিশে নিতান্ত হীন পেশা গ্রহণ করে জীবন-যাপন করছে। কারণ তাদের চরিত্রের পতন ঘটেছে এবং তারা মন্দস্বভাব ও প্রতারণায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। যখন কোনো জাতি অথবা নগরীর মধ্যে অনুরূপ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন আল্লাহ্ তার ধ্বংস ও বিনাশের নির্দেশ প্রদান করেন। এটাই তাঁর সেই মহান বাণীর মর্ম, যেখানে তিনি বলেছেন, আমরা যখন কোনো গ্রামকে ধ্বংস করে ফেলতে ইচ্ছে করি, তখন আমরা তার বিলাসী ধনিকদেরকে নির্দেশ দেই—তারা সেখানে দুষ্কর্ম করে; সুতরাং তাদের উপরে সত্য প্রকটিত হয়। অতঃপর আমরা তাকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে ফেলি।[৪৭]

তার কারণ এই যে, এ পরিস্থিতিতে তাদের উপার্জন তাদের অভাব পূরণ করতে সমর্থ হয় না। কেননা তাদের অভ্যাস অত্যধিক এবং প্রবৃত্তির তাড়না সবল। সুতরাং তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। এভাবে একের পর এক মানুষের অবস্থায় অবক্ষয় দেখা দিলে সমুদয় নগরীর শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে এবং ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। সম্ভবত এ কারণেই কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলে থাকেন, কোনো নগরে যখন নারাঙ্গি গাছের সংখ্যা বেশি হয়, তখন বুঝতে হবে তা ধ্বংসের সন্নিকটবর্তী। এজন্য সাধারণ নাগরিকদের অনেকেই নারাঙ্গি গাছ লাগায় না। এবং তাদের ঘর দ্বারে এর অবস্থানকে অশুভ বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়; তার বিনাশ বিশেষ করে নারাঙ্গি গাছের সাথে যুক্ত করার কোনো হেতু নেই। বরং এর অর্থ এই যে, নগর উদ্যান ও জলের ফোয়ারা নাগরিক সভ্যতার অনিবার্য ফসল। এদের মধ্যে নারাঙ্গি, লেবু[৪৮], সরল ও এ প্রকার অন্যান্য গাছ, যা কোনো আহার্য যোগায় না, উপকারও দেয় না; তার উপস্থিতি শুধু নগর সংস্কৃতির চূড়ান্তরূপই প্রকাশ করে। কেননা উদ্যানে এগুলো শুধু অঙ্গ সৌরবের জন্য লাগানো হয় এবং তাও নগর সংস্কৃতি তার যাবতীয় বৈচিত্র্যসহ আত্মপ্রকাশ করার পরই সম্ভব হয়ে থাকে। এটাই সেই পর্যায়, যেখানে নগরের বিনাশ ও অবক্ষয়ের আরম্ভ, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। করবী গাছ সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বলা

৪৭. কোরান, ১৭, ১৬।

৪৮. সম্ভবত এ সকল ফলের ব্যবহার একান্ত সীমিত বিধায় অনুরূপ মন্তব্য করা হয়েছে।

হয়েছে। এও এ পর্যায়েরই ব্যাপার। কারণ উদ্যানে করবী রোপণের উদ্দেশ্য হল তার সাদা লাল ফুলের দ্বারা তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। এটা বিলাসের ধর্ম।

নগর সংস্কৃতির বিচারের অন্যতম আরো একটি কারণ হল প্রবৃত্তির সম্ভোগ ও তার বল্গাহীন অনুশীলনের বিলাস। এর ফলে ঔদারিকতার প্রসার ঘটে এবং চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের ব্যাপারে আতিশয্য দেখা দেয়। এরই অনুসারী হয়ে আসে যৌনবিলাস–অধিক বিবাহ, ব্যভিচার ও সমকামিতা। এগুলোর প্রসার মানব জাতির অস্তিত্বকে বিকৃত করে তোলে। ব্যভিচার বংশধারার মধ্যে এক অস্বাভাবিক মিশ্রণের সৃষ্টি করে প্রত্যেককেই নিজের সন্তান সম্পর্কে সন্দিগ্ধ করে দেয়। কারণ গর্ভধারণে একাধিক বীর্যের উপস্থিতি কোনোটিরই নিশ্চয়তা বিধান করে না। এর ফলে সন্তানের প্রতি স্বাভাবিক অপত্য স্নেহের অভাব দেখা দেয় এবং তাদের প্রতিপালনের প্রতি উদাসীনতার ফলে তার ধ্বংস হয়ে যায়। এরূপ মনোভাব মানব জাতির অস্তিত্বের পরিপন্থী। অন্যদিকে অনুরূপ মিশ্রণের সন্দেহ ছাড়াও অস্তিত্বের বিনাশ ঘটতে পারে; যেমন সমকামিতার দ্বারা হয়ে থাকে। তাতে সন্তান উৎপাদনের সম্ভাবনাই হ্রাস প্রায়। এ কারণে এ ব্যাপারটি ব্যভিচার থেকেও জঘন্য। কেননা এর প্রসার মানুষের অস্তিত্বের বিকাশ ব্যতিরেকেই নিঃশেষ হয়ে যায়। অথচ ব্যভিচার স্বয়ং অস্তিত্বহীনতা নয়; বরং তার উপাদানকে বহন করে মাত্র। এ বিষয়ে ইমাম মালেকের মতাদর্শ অন্য সকলের অপেক্ষা বিশিষ্ট।[৪৯] এতে বোঝা যায়, তিনি এ সম্পর্কে ধর্মীয় বিধানের যথার্থতাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

পাঠক, এ বিষয়টি ভালো করে বুঝে নিন এবং বিবেচনা করে দেখুন যে, যথার্থই নগর সংস্কৃতি ও তার বিলাসব্যসন সভ্যতার চরম পর্যায়। বস্তুত তা যখন তার চরম বিকাশ সীমায় পৌঁছে, তখনি তাতে বিকৃতি দেখা দেয় এবং অবক্ষয়ের অধীন হয়ে পড়ে। যেমন প্রাণীদের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল অনুরূপ অবক্ষয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বরং বলতে গেলে নগর সংস্কৃতি ও বিলাসব্যসনের ফলে যে অভ্যাসাদি গড়ে ওঠে, তারাই মূর্তিমান অবক্ষয়। কারণ, মানুষ এ কারণেই মানুষ যে, সে তার কল্যাণ আকর্ষণ করার, তার অকল্যাণকে প্রতিরোধ করার এবং এ সকল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তার চরিত্র দৃঢ় করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু একজন নগরবাসীর পক্ষে নিজের এ ক্ষমতা বহিঃপ্রকাশের কোনো সুযোগ নেই। কোথাও সে স্বস্তিজনিত অক্ষমতার জন্য তার প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ করতে সমর্থ হয় না। আবার কোথাও প্রাচুর্য ও বিলাসিতার মধ্যে প্রতিপালিত হওয়ার ফলে অহংকারের জন্য সে তা করতে ঘৃণা করে। এ দুটি মনোভাবই ঘৃণিত। এভাবে সে তার অকল্যাণকে প্রতিরোধ করতে এবং তজ্জন্য তার চরিত্রকে সংশোধন করতেও সে অপারগ। কারণ নাগরিক তার শিক্ষাদীক্ষা ও শাসনের মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে প্রয়োজনীয় শৌর্যকে হারিয়ে বসেছে। সে এখন রক্ষীদলের উপর নির্ভরশীল; তারাই তার পক্ষ থেকে প্রতিরোধের কাজ করে। এ অবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার ধর্মকেও বিকৃত করে ফেলে। কারণ তার প্রবৃত্তি যে সকল অভ্যাসের দ্বারা পরিবৃত্ত এবং তার আত্মা যে সকল কালিমার দ্বারা কলুষিত, তা থেকে মুক্তি পাবার কোনো পথ তার

৪৯. মালেকী মজহাবে এর জন্য প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু নির্দিষ্ট রয়েছে।

নেই; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। খুব কম ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। কাজেই মানুষ যখন তার ক্ষমতা, চরিত্র ও ধর্মের দিক থেকে বিকৃত হয়ে পড়ে, তখন বলতে গেলে তার মনুষ্যত্বই বিনষ্ট হয় এবং তা স্বভাবের বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। এ দিক থেকে দেখতে গেলে যারা সুলতানী সৈন্যদলে থাকা সত্ত্বেও যাযাবরী জীবন ও স্থূলরুচির অধিকতর নিকটবর্তী, তারা এ নগর সংস্কৃতি ও তার চারিত্রিক পরিমণ্ডলে প্রতিপালিত ব্যক্তিদের অপেক্ষা অনেকখানি সুস্থতার অধিকারী। এটা প্রায় প্রতিটি সাম্রাজ্যেই বিদ্যমান। উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, নগর সংস্কৃতি পৃথিবীর সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের বিকাশের একটি চরম বিরতি পর্যায়। আল্লাহ্ পবিত্র ও মাহন; প্রতি মুহূর্তে তিনি কর্তব্যরত[৫০] এবং কোনো কর্তব্যই তাঁকে অন্য কর্তব্য থেকে বিরত রাখতে পারে না।

৫০. কোরান।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

[যে নগরগুলো রাজশক্তির কেন্দ্র হিসাবে বিরাজ করে, সাম্রাজ্যের পতন ও অবক্ষয়ে তারা ধ্বংসের সম্মুখীন হয়]

আমরা ইতিপূর্বে সভ্যতার আলোচনায় বক্তব্য রেখেছি যে, যখন কোনো সাম্রাজ্য অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন তার শাসকের রাজধানী হিসাবে যে নগরী বিরাজমান ছিল, তার জনবসতিও হ্রাস পায়। অনেক সময় তা ধ্বংসের পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়। তার ব্যতিক্রম খুব কমই দেখা যায়। এর কতিপয় কারণ বিদ্যমান।

প্রথমত, প্রতিটি সম্রাজ্যই তার প্রথম দিকে যাযাবরী চরিত্রের অধিকারী হওয়ার ফলে মানুষের সম্পদ সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকে এবং এ ব্যাপারে কোনোপ্রকার চাতুর্যের প্রশ্রয় দেয় না। এর ফলে রাজকোষের উৎস কর ও জরিমানার চাপ খুব কম থাকে। ব্যয় কম হওয়ার জন্য বিলাসিতার খুব একটা অবকাশ থাকে না। সুতরাং ঐ নগরী যখন পূর্ববর্তী রাজশক্তির কবল থেকে পরবর্তী অন্য কোনো নতুন শক্তির আয়ত্তাধীন হয়ে পড়ে, তখন সেখানে বিলাসব্যসনে ভাটা পড়ে। নতুন রাজশক্তির অধীনস্থ প্রজারাও বিলাসব্যসন থেকে দূরে সরে দাঁড়ায়। কারণ প্রজাবৃন্দ শাসকদের অনুসারী হয়ে থাকে। সুতরাং তারা সাম্রাজ্যের রীতিনীতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। অনেক সময় এটা স্বেচ্ছায় হয়; কেননা মানুষ স্বাভাবিকভাবেই নেতৃবৃন্দের আদর্শ অনুসরণ করে। আবার অনেক সময় তারা অনুরূপ আচরণ করতে বাধ্য হয়। কেননা সাম্রাজ্য তাদেরকে বিলাস সংকোচের দিকে আহ্বান জানায় এবং অভ্যাসাদির পরিপোষক প্রয়োজনীয় ঐশ্বর্য থেকেও তাদেরকে বিরত রাখে। এ কারণে নগর সংস্কৃতির মধ্যে ভাটা দেখা দেয় এবং বিলাসব্যসনের বহু কিছু বিদূরিত হয়। এটাই সেই অবস্থা, যা আমরা নগর সংস্কৃতির বিনাশ বলে উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল, যে কোনো সাম্রাজ্যের পক্ষে একমাত্র শত্রুতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের পরই প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি লাভ হয়ে থাকে। এ শত্রুতার অর্থ হল প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি সাম্রাজ্যের মধ্যে একে অপরের অস্তিত্ব বিলোপ করার প্রয়াস। তাদের প্রত্যেকেই নিজের অভ্যাস ও অবস্থার আধিক্যের দ্বারা অপরের উপর জয়ী হতে চেষ্টা করে। সুতরাং দুটি প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে একটির বিজয়ের অর্থ অন্যটির বিলোপ সাধন। এর ফলেই পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যের সকল বিষয়ই নবাগত সাম্রাজ্যের নিকট দূষণীয়, ক্ষতিকর ও কদর্য বলে ঠেকে। বিশেষ করে বিলাসব্যসনের সকল অবস্থাই নবাগতরা ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে এবং তারা তার স্থলে নবতর বিলাসলীলার উদ্ভব ঘটায়। এভাবে পর্যায়ক্রমে তারা

সম্পূর্ণ নতুন একটি নগর সংস্কৃতির জন্ম দেয়। কিন্তু এর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত ভূতপূর্ব সাম্রাজ্যের সংস্কৃতি বিনাশ পেতে থাকে। এটাকে আমরা নগর সংস্কৃতির অবক্ষয় বলে বর্ণনা করেছি।

তৃতীয় বিষয়টি হল, প্রত্যেক জাতির একটি জন্মস্থান প্রয়োজনীয়, যেখান থেকে তাদের আবির্ভাব ঘটবে এবং তাদের রাজশক্তির সূত্রপাত হবে। এর পর তারা যখন অন্য কোনো দেশ জয় করে, তখন তা পূর্বটির অনুসারী হয় এবং তার শহর-নগরও পূর্ববর্তী শহরের অনুগত হয়ে ওঠে। এভাবে অধিকৃত সাম্রাজ্যে শক্তির বিন্যাস প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল মধ্যভাগে হওয়া উচিত; যাতে সে শক্তি বিন্যাসেরও কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। ফলে, সাম্রাজ্যের অধিকারীরা তাদের পূর্ববর্তী রাজধানী ত্যাগ করে নতুন রাজধানী স্থাপন করে এবং তাদেরকে অনুসরণ করে মানুষ সম্রাট ও সাম্রাজ্যশক্তির নৈকট্যের জন্য সেই নতুন স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পরিণামে প্রথমটির জনবসতি কমে গিয়ে উজাড় হয়ে যায়। অথচ নগর সভ্যতা জনবসতির আধিক্যের ফলেই সজীব থাকে; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এখানে তার অভাব দেখা দেয়ার ফলে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে। এটাই আমাদের আলোচ্য অবক্ষয়।

এর উদাহরণ সলজুকীদের ঘটনা থেকে নেয়া যায়। তারা তাদের রাজধানী বাগদাদ থেকে ইস্পাহানে স্থানান্তরিত করায় অনুরূপ অবস্থা দেখা গিয়েছিল। আরবরাও পূর্ববর্তী শাসনকেন্দ্র মাদায়েন থেকে বসরা ও কুফায় তা স্থানান্তরিত করেছিল। অনুরূপভাবে বনি আব্বাস উমাইয়া রাজধানী দামেশককে ত্যাগ করে বাগদাদকে বরণ করে নিয়েছিল। মাগরিবের বনি মারিণও মারাকেশ থেকে ফেজে রাজধানী স্থানান্তর করে। মোটামুটিভাবে সাম্রাজ্যের এ প্রকার রাজধানী পরিবর্তন প্রথম নগরীর সভ্যতার ক্ষতি সাধন করে।

চতুর্থ বিষয়টি হল, যে কোনো নতুন সাম্রাজ্য যখন পূর্ববর্তী অন্য কোনো সাম্রাজ্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তখন এ নতুন শক্তি অবশ্যই পূর্ববর্তী শক্তি ও তার দলবল সম্পর্কে অবহিত হতে চেষ্টা করে এবং তাদেরকে যতদূর সম্ভব সাম্রাজ্যের এমন কোনো অংশে বিতাড়িত করতে উদ্যোগ নেয়, যাতে তারা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে সমর্থ না হয়। কারণ, রাজধানীর অধিকাংশ লোকই সাম্রাজ্যের সমর্থক; হয় তারা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় সহায়ক শক্তি হিসাবে এখানে এসেছে অথবা তারা নাগরিক হিসাবেই উক্ত সহায়তায় অংশগ্রহণ করেছে। কারণ তারা যে নগর পরিবেশে বসবাস করে, তাতে সাধারণভাবেই সাম্রাজ্য শক্তির সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। কেননা তারা বিচিত্র পেশায় ও বিভিন্ন আকারে জীবিকা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। এ কারণে দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই এ সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়াতলে লালিত হয়ে তারই অনুসারী হয়ে উঠেছে। হয়ত বা তারা শৌর্যবীর্য বা গোত্রপ্রীতির অধিকারী নয়; কিন্তু দীর্ঘদিন সাম্রাজ্যের বদান্যতায় তার প্রতি যে সম্প্রীতি ও আনুগত্যের ভাব জন্মেছে, তার আকর্ষণেই তার স্থায়িত্বে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। কিন্তু নবাগত সাম্রাজ্য শক্তি স্বাভাবিকভাবেই পুরাতন সাম্রাজ্যের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত করতে প্রয়াসী হয়। সুতরাং তারা

এ প্রকার লোকদেরকে সম্ভাব্য নিরাপদ স্থানে তাদের তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করে। অনেক সময় তারা বন্দী ও অন্তরীণ অবস্থায় যায়; আবার অনেক সময় বেশ সম্মান ও সৌহার্দের সাথে তাদেরকে স্থানান্তর করা হয়। যাতে তারা কোনোপ্রকার অসদ্ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে না পড়ে। এ বিতাড়নের ফলে অবস্থা এমনই দাঁড়ায় যে, রাজধানীতে ব্যবসায়ী, কৃষিকর্মের সাথে জড়িত মজদুর, কয়ালের কাজে নিযুক্ত কর্মী এবং সাধারণ মানুষ ব্যতীত আর কেউই অবশিষ্ট থাকে না। তাদের শূন্যস্থানে নবাগত শক্তির সাহায্যকারী ও দলবল এসে জাঁকিয়ে বসে এবং নগরীর নতুন প্রাণসঞ্চার করে। কিন্তু ইতিপূর্বে পুরাতনের যাওয়ার ফলে নগরীর জনবসতিতে যে শূন্যতা দেখা দেয়, তাকেই আমরা নগর সভ্যতার অবক্ষয় বলে নির্দেশ করেছি।

অতঃপর এ স্থলেই নবাগত সাম্রাজ্য শক্তির ছত্রচ্ছায়াতলে আবার নবীন জনবসতি গড়ে ওঠে এবং তাদের সহায়তায় সাম্রাজ্যের যোগ্যতা অনুযায়ী একটি নতুন সংস্কৃতিও জন্মলাভ করে। এর তুলনা এমন একটি গৃহের সাথে করা যায়, যার মধ্যে প্রচুর অসুবিধা বিদ্যমান এবং তার অনেক গঠন ও সুযোগ-সুবিধা বর্তমান পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এমন একটি গৃহের কেউ যদি অধিকার লাভ করে, তা হলে তার সামর্থ্যানুসারে বিশেষ বিশেষ ধারায় অবশ্যই এ গৃহের পরিবর্তন সাধন করবে। তার গঠন বদলে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে নিশ্চয়ই সে নিজের চাহিদা ও পরিকল্পনা মত তাকে গড়ে তুলবে। সুতরাং সে এ গৃহের অনেক কিছুই ভেঙে ফেলে পুনরায় নির্মাণ করবে। বস্তুত এ প্রকার বহু ঘটনাই আমরা রাজধানী শহরগুলোতে ঘটতে শুনেছি ও দেখেছি। আল্লাহ্ দিবারাত্রি নির্ধারণ করে থাকেন।[৫১]

সামগ্রিকভাবে এরূপ পরিস্থিতির প্রাথমিক স্বাভাবিক কারণ হল এই যে, রাজশক্তি ও সাম্রাজ্য সভ্যতার জন্যই; তারা যেন তার প্রমূর্তরূপ। বস্তুত সভ্যতার উপকরণগুলোকেও যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য এ শক্তি সংগঠনের প্রয়োজন। বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিষয়াবলির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, এদের একটি থেকে অন্যটিকে পৃথক করা যায় না। সুতরাং জনবসতি ব্যতীত সাম্রাজ্য যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি জনবসতিও সাম্রাজ্য ও রাজশক্তির সহায়তা ব্যতীত কোনো কিছু করতে অপারগ। কারণ মানুষের স্বভাবে পরস্পর উৎপীড়নের যে ভাবটি বিদ্যমান, তার একজন শৃঙ্খলা বিধায়কের অস্তিত্ব অনিবার্য করে তোলে এবং তদনুযায়ী শাসন ব্যবস্থাও নির্ধারিত হয়ে যায়। তা ধর্মীয় বিধান অনুসারে অথবা রাজশক্তির প্রাধান্য বিস্তারে, যেভাবেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, তার অর্থই হচ্ছে সাম্রাজ্য। সুতরাং তারা যেহেতু পরস্পর পৃথক হতে পারে না, সেজন্য একের অবক্ষয় অন্যের অবক্ষয় ডেকে আনে এবং একের অস্তিত্বহীনতা অন্যের অস্তিত্বহীনতার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অবশ্য সভ্যতার সামগ্রিক বিনাশ একমাত্র সাম্রাজ্য শক্তির সামগ্রিক পতন থেকেই অস্তিত্বে আসে। যেমন সাধারণভাবে রোমান, পারস্য ও আরব সাম্রাজ্য এবং উমাইয়া ও আব্বাসী সাম্রাজ্য। আবার কখনো ব্যক্তিবিশেষের সাম্রাজ্য; যেমন নওশেরোয়াঁ, হিরাক্লিয়াস, আবদুল মালেক ইবনে মারোয়ান, হারুনুর রশীদ প্রমুখ সম্রাটগণ। তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে

৫১. কোরান, ৭৩, ২০।

সৃষ্ট সভ্যতায় পরবর্তী উত্তরাধিকারী এসে তাঁর অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধির ধারা অক্ষুণ্ন রাখে। তাঁদের মধ্যে নিকট সাদৃশ্য থাকার ফলে খুব একটা অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয় না। তার কারণ, সাম্রাজ্যের যে শক্তিটি সভ্যতার বিকাশ সাধনে তৎপর হয়, তা হল তার গোত্রপ্রীতি ও শৌর্যবীর্য। তা সাম্রাজ্যের বংশপরম্পরাগত ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্থায়ী হয়ে বিরাজ করে। সুতরাং এ গোত্র যখন বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন তার স্থলে যে গোত্রপ্রীতি এসে দেখা দেয়, তা সভ্যতায় কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। সুতরাং এটা পূর্ববর্তী শৌর্যবীর্যকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে সভ্যতার অবক্ষয়কে ব্যাপক করে তোলে; যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। তিনি যদি ইচ্ছে করেন, তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে নবীন সৃষ্টির আগমন ঘটাতে পারেন এবং তা আল্লাহ্র নিকট দুঃসাধ্য কিছু নয়।[৫৭]

৫৭. কোরান, ১৪, ১৯।

বিংশ পরিচ্ছেদ

[কোন কোন নগর অন্য নগর অপেক্ষা বিশেষ শিল্পকর্মের দ্বারা চিহ্নিত হয়]

এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, নগরবাসীদের পরিশ্রম পরস্পরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে। কেননা সভ্যতার মৌল প্রকৃতিই হল পরস্পর সহায়তা। এ সহায়তা সম্পাদনে যে শ্রম নিয়োজিত হয়, তা বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ জনগোষ্ঠীর আয়ত্তাধীনে থাকে এবং তারাই তার জন্য যত্নশীল হয়ে তৎসংশ্লিষ্ট শিল্পকর্মে দক্ষতা অর্জন ও তাকে তাদের পেশা হিসাবে গ্রহণ করে। তার দ্বারাই তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ এবং আহার্য অন্বেষণ করে থাকে। কারণ নগরবাসী সকলেই উক্ত শিল্পের মুখাপেক্ষী এবং দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োজন অনুভব করে। অন্যদিকে যে সকল শিল্পকর্মের চাহিদা নগরজীবনে অনুপস্থিত, তাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। কারণ তাতে দক্ষতা অর্জন বা তাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করায় কোনোপ্রকার উপকারিতা নেই।

এ সকল শিল্পকর্মের মধ্যে এমন অনেক শিল্প আছে, যা দৈনন্দিন জীবনের চাহিদার অন্তর্গত এবং প্রায় প্রতিটি শহরেই পাওয়া যায়; যেমন সীবন শিল্প, লৌহশিল্প, কাষ্ঠশিল্প এবং অনুরূপ অন্যান্য শিল্প। এর মধ্যে আবার কতগুলো আছে যা বিশেষভাবে বিলাসব্যসন ও তার অবস্থা বৈচিত্র্যের জন্য প্রয়োজনীয়। এগুলো একমাত্র বিপুল জনসংখ্যার অধিকারী নগরগুলোতে পাওয়া যায়। যেখানে জনজীবন নগর সংস্কৃতির অভ্যাস ও বিলাসব্যসনে পরিবৃত। যেমন কাঁচ শিল্প, রঞ্জন শিল্প, তেল শিল্প, রন্ধন শিল্প, তাম্রশিল্প, পিষ্টক শিল্প, শয্যা শিল্প, মাংস শিল্প এবং অনুরূপ অন্যান্য শিল্প। এদের মধ্যেও বৈচিত্র্য বিদ্যমান। সুতরাং যে-কোনো নগরীর সংস্কৃতি অভ্যাস ও বিলাসী চাহিদার অনুপাতেই উক্ত শিল্পকর্মসমূহের মধ্যে কতিপয় এক নগরে এবং অন্য কতিপয় অন্য নগরে বিকশিত হয়ে থাকে। স্নানাগারসমূহকেও এ পর্যায়ে ধরা যায়; তারাও কেবল বৃহৎ ও বিপুল জনসংখ্যার অধিকারী নগরগুলোতেই পাওয়া যায়। কারণ এগুলো ব্যবহারের জন্য বিলাসী মনোভাব ও সম্পদের প্রাচুর্য থাকা প্রয়োজন। এ কারণে স্নানাগার মধ্যমশ্রেণীর নগরগুলোতে পর্যন্ত পাওয়া যায় না। যদিও অনেক রাজশক্তি ও নেতৃবৃন্দ অনুরূপ কিছুর প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং স্নানাগারের পত্তন করে সচলও করে তোলেন, তথাপি যেহেতু সেখানে এগুলোর প্রতি সাধারণ মানুষের কোনো আকর্ষণ নেই, সেজন্য অতিসত্বর পরিত্যক্ত ও ধ্বংস হয়ে যায়। পরিচালনাকারীরা তা ছেড়ে পলায়ন করে। কারণ এরূপ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে তারা জীবিকা নির্বাহ বা কোনো প্রকার উপকার লাভ করতে সমর্থ হয় না। আল্লাহ্ সংকুচিত করেন এবং তিনিই প্রসারিত করেন।[৫৩]

---

৫৩. কোরান, ২, ২৪৫।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

[নগর জীবনে গোত্রপ্রীতির অস্তিত্ব এবং নগরবাসীর কতকাংশের অপর কতকাংশের উপর প্রাধান্য বিস্তার]

এটা অতিশয় সুস্পষ্ট যে, মানুষ এক বংশধারার অন্তর্গত না হলেও তাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সংযোগের স্বভাব বিদ্যমান। অবশ্য, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, এ সম্প্রীতি বংশধারাজাত সম্প্রীতি অপেক্ষা দুর্বল হয়ে থাকে। কারণ এর ফলে বংশধারাগত ঐক্যের একটি সামান্য অংশই লাভ হয়। নগরবাসীদের অনেকেই বৈবাহিক সম্পর্কেও ঘনিষ্ঠতা অর্জন করে এবং পরস্পরকে তারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ও আত্মীয়তা সূত্রে আকর্ষণ করে থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের মধ্যে গোষ্ঠী ও গোত্রাদির মধ্যকার শত্রুতা ও বন্ধুত্বের অনুরূপ মনোভাব বিদ্যমান। এর ফলে তারাও নানা দলে ও গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

এমতাবস্থায় যখন সাম্রাজ্যের মধ্যে অবক্ষয় দেখা দেয় এবং দূরবিস্তৃত অঞ্চলগুলো থেকে তার ছত্রচ্ছায়া সংকুচিত হয়ে আসে, তখন নগরবাসীরা তাদের নিরাপত্তা এবং তাদের আঞ্চলিক স্বার্থ সম্পর্কে তৎপর ও যত্নবান হতে বাধ্য হয়। তারা মিলিত হয়ে পরামর্শ করে এবং উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থকে নিম্ন শ্রেণীর স্বার্থ থেকে পৃথক করে ফেলে এবং যেহেতু মানুষের স্বভাবের মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের উচ্চাশা বিদ্যমান, সেই জন্য নেতৃস্থানীয়রা শাসকের দুর্বলতা ও সাম্রাজ্যের অসহায়তার সুযোগে অন্যায় হস্তক্ষেপের দিকে অগ্রসর হয়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই তার সঙ্গীর সাথে প্রতিযোগিতায় নামে এবং প্রত্যেকেই নিজ দল, পোষ্য ও চুক্তিবদ্ধ জনসমষ্টির নিকট থেকে সাহায্য ও আনুগত্য কামনা করে। তারা জনতা ও সাধারণের সমর্থন আদায়ের জন্য সম্পদ ব্যয় করতে আরম্ভ করে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সহচরকে অতিক্রম করার চেষ্টায় অবতীর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত কারো না কারো প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং অন্য সকলকে এর যোগ্যতা মেনে নিতে বাধ্য করে। সুতরাং তারা প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে হত্যা ও নির্বাসনের মাধ্যমে নির্মূল করতে চেষ্টা করে। এমনিভাবে তাদের মধ্য থেকে একটি কার্যকরী শৌর্য আত্মপ্রকাশ করে আক্রমণোদ্যত সকল নখরকে ভোঁতা করে ফেলে এবং সমগ্র নগর পরিবেশের উপর তাদের অন্যায় আধিপত্য বিস্তার পূর্ণ করে। তারা ধারণা করে যে, তার ফলে তাদের জন্য একটি নবীন রাজশক্তির ভিত্তি স্থাপিত হল, যা তাদের বংশাবলিতেও উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তাবে। সুতরাং এ ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে ও বৃহৎ সাম্রাজ্যের অনুরূপ উজ্জীবন ও অবক্ষয়ের সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়ে থাকে।

অনেক সময় তাদের অনেকেই বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিকারীদের ন্যায় জাঁকজমকের উচ্চাশা পোষণ করে। তারা যেমন গোত্র, জনগোষ্ঠী, গোত্রপ্রীতি, অভিযান, যুদ্ধবিগ্রহ, দেশ ও রাজ্যের অধিপতি হয়ে রাজকীয় বৈভব লাভ করেছে, এরাও তেমনি আড়ম্বরে তাদেরকে ভূষিত করে। এরাও সিংহাসনে উপবেশন করে, রাজকীয় পরিচ্ছদ তৈরি করে, বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের জন্য বাহন ব্যবহার করে এবং অঙ্গুরীয়, আদবকায়দা ও

রাজকীয় অভিভাষণের দ্বারা একটি রাজবিভ্রমের সৃষ্টি করে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট তাদের এ প্রকার আচরণ একান্ত উপহাসযোগ্য। কারণ তারা এমন কিছু করেছে, যার কোনো যোগ্যতা তাদের নেই। একমাত্র সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও তাদের কিছু সংখ্যক আত্মীয়-স্বজনই তাদেরকে অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি করতে সুযোগ দিয়েছে এবং এর ফলে তারা একটি গোত্রপ্রীতির অধিকারী হয়ে উঠেছে। অবশ্য অনেকে এ অবস্থা থেকে সসম্মানে দূরে সরে দাঁড়ায় এবং সরলভাবে নিজেদের অসারতা অনুধাবন করে অপরের নিকট হাস্যাস্পদ ও বাতুল হবার পূর্বেই সরে পড়ে।

বর্তমানকালে হেফসী সাম্রাজ্যের শেষের দিকে আফ্রিকিয়ার জারিদ অঞ্চলে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। সেখানে তারাবলিস, কাতেস, তোজারা, নফ্তা, কফসা, বস্করা, যাব এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলে রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে পূর্বোক্ত উচ্চাশার প্রসার কয়েক দশক যাবত লক্ষ করা যাচ্ছে। তারা তাদের নগর কেন্দ্রগুলোতে প্রাধান্য বিস্তার করে সাম্রাজ্যের শাসন এবং রাজকোষের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছে। তারা সাম্রাজ্যের প্রতি একটি দৃশ্যমান আনুগত্য ও সন্তুষ্টি বজায় রেখে তাকে অত্যন্ত ভদ্রতা, সদাশয়তা ও বশংবদতার সাহায্যে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে। তাদের প্রকৃত অবস্থা এ বাহ্যরূপের সম্পূর্ণ বিরোধী। বরং বর্তমানে তাদের এ অন্যায় অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে পরবর্তীদের মধ্যে বর্তেছে। তাদের চরিত্রেও সেই স্থূলতা ও অহংকার দেখা দিয়েছে, যা সাম্রাজ্যাধিপতি ও তাদের বংশাবলির মধ্যে দেখা দিয়ে থাকে। তাদের অবস্থা-ব্যবস্থা অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদেরকে সুলতানদের শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করে।

অবস্থা এভাবে চলবার পর আমাদের নেতা আমীরুল মোমেনীন আবুল আব্বাস এ অন্যায্য অধিকারের সমস্ত নিদর্শন বিলুপ্ত করে তাদের সকল ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছেন। তাঁর সাম্রাজ্যের ইতিহাস বর্ণনাকালে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করব।[৫৪] সিনহাজাদের সাম্রাজ্যের শেষের দিকেও অনুরূপ কিছু ঘটনা লক্ষ করা গিয়েছিল। সেখানেও জারিদ অঞ্চলের নগরসমূহের অধিবাসীরা অন্যায়ভাবে সাম্রাজ্যের উপর হস্তক্ষেপ করেছিল। অতঃপর আল-মোহেদদের নেতা ও সম্রাট আবদুল মোমেন ইবনে আলী তাদের সকল ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন এবং তাদেরকে স্বস্ব অধিকার হতে মাগরিবের দিকে বিতাড়িত করেন। এর ফলে উক্ত অঞ্চল থেকে তাদের সমুদয় নিদর্শন বিলুপ্ত হয়ে যায়, যেমন আমরা তাদের ইতিহাস বর্ণনার সময় উল্লেখ করব। বনি আবদুল মোমেন সাম্রাজ্যের শেষের দিকে 'সেবতা'তেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে।

সাধারণভাবে এ প্রকার অন্যায় হস্তক্ষেপ তাদের পক্ষেই সম্ভব হয়, যারা নগরীর মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশ ও পদমর্যাদার অধিকারী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের নেতৃত্ব ও ক্ষমতার প্রভাব বিদ্যমান। অনেক সময় গোলযোগ সৃষ্টিকারী নিচে শ্রেণীর সাধারণ লোকের হাতেও এ অন্যায় অধিকারের ক্ষমতা এসে পড়ে। কারণ গোত্রপ্রীতি, সাধারণ সম্প্রীতি ও জনতার সমর্থনে সে এর যোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। এমন কিছু কার্যকারণ এসে একত্র হয়, যার অনুপাতে এরা গোত্রপ্রীতিহীন উচ্চ শ্রেণীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে বসে। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ তাঁর সর্ব কর্মে বিজয়ী।[৫৫]

---

৫৪. রোজেনথালে আবুল আব্বাসের নামের উল্লেখ নেই।

৫৫. কোরান, ১২, ২১।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

[নগরবাসীদের ভাষা]

জেনে রাখুন, নগরবাসীদের ভাষা একমাত্র জাতি, প্রাধান্য বিস্তারকারী গোত্র এবং নগর পত্তনকারীদের ভাষাই হয়ে থাকে। এ কারণে বর্তমানকালে পূর্ব-পশ্চিমের সমুদয় ইসলামী সাম্রাজ্যাধীন শহরগুলোর ভাষা আরবি; যদিও মুজারী আরবি ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা ও তার কারক চিহ্নাদি বহুলাংশে বিনষ্ট হয়ে গেছে। এর কারণ এই যে, ইসলামী সাম্রাজ্যশক্তি বিচিত্র জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায় এর অস্তিত্বকে যেমন রক্ষা করেছে, তেমনি রাজশক্তিরও বিকাশ ঘটেছে। অন্যান্য সকল জাতিই তার এ বিকাশ ধারায় উপাদান হিসাবে কাজ করেছে এবং বাস্তব ক্ষেত্রেও আকৃতি সর্বদাই উপাদানের উপর অগ্রাধিকার লাভ করে। এ ক্ষেত্রে ধর্ম অগ্রাধিকার লাভ করেছে এবং তার ভিত্তি হল ধর্মীয় বিধান। তা যেহেতু আরবি ভাষায় লিপিবদ্ধ এবং তার প্রবর্তক নবী (সঃ) ও যেহেতু আরবি ভাষাভাষী, এ জন্য তার অধিকৃত সকল রাজ্যে আরবি ব্যতীত অন্য সকল ভাষা পরিত্যাগ করা হয়েছে।

পাঠক, এ ব্যাপারে হজরত উমর (রাঃ)-র নিষেধাজ্ঞার কথা বিবেচনা করুন। তিনি অনারব বাগ্‌বিধি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি বলতেন, এটা ধূর্তামি অর্থাৎ কূটকৌশল ও প্রতারণা। সুতরাং ধর্ম যখন অনারব ভাষার সংশ্রব ত্যাগ করল এবং সমগ্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাদের ভাষা আরবি হয়ে দাঁড়াল, তখন সকল রাজ্যেই অন্য ভাষা পরিত্যক্ত বিবেচিত হল। কারণ মানুষ সর্বদাই শাসক ও তাঁর ধর্মকে অনুসরণ করে থাকে। এর ফলে আরবি ভাষার ব্যবহার ইসলামী নিদর্শন ও আরবের আনুগত্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়াল। সকল মানুষই সকল রাজ্যে তাদের বাগ্‌ধারা ও ভাষা পরিত্যাগ করল। আরবি ভাষাই তাদের ভাষা হল এবং ধীরে ধীরে তা সকল নগরে সকল রাজ্যে স্থায়ী হয়ে উঠল। অনারব ভাষাগুলোই বরং সেখানে অনুপ্রবেশকারী ও অপরিচিত ঠেকতে লাগল। অতঃপর আরবি ভাষা এই ব্যাপক মিশ্রণের ফলে তার বিধি ও অন্ত্য চিহ্নাদির ক্ষেত্রে বিকৃত হয়ে উঠল, যদিও ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে তার শক্তি তখনো বিদ্যমান। এভাবে পরিবর্তিত আরবি ভাষাকে সকল ইসলামী শহর-নগরে 'নাগরিক ভাষা' বলে আখ্যায়িত করা হল।

তদুপরি বর্তমানকালে নগরবাসীদের অধিকাংশই আরবদের সন্তান-সন্ততি। ইসলামী সাম্রাজ্যগুলোতে তারাই এ সকল নগরের অধিপতি এবং তাদের বিলাস-ব্যসনের শিকারে পরিণত হয়েছিল। তারা তখন সংখ্যার দিক থেকে অনারবদেরকে

কোণঠাসা করে নিজেরা তাদের উত্তরাধিকার ও ভূমির অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিল। ভাষা যেহেতু উত্তরাধিকারের ব্যাপার; এজন্য পূর্বপুরুষদের ধারা অনুসারেই বর্তমানকালেও আরবি ভাষাই অবশিষ্ট রয়েছে। যদিও অনারবদের সাথে মেলামেশায় ক্রমশ তার বাগ্‌বিধিতে বিকৃতি দেখা দিয়েছে। এ কারণেই উক্ত ভাষাকে নাগরিক ভাষা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ শহর-নগরেই তার ব্যবহার সীমাবদ্ধ। কেননা যাযাবরী জীবনের অধিকারী আরবদের ভাষা অনুরূপ নয়; তার আরবিয়ত্ব এখনও অটুট রয়েছে।

অতঃপর যখন তাদের পরে অনারব দায়লমী ও সলজুকীরা পূর্বাঞ্চলে এবং জানাতা ও বারবাররা মাগরিবে আধিপত্য বিস্তার করল, সমুদয় ইসলামী সাম্রাজ্যের উপরই তাদের প্রাধান্য ও রাজশক্তি স্থাপিত হল, তখন এ ক্ষমতা বিচ্যুতির ফলে আরবি ভাষা আরো বিকৃত হয়ে উঠল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, মুসলমানরা যদি কোরান-হাদিসের প্রতি সমীহের ভাব পোষণ না করত, তা হলে তার অস্তিত্বই লোপ পেত। যেহেতু কোরান-হাদিস ব্যতীত ধর্মের সংরক্ষণ সম্ভবপর নয়, এজন্য তাদের ভাষার কল্যাণে অল্প করে হলেও আরবি কাব্য ও মুজারী বাগ্‌বিধির কিছুটা নগরগুলোতে বিদ্যমান ছিল। অতঃপর তাতার ও মোঙ্গলরা পূর্বাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করলে, তারা মুসলমান না হওয়ায়, আরবি ভাষার এই সহায়ক শক্তিটিই বিলুপ্ত হয়ে তা একেবারেই অপাংক্তেয় হয়ে পড়ল। এমনকি মুসলমানদের রাজ্যগুলোতেও তার চিহ্ন রইল না। ইরাক, খুরাসান, পারস্য, হিন্দু, সিন্ধু, মাওরায়ান্নাহার, উত্তরাঞ্চল, রোমদেশ—কোথাও এর অস্তিত্ব নেই। আরবি গদ্য ও পদ্যের যে ধারা প্রবাহিত ছিল, তা রুদ্ধ হয়েছে। শুধু আরবি জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়ায় আরবি ভাষা শিক্ষার একটা প্রচেষ্টা বিদ্যমান এবং তাও আল্লাহ্ যাদেরকে এরূপভাবে আরবি ভাষা সংরক্ষণের ক্ষমতা অর্পণ করেছেন, তারাই করে থাকে।

অবশ্য আরবি মুজারী ভাষার অনেকখানি এখনও মিশর, সিরিয়া, আন্দালুস ও মাগরিবে বর্তমান। ধর্মের অস্তিত্বই এর কারণ। অবশ্যই তাও কতকাংশেই মাত্র সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু ইরাক ও তার পরবর্তী রাজ্যগুলোতে তার বিকৃতরূপ ও মূল, কোনোটারই অস্তিত্ব নেই। এমনকি আরবি গ্রন্থগুলো অনারব ভাষায় লিখিত হচ্ছে এবং পাঠদান কেন্দ্রেও অনারব ভাষাতেই তাদের ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

আল্লাহ্‌ই সত্য সম্পর্কে অধিকতর অবগত। আল্লাহ্‌ই দিবারাত্রি নির্ধারণ করেন। আমাদের নেতা মুহম্মদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং তাঁর বংশধর ও সহচরদের উপর অসংখ্য অবারিত শান্তি সর্বদা মহাপ্রলয়ের দিবস পর্যন্ত বর্ষিত হতে থাকুক। সমস্ত প্রশংসাই নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিমিত্ত।

ইবনে খালদুন

তিউনিসিয়ার
স্মারক ডাকটিকিট

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ Arnold J. Toynbee
মুকাদ্দিমা সম্পর্কে বলেছেন
"undoubtedly the greatest work of its kind
that has ever yet been created by
any mind in any time or place."

Bernard Lewis তার *The Arabs in History*
গ্রন্থে ইবনে খালদুনকে উপস্থাপন করেছেন এভাবে
"the greatest historian of the Arabs
and perhaps the greatest
historical thinker of the Middle Ages"

আল-মুকাদ্দিমা দ্বিতীয় খণ্ড

ইবনে খালদুন

অনুবাদ। গোলাম সামদানী কোরায়শী

আল-মুকাদ্দিমা

[দ্বিতীয় খণ্ড]

দিব্য প্রকাশ

ইবনে খালদুন

আল-মুকাদ্দিমা

[দ্বিতীয় খণ্ড]

গোলাম সামদানী কোবায়শী
অনূদিত

তৃতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ২০১২
প্রথম দিব্যপ্রকাশ সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৭
প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৮১

আল্ মুকাদ্দিমা (২য় খণ্ড)
ইবনে খালদুন

প্রকাশক
দিব্যপ্রকাশ
৩৮/২ক বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১২১৫৭৪
dibyaprakashbooks@gmail.com

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মঈনুল আহসান সাবের

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন, ঢাকা

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

অনলাইনে বই পেতে
www.rokomari.com

মূল্য : ৫৫০ টাকা US $ 20

AL-MUQADDIMAH-VOL. II : A Bengali Translation of Ibn Khaldun's 'Al-Muqaddima' from 'Kitabul Ibar' by Ghulam Samdani Quraishy. First Published June 1981. First Dibyaprakash edition : February 2007. Cover design : Mainul Ahsan Saber. Price Tk. 550

ISBN 984 483 260 8

বিষয়-সূচি

পঞ্চম অধ্যায়

জীবিকা, তা অর্জন ও শিল্পগত বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং তৎসমুদয়ে ক্রিয়াশীল বিচিত্র অবস্থা ও সমস্যাবলি ৯

প্রথম পরিচ্ছেদ : সম্পদ ও উপার্জনের তাৎপর্য, এর ব্যাখ্যা এবং উপার্জন বস্তুত মানসিক শ্রমের মূল্য মাত্র ১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জীবিকা এবং এর বিভিন্ন প্রক্রিয়া, প্রকার ও প্রথা ১৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ . চাকরি স্বাভাবিক জীবিকা নয় ·১৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : প্রোথিত ও সঞ্চিত ধনভাণ্ডার থেকে সম্পদ লাভের চেষ্টা স্বাভাবিক জীবিকা নয় ১৮

পঞ্চম অধ্যায় : পদমর্যাদা সম্পদের জন্য উপকারী ২৪

ষষ্ঠ অধ্যায় : সাধারণভাবে সৌভাগ্য ও সম্পদ বশংবদ ও চাটুকারীদের করতলগত হয় এবং এ প্রকার চরিত্র সৌভাগ্যের অন্যতম কারণ ২৬

সপ্তম পরিচ্ছেদ ধর্মীয় বিষয়াদি পরিচালনাকারী; যেমন কাজী, মুফতী, মুদর্রিস ইমাম, খতিব, মুয়াজ্জেম এবং অনুরূপ অন্যান্যরা—সাধারণভাবে তাদের অবস্থা কখনই সচ্ছল হয় না ৩১

অষ্টম অধ্যায় : কৃষিকাজ দুর্বল শ্রেণী ও সরলপ্রাণ বেদুইনদের জীবিকা ৩৩

নবম পরিচ্ছেদ : বাণিজ্যের অর্থ এর প্রক্রিয়া ও প্রকার ৩৪

দশম পরিচ্ছেদ : কোন্ শ্রেণীর লোক বাণিজ্যের দ্বারা উপকৃত হয় এবং কাদের তা পরিত্যাগ করা উচিত ৩৫

একাদশ পরিচ্ছেদ . ব্যবসায়ীদের চরিত্র রাজন্যবর্গ ও সম্ভ্রান্তদের চরিত্র অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর হয়ে থাকে ৩৭

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : ব্যবসায়ীদের পণ্যসামগ্রী চালান দেওয়া ৩৮

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : মজুদদারী ৪০

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : পণ্যের সুলভ মূল্যে ব্যবসায়ীদেরকে মন্দা বাজারের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করে ৪২

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : ব্যবসায়ীদের চরিত্র নেতৃস্থানীয়দের চরিত্র অপেক্ষা হীন ও সম্ভ্রমের অতীত ৪৪

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : শিল্পকর্মের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ৪৬

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : নাগরিক সভ্যতার পরিপূর্ণতা ও প্রাচুর্যের দ্বারাই কেবল শিল্পকলার পরিপূর্ণতা লাভ ঘটে ৪৮

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : নগর জীবনে শিল্পকলার স্থায়িত্ব কেবলমাত্র নাগরিকতার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের ফলেই সম্ভব ৫০

উনবিংশ পরিচ্ছেদ : শিল্পকলার উন্নতি ও প্রাচুর্য মানুষের চাহিদার উপর নির্ভরশীল ৫২
বিংশ পরিচ্ছেদ : কোন নগরী যখন ধ্বংসের সম্মুখিন হয়, তখন এর শিল্পকলাও বিলীন হতে থাকে ৫৩
একবিংশ পরিচ্ছেদ : আরবরা সকল মানুষ অপেক্ষা শিল্পকলার সাথে অধিকতর অপরিচিত ৫৪
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি বিশেষ একটি শিল্পকর্মে অভ্যস্ত হয়ে উঠে, তার পক্ষে এর পরে অন্য একটিতে অভ্যস্ত হওয়া খুব কমই সম্ভব হয় ৫৬
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ : মূল শিল্পকলাসমূহ সম্পর্কে আভাস দান ৫৭
চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ : কৃষিশিল্প ৫৮
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ : স্থাপত্য শিল্প ৫৯
ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ : সূত্রধরের শিল্প ৬৩
সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ : বয়ন ও সীবন শিল্প ৬৬
অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ : ধাত্রী শিল্প ৬৮
উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : চিকিৎসা শিল্প এবং এর প্রয়োজনীয়তা প্রান্তরীয় জীবন অপেক্ষা শহর-নগরে সর্বাধিক ৭২
ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : লিপিকর্ম ও গ্রন্থাদি রচনাও মানবিক শিল্পকলার অন্তর্ভুক্ত ৭৭
একত্রিংশ পরিচ্ছেদ : পুস্তক শিল্প ৮৫
দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ : সঙ্গীত শিল্প ৮৮
ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ : শিল্পকলা, বিশেষ করে রচনা ও গণিত শিল্পীকে বিচক্ষণতার অধিকারী করে ৯৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উহাদের বিভিন্ন শাখা; শিক্ষা, এর বিভিন্ন পদ্ধতি ও এর যাবতীয় কারণ; তৎসমুদয়ে ক্রিয়াশীল বিচিত্র অবস্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট একটি ভূমিকা ও পরিশিষ্টসমূহ ৯৭

প্রথম পরিচ্ছেদ : মানব সভ্যতার জ্ঞান ও শিক্ষা উভয়েই স্বাভাবিক বিষয় ৯৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিক্ষা ব্যবস্থাও শিল্পকর্মের অন্তর্গত ১০১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : জনবসতিপূর্ণ ও নাগরিকতায় সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অত্যধিক প্রসার ঘটে ১০৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বর্তমানকালে সভ্যতা লালিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রকার ১০৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : কোরান সম্পর্কীয় এলমে তফসীর ও এলমে কেরাত ১১২
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : হাদিস সম্পর্কীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি ১১৮
সপ্তম পরিচ্ছেদ : ফেকাহশাস্ত্র এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট দায়ভাগ ১২৮
অষ্টম পরিচ্ছেদ : দায়ভাগ শাস্ত্র ১৩৯
নবম পরিচ্ছেদ : ফেকাহশাস্ত্রের মূলনীতি এবং এতদ্‌সম্পর্কীয় বিতর্ক ও মতপার্থক্য ১৪২
দশম পরিচ্ছেদ : এলমে কালাম ১৫০
একাদশ পরিচ্ছেদ : পরিবর্তমান ক্রিয়াশীল জগৎ একমাত্র মননশীলতার দ্বারাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ১৬৪
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : অভিজ্ঞতাজাত বুদ্ধি ও এর উদ্ভবের প্রক্রিয়া ১৬৬
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : মানুষের জ্ঞান ও ফেরেশতাদের জ্ঞান ১৬৮
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : নবী (আঃ)-দের জ্ঞান ১৭০
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : সত্তাগত দিক থেকে মানুষ অজ্ঞ; অর্জনের দ্বারাই সে জ্ঞানী হয় ১৭২

ষোড়শ পরিচ্ছেদ : কোরান হাদিসের দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহের রহস্য উন্মোচন এবং এর ফলে ধর্মীয় বিশ্বাসে যে অভিনব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে তাদের বর্ণনা ১৭৪
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : অধ্যাত্মবাদ বিষয়ক শাস্ত্র বিশদীকরণ ও বিশ্লেষণ ১৮৭
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : স্বপ্ন ব্যাখ্যাশাস্ত্র ২০৩
উনবিংশ পরিচ্ছেদ : বুদ্ধিগ্রাহ্য শাস্ত্রাদি ও এর প্রকারভেদ ২০৮
বিংশ পরিচ্ছেদ : সংখ্যা সম্পর্কীয় শাস্ত্রাদি। গণিতশাস্ত্র; হিসাবশাস্ত্র; বীজগণিত; ব্যবহারিক গণিত ও দায়ভাগ ২১৪
একবিংশ পরিচ্ছেদ : জ্যামিতি বিষয়ক শাস্ত্রাদি ২২০
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : জ্যোতিষশাস্ত্র ২২৩
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ : যুক্তিবিদ্যা ২২৬
চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ : পদার্থবিদ্যা ২৩৩
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ : চিকিৎসাশাস্ত্র ২৩৪
ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ : কৃষিবিদ্যা ২৩৬
সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ : অধ্যাত্মবিদ্যা ২৩৭
অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ : জাদু ও ইন্দ্রজাল সম্পর্কীয় শাস্ত্রাদি ২৪০
উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ : বর্ণনাদি-রহস্যশাস্ত্র; ওজনের সম্পর্ক, এর অবস্থা ও এর বিপরীতধর্মী পরিমাণ এবং বিচিত্র প্রকৃতি ও চিকিৎসাশাস্ত্র অথবা কিমিয়া শিল্পের মিশ্রণজনিত সংশ্লিষ্ট অবস্থানের প্রতি সম্পর্কযুক্ত বিশিষ্ট পর্যায়গত শক্তি আবিষ্কার সম্বন্ধীয় আলোচনা; আত্মিক চিকিৎসা; রাজন্যবর্গ ও তাদের সন্তান-সন্ততির জন্মক্ষণ সম্পর্কীয় আলোকবিচ্ছুরণ; আত্মিক প্রভাব ও ঐশী আনুগত্য, প্রেম, আত্মসংযোগ, সাধনা, আনুগত্য, উপাসনা, সম্প্রীতি, আসক্তি, নাস্তির নাস্তি, একাগ্রতা, ধ্যান, বন্ধুত্ব, সখ্যতা প্রভৃতির স্থান স্বাভাবিক প্রভাব; শেষ পর্যায়গুলোর জন্য পরিচ্ছেদ; অন্তিম উপদেশ, উপসংহার, বিশ্বাস, ইসলাম-নিষিদ্ধতা ও যোগ্যতা; পৃথিবীর যায়েরজা থেকে প্রশ্নাদির উত্তর বের করার প্রক্রিয়া; বর্ণ পদ্ধতির দ্বারা (অন্তরের) গোপন রহস্য সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ সম্পর্কীয় অনুচ্ছেদ; উপাদানের শক্তি বের করার বর্ণনা ২৫২
ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : রসায়নশাস্ত্র ২৮৪
একত্রিংশ পরিচ্ছেদ : দর্শনের অসারত্ব ও দর্শনশাস্ত্রানুসারীদের বিকৃতি ২৯৭
দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ : জ্যোতিষ শিল্পের অসারতা, এর উপলব্ধির দুর্বলতা এবং এ উদ্দেশ্যের বিকৃতি ৩০৫
ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ : কিমিয়াশাস্ত্রের ফলাফলের অস্বীকৃতি, এর অস্তিত্বের অসম্ভাব্যতা এবং এর চর্চার ফলে সংঘটমান বিকার-বিকৃতি ৩১২
চতুর্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ . শাস্ত্রসম্পর্কীয় গ্রন্থাদির আধিক্য জ্ঞানার্জনের পথে বাধাস্বরূপ ৩২১
পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ : গ্রন্থরচনার জন্য নির্ভরযোগ্য উদ্দেশ্যাবলি এবং তদতিরিক্ত অপরিহার্য বিষয়সমূহ ৩২৩
ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ : শাস্ত্রাদি সম্পর্কে প্রচলিত সংক্ষিপ্ত পুস্তকের আধিক্য শিক্ষাদানকে ব্যাহত করে ৩২৮
সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ : শিক্ষাদানের যথার্থ উদ্দেশ্য এবং এর কল্যাণকর পদ্ধতি ৩৩০
অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ : সহায়ক শাস্ত্রাদিতে চিন্তার দীর্ঘ অবকাশ এবং এর সমস্যাদিতে প্রসারতা নেই ৩৩৫

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : শৈশবকালীন শিক্ষা এবং মুসলিম অধ্যুষিত নগরসমূহে এর পদ্ধতিগত বিভিন্নতা ৩৩৭
চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : শিক্ষার্থীদের প্রতি কঠোরতা তাদের জন্য ক্ষতিকর ৩৪১
একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : জ্ঞানের অন্বেষণে দেশভ্রমণ ও জ্ঞানীদের দর্শনলাভ শিক্ষার পরিপূর্ণতা বিধায়ক ৩৪৩
দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : মানব সমাজে জ্ঞানীরাই রাজনীতি ও এর বিচিত্র মতাদর্শ থেকে অধিকতম দূরে অবস্থান করেন ৩৪৪
ত্রয়োচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : ইসলামী শাস্ত্রবিদদের অধিকাংশই অনারব ৩৪৬
চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : কোন অনারব যখন তার ভাষায় বিজ্ঞ হয়ে উঠে, তখন তার পক্ষে আরবি ভাষাভাষীদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন ত্রুটিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় ৩৫০
পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : আরবি ভাষা সম্পর্কীয় শাস্ত্রাদী—ব্যাকরণশাস্ত্র; অভিধানশাস্ত্র; অনুচ্ছেদ; অলংকারশাস্ত্র; সাহিত্যশাস্ত্র ৩৫৩
ষড়চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : ভাষা একটি শিল্পগত যোগ্যতা ৩৬৭
সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : বর্তমান আরবি একটি স্বতন্ত্র ভাষা এবং মুজার ও হিমিয়ারের ভাষা থেকে এটা ভিন্ন ৩৬৯
অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ : নাগরিক ও শাহরবাসীদের ভাষা স্বতন্ত্র এবং মুজারি ভাষা থেকে উহা ভিন্ন ৩৭৪
ঊনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : মুজারি ভাষার শিক্ষাব্যবস্থা ৩৭৬
পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : ভাষার এই যোগ্যতা ও আরবি ভাষাতত্ত্ব এক নয় এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে শেষোক্তটির প্রয়োজন সামান্য ৩৭৭
একপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : বাক্‌শৈলীবিদদের পরিভাষায় 'আস্বাদ' শব্দটির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য নিরূপণ এবং সাধারণত আরবীয়ত্ব অর্জনকারী অনারবদের তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার হেতু বর্ণনা ৩৮০
দ্বিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : সাধারণভাবে শহরবাসীরা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে এই ভাষাগত যোগ্যতা অর্জনে অক্ষম এবং যারা আরবি ভাষা পরিমণ্ডল থেকে অধিকতর দূরে অবস্থিত, তাদের জন্য তা ততোধিক কষ্টকর ও কঠিন ৩৮৪
ত্রিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : গদ্য ও পদ্য বিষয়দ্বয়ে বাণীর দ্বিধাবিভক্তি ৩৮৮
চতুর্পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : গদ্য ও পদ্য উভয় বিষয়ে দক্ষতার সুযোগ খুব অল্পই ঘটে থাকে ৩৯১
পঞ্চপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : কাব্যশিল্প ও তার শিক্ষাপদ্ধতি ৩৯২
ষট্‌পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : গদ্য ও পদ্যের কলাকৌশল শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; অর্থের মধ্যে নয় ৪০৪
সপ্তপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : অতিরিক্ত কণ্ঠস্থ শক্তির দ্বারা এই যোগ্যতা অর্জিত হয় এবং কণ্ঠস্থ বিষয়ের উপর তার উৎকর্ষ নির্ভরশীল ৪০৫
অষ্টপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ : স্বাভাবিক ও অলংকৃত বাণীরূপ এবং অলংকরণের উৎকর্ষ অপকর্ষের স্বরূপ বর্ণনা ৪০৯
ঊনষষ্টি পরিচ্ছেদ : পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিরা কাব্যচর্চার উর্ধ্বে অবস্থান করেন ৪১৬
ষষ্টি পরিচ্ছেদ : বর্তমানকালের নাগরিক ও বেদুইন আরবি কাব্য আন্দালুসের 'মুয়াশ্যিহা' ও 'জযল' কবিতা; পূর্বাঞ্চলে 'মুয়াশ্যিহা' ও 'জযল' কবিতা। ৪১৮
উপসংহার ৪৫৬

পঞ্চম অধ্যায়

জীবিকা, তার অর্জন ও শিল্পগত বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং তৎসমুদয়ে ক্রিয়াশীল বিচিত্র অবস্থা ও সমস্যাবলি

প্রথম পরিচ্ছেদ

[সম্পদ ও উপার্জনের তাৎপর্য, তাদের ব্যাখ্যা এবং উপার্জন বস্তুত মানবিক শ্রমের মূল্য মাত্র]

জেনে রাখুন, মানুষ স্বভাবত-ই এমন সব বিষয়বস্তুর মুখাপেক্ষী, যা তাকে বিভিন্ন অবস্থা ও পর্যায়ে জীবনের বিকাশ থেকে পূর্ণতা এবং বার্ধক্যের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত আহার ও শক্তি হিসেবে সাহায্য করে থাকে। বস্তুত আল্লাহ্ অভাবশূন্য; কিন্তু তোমরা পরমুখাপেক্ষী।[১] পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ মানুষের জন্যই পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে তিনি তাঁর গ্রন্থের একাধিক বর্ণনায় ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি তোমাদের জন্য আকাশসমূহে যা কিছু আছে এবং পৃথিবীর সব কিছু বশীভূত করে দিয়েছেন।[২] তিনি সূর্য-চন্দ্রকে তোমাদের বশীভূত করেছেন; সাগরকে তোমাদের বশীভূত করেছেন; নৌযানকে তোমাদের বশীভূত করেছেন; জীবকুলকে তোমাদের বশীভূত করেছেন এবং এমন অনেক কিছু, যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় লাভ করা সম্ভব। এর ফলে মানুষের হাত পৃথিবী ও এর সব বস্তুর প্রতি প্রসারিত হয়েছে। কারণ তিনি তাকে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার প্রদান করেছেন। এর কারণে মানুষের হাত সদা প্রসারমান এবং সকলেই এ প্রচেষ্টার অংশীদার। সুতরাং এক হাত যা লাভ করে, তার বিনিময়ে ছাড়া হস্তান্তর করতে চায় না। বস্তুত এভাবে মানুষ যখন তার প্রাথমিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে শক্তি অর্জন করে তখন সে উপার্জন করতে চেষ্টা চালায়; যাতে আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ থেকে সে তার প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য ব্যয় করতে সমর্থ হয় এবং প্রয়োজনীয় বিনিময় সৃষ্টি করতে পারে। মহান আল্লাহ্ বলেন, তোমরা আল্লাহ্র কাছে খাদ্য অন্বেষণ কর।[৩]

কখনও সে জন্য তা বিনা চেষ্টাতেও লভ্য হয়ে ওঠে; যেমন কৃষিকর্মের যোগ্য বৃষ্টি এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়। কিন্তু এগুলো সহায়ক শক্তি হিসেবেই কাজ করে; এর সাথে প্রচেষ্টাকে যোগ করা প্রয়োজন, যেমন পরে এর বর্ণনা আসছে এভাবে মানুষের প্রচেষ্টার দ্বারা উপার্জিত সামগ্রী যদি তার প্রয়োজন ও অভাব পূরণের পরিমাণ অনুযায়ী হয়, তা হলে তাকে বলা হয় জীবিকা এবং তা থেকে বেশি হলে একে বিলাসী পর্যায় ও পুঁজি বলে অভিহিত করা হয়। তারপর এরূপ লব্ধ বা অর্জিত সামগ্রী যদি সংশ্লিষ্ট

---

১. কোরান, ৪৭, ৩৮।

২. কোরান, ১৪, ৩২; তুল, ১৩, ২; ১৬, ১২; ২২, ৬৫; ২৯, ৬১; ৩১, ২০; ৩৫, ১৩; ৩৯, ৫; ৪৫, ১২।

৩. কোরান, ২৯, ১৭।

ব্যক্তিকে পুনরায় উপকৃত করে এবং তার কল্যাণে ও প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য তা তাকে ফসল দেয়, তা হলে অনুরূপ সামগ্রীকে 'সম্পদ' বলা হয়। হযরত (সঃ) বলেছেন, তোমার সম্পত্তির ঐ অংশই তোমার জন্য, যা তুমি খাদ্য হিসেবে হজম করেছ, পরিধেয় হিসেবে বিনষ্ট করেছ এবং দান হিসেবে ব্যবহার করেছ। সুতরাং ঐ সামগ্রী যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কল্যাণে ও অভাব পূরণে পুনরায় উপকার না দেয়, তা হলে এর অধিকারীর দিকে লক্ষ্য রেখেই একে সম্পদ বলা যাবে না। তখন অধিকৃত সামগ্রী বান্দার প্রচেষ্টা ও সামর্থ্যের ফসল বলে তাকে বলা হয় 'উপার্জন'। উত্তরাধিকারের ব্যাপারটি এর উদাহরণ হিসেবে নেয়া যায়। কেননা তা মৃতব্যক্তির দিকে লক্ষ করলে উপার্জন বলতে হয়; কোনক্রমেই তাকে সম্পদ বলা যায় না। কারণ এ পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার কোনো উপকারেই আসে না। কিন্তু উত্তরাধিকারীদের প্রতি লক্ষ করলে, যেহেতু তা তাদেরকে উপকৃত করে, সেজন্য তাকে সম্পদ বলা যায়। তাহলে সুন্নতের কাছে এটিই সম্পদের তাৎপর্য। অবশ্য মুতাজিলা সম্প্রদায় এটাকে সম্পদ বলার জন্য এরূপ শর্ত আরোপ করেছে যে, তা যেন ন্যায়ানুগ অধিকারে লব্ধ হয়। সুতরাং যা অনুরূপ ন্যায় অধিকারে লব্ধ নয়, তাকে সম্পদ বলা যায় না। এদিক থেকে বলপ্রয়োগে আহৃত ও নিষিদ্ধ পন্থায় উপার্জিত সব কিছুকে সম্পদ নামে অভিহিত করার অনুপযুক্ত বলে মনে করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ্ উৎপীড়ক, অত্যাচারী, বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী সকলেই সম্পদ প্রদান করেন এবং তিনি যাকে ইচ্ছা তার দয়া ও সৎপথ অর্পণ করে থাকেন। মুতাজিলা সম্প্রদায় তাদের মতের সমর্থনে যেসব প্রমাণ উপস্থিত করেছে, তা বিশদ করার স্থান এটা নয়।

অতঃপর জেনে রাখুন, উপার্জন একমাত্র অর্জনের প্রচেষ্টা ও প্রাপ্তির ইচ্ছার মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব। সম্পদের ক্ষেত্রেও এক বা একাধিক পন্থায় এর জন্য প্রচেষ্টা ও শ্রম নিয়োগের প্রয়োজন। মহান আল্লাহ্ বলেন, তোমরা আল্লাহ্র কাছে সম্পদ অনুসন্ধান কর। কেননা তা লাভের প্রচেষ্টা একমাত্র আল্লাহ্র সাহায্যে ও তাঁর নির্দেশ অনুসারেই সফল হতে পারে। বস্তুত সব কিছুই তাঁর কাছে থেকে প্রাপ্ত। সুতরাং উপার্জন ও পুঁজি সঞ্চয়ন, যাই হোক না কেন, সব বিষয়েই মানবিক শ্রম বিনিয়োগের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ তা যদি শিল্পকর্ম হয়, তা হলে তা যে শ্রমেরই ফসল, সে সম্পর্কে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা নেই; এমনকি তা যদি প্রাণী, উদ্ভিদ ও খনি থেকে আহৃত হয়, তা হলেও, পাঠক, আপনি অবশ্য দেখতে পাবেন যে, এতেও মানবিক শ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায় তা অর্জিত হয় না এবং উপকারেও আসে না।

অতঃপর মহান আল্লাহ্ স্বর্ণ ও রৌপ্য নামে দুটি খনিজ পদার্থ সৃষ্টি করেছেন যা সব প্রকার সম্পত্তির মূল্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে পৃথিবীবাসীর ধারণা এ দুটি সঞ্চয় ও আহরণযোগ্য সামগ্রী। যদিও তারা অনেক সময় অন্য অনেক কিছু আহরণ করে; কিন্তু সব কিছুই এ দুই পদার্থ লাভ করার জন্য। কারণ অন্য সবকিছুতেই বাজারমূল্যের ওঠানামা আছে; শুধু এ দুটিই এর বাইরে অবস্থান করে। সুতরাং এ দুটি উপার্জন, আহরণ ও সঞ্চয়ের মূল ভিত্তি। যখন এসব বিষয় স্থিরীকৃত হল, তখন এও জেনে রাখুন যে, পুঁজি হিসেবে যা কিছু মানুষের উপকারে আসে ও তার দ্বারা আহৃত হয়, তা যদি শিল্পকর্ম হয়, তা হলে তা হতে তার—আহৃত উপকারিতা তার শ্রমেরই

মূল্য বিশেষ। কেননা এটিই তার আহরণের উদ্দেশ্য। যেহেতু সেখানে শ্রম ছাড়া অন্য কিছু নেই এবং এ শ্রম সে তার আহরণের লক্ষ্য বলে নির্ধারণ করে নি। কখনও শিল্পকর্মে এ শ্রমের সাথে অন্য কিছুও মিশ্রিত থাকে; যেমন সূত্রধর ও তাঁতীর কাজে কাঠ ও সুতো। কিন্তু শ্রমই সেখানে বেশি, এজন্য তার মূল্যও অত্যধিক। কিন্তু যদি তা শিল্পকর্ম ছাড়া অন্য কিছু হয়, তা হলে তার আহৃত উপকারিতার মূল্যের মধ্যে যে শ্রমের দ্বারা তা সম্ভব হয়েছে, তার মূল্যও ধরতে হবে। কারণ শ্রম না হলে তার আহরণ সম্ভব হতো না। কখনও তার অধিকাংশের মধ্যে শ্রম বিনিয়োগের ব্যাপারটি সুস্পষ্ট থাকে; সুতরাং তা ক্ষুদ্র হোক বা বৃহৎ হোক, মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে শ্রমের একটি অংশ থাকেই। আবার কখনও শ্রমের ব্যাপার অস্পষ্ট হয়; যেমন মানুষের খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির মূল্য নির্ধারণে দেখা যায়। অবশ্য শ্রম ও অন্যবিধ খরচ-পত্রের ন্যায্য অংশ শস্যের মূল্য নির্ধারণে লক্ষ্য করা হয়, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। কিন্তু যেসব অঞ্চলে চাষাবাদের বিষয়টি আয়াসসাধ্য বা তার অন্যবিধ খরচ-পত্র খুব বেশি কিছু নয়, সেখানে এটা প্রায় অস্পষ্ট থাকে। খুব অল্প সংখ্যক চাষী ছাড়া অন্যরা এটাকে গণ্যই করে না। যাহোক, উপরিউক্ত বর্ণনায় একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, উপকারিতা ও উপার্জিত সামগ্রীর সব অথবা তার অধিকাংশই মানবিক শ্রমের মূল্য মাত্র এবং এটাতে সম্পদের অর্থও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এটা তাই, যার দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব। উপার্জন ও সম্পদের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান, এখানে তা-ও ব্যাখ্যাসহ স্পষ্ট হয়েছে।

জেনে রাখুন, যখন শ্রম বিলুপ্ত হয় অথবা জনবসতির অভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন আল্লাহ্ও উপার্জনের দ্বার রুদ্ধ করে দেন। পাঠক, আপনি স্বল্প জনসংখ্যার অধিকারী নগরগুলোর দিকে লক্ষ্য করে দেখুন; কেমনভাবে তাদের সম্পদ ও উপার্জন সামান্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অথবা কোথাও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কারণ সেখানে মানবিক শ্রম হ্রাস পেয়েছে। অনুরূপভাবে যেসব নগরীর জনসংখ্যা অত্যধিক, তাদের অধিবাসীদেরকে দেখতে পাবেন, তারা বেশি সচ্ছলতা ও আরাম-আয়েসের অধিকারী; যেমন পূর্বে আমরা এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছি। এ দিকে লক্ষ রেখেই দেশের সাধারণ মানুষ বলে থাকে, যে স্থানের জনবসতি হ্রাস পেয়েছে, সেখানকার সম্পদও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হ্যাঁ নদী ও স্রোতস্বিনীর ধারাও বালুকা প্রান্তরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু তার স্রোতকে উদ্ধার করতে হলে খনন ও প্রবহমানের ব্যবস্থা করা দরকার এবং নানাবিধ শ্রম ছাড়া তা সম্ভব নয়। এমনি বোধহয়, পোষ্য প্রাণীদের দুধের ধারা, যদি তাকে দোহনের দ্বারা প্রবাহমান রাখা না যায়, তা হলে ক্রমশ হ্রাস পেয়ে তা শুকিয়ে যায়। স্রোতস্বিনী ও পয়স্বিনীর মধ্যে এ ব্যাপারে পার্থক্য নেই। পাঠক, জনবহুল নগরীতে এককালে যেসব প্রস্রবণ ছিল, তাদের দিকে লক্ষ করুন; কীভাবে তারা নগরীর পতনে পর সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে; যেন কখনও তাদের অস্তিত্ব ছিল না। আল্লাহ্ দিবারাত্রির নির্ধারণ করে থাকেন।[৪]

---

৪. কোরআন, ৭৩, ২০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[জীবিকা এবং তার বিভিন্ন প্রক্রিয়া, প্রকার ও প্রথা]

জেনে নিন যে, জীবিকার অর্থ হল সম্পদ অর্জনের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা। এটা জীবন শব্দজাত[৫]। কারণ জীবন তথা মানুষের অস্তিত্ব এটি ছাড়া সম্ভব নয় বলে একেই জীবনের আধার স্বরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে।

অতঃপর সম্পদ অর্জন ও উপার্জন সম্পর্কে বলতে গেলে এটি কখনও অপরের কাছ থেকে গ্রহণ এবং তার ওপর প্রতিপত্তির প্রভাবে সংগ্রহ করা হয়। এর জন্য সুপরিচিত বিধি-নিয়ম বিদ্যমান এবং তাকে জরিমানা ও শুল্ক-করাদি বলা হয়। কখনও স্থলভাগে বা সমুদ্রে বন্যপ্রাণী নিধন ও শিকারের মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং তাকে শিকার বলা হয়। কখনও পালিত পশুর উপজাত, যা মানুষের উপকারে ও ব্যবহারে লাগে, তা দিয়ে অর্জিত হয়। যেমন—পালিত পশুর দুধ, রেশম কীটের রেশম ও মৌমাছির মধু। অথবা চাষাবাদ ও বৃক্ষরোপণ করে এগুলোর সংরক্ষণ ও ফল-ফসল অর্জনের দ্বারা করা হয় এবং এগুলোকে কৃষি বলা হয়ে থাকে।

কখনও মানবিক শ্রমের দ্বারা উপার্জনের ব্যবস্থা করা হয়। কখনও এ শ্রম বিশেষ উপকরণের সাথে যুক্ত হয়; যেমন—লিখন, ছুতারের কাজ, সীবন, বয়ন, অশ্বারোহণ ও ইত্যাকার অন্যান্য বিষয় এবং এগুলোর নাম শিল্পকর্ম। আবার কখনও এটি নির্দিষ্ট কোনো উপকরণের সাথে যুক্ত হয় না; এটি অবশিষ্ট সব পরিশ্রম ও তৎপরতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। কখনও এ উপার্জন পণ্যদ্রব্য এবং বিনিময়ের জন্য তার প্রস্তুতির দ্বারা অর্জিত হয়। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে পণ্যদ্রব্যকে চালান করা হয় অথবা নির্দিষ্ট স্থানে মজুদ করে বাজার মূল্যের ওঠানামা লক্ষ করা হয়। একেই বলা হয় বাণিজ্য।

এগুলোই জীবিকার প্রক্রিয়া ও তার প্রকার। সাহিত্যিক ও দার্শনিকের মধ্যে বিশেষজ্ঞরা যা বলেছেন, তার অর্থও এরূপ। যেমন হারিরী[৬] ও অন্যান্যদের বর্ণনা। তারা বলেছেন, জীবিকা বলতে রাজকীয় পদ, বাণিজ্য, কৃষিকার্য ও শিল্পকর্ম বোঝায়। অবশ্য রাজকীয় পদ জীবিকা অর্জনের স্বাভাবিক কোনো প্রথা নয়; সুতরাং আমরা এর সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি না। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজকীয় শুল্ক-করাদির অবস্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কথা বলতে গিয়ে এগুলো সম্পর্কে একটুখানি আলোচনা করেছি। কিন্তু কৃষিকাজ, শিল্পকর্ম ও বাণিজ্য স্বাভাবিক জীবিকা অর্জন

---

৫. মূলে আছে 'আরশ'।

৬. 'মকামাত' গ্রন্থ প্রণেতা কাসেম ইবনে আলী; ৪৪৯-৫১৬ (১০৫৫-১১২২ খ্রি:) হি:।

প্রক্রিয়া। এগুলোর মধ্যে কৃষিকাজ মূলত সর্বাগ্রগামী। কেননা তা অবিমিশ্র, স্বাভাবিক ও সহজাত। তার জন্য চিন্তা ও বিদ্যার প্রয়োজন নেই। এজন্য সৃষ্টির মধ্যে মানব পিতা হযরত আদমের প্রতি একে নির্দেশ করা হয়েছে। তিনিই এর শিক্ষক ও অবলম্বনকারী। এ নির্দেশের দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে যে, কৃষিকাজ জীবিকা প্রক্রিয়ায় সর্বাগ্রগামী এবং স্বভাবের সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। শিল্পকর্ম তার দ্বিতীয় পর্যায় এবং পরবর্তী। কেননা তা মিশ্র বিদ্যার সাথে জড়িত। এর জন্য প্রচুর চিন্তা ও সযত্ন অনুশীলনের প্রয়োজন। সম্ভবত এ কারণেই এটি একমাত্র সেই নগর জীবনে পাওয়া যায় যা যাযাবর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় ও পরবর্তী। এজন্যই একে সৃষ্টির দ্বিতীয় পিতা হযরত ইদরিসের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তিনিই তাঁর পরবর্তী মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশের মাধ্যমে এ শিল্পকর্মের উদ্ভাবন করেছিলেন।

বাণিজ্য যদিও উপার্জনের দিক থেকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অধিকারী, তবুও তার অধিকাংশ পথ ও প্রথা ক্রয়-বিক্রয় মূল্যের মধ্যবর্তী অবস্থায় গৃহীত কলাকৌশল মাত্র। যাতে এ দুটির উপজাত থেকে উপার্জনের উপকারিতা লাভ করা যায়। এ কারণে ধর্মীয় বিধান এতে চাতুর্যকে প্রশ্রয় দিয়েছে। কারণ বাণিজ্যের মধ্যে জুয়ার অনুরূপ একটি অবস্থা বিদ্যমান। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, কোন কিছু না দিয়েই মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করা। এজন্য একে বিধিসিদ্ধ বলে স্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[চাকরি স্বাভাবিক জীবিকা নয়]

জেনে রাখুন যে, শাসকের জন্য তাঁর শাসনতান্ত্রিক ও রাজকীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সব বিভাগেই লোক নিয়োগ করা প্রয়োজন। তাঁর সেনাদল, রক্ষীবাহিনী ও মসীজীবীদের সহায়তা দরকার। প্রত্যেক বিভাগে তিনি এমন কিছু লোক প্রত্যাশা করেন, যারা তাঁর জ্ঞানে সেজন্য যথেষ্ট এবং তিনি সেই অনুপাতে তাদের বেতনাদির ব্যয়ভারও রাজকোষ থেকে বহন করে থাকেন। এসব চাকরির সবটুকুই শাসনতান্ত্রিক পর্যায়ভুক্ত এবং তারই কল্যাণে তাদের জীবিকা অর্জিত হয়ে থাকে। কেননা এসব চাকরির অধিকারীরা শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ভোগ করেন এবং সর্বোচ্চ শাসকই তাদের সব শক্তির উৎস।

অবশ্য এর চেয়ে নিম্ন মর্যাদার চাকরিও বিদ্যমান। তার কারণ এই যে, অধিকাংশ ধনাঢ্য ব্যক্তিই নিজ প্রয়োজনের কাজ করতে ঘৃণা করে অথবা তারা তা করার যোগ্যতা রাখে না। কেননা তারা প্রাচুর্য ও বিলাসের মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে তার সঙ্গতি হারিয়েছে। সুতরাং তারা উক্ত কাজের জন্য একজনকে নিয়োগ করে এবং তার সম্পদ থেকে এর পারিশ্রমিক বহন করে থাকে। কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক পৌরুষের জন্য এ অবস্থা প্রশংসনীয় নয়। কারণ যে-কোন ব্যক্তির অপরের উপর নির্ভর করা অক্ষমতার নামান্তর। এটি একদিকে যেমন তার দায়িত্ব ও ব্যয় বৃদ্ধি করে, তেমনি অন্যদিকে কাপুরুষতা ও অক্ষমতার মতো এমন দুটি দোষের প্রতি ইঙ্গিত করে, যা পৌরুষের ধর্মে সর্বদাই পরিত্যাজ্য। অবশ্য অভ্যাসই মানুষকে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিবর্তে অস্বাভাবিককে প্রিয় হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য করে। কেননা মানুষ তার পিতা-মাতার নয়, অভ্যাসের সন্তান।

তদুপরি যে কাজের যোগ্য ও যার উপর নির্ভর করা যায়, তেমন চাকরের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। বস্তুত এমন কাজে নিয়োজিত চাকর চার প্রকার হতে পারে। হয় সে করিতকর্মা ও তার প্রতি অর্পিত দায়িত্বে বিশ্বস্ত হবে; নয়ত তার বিপরীত; অর্থাৎ সে করিতকর্মাও নয় এবং তার হাতে অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। অথবা যে-কোন একটি ব্যাপারে বিপরীত হবে; যেমন করিতকর্মা কিন্তু বিশ্বস্ত নয় এবং বিশ্বস্ত কিন্তু করিতকর্মা নয়। এদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর চাকর, যে করিতকর্মা ও বিশ্বস্ত, তাকে কোন অবস্থাতেই কারও পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কারণ সে তার কর্মকুশলতা ও বিশ্বস্ততার দরুন সাধারণ মানুষের সাহচর্যকে হেয় জ্ঞান করবে এবং তার সেবার জন্য

বেশি মূল্য প্রত্যাশা করবে। কারণ সে এর চেয়ে বেশি দাবি করার যোগ্যতা রাখে। সুতরাং যারা বিরাট জাঁকজমকের অধিকারী, তেমন আমীর-উমরাহগণ ছাড়া অন্য কেউ তাকে প্রতিপালিত করতে সক্ষম হবে না। জাঁকজমকের ব্যাপকতার মধ্যেই এরূপ চাকরের প্রয়োজন সর্বাধিক।

দ্বিতীয় পর্যায়ের চাকর, যার কর্মকুশলতা ও বিশ্বস্ততার কোনো গুণ নেই, তেমন কোনো লোককে কোনো বুদ্ধিমানের পক্ষে নিয়োগ করা সম্ভব নয়। কেননা সে নিয়োগকর্তাকে দুদিক থেকেই একসঙ্গে কর্তন করবে। কর্মকুশলতার অভাবে তাঁর সব কাজ নষ্ট করবে এবং অন্যদিকে তাঁর সম্পদ অপহরণের দ্বারা তাঁকে নিঃস্ব করে তুলবে। যে-কোনো অবস্থাতেই সে মালিকের উপর গুরুভারস্বরূপ।

সুতরাং এ দু প্রকার চাকর নিয়োগের লোভ প্রত্যেককেই ত্যাগ করা উচিত। কাজেই তাদের জন্য শেষ দু প্রকার ছাড়া অন্য পথ নেই। এ দু প্রকার হলো বিশ্বস্ত কিন্তু অকরিতকর্মা এবং করিতকর্মা কিন্তু অবিশ্বস্ত। এ দু প্রকারের মধ্যেও যে-কোন একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে মানুষের মধ্যে দুটি মত প্রচলিত আছে। আবার প্রতিটি মত পোষণের কারণও রয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রে চাকর যদি করিতকর্মা হয়ে বিশ্বস্ত না-ও হয়, তবু তাকেই প্রাধান্য দেয়া দরকার। কারণ তাতে কাজের ক্ষতি হবে না এবং তার তছরুপের প্রবৃত্তিকে সতর্ক পাহারার মাধ্যমে আয়ত্তে রাখা যাবে। কিন্তু অকরিতকর্মা যদিও বিশ্বস্ত হয়, তবুও তার অকাজের দ্বারা লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই বেশি হবে। পাঠক, এটা জেনে নিন এবং চাকর গ্রহণের ক্ষেত্রে একে একটি কার্যকর নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করুন। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[প্রোথিত ও সঞ্চিত ধনভাণ্ডার থেকে সম্পদ লাভের চেষ্টা স্বাভাবিক জীবিকা নয়]

জেনে রাখুন, নগরবাসী বহু দুর্বল বুদ্ধির লোক মাটির নিচে থেকে ধনরত্ন বের করার জন্য লালায়িত হয় এবং তাকেই তাদের উপার্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের ধারণা পূর্ববর্তী সব জাতির ধনরত্ন মাটির নিচে সঞ্চিত রয়েছে এবং ঐ সম্পদ এমন যাদু প্রক্রিয়ায় সীলমোহরকৃত যে, একমাত্র উক্ত বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও পক্ষে তা ভেঙে ফেলা সম্ভব নয়। কেননা কেবল অভিজ্ঞ ব্যক্তি তার জন্য প্রয়োজনীয় ধোঁয়া, প্রার্থনা ও উৎসর্গাদি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। আফ্রিকার নগরবাসীদের ধারণা, ইসলামের পূর্ববর্তী যেসব ফিরিঙ্গী জাতি সেখানে বাস করত, তারা তাদের ধনরত্ন মাটির নিচে পুঁতে রেখে গেছে। তারা তার নিদর্শন এমনভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছে যে, তার রহস্য উদ্ধার করতে পারলেই কেবল ঐসব ধনরত্ন বের করা সম্ভব। পূর্বাঞ্চলের নগরবাসীরাও কিবতী, রোমান ও পারসিকদের সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ করে এবং তারা এ প্রসঙ্গে এমন সব কাহিনী বর্ণনা করে, যা অবাস্তব কল্পকথার সমতুল্য। যেমন এমন একদল গুপ্তধন অন্বেষণকারী একটি সম্পদাগার খুঁরলো, যারা কোন প্রকার যাদুবিদ্যা জানে না বা তার সংবাদও রাখে না; সুতরাং তারা দেখতে পেল উক্ত ধনাগার শূন্য অথবা কীটপতঙ্গে পরিপূর্ণ। অথবা তারা দেখতে পেল, যে স্থান অগাধ ধনরত্নে পূর্ণ রয়েছে; কিন্তু এর সামনে উন্মুক্ত তরবারী হাতে প্রহরী দণ্ডায়মান। অথবা এমনভাবে উক্ত স্থান কাঁপতে লাগল যে, বুঝি-বা তাদেরসহ ধসে যাবে। এমন আরও বহু অলীক কথাবার্তা।

আমরা মাগরিবের এমন অনেক বিদ্যার্থীকে দেখতে পাই, যারা স্বাভাবিক পথে জীবিকা অর্জন ও তার উপকরণ সংগ্রহে অক্ষম, তারা পার্শ্বদেশ ছিন্নভিন্ন এমন কিছু লেখা কাগজ নিয়ে ধনী ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হয়। এসব কাগজে হয় অনারব ভাষায় কিছু লেখা থাকে অথবা তাদের ধারণা অনুসারে গুপ্তধনের মালিকদের নির্দেশিকা থেকে এতে এমন কিছু কথা অনূদিত হয়েছে, যা গুপ্তধনের জন্য নির্দিষ্ট বিভিন্ন স্থানের দিক্ নির্দেশ করে। এর দ্বারা এসব বিদ্যার্থী সম্পদ লাভের উদ্দেশ্য পোষণ করে। তারা ধনীদেরকে অনুরূপ স্থান খনন ও গুপ্তধন সন্ধানে উৎসাহ যোগায়। এটি করতে গিয়ে তারা এরূপ ভান করে যে, উক্ত ধনী ব্যক্তিদেরকে তারা এজন্য জানাচ্ছে, যাতে তাঁরা এরূপ ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির সময় শাসকদের লোলুপ দৃষ্টি ও তাদের দেয়া শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা

করতে পারেন। অনেক সময় তাদের কাছে বিরল ও অদ্ভুত ধরনের যাদুর উপকরণ থাকে, যা দিয়ে তারা তাদের অন্যান্য দাবির সত্যতা প্রমাণের ভান করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা যাদু ও তার প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এর ফলে বহু দুর্বল বুদ্ধির লোক আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং খনন কাজ পরিচালনার জন্য লোক সংগ্রহ করে। তারা রাতের আঁধারের আড়ালে অনুসন্ধান কাজ চলায়; যাতে রাজকীয় প্রহরী বা রাজপুরুষদের দৃষ্টি এর উপর না পড়ে। এর পর যখন কোনো কিছু পাওয়া যায় না, তখন ব্যর্থতার সমস্ত দায়িত্ব সেই যাদুমন্ত্রের অজ্ঞতার উপর ন্যাস্ত করা হয়; যা দিয়ে এ সম্পদটিকে সীলমোহর করা হয়েছে। এভাবে তারা এ প্রলোভনের ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্য নিজেদেরকে প্রতারিত করে।

যতদূর সম্ভব এ ব্যাপারে তাদের উৎসাহিত হওয়ার একমাত্র কারণ তাদের নির্বুদ্ধিতা। কারণ তারা জীবিকা অর্জনের স্বাভাবিক পন্থা বাণিজ্য, কৃষিকাজ ও শিল্পকর্ম প্রভৃতির দ্বারা উপার্জন করতে অক্ষম। এজন্য তারা বিকৃত পন্থা ও অস্বাভাবিক ধারায় জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করে। এরূপ ও এমন অন্যান্য আচরণ, এ কথারই প্রমাণ দেয় যে, তারা উপার্জনে অক্ষম এবং তারা সম্পদ লাভ ও অর্জন করতে কোনো প্রকার কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়াই সফলকাম হতে চায়। অথচ তারা বুঝতে পারে না যে, তারা এমন কাজের দ্বারা অনর্থক নিজেদেরকে জীবিকা অর্জনের স্বাভাবিক প্রচেষ্টার চেয়ে বেশি দুঃখ, কষ্ট ও মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন করে। তদুপরি এরূপ প্রতারণার জন্য তাদের শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনাও বিদ্যমান।

অনেক সময় ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে উৎসাহের একটি অন্যতম কারণ হলো বিলাস-ব্যসনের আতিশয্য এবং এর এমন সমস্ত অভ্যাস, যা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। কিছুতেই এখন আর উপার্জনের বিভিন্ন উপায় ও প্রক্রিয়া তার চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হচ্ছে না। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যখন স্বাভাবিক উপার্জন দিয়ে তার চাহিদা মেটাতে অক্ষম হয়, তখন তার সামনে এ একটি পথই খোলা থাকে, তা হলো, সে হঠাৎ কোন প্রকার পরিশ্রম ছাড়াই এমন বিপুল সম্পদের অধিকারী হবে, যা দিয়ে সে তার বিশ্বাস পরিবৃত অভ্যাসগুলোকে তৃপ্তিদান করতে পারে। কাজেই সে এরূপ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় লালসাগ্রস্ত হয়ে ওঠে এবং এর জন্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে। এ জন্যেই, পাঠক, আপনি লক্ষ করেছেন যে, সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এবং ব্যাপক পরিধি ও বহুল বিলাসের অধিকারী নগরীগুলোর অধিকাংশ লোক এ বিষয় নিয়ে লালায়িত হয়ে ওঠে। যেমন মিশর ও অনুরূপ অন্যান্য নগরীর লোকজন। আমরা দেখতে পাই, এসব নগরীর অধিকাংশ লোক এ বিষয়ে উৎসাহী এবং তা লাভ করতে সচেষ্ট। তারা বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অশ্বারোহীদেরকে অনুরূপ বিষয়াদির বিরল সংবাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং অনুরূপ উৎসাহের সঙ্গে তারা কিমিয়াশাস্ত্র শিক্ষা করতে অগ্রসর হয়। অনুরূপভাবে আমরা এ কথাও জানতে পেরেছি যে, মিশরবাসীরা খুব আগ্রহের সাথে মাগরিবের বিদ্যার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাত করে; যাতে তাদের সাহায্যে কোনো প্রোথিত সম্পদ ও সঞ্চয়াগার আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। তদুপরি তারা যাদুবিদ্যার সাহায্যে মাটিতে পানি শুষে নেয়ার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করে। কারণ তাদের ধারণা

এসব গুপ্তধনের অধিকাংশই নীলনদের প্রবাহ পথে লুক্কায়িত রয়েছে এবং সম্ভবত এ অঞ্চলের একটা বিরাট সঞ্চয় ও অপরিমিত ধনরত্ন এ নীলনদ তার স্রোতের দ্বারা ঢেকে রেখেছে। যেসব লোক এ সম্পর্কে লিখিত তথাকথিত অলীক বই রক্ষা করছে, তারা এ বলে তাদের মিথ্যাকে ঢাকা দেয় যে, কেবল নীলনদের এ প্রবাহের জন্য তারা এসব ধনের কাছে পৌঁছতে পারছে না। এভাবে তারা তাদের জীবিকার পথ প্রশস্ত করে এবং এসব অলীক কাহিনীর শ্রোতারাও যাদুবিদ্যার সাহায্যে নীলনদের পানি শুকিয়ে তাদের ঈপ্সিত বস্তু লাভ করার জন্য মেতে ওঠে। যাদুবিদ্যার প্রতি তাদের একটা অস্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। কারণ এ বিষয়টি বহু প্রাচীনকাল হতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে। যাদুবিদ্যা ও তার বহু নিদর্শন তাদের অঞ্চলের সমাধি ও অন্যান্য সৌধাদিতে অবশিষ্ট রয়েছে। ফেরাউনের যাদুর ব্যাপারগুলোও এ ব্যাপারে তাদের বিশিষ্টতার স্মরণ করায়।[৭] মাগরিবের লোকেরাও পূর্বাঞ্চলের দার্শনিকদের রচনা বলে একটি দীর্ঘ কবিতার কথা উল্লেখ করে, যার মধ্যে যাদু প্রক্রিয়ার সাহায্যে পানি শুষে নেয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠক, আপনি উক্ত প্রক্রিয়া ঐ পদ্যটির মধ্যেই দেখতে পাবেন; যেমন পদ্যটি এই :

ওহে মাটিতে পানি শুষে নেওয়া রহস্যময় প্রক্রিয়ার অন্বেষণকারী।
এক বিচক্ষণ সত্যবাদীর বক্তব্য শ্রবণ কর।
তারা যে সব পুস্তক রচনা করেছে, তা ত্যাগ কর,
এগুলো অলীক কল্পনা ও অন্যান্য বাগাড়ম্বর পরিপূর্ণ।
আমার এ সত্য ও সদুপদেশপূর্ণ কথাগুলো শ্রবণ কর,
অবশ্য তুমি যদি এমন ব্যক্তি হও, যে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয় না।
তুমি যদি কোন কূপের পানি শুষে নিতে মনস্থ কর,
যার সম্পর্কে সর্বপ্রকার জল্পনা-কল্পনা নিস্ফল হয়েছে।
তা হলে তোমার নিজের অনুরূপ একটি মূর্তি অঙ্কন কর, দণ্ডায়মান—
এর মস্তকটি একটি তরুণ সিংহের অনুরূপ—গোলাকার।
এর দুটি হাত একটি রজ্জু ধরে রাখবে, যার সাহায্যে
সে একটি বালতি কূপের অভ্যন্তর থেকে টেনে তুলছে।
তার বুকে একটি 'হে' বর্ণ লিখবে, যেমন তুমি দেখতে পাও—
'তালাক' শব্দের সংখ্যামান, বারংবার লেখা ত্যাগ কর।
তা 'ত্ব'য়ের উপর পদক্ষেপ করবে তাকে স্পর্শ না করে
একজন সাহসী, বুদ্ধিমান ও সতর্ক লোকের ন্যায় হাঁটবে।
এতদ্‌সমুদয়ের চতুর্দিকে একটি রেখা থাকবে,
তা গোলাকার না হয়ে চতুষ্কোণ হলে ভাল হয়।
তার উপর তুমি একটি পাখি জবেহ কর, রক্ত দিয়ে মাখাও,
জবেহের পরে তাকে সুগন্ধী ধোঁয়ায় আবৃত কর।
চন্দন, লোবান, ধুনা,
ও 'কুস্তা' মূল এবং তাকে রেশম দ্বারা আচ্ছাদিত কর।
বস্ত্রটি লাল অথবা হলুদ বর্ণের, নীল বর্ণের নয়—
এতে সবুজ ও ধূসর বর্ণ থাকবে না।

---

৭. তুল. কোরান, ৭, ১১০।

তা বাঁধা হবে দুটি সুতায়—সাদা পশম
অথবা লাল, খাঁটি টকটকে লাল।
উদীয়মান রাশি হবে সিংহ, যেমন তারা বর্ণনা করেছে,
এবং মাসের আরম্ভটি হবে কৃষ্ণপক্ষ।
চন্দ্র বুধের কল্যাণাংশে সম্মিলিত থাকবে,
শনিবার—এ লগ্নই প্রচেষ্টার সময়।

অর্থাৎ ত্বয়ের অবস্থান তার পদদ্বয়ের নিচে হবে, যেন সে এর উপর দিয়ে হাঁটছে।[৮] আমার কাছে এ দীর্ঘ কবিতাটি প্রবঞ্চকদের মানুষকে বোকা বানানোর অপকৌশল ছাড়া অন্য কিছুই নয়। তারা এর মধ্যে বিচিত্র অবস্থা ও অদ্ভুত সব পরিভাষা ব্যবহার করেছে। তাদের প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাচারের পর্যায় এ পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, তারা গুপ্তধন প্রাপ্তির সম্ভাবনার জন্য প্রসিদ্ধ ঘর ও পরিচিত স্থানগুলোতে কিছুকাল বসবাস করে এবং সেখানে গর্ত করে তাদের ঐসব নিদর্শন ও বস্তু রেখে আসে, যা তারা তাদের এসব অলীক রচনাবলিতে উল্লেখ করে। তারপর তারা একশ্রেণীর নির্বোধ লোকদের কাছে এসব লেখা নিয়ে গিয়ে ঐসব গৃহ ও স্থান ভাড়া নিতে এবং সেখানে বসবাস করতে উদ্বুদ্ধ করে। তারা তাদেরকে বোঝায়—সেখানে এত বেশি ধনরত্ন আছে যে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এর পর তারা তাদের কাছে ঐসব ধনরত্নের যাদুক্রিয়া ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাচার ও ধূম্রসুগন্ধী ক্রয় করতে সম্পদ দাবি করে এবং সেখানকার গর্তগুলোয় তারা নিজের হাতে যেসব নিদর্শন রেখেছিল, তা বের করার উদ্যোগ আয়োজনে লিপ্ত হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঐগুলো দেখে আরও উৎসাহিত হয়ে ওঠে। অথচ ইতোমধ্যে সে যে প্রতারণার জালে আটকে পড়ে সবকিছু গোলমাল করে ফেলেছে তা বুঝতেও সক্ষম হয় না। তারাও সুযোগ বুঝে তাদের সংকেতিক ভাষায় কথাবার্তা বলে, যার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আরও জড়িয়ে পড়ে। এরূপ ভাষা ব্যবহারের একমাত্র উদ্দেশ্য তাদের খনন কাজ, সুগন্ধী ব্যবহার, প্রাণী উৎসর্গ প্রভৃতি আচার অনুষ্ঠানের ফলাফল যেন ঐ ব্যক্তি বুঝতে না পারে।

এ প্রসঙ্গে যথার্থ কথা বলতে গেলে এটা বলতে হয় যে, জ্ঞানে ও শ্রুতিতে কোথাও অনুরূপ গুপ্তধন প্রাপ্তির সম্ভাবনার কোনো ভিত্তি নেই। পাঠক, জেনে রাখুন, যদিও অনেক সময় এরূপ সঞ্চিত সম্পদ পাওয়া যায়, কিন্তু এটা একান্তই বিরল ও আকস্মিক। কেউ ইচ্ছা করে তা লাভ করতে পারে না। তা এমন কোনো বিষয় নয় যে, সব মানুষই তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের ধনরত্ন মাটির নিচে পুঁতে ফেলে এবং তার সীলমোহরের জন্য যাদুবিদ্যার আশ্রয় নেয়। প্রাচীনকালেও এরূপ কোনো সাধারণ অভ্যাস ছিল না, আধুনিককালেও দেখা যায় না। যে সব গুপ্তধনের কথা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে এবং ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌রা যার সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন[৯], ঐগুলো মূর্খতার যুগের প্রোথিত সম্পদ। আবার তাও হঠাৎ কোনো সময় আকস্মিকভাবে পাওয়া যায়। এর প্রাপ্তি কখনই ইচ্ছা ও অনুসন্ধানের ফল নয়।

---

৮. রোজেনথালে এ বাক্যটি পদ্যের মধ্যভাগে—লোকের ন্যায় হাঁটিবে-এর পরে উল্লেখিত হয়েছে।

৯. তুল, বোখারী (১ম খণ্ড)।

তদুপরি যে ব্যক্তি তার ধনরত্ন মাটিতে পুঁতে রাখে এবং তার উপর যাদুবিদ্যার দ্বারা সীলমোহর লাগিয়ে দেয়, সে নিশ্চয় তাকে সম্পূর্ণ গোপন করার জন্যই এটা করে। সুতরাং তার পক্ষে গুপ্তধনলোভীদের জন্য এর নিদর্শন ও সাক্ষ্য প্রমাণ রেখে যাওয়া কী করে সম্ভব হতে পারে! সে এ ধনরত্ন গোপন করতে চেয়েছে, এটা যদি সত্য হয়; তা হলে কখনও সে সে জন্য বই লিখে সব শহরের লোকদেরকে তা খুঁজে বের করতে আমন্ত্রণ জানিয়ে যাবে না। কারণ এতে তার গোপন করার উদ্দেশ্যই মাটি হয়ে যায়। এ ছাড়াও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের সব কাজেই একটা উদ্দেশ্য থাকে এবং তা কল্যাণধর্মী হয়। সুতরাং মানুষের সম্পদ প্রোথিত করার উদ্দেশ্য হল, তা যাতে তার সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন অথবা অন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি লাভ করতে পারে। কিন্তু এ ছাড়া সে যদি এটাকে সকলের কাছ থেকে সম্পূর্ণ গোপন করতে চায় এবং অনাগত ভবিষ্যতে কোনো জাতি বা ব্যক্তি তা জানতে পারবে না, এটাই যদি তার উদ্দেশ্য হয়, তা হলে বুঝতে হবে তা সে নষ্ট ও ধ্বংস করার জন্যই করেছে। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এটা করতে পারে না।

অবশ্য তাদের বক্তব্য এই যে, আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ধনরত্ন কোথায়? তাদের সে অফুরন্ত ও অসংখ্য ধনরত্নের কথাও আমরা জানতে পেরেছি! এর উত্তরে, পাঠক, জেনে রাখুন, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমাণিক্য ও অন্যান্য সামগ্রী খনিজ দ্রব্য এবং উপার্জিত সম্পদ। যেমন—লোহা, তামা, সীসা এবং অন্যান্য মৌলিক ও খনিজ পদার্থ। সভ্যতাই ওগুলোকে মানবিক শ্রমের দ্বারা বের করেছে এবং প্রয়োজন মতো একে বাড়িয়েছে কমিয়েছে। তার মধ্যে যা মানুষের হাতে পাওয়া যায়, তা হস্তান্তর ও উত্তরাধিকার সূত্রে সচল। অনেক সময় তা একদিক থেকে অন্যদিকে এবং এক সাম্রাজ্য থেকে অন্য সাম্রাজ্যে বিচিত্র উদ্দেশ্য ও সভ্যতার আকর্ষণে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। সুতরাং মাগরিব ও আফ্রিকিয়ায় যদি সম্পদ হ্রাস পায়, তা হলে দেখা যাবে শ্লাভ ও ফিরিঙ্গী অঞ্চলে তা বেড়ে উঠেছে এবং মিশর ও সিরিয়ায় কমে গেলেও হিন্দ ও চীনে তার অভাব নেই। এটা প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও উপার্জিত সম্পদ বৈ অন্য কিছু নয়; সভ্যতা একে বাড়ায় ও কমায়। অন্যদিকে খনিজ পদার্থও অন্যান্য বস্তুর ন্যায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মোতি ও মণিমাণিক্য সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ক্ষয়ের সম্মুখীন হয়। অনুরূপভাবে সোনা, রুপা, তামা, লোহা, সীসা এবং টিনও ক্ষয়ের অধীন। এগুলোও স্বাভাবিক ধ্বংস ও বিনষ্টের ফলে খুব তাড়াতাড়ি ওগুলোর মূলসত্তা হারিয়ে ফেলে।

হ্যাঁ, মিশরে যে ধনপ্রাপ্তি ও গোপন সঞ্চয়ের ব্যাপার দেখা গেছে, এর কারণ এ যে, দেশটি হাজার হাজার বছর অথবা তারও বেশি সময় ধরে কিবতীদের শাসনাধীনে ছিল। তারা মৃতদেহকে সোনা, রুপা, মণিমাণিক্য ও সামগ্রীসহ সমাধিস্থ করত। তাদের প্রাচীন সম্রাটদের সময়ে এটাই প্রথা ছিল। তারপর কিবতীদের পতন ঘটলে পারস্যবাসীরা উক্ত দেশের অধিকারী হয় এবং ধনরত্নের উদ্দেশ্যে তাদের সমাধিগুলোতে সুড়ঙ্গ কেটে তা বের করে আনে। তারা এসব কবর থেকে এত সম্পদ পেয়েছিল, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যেমন সম্রাটদের সমাধি পিরামিড ও অন্যান্য সমাধিসৌধ। পারস্যবাসীদের পরে গ্রিকরাও অনুরূপ কাজ করেছে। এ কারণে বর্তমানকালে তাদের সমাধিগুলোকে

ধনরত্ন প্রাপ্তির স্থান বলে ধারণা করা হয় এবং অনেক সময় আকস্মিকভাবে সেখানে প্রোথিত সম্পদ পাওয়া যায়। এগুলো হয় মৃত ব্যক্তিদের সম্পদ অথবা তাদের সম্মানে প্রদত্ত সোনা-রুপার বাসনপত্র ও সিন্দুক, যা পূর্ব থেকেই এ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হত। সুতরাং কিবতীদের সমাধিস্থলগুলো হাজার হাজার বছর ধরে এ ধনরত্ন প্রাপ্তির ধারণার শিকার হয়ে এসেছে। এ কারণেই মিশরবাসীরা এসব বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করাকে অর্থপূর্ণ মনে করে এবং তা বের করার চেষ্টাও চালায়। এমনকি সাম্রাজ্যের শেষের দিকে তারা যখন অন্যান্য বিষয়ের ওপর কর আরোপ করে, তখন গুপ্তধন অন্বেষণকারীদের উপরও কর ধার্য করা হয়। এসব কর একশ্রেণীর নির্বোধ ও লোলুপ ব্যক্তিরা দিয়ে থাকে এবং এর মাধ্যমে এসব অর্থলোভী ব্যক্তি এ সমাধিস্থলগুলো উন্মুক্ত করার ও তাদের উদ্দিষ্ট সম্পদ বের করার সুযোগ লাভ করে। কিন্তু তাদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অনুরূপ ব্যর্থতা থেকে আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি। যদি কারও মনে অনুরূপ দুর্মতি দেখা দেয় কিংবা কেউ যদি অনুরূপ কোনো চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ে, তার উচিত স্বাভাবিক জীবিকা অর্জনে তার আলস্য ও অক্ষমতা থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করা। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (স) এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। সুতরাং ঐ ব্যক্তির উচিত অনুরূপভাবে শয়তানের পথ ও তার কুমন্ত্রণা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। সে যেন তার প্রবৃত্তিকে এসব অবাস্তব ও মিথ্যা কাহিনীর দ্বারা বিভ্রান্ত হতে না দেয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অগণিত সম্পদ দান করেন।[১০]

১০. কোরান, ২, ২১২; ৩, ৩৭; ২৪, ৩৮।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[পদমর্যাদা সম্পদের জন্য উপকারী]

এটা এই যে, আমরা পদমর্যাহীন অপেক্ষা সম্পদশালী ও পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিদেরকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বেশি সচ্ছলতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হিসেবে দেখতে পাই। এর কারণ এই যে, পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকে সর্বদাই লোকে মান্য করে এবং তার পদমর্যাদার প্রতি তাদের আকর্ষণ ও এর সহায়তার প্রয়োজনে তারা পরিশ্রমের সাহায্যে তার নৈকট্য লাভের প্রয়াসী হয়। সুতরাং মানুষ তার যেকোন প্রকার প্রয়োজন—মৌলিক, অভাবজাত অথবা বিলাসী যা-ই হোক না কেন, তাদের পরিশ্রমের দ্বারা তা পূরণ করার চেষ্টা করে। এর ফলে উক্ত পরিশ্রমের ফসল পদমর্যার অধিকারী ব্যক্তির উপার্জন হিসেবে গণ্য হয়। যেসব বিষয়ে সাধারণভাবে মানুষ বিনিময় প্রত্যাশা করে, তার ক্ষেত্রে সেগুলোও বিনা মজুরিতে মানুষের দ্বারা সম্পন্ন হয়। সুতরাং এসব শ্রমের সব মূল্যই ঐ বিশেষ ব্যক্তিটির জন্য জমা হয়ে ওঠে। এভাবে সে তার পরিশ্রমলব্ধ অর্থ ও তার প্রয়োজনীয় ব্যয়ের মধ্যে একটা উদ্বৃত্তের অধিকারী হতে থাকে এবং ক্রমশ তার ঐশ্বর্য বেড়ে যায়। যেহেতু পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির জন্য অনুরূপ বিনামূল্যের শ্রমলাভ একটি সহজ ব্যাপার, সেজন্য অতি অল্প সময়ে সে ধনের অধিকারী এবং সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের অধিনায়ক হয়ে পড়ে। এই অর্থ শাসনতান্ত্রিক পদমর্যাদা ও জীবিকা অর্জনের একটি উপায় বলে গণ্য হতে পারে, যেমন আমরা আগে বলেছি।

অথচ অনুরূপ পদমর্যাদাহীন ব্যক্তি সর্বত্রই, যদিও সে সম্পদশালী হয়, তবুও সচ্ছলতা তার সম্পদ ও পরিশ্রমের অনুপাতেই হয়ে থাকে। অধিকাংশ ব্যবসায়ীই এ পর্যায়ের। এজন্য পাঠক, দেখতে পাবেন পদমর্যাদার অধিকারীরা তাদের চেয়ে বেশি সচ্ছল। অন্য একটি উদাহরণও এর সাক্ষ্য দেয়। আমরা এমন অনেক ধর্মশাস্ত্রবিদ্, ধার্মিক ও সাধুব্যক্তিকে দেখতে পাই, যাদের পুণ্যাত্মা হওয়ার ধারণা প্রচারিত হতে না হতেই মানুষ তাঁদের কল্যাণ কামনাকে আল্লাহ্‌র কাজ বলে মনে করে। সুতরাং তারা তাঁদের সাংসারিক কাজে সাহায্য করতে এবং নানাবিধ অভাব পূরণে এগিয়ে আসে। এর ফলে অতিসত্বর তাঁদের সচ্ছলতা দেখা দেয় এবং তাঁরাও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হতে থাকেন। অবশ্য এক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটিয়ে তাঁরা যৎকিঞ্চিৎ উপার্জনও করে থাকেন। এমন বহু ব্যক্তিকেই আমরা নগর, পল্লী ও প্রান্তরে ধনাঢ্যতা লাভ করতে দেখেছি। মানুষ তাঁদের জন্য ক্ষেতে-বাগানে কাজ করে দিচ্ছে; অথচ তাঁরা ঘরের মধ্যে বসে থাকেন; কখনও বের হয়ে দেখতেও যান না। এদিকে দিনে দিনে

তাঁদের সম্পদ বাড়তে থাকে, উপার্জন অপরিমাণ হয়ে ওঠে এবং তাঁরা কোনো প্রকার প্রচেষ্টা ছাড়াই ধনী হয়ে দাঁড়ান। যারা এমন সচ্ছলতার রহস্য বোঝে না, তারা তাঁদের আসবাবপত্র, প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে। বস্তুত পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অগণিত সম্পদের অধিকারী করেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[সাধারণভাবে সৌভাগ্য ও সম্পদ বসংবদ ও চাটুকারদের করতলগত হয় এবং এমন চরিত্র সৌভাগ্যের অন্যতম কারণ]

আমাদের আগের আলোচনায় একথা প্রকাশ পেয়েছে যে, মানুষ যে উপার্জনের দ্বারা উপকৃত হয়, তা তাদের শ্রমের মূল্য মাত্র। যদি কাউকেও সামগ্রিকভাবে শ্রম থেকে বিরত রাখা হয়, তা হলে তার উপার্জনও শূন্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকবে। বস্তুত তার শ্রম, এর মর্যাদা ও মানুষের কাছে এর চাহিদা অনুসারেই তার মূল্যমান নির্ধারিত হয় এবং সে অনুপাতেই তার উপার্জন বৃদ্ধি পায় অথবা ঘটে যায়। একটু আগেই আমরা বর্ণনা করেছি যে, পদমর্যাদা মানুষের সম্পদ লাভের সহায়ক। কারণ ঐ পদের অধিকারীদের নৈকট্য লাভ করে বিপদ দূর অথবা সম্পদ লাভ করার জন্য মানুষ তাদের জন্য নিজেদের শ্রম ও ঐশ্বর্য ব্যয় করে থাকে। তারা ঐ মর্যাদার জন্য যে শ্রম ও সম্পদ ব্যয় করে, এর বিনিময়ে ঐ পদের সহায়তায় সৎ-অসৎ সর্বপ্রকার উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়। সুতরাং তাদের এ শ্রম তাঁদের উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তার মূল্য তাঁদের জন্য সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য এনে দেয়। এর ফলে তাঁরা অতি অল্প সময়ে ধনাঢ্যতার অধিকারী হয়ে দাঁড়ান।

অতঃপর পদমর্যাদার এ স্তরও মানুষের মধ্যে বিভিন্ন এবং পর্যায়ক্রমে একের পর এক অবস্থিত। এর সর্বোচ্চ পর্যায় হলেন রাজন্যবর্গ, যাদের উপর আর কারও কোনো ক্ষমতা নেই এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে এমন সাধারণ মানুষ, যারা কল্যাণ-অকল্যাণ কোনটারই শক্তি বহন করে না। এ দুটির মধ্যে আরও বহু বিচিত্র পর্যায় রয়েছে। এটাই সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌র রহস্যলীলা, যা দিয়ে তিনি তাদের জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাদের কল্যাণ সুলভ করেন এবং তাদের অস্তিত্বকে পরিপূর্ণ করে তোলেন। কারণ মানব জাতির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য পরস্পরের কল্যাণধর্মী সহায়তা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। কেননা আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কোনো এক ব্যক্তির পক্ষে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। যদি কল্পনায় তার অস্তিত্ব ধরেও নেয়া যায়, তবুও তার স্থায়িত্ব কিছুতেই সম্ভব হয়ে উঠবে না।

তদুপরি এ সহায়তাও তাদের মধ্য থেকে স্বতোৎসারিত নয়; বরং অধিকাংশের পক্ষে মানব জাতির যথার্থ কল্যাণের উপলব্ধি না থাকায় এটি তাদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করা হয়। কেননা আল্লাহ্ মহান তাদেরকে ইচ্ছশক্তি দিয়েছেন এবং তাদের কার্যাবলি স্বভাবের তাড়নায় নয়, বরং চিন্তা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এটা কখনও সহায়তা থেকে দূরে সরে যায় এবং তখনই তাকে এ বিষয়ে

উৎসাহিত করতে হয়। সুতরাং তাদের মধ্যে এমন একজন উৎসাহদাতার অস্তিত্ব প্রয়োজন, যিনি স্বজাতিকে কল্যাণের পথে পরিচালনা করবেন; যাতে তাদের দায়িত্বের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করতে পারে। এটাই মহান আল্লাহ্‌র সেই বাণীর অর্থ—'আমরা তাদের অনেককে অন্য অনেকের উপর পর্যায়ক্রমে উন্নীত করেছি; যাতে তারা একে অন্যকে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগ করতে পারে। বস্তুত তোমার প্রতিপালকের দয়া তাদের সঞ্চয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'।[১১]

আগে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, পদমর্যাদাই ঐ শক্তি, যা মানুষকে তাদের অধীনস্থ স্বজাতির গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা দেয়। তাঁরা অনুমতি ও নিবৃত্তি, ধমকের প্রভাব ও আধিপত্যের ভাব দ্বারা অধীনস্থদেরকে অকল্যাণের প্রতিরোধ এবং কল্যাণের আগ্রহ সম্পর্কে উৎসাহিত করে তোলেন। এ ব্যাপারে ধর্মীয় অনুশাসন ও মানবিক কল্যাণের সবখানে ন্যায়কে তাঁরা অনুসরণ করে অন্যান্য উদ্দেশ্যও সাধন করে থাকেন। এর প্রথমটির দ্বারা একান্তভাবে ঐশী বিষয়গুলোতে মৌলিক সহায়তার উদ্দেশ্য থাকে এবং দ্বিতীয়টির দ্বারা প্রথমটিরই অন্তর্গত এমন একটি সহায়তার কামনা করা হয়, যা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সবখানেই অশুভ শক্তির আকারে বিদ্যমান। কেননা অনেক সময় বেশি কল্যাণের জন্য এর উপকরণের মধ্যেই সামান্য অকল্যাণের অস্তিত্ব অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এর ফলে কল্যাণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় না; বরং তার অন্তর্গত সামান্য অকল্যাণ বহন করেই তা বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। সৃষ্টির উপর অবিচারের অর্থ সম্ভবত এটাই; ভালো করে বুঝে নেয়া প্রয়োজন।

অতঃপর মানব সভ্যতার নাগরিক অথবা আঞ্চলিক যেকোন পর্যায়ে মানুষের প্রতিটি শ্রেণী তার নিম্নতর শ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা রাখে। অন্যদিকে নিম্ন শ্রেণীটিও উচ্চ শেণীর পদমর্যাদার সহায়তা গ্রহণ করতে তৎপর হয়। সুতরাং এভাবে প্রতিটি শ্রেণী তার অধীনস্থ জনসমষ্টির কাছ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলো দ্বারা উপার্জনের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। বস্তুত পদমর্যাদার এ ধারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। এটি পদমর্যাদার অধিকারীর পর্যায় ও শ্রেণী অনুসারেই ব্যাপক ও সংকীর্ণ হয়ে থাকে। সুতরাং পদমর্যাদা যদি ব্যাপক হয়, তা হলে তার উপার্জনের মাত্রাও সে অনুপাতে ব্যাপক এবং যদি সংকীর্ণ ও স্বল্প হয়, তা হলে উপার্জনও সে অনুযায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু পদমর্যাদাহীন ব্যক্তি সম্পদের অধিকারী হলেও তার সচ্ছলতা নিজ শ্রম ও সম্পদের অনুপাতেই দেখা দেয়। সে তার ঐ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য গমনা-গমন করে যে পরিমাণ প্রচেষ্টা চালায়, সে অনুযায়ী তার প্রাপ্তি। যেমন অধিকাংশ বণিক ও কৃষকের এটাই সাধারণ অবস্থা এবং শিল্পীদের বেলায়ও এটা প্রযোজ্য। কারণ তারা যখন পদমর্যাদাহীন হয়ে শুধুমাত্র তাদের শিল্পকর্মের উপর নির্ভর করে, তখন অনেক ক্ষেত্রেই তারা দারিদ্র্য ও অনাহারের সম্মুখীন হয়। অতি সত্বর সম্পদ লাভের কোনো সম্ভাবনা থাকে না; বরং তারা কেবল জীবনকে জীবিত রাখে এবং দারিদ্র্যকে প্রাণপণে প্রতিরোধ করে।

---

১১. জামাতুল, কোরান, ৪৩, ৩২; ৬, ১৬৫; ২৫, ২০।

যখন এ বক্তব্য পরিষ্কার হল যে, পদমর্যাদা বিভিন্ন শ্রেণীর এবং সৌভাগ্য ও কল্যাণ কেবলমাত্র এর অধিকারী হওয়ার দ্বারাই ত্বরান্বিত হয়, তখন পাঠক এ কথাও আপনি বুঝতে পেরেছেন যে, এ পদমর্যাদা বিতরণ একটি অতি বৃহৎ ও মহৎ সৌভাগ্য বিতরণের সমতুল্য। যিনি এটি বিতরণ করেন, তিনি যথার্থই মহান সৌভাগ্য বিতরণকারী এবং তিনি তা তাঁর অধীনস্থদের মধ্যেই বিতরণ করে থাকেন। সুতরাং এর বিতরণ একটি ক্ষমতার উৎস থেকে, একটি সম্মানের ভিত্তি হতে নিচে নেমে আসে। এজন্যই এ সৌভাগ্যের প্রত্যাশী-অভিলাষীরা বিনয় ও তোষামোদের প্রয়োজন অনুভব করে থাকে। যেমন তার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও রাজাদের কাছে অনুরূপ চরিত্র নিয়ে উপস্থিত হয়। কারণ এটি ছাড়া তা লাভ করার অন্য কোন পথ নেই। এ জন্যই আমরা বলেছি যে, বিনয় ও চাটুকারিতার দ্বারাই কেবল সেই পদমর্যাদা লাভ করা যায়, যা সৌভাগ্য ও সম্পদের খনি এবং এ কারণেই অধিকাংশ সচ্ছল ও ধনাঢ্য ব্যক্তি এ অভ্যাসের দাস। সম্ভবত আমরা এ কারণেই এমন অনেক লোককে দেখতে পাই, যারা তাদের অহঙ্কার ও আত্মমর্যাদার দরুন অনুরূপ পদমর্যাদার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং তারা তাদের শ্রমের বিনিময়ে যা পায়, তা দিয়েই কোনো প্রকারে দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতার মধ্যে জীবনধারণ করছে।

পাঠক, জেনে রাখুন, এ অহঙ্কার ও আত্মশ্লাঘা খুবই নিন্দনীয় চরিত্রগুণ। এটি একমাত্র সেই ব্যক্তির মধ্যেই জন্মাতে পারে, যে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে এবং তাঁর ধারণা মানুষ তার কাছ থেকে জ্ঞান ও গুণের সামগ্রী গ্রহণ করার জন্য অবশ্যই ছুটে আসবে। যেমন জ্ঞানের সাগর পণ্ডিত ব্যক্তি, উন্নত রচনাশক্তির অধিকারী লেখক অথবা উচ্চ কবিত্বশক্তির অধিকারী কবি। তাঁরা সবাই নিজ বিষয়ে ক্ষমতাবান এবং এ কারণেই মানুষ তাদের মুখাপেক্ষী এ ধারণা তাদেরকে অহঙ্কারী করে তুলেছে। বংশমর্যাদা ও কৌলিন্যের অধিকারীরাও অনুরূপ ধারণা পোষণ করে। কারণ তাদের পিতৃপুরুষের কেউ সম্রাট, বিখ্যাত জ্ঞানী অথবা প্রখ্যাত পুণ্যাত্মা ছিলেন। নগরে তাদের পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব দেখে ও শুনে তারাও ধারণা করে যে, তা তাদেরও প্রাপ্য। কারণ তারা সেই সব গুণি ব্যক্তি আত্মীয় ও উত্তরাধিকারী। অথচ তাদের মধ্যে উক্ত জ্ঞান-গুণের নিদর্শনমাত্রও নেই। কারণ জ্ঞান-গুণ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যায় না। অনুরূপভাবে কুশলী, দূরদর্শী ও বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও অনেক সময় নিজেদেরকে মনে মনে পরিপূর্ণতার প্রতিমূর্তি ভেবে মানুষ তাদের মুখাপেক্ষী হওয়ার ধারণা পোষণ করে।

পাঠক, এসব লোকের প্রত্যেককেই আপনি দেখতে পাবেন, তারা উন্নাসিকতায় নিমগ্ন এবং তাঁরা পদমর্যাদার সামনে নতি স্বীকারও করেন না ও তার অধিকারীদের চাটুকারিতায় যোগ দেন না। তাঁরা নিজেদের ছাড়া অন্য সবাইকেই তুচ্ছজ্ঞান করেন; কারণ তাদের ধারণা, তারাই মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ কারণেই তাদের অনেকেই এমন কি স্বয়ং সম্রাটের সামনেও বিনয় প্রকাশে বিরত থাকেন এবং অনুরূপ কিছু করাকে হেয়তা, অপমান ও নির্বুদ্ধিতা বলে মনে করেন। তাঁদের প্রতি মানুষ তাঁদের ধারণা অনুসারে সম্মান প্রদর্শন করবে, এটাই তাঁরা কামনা করেন এবং এক্ষেত্রে কেউ ত্রুটি প্রকাশ করলে হিংসা পোষণ করতে আরম্ভ করেন। অনেক সময় অনুরূপ আচরণের জন্য

তাঁরা নানাবিধ কথাবার্তা ও দুঃখও প্রকাশ করে থাকেন। এভাবে তারা বাস্তব সত্যকে গ্রহণ করা থেকে দূরে সরে থাকেন অথবা মানুষের অস্বীকৃতি থেকে কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করেন না। এর ফলে মানুষ তাঁদেরকে খুব সুনজরে দেখেন না। কারণ আত্মম্ভরিতা প্রতিটি মানুষের প্রকৃতিবিশেষ। এ কারণে তাদের কেউ কারও যোগ্যতা ও উন্নাসিকতা মেনে নিতে চান না; যদি না তা ত্রাস, প্রাধান্য ও ব্যাপকতার দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বস্তুত এ সবগুলোই পদমর্যাদার সাথে সংযুক্ত। সুতরাং উপরোক্ত চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির যদি পদমর্যাদা না থাকে, তা হলে তার অনস্তিত্বের জন্য সে নিজেও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে; পাঠক, যেমন আপনি ইতোমধ্যে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাঁরা মানুষের প্রতি উন্নাসিকতার জন্য তাদের বিরক্তিই উৎপাদন করে। তাদের সদাচারের কোন ন্যায্য অংশই তারা পায় না। এ কারণেই তাদের মধ্যকার সর্বোচ্চ গুণী ব্যক্তিরাও পদমর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ মানুষ তাদেরকে ভালবাসে না এবং তাঁরাও তাঁদের অভ্যস্ত কর্তব্যগুলো সম্পাদন ত্যাগ করে ঘরেই অবস্থান করতে থাকে। এর ফলে তাদের জীবিকা রুদ্ধ হয়ে যায় এবং অসচ্ছলতা, দারিদ্র্য অথবা তার চেয়ে কিছুটা উন্নততর অবস্থার অধিকারী হতে পারে মাত্র। কিন্তু কোন প্রকার ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়া কোন কালেই তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

এ থেকেই সম্ভবত মানুষের মধ্যে এ কথাটি বিখ্যাত হয়ে আছে যে, পূর্ণ জ্ঞানী কখনও পার্থিব সম্বন্ধেও ভাগ পায় না। কখনও এ ধারণার জন্য এভাবে যুক্তি দেয়া হয় যে, যেহেতু তাঁকে জ্ঞানের ভাগ পরিপূর্ণভাবে দেয়া হয়েছে সেজন্য পার্থিব সম্পদের ভাগ সে অনুপাতে কেটে রাখা হয়েছে। এটাই সম্ভবত এ কথার অর্থ যে, যাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা লাভ করা তার জন্য সহজ করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ই সব কিছুর নির্ধারক। তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রতিপালক নেই।

এরূপ উন্নাসিকতার বহু উদাহরণ সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও দেয়া যায়। সেখানেও তা নানা পর্যায়ে ঘটে থাকে। অনেক সময় নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উচ্চ পদমর্যাদার আসীন হয় এবং উচ্চশ্রেণীর বহুলোক কেবলমাত্র এ কারণে নিম্নে নেমে যায়। এর কারণ এই যে, সাম্রাজ্য যখন এর প্রাধান্য ও আধিপত্য বিস্তারের সীমায় পৌঁছে, তখন সাম্রাজ্যাধিকারীর গোত্রই রাজশক্তি ও রাজ্যশাসনের একক দায়িত্ব পালন করতে থাকে এবং অন্যরা এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। যদি তাদেরকে গ্রহণও করা হয়, তবু তারা রাজশক্তির অধিকারীদের পদমর্যাদার নিম্নে এবং শাসকের নির্দেশের অধীনে নিয়োজিত থাকে; যেন তারা সম্রাটের আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র।

অতঃপর সাম্রাজ্য স্থায়ী হয়ে এর রাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠলে, তখন সম্রাটের কাছে যারাই তাদের আন্তরিক সেবা ও সদুপদেশ নিয়ে উপস্থিত হয়, তিনি তাদের সবাইকেই সমদৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করেন। তিনি তাদেরকে সমমর্যাদা দিয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদিতে নিয়োগ করেন। এজন্য দেখা যায়, শুধু সম্রাটের স্বগোত্র নয়, বহু সাধারণ লোকও তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতার গুণে তাঁর নৈকট্য লাভ করে এবং তাদের সেবার দ্বারা তাঁর মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়। এক্ষেত্রে তারা ব্যাপকভাবে সম্রাট, তাঁর সভাসদ ও বংশাবলির বশ্যতা স্বীকার এবং তাঁদের তোষামোদীর দ্বারা সাহায্য গ্রহণ

করে থাকে। এর ফলে তাঁদের সাথে এসব লোকের সাহচর্য স্থায়ী হয়ে ওঠে এবং সম্রাট তাদেরকে নিজের লোক বলে গণ্য করেন। সুতরাং এ পদমর্যাদার মাধ্যমে তারা প্রচুর সম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিকারী হয় এবং সাম্রাজ্যের গণ্যমান্য লোকের মধ্যে তারা বিধৃত হয়ে যায়।

অথচ এ সময়ে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোত্রের নবীন বংশধরেরা, সাম্রাজ্যের জন্য তাদের পিতৃপুরুষদের কষ্ট স্বীকার ও আন্তরিক অবদানের কথা স্মরণ করে গর্বে স্ফীত হতে থাকে এবং ঐসব কীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে তারা গর্বিতভাবে সম্রাটের উপর চাপ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে। তাদের সব আচরণে ও কথাবার্তায় এসব বিষয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রকাশ পায়। ফলে সম্রাট তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেন এবং তার পরিবর্তে এসব নব-নিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। কারণ তাদের প্রাচীন কোন কীর্তি উল্লেখ করার মত কিছু নেই এবং সে জন্য তাদের ইঙ্গিত করা বা অহঙ্কারী হওয়ারও কোন সুযোগ নেই। তাদের একমাত্র চরিত্র হল তাঁর বশ্যতা, চাটুকারিতা এবং তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করে। সুতরাং তাদের পদমর্যাদা ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং তাদের অবস্থা উন্নীত হয়। তাদের প্রতি সবর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং সম্রাটের কাছে তাদের মর্যাদা ও সম্মানের ফলে বিশিষ্টরাও তাদেরকে সমীহ করতে আরম্ভ করেন। আর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাদের বংশাবলি তাদের সেই উন্নাসিকতা এবং প্রাচীন কীর্তির গর্বে সমাহিত হয়ে থাকে। এ মানসিকতা তাদের জন্য সম্রাটের বিরক্তি উৎপাদন এবং নব-নিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে তাদের উপর প্রাধান্য দেয়ার জন্য তাঁকে প্ররোচনা দেয়া ছাড়া অন্য কিছুই বহন করে আনে না। এভাবে সাম্রাজ্যের শেষ পর্যন্ত ঐ অবস্থা বিরাজ করে। সাম্রাজ্যগুলোতে এ বিষয়টি একান্তই স্বাভাবিক এবং এ থেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নবনিযুক্ত ব্যক্তিদের পদমর্যাদার পথ সুগম হয়েছে। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ই সব বিষয়ে অবগত। তিনিই একমাত্র সহায়। তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রতিপালক নেই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[ধর্মীয় বিষয়াদি পরিচালনাকরী; যেমন কাজী, মুফতী, মুদর্রিস, ইমাম, খতিব, মুয়াজ্জেন[১১-ক] এবং অনুরূপ অন্যান্যরা; সাধারণভাবে তাদের অবস্থা কখনও সচ্ছল হয় না]

এর কারণ এই যে, উপার্জন, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, শ্রমের মূল্য মাত্র এবং তা চাহিদার অনুপাতে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। সুতরাং কোন প্রকার শ্রম যদি একান্ত প্রয়োজনীয় এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, তা হলে তার মূল্য যেমন বাড়ে, তেমনি তার চাহিদাও বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এসব ধর্মীয় শিল্পকর্মের অধিকারীদের শ্রমে সাধারণ মানুষের কোন চাহিদা নেই। এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ধর্মের অনুরাগী বিশেষ ব্যক্তিরাই আকৃষ্ট হয়ে থাকেন। ধর্মীয় সমস্যার সমাধানে ফতোয়া এবং ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসায় কাজীর বিচারের প্রয়োজন হলেও এটি সাধারণভাবে অত্যাবশ্যকীয় নয়। এ কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের কোন চাহিদা নেই বললেও চলে। এসব ধর্মীয় কর্মাদি সম্পর্কে একমাত্র সাম্রাজ্যের অধিপতিরাই চিন্তা করেন এবং তাঁরাই এগুলোর প্রতিষ্ঠা করেন। কেননা তাঁদের উপর ধর্মীয় কল্যাণবিধানের দায়িত্ব বর্তমান। সুতরাং এগুলোর নিয়োগের ও চাহিদার পরিমাণ অনুসারে সম্পদের একটা অংশ সে জন্য ব্যয় করে থাকেন, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এর ফলে এসব ধর্মীয় কর্তব্যে রত ব্যক্তিরা কখনও শৌর্য-বীর্যের অধিকারী ও ব্যাপক প্রয়োজনীয় শিল্পকর্মের শ্রমিকদের সমমর্যাদা লাভ করতে পারে না। যদিও ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের দিক থেকে তাঁদের কর্তব্য কর্ম শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদার অধিকারী, তবু সে জন্য মূল্য দেয়ার ক্ষেত্রে চাহিদার ব্যাপকতা ও প্রয়োজনের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ রাখা হয়। এজন্য তাঁদের ভাগে অতি অল্পই পড়ে।

তদুপরি তাঁদের কর্তব্যকর্মের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তাঁরা সব শ্রেণীর মানুষ চেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী এবং তাঁরা নিজেরাও নিজেদেরকে এরূপ ভেবে থাকেন। সুতরাং তাঁরা পদমর্যাদার অধিকারীদের বশ্যতা স্বীকার করে বেশি সম্পদ লাভের পথে আগান না। বরং বলা যায়, অনুরূপ কিছু করার তাদের অবসরই নেই। কারণ তাঁরা যে মহান কর্তব্যকর্মে নিয়োজিত রয়েছেন, সেজন্য চিন্তা ও সাধনাতেই তাঁদের সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। বরং এভাবেও বলা যায় যে, তাঁরা যে মহান কর্তব্যে নিয়োজিত আছেন, এর মর্যাদাই তাঁদেরকেই পার্থিব ক্ষমতার অধিকারীদের পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত রাখে।

১১-ক কাজী = বিচারক; মুফতি = ধর্মীয় বিধান দানকারী; মুদরিস = শিক্ষক; ইমাম = নামাজ পরিচালনাকারী এবং মুয়াজ্জেম = নামাজের আহ্বানকারী।

কারণ তাঁদের পক্ষে এরূপ কাজ করা শোভা পায় না। এজন্যই সাধারণভাবে তাঁরা সম্পদের অধিকারী হতে পারেন না।

এ ব্যাপারে আমি অনেক গুণী ব্যক্তির সাথে তর্কে লিপ্ত হয়েছি; তারা এ বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। আমার হাতে সম্রাট আল-মামুনের প্রাসাদের হিসাব দপ্তরের কিছু ছিন্নপত্র বিদ্যমান, যাতে নানা বিষয়ে তৎকালীন আয়-ব্যয়ের বহু হিসাব রয়েছে। সেখানে কাজী, ইমাম, মুয়াজ্জেন প্রমুখ বৃত্তিধারীদের বেতনের যে হিসাব পাচ্ছি, তা আমার বক্তব্যের অনুকূলেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। আমি পূর্বোক্ত সেই তার্কিক গুণীদেরকে তা দেখিয়েছি এবং পরিশেষে তাঁরাও স্বীকার করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্‌র এ সৃষ্টি জগতের রহস্যলীলা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁর বিচক্ষণতার অপার মহিমা দেখে বিস্মিত হয়েছি। প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহই সৃষ্টি করেন এবং নিবারণ করেন। তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রতিপালক নেই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[কৃষিকাজ.দুর্বল শ্রেণী ও সরলপ্রাণ বেদুইনদের জীবিকা]

কেননা তা জীবিকার দিক থেকে স্বাভাবিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রক্রিয়ার দিক থেকে অবিমিশ্র। এ কারণে, পাঠক, সাধারণত নগরবাসী কাউকেও এ বৃত্তি গ্রহণ করতে দেখবেন না। এবং সেখানকার ধনাঢ্য বিলাসীদের সম্পর্কে প্রশ্নই ওঠে না, কারণ এ জীবিকার অধিকারীরা হীনতার দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (স) আনসারদের ঘরের দ্বারে লাঙ্গলের ফলা দেখতে পেয়ে বলেছিলেন, 'যাদের ঘরের দ্বারে এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সেখানে হীনতাও এর সঙ্গে এসেছে।' বোখারি এই উক্তিকে অনুরূপ বিষয়ের আধিক্যের প্রতি আরোপ করেছেন এবং তিনি এরই ব্যাখ্যা করে তাঁর সংকলনে অধ্যায় যোজনা করেছেন,—'কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের যে পরিণাম অথবা নির্দেশিত সীমা অতিক্রম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।' এর কারণ সম্ভবত আল্লাহ ভাল জানেন, এই যে, এই জীবিকার জন্য কৃষকদেরকে যে কর দিতে হয়, তা দিয়ে তারা কোন না কোন ক্ষমতার বশীভূত হয়ে পড়ে। কেননা কর আদায়কারীমাত্রই হীনতা ও অক্ষমতার অধিকারী এবং এর দ্বারা তাকে কারও শাসন ও আধিপত্য স্বীকার করে নিতে হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মহাপ্রলয়ের পূর্বে জাকাত আরোপিত কর-এ পরিণত হবে। এ দ্বারা তিনি অবিচারী রাজশক্তি, মানুষের জন্য কঠোরতা, আধিপত্য ও উৎপীড়ন এবং পুঁজি সংগ্রহে মহান আল্লাহ্‌র প্রাপ্যাদি ভুলে যাবার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। রাজশক্তি ও সাম্রাজ্য যে এ সব অধিকারকে আরোপিত করের ন্যায় মনে করবে, তার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। বস্তুত আল্লহ্ যা ইচ্ছা করতে পারেন। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্‌ই সব কিছু অবগত এবং তিনিই একমাত্র শক্তিদাতা।

নবম পরিচ্ছেদ

[বাণিজ্যের অর্থ, তার প্রক্রিয়া ও প্রকার]

পাঠক, জেনে রাখুন, বাণিজ্য হল স্বল্পমূল্যে সামগ্রী ক্রয় করে বেশি মূল্যে বিক্রয় করার মাধ্যমে পুঁজি বৃদ্ধি করে উপার্জনের ব্যবস্থা করা। বিক্রেয় পণ্য যাই হোক না কেন; আটা, শস্য, পশু অথবা পরিধেয়, ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পুঁজির এ বৃদ্ধিকে বলা হয় 'লাভ'। এ লাভ করার প্রক্রিয়া, হয় পণ্য মজুদ করে বাজার দরের সুলভ থেকে মহার্ঘ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা, যাতে বেশি লাভ হয় অথবা পণ্য ক্রয়ের স্থান থেকে এমন এক স্থানে চালান করা যেখানে বাজার তেজী; ফলে লাভও বেশি। এজন্যই অনেক বয়োবৃদ্ধ অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী বাণিজ্যের অর্থজিজ্ঞাসুদেরকে বলেছেন, আমি তোমাকে এটি দুটি কথার দ্বারা শিখিয়ে দিচ্ছি—'সুলভ মূল্যে ক্রয় ও বেশি মূল্যে বিক্রয়।' এ উক্তি থেকেও ঐ কথাই প্রকাশ পাচ্ছে, বাণিজ্য অর্থে আমরা পূর্বে যা বর্ণনা করেছি। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ই বেশি জ্ঞানী; তিনিই একমাত্র ভরসা এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রতিপালক নেই।

দশম পরিচ্ছেদ

[কোন শ্রেণীর লোক বণিজ্যের দ্বারা উপকৃত হয় এবং কাদের তা পরিত্যাগ করা উচিত।[১২]]

ইতিপূর্বে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, বাণিজ্য হল পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে তার চেয়ে বেশি মূলে বিক্রয়ের মাধ্যমে পুঁজি বৃদ্ধি করা। এটি করতে গিয়ে বাজার দরের ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করা; অন্যত্র চালান দেয়া, যেখানে উক্ত পণ্যের চাহিদা ও মূল্য অত্যধিক অথবা নির্ধারিত সময়ের পরে পরিশোধযোগ্য বেশি মূল্যে বিক্রয় করা। কিন্তু শেষোক্ত এ প্রক্রিয়ায় মূল পুঁজির তুলনায় লাভের পরিমাণ খুবই অল্প। অবশ্য পুঁজির পরিমাণ বেশি হলে এ অল্পও বেশি বলে মনে হবে। কেননা অধিকের অল্পও বেশি।

অতঃপর পুঁজি বৃদ্ধির এ প্রক্রিয়ায় পণ্য সামগ্রী বিক্রেতাদের কবলে যায় এবং তাদের ক্রয়-বিক্রয় ও মূল্য প্রদানের ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রিতা লাভের বিষয়টি অনিশ্চিত করে তোলে। কারণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণের সংখ্যা খুব কম। এর ফলে ভেজাল, ওজন হ্রাস, পণ্যবিকৃতি ও মূল্য প্রদানে গড়িমসি দেখা দেয় এবং লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। কেননা এ সময়ে পুঁজি আবদ্ধ হয়ে থাকে এবং এর বৃদ্ধি স্থগিত হয়ে পড়ে। অনেক সময় ক্রেতারা অস্বীকৃতি ও প্রতারণার মাধ্যমে মূল পুঁজিকেই নষ্ট করে দিতে চায়; যদি না এর জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যবস্থা থাকে। দেশের শাসনব্যবস্থা এ ব্যাপারে খুব কমই সাহায্য করতে পারে। কারণ এর নিয়ন্ত্রণ প্রকাশ্য বিষয়গুলোর উপরই বর্তায় মাত্র। এভাবে ব্যবসায়ী বেশ অসুবিধাজনক অবস্থার সম্মুখীন হয়।

এসব অনিশ্চয়তা ও অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে তাকে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করতে হয়। এর ফলে কখনও কিছু লাভ দেখা দেয়, কখনও-বা কিছুই পায় না; আবার কখনও আসল পুঁজিই নষ্ট হয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ী যদি ঝগড়া করতে প্রস্তুত, হিসাব-নিকাশে দক্ষ, তাগাদা-তদবিরে কঠোর এবং শাসকের দ্বারস্থ হতে উদ্যোগী হয় তা হলে তার এই সাহস ও তদবিরের গুণে ক্রেতারা অনেকাংশে ন্যায্য আচরণ করতে বাধ্য হয়। অন্যথায় ব্যবসায়ীকে কোন পদমর্যাদার সাহায্য গ্রহণ করতে হবে, যাতে ক্রেতারা তাকে সমীহ করে এবং শাসন কর্তৃপক্ষও তার খাতক ক্রেতাদের কাছে থেকে মূল্য আদায় করে দিতে তৎপর হয়। এর ফলে সে ব্যবসায় ক্ষেত্রে কিছুটা ন্যায্য আচরণ

---

১২. এ পরিচ্ছেদে রোজেনথাল দ্বাদশ, ত্রয়োদশে দশম এবং একাদশে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছেন।

এবং ক্রেতাদের কাছে থেকে পুঁজি উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। প্রথমটিতে তারা স্বেচ্ছায় এবং দ্বিতীয়টিতে তারা বাধ্যতামূলকভাবে এগিয়ে আসে।

কিন্তু কোন ব্যবসায়ী যদি স্বয়ং অনুরূপ সাহস ও তৎপরতা দেখাতে না পারে এবং তার কোন প্রকার শাসনতান্ত্রিক পদমর্যাদার সহায়তা না জোটে, তা হলে তার পক্ষে বাণিজ্যের বৃত্তি গ্রহণ না করা উচিত। কারণ এ অবস্থায় ব্যবসায়ে নামার অর্থ তার সমস্ত সম্পদ নষ্ট হওয়ার পথ করে দেয়া। ক্রেতারা তার পুঁজি খেয়ে ফেলবে এবং সে নিজে তাদের কাছে থেকে, বলতে গেলে, কোনো ন্যায্য আচরণই পাবে না। কারণ মানুষের অধিকাংশই, বিশেষ করে প্রজা ও ক্রেতাসাধারণ অন্যের অধীনস্থ সম্পদ কুক্ষিগত করে নিতে সর্বদা লালায়িত ও উদগ্রীব। যদি না শাসনতান্ত্রিক নিয়ম-নীতির সংযম থাকত, তা হলে মানুষের সম্পদ লুটের মাল হয়ে দাঁড়াত। আল্লাহ্ যদি না মানুষের একাংশ দিয়ে অপরাংশকে প্রতিরোধ করতেন, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ নিখিল বিশ্বের প্রতি অনুগ্রহশীল।[১৩]

১৩. কোরান।

একাদশ পরিচ্ছেদ

[ব্যবসায়ীদের চরিত্র রাজন্যবর্গ ও সম্ভ্রান্তদের চরিত্র অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর হয়ে থাকে।[১৪]]

কেননা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অধিকাংশ সময় ক্রয়-বিক্রয়ে নিয়োজিত থাকে এবং সেজন্য তাদেরকে আবশ্যকীয়ভাবে চালাকির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। এভাবে ক্রমশ ত্রুটির অধীন হলে তা তার চরিত্রের উপরও প্রভাব বিস্তার করে বসে অর্থাৎ চরিত্রের দিক থেকেই সে চতুর হয়ে পড়ে এবং তার মধ্যে সম্ভ্রমবোধের অভাব ঘটে, যা দ্বারা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও রাজন্যবর্গ ভূষিত হয়ে থাকেন। তারপর যদি এ চাতুর্যের অনুসরণে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তাদের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ঝগড়া, ভেজাল, প্রতারণা এবং পণ্য সামগ্রীর মূল্য গ্রহণ ও প্রদানে মিথ্যা শপথ ইত্যাদির ন্যায় নীচ প্রবৃত্তির দ্বারস্থ হয়, তা হলে অত্যন্ত সুস্পষ্ট কারণেই তাদের চরিত্র অসৎ হয়ে উঠবে। পাঠক, এজন্যই দেখতে পাবেন যে, রাজশক্তির অধিকারী ব্যক্তিরা এমন চরিত্র সৃষ্টির আশঙ্কাতেই এই জীবিকা গ্রহণ থেকে দূরে সরে থাকেন। অবশ্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি বিদ্যমান, যারা তাদের সৎবৃত্তি ও সম্ভ্রান্ত যোগ্যতার দরুন এসব দোষ থেকে বেঁচে থাকতে সমর্থ হন; যদিও বাস্তবে তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে সৎপথ প্রদর্শন করে থাকেন[১৫] এবং তিনিই সব পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জনতার প্রতিপালক।

---

১৪. এ পরিচ্ছেদটি রোজেনথাল পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুর পূর্ববর্তী সংস্করণ বলে মনে করেন এবং এর সাথে পাদটীকায় বর্ণনা করেছেন।

১৫. কোরান, ২, ১৪২।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

[ব্যবসায়ীদের পণ্যসামগ্রী চালান দেয়া]

ব্যবসা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী তার সেই পণ্যকে চালান দিয়ে থাকেন রাজা, প্রজা, ধনী ও দরিদ্রের কাছে যার ব্যাপক চাহিদা বিদ্যমান। কেননা এ প্রক্রিয়াতেই তাঁর পণ্য বেশি কেটে থাকে। কিন্তু তা না করে তিনি যদি শুধু কিছু সংখ্যক লোকের চাহিদা অনুযায়ী পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করেন, তাহলে এটার বিক্রয়ের সম্ভাবনা একান্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কেননা ঐ কিছু সংখ্যক ক্রেতা এ ব্যাপারে উদাসীন হলে এবং কোন প্রকার অসুবিধা দেখা দিলে তার বাজার মন্দা হয়ে দাঁড়ায় ও লাভের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়।

অনুরূপভাবে চাহিদা অনুসারে পণ্য চালান দিতে গিয়ে তাকে সর্বদা মধ্যমমানের প্রলি লক্ষ রাখা উচিত। কেননা বেশি মূল্যের সামগ্রী একমাত্র ধনাঢ্য ও সম্রাটের সভাসদদের পক্ষেই ক্রয় করা সম্ভব এবং স্বভাবতই তাদের সংখ্যা কম। বস্তুত মানুষ সর্বদা মধ্যমমানের পণ্যকেই আদর্শ ক্রয়দ্রব্য বলে মনে করে। সুতরাং এ ব্যাপারে ব্যবসায়ীকে অবশ্যই তৎপর হতে হবে। কারণ এ বিবেচনার উপরই তার পণ্যের বাজারের তেজী ও মন্দা ভাব নির্ভর করছে। অনুরূপভাবে ব্যবসায়ী যদি বহু দূরদর্শী অথবা বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে তার পণ্যকে অন্যত্র পৌঁছাতে সক্ষম হয়, তা হলে এর দ্বারা ব্যবসায়ী বেশি উপকার, প্রচুর লাভ এবং বাজার মূল্যের ব্যাপক সুযোগ পেতে পারে। কেননা উক্ত অঞ্চলের অবস্থান বহু দূরে অথবা বিপদসঙ্কুল পথের পরপারে হওয়ায় সেখানে চাহিদা অনুসারে সরবরাহকৃত পণ্যের পরিমাণ অল্প হবে। কারণ এমন অসুবিধার জন্যই এর সরবরাহকারীর সংখ্যা কম এবং এর অস্তিত্ব মূল্যবান। সুতরাং যে পণ্যের চাহিদা আছে অথচ এর পরিমাণ কম, এর মূল্য অবশ্যই বেড়ে যাবে। কিন্তু এর বিপরীতভাবে যদি স্থানটি নিকটবর্তী ও রাস্তাঘাট নিরাপদ হয়, তা হলে সেখানে পণ্য সরবরাহকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং পণ্যের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে এর মূল্য সুলভ হয়ে উঠবে।

পাঠক, এ কারণেই আপনি দেখতে পান যে, যে-সব ব্যবসায়ী সুদান অঞ্চলে যেতে আগ্রহী, তারা তুলনামূলকভাবে বেশি সচ্ছল এবং প্রচুরতর ঐশ্বর্যের অধিকারী। কেননা সুদানের পথ অতিশয় দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য। তৃষ্ণা ও ভীতির আশঙ্কায় পরিপূর্ণ কঠিন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে সেখানে যেতে হয়। এ পথে নির্দিষ্ট পরিচিত কিছু সংখ্যক স্থান ছাড়া অন্যত্র পানীয় জল পাওয়া যায় না এবং এর সন্ধানও পথ-প্রদর্শক ছাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। এ কারণে এ পথের দূরত্ব ও বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে খুব অল্প লোকই সাহস

করে থাকে। এর ফলেই সুদানের পণ্য আমাদের বাজারে খুব কম পাওয়া যায় এবং তার মূল্য বেশি। অনুরূপভাবে আমাদের এলাকার পণ্যও সেখানে বিরল। এ কারণে এসব অঞ্চলে পণ্য সরবরাহকারীরা সহজে তাদের পুঁজি বাড়িয়ে প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হয়ে ওঠে।

অনুরূপভাবে আমাদের এলাকা থেকে পণ্য নিয়ে যারা পূর্বাঞ্চলে যায়, তাদেরকেও কষ্টসাধ্য দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু যারা একই পরিমণ্ডলে ঘোরাফিরা করে এক শহর থেকে অন্য শহরে পণ্য চালান দেয়, তাদের খুব বেশি একটা উপকার হয় না। কারণ বেশি সরবরাহকারী, অতিরিক্ত পণ্য থাকার ফলে তাদের লাভের পরিমাণ খুব নগণ্য। আল্লাহ, তিনিই তো সম্পদদাতা; প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী।[১৬]

---

১৬. কোরান, ৫১, ৫৬।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

[মজুদদারী]

নগরীর দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ লোকদের কাছে এটি সুপরিচিত যে, দুর্মূল্যের জন্য শস্যাদি মজুদ করে রাখা অশুভ কাজ। কারণ তার দ্বারা লব্ধ উপকার পরিণামে ক্ষতি ও সর্বনাশ ডেকে আনে। এর কারণ সম্ভবত, আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, এই যে, মানুষ স্বভাবতই খাদ্যের মুখাপেক্ষী এবং এ উদ্দেশ্যে তারা যে পরিমাণ অর্থেরই প্রয়োজন হোক না কেন, ব্যয় করতে বাধ্য। অথচ এ বাধ্য-বাধকতার জন্য তাদের অন্তরে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং অন্তরের এ ক্ষোভ, যারা মানুষকে অনর্থক বেশি দিতে বাধ্য করে, তাদের অশুভ পরিণাম ডেকে আনতে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। সম্ভবত একেই ধর্মপ্রবর্তক অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ কুক্ষিগত করার স্বভাব হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। এ ক্ষেত্রে যদিও বিষয়টি অনর্থক নয়, তবু তার জন্য অন্তর বিক্ষুব্ধ হয় এবং মানুষ যেভাবে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ ছাড়াই অতিরিক্ত মূল্য দিতে বাধ্য হয়, তাতে ব্যাপারটিকে জবরদস্তি বললেও অত্যুক্তি হয় না।

অবশ্য খাদ্য ও খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য পণ্যের প্রতি মানুষ অনুরূপ মুখাপেক্ষী নয়। তা তার প্রবৃত্তির বিচিত্র চাহিদা পূরণ করতেই ক্রয় করে থাকে এবং এর জন্য তারা লোভের বশে ইচ্ছা করেই অর্থ ব্যয় করে। সুতরাং তাদের অনুরূপ অর্থব্যয়ে অন্তরে কোন ক্ষোভ থাকে না। এ কারণেই যারা মজুদদারীর দ্বারা পরিচিত হয়ে ওঠে, মানুষের আন্তরিক ক্ষোভ তাদের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হতে থাকে। কারণ তারা মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে এবং সেজন্য তাদের লাভ দূষিত হয়ে দাঁড়ায়। মহান আল্লাহ্‌ই সর্বোত্তম জ্ঞাতা।

এ বক্তব্যের সাথে মিলে, এমন একটি রসাত্মক কাহিনী আমি মাগরিবের কোন এক জ্ঞানবৃদ্ধের মুখ থেকে শুনেছিলাম। আমাদের উস্তাদ আবু আবদুল্লাহ আবেলি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি সুলতান আবু সায়িদের সময় ফেজনগরীর কাজী ধর্মশাস্ত্রবিদ আবুল হাসান মলিলীর কাছে একবার উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে তার বেতনের জন্য সঞ্চিত পণ্যের উপর ধার্যকৃত যে-কোন একটি খাতের কর গ্রহণ করতে বলা হয়েছিল। উস্তাদ আবেলি বলেন, উক্ত কাজী এটি শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, মদের উপর ধার্যকৃত কর। এটি শুনে উপস্থিত তাঁর সঙ্গীরা সবাই হেসে উঠলেন এবং বিস্মিত হলেন। পরে তারা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, যেহেতু সঞ্চিত পণ্যদ্রব্যের উপর ধার্যকৃত সব করই নিষিদ্ধতার

দিক থেকে সমতুল্য, কাজেই আমি তার মধ্য থেকে এমন একটি গ্রহণ করলাম, যা প্রদান করতে মানুষ ক্ষুব্ধ হয় না। ভাবাবেগে আনন্দিত মূর্ছিত হওয়ার জন্যই মানুষ মদ ক্রয় করতে তাদের সম্পদ ব্যয় করে থাকে। সুতরাং এর জন্য তাদের কোন প্রকার আক্ষেপ থাকে না এবং অন্তরের মধ্যে কোন বিক্ষোভও বহন করে না।

যথার্থই এ এক অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ অন্তরের গোপন বাসনাও জানেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

[পণ্যের সুলভ মূল্য ব্যবসায়ীদেরকে মন্দা বাজারের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করে]

এটা এই যে, উপার্জন ও জীবিকানির্বাহ, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, শিল্পকর্ম অথবা বাণিজ্যের দ্বারা সম্ভব হয়ে থাকে। বাণিজ্য বলতে সামগ্রী ক্রয় করে মজুদ করা এবং বাজার দরের উঠানামা লক্ষ করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মূল্যবৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করা বোঝায়, এর ফলে উদ্বৃত্তকে বলা হয় লাভ এবং এর মাধ্যমেই অনুরূপ বৃত্তিধারীদের জন্য সর্বদা উপার্জন ও জীবিকা সংগ্রহ হয়ে থাকে। সুতরাং পণ্যসামগ্রী, তথা খাদ্যদ্রব্য, পরিচ্ছদ অথবা যা দিয়ে পুঁজি সংগৃহীত হয়, সেগুলোর মূল্য সুলভ হয়ে উঠলে ব্যবসায়ী বাজারদরের উঠা-নামার সুযোগ পায় না এবং এ অবস্থা দীর্ঘকাল ধরে থাকলে তার লাভ তথা পুঁজি বৃদ্ধির সমস্ত সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট পণ্যের বাজার মন্দা থাকার ফলে ব্যবসায়ীর শুধু কষ্টই সার হয়। সুতরাং সে এ ব্যাপারে যে কোন প্রকার চেষ্টা থেকে বিরত হয় এবং তার পুঁজি নষ্ট হয়ে যেতে থাকে।

পাঠক, এক্ষেত্রে প্রথমে শস্যের কথাই বিবেচনা করুন। এর মূল্য স্থায়ীভাবে সুলভ হয়ে উঠলে, এর সাথে সংশ্লিষ্ট সব বৃত্তিধারী অবস্থা কী নিদারুণভাবেই না বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে অতি নগণ্য লাভ কিংবা তার অস্তিত্বহীনতা শস্য উৎপাদনকারী চাষী থেকে আরম্ভ করে সব পর্যায়ের লোকের মধ্যেই নিরুৎসাহ ছড়িয়ে দেয়। কারণ তারা এতে তাদের পুঁজি বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা দেখে না এবং যে সামান্য লাভ হয় তাতে খরচ না পুষিয়ে মূলধনের উপর চাপ পড়ে। এভাবে তারা ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতার সম্মুখীন হয়। অনুরূপভাবে শস্যের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বৃত্তিজীবীরা, যেমন—পেষণকারী, রুটি প্রস্তুতকারী তথা তার উৎপাদন থেকে আরম্ভ করে খাদ্যরূপে পরিণত হওয়া পর্যন্ত যারা এর সাথে যুক্ত আছে, তাদের সবার অবস্থাই শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

অনুরূপভাবে সৈন্যদলও দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই শাসক তাদের বেতন উৎপাদিত শস্যের দ্বারা পরিশোধ করে থাকেন। এর ফলে তাদের জন্য নির্ধারিত করের পরিমাণ কমে যায়। সুতরাং তাদের পক্ষে সৈনিক বৃত্তি রক্ষা করে চলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়; অথচ এ উদ্দেশ্যেই তারা শাসকের কাছ থেকে শস্য ও করের ভাগ লাভ করত। কিন্তু বেতনের দুরবস্থা তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে ফেলে।

অনুরূপভাবে যখন মধু ও চিনির মূল্য স্থায়ীভাবে সুলভ হয়ে দাঁড়ায়, তখন এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে ন্যূনতা দেখা দেয় এবং বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ীরা এগুলোর ব্যবহার ত্যাগ করে। অনুরূপভাবে যাবতীয় পরিচ্ছেদের মূল্যের সুলভতা দুরবস্থার সৃষ্টি করে।

বস্তুত অতিরিক্ত সুলভ মূল্য যেমন বৃত্তিজীবীদের জীবননির্বাহে বাধার সৃষ্টি করে, তেমনি কোন বিশেষ পণ্যের অতিরিক্ত দুর্মূল্যও একই প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়। অবশ্য অনেক সময় এ শেষোক্ত কারণটি অতিরিক্ত মূল্যের দ্বারা পুঁজি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে বটে; কিন্তু তেমন সুযোগ খুবই কম দেখা যায়। সাধারণভাবে মধ্যম মূল্যমান ও বাজারদরের সত্বর ওঠা-নামাই জীবন ও জীবিকার জন্য অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে থাকে। এ সম্পর্কে মানবসভ্যতার প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাগুলো থেকেই আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারি।

যে খাদ্যদ্রব্য ও পণ্যসামগ্রীর প্রতি ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সব মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা অত্যধিক, কেবল সেগুলোতে সুলভ মূল্য প্রশংসনীয় হয়ে থাকে। কেননা সমাজে এসব দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যাই বেশি। সুতরাং এতে তাদের ব্যাপক সুবিধা হয়। বস্তুত এ ক্ষেত্রে ব্যবসার পণ্য অপেক্ষা এগুলোকে খাদ্য সামগ্রী হিসেবে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। আল্লাহ্ই সম্পদদাতা, প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং বিরাট সিংহাসনের একমাত্র প্রভু।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

[ব্যবসায়ীদের চরিত্র নেতৃস্থানীয়দের চরিত্র অপেক্ষা হীন এবং সম্ভ্রমের অতীত]

ইতিপূর্বে আমরা অন্য একটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি যে, ব্যবসায়ীরা পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় এবং তার মাধ্যমে লাভ ও উপকার প্রাপ্তির প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। সুতরাং এ ব্যাপারে তাদেরকে চাতুর্য, বিবাদ, বুদ্ধিমত্তা, মামলাবাজী ও প্রচুর নিষ্ঠার পরিচয় দেয়া প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। কেননা এগুলো এ জীবিকার আনুষঙ্গিক ফলশ্রুতি। বস্তুত এ সব গুণ পবিত্রতা ও ভদ্রতার বিরোধী এবং এর ক্ষতিকারক। কেননা প্রতিটি প্রতিক্রিয়াই মানুষের প্রবৃত্তিতে এর প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং সৎকাজ সৎ-প্রভাব ও পবিত্রতা বহন করে এবং অসৎ কাজ ও শৈথিল্য এর বিপরীত প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। কাজেই এদের বারংবার ও পর্যায়ক্রমিক প্রকাশ এদেরকে স্থায়ী ও দৃঢ় করে তোলে এবং অসৎ কার্যাদির ক্রমবর্ধমান প্রভাব সচ্চরিত্রের বিনাশ ঘটাতে আরম্ভ করে। মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাধারণ ফলশ্রুতি এটাই।

এ প্রভাব ব্যবসায়ীদের শ্রেণী ও পর্যায় অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে যারা নিম্ন পর্যায়ের, যারা বিক্রেতাদের দুষ্কৃতি তথা ভেজাল, প্রতারণা, জোচ্চুরি এবং পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ে মান ও মূল্য সম্পর্কে মিথ্যা শপথের ন্যায় দুষ্কর্মের সাথে সংযুক্ত থাকে, তাদের মধ্যে এসব দুশ্চরিত্রের অবস্থা ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। তারা শৈথিল্যের মধ্যে জড়িত হয়ে সম্পূর্ণভাবে সম্ভ্রমবোধ ও এর সংরক্ষণ থেকে দূরে সরে যায়। যাহোক, যে-কোন অবস্থাতেই তাদের সম্ভ্রমবোধের মধ্যে চাতুর্য ও কলহের প্রবৃত্তি অনিবার্যভাবে প্রবেশ করে ক্রমশ এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দেয়। তাদের মধ্যে অন্য শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা, যাদের সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে বর্ণিত পরিচ্ছেদে বলেছি যে, তারা পদমর্যাদার দ্বারা একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। যাতে তাদেরকে উপরোক্ত দুষ্কর্মাদির দ্বারস্থ হতে না হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থার সাফল্য খুবই নগণ্য ও বিরল হতে পারে যে, তাদের কাছে হঠাৎ কোন অভিনব উপায়ে অথবা নিজ বংশাবলির কারও কাছে থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর ধনসম্পদ লাভ হল, যা দিয়ে তারা সাম্রাজ্যাধিপতিদের নৈকট্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছে এবং এটা তাদের সমসাময়িক অন্য সবার মধ্যে তাদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ফলে তারা উপরোক্ত দুষ্কর্মাদির সংস্পর্শ থেকে দূরে সরে থাকার জন্য ব্যবসার ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিনিধি ও চাকর-গোমস্তাদের উপর নির্ভর করতে পারছে। শাসকরাও তাদের সাহচর্য ও উপঢৌকনাদির জন্য তাদের

অধিকার রক্ষায় সুবিচারকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। সুতরাং এসব বিষয় মিলেমিশে তাদেরকে সে সব অনিবার্য দুষ্কর্ম থেকে দূরে রেখেছে, যার কথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে তাদের সম্ভ্রমবোধ কোন প্রকার বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন না হয়ে স্থায়ী হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য তবুও যবনিকার অন্তরালে অনুষ্ঠিত ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার প্রভাবের কথা অস্বীকার করা যায় না। কারণ তাদেরকে অবশ্যই তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা গৃহীত ব্যবস্থাদির প্রতি সম্মতি অথবা অসম্মতি জ্ঞাপন এবং এদের জন্য প্রয়োজনীয় গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। তবে এরূপ সংস্পর্শের পরিধি সংকীর্ণ এবং এর প্রভাবও সেই অনুপাতে দুর্নিরীক্ষ। আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্মসমূহকে সৃষ্টি করেছেন।[১৭]

১৭. কোরান, ৩৭, ৯৬।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

[শিল্পকর্মের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন]

জেনে রাখুন, শিল্প এমন একটি অভ্যাস, যা গড়ে তুলতে দৈহিক ও মানসিক শ্রমের প্রয়োজন। শ্রমের দিক থেকে এটা দৈহিকভাবে অনুভবযোগ্য। বস্তুত যা দৈহিক শ্রমের দ্বারা অনুভবযোগ্য তা সাহচর্যের দ্বারা অনুসৃত হলে বেশি সম্পূর্ণ ও ব্যাপক হয়ে ওঠে। কেননা দৈহিক শ্রমের ক্ষেত্রে সাহচর্যই বেশি উপকারী। ফলত শিল্প একটি অভ্যাস, যা বিশেষ প্রক্রিয়ায় বারংবার অনুশীলনের দ্বারা স্থায়ী হয় এবং তার বাস্তবরূপ পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ অনুকরণ মূলের অনুপাতেই সমৃদ্ধ হয়। চোখে দেখা সবসময় শ্রুতি ও জ্ঞানের চেয়ে বেশি পূর্ণতা ও ব্যাপকতার অধিকারী। সুতরাং এর দ্বারা যে অভ্যাস গড়ে ওঠে, তা শ্রুতির দ্বারা লব্ধ অভ্যাস অপেক্ষা পূর্ণতর ও স্থিরতর হয়ে থাকে। শিক্ষার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা ও শিক্ষকের দক্ষতা অনুসারেই শিল্প সম্পর্কে শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও অভ্যাস গড়ে ওঠে।

অতঃপর শিল্পকর্মের মধ্যে কিছু সংখ্যক অবিমিশ্র এবং কিছু সংখ্যক মিশ্র শিল্প বিদ্যমান। অবিমিশ্র শিল্পকর্ম মৌলিক প্রয়োজনের সাথে বিশিষ্ট এবং মিশ্রগুলো সাধারণভাবে পরিপূর্ণতা বিধায়ক প্রয়োজনের সৃষ্টি। এর মধ্যে অবিমিশ্র শিল্পকর্মই এর অবিমিশ্রতার বৈশিষ্ট্যের জন্য সর্বপ্রথমে শিক্ষণীয়। কেননা এটা মৌলিক প্রয়োজনের সাথে বিশিষ্ট হওয়ায় তার অনুসৃতির ধারা ব্যাপক। সম্ভবত এ কারণেই এটা যেমন শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী, তেমনি এর শিক্ষাও কতকাংশে অসম্পূর্ণ। কেননা মননশক্তি সর্বদাই তার বিভিন্ন প্রকার ও মিশ্ররূপকে সম্ভাবনা থেকে বাস্তবের মধ্যে প্রকাশ করতে তৎপর থাকে। আবার এ প্রকাশও অল্প অল্প আবিষ্কারের দ্বারা পর্যায়ক্রমে হয়ে থাকে এবং এভাবেই শিল্পকর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং এর প্রকাশ ও পরিপূর্ণতা আকস্মিক কোন ব্যাপার নয়। এটা যুগ পরম্পরায় ও পুরুষানুক্রমে দেখা দেয়। কারণ সম্ভাবনার বাস্তবায়ন কখনই হঠাৎ করে হয় না, বিশেষভাবে শিল্পের ক্ষেত্রে। সুতরাং এর জন্য সময়ের প্রয়োজন। পাঠক, এজন্যই আপনি দেখতে পাবেন, ক্ষুদ্র শহরগুলোর শিল্পকর্ম অসম্পূর্ণ এবং সেখানে অবিমিশ্র শিল্পেরই প্রাধান্য। এর পর যখন তার নাগরিকত্ব বৃদ্ধি পায় এবং বিলাস-ব্যসনের অমোঘ আকর্ষণ শিল্পকর্মের প্রসারে সাহায্য করে, তখন শিল্প তার সম্ভাবনা থেকে বাস্তবে রূপায়িত হতে থাকে।

শিল্পকে অন্যদিক থেকেও ভাগ করা যায়; তার মধ্যে কতকগুলো জীবিকানির্বাহের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এক্ষেত্রে এটা মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্গত কিংবা তার বাইরেও হতে

পারে। অন্য কতকগুলো মানুষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য মননশক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট; যেমন—জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পচর্চা ও শাসনব্যবস্থা। প্রথমটির উদাহরণ বয়নশিল্প, চর্মশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, লৌহশিল্প এবং অনুরূপ অন্যান্য শিল্পকর্ম। দ্বিতীয়টির উদাহরণ পুস্তক শিল্প অর্থাৎ অনুলিপি ও বাঁধাই দ্বারা পুস্তক প্রস্তুত করা, সঙ্গীত শিল্প, কবিত্ব, শিক্ষাদান এবং অনুরূপ অন্যান্য শিল্পজ্ঞান। তৃতীয়টির উদাহরণ মৌলিক বৃত্তি এবং অন্যান্য শিল্পকৌশল।[১৮] আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞাতা।

১৮. এ অনুচ্ছেদটি রোজেনথালে নেই।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

[নাগরিক সভ্যতার পরিপূর্ণতা ও প্রাচুর্যের দ্বারাই কেবল শিল্পকলার পরিপূর্ণতা লাভ ঘটে]

এর কারণ এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের নাগরিক জীবন পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং নগর সংস্কৃতি বিকশিত না হয়, ততক্ষণ তাদের সব চিন্তা জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতেই ব্যস্ত থাকে। তারা গম ও অন্যান্য শস্যাদি থেকে খাদ্য সংগ্রহে তৎপর হয়। তারপর যখন নগর সংস্কৃতি বিকশিত হয়, শ্রমের প্রাচুর্য দেখা দেয় এবং উৎপাদন মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করে অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায়, তখন এ অতিরিক্ত উদ্বৃত্তকে জীবনের পূর্ণতা বিধানের প্রয়োজনে ব্যয় করা হয়।

অতঃপর এ শিল্পকলা ও নানা প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান, এটা মানুষের সেই মননশক্তির ফসল, যা দ্বারা সে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে আছে। অথচ খাদ্য গ্রহণের দিক থেকে সে সব প্রাণীর সাথে ক্ষুণ্নিবৃত্তির ক্ষেত্রে এক। এজন্যই তার এ পাশবিক চাহিদা পূরণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা থেকে অগ্রবর্তী। কেননা মৌলিক প্রয়োজনের চাহিদা মিটাবার পর এদের সৃষ্টি। সুতরাং মৌলিক প্রয়োজনের নগরজীবনের ব্যাপকতা অনুসারেই তার কারুকার্য সম্পাদনের জন্য শিল্পকলার বিকাশ ঘটে এবং বিলাস-ব্যসন ও সচ্ছলতার দাবি অনুপাতেই তাতে নতুনত্বের চাহিদা দেখা দেয়। এ কারণেই প্রান্তরীয় জীবন অথবা ক্ষুদ্র নগরী অবিমিশ্র শিল্প ছাড়া অন্যগুলোর চাহিদা উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়। বিশেষভাবে সে শিল্পই বিকশিত করে, যা জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত, যেমন সূত্রধর, কর্মকার, দরজী, জোলা ও চর্মকারের কাজ। এগুলো দীর্ঘদিন ধরে সেখানে—অনুশীলিত হলেও তাতে কোন প্রকার পরিপূর্ণতা ও নতুনত্ব দেখা যায় না। বরং সে পর্যায়েই থাকে, যা দ্বারা মৌলিক প্রয়োজন মেটে। কেননা এদের সবগুলোই সেখানে অন্য উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম মাত্র; নিজেরা উদ্দেশ্য নয়।

যখন নগরজীবনে জোয়ার দেখা দেয় এবং পরিপূর্ণতা বিধায়ক অভাবগুলোর চাহিদা জাগ্রত হয়ে ওঠে, তখন শিল্পকলা তার সামগ্রিক কারুকার্যসহ বিকশিত হতে থাকে। শিল্পকলা তার চরম পর্যায়ে উপনীত হয়ে তা সহ আরও বহু শিল্পের জন্ম সম্ভব করে তোলে। বিলাস-ব্যসনের অভ্যাস ও তার আনুষঙ্গিক অবস্থাই চর্মকার, চর্মরঞ্জক, স্বর্ণকার ও অন্যান্য শিল্পকর্মীর আবির্ভাব ঘটায়। কিন্তু নগরজীবনের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়ে এতে পরিপূর্ণতার চাহিদা আরও ব্যাপক হয়ে দাঁড়ালে, এসব শিল্পও আরও চরম পর্যায়ে পৌঁছে কারুকার্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। নগরে বহু লোক তখন এসব শিল্পকর্মকে

তাদের জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। কারণ নগরের বিলাসী জীবনের চাহিদা অনুসারে এসব শিল্পে নিয়োজিত শ্রমের মূল্য বহুগুণে বেড়ে যায়। সে বিলাসের চাহিদা অনুসারেই তৈলকার, তাম্রকার, স্নানাগার-সহচর, পাচক, পিষ্ঠক প্রস্তুতকারক, হালুইকর, সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষক ও বিভিন্ন উপলক্ষে ঢোলবাদকের অস্তিত্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে পুস্তক-শিল্পী, যারা পুস্তকের অনুলিপি, বাঁধাই ও সংশোধনের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে। এ শিল্পটি নগরজীবনের মনন কার্যাদির ন্যায় বিষয়ের মধ্যে বিলাসী আত্মনিয়োগের পরিচয় বহন করে।

নগরজীবনের সংস্কৃতি চেতনার পরিধি সীমা অতিক্রম করলে শিল্পকর্মও সীমা ছাড়িয়ে যায়। যেমন, আমরা মিশরবাসীদের সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা বোবা প্রাণী ও পোষ্য গাধাকে পর্যন্ত শিক্ষিত করে তোলে এবং তারা এমন সব অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দেখায়, যাতে মনে হয়, যেন এদের স্বরূপের পরিবর্তন ঘটে গেছে। তারা এদেরকে 'হুদীর তালে তালে নাচতে এবং শূন্যে প্রসারিত দড়ির পর দিয়ে হেঁটে যেতে শিখায়। এছাড়া ভারী পশু ও পাথর উত্তোলনের প্রক্রিয়া এবং আরও এমন অনেক শিল্পকলা মিশরবাসীরা জানে, যা আমাদের এ মাগরিবে দেখা যায় না। কারণ মাগরিবের সভ্যতা মিশর ও কায়রোর সভ্যতার সীমায় পৌঁছতে পারে না। আল্লাহ্ এদের সভ্যতাকে মুসলমানদের দ্বারা চিরঞ্জীব করে রাখুন। আল্লাহ্ মহা বিচক্ষণ ও জ্ঞানময়।[১৯]

১৯. কোরান, ২, ৩২।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

[নগর জীবনে শিল্পকলার স্থায়িত্ব
কেবলমাত্র নাগরিকতার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের ফলেই সম্ভব]

এর কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এটা এই যে, সর্বপ্রকার শিল্পকলাই মানব সমাজের অভ্যাস ও অনুশীলনের ফসল। অভ্যাসাদি দীর্ঘকালব্যাপী বারংবার অনুশীলনের ফলেই স্থায়িত্ব লাভ করে এবং এর বিশেষ স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পুরুষানুক্রমে অবর্তিত হতে থাকে। সুতরাং এর বিশেষ রূপ একবার দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়ে পড়লে এর উচ্ছেদ দুঃসাধ্য হয়। এজন্যই আমরা দেখতে পাই, যেসব নগরী এক সময়ে ব্যাপক নগর সংস্কৃতির অধিকারী ছিল; পরবর্তীকালে এদের জনসমুদ্রে ভাঁটা পড়ে অবস্থা হ্রাস পেলেও সেখানে এসব শিল্পকলার এমন সব নিদর্শন বিদ্যমান, যা অন্যত্র নবীন জনবহুল নগরগুলোতে নেই; যদিও এসব নগরী পূর্ণতা ও সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছেছে। এটা অন্য কিছু নয়; বরং ঐসব প্রাচীন নগরীতে শিল্পকলা সুদীর্ঘকালব্যাপী বিচিত্র অবস্থা ও পর্যায়ক্রমিক অনুশীলনের মাধ্যমে এমন একটি স্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে পরবর্তীকালে অন্যদের উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

বর্তমানকালে আমরা আন্দালুসে অনুরূপ অবস্থাই দেখতে পাচ্ছি। সেখানে শিল্পকলার সমস্ত রীতিই প্রচলিত্ এবং নাগরিক অভ্যাসাদির জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয়, সেসব অবস্থাই সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যেমন—স্থাপত্য, রন্ধন শিল্প, বিভিন্ন প্রকার সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্য, প্রাসাদের শয্যাবিলাস, সুপরিকল্পিত ও সুন্দর গৃহ নির্মাণ খনিজ পদার্থ ও মৃত্তিকার বাসন তৈরি, অন্যান্য তৈজসপত্র প্রস্তুত, ভোজসভা ও বাসরসজ্জার ব্যবস্থা এবং বিলাস-ব্যসন ও এর অভ্যাসাদির উপযোগী অন্যান্য শিল্পকর্ম। পাঠক, আপনি আন্দালুসবাসীদেরকে এসব বিষয়ে তৎপর ও অভিজ্ঞ দেখতে পাবেন। আরও দেখবেন, এসব শিল্পকর্মই তাদের কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তারা এর এমন একটি পরিপূর্ণ অংশের অধিকারী, যা দ্বারা তারা অন্যান্য সব নগরীর মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে রয়েছে। যদিও বর্তমানে এর জনবসতি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং তাও এত বেশি যে, সমুদ্র তীরবর্তী অন্য কোন অঞ্চলের সাথে তার তুলনা করা যায় না। তবু এটা একমাত্র সেই অবস্থা, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। তাদের নগর সংস্কৃতি দীর্ঘস্থায়ী উমাইয়া সাম্রাজ্য, তার পূর্ববর্তী গথ সাম্রাজ্য এবং এর পরবর্তী ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের সাম্রাজ্য ও অনুরূপ অন্যান্যের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে। সুতরাং নগর সংস্কৃতি সেখানে এমন একটি স্তরে উপনীত হয়েছে, যার তুলনা পৃথিবীর অন্যত্র পাওয়া যায় না। অবশ্য ইরাক, সিরিয়া ও মিশর

সম্পর্কেও অনুরূপ সংবাদ আমরা পেয়েছি। সেখানেও সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এর ফলে সেখানে সর্বপ্রকার শিল্পকলা সুবিকশিত এবং এর সব কারুকার্য ও নতুনত্বসহ পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। সুতরাং বর্তমানকালেও এর স্বরূপ বিদ্যমান রয়েছে এবং সেখানকার জনবসতি নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত তার অস্তিত্ব লোপ পাবে না। কাপড়ের পাকা রঙের সাথেই এটা তুলনীয়।

তিউনিসেও অনুরূপ অবস্থা বিরাজমান। এটা সিনহাজা সাম্রাজ্য ও তার পরবর্তীকালে আল-মোহেদ সাম্রাজ্য থেকে যে নগর সংস্কৃতি লাভ করেছে এবং অবস্থা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে তা পূর্ণতর রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য মনের দিক থেকে এটা আন্দালুসের সমতুল্য নয়। তবুও এর মধ্যে মিশরীয় সংস্কৃতি থেকে আগত নানা রীতি-প্রকৃতি ব্যাপক বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। এদের মধ্যকার স্বল্প দূরত্ব এবং প্রতি বছর ভ্রমণকারীদের যাতায়াতে এ মিশ্রণ সম্ভব হয়ে উঠেছে। অনেক সময় মিশরীয়রা এখানে এসে দীর্ঘদিন বসবাসও করেছে। এভাবে তারা তাদের বিলাসের অভ্যাস এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পকর্মের মধ্যে যা শোভন বলে পরিচিত, তা এখানে সংক্রমিত করেছে। এ কারণে তিউনিসের অবস্থা অনেকাংশে মিশরের সাথে মিলে। এর কারণও আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। অন্যদিকে আন্দালুসের সাথেও এর মিল আছে। কারণ সপ্তম শতাব্দীতে পূর্ব আন্দালুসের বহু লোক নির্বাসিত হয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এর ফলে সেখানে আন্দালুসীয় রীতিনীতিও তার শিকড় গেড়ে বসেছে। যদিও বর্তমানে তিউনিসের জনবসতি নগর সংস্কৃতি লালনের অনুকূলে নয়, তবু এর যে স্বরূপ একবার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এটা তার আধার বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত অতি অল্পই পরিবর্তিত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে আমার কায়রোয়ান, মারাকেশ, কেল-আহাম্মদ প্রভৃতি নগরীতে সংস্কৃতির নিদর্শন দেখতে পাই; যদিও এসব নগরী আজ বিধ্বস্ত এবং বিলীয়মান বলে ধরা যায়। একমাত্র অভিজাত লোকের দৃষ্টিতে এসব নিদর্শন ধরা পড়তে পারে এবং তিনি বুঝতে পারেন যে, শিল্পকর্মের যে নিদর্শন সেখানে বিদ্যমান, তা এককালীন সজীবতার প্রমাণ বহন করছে। যেমন পুস্তকের লিপির লেখা মুছে গেলেও তার নিদর্শন অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ্ সর্বস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞাতা।[২০]

২০. কোরান, ১৫, ৮৬, ৩৬, ৮১।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

[শিল্পকলার উন্নতি ও প্রাচুর্য মানুষের চাহিদার উপর নির্ভরশীল]

এর কারণও খুবই সুস্পষ্ট। তা এই যে, মানুষ বিনামূল্যে তার শ্রম নিয়োগে উৎসাহী হয় না। কেননা এ শ্রমের দ্বারাই তার উপার্জন ও জীবিকা নির্বাহ হয়ে থাকে। বস্তুত এ বিনিময় ছাড়া তার দীর্ঘজীবনের জন্য অন্য কোন কিছুই উপকারী বলে বিবেচিত হতে পারে না। এ কারণে সে তার শ্রমকে এমন বিষয়ে নিয়োগ করে, নগরীতে যার মূল্য বিদ্যমান এবং তা দিয়ে তার উপকৃত হওয়া সম্ভব।

সুতরাং কোন শিল্পকর্মের যদি চাহিদা থাকে এবং তার জন্য ব্যয় করতে মানুষ আগ্রহী হয়, তখন এ শিল্পের অবস্থা সেই পণ্যসামগ্রীর সাথে তুলনীয়, যার বাজার তেজী ও সহজে বিক্রয়যোগ্য। এর ফলে নগরীর লোকেরা উক্ত শিল্পের শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হয়ে একে তাদের জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়। অন্যদিকে যদি কোন শিল্পকর্মের চাহিদা এবং এর বাজারের তেজীভাব না থাকে, তা হলে তা শিক্ষা করতে কেউ আগ্রহী হয় না। ফলে তা পরিত্যাক্ত অবস্থায় অবহেলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। এজন্যেই হযরত আলী থেকে বলা হয় যে, প্রতিটি লোকের মূল্য তার সৎকর্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ তার শিল্পকর্মই তার মূল্য বহন করে; কেননা তার জন্য নিয়োজিত শ্রমের মূল্য দিয়েই সে জীবিকা নির্বাহ করে।

এখানে অন্য একটি বিষয়ও লক্ষ্য করা যায়। এটা এই যে, শিল্পকর্ম ও তার উন্নতি সাম্রাজ্যের চাহিদার ফলে ত্বরান্বিত হয়। এরূপ শিল্পের বাজারে তেজীভাব ও চাহিদায় উৎসাহ থাকে। কিন্তু যে শিল্পকে সাম্রাজ্য শক্তি চায় না; বরং নগরীর অন্য লোকেরা ওটার ক্রেতা, ওটার তেমন কোন প্রসার হয় না। কারণ সাম্রাজ্য এক বিরাট বাজারতুল্য; এতে সব বস্তুই বিক্রয় হয় এবং এর চাহিদার কাছে অল্প-বেশির কোন পার্থক্য নেই। কাজেই যা সেই বিরাট বাজারে কাটে, তা-ই প্রচুর ও অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায়। আর সাধারণ মানুষ যদি কোন শিল্পের চাহিদা সৃষ্টি করে, তা হলে ওটা ততটা প্রসার লাভ করে না এবং এর বাজারেও তেমন তেজীভাব দেখা যায় না। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ তাঁর ঈপ্সিত বস্তুত উপর ক্ষমতাবান।

বিংশ পরিচ্ছেদ

[কোন নগরী যখন ধ্বংসের সম্মুখীন হয়,
তখন এর শিল্পকলাও বিলীন হতে থাকে]

এটা, যেমন আমরা বর্ণনা করেছি যে, শিল্পকলা তখনই উন্নতি লাভ করে, যখন প্রয়োজন ও চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং নগরীর অবস্থা যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, এর জনবসতি ও অধিবাসীর সংখ্যা কমে গিয়ে অবক্ষয় দেখা দেয়, তখন তার বিলাস-ব্যসন কমে গিয়ে পুনরায় মৌলিক প্রয়োজনের দ্বারা জীবন-যাপনের ধারা ফিরে আসে। কাজেই বিলাসের অনুসারী শিল্পকলাও হ্রাস পেতে থাকে। কারণ উক্ত শিল্পকলার কর্মীরা আর তা দিয়ে তাদের জীবিকার সংস্থান করতে সমর্থ হয় না। কাজেই তারা অন্য কিছুর অনুসন্ধান করে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তাদের পিছনে তার কোন উত্তরাধিকারী থাকে না। সুতরাং এসব শিল্পকলার সব রীতিনীতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যেমন—বিলাসের প্রয়োজনে সৃষ্ট চিত্রকর, স্বর্ণকার, লিপিকর, অনুলিপিকর এবং অনুরূপ অন্যান্য শিল্পকর্মী বিলীন হতে থাকে। এভাবে নগরজীবনের বিলীয়মানতার সাথে সঙ্গতি রেখে শিল্পকর্ম ধ্বংস হতে হতে একসময় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। আল্লাহ্ সর্বস্রষ্টা, সর্বজ্ঞাতা, পবিত্র ও মহান।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

[আরবরা সব মানুষের চেয়ে শিল্পকলার সাথে বেশি অপরিচিত]

এর কারণ এই যে, আরব বেদুইনরা যাযাবরী জীবনে অতিমাত্রায় অভ্যস্ত এবং নাগরিক জীবন ও প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম ইত্যাদির সাথে তাদের পরিচয় নেই বললেই চলে। এ তুলনায় পূর্বাঞ্চলের অনারব এবং রোম সাগরের তীরবর্তী খ্রিস্টান জাতিগুলো নাগরিক জীবনে বেশি প্রতিষ্ঠিত। কারণ তারা এ নাগরিকতার মধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে এবং যাযাবরী জীবন ও এর অভ্যাসাদির সাথে তাদের পরিচয় নেই। এমন কি যে উট আরবদেরকে প্রান্তরের বন্যজীবন যাপন করতে এবং যাযাবর বৃত্তিতে নিমজ্জিত থাকতে আকর্ষণ করে, তা ঐসব জাতির মধ্যে একেবারেই অনুপস্থিত। এর চারণ ভূমিও তাদের অঞ্চলে নেই এবং উটের প্রসবক্রিয়ার উপযোগী বালুকা প্রান্তরও সেখানে পাওয়া যায় না। এজন্য আমরা দেখতে পাই আরবদের জন্মভূমি এবং যেসব অঞ্চল তারা ইসলামের আবির্ভাবের পরে নিজেদের আয়ত্তে এনেছিল, সেখানে সামগ্রিকভাবে শিল্পকলায় অপ্রাচুর্য বিদ্যমান; এমন কি অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনুরূপ বিষয়াদি সংগ্রহ করা সত্ত্বেও। পাঠক, এবার অনারব চীন, হিন্দ, তুর্কিস্থান এবং খ্রিস্টান জাতিগুলোর আবাসভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করুন; সেখানে কীভাবেই না শিল্পকলার প্রাচুর্য দেখা দিয়েছে এবং অন্যান্য জাতি তাদের কাছে থেকে ওটা গ্রহণ করছে!

মাগরিবের অনারব বারবারগণ এক্ষেত্রে আরবদের সমতুল্য। কারণ তারাও দীর্ঘকাল ধরে যাযাবরী জীবনধারায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। পাঠক, তাদের এ অঞ্চলে শহর-নগরের স্বল্পতাই আপনার জন্য এ বক্তব্যের সাক্ষ্য বহন করছে; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এ কারণে মাগরিবেও শিল্পকলার অপ্রাচুর্য এবং যা আছে, তাও অপ্রতিষ্ঠিত। শুধুমাত্র পশমের বয়নশিল্প এবং চামড়ার জুতা তৈরি ও রঞ্জনশিল্পের যা কিছু অবশিষ্ট আছে। কারণ তারা নগর জীবন গ্রহণ করার পর এ দুটি শিল্প চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। কেননা এ দুটির চাহিদা যেমন এখানে সাধারণ, তেমনি অন্যান্য শিল্পের মধ্যে এ দুটিই এ অঞ্চলে বহুল প্রচলিত। তদুপরি তারা যাযাবরী জীবন থেকেই এ দুটিতে অভ্যস্ত ছিল।

কিন্তু পূর্বাঞ্চলে সুপ্রাচীন পারস্য, নাবতী, কিবতী, বনি-ইসরাইল, গ্রিক, রোমান প্রমুখ জাতিগুলোর রাজ্যকাল থেকেই সেখানে দীর্ঘকাল ধরে নগর সংস্কৃতির চর্চা হয়েছে এবং ক্রমশ তা সুপ্রতিষ্ঠিতও হয়ে গেছে। এর সঙ্গে বিচিত্র শিল্পকলারও বিকাশ ঘটেছে; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। কাজেই এর নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি।

ইয়ামেন, বাহরাইন, উম্মান, আল-জাজিরা প্রভৃতি অঞ্চল যদিও আরবদের অধিকারে ছিল, তবুও সেখানে হাজার হাজার বছর ধরে এদেরই বহু জাতি কর্তৃক সাম্রাজ্য পরিচালিত হয়েছে। তারা শহর-নগর পত্তন করেছে এবং নগর সংস্কৃতি ও বিলাস-ব্যসনের চরম সীমায় পৌঁছেছে। এসব জাতির মধ্যে আদ, সামুদ, আমালেকা, হিমিয়ার এবং তাদের পরে তুব্বা ও'আযেয়া'রা দীর্ঘকাল ধরে রাজ্য পরিচালনা করেছে। তাদের দ্বারা পর্যায়ক্রমে নগর সংস্কৃতি বিকশিত, এর স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত এবং শিল্পকলার প্রাচুর্য অবারিত হতে পেরেছে। এ কারণেই সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির ফলে ওটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং ওটা বারবার নবায়নের মধ্য দিয়ে বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে। এ কারণে এসব অঞ্চল এখনও বুটিদার, ডুরিদার, সূক্ষ্ম জমিন ও রেশমী বস্ত্রাদির উৎপাদনস্থল বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। আল্লাহ্ পৃথিবী ও তার উপরিস্থিত সব কিছুর উত্তরাধিকারী এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তিনি সর্বোত্তম।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

[যে ব্যক্তি বিশেষ একটি শিল্পকর্মে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তার পক্ষে এর পরে অন্য একটিতে অভ্যস্ত হওয়া খুব কমই সম্ভব হয়]

এর উদাহরণ যেমন দর্জির কাজ। যখন কোন ব্যক্তি দর্জির কাজে অভ্যস্ত হয়ে দক্ষতা অর্জন করে এবং তা তার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে, তখন তার পক্ষে সুতোর বা রাজমিস্ত্রীর কাজে দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়। যদি তেমন কিছু হয়, তা হলে বুঝতে হবে প্রথমটির কোন দৃঢ়তা তার মধ্যে অর্জিত হয়নি এবং এর রং তার মধ্যে পাকা হয়ে লাগেনি।

এর কারণ এই যে, অভ্যাসমাত্রই জীবাত্মার গুণ ও রং বিশেষ। ওদের একাধিক একসঙ্গে ভীড় জমাতে পারে না। যে-ব্যক্তি সদ্যোজাত প্রকৃতির অধিকারী তার পক্ষে যে-কোন অভ্যাস গ্রহণ এবং এর যোগ্যতা অর্জন অত্যন্ত সহজ হয়ে থাকে। সুতরাং যখন জীবাত্মা কোন একটি বিশেষ অভ্যাসের দ্বারা রঞ্জিত হয়ে ওঠে, তখন সে নিষ্কলুষ প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যায় এবং উক্ত অভ্যাসের দ্বারা অর্জিত রঙের দরুন এর গ্রহণ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই অন্য একটি অভ্যাস গ্রহণের ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এটা এতই স্পষ্ট যে, যে-কোন বাস্তব উদাহরণ পরীক্ষা করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এজন্য পাঠক, আপনি এমন ব্যক্তি খুব কমই দেখতে পাবেন, যে একটি শিল্পে দক্ষতা অর্জন করার পর অন্য একটিতেও সমানভাবে একই পর্যায়ে দক্ষতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। এমনকি যারা মননশীল জ্ঞানের চর্চা করেন, তাদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। তাদের মধ্যে যিনি কোন একটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে চরম সীমায় পৌঁছেছেন, তিনি অন্য বিষয়ে অনুরূপ দক্ষতার অধিকারী হতে পারেন না। পরীক্ষা করলেই এর ত্রুটি বের হয়ে পড়ে। অবশ্য খুব অল্পক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। এর সুস্পষ্ট কারণ, আমরা পূর্বে যে যোগ্যতার কথা বলেছি ওটাই। তা হল, জীবাত্মার অভ্যাসের দ্বারা রঞ্জিত হওয়া। পবিত্র ও মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞানের আধার। তিনিই একমাত্র সহায় এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রতিপালক নেই।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

[মূল শিল্পকলাসমূহ সম্পর্কে আভাস দান]

জেনে রাখুন, মানব সমাজে শ্রমের পরম্পরাগত প্রাচুর্যের জন্য শিল্পকলার বৈচিত্র্য বিদ্যমান। এ বৈচিত্র্যের পরিমাণ এত বেশি যে, বর্ণনার দ্বারা এর ইতি ও সংখ্যার দ্বারা এর শেষ করা সম্ভব নয়। অবশ্য যেগুলো মানব সভ্যতার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় অথবা বিষয়বস্তুর দিক থেকে সম্ভ্রান্ত, আমরা এখানে কেবলমাত্র সেগুলোর উল্লেখ করব। এছাড়া অন্যগুলো পরিত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

একান্ত প্রয়োজনীয়গুলোর মধ্যে; যেমন—কৃষিকর্ম, স্থাপত্য, দর্জির কাজ, কাঠশিল্প ও বয়নশিল্প এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে সম্ভ্রান্ত শিল্পের মধ্যে; যেমন—ধাত্রীবিদ্যা, গ্রন্থ-রচনা, পুস্তকশিল্প, সঙ্গীতবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রের নাম উল্লেখ করা যায়। ধাত্রীবিদ্যা সভ্যতার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তার সাধারণ চাহিদা বিদ্যমান। কারণ এর দ্বারা নবজাতক জীবন লাভ করে এবং সম্ভবত তার জন্ম সম্পূর্ণ হয়। তদুপরি তার বিষয়বস্তু হল নবজাতক ও তাদের মাতৃকুল। চিকিৎসাশাস্ত্র হল মানুষের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও এর রোগ প্রতিরোধের বিদ্যা। এটা পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্গত হলেও এর আলোচ্য বিষয় মানুষের দেহ। গ্রন্থ রচনা ও এর অনুসারী পুস্তকশিল্প, এর দ্বারা মানুষের প্রয়োজন সংরক্ষিত, এর ভুল-ভ্রান্তি অপসারিত এবং তার মনোভাব দূর-দূরান্তে প্রকাশিত হয়। এরই কল্যাণে মানুষের মনন ও জ্ঞানের ফসল গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ হয়ে চিরকালের জন্য সংরক্ষিত হয় এবং মানুষের চিন্তাজগতের মর্যাদা উন্নত হয়ে প্রকাশ পায়। সঙ্গীতবিদ্যা শব্দাবলির সুসমন্বয় সাধন করে এর অন্তর্গত সৌন্দর্যকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারে পৌঁছে দেয়।

শেষোক্ত এ তিন শিল্পই মহান সম্রাটদের সাহচর্যের দিকে আকর্ষণ করে এবং এ বিষয়ে গুণী ব্যক্তিরা তাঁদের অন্তরঙ্গ পরিবেশ ও সৌখিন জলসায় উপস্থিত থেকে মনোরঞ্জনে সমর্থ হন। এ কারণে এ তিনটি শিল্পের যে সম্ভ্রম বিদ্যমান তা অন্য কোথাও নেই। এছাড়া অন্যান্য সব শিল্পই সাধারণভাবে অনুসারী ও অনুগামী। অবশ্য অনেক সময় উদ্দেশ্য ও চাহিদার পরিবর্তনে সব শিল্পেরই মর্যাদার পরিবর্তন ঘটে থাকে। আল্লাহ্ই যথার্থতা সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত।[২১]

---

২১. রোজেনাথালে এখানে—আল্লাহ্ সর্বস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞাতা।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

[কৃষি শিল্প]

এ শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য হল খাদ্য ও শস্য। এটা ভূমি চাষ, বীজ বপন, গাছের পরিচর্যাকরণ এবং জলসেচ ও অন্যান্য প্রক্রিয়ার দ্বারা এর বৃদ্ধিকে সীমায় পৌঁছানো। তারপর এর শীষগুলো কেটে এনে শস্য বের করে নেয়া। এছাড়া এর সাথে অন্যান্য শ্রম, উপকরণ ও চাহিদার যথাযথ ব্যবহারের প্রতি লক্ষ রাখা। এটা অন্য সব শিল্প অপেক্ষা অগ্রবর্তী। কারণ এটা সেই খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করে, যা সাধারণভাবে মানুষের দৈহিক পরিপূর্ণতার জন্য অপরিহার্য। কেননা তার অস্তিত্ব অন্য সব বিষয়কে বাদ দিতে পারে কিন্তু খাদ্য পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। এ কারণে এ শিল্পটি প্রান্তরীয় জীবনের সাথে বিশিষ্ট। আমরা পূর্বেও বলেছি যে, প্রান্তরীয় জীবন নাগরিক জীবনের পূর্ববর্তী ও অগ্রবর্তী। এ কারণেই এ শিল্পটি প্রান্তরীয় জীবনের সাথে জড়িত। নগরবাসীরা এটা গ্রহণ করে না এবং এ সম্পর্কে কিছু জানেও না। কেননা তাদের সব অবস্থাই প্রান্তরীয় জীবনের পরবর্তী সৃষ্টি। সুতরাং নগরের শিল্পকলাও তার পরবর্তী ও অনুসারী। পবিত্র ও মাহন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে বান্দাদেরকে স্থান দিয়ে থাকেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

[স্থাপত্য শিল্প]

এ শিল্পকর্ম নাগরিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পসমূহের মধ্যে প্রথম এবং অগ্রবর্তী। এটা নিরাপত্তার জন্য গৃহ ও অট্টালিকা এবং নাগরিক জীবনে দৈহিক আশ্রয়ের জন্য সুরক্ষিত আবাস নির্মাণে শ্রম নিয়োগের জ্ঞান লাভ করা। এটা এই যে, মানুষ যেহেতু জন্মগতভাবে তার সব অবস্থার পরিণাম চিন্তা করতে অভ্যস্ত, সেজন্য অবশ্যই সে শীত-গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষা করার উপায় ভেবে দেখবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ছাদ ও চতুর্দিকে দেয়ালবিশিষ্ট গৃহাদি নির্মাণ করবে।

মানুষ তাদের এ সহজাত চিন্তাশক্তির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের অধিকারী এবং বস্তুত এর মধ্যেই তাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় বিধৃত রয়েছে। বাস্তবক্ষেত্রে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, তার অনুরূপ চিন্তা করতে বাধ্য এবং মোটামুটিভাবে সেজন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থাও তারা গ্রহণ করে থাকে। যেমন—দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঞ্চলের অধিবাসীরা। কিন্তু যাযাবরী জীবনের অধিকারীরা অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে দূরে সরে থাকে। কারণ তারা এই মানবিক শিল্পকর্মের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম। সুতরাং তারা প্রকৃতির দ্বারা প্রস্তুত গর্ত ও গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

অতঃপর সমভাবাপন্ন অঞ্চলের যারা আশ্রয়ের জন্য গৃহাদি নির্মাণ করতে অভ্যস্ত, তারা সংখ্যায় বেশি বলে একই সমতলে প্রচুর পরিমাণে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে ফেলে। অথচ এসব সত্ত্বেও তারা পরস্পরের কাছে অপরিচিত ও অজ্ঞাত থেকে যায়। সুতরাং তারা একে অপরের কাছে থেকে রাত্রিকালীন আক্রমণের আশঙ্কা করে। কাজেই তাদের এ সমাবেশকে চতুর্দিক হতে প্রাচীর বিন্যাসের দ্বারা সুরক্ষিত করার প্রয়োজন তারা তীব্রভাবে অনুভব করে। এভাবে এ প্রাচীরবেষ্টিত অঞ্চল একটি নগর বা পল্লীতে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং সেখানে তাদেরকে পরস্পরের কাছ থেকে রক্ষা করার জন্য শাসকের অস্তিত্ব অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। কখনও তারা বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে এবং অধীনস্থ অন্যান্য সবাইকে রক্ষা করার জন্য রক্ষীপ্রাকার ও দুর্গ নির্মাণ করে থাকে। রাজন্যবর্গ এবং তত্তুল্য ক্ষমতার অধিকারী আমির ও গোত্রপ্রধানগণ অনুরূপ উদ্যোগ আয়োজন করে থাকেন।

নগরীর এ স্থাপত্যের মধ্যেও বিচিত্র অবস্থার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। প্রতিটি নগরীই তার পরিচিত শিল্পজ্ঞান এবং প্রচলিত ধারা অনুসারে নির্মাণকার্যে অগ্রসর হয়। এক্ষেত্রে এদের নিজস্ব রুচি এবং সম্পদ ও দারিদ্র্য অনুসারে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। যে-

কোন এক নগরীর মধ্যেও অনুরূপ পার্থক্য বিদ্যমান। নগরবাসীদের মধ্যে অনেক বিরাট বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করে। এদের প্রাঙ্গণ প্রশস্ত এবং সেখানে বহু গৃহ, কুঠি ও বিপুলায়তন কক্ষ থাকে। কারণ গৃহস্বামীর সন্তান-সন্ততি, চাকর-নফর, পোষ্য ও অনুগামীদের সংখ্যা প্রচুর। তারা পাথর দ্বারা আস্তর লাগায়। তারা পাথর দ্বারা এসব অট্টালিকার দেয়াল নির্মাণ করে এবং তা গাঁথার জন্য চুন মিশ্রিত মসলা ব্যবহার করে। তারপর এতে রং ও প্রলেপের দ্বারা আস্তর লাগায়। তারা এর সর্বাংশে করুকার্যমণ্ডিত ও মসৃণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তাদের উদ্যোগ আয়োজনের দ্বারা এ মনোভাবই প্রকাশ করতে চায় যে, তারা আশ্রয়স্থলকে কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। তাদের বাহনাদি বাঁধার জন্য আস্তাবলের প্রয়োজনও দেখা দেয়; যদি তারা সৈনাদলের কেউ হয় এবং তাদের প্রচুর সংখ্যক অনুগামী ও সহচর থাকে—যেমন আমীর এবং তাদের সমমর্যাদার রাজকীয় পুরুষ।

আবার অনেকে নিজে থাকার জন্য এবং সন্তান-সন্ততিকে আশ্রয় দেবার জন্য ক্ষুদ্র গৃহ ও কুটির নির্মাণ করে। এর অতিরিক্ত কিছু করার সঙ্গতি তার নেই এবং সেজন্যই সে একান্তভাবে মানুষের প্রকৃতিগত আশ্রয়লাভের ন্যূনতম ব্যবস্থা করে থাকে। এ দুটি স্তরের মাঝখানে আরও অগণিত স্তর বিদ্যমান।

রাজন্যবর্গ ও সাম্রাজ্যের অধিপতিরা বিরাট নগর পত্তন ও উন্নত অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করতে গিয়েও এ শিল্পের সহায়তা গ্রহণ করেন এবং উক্ত শিল্পকর্মের চূড়ান্ত রূপ তুলে ধরার জন্য অট্টালিকাগুলো বৃহৎ আকৃতি ও গঠন সৌকর্যের ক্ষেত্রে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

স্থাপত্য শিল্প মানব সমাজের উপরোক্ত সমস্ত চাহিদাই পূরণ করে থাকে। সমভাবাপন্ন ও তার সন্নিহিত অঞ্চলগুলোতে এ শিল্পের বেশি চর্চা হয়ে থাকে। কারণ অসমভাবাপন্ন অঞ্চলগুলোতে অনুরূপ স্থাপত্যের কোন নিদর্শন দেখা যায় না। কেননা সেখানকার মানুষ বাঁশ ও মাটির তৈরি কুটির অথবা গর্ত ও গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে জীবন কাটায়।

এসব শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যেও বিভিন্নতা দেখা যায়। তাদের মধ্যে অনেকেই বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ। আবার অনেকের মধ্যে সেই অভিজ্ঞতার কোন চিহ্ন নেই। অন্যদিকে এ স্থাপত্যের অন্তর্গত গঠনপ্রণালীরও ইয়ত্তা নেই। এর মধ্যে মসৃণ পাথর ও ইঁটের গাঁথুনির দ্বারা দেয়াল তোলা হয়। এগুলোর গাঁথুনির মসলা হিসেবে মাটি ও চুন ব্যবহার করে এমনভাবে এগুলোর জোড়গুলো মিলিয়ে দেয়া হয় যে, দেখতে সমস্ত দেয়ালটিই অখণ্ড বলে মনে হয়। এর মধ্যে শুধু মাটির কাজও আছে; তা দিয়ে দেয়াল তৈরি হয়। সে জন্য দুটি কাঠের ফলক ব্যবহার করা হয়। তাদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ স্থান ও প্রচলন অনুসারে নানাপ্রকার হয়ে থাকে। এর মধ্যম পরিমাণ দৈর্ঘ্যে চার হাত এবং প্রস্থে দুই হাত। এ দুটি ফলককে ভিত্তির ওপর স্থাপন করে তাদের মধ্যে নির্মাণকর্তার প্রয়োজন ও ভিত্তির প্রস্থ অনুসারে ব্যবধানের সৃষ্টি করা হয়। তারপর উক্ত দুটি ফলককে কাঠের টুকরার দ্বারা একত্রে বেঁধে দড়ির সাহায্যে টানা দিয়ে স্থির রাখার ব্যবস্থা করা হয় এবং এ ফলক দুটির মধ্যবর্তী শূন্যস্থানের দুই সীমায় দুটি ছোট কাঠের টুকরা দিয়ে

বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর এ ফাঁকের মধ্যে চুনমিশ্রিত মৃত্তিকা ঢেলে দিয়ে তাকে ভাল করে মিশ্রিত করে বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির দ্বারা বারবার উল্টা-পাল্টা করা হয়। এভাবে ওটা বসে গেলে পুনরায় দ্বিতীয়, তৃতীয়বার মাটি দিয়ে অনুরূপ প্রক্রিয়ায় ফলক দুটির মধ্যবর্তী ফাঁকটি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কাজ চলতে থাকে। অনুরূপ প্রক্রিয়ায় চুন ও মাটি মিশ্রিত হয়ে সম্পূর্ণ অংশটিই অখণ্ড বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। তারপর পুনরায় পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় ফলক দুটি তার উপর স্থাপন করে উলট-পালটের দ্বারা মাটি বসানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং পর্যায়ক্রমে এক সারির উপর অন্য সারি বসে সমস্ত দেয়ালটি এমনভাবে গড়ে ওঠে, যা দেখতে একটি অখণ্ড বস্তু বলে ধারণা হয়। দেয়াল তৈরির এ পদ্ধতিকে বলা হয় 'তাবিয়া'[১২] এবং যারা এ কাজ সম্পন্ন করে তাদেরকে বলা হয় 'তাওয়াব'।

স্থাপত্যের অন্য একটি শিল্পকর্ম হল দেয়ালের ওপর চুনের প্রলেপ দেয়া। এ উদ্দেশ্যে চুনকে পানিতে ভিজিয়ে খামির করা হয় এবং তার তেজস্ক্রিয়া দূর করে দেয়ালে লাগনোর উপযোগী ধাতস্থ করার জন্য এক সপ্তাহ অথবা দুই সপ্তাহ রেখে দেয়া হয়। তারপর নির্মাতার পছন্দ মত ওটা তৈরি হলে তাকে দেয়ালের উপরের দিক থেকে তার সাথে মিশিয়ে দেয়া পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়।

স্থাপত্যের অন্য একটি শিল্প প্রক্রিয়া হল ছাদ প্রস্তুতকরণ। এর জন্য গৃহের দুটি দেয়ালের উপরে সুতোরের দ্বারা মসৃণকৃত অথবা শক্ত কাঠখণ্ড স্থাপন করা হয় এবং এদের ওপর আরও কাঠখণ্ড বিছিয়ে পেরেক দ্বারা আটকে দেয়া হয়। তারপর এগুলোর উপর মাটি ও চুন ঢালাই করে মুগুর দ্বারা পিটিয়ে মিশিয়ে সমান করে দেয়া হয় এবং তার উপর দেয়ালে প্রলেপ দেয়ার ন্যায় চুনের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়।

স্থাপত্যের অন্য একটি দিক মসৃণকরণ ও অলঙ্করণ শিল্প। যেমন কলিচুন পানিতে গুলিয়ে খামিরের দ্বারা দেয়ালের ওপর নানাবিধ আকৃতি নির্মাণ করা। এভাবে কোন আকৃতি সংগঠিত হলে তার অন্তর্গত আর্দ্রতা অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় লোহার যন্ত্রাদি দ্বারা খোদাই করে এমনভাবে পালিশ করা, যাতে তার সৌন্দর্য ও সজীবতা ফুটে ওঠে। অনেক সময় দেয়ালের উপর মার্বেল পাথর, ইঁট, কাদামাটি, ঝিনুক অথবা খনিজ অঙ্গার লাগিয়ে সেগুলো দিয়ে সুসামঞ্জস্য কিংবা বৈচিত্র্যময় আকারা নির্মাণ করা হয়। শিল্পীদের দ্বারা নির্দিষ্ট গঠন ও অনুপাত অনুযায়ী এগুলো দেয়ালের উপর ফুটে ওঠে। যেন তা একটি সজীব বাগানের অংশবিশেষ। এছাড়াও পানি নির্গমনের জন্য প্রণালী ও চৌবাচ্চা নির্মাণের কলা-কৌশল রয়েছে। গৃহাদির মধ্যে মার্বেল পাথরের মজবুত করে একটি জলাধার প্রস্তুত করা হয়, যার মধ্যভাগে সংস্থাপিত মুখের দ্বারা চৌবাচ্চায় পানি এসে পড়ে এবং বাইরে থেকে নালার সাহায্যে এ পানি চৌবাচ্চায় সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এই প্রকার আরও বহু নির্মাণকৌশল বিদ্যমান।

এসব শিল্পকর্মে শিল্পীরা তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অনুসারে বৈচিত্র্যের অধিকারী হয়ে থাকে এবং নগরীর জনবসতির প্রাচুর্য ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। অনেক সময় শাসকগণও এসব শিল্পী, যারা নির্মাণকার্যে দক্ষতার অধিকারী, তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ করে থাকেন।

---

১২. মূল শব্দটি সম্ভবত স্পেনিশ তাপিয়া।

এর বর্ণনা এই যে, মানুষ জনবসতিবহুল নগরীগুলোতে বাসস্থানের জন্য উপর নিচের শূন্য ও উন্মুক্ত স্থান, এমন কি গৃহাদির বহিরাঙ্গন ব্যবহার করতে তৎপর হয়ে ওঠে। এর ফলে অনেক সময় দেয়ালের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেয়। সুতরাং গৃহের মালিকরা প্রতিবেশীদেরকে এরূপ তৎপরতায় বাধা দেয়। অবশ্য প্রতিবেশীদের এরূপ তৎপরতার আইনানুগ অধিকার থাকলে তা সম্ভব হয় না। তারা রাস্তা-ঘাট, পয়ঃপ্রণালী ও পরিত্যাক্ত আবর্জনা নিষ্কাশন করার প্রয়োজনে নির্মিত নালা ইত্যাদি নিয়েও বিরোধের সম্মুখীন হয়। অনেক সময় অনেকে অপরের দেয়াল, কার্নিশ অথবা নালার অংশবিশেষের উপর দাবি উত্থাপন করে। তাদের ঘন সন্নিবেশিত অবস্থানের জন্যই এরূপ হয়ে থাকে। অনেক সময় অনেকে প্রতিবেশীর ভগ্নপ্রায় দেয়ালের পতন আশঙ্কা করে আপত্তি উত্থাপন করে এবং ওটা ভেঙ্গে ফেলে ক্ষতির আশঙ্কা দূর করার জন্য তাদেরকে শাসকের নির্দেশের মুখাপেক্ষী হতে হয়। অনেক সময় শরীকদের মধ্যে কোন বাসস্থান ভাগ করে দেবার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তা এমনভাবে করতে হয়, যাতে বাসস্থানের ক্ষতি অথবা তার উপযোগিতা নষ্ট না হয়ে যায়। এমন আরও বহু সমস্যা বিদ্যমান। একমাত্র নির্মাণ কাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই এর সুষ্ঠু সমাধান করতে পারেন। তারা এসব ব্যাপারে জোর ও গিঁট, কাঠের বিভিন্ন অবস্থান, দেয়ালের হেলান দেয়া ও সোজা অবস্থা, গঠন ও উপযোগিতা অনুসারে গৃহাদির সুষম বণ্টন এবং আগম-নির্গমনের ক্ষেত্রে প্রণালীবাহিত জলধারা গৃহ ও দেয়ালের ক্ষতিকারক হবার আশঙ্কা ইত্যাকার অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করার ক্ষমতা রাখেন। অন্যের পক্ষে এরূপ বিবেচনা সম্ভব নয়। অবশ্য এসব সত্ত্বেও তারা সাম্রাজ্যের শক্তি ও দুর্বলতা অনুসারে এবং পুরুষানুক্রমে এসব বিষয়ে ক্ষমতা-অক্ষমতার বৈচিত্র্য বহন করে আসছেন।

আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, এসব শিল্পকর্ম ও তার পরিপূর্ণতা নাগরিক জীবনের সমৃদ্ধি এবং তার প্রাচুর্য চাহিদার প্রাচুর্য থেকে এসে থাকে। এজন্যই সাম্রাজ্য তার প্রথম দিকে প্রান্তরীয় জীবনবোধে উদ্দীপ্ত থাকায় এসব শিল্পকর্মের জন্য অন্য অঞ্চলের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। যেমন সম্রাট ওলিদ ইব্‌নে আবদুল মালেকের সময় দেখা গেছে; যখন তিনি মদিনার মসজিদ বয়তুল মুকাদ্দস ও সিরিয়ায় নিজ নামাঙ্কিত মসজিদ বিনির্মাণের মনস্থ করলেন, তখন কনস্টান্টিনপোলের রোমান সম্রাটের কাছে দক্ষ নির্মাণশিল্পীর জন্য লোক পাঠাতে হল। রোমান সম্রাট তাঁর চাহিদা অনুযায়ী এমন সব কর্মী পাঠিয়েছিলেন, যাদের দ্বারা ওলিদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল।

এসব শিল্পকর্মীদেরকে অনেক সময় জ্যামিতির অনেক কিছু জানতে হয়। যেমন—সমান করার জন্য ওলন দড়ি, পানি উপরের দিকে প্রবাহিত করার জন্য ব্যবস্থা এবং ইত্যাকার আরও বহুবিষয়। সুতরাং তাদেরকে এসব সমস্যা সম্পর্কে জানতে হয়। অনুরূপভাবে যন্ত্রের সাহায্যে ভার-উত্তোলন। কারণ পাথরের দ্বারা বিরাট আকারের কোন বস্তু তৈরি করে তা প্রাচীরের উপরে উঠাবার জন্য কর্মীদের শক্তিই যথেষ্ট নয়। এজন্য কৌশলের দ্বারা তাদের শক্তিকে বহুগুণে বাড়াতে হয়। এ উদ্দেশ্যে জ্যামিতিক নিয়ম অনুসারে প্রস্তুত নির্দিষ্ট ছিদ্রাদিতে রশি প্রবেশ করিয়ে যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করলে বস্তুর ভার বহুলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত বলে মনে হয়। এ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রকে 'মিখাল' (কপিকল)

বলা হয়। এর সাহায্যে অনায়াসে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে থাকে এবং এর কাজ একমাত্র মানুষের মধ্যে প্রচলিত জ্যামিতিক নিয়মাবলির মাধ্যমেই সফল হওয়া সম্ভব। অনুরূপ উপায়েই বর্তমানকালেও দণ্ডায়মান বিরাট বিরাট সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। অথচ মানুষের ধারণা এই যে, এগুলো প্রাক-ইসলাম যুগের কীর্তি এবং যারা এগুলো নির্মাণ করেছিলেন, তাদের দেহের আকৃতি এগুলোর অনুপাতেই বিরাট ছিল। কিন্তু আদৌ তা নয়। তারা এ জ্যামিতিক প্রক্রিয়াতেই এসব সৌধের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেছিলেন; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। পাঠক, এটা বুঝে নিন। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন।[২৩] পবিত্র তিনি।

২৩. কোরান, ৩, ৪৭।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

[সূত্রধরের শিল্প]

এ শিল্পটি সভ্যতার মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্গত এবং এর উপকরণ হল কাঠ। এর বর্ণনা এই যে, পবিত্র ও মহান আল্লাহ তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেই মানুষের জন্য এমন উপকারিতার সন্নিবেশ করেছেন, যা দিয়ে তাদের প্রয়োজন ও অভাব পূরণ হয়। এদের মধ্যে বৃক্ষ অন্যতম; এর মধ্যে মানুষের জন্য এত উপকার বিদ্যমান, যা গুণে শেষ করা যায় না এবং প্রত্যেকেই এগুলোর সাথে পরিচিত। এসব উপকারের একটি হল এদের শুকিয়ে কাঠ হিসেবে ব্যবহার করা। প্রথমেই মানুষ জীবনধারণের প্রয়োজনে এই শুষ্ক কাঠকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে। তাদের ভর দিয়ে চলবার লাঠি, পাচনবাড়ি এবং এদের ন্যায় অন্যান্য কাজে এর ব্যবহার হয়। কোন বস্তুর ভারের ফলে কাৎ হয়ে পড়া থেকে ঠেকনার সাহায্যে রক্ষা করার জন্যও এর প্রয়োজন দেখা দেয়। এ ছাড়াও নগর ও প্রান্তরবাসীদের জন্য এতে প্রচুর উপকারিতা রয়েছে। প্রান্তরবাসীরা কাঠ দ্বারা তাদের তাঁবুর খুঁটি ও টানা, সোয়ারীর জন্য হাওদা এবং অস্ত্র হিসেবে বর্শা, ধনুক ও তীর প্রস্তুত করে থাকে। নগরবাসীরা তাদের গৃহের জন্য ছাদ, দরজার কপাট এবং বসার আসন এ কাঠ দ্বারা নির্মাণ করে। এসব কাজের প্রতিটিতেই কাঠ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার হয়। কিন্তু তাকে নির্দিষ্ট আকারে রূপ দেবার জন্য শিল্পের সহায়তা প্রয়োজন।

এসব কাজে ব্যবহৃত শিল্পকর্ম, যা দিয়ে প্রতিটি উদ্দিষ্ট বস্তুর স্বরূপ বাস্তবায়িত হয়, তাকে সূত্রধরের কাজ বলে অভিহিত করা হয় এবং এর মর্যাদার তারতম্যও বিদ্যমান। এর জন্য উক্ত কাজের শিল্পীকে প্রথমেই কাঠ ফেঁড়ে ক্ষুদ্র খণ্ড ও তক্তায় রূপান্তরিত করতে হয় এবং পরে এসব টুকরা জোড়া দিয়ে উদ্দিষ্ট সামগ্রীর রূপ ফুটিয়ে তুলতে হয়। সংশ্লিষ্ট শিল্পী এসব খণ্ডকেই তাদের শিল্প-কৌশলের বিন্যাস অনুসারে এমনভাবে সাজান, যাতে প্রতিটি সামগ্রী তার নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। যিনি এ কাজে নিয়োজিত হন, তাকে সূত্রধর বলা হয় এবং তিনি সভ্যতার একজন প্রয়োজনীয় শিল্পী।

অতঃপর যখন নগর সংস্কৃতির বিস্তৃতি দেখা দেয় এবং বিলাস-ব্যসনের বিকাশ হয়, তখন মানুষ এসব কাজ; তথা—ছাদ, দরজা, আসন ও অন্য সামগ্রীর প্রতিটির ক্ষেত্রে কারুকার্য সম্পাদনের চেষ্টা করে। এভাবে উক্ত শিল্পকর্মে কারুকার্য সম্পাদন ও সৌন্দর্যমণ্ডিতকরণের যে অদ্ভুত প্রচেষ্টা দেখা দেয়, তা সভ্যতার পরিপূর্ণতা বিধায়ক শিল্প-নৈপুণ্য মাত্র; কোনক্রমেই তা মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন দরজায় ও

আসন ইত্যাদিতে খোদাইয়ের কাজ। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠখণ্ডকে মসৃণ ও অলঙ্কৃত করে তারপর এদেরকে নির্দিষ্ট অনুপাত অনুসারে পেরেকের সাহায্যে এমনভাবে মিলিয়ে দেয়া, যাতে দেখতে ওটা একটি অখণ্ড কাজ বলে মনে হয়। অনেক সময় এসব কাঠখণ্ডের দ্বারা বিচিত্র আকৃতির সৃষ্টি করে এমন শিল্প-কৌশলের দ্বারা বিন্যস্ত করা হয় যে, কাঠের কাজের মধ্যে এতে অদ্ভুত শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় ফুটে ওঠে। এভাবে কাঠের দ্বারা প্রস্তুত সর্ব প্রকার সামগ্রীতে শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দেয়া হয়।

অনুরূপভাবে সমুদ্রগামী জাহাজ প্রস্তুত করতেও তক্তা ও পেরেকের সমন্বিত রূপ ফুটিয়ে তুলবার জন্য এ শিল্পকর্মের প্রয়োজন দেখা দেয়। এটা জ্যামিতিক পরিমাপ অনুযায়ী মাছের দেহের আদলে এবং তার পাখনা ও বুকের সাহায্যে সন্তরণের দিকে লক্ষ রেখে এমন একটি আকৃতি গড়ে তোলা, যা পানি কেটে অগ্রসর হতে বেশি উপযোগী বলে বিবেচিত হতে পারে। শুধু এতে মাছের মধ্যকার প্রাণের গতির পরিবর্তে বাতাসের দ্বারা গতি সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়। অনেক সময় রণতরীগুলোতে দাঁড়ের সাহায্যেও গতি সঞ্চার করা হয়ে থাকে। এ শিল্পটি তার মূল ভিত্তিতেই এর সর্বপ্রকার কর্মের জন্য জ্যামিতিশাস্ত্রের একটি বিরাট অংশের ওপর নির্ভরশীল। কারণ যে-কোন সামগ্রীকে তার কল্পিত সম্ভাবনা থেকে বাস্তবে রূপদানের জন্য নির্দিষ্ট অনুপাত অনুসারে সাধারণ অথবা বিশেষ রূপটির যথাযথ অনুসরণ প্রয়োজন এবং এ নির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটাতে হলে জ্যামিতির সাহায্য অপরিহার্য।

এ কারণে দেখা যায় গ্রিক জ্যামিতিবিদরা প্রায় সকলেই উক্ত শিল্পকর্মে অভিজ্ঞ ছিলেন। 'জ্যামিতির মূলনীতি' গ্রন্থ প্রণেতা ইউক্লিড একজন সূত্রধর ছিলেন[২৪] এবং তিনি এ পেশার দ্বারাই পরিচিত হতেন। অনুরূপভাবে 'সুচিঘন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অধ্যায়' রচয়িতা অ্যাপলোনিয়াম, মিলানিয়াম প্রমুখ অন্যান্য অনেকেই এ শিল্পের সাথে পরিচিত ছিলেন।

অনেক সময় বলা হয় যে, সমগ্র সৃষ্টিতে যিনি সর্বপ্রথম এ শিল্পজ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁর নাম হযরত নুহ (আ)। তিনি এ শিল্পের সাহায্যেই তাঁর মুক্তির জাহাজ তৈরি করেছিলেন, যা সেই মহাপ্লাবনে তাঁর অলৌকিক ক্রিয়া হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। এ সংবাদ যদিও সম্ভব অর্থাৎ তিনি সূত্রধর ছিলেন; কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথম এ বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন বা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। অনুরূপ কিছুর জন্য সময়ের দূরত্বের কারণেই কোন প্রকার প্রমাণ এসে পৌঁছায় না। এ সংবাদের অর্থ আল্লাহ্ই ভাল জানেন, সম্ভবত এই যে, সূত্রধরের এ শিল্পকর্ম অতিপ্রাচীন এবং হযরত নুহের পূর্বেকার এ সম্পর্কীয় কোন সংবাদ জানা যায় না। সুতরাং তাঁকেই এর প্রথম শিক্ষক বলে ধরে নেয়া হয়েছে। পাঠক, এর মধ্য দিয়ে সৃষ্টির মধ্যকার এ শিল্পকর্মাদির রহস্য অনুধাবন করতে সচেষ্ট হোন। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা এবং তিনিই একমাত্র সহায়।

---

২৪. যতদূর সম্ভব পরবর্তী অ্যাপলোনিয়ামের নামই এ প্রসঙ্গে অধিকতর পরিচিত।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

[বয়ন ও সীবন শিল্প]

জেনে রাখুন, মনুষ্যত্বের দিক থেকে যারা সমভাবাপন্ন মানুষ, তাদের জন্য আশ্রয়ের চিন্তা যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি পরিচ্ছদের চিন্তাও এবং এক্ষেত্রে বয়নকৃত সামগ্রীর সাহায্যে তারা শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা করে থাকে। এ উদ্দেশ্যে সুতাকে এমনভাবে একত্র করতে হয়, যাতে তা দিয়ে একটি অখণ্ড কাপড় প্রস্তুত হতে পারে। এ প্রক্রিয়ার নামই বোনা বা বয়ন।

প্রান্তরীয় জীবনের অধিকারীরা এ ব্যাপারে এক খণ্ডকেই যথেষ্ট মনে করে; কিন্তু তারাই যখন নাগরিক জীবনে প্রবেশ করে, তখন তারা এ অখণ্ড কাপড়কে খণ্ড খণ্ড করে তাদের আকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে মানানসই রূপে কেটে নেয়। তারপর এসব খণ্ডকে সুতার দ্বারা একত্র করে পরিধানের যোগ্য একটি পরিচ্ছদে রূপান্তরিত করে। এভাবে একত্র করার কাজে যে-বিদ্যাটির সাহায্য নেয়া হয়, তাকে বলে সীবন। এ শিল্প দুটি সভ্যতার জন্য মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্গত। কারণ সব মানুষই আচ্ছাদনের জন্য এর মুখাপেক্ষী।

পশম, রেশম ও কার্পাসের লম্বা সুতার টানা এবং প্রস্থ সুতার পড়েন এমনভাবে পরস্পর গ্রথিত করা, যাতে এগুলোর সম্মিলনে একটি অখণ্ড জমিন গড়ে ওঠে। এটাই বয়নের উত্তম প্রক্রিয়া এবং এর সাহায্যেই নির্দিষ্ট আকৃতির বস্ত্রাদি তৈরি হয়। এগুলোর মধ্যে পশমের তৈরি চাদর এবং রেশম ও কার্পাসের তৈরি পরিচ্ছদের বস্ত্র ইত্যাদি দেখা যায়। দ্বিতীয় শিল্পটি এসব বস্ত্রখণ্ডকে বিভিন্ন আকৃতি ও ধারা অনুসারে প্রথমে কাঁচি দিয়ে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপযোগী করে কর্তন করা এবং তারপর উত্তমরূপে সুতার দ্বারা সেলাই, বন্ধনীর দ্বারা জোড়া দেয়া, পেঁচিয়ে আটকানো অথবা ফাঁক রেখে গাঁথার মাধ্যমে[২৫] শিল্পের প্রচলিত ধরন অনুসারে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা।

এ দ্বিতীয় শিল্পটি বিশেষভাবে নাগরিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। কেননা যাযাবরী জীবন এসব বিষয়ে আগ্রহ পোষণ করে না। তারা কাপড় পরার জন্যই পরে। তাকে খণ্ড করে নির্দিষ্ট মাপে সেলাই করার মাধ্যমে শোভন পরিচ্ছদ তৈরির ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহ নেই; এটা একমাত্র নাগরিক জীবনের বিচিত্র বিষয়-বিলাসেরই সৃষ্টি। পাঠক, এদিক থেকে হজ্বব্রত পালনের সময় সেলাইযুক্ত কাপড় পরা নিষিদ্ধ হওয়ার রহস্যটি

২৫. মূল শব্দের আভিধানিক অর্থ অনসুরণ করে এ অর্থ দেয়া হয়েছে। সম্ভবত এই চার প্রকার সীবন প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল।

অনুধাবন করুন। কারণ ধর্মীয় বিধান অনুসারে হজ্বব্রত প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হল সাংসারিক সব বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসা। যেমন 'আমরা প্রথমবার সৃষ্টি করেছি' এমন কি কোন ব্যক্তির পক্ষে তার বিলাসী অভ্যাস, তথা সুগন্ধী, নারী সংসর্গ, সেলাইকৃত পরিচ্ছদ, পাদুকা ইত্যাদির সাথে সংশ্রব রাখা সম্ভব নয় এবং শিকার ও অন্যান্য অভ্যাস, যা দিয়ে তার প্রবৃত্তি ও চরিত্র অনুরঞ্জিত হয়েছিল, তাও তাকে ত্যাগ করতে হবে; যেমন মৃত্যুর সময় সে সব কিছু ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সে এমনভাবে আসবে, যেন সে হাশরের মাঠে উপস্থিত হচ্ছে, তার অন্তর বিনম্র এবং তার উদ্দেশ্য একমাত্র প্রভুর সন্তুষ্টি। এক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্যে যদি আন্তরিকতা থাকে, তা হলে এর প্রতিদানে সে সর্বপাপ থেকে এমনভাবে মুক্ত হবে, যেমন প্রথম দিন তার জননী তাকে নিষ্কলুষ জন্ম দিয়েছিল। তোমার পবিত্রতা হোক, তুমি বান্দাদের প্রতি কী অপরিসীম দয়া ও মমতার অধিকারী! তাদেরকে তোমার সকাশে পথপ্রদর্শন করতে তুমি কতই না ব্যাগ্র!

বস্তুত এ দুটি শিল্প সৃষ্টিজগতে অতিশয় প্রাচীন; কেননা সমভাবাপন্ন অঞ্চলগুলোতে দেহ আচ্ছাদনের এ স্বভাব মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু গ্রীষ্মের দরুন অসমভাবাপন্ন অঞ্চলে এই আচ্ছাদনের প্রতি তেমন কোন আগ্রহ নেই। এজন্য প্রথম অঞ্চলের সুদানের অধিবাসীদের সম্পর্কে আমরা শুনতে পাই যে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উলঙ্গ। এ শিল্পের প্রাচীনত্বের জন্য একে হযরত ইদরিস (আঃ)-এর সাথে সম্পর্কিত করা হয়। কেননা তিনি নবীদের মধ্যে অতিশয় প্রাচীন। অনেক সময় এসব শিল্পকর্মের সাথে হারমিসের নাম যুক্ত হয়। কখনও বলা হয়, হারমিসই ইদরিস। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং সর্বস্রষ্টা ও সর্বজ্ঞাতা।[২৬]

২৬. কোরান, ১৫, ৮৬; ৩৬, ৮১।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

[ধাত্রী শিল্প]

এটি মানব শিশুকে তার মাতৃজঠর থেকে বের করার প্রক্রিয়া সংবলিত শিল্প হিসেবে পরিচিত। এ কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় যত্ন এবং এর উপকরণ সংগ্রহ এর অন্তর্গত। তারপর, আমরা যেমন পরে বর্ণনা করছি, সে অনুযায়ী নবজাতকের কল্যাণের প্রতি লক্ষ রাখাও এর সাথে সংশ্লিষ্ট। এ শিল্পটি সাধারণভাবে নারী সমাজের আয়ত্তাধীন। কেননা তারাই পরস্পরের গোপনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য বেশি যোগ্য। নারীদের মধ্যে যারা এ কাজে নিযুক্ত, তাদেরকে 'কাবেলা' (গ্রহিতা) বলে অভিহিত করা হয়। শব্দটি প্রদান ও গ্রহণের মনোভাব থেকে গৃহীত হয়েছে। যেন প্রসবকারিণী তাকে নবজাতক প্রদান করে এবং সে তা গ্রহণ করে।

এর বর্ণনা এই যে, মাতৃগর্ভে যখন ভ্রূণের সৃষ্টি ও এর পর্যায়ক্রমিক বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে চরম সীমায় পৌঁছে এবং আল্লাহ্ তার জন্য সেখানে অবস্থানের যে সময়সীমা,—সাধারণভাবে নয় মাস,—নির্ধারণ করেছিলেন, তা পূর্ণ হয়, তখন আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ আকর্ষণেই ওটা বাইরে আসার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ সময় বহির্পথ সংকীর্ণ হওয়ার ফলে ব্যাপারটি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় চাপের ফলে যোনির পার্শ্বদেশ ক্ষতবিক্ষত হয়। অনেক সময় জরায়ুর সাথে সংশ্লিষ্ট ঝিল্লীর আবরণ ফেটে যায়। এ সবই ব্যথার কারণ ঘটিয়ে এর আবির্ভাবকে তীব্র করে তোলে এবং এগুলোরই সম্মিলিত অর্থ প্রসববেদনা। এ পর্যায়ে ধাত্রী অনেকদিন থেকেই প্রসূতিকে সাহায্য করতে পারে; সে তার পৃষ্ঠদেশ, উভয় বস্তী ও জরায়ু সংলগ্ন নিম্নভাগ মালিশ করে দিতে পারে। এর ফলে জাতক বহিষ্কারে নিয়োজিত প্রসূতির শক্তি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং যতদূর সম্ভব তার কষ্টের লাঘব হয়। ধাত্রী এক্ষেত্রে প্রসূতির কষ্টের ধারা অনুসরণ করেই তাকে সাহায্য করে।

অতঃপর জাতক ভূমিষ্ঠ হলে তার পাকস্থলীর সাথে যুক্ত নাভীর নাড়ীর দ্বারা মাতৃজরায়ুর অন্তর্গত ফুলের সাথে সে তখনও সংযুক্ত থাকে। বস্তুত এ নাড়ীর দ্বারাই সে জরায়ুতে অবস্থানকালে খাদ্য গ্রহণ করেছে এবং উক্ত ফুল একটি অতিরিক্ত অঙ্গ, যা জাতককে খাদ্য সরবরাহ করার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল। ধাত্রী এমনভাবে জাতকের এ নাড়ীচ্ছেদ করে, যাতে ওটা অতিরিক্ত অঙ্গের স্থানে না পৌঁছায় এবং জাতকের পাকস্থলী ও মাতৃজরায়ুর কোন ক্ষতি সাধিত না হয়। তারপর সে উক্ত নাড়ীর কর্তিত স্থানটিকে সেঁকা দিয়ে অথবা অন্য যেভাবে সে ভাল মনে করে, এর সংক্রমিত হওয়ার পথ রুদ্ধ করে।

অতঃপর এ জাতক, যার হাড় কোমল এবং সহজে বাঁকানো বা ফিরানো সম্ভব, সে একটি সংকীর্ণ পথ দিয়ে বাইরে আসার ফলে অনেক সময় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকৃতি ও তার গড়ন বিকৃত হয়ে যায়। কারণ এগুলো সদ্য সৃষ্ট এবং তখনও কোমল অবস্থায় বিদ্যমান। সুতরাং ধাত্রী নবজাতকের এমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মৃদুচাপ ও অন্যবিধ ব্যবস্থা দ্বারা তার স্বাভাবিক গঠনের দিকে ফিরিয়ে আনে, যাতে নবজাতক তার নির্দিষ্ট গড়ন ও আকৃতিসহ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে।

অতঃপর ধাত্রী প্রসূতির দিকে দৃষ্টি দেয় এবং যথাস্থানে মালিশ ও কোমল চাপ প্রয়োগের দ্বারা তার জরায়ুস্থ ফুল বের হয়ে আসতে সাহায্য করে। কারণ অনেক সময় ওটা বের হতে কিছুটা দেরি হয়। এর ফলে এ আশঙ্কা দেখা দেয় যে, তার বের হওয়ার পূর্বেই জরায়ুর সংকোচন শক্তি ক্রিয়াশীল হতে পারে। যেহেতু ফুল একটি অতিরিক্ত অঙ্গ, সুতরাং ওটা সেখানে আটকে গেলে পচে উঠবে এবং তার দ্বারা জরায়ু বিষাক্ত হয়ে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই ধাত্রী এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে এবং বিভিন্ন কৌশলে ফুলের বিলম্বিত পতনকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে।

এর পর সে নবজাতকের দেহকে তেল ও অন্যবিধ সংকোচক পদার্থের দ্বারা মর্দন করে, যাতে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্ত হয়ে ওঠে এবং জরায়ুতে অবস্থানকালীন তার গাত্রে লেগে থাকা তরল পদার্থ শুকিয়ে যায়। তারপর সে নবজাতকের চোয়াল ধরে কিঞ্চিৎ চাপ দেয়, যাতে তার তালু উঁচু হয়ে ওঠে; সে তার নাসারন্ধ্র পরিষ্কার করে, যাতে তার মস্তিষ্কের পথ সুগম হয় এবং তার মুখে তরল পদার্থ দিয়ে তাকে গিলতে সাহায্য করে, যাতে তার পাকস্থলীর বাধা অপসারিত হয়ে তার পার্শ্বদ্বয়ের সম্মিলিত অবস্থার মধ্যে ফাঁকের সৃষ্টি হয়।

অতঃপর ধাত্রী প্রসববেদনার দরুন প্রসূতির যে দৈহিক ক্লান্তি দেখা দিয়েছে, তার জন্য ওষুধ প্রয়োগ করে এবং তার জরায়ু থেকে নবজাতকের বিচ্ছিন্নতার ফলে যে অস্বস্তির সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করতে চেষ্টা করে। কারণ জাতক যদিও মাতৃজরায়ুর সাথে সংযুক্ত কোন অঙ্গ নয়, তবুও তাতে তার পর্যায়ক্রমিক পরিবর্ধনের ফলে এর সংযুক্ত অংশেই পরিণত হয়েছিল। সুতরাং তার বিছিন্ন হবার বেদনা অঙ্গ-কর্তনের বেদনার ন্যায়ই তীব্র। এ বেদনার ওষুধ দেয়ার সঙ্গে ধাত্রী জাতকের বহিরাগমনের ফলে চাপে ও ছিন্ন হওয়ার দরুন যোনিদেশের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তারও চিকিৎসা করে। এসব দুঃখ কষ্টের ব্যাপারে আমরা ধাত্রীদেরকেই বেশি যোগ্যতার সাথে ওষুধ প্রয়োগ করতে দেখতে পাই। এমনিভাবে নবজাতক তার দুগ্ধপোষ্য অবস্থা অতিক্রম না করা পর্যন্ত যে সব রোগ-শোকের অধীন হয়, তাতেও অভিজ্ঞ চিকিৎসক অপেক্ষা এ ধাত্রীরাই বেশি ফলপ্রসূ ব্যবস্থার অধিকারিণী হিসেবে দৃষ্টিগোচর হয়। এর একমাত্র কারণ দুগ্ধাবস্থা অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত নবজাতকের দেহজ শক্তি একটা সম্ভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং এর পরেই সে যথার্থ মানবদেহের অধিকারী হয়। সুতরাং তখন তার দৈহিক বিষয়াদির জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন অত্যধিক দেখা দেয়। এজন্যই পাঠক, আপনি যেমন দেখতে পাচ্ছেন, উপরোক্ত শিল্প মানব সভ্যতা তথা মানব জাতির অস্তিত্বের জন্য মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাদের ব্যক্তিগত আবির্ভাব এর সাহায্য ছাড়া সাধারণত সম্পূর্ণ হয় না।

কখনও কোন কোন ব্যক্তির জন্য এ শিল্পের সাহায্যের প্রয়োজন না-ও হতে পারে। কখনও এটি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে তাদের জন্য অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ক্রিয়া-কলাপ হিসেবে দেখা দেয়; যেমন নবী, রসূলদের বেলায় ঘটে থাকে; আল্লাহ্ তাঁদেরকে শান্তি ও স্বস্তি দান করুন। আবার কখনও সহজাত প্রবৃত্তি ও নির্দেশের দ্বারা এটা সংঘটিত হয়। নবজাত সহজাত তাড়নায় জন্ম-প্রক্রিয়া পার হয়ে আসে এবং এ শিল্প-কৌশলের সাহায্য ছাড়াই তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের ঘটনা বহু ঘটেছে। এর মধ্যে নবী (স) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি সহাস্য বদনে ত্বকচ্ছেদ অবস্থায় ভূমিতে দু হাত স্থাপন করে এবং দৃষ্টি আকাশে তুলে ধরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত ঈসাও তাঁর দোলনায় ইত্যাদি ইত্যাদি। সহজাত প্রবৃত্তির কথাটিও অস্বীকার করা যায় না। কারণ বাক্‌হীন প্রাণীরাও অদ্ভুতসব সহজাত তাড়নার অধিকারী; যেমন—মৌমাছি ও অন্যান্য প্রাণী। সুতরাং মানুষ সৃষ্টির সেরা হবার পরে তার সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে; পাঠক, আপনার কী ধারণা হয়! বিশেষত সে আল্লাহ্‌র মহিমার দ্বারা বিশিষ্ট।

অতঃপর নবজাতক সকলের মধ্যে মাতৃস্তন্য পানের প্রতি আগ্রহী হবার যে সহজাত প্রবৃত্তি দেখা যায়, ওটাই প্রমাণ করে যে, তাদের সকলের জন্যই এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। বস্তুত মহান আল্লাহ্‌র করুণা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ বিষয়টি হতে ফারাবী এবং আন্দালুসী দার্শনিকদের মতামতের অসারতা প্রতিপন্ন হয়। তারা বিভিন্ন জাতির জাতিত্ব ও বস্তুর অস্তিত্ব বিনাশকে অসম্ভব বলে মনে করে। বিশেষ করে মানব জাতির অস্তিত্ব। তারা বলেন, যদি ব্যক্তিগতভাবে মানুষের অস্তিত্ব অসম্ভব হত, তা হলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বই থাকত না এবং এ ধাত্রীশিল্পের ওপর তার নির্ভরতা তাকে আরও বেশি করে অস্তিত্বহীনতার দিকে ঠেলে দিত। কারণ আমরা যদিও এ শিল্পের সাহায্য ছাড়া কোন জাতকের অস্তিত্ব ধরেও নিই এবং তার দুগ্ধপোষ্য অবস্থা অতিক্রমের কথা মেনেও নিই, তা হলেও দেখা যাবে তার স্থায়িত্ব আদৌ সম্ভব নয়। অথচ সর্বপ্রকার শিল্পকর্ম মানব মণীষার ফসল, এর অনুসারী ও অনুগামী।

ইবনে সিনা এ মতের বিরোধী মত পোষণ করেন বলে তা খণ্ডন করেছেন। তিনি জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্তির সম্ভাবনা এবং সৃষ্টিজগতের বিনাশ স্বীকার করেন। তাঁর মতে আকশমণ্ডলের বিশেষ চাহিদা এবং প্রস্তুতির আশ্চর্য গঠন-প্রক্রিয়ায় বহু যুগ পরে পুনরায় সৃষ্টিজগতের অস্তিত্বে আসা সম্ভব। এর ফলে মাটিতে উপযোগী মিশ্রণের সৃষ্টি হবে এবং সেই অনুপাতে উত্তাপের আবির্ভাব ঘটিয়ে মানুষের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ করে তুলবে। তারপর তার প্রতিপালনের জন্য কোন প্রাণীর মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না সৃষ্টি করা হবে এবং সে মানব শিশুকে অপত্যস্নেহে তার দুগ্ধপোষ্য অবস্থা অতিক্রম করে অস্তিত্বে পূর্ণ হয়ে ওঠার জন্য সাহায্য করবে। তাঁর এ মত 'হাই ইবনে ইয়াকযান' নামক পুস্তকে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।[২৭] কিন্তু এ যুক্তি-প্রমাণও ভিত্তিহীন। আমরা তাঁর সাথে জাতির অস্তিত্ব বিলোপের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে একমত হতে পারি; তবু তা অনুরূপ যুক্তি-

২৭. অবশ্য 'হাই ইবনে ইয়াকযান' ইবনে সিনার নয়, বরং ইবনে তুফায়েলের রচনা।

প্রমাণের ভিত্তিতে নয়। কারণ তাঁর প্রমাণের ধারা এক অবশ্যম্ভাবী কার্যকারণের সাথে যুক্ত। অথচ একজন ইচ্ছাময় কর্তার অস্তিত্বের ধারণা এ মতকে খণ্ডন করে এবং ইচ্ছাময় কর্তার ধারণা অনুসারে অনাদি মহিমা ও ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে কোন প্রকার মাধ্যমের কারণ নেই। সুতরাং এমন কষ্ট-কল্পনার প্রয়োজন কী!

তদুপরি তর্কের খাতিরে যদি একে মেনেও নেয়া যায়, তাহলে এ যুক্তি-প্রমাণের চরম পর্যায় হল এই ব্যক্তিপর্যায়ে সৃষ্ট মানবের অস্তিত্বকে মূকপ্রাণীর সহজাত প্রতিপালন প্রবৃত্তির ওপর ন্যাস্ত করা মাত্র। এরূপ করার প্রয়োজন কী? মূকপ্রাণীর মধ্যে যদি সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না সৃষ্টি হতে পারে, তাহলে জাতকের মধ্যে এর সৃষ্টি হতে বাধা কোথায়! যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। কোন প্রাণীবিশেষের মধ্যে নিজের উপকার সাধনের জন্য প্রবৃত্তির তাড়না সৃষ্টি করা অপরের উপকার সাধনের প্রবৃত্তি অপেক্ষা বেশি সম্ভাবনাময়। সুতরা; পাঠক, উপরোক্ত দুটি মত-ই তাদের বিশেষ যুক্তি-প্রমাণের দিক থেকে নিজেদের অসারতা প্রতিপন্ন করছে, আমরা এ বক্তব্যই আপনার সামনে তুলে ধরেছি। মহান আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞানের আধার।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[চিকিৎসা এবং এর প্রয়োজনীয়তা
প্রান্তরীয় জীবন অপেক্ষা শহর-নগরে সর্বাধিক]

এ শিল্পটি শহর নগরের জীবনের জন্য মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত; কারণ এর উপযোগিতার দিক এভাবেই সর্বত্র পরিচিত। বস্তুত এর ফলশ্রুতি হল স্বাস্থ্যবানদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করা এবং রুগ্নদের রোগ ওষুধাদি প্রয়োগের মাধ্যমে দূরীভূত করা; যাতে সকলেই নিরোগ ও স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠতে পারে।

জেনে রাখুন, সব রোগের মূল উৎস হল খাদ্যদ্রব্য। যেমন হযরত মুহম্মদ (স) তাঁর এক বাণীতে বলেছেন। ওটা চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি পূর্ণ বিধান এবং সেই অনুপাতে উক্ত শিল্পের অধিকারীদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। যদিও জ্ঞানীরা এর বিষয় বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। তা এই যে, তিনি বলেছেন, পাকস্থলী হল রোগের গৃহ; সংযম সব ওষুধের মূল এবং বেশি আহার সব রোগের উৎস। তাঁর বক্তব্য—পাকস্থলী সব রোগের গৃহ; এর কারণ সুস্পষ্ট। তাঁর বাণী, সংযম সব ওষুধের মূল; এক্ষেত্রে সংযম অর্থ ক্ষুধা অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণে সংযম হওয়া। এর অর্থ এই যে, ক্ষুধা এমন এক মহৌষধি যা সব ওষুধের মূল। তাঁর উক্তি, বেশি আহার সব রোগের উৎস; এর অর্থ খাদ্যের ওপর খাদ্য গ্রহণ এবং পাকস্থলী পূর্বের খাদ্য জীর্ণ করার পূর্বেই তার ওপর অন্য আহার্যের বোঝা চাপিয়ে দেয়া।

এসব বক্তব্যের ব্যাখ্যা এই যে, পবিত্র আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার জীবনকে আহার্যের ওপর নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। সে তা গ্রহণ করে এবং এর মধ্যকার পরিপাকশক্তি একে পরিপাক করে দেহের অংশ হিসেবে রক্ত ও অস্থির উপযোগী তরল পদার্থে রূপান্তরিত করে দেয়। পুনরায় এর অন্তর্গত বৃদ্ধি শক্তি এ তরল পদার্থকে মাংস ও হাড়ে পরিণত করে। পরিপাক করার অর্থ দেহের তাপে পর্যায়ক্রমে খাদ্যদ্রব্যকে সিদ্ধ করে দেহের অংশে পরিণত করা। এর ব্যাখ্যা এই যে, খাদ্য যখন মুখে প্রবেশ করে এবং দাঁতগুলো তাকে চর্বণ করে, তখন মুখের তাপে তার মধ্যে কথঞ্চিৎ পরিপাক ক্রিয়া শুরু হয়। এর ফলে এর মিশ্রণের মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা হয়। যেমন, পাঠক আপনি লক্ষ করতে পারেন যে, যে খাদ্য আপনি গ্রাস হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তা যদি চিবিয়ে পুনরায় বাইরে আনেন, তা হলে এতে খাদ্য গ্রহণকালীন মিশ্রণ অপেক্ষা ভিন্নতর মিশ্রণ দেখা যাবে। তারপর পাকস্থলীতে উক্ত খাদ্য পৌঁছলে এর তাপ খাদ্যকে পরিপাক করে তরল পদার্থে পরিণত করে এবং ওটা বস্তুত পরিপাককৃত

আহার্যের নির্যাস। এর পর এ নির্যাস যকৃতের কাছে প্রেরণ করা হয় এবং পাকস্থলীতে অবশিষ্ট ভারী পদার্থকে নিম্নের দুটি বহির্পথের দিকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তারপর যকৃত এ তরল পদার্থকে স্বীয় তাপে জারিত করে বিশুদ্ধ রক্তে পরিণত করে। এরূপ পরিপাকের সময় তরল পদার্থের ওপরে যে ফেনার মত বস্তু ভেসে বেড়ায় ওটাই হলুদ পিত্ত এবং এর মধ্যে কিছু অংশ শুষ্ক হয়ে জমে যায়, ওটাই ঘন আকারে কফ হয়ে অবস্থান করে। এর পর যকৃত সমস্ত রক্তকে শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত করে। সেখানে তা পুনরায় দৈহিক তাপে পরিপাক হয়। এ পরিপাকের সময় বিশুদ্ধ রক্ত থেকে এক প্রকার আর্দ্র-উষ্ণ বাষ্পের জন্ম হয়, যা জীবাত্মার শক্তি বর্ধন করে। এ বর্ধনশক্তি ক্রিয়াশীল হলে রক্ত মাংসে পরিণত হয় এবং তার ঘন অংশ অস্থি গঠন করে। তারপর দেহ এ পরিপাক ক্রিয়াতে যা অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায়, তাকে বিভিন্ন ধরনের পরিত্যাজ্য পদার্থে যেমন ঘাম, থুথু, তরল শ্লেষ্মা ও অশ্রুতে পরিণত করে। এটাই আহার্যের শক্তি থেকে ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে মাংসে পরিণত হবার রূপরেখা।

অতঃপর সব রোগের উৎস এবং অধিকাংশ রোগের স্বরূপ হল জ্বর। এর কারণ এই যে, দেহের উত্তাপ অনেক সময় উপরোক্ত প্রতিটি পর্যায় পরিপাক-ক্রিয়ার যে ব্যবস্থা বিদ্যমান, এর কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং উক্ত খাদ্যবস্তু অজীর্ণ অবস্থায় বিরাজ করে। এর কারণ সম্ভবত পাকস্থলীতে বেশি খাদ্যের উপস্থিতি, যা এর স্বাভাবিক তাপকে পরাস্ত করে। অথবা পাকস্থলীতে পূর্বের খাদ্য অজীর্ণ অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও আরও খাদ্য গ্রহণ। এর ফলে হয় পাকস্থলীর স্বাভাবিক তাপ পূর্বের অজীর্ণ খাদ্যকে ত্যাগ করে নতুন খাদ্য পরিপাক করতে শুরু করে; নয়ত তাদের উভয়কেই একসঙ্গে পরিপাক করতে গিয়ে সে অক্ষম হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং পাকস্থলী এ অজীর্ণ খাদ্যরসকেই যকৃতে প্রেরণ করে; কিন্তু যকৃতের উত্তাপও তাকে পরিপাক করতে সমর্থ হয় না। অনেক সময় অনুরূপ প্রক্রিয়ায় আগত অজীর্ণ রসের কতকাংশ পূর্ব থেকেই যকৃতে বিদ্যমান থাকে। কাজেই যকৃতের পক্ষে এর সবগুলোকে শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এ পরিস্থিতিতে দেহ সক্ষম হলে তার প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে শিরাবাহিত এ রক্তের অতিরিক্ত অংশকে ঘাম, অশ্রু ও থুথুর আকারে বের করে দেয়। অনেক সময় অক্ষমতার ফলে এর অধিকাংশই শিরা, যকৃত ও পাকস্থলীতে অবস্থান করে এবং কালক্রমে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রতিটি মিশ্রিত তরল পদার্থ পরিপাক ও জীর্ণ না হলে, এতে দুর্গন্ধ দেখা দেয়। ফলে উক্ত অজীর্ণ খাদ্যও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে ওঠে এবং তাকেই 'খিলত' বা বদরক্ত বলা হয়। বস্তুত প্রতিটি দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থই এক অদ্ভুত উত্তাপের জন্ম দেয়। মানুষের দেহে অনুরূপভাবে উৎপন্ন উত্তাপকেই জ্বর বলা হয়ে থাকে।

পাঠক, পরিত্যক্ত খাদ্রসামগ্রী পঁচে যাওয়া এবং বিষ্ঠার দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে ওঠার সাথে এ বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন। কীভাবে এগুলোতে উত্তাপের সৃষ্টি হয়ে তার প্রস্তুতি অনুসারে অগ্রসর হয়ে যায়। দেহের মধ্যে জ্বরের ব্যাপারটিও অনুরূপভাবেই সংঘটিত হয় এবং ওটাই সব রোগের মূল ও উৎস, যেমন হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে। এজন্য এসব জ্বরের ওষুধ হল নির্দিষ্ট কয়েক সপ্তাহ রোগীকে আহার গ্রহণে বিরত রাখা। তারপর তাকে নরম খাদ্য দেয়া যাতে তার আরোগ্য অবস্থা সম্পূর্ণ হতে পারে।

অনুরূপভাবে সুস্থ দেহকেও এসব রোগ ও অন্যবিধ সংক্রমণ হতে সংরক্ষণ করা সম্ভব এবং তার উৎসও উক্ত হাদীসটিতে রয়েছে।

কখনও অনুরূপ পচনক্রিয়া অঙ্গবিশেষে দেখা দেয় এবং এর ফলে উক্ত অঙ্গটি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিংবা দেহের কোন অংশে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, হয় প্রধান অঙ্গগুলোতে, নয়ত অন্যত্র কোথাও। কখনও কোন অঙ্গ এমনভাবে রোগাক্রান্ত হয় যে, উক্ত অঙ্গের চলনশক্তি রহিত হয়ে যায়। এগুলো থেকেই সব রোগের উৎপত্তি হয় এবং তার মূল উৎস সাধারণভাবে খাদ্যদ্রব্য। সব বিষয়েই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য।

এসব রোগ শহর-নগরের জনসমাজেই বেশি দেখা যায়। এর কারণ তাদের জীবনের সচ্ছলতা। তারা বেশি খাদ্য গ্রহণ করে, খাদ্যসামগ্রীর কোন বিশেষ একটি প্রকারেই তারা সন্তুষ্ট নয় এবং তা গ্রহণ করতে গিয়ে তারা বাছ-বিচারের প্রয়োজনবোধ করে না। তারা রন্ধন প্রক্রিয়ার দ্বারা বহু খাদ্যসামগ্রী, যেমন—বিচিত্র মসলা, শাক-সব্জি এবং শুষ্ক ও কাঁচা ফল-মূল একত্রে মিশ্রিত করে। তদুপরি তারা কোন এক প্রকার বা কতক প্রকারেও সন্তুষ্ট হতে চায় না। অনেক সময় আমরা এক প্রকার খাদ্যেই চল্লিশ প্রকার সব্জি ও মাংসের মিশ্রণ লক্ষ করেছি। এর ফলে খাদ্য সামগ্রীতে এক অদ্ভুত মিশ্রণের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এগুলো দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য উপাদেয় বলেও প্রমাণিত হয় না।

এছাড়া শহর-নগরের আবহাওয়া অতিরিক্ত আবর্জনাজাত বিচিত্র দুর্গন্ধযুক্ত বাষ্পের মিশ্রণে দূষিত হয়ে ওঠে। বস্তুত বায়ু আত্মশক্তিকে সতেজ করে এবং এ সতেজভাবের দরুন তার পরিপাকশক্তির উপযোগী স্বাভাবিক তাপ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। তদুপরি শহরবাসীদের মধ্যে ব্যায়ামের অভ্যাস নেই বললেই চলে। কারণ তারা সাধারণভাবে শান্তি ও স্বস্তির মধ্যে নিমগ্ন থাকে; কোন প্রকার পরিশ্রমের কাজ তাদেরকে করতে হয় না এবং এর কোন প্রভাবও তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত অনুরূপ অবস্থা নেই; সেখানে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক প্রতিটি বর্ণের বিচিত্র নিয়মকানুন বর্ণনা করে শিক্ষা দেন না; বরং সেখানে শব্দগুলোর আদল উপস্থিত করার মত লিপি-চাতুর্য শিক্ষা দেয়া হয়। যাতে শিক্ষার্থী শব্দাবলি শেখার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে এবং তার আঙুল এর উপযোগী হয়ে ওঠে। এভাবে শিক্ষা লাভের পর তাকে বলা হয় 'উত্তম' লিপিকর।

আরবিলিপি তুব্বা সাম্রাজ্যের সময় চরম বিকাশ লাভ করেছিল। এতে দৃঢ়তা সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়ে তৎকালীন নাগরিক জীবনের বিলাস-ব্যসনের উপযোগী হয়ে উঠেছিল। একে হিমিয়ারি লিপি বলা হত। তারপর এটি আল-মুনজিরের বংশাবলির স্থাপিত রাজধানী হিরায় স্থানান্তরিত হয়। তারা তুব্বা রাজন্যবর্গের বংশ সম্পর্কের দাবিতে এ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ইরাক ভূমিতে আরবি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তারাই এ লিপির উত্তরাধিকার লাভ করেন। কিন্তু এ দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য থাকায় লিপির ব্যবহার তাদের কাছে তুব্বা-রাজাদের ন্যায় উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি। এ কারণে নাগরিকত্ব ও তার অনুসারী অন্যান্য শিল্পকর্মেও তারা পূর্বানুরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়নি। হিরা থেকে তায়েফবাসী ও কোরায়েশরা এ লিপির

শিক্ষা গ্রহণ করে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কথিত আছে, যিনি হিরা থেকে এ লিপির শিক্ষা গ্রহণ করেন, তার নাম সুফিয়ান ইবনে উমাইয়া। বলা হয়, তার নাম হরব ইবনে উমাইয়া। তিনি ওটা আসলাম ইবনে সদরার কাছে থেকে শিখেছিলেন। এ মত সম্ভাব্য সত্যে বাস্তব এবং তাদের সেই মত অপেক্ষা নিকটবর্তী, যারা বলেন যে, তারা এটা ইরাকবাসী ইয়াদদের কাছে থেকে শিক্ষা করেছিলেন। ইয়াদীদের এক কবি বলেন—

তারাই সেই জাতি, যাদের অধীনে ইরাকের প্রাঙ্গণ বিদ্যমান, যখন
তারা একত্রে ভ্রমণ করে; কলম ও লিপিও তাদের আয়ত্তাধীন।

এ ধারণা একান্তই অসম্ভব। কারণ ইয়াদরা যদিও ইরাকের ভূমি অধিকার করেছিল, তবুও তারা সর্বদা যাযাবরী জীবনবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। অথচ লিপি-শিল্প নিশ্চিতভাবে নাগরিক জীবনের শিল্পকলা। কবির এ উক্তির একমাত্র অর্থ এটাই যে, তারা অন্যান্য আরব বেদুইনদের অপেক্ষা লিপি ও কলমের বেশি নিকটবর্তী ছিল। কারণ তারা শহর-নগর ও এর সন্নিহিত অঞ্চলগুলোর সাথে জড়িত ছিল। অন্যদিকে যে মতানুসারে বলা হয় যে, হেজাজবাসীরা এ শিল্পকে হিরা থেকে এবং হিরাবাসীরা তুব্বা রাজন্যবর্গের কাছে থেকে শিক্ষা করেছিল, তা সব মতের মধ্যে অধিকতম সাজুয্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

আমি ইবনে আব্বারের 'তাকমেরা' গ্রন্থে ইবনে ফর্‌রুখ আল কায়রোয়ানী আল কাসী আল আন্দালুসীর[২৯] প্রশংসায় দেখেছি। ইনি ইমাম মালেকের সহচর ছিলেন এবং তার নাম আবদুল্লাহ্ ইবনে ফর্‌রুখ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ ইবনে আনউম।[৩০] ইনি তার পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করছেন, তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে বললাম, হে কোরায়েশ বংশীয়রা! আমাকে এ আরবি লিপি সম্পর্কে সংবাদ দাও। তোমরা কি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে এ লিপি ব্যবহার করতে? এর যা একত্র করে লেখার, তা একত্র করে লিখতে এবং যা পৃথক করে লেখার, তা পৃথক করে লিখতে? যেমন আলিফ, লাম, মিম, নুন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বললাম, তোমরা কার কাছে থেকে ওটা গ্রহণ করেছিলে? তিনি বললেন, হরব ইবনে উমাইয়ার কাছে থেকে। বললাম, হরব কার কাছে থেকে গ্রহণ করেছিল? বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে জদআনের কাছ থেকে। বললাম, আবদুল্লাহ্ ইবনে জদআন কার কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল? বললেন, আনবারবাসীদের কাছে থেকে। বললাম, আনবারবাসীরা কার কাছে থেকে গ্রহণ করেছিল? বললেন, তাদের মধ্যে এক ইয়ামেনবাসী নবাগতের কাছে থেকে। বললাম, সেই নবাগত কার কাছে থেকে গ্রহণ করেছিল? বললেন, খলজান ইবনে কাসেমের কাছে থেকে; যিনি হুদ নবীর ওহী লিখে রাখতেন এবং তিনি বলতেন,

তোমরা কি প্রতি বছর একটি করে প্রথার জন্ম দান কর
এবং একটি মত, যা বিভিন্ন ধারায় ব্যাখ্যা করা হয়?
সে জীবন অপেক্ষা মৃত্যু অনেক ভাল, যার জন্য গালি দেয়
জুরহুম; যাদেরকে তাদের গালি দিতে পারে এবং হিময়ার।

২৯. জীবনকাল, ১১৫-১৭৫ (৭৩৪-৭৯২ খ্রিঃ) হিঃ।
৩০. জীবনকাল, ৭৪/৭৫-১৫৬/১৬১ (৬৯৩/৯৫-৭৭২/৭৮ খ্রিঃ) হিঃ।

ইবনে আব্বারের 'তাকামেলা' গ্রন্থের উদ্ধৃতি এখানেই শেষ। তার শেষের দিকে তিনি আরও বলেছেন। এ বক্তব্যগুলো আমার কাছে আবু বকর ইবনে আবু হুমায়রা, আবু বাহর ইবনেল আস,[৩১] আবুল ওলীদ ওয়াক্শী,[৩২] আবু উমর তিলমেনাকী,[৩৩] ইবনে আবু আবদুল্লাহ্ ইবনে মুফরেহের শ্রুতি পরম্পরায় বর্ণিত গ্রন্থে এবং তাঁর হস্তাক্ষরে যথাক্রমে আবু সাইদ ইবনে ইউনুস,[৩৪] মুহম্মদ ইবনে মুসা হয় না। সুতরাং শহর-নগরে রোগ-শোকের প্রাদুর্ভাবের অনুপাতেই তারা এ চিকিৎসাশিল্পের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে।

কিন্তু প্রান্তরবাসীদের কথা বলতে গেলে, তাদের খাদ্য সাধারণভাবে স্বল্প। শস্যের অভাবে তাদের ওপর ক্ষুধারই প্রাধান্য বিরাজমান, এমন কি ওটাই তাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। অনেক সময় এ অভ্যাসের স্থায়িত্ব দেখে মনে হয়, ওটা যেন তাদের সহজাত প্রকৃতি। এর পর মসলাপাতি তাদের কাছে অতি সামান্য অথবা নেই বললেই হয়। বিচিত্র মসলা ও ফল-মূল দিয়ে রন্ধনের প্রক্রিয়া নাগরিক জীবনের বিলাস-ব্যসনের অন্তর্গত; তারা অনুরূপ বিলাসের ধারে-কাছেও অবস্থান করে না। সুতরাং তারা তাদের খাদ্য সামগ্রীকে অবিমিশ্রভাবে গ্রহণ করে এবং যা দিয়ে তার মধ্যে মিশ্রণের সৃষ্টি হতে পারে, তা থেকে দূরে থাকে। দেহের পক্ষে তাদের এ খাদ্য খুবই সহজপাচ্য হয়ে দেখা দেয়। তাদের পরিবেশের আবহাওয়াও দূষিত হয় না। তারা স্থায়ী বাসিন্দা হলেও অনধিক দূষিত পদার্থ ও দুর্গন্ধের জন্য এবং যাযাবরী বৃত্তিতে অভ্যস্ত হলে বিচিত্র বায়ুর স্পর্শে তারা মুক্ত পরিবেশে বাস করে।

ব্যায়াম বলতে যা বোঝায় তা চূড়ান্তভাবে তাদের মধ্যে বিদ্যমান। তাদের অশ্বারোহণ, শিকার করা, কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে অগ্রসর হওয়া বা নিজের পরিশ্রমের দ্বারা নিজের অভাব পূরণ করার মধ্যে এর প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। সুতরাং এসব কাজে তাদের পরিপাকশক্তি সতেজ ও সুস্থ থাকে এবং এক খাদ্যের ওপরে অন্য খাদ্য গ্রহণের কোন সুযোগই তারা পায় না। কাজেই তাদের দৈহিক গড়ন বেশি সুস্থ এবং তারা রোগাক্রান্ত হওয়ার কবল থেকে দূরে থাকে। এজন্যই তারা চিকিৎসাশিল্পের খুব একটা প্রয়োজন অনুভব করে না। সম্ভবত এ কারণেই আমরা প্রান্তরীয় জীবনে কোন চিকিৎসককে দেখতে পাই না। তাদের প্রয়োজন নেই বলেই এরূপ হয়েছে। নয়তো তাদের প্রয়োজন থাকলে অবশ্যই দেখা যেত। কারণ তাদের প্রয়োজন চিকিৎসকের জন্য জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হত এবং তিনি সেখানে বসবাস করতে বাধ্য হতেন। এটাই আল্লাহর প্রথা যা তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে গেছে এবং তোমরা তাঁর প্রথার মধ্যে কখনই কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারবে না।[২৮]

---

৩১. সুফিয়ান, ৪৪০-৫২০ (১০৪৯-১১২৬ খ্রিঃ) হিঃ।
৩২. হিশাম ইবনে আহমদ, মৃত্যু ৪৮৯ (১০৯৬ খ্রিঃ) হিঃ।
৩৩. আহমদ ইবনে মহম্মদ, ৩৪০-৪২৯ (৯৫২-১০৬৮) হিঃ।
৩৪. বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবদুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে ইউনুস, ২৮১-৩৪৭ (৮৯৫-৯৫৮ খ্রিঃ) হিঃ।
২৮. কোরান, ৩৩, ৬২; ৩৫, ৪৩; ৪৮, ২৩।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[লিপিকর্ম ও গ্রন্থাদি রচনাও মানবিক শিল্পকলার অন্তর্ভুক্ত]

এটা কতগুলো রেখা ও বর্ণপ্রতীক, যা মনোভাবের শ্রুত শব্দাবলিকে বুঝিয়ে থাকে। আভিধানিক ব্যঞ্জনায় এটা দ্বিতীয় স্তরে অবস্থিত। কারণ রচনা এমন মহান শিল্পকর্ম, যা দিয়ে মানুষ ও অন্যান্য পশুর মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এটা মানুষের অন্তরস্থিত মানোভাবকে প্রকাশ করে এবং ওটা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্যাবলিকে দূরদূরান্তে প্রচারিত করে। এর ফলে অনেক প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা হয় এবং সাক্ষাৎ দর্শনের কষ্ট দূরীভূত হয়। এটা পূর্ববর্তীদের গ্রন্থাদির জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তত্ত্বকথার সংবাদ দেয় এবং তাঁরা যা কিছু জ্ঞান ইতিহাসের ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তার সংবাদ এনে পৌঁছায়। এসব কারণ ও উপকারিতার জন্যই এটা একটি মহান শিল্পকর্ম।

এ শিল্পকর্মের সম্ভাবনা মানুষের মধ্যে শিক্ষার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়। জনবসতি ও সভ্যতার ক্রমানুপাতে তাদের পরিপূর্ণতা বিধায়ক চরিত্রের ঔৎসুক্য ও চাহিদায় এটা বিকশিত হয়। এজন্যই নগরজীবনে লিপির সৌন্দর্য বেশি বিকশিত হয়ে থাকে; কেননা এটাও তার সামগ্রিক শিল্পকর্মের অন্তর্ভুক্ত। আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, এ শিল্পকর্মই নগরজীবনের স্বরূপ এবং ওটাই এর জনসমাজের অনিবার্য ফলশ্রুতি। এ কারণেই আমরা অধিকাংশ প্রান্তরবাসীকে দেখতে পাই, তারা লিখতে ও পড়তে জানে না। তাদের মধ্যে যারা লিখতে পড়তে জানে, তাদের লিপি ও পাঠ ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে। যে সব নগরী জনসংখ্যায় সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তাদের মধ্যে লিপি-পদ্ধতির অতিশয় সুন্দর ও চরম বিকাশ লক্ষ করে থাকি। এটি শিল্পকর্ম হিসেবে অনুসৃত হবার ফলেই তাদের কাছে সহজ হয়ে উঠেছে। যেমন বর্তমানকালে মিশরের কথা আমরা শুনতে পাই। সেখানে শিক্ষকগণ লিপি-শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে তাঁরা প্রতিটি বর্ণের আকৃতি সম্পর্কে নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তদুপরি তাঁরা তা লেখার ব্যাপারে হাতে-কলমে শিক্ষার্থীদেরকে সাহায্য করেন। এর ফলে তাঁদের কাছে শিক্ষার মর্যাদা বেড়েছে এবং শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ ঔৎসুক্য দেখা গেছে। সুতরাং তাঁদের ব্যবস্থায় এর শক্তি পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে।

এর অনুরূপ শিল্পকর্ম ও তার প্রাচুর্য দেখা দেবার পশ্চাতে জনবসতির আধিক্য এবং শ্রমের ব্যাপক বিন্যাস বিদ্যমান। আন্দালুস ও মাগরিবে লিপি-শিল্পের ইবনে নুমান, ইয়াহিয়া ইবনে মুহম্মদ ইবনে হাশিশ ইবনে উমর ইবনে আইউব আল মাগাফেরী

তিউনিসী, বাহলুল ইবনে উবাইদা আল হামী, আবদুল্লাহ্ ইবনে ফররুখ থেকে বর্ণিত অবস্থায় উপস্থিত করেছেন। শেষ।

হিমিয়ারদের বিশিষ্ট একটি লিপি ছিল, একে 'মুসনাদ' বলা হত। এর বর্ণগুলো ছিল পৃথক পৃথক এবং তারা এটা তাদের অনুমতি ছাড়া কাউকেই লিখতে দিত না। হিমিয়ারদের কাছ থেকেই মুজার আরবি লিপির শিক্ষা গ্রহণ করে; কিন্তু প্রান্তরীয় জীবনবোধের প্রাধান্যের জন্য তারা এতে দক্ষতার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়নি। এ কারণেই তাদের লিপিতে শিল্প-নৈপুণ্যের প্রকাশ দেখা যায় না। সুতরাং তাদের প্রচেষ্টা কোন দৃঢ় ভিত্তির সৃষ্টি করতে পারে নি এবং এতে স্থিরতা ও সৌন্দর্যের পরিচয়ও প্রস্ফুটিত হয়নি। কারণ প্রান্তরীয় জীবনবোধের সাথে শিল্পচর্চার অসঙ্গতি এবং তার প্রতি সাধারণ চাহিদার অভাব বিদ্যমান। এজন্যই আরবের লিপিচর্চা প্রান্তরীয় জীবনবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং বলতে গেলে তা বর্তমানকালে তাদের লিপিশিল্প বা তার নিকটবর্তী কোন এক পর্যায়ে ছিল। বরং যথার্থভাবে বলতে গেলে বর্তমানকালে তাদের লিপিশিল্প হিসেবে বেশি উৎকর্ষের দাবিদার। কারণ তারা অধিকতরভাবে নাগরিক জীবনের সন্নিহিত এবং বিভিন্ন নগর ও সাম্রাজ্যের সংশ্রবে এসেছে।

কিন্তু মুজারের প্রান্তরীয় জীবনধারা ইয়ামেনবাসী, ইরাকবাসী, সিরিয়াবাসী ও মিশরবাসীদের অপেক্ষা বেশি গভীর এবং নাগরিকত্ব হতে দূরতর পর্যায়ে অবস্থিত ছিল। এ কারণে ইসলামের প্রথম দিকে আরবিলিপি স্থায়িত্ব, স্থিরতা ও উৎকর্ষের কোন চরম পর্যায়েই উপনীত হতে পারেনি; এমন কি তা মধ্যম স্তরেও অবস্থান করেনি। এর একমাত্র কারণ আরব-বেদুইনদের প্রান্তরীয় জীবন ও বন্যতা এবং শিল্পকলা সম্পর্কে স্বাভাবিক উদাসীনতা।

পাঠক, এ কারণে সাহাবীদের দ্বারা লিপিকৃত কোরানে তাদের হস্তাক্ষর যে অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল, তার প্রতি লক্ষ করুন। তা উৎকর্ষের দিক থেকে মোটেই সুবিন্যস্ত ছিল না। সুতরাং লিপিশিল্পের বিশেষজ্ঞরা অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পোচিত বর্ণাদির রেখাবিন্যাসের অভাবের বিরোধিতা করেছেন। তারপর পূর্বসূরি তাবেয়ীগণ হযরত মুহম্মদ (স)-এর সহচরবৃন্দ যে হস্তাক্ষরে কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন, তাকে পুণ্যের নিদর্শন হিসেবে অনুসরণ করেছেন। কারণ সাহাবীরা তাঁর পরে মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী এবং আল্লাহ্‌র গ্রন্থ সম্পর্কীয় ওহী ও বক্তব্যের প্রথম শ্রোতা ছিলেন। যেমন বর্তমানকালে অনেকেই কোন ধর্মগুরু বা বিজ্ঞ আলেমের হস্তাক্ষর পুণ্যার্থে অনুসরণ করে; ওটা শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হওয়াতে এক্ষেত্রে কোন ইতর-বিশেষ হয় না। কিন্তু এর সাথে কি সাহাবীদের হস্তাক্ষরের প্রতি অনুরূপ ব্যবহারের তুলনা করা যায়? অথচ কার্যত তাই হয়েছে এবং তা অনুসৃত হয়ে একটি লিপিধারার সৃষ্টি করেছে। বিশেষজ্ঞরা যথাস্থানে এ ব্যাপারে যথার্থ লিপিবিন্যাস সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন।

পাঠক, এখানে কখনই সেসব উদাসীন লোকের বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না, যারা বলে যে, সাহাবীরা লিপিশিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। লিপিশিল্পের মৌল রেখাবিন্যাসের সাথে তাঁদের হস্তাক্ষরের অসামঞ্জস্য সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করা হয়; তা ঠিক নয়; বরং তার প্রতিটি ব্যতিক্রমেই কার্যকারণ বিদ্যমান। এ কারণেই তারা

বলে, যেমন 'লাআযবাহান্নাহু'[৩৫] (আমি তাকে অবশ্য জবাই করে ফেলব) বাক্যের প্রথমে 'লা' শব্দে যে অতিরিক্ত 'আলেফ'টি সংযোজিত রয়েছে, তার উদ্দেশ্য হল, এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া যে, ক্রিয়াটি বাস্তবায়িত হয়নি। অনুরূপভাবে 'বে আয়দি' (তাঁর হাতে) বাক্যাংশের মধ্যে একটি অতিরিক্ত 'ইয়া' সংযোজনের উদ্দেশ্য হল ঐশী শক্তির পূর্ণতা সম্বন্ধে অবহিত করা। এমন আরও উদাহরণ বিদ্যমান। বস্তুত এগুলো সম্পর্কে তাদের বক্তব্য আপ্তবাক্য ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ ধারণাই তাদেরকে এরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে যে, এর মাধ্যমে তারা সাহাবীদেরকে তাঁদের হস্তাক্ষরজনিত ত্রুটির অক্ষমতা থেকে মুক্ত করতে পারবে। এ সঙ্গে তারা হস্তাক্ষরের ত্রুটিহীনতাকেও একটি মহৎ গুণ বলে ধারণা করেছে। সুতরাং তারা সাহাবীদেরকে উক্ত ত্রুটি থেকে মুক্তি দিতে সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং তাঁদের প্রতি হস্তাক্ষরের উৎকর্ষের অধিকার আরোপ করেছে। তাঁদের হস্তাক্ষর যে যে স্থানে উৎকর্ষের বিরোধী হয়েছে, সে জন্য কার্যকারণ বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন অথচ এটি আদৌ ঠিক নয়।

পাঠক, জেনে রাখুন, হস্তাক্ষর তাঁদের জন্য কোন বিশেষ গুণ নয়। কারণ এটা নাগরিক জীবনের অনুষঙ্গী সর্বপ্রকার শিল্পকর্মের অন্তর্গত একটি শিল্পমাত্র; যেমন আপনি ইতিপূর্বে তার বিবরণ অবগত হয়েছেন। বস্তুত শিল্পকর্মে নৈপুণ্য সর্বদাই আপেক্ষিক। কোন সময়েই তা স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন বিষয় নয়। এজন্যই এর ত্রুটি কোন প্রকারের ধর্ম ও চরিত্রের ত্রুটি বলে পরিগণিত হতে পারে না। বরং এই ত্রুটি জীবন-যাপন প্রণালীর সাথে সংশ্লিষ্ট হবে এবং এ পর্যায়ে সভ্যতা ও তা দিয়ে মানুষের মনোভাব প্রকাশে এর ব্যবহার দ্বারা এর অবস্থা স্থিরীকৃত হবে।

হযরত মুহম্মদ (স) নিরক্ষর ছিলেন। এটা তাঁর জন্য একটি মহৎ গুণ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। কারণ তাঁর মর্যাদার স্বরূপ ভিন্ন। তিনি সভ্যতা ও জীবিকার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত সর্বপ্রকার শ্রমনির্ভর শিল্পকলা থেকে মুক্ত এবং তার উর্ধ্বে ছিলেন। কিন্তু নিরক্ষরতা আমাদের জন্য কোন মহৎ গুণ নয়। কারণ তিনি যে ক্ষেত্রে সর্বত্যাগী হয়ে তাঁর প্রভুর নৈকট্যপ্রয়াসী, সেক্ষেত্রে আমরা এ সবাইকে আঁকড়ে ধরে জীবন-যাপনে তৎপর। সব শিল্পকলারই এ অবস্থা; এমন কি পরিভাষাসর্বস্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। সুতরাং তাঁর জন্য এসব সাংসারিক উপকরণ থেকে মুক্তিই একটি মহৎ গুণ; কিন্তু আমাদের অবস্থা তদ্রূপ নয়।

অতঃপর যখন আরবদের মধ্যে রাজশক্তির আবির্ভাব ঘটল তখন তারা বহু নগর অধিকার করল এবং বিভিন্ন দেশের ওপর তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হল। তারা কুফা ও বসরায় এসে নাগরিক হয়ে বসল। সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে রচনাশক্তি ব্যবহারের উপলক্ষ আসল এবং লিপির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠল। তারা এর শিল্প-নৈপুণ্যকে অনুসন্ধান করে শিখে নিলে এবং তার ব্যবহারে পারদর্শী হতে লাগল। এর ফলে লিপিশিল্পে উৎকর্ষের ভাব দেখা দিল এবং তা স্থায়ী হয়ে উঠল। কুফা ও বসরায় চর্চা একটি বিশেষ নির্ভরযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছলেও তা চরম পর্যায় নয়। তবুও কুফার লিপি বর্তমান যুগে একটি সুপরিচিত বর্ণবিন্যাস প্রণালী।

---

৩৫. এটি ও এর পরবর্তী বাক্যাংশটি যথাক্রমে কোরান, ২৭, ২১ এবং ১৫, ৪৭ হতে উদ্ধৃত।

অতঃপর আরবরা দিকে দিকে ও দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ল। তারা আফ্রিকিয়া ও আন্দালুস জয় করল। বনি আব্বাস বাগদাদের ভিত্তি স্থাপন করে তাতে লিপিশিল্পের চরম বিকাশ ঘটাল। কারণ তাতে জনবসতির প্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল এবং এসঙ্গে তা ইসলাম ও আরবি সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। বাগদাদী লিপির ধারা অনেকাংশে কুফী লিপিকে অতিক্রম করে বেড়ে উঠল। অবশ্য উৎকর্ষ, সৌন্দর্য ও শোভন প্রকাশের ধারা অনুসরণ করেই এ ব্যতিক্রমের সৃষ্টি হয়েছিল। বিভিন্ন শহর-নগরে এ বিরোধিতার প্রভাব বিস্তৃত হয়ে স্থায়ী রূপ ধারণ করল। এ অবস্থায় বাগদাদে উক্ত লিপির ধরন উজির আলী ইবনে মুকলা[৩৬] দৃঢ় হস্তে ধারণ করলেন এবং তাঁকে অনুসরণ করলেন 'ইবনে বাওয়াব' নামে পরিচিত বিখ্যাত লেখক আলী ইবনে হেলাল[৩৭]। তাঁরই ধারায় তৃতীয় শতাব্দী ও তার পরবর্তীকালে লিপিশিল্পে শিক্ষাদানের ব্যাপারে একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছল। এস্থানে বাগদাদী লিপি গড়ন ও বিন্যাস রীতিতে কুফী লিপি থেকে অনেক দূরে সরে গেল; ফলে তাদের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

এর পরও পার্থক্যের ধারা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যুগ পরম্পরায় গৃহীত বিভিন্ন বিন্যাস ও গঠনের মাধ্যমে বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ওটা এসে ইয়াকুত[৩৮] ও আলওলী আলী আজমীর[৩৯] ন্যায় উত্তরসূরিদের কাছে শেষ হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তাঁদের অনুসৃত ধারাই একটা পর্যায়ের সৃষ্টি করেছে।

অতঃপর এটা মিশরে স্থানান্তরিত হয়ে কতকাংশে ইরাকি ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং অনারবরা এ শিল্পকে মিশরেই পরিবর্ধিত করে শিক্ষার ধারা অব্যাহত রেখেছে। সুতরাং মিশরি লিপির জন্য পার্থক্যের ধারা সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য আফ্রিকি লিপি তার প্রাচীন রেখাবিন্যাসের ধারা অব্যাহত রাখার ফলে বর্তমানে পূর্বাঞ্চলীয় গঠন-সৌকর্যের খুব নিকটবর্তী রয়ে গেছে। আন্দালুসের রাজশক্তি উমাইয়াদের দ্বারা পৃথক হয়ে গড়ে ওঠার ফলে তারা নাগরিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে সংস্কৃতি শিল্পকলা ও লিপিতে পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। বর্তমানকালে সে পার্থক্যই আন্দালুসী রীতি হিসেবে সুপরিচিত হয়ে রয়েছে।

এভাবে বিভিন্ন দিকে ইসলামী সাম্রজ্যগুলোতে সভ্যতার বান ডেকেছিল এবং এক সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্য বিস্তৃত ও তাদের বাজার তেজী ভাব ধারণ করেছিল। এর ফলে গ্রন্থ রচনার ধারা বৃদ্ধি পেয়ে প্রচুর গ্রন্থাদি ও তাদের গ্রন্থনশিল্পে সৌষ্ঠবের সৃষ্টি হয়েছিল। এগুলোর দ্বারা প্রাসাদ ও রাজকীয় আগার এমনভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, যার তুলনা সম্ভব নয়। দিকে দিকে মানুষের প্রচেষ্টা ও প্রতিযোগিতাও এক্ষেত্রে দর্শনীয় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

অতঃপর ইসলামী সম্রাজ্যের বিন্যাস শিথিল হয়ে এলে তার শক্তির হ্রাস প্রাপ্তির সাথে এ সব বিষয়ই সংকুচিত হয়ে পড়ল। বাগদাদের খেলাফতের পতনে সেখানকার

---

৩৬. মুহম্মদ ইবনে আলী; ২৭২-৩২৮ (৮৮৬-৯৪০ খ্রিঃ) হিঃ।
৩৭. মৃত্যু ৪১৩ (১০২২ খ্রিঃ) হিঃ।
৩৮. আল মুস্তাসিমী; মৃত্যু ৬৯৮ (১২৯৯ খ্রিঃ) হিঃ।
৩৯. প্রকৃত নাম আবুল হাসান আলী ইবনে জেদ্দী।

শিক্ষাগারগুলো উজাড় হয়ে উঠল এবং লিপি ও রচনার বিদ্যা; বরং বলতে গেলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব ধারা মিশর ও কায়রোতে স্থানান্তরিত হল। বর্তমানকালেও সেখানে তাদের বাজার সরগরম দেখতে পাচ্ছি। লিপি সংক্রান্ত বিষয়ে যেখানে এমন শিক্ষক আছেন, যারা শিক্ষার্থীদেরকে প্রতিটি বর্ণের রেখাবিন্যাস ও গঠনসহ হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তাদের গড়নও তাদের কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সুতরাং শিক্ষার্থীর পক্ষে তাদের গড়নসহ রেখাবিন্যাস শিখে নিতে খুব বেগ পেতে হয় না। তারা তাদের সৌন্দর্য, বিচিত্র ভঙ্গি ও লিখন পদ্ধতিসহ অতিসত্বর দক্ষতা অর্জন করে এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের রীতি-নীতি সম্পর্কে অবহিত হয়। এভাবে সেখানে শিক্ষার একটি উত্তম ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।

আন্দালুসবাসীরা আরবি সাম্রাজ্যের পতন এবং তার পরবর্তী বারবারদের আধিপত্য শিথিল হয়ে পড়ায় নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষভাবে তাদের ওপর খ্রিস্টান জাতিগুলোর আধিপত্য বিস্তৃত হলে তারা মাগরিব ও আফ্রিকিয়ার সমুদ্র তীরে চলে আসে। লামতুনা সাম্রাজ্যের সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে এসব অঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের শিল্পকলার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে এবং তারাও বিভিন্ন সাম্রাজ্যের আশ্রয়ে এই প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এর ফলে তাদের লিপি আফ্রিকিয়ার লিপির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হয় এবং তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কায়রোয়ান ও মাহদিয়া নগরের সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বিস্তৃতির সঙ্গে তাদের লিপিও বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল। সুতরাং তিউনিসকে কেন্দ্র করে এর সন্নিহিত সব আফ্রিকিয়ায় আন্দালুসী-লিপিই প্রাধান্য বিস্তার করল। কারণ পূর্ব-আন্দালুস হতে নির্বাসিত জনসমষ্টির অধিকাংশই এসব অঞ্চলে বসবাস করছিল। তাদের প্রাচুর্যই এ প্রভাবকে অনিবার্য করে তুলল। শুধু জারিদ অঞ্চলে একটি নিজস্ব রীতি বর্তমান ছিল। কারণ তারা আন্দালুসী লিপিকরদের সাথে মিলিত হয়নি এবং তাদের সাহচর্যের প্রভাব গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি। কেননা তারা দলে দলে রাজধানী তিউনিসকে লক্ষ্য করেই ছুটে আসত এবং সেখানেই বসবাস করত।

এভাবে আফ্রিকিয়াবাসীদের মধ্যে আন্দোলুসীলিপির একটি শোভন সংস্করণ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এর পর আল মোহেদ সাম্রাজ্যের ছত্রছায়া কতকাংশে খণ্ডিত হয়ে পড়লে এবং জনবসতির হ্রাসপ্রাপ্তিতে নগরসংস্কৃতি ও বিলাস-ব্যসনে ভাঁটা দেখা দিলে লিপির অবস্থাও শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায় ও তার চর্চা কমে যায়। জনবসতির ওপর নির্ভরশীল এর শিক্ষা ব্যবস্থাও চাহিদার অভাবে ভেঙ্গে পড়ে। শুধু সেখানে আন্দালুসী লিপির একটি নিদর্শন বিদ্যমান, যা সাক্ষ্য দেয় যে, এক সময়ে সেখানে এর অপ্রতিহত প্রভাব বর্তমান ছিল। যেমন আমরা পূর্বে বলেছি নাগরিক জীবনে কোন শিল্পকর্ম স্থায়ী হয়ে উঠলে তার নিশ্চিহ্ন হওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার।

এর পর দূরতম মাগরিবে বনি মারিন সাম্রাজ্য আন্দালুসী লিপির একটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ, তারা এর নিকটবর্তী ছিল এবং আন্দালুসীরাও তাদের নিকটবর্তী ফেজে এসে বসবাস করছিল। তদুপরি বনি মারিন তাদেরকে তাদের সাম্রাজ্যের সর্বকাল ধরে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু এর পরে সাম্রাজ্য ও রাজধানীর বাইরে

অন্যান্য অঞ্চলে লিপির ধারা সম্পূর্ণ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল; যেন কখনও এর অস্তিত্বই ছিল না। এর ফলে আফ্রিকিয়া ও দুই মাগরিবের অন্যান্য অঞ্চলের লিপিকর্ম উৎকর্ষ হারিয়ে ক্রমশ ত্রুটিপূর্ণ হয়ে উঠল। এ কারণে সেখানকার লিপিতে কোন পুস্তকের অনুলিপি প্রস্তুত করলে এর দ্বারা পাঠকের কষ্ট ও সময় নষ্ট ছাড়া অন্য কোন লাভ হয় না। কারণ লিপির অবস্থা বিকৃতি, পরিবর্তন ও আকৃতিগত বিচ্যুতির মাধ্যমে এখন শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, বহু পরিশ্রমের পরই তার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়। নাগরিকত্বের হ্রাস ও সাম্রাজ্যের বিনাশের ফলে অন্যান্য শিল্পকর্মের ভাগ্যে যা ঘটে থকে, এখানেও তাই ঘটেছে। আল্লাহ্ নির্দেশ দেন এবং তাঁর নির্দেশ অমান্যকারী কেউ নেই।[৪০]

উস্তাদ আবুল হাসান আলী ইবনে হেলাল, যিনি বাগদাদের প্রসিদ্ধ লিপিশাস্ত্রবিদ ইবনে বাওয়াব[৪১] নামে পরিচিত, 'বাসিত' ছন্দে 'রে' বর্ণের অন্ত্যমিলে তাঁর একটি পদ্য বিদ্যমান; তাতে তিনি লিপিশিল্প সম্পর্কে যা কিছু জ্ঞাতব্য তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। আমি বর্তমান গ্রন্থের এ পরিচ্ছেদে একে উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছি; যাতে যারা উক্ত শিল্প সম্পর্কে অবগত হতে চান, তারা উপকৃত হতে পারেন। পদ্যটির আরম্ভ নিম্নরূপ :

হে শিক্ষার্থী, তুমি যদি লিপিশিল্পে উৎকর্ষ সাধন করতে চাও;
তোমার যদি ইচ্ছা থাকে সুন্দর হস্তাক্ষর ও সুন্দর অঙ্কনের
যতি সত্যই লিখনশাস্ত্রে তোমার দৃঢ় ইচ্ছা আন্তরিক হয়,
তা হলে তোমার সহায়কের কাছে সহজ পদ্ধতির আকাঙ্ক্ষা কর।
কলম তৈরির জন্য সরল খাগড়া সংগ্রহ কর,
তা যেন শক্ত হয় এবং শিল্পকর্মে দক্ষতা অর্জনের সহায়ক হয়।
অতঃপর তুমি তাতে নিব্ সংযুক্ত করতে চাইলে, সূক্ষ্ম কর
এমন ধারণা অনুসারে, যা সার্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
তার উভয় দিকে লক্ষ কর; তারপর তার নিব্
এমন একটি দিকে প্রস্তুত কর, যা সূক্ষ্ম ও সঙ্কীর্ণ।
কলমের নিবের দিকটিকে একটি সুষম আকৃতি দাও,
যা লম্বাও না হয়, আবার খাটও না হয়।
তার মাঝখানে এমনভাবে ফাঁড়, যাতে তার কর্তনটি
উভয় দিক থেকে সমান আকৃতিতে বিরাজ করে।
অতঃপর তুমি যখন এসব কিছু যথাযথ পালন করলে
এবং বুঝতে পারলে যে, তোমার সব প্রচেষ্টা সফল হয়েছে।
আমি এর সব রহস্য খুলে ধরব, এমন লোভ করো না;
বরং আমি তো তার গুপ্ত রহস্যের কিছুটা অবশিষ্টই রাখতে চাই।
কিন্তু আমি যা কিছু বলতে চাই, তার নির্গলিতার্থ হল,
তার আকৃতি চতুষ্কোণ ও গোলাকারের মধ্যবর্তী হবে।
তোমার দোয়াতকে ঝুল দিয়ে পূর্ণ করে শিকা মিশাও
এবং অম্লফলের নির্যাস দিয়ে খুব ভাল করে নাড়।

---

৪০. কোরান, ১৩, ৪১।
৪১. ৩৭ নং টীকা দ্রঃ।

তার সাথে মিশাও রঙ্গীন উপাদান, যা মিশ্রিত করা
হয়েছে হরিতাল ও কর্পূরের সাথে।
অতঃপর তার মিশ্রণ ভাল করে প্রস্তুত হলে অনুসন্ধান কর
পরিষ্কার, উত্তম ও পরীক্ষিত কাগজ।
তাকে পরিমাণ অনুসারে কেটে নিবার পর তাতে চাপ দাও,
যাতে তার অন্তর্গত সব অমসৃণ ও বিরূপ অবস্থা দূরীভূত হয়।
অতঃপর তাতে ধৈর্যের সাথে রেখা অঙ্কন কর;
বস্তুত ধৈর্যশীলের ন্যায় অন্য কারও উদ্দেশ্য সফল হয় না
এর পর একটি কাঠের তক্তার ওপর নিয়ে একান্ত আগ্রহে
তোমার কাজ আরম্ভ কর, তাতে যেন অস্থিরতা না থাকে।
প্রথম অবস্থায় তোমার রেখার অপকর্ষের জন্য
লজ্জিত হইও না; কেননা প্রাথমিক অবস্থা এরূপই হয়।
প্রথমে কঠিন মনে হয়, পরে সহজ হয়ে আসে;
যে-কোন সহজ অভ্যাসের অধিকারী প্রথমে কাঠিন্যের সম্মুখীন হয়।
এভাবে তুমি যখন তোমার উদ্দেশ্যে সফলকাম হবে,
তখন যথার্থই আনন্দ ও দক্ষতার দ্বারা তৃপ্তিলাভ করবে।
আর তখন তোমার উপাস্যের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁর সন্তুষ্টি
কামনা করিও; কেননা প্রভু কৃতজ্ঞের আশা পূর্ণ করেন।
তোমার হাতের প্রতি দৃষ্টি রাখ, তার আঙুল যেন
কল্যাণকে রূপ দেয়, যা তুমি এ মায়াবী জগতে রেখে যাবে।
মানুষের সব কর্মফলের সাক্ষাৎ আগামীতে পাওয়া যাবে
দুর্ভাগ্যের লিপিতে অঙ্কিত এক উন্মুক্ত গ্রন্থ।

পাঠক, জেনে রাখুন, লিপি যেমন কথা ও বক্তব্যের প্রতীক, ঠিক তেমনি কথা ও বক্তব্যও আত্ম ও অন্তরে লুক্কায়িত ভাবের প্রতিধ্বনি। সুতরাং তাদের প্রত্যেকটিই সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জলতা হতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রাঞ্জলতা শিক্ষা দিয়েছেন।[৪২] এটা সর্ব বিষয়ে প্রাঞ্জলতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং লিপিশিল্পের উৎকৃষ্ট অবস্থার অর্থ হল ওটা সুস্পষ্টভাবে উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করবে। এতে প্রতিটি নির্দিষ্ট বর্ণের অবস্থান পৃথক এবং তার গড়ন ও রেখা সুস্পষ্ট সীমার দ্বারা অন্যটি হতে বিশিষ্ট হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে যদি লিপিকররা একই শব্দের বিভিন্ন বর্ণকে পরস্পর সংযুক্ত করার কোন রীতি প্রচলিত করে থাকেন, তা হলে উক্ত প্রচলন অনুসারে তা লিপিবদ্ধ হবে। এক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি অনুসারেই পৃথক বর্ণগুলোর অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। যেমন, কোন শব্দের প্রথমের দিকে 'আলেফ'; অনুরূপভাবে 'রে, 'যে', 'দাল', 'যাল' ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের শেষের দিকে থাকলে এরূপ হবে না। এভাবে শেষ পর্যন্ত অনুসৃত হবে।

অতঃপর পরবর্তী লিপি-বিশারদ্‌রা কিছু সংখ্যক শব্দের পরস্পরের সংযুক্তি এবং কিছু সংখ্যক বর্ণের উহ্য রাখার ধারা প্রচলন করেন। এ রীতি-নীতি তাঁদের কাছে সুপরিচিত এবং যারা তাদের পরিভাষার সাথে পরিচিত, তারা ছাড়া অন্যদের কাছে এগুলো দুর্বোধ্য শব্দের সমষ্টিমাত্র। এসব লিপিকর মূলত শাসন ব্যবস্থার নথি-পত্র এবং

৪২. কোরান; ৫৫, ৩-৪।

কাজীদের বিবরণী লেখক। এজন্যই তারা এককভাবে এসব পরিভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ। তাদের লেখার বিষয় বেশি বলে এরূপ সংক্ষিপ্তির প্রয়োজন দেখা দেয়। তবুও তাদের লিপির খ্যাতি আছে এবং তারা ছাড়া অনেকেই এরূপ পরিভাষার সাথে পরিচিত বলে এটা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং তারা উক্ত পরিভাষাদির সাথে অপরিচিত কোন ব্যক্তির কাছে যখন লিখেন, তখন স্বভাবতই সংক্ষিপ্তির পথ পরিত্যাগ করে যথাসম্ভব স্পষ্ট করে লেখার চেষ্টা করেন। নয়তো ওটা তাদের কাছে অনারব লিপির ন্যায় দুর্বোধ্য বলে মনে হবে। কারণ এ সংকেতিক লিপি এবং অনারব লিপি অপরিচয়ের দরুন উভয়ই সমান দুর্বোধ্য। এক্ষেত্রে অস্পষ্টতার জন্য কোন প্রকার প্রয়োজনের অজুহাত সৃষ্টির অবকাশ নেই। অবশ্য শাসন-ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পদ ও সেনাদলের বিষয়াদির লেখকরা এ অজুহাত তুলতে পারেন। কারণ তাদের অনেক বিষয় মানুষের কাছে গোপন করতে হয়। বস্তুত শাসন-ব্যবস্থায় এমন অনেক বিধি-নিষেধ বিদ্যমান, যা গোপন রাখাই বিধেয়। কাজেই এক্ষেত্রে বিশেষ সাংকেতিক লিপির সাহায্য গ্রহণ করেন এবং এর ফলে বিষয়টি একটি প্রহেলিকায় পরিণত হয়।

এমন সংকেতের ক্ষেত্রে বর্ণ দ্বারা শব্দের কাজ চালানো হয়; সুগন্ধী, ফলমূল পাখি ও ফুলের নামও বর্ণের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় এবং অনেক সময় বর্ণাদির স্বাভাবিক রেখাবিন্যাসকে ভিন্নভাবে তুলে ধরে সংকেতের চাহিদা পূরণ করা হয়। এভাবে কারও কাছে গোপনে কিছু বলার কাজ সম্পন্ন করা হয়। অনেক সময় লেখকরা এরূপ সংকেতে মনের ভাব প্রকাশ করে তা বুঝবার জন্য সংকেত নির্দেশ লিখে দেন। কারণ উক্ত সংকেত পূর্ব থেকে প্রচলিত না থাকলে এরূপ করার প্রয়োজন হয়। এর ফলে তারা এমন কতকগুলো নীতি প্রণয়ন করেন, যার সাহায্যে অনুমান করে উক্ত সংকেতের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়। একে তারা 'রহস্যের চাবিকাঠি' বলে অভিহিত করেন। এসব বিষয় নিয়ে অনেকেই বিচিত্র সংকলনের অধিকারী হয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ্ যথার্থ বিচক্ষণ ও প্রকৃষ্ট জ্ঞানের অধিকারী।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[পুস্তক শিল্প]

প্রাচীনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংকলন ও সরকারি নথি-পত্র ইত্যাদির অনুলিপি, বাঁধাই এবং বর্ণনার ধারা ও শৃঙ্খলাবোধের দ্বারা সংশোধনের প্রতি সব প্রচেষ্টা নিয়োজিত ছিল। এর কারণ হিসেবে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও নাগরিক জীবনের অনুষঙ্গী বিষয়াদির কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু বর্তমানকালে সাম্রাজ্যের পতন ও জনবসতির হ্রাসপ্রাপ্তির ফলে এগুলোর অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে।

অথচ ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ইরাক ও আন্দালুসে এক সময়ে এসব বিষয়ের সাগর উথলিয়ে উঠেছিল। বস্তুত এ সবই জনবসতির ফসল ও সাম্রাজ্য শক্তির বিন্যাসের অনুষঙ্গী এবং এদুটির কাছে তার ব্যাপক চাহিদার অনুগামী। এর ফলেই সেকালে গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের প্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল। যুগে যুগে ও দিকে দিকে মানুষ এগুলোর অনুলিপি প্রস্তুত করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। এর ফলে গ্রন্থাদির অনুলিপি প্রস্তুত হয়ে বাঁধাই হত। এভাবে পুস্তক-প্রস্তুত শিল্পের আবির্ভাব ঘটে এবং শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তিরা অনুলিপি তৈরি, সংশোধন ও বাঁধাই করার কাজ সম্পন্ন করতেন। এছাড়া পুস্তক সম্পর্কীয় অন্যান্য যাবতীয় কাজ ও সংকলনের দায়িত্বও তাদের উপর ন্যস্ত হত। বিরাট জনবহুল নগরীতেই এসব কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হত।

প্রথমদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পুস্তকাদির অনুলিপি এবং রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় পুস্তিকা, দানপত্র ও ফরমান ইত্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে চামড়া থেকে তৈরি এক প্রকার উপকরণ ব্যবহার করা হত। এতে একদিকে যেমন প্রচুর সুবিধা ছিল, অন্যদিকে তেমনি তখন লেখার সামগ্রীর স্বল্পতা ছিল বলে কাজ চলে যেত। ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রাথমিক এমন অবস্থার কথা আমরা পরে বর্ণনা করব। এর সাথে রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় নির্দেশ ও দলিলপত্রও তখন এত ব্যাপক হয়ে ওঠেনি। ফলে চামড়ার ওপর লেখা বিষয়াদিকে যেমন মর্যাদার চোখে দেখা হত, তেমনি তার বিশুদ্ধতা ও নির্ভরশীলতা সম্পর্কেও প্রশ্নের অবকাশ দেখা দেয়নি।

এর পর গ্রন্থ রচনা ও নথিপত্র সংরক্ষণের বিষয়টি ব্যাপক আকার ধারণ করল এবং রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় নির্দেশ ও দলিলপত্রাদিও বেড়ে উঠল। সুতরাং চামড়ার পক্ষে এ সব বিষয়ের সংরক্ষণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এ সময়ে ফজল ইবনে ইয়াহিয়া কাগজ প্রস্তুত করার বিষয়ে নির্দেশ দিলেন এবং কাগজ প্রস্তুত হলে তাতে রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় নির্দেশ ও দলিলাদি সংরক্ষিত হতে লাগল। সাধারণ লোকও তাদের রচনা কাজ এবং

সরকারি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনুলিপি প্রস্তুতকরণে তা ব্যবহার করতে আরম্ভ করল। এর প্রস্তুতকরণ শিল্প চাহিদা অনুসারে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল।

এর পর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকারীরা এবং রাজশক্তির অধিকারীরা বিভিন্ন বিষয়ের সংকলনগুলোকে বর্ণনা সূত্রের দ্বারা উক্ত বিষয়াদির রচক ও কথকদের সাথে সংযুক্তির মাধ্যমে সংরক্ষণ ও শুদ্ধকরণের দিকে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। কেননা এরূপ সংরক্ষণ ও শুদ্ধীকরণের কাজটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে প্রতিটি বক্তব্য তার বক্তার প্রতি যথার্থভাবে নির্দেশিত এবং প্রতিটি ধর্মীয় বিধান এর প্রবর্তক ও গবেষকের প্রতি যথার্থভাবে আরোপিত হল। সুতরাং যে সংকলনে অনুরূপভাবে সংকলয়িতা কোন সূত্র-প্রমাণ উপস্থিত করে তার প্রামাণ্য নির্দেশ করতে সক্ষম হত না, তার কোন নির্দেশ বা বক্তব্য গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হত না। তখনকার দিনে দেশ-কাল-পাত্র জুড়ে এটাই ছিল জ্ঞানান্বেষী ও জ্ঞানের বাহকদের অবস্থা।

কিন্তু আধুনিক পুস্তক রচনা শিল্পে এ সূত্র-প্রমাণের বিষয়টি পরিত্যাক্ত হয়েছে। কারণ তৎকালে এর সর্বাপেক্ষা বেশি উপযোগিতা ছিল হাদীসের বিভিন্ন অবস্থা,[৪৩] যেমন—শুদ্ধ, শোভন, সংযুক্ত সূত্র, বিক্ষিপ্ত সূত্র, বিচ্ছিন্ন সূত্র, অপেক্ষিত সূত্র ইত্যাদি জেনে নিয়ে মিথ্যা হাদীস থেকে তাদেরকে পৃথক করা। এ বিষয়ে করণীয় সব কিছুই যথাযথ বিচার ও সরাসরি নির্ণয়ের মাধ্যমে হাদীসের মূল সংকলনগুলোতে করা হয়েছে এবং জাতির কাছে তা গৃহীত বলেও গণ্য হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে এ বিষয়ে বেশি কিছু করা অর্থহীন তৎপরতা বলে বিবেচিত হচ্ছে। একমাত্র আধুনিক হাদীস সংকলন এবং ধর্মীয় বিধানের নিমিত্ত রচিত গ্রন্থাদির শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার ছাড়া সূত্র-প্রমাণের অন্য কোন উপকার বর্তমানে নেই। অতীতে অবশ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন সংকলন ও রচনাতেও এ সূত্র-প্রমাণের সাহায্যে রচয়িতার সাথে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হত এবং তাদের কাছ থেকেই যে এসব বিষয় যথাযথ বর্ণিত হয়েছে, তার নিশ্চয়তা বিধান করা হত। পূর্বাঞ্চলে ও আন্দালুসে এ বিষয়টি অতিশয় নিষ্ঠা ও সুস্পষ্টতার সাথে অনুসরণ করা হত। এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, তৎকালে এসব অঞ্চলে অনুলিপিকৃত বিভিন্ন গ্রন্থাদি একান্ত নির্ভরযোগ্য, সুদৃঢ় ও বিশুদ্ধ। তাদের অনুসৃত সেসব নীতি বর্তমানকালের মানুষের দ্বারাও ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে, এসব প্রাচীন নীতি কতটা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের লোক একালেও তাঁদের সেই গ্রন্থাদির অনুলিপি প্রস্তুত করাচ্ছে এবং তাঁদের অনুসৃত নীতির সামনে জোড়হস্ত হয়ে আনুগত্য প্রকাশ করছে।

বর্তমানকালে মাগরিব অঞ্চল ও তার অধিবাসীদের মধ্য থেকে গ্রন্থাদি রচনার ও অনুলিপি প্রস্তুতের এসব প্রথা লোপ পেয়েছে; তাদের মধ্যে সংরক্ষণ লিপিবদ্ধকরণ ও বর্ণনার সে ধারা আর নেই। কারণ জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে আবার প্রান্তরীয় জীবন দেখা দিয়েছে। তারা এখন সেই প্রান্তরীয় লিপির সাহায্যে মূল গ্রন্থ ও সংকলনাদির অনুলিপি প্রস্তুত করে থাকে। মাগরিবের বিদ্যার্থীরা অস্পষ্টতা, বিচ্যুতি ও বিকৃতিতে পরিপূর্ণ

৪৩. এর মূল পরিভাষা যথাক্রমে, সহিত, হাসান, মুসনাদ, মুরসাল, মাকত্, মওকুফ, মউযু ইত্যাদি। ষষ্ঠ অধ্যায়ের, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রঃ।

হস্তাক্ষর দ্বারা দুর্বোধ্য অনুলিপি প্রস্তুত করছে; যে-কোন পাঠকের পক্ষে এগুলোর পাঠোদ্ধার অতিশয় দুরূহ ব্যাপার এবং খুব কম ক্ষেত্রে এগুলো থেকে কোন প্রকার লাভের সম্ভাবনা বিদ্যমান।

এ কারণে ধর্মীয় বিধানাদির ক্ষেত্রেও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিচ্ছে। কেননা এ ব্যাপারে অনুসৃত অনেক বিধানই বিশেষ মজহাবের ইমাম থেকে যথাযথ বর্ণিত হবার প্রমাণবিহীন এবং এগুলো একমাত্র ঐসব সংকলন থেকে 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং'-ভাবে গৃহীত হয়েছে। তদুপরি তাদের অনেক ধর্মীয় নেতা এগুলোর সাথে নিজের রচনাকর্ম মিশিয়ে একটা ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এ শিল্পে তাদের বিচক্ষণতার অভাব এবং তাদের উদ্দেশ্য সম্পূরণের উপযোগী শিল্পজ্ঞানও তাদের আয়ত্তাধীন নয়। আন্দালুসের এ শিল্পের অতি সামান্য চিহ্ন ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাব বিদ্যমান। তাও বিলীন হবার পথে অগ্রসর হচ্ছে। আর মাগরিবে এ জ্ঞানচর্চার ধারা প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তাঁর বিষয়াদিতে সাফল্যের অধিকারী।[৪৪]

বর্তমানে আমরা জানতে পেরেছি যে, সূত্র-প্রমাণসহ বর্ণনার ধারা এখনও পূর্বাঞ্চলে প্রবাহমান রয়েছে। যারা সংকলনাদি শুদ্ধ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য সেখানকার সাহায্য খুবই সহজলভ্য। কারণ সেখানে এখনও জ্ঞানচর্চা ও তৎসংশ্লিষ্ট শিল্পাদির বাজারে তেজীভাব বিদ্যমান; যেমন আমরা পরে এ সম্পর্কে বর্ণনা করব। অবশ্য অনুলিপি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে লিপির যে উৎকর্ষ সেখানে বিদ্যমান, তা অনারবদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে এবং তাদের দ্বারা ব্যবহৃত লিপিতেই। নয়তো মিশরেও অনুলিপির অবস্থা মাগরিবের ন্যায় বিকৃতির অধীন হয়ে পড়েছে; বরং তার চেয়েও শোচনীয়। পবিত্র মহান আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জ্ঞাতা এবং তিনিই একমাত্র সহায়।

---

৪৪. কোরান, ১২, ২১।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[সংগীত শিল্প]

এটা সমিল কবিতার ধ্বনিসমূহকে সুপরিচিত মাত্রাবিন্যাসের অনুপাতে সুরের মধ্যে বিধৃত করার শিল্পবিশেষ। এতে প্রতিটি ধ্বনি তার মাত্রা অনুসারে উচ্চারিত হয়ে একটি সুরের জন্ম দেয় এবং এসব সুর তাল অনুসারে গ্রথিত করে এমন একটি সুসমঞ্জস ঐক্যতানের সৃষ্টি করা হয়, যা শ্রবণেন্দ্রিয়কে মোহিত করে। এ ধ্বনি সমষ্টির পরস্পর সুসংবদ্ধ অবস্থানের মধ্যেই এ মুগ্ধকর আকর্ষণের সৃষ্টি হয়।

এর বর্ণনা এই যে, সংগীতশাস্ত্রে এটা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, ধ্বনিসমূহ পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। বস্তুত যে-কোন ধ্বনি অন্য ধ্বনির অর্ধেক, এক-চতুর্থাংশ, এক-পঞ্চমাংশ ও এক-একাদশাংশ হিসাবে বিচিত্র সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করে শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করার পূর্বে প্রতিটি একক ধ্বনিকে মিশ্র করে তোলে। অবশ্য যে-কোন মিশ্রণই শ্রুতি সুখকর নয়; বরং শ্রুতিমধুর ধ্বনি মিশ্রণের কতগুলো বিশেষ স্বরূপ আছে, যা সংগীতশাস্ত্রবিদ্‌রা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং সে সম্পর্কে আলোচনাও করেছেন। যথাস্থানে তার বর্ণনা পরে আসবে।

কখনও সংগীতের এ সুর লহরীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন বস্তুর শব্দাবলিকেও এর সাথে মিলিত করা হয়। এ উদ্দেশ্যে নির্মিত বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে আঘাত করে অথবা ফুৎকার দিয়ে এ শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে সংগীতের সুর আরও শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে। বর্তমান সময়ে মাগরিবের এ প্রকার—কতিপয় যন্ত্র বিদ্যমান। তার মধ্যে বাঁশী, যাকে 'শাব্বাবা' বলে ডাকা হয়। এটি একটি ফাঁপা নল, যার পাশে কিছু সংখ্যক ছিদ্র থাকে এবং তাতে ফুঁ দিলে শব্দ উত্থিত হয়। উক্ত শব্দ এসব ছিদ্রপথে বের হবার কালে উভয় হাতের আঙুলকে অত্যন্ত সুপরিচিত নিয়মে তার ওপর চেপে ধরে তাকে মাত্রাযুক্ত করা হয়। এর ফলে শব্দাবলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য দেখা দেয় এবং উক্ত সুসমঞ্জস শব্দ-তরঙ্গ সংগীতের সুরের সাথে মিলিত হয়। শ্রবণেন্দ্রিয় তা এই সুসমঞ্জস্যতার জন্যই তাকে প্রিয় মনে করে, যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

এমন বাঁশী জাতীয় অন্য একটি বাদ্যযন্ত্রের নাম 'যুলামী'। তার কাঠের দুই পাশ একত্র করে তৈরি নলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। অবশ্য তা ফাঁপা হলেও গোলাকার নয়; কারণ তা দুটি খোদাই করা খণ্ড একত্র করে প্রস্তুত হয়েছে এবং তাতেও ছিদ্র আছে। তার সাথে সংযুক্ত একটি নলের মধ্য দিয়ে তাতে ফুঁ দিতে হয় এবং তার মধ্য দিয়ে ফুৎকার মূল অংশে প্রবেশ করে তা শব্দের সৃষ্টি করে। শাব্বাবার ন্যায় তাতে ছিদ্রমুখে আঙ্গুল চেপে ধরে শব্দকে মাত্রাযুক্ত করতে হয়।

বর্তমানকালে এ বাঁশীজাতীয় বাদ্যযন্ত্রাদির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম হল 'বুক' (শিঙ্গা)। এটা তামার দ্বারা তৈরি, মধ্য ফাঁপা, বাহু সমান দীর্ঘ এবং এর ফাঁপা অংশটি ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হয়ে হাতের তালুর পরিমাণ গোলাকৃতি হয়ে কলমের নিব্ লাগাবার স্থানের ন্যায় শেষ হয়েছে। তাতে সংযুক্ত একটি ক্ষুদ্র নলে ফুঁ দিলে সে ফুৎকার এর মধ্যে প্রবেশ করে ভারী ও উচ্চ শব্দ উত্থিত করে। তাতেও কতিপয় ছিদ্র রয়েছে এবং আঙুলি স্থাপন করে উক্ত শব্দকে পূর্বানুরূপ তালযুক্ত করা হয়। এর ফলে ধ্বনি-তরঙ্গ শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে।

এসব বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে তার সংযুক্ত বাদ্যযন্ত্র বিদ্যমান। এদের সবগুলোই মধ্য ফাঁপা। এদের আকৃতি হয় গোলকের ন্যায় গোলাকার; যেমন 'বরবাত' ও 'রবাব'; নয়ত চতুষ্কোণ; যেমন 'কানুন'। এদের উপরিভাগে তারগুলোকে এক মাথায় বেঁধে অন্য মাথায় কীলকের সাথে জড়িয়ে দেয়া হয়। কীলকগুলো যন্ত্রের গায়ে সংলগ্ন থাকে এবং প্রয়োজন মত তদেরকে মুচড়ে তারগুলো ঢিলা ও আঁটা করা যায়। তারপর এ তারগুলোতে অন্য কোন কাঠখণ্ড দিয়ে আঘাত করা হয় অথবা একটি ধনুকের ছিলায় তার বেঁধে একে মোম অথবা চর্বি দ্বারা মেজে তা দ্বারা উক্ত তারের ওপর ঘর্ষণ করা হয়। উক্ত তারগুলোর ওপর হাতের চাপ শিথিল করে কিংবা এক তার থেকে অন্য তারে স্থানান্তর করে উত্থিত শব্দাবলির মাত্রা ঠিক করা হয়। এমন বীণজাতীয় তারের সব বাদ্যযন্ত্রে বাম হাত এর অঙ্গুলীগুলো আঘাত ও ঘর্ষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য তারের পাশে উঠা-নামা করে। এর ফলে সুসমঞ্জস্য শ্রুতিমধুর ধ্বনি তরঙ্গ বের হয়ে আসে।

কখনও ধাতুনির্মিত পাত্রাদিতে কাঠখণ্ডের দ্বারা আঘাত করে এবং দুটি কাঠির দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করেও সুসমঞ্জস্য তাল-লয় সহকারে স্বরলহরীর সৃষ্টি করা হয়, যা শ্রুতিমধুর হয়ে থাকে।

পাঠক, আমরা এখন আপনার সামনে সংগীতের শ্রুতিমাধুর্যের কারণ বর্ণনা করতে চেষ্টা করব। এটা এই যে, মাধুর্য হল, যেমন যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে, কোমলতার উপলব্ধি এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি বিশেষ অবস্থার নাম। সুতরাং এ অবস্থা যদি উপলব্ধির সাথে সুসামঞ্জস্য ও কোমল প্রকৃতির হয়, তাহলেই তা মধুর হয়ে উঠে। অন্যদিকে ওটা যদি উপলব্ধির ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য ও কর্কশ হয়, তাহলে বেদনাদায়ক হয়ে থাকে। এভাবে দেখতে গেলে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যা নরম, তাই সাধারণভাবে স্বাদগ্রহণকারী ইন্দ্রিয়ের কাছে একটি সুষম অবস্থার সৃষ্টি করে। এমনিভাবে স্পর্শের ক্ষেত্রে যা কোমল এবং গন্ধদ্রব্যাদির ক্ষেত্রে তাই হৃদশক্তির বাষ্পীয় বিস্তারের সহায়ক, যা সুষম মিশ্রণের অধিকারী। কেননা ওটাই উপলব্ধিকারী এবং ইন্দ্রিয়গুলো তার কাছেই এ অবস্থাকে পৌঁছে দেয়। এ কারণেই সুগন্ধী গুল্ম, ফুল ও আতর আত্মশক্তির জন্য এমন অদ্ভুত গন্ধ ও কোমলতা বহন করে আনে। কারণ তাতে সেই বিশেষ উষ্ণতার প্রাধান্য যা হৃদশক্তির মিশ্রণের মধ্যে বিদ্যমান।

দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে এ কোমলতার অর্থ তাদের গড়ন, আকৃতি ও অবস্থার ক্ষেত্রে সুষমতার উপস্থিতি; কেননা ওটাই জীবাত্মার জন্য বেশি সুসামঞ্জস্য ও অতিরিক্ত সহজগ্রাহ্য। সুতরাং দ্রষ্টব্য বস্তুটি যদি তার মৌলিক উপাদান অনুসারে তার আকৃতি ও গঠনসৌকর্যে বিশিষ্ট হয় এবং এমনভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, যাতে তার বিশিষ্ট উপাদানগত পরিপূর্ণতা ও সুষমতার যথার্থ সীমা বজায় থাকে, তা হলে ইন্দ্রিয়ের

কাছে ওটাই সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব আকারে ধরা দেয়। এর ফলেই এ অবস্থাটি উপলব্ধিকারী আত্মশক্তির জন্য সুসামঞ্জস্য হয় এবং সে ওটা থেকে মাধুর্য সংগ্রহ করে।[৪৫] এজন্যই পাঠক, আপনি দেখতে পাবেন, যে-সব প্রেমিক প্রেমের মধ্যে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে, তারা তাদের প্রেম ও আকর্ষণের গভীরতা বুঝানোর জন্য বলে যে, প্রিয়তমের আত্মার সাথে তাদের আত্মা মিশে গেছে। এর মধ্যে যে রহস্য আছে, তা কেবল আপনি ভুক্তভোগী হলেই বুঝতে পারবেন। এটা আর কিছুই নয়, উৎসের ঐক্য। কারণ আপনার নিজের অস্তিত্ব ছাড়া অন্য যা কিছু আছে, তার প্রতি যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন আপনার ও তাদের মধ্যে এ উৎসের ঐক্য বিদ্যমান। সৃষ্টির অস্তিত্বের ক্ষেত্রে আপনাদের উভয়ের বিদ্যমানতাই এর সাক্ষ্য বহন করছে।

এর এই তাৎপর্যের অন্য একটি দিক এই যে, প্রতিটি বস্তুই অন্য সব বস্তুর সাথে অংশীদারিত্বে এক; যেমন দার্শনিকগণ বলে থাকেন। সুতরাং এদিক থেকে আপনি যার মধ্যে পরিপূর্ণতার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন, তার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিতে তৎপর হয়ে ওঠেন এবং জীবাত্মা তখন কল্পনার জগৎ ত্যাগ করে সেই বাস্তবে ফিরে আসতে উন্মুখ হয়, যা বস্তুত উৎস ও সৃষ্টির মধ্যে ঐক্য হিসেবে বিরাজমান।

যেহেতু মানুষের কাছে সর্বাপেক্ষা সুসামঞ্জস্য এবং তার পরিপূর্ণ উপলব্ধির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হল তার মানবিক দেহের আকৃতি ও গঠন সৌন্দর্য, সেজন্য সেই গঠন, শব্দাবলি ইত্যাদির মধ্যে সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠবকে উপলব্ধি করাই তার সহজাত প্রবৃত্তির বেশি নিকটবর্তী। এ কারণেই প্রতিটি মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তির আকর্ষণেই দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য বিষয়াদির মধ্যে সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করে থাকে।

এ কারণে শ্রোতব্য বিষয়ের ধ্বনিসমষ্টির সুসামঞ্জস্যতাই সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে; ওটা বিসদৃশাতা নয়। কেননা ধ্বনিসমূহের জন্য অঘোষ, ঘোষ, কোমল, কর্কশ, কম্পিত, ঘৃষ্ট ইত্যাদি বহু অবস্থা বিদ্যমান। এতে সামঞ্জস্য বিধানের অর্থই হল এমন একটি মিশ্রণের সৃষ্টি করা, যাতে শ্রুতিমাধুর্য উৎপন্ন হয়।

প্রথমত, ধ্বনি তার বিস্তার সীমা হঠাৎ অতিক্রম করবে না; বরং তা ক্রমান্বয়ে হবে এবং তার প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে আসবে। প্রতিটি ধ্বনির ক্ষেত্রেই এ অবস্থা প্রযোজ্য। ধ্বনির এ বিস্তারের মধ্যভাগে পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্যও উভয় মেরুর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করবে। পাঠক, এক্ষেত্র ভাষাবিদ্‌দের বিসদৃশ ধ্বনি সংযোগ এবং সমোচ্চারিত ধ্বনির সহাবস্থানের বিষয়টিকে মন্দ বলার ব্যাপারে চিন্তা করতে পারেন। কারণ ওটাও এ পর্যায়ের।

দ্বিতীয়ত, ধ্বনি বিভিন্ন অংশে সুসামঞ্জস্যতা লাভ করবে; যেমন পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং ধ্বনি তার অর্ধাংশে, এক-তৃতীয়াংশে, অথবা অনুরূপ অন্যান্য অংশে এমনভাবে স্থানান্তরিত হবে, যাতে সংগীতশাস্ত্রবিদদের নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সুতরাং উক্ত শিল্পের বিশেষজ্ঞরা যে-ভাবে বর্ণনা করেছেন, ধ্বনিগুলো যদি সেভাবে সুসামঞ্জস্য অবস্থাদির সৃষ্টি করে, তা হলে ওটা কোমল ও শ্রুতিমধুর হয়ে দাঁড়াবে।

---

৪৫. এর পরবর্তী বর্ণনার কতকাংশের সাথে এ পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য অতিশয় ক্ষীণ; মনে হয়, এটা প্রক্ষেপ (রোজেনথাল, ২য় খণ্ড, ৩৯৮ পৃ: দ্র:)।

এরূপ সুসামঞ্জস্য অবস্থার মধ্যে অনেকগুলোই সরল; বহুলোক অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এরূপ ধ্বনি-তরঙ্গ সৃষ্টিতে পারঙ্গম। তারা এর জন্য কোন প্রকার শিক্ষা বা শিল্পানুশীলনের মুখাপেক্ষী হয় না। যেমন আমরা বহু লোককেই স্বভাবদত্তভাবে কাব্যের ছন্দ, নৃত্যের মাত্রা ও ইত্যাকার অন্যান্য বিষয়ে দক্ষতার অধিকারীরূপে দেখতে পাই। সাধারণ মানুষ তাদের এ শক্তিকে 'গীতিময়তা' বলে অভিহিত করে। কুরআন পাঠকারীদের অনেককেই এ অবস্থার সাথে তুলনা করা যায়। তারা এমনভাবে কুরআন পাঠ করে, যাতে ধ্বনিসমষ্টির মধ্যে সুরের সৃষ্টি হয়ে একটা সংগীতসুলভ আবেশের উদ্ভব ঘটে এবং তাদের সুন্দর বাক্-বিন্যাস ও সুরসঙ্গতির দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দকে মোহিত করতে সক্ষম হয়।

এরূপ সুরসঙ্গতির ক্ষেত্রে যা মিশ্রণের দ্বারা জটিল হয়ে ওঠে, ওটা সব মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয় এবং সকলের স্বভাবদত্ত শক্তিও তার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়; যদি সে সজ্ঞান হয়।

এটাই সেই সুরসৃষ্টির ব্যাপার, যার দায়িত্ব সংগীতশাস্ত্র বহন করছে; যেমন আমরা উক্ত শাস্ত্র আলোচনার সময় বর্ণনা করব।

ইমাম মালেক (রহঃ) সুর করে কুরআন পাঠের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন এবং ইমাম শাফেয়ী এ সম্পর্কে মত দিয়েছেন। অবশ্য এক্ষেত্রে সুরের অর্থ সংগীতশিল্পের অনুরূপ সুর নয়। কারণ কুরআন পাঠে তার ব্যবহারের নিষেধ সম্পর্কে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। কেননা সংগীতশিল্পের উদ্দেশ্য সব দিক থেকেই কুরআন পাঠের সাথে সামঞ্জস্যহীন। কুরআন পাঠ ও তার যথাযথ উচ্চারণ এমন কিছুসংখ্যক ধ্বনিমাত্রার অধীন, যা দিয়ে বর্ণমালা তার স্বরচিহ্নাদিসহ যথাবিহিতভাবে স্পষ্ট হতে পারে। যেমন দীর্ঘস্বর; তার দৈর্ঘ্য ও হ্রস্বতারও নির্ধারিত বৈচিত্র্য বিদ্যমান এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়। একইভাবে সুর সৃষ্টির জন্যও নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বরবিন্যাসের প্রয়োজন; তাছাড়া তার মধ্যে সঙ্গতি বিধানের দ্বারা পূর্ণতালাভ সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেমন আমরা পূর্বে বলেছি যে, এ সঙ্গতিই সুরের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং তাদের একের ক্ষেত্রে অন্যের বিষয়টি প্রযোজ্য বলে বিবেচনা করলে উভয়ের বিনষ্টি সাধন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

বস্তুত কুরআন পাঠের বিষয়টি সংগীতের পূর্বেই সুনির্দিষ্ট বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে, যাতে উক্ত গ্রন্থের সনাতন ধারায় কোন প্রকার ব্যতিক্রমের সৃষ্টি না হয়। সুতরাং সুর ও যাথাবিহিত কুরআন পাঠকে একত্র করার কোন অবকাশ নেই। ফলত, তাঁদের উপরোক্ত মতানৈক্যের একমাত্র লক্ষ্য হল সেই সরল সুর, যা গীতিশক্তির অধিকারী ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্ট হয়ে থাকে; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং পাঠক এক্ষেত্রে তার পঠিত শব্দাবলিকে এমনভাবে আবৃত্তি করবে, যেন তার ধ্বনি তরঙ্গে অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে সংগীত ও আবৃত্তির পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরূপ হলে তা আর ইমাম মালেকের বক্তব্য অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে না। বস্তুত এ পার্থক্যের অভাবই তাঁদের বিতর্কের ভিত্তি। অবশ্য কুরআন পাঠ সম্পর্কে সুস্পষ্ট মত এটাই যে, তা এই যাবতীয় আবিলতা থেকে মুক্ত হবে; যেমন ইমাম মালেক মন্তব্য করেছেন। কেননা কোরানের বিষয়বস্তু হল মৃত্যু ও তার পরবর্তী বিষয়াদির প্রতি বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদনের স্থান। এর সাথে সুস্বর শুনে মোহিত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। সাহাবীদের (রা) কুরআন পাঠও এ ধারাকেই অনুসরণ করেছে; যেমন তাঁদের ইতিহাসে তার বর্ণনা বিদ্যমান।

এ ক্ষেত্রে হযরত মুহম্মদ (স)-এর সেই বাণী, যাতে তিনি বলেছেন, আমাকে দাউদ বংশীয়দের সুস্বরের একটি অংশ প্রদান করা হয়েছে;[৪৬] তার অর্থ গীত ও সুর সৃষ্টি নয়। তার একমাত্র অর্থ হল সুন্দর স্বর, সুষ্ঠু পাঠ এবং প্রতি বর্গকে তার যথার্থ স্থান থেকে সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা।

ইতোপূর্বে যেহেতু আমরা সংগীতের তাৎপর্য বর্ণনা করেছি; সুতরাং পাঠক, জেনে রাখুন, ওটা একমাত্র সভ্যতারই অবদান। মানুষের এ সভ্যতা যখন মৌলিক প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে প্রয়োজনের সৃষ্ট অভাব পূরণ করতে সমর্থ হয় এবং পরিপূর্ণতা বিধায়ক অভ্যাসাদির দিকে এগিয়ে যায়, তখনই তারা বিষয়-বৈচিত্র্যের অনুসরণ করে ও এসব শিল্পের উদ্ভব ঘটায়। কারণ এরূপ শিল্পকর্মে তারাই নিয়োজিত হতে পারে, যারা তাদের প্রয়োজনীয় সব অভাব পূরণ করেছে এবং জীবিকা, সংসার ও অন্যান্য বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। কাজেই সব অবস্থায় সর্ববিধ দায়িত্বমুক্ত ব্যক্তিরাই ভোগ-সম্ভোগের বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য এসব শিল্পের দ্বারস্থ হয়।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে অনারব দেশগুলোর শহর-নগরে এসব শিল্পকলার এক তরঙ্গায়িত সমুদ্র বিরাজমান ছিল। তাদের সম্রাটগণ এসব বিষয় লালন করতেন এবং আগ্রহ সহকারে এদের মাধুর্য সম্ভোগে তৎপর থাকতেন। এমন কি পারস্য সম্রাটগণ এ সমস্ত বিষয়ের শিল্পী-কুশলীদেরকে যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন এবং তারা সাম্রাজ্যে বিশেষ পদমর্যাদার অধিকারী ছিল। তারা জলসায় ও সমাবেশে উপস্থিত হয়ে সংগীত পরিবেশন করত। বর্তমানকালেও অনারব প্রতিটি অঞ্চলে ও রাজ্যপাটে শিল্পীদের অনুরূপ মর্যাদা বিদ্যমান।

কিন্তু আরবদের মধ্যে প্রথমে ছিল কাব্য-প্রীতি। তারা বক্তব্যকে সমান অংশে সঙ্গতি রক্ষা করে হসন্ত ও আকারাদি যুক্ত বর্ণমালার মাত্রা অনুসারে সুসংবদ্ধ করত। তারপর বক্তব্য বিষয়কে এসব অংশের মধ্যে এমনভাবে সুবিন্যস্ত করত যে, তার প্রতিটি অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ তাৎপর্যের বাহন হয়ে উঠত। এর ফলে অন্য অংশের সাহায্য ছাড়াই তার অর্থ সুস্পষ্ট হত। তারা একে বলত কাব্য পঙ্‌ক্তি। এক্ষেত্রে প্রথমে তারা বক্তব্যটিকে অংশে অংশে ভাগ করে একটি কোমলতার সৃষ্টি করত এবং এ অংশগুলোকে পূর্বাপর সামঞ্জস্য রেখে বিন্যস্ত করত। পরে যথার্থ উদ্দেশ্য ও সে অনুযায়ী বক্তব্যকে মিলিয়ে একটি পরিপূর্ণ সঙ্গতির সৃষ্টি করত। এভাবে তাদের উচ্চারিত বাণীসমষ্টির মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য দেখা দিত, যা অন্যত্র সুলভ নয়। তার এরূপ মর্যাদার উৎস হল সেই সুসামঞ্জস্য বিন্যাস প্রণালী। এভাবে প্রস্তুত তাদের কাব্যসম্ভার তাদের ইতিহাস ও বিচক্ষণতার ভাণ্ডার এবং তাদের দুঃখ-বেদনার গাথা হয়ে উঠেছিল। এতে যেমন ছিল অর্থের যথার্থতা তেমনি ছিল আঙ্গিকের অভিনবত্ব। এটা নিয়েই তারা বহুকাল পর্যন্ত ব্যাপৃত ছিল।

অনুরূপভাবে বক্তব্যকে অংশে অংশে ভাগ করে হসন্ত ও স্বরান্ত বর্ণমালা একত্রীকরণের মাধ্যমে সঙ্গতি দেখা দিত, তা ঐকতান সাগরের একটি বিন্দু মাত্র; যেমন সংগীতশাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে ওটা সকলের কাছে সুপরিচিত। কিন্তু আরবরা এর বেশি অন্য কিছু বুঝত না। কেননা তারা তখন কোন প্রকার শাস্ত্র ও শিল্পের সাথে পরিচিত হয়নি। তাদের প্রান্তরীয় জীবনবোধেরই প্রাধান্য ছিল। তারপর উট চালকরা তাদের মধ্যে হুদীর

৪৬. বোখারী, ৩য় খণ্ড দ্র:।

সুর নিয়ে এল এবং যুবকরা তাদের অবসরকালীন আনন্দের জন্য সুরালাপ করতে লাগল। এর ফলে ধ্বনি-তরঙ্গের আবৃত্তির মাধ্যমে সুরের সৃষ্টি হল। এ সুরকে কাব্যে প্রয়োগ করলে তারা তাকে সংগীত বলত এবং কোন প্রকার স্তুতি ও পাঠকার্যে প্রয়োগ করলে তাকে বলত 'তাগবির'। আবু ইসহাক যুজ্জাজ বলেছেন,[৪৭] ওটা 'গাবের' অর্থাৎ পরকালের চিরস্থায়ী জীবন সম্পর্কে স্মরণ করায় বলে তার এ নামকরণ করা হয়েছে। আরবদের এ সংগীত প্রয়াসের মধ্যে অনেক সময় বিভিন্ন সুরের মধ্যে একান্ত সরল সঙ্গতি দেখা দিত; যেমন ইবনে রশিক তাঁর 'উমদা' গ্রন্থের শেষ দিকে এবং অন্যরা অন্যত্র এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এরূপ সরল সুর-সঙ্গতিকে তারা 'সান্নাদ' বলে অভিহিত করত। তাদের এমন সুর-সঙ্গতির অধিকাংশই ছিল লঘু তালের, যা নৃত্যে এবং পদচারণায় ঢোলক ও বাঁশীর সাথে ব্যবহৃত হত। এতে একটা লঘু আনন্দ শিহরণের সৃষ্টি হত, যা গম্ভীরকেও অস্থির করে তুলত। তারা একে বলত 'হজাজ'। এটা এবং এর অনুরূপ অন্যান্যগুলোর সবাই সরল সুরগ্রাম, যা একান্তভাবে প্রাথমিক স্তরের। সুতরাং এগুলো কোন প্রকার শিক্ষা ছাড়াই মানব প্রকৃতির পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব। বস্তুত, সর্বপ্রকার শিল্পকলার অবস্থাই এরূপ।

আরবদের সেই প্রান্তরীয় জীবন ও মূর্খতার যুগে এ অবস্থাই চলছিল। তারপর ইসলামের আবির্ভাব ঘটল। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করল এবং অনারবদের শাসন-ব্যবস্থা নিজেদের কবলিত করে তাদের সব কিছুর ওপর সর্বেসর্বা হয়ে উঠল। এসব সত্ত্বেও পাঠক, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, তারা কতখানি প্রান্তরীয় জীবনবোধ ও সাফল্যের অধিকারী ছিল। এর সাথে তাদের ধর্মীয় সততা ও নিষ্ঠা মিলে তাদেরকে অবসর বিনোদনের যাবতীয় ব্যাপার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। যা ধর্ম ও জীবিকার সহায়ক ছিল না, তেমন সব কিছুকে তারা বিনা দ্বিধায় ত্যাগ করেছিল। একমাত্র কুরআন পাঠে আবৃত্তির মাধুর্য এবং কাব্য পাঠে সুরের অনুরণন শিহরণকে তারা উপভোগ করত। কেননা এটাই ছিল তাদের অনুসৃত প্রথা ও অনুকরণীয় জ্ঞানাদর্শ।

অতঃপর যখন তাদের ওপর বিলাস-ব্যসনের প্রভাব এসে পড়ল এবং বিভিন্ন জাতির লুণ্ঠিত দ্রব্যে তাদের মধ্যে সচ্ছলতার আবির্ভাব ঘটল, তখন তারা জীবনের ভোগ-সম্ভোগ আস্বাদনের চাকচিক্য ও অবসর বিনোদনের মাধুর্যের প্রতি আকর্ষিত হল। পারস্য ও রোমের সংগীতবিদরা সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হেজাজের অভিমুখে যাত্রা করল এবং পরিণামে আরবদের আশ্রিতপোষ্যে পরিণত হল। তার সারাঙ্গী, তানপুরা, বীণা ও বাঁশী সহযোগে গীত গাইতে আরম্ভ করল। আরবরা তাদের সুর শুনে তাদের কবিতাগুলোতেই সেই সুর আরোপ করল। মদিনায় 'নাশিত ফারেসী', 'তোয়েস', 'সায়েব' ও 'হায়ের'—আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফরের আশ্রিত, প্রমুখ গুণীরা অভিভূত হল। তারা আরবদের কবিতা শুনে তাতে সুর দিল এবং অদ্ভুত কৃতকার্যতা লাভ করল। তাদের নাম চতুর্দিকে ছাড়িয়ে পড়ল। তারপর তাদের কাছ থেকে 'মাবাদ' ও তার সমকালীন অন্যান্যরা এবং ইবনে সুরাইজ ও তত্তুল্য আরও অনেকে তাদের কাছে থেকে এ শিল্প গ্রহণ করল। এভাবে সংগীতশিল্প পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বনি-আব্বাসের

৪৭. আবু ইসহাক ইব্রাহীম সারী; মৃত্যু ৩১১ (৯২৩ খ্রিঃ) হিঃ (?)।

রাজত্বকালে ইব্রাহীম ইবনে মাহদী, ইব্রাহীম মোশেলী ও তৎপুত্র ইসহাক এবং তৎপুত্র হাম্মাদের সাধনায় এসে পূর্ণতা লাভ করল। বস্তুত, তাদের সাম্রাজ্য বাগদাদে এ শিল্পটি এতদূর সমৃদ্ধি লাভ করেছিল যে, তার বর্ণনা এবং তৎসম্পর্কিত জলসাসমূহের কথা এ বর্তমানকাল পর্যন্ত আলোচিত হয়ে থাকে।

ঐ সময়ের লোকেরা সর্বদা আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকত। তারা নৃত্যের জন্য পৃথক পোশাক, লাঠি এবং সুর-আরোপিত কবিতা ব্যবহার করত। এ বিষয়টিই সম্পূর্ণ পৃথকভাবে তাদের অবসর বিনোদনের সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হত। এ নৃত্যের ক্ষেত্রে অন্য কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে একটি পৃথক ধারা তৈরি করা হয়েছিল, তাকে বলা হত 'খুরজি'। এটা কাঠের তৈরি একটি ঘোড়ার আকৃতি, যাতে জিনপোশ ও মেয়েলী পোশাক থাকত। নৃত্যশিল্পীরা যেন তার ওপর আরোহণ করেছে, অনুরূপভাবে আক্রমণ, পশ্চাদপসারণ এবং তরবারি নিয়ে খেলা দেখাত। ভোজসভা, বিবাহ-বাসর, ঈদ উৎসব ও অন্যান্য অবসর বিনোদনের আনন্দমেলায় এমন আরও বহু বিচিত্র বিষয়ের আয়োজন করা হত।

বাগদাদ ও ইরাকের অন্যান্য পল্লী-শহরে এ রকম শিল্পের ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল এবং সেখান থেকে অন্যত্রও এদের প্রসার ঘটেছিল। মোশেলীদের এক যুবক আশ্রিত-পোষ্য ছিল; নাম ছিল 'যরইয়াব'।[৪৮] সে তাদের কাছে থেকে সংগীতশিল্পে দীক্ষা নিয়ে খুব দক্ষ হয়ে ওঠে। এর ফলে তার প্রতি হিংসাপরবশ হয়ে তারা তাকে পশ্চিমাঞ্চলে পাঠিয়ে দেয়। সে হকম ইবনে হিশাম ইবনে আবদুর রহমান আদ্দাখেল, আন্দালুসের তৎকালীন সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হয়। উক্ত সম্রাট তাকে খুবই সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। তিনি তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এগিয়ে আসেন, তাকে নানাবিধ পুরস্কার প্রদান করেন এবং তার জন্য জায়গীর ও ভাষা নির্দিষ্ট করে দেন। তিনি উক্ত গায়ককে তাঁর সাম্রাজ্যের সভাসদদের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেন। এর ফলে আন্দালুসে সে তার যোগ্য উত্তরাধিকারী রেখে যেতে সমর্থ হয়; যারা পরবর্তীকালে ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের কাল পর্যন্ত সেখানে সংগীতের ধারাকে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। আশবেলিয়া (শোভিলা)-য় উক্ত শিল্পের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে এবং সেখানে সভ্যতার সজীবতা নষ্ট হওয়ার পর তার উত্তরাধিকার সমুদ্র তীরবর্তী আফ্রিকিয়া ও মাগরিবে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে তা বিভিন্ন শহর নগরে বিস্তৃত হয়েছিল। সাম্রাজ্য শক্তির বিলুপ্তি ও সভ্যতার অবক্ষয়ের পরও বর্তমানে সেখানে তার কিঞ্চিৎ চমক বিদ্যমান।

বস্তুত এ সংগীত শিল্প সভ্যতার প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিল্পের শেষে আবির্ভূত হয়। কেননা ওটা একান্তই পরিপূর্ণতা বিধায়ক অভ্যাস এবং অবসর বিনোদনের আনন্দ সৃষ্টি ছাড়া সাধারণভাবে একে কোন পেশা হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এ কারণে সভ্যতার অবক্ষয় ও বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিলে এ শিল্পই সর্বপ্রথম বিলুপ্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ্ই সব বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী।

---

৪৮. আলী ইবনে নফী, ইনি বস্তুত দ্বিতীয় আবদুর রহমানের দরবারে বরিত হন।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[শিল্পকলা, বিশেষ করে রচনা ও গণিতশিল্পীকে বিচক্ষণতার অধিকারী করে]

এ গ্রন্থে আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, মানুষের মধ্যে বিবেচনাশক্তি বলে যে বিষয়টি আছে, তা প্রথমত তার মধ্যে একান্তই সম্ভাবনার আকারে বিরাজ করে। তাকে সেই সম্ভাবনা থেকে বাস্তবের মধ্যে আনতে হলে প্রথমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধির সাহায্য প্রয়োজন। তারপর ওটা থেকে উক্ত শক্তি মনন ও চিন্তনের মাধ্যমে উপলব্ধির পরিপূর্ণতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির সাথে একাত্মতা লাভ করে। তখন সে আত্মিক সত্তায় রূপান্তরিত হয় এবং তার অস্তিত্ব পূর্ণ হয়ে ওঠে। সুতরাং এদিক থেকে লক্ষ করলে প্রতিটি জ্ঞান ও চিন্তা তার বুদ্ধির অনন্যতাকে ফুটিয়ে তুলতে থাকে। শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। এর বিষয় ও অভ্যাস উভয়ই সর্বদা এমন একটি জ্ঞানগত বিচক্ষণতার সৃষ্টি করে, যা মূলত এর অভ্যাসেরই ফলশ্রুতি। এ দিক থেকে বলতে গেলে প্রতিটি অভিজ্ঞতাই বৃদ্ধি বাড়ায়। বিভিন্ন শিল্পকর্মের অভ্যাস বিবেচনাশক্তি বৃদ্ধি করে এবং পরিপূর্ণ নাগরিক জীবনও বিচক্ষণতার জন্ম দেয়। কেননা এই শেষোক্তটি বিভিন্ন শিল্পকর্ম, যেমন, গৃহস্থালীর পরিচর্যা, সমকালীনদের সাথে জীবন-যাপন, তাদের সাহচর্য বিচিত্র ব্যবহারবিধির শিক্ষা এবং এটির পর ধর্মীয় বিধি-বিধানের প্রতিষ্ঠা ও তার যথাবিহিত আচার অনুষ্ঠানের আয়োজন ইত্যাদির সমষ্টি হিসেবে দেখা দেয়। এ সবকিছু, করার জন্য এমন নীতি-নিয়ম শিক্ষার প্রয়োজন, যা বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব এবং এর ফলে এ সবগুলোই বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটায়।

সমস্ত শিল্পের মধ্যে রচনাশক্তি এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশি উপকার সাধন করে থাকে। কেননা এটির জন্য বিচিত্র বিষয় অধ্যয়ন এবং বিভিন্নভাবে মননের প্রয়োজন হয়। অন্যান্য শিল্পে বিষয়টি তদ্রূপ নয়। এর বর্ণনা এই যে, রচনাশক্তি বস্তুত লিপির অন্তর্গত বর্ণমালার সাহায্যে বাক্যাবলিকে রূপায়িত করা এবং উক্ত বাক্যাবলির মূল উৎস হল মননের অন্তর্নিহিত ভাব-তরঙ্গ। এ ভাব-তরঙ্গ একের পর এক বিষয় অনুসরণ করে ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে যায়। এর ফলে লেখক যতক্ষণ রচনাশক্তির প্রকাশে ব্যাপৃত থাকে, ততক্ষণ সে এ ভাব-তরঙ্গে নিমজ্জিত থাকে এবং এর দ্বারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এ কারণেই সে প্রমাণের দ্বারা প্রামাণ্যকে অধিকার করার শক্তি অর্জন করে। এর নাম মনন শক্তি, যা দিয়ে মানুষ অজ্ঞাত বিষয়াদিকে জানার শক্তি অর্জন করেছে। এ শক্তিকে প্রয়োগ করতে গিয়ে সে যে বিবেচনার পরিচয় দেয়, তাতেই তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে।

এভাবে শিল্পের সাথে যুক্ত হবার ফলে তার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চাতুর্য ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের আধিক্য দেখা দেয়। কেননা লেখক বিচিত্র বিষয়ে অবগাহন করে তার নির্যাসকে বাস্তবে রূপায়িত করার অভ্যাস গড়ে তোলে। এজন্যই পারস্য সম্রাট তাঁর লেখকদের সম্পর্কে বলেছিলেন, তারা 'দেওয়ান' অর্থাৎ শয়তান অথবা উন্মাদ। কারণ তিনি তাদের এপ্রকার চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়েছিলেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সম্রাটের এ উক্তিই লেখকদের সাথে সম্পর্কিত 'দেওয়ান' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত উৎস।

এর সাথে হিসাব-নিকাশকারীদেরকেও যোগ করা যায়। কারণ হিসাব-নিকাশ শিল্পে সংখ্যার যোগ-বিয়োগজনিত এক ব্যাপক তৎপরতা বিদ্যমান। তাতেও নানাবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রচেষ্টা রয়েছে। এর ফলে হিসাবকারী বিচিত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও চিন্তনের অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এরূপ অভ্যাসের নামই বুদ্ধিমত্তা।

আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃজঠর থেকে এমন অবস্থায় বের করেছেন, যে, তখন তোমরা কিছুই জান না। তিনি তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় দিয়েছেন। কতই না সামান্য তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ![৪৯]

৪৯. তুল কোরান, ১৬, ৭৮; ৭, ১০; ২৩, ৭৮; ৩২, ৯; ৬৭, ২৩; কোরানের বিভিন্ন আয়াতের মিশ্রণে সৃষ্ট।

ষষ্ঠ অধ্যায়

[জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তাদের বিভিন্ন শাখা; শিক্ষা তার বিভিন্ন পদ্ধতি ও তার যাবতীয় কারণ; তৎসমুদয়ে ক্রিয়াশীল বিচিত্র অবস্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট একটি ভূমিকা ও পরিশিষ্টসমূহ।]

মানুষের সেই মননশক্তি সম্পর্কে ভূমিকা, যা দিয়ে তাকে সমগ্র প্রাণিজগতের মধ্যে বিশিষ্ট করা হয়েছে। এর দ্বারা তাকে জীবিকা অর্জনের পথ প্রদর্শন করানো হয়েছে এবং তার স্বজাতির সাহায্য গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এর মাধ্যমেই সে স্বীয় উপাস্যের বিষয়ে চিন্তা করতে আগ্রহী হয়েছে এবং রসূলগণ তাঁর কাছে থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে উৎসুক হয়েছে। এর ফলেই সে সমগ্র প্রাণিজগতকে তার বশ্যতা স্বীকার করাতে এবং তার শক্তির অধীন করতে সমর্থ হয়েছে। বস্তুত এভাবে আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর বহু সৃষ্টির ওপর মর্যাদা দান করেছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

[মানব সভ্যতায় জ্ঞান ও শিক্ষা উভয়ই স্বাভাবিক বিষয়[১]]

এর বর্ণনা এই যে, মানুষ তার প্রাণিসুলভ অনুভূতি, গতি, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদির দিক থেকে অন্যান্য প্রাণীর সাথে একই পর্যায়ের। একমাত্র মননশক্তিই তাকে প্রাণীর মধ্যে বিশিষ্ট করেছে। এর দ্বারাই সে তার জীবিকা অর্জন করতে, তন্নিমিত্ত স্বজাতীয়দের সহযোগিতা করতে এবং উক্ত সহযোগিতার প্রয়োজনে সমাজবদ্ধ জীবন-যাপন করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এরই কল্যাণে যে আল্লাহর কাছে থেকে নবী-রসূলের আনীত বিধি-নিষেধ গ্রহণ করতে এবং এর অনুষ্ঠান ও অনসুরণ করে পারলৌকিক কল্যাণ সাধন করতে সচেষ্ট হয়।

---

১. এ পরিচ্ছেদের অনুবাদ রোজেনথাল পাদটীকায় তুলে দিয়েছেন। তাঁর মতে এটা গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে পরিবর্তিত হয়েছে। অনুরূপ কারণে রোজেনথাল এস্থলে যে পরিচ্ছেদটি বর্ণনা করেছেন, তা আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে নেই। সম্পূর্ণতার জন্য আমরা এর অনুবাদ নিম্নে প্রদান করছি।

'মানুষের মননশক্তি'

জেনে রাখুন, আল্লাহ্ মননশক্তির দ্বারা মানুষকে সকল প্রাণীর মধ্যে বিশিষ্ট করেছেন এবং একে তিনি মানুষের পরিপূর্ণতা লাভের আরম্ভ ও সমগ্র সৃষ্টির ওপর তার আধিপত্য বিস্তারের শেষ পরিণতি হিসেবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

এ বিষয়টির বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রাণী মাত্রেই অনুভূতিশীল। তার অস্তিত্বের বাইরে অন্য সকল বস্তু ও বিষয় সম্পর্কে সে নিজ অনুভূতির মাধ্যমে চেতনা লাভ করে থাকে। এক্ষেত্রে মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণী তাদের আল্লাহ্ প্রদত্ত বাহ্য-ইন্দ্রিয়লব্ধ চেতনা—যেমন শ্রুতি, দৃষ্টি, গন্ধ, স্বাদ ও স্পর্শ প্রভৃতির দ্বারা সচেতন হতে পারে। কিন্তু মানুষ এর অতিরিক্ত, তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, এমন বিষয় সম্পর্কেও চিন্তার মাধ্যমে অবহিত হতে পারে। এ শক্তি তার মস্তিষ্কের গহ্বরে নিহিত রয়েছে। এরই সাহায্যে যে তার অনুভূত দৃশ্যাবলিকে মননশক্তির দ্বারস্থ করে এবং তথা হতে নির্যাস গ্রহণের মাধ্যমে অন্য দৃশ্যের উদ্ভব ঘটায়। এ মননশক্তি, অনুভূত বিষয়াদির বাইরের দৃশ্যাবলিকে আয়ত্ত করার জন্য বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের একটি প্রক্রিয়া মাত্র। কোরানে একেই 'আকাইদা' বা হৃদয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'তিনি তোমাদেরকে শ্রবণ, দর্শন ও হৃদয়ের অধিকারী করেছেন। 'আকইদা' বহুবচন; এর একবচন ফুয়াদ। এস্থলে এর অর্থ মননশক্তি।

এ মনন শক্তির কতকগুলো স্তর বিদ্যমান। প্রথম স্তর হল বাহ্য জগৎ সম্পর্কে এমন এটি বুদ্ধিগ্রাহ্য উপলব্ধি লাভ করা, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার চেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। এ ধরনের মনন মূলত ইন্দ্রিয় উপলব্ধির ওপর নির্ভরশীল। একেই 'বিষয়বুদ্ধি' বলা হয়। এর সাহায্যেই মানুষ তার জীবনধারণোপযোগী সামগ্রী সংগ্রহ এবং এর বিপরীত বিষয়াদিকে বর্জন করে।

মানুষ সর্বদাই এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করে থাকে। নিমেষমাত্রও এর ব্যতিক্রম হয় না; বরং চোখের পলকে তার এ চিন্তা জাগ্রত হয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরই ফলশ্রুতিতে উদ্ভাবিত হয় বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আমাদের পূর্ব বর্ণিত বিচিত্র শিল্পকর্ম।

অতঃপর এ মননশক্তি এবং মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি; বরং প্রাণী মাত্রের স্বভাব অনুযায়ী যা লাভ করা দরকার, তার জন্য এমন সব অনুভব ও উপলব্ধির মুখাপেক্ষী হতে হয়, যা সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে থাকে না। এ করণে মননশক্তির নির্দেশ অনুসারে মানুষ এমন ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হয়, যাঁরা এ বিষয়ে পূর্বাহ্নে শিক্ষা, অতিরিক্ত অভিজ্ঞতা অথবা উপলব্ধির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করেছেন। অথবা তাঁরা তাদের পূর্ববর্তী নবীদের প্রচারিত শিক্ষা থেকে তা প্রাপ্ত হয়েছেন। কারণ নবীরা তাঁদের সমসাময়িক মানুষকে এসব বিষয়ে অবহিত করেন এবং পরবর্তীকালে সেই শিক্ষা যুগ পরম্পরায় আগ্রহের সাথে গৃহীত হতে থাকে।

অতঃপর তার মনন ও চিন্তা যে-কোন একটি বিষয়কে অবলম্বন করে পৃথক পৃথকভাবে আবর্তিত হয় এবং এর মৌল উপাদানের মধ্যে আগত বিভিন্ন ক্রিয়াশীল অবস্থা নিরীক্ষণে রত হয়। এভাবে তার অনুশীলনের ফলে তার সংশ্লিষ্ট সব ব্যাপার সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এ পর্যায়ে উপনীত হলে উক্ত বিষয়টি তার সামগ্রিকতায় মৌল উপাদান ও সংশ্লিষ্ট অবস্থাদিসহ একটি বিশেষ শাস্ত্রে পরিণত হয়। উত্তর পুরুষরা এ বিশেষ শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে আগ্রহী হয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের শরণাপন্ন হয়ে থাকে এবং এরই অনিবার্য তাড়নায় শিক্ষার ধারা গড়ে ওঠে। এ কারণেই পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জ্ঞান ও শিক্ষা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অন্তর্গত। আল্লাহ্ই সব বিষয়ে অবগত।

মননের দ্বিতীয় স্তর হল এমন আদর্শ ও আচার-আচরণের কথা চিন্তা করা, যা দ্বারা মানুষ স্ব-সমাজ অন্যের সাথে বসবাস করতে এবং সমাজকে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। এ স্তরটি মূলত গুণগ্রাহিতার দ্বারা অভিজ্ঞতা পরম্পরায় ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এবং পরিণামে এগুলো একটি কল্যাণধর্মী চেতনার সৃষ্টি করে। একেই বলা হয় 'বিবেক বুদ্ধি'।

মননের তৃতীয় স্তরটি হল ইন্দ্রিয় তৎপরতার মাধ্যম ছাড়া জ্ঞান অথবা অনুমিত সিদ্ধান্তের সাহায্যে কোন বিষয় সম্পর্কে অবগতি লাভের প্রচেষ্টা। একে 'কল্পনাবুদ্ধি' বলা হয়। এটা উপলব্ধি ও গুণগ্রাহিতা উভয়ের দ্বারা গড়ে ওঠে। এরা বিশেষ ধারায় এবং বিশেষ অবস্থায় সম্মিলিত হয়ে অনুরূপ ভিন্ন একটি উপলব্ধি ও গুণগ্রাহিতার জন্ম দেয়। অতঃপর এগুলো পুনরায় আরও কিছু শক্তির সাথে মিশ্রিত হয় এবং আরও কিছু জ্ঞানের জন্ম দেয়। পরিণামে এর অস্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার সাযুয্য পার্থক্য, কারণ ও উপলক্ষসহ উপলব্ধিতে প্রকট হয়। এরূপ বিষয়াদির মননের দ্বারা মানুষ তার অস্তিত্বের পরিপূর্ণতা বিধান করে এবং সে শুদ্ধচিন্তা ও আত্মিক উপলব্ধির শক্তি অর্জন করতে সমর্থ হয়। এটা মানুষের অস্তিত্বের যথার্থ স্বরূপ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিল্পকর্মের অন্তর্গত[২]]

এর বিবরণ এই যে, কোন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন, তার শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ এবং তার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকরণের জন্য অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একমাত্র তার প্রাথমিক অবস্থাদি ও তার নিয়মাবলি আয়ত্তকরণ এবং তার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয়ে তার মূলনীতি থেকে যোগ্য সমাধানসুলভ বৈচিত্র্যের উদ্ভাবনের মাধ্যমেই এটা সম্ভব হয়ে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিদ্যার্থী এ অভ্যাস গড়ে তুলতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত শাস্ত্রে তার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জিত হয়েছে বলে মনে করা যায় না।

বস্তুত শাস্ত্র সম্পর্কিত এ যোগ্যতা শুধু এর উপলব্ধি ও অনুধাবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কারণ আমরা দেখতে পাই যে, কোন বিশেষ শাস্ত্রের কোন বিশেষ সমস্যার উপলব্ধি অনুধাবনের ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনকারী এবং বিশিষ্ট জ্ঞানী ও অশিক্ষিত সাধারণ লোকের মধ্যে সমধর্মিতা বিদ্যমান। কিন্তু এক্ষেত্রে যোগ্যতা বলতে বুঝায়, তা একমাত্র বিশিষ্ট জ্ঞানী ও বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব। অন্যেরা ওটা উপলব্ধি করতে পারে বটে; কিন্তু যোগ্যতার অধিকার তাদের নেই। এর ফলে একথাই প্রমাণিত হয় যে, যোগ্যতার জন্য সংশ্লিষ্ট সমস্যার উপলব্ধি ও অনুধাবনই যথেষ্ট নয়।

সমস্ত যোগ্যতাই আধিভৌতিক। ওটা দৈহিক হোক অথবা মানসিক হোক— চিন্তনীয় হোক বা অন্য কিছু হোক; যেমন গণিত। বস্তুত সব আধিভৌতিক বিষয়ই উপলব্ধিগ্রাহ্য; সুতরাং তার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। এজন্য প্রতিটি শাস্ত্র ও শিল্পকর্মে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য এমন বিখ্যাত শিক্ষকদের প্রয়োজন হত, যারা দেশে ও কালে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বজনমান্য বলে বিবেচিত হয়েছেন। তদুপরি শিক্ষাব্যবস্থা যে, একটি শিল্পকর্ম, তা এর জন্য ব্যবহৃত পরিভাষার বিভিন্নতা থেকেও বুঝতে পারা যায়। এজন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতিটিতেই বিশেষজ্ঞ ও সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানীরা এর শিক্ষাদানের জন্য বিশিষ্ট পরিভাষার সৃষ্টি করেছেন। বস্তুত সব প্রকার শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেই এ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এতে বুঝা যায় যে, উক্ত পরিভাষা সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের মৌলিক উপাদানের অন্তর্গত নয়। কারণ তেমন কিছু হলে ওটা সকলের কাছেই এক হত। পাঠক, আপনি অবশ্যই লক্ষ করেছেন যে, ধর্মীয় দর্শনশাস্ত্র (এলমে কালাম) শিক্ষাদানে ব্যবহৃত

---

২. এ পরিচ্ছেদটি রোজেনথালে সপ্তম পরিচ্ছেদে স্থান পেয়েছে।

পরিভাষার ক্ষেত্রে কীভাবে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিশেষজ্ঞরা মতানৈক্যের সৃষ্টি করেছেন। ধর্মীয় মূল নীতিশাস্ত্র (অসুলে ফেকাহ্) ও আরবি ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও এ অবস্থা হয়েছে। এমনিভাবে প্রতিটি শাস্ত্র, যাই অধ্যয়ন করার জন্য ব্রতী হওয়া যাক না কেন, আপনি এর শিক্ষাদান সম্পর্কীয় পরিভাষায় মতানৈক্য দেখতে পাবেন। সুতরাং এর দ্বারা এ কথাই বুঝা যায় যে, এগুলো শিক্ষাব্যবস্থারই শিল্প-সংক্রান্ত ফসল এবং সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের উপাদান মূলত এক।

এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হবার পর এটা জেনে রাখুন যে, বর্তমানকালের মাগরিবের অধিবাসীদের মধ্যে এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় লোপ পেতে বসেছে। এর কারণ অত্র অঞ্চলের জনবসতির হ্রাস, সাম্রাজ্যের দুরাবস্থা এবং এদের ফলে শিল্পকর্মের শোচনীয়তা ও বিলুপ্তি; যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এর উদাহরণ কায়রোয়ান ও কার্ডোভা এক সময়ে যথাক্রমে মাগরিব ও আন্দালুসের দুটি বিশিষ্ট নগরী ছিল। তাদের জনবসতিতে প্রাচুর্য ছিল এবং তাদের শাস্ত্রালোচনা ও শিল্পচর্চার ব্যাপক চাহিদার ফলে সমৃদ্ধির সাগর উথলে উঠেছিল। তাদের সমৃদ্ধির দীর্ঘস্থায়িত্ব ও নাগরিক জীবনের প্রয়াসের ফলে শিক্ষাব্যবস্থার দৃঢ়তা এসেছিল। কিন্তু তাদের দুরবস্থা দেখা দেয়ার ফলে এ পশ্চিমাঞ্চল থেকে শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছে। আল মোহেদ সাম্রাজ্যে মারাকেশে এ বিষয়ে কিছুটা চর্চা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে আল মোহেদদের প্রান্তরীয় জীবনবোধের প্রাধান্য থাকায় নাগরিকত্বের তেমন প্রসার প্রথমদিকে দেখা যায় নি। পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যের স্বল্পস্থায়িত্বের জন্য বিকাশমান নাগরিক জীবনও এর ধারা সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়নি। এর ফলে সংশ্লিষ্ট শিল্পকর্মাদির বিকাশও খুব অল্পই পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল।

মারাকেশের সাম্রাজ্যশক্তি বিলুপ্ত হবার পর[৩] আফ্রিকিয়া থেকে কাজী আবুল কাসেম ইবনে যয়তুন[৪] সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্বাঞ্চলে গমন করেন। তিনি ইমাম ইবনে আল খতিবের[৫] শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে সমর্থ হন এবং তাঁদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। চিন্তামূলক ও বর্ণনামূলক উভয় শাস্ত্রেই তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তারপর প্রচুর জ্ঞান ও উত্তম শিক্ষাদান প্রণালীর সঞ্চয় নিয়ে তিনি তিউনিসে ফিরে আসেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আবু আবদুল্লাহ্ ইবনে শোয়ায়েব দাকালী[৬] পূর্বাঞ্চল থেকে ফিরে আসেন। ইতিপূর্বে ইনিও মাগরিব থেকে সেখানে গিয়েছিলেন এবং মিশরীয় শিক্ষাদীক্ষায় অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। এখন তিনিও ফিরে এসে তিউনিসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর শিক্ষাদান প্রণালীও উপকারী বলে বিবেচিত হল। তিউনিসবাসীরা তাঁদের উভয়ের কাছে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করল এবং এ শিক্ষার ধারা তাঁদের শিষ্যদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে আবর্তিত হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত

---

৩. এস্থলে ইবনে খলদুন ১২৬৯ খ্রিস্টাব্দে মারিনীদের দ্বারা আল মোহেদ সাম্রাজ্য বিন্যাসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

৪. আবুল কাসেম ইবনে আবু বকর; ৬২১-১৯১ (১২২৪-১২২৯ খ্রিঃ) হিঃ। ইনি ৬৪৮ ও ৬৫৬ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে পূর্বাঞ্চলে ভ্রমণ করেন।

৫. ইনি ইমাম ফখরউদ্দিন রাজী। ২২৮ পৃঃ ৫০ নং টীঃ দ্রঃ।

৬. মুহম্মদ ইবনে শোয়ায়েব আল হাশকুরী; মৃত্যু ৬৬৪ (১২২৫ খ্রি:) হি:।

তা কাজী মুহম্মদ উবনে আবদুস সালাম[৭] যিনি ইবনে হাজেবের[৮] বিখ্যাত গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারী, তাঁর এবং তাঁর শিষ্যদের কাছে এসে শেষ হল। তিউনিস থেকে তিলমিসানে এ শিক্ষার ধারা ইবনে ইমাম[৯] ও তাঁর শিষ্যদের দ্বারা নীত হয়েছিল। ইনি ইবনে আবদুস সালামের সাথে একই শিক্ষকের অধীনে একই সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানকালে তিউনিসে ইবনে আবদুস সালামের শিষ্য এবং তিলমিসানে ইবনে ইমামের শিষ্যরা বিদ্যমান। কিন্তু তাদের সংখ্যা এত অল্প যে, ভয় হয়, হয়ত তাঁদের শিক্ষার ধারা একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

অতঃপর সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে 'যাওয়াহ্' থেকে আবু আলী নাসেরউদ্দিন আহ মাশাদ[১০] পূর্বাঞ্চলে গমন করে আবু আমর ইবনে হাজেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি তাঁদের কাছে শিক্ষালাভ করে তাঁদের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি শিহাবউদ্দিন আল কেরাফীর[১১] সাথে একই সময়ে শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করেন এবং চিন্তামূলক ও বর্ণনামূলক উভয় শাস্ত্রধারায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তারপর তিনি প্রচুর জ্ঞান ও উপযোগী শিক্ষাদান পদ্ধতিসহ মাগরিবে ফিরে আসেন। তিনি 'বেজা' (বগি)তে বসবাস অবলম্বন করে সেখানে বিদ্যার্থীদের মধ্যে শিক্ষার ধারা প্রচলিত করেন। অনেক সময় তাঁর এক শিষ্য ইমরান আল মাশাদ[১২] তিলমিসানে গমন করতেন এবং সেখানে বসবাস করে উক্ত শিক্ষা পদ্ধতির ধারা সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য বর্তমানকালে বগি ও তিলমিসানে তাঁদের শিষ্যের সংখ্যা খুবই কম; বরং নেই বললেই চলে।

কার্ডোভা ও কায়রোয়ানের পতনের পর থেকে ফেজ ও মাগরিবের অন্যান্য অঞ্চলে সুশিক্ষার ধারা অন্তর্হিত হয়েছে। তাদের মধ্যে ধারাবাহিকতা সংরক্ষিত হয়নি। এর ফলে সেখানকার অধিবাসীদের শাস্ত্রানুশীলনের অভ্যাস ও দক্ষতা অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। এসব বিষয়ে যোগ্যতা অর্জনের সহজতম পন্থা হল কথোপকথন ও বিতর্কের মাধ্যমে ভাষায় প্রকাশের ক্ষমতা লাভ করা। সম্ভবত এ পদ্ধতিতেই একজন বিদ্যার্থী সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি ও এর যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে সমর্থ। পাঠক, আপনি এতদঞ্চলের বিদ্যার্থীদেরকে দেখতে পাবেন, তারা জীবনের অধিকাংশ সময় জ্ঞানের সভায় কাটিয়েও কেমন নিশ্চুপ, কোন কথা বলতে ও কারও প্রতি কিছু আরোপ করার কোন ক্ষমতাও তাদের নেই। শুধুমাত্র কণ্ঠস্থ করার দিকেই তাদের দৃষ্টি পড়ে আছে এবং তাও প্রয়োজনের [illegible]। সুতরাং দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেও তারা জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কোন সক্রিয় যোগ্যতার অধিকারী হয় না। এর ফলে, পাঠক, আপনি দেখতে পাবেন, যারা তাদের বিদ্যা অর্জন সম্পূর্ণ করেছে বলে মনে হবে, তারাও

---

৭. আন হাওয়ারী; ৬৩৬-৭০৬ (১২৭৭-১৩৪৮ খ্রি:) হি:। ইবনে খলদুনের শিক্ষকদের অন্যতম।

৮. বিখ্যাত আরবি ব্যাকরণ প্রণেতা আবু আমর উসমান ইবনে হাজেব; মৃত্যু ৬৪৬ (১২৪৯ খ্রি:) হি:।

৯. এ নামে তাঁ দুই ভাই ছিলেন; আবু যায়েদ আবদুর রহমান; মৃত্যু ৭৪৩ (১৩৪৪ খ্রি:) হি: এবং আবু মুসা ইসা; ১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দের প্লেগ মহামারীতে মৃত্যু হয়।

১০. মনসুর ইবনে আহমদ; ৬৩২-৭৩১ (১২৩৫-১৩৩০ খ্রি:) হি:। মাশাখালী (।)।

১১. আহমদ ইবনে ইদরিস; মৃত্যু ৬৪৮ (১২৮৮ খ্রি:) হি:।

১২. ইমরান ইবনে মুসা; ৬৭০-৭৪৫ (১২৭২-১৩৪৫ খ্রি:) হি:।

কোন দায়িত্ব পালন, বির্তক অনুষ্ঠান ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কিরূপ অযোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে! তাদের এমন ত্রুটির একমাত্র করণ তারা যথার্থ শিক্ষা ও এর প্রয়োজনীয় ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। অথচ এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের কণ্ঠস্থ করার শক্তি অন্য সকলের চেয়ে বেশি এবং এ ব্যাপারেই তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। কারণ তাদের ধারণা শিক্ষাগত যোগ্যতা বলতে এ মুখস্থ করাকেই বুঝায়। যদিও প্রকৃত অবস্থা মোটেও তা নয়।

এর আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যাবে এই বিষয়ের মধ্যে যে, মাগরিবে বিদ্যার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থানের নির্দিষ্ট সময় হল ষোল বছর; অথচ তিউনিসে এ সময় মাত্র পাঁচ বছর। সম্ভবত এটাই জানা মতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থানের সর্বাপেক্ষা কম সময়। এর মধ্যেই বিদ্যার্থী তার শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনে সাফল্য লাভ করে অথবা ব্যর্থ হয়। কিন্তু মাগরিবে বর্তমানকালে এটা অপেক্ষা দীর্ঘ সময় নির্ধারণের একমাত্র কারণ সেখানকার শিক্ষাব্যস্থার ত্রুটি। এর ফলে সেখানকার বিদ্যার্থীদের জ্ঞানার্জন এমন একটি কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার ফলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। এতে অন্য কোন রহস্য নেই।

আন্দালুসবাসীদের মধ্যেও শিক্ষাবিস্তারের সেই ধারা আর অবশিষ্ট নেই। শত শত বছর ধরে মুসলমান জনবসতির হ্রাসপ্রাপ্তির ফলে তাদের মধ্য থেকে শাস্ত্রানুশীলনের আগ্রহ লোপ পেয়েছে। একমাত্র আরবি ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য ছাড়া অন্য সব বিষয়ের কোন অস্তিত্ব নেই। তারা বহু কষ্টে একেই টিকিয়ে রেখেছে এবং উক্ত বিষয় দুটির শিক্ষার ধারা সংরক্ষণ করার ফলে তা এখনও মোটামুটি অক্ষত আছে। ধর্মীয় শাস্ত্র এখন তাদের মধ্যে মূল থেকে বিচ্যুত একটি নিদর্শন হিসেবে বিদ্যমান। কিন্তু চিন্তামূলক শাস্ত্রাদির ক্ষেত্রে মূল ও তার নিদর্শন কোনটিই অবশিষ্ট নেই। এর কারণ জনবসতি হ্রাসের ফলে তাদের মধ্যে শিক্ষার ধারা অবলুপ্ত হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশ স্থানই শত্রুদের কবলে চলে গেছে। কেবলমাত্র সমুদ্রতীরবর্তী সামান্য অঞ্চলে এখনও তাদের আধিপত্য আছে। কিন্তু সেখানকার অধিবাসীরা অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা জীবিকার জন্যই বেশি সময় ব্যয় করে থাকে। আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশের ওপর ক্ষমতাবান।[১৩]

কিন্তু পূর্বাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের ধারা রুদ্ধ হয়নি; বরং সেখানে শাস্ত্রের বাজার তেজী এবং তার সাগর ফুলে ফেঁপে রয়েছে। কারণ সেখানে শিক্ষার ধারা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে সুযোগ পেয়েছে এবং জনবসতির প্রাচুর্য একে সহায়তা করেছে। যদিও এর শিক্ষার কেন্দ্র বিরাট বিরাট নগরীগুলো, যেমন—বাগদাদ, বসরা, কুফা প্রভৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে, তবুও আল্লাহ, তাদের অপেক্ষাও বিরাট নগরাদির দ্বারা উক্ত চর্চাকে অব্যাহত রেখেছেন। ফলে উপরোক্ত নগরসমূহ থেকে শিক্ষা ইরাক আজম, খুরাসান মাওরায়ান্নাহার প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় নগর এবং কায়রো ও তার সন্নিহিত অন্যান্য পশ্চিমাঞ্চলীয় নগরে স্থানান্তরিত হয়েছে। এ কারণে উপরোক্ত নগরসমূহে জনবসতির ধারাবাহিকতা ও সমৃদ্ধির কখনও অভাব হয়নি এবং সেদিক থেকে শিক্ষার ধারাও সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। পূর্বাঞ্চলবাসীরা মোটামুটিভাবে শিক্ষাদান শিল্পে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ;

১৩. কোরান; ১২, ২১।

বরং বলা যায়, অন্যান্য সব শিল্পকর্মেই তারা দক্ষ। এজন্যই মাগরিব থেকে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে পূর্বাঞ্চলে গমনকারী অধিকাংশ বিদ্যার্থীর ধারণা এই যে, পূর্বাঞ্চলীয়রা বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে মোটামুটিভাবে পশ্চিমাঞ্চলীয়দের অপেক্ষা বেশি পরিপূর্ণতার অধিকারী। তারা তাদের সহজাত প্রবৃত্তি অনুসারেই বেশি সচেতন ও বিচক্ষণ। তাদের বিবেচনা শক্তি সহজাত প্রকৃতি অনুযায়ীই মাগরিববাসীদের অপেক্ষা পরিপূর্ণতর। এমন ধারণা অনুসারে এসব বিদ্যার্থীরা আমাদের ও তাদের মনুষ্যত্বের মধ্যে পার্থক্য আছে বলে বিশ্বাস করে। এজন্যই তারা পূর্বাঞ্চলীয়দের জ্ঞান ও শিল্পকর্মের ব্যুৎপত্তি দেখে যেমন মুগ্ধ হয়, তেমনি অন্ধভাবে তাদেরকে অনুসরণ করে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়।

বস্তুত পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে এ পরিমাণ কোন পার্থক্য নেই, যাকে মানুষের সত্তাগত পার্থক্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে। অবশ্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় প্রথম ও সপ্তমের ন্যায় অসমভাবাপন্ন অঞ্চলদ্বয় সম্পর্কে অনুরূপ পার্থক্যের কথা বলা যায়। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, উপাদানগত মিশ্রণ সেখানে অসমভাবাপন্ন হওয়ায় জীবাত্মাও তার অনুসারী হয়ে গড়ে ওঠে। সুতরাং পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের যে বিষয়টি মর্যাদাগত পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে, তা হল নাগরিক জীবনের ফলশ্রুতি হিসেবে বেশি বুদ্ধিমত্তার প্রভাব; যেমন শিল্পকর্ম সম্পর্কে আলোচনার সময় বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা এস্থানে তার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করব।

ওটা এই যে, নাগরিকগণ তাদের জীবনের সর্বাবস্থায় জীবিকা, বাসস্থান, স্থাপত্য এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ববিধ কাজে কতিপয় নিয়ম মেনে চলে। তাদের পরিশ্রম, তাদের অভ্যাস ও তাদের আচার-আচরণ এবং তাদের সর্বপ্রকার তৎপরতায় এটি দেখা যায়। তারা কোন কাজ আরম্ভ করার কালে এ সম্পর্কে অবহিত হয় এবং প্রয়োজনীয় গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে তাকে সম্পন্ন করে। এর ফলে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, এ নীতিগুলো যেন সীমারেখা, যা অতিক্রম করা যায় না। অথচ এমন অবস্থা সত্ত্বেও এসব বিষয় এমন কতিপয় শিল্পকর্ম হিসেবে গড়ে ওঠে যে, তা পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে গ্রহণ করে থাকে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রতিটি পর্যায়ক্রমিক শিল্পানুষ্ঠান জীবাত্মার ওপর এমন একটি প্রভাব বিস্তার করে, যা তাকে একটি নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। এর ফলে সে অন্য একটি শিল্পকর্ম গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করে এবং তার বুদ্ধিমত্তা দ্রুততার সাথে বিচিত্র বিষয়ের পরিচয় গ্রহণে সমর্থ হয়।

মিশরীয়দের মধ্যে বিভিন্ন শিল্পকর্ম শিক্ষার যে পর্যায়ের কথা আমরা জানতে পেরেছি, তা একান্তভাবে দুরাধিগম্য। যেমন তারা পোষা গাধা, অন্য চতুষ্পদ মূক প্রাণী ও পাখিকে এমন সব কথা এবং কাজ শিক্ষা দেয় যা তাদের বিরলত্বের জন্যই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মাগরিববাসীরা ওটা শিক্ষা দেয়াতো দূরের কথা তার রহস্য অনুধাবন করতেই অপারগ হয়।

বস্তুত শিক্ষায়, শিল্পকর্মে ও জাতীয় অভ্যাসমূলক অবস্থাদিতে লব্ধ উত্তম নৈপুণ্য মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার প্রসার ঘটায় এবং তার মননশক্তিকে উজ্জ্বল করে তোলে। যোগ্যতার ব্যাপ্তিই এর উৎস। আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, মানুষের জীবাত্মা উপলব্ধির সাহায্যেই বিকশিত হয় এবং এরই ফলে সে যোগ্যতায় সুসজ্জিত হয়ে ওঠে।

ক্রমাগত শিক্ষার প্রভাব তার মধ্যে যে নৈপুণ্যের জন্ম দেয়, তারই কল্যাণে তাদের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য পরিমাণে বেড়ে গেছে। একেই সাধারণ মানুষ মানবিক সত্তার পার্থক্য বলে ধারণা করে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়।

পাঠক, নগরবাসীদের সাথে প্রান্তরবাসীদের তুলনা করলেই ব্যাপারটি বুঝতে পারেন। আপনি নগরবাসীকে কেমন বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল ও বিচক্ষণতায় পটু দেখতে পান; এ তুলনায় প্রান্তরবাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মনে হবে, তার মানবিক সত্তাই বুঝি পৃথক এবং বুদ্ধির দিক থেকে তার সম্ভাবনাও বুঝি অন্তর্হিত। কিন্তু মূলত তা নয়। এরূপ পার্থক্যের একমাত্র কারণ নগরবাসী তার নাগরিক জীবনের বিচিত্র অভ্যাস ও অবস্থা থেকে শিল্প ও সদাচারের নৈপুণ্য অর্জন করেছে, যা প্রান্তরবাসীর সম্পূর্ণ অপরিচিত। সুতরাং কোন নগরবাসী যখন শিল্পনৈপুণ্য, যোগ্যতা ও শিক্ষায় সুসজ্জিত হয়ে ওঠে; তখন তাকে দেখে প্রত্যেক অযোগ্য ব্যক্তিরই মনে হতে থাকে যে, ওটা একমাত্র তার বুদ্ধিবৃত্তির জন্যই সম্ভব হয়েছে এবং প্রান্তরবাসীদের জীবাত্মা তাদের সহজাত প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির ফলেই অনুরূপ নৈপুণ্য থেকে বঞ্চিত। অথচ প্রকৃত অবস্থা আদৌ তা নয়। বরং আমরা প্রান্তরবাসীদের মধ্যেও এমন লোকের সাক্ষাৎ পাই, যারা সহজাত বুদ্ধিমত্তা ও উপলব্ধির এক পরিপূর্ণ উচ্চস্তরে অবস্থান করে। বস্তুত নগরবাসীদের মধ্যে যা প্রকাশ পায়, তা শিল্পনৈপুণ্য ও শিক্ষাগত যোগ্যতার চাকচিক্য ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কেননা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, এ দুটি বিষয়ের প্রভাবে জীবাত্মা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

পূর্বাঞ্চলবাসীদের অবস্থা এটাই; কারণ তাও শিক্ষা ও শিল্পে মর্যাদার দিক থেকে উন্নত এবং প্রতিষ্ঠার দিক থেকে দৃঢ়। তাদের তুলনায় পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীরা প্রান্তরীয় জীবনের বেশি নিকটবর্তী। এর কারণও আমরা এ পরিচ্ছেদের পূর্বে বর্ণনা করেছি। কিন্তু উদাসীন প্রকৃতির সাধারণ দৃষ্টির লোকেরা এ বিষয়টিকে মনুষ্যসত্তার পার্থক্য বলে ধারণা করে এবং এর দ্বারা পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদেরকে বিশেষিত করে। বস্তুত এটা আদৌ সত্য নয়। পাঠক, বিষয়টি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করুন। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিতে এটা যা ইচ্ছা বাড়িয়ে থাকেন। তিনিই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর উপাস্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[জনবসতিপূর্ণ ও নাগরিকতায় সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অত্যধিক প্রসার ঘটে]

এর কারণ, শিক্ষাদান প্রণালী, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, সামগ্রিক শিল্পকর্মের অন্তর্গত এবং ইতিপূর্বে আমরা এটাই বলেছি যে, এসব শিল্পকর্মের বিকাশ একমাত্র নগর পরিবেশেই দেখা যায়। এসব পরিবেশের জনবসতির অল্পাধিক্য এবং এর নাগরিকতা ও বিলাস-ব্যসনের তারতম্যানুসারে শিল্পকর্মের মধ্যেও প্রাচুর্য ও স্বল্পতা দেখা দিয়ে থাকে। কেননা এর সাথে সংশ্লিষ্ট সব ব্যাপারটিই মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত। সুতরাং মানুষের শ্রম যখন মৌলিক প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত হয়, তখনই একে উক্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত মানুষের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক বিষয়সমূহে নিয়োগ করা হয় এবং ওটাই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকর্ম। এর ফলে যে ব্যক্তি তার সহজাত প্রবৃত্তির জন্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহী অথচ পল্লীতে অথবা অসংস্কৃতিপরায়ণ কোন নগর পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছে, তার পক্ষে সেখানে এ শিল্পসুলভ শিক্ষাব্যবস্থার সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ প্রান্তরীয় জীবনে শিল্প-সংস্কৃতির একান্ত অভাব, যেমন পূর্বে বলেছি। সুতরাং তাতে তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিপুল জনবসতিপূর্ণ সমৃদ্ধ নগর পরিবেশের দিকে অগ্রসর হয়ে আসতে হবে। বস্তুত এভাবেই প্রান্তরীয় জীবনের শিল্পাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়ে থাকে।

পাঠক, আমাদের এ বক্তব্যকে ইসলামের প্রথমদিকে জনবসতিপূর্ণ বাগদাদ, কার্ডোভা, কায়রোয়ান, বসরা, কুফা প্রভৃতি নগরীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করুন। এসব নগরীর নাগরিক জীবনে সমৃদ্ধি আসার পর কীভাবে তাদের মধ্যে বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাগর উথলে উঠেছিল। তারা শিক্ষাব্যবস্থা ও তার পরিভাষা নির্মাণে বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছিল এবং বিভিন্ন সমস্যা ও এর সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পরিচয় দিয়েছিল; এর ফলে তারা একদিকে যেমন পূর্বসূরিদের আয়োজনকে অতিক্রম করেছিল, অন্যদিকে তেমনই উত্তরসূরিদের জন্যও অননুকরণীয় আদর্শ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল। তারপর যখন তাদের জনবসতি হ্রাস পেল ও অধিবাসীর সংখ্যা সংকুচিত হয়ে এল, তখন তাদের সেই প্রসারতাও তার সব বিষয়সহ সংকীর্ণ হয়ে উঠল। তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান গেল, তার শিক্ষার ধারা গেল এবং ইসলামী নগরগুলো থেকে সব কিছুই স্থানান্তরিত হল।

বর্তমানকালে আমরা দেখছি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষাব্যবস্থা যা কিছু আছে তা মিশরের কায়রো নগরীতে বিদ্যমান। এর কারণ তার জনবসতি সাগর সদৃশ এবং

হাজার বছর ধরে তার নাগরিক সমৃদ্ধি স্থায়িত্বের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে এসেছে। এর ফলে সেখানে বিচিত্র শিল্পের বিকাশ হয়ে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং বিশেষভাবে শিক্ষাব্যবস্থার সমৃদ্ধি অতুলনীয় হয়ে রয়েছে।

বিগত দুইশ বছর ধরে সম্রাট সালাহউদ্দিন ইবনে আইউবের সময় থেকে পরবর্তীকাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে উক্ত অঞ্চলে যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তাতে তুর্কি আমলেও শিক্ষাব্যবস্থার এ ভিত্তি আরও সুরক্ষিত ও দৃঢ় হয়ে উঠেছে। এর কারণ তুর্কি আমীররা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত তাদের পদমর্যাদা সম্পর্কে অনেক সময় সম্রাটের হস্তক্ষেপের আশঙ্কা করত। বিশেষ করে তাদের সন্তান-সন্ততিদের ক্ষেত্রে এ উত্তরাধিকার হারাবার আশঙ্কা বদ্ধমূল ছিল। কারণ তারা সম্রাটের ক্রীতদাস ও আশ্রিত পোষ্যের অন্তর্গত ছিল এবং এরূপ ক্ষেত্রে সম্রাটদের পক্ষ থেকে শাস্তি ও উৎপীড়নের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। সুতরাং এসব আমীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মস্থল ও অনাথাশ্রম প্রচুর পরিমাণে প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং তাদের পরিচালনার জন্য বিপুল ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। এগুলোর পরিচালন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে অথবা তা থেকে অন্য উপায়ে কিছু লাভ করে যাতে তাদের বংশাবলি সচ্ছলতার সাথে জীবন-যাপন করতে পারে, তার জন্য তাতে অংশীদারিত্বের ব্যবস্থাও তারা করে রেখেছিল। অবশ্য এটা ছাড়াও সাধারণভাবে তাদের মধ্যে সৎকাজ ও কল্যাণধর্মীতার আকর্ষণ ছিল এবং তাদের কীর্তি ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পারলৌকিক পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা জড়িত ছিল। সুতরাং এসব কারণে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির পরিমাণ বিপুলভাবে বেড়ে গিয়েছিল এবং তার আয় ও ফসল বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর সাথে সঙ্গতি রেখে বিদ্যার্থী ও শিক্ষকের সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছিল। কারণ তাদের ব্যয়ভার বহনের কোন অসুবিধা ছিল না। ফলে ইরাক ও মাগরিব অঞ্চল থেকে প্রচুর লোক সেখানে জ্ঞানার্জনের জন্য যাত্রা করত। এভাবে ধীরে ধীরে সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটেছিল এবং তার ব্যাপক বিস্তৃতি সম্ভব হয়েছিল। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন।[১৪]

---

১৪. কোরান; ৩, ৪৭।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[বর্তমানকালে সভ্যতা লালিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রকার]

জেনে রাখুন, যে সব জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষ উৎসাহী হয় এবং নগর পরিবেশে তাদের শিক্ষাগ্রহণ ও দানের ব্যবস্থা করে, তা দুই প্রকার। যাকে স্বাভাবিক বলা যায় এবং মানুষের চিন্তাধারাই তার দিকে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। অন্য প্রকারটি বর্ণনামূলক, যা প্রবর্তনের কাছে থেকে গ্রহণ করতে হয়।

প্রথম প্রকারটি মূলত দার্শনিক শাস্ত্রজ্ঞান, যা মানুষ তার মননশক্তির দ্বারা অবহিত হতে পারে। সে তার মানবিক উপলব্ধির দ্বারাই তার আলোচ্য বিষয়, সমস্যাদি, প্রমাণের বিশ্লেষণ ও শিক্ষাদান প্রণালী সম্পর্কে অবগতি লাভ করে। এমন কি এর মাধ্যমেই যে এর শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার-বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হয়। এ ক্ষেত্রে তার সমগ্র তৎপরতা তার চিন্তাশীলতার ওপর নির্ভরশীল।

দ্বিতীয়টি প্রবর্তিত ও বর্ণিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমষ্টি। এর সব অংশই ধর্মীয় প্রবর্তকের কাছ থেকে প্রামাণ্য বর্ণনার সাহায্যে গ্রহণ করতে হয়; বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের কোন অবকাশ এতে নেই। অবশ্য একমাত্র মূলনীতি থেকে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার উদ্ভাবন ও সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন হয়। কারণ বিস্তারিত ও পরবর্তীকালে আগত সমস্যাবলি কোন মূলনীতি প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অস্তিত্বে আসে না। ফলে উক্ত সমস্যাবলিকে এক প্রকার অনুমান সূত্রে মূলের সাথে মিলিয়ে সমাধান করতে হয়। অবশ্য এরূপ অনুমান সর্বক্ষেত্রেই মূলনীতিতে বিধৃত ও বর্ণিত নির্দেশ অনুসারে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। সুতরাং পরিণামে এ অনুমান প্রক্রিয়াও মূলের সাথে দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট বলে বর্ণনাধারারই অন্তর্গত হয়ে পড়ে।

এমন সব বর্ণিত শাস্ত্রই কুরআন ও হাদীস থেকে গৃহীত ধর্মীয় বিধানের অন্তর্গত। আল্লাহ্ ও তাঁর প্রেরিত পুরুষ আমাদের জন্য যা কিছু প্রবর্তন করেছেন, তাই এসব শাস্ত্রের ভিত্তি। এর সাথে সংশ্লিষ্ট আরও কিছু শাস্ত্র রয়েছে, যা উপরোক্ত শাস্ত্রালোচনায় সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তারপর এ সবগুলো শাস্ত্রই আরবি ভাষাসংক্রান্ত বিভিন্ন জ্ঞানের অনুসারী হয়; কারণ এই আরবি জাতীয় ভাষা এবং তাতেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

এসব বর্ণিত শাস্ত্রের বহু শাখা-প্রশাখা বিদ্যমান। কারণ এসব সম্পর্কে আদিষ্ট ব্যক্তিকে অবশ্যই তার নিজের জন্য ও স্বজাতির জন্য মহান আল্লাহর অপরিহার্য নির্দেশ সংবলিত বিধি-নিষেধ জেনে নিতে হয়। এসব বিধি-নিষেধ কুরআন হাদীসের সরাসরি

নির্দেশ, সর্বসম্মতি অথবা মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে। এ কারণে তাকে সর্বপ্রথম কোরানের মর্মার্থ ও শব্দাবলির আর্থিক পরিমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয়। একেই বলা হয় 'এলমে তফসীর' বা ব্যাখ্যাশাস্ত্র। তারপর কোরানের বাণী, যা হযরত মুহম্মদ (স) আল্লাহর কাছে থেকে বর্ণনা করেছেন, তা কিভাবে তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে সে সূত্র বিচার এবং কুরআন পাঠে বিভিন্ন পাঠসৃষ্টিতে মতানৈক্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। একেই বলা হয় 'এলমে কেরাত' বা কুরআন পাঠশাস্ত্র। এ ছাড়াও হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মুখ নিঃসৃত বাণী যা হাদীসরূপে পরিচিত, তা কিভাবে শ্রুতি পরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে এবং তার বর্ণনাসূত্রের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করার প্রয়োজন হয়। কারণ এ সূত্রান্তর্গত ব্যক্তিদের যোগ্যতা, অযোগ্যতা, সততা-অসততার মাধ্যমেই বর্ণিত বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে এবং তার নির্দেশ আবশ্য পালনীয় বলে স্থিরকৃত হয়ে থাকে। এমন বিচার-বিশ্লেষণ, সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যাপারকে বলা হয় 'এলমে হাদীস' বা হাদীসশাস্ত্র।

অতঃপর এসব উৎস থেকে সব সমস্যার উপযোগী মূলনীতি বের করে আনা প্রয়োজন এবং সে জন্য একটি নৈতিক মানদণ্ড স্থাপনেরও আবশ্যকতা রয়েছে। যে আলোচনা ও অনুসন্ধান এ বিষয়ে সাহায্য করে, তাকে বলা হয় 'অসুলে ফেকাহ' বা মূল নীতিশাস্ত্র। এর পর মূলনীতির সাহায্যে মানুষের পালনীয় যে সব ফলাফল লাভ হয়; বিধি-নিষেধ দেখা দেয়, তারই নাম 'ফেকাহ' বা ধর্মীয় শাস্ত্র।

অন্যদিকে এসব অবশ্য পালনীয় বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলো দৈহিক ক্রিয়াকলাপের সাথে সম্পর্কযুক্ত; আবার অনেকগুলো হৃদয়ের সাথে। এ শেষেরটিকেই বলা হয় 'ঈমান' বা বিশ্বাস; যা বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য দুটি পর্যায়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। এসব বিশ্বাস্য ধ্যান-ধারণার মধ্যে আল্লাহ্‌র সত্তা, তাঁর গুণাবলি, পুনরুত্থান, স্বর্গীয় সুখ ও নরকীয় শাস্তি, ভাগ্য ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা এবং এ সবাইকে যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাকে বলা হয় 'এলমে কালাম' বা ধর্মীয় দর্শন।

অতঃপর কুরআন ও হাদীসের বিষয়াদি পর্যালোচনা করার পূর্বে ভাষা সম্পর্কীয় শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। কেননা উক্ত পর্যালোচনা ভাষাজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। এটি কয়েক প্রকার; তার মধ্যে অভিধান, ব্যাকরণ, অলঙ্কার শাস্ত্র ও সাহিত্য। আমরা যথাস্থানে এ সম্পর্কে আলোচনা করব।

এসব বর্ণিত শাস্ত্রাদির সব অংশই ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের সাথে সংশ্লিষ্ট। যদিও সাধারণভাবে সব ধর্মেই এমন শাস্ত্রাদির অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। যদি থাকে, তা হলে ওটা দূরতম জ্ঞাতি হিসেবে এর সাথে এ বিষয়ের মধ্যে অংশীদার হবে যে, এসবই মহান আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ধর্মীয় বিধানরূপে তার প্রবর্তকের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু বিশেষভাবে দেখতে গেলে এই ইসলামী শাস্ত্রাদি অন্য সব কিছু থেকে পৃথক; কেননা এটা অন্য সব ধর্মকে বাতিল করে দিয়েছে। এজন্যই ইসলাম-পূর্ববর্তী সব ধর্মীয় আলোচনা পরিত্যাক্ত। তাতে দৃষ্টিপাত করাও নিষিদ্ধ। ধর্মীয় বিধান কুরআন ছাড়া অন্য ধর্মগ্রন্থের আলোচনা করতে নিষেধ করেছে। হযরত মুহম্মদ (স) বলেছেন, তোমার গ্রন্থধারীদেরকে সত্যও বল না, মিথ্যাও বল না। বলো, আমরা বিশ্বাস করি, যা

আমাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তোমাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। আমাদের ও তোমাদের উপাস্য এক।[১৫] নবী (স) উমর (রা)-এর হাতে তৌরাতের একটি পৃষ্ঠা দেখে রাগ করেছেন এবং তার চিহ্ন তাঁর মুখমণ্ডলে প্রকাশ পেয়েছিল। তারপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের কাছে এ ধর্মকে উজ্জ্বল সুস্পষ্টভাবে আনয়ন করিনি? আল্লাহ্‌র কসম, আজ মুসা জীবিত থাকলে আমাকে অনুসরণ করা ছাড়া অন্যকিছু করতে পারতেন না।

অতঃপর এসব বর্ণিত শাস্ত্রের প্রসার এ উম্মতের মধ্যে যেভাবে হয়েছে, তার বেশি ধারণা করা যায় না। এতে অনুসন্ধানকারীদের দৃষ্টি এমন এক চরম সীমায় পৌঁছেছে, যার অতিরিক্ত কিছু আছে বলে মনে হয় না। এর পরিভাষাসমূহ সংস্কৃত হয়েছে, এর শাখা-প্রশাখাগুলো বিন্যস্ত হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্বের গন্তব্যে উপনীত হয়েছে। এর প্রতিটি শাখায় এমন ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা আদর্শ হিসেবে অনুসরণীয় এবং এমন সব গঠন-পদ্ধতি স্থিরকৃত হয়েছে, যা দিয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া সম্ভব। এসব বিষয় থেকে অনেকগুলোর সাথে পূর্বাঞ্চল ও অনেকগুলোর সাথে পশ্চিমাঞ্চল বিশিষ্ট হয়েছে। এসব বিখ্যাত শাস্ত্রাদি সম্পর্কে আমরা অচিরেই শাস্ত্রাদির পর্যায়ক্রমিক আলোচনা উল্লেখ করব।

বর্তমানকালে মাগরিবে শাস্ত্রাদির বাজারে মন্দা দেখা দিয়েছে। কারণ তার জনবসতি হ্রাস পেয়েছে, এবং তার শিক্ষা ও শিক্ষা-পদ্ধতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যেমন আমরা এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি। জানি না, আল্লাহ্ পূর্বাঞ্চলকে কী করবেন! তবে সাধারণ ধারণা এই যে, সেখানে শাস্ত্র ও শিক্ষা-পদ্ধতির ধারাবাহিকতা সংরক্ষিত হবে। সেখানে নাগরিকত্বের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় ও বিলাসী শিল্পসম্ভারেরও প্রাচুর্য থাকবে। কারণ বিপুল ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত খাদ্যপুষ্ট বিদ্যার্থীরা এসব ধারাকে সজীব রাখবে। পবিত্র ও মহান আল্লাহ তিনি তাঁর ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে অতিশয় পারঙ্গম এবং তাঁর হাতেই সাহায্য ও সহায়তা।

---

১৫. কোরান; ২৯, ৪৬।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[কুরআন সম্পর্কীয় এলমে তফসীর ও এলমে কেরাত]

কুরআন আল্লাহ্‌র নবীর ওপর অবতীর্ণ বাণীর সমষ্টি এবং গ্রন্থাকারে দুই মলাটের মধ্যবর্তী লিপিবদ্ধ অবস্থার নাম। এটি সুসংবদ্ধসূত্রে সমগ্র জাতির মধ্যে প্রচারিত। অবশ্য সাহাবীরা এটি রসূলুল্লাহ্ (স)-এর কাছ থেকে বর্ণনা করার সময় এর কতিপয় শব্দ, বর্ণের অবস্থান ও তাদের উচ্চারণের ক্ষেত্রে মতভেদ পোষণ করেছেন। এগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়ে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে সাতটি মত নির্দিষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য এ সাতটি মতও সুসংবদ্ধসূত্রে তাদের উচ্চারণসহ প্রচারিত হয়েছে এবং যারা এসব মতের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁদের সাথে সম্বন্ধযুক্তভাবে এগুলোকে এক বিরাট দল বর্ণনা করেছেন। এর ফলে এ সাতটি পাঠ এলমে কেরাতের ভিত্তি হিসেবে স্থিরীকৃতি হয়েছে। অনেক সময় এর বাইরেও কিছু সংখ্যক পাঠভেদ এসে উক্ত সাতটি পাঠের সাথে যুক্ত হয়। কিন্তু কেরাতশাস্ত্রবিদদের কাছে এ অতিরিক্তগুলোর বর্ণনাসূত্র তেমন প্রামাণ্য কিছু নয়।

কোরানের এ সাতটি পাঠ কেরাতশাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে সুপরিচিত। অনেকেই এ সাতটি পাঠের সুসংবদ্ধ বর্ণনা সূত্রের বিরোধিতা করেছেন। কারণ তা তাদের কাছে উচ্চারণের বৈচিত্র্য মাত্র; যার সুসমন্বিত কোন রূপ নেই। অবশ্য তা তাদের কাছে কোরানের সুসংবদ্ধ বর্ণনা সূত্রের জন্য কোন প্রকার ত্রুটি নয়। অন্য অনেকে এ মতকে অস্বীকার করে সাতটি পাঠের বিষয়টি সুসংবদ্ধভাবে বর্ণিত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আবার অনেকে উচ্চারণের বিষয়টি ছাড়া অন্যান্যগুলো, যেমন দীর্ঘস্বর ও হ্রস্ব স্বর ইত্যাদির ব্যাপারে ধারাবাহিক বর্ণনার কথা বলেছেন। কারণ কারও পক্ষে এ উচ্চারণ ভেদ শ্রবণ করা সম্ভব নয়। এটাই শুদ্ধ মত।

কেরাতশাস্ত্রবিদরা এভাবে এসব পাঠের ধারা ও সেগুলোর বর্ণনা অব্যাহত রেখেছিলেন। এর পর শাস্ত্রাদি লিপিবদ্ধ ও একত্রীকরণের যুগ দেখা দিল এবং যথাযথ ধারা অনুসারে গ্রন্থাদি রচনা করা হল। এর ফলে বিষয়টি একটি পৃথক শাস্ত্র ও বিশেষ জ্ঞানে পরিণত হল। মানুষ একে পূর্বাঞ্চল ও আন্দালুসে পুরুষানুক্রমে বর্ণনা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত পূর্ব আন্দালুসে আমেরীনদের আশ্রিতপোষ্যদের অন্যতম মুজাহিদের[১৬] শাসনকাল এসে উপস্থিত হল। ইনি কোরানের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ কেরাত সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। কারণ তাঁর

---

১৬. মৃত্যু ৪৩৬ (১০৪৫ খ্রি:) হি:।

পৃষ্ঠপোষক আল মনসুর ইবনে আবু আমের তাঁকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেছিলেন এবং যথারীতি শিক্ষাদানের মাধ্যমে তৎকালীন কেরাত বিশারদদের মধ্যে তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলতে চেয়েছিলেন। এর ফলে মুজাহিদ এই ব্যাপারে ব্যাপক দক্ষতার অধিকারী হন। এর পর মুজাহিদ দানিয়াও পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপগুলোর শাসক নিযুক্ত হন। তাঁর কল্যাণে সেখানে এলমে কেরাতের আলোচনা অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করে। তিনি স্বয়ং এ শাস্ত্রে একজন ইমাম বলে পরিগণিত ছিলেন। তদুপরি কেরাত সম্পর্কীয় এ বিশিষ্টতা ছাড়াও অন্যান্য শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পণ্ডিত্য ছিল। এর ফলে তাঁর সময়ে আবু আমর দানীর[১৭] আবির্ভাব ঘটে এবং ইনি শাস্ত্রকে চরম সীমায় উন্নীত করেন। শেষ পর্যন্ত এলমে কেরাত সম্পর্কীয় জ্ঞানের জন্য তাঁকেই আদর্শরূপে গণ্য করা হত এবং এ সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্র-প্রমাণ বর্ণনা ক্ষেত্রে তাঁকেই নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হত। তাঁর এ সম্পর্কীয় রচনাকর্মও একাধিক। ফলত মানুষ অন্য সবাইকে ত্যাগ করে এ শাস্ত্রে দানীকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করে এবং অন্য সব রচনা বাদ দিয়ে তাঁর গ্রন্থ 'কিতাবুল্ তাইসীর'কে পাঠ্য হিসেবে বরণ করে নেয়।

অতঃপর এর সন্নিহিত বিভিন্ন যুগ ও পুরুষানুক্রম অতিক্রম করে সাতিবার অধিবাসী আবুল কাসেম ইবনে ফীর্রুর[১৮] আবির্ভাব ঘটে এবং তিনি পূর্বোক্ত আবু আমরের রচনাবলির সংস্কার করে তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করতে সচেষ্ট হন। তিনি এ উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ পদ্য রচনা করে তাতে কেরাতশাস্ত্রবিদদের নাম আরবি বর্ণমালার ধারা অনুসারে বিবৃত করেন এবং তা যাতে সংক্ষিপ্ত ও সারল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়, সে জন্য প্রচেষ্টা চালান। এর ফলে পদ্যটি সহজে কণ্ঠস্থ করার উপযোগী হয়ে উঠে। তিনি এতে কেরাতশাস্ত্রকে এক ক্ষুদ্র আধারে সন্নিবেশিত করার প্রয়াসে সাফল্য লাভ করেন। এ কারণেই মানুষ একে মুখস্থ করতে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি শিক্ষার্থীদের জন্য এটি পাঠ্য হিসেবে নির্ধারিত করতে তৎপর হয়। এর ফলে তদবধি এ পদ্যটি মাগরিব ও আন্দালুসের শহরগুলোতে পাঠ্য হিসেবে বিদ্যমান।

অনেক সময় এ কেরাতশাস্ত্রের সাথে আরবি লিপিশাস্ত্রকেও যোগ করা হয়। এতে কুরআনে ব্যবহৃত আরবি বর্ণমালার গড়ন ও তাদের রেখা-বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হয়। কারণ সেখানে এমন অনেক বর্ণ ও তার রেখা-বিন্যাস বিদ্যমান, যা সাধারণ ধারার ব্যতিক্রম। যেমন 'বেআয়দি' বাক্যাংশে একটি অতিরিক্ত 'ইয়া' এবং 'লা আজবাহান্নাহু' ও 'লা আউযাউ' বাক্য দুটিতে অতিরিক্ত 'আলেফ' রয়েছে।[১৯] অনুরূপভাবে 'জাযাউজ্জালেমিন'[২০] বাক্যাংশে একটি 'ওয়াউ' ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক স্থানে 'আলেফ' বর্ণটি উহ্য, আবার অনেক স্থানে তা প্রকাশ্য। 'তে' বর্ণটি অনেক স্থানে লম্বা করে লেখা হয়েছে; অথচ তা যথানিয়মে উপরে দুটি ফোঁটাসহ 'হে'র আকারে লেখা উচিত। এমন অন্যান্য বিষয়। আমরা লিপিসম্পর্কীয় আলোচনার সময় কোরানের এ লিপি-বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছি।

---

১৭. উসমান ইবনে সায়িদ; ৩৭২-৪৪৪ (৯৮৩-১০৫৩ খ্রি:) হি:।
১৮. ৫৪৮-৯০ (১১৪৪-৯৪ খ্রি:) হি:।
১৯. পূর্ব হতে যথাক্রমে কোরান; ৫১; ৪৭; ২৭, ২১; ৯, ৪৭ দ্র :।
২০. কোরান; ৫, ২৯;৫৯, ১৭।

সুতরাং এসব বিষয় যখন লিপির সাধারণ গড়ন ও তার নিয়মাবলির বিরোধী বলে পরিচিত হল, তখন এগুলোকে সংখ্যায়িত করে সুনির্দিষ্ট করার প্রয়োজন দেখা দিল। মানুষ এ উদ্দেশ্য সাধনে গ্রন্থ রচনা করল এবং শেষ পর্যন্ত তা পূর্বোল্লেখিত মাগরিবের আবু আমর দানীর হাতে এসে পৌঁছল। তিনি বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বহু পুস্তিকা রচনা করলেন। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'কিতাবুল মুকনী'। মানুষের কাছে এটা খুবই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হল এবং তারা এর ওপর নির্ভরও করল। তারপর এ বিষয়টিকে পূর্বোক্ত আবুল কাসেম সাতেবী 'রে' বর্ণের অন্ত্যমিলে একটি বিখ্যাত পদ্যে বর্ণনা করলেন। মানুষ খুব আগ্রহসহকারে তাকে কণ্ঠস্থ করতে লাগল। আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে নাজাহ্[২১] এ বিষয়ে তাঁর গ্রন্থ আলোচনা করেছেন। ইনি মুজাহিদের আশ্রিত পোষ্য এবং আবু আমর দানীর শিষ্য ছিলেন। দানীর শিক্ষা ও গ্রন্থাদির বর্ণনাকারী হিসেবেই ইনি সমধিক পরিচিত।

অতঃপর এ বিষয়ে আরও মতভেদ দেখা দিল। উত্তরসূরিদের মধ্যে মাগরিবে আল খার্রাজ[২২] 'রেজাখ' ছন্দে এসব লিপিগত বৈষম্য নিয়ে একটি পদ্য রচনা করলেন। তাতে তিনি পূর্বোক্ত 'কিতাবুল মুকনী'র অতিরিক্ত অনেক লিপি-বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এর মধ্যে এই নতুন বৈষম্যের উল্লেখকারীদের সূত্রও বিদ্যমান ছিল। পদ্যটি মাগরিবে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং মানুষ আগ্রহসহকারে একে কণ্ঠস্থ করার জন্য গ্রহণ করে। এর ফলে আবু দাউদ, আবু আমর ও সাতেবীর গ্রন্থাদি পরিত্যক্ত বলে বিবেচিত হয়। অন্তত লিপিসংক্রান্ত ব্যাপারে এ অবস্থা তাদের মধ্যে দেখা দেয়।

তফসীর

অতঃপর তফসীর সম্পর্কে বলতে গেলে, জেনে রাখুন, কুরআন আরবের ভাষায় ও তাদের বাকবৈদগ্ধ্য অনুসারেই অবতীর্ণ হয়েছিল। এর ফলে তাদের প্রত্যেকেই এর অর্থ বুঝতে পারত এবং এর একক শব্দাবলির অর্থ ও বাকবিন্যাসের তাৎপর্যও হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হত। কুরআন বিভিন্ন উপলক্ষের পরিপ্রেক্ষিত আল্লাহ্‌র একত্ব ও নানাপ্রকার কর্তব্য নির্দেশে অংশ ও শ্লোকপরম্পরায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে যেমন নিছক বিশ্বাস-নির্ভর ধারণা আছে, তেমনি আছে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক বিধিনিষেধ। এর মধ্যে অনেক নির্দেশ পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে ও অনেকগুলো পরে এবং এ পরবর্তীগুলো অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী নির্দেশকে রহিত করেছে। নবী (স) এসব সম্পর্কীয় সব কিছুই তাদের জন্য বিশদ করতেন। যেমন আল্লাহ্ মহান বলেছেন, 'যাতে তুমি তাদের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়াদি বিশদ করতে পার।'[২৩] সুতরাং নবী (স) সংক্ষিপ্ত বিষয়কে বিশদ করতেন, রহিতকারী ও রহিতকৃত বিষয়াদির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতেন এবং সাহাবীদেরকে তা বুঝিয়ে দিতেন। তাঁরা বুঝতে পারতেন এবং বিভিন্ন আয়াত অবতরণের কারণ ও এর যথার্থ উদ্দেশ্য তাঁর কাছ থেকে বর্ণনার মাধ্যমে জেনে

২১. ৪১৩-৯৬ (১০২২-১১০৩ খ্রি:) হিঃ।
২২. মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ; ৭০৩ (১৩০৫ খ্রি:) হি: (?)
২৩. কোরান; ১৬, ৪৪।

নিতে সমর্থ হতেন। যেমন মহান আল্লাহ্‌র এ বাণী—'যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসবে'[২৪]—থেকে জানা গিয়েছিল যে, এটি নবী (স)-এর তিরোধানের ইঙ্গিত। এরূপ অন্যান্য বিষয়।

এসব বিষয় সাহাবীদের—আল্লাহ্ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন—কাছ থেকে যথা নিয়মে বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁদের পরবর্তীকালে তাবেয়ীগণও এসব বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত রয়েছেন। তাঁদের কাছ থেকেও এগুলো যথারীতি বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে পূর্বসূরিদের প্রাথমিক স্তরে এর পর্যালোচনা অব্যাহত থাকে এবং ক্রমশ সুপরিচিত বিষয়গুলো নিয়ে শাস্ত্র গড়ে ওঠে। বিভিন্ন গ্রন্থ সংকলিত হয় এবং অনেকেই এ বিষয়ে লিখতে আরম্ভ করেন। এসব বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদ সাহাবী ও তাবেয়ীদের কাছ থেকে বর্ণনা করা হয়। শেষ পর্যন্ত এটি এসে তাবারী, ওয়াকেদী, সালাবী এবং তাদের ন্যায় অন্যান্য কুরআন ব্যাখ্যাতাদের কাছে পৌঁছে। তাঁরা এ বিষয় নিয়ে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় যতদূর সম্ভব বিচিত্র সংবাদাদি পরিবেশন করেন।

অতঃপর ভাষা সম্পর্কীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকর্মের পর্যায়ে চলে আসে। কোরানের বাণীতে ব্যবহৃত শব্দাবলির আভিধানিক অর্থ এবং বাকবিন্যাসে স্বরচিহ্ন ও অলঙ্কারাদির প্রয়োগ সম্পর্কীয় আলোচনা আরম্ভ হয়। এ বিষয় নিয়েও নানাবিধ সংকলন গ্রন্থ রচিত হয়। যেহেতু এসব বিষয়ে আরবদের স্বাভাবিক যোগ্যতা থাকায় তারা কোন প্রকার বর্ণনা বা গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভব করত না, সুতরাং তাদের উৎসাহের অভাবে মানুষ এসব বিষয় ভুলে যেতে থাকায় আরবি ভাষাভাষীদের গ্রন্থাবলি থেকে তার প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ করা হল। কোরানের ব্যাখ্যার ব্যাপারেও এগুলোর প্রয়োজন দেখা দিল। কারণ কুরআনও আরবদের ভাষায় এবং তাদের আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

এসব বিষয়ের তাগিদে কোরানের তফসীর দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। এর এক ভাগ হল বর্ণিত বিষয়াদি সম্বলিত তফসীর; যা পূর্বসূরিদের কাছ থেকে বর্ণনাসূত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংবাদের সমষ্টিমাত্র। এসব তফসীরে মূলত কোরানের রহিতকারী ও রহিতকৃত বিষয়াদি, অবতরণের কারণ ও বিভিন্ন আয়াতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় এবং এসব বিষয় সম্পর্কীয় জ্ঞান একমাত্র সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে বর্ণনার মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে। পূর্বসূরিগণ এ সব বিষয়ে প্রচুর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন এবং যথাসম্ভব সুবিন্যস্ত আকারে একত্র করেছেন। অবশ্য এসব সত্ত্বেও তাঁদের গ্রন্থাবলি ও বর্ণিত বিষয়সমূহের মধ্যে ভাল, মন্দ এবং গ্রহণযোগ্য ও বর্জনযোগ্য উভয় প্রকার সামগ্রীই বিদ্যমান।

এর কারণ এই যে, আরবরা গ্রন্থ ও শাস্ত্রাদির কোন ধার ধারত না। তাদের প্রকৃতিতে প্রান্তরীয় জীবন ও নিরক্ষতার প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। সুতরাং তারা যখন সাধারণ মানবীয় ঔৎসুক্যের তাড়নায় সৃষ্টির কার্যকারণ, পৃথিবীর প্রারম্ভ, জীবনের রহস্য প্রভৃতি জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করত, তখন স্বভাবতই তারা তাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থধারীদের কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত এবং তাদের দ্বারা প্রদত্ত সংবাদে নিজেদের

২৪. কোরান; ১১০, ১।

উৎসুক্য লাঘব করত। এসব গ্রন্থধারী ব্যক্তি তৌরাতের অনুসারী ইহুদী এবং তাদের পরবর্তী ধর্মানুসারী খ্রিস্টান। আরবদের মধ্যে অবস্থানকারী তৌরাতের অনুসারীরাও তাদের ন্যায় যাযাবর জীবনের অধিকারী ছিল। তারা এসব ব্যাপারে সাধারণ গ্রন্থধারীদের ন্যায়ই সহজ জ্ঞানের অধিকারী ছিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ইহুদী ধর্মগ্রহণকারী হিমিয়ার বংশীয় লোক। তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পরও এমন সব ধ্যান-ধারণা পোষণ করত, যার সাথে ধর্মীয় বিধি-বিধানের কোন সম্পর্ক ছিল না। যেমন সৃষ্টির প্রারম্ভ সম্পর্কীয় ধারণা, ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য বিষয়াদির বাণী ও আভাস এবং এমন অন্যান্য বিষয়। এ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে কাব আল আহবার[২৫] ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ,[২৬] আবদুল্লাহ ইবনে সাল্লাম[২৭] ও অনুরূপ অন্যান্যদের নাম উল্লেখযোগ্য।

ফলত এ শ্রেণীর লোকদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির বর্ণনায় তফসীর গ্রন্থসমূহ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সংগৃহীত এসব বর্ণনার উৎস তারাই এবং এগুলো এমন বিধি-নিষেধ সম্পর্কীয়ও নয়, যাতে এগুলো কার্যকরী করার জন্য অনুসন্ধান পূর্বক শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ধারণ করা যেতে পারে। কুরআন ব্যাখ্যাতারা এ ব্যাপারে অনুরূপ কারণেই শৈথিল্য দেখিয়ে এ জাতীয় বর্ণনার দ্বারা তাদের তফসীর গ্রন্থগুলো পূর্ণ করে তুলেছেন। এসব বর্ণনার মূল ভিত্তি, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি, সেই তৌরাতের অনুসারীদের জ্ঞান, যারা যাযাবরী জীবনচর্চায় অভ্যস্ত। তাদের কাছ থেকে বর্ণিত এসব বিষয়ের সত্যতা নির্ধারণের জন্য তাদের খ্যাতি ও ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন প্রামাণ্য উপকরণ নেই। যেহেতু তারা নিজ ধর্ম ও জাতির কাছে বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ও খ্যাতির অধিকারী, সুতরাং তাদের কাছ থেকে এসব বিষয় গ্রহণ করতে কোন অসুবিধার কথা মনে হয়নি।

কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে মানুষ এসব বিষয় নিয়ে বিচার-বিবেচনার সম্মুখীন হয়েছে। মাগরিব অঞ্চলে উত্তরসূরিদের মধ্যে আবু মোহাম্মদ ইবনে আতিয়া[২৮] এ শ্রেণীর সব তফসীর গ্রন্থের বিষয়াবলিকে সংগ্রহ করে তাদের মধ্যে সম্ভাব্য শুদ্ধ বিষয়কে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি এসব বিষয়ে সুন্দরভাবে একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন, যা মাগরিব ও আন্দালুসে খুবই সুপ্রচলিত হয়েছে। তাঁকে অনুসরণ করে কুরতবী[২৯]ও অনুরূপভাবে একই প্রক্রিয়ায় একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা পূর্বাঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

তফসীরের দ্বিতীয় শ্রেণীটি হল মূলত ভাষা সম্পর্কীয়। এতে শব্দার্থ, স্বরচিহ্ন, অলঙ্কারশাস্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে যথানিয়মে কোরানের বক্তব্যের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তফসীরের এ শ্রেণীটি তুলনামূলকভাবে প্রথমটি থেকে কম সংখ্যক। কারণ প্রথম শ্রেণীর তফসীরের বিবরণধারাই কুরআন ব্যাখ্যার মূল লক্ষ্য। তদুপরি এ দ্বিতীয় শ্রেণীর বিষয় একমাত্র ভাষা সম্পর্কীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকর্মে পরিণত

২৫. প্রথম অধ্যায়ের ৪৩ নং টীকা দ্র:।
২৬. পূর্বোক্ত।
২৭. আবদ আল্লাহ্ ইবনে সালাম।
২৮. আবদুল হক ইবনে গালেব; ৪৮১-৫৪২ (১০৮৮-১১৪৭ খ্রি:) হি:।
২৯. মুহম্মদ ইবিনে আহমদ ইবনে ফরাহ; মৃত্যু ৬৭১ (১২৭৩ খ্রি:) হি:।

হওয়ার পরই উদ্ভাবিত হয়েছে। অবশ্য অনেক তফসীরকার আনুষঙ্গিক বিষয় হিসেবে এগুলোর বর্ণনায় অনেক স্থানে ব্রতী হয়েছে।

এ বিষয়কে মূল উপজীব্য করে সর্বাপেক্ষা সুন্দর যে তফসীরটি রচিত হয়েছে তার নাম 'আল কাশ্‌শাফ'। এর রচয়িতা ইরাকের খোয়ারজম নিবাসী আল্লামা জমখশরী।[৩০] ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে ইনি মুতাজেলাপন্থী। এর ফলে উক্ত তফসীরকার কোরানের বিভিন্ন আয়াতে যেখানে বিরোধের ব্যাপার আছে, সেখানে অলঙ্কারশাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে মুতাজেলাদের বিকৃত মতবাদকে প্রতিষ্ঠা দান করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ কারণে আহলে সুন্নতের বিশেষজ্ঞরা এ তফসীর সম্পর্কে উদাসীনতা প্রদর্শন করেন এবং সাধারণ পাঠককে তার ফাঁদগুলো থেকে সতর্ক থাকতে উপদেশ দেন। অবশ্য এসব সত্ত্বেও তাঁরা উক্ত তফসীরটির ভাষা ও অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কীয় নির্ভরযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। পাঠক যদি এ তফসীর পাঠের সঙ্গে সঙ্গে আহলে সুন্নতের মাতদর্শ সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় যুক্তি-প্রমাণের জ্ঞান তার থাকে, তা হলে অবশ্যই যে উক্ত তফসীরে বর্ণিত বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। বস্তুত অনুরূপ অবস্থায় তার উচিত এ তফসীর থেকে উপকৃত হওয়া; কারণ ভাষা সম্পর্কীয় বিরল জ্ঞানসম্ভারে এটা পরিপূর্ণ।

সাম্প্রতিককালে ইরাকের এক বিজ্ঞব্যক্তির রচনা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। তাঁর নাম শরফউদ্দিন তৈয়বী[৩১] এবং তিনি ইরাক আজমের তাবরিজের অধিবাসী। তিনি তাঁর রচনায় জমখশরীর গ্রন্থের ব্যাখ্যা করে আক্ষরিক দিক থেকে তাঁকে অনুসরণ করেছেন বটে; কিন্তু মতাদর্শের ক্ষেত্রে মুতাজেলাবাদকে যোগ্য যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তিনি এটিও বিশদ করেছেন যে, কোরানের আয়াতের অন্তর্গত অলঙ্কারশাস্ত্র সেই বক্তব্যকেই উপস্থিত করে, যা আহলে সুন্নতের; মুতাজেলাদের নয়। তিনি সমস্ত আলঙ্কারিক শস্ত্রজ্ঞানসহ এদিক থেকে একটি উত্তম কাজ করেছেন। বস্তুত তিনি সব জ্ঞানী অপেক্ষা বেশি জ্ঞানী।[৩২]

৩০. ৪২ নং টীকা দ্র:।
৩১. হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ্; মৃত্যু ৭৪৩ (১৩৪৩ খ্রি:) হি:।
৩২. কোরান; ১২, ৭৬।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

[হাদীস সম্পর্কীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি]

হাদীস সম্পর্কীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংখ্যা প্রচুর এবং নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। তার মধ্যে রহিতকারী ও রহিতকৃত হাদীস সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করা। কেননা আমাদের ধর্মীয় বিধানে এ রহিতকরণের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি যা কিছু নির্দেশ করেছেন, তাতে অনুগ্রহ প্রদর্শন ও সহজীকরণের জন্য তিনি পুনরায় নির্দেশ প্রদান করে থাকেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আমরা এজন্যই কোন আয়াতকে রহিত করি অথবা ভুলিয়ে দেই, যাতে তার চেয়ে ভাল কিছু, অথবা তার অনুরূপ কিছু আনয়ন করতে পারি।'[৩৩]

বস্তুত রহিতকারী ও রহিতকৃত বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যদিও কুরআন ও হাদীসের ক্ষেত্রে সাধারণ, তবুও কোরানের সাথে সংশ্লিষ্ট এ বিষয়াটি তফসীর গ্রন্থগুলোতে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত হয়েছে এবং হাদীসের ক্ষেত্রে তা বিভিন্ন শাস্ত্রালোচনার ওপর নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে। সুতরাং যখন দুটি হাদীস আদেশ ও নিষেধ সংক্রান্ত ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় এবং কোন প্রচার ব্যাখ্যার সাহায্যেও তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন সম্ভবপর হয়ে ওঠে না তখন ওগুলোর মধ্যে অগ্র-পশ্চাতের বিষয়টি স্থির করতে হয় এবং তার মাধ্যমে অগ্রবর্তীটি রহিতকৃত ও পশ্চাদ্বর্তীটি রহিতকারী হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে।

এ বিষয়টি হাদীসশাস্ত্রে খুবই কঠিন। যুহরী বলেছেন, ধর্মশাস্ত্রবিদগণ রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসের মধ্যে রহিত অরহিতের বিষয়টি জানতে গিয়ে খুবই দুরবস্থা ও অসম্ভাব্যতার সম্মুখীন হয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী এ ব্যাপারে অদ্ভুত দক্ষতার অধিকারী ছিলেন।

হাদীস[৩৫] শাস্ত্রের একটি দিক হল বর্ণনাসূত্রের বিচার-বিবেচনা এবং সূত্রান্তর্গত পূর্ণ তাদির প্রাপ্তির ভিত্তিতে হাদীসের বিষয়বস্তু অবশ্য পালনীয় প্রকৃতির জ্ঞান লাভ করা।

---

৩৩. কোরান; ২, ১০৬।

৩৫. নিম্নের কয়েকটি অনুচ্ছেদের একটি ভিন্ন পাঠ রোজেনথালে বিদ্যমান। আমাদের ব্যবহৃত পাঠটি তিনি পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন এবং তিনি মনে করেন এ পাঠটি পরে সংশোধিত হয়। আমাদের ব্যবহৃত মূল সংস্করণের পাদটীকাতেও এ সংশোধিত পাঠটি বিদ্যমান। সুতরাং গ্রন্থের সম্পূর্ণতার প্রয়োজনে আমরা এর অনুবাদ নিম্নে সন্নিবেশিত করছি।
হাদিসশাস্ত্রের একটি দিক হল সেসব নীতির জ্ঞান লাভ করা যা নেতৃস্থানীয় হাদিসবিদগণ বর্ণনাসূত্র সূত্রান্তর্গত ব্যক্তিবর্গ, তাদের নাম, তাদের পরস্পর হতে হাদিস গ্রহণের ধারা, তাদের

কারণ হাদীসের মর্মানুযায়ী বিধি-নিষেধ তখনই অবশ্য পালনীয় বলে গণ্য হবে, যখন তার সম্পর্কে এ বিশ্বাস জন্মাবে যে, সত্যই তা হযরত মুহম্মদ (স)-এর কাছ থেকে

অবস্থা ও শ্রেণী এবং তাদের পরিভাষার তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য প্রবর্তন করেছেন। এর ফলাফলের গুরুত্ব এদিক হতে যে, সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে সেই হাদিসের নির্দেশ অবশ্য পালনীয় হওয়ার জন্য এর সত্যতা সম্পর্কে প্রতীতি জন্মানো প্রয়োজন। সুতরাং গবেষককে অনুরূপ প্রতীতির জন্য অবশ্যই এর সূত্র বিচার করে দেখতে হবে। এটা করতে গিয়ে তারা হাদিসের সূত্রাদি পরীক্ষা করবেন; সূত্রান্তর্গত ব্যক্তিবর্গকে ন্যায়নিষ্ঠা, দৃঢ়তা, বিশ্বস্ততা, ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্তি এবং এসব সম্পর্কে ন্যায়নিষ্ঠ নেতৃস্থানীয় হাদিসবিদদের মন্তব্য অনুধাবন করে বিশ্লেষণ করবেন। অতঃপর এ ব্যাপারে তাদের স্তরভেদ : তাদের পরস্পরের কাছ থেকে হাদিস গ্রহণের ধারা, যথা—উস্তাদের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ, তার সামনে উস্তাদের হাদীস পাঠ, উস্তাদের সম্মুখে তার হাদিস পাঠ, তাকে উস্তাদ কর্তৃক হাদিস লিখে দেয়া, লিখে নিতে সাহায্য করা, অনুমতি দেয়া এবং এসব সংক্রান্ত বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে উস্তাদদের মন্তব্য বিচার করে দেখতে হবে।

হাদিসশাস্ত্রবিদদের মতানুসারে সর্বোচ্চ মর্যাদার হাদিস হল 'সহিহ' (শুদ্ধ), এর পর 'হাসান' (ভাল) এবং সর্বনিম্ন মর্যাদার হাদিস 'জয়ীফ' (দুর্বল) বলে খ্যাত। এ সর্বনিম্ন স্তরটিতে 'মুরসাল' (একজনের দ্বারা বিচ্ছিন্ন), 'মুনকাতি' (একসূত্র বিচ্ছিন্ন), 'মুঘাল' (দুসূত্র বিচ্ছিন্ন), 'মুআল্লাল' (কোন প্রকার অনিশ্চয়তা যুক্ত), 'শাখ' (একক), 'গরিব' (বিরল) ও 'মুনকার' (সন্দেহযুক্ত) প্রভৃতি হাদিস বিদ্যমান। এদের মধ্যে অনেকগুলো বর্জন ও অনেকগুলোর গ্রহণ সম্পর্কে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সহিহ হাদিস সম্পর্কেও তাদের এ প্রকার মতানৈক্য বিদ্যমান। অনেকে এর গ্রহণযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে একমত হয়েছেন; আবার অনেকে এ ব্যাপারে মতভেদ উপস্থাপন করেছেন। তাদের মধ্যে প্রচলিত এসব সম্পর্কীয় পরিভাষা নিয়েও মতানৈক্যের অন্ত নেই।

অতঃপর তারা হাদিসের অন্তর্গত বক্তব্যে ব্যবহৃত শব্দাবলি বিচারের ক্ষেত্রেও এধারা অনুসরণ করেছেন। এর ফলে বক্তব্যের অসুবিধাগুলো পরিচয়ের জন্য 'গরিব' (অস্বাভাবিক), 'মুশকিল' (কষ্টসাধ্য), 'তাসহিফ (বিকৃত), 'মুকতারিক' (বিচ্ছিন্ন), 'মুখতালিফ' (দ্ব্যর্থবোধক) প্রভৃতি পরিভাষার সৃষ্টি করেছেন। তারা এসব বিষয়ের প্রতিটির জন্য পৃথক পরিচ্ছেদের সৃষ্টি করে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা নির্ধারণ করে গিয়েছেন। যাতে এসব বিষয়ের মর্যাদা, শিরোনাম, সূত্রান্তর্গত ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে মুক্তি সম্ভব হতে পারে।

নেতৃস্থানীয় হাদিসশাস্ত্রবিদদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম এসব বিষয় নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, তিনি আবু আবদুল্লাহ্ হাকেম। বস্তুত তিনিই এসব নীতিকে সংশোধিত ও সংমার্জিত আকারে পরিবেশন করেন। এ ব্যাপারে তার রচনাবলি সর্বজন পরিচিত। অতঃপর নেতৃস্থানীয় বহু হাদীসশাস্ত্রবিদ এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। উত্তরসূরিদের মধ্যে এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থপ্রণেতা হলেন আবু আমর ইবনে সেলাহ। তিনি সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে জীবিত ছিলেন। মহীউদ্দিন আন নববী অনুরূপ দক্ষতার সাথে তাঁকে অনুসরণ করেন।

এ শাস্ত্রটি এর বিষয়বস্তুর দিক থেকে অতিশয় সম্ভ্রান্ত। কেননা এর মাধ্যমেই ধর্মপ্রবর্তকের কাছ থেকে বর্ণিত হাদিসসমূহকে বিচার করে গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা সংরক্ষিত করার জ্ঞান লাভ হয়।

পাঠক, জেনে রাখুন, সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে হাদিস বর্ণনাকারীদের পরিচয় সমগ্র ইসলামী শহর-নগরে সুবিদিত। তাঁদের মধ্যে অনেকে হেজাজে, অনেকে কুফায়, অনেকে বসরায়, অনেকে সিরিয়া ও মিশরে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁদের সকলেই সমসাময়িককালে সর্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। এক্ষেত্রে হেজাজবাসীদের হাদিস বর্ণনার দ্বারা অন্য সকলের অপেক্ষা উচ্চ পর্যায়ের ছিল। তাঁরা সূত্র, মূল বক্তব্য প্রভৃতির ব্যাপারে বিশুদ্ধতার জন্য কঠোর নিয়ম পালন করতেন। তাঁরা বর্ণনায় শর্তাদির ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠা ও দৃঢ়তাকে অত্যধিক মূল্য দিতেন। অপরিচিত ও অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে তাঁরা হাদিস গ্রহণ করতে সর্বদা দ্বিধান্বিত হতেন।

বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যে সূত্র-বিচারে এ প্রয়োজনীয় বিশ্বাস জন্মায়, তার সম্পর্কে অবশ্যই খোঁজ-খবর নিতে হবে। এটা আর কিছু নয়, হাদীস বর্ণনাকরীদের সততা ও দৃঢ়তা পরীক্ষা করা মাত্র। এ ক্ষেত্রে একমাত্র সে সব বিশিষ্ট ধর্মপ্রাণ জ্ঞানীদের মতামত দ্বারাই এ বিশ্বাস উৎপাদন হতে পারে, যারা তাদের ন্যায়নিষ্ঠার জন্য দোষত্রুটি মুক্ত রয়েছেন। এরূপভাবে সূত্রবিচারের ফলাফল দ্বারাই আমরা সংশ্লিষ্ট হাদীসটি গ্রহণ ও বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।

এসব হাদীস বর্ণনাকরীদের মধ্যে সাহাবী ও তাবেয়ীগণও রয়েছেন। তাঁদের মধ্যেও এ ব্যাপারে স্তরবিন্যাস ও পার্থক্য সৃষ্টির প্রয়োজন এবং এ অনুসারে প্রত্যেককে বিবেচনা করা দরকার। অনুরূপ বর্ণনাসূত্র কখনও সংযুক্ত এবং কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা দেয়। যেমন বর্ণনাকারী যার কাছ থেকে বর্ণনা করছে, তার চাক্ষুস সাক্ষাৎ পায় না। অনেক সময় হাদীসের মধ্যকার ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনাসূত্রকে দুর্বল করে তোলে এবং তা সূত্রকে দ্বিধাবিভক্ত করে দেয়। এদের মধ্যে সর্বোচ্চটি গ্রহণ এবং সর্বনিম্নটি বর্জনযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এর মধ্যবর্তী অবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে মতানৈক্য বিদ্যমান। তারা হাদীসের এমন বিভিন্ন অবস্থা বোঝানোর জন্য কিছু সংখ্যক পরিভাষার সৃষ্টি করেছেন। যেমন 'সহিহ' (শুদ্ধ), 'হাসান' (ভাল), 'জয়ীফ' (দুর্বল), 'মুরসাল' (একজনের দ্বারা বিচ্ছিন্ন), 'মুনকাতি' (একসূত্র বিচ্ছিন্ন) 'মুঘাল' (দুসূত্র বিচ্ছিন্ন), 'শাঘ' (একক), 'গরিব' (বিরল) এবং এমন আরও অনেক পরিভাষা, যা তাদের মধ্যে সুপ্রচলিত। তারা এর প্রতিটি নিয়ে একটি অধ্যায়ের সূচনা করেছেন এবং তার মধ্যে ভাষাবিদদের সংশ্লিষ্ট মতামত বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বর্ণনাকারীদের একে অপরের কাছ থেকে গ্রহণের পর্যায়টি তারা বিবেচনা করেছেন। তারা কি পাঠের মাধ্যমে, লিপির দ্বারা, লিপিকৃত বিষয়াদির ওপর অনুমতি গ্রহণ অথবা কিছু সংখ্যক হাদীস অন্যকে শিক্ষা দিবার অনুমতিপত্র লাভের সাহায্যে এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন! তদুপরি এসব বিষয়ে পর্যায়ক্রমেরও তারতম্য বিদ্যমান। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের এ সম্পর্কে গ্রহণ-বর্জনের যে মতানৈক্য বিদ্যমান, তাও আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

এর পর তারা এসব বিষয়কে অনুসরণ করে হাদীসের মূল বক্তব্যের অন্তর্গত শব্দাবলির বিবেচনা করতে অগ্রসর হয়েছেন। এক্ষেত্রেও 'গরিব' (বিরল), 'মুশকিল' (কষ্টসাধ্য), 'তাসহিফ' (বিকৃত), 'মুফতারিক' (বিচ্ছিন্ন), 'মুখতালিফ' (দ্ব্যর্থবোধক) এবং অনুরূপ অন্যান্য পরিভাষা বিদ্যমান। এগুলোই, যাতে হাদীসশাস্ত্রবিদরা সাধারণভাবে তাদের বিচার-বিবেচনা প্রয়োগ করে থাকেন।

সাহাবী ও তাবেয়ীদের সময়ে হাদীস বর্ণনাকারীদের অবস্থা স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে সুপরিচিত ছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই হিজাজে, অনেকে বসরায়, অনেকে কুফায় এবং অনেকে সিরিয়া ও মিশরে অবস্থান করছিলেন। তাদের সকলেই সমসাময়িককালের কাছে পরিচিত ছিলেন। এক্ষেত্রে হিজাজবাসীদের বর্ণনাসূত্র সমসাময়িক অন্য দলের অপেক্ষা উচ্চ পর্যায় এবং বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে শুদ্ধতর অবস্থায় বিরাজমান ছিল। কারণ তাঁরা বর্ণনাসূত্রের মধ্যে ন্যায় ও সততাকে অতিশয় কঠোরতার

সাথে পালন করতেন এবং অপরিচিত অবজ্ঞাত কারও কাছে কোন প্রকার হাদীস গ্রহণ করতেন না।

এ হিজাজী বর্ণনাধারায় পূর্বসূরিদের পরবর্তী পর্যায়ে নেতৃত্ব দেন ইমাম মালেক (রা)। তিনি মদিনার বিজ্ঞজন ছিলেন। তারপর তাঁর সহচরবৃন্দের মধ্যে ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ মুহম্মদ ইবনে ইদরিস শাফেয়ী (রা) ইবনে ওহাব'[৩৬] ইবনে বুকাইর,[৩৭] আল কানী,[৩৮] মুহম্মদ ইবনে হাসান[৩৯] এবং তাঁদের পরবর্তীকালে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও তাঁদের তুল্য অন্যান্য জ্ঞানীরা এ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।

এ শাস্ত্রালোচনার প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় বিধানসমূহ একান্ত শ্রুতিনির্ভর মাত্র ছিল। পূর্বসূরিরা এ ব্যাপারে নিয়োজিত হয়ে যথার্থ শুদ্ধ সূত্রাদি খুঁজে বের করতেন এবং তাকে পরিপূর্ণতা দান করতেন। ইমাম মালেক (রহঃ) তাঁর 'মুয়াত্তা' গ্রন্থ রচনা করলেন এবং তাতে তিনি সর্বসম্মত শুদ্ধ বিধি-বিধানসমূহ একত্র করে তাকে ফেকাহ্শাস্ত্রের ধারা অনুসারে অধ্যায়ে বিভক্ত করলেন। এর পর হাদীস কণ্ঠস্থকারীগণ হাদীস বর্ণনার বিভিন্ন ধারা ও তার সূত্রাদির বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করতে সচেষ্ট হলেন। এর ফলে দেখা গেল, অনেক সময় একটি হাদীসই বিভিন্ন বর্ণনাকারী ও বিচিত্র সূত্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে এবং অনেক সময় তার অন্তর্গত বিচিত্র বিষয়ের জন্য একাধিক অধ্যায়ে বর্ণিত হওয়ার যোগ্যতা বহন করছে। এ সময়ে তৎকালীন হাদীসশাস্ত্রবিদদের শিরোমণি ইমাম মুহম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারি আবির্ভূত হলেন। তিনি তাঁর সূত্রসিদ্ধ সংকলনে হিজাজী, ইরাকী ও সিরিয়াবী তথা সব ধারায় প্রাপ্ত সব হাদীসকে বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করে লিপিবদ্ধ করলেন। তিনি তাঁদের সকলের ঐকমত্যের দ্বারা বর্ণিত হাদীসগুলোই সংগ্রহ করেছিলেন এবং যাতে মতভেদ ছিল তা পরিহার করেছিলেন। তাঁর সংগৃহীত হাদীসমূহ বিষয় অনুসারে একাধিক অধ্যায়ে বারংবার বর্ণিত হয়েছে এবং এর ফলে তাঁর হাদীসগুলো বারংবার উল্লেখের দ্বারা আবর্তিত হয়েছে। এজন্য বলা হয় যে, তাঁর সংকলনে সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা নয় হাজার[৪০] দুইশ হলেও তার মধ্যে তিন হাজারই বারংবার উল্লেখিত। অবশ্য এসব বারংবার উল্লেখিত হাদীসের জন্য প্রতিটি অধ্যায়েই পৃথক ধারা ও সূত্র বিদ্যমান।

অতঃপর আবির্ভূত হলেন ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল কুশায়রী (রহঃ)। তিনি তার সূত্রসিদ্ধ সংকলন প্রস্তুত করতে গিয়ে বোখারির পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন এবং ঐকমত্যে প্রতিষ্ঠিত হাদীসসমূহ ছাড়া বারংবার উল্লেখিত হাদীস ত্যাগ করলেন। তিনি সব ধারা ও সূত্র একত্র করে তাঁর সংগ্রহকে ফেকাহ্শাস্ত্র ও তার শিরোনাম অনুসারে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করেছিলেন। অবশ্য এসব সত্ত্বেও তাঁরা উভয়ে সব শুদ্ধ হাদীস

---

৩৬. আবদুল্লাহ্ ইবনে ওহাব; ১২৫-১৯৭ (৭৪৩-৬১৩ খ্রি:) হি:।

৩৭. ইয়াহিয়া ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে বুকাইর; ১৫৪-২৩১ (৭৭১-৮৪৫ খ্রি:) হি:।

৩৮. আল কানাবী (?); আবুদল্লাহ্ ইবনে মাসলামা; মৃত্যু ২২১ (৮৩৬ খ্রি:) হি:।

৩৯. ইনি সম্ভবত মুহম্মদ ইবনে হাসান আল ওয়াসেতী আল মুজানী, যাকে ইমাম বোখাদ্দা [তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে কিছুটা গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করেছেন। সেখানে তাঁর মৃত্যুকাল ১৮৩ (৮০৩ খ্রি:) হিজরী বলে উল্লিখিত হয়েছে।

৪০. অন্যত্র 'সাত হাজার'।

সংকলন করতে সক্ষম হননি। এ কারণে মানুষ নানাবিষয়ে তাঁদের বর্ণিত হাদীসসমূহের অতিরিক্ত হাদীস সংযোজনে তৎপর হয়ে উঠেছিল।

এর ফলে তারপর আবু দাউদ সিজস্থানী, আবু ইসা তিরমিজী ও আবু আবদুর রহমান নেসাঈ তাঁদের হাদীস সংকলনে সহিহ হাদীস অপেক্ষা বেশি ব্যাপক ভিত্তিতে সংগ্রহ কাজ পরিচালনা করেন এবং যাতে প্রয়োজনীয় কার্যকরী শর্তাদি অনুসারে হাদীসটি গৃহীত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ রাখেন। তাঁদের আরোপিত শর্তাদির ক্ষেত্রে যা উচ্চশ্রেণীর, তাই সহিহ্ (শুদ্ধ) হিসেবে সুপরিচিত এবং এছাড়া যা তারচেয়ে নিম্নশ্রেণীর 'হাসান' (ভাল) ও অন্য কিছু তাও তাঁরা ধর্মীয় প্রথা ও অনুষ্ঠানের নির্দেশিকা হিসেবে সংগ্রহ করেছেন।

মুসলমানদের কাছে এগুলোই সূত্রসিদ্ধ হাদীস সংকলন এবং এগুলোই ধর্মীয় প্রথা অনুসারে সব প্রকার হাদীস সম্পর্কীয় গ্রন্থাদির উৎসমূল। পরবর্তীকালে এসব গ্রন্থের পরিমাণ যদিও অনেক হয়েছে, তবুও সাধারণভাবে এগুলোকেই প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।[৪১]

হাদীস আলোচনায় এসব শর্ত ও পরিভাষার জ্ঞান অর্জন করাকেই 'এলমে হাদীস' বলা হয়। কখনও এটি থেকে রহিতকারী ও রহিতকৃত হাদীসসমূহকে পৃথক করে তাকে একটি একক বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এরূপ 'গরিব' (বিরল) হাদীসের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এসব বিষয়ে মানুষের বহু বিখ্যাত রচনা বিদ্যমান। তারপর সুসামঞ্জস্য ও বিরোধী হাদীসসমূহ একত্রে পৃথকভাবে প্রকাশ করেও অনেকে গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। বস্তুত এ হাদীসশাস্ত্রে মানুষ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন তাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও হাদীসশাস্ত্রবিদদের মধ্যে একজন হলেন আবু আবদুল্লাহ্ আল হাকেম। এ বিষয়ে তাঁর গ্রন্থটি খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি হাদীসের মধ্যকার বহু দোষ-ত্রুটি দূর করে তার সৌন্দর্যকে

---

৪১. রোজেনথালে এ অনুচ্ছেদ ও এর পরবর্তী অনুচ্ছেদটি পাঠে কিছুটা ব্যতিক্রম ও সংযোজন বিদ্যমান। এটাও পরবর্তী সংশোধিত পাঠ বলে গৃহীত। গ্রন্থের সম্পূর্ণতার জন্য আমরা এর অনুবাদ নিম্নে প্রদান করছি।

এগুলোই ইসলামী জগতে ধর্মীয় বিধানের উৎস হিসেবে গৃহীত হাদিস সংকলন এবং এগুলোই আহলে সুন্নত কর্তৃক গৃহীত হাদিসগ্রন্থ। এ পাঁচটি গ্রন্থের সাথে আরও সংকলন সংযোজিত হয়েছে; যেমন আবু দাউদ তায়ালমীর 'মুসনাদ' এবং আল বাজ্জার, আদব ইবনে হুমাইদ দারেমী, আবু ইয়ালা মোশোলী ও আহমদ ইবনে হাম্বলের অনুরূপ সংকলনাদি। ইবনে সালেহের মতানুসারে পরবর্তী এসব হাদিস সংকলয়িতার উদ্দেশ্য ছিল সাহাবীদের মধ্যে প্রচলিত সমুদয় হাদিস সংক্রান্ত বিষয়ের একত্র সন্নিবেশ করা, তাদের প্রমাণ উপস্থিত করা নয়।

যাহোক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তৎপুত্র আবদুল্লাহ্‌র কাছে তাঁর সংকলন গ্রন্থ 'মুসনাদ' সম্পর্কে যে বক্তব্য উপস্থিত করতেন, তাতে জানা যায় সংকলনে হাদিসের সংখ্যা একত্রিশ হাজার। ইমাম সাহেবের সহচরদের মাধ্যমে অনুরূপ এক বর্ণনায় জানতে পারা যায় যে, তিনি সাড়ে সাত লক্ষ হাদিসের মধ্যে বাছাই করে উক্ত পরিমাণ হাদিস তাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। হযরত মুহম্মদ (স)-এর কাছ থেকে বর্ণিত যে সকল হাদিসের মধ্যে তাদের সত্যতা সম্পর্কে বিতর্ক বিদ্যমান, পাঠক, আপনি তেমন কিছু এ সংকলনে পাবেন না। সুতরাং এগুলো দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা সম্ভবপর। এদিক থেকে দেখতে গেলে ইবনে সালেহের পূর্বোক্ত বক্তব্য এস্থলে প্রযোজ্য হতে পারে না। আমি ইমাম আহমদের বক্তব্যকে ইবনে জওজী রচিত 'মানাকিযে ইমাম আহমদ' নামক গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত করেছি।

প্রকটিত করেছেন। এ বিষয়ে পরবর্তীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল আবু আমর ইবনে সালাহের রচনা। ইনি সপ্তম শতাব্দীর প্রথমদিকে জীবিত ছিলেন। মহিউদ্দিন আন নববী অনুরূপভাবে তাঁকে অনুসরণ করে এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হন।

যাহোক শাস্ত্রটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ; বস্তুত এর সাহায্যে ধর্মপ্রবর্তকের কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো সংরক্ষিত হয়। অবশ্য এ কালে কোন প্রকার হাদীস প্রকাশ করা এবং তা পূর্বসূরিদের সংগ্রহের সাথে যোগ করার বিষয় আর অবশিষ্ট নেই। কেননা স্বভাবতই এর সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, ঐসব হাদীসশাস্ত্রবিদ তাঁদের সংখ্যাধিক্য, সমকালীন অবস্থান, যোগ্যতা ও সাধনার দ্বারা সমগ্র হাদীসই সংগৃহীত করেছেন। তাঁরা এমন কোন দিক উদাসীনতার মধ্যে পরিত্যাগ করেন নি, যাতে পরবর্তী লোকেরা নিজেদেরকে ব্যাপৃত করতে পারেন। বস্তুত এরূপ কোন ধারণা পোষণ করা একান্তই অসম্ভব। সুতরাং একালে এ বিষয়ে একমাত্র কর্তব্য দাঁড়িয়েছে মূল গ্রন্থাবলিকে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত রাখা, সংকলয়িতাদের কাছ থেকে বর্ণনার ধারা সংরক্ষণ করা এবং তাঁদের বর্ণিত সূত্রাদির সত্যতা যাচাই করে দেখা। এগুলোর ওপর হাদীসশাস্ত্রবিদদের দ্বারা নির্দিষ্ট ও প্রচলিত নীতিমালা এবং শর্তাদি প্রয়োগ করে বিবেচনা করা, যাতে সব বর্ণনাসূত্র তাদের গন্তব্য পর্যন্ত সুসংবদ্ধতায় সজ্জিত হয়ে ওঠে। বস্তুত এটি ছাড়া খুব কম ক্ষেত্রেই এই মূল পাঁচটি সংকলনের বাইরে অতিরিক্ত কিছু করা সম্ভব হয়েছে।

এসব সংকলনের মধ্যে বোখারির মর্যাদা সর্বোচ্চ। মানুষ এর ব্যাখ্যা ও এর বর্ণনাধারা বিশ্লেষণ করা খুবই কঠিন বলে মনে করে। কারণ এরূপ কিছু করতে হলে তাদেরকে হিজাজ, ইরাক ও সিরিয়ায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধারা, এগুলোর অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গ, তাদের অবস্থা এবং তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত জানতে হয়। তদুপরি তাঁর অধ্যায়গত শিরোনাম ব্যবহারের ব্যাপারটিতে গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপের প্রয়োজন হয়। কারণ বোখারী একটি অধ্যায় বিশেষ শিরোনাম ব্যবহার করে একটি হাদীসকে বিশেষ সূত্র ও ধারায় এর অধীনে বর্ণনা করেন। এভাবে শিরোনামে শিরোনামে হাদীসটি তার বিচিত্র বিষয় ও বিভিন্নতাসহ বহু অধ্যায়ে বর্ণিত হয়ে আবর্তিত হয়।[৪২] যে ব্যক্তি একে

৪২. এর পরও রোজেনথালে দুটি অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছে এবং রোজেনথাল কর্তৃক ব্যবহৃত একাধিক সংকলনে এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। আমরা গ্রন্থের সম্পূর্ণতার জন্য এর অনুবাদ নিম্নে তুলে দিচ্ছি।

অধ্যায়ে ব্যবহৃত শিরোনামগুলো আলোচনা করলে প্রতিটি অধ্যায় ও তৎসংশ্লিষ্ট হাদিসটির মধ্যকার সম্পর্কের কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়। যাহোক, অনেক ক্ষেত্রেই এ সম্পর্কটি অস্পষ্ট এবং বহু ব্যক্তিই একে স্পষ্ট করার জন্য বাগবিস্তার করেছেন।

অনুরূপ বিষয় নিম্নলিখিত অধ্যায় শিরোনামটির ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে। যেমন : 'গৃহটি এমন একজন আবিসিনীয় ব্যক্তির দ্বারা বিনষ্ট হবে যার ক্ষুদ্র দুটি পা থাকবে।' এ হাদিসটি গোলযোগ (ফিতন) অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এর পর ইমাম বোখারী কোরানের আয়াত উদ্ধৃত করেছেন—'এবং যখন আমরা গৃহটিকে মানুষের মিলনস্থল ও আশ্রয় করলাম'। এছাড়া উক্ত অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। এর ফলে উক্ত অধ্যায় শিরোনামা ও তৎসংশ্লিষ্ট হাদিসটির সম্পর্কে মানুষের কাছে অস্পষ্ট রয়ে গেছে। অনেকে বলেছেন যে গ্রন্থকার প্রথমে অধ্যায় শিরোনামগুলোকে তাঁর সংকলনের। খসড়ার লিপিবদ্ধ করেছিলেন, পরে তদনুযায়ী প্রাপ্ত হাদিস তাতে সংকলিত করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী তা সম্পূর্ণ করার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং এ প্রকার অসম্পূর্ণভাবেই তাঁর গ্রন্থটি বর্ণিত হয়।

ব্যাখ্যা করতে যাবেন, তিনি যদি এসব বৈচিত্র্য সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করতে না পারেন, তা হলে তাঁর ব্যাখ্যা কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। যেমন আমরা ইবনে বাত্তাল,[৪৩] ইবনে মুহাল্লাব,[৪৪] ইবনে তীন[৪৫] প্রমুখের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। আমরা আমাদের শিক্ষকদের অনেককে বলতে শুনেছি—আল্লাহ্ তাঁদেরকে শান্তি দিন; বোখারির ব্যাখ্যা জাতির একটি ঋণ বিশেষ। এ কথার দ্বারা তাঁর এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, কোন জ্ঞানীই এদিক থেকে এর যোগ্য ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে সমর্থ হননি।

মসুলিমদের বিশুদ্ধ সংকলন সম্পর্কে মাগরিববাসীরা খুবই শ্রদ্ধাশীল। তারা একেই মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছেন এবং বোখারীর ওপর মর্যাদা দিয়েছেন। কেননা বোখারী আলোচনার জন্য এমন অনেক হাদীস গ্রহণ করেছেন, যা তাঁর শর্তানুসারে শুদ্ধ নয় এবং তার ব্যবহৃত শিরোনামগুলোতেই এর অধিকাংশ বিদ্যমান। মালেকী মজহাবের শাস্ত্রবিদ ইমাম মারেজী[৪৬] মুসলিমের সংকলনের একটি ব্যাখ্যা রচনা করেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন 'আলমুলেম বেফাওয়ায়েদে মুসলিম'।[৪৭] এতে তিনি এলেম হাদীসের বিচিত্র উৎস এবং ফেকাহশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তারপর একে পূর্ণতা দান করেছেন কাজী ইয়ায[৪৮] এবং পরিশিষ্ট যোগ করে এর নাম রেখেছেন 'ইকমালুল মুলেম'।[৪৯] তাদের উভয়কে অনুসরণ করে তারপর মহীউদ্দিন নববী উক্ত উভয় গ্রন্থের সামগ্রিক ব্যাখ্যার পরিপূর্ণতা দান করেছেন এবং এদের ওপর আরও কিছু যোগ করে বিষয়টি সম্পূর্ণ করে তুলেছেন।

এছাড়া অন্যান্য হাদীস সংকলন, যা থেকে ফেকাহশাস্ত্রবিদরা প্রচুর প্রমাণ গ্রহণ করেছেন, তাদের অধিকাংশের ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট ফেকাহ গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান। অবশ্য তাদের এলমে হাদীস সম্পর্কীয় পৃথক রচনাও বিদ্যমান এবং মানুষ এর উপরও কাজ

যাহোক, আমি গ্রানাডার কাজী ইবনে বাক্কারের কাছ থেকে এ প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য জানতে পেরেছি। ইনি ৭৪১ (১৩৪০ খ্রি:) হি: সনে তায়িফার যুদ্ধে মারা যান। কাজী ইবনে বাক্কার বোখারীর সংকলনের অধ্যায় শিরোনাম বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান রাখতেন। তিনি বলেছেন, বোখারী এ অধ্যায় শিরোনাম ব্যবহার করে কোরানের আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। আয়াতের বর্ণনাটিকে তিনি ঐশ্বরিক বিধান হিসেবে নয়, বরং আইনানুগ বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অসুবিধা দেখা দেয় এক্ষেত্রে যে, আয়াতের অর্থ 'আমরা করলাম' কে 'আমরা ঐশ্বরিক বিধান অনুসারে প্রতিষ্ঠিত করলাম' করতে হয়। যদি একে 'আমরা নিয়মানুসারে করলাম' করা যায়, তাহলে আর কোন অসুবিধা থাকে না এবং দুটি ক্ষুদ্র পা-বিশিষ্ট লোক দ্বারা এর বিনষ্টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আমি এ ব্যাখ্যাটি আমাদের শিক্ষক আবুল বরাক্কাত আশ বাকেল্লানীর কাছ থেকে গ্রহণ করেছি। ইনি উপরোক্ত ইবনে বাক্কারের বরাত দিয়ে এটি বর্ণনা করেছেন। আল বাকেল্লানী তাঁর একজন সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন।

৪৩. আলী ইবনে খলফ; মৃত্যু ৪৪৯ (১৯০৭ খ্রি:) হি:।

৪৪. অজ্ঞাত।

৪৫. অজ্ঞাত।

৪৬. আল মাজরী (?); মুহম্মদ ইবনে আলী; ৪৫৩-৫৩৬ (১০৬১-১১৪২ খ্রি:) হি:।

৪৭. মুসলিমের উপকারিতার জ্ঞান দানকারী।

৪৮. ইয়ায; ইবনে মুসা; ৪৭৬-৫০৪ (১০৮৩-১১৪৯ খ্রি:) হি:।

৪৯. 'মুলেম' নামক গ্রন্থের সম্পূর্ণতা।

করেছে তারা এ সংকলনের মধ্যেও এলমে হাদীস, তার আলোচ্য ধারা এবং বর্ণনা সূত্রের অন্তর্গত সাধারণ হাদীসের যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছে।

পাঠক, জেনে রাখুন, বর্তমানকালে সব শ্রেণীর হাদীসেরই মর্যাদা স্থিরীকৃত হয়ে গেছে। তার মধ্যে কোনটি সহিহ, কোনটি হাসান, কোনটি জঈফ, কোনটি 'মালুল' (ত্রুটিপূর্ণ) ইত্যাদি সবকিছু সম্পর্কে হাদীসশাস্ত্রবিদগণ এবং বিশেষজ্ঞ তত্ত্ববিদেরা বিশ্লেষণ করে সুপরিচিত করে তুলেছেন। সুতরাং যা পূর্বে শুদ্ধ বলে স্থিরীকৃত হয়েছে, তাকে শুদ্ধ করার আর কোন অবকাশ নেই। বস্তুত হাদীস বিশেষজ্ঞগণ সব হাদীসের ধারা ও বর্ণনাসূত্র সম্পর্কে এতটা অবহিত ছিলেন যে, যদি কোন হাদীস তাঁদের সামনে তার যথার্থ ধারা ও সূত্র ছাড়া উপস্থিত করা হত, তা হলে তার কাঠামোর পরিবর্তন সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ বলে দিতে পারতেন। ইমাম মুহম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারি সম্পর্কে অনুরূপ একটি ঘটনা বিদ্যমান। তিনি বাগদাদে উপস্থিত হলে সেখানকার হাদীসবিদরা তাঁকে পরীক্ষা করতে মনস্থ করলেন। তাঁরা কিছু সংখ্যক হাদীসের সূত্র পরিবর্তন করে সেগুলোর সম্বন্ধে তাঁর অবহিতির কথা জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমি এগুলো সম্বন্ধে কিছু জানি না; তবে আমাকে অমুক এ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছে যে,—এ বলে তিনি সবগুলো হাদীসের সঠিক সূত্র এবং প্রতিটির পাঠকে যথাস্থানে সংস্থাপন করলেন। তাঁর এ দক্ষতা দেখে সকলে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিলেন।

পাঠক, আরও জেনে রাখুন যে, ধর্মীয় বিধানের গবেষক ইমামগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আধিক্য ও স্বল্পতার অধিকারী। ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) সম্পর্কে বলা হয় যে, তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা সতের অথবা তার নিকটবর্তী কোন পরিমাণ। ইমাম মালেক (রহঃ)-এর কাছে তাঁর 'মুয়াত্তা' সংকলনে যা শুদ্ধ বলে গণ্য হয়েছে, তার পরিমাণ তিনশ বা অনুরূপ কিছু। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের সূত্রসিদ্ধ সংকলনে হাদীসের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার।[৫০] তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ গবেষণায় ব্যবহৃত হাদীসই বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে অনেক প্রতিহিংসাপরায়ণ হীনমনা ব্যক্তি—একথা বলে থাকেন যে, তাদের মধ্যে যারা স্বল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, হাদীস সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান অল্প বলেই এটি হয়েছে। বস্তুত তাঁদের ন্যায় সর্বজনমান্য ধর্মশাস্ত্রবিদদের সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ করার কোন কারণ নেই। কারণ তাঁদের প্রবর্তিত ধর্মীয় মতামত কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতেই সংস্থাপিত হয়েছে। সুতরাং তাঁদের মধ্যে যার প্রত্যক্ষভাবে হাদীসের জ্ঞান স্বল্প, তাঁর উপর অবশ্যই এর অনুসন্ধান ও বর্ণনা এবং তৎসম্পর্কে আগ্রহ ও আলোচনা করা একান্ত কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, যাতে ধর্মীয় বিধান যথার্থ ভিত্তির ওপর স্থাপিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ধর্মপ্রবর্তক যে সব নির্দেশ রেখে গেছেন তা অবশ্যই

৫০. কোন কোন সংস্করণে হাদিসের পরিমাণ ৪০ হাজার ও ৩০ হাজার বলেও উল্লেখিত হয়েছে। ৪১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

তাঁকে জেনে নিতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের মধ্যে যারা স্বল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন; এর কারণ হাদীস বর্ণনায় যে বাকবিতণ্ডা দেখা দেয় এবং এর বিভিন্ন ধারায় যে প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান, তা তাঁরা পরিত্যাগ করতে চেয়েছেন। কেননা এ ক্ষেত্রে সূত্রান্তর্গত বিচার-বিবেচনাই অধিকাংশের কাছে অগ্রাধিকার পায়। সুতরাং তাদের গবেষণার প্রয়োজনে তাঁরা হাদীসের এ সূত্রবিচার ও বিভিন্ন ধারার আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে যাননি। এজন্য তাঁদের কাছে যা সুস্পষ্ট বলে মনে হয়েছে, তা ছাড়া অন্যান্য হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত রয়েছেন।

তদুপরি সাধারণভাবে হিজাজবাসীরা ইরাকবাসীদের অপেক্ষা বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন। কারণ মদিনা হিজরতের স্থান ও সাহাবীদের আবাসকেন্দ্র ছিল। সেখান থেকে যাঁরা ইরাকে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন, তাঁরা অধিকাংশ সময় ধর্মযুদ্ধে অতিবাহিত করেছেন। ইমাম আবু হানিফার হাদীস বর্ণনার পরিমাণ স্বল্প হওয়ার কারণ তিনি বর্ণনার শর্তাদি সম্পর্কে কঠোরতা ও সুবিবেচনার ধারা পোষণ করতেন। তিনি অনেক বিশ্বাস্যসূত্রের হাদীসকেও বাস্তবতা বিরোধী হওয়ার ফলে দুর্বল বলে ত্যাগ করেছেন। এ কারণে তাঁর হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর হাদীসের সংখ্যা স্বল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি মনে করার কোন কারণ নেই যে, তিনি ইচ্ছা করে হাদীস বর্ণনা ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর চরিত্র এরূপ কাজ থেকে অনেক ঊর্ধ্বে ছিল। এ ব্যাপারে তাঁর এ পরিচয়ই যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে যে, তিনি ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কীয় গবেষক ইমামদের অন্যতম। হাদীসশাস্ত্রবিদরাও তাঁর মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে এর উপর নির্ভর ও এর নির্দেশের ধারায় গ্রহণ-বর্জন করতে তৎপর হয়েছেন।

অবশ্য তিনি ছাড়া অন্য হাদীসশাস্ত্রবিদগণ, যাদের সংখ্যা প্রচুর, তাঁরা হাদীস সম্পর্কীয় তাঁদের শর্তাদিতে আরও ব্যাপকতার সৃষ্টি করেছেন। ফলে তাঁদের হাদীসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুত তাঁদের প্রত্যেকেই গবেষণায় রত। এমনকি ইমাম আবু হানিফার সহচররাই তাঁর পরবর্তীকালে আরোপিত শর্তাদিতে প্রসারতা সৃষ্টি করায় তাঁদের হাদীস বর্ণনা অনেকগুণে বেড়ে গেছে।

তাহতাবী[৫১] প্রচুর হাদীস বর্ণনা করে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন; যদিও এটি বোখারি ও মুসলিমের ধারায় প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ হাদীসবিদরা বলেন যে, বোখারী ও মুসলিম তাদের সংকলনদ্বয়ে যে শর্তাদি আরোপ করেছেন, তা জাতির সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত; কিন্তু তাহতাবীর আরাপিত শর্তাদি তদ্রূপ নয়। তিনি অনেক অবজ্ঞাত ও অন্যবিধ ব্যক্তির কাছ থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। এজন্য তাঁর গ্রন্থের উপরে বিশুদ্ধ দুটি সংকলন স্থান পেয়েছে। এমন কি 'সুনন' সংকলনরূপে পরিচিত সংকলনগুলোও তাঁর সংকলনকে পিছনে ফেলে অগ্রসর হয়ে গেছে। কারণ তাহতাবী তাঁদের আরোপিত শর্তাদি পূরণ করতেও সমর্থ হননি। এ জন্যই বোখারী ও মুসলিমের সংকলনদ্বয়কে তাঁদের আরোপিত শর্তাদির সর্বসম্মতিক্রমে

৫১. আহমদ ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ৩২১ (৯৯৩ খ্রি:) হি:।

গৃহীত বিশুদ্ধতা অনুসারে সর্বজনগ্রাহ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠক, এ ব্যাপারে আপনার মনে কোন প্রকার সন্দেহ থাকার কথা নয়। কারণ তাঁদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা এবং তাঁদের জন্য যথার্থ অজুহাত সৃষ্টির অধিকার জাতির অবশ্যই আছে। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সব বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।[৫২]

---

৫২. ইহার পরেও রোজেনথালে একটি সংযোজন বিদ্যমান। আমরা গ্রন্থের সম্পূর্ণতার জন্য ইহার অনুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি।

হাদীস শাস্ত্রের অন্য একটি দিক হইল এই সকল সংকলনে সংগৃহীত হাদীসমূহকে উহাদের অধ্যায় ও শিরোনাম অনুসারে একের পর এক আলোচনা করা এবং এইরূপ আলোচনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত নিয়মাবলি প্রয়োগ করা। এই প্রকার কাজ হাদীসবিশারদ আবু উমর ইবনে আবদুল বার[ক], আবু মুহম্মদ ইবনে হজম[খ], কাজী ইয়ায[গ], মহীউদ্দিন নববী[ঘ], ইবনে আত্তার[ঙ] এবং পূর্ব-পশ্চিমের আরও বহু বিশিষ্ট ধর্মীয় শাস্ত্রাধিনায়কগণ করিয়াছেন। অবশ্য ইহা সত্য যে, তাঁহাদের হাদীস সম্পর্কীয় বর্ণনার আরও বহু বিষয়; যেমন হাদীসের পাঠ; ভাষা ও ব্যাকরণ ইত্যাদিও ধারণ করিয়া আছে। তথাপি তুলনামূলকভাবে হাদীস বর্ণনার সূত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদিই তাঁহাদের আলোচনায় অধিক ও বিস্তারিতভাবে আসিয়াছে।

এইগুলিই বর্তমানকালে নেতৃস্থানীয় হাদীসশাস্ত্রবিদদের নিকট প্রচলিত হাদীস সম্পর্কীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান। আল্লাহ্ সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করেন এবং উহা লাভ করিতে সাহায্য করিয়া থাকেন।

ক. ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ : ৩৬৮-৪৬৩ (৯৭৮-১০৭১ খ্রি:) হি:।

খ. তৃতীয় অধ্যায় ৫৯নং টীকা দ্র:।

গ. ৪৮নং টীকা দ্র:।

ঘ. ৪৮নং টীকা দ্র:।

ঙ. নববীর শিষ্য আলী ইবনে ইব্রাহিম; ৬৫৪-৭২৪ (১২৫৬-১৩২৪ খ্রি:) হি:।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

[ফেকাহ্‌শাস্ত্র এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট দায়ভাগ]

ফেকাহ্ হল বান্দাদের ওপর আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আদিষ্ট অবশ্য পালনীয়, নিষিদ্ধ, অনুমোদনযোগ্য, অপছন্দনীয়, বৈধ ইত্যাদি বিধানসমূহের জ্ঞান লাভ করা। এগুলো কুরআন, হাদীস এবং ধর্মপ্রবর্তক প্রচলিত বিভিন্ন প্রমাণাদির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে। বস্তুত অনুরূপ যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধি-নিষেধকেই ফেকাহ্ বলা হয়।

পূর্বসূরিরা এসব যুক্তি-প্রমাণ থেকে মতানৈক্যের সাথে বিভিন্ন বিধি-বিধান আবিষ্কার করতেন। তাঁদের এমন মতানৈক্য ছিল অবশ্যম্ভাবী। কারণ তাঁরা যে বক্তব্য থেকে প্রমাণাদি সংগ্রহ করতেন, তা আরবি ভাষায় লিখিত এবং এসব বক্তব্যের শব্দাবলিতে একাধিক অর্থের সম্ভাবনার তাগিদে ও বিশেষ করে তার সাথে ধর্মীয় বিধি-বিধানের যোগ থাকায় তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য খুবই সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল। তদুপরি হাদীসের বিভিন্ন ধারা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের অন্তর্গত বিধি-বিধানের পরস্পর বিরোধিতা যে-কোন একটিকে প্রাধান্য দেয়ার দিকে আকর্ষণ করত। এর ফলে প্রমাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য অনিবার্য হয়ে উঠত। অন্যদিকে কুরআন-হাদীসের নির্দিষ্ট বক্তব্যের বাইরে প্রমাণাদির ক্ষেত্রে সর্বদা মতানৈক্য বিদ্যমান। এটি ছাড়া নিত্য-নতুন সমস্যার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বক্তব্যে সমাধান অনেক সময় পাওয়া যায় না। সুতরাং উক্ত বক্তব্যের মধ্যে সমাধানের যে সম্ভাবনা থাকে, তাকে পরিস্ফুট করতে যেয়ে সমস্যার সাথে মিলিয়ে নিতে হয়। ফলে এসব বিষয়েই মতানৈক্যের ব্যাপারটি অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায়। এসব দিক থেকেই পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি সকলের মধ্যে মাতনৈক্যের বাস্তবতা এমন অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

অতঃপর সাহাবীদের মধ্যে সকলেই ধর্মীয় বিধানদানের যোগ্য ছিলেন না এবং ধর্মীয় মতামতও সকলের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে তাঁরাই অগ্রসর হয়ে আসতেন, যারা কুরআন কণ্ঠস্থ করেছিলেন এবং এর রহিতকারী ও রহিতকৃত, সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক ও অন্যান্য সব নির্দেশাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতেন। এগুলো তাঁরা স্বয়ং নবী (স) অথবা তাঁর কাছে থেকে শ্রবণকারী বিশিষ্ট সাহাবীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য তাঁদেরকে 'কারী' (পাঠক) বলে অভিহিত করা হত অর্থাৎ যারা কুরআন পাঠ করতে পারেন। কারণ আরবরা জাতি হিসেবে নিরক্ষর ছিল। এ কারণে তৎকালে তাদের পাঠকের বিরলত্বের জন্যই পাঠকারীদের প্রতি এ বিশেষণ প্রয়োগ করা হত। ইসলামের প্রথম দিকের অবস্থা অনুরূপই ছিল। তারপর ইসলামী নগরগুলোর

অবস্থা প্রসারতা লাভ করল এবং গ্রন্থাদির সাথে পরিচিত হয়ে আরবদের নিরক্ষরতাও দূরীভূত হল। নানাবিধ গবেষণা ও ফেকাহ্‌শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দিল এবং তা শিল্পকর্ম ও শাস্ত্র হিসেবে গড়ে উঠল। সুতরাং এসব কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে তখন 'কারীর' পরিবর্তে 'ফকিহ্' (বোদ্ধা) ও 'আলেম' (জ্ঞানী) বলে ডাকা হল। ফেকাহ্‌শাস্ত্রও তাঁদের মধ্যে দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগে সিদ্ধান্ত ও অনুমানের প্রধান্য দেখা দিল এবং ইরাকবাসীরা এর অনুসারী হলেন। অন্যভাগে হাদীসবিদরা প্রাধান্য বিস্তার করলেন এবং হিজাজবাসীরা একে প্রাধান্য দিলেন। ইরাকবাসীদের মধ্যে হাদীসের প্রসার কম ছিল; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং তাঁরা অনুমানকেই বেশি ব্যবহার করলেন এবং তাতে দক্ষ হয়ে উঠলেন। এজন্য তাঁদেরকে 'আহ্‌লে রায়' (সিদ্ধান্তবাগীশ) আখ্যা দেয়া হল। তাঁদের মধ্যে যাঁরা মতামত প্রতিষ্ঠা লাভ করল এবং যাঁর অনুসারীর ব্যাপকতা দেখা দিল, তিনি হলেন ইমাম আবু হানিফা। হিজাজে এ বিষয়ে প্রথমে নেতৃত্ব দিলেন ইমাম মালেক এবং তাঁর পরবর্তীকালে ইমাম শাফেয়ী।

এর পর কিছু সংখ্যক জ্ঞানী অনুমানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন এবং তার দ্বারা কোন কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণকে তাঁরা নীতিবিরুদ্ধ বলে মত দিলেন। তাঁদেরকে 'যাহেরিয়া' বলে অভিহিত করা হয়। তাঁরা ধর্মীয় বিধানের সব উৎসমূল কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য ও সর্বসম্মতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেললেন এবং প্রকাশ্য অনুমান ও বক্তব্য সংলগ্ন কার্যকারণকে বক্তব্যের সুস্পষ্টতায় ফিরিয়ে আনলেন। কারণ যে বিশেষ কার্যকারণ উপলক্ষ করে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়, তাই সর্বত্র তার নির্দেশকে বহন করে আনে। এ মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দাউদ ইবনে আলী,[৫৩] তাঁর পুত্র[৫৪] ও তাঁদের সহচরবৃন্দ।

উপরোক্ত তিনটি মতাদর্শই জাতির মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্যরূপে সুপরিচিত ছিল। নবী বংশীয়রা তাঁদের অভিনব মতাদর্শের সমন্বয়ে একটি বিরল পন্থা ও সে জন্য পালনীয় শাস্ত্রীয় বিধান গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা তাঁদের এ মতাদর্শের ভিত্তি করেছিলেন কতিপয় সাহাবীর প্রতি দোষারোপ, তাঁদের ইমামদের পবিত্রতা এবং তাঁদের মধ্যকার সর্বপ্রকার মতানৈক্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করার ন্যায় কিছুসংখ্যক কাল্পনিক নীতি-নিয়মকে। খারেজীরাও অনুরূপ বিরল পথের পথিক হয়েছিলেন। সর্বসাধারণ তাঁদের এমন মতাদর্শকে গ্রহণ করেনি; বরং তারা এর সমালোচনা করতে অস্বীকার করেছিল। এর ফলে আমরা এসব মতাদর্শ সম্পর্কে কোন কিছু জানতে পারি না এবং তাঁদের গ্রন্থাদির কোন বর্ণনাও কোথাও দেখতে পাই না। একমাত্র তাঁদের আবাসস্থল ছাড়া অন্য কোথাও এদের কোন নিদর্শন নেই। শিয়ারা তাদের অঞ্চল এবং মাগরিবে, পূর্বাঞ্চলে ও ইয়ামেনে প্রতিষ্ঠিত তাদের সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়াতলে বহু গ্রন্থ রচনা করেছিল। খারেজীরাও অনুরূপ প্রচেষ্টার অধিকারী। বস্তুত তাদের প্রতিটি দলই কিছুসংখ্যক গ্রন্থ, অন্যবিধ রচনা এবং বিরল মতামতের পৃষ্ঠপোষক।

---

৫৩. ২০২-২৭০ (৮১৮-৮৮৪ খ্রি:) হি:।
৫৪. মুহম্মদ; ২৫৫-২৯৭ (৮৬৯-৯১০ খ্রি:) হি:।

পূর্বোক্ত 'যাহেরিয়া' সম্প্রদায়ের মতবাদও বর্তমানকালে তাদের ইমামদের অনস্তিত্ব এবং সাধারণ মানুষের বিরোধিতার ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। অবশ্য তাদের পুস্তকাদি এখনও বর্তমান। অনেক সময় বহু বিদ্যার্থী তাদের মতবাদ সম্পর্কে অবহিত হতে এসব গ্রন্থ পাঠের কষ্ট স্বীকার করে। তাদের ফেকাহ্‌শাস্ত্র ও মাতদর্শ গ্রহণ করার ইচ্ছাতেই তারা অনুরূপ প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু দীর্ঘ সময়েও তাতে সফলকাম হয় না। তদুপরি এমন প্রচেষ্টায় তারা সাধারণের বিরাগভাজন ও অস্বীকৃতির সম্মুখীন হয়। অনেক সময় অনুরূপ প্রচেষ্টায় নিরত ব্যক্তিদেরকে অভিনব তত্ত্বের উদ্ভাবক বলে মনে করা হয়। কারণ তারা এসব মতবাদ পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলো থেকে গ্রহণ করে মাত্র; কোন শিক্ষকের সাহায্য তারা পায় না।

ইবনে হজম[৫৫] আন্দালুসে এরূপ কাণ্ড করেছিলেন। হাদীসশাস্ত্রে তাঁর উচ্চমর্যাদা থাকা সত্ত্বেও তিনি এ যাহেরিয়া সম্প্রদায়ের মতাদর্শ গ্রহণ করেন এবং তাঁর ধারণা অনুসারে তাদের বক্তব্যাদি সম্পর্কে গবেষণা করে তিনি তাতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি উক্ত সম্প্রদায়ের ইমাম দাউদের বিরোধিতা করেন এবং অন্যান্য মুসলিম ইমামদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এর ফলে সাধারণ মানুষ তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে তাঁর মতাদর্শকে তুচ্ছজ্ঞান ও অস্বীকার করে। তারা তাঁর গ্রন্থাদির প্রতি উদাসীনতা দেখিয়ে পরিত্যাগ করে; এমনকি এগুলো বাজারে বিক্রয় করাও নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। অনেক সময় এগুলো ছিঁড়ে টুকরা টুকরাও করে ফেলা হয়। সুতরাং পরিণামে সিদ্ধান্তবাদী ইরাকবাসীদের মতাদর্শ এবং হাদীসবাদী হিজাজবাসীদের মতাদর্শই টিকে রয়েছে।

ইরাকবাসীদের মতাদর্শের কেন্দ্রীয় শক্তি হলেন তাদের ইমাম আবু হানিফা নুমান ইবনে সাবিত। ফেকাহ্‌শাস্ত্রে তাঁর স্থান অতুলনীয়। এ ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষরাই সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। বিশেষভাবে ইমাম মালেক ও শাফেয়ী এসব সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন।

হিজাজবাসীদের ইমাম হলেন ইমাম মালেক ইবনে আনাস আল আসবাহী। তিনি হিযরতভূমি মদিনার ইমাম; আল্লাহ্ তাঁকে শান্তি দিন। তিনি ধর্মীয় বিধানের জন্য অন্যদের কাছে সুপরিচিত উৎসগুলো ছাড়াও একটি অতিরিক্ত উৎস সংযোগের মাধ্যমে বিশিষ্ট হয়ে রয়েছেন। এ উৎসটি হল মদিনাবাসীদের আচরণ। কেননা তিনি দেখেছেন যে, মদিনাবাসীরা গ্রহণ বর্জনের ক্ষেত্রে যে বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন, তা তাঁদের পূর্বসূরিদের অনুসরণের ফলেই হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে এর উৎস সেই পুরুষে গিয়ে পৌঁছায়, যাঁরা হযরত মুহম্মদ (স)-এর ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করে তাঁর আদর্শ তাঁর কাছে থেকে গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণে বিষয়টি তাঁর কাছে ধর্মীয় প্রমাণাদির একটি নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অবশ্য অনেকেই এ বিষয়টিকে 'ইজমা' বা সর্বসম্মতির সমপর্যায়ভুক্ত মনে করে অস্বীকার করেছেন। কারণ সর্বসম্মতির ব্যাপারটি শুধু মদিনাবাসীদের ঐক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; বরং তা সমগ্র জাতির সম্মতির ব্যাপার।

---

৫৫. তৃতীয় অধ্যায় ৫৯ নং টীকা দ্র:।

পাঠক, জেনে রাখুন, ইজমা তথা সর্বসম্মতি বলতে যা বুঝায়, তা হল গবেষণালব্ধ কোন ধর্মীয় বিধানের ওপর সকলের মতৈক্য। কিন্তু মালেক (রহঃ) মদিনাবাসীদের আচরণকে এ পর্যায়ে বিবেচনা করেননি। তিনি একে পুরুষানুক্রমে অনুসৃত ও দৃষ্ট এমন একটি ঐকমত্য বলে মেনে নিয়েছেন, যার উৎস ধর্মপ্রবর্তকের ক্রিয়াকলাপ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। এর ফলেই এরূপ ঐকমত্যের অনুসরণের দায়িত্ব সমগ্র জাতির ওপরই বর্তায়। এ বিষয়টিকে সর্বসম্মতির অধ্যায়ে এজন্যই বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা তা সর্বসম্মতির সাথেই সাযুজ্যপূর্ণ। কারণ তাতে যে ঐকমত্য বিদ্যমান, তার সাথে সর্বসম্মতির একটি বাহ্য ঐক্য আছে; যদিও ইজমার বিষয়টি হল গবেষণা ও বিবেচনালব্ধ প্রমাণাদির ওপর ঐকমত্য এবং মদিনাবাসীদের ঐকমত্য হল পূর্বসূরিদের আচরণ প্রত্যক্ষ করে কোন বিষয় গ্রহণ বা বর্জন করার বিষয়। যদি এ বিষয়টি নবী (সঃ) এর ক্রিয়াকলাপ, বক্তব্য অথবা অন্য প্রকার বিচিত্র প্রমাণ; যেমন—সাহাবীদের কার্যাবলি, পূর্বসূরিদের ধর্মাচরণ, সাহচর্য প্রভৃতির সাথে বর্ণনা করা হত, তা হলে সর্বাপেক্ষা ভাল হত।

অতঃপর মালেক ইবনে আনাসের পরবর্তীকালে মুহম্মদ ইবনে ইদরিস মুত্তালেবী শাফেয়ী (রঃ) নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইনি ইমাম মালেকের পরে ইরাকে গমন করে ইমাম আবু হানিফার সহচরদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ফলে তিনি হিজাজবাসীদের ধারাকে ইরাকবাসীদের ধারার সাথে মিশ্রিত করেন এবং একটি নতুন মতাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন। তিনি বহু মতামতে ইমাম মালেকের বিরোধিতা করেছেন।

তাঁদের দুজনের পরে আসেন আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)। ইনি হাদীসবিদ হিসেবে খুব উচ্চমর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর সহচরগণ হাদীসের বিরাট পুঁজির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইমাম আবু হানিফার সহচরদের কাছে শিক্ষা লাভ করেছেন। এর ফলে তাঁরাও একটি বিশেষ মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন।

এভাবে এই চারজন ইমামের মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য সব শহরে একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছল এবং অন্য সব মতাদর্শ পরিত্যক্ত বলে বিবেচিত হল। বিভিন্ন শাস্ত্রে বিচিত্র পরিভাষা ও মতামত সৃষ্টির ব্যাপকতা দেখা দেয়ায় মানুষ মতানৈক্যের বিপুল ধারাকে সীমাবদ্ধ করতে বাধ্য হল। কারণ এর অধিকাংশই যথার্থ গবেষণার বস্তু ছিল না এবং যারা এ কাজের যোগ্য নয়, তারাও আসর জমিয়ে বসছিল। তাদের মধ্যে এমন অনেকেও ছিল, যাদের মতাদর্শ বা ধর্ম কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তাদের অযোগ্যতা ও হঠকারিতা প্রকাশ পেয়ে মানুষকে এ চার ইমামের আশ্রয় গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করল। তাঁদের প্রত্যেকেই একটি বিশিষ্ট অনুসারী দলের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে উঠলেন। তাঁদের একজনকে ছেড়ে অন্যজনকে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। কেননা এরূপ আচরণের মধ্যে ধর্মমত নিয়ে খেলা করার একটি প্রবৃত্তি বিদ্যমান। সুতরাং এভাবে বিষয়টি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ায় বর্তমানকালে ফেকাহ্‌শাস্ত্রের কাজ হল ঐসব ইমামের মতাদর্শ বর্ণনা করা এবং প্রতিটি অনুসারীর তাঁর নিজের ইমামের বর্ণনার শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করে তাঁর নির্দেশকে বাস্তবায়িত করা। বস্তুত বর্তমানকালে গবেষণার আর কোন অবকাশ নেই; যে-কোন সমস্যাকে প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শের আলোকে বিচার

করার প্রতি জোর দেয়া হচ্ছে এবং নতুন কোন গবেষণা ও তার অনুসরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফলে এ যুগে পৃথিবীর সব মুসলমান এ চারজন ইমামের অনুসারী হয়ে উঠেছে।

তাঁদের মধ্যে আহমদ ইবনে হাম্বলের অনুসারীর সংখ্যা কম। এর কারণ তিনি গবেষণা অপেক্ষা বেশি মাত্রায় হাদীসের অকৃত্রিম নির্দেশের উপর নির্ভর করেছেন এবং একটি নির্দেশকে অন্য নির্দেশের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে বিধান রচনা করেছেন। তাঁর অনুসারীদের অধিকাংশই সিরিয়া এবং ইরাকের বাগদাদ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী। অন্য সব দল অপেক্ষা তারাই বেশি মাত্রায় হাদীসের বর্ণনায় আগ্রহী এবং সেই অনুপাতে অনুমান প্রক্রিয়ার প্রতি যথাসম্ভব উদাসীন। বাগদাদে এক সময়ে তাদের সংখ্যাধিক্য ও প্রতিপত্তি ছিল। এর ফলে সেখানে ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শিয়াদের সাথে তাঁদের ঝগড়া লেগেই থাকত এবং ক্রমশ এক সময়ে তা বিরাট আকার ধারণ করে। তাতারীরা বাগদাদে আধিপত্য বিস্তারের পর এ প্রতিপত্তি কমে যায় এবং পুনরায় তা আর ফিরে আসেনি। বর্তমানে হাম্বলীদের অধিকাংশ সিরিয়ায় বাস করে।

ইমাম আবু হানিফার অনুসারীদের সংখ্যা বর্তমানকালে ইরাক, হিন্দ, চীন, মাওরায়ান্নাহার এবং অনারব সব দেশেই প্রচুর বিদ্যমান। যেহেতু তাঁর মতাদর্শটি ইরাক ও ইসলামী রাজধানী বাগদাদের সাথে বিশিষ্ট ছিল এবং আব্বাসী খলিফাদের সহচররা উক্ত মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন, এজন্যই তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বেড়ে উঠেছিল। তদুপরী শাফেয়ীদের সাথে বিতর্কিত বিষয়াদির মীমাংসায় তাদের যুক্তি-প্রমাণ অত্যন্ত সুন্দর এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাদের রচনার পরিমাণ ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের সে সব বিচিত্র জ্ঞানগর্ভ বিষয় এবং যুক্তিতর্কের আশ্চর্য উদাহরণ সবাই মানুষের সামনে বিদ্যমান। অবশ্য মাগরিবে এর সামান্য অংশই আছে এবং তাও কাজী ইবনে আরবি[৫৬] ও আবুল ওলিদ বাজীর[৫৭] ভ্রমণের কল্যাণেই এখানে এসেছে।

ইমাম শাফেয়ীর অনুসারীর সংখ্যা অন্য সব স্থান অপেক্ষা মিশরেই বেশি। তাঁর মতাদর্শ ইরাক, খুরাসান, মাওরায়ান্নাহার প্রভৃতি অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছিল এবং এক সময়ে হানাফী ধর্মীয় বিধান ও শিক্ষা-দীক্ষার সাথে সমান তালে সব শহরেই তার প্রতিপত্তি বর্তমান ছিল। এর ফলে হানাফীদের সাথে তাদের বিতর্ক বিরাট আকার ধারণ করে এবং বিতর্কিত বিষয়ে তাঁদের সম্মিলিত যুক্তি-প্রমাণে গ্রন্থাদির পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তীকালে পূর্বাঞ্চলের পতনের ফলে এর সবকিছুই বিনষ্ট হয়ে যায়।

ইমাম শাফেয়ী মিশরের বনি আবদুল হকমের[৫৮] কাছে উপস্থিত হলে তাদের একটি দল তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে আল বুয়ায়তী,[৫৯] আল মুজনী[৬০] ও অন্যান্য অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য। বনি আবদুল হকমের অন্তর্গত মালেকী মতাদর্শেরও একটি

---

৫৬. মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইশবিলী; মৃত্যু ৫৪৩ (১১৪৮ খ্রি:) হি:।
৫৭. সুলায়মান ইবনে খলফ (একাদশ শতাব্দী খ্রি:)।
৫৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল হকম; মৃত্যু ২১৪ (৮৩০ খ্রি:) হি:।
৫৯. ইউসুফ ইবনে ইয়াহিয়া; মৃত্যু ২৩১/৩২ (৮৪৫/৪৬ খ্রি:) হি:।
৬০. ইসমাইল ইবনে ইয়াহিয়া; মৃত্যু ২৬৪ (৮৭৮ খ্রি:) হি:।

দল ছিল; তাঁদের মধ্যে ছিলেন আশহুব,[৬১] ইবনে কাসেম,[৬২] ইবনে মাওয়াজ[৬৩] ও অন্যান্য অনেকে। তারপর হরস ইবনে মিসকীন[৬৪] ও তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং এর পর কাজী আবু ইসহাক ইবনে শুবান[৬৫] ও তাঁর সহচরবৃন্দ।

অতঃপর রাফেজীদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে মিশর থেকে আহলে সুন্নতের ফেকাহ্‌শাস্ত্র বিদূরিত হয় এবং তার স্থানে আহলে বয়তের ফেকাহ্ প্রতিপত্তি লাভ করে। অন্য সব দল ও মতাদর্শের অবস্থা এমনই হয়ে দাঁড়ায় যে, তারা বিগত ও বিচ্যুত বলে মনে হতে থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কাজী আবদুল ওহাব[৬৬] বাগদাদ থেকে চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে মিশরে পৌঁছান। আমার যতটুকু মনে হয়, তাঁর মিশরে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল জীবিকা অর্জন ও ভাগ্যান্বেষণ। মিশরের উবাইদী খলিফাগণ তাঁকে যথাযথ সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। এরূপ সম্মান প্রদর্শনে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আব্বাসী খলিফারা যাতে বুঝতে পারে যে, যোগ্য লোকের মর্যাদা দিতে তাঁরা জানেন। কারণ আব্বাসীরা উক্ত কাজী সাহেবের নিন্দা প্রচার করে তাঁকে তাড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। যাহোক, তাঁর আগমনে মিশরে মালেকী মতাদর্শের কিছুটা সুসার হয়।

অতঃপর সালাহউদ্দিন ইউসুফ ইবনে আইউবের হাতে উবাইদী সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে নবী বংশীয়দের এ ফেকাহ্‌শাস্ত্র দূর হয়ে পুনরায় আহলে সুন্নতের ফেকাহ্ প্রবর্তনের সুযোগ আসে এবং সেখানে ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর সহচরবৃন্দের মতাদর্শ প্রচলিত হয়। ইরাক ও সিরিয়া থেকে এটি পূর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থায় এখানে ফিরে আসে এবং তার প্রসার ঘটে। এ বিষয়ে সিরিয়ায় আইউবী শাসন আমলে প্রতিপালিত মহীউদ্দিন নববী ও ইজ্জুদ্দিন ইবনে আবদুস্ সালামও[৬৭] খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তারপর মিশরে ইবনে রেফাআ[৬৮] ও তকীউদ্দিন ইবনে দাকিকুল ইদ[৬৯] এবং তাঁদের পরে তকীউদ্দিন সবকী[৭০] সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। অনুরূপভাবে এ ধারা বর্তমানকালে মিশরের শায়খুল ইসলামের প্রসিদ্ধ পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। এ শেষোক্তজনের নাম সিরাজউদ্দিন বালকিনী।[৭১] তিনি বর্তমানে শুধু শাফেয়ী মতাদর্শী জ্ঞানীদের মধ্যে নন; বরং সমগ্র মিশরের আলেম সমাজের শিরোমণি।

ইমাম মালেকের মতাদর্শ মাগরিব ও আন্দালুসের অধিবাসীরা বিশেষ আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছে। যদিও তাঁর মতাদর্শ অন্যত্রও দেখা যায়, তবুও উক্ত দুই এলাকার

---

৬১. ইবনে আবদুল আজিজ; ১৪০-২০৪ (৭৫৮-৮২০ খ্রি:) হি:।
৬২. আবদুর রহমান; ১৩২-১৯১ (৭১৯-৮০৬ খি:) হি:।
৬৩. মুহম্মদ ইবনে ইব্রাহিম; মৃত্যু ২৮১ (৮৯৪ খ্রি:) হি:।
৬৪. ১৫৪-২৫০ (৭৭০-৮৬৪ খ্রি:) হি:।
৬৫. মুহম্মদ ইবনে কাসেম; মৃত্যু ৩৫৫ (৯৬৬ খ্রি:) হি:।
৬৬. ইবনে আলী; ৩৬২-৪২২ (৯৭৩-১০৭১ খ্রি:) হি:।
৬৭. আবদুল আজিজ ইবনে আবদুস সালাম; ৫৭৭-৬৬০ (১১৮২-১২৬৮ খ্রি:) হি:।
৬৮. আহমদ ইবনে মুহম্মদ; ৬৪৫-৭১০ (১২৪৮-১৩১০ খ্রি:) হি:।
৬৯. মুহম্মদ ইবনে আলী; ৬২৫-৭০২ (১২২৮-১৩০২ খ্রি:) হি:।
৭০. আলী ইবনে আবদুল কাফী; ৬৮৩-৭৫৫ (১২৮৪-১৩৫৪/৫৫ খ্রি:) হি:।
৭১. উমর ইবনে রসলান; ৭২৪-৮০৫ (১৩২৪-১৪০৩ খ্রি:) হি:।

লোকেরা প্রায় সামগ্রিকভাবেই তাঁকে অনুসরণ করে থাকে। এর কারণ সম্ভবত এ দুই অঞ্চলের অধিবাসীরা ভ্রমণের শেষ পর্যায় ছিল হিজাজ এবং তখন মদিনা ছিল শাস্ত্রাদির কেন্দ্রস্থল। তারপর সেখান থেকে তা ইরাকে স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের ভ্রমণ পথে ইরাক না পড়ায় তারা মোটামুটিভাবে মদিনার আলেম সমাজকে অনুসরণ করেছে। ঐ সময়ে সেখানকার ধর্মীয় নেতা ও ইমাম ছিলেন মালেক। তিনি তাঁর পূর্বসূরি শিক্ষক ও উত্তরসূরি শিষ্যবৃন্দসহ সেখানে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিলেন। এর ফলে মাগরিব ও আন্দালুসের অধিবাসীরা তাঁর শিক্ষাই গ্রহণ করেছে এবং অন্যদের শিক্ষা তাদের মধ্যে না পৌঁছবার ফলে তারা তাঁকেই অনুসরণ করেছে। তদুপরি মাগরিব আন্দালুসের অধিবাসীদের ওপর প্রান্তরীয় জীবনবোধের প্রাধান্য ছিল অত্যধিক। তারা ইরাকবাসীদের ন্যায় নাগরিক জীবনের সাথে পরিচিত ছিল না। এ কারণে হিজাজবাসীদের সাথে প্রান্তরীয় জীবনবোধের দিক থেকে তাদের মিল ছিল বেশি। এ কারণে এই মালেকী মতাদর্শ তাদের কাছে বেশি সরল মনে হয়েছে। কারণ তা অন্যান্য মতাদর্শের ন্যায় নাগরিক জীবনাদর্শের দ্বারা মার্জিত ও পরিশোধিত হয়নি।

বস্তুত প্রতিটি মতাদর্শ সম্পর্কীয় শাস্ত্রাদিই উক্ত মতের অনুসারীদের কাছে একটি বিশিষ্ট ধারা। এটা অনুসরণ করতে হলে তাদেরকে গবেষণা ও অনুমানকে কাজে লাগাবার পথ থেকে বিরত থাকতে হয়। তারা শুধু তাদের ইমামের মতামতে নির্ধারিত নিয়মাবলি মেনে নিয়ে সমস্যাকে সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে মিলানো এবং সন্দেহের বেলায় পৃথক করার কাজটিই সুচারুরূপে করতে পারে। অবশ্য এরূপ সামঞ্জস্য বিধান ও পৃথকীকরণের জন্যও সুদৃঢ় যোগ্যতার প্রয়োজন; যাতে এ দুটি বিষয়ে যতদূর সম্ভব ইমামের মতাদর্শ অনুসারে সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়। ফলত এ যোগ্যতাকেই বর্তমানকালে ফেকাহ্‌শাস্ত্র বলা হয়ে থাকে। এদিক থেকে মাগরিবের অধিবাসীরা সকলেই ইমাম মালেকের অনুসারী।

তাঁর শিষ্যরা ইরাক ও মিশরেও ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইরাকে ছিলেন কাজী ইসমাইল[৭২] ও তাঁর সমশ্রেণীর আরও অনেকে। যেমন ইবনে খোয়াজ মন্দাদ,[৭৩] ইবনে লাব্বান,[৭৪] কাজী আবু বকর আবহুরী,[৭৫] কাজী আবুল হাসান ইবনে কাস্‌সার,[৭৬] কাজী আবদুল ওহাব[৭৭] এবং তাঁদের পরবর্তী আরও অনেকে। মিশরে ছিলেন ইবনে কাসেম, আশহুব, ইবনে আবদুল হকম, হারেস ইবনে মিসকীন[৭৮] এবং তাঁদের সমশ্রেণীর অন্যান্য জন। আন্দালুস থেকে ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়া লায়ছী[৭৯] গমন করে ইমাম মালেকের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি তাঁর কাছ থেকে 'মুয়াত্তা' গ্রন্থ বর্ণনার

৭২. ইসমাইল ইবনে ইসহাক; ১৯৯/২০০-২৮২ (৮১৫/১৬-৮৯৬ খ্রি.) হি:।
৭৩. আবু আবুদল্লাহ্ মুহম্মদ ইবনে আহমদ; কাজী আবহুরীর শিষ্য।
৭৪. ইবনে মুত্তাব (?); ইনি সম্ভবত কাজী ইসমাইলের শিষ্য; মৃত্যু ৩০৩ (৯১৬ খ্রি:) হি:।
৭৫. মহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্—২৮৯-৩৭৫ (৯০২-৯৮৬ খ্রি:) হি:।
৭৬. আলী ইবনে আহমদ; মৃত্যু ৩৯৮ (১০০৮ খ্রি:) হি:।
৭৭. ৬৬ নং টীকা দ্র:।
৭৮. ইনি ও তার পূর্ববর্তী তিনজনের জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৬১-৬৪ নং টীকা দ্র:।
৭৯. মৃত্যু ২৩৪/৩৬ (৮৪৮/৫০ খ্রি:) হি:।

অনুমতি লাভ করেন এবং তাঁর সহচরবৃন্দের মধ্যে পরিগণিত হন। তাঁর পরে আবদুল মালেক ইবনে হাব্বি[৮০] গমন করে ইবনে কাসেম ও তাঁর সমশ্রেণীর অন্যান্যদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং আন্দালুসে মালেকী মতাদর্শ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। যিনি এ মতের 'আল ওয়াজেহা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তারপর তাঁর শিষ্যদের অন্যতম উতবী[৮১] নিজ নাম অনুসারে 'উতবিয়া' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আফ্রিকিয়া থেকে আসাদ ইবনে ফুরাত[৮২] গমন করে প্রথমে ইমাম আবু হানিফার সহচরদের কাছে শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে মালেকী মতাদর্শে ফিরে আসেন। তিনি ইবনে কাসেমের কাছে উপস্থিত হয়ে ফেকাহ্‌শাস্ত্রের সব বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থটি নিয়ে কায়রোয়ানে ফিরে আসেন এবং আসাদ ইবনে ফুরাতের নাম অনুসারে তার নামকরণ করেন 'আসদিয়া'। সাহনুন[৮৩] আসাদের কাছেই এ গ্রন্থটি পাঠ করেন এবং তারপর পূর্বাঞ্চলে গমন করে ইবনে কাসেমের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। এর ফলে আসদিয়া গ্রন্থের বহু সমস্যার সাথে বিরোধিতার সূত্রপাত হয় এবং সাহনুন এর অনেকগুলোই প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সমগ্র সমস্যা একত্র করে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন এবং আসদিয়া গ্রন্থের সাথে বিরোধী বিষয়গুলোকে তাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইবনে কাসেম সাহনুনের কাছে প্রদত্ত একটি পত্রে আসাদকে তাঁর গ্রন্থ থেকে সাহনুন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত সমস্যাগুলো নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে আদেশ দেন এবং বিতর্কিত বিষয়ে সাহনুনকে অনুসরণ করতে নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু আসাদ এ নির্দেশ মেনে নেননি। ফলে মানুষ তার গ্রন্থ ত্যাগ করে সাহনুনের গ্রন্থ অনুসরণ করতে থাকে। এ গ্রন্থে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিচিত্র বিষয়ের মিশ্রণ থাকায় এর নামকরণ করা হয় 'মুদাব্বানা' ও 'মুখতালাতা'। কায়রোয়ানবাসীরা এ 'মুদাব্বানা' গ্রন্থ এবং আন্দালুসবাসীরা 'ওয়াজেহা' ও 'উতবিয়া' গ্রন্থদ্বয়কে বিশেষ আগ্রহের সাথে অনুসরণ করতে থাকে।

অতঃপর ইবনে আবু যায়েদ[৮৪] এ মুদাব্বানা ও মুখতালাতা গ্রন্থটিকে তাঁর 'মুখতাসর' নামীয় গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত করেন এবং কায়রোয়ানের ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদদের অন্যতম আবু সাইদ বারাদেই[৮৫] তার 'তাহজিব' নামক পুস্তকেও তার একটি সংক্ষিপ্ত সুবিন্যস্ত রূপ তুলে ধরেন। এ শেষোক্ত পুস্তকটিকেই আফ্রিকিয়ার উস্তাদগণ নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করেন এবং এছাড়া অন্যগুলোকে পরিত্যাগ করেন। অনুরূপভাবে আন্দালুসবাসীরাও 'উতবিয়া' গ্রন্থটিকে অনুসরণযোগ্য বিবেচনা করে ওয়াজেহা এবং অন্য সব কিছুকে পরিত্যাগ করেছিল।

এভাবে মালেকী মতাদর্শের আলেমগণ এসব মূল গ্রন্থের ব্যাখা, টীকা-টিপ্পনী ও সংকলন রচনা করতে থাকেন। আফ্রিকিয়াবাসীরা মুদাব্বান গ্রন্থের ওপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়

---

৮০. মৃত্যু ২৩৮/৩৯ (৮৫৩/৫৪ খ্রি:) হি:।
৮১. মুহম্মদ ইবনে আহমদ; মৃত্যু ২৩৫ (৮৬৯ খ্রি:) হি:।
৮২. ১৪২/৪৫-২১৩/১৪ (৭৫৯/৬৩-৮২৮/৩০ খ্রি:) হি:।
৮৩. আবদুস সালাম ইবনে সাইদ; ১৬০-২৪০ (৭৭৭-৮৫৪ খ্রি:) হি:।
৮৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবু যায়েদ; ৩১৬-৩৮৬ (৯২৮-৯৯৬ খ্রি:) হি:।
৮৫. খলফ ইবনে আবুল কাসেম; ইনি উক্ত গ্রন্থ ৩৭২ (৯৮২ খ্রি:) হিজরিতে রচনা করেন।

যা লেখার তা লিখেছে; যেমন ইবনে ইউনুস,[৮৬] আল্ লখমী,[৮৭] ইবনে মুহরিয,[৮৮] আত্তিউনিসী,[৮৯] ইবনে বাশির[৯০] এবং তাঁদের তুল্য আরও অনেকে। অনুরূপভাবে আন্দালুসবাসীরাও উতবিয়ার ওপর আল্লাহ্ চানতো অনেক কিছু লিখেছে; যেমন ইবনে রুশদ[৯১] ও তাঁর তুল্য অন্যান্যরা। ইবনে আবু যায়েদ 'নাওয়াদের' নামক গ্রন্থে মূল গ্রন্থগুলোর সব বিষয়, মতানৈক্য ও নানাবিধ মতামত একত্র করেন। এর ফলে মালেকী মজহাবের সব মূলগ্রন্থ ও তাদের ব্যাখ্যা ইত্যাদি একটি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়। ইবনে ইউনুস এর অধিকাংশকেই তাঁর মুদাব্বানা সম্পর্কীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেন। এভাবে কার্ডোভা ও কায়রোয়ানের সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত উভয় স্থানে মালেকী মতাদর্শের প্রচার ব্যাপক আকৃতি ধারণ করে।

অতঃপর[৯২] মাগরিববাসীরা একে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে। এ পর্যায়ে আবু আমর ইবনে হাজেবের গ্রন্থটি প্রকাশ পায়। ইনি এতে উক্ত মজহাবের বিচিত্র ধারা প্রতিটি

---

৮৬. আবু আবদুল্লাহ ইবনে ইউনুস; মৃত্যু ৪৫৯ (১০৫৯ খ্রি:) হি:। মতান্তরে আবু বকর মুহম্মদ ইবনে ইউনুস।

৮৭. আলী ইবনে আবদুল্লাহ; মৃত্যু ৪২৮ (১০৮৫ খ্রি:) হি:।

৮৮. আবুল কাসেম; পরবর্তী তিউনিসীর সমসাময়িক।

৮৯. আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবনে হাসান; মৃত্যু ৪৪৭/৪৪৯ (১০৫৬/১০৫৮ খ্রি:) হি:।

৯০. ইনি সম্ভবত ইব্রাহিম ইবনে আবদুস্ সামাদ; খ্রি: একাদশ শতাব্দী (?)

৯১. মুহম্মদ ইবনে আহম্মদ; ৪৫০-৫২০ (১০৫৮-১১২৬ খ্রি:) হি:; প্রসিদ্ধ দার্শনিকের পিতামহ।

৯২. এ অনুচ্ছেদটির প্রথম দিকের একটি সংযোজিত পাঠ রোজেনথালে বিদ্যমান। আমাদের ব্যবহৃত মূল গ্রন্থে না থাকলেও সম্পূর্ণতার জন্য আমরা এর অনুবাদ নিম্নে তুলে দিচ্ছি।

'মালেকী মাজহাবের তিনটি বিভিন্ন শাখা বিদ্যমান। এর একটি হল কায়রোয়ানবাসীদের; এর প্রতিষ্ঠাতা ইবনে কাসেমের শিষ্য 'শাহনুন'। দ্বিতীয়টি হল কার্ডোভাবাসীদের; এর প্রতিষ্ঠাতা ইবনে হাবিব। ইনি মালেক, মুতারিফ, ইবনে মাজিশুন, আসবাগ প্রমুখ জ্ঞানীদের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তৃতীয়টি ইরাকবাসীদের; এর প্রতিষ্ঠাতা কাজী ইসমাইল ও তাঁর সহচরবৃন্দ। মিশরীয় শাখাটি ইরাকি শাখারই অনুসারী। কাজী আবদুল ওয়াহাব চতুর্থ (দশম) শতাব্দীতে বাগদাদ হতে মিশরে পৌঁছান এবং মিশরীয়রা তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করে। মিশরে মালেকী মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা হয় হারেস ইবনে মিসকিন, ইবনে মুয়ারসের, ইবনে লাহিব, ইবনে রশিক প্রমুখ শাস্ত্রবিদদের দ্বারা। অতঃপর এটা শিয়া ও আলী বংশীয়দের চরমপন্থী ধর্মীয় বিধানের উদ্ভবের ফলে গুপ্ত অবস্থায় নিজেকে সংরক্ষণ করে।

কায়রোয়ান ও আন্দালুসবাসীরা ইরাকি শাখার মতামত পরিত্যাগ করেছিল। কারণ এটি বহুদূরে অবস্থিত, এর মতামত বর্ণনার সূত্র অস্পষ্ট এবং যে সব ভিত্তির উপর ইরাকি মতাদর্শ দাঁড়িয়েছিল, সে সম্পর্কেও তারা খুব অল্পই অবগত ছিল। বিশেষজ্ঞেরা স্বভাবতই স্বাধীন মতামতের পক্ষপাতী এমন কি তাঁদের মতামত সাধারণ ধ্যান-ধারণার বিরোধী হলেও তারা কেবলমাত্র প্রচলিত ধারণার উপর নির্ভর করেন না এবং একে কোন প্রচার নীতি হিসেবেও মেনে নেন না। এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, মাগরিব ও আন্দালুসবাসীরা ইমাম মালেক ও তাঁর সহচরবৃন্দের ব্যবহৃত কোন হাদিসের সহায়তা ছাড়া ইরাকি মতামত মেনে নিতে পারেনি। অবশ্য পরবর্তীকালে এসব ভিন্ন ভিন্ন শাখা অনেকাংশে একে অপরের সাথে মিলে গেছে।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবুবকর আত্তারতুশী আন্দালুস হতে ভ্রমণে বের হন। তিনি জেরুজালেমে থেকে সেখানে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসীরা তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আন্দালুসীর শাখার অনেক কিছু তাদের মিশরীয় শাখার সাথে মিশ্রিত করে নেয়। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন 'তিরাজ' গ্রন্থ রচয়িতা

অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করেন এবং প্রতিটি সমস্যায় তাদের মতামতকে একত্র লিপিবদ্ধ করেন। ফলে গ্রন্থটি মালেকী মজহাবের একটি সংক্ষিপ্তসারে পরিণত হয়। মিশর অঞ্চলে হারেস ইবনে মিসকীন,[৯৩] ইবনে মুবাশ্‌শার,[৯৪] ইবনে লুহাইত,[৯৫] ইবনে রশিক,[৯৬] ইবনে শাস,[৯৭] প্রমুখ শাস্ত্রবিদদের সময় থেকেই মালেকী মতাদর্শ প্রচলিত ছিল এবং আলেকজান্দ্রিয়াতেও বনি আউফ,[৯৮] বনি সনদ[৯৯] ও ইবনে আতাউল্লাহ,[১০০] এ ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। আমি জানি না, আবু আমর ইবনে হাজেব[১০১] তাদের মধ্যে কার কাছ থেকে এ ধারার শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য তিনি উক্ত অঞ্চল থেকে উবাইদী সাম্রাজ্যের পতন এবং নবী বংশীয়দের ফেকাহ্‌শাস্ত্রের অবসানের পর শাফেয়ী ও মালেকী মজহাবের পুনরাগমনের সময়ে এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে তাঁর গ্রন্থটি মাগরিব অঞ্চলে পৌঁছলে সেখানকার বিদ্যার্থীদের অধিকাংশই একে

কাজী সনদ ও তাঁর সহচরবৃন্দ। তাঁদের কাছে বহুলোক শিক্ষা লাভ করেন। তাদের মধ্যে বনি আউফ ও তাদের অনুসারী বিদ্যমান। আবু আমর আল হাজিবও তাদের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তার পরবর্তীকালে শিহাবউদ্দিন আল কারাফী আবির্ভূত হন। এভাবে সেখানে মালেকী মতাদর্শের একটি ধারাবাহিকতা সংরক্ষিত হয়।

আলী বংশীয় উবাইদীদের শাসন আমলে মিশরের শাফেয়ী মতাদর্শও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে খোরাশানী শাফেয়ী জ্ঞানী আর্‌রাফির গ্রন্থকে কেন্দ্র করে শাস্ত্রবিদগণ একে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। সিরিয়ায় অন্য একজন শাফেয়ী মতাদর্শের নেতৃস্থানীয় শাস্ত্রবিদ মহীউদ্দিন আন্ নববী এ সময়ে আবির্ভূত হন।

পরবর্তীকালে পশ্চিমাঞ্চলীয় মালেকী মতাদর্শ ও অশ্ শারিমাশীর মাধ্যমে ইরাকি শাখার অনেক কিছু গ্রহণ করে। ইনি পশ্চিমাঞ্চলীয় ও মিশরীয় শাখার একজন অনন্য সাধারণ প্রতিনিধি হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। আব্বাসী সম্রাট আজ্ জাহিরের পুত্র ও আল মুস্তাসিমের পিতা আল মুস্তানসির যখন বাগদাদে তাঁর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন; তখন তিনি তৎকালীন মিশরের উবাইদী সম্রাটকে আশ্ শারিমাশীকে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। উবাইদী সম্রাট তাকে যেতে অনুমতি দেন এবং তিনি বাগদাদে পৌঁছলে তাঁকে মুস্তানসিরিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। তিনি সেখানে হালাকু খানের অভিযান ৬৫৬ (১২৫৮ খ্রি:) হিজরী পর্যন্ত ছিলেন। অবশ্য তিনি হালাকুর হত্যাকাণ্ডের কবল হতে বেঁচে যেতে সক্ষম হন। সম্ভবত এ কারণেই তিনি সেখানে হালাকু খানের পুত্র আহমদ আবাগার সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

মিশরীয় মতাদর্শের একটি সর্বার্থসার সংগ্রহ, যার সাথে পশ্চিমাঞ্চলীয় উপাদানও মিশ্রিত ছিল, তা, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, আবু আমর ইবনে আল হাজিবের 'মুখতাসর' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছিল। এ গ্রন্থে প্রতিটি শাস্ত্রীয় বিধান সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় সমস্যাদি এবং প্রতি সমস্যা সম্পর্কে বিচিত্র মতামত বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে উক্ত গ্রন্থটি মালেকী মতাদর্শের একটি সর্বসার সংগ্রহ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

৯৩. ষষ্ঠ অধ্যায় : ৬৪ নং টীকা দ্র:।

৯৪. ইবনে মুয়ায়সের (?); আহমদ ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ৩০৯ (৯২২ খ্রি:) হি:।

৯৫. ইবনে লাহিব (?); অজ্ঞাত।

৯৬. হাসান ইবনে আতিক; ৫৪৭—৬৩২ (১১৫৩—১২৩৫ খ্রি:) হি:।

৯৭. আবদুল্লাহ্ ইবনে নজম; মৃত্যু ৬১৬ (১২১৯ খ্রি:) হি:।

৯৮. ইসমাইল ইবনে মক্কী; ৪৮৫—৫৮১ (১০৯২—১১৭৫ খ্রি:) হি:।

৯৯. সনদ ইবনে ইনান; মৃত্যু ৫৪১ (১১৪৯ খ্রি:) হি:।

১০০. আবদুল করিম ইবনে আতাউল্লাহ্; মৃত্যু ৫১২ (১২৬৬ খ্রি:) হি:।

১০১. উসমান ইবনে উমর; মৃত্যু ৬৪৬ (১২৪৯ খ্রি:) হি:।

আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে; বিশেষ করে বগির অধিবাসীরা। তখন তাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন আবু আলী নাসেরউদ্দিন যাওয়াবী।[১০২] বস্তুত তিনিই উক্ত গ্রন্থটিকে মাগরিবে আনয়ন করেন। তিনি গ্রন্থটি মিশরে ইবনে হাজেবের সহচরদের কাছে পাঠ করেন এবং তার একটি অনুলিপি প্রস্তুত করে বগিতে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এর প্রসারের সুযোগ করে দেন। সেখান থেকে এটি মাগরিবের সব শহরে প্রচলিত হয়েছে। বর্তমানকালে মাগরিবের সব বিদ্যার্থীই এর পাঠ ও আলোচনা কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। কারণ উস্তাদ নাসেরউদ্দিন এর পাঠ ও আলোচনায় উৎসাহ প্রদান করেছেন। এতদঞ্চলের বহু উস্তাদ এর ব্যাখ্যা প্রস্তুত করেছেন; যেমন ইবনে আবদুস সালাম, ইবনে রাশেদ,[১০৩] ইবনে হারুন।[১০৪] তাঁরা সকলেই তিউনিসের শিক্ষকমণ্ডলীর অন্তর্গত। তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি যোগ্যতার অধিকারী হলেন ইবনে আবদুস্ সালাম। অবশ্য তাঁরা এতদসত্ত্বেও তাঁদের পাঠ্য-তালিকায় 'তাহজিব' গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত রেখেছেন। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।[১০৫]

---

১০২. ষষ্ঠ অধ্যায় : ১০ নং টীকা দ্র:।
১০৩. মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল কাফসী; মৃত্যু ৭৩৬ (১৩৩৬ খ্রি:) হি:।
১০৪. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহম্মদ; ৬০৩—৭০২ (১২০৭—১৩০৩ খ্রি:) হি:।
১০৫. কোরান; ২, ১৪২।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[দায়ভাগশাস্ত্র]

'এলমে ফরায়েজ' বা দায়ভাগশাস্ত্র হল উত্তরাধিকারের নির্ধারিত অংশসমূহকে জানা, কোন সম্পত্তিতে নির্দিষ্ট প্রাপ্যকে বিশুদ্ধ সংখ্যামানের দ্বারা প্রকাশ করা এবং এ ক্ষেত্রে প্রাপ্য অংশের মূল উৎস অথবা তার শাখাগত প্রাপ্তির সুযোগ বিধান বিবেচনা করা। শেষের বিষয়টির বর্ণনা এই যে, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার প্রাপ্য অংশ অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিভক্ত হবে এবং এ পর্যায়ে একটি সুষ্ঠু হিসাবের প্রয়োজন; যাতে প্রাথমিক প্রাপ্য নির্দিষ্ট হয়ে পুনরায় ঐ মৃত উত্তরাধিকারীর প্রাপ্যটি যথাবিহিতভাবে সকলের অংশে সংযোজিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে দুটি হিসাবের সব অংশই প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর জন্য অবিভক্তভাবে প্রকাশ পাবে। কখনও এমন উত্তরাধিকারীর মৃত্যু একজন, দুজনের চেয়েও বেশি হয়ে থাকে। এভাবে তার সংখ্যা যত বেশি হয়, হিসাবের সংখ্যাও তত বেড়ে যায় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই পৃথক হিসাবের প্রয়োজন দেখা দেয়। অনুরূপভাবে যদি প্রাপ্য অংশাদির দুটি দিক বের হয়ে পড়ে; যেমন একদিকে কিছু সংখ্যক উত্তরাধিকারী একজনের উত্তরাধিকার স্বীকার করে এবং অন্যদিকে কিছু সংখ্যক তা অস্বীকার করে, তাহলে উক্ত বিষয়টিও দুদিক থেকে হিসাব করে দেখতে হবে। প্রথমে প্রাপ্য অংশের সীমা নির্ধারণ করতে হবে এবং পরে পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মূল প্রাপ্য অংশ অনুসারে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। এরূপ প্রতিটি বিষয়েই যথাযথ হিসাবের প্রয়োজন। এ কারণেই দায়ভাগের এ বিষয়টিকে ফেকাহ্‌শাস্ত্রের একটি পৃথক অধ্যায় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ এতে ফেকাহ্‌র সাথে হিসাবের যোগ রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ হিসাবের জটিলতার জন্য একে একটি পৃথক শাস্ত্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

এ বিষয়ের উপর মানুষের মধ্যে বহু রচনা বিদ্যমান। মালেকী মজহাবে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রচনা আন্দালুসের উত্তরসূরির মধ্যে ইবনে সাবেতের[১০৬] গ্রন্থ, কাজী আবুল কাসেম হাওফীর 'মুখতাসর',[১০৭] তারপর জাদীর[১০৮] এবং আফ্রিকিয়ার উত্তরসূরিদের মধ্যে ইবনে মুনাম্মার তারাবলেসী[১০৯] ও তাঁর সমতুল্য অন্যান্যদের গ্রন্থাবলি।

---

১০৬. আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ; মৃত্যু ৪৪৭ (১০৩৬ খ্রি:) হি: (?)।

১০৭. আহমদ ইবনে মুহম্মদ ইবনে খলফ; মৃত্যু ৫৮৮ (১১৯২ খ্রি:) হি:।

১০৮. ইনি 'জাদীয়া' নামক গ্রন্থের রচয়িতা আবু মুহম্মদ হাসান ইবনে আলী ইবনে জাদ সাকিলী কিনা, জানা যায়নি।

১০৯. খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন।

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মজহাবের অনুসারীদের মধ্যে এ বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থাদি বিদ্যমান এবং এমন বিরাট ও জটিল কার্যাদি রয়েছে, যা তাঁদের ফেকাহ্ ও হিসাবশাস্ত্র সম্পর্কীয় জ্ঞানের গভীরতার সাক্ষ্য প্রদান করে। বিশেষভাবে মজহাবের অনুসারী আবুল মুয়ালী[১১০] (রাঃ) ও তাঁর সমতুল্য অন্যান্যদের গ্রন্থাদি।

বস্তুত এটি একটি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন শাস্ত্র; কেননা এতে শ্রুতি ও বুদ্ধি উভয়েরই দক্ষতার মিশ্রণ বিদ্যমান। এর সাহায্যে উত্তরাধিকারীদের ন্যায্য প্রাপ্য নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ পন্থায় বের করা সম্ভব হয়। বিশেষ করে যখন উক্ত প্রাপ্য সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং উত্তরাধিকারীরা জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এ কারণে প্রত্যেক শহরের জ্ঞানীসমাজ উক্ত বিষয়ে আগ্রহী হয়ে থাকেন। বিভিন্ন গ্রন্থ রচয়িতারা অনেক সময় এমন আগ্রহের আতিশয্যে হিসাবের ব্যাপারে এবং বিচিত্র সব সমস্যা ধরে নিয়ে তার অজ্ঞাত প্রাপ্যাদির নিকাশের জন্য হিসাবশাস্ত্রকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। যেমন—বীজগণিত, পাটীগণিত ও অনুরূপ অন্যান্য শাস্ত্রের বেলায় করা হয়। সুতরাং তারা এমন বিষয়ের দ্বারা তাঁদের গ্রন্থাদি পরিপূর্ণ করে তোলেন। অথচ মানুষের মধ্যে অনুরূপ জটিল হিসাবাদির খুব পরিচিতি নেই। কারণ তারা সাধারণভাবে উত্তরাধিকার নির্ণয়ের জন্য যে ধরনের হিসাব করে থাকে, সে তুলনায় এসব গ্রন্থে প্রদত্ত বিষয়াদি বিরল ও দুষ্পাপ্য হওয়ায় এটি দ্বারা তাদের কোন উপকারই হয় না। অবশ্য এসব বিষয় অনুশীলনকারী এবং বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যোগ্যতা অর্জনকারীদের জন্য অতিশয় উপকারী বলে গণ্য হতে পারে।

অনেক সময় এ দায়ভাগশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপালনের জন্য আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন। তাতে বলা হয়েছে যে, 'ফরায়েজ' জ্ঞানের এক-তৃতীয়াংশ এবং তা-ই সর্বপ্রথম বিস্মরণযোগ্য বিষয়। অন্য একটি বর্ণনায়,—জ্ঞানের অর্ধেক। আবু নাইম আল হাফেজ[১১১] এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা দায়ভাগশাস্ত্রীরা এ ধারণার ফলেই প্রমাণ উপস্থিত করেন যে, এস্থানে ফরায়েজের অর্থ উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় নির্ধারিত প্রাপ্য। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ স্থানে অনুরূপ ধারণা পোষণ একান্ত অবাস্তব। কেননা এ স্থানে ফরায়েজের অর্থ উপাসনা, অভ্যাস, উত্তরাধিকার ও অন্যান্য নানাবিধ পালনীয় কর্তব্য। এদিক থেকে বলতে গেলে তার জ্ঞানের অর্ধেক ও এক-তৃতীয়াংশ হওয়ার ব্যাপারটি যুক্তিসিদ্ধ হয়। কিন্তু এর অর্থ উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য ধরলে সমগ্র ধর্মীয়শাস্ত্রের তুলনায় এর অংশ একান্তই সামান্য। কারণ এ বিশেষ শাস্ত্রের নাম হিসেবে 'ফরায়েজ' শব্দটির ব্যবহার অথবা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অংশাদির পরিভাষা হিসেবে এর প্রচলন ফেকাহ্শাস্ত্রের নানাবিধ শাখা-প্রশাখার উদ্ভব এবং সেজন্য পরিভাষা সৃষ্টির সময়ই শাস্ত্রবিদদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় এটি এ অর্থে ছিল না। তখন এটি সাধারণ অর্থে 'ফরজ' শব্দ থেকে তৈরি হয়েছিল; যার আভিধানিক অর্থ ধরে নেয়া অথবা

---

১১০. আবুল মুয়ালী আবদুল মালেক ইবনে আবদুল্লাহ্ আল জুয়য়নী; ৪১৯—৪৬৮ (১০২৮—১০৮৫ খ্রি:) হি:।

১১১. আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ; ৩৩৬—৪৩০ (৯৪৮—১০৩৮ খ্রি:) হি:।

কর্তন করা। তখন এটি সব 'ফরজের' বহুবচন হিসেবেই ব্যবহৃত হত; যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। বস্তুত ধর্মীয় বিধান অনুসারে এটাই এ শব্দটির যথার্থ তাৎপর্য। সুতরাং একে তখন তারা যে অর্থে ব্যবহার করেছিলেন, তা ছাড়া অন্য অর্থে প্রয়োগ করা উচিত নয়। কারণ প্রসঙ্গ অনুসারে তাই এ শব্দের যথার্থ অর্থ। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জ্ঞাতা এবং তিনিই একমাত্র সহায়।

নবম পরিচ্ছেদ

[ফেকাহ্‌শাস্ত্রের মূলনীতি এবং এসব সম্পর্কীয় বিতর্ক ও মতপার্থক্য]

জেনে রাখুন যে, অসুলে ফেকাহ্ বা ফেকাহ্‌র মূলনীতি ধর্মীয় শাস্ত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চমর্যাদার অধিকারী এবং অতিশয় উপকারী। এটি পালনীয় ও কর্তব্য বিধি-নিষেধের উৎস হিসেবে ধর্মীয় প্রমাণাদির পর্যালোচনার জ্ঞান, ধর্মীয় প্রমাণাদির মূল উৎস হল আল্লাহ্‌র গ্রন্থ অর্থাৎ কুরআন এবং তার ব্যাখ্যাকারী হাদীসসমূহ।

নবী (সঃ)-এর কালে বিধি-নিষেধ তাঁর কাছ থেকেই গ্রহণ করা হত। তাঁর উপরেই অবতীর্ণ কুরআনকে তিনি নিজ বাক্য ও কর্মের দ্বারা ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্যের ফলে এ সম্পর্কের কোন প্রকার বর্ণনা, বিবেচনা ও অনুমানের প্রয়োজন হত না। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর—আল্লাহ্‌র করুণা ও শান্তি তাঁর উপর বর্ষিত হোক—সেই সুস্পষ্ট বক্তব্যের ধারা ছিন্ন হল এবং কুরআনকে সুসংবদ্ধ ধারাবাহিকতায় সংরক্ষণ করা হল।

হাদীস সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, যেসব হাদীস কথা ও কাজের বিশুদ্ধ ধারাবাহিকতায় বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে, সে সবের নির্দেশ অবশ্য পালনীয় বলে সব সাহাবীই (রাঃ) ঐকমত্য পোষণ করেন। এ ক্ষেত্রে হাদীস সংক্রান্ত সব বিষয়টি এমনভাবে বর্ণিত হবে, যাতে সত্য বলে প্রতীতি জন্মায়।

এভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় বিধানের উৎস হিসেবে কুরআন ও হাদীস নির্দিষ্ট হয়েছিল। তারপর এ দুটির সাথে 'ইজ্‌মা' এসে সংযুক্ত হল। কেননা সাহাবীরা যে-কোন প্রকার অশোভন ব্যাপারকে ঐক্যের সাথে প্রতিরোধ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের এমন ঐক্য কোন প্রকারেই ভিত্তিহীন হতে পারে না। কারণ তাঁদের মতো লোকেরা বিনা প্রমাণে কোন বিষয়ের উপর ঐকমত্য পোষণ করতে পারেন না। যুক্তি-প্রমাণ তাঁদের এ দলের পবিত্রতা সম্পর্কেই সাক্ষ্য দেয়। এ জন্যই ধর্মীয় বিধানে এ সর্বসম্মতি বা ইজ্‌মা ক্রমশ একটি প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

অতঃপর আমরা যখন সাহাবী ও পূর্বসূরিদের কুরআন ও হাদীস দ্বারা যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করি, তখন দেখতে পাই তাঁরা তুলনামূলক বিষয়াদির দ্বারা অনুরূপ অন্য বিষয় সম্পর্কে অনুমান করেছেন। তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে একটির দৃষ্টান্তে অন্যটি সম্পর্কে বিবেচনা করেছেন এবং এ ব্যাপারে পরস্পরকে সমর্থন দিয়েছেন। কারণ নবী (সঃ)-এর তিরোধানের পর যে ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করে, সেসম্পর্কে সব সমাধান কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্যের মধ্যে ছিল না। সুতরাং তাঁরা

প্রতিষ্ঠিত প্রমাণের দ্বারা অনুমান করেছেন এবং সুস্পষ্ট বক্তব্যের সাথে উক্ত সমাধানকে মিলাতে চেয়েছেন। অবশ্য এরূপ সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে শর্তাদি ছিল, যাতে দুটি তুল্য বা অনুরূপ বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমতার দিক থেকে শুদ্ধ হয়। এর ফলে যেন এরূপ ধারণা জন্মায় যে, এ উভয়ের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ একই। এভাবে উক্ত বিষয়টি একটি ধর্মীয় প্রমাণে পরিণত হয়। তাকেই বলা হয় 'অনুমান'। তা-ই চতুর্থ প্রমাণ নামে অভিহিত।

জ্ঞানীসমাজের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল এগুলোই প্রামাণ্য মূলনীতি। অবশ্য অনেকে এ 'ইজ্‌মা' (সর্বসম্মতি) ও 'কিয়াস' (অনুমান) সম্পর্কে বিরোধিতা করেছেন; কিন্তু তাঁদের সংখ্যা নগণ্য। অন্য অনেকে এ চারটি প্রমাণের সাথে আরও কিছু প্রমাণ যুক্ত করেছেন। এগুলোর উপলব্ধিজাত দুর্বলতা ও মতামতের বিরলত্বের জন্য আমরা এখানে তাদের বিবরণ তুলে ধরতে চাই না। বস্তুত এ শাস্ত্রের প্রথম থেকেই উপরোক্ত চারটি বিষয়কেই প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করার জন্য আলোচনা উপস্থিত করা হয়েছে।

কোরানের প্রামাণিকতা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তার বিষয়বস্তুর অকাট্য অলৌকিকত্ব ও তার রচনার সুসংবদ্ধ ধারাবাহিকতাই এমন এক সত্যতার সাক্ষ্য দেয়, যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। হাদীস সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারমধ্যে যা বিশুদ্ধ বর্ণনাধারায় আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, সে সম্পর্কীয় নির্দেশাবলির অবশ্য পালনীয়তা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধ; যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। নবী (সঃ)-এর জীবদ্দশায় ধর্মীয় বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধসহ বিভিন্ন অঞ্চলে পত্রলিখন, দূত প্রেরণ প্রভৃতি কাজের মাধমে হাদীসের প্রামাণ্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'ইজ্‌মা' সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সাহাবী (রাঃ) গণ তাঁদের বিরোধিতাকে একতার সাহায্যে প্রতিরোধ করেছেন এবং এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে তাঁদের নিরপেক্ষতা জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সত্য। 'কিয়াস' সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, তা সাহাবীদের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধ; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। সুতরাং এগুলোই প্রামাণ্য মূলনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

অতঃপর বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে এর সংবাদের সত্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বর্ণনার ধারা ও বর্ণনাকারীদের সততা বিচার করে দেখতে হয়; যাতে এর ফলাফলের উপর নির্ভর করে বিষয়টিকে সত্য বলে ধারণা করা যায়। কারণ এরূপ ধারণাই এর অবশ্য পালনীয়তার ভিত্তিভূমি। সুতরাং এ বিষয়গুলোও এ শাস্ত্রের নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। দুটি হাদীসের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতার ব্যাপারটিও এর সাথে যুক্ত হবে। এক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে কোনটি অগ্রবর্তী এবং কোনটি রহিতকারী ও কোনটি রহিতকৃত, তাও জেনে নিতে হয়। এসব বিষয়ও এ শাস্ত্রের বিভিন্ন পরিচ্ছেদ ও অধ্যায়ের অন্তর্গত।

এর পর শব্দাবলির অর্থবৈশিষ্ট্য নিয়ে বিবেচনার বিষয়টি নির্দিষ্ট হয়ে আছে। বস্তুত এদের অর্থগত সাধারণ অবস্থা অনুধাবনের জন্য বাক্যান্তর্গত গঠন সৌকর্য বিচারের প্রয়োজন আছে। এ ক্ষেত্রে উক্ত বিচারের জন্য শব্দ ও বাক্যের সুপ্রচলিত অর্থাবলি জানতে হয়। এর জন্য ভাষাতাত্ত্বিক যে নিয়মাবলি রয়েছে, তাকে 'এলমে নুহু' (বাক্ বিন্যাসশাস্ত্র), 'এলমে সরফ' (শব্দগঠনশাস্ত্র) ও 'এলমে বয়ান' (অলঙ্কারশাস্ত্র) বলা হয়।

অবশ্য ভাষাভাষীদের কাছে যখন ভাষাগত এ যোগ্যতা স্বতোঃস্ফূর্ত ছিল, তখন এসব নিয়ম ও শাস্ত্রের প্রয়োজন হয়নি; এমন কি ফেকাহ্‌শাস্ত্রও এগুলোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। কারণ তখন তা সহজাত প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তারপর আরবি ভাষায় এ যোগ্যতা বিকৃত হয়ে পড়লে বিশেষজ্ঞরা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে পৃথক পৃথক প্রণালীবদ্ধ করে ফেলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা বিশুদ্ধ শ্রুতি এবং বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে তাঁদের গবেষণাজাত অনুমানের সাহায্য নিয়েছিলেন। এর ফলে এগুলো এমন কিছু সংখ্যক শাস্ত্রে পরিণত হল; ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদরা আল্লাহ্‌র বাণীর নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করতে এদের সাহায্য নিতে বাধ্য হলেন। তারপর সেখানে বাক্যের গঠনপ্রণালি থেকে অন্যবিধ অর্থোদ্ধারের বিষয়টি দেখা দিল। তা-ই বাক্যের গঠনপ্রণালি থেকে উদ্ভূত বিশেষ প্রমাণাদির সাহায্যে তার অর্থান্তর্গত ধর্মীয় বিধি-নিষেধকে রূপদান করা এবং একেই ফেকাহ্‌শাস্ত্র বলা হয়।

অবশ্য এ ব্যাপারে সাধারণভাবে প্রচলিত অর্থাদি জানা-ই যথেষ্ট নয়; বরং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য এমন অনেক বিষয় জানতে হয়, যার উপর বিশেষ অর্থের দিকটি নির্ভর করে। কেননা এ বিশেষ অর্থের দ্বারাই ধর্মশাস্ত্রবিদ ও বিশেষজ্ঞদের গৃহীত নীতিমালার মাধ্যমে বিধি-নিষেধ প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে। কারণ তারা এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই নিয়মগুলো গ্রহণ করেছেন। যেমন শব্দার্থ অনুমানের দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না। একাধিক অর্থবিশিষ্ট শব্দের একই প্রসঙ্গে একটির বেশি অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। 'ওয়াও' (সংযোগমূলক অব্যয়) থাকলেই তার দ্বারা পর্যায়ক্রম বোঝাবে না। সাধারণ থেকে যদি একটি বিশেষ অংশ বের করে নেয়া হয়, তা হলে অন্য অবশিষ্ট অংশ কি প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করা যাবে? অনুজ্ঞা কি অবশ্য পালনীয়, না শুধু পালনীয়; তৎক্ষণাৎ, না কিছুকাল পরবর্তী এবং নিষেধের উদ্দেশ্য কি বিকৃতি প্রতিরোধ, না সুস্থতাজ্ঞাপক? শর্তহীনকে কি শর্তাধীনের উপর প্রয়োগ করা যায়? কোন বিশেষ কার্যকারণ সংবলিত বক্তব্য কি অন্যত্র প্রযোজ্য, কিংবা প্রযোজ্য নয়? অনুরূপ আরও বহু বিষয়। এদের সবগুলোই এ শাস্ত্রের নিয়মাবলির অন্তর্ভুক্ত। কারণ এ সবগুলোই ভাষার আর্থিক প্রসারতার সাথে সংশ্লিষ্ট।

অতঃপর কিয়াস বা অনুমান সম্পর্কে বিবেচনা করা এ শাস্ত্রের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা এতে অনুমানযোগ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়াদির ক্ষেত্রে মূল ও শাখার ব্যাপারটি যথার্থতার সাথে বিশ্লেষণ করতে হয় এবং সেই বিশেষ গুণটি সুস্পষ্টভাবে অধিকার করতে হয়, যা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত শাখা এ দিক থেকেই মূলের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। অনুরূপভাবে প্রসঙ্গের অন্যান্য গুণাবলি অথবা শাখার মধ্যে উক্ত গুণটির অবস্থান এমনভাবে বিচার করে দেখতে হয়, যাতে তার উপর নির্দেশ প্রয়োগ করতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়। এমন এর অনুসারী আরও বহু সমস্যা। এ সবাই এ শাস্ত্রের নিয়মাবলির অন্তর্গত।

জেনে রাখুন, এ 'অসুলে ফেকাহ্' নামক শাস্ত্রটি জাতির মধ্যে নবাগত শাস্ত্রগুলোর অন্যতম। পূর্বসূরিরা এ বিষয়ে অনেকখানি উদাসীন ছিলেন। তাঁদের ভাষাগত যোগ্যতাই তাঁদেরকে শব্দার্থের বেশি কিছু জানার প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্তি দিয়েছিল।

অবশ্য বিধি-নিষেধ নির্ধারণের জন্য বিশেষভাবে যে সব নিয়মের প্রয়োজন হয়, তার অধিকাংশই তাঁদের কাছ থেকে গৃহীত। কিন্তু বর্ণনাসূত্রাদি বিচারের জন্য তাঁরা তেমন কোন প্রয়োজন বোধ করতেন না। কারণ সময়ের নৈকট্য বর্ণনাকারীদের সম-সাময়িকতা এবং তাঁদের সম্পর্কে অবগতিই এ ব্যাপারে তাঁদেরকে নিরস্ত্র করেছে।

কিন্তু পূর্বসূরিদের তিরোধানের পর যখন প্রাথমিকযুগ অন্তর্হিত হল এবং সব শাস্ত্রই শিল্পকর্ম হয়ে উঠল, যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, তখন ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদ ও গবেষকরা প্রমাণাদির দ্বারা বিধি-নিষেধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এসব নিয়ম-নীতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। সুতরাং তাঁরা একে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র হিসেবে লিপিবদ্ধ করলেন এবং তার নাম রাখলেন ফেকাহ্‌শাস্ত্রের মূলনীতি।

এ বিষয়ে প্রথম পুস্তক রচনা করেন ইমাম শাফেয়ী (রাঃ)। তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে আদেশ, নিষেধ, অলঙ্কার, হাদীস, রহিতকরণ, কিয়াসে বিবেচ্য সুস্পষ্ট কার্যকারণ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারপর হানাফী ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদরা এ বিষয়ে পুস্তকাদি শিখলেন, তাঁরা এসব নীতির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলেন এবং তার বিষয়বস্তুকে ব্যাপক করে তুললেন। কালাম শাস্ত্রবিদ্‌রাও অনুরূপ পুস্তকাদি রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের তুলনায় ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদদের রচনা এ বিষয়ে ফেকাহ্‌র সাথে বেশি যুক্ত এবং বিচিত্র বিষয়ে বেশি উপযোগী। কেননা এর উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত প্রচুর এবং এর সব সমস্যা ফেকাহ্‌শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা হয়। কিন্তু কালামশাস্ত্রবিদরা অনুরূপ সমস্যাবলিকেই ফেকাহ্‌র নীতি থেকে মুক্ত করে যতদূর সম্ভব বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রমাণাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেন। কারণ এরূপ যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করাই তাঁদের শাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম ও সবিশেষ উদ্দেশ্য।

হানাফী ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদরা আলোচ্য বিষয়ে শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ প্রয়োগে এবং বিভিন্ন শাস্ত্রীয় সমস্যা থেকে এসব নীতির আবিষ্কারে যথাসাধ্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের ইমামদের মধ্যে আবু যায়েদ দবুসী[১১২] কিয়াস সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি সর্বপ্রকার বক্তব্য ও শর্ত যথা প্রয়োজন একত্র করেছেন এবং তার পরিপূর্ণতার দ্বারা 'অসুলে ফেকাহ্'শাস্ত্রীয় শিল্প হিসেবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তার সমস্যাবলি সুবিন্যস্ত ও তার নিয়মাবলি সুসংবদ্ধ হয়েছে।

এ বিষয়ে মানুষ কালামশাস্ত্রবিদদের ধারাও অনুসরণ করেছে। এর ফলে কালামশাস্ত্রীরা যেসব বই-পুস্তক রচনা করেছেন, তার মধ্যে ইমামুল হরামাইন-এর 'আল বুরহান' এবং ইমাম গাজ্জালীর 'আল মুস্তাসফা'—পুস্তক দুটি উল্লেখযোগ্য। তাঁরা উভয়েই 'আশায়েরা' পন্থী। এ বিষয়ে আবদুল জব্বারের 'আল আমদ' এবং আবুল হোসাইন বসরী[১১৪] রচিত উক্ত পুস্তকের ব্যাখা 'আল মুতামদ'ও উল্লেখযোগ্য এবং এ দুজন 'মুতাজেলা' পন্থী। বস্তুত এ চারটি পুস্তকই এ বিষয়ের নিয়ম ও স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হত। তারপর পরবর্তী কালামশাস্ত্রবিদদের মধ্যে বিশিষ্ট দুজন জ্ঞানী এ চারটি

১১২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর; মৃত্যু ৪৩০ (১০১৯ খ্রি:) হি:।
১১৩. আবদুল জব্বার ইবনে আহমদ আসাদাবাদী, মৃত্যু ৪১৫ (১০২৫ খ্রি:) হি:।
১১৪. মুহম্মদ ইবনে আলী; মৃত্যু ৪৩৬ (১০৪৪ খ্রি:) হি:।

পুস্তকের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। তাঁরা হলেন, ইমাম ফখরউদ্দিন ইবনে খতিব; উনি আল মাহসুল এবং সাইফুদ্দিন আমিদী,[১১৫]; ইনি 'আল আহকাম' নামে পুস্তক দুটি রচনা করেছিলেন। অবশ্য তাঁদের যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের ধারায় পার্থক্য বিদ্যমান। ইবনে খতিব যুক্তি-প্রমাণের প্রাচুর্যের প্রতি এবং আমিদী বিভিন্ন মতাদর্শ ও বিচিত্র সমস্যা বিশ্লেষণের প্রতি বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আল মাহসুল পুস্তকটির সংক্ষিপ্তসার রচনা করেছেন ইমাম খতিবের শিষ্য সিরাজউদ্দিন আরমাবী[১১৬] ও তাজউদ্দিন আরমাবীর[১১৭] ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি যথাক্রমে 'আত্তাহসীল' ও 'আল হাসেল' নামক পুস্তক দুটিতে। শিহাবউদ্দিন কেরাফী[১৮৮] উক্ত দুটি পুস্তক থেকে বিভিন্ন আলোচনা ও নিয়ম চয়ন করে 'তানকিহাত' নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেন। বিদ্যার্থীরা প্রাথমিক পর্যায়ে এ শেষোক্ত দুটি পুস্তিকাকে আগ্রহের সাথে পাঠ করে থাকে। এর ফলে বহুলোক এ দুটির ব্যাখ্যাপুস্তক রচনা করেছে। অবশ্য আমিদীর 'আল আহকাম' গ্রন্থটি সমস্যাবলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বেশি যোগ্য। সুতরাং তার একটি সংক্ষিপ্তসার আবু আমর ইবনে হাজেব[১২০] 'মুখতাসর কবীর' নামে রচনা করেছেন এবং তা বিখ্যাতও হয়েছে। তারপর তিনি উক্ত গ্রন্থকে অন্য একটি পুস্তিকায় সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। বিদ্যার্থীরা সেটি গ্রহণ করেছে এবং পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের সকলেই সেটি গ্রহণ, পাঠ ও এর ভাষ্য তৈরির ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বস্তুত এ শাস্ত্রেকালামশাস্ত্রবিদদের ধারার সারবস্তু এসব সংক্ষিপ্ত পুস্তিকার মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে।

হানাফীদের ধারায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের মধ্যে আবু যায়েদ দবুসীর গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং উত্তরসূরিদের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল সাইফুল ইসলাম বজদবীর[১২১] রচনা। ইনি বিশিষ্ট জ্ঞানী এবং তাঁর গ্রন্থটিও একটি ব্যাপক পরিধির আলোচনা। হানাফীশাস্ত্রবিদদের মধ্যে ইবনে সাআতী[১২২] আল আহকাম ও বজদবীর গ্রন্থকে একত্র করে দুটি ধারার সম্মিলন ঘটিয়েছেন। গ্রন্থটির নাম 'আল বাদাই'। বস্তুত এ গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন। বর্তমানকালে বিশিষ্ট জ্ঞানীরা এ গ্রন্থটি পাঠ ও আলোচনা করে থাকেন। বহু অনারব জ্ঞানী ব্যক্তি এর ব্যাখ্যা প্রস্তুত করতে আগ্রহী হয়েছেন। বর্তমানে আমরা এ অবস্থাই দেখতে পাচ্ছি।

অসুলে ফেকাহ্ নামক এই শাস্ত্রের এটাই তাৎপর্য; এর আলোচ্য বিষয়ও এমন এবং বর্তমানকালে প্রাপ্য তার বিখ্যাত রচনাবলিও অনুরূপ; যেমন বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্

---

১১৫. আলী ইবনে আবু আলী; মৃত্যু ৬৩১ (১২৩৩ খ্রি:) হি:।
১১৬. মাহমুদ ইবনে আবু বকর ৫৯৪—৬৮২ (১১৯৮-—২৮৩ খ্রি:) হি:।
১১৭. মুহম্মদ ইবনে হাসান; মৃত্যু ৬৫৬ (১২৫৮ খ্রি:) হি:।
১১৮. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১১ নং টীকা দ্র:।
১১৯. আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর; ত্রয়োদশ শতাব্দী।
১২০. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১০১ নং টীকা দ্র:।
১২১. আলী ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ৪৮২ (১০৮৯ খি:) হি:।
১২২. আহমদ ইবনে আলী; মৃত্যু ১২৯৯ খ্রিষ্টাব্দের পরে।

আমাদেরকে জ্ঞানের দ্বারা উপকৃত করেন এবং তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে আমাদেরকে তার অধিকারী করেন। অবশ্যই তিনি প্রতি বিষয়ে ক্ষমতাবান।

মত পার্থক্য

মত পার্থক্য সম্পর্কে জেনে রাখুন যে, এ ফেকাহ্ নামক শাস্ত্রটি যেসব শাস্ত্রীয় যুক্তি-প্রমাণ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে গবেষণাকারীদের মধ্যে তাঁদের উপলব্ধি ও দৃষ্টিকোণের কারণ প্রচুর মতানৈক্য দেখা দেয়। এরূপ মতানৈক্য অনিবার্য এবং এর কারণও আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। জাতির মধ্যে এ ব্যাপারে একটা বিরাট উদারতা বিদ্যমান ছিল। অনুসারীরা বিশিষ্ট জ্ঞানীদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুসরণ করতে সক্ষম হত। পরে উদারতার এ পর্যায় যখন চারজন ইমামের অস্তিত্বকে সম্ভব করে তুলল এবং বিভিন্ন নগরীর লোকেরা তাঁদের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করল তখন তাঁদের প্রতি আনুগত্যকেই মানুষ সীমাবদ্ধ করে নিল এবং এছাড়া অন্যদের প্রতি আনুগত্যের পথে বাধা সৃষ্টি করল। কারণ তখন শাস্ত্রাদির অতিমাত্রায় বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং গবেষণার ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে বসেছিল। তদুপরি সময়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এ চারটি মজহাবের বাইরে ভিন্নতর মতাদর্শ সৃষ্টির বিষয়টির জন্য যোগ্যলোকের অভাব দেখা দিয়েছিল। সুতরাং উক্ত চারটি মজহাব জাতির ধর্মীয়-ভিত্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে গেল। এদের অনুসারীরা পরস্পরের মধ্যে যে মতানৈক্যের সৃষ্টি করল, তাই ধর্মীয় বিধি-বিধান ও শাস্ত্রীয় মূলনীতির মতপার্থক্যের স্থলাভিষিক্ত হয়ে উঠল। যেন তাদের বাইরে আর কোন মতামত নেই।

এভাবে প্রতিটি দল তাঁদের ইমামের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে বিতর্কের সাহায্য গ্রহণ করেছে। তারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ইমামের মতকে বিশুদ্ধ মূলনীতি, সুদৃঢ় ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে এবং যে যা অনুসরণ করে, তাকেই একমাত্র সত্যপথ বলতে উৎসাহী হয়েছে। এ বিরোধ ধর্মীয় সমস্যার প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং ফেকাহ্‌শাস্ত্রের প্রতিটি অধ্যায়ে দেখা দিয়েছে। কখনও এ বিরোধ দেখা দিয়েছে শাফেয়ী ও মালেকের মধ্যে এবং আবু হানিফা তাঁদের একজনের সাথে মতৈক্য প্রদর্শন করেছেন। আবার কখনও মালেক ও আবু হানিফার মধ্যে এবং শাফেয়ী যে-কোন একজনের সাথে একমত হয়েছেন। আবার কখনও শাফেয়ী ও আবু হানিফার মধ্যে এবং মালেক তাঁদের যে-কোন একজনকে সমর্থন করেছেন। এমন বিরোধ-বিতর্কে ইমামদের যুক্তিপ্রদানের উৎস, মতোনৈক্যের ভিত্তি এবং তাঁদের গবেষণার বাস্তব লক্ষ্য বিশ্লেষণ সর্বদাই স্থান পেয়েছে। সুতরাং এরূপ বিরোধ-বিতর্কের সম্মিলিত রূপকে বলা হত 'মতপার্থক্য'। এ বিষয়ে যিনি অবতীর্ণ হতেন তাঁকেও এসব নিয়ম-কানুন জানতে হত, যার সাহায্যে গবেষকরা একটি বিশেষ মতের প্রতিষ্ঠা করেন। কারণ গবেষক যদিও তাঁর এমন জ্ঞানের দ্বারা একটি নতুন সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করেন; তবুও মতপার্থক্য প্রতিরোধকারীকে ঐ জ্ঞানের দ্বারাই উক্ত সিদ্ধান্তকে বিরোধীপক্ষের যুক্তি-প্রমাণের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হয়; যাতে তা তাদের আক্রমণে বিধ্বস্ত না হয়ে যায়।

এটি, আমার জীবনের শপথ, খুবই উপকারী বিদ্যা। এর চর্চার ফলে ইমামদের যুক্তি-প্রমাণের উৎস ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান জন্মায় এবং এ বিদ্যায় অনুশীলনকারীরা যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা কোন বিষয় প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে মালেকীদের অপেক্ষা হানাফী ও শাফেয়ীদের রচনা বেশি। কারণ কিয়াস হানাফীদের মতাদর্শের দিক থেকে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একটি বহুল-ব্যবহৃত ভিত্তি; যেমন, পাঠক, আপনি জানতে পেরেছেন। এ কারণে তাঁরা বিচার ও বিতর্কে বেশি দক্ষ। কিন্তু মালেকীদের কাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের ভিত্তি হাদীস হওয়ায়, তারা বিতর্ক বিচারে অভ্যস্থ নয়। তদুপরি তাদের অধিকাংশই মাগরিবের অধিবাসী, প্রান্তর জীবনে নিবিষ্ট এবং সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র শিল্পকৌশল সম্পর্কে উদাসীন।

এ বিষয়ে ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-এর 'আল-মাখাজ'; মালেকীপন্থী আবু বকর আরবীর[১২৩] 'আত্তালখীম,'—যা তিনি পূর্বাঞ্চল থেকে নিয়ে এসেছেন; আবু যায়েদ দবুসীর[১২৪] 'আত্তালিকা'; মালেকী উস্তাদদের অন্যতম ইবনে কাস্‌সারের[১২৫] 'উয়ুনুল আদেল্লা' প্রভৃতি গ্রন্থ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইবনে সাআতী তাঁর 'অসুলে ফেকাহ্' সম্পর্কীয় 'মুখতাসর' গ্রন্থে ফেকাহ্‌শাস্ত্রের সব বিরোধাত্মক বিষয় প্রতিটি সমস্যার ক্ষেত্রে যথানিয়মে পূর্বাপর সামঞ্জস্য রেখে একত্রে বর্ণনা করেছেন।

বিতর্ক

বিতর্ক হল ফেকাহ্‌শাস্ত্রের বিভিন্ন মজহাব ও অন্যান্যদের মধ্যে অনুষ্ঠেয় তর্কযুদ্ধ সম্বন্ধীয় প্রচলিত নিয়মাবলি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। কারণ তর্কযুদ্ধে যেহেতু স্বীকার-অস্বীকারের পরিধি ব্যাপক, সেজন্য তার প্রতিটি পক্ষ অধিকতরভাবে যুক্তি-প্রমাণের মুখাপেক্ষী এবং এর মাধ্যমেই তারা প্রশ্নোত্তর পরিচালনা করে থাকে। এর ফলে এক পক্ষ শুদ্ধ এবং অন্যপক্ষ ভ্রান্ত হয়ে দাঁড়ায়। এ দিক থেকে বিবেচনা করেই বিশেষজ্ঞরা তার রীতি-নীতি ও বিধি-নিষেধ নির্ধারণ করেছেন; যাতে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ উভয়পক্ষ স্বীকার-অস্বীকারের ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ থাকে। কোন অবস্থায় একপক্ষ যুক্তি উপস্থিত করবে এবং অন্যপক্ষ উত্তর দিবে। কোন স্থানে যুক্তি উপস্থাপন উপযুক্ত হবে; কীভাবে বিতর্কিত বিষয় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে; কোন স্থানে আপত্তি ও পাল্টা আপত্তি উত্থাপন করবে; কোথায় এক পক্ষকে নীরব হয়ে প্রতিপক্ষকে বক্তব্য ও যুক্তি উপস্থিত করতে দিতে হবে—এমন বহু বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হয়। এ জন্যই বলা হয় যে, বিতর্ক অর্থই যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের মাত্রা ও নিয়মাবলির জ্ঞান; যা দ্বারা কোন মতকে সুরক্ষিত ও বিধ্বস্ত করা সম্ভব হয়। এরূপ মত ফেকাহ্‌শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত অথবা বাইরেরও হতে পারে।

---

১২৩. আবু বকর ইবনে আরবি (র) ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৫৬ নং টীকা দ্র:।
১২৪. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১১২ নং টীকা দ্র:।
১২৫. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৭৬ নং টীকা দ্র:।

এ বিতর্কের দুটি ধারা বিদ্যমান; একটি 'বজদবী' ধারা[১২৬]; এটি ধর্মীয় যুক্তি-প্রমাণ তথা, কুরআন-হাদীস-ইজমা ইত্যাদির দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধতা। অন্য ধারাটি 'আমিদী' ধারা'[১২৭] নামে পরিচিত; এতে যে-কোন শাস্ত্রের দ্বারা যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করা সম্ভব এবং তার অধিকাংশই যুক্তিমাত্র। তার বহিরাঙ্গটি কল্যাণকর হলেও তার অন্তরঙ্গ পরিবেশ বিভ্রান্তিতে ভরা। কারণ আমরা যখন যুক্তিশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ নিয়ে বিবেচনা করি, তখন দেখতে পাই যে, তাতে বহুল পরিমাণে ভ্রান্ত অনুমান ও তর্কাভাস বিদ্যমান। যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, তাতে যুক্তি উপস্থাপনের ধারা সুরক্ষিত এবং যথেচ্ছা যুক্তি প্রয়োগের বৈচিত্র্য অনায়াসলব্ধ। বস্তুত এ আমিদীই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এ ধারার উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এজন্যই এ ধারাটি তাঁর নামে নামাঙ্কিত হয়েছে। ইনি প্রথমে এ ধারায় 'আল-এরশাদ' নামে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেন এবং পরবর্তীকালে উত্তরসূরিদের মধ্যে নসফী[১২৮] ও অন্যান্যরা তাঁকে অনুসরণ করেছেন। বহুলোক তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এ ধারায় অগ্রসর হয়েছেন; ফলে তাঁদের রচনাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

অবশ্য বর্তমানকালে এ বিষয়টি ইসলামী শহরগুলোতে পরিত্যাক্ত; কেননা সেখানে জ্ঞানার্জন ও শিক্ষার ধারা অবরুদ্ধ হয়ে এসেছে। তদুপরি এ বিষয়টি একান্তই পরিপূর্ণতা বিধায়ক; মৌলিক অন্তর্গত নয়। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞাতা এবং তিনিই একমাত্র সহায়।

---

১২৬. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১২১ টীকা দ্রষ্টব্য; সাধারণভাবে ইনি 'ফখরুল ইসলাম' (ইসলামের গর্ব) নামে খ্যাত।

১২৭. মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ৬১৫ (১২১৮ খ্রি:) হি:।

১২৮. উমর ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ৫৩৭ (১১৪২ খ্রি:) হি:।

দশম পরিচ্ছেদ

[এলমে কালাম]

এ শাস্ত্রে বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রমাণাদির দ্বারা ধর্মীয় বিশ্বাসের ধ্যান-ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত এবং আহলে সুন্নত ও পূর্বসূরিদের সনাতন পথ থেকে বিচ্যুত অভিনব মতবাদের ধারক ও বাহকদেরকে প্রতিরুদ্ধ করা হয়।

ধর্মীয় বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু হল একত্ববাদ। আমরা এখানে সে সম্পর্কে একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য চমৎকার প্রমাণ উপস্থিত করব; যাতে সহজতম উপায় ও ভিত্তিতে আমাদের কাছে একত্ববাদের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এর পর আমরা এলমে কালাম সম্পর্কীয় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ, মুসলমানদের মধ্যে এর আবির্ভাব এবং এর প্রতিষ্ঠার কার্যকারণ বর্ণনা করব। এখন আমরা বলছি জেনে রাখুন, সৃষ্টিজগতে অস্তিত্বের সম্ভাবনা; তা সত্তাগত, মানুষ অথবা প্রাণীর কৃতকর্মের ফলে উদ্ভূত, যা-ই হোক না কেন, তার জন্য অগ্রবর্তী কার্যকারণের প্রয়োজন রয়েছে। বস্তুত তার দ্বারা তা স্থায়ী স্বভাবে সংঘটিত এবং তার দ্বারাই তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হয়। তদুপরি এসব কার্যকারণও নবাগত এবং এদের জন্যও অন্যবিধ কার্যকারণের প্রয়োজন। এভাবে এসব কার্যকারণের ধারা ঊর্ধ্বগতি হয়ে এমন এক চরম কারণে শেষ হয়, যিনি তাদের অস্তিত্ব বিধায়ক ও স্রষ্টা; তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই—পবিত্র তিনি।

এসব কার্যকারণ তাদের ঊর্ধ্বগতি পরম্পরায় বহুগুণিত হয় এবং দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সুবিশাল হয়ে দাঁড়ায়। তখন বুদ্ধি তাদের উপলব্ধি ও গণনায় দিশা হারিয়ে ফেলে। কারণ একমাত্র সর্বগ্রাসী জ্ঞান ছাড়া তাদেরকে আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। বিশেষ করে মানুষ ও প্রাণিজগতের কার্যাবলি। তাদের সামগ্রিক কার্যকারণের মধ্যে ইচ্ছা ও আগ্রহ দৃশ্যমান। কেননা কোন কাজই ইচ্ছা ও আগ্রহ ছাড়া সম্পন্ন হয় না। আবার এ ইচ্ছা ও আগ্রহ পূর্ববর্তী কতিপয় পরস্পর অনুসৃত ধারণা থেকেই সাধারণভাবে জন্মে। সুতরাং এসব ধারণাই কর্মের ইচ্ছার জনয়িত্রী। কখনও এসব ধারণার কার্যকারণ হিসেবে অন্য আরও কিছু ধারণার প্রয়োজন হয়। বস্তুত মানবাত্মায় এসব ধারণার উৎপত্তির যথার্থ কারণ অপরিচিত। কারণ কারও পক্ষে আত্মিক বিষয়াদির প্রারম্ভ ও তার পর্যায়ক্রমিক অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। একমাত্র আল্লাহই এসব বিষয়কে তাদের মননে নিক্ষেপ করে থাকেন এবং এর একাংশ অপরাংশকে অনুসরণ করে। মানুষ তাদের আদি ও অন্ত জানতে অক্ষম। সে সাধারণভাবে তাদের বাহ্যিক কারণ সম্পর্কেই অবহিত হতে পারে এবং তাই তার উপলব্ধিতে একটি ধারাবাহিকতা ও শৃঙ্খলার সাথে অবতীর্ণ হয়ে থাকে।

কেননা মানবাত্মার স্বভাব সীমাবদ্ধ এবং একটি বিশেষ পর্যায়ের অন্তর্গত। অথচ ধারণাসমূহ ও তার বিন্যাস মানবাত্মা থেকে বিস্তৃততর। কারণ তা সেই মননের অন্তর্গত, যা মানবাত্মার পর্যায়কে সর্বদা অতিক্রম করে। সুতরাং মানবাত্মার পক্ষে তাদের অধিকাংশই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়; তার সামগ্রিক আয়ত্তি তো অনেক দূরের কথা। পাঠক, এ পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মপ্রবর্তকের সেই নিষেধাজ্ঞাকে বিবেচনা করুন, যাতে তিনি কার্যকারণ অনুসন্ধান ও তার অবগতি থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। কারণ তা এমন এক প্রান্তর, যেখানে মননশক্তি দিশা হারিয়ে ফেলে এবং দীর্ঘকালের প্রচেষ্টাতেও কোন গন্তব্য ও তাৎপর্য তার হস্তগত হয় না। 'বল, আল্লাহ! তারপর তাদেরকে তাদের অন্বেষণের খেলায় মজে থাকতে দাও'।[১২৯]

কখনও এ কার্যকারণ অন্বেষণের ধারা সামর্থ্যের সীমায় গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন অন্বেষণকারী বিভ্রান্ত-বিপর্যস্ত হয়ে যায়। আমরা অনুরূপ প্রকাশ্য ক্ষতি ও নৈরাশ্য থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পাঠক, কখনও মনে করবেন না যে, এরূপ অনুসন্ধানে নিরত হওয়া এবং তা থেকে প্রত্যাবর্তন করা আপনার সামর্থ্য ও ইচ্ছাশক্তির অধীন। বরং তা মানবাত্মার এক প্রকার আসক্তি এবং আমাদের অজ্ঞাত এক ধারায় তা কার্যকারণ অনুসন্ধানের ফলে মানবাত্মায় স্থায়ী হয়ে ওঠে। বস্তুত আমরা যদি তা জানতে পারতাম, তাহলে অবশ্যই তা থেকে বিরত থাকতাম। সুতরাং আমাদের উচিত তার সব কিছু থেকেই দৃষ্টিকে সরিয়ে নেয়া।

অন্যদিকে অস্তিত্বের উপর এ কার্যকারণের প্রভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরিজ্ঞাত। কারণ একমাত্র স্বভাবের ধারাতেই তার সম্বন্ধে জানা যায়। কার্যকারণ সম্বন্ধে ব্যাপারটি একান্তই বাহ্য-বিষয়াদির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তার প্রভাবের যথার্থ তাৎপর্য ও ধারা সর্বদাই অজ্ঞাত থাকে। 'তোমাদেরকে অতি অল্পই জ্ঞান দান করা হয়েছে'।[১৩০] এ কারণেই আমাদেরকে সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে এবং ত্যাগ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমরা যেন আমাদের সব আগ্রহ সেই সর্ব কারণের আধার, তার অস্তিত্ব ও ক্রিয়াবিধায়কের প্রতি নিবদ্ধ করি। যেন আমাদের আত্মশক্তিতে একত্ববাদের অনুভূতি দৃঢ় হয়। কারণ, আমরা জানি, ধর্মপ্রবর্তক আমাদের ধর্মীয় কল্যাণ ও সৌভাগ্যের পন্থা সম্পর্কে বেশি অবগত। কারণ তিনি অনুভূতির অতীত বিষয়েও জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই—এ সাক্ষ্য প্রদানকারী অবস্থায় যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এরূপ কার্যকারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হল সে এ সাক্ষ্যদান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং তার উপর ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ সত্য হয়ে উঠল। যদি সে এমন মনন ও আলোচনার সাগরে সাঁতার দেয় এবং তাদের প্রভাবের পর্যায়ক্রম একের পর এক বিবেচনা করতেও সক্ষম হয়, তবুও আমি তাকে এ বিষয়ে আশ্বাস দিতে পারি যে, সে নৈরাশ্য ছাড়া অন্যকিছু নিয়ে ফিরতে সমর্থ হবে না। এজন্য ধর্মপ্রবর্তক আমাদেরকে কার্যকারণ অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকতে এবং শর্তহীনভাবে একত্ববাদের দ্বারস্থ হতে

১২৯. কোরান; ৬, ৯১।
১৩০. কোরান; ১৭, ৮৫।

নির্দেশ দিয়েছেন। 'বল, তিনি আল্লাহ্ এক; আল্লাহ্ অভাবশূন্য, তিনি জনক নন, জাতও নন; তাঁর সমতুল্য অন্য কিছু নেই'।[১৩১]

পাঠক, আপনার মননশক্তি যদি এ ধারণা জন্মায় যে, সে এ সৃষ্টিজগত ও তার কার্যকারণ সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে জানতে পারবে এবং অস্তিত্বের সব পর্যায় জানতে পারবে, তা হলেও তার উপর নির্ভর করবেন না। কারণ এরূপ ধারণা নিছক বোকামী মাত্র। জেনে রাখুন, উপলব্ধিকারীর কাছে তার বাহ্য ধারণা অনুসারে প্রতিটি অস্তিত্ব সম্পর্কীয় উপলব্ধিই সীমাবদ্ধ এবং সেই সীমা অতিক্রম করার সাধ্য তার নেই। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়টি অনুরূপ নয় এবং অস্তিত্বগত সত্য এ সীমাবদ্ধতা থেকে বড়। পাঠক, আপনি কি দেখতে পান না, একজন বধির কীভাবে অস্তিত্ব সম্পর্কে উপলব্ধির ক্ষেত্রে চারটি ইন্দ্রিয় ও তদ্‌জাত বিবেচনার ওপর সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং শ্রোতাব্য সবকিছু তার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়! অনুরূপভাবে অন্ধের জন্যও দ্রষ্টব্য সব কিছু রহিত হয়ে পড়ে। তারা যদি না পিতা-মাতা, শিক্ষক ও সমসাময়িক অন্য সবার পদাঙ্ক অনুসরণ করত, তা হলে তাদের অভিজ্ঞতার অতীত সব ব্যাপারই অস্বীকার করে বসত। কিন্তু তারা অন্য সবার ধারা অনুসরণ করেই তাদের উপলব্ধির অতীত এসব বিষয় স্বীকার করে। এ ক্ষেত্রে তাদের সহজাত প্রবৃত্তি ও উপলব্ধির ধারা কোন সাহায্যই করে না। মূক প্রাণীদেরকে জিজ্ঞাসা করলে যদি তারা কথা বলতে পারত, তা হলে অবশ্যই বলত যে, মননশক্তি বলে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই এবং থাকলে অবশ্যই তাদের মধ্যেও থাকত।

পাঠক, এ বিষয়টি যদি আপনি বুঝে থাকেন, তা হলে এও বুঝবেন যে, সেখানে এমন একটি উপলব্ধির অস্তিত্ব আছে, যা আমাদের উপলব্ধি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কেননা আমাদের উপলব্ধি সৃষ্ট ও নবাগত এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা বিরাট। সীমাবদ্ধতাই অজ্ঞানতা; অথচ অস্তিত্ব এ সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে বিস্তৃত। 'একমাত্র আল্লাহ্‌ই সবাইকে বেষ্টন করে আছেন।'[১৩২] সুতরাং আপনার উপলব্ধি ও উপলব্ধ বিষয় সবকিছুর মধ্যে সীমাবদ্ধতাকে অনুধাবন করুন এবং ধর্মপ্রবর্তক আপনার বিশ্বাস ও কর্তব্য সম্পর্কে যা নির্দেশ করেন, তাকে অনুসরণ করুন। কেননা তিনি আপনার কল্যাণ সম্পর্কে বেশি আগ্রহী এবং আপনার উপকার সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত। কারণ তাঁর উপলব্ধির পর্যায় আপনার উপলব্ধি থেকে উন্নত এবং তাঁর বিবেচনাশক্তি আপনার বুদ্ধিমত্তা থেকে ব্যাপকতর পরিধিতে বিধৃত।

পাঠক, এ বিষয়টিকে বুদ্ধিমত্তা ও তার উপলব্ধির প্রক্রিয়া সম্পর্কে কটাক্ষপাত বলে মনে করবেন না। বরং বুদ্ধিমত্তা একটি বিশুদ্ধ তুলাদণ্ড এবং তার নিয়মাবলিও বিশ্বস্ত; তাতে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু তাই বলে তা দিয়ে আপনি আল্লাহ্‌র একত্ব, পরকাল, নবুয়তের তাৎপর্য, আল্লাহ্‌র গুণাবলির যথার্থতা এবং অনুরূপ যা কিছু তার আয়ত্তের বাইরে, তা মেপে দেখতে যাবেন না। কারণ এরূপ কিছু করার অর্থ হল অসম্ভবের জন্য লোভ করা।

---

১৩১. কোরান; ১১২।
১৩২. কোরান; ৮৫, ২০

এর উদাহরণ সেই ব্যক্তির কাজের দ্বারা দেয়া যায়, যে তুলাদণ্ডে স্বর্ণ ওজন করতে দেখে তা দিয়ে পর্বত মেপে দেখতে লালায়িত হয়ে উঠল। তার এ অসম্ভব বাসনা অবশ্যই এটি প্রমাণ করে না যে, তুলাদণ্ডের রীতিনীতি মিথ্যা। বরং বুদ্ধির একটি সীমা আছে; এর কাছে তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়। সে এর পর্যায় কখনই এত ব্যাপক করে তুলতে পারে না, যা দিয়ে সে আল্লাহ্ ও তাঁর গুণাবলিকে বেষ্টন করে ফেলতে পারে। কারণ সে তো তাঁর মধ্য থেকে বিস্তারমান সৃষ্টিপ্রবাহের একটি কণা মাত্র। পাঠক, এ থেকেই সেসব ব্যক্তির ভুলের পরিমাণ উপলব্ধি করতে পারবেন, যারা উপরোক্ত বিষয়গুলোতে শ্রুতির উপর বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। বস্তুত এটি তাদের বিবেচনাশক্তির ত্রুটি এবং তাদের মননশক্তির বিভ্রান্তি মাত্র। পাঠক, এ থেকে আপনি অবশ্যই সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

যখন এ বিষয়টি পরিস্ফুট হল, তখন এটি অবশ্যই সম্ভব যে, কার্যকারণ তার পরম্পরাগত ঊর্ধ্বগতিতে আমাদের উপলব্ধি ও অস্তিত্বের পর্যায় অতিক্রম করে যায় এবং তখন তা আর উপলব্ধির বিষয়বস্তু থাকে না। সুতরাং তার অনুসন্ধানে রত বুদ্ধি তখন কল্পনার জগতে বিচরণ করতে থাকে এবং ক্রমশ তা দিশাহারা হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কাজেই একত্ববাদ হল কার্যকারণ ও তার প্রভাবের চরম উপলব্ধির অক্ষমতা এবং তার স্রষ্টা ও বেষ্টনকারীর অস্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণ। কারণ তিনি ছাড়া অন্য কোন কর্তা নেই এবং সবকিছুর গন্তব্য তিনি ও তাঁর মহিমাই সকলের আশ্রয়স্থল। তাঁর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিচয় হল এই যে, আমরা তাঁর মধ্য থেকে আবির্ভূত হয়েছি; অন্য কিছু নয়। এটাই সেই জ্ঞানীর তাৎপর্য; যা বিশিষ্ট সত্যনিষ্ঠদের কাছ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে; তাঁরা বলেছেন, 'উপলব্ধির অক্ষমতাও এই প্রকার উপলব্ধি।'[১৩৩]

অতঃপর এ একত্ববাদের ব্যাপারে শুধু বিশ্বাসই বিবেচনাযোগ্য নয়। কারণ তাতো একটি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি মাত্র; যা জীবাত্মার আবেগের বহিঃপ্রকাশ। বরং তার পরিপূর্ণতার জন্য জীবাত্মাকে সেই গুণে গুণান্বিত হতে হবে। যেমন উপাসনা ও ক্রিয়াকর্মের আসল উদ্দেশ্য হল আনুগত্যের যোগ্যতা সৃষ্টি করা এবং অন্তরকে উপাস্য ছাড়া অন্য সব বিষয় থেকে মুক্ত করা। এর ফলে পরিণামে যাতে ইচ্ছুক সাধনাকারী আল্লাহ্ময় হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও দশার পার্থক্য হল কথা ও গুণের পার্থক্য।

এর ব্যাখ্যা এই : বহু লোক জানে যে, অসহায় ও অনাথের প্রতি দয়া করা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায় এবং তাঁর কাছে এটা পছন্দনীয়। তারা এ সম্পর্কে কথা বলে, স্বীকার করে এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যে তার সমর্থনের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু তারাই যদি নিপীড়িত লোকদের, অনাথ শিশু ও অসহায় সন্তানকে দেখে, তা হলে তৎক্ষণাৎ দূরে সরে যায়। তারা এদের কাছেই যেতে চায় না; এদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়া এবং তার আরও পরবর্তী পর্যায়ে জড়িয়ে ধরা, কোলে তুলে নেয়া ও কিছু দান করা তো অনেক দূরের কথা। সুতরাং এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা যায় যে, তার কেবল মাত্র অসহায়ের প্রতি দয়ার জ্ঞান আছে; কিন্তু উক্ত জ্ঞান অনুসারে তা দিয়ে নিজেকে গুণান্বিত

১৩৩. এ উক্তিটি অনেক জায়গায় উদ্ধৃত হয়েছে; কোন ব্যক্তিবিশেষের বাণী বলে মনে হয় না।

করার অবস্থা এখনও সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তির জন্য, অনাথকে দয়া করা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উপায়—এ জ্ঞানসহ অন্য অবস্থাটিও লাভ হয়, তা হলে সে অবশ্যই পূর্বোক্ত ব্যক্তির চেয়ে বেশি উন্নত। এটাই দয়ার গুণে গুণান্বিত হওয়া এবং তা প্রদর্শনের যোগ্যতা অর্জন। কাজেই সে যখন কোন অনাথ-অসহায়কে দেখে, তখন তাড়াতাড়ি তার কাছে যেয়ে তার মাথায় হাত বুলায় এবং তার প্রতি দয়া দেখিয়ে পুণ্যের প্রত্যাশা করে। সে এ বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করতে পারে না; এমনকি বাধা দিলেও সে এগিয়ে যায় এবং তার হাতে যা উপস্থিত আছে তা দিয়েই অনাথকে সাহায্য করে থাকে।

পাঠক, একত্ববাদ সম্পর্কে আপনার জ্ঞান ও তার গুণে গুণান্বিত হওয়ার অবস্থাও এমন। গুণান্বিত হওয়ার মধ্যদিয়ে জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে এবং এটি গুণান্বয়ের পূর্ববর্তী জ্ঞানের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। কারণ শুধু জ্ঞান লাভ করলেই গুণের অবস্থা জন্মায় না; বরং সেজন্য বারবার অসংখ্যবার অনুশীলন করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমেই যোগ্যতার স্থায়িত্ব ও গুণান্বয়ের যথার্থতা অর্জিত হয়ে সেই দ্বিতীয় জ্ঞানের উদ্ভব ঘটে, যা পরকালের কল্যাণ বহন করে আনে। কারণ গুণহীন প্রথম জ্ঞানের মূল্য ও উপকারিতা খুব একটা কিছু নেই। অধিকাংশ চিন্তাবিদদের জ্ঞান এ পর্যায়ের। কিন্তু লক্ষ্য হল সেই জ্ঞান, যা অভ্যাসের দ্বারা অর্জিত অবস্থার সাথে একাত্ম হয়ে অবস্থান করে।

পাঠক, জেনে রাখুন, ধর্মপ্রবর্তক যেসব বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন, তার মধ্যে পরিপূর্ণতার স্বরূপটি হল এই। বিশ্বাসের ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন, তাতে পরিপূর্ণতা হল সেই গুণে গুণান্বিত হওয়ার দ্বিতীয় জ্ঞান এবং উপাসনার ক্ষেত্রে যে পালনীয় কার্যকলাপের নির্দেশ দিয়েছেন সেখানেও পরিপূর্ণতা হল তার গুণ ও তাৎপর্যের দ্বারা নিজের অস্তিত্বকে সজ্জিত করা। কাজেই উপাসনা সম্পর্কে আগ্রহ ও তার নিয়মানুবর্তিতা পালনের মাধ্যমেই সেই মহৎ ফল অর্জনের অবস্থা দেখা দিতে পারে। হযরত (সঃ) সব উপাসনার সার হিসেবে বলেছেন, 'নামাজ আমার চোখের মণি।'[১৩৪] কেননা নামাজ তাঁর জন্য এমন একটি গুণ ও দশার সৃষ্টি করেছে, যার মধ্যে তিনি চরম পুলক আস্বাদন করেন এবং ঐ কারণেই তা তাঁর চোখের মণি। তাঁর এ অবস্থার সাথে সাধারণ মানুষের নামাজের কি কোন তুলনা হতে পারে এবং আর কে তাদেরকে এ পথ দেখাতে পারে? 'সর্বনাশ সেই নামাজীদের জন্য, যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে উদাসীন!'[১৩৫] হে আল্লাহ্! আমাদেরকে শক্তি দিন। 'আমাদেরকে সেই সরল পথ প্রদর্শন করুন, যে পথে আপনার অনুগৃহীত বান্দারা পদচারণা করেছেন; যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট, তাদের পথ নয়।'[১৩৬]

এ প্রসঙ্গে আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি, তা দিয়ে এটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বান্দার পালনীয় সর্বপ্রকার আদেশ-নিষেধের উদ্দেশ্য হল তার মধ্যে এমন একটি দৃঢ় যোগ্যতার সৃষ্টি করা, যাতে মানবাত্মা বাধ্য হয়ে সেই জ্ঞানের দ্বারস্থ হয়, যাকে

---

১৩৪. হাদিসে উল্লেখিত হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর প্রিয় বস্তুত্রয়ের একটি; অন্য দুটি হল স্ত্রীলোক ও সুগন্ধী।

১৩৫. কোরান, ১০৭, ৪-৫।

১৩৬. কোরান, ১, ৬-৮।

একত্ববাদ বলা হয়ে থাকে। এটাই বিশ্বাসের বিষয় এবং এর দ্বারাই পারলৌকিক কল্যাণ অর্জিত হয়ে থাকে। এ অবস্থাটি মানসিক ও দৈহিক উভয় প্রকার ক্রিয়া-কলাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ আলোচনা থেকে এটি বোঝা যায় যে, সর্বপ্রকার ধর্মীয় বিধি-নিষেধের ভিত্তি ও উৎস হল এ বিশ্বাস।

বাস্তবিকই বিশ্বাস এমনই এক মর্যাদায় বিভূষিত এবং এদিক থেকে তার বিভিন্ন স্তর বিদ্যমান। তার প্রথম স্তর অন্তরের বিশ্বাসকে মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা এবং তার সর্বোচ্চ স্তর অন্তরের বিশ্বাসকে এমন একটি অবস্থা সৃষ্টির মধ্যে বাস্তবায়িত করা, যাতে অন্তরের প্রভাবের আকর্ষণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সে অনুযায়ী কাজ সম্পাদনে নিয়োজিত হয়। তার নির্দেশে বান্দার যাবতীয় কাজকর্ম এমনভাবে পরিচালিত হবে, যা দিয়ে অন্তরের সেই বিশ্বাসের গভীরতা প্রকটিত হয়ে উঠবে। এটাই বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্তর। এটাই সেই পরিপূর্ণ বিশ্বাস, যার প্রভাবে বিশ্বাসী ছোট-বড় কোন অন্যায় অনুষ্ঠান করতে সমর্থ হয় না। কারণ এর যোগ্যতা ও দৃঢ়তা তাকে এক পলকের জন্য এর নির্দিষ্ট পথ থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না। হযরত (সঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যাভিচারীই এমন অবস্থায় ব্যভিচার করে না, যখন সে বিশ্বাসী।'[১৩৭] হিরাক্লিয়াসের হাদীসে আছে, যখন তিনি হযরত (সঃ) এর অবস্থাদি সম্পর্কে আবু সুফিয়ান ইবনে হরবকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, তখন তাঁর সহচরদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, তাঁর ধর্মে প্রবেশ করার পর কেউ কি রাগ করে ফিরে গেছে? আবু সুফিয়ান বললেন, না। হিরাক্লিয়াস বললেন, বিশ্বাসের অবস্থাই এই; যখন এর আনন্দ শিহরণ হৃদয়কে স্পর্শ করে।' এর অর্থ বিশ্বাসের প্রভাব যখন একবার দৃঢ়মূল হয়, তখন জীবাত্মার পক্ষে তার বিরোধিতা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিটি প্রভাবের অবস্থাই এমন; তা সহজাত প্রবৃত্তির ন্যায় বদ্ধমূল অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

এটাই বিশ্বাসের সেই চরম পর্যায়। এটি পবিত্রতার তুলনায় দ্বিতীয় স্তরের। কারণ পবিত্রতা নবীদের জন্য পূর্ব থেকেই অবশ্যম্ভাবী এবং এটি বিশ্বাসীরা তাদের সততা ও কার্যকলাপের দ্বারা পরে অর্জন করে থাকেন। বিশ্বাসের এরূপ যোগ্যতা ও দৃঢ়তার ফলেই এর মধ্যে বৈচিত্র্য দেখা দিয়ে থাকে এবং পাঠক, এর প্রচুর দৃষ্টান্ত আপনি পূর্বসূরিদের কথাবার্তার মধ্যে দেখতে পাবেন।

বোখারীর হাদীস সংকলনের শিরোনাম ব্যবহারে দেখা যায়, বিশ্বাসের অধ্যায়ে লিখেছেন; যেমন 'বিশ্বাস কথা ও কাজ এবং তা বাড়ে ও কমে'; 'নামাজ ও রোজা ইমানের অংশ'; 'রমজানের নফল এবাদত ইমানের অংশ'; 'লজ্জা ইমানের অংশ' ইত্যাদি। এখানে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের কথাই বলা হয়েছে; যার দিকে ইতোপূর্বে ইঙ্গিত করেছি এবং তার প্রভাবের কথাও বলেছি। এটাই কার্যকরী বিশ্বাস। অন্যথায় যে সত্য স্বীকৃতি বিশ্বাসের প্রাথমিক স্তরে বিদ্যমান, তাতে কোন প্রকার পার্থক্যের অবকাশ নেই। সুতরাং যারা তাকে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রাথমিক অবস্থায় বিবেচনা করেন এবং তাকে স্বীকৃতি বলে মেনে নেন, তারা পার্থক্যের কথা স্বীকার করেন না। যেমন কালামশাস্ত্রবিদগণ এ মত পোষণ করেন। আর যারা যে পর্যায়ের কথা বিবেচনা করে এ

---

১৩৭. বোখারী দ্রষ্টব্য।

স্বীকৃতিকে সেই পরিপূর্ণ বিশ্বাসের উপর ন্যাস্ত করেন, যা বিশ্বাসীর মধ্যে গুণ হিসেবে প্রকাশ পায়, তারা পার্থক্যের কথা স্বীকার করেন। কিন্তু এ পার্থক্য বিশ্বাসের প্রাথমিক অবস্থা স্বীকৃতির যথার্থতায় কোন প্রকার ত্রুটির জন্ম দেয় না। কেননা স্বীকৃতি তার সর্বাবস্থায় বিদ্যমান।

কারণ প্রথম অবস্থায় যাকে ইমান বলা হয়, তার কাজ হল বিশ্বাসীকে 'কুফুর' (অবিশ্বাস) থেকে মুক্তি দেয়া এবং তার দ্বারাই 'মোমেন' (বিশ্বাসী) ও 'কাফের' (অবিশ্বাসীর) মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়ে থাকে। সুতরাং তা থেকে কম কোন কিছুর দ্বারা তা সিদ্ধ হওয়ার নয়। বস্তুত তার অস্তিত্বের দিক থেকে তা একক বিষয়; পার্থক্যের কোন অবকাশ নেই। পার্থক্য যা কিছু, তার সবাই তার প্রভাবে সৃষ্ট কার্যকলাপের মধ্যে; যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। অতএব এটি বুঝে নিন।

পাঠক, জেনে রাখুন, ধর্মপ্রবর্তক আমাদের জন্য এ ইমামের বলে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন, তা হল এ প্রাথমিক স্তরের, যাকে স্বীকৃতি বলা হয়। তিনি কতকগুলো নির্দিষ্ট বিষয় স্থির করে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে অন্তরের সাথে তা স্বীকার করে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা অবশ্যই অন্তরে এদের ধারণা পোষণ করব এবং এর সঙ্গে আমাদের জিহ্বা দিয়েও এদের স্বীকৃতি প্রদান করব। এগুলো বিশ্বাসের বিষয় হিসেবে ধর্মীয় বিধানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। ইমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে হযরত (সঃ) বলেছিলেন, 'তা আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাবর্গ, তাঁর গ্রন্থাদি, তাঁর প্রেরিত পুরুষগণ ও পরকাল সম্পর্কে বিশ্বাস করা এবং নির্ধারিত বিষয়াদি ও তার ভালোমন্দ সম্বন্ধে বিশ্বাস করা।'[১৩৮]

এগুলোই সেই বিশ্বাসের বিষয়, যা এলমে কালামে আলোকিত হয়েছে। পাঠক, আমরা সংক্ষেপে এর প্রতি ইঙ্গিত করব, যাতে এ শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য এবং তার আবির্ভাবের কারণ আপনার সামনে পরিস্ফুট হতে পারে। সুতরাং আমাদের বক্তব্য এই যে, জেনে রাখুন, ধর্মপ্রবর্তক আমাদেরকে সেই স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন, যাঁকে তিনি সর্বকর্মের উৎস বলে মনে করেন এবং এককভাবে তাঁকেই তিনি নির্দেশ করেছেন; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। তিনি আমাদেরকে আরও জানিয়েছেন যে, এ বিশ্বাসই আমাদের মোক্ষলাভের উপায়; যদি মৃত্যুর সময় আমরা এটি পোষণ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি। কিন্তু তিনি আমাদেরকে এ স্রষ্টা উপাস্যের অস্তিত্বরহস্য সম্পর্কে কিছুই বলে যাননি। কেননা তা আমাদের উপলব্ধি ও অনুভবের বহু উর্ধ্বে অবস্থিত এবং আমরা তাতে অক্ষম।

এ কারণেই তিনি আমাদেরকে সর্বপ্রথম নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন স্রষ্টার সেই সত্তাকে সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা থেকে পবিত্র রাখি। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে তিনি এদের স্রষ্টা, এ বিষয়টি অশুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্যের কোন প্রকার কারণ নির্দেশ সম্ভবপর হয় না। তারপর তিনি তাঁর গুণাবলিকেও নশ্বর গুণাবলির সাথে তুলনা করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এতেও সেই পরম স্রষ্টা সৃষ্টির অনুরূপ হয়ে দাঁড়ান। তারপর তিনি সেই পরম স্রষ্টার একক সত্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে

---

১৩৮. মুসলিম দ্রষ্টব্য।

বলেছেন। কেননা তিনি একক না হলে বিরোধিতার জন্য সৃষ্টিকর্ম কখনও সম্পূর্ণ হত না। তারপর তিনি আমাদেরকে বিশ্বাস করতে বলেছেন যে, তিনি জ্ঞানী ও ক্ষমতাবান। কেননা এর ফলেই তাঁর কার্যকলাপ পূর্ণতা লাভ করে একটি সুসম্পন্ন উদ্ভাবন ও সৃজনশক্তির পরিচয় বহন করে। তিনি ইচ্ছাময়; নয়তো তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়াত। তিনি প্রতিটি বস্তুকে নির্ধারিত রূপদানকারী; নয়তো তাঁর ইচ্ছাশক্তি নবোদ্ভূতে হয়ে পড়ত। তিনি মৃত্যুর পর পুনরায় আমাদেরকে তাঁর উদ্ভাবনের পরিপূর্ণতা বিধানের জন্যই জীবিত করবেন। কেননা এ সৃষ্টিকর্ম যদি চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার জন্য করা হত, তা হলে তা অনর্থক বলে মনে হত। বরং তা মৃত্যুর পরেও চিরকালীন জীবনের জন্যই নির্ধারিত।

অতঃপর ধর্মপ্রবর্তক আমাদেরকে এ পারলৌকিক জীবনের মন্দভাগ্য থেকে মুক্তির জন্য রসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা বিশ্বাস করতে বলেছেন। কারণ তৎকালীন জীবনের অবস্থা সৌভাগ্যে-দুর্ভাগ্যে বিচিত্র এবং সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নেই বললেও চলে। তিনি সেই অদৃশ্য জগতের সংবাদ প্রদান করে আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের পরিমাণকে পূর্ণতা দান করেছেন। তিনি দুটি পথের কথা উল্লেখ করেছেন। এক পথের শেষে বেহেশত; যেখানে সম্ভোগের প্রাচুর্য এবং অন্য পথের শেষে দোজখ; যেখানে শাস্তির অফুরন্ত সম্ভার।

এগুলোই বিশ্বাসের মৌলিক বিষয়; বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রমাণাদির দ্বারা যাদের কার্যকারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কুরআন-হাদীসে এদের প্রমাণের প্রাচুর্য বিদ্যমান। এসব প্রমাণ থেকেই পূর্বসূরিগণ এগুলো গ্রহণ করেছেন, জ্ঞানীরা এদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বিশেষজ্ঞরা এদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। অবশ্য পরবর্তীকালে এসব বিশ্বাস্য বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনায় মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। এরূপ মতানৈক্যের অধিকাংশেরই ভিত্তিভূমি কোরানের দ্ব্যর্থবোধক শ্লোকসমূহ। সুতরাং এগুলোর অর্থ নিয়ে বিবাদ, বিতর্ক ও শ্রুতির অতিরিক্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োগ দেখা দিয়েছে। এগুলোর ফলশ্রুতি হিসেবে এলমে কালামের উদ্ভব ঘটেছে।

পাঠক, আমরা এখন আপনার সামনে উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বিশদ করতে চেষ্টা করব। এটি এই যে, কোরানের বহু আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উপাস্যের যে গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে সর্বপ্রকার তুলনা থেকে পবিত্র। এগুলোর প্রতিটিই অব্যাখ্যেয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন। সুতরাং তাদের যথাযথ বিশ্বাসই অবশ্য কর্তব্য। ধর্মপ্রবর্তক (সঃ), সাহাবী ও তাবেয়ীদের বাণীতে এদের স্পষ্ট বক্তব্যকেই বিশদ করা হয়েছে। তারপর কোরানে এমন কিছু সংখ্যক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যা দ্বারা কখনও সত্তায় আবার কখনও গুণাবলিতে তুলনার একটা ধারণা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ আছে। কিন্তু পূর্বসূরিগণ এক্ষেত্রে পবিত্রতার প্রমাণ-প্রাচুর্য ও সুস্পষ্ট বক্তব্যের আধিক্যের জন্য তাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং কোন প্রকার তুলনাকে অসম্ভব বলে জেনেছেন। তাঁরা এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন যে, আয়াতগুলো আল্লাহ্‌র কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা এদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং কোন প্রকার আলোচনা ও ব্যাখ্যার দ্বারা এদের অর্থ পরিস্ফুট করতে উদ্যোগী হননি। এটাই তাঁদের অধিকাংশের সেই বাণীর তাৎপর্য

যেখানে তাঁরা বলেছেন, এগুলোকে পাঠ কর, যেমন এসেছে; অর্থাৎ বিশ্বাস কর যে, এগুলো আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই এসেছে। এদের ব্যাখ্যা ও বিশদীকরণের কোন চেষ্টা কর না। কারণ, এমনও হতে পারে যে, এগুলো তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই এসেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিরতি ও আনুগত্য অবশ্য প্রদর্শনীয়।

তাঁদের সমসাময়িককালে অভিনব মতের অনুসারীরা সংখ্যায় স্বল্প ছিল। তারা এসব দ্ব্যর্থবোধক আয়াতের বক্তব্য অনুসরণ করে তুলনার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিত। তাদের মধ্যে একদল স্রষ্টার সত্তায় তুলনা আরোপ করে তাঁর হাত, পা ও মুখমণ্ডল আছে বলে মনে করত। এক্ষেত্রে তারা কুরআন-হাদীসের প্রকাশ্য বক্তব্যকে কাজে লাগাত। সুতরাং তারা সুস্পষ্ট সাকারবাদের অধীন হয়ে সম্পূর্ণ পবিত্রতার প্রমাণগুলোর বিরোধিতা করত। কারণ কোন প্রকার আকারের বোধগম্যতা অভাব ও ত্রুটির অধীন হতে বাধ্য। তদুপরি সম্পূর্ণ পবিত্রতার সপক্ষে প্রামাণ্য আয়াতগুলো, যা সংখ্যায় বেশি ও বক্তব্যে সুস্পষ্ট; তা ঐসব আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ থেকে বেশি ভাল, যাদের বক্তব্যের স্বরূপ নির্ধারণের কোন প্রকার ব্যাখ্যার মাধ্যমে এ দু শ্রেণীর আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা না করে অধিকাংশ আয়াতের বক্তব্যকেই প্রাধান্য দিতে পারি।

অতঃপর এরূপ সাকারবাদীরা তাদের বক্তব্যের দুর্ভাগ্য থেকে পলায়নের জন্য বলেছে, 'এ দেহ অন্যান্য দেহের মতো নয়।' কিন্তু এটি তাদের দুর্ভাগ্যকে প্রতিরোধ করে না। কারণ এ বক্তব্যটি ত্রুটিপূর্ণ এবং 'ইতি' ও 'নেতি'র এক অপূর্ব মিশ্রণ। কেননা এটি দেহের বোধগম্য স্বরূপের সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি তারা এ দুই দেহের ধারণার মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করে, তা হলে তারা অবশ্যই সুপরিচিত ধারণাকে নস্যাৎ করছে এবং এক্ষেত্রে তারা আমাদের পবিত্রতার মতের সাথে ঐক্য স্থাপনে বাধ্য। এর পর দেহ শব্দটি তাদের একটি নাম হিসেবেই শুধু অবশিষ্ট থাকছে। অবশ্য আল্লাহ্‌র এমন নাম গ্রহণও অনুমতিসাপেক্ষ।

এমন অভিনব মতের অধিকারীদের একদল গুণাবলির মধ্যে তুলনার বক্তব্য উপস্থিত করেছে। যেমন আল্লাহ্ সম্পর্কে দিক, আরোহণ, অবতরণ, শব্দ, অক্ষর ও অনুরূপ অন্যান্য গুণের মত তারা পোষণ করে। এ মতও তাদেরকে সাকারবাদের দিকে আকর্ষণ করে এবং এজন্যই তারা পূর্ববর্তীদের ন্যায় বলতে বাধ্য হয় যে, এ শব্দ অন্যান্য শব্দের মতো নয়; এ দিক অন্যান্য দিকের মতো নয়; এ অবতরণ অন্যান্য অবতরণের মতো নয়—যাকে সাধারণ দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট করা যায়।

তাদের এমন মতবাদের প্রতিরোধকল্পে ইতিপূর্বে যে প্রমাণ প্রয়োগ করা হয়েছে, তাই এখানে প্রযোজ্য। এর পর কোরানের আয়াতের এ প্রকাশ্য বক্তব্যের ক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের বিশ্বাস ও তাঁদের মতাদর্শই অবশিষ্ট থাকছে। তা আয়াতের প্রকাশ্য অর্থকে যথাযথ বিশ্বাস করা মাত্র। কারণ তাদের এ অর্থ নস্যাৎ করতে গেলে তাদেরকেই নস্যাৎ করার অনুরূপ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ এগুলো কোরানের বিশুদ্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত আয়াত; এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

পাঠক, এ জন্যই আপনি এ বিশেষ সাক্ষাৎ লাভ করবেন ইবনে যায়েদের 'রেসালা'[১৩৯] ও তাঁর 'মুখতাসর' নামক গ্রন্থে এবং হাফেজ ইবনে আব্দুল বার[১৪০] ও

---

১৩৯. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৮৪ নং টীকা দ্র:।

১৪০. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৫২ নং টীকা দ্র:।

অন্যান্যদের রচনায়। সেখানে তারা উপরোক্ত বক্তব্যেরই সমর্থন দিয়েছেন। তাঁদের আলোচনার ধারা অনুসরণ করলে সেখানকার বিশেষ ইঙ্গিত কারও দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কথা নয়।

অতঃপর যখন শাস্ত্র ও শিল্পের প্রাচুর্য দেখা দিল এবং মানুষ সব দিকে গ্রন্থ রচনায় ও আলোচনায় মনোনিবেশ করল, তখন কালামশাস্ত্রবিদরা পবিত্রতা সম্পর্কে পুস্তকাদি লিখলেন। মুতাজেলাদের অভিনব মতবাদ প্রকাশ পেল। তারা অব্যাখ্যেয় আয়াতগুলোতেও এ পবিত্রতার নীতি সাধারণভাবে প্রয়োগ করে জ্ঞান, ক্ষমতা, ইচ্ছা ও জীবন সম্পর্কীয় গুণাবলির অর্থকেও নস্যাৎ করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তারা এগুলোকে বিধি-নিষেধের অতিরিক্ত বলে ভাবল। কারণ এসব গুণের অনাদিত্ব স্বীকার করে নিলে তাদের ধারণা মতে অনাদিতে বিভিন্নতা দেখা দেয়। কিন্তু এ মত গ্রহণযোগ্য নয়; কেননা গুণাবলি কখন সত্তার অন্তর্গত ও তার বহির্ভূত কিছু নয়। তারা ইচ্ছার অনাদিত্বও অস্বীকার করেছে। এর ফলে তাদেরকে নির্ধারণের ব্যাপারটিও অস্বীকার করতে হয়েছে। কারণ এ নির্ধারণের অর্থই হল সৃষ্টির পূর্বে ইচ্ছার অস্তিত্ব বর্তমান থাকা। তারা শ্রুতি ও দৃষ্টিকেও অস্বীকার করেছে; কারণ এগুলোও দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তাদের এ মতও গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ উক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থের মধ্যে দেহের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তা শুধু শ্রুত ও দৃষ্ট বস্তুর উপলব্ধিমাত্র। তারা শ্রুতি ও দৃষ্টির ন্যায় বাক্যকেও অস্বীকার করেছে। অথচ বাক্য যে স্বয়ম্ভু হতে পারে, এ বিষয়টি তারা বুঝতে সক্ষম হয়নি। তারা এর সূত্র ধরে এ মতও প্রকাশ করেছে যে, কুরআন সৃষ্ট। পূর্বসূরিরা এ অভিনব মতবাদের সুস্পষ্ট বিরোধিতা করেছেন। তবুও এ অভিনব মতে ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। কোন কোন খলিফা মুতাজেলাদের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে এ মতবাদ গ্রহণ করে মানুষকে এর অনুসারী করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পূর্বসূরি বিশেষজ্ঞরা এর বিরোধিতা করেছেন এবং এ বিরোধের ফলে প্রচুর সম্পদ নষ্ট হয়েছে ও রক্তপাত ঘটেছে।

এসব কারণে আহলে সুন্নতদের জন্য বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়; যাতে এরূপ অভিনব মতামতের প্রসার রোধ করা সম্ভব হয়। কালামশাস্ত্রবিদ শিরোমণি উস্তাদ আবুল হাসান আশআরী[১৪১] এ প্রতিরোধের জন্য দণ্ডায়মান এবং সব মত ও পথের মধ্যে তুলনাহীনতার একটি মধ্যপন্থা আবিষ্কার করেন। তিনি প্রতিটি বিষয়ের তাত্ত্বিক অর্থ সুপ্রতিষ্ঠিত করে তাকে পূর্বসূরিদের নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত করেন। তিনি বিশেষ বিশেষ যুক্তি-প্রমাণের ক্ষেত্রেও সাধারণ ধারণার প্রতিষ্ঠা অবারিত করে তোলেন। এর ফলে তিনি শ্রুতি ও মনন উভয়বিধ প্রমাণের সাহায্যে চারটি তাত্ত্বিক গুণ—শ্রুতি, দৃষ্টি, বাক্য ও স্বয়ম্ভরতার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। অভিনব মতবাদের সর্বক্ষেত্রে তিনি বিরোধিতা করে তাকে নস্যাৎ করেন। অভিনব মতামত পোষণকারীরা তাদের যুক্তির ভিত্তি হিসেবে কল্যাণ, সর্বোত্তম, সৎ ও অসৎ প্রভৃতির যে ধারণা তুলে ধরেছিল, তিনি তারও যথাযথ আলোচনা করেন। তিনি রসূল প্রেরণ, পারলৌকিক

১৪১. আলী ইবনে ইসমাইল; ২৬০—৩২৪ (৮৭৪—৯৩৫ খ্রি:) হি:।

অবস্থা, বেহেশ্‌ত, দোজখ, পুণ্য ও শাস্তির ধারণাগুলোকে পূর্ণতা দান করেন। এদের সাথে তিনি 'ইমামত' সম্পর্কীয় আলোচনাও সংযুক্ত করেন। কারণ তখন শিয়া ইমামিয়া সম্প্রদায়ের অভিনব মত—'ইমামের প্রতি বিশ্বাসও ইমানের অংশ'—এটি প্রকাশ পেয়েছিল। তারা ধারণা করে, নবীর জন্য এ ইমাম নির্দিষ্ট করে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য এবং এ ব্যাপারে দায়িত্ব কার উপর বর্তাবে, তার প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়া শুধু তাঁর নয়, সমগ্র জাতিরও অবশ্য করণীয়। ইমামত সম্পর্কীয় এ ধারণার ত্রুটি এই যে, এটি একান্তই সামাজিক কল্যাণের বিষয়; এর সাথে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোন সম্পর্ক নেই। অথচ তাদের এমন ধারণার জন্যই এ বিষয়টিকে আলোচ্য শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কালামশাস্ত্রবিদগণ এসব আলোচনার সমষ্টিকে 'এল্‌মে কালাম' নামকরণ করেছেন। এর কারণ, হয়—এতে আভিনব মতের পোষকদের বিরুদ্ধে যুক্তিজাল বিস্তারের বিষয় আছে, যা বাকসর্বস্ব ব্যাপার মাত্র; কখনই এটি কর্তব্যকর্মের মধ্যে বিধৃত হয় না; নয়ত এ শাস্ত্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্য হল স্বয়ম্ভু বাক্যের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তাদের যুক্তি-প্রমাণ অন্বেষণ। এ জন্যই এটি 'এলমে কালাম' (বাকশাস্ত্র) বলে অভিহিত হয়েছে।

উস্তাদ আবুল হাসান আশআরীর অনুসারীদের সংখ্যা প্রচুর এবং তাঁর পরবর্তীকালে তাঁর পথ অনুসরণ করে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে, যেমন ইবনে মুজাহেদ[১৪২] ও অন্যান্যরা খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁদের কাছ থেকে কাজী আবু বকর বাকেল্লানী[১৪৩] এটি গ্রহণ করে ইমামত সম্পর্কীয় বিষয়ে তাঁদের ধারা অনুসারে আরও এগিয়ে গেছেন। তিনি এ মতটিকে আরও পরিস্ফুট করেছেন এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য এমন বহু প্রস্তাবনার সৃষ্টি করেছেন, যার উপর শাস্ত্রান্তর্গত যুক্তিপ্রমাণের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। যেমন অণু ও শূন্যের প্রতিষ্ঠা; একটি বহিরাগত অবস্থা নির্ভর করতে পারে না; একই বহিরাগত অবস্থা দুটি কালে স্থায়ী হয় না এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়, যার উপর তাদের যুক্তি-প্রমাণ নির্ভর করে। তিনি এসব নিয়মকে ধর্মীয় বিশ্বাসাদির অনুসারী করেছেন এবং বিশ্বাসকে অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা এ বিশ্বাসের প্রয়োজনেই এসব যুক্তি-প্রমাণের উদ্ভাবনা। সুতরাং যুক্তি-প্রমাণ নস্যাৎ হলেই বিশ্বাস নস্যাৎ হয়ে যাবে—এ ধারণার উদ্ভব যেন না হয়।

এর ফলে এ ধারা পূর্ণতা লাভ করেছে এবং একটি উৎকৃষ্ট বিতর্কশাস্ত্র ও ধর্মীয় জ্ঞানের শাখায় পরিণত হয়েছে। অবশ্য অনেক সময় উক্ত শাস্ত্রে ব্যবহৃত যুক্তি-প্রমাণের বাহ্যিক রূপটি শিল্পসৌষ্ঠব সম্পন্ন বলে মনে হতে না পারে। এর কারণ জাতি তখনও সারল্যের মধ্যে অবস্থান করছে; তখনও তাঁদের মধ্যে যুক্তিবিদ্যার সেই স্বরূপ প্রকটিত হয়নি, যা দিয়ে প্রমাণের সৃষ্টি হয় এবং অনুমানের সূত্রাদি বিবেচনা করা হয়। বস্তুত যুক্তিবিদ্যা তখনও প্রকাশ্য স্বীকৃতি লাভ করেনি এবং তার যে অস্তিত্ব তখন বর্তমান ছিল, কালামশাস্ত্রবিদগণ তার সাহায্য গ্রহণ করেননি। কারণ তা তখন দর্শনের অন্তর্গত

---

১৪২. আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে আহমদ তাই; মৃত্যু ৩৬০—৭০ (৯৭০—৮০ খ্রি:) হিজরীর মধ্যে।

১৪৩. ভূমিকার ৮৩ নং টীকা দ্র:।

এবং সে দিক থেকে ধর্মীয় বিধি-বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। একারণেই যুক্তিবিদ্যা তাঁদের প্রমাণ উপস্থাপনে সম্পূর্ণ পরিত্যাক্ত ছিল।

কাজী আবুবকর বাকেল্লানীর পরে এ ধারায় আশায়েরাপন্থী বিখ্যাত ইমামুল হরমাইন আবদুল মুআলী[১৪৪] আবির্ভূত হন। তিনি এ ধারার একটি ব্যাপক গ্রন্থ রচনা করে সেখানে আলোচনাকে আরও বিস্তৃত করেন। তারপর তিনি তার সংক্ষিপ্তসার 'আল ইরশাদ' গ্রন্থটি রচনা করে এবং মানুষ একে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে দিক নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করে।

এর পর মুসলমানদের মধ্যে যুক্তিবিদ্যার প্রসার ঘটে। মানুষ এটি পাঠ করতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশ তারা যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের মধ্যে পার্থক্য রচনা করতে সক্ষম হয়। যুক্তিবিদ্যা প্রমাণের জন্য একটি মাপকাঠি ও নিয়মবিশেষ। এর দ্বারা যেমন এ শাস্ত্রে প্রমাণ উপস্থিত করা যায়; তেমনি অন্যান্য শাস্ত্রেও করা সম্ভব। তারপর তারা পূর্ববর্তীদের কালামশাস্ত্র সম্পর্কীয় নিয়ম ও প্রস্তাবনাগুলোতে দৃষ্টি দেয় এবং এ নবলব্ধ প্রমাণাদির দ্বারা তার বহু বিষয়ের বিরোধিতা করতে আরম্ভ করল। অনেক সময় তারা এ প্রসঙ্গে যে যুক্তি-প্রমাণ দেখতে পেত তার অধিকাংশই ছিল পদার্থবিদ্যা ও আধ্যাত্মতত্ত্ব সম্পর্কীয় দার্শনিকদের বক্তব্য থেকে নেওয়া। সুতরাং তারা যখন এগুলোকে যুক্তিবিদ্যার মাপকাঠিতে বিচার করে দেখল, তখন ঐসব যুক্তির অনেকগুলোই পূর্বের স্থানে ফিরে গেল। কিন্তু এর ফলে তারা প্রমাণের ত্রুটিতে প্রামাণ্যকে অবিশ্বাস করতে বসল না। যেমন কাজী বাকেল্লানীও করেননি। সুতরাং তাদের এ নব্য প্রচেষ্টা তার পরিভাষাদিসহ পূর্ববর্তী ধারা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়াল এবং একে পরবর্তীদের ধারা বলে অভিহিত করা হল।

এ পরবর্তীরা অনেক সময় এ আলোচনায় ধর্মীয় বিশ্বাসাদি সম্পর্কে দার্শনিকদের মতবিরোধেরও প্রতিবাদ করেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের মতামত অভিনব মতবাদীদের সাথে এক হয়ে যাওয়ায় তারা দার্শনিকদেরকে ধর্মীয় বিশ্বাসের শত্রু বলে ভেবেছেন। এ ধারায় সর্বপ্রথম ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) কালামশাস্ত্র সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁকে অনুসরণ করেন ইমাম ইবনে খাতিব।[১৪৫] তারপর একদল তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। কিন্তু এর পরে পরবর্তীর দর্শন গ্রন্থাদির বিষয় ব্যবহারে আতিশয্যের পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেন এবং তাঁদের মধ্যে উক্ত দুটি শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর পার্থক্য লোপ পেয়ে বিভ্রান্তিকর হয়ে দাঁড়াল। তাঁরা উভয় শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছুটা ঐক্য থাকার ফলে সেগুলোকে এক বলে ভাবতে লাগলেন।

পাঠক, জেনে রাখুন, কালামশাস্ত্রবিদগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সৃষ্টজগৎ ও তার অবস্থাদির দ্বারা স্রষ্টা ও তাঁর গুণাবলির প্রমাণ উপস্থিত করতেন এবং সাধারণভাবে এটাই ছিল তাঁদের প্রমাণের অন্যতম বিষয়। পদার্থবিদ্যার আলোচনায় দার্শনিকগণ যে স্বাভাবিক দেহের প্রতি দৃষ্টি দেন, তাও এ সৃষ্টজগতেরই অংশবিশেষ। অবশ্য দার্শনিক

১৪৪. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১১০ টীকা দ্র:।
১৪৫. তৃতীয় অধ্যায়ের ৫০ নং টীকা দ্র:।

যে দৃষ্টিতে সেটাকে দেখেন, তা থেকে কালামশাস্ত্রবিদের দৃষ্টি ভিন্ন। তিনি এ দেহকে তার গতি ও স্থিতির দিক থেকেই বিবেচনা করেন। অথচ কালামশাস্ত্রী তাকে একজন কর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে লক্ষ করেন। এভাবে আধ্যাত্মবাদে দার্শনিক কেবলমাত্র একটি শর্তহীন অস্তিত্ব ও তার সত্তাসম্পর্কীয় বিষয়াদি নিয়েই বিচার করেন। কিন্তু কালামশাস্ত্রী এ অস্তিত্ব সম্পর্কেই এমনভাবে বিবেচনা করেন, যাতে তা একজন স্রষ্টার প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করতে পারে। সুতরাং মোটামুটিভাবে কালামশাস্ত্রবিদদের কাছে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হল সেসব ধর্মীয় বিশ্বাস, যা সত্য বলে ধর্মীয় বিধান দ্বারা নির্দিষ্ট হয়েছে। যাতে এ নির্ধারিত ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে অভিনব মতামত দূর হয় এবং কোন প্রকার দ্বিধা সন্দেহের অবকাশ না থাকে, সে জন্যই তাঁরা এগুলো সম্পর্কে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করে থাকেন। পাঠক, আপনি যদি এ শাস্ত্রের উদ্ভব, যুগ পরম্পরায় এর সম্পর্কে মানুষের বিচিত্র আলোচনা এবং সবাই এগুলোকে সঠিক মেনে নিয়ে যেভাবে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে, তার প্রতি দৃষ্টি দেন, কেবল তা হলেই এ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আমরা যা বর্ণনা করেছি তা আপনার বোধগম্য হবে এবং দেখবেন তা কখনও সীমা অতিক্রম করে না।

কিন্তু এ উত্তরসূরিদের কাছে এ দুটি ধারা একত্রে মিলে গেছে এবং কালামশাস্ত্রের সমস্যাদির সাথে দর্শনশাস্ত্রের অনুরূপ বিষয় এমনভাবে তালগোল পাকিয়ে গেয়েছে যে, তাদের একটি অন্যটি থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। বিদ্যার্থীরা তাঁদের অনুরূপ গ্রন্থাদি থেকে কোন বিষয়ই সুষ্ঠুভাবে জানতে সক্ষম হয় না, যেমন বায়জাবীর 'আত্তাওয়ালি' নামক গ্রন্থ এবং তাঁর পরবর্তী অন্যান্য অনারব শাস্ত্রবিদদের গ্রন্থাবলি। অবশ্য এ মিশ্রধারায় রচিত গ্রন্থাবলি পাঠে বিভিন্ন মতাদর্শ এবং যুক্তি উপস্থাপনের দক্ষতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে বিদ্যার্থীরা উপকৃত হতে পারে। কেননা এসব বিষয় সেখানে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। কিন্তু কালামশাস্ত্রের বিশ্বাসাদি সম্পর্কে পূর্বসূরিদের ধারা জানতে হলে, তা একমাত্র কালামশাস্ত্রবিদদের প্রাচীর ধারাতেই পাওয়া যাবে এবং তার মূল ভিত্তি হল 'কিতাবুল ইরশাদ' ও তার অনুসারী অন্যান্য গ্রন্থ।

যারা ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দার্শনিকদের মতামতের প্রতিবাদ করতে ইচ্ছুক তারা ইমাম গাজ্জালী ও ইমাম ইবনে খতিবের গ্রন্থাবলি পাঠ করুন। কারণ তাঁদের রচনাবলিতে যদিও প্রাচীন পরিভাষার বিরোধিতা বিদ্যমান, তবু এগুলোতে সমস্যাদির মিশ্রণ ও আলোচ্য বিষয়ের বিভ্রান্তি নেই; যেমনটি আমরা তাঁদের পরবর্তীদের রচনার লক্ষ করেছি।

অবশ্য মোটামুটি বলতে গেলে এটি জেনে রাখা দরকার যে, এ শাস্ত্রটি, যাকে এলমে কালাম বলা হয়, তা বর্তমানকালে বিদ্যার্থীদের আর পাঠ করার প্রয়োজন নেই। কারণ পথভ্রষ্ট ও অভিনব মনের অধিকারীদের সংখ্যা বহুলাংশে কমে গেছে। তদুপরি আহলে সুন্নতের বিশিষ্ট জ্ঞানীরা এ বিষয়ে যেসব গ্রন্থ রচনা ও সংকলন করেছেন, তাই এজন্য যথেষ্ট। কারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি-প্রমাণের দরকার তখনই পড়ে, যখন প্রতিরোধ ও সহায়তার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু বর্তমানে অনুরূপ পরিস্থিতির মাত্র একটি দিকই

অবশিষ্ট আছে; তা হল সর্বপ্রকার বল্গাহীন উক্তি ও অসৎ ধারণা থেকে স্রষ্টার পবিত্রতাকে মুক্ত রাখা।

একদল কালামশাস্ত্রবিদের শাস্ত্রালোচনাকালে জুনায়েদ (রহঃ)[১৪৬] তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কেউ তাঁকে তাঁদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তাঁদের পরিচয় কী? বলা হল, এ দল যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে পরিবর্তনশীল গুণাবলি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি আবিলতা থেকে আল্লাহ্‌র পবিত্রতাকে রক্ষা করেন। এর উত্তরে তিনি বললেন, যেখানে ত্রুটি একান্তই অসম্ভব, সেখান থেকে ত্রুটি দূর করাও এক প্রকার ত্রুটি। অবশ্য এসব সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ ও বিদ্যার্থীদের এ শাস্ত্রালোচনার উপকারিতা সর্বজনস্বীকৃত। কারণ সুন্নতের অনুসারীদের জন্য নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কীয় যুক্তি-প্রমাণের অনভিজ্ঞতা কোনক্রমেই শোভন বলে বিবেচিত হতে পারে না। আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের বন্ধু।[১৪৭]

১৪৬. তৃতীয় অধ্যায়ের ৩১৪ নং টীকা দ্র:।
১৪৭. কোরান; ৩, ৬৮।

একাদশ পরিচ্ছেদ

[পরিবর্তমান ক্রিয়াশীল জগৎ একমাত্র মননশীলতার দ্বারাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়]

জেনে রাখুন, সৃষ্টিজগৎ, শুদ্ধসত্তা যথা, উপাদান ও তার প্রতিক্রিয়া এবং সেগুলোর ফলে উদ্ভূত ধাতু, উদ্ভিদ ও প্রাণী—এ তিন সৃষ্টি নিয়ে ব্যাপৃত। এদের সমস্ত কিছুই ঐশ্বরিক শক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এছাড়া এ সৃষ্টিজগতে আছে প্রাণিসমাজের উদ্দেশ্যপূর্ণ কার্যকলাপ। এগুলোও, আল্লাহ্ যে উদ্দেশ্যে ন্যস্ত করেন, সেদিক থেকে তাঁর ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। এসব কার্যকলাপের মধ্যে কিছু আছে সুপরিকল্পিত সুবিন্যাস্ত; এগুলোই মানুষের কাজ এবং কিছু আছে অপরিকল্পিত অবিন্যস্ত; এগুলো হল মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর কাজ।

এর কারণ এই যে, মননশক্তি স্বাভাবিকভাবে অথবা প্রচলিত ধারায় পরিবর্তমান বস্তুপুঞ্জের পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং সে যখন কোনো একটি বস্তু উদ্ভাবন করতে ইচ্ছা করে, তখন পরিবর্তমান বস্তুপুঞ্জের মধ্যকার বিন্যাসের জন্য তাকে তৎসংশ্লিষ্ট কারণ, লক্ষ্য অথবা শর্তাদি জেনে নিতে হয়। এ জানা মোটের উপর তার প্রারম্ভ বিশেষ। কারণ তা প্রাথমিক প্রস্তুতির পরই অস্তিত্বে আসে। এ জন্যই অগ্রবর্তী বিষয়কে পশ্চাদ্বর্তী করা যায় না এবং পশ্চাদ্বর্তীকেও অগ্রবর্তী করা সম্ভব নয়। উপরোক্ত প্রারম্ভের জন্য কখনো অন্য একটি প্রারম্ভ থাকে, যা ঐ প্রারম্ভসমূহেরই অন্তর্গত এবং একমাত্র পশ্চাদ্বর্তী হিসেবে অস্তিত্বে আসে। কখনো এটা ক্রমান্বয়ে উপরে উঠতে থাকে অথবা শেষ হয়ে যায়। সুতরাং তা যখন প্রারম্ভের শেষ দুই, তিন অথবা ততোধিক পর্যায়ে উপনীত হয় এবং ঐ ক্রিয়াটি আরম্ভ করা হয়, যা দিয়ে বিষয়টি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে, তখন সেই শেষ প্রারম্ভ থেকে ক্রিয়াটি আরম্ভ করা হয়, যেখানে মননশক্তি গিয়ে শেষ হয়েছে। কাজেই ঐ শেষ প্রারম্ভটি ক্রিয়ার প্রথম পর্যায় হয়ে থাকে। তারপর তাকে অনুসরণ করে কর্তা সেই কার্যকারণ ধারায় পৌঁছে, যেখানে সে প্রথম মনন কাজ আরম্ভ করেছিল। যেমন কেউ যদি আচ্ছাদনের জন্য একটি ছাদের পরিকল্পনা করে, তা হলে তার ধীশক্তি তাকে সেই প্রাচীরের দিকে নিয়ে যাবে, যা দিয়ে ঐ ছাদটি রক্ষিত হতে পারে। এর পর তার দৃষ্টি পড়বে সেই ভিত্তির দিকে, যার উপর ঐ ছাদটি দাঁড়াতে পারে এবং এটিই মননের শেষ পর্যায়। তারপর সে প্রথমে ভিত্তি নির্মাণ করবে, এর পরে প্রাচীর এবং এর পরে ছাদ। এটা তার ক্রিয়ার শেষ পর্যায়।

তাঁদের সেই বক্তব্যের অর্থও এটাই, যেখানে তাঁরা বলেন, কাজের আরম্ভ চিন্তার শেষ এবং চিন্তার আরম্ভ কাজের শেষ। সুতরাং বাহ্যিকভাবে মানুষের ক্রিয়া এসব

পর্যায়ক্রমের পরস্পরের নির্ভরশীলতা সম্পর্কে মননশক্তির প্রয়োগ ছাড়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। একমাত্র এ চিন্তার পরই সে কাজ শুরু করতে পারে। তার চিন্তার প্রথম পর্যায় কার্যকারণ হিসেবে অন্তিম এবং তা-ই ক্রিয়ার ক্ষেত্রে শেষ পর্যায়। তার কার্যের প্রথম পর্যায় কার্যকারণ হিসেবে প্রথম এবং তাই চিন্তার ক্ষেত্রে শেষ পর্যায়। এমন পর্যায় বিন্যাস সম্পর্কে অবহিতির ফলেই মানুষের কার্যকলাপে শৃঙ্খলা দেখা দিয়ে থাকে।

কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর কার্যাবলিতে এ শৃঙ্খলাবোধের বালাই নেই। কারণ তাদের মধ্যে কার্যসম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যায়বিন্যাস সম্পর্কীয় মননশীলতার অস্তিত্ব নেই। অন্যান্য প্রাণীরা ইন্দ্রিয়শক্তির সাহায্যে অনুভূতি লাভ করলেও তাদের উপলব্ধ জ্ঞান পৃথক-পৃথকভাবে অবস্থান করে এবং তাতে সমন্বয় সাধনের কোনো প্রক্রিয়া নেই। কারণ একমাত্র মননশক্তির সাহায্যেই এ সমন্বয় সাধিত হয়ে থাকে।

সুতরাং এ সৃষ্টিজগতে যেহেতু শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধিকেই একমাত্র ধর্তব্য বলে বিবেচনা করা হয় এবং শৃঙ্খলাবোধহীন উপলব্ধি তার অনুগত হয়ে থাকে, সে জন্য প্রাণিজগতের কার্যাবলিকে এ পর্যায়ে ফেলে তাকে মানুষের অধীন করে দেয়া হয়েছে। মানুষের কার্যাবলি এ পরিবর্তমান জগতের উপর তার সক্রিয়তাসহ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে এবং এর ফলে জগতের সবকিছুই তাদের অনুগত ও বাধ্য হয়ে পড়েছে। মহান আল্লাহ্‌র বাণীতে প্রতিনিধিত্বের কথা বলে এরই প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করব'।[১৪৮]

এ সেই মননশক্তি, যা মানবিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে অন্য সব প্রাণী থেকে মানুষকে পৃথক করে দিয়েছে। তার এ মননশক্তির কার্যকারণ ও উপলক্ষ সম্পর্কীয় পর্যায়ক্রমিক অবগতি মাত্রা অনুসারে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধিত হয়ে থাকে। মানুষের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যারা এ কার্যকারণের দু স্তর, তিন স্তর পর্যন্ত অবহিত হতে পারেন; অনেকে এ সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হন না; আবার অনেকে পাঁচ স্তর, ছয় স্তর পর্যন্ত গিয়ে উপনীত হন এবং এদিক থেকে তাঁদের মনুষ্যত্বও উন্নত পর্যায়ের হয়ে থাকে। পাঠক, দাবা খেলোয়াড়কে দিয়ে এ বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন। খেলোয়াড়দের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যারা প্রচলিত পর্যায়ক্রমে তিন চাল এমনকি পাঁচটি চাল পর্যন্ত ধারণা করে রাখতে পারেন; আবার অনেকে তাদের ধীশক্তির ত্রুটির জন্য অনুরূপ কিছু ধারণা করতে অক্ষম। অবশ্য একদিক থেকে এ উদাহরণটি যদিও যুক্তিযুক্ত নয়; কারণ দাবা খেলার বিষয়টি অর্জিত যোগ্যতামাত্র এবং কার্যকারণ ও উপলক্ষের পর্যায়ক্রমিক অবগতির স্বভাবজাত; তবুও এ উদাহরণের সাহায্যে কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি এসব সম্পর্কীয় নিয়মাবলির বিন্যাসধারা বুঝতে সক্ষম হবেন। 'আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে তাঁর জন্য অনেক সৃষ্টির উপর দর্শনীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন।[১৪৯]

---

১৪৮. কোরান; ২, ৩০।
১৪৯. কোরান; ১৭, ৭০।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

[অভিজ্ঞতাজাত বুদ্ধি ও তার উদ্ভবের প্রক্রিয়া]

পাঠক, আপনি অবশ্যই শুনেছেন যে, দার্শনিকদের গ্রন্থে লেখা রয়েছে, মানুষ স্বভাবতই নাগরিক। তাঁরা নবুয়ত ও অন্যান্য বিষয় প্রতিষ্ঠার জন্য এর উল্লেখ করেছেন। এ বক্তব্যে তাঁরা মানুষকে নগরীর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন বটে; কিন্তু এটি তাঁদের কাছে মানব সমাজেরই রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ বক্তব্যের তাৎপর্য হল এই যে, একক কোনো ব্যক্তির পক্ষে জীবনধারণ করা সম্ভব নয় এবং তার স্বজাতির সাহায্য ছাড়া তার অস্তিত্বই সম্পূর্ণ হতে পারে না। কারণ সে একা তার অস্তিত্ব ও জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করতে অপারগ। সুতরাং সে সর্বদা তার সামগ্রিক প্রয়োজন পূরণে অপরের সাহায্যের উপর স্বভাবতই নির্ভরশীল। এ সাহায্যের জন্য তাকে সর্বপ্রথম পরস্পর নির্ভরতার উপলব্ধি জাগ্রত করতে হয় এবং পরে পরস্পর সহযোগিতা ও অন্যবিধ কার্যাদিতে অগ্রসর হতে হয়। অনেক সময় এ পারস্পরিক ব্যবহার উদ্দেশ্যের সমতার জন্য প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকে ঠেলে দেয় এবং এর ফলে ঈর্ষা ও সম্প্রীতি, বন্ধুত্ব ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এরই বৃহৎ পরিণতি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ ও শান্তির পর্যায় ডেকে আনে।

এসব অবস্থা যে-কোন পর্যায়েই অনুষ্ঠিত হোক না কেন, কোনক্রমেই অসংবদ্ধ প্রাণীদের অনুরূপ নয়। বরং আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে মননশক্তির দ্বারা কার্যাবলিকে সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত করার ক্ষমতা দিয়েছেন, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এর মাধ্যমে তিনি তাদের মধ্যে একটি শৃঙ্খলাবোধের জন্ম দিয়েছেন। তাদেরকে এসব কাজ শাসনতান্ত্রিক পন্থায় ও দার্শনিক পদ্ধতিতে সংঘটিত করার অনায়াস নৈপুণ্যও দান করেছেন। বস্তুত এগুলোর মাধ্যমে তারা অকল্যাণ থেকে কল্যাণের দিকে এবং অশুভ থেকে শুভের দিকে এগিয়ে এসেছে। অবশ্য এর পূর্বে তারা অশুভ ও অকল্যাণকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছে এবং এ ব্যাপারে তারা তাদের কৃতকর্মের ফলে সঞ্চিত সুষ্ঠু অভিজ্ঞতা ও সুপরিচিত অভ্যাসাদির সাহায্য নিয়েছে। সুতরাং এসব কাজের দ্বারা উদ্দেশ্যহীন পশুজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পেরেছে এবং তাদের কার্যাবলির উপর মননশীলতার সেই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, যা দিয়ে তারা অকল্যাণ থেকে দূরে সরে এসেছে।

এসব তাৎপর্য, যা দিয়ে মানুষের বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়েছে, কোন দিক থেকেই সম্পূর্ণভাবে অনুভূতির বাইরে নয়। কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে সে জন্য গভীরভাবে তলিয়ে

দেখতে হয় না। বরং তার সবকিছুই অভিজ্ঞতার দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় এবং তা দিয়ে উপযোগিতার পর্যায়ে আসে। কেননা এগুলো অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত আংশিক তাৎপর্য; কখনও সত্য হয়, কখনও মিথ্যা হয় এবং ঘটনাবলির মধ্যে এমন নিবিড়ভাবে প্রকাশ পায়, যা দিয়ে তার অন্বেষণকারী তৎসম্পর্কিত জ্ঞানলাভে উপকৃত হয়ে থাকে। বস্তুত প্রতিটি মানুষের জন্যই স্বজাতির সাথে তার ব্যবহারের ফলে সংঘটিত পরিস্থিতিতে তার ক্ষমতা অনুসারে অভিজ্ঞতা লাভের দ্বারা উপকৃত হওয়ার সম্ভবনা বিদ্যমান। এমনকি এটি থেকেই সে তার ন্যায্য ও উচিত গ্রহণ-বর্জনের ধারণা লাভ করে। স্বজাতির সাথে এরূপ ব্যবহারের পৌনঃপুনিকতাই তাকে যোগ্য করে তোলে। যে ব্যক্তি অনুরূপভাবে তার সারা জীবন ধরে অভিজ্ঞতার অনুসন্ধানে সমর্থ হয়, তার পক্ষে প্রতিটি সমস্যায় প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। অবশ্য এজন্য তাকে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রয়োজন।

কিন্তু আল্লাহ্ খুব অল্প সময়ের অভিজ্ঞতার দ্বারাই মানুষকে অনুরূপ ব্যুৎপত্তি লাভের পথ সুগম করে দিয়েছেন। কারণ এ ব্যাপারে সে পিতামাতা, শিক্ষক ও গুরুজনদেরকে অনুসরণ করে থাকে। এর ফলে তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা-দীক্ষায় যে জ্ঞান সঞ্চিত হয়, তার মাধ্যমে সে দীর্ঘকাল ধরে সংঘটিত ঘটনাবলিকে লক্ষ করে জ্ঞান সংগ্রহের বিপুল আয়াস থেকে বেঁচে যায়। যে ব্যক্তি অনুরূপ জ্ঞান লাভ ও অনুসরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় অথবা স্বেচ্ছায় শোনার ও অনুগত হওয়ার প্রবৃত্তি ত্যাগ করে, তার পক্ষে এ ব্যাপারে ব্যুৎপত্তি লাভ খুবই কষ্টসাধ্য। কেননা সে অনবরত অপরিচয়ের দ্বারা বিব্রত এবং সম্পর্কহীনতার মধ্যে অবগত হবে। এর ফলে তার আচার ও ব্যবহার অসংলগ্ন ও ত্রুটিপূর্ণ হয়ে দেখা দিবে এবং সে স্বজাতির মধ্যে সাচ্ছন্দ্যের সাথে জীবন-যাপন করতে সক্ষম হবে না।

এটাই সম্ভবত সেই বিখ্যাত বাণীর তাৎপর্য; যাকে পিতামাতা শিক্ষা দেয়নি, তাকে সময় শিক্ষা দেয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষের সাথে ব্যবহার সম্পর্কে পিতামাতা ও তাঁদের সমস্থানীয় শিক্ষক ও গুরুজনদের কাছ থেকে দীক্ষা ও শিক্ষা কোনটাই গ্রহণ করেনি, তাকে অবশ্যই স্বাভাবিক পর্যায়ে সংঘটিত ঘটনাবলির ধারা অনুসরণ করে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তখন সময় হবে তার শিক্ষক ও সংশোধক। কারণ তার অন্তর্গত সহযোগিতার স্বাভাবিক প্রেরণাই তাকে এ শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য করবে।

একেই বলা হয় অভিজ্ঞতাজাত বুদ্ধি। এটি কার্যাবলির সংঘটক বিবেক-বুদ্ধির পরে আবির্ভূত হয়ে থাকে, যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। বুদ্ধির এ দুটি পর্যায়ের পরে আরও একটি পর্যায় বিদ্যমান; তাকে বলা হয় তাত্ত্বিকবুদ্ধি। জ্ঞানীরা এর ব্যাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন; সুতরাং আমাদের এ গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা প্রদান করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে শ্রুতি, দৃষ্টি ও হৃদয় প্রদান করেছেন; কী অল্পই না তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।'[১৫০]

---

১৫০. পঞ্চম অধ্যায়ের ৪৯ টীকা দ্র:।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

[মানুষের জ্ঞান ও ফেরেশতাদের জ্ঞান]

আমরা আমাদের অভ্যন্তরে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার বলে তিনটি জগৎকে প্রত্যক্ষ করে থাকি। এদের প্রথমটি অনুভূতির জগৎ। আমরা এ জগৎকে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর সাহায্যে বিবেচনা করি এবং এ ইন্দ্রিয়ানুভূতির দিক থেকে আমরা প্রাণিজগতের সাথে একই পর্যায়ে অবস্থিত। তারপর আমরা বিবেচনা করি সেই মননশক্তিকে, যা দিয়ে মানুষের বিশিষ্টতা সম্পন্ন হয়েছে। এর মাধ্যমেই আমরা অনিবার্যভাবে জ্ঞাত হই যে, মানুষের মধ্যে আত্মা বিদ্যমান। কারণ এ আত্মাই ইন্দ্রিয়ের অতীত জ্ঞানজগতের সাথে আমাদের সংযুক্তি সাধন করে। এর ফলে আমরা ইন্দ্রিয়ানুভূতির উর্ধ্বে অবস্থিত একটি জগতের সন্ধান পাই। তারপর আমরা আমাদের উর্ধ্বস্থিত এমন একটি তৃতীয় জগতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, যার প্রভাব আমাদের হৃদয়ে ইচ্ছা ও আগ্রহের সৃষ্টি করে আমাদেরকে ক্রিয়াশীল গতির দিকে পরিচালিত করে। এর ফলে আমরা বুঝতে পারি যে, সেখানে আমাদের জগতের উপরে অন্য একটি জগৎ আছে, যেখানকার কর্তা আমাদেরকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করছে। তাই আত্মা ও ফেরেশতাজগৎ। উক্ত জগতের সাথে আমাদের বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সেখানে এমন অনুভূতিশীল সত্তা বিদ্যমান, যার প্রভাব আমাদের উপর সক্রিয় রয়েছে।

অনেক সময় এ উন্নত আত্মিকজগৎ ও তার সত্তাদি সম্পর্কে স্বপ্ন এবং নিদ্রার মধ্যে প্রাপ্য অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা হয়। সেখানে আমাদের উপর এমন সব বিষয়ের প্রক্ষেপ ঘটে, যার সম্পর্কে আমরা জাগরণে সম্পূর্ণ অনবহিত থাকি। এর পর তার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়ে বাস্তব ঘটনা দেখা দেয় এবং তখন আমরা বুঝতে পারি যে, তা সত্য ও এক সত্য-জগৎ থেকেই তা এসেছে। অবশ্য সেখানে দুঃস্বপ্নও আছে; এগুলো বস্তুত কিছু কাল্পনিক চিত্র, যা অনুভূতি তার গোপন স্তরে সঞ্চিত করে রাখে এবং অনুভূতির অতীত অবস্থার মননশক্তি তাকে নিয়ে ব্যাপৃত হয়। পাঠক, আমরা এ আত্মিকজগৎ সম্পর্কে এটি ছাড়া খুব সুস্পষ্ট কোন প্রমাণের সাক্ষাৎ পাইনি। সুতরাং এটি থেকে মোটামুটিভাবে সে সম্পর্কে আমরা একটি ধারণা সৃষ্টি করতে পারি মাত্র; এর বিস্তারিত জানার কোন উপায় নেই।

আধ্যাত্মতত্ত্ববিদ দার্শনিকরা উক্ত জগতের সত্তা ও তার বিন্যাসগত যে বিশদ ধারণা পোষণ করেন, যাকে তাঁরা বুদ্ধি বলে অভিহিত করেন, তার কোন বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি নেই। কারণ উক্ত ব্যাপারে যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণের শর্তাদিতে ত্রুটি বিদ্যমান; যেমন এ

সম্পর্কে যুক্তিবিদ্যায় তাদের আলোচনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা তার শর্তের একটি দিক হল তার প্রতিজ্ঞাগুলো প্রাথমিকভাবে সত্তাগত হবে। কিন্তু উক্ত জগতের এ আত্মিক সত্তাগুলোর প্রকৃত অবস্থা অপরিজ্ঞাত। সুতরাং উক্ত ব্যাপারে প্রমাণ উপস্থিত করার কোন উপায় নেই। কাজেই ইমান সম্পর্কীয় বিষয়াদিতে ধর্মীয় বিধান তাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করে এবং যে নির্দেশ দেয় তা থেকে সংগ্রহ ছাড়া উক্ত জগৎ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার উপলব্ধিগত কোন পথ নেই।

বস্তুত এ জগৎত্রয়ীর মধ্যে যে জগৎটি আমাদের উপলব্ধিতে অতিমাত্রায় স্পষ্ট, তা হল মানবিক জগৎ। কেননা তা প্রজ্ঞার দ্বারা আমাদের দৈহিক ও আত্মিক উপলব্ধিতে গোচরীভূত। এটি ইন্দ্রিয়ানুভূতির দিক দিয়ে প্রাণিজগতের সাথে যুক্ত এবং বুদ্ধির দিক দিয়ে ও আত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে সেই ফেরেশতা জগতের সাথে সম্পৃক্ত, যা সত্তার দিক থেকে বুদ্ধি ও আত্মারই সমগোত্রীয়। ফেরেশতারা দৈহিক আকার ও উপাদান থেকে মুক্ত এবং তাদের সত্তা এমন শুদ্ধ বুদ্ধিস্বরূপ, যার মধ্যে বুদ্ধি, বোদ্ধা ও বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। যেন তারা উপলব্ধি ও বুদ্ধিরই সত্তাস্বরূপ। সুতরাং তাদের স্বভাব অনুসারেই সর্বদা তারা বিচিত্র বিষয়ের জ্ঞান লাভ করছে, যার মধ্যে কোন প্রকার বিচ্যুতির কোন সম্ভাবনা আদৌ নেই।

মানুষের জ্ঞান হল জ্ঞাত বস্তুর একটি আকৃতি তার সত্তার মধ্যে এমনভাবে বিধৃত হওয়া, যা ইতিপূর্বে হয়নি। এর সবটুকুই অর্জিত এবং যে সত্তায় এ জ্ঞাত বস্তুসমূহের আকৃতি বিধৃত হয়, তা বস্তুগত উপাদানে জীবাত্মা গঠিত। এটি জ্ঞাত বস্তুপুঞ্জের জ্ঞান লাভ দ্বারা ক্রমশ বিকশিত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং মৃত্যুর মধ্যে তার সত্তাগত ও উপাদানগত পূর্ণতা যথাস্থানে উপনীত হয়। তার আত্মার ঈপ্সিত বিষয়াদি সর্বদাই ইতি ও নেতির মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে এবং তাদের যে-কোন একটিকে কামনা করার জন্য এ উভয় প্রান্তের মধ্যভাগে একটি যোগসূত্র স্থাপিত থাকে। তাদের যে-কোন একটি যখন অর্জিত হয়, তখন তার যথার্থতা প্রতিপাদনের জন্য সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় তাকে কলাকৌশলগত যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা বিশদ করা হয়; কিন্তু তা যবনিকার অন্তরালেই থেকে যায়। কখনই তেমনভাবে গোচরীভূত হয় না, যেমনটি ফেরেশতাদের জ্ঞানের মধ্যে বিদ্যমান। আবার কখনও এ যবনিকা উত্তোলিত হয় এবং চাক্ষুষ উপলব্ধির মাধ্যমে সামঞ্জস্য বিধান ঘটে থাকে।

এটি বর্ণিত হয়েছে যে, মানুষ স্বভাবত অজ্ঞ। কারণ তার জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়ার মধ্যে অস্থিরতা বিদ্যমান। সে শুধুমাত্র অর্জন ও কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে জ্ঞানী হয়। এক্ষেত্রে তার ঈপ্সিত বস্তুকে লাভ করার জন্য তাকে কৌশলগত শর্তাদির অনুধাবনে যত্নবান হতে হয়। যবনিকা উত্তোলনের যে ব্যাপারটির প্রতি আমরা ইঙ্গিত প্রদান করেছি, তা কেবল নামজপের অনুশীলনের মাধ্যমে সম্ভব হয়। এ নামজপের মধ্যে নামাজই শ্রেষ্ঠ; কেননা তা অসৎ কথা ও কার্য থেকে বিরত রাখে। তদুপরি গুরুত্বপূর্ণ ভোগ-সম্ভোগ থেকেও পবিত্রতা অর্জন করতে হয় এবং তার মুখ্য পন্থা হল রোজা। সর্বোপরি সমস্ত শক্তি দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি একাগ্র হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। 'আল্লাহ্ মানুষকে তাই জানিয়েছেন, যা তার জানা ছিল না।[১৫১]

১৫১. কোরান; ৯৫, ৫।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

[নবী (আঃ) দের জ্ঞান]

আমরা দেখতে পাই, এ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে এমন একটি আধ্যাত্মিক অবস্থা বিদ্যমান, যা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও অবস্থা থেকে ভিন্ন। এর ফলে তাঁদের মধ্যে ঐশী একাগ্রতা সমগ্র মানবিক অনুভূতি ও প্রবৃত্তিকে ছাপিয়ে ওঠে এবং লোভ, ক্রোধ ও অন্যান্য দৈহিক অবস্থা অতিক্রম করার একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা জাগ্রহ হয়। এ কারণে, পাঠক, আপনি দেখতে পাবেন তাঁরা ঐশী অবস্থার দ্বারা নিজেদেরকে পবিত্র রাখেন এবং আল্লাহ্‌র সাথে সংযুক্তির পরিচয়বাহী তপজপ তাঁদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে। এ অবস্থায় তাঁদের কাছে যেসব প্রত্যাদেশ আসে, তা দিয়ে তাঁরা স্বজাতিকে সৎপথ প্রদর্শনের সংবাদ প্রদান করেন। এক্ষেত্রে তাঁদের প্রদর্শিত পথ ও অনুষ্ঠানাদির মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য বিদ্যমান। এর পরিবর্তন খুবই কম হয়ে থাকে; দেখে মনে হয়, এরূপ সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে যেন আল্লাহ্ তাঁদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

এ গ্রন্থের প্রথমদিকে আমরা অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকারীদের আলোচনায় ওহি বা প্রত্যাদেশ সম্পর্কে কথা বলেছি। আমরা সেখানে বর্ণনা করেছি যে, সমস্ত সৃষ্টজগৎ-ই তার অবিমিশ্র ও মিশ্র স্বরূপে একটি স্বাভাবিক পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত। উক্ত বিন্যাস সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত। প্রতিটি জগতের শেষ দিগন্তে যে সত্তাগুলোর অবস্থিতি, তারা সর্বদাই নিম্ন ও উর্ধ্বদিক থেকে তাদের সন্নিহিত সত্তার সাথে মিলিত হতে উৎসুক। এ ঔৎসুক্য একান্তই স্বভাবজ; যেমন অবিমিশ্র দৈহিক উপাদানগুলোর মধ্যে দেখা যায়। যেমন উদ্ভিদজগতের শেষ প্রান্ত খেজুর ও আঙুরের সাথে প্রাণিজগতের প্রান্ত শামুক ও ঝিনুকের সংযুক্তি। যেমন বানর জগতে,[১৫২] যেখানে অনুভূতি ও চাতুর্য এসে একত্র হয়েছে, তার সাথে দূরদর্শী ও মননশীল মানুষের অবস্থান। এ পরিবর্তনশীল যোগ্যতা, যা প্রতিটি জগতের উভয় প্রান্তে বিদ্যমান, তাকেই সংযুক্তি বলা হয়েছে।

এ মানবিক জগতের উর্ধ্বে একটি আত্মিক-জগৎ বিদ্যমান; আমাদের মধ্যে পরিদৃষ্ট তার বিভিন্ন নিদর্শনই তার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করছে। বস্তুত তারই কল্যাণে আমাদের মধ্যে উপলব্ধি ও এর সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেই জগতের জ্ঞানী সত্তাগুলো শুদ্ধ উপলব্ধি ও নিছক বুদ্ধিমাত্র। তা-ই ফেরেশতাজগৎ। সুতরাং উপরোক্ত সব দিক থেকে বিবেচনা করলে এ বিষয়টি অবশ্যই স্পষ্ট হয় যে, মানবিক সত্তার মধ্যেও ফেরেশতীয়

---

১৫২. প্রথম অধ্যায়ের ১১১ নং টীকা দ্র:।

সত্তায় রূপান্তরিত হওয়ার একটা যোগ্যতা বিদ্যমান। এভাবে মানবিক সত্তা কোন কোন সময়ে ও বিশেষ মুহূর্তে ফেরেশতীয় সত্তায় পরিণত হতে সক্ষম হয়। এর পর পুনরায় সে মানবিক সত্তায় ফিরে আসে এবং ফেরশতীয় জগৎ থেকে প্রদত্ত শিক্ষার মাধ্যমে তাকে স্বজাতির কাছে প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়; এটাই প্রত্যাদেশ ও ফেরেশতাদের ভাষণের যথার্থ তাৎপর্য। নবীগণ (আঃ) সকলেই এ সহজাত প্রবৃত্তির অধিকারী। তা-ই যেন তাঁদের স্বভাব এবং এর ফলে তাঁরা এরূপ রূপান্তরিত হওয়ার সময় যে প্রকট কষ্ট ও চাপ অনুভব করেন, সে সম্পর্কে তাঁদের আশঙ্কার প্রকাশ সর্বজন পরিচিত। এরূপ অবস্থায় তাঁরা যে জ্ঞান লাভ করে থাকেন, প্রত্যক্ষ ও চাক্ষুষ জ্ঞানের মতই তা সাবলীল। তাতে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তি সংঘটিত হওয়ার অবকাশ নেই। বরং এতে অদৃশ্যের যবনিকা অপসারিত হওয়ায় এবং সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করায় তাঁদের এ জ্ঞান সত্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পুনরায় তাঁদের মানবিক সত্তায় ফিরে আসাতেও এ সুস্পষ্ট জ্ঞান বিচ্ছিন্ন হয় না। কারণ তাঁরা পূর্ব থেকেই অনুরূপ একটি অবস্থার সাহচর্যে গমনের জন্য উৎসুক হয়ে থাকেন। তদুপরি এ পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে এমন একটি বিচক্ষণতা বিদ্যমান, যা তাঁদেরকে অনায়াসে এর সাথে সংযুক্ত করে দেয়।

বস্তুত জ্ঞান লাভের এ প্রক্রিয়া সর্বক্ষণ ধরে তাঁদের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত স্বজাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য তাঁদের প্রেরিতত্ত্ব পরিপূর্ণতায় উপনীত হয়। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেছেন, 'আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ; শুধু আমার উপর প্রত্যাদেশ অর্পিত হয়েছে। অবশ্যই তোমাদের উপাস্য একমাত্র প্রভু; তোমরা তাঁকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তোমাদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।'[১৫৩]

পাঠক, এটি বুঝে নেন এবং অতিরিক্ত অবগতির জন্য আমরা এ গ্রন্থের প্রথমদিকে অদৃশ্যের সংবাদ উপলব্ধিকারীদের প্রকারভেদ বর্ণনায় যা বলেছি, পাঠ করুন। এর ব্যাখ্যা ও বিবরণে আপনার কাছে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। কেননা আমরা সেখানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত ও যথেষ্ট বর্ণনা প্রদান করেছি। আল্লাহ্ই একমাত্র সহায়ক।

---

১৫৩. কোরান; ৪১, ৬।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

[সত্তাগত দিক থেকে মানুষ অজ্ঞ; অর্জনের দ্বারাই সে জ্ঞানী হয়]

আমরা এ পরিচ্ছেদগুলোর প্রথম দিকে বর্ণনা করেছি যে, মানুষ প্রাণিজগতের অন্তর্গত জীববিশেষ। আল্লাহ্ তাকে তৎপ্রদত্ত মননশক্তির দ্বারা অন্য সকলের মধ্যে বিশিষ্ট করেছেন। এ মননশক্তি দ্বারাই সে তার কার্যাবলিকে সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করে থাকে; এটাই তার বিবেক-বুদ্ধি। অথবা সে এর দ্বারা বিচিত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তার স্বজাতির মধ্যে কল্যাণ-অকল্যাণকে উপলব্ধি করে; এটাই তার অভিজ্ঞতাজাত বুদ্ধি। অথবা সে এর দ্বারা দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের যথার্থ অবস্থার ধারণার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়; এটাই তার তাত্ত্বিক বুদ্ধি।

এ মননশক্তি তার প্রাণী হিসেবে তার পূর্ণতা আসার পরই দেখা দেয়। এর আরম্ভ হয় পার্থক্য বিচারের দ্বারা এবং এই বিচারশক্তির উদ্ভবের পূর্বে সে সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন অবস্থায় থাকে। তাকে তখন একটি জীবমাত্র বলে গণ্য করা যায় এবং সে তখনও তার অস্তিত্বের সেই প্রাথমিক অবস্থা বীর্য, রক্তপিণ্ড ও মাংসপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত।[১৫৪] তারপর তার মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা দেয়, তার কারণ আল্লাহ্ তার মধ্যে ইন্দ্রিয় ও হৃদয় প্রদান করেছেন; ওটাই মননশক্তি। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে বলেছেন, তিনি তোমাদের জন্য শ্রুতি, দৃষ্টি ও হৃদয় প্রদান করেছেন।[১৫৫]

সুতরাং মানুষ তার এ বিচারশক্তির পূর্বাবস্থায় একটি দৈহিক কাঠামো মাত্র। কারণ তখন সব বিষয় সম্পর্কেই সে জ্ঞানহীন। তারপর তার ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে তার প্রকৃতি পূর্ণতা লাভ করে এবং তার মনুষ্য সত্তার অস্তিত্ব পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

পাঠক, আল্লাহ্ তাঁর নবীর প্রতি প্রত্যাদেশের প্রারম্ভেই যা বলেছেন, তার প্রতি লক্ষ্য করুন। তিনি বলেছেন, 'তোমার সেই প্রভুর নামে পাঠ কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে। পাঠ কর এবং তোমার প্রভু অতিশয় সম্মানিত, যিনি লেখনির সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।[১৫৬] অর্থাৎ তিনি তাকে সেই জ্ঞান দিয়েছেন, যা পূর্বে তার ছিল না। কারণ এর পূর্বে সে ছিল রক্তপিণ্ড ও মাংসপিণ্ড। এর মাধ্যমে আমরা মানুষের প্রকৃতি ও সত্তার যথার্থ স্বরূপ বুঝতে

---

১৫৪. তুল, কোরান; ১২, ৫।
১৫৫. কোরান; ১৬, ৭৮।
১৫৬. কোরান; ৯৬, ১—৫; এটাই কোরানের প্রথম অবতীর্ণ আয়াত বলে গণ্য।

পেরেছি; তা তার সত্তাগত অজ্ঞতা ও অর্জিত জ্ঞান। কোরানের মহতি আয়াত এর প্রতিই ইঙ্গিত করে তার অস্তিত্বের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রদর্শিত অনুগ্রহের পর্যায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বস্তুত এটাই মনুষ্যত্ব এবং তারই সহজাত ও অর্জিত দুটি অবস্থা আমরা কোরানের সর্বপ্রথম ও প্রত্যাদেশের প্রারম্ভে দেখতে পাচ্ছি। 'আল্লাহ্ সর্বজ্ঞান ও মহা-বিচক্ষণতার অধিকারী'।[১৫৭]

১৫৭. কোরান; ৪, ১৭; ৯২; ১০৪; ১১১; ১৭০।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

[কুরআন-হাদীসের দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহের রহস্য উন্মোচন এবং এর ফলে ধর্মীয় বিশ্বাসে যে অসৎ ও অভিনব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে, তাদের বর্ণনা]

জেনে রাখুন, পবিত্র আল্লাহ্ আমাদের প্রতি তাঁর নবী (সঃ)-কে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি আমাদেরকে মোক্ষ ও সুখ-সম্ভোগের সৌভাগ্যের দিকে আহ্বান করতে পারেন। তিনি তাঁর নবীর উপর সম্ভ্রান্ত গ্রন্থকে প্রাঞ্জল আরবি ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন। এতে তিনি আমাদের এমন সব দায়িত্বের কথা বলেছেন, যা আমাদেরকে সেই গন্তব্যের দিকে পরিচালিত করে। এ সম্পর্কীয় বক্তব্যের মধ্যে একান্ত প্রয়োজনেই তাঁর গুণাবলি ও পবিত্র নামের বর্ণনা এসেছে, যাতে আমরা তাঁর সত্তার পরিচয় লাভ করতে পারি। আমাদের সাথে সম্পর্কিত আত্মার কথা, প্রত্যাদেশের কথা এবং আমাদের কাছে প্রেরিত রসূল ও তাঁর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারী ফেরেশতাদের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি আমাদের জন্য পুনরুত্থান দিবসের কথা ও এর সম্পর্কে বিচিত্র সতর্কবাণীর উল্লেখ করেছেন; কিন্তু এর কোন কিছু সম্পর্কেই সময় নির্দিষ্ট করে দেননি।

এ সম্ভ্রান্ত কোরানে কতিপয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে আরবি বর্ণমালার বিচ্ছিন্ন কিছু বর্ণ রয়েছে। এগুলোর যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধির কোন পথ আমাদের জানা নেই। কোরানের এমন সব বিষয়কেই দ্ব্যর্থবোধক বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ এগুলোর অর্থানুসন্ধানের প্রবৃত্তির নিন্দা করে বলেছেন, তিনিই তোমার উপর গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন; যাতে সুস্পষ্ট নির্দেশবাহী আয়াতসমূহ রয়েছে, ওগুলোই গ্রন্থজননী এবং অন্যগুলো দ্ব্যর্থবোধক। তারপর যাদের অন্তঃকরণে কলুষ বিদ্যমান, তারা গোলযোগ সৃষ্টি ও ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে সেগুলোর এমন দ্ব্যর্থবোধকতার তাৎপর্য অনুসন্ধান ব্যাপৃত হয়। বস্তুত ওগুলোর ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন এবং জ্ঞানে দৃঢ়প্রত্যয়ী ব্যক্তিরা বলেন, 'আমরা সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম; সবই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে। একমাত্র হৃদয়বানরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।[১৫৮]

সাহাবী ও তাবেয়ীনদের মধ্যকার জ্ঞানী পূর্বসূরিরা এ আয়াতকে লক্ষ করে বলেছেন যে, তার মধ্যে নির্দেশবাহী আয়াতসমূহই সুস্পষ্টভাবে বিধি-নিষেধ প্রতিষ্ঠিত করেছে। এজন্য ফেকাহ্শাস্ত্রবিদ্গণ তাঁদের পরিভাষা বিশ্লেষণে বলেছেন, নির্দেশবাহী আয়াতের অর্থ, যার তাৎপর্য সুস্পষ্ট। কিন্তু দ্ব্যর্থবোধক আয়াতগুলো সম্বন্ধে তাঁদের বিভিন্ন বর্ণনা বিদ্যমান। বলা হয় যে, দ্ব্যর্থবোধক অর্থ, যার তাৎপর্য নির্ধারণে যুক্তি ও ব্যাখ্যার

১৫৮. কোরান; ৩, ৬।

প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ এগুলো অন্য আয়াত বা বুদ্ধির বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় এবং এর ফলে সেগুলোর যথার্থ তাৎপর্যই উহ্য হয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গেই ইবনে আব্বাস বলেছেন, দ্ব্যর্থবোধক আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু বিশ্বাস করতে হয়; পালন করতে হয় না।[১৫৯] মুজাহেদ[১৬০] ও আকরামা[১৬১] বলেছেন, বিধি-নিষেধ ও কাহিনী সম্পর্কিত আয়াতগুলো ছাড়া সবাই দ্ব্যর্থবোধক। কাজী আবু বকর ইমামুল হরমাইনও এ মত পোষণ করেন। ইমাম সউরী,[১৬২] শাবী[১৬৩] পূর্বসূরিদের একদল জ্ঞানী বলেছেন, দ্ব্যর্থবোধক বলতে বোঝায়, যার সম্পর্কে জ্ঞান লাভের কোন উপায় নেই। যেমন—মহাপ্রলয়ের শর্তাদি, সতর্কীকরণ সম্পর্কীয় বিভিন্ন সময় এবং কোরানের বিভিন্ন অধ্যায়ের প্রারম্ভে অবস্থিত আরবি বর্ণমালা।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌র উক্তি—'এগুলো গ্রন্থজননী', অর্থাৎ এগুলোই অধিকাংশ ও সাধারণ। সেই তুলনায় দ্ব্যর্থবোধক আয়াত খুবই কম। কখনও এ নগণ্য সংখ্যা থেকেও অনেকগুলোকে নির্দেশবাহী আয়াতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারপর আল্লাহ্ ব্যাখ্যার দ্বারা অথবা এমন সব অর্থের দ্বারা এদের তাৎপর্য অনুসন্ধান করার নিন্দা করেছেন, যা কোরানের ভাষণে ব্যবহৃত আরবি ভাষায় বোধগম্য নয়। তিনি অনুরূপ সন্ধানে নিয়ত ব্যক্তিদেরকে 'কলুষময়' বলে অভিহিত করেছেন; অর্থাৎ এসব ব্যক্তি বলতে ধর্মদ্বেষী, নাস্তিক ও অভিনব মতের পোষক সেসব মূর্খকে বোঝায়, যারা সত্য বিচ্যুত হয়েছে। তাদের অনুরূপ কাজে ব্যাপৃত হওয়ার উদ্দেশ্য হল সেরূপ গোলযোগের সৃষ্টি করা, যার মধ্যে আল্লাহ্‌র অংশীদারিত্ব অথবা বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা বিদ্যমান। অথবা তাদের অভিনব মতবাদের পরিপোষকতায় যা অনুসরণ করতে চায়, তদ্রূপ কোন ব্যাখ্যার সৃষ্টি করা।

অতঃপর পবিত্র আল্লাহ্ আমাদেরকে সংবাদ জানিয়েছেন যে, তিনি এসব দ্ব্যর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা নিজের দায়িত্বে রেখেছেন এবং তিনি ছাড়া এগুলোর প্রকৃত অর্থ কেউ জানে না। এজন্য তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ ছাড়া এর ব্যাখ্যা অন্য কেউ জানে না। এর পর জ্ঞানীদেরকে এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, জ্ঞানে দৃঢ় প্রত্যয়ী ব্যক্তিরা বলেন, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এ কারণে পূর্বসূরিরা জ্ঞানে দৃঢ় প্রত্যয়ী বাক্যাংশটিকে বিচ্ছিন্নভাবে স্থান দিয়েছেন এবং সংযোগমূলক অব্যয় 'এবং' দ্বারা একে আল্লাহ্‌র সাথে সংযুক্ত করার চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ অদৃশ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনই বেশি প্রশংসনীয়। অথচ সংযোগমূলক অব্যয় দ্বারা যুক্ত করলে তা দৃশ্য বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন হয়ে দাঁড়ায়। কেননা তখন জ্ঞানীরাও এর ব্যাখ্যা অবগত; সুতরাং তা আর অদৃশ্য থাকে না। একে আল্লাহ্‌র এই উক্তি আরও দৃঢ় করে—'সবই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে।' এতে বোঝা যায় যে, এর ব্যাখ্যা মানুষের অবগতির অতীত।

---

১৫৯. ইমাম সিউতীর 'ইতকান' গ্রন্থ দ্র:।
১৬০. তৃতীয় অধ্যায়ের ৩০০ নং টীকা দ্র:।
১৬১. মৃত্যু ১০৪/১০৭ (৭২৩/৭২৬ খ্রি:) হি:।
১৬২. তৃতীয় অধ্যায়ের ২২৫ নং টীকা দ্র:।
১৬৩. আমির ইবনে শারাহিল; মৃত্যু ১০৩/৬ (৭২১—৭২৫ খ্রি:) হি:।

বস্তুত প্রতিটি আভিধানিক শব্দের সেই অর্থই আমরা বুঝতে সক্ষম, যা আরবি ভাষা-ভাষীদের কাছে প্রচলিত রয়েছে। সুতরাং যেক্ষেত্রে বক্তব্যকে বক্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, সেক্ষেত্রে শব্দের অর্থ নিয়ে আমরা দিশাহারা হয়ে পড়ি। অনুরূপ বিষয় যদি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে, তা হলে তার অবগতিকে আমরা আল্লাহ্‌র উপরেই ন্যাস্ত করি এবং আমাদের ঈপ্সিত অর্থ খোঁজা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখি। কারণ এছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যখন সেসব লোককে দেখবে, যারা কোরানের অর্থ নিয়ে বিতর্কে ব্যাপৃত, বুঝবে, তাদেরকেই আল্লাহ্ বোঝাতে চেয়েছেন। তাদের কাছ থেকে তোমরা দূরে সরে থাক।' দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহ সম্পর্কে এটাই পূর্বসূরিদের মতাদর্শ। হাদীসেও অনুরূপ শব্দাবলি এসেছে এবং সেগুলোর ক্ষেত্রেও তাঁরা কোরানের আয়াতের অনুরূপ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। কারণ উভয়ের উৎস একই।

আমাদের উপরোক্ত বক্তব্য অনুসারে যেহেতু দ্ব্যর্থবোধক আয়াতগুলোর প্রকৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সুতরাং আমরা এখন এ সম্পর্কে মানুষের মতানৈক্য বর্ণনায় মনোনিবেশ করব। অবশ্য এগুলোর মধ্যে তারা মহাপ্রলয় ও তার শর্তাদি, সতর্কীকরণমূলক বিভিন্ন ঘটনার সময়, দোজখের দারোগাদের সংখ্যা এবং এমন অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, তা প্রকৃত প্রস্তাবে, আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন, আদৌ দ্ব্যর্থবোধক নয়। কারণ সেখানে কোন সংক্ষিপ্ত শব্দ বা অন্য কিছু আসেনি; বরং এগুলো কিছু সংখ্যক ঘটনাবলির সময়, যার নিশ্চিত আবির্ভাব সম্পর্কীয় জ্ঞান আল্লাহ্ তাঁর গ্রন্থে নবীর বাচনিক বক্তব্যের মাধ্যমে নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। এ জন্যই তিনি বলেছেন, 'এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে।'[১৬৪] সুতরাং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অনেকেই এগুলোকে দ্ব্যর্থবোধক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন!

কোরানের বিভিন্ন অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলো বিদ্যমান, সেগুলোর তাৎপর্য এই যে, এগুলো আরবি বর্ণমালা এবং এগুলোর অনুরূপ অবস্থানের নিশ্চয়ই কোন একটা অর্থ আছে। যমখশরী[১৬৫] এগুলো সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে, এদের অবস্থান কোরানের অনুকরণীয় প্রাঞ্জলতার কথাই বোঝায়। কারণ কুরআন এসব বর্ণে এবং এগুলোর সম্মিলিত রূপেই অবতীর্ণ হয়েছে। মানুষও এগুলোর দ্বারা রচনার ক্ষেত্রে সম-মর্যাদার দাবিদার। কিন্তু রচনার পরই কেবল তাদের অর্থের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এজন্য এগুলোর অর্থ সম্পর্কে কোন ভিন্নমত পোষণ করতে হলে তা একমাত্র বিশুদ্ধ হাদীসাদির দ্বারাই সম্ভব। যেমন তাঁরা বলেছেন, 'তাহা' অর্থ 'তাহির' (পবিত্র) ও 'হাদি' প্রদর্শক এবং এমন অন্যান্য বিষয়। কিন্তু এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ হাদীসাদির প্রকাণ্ড অভাব। এদিক থেকেই এগুলোকে দ্ব্যর্থবোধক বলা যায়।

প্রত্যাদেশ, ফেরেশতা, আত্মা ও জিন; এগুলোর দ্ব্যর্থবোধকতার কারণ এগুলোর যথার্থ তাৎপর্য অপরিচিত এবং এ দিক থেকেই এগুলো দ্ব্যর্থবোধক হয়ে উঠেছে। অনেকেই এগুলোর সাথে অনুরূপ অন্যান্য বিষয় যোগ করেছেন; যেমন কিয়ামত

১৬৪. কোরান; ৭, ১৮৭; ৩৩, ৬৩।
১৬৫. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩০ নং টীকা দ্র:।

সম্পর্কীয় বিভিন্ন অবস্থা, বেহেশত, দজ্জাল, গোলযোগ, প্রলয়ের শর্তাদি এবং যা কিছু সুপরিচিত স্বভাবের বিরোধী। এগুলো অসম্ভব নয়; কিন্তু সাধারণ লোকের ধারণা এগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিশেষ করে কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ; তাঁরা এগুলোর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট হয়েছেন। পাঠক, আপনি তাঁদের গ্রন্থাদিতে এগুলোর বিবরণ দেখতে পাবেন।

সুতরাং দ্ব্যর্থবোধক বলতে সে সব গুণই শুধু অবশিষ্ট থাকে, যা দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর গ্রন্থে নবীর বাচনিকে নিজেকে গুণান্বিত করেছেন। এসব গুণের বাহ্যিক দিকে লক্ষ করলে এগুলোতে কিছুটা ত্রুটি, কিছুটা অক্ষমতার রেশ পাওয়া যায়। আমাদের পূর্ববর্ণিত পূর্বসূরিদের মতাদর্শের পরে মানুষ এগুলোর বাহ্যিক অর্থ নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে এবং তাদের তর্ক-বিতর্কের ফলে বিচিত্র অভিনব মতামতের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে আমরা সেসব মতাদর্শ এবং তার মধ্যে বিকৃত মতের উপর বিশুদ্ধ মতের প্রাধান্য দানে সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করব। প্রারম্ভেই বলছি, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ছাড়া আমার কোন ক্ষমতা নেই।

জেনে রাখুন, পবিত্র আল্লাহ্ তাঁর গ্রন্থে নিজের গুণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জ্ঞানী, ক্ষমতাবান, ইচ্ছাময়, জীবিত, শ্রোতা, দ্রষ্টা, কথক, মহিমাময়, সম্ভ্রান্ত দাতা, অনুগ্রাহী, পরাক্রান্ত ও মহান। অনুরূপভাবে তিনি তাঁর জন্য দুই হাত, দুই চোখ, মুখমণ্ডল, পা ও জিহ্বা ইত্যাদি গুণের কথাও বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে তাঁর ঐশ্বরিক শক্তির জন্য কতকগুলোর প্রয়োজন; যেমন—জ্ঞান, শক্তি ও ইচ্ছা। তারপর জীবন এই সবগুলোর শর্তস্বরূপ। এদের মধ্যে অনেকগুলো পূর্ণতা বিধায়ক গুণ; যেমন—শ্রুতি, দৃষ্টি ও বচন। এদের মধ্যে অনেকগুলোতে ত্রুটির আভাস বিদ্যমান; যেমন—আরোহণ, অবতরণ ও আগমন এবং যেমন—মুখমণ্ডল, দুই হাত, দুই চোখ; যেগুলো নশ্বর জীবের গুণ। তারপর ধর্মপ্রবর্তক আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, আমরা কিয়ামতের দিন আমাদের প্রভুকে তেমনভাবে দেখতে পাব, যেমন পূর্ণিমার রাতে চন্দ্রকে দেখি। এ দর্শনে কোন প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হবে না; যেমন বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে।

সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যকার পূর্বসূরিরা আল্লাহ্‌র ঐশ্বরিক শক্তি ও পূর্ণতা বিধায়ক গুণগুলোর স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং যেসব গুণে কিছুটা ত্রুটির আভাস পরিলক্ষিত হয়, সেগুলোর অর্থ সম্পর্কে চিন্তা না করে যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করেছেন। তারপর তাঁদের পরবর্তীকালে মানুষ এসব গুণ নিয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি করেছে। মুতাজিলা সম্প্রদায় আবির্ভূত হয়ে এসব গুণকে নিছক মানসিক ধারণা বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এগুলোকে আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে স্থায়ীগুণ বলতে অস্বীকার করেছে। তারা এরূপ গুণমুক্ত অবস্থাকেই একত্ববাদ বলে আখ্যা দিয়েছে। তারা মানুষকে তাদের কৃতকর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছে এবং এর সাথে আল্লাহ্‌র ক্ষমতার সংযুক্তিকে অস্বীকার করেছে। বিশেষ করে দুষ্কর্ম ও পাপ সম্পর্কে এ যুক্তি প্রয়োগ করেছে; কেননা কোন বিচক্ষণের পক্ষেই অনুরূপ কার্যাদি সম্পাদন করা সম্ভব নয়। তারা বান্দার জন্য সর্বোত্তম কল্যাণের বিষয়টি আল্লাহর উপর অবশ্য কর্তব্য বলে ধরেছে। একেই তারা বলেছে ন্যায়পরায়ণতা। যদিও এর পূর্বে তারা পূর্বনির্ধারণের

অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে কথা বলেছেন। এভাবে সমস্ত বিষয়েই তথা নবার্জিত জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে তারা বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন তুলেছে, যেমন বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ মতামত পোষণকারী মাবাদ আল জুহনী[১৬৬] ও তার সহচরদের পক্ষ ত্যাগ করে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর বের হয়ে এসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত পূর্বনির্ধারণের অসম্ভাব্যতার মতটি তাদের মধ্যে ওয়াসেল ইবনে আতা আল গাজ্জালীর[১৬৭] দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি হাসান বসরীর শিষ্য এবং আবদুল মালেক ইবনে মারোয়ানের সময় জীবিত ছিলেন। তারপর এটি মামার আস্‌সুলামীর[১৬৮] সময় পরিত্যাক্ত হয় এবং এ সম্ভাব্যতার মত পরিত্যাগকারীদের মধ্যে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের নেতা আবু হুজাইল আল্লাফও[১৬৯] ছিলেন। ইনি উসমান ইবনে খালেদ আত্তাওবীলের[১৭০] মাধ্যমে ওয়াসেল থেকে এ পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। উসমানও এ পূর্বনির্ধারণের সম্ভাব্যতার মত পোষণ করতেন। এ বিষয়ে তিনি তৎকালে প্রচারিত তাদের মতাদর্শ অনুসরণের অস্তিত্ব সংশ্লিষ্ট গুণাবলি অস্বীকার করার ক্ষেত্রে দার্শনিকদের মতামত অনুসরণ করতেন।

অতঃপর ইব্রাহীম নাজ্জাম[১৭১] এসে পূর্বনির্ধারণের কথা বললেন এবং মুতাজিলারা তাঁর কথা মেনে নিল। তিনি দর্শনের গ্রন্থাদি পাঠ করে গুণাবলি অস্বীকারের মতামতকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করলেন। তিনি মুতাজিলা সম্প্রদায়ের নীতিমালা প্রবর্তন করলেন। তারপর আবির্ভূত হলেন জাহেয,[১৭২] কাবী[১৭৩] ও জুবাঈ।[১৭৪] তাঁদের প্রবর্তিত এ পন্থাকেই বলা হত 'এলমে কালাম'। এর এরূপ নামকরণের কারণ তাতে যুক্তি-প্রমাণ ও বিতর্ক ছিল; যাকে 'কালাম' বা আলোচনা বলা হয়ে থাকে। অথবা তাদের পন্থার মূল ছিল, আল্লাহ্‌র বাক্‌শক্তির অর্থাৎ কালামের গুণকে অস্বীকার করা। এ জন্যই শাফেয়ী বলতেন, এদেরকে খেজুরের শাখা দিয়ে পিটানো এবং মানুষের দর্শনীয় স্থানে ফেলে রাখা উচিত।

যা হোক, মুতাজিলারা তাদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করে এবং তাতে গ্রহণ ও বর্জনের কাজ চালিয়ে যায়। তারপর উস্তাদ আবুল হাসান আশআরী[১৭৫] আবির্ভূত হন এবং তাদের অনেক নেতৃস্থানীয় জ্ঞানীর সাথে কল্যাণ ও সর্বোত্তম কল্যাণের সমস্যা নিয়ে বিতর্ক-প্রবৃত্ত হন; তিনি তাদের পন্থা ত্যাগ করেন এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে সাইদ ইবনে কেলাব,[১৭৬] আবুল আব্বাস কেলানেসী,[১৭৭] হরস ইবনে আসাদ মুহাসেবী[১৭৮] প্রমুখ

---

১৬৬. মৃত্যুকালে ৮০ হিজরির পরবর্তী।
১৬৭. জীবনকাল ৮০—১৩১ (৭০০—৭৩৯ খ্রি:) হি:।
১৬৮. (মুআম্মার) ইবনে আব্বাস; মৃত্যু ২১৫ (৮৩১ খ্রি:) হি:।
১৬৯. মুহাম্মদ ইবনে হুজাইল; মৃত্যু ২২৬—২৩৫ (৮৪০—৮৫০ খ্রি:) হি:।
১৭০. পরিচয় অস্পষ্ট।
১৭১. ইব্রাহীম ইবনে সাইয়ার; মৃত্যু ২২০—২৩০(৮৩৫—৮৪৫ খ্রি:) হি:।
১৭২. আমর ইবনে বহর; ১৬০—২৫৫ (৭৭৬—৮৬৯ খ্রি:) হি:।
১৭৩. আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ বলখী; মৃত্যু ৩১৯ (৯৩১ খ্রি:) হি:।
১৭৪. মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব; ২৩৫—৩০৩ (৮৫০—৯১৬ খ্রি:) হি:।
১৭৫. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৪১ নং টীকা দ্রষ্টব্য।
১৭৬. আবদুল্লাহ ইবনে মুহম্মদ; কুল্লাব (?); খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর শেষার্ধ।
১৭৭. পরিচয় খুব স্পষ্ট নয়; শহরস্তানী রচিত 'মেলাল ও নেহালে' উল্লেখিত।
১৭৮. অধ্যায়তত্ত্বের প্রসিদ্ধ লেখক; ১৬৫—২৪৩ (৭৮২—৮৫৫ খ্রি:) হি: (?)।

পূর্বসূরিদের অনুগামীবৃন্দের মতাদর্শ গ্রহণ করেন। এটাই আহলে সুন্নতের পন্থা। তিনি তাঁদের বক্তব্যকে কালামশাস্ত্রীয় যুক্তির সাহায্যে জোরদার করেন এবং মহান আল্লাহ্‌র জন্য সত্তার সাথে স্থায়ী গুণাবলির প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে আল্লাহ্‌র গুণ হিসেবে জ্ঞান, ক্ষমতা ও ইচ্ছা প্রতিষ্ঠা লাভ করে; কারণ এগুলো ছাড়া প্রতিরোধ স্থাপন ও নবীদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। তাঁরা আল্লাহ্‌র জন্য বচন, শ্রুতি ও দৃষ্টির মত পোষণ করতেন। যদিও এগুলোতে আকারবিশিষ্ট শব্দ ও বর্ণের দিক থেকে বাহ্যিকভাবে কিছুটা ত্রুটির ধারণা পোষণ করা হয়, তবুও যেহেতু বচনের জন্য আরবি ভাষাভাষীদের মধ্যে শব্দ ও বর্ণ ছাড়া অন্য একটি অর্থও বিদ্যমান এবং তা হল 'যা আত্মার মধ্যে আবর্তিত হয়'; সেজন্য তাঁরা পূর্বের মতের চেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এ অর্থ অনুযায়ী বচনকে মহান আল্লাহ্‌র জন্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ত্রুটির ধারণাকে নস্যাৎ করে দেন। বচনের এ গুণকে তাঁরা অনাদি গুণাবলির মধ্যে ধরে অন্য সবে গুণের সাথে এর সম্পর্ককে সাধারণ করে দেন। এর ফলে কুরআন মহান আল্লাহ্‌র অনাদিগুণ তথা অন্তর্নিহিত বচন এবং নবোদ্ভূত বর্ণসমষ্টি ও পঠনের মাধ্যমে প্রকাশিত শব্দাবলির মিশ্র নাম হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং কুরআনকে যখন বলা হয় 'অনাদি', তখন তা দিয়ে প্রথমটি এবং যখন বলা হয়, তা শ্রুত ও পঠিত; তখন তার পাঠ ও লিপি বলতে যা বোঝায়, তা-ই মনে করা হয়ে থাকে।

অথচ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর ধার্মিকতার বৈশিষ্ট্য হিসেবে কোরানের উপর নবায়নের গুণ আরোপ থেকে বিরত ছিলেন। কারণ তিনি এ বিষয়ে তাঁর পূর্বসূরিদের কাছ থেকে শোনেননি। অবশ্য তাঁর বক্তব্যের অর্থ এ নয় যে, তিনি লিপিবদ্ধ কুরআনকে এবং প্রচলিত প্রথা অনুসারে তার পাঠকে অনাদি বলতেন। বরং তা যে নবায়িত হয়, তা তিনি নিজেও প্রত্যক্ষ করেছেন। একমাত্র ধার্মিকতার বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি তা স্বীকার করে নিতে পারেননি। এছাড়া অন্য যা কিছু,—তা প্রয়োজনের জন্যই তিনি অস্বীকার করেছেন। এছাড়া অন্য কিছু তাঁর সম্পর্কে ধারণা করা যায় না।

শ্রুতি ও দৃষ্টি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। তারা যদিও ইন্দ্রিয়ানুভূতির ধারণা সৃষ্টি করে, তবুও তাদের দ্বারা আভিধানিক দিক থেকে শ্রুত ও দৃষ্ট বস্তুকেও বোঝায় এবং এক্ষেত্রে ত্রুটির পূর্ব ধারণাও নস্যাৎ হয়ে যায়। কারণ তাদের শেষোক্ত এ অর্থও অভিধানের দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত। আরোহণ, আগমন, অবতরণ, মুখমণ্ডল, দুই হাত, দুই চোখ ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য হল, এগুলোর মধ্যে তুলনামূলক যে ত্রুটির ধারণা বিদ্যমান, তার জন্যই আভিধানিক অর্থ ত্যাগ করে আরবের প্রথা অনুসারে রূপক অর্থে ব্যবহার করতে হবে। তাদের প্রথা এই যে, যে সব শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়, সেস্থানে তারা রূপক অর্থ গ্রহণ করে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণী '(প্রাচীরটি) পড়ে যেতে ইচ্ছুক হচ্ছিল'[১৭৯] এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়। এ রূপক অর্থ গ্রহণের বিষয়টি তাদের একটি সুপ্রচলিত প্রথা; এটি অস্বীকৃত নয়, অভিনবও নয়।

অবশ্য উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে তাঁদের এ ব্যাখ্যা পূর্বসূরিদের সমর্পণসুলভ মতাদর্শের বিরোধী। সম্ভবত এ কারণেই পূর্বসূরিদের অনুগামী হাদীসশাস্ত্রবিদ্ ও

১৭৯. কোরান; ১৮, ৭৭।

উত্তরসূরি হাম্বলীদের একটি দল উপরোক্ত গুণাবলি আরোপের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মিতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা এসব গুণ মহান আল্লাহ্‌র জন্য সুনির্দিষ্ট বলে মনে করেন; যদিও এদের যথার্থ পরিচয় অজ্ঞাত। তাঁরা বলেন, 'আল্লাহ্ আরশের উপর আরোহণ করলেন'[১৮০]—এক্ষেত্রে শব্দের অর্থের দিক থেকে আরোহণ তাঁর জন্য প্রতিষ্ঠিত; অন্যথায় শব্দার্থ অনর্থক বলে প্রতিপন্ন হবে। তেমনি আমাদের পক্ষে এ আরোহণের যথার্থ তাৎপর্য বলা সম্ভব নয়; অন্যথায় তা নেতিবাচক আয়াতগুলোতে বর্ণিত নিষেধের বিরোধী তুলনায় পর্যবসিত হবে। আল্লাহ্ বলেছেন, 'তাঁর ন্যায় কিছু নেই;[১৮১] তারা যে গুণ আরোপ করে, তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র;[১৮২] অত্যাচারীরা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ্ বহু উর্ধ্বে;[১৮৩] তিনি জনক নন, জাতও নন।'[১৮৪] অথচ এসব আয়াতের নির্দেশ অনুসরণের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁরা বুঝতে পারেননি যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র জন্য আরোহণের শব্দার্থ সম্পর্কীয় গুণ নির্দিষ্ট করে তুলনার মধ্যে প্রবেশ করে বলেছেন। কারণ ভাষাভাষীদের কাছে আরোহণের অর্থ হল স্থিরতা ও স্থান গ্রহণ এবং এটি দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট। শব্দার্থের অনর্থক হওয়ার যে দোষটি তাঁরা অপছন্দ করেছেন, তা শব্দের ক্ষেত্রেই শুধু প্রযোজ্য এবং তাতে কোন অসুবিধা নেই। একমাত্র অসুবিধা হল শব্দান্তর্গত সক্রিয়তাকে নস্যাৎ করে দেয়ায়। অনুরূপভাবে বান্দার উপর অসম্ভব দায়িত্ব অর্পণের বিষয়টিকেও তাঁরা অপছন্দ করেছেন। বস্তুত এটি একটি ভ্রান্তধারণা মাত্র। কারণ দ্ব্যর্থবোধক নির্দেশে কখনও দায়িত্ব বর্তায় না। অথচ এগুলো সত্ত্বেও তাঁরা দাবি করেন যে এটাই পূর্বসূরিদের মতাদর্শ। আল্লাহ্ না করুন, এটি আদৌ তা নয়। পূর্বসূরিদের মতাদর্শ হল, আমরা পূর্বে যা বর্ণনা করেছি, এসব শব্দার্থের বিষয়টিকে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করা এবং তা জানার চেষ্টা থেকে বিরত থাকা।

কখনও তারা আল্লাহ্‌র আরোহণের ব্যাপারটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইমাম মালেকের বক্তব্যকে উপস্থিত করে। তিনি বলেছেন, আরোহণের বিষয়টি সুপরিজ্ঞাত এবং আল্লাহ্‌র জন্য তা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এর অর্থ তারা যা ভেবেছে, তা নয়। কারণ ইমাম মালেক আরোহণের অর্থ জানতেন। এক্ষেত্রে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা এই যে, আরোহণের অর্থ অভিধানের দিক থেকে সুস্পষ্ট; তা দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তার অবস্থা অর্থাৎ তাৎপর্য,—কেননা, গুণাবলির তাৎপর্যই হল তাদের অবস্থা; আল্লাহ্‌র জন্য অপরিজ্ঞাতভাবে প্রতিষ্ঠিত। অনুরূপভাবে তারা 'সওদা'র একটি হাদীস দ্বারা আল্লাহ্‌র স্থান নির্দেশে যুক্তি দিয়ে থাকে। হাদীসটি এই যে, তাঁকে নবী (সঃ) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আল্লাহ্ কোথায়? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আকাশে। তখন হযরত বললেন, তাঁকে মুক্ত করে দাও, সে বিশ্বাসীনী। নবী (সঃ) তাঁর আকাশে আল্লাহ্‌র জন্য স্থান নির্ধারণকে তাঁর ইমানের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেননি; বরং তিনি যে বাহ্যিক

---

১৮০. কোরান; ৭, ৫৪।

১৮১. কোরান; ৪২, ১১।

১৮২. কোরান; ২৩, ৯১; ৩৭, ১৫৯।

১৮৩. কোরান অনুরূপ উদ্ধৃতি নয়।

১৮৪. কোরান; ১১২, ৩।

অর্থে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, তাকেই গণ্য করেছেন এবং 'আল্লাহ্ আকাশে আছেন' তাঁর এ বিশ্বাসের ফলেই তিনি সেসব জ্ঞানে দৃঢ় প্রত্যয়ীদের অন্তর্গত হয়ে গেছেন, যারা দ্ব্যর্থবোধক বিষয়াদির প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম না করেই তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকেন। আল্লাহ্‌র কোন স্থানে নির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারটি মূলত সেই বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রমাণাদির দ্বারা নস্যাৎ হয়, যাতে এর প্রয়োজনের অস্বীকৃতি বিদ্যমান। এগুলো আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বিধায়ক নেতিবাচক আয়াতগুলোর দ্বারা সমর্থিত। যেমন, 'তার তুল্য অন্য কিছু নেই' এবং এর অনুরূপ অন্যান্য আয়াত। আল্লাহ্‌র উক্তি—তিনি আল্লাহ্ আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে।[১৮৫] এতেও যেহেতু একটি অস্তিত্ব একই সময়ে দুই স্থানে অবস্থান করে না, সুতরাং সুনিশ্চিতভাবে এতে স্থান নির্দেশ করা হয়নি; এর উদ্দেশ্য ভিন্ন।

অতঃপর তারা তাদের আবিষ্কৃত এ অভিনব ব্যাখ্যাকে মুখমণ্ডল, দুই চোখ, দুই হাত, অবতরণ, বচন, বর্ণ ও শব্দ ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এদের অর্থ দৈহিক সম্পর্কের সীমাবদ্ধতা থেকে ব্যাপক করে তুলেছে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে এসব গুণের দেহসম্পর্ক থেকে পবিত্র বলে ঘোষণা করেছে। অবশ্য অভিধানে অনুরূপ অর্থের কোন সম্ভাবনা কোথাও নেই। তাদের প্রথম ও শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত সকলেই পর্যায়ক্রমিকভাবে এ মতবাদের অনুসরণ করেছে। আহলে সুন্নতের আশায়েরা ও হানাফী কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ এ মতবাদের দরুন তাদেরকে খুব সুনজরে দেখতে পারেননি এবং তাঁরা সর্বতোভাবে এসব মতবাদ এড়িয়ে গেছেন। এ প্রসঙ্গে বোখারায় হানাফী কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ ও ইমাম মুহম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারীর মধ্যে যা অনুষ্ঠিত হয়, তা সকলের কাছেই সুপরিচিত।

আল্লাহ্‌র দেহবাদীরাও অনুরূপভাবে তাঁর দেহ প্রতিষ্ঠিত করে বলেছে যে, তা অন্যান্য দেহের মতো নয়। কারণ ধর্মীয় বিধানের বিভিন্ন বর্ণনায় আল্লাহ্‌র দেহের কথা উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং একমাত্র অনুরূপ শব্দাবলির বাহ্যিক অর্থই তাদেরকে এমন বক্তব্যের প্রতি আকর্ষণ করেছে। পরিণামে তারা এ বাহ্যরূপেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়ে তারা আল্লাহ্‌র দৈহিক আকৃতি প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ ব্যাপারে তারা পূর্বোল্লেখিত ধারণা পোষণ করতে বাধ্য হয়েছে এবং একটি ত্রুটিপূর্ণ শিথিল যুক্তির সাহায্যে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে বলেছে, 'দেহ আছে, তবে অন্যান্য দেহের মতো নয়।' অথচ দেহ আরবি অভিধানে তার অর্থ এমন কিছু, যার মধ্যে বেধ ও সসীমতা বিদ্যমান। এ ব্যাখ্যা ছাড়াও অন্যত্র আছে, যা স্বাবলম্বী অথবা স্বনির্ভর উপাদানে গঠিত ইত্যাদি। কিন্তু কালামশাস্ত্রবিদ্‌দের পরিভাষার অর্থ এ আভিধানিক তাৎপর্য থেকে ভিন্ন। এ কারণে দেহবাদীরা অতিরঞ্জনের মাধ্যমে এক অভিনব মত তথা ধর্মদ্রোহিতার সৃষ্টি করেছে। কেননা তারা আল্লাহ্‌র জন্য এমন একটি গুণের কথা বলছে, যা ত্রুটির ধারণা জন্মায় এবং যা আল্লাহ্ ও তাঁর নবীর বাণীতে কোথাও নেই।

---

১৮৫. কোরান; ৬, ৩।

পাঠক, আমাদের এ আলোচনার দ্বারা আশা করি, আপনার কাছে পূর্বসূরি আহলে সুন্নত, হাদীসশাস্ত্রবিদ্, মুতাজিলা ও দেহবাদী অভিনব মতের ধারক প্রমুখ কালামশাস্ত্রবিদ্দের মধ্যকার মতাদর্শের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হাদীসশাস্ত্রবিদ্দের মধ্যেও এমন অনেক অতিরঞ্জনপ্রিয় লোক ছিল, যাদেরকে প্রকাশ্য তুলনার জন্য 'তুলনাবাদী' বলে অভিহিত করা হতো। তাদের অনেকের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা বলেছে, আমাদেরকে আল্লাহ্র দাঁড়ী ও গুপ্তস্থান সম্পর্কে ক্ষমা কর এবং এ দুটি ছাড়া অন্য যা কিছু তোমাদের মনে আসে জিজ্ঞাসা করতে পার।'[১৮৬] বস্তুত এ ক্ষমা প্রার্থনা তাদের কোন কাজেই আসে না। কারণ তাদের উদ্দেশ্য তারা এসব বিষয়কে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত কিছু সংখ্যক শব্দের বাহ্যিক অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় এবং এক্ষেত্রে তারা নেতৃবৃন্দের পথই অনুসরণ করছে মাত্র। অন্যথায় এমন উক্তি নিঃসন্দেহে ধর্মদ্রোহিতা। আল্লাহ্ আমাদেরকে রক্ষা করুন।

এমন অভিনব মতামতের বিরুদ্ধে আহলে সুন্নত রচিত গ্রন্থাবলি যুক্তিপ্রমাণে পরিপূর্ণ এবং সেখানে অত্যন্ত বিশুদ্ধ প্রমাণাদির দ্বারা এগুলো নস্যাৎ করা হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি আমাদেরকে এ বিষয়ে পথ দেখিয়েছেন; তিনি যদি আমাদেরকে পথ না দেখাতেন, তাহলে আমরা কখনও পথ খুঁজে পেতাম না।[১৮৭]

অন্যান্য প্রকাশ্য বিষয়, যেগুলোর প্রমাণ ও প্রামাণ্য উভয়ই কিঞ্চিৎ উহ্য; যেমন—প্রত্যাদেশ, ফেরেশতা, আত্মা, জিন, 'বরজখ' (প্রেতপুরী), প্রলয়ের বিভিন্ন অবস্থা, 'দজ্জাল', গোলযোগ, প্রলয়ের শর্তাদি এবং যা কিছু দুর্বোধ্য অথবা অস্বাভাবিক; আমরা সেসবকে আশায়েরাপন্থীদের বিস্তারিত মতামতের উপর স্থাপন করেছি। তাঁরা আহলে সুন্নত এবং তাঁদের মতে দ্ব্যর্থবোধক কিছু নেই। এর পরও আমরা যদি এসব বিষয়ে দ্ব্যর্থবোধকতার প্রশ্রয় দেই, তা হলে তার রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্য আমাদেরকে কিছুটা বিশদ আলোচনায় অবতীর্ণ হতে হবে। সুতরাং আমরা বলি, জেনে রাখুন, মনুষ্য জগৎ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সমুন্নত। তার মধ্যে যদিও মনুষ্যত্বের তাৎপর্য সংহতভাবে অবস্থান করছে, তবুও তা কিছু পর্যায়ে বিভক্ত এবং তার প্রতিটি পর্যায় সংশ্লিষ্ট বিশেষ অবস্থার জন্য অন্যটি থেকে ভিন্ন। ফলত মনে হবে, তার প্রতিটি পর্যায়ের তাৎপর্যই ভিন্ন প্রকৃতির।

তার প্রথম পর্যায় দৈহিক জগৎ; এর বাহ্যেন্দ্রিয়, এর জীবনধারণ সম্পর্কীয় মননশীলতা এবং এর বর্তমান অস্তিত্বের প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম তৎপরতা।

দ্বিতীয় পর্যায় স্বপ্ন জগৎ। এটি মানুষে মনোজগতের বিচিত্র ধারণার কাল্পনিক উপলব্ধি, যা স্থান-কাল ও দৈহিক যাবতীয় অবস্থার বন্ধন মুক্ত হয়ে বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা সংঘটিত হয় এবং এমন এক স্থানে হয়, যেখানে স্বপ্নদর্শী নিজে উপস্থিত নয়। সৎ স্বপ্নদর্শীর জন্য এর মাধ্যমে তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ঈপ্সিত সুসংবাদ লাভ ঘটে থাকে; যেমন সত্যবাদী (সঃ) এ অঙ্গীকার রেখে গেছেন।

---

১৮৬. এ উক্তিটি দাউদ আল জাওবারিবীর বলে বলা হয়।

১৮৭. কোরান; ৭, ৪৩।

এ দুটি পর্যায় সমগ্র মানব সমাজের প্রতিটি বক্তির জন্য সাধারণ এবং পাঠক, আপনি নিশ্চয় লক্ষ করেছেন যে, উপলব্ধির দিক থেকে এ দুটির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

তৃতীয় পর্যায়টি নবুয়তের পর্যায়। এটি মানব সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্য বিশিষ্ট। কারণ আল্লাহ্ই তাঁদেরকে তাঁর পরিচয় ও একত্ববাদের দ্বারা বিশিষ্ট করে তুলেছেন। তাঁর প্রত্যাদেশ নিয়ে তাঁদের কাছে ফেরেশতা আগমন করে এবং মানব সমাজের যাবতীয় অবস্থা সংশোধনের এমন দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পিত হয়, যা মানব জীবনের বাহ্যিক অবস্থার সাথে সর্বাংশে এক নয়।

চতুর্থ পর্যায়টি মৃত্যু। এতে প্রতিটি মানুষ তার বাহ্যিক জীবন ত্যাগ করে প্রলয় পূর্ববর্তী এমন এক অস্তিত্বে গমন করে, যাকে 'বরজখ' বলা হয়। সেখানে সে তার কর্মানুযায়ী সুখ অথবা শাস্তি ভোগ করে। তারপর তাকে মহাপ্রলয় দিনের দিকে পরিচালিত করা হয়। সেই বিশাল প্রতিদান প্রাপ্তিস্থানে সে সুখের অধিকারী হয়ে বেহেশতে যায় অথবা দুঃখের অধিকারী হয়ে দোজখে যায়।

পূর্বোক্ত দুটি পর্যায়ের সাক্ষাৎ হল প্রজ্ঞা। তৃতীয় নবুয়ত পর্যায়ের সাক্ষ্য হল অলৌকিক ক্রিয়া ও নবীদের বিশিষ্ট অবস্থা। চতুর্থ পর্যায়ের সাক্ষ্য হল মহান আল্লাহ্র কাছ থেকে পুনরুত্থান, বরজখের অবস্থা ও বিচারদিন সম্পর্কে যে সমস্ত প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য বুদ্ধিও অনুরূপ কিছুই কামনা করে। কেননা আল্লাহ্ পুনরুত্থান সম্পর্কীয় তাঁর বহু বাণীতে আমাদেরকে এ সম্পর্কে সচেতন করেছেন। এর সত্যতার সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট প্রমাণ হল প্রতিটি মানুষের জন্য যদি তার এ জীবন ছাড়া মৃত্যুর পরপারে অন্য কোন জীবন ও তার সংশ্লিষ্ট যোগ্য অবস্থা না থাকত, তা হলে তার প্রথম অস্তিত্ব নিতান্ত অনর্থক হয়ে দাঁড়াত। কারণ মৃত্যুর অর্থ যদি নিতান্ত নাস্তি হয়, তা হলে প্রতিটি মানুষের উদ্দেশ্যই নাস্তিতে পর্যবসিত হয় এবং তার অস্তিত্বের জন্য কোন প্রকার বিচক্ষণতারই প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ বিচক্ষণ স্রষ্টার জন্য এ অনর্থক সৃষ্টি একান্তই অসম্ভব।

যখন এ চারটি অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল, তখন আমরা এগুলো সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধির কথা বর্ণনা করতে পারি। পাঠক, এ উপলব্ধির ক্ষেত্রে যে সুস্পষ্ট বৈচিত্র্য বিদ্যমান, তা থেকে আপনি দ্ব্যর্থবোধক বিষয়াদির রহস্য বুঝতে পারবেন।

প্রথম পর্যায়ের ক্ষেত্রে মানুষের উপলব্ধি অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রকাশ্য। মহান আল্লাহ্ বলেছেন—'আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাতৃগর্ভ থেকে এমন অবস্থায় বের করেছেন, যখন তোমরা কিছুই জান না এবং তিনি তোমাদেরক শ্রুতি, দৃষ্টি ও হৃদয় প্রদান করেছেন।[১৮৮] এসব উপলব্ধির মাধ্যমে সে পরিচয়ের যোগ্যতা অর্জন করে, তার মনুষ্যত্বের তাৎপর্য পরিপূর্ণ হয় এবং মোক্ষ লাভের জন্য প্রয়োজনীয় উপাসনার দায়িত্ব সে পালন করতে সক্ষম হয়।

তার দ্বিতীয় পর্যায়ের উপলব্ধি, যাকে স্বপ্ন বলা হয়েছে, তা বাহ্যেন্দ্রিয়ের উপলব্ধিরই অনুরূপ; কিন্তু তাতে জাগরণের ন্যায় বাহ্যেন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল থাকে না।

---

১৮৮. কোরান; ১৬, ৭৮।

অবশ্য স্বপ্নদর্শী তার স্বপ্নে দৃষ্ট প্রতিটি বিষয়কেই যথাযথ বলে মনে করে; এ বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ও দ্বিধা থাকে না,—যদিও তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক ক্রিয়া স্থগিত থাকে। মানুষ এ অবস্থার ব্যাখ্যায় দুই দলে বিভক্ত; একদল,—দার্শনিকবৃন্দ; তাঁদের ধারণা,—কাল্পনিক দৃশ্যাবলিকে কল্পনাশক্তি মননের সাহায্যে মিশ্র অনুভূতির কাছে উপস্থিত করে এবং এ মিশ্র অনুভূতি বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্তী একটি স্তর। এর ফলে অনুভূত বিষয় প্রকাশ্যে সব ইন্দ্রিয়ের সামনে প্রকটিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁদের এ ধারণায় অসুবিধার দিক হল এই যে, আল্লাহ্ বা ফেরেশতাদের তরফ থেকে যেসব সৎস্বপ্ন দৃষ্ট হয়, তা কাল্পনিক ও বিশৃঙ্খল স্বপ্নের চেয়ে উপলব্ধিতে বেশি দৃঢ় ও স্থায়ী হয়ে থাকে; অথচ কল্পনাশক্তি এ দুটির মধ্যে তাঁদের বর্ণনা মতে এক।

অন্য দলটি হলেন কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ। তাঁরা এ ব্যাপারটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, এটি এক প্রকার উপলব্ধি, যা আল্লাহ্ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সৃষ্টি করেন, যেমন জাগ্রত অবস্থায় সৃষ্টি হয়। এটাই যোগ্যতর ব্যাখ্যা; যদিও আমরা এর যথার্থ অবস্থা কল্পনা করতে পারি না। এই নিদ্রার উপলব্ধি এর পরবর্তী স্তরগুলোর উপলব্ধির জন্য একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

তৃতীয় পর্যায়টি নবীদের পর্যায়। এ পর্যায়ে ইন্দ্রিয়ানুভূতির এ বৈশিষ্ট্যের যথাযথ অবস্থা সংশ্লিষ্ট নবীর প্রজ্ঞাতেও অপরিজ্ঞাত; অথচ এটি তাঁদের কাছে বিশ্বাসের চেয়েও সুস্পষ্ট। এজন্য নবী আল্লাহ্‌কে দেখেন, ফেরেশতাকে দেখেন; আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তাঁর কথা শোনেন অথবা ফেরেশতার কাছ থেকে আল্লাহ্‌র কথা শোনেন; তিনি বেহেশত-দোজখ দেখেন, 'আরশ' 'কুর্সী' দেখেন,; তাঁর রাত্রিকালীন ভ্রমণে তিনি 'বোরাকে' চড়ে সপ্তাকাশ ভেদ করে চলে যান; সেখানে নবীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন, তাঁদের সাথে নামাজ পড়েন; তিনি এমন অনেক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় উপলব্ধি করেন, যা তিনি তাঁর দৈহিক পরিধিতে জাগরণে ও নিদ্রায় উপলব্ধি করে থাকেন। আল্লাহ্‌ই এজন্য তাঁর মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের সৃষ্টি করেন। এটি মানুষের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়জাত উপলব্ধি নয়।

এ ব্যাপারে ইবনে সিনার বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি নবুয়তের ব্যাপারটিকে নিদ্রার পর্যায়ে নামিয়ে সেই কল্পনাশক্তির মিশ্র অনুভূতির কাছে দৃশ্য পাঠানোর সাথে মিলিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাদের সমালোচনা নিদ্রা অপেক্ষাও কঠোর হতে বাধ্য। কারণ আমরা পূর্বে যেমন বর্ণনা করেছি, এক্ষেত্রেও স্বভাবত একটিই; সুতরাং এ দিক থেকে নবীর কাছে ওহী এবং স্বপ্নের তাৎপর্য ও বিশ্বাস একই পর্যায়ের হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু, পাঠক, আপনিও জানেন যে, বিষয়টি আদৌ তেমন নয়। এজন্য নবী (সঃ) ওহী অবতরণের পূর্বে ছয়মাস স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এবং এটি ওহীর সময়ের মধ্যে গণ্য হলেও তার ভূমিকা হিসেবেই স্থান পেয়েছিল। তদুপরি এটি যে যথার্থ অর্থে স্বপ্ন, তাও জানা গিয়েছিল। অনুরূপভাবে ওহীর বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি এর অবতরণকে কঠিন এবং এর তীব্রতাকে অসহ্য মনে করতেন; যেমন বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ কারণে প্রথম দিকে খণ্ড খণ্ড আয়াত অবতীর্ণ হত এবং পরবর্তীকালে তবুক যুদ্ধের সময় তাঁর উপর সূরা 'বারাআত' অবতীর্ণ হয়; অথচ তিনি তখন সহজভাবে তাঁর উটনীর উপর বসেছিলেন। কাজেই এটি যদি মননের

কল্পনাশক্তিতে ও কল্পনাশক্তির মিশ্র অনুভূতিতে অবতরণের ব্যাপার হত, তা হলে এ অবস্থাগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকত না।

চতুর্থ পর্যায়টি মৃত ব্যক্তিদের বরজখে অবস্থানের ব্যাপার এবং এর প্রারম্ভ হল কবর। তখন তারা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অথবা তাদের পুনরুত্থানের সময়, যখন তারা দেহের মধ্যে ফিরে আসবে। যে-কোন অবস্থাতেই হোক, তাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি বর্তমান। সুতরাং মৃত ব্যক্তি কবরে প্রশ্নকারী দুজন ফেরেশ্‌তাকে দেখতে পায়; সে তার এ দু চোখের দ্বারাই বেহেশ্‌ত বা দোজখে তার স্থান দেখতে সক্ষম হয়; সে জানাজায় উপস্থিত লোকদেরকে দেখে, তাদের কথা শোনে, এমনকি তাকে কবর দিয়ে তারা যখন ফিরে যায়, তাদের পায়ের আওয়াজ পর্যন্ত তার কানে এসে বাজে; তারা তাকে আল্লাহ্‌র একত্ব ও দুই কলেমা উচ্চারণ করার জন্য যেভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করে, তাও সে শুনতে সক্ষম হয়; অনুরূপ অন্যান্য ব্যাপার। বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বদরের চিহ্নিত স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন, সেখানে কোরায়েশের নিহত ব্যক্তিরা ছিল; তিনি তাদেরকে নামধরে ডাকতে আরম্ভ করলেন। উমর (রাঃ) বললেন, রসূলুল্লাহ্! আপনি কি কতকগুলো গলিত শবের সাথে কথা বলছেন? তিনি (সঃ) বললেন, তাঁর শপথ, যার হাতে আমার আত্মা, তারা আমার কথা তোমাদের চেয়ে ভালোভাবে শুনতে পায়।[১৮৯]

এর পরও তারা পুনরুত্থানের দিনে সেই কিয়ামতের সময় প্রত্যেকেই নিজ নিজ নামসহ সবকিছু চাক্ষুষ দেখতে পাবে, যেমন তারা জীবিতাবস্থায় দেখতে পেত। তারা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব মর্যাদা অনুসারে বেহেশ্‌তের ভোগ-সম্ভোগ এবং দোজখের শাস্তি ভোগ করবে। তারা ফেরেশ্‌তামণ্ডলীকে দেখতে পাবে এবং তাদের প্রভুকেও দেখবে; যেমন বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে, তোমরা অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে, যেমন পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে পাও; তাঁর দর্শনলাভে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হবে না। উপলব্ধির এই যে বিশেষ পর্যায়, তা জীবিতাবস্থায় তার মধ্যে ছিল না; কিন্তু যখন হবে, তখন এ দৈহিক অনুভূতির মতোই স্পষ্ট হবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে আল্লাহ্‌ই তার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান সৃষ্টি করবেন, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি।

এর রহস্য জানার জন্য, পাঠক, এ বিষয়টি বুঝে নিতে হবে যে, মানুষের আত্মা, দেহ ও তার ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে আবির্ভূত হয়ে থাকে। সুতরাং তা যখন নিদ্রা, মৃত্যু অথবা নবীর কাছে ওহী অবতরণের অবস্থায় মানবিক অনুভূতি থেকে ফেরেশ্‌তীয় অনুভূতির জগতে প্রবেশ করে, তখন সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন সেই মানবিক অনুভূতিকেই তার সঙ্গে নিয়ে যায়। কাজেই এ অবস্থায় সে যা ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পারে এবং তার উপলব্ধি দৈহিক উপলব্ধি থেকে উন্নততর হয়ে দেখা দেয়। এটি ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)-এর বক্তব্য। তিনি তার উপর আরও বলেছেন যে, মানবিক আত্মা দেহ বিচ্যুত হয়েও তার একটি আকৃতি বিদ্যমান থাকে; ঠিক যেমনি দুই চোখ, দুই কান এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তুল্যভাবে অবস্থান করতে থাকে, যেমন দেহের মধ্যে এর আকৃতিসহ ছিল।

আমি বলি, এর দ্বারা সেই যোগ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে উপলব্ধির অতিরিক্ত দেহের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। পাঠক, আপনি যদি এ

---

১৮৯. বোখারী (৩য় খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

বিষয়টি বুঝে থাকেন, তা হলে অবশ্যই জানতে পেরেছেন যে, উপলব্ধির এ মাধ্যমগুলো উপরিউক্ত চারটি পর্যায়েই অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু এগুলো তখন জীবনের অনুরূপ নয়। বরং তা শক্তি ও দুর্বলতা অনুসারে বিচিত্র হয়ে দেখা দেয় ও অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে আবর্তিত হয়। কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ এর প্রতিই সংক্ষেপে ইঙ্গিত করে বলেছেন যে, আল্লাহ্ এসব উপলব্ধিতে অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞানের সৃষ্টি করেন, সেই উপলব্ধি যেভাবেই হোক না কেন। এর দ্বারা তার সেই পরিমাণই বোঝাতে চেয়েছেন, যা আমরা উপরে বিশদ ব্যাখ্যা করেছি।

দ্ব্যর্থবোধক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে এটাই আমাদের সংক্ষিপ্ত ও বোধগম্য সামান্য আলোচনা। আমরা যদি এটি অপেক্ষা অতিরিক্ত বিশদ করতে যাই, তা হলে তা দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে। আমাদের উচিত পবিত্র আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর নবী ও গ্রন্থাদি বোঝার এবং সে সম্পর্কে সঠিক পথ পাবার জন্য আকুল আবেদন উপস্থিত করা। একমাত্র এ পথে আমরা একত্ববাদের যথার্থতা এবং আমাদের মোক্ষলাভের সফলতা লাভ করতে পারি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ দেখিয়ে থাকেন।[১৯০]

---

১৯০. কোরান; ২, ১৪২।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

[অধ্যাত্মবাদ বিষয়ক শাস্ত্র]

এ শাস্ত্রটি মুসলিম ধর্মীয় বিধানে নবাগত। এর মূল ভিত্তি হল, এ শাস্ত্রের অধিকারীদের জীবনধারা সর্বদাই সাহাবী, তাবেয়নি ও তাঁদের পরবর্তী জাতির পূর্বসূরি ও নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে সত্য ও সৎপথ প্রাপ্তির পন্থা হিসেবে বিরাজমান ছিল। এর মূল বিষয় আল্লাহ্‌র উপাসনায় ব্যাপৃত থেকে নিজেকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা; পার্থিব সম্পদ ও সৌন্দর্য থেকে দূরে অবস্থান করা; সাধারণ মানুষের কাছে লোভনীয় সম্পদ ও পদমর্যাদার লালসাকে ত্যাগ করা এবং মানুষের সংস্পর্শ থেকে একাকী নির্জনতার মধ্যে উপাসনায় নিজকে নিয়োজিত করা—এসব কিছুই সাহাবী ও পূর্বসূরিদের মধ্যে সাধারণ ব্যাপার ছিল।

অতঃপর দ্বিতীয় শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ে যখন পার্থিব জীবনের প্রতি আগ্রহ বেড়ে উঠল এবং মানুষ পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য ও সম্পদকে প্রাধান্য দিতে লাগল, তখন যারা উপাসনার মধ্যে নিজেদেরকে উৎসর্গ করলেন, তাঁরা সুফী বা সুফীতত্ত্ববিদ্ নামে বিশিষ্ট হয়ে উঠলেন। কুশায়রী (রহঃ)[১৯১] বলেছেন, 'আরবি ঐতিহ্য হিসেবে এ নামের শ্রুতি বা অনুমানগত কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। প্রকাশ্যত মনে হয়, এটি উপাধি বিশেষ। যারা একে আরবি 'সাফা' (শুদ্ধি) অথবা 'সিফত' (গুণ) থেকে ব্যুৎপন্ন বলে মনে করেন; তাদের বক্তব্যও আভিধানিক যুক্তির দিক থেকে ধোপে টিকে না।' তিনি বলেছেন, 'অনুরূপভাবে 'সুফ' (পশম) থেকেও যুক্তিযুক্ত হয় না; কারণ তারাই এককভাবে পশম পরিধান করতেন না।

আমার বক্তব্য এই যে, প্রকাশ্যভাবে এ ধারণাই প্রচলিত যে, শব্দটি 'সুফ' থেকেই ব্যুৎপন্ন হয়েছে। তাঁরা সাধারণভাবে এ পশমিবস্ত্র পরিধানের দ্বারাই বিশিষ্ট ছিলেন। কারণ তাঁরা সাধারণের জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদের বিরোধিতার জন্যই এ পশমকে বেছে নিয়েছিলেন। তারপর তারা যখন সংযম ও লোকজনের কাছ থেকে দূরে সরে নির্জনে উপাসনা করার বিশেষ পদ্ধতিতে পরিচিত হয়ে উঠলেন, তখন যা দিয়ে তাঁদেরকে বোঝা যায়, তা দিয়েই বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন।

বস্তুত বক্তব্য এই যে, মানুষ যা দিয়ে মানুষ, তা একমাত্র তার সেই উপলব্ধি, যার কল্যাণে সে সমগ্র প্রাণীর মধ্যে বিশিষ্ট। তার এ উপলব্ধি দুই প্রকারের; একটি জ্ঞান ও তত্ত্বকথা বিশ্বাস, ধারণা, সন্দেহ ও কল্পনা ইত্যাদির উপলব্ধি এবং অন্যটি বিচিত্র দশা

---

১৯১. তৃতীয় অধ্যায়ের ৮৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

তথা আনন্দ, বেদনা, সংকীর্ণতা, উদারতা, সন্তুষ্টি, ক্রোধ, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের উপলব্ধি। বুদ্ধিমান ও বিবেচক আত্মা দেহের মধ্যে উপলব্ধি, ইচ্ছা ও এসব দশার মাধ্যমে পরিবর্ধিত হয়ে ওঠে এবং এগুলোর দ্বারাই সে মানুষ হিসেবে বিশিষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। এর কতক অপর কতকাংশ থেকে জন্মায়; যেমন জ্ঞান জন্মায় যুক্তি-প্রমাণ থেকে, আনন্দ ও বেদনা যথাক্রমে উপাদেয় ও দুঃখজনক উপলব্ধি থেকে, উদ্যম বিশ্রাম থেকে এবং আলস্য ক্লান্তি থেকে। অনুরূপভাবে সাধকের সাধনা ও উপাসনাতেও তার জন্য একটি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, যাকে তার উক্ত সাধনার ফল বলে আখ্যায়িত করা যায়।

বস্তুত সাধকের এ অবস্থা বা দশা, হয় তার এক প্রকার উপাসনা, যার ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার দৃঢ়তা ও বিশেষ স্থান নির্দেশ করে; অথবা তা কোন প্রকার উপাসনা নয়, শুধুমাত্র আত্মার অর্জিত একটি গুণ, যা বেদনা, আনন্দ-উদ্যম, আলস্য বা অন্য প্রকার উপলব্ধিগত অবস্থানের জন্য জন্মে থাকে। এভাবে সাধক এক স্থান থেকে অন্য স্থানে উন্নীত হতে থাকে এবং পরিণামে সেই একত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানে উপনীত হয়, যা সৌভাগ্যের চরম গন্তব্য বলে গণ্য হয়ে রয়েছে। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি 'আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই'—এ স্বীকৃতিসহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে বেহেশতে প্রবেশ করে। বস্তুত সাধকের জন্য সাধনার এ পর্যায়ে উপনীত হওয়া প্রয়োজন। এ পর্যায়ের সামগ্রিক ভিত্তিই হল আনুগত্য ও আন্তরিকতা। এর প্রারম্ভ বিশ্বাস থেকে ও এর সঙ্গেও বিশ্বাসের অভিযাত্রা এবং এ বিশ্বাস থেকেই দশা, গুণ, ফল ও ফসল সবই উৎপন্ন হয়ে থাকে। এভাবে একের পর এক অবস্থার সৃষ্টি হয়ে একত্ব ও দিব্যজ্ঞানের পর্যায়ে এসে দেখা দেয়। যখন কোন ফলে ত্রুটি দেখা দেয় বা অসুবিধা জন্মায়, তখন আমরা বুঝতে পারি, তা পূর্ববর্তী স্তরের ত্রুটি থেকেই জন্মেছে। এ বিষয়টি আত্মিক ধারণা ও হার্দিক অনুভবের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। এ জন্যই সাধককে তার সর্ববিধ ক্রিয়া-কলাপে বিচার-বিশ্লেষণ ও তাত্ত্বিক নিরীক্ষার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। কারণ ক্রিয়ার মাধ্যমে ফললাভের বিষয়টি সুনিশ্চিত; সুতরাং নিষ্ফল হলে সে জন্য প্রক্রিয়ার ত্রুটি-বিচ্যুতিই দায়ী। সাধক তার আস্বাদের মাধ্যমে এর সংবাদ পেয়ে থাকেন এবং এর কার্যকারণ বিশ্লেষণ করেই নিজেকে পরীক্ষা করেন। এ ব্যাপারে খুব অল্প সংখ্যক মানুষই তাঁদের উপলব্ধিকে বুঝতে সক্ষম হয়। কারণ এক্ষেত্রে উদাসীনতা সর্বত্রই বিদ্যমান।

উপাসনাকারীদের উদ্দেশ্য যদি অনুরূপ কোন পর্যায়ে উপনীত হওয়ার বাসনা না হয়, তা হলে বলতে হবে, তাঁরা ধর্মীয়শাস্ত্রকে অনুসরণ করে আন্তরিকভাবে শুধু তার পালন ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মাত্র। অথচ এ অধ্যাত্মতত্ত্বের অধিকারীরা উক্ত বিষয়াদির ফলাফলকেই আস্বাদ ও অনুভবের দ্বারা বিশ্লেষণ করে থাকেন। কেননা এর মাধ্যমেই তারা বুঝতে পারেন যে, এগুলো ত্রুটিপূর্ণ, না ত্রুটিশূন্য। বস্তুত এদিক থেকে প্রকাশ পায় যে, তাদের পন্থার মূল ভিত্তি হল গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে আত্মার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সাধনা থেকে প্রাপ্ত এমন আস্বাদ ও অনুভবের মাত্রা বিশ্লেষণ। এগুলোর মাধ্যমেই সাধকের জন্য একটি স্থান নির্ধারিত হয় এবং সেখান থেকে অন্যত্র গমনের পথরেখা নির্দেশিত হয়। এসব অনুষ্ঠানসহ তাদের মধ্যে প্রচলিত নীতিমালা ও পরিভাষা

বিদ্যমান। কারণ প্রতিটি শব্দই তার আভিধানিক অর্থে একটা পরিচিত বৃত্তের মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং ওটাকে যখন অপরিচিত ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন স্বভাবতই আমরা ওটার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে এমন পরিভাষারূপে গ্রহণ করি, যাতে উদ্দিষ্ট ভাব সহজে বোধগম্য হতে পারে। এ কারণেই এ সম্প্রদায় তাদের পরিভাষাসহ এমন একটি শাস্ত্রের জন্ম দিয়েছে, যাতে তারা ছাড়া অন্য ধর্মবিদ্‌দের বলার কিছু নেই। এর ফলে—ধর্মীয়শাস্ত্রের পরিধিই দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এর একটি ভাগ ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদ্ ও ফতোয়া দানকারীদের অধীনস্থ; যাতে উপাসনা, অভ্যাস ও ব্যবহার সম্পর্কীয় সাধারণ বিধি-নিষেধ বিদ্যমান। অন্য ভাগটি এমন একদল লোকের দায়িত্বে ন্যস্ত, যাঁরা সাধনা, আত্মার পরীক্ষা, সাধনার পন্থায় লব্ধ আস্বাদ ও অনুভবের বিশ্লেষণ, এক আস্বাদ থেকে অন্য আস্বাদে গমন এবং তাদের মধ্যকার এ সম্পর্কীয় বিচিত্র পরিভাষার তাৎপর্য ব্যাখ্যায় নিয়োজিত।

যখন বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত ও সংকলিত হল এবং জ্ঞানীরা ফেকাহ্, অসুলে ফেকাহ্, কালাম, তফসীর ও অন্যান্য বিষয়ে সুসংবদ্ধ আলোচনা লিপিবদ্ধ করলেন, তখন এ পন্থার বিভিন্ন লোকও এ সম্পর্কে গ্রন্থাদি লিখতে উদ্যোগী হলেন। তাদের মধ্যে আল মুহাসেবী তাঁর 'রেয়াআ' নামক গ্রন্থে সাধারণ ধার্মিকতা ও গ্রহণ-বর্জনের দিক থেকে আত্মার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। তাদের মধ্যে অনেকে উক্ত পন্থার নীতিমালা সাধকদের আস্বাদ ও বিভিন্ন অবস্থা, বিচিত্র দশা সম্পর্কে লিখলেন; যেমন আল-কুশায়রী তাঁর 'রেসালা' নামক গ্রন্থে, আস্‌সোহরোয়ার্দী[১৯২] তার 'আওয়ারেফুল 'মাআরেফ' নামক গ্রন্থে এবং অন্যান্যরা অনুরূপ গ্রন্থাদিতে লিখেছেন। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) তাঁর 'এহিয়া' নামক গ্রন্থে এ উভয় বিষয়কে একত্র করেছেন। তিনি এতে ধার্মিকতা ও শিষ্যত্বের বিষয় বর্ণনা করে উক্ত পন্থার নীতি, প্রথা এবং তাদের শাস্ত্রীয় বক্তব্যের পরিভাষাসমূহকে বিশ্লেষণ করেছেন। এভাবে সুফীতত্ত্ব জাতির কাছে একটি সুসংবদ্ধ শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। অথচ এর পূর্বে এ পন্থাটি উপাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং বিধি-নিষেধগুলো একের অন্তর থেকে অপরের অন্তরে দীক্ষার মাধ্যমে সঞ্চারিত হতো মাত্র। অবশ্য এক সময়ে গ্রন্থবদ্ধ সব শাস্ত্রের তথা তফসীর, হাদীস, ফেকাহ্, অসুলে ফেকাহ্ ইত্যাদির অবস্থাও অনুরূপভাবে প্রচলিত ছিল।

অতঃপর এ সাধনা, নির্জনতা ও নামজপ; সাধক সাধারণভাবে এগুলো অনুসরণ করে এসে উপনীত হয় ইন্দ্রিয়ের যবনিকা উন্মোচন এবং আল্লাহ্ মহিমার জগতে দৃষ্টি নিক্ষেপে। সাধারণ ইন্দ্রিয়ের অধিকারীর জন্য অনুরূপ উপলব্ধির কোন অবকাশ নেই। অথচ আত্মা সেই মহিমাজগতের অধিবাসী। অনুরূপ উপলব্ধির কারণ এই যে, আত্মা যখন বাহ্যেন্দ্রিয়ের দিক থেকে অন্তরেন্দ্রিয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তখন বাহ্যোপলব্ধি দুর্বল হয়ে আত্মার অবস্থা-ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়ে ওঠে।। তার প্রভাব বিস্তৃত হয় ও তার বুদ্ধি নবীন জীবন লাভ করে। নামজপ একে সাহায্য করে থাকে; কেননা আত্মার শক্তি বৃদ্ধিতে এটি খাদ্যতুল্য। এভাবে আত্মশক্তি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ও বিস্তৃত হয়ে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়, যাকে বলা যায় জবানের স্তর থেকে চাক্ষুষ দর্শনের স্তরে

১৯২. উমর ইবনে মুহম্মদ; ৫৩৯—৬৩২ (১১৪৫—১২৩৫ খ্রি:) হি:।

উপনীত হওয়া। এ সময় ইন্দ্রিয়াদির যবনিকা উত্তোলিত হয় এবং আত্মা তার সত্তাগত উপলব্ধির ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা লাভ করে। কারণ সে ঐ নিছক উপলব্ধিরই স্বগোত্রীয়। তখন তার সামনে ঐশ্বরিক বদান্যতা প্রজ্ঞা ও মুক্তির অসীম দিগন্ত উন্মোচিত হয় এবং তার সত্তা তার যথার্থ তাৎপর্যে বিধৃত হয়ে উন্নত স্তরে—ফেরেশেতার জগতে উন্নীত হয়।

সাধকদের অধিকাংশের জন্যই এ দিব্যজ্ঞান এসে দেখা দেয়। এর ফলে তাঁরা সৃষ্টির এমন অনেক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, যা অন্যদের পক্ষে সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে তাঁরা বহু ঘটনাকে সেগুলো সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই জানতে পারেন এবং তাঁরা তাঁদের ইচ্ছা ও আত্মশক্তির বলে সৃষ্টির নিম্নস্তরে হস্তক্ষেপ করে অঘটন ঘটাতে সক্ষম হয়। ফলে সৃষ্টি তাঁদের ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে ওঠে। অবশ্য তাঁদের মধ্যে মহৎ ব্যক্তিরা এ দিব্যশক্তিকে কিছুই গণ্য করেন না; তাঁরা অস্বাভাবিক ক্ষমতা প্রকাশ, কোন কিছুর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদ প্রদান এবং এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে উদ্যোগী হন না; বরং তাঁরা অনুরূপ দিব্যশক্তিতে তাঁদের জন্য পরীক্ষার বিষয় বলে মনে করেন এবং তার আবির্ভাব ঘটলে তাঁরা আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হয়ে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হন। সাহাবীরা (রাঃ) এ দিব্য সাধনার অধিকারী ছিলেন এবং এমন দিব্যশক্তির প্রাচুর্য তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল। অথচ তাঁরা এর প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেননি। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাঃ) সম্পর্কে প্রচুর উদাহরণ বিদ্যমান। অধ্যাত্মবাদীরা এক্ষেত্রে তাঁদেরকে অনুসরণ করেছেন। আল কুশায়রীর গ্রন্থ 'রেসালায়' তাঁদের কথা এবং তাদের অনুসারী উত্তরসূরিদের কথা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর উত্তরসূরিদের মধ্যে একটি দল ইন্দ্রিয় যবনিকা উন্মোচন এবং তার অন্তরালবর্তী উপলব্ধির আলোচনায় সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। এ ব্যাপারে তাঁদের অনুশীলনের ধারা বিচিত্র হয়ে দাঁড়াল। ইন্দ্রিয়ানুভূতির মৃত্যু এবং মননসর্বস্ব আত্মাকে নামজপের দ্বারা সঞ্জীবিত করার শিক্ষাপ্রণালীতে মতভেদ দেখা দিল। কেননা এ প্রক্রিয়ায় আত্মা এমন একটি উপলব্ধির অধিকারী হয়, যা এর সত্তার খাদ্য গ্রহণ ও প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে পূর্ণতা প্রাপ্তির দ্বারা অর্জিত হয়ে থাকে। এরূপ উপলব্ধি অর্জিত হলে, তাঁরা ধারণা করেন যে, অস্তিত্ব তখন এই একটি উপলব্ধিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং এর কল্যাণে তাঁরা সৃষ্টির রহস্যসত্তা অনুধাবন ও আরশ থেকে ফরাশ পর্যন্ত যাবতীয় বস্তুর তাৎপর্য অনুসরণ করতে সক্ষম হন। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) তাঁর 'এহিয়া' গ্রন্থে সাধনার প্রক্রিয়া বর্ণনা করার পর অনুরূপ ধারণা প্রকাশ করেছেন।

পুনরায় এ দিব্যজ্ঞান তাঁদের মতে তখনই বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হয়, যখন তা নিষ্ঠার দ্বারা অর্জিত হয়। কেননা অনেক সময় বিশ্বাসের এ নিষ্ঠা ব্যতিরেকেই ক্ষুধা ও নির্জনতার কল্যাণে একপ্রকার দিব্যানুভূতির জন্ম সম্ভব; যেমন যাদুকর ও অন্যান্য যোগসাধনাকারীদের মধ্যে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে আমরা একমাত্র সেই দিব্যজ্ঞানের কথা বলছি, যা নিষ্ঠার মাধ্যমে উদ্ভূত হয়ে থাকে। এর উদাহরণ হল, যদি কোন দর্পণকে কূব্জাকৃতি অথবা গর্তাকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তা হলে তাতে প্রতিবিম্বিত বস্তুর আকৃতি যথার্থ না হয়ে বিকৃত আকারে দেখা যাবে। কিন্তু যদি উক্ত দর্পণটি সরলভাবে

বিস্তৃত থাকে, তা হলে তাতে প্রতিটি বস্তুর আকৃতি বিশুদ্ধভাবেই দেখা যাবে। বস্তুত আত্মার জন্য বিশ্বাসের নিষ্ঠা দর্পণের এ সরল বিস্তৃতির ন্যায় এবং তাতে প্রতিবিম্বিত অবস্থাদিও অনুরূপভাবেই তুলনীয়।

সুতরাং উত্তরসূরিরা যখন অনুরূপ দিব্যজ্ঞানের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠলেন, তখন তারা ঊর্ধ্বজগৎ নিম্নজগতের যাবতীয় বস্তুর তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁরা ফেরেস্তা, আত্মা, আরশ, 'কুর্সী' এবং এমন অন্যান্য বিষয় নিয়ে তাৎপর্য বিশ্লেষণে নিয়োজিত হলেন। যারা তাঁদের এসব বিষয় সম্পর্কীয় উপলব্ধির কোন ধারণা রাখতেন না, তাদের পক্ষে এদের মধ্যকার আস্বাদ ও অনুভবের প্রকৃতি অনুধাবন করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ধর্মীয় ফতোয়া দানকারীর অনেকেই তাদেরকে অস্বীকার করলেন, আবার অনেকে মেনে নিলেন। অবশ্য এ পন্থায় কোন প্রকার যুক্তি-প্রমাণের কোন উপযোগিতা নেই। কারণ এর সব ব্যাপারটিই প্রজ্ঞার লীলা-খেলা।

বিশদীকরণ ও বিশ্লেষণ

হাদীস ও ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদ্‌দের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কীয় বক্তব্যের বহুস্থানে এ কথা ব্যক্ত হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টি থেকে ভিন্ন। কালামশাস্ত্রবিদদের বক্তব্যে আছে, তিনি ভিন্নও নন; যুক্তও নন। দার্শনিকরা বলেন, তিনি জগতের মধ্যেও নন; বাইরেও নন। উত্তরসূরি সুফীসাধকদের বক্তব্য হল, আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির সাথে এক; হয় তা তাঁর অবতরণের মাধ্যমে, নয়ত তিনিই একমাত্র সত্তা। কেননা বিশেষ বা সাধারণ কোন দিক থেকে তিনি ছাড়া অন্য কারও অস্তিত্ব নেই।

এখানে আমরা এসব মতাদর্শের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং প্রতিটির যথার্থ তাৎপর্য প্রদান করব। যাতে প্রতিটির অর্থ আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সুতরাং আমরা বলি, ভিন্নতার দুটি অর্থ হতে পারে।

এর একটি হল, তিনি দেশ ও দিকে ভিন্ন এবং এর বিপরীত হল তিনি সংযুক্ত। তাঁর এমন বিপরীত হবার বিষয়টি তাঁকে কোন বিশেষ স্থানে নির্দিষ্ট করা থেকে বোঝা যেতে পারে। এক্ষেত্রে অনুরূপ নির্দিষ্টকরণ প্রকাশ্য হবে এবং এটাই দেহের অধিকারী হওয়ার ধারণা। অথবা আবশ্যকীয়ভাবে তা দেখা দিবে এবং এটাই দেহের বহিত তুলনা, যহা তাঁর বিশেষ কোন দিকে হওয়ার মতবাদের অনুরূপ। পূর্বসূরিদের অনেকের কাছ থেকে অনুরূপ সুস্পষ্ট ভিন্নতার মতাদর্শ বর্ণিত হয়েছে; অবশ্য তার অর্থ এমন ভিন্নতা ছাড়া অন্য কিছু মনে করা যেতে পারে। এ কারণেই কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ এমন ভিন্নতার কথা অস্বীকার করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন,—স্রষ্টা সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না যে, তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে ভিন্ন; আবার সংযুক্ত বলারও উপায় নেই। কারণ এ উভয়টি একমাত্র নির্দিষ্ট স্থানের অধিকারীর পক্ষেই সম্ভব।

কোন স্থান সম্পর্কে যা বলা হয় যে, তা কোন একটি বিশেষ গুণ অথবা তার বিপরীত কোন কিছুর সাথে সংযুক্তি ব্যতিরেকে থাকতে পারে না; তা একমাত্র সংযুক্তির বাস্তবতা ও অবাস্তবতার দ্বারাই সত্য বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু তার অভাব হলে তা আর সত্য হয় না; বরং তখন তা যে-কোন বিশেষ গুণ বা তার বিপরীতের সাথে সংযুক্তি

ব্যতিরেকেই অবস্থান করে। যেমন জড়পদার্থ সম্পর্কে বলা হয়, জ্ঞানী নয়, মূর্খ নয়, ক্ষমতাবান নয়, অক্ষম নয়, শিক্ষিত নয় ও অশিক্ষিত নয়। এক্ষেত্রে অনুরূপ ভিন্নতার গুণের দ্বারা বিশিষ্ট হওয়ার জন্য তাকে প্রতিষ্ঠিত অর্থানুসারে যে-কোন একটি দিকে অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। অথচ স্রষ্টা অনুরূপ কোন বিষয় থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। ইমামুল হরমাইনের গ্রন্থ 'আল লুমা'র ব্যাখ্যায় ইবনে তিলমেসানী[১৯৩] এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, স্রষ্টা সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না যে, তিনি জগৎ থেকে ভিন্ন, জগতের সাথে সংযুক্ত, তিনি জগতের মধ্যে এবং তিনি জগতের বাইরে। কারণ দার্শনিকরা যা বলেন, তা এরূপ যে, তিনি জগতের মধ্যেও নন, বাইরেও নন। তাঁদের এ বক্তব্যের ভিত্তি হল, স্থান বিরহিত উপাদানের অস্তিত্ব। কিন্তু এ ভিত্তিকে কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ অস্বীকার করেছেন। কেননা এতে উক্ত উপাদানের সাথে স্রষ্টাকে একটি বিশেষ গুণের দিক থেকে সমান বলে গণ্য করা হয়। কালামশাস্ত্রে এর বিস্তারিত বর্ণনা বিদ্যমান।

ভিন্নতার অন্য অর্থটি হল পৃথক ও বিরোধী। এতে বলা যায়, স্রষ্টা তাঁর সত্তা, পরিচয়, অস্তিত্ব ও গুণাবলির দিক থেকে সৃষ্টি থেকে ভিন্ন। এর বিপরীতে আসে ঐক্য, মিশ্রণ ও একত্রীভবন। এ ভিন্নতাই সমগ্র পূর্বসূরি, ধর্মতত্ত্ববিদ্, কালামশাস্ত্রবিদ্, প্রাচীন সুফীতত্ত্ববিদ্ তথা সব তত্ত্বানুসারীর মতাদর্শ। যেমন 'রেসালা' গ্রন্থের অনুগামী এবং তাঁদের পথের পথিক অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

পরবর্তী সুফীসাধকদের মধ্যে একটি দল, যারা প্রজ্ঞাজাত উপলব্ধিকে বিতর্কেয় জ্ঞানের বিষয়ে পরিণত করেছেন, তাঁরা এ মত পোষণ করেন যে, মহান স্রষ্টা তাঁর পরিচয়, অস্তিত্ব ও গুণাবলির দিক থেকে সৃষ্টির সাথে এক। অনেক সময় তাঁরা ধারণা করেন যে, এটি এরিস্টটলের পূর্ববর্তী প্লেটো ও সক্রেটিসের ন্যায় দার্শনিকদের মত। এটাই সেই মত, যা কালামশাস্ত্রবিদ্‌রা সুফীসাধকদের বিশেষ মত হিসেবে কালামশাস্ত্রে বর্ণনা করেন এবং তার প্রতিবাদ করতে তৎপর হন। অবশ্য তাঁরা এটি মনে করেন না যে সেখানে দুটি সত্তার সম্ভাবনা আছে। তার একটি অন্যটির অস্তিত্বের পরপন্থী অথবা একটি অন্যটিতে অংশ হিসেবে পর্যবসিত হয়। কারণ এরূপ ধারণার মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধিতাই বিদ্যমান। তাঁরা এরূপ কোন কিছু বলেন না। বস্তুত সুফীসাধকদের কথিত এ একত্ব সেই অবতারবাদ, যা খ্রিস্টানগণ ঈসা (আঃ)-এর জন্য দাবি করে থাকে। বরং এটি সেই অবতারবাদ থেকেও অদ্ভুত প্রকৃতির। কেননা এটি অবিনশ্বরের নশ্বরে অবতরণ এবং তার সাথে একত্রীভবন। এটি সেই মতের সাথেও অবিকল এক, যা ইমামিয়া শিয়াগণ তাদের ইমামদের সম্পর্কে পোষণ করে থাকেন। তাদের আলোচনায় এই একত্বের বর্ণনা দুভাবে এসেছে।

প্রথমত এই যে অনাদি সত্তা দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সমগ্র নশ্বরতায় সর্বদা নিজেকে ব্যাপৃত করছে এবং উভয় উপলব্ধির ক্ষেত্রেই সে এক হয়ে ধরা দিচ্ছে। বস্তুত সে-ই তার প্রকাশকারী এবং সে-ই তার রক্ষাকারী; অর্থাৎ সে-ই সব কিছুর অস্তিত্বের বিধায়ক। এর অর্থ তার অভাবে সব কিছুই নাস্তিতে পর্যবসিত হত। এটাই অবতারবাদীদের মত।

---

১৯৩. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ৬৫৮ (১২৬০ খ্রি:) হি:।

দ্বিতীয়টি হল সম্পূর্ণ একত্ববাদীদের মত। তারা যেন অবতারবাদীদের মতের মধ্যে এ সামগ্রিক ঐক্যের বিরোধী একটি চেতনা আবিষ্কার করেছে। সুতরাং তার সেই অনাদিশক্তি ও সৃষ্টিজগতের মধ্যে সত্তা, অস্তিত্ব ও গুণাবলির ক্ষেত্রে কোন প্রকার ভিন্নতার ধারণা অস্বীকার করেছে। তারা মানবিক উপলব্ধি ও মননের মধ্যে সে সম্পর্কে যে প্রকাশ্য বিভিন্নতার ধারণা বিদ্যমান, তাকে একান্তই মানবিক উপলব্ধির বিষয় বলে ভ্রমাত্মক গণ্য করেছে। বস্তুত এগুলো ধারণা মাত্র। তদুপরি এ ধারণা বলতে তারা সে ধারণার কথাও বোঝাতে চায় না, যা জ্ঞান, কল্পনা ও সন্দেহের সাথে জড়িত; বরং তারা বলতে চায় যে, অনুরূপ কোন কিছুরই যথার্থ অস্তিত্ব নেই। কেবল মাত্র মানবিক উপলব্ধিতেই এটি বিদ্যমান। কারণ একমাত্র অনাদি সত্তা ছাড়া দৃশ্যমান জগতে কোথাও অন্য কারও কোন অস্তিত্ব নেই। যেমন আমরা পরে এ সম্পর্কে যথাসাধ্য বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

বস্তুত এ বিষয়টি বোঝার জন্য মানবিক উপলব্ধিসমৃদ্ধ যুক্তি-প্রমাণের উপর নির্ভর করায় কোন লাভ নেই। কেননা এটি একমাত্র ফেরেশতীয় উপলব্ধির মাধ্যমেই বর্ণিত হতে পারে। নবীগণ একমাত্র সহজাত প্রবৃত্তির কল্যাণে অনুরূপ উপলব্ধির অধিকারী হন এবং ওলীরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এর আস্বাদ লাভ করে থাকেন। কিন্তু যারা এরূপ উপলব্ধিকে জ্ঞানের দ্বারা অর্জন করতে ইচ্ছুক হয়, তাদের সেই ইচ্ছা পথভ্রষ্টতা মাত্র। অনেক সময় অনেক গ্রন্থকার প্রকাশ্য (বস্তু)-বাদীদের ধারা অনুসারে সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন ও তাৎপর্য বিশ্লেষণে এ তত্ত্বকে ব্যবহার করতে ইচ্ছা করেন। এর ফলে তারা রহস্যময়কে আরও রহস্যময় করে তোলেন মাত্র।

অনেক সময় গ্রন্থরচয়িতারা সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটনে ও তার তাৎপর্যের পর্যায়ক্রম বিন্যাসে তাদের মতাদর্শের কথা বর্ণনা করার চেষ্টা করেন; কিন্তু এতে বিষয়টি মনন, পরিভাষা ও জ্ঞানসমৃদ্ধ শাস্ত্রগুলোর তুলনায় একান্তই রহস্যময় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন ফরগানী[১৯৪] ইবনে ফারেজের[১৯৫] দীর্ঘ কবিতাটির ব্যাখ্যার ভূমিকায় অনুরূপ একটি আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন। সেখানে তিনি একজন কর্তার মাধ্যমে সৃষ্টির আবির্ভাব ও তার পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসের বর্ণনা করেছেন। সৃষ্টিজগৎ সামগ্রিকভাবে একত্বের এমন একটি গুণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যাকে একত্বের প্রকাশস্থান বলে অভিহিত করা যায়। বস্তুত এ উভয় গুণ এমন একটি সম্ভ্রান্ত সত্তা থেকে বের হয়ে এসেছে, যা অন্যান্য এককত্বের স্বরূপবিশেষ। এ বহিঃপ্রকাশকে তারা জ্যোতির্ময়তা বলে আখ্যায়িত করেন।

এরূপ জ্যোতির্ময় বহিঃপ্রকাশের যতগুলো পর্যায় আছে, তাদের কাছে এর প্রথম পর্যায় হল নিজের কাছে জ্যোতিষ্মান হওয়া। এটি আবির্ভাব ও বহিঃপ্রকাশের পূর্ণতাকে বহন করে। কারণ তাদের বর্ণিত একটি হাদিসে অনুরূপ একটি বক্তব্য বর্তমান। সেখানে পরম সত্তা বলেছেন, 'আমি একটি গুপ্ত খনি ছিলাম, আমি পরিচিত হতে আগ্রহী হলাম; সুতরাং আমি এ সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করলাম, যাতে তারা আমাকে জানতে পারে।'[১৯৬]

১৯৪. সাইদউদ্দিন মুহম্মদ ইবনে আহমদ; খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী।
১৯৫. উমর ইবনে ফারেজ; ৫৭৭—৬৩২ (১১৮২—১২৩৫ খ্রি:) হি:।
১৯৬. এটিই 'হাদিসে কুদসী' নামে পরিচিত।

এ পূর্ণতা তাদের কাছে, অস্তিত্বের মধ্যে অবতরণশীল আবির্ভাব এবং তাৎপর্যাদির বিস্তার। এটাই তাদের কাছে তত্ত্বের জগৎ, পূর্ণতার অবস্থান ও 'মুহম্মদী' তাৎপর্যের পর্যায়। এ পর্যায়ে গুণাবলির তাৎপর্য, 'লওহ' কলম, সব নবী-রসূলের সব তাৎপর্য এবং মুহম্মদী সম্প্রদায়ের পূর্ণত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের অবস্থান। এ পর্যায়কে মুহম্মদী তাৎপর্যের বিস্তার বলে গণ্য করা হয়। এসব তাৎপর্য থেকে অন্যবিধ বহু তাৎপর্য বস্তুজগতে ছড়িয়ে পড়ে। একেই তুলনীয়তার পর্যায় বলা হয়। তারপর তা থেকে 'আরশ', কুর্সী, আকাশমণ্ডল, মৌল উপাদানের জগৎ এবং এর পরে মিশ্রণের জগৎ। এটাই সংশোধনের জগৎ; কিন্তু যখন এগুলো জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে, তখনই বিস্ফোরণের জগতে উপনীত হয়। শেষ।

এ মতাদর্শটিকে জ্যোতির্ময় বহিঃপ্রকাশ ও অবস্থানবাদীদের মতাদর্শ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এমন আলোচনার যথার্থ তাৎপর্য তার রহস্যময়তা ও জটিলতার জন্যই যুক্তিবাদীদের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। বস্তুত এটি প্রজ্ঞাজাত উপলব্ধিবাদী ও যুক্তিবাদীদের মধ্যকার এক ব্যবধান সৃষ্টিকারী পর্যায় মাত্র। অনেক সময় উপরোক্ত পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসকে প্রকাশ্য ধর্মীয় বিধানের সাহায্যে অস্বীকার করা হয়; কেননা সেখানে এমন কোন কিছুর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

অনুরূপভাবে অন্য অনেকে সম্পূর্ণ একত্ববাদের ধারণা পোষণ করতে অগ্রসর হয়েছেন। এ মতটি বোধগম্যতা ও ব্যাখ্যার দিক থেকে পূর্বটি অপেক্ষাও অদ্ভুত প্রকৃতির। তাদের ধারণা অস্তিত্বের বিস্তারের মধ্যেই তার শক্তি নিহিত এবং এর দ্বারাই বস্তু, তার আকৃতি ও উপাদানের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

বস্তুত মৌল উপাদান একমাত্র তার অন্তর্গত শক্তির দ্বারাই বর্তমান। অনুরূপভাবে তার অভ্যন্তরীণ উপাদানে যে শক্তি ছিল, তার কল্যাণেই সে অস্তিত্বে এসেছে তারপর তার মিশ্রণে উৎপন্ন বস্তুর মধ্যে যে শক্তি দেখা যায়, তা সেই শক্তিকেই বহন করছে, যা দিয়ে এ মিশ্রণ সম্ভব হয়েছে। যেমন খনিজ পদার্থের শক্তি, তার মধ্যে মৌল উপাদানের শক্তি তার আকৃতিসহ বিদ্যমান এবং তদুপরি অতিরিক্ত খনিজশক্তি। তারপর প্রাণীশক্তি, তাতে খনিজ পদার্থের শক্তির অন্তর্ভুক্তি ছাড়াও তার নিজস্ব শক্তি বিদ্যমান। অনুরূপভাবে মানবিক শক্তি প্রাণীশক্তিসহ অবস্থান করছে। তারপর আকাশীয় শক্তি মানবিক শক্তি ও তার অতিরিক্ত শক্তির আধার। অনুরূপ আত্মিক সত্তার শক্তি ও কোন প্রকার বিশেষত্ব ব্যতিরেকেই সব কিছুর সম্মিলিত আধার রূপ শক্তি। এটাই ঐশ্বরিক শক্তি, যা সব সমগ্র ও অংশের মধ্যে অস্তিত্বের স্রোতধারায় প্রবহমান। এটাই সবাইকে একত্র করে সবাইকে বেষ্টন করে রেখেছে। তার এ অবস্থান, বহিঃপ্রকাশের দিক থেকে নয়, গোপনীয়তার দিক থেকে নয়, আকৃতির দিক থেকে নয় এবং উপাদানের দিক থেকেও নয়। বরং সবই এক এবং তাই ঐশ্বরিক সত্তার স্বরূপ। যথার্থ অর্থে এ সত্তা এক সরল একক মাত্র। বিবেচনাই তাকে বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে চিহ্নিত করে। যেমন মানবিক শক্তির প্রাণীশক্তিসহ অবস্থান। পাঠক, আপনি কি দেখতে পান না যে, তা ঐ শক্তির অন্তর্গত এবং তার অস্তিত্বে অস্তিত্ববান। এ কারণে বারেক মাত্র হলেও সে তার বৈশিষ্ট্যসহই সাধারণত্বকে প্রকটিত করে তোলে। এটি সর্বপ্রকার অস্তিত্বেই বিদ্যমান,

যেমন আমরা বর্ণনা করেছি। আবার কখনও অংশ হয়েও তুলনার ধারায় সে সমগ্রকে প্রস্ফুটিত করে দেয়।

ফলত তারা এ মতবাদে যে-কোন প্রকারেই হোক, সর্বদা ও সর্বত্র মিশ্রণ ও আধিক্য থেকে পালিয়ে বেড়ায়। একমাত্র ধারণা আর কল্পনাই এরূপ আচরণকে তাদের জন্য অনিবার্য করে তুলেছে। এ মতবাদের আলোচনায় ইবনে দহকানের বক্তব্য থেকে যা বোঝা যায়, তা এই যে, তারা একত্ববাদ সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, তাকে দার্শনিকের বর্ণ সম্পর্কীয় বক্তব্যের সাথে তুলনা করা যায়। তারা বলেন, বর্ণের অস্তিত্ব কিরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত; কাজেই কিরণের অভাব দেখা দিলে বর্ণনাদির অস্তিত্ব কোন প্রকারেই সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে তাদের কাছে অনুভবযোগ্য সব অস্তিত্বই সচেতন অনুভূতির উপর নির্ভরশীল; বরং বুদ্ধিগ্রাহ্য ও কাল্পনিক অস্তিত্ব ও তার বিদ্যমানতার জন্য মননশীল উপলব্ধির উপর নির্ভর করছে। সুতরাং এদের সব বিশিষ্ট অস্তিত্বের জন্যই মানবিক উপলব্ধির অস্তিত্ব একান্ত প্রয়োজনীয়। যদি সামগ্রিকভাবে মানবিক উপলব্ধির অস্তিত্বহীনতা ধরে নেয়া যায়, তা হলে অস্তিত্বের মধ্যে বিশিষ্টতাসূচক কোন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং তা তখন সরল এককমাত্র। কাজেই উষ্ণ ও শৈত্য, কঠোরতা ও কোমলতা; বরং মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, আকাশ, নক্ষত্রমালা সব কিছুই একমাত্র তাদেরকে অনুভবকারী ইন্দ্রিয়াদির কল্যাণেই অস্তিত্ববান। এর জন্যই উপলব্ধির মধ্যে তাদের সেই বৈশিষ্ট্য দেদীপ্যমান, যা তাদের অস্তিত্বে নেই; কেবলমাত্র উপলব্ধিতেই বিরাজ করছে। সুতরাং বৈশিষ্ট্যকারী উপলব্ধি যখন থাকে না, তখন কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না; তখন উপলব্ধিও একক—তা আমি, অন্য কেউ নয়।

তারা একে ঘুমন্ত ব্যক্তির অবস্থার সাথে তুলনা করেন। কারণ সেই ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয় বলে সব বস্তুরই সম্পর্ক বিরহিত থাকে। সে এ অবস্থায় থাকাকালে একমাত্র কল্পনাশক্তিই তাকে যা কিছু বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক বস্তুর সন্ধান দেয়। তারা বলেন, অনুরূপভাবে জাগ্রত ব্যক্তির অবস্থাও একই পর্যায়ের; তার মানবিক উপলব্ধির কল্যাণেই সে সব অস্তিত্বের বিশিষ্টতাজ্ঞাপক জ্ঞান লাভ করে থাকে। যদি তার এ উপলব্ধির অস্তিত্বহীনতা ধরে নেয়া যায়, তা হলে ঐসব বৈশিষ্ট্যও অন্তর্ধান করবে। এটাই তাদের কথিত সেই ধারণার অর্থ। বস্তুত এ ধারণা মানবিক উপলব্ধির অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় নয়।

ইবনে দহকানের[১৯৭] আলোচনা থেকে যা বোধগম্য হয়েছে, এটি তারই সংক্ষিপ্ত সার। বস্তুত এরূপ যুক্তি একান্তই পরিত্যাজ্য। কারণ আমরা যে নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি, তা আমাদের চোখের সামনে না থাকলেও তার বিদ্যমানতা সম্পর্কে আমরা বিশ্বাস না করে পারি না। আমরা এও বিশ্বাস করি যে, সেখানে আকাশ আছে, সেই আকাশে নক্ষত্রমালা আছে এবং আরও এমন অনেক কিছু আছে, যা আমাদের দৃষ্টির সামনে নেই। মানুষ মাত্রেই এগুলো অকাট্যরূপে বিশ্বাস করে। বস্তুত কেউই তার মধ্যকার অনুরূপ বিশ্বাসের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে সক্ষম নয়। তদুপরি উত্তরসূরি তত্ত্ববিশারদ

১৯৭. পরিচয় অজ্ঞাত।

সুফীসাধকরা বলছেন, সাধকের দিব্যজ্ঞান জন্মানোর পর অনেক সময় এরূপ একত্বের ধারণা এসে উপস্থিত হয়; তারা একে 'সম্মিলনস্থান' বলে অভিহিত করেন। তারপর সে এ স্থান থেকে উন্নীত হয়ে অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির পর্যায়ে এসে পৌঁছে। তারা একে 'বিয়োজনস্থান' বলে আখ্যায়িত করেন। বস্তুত এটাই তত্ত্ববিদ্ বিচক্ষণ সাধকের পর্যায়। তাদের কাছে প্রত্যেক সাধককেই এ সম্মিলনঘাঁটি অতিক্রম করতে হয়। অবশ্য এ ঘাঁটিটি খুবই কঠিন স্থান; কারণ সেখানে সাধকের থেমে পড়ায় আশঙ্কা বিদ্যমান। এর ফলে তার সব প্রচেষ্টাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এভাবে সুফীসাধকদের সাধনার বিচিত্র পর্যায়ক্রমকে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।

অতঃপর সুফীসাধকদের এ উত্তরসূরি কালামশাস্ত্রবিদ্গণ, যারা দিব্যজ্ঞান ও বাহ্যানুভূতির অতীত বিষয়ে আগ্রহী, তারা এ ব্যাপারে আতিশয্যের অনুসারী হয়ে উঠলেন। সুতরাং তাদের মধ্যে অনেকেই একত্ব ও অবতারবাদের দিকে ঝুঁকে পড়লেন, যেমন আমরা তার প্রতি ইঙ্গিত করেছি। তারা এ বিষয়ের আলোচনায় গ্রন্থাদি পূর্ণ করে তুললেন। যেমন হারাবী[১৯৮] তার 'মকামাত' নামক গ্রন্থে এবং অন্যান্যরা। তাদেরকে অনুসরণ করলেন ইবনেল আরাবী ও ইবনে সাবঈন[১৯৯] এবং তাঁদের শিষ্যবৃন্দ। তারপর এ ধারায় কবিতা রচনায় অগ্রসর হলেন ইবনে আফিফ,[২০০] ইবনে ফারেজ ও নজম ইসরাইলী[২০১]। তাদের পূর্বসূরিরা রাফেজী সম্প্রদায়ের উত্তরসূরি ইসমাইলীদের সাথে জড়িত ছিলেন। এ সম্প্রদায়ও অবতারত্ব ও ইমামদের ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পর্কে এমন মতামত পোষণ করত, যা তাদের পূর্বসূরিদের মধ্যে ছিল না। এর ফলে এদের এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মতামত গ্রহণ করে বসল; তাদের আলোচনা মিশ্রিত এবং তাদের বিশ্বাসাদি সমতুল্য হয়ে উঠল।

এরই ফলশ্রুতিতে সুফীসাধকদের আলোচনায় 'কুতব'-এর আবির্ভাব ঘটল। এ শব্দের অর্থ দিব্যজ্ঞানীদের শিরোমণি। তাদের ধারণা, তাঁকে এ দিব্যজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্য কেউই অতিক্রম করতে সমর্থ হবে না এবং এমন অবস্থায় তিনি তিরোহিত হবেন। তারপর দিব্যজ্ঞানীদের মধ্য থেকে অন্য কেউ তাঁর স্থান গ্রহণ করবেন। ইবনে সিনা তাঁর 'ইশারাত' নামক গ্রন্থের সুফীতত্ত্ব অধ্যায়ে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, 'সত্যের মর্যাদা এমনই মহিমান্বিত যে, তা প্রত্যেক অনুসন্ধানীর জন্যই লভ্য নয় অথবা তা এককালে একাধিক ব্যক্তির পক্ষেও জ্ঞাতব্য নয়।' বস্তুত এটি এমন একটি বক্তব্য, যার জন্য যুক্তিগ্রাহ্য ও ধর্মীয় বিধানসম্মত কোন প্রমাণ নেই। এটি কেবলমাত্র একটি বাক্সর্বস্ব বক্তব্য এবং রাফেজী সম্প্রদায় তাদের ইমামদের দিব্য উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যা বলে থাকে, তারই অনুরূপ একটি মত। পাঠক লক্ষ করেন, কীভাবে এসব সুফীসাধকের মনোভাব রাফেজী সম্প্রদায়ের মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং তাঁরা এর নিকটবর্তী হয়েছেন।

---

১৯৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহম্মদ; ৪০১—৪৮১ (১০১১—১০৮৯ খ্রি:) হি: (?)।

১৯৯. তৃতীয় অধ্যায়ের ৩১৭ নং টীকা দ্র :।

২০০. শামসুদ্দিন মুহম্মদ ইবনে আফিফুদ্দিন সুলায়মান ইবনে আলী ভিলমিসানী; মৃত্যু ৬৮৮ (১২৮৯ খ্রি:) হি: (?)।

২০১. নজমুদ্দিন ইবনে ইসরাইল; ৬০৩—৬৭৭ (১২০৬—১২৭৮ খ্রি:) হি:।

অতঃপর তারা উক্ত কুতবের পরে সুবিন্যস্তভাবে 'আবদাল'দের অস্তিত্বের কথা বলেছেন, যেমন শিয়ারা 'নকীব'দের সম্পর্কে বলে থাকে। এমনকি তারা সূত্র পরম্পরায় অধ্যাত্মতত্ত্বের নিদর্শন হিসেবে 'খিরকা' পরিধানকে তাদের পন্থা ও সম্প্রদায়ের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করল, তখন তাকেও হযরত আলীর সাথে সংযুক্ত করতে দ্বিধা করল না। বস্তুত এটিও সেই শিয়া মতের পরিপূরক। অন্যথায় আলী (রাঃ) সাহাবীদের মধ্যে অনুরূপ কোন পন্থা বা মতের পোশাক ও দশার দ্বারা বিশিষ্ট ছিলেন না। বরং আবুবকর ও উমর (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পরে সর্বাপেক্ষা বেশি ধর্মনিষ্ঠ ও উপাসনা পরায়ণ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এমন কেউই ছিলেন না, যাঁকে ধর্মের ব্যাপারে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। বরং সাহাবীদের সকলেই ধর্মত্যাগ ও সংযমের ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে বিরাজমান ছিলেন। তাঁদের চরিত্র ও ইতিহাস এ কথাই সাক্ষ্য দেয়। অবশ্য শিয়ারা তাদের সুপরিচিত শিয়া মতামতের জন্য এ ব্যাপারে অন্য সবার চেয়ে আলীকে বেশি গুণগ্রামের অধিকারী বলে মনে করে।

এ ব্যাপারে যা সুস্পষ্ট, তা এই যে, ইরাকে যখন ইসলামিয়া সম্প্রদায়ের শিয়ারা আত্মপ্রকাশ করল এবং তাদের সর্বজনবিদিত ইমাম সম্পর্কীয় ধারণা ও এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় প্রকাশ পেল, তখন সেখানকার সুফীসাধকরা তাদের মতামত থেকে তত্ত্বচয়ন করে প্রকাশ ও গোপনের মধ্যে একটি তুলনামূলক ভারসাম্যের সৃষ্টি করলেন। তাঁরা ইমামকে ধর্মীয় বিধানের প্রতি মানুষের আনুগত্য সম্পাদনের জন্য শাসনক্ষমতার অধিকারী করলেন এবং ধর্মীয় বিধানে যেমন বর্ণিত হয়েছে, সে অনুযায়ী যাতে মতানৈক্যের সৃষ্টি না হয়, সেজন্য তাঁকে এককভাবে এ দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তারপর তারা আল্লাহ্‌র তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য কুতবের প্রতিষ্ঠা করলেন; কেননা তিনি দিব্যজ্ঞানীদের শিরোমণি। তারা তাঁকে ইমামের সাথে প্রকাশ্য তুলনার ভিত্তিতে একক দায়িত্ব অর্পণ করে গোপন তত্ত্বের জন্য নির্দিষ্ট করলেন। যাতে তিনি এ বিষয়ে ইমামের সমতুল্য ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন। তারা তাঁর নাম রাখলেন 'কুতব' তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র নির্ভর তাঁর উপর। এভাবে তারা তুলনার চূড়ান্ত পর্যায় অনুসরণ করে 'নকীব' (নেতা) এর অনুরূপ 'আবদাল' (সাধু) নিয়োজিত করলেন। পাঠক, বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করুন।

সুফীসাধকদের অনুরূপ মনোভাবের সাক্ষ্য দেয় প্রতীক্ষিত ইমাম ফাতেমী সম্পর্কে তাদের আলোচনা। তারা এ বিষয় দিয়ে তাদের গ্রন্থাবলি পূর্ণ করে রেখেছেন। অথচ পূর্বসূরি সুফীসাধকদের আলোচনায় এ সম্পর্কে ইতি বা নেতিবাচক কোন বক্তব্যই নেই। এটি একমাত্র শিয়া ও রাফেয়ী সম্প্রদায়ের গ্রন্থ ও মতাদর্শ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করেন।[২০২]

টীকা

এখানে আমাদের উস্তাদ দিব্যজ্ঞানী আন্দালুসের ওলীশ্রেষ্ঠ আবু মাহদী ইসা ইবনে যিয়াতের[২০৩] একটি আলোচনা পরিচ্ছেদ আকারে সন্নিবেশিত করাকে আমি প্রয়োজনীয়

২০২. কোরান; ১০; ৩৫; ৪৬, ৩০।
২০৩. বিস্তারিত পরিচয় অজ্ঞাত।

মনে করছি। ইনি অধিকাংশ সময় হারাবীর[২০৪] মকামাত নামীয় গ্রন্থের কিছু সংখ্যক পদ্যাংশ নিয়ে এ আলোচনার সূত্রপাত করতেন। তাতে যে বক্তব্য আছে, তা সার্বিক একত্ববাদের ধারণা জন্মাতো অথবা প্রায় অনুরূপ কিছুর কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করত। তাঁর বক্তব্যটি নিম্নরূপ :

সেই একের একত্ববাদকে কেউই বর্ণনা করতে পারে না;
কেননা যে কেউ তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কে বলতে চায়, সে অস্বীকার করে।
তাঁর প্রশংসা করার জন্য যারা তাঁর একত্বের কথা বলে,
তারা প্রকৃতপক্ষে দ্বিত্বের কথাই বলে এবং একক সত্তা তা নস্যাৎ করেন।
তাঁর একত্ব! তা একমাত্র তাঁরই জ্ঞাত একত্ব;
যে ব্যক্তি প্রশংসাস্থানে তার উল্লেখ করে, সে পথভ্রষ্ট।

উস্তাদ আবু মাহদী এ বক্তব্যের অসুবিধার দিক উল্লেখ করে বলেছেন যে, হারাবী কর্তৃক যারা এই একের একত্বের কথা বলেছে, তারা অস্বীকারকারী এবং যারা তাঁর স্তুতি ও প্রশংসা করেছে, তারা পথভ্রষ্ট, এরূপ উক্তি মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা অনুরূপ পদ্যাংশকে কঠোর সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখে তাঁর লেখককে ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী করেছে। বস্তুত মানুষ এ বক্তব্যকে খুবই শিথিলভাবে গ্রহণ করেছে। আমরা এ দলের মতামত অনুসারে বলতে পারি যে, তাদের কাছে একত্বের অর্থ অনাদিসত্তার যথার্থতা প্রতিপাদন করে সৃজ্যমানতার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা এবং সামগ্রিকভাবে অস্তিত্ব যে একটিমাত্র সত্তা ও একটিমাত্র আধার—এটাই প্রতিপন্ন করা। উক্ত সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম আবু সাইদ আলজাজ্জার[২০৫] বলেছেন, সত্য যা প্রকাশ পেয়েছে ও যা গোপন রয়েছে, তা-ই। তাদের মত এই যে, অস্তিত্বের মধ্যে একাধিক্যের বিদ্যমানতা দ্বিত্ববাদকেই প্রকটিত করে তোলে। বস্তুত অনুভূতির উপস্থিতির জন্যই এমন একাধিক্যের ধারণা মায়া-মরীচিকা ও দর্পণে প্রতিবিম্বিত দৃশ্যাদির ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এর জন্যই একমাত্র অনাদি সত্তা ছাড়া অন্য যা কিছু তাকে যদি যথাযথ অনুসরণ করা যায়, তা হলে নাস্তি বলেই প্রতীতি জন্মাবে। এটাই সেই বাণীর অর্থ, যাতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ছিলেন এবং তাঁর সাথে অন্য কোন কিছুই ছিল না। বর্তমানেও তিনি তাই—অন্তত তাদের কাছে, যা তিনি ছিলেন। কবি লাবিদের যে বক্তব্যকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সত্য বলে স্বীকার করেছেন, তাও এমন। লাবিদ বলেছেন, 'সাবধান, আল্লাহ্ ছাড়া সব কিছুই মিথ্যা'।[২০৬] তারা বলেন, সুতরাং যে ব্যক্তি একত্ব ও স্তুতির কথা বলে, সে এমন একটি সৃজিত অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করছে, যা সে নিজে স্বয়ং; সে এমন একটি সৃজিত একত্বের কথা বলছে, যা তারই কর্ম এবং এমন একজন অনাদি সৃজকের বার্তা জানাচ্ছে, যিনি একমাত্র উপাস্য।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, একত্বের অর্থ সৃজ্যমানতার স্বরূপে অস্বীকৃতি। অথচ এ সৃজ্যমানতার স্বরূপ বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত; বরং একাধিক্যে পরিপূর্ণ সুতরাং একত্ববাদ

২০৪. হারাবী; ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৯৮ নং টীকা দ্র:।
২০৫. আল-খার্রাজ (?); আহম্মদ ইবনে ইসা; মৃত্যু ২৮৬ (৮৯৯ খ্রি:) হি: (?)।
২০৬. বোখারী দ্র:। লাবিদ ইবনে রাবিয়া; মৃত্যু ৪১ (৬৬১ খ্রি:) হি:।

অস্বীকৃত এবং সে সম্পর্কিত দাবি মিথ্যা। যেমন একই গৃহে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তি যদি তার সঙ্গীকে বলে, এ গৃহে তুমি ছাড়া অন্য কেউ নেই! তখন তার সঙ্গী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবে, হাঁ, একমাত্র তুমি অস্তিত্বহীন হলেই তা সত্য হতে পারে।

অনেক বিশেষজ্ঞ তাদের ঐ কথায় যে আল্লাহ্ সময় সৃষ্টি করেছেন, বলেছেন, এ শব্দগুলো তাদের মূলের বিরোধিতা করছে। কেননা সময়ের সৃষ্টি অবশ্যই সময়ের পূর্বকালীন এবং এ সৃজনটি এমন একটি ক্রিয়া, যা অনুষ্ঠিত হবার জন্য সময়ের প্রয়োজন। বস্তুত এরূপ ধারণা সৃষ্টির ব্যাপারটি তাৎপর্যাদি বিশ্লেষণের অপারগতা এবং ভাষার পক্ষে তাদের যথার্থ সত্য প্রকাশ ও বর্ণনার অক্ষমতার জন্য সৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং যখন এটি স্থির হল যে, যথার্থ একত্ববাদী তিনিই, যিনি একক এবং তিনি ছাড়া সবই নাস্তি, তখনই একত্ব যথার্থ অর্থে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। এটাই তাদের সেই বাণীর অর্থ, যেখানে তারা বলেছেন, আল্লাহ্কে আল্লাহ্ই জানতে পারেন।'

অবশ্য যারা তাদের নিজ অস্তিত্বের চিহ্ন ও নির্দেশাদিসহ সত্যের একত্ব সম্পর্কে মত প্রকাশ করে, তাদের কোন অসুবিধা নেই। কারণ বিষয়টি একান্তই সেই পর্যায়ের, যেখানে বলা হয়, 'পুণ্যবানদের পুণ্য নৈকট্যপ্রয়াসীদের জন্য পাপ।' কেননা এরূপ মত প্রকাশ বস্তুত বশ্যতা, আনুগত্য ও দ্বৈতচেতনার অনিবার্য ফলশ্রুতি। এদিক থেকে যে সম্মিলনস্থানে উন্নীত হয়, সে তার বিশেষ মর্যাদার জ্ঞানসহ ত্রুটির সম্মুখীন না হয়ে পারে না। কারণ এটি এমন এক বিভ্রান্তি, যা আনুগত্যের সাথে জড়িত রয়েছে। একমাত্র চাক্ষুষ দর্শনই তা দূর করতে পারে এবং সম্মিলনের স্বরূপগত উপলব্ধি নশ্বরতার অপবিত্রতা থেকে মুক্তি দিতে পারে। যারা সামগ্রিক একত্বের কথা বলেন, তারা সম্মিলনের এরূপ একটি ধারণার মধ্যে গভীরভাবে নিমজ্জিত রয়েছেন। যাহোক যে-কোন দিক থেকেই দেখা যাক না কেন, তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষ্য হল একের সাথে মিলন। কবির কবিতায় এ বিষয়টি সেই উন্নত অবস্থার উপলব্ধি, সতর্কতা ও উৎসাহের জন্যই প্রকাশিত হয়েছে। কেননা এর মাধ্যমেই দ্বৈতভাবে দূরীভূত হয়ে, ধারণা নয়, স্বরূপের দিক থেকে সামগ্রিক একত্ব লাভ হয়ে থাকে। সেই কথা—যে মেনে নিয়েছে, সেই স্বস্তি লাভ করেছে—তার অর্থ ও অনুরূপ। এর তাৎপর্য যার কাছে দুরূহ হয়, সে যেন এ কথাটি বুঝে নেয়, যেখানে পরম সত্তা বলেছেন, "আমি তার শ্রুতি ও দৃষ্টি ছিলাম।'

পাঠক, এগুলোর অর্থ যদি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তা হলে শব্দ নিয়ে কলহের কোন অবকাশ নেই। যে ব্যক্তি এ পর্যায়ের ঊর্ধ্বস্থিত চেতনাস্তরে উপনীত হতে সক্ষম, কেবল তারই কাছে সমগ্র বিষয়টির তাৎপর্য উদ্ভাসিত হতে পারে। অন্যথায় এ সম্পর্কে বলার বা সংবাদ দিবার কোন কিছু নেই। সুতরাং এ প্রসঙ্গে উপরোক্ত আভাসদানই যথেষ্ট; কেননা এমন বিষয়ে গভীর দৃষ্টি দেয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। এর কথা এ সম্পর্কীয় আলোচনায় সর্বত্রই সুপরিচিত।

এখানে আবু মাহদী যিয়াতের বক্তব্য শেষ হল। আমি এটি উজির ইবনে খতিবের[২০৭] অধ্যাত্মপ্রেম সম্পর্কীয় রচনা 'আত্তারীফ বিল হুব্বেশ্ শরীফ' (মহান প্রেমের পরিচয়) নামক গ্রন্থ থেকে এটা বর্ণনা করেছি। আমি এটি আমাদের উস্তাদের কাছে

২০৭. মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্; ৭১৩—৭৭৬ (১৩১৩—১৩৭৮ খ্রি:) হি:।

বহুবার শুনেছি। অবশ্য আমি মনে করি উক্ত গ্রন্থে তা আরও বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হয়েছে। কারণ উক্ত গ্রন্থের সাথে পরিচয় বহুদিন পূর্বের। আল্লাহ্ই শক্তিদাতা!

অতঃপর ফেকাহ্শাস্ত্রবিদ ও ফতোয়াদানকারী ধর্মজ্ঞানীরা এ উত্তরসূরি সুফীসাধকদের উপরোক্ত বক্তব্য এবং অনুরূপ বিষয়কে প্রতিবাদযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। অনুরূপভাবে এ পন্থায় তাদের জন্য যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, তা-ও ফেকাহ্শাস্ত্রবিদ্গণ অস্বীকার করতে চেয়েছেন। যথার্থ অবস্থা হল এই যে, তাঁদের অনুরূপ বক্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান। তাদের সমগ্র বক্তব্যকে চারটি আলোচ্য বিষয়ে সন্নিবেশিত করা যায়। প্রথমত, সাধনার বিভিন্ন পর্যায়, তার দ্বারা প্রাপ্ত আস্বাদ ও অনুভূতি এবং কার্যাবলির মধ্যদিয়ে আত্মাকে পরীক্ষা করার আলোচনা; যাতে এগুলোর মাধ্যমে সেই আস্বাদ লভ্য হয়ে ওঠে, যা একটি স্থানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অন্য স্থানে উত্তরণের ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে—যেমন আমরা পূর্বে বলেছি।

দ্বিতীয়ত, দিব্যজ্ঞান এবং অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে অনুভূতির যথার্থ তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা। যেমন ঐশ্বরিক গুণাবলি, আরশ, কুর্সী,[২০৮] ফেরেশতা, ওহী, নবুয়ত, আত্মা, দৃশ্য ও অদৃশ্য সর্বপ্রকার অস্তিত্বের তাৎপর্য স্রষ্টা ও উদ্ভাবক হতে আরম্ভ হবার পর যাবতীয় সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস; যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, বিচিত্র বিভূতির দ্বারা বিভিন্ন জগৎ ও সৃষ্টির মধ্যে প্রভাব বিস্তারের আলোচনা।

চতুর্থত, এমন কিছু বাহ্যিক দুর্বোধ্যতাযুক্ত শব্দ, যা ঐ সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়দের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে এবং যাকে তারা তাদের পরিভাষায় 'তাবোল্লাস' বলে অভিহিত করে থাকে। এগুলোর বাহ্য স্বরূপ বুঝে ওঠা খুবই দুঃসাধ্য। এজন্য এদের কতকাংশ অস্বীকৃত, কতকাংশ শোভন এবং অপর কতকাংশ একান্তই ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

সাধনার বিভিন্ন পর্যায় ও স্থান, তা দিয়ে লব্ধ বিচিত্র আস্বাদ ও অনুভূতি এবং তাদের কার্যকারণের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে আত্মাকে পরীক্ষার মধ্যে ন্যাস্ত করা এমন কিছু বিষয়, যাতে কারও প্রতিবাদ করার কিছু নেই। এক্ষেত্রে তাদের আস্বাদও যথার্থভিত্তিক এবং এর যথাযথ প্রাপ্তিও সৌভাগ্যের নামান্তর মাত্র। উক্ত সম্প্রদায়ের বিচিত্র বিভূতি, অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান এবং সৃষ্টজগতে তাদের প্রভাব বিস্তারের স্বরূপও বিষয় হিসেবে যথার্থ ও স্বীকৃতির যোগ্য। যদিও বহু জ্ঞানী এগুলোকে অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু তা ঠিক নয়। আশায়েরা সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম উস্তাদ আবু ইসহাক ইসফারায়নী[২০৯] অলৌকিক ক্রিয়ার সাথে তাদের বিভ্রান্তিকর মিশ্রণের কারণস্বরূপ ঐসব বিভূতিকে অস্বীকার করার যে যুক্তি উপস্থিত করেছেন, তাও আহলে সুন্নতের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা উত্থাপিত এ দুটির মধ্যে দাবিজনিত পার্থক্যের দরুন কার্যকরী হচ্ছে না। কারণ নবুয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট অলৌকিক ক্রিয়া নবী আনীত বক্তব্যের সমর্থনে উত্থাপিত হয়ে থাকে। তাঁরা আরও বলেছেন যে, মিথ্যা দাবির প্রতিক্রিয়া হিসেবে অনুরূপ ক্রিয়া অনুষ্ঠান স্বাভাবিক নয়। কেননা সত্যের সাথে

২০৮. আরশ = সিংহাসনদ; কুর্সী = আসন।
২০৯. প্রথম অধ্যায়ের ১০৭ নং টীকা দ্র:।

অলৌকিক সংশ্লিষ্ট হওয়া যুক্তিগ্রাহ্য এবং তার অন্তর্নিহিত স্বরূপই হল সত্যতা। সুতরাং তা যদি কোন মিথ্যাবাদীর দাবি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে সত্যের স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং কার্যত এটি অসম্ভব। তদুপরি উপরোক্ত বিচিত্র বিভূতির অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা বিদ্যমান। সুতরাং এরূপ একটি বিষয়কে অস্বীকার করার মধ্যে কিছুটা প্রশ্রয় পেয়ে থাকে।

সাহাবী ও পূর্বসূরি নেতৃস্থানীয়দের মধ্যেও অনুরূপ বিভূতির প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। এগুলো সর্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ।

আলোচ্য সম্প্রদায়ের দিব্যজ্ঞান, ঊর্ধ্বস্তরের তাৎপর্য বিশ্লেষণ এবং সৃষ্টির আবির্ভাবের পর্যায়বিন্যাস সম্পর্কীয় আলোচনায় অধিকাংশ বক্তব্যই একপ্রকার দ্ব্যর্থবোধক কেননা তা তাদের কাছে প্রজ্ঞাজাত। বস্তুত এ প্রজ্ঞা ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের আস্বাদ কখনই সম্পূর্ণ নয়। অথচ ভাষার এমন কোন শক্তি নেই, যা দিয়ে তাদের এ আস্বাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যায়। কারণ ভাষার প্রচলন এমন সুপরিচিত ভাবপ্রকাশের জন্য নির্ধারিত, যার অধিকাংশই অনুভূতিজাত। সুতরাং আমাদের উচিত তার এ সম্পর্কীয় আলোচনায় কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন না করা এবং অন্যান্য দ্ব্যর্থবোধক বিষয়াদিকে আমরা যে অবস্থায় পরিত্যাগ করেছি, এগুলোকেও অনুরূপভাবে পরিত্যাগ করা। বস্তুত যাঁরা ধর্মীয় বিধানের সাথে মিলিয়ে এসব বক্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করার আল্লাহ্‌দত্ত শক্তি অর্জন করেছেন, তাঁদের এ ক্ষমতাকে সৌভাগ্য জ্ঞান করা উচিত।

তাঁদের সেই দুর্বোধ্য শব্দাবলি, যাকে 'ভাবোল্লাস' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে, তাদের সম্পর্কে ধর্মীয় বিধানের অধিকারীরা সর্বদাই বিরূপ মনোভাব পোষণ করে থাকেন। পাঠক, জেনে রাখুন, এ সম্প্রদায়ের প্রতি সর্বাপেক্ষা যুক্তিপূর্ণ ব্যবহার হল এই যে, তারা ইন্দ্রিয়ের অতীত অদৃশ্য জগতের অধিবাসী। ভাবের আবেগ এমনভাবে তাঁদেরকে আবিষ্ট করে ফেলে যে, তারা যা বলতে চায় না, তাও বলে বসেন। বস্তুত বাহ্যেন্দ্রিয় বিরহিতদের কোন নির্দেশের অধীনে আনা যায় না এবং যারা কোন কার্য সম্পাদনে বাধ্যবাধকতার বশ, তারা সর্বদাই ক্ষমার যোগ্য।

সুতরাং তাঁদের মধ্যে যার শ্রেষ্ঠত্ব ও আনুগত্য সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে, তার অনুরূপ বক্তব্য ও অন্যান্য কার্যকে সদিচ্ছা প্রণোদিত বলে মনে করতে হবে। কারণ তাদের প্রজ্ঞাজাত অনুভূতির যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন মাধ্যমের অভাবেই সম্ভব নয়। যেমন আবু ইয়াজিদ বস্তামী[২১০] ও অন্যান্য সাধকদের বেলায় দেখা গেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে যদি কারও শ্রেষ্ঠত্ব জানা না যায় এবং তার প্রসিদ্ধি লাভও না ঘটে, তাহলে অনুরূপ বক্তব্যাদির জন্য তার বিচার অনুষ্ঠিত হতে পারবে। কারণ তার সম্পর্কে এমন কিছু প্রকাশ পায়নি, যা দিয়ে আমরা তার বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে পারি। অন্যদিকে যে ব্যক্তি কোন প্রকার দশার অধীন না হয়ে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে অনুরূপ বক্তব্য উপস্থিত করবে, তাকেও বিচারের আওতায় আনতে হবে। এ কারণেই ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদ ও নেতৃস্থানীয়

২১০. প্রসিদ্ধ অধ্যায়বিদ্; মৃত্যু ২৬০ (৮৬৪ খ্রি:) হি: (?)।

সুফীসাধকরা হাল্লাজের[২১১] হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ ইনি কোনরূপ দশাগ্রস্ত না হয়ে সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

'রেসালা' নামক গ্রন্থে বর্ণিত পূর্বসূরি সুফীসাধকগণ উক্ত পন্থায় সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ছিলেন; যাদের সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আভাস দিয়েছি। তাঁদের দিব্যজ্ঞানের প্রতি এবং অনুরূপ কোন অনুভূতি সম্পর্কে কোন প্রকার লালসা ছিল না। তাঁরা কেবলমাত্র যথাসাধ্য আনুগত্য ও অনুসরণের ইচ্ছাই পোষণ করতেন। তাদের কারও যদি অনুরূপ কোন বিষয় দেখা দিত, তাঁরা তা থেকে দূরে সরে যেতেন এবং কাউকেও জানাতেন না। বরং তাঁরা এগুলোকে বাধা ও পরীক্ষার বিষয় মনে করে যথাসম্ভব দূরে পলায়ন করতেন। কারণ এ জাতীয় উপলব্ধি আত্মারই বিচিত্র প্রসারের নিদর্শন এবং সেদিক থেকে এটা সৃষ্ট ও নশ্বর। অথচ সামগ্রিক অস্তিত্বের পরিধি কোন সময়েই মানবিক উপলব্ধির দ্বারা সীমিত হতে পারে না। আল্লাহ্র জ্ঞান সর্বব্যাপী এবং তার সৃষ্টি আরও বিশাল। তাঁর ধর্মীয় বিধান সুপথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বেশি দৃঢ়; সুতরাং তাঁরা তাঁদের অনুভূত বিষয়াদির কোন কিছুই বলতে চাইতেন না। বরং এসব ব্যাপারে অনুসন্ধান করাকে বিপজ্জনক মনে করতেন এবং তাঁদের সঙ্গীসাথীদেরকে অনুরূপ অনুসন্ধান ও অবগতির মাধ্যমে দিব্যজ্ঞান লাভ থেকে বিরত থাকতে বলতেন। তাঁরা এ দিব্যজ্ঞান লাভের পূর্বে যেমন বাহ্যেন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক অবস্থায় আনুগত্য ও অনুসরণের মধ্যে ছিলেন, তেমনি অবস্থাকে অপরিত্যাজ্যরূপে গ্রহণ করার জন্য সঙ্গীসাথীদেরকে নির্দেশ দিতেন। বস্তুত সাধকের অবস্থা এরূপই হওয়া উচিত। আল্লাহ্ই যথার্থ জ্ঞানের শক্তি প্রদান করে থাকেন।

---

২১১. হুসাইন ইবনে মনসুর; ২৪৪—৩০৯ (৮৫৯—৯২২ খ্রি:) হি:।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

[স্বপ্ন ব্যাখ্যাশাস্ত্র]

এটিও ধর্মীয়শাস্ত্রাদির অন্তর্গত এবং সাধারণভাবে শাস্ত্রাদি শিল্পকর্মে পরিণত হলে এটিও আবির্ভূত হয়েছে ও মানুষ এ বিষয়াদি নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছে। অবশ্য স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যার ব্যাপারটি এ উত্তরসূরিদের ন্যায় পূর্বসূরিদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। হয়ত পূর্বেকার রাজন্যবর্গ ও অন্যান্য জাতির মধ্যেও এর প্রচলন ছিল; কিন্তু তা আমাদের কাছে পৌঁছায়নি। তদুপরি ইসলামী জগতের স্বপ্ন ব্যাখ্যাদাতাদের বক্তব্যই এ বিষয়ে যথেষ্ট ছিল। নয়তো স্বপ্নের ব্যাপার তো সমগ্র মানবজাতিরই সাধারণ বিষয়; সুতরাং এর ব্যাখ্যাও নিশ্চয়ই ছিল। কোরানে যেমন এসেছে, সত্যবাদী ইউসুফ নবী (আঃ) স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন। অনুরূপভাবে বিশুদ্ধ হাদিস নবী (সঃ) ও আবুবকর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, স্বপ্ন অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে উপলব্ধির মাধ্যম বিশেষ। হযরত (সঃ) বলেছেন, সুস্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আরও বলেছেন, সুসংবাদের মধ্যে একমাত্র সুস্বপ্নই অবশিষ্ট রয়েছে; সৎব্যক্তি তা দেখে অথবা তাকে দেখানো হয়।

সর্বপ্রথম যে বিষয়টির দ্বারা নবী (সঃ)-এর কাছে ওহী আসার সূত্রপাত হল, তা স্বপ্ন এবং তখন তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তাই প্রভাতের আলোকরশ্মির ন্যায় প্রতিভাত হত। নবী (সঃ) ভোরের নামাজের শেষে তাঁর সঙ্গীদেরকে বলতেন, রাতে তোমাদের কেউ কি স্বপ্ন দেখেছ? তিনি সুসংবাদ লাভ করার জন্যই এ ব্যাপারে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন। কারণ এর মধ্যে ধর্মের প্রকাশ ও তার গৌরব বৃদ্ধির অবকাশ ছিল।

অদৃশ্য জগতের সংবাদ আহরণের মাধ্যম হিসেবে স্বপ্নের প্রতিষ্ঠা লাভের কারণ এই যে, হৃদয়ের মাংসল অবস্থান হতে সূক্ষ্ম বাষ্পের আকারে উত্থিত হার্দিক সজীবতা, যা শিরা-উপশিরায় রক্তের সাথে দেহে পরিব্যাপ্ত হয়, তার দ্বারাই জৈবিক শক্তি ও ইন্দ্রয়ানুভূতির পরিপূর্ণতা লাভ ঘটে থাকে। সুতরাং তা যখন পঞ্চেন্দ্রিয়ের অত্যাধিক ব্যবহার ও বাহ্যিক শক্তির তৎপরতার ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দেহের উপরিভাগকে রাত্রিকালীন শীতলতা আবৃত করে ফেলে, তখন এ হার্দিক সজীবতা দেহের সমস্ত সীমা থেকে সংকুচিত হয়ে হৃদয়ের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়। তা ঐ স্থানে তার কর্মতৎপরতা পুনরায় আরম্ভ করার জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করে। তখন বাহ্যেন্দ্রিয়ের সব তৎপরতা রহিত হয়ে যায়। এটাই নিদ্রার অর্থ; যেমন এ গ্রন্থের প্রথম দিকে বর্ণিত হয়েছে।

এ হার্দিক সজীবতাই হল মানুষের বিবেকবুদ্ধির বাহন এবং এ বিবেকবুদ্ধিই সম্ভাব্য সত্তাগত জগতের যাবতীয় বিষয়াদি উপলব্ধিকারী। কেননা তার যথার্থ স্বরূপ ও সত্তাই

হল এ উপলব্ধি। সে অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে এ কারণেই উপলব্ধি করতে অপারগ হয়, যেহেতু দৈহিক শক্তি ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের পরিচালনার ব্যস্ততা তাকে বাধা দিয়ে থাকে। সুতরাং যখন সে এ প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হয়ে এককভাবে অবস্থান করে, তখন সে তার যথার্থ স্বরূপে সেই নিছক উপলব্ধির জগতে প্রত্যাবর্তন করে এবং সে উপলব্ধিযোগ্য সবকিছুই বুঝতে সক্ষম হয়। কাজেই তার এ তৎপরতা কতকাংশ রহিত হয়ে গেলে সে তার একাকিত্বের পরিমাণ অনুসারে আবশ্যিকভাবে সেই জগতে প্রত্যাবর্তনের একটি মুহূর্তে লাভ করে। সে এ নিদ্রার অবস্থায় থাকাকালে তার বাহ্যেন্দ্রিয়ের সমস্ত তৎপরতাই বন্ধ হয়ে যায়। বস্তুত এ তৎপরতাই সর্বাপেক্ষা বিরাট প্রতিবন্ধক। সুতরাং তার অভাবে সে এ সময়ে সেই জগতে প্রবেশের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং যোগ্য উপলব্ধির দ্বারস্থ হয়। এভাবে সে যা কিছু সেই জগৎ থেকে জানতে পারে তা নিয়েই দেহের সীমায় ফিরে আসে।

কারণ যতক্ষণ সে দেহের মধ্যে আছে, ততক্ষণ দেহকে কেন্দ্র করে সে আবর্তিত হয় এবং দৈহিক উপলব্ধিগত মাধ্যম ছাড়া কোন প্রকার তৎপরতা চালানো তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এ দৈহিক উপলব্ধিগত মাধ্যমগুলোর সমস্তই মস্তিষ্কের সাথে যুক্ত এবং তাদের পরিচালিকা শক্তির নাম কল্পনা। তাই উপলুব্ধ দৃশ্যাদি থেকে কাল্পনিক দৃশ্যাদির উদ্ভব ঘটায় এবং প্রয়োজনের সময় যুক্তি-প্রমাণের কাজে ব্যবহার করার জন্য এগুলোকে স্মরণশক্তির কাছে গচ্ছিত রাখে। অনুরূপভাবে জীবাত্মাও ঐসব দৃশ্য থেকে অন্যবিধ বুদ্ধিগ্রাহ্য আত্মিক দৃশ্যাদির পৃথক উদ্ভব ঘটিয়ে ঐসব উপলুব্ধ দৃশ্যাদিকে একান্তভাবে বুদ্ধিগ্রাহ্য করে তোলে এবং তাদের মধ্যেও মাধ্যম হিসেবে সেই কল্পনাশক্তিই কাজ করে থাকে। অনুরূপভাবে জীবাত্মা যখন সেই অদৃশ্য জগৎ থেকে যা জানার জেনে নেয়, তখন সে তাকে কল্পনাশক্তির কাছে অর্পণ করে এবং উক্ত শক্তি তাকে যোগ্য দৃশ্যাদিতে রূপান্তরিত করে। তারপর সে একে মিশ্র অনুভূতির কাছে প্রেরণ করে এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি তাকে বাস্তব আকারে দেখতে সমর্থ হয়। এ পর্যায়ে সেই আত্মিক বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়টি একান্তই ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তরে নেমে আসে। এখানেও এর মাধ্যম হিসেবে কাজ করে কল্পনা। বস্তুত এটাই স্বপ্নের যথার্থ তাৎপর্য।

পাঠক, এ বর্ণনা থেকে আপনি সৎস্বপ্ন এবং অলীক অসৎ স্বপ্নের মধ্যকার পার্থক্য বুঝতে পারবেন। বস্তুত এর সবগুলোই নিদ্রাবস্থায় কাল্পনিক দৃশ্যাবলির সমষ্টি। যদি এ দৃশ্যাবলি আত্মিক বুদ্ধিগ্রাহ্যতার মাধ্যমে উপলব্ধির দ্বারস্থ হয়ে নেমে আসে, তা হলেই যথার্থ স্বপ্ন অন্যথায় এগুলো যদি কল্পনার দ্বারা স্মৃতিশক্তির কাছে গচ্ছিত দৃশ্যাবলি থেকে গৃহীত হয়, যা জাগরণে সংগৃহীত হয়েছিল, তা হলে সেগুলোকে বলা হয় অলীক অসৎ স্বপ্ন।

পাঠক, জেনে রাখুন, সৎস্বপ্নের জন্য এমন কিছু বিদ্যমান, যা তার সত্যতার আভাস ও যথার্থতার সাক্ষ্য বহন করে। এর ফলে স্বপ্নদর্শী তার নিদ্রাকালে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যে সুসংবাদ তার কাছে পাঠানো হয়েছে তা বুঝে ফেলতে সক্ষম হয়। তার মধ্যে স্বপ্নদর্শনকারী স্বপ্ন দেখার পরই খুব তাড়াতাড়ি জেগে ওঠে; যেন অতিশীঘ্র জাগরণের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ানুভূতির জগতে ফিরে আসে। কারণ এর পর যদি সে নিদ্রায় নিমজ্জিত

থাকত, তা হলে তার উপর নিক্ষিপ্ত সেই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি একান্ত দুর্বহ হয়ে দাঁড়াত। এ কারণেই সে সেই অবস্থা থেকে ইন্দ্রিয়ানুভূতির এমন এক অবস্থায় ফিরে আসে, যাতে জীবাত্মা দেহ ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সর্বদা নিমজ্জিত থাকে।

সৎস্বপ্নের চিহ্নের মধ্যে আরও একটি হল উপলব্ধির তার বিস্তারিত অবস্থাসহ স্মৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং উক্ত স্বপ্নের স্মৃতির স্থায়িত্ব লাভ করা; যাতে কোন প্রকার ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা দেখা না দেয়। তা এমনভাবে স্মৃতিতে বিজড়িত থাকে, তার জন্য কোন চিন্তা ও রোমন্থনের প্রয়োজন হয় না; বরং জাগ্রত হবার সময় তার দৃশ্যাদি স্বপ্নদর্শকের অন্তরে ভাসতে থাকে। তা থেকে কোন কিছু বিলুপ্ত হয় না। কারণ এ আত্মিক উপলব্ধির জন্য কোন সময়ের প্রয়োজন হয় না এবং তার কোন বিন্যাসক্রমও নেই; বরং তা পলকের মধ্যে উপলব্ধির জগতে আবির্ভূত হয়। অথচ স্বপ্নের জন্য সময়ের প্রয়োজন। কারণ তার উৎসস্থল মস্তিষ্কশক্তি; সেখান থেকে স্মৃতিশক্তির মধ্যদিয়ে কল্পনাশক্তির দ্বারা মিশ্র অনুভূতির কাছে আনীত হয়; যেমন আমরা পূর্বে বলেছি।

বস্তুত দেহের সব তৎপরতাই সময়সাপেক্ষ এবং এ কারণেই তাতে উপলব্ধির অগ্রপশ্চাতের দ্বারা বিন্যাসের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ কারণেই মস্তিষ্কশক্তি তা সংগৃহীত করতে গিয়ে ভ্রান্তির সম্মুখীন হয়। কিন্তু যুক্তিবাদী আত্মার উপলব্ধি অনুরূপ নয়; কেননা তা সময়সাপেক্ষ নয় এবং তাতে বিন্যাসের কোন অবকাশ নেই। তাতে যেসব উপলব্ধি উদ্ভূত হয়, তা চোখের পলক অপেক্ষাও দ্রুততর সময়ে হয়ে থাকে। এজন্যই সৎস্বপ্ন শুধু জাগরণের পর নয়; বরং জীবনের বহুকালব্যাপী স্মৃতিতে জাগরণ থাকে। কোন প্রকার উদাসীনতাই ওটাকে চিন্তা থেকে দূর করতে সক্ষম হয় না। কারণ ওটার প্রথম উপলব্ধি ছিল খুবই সুদৃঢ়।

যদি এমন হয় যে, জাগরণের পর নিদ্রায় দৃষ্ট স্বপ্নকে চিন্তা করে ও তার প্রতি একান্ত আগ্রহী হয়ে স্মরণ করতে হয় এবং তার বিস্তারিত অনেক কিছু বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে যাওয়ার জন্য কষ্ট করে স্মরণে আনতে হয়, তা হলে তা কখনই সৎস্বপ্ন নয়; বরং তাই-ই বিশৃঙ্খল অসৎ স্বপ্ন।

বস্তুত স্বপ্নের এসব নিদর্শন ওহীরই বৈশিষ্ট্য বিশেষ। মহান আল্লাহ্ তাঁর নবী (সঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'তুমি দ্রুততার জন্য তাতে তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করো না। অবশ্যই আমাদের উপর তা একত্র ও পাঠ করার দায়িত্ব। তারপর আমরা যখন তা পাঠ করি, তুমি সেই পাঠকে অনুসরণ কর। এর পর আমাদের উপরই তা বিশদ করার ভার।[২১২] তদুপরি নবুয়ত ও ওহীর সাথে স্বপ্নের সম্পর্ক বিদ্যমান; যেমন বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে। হযরত (সঃ) বলেছেন, 'স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ।' সুতরাং তার বৈশিষ্টগুলোও এ তুলনায় নবুয়তের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। সুতরাং পাঠক, একে অসম্ভব মনে করবেন না। এটাই সত্যের ধারা। আল্লাহ্ ইচ্ছামত অনেক কিছুই সৃষ্টি করে থাকেন।

ব্যাখ্যার বিষয় সম্পর্কে বলতে গেলে, জেনে রাখুন যে, বুদ্ধিগ্রাহ্য আত্মা যখন কোন বিষয়কে উপলব্ধি করে, তখন সে তাকে কল্পনাশক্তির কাছে প্রেরণ করে এবং সে তাকে

---

২১২. কোরান; ৭৫, ১৬—১৯।

দৃশ্যে রূপান্তরিত করে দেয়। এ রূপান্তরণ এমন বিষয়াদির দ্বারা সংঘটিত হয়, যা কতকাংশে তারই সমতুল্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। যেমন সে মহান সম্রাটের তাৎপর্য উপলব্ধি করল, এক্ষেত্রে কল্পনাশক্তি তাকে সমুদ্রের রূপে প্রকাশ করবে। অথবা যে শত্রুতার স্বরূপ উপলব্ধি করল; কল্পনা তাকে সাপের আকারে রূপ দিবে। ফলত জাগ্রত হওয়ার পর স্বপ্নদ্রষ্টা অনুরূপ কিছুই বুঝতে পারে না; কারণ সে সমুদ্র বা সাপের আকৃতিই দেখেছে। এক্ষেত্রে স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারী এ সমুদ্র যে এটি অনুভূত বিষয়মাত্র এবং যথার্থ উপলব্ধি এর অন্তরালে অবস্থান করছে, এর সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে তুলনার সাহায্যে ব্যাখ্যা সম্বন্ধে চিন্তা করতে বসেন। তিনি যথার্থ উপলব্ধিকে উদ্ধার করার জন্য আরও বহু চিহ্নের দ্বারা পরিচালিত হন এবং তারপর তুলনা করে বলেন যে, এটি সম্রাটেরই নামান্তর। কেননা সমুদ্র একটি বিরাট সৃষ্টি, তার সাথে সম্রাটের তুলনা করাই যোগ্য হয়। অনুরূপভাবে সাপও তার দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির বিরাটত্বের দিক থেকে শত্রুর সাথে তুল্য হবার যোগ্য। এভাবে বাসন-পত্র নারীর সাথে তুলনীয়; কেননা তারা আধার বিশেষ। অনুরূপ অন্যান্য বিষয়।

দৃষ্ট স্বপ্নাদির মধ্যে কতকগুলো এমন স্পষ্ট হয় যে, তার জন্য কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। কেননা তার প্রকাশ্যতা, স্পষ্টতা কিংবা উপলব্ধি বিষয় ও তার সাথে তুলনীয় বিষয়ের মধ্যকার নৈকট্যের জন্য তা বোধগম্য হয়ে ওঠে। এজন্য বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে, স্বপ্ন তিন প্রকার; আল্লাহ্‌র কাছ থেকে স্বপ্ন, ফেরেশতার কাছ থেকে স্বপ্ন এবং শয়তানের কাছ থেকে স্বপ্ন। এক্ষেত্রে যে স্বপ্ন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দেখানো হয়, তার সুস্পষ্টতার জন্যই কোন প্রকার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। ফেরেশ্‌তার কাছ থেকে যে স্বপ্ন আসে, তাও সৎস্বপ্ন এবং তার ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তারপর শয়তানের কাছ থেকে যে স্বপ্নের উদ্ভব হয়, তা একান্তই বিশৃঙ্খল বিষয়।

আরও জেনে রাখুন যে, আত্মা তার উপলব্ধিকে কল্পনাশক্তির কাছে পাঠালে সে তাকে অনুভূতির অভ্যস্ত দৃশ্যাদির কাঠামোতেই রূপ দিয়ে থাকে। সুতরাং স্বপ্নদ্রষ্টার অনুভূতি যদি কোন প্রকার দৃশ্য-কাঠামোর সাথে পরিচিত না থাকে, তা হলে তা অনুরূপভাবে রূপায়িত হয় না। কাজেই যে ব্যক্তি অন্ধ ও মূক হয়ে জন্মগ্রহণ করে, তার স্বপ্ন দর্শনে সম্রাটকে সমুদ্র, শত্রুকে সাপ এবং নারীকে আধার হিসেবে রূপায়িত করা সম্ভব হয় না। কেননা সে এসব বিষয়বস্তুর কোনটির উপলব্ধি করতে পারেনি। সুতরাং কল্পনাশক্তি তখন ঐগুলোকে তার উপলব্ধির অনুরূপ শ্রোতব্য ও ঘ্রাবত্য বিষয়াদির সাথে তুল্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে রূপায়িত করে। এরূপ স্বপ্নাদিতে ব্যাখ্যাকারীকে সতর্ক হয়ে এগোতে হয়। কারণ অনেক সময় অনুরূপ বিষয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা মিশ্রিত হয়ে ওঠে এবং তার নিয়মাবলি বিকৃতি লাভ করে।

পুনরায় এ স্বপ্নব্যাখ্যা এমন একটি শাস্ত্র যার জন্য কতকগুলো সর্বজনীন নিয়ম বিদ্যমান। ব্যাখ্যাকারী স্বপ্নের বিবরণের সাথে মিশিয়ে তার তাৎপর্য নিরূপণ করেন এবং সে অনুযায়ী ব্যাখ্যা নির্ধারিত হয়। যেমন তারা বলেন, সমুদ্র সম্রাটকে বোঝায়। অন্যত্র তারা বলেন, সমুদ্র ক্রোধকে বোঝায়; অন্যত্র এরই অর্থ হয় দুশ্চিন্তা ও দুর্যোগ। যেমন তারা বলে থাকেন, সাপ শত্রুকে বোঝায়; অন্যত্র বলেন জীবন, আবার অন্যত্র

গোপনীয়তা রক্ষাকারী এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়। স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারী এসব সাধারণ নিয়মকানুন মুখস্থ করেন এবং স্বপ্নের সাথে এসব নিয়মের মধ্য থেকে যা যুক্তিযুক্ত হয় ও তার চিহ্নাদি অনুরূপ যৌক্তিকতার আভাস দেয়, তিনি তারই নির্দেশ অনুসরণ করে স্বপ্নের অর্থ বলেন। এসব আভাসের কিছুটা জাগরণে, কিছুটা স্বপ্নের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যাকারীর হৃদয়ে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে। বস্তুত প্রতিটি বস্তুই তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সুগম করে তোলে।

এ স্বপ্ন ব্যাখ্যাশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে পূর্বসূরিদের মধ্যে পরস্পরের দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য জ্ঞানী হলেন মুহম্মদ ইবনে সিরিন।[২১৩] তাঁর কাছ থেকে এ শাস্ত্রের নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং বর্তমানকাল পর্যন্ত মানুষ তার পর্যায়ক্রমিক বর্ণনার ধারা রক্ষা করে চলেছে। তাঁর পরে কেরমানী[২১৪] এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তারপর উত্তরসূরি কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ এ বিষয় নিয়ে প্রচুর লিখেছেন। বর্তমানকালে মাগরিববাসীদের মধ্যে কায়রোয়ানের জ্ঞানীদের অন্যতম ইবনে আবু তালেব কায়রোয়ানীর[২১৫] গ্রন্থাদি সুপ্রচলিত; যেমন 'আল-মুমাস্তি' ও অন্যান্য গ্রন্থ। এ বিষয়ে সালেমীর[২১৬] 'আল-ইশারাত' গ্রন্থটি সর্বাপেক্ষা উপকারী ও আধুনিক। অনুরূপভাবে তিউনিসে আমাদের উস্তাদদের অন্যতম ইবনে রাশেদের[২১৭] গ্রন্থ 'আল মারকাবাতুল উলিয়া' সুপরিচিত।

বস্তুত এটি নবুয়তের কিরণে উজ্জ্বল এক শাস্ত্র। কারণ এ দুটির মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান এবং এটি নবুয়তের উপলব্ধিগত ধারার অন্তর্ভুক্ত; যেমন বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ই সর্বপ্রকার অদৃশ্য বিষয়ে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী।[২১৮]

---

২১৩. মৃত্যু ১১০ (৭৭৯ খ্রি:) হি:।
২১৪. আবু ইসহাক ইব্রাহিম; (?)
২১৫. বিস্তারিত পরিচয় অজ্ঞাত।
২১৬. মুহম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে উমর; (?)
২১৭. বিস্তারিত পরিচয় অজ্ঞাত।
২১৮. কোরান; ৯, ৭৮।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

[বুদ্ধিগ্রাহ্য শাস্ত্রাদি ও তাদের প্রকারভেদ]

বুদ্ধিগ্রাহ্য সব শাস্ত্রজ্ঞানই মানুষের স্বভাবজ; কেননা মানুষ চিন্তাশীল। তা কোন জাতি বিশেষের সাথে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সব জাতির মধ্যেই এসব বিষয়ে চিন্তা-চেতনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—তাদের সকলেই তার উপলব্ধি ও আলোচনার ক্ষেত্রে সমতার অধিকারী। বস্তুত সমাজ সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই সমগ্র মানব জাতির মধ্যে এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। এসব শাস্ত্রকে দর্শন ও বিজ্ঞানশাস্ত্র বলা হয়ে থাকে। এগুলোর চারটি শাখা রয়েছে।

প্রথম যুক্তিবিদ্যা : এটা জ্ঞাত ও অর্জিত বিষয়াদি থেকে অজ্ঞাত বিষয় অর্জনের ক্ষেত্রে মননশক্তিকে ত্রুটিমুক্ত রাখে। চিন্তাশীল ব্যক্তি এ সৃষ্টিজগতের বস্তুপুঞ্জ ও তার ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত যথার্থ স্বরূপের ইতি ও নেতিবাচক জ্ঞান লাভের জন্য যখন সাধ্যানুসারে তার চিন্তাকে ব্যবহার করেন, তখনই এ শাস্ত্রের মাধ্যমে শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারের দ্বারা এর উপকারিতা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারপর একদিকে তাঁরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদানের আকৃতি ও তা দিয়ে সৃষ্ট খনিজ পদার্থ, উদ্ভিদ ও প্রাণী; গ্রহ-নক্ষত্র ও তাদের স্বাভাবিক গতি এবং অন্যদিকে আত্মা ও তার সৃষ্ট বিচিত্র তৎপরতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চিন্তায় ব্যাপৃত হন। এরূপ বিষয়াদির পর্যালোচনাকে পদার্থশাস্ত্র বলে অভিহিত করা হয়। এটাই উক্ত ধারার দ্বিতীয় শাস্ত্র। এর পর তাঁদের অনুসন্ধান এ পদার্থ সম্পর্কীয় বিষয়াদির অতীত আত্মিক জগৎ নিয়ে নিয়োজিত হয় এবং একে অধ্যাত্মতত্ত্ব বলে আখ্যায়িত করা হয়। এটাই উক্ত ধারার তৃতীয় শাস্ত্র। চতুর্থ শাস্ত্রটি হল পরিমাণ সম্পর্কে বিবেচনা করা। এতে চারটি শাখা বিদ্যমান। সাধারণভাবে এগুলোকে 'শিক্ষণীয় বিষয়' বলে নামাঙ্কিত করা হয়।

এদের প্রথমটি জ্যামিতিশাস্ত্র। এটি সাধারণভাবে পরিমাণের বিচার-বিবেচনাকে বোঝায়। এর মধ্যে কিছু পরিমাণ সংখ্যা হিসেবে অসংযুক্ত এবং কিছু পরিমাণ সংযুক্ত। আবার এ সংযুক্তটি হয় এক মাত্রাবিশিষ্ট, যেমন—রেখা; দুই মাত্রাবিশিষ্ট, যেমন—সমতল অথবা তিন মাত্রাবিশিষ্ট যেমন—শিক্ষণীয় দেহ। তাঁরা এসব পরিমাণ ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে তাদের সত্তাগত এবং পরস্পরের প্রতি তাদের সম্পর্কগত দিক থেকে বিবেচনা করে থাকেন।

এদের দ্বিতীয়টি গণিতশাস্ত্র। এতে অসংযুক্ত পরিমাণ অর্থাৎ সংখ্যার মধ্যকার বিচিত্র অবস্থা, তাদের বৈশিষ্ট্য এবং তার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ে বিবেচনা।

এ ধারায় তৃতীয়টি হল সঙ্গীতশাস্ত্র। এটি শব্দাবলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও সুরের বিচিত্র অবস্থা এবং সেসবকে সংখ্যার দ্বারা নির্ধারণের প্রক্রিয়া। এর ফলশ্রুতি হল সঙ্গীতের বিচিত্র সুরলহরী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করা।

চতুর্থটি হল জ্যোতিষশাস্ত্র। এটি আকাশমণ্ডলের অবস্থান, তাদের আকৃতি এবং প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্রের সংখ্যাদি সম্পর্কে পর্যালোচনা। আকাশমণ্ডলে নিরীক্ষণযোগ্য তাদের বাস্তব গতির সাহায্যে তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং এ উদ্দেশ্যে, তাদের প্রত্যাবর্তন, স্থিরতা, অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণ লক্ষ্য করা।

এগুলোই দর্শনশাস্ত্রাদির মূল শাখা এবং এদের সংখ্যা সাত। এদের মধ্যে যুক্তিবিদ্যাই সর্বপ্রথম; এর পর শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ। এদের সর্বপ্রথম গণিত, এর পর জ্যামিতি, এর পর জ্যোতিষশাস্ত্র, এর পর সঙ্গীত, এর পর পদার্থবিদ্যা এবং এর পর অধ্যাত্মতত্ত্ব। আবার এদের প্রতিটির জন্যই তার সংশ্লিষ্ট শাখা-প্রশাখা বিদ্যমান। যেমন পদার্থবিদ্যার শাখা চিকিৎসাশাস্ত্র; গণিতের শাখা হিসাবশাস্ত্র, দায়ভাগ ও ব্যবহারিক গণিত। জ্যোতিষশাস্ত্রের শাখা হল জ্যোতিষীর ছকবিন্যাস; এতে গ্রহণ-নক্ষত্রের অবস্থান ও গতি নিরূপণ করার জন্য কতিপয় নিয়মের সহায়তা গ্রহণ করা হয়, যাতে প্রয়োজনের সময় তাদের অবস্থান জানতে পারা যায়। এ গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কীয় বিদ্যার অন্য একটি শাখা হল নক্ষত্রপ্রভাবের জ্ঞান (জ্যোতিষী)। আমরা একের পর এক এদের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করব।

পাঠক, জেনে রাখুন, বিভিন্ন গোত্র ও জাতির মধ্যে যারা এসব বিষয়ে মনোনিবেশ করেছেন এবং যাদের কথা আমরা জানতে পেরেছি, তাদের মধ্যে প্রাক্-ইসলামী যুগের দুটি বৃহৎ জাতির নাম উল্লেখযোগ্য। তারা হল পারসিক ও রোমান। আমরা যতদূর জেনেছি, তাদের মধ্যে জনবসতির প্রাচুর্যের জন্য উপরোক্ত শাস্ত্রাদির বাজার খুবই তেজী ছিল। তাদের শাসনব্যবস্থা, তাদের সাম্রাজ্য; বস্তুত প্রাক্-ইসলামী যুগে তাদেরই যুগ; এ কারণে তাদের অঞ্চল ও নগরসমূহে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমুদ্র উথলে উঠেছিল। কেলাদীয়গণ ও তাদের পূর্ববর্তী আসিরীয়গণ এবং তাদের সমসাময়িক কিবতীগণ যাদুবিদ্যা, জ্যোতিষ ও এ সম্পর্কীয় ইন্দ্রজালাদির প্রতি অতি মাত্রায় আগ্রহী ছিল। তাদের কাছ থেকে পারস্য ও গ্রিসবাসীরা এটি গ্রহণ করেছে। তবুও কিবতীরাই এ বিষয়ে বিশিষ্টতা অর্জন করে এবং তাদের মধ্যে এর প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। কোরানে হারূত-মারূতের কাহিনী এবং যাদুকরদের বর্ণনা বিদ্যমান।[২১৯] জ্ঞানীরাও উচ্চমিশরের বহু মন্দিরের কথা বর্ণনা করেছেন। তারপর বিভিন্ন ধর্মমত একের পর এক এসব বিদ্যা পরিত্যাগ ও নিষিদ্ধ করার দিকে অগ্রসর হয়েছে। এর ফলে এসব শাস্ত্র এমনভাবে পরিত্যাক্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়েছে যে, যেন কখনও তাদের অস্তিত্বই ছিল না। তবুও এসব শাস্ত্রের অনুসারীরা এর অনেক কিছুই বর্ণনা করে থাকে; অবশ্য এগুলোর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তদুপরি ধর্মীয় বিধানের তরবারী এখনও এগুলোর উপর উদ্যত এবং এগুলো সম্পর্কে অনুসন্ধানের বিরোধী।

---

২১৯. তুল কোরান; ২, ১০২ এবং ফেরাউনের যাদুকরী কাহিনী।

পারস্যবাসীদের কাছে এসব বুদ্ধিগ্রাহ্য শাস্ত্রের বিরাট সম্ভার ও ব্যাপক পরিধি বিদ্যমান ছিল। কারণ তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও তার ধারাবাহিকতা ছিল বিশাল ও সুদৃঢ়। এ কারণে বলা হয় যে, এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান তাদের কাছ থেকেই গ্রিকদের কাছে পৌঁছেছিল। আলেকজান্ডার দারাকে হত্যা করে কায়ানী সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তারকালে এ ব্যাপারটি অনুষ্ঠিত হয় এবং গ্রিকরা তাদের গ্রন্থাবলি ও শাস্ত্রাদির উপরও আধিপত্য বিস্তার করে। অবশ্য মুসলমানরা পারস্য বিজয়কালে তাদের শাস্ত্রাদি সংবলিত গ্রন্থাদি ও পুস্তক-পুস্তিকার এমন এক বিরাট সঞ্চয় লাভ করেছিল, যা গণনার দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। সাদ ইবনে আদি-ওক্কাস এ গ্রন্থাবলি সম্পর্কে কী করণীয় এবং তা মুসলমানদের জন্য আনয়ন করা যায় কিনা, সে সম্পর্কে অনুমতি প্রার্থনা করে হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের কাছে পত্র লিখেছিলেন। হযরত উমর উত্তরে তাঁর কাছে লিখেছিলেন যে, ঐগুলোকে যেন পানিতে নিক্ষেপ করা হয়। কারণ এগুলোতে যদি সৎপথ প্রদর্শনের কিছু থাকে, তা হলে আল্লাহ্ আমাদেরকে তার চেয়ে বেশি উৎকৃষ্ট বস্তুর দ্বারা সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। অন্যথায় এগুলোতে যদি পথভ্রষ্টতার কিছু থাকে, তা হলে আল্লাহ্ই এগুলো থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। সুতরাং এ নির্দেশ অনুসারে সৈন্যরা এসব গ্রন্থকে পানি অথবা আগুনে নিক্ষেপ করেছিলেন। এর ফলে পারস্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের কাছে পৌঁছবার পথে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

রোমানদের মধ্যে প্রথম দিকে সাম্রাজ্যশক্তির অধিকারী গ্রিকগণ। তাদের মধ্যে এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপক বিস্তৃতি ছিল। তাদের মধ্যকার দার্শনিক শিরোমণি ও অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিরা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে তাদের মধ্যে পরিব্রাজক অলিন্দবিহারীগণ[২২০] এসব বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উত্তম পথ আবিষ্কার করেছিলেন। জ্ঞানীদের ধারণামতে শীতাতপের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য তাঁরা অলিন্দে বসে পাঠাভ্যাস করতেন। এসব বিষয়ে তাঁদের শিক্ষাদানের ধারা, জ্ঞানীদের ধারণা অনুসারে, জ্ঞানী লোকমানের কাছ থেকে তাঁর শিষ্য পিপার সক্রেটিসের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েছিল।[২২১] এর পর তাঁর শিষ্য প্লেটো, প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটল, এরিস্টটলের শিষ্য আলেকজান্ডার আফ্রোদিসিয়াস ও থেমিসিয়াস প্রমুখ জ্ঞানীদের মাধ্যমে তা আবর্তিত হয়েছে। এরিস্টটল গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডারের শিক্ষক ছিলেন। এ আলেকজান্ডারই পারস্যবাসীদের রাজ্য আক্রমণ করে তাদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। বস্তুত এরিস্টটল গ্রিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি খ্যাতি ও প্রভাবের অধিকারী হয়েছিলেন। এজন্য তাকে 'প্রথম শিক্ষক' বলা হয়। পৃথিবীব্যাপী তাঁর সুখ্যাতি বিদ্যমান।

---

২২০. মূলে আছে 'মাশ্শাউন' ও 'আহলু রোয়াক' সম্ভবত এক্ষেত্রে সংক্ষেপে 'স্টয়িক ও সফিস্ট' দার্শনিকদের কথা বলতে চেয়েছেন।

২২১. এক্ষেত্রেও সম্ভবত ডায়োজেনিস ও সক্রেটিসের ঐতিহ্য সম্পর্কীয় একত্র করা হয়েছে। লোকমান সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি গ্রিক সাধুপুরুষ ছিলেন। তিনি হযরত দাউদের সমসাময়িক এবং তাঁর শিষ্য হিসেবে এমপিডকলিসের নাম উল্লেখ করা হয়। কোরানে তাঁর উল্লেখ রয়েছে।

অতঃপর গ্রিকদের আধিপত্যের অবসান ঘটলে রোমান সম্রাটগণ ক্ষমতা হস্তগত করলেন এবং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন। এর ফলে ধর্মমত ও ধর্মীয় বিধানের প্রেরণা অনুসারে এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিত্যাক্ত বলে বিবেচিত হয় এবং এদের সঞ্চয় ও সংকলন গ্রন্থাকারে তাদের রাজকোষে সংরক্ষিত থাকে। এমনকি রোমানরা সিরিয়া অধিকার করার পরও এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি তাদের মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল।

এর পর আল্লাহ্ ইসলামের আবির্ভাব ঘটালেন। মুসলমানরা চতুর্দিকে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করল, যা তৎকালীন পরিবেশে তুলনারহিত। তারা রোমানদেরকে তাদের ক্ষমতাসহ অন্যান্য জাতির উপর তাদের আধিপত্যকে কুক্ষিগত করে নিল। মুসলমানদের প্রাথমিক বিকাশ একান্ত সারল্য ও শিল্পকর্ম সম্পর্কে উদাসীনতার মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয়েছিল। এর পর তাদের মধ্যে যখন শাসনব্যবস্থা ও সাম্রাজ্যের স্বরূপ সুদৃঢ় হয়ে উঠল, তখন তারা নানাদিক থেকে এমনভাবে নাগরিকত্বের বিকাশ ঘটাল, যা অন্যান্য জাতির মধ্যে সহজলভ্য নয়। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকর্মের বৈচিত্র্য সম্পাদনে নিয়োজিত হল এবং তাদের অধীনস্থ প্রজা খ্রিস্টান বিশপ ও পাদ্রীদের কাছ থেকে এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্ণনা শুনে তার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠল। সাধারণভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনা আত্মবিকাশের যে ধারা অনুসরণ করে, এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। সম্রাট আবু জাফর আল-মনসুর রোমান সম্রাটের কাছে এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় গ্রন্থাদির অনুবাদ পাঠানোর জন্য পত্র লিখলেন। রোমান সম্রাট তাঁর কাছে ইউক্লিডের গ্রন্থ এবং পদার্থবিদ্যা সম্পর্কীয় অন্যান্য গ্রন্থাদি পাঠিয়ে দিলেন। মুসলমানরা তা পাঠ করল এবং তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হল। এর ফলে তাদের মধ্যে এসম্পর্কীয় অন্যান্য গ্রন্থাদির সংবাদ জানার ও সংগ্রহ করার লোভে প্রবল হয়ে উঠল।

এর পর সম্রাট আল মামুনের আবির্ভাব ঘটল। পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য অনুসারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অতিমাত্রায় অনুরক্তি ছিল। এর ফলে তাঁর মধ্যে এসব শাস্ত্রাদির সংগ্রহের লোভ জাগল। তিনি রোমান সম্রাটের কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রিক ঐতিহ্য বের করে দেয়ার এবং তাকে আরবি লিপিতে ভাষান্তরিত করার অনুমতি চেয়ে দূত পাঠালেন। সম্রাট আল মামুন যথারীতি অনুবাদকও পাঠিয়েছিলেন। তারা এ সুযোগে সামগ্রিকভাবে গ্রিক ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে সংগ্রহ করেছিলেন।

অতঃপর মুসলিম চিন্তাবিদরা এসব বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত হলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করলেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে তাঁদের বিচার-বিবেচনা একটা চরম পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হল। অনেক বিষয়ে তারা প্রথম শিক্ষকের মতামতের বিরোধিতা করলেন এবং তাঁর বিশেষ খ্যাতির জন্য তাঁকেই তাঁরা গ্রহণ-বর্জনের জন্য বিশেষভাবে তাঁদের লক্ষ্যস্থানী বলে গ্রহণ করে নিলেন। তাঁরা এসব বিষয়ে প্রচুর সংকলন তৈরি করলেন এবং পূর্বসূরিদের অনুরূপ প্রচেষ্টাকে তাঁরা আরও ব্যাপকতা দান করলেন। সমগ্র জাতির মধ্যে এ ব্যাপারে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে পূর্বাঞ্চলে ছিলেন আবু নসর ফারাবী ও আবু আলী ইবনে সিনা এবং আন্দালুসে ছিলেন কাজী আবুল ওলিদ

ইবনে রুশদ ও উজির আবুবকর ইবনে সায়েগ।[২২২] শেষোক্ত এ দুজন উল্লেখিত বিষয়াদিতে চরম সীমায় উপনীত হয়েছিলেন। এভাবে উপরোক্ত সকলেই খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির মধ্যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করেছিলেন।

তাদের মধ্যে অনেকেই শুধুমাত্র উল্লেখিত শিক্ষণীয় বিষয়াদি (গণিতশাস্ত্র) সম্পর্কেই নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট জ্যোতিষ্ক, যাদু ও ইন্দ্রজাল ইত্যাদিতে ব্যাপৃত ছিলেন। এসব বিষয়ে নিয়োজিতদের মধ্যে পূর্বাঞ্চলে জাবের ইবনে হাইয়ান এবং আন্দালুসে মাসলামা ইবনে আহমদ মাজারিতী ও তাঁর শিষ্যগণ প্রচুর খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন।

এসব বিষয়ে সাধনার ফলে জাতির ধর্মমত ও তার অনুসারীদের মধ্যে যা অনুপ্রবেশ করার করেছে। যারা এসব বিষয়কে প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং তাদের সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করেছেন, তাঁদেরকে তা কতকাংশে প্রলোভিতও করেছে। এক্ষেত্রে পাপ তাদের উপরই অর্সাবে, যারা তার অনুষ্ঠান করেছেন। যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করতেন, তা হলে তারা তা করতে পারত না।'[২২৩]

অতঃপর মাগরিব ও আন্দালুসে জনবসতির প্রবাহ স্তিমিত হয়ে এল এবং শাস্ত্রাদির চর্চা তার পরিমাণ অনুসারে হ্রাস পেল, তখন স্বভাবতই এ অবস্থা বিশৃঙ্খল হয়ে উঠল। অবশ্য এসব সত্ত্বেও সেখানে, পাঠক, মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিদর্শন আপনি দেখতে পাবেন, যা আহলে সুন্নতের জ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অথচ পূর্বাঞ্চলবাসীদের যে সংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, তাতে বোঝা যায় যে, সেখানে এখনও এ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। বিশেষভাবে ইরাকে আজম এবং তার পরবর্তী মাওরায়ান্নাহার অঞ্চলে এদের প্রাচুর্য রয়েছে। বস্তুত তারা এখনও চিন্তামূলক ও বর্ণনামূলক উভয় ধারাতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চূড়ায় অবস্থান করছেন। কারণ এখনও তাদের জনবসতি পরিপূর্ণ এবং এখনও তাদের নাগরিকত্ব দৃঢ়ভাবে স্থায়ী।

মিশরে আমি খোরাসানের হিরাতের অধিবাসী নেতৃস্থানীয় জ্ঞানীদের অন্যতম প্রসিদ্ধ সাদউদ্দিন তাফতাজানীর[২২৪] বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়াদির উপর রচিত একাধিক গ্রন্থ দেখেছি। তার মধ্যে কালামশাস্ত্র, ফেকাহ্‌শাস্ত্রের মূলনীতি ও অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কীয় গ্রন্থাদি বিদ্যমান এবং এসব গ্রন্থ এ কথারই সাক্ষ্য যে, এসব বিষয়ে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য রয়েছে। তদুপরি এসব গ্রন্থ থেকেই বুঝতে পারি যে, উপরোক্ত গ্রন্থকার বিজ্ঞান সম্পর্কীয় বিষয়াদিতে জ্ঞান ও আগ্রহ রাখেন এবং সব চিন্তামূলক শাস্ত্রাদিতেই তাঁর একটি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় বিদ্যমান। বস্তুত 'আল্লাহ্ তাঁর সহায়তার দ্বারা যাকে ইচ্ছা সাহায্য করে থাকেন।[২২৫]

অনুরূপভাবে আমাদের কাছে এ সংবাদও পৌঁছেছে যে, ফিরিঙ্গীদের দেশে রোম ও তার নিকটবর্তী সমুদ্রের উত্তর তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে এসব দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কীয়

২২২. মুহম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া; মৃত্যু ৫৩৩ (১১৩৯ খ্রি:) হি:।
২২৩. কোরান; ৬, ১৩৭।
২২৪. মাসউদ ইবনে উমর; ৭২২—৭৯২ (১৩২২—১৩৯০ খ্রি:) হি:।
২২৫. কোরান; ৩, ১৩।

বিষয়াদির বাজার অতিশয় তেজী। এদের নিদর্শনাবলি সেখানে নিত্য নবীন, এদের শিক্ষাদানের প্রণালী সংখ্যাহীন, এদের সংকলনাদি ব্যাপক, এদের ধারকের সংখ্যা পরিপূর্ণতাজ্ঞাপক এবং এদের অন্বেষণকারীর দল প্রতিনিয়ত বিস্তারমান হয়ে উঠছে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, সেখানে কী ঘটছে। 'তিনিই যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছা নির্বাচন করে থাকেন।'[২২৬]

২২৬. কোরান; ২৮, ৬৮।

বিংশ পরিচ্ছেদ

[সংখ্যা সম্পর্কীয় শাস্ত্রাদি]

এদের প্রথম গণিতশাস্ত্র। এটি সংযুক্তির দিক থেকে সংখ্যাসমূহের বৈশিষ্ট্যকে অনুধাবন করা। এ সংযুক্তি পর্যায়ক্রমিকভাবে অথবা গুণিতক আকারে অনুষ্ঠিত হতে পারে। যেমন সংখ্যাগুলো যখন এক সংখ্যার অতিরিক্ত হওয়ার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়, তখন তাদের দুটি দিকের যোগফল যে-কোনো সমদূরত্ববিশিষ্ট দুটি দিকের যোগফলের সমান হয়। যেমন মধ্যবর্তী সংখ্যার গুণিতক, যদি এসব সংখ্যার সংখ্যামান অযুগ্ম হয়; যেমন সংখ্যাসমূহের পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস, যুগ্ম সংখ্যার পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস এবং অযুগ্ম সংখ্যার পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস। যেমন সংখ্যাগুলো যদি একটি বিশেষ সম্বন্ধে পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়; যেমন এদের প্রথমটি দ্বিতীয়টির অর্ধেক, দ্বিতীয়টি তৃতীয়টির অর্ধেক এবং এভাবে শেষ পর্যন্ত কিংবা প্রথমটি দ্বিতীয়টির এক-তৃতীয়াংশ, দ্বিতীয়টি তৃতীয়টির এক-তৃতীয়াংশ এবং এভাবে শেষ পর্যন্ত; তা হলে তাদের পর্যায়ক্রমের দুটি দিকের একে অপরের সাথে গুণফল সমদূরত্ববিশিষ্ট যে-কোনো দুটি সংখ্যার একে অপরের সাথে গুণফলের সমান হবে। যেমন মধ্যবর্তী সংখ্যার বর্গফল, যদি সংখ্যামান অযুগ্ম হয়; এটি যেমন পর্যায়ক্রমিকভাবে যুগ্ম সংখ্যার যুগ্মত্ব—দুইয়ের পরে চার, আট ও ষোল।

যেমন সংখ্যাগত ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ ও ষড়ভুজ গঠনের ক্ষেত্রে সংখ্যা-বৈশিষ্ট্যের যে নতুনত্ব দেখা দেয়; যখন এগুলোকে পর্যায়ক্রমে রেখায় বিন্যস্ত করে এক থেকে শেষ সংখ্যা পর্যন্ত যোগ করা হয়; তখন এর ফলে ত্রিভুজের সৃষ্টি হয়ে থাকে। ত্রিভুজগুলো অনুরূপভাবে বিভিন্ন বাহুর নিম্নে রেখায় পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়; এর ফলে প্রতিটি ত্রিভুজ তার সম্মুখবর্তী বাহুর এক-তৃতীয়াংশের দ্বারা বর্ধিত হয়ে চতুর্ভুজে পরিণত হয়। এভাবে প্রতিটি চতুর্ভুজ তার সম্মুখবর্তী বাহুর দ্বারা বর্ধিত হয়ে পঞ্চভুজ হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে শেষ পর্যন্ত।

বাহুগুলোর পর্যায়ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত হয়ে এমন একটি ছকের সৃষ্টি করে, যা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে রেখাবিশিষ্ট। তার প্রস্থে সংখ্যাগুলো পর্যায়ক্রমে থাকে। তারপর ত্রিভুজগুলো, চতুর্ভুজগুলো, পঞ্চভুজগুলো এবং এভাবে শেষ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত হয়। দৈর্ঘ্যে প্রতিটি সংখ্যা ও তার নকশা যতদূর সম্ভব হয়ে থাকে। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে এদের যোগফল ও পরস্পরের ভাগফল দ্বারা অভিনব বৈশিষ্ট্যসমূহের উদ্ভব ঘটে। এগুলো অনুশীলনের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে এবং শাস্ত্রবিদ্‌দের সংকলনসমূহে এসব সমস্যা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

অনুরূপভাবে যুগ্ম, অযুগ্ম, যুগ্মের যুগ্ম, অযুগ্মের যুগ্ম, যুগ্ম ও অযুগ্মের যুগ্ম সংখ্যাগুলোতে নতুনত্ব সংঘটিত হয়। বস্তুত এদের প্রতিটির জন্যই এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা একমাত্র এ শাস্ত্রেই পাওয়া যায়; অন্যত্র পাওয়া সম্ভব নয়।

শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে এ শাস্ত্র প্রথম এর সুপ্রতিষ্ঠিত অংশ এবং গণিতের প্রমাণ হিসেবে গৃহীত পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি দার্শনিকদের জন্য এ বিষয়ে রচনা বিদ্যমান। অবশ্য অধিকাংশই একে শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে গণ্য করেন; গ্রন্থ রচনার দ্বারা একে পৃথক করতে চান না। পূর্বসূরিদের মধ্যে ইবনে সিনা তাঁর 'শেফা' ও 'নাজাত' গ্রন্থে এবং অন্যান্যরা অন্যত্র এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন। কিন্তু উত্তরসূরিদের কাছে এটি পরিত্যাজ্য; কারণ প্রচলনের অভাব। তার উপকারিতা যেহেতু প্রমাণ উপস্থাপনের সীমাবদ্ধ—গণিতে নয়, এজন্য তারা এটি পরিত্যাগ করেছেন। অবশ্য এর পূর্বে তারা গাণিতিক প্রমাণাদিতে এর সার-সংকলন করে রেখেছেন। যেমন ইবনে বান্না[২২৭] তাঁর 'রফয়েল হেজাব' গ্রন্থে ও অন্যত্র করেছেন। আল্লাহ পবিত্র মহান এবং সর্বজ্ঞ।

হিসাবশাস্ত্র

সংখ্যা সম্পর্কীয় শাস্ত্রাদির একটি শাখা হিসাবশাস্ত্র। এটি সংযুক্তি ও বিযুক্তির মাধ্যমে সংখ্যাসমূহের দ্বারা হিসাবের একটি ব্যবহারিক শিল্প। সংখ্যাসমূহের মধ্যে সংখ্যামানের সংযুক্তিকরণকে বলা হয় 'যোগ', কখনও এ সংযুক্তিকরণ গুণিতকের মাধ্যমে হয়; যেমন সংখ্যার একাদিক্রমে অন্য সংখ্যার সাথে গুণিতকে বর্ধিত হয়; একে বলা হয় 'গুণ'। সংখ্যাসমূহের মধ্যে বিযুক্তিকরণও বিদ্যমান। এটি যদি একক মান অনুসারে হয়; যেমন কোনো সংখ্যা হতে অন্য একটি সংখ্যা পৃথক করা এবং অবশিষ্ট সংখ্যার জ্ঞান লাভ করা; তা হলে তাকে বলা হয় 'বিয়োগ'। অথবা কোন সংখ্যাকে বিভাজনের দ্বারা সম অংশে বিভক্তি করা ও তার সংখ্যামানকে ফল হিসেবে লাভ করা; একে বলা হয় 'ভাগ'।

এ সংযুক্তি ও বিযুক্তি সমস্ত সংখ্যা অথবা ভগ্নাংশে সমভাবে প্রযোজ্য। ভগ্নাংশ বলতে একটি সংখ্যার অন্য সংখ্যার সাথে সম্বন্ধকে বোঝায় এবং এ সম্বন্ধকেই ভগ্নাংশ বলা হয়। অনুরূপভাবে সংযুক্তি ও বিযুক্তি বর্গফল লাভ হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় যে সংখ্যাটি বিষদ হয়, তাকে বলা হয় 'মূলদ' এবং তার বর্গ ও অনুরূপ; এর ফলে তার জন্য অঙ্ক করার প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। এভাবে যে সংখ্যাটি বিষদ হয় না, তাকে বলা হয় 'করণী' এবং তার বর্গটি হয় মূলদ হয়, যেমন তিনের বর্গমূলের বর্গ হল তিন; নয়ত করণী হয়, যেমন তিনের বর্গমূলের বর্গ হল তিনের বর্গমূল। এটি করণী এবং এর জন্য অঙ্ক করার প্রয়োজন হয়। এসব বর্গমূলেও সংযুক্তি ও বিযুক্তি দেখা দিয়ে থাকে।

অঙ্ক করার এ শিল্পটি নবাগত। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হিসাবাদির জন্য এর প্রয়োজন হয়। মানুষ এ বিষয়ে বহু পুস্তক রচনা করেছে এবং নগরগুলোতে বিদ্যার্থীদেরকে এভাবে শিক্ষাদানের প্রথা প্রচলন করেছে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এটি দ্বারা আরম্ভ করা উত্তম। কারণ এ বিষয়টি সুপরিচিত ও সুস্পষ্ট এবং এর প্রমাণগুলো সুবিন্যাস্ত। সাধারণভাবে এটি দ্বারা দীপ্ত বুদ্ধিমত্তা ও সত্যনিষ্ঠার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এজন্য বলা হয়

২২৭. প্রথম অধ্যায়ের ১৩৪ নং টীকা দ্র.।

যে, যে ব্যক্তি প্রথম জীবনে অঙ্ক শিক্ষার দ্বারা জ্ঞানার্জন আরম্ভ করে, তার উপর সত্যনিষ্ঠার প্রভাব বিস্তৃত হয়। কেননা হিসাবশাস্ত্র শুদ্ধভিত্তি ও আত্মপরিষ্কার দ্বারা সুসজ্জিত। এর ফলে তা তার চরিত্রের অন্তর্গত হয়ে দাঁড়ায় এবং সে এ সততার দ্বারা অভ্যস্ত হয়ে তাকে মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে।

বর্তমানকালে মাগরিবে এ বিষয়ের উপর রচিত সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও বিশদ গ্রন্থ হল 'আল হিসারুস্ সগীর'।[২২৮] এ বিষয়ে ইবনে বান্না আল মারাকেষীর ব্যবহারিক নিয়মাবলির সংক্ষিপ্তসার পুস্তকটি খুবই উপকারী। তারপর তিনি এ পুস্তকের 'রফ্য়েল হিজাব' নামে যে ব্যাখ্যা রচনা করেছেন, তা প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জন্য খুবই কঠিন। কেননা তাতে দৃঢ়ভিত্তিক যুক্তি-প্রমাণাদি বিদ্যমান। অবশ্যই গ্রন্থটি উন্নতমানের এবং আমাদের উস্তাদদেরকে তার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে দেখেছি। বস্তুত তা এ শ্রদ্ধার যোগ্য। এ গ্রন্থে লেখক ইবনে বান্না, আল্লাহ্ তাঁকে শান্তি দিন, ইবনে মুনয়েমের[২২৯] 'ফেকহুল হিসাব' ও আল আহদাবের[২৩০] 'কামেল' নামক দুটি গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি উক্ত দুটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত-সার বর্ণনা করে তাদের বর্ণ সংকেতের পরিবর্তন সাধন করেছেন এবং সেজন্য বুদ্ধিগ্রাহ্য, সুস্পষ্ট প্রমাণাদি উপস্থিত করেছেন। এটাই বর্ণ সংকেতের রহস্য ও তার সার-সংক্ষেপ। ফলে এর সবগুলোই দুরূহ। এগুলো প্রমাণ হিসেবে আসার জন্যই এ দুরূহতা জন্মেছে। বস্তুত সব শিক্ষণীয় বিষয়ের ধরনই এই। কেননা তাদের সমস্যা, ব্যবহারিক প্রয়োগ সবই সুস্পষ্ট। যখন তাদের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, তখন এ ব্যবহারিক দিকগুলোরই কার্যকারণ উপস্থিত করতে হয়। এর ফলেই কিছুটা দুর্বোধ্যতা দেখা দেয়; যা সমস্যার ব্যবহারিক প্রয়োগে নেই। পাঠক, এটাকে বুঝে নিন। বস্তুত 'আল্লাহ্ তাঁর আলোর দ্বারা যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। তিনিই সক্ষম ও সুদৃঢ়।[২৩১]

বীজগণিত[২৩২]

গণিতশাস্ত্রের অন্য একটি শাখা হল বীজগণিত। এটি এমন এক শিল্পকর্ম, যা দিয়ে জ্ঞাত উপাত্ত থেকে অজ্ঞাত সংখ্যা বের করা হয়; যদি তাদের মধ্যকার সম্বন্ধের মধ্যে অনুরূপ কিছুর চাহিদা থাকে। এ শাস্ত্রবিদরা এর জন্য পরিভাষা সৃষ্টি করে গুণনের দ্বারা গুণিতকের পন্থায় অজ্ঞাত বিষয়াদির জন্য পর্যায়ক্রম নির্দিষ্ট করেছেন। এর প্রথমটি হল 'সংখ্যা'; কেননা তার দ্বারা অজ্ঞাত উদ্দেশ্য, তার প্রতি আরোপিত অজ্ঞাত সম্বন্ধের প্রকাশের মাধ্যমে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এর দ্বিতীয়টি 'বস্তু'; কেননা প্রতিটি অজ্ঞাত বিষয় তার বিমূর্ত অবস্থার দিক থেকে বস্তুবিশেষ। এর সঙ্গে তা বর্গমূলও; কেননা দ্বিতীয় পর্যায়ে তার গুণনীয়তা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এর তৃতীয়টি হল 'সম্পদ' এবং তা একটি বিমূর্ত বিষয়।

---

২২৮. আল হাসসারের 'সগীর' নামক পুস্তক (.); মুহম্মদ ইবনে আইয়াশ।
২২৯. মুহম্মদ ইবনে ইসা ইবনে আবদুল মোনেম; সিসিলির ২য় রোজাবেব দাবারে প্রতিপালিত।
২৩০. বিস্তারিত পরিচয় অজ্ঞাত।
২৩১. কোরান; ২৪, ৩৫
২৩২. মূল : এলমুজ জবরে ওল মোকাবেলা।

এর পরবর্তী তৎপরতা গুণনীয়ের অন্তর্গত মূল অনুসারে দেখা দেয়। এর পর উপাত্ত সম্পর্কীয় কার্যধারা সমস্যার মধ্যে আবর্তিত হয় এবং এতে দুটি অথবা বেশি সংখ্যক অনুরূপ বিরোধী বিষয়ের মধ্যে সমীকরণে অগ্রসর হয়। ফলে এদের কতকাংশ অপর কতকাংশের মুখোমুখি হয় এবং এদের অন্তর্গত ভগ্নাংশকে পূরণ করে রাশিটিকে সমস্ত করে তোলে। সমীকরণের এ পর্যায়ক্রম যতদূর সম্ভব স্বল্প মৌখিক বিন্যাসে সীমিত রাখার প্রয়াসে তাঁদের কাছে গৃহীত বীজগণিতের নির্ভর সেই ত্রয়ীতে পর্যবসিত হয়; এরা হল সংখ্যা, বস্তু ও সম্পদ।

যখন সমীকরণ একক ও এককের মধ্যে হয়, তখন তা নির্দিষ্ট থাকে এবং 'সম্পদ' ও বর্গমূলের বিমূর্ত অবস্থা দূরীভূত হয়ে তা নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। 'সম্পদ' যখন সমীকৃত হয়, তখন তার সংখ্যামান দ্বারা তা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। সমীকরণ যদি এক ও দুয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে জ্যামিতিক প্রক্রিয়া তাকে বিশ্লেষাত্মক গুণনের দ্বারা দুয়ের মধ্যে প্রকাশ করে এবং তা বিমূর্ত হয়ে থাকে। এ বিশ্লেষণাত্মক গুণন তাকে নির্দিষ্ট করে। দুই ও দুয়ের মধ্যে সমীকরণ সম্ভব নয়। বীজগণিতজ্ঞদের কাছে সমীকরণ সম্পর্কীয় সমস্যাদির সর্বাধিক সংখ্যা হল ছয়। কারণ সংখ্যা, বর্গমূল ও সম্পদের মধ্যকার অমিশ্র ও মিশ্র সমীকরণের সংখ্যা ছয় হয়ে থাকে।

এ বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ রচনাকারীর নাম আবু আবদুল্লাহ্ আলখোয়ারজমী[২৩৩] ও তাঁর পরবর্তীকালে আবু কামেল মুজা ইবনে আসলাম।[২৩৪] মানুষ এ বিষয়ে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। বীজগণিতের ছয়টি সমস্যা নিয়ে লিখিত তাঁর গ্রন্থটি এ বিষয়ে লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর। আন্দালুসবাসীরা এর প্রচুর ব্যাখ্যা-পুস্তক রচনা করেছে এবং এ ব্যাপারে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এসব ব্যাখ্যা-পুস্তকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর হল আল কোরাশীর রচনা।[২৩৫]

আমরা জানতে পেরেছি যে, বিষয়সমূহের নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞরা পূর্বাঞ্চলে সমীকরণকে এ ছয়টি বিষয় অপেক্ষা বেশি প্রসারিত করেছেন এবং তার সংখ্যাকে তাঁরা বিশের বেশি করে তুলেছেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ের জন্যই জ্যামিতিক যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে নির্ভরযোগ্য সমাধান বের করেছেন। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা পরিবর্ধিত করেন এবং তিনি মহান ও পবিত্র।[২৩৬]

ব্যবহারিক গণিত ও দায়ভাগ

গণিতশাস্ত্রের অন্য একটি শাখা হল ব্যবহারিক গণিত। এটি নাগরিক জীবনে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে, হিসাব সম্পর্কীয় তৎপরতায় ব্যবহৃত হয়; যেমন—ক্রয়-বিক্রয়, ভূমি জরিপ, জাকাত এবং এমন অন্যান্য বিষয় যাতে সংখ্যা ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে হিসাবের দুটি দিকই অজ্ঞাত ও জ্ঞাত, ভগ্নাংশ ও সমস্ত, বর্গমূল ও অন্যান্য

২৩৩. মুহম্মদ ইবনে মুসা; জীবনকাল খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগ।
২৩৪. খুব সম্ভব নবম শতাব্দী (খ্রি:)।
২৩৫. বগি অঞ্চলের আবুল কাসেম আল কোরাশী।
২৩৬. কোরান; ৩৫, ১।

রাশির মাধ্যমে কার্যকরী হয়ে থাকে। এ বিষয়ে সম্ভাব্য সমস্যাদির বর্ণনায় আতিশয্যের উদ্দেশ্য হল, যাতে এগুলো বারবার অনুসরণ করার মাধ্যমে অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার সুযোগ ঘটে এবং হিসাবের কাজে একটি স্থায়ী যোগ্যতা লাভ হয়। আন্দালুসের হিসাবশাস্ত্রবিদদের মধ্যে এ বিষয়ে প্রচুর রচনা বিদ্যমান; তার মধ্যে জাহরাবী[২৩৭] ইবনে সামাহ,[২৩৮] আবু মসলিম ইবনে খলদুন[২৩৯] এবং অন্য অনেকের ব্যবহারিক গণিত সুপ্রসিদ্ধ। উল্লেখিত সকলেই মাসলামা মাজরিতীর শিষ্য।

এর অন্য একটি শাখা দায়ভাগ। এটি উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অংশাদি হিসাব করার শিল্পকর্ম বিশেষ। কেননা অনেক সময় একাধিক উত্তরাধিকার লাভের প্রসঙ্গ দেখা দেয়; তেমনি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এর ফলে এ উত্তরাধিকার পুনরায় সংশ্লিষ্ট উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। অথবা একাধিক ব্যক্তির জন্য অনুরূপভাবে প্রাপ্য অংশের একত্র ও একাধিক হওয়ায় তাদের সমগ্র প্রাপ্যের পরিমাণ সমগ্র সম্পত্তি অপেক্ষা বেশি[২৪০] হয়। কিংবা কোন উত্তরাধিকারে কারও প্রতি বিশেষ অঙ্গীকার অথবা অস্বীকৃতি হিসাবের প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে তোলে। ফলে অনুরূপ সব সমস্যায় উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় ন্যায্য প্রাপ্য নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট সংখ্যামানের দ্বারা তাকে শুদ্ধরূপে প্রকাশ করতে হয়; যাতে প্রতিটি উৎস থেকে উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অংশ অনুসারে সম্পদ লাভ করতে পারে।

এর ফলে হিসাবশাস্ত্রের একটি বিরাট অংশ এতে ব্যবহৃত হয়; সেই সমস্ত ভগ্নাংশ, বর্গমূল, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত রাশির প্রয়োজন দেখা দেয় এবং ধর্মীয় বিধান ও সে-সম্পর্কীয় সমস্যাদির ভিত্তিতে এ হিসাবাদিকে বিন্যস্ত করা হয়। এর ফলে এ হিসাবশাস্ত্র তখন কতকাংশে ধর্মীয় বিধানের অন্তর্গত হয়ে দাঁড়ায়; কেননা এগুলো তখন নির্দিষ্ট প্রাপ্য, প্রাপ্য বিশেষের হ্রাস, অঙ্গীকার, অস্বীকৃতি, হেবা, দাসত্ব মোচন সম্পর্কীয় হেবা[২৪১] প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যায় নির্দেশরূপে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে ধর্মীয় বিধান অনুসারে ন্যায্য প্রাপ্য সংশোধন করে নিশ্চিত করার জন্য হিসাবশাস্ত্রের একটা অংশও এতে ব্যবহার করা হয়।

বস্তুত এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র। অনেক সময় এ শাস্ত্রবিদরা তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসেবে নবীর একাধিক হাদীসের উল্লেখ করেন; যেমন তা সমগ্র জ্ঞানের এক-তৃতীয়াংশ; তা-ই সেই শাস্ত্র, যা সর্বপ্রথম নিশ্চিহ্ন হবে এমন অন্যান্য বক্তব্য। আমার মত এই যে, এসব হাদীসের মধ্যে ব্যবহৃত 'ফরায়েজ' শব্দটি তা মূল অর্থ অবশ্যকর্তব্য এর দিক হতেই সর্বত্র প্রযোজ্য; উত্তরাধিকারের প্রাপ্যাদি অর্থে নয়। কেননা, শেষোক্ত

---

২৩৭. আলী ইবনে সুলায়মান (?)।

২৩৮. আসবাগ ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ৪২৬ (১০৩৫ খ্রি:) হি:।

২৩৯. আমর ইবনে আহম্মদ; মৃত্যু ৪৪৯ (১০৫৯ খ্রি:) হি:।

২৪০. যেমন কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রী, দুই মেয়ে ও পিতা-মাতা রেখে মারা যায়, তাহলে দুই মেয়ে পাবে দুই-তৃতীয়াংশ। পিতা-মাতা এক-তৃতীয়াংশ এবং স্ত্রী এক-অষ্টমাংশ। এতে প্রাপ্য অংশাদি সমগ্র সম্পত্তির বেশি হয়। এমতাবস্থায় সকলের প্রাপ্যাদি হ্রাস করে হিসাব সম্পূর্ণ করতে হবে।

২৪১. যদি কোন ক্রীতদাসকে নির্দিষ্ট বিনিময় বা সময় অন্তর মুক্তির অঙ্গীকারপত্র দেয়া হয়।

অর্থে ব্যবহৃত হলে এর পরিমাণ সামগ্রিক জ্ঞানের এক-তৃতীয়াংশ অপেক্ষা অনেক কম। অথচ 'অবশ্যকর্তব্যে'র পরিমাণ এটি অপেক্ষা অনেক বেশি।

এ বিষয় নিয়ে পূর্বসূরি ও উত্তরসূরিদের মধ্যে অনেকেই গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মতাদর্শ অনুসারে যারা এ দায়ভাগ নিয়ে পুস্তকাদি রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম রচনা হল ইবনে সাবেতের পুস্তক, কাজী আবুল কাসেম হওফীর 'মুখতাসর' এবং ইবনে মুনাম্মার, জাদী[২৪২] ও সওদী এবং অন্যান্যদের পুস্তকাবলি। কিন্তু এক্ষেত্রে হওফীরই শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর গ্রন্থটি সর্বোচ্চ স্থান পাবার যোগ্য। ফেজের নেতৃস্থানীয় শিক্ষকদের মধ্যে আমাদের শিক্ষক আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে সুলায়মান উক্ত গ্রন্থের একটি ব্যাখ্যাপুস্তক রচনা করেছেন। শাফেয়ী মতাদর্শ অনুযায়ী ইমাম হরমাইন উক্ত বিষয়ে গ্রন্থ বচনা করেছেন। এ গ্রন্থে তাঁর শাস্ত্রাদি সম্পর্কীয় দক্ষতা এবং গভীরতার পরিচয় বিদ্যমান। এ বিষয়ে হানাফী ও হাম্বলীদেরও রচনা রয়েছে। বস্তুত শাস্ত্রাদির ব্যাপারে মানুষের স্থান বৈচিত্র্যমণ্ডিত। আল্লাহ্ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন এবং তিনি ভিন্ন অন্য কোনো প্রতিপালক নেই।

---

২৪২. অন্যান্যদের জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১০৬—১০৯ নং টীকা দ্র. এবং সওদী আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে ইয়াহিয়া; জন্ম ৬৪৩ (১২৪৬ খ্রি:) হি:।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

[জ্যামিতি বিষয়ক শাস্ত্রাদি]

এ শাস্ত্রটি পরিমাণ নিয়ে বিচার-বিবেচনা করে। উক্ত পরিমাণ কখনও সংযুক্ত হয়; যেমন রেখা, সমতল ও ঘনবস্তু এবং কখনও বিযুক্ত হয়, যেমন—সত্তাগত ক্রিয়াশীল উপাদানসহ সংখ্যাসমূহ। যথা, যে-কোন ত্রিভুজের একটি কোণ অন্য দুটি সমকোণের সমান। যথা, দুটি সমান্তরাল রেখা অন্তহীনভাবে একই দিকে বিস্তৃত হলেও পরস্পর মিলিত হয় না। যথা, দুটি রেখা পরস্পরকে কর্তন করার ফলে উৎপন্ন দুটি বিপরীত কোণ একে অপরের সমান। যথা, চারটি সমপরিমাণের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টির গুণফল দ্বিতীয় ও চতুর্থটির গুণফলের সমান। এমন অন্যান্য বিষয়।

এ বিষয়ে গ্রিকদের যে গ্রন্থটি অনূদিত হয়ে এসেছে, তা হল ইউক্লিডের গ্রন্থ; তাকে 'মূলনীতি ও ভিত্তি'র গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সব বিষয় তাতে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম সম্রাট আবু জাফর আল মনসুরের সময় গ্রিক গ্রন্থাদি অনূদিত হয়। অনুবাদকের আধিক্যের ফলে উক্ত গ্রন্থের বিভিন্ন অনুবাদ বিদ্যমান। তার মধ্যে হুনাইন ইবনে ইসহাক,[২৪৩] সাবেত ইবনে কুর[২৪৪] ও ইউসুফ ইবনে আল-হাজ্জাজের[২৪৫] গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ।

গ্রন্থটিতে পনেরটি আলোচনা রয়েছে। তার মধ্যে চারটি সমতল সম্পর্কীয়; একটি সমপরিমাণ সম্পর্কীয়; একটি এক সমতলের অন্য সমতলের সাথে সম্বন্ধ সম্পর্কীয়; তিনটি সংখ্যা সম্পর্কীয় এবং দশমটি মূলদ ও সে সম্পর্কীয় শক্তি নিয়ে বিবৃত হয়েছে; এর অর্থই বর্গমূল। অবশিষ্ট পাঁচটি ঘনবস্তুর আলোচনায় নিয়োজিত।

মানুষ এ গ্রন্থটির বহু সংক্ষিপ্ত-সার রচনা করেছে। যেমন ইবনে সিনা তাঁর 'শেফা' নামক গ্রন্থের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে করেছেন। তিনি তার একটি অংশকে এ উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ব্যবহার করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনে আবু সেল্‌ত[২৪৬] তাঁর 'এক্তেসার' গ্রন্থে এবং অন্যান্যরা অন্যত্র করেছেন। অন্য অনেকে এ গ্রন্থের প্রচুর ব্যাখ্যাপুস্তকও রচনা করেছেন। বস্তুত এ গ্রন্থটি সাধারণভাবে এ জ্যামিতিশাস্ত্র জ্ঞানের উৎস।

---

২৪৩. মৃত্যু ২৬০ (৮৭৩ খ্রি:) হি: (?)।
২৪৪. মৃত্যু ২৮৮ (৯০১ খ্রি:) হি:)।
২৪৫. সম্ভবত প্রসিদ্ধ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইবনে মতর (?)।
২৪৬. ইনি সম্ভবত আবুস্ সেল্‌ত উমাইয়া ইবনে আবদুল আজিজ ইবনে আবুস্ সল্‌ত; মৃত্যু ৪৬০ (১০৬৮ খ্রি:) হি: (?)।

পাঠক, জেনে রাখুন, জ্যামিতি তার অধিকারীকে বুদ্ধির দীপ্তি ও চিন্তার সৌকর্য প্রদান করে। কেননা তার সমগ্র যুক্তি-প্রমাণই সুস্পষ্টভাবে বিন্যস্ত ও পর্যায়ক্রমিকভাবে সুসজ্জিত; এ বিন্যাস ও শৃঙ্খলার জন্য তার অনুমানসমূহের মধ্যে ভ্রান্তির অনুপ্রবেশ খুব সহজসাধ্য নয়। এর ফলে উক্ত শাস্ত্রের অনুশীলনের চিন্তাশক্তি ভ্রান্তি হতে দূরে সরে আসে এবং উক্ত শাস্ত্রাধিকারীর জন্য এমন বিপদ থেকে উদ্ধারলাভের এক স্বতন্ত্র বুদ্ধিমত্তার জন্ম দেয়। জ্ঞানীরা মনে করেন, প্লেটোর গৃহের দ্বারদেশে লিখিত ছিল যে, 'যিনি জ্যামিতিবিদ নন, তিনি যেন আমাদের এ গৃহে প্রবেশ না করেন।' আমাদের উস্তাদগণ, আল্লাহ্ তাঁদেরকে শান্তি দিন, বলতেন, মননশক্তির জন্য জ্যামিতি কাপড়ের জন্য সাবান তুল্য; তা দ্বারা ধৌত করলে ময়লা দূরীভূত হয় এবং পরিচ্ছদকে তৈলসিক্ততা ও মালিন্য থেকে পরিষ্কার করে। এর এমন বৈশিষ্ট্য আমাদের সেই পূর্বকথিত বিন্যাস ও শৃঙ্খলারই ফল।

এই জ্যামিতিরই অন্য একটি শাখা হল ভূগোলকের বিভিন্ন আকৃতি ও শাঙ্কব বিভাগ। ভূগোলকের আকৃতি সম্পর্কে গ্রিকদের রচিত দুটি গ্রন্থ বিদ্যমান। এর একটি থিউডোসিয়াস ও অন্যটি মিনালেয়াসের রচনা। থিউডোসিয়াসের গ্রন্থটি অধিকাংশ যুক্তি-প্রমাণের ব্যবহারিক দিক থেকে মিনালেয়াসের গ্রন্থটির পূর্ববর্তী। যে ব্যক্তি জ্যোতিষচর্চা করতে ইচ্ছুক, তার জন্য এ দুটি গ্রন্থ একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ এ-সম্পর্কীয় যুক্তি-প্রমাণ উক্ত দুটি গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল। কেননা জ্যোতিষের সব আলোচনাই ভূগোলক সম্পর্কীয় এবং গতির ফলে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার বিভাগ ও চক্র, যা তার সাথে সম্পর্কযুক্ত; যেমন পরে আমরা এ সম্পর্কে বর্ণনা করব। এ কারণে তাদের বিভিন্ন সমতল ও বিভাগের জ্ঞান ভূগোলকের অনুরূপ জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।

শাঙ্কব বিভাগগুলোও জ্যামিতির শাখা বিশেষ। এটি এমন একটি শাস্ত্র, যা শঙ্কুসদৃশ আকৃতিগুলোর গঠন ও কর্তন সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে এবং এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের উপর জ্যামিতিক প্রমাণ উপস্থিত করে। এসব প্রমাণ প্রথম শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এর উপকারিতা হল, আকৃতি বিশিষ্ট ব্যবহারিক শিল্পকর্মে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করা। যেমন—কাষ্ঠশিল্প ও স্থাপত্য; অদ্ভুত আকৃতি ও বিরল স্থাপত্য নিদর্শনের প্রক্রিয়া; কপিকল ও অন্যান্য কৌশলের সাহায্যে ভারী বোঝা ও বিরাট আকৃতির বস্তু পরিবহন ও উত্তোলন সংক্রান্ত কলা-কৌশল এবং এমন অন্যান্য বিষয়। অনেক গ্রন্থ রচয়িতা এ বিষয় নিয়ে ব্যবহারিক কৌশলগত পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলোতে অদ্ভুত শিল্পকর্ম ও বিরল কলা-কৌশলের চূড়ান্ত রূপ দেখানো হয়েছে। অনেক সময় এগুলোর জ্যামিতিক যুক্তি-প্রমাণের দুরূহতার জন্য দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। অনুরূপ গ্রন্থাদি মানুষের কাছে বিদ্যমান। তারা এগুলোকে বনি শাকেরের[২৪৭] সাথে সম্পর্কযুক্ত করে থাকে। মহান আল্লাহই সর্বোত্তম জ্ঞাতা।

জরিপ

জরিপ জ্যামিতিরই একটি অংশ। এটি এমন একটি বিষয়, যা পৃথিবী পরিমাপ করার জন্য প্রয়োজন হয়। এর অর্থ কোন নির্দিষ্ট ভূভাগকে বিঘত, হাত অথবা অন্য কোন মাপ

২৪৭. তারা খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর অন্তর্গত।

দ্বারা তার পরিমাণ বের করা কিংবা কোন ভূভাগের সাথে অন্য ভূভাগের সম্পর্ক তুলনা করার সময় অনুরূপ কিছু করা। শস্যক্ষেত্র, খামার, বাগান প্রভৃতির খাজনা নির্দিষ্ট করতে এবং উত্তরাধিকারী অথবা অংশীদারদের মধ্যে দেয়াল, ভূমি ইত্যাদি ভাগ করতে এ শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ এ বিষয় নিয়ে প্রচুর ও উত্তম পুস্তকাদি রচনা করেছে। আল্লাহ্ তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় যথার্থ উপলব্ধির শক্তি দান করেন।

দৃষ্টিবিদ্যাও জ্যামিতির একটি শাখা। এ শাস্ত্রের দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধির ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতিকে কারণসহ বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রে দর্শন প্রক্রিয়াটি বিবেচনা করা হয়। এর ভিত্তি এই যে, দর্শনকার্যটি আলোকরশ্মির দ্বারা সৃষ্ট শাঙ্কব প্রতিফলনের মাধ্যমে সমাধা হয়। এর সর্বোচ্চ পর্যায় দৃষ্টিকোণ ও এর ভিত্তি দৃষ্ট বস্তু। তারপর এ দর্শন প্রক্রিয়ায় নিকটবর্তী বস্তুকে ক্ষুদ্র দৃষ্ট হওয়ার ব্যাপারে বহু ভুল-ভ্রান্তি দেখা দেয়। অনুরূপভাবে জলের নিচে ও স্বচ্ছবস্তুর অন্তরালবর্তী আকৃতিকে বৃহৎ দেখায়; পতনশীল বৃষ্টিবিন্দুকে সরলরেখায় দেখা যায়; শিখাকে চক্রকার মনে হয় এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়। এ শাস্ত্রে এসব বিষয়ের কার্যকারণ ও অবস্থা জ্যামিতিক যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়। অনুরূপভাবে এর দ্বারা চন্দ্রদর্শনের বিভিন্নতাকে বিশদ করা হয় এবং এর উপরই নতুন চন্দ্রের উদয় ও চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কীয় বিষয়াদি সেগুলোর সংশ্লিষ্ট কারণের বৈচিত্র্যসহ নির্ভরশীল। অনুরূপ অন্যান্য অনেক বিষয়।

এ বিষয়ে গ্রিকদের প্রচুর রচনা বিদ্যমান। ইসলামী জগতে এ বিষয়ে যার রচনা সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত তিনি হলেন ইবনে হায়ছম।[২৪৮] অন্য অনেকেও এ বিষয়ে গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। বস্তুত এ বিষয়টি উক্ত গণিতশাস্ত্রাদি ও সেগুলোর শাখা-প্রশাখার অন্তর্ভুক্ত।

---

২৪৮. হাসান (হুসাইন) ইবনে হাসান (হুসাইন) ইবনে হায়ছম; ৩৫৪—৪৩০ (৯৬৫—১০৩৯ খ্রি:) হি: (?)।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

[জ্যোতিষশাস্ত্র]

এটি এমন এক শাস্ত্র যা দ্বারা স্থির, গতিশীল ও ঘূর্ণায়মান নক্ষত্রাবলির গতি নিরীক্ষণ করা হয় এবং উক্ত গতিজনিত অবস্থা থেকে আকাশমণ্ডলের আকৃতি ও গঠন সম্পর্কে প্রমাণ গ্রহণ করা হয়। এসব প্রমাণ অনুভূত গতি থেকে জ্যামিতিক প্রক্রিয়ায় উপস্থাপিত হয়ে থাকে। যেমন এ শাস্ত্র প্রমাণ দেয় যে, পৃথিবীর কেন্দ্র সূর্যমণ্ডলের কেন্দ্র থেকে ভিন্ন; কেননা অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণের গতি বিদ্যমান। যেমন এটি প্রমাণ করে যে, নক্ষত্রের প্রত্যাবর্তন ও স্থিরতা সেগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র গোলকের বর্তমানতা বোঝায়; যা সেগুলোর ব্যাপক কক্ষপথে পরিক্রমণশীল। যেমন এটি প্রমাণ উপস্থিত করে যে, স্থির নক্ষত্রের গতি একটি অষ্টম আকাশের বিদ্যমানতা বুঝিয়ে থাকে। যেমন এটি প্রমাণ দেয় যে, নক্ষত্রসমূহের বিচিত্র প্রবণতা সেগুলোর একাধিক কক্ষপথের ইঙ্গিত বহন করে। এরূপ অন্যান্য বিষয়।

নক্ষত্রসমূহের এ গতি, অবস্থা ও বৈচিত্র্য একমাত্র পর্যবেক্ষণের দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। কেননা একমাত্র এরই সাহায্যে আমরা অগ্রগমন ও পশ্চাদপসরণের গতি জানতে পারি। অনুরূপভাবে বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডল এবং প্রত্যাবর্তন ও স্থিরতার বিষয়টি জানা যায়। এরূপ অন্যান্য বিষয়।

গ্রিকগণ এ বিষয়ে অতিমাত্রায় পর্যবেক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করতেন এবং তাঁরা নির্দিষ্ট নক্ষত্রের গতি পর্যবেক্ষণের জন্য বহু যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁরা এগুলোকে 'জাতুল হলক'[২৪৯] বলে অভিহিত করতেন। এগুলো ব্যবহার করার প্রক্রিয়া এবং আকাশমণ্ডলের গতির সাথে এগুলোর গতির সামঞ্জস্য বিধান করে তা দিয়ে প্রমাণ গ্রহণ করার পদ্ধতি সবই মানুষের কাছে ঐতিহ্য হিসেবে বিদ্যমান।

ইসলামী জগতে এ ব্যাপারে খুব কমই আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। সম্রাট মামুনের শাসন আমলেই এর যৎসামান্য দেখা গিয়েছিল এবং 'জাতুল হলক' নামীয় এ যন্ত্রটির নির্মাণকার্যও আরম্ভ হয়েছিল; কিন্তু তা সম্পূর্ণ হতে পারেনি। তাঁর মৃত্যুর পর এর তৎপরতা লোপ পায় এবং পরিত্যক্ত হয়। তারপর প্রাচীন পর্যবেক্ষণাদির উপর নির্ভর করা হত। কিন্তু দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার ফলে তার কোন কার্যকারিতাই অবশিষ্ট ছিল না। কারণ পর্যবেক্ষণ যন্ত্রের গতির সাথে আকাশমণ্ডল ও নক্ষত্রমালার গতির সামঞ্জস্যবিধান একমাত্র নিকটবর্তী অনুমানের ধারাতেই লব্ধ বলে গণ্য হয়; কখনই

---

২৪৯. অর্থ 'বৃত্তবিশিষ্ট'; 'অ্যাস্ট্রোল্যাব' (রোজেনথাল)।

যথার্থ তথ্য পাওয়া যায় না। সুতরাং সময়ের ব্যবধান বেড়ে গেল এ নৈকট্যসুলভ অনুমানের পার্থক্যও বেড়ে যায়।

এ জ্যোতিষশাস্ত্র একটি সম্ভ্রান্ত শিল্পকর্ম। সাধারণভাবে যা বোঝা যায় যে, এ শাস্ত্র আকাশ, কক্ষপথ ও নক্ষত্রমালার যথার্থ চিত্র তুলে ধরে, বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। বরং এটি সংশ্লিষ্ট সব কিছুর ঐ গতি থেকে ধার্যকৃত আকাশমণ্ডলের আকৃতি-প্রকৃতির জ্ঞান দান করে। পাঠক, আপনি জানেন যে, যে-কোন বস্তুর পক্ষে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ফল প্রদান করা অসম্ভব নয়। আমরা যদি বলি যে, গতি অবশ্যই আছে, তা হলে এ অবশ্যগতি থেকে গতিময় বস্তুটির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়; কিন্তু এটি কোনক্রমেই সেই বস্তুটির যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান দান করে না। এসত্ত্বেও জ্যোতিষশাস্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটি শিক্ষণীয় বিষয়াদির একটি বিশেষ স্তম্ভ স্বরূপ।

এ শাস্ত্রে সর্বাপেক্ষা সুন্দর রচনা হল 'ম্যাজেস্টি' নামক গ্রন্থ। টলেমীর সাথে একে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। এ গ্রন্থের ব্যাখ্যাপুস্তক রচয়িতারা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, এই টলেমী গ্রিক সম্রাট টলেমীদের কেউ নন। ইসলামী জগতের দার্শনিকদের নেতৃস্থানীয় অনেকেই এ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত-সার রচনা করেছেন; যেমন ইবনে সিনা অনুরূপ সংক্ষিপ্ত-সার প্রস্তুত করে তা তাঁর 'শেফা' নামক গ্রন্থের শিক্ষণীয় বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আন্দালুসের দার্শনিক ইবনে রুশদও এ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনে সামাহ্ এবং ইবনে আবুস্ সেল্ত তাঁর 'এক্তেসার' নামক গ্রন্থে সংক্ষিপ্তির কাজ করেছেন। ইবনে ফরগানীরও[২৫০] একটি সংক্ষিপ্ত জ্যোতিষশাস্ত্র বিদ্যমান। তিনি সেটাকে সহজ করেছেন এবং সেটার জ্যামিতিক প্রমাণগুলো বাদ দিয়েছেন। 'আল্লাহ্ মানুষকে তা-ই জানিয়েছেন, যা তার জানা ছিল না।'[২৫১] পবিত্র তিনি, তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই—নিখিল জগতের প্রতিপালক।

জ্যোতিষ তালিকাশাস্ত্র

জ্যোতিষশাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার মধ্যে জ্যোতিষ তালিকাশাস্ত্র অন্যতম। এটি সংখ্যার দ্বারা হিসাব সংরক্ষণ জাতীয় শিল্প বিশেষ। এতে গতির দিক থেকে প্রতিটি নক্ষত্রকে বিশিষ্ট করা হয় এবং জ্যোতিষশাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুসারে তার অবস্থান সম্পর্কীয় দ্রুততা, ধীরতা, স্থিরতা, প্রত্যাবর্তন ইত্যাদির পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হয়। এর দ্বারা নক্ষত্রসমূহের গতি হিসাব করে যে-কোন সময়ে কক্ষপথে সেগুলোর নির্দিষ্ট অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয় এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় যুক্তি-প্রমাণ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে।

এ শিল্পটির নীতিমালা বিদ্যমান; যেমন প্রস্তাবনা ও মূলনীতি। এগুলোর দ্বারা মাস, দিন ও অতীত তারিখের জ্ঞান লাভ করা যায়। এর কতিপয় সুনির্দিষ্ট নীতি রয়েছে; এগুলোর দ্বারা অপভূ, অনুভূ, বিষুবলম্ব এবং বিভিন্ন প্রকার গতির পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলোর পরস্পরের বৈচিত্র্য পরিস্ফুট করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য এগুলোর হিসাব

২৫০. আহমদ ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যুকাল ২৪৭ (৮৬২ খ্রি:) হিজরীর পরবর্তী।
২৫১. কোরান ৯৬, ৫।

ছকের মাধ্যমে সহজভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। একেই বলা হয় জ্যোতিষতালিকা। এ প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট সময়ে নক্ষত্রমালার নির্দিষ্ট অবস্থানের জ্ঞান লাভ করাকে বলা হয় উপযোজন ও তালিকাবদ্ধকরণ।

পূর্বসূরি ও উত্তরসূরিদের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন; যেমন—আলবাত্তানী[২৫২] ও ইবনে কুম্মাদ।[২৫৩] বর্তমানকালে মাগরিবের উত্তরসূরি শাস্ত্রবিদ্‌রা তাঁদের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে একটি জ্যোতিষতালিকাকে গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থটি সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকের তিউনিসের জ্যোতিষবিদ্‌দের অন্যতম ইবনে ইসহাকের নামের সাথে জড়িত।[২৫৪] তাদের ধারণা ইবনে ইসহাক এ তালিকা নির্মাণে পর্যবেক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। সিসিলি দ্বীপের একজন ইহুদী পণ্ডিত, যিনি জ্যোতিষ ও শিক্ষণীয় বিষয়াদিতে দক্ষ এবং এসব বিষয়ে পর্যবেক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করে থাকেন, তিনিই তাঁর পর্যবেক্ষণলব্ধ নক্ষত্রের অবস্থা ও গতির সংবাদ ইবনে ইসহাককে পাঠিয়েছেন। সুতরাং মাগরিববাসীরা তাদের এ ধারণা অনুসারে উক্ত গ্রন্থটির ভিত্তি নির্ভরযোগ্য বলে সেটির সাহায্য গ্রহণ করে। ইবনে বান্না[২৫৫] এ গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রস্তুত করে 'আল মিনহাজ' নামে অন্য একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এতে হিসাবের বিষয়টি সহজতর হওয়ায় মানুষ একে আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছে। অবশ্য তাদের এমন আগ্রহ একমাত্র জ্যোতিষশাস্ত্রীয় নিয়ম-কানুন জানার জন্যই এবং সে জন্যই তারা কক্ষপথে নক্ষত্রের অবস্থান জানতে এত ব্যাগ্র হয়ে থাকে। তাতে এ বিষয়টুকুই জানা যে, নক্ষত্রের বিশেষ অবস্থানের ফলে মনুষ্যজগতের রাজশক্তি, সাম্রাজ্য, মানুষের জন্ম, ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি ইত্যাদির উপর কী প্রভাব পড়ে থাকে। আমরা পরে এ সম্পর্কে বর্ণনা করব এবং আল্লাহ্ চান তো তাদের যুক্তি-প্রমাণাদিও বিশ্লেষণ করব। আল্লাহ্ যা ভালবাসেন, যাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তার জন্যই সহায়ক হন এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।

---

২৫২. মুহম্মদ ইবনে জাবির; ২৪৪—৩১৭ (৮৫৮—৯২৯ খ্রি:) হি: (?)।
২৫৩. আহমদ ইবনে ইউসুফ ইবনে কুম্মাদ; মৃত্যু ৫৯১ (১১৯৫ খ্রি:) হি: (?)।
২৫৪. আবুল আব্বাস আলী ইবনে ইসহাক; হিজরী সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ।
২৫৫. অব্যবহিত পূর্ববর্তী ২২৭ নং টীকা দ্র:।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

[যুক্তিবিদ্যা]

এ শাস্ত্রটি এমন কতিপয় নীতির সমষ্টি যা দিয়ে বস্তুর সত্তাগত সংজ্ঞায় শুদ্ধাশুদ্ধির পার্থক্য নির্ণয় করা যায় এবং সত্যোপলব্ধির প্রমাণ প্রয়োগে ভ্রান্তির অপনোদন সম্ভব হয়। এর কারণ এই যে, উপলব্ধি কেবলমাত্র পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ চেতনারই সমষ্টি। বুদ্ধিমান অবুদ্ধিমান নির্বিশেষে সব প্রাণীই এ উপলব্ধিতে অংশীদার। মানুষ একমাত্র এ ইন্দ্রিয়জাত চেতনার অতীত সার্বিক ধারণার উপলব্ধির দ্বারাই সবার মাঝে বিশিষ্ট হয়ে আছে।

এর বিবরণ এই যে, মানুষ সমতুল্য ব্যষ্টিসমূহ থেকে তার কল্পনায় এমন একটি ধারণা জন্মায়, যা ঐসব অনুভূত ব্যষ্টির উপর প্রযোজ্য হতে পারে এবং একেই সার্বিক ধারণা বলে। তারপর মানুষের ধারণা এসব ব্যষ্টি ও অন্যতর ব্যষ্টিসমূহের মধ্যে বিবেচনা-শক্তি প্রয়োগ করে এবং কতকাংশে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায়। এর ফলে সে এ দুটির ঐক্যের ভিত্তিতে এমন একটি ধারণা লাভ করে, যা তাদের উভয়ের উপর প্রযোজ্য হয়ে থাকে। এভাবে ক্রমশ সে অগ্রসর হয়ে এমন একটি একক সার্বিক ধারণায় উপনীত হয়, যার সাথে সামঞ্জস্য হতে পারে এমন কোন অন্য সার্বিক ধারণায় অস্তিত্ব থাকে না। এ কারণে উক্ত ধারণাটি একক হয়ে দেখা দেয়।

এর উদাহরণ, যেমন মানুষের ব্যষ্টি থেকে জাতির এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করা, যা তাদের সবার উপর প্রযোজ্য হতে পারে। তারপর এ ধারণাকে পশুর সাথে মিলিয়ে এমন গুণের ধারণা লাভ করা যায়, যা এ দুটির উপর প্রযোজ্য হয়। এর পর এ দুটি ও বৃক্ষের মধ্যে বিবেচনা করে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করা যায়, যা মহাগণের কাছে পৌঁছে দেয় এবং এটাই বস্তুসত্তা। এর পর আর এমন কোন সার্বিক ধারণা পাওয়া যায় না, যার সাথে এর সামঞ্জস্য বিধান হতে পারে। সুতরাং বুদ্ধি এখানে এসে ধারণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে থমকে দাঁড়ায়।

অতঃপর আল্লাহ্ এ মানুষের মধ্যে এমন এক মননশক্তি প্রদান করেছেন, যা দিয়ে সে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা উপলব্ধি করতে পারে। তার এ জ্ঞান হয় বস্তুসত্তার ধারণা মাত্র অর্থাৎ এমন একটি সবল উপলব্ধি যার সাথে কোন সিদ্ধান্ত নেই। অথবা সত্যোপলব্ধি অর্থাৎ কোন বিষয় সম্পর্কে কোন বিষয়ের প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত। এর ফলে উদ্দেশ্য সাধনে মননশক্তির তৎপরতা হয়, উক্ত সব সার্বিক ধারণাকে পরস্পরের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত করবে, যাতে কল্পনায় এমন একটি সার্বিক ধারণার সৃষ্টি হয়, যা

বাস্তবে তার অন্তর্গত সব অংশের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য এবং এ কাল্পনিক ধারণার দ্বারা সব ব্যষ্টির বস্তুসত্তার জ্ঞান লাভ সুগম হতে পারে। অথবা তা কোন বিষয়ের জন্য কোন বিষয়ের প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত এমনভাবে দান করবে যাতে তার দ্বারা সত্যোপলব্ধি জন্মায়। অবশ্য বাস্তবিক পক্ষে এ সত্যোপলব্ধির চরম পর্যায় ধারণাতেই পর্যবসিত হয়। কেননা তার এ উপলব্ধি জন্মানোর পর দেখা যায়, তা বস্তুপুঞ্জের সেই স্বরূপকেই গোচরীভূত করে, যা সিদ্ধান্তমূলক জ্ঞানের ফলশ্রুতি মাত্র।

বস্তুত মননশক্তির এ তৎপরতা কখনও শুদ্ধ পন্থায়, আবার কখনও অশুদ্ধ পন্থায় আবর্তিত হয়ে থাকে; এর ফলেই যে পন্থায় মননশক্তি উদ্দিষ্ট জ্ঞান লাভের জন্য তৎপর হবে, তাকে স্পষ্ট করে তোলা দরকার; যাতে শুদ্ধাশুদ্ধির পার্থক্য নির্ণীত হয়ে যায়। এজন্যই এ বিষয়টি যুক্তিবিদ্যার নীতিতে পরিণত হয়েছে। পূর্বসূরিরা প্রথম দিকে এ বিষয়ে সামান্য সামান্য ও পৃথক পৃথকভাবে কথা বলতেন এবং তাঁরা এর পন্থাগুলোকে বিন্যস্ত ও এর সমস্যাগুলোকে একত্র করেননি। এ অবস্থায় গ্রিস দেশে এরিস্টটল আবির্ভূত হলেন। তিনি এ বিদ্যার আলোচ্য বিষয়কে বিন্যস্ত এবং এর সমস্যা ও পরিচ্ছেদগুলোকে সজ্জিত করলেন। তিনি এটাকে দার্শনিক শাস্ত্রাদির প্রথম পাঠ্য ও উপক্রমণিকা হিসেবে স্থান দিলেন। এজন্যই তাঁকে 'প্রথম শিক্ষক' বলে অভিহিত করা হয়। এ যুক্তিবিদ্যার জন্য তাঁর বিশিষ্ট রচনাটির নাম 'নস' (পাঠ)। এতে আটটি গ্রন্থ বিদ্যমান : এর চারটি অনুমান প্রক্রিয়া এবং চারটি তার বিষয়বস্তুর উপর বিন্যস্ত।[২৫৬]

এর বর্ণনা এই যে, উদ্দিষ্ট সত্যোপলব্ধি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। তার মধ্যে উদ্দিষ্ট বিষয় স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাসরূপে দেখা দেয়। তার মধ্যে উদ্দিষ্ট ধারণার আকারের আসে এবং এর কয়েকটি পর্যায় বিদ্যমান। এর ফলে অনুমানকে উদ্দিষ্টের দিক থেকে এমনভাবে বিবেচনা করা হয়, যা তার উপকারে আসে। এ বিবেচনার দিক থেকে তার প্রস্তাবনাগুলো কোন্ প্রকৃতির হওয়া বিধেয়। তারপর এটি কোন্ গণের অধীনে হবে—জ্ঞান, না ধারণার! কখনও এ অনুমানকে বিশেষ কোন উদ্দিষ্ট সামনে রেখে দেখা হয় না; বরং তার ফলশ্রুতির দিক থেকেই বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। এদিক থেকে প্রাথমিক বিবেচনাকে বলা হয় বস্তু অর্থাৎ এর দ্বারা আমরা সেই বিশেষ উদ্দেশ্যজাত বস্তুকেই বুঝি, যা জ্ঞান বা ধারণারূপে অস্তিত্বে আসে। এ দিক থেকে দ্বিতীয় বিবেচনাকে বলা হয় আকৃতি এবং সাধারণভাবে অনুমানের বিকাশ। এসব কিছু মিলিয়ে যুক্তিবিদ্যার গ্রন্থের সংখ্যা আট।

প্রথম গ্রন্থ : সেই মহাগণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, যা কল্পনায় সমস্ত অনুভূত বস্তুর অতীতরূপে তার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এ মহাগণের পরবর্তী অন্য কোন গতি নেই। একে বলা হয় 'কিতাবুল মাকুলাত' বা ধারণার গ্রন্থ।

দ্বিতীয় গ্রন্থ : সত্যোপলব্ধির প্রস্তাবনা এবং তার বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করে। একে বলা হয় 'কিতাবুল ইবারত' বা ব্যাখ্যার গ্রন্থ।

---

২৫৬. রোজেনথালে 'ফস্', বলে উল্লেখিত; গ্রন্থবিভাগ ও অন্য সংস্করণে তিন ও পাঁচ এবং এ বিভাগই শুদ্ধ।

তৃতীয় গ্রন্থ : অনুমান এবং সাধারণভাবে তার বিকাশ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করে। একে বলা হয় 'কিতাবুল কিয়াস' বা অনুমানের গ্রন্থ। আকৃতির দিক থেকে বিবেচনার এটাই শেষ পর্যায়।

অতঃপর চতুর্থ গ্রন্থ 'কিতাবুল বুরহান' বা প্রমাণের গ্রন্থ; এটি বিশ্বাস উৎপাদনকারী অনুমান সম্পর্কে বিবেচনা করে। কীভাবে তার প্রস্তাবনাগুলো বিশ্বাস্য হতে বাধ্য এবং কীভাবে তা উক্ত বিশ্বাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্যান্য শতাব্দীর সাথে বিশিষ্ট হয়ে দেখা দেয়। যেমন তার সত্তাগত ও প্রাথমিক হওয়া এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়। এ গ্রন্থে সংজ্ঞা ও সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কেননা এর উদ্দেশ্য হল একমাত্র বিশ্বাস। কারণ সংজ্ঞা ও সংজ্ঞিতের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী সামঞ্জস্যের তা ছাড়া অন্য কিছুর সম্ভাবনা থাকে না। এজন্যই পূর্বসূরিগণ এ গ্রন্থে এসব বিষয় বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চম গ্রন্থ : 'কিতাবুল জদল' বা বিতর্কের গ্রন্থ; এটি সেই উপকারী অনুমান শক্তিতে জাগ্রত করে, যা দিয়ে বিরোধী বক্তব্য কর্তন ও শত্রুর মুখ বন্ধকরণের ক্ষমতা জন্মে এবং কীভাবে তার জন্য প্রসিদ্ধ বিষয়াদি ব্যবহার করতে হবে, তা সে সম্পর্কেও শিক্ষা দেয়। এটি অন্যবিধ শতাব্দীর দ্বারাও এ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় তুলে ধরে। এগুলোর বর্ণনা সেখানে বিদ্যমান। এ গ্রন্থে সেসব উৎসের কথা বর্ণনা করা হয়, যে স্থান থেকে অনুমানকারী তার অনুমানকে চয়ন করতে পারে এবং সেজন্য মধ্যবর্তী নামীয় উদ্দেশ্যের উভয় দিকের একত্রকারীকে পৃথক করতে সক্ষম হয়। এ গ্রন্থের প্রস্তাবনার বিপরীতধর্মী ব্যবহারও বিদ্যমান।

ষষ্ঠ গ্রন্থ : 'কিতাবুস্ সফস্তা' বা তর্কাভাসের গ্রন্থ; এটি এমন এক অনুমান সম্পর্কে আলোচনা করে, যা সত্যের বিরোধীপক্ষকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তার্কিক সেটার দ্বারা তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করে; যদিও সে নিজেই ভ্রান্ত। এ আলোচনা এজন্যই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যাকে ভ্রান্ত অনুমান সম্পর্কে অবহিত হয়ে তা থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয়।

সপ্তম গ্রন্থ : 'কিতাবুল খেতাবা' বা বাগ্মিতার গ্রন্থ; এটি এমন এক উপকারী অনুমান সম্পর্কে আলোচনা করে, যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করে বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিচালিত করা সম্ভব হয়। এটি উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহারযোগ্য বক্তব্যাদি সম্পর্কেও অবহিত করে।

অষ্টম গ্রন্থ : 'কিতাবুশ্শের' বা কবিতার গ্রন্থ; এ এমন এক অনুমান সম্পর্কে শিক্ষা দেয়, যা উপমা উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে বিশেষভাবে কোন বিষয়ের আগ্রহ অথবা ঘৃণা সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করে এবং এ উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য কাল্পনিক প্রস্তাবনাগুলোর জ্ঞানদান করে।

এগুলোই হল পূর্বসূরিদের কাছে সুপরিচিত যুক্তিবিদ্যার আটটি গ্রন্থ। তারপর এ শিল্পজ্ঞান সংস্কৃত ও সজ্জিত হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে গ্রিক দার্শনিকগণ এ মতে উপনীত হলেন যে, পাঁচটি সার্বিক ধারণার জন্য পৃথক আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। বস্তুত এগুলো বহির্বস্তু, তার অংশাদি ও তাতে আপতিক বিষয়াদির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণা সৃষ্টির জন্য খুবই উপকারী। এ পাঁচটি হল গণ, বিভেদক, জাতি, বিশেষ ও সাধারণ

আপতিক। তাঁরা এগুলোর জন্য আলোচ্য যুক্তিবিদ্যায় একটি আলোচনা সংযোজন করলেন এবং এভাবে আলোচনার সংখ্যা নয়টিতে উপনীত হল।

এসব কিছুই ইসলামী জগতে অনুবাদের মাধ্যমে এলো এবং ইসলামী দার্শনিকগণ এগুলোর সংক্ষিপ্ত-সার ও ব্যাখ্যা রচনার মাধ্যমে এগুলোকে গ্রহণ করলেন। যেমন ফারাবী ও ইবনে সিনা এবং তারপর আন্দালুসের ইবনে রুশদ করেছিলেন। এক্ষেত্রে ইবনে সিনা বিরচিত 'কিতাবুশ্‌শেফ' নামক গ্রন্থে—দর্শনের সাতটি বিষয়কেই পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

অতঃপর উত্তরসূরিরা এসে যুক্তিবিদ্যার পরিভাষার পরিবর্তন করলেন। তারা এ পাঁচটি সার্বিক ধারণার বিবেচনার সাথে সেগুলোর ফলাফলও সংযুক্ত করলেন। বস্তুত এগুলো সংজ্ঞা ও ধারা সম্পর্কীয় আলোচনা; তারা এগুলোকে প্রমাণের গ্রন্থ থেকে স্থানান্তরিত করেছেন। তাঁরা কিতাবুল মাকুলাত বা ধারণার গ্রন্থকে বাদ দিয়েছেন; কেননা যুক্তিবিদ্‌গণ তাতে সত্তাগতভাবে নয়; বরং আপতিকভাবে বিবেচনা করে থাকেন। তাঁরা ব্যাখ্যার গ্রন্থে অনুমানে বিপরীত প্রক্রিয়াকে যুক্ত করেছেন; যদিও পূর্বসূরিদের কাছে তা বিতর্কের গ্রন্থে সন্নিবেশিত ছিল। অবশ্য তা অনেক দিক থেকেই প্রস্তাবনাসমূহের অনুসারী বিষয়। তারপর তাঁরা সাধারণভাবে উদ্দেশ্য সাধনের দিক থেকে অনুমান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বস্তুর দিক থেকে নয়। তাঁরা বস্তুর দিক থেকে তাতে আরও গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। বস্তুত যে অনুমান এ পাঁচটি গ্রন্থে তথা প্রমাণ, বিতর্ক, বাগ্মিতা, কবিতা ও তর্কাভাসে বিধৃত রয়েছে, তাঁদের আলোচনা সেটাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। অনেক সময় সেগুলোর আংশিক মাত্র তাঁরা স্পর্শ করেছেন এবং অবশিষ্টাংশ সম্পর্কে উদাসীন রয়েছেন; যেন সেগুলোর অস্তিত্বই ছিল না। অথচ এগুলোই আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরস্থল গ্রন্থাবলি।

অতঃপর তাঁরা তাঁদের গৃহীত বিষয়াদি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন এবং এগুলোকে এমনভাবে বিবেচনা করেছেন যে, এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র; এটি আদৌ অন্যান্য শাস্ত্রের মাধ্যম নয়। এর ফলে তাঁদের এ সম্পর্কীয় আলোচনা দীর্ঘ ও ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম যিনি এ বিষয়ে সূত্রপাত করেছেন, তিনি হলেন ইমাম ফখরুদ্দিন ইবনে খতিব এবং তাঁর পরে আফজালউদ্দিন খোনজী;[২৫৭] শেষোক্তজনের গ্রন্থাবলি পূর্বাঞ্চলীর জ্ঞানীদের কাছে বর্তমানকালেও নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। তিনি এ শাস্ত্রে 'কাশফুল ইসরার' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন; এ গ্রন্থটি দীর্ঘ। তাঁর রচনা 'মুখতাসর আল মুযেজ' শিক্ষাদানের জন্য উত্তম। এর পর 'মুখতাসর আল জুমল' চার পৃষ্ঠা পরিমাণ একটি পুস্তিকা, যাতে যুক্তিবিদ্যার সার-সংক্ষেপ ও তার নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বর্তমানকালে তাকে গ্রহণ করেছে এবং উপকৃত হচ্ছে।

বর্তমানকালে পূর্বসূরিদের গ্রন্থাবলি পরিত্যাক্ত হয়েছে; যেন ঐগুলোর অস্তিত্ব কখনও ছিল না। অথচ এসব গ্রন্থই যুক্তিবিদ্যার ফলাফল ও তার উপযোগিতার দ্বারা সর্বাংশে পরিপূর্ণ রয়েছে; যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। আল্লাহ্‌ই যথার্থ সত্যের প্রতি পথ দেখিয়ে থাকেন।

---

২৫৭. মুহম্মদ ইবনে নামোয়ার; ৫৯০-৬৪৬ (১১৯৪-১২৪৮ খ্রি:) হি:।

পাঠক, জেনে রাখুন যে, এ বিষয় নিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত হওয়াকে পূর্বসূরি ও কালামশাস্ত্রবিদ্‌রা খুবই উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁরা এর মারাত্মক সমালোচনা করেছেন এবং এ বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। তাঁরা এর শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তারপর উত্তরসূরিদের মধ্যে ইমাম গাজ্জালী ও ইমাম ইবনে খতিবের সময় থেকে বিষয়টির প্রতি কিছুটা সদয় দৃষ্টি পোষণ করা হয়েছে। তবুও ঐ সময় থেকে খুব কম লোকই এ বিষয়ের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছে। অধিকাংশ লোকই সেই পূর্বসূরিদের মতামতের উপর দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এর ফলে তারা অনুরূপভাবে একে অস্বীকার করে ও এটি থেকে দূরে সরে থাকে। পাঠক, আমরা আপনার সামনে এ গ্রহণ-বর্জনের রহস্য বর্ণনা করব, এর ফলে আপনি জ্ঞানীদের বিচিত্র ও বিভিন্ন মতাদর্শের সঠিক উদ্দেশ্য জেনে নিতে সক্ষম হবেন।

এর বিবরণ এই যে, কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ যখন ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কীয় ধ্যানধারণাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা সাহায্য করার জন্য এলমে কালামের প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন তাঁরা এ উদ্দেশ্যে যুক্তি-প্রমাণের উপস্থাপন তাঁদের বিশেষ ধারাতেই করেছিলেন। এসব যুক্তি-প্রমাণ তাঁরা তাঁদের গ্রন্থাদিতে বর্ণনা করেছেন; যেমন তাঁরা প্রমাণ উপস্থিত করতে গিয়ে পৃথিবীর সৃজন প্রক্রিয়াকে তার মধ্যের আপতন ও তার সৃজনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কেননা দেহ মাত্রই সৃজন-প্রক্রিয়ার অধীন; সুতরাং যা সৃজন-প্রক্রিয়ার অধীন তা অবশ্যই সৃষ্ট। যেমন তাঁরা পারস্পরিক প্রতিরোধের অসম্ভাব্যতার দ্বারা আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেমন তাঁরা দৃশ্যমান গুণাবলির ধারা অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র জন্য অদৃশ্য ব্যাপক গুণ চারটিকে অনাদি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। অনুরূপ অন্যান্য আরও যুক্তি-প্রমাণ তাঁদের গ্রন্থাবলিতে বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর তাঁরা এসব যুক্তি-প্রমাণকে প্রতিষ্ঠা দেয়ার জন্য কতিপয় নিয়ম কানুন বর্ণনা করলেন এবং এগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাবনার আকারে দেখা দিল। যেমন স্বয়ম্ভু-অণু; কাল-অণু; দেহাদির মধ্যবর্তী শূন্যতা; বস্তুর জন্য স্বভাব ও বুদ্ধিগ্রাহ্য মিশ্রণের অস্বীকৃতি; আপতিক বস্তুর দুটি কালে স্থায়ী হওয়ার অসম্ভাব্যতা; সৃষ্ট বস্তুর গুণ হিসেবেই দশার স্বীকৃতি যা বর্তমানও নয়, অবর্তমানও নয়; এরূপ অন্যান্য আরও বিষয়ের প্রতিষ্ঠা করলেন, যার উপর তাঁদের যুক্তি-প্রমাণের বিশেষ ভিত্তি স্থাপিত হল।

এর পর শায়খ আবুল হাসান, কাজী আবু বকর ও উস্তাদ আবু ইসহাক এ মত পোষণ করলেন যে, এসব ধর্মীয় বিশ্বাসের যুক্তি-প্রমাণাদি প্রতিবিম্বধর্মী অর্থাৎ এগুলোর অকৃতকার্যতায় প্রামাণ্য বিষয়ও অকৃতকার্য হয়ে পড়ে। এজন্যই কাজী আবু বকর এ মত দেন যে, এ যুক্তিপ্রমাণগুলোও ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুরূপ; সুতরাং এগুলোর সমালোচনা ধর্মীয় বিশ্বাসের সমালোচনারই তুল্য; কেননা বিশ্বাস এসব যুক্তিপ্রমাণের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

পাঠক, আপনি যদি যুক্তিবিদ্যার বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, তার সমগ্রটাই বুদ্ধিগ্রাহ্য বিন্যাসের উপর আবর্তনশীল। এটি বস্তুজগতে এমন একটি স্বাভাবিক সার্বিক ধারণার প্রতিষ্ঠা করে, যা কাল্পনিক সার্বিক ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে পাঁচাট সার্বিক ধারণায় বিভক্ত হয়ে যায়। এগুলো হচ্ছে গণ, বিভেদক,

জাতি, বিশেষ ও সাধারণ আপতিক। কিন্তু এ সবাই কালামশাস্ত্রবিদ্‌দের কাছে অগ্রাহ্য বলে গণ্য। সার্বিক ধারণা ও সত্তাগত ধারণাও তাঁদের কাছে একটি কাল্পনিক বিবেচনা মাত্র, বস্তুজগতে এমন কিছু নেই, যা এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। অথবা যারা দশার কথা বলেন, তাদের কাছে তা একটি দশা মাত্র। এর ফলে পাঁচটি সার্বিক ধারণা এবং তাদের উপর ভিত্তি করে রচিত সংজ্ঞা অগ্রাহ্য হয়। দশটি ধারণাও অগ্রাহ্য বলে গণ্য হয়। সত্তাগত গুণের ধারণা অগ্রাহ্য হওয়ার ফলে প্রমাণ গ্রহণে সত্তাগত আবশ্যকীয় শর্তযুক্ত সব প্রস্তাবনা অগ্রাহ্য বলে পরিগণিত হয়। যুক্তি-প্রমাণের সেসব উৎসও অগ্রাহ্য হয়, যা বিতর্কগ্রন্থের সারবস্তু। এগুলো থেকেই সেই মধ্যবর্তী ধারণার উৎপত্তি যা অনুমানের দুটি প্রান্তকে একত্র করে থাকে। এ সামগ্রিক অগ্রাহ্যতার ফলে একমাত্র কাঠামোগত অনুমানই অবশিষ্ট থাকে এবং সংজ্ঞাসমূহের মধ্যে সেই সংজ্ঞাই অবশিষ্ট থাকে, যা সংজ্ঞিত বিষয়ের সব অংশের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। বস্তুত এটি তদ্রূপ অবস্থা থেকে সাধারণ হবে না, যাতে তার মধ্যে অন্য কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে এবং তা থেকে বিশেষও হবে না, যাতে তার মধ্যকার কিছু অংশ বাইরে থেকে যেতে পারে। সংজ্ঞার এ দুটি দিককেই ব্যাকরণবিদগণ 'সমন্বয়' ও 'প্রতিরোধ' এবং কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ 'বিতাড়ন' 'ও' 'প্রতিফলন' নামে[২৫৮] ব্যাখ্যা করে থাকেন।

এভাবে তাঁদের কাছে যুক্তিবিদ্যার সব স্তম্ভই ধসে পড়ে। সুতরাং আমরা যখন যুক্তিবিদ্যার ধারা অনুসারে উপরোক্ত বিষয়গুলোকে প্রতিষ্ঠা করতে যাই, তখন কালামশাস্ত্রবিদদের প্রস্তাবনার অনেক কিছুই অগ্রাহ্য করতে হয়। এর ফলে তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কীয় যুক্তি-প্রমাণের অগ্রাহ্যতা দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে; যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই কালামশাস্ত্রবিদদের মধ্যে পূর্বসূরিরা এ যুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের প্রতি এমন মারমুখী অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এবং যুক্তি-প্রমাণের অগ্রাহ্যতার প্রতি লক্ষ রেখে একে অভিনব মত অথবা ধর্মদ্রোহিতা বলে গণ্য করেছেন।

কিন্তু ইমাম গাজ্জালী হতে আরম্ভ করে উত্তরসূরিগণ যুক্তি-প্রমাণের প্রতিবিম্বন ধর্মিতাকে অস্বীকার করেছেন এবং তাঁদের কাছে যুক্তি-প্রমাণের অগ্রাহ্যতার দ্বারা প্রামাণ্য বিষয় অগ্রাহ্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী নয়। তাঁর যুক্তিবিদ্‌দের বুদ্ধিগ্রাহ্য বিন্যাস, স্বভাববিশিষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব এবং বাস্তবে সার্বিক ধারণার অবস্থান সম্পর্কীয় মতামতকে শুদ্ধ বলে গণ্য করেছেন। এর ফলে তাঁরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ধর্মীয় বিশ্বাসের কতিপয় যুক্তি-প্রমাণের বিরোধী হলেও যুক্তিবিদ্যা সাধারণভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসাদির পরিপন্থী নয়। বরং তাঁরা এমন প্রমাণও উপস্থিত করেছেন, যার ফলে কালামশাস্ত্রবিদ্‌দের রচিত অনেক প্রস্তাবনাই অগ্রাহ্য হয়ে গেছে। যেমন স্বয়ম্ভু-অণু ও মধ্যবর্তী শূন্যতার অবাস্তবতা এবং আপতিক বস্তু ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা তাঁরা সপ্রমাণ করেছেন। তাঁরা কালামশাস্ত্রবিদ্‌দের যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াও অন্যবিধ যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এক্ষেত্রে পূর্বোক্ত যুক্তি-প্রমাণকে মনন ও বুদ্ধিগ্রাহ্য অনুমানের দ্বারা শুদ্ধ করেছেন। এতে প্রথা অনুযায়ী ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটির কথা তাঁরা স্বীকার করেননি।

---

২৫৮. মূল শব্দগুলো যথাক্রমে 'জমা ও মানা' এবং 'তয়দ ও আক্‌স'।

এটাই ইমাম ইবনে খতিব ও গাজ্জালী এবং তাঁদের অনুসারীদের বর্তমানকালীন অভিমত। পাঠক, এ বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং শাস্ত্রবিদ্‌রা কোন্ ধারা অনুসারে, কোন্ উপলব্ধির ভিত্তিতে তাঁদের মতামত প্রকাশ করে থাকেন, তা সম্যকরূপে জেনে নিন। আল্লাহ্ যথার্থতার দিকে পথ প্রদর্শন এবং গমনে সহায়তা করে থাকেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

[পদার্থবিদ্যা]

এটি এমন একটি শাস্ত্র, যা গতি ও স্থিতির দিক থেকে দেহ সম্পর্কে আলোচনা করে। এটি আকাশীয় বস্তুপুঞ্জ ও মৌল উপাদান এবং তৎসৃষ্ট মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ ও খনিজ পদার্থ সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে। পৃথিবীতে সৃষ্ট ঝর্ণাধারা, ভূমিকম্প এবং আকাশে সৃষ্ট মেঘ, বাষ্প, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড় ইত্যাদি সম্পর্কেও এটি বিচার করে দেখে। এর অন্য বিচারের বিষয় হল দেহের মধ্যে গতির আরম্ভ অর্থাৎ সেই প্রাণশক্তি, যা বিচিত্রভাবে মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে বিরাজমান।

এ বিষয়ে এরিস্টটলের গ্রন্থাবলি মানুষের সামনে বিদ্যমান। দর্শনশাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থের সাথে এগুলোও সম্রাট মামুনের শাসন আমলে অনূদিত হয়েছিল। এ ধারা অনুসরণ করেই মানুষ এগুলোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রন্থাদি রচনা করেছে। এসব রচনার মধ্যে ইবনে সিনা বিরচিত 'কিতাবুশ্ শেফা' এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনায় সমৃদ্ধ। তিনি এতে দর্শনের সাতটি শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করেছেন, যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তারপর তিনি এর সংক্ষিপ্ত-সার বর্ণনা করে 'কিতাবুন্ নাজাত' ও 'কিতাবুল ইশারাত' রচনা করেছেন। সেখানে বলতে গেলে তিনি এরিস্টটলের বহু মতামতের বিরোধিতা করে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু ইবনে রুশদ এরিস্টটলের গ্রন্থটি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই সংক্ষিপ্ত-সার ও ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর পরে বহু লোক এ বিষয়ে গ্রন্থাদি রচনায় আত্মনিয়োগ করেছে; তবুও তাঁদের এ গ্রন্থগুলোই বর্তমানকালেও এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজনমান্য।

পূর্বাঞ্চলবাসীরা ইবনে সিনা বিরচিত 'কিতাবুল ইশারাত'কেই আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছে। ইমাম ইবনে খতিব উক্ত গ্রন্থটির একটি উত্তম ব্যাখ্যা প্রস্তুত করেছেন। আমেদীরও[২৫৯] অনুরূপ একটি ব্যাখ্যা বিদ্যমান। খাজা নামে পরিচিত নাসিরউদ্দিন তুসীও[২৬০] এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেছেন। ইনিও পূর্বাঞ্চলবাসী এবং উক্ত গ্রন্থের বহু বিষয়ে তিনি ইবনে খতিবের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন। এর ফলে তাঁর চিন্তা ও আলোচনায় আরও বিস্তৃতি এসেছে। বস্তুত 'প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে তিনি মহাজ্ঞানী।'[২৬১] আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।

---

২৫৯. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১১৫ নং টিকা দ্র:।

২৬০. মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ; ৫৯৭-৬৭২ (১২৩১-১২৭৪ খ্রি:) হি:।

২৬১. কোরান; ১২, ৭৬

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

[চিকিৎসাশাস্ত্র]

পদার্থবিদ্যারই একটি শাখা চিকিৎসাশিল্প। এ শিল্পজ্ঞান রোগ ও আরোগ্যের ভিত্তিতে মানুষের দেহ নিয়ে বিচার-বিবেচনা করে। সুতরাং দেহের অধিকারীকে স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও রোগ নিরাময় সম্পর্কে এ শাস্ত্র ওষুধ ও পথ্যের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে থাকে। অবশ্য এর পূর্বে সে দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট রোগাদি, সেগুলোর উৎপত্তির যথাস্থানীয় কারণ এবং রোগের যোগ্য ওষুধ নির্ণয় করে। এক্ষেত্রে চিকিৎসাশাস্ত্র একদিকে ওষুধের মিশ্রণ ও শক্তির প্রতি এবং রোগের চিহ্নাদির মাধ্যমে এর অবস্থা ও ওষুধ গ্রহণের যোগ্যতার প্রতি লক্ষ রাখে। প্রথমে সে রোগীর অবয়ব, মলমূত্রাদি ও নাড়ী পরীক্ষা করে এবং এগুলোর মধ্যে স্বভাব-শক্তির যথারীতি প্রকাশকে প্রত্যক্ষ করে। কেননা স্বাস্থ্য ও রোগ—উভয় অবস্থাতেই স্বভাবই পরিচালিকা শক্তি। চিকিৎসক কেবলমাত্র সেই শক্তিকে দেহের গঠন, ঋতু ও বয়স অনুসারে এর স্বাভাবিক প্রকাশের মধ্য দিয়ে কতকাংশে অনুধাবন ও নিরীক্ষণ করে। যে জ্ঞান এ সব বিষয়কে একত্র করে তাকেই বলা হয় চিকিৎসাশাস্ত্র।

অনেক সময় একটি বিশেষ অঙ্গকে পৃথকভাবে আলোচনা করে এ সম্পর্কীয় জ্ঞানকেই একটি বিশেষ শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। যেমন—চক্ষু, তার রোগ শোকাদি এবং সুরমাদি প্রয়োগে আরোগ্য প্রক্রিয়ার বর্ণনা। অনুরূপভাবে উক্ত শাস্ত্রের সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপকারিতার জ্ঞানকে সংযুক্ত করা হয়। এর অর্থ প্রাণিদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে উপকারিতার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তা বর্ণনা করা। যদিও এরূপ বর্ণনার সাথে চিকিৎসাশাস্ত্রের কোন সম্পর্ক নেই, তবুও চিকিৎসাবিদ্‌গণ একে উক্ত শাস্ত্রের অনুসারী ও অনুগামী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন।

এ বিষয়ে গ্যালেনের একটি মহৎ গ্রন্থ বিদ্যমান, যা খুবই উপকারী। বস্তুত তিনিই এ বিষয়ে নেতৃস্থানীয় এবং তাঁর গ্রন্থটি পূর্বসূরিদের সময়েই অনূদিত হয়েছিল। বলা হয় তিনি হযরত ইসা (আঃ)-এর সমসাময়িক ছিলেন এবং বলা হয় যে, তিনি নির্বাসিত অবস্থায় বাধ্য হয়ে চাপের মুখে সিসিলি দ্বীপে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ বিষয়ে তাঁর গ্রন্থাদিকেই পরবর্তী চিকিৎসাবিদ্‌গণ সকলেই অনুসরণ করেছেন।

ইসলামী জগতে এ শিল্পে এমন সব নেতৃস্থানীয় চিকিৎসাবিদ জন্মেছেন, যাঁরা নানা বিষয়ে পূর্বসূরিদেরকে অতিক্রম করে গেছেন। যেমন—ইমাম রাযী,[২৬২] আল মজুসী,[২৬৩]

---

২৬২. মুহম্মদ ইবনে জাকারিয়া; ২৫১-৩১৩ (৮৬৫-১২৫ খ্রি:) হি:।

২৬৩. আলী ইবনে আব্বাস খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী।

ইবনে সিনা এবং আন্দালুসবাসীদের মধ্যেও অনেকে আছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ইবনে জহুর।[২৬৪] এ শিল্পটি বর্তমানকালে মুসলিম অধ্যুষিত নগরগুলোতে তাদের জনবসতি হ্রাস পাওয়ায় ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। বস্তুত এটি এমন একটি শিল্পজ্ঞান, যা একমাত্র নাগরিকত্ব ও বিলাস-ব্যসনের ফলেই প্রয়োজনীয় বলে অনুমিত হয়; যেমন এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে বিশদ বর্ণনা করব।

বেদুইন জনগোষ্ঠিতেও এক প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্র বিদ্যমান, সাধারণভাবে যার ভিত্তি তারা কতিপয় ব্যক্তির অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার উপর স্থাপন করে থাকে। তারা এটি পুরুষানুক্রমে গোত্রের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের কাছ থেকে লাভ করে আসছে। অনেক সময় এ চিকিৎসার দ্বারা অনেকে সুস্থ হয়; কিন্তু কোন ক্রমেই এটি স্বাভাবিক পদ্ধতিজাত নয় এবং যথার্থ মেজাজ অনুযায়ীও নয়।

আরব বেদুইনদের কাছে এমন চিকিৎসা প্রচুর ছিল এবং তাদের মধ্যে বহু খ্যাতিমান চিকিৎসকও ছিল। যেমন হারেস ইবনে কালাদা[২৬৫] ও অন্যান্য চিকিৎসকবৃন্দ। ধর্মীয় বিধানে যেসব চিকিৎসার কথা বর্ণিত হয়েছে, তাও এ প্রকৃতির। ওহীর দ্বারা এ ব্যাপারে কোন কিছুই সাব্যস্ত হয়নি। এগুলো একান্তই আরব বেদুইনদের অভ্যাসের বিষয়। নবী (সঃ)-এর অবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর যে উল্লেখ এসেছে, তা এ অভ্যাস ও সহজাত প্রবৃত্তির ব্যাপার। এটি ওহীর দ্বারা নির্দিষ্টকৃত কোন অবশ্য পালনীয় বিষয় নয়। কারণ নবী (সঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছে আমাদেরকে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ শিক্ষা দেবার জন্য; চিকিৎসাশাস্ত্র ও অনুরূপ অন্যান্য অনুশীলনযোগ্য শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করার জন্য নয়। খেজুরের ফলোৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর যে অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে, তা সুপরিজ্ঞাত। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "তোমরা তোমাদের পার্থিব বিষয়ে বেশি অবগত।"[২৬৬] সুতরাং বিশুদ্ধ হাদিসাদিতে এ চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তাকে কোন ক্রমেই শাস্ত্রীয় বিধান হিসেবে গণ্য করা যায় না। সেখানে এরূপ প্রমাণ করার কোন কিছু পাওয়াও যায় না। অবশ্য আল্লাহ্ চান তো এগুলোকে যদি কল্যাণের বাহক হিসেবে সত্য বিশ্বাসে প্রয়োগ করা যায়, তা হলে তার দ্বারা মহৎ উপকারের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু কোন প্রকারেই তা মেজাজ অনুসারী চিকিৎসা নয়; বরং তা বিশ্বাস বচনের একান্ত প্রভাব মাত্র। যেমন মধু দ্বারা পেটের পীড়া নিরাময় ও অন্যান্য ব্যাপারে দেখা গেছে।[২৬৭] আল্লাহ্ যথার্থতার দিকে পথ প্রদর্শন করে থাকেন এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রতিপালক নেই।

---

২৬৪. আব্দুল মালীক ইবনে জুহর; মৃত্যু ৫৫৭ (১১৬২ খ্রি:) হি:।

২৬৫. কিংবদন্তীধন্য এ চিকিৎসকের জীবনকাল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হতে হযরত মাবিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।

২৬৬. এ ঘটনাটি মদিনার; খেজুরের ফলোৎপাদন বৃদ্ধি প্রক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য অ-ফলপ্রসূ হলে তিনি এ কথা বলেন।

২৬৭. অনুরূপভাবে মধু সম্পর্কে মন্তব্য বিদ্যমান। হাদিস গ্রন্থ দ্র.।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

[কৃষিবিদ্যা]

এ শিল্পজ্ঞানটি পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত। এটি সেচ, সার প্রয়োগ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভিদের পরিচর্যা ও বৃদ্ধি সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে এবং উদ্ভিজ্জস্থানের নবায়ন, মরসুমের যোগ্যতা ও যা কিছু উদ্ভিদের কল্যাণপূর্ণতা বিধান করে, সেসবই এর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত।

পূর্বসূরিগণ এ ব্যাপারে অতিমাত্রায় আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা উদ্ভিদের রোপণ ও বৃদ্ধি এবং তার বৈশিষ্ট্য ও সজীবতার সর্বব্যাপারে দৃষ্টিপাত করতেন। তাঁরা উদ্ভিদের এ সজীবতার যে দিকটিকে নক্ষত্র ও গ্রহাদির প্রভাবের অধীন বলে মনে করতেন, তার সবই যাদুবিদ্যায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ কারণে তাঁরা উপরিউক্ত বিষয়ে বেশি মনোযোগী হয়েছিলেন।

গ্রিকদের গ্রন্থাবলি হতে নবতী জ্ঞানীদের নামের সাথে জড়িত 'কিতাবুল ফলাহাতিন্ নাবতিয়া' (নবতী কৃষিবিদ্যার গ্রন্থ)[২৬৮] নামে একটি গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে, যা এ বিষয়ে প্রচুর জ্ঞানের আধারস্বরূপ। মুসলমানরা যখন এ গ্রন্থের বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি দিল, তখন তারা দেখতে পেল যে, এর সাথে যাদুবিদ্যা সম্পর্কীয় যে বিষয় সংযুক্ত রয়েছে, তার পথ তাদের কাছে রুদ্ধ এবং তার প্রতি দৃষ্টি তাদের কাছে নিষিদ্ধ। সুতরাং তারা উক্ত গ্রন্থের উদ্ভিদ রোপণ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তার পরিচর্যা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখল। অন্য বিষয়টির সাথে সম্পর্কীয় যাবতীয় আলোচনা তারা পরিত্যাগ করল। ইবনে আওয়াম[২৬৯] এ প্রক্রিয়াতেই 'নবতী কৃষিগ্রন্থের' সংক্ষিপ্তকরণ করেছেন এবং অন্য বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে। পরে মাসলামা তাঁর যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থাদিতে উপরিউক্ত বিষয়ের মূল বক্তব্যগুলো সংগৃহীত করেছেন; যেমন মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমরা যাদুবিদ্যার উপর আলোচনাকালে এদের উল্লেখ করব।

কৃষিবিদ্যা সম্পর্কে উত্তরসূরিদের প্রচুর রচনা বিদ্যমান। এতেও আলোচনা উদ্ভিদের রোপণ, পরিচর্যা তার অভাব ও বাধা-বিপত্তি দূরীকরণ এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়কে অতিক্রম করেনি। এসব রচনা বর্তমানকালেও বিদ্যমান।

---

২৬৮. গ্রন্থটি আবুবকর মুহম্মদ ইবনে আলী ইবনে ওহশিয়ার নামের সাথে জড়িত।
২৬৯. ইয়াহিয়া ইবনে মুহম্মদ; দ্বাদশ শতাব্দীর (খ্রি:) প্রথমার্ধ।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

[অধ্যাত্মবিদ্যা]

এটি এমন একটি শাস্ত্র, যা একান্ত সত্তার ব্যাপারে বিচার-বিবেচনা করে। প্রথমে সে দেহ ও আত্মা সম্পর্কীয় সাধারণ বিষয়, তথা—সত্তা, একত্ব, বহুত্ব, অবশ্যম্ভাবিতা, সম্ভাব্যতা এবং ইত্যাকার অন্যান্য বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত হয়। তারপর সে সৃষ্টির আদি সম্পর্কে দৃষ্টি দেয় এবং এ আদি পর্যায় একান্তভাবে আধ্যাত্মিক। এর পর তা হতে দৃষ্টি জগতের বিকাশ ও পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করে। পরবর্তী পর্যায়ে দেহবিচ্যুত আত্মার অবস্থাবৈচিত্র্য ও তার প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন নিয়ে বিবেচনা করে থাকে।

এটি আধ্যাত্মবিদ্‌দের কাছে একটি মহান শাস্ত্র। তাঁদের ধারণা, এটি তাঁদেরকে অস্তিত্বের যথাযথ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে সাহায্য করে এবং তাঁদের ধারণা অনুসারে এটাই সৌভাগ্যের যথার্থ স্বরূপ। অনতিবিলম্বে তাঁদের এ ধারণার প্রতিবাদ বর্ণিত হচ্ছে। তাঁদের বিন্যাস অনুসারে এ শাস্ত্র পদার্থবিদ্যার পরবর্তী পর্যায়। এজন্যই তাঁরা একে 'পদার্থের পরবর্তী' (অধি) বিদ্যা বলে অভিহিত করে থাকেন।

এ বিষয়ে প্রথম শিক্ষকের গ্রন্থাবলি মানুষের সামনে বিদ্যমান। ইবনে সিনা তাঁর 'কিতাবুশ্ শেফা ও নাজাত' গ্রন্থদ্বয়ে এদের সংক্ষিপ্ত-সার সংগ্রহ করেছেন। আন্দালুসের দার্শনিকদের অন্যতম ইবনে রুশদও এর সংক্ষিপ্ত-সার প্রকাশ করেছেন। উত্তরসূরিরা যখন জাতির শাস্ত্রালোচনার ধারা প্রবর্তন করলেন এবং এ বিষয়েও তাঁরা সংগ্রহ প্রকাশ করলেন, তখন ইমাম গাজ্জালী তার মধ্যে যা অগ্রাহ্য করার, তা অগ্রাহ্য করলেন।

অতঃপর উত্তরসূরি কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ আলোচনার সামঞ্জস্যের জন্য এলমে কালাম ও দর্শনের বিষয়াদি একত্রে মিশ্রিত করে ফেললেন। এর ফলে এলমে কালামের বিষয় ও আধ্যাত্মবিদ্যার বিষয় সমতুল্য মনে হতে লাগল এবং তাদের সমস্যাগুলো প্রায় এক হয়ে দাঁড়াল। ফলে উভয় শাস্ত্র এমনভাবে মিশ্রিত হল যে, তারা যেন একটি শাস্ত্র। তারপর তাঁরা পদার্থবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যায় দার্শনিক বিন্যাস পরিবর্তন করে ফেললেন এবং সেগুলোকে মিশ্রিত করে একটি শাস্ত্রে পরিণত করলেন। তাঁরা প্রথমে সাধারণ বিষয়াদি হিসেবে এলমে কালামের বর্ণনা করে এর পর দেহসংক্রান্ত বিষয়াদি ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় এবং এর পর আত্মা সংক্রান্ত বিষয়াদি ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় আলোচনা করলেন। এভাবে তাঁরা উক্ত শাস্ত্রের শেষ অবধি অনুসরণ করেছেন। যেমন ইমাম ইবনে খাতিব তাঁর 'মবাহিছুল মশরেকিয়া' নামক গ্রন্থে এবং তাঁর পরবর্তী সব কালামশাস্ত্রীই তাঁদের রচনাবলিতে করেছেন।

এভাবে এলমে কালাম দর্শনের বিষয়ের সাথে মিশে গেছে এবং দর্শনের আলোচ্য বিষয়ে তার গ্রন্থাদি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেন তাদের আলোচ্য বিষয় ও সমস্যাদি একই উদ্দেশ্য বহন করছে। ফলে মানুষের মধ্যে এমন এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে যে, এ শাস্ত্র সঠিক। অথচ এলমে কালামে বর্ণিত সমস্যাদি একমাত্র ধর্মীয় বিধানের মাধ্যমে প্রবর্তিত বিশ্বাসের সমষ্টি। পূর্বসূরিগণ এগুলোকে কোন প্রকার বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রমাণ ও ব্যাখ্যার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। যার অর্থ এই যে, এগুলো অনুরূপভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ বুদ্ধি-বিবেচনা, ধর্মীয় বিধান ও তার যুক্তি-তর্ক থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। কালামশাস্ত্রবিদ্‌রা যে এসব বিষয়ে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করেছেন, তা এজন্য নয় যে, তার দ্বারা তাঁরা এ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কারণ এরূপ প্রতিষ্ঠা একান্তভাবে দর্শনের ব্যাপার। বরং এসব যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা তাঁরা পূর্বসূরিদের মতাদর্শকে আরও শক্তিশালী করতে চেয়েছেন এবং এ উদ্দেশ্যেই তাঁদের বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি-প্রমাণের অন্বেষণ। অন্যদিকে এর দ্বারা তাঁরা সে সব অভিনব মতাদর্শকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছেন, যার অনুসারীরা ধারণা করে যে, এ ব্যাপারে তাদের উপলব্ধির ভিত্তি হল বুদ্ধিমত্তা। অবশ্য তাঁদের এ প্রচেষ্টাও ধর্মীয় বিশ্বাসকে শ্রুতিনির্ভর প্রমাণাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠা এবং পূর্বসূরিদের শিক্ষা অনুযায়ী বিশ্বাস করার পরই অস্তিত্বে এসেছে। যুক্তি-প্রমাণের এ দুটি পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর।

কারণ ধর্মপ্রবর্তকের উপলব্ধির পরিধি মননশীল উপলব্ধির যুক্তি-প্রমাণ হতে ব্যাপকতর বিন্যাসে অবস্থিত। এটি সর্বদাই বুদ্ধির উপরে অবস্থান করে এবং তাকে পরিবেষ্টন করে থাকে। কেননা এটি সর্বদাই ঐশ্বরিক জ্যোতির দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছে। সুতরাং এটি কোনক্রমেই দুর্বল মননশীলতা ও পরিবেষ্টিত উপলব্ধির অধীনে আসতে পারে না। কাজেই ধর্মপ্রবর্তক যখন আমাদেরকে কোন একটি উপলব্ধির দিকে পথ প্রদর্শন করেন, তখন আমাদের উচিত তাকে আমাদের উপলব্ধির উপরে স্থান দেয়া এবং অনুরূপভাবেই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আমরা মননশীল উপলব্ধির দ্বারা কখনই তাকে শুদ্ধ করতে অগ্রসর হব না; যদিও তা আমাদের মননশীলতার বিরোধী হয়। বরং তাকে আমরা বিশ্বাস ও জ্ঞান হিসেবেই আদেশ পালনে তৎপর হব। আমরা যদি এর কোন কিছু বুঝতে অক্ষম হই, তা হলে তৎসম্পর্কে নীরব থাকব এবং তাকে ধর্মপ্রবর্তকের দিকে আরোপ করব ও আমাদের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকব।

ধর্মদ্রোহীরা পূর্বসূরিদের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরোধিতা করে যে সব যুক্তিগ্রাহ্য অভিনব মতামতের প্রচার করেছিল, কালামশাস্ত্রবিদ্‌রা সেগুলোর প্রতিরোধকল্পেই এ সব যুক্তি-প্রমাণের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। সুতরাং তাঁরা তাদের অনুরূপ যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা তাদের প্রতিবাদ করতে অগ্রসর হলেন এবং এ কারণেই যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদির প্রয়োজন দেখা দিল; যাতে পূর্বসূরিদের মতাদর্শ তার সাহায্যে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। কিন্তু পদার্থবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যায় আলোচিত বিষয়াদির বিচার-বিবেচনা করে শুদ্ধ ও অগ্রাহ্য করার ব্যাপারটি কখনই এলমে কালামের আলোচ্য বিষয় হতে পারে না এবং কালামশাস্ত্রবিদ্‌দের বিচার-বিতর্কের বিষয়ও এটি নয়।

পাঠক, জেনে রাখুন, আমাদের এ আলোচনা এ উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত, যাতে আপনি উক্ত দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারেন। কারণ এ দুটি শাস্ত্র উত্তরসূরিদের কাছে তাদের গঠন ও রচনার দিক থেকে মিশ্রিত অবস্থায় বিদ্যমান। কিন্তু সত্য এই যে, তাদের প্রত্যেকটিই সংশ্লিষ্ট অধিকারীর জন্য তাদের আলোচ্য বিষয় ও সমস্যাদিসহ পৃথক। তাদের এ মিশ্রণ একমাত্র যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনের দিক হতেই সম্ভব হয়েছে এবং কালামশাস্ত্রবিদ্‌দের এমন যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করেছে, যেন তাঁরা যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা বিশ্বাস উৎপাদন করতে চেয়েছেন। কিন্তু বিষয়টি আদৌ তা নয়; বরং তা শুধু ধর্মদ্রোহীদের মতামতের প্রতিবাদ। যে সত্যকে ধরে নিয়ে তাঁরা উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হয়েছেন, তা সকলের কাছে সুপরিজ্ঞাত।

অনুরূপভাবে উত্তরসূরিদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাসী সুফীসাধক কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ তাঁদের দিব্যানুভূতি নিয়েও আলোচনায় ব্যাপৃত হয়েছেন। তাঁরা উপরিউক্ত দুটি বিষয়ের সাথে তাঁদের বিষয়টি মিশ্রিত করে সব ব্যাপারটিকেই এক আলোচনার অন্তর্গত করেছেন। যেমন—নবুয়ত, একত্ব, অবতারত্ব, এককসত্তা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তাঁদের আলোচনা। অথচ এ তিনটি বিষয়ে উপলব্ধির ক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক। বিশেষ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাস্ত্রানুসারী ধারা থেকে সুফীসাধকদের উপলব্ধি বহুদূরে অবস্থিত। কারণ তাঁরা এ ব্যাপারে দিব্যানুভূতির কথা বলেন এবং কোন প্রকার প্রমাণ থেকে সর্বদা দূরে থাকেন। বস্তুত দিব্যানুভূতি শাস্ত্রীয় আলোচনা ও তার অনুসারী উপলব্ধির ক্ষেত্র থেকে বহুদূরে বিরাজমান। আমরা ইতোপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং পরেও আলোচনা করব। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্‌ই একমাত্র যথার্থ সত্য সম্পর্কে জ্ঞাত।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

[যাদু ও ইন্দ্রজাল সম্পর্কীয় শাস্ত্রাদি]

এসব শাস্ত্র এমন কিছু যোগ্যতার কথা আলোচনা করে, যা দ্বারা মানুষের আত্মশক্তি মৌলিক উপাদানের জগতে বিশেষ প্রভাব প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়। এ প্রভাব প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কোন কিছুর সহায়তা গ্রহণ না করলে, তাকে বলা হয় 'যাদু' এবং আকাশীয় বিষয়াদির সহায়তা গ্রহণ করলে, তাকে বলা হয় 'ইন্দ্রজাল'।

ধর্মীয় বিধানে যেহেতু এসব বিদ্যা নিষিদ্ধ ছিল; কেননা এগুলোতে অনিষ্টকর বিষয় এবং আল্লাহ ছাড়া নক্ষত্র অথবা অন্যবিধ শক্তির প্রতি একাগ্র হওয়ার শর্ত ছিল, সেজন্য এ সম্পর্কীয় রচনাবলি মানুষের কাছে ছিল না বললেই চলে। শুধু হযরত মুসা (আঃ)-র পূর্ববর্তী প্রাচীন জাতিগুলোর গ্রন্থাদিতে যা কিছু পাওয়া যেত। যেমন—নবতী ও কেলাদীয়দের গ্রন্থাবলি। কারণ তাঁর পূর্ববর্তী সব নবীই কোন প্রকার ধর্মীয় বিধান এবং তৎসম্পর্কীয় বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করেননি। তাঁদের গ্রন্থাবলিতে উপদেশ, আল্লাহ্‌র একত্ব এবং বেহেশত-দোজখ সম্পর্কীয় বিবরণই লিপিবদ্ধ থাকত।

সুতরাং এসব বিদ্যা ব্যাবিলনের অধিবাসী সিরীয় ও কেলাদীয়দের মধ্যে এবং মিশরের কিবতী ও অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। এসব বিষয়ে তাদের মধ্যে গ্রন্থাদি ও অন্যান্য নিদর্শনও ছিল। এ বিষয়ে তাদের গ্রন্থাদির অতি অল্পই আমাদের মধ্যে অনূদিত হয়েছে। যেমন ব্যাবিলনের ধারা অনুসারে ইবনে ওয়াহশিয়া রচিত 'আল ফালাহতুন্ নবতিয়া' গ্রন্থটি। মানুষ এ গ্রন্থ থেকে এ বিষয়টি গ্রহণ করে তাকে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত করেছে। এর পর বিষয়টি তারা বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত করে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছে। যেমন—'সাত তারকার পুস্তিকাবলি' এবং নক্ষত্র, রাশিচক্র ও অন্যান্য বিষয় সম্বলিত 'তিমতিম হিন্দী' নামক গ্রন্থ।[২৭০]

পরবর্তীকালে পূর্বাঞ্চলে এ জাতির নেতৃস্থানীয় যাদুকর জাবেন ইবনে হাইয়ানের[২৭১] আবির্ভাব ঘটল। তিনি এবিষয়ে সব জাতির গ্রন্থাবলি অনুসন্ধান করে এ শিল্পটিকে আবিষ্কার করলেন এবং এর সারাংশ অন্বেষণ করে একে যথানিয়মে প্রকাশ করলেন। এ বিষয়ে তাঁর একাধিক রচনা বিদ্যমান। তিনি এ বিষয়ে ও 'সিমিয়া'[২৭২] শাস্ত্রে তাঁর আলোচনাকে দীর্ঘ করেছেন; কেননা শেষোক্তটি তারই অনুসারী। কারণ কোন একটি

---

২৭০. 'তুমতুম' 'তমতম' (রোজেনথাল)।

২৭১. কিমিয়া বা রসায়নশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেই ইতিহাসখ্যাত।

২৭২. মূল গ্রন্থে আমরা সিমিয়া পেয়েছি; কিন্তু শব্দটি কিমিয়া হলে অধিকতর মানানসই হত।

আকৃতিকে অন্য কোন আকৃতিতে রূপান্তরিত করা একমাত্র আত্মিক শক্তির দ্বারাই সম্ভব, বাস্তব শিল্প প্রক্রিয়ার দ্বারা নয়। সুতরাং তাও এক প্রকার যাদুবিদ্যা; যেমন আমরা যথাস্থানে তার আলোচনা করব।

অতঃপর আন্দালুসের যাদুশাস্ত্রাদি ও শিক্ষণীয় বিষয়াদির নেতৃস্থানীয় জ্ঞানী মাসলামা ইবনে আহমদ মাজারিতী আবির্ভূত হলেন। উপরিউক্ত সব গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত-সার রচনা ও সংস্কার সাধন করলেন এবং 'গায়াতুল হাকিম' নামক তাঁর গ্রন্থে সবাইকে একত্র করে ফেললেন। তাঁর পরে আর কেউ উপরিউক্ত বিষয়ে কোন রচনা উপস্থিত করেননি।

পাঠক, এখানে আমরা আপনার সামনে যাদুর স্বরূপ উদঘাটনের জন্য একটি ভূমিকার অবতারণা করব। এটি এই যে, মানুষের আত্মাসমূহ যদিও জাতিগত দিক থেকে এক; কিন্তু বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তা বিভিন্ন। তাদের কয়েকটি প্রকার বিদ্যমান এবং প্রতিটি প্রকার সত্তাগত দিক থেকে এমন একটি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিশিষ্ট যা অন্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রতিটি প্রকারের জন্য তার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিশিষ্ট সহজাত প্রবৃত্তি ও জন্মগত চরিত্রে পরিণত হয়েছে। নবী (আঃ)-দের আত্মাসমূহের জন্য এমন একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা তাঁদেরকে মানবীয় আত্মশক্তি হতে ফেরেশতীয় আত্মশক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার যোগ্যতা প্রদান করে, এবং রূপান্তরণে এ বিশেষ মুহূর্তটিতে তাঁরা যথার্থই ফেরেশতা হয়ে দাঁড়ান। এটাই ওহীর তাৎপর্য; যেমন যথাস্থানে তার আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এটাই সেই অবস্থা, যাতে তাঁরা ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ এবং পবিত্র ও মহান আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রেরিত ফেরেশতাদের ভাষণের সাক্ষাৎ লাভ করে থাকেন; যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত এ অবস্থা থেকেই তাঁরা সৃষ্টিজগতে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা লাভ করেন।

যাদুকরদের আত্মার মধ্যেও এমন একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা দ্বারা তারা সৃষ্টি জগতে প্রভাব বিস্তার এবং সেজন্য ব্যবহারের নিমিত্ত নক্ষত্রীয় আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা অর্জন করে। তাদের এ প্রভাব বিস্তার একান্ত আত্মিক শক্তি বা শয়তানী শক্তির দ্বারা সম্ভব হয়। কিন্তু নবীদের প্রভাবের মূলে ঐশ্বরিক সাহায্য এবং ঐশী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আর যাদুকরদের অদৃশ্য সংবাদ অবগত হওয়ার প্রক্রিয়ায় শয়তানী শক্তির বৈশিষ্ট্যই ক্রিয়াশীল। এভাবে আত্মশক্তির প্রতিটি প্রকারেই এমন একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অপরের মধ্যে পাওয়া যায় না।

যাদুকরদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এ আত্মশক্তি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত; এদের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ। এদের প্রথম পর্যায় হল মানসিক শক্তিতে প্রভাব বিস্তারকারী; এরা এ ব্যাপারে কোন কৌশল বা মাধ্যমের সাহায্য গ্রহণ করে না। এ পর্যায়টিকেই দার্শনিকগণ যাদু (সিহর) বলে অভিহিত করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের আত্মশক্তি আকাশমণ্ডল, মৌলিক উপাদান অথবা সংখ্যার বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক মেজাজের সহায়তায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাঁরা একে বলেন ইন্দ্রজাল (তিলিসমাত)। মর্যাদার দিক হতে এটি পূর্বটি অপেক্ষা নিম্নমানের। তৃতীয় পর্যায়টি কল্পনাশক্তির মধ্যে তার ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করতে চায় এবং এক্ষেত্রে সে বিচিত্র তৎপরতার দ্বারা পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়। সে এই কল্পনার মধ্যে নানাবিধ অদ্ভুত মূর্তি, আকৃতি ও দৃশ্য—যা তার ইচ্ছাশক্তি আনয়ন করতে সক্ষম,

তা উপস্থিত করে। পরে সে এগুলোকে তার আত্মশক্তির প্রভাবে দর্শকদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির কাছে অবতরণ করায় এবং এর ফলে দর্শকরা এগুলোকে বাস্তবে অস্তিত্বশীল বলে দেখতে পায়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেখানে অনুরূপ কিছুর অস্তিত্ব নেই। যেমন অনেকের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা উদ্যান, নদ-নদী ও প্রাসাদ দেখিয়েছে; অথচ বাস্তবে সেখানে অনুরূপ কিছু ছিল না। একে দার্শনিকগণ 'শউযা' অথবা 'শবযা' অর্থাৎ ভোজবাজি বলে আখ্যায়িত করেন। এটাই এ পর্যায়গুলোর ব্যাখ্যা।

অতঃপর এ বৈশিষ্ট্য যাদুকরদের আত্মশক্তিতে সম্ভাবনার আকারে সুপ্ত থাকে; যেমন সমস্ত মানবিক শক্তির স্বাভাবিক অবস্থা। এটি একমাত্র অনুশীলনের মাধ্যমেই বাস্তবে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুত যাদুকরদের এ অনুশীলন আকাশমণ্ডল, নক্ষত্রাদি, উর্ধ্ব জগৎ, শয়তানী শক্তি প্রভৃতি নানা প্রকার সম্মান, উপাসনা, বিজয়, আনুগত্যের মাধ্যমে একাগ্র হওয়ার দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এজন্যই একে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের প্রতি একাগ্রতা ও প্রণিপাত বলে চিহ্নিত করা হয় এবং বস্তুত আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের প্রতি একাগ্রতা ধর্মদ্রোহিতারই নামান্তর। এ দিক হতেই যাদু মাত্রেই ধর্মদ্রোহিতা এবং এর উপাদান ও কার্যকারণের মধ্যে এ ধর্মদ্রোহিতা বিদ্যমান; যেমন পাঠক, আপনি ইতোপূর্বে লক্ষ করেছেন। সম্ভবত এজন্য ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌গণ যাদুকরকে হত্যা করার ব্যাপারে মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন। কেননা এ হত্যার বিধান কি তার কার্যাবলির পূর্বেকার ধর্মদ্রোহিতার জন্য অথবা সে যে দুষ্কর্মের অনুষ্ঠান করেছে এবং সেজন্য সৃষ্টিজগতে যে অনাসৃষ্টি দেখা দিয়েছে, সেজন্য? অবশ্য তার কার্যের দ্বারা উক্ত সব কিছুই বাস্তবায়িত হচ্ছে।

যেহেতু যাদুশক্তির প্রথম দুটি পর্যায়ের জন্য একটি বাস্তব তাৎপর্য বিদ্যমান এবং তৃতীয় পর্যায়টির অনুরূপ বাস্তবতা বলে কিছু নেই, সেজন্য জ্ঞানীরা এ শক্তি সম্পর্কে মতভেদের সম্মুখীন হয়েছেন। বস্তুত এ যাদুশক্তির যথার্থই কোন বাস্তব অস্তিত্ব আছে, না এটা একান্তই কাল্পনিক বিষয়? যারা এর বাস্তব অস্তিত্বের কথা বলেন, তাদের দৃষ্টি প্রথম দুটি পর্যায়ের দিকে নিবদ্ধ এবং যারা এর বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন, তারা এ শেষ তৃতীয় পর্যায়টির দিকে লক্ষ করে থাকেন। সুতরাং যথার্থ অর্থে তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই; বরং এ পর্যায়গুলোর মিশ্রণের ফলেই এ পার্থক্য দেখা গেছে। আল্লাহ্ই উত্তম জ্ঞাতা।

পাঠক, জেনে রাখুন, আমরা ইতোপূর্বে যে প্রভাবের কথা বর্ণনা করেছি, তার জন্য জ্ঞানীদের মধ্যে যাদুর অস্তিত্বের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। কুরআন এ সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থিত করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'বরং শয়তানরাই ধর্মকে অস্বীকার করে মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। এবং যা কিছু ব্যাবিলনে দুজন ফেরেশতার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল; হারূত ও মারূত। তারা এ কথা না বলে কাউকেও শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষা মাত্র; সুতরাং ধর্ম ত্যাগ কর না। তারা তাদের উভয়ের কাছ থেকে সেসব বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করত, যা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে পারে। অবশ্য আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া তা দিয়ে কারও কোন ক্ষতি করতে পারত

না'।[২৭৩] বিশুদ্ধ হাদীসে এসেছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে যাদু করা হয়েছিল। এর প্রভাবে তাঁর এরূপ মনে হত যে, তিনি কোন কাজ করছেন; অথচ প্রকৃত অবস্থায় তিনি তা করছেন না। তাঁর উপর কৃত যাদু একটি চিরুনীর মধ্যে রেশমে পেচিয়ে একটি খেজুরপাতার খাপে পুরে 'সিরোয়ান' নামী একটি কূপে[২৭৪] প্রোথিত করে রাখা হয়েছিল তারপর পরাক্রান্ত ও মহিমান্বিত আল্লাহ্ 'মুআব্বাযাত' (আশ্রয় প্রার্থনা) নামীয় দুটি সূরায় এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন : (আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি) 'গ্রন্থিতে ফুঁৎকার প্রদানকারিণীদের অকল্যাণ হতে।' হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'অতঃপর যেসব গ্রন্থির দ্বারা তাঁকে যাদু করা হয়েছিল, তার প্রতিটির উপর এটি পাঠ করতে না করতেই তা খুলে যেত।'

ব্যাবিলনের অধিবাসী, যারা নবতী, কেলাদীয় ও সিরীয়, তাদের মধ্যে যাদুবিদ্যার ব্যাপক প্রসার ছিল। এ সম্পর্কে কুরআন বক্তব্য রেখেছে এবং ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে। হযরত মুসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের সময় ব্যাবিলন ও মিশরে যাদুবিদ্যার বাজার খুবই তেজী ছিল। এ জন্য মুসার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ তারা যে বিষয়ে দক্ষতা দাবি করত এবং প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হত, তার সমগোত্রীয় ছিল। মিশরের সাইদ অঞ্চলের মন্দিরাদির মধ্যে এমন সব নিদর্শন বিদ্যমান, যা উক্ত যাদুবিদ্যার সাক্ষ্য প্রদান করে।

আমরা স্বচক্ষে এমন এক যাদুকরের কার্যকলাপ দেখেছি, যে কাকেও যাদু করতে হলে তার মূর্তি নির্মাণ করত এবং তাতে ঐ ব্যক্তির মধ্যে বর্তমান বৈশিষ্ট্যাদির বিপরীত যাদুকরের ঈপ্সিত ও সাধনযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্যের আরোপ করত। এসব বৈশিষ্ট্যের সংকেত ছিল সংযোজন ও বিয়োজন সম্পর্কীয় কতিপয় নাম ও গুণ। তারপর সে যাদুর জন্য নির্ধারিত ঐ ব্যক্তির যথার্থ বা প্রায় যথার্থ মূর্তির উপর তার বাণী প্রয়োগ করত এবং এ অশালীন ভাষা বারংবার উচ্চারণ করার ফলে তার মুখে জমে উঠা থুথু তার উপর নিক্ষেপ করত। এর সাথে সে পূর্ব থেকে সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত কোন বস্তুতে গিঁট দিত এবং এর দ্বারা সে তার যাদুর অবশ্যম্ভাবী প্রভাবকে সফল করার সু-ধারণা পোষণ করত। সে তার ফুঁৎকারের সঙ্গে সঙ্গে তার সহযোগী জিনকে উদ্দেশ্য সফলের আহ্বান জানাত এবং এর মাধ্যমে তার ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তাকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলত। বস্তুত এ মূর্তি নির্মাণ ও অশালীন ভাষার মধ্যে একটা অশুভ শক্তি বিদ্যমান, যা তার ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে তার মধ্য থেকে বের হয়ে আসত। এর ফলে তার এ প্রক্রিয়া থেকে একটি অশুভ শক্তি জাগ্রত হয়ে যাদুকৃত ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করত।

যাদুবিদ্যার চর্চাকারী এমন অনেক ব্যক্তির কার্যকলাপও দেখেছি, যারা কোন কাপড়ের টুকরা বা চামড়ার অংশের প্রতি ইঙ্গিত করে তার মন্ত্র উচ্চারণ করেছে এবং ঐগুলো তৎক্ষণাৎ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। এরূপভাবে অনেকে চারণভূমিতে ছাগলের পেটের দিকে কর্তনের ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করেছে এবং পরিণামে পেট থেকে নাড়ীভুঁড়ি মাটির উপর ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা শুনতে পেয়েছি যে, বর্তমানকালে হিন্দে এমন যাদুকরও আছে, যারা কোন মানুষের প্রতি ইঙ্গিত করলে তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে মৃত্যুর

২৭৩. কোরান; ২, ১০২।
২৭৪. উক্ত কূপটি মদিনায় অবস্থিত।

কোলে ঢলে পড়ে। অনেক সময় তার হৃদপিণ্ড খুঁজলে আর তা দেহের অভ্যন্তরে পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে ডালিমের প্রতি ইঙ্গিত করলে তার দানাগুলো উধাও হয়ে যায়। এরূপ সুদান ও তুরস্ক সম্পর্কে আমরা শুনেছি যে, সেখানে এমন যাদুকর আছে, যারা মেঘমালাকে যাদু করে নির্ধারিত স্থানে বৃষ্টি বর্ষাতে বাধ্য করে।

অনুরূপভাবে আমরা 'প্রণয় সংখ্যার' ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি। এগুলো হল—'রে-কাফ-রে-ফে-দাল্'; দুটি সংখ্যার একটি হল দুশ বিশ এবং অপরটি হল দুশ চুরাশি। এদের প্রণয় সংখ্যা হওয়ার অর্থ হল এই যে, এদের প্রতিটির অর্ধাংশ, এক-তৃতীয়াংশ, এক-ষষ্ঠাংশ, এবং অনুরূপ অংশাদি একত্র করলে সঙ্গী অন্য সংখ্যাটির সমান হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই এগুলোকে 'প্রণয় সংখ্যা' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ইন্দ্রজালবিদ্যার অধিকারীরা বর্ণনা করেছে যে, প্রণয়ী যুগলের মধ্যে প্রীতিবর্ধন এবং উভয়ের মিলনের ক্ষেত্রে এ সংখ্যাগুলোর জন্য প্রভাব বিদ্যমান। এ উদ্দেশ্যে দুটি প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করতে হবে। এদের একটি শুক্রের উদয়কালে, যখন সে তার কক্ষে অথবা উন্নত অবস্থায় চন্দ্রের প্রতি প্রণয় ও সম্মতিসহ দৃষ্টিপাত করছে, তখন নির্মিত হবে এবং অপরটির জন্য প্রথমটির সপ্তম অবস্থান বেছে নিতে হবে। এদের একটি প্রতিমূর্তির উপর একটি সংখ্যা এবং অপরটির উপর অপর সংখ্যাটি থাকবে। এর মাধ্যমে তার অর্থাৎ প্রিয়তমের মিলনের আধিক্য কামনা করতে হবে। আমি জানি না, এ ক্ষেত্রে আধিক্য বলতে সংখ্যা না অংশের কথা বলা হয়েছে। যাহোক এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রণয়ী যুগলের মধ্যে এমন বিরাট সম্প্রীতির সৃষ্টি হবে, যার জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়াই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। 'গায়াতুল হাকিম' গ্রন্থ রচয়িতা এবং অনুরূপ বিষয়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এ বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। এর বাস্তব অভিজ্ঞতারও প্রমাণ আছে।

অনুরূপভাবে 'সিংহ মোহর'-এর কথাও উল্লেখ করা যায়; যাকে 'নুড়ি মোহর'ও বলা হয়। এটা একটি ধাতুনির্মিত অঙ্গুস্তানায় একটি সিংহের মূর্তি অঙ্কিত করা, যার লেজটি মাটির উপর ঝুলে থাকবে এবং সে নুড়িস্তূপে কামড় দিয়ে তাকে দুভাগে ভাগ করে ফেলবে। এর সামনে থাকবে একটি সাপের মূর্তি, যা সিংহের সম্মুখস্থ পদদ্বয়কে বেষ্টন করে ঊর্ধ্বফণা অবস্থায় এমনভাবে থাকবে, যাতে তার মুখব্যাদন সিংহের মুখের সামনে অবস্থান করে। সিংহের পৃষ্ঠদেশে হামাগুড়ি দিচ্ছে, এমন একটি বৃশ্চিক মূর্তি আঁকতে হবে। এভাবে সমস্ত বিষয়টি আঁকার জন্য যাদুকরকে এমন একটি সময় বেছে নিতে হবে, যখন সূর্য সিংহে প্রথম অথবা তৃতীয় মুখে প্রবেশ করে। অবশ্য লক্ষ রাখতে হবে, তখন সূর্য ও চন্দ্র উভয়েই তাদের শুভ অবস্থায় এবং অকল্যাণ যোগ হতে দূরে থাকে। যখন এ দিনক্ষণ পাওয়া যাবে ও অঙ্কনকারী তার মধ্যে তার কার্য সমাধা করতে পারবে, তখন ঐ সময়ে যে এক মিসকাল বা তদপেক্ষা কম পরিমাণ স্বর্ণের মধ্যে এ মোহর প্রস্তুত করে রাখবে। পরে একে গোলাপজলে বিগলিত জাফরানের মধ্যে ডুবিয়ে হলুদবর্ণ রেশমের একটি বস্ত্রখণ্ডে জড়িয়ে সংরক্ষণ করবে।

মানুষের ধারণা এই যে, উক্ত মোহর ধারণকারী শাসকদেরকে সাহচর্য, সেবা ও তাদেরকে বশীভূত করার ব্যাপারে এমন এক ক্ষমতার অধিকারী হয়, যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। অনুরূপ শাসকগণও তা পরিধান করলে তাদের অধীনস্থদের উপর

অপরিসীম ক্ষমতা ও সম্মানের অধিকারী হন। এ প্রক্রিয়াটিও যাদুবিদ্যার অধিকারীরা 'গায়াতুল হাকিম' ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সেখানে এর বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রমাণও তারা তুলে ধরেছেন।

অনুরূপভাবে সূর্যের বিশিষ্ট ষড়ভুজক্ষেত্রের[২৭৫] সাথে সামঞ্জস্য বিধানেরও ব্যাপার রয়েছে। তারা বর্ণনা করেছেন যে, এটি নির্মাণ করতে হবে এমন এক সময়ে, যখন সূর্য তার উন্নত অবস্থায় অকল্যাণের পরিধি হতে বিমুক্ত হয়ে বিরাজমান এবং চন্দ্রও রাজকীয় ভাগ্যোদয়ের এমন একটি পর্যায়ে রয়েছে, যেখানে দশম কক্ষের অধিকারীর প্রণয় ও সম্মতিপূর্ণ দৃষ্টি উদীয়মানের প্রতি আরোপিত বলে গণ্য করা হয়। এ পর্যায়ে মহান যুক্তি-প্রমাণের সহায়তায় রাজকীয় জন্মাদি শুভ বলে পরিগণিত হয়। এর পর সুগন্ধীতে ডুবিয়ে তাকে হলুদবর্ণের একখণ্ড রেশমি বস্ত্রে তুলে রাখতে হবে। তাদের ধারণা, এভাবে নির্মিত অঙ্গুস্তানায় রাজকীয় সাহচর্য, সেবা ও সৌহার্দ্যের এক অসাধারণ প্রভাব বিদ্যমান। এমন বিষয়াদির উদাহরণ প্রচুর।

মাসলামা ইবনে আহমদ মাজরিতী প্রণীত 'গায়াত' গ্রন্থটি এ শিল্পজ্ঞানের একটি উত্তম সংগ্রহ; সেখানে এর সব বিষয় ও সমস্যা পরিপূর্ণ বিস্তারে আলোচিত হয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি যে, ইমাম ফখরুদ্দিন ইবনে খতিব এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তার নাম রেখেছেন, 'সের্রুমাক্তুম'। গ্রন্থটি পূর্বাঞ্চলে বিদ্যমান এবং সেখানকার অধিবাসীরাই তা ব্যবহার করছে; অবশ্য আমাদের তা দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আমাদের ধারণা এই যে, ইমাম ইবনে খতিব এ বিষয়ের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নন। সম্ভব ব্যাপারটি এর বিপরীত কিছু। মাগরিব অঞ্চলে এমন যাদুবিদ্যার অধিকারী একশ্রেণীর লোককে বলা হয় 'কর্তনী'।[২৭৬] এদের কথাই ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, এরা বস্ত্র বা চর্মখণ্ডের প্রতি ইঙ্গিত করে এবং তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ছাগলের পেট কর্তনের ইঙ্গিত করলে তা কর্তিত হয়ে নাড়ীভুঁড়ি বের হয়ে পড়ে। বর্তমানকালে এদের এই 'কর্তনী' নাম হওয়ার কারণ এই যে, এরা যাদুবিদ্যার মধ্যে এ বিষয়টিকেই বেশি মাত্রায় ধারণ করে আছে। এরা ছাগলের মালিকদেরকে এর দ্বারা ভয় দেখায়, যাতে তারা অতিরিক্ত পশু থাকলে তা যাদুকরকে দিয়ে দেয়। অবশ্য যাদুকররা শাসকদের ভয়ে এ কাজটি একান্ত গোপনে করে থাকে।

আমি অনুরূপ একটি দলের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম এবং তাদের এসব কার্যকলাপও লক্ষ করেছি। তারা আমাকে জানিয়েছে যে, তাদের জন্য নক্ষত্র ও জিনের আত্মিক শক্তিকে সহযোগী করার অধার্মিক প্রার্থনাদিসহ এক প্রকার বিশেষ সাধনা ও একাগ্রতার একটি প্রক্রিয়া আছে। এ বিষয়ে তাদের কাছে 'খিঞ্জিরিয়া'[২৭৭] নামে লিখিত একটি পুস্তিকাও বিদ্যমান এবং তারা তার পঠন-পাঠনে নিরত। তারা এমন সাধনা ও একাগ্রতার দ্বারা এসব কাজ সম্পাদন করার শক্তি অর্জন করে। অবশ্য তাদের এমন

২৭৫. সূর্যের বিশিষ্ট 'ছত্রিশ ক্ষেত্র' (রোজেনথাল)।
২৭৬. মূল 'বাআব'; 'বাআধীন'।
২৭৭. বিস্তারিত পরিচয় অজ্ঞাত।

যাদুশক্তির প্রভাব স্বাধীন ব্যক্তি ছাড়া আসবাবপত্র, পশু ও দাস-দাসীর উপর কার্যকরী হয়ে থাকে। তারা এ প্রভাবের ক্ষেত্রকে এ বলে ব্যাখ্যা করে যে, যা দেরহামের বিচরণ ক্ষেত্র, তাদের প্রভাব সেখানেই কার্যকরী হয়। অর্থাৎ এমন সমস্ত সম্পত্তি, যার ক্রয়-বিক্রয় ও অধিকার লাভ করা যায়। এরূপই তাদের ধারণা; আমি তাদের অনেককে জিজ্ঞাসা করায় তারা আমাকে এ সংবাদ দিয়েছে। আর তাদের কার্যাবলি তাও প্রকাশ্য ও বর্তমান; আমরা তাদের অধিকাংশ সম্পর্কে অবগত এবং কোন প্রকার দ্বিধা সন্দেহের অবকাশ ছাড়াই আমরা এসব প্রত্যক্ষও করেছি।

পৃথিবীতে যাদুবিদ্যা ও ইন্দ্রজালের অবস্থা ও প্রভাব এরূপ। অবশ্য দার্শনিকরা একে মানবাত্মার প্রভাবজাত বলে প্রতিষ্ঠিত করার পর যাদু ও ইন্দ্রজালের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন এবং তাঁরা এটাও প্রমাণিত করেছেন যে, মানবাত্মার জন্য প্রভাব বিদ্যমান। বস্তুত এ আত্মশক্তি তৎসংশ্লিষ্ট দেহের উপর অস্বাভাবিক ধারায় এবং দৈহিক কার্যকারণের পরিধির বাইরেও প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ। বরং বলা যায় যে, এসব প্রভাব আত্মশক্তির বিচিত্র অবস্থার ফসল। কখনও এটি আনন্দ ও সুখানুভূতিজাত উষ্ণতার ন্যায়; আবার কখনও এটি আত্মগত ধারণার আকারে—যেমন কল্পনার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়ে থাকে। কোন প্রাচীরের প্রান্তদেশ অথবা ঝুলন্ত দড়ির উপর দিয়ে পদচারণাকারীর অবস্থাকে এ প্রসঙ্গে বিবেচনা করা যায়। অনুরূপ অবস্থায় যদি তার মধ্যে পতনের কল্পনা বলবতী হয়, তাহলে সে অবশ্যই পতিত হবে। এজন্যই বহু লোককে দেখা যায় যে, তারা অনুশীলনের মাধ্যমে এ কাজটি এমনভাবে রপ্ত করে, যাতে তাদের মধ্যে হতে এ পতনের কল্পনা দূরীভূত হয়ে যায়। ফলে, পাঠক আপনি দেখতে পান যে, তারা প্রাচীরের প্রান্তদেশ ও ঝুলন্ত দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে; অথচ পড়ে যাবার কোন প্রকার ভীতি তাদের মধ্যে নেই।

এর দ্বারা এ কথায় প্রতিষ্ঠিত হয় যে, এ বিষয়টি মানবাত্মার প্রভাবের ফল এবং পতন সম্পর্কীয় তার ধারণা কল্পনারই ফসল। সুতরাং অনুরূপভাবে আত্মশক্তি যদি দেহজ স্বাভাবিক কার্যকারণের পরিধির বাইরেও দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়, তা হলে তার পক্ষে সংশ্লিষ্ট দেহ ছাড়া অন্যত্রও প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব। কেননা তৎসংশ্লিষ্ট ঐ জাতীয় অন্যান্য দেহের উপর প্রভাব বিস্তারের ধারা একই। যেহেতু তার এ প্রভাব কোন বিশেষ দেহের প্রতিক্রিয়াজাত এবং এর পরিমণ্ডলে বিন্যস্ত নয়, সুতরাং এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আত্মশক্তি সর্বপ্রকার দেহের উপরই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।

অবশ্য তারা যে যাদু ও ইন্দ্রজালের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন তা হল এই যে, যাদুকর কোন প্রকার সহায়কশক্তির মুখাপেক্ষী নয় এবং ঐন্দ্রজালিক নক্ষত্রের আত্মশক্তি, সংখ্যার রহস্যজ্ঞান, সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এবং জাগতিক উপাদানে প্রভাবশীল আকাশীয় পরিমণ্ডলের সহায়তা গ্রহণ করে থাকে। জ্যোতিষবিদ্‌রাও এ শেষোক্ত প্রভাবের কথা বলে থাকে। দার্শনিকরা আরও বলেন, যাদু হল আত্মশক্তির সাথে আত্মশক্তির ঐক্য এবং

ইন্দ্রজাল হল দেহের সাথে আত্মশক্তির একত্ববোধ। তাঁদের কাছে এর অর্থ হল, আকাশীয় উন্নত প্রকৃতির সাথে নিম্ন প্রকৃতির সংযোগ স্থাপন। উন্নত প্রকৃতি হল নক্ষত্রমণ্ডলীয় আত্মশক্তি। এ কারণে যাদুবিদ্যার অধিকারী সাধারণভাবে জ্যোতিষের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। দার্শনিকদের কাছে যাদুকর তার যাদুশক্তি অর্জন করে না; বরং তাঁদের ধারণা এই যে, এ বিশেষ ধরনের শক্তির প্রভাব তার মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে বর্তমান থাকে।

দার্শনিকদের কাছে অলৌকিক ক্রিয়া ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য এই যে, অলৌকিক ক্রিয়ার প্রভাব ঐশ্বরিক শক্তির মাধ্যমে আত্মার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকে এবং তা এ ক্রিয়া অনুষ্ঠানের জন্য আল্লাহ্‌র শক্তির দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। অথচ যাদুকর তার কার্য-কলাপ নিজের দিক থেকে নিজ আত্মশক্তির দ্বারা সংঘটিত করে থাকে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে সে শয়তানী শক্তিগুলোর সাহায্যও গ্রহণ করে। সুতরাং এদের মধ্যকার পার্থক্য এদের বোধগম্যতা, স্বরূপ ও সত্তার মধ্যে বিধৃত। আমরা কেবল এদের বাহ্যিক নিদর্শনাদির দ্বারাই পার্থক্যের যুক্তি-প্রমাণ গ্রহণ করে থাকি। এটি এই যে, যিনি কল্যাণের অধিকারী, কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত, কল্যাণের নিমিত্ত উৎসর্গিত প্রাণ এবং যিনি তাঁর কার্যের দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণীর দাবি উত্থাপন করেন, তেমন ব্যক্তিবর্গই আলৌকিক ক্রিয়ার দ্বারা বিশিষ্ট হয়ে থাকেন। কিন্তু যাদু একমাত্র অশুভ তৎপরতার অধিকারী ও অসৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত ব্যক্তির মধ্যেই পাওয়া যায়। এর দ্বারা তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ও শত্রুর ক্ষতিসাধন এবং অনুরূপ অন্যান্য কাজ করে থাকে। এটি বস্তুত এমনসব ব্যক্তির মধ্যেই দেখা যায়, যাদের আত্মশক্তি অশুভ প্রভাবের অধিকারী। এটাই অধ্যাত্মবিদ্ দার্শনিকদের কাছে অলৌকিক ক্রিয়া ও যাদুর মধ্যকার পার্থক্য।

কখনও অনেক সুফীসাধক ও বিভূতির অধিকারী ব্যক্তিদের মধ্যেও জাগতিক ব্যাপারে প্রভাব বিস্তারের ঘটনা দেখা যায়। অবশ্য একে যাদু বলে গণ্য করা হয় না। কারণ এটি একমাত্র ঐশ্বরিক সহায়তায় অনুষ্ঠিত হয়। কেননা তাঁদের সাধনার দ্বারা ও আচার-অনুষ্ঠান নবুয়তের প্রভাবজাত এবং তার অনুসারী। তাঁরা তাঁদের দশা, বিশ্বাস ও আল্লাহ্‌র বাণীর প্রতি একাগ্র নিষ্ঠার কল্যাণে ঐশ্বরিক সহায়তার একটা বিরাট অংশ লাভ করে থাকেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কখনও অশুভ কাজে সমর্থ হলেও তা সম্পূর্ণ হয় না; কেননা তাদের অনুরূপ প্রভাব কার্যকরী করার ব্যাপারে তাঁরা ঐশী নির্দেশের অধীন এবং এজন্য তাঁরা অনুরূপ অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং তারা যে বিষয় সম্পর্কে অনুমতিপ্রাপ্ত হননি, তা তাঁরা করতে পারেন না এবং এসব সত্ত্বেও কেউ অনুরূপ কার্য করলে, তিনি সত্য থেকে বিচ্যুত হবেন। অনেক সময় এ কারণে তাঁর দশাও অন্তর্হিত হয়ে যায়। কাজেই অলৌকিক ক্রিয়া যেহেতু আল্লাহ্‌র সহায়তা ও ঐশ্বরিক শক্তি সহযোগিতার ফসল, সেজন্য এর সাথে যাদুপ্রক্রিয়ার কোন কিছুই বিরোধ উপস্থিত করতে পারে না।

পাঠক, আপনি ফেরাউন কর্তৃক নিয়োজিত যাদুকরদের অবস্থা লক্ষ করুন। তারা হযরত মুসার সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলে তাদের রচিত সর্বপ্রকার ইন্দ্রজাল কী করে যষ্ঠির অলৌকিকক্রিয়ার গ্রাসে পরিণত হয়েছিল! তাদের সব যাদু বিধ্বস্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে; যেন কখনও সেগুলোর অস্তিত্বই ছিল না। অনুরূপভাবে নবী (সঃ)-এর উপর 'আশ্রয় প্রার্থনা'র দুটি সূরা অবতীর্ণ হলে তাতে এ বাক্যটি—'এবং গ্রন্থিতে ফুঁৎকার প্রদানকারিণীদের অকল্যাণ হতে' ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'অতঃপর তিনি যেসব গ্রন্থির দ্বারা যাদুকৃত হয়েছিলেন, তার প্রতিটির উপর এটি পাঠ করতে না করতেই খুলে গিয়েছিল। কাজেই যাদু আল্লাহ্‌র নাম এবং বিশ্বাসের আন্তরিকতার সাথে তার উচ্চারণ দ্বারা বিনষ্ট হয়।

ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন যে, 'যরকশ কাবিয়ী'[২৭৮] নামে পারস্য সম্রাট খসরুর একটি পতাকা ছিল। তাতে আকাশমণ্ডলীয় ধারায় শত সংখ্যার একটি যাদুচক্র স্বর্ণসূত্রের দ্বারা বয়ন করা ছিল এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু কাদেসিয়ার যুদ্ধে সেনাপতি রুস্তম নিহত হলে এবং পারস্য সৈন্যদল পরাজিত হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে উক্ত পতাকা ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় পড়েছিল।

এ পতাকাটিতে ঐ যাদু প্রক্রিয়াই ছিল, যাকে ঐন্দ্রজালিক ও যাদুচক্রের প্রস্তুতকারীরা মনে করত যে, এটা সাথে থাকলে বিজয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এরূপ একটি বিষয় কোন পতাকায় থাকলে অথবা তা সাথে বহন করলে পরাজয়ের সম্ভাবনা আদৌ থাকে না। কিন্তু এর বিরুদ্ধে ঐশ্বরিক সাহায্য এসে পৌঁছায় এবং নবী (সঃ)-এর সহচরদের বিশ্বাস ও আল্লাহ্‌র বাণীর প্রতি দৃঢ়তার মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পাওয়ায়, উক্ত পতাকার অন্তর্গত প্রতিটি যাদুর গ্রন্থি খুলে পড়েছে, বিচলিত হয়েছে এবং তার সব তৎপরতা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

অবশ্য ধর্মীয় বিধান এই যাদু, ইন্দ্রজাল ও ভোজবাজির মধ্যে কোন পার্থক্যের সৃষ্টি করে না; বরং সবগুলোকে একই নিষিদ্ধ পর্যায়ে স্থাপন করে। কারণ ধর্মপ্রবর্তক আমাদের জন্য সেসব কর্মই বৈধ বলে নির্দেশ প্রদান করেন, যা দ্বারা আমরা আমাদের পারলৌকিক কল্যাণবাহী ধর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি অথবা যা দ্বারা আমরা আমাদের পার্থিব জীবনের কল্যাণবাহী জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ হতে পারি। যে কর্মধারা এ দুটির মধ্যে কোনটি সম্পর্কেই আমাদেরকে গুরুত্ব অনুধাবন করায় না; তার মধ্যে যদি ক্ষতি অথবা কোন প্রকার ক্ষতির কারণ বিদ্যমান থাকে, তাহলে তা সেই ক্ষতির অনুপাতেই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন যাদু-প্রক্রিয়া সংঘটনের মধ্যে আমরা এ ক্ষতি দেখতে পাই। ইন্দ্রজালও এর সাথে যুক্ত হয়; কেননা তাদের প্রভাবের পরিণাম একই। যেমন জ্যোতিষ তার প্রভাব সংক্রান্ত বিশ্বাসের মধ্যে ক্ষতির কারণ বিদ্যমান। কেননা এর ফলে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের প্রতি কার্যসম্পাদনের নির্ভরতার মাধ্যমে ধর্মীয় বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপভাবে উক্ত কর্মধারা যদি গুরুত্বপূর্ণ ও ক্ষতিকর কোন কিছু না হয়, তা

২৭৮. 'দয়ফ্‌শে কাবিয়াঁ' (রোজেনথাল)। অর্থ রাজকীয় পতাকা।

হলেও তা পরিত্যাগ করা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে প্রভূত সাহায্য করে থাকে। কারণ যে-কোন ব্যক্তির সুন্দর ইলম হল তার অনুপকারী সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করা। এ কারণেই বিধান যাদু, ইন্দ্রজাল ও ভোজবাজিকে একই পর্যায়ে ফেলেছে এবং তাদের মধ্যে ক্ষতির বিদ্যমানতার জন্যই সেগুলোকে দূষণীয় ও নিষিদ্ধ বলে বিবেচনা করেছে।

দার্শনিকগণ যে অলৌকিক ক্রিয়া ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে কালামশাস্ত্রবিদ্‌গণ অলৌকিক ক্রিয়ার সাথে ভবিষ্যৎবাণীর সম্পর্ক নির্দেশ করে বলেছেন যে, এটা এমন এক বিষয়ে দাবি উত্থাপন করা, যা সংঘটিত হয়ে সেই দাবির সত্যতা প্রমাণ করে। তাঁরা বলেন, যাদুকর সর্বদাই এরূপ দাবি উত্থাপন হতে দূরে সরে থাকে এ কারণেই অনুরূপ কোন ঘটনা তার দ্বারা সংঘটিত হয় না। মিথ্যা দাবির উপর অলৌকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বিধিসম্মত নয়। কেননা অলৌকিক ক্রিয়ার দ্বারা সত্যের প্রমাণ সংগ্রহের ব্যাপারটি বুদ্ধিগ্রাহ্যতার দ্বারা সিদ্ধ। কারণ উক্ত ক্রিয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সত্যতা প্রমাণ করা। সুতরাং তা যদি মিথ্যুকের দাবি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে সত্যবাদী মিথ্যাবাদী হয়ে দাঁড়াবে এবং এটা অসম্ভব। এ কারণেই সাধারণত মিথ্যুকের পক্ষে অলৌকিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান সম্ভব নয়।

অবশ্য দার্শনিকদের কাছে এদুটির মধ্যকার পার্থক্যের কথা আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি। এটা হল উভয় দিকের মধ্যে পরম কল্যাণ ও পরম অকল্যাণের ব্যবধান। যাদুকরের দ্বারা কোন কল্যাণ অনুষ্ঠান সম্ভব নয় এবং যাদুও কোন প্রকার কল্যাণের কার্যকারণ সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয় না। তেমনি অলৌকিক ক্রিয়ার অধিকারীর পক্ষে কোন প্রকার অকল্যাণ করা সম্ভব নয় এবং উক্ত ক্রিয়া কোন প্রকার অকল্যাণের কারণ সৃষ্টিতেও নিয়োজিত হয় না। বস্তুত এ দুটি যেন তাদের জন্মগত প্রকৃতির মধ্যেই পরস্পর বিরোধী। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সুপথ দেখান; তিনিই শক্তিমান ও পরাক্রান্ত; তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রতিপালক নেই।

এরূপ আত্মিক প্রভাবাদির সমগোত্রীয় হল 'নজর লাগা'। এটা অনুরূপ দৃষ্টির অধিকারীর আত্মিক প্রভাবের ফল। সে যখন কোন বস্তু বা অবস্থাকে সুন্দর দেখে এবং তার কাছে এর সৌন্দর্যকে অতিশয় মনে হয়, তখন তার এ সৌন্দর্যানুভূতি হতে তার মধ্যে এমন একটি হিংসার উদ্রেক হয়, যা উক্ত বস্তু বা বিষয়ের অধিকারীর কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নেওয়ার ইচ্ছাকে জাগ্রত করে দেয় এবং এর ফলে তার বিনষ্টি ঘনিয়ে আসে। বস্তুত এ নজর লাগার বিষয়টি একটি সহজাত প্রকৃতি। এরও আত্মিক প্রভাবাদির মধ্যে পার্থক্য এই যে, এ নজরের ব্যাপারটি একটি সহজাত প্রবৃত্তি; এটি ব্যর্থ হয় না, অধিকারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না এবং ইচ্ছা করলেও এটি অর্জন করতে পারে না। অবশ্য সব প্রভাব সংক্রান্ত বিষয়ে দৃষ্টি দিলে এমন অনেক প্রভাব পাওয়া যাবে, যা অনুরূপভাবে অর্জন করা সম্ভব নয়। তবুও উক্ত প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি প্রভাবকর্তার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তার মধ্যে সহজাত হল বিস্তারের সম্ভাবনা শক্তি; বিস্তার নয়। এজন্য তাঁরা বলেন, যাদু বা বিভূতির সাহায্যে হত্যাকারীকে হত্যা

করা যাবে; কিন্তু বদনজরের দ্বারা হত্যাকারীকে হত্যা করা যাবে না। এরূপ পার্থক্যের কারণ এই যে, সে এটি ইচ্ছা করে করেনি এবং তার উদ্দেশ্য এরূপ ছিল না অথবা সে এটা পরিত্যাগও করতে পারত না। বস্তুত এরূপ প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে সে একান্তই বাধ্য। আল্লাহ্ই অদৃশ্য বিষয়ে উত্তম জ্ঞাতা এবং রহস্যাদির স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক অবগত।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[বর্ণাদি-রহস্যশাস্ত্র]

এ শাস্ত্রকে বর্তমানকালে 'সিমিয়া' বলে অভিহিত করা হয়। এর এ গঠনপ্রণালি ইন্দ্রজালবিদ্যা থেকে সুফীসাধকের মধ্যকার ক্ষমতা আরোপকারীদের দ্বারা পরিভাষায় সন্নিবেশিত হয়েছে এবং একটি সাধারণ বিষয়কে বিশেষ অর্থে নিয়োজিত করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে এ শাস্ত্রটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের পরে দেখা দিয়েছে। সুফীসাধকদের মধ্যে গোঁড়ামির আবির্ভাব, ইন্দ্রিয়ানুভূতির যবনিকাভেদের চেষ্টা, তাঁদের দ্বারা অস্বাভাবিক ঘটনাবলি সংঘটন ও মৌলিক উপাদানের জগতে ক্ষমতা আরোপ, নানাবিধ গ্রন্থ সংকলন ও পরিভাষার সৃষ্টি এবং একক সত্তা থেকে সমগ্র অস্তিত্বের বিকাশ ও বিন্যাস সম্পর্কে তাঁদের ধারণা জন্মের সময় এ শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে।

তাদের ধারণা এই যে, নামসমূহের পরিপূর্ণ বিকাশ আকাশমণ্ডল ও গ্রহ-নক্ষত্রের আত্মশক্তির মধ্যে রয়েছে এবং এসব নামের মধ্যে বর্ণাদির স্বভাব ও রহস্য বিদ্যমান। অনুরূপভাবে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তা বিন্যাসধারায় বিরাজিত এবং সৃষ্টিও তার প্রথম আবির্ভাবের পর থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে এ ধারা বহন করছে ও তার রহস্যলীলা প্রকাশ করছে। এ কারণেই এই বর্ণাদির রহস্যশাস্ত্রের জন্ম। এটি 'সিমিয়া'[২৭৯] শাস্ত্রেরই শাখা-প্রশাখার অন্তর্গত এবং এর বিষয়বস্তু অবগতির অতীত ও এর সমস্যাদিও সংখ্যার দ্বারা সীমিত নয়। এ শাস্ত্রে আলবুনী,[২৮০] ইবনে আরবি ও অন্যান্য অনেকের, যারা উক্ত দুজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, তাদের একাধিক রচনা বিদ্যমান। তাদের মতে এ শাস্ত্রের ফলশ্রুতি ও লাভ হল সৃষ্টিজগতে বিরাজমান রহস্যলীলাকে বেষ্টনকারী বর্ণমালা থেকে সৃষ্ট ঐশ্বরিক বাণী ও সুন্দর নামসমূহের দ্বারা বিদ্যানুভূতিসম্পন্ন আত্মার বস্তু জগতের উপর আরোপ করা।

তারপর তারা এ বর্ণাদির মধ্যে রক্ষিত ক্ষমতা আরোপের রহস্য নিয়ে মতানৈক্যে উপনীত হয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকে একে বর্ণাদির মধ্যকার মেজাজের উপর নির্ভরশীল করেছেন এবং তারা মৌল উপাদানের ন্যায় এ বর্ণাদিকেও স্বভাব অনুসারে চারভাগে ভাগ করেছেন। মৌল পদার্থের স্বভাব অনুসারে প্রতিটি ভাগকে সেই স্বভাবের সাথে বিশিষ্ট করেছেন এবং ঐভাবে নির্দিষ্ট বর্ণাদির দ্বারা স্বভাব অনুযায়ী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং একটি কাল্পনিক বিভাগ

---

২৭৯. খুব সম্ভব 'কিমিয়া' শব্দের সাথে মিল রেখে উদ্ভাবিত।
২৮০. আহমদ ইবনে আলী; মৃত্যু ৬২২ (১২২৫ খ্রি:) হি: (?)।

অনুযায়ী, যাকে তারা ভগ্নাংশকরণ বলে অভিহিত করেন, এসব বর্ণ মৌল পদার্থের ভিত্তিতে আগ্নেয়, বায়বীয়, জলীয় ও মৃন্ময় পর্যায়ে বিভক্ত হয়েছে। এভাবে 'আলিফ' আগুনের জন্য, 'বে' বায়ুর জন্য, 'জিম' জলের জন্য এবং 'দাল' মৃত্তিকার জন্য নির্ধারিত। পুনরায় অনুরূপভাবে পদার্থ অনুসারে অবশিষ্ট বর্ণাদি পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। সুতরাং আগ্নেয় উপাদানের জন্য সাতটি বর্ণ, যেমন—আলিফ, হে, ত্বয়, মিম, ফে, সিন ও যাল; বায়বীর উপাদানের জন্য সাতটি বর্ণ, যেমন—বে, ওয়াও, ইয়া, নুন, দ্বোয়াত, তে ও স্বয়; জলীয় উপাদানের জন্য সাতটি বর্ণ, যেমন—জিম, যে, কাফ, সোয়াদ, ক্বাফ, ছে ও গাইন এবং মৃন্ময় উপাদানের জন্য সাতটি বর্ণ, যেমন—দাল, হ্বে, লাম, আইন, রে, খে ও শিন নির্ধারিত হয়েছে।

আগ্নেয় বর্ণগুলো শৈত্যজনিত রোগাদি দূর করার জন্য এবং যেখানে উত্তাপ সৃষ্টির আতিশয্যের প্রয়োজন সেখানে তাই ব্যবহৃত হয়। এ ব্যবহার অনুভূতির দিক থেকে কিংবা নির্দেশের দিক থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেমন—আগ্রাসন, হত্যাকাণ্ড ও যুদ্ধাদির ক্ষেত্রে মঙ্গলগ্রহের শক্তিবৃদ্ধি করা। এভাবে জলীয় বর্ণগুলো উষ্ণতাজনিত জ্বর ও অন্যান্য রোগের প্রকোপ দূর করা এবং যেখানে শৈত্যশক্তি বৃদ্ধি করা দরকার সেখানে সে উদ্দেশ্যে অনুভূতি ও নির্দেশের দিক থেকে ব্যবহৃত হয়। যেমন চন্দ্রের শক্তিবৃদ্ধি করা এবং এরূপ অন্যান্য বিষয়।

বর্ণাদি-রহস্যবাদীদের মধ্যে অনেকে বর্ণের মধ্যস্থিত সংখ্যার দিক থেকে এদের ক্ষমতা আরোপের রহস্য রয়েছে বলে বিবেচনা করেন। কেননা 'আবজদ'[২৮১] হিসেবে ব্যবহৃত বর্ণমালা নির্ধারিত ও স্বাভাবিক পদ্ধতিতে সুপরিচিত সংখ্যাসমূহকে বুঝিয়ে থাকে। তাদের মধ্যকার সংখ্যাগত এ সম্পর্ক প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের পরস্পরের সম্পর্কেরই দ্যোতক। যেমন 'বে', 'কাফ' ও 'রে'র মধ্যকার সম্পর্ক; এদের প্রত্যেকটিই তার পর্যায় অনুসারে দ্বিত্ব বোঝায়। 'বে' এককের পর্যায়ে দুইকে বোঝায়, 'কাফ' দশকের পর্যায়ে বিশকে বোঝায় এবং 'রে' শতকের পর্যায়ে দু'শকে বোঝায়। অনুরূপভাবে এ সম্পর্ক এবং 'দাল', 'মিম' ও 'তে'র মধ্যে তাদের সকলের চতুঃসংখ্যা বোঝানোর দিক থেকে সম্পর্ক বিদ্যমান। দুই ও চার সংখ্যার মধ্যে গুণিতকের সম্পর্ক রয়েছে।

অন্যদিকে তারা শব্দাবলির জন্য যাদুচক্র বের করেছে, যেমন সংখ্যার জন্য যাদুচক্র বিদ্যমান। বর্ণের সংখ্যা ও আকৃতির সংখ্যার দিক থেকে প্রতিটি বর্ণপর্যায়ই একটি যাদুচক্রের সাথে বিশিষ্ট। এভাবে বর্ণ-রহস্য ও সংখ্যা-রহস্য উভয়ের মধ্যকার সম্পর্কের দরুন তাদের ক্ষমতা আরোপের বিষয়টি মিশে গেছে। তারপর এসব বর্ণ ও পদার্থের মিশ্রণের মধ্যে অথবা বর্ণমালা ও সংখ্যাসমূহের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান, তা খুবই দুর্বোধ্য প্রকৃতির কঠিন বিষয়। কারণ এগুলো কোন প্রকার শাস্ত্ররীতি ও অনুমানসিদ্ধ ব্যাপার নয়। এ বিষয়ে তাদের বক্তব্যের ভিত্তি হল আস্বাদ ও দিব্যানুভূতি। আলবুনী বলেছেন, 'এ কথা মনে করো না যে, বর্ণাদির রহস্যজ্ঞান বুদ্ধিগ্রাহ্য অনুমান দ্বারা লভ্য কোন বিষয়; এটি একমাত্র পর্যবেক্ষণ ও ঐশী সহায়তায় লাভ হতে পারে।'

---

২৮১. প্রথম অধ্যায়ের ১৪২ নং টীকা দ্র.।

এসব বর্ণ ও তা থেকে সৃষ্ট শব্দাবলি দ্বারা বস্তুজগতের উপর ক্ষমতা আরোপ এবং সৃষ্টবস্তু তা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি তাদের অনেকের কাছ থেকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হওয়ায় এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যাকে অস্বীকার করা যায় না। কখনও এমন ধারণা পোষণ করা হয় যে, তাদের ক্ষমতা আরোপ ও ঐন্দ্রজালিকদের ক্ষমতা আরোপ একই পর্যায়ের; কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। কারণ ইন্দ্রজালের স্বরূপ ও তার প্রভাব সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যে বিশ্লেষণ প্রদান করেছে, তা এই যে, এটি রৌদ্র উপাদানজনিত আত্মশক্তি বিশেষ। এটি আকাশমণ্ডলীয় রহস্য-শক্তি, সংখ্যার সম্পর্ক শক্তি এবং মানসিক শক্তির প্রভাব-আশ্রয়ে ইন্দ্রজালের আত্মাকে জাগ্রতকারী ধূপ-ধূনাদির আকর্ষণশক্তির সম্মিলিত মিশ্রণে এমন একটি রৌদ্রতেজ ও প্রভাবশীল ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, যা দ্বারা বিষয়টি সংঘটিত হয়ে থাকে। এর ফলশ্রুতি হল উন্নত প্রকৃতিসমূহকে নিম্ন প্রকৃতির সাথে সংযুক্ত করা। তাদের কাছে এটি বলতে গেলে, বায়বীয়, মৃন্ময়, জলীয় ও আগ্নেয় উপাদানসমূহের সম্মিলিত মণ্ড তুল্য। অনুরূপ মণ্ডজনিত মিশ্রণের দ্বারাই বাস্তব উপাদান তাদের নিজস্ব সত্তাসহ সংশ্লিষ্ট আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। এরূপ খনিজ পদার্থের সারবস্তু; তাও এমন এক মণ্ডের ন্যায়, যার মধ্যে পদার্থ নিজ শক্তি সঞ্চারিত করে পরিবর্তনের দ্বারা নিজমূর্তি পরিগ্রহ করে। এ জন্যই তাঁরা বলেন যে, কিমিয়াশাস্ত্রের বিষয় হল দেহের মধ্যে দেহের সঞ্চারণ; কেননা এসব দেহের সারবস্তু সমুদয়ই দেহবিশিষ্ট। তারা বলেন, ইন্দ্রজালের বিষয় হল দেহের মধ্যে আত্মশক্তির সংক্রমণ। কেননা এটি নিম্ন প্রকৃতির সাথে উন্নত প্রকৃতির সংযোগ স্থাপন এবং এ নিম্ন প্রকৃতিই দেহ ও উন্নত প্রকৃতি আত্মশক্তির সমষ্টি।

ঐন্দ্রজালিক ও বর্ণাদি-রহস্যবাদীদের ক্ষমতা আরোপের মধ্যকার পার্থক্যের বিশ্লেষণ এই যে, সর্বপ্রথম আপনাকে এ বিষয়টি জেনে নিতে হবে—বস্তুজগতের উপর ক্ষমতা আরোপের সমুদয় ব্যাপারটিই মানুষের আত্মশক্তি ও মানসিক শক্তির প্রভাবের ফসল। বস্তুত মানুষের আত্মশক্তি বস্তুজগতের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সত্তাগতভাবেই তাদের উপর নির্দেশ প্রদানকারী। অবশ্য ঐন্দ্রজালিকদের ক্ষমতা আরোপের বিষয়টি আকাশমণ্ডলীয় আত্মশক্তির অবতরণ এবং তার সাথে আকৃতি অথবা সংখ্যাগত সম্পর্কের সংযোগ স্থাপনের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এর ফলে এমন একটি মিশ্রণের সৃষ্টি হয়, যা দ্বারা বস্তুর উদ্দিষ্ট পরিবর্তন ও বৈপরীত্য সাধিত হয়; যেমন মণ্ডের মধ্যে সঞ্চিত শক্তির দ্বারা অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। আর বর্ণাদি রহস্যবাদীদের ক্ষমতা আরোপের বিষয়টি হল সাধনার ফলে লব্ধ শক্তি ও ঐশী জ্যোতির প্রভাবজাত দিব্যানুভূতি এবং সর্বোপরি ঐশ্বরিক সহায়তার ফসল। এর প্রভাবেই বস্তুপুঞ্জ কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়াই তার বশীভূত হয় এবং এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার আকাশমণ্ডলীয় শক্তি ও অন্য প্রভাবের প্রয়োজন হয় না। কেননা এর সহায়ক শক্তি ঐগুলোর চেয়ে উন্নততর।

ঐন্দ্রজালিকরা তাদের ক্ষমতা আরোপের ক্ষেত্রে আকাশমণ্ডলীয় শক্তির অবতারণে আত্মশক্তিকে সজ্জিত করার জন্য খুব অল্প সাধনার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে এবং এ প্রসঙ্গে তারা যা কিছু করে, অনুশীলন ও একাগ্রতার দিক থেকে তা খুবই সহজ। কিন্তু বর্ণাদি

রহস্যবাদীদের সাধনা তদ্রূপ নয়। তাদের সাধনা বিরাট ও ব্যাপক এবং সৃষ্টজগতে ক্ষমতা আরোপের উদ্দেশ্যেও পরিচালিত নয়; কেননা এরূপ কিছু উক্ত সাধনার প্রতিবন্ধক স্বরূপ। ক্ষমতা আরোপের বিষয়টি একান্তই তাদের আকস্মিক লব্ধশক্তি— আল্লাহ্ প্রদত্ত বিভূতিসমূহের অন্যতম। এ কারণে বর্ণাদি রহস্যবাদী যদি আল্লাহ্র রহস্যজ্ঞান ও অধ্যাত্মশক্তির স্বরূপ সম্পর্কে অনবহিত হয়, যা তার পর্যবেক্ষণ ও দিব্যানুভূতির ফলশ্রুতি এবং সে একমাত্র শব্দ, বর্ণাদি ও বাক্যাবলির প্রকৃত জ্ঞানের মধ্যে নিজকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে, তাহলে এরূপ ব্যক্তি এসব বিষয় দ্বারা ক্ষমতা আরোপকারী 'সিমিয়া'শাস্ত্রবিদ্ হিসেবে পরিচিত হবে বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার ও ঐন্দ্রজালিকের মধ্যকার ব্যবধানও ঘুচে যাবে। বরং ঐন্দ্রজালিক তখন তার চেয়ে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ তাঁর জন্য একটি শাস্ত্রীয় প্রকৃতির মূলনীতি ও সুবিন্যস্ত পদ্ধতি বিদ্যমান। কিন্তু বর্ণাদি রহস্যবাদীর জন্য তেমন কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। কারণ তার সাধনাগত নিষ্ঠার অভাবে সে যদি বাক্শক্তির স্বরূপ ও সম্পর্কগত রহস্য উদ্ঘাটনের দিব্যানুভূতি হারিয়ে ফেলে তাহলে তার জন্য পরিভাষাগত শাস্ত্রীয় পটভূমিতে এমন কোন প্রামাণ্য পদ্ধতি অবশিষ্ট থাকবে না, যার উপর সে নির্ভর করতে পারে এবং এ দিক থেকে তার মর্যাদা আরও নিচে নেমে যাবে।

কখনও বর্ণাদি রহস্যবাদীরা শব্দ ও বাক্যাদির শক্তিকে নক্ষত্রীয় শক্তির সাথে মিশিয়ে ফেলে। এর ফলে তারা আল্লাহ্র নামসমূহ অথবা তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রহস্যচক্র, এমন কি যাবতীয় শব্দাবলি জপের সময় নির্ধারণ করে দেয়; যাতে এসব নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত নক্ষত্র থেকে শক্তি সঞ্চারিত হতে পারে। যেমন আলবুনী তার গ্রন্থে অনুরূপ বিষয়ের সন্নিবেশ করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন আনমত (নিয়মাবলি)। তাদের কাছে উপরোক্ত সম্পর্ক সেই রহস্যময় সত্তার[২৮২] দান এবং শব্দাবলির পরিপূর্ণ রহস্যশক্তি এক সংশোধ্যমান[২৮৩] জগতে বিরাজিত। একমাত্র এ সম্পর্কের আকর্ষণেই এ শক্তির বিস্তারিত অবস্থা বস্তুর স্বরূপে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। তাদের কাছে এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হল পর্যবেক্ষণলব্ধ নির্দেশ। সুতরাং বর্ণাদি রহস্যবাদী যখন এ পর্যবেক্ষণ শক্তি হারিয়ে এ সম্পর্কজ্ঞানকে অপরের শিক্ষার মাধ্যমে লাভ করে, তখন তার ও ঐন্দ্রজালিকের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য থাকে না; বরং ঐন্দ্রজালিক এক্ষেত্রে তার চেয়ে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; যেমন আমরা পূর্বে বলেছি।

অনুরূপভাবে কখনও ঐন্দ্রজালিক তার ক্রিয়া ও নক্ষত্রীয় ব্যক্তিকে বিশেষ বিশেষ শব্দের দ্বারা রচিত প্রার্থনার সাথে মিশ্রিত করে; কেননা উক্ত শব্দাবলি ও নক্ষত্রের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। অবশ্য এ সম্পর্ক নির্ধারণ তাদের কাছে বর্ণাদি-রহস্যবাদীদের পর্যবেক্ষণ অবস্থালব্ধ সম্পর্কের মতো নয়। বরং এক্ষেত্রে তারা তাদের যাদুসংক্রান্ত মূলনীতির ধারাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং এ ধারা অনুসারে তারা সমগ্র সৃষ্টজগতের জন্যই নক্ষত্রমালাকে বিভক্ত করে। এর ফলে নক্ষত্রমালা স্বয়ম্ভু, আপতিক, সত্তাগত, তাত্ত্বিক বস্তু এবং বর্ণ ও শব্দাবলি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নির্ধারিত হয়।

---

২৮২. মূল 'আমাইয়া'।
২৮৩. মূল 'বরবখিয়া'।

এভাবে প্রতিটি তারকাই একটি নির্দিষ্ট অংশের জন্য বিশিষ্ট এবং এ ধারা অনুসারে তারা কোরানের সূরা ও আয়াতগুলোকে বিভক্ত করে এমন কতিপয় ভিত্তি গড়ে তুলেছে, তা যেমন অদ্ভুত, তেমনি অনস্বীকার্য। যেমন মাসলামা মাজরিতী তাঁর 'গায়াত' নামীয় গ্রন্থে করেছেন। আলবুনীর 'আনমাত' গ্রন্থের বিষয়বস্তু থেকে এটাই প্রকাশ পায় যে, তিনিও তাদের এ পথ অবলম্বন করেছেন। পাঠক, আপনি যদি তাঁর 'আনমাত' অনুসন্ধান করে দেখেন; সেখানে তিনি যেসব প্রার্থনাবাক্য ব্যবহার করেছেন, তা যদি বিবেচনা করেন; সপ্ত নক্ষত্রের কালানুসারে তাদের বিভক্তি-বিন্যাসকে যদি লক্ষ করেন এবং এর পর আপনি যদি 'গায়াত' গ্রন্থ সম্পর্কে অবহিত হন; সেখানে নক্ষত্রমণ্ডলীর যে 'আহ্বানবাক্য' বিদ্যমান, তা যদি বিবেচনা করে দেখেন অর্থাৎ সেখানে প্রতিটি নক্ষত্রের জন্যই নির্দিষ্ট প্রার্থনা আছে, যাকে তারা 'আহ্বানবাক্য' বলে অভিহিত করে ও যা ঐ নক্ষত্রের শক্তিকে আকর্ষণের জন্য প্রয়োগ করা হয়, তাহলে আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনই সেখানে দেখতে পাবেন। এ সমর্থন, হয় তাদের মৌলিক বিষয়ের ক্ষেত্রে কিংবা তাদের উদ্ভাবনের অভিনবত্ব ও সংশোধ্যমান জ্ঞানগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার অস্তিত্বকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। অথচ 'তোমাদেরকে অতি অল্পই জ্ঞান দান করা হয়েছে।'[২৮৪] তদুপরি ধর্মীয় বিধান কোন শাস্ত্রের অসম্ভাব্যতার জন্যই ওটাকে নিষিদ্ধ করেনি; বরং যাদুবিদ্যার সত্যতা স্বীকার করেও সে ওটাকে নিষিদ্ধ করেছে। এজন্য আমরা যা জানি, তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট বলে মনে করি।[২৮৫]

---

২৮৪. কোরান; ১৭, ৮৫।

২৮৫. এটির পর রোজেনথালে একটি সংযোজন বিদ্যমান। কোন কোন সংস্করণে এর অস্তিত্ব রয়েছে। আমাদের অনুসৃত মূল গ্রন্থে তা নেই। তবু সম্পূর্ণতার জন্য আমরা এর অনুবাদ নিম্নে তুলে দিলাম।

এখানে বিষয়টি পরিস্ফুট করার জন্য কিছু মন্তব্য উপস্থিত করছি।

বর্ণাদি-রহস্যবিদ্যাটি এর গঠনের দিক থেকে অবশ্যই যাদুবিদ্যার অন্তর্গত এবং তা এভাবে অর্জন করতে গেলে এমন কিছুসংখ্যক অনুশীলনের দ্বারস্থ হতে হয়, যা ধর্মীয় বিধান অনুসারে অসিদ্ধ নয়। এর বিবরণ এই যে, যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, দুই শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টিজগতে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ। তাদের মধ্যে নবী রসূলগণ আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তির সাহায্যে এটি করে থাকেন এবং যাদুকরগণ তাদের সহজাত শক্তির মাধ্যমে অনুরূপ ব্যাপার সংঘটিত করে। সুফীসাধকরাও তাঁদের বিশ্বাসের দৃঢ়তায় অনুরূপ কার্যকলাপের অধিকারী হতে পারেন। এটি তাঁদের বাহ্যেন্দ্রিয়ের অতীত সাধনার ফল। অবশ্য এটি তাঁরা কামনা করেন না; বরং স্বতোসিদ্ধভাবেই এটি দেখা দেয়। এটি যদি শক্তিমান সাধকদের মধ্যে দেখা দেয়, তাহলে তাঁরা একে অস্বীকার করতে চান, আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং এরূপ বিভূতিকে প্রলোভন বলে গণ্য করেন। এ প্রসঙ্গে আমরা আবু ইয়াজিদ বিস্তামীর একটি 'ঘটনা'র কথা উল্লেখ করতে পারি। একদা বিকালে তিনি দজলার কূলে উপস্থিত হয়ে অতি দ্রুত তা পার হবার কথা চিন্তা করছিলেন; এমন সময় নদীর উভয় কূল একত্র মিলে গেল। আবু ইয়াজিদ এটি দর্শনে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে বলে উঠলেন, 'আমার আল্লাহ্ প্রীতির কোন অংশই আমি এ সামান্য মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করতে পারি না।' অতঃপর তিনি খেয়া নৌকায় উঠে যথারীতি খেয়া মাঝিদের সাথে নদী পার হলেন।

যাদুর ক্ষমতা সহজাত হলেও এর সম্ভাবনাকে মূর্ত করে তোলার জন্য অনুশীলনের প্রয়োজন। যাদুর অনেক শক্তি সহজাত না হলেও অর্জন করা সম্ভব হয়; কিন্তু এ অর্জিত শক্তি সর্বদাই সহজাত অপেক্ষা নিম্নমানের হয়ে থাকে। তবুও যাদুশক্তি সহজাত হোক, বা না হোক, এর জন্য সর্বক্ষেত্রেই অনুশীলনের প্রয়োজন। এরূপ অনুশীলনের পদ্ধতি সর্বজন পরিচিত। এর

তাদের কাছে 'সিমিয়া' শাস্ত্রের অন্য একটি শাখা হল প্রশ্নের অন্তর্গত শব্দাবলির সাথে উত্তরে ব্যবহৃত শব্দাবলির মধ্যকার বর্ণগত সামঞ্জস্য বিচার করে উত্তর বের করা। তারা একে সংঘটিতব্য বিষয়াদির সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার ঈপ্সিত ভিত্তি বলে মনে করে। বস্তুত এটি অনেকাংশে ধাঁধাঁ ও হেঁয়ালী জাতীয় প্রশ্নাদির সমতুল্য। এ বিষয়ে দোয়া ও অজিফার আকারে তাদের মধ্যে বিস্তর বক্তব্য বিদ্যমান। এর মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হল সবতী রচিত পৃথিবীর 'যায়েরজা'; ইতিপূর্বে এর আলোচনা করা হয়েছে।[২৮৬] আমরা এখানে উক্ত যায়েরজার চতুর্দিকে অঙ্কিত চক্র, তালিকা ইত্যাদিসহ এর ব্যবহার-প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করব। তারপর আমরা এর যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করব এবং বলব যে, তা অদৃশ্যের সংবাদ জ্ঞাপনের কোন বিষয় নয়। এর সমুদয় ব্যাপারটি প্রশ্ন ও তার উত্তরের মধ্যে প্রক্রিয়াগত সামঞ্জস্য বিধানের ফল মাত্র।

যাবতীয় প্রকার ও প্রক্রিয়া মাসলামা মাজরিহী তাঁর 'গায়াত' গ্রন্থে, জাবির ইবনে হাইয়ান তাঁর পুস্তিকাসমূহে এবং অন্যান্যরা অন্যত্র বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। যারা যাদুবিদ্যা অর্জন করতে ইচ্ছুক, তেমন বহু ব্যক্তির দ্বারা এসব রীতিনীতি ও যাদু প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়েছে।

যাহোক, যাদুবিদ্যার প্রাচীন অনুসারীদের মধ্যে এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা একান্তই ধর্মহীন। যেমন তাতে নক্ষত্রের প্রতি একাগ্রতা এবং তাদের আত্মশক্তিকে আকর্ষণ করার জন্য 'কিয়ামাত' নামীয় প্রার্থনা বিদ্যমান। তদুপরি তাতে এ বিশ্বাসও রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া এগুলোও প্রয়োজনীয় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। কারণ এসব নক্ষত্রের রাশিচক্র যে, জন্ম-পত্রিকার উপর প্রভাব বিস্তার করে, অনুরূপ বিশ্বাস না করলে ঈপ্সিত ফললাভের বাসনা পোষণ করা সম্ভব নয়।

বস্তুত এমন বহুলোক, যারা সৃষ্টিজগতে যাদুশক্তির দ্বারা প্রভাব বিস্তার করতে ইচ্ছুক, তারা এ বিষয়েই অধিকতরভাবে ব্যাপৃত রয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই তারা এমন একটি প্রক্রিয়ার অনুসরণ করেছে, যাতে ধর্মহীনতা বা এর অনুষ্ঠানের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে তারা তাদের প্রক্রিয়াকে এমনভাবে পরিবর্তন করেছে, যা ধর্মীয় বিধানসম্মত। তাদের এরূপ প্রক্রিয়ায় কোরান ও হাদিস হতে সংগৃহীত 'নামজপ' (জিকির) ও প্রার্থনা (সবুহাত) বিদ্যমান। তারা এগুলোর মধ্য হতে উপরোল্লিখিত পৃথিবীর সত্তা, গুণ ও প্রভাব এবং তৎসংশ্লিষ্ট সপ্ত নক্ষত্রের সক্রিয়তা অনুসারে বিভক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য যোগ্য বিষয় বেছে নিয়েছে। এগুলো প্রয়োগ করার জন্য দিনক্ষণও নির্দিষ্ট করেছে। বস্তুত তারা এ সমুদয় বিষয়টিকেই এমনভাবে ব্যবহার করেছে, যাতে এর দ্বারা যাদুবিদ্যার ধর্মদ্রোহিতা এবং এসব সম্পর্কিত কার্যকারণগুলোর উপর একটি ছদ্মাবরণ সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণে তারা বাহ্যত; ধর্মীয় বিধানসিদ্ধ রীতি-নীতির ব্যবহারকে নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাদের এমন বিধানসিদ্ধ রীতিনীতি সত্ত্বেও তা যাদুবিদ্যা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কারণ তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের প্রভাবের উপর বিশ্বাসের পরিধি হতে কোন প্রকারেই মুক্ত নয়।

এসব লোক সৃষ্টিজগতের উপর এমন ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে ইচ্ছুক, যা ধর্মপ্রবর্তক কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। নবীরা যেসব অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করেছেন, তাতে ঐশী সাহায্য বিদ্যমান ছিল। তাঁরই অনুমতিক্রমে তাঁরা এগুলো দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। সাধু-দরবেশদের অলৌকিক বিভূতি সাধনালব্ধ বিশেষ জ্ঞান, দিব্যানুভূতি এবং তজ্জনিত ক্ষমতাপ্রাপ্তির বিশেষ অনুমতির মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়েছে। তাঁরা ঐশী অনুমতি ছাড়া অনুরূপ কিছু করতে কখনও উদ্যোগী হননি।

সুতরাং এসব দিক হতেই বর্ণাদি রহস্যবাদীদের বিশ্বাস প্রক্রিয়ায় বিশ্বস্ততা বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমি এটি পরিস্ফুট করেছি যে, এ রহস্যবিদ্যাটিও যাদুরই একটি প্রশাখাবিশেষ। আল্লাহ তাঁর দয়ায় সত্যের দিকে পথ দেখিয়ে থাকেন।

২৮৬. প্রথম অধ্যায়ের ১৪৪ ও ১৪৫ নং টীকা দ্র:।

ইতিপূর্বেও আমরা এ সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করেছি। আমাদের কাছে এমন কোন বর্ণনাসূত্র নেই, যা দিয়ে আমরা এ সম্পর্কিত দীর্ঘ কবিতাটির শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় করতে পারি। তবে আমাদের যতদূর মনে হয়, এর এই পাঠটি সাধারণভাবে বিশুদ্ধ বলে স্বীকৃত। আল্লাহ্ তাঁর কৃপায় শক্তি দান করুন। কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত্ত হল।[২৮৭]

অকিঞ্চন সবতী তার প্রভুর প্রশংসা করেও
মানুষের কাছে প্রেরিত দিশারীর শান্তি কামনা করে বলছে,
মুহম্মদ রসূলরূপে আবির্ভূত; নবীদের তিনি মোহর এবং
সহচর ও পরবর্তী অনুগামীদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।
দেখ, এই যে পৃথিবীর যায়েরজা, যা
তোমাদের গোত্রে দেখেছ এবং বুদ্ধিতেও এসেছে।
যে এর গঠন সম্যক, জানবে, সে নিজ দেহকেও জানবে
এবং সেই নির্দেশাবলি সম্যক্ উপলব্ধি করবে, যা উন্নত স্তরে পরিকল্পিত
যে সংযোগকে সম্যক জানবে, সে শক্তিকে উপলব্ধি করবে
এবং ধর্মভীরুতা ও প্রতিটি বিষয়ের জন্য তার ফলকে জানবে।
যে প্রক্রিয়াকে সম্যক জানবে, সে এর রহস্যকে সম্যক জানবে
এবং সে নিজেই বুঝতে পারবে ও তার অধিকার সিদ্ধ হবে।
তাকে দেখবে অধ্যাত্ম জগতের স্বরূপ বিশ্লেষণকারীরূপে;
বস্তুত এটি এমন ব্যক্তির পর্যায়, যিনি তপজপে পূর্ণতাপ্রাপ্ত।
এই সেই রহস্যাবলি, তোমাদের তা গোপন রাখা উচিত;
তাকে চক্রাদির মধ্যে রক্ষা কর ও 'হে'-র দ্বারা সমতা বিধান কর।
'ত্বয়ের' জন্য আছে সিংহাসন, তাতেই আমাদের চিত্রাদি
পদ্যে ও গদ্যে; যা তুমি ছকসহকারে দেখতে পাবে।
চক্রাদির সম্পর্ক তাদের আকাশমণ্ডলের সম্পর্কের অনুরূপ
এবং সেখানে তুমি উন্নত পর্যায়াদির নক্ষত্র অঙ্কন কর।
তত্ত্বগুলোর জন্য সচেষ্ট হও ও তাদের বর্ণাদি লিপিবদ্ধ কর
এবং সীমান্তে শূন্যস্থানে তার অনুরূপ উষ্ণীয় বাঁধ।
তাদের 'জের'-এর আকৃতি বিন্যাস ও তাদের ঘরগুলো সমান কর
এবং তাদের 'হাম' বিশ্লেষণ কর ও তাদের আলোক উজ্জ্বল হোক।
প্রকৃতির জন্য জ্ঞানার্জন কর জ্যামিতিক প্রক্রিয়ায়
এবং সঙ্গীতজ্ঞের জ্ঞান ও চারটি অনুরূপভাবে
সঙ্গীতের ন্যায় সমমান যুক্ত কর ও তার বর্ণাদির জ্ঞান
এবং যন্ত্রপাতির জ্ঞান; বিশ্লেষণ ও অর্জন কর।
তার চক্রগুলোকে সমান কর ও তার বর্ণাদির সঙ্গতি রক্ষা কর;
তার পৃথিবীকে মুক্ত রাখ ও অঞ্চলকে ছকবন্দী কর।
আমাদের আমীর, তিনি জানাতী সাম্রাজ্যের শেষ
অস্বীকার করেছেন এবং তাঁর শাসন সেখানে মুক্ত হয়েছে।[২৮৮]
আন্দালুসের একটি অংশ ও তাদের হুদের এক তনয়;

২৮৭. কবিতাটির পাঠভেদ বিদ্যমান। রোজেনথালের অনুবাদে এর আভাস পাওয়া যায়। আমরা সম্ভাব্য বোধগম্যতাকে সামনে রেখে মূলের অনুসরণ করেছি।

২৮৮. আমীর আল মোহেদ সম্রাট ইয়াকুব আল মনসুর (১২৮৪—৯৯ খ্রি:)।

বনি নাসির এলো ও বিজয় তাদের অনুবর্তী হলো।[২৮৯]
রাজন্যবর্গ, অশ্বারোহী ও দর্শনের অধিকারীগণ,
যদি চাও তাদেরকে প্রতিষ্ঠা কর এবং তাদের অঞ্চল সজ্জিত।
একত্ববাদের মেহেদী, তিউনিসে তাদের রাজত্ব—
রাজন্যবর্গ, পূর্বাঞ্চলে রহস্য চক্রাদিতে অবতীর্ণ।
অঞ্চলে বিভক্ত কর ও নিখোঁজের অনুসন্ধানকারী হও;
রোমের জন্য যদি চাও, তাহলে নির্ভুলভাবে আকৃতি দাও।
আলফ্যান্সু ও বারসেলুনা, তাদের বর্ণ হল 'রে';
তাদের ফ্রান্স হল 'দাল'-এবং ত্বয়ের দ্বারা পূর্ণতা লাভ।
কানাওয়ার রাজন্যবর্গ, তাদের 'ক্বাফের' জন্য বালতির ন্যায়
এবং আমাদের বেদুইনগণ, দাসত্বের মধ্যে কর্মে নিয়োজিত।
হিন্দ, হাবশী অঞ্চল, সিন্ধু, তারপর হারমিন—
পারস্যবাসী, তাতারী এবং তাদের পরবর্তী অন্যান্যরা।
তাদের কাইজার এসেছে[২৯০] ও তাদের ইয়াজদাগির্দ
'কাফে'র জন্য এবং তাদের কিবতীরা 'লামে'র দীর্ঘায়িত।
আব্বাস, তাদের সকলেই সম্ভ্রান্ত ও মহান—
কিন্তু তুর্কিরা এ কর্মপ্রবাহকে রুদ্ধ করে ফেলেছে।
অতঃপর তুমি যদি রাজন্যবর্গের যথার্থ অবস্থা ও প্রত্যেককে জানতে চাও,
তা হলে ঘরগুলো মোহরাঙ্কিত কর; তারপর সম্পর্ক নির্ণয় কর।
বর্ণাদির রীতির নির্দেশে এবং তার জ্ঞান অনুসরণ করে—
তাদের প্রকৃতির জ্ঞান ও সমুদয়কে বাস্তবায়িত কর।
যে ব্যক্তি জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে জানে, সে আমাদের জ্ঞানও জানবে;
সে সৃষ্টির রহস্য জানতে পেরে পরিপূর্ণতা লাভ করবে।
তার জ্ঞান দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হবে, তার প্রভুকে জানতে পারবে
এবং সেই ভবিষ্যদবাণীর জ্ঞান, যা 'হ্বে' 'মীমের' দ্বারা বিভক্ত।
যখন এমন একটি নাম আসবে, ছন্দ যাকে ছিন্নভিন্ন করে,
তখন অবশ্যই শাসকের নির্দেশ থাকবে তাকে হত্যা করার।
তোমার সামনে বহু বর্ণ আসবে সেগুলোকে গুণের দ্বারা সমান কর
এবং সিবুয়াই-এর বর্ণগুলো তোমাকে মীমাংসার সন্ধান দিবে।
অনির্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠিত কর, সম্মুখীন হও ও পরিবর্তন কর;
তোমার অমূল্য অনুশীলনের দ্বারা অংশগুলোকে পৃথকভাবে।
গ্রন্থি বন্ধনে ও ছিন্নকরণে জয়ীকে জানতে পারবে;
বুদ্ধির সক্রিয়তায় তার দুই গুণকে ক্ষণিক বর্ধিত কর।[২৯১]
কোন উদয় ক্ষণকে নির্বাচন কর ও তার পর্যায় অনুসারে সমান কর;
তার বর্গমূলদ্বয়কে উল্টে দাও এবং চক্রকে পরিবর্তন কর।
কোন ব্যক্তি তাকে জানতে পারবে ও তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে;
তার বর্ণাদি দেয়া হবে এবং তারা পদ্যরূপে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।
যদি এটি শুভ হয়, তা হলে নক্ষত্রসমূহও শুভ হবে;

---

২৮৯. এখানে 'হুদ' ও বনি নাসিরের পরিচয় খুব স্পষ্ট নয়।
২৯০. এখানে মূলে 'যাআ' স্থলে 'হা' পাঠান্তর আছে।
২৯১. এ দুটি পংক্তি রোজেনথালের অনুবাদে অনুপস্থিত।

রাজন্য সম্পর্কেই তোমার জন্য যথেষ্ট এবং তার উন্নত নাম পাবে।
তাদের 'দালে'র অবস্থান যথাযোগ্য রহস্যজালে আবৃত;
অতঃপর আমাদের সম্পর্কের সঙ্গতি, যার মধ্যে যোগ্যস্থান পাবে।
তাদের 'জের'-এর তন্তুগুলো 'হ্বে'র সাথে 'বাম'-এর সন্নিহিত
এবং তাদের দ্বিত্ব ত্রিত্বের স্বরূপ সমগ্রের মধ্যে প্রকাশিত।
আকাশমণ্ডলে প্রবেশ করাও এবং ছকের দ্বারা পরিবর্তন কর;
আবজদের বর্ণাদি অঙ্কন কর এবং অবশিষ্ট রাখ অঙ্ক হিসেবে।
প্রচলিত ছন্দহীনতাকে গ্রহণ কর ও তার অনুরূপ কোন কিছুকে স্বীকৃতি দাও;
যা কবিতার ছন্দাদিতে দেখা যায়—সমগ্রতায় পূর্ণ হয়।
আমাদের ধর্মের ভিত্তি, আমাদের শাস্ত্রের মূলনীতি—
আমাদের ব্যাকরণের জ্ঞান; সংরক্ষণ ও অর্জন কর।
একটি তাঁবু, প্রবেশ করাও এবং সংযোগের উপর তার বর্গমূল বসাও;
তার পবিত্র নাম লও। শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা ও একত্ব প্রকাশ কর।
প্রতিটি উদ্দেশ্যের জন্য কাব্যপঙ্‌ক্তি রচনা কর এবং
সে উদ্দেশ্যে পদ্যের মাধ্যমে উন্নত জগতের রহস্য প্রকাশ কর।
তার সীমাবদ্ধতা দূর কর; অনুরূপভাবে তাদের গণনাও—
রহস্যোদ্‌ঘাটিকা জ্ঞান—তাতেই যোগ্য পথ খুঁজে পাবে।
কাব্যপঙ্‌ক্তিগুলো প্রকাশ পাবে ও বিশ গুণিতক হবে—
সহস্র থেকে স্বাভাবিকভাবে, হে ছকের অধিকারী!
তোমাকে এমন শিল্পকর্ম দেখাবে, যা গুণের দ্বারা পূর্ণ হয়;
তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে এবং উন্নত জগতের জ্ঞান লাভ হবে।
তাদের 'জের'-কে ছন্দোবদ্ধ কর; প্রশংসা কর গলিত রৌপ্যের
এবং তাকে 'জের'-এর চক্রাদিতে প্রতিষ্ঠিত করে অর্জন কর।
সংযোগাদির মাধ্যমে তাকে প্রতিষ্ঠা দাও ও তার গণনার মূলনীতি—
তাদের বর্ণাদির রহস্যলীলা—তার ধারাবাহিকতা রক্ষা কর।

৪৩ কাফ আলিফ কাফ ওয়াও কাফ হ্বে ওয়াও আলিফ হে আম লাহু রে লা সা কত্ব আলিফ লাম মিম নুন হ্বে আইন ফে ওয়াও লাম মুনাফেরা (পলায়নপর)।[২৯২]

ওজনের সম্পর্ক, তার অবস্থা ও তার বিপরীতধর্মী পরিমাণ এবং বিচিত্র প্রকৃতি ও চিকিৎসাশাস্ত্র অথবা কিমিয়াশিল্পের মিশ্রণজনিত সংশ্লিষ্ট অবস্থানের প্রতি সম্পর্কযুক্ত বিশিষ্ট পর্যায়গত শক্তি আবিষ্কার সম্বন্ধীয় আলোচনা।

হে চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুসন্ধানকারী, জাবিরের[২৯৩] জ্ঞানসহ
এবং পরিমাণসমূহের পরিমাণ পর্যায়ক্রমে জ্ঞাতা!
যদি তুমি চিকিৎসাশাস্ত্র জানতে চাও, তাহলে অবশ্যই
নিক্তির নিয়মাবলির সম্পর্ক জানতে হবে, যা উদ্দেশ্য সফলে অব্যর্থ।
তোমাদের আরোগ্য অবশ্যই ঘটবে ও মহৌষধটি যথার্থ
তোমাদের মিশ্রণের সৌকর্য বিশুদ্ধ আকারে প্রতিভাত হবে।

---

২৯২. এগুলো সংখ্যার বর্ণসংকেত বলে মনে হয়।
২৯৩. জাবির ইবনে হাইয়ান।

আত্মিক চিকিৎসা

তুমি 'ইলাউশ'কে চাও ৫৬৫ হে ও তার তেল[২৯৪] সুসজ্জিত।
'বাহরাম,' 'বরজিস'-এর জন্য[২৯৫] এবং অন্য সাতটি পরিপূর্ণভাবে।
শৈত্যজনিত বেদনা দূর করার জন্য পরিশুদ্ধ কর—
অনুরূপভাবে এবং বিন্যস্ত কর যেখানে তা রূপান্তরিত হয়।

কদ মানঅ' ৩৫৫ ওয়াও হেহ্বে ৬ স্বহ্ব লহাই ওয়াও লমহ্ব আলিফ আ আলিফ ওয়াৎ হেহ্বে ওয়াই সকরহু লা লাম হ্বে মহহত মহহহ আইন আইন মি মর হ্বে হ্বে ২২৪২ লাম কাফ আ' আ'র।

রাজন্যবর্গ ও তাদের সন্তান-সন্ততির।

জন্মক্ষণ সম্পর্কীয় আলোক বিচ্ছুরণ।

আলোক বিচ্ছুরণ সম্পর্কীয় জ্ঞান খুবই দুরূহ;
তার ধনুকের পার্শ্ব রাশিচক্রে প্রতিভাত।
কিন্তু হজ্জের স্থানে আমাদের ইমামের অবস্থান
প্রকাশিত হয়, যখন নক্ষত্রমণ্ডলীর অক্ষাংশ সমান্তরাল হয়।
'দালে'ই কেন্দ্রস্থল, তার দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের মাঝে
যে অর্থ উপলব্ধি করতে পারে, উন্নত হয়; তারপর সম্মানিত।
চতুর্বর্গের সংঘটন স্থল, তার 'সিন' বিচ্যুতির নায়ক;
তাদের ষড়বর্গের জন্য অনুবর্তী গৃহের ত্রিবর্গ।
বর্ধিত করা হবে চতুর্বর্গের জন্য এবং এটাই তার অনুমান
নিশ্চিতভাবে ও তার বর্গমূল; আইনের সাথে সক্রিয়।
দুই চতুর্থাংশের দিকে লক্ষ রেখে তোমার আলোকের মিশ্রণ ঘটাও
'সোয়াদে' এবং গুণিত কর; তার চতুর্বর্গ প্রকাশিত হবে।

বিশিষ্ট হয়েছে স্বহ্ব স্বহ্ব আইন ৮ দআ' ওয়াই এখানে এ প্রক্রিয়াটি রাজন্যবর্গের জন্য এবং নিয়ম তার প্রক্রিয়ার জন্য অব্যর্থ। এটি অপেক্ষা অদ্ভুত কিছু পরিলক্ষিত হয়নি।

রাজন্যবর্গের স্থান: প্রথম স্থান (৫), দ্বিতীয় স্থান (illegible), তৃতীয় স্থান (৫৫), চতুর্থ স্থান (illegible), পঞ্চম স্থান (৪৬) ষষ্ঠ স্থান (illegible) ও সপ্তম স্থান (illegible).২৯৬

সংযোগ ও বিয়োগ রেখা (illegible)।
সংযোগ রেখা (illegible)।
বিয়োগ রেখা (illegible)

২৯৪. এখানে পাঠান্তর বিদ্যমান; অর্থ, মস্তিষ্ক।

২৯৫. পূর্ববর্তী ইলাউশা = হিলিয়াস = সূর্য; বাহরাম = মঙ্গল এবং বরজিস = বৃহস্পতি।

২৯৬. এ পৃষ্ঠার বন্ধনী মধ্যস্থিত বর্ণ সংকেতগুলোর সংখ্যামান উদ্ধারের চেষ্টা করে আমরা পরাস্ত হয়েছি। যতদূর মনে হয়, এগুলো 'আবজদ' (প্রথম অধ্যায়ের ১৪২ নং টীকা দ্র:) হিসাব, 'রুস্‌মুল গুবার' ও 'রুস্‌মুয্ যিমাম' সংখ্যামান একত্র করে প্রস্তুত করা হয়েছে। শেষোক্ত দুটির জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩১৭ ও ৩১৮ নং টীকা দ্র:। এভাবে বিচিত্র বর্ণ-সংকেত একত্র হওয়ার ফলে বিষয়টি দুর্বোধ্য উঠেছে। এজন্য আমরা অনুবাদের চেষ্টা না করে যথাযথ তুলে দিলাম। একমাত্র 'দ্বিতীয় স্থান'-এর পরবর্তী বন্ধনীযুক্ত সংকেতগুলো ডান দিক হতে এবং অন্যান্য সকল সংকেত বাম দিক হতে আরম্ভ হয়েছে।

সকলের জন্য সূত্র ও ২৯৭ পরিপূর্ণ আকর্ষণের অনুপ্রেরণা ( ).

সংযোগ ও বিয়োগ ( ).

সংযোগাদির ব্যাপারে আবশ্যকীয় পরিপূর্ণতা ( )

আলোক সংস্থাপন ( ).

প্রশ্নোত্তর উত্তর প্রদানকারী কর্তন ( )

রাজন্যবর্গের নিকট হইতে প্রশ্ন সংস্থাপন ( ).

সম্পত্তির স্থান— আলো ( ); ঐশ্বর্যের স্থান ( ).

আত্মিক প্রভাব ও ঐশী আনুগত্য

হে রহস্যের অনুসন্ধানী! তোমার প্রভুর প্রশংসার জন্য
তাঁর সুন্দর নামগুলোর মধ্যে তুমি লক্ষ্যে অব্যর্থ হবে।
তোমার অনুগত হবে সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিরা তাদের অন্তরসহ;
অনুরূপ তাদের নেতৃবৃন্দ এবং সূর্যের মধ্যে সক্রিয় হবে।
সাধারণ লোককে দেখবে তোমার প্রতি আকর্ষিত[২৯৮]—
যা বলবে সত্য এবং অন্যকে তারা ছেড়ে দিবে।
তোমার পথ হল এ প্রবাহ ও পথ, যা আমি
বলছি তোমরা ছাড়া অন্যকে এবং তোমাদের সাহায্য স্পষ্ট।
যদি চাও জগতে ধার্মিকতার সাথে জীবিত থাকবে
এবং একটি সুপ্রতিষ্ঠ ধর্মমত অথবা নিজেই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।
যিন্নুন[২৯৯] ও জুনায়েদের[৩০০] ন্যায় একটি শিল্পের রহস্যসহ
এং বিস্তামের[৩০১] রহস্য আচ্ছাদনে আমি তোমাকে আবৃত দেখছি।
উন্নত জগৎ সম্পর্কে তুমি বক্তব্য প্রকাশ করবে—
অনুরূপ বলেছে হিন্দ এবং সুফীসাধকের দল।
রসূলুল্লাহের পথ সত্যের আলোকে উজ্জ্বল
অনুরূপ শিল্পকর্ম জিব্রাইল অবতীর্ণ করেননি।
তোমার তৎপরতা আল্লাহ্‌র প্রশংসা, তোমার ধনুক উদয়কাল,
বৃহস্পতিবারে ও রবিবারে আরম্ভ সুস্পষ্টভাবে দেখা দিবে।
অনুরূপ শুক্রবারেও পবিত্র নামগুলোর সাথে;
সোমবারে সুন্দর নামগুলো পরিপূর্ণ করবে।
তার 'ত্ব'য়ের মধ্যে রহস্য আছে; 'হে'র মধ্যেও যখন[৩০২]
আমি তোমাকে দেখি সমগ্রের তুলনায় বদ্ধপরিকর।
এদের অঙ্কনের জন্য একটি শুভক্ষণ তাদের শর্ত;
ধূপকাঠি ও 'মস্তকী'র সাহায্যে ধূম্রাদি উৎপন্ন করতে হবে।
এর উপর সূরা 'হাশরে'র শেষ দ্বারা প্রার্থনা জানাবে,
সূরা 'এখলাস' ও সূরা 'ফাতেহ'[৩০৩] পাঠ করবে।

---

২৯৭. রোজেনথাল 'সূত্র'-এর স্থলে 'জের' শব্দ ব্যবহার করেছেন।
২৯৮. রোজেনথালে এর পরবর্তী তিনটি ছত্রের অনুবাদ নেই।
২৯৯. বিখ্যাত সুফীসাধক; মৃত্যু ২৪৬ (৮৪১ খ্রি:) হি:।
৩০০. তৃতীয় অধ্যায়ের ৩১৪ নং টীকা দ্র:।
৩০১. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২১০ নং টীকা দ্র:।
৩০২. রোজেনথালে এর পরবর্তী তিনটি ছত্রের অনুবাদ নেই।
৩০৩. তুল, কোরান, ১৫, ৮৭।

(নক্ষত্রমালার আলোক সংযোগ) বলআ'নী লাহি লা স্ব গাইন লদ যআ' ক্বাফ স্বহ্বে মিম ফে ওয়াই ইয়া।

তোমার ডান হাতে থাকবে লোহা ও অঙ্গুরীয়;
সমুদয় তোমার মস্তিষ্কে; প্রার্থনায় অবশ্য নয়।
হাশরের আয়াত, তার দিকে তোমার অন্তরকে নিবিষ্ট কর;
সৃষ্টি জগৎ যখন নিদ্রাতুর তখন তা পাঠ ও আবৃত্তি কর।
সৃষ্টি জগতে এটাই রহস্য, এটি ছাড়া অন্য কিছু নেই;
এটাই মহান আয়াত; স্বরপ জ্ঞান হও ও অর্জন কর।
এর যথাযোগ্য সাধনার দ্বারা তুমি 'কুতব' হয়ে দাঁড়াবে
এবং উন্নত জগতের সমুদয় রহস্য জানতে পারবে।
'সরী[৩০৪] এর দ্বারা গুহ্য সাধনা করতেন ও তাঁর পূর্বে মারুফ[৩০৫]
এবং হাল্লাজ[৩০৬] এর প্রকাশ্য ঘোষণার দ্বারা বন্দী হয়েছিলেন।
এর দ্বারা শিবলি[৩০৭] সর্বদা কার্য সম্পাদন করতেন
যতক্ষণ না তিনি সাধকের উচ্চস্তরে উন্নীত হয়ে গেলেন।
সুতরাং তুমি সাধনার দ্বারা সর্বপ্রকার কলুষ হতে অন্তর পবিত্র কর;
নামজপকে সঙ্গী কর, রোজা রাখ এবং নফল নামাজ পড়।
এ পন্থীদের রহস্যজ্ঞান একমাত্র বিচক্ষণ ছাড়া কারও লভ্য নয়,
যে ব্যক্তি বিজ্ঞানের রহস্য আয়ত্ত করে যোগ্য হয়েছে।

প্রেম, আত্মসংযোগ, সাধনা, আনুগত্য, উপাসনা, সম্প্রীতি, আসক্তি, নাস্তির নাস্তি, একাগ্রতা, ধ্যান, বন্ধুত্ব, সখ্যত্য প্রভৃতির স্থান।

স্বাভাবিক প্রভাব

বরজিসের[৩০৮] জন্য প্রণয়ের একটি চক্র বিদ্যমান, যাকে তারা
টিন অথবা তামার মিশ্রণের দ্বারা পরিপূর্ণভাবে সক্রিয় করে।
বলা হয় যে, রৌপ্যের দ্বারা; বিশুদ্ধ, আমি তা দেখেছি;
তোমাকে তার রেখাগুলোর উন্নত পর্যায় উদীয়মান করবে।
এর মাধ্যমে চন্দ্র হতে বেশি কিরণ প্রাপ্তির চেষ্টা কর;
তোমাকে তার সূর্য নির্ভরতার সাথে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে।
তার দিবস ও ধূপধূনাদি; তাদের হিন্দের ধূপকাঠি
এবং সময় একটি ঘণ্টার ও প্রার্থনা, যা উপকারী।
তার প্রার্থনা উদ্দেশ্যানুসারী; তা-ই ক্রিয়াশীল হবে।
এবং 'তাসিমান' হতে প্রার্থনাও তার জন্য সুস্পষ্ট হবে।
বলা হয়, তার গঠন সম্পর্কীয় বর্ণমালার প্রার্থনা;

৩০৪. সরী আস্ সকতী; মৃত্যু ২৫৩ (৮৫৭ খ্রি:) হি:।
৩০৫. মারূফ আল্‌করখী; মৃত্যু ২০/২০৪ (৮১৬/২০ খ্রি:) দ্র:।
৩০৬. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২১১ নং টীকা দ্র:।
৩০৭. আবু বকর আশ্‌শিবলী, মৃত্যু ৩৩৪/৩৫ (৯৪৫ খ্রি:) হি:।
৩০৮. বৃহস্পতি; ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৯৫ নং টীকা দ্র:।

বায়ুর উত্তাপের দ্বারা অথবা যোগ্য উদ্দেশ্যাদির জন্য।
সুতরাং তুমি তার 'দাল' ও 'লামে'র দ্বারা বর্ণাদি অঙ্কিত কর;
এটাই চতুর্বর্গের চক্র, যা এভাবে অর্জিত হবে।
তার নির্দেশ যদি তোমার প্রবৃত্তির অনুসারী না হয়,[৩০৯]
তাহলে 'দাল' আরম্ভের জন্য; 'ওয়াও' জয়নবকে বদ্ধ করতে।
তার 'বে'-কে ও তাদের 'বে'-কে সুন্দর কর, যখন
তোমার মনোঃপূত হবে এবং তাদের অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক বাক্য।
তোমাদের গঠন হতে শর্তসহ আকৃতিসমূহ অঙ্কন কর;
অতিরিক্ত যোগ করলে যথাযোগ্য কর, যাতে তোমার ক্রিয়া অনুযায়ী হয়।
মরিয়মের কুঞ্জী; বস্তুত তাদের উভয়ের ক্রিয়া সমান;
'বাওরী'[৩১০] ও 'বিস্তামী' তার সূরার আবৃত্তিকারী।
তোমার প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ইচ্ছায় এবং তুমি লুপ্ত উদ্ধারকারী হও
'ওহশীর'[৩১১] যুক্তি-প্রমাণ, যা আগ্রাসনের জন্য আকর্ষিত।
তার ঘরগুলো সহস্র ও তার অতিরিক্ত দ্বারা পরিবর্তন কর;
তার অভ্যন্তরে রহস্য এবং সেই রহস্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হও।

শেষ পর্যায়গুলোর জন্য পরিচ্ছেদ

তোমার জন্য অদৃশ্য; উন্নত জগৎ হতে একটি আকৃতি লাভ করবে।
একটি গৃহ তোমাকে পাবে; তার আচ্ছাদন অলংকৃত।
সৌন্দর্যে ইউসুফ তুল্য; এটি তারই সমতুল্য—
গদ্যে ও প্রাঞ্জলতায় অবতীর্ণ এক স্বরূপ।
তার হাতে দৈর্ঘ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে বক্তব্যদানকারী;
সে এমন একটি একতারা, যা বুলবুলের ন্যায় বর্ণনা করে।
বহালুল[৩১২] তার রূপের আসক্তিতে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে
এবং তার বিকাশকালে বিস্তামের জন্য লজ্জা এনেছে।
তার জন্য মরেছে ও তার প্রেম আকণ্ঠ পান করেছে
জুনায়েদ ও বসরী[৩১৩] এবং দেহ পরিত্যক্ত হয়েছে।
আল্লাহ্‌র প্রশংসায় তার সীমা সন্ধান করবে এবং যে ব্যক্তি
তার সুন্দর নামগুলোর দ্বারা কোন সম্পর্ক ছাড়াই তা চাইবে।
যে ব্যক্তি এ সুন্দরের অধিকারী, সে তার উদ্দেশ্য সাধনে সফল
এবং সে সেই উন্নত প্রতিবেশের জুলফিদ্বয়ের লক্ষ্যভেদে সার্থক।
তোমাকে অদৃশ্যের সংবাদ দিবে, যদি তুমি যথার্থ সেবা কর;
তোমাকে অদ্ভুত বিষয়াদি দেখাবে; যে ব্যক্তি আশ্রয়প্রার্থী হবে।
এটাই সেই সাফল্য ও সৌন্দর্য, যা তুমি লাভ করবে;
এটি থেকেও আরও বেশি, তার ব্যাখ্যা পরে আসছে।

---

৩০৯. রোজেনথালে এর পরবর্তী ছত্রটির অনুবাদ নেই।
৩১০. 'একটি আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে'—রোজেনথাল।
৩১১. 'একটি অসত্য লোক'—রোজেনথাল; সম্ভবত ইবনে ওহাশিয়া; ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৬৮ নং টীকা দ্র:।
৩১২. সম্ভবত সুফীসাধকের একটি শ্রেণী।
৩১৩. প্রখ্যাত সুফীসাধক; তৃতীয় অধ্যায়ের ৩১০ নং টীকা দ্র:।

অন্তিম উপদেশ, উপসংহার, বিশ্বাস, ইসলাম, নিষিদ্ধতা ও যোগ্যতা

এই আমাদের কবিতা, নব্বই এর পঙ্‌ক্তি সংখ্যা;
তদতিরিক্ত যা, তা পরিচিতি, উপসংহার ও ছক।
আমি অদ্ভুত মনে করি এ পঙ্‌ক্তিগুলোকে, যাদের সংখ্যা নব্বই,
এরা এত পঙ্‌ক্তির জন্ম দিবে, যা সংখ্যায় প্রকাশযোগ্য নয়।
যে ব্যক্তি তার রহস্য বুঝবে, সে নিজকে জানতে পারবে
এবং সে ব্যক্তি গঠনের সমতুল্য ব্যাখ্যাদিও বুঝতে পারবে।
নিষিদ্ধ ও বিধানসিদ্ধ আমাদের রহস্য প্রকাশ করার জন্য
মানুষের জন্য, যদিও বিশিষ্ট হোক ও যোগ্যতার অধিকারী হোক।
যদি তুমি এর যোগ্য লোক চাও, তাহলে দৃঢ় শপথ গ্রহণ করাও;
ভ্রমণের দ্বারা বুদ্ধিমান কর এবং ধর্মের দ্বারা আশান্বিত কর।
সম্ভবত গোপন পরামর্শ করতেও তাদের রহস্য শুনতে পারবে
বিচ্ছিন্ন ও প্রকাশমান এবং উন্নত জগতে নেতৃস্থানীয় হবে।
আব্বাসের জন্য আমরা মহিমার কথা বলি ও তার গুপ্ত রহস্য;
সে সৌভাগ্যের সাক্ষাৎ পাবে এবং তার অনুসারীরা উন্নত হবে।
রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মানুষের মধ্যে দণ্ডায়মান হয়ে ভাষণ দিলেন[৩১৪]
যে ব্যক্তি আরশের উপর নেতৃত্ব দিবে, সেই পরিপূর্ণতা লাভ করবে।
আত্মাগুলো তাদের প্রকাশ্য দেহাদির মধ্যে বিন্যস্ত রয়েছে;
তাদের হত্যার জন্য দীর্ঘ আঘাতের দ্বারা অগ্রসর হয়েছে।
সেই উন্নত জগতের মধ্যে আমাদের বিনাশও বিনাশ হবে
এবং যোগ্যতা অনুসারে অস্তিত্বের আচ্ছাদন পরিধান করবে।
কবিতাটি শেষ হল এবং আল্লাহ শান্তি বর্ষণ করলেন
রসূলদের মোহরের উপর, সেই উন্নত মহান শান্তি।
শান্তি দিলেন আরশের প্রভু, মহত্ব ও উন্নতির অধিকারী;
সেই নেতাকে, যিনি সৃষ্টিজগতের নেতৃত্ব দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছেন
মুহম্মদ পথ-প্রদর্শন, ত্রাণকর্তা ও আমাদের নেতা;
তাঁর সহচরবৃন্দ সম্ভ্রান্ত ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী।

[illegible] ([illegible]) সূর্য [illegible] বিশুদ্ধ করণ ও [illegible] সমূহের [illegible]
[illegible] জন্য ([illegible]) যদি সমুদয় তত্ত্ব পরিত্যক্ত হয়—([illegible])
প্রথম শেষ [illegible] ([illegible]) যায়েরজা'র বাক্যাবলী ৩১৫

পৃথিবীর যায়েরজা হতে প্রশ্নাদির উত্তর বের করার প্রক্রিয়া, আল্লাহ্‌র কৃপায়, উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে আমাদের সাক্ষাৎ প্রাপ্তদের কাছ থেকে বর্ণিত হল।

স্তরভেদে একটি প্রশ্নের তিনশ ষাটটি উত্তর হতে পারে। তন্তুস্থিত বর্ণগুলোর সাথে প্রশ্নের সংযোগ স্থাপনের ফলে তাদের বিভিন্নতার জন্য নির্দিষ্ট উদীয়মানতার দিক হতে একই প্রশ্নের বিচিত্র উত্তর হয় এবং এ ক্ষেত্রে কবিতাটি[৩১৬] হতে বর্ণাদি বের করার প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

---

৩১৪. রোজেনথালে এর পরবর্তী ছত্রটির অনুবাদ নেই।
৩১৫. 'যায়েরজা শেষ হল'—রাজেনথাল।
৩১৬. এটি একটি কাব্য পঙ্‌ক্তি।

(সতর্কতা) তন্তু ও ছকের বর্ণসমূহকে বিন্যাস করার তিনটি নীতি বিদ্যমান। আরবি বর্ণমালা, তারা তাদের আকৃতি অনুযায়ীই আরোপিত হয়। 'রুসমুল গুবার'[১১৭] বর্ণমালা, সেগুলো পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে কতকগুলো, চক্র চারটির বেশি না হলে এদের আকৃতিগত মান অনুসারে আরোপিত হয় এবং চক্রাদি চারের বেশি হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে দশকের ঘরে ও অনুরূপভাবে শতকের ঘরে প্রক্রিয়া অনুসারে স্থানান্তরিত হয়; যেমন আমরা অচিরেই বর্ণনা করব। এ নীতিত্রয়ীর মধ্যে 'রুসমুয্ যিমাম'[৩১৮] বর্ণমালাও এরূপ। অবশ্য এ বর্ণমালা দ্বিতীয় পর্যায়ের এমন একটি সুযোগ দান করে, যাতে এক হাজারও দশের স্থানীয়। এগুলোর মান আরবি বর্ণমালার পাঁচের সাথে সম্পর্কীয়। সুতরাং ছকের ঘরে এ 'রুসম' হতে তিনটি বর্ণ এবং ঐ 'রুসম' হতে দুটি বর্ণ রাখা উচিত। এ কারণে তারা ছকের মধ্যে খালি ঘর রাখা সংক্ষিপ্ত করেছেন। তারপর যখন চক্রাদির নীতি চারের বেশি হয়, তখন ছকের দৈর্ঘ্যের সংখ্যায় হিসাব করা হয়ে থাকে এবং চারের বেশি না হলে শুধুমাত্র পূর্ণগুলোরই হিসাবের মধ্যে আনা হয়।

প্রশ্নকে প্রক্রিয়াবদ্ধ করার জন্য সাতটি নীতির প্রয়োজন হয়। তন্তুগুলোর বর্ণাদি গণনা ও বারবার করে বিয়োগ করার পর চক্রাদির সংরক্ষণ। এরা পূর্ণতাপ্রাপ্ত অবস্থায় আটটি চক্র এবং হ্রাসপ্রাপ্ত অবস্থায় ছয়টি চক্র সর্বদা হয়ে থাকে। উদীয়মান, রাশিচক্রের ক্রিয়ামক ও বৃহৎমূল চক্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং এরা সর্বদাই এক। মূলচক্রের সাথে উদীয়মানের সম্পর্ক স্থাপিত হলে কী বের হয় এবং উদীয়মান ও চক্র দ্বারা রাশিচক্রের নিয়ামককে গুণ করলে কী বের হয়, তা লক্ষ রাখা। উদীয়মানের সাথে রাশিচক্র নিয়ামককে সম্পর্কযুক্ত করা; এর সমুদয় প্রক্রিয়াটি তিনটি চক্রকে চারটি চক্রে গুণ করার দ্বারা বের হয়ে আসবে এবং এর ফলে বারটি চক্র উৎপন্ন হবে। এ তিনটি চক্রের সম্পর্ক এই যে, এদের প্রতিটি চারটি হতে তৃতীয় উৎপাদনে সম্পন্ন এবং প্রতিটি উৎপাদনের প্রারম্ভ বিদ্যমান। তারপর এরা যে চারটি চক্রের সাথে গুণিত হবে, তারাও তৃতীয় উৎপাদনের ফসল। তারপর এরা ছয় দ্বারা দুয়ের সাথে গুণিত হবে; এজন্যই তার উৎপাদন দেখা দিবে এবং প্রক্রিয়ায় তা বের হয়ে আসবে। এ বারটি চক্রের অনুসারী ফলাফল বিদ্যমান; তারাও চক্রাদির মধ্যে অবস্থিত। বস্তুত তা একটি ফল অথবা বেশি ছয়টি মাত্র।

---

৩১৭. 'রুসূমুল গবুর' নিম্নপ্রকার :

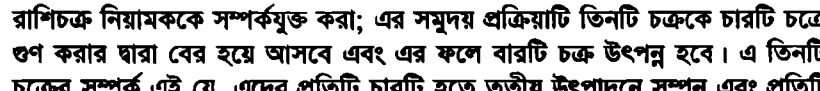

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

'গুবার' অর্থ ধূলিকণা; বর্তমানে পশ্চিমাঞ্চলে আরবি সংখ্যার লিখন প্রণালীর সাথে কিছুটা সাযুজ্য আছে।

৩১৮. 'রুসমুয যিমাম' নিম্নপ্রকার :

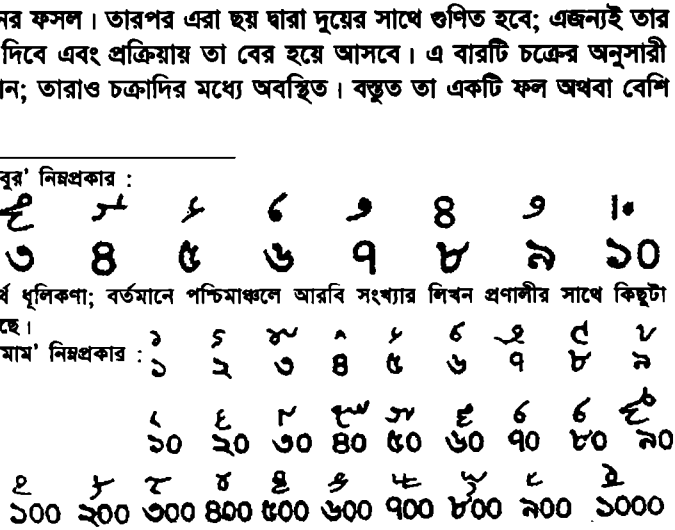

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

১০ ২০ ৩০ ৪০ ৫০ ৬০ ৭০ ৮০ ৯০

১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০ ৫০০ ৬০০ ৭০০ ৮০০ ৯০০ ১০০০

এগুলো সম্ভবত গ্রিক-কপটিক সংখ্যা লিখন প্রণালী হতে উদ্ভূত।

এ সম্পর্কীয় বর্ণনার প্রথমে আমরা একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারি, তা এই যে, 'এটি কি একটি প্রাচীন শাস্ত্র, না আধুনিক।'[৩১৯] এর উদীয়মানতা ধনুর প্রথম পর্যায়ে তন্তুগুলোর বর্ণাদির মধ্যে এবং তারপর প্রশ্নের বর্ণাদি। আমরা ধনুর শীর্ষস্থিত তন্তুর বর্ণাদি স্থাপন করি এবং তার অনুরূপ মিথুনের শীর্ষ। তার তৃতীয়টি কুম্ভের শীর্ষস্থিত তন্তু কেন্দ্রের সীমা পর্যন্ত বর্ধিত। আমরা এর সাথে প্রশ্নের বর্ণাদি সম্পর্কযুক্ত করি এবং তার সংখ্যাগুলো বিবেচনা করে দেখি। এর ফলে সংখ্যার সর্বাপেক্ষা কম মান অষ্টাশি এবং সর্বাপেক্ষা বেশি মান হয় ছিয়ানব্বই। এটাই বিশুদ্ধ চক্রের সামগ্রিক মান। এদিক থেকে আমাদের প্রশ্নের সংখ্যামান হল তিরানব্বই। এমন কি প্রশ্নের সংখ্যামান ছিয়ানব্বইয়ের বেশি হলে তাকে সংক্ষিপ্ত করা হয়। এর সমস্ত বার সংখ্যক চক্র বাদ দিয়ে তার ফল ও অবশিষ্ট সংরক্ষণ করা হয়। এদিক থেকে আমাদের প্রশ্নে সাত চক্র ও অবশিষ্ট হল নয়। একে বর্ণাদির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়, যতক্ষণ না উদীয়মানতা বার পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছায় এবং সেখানে পৌঁছালে তার গণনা ও চক্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয় না।

পুনরায় উদীয়মান যদি তৃতীয় মুখে চব্বিশ পর্যায়ের বেশি হয়, তাহলে তার সংখ্যাগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তারপর উদীয়মানের প্রতিষ্ঠা; তা এক। উদীয়মানের নিয়ামক; তা চার। বৃহৎ চক্র; তা এক। উদীয়মান ও চক্রের মধ্যস্থিত সমুদয়ের যোগফল; তা এ প্রশ্নে দুই। এ দুটি থেকে যা বের হয়, তাকে রাশিচক্রের নিয়ামকের সাথে গুণ করলে আট হয়। নিয়ামককে উদীয়মানের সাথে সম্পর্কযুক্ত করলে হবে পাঁচ। এ সাতটি নীতি। ধনুর নিয়ামকের সাথে উদীয়মান ও বৃহৎচক্রের গুণের ফলে যা বের হয়ে আসবে, তা যদি বার সংখ্যা না হয়, তা হলে ছকের নিম্নদিক থেকে উপরের দিকে আটের পাশে তাকে প্রবেশ করাতে হবে। যদি তা বার সংখ্যার বেশি হয়, তাহলে চক্র বিয়োগ করে অবশিষ্ট আটের পাশে প্রবেশ করবে। সংখ্যার শেষ পর্যায়ে একটি চিহ্ন তার এবং উদীয়মান ও নিয়ামকের মধ্য থেকে বের হয়ে আসা পাঁচের মধ্যে স্থাপন করতে হবে। উদীয়মান তখন ছকের উপরের দিকের বিস্তৃত সমতলে অবস্থান করবে। পরপর পাঁচটি চক্র গণনা করতে হবে এবং সংখ্যাটি এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে তা এ চারটির যে-কোন একটি বর্ণে উপনীত হয়। বর্ণগুলো হচ্ছে 'আলিফ', 'বে', 'জিম' অথবা 'যে'। আমাদের গৃহীত প্রক্রিয়ায় সংখ্যাটি আলিফে এসে উপনীত হবে এবং তিনটি চক্র পিছনে থাকবে। সুতরাং আমরা তিনের সাথে তিন গুণ করে নয় পাব এবং এটাই প্রথম চক্রের সংখ্যা।

এ সংখ্যাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং দুটি পাশের মধ্যবর্তী সমুদয়কে এক করতে হবে। এ দুটি পাশ লম্ব ও বিস্তৃত, ছকের সংখ্যা অনুসারে পূর্ণ ঘরগুলোর বিপরীতে আটের ঘরে হবে। এটি যদি ছকের খালি ঘরগুলোর কোনটিতে উপনীত হয়, তাহলে তাকে গণ্য না করে চক্রাদির মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে যেতে হবে। প্রথম চক্রে যে সংখ্যা রয়েছে, তা এখানে প্রবেশ করাতে হবে এবং এটি নয় সংখ্যা। ছকের সম্মুখভাগে তার সন্নিহিত যে ঘরটি রয়েছে, যাতে এরা উভয়ে একত্র হবে, তার সংখ্যামান আট। সেখান

৩১৯. এ প্রশ্নটিকেই 'য়ায়েরজা'র মাধ্যমে সাধন করে উত্তর পেতে চেষ্টা করা হয়েছে। উত্তর ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্র:।

থেকে বাম দিকে অগ্রসর হয়ে তারপর 'লাম আলিফ' বর্ণে উপনীত হবে এবং কখনই সেখান থেকে যুগ্ম বর্ণ বের হবে না। এটি তখন 'তে' বর্ণ, সংখ্যামান চারশত—রুস্‌মুয্‌ যিমামের অন্তর্গত; সুতরাং তাকে 'উদ্দিষ্ট ঘর'[৩২০] হতে স্থানান্তরিত করার পর তার উপর চিহ্ন দিতে হবে। এর সাথে নিয়ামকের চক্রে সংখ্যা যোগ করলে তের হবে। এ সংখ্যাকে তন্তুগুলোর বর্ণে প্রবেশ করাতে হবে এবং যার উপর এ সংখ্যাবিন্যাস পড়ে, তাতে থামতে হবে এবং তাতে উদ্দিষ্ট ঘর হতে চিহ্ন দিতে হবে।

পাঠক, এ নিয়ম থেকে জানতে পারবেন, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বর্ণগুলো কতবার আবর্তিত হয়ে থাকে। এটি এই যে, প্রথম চক্রের বর্ণগুলো একত্র করলে তার সংখ্যামান হবে নয়; এর রাশিচক্রের নিয়ামকের সংখ্যা চার যোগ করলে তের হবে। এ সংখ্যাকে তার সমপরিমাণের দ্বারা বর্ধিত করলে হবে ছাব্বিশ। তা থেকে বর্তমান প্রশ্নের উদীয়মান পর্যায়ের সংখ্যা এক বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকবে পঁচিশ। এটাই হবে বর্ণসমূহের প্রথম বিন্যাসের ধারা। তারপর তেইশ দুবার, বাইশ দুবার এবং এভাবে বিয়োগ দিতে দিতে পদ্য পঙ্‌ক্তির শেষ এক সংখ্যায় গিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু কারও পক্ষে প্রথমেই এক বাদ দিয়ে চব্বিশের জন্য থমকে দাঁড়ালে চলবে না।

অতঃপর দ্বিতীয় চক্রের বিষয়টি রাখতে হবে এবং প্রথম চক্রের বর্ণগুলোকে আটের সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে হবে। এটি উদীয়মান ও চক্রের সাথে নিয়ামকের গুণফলের সাথে সতের হবে; অবশিষ্ট থাকবে পাঁচ। তারপর আটের পাশে তাকে এমনভাবে চড়াতে হবে, যাতে প্রথম চক্রে শেষ হয় এবং সেখানে চিহ্ন দিতে হবে। ছকের সামনে সতেরকে প্রবেশ করাতে হবে; তারপর পাঁচকে। খালিঘরগুলোকে ধরতে হবে না এবং চক্র হবে বিশ। এর ফলে আমরা 'ছে' বর্ণটি পাব; তা পাঁচশ। অবশ্য তা 'নুন'; কেননা আমাদের চক্রটি দশকের পর্যায়ে। সুতরাং পাঁচশ পঞ্চাশে গণ্য হবে; কারণ তার চক্রটি সতের। তা যদি সতের না হতো তাহলে শতকের পর্যায়ে হতো। কাজেই 'নুন'কে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে এবং তার প্রথম দিকে পাঁচকে প্রবেশ করাতে হবে।

এর পর দেখতে হবে সমতলের যে অংশটি তার বিপরীত, তাতে কী আছে; তা এক। এ এককে বিপরীত মুখে স্থাপন করলে তা পাঁচের উপর পড়বে। এর সাথে সমতলের এককে সম্পর্কযুক্ত করলে ছয় হবে। এখানে 'ওয়াও'কে প্রতিষ্ঠা করে তাকে চিহ্নিত করতে হবে উদ্দিষ্ট ঘরের সংখ্যা চারের দ্বারা। এর সাথে উদীয়মান ও চক্রকে নিয়ামকের দ্বারা গুণিত সংখ্যা আটের সম্পর্ক স্থাপন করলে বার হবে। এর সাথে দ্বিতীয় চক্রের অবশিষ্ট পাঁচ মিলালে সতের হবে এবং এর দ্বিতীয় চক্রের সংখ্যামান।

অতঃপর আমরা এ সতেরকে তন্তুগুলোর বর্ণে প্রবেশ করালাম এবং সংখ্যাটি একের উপর পড়ল। এখানে 'আলিফ'কে প্রতিষ্ঠা দিয়ে উদ্দিষ্ট ঘর থেকে তার উপর চিহ্ন দিতে হবে। তন্তুগুলোর বর্ণ থেকে দ্বিতীয় চক্রের মধ্য থেকে বহিষ্কৃত সংখ্যা অনুসারে তিনটি বর্ণকে বাদ দিতে হবে। এবার তৃতীয় চক্রকে রাখতে হবে এবং পাঁচকে আটের সাথে মিলালে তের হবে; অবশিষ্ট থাকবে এক। এ একের দ্বারা চক্রটিকে আটের পাশে স্থানান্তরিত করতে হবে এবং উদ্দিষ্ট ঘরে তের প্রবেশ করাতে হবে। যার উপর সংখ্যাটি

৩২০. মূল শব্দটি 'বয়তুল কসীদ', এর অর্থ উদ্দিষ্ট কাব্য পঙ্‌ক্তিও হতে পারে।

পড়বে, তা নিতে হবে এবং তা হলো 'ক্বাফ'; তার উপর চিহ্ন দিতে হবে। তেরকে তন্তুগুলোর বর্ণে প্রবেশ করিয়ে যা বের হয়, তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে এবং তা হলো 'সিন'। উদ্দিষ্ট ঘর থেকে তার চিহ্ন প্রদান করতে হবে। তারপর চক্রের অবশিষ্টের সাথে বহিষ্কৃত সিনের নিকটবর্তী তেরকে প্রবেশ করাতে হবে; তা এক। এর পর সিনের সন্নিহিত তন্তুগুলোর বর্ণ থেকে গ্রহণ করতে হবে এবং তা 'বে'; তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে ও উদ্দিষ্ট ঘর থেকে তাতে চিহ্ন দিতে হবে। একেই বলা হয়—'হেলান চক্র' তার পরিমাপ বিশুদ্ধ।

এটি তেরকে তার অনুরূপ সংখ্যার দ্বারা বর্ধিত করা এবং সেই সাথে চক্রের অবশিষ্ট এককে সম্পর্কযুক্ত করা; এর ফলে সাতাশ হবে। এটাই 'বে' বর্ণ যা তন্তুগুলো থেকে উদ্দিষ্ট ঘরের মধ্য দিয়ে বের হয়ে এসেছে। তেরকে ছকের প্রারম্ভে প্রবেশ করাতে হবে। এরপর সমতলের বিপরীতে যা আছে তার প্রতি লক্ষ করতে হবে এবং তাকে তার অনুরূপ দ্বারা বাড়াতে হবে। এর উপর তেরর অবশিষ্ট এক বাড়িয়ে দিতে হবে এবং এর ফল হবে 'জিম' বর্ণ। মোট সংখ্যা থেকে সাত। অনুরূপভাবে 'যে' বর্ণ; আমরা তাকে প্রতিষ্ঠা দিব এবং উদ্দিষ্ট ঘর থেকে এর উপর চিহ্ন দিব। এর পরিমাপ হল সাতকে তার অনুরূপ সংখ্যার দ্বারা বাড়ানো এবং তার সাথে তেরর অবশিষ্ট এককে যোগ করা; এর ফলে সংখ্যা দাঁড়াবে পনের। এর উদ্দিষ্ট ঘরের পঞ্চদশ সংখ্যা। এটাই ত্রি-চক্রাদির শেষ পর্যায়।

এখানে চতুর্থ চক্রকে রাখতে হবে এবং পূর্ব চক্রের অবশিষ্ট মিলিয়ে এর সংখ্যা হলো নয়। এ ক্ষেত্রেও উদীয়মান ও চক্রের দ্বারা নিয়ামককে গুণ করতে হবে। এ চক্রই চতুশ্চক্রীয় প্রথম ঘরের শেষ প্রক্রিয়া। এর পর তন্তুগুলোর দুটি বর্ণকে গুণ করতে হবে এবং নয় সংখ্যাকে আটের পাশে ক্রমশ উপরের দিকে বসাতে হবে। উদিষ্ট ঘর থেকে শেষে গৃহীত বর্ণের চক্রে নয়কে প্রবেশ করাতে হবে। এর নবম হল 'রে' বর্ণ; একে প্রতিষ্ঠা দিয়ে এর উপর চিহ্ন দিতে হবে। ছকের প্রারম্ভস্থানে নয়কে প্রবেশ করিয়ে দেখতে হবে তার বিপরীত সমতলে কী আছে; তা 'জিম'। এক সংখ্যাকে উল্টে দিলে তা হবে 'আলিফ' এবং তা উদ্দিষ্ট ঘর থেকে 'রে'র দ্বিতীয় স্থানে থাকবে। একে প্রতিষ্ঠিত করে চিহ্ন দিতে হবে। এ দ্বিতীয়ের সন্নিহিত সংখ্যাকে গণনা করলেও সেই 'আলিফ' দেখা দিবে এবং একে প্রতিষ্ঠিত করে চিহ্ন দিতে হবে। তা দ্বারা তন্তুগুলোর একটি বর্ণে গুণ করতে হবে এবং নয়কে তার অনুরূপ দ্বারা বর্ধিত করলে আঠার হবে। এ সংখ্যাকে তন্তুগুলোর বর্ণাদিতে প্রবেশ করিয়ে 'বে'র কাছে থামতে হবে এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করে উদ্দিষ্ট ঘর থেকে আটচল্লিশের চিহ্ন দিতে হবে। তন্তুগুলোর বর্ণে আঠারকে প্রবেশ করিয়ে সিনের কাছে থামতে হবে এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করে দুই দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। এ দুইকে নয়ের সাথে সংযুক্ত করলে এগার হবে এবং এই এগারকে ছকের প্রারম্ভে প্রবেশ করালে তার বিপরীত সমতলে থাকবে আলিফ। একে প্রতিষ্ঠিত করে চিহ্ন দিতে হবে ছয়।

এখানে পঞ্চম চক্র রাখতে হবে; তার সংখ্যা মান সতের; অবশিষ্ট পাঁচ। এ পাঁচকে আটের পাশে চড়িয়ে তন্তুগুলোর দুটি বর্ণের সাথে গুণ করতে হবে এবং পাঁচকে তার

অনুরূপ সংখ্যার দ্বারা বর্ধিত করতে হবে। এ সংখ্যাকে তার চক্রের সংখ্যা সতেরর সাথে যুক্ত করলে মোট সংখ্যা হবে সাতাশ। এ সংখ্যাকে তন্তুসমূহের বর্ণে প্রবেশ করাতে হবে এবং 'বে'র উপর পড়বে। তাকে প্রতিষ্ঠিত করে চিহ্ন দিতে হবে বত্রিশ। সতের থেকে সেই দুইকে বাদ দিতে হবে, যা বত্রিশের ভিত্তি; অবশিষ্ট থাকবে পনের। একে তন্তুসমূহের বর্ণে প্রবেশ করালে 'ক্বাফে' উপনীত হবে। তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে চিহ্ন দিতে হবে ছাব্বিশ। এ ছাব্বিশকে হুকের প্রারম্ভে প্রবেশ করালে 'রুসমুল গুবার'-এর দুইয়ে উপনীত হবে এবং এটাই 'বে' বর্ণ। একে প্রতিষ্ঠা করে এর উপর চিহ্ন দিতে হবে পঁয়তাল্লিশ।

একে তন্তুসমূহের দুটি বর্ণে গুণ করে ষষ্ঠ চক্র রাখতে হবে। এর সংখ্যা মান তের এবং এর অবশিষ্ট এক। এখানে এ কথাই প্রকাশ পায় যে, পদ্যের চক্রমান পঁচিশ। কেননা চক্রগুলো হল পঁচিশ, সতের, পাঁচ, তের ও এক। সুতরাং পাঁচকে পাঁচের সাথে গুণ করলে পঁচিশ হবে; এটাই ঘরের পদ্যের চক্র। এ চক্রকে আটের পাশে একের দ্বারা স্থানান্তরিত করতে হবে। কিন্তু এটি উদ্দিষ্ট ঘরে তেরর দ্বারা প্রবেশ করবে না; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। কেননা এটি দ্বিতীয় বিন্যাসের দ্বারা উৎপন্ন দ্বিতীয়ের চক্র। বরং আমরা উদ্দিষ্ট ঘরের 'বে' বর্ণাদি থেকে বহিষ্কৃত চুয়ান্নের মধ্যে চারকে একের সাথে যুক্ত করব; এর ফলে পাঁচ হবে এবং পাঁচকে ওই চক্রের তেরর সাথে যুক্ত করলে আঠার হবে। একে ছকের প্রারম্ভে প্রবেশ করাতে হবে এবং তার বিপরীতে সমতলে যা আছে, তা গ্রহণ করতে হবে; তা আলিফ। তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে এবং উদ্দিষ্ট ঘর থেকে তার উপর চিহ্ন দিতে হবে বার। তাকে তন্তুসমূহের দুটি বর্ণে গুণ করতে হবে।

এখানে প্রশ্নের বর্ণগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং তার মধ্য থেকে যা বের হবে, তাকে উদ্দিষ্ট ঘরের শেষের দিকে যোগ করতে হবে। প্রশ্নের বর্ণগুলো থেকে তার উপর চিহ্ন দিতে হবে; যাতে তা উদ্দিষ্ট ঘরের সংখ্যায় প্রবেশ করতে পারে। তারপর প্রশ্নের সমুদয় বর্ণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি বর্ণের ব্যাপারে এরূপ করতে হবে। এভাবে যা তার মধ্য থেকে বের হবে, তাকে উদ্দিষ্ট ঘরের শেষের দিকে যোগ করে চিহ্ন দিতে হবে। এর পর আলিফ বর্ণের উপর একক সংখ্যার যে চিহ্ন দেয়া হয়েছে, তাকে আঠারর সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এর ফলে দুই পাওয়া যাবে এবং মোট সংখ্যা হবে বিশ। একে তন্তুসমূহের বর্ণের উপর প্রবেশ করালে 'রে' বর্ণের মধ্যে গিয়ে থামবে। তাকে প্রতিষ্ঠিত করে উদ্দিষ্ট ঘর থেকে তাকে চিহ্নিত করতে হবে; ছিয়ানব্বই। এটাই তন্তুসমূহের বর্ণচক্রাদির শেষ সীমা।

তন্তুসমূহের দুটি বর্ণকে গুণ করে সপ্তম চক্র রাখতে হবে এবং এটি দুটি অভিনবত্বের দ্বিতীয় অভিনবত্ব। এ চক্রের সংখ্যামান হল নয়; এর সাথে এক যুক্ত করলে দ্বিতীয় উৎপাদনের জন্য দশ হবে। এই এককে পরবর্তী পর্যায়ে দ্বাদশ চক্রে যোগ করতে হবে; যদি তার সম্পর্ক অনুরূপ হয় অথবা তাকে মূল থেকে কমাতে হবে। ফলে মোট হবে পনের। একে আটানব্বইয়ের পাশে চড়াতে হবে এবং দশ দ্বারা ছকের প্রারম্ভে প্রবেশ করাতে হবে; ফলে তা পাঁচশতে গিয়ে থামবে। অবশ্য মূলত এটি পঞ্চাশ মাত্র; 'নুন'কে তার অনুরূপ দ্বারা বর্ধিত করা হয়েছে। এটি ক্বাফ; একে প্রতিষ্ঠা দিয়ে উদ্দিষ্ট

ঘর থেকে তাকে চিহ্নি করতে হবে বায়ান্ন। এই বায়ান্ন থেকে দুইকে বাদ দিতে হবে এবং ওই চক্রের নয়ও বাদ পড়বে। অবশিষ্ট থাকবে একচল্লিশ। একে তন্তুগুলোর বর্ণে প্রবেশ করালে একের মধ্যে এসে থামবে; তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। অনুরূপভাবে তাকে উদ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করালে এক পাওয়া যাবে। এটাই দ্বিতীয় উৎপাদনের পরিমাণ। এর উপর উদ্দিষ্টঘর থেকে দুটি চিহ্ন প্রদান করতে হবে; এর একটি শেষ পরিমাপগত আলিফের উপর এবং অন্যটি প্রথম আলিফের উপর। দ্বিতীয়টি চব্বিশ।

তন্তুসমূহের দুটি বর্ণকে গুণ করে এবার অষ্টম চক্র রাখতে হবে; এর সংখ্যামান সতের ও অবশিষ্ট পাঁচ। আটান্নর পাশে প্রবেশ করাতে হবে এবং উদ্দিষ্ট ঘরে পাঁচ প্রবেশ করালে 'আইন'-এর সত্তরে এসে থামবে। তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। ছকের মধ্যে পাঁচ প্রবেশ করাতে হবে এবং তার বিপরীতে সমতলে যা আছে, তা গ্রহণ করতে হবে। তা এক; তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে ঘর থেকে চিহ্ন দিতে হবে আটচল্লিশ। দ্বিতীয় ভিত্তির জন্য এ চল্লিশ থেকে এক বাদ দিতে হবে এবং তার সাথে চক্রের পাঁচ যোগ করতে হবে; মোট হবে বায়ান্ন। একে ছকের প্রারম্ভে প্রবেশ করালে—'রুস্‌মু গুবার'-এর 'বো' বর্ণে এসে থামবে। এটি সংখ্যা বৃদ্ধির শতকের পর্যায়: এর ফলে দুইশ হবে। এটি 'রে' বর্ণ; তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে উদ্দিষ্ট থেকে চিহ্ন দিতে হবে চব্বিশ। সুতরাং বিষয়টি ছিয়ানব্বই থেকে প্রথম দিকে স্থানান্তরিত হবে; তা চব্বিশ। এ চব্বিশের সাথে চক্রের পাঁচ সংযুক্ত করতে হবে এবং তা থেকে এক বাদ দিলে মোট দাঁড়াবে আটাশ। এর অর্ধেককে উদ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করালে আটের উপর এসে থামবে এবং দুইকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে চিহ্ন দিতে হবে।

এখানে নবম চক্র রাখতে হবে; তার সংখ্যা তের এবং অবশিষ্ট এক। আটের পাশে এককে চড়াতে হবে। সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এ স্থানের প্রক্রিয়ার সম্পর্ক ষষ্ঠ চক্রের সম্পর্কের ন্যায় নয়; কারণ তা দ্বিতীয় উৎপাদনের ফসল এবং তা রাশিচক্রের চতুর্বর্গের তৃতীয়াংশের প্রথম ও ত্রিবর্গের চতুর্থটির ষষ্ঠাংশের শেষ। সুতরাং চক্রের তেরকে পূর্ব রাশিচক্রের ত্রিবর্গের চারের সাথে গুণ করতে হবে; ফল হবে বায়ান্ন। একে ছকের প্রারম্ভে প্রবেশ করালে তা 'রুসমুল গুবারে'র দুই বর্ণে এসে থামবে এবং তা সংখ্যার দিক থেকে একক ও দশকের ঘর অতিক্রম করে যাওয়ায় একান্তই শতকিয়া। তাকে দুইশ 'রে' বর্ণে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে এবং উদ্দিষ্ট ঘর থেকে তার উপর চিহ্ন দিতে হবে আটচল্লিশ। চক্রের তেরোর সাথে ভিত্তির এক সংযুক্ত করতে হবে এবং উদ্দিষ্ট ঘরে এ চৌদ্দ প্রবেশ করালে আটে দাঁড়াবে। তাতে আটাশের চিহ্ন দিতে হবে। চৌদ্দ থেকে সাত বাদ দিলে সাত অবশিষ্ট থাকবে; তাকে তন্তুগুলোর দুটি বর্ণে গুণ করে সাতকে প্রবেশ করালে 'লাম' বর্ণের কাছে এসে থামবে। তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে ঘর থেকে তার উপর দিতে হবে।

এভাবে দশম চক্র রাখতে হবে এবং তার সংখ্যা নয়। এটি চতুর্থ ত্রিবর্গের আরম্ভ। এ নয়কে আটের পাশে চড়ালে শূন্য ঘর পাওয়া যাবে। সুতরাং নয়কে দ্বিতীয় বার চড়ালে আরম্ভের সপ্তম স্থানে হবে। নয়কে চারের সাথে গুণ করতে হবে; কেননা আমরা দুটি নয় সহ চড়তে চাই। অবশ্য একমাত্র দুইয়ের সাথেই তাকে গুণ করা হত। এ

ছত্রিশকে ছকের মধ্যে প্রবেশ করালে তা 'রুস্‌মুয্‌ যিমাম'-এর চার এসে থামবে; তা দশকিয়া। আমরা চক্রাদির স্বল্পতার জন্য তাকে একক হিসেবে গ্রহণ করেছি। সুতরাং 'দাল' বর্ণ প্রতিষ্ঠা পাবে। ছত্রিশের সাথে ভিত্তির এক যুক্ত করলে উদ্দিষ্ট ঘরে তার সীমা নির্দিষ্ট হবে। তার উপর চিহ্ন দিতে হবে। যদি অন্য কিছু ছাড়া নয়কে গুণের দিক থেকে ছকের প্রারম্ভে প্রবেশ করানো যায়, তা হলে তা আটে এসে থামবে। এ আট থেকে চার বাদ দিলে চার অবশিষ্ট থাকবে; তাই লক্ষ্য বস্তু। যদি নয়ের দ্বিগুণ আঠারকে ছকের প্রারম্ভে প্রবেশ করানো যায়, তা হলে তা 'যিমামে'র একে এসে থামবে; এটিও দশকিয়া। তা থেকে নয়ের দ্বিগুণ দুইকে বাদ দিলে তার অবশিষ্টের অর্ধেক আটই লক্ষ্যবস্তু। যদি ছকের প্রারম্ভে নয়ের তিন গুণ সাতাশকে প্রবেশ করানো যায়, তা হলে তা যিমামের দশের উপর পড়বে। প্রক্রিয়া একই প্রকার। তারপর নয়কে উদ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করাতে হবে এবং যা বের হবে, তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে; তা আলিফ। এর পর নয়কে সেই তিনের সাথে গুণ করতে হবে, যা বিগত নয়ের অঙ্গ এবং এক বাদ দিতে হবে। ছাব্বিশকে ছকের প্রারম্ভে প্রবেশ করিয়ে যা বের হয়, তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে; তা 'রে' বর্ণে দুইশ। উদ্দিষ্ট ঘর থেকে তার উপর চিহ্ন দিতে হবে ছিয়ানব্বই।

এখানে তন্তুগুলোর দুটি বর্ণ গুণ করে একাদশ চক্র রাখতে হবে। তার সংখ্যা সতের ও অবশিষ্ট পাঁচ। আটের পাশে পাঁচকে চড়াতে হবে এবং প্রথম চক্রে পদচারণা কালে যা বারংবার এসেছে, তাকে গণনা করতে হবে। ছকের প্রারম্ভে পাঁচকে প্রবেশ করালে শূন্য ঘরে এসে পৌছবে। তার বিপরীতে সমতলে যা আছে, তা গ্রহণ করতে হবে; তা এক। এ এককে উদ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করালে 'সিন' হবে। তাকে প্রতিষ্ঠা করে তার উপর চিহ্ন দিতে হবে চার। যদি ছকে থেমে পড়ার বিষয়টি কোন পূর্ণ ঘরে এসে পৌঁছত, তা হলে আমরা এককে তিন হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতাম। সতেরকে তার অনুরূপ দ্বারা বর্ধিত করতে হবে এবং তা থেকে এক বাদ দিতে হবে।[৩২১] পুনরায় তার সাথে চার বাড়ালে মোট সাঁইত্রিশ হবে। একে তন্তুগুলোর বর্ণে প্রবেশ করালে ছয়ে এসে পৌছবে; তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে চিহ্ন দিতে হবে। পাঁচকে তার অনুরূপ দ্বারা বর্ধিত করতে হবে। তাকে ঘরে প্রবেশ করালে 'লামে'র কাছে এসে থামবে। তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে চিহ্ন দিতে হবে বিশ এবং তন্তুগুলোর দুটি বর্ণের সাথে গুণ করতে হবে।

এখানে দ্বাদশ চক্র রাখতে হবে, তার সংখ্যা হবে তের এবং অবশিষ্ট হবে এক। আটের পাশে এ এককে চড়াতে হবে। এ চক্রই সর্বশেষ চক্র, দুটি অভিনবত্বের শেষ এবং ত্রিমাত্রিক চতুর্বর্গের ও চতুর্মাত্রিক ত্রিবর্গের শেষ পর্যায়। এ এক ছকের প্রারম্ভে যিমামের আশির উপর পড়বে। এটি আটের একক মাত্র; অথচ আমাদের কাছে একটি ছাড়া অন্য কোন চক্র নেই। সুতরাং তা যদি দ্বাদশ চতুর্বর্গের চার অথবা দ্বাদশ ত্রিবর্গের তিন অপেক্ষা বেশি হত, তা হলে অবশ্যই 'হ্বে' হত; কিন্তু তা 'দাল' মাত্র। কাজেই তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে উদ্দিষ্ট ঘর থেকে তার উপর চিহ্ন দিতে হবে চুয়াত্তর। তারপর তার সাথে সম্পর্কযুক্ত সমতলে যা আছে, তার প্রতি লক্ষ করতে হবে; তা পাঁচ। তার সাথে ভিত্তির জন্য তার অনুরূপ কিছু বর্ধিত করলে দাঁড়াবে দশ। 'ইয়া'কে প্রতিষ্ঠা দিয়ে চিহ্ন

---

৩২১. এখানে রোজেনথালের অনুবাদের সাথে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান।

দিতে হবে। তারপর লক্ষ করতে হবে তা কোন পর্যায়ে পড়ে। আমরা তাকে চতুর্থ পর্যায়ে পাচ্ছি এবং সাতকে তন্তুগুলোর বর্ণে প্রবেশ করাচ্ছি। এ প্রবেশস্থলকে বলা হয়, 'বর্ণীয় প্রজনন'; সুতরাং তা হবে 'ফে'। তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে সাতের সাথে চক্রের এক-কে সংযুক্ত করতে হবে; সর্বমোট হবে আট; তাকে তন্তুগুলোর মধ্যে প্রবেশ করালে 'সিন' হবে। তাকে প্রতিষ্ঠিত করে তার উপর চিহ্ন দিতে হবে আট। এ আটকে চক্রের দশের অতিরিক্ত তিনের সাথে গুণ করতে হবে। কেননা এটাই চক্রাদির চতুর্বর্গের সেই পর্যায়ে, যা ত্রিবর্গের দ্বারা শেষ হয়েছে। ফলে তা দাঁড়াবে চব্বিশ। তাকে উদ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করিয়ে তা থেকে যা বের হয়, তার উপর চিহ্ন দিতে হবে। তা দুইশ ও তার চিহ্ন হল ছিয়ানব্বই। এটাই বর্ণাদির চক্রের দ্বিতীয় চক্রের শেষ সীমা।

তন্তুগুলোর দুটি বর্ণ গুণ করে এখানে প্রথম ফল রাখতে হবে। তার সংখ্যা নয় এবং এ সংখ্যাটি তন্তুগুলোর বর্ণকে চক্রাদিক্রমে বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে, তার সাথে সর্বদা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে; তাও নয়। এ নয়কে তন্তুগুলোর বর্ণের নব্বই সংখ্যার অতিরিক্ত তিনের সাথে গুণ করতে হবে এবং দ্বাদশ চক্রের অবশিষ্ট এক তার সাথে যুক্ত করতে হবে; মোট হবে আটাশ। তাকে তন্তুগুলোর বর্ণে প্রবেশ করালে 'আলিফে' উপনীত হবে। তাকে প্রতিষ্ঠিত করে তার উপর চিহ্ন দিতে হবে ছিয়ান্নব্বই। যদি নব্বই সম্পর্কীয় বর্ণাদির চক্রের সংখ্যা সাতকে চারের সাথে গুণ করা হয়, যা নব্বইর অতিরিক্ত তিন ও দ্বাদশ চক্রের অবশিষ্ট একের সমষ্টি, তা হলে সংখ্যামান এরূপ হবে। নয়কে আটের পাশে চড়াতে হবে এবং ছকের মধ্যে নয়কে প্রবেশ করাতে হবে; তা হলে যিমামের দুই হবে। নয়কে সমতলের সাথে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ তার সাথে গুণ করতে হবে; তা তিন এবং তার সাথে বর্ণাদির তন্তুর সংখ্যা সাতকে যুক্ত করতে হবে। তা থেকে দ্বাদশ চক্রের অবশিষ্ট এক-কে বাদ দিলে মোট হবে তেত্রিশ। তাকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করালে পাঁচে পৌছবে। তাকে প্রতিষ্ঠিত করে নয়কে তার অনুরূপ সংখ্যার দ্বারা বাড়িয়ে ছকের প্রারম্ভে আঠারকে প্রবেশ করাতে হবে। সমতলে যা আছে, তা গ্রহণ করতে হবে; তা এক। তাকে তন্তুগুলোর বর্ণে প্রবেশ করালে 'মিম'-এ পৌছবে। তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে তার উপর চিহ্ন দিতে হবে।

তন্তুগুলোর দুই বর্ণকে গুণ করে দ্বিতীয় ফল স্থাপন করতে হবে। তার সংখ্যা সতের ও অবশিষ্ট পাঁচ। পাঁচকে আটের পাশে চড়াতে হবে এবং পাঁচ দ্বারা নব্বইর অতিরিক্ত তিনকে গুণ করলে পনের হবে। তার সাথে দ্বাদশ চক্রের অবশিষ্ট এক যুক্ত করলে নয় হবে এবং ষোলকে উদ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করালে 'তে' হবে। তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে এবং তার উপর চিহ্ন দিতে হবে চৌষট্টি। নব্বইয়ের অতিরিক্ত তিনকে পাঁচের সাথে যুক্ত করতে হবে এবং তার সাথে দ্বাদশ চক্রের অবশিষ্ট এক বাড়ালে হবে নয়। তাকে ছকের প্রারম্ভে প্রবেশ করালে যিমামের ত্রিশ হবে। তারপর সমতলে যা আছে, তার প্রতি লক্ষ করলে এক পাওয়া যাবে। তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে উদ্দিষ্ট ঘর থেকে তাকে চিহ্নিত করতে হবে। তা ঘর থেকেও নবম। ছকের প্রারম্ভে নয়কে প্রবেশ করালে তা তিনে পৌছবে; এটি দশকের পর্যায়। 'লাম'কে প্রতিষ্ঠা দিয়ে তার উপর চিহ্ন দিতে হবে।

এখানে তৃতীয় ফলকে স্থাপন করতে হবে; তার সংখ্যা তের এবং অবশিষ্ট এক। আটের পাশে এককে স্থানান্তরিত করে তেরর সাথে নব্বইয়ের অতিরিক্ত তিন ও দ্বাদশ

চক্রের অবশিষ্ট এককে সংযুক্ত করলে—সতের হবে এবং এর সাথে ফলের এককে যোগ করলে দাঁড়াবে আঠার। তাকে তন্তুগুলোর বর্ণে প্রবেশ করালে 'লাম' হবে; তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে।' এটাই প্রক্রিয়ার শেষ।

এই বিগত প্রশ্নের মধ্যে যে উদাহরণটি বিদ্যমান, তা দিয়ে আমরা জানতে চেয়েছি যে, এ 'জায়েরষা,' এটি শাস্ত্র হিসেবে অর্বাচীন, না প্রাচীন। উদীয়মান তখন ধনুকের প্রথম পর্যায়ে অবস্থিত। আমরা তন্তুগুলোর বর্ণকে প্রতিষ্ঠিত করেছি, এর পর প্রশ্নের বর্ণগুলোকে এবং এর পর নীতিমালাকে। এগুলো বর্ণাদির সংখ্যামান—তিরানব্বই; তার চক্রাদির সংখ্যা সাত; তার অবশিষ্ট নয়; উদীয়মান এক; ধনুকের নিয়ামক চার; বৃহৎচক্র এক; চক্রের সাথে উদীয়মানের পর্যায় দুই; চক্রের সাথে উদীয়মানকে নিয়ামকের দ্বারা গুণের ফল আট এবং নিয়ামককে উদীয়মানের সাথে সংযুক্তকরণ পাঁচ—উদ্দিষ্ট ঘর।

একটি বিরাটাকার প্রশ্ন তোমার মধ্যে বহন করছ, অতএব সংরক্ষণ কর
উত্থাপিত সমুদয় সন্দেহ, যা শুধু অধ্যবসায়ই সহজ করতে পারে।[৩২২]

তন্তুগুলোর বর্ণ—স্বোয়াদ, ত্বয়, হে, রে, ছে, কাফ, হে, মিম, স্বোয়াদ, স্বোয়াদ, ওয়াও, নুন, বে, হে, সিন, আলিফ, নুন, লাম, মিম, নুন, স্বোয়াদ, আইন, ফে, স্বোয়াদ, ওয়াও, রে সিন, কাফ, লাম মিম, নুন, স্বোয়াদ, আইন, ফে, দ্বোয়াদ, ক্বাফ, রে, সিন, তে, ছে, খে, য্বাল, য্বয়, গাইন, শিন, ত্বয়, ইয়া, আইন, হ্বে, স্বোয়াদ, রে, ওয়াও, হ্বে, রে ওয়াও, হ্বে, লাম স্বোয়াদ, কাফ, লা, মিম, নুন, স্বোয়াদ, আলিফ, বে, জি, দাল, হে, ওয়াও, যে, হ্বে, ত্বয়, ইয়া।

প্রশ্নের বর্ণাদি—আলিফ, লা, যে, আলিফ, ইয়া, রে, জিম, তে, আইন, লাম, মিম, মিম, হ্বে, দাল, ছে, আলিফ, মিম, ক্বাফ, দাল, ইয়া, মিম। প্রথম-চক্র ৯; দ্বিতীয়-চক্র ১৭; অবশিষ্ট ৫; তৃতীয়-চক্র ১৩, অবশিষ্ট ১; চতুর্থ-চক্র ৯; পঞ্চম-চক্র ১৭; অবশিষ্ট ৫; ষষ্ঠ-চক্র ১৩, অবশিষ্ট এক; সপ্তম-চক্র ৯; অষ্টম-চক্র ১৭, অবশিষ্ট ৫; নবম-চক্র ১৩, অবশিষ্ট ১; দশম-চক্র ১৭; একাদশ-চক্র ১৭, অবশিষ্ট ৫; দ্বাদশ-চক্র ১৩, অবশিষ্ট ১; প্রথম ফল ৯; দ্বিতীয় ফল ১৭, অবশিষ্ট ৫; তৃতীয় ফল ১৩, অবশিষ্ট ১।

হে, আইন, হ্বে হ্বে, ওয়াও, ৬, ৬, ফি, আলিফ, ইয়া, ৬

সিন ... ১	যে ... ১৫	কাফ ... ২৯
ওয়াও .. ২	তে ... ১৬	দ্বোয়াদ ... ৩০
আলিফ ... ৩	ফে ... ১৭	বে ... ৩১
লাম ... ৪	স্বোয়াদ ... ১৮	ত্বয় ... ৩২
আইন ... ৫	নুন ... ১৯	হে ... ৩৩
য্বয় ... ৬	আলিফ ... ২০	আলিফ ... ৩৪
ইয়া ... ৭	য্বাল ... ২১	লাম ... ৩৫
মিম ... ৮	নুন ... ২২	জিম ... ৩৬
আলিফ ... ৯	গাইন ... ২৩	দাল ... ৩৭

৩২২. উক্ত কাব্যাংশটি প্রথম অধ্যায়ে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে।

হে, আইন, হ্বে হ্বে, ওয়াও, ৬, ৬, ফি, আলিফ, ইয়া, ৬

লাম ... ১০	রে ... ২৪	মিম ... ৩৮
খে ... ১১	আলিফ ... ২৫	ছে ... ৩৯
লাম ... ১২	ইয়া ... ২৬	লাম ... ৪০
ক্বাফ ... ১৩	বে ... ২৭	আলিফ ... ৪১
হ্বে ... ১৪	শিন ... ২৮	

ফে, ওয়াও, যে, আলিফ, ওয়াও, মিন, রে, রে, আলিফ, আলিফ, মিম, আলিফ, বে, আলিফ, রে, ক্বাফ, আলিফ, আইন, আলিফ, রে, স্বোয়াদ, হ্বে, রে হ্বে, লাম, দাল, আলিফ, রে, সিন, আলিফ, লাম, দাল ইয়া, ওয়াও, সিন, রে, আলিফ, দাল, মিম, নুন আলিফ, লাম, লাম।

এদের চক্র পঁচিশ, এর পর তেইশ দুবার, এর পর একুশ দুবার এবং এভাবে পঙ্‌ক্তির শেষ পর্যন্ত এক সংখ্যায় শেষ হবে। সমস্ত বর্ণকে স্থানান্তরিত করতে হবে। আল্লাহ্‌ই উত্তম জ্ঞাতা। নুন, ফে, রে, ওয়াও হ্বে, রে, ওয়াও, হ্বে, আলিফ, লাম, ওয়াও, দাল, সিন, আলিফ, দাল, রে, রে, সিন, রে, হে, আলিফ, লাম, দাল, রে ইয়া, সিন, ওয়াও, আলিফ, নুন, সিন, দাল, রে ওয়াও, আলিফ, বে, লাম-আলিফ, আলিফ, মিম, রে, রে, ওয়াও, আলিফ, আলিফ, লাম, আইন, লাম, লাম।

পৃথিবীর 'জায়েরযা' হতে উত্তরাদি বের করার পদ্য সংক্রান্ত আলোচনার এটাই শেষ। মানুষ যায়ের যা ছাড়া অন্য প্রকার বহু পন্থা অনুসরণ করে, যা দিয়ে তারা পদ্যরূপ ছাড়াই প্রশ্নাদির উত্তর বের করে থাকে। তাদের কাছে 'জায়েরযা' থেকে পদ্যরূপে প্রশ্নের উত্তর বের করার রহস্য হল মালিক ইবনে ওয়াহিব রচিত কাব্যপঙ্‌ক্তি—'একটি বিরাটাকার প্রশ্ন' ইত্যাদির সাথে একে মিশ্রিত করা; এ জন্যই উত্তর তার অন্ত্যমিলে বের হয়ে থাকে। অবশ্য অন্যান্য পন্থায় পদ্যহীন রূপেই উত্তর বের করার জন্য ব্যবহৃত কিছু পন্থা, যা বিশেষজ্ঞগণের কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

বর্ণাদির সামঞ্জস্য বিধানের দিক থেকে গুহ্য তথ্যাদি জানার প্রক্রিয়া সম্পর্কীয় অনুচ্ছেদ।

পাঠক জেনে রাখুন, আল্লাহ্ আমাদেরকে ও আপনাকে সুপথের দিশা দিন, এসব বর্ণই প্রত্যেক সমস্যায় প্রশ্নাদির ভিত্তি এবং তা থেকে উত্তর বের করার জন্য এগুলোকে সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হয়। এ বর্ণগুলোর সংখ্যা, পাঠক, যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন, তেতাল্লিশ। আল্লাহই অদৃশ্য বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানবান। আলিফ, ওয়াও, লাম, আলিফ, আইন, য়য়, সিন, আলিফ, লাম, মিম, খে, ইয়া, দাল লাম, যে, ক্বাফ, তে, আলিফ, রে যাল, সোয়া, ফে, নুন, গাইন, শিন, আলিফ, কাফ, কাফ, ইয়া, বে, মিম, দোয়াদ, বে, হ্বে, ত্বয়, লাম, জিম, হে, দাল, নুন লাম, ছে, আলিফ।

অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি এগুলোকে কাব্যপঙ্‌ক্তিতে বিন্যস্ত করেছেন। তাতে তাঁরা প্রতিটি যুগ্মবর্ণকে দুটি বর্ণ হিসেবে ধরেছেন এবং তার নাম রেখেছেন 'কুতুব' (ধ্রুব)। তাঁরা বলেন,

একটি বিরাটাকার প্রশ্ন তোমার মধ্যে বহন করছে, অতএব সংরক্ষণ কর
উত্থাপিত সমুদয় সন্দেহ, যা শুধু অধ্যবসায়ই সহজ করতে পারে।

পাঠক, আপনি যদি প্রশ্নের ফলাফল বের করতে চান, তা হলে বারংবার আগত বর্ণাদির আধিক্যকে বাদ দিয়ে যা থাকে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করুন। তারপর ভিত্তি থেকে; যা প্রতিটি বর্ণের জন্য কুতব, তার সাথে তুলনীয় প্রশ্নের বর্ণাদি থেকে একটি বর্ণকে বাদ দিন এবং অবশিষ্টকে প্রতিষ্ঠিত করুন। এর পর এ দুই অবশিষ্টকে একটি পঙ্‌ক্তিতে উক্ত ভিত্তির অবশিষ্টকে প্রথমে এবং প্রশ্নের অবশিষ্টকে পরে রেখে মিশ্রিত করুন। এভাবে যতক্ষণ না উভয় অবশিষ্ট একসঙ্গে অথবা একটি অন্যটির পূর্বে শেষ হয়ে যায়। তারপর অবশিষ্টগুলোকেও এরূপ পর্যায়ক্রমে রাখুন। এক্ষেত্রে যদি মিশ্রণের পর বহিষ্কৃত বর্ণাদির সংখ্যা বাদ দিবার পূর্বে ভিত্তির বর্ণ সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা হলে প্রক্রিয়াটি শুদ্ধ। এ অবস্থার তার সাথে পাঁচটি নুনযুক্ত করতে হবে, যাতে তার দ্বারা সঙ্গীতের পরিমাপসমূহ সুসামঞ্জস্য হতে পারে এবং বর্ণের সংখ্যা পূর্ণ হয়ে আটচল্লিশ বর্ণ হয়। এ বর্ণগুলোর দ্বারা চতুষ্কোণ ছক এমনভাবে পূর্ণ করুন, যাতে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে যা আছে, তা শেষে এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে যা আছে, তা প্রথমে হয়। অবশিষ্টগুলোকেও তাদের অবস্থা অনুসারে স্থানান্তরিত করুন। এভাবে করতে থাকুন যতক্ষণ না ছকের পূর্ণতা সাধিত হয়। প্রথম পঙ্‌ক্তি তার স্বরূপে প্রত্যাবর্তন করবে এবং গতি অনুসারে বর্ণাদি বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে আসতে থাকবে। এর পর প্রতিটি বর্ণের তন্তুকে চতুষ্কোণের বিভাগ অনুসারে তার জন্য প্রাপ্ত বৃহৎ অংশে বের করুন এবং তন্তুকে তার বর্ণের বিপরীতে রাখুন। তারপর আপনাকে ছকের বর্ণাদির উপাদানগত সম্পর্ক জানতে হবে এবং উদ্দিষ্ট ছক থেকে বর্ণাদির বাস্তব শক্তি, আত্মিক পরিমাপ, জৈবিক স্বভাব ও মৌলিক ভিত্তি জেনে নিতে হবে। তার আকৃতি নিম্নরূপ :

৪৩৯[৩২৩]

আলিফ	শক্তি	পরিমাপ	স্বভাব	ভিত্তি			
বে	৪,২০,৫০০	১,৯০০,১০০০	৭,৮০	৬০,৩০০	ওয়াও	পরিমাপ	মূলভিত্তি
জিম	৫,২০,২০০	৭,৩০,৪০০	৯,৭০,৮০০	৩,১০০			
দাল	৫,৯০,৭০০	২,৪০	৪০০,৮০,২০০	৬,৮০,৯০০			
হে	৪,৯০	৯,১০	৭,২০	৬,৮০,৯০০			
ওয়া			২,১০,১০০	৫,৪০		ত্বয়	শক্তি
যে			৮,৯০	৪,৫০০	স্বভাব		
				৫,২০	ফল		কাফ

১০০,১০০,১০,১
২০০,২০২,২
৩,০
৩০০,৪০৪
৪০০,৫০,৫
৫০০,৬০,৩
৭০,৭
৮০০,৮০৩
৯০০,৯০৭
৮০০
৯০০

৩২৩. এ সংখ্যাটি রোজেনথালে নেই এবং এ ছকটি দুভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। আমরা মূলের অনুসরণ করলাম।

অতঃপর আপনি প্রতিটি বর্ণের তন্তুকে 'খ-কীলক' চতুষ্টয়ের ভিত্তির সাথে গুণ করার পর যা হয়, তা গ্রহণ করুন এবং যা কীলকের সন্নিহিত, তা বর্জন করুন। অনুরূপভাবে 'পতনশীল'[৩২৪] বর্ণগুলোকেও বর্জন করতে হবে। কেননা তাদের সম্পর্ক অস্থির। এভাবে যা বের হবে, তাই 'বিস্তারমান'এর প্রথম পর্যায়। এর পর আপনি উপাদানের সমুদয়কে গ্রহণ করুন এবং তার মধ্য থেকে উৎপন্নাদির ভিত্তিকে বর্জন করুন। এর ফলে সম্ভাব্যতার সহায়তা আপতনের পরবর্তী পর্যায়ে সৃষ্টিজগতের ভিত্তি অবশিষ্ট থাকবে। আপনি তার উপর তখন বস্তুনিচয়ের কতক সারভাগকে স্থাপন করুন। এটাই সহায়তার উপাদান। আত্মার মধ্যম দিগন্ত প্রকাশ পাবে এবং আপনি তার মধ্য থেকে—উপাদানের সমুদয় থেকে বিস্তারমানের প্রথম পর্যায়কে বর্জন করলে মধ্যস্থতার জগৎ অবশিষ্ট থাকবে। এটি সম্ভাব্য সরল জগতের সাথে বিশিষ্ট, মিশ্র জগতের সাথে নয়। তারপর মধ্যস্থতার জগতকে আত্মার মধ্যম দিগন্তের সাথে গুণ করবেন, ফলে সর্বোচ্চ দিগন্ত বের হয়ে আসবে। আপনি তার উপর বিস্তারমানের প্রথম পর্যায় স্থাপন করুন। তারপর আপনি চতুর্থ থেকে মৌলিক সহায়ক উপাদানের প্রথমটি বিচ্যুত করবেন, ফলে বিস্তারমানের তৃতীয় পর্যায় অবশিষ্ট থাকবে। এর পর আপনি সর্বদা উপাদান চতুষ্টয়ের সমুদয় অংশকে বিস্তারমানের চতুর্থ পর্যায়ে গুণ করবেন, প্রথম বিস্তারিত জগৎ বের হয়ে আসবে। দ্বিতীয়টি দ্বিতীয়টিতে গুণ করলে দ্বিতীয় বিস্তারিত জগৎ, তৃতীয়টি তৃতীয়টিতে গুণ করলে তৃতীয় বিস্তারিত জগৎ এবং চতুর্থটি চতুর্থটিতে গুণ করলে চতুর্থ বিস্তারিত জগৎ প্রকাশ পাবে। এর পর আপনি সব বিস্তারিত জগৎকে একত্র করবেন এবং সার্বিক জগৎ থেকে তাকে বিচ্যুত করবেন, ফলে সারবস্তুর জগৎসমূহ অবশিষ্ট থাকবে। আপনি তাকে সর্বোচ্চ দিগন্তে ভাগ করে দিবেন, প্রথম অংশ বের হয়ে আসবে; অবশিষ্ট ভগ্নাংশকে মধ্যম দিগন্তে ভাগ করলে দ্বিতীয় অংশ বের হবে এবং তদতিরিক্ত ভগ্নাংশ যা, তাই তৃতীয়। এর চতুর্থটি চতুর্থীর মধ্যে নির্দিষ্ট। আপনি যদি চতুর্থী থেকে বেশি কিছু কামনা করেন, তা হলে আপনাকে বর্ণাদির পরে বিস্তারিত জগৎ, বিস্তারমানের পর্যায় ও দিগন্তাদির আধিক্য ঘটাতে হবে।

আল্লাহ্ আমাদেরকে ও আপনাকে সুপথ প্রদর্শন করুন। অনুরূপভাবে বিস্তারমানের প্রথম পর্যায়ে যদি সারবস্তুর জগতকে বিভক্ত করা হয়, তা হলে মিশ্র জগতের প্রথম অংশ বের হয়ে আসবে। এভাবে সম্ভাব্য জগতের সর্বশেষ পর্যায় পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে। পাঠক, বুঝে নিন ও চিন্তা করুন। আল্লাহ্ই পথ-প্রদর্শক ও যথার্থ সাহায্যকারী।

উত্তর বের করার যেসব প্রক্রিয়া তারা অবলম্বন করেন, তার মধ্যে এটিও একটি। তাদের অনেক বিশেষজ্ঞই এটি বর্ণনা করেছেন। পাঠক, জেনে রাখুন, আল্লাহ্ তাঁর আত্মিক শক্তির দ্বারা আমাদেরকে ও আপনাকে সাহায্য করুন। বর্ণাদির এ শাস্ত্র অতিশয় মহান; এ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এমন অনেক বিষয়ে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন, যা জগতে প্রচলিত অন্য কোন শাস্ত্রের দ্বারা সম্ভব নয়। এর প্রক্রিয়ার জন্য কতকগুলো অবশ্য পালনীয় শর্ত আছে। এটি দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি কখনও সৃষ্টির রহস্য ও প্রকৃতির তত্ত্ব ভেদ

৩২৪. মূল 'সাওয়াকেত', সাতটি বর্ণ, যা সূরা ফাতেহায় ব্যবহৃত হয়নি : 'ছে', 'জিম', 'খে', 'যে', 'শিন', 'দ্বয়' এবং 'ফে'।

করতে সমর্থ হন। এভাবে তিনি দর্শনের দুটি ফল সম্পর্কে অর্থাৎ এলমে 'সিমিয়া' ও তার সহোদরা এলমে 'কিমিয়া'[৩২৫] সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। বস্তুত এর মাধ্যমে তার সামনে অজ্ঞাত বিষয়াদির যবনিকা উত্তোলিত হয় এবং তিনি অন্তরের গোপনতম রহস্যাদি সম্পর্কেও অবগতি লাভ করেন। আমি মাগরিব অঞ্চলে তাদের একটি দলকে দেখেছি, যারা অনুরূপ সংযোগ স্থাপনে অভ্যস্ত। তারা এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কৃপায় অদ্ভুত কার্যকলাপ, অস্বাভাবিক ঘটনাবলি এবং বস্তুজগতে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছেন।

পাঠক, জেনে রাখুন, প্রতিটি গৌরবের ভিত্তিমূল হল অধ্যবসায় এবং প্রতিটি কল্যাণের উপযোগী যোগ্যতা ধৈর্যের মাধ্যমেই সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন অনভিজ্ঞতা ও অস্থিরতা নৈরাশ্যের কারণ হয়। সুতরাং বলছি, পাঠক, আপনি যদি 'আলফাবিতাস' অর্থাৎ 'আবজদ' বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণের পঙ্‌ক্তি, যা বর্ণাদি রহস্যবিদ্যার প্রথম দ্বার, তার শেষ সংখ্যাটি পর্যন্ত জানতে চান, তা হলে প্রতিটি বর্ণের সংখ্যামান অবশ্যই লক্ষ করতে হবে। সংখ্যার সাথে বর্ণের সম্পর্কের এ পর্যায়টি বস্তুত তার দৈহিক শক্তির অন্তর্গত। তারপর আপনি এ সংখ্যাকে তার অনুরূপ সংখ্যার দ্বারা গুণ করুন, আপনার সামনে তার আত্মিক শক্তি বের হয়ে আসবে। এটাই তার তত্ত্ব। কিন্তু এ প্রক্রিয়া শুধু নোক্তাবিহীন বর্ণগুলোর মধ্যেই সম্পূর্ণ হতে পারে, নোক্তাযুক্তগুলোর মধ্যে নয়। কেননা বর্ণমালার মধ্যে নোক্তাযুক্ত বর্ণগুলোর অর্থগত বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, যা পরবর্তী আলোচনায় আসছে।

পাঠক, জেনে রাখুন, ঊর্ধ্ব জগৎ অর্থাৎ কুর্সীতে প্রতিটি বর্ণের আকৃতির অনুরূপ আকৃতি বিদ্যমান। এর মধ্যে গতিশীল গতিহীন, ঊর্ধ্ব, অধঃ প্রভৃতিও রয়েছে। এগুলো অনুরূপভাবেই 'জায়েরযা'র নির্দিষ্ট ছকগুলোতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আরও জেনে রাখুন, বর্ণাদির শক্তি তিন প্রকারের। প্রথম প্রকার, শক্তির দিক থেকে স্বল্পতম; তা বর্ণে লিপিবদ্ধ করার পর প্রকাশ পায়। বর্ণের এ নির্দিষ্ট আকৃতিতে লিপিবদ্ধ করাই তাকে আত্মিক জগতের জন্য বিশিষ্ট করে দেয়। সুতরাং এ বর্ণটি যখন আত্মিক শক্তি ও একাগ্র ইচ্ছার সাথে প্রকাশ পায়, তখন তা দৈহিক জগতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। দ্বিতীয় প্রকারটি মনন প্রক্রিয়ার শক্তির অন্তর্গত। এটি আত্মিক শক্তিকে পরিচালিত করার দ্বারা উৎসারিত হয়। এটি ঊর্ধ্ব আত্মিক জগতে শক্তিরূপে বিরাজিত এবং দৈহিক জগতে উক্ত শক্তির একটি আকৃতিগত রূপ বিদ্যমান। তৃতীয়টি গোপন শক্তির একাগ্রতা অর্থাৎ আত্মশক্তির দ্বারা তার সম্ভাবনাকে মূর্ত করে তোলা। সুতরাং উচ্চারণের পূর্বে তার একটি চিত্র আত্মার মধ্যে অবস্থান করে এবং উচ্চারণের মধ্যে শক্তিরূপে বিরাজমান হয়।

এসব বর্ণের প্রকৃতিও বর্ণাদির জন্য সৃষ্ট প্রকৃতির ন্যায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এগুলো উষ্ণতা ও শুষ্কতা; উষ্ণতা ও আর্দ্রতা, শীতলতা ও শুষ্কতা, শীতলতা ও আর্দ্রতা। এটাই ইয়ামেনী সংখ্যার রহস্য। উষ্ণতা বায়ু ও আগুনের একত্র সম্মিলন; এ দুটি (আলিফ, হে, ত্বয়, মিম, ফে, শিন, যাল, জিম, যে, কাফ, সিন, ক্বাপ, ছে, য়য়)। শীতলতা বায়ু ও জলের একত্র সম্মিলন; (বে, ওয়াও, ইয়া, নুন, সোয়াদ, তে, দোয়াদ, দাল হ্বে, লাম,

৩২৫. মূলে 'সহোদরা' পর্যন্ত আছে; এলমে কিমিয়ার উল্লেখ নেই।

আইন, রে, খে, গাইন) শুষ্কতা আগুন ও মৃত্তিকার একত্র সম্মিলন; (আলিফ, হে, ত্বয়, মিম, ফে, শিন, যাল, বে, ওয়াও, ইয়া, নুন, সোয়াদ, তে, দোয়াদ)। এগুলোই বর্ণাদির প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য; তাদের কতকাংশ অপর কতকাংশের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে থাকে। এগুলোকে ঊর্ধ্ব ও অধঃ জগৎ তাদের প্রাথমিক উৎস অর্থাৎ পৃথক চারটি প্রকৃতির কার্য-কারণসহ প্রবেশ করে।

পাঠক, আপনি যখন কোন সমস্যা থেকে অজ্ঞাত বিষয় জানতে উদ্যোগী হবেন; তখন প্রশ্নকর্তা অথবা তার প্রশ্নের উদীয়মান সম্পর্কে নিশ্চিত হোন এবং তার তন্তু চতুষ্টয়ের অর্থাৎ প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশমের সংখ্যামান সুষম বিন্যাসে বের করুন। আপনাকে শক্তি ও তন্তুগুলোর সংখ্যাও বের করতে হবে; যেমন আমরা অচিরেই বর্ণনা করছি। তারপর আপনাকে তা যোগ, তার সম্পর্ক স্থির এবং তার উত্তর বের করতে হবে। এভাবে আপনার উদ্দেশ্য প্রকাশ্য শব্দে অথবা অর্থে প্রকাশ পাবে। অনুরূপভাবে প্রতিটি সমস্যার ক্ষেত্রেই আপনি অগ্রসর হবেন।

তার বর্ণনা হল; পাঠক, আপনি যদি প্রশ্নকর্তার নাম ও প্রয়োজনসহ উদীয়মানের বর্ণাদির শক্তি বের করতে চান, তা হলে বৃহৎ 'আবজদ' হিসেব অনুসারে তাদের সংখ্যামান একত্র করুন। ফলে উদীয়মান হবে মেষ, তার চতুর্থটি হবে কর্কট, তার সপ্তমটি হবে তুলা এবং তার দশমটি হবে মকর। এ শেষোক্তটিই এসব কীলকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। তারপর প্রতিটি রাশি থেকে সংজ্ঞার বর্ণ দুটি বর্জন করুন এবং প্রতিটি রাশি তার চক্রান্তগত নিরূপিত মূলদ সংখ্যাসমূহের কোনটির সাথে বিশিষ্ট হচ্ছে, তার প্রতি লক্ষ রাখুন। সমগ্র করণী-নিরসন সম্পর্কসমূহে ভগ্নাংশ সংশ্লিষ্ট রাশিগুলোকে পরিত্যাগ করুন এবং প্রতিটি বর্ণের নিচে তার সাথে যা বিশিষ্ট, তা স্থাপন করুন। এর পর চারটি উপাদানের বর্ণসমূহের সংখ্যা এবং তাদের সাথে বিশিষ্ট বিষয়াদি প্রথমটির ন্যায় স্থাপিত হবে। এ সমুদয় বিষয়টি বর্ণানুক্রমে অঙ্কিত করুন এবং একটি মিশ্রিত রেখার আকারে খ-কীলক, শক্তি ও নিদর্শনসমূহ বিন্যস্ত করুন। ভগ্নাংশে পরিণত করুন এবং বিচিত্র পরিমাপ বের করার জন্য যা গুণ করার, তা গুণ করুন। যোগ করুন এবং তা দিয়ে উত্তর বের করুন। এর ফলে অন্তর্গত রহস্য তার উত্তর আপনার সামনে উদ্‌ঘাটিত হবে।

এর উদাহরণ; ধরে নিন যে, উদীয়মান মেষ; যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আপনি 'হ্বে, মিম, লাম' বর্ণত্রয় অংকিত করুণ। 'হ্বে' সংখ্যামান আট; তাতে অর্ধেক, চতুর্থাংশ ও অষ্টমাংশ বিদ্যমান; তারা যথাক্রমে দাল, বে, আলিফ। মিমের সংখ্যামান চল্লিশ; তাতে অর্ধেক, চতুর্থাংশ, অষ্টমাংশ, দশমাংশ এবং সংক্ষিপ্ত করতে চাইলে দশমাংশের অর্ধেক বিদ্যমান। এরা যথাক্রমে মিম, কাফ, ইয়া, হে, দাল ও বে। লামের সংখ্যামান ত্রিশ; তাতে অর্ধেক, দুই-তৃতীয়াংশ, পঞ্চমাংশ, ষষ্ঠাংশ ও দশমাংশ বিদ্যমান। এরা যথাক্রমে কাফ, ইয়া, ওয়াও, হে ও জিম। এভাবে প্রশ্নের মধ্যে আগত প্রতিটি বর্ণ ও নামকে সংখ্যামানের দ্বারা প্রকাশ করতে হবে। অবশ্য তন্তু বের করার জন্য প্রতিটি বর্ণের বর্গফলকে তাতে প্রাপ্য বৃহত্তম অংশের দ্বারা ভাগ করে দিতে হবে। এর উদাহরণ; দাল বর্ণের সংখ্যামান চার; তার বর্গফল ষোল; তাকে তাতে প্রাপ্য বৃহত্তম সংখ্যা অর্থাৎ

দুই দ্বারা ভাগ করুন। দালের তন্তু সংখ্যা আট বের হয়ে আসবে। তারপর আপনি প্রতিটি তন্তুকে তার বর্ণের বিপরীতে স্থাপন করবেন। এর পর উপাদানগত সম্পর্কগুলো বের করবেন; যেমন ইতিপূর্বে করণী-নিরসনের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে। এর জন্য ছকান্তর্গত সংশ্লিষ্ট ঘরের ও বর্ণাদির প্রকৃতি থেকে সংখ্যামান বের করার একটি উপকারী নিয়ম বিদ্যমান; যেমন শায়খ তার পরিভাষা সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিদের জন্য তা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

বর্ণ পদ্ধতির দ্বারা (অন্তরের) গোপন রহস্য সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ সম্পর্কীয় অনুচ্ছেদ

এর বর্ণনা এই যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন রোগী সম্পর্কে তার রোগ, তার কারণ ও আরোগ্যের যোগ্য ওষুধের কথা জিজ্ঞাসা করে, তা হলে আপনি উক্ত জিজ্ঞাসুকে অজ্ঞাত কারণ সম্পর্কে তার ইচ্ছামত কতিপয় বস্তুর নাম দিতে বলবেন। যাতে এ নামকে আপনি আপনার পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। তারপর এ নামসহ উদীয়মান, উপাদান, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি, দিন ও ঘণ্টার নামের সংখ্যামান বের করবেন। অবশ্য আপনি যদি এ বিষয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে চান, তা হলেই এরূপ করতে হবে; নয়তো জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যে নামটি বলবে, তার উপরই আপনি সীমাবদ্ধ থাকবেন এবং আমাদের পরবর্তী বর্ণনা অনুসারে তাকে ব্যবহার করবেন। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি; জিজ্ঞাসু ব্যক্তি 'ফরস' (অশ্ব)-এর নাম বলল। আপনি উক্ত শব্দের বর্ণত্রয়ীর সংখ্যামান বের করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করুন। বিশদ করলে এই দাঁড়ায়; 'ফে'র সংখ্যামান আশি, তার অংশ মিম, কাফ, ইয়া, হ্বে বে; 'রে'-র সংখ্যামান দুইশ, তার অংশ ক্বাফ, নুন, কাফ, ইয়া এবং 'সিন'-এর সংখ্যামান ষাট, তার অংশ মিম, লাম, কাফ। 'ওয়াও' এর জন্য পূর্ণতাজ্ঞাপক সংখ্যা, তা দাল, জিম ও বে এবং 'সিন' ও তদ্রূপ, তা মিম, লাম ও কাফ। তারপর আপনি যখন নামসমূহের বর্ণাদিকে বিন্যস্ত করবেন এবং দেখতে পাবেন যে, দুটি উপাদানই সমান, তখন বেশি বর্ণবিশিষ্ট উপাদানকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দিন। এর পর উদ্দিষ্ট বস্তুর নামের উপাদান সম্পর্কীয় বর্ণাদির সংখ্যাকে কোন প্রকার বিন্যাস ছাড়াই তার বর্ণের সাথে একত্র করুন এবং বেশি ও শক্তিমানকে প্রাধান্য দিন।

উপাদানের শক্তি বের করার বর্ণনা[৩২৬]

এখানে মৃত্তিকাই প্রাধান্য পাবে এবং এর প্রকৃতি হল শীতলতা ও শুষ্কতা হল কাল পিত্তের প্রকৃতি। সুতরাং আপনি রোগীর নিদানকাল পিত্ত বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এর পর আপনি যখন সংখ্যামান সম্পর্কীয় বর্ণগুলো দ্বারা নিকটতম নির্দেশের ভিত্তিতে একটি বক্তব্য প্রস্তুত করবেন, তখন দেখতে পাবেন যে, ব্যথার স্থানটি কণ্ঠে রয়েছে এবং তার

৩২৬. রোজেনথালের অনুবাদে এ শিরোনামের পরেই নিম্নলিখিত ছকটি বিন্যস্ত হয়েছে—

অগ্নি ——→	মৃত্তিকা ——→	বায়ু ——→	জল
	ওয়াও	জিম	
হ হ হ	ই ই ই ই	ক ক ক ক	হ্বা
ম ম	ন	ক্ব	ল

যোগ্য ওষুধ হল পিচকারী ও পানীয়ের মধ্যে লেবুর শরবত। 'ফরস' নামের বর্ণাদির সংখ্যামানের শক্তি থেকে এটি বের হয়েছে এবং এটি একটি সংক্ষিপ্ত নিকটতম উদাহরণ।

অবশ্য ব্যক্তিবাচক নামসমূহের উপাদানগত শক্তি বের করতে হলে; যেমন 'মুহম্মদ' নামটি নেয়া হল, এ ক্ষেত্রে আপনি তার বর্ণগুলো বিশ্লিষ্ট করে অঙ্কিত করবেন। তারপর আপনি চারটি উপাদানের নামগুলোকে কক্ষ অনুসারে স্থাপন করবেন; এর ফলে প্রতিটি উপাদানের বর্ণ ও সংখ্যা আপনার সামনে বের হয়ে আসবে। এর উদাহরণ :

	আগ্নেয়		মৃন্ময়		বায়বীয়		জলীয়[৩২৭]
	আ আ আ		ব ব ব		জ জ জ জ জ জ		দ দ দ দ দ দ
	হ হ হ		ও ও ও		য য য য য য		হ্ব হ্ব হ্ব হ্ব হ্ব হ্ব
তিন প্রকার	ত্ব ত্ব ত্ব ম ম ম ফ ফ ফ	তিন প্রকার	ই ই ই ন ন ন ঘ ঘ ঘ	তিন প্রকার	ক ক ক ক ক ক স্ব স্ব স্ব স্ব স্ব ক্ব ক্ব ক্ব ক্ব ক্ব	তিন প্রকার	ল ল ল ল ল ল আ' আ' আ' আ' আ' আ' র র র র র র
	স স স		ত ত ত		ছ ছ ছ ছ ছ ছ		খ খ খ খ খ খ
	য় য় য়		য় য় য়		গ গ গ গ গ গ		শ শ শ শ শ শ

উল্লিখিত নামের এসব উপাদানের মধ্যে আপনি জলীয় উপাদানকেই সর্বাপেক্ষা শক্তিমান দেখতে পাবেন। কারণ তার বর্ণের সংখ্যা বিশ; এজন্য উল্লিখিত নামের অন্যান্য উপাদানের উপর তাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এভাবে সব নাম সম্পর্কে প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। এ সময় তাদের তন্তুর সাথে অথবা 'জায়েরযা'স্থিত উদীয়মানের সাথে সম্পর্কিত তন্তুর সাথে অথবা মালেক ইবনে ওয়াহিবের সঙ্গে সম্পর্কিত কাব্যপঙ্ক্তির তন্তুর সাথে যোগ করতে হবে। উক্ত কাব্যপঙ্ক্তিটি প্রশ্নাদির মিশ্রণের জন্য পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা নিম্নরূপ :

'সওয়ালুন্ আ'য়িমুল্ খুল্‌কে হ্বব্‌তা ফাস্বুন্ ইয়ান—গারায়েবু শক্কিন্ দ্বরত্বাহুজ্‌জেদ্দু মাস্কালা।'[৩২৮]

অজ্ঞাত বিষয়াদি জানার এটি একটি বিখ্যাত তন্তু। এর উপরই ইবনে রাকাকাম[৩২৯] ও তাঁর অনুসারীরা নির্ভর করতেন। এটি প্রথাগত উদাহরণের জন্য একটি পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। উক্ত তন্তুর প্রক্রিয়াগত বর্ণনা এই যে, প্রশ্নের শব্দাবলির সাথে ভগ্নাংশ কৌশল পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করে অঙ্কিত করতে হবে। এ তন্তু অর্থাৎ কাব্যপঙ্ক্তির বর্ণসংখ্যা তেতাল্লিশ। কেননা প্রতিটি সংযুক্ত বর্ণই দুটি বর্ণ। তারপর মিশ্রণের সময় ও মূলে যেসব বর্ণ বারংবার আসবে, তা পরিত্যাগ করতে হবে। প্রশ্নের প্রতিটি উদ্বৃত্ত বর্ণের সমতুল্য বর্ণ বিদ্যমান। উক্ত দুটি উদ্বৃত্তকে বর্ণের কতকাংশের সাথে

৩২৭. এ পুরো ছকটি রোজেনথালের অনুবাদে নেই। 'তিন প্রকার', 'ছয় প্রকারে' সহ এটির কিয়দংশ মাত্র এখানে বিন্যস্ত হয়েছে।

৩২৮. এটির অর্থ প্রথম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্র:।

৩২৯. ইনি সম্ভবত গণিতবিদ্ মুহম্মদ ইবনে ইব্রাহিম (মৃত্যু; ৭১৫ হি:, ১৩১৫ খ্রি.)

অপর কতকাংশ মিশিয়ে একটি রেখায় স্থাপন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমটি হবে 'ধ্রুব'-এর উদ্বৃত্ত ও দ্বিতীয়টি হবে প্রশ্নের উদ্বৃত্ত; এভাবে সমস্ত উদ্বৃত্ত শেষ হবে এবং সংখ্যা দাঁড়াবে তেতাল্লিশ। এর সাথে পাঁচটি নুন যোগ করতে হবে, যাতে সংখ্যাটি আটচল্লিশ হয়। এতে সংখ্যাটি 'গীতিমাত্রা'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। তারপর উদ্বৃত্তকে তার বিন্যাস অনুসারে স্থাপন করতে হবে। এতে যদি বহিষ্কৃত বর্ণাদি মিশ্রণের পর পরিত্যাগ পূর্ববর্তী মূল বর্ণের দ্বারা একটি চতুষ্কোণ ছককে এমনভাবে পূর্ণ করতে হবে, যাতে প্রথম পঙ্‌ক্তির শেষে যা আছে, তা দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির শেষে থাকবে। এ প্রক্রিয়ায় অগ্রসর থেকে হবে যতক্ষণ না প্রথম পঙ্‌ক্তি স্বরূপে ফিরে আসবে এবং গতি অনুসারে অত্র অঞ্চলের বর্ণাদি পরস্পরকে অনুসরণ করবে। এর পর পূর্ব বর্ণনা অনুযায়ী প্রতিটি বর্ণের তন্তু বের করবেন এবং তাকে তার বর্ণের বিপরীত দিকে স্থাপন করবেন। তারপর ছকস্থিত বর্ণাদির উপাদানগত সম্পর্ক এমনভাবে বের করবেন, যাতে তৎসংশ্লিষ্ট ছক থেকে তাদের স্বাভাবিক শক্তি, আত্মিক মাত্রা, জৈবিক প্রবৃত্তি ও মৌলিক ভিত্তি জানতে পারেন।

উপাদানগত সম্পর্ক বের করার বর্ণনা এই যে, ছকের প্রথম বর্ণটির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; তার স্বভাব কী এবং তাতে অবতীর্ণ কাব্যপঙ্‌ক্তিটিরই বা স্বভাব কী? যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, উত্তম; অন্যথায় দুটি বর্ণের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করুন। ছকের সব বর্ণ সম্বন্ধেই এ নিয়ম প্রয়োগের অবকাশ রয়েছে। যিনি এর নিয়মাবলি জ্ঞাত আছেন, যেমন গীতিচক্রাদির মধ্যে তা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে; তার পক্ষে এ প্রক্রিয়ার সত্যতা পরীক্ষা করা খুবই সহজ ব্যাপার। এর পর, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, খ-কীলক চতুষ্টয়ের ভিত্তির সাথে গুণ করার পর প্রতিটি বর্ণের তন্তুকে গ্রহণ করুন এবং কীলকে সন্নিহিত যা কিছু, তা বর্জন করুন। অনুরূপভাবে 'পতনশীল'গুলোকেও; কেননা তাদের সম্বন্ধ অস্থির। এভাবে যা আপনার সামনে বের হয়ে আসবে, তা হল 'বিক্ষেপণ'-এর প্রথমে পর্যায়। তারপর আপনি উপাদানের সমষ্টি গ্রহণ করুন এবং তা থেকে জাতসমূহের ভিত্তি পরিত্যাগ করুন। ফলে সম্ভাবনার মুহূর্তগুলোর মধ্যে আরোপিত হওয়ার পর সৃষ্টিজগতের ভিত্তি অবশিষ্ট থাকবে। এর পর তাতে কতিপয় বস্তুসার স্থাপন করুন; এগুলো সহায়ক উপাদান এবং এর ফলে মধ্যম আত্মিক দিগন্ত প্রকাশ পাবে। উপাদান সমষ্টি থেকে 'বিক্ষেপণ'-এর প্রথম পর্যায় নিযুক্ত করলে মধ্যম জগৎ অবশিষ্ট থাকবে। এটি সরল বস্তুজগতের সাথে বিশিষ্ট; মিশ্রের সাথে নয়। এর পর আপনি মধ্যম জগৎকে মধ্যম আত্মিক দিগন্তের সাথে গুণ করবেন; সর্বোচ্চ দিগন্ত বের হয়ে আসবে। তাতে বিক্ষেপণের প্রথম পর্যায় স্থাপন করুন এবং পরে চতুর্থ থেকে প্রথম মৌলিক সহায়ক উপাদান বিযুক্ত করুন; বিক্ষেপণের তৃতীয় পর্যায় অবশিষ্ট থাকবে। এর পর সর্বদা আপনি চারটি উপাদানের অংশগত সমষ্টি বিক্ষেপণের চতুর্থ পর্যায়ের সাথে গুণ করবেন; ফলে প্রথম বিস্তারিত জগৎ প্রকাশ পাবে। দ্বিতীয় দ্বিতীয়ের মধ্যে গুণিত হলে দ্বিতীয় বিস্তারিত জগৎ বের হয়ে আসবে। তাতে বিক্ষেপণের প্রথম পর্যায় স্থাপন করুন এবং পরে চতুর্থ থেকে প্রথম মৌলিক সহায়ক উপাদান বিযুক্ত করুন; বিক্ষেপণের তৃতীয় পর্যায় অবশিষ্ট থাকবে। এর পর সর্বদা আপনি চারটি উপাদানের অংশগত সমষ্টি

বিক্ষেপণের চতুর্থ পর্যায়ের সাথে গুণ করবেন; ফলে প্রথম বিস্তারিত জগৎ প্রকাশ পাবে। দ্বিতীয় দ্বিতীয়ের মধ্যে ঘৃণিত হলে দ্বিতীয় বিস্তারিত জগৎ বের হয়ে আসবে। অনুরূপভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ। বিস্তারিত জগতগুলো একত্র করুন এবং তাকে নিখিল জগৎ থেকে বিযুক্ত করুন। ফলে সরল জগতগুলো অবশিষ্ট থাকবে; তাকে সর্বোচ্চ দিগন্তে ভাগ করে দিন; প্রথম অংশ বের হয়ে আসবে; এখান থেকে প্রতিক্রিয়াটিকে ধারাবাহিকভাবে অক্ষুণ্ন রেখে পূর্ণতা দিতে হবে। এর জন্য ইবনে ওহশিয়া, আলবুনী ও অন্যান্যদের গ্রন্থাদিতে আলোচনা বিদ্যমান।

ঐশী বিজ্ঞান সম্পর্কীয় এ শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রে এহেন প্রচেষ্টা স্বাভাবিক ও দার্শনিক নিয়মাবলির মাধ্যমে প্রচলিত রয়েছে। বস্তুত এরই উপর ভিত্তি করেই বর্ণাদির জায়েরযা, ঐশী কলাকৌশল ও দার্শনিক যাদুক্রিয়াসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৩০] আল্লাহ্ অনুপ্রেরণা দাতা, তাঁরই সহায়তা প্রার্থিত এবং তারই উপর নির্ভর করা বাঞ্ছিত। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম রক্ষাকর্তা।

---

৩৩০. এর পর রোজেনথালের অনুবাদে নিম্নের অনুচ্ছেদটি বিদ্যমান :

'জেনে রাখুন যে, এসব বিষয় একটি মাত্র উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়; যাতে প্রশ্নের মধ্যস্থিত সম্ভাবনা অনুসারে একটি সংবাদ বের হয়ে আসে। এর মাধ্যমে তাঁরা অতীন্দ্রিয় কোন সংবাদ পরিবেশন করেন না। বস্তুত এটি এক ধরনের বুদ্ধি খেলা; যেমন আমরা গ্রন্থের প্রথম ভাগে বর্ণনা করেছি। অনুরূপভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা-রহস্যবিদ্যারও অন্তর্ভুক্ত নয়; যেমন আমরা এর ব্যাখ্যা দিচ্ছি।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[রসায়নশাস্ত্র]

এ শাস্ত্র এমন উপাদান সম্পর্কে অনুসন্ধান করে, যা দিয়ে শিল্পকৌশলের মাধ্যমে স্বর্ণ-রৌপ্য উৎপাদন সম্পূর্ণ হয় এবং এটি উক্ত উদ্দেশ্যে পরিচালিত প্রক্রিয়াও বিশ্লেষণ করে। এ উদ্দেশ্যে উক্ত শাস্ত্রবিদ্‌রা সম্ভাব্য সব বস্তুতেই, ওগুলোর মিশ্রণ ও শক্তি জেনে নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে থাকেন; যাতে তাঁরা উক্ত উদ্দেশ্যের উপযোগী উপাদানের সন্ধান লাভ করতে পারেন। এমন কি তাঁরা খনিজ পদার্থ ছাড়াও প্রাণীর উপজাত অস্থি, পালক, ডিম ও মলমূত্র প্রভৃতি পরীক্ষা করে থাকেন।

অতঃপর রসায়নশাস্ত্র সেসব প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে, যা দিয়ে উক্ত উপাদান তার সম্ভাবনা থেকে বাস্তবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। যেমন ঊর্ধ্বপাতন, পাতন, তরলের উত্তাপে ঘনীভবন, কঠিনের মুষল ও পেষকের মাধ্যমে চূর্ণীভবন এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রক্রিয়া, যা দিয়ে বস্তু তার প্রাকৃতিক অংশসমূহে দ্রবীভূত হয়। তাঁদের ধারণা এই যে, এসব কলা-কৌশলের দ্বারা এমন একটি স্বাভাবিক উপাদান বহিষ্কৃত হয়, যাকে উক্ত শাস্ত্রে 'একসির' নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। খনিজ পদার্থের মধ্যে যেগুলোর সক্রিয়ভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্যে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে, যেমন সিসা, টিন ও তামা; সেগুলোর সাথে উক্ত 'একসির'কে মিশিয়ে আগুনে উত্তপ্ত করলে তা খাঁটি স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে যায়। শাস্ত্রবিদ্‌রা তাঁদের পরিভাষায় রহস্যের স্পর্শ এনে উক্ত একসিরকে 'আত্মা' বলে এবং যে বস্তুর সাথে তা মিশ্রিত হয়, তাকে 'দেহ' বলে অভিহিত করেন। সুতরাং এসব পরিভাষা এবং যে কলা-কৌশলযোগ্য বস্তুকে স্বর্ণ ও রৌপ্যে পরিবর্তিত করে, তাদের ব্যাখ্যাই রসায়নশাস্ত্র।

প্রাচীন ও নবীন উভয় কালেই এ বিষয় নিয়ে শাস্ত্রবিদ্‌গণ গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। অনেক সময় এর আলোচনা অযোগ্য ব্যক্তিদের সাথেও সম্পর্কিত হয়েছে। এ সম্পর্কে গ্রন্থ রচয়িতাদের নেতৃস্থানীয় হলেন জাবের ইবনে হাইয়ান; এমনকি তারা রসায়নশাস্ত্রকে তাঁর সাথে বিশিষ্ট করে তাকে 'জাবেরের শাস্ত্র' নামে আখ্যায়িত করে থাকেন। এ বিষয়ে তাঁর সত্তরটি পুস্তিকা বিদ্যমান এবং এর সবগুলোই দুর্বোধ্যপ্রায়। শাস্ত্রবিদ্‌রা ধারণা করেন যে, এসব পুস্তিকার সামগ্রিক জ্ঞান আয়ত্তকরণ ছাড়া কারও পক্ষে তার দ্বার অর্গলমুক্ত করা সম্ভব নয়। আত্তুগরাই[৩৩১] এ বিষয়ে পূর্বাঞ্চলীয় উত্তরসূরি বিজ্ঞানীদের মধ্যে খ্যাতিমান। তাঁর উক্ত শাস্ত্রে সংকলন এবং যোগ্য-অযোগ্য নির্বিশেষে

৩৩১. হাসান ইবনে আলী; ৪৫৩—৫১৫ (১০৬১-১১২১ খ্রি:) হি: (?)।

সব শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের সাথে বিতর্কমূলক গ্রন্থাদি রয়েছে। আন্দালুসের বিজ্ঞানী মাসলামা আল মজরিতীও এ বিষয়ে লিখিয়াছেন; তার গ্রন্থের নাম 'রূতবাতুল হাকিম'। তিনি একে তাঁর যাদু ও ইন্দ্রজাল সম্পর্কীয় অন্য গ্রন্থ 'গায়তুল হাকিমে'-এর সহচর হিসেবে স্থাপন করেছেন। তাঁর ধারণা, এ দুটি শিল্পজ্ঞান হচ্ছে দর্শনের ফলাফল ও জ্ঞানের ফসল; যে ব্যক্তি এ দুটি সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না, সে জ্ঞান-দর্শনের ফলাফল লাভে অসমর্থ।

বস্তুত মজরিতীর গ্রন্থের আলোচনা এবং অন্যান্য শাস্ত্রবিদ্‌দের গ্রন্থাদির আলোচনা সমুদয়ই দুর্বোধ্য রহস্যতুল্য; এ সম্পর্কীয় পরিভাষা সম্বন্ধে যার জ্ঞানের গভীরতা নেই, তার পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন। আমরা তাদের এমন রহস্য ও দুর্বোধ্যতার প্রতি ধাবমান হওয়ার কারণ বর্ণনা করব। এ বিষয়ে নেতৃস্থানীয় শাস্ত্রবিদ্ আল মুগায়রিবীর[৩৩২] একটি বাক্যিক আলোচনা বিদ্যমান, যা নোকতাবিশিষ্ট বর্ণাদির অন্ত্যমিলে রচিত এবং কাব্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভিনব। এর বিষয়বস্তুও সার্বিকভাবে হেঁয়ালী ও ধাঁধার ন্যায় রহস্যমণ্ডিত এবং বোধগম্যতার অতীত। কখনও এ বিষয়ে ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ) গ্রন্থ রচনার কথা উল্লেখ করা হয়; কিন্তু এটি সঠিক নয়। কারণ তাঁর ন্যায় উন্নত ধীশক্তির অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে উক্ত শাস্ত্রবিদ্‌দের ভ্রান্তি উপলব্ধি করে তা গ্রহণ করার ধারণা পোষণ করা যায় না। কখনও শাস্ত্রবিদ্‌রা এ সম্পর্কীয় বিভিন্ন মত ও ধ্যান ধারণাকে মারোয়ান ইবনে হকমের সৎপুত্র খালেদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাবিয়ার[৩৩৩] সাথে সংযুক্ত করেন। কিন্তু এটি একান্ত সুস্পষ্টরূপে জ্ঞাত যে, খালেদ বেদুইন জীবনচক্রের অনুসারী এবং বেদুইন জীবনবোধের নিকটবর্তী। বস্তুত বেদুইন জীবন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা থেকে সম্পূর্ণ দূরে অবস্থিত ছিল। সুতরাং তাঁর পক্ষে কী করে জটিল উপাদান ও তাদের মিশ্রণের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল এমন একটি বিরল শিল্পকর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব? তদুপরি উক্ত বিষয় সম্পর্কিত পদার্থবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রে গবেষণাকারীদের গ্রন্থাদি তখনও প্রকাশিত ও অনূদিত হয়নি। অবশ্য পরবর্তীকালে বিচিত্র শিল্পকর্মে অভিজ্ঞ খালেদ ইবনে ইয়াজিদ নামে কারও সাথে উপরোক্ত খালেদের নামের সাদৃশ্য ঘটে এমন কিছু হয়ে থাকলে তা হতে পারে।

পাঠক, এখানে উপরোক্ত শিল্পকর্ম সম্পর্কীয় আবু সামাহ্‌র উদ্দেশ্যে রচিত আবু বকর ইবনে বিশরুনের[৩৩৪] একটি পুস্তিকা আপনার জন্য উদ্ধৃত করছি। তাঁর উভয়ে মাসলামার শিষ্য। উক্ত পুস্তিকার আলোচনায় যদি আপনি যথাযথভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, তা হলে উক্ত শাস্ত্র সম্পর্কে তাদের বক্তব্যের ধারা অনুভব করতে পারবেন। ইবনে বিশরুন তাঁর পুস্তিকার প্রারম্ভে উদ্দেশ্যের সাথে অসলগ্ন কিছু বক্তব্যের পর বলেছেন, 'এ মহান শিল্পকর্মের ভূমিকাস্বরূপ যে আলোচনা বিদ্যমান, তা পূর্বসূরিগণ ও দার্শনিকবৃন্দ সকলেই পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন। এ আলোচনা খনিজ পদার্থের উদ্ভব, প্রস্তর ও মণিমুক্তার সৃষ্টি এবং বিভিন্ন স্থান ও ভূমিসংস্থানের প্রকৃতি সম্পর্কীয়

৩৩২. এ অধ্যায়ে পুনরায় উল্লেখিত।
৩৩৩. মৃত্যুকাল ৮৪—৯০ (৭০৩—৭০৯ খ্রি:) হি: বলে অনুমিত।
৩৩৪. ইবনে বিশরুনের সময়ও খ্রিস্টীয় সহস্রাব্দের মধ্যে বলে ধরা হয়।

জ্ঞান। এ বিষয়টি অতি পরিচিত বলিয়াই এর আলোচনা থেকে আমরা বিরত রইলাম। কিন্তু আমরা এ সম্পর্কে যা খুবই প্রয়োজনীয়, তাই এখানে বর্ণনা করব। সুতরাং তার পরিচয় দান আরম্ভ করছি।"

শাস্ত্রবিদ্‌রা বলেন, এ শাস্ত্রের জ্ঞানার্জনকারীদের জন্য প্রথমেই তিনটি বিষয় জেনে নেয়া প্রয়োজন। এর প্রথমটি হল, এটি সম্ভব কিনা; দ্বিতীয়টি কিসের দ্বারা সম্ভব এবং তৃতীয়টি কিসের দ্বারা কীভাবে সম্ভব। বিদ্যার্থী যখন এ তিনটি বিষয় জানতে পারে এবং সে সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, তখন তার উদ্দেশ্য সাধিত হয় ও উক্ত শাস্ত্রের চরম জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয়। এ শাস্ত্রের সম্ভাব্যতা ও তার অস্তিত্ব সম্পর্কীয় প্রমাণের জন্য, পাঠক, ইতিপূর্বে আপনার কাছে 'একসির' সম্পর্কে যা বলেছি, তাই যথেষ্ট বলে মনে করি। অবশ্য কিসের দ্বারা এটি সম্ভব হয়, সেই সম্পর্কে তারা ঐ প্রস্তর সম্বন্ধীয় আলোচনাকে বুঝিয়ে থাকেন, যা দিয়ে তাকে প্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব। যদিও সম্ভাবনার দিক থেকে প্রতিটি বস্তুতেই এ প্রক্রিয়ার শক্তি বিদ্যমান; কেননা তা চারটি প্রকৃতিগত উপাদানের অন্তর্গত এবং তাদের দ্বারাই আরম্ভে গঠিত হয় ও অন্তে তাদের মধ্যেই প্রত্যাবৃত্ত হয়; তবুও এগুলোর মধ্যে এমন বস্তুও রয়েছে, যাতে শুধু সম্ভাবনাই বিদ্যমান, বাস্তবতা নয়। এর বর্ণনা এই যে এদের মধ্যে অনেকগুলোর বিশ্লেষণ সম্ভব এবং অনেকগুলোর বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। সুতরাং তাদের মধ্যে যেগুলোর বিশ্লেষণ সম্ভবপর, সেগুলোকেই প্রক্রিয়া ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে সাধিত করা হয় এবং তার মধ্য দিয়ে এগুলো সম্ভাবনা থেকে বাস্তব শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে যেগুলোর অনুরূপ বিশ্লেষণ সম্ভবপর নয়, সেগুলোকে প্রক্রিয়া ও প্রচেষ্টার দ্বারা সাধিত করা হয় না; কেননা তারা শুধু সম্ভাবনারই আধার। তাদের মধ্যকার উপাদানগত প্রকৃতিগুলো পরস্পরের মধ্যে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায় এ বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে উপাদানের অন্তর্গত বৃহৎ শক্তির ক্ষুদ্র শক্তির উপর প্রাধান্যের কথা বলাই বাহুল্য।

অতএব, পাঠক, আল্লাহ্ আপনাকে শক্তি দিন, আপনার জন্য সেসব বিশ্লেষণযোগ্য প্রস্তরের সুষম অবস্থা জেনে নেয়া অত্যাবশ্যকীয়, যেগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব। আপনি তাদের জাতি, শক্তি, ক্রিয়া এবং তাদের মধ্যে সাধ্য দ্রবীভবন, ঘনীভবন বিশোধন, উত্তাপন, বিশোষণ ও রূপান্তর সম্পর্কীয় যাবতীয় তত্ত্ব জেনে নিবেন। কেউ যদি উক্ত শিল্পের স্তম্ভস্বরূপ এসব নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞাত না হয়, তা হলে তার পক্ষে কখনই এ বিষয়ে সফলকাম ও কল্যাণের বাহক হওয়া সম্ভব নয়।

পাঠক, আপনার এটা জেনে নেয়াও প্রয়োজনীয় যে, উপরোক্ত বিষয়ে অন্যের সহায়তা গ্রহণ করা সম্ভব অথবা এককভাবে তাই তার জন্য যথেষ্ট। প্রারম্ভে তা কি এককভাবে ছিল, না তার সাথে অন্যেরও অংশীদারিত্ব ছিল; তারপর সাধিত হওয়ার কালে একক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং প্রস্তররূপে আখ্যায়িত হয়েছে। আপনার জন্য তার ক্রিয়ার স্বরূপ, তার মাত্রা ও কালের পরিমাণ এবং তার মধ্যে আত্মার বিন্যাস ও জৈবিক শক্তির অনুপ্রবেশ জেনে নিতে হবে। আগুন কি সংশ্লেষণের পর তার বিশ্লেষণে সমর্থ? যদি সমর্থ না হয়, তা হলেই বা তার কারণ কী এবং কোন কারণটি এটাকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে? এটা এ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য; পাঠক, এটা হৃদয়ঙ্গম করুন।

জেনে রাখুন যে, দার্শনিকরা সকলেই জৈবিক শক্তির প্রশংসা করেছেন এবং ধারণা করেছেন যে, এ শক্তিই দেহের পরিচালক, উত্তেজক, প্রতিরোধক ও তাতে ক্রিয়াশীল শক্তি। এর কারণ এই যে, এ জৈবিক শক্তি দেহকে পরিত্যাগ করলে তা মৃত ও শীতল হয়ে যায়। তখন আর সে গতিমান ও অপরের কবল থেকে নিজেকে প্রতিরোধ করতে পারে না; কেননা তখন তাতে জীবন নেই, আলোক নেই।

আমরা এই দেহ ও জৈবিক শক্তির কথা এ জন্যই বর্ণনা করেছি যে, এসব গুণ মানুষের সেই দেহের সাথে তুলনীয়, যা প্রাতঃকালীন ও রাত্রিকালীন আহার্যের দ্বারা গঠিত এবং যার স্থায়িত্ব ও পরিপূর্ণতা সজীব জ্যোতির্ময় জৈবিক শক্তির দ্বারা সাধিত হয়। এ শক্তির দ্বারাই দেহ এমন বৃহৎ ও পরস্পরবিরোধী কর্মাদি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়, যা এ সজীব শক্তির অধিকার ছাড়া অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষ তার প্রকৃতিগত উপাদানসমূহের বিন্যাস বিরোধের জন্যই প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়। যদি তার প্রাকৃতিক উপাদান সুষম অবস্থায় বিরাজ করত, তা হলে কখনও সে আপতন ও বিরোধের কবলে পড়ত না এবং জৈবিক শক্তিও তার দেহ থেকে বের হতে পারত না; ফলে সে চিরজীবী চিরস্থায়ী হয়ে উঠত। পবিত্র তিনি, সব বস্তুর পরিচালক—তিনিই উন্নত।

জেনে রাখুন, প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ, যা দিয়ে এ ক্রিয়া উদ্ভূত হয়; প্রাথমিক পর্যায়ে তাতে এমন একটি অবস্থা বিরাজ করে, যা তাকে পরিচালনা ও আকর্ষণ করে এক অত্যাবশ্যকীয় পরিণামের দিকে নিয়ে যায়। তারা একবার এ অবস্থায় আপতিত হলে তাদের পক্ষে আর গঠন-পূর্ব উপাদানসমূহে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব নয়; যেমন আমরা ইতিপূর্বে মানুষের ব্যাপারে বলেছি। কেননা এখন এ স্বনির্ভর প্রাকৃতিক উপাদান পরস্পরের সাথে গ্রথিত হয়ে একই বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এটাকে এর শক্তি ও ক্রিয়ার ক্ষেত্রে জৈবিক শক্তির সাথে এবং তার গঠন ও রোধের ক্ষেত্রে দেহের সাথে তুলনা করা যায়। অথচ ইতিপূর্বে তারা উপাদান হিসেবে পৃথক পৃথক সত্তায় অস্তিত্ববান ছিল। বস্তুত এ প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের কার্যকারিতা কী বিস্ময়কর! এদের দুর্বলতমটিও বস্তুর বিশ্লেষণ, গঠন ও পরিপূর্ণতায় শক্তিমান হয়ে ওঠে। এ জন্যই আমরা শক্তিমান ও দুর্বলের কথা বলেছি একমাত্র এদের প্রথম গঠনেই বিরোধের জন্য পরিবর্তন ও অস্তিত্বহীনতা দেখা দেয় এবং দ্বিতীয় গঠনে ঐক্যের জন্যই অনুরূপ কিছু হয় না।

পূর্বসূরিদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন যে, এ প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ ও বিভাজনের মধ্যেই সজীবতা ও স্থায়িত্ব এবং গঠনের মধ্যেই মৃত্যু ও অনস্তিত্ব। এ বক্তব্যের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম অর্থ বিদ্যমান; কেননা দার্শনিক তাঁর সজীবতা ও স্থায়িত্বের বক্তব্যের দ্বারা তার অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আগমনের কথা বোঝাতে চেয়েছেন। কারণ তা যতক্ষণ তার প্রথম গঠনে অবস্থান করে ততক্ষণ তা নিঃসন্দেহে অস্তিত্বহীন; তারপর তা দ্বিতীয় গঠনে সংগঠিত হলে অনস্তিত্ব দূরীভূত হয়। এ দ্বিতীয় সংগঠন একমাত্র বিশ্লেষণ ও বিভাজনের পরেই সম্ভব হয়। এ জন্য এ প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ ও বিভাজন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সুতরাং তা যখন দ্রবণযোগ্য দেহে স্থায়ী হয়, তার আকৃতিহীনতার জন্যই তাতে পরিব্যপ্ত হয়ে থাকে; কেননা তা দেহের মধ্যে আকৃতিহীন জৈবিক শক্তির সাথে তুলনীয়। এর কারণ এই যে, তার কোনো ভার নেই। পাঠক, আল্লাহ্ চান ত, আপনি অচিরেই তা দেখতে পাবেন।

আপনার জন্য এটা জেনে নেয়া অত্যাবশ্যকীয় যে, সূক্ষ্মের সাথে সূক্ষ্মের মিশ্রণ স্থূলের সাথে স্থূলের মিশ্রণ অপেক্ষা সহজতর। এ বক্তব্যের দ্বারা আমরা সূক্ষ্মদেহী ও স্থূলদেহী আকৃতির সাদৃশ্য বোঝাতে চেয়েছি; কেননা সব বস্তুই তাদের আকৃতির সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকে। আমরা এর বর্ণনা এ জন্যই উত্থাপন করেছি, যাতে আপনি জেনে নিতে পারেন যে, স্থূল বস্তু অপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্তুর প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে প্রক্রিয়াজাতকরণের বিষয়টি বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সহজ। কখনও এ ধারণা পোষণ করা হয় যে, বস্তুসার অপেক্ষা প্রস্তরাদি আগুনের তাপে অধিককাল স্থায়ী হয় ও বেশি শক্তির পরিচয় দিয়ে থাকে। যেমন আপনি দেখতে পাবেন গন্ধক, পারদ ইত্যাদি সারবস্তু অপেক্ষা সোনা, রুপা ও তামা আগুন-তাপে বেশি স্থিতিশীল। আমরা বলব, আকৃতিবিশিষ্ট সব বস্তুই এককালে নিজ সত্তায় সারোৎসার রূপে অস্তিত্ববান ছিল। তারপর প্রাকৃতিক উত্তাপের স্পর্শ তাদেরকে স্থূল সংসক্ত বস্তুর আকৃতিতে রূপান্তরিত করেছে। বস্তুত তাদের স্থূলত্ব ও সংসক্তির জন্যই আগুন তাদেরকে বিশ্লিষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। এর পর আগুনের উত্তাপ অত্যধিক হওয়ায় উক্ত বস্তুনিচয় তাদের প্রাথমিক সৃষ্টি প্রক্রিয়াজাত অবস্থার ন্যায় সারবস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ফলত এসব সূক্ষ্ম বস্তুসার আগুনের তাপের সংস্পর্শে এলে বিচলিত হয় এবং তাদের স্থিতি বিপর্যয় ঘটে থাকে। সুতরাং, পাঠক, আপনাকে অবশ্যই এ বিষয়টি জেনে নিতে হবে যে, কিসে বস্তুগুলোকে তাদের এ অবস্থায় এবং কিসে বস্তুসারগুলোতে তাদের এ অবস্থায় রূপান্তরিত করেছে। বলতে গেলে এটা আপনার জানার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক।

আমাদের বক্তব্য এই যে, এসব বস্তুসারের বিচলিত হবার কারণ তাদের দাহ্যতা ও সূক্ষ্মতা এবং তাদের আর্দ্রতার আধিক্যের জন্যই তারা দগ্ধ হয়। কেননা আগুন যখন তাদের এ আর্দ্রতার সন্ধান পায়, তখন তাদের সাথে সংযুক্ত হয়ে পড়ে; যেহেতু তাদের এ আর্দ্রতাও বায়বীয় গুণসম্পন্ন ও আগুনের আকৃতি গ্রহণ করতে পারে, সে জন্য আগুন তাদের অনস্তিত্ব পর্যন্ত তাদের মধ্যে স্বীয় খাদ্য গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে আকৃতিপ্রাপ্ত অনেক বস্তুই তাদের সংশক্তি ও স্থূলত্বের স্বল্পতার জন্য আগুনের সংস্পর্শে এসে বিচলিত হয়। কিন্তু এসব বস্তু যে দগ্ধ হয় না, তার কারণ এগুলো আগুনের সংস্পর্শে স্থিতিশীল মৃত্তিকা ও জলীয় উপাদানের দ্বারা গঠিত। বস্তু সৃষ্টির দীর্ঘ, কোমল ও মিশ্রণধর্মী পচনক্রিয়ায় তাদের সূক্ষ্ম অংশ তাদের স্থূল অংশের সাথে এক হয়ে গেছে। কারণ প্রতিটি বস্তু আগুনের তাপে এ জন্যই অস্তিত্বহীন হয় যে, তার সূক্ষ্ম অংশ তার স্থূল অংশের সাথে একত্রিত হয়নি এবং তার কতকাংশ অপর কতকাংশে দ্রবীভবন ও অভিযোজন ছাড়াই সন্নিবেশিত হয়েছে। সুতরাং তাদের এ সন্নিবেশ ও সংযুক্তি সহাবস্থান মাত্র, মিশ্রণ নয়। এ কারণেই তাদের পৃথকীকরণ সহজ হয়েছে। যেমন জল ও তেল এবং তাদের সমতুল্য অন্যান্য পদার্থ। এসব বিষয় বর্ণনার একমাত্র উদ্দেশ্য হল যাতে তার দ্বারা আপনি প্রাকৃতিক উপাদানের গঠন ও তাদের বিরোধের উপর প্রমাণ গ্রহণ করতে পারেন। বস্তুত এ ব্যাপারে আপনি যখন সম্যক জ্ঞান লাভ করবেন, তখন বলতে গেলে আপনি উক্ত শাস্ত্রে আপনার যোগ্যতা প্রতিপন্ন করতে পারবেন।

পাঠক, আপনার এটা জানা প্রয়োজন যে, এ শিল্পের উপাদান হিসেবে যেসব মিশ্রণ বিদ্যমান, তারা পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ, একই স্বয়ম্ভর বস্তু থেকে বিশ্লেষিত এবং একই নিয়ম

ও একই প্রচেষ্টার দ্বারা তারা একত্রিত। এ প্রক্রিয়ায় কোনো অংশবিশেষে বা সমগ্রের মধ্যে বহিরাগতের অনুপ্রবেশ নেই। যেমন দার্শনিক বলেছেন, আপনি যদি প্রাকৃতিক উপাদানের সাধনা ও সম্পাদনার ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করতে গিয়ে তাতে কোনো বহিরাগতের অনুপ্রবেশ না ঘটান, তা হলে নিশ্চিত বলা যায়, আপনি আপনার ইচ্ছা অনুসারে তার যোগ্য ও স্থায়ী জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। কেননা উপাদান এক এবং তাতে বহিরাগতের কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি তাতে বহিরাগতের অনুপ্রবেশ ঘটায়, সে বিচ্যুত হয় ও ভ্রান্তিতে পতিত হয়।

জেনে রাখুন, এ উপাদানে যদি তার সমজাত কোনো বস্তু যথারীতি দ্রবীভূত হয়; এমন কি তা সূক্ষ্মতা ও তরলতার দিক থেকে তার আকৃতি গ্রহণ করে; তা হলে তা উক্ত উপাদানে পরিব্যপ্ত হয়ে তার বিচরণস্থল পর্যন্ত তার সাথে বিচরণ করে। কেননা বস্তু যতক্ষণ পর্যন্ত স্থূল ও অমসৃণ থাকে, ততক্ষণ তার পক্ষে পরিব্যাপ্ত ও সংযুক্ত হওয়া সম্ভব হয় না এবং বস্তুর দ্রবীভবনও সারবস্তু ছাড়া সম্ভব নয়। পাঠক, এটা বুঝে নিন; আল্লাহ্ আপনাকে এ বক্তব্য বুঝতে পথ প্রদর্শন করুন।

জেনে রাখুন, আল্লাহ্ আপনাকে পথ দেখান; অবশ্যই এ দ্রবীভবন কোনো প্রাণী-দেহে অনুষ্ঠিত হলে তা এমন একটি সত্য, যার বিনাশ নেই, হ্রাস নেই। তাই সেই শক্তি, যা প্রাকৃতিক উপাদানকে রূপান্তরিত করে, তাকে ধারণ করে এবং তার জন্য অদ্ভুত বর্ণ ও পুষ্প প্রকাশ করে। কিন্তু দ্রবণশীল প্রতিটি বস্তুই এমন নয় যে, এর বিপরীত তা সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয়; কেননা তা জীবনের বিরোধী। বস্তুত তার দ্রবীভবন সঙ্গতি অনুসারেই হয় এবং এমন এক পর্যায়ে হয় যাতে তাকে আগুনের দহন ক্রিয়া থেকে প্রতিরোধ করতে পারে ও তার স্থূলত্ব দূরীভূত হয়ে যায়। প্রাকৃতিক উপাদানগুলো তাদের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতার দিক থেকে সম্ভাব্য পরিবর্তন গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং কোন বস্তু যখন তার দ্রবীভবণ ও বিশোধনের চরমে উপনীত হয়, তখন তাতে এমন একটি শক্তির উদ্ভব ঘটে, যা ধারণ করে, মগ্ন করে, পরিবর্তন করে ও পরিক্রমণ করে। যে-কোনো প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে যদি সততার চিহ্ন পরিলক্ষিত না হয়, তা হলে তাতে কোনো কল্যাণ নেই।

জেনে নিন, প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে তাপ শীতল বস্তুকে শুষ্ক করে ও তার আর্দ্রতাকে ব্যাহত করে এবং তার মধ্যে উষ্ণ আর্দ্রতাকে প্রকাশ করে ও শুষ্কতাকে ব্যাহত করে। এ ক্ষেত্রে শীতলতা ও উষ্ণতাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, তারা উভয়ে সক্রিয় এবং আর্দ্রতা ও শুষ্কতা নিষ্ক্রিয়। তারা পরস্পর নিজ সহচরের প্রতি এ নিষ্ক্রিয়তার দ্বারাই বস্তুর জন্ম দেয় ও তার সম্ভাবনার সূত্রপাত ঘটায়। যদিও এ বিষয়ে উষ্ণতা শীতলতার চেয়ে বেশি সক্রিয়। কারণ শীতলতার পক্ষে কোনো বস্তু চলমান ও গতিমান করা সম্ভব নয় এবং একমাত্র উষ্ণতাই গতির কারণ। সম্ভাবনার এ কারণ অর্থাৎ উষ্ণতা যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন কোনো বস্তুই কখনও পূর্ণতা লাভ করে না। যেমন এ উষ্ণতা কোনো বস্তুতে অত্যধিক হলে সেখানে যদি শীতলতা না থাকে, তা হলে তা তাকে জ্বালিয়ে দেয় ও বিনাশ করে। এ কারণে এসব প্রক্রিয়ায় শীতলের উপস্থিতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, যাতে তার দ্বারা বিরোধী শক্তিকে তার

বিরোধী শক্তির উপর জাগ্রত করা যায় এবং বস্তুকে আগুনের দহনক্রিয়া থেকে রক্ষা করা যায়। দার্শনিকরা সর্বাপেক্ষা বেশি এ প্রদাহী আগুনের সম্পর্কে সতর্ক করে গেছেন। তাঁরা প্রাকৃতিক উপাদান ও প্রশ্বাসবায়ুকে পরিষ্কৃত করতে, তাদের মধ্যকার আবর্জনা ও আর্দ্রতা বহিষ্কৃত করতে এবং তাদের মধ্য থেকে ক্ষতিকর ও মলিন বিষয়াদিকে দূরীভূত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এসব বিষয়ে তাঁদের মত ও প্রচেষ্টা স্থিরীকৃত হয়েছে। কেননা তাঁদের এ সম্পর্কীয় প্রক্রিয়া, আগুন থেকেই তার আরম্ভ এবং পরিণামে আগুনেই তার প্রত্যাবর্তন। এ জন্যই তাঁরা বলেছেন, তোমরা এ প্রদাহী আগুন থেকে সাবধান থেক। এটা দ্বারা তাঁরা তার মধ্যকার ক্ষতিকর উপাদানকে দূর করার কথা বুঝিয়েছেন। অন্যথায় বস্তুর উপর দুটি ক্ষতিকর উপাদান একত্র হয় এবং অতিসত্বর তার বিনাশ সাধন করে। এরূপ প্রতি বস্তুই একমাত্র তার প্রাকৃতিক উপাদানের বিরোধ ও সংঘাতেই বিকৃত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে সে দুটি বিষয়ের মধ্যে অবস্থান করে; সুতরাং এ অবস্থায় সে যদি সহায়ক ও শক্তিদাতা কোনো কিছুর সাহচর্য না পায়, তা হলে ক্ষতিকর উপাদান তার উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে ধ্বংস করে দেয়।

জেনে রাখুন, দার্শনিকদের সকলেই বস্তুসারের বস্তুর মধ্যে বারবার প্রত্যাবর্তনের কথা বর্ণনা করেছেন। কেননা তা এভাবে বেশি সংসক্তি ও শক্তির সাহায্যে অগ্নির ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকে প্রতিরোধ করতে পারে। কারণ তা এ আগুন অর্থাৎ উপাদানগত উত্তাপের সাহচর্যে মিলনক্ষণেই ক্রিয়াশীল হয়। পাঠক, তাকে সম্যকরূপে জানা প্রয়োজন।

এখন আমরা দার্শনিকদের বর্ণনা অনুসারে সেই প্রস্তর সম্পর্কে কথা বলব, যা দিয়ে এ প্রক্রিয়া সম্ভব হয়ে থাকে। তাঁরা এ ব্যাপারে মতানৈক্য পোষণ করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকের ধারণা তা প্রাণীতে বিদ্যমান; অনেকে উদ্ভিদে তার অবস্থিতি ধারণা করেন; অনেকে বলেন তা খনিজ পদার্থেই রয়েছে, আবার অনেকে উপরোক্ত সব কিছুর মধ্যেই তার অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেছেন। এসব মতামত সম্পর্কে চূড়ান্ত বিশ্লেষণ ও তাদের অনুসারীদের সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হবার প্রয়োজন আমাদের নেই; কারণ তাতে আলোচনা বেশি দীর্ঘ হয়ে পড়বে। আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, এ প্রক্রিয়া সম্ভাবনার দিক থেকে প্রতিটি বস্তুতেই উপস্থিত; কেননা প্রাকৃতিক উপাদান সব বস্তুতেই বিদ্যমান। সুতরাং তাও এরূপ।

এখানে আমাদের একান্ত ইচ্ছা, পাঠক যাতে জানতে পারেন যে, কিসের দ্বারা প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা ও বাস্তবতা অর্জিত হয়ে থাকে। আমরা আল হার্রানীর[৩৩৫] সেই বক্তব্য প্রকাশ করতে ইচ্ছুক, যাতে তিনি বলেছেন, রঞ্জন সর্বতোভাবে দুই প্রকার; এক প্রকার হল বস্তুর রঞ্জন, যেমন সাদা কাপড়ে ব্যবহৃত জাফরান, যা তাতে অবস্থাপ্রাপ্ত হয় এবং বিন্যাসের দিক থেকে তা শিথিল ও বিলীয়মান হয়ে থাকে। অন্য প্রকার রঞ্জনটি একটি স্বয়ম্ভর বস্তুর নিজস্ব উপাদানকে অন্য বস্তুর বর্ণ উপাদানের পরিবর্তিত করা। যেমন বৃক্ষের মৃত্তিকাকে তার নিজস্ব উপাদানের এবং প্রাণীর বৃক্ষকে নিজস্ব উপাদানে পরিণত করা; যার ফলে মৃত্তিকা বৃক্ষে ও বৃক্ষ প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এটা একমাত্র

৩৩৫. ইনি সম্ভবত সলিম; সিরিয়ার হার্রানের রসায়নশাস্ত্রবিদ্।

সজীব আত্মা ও সক্রিয় উত্তাপের ফলেই সম্ভব হয়। বস্তুত এটাই বস্তুসত্তার জন্ম দেয় ও বস্তুসারের পরিবর্তন করে। অবস্থা যখন এই, তখন এ কথা বলতে পারি যে, উক্ত প্রক্রিয়া হয় প্রাণী নয়তো উদ্ভিদের মধ্যে সক্রিয় হবে। এ মন্তব্যের প্রমাণ এই যে, এ উভয়টি আহার্যের সাথে অভ্যস্ত; তার দ্বারাই এদের স্থিতি ও পূর্ণতা প্রাপ্তি। অবশ্য প্রাণীর মধ্যে শক্তি ও সূক্ষ্মতার যে গুণ বিদ্যমান, তা উদ্ভিদের মধ্যে নেই। এ কারণেই দার্শনিকদের অনুসন্ধান তাতে অতি অল্পই অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রাণী তিনটি অবস্থান্তরের শেষ ও চরম পর্যায়। এর বর্ণনা এই যে, খনিজপদার্থ বৃক্ষে রূপান্তরিত ও বৃক্ষ প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়; কিন্তু প্রাণী তার চেয়ে সূক্ষ্মতর কোনো রূপে পরিবর্তিত হয় না বরং বিপরীতভাবে তা পুনরায় স্থূলত্বে ফিরে যায়। তদুপরি এ প্রাণিদেহ ছাড়া এ পৃথিবীতে আত্মা অন্য কারও সাথে সংযুক্ত হয় না; অথচ এ আত্মাই হল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্তু। প্রাণীতে এ আত্মার অবস্থান তার রূপ পরিগ্রহ করেই হয়ে থাকে। উদ্ভিদের মধ্যে যে আত্মা অধিষ্ঠিত, তা অতি সামান্য এবং তাতে স্থূলতা ও অমসৃণতা বিদ্যমান। এ সত্ত্বেও তা নিজের স্থূলতা ও উদ্ভিদের বস্তুগত স্থূলত্বের জন্য তাতে মগ্ন ও সুপ্ত রয়েছে। এ স্থূলত্ব ও তার আত্মার স্থূলত্বের জন্যই তা গতিশীল হতে পারে না। বস্তুত গতিশীল আত্মা এ সুপ্ত আত্মা থেকে বহুগুণ বেশি সূক্ষ্ম। কারণ গতিশীল আত্মা খাবার খায়, বিচরণ করে ও শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। কিন্তু সুপ্ত আত্মা খাদ্য গ্রহণ ছাড়া অন্য কিছু করতে পারে না। সজীব আত্মার দিক থেকে তুলনা করলে তাদের মধ্যকার পার্থক্য মৃত্তিকা ও জলের চলমানতার সাথে তুলনীয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর অবস্থাও অনুরূপ। সুতরাং প্রাণীর মধ্যে প্রক্রিয়াজাতকরণের বিষয়টি সবচেয়ে উন্নত, অগ্রগণ্য, সহজ ও সুলভ। কাজেই যে-কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির এটা জানার পর যা সহজ, তাতে অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা এবং যাতে দুরূহতার ভীতি আছে, তা পরিত্যাগ করা উচিত।

জেনে রাখুন, দার্শনিকদের কাছে প্রাণী কিছু ভাগে বিভক্ত; তার মধ্যে 'জননী' হিসেবে প্রাকৃতিক ও উপাদান এবং 'জাতক' হিসেবে আধুনিক সৃষ্টি বিদ্যমান। এটা সর্বপরিচিত ও সহজবোধ্য ব্যাপার। এ জন্যই মৌল উপাদান ও সৃষ্টবস্তুকে দার্শনিকরা সজীব ও নির্জীব হিসেবে বিভক্ত করেছেন। তাঁরা প্রতিটি গতিশীল সক্রিয় বস্তুকে সজীব এবং প্রতি স্থবির নিষ্ক্রিয় বস্তুকে নির্জীব বলে নির্দিষ্ট করেছেন। তাঁরা দ্রবণশীল বস্তু ও খনিজ পদার্থ তথা, সর্ববস্তুতে এ বিভাজন প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন। ফলে যে বস্তু অগ্নিতে দ্রবীভূত হয়, উদ্বায়ী হয় ও প্রজ্জ্বলিত হয়; তা সজীব এবং এর বিপরীত যা কিছু, সেসব নির্জীব বলে গণ্য হয়েছে। এ দিক থেকে প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে যেগুলো চারটি প্রাকৃতিক উপাদানে বিশ্লেষিত হয়, তাদেরকে সজীব এবং যেগুলো অনুরূপভাবে বিশ্লেষিত হয় না, তাদেরকে নির্জীব বলে বিভক্ত করেছেন।

অতঃপর দার্শনিকগণ সব সজীব বিভাগ অনুসন্ধান করে দেখেছেন। কিন্তু দর্শনীয়ভাবে চারটি উপাদানের বিভাগে বিভক্ত হয়ে বিশ্লেষিত হতে পারে, আলোচ্য শিল্পের জন্য এমন কোনো বস্তু তাঁরা খুঁজে পান না। প্রাণীর মধ্যেও একমাত্র সেই প্রস্তর ছাড়া অন্য কিছু লাভ করেননি। সুতরাং তারা তার গণ সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে জেনেছেন, গ্রহণ করেছেন এবং তাকে প্রক্রিয়াজাত করেছেন। ফলে তার দ্বারা তাঁদের

ঈপ্সিত ফল লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন। খনিজ পদার্থ ও উদ্ভিদের মধ্যেও অনেক সময় অনুরূপ অবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়; বিশেষ করে বিচিত্র উপাদান একত্র করে মিশ্রণ ও এর পর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এটা হয়ে থাকে। উদ্ভিদের মধ্যে বলতে গেলে এমন উপাদান বিদ্যমান, যা এসব বিভাগের অনেকগুলোতেই বিশ্লেষিত হয়; যেমন 'আশনান'।[৩৩৬] খনিজ পদার্থে বস্তু, বস্তুসার ও প্রশ্বাস রয়েছে। এদেরকে মিশ্রণের মাধ্যমে সাধন করলে এমন উপাদান বের হয়ে আসে, যাতে প্রভাবক্ষমতা বিদ্যমান। আমরা এদের প্রতিটিই সাধন করে দেখেছি।

এদের মধ্যে প্রাণীই সাধন প্রক্রিয়ায় সর্বাপেক্ষা উন্নত ও অগ্রগণ্য এবং তুলনামূলকভাবে সহজ ও সুলভ। সুতরাং পাঠক, আপনাকে অবশ্যই জেনে নিতে হবে প্রাণীর মধ্যে বিদ্যমান সেই প্রস্তরটির স্বরূপ কী এবং কী রূপে তা অস্তিত্বে এসেছে। আমরা বর্ণনা করেছি যে, প্রাণী জাতকসমূহের মধ্যে সর্ব প্রধান; কাজেই তাতে যা উৎপন্ন হয়, তা সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। যেমন মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিদ। মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিদ সূক্ষ্মতর এজন্য যে, তা মৃত্তিকার স্বচ্ছ স্বয়ম্ভর উপাদান ও সূক্ষ্মবস্তুর দ্বারা গঠিত; সুতরাং তার ক্ষেত্রে এ সূক্ষ্মতা ও তারল্য অবশ্যম্ভাবী। অনুরূপভাবে প্রস্তরও উদ্ভিদ ও মৃত্তিকার ক্ষেত্রে তুলনীয়। সামগ্রিকভাবে প্রাণীর মধ্যে এ প্রস্তর ছাড়া এমন কোনো বস্তু নেই, যা চারটি উপাদানে বিশ্লেষিত হতে পারে। পাঠক, এ বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করুন। কারণ তা একান্ত অকাট মূর্খ ও নির্বোধ ছাড়া অন্য সকলেরই বোধগম্য বিষয়। আমরা ইতিপূর্বে এ প্রস্তরের স্বরূপ সম্পর্কে আপনাকে অবহিত ও অবগত করেছি; এখন আমরা তার সাধন প্রক্রিয়াগুলো বর্ণনা করব, যাতে আমরা আমাদের উপর ন্যায়পরায়ণতার যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলাম, তা পূর্ণ হয়। অবশ্য—যদি পবিত্র আল্লাহ্ স্বেচ্ছায় আমাদের এ ইচ্ছার পূর্ণতা কামনা করেন।

আল্লাহ্র কৃপায় এর সাধন প্রক্রিয়া নিম্ন প্রকার : এ মহান প্রস্তরটিকে গ্রহণ করুন: অতঃপর তাকে কুম্মাণ্ড ও পাতন পাত্রে স্থাপন করুন। তার চারটি উপাদান অগ্নি, বায়ু, মৃত্তিকা ও জলে তাকে বিশ্লেষণ করুন। এগুলোই বস্তু, বস্তুসার, জৈবিক সত্তা ও রঞ্জন। তারপর আপনি যখন মৃত্তিকা থেকে জলকেও অগ্নি থেকে বায়ুকে বিচ্যুত করবেন, তখন প্রতিটিকে পৃথকভাবে স্ব স্ব পাত্রে উন্নীত করুন এবং পতিত দ্রব্যাদিকে পাত্রের তলদেশে গ্রহণ করুন। এটাই তলানি; একে তীব্র আগুনতাপে শোধন করুন; যাতে উত্তাপে তার মালিন্য দূরীভূত হয় এবং তার স্থূলতা ও অমসৃণতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাকে স্বীয় শুভ্রতার বিধৃত করুন এবং তার মধ্য থেকে সুপ্ত আর্দ্রতার আবিলতাকে উদ্বায়িত করুন। এ পর্যায়ে তা এমন একটি শুভ্র তরল পদার্থে পরিণত হবে, যার মধ্যে অস্বচ্ছতা, মালিন্য ও অসদ্ভাব নেই। তারপর আপনি প্রাথমিকভাবে তা থেকে উত্থিত উপাদানগুলোকে লক্ষ করুন এবং ঐগুলোকেও মালিন্য ও অসদ্ভাব থেকে পরিষ্কার করুন। বারবার এগুলোকে ধৌত করুন ও ঊর্ধ্বপাতিত করুন; যাতে এগুলো সূক্ষ্ম, তরল ও পরিষ্কৃত হয়ে ওঠে। আপনি যখন এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন, আল্লাহ্ আপনাকে সফলতার দ্বারা সজ্জিত করবেন।

---

৩৩৬. লবণাক্ত উদ্ভিদ বিশেষ; বিরেচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এর পর আপনি সেই বিন্যাসকে অনুসরণ করুন, যার উপর প্রক্রিয়া নির্ভরশীল। এর বিবরণ এই যে, উক্ত বিন্যাসকে একমাত্র যোজন ও পচনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। যোজন বলতে স্থূলের সাথে সূক্ষ্মের মিশ্রণ এবং পচন বলতে বিশোধন ও বিচূর্ণন বুঝিয়ে থাকে। এগুলো এমনভাবে করতে হবে, যাতে তারা একে অন্যের সাথে মিশে একবস্তু হয়ে দাঁড়ায় এবং এক্ষেত্রে জলীয় মিশ্রণের ন্যায় তাতে যেন কোনো প্রকার অসম্ভব ও অপচয়ের নিদর্শন না থাকে। এ পর্যায়ে স্থূলটি সূক্ষ্মটির ধারণশক্তি অর্জন করবে এবং বস্তুসার অগ্নির সম্মুখিন থেকে শক্তি পাবে ও তাতে স্থিতিশীল হতে পারবে। অনুরূপভাবে তদস্থ জৈবিক সত্তাও বস্তুর মধ্যে মগ্ন হতে ও তাতে বিস্তৃত থেকে শক্তি অর্জন করবে। একমাত্র বিন্যাসের পরেই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। কেননা দ্রবীভূত বস্তু যখন তার সর্বাংশে মিশ্রক আত্মার সাথে যুক্ত হবে, তখন তার আকৃতি গ্রহণের জন্য তার একাংশ অপরাংশের সাথে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে একবস্তু হয়ে দাঁড়াবে। এর ফলে বস্তুসার বা আত্মার জন্য সংস্কার, বিকার, স্থায়িত্ব[৩৩৭] ও স্থিতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে এবং বস্তু বা দেহের জন্য মিশ্রণের স্থান হিসেবে যা আপতিত হতে পারে, তার জন্যও তা প্রয়োজন।

অনুরূপভাবে জৈবিক সত্তাও যখন তাদের সাথে মিশ্রিত হয় ও সাধন প্রক্রিয়ার বলে তাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তখন তার সর্বাংশ অপর দুটির অর্থাৎ বস্তুসার ও বস্তুর সর্বাংশের সাথে মিলে একাকার হয়ে যায়। এ পর্যায়ে তারা উভয়ে এমন নিবিড় বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, যাতে কোনো প্রকার অসদ্ভাব নেই এবং তারা যেন এমন একটি সামগ্রিক অংশ, যার সব প্রাকৃতিক উপাদান অটুট ও সর্বাংশ অখণ্ড হয়ে বিদ্যমান। তারপর এ মিশ্র উপাদানটি যখন দ্রবীভূত বস্তুর সাথে মিলিত হয় এবং তাতে অগ্নির উত্তাপ প্রবল হয়ে ওঠে, তখন তার মধ্যকার আর্দ্রতা প্রকাশ পেয়ে উপরে ভেসে ওঠে ও দ্রবীভূত বস্তুতে গলে যায়। আর্দ্রতার ধর্মই হল দাহ্যতা ও অগ্নির সাথে সংযোগ। সুতরাং অগ্নি যখন তার সাথে সংযোগ স্থাপনে উদ্যোগী হয়, তখন জলীয় উপাদানের মিশ্রক জৈবকি সত্তার সাথে তার একাত্মতা তাকে বাধা দেয়। কারণ অগ্নি বিশুদ্ধ তেল ছাড়া তার সাথে একাত্ম হতে পারে না। অনুরূপভাবে জলীয় উপাদানেরও ধর্ম হল আগুন থেকে পলায়ন। সুতরাং তাতে আগুনের উত্তাপ প্রবল হয়ে তাকে উদ্বায়ী করে তুলতে চাইলে তার অন্তর্গত মিশ্রক শুষ্ক বস্তু তাকে ব্যাহত করে এবং উদ্বায়ী হতে বাধা দেয়। ফলে বস্তু জলীয় উপাদান ধারণের কারণ হয়; জলীয় উপাদান তেলের স্থিতির কারণ হয়; তেল রঞ্জনের স্থায়িত্ব বিধান করে এবং রঞ্জন তেলের আত্মপ্রকাশের কারণ ও আলোহীন নির্জীব অস্বচ্ছ বস্তুসমূহে তৈলতার আত্মপ্রকাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এটাই যথার্থ বস্তু এবং এভাবেই উক্ত প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

এটাই সেই পরিষ্কার বস্তুরূপ, যা সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসু হয়েছি। দার্শনিকগণ একে 'ডিম' বলে অভিহিত করেছেন। অবশ্যই এর দ্বারা তাঁরা 'মুরগির ডিম' বোঝাতে চাননি। জেনে রাখুন, দার্শনিকগণ একে অহেতুক এরূপ নামকরণ করেননি; বরং তাঁরা এর মধ্যদিয়ে একটি রূপকের সৃষ্টি করেছেন। আমি ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। আমি তাঁকে বলেছিলাম, হে বিজ্ঞ দার্শনিক! আপনি আমাকে দার্শনিকগণ কর্তৃক প্রাণিজ মিশ্রবস্তুকে

৩৩৭. বিষয়ানুকারে শব্দটি 'অস্থিতি' বা 'ফানা' হওয়া উচিত।

ডিম নামকরণের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিন। এটা কি তাঁদের ইচ্ছার ফসল, না বিশেষ কোনো বিষয়ের জন্য তাঁরা এমন রূপকের দ্বারস্থ হয়ে তাকে ডিম বলে অভিহিত করেছেন? তিনি বললেন, মিশ্রবস্তুর সাথে তার সাদৃশ্য ও নৈকট্যের জন্যই এরূপ করেছেন। তুমি এ ব্যাপারে চিন্তা কর; অচিরেই তোমার কাছে এর তাৎপর্য প্রকাশিত হয়ে উঠবে। আমি তাঁর সামনে চিন্তা করতে লাগলাম, কিন্তু কিছুতেই তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারলাম না। তিনি যখন আমার চিন্তা ও তার মধ্যে আমার নিমগ্নতা দেখলেন, তখন আমার বাহু স্পর্শ করে তাতে মৃদু ঝাঁকি দিয়ে বললেন, হে আবু বকর! এটা তাদের মধ্যকার প্রাকৃতিক উপাদানের মিশ্রণ ও সংগঠনকালে বর্ণ পরিমাণগত সাদৃশ্যের জন্যই হয়েছে। তাঁর এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মধ্যকার অন্ধকার বিদীর্ণ হল, আমার হৃদয়ের আলোক জ্বলে উঠল এবং আমি তা উপলব্ধি করার শক্তি লাভ করলাম। আমি এ বিষয়ে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গৃহের পথ ধরলাম। পরে আমি এ বিষয়ে একটি জ্যামিতিক ছক নির্মাণ করেছি, যা দিয়ে মাসলামার বক্তব্যের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রমাণ প্রদান করা সম্ভব। আমি বর্তমানে গ্রন্থে আপনার জন্য তা উদ্ধৃত করছি।

এর উদাহরণ এই যে, মিশ্র বস্তুটি যখন সমাপ্ত ও পূর্ণ হয়, তখন তার মধ্যকার বায়বীয় প্রকৃতি ডিমের মধ্যকার বায়বীয় প্রকৃতির অনুরূপ এবং তুলনীয়ভাবে মিশ্র বস্তুটির আগ্নেয় উপাদান ডিমটির আগ্নেয় উপাদানের অনুরূপ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে অন্য দুটি প্রাকৃতিক উপাদান মাটি ও পানি সম্পর্কে বলা যায়। সুতরাং আমরা বলব, অনুরূপভাবে সমপরিমিত দুটি বস্তুই একে অপরের রূপক হতে পারে। তার উদাহরণ এই যে, ডিমের সমতলের জন্য 'হে, যে, ওয়াও, হ্বে' নির্দিষ্ট করুন। আমরা যখন এরূপ করার ইচ্ছা করব, তখন আমরা মিশ্র বস্তুটির স্বল্পতম প্রাকৃতিক উপাদান অর্থাৎ শুষ্কতা গ্রহণ করব। আমরা এর সাথে সমপরিমাণের আর্দ্রতার উপাদান মিশ্রিত করব; ফলে শুষ্কতার প্রকৃতি আর্দ্রতার প্রকৃতিকে শোষণ করে তার শক্তিকে ধারণ করবে। এ বক্তব্যে কিছুটা রহস্য আছে বলে মনে হতে পারে; কিন্তু পাঠক এটা আপনার অগোচরে থাকবে না। তারপর আপনি এর সাথে অনুরূপ সব কিছু বস্তুসার অর্থাৎ জলীয় উপাদান থেকে মিশ্রিত করুন; ফলে সবকিছু মিলিয়ে ছয়টি দৃষ্টান্ত হবে। এর পর প্রক্রিয়াজাতকরণান্তে সমুদয়ের সাথে অনুরূপভাবে বায়বীয় প্রকৃতি অর্থাৎ জৈবিক সত্তা মিশ্রিত করুন। এর তিনটি অংশ। ফলে সব মিলে সম্ভাবনার দিক থেকে শুষ্কতার নয়টি দৃষ্টান্ত হবে। যে মিশ্র বস্তুটির প্রকৃতি তার সমতলকে বেষ্টনকারী, তার দুই পাশে নিচে দুটি প্রকৃতিকে স্থাপন করুন। এ ক্ষেত্রে প্রথম দুটি সমতল বেষ্টনকারীর পাশে জলীয় প্রকৃতি ও বায়বীয় প্রকৃতি স্থাপন করবেন। এ দুটি, 'আলিফ, হ্বে, দাল-এর পাশ ও 'আলিফ, বে, জিম, দাল[৩৩৮]-এর সমতল। অনুরূপভাবে ডিমের সমতল বেষ্টনকারী দুটি পাশ, যারা জলীয় ও বায়বীয়, এগুলোই 'হে, যে, ওয়াও, হ্বে'-এর পার্শ্বদ্বয়। সুতরাং আমি বলব, 'আবজাদের' সমতল 'হযওহ্বে'র সমতলের অনুরূপ বায়বীয় প্রকৃতি, যাকে জৈবিক সত্তা বলে অভিহিত করা হয়, তার সাথে তুলনীয়। অনুরূপভাবেই মিশ্র বস্তুটির সমতলের 'বে, জে'। বস্তুত দার্শনিকগণ কোনো বস্তুকে অন্য বস্তুর নামের দ্বারা তাদের মধ্যকার সাদৃশ্যের জন্যই অভিহিত করেছেন।

---

৩৩৮. রোজেনথালের অনুবাদে এটা 'আলিফ-জিম-দাল' এবং পরবর্তীটি 'আলিফ-বে-দাল'।

যেসব শব্দ সম্পর্কে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে, তার মধ্যে একটি হল 'পবিত্র ভূমি'; এটা ঊর্ধ্বস্থ ও নিম্নস্থ প্রাকৃতিক উপাদানের সমবায়ে সংগঠিত হয়। তামা একটি পদার্থ, যার মালিন্য দূরীভূত করে তাকে বিচূর্ণিত করার ফলে অণুতে পরিণত হয়েছে। তারপর হীরাকসের দ্বারা রক্তিম করার ফলে তা তাম্রাভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ম্যাগনেশিয়া' তাঁদের কাছে এমন একটি প্রস্তর যাতে বস্তুসার জমাট বেঁধে আছে। তাকে সেই ঊর্ধ্বস্থ প্রাকৃতিক উপাদান প্রকাশ করেছে, যাতে বস্তুসার সুপ্ত থাকে এবং সে কারণে তা অগ্নি সংঘাতের সম্মুখিন হতে পারে। 'নীললোহিত' এমন একটি লাল রং, যা অস্থিতিশীল এবং প্রাকৃতিক উত্তাপই তার জনয়িত্রী। সীসা এমন একটি প্রস্তর যাতে তিনটি বিচিত্রধর্মী শক্তি একত্র হয়েছে; এরা পরস্পর গণ ও গঠনের দিক থেকে এক। এদের একটি বস্তুসারীয়, প্রজ্জ্বল ও স্বচ্ছ এবং এটাই সক্রিয়। দ্বিতীয়টি সত্তাগত। এটি গতিশীল ও অনুভূতিশীল। অবশ্য এটা পূর্বটি অপেক্ষা স্থূল এবং এর কেন্দ্রস্থল পূর্বটির কেন্দ্রস্থল অপেক্ষা ভিন্ন। তৃতীয়টি একটি মৃন্ময় শক্তি, নিরেট ও সংকোচক এবং এর ভারের জন্য ভূ-কেন্দ্রের দিকে বিপরীতগামী। এ শক্তিই বস্তুসারীয় জৈবিক সত্তাগত সমুদয় শক্তির ধারক এবং তাদেরকে বেষ্টনকারী। এছাড়া অবশিষ্ট যা কিছু, সমুদয়ই মূর্খ সাধারণের বিভ্রান্তির জন্য কৃৎ-কৌশলগত অভিনব সৃষ্টি। যে ব্যক্তি তার প্রস্তাবনাসমূহ জ্ঞাত আছে, তার পক্ষেই অনন্য নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব।

এটাই সেই সামগ্রিক বক্তব্য, যে সম্পর্কে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে। আমি তার ব্যাখ্যাসহ তোমার কাছে প্রেরণ করলাম। আশা করি আল্লাহ্‌র কৃপায় তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। ইতি।

ইবনে বিশরুনের আলোচনা এ স্থানে শেষ হল। ইনি আন্দালুসের 'কিমিয়া' ও 'সিমিয়া' শাস্ত্রের এবং যাদুবিদ্যার তৃতীয় শতাব্দী ও পরবর্তীকালের নেতৃস্থানীয় দিক্‌পাল মাসলামা আল মজরিতীর অগ্রগণ্য শিষ্যমণ্ডলীর অন্যতম।

পাঠক, আপনি অবশ্যই লক্ষ করেছেন যে, আলোচ্য শিল্প সম্পর্কে তাদের যাবতীয় আলোচনাই কীভাবে এমন কিছু ইঙ্গিত ও রহস্যময়তায় পর্যবসিত হয়েছে, যা প্রকাশ হয়েও হতে চায় না এবং জানা যায় না। এটাই প্রমাণ করে যে, বিষয়টি প্রাকৃতিক শিল্পের অন্তর্গত নয়। কিমিয়া সম্পর্কে যে তথ্যটি আমাদের বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যকীয় এবং যার সত্যতা বাস্তব ঘটনার দ্বারা সমর্থিত, তা এই যে, এটা সূক্ষ্ম আত্মশক্তির প্রভাব জাতীয় ও বস্তুজগতে এর তৎপরতা সম্পর্কীয় বিষয়। আত্মশক্তি শুভ হলে এটা কখনও বিভূতির আকারে দেখা দেয়; আবার অশুভ ও দুষ্ট হলে এটাই যাদু হয়ে দাঁড়ায়। বিভূতির ব্যাপারটি তো একান্তই প্রকাশমান; কিন্তু যাদুর ব্যাপারটি এজন্য যে, যাদুকররা, যেমন যথাস্থানে তার তাৎপর্য বিশ্লেষিত হয়েছে, তাদের যাদুশক্তির দ্বারা বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তন করতে পারে। এ সত্ত্বেও তাদের কাছে এমন কিছু বস্তুগত উপাদান থাকে, যাতে তাদের যাদুক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন মৃত্তিকার উপাদান অথবা বৃক্ষ ও উদ্ভিদের উপাদান থেকে কিছুসংখ্যক প্রাণীর সৃষ্টি। সামগ্রিকভাবে তারা এক্ষেত্রে ভিন্নতর বস্তু উপাদান ব্যবহার করে থাকে। যেমন ফেরাউনের যাদুকররা দড়ি ও লাঠির দ্বারা যাদু সৃষ্টি করেছিল। যেমন সুদান, দক্ষিণ সীমার হিন্দু ও উত্তর সীমার

তুর্কি যাদুকরদের সম্পর্কে বর্ণিত হয় যে, তারা শূন্যে বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য বিষয় সংঘটনে যাদুক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে থাকে।

যেহেতু এ শিল্পটিও স্বর্ণের জন্য বিশিষ্ট উপাদান অপেক্ষা ভিন্নতর উপাদান থেকে এটা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ছিল, সুতরাং একেও যাদু জাতীয় ব্যাপার বলে গণ্য করা যায়। এ সম্পর্কে আলোচনাকারীরা দার্শনিকদের মধ্যে বিজ্ঞতার অধিকারী। যেমন—জাবের, মাসলামা এবং তাঁদের পূর্বসূরি অন্যান্য জাতির দার্শনিকবৃন্দ; তাঁরাও অনুরূপ পথের পথিক। এ কারণেই তাঁদের আলোচনা রহস্যময়তায় পর্যবসিত হয়েছে। এর দ্বারা তারা বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র কর্তৃক যাদুবিদ্যা ও এর বিচিত্র প্রকার সম্পর্কে প্রদত্ত অস্বীকৃতি থেকে আলোচ্যশাস্ত্রকে রক্ষা করতে চেয়েছেন মাত্র। এ শাস্ত্র অন্যের অধিকারে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁদের কার্পণ্য থেকে এটা হয়নি; যেমন যারা এই বিষয়ে যথার্থ বিশ্লেষণের দ্বারস্থ হননি, তারা অনুরূপ মতপ্রকাশ করে থাকেন। পাঠক, লক্ষ করুন, কীভাবে মাসলামা তাঁর এ শাস্ত্র সম্পর্কীয় গ্রন্থের নাম 'রুতবাতুল হাকিম' এবং যাদুবিদ্যা ও ইন্দ্রজাল সম্পর্কীয় গ্রন্থের নাম 'গায়াতুল হাকিম' রেখেছেন। এদ্বারা তিনি গায়াতের বিষয়ে সাধারণত ও রুতবাতের বিষয়ের বিশিষ্টতার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। কারণ 'গায়াত' (গন্তব্য) 'রুতবাত' (পর্যায়) হতে উন্নততর। সুতরাং বলা যায় যে, রুতবাতের আলোচ্যাদি গায়াতের অংশ বিশেষ এবং আলোচ্য বিষয়ের উদ্দেশ্যের দিক থেকে শেষোক্তটি পূর্বোক্তটিকে নিজ সীমায় বেষ্টন করে আছে। এ দুটি গ্রন্থে তাঁর বক্তব্য থেকেও আমাদের পূর্বোক্ত মন্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তারপর আমরা সেই সব ব্যক্তির ভ্রান্তির অপনোদন করব, যারা এ বিষয় সম্পর্কীয় উপলব্ধিকে প্রাকৃতিক শিল্পের অন্তর্গত বলে ধারণা পোষণ করেন। বস্তুত 'আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞাতা ও সর্বপ্রজ্ঞাতা'।[৩৩৯]

---

৩৩৯. কোরান; ৬৬, ৩।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[দর্শনের অসারত্ব ও দর্শন শাস্ত্রানুসারীদের বিকৃতি]

অত্র ও তার পরবর্তী পরিচ্ছদ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এসব শাস্ত্র সভ্যতায় আকস্মিকভাবে আগত এবং নগর জীবনে বেশি অনুশীলিত হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রে এদের ক্ষতিকর প্রভাব অত্যধিক। এ জন্যই এদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং এদের সভ্যতায় বিশ্বাসীদের যথার্থতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছে।

এর বর্ণনা এই যে, মানবজাতির অন্তর্গত একদল বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধারণা পোষণ করেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার অতীত সমুদয় বস্তুজগৎ, তাদের স্বরূপ, অবস্থা, কারণ ও কারণসহ অনুসন্ধিৎসু চিন্তা ও বুদ্ধিগ্রাহ্য অনুমানের দ্বারা উপলব্ধ হতে পারে এবং ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কীয় ধ্যান-ধারণার বিশুদ্ধি এ চিন্তার দ্বারাই লভ্য, শ্রুতির দ্বারা নয়; কেননা এগুলোও বুদ্ধিগ্রাহ্য উপলব্ধির অংশবিশেষ। এসব ব্যক্তিকে 'ফালাসফা' বলে অভিহিত করা হয়। শব্দটি 'ফিলসফ'-এর বহুবচন এবং গ্রিক ভাষায় এর অর্থ 'জ্ঞানপ্রেমিক'। সুতরাং তাঁরা এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, অনুসন্ধান করেছেন এবং যথাশক্তি উক্ত উদ্দেশ্য সম্পূরণে তৎপর হয়েছেন। তাঁরা এমন একটি পদ্ধতির জন্ম দিয়েছেন, যা দ্বারা বুদ্ধি তার অনুসন্ধান কার্য সম্পাদনে সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে সমর্থ হয় এবং তাঁরা এর নাম দিয়েছেন 'যুক্তিবিদ্যা'।

এর ফলশ্রুতি এই যে, যে অনুসন্ধিৎসা মিথ্যা থেকে সত্যকে পৃথক করার কাজে সহায়তা করে, তা একমাত্র স্মৃতিরক্ষিত বস্তুজগতের ব্যষ্টি থেকে গৃহীত তাৎপর্যাদির মধ্যেই ক্রিয়াশীল হয়। ফলে তন্মধ্য থেকে প্রথমে এমন কিছু প্রাকৃতির সার সংগৃহীত হয়, যা সমগ্র ব্যষ্টির উপর প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন সীলমোহর পঙ্ক ও মোমের উপর অঙ্কিত এর সমুদয় ছাপ সম্পর্কেই সমভাবে প্রযোজ্য হয়। অনুভূত বিষয়াদি থেকে এ সংগৃহীত সারাংশকে 'প্রাথমিক বোধ' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তারপর এসব সার্বিক তাৎপর্য যদি অন্য তাৎপর্যের সাথে মিশ্রিত থাকে, তাহলে তা থেকেও সারাংশ গৃহীত হয় এবং ইতোপূর্বে তা স্মৃতিতেও অনুরূপ পৃথকীকৃত হয়েছে। সুতরাং এর সাথে মিশ্রিত অন্য তাৎপর্যাদি থেকে তাকে পুনরায় পৃথক করা হয়। এর পর দ্বিতীয়বার অনুরূপভাবে অন্যবিধ মিশ্রণ থেকে এর সারাংশ গৃহীত হয়। এভাবে তৃতীয় বার এবং ক্রমান্বয়ে যতক্ষণ না উক্ত সারাংশ এমন সার্বিক সরল তাৎপর্যে পরিণত হয়, যা সর্বপ্রকার তাৎপর্য ও ব্যষ্টির উপর প্রযোজ্য হতে পারে। এর পর এটি থেকে আর সারাংশ গৃহীত হয় না; এটাই সর্বোচ্চ গণ।

এসব সারাংশের সবই অনুভূতির অতীত বিষয় এবং জ্ঞানার্জনের জন্য তাদের কতকাংশের সাথে অপর কতকাংশের সংযুক্তিকে 'দ্বিতীয় বোধ' বলে অভিহিত করা হয়। মননশক্তি যখন এসব সারাংশীয় বোধে অনুসন্ধান চালায় ও বস্তুর যথার্থ স্বরূপের কল্পনা দাবি করে, তখন স্মৃতির জন্য তার কতকাংশের সাথে অপর কতকাংশের সংযুক্তি ও কতকাংশের সাথে অপর কতকাংশের বিযুক্তিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্বস্ত প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে; যাতে এর দ্বারা অর্জিত বস্তুর কল্পনা যথার্থ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং একমাত্র বিশুদ্ধ প্রমাণের দ্বারাই তা সম্ভব হতে পারে; যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে অনুরূপ বিচার ও সংযুক্তির নামই 'সত্যতা'; তা পরিণামে দার্শনিকদের কাছে কল্পনা অপেক্ষা অগ্রগণ্য এবং কল্পনা প্রারম্ভে ও শিক্ষায়ই শুধু অগ্রগণ্য হিসেবে বিবেচিত। কারণ তাঁদের কাছে উপলব্ধিগত অনুসন্ধিৎসার চরম পর্যায় হল পরিপূর্ণ কল্পনা এবং সত্যতা তার মাধ্যম মাত্র। পাঠক, আপনি যুক্তিবিদদের গ্রন্থাদিতে কল্পনার অগ্রগামিতা ও তার উপর সত্যতার নির্ভরশীলতার যে বক্তব্য শুনতে পান, তা একমাত্র বোধ অর্থে; পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্থে নয়। এটাই তাঁদের গুরু এরিস্টটলের মত।

অতঃপর তাঁরা ধারণা করেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার অতীত সমুদয় বস্তুজগতের উপলব্ধির সৌভাগ্য এ অনুসন্ধিৎসা ও প্রমাণাদির দ্বারা লব্ধ হয়ে থাকে। মোটামুটিভাবে বস্তুজগৎ সম্পর্কে তাঁদের উপলব্ধির মাধ্যম ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ফসল হল তাই, যার উপর তাঁরা তাদের অনুসন্ধিৎসার সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁরা প্রথমে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, নিম্ন পর্যায়ে বস্তু বিদ্যমান। এর পর তাঁদের উপলব্ধি কিছুটা উন্নত হলে তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, প্রাণীর মধ্যে যেহেতু অনুভূতি ও গতি রয়েছে, সুতরাং জৈবিক সত্তার অস্তিত্ব আছে। এর পর তাঁরা জৈবিক সত্তার শক্তি হতে বুদ্ধির সাম্রাজ্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। এখানে তাঁদের উপলব্ধি স্থিতিশীল হওয়ায় তাঁরা আকাশীয় উন্নত বস্তু সম্পর্কে মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ফলে তাঁদের কাছে আকাশীয় বস্তুপুঞ্জেরও মানুষের অনুরূপ জৈবিক সত্তা ও বুদ্ধি থাকা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। এর পর তাঁরা এ ধারণাকে একাদিক্রমে সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করেছেন এবং উক্ত সংখ্যা দশ। নয়টি বিস্তারিত ও তাদের স্বরূপ বহুধাবিশিষ্ট এবং একটি প্রথম ও একক; তা হল দশম।

তাঁরা ধারণা করেন যে, অনুরূপ সিদ্ধান্তসহ জৈবিক সত্তার বিশুদ্ধি ও তার চরিত্রে সৎগুণের আরোপ সম্পন্ন করে বস্তুজগতের উপলব্ধিগত সৌভাগ্য অর্জন সম্ভব। কর্তব্যকর্মের সৎ ও অসৎ নির্দেশ করার জন্য যদি কোনো ধর্মীয় বিধান অবতীর্ণ না হয়, তবুও মানুষের পক্ষে তার বুদ্ধি ও অনুসন্ধিৎসার কল্যাণে এবং সৎকর্মের প্রতি আকর্ষণ ও অসৎকর্মের প্রতি বিকর্ষণ সম্পর্কীয় তার সহজাত প্রবৃত্তির গুণে অনুরূপ সৌভাগ্য অর্জন সম্ভব হতে পারে। যখন কোনো জৈবিক সত্তায় এ গুণ অনুপ্রবিষ্ট হয়, তখন সে এক অপূর্ব আনন্দ ও আস্বাদে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। এ সম্পর্কীয় মূর্খতাই চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্যের নামান্তর। এটাই তাঁদের কাছে পারলৌকিক সম্ভোগ ও দুর্ভোগের তাৎপর্য। এ ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্যের বিভ্রান্তিকর বিস্তার সবার কাছে সুপরিচিত।

এসব মতবাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, যিনি তার সমস্যাগুলোকে সংগৃহীত করেছেন, তার জ্ঞানের ধারাকে সংকলিত করেছেন এবং তার প্রমাণাদিকে সারিবদ্ধ করেছেন, তিনি বর্তমানকালে আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, ম্যাসিডোনিয়ার অধিবাসী এরিস্টটল। ম্যাসিডোনিয়া রোম সাম্রাজ্যের একটি নগর। এরিস্টটল প্লেটোর শিষ্য, আলেকজান্ডারের শিক্ষক এবং সাধারণভাবে দার্শনিকরা তাঁকে 'প্রথম শিক্ষক' বলে অভিহিত করেন। এটা দ্বারা তাঁরা যুক্তিশিল্পের শিক্ষকই বুঝিয়ে থাকেন; কারণ তাঁর পূর্বে এ শিল্পটি এমন সুসংস্কৃত ছিল না। তিনিই প্রথমে পদ্ধতিগুলো বিন্যস্ত, তার সমস্যাগুলো সুসংবদ্ধ এবং তার বিস্তারকে সুসম্পন্ন করেন। তিনি যথাসম্ভব এ শিল্পকে সর্বাঙ্গসুন্দর করেছেন; এতদ্‌সত্ত্বেও দার্শনিকদের ইচ্ছা অনুসারে তিনি যদি তৎসংশ্লিষ্ট অধ্যাত্মবিদ্যার দায়িত্ব বহন করতেন, তা হলে কতই না ভালো হত!

অতঃপর ইসলামী জগতে তাদের উত্তরসূরিদের মধ্যে অনেকেই এ মতবাদ গ্রহণ করেছেন এবং সামান্য ব্যতিক্রমসহ এরিস্টটলের মতকে যথাযথ অনুসরণ করেছেন। এর বর্ণনা এই যে, ঐসব পূর্বসূরি দার্শনিকের গ্রন্থাদি যখন আব্বাসী সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রিক ভাষা থেকে আরবি ভাষায় অনূদিত হল, তখন ইসলামী জগতের অনেকেই এসব বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। জ্ঞানের জগতে আল্লাহ্ যাদেরকে বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত করেছেন, তাঁরা তাদের মতামত গ্রহণ করলেন এবং তা নিয়ে বিতর্কে অগ্রসর হন ও বিস্তারিত সমস্যাবলিতে মতানৈক্যের অধীন হয়ে পড়লেন। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ছিলেন সাইফুদ্দৌলার শাসন-আমলে চতুর্থ শতাব্দীর দার্শনিক আবু নসর আল ফারাবী এবং ইস্পাহানের বনি বূয়ার নেজামূল মুলকের শাসন-আমলে পঞ্চম শতাব্দীর দার্শনিক আবু আলী ইবনে সিনা।[৩৪০]

জেনে রাখুন, তাঁরা এভাবে যে মতবাদের অনুসারী হয়েছেন, তা তার সমুদয় প্রকার প্রকৃতিসহ-ই অসার। অবশ্যই সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে তাঁরা যেভাবে প্রথম বোধের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন এবং তার উপর ভিত্তি করে যেভাবে উন্নয়নের মাধ্যমে অবশ্যম্ভাবী সত্তায় উপনীত হয়েছে, তা এর অতীত আল্লাহ্‌র সৃষ্টি পর্যায় সম্পর্কে উপলব্ধির অক্ষমতা ছাড়া অন্যকিছুই নয়। সৃষ্টিজগৎ এই বিন্যাস অপেক্ষা বেশি বিস্তৃত—"তিনি এমন অনেক কিছুই সৃষ্টি করেছেন, যা সম্পর্কে তোমরা অবগত নও"। শুধুমাত্র বোধের প্রতিষ্ঠা ও তাছাড়া অন্য সমুদয় সম্পর্কে তাদের উদাসীনতার ক্ষেত্রে তাঁরা পদার্থবিদদের সাথে-ই তুলনীয়। তাঁরাও বিশেষভাবে বস্তুকেই প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শ্রুতি ও বোধের দায়িত্ব এড়িয়ে যান। ফলে তাঁরা এ বিশ্বাস পোষণ করেন যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকৌশলে বস্তুর অতীত কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। অন্যদিকে সৃষ্টিজগতের উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত দার্শনিকদের যুক্তি-প্রমাণ, যাকে তাঁরা যুক্তিবিদ্যার পরিমাপ ও পদ্ধতিতে উপস্থাপিত করেন, তাও উদ্দেশ্য সম্পাদনে অক্ষম ও অসম্পূর্ণ। এদের মধ্যে যাকে তাঁরা বস্তুজগতের উপর প্রতিষ্ঠিত করে পদার্থবিদ্যা নামে অভিহিত করেছেন, এর অক্ষমতার কারণ এই যে, তাঁদের ধারণা অনুসারে সংজ্ঞা ও অনুমানের ভিত্তিতে প্রকাশিত স্মৃতিমূলক এসব ফলাফল ও বহির্জগতের বাস্তবতার মধ্যকার সামঞ্জস্য একান্তই অবিশ্বস্ত। কারণ এসব

৩৪০. রোজেনথালের অনুবাদে নেজামূল মুলকের উল্লেখ নেই।

সিদ্ধান্ত স্মৃতিমূলক, সার্বিক ও সাধারণ এবং প্রকাশ বস্তুজগৎ উপাদানের দিক থেকে ব্যষ্টির দ্বারা বিশিষ্ট। সম্ভবত তার উপাদানের মধ্যেই এমন কিছু বিদ্যমান, যা এ স্মৃতিমূলক সার্বিকতাকে প্রকাশ্য বিশিষ্টতার সাথে সুসামঞ্জস্য হতে বাধা দেয়। অবশ্য এক্ষেত্রে বাস্তব অনুভূতিই কিছুটা ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং বলা যায়, অভিজ্ঞতাই এর প্রমাণ; এসব যুক্তি-প্রমাণ নয়। কাজেই সেখানে তাঁদের দাবি অনুসারে সেই বিশ্বাসের অবকাশ কোথায়?

কখনও স্মৃতিশক্তি কাল্পনিক আকৃতির দ্বারা প্রাথমিক বোধকে ব্যষ্টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে তৎপর হয়। কিন্তু তার এ তৎপরতা দ্বিতীয় বোধের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়; কেননা তা পৃথকীকরণের দিক থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের। যা হোক, এ প্রথম পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুভূতির সমগোত্রীয়। কারণ প্রথম বোধ বহির্জগতের দ্বারা পূর্ণভাবে বিন্যস্ত হওয়ায় সামঞ্জস্যের দিক থেকে তার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা তাদের এ-সম্পর্কীয় দাবি মেনে নিতে পারি। অবশ্য এ প্রসঙ্গেও আমাদের জন্য এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা ত্যাগ করা উচিত। কেননা যে-কোনো মুসলমানের জন্য তার অনুপকারী বিষয় পরিত্যাগের যে বিধান রয়েছে তার সাথে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ পদার্থবিদ্যার সমস্যাসমূহ আমাদের ধর্মীয় বিধানে ও জীবন আচরণে গুরুত্বপূর্ণ তেমন কিছু নয়; সুতরাং তা ত্যাগ করাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

অবশ্য তাঁদের আলোচনার যে অংশটি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুজগৎ সম্পর্কে বিদ্যমান, যাকে আত্মাজগৎ বলা যায় এবং যাকে তাঁরা ঐশীবিদ্যা ও পদার্থের পরবর্তী বিদ্যা নামে অভিহিত করেছেন, তার স্বরূপ মূলতই অজ্ঞাত। তাতে উপনীত হবার কোনো সংযোগ নেই এবং তার কোনো বাস্তব প্রমাণও নেই। কারণ প্রকাশ ও বিশিষ্ট বস্তুজগৎ থেকে বোধশক্তিকে পৃথক করার কাজ কেবলমাত্র আমাদের উপলব্ধিজাত পরিধিতেই সম্ভব হতে পারে। আত্মাজগতের স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করতে পারি না; সুতরাং আমাদের পক্ষে সেখান থেকে সার গ্রহণ করে ভিন্ন কোনো প্রকৃতি পৃথক করা সম্ভব নয়। বস্তুত উক্ত জগৎ ও আমাদের মধ্যে একটি যবনিকা বিদ্যমান। ফলে সেখান থেকে আমরা কোনো বাস্তব প্রমাণই গ্রহণ করতে পারি না এবং সাধারণভাবে তার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করার জন্য আমাদের উপলব্ধি কোনো কাজেই লাগে না। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম মানুষের জীবাত্মা ও তার উপলব্ধির মধ্যে আমরা লাভ করতে পারি। বিশেষ করে সেই স্বপ্নের মধ্যে যা প্রত্যেকের মধ্যেই বিশেষ আবেগের ফসল হিসেবে বিদ্যমান। এছাড়া যা কিছু তার স্বরূপ ও গুণ হিসেবে রয়েছে, সেসবই গৃহ্যতত্ত্ব; তাকে আয়ত্তে আনার কোনো পথ উন্মুক্ত নেই।

দার্শনিকদের মধ্যে বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন 'যার বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তার উপর কোনো প্রমাণ উপস্থিত করা যায় না। কারণ বাস্তব প্রমাণের প্রাথমিক শর্তই হল প্রামাণ্যের সত্তাগত অস্তিত্ব।' তাঁদের শিক্ষাগুরু প্লেটো বলেছেন, 'অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনায় কোনো প্রকার বিশ্বাসে উপনীত হওয়া যায় না। তাতে একমাত্র 'যথোপযুক্ত' ও 'যথার্থ' বলা যেতে পারে।' অর্থাৎ একটি ধারণামাত্র। কাজেই আমরা যখন এরূপ পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার পর শুধুই একটি ধারণা

লাভ করতে সমর্থ হই, তখন আমাদের জন্য সেই প্রথম ধারণাই কি যথেষ্ট নয়? ফলত এসব জ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করে আমাদের কী লাভ? অথচ আমাদের এবংপ্রকার কষ্ট স্বীকারের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুজগৎ সম্পর্কে স্থির বিশ্বাসে উপনীত হওয়া এবং তাঁদের কাছেও মানুষের মননশীলতার এটাই একমাত্র লক্ষ্য।

তাদের সেই বক্তব্য—বস্তুজগৎকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার সৌভাগ্য এসব যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যেই লাভ হয়ে থাকে; বস্তুত একটি অলীক অবাঞ্ছিত বক্তব্য মাত্র। তার ব্যাখ্যা এই যে, মানুষ দুটির অংশের দ্বারা গঠিত; এর একটি দৈহিক এবং অপরটি তার সাথে মিশ্রিত আত্মিক। এদের প্রতিটির জন্য পৃথক পৃথক উপলব্ধি বিদ্যমান; যদিও তাদের মধ্যে উলব্ধিকারী একক। তা তাদের আত্মিক অংশ; যে কখনও আত্মিক উপলব্ধির দ্বারা আবার কখনও দৈহিক উপলব্ধির দ্বারা জ্ঞান লাভ করে। অবশ্য আত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে যে-কোনো প্রকার মাধ্যম ছাড়াই নিজ সত্তাকে ব্যবহার করে। অন্যদিকে দৈহিক উপলব্ধির জন্য তাকে ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের ন্যায় দৈহিক যন্ত্র-মাধ্যম ব্যবহার করতে হয়।

প্রতিটি উপলব্ধিকারীই তার উপলব্ধির আনন্দ উপভোগ করে থাকে। পাঠক, এক্ষেত্রে শিশুর মাধ্যমবিশিষ্ট প্রাথমিক উপলব্ধির বিষয়টি বিবেচনা করুন। সে কীভাবেই না আলোক দর্শনে ও শব্দ শ্রবণে উল্লসিত হয়ে থাকে। সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জৈবিক সত্তা নিজস্বরূপে মাধ্যমহীন যে উপলব্ধি লাভ করে, তাতে এরূপ আনন্দ ও আস্বাদের মাত্রা সমধিক। অনুরূপভাবে জীবাত্মা যখন মাধ্যমহীন স্বরূপগত উপলব্ধির দ্বারস্থ হয়, তখন তার জন্য যে পরিমাণ উল্লাস ও আস্বাদ লাভ ঘটে, তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বস্তুত এ উপলব্ধি কোনো প্রকার অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানের দ্বারা লাভ করা যায় না। এটা একমাত্র ইন্দ্রিয় যবনিকার উত্তোলন এবং দৈহিক উপলব্ধির মাধ্যমগুলোর সম্পূর্ণ বিস্মৃতির মাধ্যমেই ঘটে থাকে।

সুফিসাধকরা এ উল্লাস লাভের জন্যই জৈবিক সত্তায় অনুরূপ উপলব্ধির আবির্ভাবের নিমিত্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। এ উদ্দেশ্যেই তাঁরা সাধনার দ্বারা দৈহিক শক্তি ও তার উপলব্ধিসমূহকে মৃতবৎ করে তোলেন; এমন কি মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তিকেও রহিত করেন। যাতে দৈহিক বাধাবিপত্তি অপসারিত হওয়ার ফলে জৈবিক সত্তা তার স্বরূপগত উপলব্ধি লাভ করতে পারে। এর ফলে তাঁদের জন্য যে আনন্দ ও আস্বাদ লাভ ঘটে, তা ভাষায় বর্ণনাযোগ্য নয়। এরূপ আনন্দ লাভের ধারণাও দার্শনিকদের কাছে তার উপলব্ধির বিশুদ্ধতার দিক থেকে গ্রহণযোগ্য; কিন্তু এসত্ত্বেও এর অস্তিত্ব তাঁদের উদ্দেশ্যের সাথে যথার্থভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

অতএব তাঁদের বক্তব্য—বাস্তব প্রমাণ ও মননশীল যুক্তি অনুরূপ উপলব্ধি ও তৎসংশ্লিষ্ট আনন্দের জন্ম দিতে পারে; পাঠক, আপনি লক্ষ করেছেন, তা একান্তই ভিত্তিহীন। কারণ বাস্তব প্রমাণ ও যুক্তিতর্কের সবই দৈহিক উপলব্ধিজাত এবং তাদের সংগঠনের মস্তিষ্কে কল্পনা, মনন ও স্মৃতি ক্রিয়াশীল। অথচ আমরা বলি যে, অনুরূপ উপলব্ধি লাভ করতে হলে প্রথম যে বস্তুটির প্রয়োজন, তা হল এসব মস্তিষ্কশক্তির অপসারণ; কেননা এরা ঐ উপলব্ধির ক্ষেত্রে সংঘাত সৃষ্টিকারী এবং তার উদ্দেশ্যে

বিরূপতা প্রকাশকারী। পাঠক, আপনি তাঁদের মধ্যকার দক্ষ ব্যক্তিকেও 'কিতাবুশ্ শেফা', 'ইশারাত' ও 'নাজাত' এবং এরিস্টটল ও অন্যদের রচনাবলির সংক্ষিপ্ত-সার রচয়িতা ইবনে রুশদের গ্রন্থে আত্মনিয়োগ করে দেখবেন। তাঁরা এসব গ্রন্থের পৃষ্ঠা মন্থন করছেন, তাদের যুক্তি-প্রমাণের দৃঢ়তা অনুধাবন করছেন এবং তা দিয়ে তাদের মধ্যে অনুরূপ সৌভাগ্যের অংশ অনুসন্ধান করে ফিরছেন; অথচ তাঁরা বুঝতেও পারছেন না যে, এতদ্বারা তাঁরা কেবল তার পথে বাধাই সৃষ্টি করছেন! তাঁদের একমাত্র নির্ভরতা এরিস্টটল, ফারাবী ও ইবনে সিনা থেকে বর্ণিত সেই বক্তব্য, যাতে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি সক্রিয় মননশীলতা অর্জন করতে পেরেছে এবং তার সাথে তার জীবনের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে, তার জন্য অবশ্য সেই সৌভাগ্যের প্রাপ্তিলাভ ঘটেছে।'

তাঁদের কাছে সক্রিয় মননশীলতা বলতে আত্মজগতের পর্যায়ক্রমের সেই প্রথম পর্যায়কে বোঝায়, যার উপর থেকে ইন্দ্রিয় যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে এবং এ সক্রিয় মননশীলতার সাথে সংযোগকে তাঁর জ্ঞানজ উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন। অথচ, পাঠক, আপনি ইতিমধ্যে তার অমরতা লক্ষ করেছেন। এরিস্টটল ও তাঁর অনুসারীগণ এ সংযোগ ও উপলব্ধির দ্বারা জৈবিক সত্তার সেই স্বরূপগত মাধ্যমহীন উপলব্ধিকেই বুঝিয়েছেন এবং তা ইন্দ্রিয় যবনিকার উন্মোচন ছাড়া সম্ভব নয়।

অন্যদিকে তাঁদের বক্তব্য—'এ উপলব্ধিজাত আনন্দ সেই প্রতিশ্রুত সৌভাগ্যের নামান্তর মাত্র'; তাও অনুরূপভাবেই অসার। কেননা তাঁদের প্রতিষ্ঠিত বক্তব্য থেকে আমাদের সামনে এটাই প্রকাশ পেয়েছে যে, জৈবিক সত্তার জন্য ইন্দ্রিয়ের অতীত ভিন্ন এক উপলব্ধি বিদ্যমান, যা কোনো প্রকার মাধ্যম ছাড়াই অর্জিত হয় এবং তার এরূপ উপলব্ধির দ্বারা সে তীব্র আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু এ বক্তব্য কোনো প্রকারেই এটা বোঝায় না যে, তা-ই পারলৌকিক সৌভাগ্যের নামান্তর এবং অবশ্য লভ্য। বরং তা এ সৌভাগ্যের বিচিত্র আস্বাদের একটি অংশ মাত্র।

অতঃপর তাদের বক্তব্য—'বস্তুজগৎকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার মধ্যেই সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে; তা এমন একটি অসার বাক্য, যা একত্ববাদের ভিত্তি প্রসঙ্গে আমাদের পূর্ব বর্ণিত স্বকপোলকল্পনা ও বিভ্রান্তির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। কেননা বস্তুজগৎ প্রতিটি উপলব্ধিকারীর কাছে তার উপলব্ধি-মাধ্যমের অনুপাতে সীমাবদ্ধ; আমরা ইতিপূর্বেই এর বিকৃতির কথা বর্ণনা করেছ। বস্তুত বস্তুজগৎ অনুরূপভাবে বেষ্টিত হওয়ার চেয়ে বিস্তৃততর অথবা দৈহিক ও আত্মিক যে-কোনো দিক থেকে তার যথাযথ অনুধাবন সম্ভবপর নয়। তাদের মত ও পথের আলোচনায় সামগ্রিকভাবে আমাদের যা লভ্য হয়েছে, তা এই যে, উক্ত আত্মিক অংশ যখন দৈহিক শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন সে তার স্বরূপগত এক বিশেষ ধরনের উপলব্ধির মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে; কিন্তু তার সেই উপলব্ধির ক্ষেত্র আমাদের আয়ত্তাধীন এ বস্তুজগৎ মাত্র। তা কিছুতেই এমন ব্যাপক কোনো উপলব্ধি নয়, যা সমগ্র অস্তিত্বকে বেষ্টন করতে পারে। কারণ তা বেষ্টনীর অতীত। যা হোক, সে তার এরূপ উপলব্ধির সাহায্যেই তীব্র আনন্দ উপভোগ করে; যেমন শিশু তার ক্রমবর্ধমান প্রাথমিক অবস্থায় ইন্দ্রিয়জাল উপলব্ধির দ্বারা আনন্দ লাভ করে থাকে। সুতরাং এর পর কে সমগ্র বস্তুজগতের

উপলব্ধির কথা বলতে পারে; কিংবা সেই সৌভাগ্যলাভের ধারণা দিতে পারে যার প্রতিশ্রুতি আমরা ধর্মীয় বিধানে পেয়েছি যদি আমরা তার কর্তব্য পালন না করি! 'আক্ষেপ! আক্ষেপ!! সেই বিষয়ের জন্য যা দিয়ে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে।'

তাঁদের সেই বক্তব্য—'মানুষ সচ্চরিত্রের অনুশীলন ও অসচ্চরিত্র থেকে বিরত থেকে নিজের জীবাত্মার সংশোধন ও সংমার্জনে স্বাধীন; তা এমন একটি বিষয় যার ভিত্তি হল এই যে, তার স্বরূপগত উপলব্ধিজাত আনন্দই তার প্রতি প্রতিশ্রুত সৌভাগ্যের নামান্তর। কারণ অসচ্চরিত্র জৈবিক সত্তার পরিপূর্ণ উপলব্ধির ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ; কেননা সে দৈহিক শক্তির রূপ-বৈচিত্র্যের মধ্যে নিমগ্ন থাকে।'

আমরা বর্ণনা করেছি যে, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের নিদর্শন এ দৈহিক ও আত্মিক উপলব্ধির অতীত একটি বিষয়। দার্শনিকরা যে সংমার্জনার মাধ্যমে তার সাথে সংযুক্তির কথা বলেছেন, এর উপকারিতা শুধু আত্মিক উপলব্ধিজাত আনন্দ প্রসারের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। বস্তুত তাকেই অনুমান ও পদ্ধতিগত ধারণার অধীন বলা যায়। কিন্তু তার অতীত যে সৌভাগ্যের কথা ধর্মপ্রবর্তক প্রতিশ্রুতি হিসেবে আমাদেরকে বলেছেন এবং যা কেবলমাত্র তৎপ্রদত্ত আদেশ পালন ও চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমেই লাভ করা যায়, তা এমন একটি বিষয়, যা কোনো উপলব্ধিকারীর উপলব্ধিই বেষ্টন করতে পারে না। এ কারণেই তাঁদের নেতৃস্থানীয় দার্শনিক আবু আলী ইবনে সিনা তাঁর 'আল মবদা ওয়াল মা-আদ' নামক গ্রন্থে সতর্ক করে দিয়ে যা বলেছেন, তার অর্থ হল : আত্মিক পুনরুত্থান ও তার অবস্থাসমূহ এমন কিছু বিষয়, যা বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রমাণ ও অনুমানের দ্বারা অনুধাবন করা যায়। কারণ তা সংরক্ষিত প্রাকৃতিক ধারা ও ঐক্যবদ্ধ ধারণায় বিধৃত রয়েছে। সুতরাং তার উপর যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের অবকাশ বিদ্যমান; কিন্তু দৈহিক পুনরুত্থান ও তার অবস্থাসমূহের অনুধাবন বাস্তব প্রমাণের দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ তার ধারা ঐক্যবদ্ধ নয়। বরং তার ব্যাপারে মোহাম্মদী সত্যধর্মবিধান আমাদের সামনে বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেছে। সুতরাং আমাদের উচিত তাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং তার অবস্থাসমূহ জানার জন্য তার দ্বারস্থ হওয়া।

অতএব এই শাস্ত্র, পাঠক, আপনি লক্ষ করেছেন, তা কীভাবে তাদের অতি আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণ করতে অক্ষম। তদুপরি তাতে ধর্মীয় বিধান ও তার বহিরঙ্গের বিরোধিতার উপাদান বিদ্যমান। ফলত এই শাস্ত্র সম্পর্কে আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, তাতে একটিমাত্র উপকারিতাই বিদ্যমান; তা হল যুক্তিপ্রমাণ বিন্যাসের ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তিকে তীক্ষ্ণ করা, যাতে বাস্তব প্রমাণের ক্ষেত্রে উত্তম যোগ্যতা ও বিশুদ্ধতা অর্জিত হতে পারে। এ হল দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততার সাথে অনুমান পরম্পরার শৃঙ্খলা ও বিন্যাস; যাতে তাঁরা তাঁদের যুক্তিবিদ্যার শর্তাদিরূপে এবং পদার্থবিদ্যার পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করেছেন। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব বিষয়কে পদার্থবিদ্যা, শিক্ষণীয় গণিতাদি এবং তার পরবর্তী শাস্ত্রাদির জন্য ব্যবহার করে থাকেন। এর ফলে যে-কোনো অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন ও গঠনের ক্ষেত্রে বেশি মাত্রায় শর্তসাপেক্ষ বাস্তব প্রমাণের প্রয়োগজনিত পরিচিতির দ্বারা বিশ্বস্ততা ও বিশুদ্ধতার একটি যোগ্যতা লাভ করতে সমর্থ হয়। কারণ উক্ত শাস্ত্রটি যদিও তাদের উদ্দেশ্য সম্পূরণ করতে

অপারগ, তবু আমাদের জ্ঞানানুসারে তা বিতর্ক-বিচারের শুদ্ধতম পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

সুতরাং পাঠক, আপনি যেমন জানতে পারলেন, এটাই এ শাস্ত্র পাঠের ফলশ্রুতি এবং এর সাথে শাস্ত্রবিদ্‌দের বিচিত্র মত ও পথ, তাদের ক্ষতিকারক ধারণা সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করা যায়। কাজেই উক্ত শাস্ত্র সম্পর্কে উৎসাহী ব্যক্তিমাত্রকেই তার অপকারিতা সম্বন্ধে সতর্কতার সাথে অবহিত হতে হবে। যে-কোনো ব্যক্তি তার সৃষ্টিশক্তিকে ধর্মীয় বিধান, কোরানের ভাষ্য, শাস্ত্রীয় অনুশাসন ইত্যাদির যথাযথ অবহিতির দ্বারা উজ্জ্বল করে যেন তাতে দৃষ্টিপাত করে। ধর্মীয় জ্ঞানহীন অবস্থায় কারও পক্ষে উক্ত শাস্ত্রের উপর ঝুঁকে পড়া উচিত নয়; অন্যথায় তার অপকারিতা থেকে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা খুবই কম। আল্লাহ্‌ই সঠিক পথের সাহায্যদাতা এবং সত্যের দিকে তিনিই পথ প্রদর্শন করেন। 'আমরা কিছুতেই সত্যের পথ অনুসরণ করতে পারতাম না, যদি না আল্লাহ্ আমাদেরকে সেই পথ প্রদর্শন করতেন।[৩৪১]

৩৪১. কোরান; ৭, ৪৩।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[জ্যোতিষশিল্পের অসারতা, তার উপলব্ধির দুর্বলতা এবং তার উদ্দেশ্যের বিকৃতি]

এই শিল্পের অনুসারীরা ধারণা পোষণ করেন যে, তাঁরা বস্তুজগতে সংঘটিতব্য বিষয়াদি পূর্বাহ্নেই জানতে পারেন। এরূপ জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষেত্রে নক্ষত্রের শক্তি ও সৃজ্যমান বস্তুর উপর তাদের প্রভাব তাঁদেরকে ব্যষ্টি বা সমষ্টিগতভাবে সাহায্য করে। এর ফলে আকাশমণ্ডল ও নক্ষত্রাদির গঠনপ্রকৃতি সামগ্রিকভাবে সংঘটিতব্য সার্বিক ও আংশিক বিষয়ের প্রতিটির উপর প্রমাণ উপস্থিত করে থাকে।

জ্যোতিষীদের মধ্যে পূর্বসূরিগণ এ মত প্রকাশ করতেন যে, নক্ষত্রাদির শক্তি ও প্রভাবের বিষয়টি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। কিন্তু এটা এমন একটি বিষয়, যা যথাযথ অর্জন করতে হলে মানবজাতির সমুদয় জীবনকালও যথেষ্ট নয়। কারণ অভিজ্ঞতা একমাত্র বারংবার সংঘটনের দ্বারা অর্জিত হয় এবং এরূপ পরম্পরা অনুসরণ করেই জ্ঞান বা ধারণা লাভ করে। নক্ষত্রাদির আবর্তনের মধ্যে এমনও আছে, যার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। সুতরাং তাদের বারংবার আবর্তনের জন্য এমন দীর্ঘ সময় ও কাল পরিধির দরকার, যা জাগতিক জীবনকালের দৈর্ঘ্য দিয়ে পূরণ হবার নয়। অনেক সময় তাঁদের মধ্যকার দুর্বলচেতাগণ এ মত প্রকাশ করে যে, নক্ষত্রাদির শক্তি ও প্রভাবের জ্ঞান প্রত্যাদেশের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। এটা একান্তই অসার কল্পনা, আমাদের জন্য এর অসারতা প্রতিপন্ন করার প্রয়োজন নেই; তাদের নিজেদের বক্তব্যই এজন্য যথেষ্ট।

পাঠক, তবুও এ প্রসঙ্গে আপনার জ্ঞাতব্য সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, নবীগণ (আঃ) শিল্পাদি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতেন। তদুপরি তাঁরা অদৃশ্যের সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিশেষ নির্দেশ না হলে কখনও আগ্রহ দেখাতেন না। সুতরাং তারা কীভাবে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে এ শিল্প গড়ে ওঠা এবং নবী অনুসারীদের মধ্যে অনুরূপ চরিত্র দেখা দেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করতে পারে।

অবশ্য টলেমী ও উত্তরসূরিদের মধ্যকার তাঁর অনুসারীদের মত এই যে অনুরূপভাবে নক্ষত্রাদির প্রমাণ উপস্থাপন একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার; তা বস্তুজগতের উপর নক্ষত্রাদির বিশেষ প্রভাব থেকে সংঘটিত হয়। টলেমী বলেন, কারণ বস্তুজগতে চন্দ্র-সূর্যের ক্রিয়া ও প্রভাব একটি প্রকাশ্য ব্যাপার; কারও পক্ষে তা অস্বীকার করার অবকাশ নেই। যেমন—সূর্য, ঋতু পরিবর্তন, তার বৈশিষ্ট্য গঠন এবং ফল-মূল ও

শস্যাদির পক্বতা সাধন, ইত্যাকার ব্যাপারে সক্রিয়তা দেখিয়ে থাকে। যেমন চন্দ্রের ক্রিয়া আর্দ্রতা সৃষ্টি, জলীয় উপাদান বৃদ্ধি দূষিত আবর্জনাদির পচন ও শস্য-কুষ্মাণ্ডাদির ফলন প্রভৃতি বহু বিষয়ে যুক্ত হয়।

অতঃপর টলেমী বলেন, এ দুটি ছাড়া অন্যান্য নক্ষত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য আমাদের সামনে দুটি পথ বিদ্যমান। এদের একটি হল এ প্রসঙ্গে শিল্পবিশারদের কাছ থেকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া। অবশ্য এতে আত্মার তৃপ্তি ঘটে না। অন্য পথটি হল সংযোগ সাধন ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রতিটি নক্ষত্রকে সেই মহা-জ্যোতিষ্কের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে অনুমান করা, যার শক্তি ও প্রভাবের সমুদয় ব্যাপারই আমরা প্রকাশ্যভাবে জানতে পেরেছি। সুতরাং আমরা লক্ষ করতে পারি যে, তার নৈকট্য লাভে নক্ষত্রাদির শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি পায় কিনা। যদি তেমন কিছু ঘটে তাহলে তার সাথে নক্ষত্রাদির সামঞ্জস্য প্রমাণিত হবে। অন্যদিকে যদি অনুরূপ নৈকট্যের ফলে শক্তি ও প্রভাব হ্রাস পায়, তাহলে তাদের প্রকৃতির বিরোধিতাই প্রতিপন্ন হবে। এর পর আমরা যখন নক্ষত্রাদির ব্যষ্টিগত শক্তিকে জানতে পারব, তখন আমাদের পক্ষে তাদের সমষ্টিগত শক্তিকেও জানা সম্ভব হবে। এটা তাদেরকে তাদের ত্রয়ী, চতুরঙ্গী ও অন্যবিধ গঠিত প্রক্রিয়ায় পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানা যেতে পারে। তদুপরি এ জ্ঞান মহা-জ্যোতিষ্কের সাথে রাশিচক্রের প্রাকৃতিক উপাদান থেকেও আহৃত হতে পারে।

যখন আমরা সামগ্রিকভাবে নক্ষত্রাদির শক্তি জানতে পারি, তখন দেখি যে, তারা বায়ুতে প্রভাবশীল এবং এ ব্যাপারটি একান্তই প্রকাশ্য। এর ফলে বায়ুতে যে মিশ্রণের সৃষ্টি হয়, তা তার অধীনস্থ সৃজ্যমান বস্তুপুঞ্জেও সংক্রমিত হয়ে থাকে। তার দ্বারাই বীর্য ও বীজের গঠন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এর ফলে তজ্জাত দেহে যেমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়, তেমনি তৎসংশ্লিষ্ট জীবাত্মা তাদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ ও অন্যান্য গুণাবলি অর্জন করে থাকে এবং উক্ত দেহ ও জীবাত্মাকে অনুসরণকারী অবস্থাসমূহও এসে উপস্থিত হয়। কারণ বীর্য ও বীজের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য থাকে, তা তজ্জাত ও তজ্জনিত বস্তুতে সংক্রমিত হয়।

টলেমী বলেন, এতদসত্ত্বেও তা ধারণামাত্র; তাতে বিশ্বাসের কোনো অবকাশ নেই এবং তা ঐশী সিদ্ধান্ত অর্থাৎ ভাগ্যের ব্যাপারও নয়। তা একমাত্র সৃজ্যমান বস্তুর সামগ্রিক কার্য-কারণের অংশবিশেষ হতে পারে। অথচ ঐশী সিদ্ধান্ত সব বস্তুর পূর্ববর্তী। টলেমী ও তাঁর অনুসারীদের বক্তব্য এটার সংক্ষিপ্ত-সার। এটা তাঁর 'চতুর্বর্গ' ও অন্যান্য গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। এ বর্ণনা থেকেই এ শিল্পের উপলব্ধিগত দুর্বলতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এটা এ যে, এই শিল্প সম্পর্কে কোনো প্রকার সম্ভাব্য জ্ঞান অথবা ধারণা তখনই অর্জিত হওয়া সম্ভব, যখন তা তার সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার কার্যকারণ তথা কারক, গ্রাহক, আকার ও উদ্দেশ্যসহ জ্ঞাত হবে; যেমন যথাস্থানে তা বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের বর্ণনা অনুসারে নক্ষত্রাদির শক্তি কারকমাত্র এবং বস্তুর একাংশ তার গ্রাহক। তদুপরি নক্ষত্রাদির এ শক্তি সামগ্রিক কারকতার অধিকারী নয়; বরং বস্তুর উপাদানে তার সাথে অন্য শক্তিও কারকরূপে বিদ্যমান। যেমন পিতার জন্য জন্মদানের শক্তি, বীর্যের

মধ্যকার বৈশিষ্ট্যের শক্তি এবং প্রতিটি প্রজাতিকে পরস্পর পৃথক করার বিশেষ শক্তি। এছাড়াও অন্যান্য শক্তি বিদ্যমান।

বস্তুত নক্ষত্রাদির শক্তি যখন পূর্ণতা লাভ করে এবং তার সম্পর্কে আমরা জানতে পারি, তখনও একমাত্র এটাই জানা যায় যে, তা সম্ভাব্য বস্তুর সামগ্রিক কার্য-কারণের একটি অংশ। তারপর এ নক্ষত্রাদির শক্তি ও প্রভাবজনিত জ্ঞানের জন্য অতিরিক্ত সংযোগ সাধন ও অনুমান প্রক্রিয়ার শর্ত আরোপ করা হয় এবং বলতে গেলে তখনই সম্ভাব্য বস্তু সম্পর্কে ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ সংযোগ সাধন ও অনুমান প্রক্রিয়া মূলত অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির মননের শক্তি মাত্র; তা সম্ভাব্য বস্তুর কার্যকারণও নয় এবং শিল্পের ভিত্তিও নয়। সুতরাং এ সংযোগ সাধন ও অনুমান প্রক্রিয়ার অভাব ঘটলে তার ধারণা সৃষ্টির পর্যায়ে সন্দেহের নিম্নস্তরে নেমে আসে। তদুপরি এরূপ ধারণা সৃষ্টি তখনই সম্ভব, যখন কোনো প্রকার বিপত্তি ছাড়া নক্ষত্রাদির শক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান যথাযথভাবে অর্জিত হয়। অথচ এটা এক আয়াসসাধ্য ব্যাপার; এর জন্য নক্ষত্রাদির গতিশীল অবস্থায় তাদের আবর্তনের সংখ্যা জানতে হয়। এবং এর মাধ্যমে তাদের গঠনপ্রকৃতিও জানতে হয়। কারণ প্রতিটি নক্ষত্রের বিশিষ্ট শক্তি সম্পর্কে প্রমাণের একান্ত অভাব।

অতএব সূর্যের সাথে সম্বন্ধযুক্ত অনুমানের উপর ভিত্তি করে টলেমী পাঁচটি গ্রহের শক্তির প্রতিষ্ঠাদানের যে উপলব্ধিগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছেন, তা একান্তই দুর্বল। কারণ সূর্যের শক্তি সমুদয় নাক্ষত্রিক শক্তির উপর প্রভাবশীল ও আধিপত্য বিস্তারকারী। সুতরাং তাঁর বক্তব্যানুসারে তাদের সাহচর্যে সূর্যের শক্তিমত্তার হ্রাস-বৃদ্ধি জানার সম্ভাবনা খুবই অল্প। বস্তুত এসব বিষয়ই বস্তুজগতে সংঘটিতব্য বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা প্রদান প্রসঙ্গে উক্ত শিল্পের যে ব্যবস্থা বিদ্যমান, তার সমালোচনার জন্য যথেষ্ট। তদুপরি নিম্নজগতের উপর নক্ষত্রাদির প্রভাব বিস্তারের ব্যাপারটিও প্রমাণসিদ্ধ নয়। পাঠক, আপনি লক্ষ করেছেন, যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে একত্ববাদের অধ্যায়ে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো কর্তা নেই। এ প্রসঙ্গে কালামশাস্ত্রবিদগণ যে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করেছেন তার বর্ণনা প্রদানও নিষ্প্রয়োজনীয়। তাঁরা বলেছেন, কার্যের সাথে কারণের সংযোগের বিষয়টি অজ্ঞাত পর্যায়ের এবং প্রকাশ্য দৃষ্টিতে বুদ্ধি এ ব্যাপারে প্রভাব সম্পর্কীয় যে মত প্রকাশ করে থাকে, তাও সন্দেহমুক্ত নয়। সম্ভবত এ কার্যকারণ সংযুক্তি সুপরিচিত প্রভাব প্রক্রিয়ার অতীত কোনো বিষয়। ঐশী মহিমাই এদুটির মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী; যেমন ঊর্ধ্ব ও নিম্নের সমুদয় সম্ভাবনার মধ্যেই তা সংযোগস্থাপন করে থাকে। বিশেষত ধর্মীয় বিধানসমূহ সংঘটিতব্য বিষয়কেই মহান আল্লাহ্‌র মহিমার সাথে সংযুক্ত করে এবং অন্যসব শক্তি থেকেই তার মুক্তির কথা বলে।

নবুয়তও নক্ষত্রাদির শক্তিমত্তা ও প্রভাবকে স্বীকার করে না। ধর্মীয় বিধানের বক্তব্য এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করছে। যেমন হযরত মুহম্মদ (সঃ) বলেছেন, 'কারও মৃত্যু বা জন্মের জন্য চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হয় না।'[৩৪২] তিনি অন্যত্র বলেছেন, (আল্লাহ্ বলেন,) 'আমার বান্দাদের অনেকেই আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং অনেকেই আমাকে অস্বীকারকারী হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা বলেছে—আল্লাহ্‌র দয়ায় ও কৃপায় আমাদের জন্য বৃষ্টি হয়েছে,

৩৪২. বোখারী (১ম খণ্ড)।

তারা আমার প্রতি বিশ্বাস করেছে এবং নক্ষত্রাদিকে অস্বীকার করেছে। আবার যারা বলেছে—অমুক নক্ষত্র সংযোগে আমাদের জন্য বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমাকে অস্বীকার করেছে এবং নক্ষত্রাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।'[৩৪৩] হাদীসটি শুদ্ধ।

পাঠক, ধর্মীয় বিধানের দিক থেকে এ শিল্পের অসারত্বের বিষয়টি আপনার সামনে পরিস্ফুট হয়েছে। এর সঙ্গে উপলব্ধিগত দুর্বলতাকে যোগ করলে বুদ্ধির কাছেও এটা দুর্বল। তদুপরি এর ফলে মানব সভ্যতায় যে অপকারিতার সঞ্চার হয়, তাও যোগ করতে হবে। এর ফলে সাধারণের ধ্যান-ধারণায় বিকৃতি দেখা দেয়। কারণ কখনও হঠাৎ উক্ত শিল্পজাত সিদ্ধান্ত আকস্মিকতার জন্য সত্য হয়ে দেখা দিলে কোনো প্রকার বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়াই অজ্ঞলোকেরা তার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং তার সমস্ত বিধি-বিধানকেই অকট্য সত্য বলে ভাবতে থাকে। অথচ আদৌ তা নয়। এর ফলে তারা প্রকৃত সৃষ্টিকর্তাকে এড়িয়ে অন্যের প্রতি তার সংগঠনের ক্ষমতা আরোপ করে। এ ছাড়াও এ শিল্পচর্চার ফলে অধিকাংশ সময় সাম্রাজ্যে দুর্যোগের প্রত্যাশা দেখা দেয় এবং এ প্রত্যাশা সাম্রাজ্যের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষাকারী শত্রুদের মধ্যে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মনোভাব জাগিয়ে তোলে। আমরা এমন বহু ঘটনা দেখেছি। সুতরাং ধর্ম ও সাম্রাজ্য উভয়ের ক্ষেত্রে এ শিল্প যে পরিমাণ অপকার সাধন করে, তার প্রতি লক্ষ রেখে সমগ্র মানব সমাজেই তা নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য এর ফলে এ শিল্পটির স্বাভাবিক অস্তিত্ব এবং মানুষের নিজস্ব উপলব্ধি ও জ্ঞান অনুসারে তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বাধার সৃষ্টি হবে না। কারণ ভালো ও মন্দ এমন দুটি প্রাকৃতিক বিষয়, যা পৃথিবীর সর্বত্র সর্বদা বিদ্যমান; তাদের উৎখাত সম্ভব নয়। একমাত্র তাদের অর্জনের ব্যাপারেই দায়িত্বজ্ঞানে পরিচয় দাবি করা হয়। সুতরাং এটা সুনির্দিষ্ট যে, কার্যকারণসহ কল্যাণকে অর্জন করতে হবে এবং অকল্যাণ ও অপকারকে তাদের কার্যকারণসহ বিদূরিত করতে হবে। যে ব্যক্তি এ শিল্প-সম্পদকে জানেন এবং তাদের অপকারিতা সম্বন্ধে বুঝেন, তাঁর উপর এ দায়িত্ব অবশ্য বর্তাচ্ছে।

এ বক্তব্য থেকে এটাও জেনে রাখা প্রয়োজন যে, যদিও এ শিল্পজ্ঞানটি অস্তিত্বের দিক থেকে যথার্থ, তবুও মুসলমানদের মধ্যে কারো পক্ষে তার চর্চা ও তার যোগ্যতা অর্জন সম্ভব নয়। বরং যদি কোনো ব্যক্তি তাতে অনুসন্ধিৎসু হয় এবং তার সামগ্রিক জ্ঞানের ধারণা পোষণ করে, তাহলে বলতে হবে প্রকৃত প্রস্তাবে সে একান্তই অযোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে। কারণ ধর্মীয় বিধান উক্ত শিল্প সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসাকে নিষিদ্ধ করার ফলে সমাজজীবনে তার চর্চা ও তার শিক্ষার জন্য একত্রে বসা ও আলোচনাচক্রের বিষয়টি বিলীন হয়ে গেছে। এখনও যারা তার প্রতি আসক্তি পোষণ করছে, তাদের সংখ্যা একান্তই স্বল্প, বরং স্বল্প থেকে স্বল্পতর। তারা শুধু তার গ্রন্থাদি ও লিখিত আলোচনা নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাদের ভগ্নগৃহের কোণে সময় কাটায়। তাদের এমন নির্জন পাঠও সাধারণ মানুষের দৃষ্টি প্রহরার অতীত নয়। অথচ জ্যোতিষশিল্প একটি জটিল বিষয়। এর শাখা-প্রশাখা অনেক এবং অনেকস্থানেই দুর্বোধ্যতার দ্বারা আবৃত। সুতরাং এমতাবস্থায় তার যোগ্যতা অর্জন কি করে সম্ভবপর?

---

৩৪৩. বোখারী (১ম খণ্ড)।

এখানে আমরা ফেকাহ্‌শাস্ত্রকে দেখতে পাই; তার উপকারিতা ধর্ম ও সংসার উভয়কে বেষ্টন করে আছে; তার শিক্ষাও কুরআন ও হাদীসের ধারায় খুবই সহজ এবং সর্বশ্রেণীর মানুষ তার অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানে ব্যাপৃত। তবুও তার বিচার-বিবেচনা ও সংগ্রহকরণ, তার দীর্ঘকালীন পঠন-পাঠন এবং তার বৈচিত্র্য ও বহুবিধ আলোচনাচক্রে যোগদান করে তাতে যুগ ও পুরুষানুক্রমে একজনের পর একজন মাত্র দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। সুতরাং যে শাস্ত্র ধর্মীয় বিধানে পরিত্যক্ত, যার সামনে নিষিদ্ধতা ও বাধার প্রাচীর দণ্ডায়মান, যা সাধারণ মানুষের কাছে গুপ্ত, যার উৎসমূল অত্যন্ত জটিল এবং যার মৌলিক ভিত্তি ও শাখা-প্রশাখাকে অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করার পরও অতিরিক্ত সংযোগ সাধন ও অনুমান প্রক্রিয়ার দ্বারা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির যোগ্যতা বাড়াতে হয়; তার শিক্ষালাভের সুযোগ কীভাবে ঘটতে পারে! কীভাবেই বা এসব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে কোনো ব্যক্তির পক্ষে তা অর্জন ও তাতে দক্ষতা লাভ হতে পারে! যারা অনুরূপ দক্ষতার দাবি করেন, পরিণামে তাদের সেই দাবি অসার বলে গণ্য হয়। কারণ এর যোগ্য কোনো প্রমাণ তারা উপস্থিত করতে পারেন না। আর পারার কোনো কথাও নয়; মুসলমানদের মধ্যে এ শাস্ত্রের বিরলত্ব এবং তার ধারক ও বাহকদের স্বল্পতাই এর প্রমাণ বহন করে। পাঠক, এসব বিষয় বিবেচনা করুন, তা হলেই আমাদের উপরোক্ত মতামতের বিশুদ্ধতা আপনার কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। আল্লাহ অদৃশ্য বিষয়ে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী; তিনি তাঁর অদৃশ্য রহস্য কাউকেও অবগত হতে দেন না।[৩৪৪]

আমাদের সমসাময়িক সহচরদের অনেকেই অনুরূপ তাৎপর্যমণ্ডিত অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। সম্রাট আবুল হাসানের সৈন্যদলকে আরব বেদুইনরা পরাজিত করে কায়রোয়ানে অবরুদ্ধ করে ফেললে[৩৪৫] বন্ধু ও শত্রু উভয় শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ অবস্থা লক্ষ করে তিউনিসের কবিদের অন্যতম আবুল কাসেম আর্‌রূহী বলেছেন :

আমি সর্বদা মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি;
জীবনের সুখ শান্তি সবই অপগত।
এ তিউনিসে প্রভাত ও সন্ধ্যা যাপন করছি
এবং এ প্রভাত ও সন্ধ্যা সবই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি।
এখানে ভীতি, ক্ষুধা ও মৃত্যুর তাণ্ডব—
গোলযোগ ও মহামারীর দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে।
মানুষ বিদ্রোহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত—
বিদ্রোহ কি কখনও সুফল জন্ম দিয়েছে!
আহমদের অনুসারীরা আলীর জন্য ভাবছে,
তার ধ্বংস ও বিনাশ সাধিত হয়েছে।
অন্যেরা বলছে, সে অচিরেই আসবে
তোমাদের কাছে মৃদুমন্দ বায়ুর সঙ্গী হয়ে।
আল্লাহ্ এদের ও তাদের উপরে থেকে
তাঁর ইচ্ছামত নিজ বান্দাদের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন।

৩৪৪. কোরান; ৭২, ২৬।
৩৪৫. এ ঘটনাটি ১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঘটে।

হে, পলায়নপর ধাবমান নক্ষত্র পর্যবেক্ষণকারী!
এসব আকাশীর শক্তি কী করছে?
তোমরা আমাদেরকে দূরে সরিয়ে ভাবছিলে
অবশ্যই তোমরা আজ সত্য হয়ে দেখা দিবে।
কিন্তু বৃহস্পতিবারের পর বৃহস্পতিবার গেছে
এবং শনিবার ও বুধবারও এসেছে।
মাসার্ধ, তার দ্বিতীয় দশমাংশ এবং
তৃতীয় দশমাংশকেও সমাপ্তি টেনে নিয়েছে।
আমরা মিথ্যার জঘন্যতা ছাড়া অন্য কিছু দেখি নি;
এটা কি নির্বুদ্ধিতা, না ব্যাপক ষড়যন্ত্র?
আমরা আল্লাহ্‌রই এবং এটাই জেনেছি যে,
ভাগ্য কখনও প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।
আমি আল্লাহ্‌কেই আমার উপাস্য মেনে সন্তুষ্ট;
তোমাদের জন্য চন্দ্র ও সূর্যই যথেষ্ট।
এসব ভ্রাম্যমাণ নক্ষত্র—
এরা দাস-দাসী ছাড়া অন্য কিছুই নয়।
তারা ভাগ্যের অধীন; কারও ভাগ্য নির্ধারক নয়;
এ পৃথিবীতে কোনো কিছু নির্ধারণ করার শক্তি তাদের নেই।
বুদ্ধি বিপথগামী তার প্রাচীনত্বের মধ্যে,
যার অবস্থা পাপ ও বিনষ্টির অধীন।
সে বস্তুজগতে একটি প্রকৃতিকে বিচারক করেছে,
তাকে জল ও বায়ু জন্ম দিয়ে থাকে।
সে কি মিষ্টতার বিপরীতে তিক্ততাকে দেখে নি;
এ উভয়কেই তো জল ও মৃত্তিকা খাদ্য দিয়েছে।
আল্লাহ্‌ই আমার প্রতিপালক; আমি জানি না।
স্বয়ম্ভর অণুই বা কী, শূন্যতাই বা কী!
আমি সেই উপাদানকেও জানি না, যে চীৎকার করে বলে,
'আমি কোন আকার ছাড়া থাকতে পারি না।'
আমি অস্তিত্বও জানি না; অনস্তিত্বও জানি না;
প্রতিষ্ঠাতাও জানি না; বিনষ্টিও জানি না।
আমি উপার্জন কাকে বলে, তাও জানি না; অবশ্য
ক্রয়-বিক্রয় থেকে যে উপার্জন হয়, তা জানি।
আমার অনুসৃত মত ও আচরিত ধর্ম তা-ই,
যখন সব মানুষ পুণ্যাত্মারূপে বিরাজমান ছিল।
তখন ব্যাখ্যা ছিল না, মূলনীতিও ছিল না,
এ বাক্‌বিতণ্ডাও ছিল না, আর দ্বিধা-সন্দেহও ছিল না।
পূর্বসূরিগণ যা অনুসরণ করেছেন, আমরা সেই পদাঙ্ক অনুসরণকারী;
আহা, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ কতই না উত্তম!
তাঁরা তা-ই ছিলেন, যা সকলেই অবগত আছে;
তাঁদের সময়ে এরূপ হট্টগোল ছিল না।
হে, এ যুগের আশায়েরাগণ! আমাকে
এ শীত, এ গ্রীষ্ম বোধশক্তি দান করেছে।

আমি মন্দের প্রতিদানে মন্দই দিয়ে থাকি
এবং ভালোর প্রতিদান ভালো বলেই জানি।
আমি যদিও বা সম্পূর্ণ অনুগত নই,
তবুও আমি অবাধ্য নই; কাজেই আমার আশা আছে।
আমি এক মহান স্রষ্টার আজ্ঞাবহ,
আকাশ ও পৃথিবী যার আজ্ঞা পালন করছে।
এটা তোমাদের সহায়তার গুণে নয়; বরং
এক মহান নির্দেশ ও নির্ধারণই তাদেরকে পরিচালিত করে।
আশআরীকে যদি তাদের সম্পর্কে বলা হত,
বর্তমানকালে যারা তাঁর মতের অনুসরণ করে;
তাহলে তিনি বলতেন, তাদেরকে বলে দাও, আমি
তারা যা কিছু বলে, সে সম্পর্কে দায়িত্বমুক্ত।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[কিমিয়াশাস্ত্রের ফলাফলের অস্বীকৃতি, তার অস্তিত্বের অসম্ভাব্যতা এবং তার চর্চার ফলে সংঘটমান বিকার-বিকৃতি]

পাঠক, জেনে রাখুন, জীবিকা অর্জনে অক্ষম ব্যক্তিদের অধিকাংশকেই এক দারুণ লোভ এসব শিল্পচর্চায় আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য করে। তারা এ ধারণা পোষণ করেন যে, জীবিকা অর্জনের বিচিত্র কৌশল ও পন্থার এটাও একটি এবং এটার মাধ্যমে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের জন্য সম্পদ সংগ্রহ করা সর্বাপেক্ষা সহজ ও সুলভ। এর ফলে তারা অত্যধিক দুঃখ-কষ্ট, অমানুষিক পরিশ্রম এবং শাসকবর্গের নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়ে থাকেন। তদুপরি তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা যে পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করেন, তার অতিরিক্ত ক্ষতি তাদেরকে সহ্য করতে হয় এবং পরিণামে নৈরাশ্যের কবলে পড়ে অতিশয় যাতনা ভোগ করেন। অথচ তাদের ধারণা এই যে তারা একটা কাজের মতো কাজ করেছেন। একমাত্র এ ধারণাই তাদেরকে অনুরূপ লোভের বশবর্তী করে যে, খনিজ পদার্থ বিশ্লেষিত হয় এবং তাদের মধ্যকার মিশ্রিত উপাদানের জন্য একে অন্যে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এর ফলে তারা নানাবিধ রৌপ্যকে স্বর্ণে এবং তাম্র ও টিনকে রৌপ্যে পরিণত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। তাদের ধারণা, এটা প্রকৃতির সম্ভাব্য বস্তুপুঞ্জের অন্যতম। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে প্রক্রিয়াগত বৈচিত্র্য বিদ্যমান। কারণ এ প্রসঙ্গে প্রচেষ্টা ও তার আকার-প্রকার নিয়ে তাদের মধ্যে মত ও পথের পার্থক্য রয়েছে। তদুপরি এ প্রক্রিয়ায় ব্যবহারযোগ্য উপাদান নিয়েও তাদের মতানৈক্যের অন্ত নেই। তারা এটাকে 'মহান প্রস্তর' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এটা কি মলমূত্র, রক্ত, কেশ, ডিম্ব অথবা এরূপ বা ঐরূপ অন্য কোনো কিছু?

তাঁদের সামগ্রিক প্রচেষ্টার স্বরূপ হল উপাদান নির্দিষ্ট করার পর তাকে একটি নিরেট ও মসৃণ প্রস্তরের উপর রেখে মুষল দ্বারা চূর্ণ করতে হবে এবং এরূপ চূর্ণীকরণের পর্যায়ে জল দ্বারা আর্দ্রতা বাড়াতে হবে। তারপর তার সাথে উদ্দেশ্য অনুসারে বিভিন্ন জড়িবটী ও ঔষধি মিশালে তার মধ্যে এমন একটি শক্তি উৎপন্ন হবে, যা উদ্দিষ্ট খনিজ পদার্থ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। এর পর এ মিশ্রণকে জল দ্বারা আর্দ্র করে রৌদ্রে শুকাতে হবে, আগুনে জ্বাল দিতে হবে, উর্ধ্বপাতন করতে হবে অথবা বিশুদ্ধ করে ফেলতে হবে; যাতে তার মধ্যকার জলীয় ও মৃন্ময় উপাদান দূরীভূত হয়ে যায়। যখন তা এমন সব প্রক্রিয়াগত প্রচেষ্টার সাথে মিলবে এবং শিল্পের পদ্ধতি অনুসারে করণীয় সব কিছু পূর্ণ হবে, তখন তার দ্বারা যে মৃন্ময় অথবা জলীয় উপাদান অর্জিত হবে, তাকে তারা—

'একসির' বলে অভিহিত করেন। তাদের ধারণা এ একসিরকে আগুনে উত্তপ্ত রৌপ্যের মধ্যে ঢাললে তা স্বর্ণে পরিণত হবে অথবা অগ্নিতে উত্তপ্ত তাম্রের উপর নিক্ষেপ করলে রৌপ্যে পরিণত হবে। এভাবে তা প্রক্রিয়াগত উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে বাস্তবায়িত হবে।

তাদের মধ্যকার বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এ 'একসির'টি মৌলিক উপাদানের দ্বারা গঠিত এক মিশ্র বস্তু। অনুরূপ বিশেষ ঔষধি ও প্রচেষ্টার ফলে তাতে এমন একটি শক্তিশালী প্রাকৃতিক মিশ্রণের উদ্ভব ঘটে, যা তাকে উক্ত বৈশিষ্ট্য অনুসারে রূপান্তরিত করে, তার মিশ্রণ ও আকৃতির পরিবর্তন সাধন করে এবং তাতে অর্জিত বৈশিষ্ট্য অনুসারে তার শক্তি ও অবস্থাকে জাগিয়ে দেয়। যেমন রুটি তৈরির জন্য ব্যবহৃত খামির; তা গোলা ময়দাকে তার স্বরূপে পরিবর্তন করে তার মধ্যকার শিথিলতা ও স্ফীতাবস্থাকে প্রকট করে তোলে। যাতে পাকস্থলীতে তার পরিপাক সুসাধ্য হয় এবং অতিদ্রুত খাদ্যে পরিণত হতে পারে। এরূপই স্বর্ণ ও রৌপ্যের একসির তার মধ্যে খনিজ পদার্থের যে উপাদান বিদ্যমান, তাই অন্য ধাতব পদার্থকে তাদের দিকে আকর্ষণ করে এবং তাদের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে।

মোটামুটিভাবে এটাই তাদের ধারণার নির্গলিতার্থ। পাঠক, আপনি তাদেরকে এ প্রক্রিয়া সাধনে নিরত দেখতে পাবেন। তারা এর মাধ্যমে তাদের খাদ্য ও জীবিকা অর্জনের ইচ্ছা পোষণ করছে। তারা তাদের পূর্ববর্তী শাস্ত্রবিশেষজ্ঞদের গ্রন্থাদি থেকে এর নিয়ম-পদ্ধতি লিখে নিচ্ছে এবং তা নিজেদের মধ্যে প্রচার করছে। তারা এগুলোর দুর্বোধ্যতা দূর করতে এবং রহস্য উদ্ঘাটন করতে সচেষ্ট হচ্ছে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো হেঁয়ালীর অনুরূপ। যেমন জাবের ইবনে হাইয়্যানের রচিত সত্তরটি পুস্তিকা, মাসলামা আল মজরিতীর গ্রন্থ 'রুতবাতুল হাকিম', আত্তুগরাই, আল মুগায়রিবী রচিত একটি অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা এবং অনুরূপ অন্যান্য রচনা। কিন্তু দীর্ঘকাল চেষ্টা করেও তার এগুলোর উপর আধিপত্য লাভ করতে পারছে না।

এ প্রসঙ্গে আমি একদিন আন্দালুসের উস্তাদশ্রেষ্ঠ আমাদের শিক্ষাগুরু আবুল বরাকাত আত্তালফিফিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং এ বিষয়ে কতিপয় রচনার সন্ধানও তাঁকে দিয়েছিলাম। তিনি দীর্ঘ সময় এগুলো পরীক্ষা করে দেখার পর আমাকে ফেরত দিয়ে বলেছেন, আমি এ বিষয়ে দায়িত্ব নিতে পারি যে, এ উদ্দেশ্যে অনুসন্ধানকারী একমাত্র নৈরাশ্য নিয়েই তার ঘরে ফিরবে।

তাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে, যারা একমাত্র জালিয়াতির মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখে। কখনও এটা প্রকাশ্যে হয়; যেমন রৌপ্যকে স্বর্ণের আবরণে ও তাম্রকে রৌপ্যের আবরণে আচ্ছাদিত করা অথবা তাদেরকে এক, দুই ও তিন ভাগ পরিমাণ মিশিয়ে কোনো একটিতে রূপান্তরিত করা। আবার কখনও এটা গোপনে হয়; যেমন শিল্প-প্রক্রিয়ায় একটিকে অন্যটির অনুরূপ করে সজ্জিত করা। যেমন পারদের ঊর্ধ্বপাতনের দ্বারা তাম্রকে শুভ্রকোমল করে তোলা। ফলে তা এমন একটি খনিজ পদার্থে রূপান্তরিত হবে, যা রৌপ্যের অনুরূপ। একমাত্র ধাতববিশারদ ছাড়া অন্যের পক্ষে তার স্বরূপ উদঘাটন সম্ভব নয়। কাজেই এরূপ জালিয়াতরা তাদের জালিয়াতির দ্বারা এমন

মুদ্রা প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়, যার উপর শাসকবর্গের সীলমোহর প্রয়োগ করে তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে চালু করে এবং তাদেরকে বিশুদ্ধ মুদ্রা বলে ধোকা দেয়। বস্তুত এরা পেশার দিক থেকে সর্বনিকৃষ্ট এবং পরিণামের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা মন্দ ব্যক্তি। কারণ এরা মানুষের সম্পদ অপহরণের সাথে তাদের এ পেশাকে ঘুলিয়ে ফেলেছে। কেননা এ জালিয়াতরা রূপা বলতে তামা ও সোনা বলতে একমাত্র রূপা দিয়ে তার পরিবর্তে খাঁটি ধাতব মুদ্রা গ্রহণ করে। ফলে এরা শুধু চোর নয়, চোর থেকেও মন্দতর।

বর্তমানকালে মাগরিবে এ শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই বারবার বিদ্যার্থী; তারা এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে নির্বোধ লোকদের বাসস্থানে ঘুরে বেড়ায়। তারা প্রান্তরের মসজিদগুলোতে আশ্রয় নেয় এবং সেখানকার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছে এরূপ ভাণ করে যে, তাদের কাছে স্বর্ণ-রৌপ্য তৈরির শিল্পজ্ঞান রয়েছে। বস্তুত মানুষ এ দুটি ধাতব পদার্থ সম্পর্কে লালসার অধীন এবং তা লাভ করার জন্য তাদের সম্পদ বিনষ্ট করতে বদ্ধপরিকর। ফলে এসব বিদ্যার্থী এর দ্বারা তাদের জীবিকা অর্জন করতে সমর্থ হয়। তারপর তারা ঐসব ব্যক্তির সন্নিধানে থেকে ভীতি ও প্রহরার মধ্যে কাজ চালিয়ে যায়। পরিণামে তাদের অক্ষমতা প্রকাশ পেয়ে তারা অপমানিত হয়। তখন পুনরায় নতুন স্থানের সন্ধানে তারা বের হয়ে পড়ে এবং সংসারলোভীদের মধ্যে সম্পদ লাভের যে লালসা বিদ্যমান, তার সাহায্যে তাদের প্রতারণার জাল নতুনভাবে বিস্তার করে। এভাবেই তারা সর্বদা জীবিকা অন্বেষণ করে থাকে।

এ শ্রেণীর লোকদের সাথে আলোচনা করার কিছুই নেই। কারণ তারা মূর্খতা, অন্যায্যতা ও চৌর্যবৃত্তির চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। এদের এ রোগ দূর করার একমাত্র পন্থা হল প্রশাসনিক কঠোরতা এবং যথাস্থান থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা ও তাদের অবস্থার বহিঃপ্রকাশ অনুসারে তাদের হাত কেটে ফেলা। কারণ এদের এরূপ তৎপরতায় সেই মুদ্রামানের বিকৃতি ঘটে, যা সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য ক্ষতিকর। কেননা এ মুদ্রা সর্বসাধারণ মানুষের সম্পদের ভিত্তি। শাসকের উপর তার বিশুদ্ধতা রক্ষা, তার জন্য সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তার বিকৃতিসাধকদের উপর কঠোরতা প্রদর্শন করার দায়িত্ব রয়েছে।

অবশ্য যারা এ শাস্ত্রকে চর্চার জন্য গ্রহণ করেছেন ও অনুরূপ জালিয়াতির সাথে যাদের কোনো সংস্রব নেই; বরং যারা এটা থেকে দূরে সরে থেকে মুসলমানদের সম্পদ ও মুদ্রা বিনষ্ট করা থেকে নিজেদরকে পবিত্র রেখেছেন এবং যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নিজেদের সংগৃহীত 'একসির' ও ঔষধির দ্বারা রৌপ্যকে স্বর্ণে ও তাম্র, সীসা, টিন ইত্যাদিকে রৌপ্যে পরিণত করা; তাদের সাথে আমাদের একমাত্র আলোচনা ও বিতর্কের বিষয় হল তাদের এ সম্পর্কীয় উপলব্ধির উৎস নিয়ে। কারণ তাদের অনুরূপ তৎপরতা সত্ত্বেও আমরা জানি যে, এ শাস্ত্রবিদদের কারো জন্য তার উদ্দেশ্য পূর্ণ এবং কামনা সিদ্ধ হয়নি। তাদের জীবন একমাত্র এ প্রচেষ্টা, মুষল ও মুদগর ব্যবহার, ঊর্ধ্বপাতন, উত্তাপন এবং বিপদের ঝুঁকি নিয়ে জড়িবটী সংগ্রহ ও তাদের আলোচনাতে কেটেছে। তারা এ প্রসঙ্গে অপরের কীর্তি-কাহিনী বর্ণনা করেন; এমন অনেক ব্যক্তির কথা যাদের জীবনে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে এবং যাদের অনুরূপ কিছু প্রাপ্তি ঘটেছে। এসব কথা শুনে তারা তৃপ্ত

হন এবং আরও বেশি করে তাতে মনোনিবেশ করেন। এ ব্যাপারে তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় না; এটা যেন বিচিত্র কাহিনীর মায়াজালে আবদ্ধ হতবুদ্ধি মানুষের অবস্থা। তাদেরকে এসব বিষয়ের যথার্থতা সম্পর্কে চাক্ষুষ প্রমাণের কথা বললে তারা অস্বীকার করে এবং বিনা দ্বিধায় বলে, আমরা দেখিনি, শুনেছি মাত্র। প্রত্যেক যুগ ও পুরুষানুক্রমে এটাই তাদের অবস্থা!

পাঠক, জেনে রাখুন, এ শিল্পের চর্চা পৃথিবীতে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। পূর্বসূরি ও উত্তরসূরিদের অনেকেই এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আমরা এ প্রসঙ্গে তাদের মতামত উদ্ধৃত করব এবং তারপর তাদের অন্তর্নিহিত সত্তার যথার্থতা সম্পর্কে যা প্রকাশ পাবে, তা অনুসরণ করতে চেষ্টা করব। সুতরাং আমরা বলি যে, দার্শনিকদের কাছে এ শিল্পের আলোচনার ভিত্তি হল সাতটি ঘাতসহ ধাতব পদার্থের অবস্থা; এরা স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, টিন, তাম্র, লৌহ ও 'খারসিন'। এরা কি এদের বৈশিষ্ট্যসহ বিভিন্ন ও এদের বিশিষ্ট উপাদানসহ স্বয়ম্ভর অথবা এরা একটি ধাতবগোষ্ঠীর অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও এদের অবস্থা বৈগুণ্যের জন্য বৈচিত্র্যের অধিকারী? এ প্রসঙ্গে আবু নসর ফারাবী ও তাঁর অনুসারী আন্দালুসীয় দার্শনিকরা যে মত গ্রহণ করেছেন, তা হল এই যে, এরা একই ধাতব প্রজাতির অধীন এবং একমাত্র অবস্থা বৈগুণ্যেই এদের মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। এ পার্থক্যের মূলে রয়েছে আর্দ্রতা, শুষ্কতা, কোমলতা, কাঠিন্য এবং পীত, শুভ্র, কৃষ্ণ ইত্যাদি বর্ণের বৈচিত্র্য। মূলত একই প্রজাতির প্রকারভেদ মাত্র। অন্যদিকে ইবনে সিনা ও তার অনুসারী পূর্বাঞ্চলীয় দার্শনিকরা এ বিষয়ে যে মত প্রকাশ করেছেন, তা হল এই যে, এরা এদের বৈশিষ্ট্যসহ-ই বিভিন্ন এবং বিচিত্র প্রজাতি মাত্র। এদের প্রতিটি স্বয়ম্ভর ও নিজ নিজ তাৎপর্যসহ অস্তিত্ববান এবং এদের প্রতিটির জন্যই অন্যান্য প্রজাতির ন্যায় গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

ফারাবী তার নিজস্ব মত, সামগ্রিক ঐক্যের উপর ভিত্তি করেই এদের একটির অপরটিতে রূপান্তরিত হওয়ার মত প্রকাশ করেছেন। কেননা এদের গঠনগত উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব এবং শিল্প-কৌশলের মাধ্যমে অনুরূপ সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে। এদিক থেকেই কিমিয়াশাস্ত্র তাঁর কাছে সম্ভাব্য বাস্তবতা ও সহজ উৎসের অধিকারী। অন্যদিকে ইবনে সিনা তাঁর নিজস্ব মত, এদের প্রজাতিগত বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে এ শিল্পের সম্ভাব্যতা অস্বীকার এবং তার অস্তিত্ব অসম্ভব বলে মনে করেছেন। কারণ কোনো প্রকার শিল্পকৌশলের দ্বারা বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। তা একমাত্র বস্তুপুঞ্জের স্রষ্টার দ্বারাই সৃষ্টি হয়ে থাকে; অর্থাৎ তার নির্ধারণকারী সেই মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্। তদুপরি এসব বৈশিষ্ট্য তাৎপর্যের দিক থেকে ধারণার ক্ষেত্রে অজ্ঞেয়। সুতরাং কোনো প্রকার শিল্পের দ্বারা তাদের পরিবর্তন কী করে সম্ভব হতে পারে?

তুগরাই, এ শিল্পের একজন নেতৃস্থানীয় দার্শনিক। তিনি ইবনে সিনার উপরোক্ত বক্তব্যের ভ্রান্তি প্রমাণ করে বলেছেন, শিল্প-কৌশলের এ প্রচেষ্টার দ্বারা এদের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি ও তার অভিনবত্ব উদ্দেশ্য নয়; বরং এটা শুধুমাত্র বস্তুকে তার বৈশিষ্ট্য গ্রহণে প্রস্তুত করা। বস্তুত এ বৈশিষ্ট্য বস্তুর স্রষ্টা ও উদ্ভাবকের কাছ থেকে অনুরূপ প্রস্তুতির পরই

অস্তিত্বে আসে। যেমন দেহকে মসৃণ ও চাকচিক্যমণ্ডিত করার পর তা থেকে আলোক বিকীর্ণ হয়। এজন্যই সে সম্পর্কীয় ধারণা ও জ্ঞান অর্জন করার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই।

তুগরাই বলেছেন, আমরা কোনরূপ বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান ছাড়াই কতিপয় প্রাণীর জন্মের কথা জানতে পেরেছি। যেমন মাটি ও আবর্জনা থেকে বৃশ্চিক এবং চুল থেকে সাপের জন্ম হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে কৃষিবিশারদরা যেমন বর্ণনা করেছেন যে, মধুমক্ষিকা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলে গোবৎসাদি থেকে এর জন্ম সম্ভব হয়। যেমন বিভক্ত ক্ষুরবিশিষ্ট জন্তুর শৃঙ্গ থেকে খাগড়ার উদ্ভব এবং অনুরূপ শৃঙ্গাদি রোপণের জন্য ভূমি প্রস্তুত করে তাতে মধুপূর্ণ করলে তা ইক্ষুতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং আমাদের জন্য অনুরূপভাবে স্বর্ণ-রৌপ্যের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে বাধা কোথায়![৩৪৬] সেখানে বস্তুসত্তাকে গ্রহণ করে কৌশলের মাধ্যমে তাতে অবস্থিত প্রাথমিক যোগ্যতাতেই স্বর্ণ-রৌপ্যের আকৃতি ধারণের দিকে পরিচালিত করতে হবে। তারপর ঔষধি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তার মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে, যাতে সে তার বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে।

তুগরাই-এর বক্তব্যের মর্মার্থমূলক উদ্ধৃতির এখানেই ইতি। তিনি ইবনে সিনার প্রতিবাদে যা বর্ণনা করেছেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু আমাদের জন্য এ শিল্পচর্চাকারীদের প্রতিবাদ করার উৎস সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার দ্বারা শুধু তুগরাই বা ইবনে সিনা নয়; বরং এ শিল্পের অস্তিত্বের অসম্ভাব্যতাসহ সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার মতামতই অসার বলে প্রতিপন্ন হবে।

তা এই যে, তাদের কৌশলের নির্গলিতার্থ হল তারা প্রাথমিক যোগ্যতাসহ একটি বস্তুসত্তা সম্পর্কে অবগত হবার পর তাকে প্রক্রিয়াজাত করেন এবং তার উপর সমুদয় প্রচেষ্টা ও কৌশল প্রয়োগ করে তাকে খনিজ ধাতব পদার্থের সৃজনধারার অনুসারী করেন; ফলে তা স্বর্ণ বা রৌপ্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে তারা শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে খনিতে ধাতু সৃষ্টির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে স্বল্প সময়ে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন মাত্র। কারণ যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, কর্তার শক্তি বৃদ্ধিতে ক্রিয়া স্বল্প সময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অবশ্য এটাও প্রকাশিত হয়েছে যে, স্বর্ণখনিতে স্বর্ণের জন্ম হতে একটি বৃহৎ সূর্যাবর্তন তথা এক সহস্র আশি বছরের প্রয়োজন হয়। সুতরাং কৌশলের মধ্য দিয়ে যদি শক্তি বৃদ্ধি ও অবস্থার সৃষ্টি করা যায়, তাহলে আমাদের পূর্ব বক্তব্য অনুসারে উক্ত সময়ের পরিমাণ অবশ্যই কমে আসবে। অথবা শাস্ত্রবিদরা তাদের কৌশলের মাধ্যমে বস্তুসত্তার জন্য এমন একটি মিশ্র আকৃতির জন্ম দিবেন যা তাকে খামিরের ন্যায় সম্ভাবনাময় করে তুলবে। ফলে তার অন্তর্নিহীত শক্তিই কৌশলগত বস্তুর মধ্যে রূপান্তরকরণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। এটাই পূর্ববর্ণিত 'একসির'।

পাঠক, জেনে রাখুন, প্রতিটি উপাদানগত সৃজ্যমান বস্তুর মধ্যে তারতম্যানুসারে চারটি মৌল উপাদানের একত্র হওয়া প্রয়োজন। কারণ তারা যদি সমপরিমাণে অবস্থান করে, তাহলে মিশ্রণ কখনও সম্পূর্ণ হবে না। সুতরাং তাদের মধ্যে যে-কোন একটি অংশের সমগ্রের উপর প্রভাবশীল হতে হবে। অন্যদিকে প্রতিটি মিশ্রিত সৃজ্যমান বস্তুর

৩৪৬. রোজেনথালে স্বর্ণ-রৌপ্যের পরিবর্তে খনিজ পদার্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মধ্যে স্বাভাবিক উত্তাপ থাকা অত্যাবশ্যকীয়; বস্তুত তা-ই উক্ত বস্তুর সম্ভাবনার কর্মী ও তার আকৃতির রক্ষী। তারপর সময়ের মধ্যে সৃজ্যমান প্রতিটি বস্তুর জন্য বিভিন্ন পর্যায়ক্রম থাকা প্রয়োজনীয় এবং সময় পরিধিতে তা এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে অতিক্রম করবে ও এভাবে তা চরম পর্যায়ে উপনীত হবে। পাঠক, মানুষের ক্ষেত্রে এ পর্যায়ক্রমের দিকে লক্ষ করুন। তা বীর্য, জমাট রক্ত, মাসংপিণ্ড, আকৃতি, ভ্রূণ, নবজাত, দুগ্ধপোষ্য ইত্যাদি হয়ে কীভাবে চরম সীমায় পৌঁছে? এর প্রতিটি পর্যায়ের অংশগত তারতম্য তাদের পরিমাণ ও অবস্থার দিক থেকে বিচিত্র। অন্যথায় এর প্রথম ও শেষ পর্যায়ের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য থাকত না। অনুরূপভাবে স্বাভাবিক উত্তাপও এর পর্যায়ানুক্রমে বিভিন্নতার অধিকারী। তারপর, পাঠক, আপনি স্বর্ণের ব্যাপারে তার খনিজ জীবনে এক সহস্র আশি বছর ধরে যেসব পর্যায় অতিক্রম করে এবং যেসব অবস্থাগত পরিবর্তনের অধীন হয়, তার প্রতি লক্ষ করুন। সুতরাং একজন কিমিয়াশাস্ত্রবিদের জন্যও তার খনিজ সৃজন প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে তাঁর প্রচেষ্টা ও কৌশলের মাধ্যমে তাকে সম্পূর্ণতার দিকে আকর্ষণ করতে হবে।

শিল্পকর্মের একটি চিরকালীন শর্ত হল তার মাধ্যমে যে উদ্দেশ্য সাধন করা হবে, তার ধারণা করা। দার্শনিকদের মধ্যে এ প্রবাদটি অত্যন্ত সুপ্রচলিত যে, 'ক্রিয়ায় প্রারম্ভ চিন্তার শেষ এবং চিন্তার শেষ ক্রিয়ার প্রারম্ভ।' সুতরাং স্বর্ণের জন্যও তার প্রতিটি পর্যায়ের বিচিত্র অবস্থা ও বিভিন্ন অনুপাতের কথা ধারণা করে নিতে হবে এবং এ সঙ্গে তার স্বাভাবিক উত্তাপের পরিবর্তন ও পর্যায়গত সময়ের পরিধিও জেনে নেওয়া দরকার। এ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার স্থানে কী পরিমাণ অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ করলে তা গুণে ও ক্রিয়ায় খনির প্রকৃতিদত্ত শক্তির স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে অথবা তার মধ্যকার কিছু উপাদানে এমন একটি মিশ্রিত আকৃতির সৃষ্টি হবে; যেমন রুটির জন্য খামিরের মধ্যে হয়ে থাকে। তা-ই এ সৃজ্যমান বস্তুর মধ্যে তার শক্তি ও পরিমাণ অনুসারে ক্রিয়াশীল হবে। এটা এমন সব ব্যাপারকে একমাত্র একটি ব্যাপক জ্ঞানই আয়ত্তে আনতে পারে এবং বাস্তবিকপক্ষে মানবিক জ্ঞানের পরিধি তাকে বেষ্টন করতে অক্ষম। সুতরাং যারা এ শিল্প-কৌশলের দ্বারা স্বর্ণ উৎপাদনের দাবি করে থাকেন, প্রকৃতপক্ষে তাদের এ দাবি শিল্প-কৌশলের দ্বারা হতে মানুষ উৎপাদনের দাবির সমতুল্য। যদি আমরা মেনে নিই যে, কোনো ব্যক্তি এ জন্মপ্রক্রিয়ার সমুদয় অংশ, অনুপাত, পর্যায়, জরায়ুতে ভ্রূণের সৃষ্টিধারা ইত্যাদি এমন ব্যাপকভাবে জানতে সমর্থ হয়েছে যে, তার জ্ঞানের পরিধির বাইরে কোনো কিছু অবশিষ্ট থাকেনি, তাহলে আমরা তার জন্য এরূপ মানুষ সৃষ্টির কথাও মেনে নিতে পারি। কিন্তু কোথায় এরূপ ব্যাপক জ্ঞান!

আমরা এখানে উপরোক্ত প্রমাণের একটি সংক্ষিপ্ত-সার উপস্থিত করতে চাই, যাতে তা হৃদয়ঙ্গম করতে সহজ হয়। আমরা বলব, কিমিয়াশাস্ত্রের ফলশ্রুতি ও তার প্রতিক্রিয়াগত কৌশলের মাধ্যমে দার্শনিকগণ যে বিষয়টি দাবি করেছেন, তা হল এই যে, ধাতব পদার্থের প্রকৃতিদত্ত গঠন প্রক্রিয়াকে শিল্প-কৌশলের দ্বারা অনুসরণ করা এবং তাকে প্রকৃতির সমতুল্য করে তোলা। যাতে তা দিয়ে ধাতব পদার্থ সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয় অথবা শক্তি, ক্রিয়া ও আকৃতিসহ এমন একটি মিশ্রণের আবির্ভাব ঘটে, যা বস্তুর মধ্যে

ক্রিয়াশীল হয়ে তাকে তার নিজস্ব আকৃতিতে রূপান্তরিত করতে পারে। এক্ষেত্রে শিল্প-কৌশলের এ প্রক্রিয়াকে অবশ্যই ধাতব প্রকৃতির বিচিত্র অবস্থার অনুসরণ করতে হবে, যাতে তার সাথে সামঞ্জস্য বিধান ও সমতুল্য হওয়ার বিষয়টি সম্ভব হয়। অথবা এমন কোনো বস্তু উপাদান, যা সক্রিয় শক্তি বহন করছে। এসব কিছুর জন্য যে পর্যায়ক্রমিক ও বিস্তারিত ধারণা সৃষ্টি করা প্রয়োজন, তার অবস্থা বৈচিত্র্য সীমাহীন। মানুষের জ্ঞান তাকে সামগ্রিকতায় আয়ত্ত করতে একান্তই অক্ষম। তা মানুষ, প্রাণী অথবা উদ্ভিদ সৃষ্টিরই সমতুল্য।

এটাই এ প্রমাণের নির্গলিতার্থ এবং আমার জ্ঞানমতে একান্তই অকাট্য। এ শাস্ত্রের অসম্ভাব্যতা, তা বৈশিষ্ট্যের জন্য নয় যেমন, পাঠক, আপনি দেখতে পেয়েছেন; এমন কি প্রকৃতির জন্যও নয়। তা একমাত্র ব্যাপক জ্ঞানের অভাব ও সে সম্পর্কীয় মানুষের অক্ষমতার জন্য। এ প্রসঙ্গে ইবনে সিনা যা বর্ণনা করেছেন, তা এ প্রমাণ থেকে বহুদূরে অবস্থিত। এ শাস্ত্রের অসম্ভাব্যতার অন্য একটি কারণ তার উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর বর্ণনা এই যে, স্বর্ণ-রৌপ্য সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বিচক্ষণ কৌশল ও তাদের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য তারা মানুষের উপার্জনের স্থির লক্ষ্য এবং তাদের সম্পদের নিদর্শন হতে পেরেছে। সুতরাং এগুলো যদি শিল্প-কৌশলের দ্বারা সুলভ হয়ে ওঠে, তাহলে এ সম্পর্কীয় আল্লাহ্‌র বিচক্ষণ নীতি অসার বলে প্রতিপন্ন হবে এবং তাদের প্রাচুর্যের ফলে কেউ কোনো কিছুর বিনিময়ে উক্ত দুটি ধাতব পদার্থ সঞ্চয় করতে চাইবে না। তার অসম্ভাব্যতার আরও একটি কারণ রয়েছে। এটা এই যে, প্রকৃতি কখনই তার ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নিকটতম পন্থা ত্যাগ করে জটিল ও দূরতম পন্থা গ্রহণ করে না। সুতরাং তাদের ধারণা অনুসারে এ শিল্প-কৌশলের পন্থাই যদি বিশুদ্ধ, খনিজ প্রাকৃতির প্রক্রিয়া অপেক্ষা নিকটতর এবং সময়ের দিক থেকে স্বল্পতর হত, তাহলে প্রকৃতি তা ত্যাগ করে স্বর্ণ-রৌপ্যের সৃষ্টি ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রে তার নিজস্ব পন্থা অনুসরণ করত না।

অবশ্য এ প্রসঙ্গে তুগরাই বিভিন্ন একক বস্তুসত্তা থেকে প্রকৃতির প্রচেষ্টাগত উদ্ভাবনের যে উদাহরণ দিয়েছেন; যেমন—বৃশ্চিক, মধুমক্ষিকা, সর্প ইত্যাদির সৃষ্টি; তা তাঁর ধারা ও অভিজ্ঞতার পরিধি অনুসারে হয়ত সত্য হতে পারে; কিন্তু কিমিয়াশাস্ত্রের ক্ষেত্রে তার চর্চাকারীদের মধ্যে কেউ একথা বলেননি যে, তিনি অনুরূপ কিছুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, কিংবা তার পথের সন্ধান পেয়েছেন। বরং তার চর্চাকারীরা এ পর্যন্ত কানা উটনীর ন্যায় শুধু হাতড়িয়ে ফিরছেন। কেবল কিছুসংখ্যক মিথ্যা কাহিনীই তাদের প্রাপ্য হয়েছে। যদি এ বিষয়টি তাদের মধ্যে একজনের বেলাতেও সত্য হত, তা হলে তার সন্তান-সন্ততি, শিষ্যবর্গ ও সঙ্গীরা তা অবশ্যই সংরক্ষণ করত এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে তা প্রসার লাভ করত। ফলে তার পরে অন্যান্যদের ক্রিয়া-পদ্ধতির বিশুদ্ধতা সেই প্রাপ্তির দায়িত্ব বহন করত এবং কালক্রমে তা আমাদের কাছে অথবা অন্যদের কাছে এসে উপনীত হত।

তাদের সেই বক্তব্য, একসির বলতে গেলে খামিরেরই সমতুল্য; তা এমন একটি মিশ্র উপাদান, যা তার অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যকে স্বরূপে বাস্তবায়িত করে। পাঠক, জেনে রাখুন, খামির যে গোলা ময়দাকে পরিবর্তিত করে পরিপাকের জন্য প্রস্তুত করে, তা

মূলত বিকৃতিসাধন মাত্র এবং বিকৃতি যে-কোনো বস্তুর জন্য অতিসহজ ব্যাপার; সামান্য ক্রিয়া ও প্রকৃতির চাপে তা সংঘটিত হয়ে থাকে। অথচ একসির প্রয়োগের উদ্দেশ্য হল ধাতুকে তার উন্নত ও শ্রেষ্ঠরূপে পরিবর্তিত করা। বস্তুত তা সৃষ্টি ও সংশোধন এবং সৃষ্টি সর্বদাই ধ্বংস অপেক্ষা কঠিন। সুতরাং একসিরকে খামিরের সাথে অনুমান করা যায় না।

এ প্রসঙ্গে যথার্থ বক্তব্য হল এই যে, জাবের ইবনে হাইয়্যান, মাসলামা আল মজরিতী ও তাঁদের ন্যায় অন্যান্য দার্শনিক, যারা এ শাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তাঁদের ধারণা অনুসারে যদি এ শাস্ত্রের অস্তিত্ব শুদ্ধ হয় তা হলেও তা প্রাকৃতিক শিল্পের অন্তর্গত নয় এবং কোনো প্রকার শিল্প-কৌশল দ্বারা তা সম্পন্ন হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে তাদের আলোচনাও প্রকৃতিবিজ্ঞানের ধারা অনুসারী নয়; বরং তারা যাদু ও অস্বাভাবিক ব্যাপার সম্পর্কীয় ধারা অনুসরণ করেই এর আলোচনায় লিপ্ত হয়েছেন। এটা তাই, যা হাল্লাজ ও অন্যান্যদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। মাসলামা তাঁর 'গায়াত' গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণনাই উপস্থিত করেছেন। তাঁর 'রুতবাতুল হাকিম' গ্রন্থের আলোচনাও এ ধারাবাহী। জাবের তাঁর পুস্তিকাগুলোতেও এ ধারারই অনুসরণ করেছেন। তাদের এরূপ আলোচনা সকলের কাছেই সুপরিচিত; সুতরাং তাদের ব্যাখ্যা উপস্থিত করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না।

মোটামুটিভাবে এ বিষয়টি তাদের কাছে সেসব সার্বিক বস্তুসত্তার অন্তর্গত, যা শিল্পকর্মের আওতার বাইরে অবস্থান করে। এ কারণেই অনুরূপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেমন এক দিনে বা এক মাসে কোনো বৃক্ষ ও প্রাণী সৃষ্টি করা যায় না, তেমনি স্বর্ণের উপাদান থেকেও এক দিনে বা এক মাসে স্বর্ণ তৈরি করা সম্ভব নয়। বস্তুত তাদের প্রাকৃতিক গঠনপ্রক্রিয়া একমাত্র এমন কিছুর দ্বারাই পরিবর্তন করা সম্ভব, যা প্রকৃতির ও শিল্পের কৃৎ-কৌশল বহির্ভূত। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কিমিয়াশাস্ত্রকে শিল্পকর্ম হিসেবে গ্রহণ করে, সে তার সম্পদ ও শক্তি বিনাশ করে মাত্র। এজন্যই এরূপ শিল্প প্রচেষ্টাকে নিষ্ফল প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করা হয়। কারণ তার দ্বারা যদি অভীষ্ট লাভ ঘটেও, তা হলেও তা প্রকৃতি ও শিল্প প্রক্রিয়ার বহির্ভূত কোনো কারণেই ঘটবে। যেমন—জলের উপর হাঁটা, বায়ুতে ভাসমান হওয়া, নিরেট বস্তুতে প্রবেশ করা এবং অনুরূপ অন্যান্য ঘটনা, যা স্বভাবের বিরোধী হয়ে পুণ্যাত্মাদের বিভূতি হিসেবে প্রকাশ পায়। অথবা যেমন পাখি সৃষ্টি ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয় নবীদের অলৌকিক ক্রিয়া হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'তুমি যখন মৃত্তিকা থেকে আমার নির্দেশে একটি পাখির মূর্তি প্রস্তুত করলে; তারপর তাতে ফুৎকার দিলে, তখন তা আমার নির্দেশেই পাখি হয়ে উঠল'।[৩৪৭] এমন কাজ সহজ হওয়ার ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অবস্থার উপর নির্ভরশীল। অনেক সময় তা এমন যোগ্য ব্যক্তিকে অর্পণ করা হয়, যিনি অপরকে সেই ক্ষমতা দান করেন এবং এই অপর ব্যক্তি তা ধার হিসেবে ভোগ করে থাকেন। আবার অনেক সময় এমন যোগ্য ব্যক্তিকে দেওয়া হয়, যিনি দান করার ক্ষমতা রাখেন না; ফলে তা অন্যের হাতে কখনও সম্পূর্ণ হয় না।

---

৩৪৭. কোরান; ৩, ৪৯; ৫, ১১০।

এ দিক থেকে দেখতে গেলে এ শাস্ত্রের প্রক্রিয়াটি যাদুর পর্যায়ে পড়ে। বস্তুত ইতিপূর্বে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, তা একমাত্র আত্মিক প্রভাব ও স্বভাব বহির্ভূত প্রক্রিয়ার দ্বারা অলৌকিক ক্রিয়া, বিভূতি অথবা যাদুর আকারে সংঘটিত থাকে। এজন্য এ সম্পর্কে দার্শনিকদের সকলের আলোচনাই এমন রহস্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে যে, একমাত্র যাদুবিদ্যার উপর যার ব্যাপক দখল আছে এবং যিনি বস্তুজগতের উপর আত্মিক প্রভাবের বিষয়টি ভালো করে জানেন, তার পক্ষেই তার তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব। অস্বাভাবিক ঘটনাবলির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই; কারও পক্ষেই তাকে অর্জন করার ইচ্ছা স্বাভাবিক নয়। বস্তুত 'আল্লাহ্, তাদের সব ক্রিয়া-কর্মকে বেষ্টন করে আছেন।'

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে বিষয়টি এ শিল্পকর্ম অনুসন্ধান ও তাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, তা হলে, যেমন আমরা পূর্বেও বলেছি, স্বাভাবিক উপায়ে জীবিকা অর্জনের অক্ষমতা এবং কৃষি, ব্যবসায় ও শিল্পের ন্যায় স্বাভাবিক পন্থা ত্যাগ করে ভিন্ন পন্থায় জীবিকার অন্বেষণ করা। সুতরাং এই রূপে অক্ষম ব্যক্তিরাই জীবিকার জন্য এ কঠিন পথে পদচারণা করে এবং কিমিয়া ও অন্যবিধ উপায়ে হঠাৎ অগাধ সম্পদের অধিকারী হবার আশায় ঘুরে বেড়ায়। মানব সমাজে নিঃস্বরাই অধিকাংশ হারে এ বৃত্তি গ্রহণ করে থাকে। মানুষ এ প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলে; এমন কি এ সম্পর্কে তাদের অস্বীকৃতি ও অসম্ভাব্যতার ধারণা থেকে শাস্ত্রবিদ দার্শনিকদেরকেও রেহাই দেয় না। এরই ফলে দেখা যায়, এ শাস্ত্রের অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে মত পোষণকারী ইবনে সিনা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত মন্ত্রী এবং ধনাঢ্য ও সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি। অপর দিকে তার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে মত প্রকাশকারী ফারাবী ছিলেন সেই সম্পদহীন লোকদের একজন, যারা কোনো প্রকারেই জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে ও তার কার্যকারণ অনুসন্ধানে সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। বস্তুত যারা এ শাস্ত্র সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন, এ মন্তব্য তাদের উপর সম্পদ লালসার প্রকাশ্য দোষারোপ মাত্র। 'আল্লাহ্ই খাদ্যদাতা—পরম ক্ষমতার অধিকারী।'[৩৪৮] তিনি ছাড়া অন্য প্রতিপালক নেই।

---

৩৪৮. কোরান; ৫১, ৫৮।

চতুর্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[শাস্ত্র সম্পর্কীয় গ্রন্থাদির আধিক্য জ্ঞানার্জনের পথে বাধাস্বরূপ][৩৪৯]

পাঠক, জেনে রাখুন, জ্ঞানার্জন ও তার উদ্দেশ্য অবগতির ক্ষেত্রে মানুষের জন্য সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর বিষয় হল, অত্যধিক গ্রন্থ, শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিভাষার বৈচিত্র্য ও শিক্ষা-পদ্ধতির বিভিন্নতা এবং তারপর শিক্ষার্থী ও শিষ্যকে সেসব উপস্থাপনে বাধ্য করা। বস্তুত অনুরূপ কিছু করার পরই তার জ্ঞানার্জনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষার্থীকে এসব অথবা তার অধিকাংশ বিষয় স্মরণ রাখতে হয় এবং তাদের বিচিত্র পন্থা সম্পর্কে অবহিত হতে হয়। এক্ষেত্রে যদি সে একটিমাত্র বিষয় নিয়েও সাধনা করে, তবুও, যে পরিমাণ গ্রন্থ উক্ত বিষয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা শেষ করতে তার জীবনকালও যথেষ্ট নয়। সুতরাং তার মধ্যে ত্রুটি দেখা দিতে বাধ্য এবং তার পক্ষে দক্ষতা অর্জন কিছুতেই সম্ভব নয়।

আমরা এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ মালেকী মজহাবের ফেকাহ্‌শাস্ত্রের উল্লেখ করতে পারি। এ সম্পর্কে বহুল পরিমাণ গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে : যেমন—উক্ত ফেকাহ্‌শাস্ত্রের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থাবলি; ইবনে ইউনুস, লুখামী ও ইবনে বশিরের গ্রন্থসমূহ; বিচিত্র টীকা, প্রস্তাবনা, বর্ণনা ও 'উতবিয়া' সম্পর্কীয় 'তাহসীল' গ্রন্থাদি এবং অনুরূপভাবে ইবনে হাজেবের গ্রন্থ ও সে সম্পর্কে লিখিত অন্যান্য গ্রন্থ। তারপর এদের মধ্যকার কায়রোয়ানী মতকে কার্ডোভায়ী, বাগদাদী ও মিশরীয় মত থেকে পৃথক করার প্রয়োজন রয়েছে এবং অনুরূপভাবে তাঁদের মত থেকে উত্তরসূরিদের মত পৃথক করা দরকার হয়। এভাবে বিষয় আয়ত্ত করার পরই শিক্ষার্থীর ধর্মীয় বিধান দানের মর্যাদা স্বীকৃত হয়ে থাকে। অথচ বলতে গেলে এ সম্পূর্ণ ব্যাপারটিই একটি বিষয়ের পৌনঃপুনিক উল্লেখ মাত্র এবং তাদের তাৎপর্য এক। শিক্ষার্থীকে তাদের সম্পূর্ণ বিষয় উপস্থাপন ও তাদের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয়ে বাধ্য করা হয়। এমন করে এই একটি বিষয়েই তাদের জীবন কেটে যায়।

যদি শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদেরকে মজহাবের সমস্যাদি শিক্ষার ব্যাপারের সীমাবদ্ধ রাখতেন, তাহলে বিষয়টি বহুল পরিমাণে স্বল্প, শিক্ষার দিক থেকে সহজ এবং উৎসের দিক থেকে নিকটবর্তী হত। কিন্তু তা এমন একটি রোগ, প্রতিষ্ঠিত অভ্যাসের জন্য তা দূর করা সম্ভব নয়। ফলে তা একটি স্বভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, যার স্থানান্তর ও পরিবর্তন করা যায় না।

---

৩৪৯. রোজেনথালে এ পরিচ্ছেদটি পরে এবং পরবর্তীটি এখানে বর্ণিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আরবি ভাষাতত্ত্বের কথাও দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করা যায়। এতে সিবুয়াইর গ্রন্থ ও তার উপর লিখিত অন্যান্য পুস্তকাবলি; বসরী, কুফী, বাগদাদী আন্দালুসী ও তার পরবর্তী অন্যান্যদের মতামত; পূর্বসূরি ও উত্তরসূরিদের মতামতের পার্থক্য; যেমন—ইবনে হাজেব, ইবনে মালেক এবং তাদের প্রসঙ্গে লিখিত অন্যান্য সব বিষয় রয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কাছে এসবের পাণ্ডিত্য দাবি করা হয়। ফলে এগুলো আয়ত্ত করতেই তাদের জীবনকাল অতিবাহিত হয়। তাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকের পক্ষেই তাদের চরম সীমায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। এরূপ একটি বিরল সার্থকতার নিদর্শন বর্তমানে মাগরিবে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। আরবি ভাষা-শিল্প সম্পর্কে এ রচনাটি ভাষাবিদদের অন্যতম মিশরবাসী ইবনে হিশামের। তাঁর আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, তিনি উক্ত শিল্পের চরম উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন। বস্তুত অনুরূপ দক্ষতা সিবুয়াই, ইবনে জিন্নী ও তাঁদের সমপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কেউ অর্জন করতে পারেন নি। উক্ত রচনায় তাঁর ব্যাপক দক্ষতা, এ শিল্পের মূলনীতি সম্পর্কীয় জ্ঞান, তার শাখা-প্রশাখা সম্পর্কীয় ধারণা এবং তাদের ব্যবহার প্রক্রিয়ার সুষ্ঠুতা প্রকাশ পেয়েছে। ফলে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, বিষয় গৌরব শুধু পূর্বসূরিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিশেষভাবে আমাদের পূর্ব কথিত বিচিত্র মজহাব, বিভিন্ন মত ও প্রচুর গ্রন্থ সত্ত্বেও এটা সম্ভব হয়েছে। বরং এটা 'আল্লাহ্‌র দয়া, তিনি যাকে ইচ্ছা অর্পণ করেন।'[৩৫০]

অবশ্য এরূপ দৃষ্টান্ত একান্তই বিরল। কিন্তু যা প্রকাশ্য বাস্তব, তা এই যে, যদি কোনো শিক্ষার্থী তার সম্পূর্ণ জীবনও উৎসর্গ করে, তবুও তার পক্ষে আরবি ভাষা সম্পর্কীয় সব বিষয় আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। অথচ এ ভাষাজ্ঞান বলতে গেলে তার জ্ঞানার্জনের মাধ্যমও একটি সহায়ক শক্তিমাত্র। অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে সে কী করে জ্ঞানার্জনের ফলাফল করবে? অবশ্য 'আল্লাহ্, যাকে ইচ্ছা সুপথ দেখান।'[৩৫১]

৩৫০. কোরান; ৫, ৫৪; ৫৭, ২১; ৬৪, ৪।
৩৫১. কোরান; ২, ১৪২।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[গ্রন্থ রচনার জন্য নির্ভরযোগ্য উদ্দেশ্যাবলি এবং তদতিরিক্ত পরিহার্য বিষয়সমূহ]

জেনে রাখুন, মানবিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার হল মানুষের জীবাত্মা। আল্লাহ্ তার মধ্যে উপলব্ধির যে শক্তি অর্পণ করছেন, তা-ই এ জীবাত্মায় চিন্তাশক্তির জন্ম দেয় এবং তা বিচিত্র তাৎপর্যের ধারণার মধ্য দিয়েই প্রথমে উদ্ভূত হয়। তারপর এ ধারণাই বহিরাগত স্বরূপকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অথবা দূরীভূত করে দ্বিতীয় স্তরে উক্ত চিন্তাকে প্রসারিত করে। এ সম্প্রসারণ কোনো প্রকার মাধ্যম অথবা মাধ্যম ছাড়াই চলতে থাকে, যতক্ষণ না চিন্তাশক্তি অনুরূপ গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে আপন উদ্দেশে উপনীত হয়।

এভাবে হৃদয়ের মধ্যে যখন একটি জ্ঞানের আকৃতি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তখন তা অবশ্যই অপরের কাছে বর্ণনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এ বর্ণনা কখনও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে আবার কখনও মতামত বিনিময়ের জন্য প্রকাশিত হয় এবং এভাবেই চিন্তাশক্তি তার বিশুদ্ধতা অর্জন করে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

এ বর্ণনা একমাত্র কথনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। এ কথন সে মিশ্রবাক্যের সমষ্টি, যাকে আল্লাহ্ জিহ্বার মধ্যে বিচিত্র বর্ণের মিশ্রণে সৃষ্টি করে থাকেন। বস্তুত এসব বাক্য আলজিহ্বা ও জিহ্বার আঘাতে বিচ্ছিন্ন বিচিত্র ধ্বনির স্বরূপমাত্র এবং এর মাধ্যমেই কথোপকথনকারীরা পরস্পরের কাছে তাদের মনোভাব প্রকাশ করে। মনোভাব প্রকাশের এটাই প্রথম পর্যায়; যদিও এর বৃহৎ ও মহৎ দান হল জ্ঞান-বিজ্ঞান। কারণ এ পর্যায়টিই সাধারণভাবে অন্তরে বিন্যস্ত জ্ঞান ও ইচ্ছাকে ধারণ করে থাকে।

বর্ণনার এ প্রথম পর্যায়ের পরে মনোভাব প্রকাশের একটি দ্বিতীয় পর্যায় রয়েছে। যে সব ব্যক্তি সশরীরে অনুপস্থিত, দূরে কোথাও চলে গেছে, যারা এখনও আসেনি অথবা সমসাময়িকতা ও সাক্ষাৎ দর্শন যাদের সাথে হয়নি; এ পর্যায়টি তাদের জন্যই নির্ধারিত এবং তার বর্ণনাও লিপির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ লিপির বিষয়টি হাত দিয়ে সংঘটিত এমন এক অঙ্কনপ্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার রেখা ও আকৃতি প্রচলন অনুসারে বর্ণ, শব্দ নির্বিশেষে উচ্চারিত ধ্বনিসমূহের কথাই আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে এরূপ বর্ণনা মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে কথোপকথনের সমতুল্য হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই দ্বিতীয় পর্যায়ে এটা একক বলে এটাকে 'বর্ণনা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা এটা মানুষের অন্তর্জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তত্ত্ব-তাত্ত্বিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। বস্তুত এ লিপির মাধ্যমেই শাস্ত্রবিশারদরা তাঁদের অন্তরে সঞ্চিত

ভাবরাশিকে অনাগত অদৃশ্য মানব সমাজের কল্যাণের জন্য গ্রন্থের পৃষ্ঠায় গচ্ছিত রাখেন। তাঁরাই আমাদের কাছে গ্রন্থকার নামে পরিচিত।

গ্রন্থ রচনার এ ধারা মানব সমাজের সর্বত্র বহুল পরিমাণে বিরাজিত। কাল ও পুরুষানুক্রমে তা আবর্তিত হয়েছে এবং ধর্ম, সম্প্রদায়, সাম্রাজ্য ও জাতির বিচিত্র সংবাদ বহন করে তার মতাদর্শও বিভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য দর্শনশাস্ত্রাদির মধ্যে এরূপ মতানৈক্যের অবকাশ নেই। কারণ তা একটি মাত্র ধারাতেই বিন্যস্ত। মানুষের চিন্তাশক্তি বস্তুজগতের যথার্থ স্বরূপ অনুধাবনে দৈহিক, আত্মিক, আকাশীয়, উপাদানগত, বিমূর্ত ও প্রমূর্ত তথা সর্বপ্রকারে একই ধারার অনুসারী। এ কারণেই এ বিষয়ে মতানৈক্য দেখা যায় না। ধর্মের ক্ষেত্রে মতানৈক্যের একমাত্র কারণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং অনুরূপভাবে সংবাদে বহিরঙ্গের দিক থেকে ইতিহাসেও মতদ্বৈধতা দেখা দেয়।

অতঃপর মানব সমাজের প্রচলন অনুসারে রেখা ও অঙ্কনের দিক থেকে লিপি বিভিন্ন প্রকারের। এটাকে 'কলম' ও 'খত' বলা হয়। এদের মধ্যে একটি হিমিয়ারী লিপি; তাকে 'মুসনাদ' নামে অভিহিত করা হয়। এটা প্রাচীন ইয়ামেনবাসী ও হিমিয়ারদের লিখন প্রণালি; এর সাথে পরবর্তী আরব মুজারী লিপির বিরোধ বিদ্যমান। যেমন তাদের ভাষার মধ্যেও অনুরূপ বিরোধ রয়েছে। অথচ এদের সবগুলোই আরবীয়। শুধু বর্ণনা ও উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যে এ আরবদের সাথে তাদের কোনো মিল নেই। তাদের উভয়ের বর্ণনা ধারা থেকে গৃহীত পৃথক পৃথক সাধারণ নীতিমালা বিদ্যমান। যারা বর্ণনার এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন না, তারা এ বিষয়ে অনেক সময় ভুল করে থাকেন।

এসব লিপির মধ্যে অন্য একটি হল সিরিয়ান লিপি। এটা নবতী ও কেলদানীয়দের লিখন প্রণালি। অনেক সময় অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তি এ ধারণা প্রকাশ করে যে, এটিই স্বাভাবিক লিপি; কেননা তারা প্রাচীনতম জাতি বিধায় তাদের লিপিও প্রাচীন। অবশ্য এ প্রকার ধারণার কোনো ভিত্তি নেই; সাধারণের মত মাত্র। কারণ সর্বপ্রকার নির্বাচিত কর্মপ্রণালিই স্বভাবের বহির্ভূত। একমাত্র তার প্রাচীনত্ব ও অনুশীলনের ধারাবাহিকতাই তাকে একটি সুদৃঢ় অভ্যাসে পরিণত করে এবং তদ্দর্শনে অনেকেই তাকে স্বাভাবিক বলে ভাবতে থাকে। যেমন বহু নির্বোধ প্রকৃতির লোক আরবি ভাষা সম্পর্কেও অনুরূপ ধারণা পোষণ করে। তারা বলে, আরবরা স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই নিজেদের মনোভাব প্রকাশ ও কথা বলতে শিখেছে। এরও কোনো ভিত্তি নেই।[৩৫২]

অন্য একটি লিপির নাম হিব্রু লিপি। এটা বনি ইসরাইলের বনি আবের ইবনে শালেহ ও অন্যান্যদের লিখন প্রণালি। অন্য একটির নাম ল্যাটিন লিপি। এটা রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ল্যাটিনিদের লিখনধারা। তাদের জন্য একটি বিশিষ্ট ভাষাও বিদ্যমান।

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির জন্যই তাদের প্রচলিত ধারা অনুসারে একটি লিপি বর্তমান; তাদের মধ্যেই তাদের বিশিষ্টতা এবং তাও তাদের সাথে বিশিষ্ট। যেমন—

৩৫২. অনুরূপ বর্ণনার জন্য পরে দ্র:।

তুর্কি, ফিরিঙ্গী, হিন্দী ও অন্যান্যরা। অবশ্য প্রথম উল্লেখিত তিনটি লিপিই সর্বাধিক জনপ্রিয়। তার মধ্যে সিরিয়ান লিপি তার প্রাচীনত্বের জন্য, যেমন পূর্বে বর্ণনা করেছি এবং আরবি হিব্রু যথাক্রমে তাদের মাধ্যমে কুরআন ও তৌরাত অবতীর্ণ হওয়ার জন্য। এ অবতরণে উক্ত লিপিদ্বয়ে সংশ্লিষ্ট ভাষাও ব্যবহৃত হয়েছে; যেন তারা উক্ত ভাষাদ্বয়েরই প্রতিনিধিত্ব করছে। এ কারণেই তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধানের বিষয়টি সর্বাগ্রে সংঘটিত হয় এবং তাদের বর্ণনার ধারাটি সুসংবদ্ধ আকারে স্থাপন করার জন্য নিয়ম-কানুন প্রস্তুত করা হয়। যাতে উক্ত ভাষাগত নিয়মাদির মাধ্যমে ঐশী বাণীর মধ্যকার অবশ্য পালনীয় শাস্ত্রীয় বিধান জেনে নেয়া সম্ভব হয়।

অন্যদিকে ল্যাটিনিরা রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। তারাই উক্ত ল্যাটিন ভাষা-ভাষী। তারা খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করলেন; যেহেতু উক্ত ধর্মমতের সমুদয় তৌরাত থেকে গৃহীত, যেমন এ গ্রন্থের প্রথম দিকে তার বর্ণনা গেছে; সুতরাং তারা উক্ত তৌরাত এবং ইসরাইলি নবীদের অন্যান্য গ্রন্থ তাদের ভাষায় অনুবাদ করে; যাতে ধর্মীয় বিধানাদি তারা সহজেই বুঝে নিতে পারে। এর ফলে তাদের ভাষা ও লিপি সম্পর্কে তারা অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে বেশি মনোযোগ দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু অন্যান্য লিপি সম্পর্কে অনুরূপ কোনো উদ্যোগ আয়োজন নেই; তারা প্রত্যেক জাতির মধ্যে তাদের প্রচলন অনুসারে বিদ্যমান মাত্র।

অতঃপর মানব সমাজ গ্রন্থ রচনার জন্য কিছু নির্ভরযোগ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে এবং তদতিরিক্ত যা কিছু, সব পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছে। তাদের মতে উক্ত উদ্দেশ্য সাতটি।

এদের প্রথমটি হল, আলোচ্য বিষয়, অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ ভাগ এবং সমস্যাদি যথাযথ অনুসরণসহ কোন শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটান। অথবা এমন কিছু সংখ্যক সমস্যা ও আলোচনার সৃষ্টি করা, যা কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তির মনকে আপ্লুত করে এবং তা তিনি অন্য কারো কাছে প্রকাশের তাগিদ অনুভব করেন। ফলে তাঁরা এ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে তাঁদের আলোচনাকে লিপির মাধ্যমে গ্রন্থের পৃষ্ঠায় ন্যস্ত করেন; যাতে পরবর্তীগণ উক্ত আলোচনার দ্বারা উপকৃত হন। যেমন ফেকাহ্ শাস্ত্রের নীতিমালার ব্যাপারে দেখা গিয়েছে। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম ইমাম শাফেয়ী শব্দগত শাস্ত্রীয় প্রমাণের আলোচনা করে তাকে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করেছিলেন। পরে হানাফীরা এসে প্রমাণের ক্ষেত্রে অনুমানকে আবিষ্কার করে তার সম্পূর্ণতা দান করেছেন। পরবর্তী সমাজ বর্তমানকাল পর্যন্তও তার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে।

দ্বিতীয়টি হল, কেউ পূর্ববর্তীদের আলোচনা ও গ্রন্থাদি পাঠ করার পর দেখতে পেলেন যে, তা অনেকাংশে দুর্বোধ্য এবং আল্লাহ্ তার মধ্যে বুঝতে পারার যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তা দিয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে অপরের জন্য তা বিশদ করতে মনস্থ করলেন; যাতে যোগ্য ব্যক্তিদের এ আলোচ্য বিষয় সহজ হয়ে ধরা দেয় ও তাদের উপকারে আসে। শ্রুতিনির্ভর ও মননশীল সব ব্যাপারেই বিশদীকরণের অনুরূপ উদ্যোগ প্রচলিত এবং এটা একটি উত্তম অধ্যায়।

তৃতীয়টি হল, পরবর্তীদের মধ্যে কেউ পূর্ববর্তীদের আলোচনায় কোনো প্রকার ভুল-ভ্রান্তি দেখতে পেলেন এবং যেহেতু এ পূর্ববর্তীগণ বিষয় গৌরব ও দূর-দূরান্ত

পরিব্যাপ্ত সুখ্যাতির অধিকারী; সুতরাং তিনি অনুরূপ ভ্রান্তি সম্পর্কে স্বীয় ধারণাকে এমন অকাট্য প্রমাণের দ্বারা দৃঢ় করলেন, যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তারপর তিনি উক্ত ধারণাকে পরবর্তী সমাজের জন্য রেখে যেতে ইচ্ছুক হলেন। কারণ পূর্ববর্তী গ্রন্থকারের রচনা সর্বত্র ও সর্বকালে পরিব্যাপ্ত হওয়া এবং তাঁর সর্বব্যাপী খ্যাতির জন্য তাঁর বিশ্বস্ততা নির্ভরযোগ্য হওয়ার ফলেই এরূপ ভ্রান্তি অপনোদন ও তার উৎসাদন কোনো প্রকারেই অজুহাত সৃষ্টির মাধ্যমে পরিত্যাগ করা যায় না। কাজেই তিনি তা রচনার মাধ্যমে সকলের অবগতির জন্য রেখে গেলেন।

চতুর্থটি হল, এমন একটি শাস্ত্র, যার আলোচ্য বিষয় অনুসারে কিছু সমস্যা অথবা পরিচ্ছেদ তাতে নেই; যার কাছে উক্ত শাস্ত্রের এ ক্রটিটি ধরা পড়ল, তিনি তা পূরণ করে তাকে সম্পূর্ণতা দান করতে ইচ্ছুক হলেন। যাতে উক্ত শাস্ত্রটি তার সব সমস্যা ও পরিচ্ছেদসহ একটি সম্পূর্ণ শাস্ত্র হয়ে ওঠে এবং তাতে যেন কোনো প্রকার ক্রটির কোনো অবকাশ না থাকে।

পঞ্চমটি হল, কোনো বিশেষ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়সমূহ প্রয়োজনানুরূপ বিন্যস্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় নি। সুতরাং এ সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তি তার বিষয়বস্তুকে সুবিন্যস্ত ও সুসংস্কৃত করতে উদ্যোগী হলেন এবং প্রতিটি সমস্যাকে তৎসংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে স্থাপন করলেন। যেমন ইবনে কাসেম থেকে 'সুহনুন' কর্তৃক বর্ণিত 'মুদাব্বানা' গ্রন্থ এবং ইমাম মালেকের সহচরদের কাছ থেকে 'আল উতবী' কর্তৃক বর্ণিত 'উতবিয়া' গ্রন্থ-সম্পর্কে ঘটেছে। এদের ফেকাহশাস্ত্র সম্পর্কীয় বহুবিধ সমস্যা সংশ্লিষ্ট অধ্যায় ভিন্ন অন্য অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আবু যায়েদ উক্ত 'মুদাব্বানা' গ্রন্থের পূর্বোক্তরূপ সংস্কার সাধন করেছেন; কিন্তু 'উতবিয়া' অসংস্কৃত অবস্থাতেই রয়েছে। এজন্যই আমরা এর প্রতিটি অধ্যায়েই অন্য অধ্যায়ের সমস্যাবলি দেখতে পাই। ফলে মানুষ মুদাব্বানার দ্বারাই নিজেদের কাজ চালিয়ে থাকে। এর মূলে ইবনে আবু যায়েদ ও তার পরবর্তী 'বারাদেয়ী'র অবদান বিদ্যমান।

ষষ্ঠটি হল, কোন বিশেষ শাস্ত্রের সমস্যাবলি বিভিন্ন অধ্যায়ে অন্যান্য শাস্ত্রের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় বিদ্যমান। কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি উক্ত শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত হয়ে তার সমস্যাবলিকে অনুরূপভাবে একত্র করলেন। ফলে তা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে বিন্যস্ত হয়ে মানুষের মননশীল বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত হয়ে দাঁড়ায়। যেমন অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কে অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে। আব্দুল কাহের জুরজানী[৩৫৩] ও আবু ইউসুফ সাক্কাকী[৩৫৪] উভয়ে এ শাস্ত্রের সমস্যাগুলোকে যথাযথভাবে ব্যাকরণের গ্রন্থে দেখতে পান এবং ইতিপূর্বে জাহেয তাঁর 'বয়ান ও তিবিয়ান' গ্রন্থে এর অনেক সমস্যা একত্র করেছিলেন; ফলে মানুষ এ শাস্ত্রটি সম্পর্কে উৎসুক হয়ে অন্যান্য শাস্ত্র থেকে একে পৃথক করে নিয়েছে। এ বিষয়ে তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থাবলি রচিত হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে অলঙ্কারশাস্ত্রে মূলনীতি স্থিরীকৃত হওয়ায় পরবর্তীগণ তাকে আয়ত্ত করেছেন এবং প্রত্যেক পূর্ববর্তী অপেক্ষা তার পরিধিকে বিস্তৃত করে দিয়েছেন।

---

৩৫৩. আব্দুল কাহের ইবনে আবদুর রহমান (একাদশ শতাব্দী খ্রি:)।

৩৫৪. ইউসুফ ইবনে আবু বকর; ৫৫৫-৬২৬ (১১৬০-১২২৯ খ্রি:) হি:।

সপ্তমটি হল, বিচিত্র বিষয়ের উৎসস্বরূপ কোনো গ্রন্থে বর্ণনা এমন দীর্ঘ ও বাগ্‌বহুল হওয়া, যাতে তার সংক্ষিপ্তকরণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি ইচ্ছা করলে উক্ত বর্ণনার পুনরুক্তিগুলোকে পরিহার করে তাকে সংক্ষিপ্ত করতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সর্বদাই লক্ষ রাখতে হবে যাতে প্রথম রচয়িতার বিষয়বস্তু অযথা পরিত্যক্ত হয়ে তার উদ্দেশ্য ব্যাহত না হয়।

এগুলোই সেই সব উদ্দেশ্য, গ্রন্থ রচনায় যার উপর নির্ভর করতে হয় এবং যার প্রতি লক্ষ রাখতে হয়। এছাড়া যা কিছু সবই নিষ্প্রয়োজনীয় এবং সেই সাধুতা থেকে বিচ্যুতি, বুদ্ধিমানরা সর্বদাই যার অবলম্বন করে থাকেন। যেমন পূর্ববর্তী কোনো রচয়িতার গ্রন্থ কিছুটা রদবদল তথা শব্দাদির পরিবর্তন, বিষয়াদির অগ্রপশ্চাৎ সাধন, প্রয়োজনীয় বিষয় পরিত্যাগ, অপ্রয়োজনীয় বিষয় সন্নিবেশ, বিশুদ্ধির পরিবর্তে ভ্রান্তির সংযোগ অথবা বাহুল্য বিষয়ের অবতারণার দ্বারা নিজের নামের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা। এরূপ আচরণ একমাত্র মূর্খতা ও নির্লজ্জতারই পরিচয় বহন করে। এজন্যই এরিস্টটল গ্রন্থ রচনার এসব উদ্দেশ্য বর্ণনা করে পরিশেষে বলেছেন, 'এছাড়া যা কিছু হয় বাহুল্য, নয়ত লালসা মাত্র।' তিনি এর দ্বারা পূর্বোক্ত মূর্খতা ও নির্লজ্জতাই বুঝাতে চেয়েছেন। আমরা এমন কার্য থেকে আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হচ্ছি, যাতে বুদ্ধিমত্তার কোনো পরিচয় নেই। আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা দৃঢ় বিষয়ের প্রতিটি পথ প্রদর্শন করেন।[৩৫৫]

৩৫৫. কোরান; ১৭, ৯।

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[শাস্ত্রাদি সম্পর্কে প্রচলিত সংক্ষিপ্ত পুস্তকের আধিক্য শিক্ষাদানকে ব্যাহত করে]

পরবর্তীকালের অনেক গ্রন্থকারই শাস্ত্রাদির বিষয় বর্ণনার ধারা ও বৈচিত্র্যকে সংক্ষিপ্তকরণের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। তারা তদসংশ্লিষ্ট সব বিষয়কে জানার আগ্রহেই তাদের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেছেন। এসব সংক্ষেপ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমস্যা ও প্রমাণাদির সার উপস্থিত করে এবং বর্ণনার শব্দবাহুল্য বর্জন করে অর্থের আধিক্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়। এ কারণে অনুরূপ রচনা প্রাঞ্জলতা হারিয়ে অনেকাংশে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। অনেক সময় তারা মূল গ্রন্থাদির বিস্তারিত বর্ণনা; যেমন কোরানের ভাষ্য যেমন অলঙ্কারশাস্ত্রে বিদ্যমান; তাকে স্মৃতিতে সংরক্ষণের সুবিধার জন্য সংক্ষিপ্ত করেন। যেমন ইবনে হাজেব ফেকাহ্‌শাস্ত্রেও অসুলে ফেকাহ্‌শাস্ত্রে, ইবনে মালেক আরবি ভাষাতত্ত্বে, খোনজী যুক্তিবিদ্যায় এবং তাদের সমতুল্য অন্যান্যরা করেছেন।

এ বিষয়টি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিকৃতির সৃষ্টি করে এবং জ্ঞানার্জনের পথে বাধা জন্মায়। কারণ এরূপ প্রচেষ্টা শিক্ষার চরম পরিণতিকে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে; ফলে তারা তা যথাসময়ে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে সময় পায় না। বস্তুত শিক্ষাদানের এ ধারা একান্তই অকল্যাণকর; অচিরেই এ সম্পর্কে আলোচনা আসছে।

এরূপ বিভ্রান্তিসহ এতে শিক্ষার্থীদের জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দাবলির তাৎপর্য অনুসন্ধান, তাদের ব্যাপক অর্থ গৌরব উদ্ধার এবং তাদের মধ্য থেকে সমস্যাদির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। কারণ এগুলো সহজবোধ্য বিষয় নয়। এজন্যই আমরা সংক্ষিপ্তকরণে ব্যবহৃত শব্দাবলিতে কঠিন ও দুর্বোধ্য রূপে দেখতে পাই এবং তাদের মর্মোদ্ধারে একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করতে হয়। অথচ এ সত্ত্বেও এসব সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপাঠে যে যোগ্যতা অর্জিত হয়, তা যদি যথাযথ ও কোনরূপ বাধা-বিপত্তি ব্যতিরেকেও অর্জিত হয়ে থাকে, তবুও এটা বিস্তারিত দীর্ঘ বর্ণনা পাঠে অর্জিত যোগ্যতা অপেক্ষা ন্যূন হয়ে থাকে। কারণ বিস্তারিত বিষয়ে বারংবার উল্লেখ ও বিশদীকরণের যে ধারা বর্তমান, তা পরিপূর্ণ যোগ্যতা ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে বেশি সহায়ক। সুতরাং এরূপ পৌনঃপুনিক উল্লেখের সংক্ষিপ্ত যোগ্যতার মধ্যেও সংক্ষেপের রেশ টেনে আনে এবং বলতে গেলে আলোচ্য সংক্ষিপ্ত-সারগুলোর অবস্থা তথৈবচ। অথচ এমন সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের তার কণ্ঠস্থ করাকে সহজ করে তোলা; কিন্তু পরিণামে তা

এমন এক কাঠিন্যের জন্ম দিয়েছে, যা তাদেরকে কল্যাণকর যোগ্যতা ও তার অধিকার লাভে বাধার সৃষ্টি করে। বস্তুত 'আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ বিপথে নিতে পারে না এবং তিনি যাকে বিপথে নিয়ে যান, তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান ও সর্বজ্ঞ।'

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[শিক্ষাদানের যথার্থ উদ্দেশ্য এবং তার কল্যাণকর পদ্ধতি]

জেনে রাখুন, শিক্ষাদান পদ্ধতি তখনই শিক্ষার্থীদের জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হতে পারে যখন তা ক্রমান্বয়ে অল্প অল্প করে তাদের সামনে উপস্থিত করা হয়। প্রথমে তাদের সামনে প্রতিটি অধ্যায়ের মূলনীতি সম্পর্কীয় বিষয় উপস্থিত করতে হবে, তাদের ব্যাখ্যার ব্যাপারে যথাসম্ভব সংক্ষেপের দারস্থ হতে হবে এবং এ প্রসঙ্গে তাদের বুদ্ধির শক্তি ও উপস্থাপিত বিষয় গ্রহণের ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। এভাবে তারা বিষয়ের শেষ পর্যন্ত পৌছবে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের যোগ্যতা অর্জিত হবে। অবশ্য অনুরূপ যোগ্যতা আংশিক ও দুর্বল। এমন যোগ্যতার দ্বারা তারা কেবলমাত্র বিষয়ের পরিচয় ও তার সমস্যাদির জ্ঞানলাভ করতে পারে।

এর পর দ্বিতীয়বারের মতো উক্ত বিষয়কে তাদের সামনে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং শিক্ষাদানের ব্যাপারে পূর্ববর্তী পর্যায়ে অপেক্ষা উন্নততর পর্যায়ে তাকে স্থাপন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ ও বিশদীকরণের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে; যাতে তা সংক্ষিপ্তির পরিধি ত্যাগ করে পূর্ণ বিস্তৃতি লাভ করে এবং উক্ত বিষয় সম্পর্কে বিচিত্র মতামত ও তার কারণও এখানে উল্লেখ করতে হবে। এভাবে শিক্ষার্থীরা বিষয়টির শেষ পর্যায়ে উপনীত হবে এবং এ সম্পর্কীয় যোগ্যতা ও বিশুদ্ধ আকার ধারণ করবে।

এভাবে পুনরায় উক্ত বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। এ পর্যায়ে, যেহেতু তাদের এ সম্পর্কীয় জ্ঞান একটি ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে, সুতরাং উক্ত বিষয়ের সর্বপ্রকার অস্পষ্টতা দুর্বোধ্যতা ও কাঠিন্যকে বিশদ করে তার সমস্ত অর্গল খুলে দিতে হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা এমন এক অবস্থায় উক্ত বিষয় অধ্যয়ন থেকে অব্যাহতি লাভ করবে, যখন তাদের এর উপর প্রয়োজনীয় দক্ষতা জন্মেছে।

এটাই সেই কল্যাণকর শিক্ষা পদ্ধতি এবং পাঠক, আপনি ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছেন, তা তিনটি পৌনঃপুনিকতার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়ে থাকে। অবশ্য অনেকের জন্য এটার চেয়ে কম সময়ে, দক্ষতা অর্জিত হতে পারে; কিন্তু তাও তাদের সহজাত যোগ্যতা ও সহজগম্যতার কল্যাণেই হয়ে থাকে।

আমাদের এ সমসাময়িক যুগে আমরা এমন বহু শিক্ষককে দেখেছি, যারা শিক্ষাদান পদ্ধতি ও তার উপকারিতা সম্পর্কে কোনো খোঁজ-খবর রাখেন না। তারা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক পর্যায়েই কোনো বিষয়ের দুর্বোধ্য সমস্যাবলি উপস্থিত করেন এবং তাদেরকে তা কণ্ঠস্থ করে সমাধান করতে বলেন। তারা এরূপ শিক্ষা পদ্ধতিকে

অনুশীলনের ক্ষেত্রে শুদ্ধ বলে ভাবেন এবং তাতে সতর্কতাসহকারে সংরক্ষণ করে চলার জন্য তাগিদ প্রদান করেন। ফলে তারা প্রাথমিক পর্যায়ের বিষয়বস্তু উপস্থিত করে শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা অর্জনের পূর্বেই তাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন। কারণ যে-কোনো বিষয়কে হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা ক্রমান্বয়ে জন্মে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া সামগ্রিকভাবে অনুধাবনের ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে থাকে। তখন তাদের সামনে সহজ পরিচিতি, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টি উপস্থিত করতে হয়। তারপর ক্রমশ ধীরে ধীরে তাদের যোগ্যতা বাড়তে থাকে এবং বিষয়ের বিচিত্র সমস্যার মিশ্রণ ও পৌনঃপুনিক উল্লেখ, সহজ পরিচিতির চেয়ে সামগ্রিক পরিচয়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার অবকাশ ইত্যাদির দ্বারা তা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর পর তারা যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে বিষয় সংশ্লিষ্ট সব সমস্যা সম্পর্কে দক্ষতার অধিকারী হয়ে ওঠে।

কিন্তু এর বিপরীতে চরম পর্যায়ে শিক্ষণীয় বিষয় যদি প্রাথমিক পর্যায়েই তাদের সামনে তুলে ধরা হয়, তাহলে তারা বুঝতে ও যথাযথ সংরক্ষণ করতে অসমর্থ হয় এবং এ সম্পর্কে যোগ্যতা অর্জনের বিষয়টি তাদের বুদ্ধিমত্তার উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয়টিকেই কঠিন মনে করতে থাকে এবং তা অর্জনের ক্ষেত্রে আলস্য ও বিরূপতা এসে তাদের ঔদাসীন্যকে দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে। অথচ এ সম্পূর্ণ ব্যাপারটিই শিক্ষা পদ্ধতির অবিমৃষ্যকারিতার ফসল।

সুতরাং প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত তার অধীনস্থ শিক্ষার্থীরা যে গ্রন্থ পাঠে নিয়োজিত তা যেন তাদের বোধগম্য হয়, সে বিষয়ে তাদের সামর্থ্য ও গ্রহণশক্তি অনুসারে ব্যবস্থা করা এবং প্রাথমিক অথবা শেষ পর্যায়ে, যেখানেই শিক্ষার্থীরা অবস্থান করুক না কেন, তাদের যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখা। শিক্ষক কখনও একটি গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের সাথে অন্য গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের মিশ্রণ ঘটাবেন না; যদি না, বিষয়টি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অধিগত হয়, তার উদ্দেশ্যে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে এবং এ সম্পর্কে এমন একটি যোগ্যতা অর্জিত হয়, যা ভিন্ন বিষয়ের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম। কারণ শিক্ষার্থী যদি যে-কোনো একটি শাস্ত্র সম্পর্কে যোগ্যতা অর্জন করতে সমর্থ হয়, তাহলে অবশিষ্ট শাস্ত্রাদি গ্রহণ করার একটি যোগ্যতাও তার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং তদতিরিক্ত ও তদোর্ধ অন্যান্য বিষয় অনুসন্ধানের একটি সহজ আনন্দ তার মধ্যে জন্ম লাভ করে। পরিশেষে এভাবে সে জ্ঞানের চরম পর্যায়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এর বিপরীতে যদি বিষয়টি তার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়ায়; তাহলে তার দেহে আলস্য ও তার চিন্তায় শৈথিল্য এসে তাকে নিরাশ করে তোলে এবং সে শাস্ত্র ও শিক্ষাগ্রহণ, সবই ত্যাগ করে। 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সুপথ দেখান।'[৩৫৬]

অনুরূপভাবে হে শিক্ষক, আপনার শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যে-কোনো একটি বিষয় ও একটি গ্রন্থের শিক্ষণীয় পাঠগুলোকে তার জন্য প্রয়োজনীয় বৈঠকাদির অবকাশকে দীর্ঘায়িত করবেন না। কারণ এতে তার বিষয়টি ভুলে যাওয়া এবং তার

৩৫৬. কোরান; ২, ১৪২।

একাংশ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে তার পক্ষে উক্ত বিষয়ের উপর দক্ষতা অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়বে। যখন কোনো বিষয়ের প্রাথমিক দিকগুলো তার অন্তিম দিকগুলোর সাথে একত্রে উপস্থিত থাকে, তখন সে-সম্পর্কীয় যোগ্যতা বেশি সহজ, সুসংবদ্ধ ও প্রগাঢ় হয়ে দেখা দেয়। কারণ যোগ্যতা একমাত্র ক্রিয়ার পর্যায়ক্রমিক ও পৌনঃপুনিক বিকাশের দ্বারাই অর্জিত হয়ে থাকে। কাজেই যখন ক্রিয়ার বিস্মৃতি ঘটে, তখন তা দিয়ে সৃজ্যমান যোগ্যতার মধ্যে বিস্মৃতি দেখা দেয়। 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তারই শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা শিক্ষার মাধ্যমে আয়ত্ত করতে পারছিলে না।'[৩৫৭]

শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে উত্তম মত ও অবশ্যপালনীয় পথ হল শিক্ষার্থীর উপর দুটি শাস্ত্রকে একত্রে মিশ্রিত না করা। এর ফলে তার পক্ষে একটি আয়ত্ত করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ এর ফলে তার হৃদয় দু'দিকে বিভক্ত হয়ে যায় এবং একটি ছেড়ে অন্যটিতে মনোযোগ দানের প্রয়োজন দেখা দেয়। পরিশেষে তার কাছে দুটিই সমান কঠিন ও দুর্বোধ্য ঠেকে এবং দুটি সম্পর্কেই তাকে নিরাশ হতে হয়। যখন চিন্তাশক্তি অন্য সব বিষয় থেকে নিজেকে মুক্ত করে একান্ত একটি বিষয় নিয়ে অগ্রসর হয়, তখন তার পক্ষে তাতে দক্ষতা অর্জন সর্বাপেক্ষা অবধারিত হয়ে ওঠে। আল্লাহ্ পবিত্র ও মহান; তিনি যথার্থতার সহায়তাকারী।

মানুষের চিন্তাশক্তি

জেনে নাও, হে শিক্ষার্থী, আমি তোমাকে এমন একটি উপকারী বার্তা উপঢৌকন দিচ্ছি, যদি তুমি তা শিক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ কর এবং শিল্পকৌশল হিসেবে ব্যবহার কর, তাহলে তুমি একটি বৃহৎ ভাণ্ডার ও মহৎ পুঁজি লাভ করবে। এখানে আমি তা বোঝার জন্য তোমার সামনে একটি প্রস্তাবনা পেশ করছি এবং তা এই—

মানুষের চিন্তাশক্তি তার একটি বিশিষ্ট স্বভাব। আল্লাহ্ তাঁর অন্যান্য অভিনব বস্তুর ন্যায় এটাকেও সৃষ্টি করেছেন। এটা জীবাত্মার গতিজাত একটি আবেগ, যা মস্তিষ্কের মাধ্যমে গহ্বরে ক্রিয়াশীল হয়। কখনও এ শক্তি মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করার উৎস হিসেবে দেখা দেয়। আবার কখনও এটা অজ্ঞাতকে জ্ঞাত হয়ে উদ্দিষ্ট অর্জনের দিকে পরিচালিত হবার উৎসরূপে পর্যবসিত হয়। আবার কখনও এটা এটার দুটি দিককে ধারণা করে তাদের অস্তি ও নাস্তির মধ্যে ঘুরতে থাকে; তখন চিন্তার এ স্তরটি যদি একক হয়, তাহলে চক্ষের পলকে সেই মাধ্যমকে খুঁজে পায়, যা উভয় দিকের মিলন ঘটিয়ে দেয়। কিন্তু তা যদি বিচিত্র হয়, তাহলে অন্য মাধ্যমটির অনুসন্ধান করে এবং এভাবে সে তার উদ্দিষ্ট লাভ করে। এটা মানুষের সেই চিন্তাশক্তির স্বরূপ, যা দিয়ে সে সমস্ত প্রাণিজগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

অতঃপর যুক্তিশিল্পও এ স্বাভাবিক মননশীল চিন্তাশক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মাত্র এবং তা এ শিল্পকে এ কারণেই পরিচিত করে, যাতে এর সাহায্যে চিন্তার ক্ষেত্রে যথার্থতাকে ভ্রান্তি থেকে পৃথক করে জেনে নিতে পারে। কেননা যদিও এ চিন্তাশক্তি স্বরূপের দিক থেকে যথার্থ; তবুও তার উভয় দিককে তাদের আকৃতি বহির্ভূত অন্যের

৩৫৭. কোরান; ২, ২৩৯।

উপর ধারণা করার সময় এবং ফলাফলের জন্য তার প্রতিজ্ঞাগুলোকে নির্দিষ্ট আকারে সুশৃঙ্খল ও বিন্যস্ত করার কালে গোলযোগের দরুন খুব অল্প পরিমাণে হলেও ভুলভ্রান্তির অধীন হতে পারে। সুতরাং অনুরূপ কোনো বিকৃতি দেখা দিলে যুক্তিবিদ্যা তা থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্যোগে সাহায্য করে। কাজেই যুক্তিবিদ্যা এমন এক শিল্পগত বিষয়, যা স্বাভাবিক চিন্তাশক্তির সাথে সমতালে অগ্রসর হয়ে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপে বিন্যস্ত হয়ে যায়। এর শিল্পগত বিষয় হবার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না। এ কারণেই, পাঠক, আপনি জগতের বহু বিখ্যাত চিন্তাবিদকে দেখতে পাবেন, যারা যুক্তিবিদ্যার সাহায্য ছাড়াই তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছেন; বিশেষ করে তাঁদের আন্তরিকতা ও মহান আল্লাহ্ কৃপা প্রার্থনা তাঁদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে। বস্তুত সাহায্যের ক্ষেত্রে এর মূল্য সর্বাধিক। এর ফলে তাঁরা স্বাভাবিক চিন্তাশক্তিকে শুদ্ধরূপে ক্রিয়াশীল করতে পারছেন এবং তাও তাদেরকে সেই মধ্যপন্থা ও উদ্দিষ্টের জ্ঞানার্জনে সফলকাম করেছে, যে জন্য আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছিলেন।

অতঃপর এ শিল্পগত বিষয় অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যার চেয়ে নিম্নমানের শিক্ষাদান সংশ্লিষ্ট অন্য একটি বিষয় রয়েছে, তার জন্যও একটি ভিন্ন প্রস্তাবনা প্রয়োজন। তা হল শব্দাবলির পরিচয় এবং স্মৃতিসঞ্চিত অর্থাদির উপর তাদের প্রয়োগ জ্ঞান; যা লিপিতে রেখার সাহায্যে ও ভাষণে জিহ্বার সাহায্যে নিজেকে প্রকাশ করে। সুতরাং হে শিক্ষার্থী, তোমাকে অবশ্যই এসব যবনিকা উত্তোলন করে সেই চিন্তাশক্তির মধ্যে পৌঁছতে হবে যা তোমার উদ্দিষ্টের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম।

প্রথমে দেখতে হবে লিপির রেখাগুলোর কথিত শব্দাবলিকে প্রকাশ করে কিনা এবং এটা এ বিষয়ের ন্যূনতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এর পর দেখতে হবে কথিত শব্দাবলি উদ্দিষ্ট অর্থাদির উপর প্রযোজ্য হয় কিনা। এর পর যুক্তিবিদ্যায় সুপরিচিত গঠনের মধ্যে প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অর্থসমূহকে বিন্যস্ত করার নিয়মাবলি অনুসন্ধান করতে হবে। তারপর এসব বিমূর্ত অর্থকে চিন্তার মধ্যে মিশ্রিত করতে হবে, যাতে তা দিয়ে আল্লাহ্র কৃপা ও বদান্যতার প্রার্থী হয়ে স্বাভাবিক চিন্তার মাধ্যমে উদ্দিষ্টকে স্বীকার করা যায়। অবশ্য প্রত্যেকেই এ পর্যায়ক্রম শীঘ্র অতিক্রম করতে পারে না এবং সহজে এসব শিক্ষাসংক্রান্ত যবনিকা উত্তোলন করতে সক্ষম হয় না; বরং অনেক সময় স্মৃতিশক্তি আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলে শব্দাবলির যবনিকার সামনে থমকে দাঁড়ায় অথবা যুক্তি-প্রমাণের মিশ্রণে বাকবিতণ্ডা ও দ্বিধা-সন্দেহের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উদ্দিষ্ট অর্জনে বিরত থাকে। বস্তুত এ আবর্ত থেকে একমাত্র আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া খুব কম লোকই মুক্তিলাভ করতে পারে।

যদি তোমার জন্য অনুরূপ কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়; যদি তোমার বোধগম্যতায় কোনো সন্দেহ দেখা দেয় অথবা তোমার স্মৃতিশক্তি দ্বিধায় বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে; তাহলে তা ত্যাগ কর, শব্দাবলির এ যবনিকা ও দ্বিধা-সন্দেহে এ বাধা দূরে নিক্ষেপ কর এবং এ শিল্পগত বিষয়ানুসারিতা পরিত্যাগ করে তোমার সেই স্বাভাবিক চিন্তার অঙ্গনে ফিরে যাও, যা তোমার সহজাত শক্তি। তাতেই তোমার দৃষ্টিকে, তোমার বুদ্ধিকে নিষ্কলুষভাবে বিচরণ করে তোমার উদ্দিষ্ট লাভ করতে দাও। এ ক্ষেত্রে তুমি

তোমার পদদ্বয়কে সেই স্থানে স্থাপন কর, যেখানে তোমার পূর্ববর্তী মহান চিন্তাবিদগণ স্থাপন করেছিলেন। তুমি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বিজয় কামনা কর; সেই বিজয়, যা তিনি তার কৃপায় পূর্ববর্তীদেরকে দান করেছিলেন এবং তাঁদেরকে সেই শিক্ষাদান করেছিলেন, যা তারা অর্জন করতে পারেন নি।

যখন তুমি এরূপ করতে সমর্থ হবে, তখন তোমার উপর আল্লাহ্‌র সেই বিজয়ের আলোক বিচ্ছুরিত হবে, যা তোমার উদ্দিষ্ট লাভে সহায়তা করবে এবং তোমার মধ্যে সেই মধ্যম পন্থার গুণ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, যাকে আল্লাহ্ এ স্বাভাবিক চিন্তাশক্তির লক্ষ্যরূপ নির্ধারিত করেছেন ও তোমাকে তার সহজাত করে সৃষ্টি করেছেন; যেমন আমরা পূর্বে বলেছি। এ সময়ে তুমি সেই শক্তিকে যুক্তি-প্রমাণের গঠন ও আকৃতিতে ফিরিয়ে আন, তাকে তাদের মধ্যে নিয়োগ কর এবং শৈল্পিক নিয়মাবলির মাধ্যমে তার যথার্থতা প্রতিপন্ন কর। তারপর তাকে শব্দাবলির আবরণ পরাও এবং বাণী ও ভাব বিনিময়ের জগতে তার প্রকাশ ঘটাও—সুসংবদ্ধ ও সুসংগঠিত।

অবশ্য তুমি যদি শব্দাবলির বিপত্তি, শিল্পগত প্রমাণে বাধাপ্রাপ্তি এবং তদন্তগত বিভ্রান্তি থেকে বিশুদ্ধিকে পৃথক করার প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যাহত হও, তাহলে যেহেতু এগুলো শিল্পগত প্রচলিত বিষয় ও তাদের বিভিন্ন দিক প্রচলন ও পরিভাষা অনুসারে সমান ও সমতুল্য হয়; সেজন্য তুমি তাদের মধ্যে সত্যপক্ষ নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে না। কারণ সত্যপক্ষ একমাত্র স্বভাবানুসারী হলে সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং এ দ্বিধা-সন্দেহের দৌরাত্ম্য চলতেই থাকবে। উদ্দিষ্টের উপর আবরণ আরও প্রলম্বিত হবে এবং অনুসন্ধানীকে তার অনুসন্ধান থেকে বিরত করবে। এটাই অধিকাংশ চিন্তাবিদ ও উত্তরসূরিদের অবস্থা। বিশেষ করে পূর্বে যাদের ভাষা আরবি ছিল না এবং তা তাদের মানস প্রক্রিয়াকে ব্যাহত তুলছে। অথবা যুক্তিবিদ্যার প্রমাণ প্রয়োগে যার আসক্তি তাকে পক্ষপাতী করে ফেলেছে এবং তার বিশ্বাস জন্মেছে যে, সত্যোপলব্ধির এটাই স্বাভাবিক পন্থা। যে ব্যক্তি অনিবার্যভাবে যুক্তি-প্রমাণের দ্বিধা-সন্দেহে বিপর্যস্ত হয়েছে এবং এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বস্তুত সত্যোপলব্ধির একমাত্র স্বাভাবিক পন্থা হল সেই স্বাভাবিক চিন্তাশক্তির, যার কথা আমরা পূর্বে বলেছি। যখন সমস্ত জল্পনা-কল্পনা থেকে তাকে মুক্ত করে চিন্তাবিদ তাকে মহান আল্লাহ্‌র করুণার প্রার্থী করে তুলবে, তখনই তা সম্ভব। বস্তুত যুক্তিবিদ্যাও এ চিন্তারই পরিচয়বাহী, এজন্য সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার অনুগামী হয়। হে শিক্ষার্থী, এটাকে বিবেচনা কর এবং যখনই কোনো সমস্যা হৃদয়ঙ্গমে বিপত্তি অনুভব কর, মহান আল্লাহ্‌র কৃপা প্রার্থনা করো; তোমার উপর তাঁর আলোক বিচ্ছুরিত হয়ে সত্যের দিকে পথ দেখাবে। আল্লাহ্‌ই তাঁর কৃপার দিকে পথ প্রদর্শন করেন এবং জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই আসে।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

[সহায়ক শাস্ত্রাদিতে চিন্তার দীর্ঘ অবকাশ এবং তার সমস্যাগুলোতে প্রসারতা নেই]

জেনে রাখুন, মানব সমাজে সুপরিচিত সর্ববিধ শাস্ত্রাদি দু'ভাগে বিভক্ত। তার মধ্যে একভাগ হল স্বরূপত উদ্দিষ্ট; যেমন—তফসীর, হাদীস, ফেকাহ, এলমে কালাম ধরনের ধর্মীয় শাস্ত্রাদি এবং পদার্থবিদ্যা ও আধ্যাত্মবিদ্যা জাতীয় দর্শন শাস্ত্রাদি। অন্য ভাগটি হল উপরের শাস্ত্রসমূহের জন্য সহায়ক ও মাধ্যম স্বরূপ; যেমন ধর্মীয় শাস্ত্রাদির জন্য আরবি ভাষাতত্ত্ব, অঙ্ক ইত্যাদি এবং দর্শনের জন্য যুক্তিবিদ্যা। এ শেষেরটি অনেক সময় পরবর্তী শাস্ত্রকারদের ধারা অনুসারে এলমে কালাম ও অসুলে ফেকাহ্‌র জন্যও সহায়করূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যেসব শাস্ত্র উদ্দিষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাদের ব্যাপারে আলোচনার বিস্তৃতি, সমস্যাদির ব্যাপকতা ও যুক্তি-প্রমাণের বিশ্লেষণে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এতে উক্ত শাস্ত্রাদি অধ্যয়নকারীর জন্য যোগ্যতা অর্জন ও উদ্দিষ্ট তাৎপর্যাদি অনুধাবনের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা সঞ্চারিত হবে। কিন্তু যেসব বিদ্যা অন্যের জন্য সহায়ক মাত্র; যেমন—আরবি ভাষাতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি; তাদের ব্যাপারে এ সহায়ক রূপের প্রয়োজনীয়তার অতিরিক্ত কোনো প্রকার দৃষ্টিপাতের আবশ্যকতা নেই। তাতে আলোচনার বিস্তৃতি ও সমস্যাদির ব্যাপকতা সৃষ্টিরও অবকাশ নেই। কারণ এর ফলে এগুলো তাদের উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে যাবে এবং এদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল অন্যের সহায়ক হওয়া; অন্য কিছু নয়। কাজেই যখনই এগুলো সীমা অতিক্রম করে তখনই অনুরূপ উদ্দেশ্যের বাইরে চলে যায় এবং তাদের সম্পর্কে আত্মনিয়োগ তখন বাহুল্য বলে গণ্য হয়। তদুপরি এসব সহায়ক বিদ্যার আলোচনার দৈর্ঘ্য ও শাখা-প্রশাখার বিস্তৃতি সে সম্পর্কে যোগ্যতা অর্জন একান্ত দুঃসাধ্য করে তোলে। অনেক সময় সহায়কের এ বিস্তার যথার্থ উদ্দিষ্ট শাস্ত্রাদি অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ উদ্দিষ্ট শাস্ত্রাদিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে সব কিছুকে আয়ত্তে আনতে জীবন কেটে যায়। এজন্যই এসব সহায়ক বিদ্যার চর্চায় আত্মনিয়োগ করা জীবনের ব্যর্থতা ও অনুপকারীর অনুসন্ধানে পর্যবসিত হয়।

এ ব্যাপারটিই পরবর্তী শাস্ত্রকারগণ আরবি ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, এমন কি অসুলে ফেকাহ্‌র ক্ষেত্রেও ঘটিয়েছেন। তাঁরা এগুলোতে আলোচনার পরিধি বর্ণনা ও প্রমাণ উপস্থাপনের বিষয়টি এমনভাবে বিস্তৃত করেছেন এবং সমস্যাগুলোর শাখা-প্রশাখা এত বেশি পরিমাণে বাড়িয়েছেন যে, তার ফলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যাসমূহ তাদের সহায়ক স্বরূপ

থেকে বের হয়ে নিজেরাই উদ্দিষ্ট স্বরূপে পরিণত হয়েছে। অনেক সময় এরূপ উদ্দেশ্য পরিবর্তনের ফলেই তাদের মধ্যে এমন অনেক যুক্তি ও সমস্যা আলোচিত হয়, মূল শাস্ত্রাদির জন্য যার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই; ফলে এগুলো বাহুল্য বলে গণ্য হয়ে থাকে। তদুপরি এগুলো সাধারণভাবে শিক্ষার্থীদের জন্য ক্ষতিকারক। কারণ শিক্ষার্থীদের উদ্যোগ আয়োজন এসব সহায়ক ও মধ্যম শ্রেণীর শাস্ত্রাদি অপেক্ষা মূল উদ্দিষ্ট শাস্ত্রাদির জন্য বেশি হয়ে থাকে। অথচ তারা যখন এসব সহায়ক আয়ত্ত করতে জীবন কাটিয়ে দিতে বাধ্য হয়, তখন উদ্দিষ্ট লাভের অবকাশ কোথায়?

সুতরাং শিক্ষকদের উপর অবশ্য পালনীয়রূপে এ দায়িত্ব বর্তায় যে তাঁরা যেন সহায়ক শাস্ত্রাদির ব্যাপারে আলোচনা ব্যাপক না করেন, তাদের সমস্যাদির বেশি তুলে না ধরেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে এগুলো চর্চার উদ্দেশ্য ও তাদের সীমারেখা সম্পর্কে সতর্ক করতে দ্বিধা না করেন। এর পর যদি কারো ইচ্ছাশক্তি অনুরূপ আতিশয্যের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং সে নিজে যদি তাতে মনোনিবেশ নিজের জন্য যথেষ্ট বলে মনে করে, তাহলে সে স্বেচ্ছায় যে-কোনো বন্ধুর অথবা সরল পথে বিচরণ করতে পারে। বস্তুত প্রত্যেকেই তার দৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সম্পূরণ করতে তৎপর হয়ে থাকে।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[শৈশবকালীন শিক্ষা এবং মুসলিম অধ্যুষিত নগরসমূহে তার পদ্ধতিগত বিভিন্নতা]

জেনে রাখুন, বালক-বালিকাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া ইসলামী ঐতিহ্য। মুসলমানগণ এ বিষয়টি গ্রহণ করেছে এবং তাদের নগরগুলোতে এর প্রচলন ঘটিয়েছে। কারণ এ দ্বারা মনের মধ্যে ইমাম ও শাস্ত্রীয় ধ্যান-ধারণার দৃঢ়তা জন্মে এবং কুরআনের আয়াত ও হাদীসের বাণী এ ব্যাপারে সহায়তা করে থাকে। এর ফলে কুরআন, শিক্ষার সেই ভিত্তিরূপে স্বীকৃত হয়েছে, যার উপর পরবর্তীকালে অর্জিত যোগ্যতার সৌধ গড়ে ওঠে। এর কারণ এই যে, শৈশবকালীন শিক্ষা বেশি দৃঢ় হয় এবং তার পরবর্তী শিক্ষার জন্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। কেননা অন্তের প্রথমে অনুপ্রবিষ্ট বিষয়ই যোগ্যতা-দক্ষতার ভিত্তিস্বরূপ এবং এ ভিত্তির দৃঢ়তা ও তার প্রক্রিয়া অনুসারেই সৌধের অবস্থা বিকশিত হয়ে থাকে।

শিশুদেরকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে পদ্ধতিগত বিভিন্নতা বিদ্যমান। কুরআনের শিক্ষায় যে যোগ্যতা অর্জিত হয়, তার দিকে লক্ষ রেখেই এ বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। মাগরিববাসীদের মধ্যে শিশুদের কুরআন শিক্ষার ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত রীতিই প্রচলিত। তাঁরা মাদ্রাসাসমূহে কেবলমাত্র কুরআনের লিপি-জ্ঞান, তার সমস্যাবলি এবং এ ব্যাপারে কুরআন বিশারদগণের মতানৈক্যই শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এটা ছাড়া তাঁদের শিক্ষাদানের বৈঠকে কুরআনের সাথে হাদীস, ফেকাহ্, কাব্য, ইতিহাস ইত্যাদির মিশ্রণ ততক্ষণ পর্যন্ত ঘটান না, যতক্ষণ না শিক্ষার্থী কুরআনের বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে অথবা তা ত্যাগ করে। তার ত্যাগ করার অর্থ সাধারণভাবে সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্রব ত্যাগ করাই বুঝিয়ে থাকে।

এটাই মাগরিবের শহরাঞ্চলের অধিবাসী, তাদের অনুসারী গ্রামাঞ্চলের বারবারগণ এবং সাধারণভাবে সমগ্র মাগরিবের বিভিন্ন জাতির শিক্ষা সম্পর্কীয় মতাদর্শ। বালক-বালিকারা সাবালকত্বের সীমা পার হয়ে যৌবনে পদার্পণ না করা পর্যন্ত তাদের জন্য এ শিক্ষাক্রম অনুসৃত হয়। এমন কি বয়স্করাও যখন জীবনের একটি বিশেষ সময় কাটিয়ে কুরআন শিক্ষা করতে আসে, তখনও এ রীতি অবলম্বন করা হয়। এ কারণেই তারা কুরআনের লিপিজ্ঞান ও তা কণ্ঠস্থ করার ব্যাপারে অন্য সব অপেক্ষা দক্ষ।

আন্দালুসের অধিবাসীরা কুরআনের শিক্ষা ও লিপিজ্ঞানের ব্যাপারে সাধারণ পন্থাই অবলম্বন করে। তাদের এ মতাদর্শেই সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা অনুসৃত হয়ে থাকে। অবশ্য

কুরআন যেহেতু শিক্ষার ভিত্তি, তার উৎস এবং ধর্ম ও শাস্ত্রাদির উৎপত্তিস্থল, সেজন্য তাকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে; কিন্তু এ বলে তারা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং শৈশবকালীন শিক্ষাতেও সাধারণভাবে কাব্য বর্ণনা ও গদ্য রচনা মিশ্রিত করে থাকে এবং আরবি ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান, উচ্চারণ বিধি ও হস্তলিপির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করে।

কুরআন শিক্ষার ব্যাপারে আন্দালুসবাসীদের প্রচেষ্টা এর বেশি অগ্রসর হয় না; বরং তাদের প্রচেষ্টা অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা লিপিশিক্ষার মধ্যেই বেশি নিয়োজিত থাকে। এর মধ্য দিয়েই বালকগণ বয়ঃসীমা অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করে এবং ইতিমধ্যে তারা সামান্য আরবি ভাষাতত্ত্ব, কাব্য ও তাদের পর্যালোচনার শক্তি অর্জন করে। তারা লিপিজ্ঞান ও লিখন পদ্ধতিতেও দক্ষ হয়ে ওঠে এবং মোটামুটিভাবে জ্ঞানজগতের বিভিন্ন দিকের সাথে তাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। যদিও তাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ধারা প্রচলিত রয়েছে, তবুও তারা এ পর্যায়ে এসে তদঞ্চলের নিয়মানুসারে শিক্ষার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। সুতরাং পরিণামে তারা ঐ প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারা যা অর্জন করেছে, তাই লাভ করে থাকে। বস্তুত যাকে মহান আল্লাহ্ পথ দেখান, তার জন্য এটাই যথেষ্ট এবং এতে সেই পরিমাণ যোগ্যতাও অর্জিত হয়, যা দিয়ে শিক্ষক পাওয়া গেলে তারা বেশি জ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হতে পারে।

আফ্রিকিয়াবাসীরা তাদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার ব্যাপারে কোরানের সাথে সাধারণত হাদীস মিশ্রিত করে থাকে। এ সঙ্গে তারা বিভিন্ন শাস্ত্রের নিয়মাবলি ও তাদের সমস্যাদির সামান্য অংশও শিক্ষা দেয়। তবুও কুরআন শিক্ষার ব্যাপারে তাদের প্রচেষ্টা, তার জন্য বালক-বালিকাদেরকে বেশি মনোযোগী করা এবং তার বিভিন্ন বর্ণনা ও পাঠের জ্ঞান অন্য সব বিষয় অপেক্ষা বেশি হয়ে থাকে। তাদের লিপি শিক্ষার প্রচেষ্টা এরই অনুগামী। মোটামুটিভাবে কুরআন সম্বন্ধীয় তাদের শিক্ষাধারা আন্দালুসবাসীদের শিক্ষাধারার নিকটবর্তী। কারণ এ ব্যাপারে তাদের শিক্ষা পদ্ধতি আন্দালুসী উস্তাদদের সাথে সংশ্লিষ্ট। এসব উস্তাদ সেখানে খ্রিস্টান আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ার পর পূর্ব আন্দালুসে চলে আসেন এবং অনেকে তিউনিসেও স্থায়ী আবাস স্থাপন করেন। তাঁদের কাছ থেকে আফ্রিকিয়া অঞ্চলের বালক-বালিকারা পরবর্তীকালে শিক্ষা লাভ করেছে।

আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, পূর্বাঞ্চলবাসীরাও শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুরূপ মিশ্রণ ঘটিয়ে থাকে। তবে তাদের প্রচেষ্টা কিসে বেশি নিয়োজিত, তা আমি জানি না। আমাদের কাছে যা বর্ণিত হয়েছে, তা এই যে, যৌবনকালেই তারা কুরআন, বিভিন্ন শাস্ত্রাদি ও তাদের নিয়মাবলির শিক্ষালাভ করে এবং এর সঙ্গে তারা লিপি শিক্ষাকে একত্র করে না। বরং লিপি শিক্ষার জন্য পৃথক শিক্ষক রয়েছে; যেমন সর্বপ্রকার শিল্পকর্মের জন্য শিক্ষক থাকেন। তারা এটাকে বালক-বালিকার লিখন প্রণালীর সাথে একত্র করেন না। কারণ তারা তক্তির উপর যে লিপির চর্চা করে তা ত্রুটিপূর্ণ বিধায় উন্নত হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি এ লিপিবিদ্যা শিক্ষা করতে উদ্যোগী হয়, সে তারপর তার শক্তি অনুসারে তার চর্চা করতে পারে এবং লিপি শিল্পবিদদের কাছ থেকে তা লিখে নিতে পারে।

আফ্রিকিয়া ও মাগরিববাসীরা কুরআনের উপর অত্যধিক কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে মোটামুটিভাবে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা যোগ্যতা অর্জনে পশ্চাদপদ থাকে। কারণ কুরআন পাঠে সাধারণভাবে ভাষাজ্ঞান জন্মায় না। কেননা মানুষ কোনোক্রমেই তার সমতুল্য ভাষা ব্যবহার করতে সক্ষম নয়। ফলে তারা উক্ত ভাষার বাগধারা ব্যবহার ও তার বর্ণনাশৈলী অনুকরণ থেকে সরে থাকে। অথচ এ সঙ্গে তারা কুরআন ছাড়া অন্য কোনো বর্ণনাশৈলীর সাথেও পরিচিত হতে পারে না। সুতরাং শিক্ষার্থীর পক্ষে আরবি ভাষায় যোগ্যতা অর্জন সম্ভব হয়ে ওঠে না এবং তার বর্ণনায় স্থবিরত্ব ও তার বাকপটুতায় শৈথিল্য জন্মায়।

অবশ্য এ ব্যাপারে অনেক সময় আফ্রিকিয়াবাসীরা মাগরিববাসীদের চেয়ে কতকাংশে সচ্ছলতার পরিচয় দিয়ে থাকে। কারণ, যেমন আমরা পূর্বে বলেছি, তারা কুরআনের শিক্ষার সাথে অন্যান্য শাস্ত্রের নিয়মাবলির বর্ণনা মিশ্রিত করে থাকে। এর ফলে তারা কিছুটা বাকপটুতা ও তুলনীয় বিষয় অনুসরণের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে; তবুও তাদের যোগ্যতা রচনাশৈলীর দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। কারণ তাদের সঞ্চিত শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকাংশের বর্ণনায় রচনাশৈলীর অভাব; যেমন অচিরেই সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদে তার বর্ণনা আসছে।

এক্ষেত্রে আন্দালুসবাসীরা, তাদের বিচিত্র বিষয়, কাব্য-বর্ণনা, গদ্য রচনা ও জীবনের প্রথম থেকেই আরবি ভাষার সাথে বিদ্যাচর্চার ফলে যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে বেশি আরবি ভাষাবিদ হয়ে ওঠে। এ সঙ্গে তারা অন্যান্য শাস্ত্রাদির ব্যাপারে তেমন যোগ্যতা প্রদর্শন করতে পারে না। কারণ তারা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা থেকে দূরে অবস্থান করে; অথচ এ দুটিই শাস্ত্রাদির ভিত্তি ও উৎসস্থল। এ কারণে তারা হয় লিপিবিশারদ ও উত্তম সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকে; নয়ত একান্তই অযোগ্যতার পরিচয় দিয়ে থাকে। বস্তুত শৈশবকালীন শিক্ষার অনুপাতেই অনুরূপ বৈচিত্র্য দেখা দেয়।

কাজী আবু বকর ইবনে আল আরাবী তাঁর 'রেহলাত' নামীয় গ্রন্থে শিক্ষার ব্যাপারে একটি বিরল প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে পূর্বতন বিষয়াদির উল্লেখ করে নতুন কিছুও বলেছেন এবং আরবি ভাষাতত্ত্ব ও কাব্য সম্পর্কীয় শিক্ষাকে, আন্দালুসী মতাদর্শের ন্যায় সমগ্র শাস্ত্রের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, 'কাব্য আরবের ঐতিহ্যভাণ্ডার; এ বিষয়টিই তার ও আরবি ভাষার অগ্রাধিকারকে শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় করে তোলে এবং ভাষার বিকৃতিও এর অন্যতম কারণ। তারপর শিক্ষার্থী গণিত শিখবে এবং অনুশীলনের মাধ্যমে তার মূলনীতিগুলো পর্যবেক্ষণ করবে। এর পর সে কুরআন শিখতে যাবে এবং এরূপ একটি ভূমিকার ফলে তা তাঁর কাছে সহজ বলে বোধ হবে।' তারপর তিনি বলেন, 'আমাদের দেশবাসীরা কী উদাসীন! তারা জীবনের প্রারম্ভেই বালককে কুরআন শিক্ষা দেয়; সে তা পড়ে, কিন্তু বুঝে না এবং সে এমন একটি বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত থাকে, যদপেক্ষা অন্যটি তার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ।' তিনি আরও বলেন, 'এর পর সে ধর্মের মূলনীতি, ফেকাহশাস্ত্রের মূলনীতি, বিচার-বিতর্ক, হাদীস ও সে সম্পর্কীয় অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ করবে।' এ সত্ত্বেও তিনি দুটি শাস্ত্রকে

একত্র করতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য কোনো যোগ্য শিক্ষক যদি এদুটির মিশ্রণকে বোধগম্যতা ও সহজসাধ্যতার সাথে শিক্ষা দিতে পারেন, তাহলে অসুবিধা নেই।

এটাই শিক্ষার ব্যাপারে কাজী আবু বকর (রহঃ)-এর অভিমত। আমার জীবনের শপথ, এটা অত্যন্ত সুন্দর একটি মতাদর্শ। কিন্তু প্রচলিত নিয়ম তাকে অনুমোদন করে না। কারণ প্রচলিত নিয়ম সর্বদাই অবস্থা ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। প্রচলন হল পুণ্য ও সুসারের দিকে প্রাধান্য দিয়ে কুরআন শিক্ষাকেই অগ্রাধিকার দান করা। তদুপরি এতে এমন একটি ভয়ও দূর হয় যে, বাল্যকালের চাপল্য ও বাধাবিপত্তি যদি হঠাৎ করে শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনকে ব্যাহত করে, তা হলেও সে অন্তত কুরআন পাঠ থেকে বঞ্চিত হবে না। কারণ শিক্ষার্থী যতক্ষণ পারিবারিক আবেষ্টনীতে থাকে, ততক্ষণ সে নির্দেশ পালন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু যখন বয়ঃসীমা পার হয়ে যায় ও শাসনের বাধ্যবাধকতা থেকে কতকাংশে মুক্তিলাভ করে, তখন অনেক সময় যৌবনধর্ম তার মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে এবং অন্যায্যতার তীরভূমিতে সে অনর্থক ঘুরে বেড়ায়। এজন্যই তারা পারিবারিক বেষ্টনী ও শাসনের বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ থাকা কালেই কুরআন শিক্ষাকে এতটা মূল্য দিয়ে থাকেন; যাতে এ বিষয়টি থেকে যেন সে শূন্য না হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য যদি শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন স্থায়ী হবার বিশ্বাস থাকে এবং শিক্ষা গ্রহণ করার যোগ্যতাও তার থাকে, তাহলে কাজী আবু বকর যে মতাদর্শের কথা বলেছেন, পূর্ব-পশ্চিমে গৃহীত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এটিই সর্বোত্তম ব্যবস্থা বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাঁর নির্দেশ অমান্যকারী কেউ নেই;'[৩৫৮] পবিত্র তিনি।

৩৫৮. কোরান; ১৩, ৪১।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[শিক্ষার্থীদের কঠোরতা তাদের জন্য ক্ষতিকর]

এর বর্ণনা এই যে, শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদেরকে অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান তাদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। বিশেষ করে শৈশবে এরূপ শাস্তির আধিক্য যোগ্যতা অর্জনে অকল্যাণ ডেকে আনে। শিক্ষার্থী, দাসদাসী অথবা চাকর-নফরদের মধ্যে যারা অন্যায্য ও বেশি শাসনের অধীনে থাকে, তাদেরকে অলস, মিথ্যাচারী ও দুষ্কর্মকারী বানিয়ে দেয়। শাসনের কড়াকড়ির ভয়ে তারা মনের যথার্থ ভাব প্রকাশ না করে অন্যবিধ আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং এ কারণেই তারা প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্রমান্বয়ে এটাই তাদের অভ্যাস ও চরিত্র হয়ে দাঁড়ায় এবং মানুষত্বের সব তাৎপর্য তার মূল্য হারিয়ে বসে। বস্তুত তার জন্যই এ সমাজজীবন ও সভ্যতা এবং তা আর কিছুই নয়; বরং নিজের ও নিজের আবাসভূমির স্বার্থ সংরক্ষণ ও সহায়তাবিধান। অথচ এর ফলে তারা অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং বিষয় গৌরব ও সৎ চরিত্র অর্জনে উদ্যমহীন হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমশ জীবনের উদ্দেশ্য সংকুচিত হয়ে মানুষত্বের হ্রাস ঘটে এবং এর প্রতিক্রিয়ায় তারা সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যায়।

সে সব জাতি অন্যায় শাসন ও অবিচারের মধ্যে আবদ্ধ, তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এর উদাহরণ পাওয়া যায়। পাঠক, এ বিষয়টি আপনি তাদের মধ্যে বিবেচনা করতে পারেন, যাদের শাসনভার অন্যের হাতে এবং যাদের যোগ্যতা নিজেদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ ও সহায়তা করতে অপারগ। আপনি তাদের মধ্যে অনুরূপ বিষয় সুপ্রচলিত দেখতে পাবেন। আপনি ইহুদিদের কথা চিন্তা করুন না; এর ফলে তাদের মধ্যে কী দুশ্চরিত্রেরই না জন্ম হয়েছে এবং এর জন্যই সর্বদিকে সর্বত্র তাদেরকে বহিষ্কারের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। পরিচিত পরিভাষায় অনুরূপ পরিণতির অর্থ হল দুষ্কর্ম ও প্রতারণা এবং তার কারণ আমরা ইতিপূর্বে বলেছি।

সুতরাং প্রত্যেক শিক্ষক ও জনকের উচিত তাদের ছাত্র ও পুত্রকে সদাচার শিক্ষা দেওয়ার বেলায় অন্যায় শাস্তিপ্রদান না করা। মুহম্মদ ইবনে আবু যায়েদ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য লিখিত তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, 'বালকদেরকে সচ্চরিত্র শিক্ষাদানকারী যদি শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তাহলে তার পক্ষে তিনটি বেত্রাঘাতের বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়।' হযরত উমর (রাঃ)-এর বক্তব্যে আছে, যাকে ধর্মীয় বিধান সচ্চরিত্র শিক্ষা দিতে পারে না, তাকে আল্লাহ্ও সচ্চরিত্র শিক্ষা দেন না। 'এ বক্তব্যে তিনি একদিকে সচ্চরিত্র শিক্ষাদানের জন্য প্রদত্ত অসম্মান থেকে

জীবাত্মার মুক্তি কামনা করেছেন এবং অন্যদিকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় শিক্ষা যে ধর্মীয় বিধান দিতে সক্ষম তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কারণ একমাত্র ধর্মই মানুষের কল্যাণ সম্পর্কে বেশি জ্ঞানের অধিকারী।

সম্রাট হারুনুর রশীদ তাঁর পুত্রের শিক্ষকদের প্রতি যা বলেছিলেন, তদপেক্ষা উত্তম শিক্ষা পদ্ধতি আর হয় না। খালফ আল্ আহমর[৩৫৯] বলেছেন, 'রশীদ তাঁর পুত্র মুহম্মদ আমীনের শিক্ষার ব্যাপারে আমাকে বলে পাঠালেন, হে আহমর! আমীরুল মোমেনীন আপনার কাছে তাঁর আত্মার সজীবতা ও হৃদয়ের ফসল গচ্ছিত রেখেছেন। আপনি তাকে দৃঢ়হস্তে ধারণ করুন এবং তাকে আপনার অনুগত করে নিন। যে উদ্দেশ্যে আমীরুল মোমেনীন তাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, আপনি তার সহায়ক হন। আপনি তাকে কুরআন শিক্ষা দিন; ইতিহাস, কাব্য বর্ণনা ও হাদীস পাঠে সহায়তা করুন। তাকে যথাস্থানে বক্তব্য উপস্থিত করতে এবং যথানিয়মে তা আরম্ভ করতে শিক্ষা দান করুন। যথাসময় ছাড়া তাকে হাস্য সংবরণ করতে বলুন। বনি হাসেমের গুরুজন তার কাছে উপস্থিত হলে তাদেরকে সম্মান করতে শিক্ষা দান করুন। সেনাপতিগণ তার বৈঠকে এলে তাদেরকে সম্মানসূচক আসন প্রদান করতে তাকে পরামর্শ দিন। এমন কোনো সময় যেন অতিবাহিত না হয়, যে সময়ে আপনি অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে বিরক্ত না করে উপকারী কোনো না কোনো বিষয় শিক্ষা না দেন। কারণ বিরক্তির ফলে আপনি তার মেধাকে বিকৃত করে ফেলবেন। তাকে বেশি মাত্রায় অবসর ভোগ করতে দেবেন না; তাহলে সে তাকে আরামদায়ক মনে করে তাতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। আপনার পক্ষে যতদূর সম্ভব সস্নেহ ও কোমল ব্যবহারের দ্বারা তাকে সংশোধন করতে চেষ্টা করুন। যদি সে এতে সম্মত না হয়, তাহলে অবশ্যই কঠোরতা ও কর্কশতার সাথে ব্যবহার করবেন।' শেষ।

---

৩৫৯. মৃত্যুকাল ৭৯৬-৮০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী কাল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[জ্ঞানের অন্বেষণে দেশভ্রমণ ও জ্ঞানীদের দর্শন লাভ শিক্ষার পরিপূর্ণতা বিধায়ক]

এর কারণ এই যে, মানুষ সাধারণভাবে তাদের জ্ঞান ও চরিত্র তাদের আচরিত মতাদর্শ ও অনুসৃত গুণাবলি থেকেই গ্রহণ করে থাকে। এ গ্রহণ কখনও জ্ঞান শিক্ষা ও বক্তৃতা থেকে আবার কখনও সাহচর্যের ফলে দীক্ষা ও অনুকরণের মাধ্যমে অর্জিত হয়। অবশ্য এ সাহচর্য ও দীক্ষার ফলে অর্জিত যোগ্যতা বেশি দৃঢ় ও স্থায়ী প্রভাবশীল হয়। সেজন্যই বেশি শিক্ষাগুরুর সান্নিধ্য যোগ্যতা অর্জনে বেশি দৃঢ়তা আনয়ন করে।

তদুপরি শিক্ষাব্যবস্থায় পরিভাষার আধিক্যও শিক্ষার্থীদের জন্য বিভ্রান্তিকর হয়ে দাঁড়ায়; এমন কি তাদের অনেকেই ভাবতে থাকে যে, এগুলোও বুঝি শাস্ত্রেরই অংশ। তাদের এ ধারণা দূর হবার একমাত্র পথ হল এ সম্পর্কীয় বিচিত্র মতাদর্শের শিক্ষকদের সংস্পর্শে আগমন। এর ফলে জ্ঞানীদের দর্শন লাভ ও বিভিন্ন শিক্ষকের শিক্ষাদান তাকে এসব পরিভাষার পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করবে এবং এ সম্পর্কে তাঁদের বিচিত্র মতাদর্শ দর্শনে সে তাদেরকে শাস্ত্রজ্ঞান থেকে পৃথক করতে সমর্থ হবে। সে বুঝতে পারবে যে, পরিভাষা শিক্ষাদানের বৈচিত্র্য ও লক্ষ্যে পৌঁছবার মাধ্যম ছাড়া অন্য কিছু নয়। এর দরুন যোগ্যতা অর্জনে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব লাভে তার শক্তি জাগ্রত হয়ে উঠবে। সে তার জ্ঞানকে সংশোধন করতে এবং তাকে অন্যান্য আবিলতা থেকে মুক্ত করতে পারবে। এ সঙ্গে সাহচর্য, দীক্ষা এবং সে সম্পর্কে বিভিন্ন ও বিচিত্র শিক্ষকের সহায়তা লাভ তাকে যোগ্যতার ক্ষেত্রে অনন্য করে তুলবে। অবশ্য এ সমস্তই তার পক্ষেই লভ্য, আল্লাহ্ যাকে জ্ঞানার্জন ও সৎপথ প্রাপ্তির জন্য সহজ শক্তি অর্পণ করেছেন। সুতরাং জ্ঞানী ও মহাপুরুষের সাহচর্য থেকে উপকার ও গুণাবলি লাভ করতে হলে এবং সর্বোপরি জ্ঞান অর্জন করতে হলে দেশভ্রমণ একান্তই অত্যাবশ্যকীয়। বস্তুত 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করে থাকেন।'[৩৬০]

---

৩৬০. কোরান; ২, ১৪২।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[মানবসমাজে জ্ঞানীরাই রাজনীতি ও তার বিচিত্র মতাদর্শ থেকে বেশি দূরে অবস্থান করেন]

এর কারণ এই যে, জ্ঞানীগণ মননশীল দৃষ্টি ও তাৎপর্যাদির গভীর অনুসন্ধিৎসায় অভ্যস্ত তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি থেকে তাদেরকে সংগ্রহ করে স্মৃতিতে তাদের সার সংকলন করেন। ফলে সব বিষয় একটি সার্বিক নিয়মে পর্যবসিত হয় এবং তা দিয়ে সাধারণভাবে যে-কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এটা বিশেষভাবে কোনো বস্তু সত্তা, ব্যক্তি, পুরুষ, জাতি বা শ্রেণীর ওপর বর্তায় না। এভাবে তাঁরা অনুরূপ সার্বিক ধারণা গ্রহণ করার পর বহির্জগতের ওপর তাদের জ্ঞানকে প্রয়োগ করেন। তাঁরা সব বিষয়কে তাদের সমতুল্য ও সমশ্রেণীর বিষয়াদির সাথেও অনুমান করে থাকেন; কেননা ফেকাহ্‌শাস্ত্রের অনুরূপ অনুমানের সাথে তাঁরাও পূর্বাহ্নেই পরিচিত। সুতরাং তাদের সর্বপ্রকার মনন ও সিদ্ধান্ত স্মৃতিতেই আবদ্ধ থাকে এবং তার সাথে বহির্জগতের সামঞ্জস্য বিধানের কাজ একমাত্র অনুরূপ বিচার-বিবেচনার পরই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিংবা অনেক সময় তা সামগ্রিকভাবেই সামঞ্জস্যবিহীন হয়ে দাঁড়ায়। একমাত্র স্মৃতিতে সংরক্ষিত বিষয়াদি থেকেই তা বহির্জগতের শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃতি লাভ করে। যেমন ধর্মীয় বিধানসমূহ; তারা কুরআন-হাদীস থেকে সংগৃহীত যুক্তি-প্রমাণ দ্বারাই শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়। তারপর বহির্জগতে তাদের সামঞ্জস্য বিধানের বিষয়টি অনুসন্ধান করা হয়। এটা বুদ্ধি শাসিত বিষয়াদির সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ সেখানে তাদের বিশুদ্ধি নির্ধারণের জন্য বহির্জগতের ওপরই সর্বাত্মকভাবে নির্ভর করতে হয়।

এভাবে জ্ঞানীগণ তাঁদের যাবতীয় বিষয়ে স্মৃতি সঞ্চিত ধ্যান-ধারণা ও মননশীল যুক্তি-প্রমাণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন; তাঁরা এর বাইরে অন্যরূপ পরিচয় লাভের অবকাশ পান না। অথচ রাজনীতি সর্বদাই তার চর্চাকারীকে বহির্জগতের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে বাধ্য করে এবং সেখানে যে অবস্থা দেখা দেয়, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করতে বলে। এসব বিষয় সর্বদাই অস্পষ্ট থাকে এবং সম্ভবত সেখানে এমন উপাদানও জড়িয়ে থাকে, যদ্দরুন উক্ত অবস্থাকে অন্য কোনো অবস্থার সাথে তুলনা করা বা মিলিয়ে দেখা যায় না। এ কারণেই সার্বিক ধারণার সাথে তার সামঞ্জস্য বিধান বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। বস্তুত জনসমাজের কোনো অবস্থাতে অন্য অবস্থার সাথে তুলনা করা যায় না। কারণ তারা এক বিষয়ে তুল্য হলেও একাধিক অন্য বিষয়ে ভিন্নরূপের অধিকারী হতে পারে।

জ্ঞানীগণ তাঁদের সার্বিক ধারণা ও এক বিষয়কে অনুমান করার যে অভ্যাস গড়ে তুলেছেন, তার ফলে তাঁরা যখন রাজনীতিতে দৃষ্টি দেন, তখন তাকেও তাঁরা তাঁদের সেই মননশীলতা ও যুক্তি-প্রমাণের কাঠামোতে ঢেলে সাজাতে চান; ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রান্তিতে পড়েন ও অবিশ্বস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের সাথে মানব সমাজের বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের অবস্থাও মিলিয়ে নেওয়া যায়; কারণ তাঁরাও এ শাস্ত্রবিদদের ন্যায় তাঁদের মেধাশক্তির চমৎকারিত্বে গভীর তাৎপর্য, অনুমান ও অনুকরণের পন্থা অনুসরণ করে থাকেন এবং পরিণামে ভ্রান্তিতে পড়েন।

তাঁদের তুলনায় সাধারণ, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও মধ্যম বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এক্ষেত্রে বেশি সাফল্যের মুখ দেখতে পান। কারণ তাঁদের মননশীলতার অভাব ও গভীর তাৎপর্য অনুধাবনের অনভ্যাসই তাঁদেরকে প্রতিটি বস্তুকে তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত এবং প্রতিটি অবস্থা ও ব্যক্তিকে তাদের বৈশিষ্ট্যের সাথে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য করে। তাঁরা এসব ক্ষেত্রে কোনোরূপ অনুমান বা সার্বিক ধারণার দ্বারা কাজ চালাতে যান না এবং তাঁদের মননশীলতায় অধিকাংশ স্থানেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির সীমা অতিক্রম করেন না বা তাকে স্মৃতিসর্বস্ব করে তোলেন না। যেমন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ নদীতে সন্তরণকারী তীরভূমির নৈকট্য ত্যাগ করতে চায় না। কবি বলেছিলেন,—

> সন্তরণ করতে গিয়ে অতিশয্য প্রদর্শন করো না;
> কারণ নিরাপত্তা তীরভূমিতেই বিদ্যমান।

এর ফলে এ সাধারণ ব্যক্তিগণ তাঁদের রাজনীতি সম্পর্কীয় চিন্তায় নিরাপদ ও জনসমাজের সমস্যা সমাধানে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়ে থাকেন। ফলে তাঁদের এ দৃষ্টিকোণই তাঁদেরকে বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে সাহায্য করে এবং তাঁদের জীবনকে সুন্দর করে তোলে। 'প্রত্যেক জ্ঞানীর চেয়ে তিনি বেশি জ্ঞানী।'[৩৬১]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টিও প্রকাশ পায় যে, যুক্তিবিদ্যা ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ নয়; কারণ তাতে অধিকতরভাবে ধারণার ওপর নির্ভর করা হয় এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে তা দূরে অবস্থান করে। কেননা তা বুদ্ধিগ্রাহ্যতার দ্বিতীয় স্তরের মননশীলতা। সম্ভবত তাতেও সেসব উপাদান বিদ্যমান, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাধার সৃষ্টি করে এবং বিশ্বাস্য পর্যায়ে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য বুদ্ধিগ্রাহ্যতার প্রথম স্তরের অবস্থা অন্য প্রকার। কারণ তার সারসংগ্রহ বাস্তবের নিকটবর্তী হওয়ায় অনুরূপ অসুবিধা দেখা দেয় না। তা যতই কল্পনা নির্ভর হোক, ইন্দ্রিয়ানুভূত বিষয়ের আকৃতি তাতে সংরক্ষিত থাকায় তার বিন্যাসগত সত্যতা সম্পর্কে আভাস দেয়। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ এবং তিনিই সহায়তার আধার।

---

৩৬১. কোরান; ১২, ৭৬।

ত্রয়োচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[ইসলামী শাস্ত্রবিদদের অধিকাংশই অনারব]

একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, ইসলামী দুনিয়ায় শাস্ত্রবিদদের অধিকাংশই অনারব। আরবদের মধ্যে শাস্ত্রবিদদের সংখ্যা, কি শাস্ত্রীয় বিষয়গুলোতে, কি মননশীল বিষয়গুলোতে খুবই নগণ্য ও বিরল। তাঁদের মধ্যেও এমন অনেকে আছেন, যাদের বংশ পরিচয় আরবি হলেও ভাগ্য, পৃষ্ঠপোষকতা ও শিক্ষাদান সবই অনারবদের দ্বারা ব্যবস্থিত। অথচ জাতীয়তার ধারা আরবি এবং ধর্মপ্রবর্তক স্বয়ং আরবি।

এর কারণ এই যে, এ জাতি, তার প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো প্রকার শাস্ত্র ও শিল্পজ্ঞানের অধিকারী ছিল না। কারণ তখনও তাদের মধ্যে বেদুইন জীবনের অবস্থা ও সারল্য বিদ্যমান ছিল। একমাত্র আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধ সংবলিত শাস্ত্রীয় বিধানের জ্ঞান তারা রাখতেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই স্মৃতির সাহায্যে এগুলো বর্ণনা করতেন। তারা ধর্মপ্রবর্তক ও তাঁর সহচরদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করার ফলে কুরআন ও হাদীসে এসব বিধানের উৎসের সাথে পরিচিত ছিলেন। সমগ্র জাতিই তখন পর্যন্ত বেদুইন; তারা শিক্ষাদানের বিষয় এবং গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের ধারা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। অবশ্য এ ব্যাপারে তাদের উপর কোনো চাপ এখনও সৃষ্টি হয় নি এবং অনুরূপ বিষয়াদির প্রয়োজন তখনও দেখা দেয় নি।

এ অবস্থায় সাহাবী ও তাবেয়ীনদের সময় কেটে গেছে এবং তাঁরা অনুরূপ শাস্ত্রজ্ঞানের বাহক হিসেবে বিশিষ্ট হয়ে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যকার এ বর্ণনাকারীদেরকে তখন 'কারী' বা পাঠক বলা হত অর্থাৎ তারাই কুরআন পাঠ করতেন এবং এদিক থেকে তারা নিরক্ষর ছিলেন না। কারণ নিরক্ষরতা তখন সাহাবীদের সাধারণ গুণ; কেননা তারা সকলেই বেদুইন। সুতরাং কুরআন পাঠকদেরকে 'কারী' বলার মধ্যে এ অবস্থার প্রতিই ইঙ্গিত বিদ্যমান। বস্তুত তারা তখন আল্লাহ্‌র গ্রন্থ ও তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের পাঠকারী। কারণ এ কুরআন ও হাদীস ছাড়া তারা ধর্মীয় বিধান জানতে সক্ষম হন নি এবং হাদীস অধিকাংশ স্থানে কোরানের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা মাত্র। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে আমি দুটি বিষয় রেখে গেলাম; যতক্ষণ এ দুটিকে ধরে রাখবে, বিপথগামী হবে না। এদের একটি আল্লাহ্‌র কিতাব এবং অপরটি আমার সুন্নত অর্থাৎ হাদীস।'

অতঃপর সম্রাট হারুনর রশীদ তার পরবর্তী সময় থেকে যখন স্মৃতি ও শ্রুতিবাহিত বর্ণনার ধারা প্রারম্ভ থেকে অনেক দূরবর্তী হয়ে পড়ল, তখন বিনষ্টির ভয়ে কুরআনের

ভাষ্য সংরক্ষণ ও হাদীসের বর্ণনায় বাধ্য-বাধকতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এর পর বর্ণনার সূত্র জ্ঞান ও বর্ণনাকারীদের যোগ্যতা বিচার করে সূত্রাদির শুদ্ধাশুদ্ধি জানার আবশ্যকতা বোধ হল। এর পর কুরআন ও হাদীস থেকে বিচিত্র ঘটনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারা বেড়ে গেল। এ সঙ্গে ভাষাও বিকৃত হয়ে উঠল; সুতরাং ব্যাকরণের নিয়মাবলি প্রবর্তনের প্রয়োজন এসে উপস্থিত হল। এভাবে ধর্মীয় শাস্ত্রাদির সবই বিচার-বিবেচনা, সমাধান, আবিষ্কার, যুক্তি-প্রমাণ দান ও অনুমান অনুভবের যোগ্যতায় পর্যবসিত হল। ফলে এগুলো সহায়ক কিছু শাস্ত্রজ্ঞানের মুখাপেক্ষী হয়ে উঠল। এদের মধ্যে আরবি ভাষার নিয়মাবলি, বিবেচনা ও অনুমানের নিয়মাবলি এবং ইমামী ধ্যান-ধারণাকে শুদ্ধ রাখার নিয়মাবলি হিসেবে গণ্য করা যায়। কারণ অভিনব মতবাদ ও ধর্মদ্রোহিতা তখন ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। এভাবে এসব শাস্ত্র এমন কিছু যোগ্যতার অধীন হয়ে পড়ল, যা শিক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা প্রয়োজন। ফলে এসব বিষয় সমগ্র শিল্পকর্মের অন্তর্গত বলে বিবেচিত হতে লাগল।

আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, শিল্পকলা নাগরিক জীবনের উপজীব্য এবং আরব বেদুইনগণ তা থেকে বহুদূরে অবস্থান করে। এ কারণেই শাস্ত্রাদিও নাগরিক জীবনের ফসল হয়ে দাঁড়ায় এবং আরবরা তার চর্চা ও আদান-প্রদান থেকে দূরেই রয়ে গেল। বর্তমানকালে এ নাগরিক জীবনের অধিকারীদের সবই অনারব অথবা তাদের সমতুল্য আশ্রিত পোষ্য ও বিভিন্ন নগরীর অধিবাসী। পরিচয় তাদের যাই হোক না কেন বর্তমানকালে তারা বিভিন্ন শিল্পকর্মে ও পেশায় নাগরিক জীবনের বিচিত্র অবস্থায় অনারবদের অনুসারী। কারণ তারা সেই পারস্য সাম্রাজ্যের কাল থেকে স্থায়ী নাগরিকত্বের অধিকারী বিধায় এসব বিষয়ে বেশি দক্ষ। এ কারণেই আরবি ব্যাকরণের প্রতিষ্ঠাতা হলেন সিবুয়াই, তাঁর পরে ফারেসি এবং তাঁদের পরে যুজ্জাজ[৩৬২]; তারা সকলেই বংশধারার দিক থেকে অনারব। কেবলমাত্র আরবি ভাষার পরিবেশে লালিত-পালিত হয়ে পৃষ্ঠপোষকতা ও আরবদের সাথে মেলামেশায় তা অর্জন করেছেন এবং তার জন্য নিয়মাবলি আবিষ্কার করে পরবর্তী মানব সমাজের জন্য একটি শাস্ত্রের জন্ম দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে হাদীসশাস্ত্রবিদগণ, যারা মুসলমানদের জন্য তা সংরক্ষণ করেছেন, তাদের অধিকাংশ অনারব অথবা অনারব ভাষা ও জীবন পরিবেশে লালিত-পালিত; কেননা এ শাস্ত্রের সমৃদ্ধি ইরাকের অবদান। জানা যায় যে, অসুলে ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদগণের সকলেই অনারব ছিলেন; অনুরূপ এলমে কালামেরও এবং এরূপ কুরআন ভাষ্যকারদের অধিকাংশ। বস্তুত শাস্ত্রাদির সংরক্ষণ ও সংকলনে অনারবরাই অগ্রসর হয়ে এসেছেন। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বাণীর সত্যতাই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছিলেন, 'জ্ঞান যদি আকাশের সীমাতেও ঝুলন্ত থাকে, তা হলেও পারস্যবাসীদের একটি দল তার নাগাল পাবে।'

যেসব আরব এ নাগরির জীবন ও তার সমৃদ্ধির সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং এর সংস্পর্শে এসে তাদের বেদুইন রীতি-নীতি ত্যাগ করতে সমর্থ হয়েছেন তারাও রাজ্য

৩৬২. আবু ইসহাক ইব্রাহিম আন্‌সারী; মৃত্যু ৩১১ (৯২৩ খ্রি.) হি: (র)।

শাসন ও নেতৃত্বের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন। আমরা আব্বাসী সাম্রাজ্যেই দেখতে পাই, সেখানে এমন অনেক বিষয় ছিল, যা তাদেরকে শাস্ত্রাদির চর্চা ও অনুসন্ধান থেকে রাজ্য শাসনের দিকেই বেশি আকৃষ্ট করেছে। তখন তারা সাম্রাজ্যের অধিকারী ও তার রক্ষক এবং তার শাসনকার্যে ব্যাপৃত। এ সঙ্গে তাদের মধ্যে শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগের প্রতি ঘৃণার ভাবও জন্ম লাভ করেছে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানও তখন শিল্পকর্মের ন্যায় পেশার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত নেতৃবৃন্দ সর্বদাই শিল্পকর্ম ও পরিশ্রমাদির প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে থাকেন। এমন কি যা অনুরূপ কার্যাদিতে নিয়োজিত করে, তাও তারা ভালো চোখে দেখেন না। এর ফল হয়েছে এই যে, এসব বিষয় অনারব এবং আরব ও অনারবের মিশ্রণের ফলে উদ্ভূত জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা উদ্যোগী হয়েছেন, তাদের কবলেই ঠেলে দেয়া হয়েছে। নেতৃবৃন্দ সর্বদাই এসব বিষয় তাদের দ্বারাই চর্চিত হোক, এ অভিমত পোষণ করেছেন। যেমন এটা তাদেরই ধর্ম এবং তাদেরই জ্ঞান-বিজ্ঞান। এর ফলে নেতৃবৃন্দ কখনই নিজেদেরকে এসব বিষয়ের অধিকারী না হওয়ার জন্য তুচ্ছ মনে করেন নি। শেষ পর্যন্ত জ্ঞানচর্চার সব কিছুই আরবদের অধিকারচ্যুত হয়ে অনারবদের দখলে চলে গেছে। এমন কি ধর্মীয় শাস্ত্রাদির সঙ্গেও এ নেতৃবৃন্দের সম্পর্ক বিরল হয়ে উঠেছে। কারণ তাঁদের কর্মধারাই এ বিরলত্বকে টেনে এনেছে। পরিণামে তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকারীদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে আরম্ভ করেছেন। কারণ তারা দেখতে পেয়েছেন যে, এসব জ্ঞানীরা এমন বিষয় নিয়ে ব্যাপৃত, যার সাথে নেতৃবৃন্দের কোনো সম্পর্ক নেই এবং তাদের রাজ্য শাসন ও রাজনীতিতে এসব বিষয় থেকে কোনো প্রকার সাহায্য সহানুভূতি পাওয়ার উপায় নেই। আমরা ইতিপূর্বে ধর্মীয় পদমর্যাদার আলোচনায় এ সম্পর্কে বলেছি। বস্তুত এটাই সেই কারণ, যদ্দরুন ধর্মীয় শাস্ত্রাদি অথবা সাধারণ বিষয় চর্চায় অনারবদের প্রাধান্য অনিবার্য হয়ে উঠেছে বলে আমরা মনে করি।

অবশ্য দর্শনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বলা যায় যে, তার চর্চা শাস্ত্রকার ও গ্রন্থকারদের পৃথক শ্রেণী হিসেবে গড়ে ওঠার পরই মুসলমান সমাজে প্রবেশ করেছে এবং শাস্ত্রচর্চাও ততদিনে শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তাও অনারবদের জন্য বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে এবং আরবরা তার চর্চাও পেশা হিসেবে গ্রহণ করা থেকে দূরে সরে রয়েছে। ফলে আরবি ভাষাভাষী অনারবরাই তার দায়িত্ব বহন করেছে এবং সব শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে এটি সত্য হয়েছে; যেমন ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।

ইসলামী জগতে যতদিন অনারবদের মধ্যে তাদের অঞ্চলগুলোতে ইরাক, খোরাসান ও মাওরায়ান্নাহারের নগর জীবন সমৃদ্ধ ছিল, ততদিন এ অবস্থাই বিরাজ করেছে। তারপর যখন উক্ত অঞ্চলগুলোর আলো নিভে গেছে এবং নগর জীবনের মধ্য দিয়ে জ্ঞান ও শিল্পচর্চার যে ঐশী নিয়ম প্রচলিত রয়েছে, তা অন্তর্হিত হয়েছে, তখন অনারবদের মধ্য থেকেও সামগ্রিকভাবে জ্ঞানচর্চার অভ্যাস লোপ পেয়েছে ও তারাও বেদুইন জীবনের মধ্যে [illegible] হয়ে পড়েছে। জ্ঞানচর্চা সমৃদ্ধ নগরজীবনের সাথেই আবার বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। বর্তমানকালে মিশর অপেক্ষা সমৃদ্ধ অঞ্চল আর কোথাও নেই; তাই জগজ্জননী, ইসলামের সৌধ এবং জ্ঞান ও শিল্পের উৎসভূমি। মাওরায়ান্নাহারে নগর

জীবনের এখনও কিছুটা বাকি আছে; তা সেখানকার সাম্রাজ্যের কল্যাণেই এখনও টিকে রয়েছে এবং সেই তুলনায় তাদের মধ্যেও যে জ্ঞান ও শিল্পকলার একটা অংশ অবশিষ্ট আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। তাদের মধ্যকার জ্ঞানীদের কিছু রচনা আমাদের এ অঞ্চলে এসে পৌঁছেছে। তা পাঠ করেই আমরা এরূপ ধারণা পোষণ করছি। এর রচয়িতা সাদউদ্দিন তাফতাজানী। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চল সম্পর্কে ইমাম ইবনে খতিব ও নাসিরউদ্দিন তুসীর পরে আমরা এমন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, যা আলোচনা হিসেবে চরম কোনো পর্যায়ের কীর্তি বলে গণ্য করা যেতে পারে।

পাঠক, এ বিষয়টি বিবেচনা করুন ও চিন্তা করে দেখুন; তাহলে আপনি জগতের বিচিত্র অবস্থার অদ্ভুত অনেক কিছু দেখতে পাবেন। 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন।'[৩৬৩] তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই; তিনি একক ও তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাঁরই জন্য রাজ্য ও তাঁরই জন্য প্রশংসা এবং তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি সর্বোত্তম নির্ভর। তিনি সব প্রশংসার অধিকারী।

৩৬৩. কোরান; ৩, ৪৭।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[কোনো অনারব যখন তার ভাষায় বিজ্ঞ হয়ে ওঠে, তখন তার পক্ষে আরবি ভাষাভাষীদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন ত্রুটিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়]

এর রহস্য এই যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত আলোচনা একমাত্র স্মৃতি ও কল্পনালব্ধ তাৎপর্যাদির মধ্যেই ঘটে থাকে। এটি ধর্মীয় শাস্ত্রাদি হোক বা মননশীল শাস্ত্রাদি হোক, অবস্থা একই। ধর্মীয়শাস্ত্রাদির অধিকাংশ আলোচনাই শব্দনির্ভর। আবার এ শব্দাবলির উপাদান কুরআন ও হাদীসের নির্দেশাদি এবং তাদের ভাব প্রকাশক ভাষা থেকে গৃহীত হয়ে থাকে। এদের সবই কল্পনা নির্ভর। এমনিভাবে মননশীল শাস্ত্রাদির অবস্থানও স্মৃতির মধ্যে। ভাষা অন্তরস্থিত এসব তাৎপর্যকে প্রকাশ করে থাকে। শিক্ষাদান ও তর্ক-বিতর্কে কথোপকথনের মাধ্যমে ভাষা এ ভাবকে পরস্পরের কাছে উপস্থিত করে এবং সে সম্পর্কে যোগ্যতা অর্জন করতে হলে শাস্ত্রাদির এ আলোচনা দীর্ঘদিন ধরে অনুশীলন করতে হয়।

শব্দ ও ভাষা অন্তরস্থিত এ ভাবের ওপর যেমন আবরণ ও যবনিকা স্বরূপ, তেমনই তাৎপর্যাদির জন্য বন্ধন ও সীলমোহর বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং তাদের অন্তর্গত অর্থাদি উদ্ধার করতে হলে শব্দাবলি ও অর্থের ওপর তাদের ভাষাগত নির্দেশ অনুধাবন করা আবশ্যক এবং অনুসন্ধিৎসুকে অবশ্যই এ সম্পর্কে উত্তম যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। তা না হলে তাকে স্মৃতিনির্ভর আলোচনার ক্ষেত্রে যেমন বাধার সম্মুখীন হতে হয়, তা থেকেও বেশি বাধা এসে তার সামনে উপস্থিত হবে। যখন তার যোগ্যতা এসব অর্থ নির্দেশের ক্ষেত্রে দৃঢ় হয় এবং শব্দাবলি ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের অর্থ স্মৃতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়; যেমন স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে; তখন বোধ ও অর্থের মধ্যকার এ যবনিকা সম্পূর্ণ দূর হয় অথবা শিথিল হয়ে আসে। তখন সংশ্লিষ্ট আলোচনার যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধির কাজটিই শুধু অবশিষ্ট থাকে। অবশ্য এই সমুদয়-বিষয়টি তখনই সত্য হয়, যখন শিক্ষা-দীক্ষারূপে এবং বর্ণনা ও ভাষণের মাধ্যমে হয়।

কিন্তু যদি শিক্ষার্থী অধ্যয়ন, পুস্তকের বাধ্যবাধকতা এবং শাস্ত্রাদির সমস্যার সংকলন গ্রন্থের লিপি-রেখাগুলো অনুধাবনের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে, তাহলে সেখানে গ্রন্থে ব্যবহৃত লিপি ও তার রেখাবিন্যাস এবং কল্পনায় কথিত শব্দাদির মধ্যে আরও একটি যবনিকা এসে উপস্থিত হয়। কারণ লিপির রেখা কথিত শব্দাবলির উপর বিশেষ নির্দেশ বহন করে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ নির্দেশ অবগত হওয়া যায় না, ততক্ষণ বর্ণনার তাৎপর্য উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয় না এবং অসম্পূর্ণ যোগ্যতার দ্বারা তা জানতে গেলে

পরিচয়ও সেই পরিমাণে অসম্পূর্ণ হয়। এর ফলে পাঠক ও শিক্ষার্থীর সামনে আরও একটি আবরণের সৃষ্টি হয়, যা যোগ্যতার জন্য উদ্দিষ্ট বিষয় অর্জন ও তার মধ্যে প্রথম আবরণটি অপেক্ষা ঘনীভূত হয়ে ঝুলতে থাকে। সুতরাং যখন তার অর্জিত শব্দ নির্দেশ ও লিপি নির্দেশ সম্পর্কীয় যোগ্যতা দৃঢ় হয়, তখন তার ও উদ্দিষ্ট তাৎপর্যাদির মধ্যকার সব আবরণ ছিন্ন হয়ে যায় এবং এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, সে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আলোচনার অর্থ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। যে-কোনো ভাষায় শব্দাবলি ও লিপির অন্তর্গত তাৎপর্যগুলোর এটাই সাধারণ অবস্থা। এজন্যই অল্পবয়সী শিক্ষার্থীরা এর জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনে বেশি পারদর্শী হয়ে থাকে।

অতঃপর ইসলামী জগতে রাজশক্তি যখন বিস্তৃতি লাভ করল, বহু জাতি এসে তার বশ্যতা স্বীকার করল এবং যারা একদিন নিরক্ষরতার ধারা ও ঐতিহ্য বহন করতেন, সেই পূর্বসূরিদের নবুয়ত ও গ্রন্থনির্ভর শাস্ত্রাদির যুগ অন্তর্হিত হল; তখন রাজশক্তি, পরাক্রম ও বিজিত জাতির সংস্রব তাদের মধ্যে নাগরিকত্ব ও সভ্যতার আবির্ভাব ঘটাল। এক সময়ে যে ধর্মীয় শাস্ত্রাদি শ্রুতিনির্ভর ছিল, তাকেই তারা প্রয়োজনে শিল্পকর্মে পরিণত করলেন। তাদের মধ্যেও যোগ্যতা দেখা দিল এবং সংকলন ও রচনার সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। তারা অন্যান্য জাতির শাস্ত্রাদিকেও আয়ত্তে আনবার জন্য অনুবাদের মাধ্যমে তাদের শাস্ত্রভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত করলেন এবং তাদেরকে তাদের চিন্তার আধারে স্থাপন করলেন। তারা এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অনারব ভাষার কবল থেকে মুক্ত করে তাদের নিজের ভাষায় যেমন আনলেন, তেমনি তাদেরকে পূর্বসূরিদের উপলব্ধির পরিধি থেকে বিস্তৃততর পরিধিতে বিন্যস্ত করলেন। ফলে অনারব ভাষায় এদের মূল গ্রন্থগুলো সম্পূর্ণ বিস্তৃত বিষয়, পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ এবং বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা হিসেবে পরিগণিত হল।

এভাবে সমুদয় জ্ঞানসম্ভারই আরবি ভাষায় সঞ্চিত হয়ে উঠল এবং তাদের সংকলন আরবি লিপির রেখায় পঙ্‌ক্তিবদ্ধ হয়ে গেল। সুতরাং উপরিউক্ত জ্ঞানাদির চর্চাকারীদের জন্য অন্যান্য ভাষার চেয়ে এ আরবি ভাষার শব্দাবলি ও লিপির নির্দেশ জানা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ল। কারণ অন্য ভাষা তখন বিলুপ্তির পথে এবং তাদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার কোনো অবকাশই তখন ছিল না।

আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, ভাষা যেমন জিহ্বায় উদ্ভূত একটি যোগ্যতা, তেমনি লিপিকৌশলও হস্তজাত একটি যোগ্যতা। সুতরাং যে জিহ্বা অনারব ভাষার যোগ্যতায় অগ্রগামী হয়, তার পক্ষে আরবি ভাষায় সমান দক্ষতা দেখানো কখনই সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ আমরা ইতিপূর্বে এটাও বলেছি যে, যদি কারও পক্ষে একটি শিল্পকর্মে যোগ্যতা অর্জিত হয়, তাহলে খুব কমক্ষেত্রেই তার পক্ষে অন্যতর বিষয়ে উত্তম যোগ্যতা প্রদর্শন সম্ভব হয়ে থাকে, এটা একান্তই বাস্তব। সুতরাং শিক্ষার্থী যদি আরবি ভাষা এবং তার শব্দাবলির নির্দেশ ও লিপির প্রকাশভঙ্গি বুঝতে অক্ষম হয় তা হলে তার কাছে তদন্তর্গত তাৎপর্যগুলোও দুর্বোধ্য হয়ে পড়বে; যেমন ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। অবশ্য যদি তার আরবি ভাষা শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করার সময় অনারব ভাষার যোগ্যতা দৃঢ় না হয়ে থাকে, তা হলেও হতে পারে। যেমন অনারবদের অল্পবয়স্ক সন্তান-সন্ততিরা, যারা অনারব ভাষায় যোগ্যতা অর্জনের পূর্বেই আরবদের মধ্যে লালিত-পালিত

হবার সুযোগ লাভ করেছে। সুতরাং তাদের কাছে আরবি ভাষাই তখন প্রথম ভাষা এবং এর ফলে তাদের আরবি ভাষার তাৎপর্যাদি অনুধাবন করতে কোনো প্রকার বেগ পেতে হয় না।

অনুরূপ অসুবিধা দেখা দেয় তাদের জন্যও, যারা আরবিলিপি শেখার আগে অনারব লিপিতে দক্ষ হয়ে ওঠেন। এজন্য আমরা অধিকাংশ অনারব শাস্ত্রবিদগণকে দেখতে পাই, তারা তাদের অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানের বৈঠকে গ্রন্থাদি থেকে ভাষ্যব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করার পরিবর্তে উচ্চস্বরে পাঠ করার প্রতি জোর দেন। তারা এর দ্বারা তাদের মধ্যকার সেসব আবরণ ছিন্ন করার শ্রম থেকে কতকাংশে তাদেরকে অবকাশ দেন এবং সহজে তাৎপর্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন। বর্ণনায় ও লিপিজ্ঞানে যার যোগ্যতা রয়েছে, তার পক্ষে তার যোগ্যতার সম্পূর্ণতার জন্যই অনুরূপ আচরণের প্রয়োজন হয় না। কারণ তার জন্য তখন লিপি থেকে শব্দাবলি ও শব্দাবলি থেকে অর্থসমূহের হৃদয়ঙ্গম করা সুদৃঢ় সহজাত প্রবৃত্তির মতই হয়ে দাঁড়ায় এবং তার বোধ ও তাৎপর্যাদির মধ্যকার যবনিকা উত্তোলিত হয়।

অবশ্য অনেক সময় একাগ্র শিক্ষা, ভাষার অনুশীলনী ও লিপির অভ্যাস চর্চাকারীকে যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম করে তোলে; যেমন আমরা বহু অনারব শাস্ত্রবিদের মধ্যে দেখতে পাই; যদিও এরূপ দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। অন্যদিকে অনুরূপ দক্ষ ব্যক্তিগণকেও তাদের সমপর্যায়ের আরবি জ্ঞানীদের সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, আরবীয়দের যোগ্যতা বেশি উচ্চমান ও দক্ষতাসম্পন্ন। কারণ অনারব জ্ঞানীদের মধ্যে অনারব ভাষাজ্ঞানের অগ্রগামিতার ফলে যে ত্রুটি বিদ্যমান, তা অনিবার্যভাবেই তাদেরকে পশ্চাদপদ করে রাখে।

আমাদের পূর্ববর্তী বক্তব্য অর্থাৎ ইসলামী জগতে শাস্ত্রবিদদের অধিকাংশই অনারব, এর দ্বারা এ মন্তব্যে আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। কারণ এখানে আমরা অনারব বলতে অনারব বংশোদ্ভূত বোঝাতে চেয়েছি এবং তাদের মধ্যে নাগরিকত্বের একটি দীর্ঘাচরিত বোধ থাকায়; যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি যে, তা-ই শিল্পকৌশল ও যোগ্যতার উদ্ভাবক; তারা শাস্ত্রাদিতে পারঙ্গম হয়ে দেখা দিয়েছেন। কিন্তু ভাষার অনারবত্ব এ শ্রেণীর বিষয় নয় এবং আমাদের মন্তব্যে আমরা এটাই বোঝাতে চেষ্টা করেছি।

এক্ষেত্রে এ আপত্তিও উত্থাপন করা যায় না যে, গ্রিকরাও অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে এসেছে। কারণ তারা তা তাদের প্রথম অর্জিত ভাষাতেই করেছে এবং তার জন্য যে লিপি তারা ব্যবহার করেছে, তাও তাদের মধ্যে সুপরিচিত। অথচ ইসলামী জগতে অনারব শিক্ষার্থীরা তাদের প্রথম অর্জিত ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় জ্ঞান আহরণ করে এবং এমন এক লিপির দ্বারস্থ হয়, যা তাদের যোগ্যতার কাছে অপরিচিত। এজন্য তা তাদের জন্য বাধার সৃষ্টি করে; যেমন ইতিপূর্বে আমরা বলেছি। এ বিষয়টি সর্বশ্রেণীর অনারব তথা পারস্যবাসী, রোমীয়, তুর্কি, ফিরিঙ্গী এবং অনারব ভাষাভাষী অন্য সব জাতির জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। বস্তুত 'এ বিষয়ে ইঙ্গিতজ্ঞদের জন্য প্রচুর নিদর্শন রয়েছে।'[৩৬৪]

---

৩৬৪. কোরান; ১৫, ৭৫।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[আরবি ভাষা সম্পর্কীয় শাস্ত্রাদি]

এর মূল বিভাগ চারটি : অভিধান, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও সাহিত্য। ধর্মীয় শাস্ত্রবিদদের জন্য এদের জ্ঞানার্জন অত্যাবশ্যকীয়। কারণ ধর্মীয় বিধানের সবই কুরআন ও হাদীস থেকে গৃহীত হয়েছে এবং এসব উৎস আরবি ভাষায় সংরক্ষিত রয়েছে। যেসব সাহাবী ও তাবেয়ী এগুলো বর্ণনা করেছেন, তারাও আরবি ভাষাভাষী এবং এ সম্পর্কীয় যাবতীয় সমস্যার সমাধানও তাদের ভাষায় বিদ্যমান। সুতরাং যিনি ধর্মীয় শাস্ত্রাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে ইচ্ছুক, তাকে অবশ্যই এ সংশ্লিষ্ট আরবি ভাষার শাস্ত্রাদি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

এসব শাস্ত্র বর্ণনার উদ্দেশ্য সাধনে নিজেদের অন্তর্গত শক্তির পর্যায়ক্রম অনুসারে যে তারতম্য বহন করে, তার জন্যই তাদের গুরুত্বের তারতম্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। আমাদের আলোচনায় একের পর এক প্রতিটি শাস্ত্রের এ প্রকার গুরুত্ব বর্ণিত হবে। এর ফলে আমরা বুঝতে পারব যে, তাদের মধ্যে ব্যাকরণই সর্বাগ্রগণ্য। কারণ তার দ্বারাই উদ্দিষ্ট বর্ণনার মৌল উপাদানগুলো নির্দেশিত হয়ে প্রকাশ পায় এবং তার কল্যাণেই কর্তা ও কর্ম, উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। সুতরাং ব্যাকরণ না হলে বর্ণনার মৌল উপাদানই অজানা থাকত।

অবশ্য যথার্থভাবে দেখতে গেলে অভিধানই সকলের অগ্রগণ্য হওয়া উচিত। কিন্তু অসুবিধা এখানে যে, তাতে আহৃত শব্দাবলির গঠন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান থাকে এবং এর বিপরীতে ব্যাকরণের বিভক্তি এদের সাথে যুক্ত হয়ে অন্বয়, অন্বিত ও অন্বয়ী নির্দেশের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে এদের পরিবর্তন ঘটায় ও এদের পূর্বরূপের কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট থাকে না। এ কারণেই অভিধান অপেক্ষা ব্যাকরণের গুরুত্ব সমধিক; কেননা সে সম্পর্কে সামগ্রিক বোধগম্যতার ক্ষেত্রে বিঘ্নস্বরূপ। কিন্তু অভিধানের অবস্থা তদ্রূপ নয়। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা এবং তিনিই সর্বসহায়তার আধার।

ব্যাকরণশাস্ত্র

জেনে রাখুন, প্রচলিত ধারণা অনুসারে ভাষা হল বক্তার মনোভাবের বর্ণনা এবং এ বর্ণনা মনোভাব প্রকাশের ইচ্ছা থেকে জিহ্বার ক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভূত হয়। সুতরাং এটি সম্পন্ন হবার জন্য ক্রিয়াশীল অঙ্গের মধ্যে অর্থাৎ জিহ্বার একটি স্থায়ী যোগ্যতার জন্ম হওয়া

প্রয়োজন। প্রত্যেক জাতির মধ্যে তাদের পরিভাষা অনুসারে জিহ্বার এরূপ সক্রিয়তার বর্ণনা বিদ্যমান।

মনোভাব প্রকাশের জন্য আরবদের অর্জিত জিহ্বার এ যোগ্যতাকে সর্বোত্তম ও অতিশয় প্রাঞ্জল বলে গণ্য করা হত। কেননা তাতে ব্যবহৃত শব্দাবলি তাদের নির্দিষ্ট অর্থের চেয়ে বেশি তাৎপর্য বহনের ক্ষমতা রাখত। যেমন আরবি ভাষায় ব্যবহৃত স্বরচিহ্নগুলো কর্তা, কর্ম ও সম্বন্ধকারকের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে; যেমন তাতে ব্যবহৃত বর্ণাদি ক্রিয়াপদকে তার স্বরূপের মধ্যে রেখে অন্য কোনো শব্দের সাহায্য ছাড়াই সকর্মক করে তোলে। একমাত্র আরবি ভাষাতেই এ ব্যবস্থাটি বিদ্যমান। কিন্তু আরবি ছাড়া অন্য সব ভাষায় প্রতিটি অবস্থা ও অর্থের জন্য তার নির্দেশকারী বিশেষ শব্দের প্রয়োজন হয়। এজন্যই আমরা দেখতে পাই একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য আরবি ভাষায় যে বর্ণনা আমরা ব্যবহার করি, অনারব ভাষায় তা দীর্ঘতর হয়ে থাকে। এটাই সম্ভবত হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সেই বাণীর মর্মার্থ, যেখানে তিনি বলেছেন, 'আমাকে সুসংবদ্ধ বাণীরূপ দেওয়া হয়েছে এবং আমার জন্য আলোচনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।' সুতরাং আরবদের ভাষায় বর্ণমালা, স্বরচিহ্ন ও শব্দের গঠন প্রক্রিয়ায় মনোভাব প্রকাশের এমন একটি সহজসাধ্যতা বর্তমান, যা তারা কোনো প্রকার শিল্পকৌশল ছাড়াই ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারে। বস্তুত তা তাদের ভাষার সেই যোগ্যতা, যা তাদের পূর্ববর্তীজনের কাছ থেকে পরবর্তীজন শিখে থাকে; যেমন আমাদের সন্তান-সন্ততিরা আমাদের ভাষা শিক্ষা করে।

অতঃপর ইসলামের আবির্ভাব ঘটলে আরবরা হেজাজ ত্যাগ করে অন্যান্য জাতি ও সাম্রাজ্যের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করল এবং অনারবদের সাথে মিশে গেল। ফলে অনারবদের মধ্যে যারা আরবি ভাষাভাষী হয়ে উঠল, তাদের উচ্চারণ বৈচিত্র্য শুনে আরবদের এ ভাষাগত যোগ্যতায় পরিবর্তন দেখা দিল। বস্তুত শ্রবণশক্তিই ভাষাগত যোগ্যতার নিয়ামক। সুতরাং শ্রবণশক্তি যখন বিকৃত উচ্চারণ শুনতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তখন তার প্রতিক্রিয়ায় ভাষাগত যোগ্যতার মধ্যেও বিকৃতি দেখা দেয়। ফলে জ্ঞানীরা ভাষার এরূপ পরিবর্তন দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তারা ভাষার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি এবং অনুরূপভাবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলে কুরআন-হাদীসের অর্থ বোঝাও দুষ্কর হয়ে ওঠার আশঙ্কা করলেন। এর জন্য তারা ভাষার প্রচলিত ধারা থেকে এ যোগ্যতাকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে কতগুলো নিয়ম-কানুন আবিষ্কার করলেন। এগুলো সার্বিক ধারণা ও ব্যবহার-বিধির সমতুল্য এবং এগুলো দ্বারা সর্বপ্রকার বক্তব্যকে বিবেচনা করে তুলনীয়কে তুলনীয়ের সাথে সংযুক্ত করে দিলেন। যেমন কর্তা 'উকার' বিশিষ্ট হবে, কর্ম 'আকার' বিশিষ্ট হবে এবং উদ্দেশ্য 'উকার' বিশিষ্ট হবে। এর পর তারা এসব পদের স্বরচিহ্নের পরিবর্তনের ফলে তাদের অর্থ নির্দেশের বৈচিত্র্যকে লক্ষ করলেন এবং তার পরিভাষাগত নাম রাখলেন 'ইরাব' ও যা দিয়ে এরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়, তার নাম রাখলেন 'আমেল'। এরূপ অন্যান্য বিষয়। এভাবে সমুদয় বিষয়টি সম্পর্কে তারা বিশেষ পরিভাষার সৃষ্টি করলেন এবং সব কিছু গ্রন্থে আবদ্ধ করে তাকে তাদের জন্য একটি বিশিষ্ট শিল্পকর্ম হিসেবে গড়ে তুললেন। এরূপে শাস্ত্র গড়ে উঠল, তারা তার নাম রাখলেন 'এলমে নুহু'।

এ বিষয়ে সর্বপ্রথম যিনি গ্রন্থ রচনা করেন, তিনি হলেন বনি কেনানার আবুল আসোয়াদ আদ্দৌলী। বলা হয়, তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর নির্দেশে এ কার্য সম্পাদন করেন[৩৬৫]; কেননা তিনি এ ভাষাগত যোগ্যতার পরিবর্তন লক্ষ করে তাকে সংরক্ষণের জন্য এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে গ্রন্থকার অতিদ্রুত প্রচলিত নিয়মাবলি একত্র বিন্যাস করতে তৎপর হন। তাঁর পরে অনেকেই এ বিষয়ে গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। এভাবে রচনার ধারা সম্রাট হারুনুর রশীদের শাসন আমলে খলিল ইবনে আহমদ আল ফরাহিদীর[৩৬৬] কাছে এসে উপনীত হয়। এ সময়ে আরবদের মধ্যে ভাষাগত এ যোগ্যতার অভাব দেখা দেওয়ায় মানুষ এ বিষয়ের পূর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল। ফরাহিদী এ ব্যাকরণ শিল্পের সংস্কার সাধন করে তার অধ্যায়গুলোর পূর্ণতা দান করেন। তাঁর কাছ থেকে এ সিবুয়াই[৩৬৭] গ্রহণ করেন এবং এর শাখা-প্রশাখার পূর্ণতা দান ও এর সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রাচুর্য বিধান করেন। এসব কিছু মিলিয়েই তাঁর সেই বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয়, যা পরবর্তীকালে এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনাকারী প্রত্যেকের জন্যই আদর্শ হিসেবে বিরাজ করেছে। তারপর এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য সংক্ষিপ্ত গ্রন্থাদি রচনা করেন আবু আলী আল ফারেসি[৩৬৮] ও আবুল কাসেম আল যুজ্জাজ[৩৬৯]। তাঁরাও এসব গ্রন্থে পূর্বোল্লেখিত আদর্শ গ্রন্থের ধারা অনুসরণ করেছেন।

অতঃপর এ শিল্পকর্মে আলোচনা দীর্ঘতর হয়েছে এবং কুফা ও বসরার শাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। এ দুটিই আরবি ভাষাভাষীদের প্রাচীন শহর। ফলে তাঁদের মধ্যে যুক্তি-প্রমাণের বহর বেড়েছে এবং উক্ত বিষয় শিক্ষাদানের পথ পৃথক হয়ে গেছে। তাঁদের অনুসৃত নিয়মাবলির বিভিন্নতার জন্য কোরানের বহু আয়াতের স্বরচিহ্নাদি সম্পর্কে মতের বিভিন্নতা বেড়ে গেছে এবং পরিণামে এগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী শাস্ত্রবিদরা সংক্ষেপণের মতাদর্শ গ্রহণ করেছেন এবং এসব দীর্ঘ আলোচনার সমুদয় সার সংগ্রহ করে তাঁরা অধিকাংশের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেছেন। যেমন ইবনে মালেক[৩৭০] তাঁর 'তাসহিল' নামক গ্রন্থে এবং অনুরূপ অন্যান্য গ্রন্থে অন্যরা করেছেন। অথবা তাঁরা শিক্ষার্থীদের জন্য কেবলমাত্র প্রাথমিক বিষয়গুলোর সার সংগ্রহ করেছেন; যেমন যমখশরী তাঁর 'মুফাস্‌সাল' নামক গ্রন্থে এবং ইবনে হাজেব তাঁর 'মুকাদ্দমা' নামক গ্রন্থে এ রীতি অনুসরণ করেছেন। অনেক সময় তাঁরা অনুরূপ প্রচেষ্টাকে পদ্যের মধ্যেও ধরে রাখতে চেষ্টা করেছেন। যেমন ইবনে মালেকের 'কুবরা' ও 'মুগরা' নামক 'রেজাজ' পদ্যদ্বয়ে এবং ইবনে মুতীর[৩৭১] 'আলফিয়া' নামক 'রেজাজ' পদ্যে এর স্বাক্ষর বিদ্যমান। এভাবে বলতে গেলে এ বিষয়ে রচনার পরিমাণ সংখ্যাও আয়ত্তের অতীত হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতিও

৩৬৫. হযরত আলীর এ নির্দেশের ব্যাপারটি ঐতিহাসিক কোনো প্রমাণ নেই।
৩৬৬. খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী।
৩৬৭. মৃত্যু অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে।
৩৬৮. হাসাম ইবনে আহমদ; ২৮৮-৩৭৭ (৯০১-৯৮৭ খ্রি:) হি:।
৩৬৯. আবদুর রহমান ইবনে ইসহাক; মৃত্যু ৩৭৭ (৯৪৯ খ্রি:) হি:।
৩৭০. মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্; মৃত্যু ৬৭২ (১২৭৪ খ্রি:) হি:।
৩৭১. ইয়াহিয়া ইবনে আবদুল মুতি আজ জোয়াই; মৃত্যু ৬২৮ (১২৩১ খ্রি:) হি:।

বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। ফলে পূর্বসূরিদের শিক্ষাধারা উত্তরসূরিদের শিক্ষাধারা থেকে বিভিন্ন এবং এক্ষেত্রে কুফী, বসরী, বাগদাদী ও আন্দালুসী সকলের ধারাই বৈচিত্র্যমণ্ডিত।

জনবসতির হ্রাসপ্রাপ্তির ফলে সর্বপ্রকার শাস্ত্র ও শিল্পকর্মে যে নির্জীবতা আমরা লক্ষ করেছি, তার ফলে এ শিল্পকর্মটিও গতায়ু হতে বসেছে। এ সময়ে মাগরিবে আমাদের কাছে মিশর থেকে এ বিষয়ক একটি সংকলন এসে পৌঁছেছে, যার সাথে সেখানকার জ্ঞানীদের অন্যতম জামালউদ্দিন ইবনে হিশামের নাম যুক্ত আছে।[৩৭২] তিনি এতে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত আকারে স্বরচিহ্নাদির বিষয়টির পূর্ণতাব্যঞ্জক আলোচনা উপস্থিত করেছেন। তিনি বর্ণমালা, শব্দাবলি ও বাক্যাদির উপর কথা বলেছেন। তিনি উক্ত শাস্ত্রের অধিকাংশ অধ্যায়ে স্বরচিহ্নাদি সম্পর্কিত যেসব পৌনঃপুনিক আলোচনা ছিল, তা পরিত্যাগ করেছেন। তিনি তাঁর এ গ্রন্থটির নাম রেখেছেন 'আল-মুগনী ফিল ইরাব'। তিনি এতে কোরানের স্বরচিহ্নাদি সম্পর্কে যুক্তি দেখিয়েছেন এবং তাদেরকে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে নিয়মানুযায়ী সুসজ্জিত করেছেন। এ গ্রন্থ পাঠ করে আমরা এক গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পেয়েছি। যথার্থই এটি তাঁর সংশ্লিষ্ট শিল্পকর্মে সমুন্নত দক্ষতা ও পরিপূর্ণ গভীরতার সাক্ষ্য বহন করে। মনে হয়, তিনি এ গ্রন্থে 'মোসেলের' বৈয়াকরণদের পন্থা অনুসরণ করেছেন। মোসেলীরা এ বিষয়ে ইবনে জিন্নীর পদাঙ্ক অনুসরণ ও তাঁর প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এর ফলে পূর্বোক্ত গ্রন্থকার এমন অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যে, তা তাঁর যোগ্যতার শক্তি ও তৎসংশ্লিষ্ট অবগতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। বস্তুত 'আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিতে যা ইচ্ছে বৃদ্ধি করে থাকেন'।[৩৭৩]

অভিধানশাস্ত্র

এ শাস্ত্রে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলির অর্থ বিশ্লেষণ করা হয়। এর উদ্ভব সম্পর্কীয় বর্ণনা এই যে, যখন ব্যাকরণবিদদের দ্বারা অভিহিত ভাষায় 'ইরাব' তথা স্বরচিহ্নাদির বিকৃতির মাধ্যমে আরবি ভাষার যোগ্যতা বিকৃতির অধীন হতে লাগল, তখনই তার সংরক্ষণের জন্য নিয়মাবলি আবিষ্কৃত হল; যেমন ইতিপূর্বে আমরা এ সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছি। কিন্তু তারপরও অনারবদের সাথে মেলামেশা ও ওঠাবসার ফলে বিকৃতির পরিমাণ বেড়েই চলল; এমন কি তা শব্দাবলির অর্থকেও বিকৃত করে তুলতে লাগল। ফলে আরবি ভাষার বহু বাকধারাকে ভাষাভাষীদের কাছে নির্ধারিত স্থান থেকে ভিন্নস্থানে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা দিল। এরূপ হবার মূলে আরবি ভাষাভাষী অনারবদের দ্বারা প্রচলিত অপটু বাকরীতিই দায়ী; কেননা তা প্রাঞ্জল আরবীয় রীতির বিরোধী। এর ফলে গ্রন্থ ও সংকলন রচনার মাধ্যমে শব্দাবলির অর্থ ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াল; যাতে কুরআন ও হাদীসের অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিকৃতির ফলে দুর্বোধ্যতার আশঙ্কা মূর্তিমান হয়ে না ওঠে। এ উদ্দেশ্যে বহু ভাষাবিদজ্ঞানী উদ্যোগী হন এবং উক্ত বিষয়ে সংকলনাদি রচনা করতে লাগলেন।

---

৩৭২. আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ; ৭০৮-৭৬১ (১৩০৯-১৩৬০ খ্রি:) হি:।
৩৭৩. কোরান; ৩৫, ১।

এ বিষয়ে সর্বাগ্রে রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন খলিল ইবনে আহমদ আল-ফরাহিদী। তিনি 'কিতাবুল আইন' নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং তার মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণ বিন্যস্ত সর্বপ্রকার প্রকৃতি, তথা দ্বিবর্ণী, ত্রিবর্ণী, চতুর্বর্ণী ও পঞ্চবর্ণী শব্দাবলিকে একত্রে গ্রথিত করেন। এ পঞ্চবর্ণীই আরবি ভাষায় বর্ণবিন্যাসের শেষ পর্যায়। গ্রন্থকার এ একত্রীকরণকে সুসংবদ্ধ ধারাবৈচিত্র্যে সম্পন্ন করেছেন।

এর বর্ণনা এই যে, দ্বিবর্ণী শব্দাবলির সবই এক থেকে সাতাশ পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যার পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসে বের হয়ে আসে। এ সংখ্যা সমগ্র বর্ণমালার চেয়ে এক কম। কারণ তাদের একটি বর্ণ এ সাতাশ বর্ণের প্রতিটির সাথে ধরা হয়। ফলে সাতাশটি দ্বিবর্ণী শব্দের উৎপত্তি ঘটে। তারপর তাদের দ্বিতীয়টি অনুরূপভাবে ছাব্বিশটি বর্ণের সাথে ধরা হয়। এভাবে তৃতীয়টি ও চতুর্থটি। এরপর সাতাশ সংখ্যাটিকে আটাশ সংখ্যকের সাথে ধরলে একটি শব্দের উৎপত্তি ঘটে। সুতরাং তাদের সবগুলো সংখ্যার দিক থেকে পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসে এক থেকে সাতাশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এভাবে সমস্তই একত্র হয়; যেমন গণিতবিদদের কাছে এর জন্য সুপরিচিত প্রক্রিয়া বিদ্যমান। তা এই যে, প্রথম ও শেষ সংখ্যা একত্রে যোগ করে সমষ্টিকে অর্ধাংশের দ্বারা গুণ করতে হয় এবং তার ফলকে দ্বিবর্ণী শব্দের বৈপরীত্বের জন্য দ্বিগুণিত করতে হয়। কারণ বর্ণমালার বিন্যাসের ক্ষেত্রে অগ্র-পশ্চাৎকে গণ্য করা হয়ে থাকে। এভাবে যা বের হয়ে আসবে, তাই দ্বিবর্ণী শব্দের সমষ্টি।

এক থেকে ছাব্বিশ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা বিন্যাসে যে সমষ্টি দেখা দেয়, তাতে দ্বিবর্ণী শব্দসংখ্যা গুণ করলে ত্রিবর্ণী শব্দগুলো বের হয়ে আসে। কারণ প্রতিটি দ্বিবর্ণী শব্দের সাথে এক বর্ণ বৃদ্ধি করলেই ত্রিবর্ণী হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে দ্বিবর্ণী শব্দগুলো একক বর্ণের আকারে অবশিষ্ট প্রতিটি বর্ণের সাথে যুক্ত হয় এবং এ অবশিষ্ট বর্ণের সংখ্যা দ্বিবর্ণীর পরে মাত্র ছাব্বিশটি। সুতরাং এগুলো এক থেকে ছাব্বিশ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক সংখ্যার বিন্যাসে একত্র হয় এবং তার সাথে দ্বিবর্ণী শব্দসমষ্টিকে গুণ করা হয়। এভাবে যে সংখ্যা বের হয়ে আসে, তাকে ছয়ের দ্বারা গুণ করা হয় এবং এটাই ত্রিবর্ণী শব্দসমষ্টির বৈপরীত্বের মান। এর ফলে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বারা বিন্যস্ত সমুদয় শব্দসমষ্টি বের হয়ে আসে। চতুর্বর্ণী ও পঞ্চবর্ণী শব্দ সম্পর্কেও এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়। এভাবেই গ্রন্থকার সমুদয় শব্দবিন্যাসকে একত্র করেছেন এবং পরিচিত ধারা অনুসারে ব্যঞ্জনবর্ণানুক্রমে গ্রন্থের অধ্যায়সমূহ বিন্যস্ত করেছেন।

তিনি এতে বর্ণাদির উচ্চারণস্থল অনুসারে শব্দবিন্যাসের ওপর নির্ভর করেছেন এবং এদিকে লক্ষ রেখেই কণ্ঠ্যবর্ণের দ্বারা তাঁর গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন; তারপর যথাক্রমে পরপর মূর্ধণ্য বর্ণ, দন্তমূলীয় বর্ণ ও ঔষ্ঠ্য বর্ণ স্থান পেয়েছে এবং অর্ধব্যঞ্জন তথা স্বরবর্ণগুলোকে সর্বশেষে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি কণ্ঠ্যবর্ণাদির মধ্যেও 'আইন' বর্ণ দিয়ে আরম্ভ করেছেন; কেননা তাই এ শ্রেণীর দূরতম উচ্চার্য বর্ণ। এজন্যই তিনি তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'কিতাবুল আইন'। কারণ পূর্বসূরিদের মধ্যে তাঁদের সংকলনাদির অনুরূপ নামকরণের প্রথা বিদ্যমান ছিল। তাঁরা গ্রন্থের প্রথম শব্দ ও পদ যাই থাকুক না কেন, তার দ্বারাই নামকরণ করতেন।

এরপর গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থের প্রচলিত ও অপ্রচলিত শব্দের পরিচয় প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে চতুর্বর্ণী ও পঞ্চবর্ণী শব্দাবলির মধ্যেই অপ্রচলিত শব্দের সংখ্যা অনেক; কেননা এগুলো দুরুচ্চার্য হওয়ায় আরবি ভাষাভাষীরা খুব অল্পই ব্যবহার করত। এর সাথে দ্বিবর্ণী শব্দাবলিও যুক্ত হয়েছে; বস্তুত এগুলো প্রচলনের দিক থেকে স্বল্পতার অধিকারী। ত্রিবর্ণী শব্দাবলিই সর্বাপেক্ষা বেশি ব্যবহৃত হয়েছে এবং তাদের প্রচলনের আধিক্যের জন্য গঠনও বেশি। গ্রন্থকার খলিল এ সমুদয়কেই দায়িত্ব সহকারে তাঁর কিতাবুল আইনে একত্র করেছেন এবং অতি উত্তম সম্পূর্ণতার সাথে তাদের পরিচয় তুলে ধরেছেন।

আন্দালুসের হিশাম আল মুয়াইয়েদ এর জন্য আবু বকর আল যুবায়দী[৩৭৪] চতুর্থ শতাব্দীতে এ কিতাবুল আইন, তার বিষয়বস্তুর সামগ্রিকতাসহ সংক্ষেপ করেন এবং তার সমুদয় প্রচলিত শব্দ পরিত্যাগ ও অধিকাংশ দৃষ্টান্তমূলক শব্দাদি পরিহার করেন। কণ্ঠস্থ করার ক্ষেত্রে তাঁর এ সংক্ষেপণ খুবই উত্তম বলে বিবেচিত হয়।

পূর্বাঞ্চলীয় জ্ঞানীদের মধ্যে আল জওহরী[৩৭৫] 'কিতাবুস্‌সিহাহ' রচনা করেন। তাঁর এ গ্রন্থটির শব্দাবলি সুপরিচিত বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত হয়েছে। তিনি এতে 'হামজা' (আলিফ) দিয়ে আরম্ভ করেছেন এবং শব্দাদির শেষ বর্ণ অনুসারে শিরোনাম ব্যবহার করেছেন। কারণ মানুষ এ শেষ বর্ণের ভিত্তিতেই শব্দাদি অনুসন্ধানে বেশি ব্রতী হয়। এজন্য তিনি এ ভিত্তিতে অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছেন। তারপর প্রথম বর্ণের ভিত্তিতে ও শব্দাবলিকে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত করেছেন এবং পরিচ্ছেদ আকারে শেষ বর্ণাদি পর্যন্ত শিরোনাম ব্যবহার করেছেন। তিনি খলিলের ন্যায় সমগ্র শব্দসম্ভারকে একত্র করেছেন।

অতএব এ বিষয়ে আন্দালুসবাসীদের মধ্যে দানিয়ার ইবনে সাইয়েদা[৩৭৬] আলী ইবনে মুজাহিদের শাসনকালে 'কিতাবুল মুহকাম' রচনা করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে অনুরূপ সামগ্রিকতার পরিচয় রেখেছেন এবং কিতাবুল আইনের বিষয়বিন্যাস অনুসরণ করেছেন। তিনি তাতে শব্দ প্রকরণ ও ধাতুরূপের ব্যবহার তুলে ধরেছেন; ফলে গ্রন্থটি একটি উৎকৃষ্ট সংকলনে পরিণত হয়েছে। তিউনিসের হেফসী সাম্রাজ্যের রাজন্যবর্গের অন্যতম আল মুস্তানসিরের সভাসদ মুহম্মদ ইবনে আবুল হুসাইন[৩৭৭] এ গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত-সার রচনা করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের বিষয় বিন্যাস পরিবর্তন করে কিতাবুল সিহাহ-এর ন্যায় শব্দের শেষ বর্ণানুযায়ী বিন্যাস ও শিরোনাম ব্যবহার অনুসরণ করেন। ফলে গ্রন্থটির বিষয়বস্তু এক উদরের যমজ ও এক ঔরসের দুই সন্তানরূপে পরিগণিত হয়েছে।

এ বিষয়ে নেতৃস্থানীয় ভাষাবিদদের মধ্যে 'কেরা'র[৩৭৮] 'কিতাবুল মুনজিদ', ইবনে দুরাইদের 'কিতাবুল জমহরা'[৩৭৯] এবং ইবনে আম্বারীর 'কিতাবুয্ যাহের'[৩৮০] সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

৩৭৪. মুহম্মদ ইবনে হাসান; মৃত্যু ৩৭৯ (৯৮৯ খ্রি:) হি:।
৩৭৫. ইসমাইল ইবনে হাম্মাদ; মৃত্যু খ্রি: একাদশ শতাব্দীর মধ্যে।
৩৭৬. আলী ইবনে ইসমাইল; ৩৯৮-৪৫৮ (১০০৭-১০৬৬ খ্রি:) হি: (?)।
৩৭৭. মৃত্যু ৬৭১ (১২৭৩ খ্রি:) হি:।
৩৭৮. কুরা; আলী ইবনে হুসাইন; খ্রি: দশম শতাব্দী।
৩৭৯. মুহাম্মদ ইবনে হাসান; মৃত্যু ৩২১ (৯৩৩ খ্রি:) হি:।
৩৮০. মুহম্মদ ইবনে কাশেম; ২৭১-৩২৮ (৮৮৫-৯৪০ খ্রি:) হি:।

আমাদের জানা মতে, এগুলোই অভিধানশাস্ত্রের ভিত্তিস্থানীয় রচনা। এছাড়াও কিছুসংখ্যক বিশেষ ধরনের শব্দকোষ বিদ্যমান, যাতে একক অধ্যায় অথবা সম্পূর্ণ অধ্যায়সমূহের বিষয় সন্নিবেশের প্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য এগুলোতে শব্দাবলির গাণিতিক সংখ্যা বিন্যাসের ব্যাপারটি গৌণ এবং পাঠক, আপনি অবশ্য লক্ষ করেছেন যে, পূর্বোক্তগুলোতে এ বিন্যাসের বিষয়টি ছিল মুখ্য।

এ শব্দকোষ সম্পর্কীয় অন্য একটি রচনা যমখশরীর রূপক শব্দাবলি সংগ্রহ। তিনি তার নামকরণ করেছেন 'আসাসুল বালাগত'। তিনি তাতে আরবদের দ্বারা ব্যবহৃত সর্বপ্রকার রূপক শব্দ এবং তাদের রূপকগত তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন। উপকারিতার দিক থেকে এ গ্রন্থটি অতিশয় উন্নতমানের।

অতঃপর আরবরা যেহেতু কিছুসংখ্যক শব্দকে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করে তার বিশেষ রূপের জন্য বিশিষ্ট অন্য কিছু শব্দ ব্যবহার করত, সেজন্য এসব শব্দ প্রচলন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে পৃথক হয়ে দেখা দিত। এর ফলে মানুষ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত জটিলতার জন্য ভাষা সম্পর্কীয় বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ল। যেমন তারা সাধারণভাবে যেসব বস্তুতে শুভ্রতা বিদ্যমান, সে সবের জন্য 'আবিয়ায' শব্দের প্রচলন করেছিল। এর পর তারা বিশেষভাবে অশ্বের মধ্যকার শুভ্রতার জন্য 'আশহায', মানুষের জন্য 'আযহার' এবং ছাগলের জন্য 'আমলাহ' শব্দ ব্যবহার করেছে; এমন কি এসব বিষয়ে 'আবিয়ায' শব্দ ব্যবহার অনিয়মিত ও আরবি ভাষা-নীতি থেকে বহিষ্কৃত বলে গণ্য হয়েছে।

অনুরূপ বিষয় অনুসরণ করে সালাবী[৩৮১] একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এ বিষয়ে তিনি অনন্য প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়ে তার নাম রেখেছেন 'ফেকহুল লুগাত'। এ গ্রন্থটি যে-কোনো অভিধানচর্চাকারীর জন্য আরবি ভাষারীতি থেকে বিচ্যুত হবার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার একটি উত্তম অবলম্বন। বস্তুত এক্ষেত্রে বাক্‌বিন্যাসের জন্য শুধু শব্দের প্রাথমিক প্রচলনের জ্ঞান যথেষ্ট নয়; বরং এ প্রসঙ্গে আরবদের ব্যবহারের বাস্তব প্রমাণও উপস্থিত থাকা দরকার। এ বিষয়টি গদ্যে ও পদ্যে ব্যবহারের জন্য সাহিত্যসেবীদেরই অত্যধিক প্রয়োজনীয়; যাতে তাদের একক শব্দ ব্যবহার ও মিশ্র শব্দগঠনে আরবি প্রয়োগ রীতি থেকে বিচ্যুতি মারাত্মক হয়ে না দাঁড়ায়। কারণ অনুরূপ কিছু স্বরচিহ্নাদি সম্পর্কীয় অনিয়ম অপেক্ষাও দূষণীয় ও গর্হিত।

অনুরূপভাবে পরবর্তীকালে উত্তরসূরিদের অনেকেই যৌগিক শব্দাবলি নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং যতদূর সম্ভব সামগ্রিকতার সাথে বিষয়টিকে উপস্থিত করেছেন। যদিও এসব প্রচেষ্টাকে চরম পর্যায়ের বলা যায় না, তবুও মোটের উপর অধিকাংশ শব্দ সম্পদই এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য এ বিষয়ে সর্বাধিক প্রচলিত শব্দাবলির সংগ্রহ, যেগুলো আকারে সংক্ষিপ্ত হলেও শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই সহজসাধ্য, তাদের সংখ্যা বর্তমানকালে প্রচুর। যেমন ইবনে সাকিতের[৩৮২] 'আল আলফায', 'সালাব'-এর[৩৮৩] 'আল ফসীহ' এবং অন্যান্যদের অনুরূপ রচনা এদের অনেকগুলো শব্দ সংগ্রহের

৩৮১. আবদুল মালেক ইবনে মুহম্মদ; ৩৭০-৪২৯/৩০ (৯৬২-১০৩৭/৩৯ খ্রি:) হি:।
৩৮২. ইয়াকুব ইবনে ইসহাক, মৃত্যু ২৪৩ (৮৫৭ খ্রি:) হি:।
৩৮৩. আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া; ২০০-২৯১ (৮১৬-৯০৪ খ্রি:) হি:।

দিক থেকে সংক্ষিপ্ততর। কারণ সংগ্রহকারী শিক্ষার্থীদের সুবিধার প্রতি লক্ষ রেখে এরূপ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছেন। 'আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা এবং সর্বোত্তম জ্ঞাতা'।[৩৮৪] তিনি ছাড়া অন্য কোনো প্রতিপালক নেই।

জেনে রাখুন, যে শ্রুতির দ্বারা অভিধানশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব, তা একমাত্র আরবদের মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে। তারা যেভাবে যে অর্থের জন্য এ শব্দাবলি ব্যবহার করেছে, তাই এ শ্রুতির ভিত্তি। এ কথা বলার উপায় নেই যে, তারা এদের প্রচলন ঘটিয়েছে; কারণ ভাষা সম্পর্কে এরূপ ধারণা অসঙ্গত ও অসম্ভব এবং তাদের মধ্যে কারও সম্পর্কে অনুরূপ কিছু জানা যায়নি। অনুরূপভাবে অনুমানের দ্বারাও ভাষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না; যতক্ষণ জানতে না পারি যে, তারা এভাবেই ব্যবহার করেছে, ততক্ষণ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যেমন সাধারণ মাদকদ্রব্যের দিক থেকে বিবেচনা করে 'আঙ্গুরের রস'-কে অনুরূপ অর্থে ব্যবহার করা হয়। কারণ এরূপ বিবেচনা করার পদ্ধতি অনুমানের মধ্যেই পড়ে এবং তা একমাত্র ধর্মীয় বিধানের ক্ষেত্রে অন্যতম মূলনীতি হিসেবেই গৃহীত হয়ে থাকে। অথচ ভাষার ক্ষেত্রে আমরা এমন ধরনের কোনো কিছু পাই না; তবে বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়াদির মধ্যে অনুরূপ কিছু হতে পারে এবং তাও সিদ্ধান্ত গ্রহণ মাত্র। এটিই নেতৃস্থানীয় ভাষাবিদদের অভিমত।

যদিও এ ব্যাপারে কাজী,[৩৮৫] ইবনে সুরাইহ্[৩৮৬] ও অন্যান্য জ্ঞানীরা অনুমান ব্যবহারের মত পোষণ করেন; কিন্তু এর নেতিবাচক মতটিই সর্বাগ্রগণ্য। এক্ষেত্রে এরূপ ধারণা পোষণ করার কোনো কারণ নেই যে, শব্দাবলির সংজ্ঞা নির্ধারণের মাধ্যমেই অভিধানশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে; কারণ এ সংজ্ঞার ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। একটি অপরিচিত শব্দের অস্পষ্ট অর্থ নির্দেশ করতে গিয়ে সুস্পষ্ট পরিচিত অর্থেরই সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। এজন্য অভিধানশাস্ত্রের কাজ হল 'এই শব্দের এই অর্থ'—এটিই প্রতিষ্ঠা করা এবং এদুটির মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

অলঙ্কারশাস্ত্র[৩৮৭]

আরবি ভাষাতত্ত্ব ও অভিধানশাস্ত্রের আবির্ভাবের পরই ইসলামী জগতে এ শাস্ত্রটির উদ্ভব ঘটেছে। এটাও ভাষাতত্ত্বেরই অন্তর্গত; কেননা এটাও শব্দাবলি, তাদের তাৎপর্য এবং যে উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহার ঘটে, তার বিশ্লেষণের সাথে সংযুক্ত। এর বর্ণনা এই যে, কথক তার বক্তব্যের দ্বারা শ্রোতার মনে যেসব বিষয় সঞ্চারিত করতে চায়, তা হল : হয় একক শব্দাবলির ধারণা সৃষ্টি, যা অন্বয়ী, অন্বিত ও পরস্পর সঞ্চারি এবং এসব একক বিশেষ্য, ক্রিয়া ও অব্যয়ের তাৎপর্য নির্দেশ অথবা অন্বিত পদাদি থেকে অন্বয়ীর ও কালাদির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি এবং শব্দ গঠন ও কারক তথা স্বরচিহ্নাদির পরিবর্তনের

৩৮৪. কোরান; ১৫, ৮৬।
৩৮৫. বাকিল্লানী; ভূমিকায় ৮৩ নং টীকা দ্র:।
৩৮৬. ইবনে সুরাইজ (?) সম্ভবত আহমদ ইবনে উমর; ২৪৮-৩০৬ (৮৬৩-৯১৮ খ্রি:) হি:।
৩৮৭. মূলে আছে 'এলমুল বয়ান'; আলোচনায় এর অর্থ রচনাশৈলী করেছি; কিন্তু এস্থলে সামগ্রিক অর্থে 'অলঙ্কার-শাস্ত্র' করতে হয়েছে।

মাধ্যমে তাদের তাৎপর্য নির্দেশ। এ শব্দ ও বাক্যের সমুদয় ব্যাপারটিই ব্যাকরণশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

এর বাইরে ঘটনাবলির সহায়ক বিষয়, কথক ও কর্তার অবস্থা এবং ক্রিয়া সংঘটনের কারণ নির্দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে অবশিষ্ট থাকে। কারণ এসব বিষয় নির্দেশ না করলে মনোভাব প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং বক্তা যখন এগুলো যথাযথ নির্দেশ করতে পারে, তখন সে বক্তব্যকে প্রকাশের সম্পূর্ণতা অর্জন করে। আর যদি তার বক্তব্যে অনুরূপ কোনো বিষয় না থাকে, তা হলে উক্ত বক্তব্য আরবি বাকরীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ তাদের বক্তব্যের পরিধি ব্যাপক। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাদের ভাষার বিশিষ্ট বাগধারা বিদ্যমান; প্রাঞ্জলতা ও স্বরচিহ্নাদির পরিপূর্ণতা সহ-ই এগুলো প্রচলিত।

পাঠক, আপনি অবশ্যই লক্ষ করেছেন, তাদের এ বক্তব্য 'যায়েদ আমার কাছে এসেছে' কীভাবে তাদের এ বক্তব্য 'এসেছে আমার কাছে যায়েদ' থেকে পৃথক হয়ে গেছে। কারণ এ উভয় বাক্যে প্রথমে আগত শব্দটিই বক্তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি বলেছে, 'এসেছে আমার কাছে যায়েদ', সে অন্বিত ব্যক্তি অপেক্ষা 'আগমন'-কেই গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং যে ব্যক্তি বলেছে, 'যায়েদ আমার কাছে এসেছে', সে অন্বয়ী ক্রিয়া 'আগমন' অপেক্ষা ব্যক্তিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। এভাবে একটি বাক্যের সমুদয় অংশকেই তাদের অবস্থানের গুরুত্ব অনুসারে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম, নির্দেশক সর্বনাম ও পদাশ্রিত নির্দেশকের দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। অনুরূপভাবে বাক্যের উপর অন্বয়ের গুরুত্ব আরোপের ব্যাপারটিও ঘটে থাকে। যেমন তাদের বক্তব্য—'যায়েদ দণ্ডায়মান' এবং 'অবশ্যই যায়েদই দণ্ডায়মান'[৩৮৮] : এদের প্রত্যেকটিই অর্থ নির্দেশের ক্ষেত্রে পরস্পর থেকে পৃথক; যদিও স্বরচিহ্নাদির ক্ষেত্রে এদের মধ্যে সমতা রয়েছে। প্রথমটিতে গুরুত্ব আরোপের কোনো পদ নেই। বস্তুত এটি সেই শ্রোতার জন্য, যে ইতিপূর্বে কিছুই জানত না; দ্বিতীয়টিতে 'অবশ্যই' পদের দ্বারা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এটি এমন এক শ্রোতার জন্য, যে জ্ঞাত; অথচ স্বীকার করতে ইতস্তত করছে। তৃতীয়টিতে গুরুত্ব আরোপ বৃদ্ধি করে এমন এক শ্রোতাকে বলা হয়েছে, যে সত্যকে অস্বীকার করতে চাচ্ছে। বস্তুত এদের প্রত্যেকটিই বিভিন্ন। অনুরূপভাবে আপনি যদি বলেন, 'আমার কাছে ব্যক্তিটি এসেছে'; পুনরায় এ একই ব্যক্তির ক্ষেত্রে আপনি যদি বলেন, 'আমার কাছে ব্যক্তি এসেছে'[৩৮৯]; তা হলে এ প্রকার অনির্দেশের দ্বারা তার প্রতি আপনার সম্মান প্রদর্শনের ইচ্ছাকেই বোঝাবে অর্থাৎ সেই ব্যক্তি এমনি এক ব্যক্তি, অন্য কাউকেও যার স্থলাভিষিক্ত করা যায় না।

অতঃপর অন্বিত বাক্য কখনও নির্দেশসূচক হয়; তার একটি বাস্তব তাৎপর্য থাকে, যার সাথে প্রথমেই সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। আবার কখনও আজ্ঞাসূচক হয়; যার কোনো বাস্তব তাৎপর্য নেই। যেমন অনুজ্ঞা ও তার বিভিন্ন প্রকার। এর পর কখনও দুটি বাক্যের মধ্যকার সংযোজক অব্যয় পরিত্যাগ করা হয়; যদি দ্বিতীয়টিকে সে অনুযায়ী স্বরচিহ্নাদি ব্যবহারের কোনো সুযোগ থাকে। এর ফলে দ্বিতীয়টি প্রথমটির প্রশংসা,

৩৮৮. মূলে আছে—'যায়েদুন্ কায়েমুন্'; যায়েদুন্ লা কায়েমন্ এবং ইন্না যায়েনান লা কায়েমুন্।
৩৮৯. 'যা আনি আর্ রাজুলু' এবং যাআনি-রাজুলুন্।

গুরুত্ব অথবা পরিবর্ত আকারে সংযোজকবিহীন বাক্যে রূপান্তরিত হয়। অথবা দ্বিতীয়টিকে স্বরচিহ্নাদি প্রয়োগের কোনো সুযোগ না থাকলে সংযোজক অব্যয়ই নির্ধারিত হয়ে থাকে। আবার কখনও প্রসঙ্গ অনুসারে বক্তব্য দীর্ঘ অথবা সংক্ষিপ্ত করতে হয় এবং বক্তা সেই অনুপাতে তার বক্তব্য উপস্থিত করেন। আবার কখনও দেখা যায়, একক শব্দ ব্যবহার করে তার বাচ্যার্থ গ্রহণ করা হয় না। বরং তার রূঢ়ার্থ নির্দেশ করা হয়। যেমন আপনি বলেন, 'যায়েদ সিংহ'; এতে আপনি বাচ্যার্থক সিংহত্ব বোঝাতে চান না, বরং তার রূঢ়ার্থক বীরত্বই আপনার উদ্দিষ্ট। তাকেই আপনি যায়েদের সাথে অন্বিত করেন। এরূপ অর্থগ্রহণকে 'উপমা' বলা হয়।

কখনও আপনি একটি বাক্যাংশ ব্যবহার করে তার রূঢ়ার্থ বোঝাতে চান; যেমন আপনি বলেন, 'যায়েদ প্রচুর ডেগের ছাইয়ের অধিকারী।' আপনি এর দ্বারা এর রূঢ়ার্থক তাৎপর্য অর্থাৎ দানশীলতা ও অতিথিপরায়ণতার কথাই বুঝিয়ে থাকেন। কেননা ছাইয়ের প্রাচুর্য এ দুটি বিষয় থেকেই জন্মে এবং পরিমাণে তাদের অস্তিত্ব নির্দেশ করে। এরূপ অন্যান্য দৃষ্টান্তের সমুদয় ব্যাপারটিই শব্দার্থে অতিরিক্ত তাৎপর্য নির্দেশক। বস্তুত এগুলো এমন কিছু বাস্তব দৃশ্য ও অবস্থার পরিচায়ক, যা বোঝাবার জন্য শব্দাবলির মধ্যে প্রসঙ্গ অনুসারে কিছু দৃশ্য ও অবস্থা নির্ধারিত করা হয়েছে।

সুতরাং 'অলঙ্কার' নামাঙ্কিত এ শাস্ত্র অনুরূপ দৃশ্য, অবস্থা ও প্রসঙ্গ বোঝাবার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকে এবং তার আলোচ্য বিষয় তিন প্রকারে বিভক্ত হয়। প্রথম প্রকার শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুরূপ দৃশ্য ও অবস্থাদি তাদের সর্বপ্রকার প্রসঙ্গসহ আলোচনা করে এবং একে বলা হয় 'এলমুল বালাগত' বা বাকবৈদগ্ধ্য শাস্ত্র। দ্বিতীয় প্রকার রূঢ়ি শব্দ ও তার রূঢ়ার্থক তাৎপর্য, যাকে উপমা ও রূপক বলা হয়, তাই আলোচনা করে এবং এর নাম রাখা হয় 'এলমুল বয়ান' বা রচনাশৈলী শাস্ত্র। এ দুই প্রকারের সাথে অন্য একটি প্রকারও এসে যুক্ত হয়; তার উদ্দেশ্য হল অলঙ্করণের দ্বারা ভাষার সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি। অনুরূপ অলঙ্করণ সমবিভক্ত 'ছন্দোবদ্ধ গদ্য' (সাজ), শব্দের সমতুল্যতাজনিত 'অনুপ্রাস' (তাজনিস), খণ্ডিত বাক্যগুচ্ছের মধ্যকার 'ছন্দস্পন্দ' (তারসি), শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট গূঢ়ার্থ প্রকাশক 'ব্যঞ্জনা' (তওরিয়া), বিরোধের মধ্যে তুলনায় সামঞ্জস্যের প্রতীতি 'নিদর্শনা' (তিবাক) এবং এরূপ অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা সাধিত হয়। তাঁরা একে 'এলমুল বদি' বা অলঙ্কারশাস্ত্র নামে অভিহিত করেন।

অবশ্য আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকরা এ তিন প্রকারের সমুদয়কেই 'এলমুল বয়ান' বলে আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুত এ দ্বিতীয় প্রকারের নাম; কারণ পূর্বসূরিরা এ ব্যাপারেই সর্বপ্রথম আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন। পরে এর সাথে একের পর এক অন্যান্য বিষয় এসে যুক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে জাফর ইবনে ইয়াহিয়া,[৩৯০] আল জাহেয[৩৯১] কুদামা[৩৯২] ও সমতুল্য অন্যান্যরা সংক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ধীরে

৩৯০. সম্ভবত যায়ামেকী।
৩৯১. এ অধ্যায়ের ১৭২ নং টীকা দ্র:।
৩৯২. কুদামা ইবনে জাফর; খ্রি: নবম শতাব্দী।

ধীরে এ শাস্ত্রের বিষয়াদি পূর্ণতা লাভ করেছিল। পরে সাক্কাফী[৩৯৩] এসে এর সার সংগ্রহ, এর সমস্যাদি পরিমার্জনা এবং এর অধ্যায়গুলো অব্যবহিত পূর্বে আমাদের বর্ণিত ধারা অনুসারে সুবিন্যস্ত করেন এবং ব্যাকরণ, শব্দ-প্রকরণ ও রচনাশৈলীর উপর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল মেফতাহ' রচনা করেন। তিনি এ শাস্ত্রটিকে তাঁর গ্রন্থের কতকাংশে স্থান দিয়েছেন। পরবর্তীগণ তাঁর গ্রন্থ থেকেই এ বিষয় গ্রহণ করেছেন এবং তাকে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থিত করে যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাই বর্তমানকালে প্রচলিত রয়েছে। সাক্কাফী স্বয়ং এর সংক্ষেপ করে তাঁর 'আত্তিবিয়ান' নামক গ্রন্থ, ইবনে মালেক[৩৯৪] 'আল মিসবাহ' নামক গ্রন্থ এবং জালাল উদ্দিন কাযবিনী[৩৯৫] 'আল ইজাহ' ও 'আত্তালখিস' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এ শেষোক্ত গ্রন্থটি পরিসরের দিক থেকে 'আল ইজাহ' অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বিধায় পূর্বাঞ্চলীয়দের কাছে এর চাহিদা সমধিক এবং অন্যগুলো অপেক্ষা এর ব্যাখ্যা পুস্তক বেশি ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হয়।

সামগ্রিকভাবে পূর্বাঞ্চলবাসীরা এ শাস্ত্রে পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ে বশি দক্ষতার অধিকারী। এর কারণ, আল্লাহ্ই ভালো জানেন, এই যে, বিষয়টি ভাষা সম্পর্কীয় শাস্ত্রাদির মধ্যে পরিপূর্ণতা বিধায়ক এবং এরূপ পরিপূর্ণতা বিধায়ক শিল্পকর্ম একমাত্র সমৃদ্ধ জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলোতেই পাওয়া যায়। পূর্বাঞ্চল পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় বেশি জনবসতির অধিকারী; এ কথা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। অথবা আমরা বলব, অনারবদের জন্যই এরূপ ঘটেছে এবং পূর্বাঞ্চলবাসীদের মধ্যে তাদের সংখ্যাই সর্বাধিক। যেমন যমখশরীকৃত কোরানের ভাষ্য; তার সমুদয় আলোচনাই এ শাস্ত্রকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে; বরং বলা যায়, এটিই তার উপজীব্য। মাগরিববাসীরা এ শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা থেকে মাত্র অলঙ্কারশাস্ত্রকেই বিশেষভাবে গ্রহণ করেছে। তারা একেই কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কীয় সমুদয় শাস্ত্র হিসেবে গড়ে তুলেছে। তারা এর জন্য বিচিত্র নাম, বিভিন্ন অধ্যায় এবং নানাবিধ শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি করেছে। তাদের ধারণা এই যে, তারা একে আরবি ভাষাতত্ত্বের সামগ্রিকতায় বিধৃত করেছেন; কিন্তু সত্য বলতে কি, একমাত্র শব্দগত সৌন্দর্য সৃষ্টির লালসাই তাদেরকে এ পথে পরিচালিত করেছে। বস্তুত অলঙ্কারশাস্ত্র ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে একান্তই সহজ এবং বাকবৈদগ্ধ ও রচনাশৈলীর অন্তর্গত মননশীলতার সূক্ষ্মতা ও তাৎপর্যের দুরূহতা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়েছে বলেই তারা এ দুটিকে পরিত্যাগ করেছে।

আফ্রিকিয়াবাসীদের মধ্যে যিনি এ অলঙ্কারশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁর নাম ইবনে রশিক[৩৯৬]। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল উমদা'। আফ্রিকিয়া ও আন্দালুসের অনেকেই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

জেনে রাখুন, এ শাস্ত্রের ফলশ্রুতি একমাত্র কোরানের অননুকরণীয় বাকশৈলী অনুধাবনের জন্যই; কেননা তার অননুকরণীয়তা যাবতীয় অবস্থার চাহিদা অনুসারে

৩৯৩. ৩৫৩ নং টীকা দ্র:।
৩৯৪. ৩৭০ নং টীকা দ্র:।
৩৯৫. মুহম্মদ ইবনে আবদুর রহমান; ৬৬৬-৭৩৯ (১২৬৭-১৩৩৮ খ্রি:) হি:।
৩৯৬. ভূমিকার ৮নং টীকা দ্র:।

শাব্দিক ও আর্থিক তাৎপর্য নির্দেশে সমর্থ হয়েছে। এজন্য তা পূর্ণতার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। তদুপরি তার বক্তব্য উপস্থাপনে বিশেষ শব্দের ব্যবহার পরিমার্জনা, উত্তম গঠন ও বিন্যাসে পূর্ণতা লাভ করেছে। বস্তুত এটাই কোরানের অনুকরণীয়তা, যা উপলব্ধি করতে মেধাশক্তি অপারগ হয়ে ওঠে। একমাত্র যার আরবি ভাষার সংস্পর্শ লাভ ঘটেছে এবং তার যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে, তার পক্ষেই স্বীয় রসগ্রহিতার অনুপাতে এ অননুকরণীয়তা উপলব্ধি করা সম্ভব।

এ কারণেই যেসব আরব কুরআন প্রচারকের কাছ থেকে তা শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, উপলব্ধির ব্যাপারে তাঁদের স্থান ছিল অতি উন্নত। কারণ তাঁরাই ছিলেন বাণীর দিকপাল ও বর্ণনার সম্রাট। তাঁদের মধ্যেই রসগ্রাহিতার পূর্ণতা ও বিশুদ্ধি ছিল সমধিক। এ শাস্ত্রের সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী থাকার কথা ছিল কুরআন ভাষ্যকারদের; অথচ পূর্বসূরিদের অধিকাংশ ভাষ্যেই এ বিষয়ে উদাসীনতা বিদ্যমান। এর পর জারুল্লাহ্ যমখশরী আবির্ভূত হলেন এবং তাঁর বিখ্যাত তফসীর রচনা করলেন। তিনি কোরানের সেই সমস্ত আয়াত অনুসন্ধান করে এ শাস্ত্রের সিদ্ধান্তসমূহের প্রতিষ্ঠা দিলেন, যা দিয়ে তার অননুকরণীয়তার কতকাংশ প্রকাশ পেতে পারে। এর ফলে তিনি সব তফসীরের উপর স্বীয় রচনার গৌরব প্রতিষ্ঠা করলেন। আহা, তিনি যদি কোরানের এ বাকবৈদগ্ধ চয়ন করে অভিনব মতামতের প্রতিষ্ঠা না করতেন! এ কারণেই আহলে সুন্নতের অধিকাংশ লোকই এ গ্রন্থের বাকবৈদগ্ধ্যগত পুঁজি সত্ত্বেও তা পাঠ করতে সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন। বস্তুত যে ব্যক্তি আহলে সুন্নতের ধ্যান-ধারণায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এ শাস্ত্রেও তার কিছু পরিমাণে যোগ্যতা বিদ্যমান; অন্তত যিনি গ্রন্থকারের আলোচনার যোগ্য উত্তর দানে সমর্থ অথবা যিনি অভিনব মতামতের স্বরূপ বুঝতে পেরে তা থেকে বিরত থাকতে সক্ষম; উক্ত গ্রন্থ পাঠে তার বিশ্বাসের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। কারণ এ গ্রন্থ পাঠ্য হিসেবে এজন্য নির্ধারিত হয় যাতে পাঠক অভিনব ও কাল্পনিক মতামত থেকে নিজেকে রক্ষা করে কোরানের অননুকরণীয়তা সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান লাভ করতে পারে। 'আল্লাহ্ই যাকে ইচ্ছা সরল পথে পথ দেখিয়ে থাকেন।'[৩৯৭]

সাহিত্যশাস্ত্র

এ শাস্ত্রের নিজস্ব এমন কোনো আলোচ্য বিষয় নেই, যার উপর বহিরাগতের প্রভাব প্রতিষ্ঠা অথবা তার নিরসনের জন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে। বস্তুত এর ফলাফলই ভাষাবিদদের একমাত্র লক্ষ্য এবং এর স্বরূপ হল, আরবি ভাষাভাষীদের রীতি ও ধারা অনুসরণ করে গদ্যে ও পদ্যে দক্ষতা অর্জন করা। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা আরবি ভাষার এমন সব বিষয় একত্র করেন, যা দিয়ে ভাষাগত যোগ্যতা অর্জন সম্ভব হতে পারে। যেমন— উচ্চ শ্রেণীর কাব্য, প্রাঞ্জল ও সুসমন্বিত ছন্দোবদ্ধ গদ্য এবং এগুলোর মধ্যে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে ইতস্তত ছড়ানো অভিধান ও ব্যাকরণের বিভিন্ন সমস্যা। যে-কোনো উদ্যোগী পাঠক এগুলোর মধ্য থেকে আরবি ভাষারীতির নিয়মাবলি জেনে নিতে পারে। এর সাথে আরবের প্রাচীন ইতিহাসের ঘটনাবলিও বিবৃত হয় এবং এর দ্বারা তাদের

৩৯৭. কোরান, ৫, ৬০ অনুরূপ।

কাব্যান্তর্গত এ সম্পর্কীয় বর্ণনা বুঝে নেওয়া সহজ হয়। অনুরূপভাবে তাঁরা বংশধারার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি এবং সাধারণ ইতিহাসও সংগ্রহ করেন। এ সব কিছুরই উদ্দেশ্য হল যাতে অনুসন্ধানকারীর কাছে আরবি ভাষা সম্পদ, তার রীতিনীতি ও বাকবৈদগ্ধ্যের কোনো দিকই লুক্কায়িত না থাকে। কারণ এতদসম্পর্কীয় যোগ্যতা একমাত্র এসব বিষয়ের যথাযথ সংরক্ষণ ও অনুধাবনের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। কাজেই এক্ষেত্রে সমস্ত ব্যাপারটি বোঝার জন্য যা কিছু দরকার, তাকে অগ্রাধিকার দিতে হয়।

অতঃপর ভাষাবিদরা যখন এ শাস্ত্রটির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে যান; তখন তারা বলেন, সাহিত্য হল আরবি কাব্য ও তার ইতিহাস সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ভাষাতত্ত্ব, ধর্মশাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয় থেকে প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ত জ্ঞান আহরণ করা। ধর্মশাস্ত্র বলতে তাঁরা কুরআন ও হাদীসকেই বুঝিয়েছেন। কারণ আরবি সাহিত্য জগতে এ দুটি বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ের প্রবেশাধিকার খুবই কম। অবশ্য উত্তরসূরিগণ এক্ষেত্রে অলঙ্কারশাস্ত্রের শৈল্পিক উদ্ভব ঘটিয়েছেন এবং তারা কাব্যে ব্যঞ্জনা ও তাদের সরল গদ্যে বিচিত্র বিষয়ের উপমা ব্যবহার করেছেন। এর ফলে এ শাস্ত্র অধ্যয়নকারীকে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিভাষা জেনে নিতে হয়; যাতে এ সম্পর্কে তার বোধশক্তি স্বয়ম্ভর হয়ে উঠতে পারে।

শিক্ষাদানের বৈঠকে আমরা আমাদের উস্তাদের কাছে শুনেছি, এ শাস্ত্রের মূলনীতি ও স্তম্ভ হল চারটি সংকলন গ্রন্থ। এগুলো হল ইবনে কুতাইবা রচিত 'আদাবুল কাতেব',[৩৯৮] মুবার্রাদ রচিত 'কিতাবুল কামেল,[৩৯৯] জাহেয রচিত 'কিতাবুল বয়ান ও তিবিয়্যন'[৪০০] এবং আবু আলী আল কালী আল বাগদাদী রচিত 'কিতাবুন্ নাওয়াদের'।[৪০১] এগুলো ছাড়া অন্য সবই এদের অনুগামী ও বিস্তারিত তৎপরতা মাত্র। এ বিষয়ে আধুনিকদের বহু রচনা বিদ্যমান।

প্রাথমিক যুগে সঙ্গীত এ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কারণ তা কবিতারই অনুসারী বিষয় এবং সঙ্গীত বলতে তার উপর আরোপিত সুরকেই বোঝায়। আব্বাসী সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট পদমর্যাদার লেখক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আরবি কাব্যের রীতি-নীতির সাথে পরিচিত হবার বাসনার সঙ্গীতের চর্চা করতেন। তখন এর চর্চাকে ব্যক্তিচরিত্রের বিশ্বস্ততা ও সুচারুতার ক্ষেত্রে ত্রুটি বলে গণ্য করা হত না।[৪০২] কাজী আবুল ফেরাজ ইস্পাহানীর[৪০৩] ন্যায় স্বনামধন্য জ্ঞানী এ বিষয়ে তাঁর 'আল আগানী' নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে তিনি আরবদের ইতিহাস, কাব্য, বংশধারা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সাম্রাজ্যের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি এ বর্ণনার ভিত্তি হিসেবে সম্রাট রশীদের জন্য গায়কদের রচিত একশটি সুরকে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর আলোচনা একান্তই ব্যাপক ও সম্পূর্ণ। আমার জীবনের

---

৩৯৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে মুসলিম; ২৯৩-২৭০/৭৬ (৮২৮-৮৮৪/৮৯ খ্রি:) হি:।
৩৯৯. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ; ২১০-২৮৫ (৮২৫-৮৯৮ খ্রি:) হি:।
৪০০. এ অধ্যায় দ্র:।
৪০১. ইসমাইল ইবনে কাসেম; ২৮০-৩৫৬ (৮৯৩-৯৬৭ খ্রি:) হি:।
৪০২. এর পর রোজেনথালের অনুবাদে—'মদিনা ও অন্যত্র বসবাসকারী প্রাচীন মুসলিম মণীষীগণ এ বিষয়ে সকলের জন্য আদর্শ স্থানীয়।'—এ বাক্যটি বিদ্যমান।
৪০৩. আলী ইবনে হুসাইন; ২৮৪-৩৫৬ (৮৯৮-৯৬৭ খ্রি:) হি:।

শপথ, এ গ্রন্থ আরবদের ঐতিহ্যভাণ্ডার এবং তাদের কাব্য, ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যে সৌন্দর্য বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের এক মহৎ সংকলন। আমাদের জানা মতে এ গ্রন্থের সমতুল্য বিষয়ানুসারী অন্য কোনো গ্রন্থ নেই। এ মহান গ্রন্থ সেই সমৃদ্ধি বহন করছে, যা একজন সাহিত্যসেবীর কামনার ধন। অথচ তার কাছে উপনীত হবার যোগ্যতা কোথায়!

পাঠক, আমরা ইতিপূর্বে ভাষা সম্পর্কীয় শাস্ত্রাদির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেছি, আসুন, এক্ষণে আমরা তাদের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হই। আল্লাহই যথার্থতার পথ প্রদর্শনকারী।

ষড়চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[ভাষা একটি শিল্পগত যোগ্যতা]

জেনে রাখুন, ভাষার সমুদয় ব্যাপারটিই এমন একটি যোগ্যতা, যা শিল্পকর্মের সাথে তুলনীয়। বস্তুত তা মনোভাব প্রকাশের জন্য জিহ্বার দ্বারা অর্জিত এক বিশেষ যোগ্যতা। এ কারণেই এ যোগ্যতার সম্পূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতার জন্য প্রকাশভঙ্গিতেও ভালো-মন্দের পার্থক্য হয়ে থাকে। এর বহিঃপ্রকাশ যতটা না শব্দাবলির ক্ষেত্রে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি বাকবিন্যাসের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং এ শব্দাবলিকে সুবিন্যস্ত করার পরিপূর্ণ যোগ্যতা যখন অর্জিত হয়, যখন তা উদ্দিষ্ট মনোভাব প্রকাশের যোগ্য হয়ে ওঠে এবং যখন তা রচনার পারম্পর্য রক্ষা করে প্রসঙ্গের চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়ে দাঁড়ায়, তখন বলতে গেলে বক্তা শ্রোতার মনে ভাব সঞ্চারের চরম সীমায় উপনীত হয়ে থাকে। একেই বাকবৈদগ্ধ্য বলা হয়।

এ যোগ্যতা ক্রিয়ার পৌনঃপুনিক আবর্তন ছাড়া অর্জিত হয় না। কারণ ক্রিয়া প্রাথমিকভাবে অনুষ্ঠিত হলে তার স্বরূপের মধ্যে একটি গুণের আবির্ভাব ঘটে এবং এরূপ বারংবার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা অনুরূপভাবে পৌনঃপুনিকতা বৃদ্ধি পেয়েই তা যোগ্যতা অর্থাৎ স্থায়ী গুণে পরিণত হয়।

এদিক থেকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, যে সময়ে আরবদের মধ্যে আরবি ভাষার যোগ্যতা বিদ্যমান ছিল, তখন যে-কোনো আরবি ভাষাভাষী তার গোত্রের বক্তব্য শুনে, তাদের ভাষণের রীতি-নীতি অনুধাবন করে এবং উদ্দিষ্ট ভাব প্রকাশে তাদের ভঙ্গি অনুসরণ করে সে সম্পর্কে যোগ্যতা অর্জন করতে পারত। যেমন একটি শিশু একক শব্দাবলির নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহারকে প্রথম শুনে শিক্ষা করে এবং পরে তাদের বিন্যাসধারাও শুনে শিক্ষা করে নেয়। তারপর অনবরত তার এ শ্রুতি নবীনতর হতে থাকে—প্রতিটি বক্তার কাছ থেকে সে ভাষার ব্যবহারকে বারংবার শুনতে থাকে এবং পরিণামে তার এ অবস্থা যোগ্যতা ও স্থায়ী গুণে রূপান্তরিত হয়ে সেই ভাষাভাষীদেরই একজন হয়ে দাঁড়ায়।

এভাবেই ভাষা ও বাকভঙ্গি এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে সংক্রমিত হয় এবং এভাবেই তা অনারব ও শিশুরা শিক্ষা করে। এটাই সাধারণ লোকের সেই বক্তব্যের অর্থ, যাতে তারা বলে থাকে, আরবি ভাষা আরবদের স্বাভাবিক গুণ অর্থাৎ তারা নিজেদের প্রাথমিক যোগ্যতা থেকেই তা আহরণ করেছে; অন্যদের কাছ থেকে নয়। তারপর অনারবদের সংস্পর্শে এসে মুজার তথা প্রাচীন আরবদের এ যোগ্যতা বিকৃত হয়ে গেছে।

অনুরূপ বিকৃতির কারণ এই যে, কোনো এক পুরুষের নবজাতক মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে এমন কিছু ভঙ্গি শুনতে পেল, যা আরবদের ভঙ্গি থেকে বিভিন্ন। স্বভাবতই সে অনুরূপ ভঙ্গিতে তার নিজের মনোভাব প্রকাশের চেষ্টা করবে এবং অনারবদের সাথে মিশ্রণের আধিক্য এর অনিবার্যতা ফুটিয়ে তুলবে। এ সঙ্গে সে আরবদের ভঙ্গিও শুনতে থাকবে; ফলে এ বিষয়টি তার কাছে মিশ্রিত হয়ে পড়বে এবং সে এ থেকে কিছু ও তা থেকে কিছু গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এর ফলে তার যোগ্যতা একদিন নতুন রূপ লাভ করবে এবং তা পূর্বের যোগ্যতা থেকে নিকৃষ্ট হয়ে দাঁড়াবে। আরবি ভাষার বিকৃতির এটাই অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

এ কারণেই কোরায়েশ গোত্রের ভাষা আরবের সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষা বলে খ্যাতি লাভ করেছিল। কারণ তারা চতুর্দিক থেকে অনাবর সংস্পর্শ থেকে দূরে অবস্থান করত। এর পর কোরায়েশদের পাশে যারা ছিল, সেই সকিফ, হুযাইল, খুজাআ, বনি কেননা, গতফান, বনি আসাদ, বনি তমিম প্রভৃতি গোত্রের ভাষা। কিন্তু যারা কোরায়েশদের কাছ থেকে দূরে অবস্থান করত, যেমন রবিয়া, লখাম, জুযাম, গস্‌সান, ইয়াদ, কুযাআ এবং পারসিক, রোমীয় ও হাবশী জাতিগুলো প্রতিবেশী ইয়ামেনের আরবরা, তাদের সকলের ভাষাই অনারব সাহচর্যের দরুন অসম্পূর্ণ যোগ্যতায় পরিণত হয়েছিল। আরবি ভাষাশিল্পীরা এক্ষেত্রে কোরায়েশদের কাছ থেকে অন্যান্য গোত্রের অবস্থানের দূরত্ব বিচার করেই সংশ্লিষ্ট গোত্রের ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধির প্রমাণ উপস্থিত করতেন। পবিত্র ও মহান আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ এবং তিনি সহায়তার আধার।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[বর্তমান আরবি একটি স্বতন্ত্র ভাষা এবং মুজার ও হিমিয়ারের ভাষা থেকে এটা ভিন্ন]

এর বর্ণনা এই যে, আমরা আরবি ভাষাকে মনোভাব প্রকাশে ও উদ্দিষ্ট নির্দেশে মুজারী বাকরীতিরই অনুসারী দেখতে পাই। একমাত্র কর্ম থেকে কর্তাকে পৃথক করার জন্য ব্যবহৃত স্বরচিহ্নাদিই তা থেকে লোপ পেয়েছে। ফলে তারা এর পরিবর্তে অগ্র-পশ্চাৎকরণ এবং উদ্দেশ্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশক চিহ্নাদি ব্যবহার করেছে। অবশ্য রচনাশৈলী ও বাকবৈদগ্ধ্য মুজারী বাকরীতিতেই বেশি ও সুস্পষ্ট। কারণ তাতে শব্দাবলি স্বয়ং নির্ধারিত তাৎপর্যের নির্দেশবাহী। উক্ত তাৎপর্য নির্দেশের জন্য যা অবশিষ্ট থাকে, তা হল প্রসঙ্গের প্রয়োজন এবং একেই 'প্রসঙ্গের সম্প্রসারণ' বলে অভিহিত করা হয়। প্রতিটি তাৎপর্যের সাথে অনুরূপ প্রসঙ্গের বিশিষ্ট অবস্থান অত্যাবশ্যকীয়; সুতরাং মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে এসব প্রসঙ্গের বিবেচনা করা দরকার; কেননা তারাই মনোভাবের বৈশিষ্ট্য। সব ভাষাতেই এসব প্রসঙ্গজ্ঞাপক শব্দাবলি প্রচলনের মাধ্যমেই বিশিষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু আরবি ভাষায় এগুলো নির্দেশ করার জন্য একমাত্র শব্দাবলির বিন্যাস ও অন্বয় সৃষ্ট অবস্থাবলি তথা অগ্র, পশ্চাৎ, উহ্য ও কারক চিহ্নাদি নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কখনও অব্যয় শ্রেণীর বর্ণাদির দ্বারাও তা নির্দেশিত হয়। এজন্যই এমন প্রসঙ্গ নির্দেশের তারতম্য কারণ আরবি ভাষায় বক্তব্যের পর্যায়গত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে; যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। অথচ এমন বৈশিষ্ট্যের জন্য আরবি ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ সংক্ষিপ্ততর এবং শব্দাবলি ও বর্ণনার পরিধি অন্যান্য সব ভাষা থেকে স্বল্প হয়।

এটাই রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বাণীর তাৎপর্য; তিনি বলেছেন, 'আমাকে সুসংবদ্ধ বাণীরূপ দেওয়া হয়েছে এবং আমার বক্তব্যকে যথাসম্ভব সংক্ষেপ করা হয়েছে।' পাঠক, এ বিষয়টি ইসা ইবনে উমর[৪০৪] থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তা দিয়ে বিবেচনা করুন। তাঁকে ব্যাকরণবিদদের কেউ বলেছিলেন, আমরা আরবদের বক্তব্যে পুনরুক্তি দেখতে পাই; তারা বলে, যায়েদ দণ্ডায়মান, অবশ্য যায়েদ দণ্ডায়মান ও অবশ্যই যায়েদ দণ্ডায়মান; অথচ এগুলোর অর্থ একই। এর উত্তরে তিনি তাকে বলেছিলেন, এদের অর্থ বিভিন্ন। প্রথমটি, সেই ব্যক্তির জন্য, যে যায়েদের দণ্ডায়মান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত নয়; দ্বিতীয়টি, যে তা অবগত হয়েও স্বীকার করতে ইতস্তত করছে এবং তৃতীয়টি, যে

---

৪০৪. মৃত্যুকাল ১৪৯ (৭৬৬ খ্রি:) হি:।

ব্যক্তি অবগত হয়েও অস্বীকার করার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে। সুতরাং অবস্থার বিভিন্নতায় তাদের অর্থ নির্দেশও বিভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এরূপ বাকবৈদগ্ধ্য ও রচনাশৈলী আরবরা ক্রমাগত বহন করে এসেছে এবং বর্তমানকাল পর্যন্ত এটাই তাদের মতাদর্শ। পাঠক, আপনি এ ব্যাপারে সেসব ব্যাকরণবিদের অসার মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, যারা কারক চিহ্নাদি সম্পর্কে দক্ষতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে তাদের উপলব্ধি একান্তই ত্রুটিপূর্ণ। এজন্যই তারা ধারণা করে যে, আরবি ভাষার বাকবৈদগ্ধ্য বর্তমানকালে আর নেই এবং বলতে গেলে আরবি ভাষা বিকৃত হয়ে গেছে। আদের অনুরূপ মন্তব্যের উৎস হল পদাদির শেষের কারক চিহ্নের বিকৃতি এবং এগুলোর অধ্যয়নের মধ্য দিয়েই তারা ভাষার নিয়ম-কানুন গড়ে তোলে। বস্তুত তাদের এ প্রকার মন্তব্য বিশেষ পক্ষপাতদৃষ্ট স্বভাবেরই ফল এবং এর সাথে তাদের সংকীর্ণ হৃদয়বৃত্তিও এসে মিশ্রিত হয়েছে। অন্যথায় আমরা এই বর্তমানকালেও দেখতে পাই, প্রচুর আরবি শব্দ তাদের সেই প্রাথমিক তাৎপর্যাদিতেই বিধৃত হয়ে আছে এবং মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতা ও সে অনুযায়ী বর্ণনায় পৃথক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির যোগ্যতা এখনও তাদের বক্তব্যে বিদ্যমান। ভাষার বাকরীতি ও গদ্য-পদ্যের বিষয় বৈচিত্র্যও তাদের ভাষণ বর্ণনায় রয়েছে। তাদের বৈঠকে, আসরে এখনও ওজস্বী বাগ্মী ও তাদের বাকরীতিতে এখনও হৃদয় সংবেদী কবি বিদ্যমান এবং তাদের বিশুদ্ধ রসগ্রাহিতা ও সুষ্ঠু হৃদয়বৃত্তি এখনও তাদের সাক্ষ্য বহন করছে। তাদের সংকলিত ভাষা সম্ভার থেকে একমাত্র পদাদির অন্তঃস্থিত কারক চিহ্ন ছাড়া অন্য কিছুই লোপ পায় নি। বস্তুত মুজারী ভাষা যে একক ধারা ও পরিচিত গঠন প্রক্রিয়ায় অবস্থিত ছিল, তাতে এ স্বরচিহ্নাদিই ছিল একান্ত অনুসরণীয় এবং তাতে ভাষার নিয়মাবলিরও অন্তর্গত। একমাত্র অনারবদের সাথে সংমিশ্রণে এ মুজারী বৈশিষ্ট্য বিকৃত হবার পরই সে সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। আরবরা ইরাক, সিরিয়া, মিশর ও মাগরিবের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার পরই বুঝতে পেরেছে যে, তাদের ভাষাগত এ যোগ্যতা পূর্বরূপে আর অবস্থিত নেই; বরং তা যেন ভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

অথচ এক সময়ে এ ভাষাতেই কোরাণ অবতীর্ণ হয়েছে ও হাদীসের বাণী সম্প্রচারিত হয়েছে এবং এ দুটি বিষয়ই ধর্ম ও জাতির ভিত্তি। সুতরাং আরবি ভাষার অনুরূপ পরিবর্তনের আশঙ্কা দেখা দিলে হয়ত কুরআন-হাদীসের ভাষায় বিস্মৃতি আসবে এবং তাদের অবতরণ ও সম্প্রচারকালীন ভাষার পরিচিতির অভাবে তাদের বিষয়বস্তু উপলব্ধিতে দুরূহতা দেখা দিবে। এ কারণেই উক্ত ভাষারূপের নিয়মাবলি সংকলন, তাদের তুলনীয় বিন্যাসধারা স্থাপন এবং তার মধ্য থেকে বাকরীতির আবিষ্করণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এভাবে তা একটি সুবিন্যস্ত শাস্ত্র তথা, পরিচ্ছেদ, অধ্যায়, প্রস্তাবনা ও সমস্যা সংবলিত হয়ে উঠল এবং সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রবিদরা তার নাম রাখলেন 'নুহূ' বা আরবি ভাষাশিল্প। তাদের প্রচেষ্টায় সমস্ত বিষয়টি সুসংবদ্ধ শিল্প, লেখ্যশাস্ত্র এবং আল্লাহ্‌র গ্রন্থ ও রসূলুল্লাহ্‌র হাদীস হৃদয়ঙ্গমের সমুন্নত সোপানে পরিণত হল।

সম্ভবত আমরা যদি বর্তমান আরবি ভাষা নিয়ে উদ্যোগী হই এবং তার নিয়মাবলি অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করি, তাহলে তাতে তার বিকৃত কারক চিহ্নাদির পরিবর্তে এমন অনেক বিষয়ের সাক্ষাৎ পাব ও এমন অনেক অবস্থা দেখা যাবে, যা ভাষার বিশেষ রীতি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। সম্ভবত সেগুলো ভাষার অন্তে সেভাবে থাকবে না, যেভাবে মুজারী ভাষায় বর্তমান ছিল। বস্তুত ভাষা ও তার যোগ্যতা কোনটাই হঠাৎ সৃষ্টি হয় না।

হিমিয়ারী ভাষার সাথে মুজারী ভাষার সম্পর্কও অনুরূপভাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং মুজারী পর্যায়ে হিমিয়ারী ভাষার অনেক প্রচলন ও শব্দ গঠন প্রক্রিয়া পরিবর্তিত হয়ে যায়। আমাদের কাছে শ্রুতিবাহিত এমন অনেক বিষয় বিদ্যমান যা দিয়ে এ মন্তব্যের প্রমাণ মিলে এবং যারা নিজেদের বোধের ত্রুটির জন্য মনে করে যে, তারা উভয়ে একই ভাষা, উপরিউক্ত প্রমাণ তাদের ধারণাকেও নস্যাৎ করে দেয়। তারা অনুরূপ ধারণার বশবর্তী হয়েই মুজারী ভাষার গঠন ও রীতিনীতিতে হিমিয়ারী ভাষার ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে চান। যেমন অনেকে ধারণা করেন যে, হিমিয়ারী ভাষার 'কায়ল (নেতা) শব্দটি 'কওল' (উক্তি) শব্দ থেকে ব্যুৎপন্ন এবং অনুরূপ অন্য আরও অনেক বিষয়। কিন্তু এর কোনোটিই যথার্থ নয়। বস্তুত হিমিয়ারী ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার ধারা, শব্দ গঠন ও কারক চিহ্নাদিতে মুজারী ভাষা থেকে ভিন্ন যেমন এরূপ আমরা আরবি ভাষা ও মুজারী ভাষার মধ্যে ভিন্নতা দেখতে পাই। অবশ্য মুজারী ভাষা সম্পর্কে আমাদের আগ্রহের কারণ ধর্মীয় শাস্ত্রাদির জন্যই; যেমন ইতিপূর্বে আমরা তৎসম্পর্কে বলেছি। এ কারণেই উক্ত ভাষার নিয়ম-কানুন আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু বর্তমানে আমরা আরবি ভাষা সম্পর্কে অনুরূপ কিছু করার প্রয়োজন অনুভব করে না এবং তার কোনো কারণও বিদ্যমান নেই।

বর্তমানকালের আরবি ভাষাভাষীরা যে-কোনো দিকেই বসবাস করুক না কেন, তাদের ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য 'ক্বাফ' বর্ণটি উচ্চারণের মধ্যে লক্ষ করা যায়। তারা একে শহরবাসীদের ন্যায় ক্বাফ বর্ণের উচ্চারণস্থল থেকে উচ্চারণ করে না; যেমন আরবি ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থাবলিতে বর্ণিত হয়েছে যে, তার উচ্চারণস্থল জিহ্বার প্রান্ত ও মূর্ধার ঊর্ধ্বভাগ। তারা একে 'কাফের' উচ্চারণস্থল থেকেও উচ্চারণ করে না; যদিও তার উচ্চারণস্থল ক্বাফের উচ্চারণস্থল থেকে নিম্নস্তরে এবং মূর্ধার ঊর্ধ্বভাগের সন্নিহিত। বরং তারা একে 'ক্বাফ' ও 'কাফ' বর্ণদ্বয়ের জন্য নির্ধারিত উচ্চারণস্থানের মধ্যভাগ থেকে উচ্চারণ করে থাকে। এ বৈশিষ্ট্য পূর্ব-পশ্চিমে অবস্থানরত সব গোত্রের মধ্যেই বিদ্যমান; এমন কি সব জাতি ও গোত্রের মধ্যে এটাই তাদের এমন একটি চিহ্ন, যাতে অন্য কারও অংশীদারিত্ব নেই। এর ফলে যারা আরবীয় হতে চায় এবং কোন গোত্রের সাথে সম্বন্ধ স্থাপন ও তাতে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক, তারা এ বিশিষ্ট উচ্চারণ অভ্যাস করে। তাদের মতে বিশুদ্ধ আরব, আরবিয়ত্বে অনুপ্রবেশকারী ও শহুরে জীবনের অধিকারীদের মধ্যে এ ক্বাফ বর্ণের উচ্চারণ দ্বারা পার্থক্য নির্দেশ করা সম্ভব। এতদ্বারা এটাই প্রকাশ পায় যে, এটাই মুজারী ভাষা, কারণ এ অবশিষ্ট গোত্রাবলির অধিকাংশ ও তাদের নেতৃবৃন্দ পূর্ব-পশ্চিমে সর্বত্র সুলাইম ইবনে মনসুর থেকে এবং বনি আমের ইবনে যাআযাআ ইবনে মাবিয়া ইবনে বকর ইবনে হাওয়াজেন ইবনে মনসুর থেকে মনসুর ইবনে ইকরামা ইবনে

হাফসা ইবনে কয়েস ইবনে আয়লান-এর সন্তান-সন্ততি। তারা বর্তমানকালে জনবসতির অধিকাংশ জুড়ে অন্যান্য জাতির চেয়ে বেশি প্রতাপের সাথে বিরাজ করছে। তারা মুজারের বংশাবলি এবং তাদের সাথে অবস্থানরত অন্যান্য গোত্র বনি কাহলানের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত তারাই এ 'ক্বাফ' বর্ণের উচ্চারণে অন্য সবার আদর্শস্বরূপ।

ভাষার বৈশিষ্ট্য এ গোত্রগুলোর কোনো অভিনব সৃষ্টি নয়; বরং এটা তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং বংশপরম্পরায় আগত বিশেষত্ব মাত্র। এর ফলে প্রকাশ পায় যে, এটাই নবী (সঃ)-এর ভাষা। শিয়া ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদরা এরূপ দাবি উত্থাপন করেছেন এবং তারা ধারণা পোষণ করেন যে, সূরা ফাতেহা পাঠকালে যারা 'এহ্‌দেনাস্‌ সিরাতাল্‌ মুস্তাকিমা'য় ক্বাফ বর্ণটিকে উপরিউক্ত গোত্রের উচ্চারণ অনুযায়ী উচ্চারণ করবে না, সে ভাষাকে বিকৃত করবে ও তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

জানি না, উচ্চারণের এ ব্যতিক্রমের ব্যাপারটি কোথা থেকে এল? কারণ শহরবাসীরাও তা নতুন করে সৃষ্টি করেনি। তারাও তা তাদের পূর্বসূরিদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে এবং বিজয়াভিযানের পরবর্তীকালে শহরে আগমনকারী তাদের পূর্বপুরুষরা মুজারেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যদিকে গোত্রগুলোও এ ব্যতিক্রম নতুন করে সৃষ্টি করেনি। শুধু পার্থক্য এই যে, গোত্রের অধিবাসীরা শহরবাসীদের চেয়ে বেশি মাত্রায় অনারব সংস্পর্শ থেকে দূরে অবস্থান করছে। এ বিষয়টিই তাদের মধ্যে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দেয় এবং বোঝায় যে, এটাই তাদের পূর্বপুরুষের ভাষা। তদুপরি এ কারণেই পূর্ব-পশ্চিমের সব গোত্র এ উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ। বস্তুত এটা এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা দিয়ে বিশুদ্ধ আরবকে অনুপ্রবিষ্ট ও শহরবাসী থেকে পৃথক করা যায়।

এ বিষয়টি একান্ত সুস্পষ্ট যে, 'ক্বাফ' বর্ণটির যে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের সাথে সমগ্র আরব-বেদুইন গোত্রগুলো জড়িত, তা পূর্ববর্তী ভাষাভাষীদের কাছে ক্বাফের যথার্থ উচ্চারণস্থল থেকেই উচ্চারিত হত। বস্তুত ক্বাফের এ উচ্চারণস্থলটি প্রশস্ত; তার আরম্ভ মূর্ধার ঊর্ধ্বভাগ এবং তার শেষ ক্বাফের উচ্চারণস্থল সন্নিহিত। তাকে মূর্ধার ঊর্ধ্বভাগ থেকে শহরবাসীরা এবং কাফ বর্ণের সন্নিহিতস্থল থেকে এই বেদুইন গোত্রগুলো উচ্চারণ করে থাকে। এ বক্তব্যের দ্বারা শিয়া ফেকাহশাস্ত্রবিদরা সূরা ফাতেহায় উক্ত বর্ণের বিশেষ উচ্চারণ ত্যাগ করায় নামায নষ্ট হওয়া সম্পর্কে যে বিধান দিয়েছেন, তাও প্রতিরোধ করা যায়। কারণ শহরবাসী সব ফেকাহশাস্ত্রবিদই এ বিধানের বিরোধী। অথচ তাঁদের সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা যায় না যে, তাঁরা স্বেচ্ছায় তা ত্যাগ করেছেন; বরং তার কারণ আমরা পূর্বে যা বলেছি তাই।

অবশ্য আমরা এ কথা বলব যে, এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ও উত্তম তাই, যার সাথে বেদুইন গোত্রগুলো জড়িত। কারণ তারা তা ধারাবাহিক সূত্রে লাভ করেছে; যেমন ইতিপূর্বে আমরা বলেছি এবং এ বিষয়টি এ সাক্ষ্যই দেয় যে, তা তাদের পূর্বসূরি গোত্রের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য। তাই নবী (সঃ)-এর ভাষারীতি। এ বক্তব্যের স্বপক্ষে তাদের এ আচরণ ও প্রমাণ উপস্থিত করে যে, তারা উভয় বর্ণের উচ্চারণস্থল নিকটবর্তী হওয়ায় উভয়কে যুক্ত করে ফেলেছে। যদি তা শহরবাসীদের উচ্চারণের ন্যায় মূর্ধার ভিত্তি থেকে হত, তা হলে কখনও তা কাফ বর্ণের উচ্চারণস্থানের নিকটবর্তী হত না এবং যুক্তও হত না।

অতঃপর আরবি ভাষাবিদরা যে এ ক্বাফ বর্ণটিকে কাফ বর্ণের নিকটবর্তী বলে উল্লেখ করেছেন; যেমন বর্তমানে আরব বেদুইন গোত্রগুলো উক্ত উচ্চারণের সাথে জড়িত রয়েছে এবং তাকে ক্বাফ ও কাফ বর্ণদ্বয়ের মাঝখানে স্থাপন করেছেন, যেন তা একটি স্বতন্ত্র বর্ণ; বস্তুত এসব বিষয়ই অসম্ভব বলে মনে হয়। সুস্পষ্ট যা, তা এই যে, তা ক্বাফের উচ্চারণস্থানের শেষ ভাগ থেকে উচ্চারিত। কারণ তার উচ্চারণস্থানে প্রশস্ততা বিদ্যমান; যেমন আমরা এ সম্পর্কে পূর্বে বলেছি।

এর পর তাঁরা ক্বাফের এ উচ্চারণকে অনারবসুলভ ও দূষণীয় বলে সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছেন। যেমন তা তাঁদের কাছে পূর্ববর্তী গোত্রগুলোর ভাষা বলে গৃহীত হয়নি। আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা এ উচ্চারণের পূর্বাপর সংযোগের কথা উল্লেখ করেছি। বস্তুত এটা তারা তাদের পূর্বসূরিদের কাছ থেকে পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে এবং এটা তাদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়টিই সাক্ষ্য দেয় যে, তা তাদের পূর্বসূরি গোত্রাদির এবং নবী (সঃ)-এর ভাষারীতি; যেমন ইতিপূর্বে এ সম্পর্কীয় সব কথাই বর্ণনা করা হয়েছে।

কখনও কোনো ধারণাকারী এ ধারণাও পোষণ করেন যে; শহরবাসীরা যে ক্বাফের উচ্চারণের সাথে জড়িত, তা আদৌ সেই ক্বাফ নয়; বরং তা অনারবদের সাথে মেলামেশার ফলেই তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তারা তার সেই উচ্চারণকে গ্রহণ করেছে; কাজেই তা আরবি ভাষার অন্তর্গত নয়। কিন্তু যুক্তিযুক্ত হল; যেমন আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, তা এই যে, তা এক প্রশস্ত উচ্চারণস্থল থেকে নির্গত একই বর্ণের দুটি রূপ মাত্র। পাঠক, হৃদয়ঙ্গম করুন। আল্লাহ্ সুস্পষ্ট পথ-প্রদর্শক।

অষ্টাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

[নাগরিক ও শহরবাসীদের ভাষা স্বতন্ত্র এবং মুজারী ভাষা থেকে এটা ভিন্ন]

পাঠক, জেনে রাখুন, শহরাঞ্চল ও নাগরিকদের মধ্যে কথোপকথনের ভাষা প্রাচীন মুজারী ভাষা নয়; এমনকি এসব আরব গোত্রগুলোর ভাষাও নয়; বরং তা মুজারী ভাষা ও আমাদের সময়কালীন আরব গোত্রগুলোর ভাষা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র এবং এ গোত্রগুলোর ভাষা অপেক্ষা মুজারী ভাষা থেকে তা দূরবর্তী।

অবশ্য তা যে একটি স্বতন্ত্র ভাষা, এ বিষয়টি খুবই সুস্পষ্ট; আরবি ব্যাকরণবিদদের নিয়মাবলি থেকে তার অপপ্রয়োগগত বিচ্যুতিই এর সাক্ষ্য বহন করছে। অথচ এ সত্ত্বেও তা বিভিন্ন শহরের পরিভাষা অনুসারে বৈচিত্র্যের অধিকারী। এদিক থেকেই পূর্বাঞ্চলবাসীদের ভাষা অনেকাংশে পশ্চিমাঞ্চলবাসীদের ভাষা থেকে বিভিন্ন এবং অনুরূপভাবে আন্দালুসবাসীদের ভাষার সাথে এর অঞ্চলের ভাষার বিভিন্নতা বিদ্যমান। কিন্তু প্রতিটি বাকরীতিই তার সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীদের মনোভাব প্রকাশ ও বক্তব্যের উদ্দেশ্য সাধনে পারঙ্গম। এটিই বাকরীতি ও ভাষার যথার্থ তাৎপর্য। কারক চিহ্নাদির অবলুপ্তি এ ব্যাপারে কোনো প্রকার বাধার সৃষ্টি করে না; যেমন বর্তমানকালের আরবি ভাষা সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে বলেছি।

তবে তা যে আরব গোত্রগুলোর ভাষার চেয়ে প্রাচীন ভাষা থেকে বেশি দূরবর্তী; এর কারণ এই যে, এ দূরত্ব অনারব ভাষারীতির সাথে মিশ্রণের অনুপাতেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। সুতরাং যারা এরূপ অনারবত্বের মধ্যে অধিক মিশে গেছে, তাদের ভাষাও সেই তুলনায় মূল ভাষারূপ থেকে বেশি দূরবর্তী হয়ে পড়েছে। কারণ ভাষাগত যোগ্যতা একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে থাকে; এ কথা পূর্বেই আমরা বলেছি। বস্তুত এ প্রসঙ্গে ভাষাগত এ যোগ্যতা মূল ভাষাভাষী আরবদের যোগ্যতার সাথে অনারবদের অনুরূপ যোগ্যতার মিশ্রণের ফলে উদ্ভূত। কাজেই সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীরা যে পরিমাণে অনারব বাকরীতি শুনেছে এবং যে হারে সেই পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছে, সেই অনুপাতে প্রাচীন যোগ্যতা থেকে দূরে সরে গেছে।

পাঠক, এ বিষয়টি আফ্রিকিয়া, মাগরিব, আন্দালুস ও পূর্বাঞ্চলের শহরগুলোর মধ্যে বিবেচনা করুন। এদিক থেকে আফ্রিকিয়া ও মাগরিবে অনারব বারবারদের সাথেই বেশি মিশ্রণ ঘটেছে। কারণ এতদঞ্চলে তাদের জনসংখ্যাই বেশি; কোনো শহর বা গোত্র এ আধিক্য থেকে মুক্ত বলা যায় না। সুতরাং সেখানে আরবি ভাষার উপর অনারবত্ব প্রাধান্য লাভ করেছে এবং একটি মিশ্রিত ভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন আমরা পূর্বে

বর্ণনা করেছি, অনারবত্ব সেখানে প্রাধান্য বিস্তারকারী এবং সেই তুলনায় তা পূর্ববর্তী ভাষা থেকে বেশি দূরবর্তী।

এভাবে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরাও আরব বিজয়ের পরে পারসিক তুর্কি জাতিগুলোর সাথে মিশ্রণের ফলে তাদের মধ্যকার শ্রমিক, চাষী ও কয়েদীদের ভাষার সাথে বিজয়ীদের ভাষার আদান-প্রদান ঘটল। তারা বিজিত জাতির লোকদেরকে চাকর, বাঁদী, ধাই ও দুগ্ধদাত্রী হিসেবে নিয়োগ করার ফলে তাদের প্রভাবে ভাষারূপে বিকৃতি ঘটে ভিন্ন ভাষার জন্ম হল। অনুরূপ আন্দালুসবাসীরাও অনারব জাল্লাকী ও ফিরিঙ্গীদের সাথে মিশে ভাষার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বস্তুত এসব অঞ্চলে প্রতিটি শহরবাসীই একটি ভিন্ন ভাষার অধিকারী এবং তা মুজারী ভাষা থেকে ভিন্ন। তদুপরি তাদের পরস্পরের ভাষাও অনুরূপভাবে বিভিন্ন; যেমন আমরা পরে বর্ণনা করব। ফলত সংশ্লিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিটি দৃঢ়তাই তাদেরকে ভাষাগত বিচিত্র যোগ্যতারূপে উপস্থিত করেছে। 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি ও নির্ধারণ করেন।'[৪০৫]

৪০৫. কোরান; ৩, ৪৭; ৫, ১৭; ২৪, ৪৫।

উনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[মুজারী ভাষার শিক্ষা ব্যবস্থা]

জেনে রাখুন যে, মুজারী ভাষার যোগ্যতা বর্তমানকালে বিলীয়মান নিশ্চিহ্নপ্রায়। বর্তমান গোত্রগুলোর সমগ্র ভাষারূপই কুরআন অবতরণের সময়কালীন মুজারী ভাষা থেকে ভিন্ন। বস্তুত বর্তমান ভাষা অনারবত্বের সংমিশ্রণে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষারূপ পরিগ্রহ করেছে; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। অবশ্য যেহেতু ভাষাবিশেষ একটি যোগ্যতা, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং তা শিক্ষার দ্বারা অর্জন করা সম্ভব। সর্বপ্রকার যোগ্যতারই এই অবস্থা।

কাজেই যে ব্যক্তি এ যোগ্যতা লাভের ইচ্ছা পোষণ করে ও তা অর্জন করতে চায় তার জন্য শিক্ষার পদ্ধতি হল সে কুরআন-হাদীসের ধারা অনুসারী আরবি ভাষাভাষীদের প্রাচীন বক্তব্য, পূর্বসূরিদের আলোচনা এবং বিশিষ্ট বাগ্মীদের বীরত্বব্যঞ্জক ভাষণ ও কবিদের কাব্য অধ্যয়নে নিজেকে নিয়োজিত করবে। তার সাথে আরবিয়ত্ব প্রাপ্ত অনারবদের সর্ববিষয়ে প্রদত্ত অবদানকেও অনুসরণ করবে। এভাবে বেশি মাত্রায় তাদের গদ্য-পদ্য অধ্যয়ন করায় এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হবে যে সেই ব্যক্তি যেন সেই প্রাচীন আরবীয় পরিবেশেই পরিবর্ধিত হচ্ছে এবং মনোভাব প্রকাশের ধারা যেন তাদের কাছ থেকেই শিখছে। তারপর সে তাদের বর্ণনার ধারা অনুসরণ করে নিজের মনোভাব প্রকাশের চেষ্টায় নিয়োজিত হবে এবং এ প্রসঙ্গে তাদের বাকবিন্যাস, তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত বাকভঙ্গি ও শব্দ চয়নের ধারা অনুসরণ করবে। এভাবে সংগ্রহ ও ব্যবহারের ফলে তার মধ্যে সেই ভাষাগত যোগ্যতার সৃষ্টি হবে এবং তাদের আধিক্যের মাধ্যমে এ যোগ্যতায় দৃঢ়তা ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

এর সাথে যোগ্যতা অর্জনকারীকে প্রবৃত্তির সুস্থতা, আরবদের বাসনা-কামনা সম্পর্কে সৃষ্ট উপলব্ধি, তাদের বাকবিন্যাস প্রণালীর ধারণা এবং বক্তব্য উপস্থাপনে প্রসঙ্গের প্রয়োজন ও তার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বস্তুত রস আস্বাদনের শক্তিই তার এ প্রাপ্তির সাক্ষ্য বহন করে এবং তা এ যোগ্যতা ও সুস্থ প্রবৃত্তির সম্মিলনে উদ্ভূত হয়; যেমন পরবর্তী সময়ে এ সম্পর্কে বর্ণনা আসবে। ফলত অর্জনকারীর সংগ্রহশক্তি ও তার ব্যবহারের আধিক্যের মাধ্যমেই গদ্যে-পদ্যে তার বক্তব্য শিল্পোত্তীর্ণ গুণে ভূষিত হয়ে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ, তাকেই বলা যাবে যে সে মুজারী ভাষা অর্জন করেছে। সে ঐ ভাষার বাকবৈদগ্ধ সম্পর্কে বিচারক ও সমালোচক। বস্তুত উক্ত ভাষার শিক্ষার ধারা এরূপই হওয়া উচিত। আল্লাহ তাঁর দয়ায় ও কৃপায় যাকে ইচ্ছা সুপথ দেখিয়ে থাকেন।

পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[ভাষার এই যোগ্যতা ও আরবি ভাষাতত্ত্ব এক নয় এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে শেষোক্তটির প্রয়োজন সামান্য]

এর কারণ এই যে, আরবি ভাষাতত্ত্ব বলতে ভাষাগত যোগ্যতার নিয়মাবলি ও বিশেষ অনুমান জ্ঞানকেই বোঝায়। তা অবস্থার জ্ঞান; স্বয়ং অবস্থা নয়। সুতরাং তা স্বয়ং যোগ্যতা নয়।

এটা সেই ব্যক্তির শিল্পজ্ঞানের মতো, যে-কোনো একটি শিল্পকে কেবলমাত্র শাস্ত্রের দিক থেকে জেনেছে, কিন্তু ব্যবহারের দিক থেকে দক্ষতা অর্জন করেনি। যেমন সীবন শাস্ত্রে দক্ষ কোনো ব্যক্তি যে তার ব্যবহারিক যোগ্যতা অর্জন করেনি, সে উক্ত শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করতে গিয়ে বলতে পারে, সীবন শিল্প হল সুইয়ের মার্গে সুতা পরানো; তারপর সুইটিকে কাপড়ের দুটি প্রান্ত এক করে তাতে প্রবেশ করানো এবং এমনভাবে অপর পাশে তাকে বের করা, যাতে পুনরায় ফিরিয়ে তাকে আরম্ভের স্থানে আনা যায়। এরপর তাকে আবার প্রথম ছিদ্রের সম্মুখ ভাগে পূর্ববর্তী দুটি ছিদ্রের মধ্যবর্তী ফাঁকের অনুরূপ ফাঁক রেখে বের করতে হবে এবং এভাবে ক্রিয়াটির শেষ পর্যন্ত বিষয়টিকে অনুসরণ করে যেতে হবে। উপরিউক্ত ব্যক্তি অনুরূপভাবে জোড়, ফোঁড় ও কাটা-সেলাইয়ের স্বরূপসহ সমুদয় সীবন শিল্প ও তার প্রক্রিয়াদি বর্ণনা করতে পারে; কিন্তু তাকে যদি হাতেকলমে এসব কাজ সম্পন্ন করতে বলা হয়, তাহলে তার কোনোটিই সুসম্পন্ন করতে পারবে না।

অনুরূপভাবে সূত্রধরের শিল্পজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলবে, তা হল করাতটিকে কাঠখণ্ডের মাথায় স্থাপন করে তার একপাশ ধরে রাখা এবং তার অন্যপাশে সম্মুখভাগে অন্যজন ধরবে। এভাবে উভয়ে উভয়ের দিক থেকে করাতটিকে আগ-পিছ করতে থাকবে। এর ফলে কাঠখণ্ডের উপর দিয়ে যাতায়াতকারী করাতের তীক্ষ্ণ দাঁতবিশিষ্ট প্রান্তটি তাকে ফাঁড়তে আরম্ভ করবে এবং এক সময়ে তার প্রান্তে এসে পৌঁছবে। কিন্তু এ ব্যক্তিকে যদি এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন বা তার কিছু অংশ সম্পূর্ণ করতে বলা হয়, তাহলে সে তাতে দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হবে না।

ভাষার কারক চিহ্নাদির নিয়মাবলির জ্ঞানও এরূপ তার যথার্থ যোগ্যতার সাথে বিভিন্ন। কারণ কারক চিহ্নাদির নিয়মাবলির জ্ঞান হল প্রক্রিয়ার অবস্থাগত জ্ঞান; তা স্বয়ং প্রক্রিয়া নয়। অনুরূপভাবে, পাঠক, আপনি বহু বিচক্ষণ ব্যাকরণবিদ ও আরবি ভাষাতত্ত্বে পারদর্শী ব্যক্তিকে দেখতে পাবেন, যারা যথার্থই এসব রীতিনীতির জ্ঞান

আয়ত্তে এনেছেন; কিন্তু তাঁদেরকে যদি ভাই বা বন্ধুর কাছে দুই ছত্র লিখতে অথবা কোনো অত্যাচারের বা মনোভাব প্রকাশের জন্য কিছু বর্ণনা করতে বলা হয়, তাহলে তাঁরা শুদ্ধকে ভুল করে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়ে বসেন এবং উপরিউক্ত বিষয়াদির জন্য যথার্থ বাকবিন্যাস ও আরবি ভাষারীতি অনুযায়ী মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে অপারগ হন। পাঠক, অনুরূপভাবে আপনি এমন অনেককে দেখনে, যারা এ ভাষাগত যোগ্যতা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছেন, তাঁরা কী সাবলীলভাবেই না গদ্য ও পদ্য রচনা করতে পারেন! অথচ তারা কর্তা ও কর্মের উদ্দেশ্য ও সম্বন্ধের কারক চিহ্নাদি এবং আরবি ভাষাতত্ত্বের অন্যান্য রীতিনীতি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পারেন না।

এ থেকেই জানা যায় যে, ভাষাগত যোগ্যতা ভাষাতত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় এবং বলতে গেলে তা এ শেষোক্তটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। অবশ্য কখনও কারক চিহ্নাদির বিষয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তিকেও এ যোগ্যতার ব্যাপারে পারদর্শী হিসেবে দেখতে পাই; কিন্তু এটি একান্তই বিরল ও আকস্মিক। অধিকাংশ সময় অনুরূপ ব্যতিক্রম সিবুয়াইয়ের গ্রন্থ অধ্যয়নকারীদের মধ্যে দেখা যায়। কারণ সিবুয়াই শুধু কারক চিহ্নাদির বর্ণনা করে ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি তাঁর গ্রন্থকে আরবদের প্রবাদ-প্রবচন, তাদের কাব্যের উদ্ধৃতি ও তাদের বর্ণনা রীতির দৃষ্টান্ত দিয়ে পূর্ণ করে তুলেছেন। এর ফলে উক্ত গ্রন্থটিতে এ যোগ্যতা শিক্ষাদানের উপযোগী অনেক কিছু সংগৃহীত হয়েছে। সুতরাং পাঠক, আপনি তার অধ্যয়নকারী ও জ্ঞানার্থীকে দেখতে পাবেন, তারা আরবদের বাকরীতির একটি বিশেষ অংশ অর্জন করেছে এবং তাদের সংরক্ষিত বৈশিষ্ট্য ও প্রসঙ্গের প্রয়াজনীয়তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে তারা ভাষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে সতর্ক হয়ে তাকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে তৎপর হয়েছে এবং নিজেদের মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে বেশি সফল হয়েছে।

সিবুয়াইয়ের গ্রন্থ অধ্যয়নকারী এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে যারা এ যোগ্যতার বিষয়টি উপলব্ধি করতে উদাসীন, তারা তা থেকে আরবি ভাষাতত্ত্বই শিক্ষা করে; যোগ্যতা অর্জনের কোনো সুযোগই তাদের ঘটে না। অনুরূপ উদ্ধৃতি ও সংগ্রহ পরবর্তী ভাষাতাত্ত্বিকদের গ্রন্থাবলি, যাতে শুধু ব্যাকরণ সম্পর্কীয় রীতিনীতির আলোচনা রয়েছে, আরবদের কাব্য ও ভাষাসম্পদের কোনো উদ্ধৃতি নেই; সেই সব গ্রন্থের অধ্যয়নকারীরা এ যোগ্যতা সম্পর্কে অতি অল্পই জানতে বা তার সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। এ কারণেই, পাঠক, আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা মনে করে, তারা আরবি ভাষাশিল্প সম্পর্কে বিশেষ মর্যাদা লাভের যোগ্য হয়ে উঠেছে; কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা এ বিষয়ে অন্য সব অপেক্ষা অনেক দূরে অবস্থান করছে।

আন্দালুসের আরবি শিল্পীরা ও তৎসংশ্লিষ্ট শিক্ষাদানকারীরা এক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জনে এবং অপরকে যোগ্যতার শিক্ষাদানে বেশি বাস্তব পন্থার অনুসারী। কারণ তারা তাদের শিক্ষাগ্রহণের বৈঠকে আরবের ভাষাসম্পদ ও তার প্রবাদ-প্রবচনের দৃষ্টান্ত ব্যবহার এবং বহুবিধ বাকবিন্যাস সম্পর্কীয় বিষয় উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষার্থীরাও তাদের শিক্ষাগ্রহণের মধ্যপথে যোগ্যতার অনেক নিদর্শনের সাথে পরিচিত হয়; সুতরাং তার প্রকৃতি তার ছাঁচে ঢালাই হয়ে প্রস্তুত হয় এবং যোগ্যতার অর্জন ও গ্রহণের উযোগী হয়ে ওঠে।

কিন্তু তারা ছাড়া মাগরিব ও আফ্রিকিয়াবাসী অন্যান্যরা আরবি ভাষাতত্ত্বকে একটি শাস্ত্র হিসেবে আলোচনার জন্য গ্রহণ করেছে এবং আরবদের ভাষাসম্পদে ব্যবহৃত বাকবিন্যাস ধারাকে উপলব্ধি করার প্রত্যক্ষ পথ পরিহার করে চলছে। অবশ্য তারা অনেক সময় কোনো দৃষ্টান্তকে কারক চিহ্নাদির জন্য ব্যবহার করে এবং কোনো বিশেষ রীতিকে প্রধান্য দেবার জন্য তার প্রমাণও গ্রহণ করে; কিন্তু সবই মেধাশক্তির চাহিদা অনুসারেই হয়; ভাষার নিজস্ব সম্পদ ও বিন্যাস অনুধাবনের জন্য নয়। এর ফলে আরবি ভাষাশিল্পও যুক্তিবিদ্যা বা তর্কশাস্ত্রের অনুরূপ মননশীল নীতিসর্বস্ব একটি শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে এবং সে সম্পর্কে যোগ্যতা অর্জনের পথ ও দৃষ্টান্ত থেকে বহুদূরে সরে গেছে। এর এ বৈশিষ্ট্য এর অনুসারী শহর ও বিভিন্ন দিকবাসী ভাষাবিদদেরকে যোগ্যতা থেকে সম্পূর্ণ দূরে ঠেলে দিয়েছে; বস্তুত তাদেরকে দেখে মনে হয়, তারা বুঝে আরবদের ভাষাসম্পদ সম্পর্কে মোটেও অবহিত নয়। তাদের এরূপ অবস্থার একমাত্র কারণ তারা ভাষার দৃষ্টান্ত, তার বাকবিন্যাস ধারা, তার রীতিনীতির ভালমন্দ বিচার এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থীর জন্য এসব অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা পরিত্যাগ করেছে। বস্তুত ভাষাগত যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীর তার চেয়ে উত্তম সহায় আর নেই। নিয়মাবলি প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো শাস্ত্রসম্পর্কীয় দক্ষতা অর্জনের মাধ্যম মাত্র; অথচ তারা এগুলোকে তাদের যোগ্য স্থান থেকে বিচ্যুত করে তাদেরকেই শাস্ত্রের মর্যাদা দান করেছে এবং পরিণামে ফললাভ বঞ্চিত হচ্ছে।

আমরা এ পরিচ্ছেদে ভাষাগত যোগ্যতা অর্জনে যা কিছু বর্ণনা করেছি, তার নির্গলিতার্থ হল এই যে, আরবি ভাষাগত যোগ্যতা অর্জন করতে হলে আরবদের ভাষাসম্পদকে বেশি আয়ত্তে আনতে হবে; যাতে শিক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তিতে তাদের বাকবিন্যাস ধারার ছাপ সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয় এবং সে তাতেই বিধৃত হয়ে গড়ে ওঠে। এর ফলে তার অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াবে যে, সে যেন তাদের মধ্যেই লালন-পালন হচ্ছে এবং বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠছে। এভাবে তার এমন একটি স্বতন্ত্র ভাষাগত যোগ্যতা অর্জন সম্ভব হবে, যা দিয়ে সে তাদের ধারা অনুসারে নিজের মনোভাব প্রকাশের শক্তিলাভ করতে পারবে। আল্লাহ্ যাবতীয় বিষয় নির্ধারিত করে থাকেন এবং আল্লাহ্ই অদৃশ্য সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত।

একপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[বাকশৈলীবিদ্‌দের পরিভাষায় 'আস্বাদ' শব্দটির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য নিরূপণ এবং সাধারণত আরবীয়ত্ব অর্জনকারী অনারবদের তা থেকে রক্ষা হওয়ার কারণ বর্ণনা]

জেনে রাখুন, আস্বাদ শব্দটিকে বাকশৈলী সম্পর্কীয় বিচিত্র বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই ব্যবহার করে থাকেন এবং এর অর্থ ভাষার জন্য প্রয়োজনীয় বাকবৈদগ্ধ্যের যোগ্যতা অর্জন। বাকবৈদগ্ধ্যের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে করা হয়েছে যে, এ বাকবিন্যাসের সর্বপ্রকার প্রক্রিয়ায় উদ্দেশ্য সাধনের বৈশিষ্ট্যসহ ভাষার অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে প্রকাশ লাভ করা। সুতরাং আরবি ভাষাভাষী বাকবৈদগ্ধ্যের অধিকারী ব্যক্তি সর্বদাই এক্ষেত্রে সেসব গঠন প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করেন, যা আরবদের বাকরীতি ও ভাষণ বৈচিত্র্যের দ্বারা সমর্থিত হয় এবং তিনি তার বক্তব্যকে সর্বপ্রযত্নে এ ধারায় বিধৃত করেন। সুতরাং আরবদের বাকসম্পদের মিশ্রণে যখন তার প্রচেষ্টা এ উদ্দেশ্য সাধনে সিদ্ধ হয়, তখনই বলতে পারা যায় যে, উক্ত ধারায় বাকসংগঠনের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। ফলে তিনি অতি সহজে বাকবিন্যাসে সমর্থ হন এবং তার এ প্রচেষ্টা বলতে গেলে আরবীয় বাকবৈদগ্ধ্যের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ অনুসরণ করে না। তিনি যদি অনুরূপ পথ ছাড়া অন্য পথে বাকবিন্যাসকে প্রকাশিত হতে শোনেন, তৎক্ষণাৎ তা বুঝতে পারেন এবং অতি সামান্য চিন্তা বা কোনরূপ চিন্তা না করেই তার শ্রবণশক্তির মাধ্যমে সে সম্পর্কে অবহিত হন। বস্তুত এক্ষেত্রে তিনি তাকেই যথার্থ বলে জানেন, যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে তিনি সে সম্পর্কে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কারণ যোগ্যতা যখন একবার যথাস্থানে সুপ্রতিষ্ঠ ও দৃঢ়মূল হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা সংশ্লিষ্ট স্থানের প্রকৃতি ও সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করে। এ কারণেই এমন বহু উদাসীন প্রকৃতির লোক, যারা যোগ্যতার এ বৈশিষ্ট্যের সংবাদ রাখে না, তারা ধারণা পোষণ করে যে, আরবদের জন্য ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সঠিক কারক চিহ্নাদি ও বাকবৈদগ্ধ্য প্রদর্শন একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তারাই বলে আরবরা স্বভাবতই বিশুদ্ধ কথোপকথন করে; অথচ বিষয়টি আদৌ তা নয়। বরং তা বাকসংগঠনের সেই ভাষাগত যোগ্যতা, যা সুপ্রতিষ্ঠ ও দৃঢ়মূল হলে এমনভাবে প্রকাশ পায় যে, সাধারণ দৃষ্টিতে তা স্বভাব ও সহজাত প্রকৃতি বলে প্রতীয়মান হয়।

এ যোগ্যতা, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে একমাত্র আরবদের বাণীর সাহচর্য, বারংবার শ্রবণে তার প্রতিধ্বনি এবং তার বাকবিন্যাসের ধারা উপলব্ধির মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে

থাকে। আরবি ভাষাশিল্পীরা সে সম্পর্কে যেসব শাস্ত্রীয় নিয়মাবলি আবিষ্কার করেছেন, তাদের পরিচয় লাভের মাধ্যমে উক্ত যোগ্যতা অর্জিত হয় না। কারণ নিয়মাবলি শুধু সংশ্লিষ্ট ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানদান করতে পারে; কিন্তু বাস্তব ভিত্তিতে প্রসঙ্গানুরূপ তার যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করতে পারে না। এর বর্ণনা ইতিপূর্বে গেছে।

সুতরাং যখন এ বিষয়টি পরিস্ফুটিত হল, তখন বলতে হয়, বাকবৈদগ্ধ্যের যোগ্যতা হল এমন একটি শক্তি, যা তার অধিকারীকে আরবদের ভাষার বাকসংগঠন ও বাকবিন্যাসের অনুরূপ উৎকৃষ্ট ও উত্তম বাণী সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। বরং এ যোগ্যতার অধিকারী যদি এই নির্দিষ্ট পথ ও বিশেষ বিন্যাস ধারাকে অতিক্রম করে কিছু করতে চান, তাহলে তিনি কিছুতেই উক্ত যোগ্যতা প্রকাশে সমর্থ হবেন না এবং ভাষাও তার এই ব্যতিক্রমী প্রচেষ্টায় সহযোগী হবে না। কেননা তিনি তাতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেননি এবং তার দৃঢ়মূল যোগ্যতা তাকে উক্ত পথের পথিক থেকে অনুপ্রাণিত করেনি। সুতরাং যখনই তার সামনে এমন বাণী উপস্থিত হবে, যা আরবদের বাকরীতি ও বাকবৈদগ্ধ্যের সংগঠন ধারা অতিক্রম করে সৃষ্টি হয়েছে, তিনি তৎক্ষণাৎ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করবেন এবং বুঝতে পারবেন যে, এটা আরবদের সেই বাণী সম্পদের অন্তর্গত নয়, যার সাহচর্যে তিনি যোগ্যতা অর্জন করেছেন। অবশ্য তিনি তার এ ধারণা ব্যাকরণবিদ ও বাকশৈলীবিদদের ন্যায় যুক্তি-প্রমাণসহকারে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। কারণ এ যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যাপারটি অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত নিয়মাবলির জ্ঞান থেকে অর্জিত হয়ে থাকে এবং পূর্বোক্ত ধারণার বিষয়টি একটি বিমূর্ত আবেগ, যা আরবদের বাণীর সাহচর্য থেকে লব্ধ হয়ে থাকে; এমন কি তার অর্জনকারী তাদেরই একজন হয়ে যায়।

এর উদাহরণ এই যে, আমরা যদি এমন একটি শিশুর অস্তিত্ব কল্পনা করি, যে আরব গোত্র ও পরিবেশে জন্মেছে ও প্রতিপালিত হয়েছে তা হলে সে অবশ্যই তাদের ভাষা শিক্ষা করবে এবং তার কারক-চিহ্নাদি ও বাকবৈদগ্ধ্যকেও আয়ত্তে আনবে; এমন কি এ বিষয়ে চরম সাফল্য লাভ করবে। অথচ সে এ শাস্ত্রীয় নিয়মাবলির বিন্দু-বিসর্গ না-ও জানতে পারে; বরং তার এমন যোগ্যতা একমাত্র ভাষা ও তার উচ্চারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং একইভাবে যে উক্ত গোত্র ও পরিবেশ থেকে দূরে অবস্থান করছে, সেও তাদের বাণী, কাব্য ও বাগ্মীতা কণ্ঠস্থ করে এবং তাদের ক্রমাগত অনুশীলনের মাধ্যমে সেই যোগ্যতা অর্জন করতে পারে ও তাদের একজন হয়ে যেতে পারে। যেন সে সেসব গোত্র-পরিবেশ ও তাদের ভাষার সাহচর্যেই জন্মেছে ও প্রতিপালিত হয়েছে। অথচ নিয়মাবলির জ্ঞান তাকে অনুরূপ যোগ্যতা অর্জনে কোনো প্রকার সাহায্যই করতে পারে না।

এই যে যোগ্যতা, যখন তা সুপ্রতিষ্ঠ ও দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে, তখনই তাকে বোঝাবার জন্য বাকশিল্পবিশারদদের পরিভাষা অনুসারে 'আস্বাদ' শব্দটির রূপক গ্রহণ করা হয়। প্রচলন অনুসারে আস্বাদ বলতে খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ গ্রহণকেই বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু যেহেতু এ যোগ্যতার আধার হল জিহ্বা এবং তার দ্বারাই বাণী উচ্চারিত হয়; যেমন খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করতে এ জিহ্বাই ব্যবহার করা হয়; সেজন্য এ আস্বাদ শব্দটিকেই রূপক

হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তদুপরি ভাষাগত এ গুণটি জিহ্বার একটি আবেগজনিত অবস্থা, যেমন খাদ্যবস্তু তার জন্য বাস্তব অনুভূতি; সেই কারণেও একে আস্বাদ বলা হয়।

পাঠক, যদি এ বিষয়টি আপনার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে, যেসব অনারব জাতি আরবি ভাষা পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেছে এবং উক্ত ভাষা গ্রহণ করতে ও উক্ত ভাষাভাষীদের সাথে মিশ্রণের ফলে কথা বলতে বাধ্য হয়েছে; যেমন—পূর্বাঞ্চলে পারসিক, রোমীয় ও তুর্কি এবং পশ্চিমাঞ্চলে বারবারগণ; তাদের কারও পক্ষে এ আস্বাদ লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ তারা ভাষাগত যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে ত্রুটির অধীন; ইতিপূর্বে আমরা এ সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছি। কেননা তাদের এমন ভিন্ন ভাষা গ্রহণের পর্যায় জীবনকালের একটি অংশ অতিবাহিত হওয়া এবং তাদের নিজ ভাষার যোগ্যতা তাদের জিহ্বায় এসে যাওয়ার পর দেখা দিয়েছে। তারা শহরাঞ্চলে প্রবেশ করে তত্রস্থ অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত শব্দ গঠন ও বাকবিন্যাসকে প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করেছে। অথচ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, শহরবাসীদের মধ্যে এ যোগ্যতা তখন বিলীয়মান এবং তারা তা থেকে ক্রমশ দূরে সরে এসেছে। তখন তারা মনোভাব প্রকাশে যে যোগ্যতা ব্যবহার করছে, তা এ আলোচনার উদ্দিষ্ট যোগ্যতা নয়; বরং তা ভিন্ন প্রকৃতির অন্য এক যোগ্যতা। এভাবে যারা গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ এ যোগ্যতার বিচিত্র নিয়মাবলির সাথে পরিচিত হয়, তারা তার রীতিনীতিই শিক্ষা করে; যোগ্যতা অর্জন তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না; যেমন পাঠক আপনি বুঝতে পেরেছেন। বস্তুত উদ্দিষ্ট যোগ্যতা একমাত্র আরবদের বাণীর সাহচর্য, তার অভ্যাস ও বারংবার অনুশীলনের মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

পাঠক, এ প্রসঙ্গে যদি আপনার সামনে সিবুয়াই, ফারেসি, যমখশরী ও তত্তুল্য অন্যান্য ভাষাতত্ত্ব বিশারদের অনারব হওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ যোগ্যতার অধিকারী হওয়ার শ্রুত কাহিনী বাধাস্বরূপ এসে উপস্থিত হয়, তাহলে আপনি জেনে রাখুন, এসব বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাদের কথা আপনি শুনতে পাচ্ছেন, তাঁরা একমাত্র বংশধারার দিক থেকেই অনারব ছিলেন। কিন্তু তাঁদের জন্ম ও প্রতিপালন উদ্দিষ্ট যোগ্যতার অধিকারী আরব পরিমণ্ডলেই হয়েছিল এবং তাঁরা তাদের কাছ থেকেই তার শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলেই তারা বক্তব্য উপস্থাপনে এমন এক চরম পর্যায়ে উপনীত হন, যার অতিরিক্ত আর কিছু নেই বললেই চলে। যেন তারা তাদের জন্মের প্রথম লগ্নে সেই আরব শিশুদেরই সমতুল্য, যারা তাদের গোত্র পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে সেখানে প্রতিপালিত হয়েছে এবং ভাষার সব রহস্য অনুধাবন করে তার অধিকারী হয়ে গেছে। সুতরাং ঐসব বিশিষ্ট ব্যক্তি বংশধারার দিক থেকে অনারব হলেও ভাষা ও বাণীর দিক থেকে অনারব নন। কারণ তারা যোগ্যতার অধিকারী জাতিকে তাদের সমৃদ্ধির যুগে এবং ভাষাকে তার যৌবনকালে পেয়েছেন। তখন তাদের মধ্য থেকে যোগ্যতার নিদর্শন দূর হয়নি এবং শহরবাসীরাও তা হারিয়ে বসে নি। এর ফলে তারা তাদের বাণীর সাহচর্য লাভ করে তার অনুশীলনে লিপ্ত হয়ে যোগ্যতার চরমে পৌঁছেছিলেন।

অথচ বর্তমানকালে কোনো একজন অনারব যখন শহরবাসী আরবি ভাষাভাষীদের সাথে মিশ্রিত হয় তখন ভাষার ক্ষেত্রে এ উদ্দিষ্ট যোগ্যতার বিষয়টিকে একটি

চিহ্নাবশেষহীন বস্তু হিসেবেই দেখতে পায়। মনোভাব প্রকাশের জন্য তারা ভাষাগত যে যোগ্যতা ব্যবহার করে তার সাথে আরবি ভাষার সেই যোগ্যতার কোনো প্রকার সম্ভাবনা নেই। তদুপরি আমরা যদি এটা ধরে নেই যে, উক্ত ব্যক্তি আরবদের বাণী ও কাব্য দৃষ্টান্তের সাহচর্যে এল এবং তাদের অধ্যয়ন ও অনুশীলনের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করল তবুও তার পক্ষে উক্ত যোগ্যতা লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি যে, কোনো যোগ্যতা যদি একবার দৃঢ়মূল হয়ে বসে তাহলে সেখানে অন্য কোনো যোগ্যতার আবির্ভাব ত্রুটিপূর্ণ ও বিকলাঙ্গ হয়ে থাকে। আর যদি আমরা এটা ধরে নেই যে, কোনো অনারব বংশোদ্ভূত ব্যক্তি অনারব ভাষার মিশ্রণ থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং সে আলোচ্য যোগ্যতা অর্জনে যথাযথ স্মৃতি ও অনুশীলনের সাহায্য গ্রহণ করেছে তা হলেও বলতে হবে যে, এ বিষয়ে তার সাফল্য অবধারিত নয়; বরং অনুরূপ সাফল্য একান্তই বিরল এবং আমাদের বর্ণনা থেকে পাঠক অবশ্যই তার কারণ বুঝে নিয়েছেন। অনেক সময় অনেক ব্যক্তি বাকশৈলীর এ নিয়মাবলি অধ্যয়ন করেই দাবি করে যে, তার জন্য এ প্রয়াসের মাধ্যমেই 'আস্বাদ' লাভ ঘটেছে; বস্তুত এরূপ দাবি ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তিকর বিষয় মাত্র। কারণ বাকশৈলীর নিয়মাবলি অধ্যয়নে উক্ত ব্যক্তিবর্গ শুধু সে-সম্পর্কীয় যোগ্যতাই অর্জন করতে পারে তাতে বর্ণনাশক্তির যোগ্যতা অর্জনে কোনো সাহায্যই আসবে না। 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন'।[৪০৬]

৪০৬. কোরান; ২, ১৪২।

দ্বিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[সাধারণভাবে শহরবাসীরা শিক্ষার মধ্যদিয়ে এ ভাষাগত যোগ্যতা অর্জনে অক্ষম এবং যারা আরবি ভাষাপরিমণ্ডল থেকে অনেক দূরে অবস্থিত তাদের জন্য তা ততো কষ্টকর ও কঠিন]

এরূপ পরিস্থিতির কারণ হিসেবে শিক্ষার্থীর উদ্দিষ্ট যোগ্যতার বিরোধী ভিন্নতর যোগ্যতার আবির্ভাবকে ধরা যায়। এর ফলে সে অনারবত্ব মিশ্রিত শহরীয় বাক-রীতির কবলে পড়ে। পরিণামে উক্ত বাকরীতি তাকে প্রথম যোগ্যতা থেকে নামিয়ে এক ভিন্নতর যোগ্যতায় স্থাপন করে এবং তাই বর্তমানকালে ভাষাগত নাগরিক যোগ্যতা। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই, শিক্ষকগণ সর্বাগ্রে শৈশবকালীন শিক্ষায় এ ভাষার ওপরই জোর দিয়ে থাকেন। ব্যাকরণবিদদের ধারণা, ভাষার এমন অগ্রগামিতার কারণ তাদের ভাষাশিল্প; কিন্তু আসলে তা নয়। এ শিক্ষা একমাত্র সেই উদ্দিষ্ট যোগ্যতা সৃষ্টির প্রতি লক্ষ রেখে আরবের বাণী ও বাকরীতির অনুশীলনেই সম্ভব হয়ে থাকে। অবশ্য ব্যাকরণশিল্প এরূপ প্রক্রিয়ায় সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে যে বাকরীতি বেশি অনারব পরিবেশের অধীন এবং বেশি মুজারী বাক্‌রীতি থেকে দূরে অবস্থিত, তা সেই পরিমাণেই তার শিক্ষার্থীকে মুজারী ভাষা ও তার যোগ্যতা অর্জনে বাধার সৃষ্টি করবে। কারণ সেখানে দুটি বিরোধী বাকরীতির মধ্যকার প্রাধান্যের সম্ভাবনাই বেশি। পাঠক, শহরবাসীদের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখতে পারেন।

আফ্রিকিয়া ও মাগরিববাসীরা যেহেতু অধিকতরভাবে অনারব পরিবেশের অধীন ও আদি বাকরীতি থেকে বেশি দূরে অবস্থান করত, সেজন্য শিক্ষার মাধ্যমে এ ভাষাগত যোগ্যতা অর্জনে তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিও ছিল অপরিসীম। ইবনে রফিক[৪০৭] বর্ণনা করেছেন, কায়রোয়ানের কোনো এক লেখক তার সঙ্গীর কাছে নিচের এ প্রশ্নটি লিখেছিল :

'হে ভ্রাত ঃ এবং যার অনুপস্থিতে আমি নাস্তি জ্ঞান করি! আবু সাইদ আমাকে এ বক্তব্য জানিয়েছে যে, তুমি এরূপ স্মরণ করতে যে, তুমি তাদের সঙ্গে থাকবে, যারা আসবে। আজ আমাদেরকে ব্যাহত করেছে, ফলে আমাদের বাইরে যাবার ব্যবস্থা করেনি। অবশ্য এ গৃহের অধিবাসী কুকাজের কুকুরগুলো তারা একে মিথ্যা বলে নস্যাৎ

৪০৭. ভূমিকা দ্র:।

করেছে। তাতে এর একটি বর্ণও নেই। তোমার প্রতি আমার পত্র এবং আল্লাহ্ চান তো আমি তোমার প্রতি ব্যাকুল।'[৪০৮]

—বস্তুত মুজারী ভাষায় তাদের যোগ্যতার এটাই ছিল নমুনা এবং এর কারণও আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

অনুরূপভাবে তাদের কাব্যসম্ভারও ভাষাগত যোগ্যতাহীন নিম্ন পর্যায়ের হত এবং এ অবস্থা ক্রমান্বয়ে বর্তমানকাল পর্যন্ত চলে এসেছে। এ কারণেই আফ্রিকিয়ায় বিখ্যাত কবিদের মধ্যে একমাত্র ইবনে রশিক[৪০৯] ও ইবনে শরফ[৪১০] ছাড়া অন্য কারও নাম উল্লেখযোগ্য নয়। বস্তুত কাব্যপ্রতিভায় অধিকাংশ কবিই ভাষাগত যোগ্যতার দিক থেকে নবাগত। তাদের বাকবৈদগ্ধ্য তদবধি বর্তমানকাল পর্যন্ত ত্রুটির অভিমুখী হয়েই অগ্রসর হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে যোগ্যতা অর্জনের ব্যাপারে তাদের চেয়ে আন্দালুসবাসীদের দক্ষতা সমধিক। কারণ তারা গদ্য ও পদ্যের বিরাট সংগ্রহ থেকে এ যোগ্যতা অর্জনের প্রভূত প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। তাদের মধ্যে ইবনে হাইয়্যান[৪১১] নামী ঐতিহাসিক এ ভাষাশিল্পবিদদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় এবং তার সমৃদ্ধির পতাকাবাহী ছিলেন। ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের সময়েও ইবনে আবদে রাব্বিহি,[৪১২] আল কস্তালী[৪১৩] ও তত্তুল্য অন্যান্য কবিরা ছিলেন। কারণ তাদের মধ্যে এ ভাষ্য ও সাহিত্যের সাগর উত্তাল হয়ে উঠল তা শত শত বর্ষব্যাপী তাদের মধ্যে আন্দোলিত হচ্ছিল এবং খ্রিস্টান আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ার ফলে নির্বাসনের দুর্যোগ না আসা পর্যন্ত তাতে ভাঁটা পড়েনি। এ সময়ে তারা এসব বিষয়ে শিক্ষা-দীক্ষা থেকে দূরে সরে আসে এবং জনবসতি হ্রাসপ্রাপ্তিতে সর্বপ্রকার শিল্পকর্মেই অবক্ষয় দেখা দেয়। ফলে ভাষাগত যোগ্যতাও তার তুঙ্গ অবস্থা থেকে নেমে এসে সর্ব নিম্নস্তরে উপনীত হয়।

তাদের মধ্যে উপরিউক্ত বিষয়ে শেষ প্রতিনিধি ছিলেন সালেহ ইবনে শরীফ[৪১৪] ও মালেক ইবনে মুরাহাল।[৪১৫] তারা উভয়ে বনি আহমারের রাজত্বকালের প্রথমদিকে শেভিলার এ বিষয়ক গোষ্ঠীর উত্তরসূরি হিসেবে সিওটায় বর্তমান ছিলেন। আন্দালুস এরূপ যোগ্যতার অধিকারী তার হৃদয়খণ্ডগুলোকে নির্বাসনের মাধ্যমে সমুদ্রতীরে নিক্ষেপ করেছিল; ফলে তারা শেভিলার তীরভূমি থেকে সিওটায় এবং পূর্ব আন্দালুস থেকে আফ্রিকিয়ায় এসেছিলেন। কিন্তু তাদের উপস্থিতি সত্ত্বেও সব কিছু বিলীন হচ্ছিল এবং এ বিষয়ে শিক্ষার ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। কারণ সমুদ্রতীরবাসীরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছিল না এবং তা গ্রহণ করাও তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা

---

৪০৮. বলাবাহুল্য ভাষার সেই নমুনা অনুবাদে উপস্থিত করা সম্ভব নয়।
৪০৯. ভূমিকা দ্র:।
৪১০. তৃতীয় অধ্যায়ের ৩ নং টীকা দ্র:।
৪১১. ভূমিকা দ্র:।
৪১২. ভূমিকার ৫০ নং টীকা দ্র:।
৪১৩. আহমদ ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।
৪১৪. সালেহ ইবনে ইয়াজিদ; ৬০১-৬৮৪ (১২০৪-১২৮৬ খ্রি:) হি:।
৪১৫. মালেক ইবনে আবদুর রহমান; ৬০৪-৬৯৯ (১২০৭-১৩০০ খ্রি:) হি:।

বারবারী অনারবত্বের আধিপত্যের দরুন তাদের বাকরীতিতে বক্রতা বিদ্যমান ছিল এবং আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি যে, তা এ বিষয়ের পরিপন্থী।

অতঃপর এ ভাষাগত যোগ্যতা পুনরায় পূর্বের সেই সমৃদ্ধিসহ আন্দালুসে ফিরে আসে এবং ইবনে সিরীন,[৪১৬] ইবনে জাবের[৪১৭], ইবনে জিয়াব[৪১৮] ও তাঁদের পর্যায়ভুক্ত অন্যান্যরা খ্যাতি লাভ করেন। তাঁদের পরে ইব্রাহিম আস্‌সাহেলী আত্তুয়াইজন[৪১৯] ও তার পর্যায়ভুক্ত অন্যান্যরা এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ইবনে খাতিব আবির্ভূত হন,[৪২০] যিনি সম্প্রতি তাঁর শত্রুদের প্রচেষ্টায় শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন। তাঁর ভাষাগত যোগ্যতার অভাব পূরণ হবার নয় এবং তাঁর পরে তাঁর শিষ্যরা তাঁর অনুসরণ করছে।

সামগ্রিকভাবে আন্দালুসে এ ভাষাগত যোগ্যতার পরিচয় সমধিক এবং তার শিক্ষাদান পদ্ধতিও তুলনামূলকভাবে সহজ ও সাবলীল। বর্তমানকালেও তারা আমাদের সেই পূর্ববর্ণিত আরবি ভাষার বিষয়বৈচিত্র্য অনুসরণ ও সংরক্ষণ এবং সাহিত্যের চর্চা ও তা শিক্ষাদান পদ্ধতির ধারা যত্নের সাথে রক্ষা করছে। কারণ অনারব ভাষার অধিকারী, যারা মিশ্রণের দ্বারা তাদের বাকরীতিকে বিকৃত করতে পারে, তারা সেখানে একান্তই নবাগত এবং সমুদ্রতীরের এ অঞ্চলের আন্দালুসী ও বারবার অধিবাসীদের মধ্যে অনারব ভাষার কোনো ভিত্তিই নেই। তারা এ অঞ্চলের অধিবাসী এবং তাদের ভাষাই এ অঞ্চলের ভাষা। একমাত্র শহরগুলোতেই এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। তারা অনারবত্ব ও বারবারী ভাষার বাকধারায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এর ফলে তাদের পক্ষে শিক্ষার মাধ্যমে ভাষাগত যোগ্যতা অর্জন কঠিন হয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু আন্দালুসবাসীদের অবস্থা এর বিপরীত।

পাঠক এ বিষয়টি উমাইয়া ও আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সময়কালীন পূর্বাঞ্চলবাসীদের অবস্থার সাথে বিবেচনা করুন। তৎকালে তাদের অবস্থাও ভাষাগত যোগ্যতা ও চমৎকারিত্বের ব্যাপারে সর্বক্ষেত্রে আন্দালুসবাসীদের সমতুল্য ছিল। কারণ তৎকালে এ বিষয়ে তারা অনারবদের সাথে খুব সামান্যই মিশ্রণের কবলে পতিত হয়েছিল। সুতরাং তাদের মধ্যে তখন এ যোগ্যতাটি সুদৃঢ় ছিল এবং তাদের সময়ে লেখক ও কবিদের খ্যাতি ছিল পরিপূর্ণ। কেননা তখন পূর্বাঞ্চল আরবরা ও তাদের সন্তান-সন্ততিদের দ্বারা পূর্ণ ছিল।

পাঠক, এ প্রসঙ্গে 'কিতাবুল আগানী' তাদের গদ্য-পদ্যের যে বিরাট সম্ভার উপস্থিত করেছে, তার প্রতি লক্ষ করুন। কারণ এ গ্রন্থটি যথার্থই আরবদের এবং তাদের ঐতিহ্য সম্ভার। এতে তাদের ভাষা, ইতিহাস, যুদ্ধ-বিগ্রহ, আরবীয় জাতিত্ব, নবী (সঃ)-এর চরিত্র, খলিফা ও রাজন্যবর্গের কীর্তিমালা, কাব্য, সঙ্গীত এবং সঙ্গীতজ্ঞদের যাবতীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। আরবদের অবস্থা জানার জন্য এটার চেয়ে ব্যাপক বিষয় সম্বলিত অন্য আর কোনো গ্রন্থ নেই।

---

৪১৬. মুহম্মদ ইবনে আহমদ; ৬৭৪-৭৪৭ (১২৭৬-১৩৪৬ খ্রি:) হি:।
৪১৭. মুহম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আলী; ৬১৮-৭৮০ (১২৯৯-১৩৭৮ খ্রি:) হি:।
৪১৮. আলী ইবনে মুহম্মদ; ৬৭৩-৭৪৯ (১২৭৪-১৩৪৯ খ্রি:) হি:।
৪১৯. ইব্রাহিম ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ৭৪৭ (১৩৪৬ খ্রি:) হি:।
৪২০. তৃতীয় অধ্যায় দ্র:।

বস্তুত ভাষাগত যোগ্যতার এ বিষয়টি উক্ত দুটি সাম্রাজ্যের সময় সুদৃঢ়ভাবে বিরাজমান ছিল। এমন কি অনেক সময় এর বহিঃপ্রকাশ তাদের মধ্যে এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মূর্খতার যুগেও তা দেখা যায়নি; যেমন আমরা পরে এ সম্পর্কে বর্ণনা করব। এমনি অবস্থায় থেকে এক সময় আরবদের কর্তৃত্ব নষ্ট হল, তাদের ভাষা বিকৃত হল, তাদের বাণী লুপ্ত হল, তাদের বিষয় গৌরব ও সাম্রাজ্য সমাপ্ত হল এবং ক্ষমতা অনারবদের হাতে চলে গেল। তখন তাদের হাতেই রাজশক্তি এবং চতুর্দিকে তাদেরই আধিপত্য। দায়লমী ও সলজুকীদের সময়েই অনুরূপ ঘটনা ঘটল। তারা শহরবাসীদের মধ্যে প্রবিষ্ট হল এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাদের ভাষায় পৃথিবী পরিপূর্ণ করে তুলল। ভাষার ক্ষেত্রে অনারবত্ব শহরবাসী ও নাগরিকদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হল এবং পরিণামে তারা আরবি বাকরীতি থেকে দূরে সরে গেল। যোগ্যতার অভাবের ফলে শিক্ষার্থীরাও সেই যোগ্যতা অর্জনে বিচ্যুতির অধীন হতে লাগল। বস্তুত বর্তমানকালে তাদের গদ্য-পদ্যের এ স্বরূপই আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি; যদিও এ বিষয়ে তাদের সৃষ্টির সংখ্যা প্রচুর। 'আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন ও নির্বাচন করেন'।[৪২১] পবিত্র ও মহান আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ এবং তিনিই সহায়তার আধার। তিনি ছাড়া অন্য কোনো প্রতিপালক নেই।

৪২১. কোরান; ২৮, ৬৮।

ত্রিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[গদ্য ও পদ্য বিষয়দ্বয়ে বাণীর দ্বিধাবিভক্তি]

জেনে রাখুন, আরবদের বাকরীতি ও বাণী দুটি ভাগে বিভক্ত। এর একটি ছন্দোবদ্ধ কাব্য; তা মাত্রাযুক্ত সমিল বাণীরূপ। সমিল অর্থে তার মাত্রাযুক্ত প্রতিটি পঙ্‌ক্তি একটি বর্ণের ধারায় মিলবে এবং একেই বলা হয় অন্ত্যানুপ্রাস। এর দ্বিতীয়টি হল গদ্য; তা মাত্রাবিহীন বাণীরূপ। এ দুটি বিষয়ের প্রত্যেকটিই বাণী সম্পর্কীয় বিচিত্র বিষয় ও মতাদর্শের ধারক ও বাহক। বাক্যের মধ্যে স্তুতি, নিন্দা ও শোকগাথা। গদ্যের মধ্যে ছন্দোবদ্ধ গদ্য, যা খণ্ড খণ্ড আকারে রচিত হয় এবং প্রতি দুটি বাক্যের মধ্যে একটি মিল অনুসরণ করা হয়; তাকেই ছন্দোবদ্ধতা বলে। গদ্যের অন্য একটি হল সরল গদ্য, যাতে বক্তব্যকে নির্বাধে বিস্তার করা হয়। কোনো প্রকার অংশে ভাগ না করে বরং কোন প্রকার অন্ত্যমিল ও অন্যবিধ বাধ্যবাধকতা ছাড়াই বক্তব্যকে ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়। এরূপ গদ্য ভাষণে, প্রার্থনায় এবং সাধারণ মানুষের উৎসাহ বর্ধন ও সতর্কীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

কুরআন যদিও গদ্যে রচিত, তবুও তা উপরিউক্ত দুটি রূপের কোনটিতেই এককভাবে পড়ে না। তাকে সরল বাধাবন্ধনহীন গদ্যও বলা যায় না; আবার ছন্দোবদ্ধ গদ্যও বলা যায় না। বরং তাতে শ্লোকের বিভক্তি এমন এক স্থানে মূর্ত হয়, যেখানে আস্বাদ একটি বক্তব্যের সমাপ্তি ঘোষণা করে এবং এর পরে বক্তব্য অন্য একটি শ্লোকে প্রত্যাবৃত্ত হতে থাকে। এরূপ প্রত্যাবর্তন বা দ্বিরুক্তি কোনো প্রকার বর্গের ছন্দোবদ্ধতা ও অন্ত্যানুপ্রাসের আবশ্যকতা ছাড়া ঘটে থাকে। এটাই আল্লাহ্ মহানের বাণীর অর্থ; তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ্ সুন্দরতম অভিনব বাণী অবতীর্ণ করেছেন, যা গ্রন্থরূপে পরস্পরতুল্য দ্বিরুক্তিবিশিষ্ট; যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তার সংস্পর্শে তাদের গাত্রচর্ম শিহরিত হয়ে ওঠে।'[৪২২] তিনি আরও বলেছেন, 'আমরা শ্লোকগুলোকে বিভক্ত করে দিয়েছি।[৪২৩] কোরানের শ্লোকসমূহের শেষাংশকে 'বিভাজক' (ফাওয়াসেল) বলা হয় এজন্যই যে, এগুলো গদ্যের ছন্দোবদ্ধতা নয়। কারণ সেখানে অনুরূপ ছন্দোবদ্ধতার বাধ্যবাধকতা নেই। এমন কি এগুলোতে অন্ত্যমিলের কিছু নেই। 'দ্বিরুক্তিবিশিষ্ট' (মাছানী) নামটি সাধারণভাবে কোরানের সর্বপ্রকার শ্লোক সম্পর্কেই প্রযোজ্য হয় এবং এর কারণ আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। বিশেষভাবে এর দ্বারা 'সূরা ফাতেহা' কুরআন

---

৪২২. কোরান, ৩৯, ২৩।
৪২৩. কোরান; ৬, ৯৭।

জননীকে বুঝিয়ে থাকে এবং তার কারণ উক্ত সূরায় এর প্রাধান্য। যেমন প্রাধান্যের তারকা বলতে 'সপ্তর্ষিমণ্ডল' (সুরাইয়া)-কে বোঝায়। এজন্যই উক্ত সূরাকে 'দ্বিরুক্তিবিশিষ্ট সপ্তশ্লোক' বলে অভিহিত করা হয়। পাঠক, এর সাথে কুরআন ভাষ্যকারদের দ্বারা উক্ত সূরার 'মাছানী' নামকরণের কারণ বর্ণনা মিলিয়ে লক্ষ করুন, দেখতে পাবেন, আমাদের বক্তব্যের সত্যতার সাক্ষ্যই তা বহন করছে।

জেনে রাখুন, উপরিউক্ত প্রতিটি বিষয়েরই বিশেষ রীতি বিদ্যমান, যা সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রকারদের কাছে সুপরিচিত এবং যা অন্য বিষয়ের উপযোগী নয় ও তাতে ব্যবহৃতও হয় না। যেমন 'নসিব' বা প্রণয়োপাখ্যান কাব্যের সাথে বিশিষ্ট, স্তুতি ও প্রার্থনা ধর্মীয় ভাষণের সাথে বিশিষ্ট, প্রার্থনা সাধারণ অভিভাষণের সাথে বিশিষ্ট এবং অনুরূপ অন্যান্য রীতি।

উত্তরসূরিরা গদ্যের মধ্যে কাব্যের রীতি ও মাত্রা ব্যবহার করেছেন। তারা গদ্যে ছন্দোবদ্ধতার আতিশয্যে, অন্ত্যমিলের আবশ্যকতা এবং উদ্দেশ্য বর্ণনার পূর্বে প্রণয়োপাখ্যানের আভাস তুলে ধরেছেন। পাঠক, চিন্তা করে দেখলে দেখতে পাবেন, তা কাব্য ও তার বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত; একমাত্র 'মাত্রা' ছাড়া তাদের মধ্যে অন্য কোনো পার্থক্য নেই। রাজকীয় লেখকদের মধ্যকার উত্তরসূরিরা এ পথে এগিয়ে এসেছেন এবং রাজকীয় অভিভাষণে এরূপ গদ্যকে ব্যবহার করেছেন। তারা সমুদয় বিষয়বস্তুকে এ গদ্য রূপে প্রকাশ করতে গিয়ে তাদের প্রিয় একটি বিষয় হিসেবে এটাকে গড়ে তুলেছেন এবং তাতে সর্বপ্রকার রীতিনীতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তারা সরল গদ্যরীতিকে পরিত্যাগ করেছেন ও ভুলে গিয়েছেন। বিশেষভাবে পূর্বাঞ্চলবাসীদের মধ্যে এ রীতি বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমানকালেও উদাসীন লেখকদের কাছে রাজকীয় অভিভাষণ লেখার জন্য এ গদ্যরীতিই ব্যবহৃত হচ্ছে, যার প্রতি আমরা ইঙ্গিত করেছি। কিন্তু বাকবৈদগ্ধ্যের দিক থেকে এটা সঠিক নয়। কারণ তার উদ্দেশ্য হল প্রসঙ্গানুরূপ বক্তব্যের উপস্থাপন এবং বক্তা ও শ্রোতার অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান। উপরিউক্ত রীতিতে তা সম্ভব নয়।

এভাবে পরবর্তীগণ সমিল গদ্যের যে ধারা প্রবর্তন করেছেন, তাতে তারা কাব্যরীতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন; উক্ত রীতি থেকে রাজকীয় অভিভাষণাদিকে মুক্ত করা দরকার। কারণ কাব্যরীতিতে রসিকতা, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে ভাঁড়ামি, প্রশংসায় আতিশয়োক্তি, প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগ, উপমা ও অলঙ্কারাদির আতিশয্য প্রভৃতির স্থান আছে; কিন্তু ভাষণে এসব কিছুর তেমন প্রয়োজন নেই। তদুপরি অন্ত্যমিল প্রয়োগের বিষয়টিও আবশ্যকীয়ভাবে রসিকতা ও অলঙ্করণকে টেনে আনে। অথচ শাসক ও রাজন্যবর্গের মহিমা এবং তাঁদের পক্ষ থেকে সাধারণের প্রতি উচ্চারিত উদ্দীপনা ও সতর্কীকরণ এরূপ রীতির বিরোধী। এ কারণেই রাজকীয় অভিভাষণগুলোতে সর্বোত্তম হল সরল গদ্য, যে গদ্য বক্তব্যকে কোনো প্রকার ছন্দোবদ্ধতার বাধ্যবাধকতা ছাড়াই সাবলীল করে তুলবে। অবশ্য খুব কম ক্ষেত্রেই এরূপ ছন্দোবদ্ধতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে; আবার তাও এমন হতে হবে যে, ভাষাগত যোগ্যতা যেন অনায়াস পটুত্বে তার যোগান দিয়ে বক্তব্যের বিস্তার সাধন করতে পারে। এরপর বক্তব্যকে প্রসঙ্গানুরূপ করার ক্ষেত্রে যেন তার যথার্থতা সম্পাদন করতে সমর্থ হয়। কারণ প্রসঙ্গ বিচিত্রধর্মী

এবং প্রতিটি প্রসঙ্গই তার নির্ধারিত রীতির সাথে বিশিষ্ট। এদিক থেকেই তাতে আতিশয্য, সংক্ষেপ, উহ্য, অভিব্যক্তি, বিশদ, ইঙ্গিত, রূপক, শ্লেষ প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়কে যথাপ্রয়োজন প্রকাশ করতে হয়।

সুতরাং রাজকীয় অভিভাষণাদিকে কাব্যরীতির এ ভঙ্গিতে খণ্ড খণ্ড করে প্রকাশ করা দূষণীয়। ভাষার ওপর অনারবত্বের আধিপত্যই সমসাময়িক ভাষাবিদ্‌দেরকে অনুরূপ রীতি অনুসরণে উৎসাহিত করেছে। এ সঙ্গে তারা বক্তব্যকে প্রসঙ্গানুসারে সুসামঞ্জস্য করতেও অপারগ। এ কারণেই তারা সরল গদ্যের ব্যাপক বাক্‌বৈদগ্ধ্য ও সাবলীল বিস্তারে বক্তব্য উপস্থাপন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। মনোভাবকে প্রসঙ্গের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে প্রকাশের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যে অক্ষমতা বিদ্যমান, তাকে আবৃত করার জন্যই তারা এরূপ ছন্দোবদ্ধ গদ্যরীতির প্রতি আসক্তি প্রদর্শন করেছেন। বস্তুত এর দ্বারা তারা অলঙ্করণ, ছন্দোবদ্ধতা ও বিচিত্র বাক্‌কুশলতায় তাদের অক্ষমতার ক্ষতিপূরণ করে নিতে চায় এবং এছাড়া সব কিছুতেই তারা উদাসীন।

পূর্বাঞ্চলের লেখক ও কবিরাই এ রীতিটিকে সব বিষয়ে বেশি আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছে এবং বর্তমানকালেও তারা এ ব্যাপারে আতিশয্য দেখিয়েছে। এমন কি এক্ষেত্রে তারা কারক-চিহ্নাদি ও শব্দ গঠনের নিয়মাবলির প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়ে সমতুল্যতা অথবা সামঞ্জস্য রক্ষা করছে। যদি কোথাও বাক্যগুলোর মধ্যে এমন সমতুল্যতার অভাব ঘটে, তাহলে তার জন্য তারা বাক্‌রীতির ধারা পরিবর্তন করতে রাজি, তবুও সেই সমতুল্যতা আনতে হবে। যদি কারক-চিহ্নাদি পরিত্যাগ করতে হয় ও বাক্‌বিন্যাসের ধারা বিকৃত করতে হয়; তবু তা করে হলেও রচনাকে এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে তা সমতুল্যতা অর্জনের লক্ষ্যে অব্যর্থ হয়ে দেখা দেয়। পাঠক, এ বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনার সাথে তাকে বিবেচনা করে দেখুন; আশা করি, আমাদের বক্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। আল্লাহ্ তার অশেষ কৃপা ও দয়াগুণে যথার্থতার জন্য সহায়তাকারী এবং মহান আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞাতা।

চতুঃপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[গদ্য ও পদ্য উভয় বিষয়ে দক্ষতার সুযোগ খুব অল্পই ঘটে থাকে]

এর কারণ এই যে, আমরা যেমন ইতিপূর্বে ভাষাগত যোগ্যতার কথা বর্ণনা করেছি, ঠিক তেমনি যখন কোনো আধারে একটি যোগ্যতা দৃঢ়মূল হয়ে বসে, তখন তার পশ্চাতে আগত অন্য কোনো যোগ্যতা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কারণ মানব প্রকৃতির প্রাথমিক পর্যায়ে এ যোগ্যতা গ্রহণ ও অর্জনের বিষয়টি সহজতর ও সাবলীল হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে যদি ভিন্ন কোনো যোগ্যতা অগ্রগামী হয়ে এ সুযোগ গ্রহণ করে, তাহলে তা পরবর্তী যোগ্যতা অর্জনের কাল দীর্ঘায়িত করে তার ত্বরিত গ্রহণের পথে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে একটি বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং যোগ্যতার পূর্ণতা লাভে ত্রুটি দেখা দেয়।

এ বিষয়টি সাধারণভাবে সর্বপ্রকার শিল্পগত যোগ্যতার ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। যথাস্থানে আমরা অনুরূপ যুক্তি-প্রমাণ সহযোগেই এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য উপস্থিত করেছি। পাঠক, সেই যুক্তি-প্রমাণকে আপনি ভাষার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে পারেন। কারণ এটাও ভাষাগত যোগ্যতা এবং তুলনামূলকভাবে শিল্পগত যোগ্যতারই অনুরূপ। লক্ষ্য করুন, যে ব্যক্তির যোগ্যতায় অনারবত্ব অগ্রগামী হয়, সে কীভাবে সর্বকালের জন্য আরবি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রুটির অধীন হয়ে থাকে। এজন্যই দেখা যায়, যে অনারব ফারসি ভাষায় দক্ষ, সে আরবি ভাষার যোগ্যতা অর্জনে পশ্চাদ্‌পদ থাকে এবং তার শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান কাজে ব্যাপৃত থাকলেও তার সেই ত্রুটি দূরীভূত হতে চায় না। এরূপ বারবার, রোমীয় ও ফিরিঙ্গীদের অবস্থা; তাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যককেই আপনি আরবি ভাষাগত যোগ্যতায় পারদর্শী হতে দেখতে পারবেন। এর কারণও সেই একই অর্থাৎ তাদের ভাষাগত যোগ্যতায় ভিন্ন ভাষার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং তা এমনভাবে হয়েছে যে উপরিউক্ত ভাষাভাষী কোনো শিক্ষার্থীকে যদি আরবি ভাষাভাষী পরিবেশে রেখে সে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলি থেকেও শিক্ষা দেওয়া হয়, তবুও সে তার তাৎপর্য জ্ঞান ও আহরণের ক্ষেত্রে ত্রুটির কবলমুক্ত হতে সমর্থ হয় না। বস্তুত এটা ভাষার প্রতিবন্ধকতা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ইতিপূর্বে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, বাক্‌রীতি ও ভাষা শিল্পাদির সমতুল্য এবং পাঠক, আপনি এ আলোচনাও পাঠ করেছেন যে, শিল্পজ্ঞান ও তার যোগ্যতা কখনও একত্র ভীড় করে না। সুতরাং কোনো ব্যক্তির একটি শিল্পে দক্ষতা অর্জিত হলে, অন্যটিতে সে কখনও দক্ষতা প্রদর্শন অথবা তার ওপর যথার্থ আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং তোমাদের জানা সব কিছুকে সৃষ্টি করেছেন।[৪২৪]

---

৪২৪. কোরান; ৩৭, ৯৬।

পঞ্চপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[কাব্যশিল্প ও তার শিক্ষা পদ্ধতি]

এ বিষয়টি আরবি বাণীর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলোর অন্তর্গত। কাছে এটা কাব্য বলে অভিহিত এবং এটা সব ভাষাতেই বিদ্যমান। অবশ্য আমরা এক্ষণে আরবি কাব্য সম্পর্কেই কথা বলব। যদিও সব ভাষাকেই ভাষাভাষীদের মনোভাব প্রকাশের বাণীরূপ হিসেবে তার অস্তিত্বের সম্ভাবনা রয়েছে, তবুও প্রতিটি ভাষারই বাক্‌বৈদগ্ধ্য সম্পর্কীয় এমন কিছু নিয়ম আছে, যা তারই সাথে বিশিষ্ট।

আরবি ভাষায় কাব্য তার প্রকাশধারায় অভিনব ও তার গঠনসৌকর্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। তা খণ্ড খণ্ড বাণীরূপের সমষ্টি, মাত্রার দিক থেকে তার প্রতিটি অংশ সমান এবং প্রতিটি পঙ্‌ক্তি শেষ বর্ণের দিক থেকে সমিল ঐক্যবদ্ধ। এসব খণ্ডের মধ্যে প্রতিটি খণ্ড তাদের কাছে 'বয়ত' বা পঙ্‌ক্তি বলে আখ্যাত এবং পঙ্‌ক্তি শেষের যে বর্ণটির মিলের মধ্য দিয়ে এ পঙ্‌ক্তিগুলো একত্র গ্রথিত হয়, তাকে বলা হয় 'রবিয়া' বা অন্ত্যমিল ও 'কাফিয়া' বা অন্ত্যানুপ্রাস। এভাবে গ্রন্থণার শেষ পর্যন্ত বাণীরূপের সমষ্টিকে তারা 'কসিদা' বা দীর্ঘকবিতা ও 'কলেমা' বা বাণী বলে অভিহিত করে। এ কসিদার প্রতিটি পঙ্‌ক্তিই তার বাক্‌বিন্যাস ও ভাবপ্রকাশের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে; যেন তা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বক্তব্য এবং পূর্বাপর সম্পর্কবিহীন একটি স্বতন্ত্র বাণীরূপ। সুতরাং তাকে সম্পূর্ণ কসিদা থেকে পৃথক করে নিতেও যে কোনো প্রকার স্তুতি, প্রেম বা শোকের ভাব প্রকাশে তা পূর্ণতার দাবি করতে পারে। এজন্যই কবি এরূপ কাব্যপঙ্‌ক্তিকে ভাব প্রকাশের স্বাতন্ত্র্য দানে তৎপর হন। তারপর তিনি অনুরূপ বক্তব্যসহ অন্য একটি কাব্যপঙ্‌ক্তির সৃষ্টি করেন। এভাবে তিনি এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে ও এক ভাব থেকে অন্য ভাবে নিজেকে এমনভাবে নিয়োজিত করেন, যাতে প্রথম ভাব ও তার তাৎপর্যের সাথে দ্বিতীয় ভাবের সামঞ্জস্য বিধান হয় এবং সমগ্র কসিদাটি বিশৃঙ্খল ভাববিন্যাস থেকে মুক্তি পায়। যেমন কবি প্রেমের স্মৃতিচারণ থেকে স্তুতি বর্ণনায় তার ধারার পরিবর্তন করেন। এমনিভাবে প্রান্তর ও পাহাড়ের গুণ কীর্তন করতে করতে বাহন, অশ্ব অথবা স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যাবলির বর্ণনায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন। কখনও প্রিয়জনের প্রশংসা করতে গিয়ে তার গোত্র ও সৈন্যদলের গুণাবলি ব্যাখ্যায় সচেষ্ট হন। আবার কখনো শোকগাথায় বেদনা ও হা-হুতাশের বর্ণনা দিতে গিয়ে মৃতব্যক্তির দোষগুণও স্মরণ করতে পারেন। এমন অন্যান্য বিষয়।

কিন্তু বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যাই হোক, সমগ্র কসিদাটির সংহতির জন্য একটি মাত্র মাত্রার অনুসরণ করা হয়; যেন কবিপ্রকৃতি শৈথিল্য প্রদর্শন করে প্রায় সমতুল্য মাত্রার

ব্যতিক্রম বহু লোকের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। সে যা হোক, এসব মাত্রার জন্য যে শর্ত ও নিয়ম বিদ্যমান, তা ছন্দশাস্ত্রে আলোচিত হয়ে থাকে। অবশ্য শাস্ত্রের প্রকৃতি অনুসারে যেসব মাত্রার বিন্যাস হওয়া সম্ভব, আরবরা সে সবই ব্যবহার করেনি; বরং এগুলো এমন কিছু বিশেষ মাত্রা, যাকে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রবিদরা 'বাহর' বা ছন্দ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা এসব ছন্দের সংখ্যা নির্দেশ করেছেন পনের অর্থাৎ তারা স্বাভাবিক মাত্রায় এগুলোর বাইরে আরবদের রচিত কোনো পদ্য পান নি।

জেনে রাখুন, আরবদের বাণী সাধনায় কাব্যের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। এজন্যই তারা তাকে তাদের জ্ঞান-গুণ ও ইতিহাসের রক্ষণাগার, তাদের সফলতা ও ব্যর্থতার সাক্ষী এবং তাদের বহুবিধ বিচক্ষণতা ও জ্ঞান-সাধনার উৎসরূপে স্থাপন করেছে। তাদের মধ্যকার অন্যান্য যোগ্যতার ন্যায় এ কাব্যের যোগ্যতাও একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ছিল। বস্তুত ভাষাগত যোগ্যতার সবই তাদের এ বাণীরূপের কৌশল আয়ত্ত ও তার অনুশীলনের মাধ্যমেই কেবল অর্জন করা সম্ভবপর। এরূপ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল তাদের অনুরূপ যোগ্যতার অধিকারী হওয়া যায়।

বাণী সাধনার সাথে সম্পর্কিত সর্বপ্রকার বিষয়ের মধ্যে কাব্য বেশ আয়াসসাধ্য; বিশেষ করে পরবর্তীকালের যারা বাণীশিল্প হিসেবে তার যোগ্যতা অর্জনে প্রয়াসী তাদের জন্যই বটে। কারণ তার প্রতিটি পঙ্‌ক্তি এমন একটি বাণীরূপ, যা তার অন্তর্গত মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অন্য সব কিছু থেকে পৃথকভাবে উপলব্ধ হবার যোগ্য। সুতরাং তার জন্য সংশ্লিষ্ট যোগ্যতায় এমন এক প্রকার সূক্ষ্ম বোধের সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন, যাতে কাব্যময় ভাব সাবলীলভাবে আরবদের কাব্যধারায় সুপরিচিত গঠনসৌকর্যে বিধৃত হতে পারে এবং তাকে একটি স্বতন্ত্র রূপদানে সক্ষম হয়। তারপর অনুরূপভাবে আরও একটি কাব্য পঙ্‌ক্তির সৃষ্টি হবে এবং পুনরায় আরও একটি। এভাবে মনোভাব প্রকাশের প্রয়োজনীয় বিষয়টি পূর্ণতা লাভ করবে। এর পর সমগ্র কসিদাটির সংহতি বিধানের জন্য পঙ্‌ক্তিমালার মধ্যে বিষয়গত বৈচিত্র্যের দিক থেকে সখ্যতা স্থাপন করতে হবে। এভাবে তার সৃজনধারার আয়াসসাধ্যতা ও বিষয়বিন্যাসের অভিনবত্ব তার রীতিনীতিতে দক্ষতা লাভের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করেছে এবং বাণীকে তার গঠনসৌকর্যে বিধৃত করার ক্ষেত্রে মননশীলতা প্রাখর্য দাবি করেছে। এজন্যই সাধারণভাবে আরবীয় ভাষাগত যোগ্যতাই তার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তার মধ্যে এমন সূক্ষ্ম বোধ ও দক্ষতা থাকতে হবে, যাতে আরবদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রীতি ও তার ব্যবহার সুরভিত অবস্থায় মূর্ত হয়।

পাঠক, আসুন, আমরা এখানে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রবিদ্‌দের কাছে গৃহীত এ 'উসলুব' বা রীতি শব্দটির তাৎপর্য বর্ণনা করি এবং তারা এর দ্বারা সাধারণভাবে কী বোঝাতে চান, তার যথার্থতা জেনে নিই। অতএব জেনে রাখুন যে, তারা এর দ্বারা এমন একটি তাঁতের কথা বোঝাতে চান যার মধ্যে বাক্‌বিন্যাসকে বয়ন করা হয় অথবা এমন একটি ছাঁচের কথা যাতে তাকে ঢালাই করা হয়। এর দ্বারা কোনো বক্তব্যের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশকে বোঝায় না; কারণ এ দায়িত্ব কারক-চিহ্নাদি পালন করে থাকে। এর দ্বারা কোনো

বক্তব্যের বাক্‌বিন্যাস বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত মূল অর্থের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয় না; যেমনটি বাক্‌বৈদগ্ধ্য ও বাক্‌শৈলীর বিচারে প্রকাশ পেয়ে থাকে। এর দ্বারা আরবদের ব্যবহৃত মাত্রাজ্ঞানকেও বোঝানো হয় না, যা আমরা ছন্দশাস্ত্রে দেখতে পাই। বরং এসব শাস্ত্রই কাব্য-কৌশলের আওতা বহির্ভূত অবস্থায় বিরাজ করছে। বস্তুত এ উসলুব বলতে একমাত্র সেই সার্বিক বাক্‌বিন্যাস পরম্পরার এমন একটি হার্দিক রূপকে বোঝায়, যা যে-কোনো বিশেষ বাক্‌বিন্যাসকে মূর্ত করে তুলতে পারে। এ হার্দিক রূপটিকে মননশক্তি বাস্তব বাক্‌বিন্যাস ও তার বিশদ প্রক্রিয়া থেকে সারাংশ হিসেবে গ্রহণ করে কল্পনার মধ্যে তাঁর বা ছাঁচের আকারে স্থাপন করে। তারপর আরবদের কাছে কারক-চিহ্নাদি ও বাক্‌শৈলীর দিক থেকে বিশুদ্ধ বলে গৃহীত বাক্‌বিন্যাসকে চয়ন করে উপরিউক্ত তাঁত অথবা ছাঁচের মধ্যে যথানিয়মে বিন্যস্ত করে; যেমন একজন কারিগর তার ছাঁচে ও একজন তন্তুবায় তার তাঁতে করে থাকে। পরিণামে এ ছাঁচটি এমন এক বাক্‌বিন্যাসকে মূর্ত করে তোলে, যা বক্তব্যের উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারে এবং আরবি বাক্‌রীতি অনুপাতে যোগ্যতার একটি বিশুদ্ধ স্বরূপ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়।

বাণীসাধনার প্রতিটি প্রক্রিয়াতেই এমন কিছু রীতি বা উসলুব বিদ্যমান, যা তার সাথে বিশিষ্ট এবং যা বিচিত্র ধারায় আত্মপ্রকাশ করে থাকে। সুতরাং কাব্যে পরিত্যক্ত বস্তুর ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে হলে তা সম্বোধনের আকারে উপস্থিত হয়। যেমন কবি বলেন,[৪২৫]

> 'হে উন্নতশীর্ষ পর্বতগাত্রে অবস্থিত মায়্যার আবাসস্থল!'

কখনো সঙ্গীদেরকে থামতে বলে জিজ্ঞেস করা হয়। যেমন কবি বলেন,[৪২৬]

> 'দাঁড়াও, সেই গৃহকে জিজ্ঞাসা কর, যার অধিবাসীরা অতর্কিতে সরে গেছে।'

কখনও সেই ধ্বংসাবশেষের উপর বন্ধুদেরকে অশ্রুপাত করতে বলা হয়। যেমন কবি বলেন,[৪২৭]

> 'দাঁড়াও, বন্ধু ও তার গৃহের স্মরণে অশ্রু বিসর্জন করি।'

অথবা কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে উত্তরের জন্য জিজ্ঞাসু হতে বলা হয়। যেমন কবি বলেন,[৪২৮]

> 'তুমি জিজ্ঞেস করনি? তাহলে ধ্বংসাবশেষই তোমাকে বলে দিত।'

যেমন ধ্বংসাবশেষকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তদ্রূপ করতে বলা হয়। যেমন কবি বলেন,[৪২৯]

> 'গজলের পাশে অবস্থিত আবাসভূমিকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কর।'

---

৪২৫. 'নাবিগা যুবিয়ানী'।
৪২৬. অজ্ঞাত।
৪২৭. 'ইমরুল কায়েস'।
৪২৮. অজ্ঞাত।
৪২৯. ইমরুল কায়েস।

অথবা তার জন্য বৃষ্টিপাতের প্রার্থনা করা হয়। যেমন কবি বলেন,[৪৩০]

'সুপ্রচুর বৃষ্টিপাতে তাদের ধ্বংসাবশেষ পরিতৃপ্ত হোক
এবং তাদের মধ্যে জাঁকজমক ও প্রাচুর্য ফিরে আসুক।'

অথবা বিদ্যুতের কাছে তার জন্য বৃষ্টিপাত কামনা করা হয়। যেমন কবি বলেন,[৪৩১]

'হে বিদ্যুৎ! আরবাকের আবাসস্থানের উপর দৃষ্টিপাত করছ;
মেঘমালাকে সেখানে তাড়িয়ে নিয়ে যাও, উটনীকে তাড়াবার মতো।'

অথবা শোকগাথায় বেদনা প্রকাশের জন্য কাঁদতে বলা হয়। যেমন কবি বলেন,[৪৩২]

'এরূপ ঘটনাটি গুরুত্ব লাভ করুক ও বিষয়টি ঘৃণার্হ হোক;
যে চক্ষু অশ্রুপাত করে নি, তার কোন অজুহাত নেই।'

অথবা ঘটনার গুরুত্ব সম্পাদনের জন্য বলা হয়। যেমন কবি বলেন,[৪৩৩]

'তুমি কি দেখেছ, কীভাবে তারা কাষ্ঠখণ্ডে বাহিত হয়েছে!
তুমি কি দেখেছ, কীভাবে সমাবেশের আলো নিভে গেছে!'

অথবা তার তিরোধানে সব সৃষ্টি বেদনাহত বলে ধরা হয়। যেমন কবি বলেন,[৪৩৪]

'সমৃদ্ধ চারণভূমির কোনো রক্ষী নেই, রাখাল নেই
মৃত্যু নেই। দীর্ঘবর্শাধারী বলশালীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।'

অথবা তার জন্য শোক প্রকাশে অনিচ্ছুক জড় পদার্থের ভর্ৎসনা করা হয়। যেমন খারেজী মহিলাকবি বলেন,[৪৩৫]

'হে খাবুর বৃক্ষ! তুমি পত্রাদির দ্বারা আচ্ছাদিত কেন?
তাহলে তুমি কি ইবনে তরিফের শোকে অবির্ভূত হওনি!

অথবা শত্রুস্থানীয়কে তার শক্তির দাপট থেকে মুক্তির সান্ত্বনা দেওয়া হয়। যেমন কবি বলেন,[৪৩৬]

'হে রবিআ ইবনে নজার তোমার বর্শা ফেলে দাও,
অনবরত আক্রমণকারী তোমার শত্রু মৃত্যুর কবলে পতিত।'

বাণী সাধনার সব বিষয় ও মতাদর্শে এমন উদাহরণের প্রাচুর্য রয়েছে। এজন্য বাক্‌বিন্যাস কখনও বাক্যরূপে, কখনও অবাক্য অন্যরূপে; আবার সেই বাক্যও কখনও অনুজ্ঞাবোধক, কখনও বিধেয়জ্ঞাপক; কখনও উদ্দেশ্যের বার্তাবাহী, কখনও ক্রিয়ার অন্বয়ীরূপ, কখনও সুসমন্বিত, কখনও অসমন্বিত, কখনও বিচ্ছিন্ন, কখনও সুসংবদ্ধ;

৪৩০. আবু তাম্মাম।
৪৩১. পূর্বোক্ত।
৪৩২. পূর্বোক্ত।
৪৩৩. শরীফ আর্‌রাজী।
৪৩৪. অজ্ঞাত।
৪৩৫. ফারিয়া বিনতে তারিফ; তার ভ্রাতার শোকে।
৪৩৬. শরীফ আর্‌রাজী।

আরবি বাণী-সাধনার ধারাবিন্যাস ও শব্দাবলির পরস্পর সম্বন্ধের অনুপাতেই এরা বিন্যস্ত হয়ে থাকে। পাঠক, আপনি আরবি কাব্যের এসব বিষয় অনুশীলনে কীভাবে একটি সার্বিক মননশীল ছাঁচের ধারণা লাভ করা যায়, তা এ বর্ণনা থেকে বুঝতে পারবেন। বস্তুত এসব নির্দিষ্ট বাক্‌বিন্যাস থেকে এমন একটি ছাঁচ গড়ে ওঠে, যা সমগ্রের উপর প্রযোজ্য হতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে একজন বচন-রচনাকারী একজন কারিগর অথবা বয়নকারীর সমতুল্য এবং তার মননের সমন্বিত রূপ বস্তু তৈরির ছাঁচ অথবা বয়ন করার তাঁতের ন্যায়। সুতরাং তা যদি তৈরির সময় ছাঁচের বাইরে চলে যায় অথবা বয়নের সময় তাঁতের মধ্যে না থাকে, তা হলেই নষ্ট হয়ে যায়।

পাঠক, এখানে আপনি কিছুতেই এ কথা বলতে পারবেন না যে, বাক্‌বৈদগ্ধ্যের নিয়ম-কানুন জেনে নেওয়াটাই এজন্য যথেষ্ট। কারণ আমরা বলব, বাক্‌বৈদগ্ধ্য সম্পর্কীয় নিয়মাবলি কতিপয় শাস্ত্রীয় ও অনুমানসিদ্ধ ধারা মাত্র, যা দিয়ে বাক্‌বিন্যাসকে অনুমানের ভিত্তিতে তার নির্দিষ্ট কাঠামোতে ব্যবহার করা যেতে পারে। তা এমন একটি অনুমান, যা শাস্ত্রীয় হলেও সার্বিক ও শুদ্ধ; যেমন কারক-চিহ্নাদি সম্পর্কীয় অনুমানসিদ্ধ নিয়মাবলির মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু আমরা এখানে যেসব উসলুবের কথা বর্ণনা করছি, তাতে অনুমানের কোনো স্থান নেই; তা একমাত্র আরবদের কাব্যগত বাক্‌বিন্যাস, যা তাদের বাক্‌রীতিতে প্রচলিত, তার অনুসন্ধানের মাধ্যমে স্বভাবের মধ্যে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হওয়া, যা ক্রমশ দৃঢ়তা লাভ করে এবং তার দ্বারা কাব্যের বিন্যাসধারায় আরবদের অনুরূপ ব্যবহার ও সৃষ্টি সম্ভব হয়ে থাকে। যেমন আমরা সাধারণ বর্ণনায় ইতিপূর্বে বলেছি যে, আরবি ভাষাতত্ত্ব ও বাক্‌শৈলীর শাস্ত্রীয় নিয়মাবলির শিক্ষা এক্ষেত্রে কোনো সাহায্যই করে না। অন্যদিকে আরবের বাণী-সাধনায় যা কিছু শাস্ত্রীয় নিয়ম বলে অনুমানসিদ্ধ, আরবরা সে সবই ব্যবহার করেনি। বরং তাদের এ সম্পর্কীয় ব্যবহার এত বিচিত্র ধারায় উৎসারিত হয়েছে যে, একমাত্র তাদের বাণী কণ্ঠস্থকারীদের কাছে তার স্বরূপ পরিস্ফুট হতে পারে এবং তাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এ রূপবৈচিত্র্যকে অনুমানসিদ্ধ নিয়মাবলির অধীনে বিবৃত করা সম্ভব। সুতরাং কেউ যদি আরবি কাব্য-সম্ভারে এ ধারায় দৃষ্টিপাত করে এবং সেই ছাঁচসদৃশ মানসিক রীতি নিয়ে তার সৌন্দর্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তাহলে তাকে তাদের ব্যবহৃত বাক্‌বিন্যাসের মধ্যেই তা করতে হবে; অনুমানসিদ্ধ সম্ভাবনার মধ্যে নয়। এজন্যই আমাদের বক্তব্য এই যে, এমন মানসিক ছাঁচ প্রস্তুত করতে হলে আরবের কাব্য ও বাণীসম্ভার কণ্ঠস্থ করা প্রয়োজন।

বস্তুত তাদের বাণীতে বিবৃত এ মানসিক ছাঁচের উপাদান শুধু কাব্যেই নয়, গদ্যেও হয়ে থাকে। কারণ, আরবরা এ উভয় প্রক্রিয়াতেই তাদের বাণীর সাধনা করেছে এবং উভয়টিকে পৃথক আকারে রূপায়িত করেছে। এজন্য কাব্যে তারা সমমাত্রিক বাক্যখণ্ড, অবশ্য পালনীয় অন্ত্যমিল এবং প্রতিটি পঙ্‌ক্তিকে বক্তব্যের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গদ্যেও অনেক সময় সমমাত্রা ও সমতুল্যতার বিষয়টি এসেছে, কখনও ছন্দোবদ্ধ তার দ্বারা বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি হয়েছে, আবার কখনও সরল সাবলীল আকারে তাকে বিন্যস্ত করেছে। আরবদের বাক্‌রীতিতে এদের প্রতিটিই অতিশয় সুপরিচিত। বস্তুত তাদের এ ব্যবহারই এমন এক ভিত্তি, যার ওপর রচনাকারী তার

উদ্দিষ্ট রচনা গড়ে তোলে এবং একমাত্র তাদের বাণীসম্ভারের কণ্ঠস্থকারীই এ ভিত্তি জানতে সক্ষম। এভাবে বিচিত্র বিশদ বাণী-কাঠামো থেকে তার মানসমুকুরে এমন একটি সার্বিক সাধারণ ছাঁচ প্রতিবিম্বিত হয়, যার সাহায্যে সে তাদের অনুরূপ রচনাকার্যে পারদর্শী হয়ে ওঠে; যেমন কারিগর তার ছাঁচের দ্বারা এবং বয়নকারী তার তাঁতের দ্বারা অনুরূপ কার্য সম্পাদন করে থাকে। এ কারণেই এ রচনা বিষয়টি ব্যাকরণবিদ্ বাক্‌শৈলীবিশারদ ও ছান্দসিকের দৃষ্টি থেকে পৃথক একটি দৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল।

অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে, উল্লেখিত শাস্ত্রসমূহের নিয়মাবলি এ রচনার শর্তস্বরূপ; তা এগুলোর সহায়তা ছাড়া পূর্ণতা লাভ করে না। এসব নিয়ম-কানুন থেকে যে গুণাবলি সংগৃহীত হয়, তা বাণীরচনায় সেই দৃষ্টিকেই তীক্ষ্ণ করে মাত্র, যা ছাঁচের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে এবং এ ছাঁচকেই শাস্ত্রবিদ্‌রা 'উসলুব' বা রীতি বলে অভিহিত করেন। এ রীতিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে আরবীয় গদ্য-পদ্যের বাণীসম্ভার কণ্ঠস্থ করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে থাকে।

পাঠক, উপরিউক্ত বর্ণনার দ্বারা উসলুবের তাৎপর্য পরিস্ফুট হবার পর, আসুন, আমরা কাব্যের সংজ্ঞা বা রূপরেখা তুলে ধরি, যা দিয়ে আমরা আমাদের এ উদ্দেশ্যের দুরূহতার কিছুটা উপলব্ধি করতে পারব। কারণ আমরা এ বিষয়ে যতদূর দেখেছি, পূর্বসূরিদের মধ্যে কাউকেও এতে আত্মনিয়োগ করতে দেখি নি। এ প্রসঙ্গে ছন্দশাস্ত্রীরা তার মাত্রা ও অন্ত্যমিলযুক্ত বাণীরূপ হওয়ার যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, তা আমাদের মানসমুকুরে কাব্যের যে স্বরূপ বিদ্যমান, তার সংজ্ঞা বা রূপরেখা কোনোটাই হতে পারে না। তাদের সর্বপ্রকার কলাকৌশল কাব্যের ঐদিকটিই পরিস্ফুট করে তোলে, যা কাব্য পঙ্‌ক্তিগুলোকেই পর্যায়ক্রমে স্বরান্ত ও হসন্তের সংখ্যায় একটি ঐক্যবদ্ধরূপে বিধৃত করে এবং ছন্দের দিক থেকে পঙ্‌ক্তিগুলোর গঠনসৌকর্যে সামঞ্জস্য বিধান করে মাত্র। এটা শব্দাবলি ও তার তাৎপর্যাদি থেকে পৃথক একটি মাত্রাজ্ঞানের ধারণা মাত্র। সুতরাং এটা তাদের মতানুসারে একটা সংজ্ঞা হয়ত হতে পারে। কিন্তু আমরা এখানে কাব্যকে তার কারক-চিহ্নাদি, বাক্‌বৈদগ্ধ্য, মাত্রা ও বিশেষ ছাঁচের ভিত্তিতে অখণ্ডরূপে দেখতে চাই। কাজেই তাদের সংজ্ঞায় আমাদের কাজ না চলাটা বিচিত্র কিছু নয়। এজন্যই এসব দিক থেকে তার এমন একটি বর্ণনা থাকা দরকার, যা তার যথার্থ স্বরূপকে আমাদের সামনে পরিস্ফুট করে তোলে।

আমরা বলব, কাব্য হল একটি বিদগ্ধ বাণীরূপ, যা অলঙ্কার ও বর্ণনার উপর ভিত্তি করে রচিত, যা সমমাত্রা ও অন্ত্যমিলে খণ্ড খণ্ড রূপে বিন্যস্ত, যার প্রতিটি খণ্ড তার উদ্দেশ্য ও প্রকাশের পূর্বাপর থেকে স্বতন্ত্র এবং যা আরবের বিশিষ্ট বাক্‌রীতিতে বিধৃত হয়ে উৎসারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য তা 'একটি বিদগ্ধ বাণীরূপ' বস্তুত একটি গণ বা সার্বিক ধারণা মাত্র। 'যা অলঙ্কার ও বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে রচিত' কথাটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা ভিন্ন বাণীরূপ থেকে তাকে পৃথক করে; কারণ অনুরূপ না হলে উক্ত বাণী সাধারণত কাব্য হয় না। আমাদের এ কথা—'যা সমমাত্রা ও অন্ত্যমিলে খণ্ড খণ্ড রূপে বিন্যস্ত'—তাও এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা তাকে বাণীর সেই গদ্যরূপ থেকে পৃথক করে, যা কারো কাছে কাব্য বলে অভিহিত হয় না। তারপর

আমরা যে বলেছি, 'যার প্রতিটি খণ্ড তার উদ্দেশ্যও প্রকাশে পূর্বাপর থেকে স্বতন্ত্র', তা বলতে গেলে কাব্য স্বরূপের বর্ণনা; কেননা তার পঙ্‌ক্তিগুলো এভাবেই হয় এবং এক্ষেত্রে অন্য কোনো কিছু থেকে তাকে পৃথক করতে হয় না। আমাদের বক্তব্য, 'যা আরবের বিশিষ্ট বাক্‌রীতিতে বিধৃত; তাও এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা কাব্যের অনুরূপ পরিচিতিতে বিধৃত নয়, এমন সব কিছু থেকে তাকে পৃথক করে; কেননা তা তখন আর কাব্য বলে গণ্য হয় না। বস্তুত এরূপ রচনা বাণীর পদ্যরূপ মাত্র। কারণ কাব্যের এমন কিছু রীতি বর্তমান, যা গদ্যের নেই এবং অনুরূপভাবে গদ্যেরও এমন কিছু রীতি রয়েছে, যা কাব্যের নেই। সুতরাং বাণীর যে-কোনো গদ্যরূপ যা সংশ্লিষ্ট বিশেষ রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা কাব্য বলে অভিহিত হবে না।

এদিক থেকে বিবেচনা করেই আমাদের বহু উস্তাদ, যারা সাহিত্যশিল্পে পারদর্শী, তাঁদেরকে এ অভিমত প্রকাশ করতে দেখেছি যে, আলমুতানব্বী ও আল মুআরীর[৪৩৭] পদ্য রচনায় কাব্যের কোনো নামগন্ধ নেই; কেননা তাঁরা তাতে আরবীয় রীতি অনুসরণ করেন নি। এ প্রসঙ্গে যারা এ ধারণা পোষণ করেন যে, বাণীর কাব্যরূপ আরব ও আরব ছাড়া অন্যত্রও পাওয়া যায়, তাদের জন্য কাব্য সংজ্ঞায় বর্ণিত আমাদের এই বক্তব্য, 'যা আরবের বিশিষ্ট বাক্‌রীতিতে বিধৃত', তা কাব্যকে অন্যান্য জাতির কাব্য থেকে পৃথক করবে। আর যারা মনে করেন যে, কাব্য আরব ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় না, তাদের জন্য অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন নেই; তারা সেখানে বলবেন, 'যা বিশিষ্ট রীতিতে বিধৃত' মাত্র।

আমরা যেহেতু কাব্যের স্বরূপ বর্ণনা থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পেরেছি, সুতরাং আসুন, আমরা এখন তার রচনা-প্রক্রিয়ার প্রতি মনোনিবেশ করি। আমরা বলব, জেনে রাখুন, কাব্য রচনা ও তার কলা-কৌশলের দক্ষতা অর্জনের জন্য কিছু শর্ত বিদ্যমান। এদের প্রথমটি হল অনুরূপ কাব্যের অর্থাৎ আরবদের কাব্য-সম্ভারের জ্ঞান আহরণ, যাতে তা দিয়ে প্রবৃত্তির মধ্যে এমন একটি যোগ্যতার সৃষ্টি হয়, যা তাঁতের ন্যায় বাণী বয়নে সাহায্য করতে সক্ষম এবং বাক্‌রীতির অন্তর্গত সমৃদ্ধ, বিশুদ্ধ ও প্রচুর দৃষ্টান্ত কণ্ঠস্থকরণে সুচয়নের দিক্ নির্দেশ করতে পারে। এরূপ সুচয়িত কণ্ঠস্থ সংগ্রহের সর্বাপেক্ষা স্বল্প পরিমাণ, যা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে, তা হল ইসলামী যুগের বিখ্যাত কবিদের কাব্য। যেমন—ইবনে আবু রাবিয়া, কুছাইর, যুররুম্মা, জরির, আবু নাওয়াস, হাবীব, আল বুহতরী, আর্‌রাজী ও আবু ফেরাস।[৪৩৮] এর অধিকাংশই 'কিতাবুল আগানী'তে বিধৃত কাব্য; কেননা তা ইসলামী যুগের সব কবি এবং জাহেলী যুগের নির্বাচিত কবিদের কাব্যের এক ব্যাপক সংকলন। যে ব্যক্তি অনুরূপ সংগৃহীত জ্ঞান থেকে বিচ্যুত হবে, তার কাব্যসাধনা অসম্পূর্ণ ও নীরস হতে বাধ্য এবং একমাত্র এরূপ সংগ্রহের প্রাচুর্যই তার কাব্যরূপকে উজ্জ্বল ও সজীব করে তুলতে পারে। সুতরাং যার সংগ্রহজ্ঞান

৪৩৭. আব্বাসীয় যুগের দুজন বিশিষ্ট কবি; জীবনকাল হিজরী চতুর্থ শতাব্দী।

৪৩৮. উমাইয়া ও আব্বাসী যুগের কয়েকজন বিশিষ্ট কবি। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'আরবি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' দ্র:। যে দৃষ্টিকোণ হতে তাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে, তা সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য নয়। আল মুতানব্বী ও আল মুজারী সম্পর্কে পূর্ব পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বক্তব্যই এ জন্য যথেষ্ট। বলাবাহুল্য এখানের মতামত ইবনে খলদুনের নিজস্ব নয়।

স্বল্প কিংবা তার একান্ত অভাব, তাঁর সাধনায় কাব্য নেই; বস্তুত তার প্রচেষ্টা নিকৃষ্ট পদ্য সৃষ্টি করতে পারে মাত্র। কাজেই যার জন্য উক্তরূপ সংগৃহীত জ্ঞানের অভাব রয়েছে, তার জন্য কাব্যসাধনা থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়।

অতঃপর এরূপ সংগৃহীত জ্ঞানের পূর্ণতা ও প্রকৃতিকে তাঁত বয়নের জন্য একাগ্র করার যোগ্যতা অর্জনের পর পদ্য রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এ উদ্যোগের প্রাচুর্য যোগ্যতাকে দৃঢ় ও স্থায়ী করে তুলবে। অনেক সময় বলা হয়, কাব্য রচনার শর্ত হল সংগৃহীত জ্ঞানকে ভুলে যেতে হবে, যাতে তার বাহ্যিক শক্তির রেখাবিন্যাস বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেননা তা যোগ্যতার যথার্থ প্রয়োগের পথে বাধার সৃষ্টি করে। সুতরাং রচনাকারী যখন তা ভুলে যাবে এবং তার প্রকৃতি তার বিমূর্তরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, তখন তার মধ্যে উসলুব বা রীতি মূর্ত হয়ে উঠবে। যেন তাই তাঁতের আকারে সেই ভুলে যাওয়া শব্দাবলির স্থানে প্রয়োজনীয় অনুরূপ অন্য শব্দ এনে বয়নকার্যে নিরত হবে। তারপর এ উদ্যোগের জন্য নির্জনতা এবং ফুল ও জলের সমারোহে উৎকৃষ্ট পরিবেশের প্রয়োজন। অনুরূপভাবে শ্রুতিসুখকর অন্য বিষয়েরও দরকার রয়েছে, যাতে আনন্দ সম্ভোগের মাধ্যমে তার কবিপ্রকৃতি একাগ্রতায় উজ্জ্বল ও উৎফুল্ল হয়ে উঠতে পারে।

এসবসহ কাব্য রচনার আরও একটি শর্ত হল, কবি অবসর ও সতেজ ভাবের মধ্যে অবস্থান করবে। বস্তুত এটা তাকে বেশি একাগ্র ও উদ্দীপ্ত করে প্রকৃতিকে তার মানসের অনুরূপ একটি রচনা তাঁতের আবির্ভাব ঘটাতে সাহায্য করবে। শাস্ত্রবিদ্‌রা বলেন, কাব্য সাধনার উৎকৃষ্ট সময় হল প্রাতঃকাল; তখন নিদ্রা থেকে জাগ্রত অবস্থা, পাকস্থলী শূন্য, মননশক্তি সতেজ এবং একটি অবসরের পরিবেশ বর্তমান। অনেক সময় তারা এটাও বলেন যে, প্রেম ও মাদকতা কাব্যের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। ইবনে রসিক তাঁর 'উমদা' নামক গ্রন্থে অনুরূপ বিষয়ের বর্ণনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থটি এ শিল্পকৌশল বর্ণনা ও তার যথাযথ গুরুত্ব প্রদানে একক কৃতিত্বের অধিকারী। এ বিষয়ে তাঁর ন্যায় অন্য কেউ ইতিপূর্বে ও অতঃপরে সমতুল্য কিছু রচনা করেননি। তারা আরও বলেন, এসব সত্ত্বেও যদি কাব্যরচনা তার কাছে কঠিন বলে মনে হয়, তাহলে অন্য সময়ের জন্য তা স্থগিত রাখতে হবে এবং কোনো প্রকারেই তার জন্য প্রকৃতির ওপর চাপ সৃষ্টি করা যাবে না।

কাব্যপঙ্‌ক্তির গঠন ও বয়নের প্রারম্ভেই একটি অন্ত্যমিল নির্দিষ্ট করতে হবে, যার ওপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং বক্তব্যকে উক্ত মিল অনুসারে শেষ পর্যন্ত গড়ে তোলা যায়। কারণ পঙ্‌ক্তির অন্ত্যমিল সম্পর্কে অসতর্ক হলে রচয়িতার পক্ষে তাকে যথাস্থানে স্থাপিত করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। অনেক সময় এটা আর আয়ত্তে আসতে চায় না এবং আয়াসসাধ্য হয়ে ওঠে। কোনো সময় যদি রচয়িতার কাছে কোনো উৎকৃষ্ট পঙ্‌ক্তি এসে যায়, অথচ তা প্রসঙ্গের সাথে মিলছে না এমন অবস্থা দেখা দেয়; তাহলে তাকে যোগ্য প্রসঙ্গের জন্য রেখে দিতে হবে। কারণ প্রতিটি পঙ্‌ক্তিই অর্থের দিক থেকে স্বতন্ত্র। সুতরাং তার জন্য যোগ্য প্রসঙ্গ অনুসন্ধান ছাড়া অন্য কিছু করার নেই এবং এ ব্যাপারে যথাসম্ভব করাই বাঞ্ছনীয়।

কাব্য রচনার পর রচয়িতার উচিত তাকে পরিমার্জনা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে পুনরায় বিচার করা। যদি দেখা যায় যে, তা মানানুযায়ী উৎকর্ষ লাভ করেনি, তাহলে

তাকে পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করা উচিত নয়। বস্তুত মানুষ মাত্রেই তার কাব্য সম্পর্কে দুর্বলতা পোষণ করে; কারণ তা তার মননের অঙ্কুর ও তার প্রতিভার নিদর্শন। সুতরাং এর জন্য এমন ভাষা প্রয়োগ করতে হবে, যা বাক্‌বিন্যাসের দিক থেকে সর্বাধিক বিশুদ্ধ। যাতে ভাষাগত প্রয়োজনীয়তার কোনো চিহ্ন নেই, তেমন বাক্‌রীতি পরিত্যাগ করা উচিত। কেননা তা বাণীকে বাক্‌বৈদগ্ধ্যের দিক থেকে নামিয়ে দেয়। নেতৃস্থানীয় ভাষাতত্ত্ববিদরা নব্য কবিদেরকে এ প্রয়োজনীয়তার দিকটি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। কারণ তাদের পক্ষে পূর্বোক্ত বিষয়টি পরিত্যাগ করে উত্তম আদর্শ অনুসরণে যোগ্যতার পরিচয় দেওয়া সম্ভব। যথাসম্ভব জটিল বাক্‌বিন্যাসও পরিত্যাগ করা উচিত। একমাত্র সেসব শব্দই ব্যবহার করা চাই, যার উচ্চারণমাত্র তাৎপর্যাদি বোধগম্য হয়ে ওঠে।

অনুরূপভাবে একই পঙ্‌ক্তির মধ্যে একাধিক অর্থের সংস্থানও অনেকাংশে বোধের কাছে দুর্বহ হয়ে দাঁড়ায়। সর্বাপেক্ষা সুচয়িত শব্দ তা-ই, যার অর্থের মধ্যে গভীরতা আছে এবং তা ব্যঞ্জনায় উক্ত পরিধিকেও অতিক্রম করে যায়। কিন্তু কেবলমাত্র অর্থের আধিক্য বাহুল্য বিধায় মননশক্তিকে তা অযথা ব্যতিব্যস্ত করে তোলে এবং আমাদের পক্ষে তার বাক্‌বৈদগ্ধ্য উপলব্ধি করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কাব্যের শব্দাবলিকে অতিক্রম করে তাদের অর্থ যদি বাঙ্ময় হয়ে উঠতে না পারে, তা হলে কাব্য কখনও সাবলীল হয় না।

এজন্যই আমাদের উস্তাদগণ (রহঃ) পূর্ব-আন্দালুসের কবি আবু বকর ইবনে খাফাজার[৪৩৯] কাব্যকে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করতেন। কারণ তার কাব্য পঙ্‌ক্তির এক আধারেই বহু অর্থের ভীড় জমে উঠত। অনুরূপভাবে তাঁরা আল মুতানববী ও আল মুআরীর কাব্যকেও দূষণীয় বলে উল্লেখ করতেন। কারণ তাদের কাব্য আরবীয় রীতিতে গ্রথিত নয়; এ সম্পর্কে পূর্বেও বলা হয়েছে। ফলে তাদের কাব্য তার যথার্থ পর্যায় থেকে নিম্নে অবতরণ করে বাণীর পদ্যরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে রসানুভূতিই একমাত্র বিচারক।

কবির উচিত দূরন্বিত ও দুর্বোধ্য শব্দাবলির পরিহার করা ও অনুরূপভাবে এমন শব্দও তিনি ব্যবহার করবেন না, যা অত্যধিক ব্যবহারে অতিশয় সাধারণ হয়ে পড়েছে। কারণ এরূপ শব্দাবলি রচনাকে বাক্যবৈদগ্ধ্যের স্তর থেকে নামিয়ে দেয়। অতি সাধারণ ভাবের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি প্রযোজ্য; তাতেও বাক্‌বৈদগ্ধ্যের অবনতি ঘটে। ফলে রচনা খুবই সাধারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং অপরের মনে কোনো প্রকার সাড়া জাগায় না। যেমন সাধারণ লোকের কথা, আগুন গরম আর আকাশ আমাদের মাথার উপরে। কাজেই রচনা যেই পরিমাণে অপরের মনে সাড়া জাগাতেই ব্যর্থ হয়, সেই পরিমাণে বাক্‌বৈদগ্ধ্য থেকে দূরে সরে পড়ে। কারণ এ দুটি বিষয় রচনার দুইই বিপরীত মেরু। এজন্যই অধ্যাত্ম ও নবুয়ত সম্পর্কীয় বিষয়ে বাক্য সাধারণত উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি এবং একমাত্র দক্ষ কবিরাই এক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য লাভ করেছেন। তবুও তাদের এ সাফল্যের পরিমাণ যেমন স্বল্প, তেমনি তা আয়াসসাধ্যও। কারণ এ সম্পর্কীয় সব বিষয়ই সাধারণের পরিচিত; ফলে কাব্যও সাধারণ হতে বাধ্য।

---

৪৩৯. ইব্রাহিম ইবনে আবুল ফতেহ; ৪৫১-৫৩৩ (১০৬০-১১৩৯ খ্রি:) হি: (?)।

উল্লেখিত সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে কাব্য রচনা করা খুবই কঠিন ব্যাপার; তবুও কবিকে অনুশীলন ও অভ্যাসের উপর জোর দিতে হবে। কারণ প্রতিভা দুগ্ধবতী স্তনের তুল্য; দোহনে তার দুগ্ধধারা বৃদ্ধি পায় এবং পরিত্যাগ করলে স্বল্প দুধ অথবা অনেক ক্ষেত্রে শুকিয়ে যায়। যাহোক, এ রচনা শিল্প ও তার শিক্ষাপদ্ধতি ইবনে রসিকের 'উমদা' নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের পক্ষে যতটুক অনুধাবন করা সম্ভব হয়েছে, আমরা এখানে বর্ণনা করেছি। যিনি এ সম্পর্কে আরও বেশি অবগত হতে চান, তাঁর জন্য উক্ত গ্রন্থ পাঠ ছাড়া গত্যন্তর নেই এবং এর ফলে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন হবে। এ প্রসঙ্গে আমাদের এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই যথেষ্ট বলে মনে করি। আল্লাহ্ই যথার্থ সহায়ক।

মানুষ এ কাব্যশিল্পের বিষয়ে পদ্যাদিও রচনা করেছে এবং তাতে সংশ্লিষ্ট আবশ্যকীয় বিষয়াদির উল্লেখ বিদ্যমান। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর একটি পদ্য, মনে হয় ইবনে রসিকের রচনা :

আল্লাহ্ কাব্যশিল্পের উপর অভিসম্পাত করুন! আহা;
কত প্রকারের মূর্খই না আমরা তাতে দেখতে পেয়েছি!
তারা বিরল বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে; অথচ
পরিবর্তে শ্রোতাদের জন্য সহজ ও প্রাঞ্জলকে ত্যাগ করে।
অসম্ভবকে তারা মনে করে এক বিশুদ্ধ ভাবাবেগ এবং
অতি সাধারণ বাণীরূপকে ভাবে অতিশয় মূল্যবান।
যথার্থ বিষয় সম্পর্কে তারা একান্তই অজ্ঞ; অথচ তারা
এটিও বুঝতে পারে না যে, তারা মূর্খতা দেখাচ্ছে।
আমরা নই, বরং অন্যরা তাদেরকে ভর্ৎসনা করে;
বস্তুত আমাদের কাছে তাদের অক্ষমতাই প্রকাশ পায়।
কাব্য তো পদ্যের তুল্যই একটি সুসমঞ্জস বাণীরূপ; শুধু
গুণের দিক থেকেই তাদের বিষয় বৈচিত্র্য পরিস্ফুট হয়।
তার একাংশ অপরাংশের সাথে আকারে তুলনীয় এবং
তার সম্মুখ ও পশ্চাৎ সবই অনুরূপ সমতুল্যতায় সুগঠিত।
তাতে এমন তাৎপর্য বিধৃত, যা তোমার কামনার
অন্তর্গত হয়নি, অথচ তা-ই বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।
বর্ণনার শেষ পর্যন্ত তা এমনভাবে সংস্থাপিত হয়েছে,
যেন দর্শকদের সামনে একটি সৌন্দর্য ফুটে উঠছে।
শব্দাবলি যেন তাতে মুখের অবয়বতুল্য এবং
অর্থ তাতে চক্ষুর তুল্যই সুবিন্যস্ত রয়েছে।
সেই চক্ষু মনের কামনাকেই উৎসারিত করছে এবং
আবৃত্তিকারকে তার সৌন্দর্য দিয়ে আবৃত করছে।
সুতরাং তুমি যখন তোমার কাব্যে স্বাধীন পুরুষের প্রশংসা কর,
তখন সেখানে এমন বক্তব্য আনবে, যা সবার কাম্য হয়।
তোমার প্রণয়াভাস হবে অতিশয় সাবলীল এবং
তোমার প্রশংসিতকে অতিশয় বাস্তব সত্য করে তুলবে।
যা কিছু শ্রুতিকটু তা অবশ্যই তোমাকে পরিত্যাগ করতে হবে;
যদি অনুরূপ শব্দাবলি মাত্রার দিক থেকে সুসমঞ্জসও হয়।

যখন তুমি কাকেও বিদ্রূপ করতে ইচ্ছা কর, তখন
অবশ্যই কটুবাক্য প্রয়োগকারীদের পথ ত্যাগ করতে হবে।
এ উদ্দেশ্যে তোমার সরল বর্ণনা হবে ওষুধের মতো এবং
তোমার শ্লেষাত্মক ইঙ্গিত রোগের নিবৃত্তি ঘটাবে।
যখন তুমি তোমার কাব্যে এমন কাহারও জন্য অশ্রুপাত কর,
যে অচিরেই বিচ্ছেদ ঘটিয়ে যাত্রার আয়োজন করছে;
তখন অবশ্যই তুমি হা-হুতাশ পরিত্যাগ করবে এবং তোমার
উদ্গাত অশ্রুধারাকে অবদমিত করার চেষ্টা করবে।
অতঃপর তুমি যদি তিরস্কার করতে চাও, তা হলে
প্রতিজ্ঞার সাথে ভর্ৎসনা ও কঠোরতার সাথে কোমলতা মিশাও।
এর ফলে তাকে তুমি এমন অবস্থায় পরিত্যাগ করবে,
যেন সে ভীত ও নিঃশঙ্ক, শক্তিমান ও দুর্বল হয়ে থাকে।
সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ব্যঙ্গ হল যা কাব্য-সুষমা মণ্ডিত হয়,
যদিও তা প্রকাশ্য ও সুস্পষ্টভাবে উৎসারিত হোক না।
তার উচ্চারণমাত্র মানুষ অনুরূপ কিছু সৃষ্টির জন্য ব্যাকুল হবে
এবং সৃষ্টি করতে গিয়ে অক্ষমতার সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছবে।

এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য অনেকের বাণী; যেমন আন্‌নাশী বলেছেন,[৪৪০]

কাব্য তা-ই, যার বক্ষের বক্রতাতে তুমি সমতল করেছ
এবং পরিমার্জনার দ্বারা যার পৃষ্ঠের পরিধিকে আয়ত্তে এনেছ।
যার বিদীর্ণ রেখাগুলো তোমার অতিশয়োক্তিতে আবৃত হয়েছে
এবং তোমার সংক্ষিপ্ত ভাষণে যার দৃষ্টির অন্ধত্ব ঘুচেছে।
যার কাছে ও দূরের মধ্যে তুমি সেঁতু বেঁধে দিয়েছ
এবং যার স্থির ও প্রবহমান জলরাশি সংযুক্ত করেছ।
যার বিষয় প্রসঙ্গ সৌন্দর্যের তুলনা কামনা করে,
তুমি যেই তুলনাকে সমতুল্য বিষয়ের দ্বারা পূর্ণ করেছ।
তুমি যখন কাব্যে কোন দানশীল সম্ভ্রান্তকে প্রশংসা করেছ,
তখন কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে সমুদয় ঋণ শোধ করেছে।
তুমি তাকে দিয়েছ যা মূল্যবান ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ
এবং মহত্ত্ব ও মহার্ঘতার দ্বারা তাকে বিশিষ্ট করেছ।
সুতরাং কাব্য তার বিচিত্র প্রবাহ ধারায় সাবলীল হবে
এবং তার বিভিন্ন বিষয় সম্মিলনে সহজ হয়ে উঠবে।
যখন তুমি কোন আবাসভূমি ও তার অধিবাসীদের জন্য কাঁদবে,
তখন সেই ব্যথিত জনের জন্য অবশ্যই অশ্রুপাত করবে।
তুমি যদি কোন সন্দেহকে রূপকে প্রকাশ করতে চাও,
তা হলে বিষয়টি প্রকাশ ও গোপনের মধ্যভাগে রাখবে।
এর ফলে শ্রোতা তার সন্দেহকে প্রশংসার সাথে এবং
তার ধারণাকে বিশ্বাসের সাথে মিশিয়ে ফেলবে।
যদি তুমি তোমার ভ্রাতার পদস্খলনের জন্য ভর্ৎসনা কর,
তা হলে তার কঠোরতাকে কোমলতার দ্বারা আবৃত করিও।
ফলে তুমি তাকে তার দুর্বলতাসহ বন্ধুত্বকামী দেখবে

৪৪০. আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ ইবনে মুহম্মদ; মৃত্যু ২৯৩ (৯০৬ খ্রি:) হি:।

এবং তার ব্যথা বেদনার মধ্যে আশ্বাসের স্পর্শ লাগবে।
যখন তুমি তোমার এমন কোন প্রিয়তমাকে আঘাত করতে চাও,
যে তার অন্যায্য ছলা-কলায় তোমার বিচ্ছেদ কামনা করেছে;
তা হলে তুমি বাণীর সূক্ষ্মতা ও কোমলতায় তাকে বাঁধবে
এবং তার সংগোপন ও তীর্যক প্রকাশে তাকে উদ্দীপ্ত করবে।
যখন তুমি তোমার কোন স্খলনের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা কর,
তখন বাণীকে প্রকাশ ও অপ্রকাশে দোদুল্যমান করে তুলবে।
তা হলে তোমার ত্রুটিতে আহত ব্যক্তির কাছে তা নিজের
ভর্ৎসনা রূপেই দেখা দিবে এবং সে প্রতিজ্ঞার মুখাপেক্ষী হবে।

ষট্‌পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[গদ্য ও পদ্যের কলা-কৌশল শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; অর্থের মধ্যে নয়]

জেনে রাখুন, গদ্য ও পদ্যরূপে বাণীর শিল্পসাধনা শুধুমাত্র শব্দের ক্ষেত্রেই; অর্থের ক্ষেত্রে তা সম্প্রসারিত নয়। ভাব এখানে শব্দের অনুসারী এবং শব্দই মূল ভিত্তি। সুতরাং যে শিল্পী তার ভাষাগত যোগ্যতাকে গদ্য ও পদ্যে রূপায়িত করেন, তিনি একমাত্র তার শব্দ রূপটিই তুলে ধরেন এবং এক্ষেত্রে আরবের ভাষাসম্পদ থেকে সংগৃহীত শব্দাবলিই তাকে পথ দেখায়। কারণ তাদের বহুল ব্যবহার ও উচ্চারণে তার জিহ্বা অভ্যস্ত হয়েছে এবং পরিণামে মুজারী বাক্‌রীতিতে তার যোগ্যতা দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছে। তিনি নিজের গোত্র পরিবেশের অনারবত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছেন এবং এখন নিজেকে আরবীয় গোত্র পরিবেশে জাত একজন হিসেবে গণ্য করতে পারেন। তিনি উক্ত পরিবেশের শিশুর মতই ভাষায় দীক্ষা লাভ করেছেন এবং পরিণামে তাদেরই একজন হয়ে গিয়েছে।

এর বর্ণনা এই যে, আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, ভাষা উচ্চারণের একটি বিশেষ যোগ্যতা বৈ অন্য কিছু নয়; জিহ্বাকে বারংবার এ উচ্চারণের দ্বারা অভ্যস্ত করে তুললেই এরূপ যোগ্যতা অর্জন সুগম হয়। বস্তুত এ উচ্চারণ ও প্রকাশের সবটুকুই শব্দাবলি মাত্র এবং ভাব বলতে যা কিছু বোঝায়, তা সবই অন্তরে লুকায়িত। তদুপরি এ ভাব সবার কাছেই বিদ্যমান এবং সবার চিন্তাধারাই তাকে ইচ্ছামত লালন করতে সক্ষম। সুতরাং এ ভাবরূপী আবেগকে বিন্যস্ত করতে কোন প্রকার শিল্প-কৌশলের দ্বারস্থ হতে হয় না; বরং উক্ত ভাবসম্পদকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বাণীরচনার জন্যই শিল্পকলার প্রয়োজন দেখা দেয়; একথা পূর্বেও আমরা বলেছি।

প্রকৃতপক্ষে এ শব্দাবলি ভাবের ছাঁচতুল্য। যেমন সমুদ্রের জলে পরিপূর্ণ পাত্রাদি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে; তাদের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, ঝিনুক, স্ফটিক ও মৃত্তিকার পাত্র হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাদের অভ্যন্তরস্থ জল এক। এ জলপূর্ণ পাত্রগুলোর উৎকর্ষ-অপকর্ষ তাদের সত্তাগত বৈচিত্র্যের দ্বারাই সাধিত হয়; তাদের অন্তর্গত জলের দ্বারা নয়। অনুরূপ ভাষাও তার বাক্‌বিন্যাস স্তরের তারতম্যে উৎকর্ষ ও বাক্‌বৈদগ্ধের দিক থেকে ব্যবহারিকভাবে বিভিন্ন হয়ে দেখা দেয়; অথচ ভাব তার স্বরূপে একই অবস্থায় বিদ্যমান। একমাত্র ভাষাগত যোগ্যতা অনুসারে বাক্‌বিন্যাস ও বাক্‌রীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিই যখন তার মনোভাব প্রকাশ করতে তৎপর হয়, তখন কিছুতেই সুষ্ঠুতা প্রদর্শন করতে পারে না। তার তুলনা সেই পঙ্গুর সাথে করা যায়, যার উত্থান শক্তি নেই বলেই সে চাইলেও উঠে দাঁড়াতে পারে না। 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তা-ই শিক্ষা দেন, যা তোমরা জানতে পারতে না।'[৪৪১]

---

৪৪১. কোরান; ২, ১৫১।

সপ্তপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[অতিরিক্ত কণ্ঠস্থ শক্তির দ্বারা এ যোগ্যতা অর্জিত হয় এবং কণ্ঠস্থ বিষয়ের উৎকর্ষের উপর তার উৎকর্ষতা নির্ভরশীল]

আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, যে ব্যক্তি আরবি ভাষায় যোগ্যতা অর্জন করতে চায়, তাকে অবশ্যই অতিরিক্ত মুখস্থ শক্তির ব্যবহার করতে হবে এবং তার এরূপ মুখস্থ বিষয়ের উৎকর্ষ, স্বরূপগত পর্যায় ও আধিক্য-স্বল্পতার পরিমাণ অনুসারে কণ্ঠস্থকারীর অর্জিত যোগ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হবে। সুতরাং যার কণ্ঠস্থ বিষয় আরবীয় মুসলিম কবি—হাবিব, ইতাবী, ইবনে মুতাজ, ইবনে হানী ও শরিফ আররাজীর কাব্য অথবা ইবনে মুকাফ্ফা, সহল ইবনে হারুন,[৪৪২] ইবনে যিয়াত, আলবাদী ও আস্সাবীর[৪৪৩] পুস্তিকাবলি থেকে সংগৃহীত হবে, তার এ সম্পর্কীয় যোগ্যতা সর্বোৎকৃষ্ট ও বাক্‌বৈদগ্ধের দিক থেকে উচ্চ পর্যায়ের বলে গণ্য হবে। এ তুলনায় যে ব্যাপ্তি পরবর্তীকালের কবিদের, যেমন ইবনে সহল ও ইবনে নবিহ্‌র[৪৪৪] কাব্য অথবা আল বিসানী ও ইমাদ ইস্পাহানীর[৪৪৫] সরল গদ্য কণ্ঠস্থ করবে পূর্বসূরিদের তুলনায় তাঁদের মর্যাদা নিম্নতর হওয়ায় তার যোগ্যতাও নিম্নপর্যায়ের হবে। যে-কোন বিচক্ষণ সমালোচকের কাছেই রসানুভূতির দিক থেকে এ বিষয়টি পরিস্ফুট হতে পারে।

বস্তুত কণ্ঠস্থ ও বিষয়াদির উৎকর্ষের ওপর পরবর্তীকালীন ব্যবহারের উৎকর্ষ নির্ভরশীল হয় এবং এ দুটির উৎকর্ষই যোগ্যতার উৎকৃষ্টতা প্রতিপন্ন করে। সুতরাং কণ্ঠস্থ বিষয়াদি যদি পর্যায়ের দিক থেকে উচ্চতর হয়, তা হলে তা থেকে অর্জিত যোগ্যতাও উচ্চস্তরের হবে। কেননা প্রবৃত্তি তার গৃহীত তাঁত দ্বারাই বয়ন করে এবং যোগ্যতার শক্তি তার খাদ্য অনুপাতেই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এ বিষয়ক বর্ণনা এই যে, জীবাত্মা যদিও তার সহজাত প্রবৃত্তিতে একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তবুও তার উপলব্ধিগত জ্ঞানের তারতম্যানুসারে মানুষের মধ্যে তা বিচিত্ররূপে প্রকাশ পায়। আর এ বৈশিষ্ট্যের মূলে বহির্জগৎ থেকে উপলব্ধিজাত জ্ঞান, তজ্জনিত যোগ্যতা ও সত্তাগত বৈশিষ্ট্যই ক্রিয়াশীল থাকে। এদের ফলে তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হয় এবং তার শক্তি সম্ভাবনা থেকে বাস্তবে মূর্তি পরিগ্রহ করে।

---

৪৪২. এ অধ্যায়ের ৪৩৮ নং টীকা দ্র:।

৪৪৩. যথাক্রমে মুহম্মদ ইবনে আবদুল মালেক, বদিজ্জামান হামদানী ও ইব্রাহিম ইবনে খলিল; ৩১৩-৩৮৪ (৯২৫-৯৯৪ খ্রি:) হি:।

৪৪৪. ইব্রাহিম ইবনে সহল ইসরাইলী; মৃত্যু ৬৫৮ (১২৬০ খ্রি:) হি: ও আলী ইবনে মুহাম্মদ; মৃত্যু ৬১৯ (১২২২ খ্রি:) হি:।

৪৪৫. তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪৪ ও ১৪৫ নং টীকা দ্র:।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে, জীবাত্মার এ যোগ্যতা লাভের বিষয়টি একান্তই ধীর প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়। সুতরাং কবিত্বের যোগ্যতা কাব্য কণ্ঠস্থ করার মাধ্যমে, রচনার যোগ্যতা ছন্দোবন্ধ ও সরল গদ্য মুখস্থ করার মাধ্যমে এবং শাস্ত্রীয় জ্ঞান বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন, উপলব্ধি, আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে ফেকাহ্‌শাস্ত্রের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে ফেকাহ্‌শাস্ত্র অধ্যয়ন, তার সমস্যাবলির বিচার তার শাখা-প্রশাখার জ্ঞান ও মূল থেকে শাখার ব্যুৎপত্তির জ্ঞানলাভ করতে হয়। আধ্যাত্মিক সূফীতত্ত্ব সম্পর্কে যোগ্যতার জন্য উপাসনা, নামজপ, লোক সংসর্গ থেকে দূরে সরে নির্জনবাসের মধ্যে বহিরেন্দ্রিয়ের বিলুপ্তি সাধন এবং এর মাধ্যমে অন্তরেন্দ্রিয় ও আত্মিক শক্তির যোগ্যতার জাগরণ ঘটাতে হয়। পরিণামে সেই যোগ্যতাই ঐশ্বরিক ক্ষমতায় বিভূষিত হয়ে থাকে। এরূপ অন্যান্য সব বিষয়।

বস্তুত এদের প্রত্যেকটির মধ্যে জীবাত্মার জন্য এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা দিয়ে তা মণ্ডিত হয় এবং তার মধ্যে উদ্ভূত যোগ্যতার উৎকর্ষ-অপকর্ষ অনুসারে তার যোগ্যতা অর্জিত হয়ে থাকে। সুতরাং উচ্চ পর্যায়ের বাক্‌বৈদগ্ধ্য অর্জনের জন্য তার সমতুল্য উচ্চপর্যায়ের বাক্‌বিন্যাসের কণ্ঠস্থকরণ আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। এ কারণেই ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদ ও অন্যান্য শাস্ত্রবিশারদ সবাই এ বাক্‌বৈদগ্ধ্যের ক্ষেত্রে অক্ষমতার অধিকারী। এর একমাত্র কারণ তাদের কণ্ঠস্থ বিষয়াদি এবং তা এমন সমস্ত শাস্ত্রীয় নিয়ম-কানুন ও ফেকাহ্‌শাস্ত্রীয় বর্ণনায় পরিপূর্ণ, যা বাক্‌বৈদগ্ধ্যের দিক থেকে নিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে। কারণ এমন নিয়মাবলি ও শাস্ত্র সম্পর্কীয় বর্ণনার মধ্যে বাক্‌বৈদগ্ধ্যের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং এমন সঞ্চয় যখন বেশি মাত্রায় কোন মননশক্তিতে প্রবেশ করে এবং জীবাত্মা তার দ্বারা রঞ্জিত হয়ে ওঠে, তখন তা থেকে উদ্ভূত যোগ্যতা একান্ত দুর্বল হতে বাধ্য। এর ফলে আরবীয় বাক্‌বিন্যাসের রীতিনীতি থেকে অনেক দূরে সরে যায়। আমরা ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদ্, ব্যাকরণবিশারদ, কালাম শাস্ত্রী, তার্কিক ও অন্যান্য গুণীজন, যারা আরবীয় বাক্‌ধারার বিশুদ্ধ ও সভ্রান্ত সঞ্চয়ের দ্বারা পূর্ণতা লাভ করতে পারেন নি, তাদের কাব্য রচনাকে অনুরূপ অবস্থার মধ্যে পতিত দেখতে পাই।

আমাদের এক সঙ্গী, মারিনী সাম্রাজ্যের বিচক্ষণ রচনাবিদ 'আলামা' গ্রন্থের রচয়িতা আবুল কাসেম ইবনে রেদোয়ান[৪৪৬] আমাদেরকে জানাতে গিয়ে বলেছেন, "আমি একদিন সম্রাট আবুল হাসানের লেখক, আমাদের সাথী আবুল আব্বাস ইবনে শোয়ায়েব,[৪৪৭] যিনি তখন ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের শিরোমণি ছিলেন, তার কাছে আলোচনার জন্য ইবনে নহুবীর কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিটি আবৃত্তি করেছিলাম :

> বুঝতে পারি নি, যখন ধ্বংসাবশেষের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম,
> তাদের নতুন ও পুরাতনের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা।

আমি কবির নাম বলিনি, কিন্তু তিনি শুনিবামাত্র বলে উঠলেন, এটি একজন ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদদের কাব্য। আমি তাঁকে বললাম, আপনি কী করে বুঝলেন? তিনি

৪৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ।
৪৪৭. আহমদ ইবনে শোয়ায়েব; মৃত্যু ৭৫০ (১৩৪৯ খ্রি:) হি:।

বললেন, তার 'কোন পার্থক্য আছে কিনা'—এ উক্তির দ্বারা। কারণ এটি ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদদের বাগ্‌ধারা; আরবীয় বাক্‌রীতির অন্তর্গত নয়। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র জন্য আপনার পিতা উৎসর্গ হোন; ইনি ইবনে নহুবী![৪৪৮]

কিন্তু লেখক ও কবিদের অবস্থা অনুরূপ নয়। কারণ তারা তাদের সঞ্চয়ের মধ্যে আরবের বাক্‌বিন্যাস ও তাদের সরল গদ্যরীতির সমুদয় উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত চয়ন করেছে এবং এসব উৎকৃষ্ট বাক্‌রীতির সাথে নিজেদের পরিচয়কে গভীর করে তুলেছে।

একদিন আমি আমার সঙ্গী, আন্দালুসের বনি আহমার রাজন্যবর্গের মন্ত্রী আবু আবদুল্লাহ্‌ ইবনে খতিব, যিনি তখন রচনা ও কাব্যশিল্পে সবার অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হবেন; তাঁর সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে বললাম, 'আমি কাব্য রচনা করতে উদ্যত হলেই কঠিন বাধার সম্মুখীন হই; অথচ এ ব্যাপারে আমার বিচক্ষণতা এবং বিশুদ্ধ বাক্‌বিন্যাসের সঞ্চয় কুরআন, হাদীস ও আরবের বাণীসম্ভার মিলিয়ে স্বল্প হলেও উল্লেখযোগ্য। আমার মনে হয়, আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, এর যথার্থ কারণ হচ্ছে আমার স্মৃতিতে পূর্ব সঞ্চিত শাস্ত্রীয় পদ্য ও নিয়মাবলি সম্পর্কিত বিচিত্র রচনা। কেননা আমি কেরাত ও লিপিশাস্ত্র সম্পর্কে শাতেবীর[৪৪৯] দুটি কবিতা 'কুবরা' ও 'মুগরা' মুখস্থ করেছি এবং তাদের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করেছি। আমি ফেকাহশাস্ত্র ও তার মূলনীতি সম্পর্কীয় ইবনে হাজেবের[৪৫০] দুটি গ্রন্থ, যুক্তিবিদ্যায় খোনজীর[৪৫১] 'জুমাল', 'আসতসহিল' গ্রন্থের কতকাংশ অধ্যয়ন করেছি এবং বিভিন্ন বৈঠকে শিক্ষাদানের বিচিত্র নিয়ম-কানুন শিখে নিয়েছি। এর ফলে আমার স্মৃতির সঞ্চয় এসব বিষয়ে পূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং কুরআন, হাদীস ও আরবের বাণী থেকে সুচয়নের মাধ্যমে আমি যে যোগ্যতার প্রত্যাশী হয়েছিলাম, তাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। সুতরাং আমার প্রতিভা সে সম্পর্কে চরম পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি।' তিনি আমার এ বক্তব্য শুনে কিছুক্ষণ অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। পরে বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, তুমি। একমাত্র তুমি ছাড়া কি এ কথা অন্য কেউ বলতে পারত!'

পাঠক, এ পরিচ্ছেদে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা দিয়ে আরও একটি বিষয় আপনার সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে এবং তা এই যে, ইসলামী যুগের আরবি কবিদের বাণী বাক্‌বৈদগ্ধ্য রসানুভূতির দিক থেকে জাহেলী যুগের কবিদের বাণীর চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ে অবস্থিত। এ অবস্থা তাদের গদ্য ও পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। আমরা হাস্‌সান ইবনে সাবেত, উমর ইবনে আবু রবিয়া, হুতাইয়া, জরির ফরসদক, নুসাইয়েব, গায়লান জুররুম্মা, আহওয়াজ, বাশ্‌শার প্রমুখ কবিদের[৪৫২] কাব্য এবং উমাইয়া সাম্রাজ্য ও আব্বাসী সাম্রাজ্যের প্রথম দিককার পূর্বসূরি আরবদের ভাষণ; রচনা ও রাজন্যবর্গের সাথে কথোপকথন ইত্যাদির মধ্যে বাণীর যে নিদর্শন লাভ করি, তা জাহেলী যুগের

৪৪৮. ইউসুফ ইবনে মুহম্মদ; ৪৩৩-৫১৩ (১০৪২-১১১৯ খ্রি:) হি:।
৪৪৯. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৮ নং টীকা দ্র:।
৪৫০. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৮ নং টীকা দ্র:।
৪৫১. ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৫৭ নং টীকা দ্র:।
৪৫২. এ দুটি স্থানে উল্লেখিত কবিদের পরিচয়ের জন্য একাডেমী প্রকাশিত 'আরবি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' দ্র:।

নাবেগা, আন্তারা, ইবনে কুলসুম, যুহাইর, আলকামা ইবনে আবদা, তরফা ইবনে আবদ প্রমুখ কবিদের[৪৫৩] কাব্য ও তাদের সমকালীন গদ্যভাষণ ইত্যাদি থেকে বাক্‌বৈদগ্ধ্যের দিক দিয়ে বহু উচ্চস্তরে দেখতে পাই। সুস্থ প্রবৃত্তি ও বিশুদ্ধ আস্বাদশক্তিই একমাত্র বাক্‌বৈদগ্ধ্যের বিচক্ষণ সমালোচকের কাছে এ মন্তব্যের সাক্ষ্য উপস্থিত করতে পারে।

এর কারণ এই যে, আরবদের মধ্যে যারা ইসলামের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, তারা কুরআন হাদীসের সেই উচ্চ পর্যায়ের বাণীরূপ শুনেছেন, যার সমতুল্য কোন কিছু রচনা করতে মানুষের শক্তি অক্ষম হয়েছে। তা তাদের অন্তরে অনুপ্রবেশ করেছে এবং তাদের আত্মশক্তিকে তার বাক্‌রীতিতে অভ্যস্ত করে তুলেছে। এর ফলে তাদের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়েছে এবং বাক্‌বৈদগ্ধ্যের দিক থেকে তাদের যোগ্যতা পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের লোকদের চেয়ে সমুন্নতি লাভ করেছে। কারণ পূর্ববর্তীরা এ পর্যায়ের বাণীরূপ শোনেনি এবং তারা এর মধ্যে লালিতও হয়নি। সুতরাং এ কারণেই ইসলামী যুগের তাদের গদ্য ও পদ্য রচনা গঠনসৌকর্য ও অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক থেকে পূর্ববর্তীদের চেয়ে বেশি সুন্দর ও শোভন হয়ে উঠেছে। এমন উচ্চ পর্যায়ের বাণীরূপ থেকে আদর্শ গ্রহণ করার ফলেই তাদের রচনা বেশি দৃঢ়ভিত্তিক ও ব্যাপকতর পরিমার্জিত রূপ লাভ করেছে। পাঠক, বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করুন, আপনার রসানুভূতিই এর সাক্ষ্য বহন করবে; যদি আপনি বাক্‌বৈদগ্ধ্য সম্পর্কীয় বিচক্ষণতা ও আস্বাদের অধিকারী হয়ে থাকেন।

আমাদের উস্তাদ শরীফ আবুল কাসেম[৪৫৪] যিনি আমাদের সময়ে গ্রানাডার কাজী ছিলেন, এ রচনাশিল্পে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি এ বিষয়ে আশ্‌মালুবীনের[৪৫৫] শিষ্য কয়েকজন উস্তাদের কাছে সিওটায় শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি ভাষা সম্পর্কীয় বিষয়াদিতে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তার চরম সীমায় উপনীত হন। একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইসলামী যুগের আরবরা জাহেলী যুগের আরবদের চেয়ে বাক্‌বৈদগ্ধ্যের ক্ষেত্রে বেশি উচ্চ পর্যায়ে অধিষ্ঠিত, এর কারণ কি? তাঁর রসানুভূতির গভীরতার জন্যই এ প্রশ্নের গুরুত্ব তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। সুতরাং অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আমাকে বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, আমি জানি না। তারপর আমি তাঁকে বললাম, এ বিষয়ে আমার যা মনে হয়েছে তা আপনার সামনে পেশ করতে পারি। আমার ধারণা, এটাই এরূপ হওয়ার কারণ। এর পর তাঁর সামনে আমার উল্লেখিত বক্তব্য উপস্থিত করেছিলাম। শুনে তিনি নির্বাক হয়ে রইলেন; পরে বললেন, হে বিচক্ষণ! এটি এমন একটি বক্তব্য, যা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা উচিত।

এ ঘটনার পর তিনি আমার মতামতের গুরুত্ব দিতেন, শিক্ষার বৈঠকে আমার বক্তব্যকে তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং শাস্ত্রীয় বিষয়াদি সম্পর্কে আমার পাণ্ডিত্যের কথা বলতেন। আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বাক্‌শৈলী শিক্ষা দিয়েছেন।[৪৫৬]

---

৪৫৩. এদুটি স্থানে উল্লেখিত কবিদের পরিচয়ের জন্য একাডেমী প্রকাশিত 'আরবি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' দ্র:।

৪৫৪. মুহম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহম্মদ; ৬১৭-৭৬০ (১২৯৭-১৩৫ খ্রি:) হি:।

৪৫৫. উমর ইবনে মুহম্মদ; ৫৬২-৬৪৫ (১১৬৭-১২৪৫ খ্রি:) হি:।

৪৫৬. কোরান; ৫৫, ৩-৪।

অষ্টপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

[স্বাভাবিক ও অলঙ্কৃতবাণীরূপ ও অলঙ্করণের উৎকর্ষ-অপকর্ষের স্বরূপ বর্ণনা]

জেনে রাখুন, যে বাণীকে প্রকাশ ও বর্ণনা বলা হয়, তার রহস্য ও শক্তি একমাত্র মনোভাব সঞ্চারণের মধ্যে নিহিত রয়েছে। কিন্তু অনুরূপ উদ্দেশ্যে যদি তা পরিচালিত না হয়, তাহলে তা সেই মৃতের সমতুল্য, যার মধ্যে কোন ব্যঞ্জনা নেই। বস্তুত বাণীর পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনাকেই বাক্‌বৈদগ্ধ্য বলা হয়, যার সংজ্ঞা বাক্‌শৈলীবিদদের কাছ থেকে পাঠক, আপনি জানতে পেরেছেন। তারা বলেন, তা প্রসঙ্গের চাহিদার সাথে বাণীর সামঞ্জস্য বিধানের নামান্তর। এ সঙ্গে উক্ত প্রসঙ্গের সাথে শব্দাবলির বিন্যাসের সামঞ্জস্য সাধন করতে যেসব শর্ত ও নিয়মের প্রয়োজন, তার জ্ঞানও অর্জন করতে হয় এবং এ সব মিলিয়েই বাক্‌বৈদগ্ধ্যের বিষয়টি গড়ে ওঠে।

এভাবে বাণীকে প্রসঙ্গানুরূপ সুসমঞ্জস করার জন্য বাক্‌বিন্যাসের প্রয়োজনীয় শর্তাদি ও নিয়মাবলি আরবি ভাষা থেকে গ্রহণ করার পর রীতিতে পরিণত হয়েছে। বিন্যাস তার প্রচলন অনুসারে এসব শর্ত ও নিয়ম দ্বারা দুটি অন্বয়ী পদের মধ্যে অন্বয়ের ব্যবস্থা করে থাকে এবং এটাই আরবি ব্যাকরণের মূলনীতি। অনুরূপভাবে পদগুলো বিন্যাসের বাস্তবায়নে অগ্র-পশ্চাৎ, নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট-সুস্পষ্ট, শর্তযুক্ত-শর্তহীন প্রভৃতি অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে এবং অন্বয়ের বের হতে আগত অন্যান্য নিয়মকে পরিস্ফুট করে তোলে। বক্তার মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে এভাবে যেসব শর্ত ও নিয়ম প্রযোজ্য হয় তাই একটি বিষয়ের রীতিনীতি এবং শাস্ত্রবিদগণ তাকে বাক্‌বৈদগ্ধ্যের সাথে সম্পর্কিত বিষয় হিসেবে 'ভাবপ্রকাশ শাস্ত্র' নামে অভিহিত করেছেন। এ কারণেই আরবি ভাষাতত্ত্বের রীতিনীতি এ ভাবপ্রকাশ শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়; কেননা তা অন্বয়ের দ্বারা যা প্রকাশ করে তা এর অন্বয় বহির্ভূত সুপ্ত অবস্থারই অংশ মাত্র। সুতরাং বিন্যাসের মধ্যে স্বরচিহ্নাদি ও ভাবপ্রকাশের রীতিনীতির অভাবজনিত কোন ত্রুটির ফলে যদি তা প্রসঙ্গকে প্রকাশ করতে না পারে তাহলে তা প্রসঙ্গের চাহিদা অনুসারে বক্তব্যের সামঞ্জস্য বিধানেও অপারগ হবে এবং সেই উদ্দেশ্যহীন বক্তব্যে পরিণত হবে যা প্রাণহীন বলে গণ্য।

অতঃপর এ প্রসঙ্গানুরূপ বাক্‌বিন্যাস ধারাকে বিচিত্র ভাবের মধ্যে সঞ্চারিত করার বিভিন্ন প্রচেষ্টা দেখা দেয়। কারণ বাক্‌বিন্যাস প্রচলন অনুসারেই একটি অর্থের বাহক হয়; একে উপলব্ধি করার পর মননশক্তি তার অনুষঙ্গী সম্ভাব্য, সম্ভাবিত ও সমতুল্য তাৎপর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তা তখন উপমা অথবা লক্ষণার সাহায্যে পরোক্ষ অর্থ

প্রকাশ করে থাকে। এ সম্পদটি যথাস্থানে বর্ণিত হয়েছে। বাচ্যার্থ উপলব্ধির মধ্যে যেমন একটি আস্বাদ আছে, অনুরূপভাবে পরোক্ষ তাৎপর্য অনুসন্ধানেও মননশক্তি একটি আস্বাদ লাভ করে; বরং পূর্বের আস্বাদ অপেক্ষা এটি তীব্র হয়ে উপলুব্ধ হয়। কারণ এসব কিছুর মধ্যে প্রমাণ থেকে প্রামাণ্যকে আয়ত্ত করার একটি আনন্দ বিদ্যমান এবং পাঠক, আপনি জানতে পেরেছেন যে, এ আনন্দই রসানুভূতির কারণ।

অতঃপর এরূপ পরোক্ষ তাৎপর্য অনুসন্ধানের বিষয়টির জন্যও শর্ত ও নিয়ম বর্তমান এবং রীতিনীতির মতো এগুলোও বিষয়টিকে শাস্ত্রাকারে গড়ে তুলেছে। শাস্ত্রবিদগণ এর নাম দিয়েছেন 'বাক্‌শৈলী' শাস্ত্র। এটি প্রসঙ্গানুরূপ ভাবপ্রকাশ শাস্ত্রের সহোদরা তুল্য; কেননা এটিও ভাবার্থের বিন্যাস ও তার তাৎপর্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট। বস্তুত ভাবপ্রকাশ শাস্ত্রের রীতিনীতি প্রকাশের দিক থেকে বিন্যাসাদির স্বরূপের সাথে জড়িত রয়েছে এবং পাঠক, যেমন আপনি জানতে পেরেছেন শব্দ ও অর্থ উভয়ে পরস্পর নির্ভরশীল ও সম্পূরক। সুতরাং এ ভাবপ্রকাশ ও বাক্‌শৈলী উভয়েই বাক্‌বৈদগ্ধের অংশ এবং তাদের সমন্বয়ে ভাষার সম্পূর্ণতা সাধিত হয়। যদি কোথাও এ বাক্‌বৈদগ্ধের অভাব ঘটে, তাহলে বিদগ্ধজনের কাছে তা মূক প্রাণীদের শব্দাবলির সাথে তুলনীয় এবং তা আরবি ভাষার না হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ আরবি ভাষা তা-ই, যার প্রকাশ প্রসঙ্গানুরূপ হয়ে থাকে এবং এদিক থেকে বাক্‌বৈদগ্ধ্য আরবীয় বাণীর মূল ভিত্তি, তার সত্তা, তার আত্মশক্তি ও তার প্রকৃতি।

অতঃপর পাঠক, এটি জেনে রাখুন, শাস্ত্রবিদগণ যখন বলেন বক্তব্যটি স্বাভাবিক তখন তারা তার দ্বারা সেই বক্তব্যকে বুঝিয়ে থাকেন, যা মনোভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যের দিক থেকে আকৃতি ও প্রকৃতিতে পূর্ণতা লাভ করেছে। কারণ তা বর্ণনা ও ভাষণ; কতিপয় ধ্বনির উচ্চারণ মাত্র তার উদ্দেশ্য নয়। বরং বক্তা তার মাধ্যমে শ্রোতাকে তার মনোগত ভাব সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবহিত করতে চান এবং এক্ষেত্রে তিনি বিশ্বস্ত হতে চান। এভাবে বক্তব্য বক্তার মনোগত ভাব প্রকাশের পর তার বাক্‌বিন্যাসে বিচিত্র ধরনের পরিমার্জনা ও অলঙ্করণ সংযোজিত হয়; যেন এসব বিষয়ের দ্বারা বক্তব্যকে বিশুদ্ধতায় উজ্জ্বল করে তোলা হয়। এরূপ অলঙ্করণের মধ্যে ছন্দোবদ্ধ গদ্যে চাকচিক্য, বাক্‌বিন্যাসের মধ্যে মাত্রার সমতুল্যতা, বিচিত্র নিয়মে তার বিভাজন সৌকর্য, দ্ব্যর্থবোধক শব্দের দ্বারা মুক্ত তাৎপর্যের ব্যঞ্জনা, বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্যের প্রতীতি[৪৫৭]

---

৪৫৭. এখানে রোজেনথালের অনুবাদে অত্র পরিচ্ছেদের অংশবিশেষের একটি ভিন্ন পাঠ সন্নিবেশিত হয়েছে; আমরা সম্পূর্ণতার জন্য এর অনুবাদ নিম্নে তুলে দিচ্ছি।

এবং অন্যান্য আলঙ্কারিক বিষয়াদি, যা শাস্ত্রবিদগণ আবিষ্কার ও নির্ধারিত করেছেন। তাঁরা এদের জন্য নিয়ম ও শর্তাবলি প্রবর্তন করেছেন এবং এগুলোকেই তাঁরা অলঙ্কারশাস্ত্র বলে অভিহিত করেন।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের পূর্ব-পশ্চিম উভয় অঞ্চলের আলঙ্কারিকগণ এ শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার স্বরূপ নির্ধারণে মতানৈক্য পোষণ করেন; যেমন তাদের মধ্যে এদের অনেকগুলোই শাস্ত্রীয় দিক হতে অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্তর্গত কিনা, সে সম্পর্কেও মতভেদ বিদ্যমান। পশ্চিমাঞ্চলীয়গণ এ সম্পর্কে নেতিবাচক মত পোষণ করেন। পূর্বাঞ্চলীয়দের ধারণা, এটি অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হলেও বাণীর উৎসমূলের সাথে এর কোন সাযুজ্য

নেই। বরং বাণী তার গঠনসৌকর্য প্রসঙ্গের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবার পরই এর ব্যবহার উক্ত বাণীরূপকে অতিরিক্ত ঔজ্জ্বল্য, আভরণ মাধুর্য ও সৌন্দর্য দান করে থাকে। বস্তুত বাণী প্রসঙ্গে চাহিদা পূরণ করতে না পারলে এর আরবিয়ত্ব লাভই ঘটে না; এমতাবস্থায়—কোন প্রকার চাকচিক্যই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম নয়। তদুপরি অলঙ্কারশাস্ত্রের সমুদয় বিষয়ই আরবের ভাষা-সম্পদ বিশ্লেষণ ও ব্যবহারের মাধ্যমেই উদ্ভাবিত হয়েছে। এর কতকাংশ আরবদের বাকরীতি হতে শ্রুত এবং তাদের অস্তিত্ব পরীক্ষিত সত্য বলে বিবেচিত হয়েছে। আবার এর কতকাংশ ভাষা-সম্পদের বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া বিবেচিত হয়েছে। আবার এর কতকাংশ ভাষা-সম্পদের বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া গিয়েছে। আরবি সাহিত্য সাধকদের বাণী হতেই অনুরূপ বিষয়াদি লাভ করা সম্ভব।

যখন তারা অলঙ্কৃত বাণীরূপের কথা বলেন, তখন এরূপ অলঙ্কারসমৃদ্ধ বাণীর কথাই বুঝিয়ে থাকেন। শাস্ত্রবিদরা তাঁদের গ্রন্থে স্বাভাবিক বাণীরূপের ভাবপ্রকাশের কথাও তুল্য গুরুত্বে বর্ণনা করেন। ফলে দেখা যায়, এরা একে অপরের বিরোধী; এমন কি মনে হয়, অলঙ্কারশাস্ত্রই বুঝি অলঙ্কারশাস্ত্রের বিরোধী।

যেহেতু অলঙ্করণের এ বিষয়টি কোন সুস্পষ্ট আলোচ্য সীমার অন্তর্ভুক্ত ছিল না এবং এটি তখন শাস্ত্র হিসেবেও গড়ে উঠেনি, সেজন্য প্রাচীন সাহিত্যশাস্ত্রীরা একে সাহিত্যশিল্পের অন্তর্গত বিষয় হিসেবে আলোচনা করেছেন এবং সেভাবেই তাদের গ্রন্থাদিতে বিন্যস্ত করেছেন। ইবনে রশিক তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল উমদা'তে এরূপ করেছেন। এ গ্রন্থে এ সম্পর্কীয় তাঁর বিষয় বিন্যাসের ধারা অভূতপূর্ব। এতে তিনি প্রথমে কাব্য রচনার নিয়ম পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। পরে এর সাথে সঙ্গতি রেখে অলঙ্কারাদির বর্ণনা তুলে ধরেছেন। আন্দালুসের আরও অনেক সাহিত্যশাস্ত্রীই এরূপ আলোচনা করেছেন।

বলা হয়ে থাকে যে, এ অলঙ্কার ব্যবহারে যিনি সর্বপ্রথম তার কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, তিনি হলেন আবু তাম্মাম হাবিব ইবনে আউস আততায়ী। তিনি তার রচনাকে তা দিয়ে ভরে ফেলেছেন। তাঁর পরবর্তী লোকেরা এ বিষয়ে তাঁকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে কাব্য রচনার অলঙ্করণের এ প্রকার আতিশয্য ছিল না। এ কারণেই প্রাক্-ইসলামী ও ইসলামী আমলের খ্যাতিমান কবিদের মধ্যে কেউই তাদের কাব্যে অনুরূপ অলঙ্করণের প্রয়াস দেখাননি। অলঙ্কার তাদের কাব্যেও আছে, কিন্তু তা এসেছে একান্ত স্বতোঃস্ফূর্তভাবে এবং তাদের বাক্‌বৈদগ্ধ্যের অনুষঙ্গী রূপে। স্বাভাবিক সুষ্ঠুতাই তাদের কাব্য-স্বাদ আস্বাদনের মানদণ্ড ছিল। এজন্যই তাদের অলঙ্কার ব্যবহারে কোন প্রকার আয়াসের চিহ্ন নেই; তাতে বাণীর যথার্থস্বরূপ ব্যাহত হয়নি এবং কোন প্রকার কষ্ট-কল্পনার আশ্রয়ও নিতে হয়নি। বরং তাদের স্বভাব ও অভ্যাস একান্ত স্বাভাবিকভাবেই এর জন্ম দিয়েছে। ফলে অলঙ্কার সমৃদ্ধ হয়েও তাদের বাণীরূপ এর স্বভাবসুলভ আন্তরিকতা পরিহার করেনি।

প্রাক্-ইসলাম ও ইসলামী আমলের গদ্য রচয়িতারাও কোন প্রকার অলঙ্কার, মাত্রা, মিল ইত্যাদি ছাড়াই সহজ-সরল গদ্য রচনা করতেন। পরবর্তী পর্যায়ে ইব্রাহিম ইবনে হিলাল আস্‌সাবীর আবির্ভাবে এর ব্যতিক্রম ঘটে। বানি বুয়া শাসকদের এ দরবারী লেখক কাব্যশিল্পে ব্যবহৃত অলঙ্করণের অনুকরণ একান্ত শাসনকার্যে ব্যবহৃত গদ্য রচনা ও ভাষণ বিবৃতিতেও অলঙ্করণের বাহুল্য ঘটান। এ ব্যাপারে তার স্বাধীনতা ছিল; কারণ তার উপরস্থ শাসকবৃন্দের কেউই আরবি ভাষাভাষী ছিলেন না। তদুপরি তার কাজকর্ম ছিল একান্ত সাধারণ মানুষ নিয়ে এবং তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যিনি খলিফাদের ন্যায় রচনায় বাক্‌বৈদগ্ধ্যের জন্য দাবি উত্থাপন করতে পারেন। ফলে আস্‌সাবী তার রচনায় এমন নিম্নস্তরের অলঙ্করণের সংযোগ সাধন করেছেন, যা সাধারণ রাজকীয় ফরমানাদিতে করা হয়ে থাকে, বিশেষভাব ব্যক্তিগত পর্যায়ে এর আধিক্য দেখা যায়। কিন্তু তবুও তখন তিনি এ বিষয়ে সার্থকতা অর্জন করেন এবং তার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার পার্শ্ববর্তী রচয়িতাদের রচনা আরও অধিকতর অলঙ্কার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ফলে এক সময়ে যে সহজ সরল গদ্যে বাগ্মিতা প্রদর্শনের রীতি প্রচলিত ছিল, মানুষের পক্ষে তা স্মরণ করাও অসম্ভব

ইত্যাদি স্থান লাভ করে; যাতে শব্দাবলি ও তাদের অর্থের মধ্যে সমধর্মিতা পরিস্ফুট হয়। এর ফলে বক্তব্য এমন ঔজ্জ্বল্য, শ্রুতিমাধুর্য, আস্বাদ ও সৌন্দর্য লাভ করে, যার সবটুকুই ভাব প্রকাশের অতিরিক্ত।

এ শৈল্পিক উৎকর্ষ কোরানের অননুকরণীয় বাণীর বহুস্থানে বিদ্যমান। যেমন—'রাত্রির শপথ, যখন তা আবৃত করে এবং দিবসের শপথ, যখন তা প্রকাশিত হয়।' যেমন—'অবশ্য যে ব্যক্তি দান করেছে, বিরত রয়েছে এবং সুন্দরতমকে সত্য বলে জেনেছে।' এভাবে আয়াতের শেষ বিভাজন পর্যন্ত। অনুরূপ অন্যত্র, যেমন—'অবশ্য যে ব্যক্তি বিপথে গিয়েছে ও পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে'—আয়াতের শেষ পর্যন্ত। এরূপ, 'তারা ভাবছে যে, তারা কাজের মত কাজ করছে।' এমন উদাহরণ প্রচুর।[৪৫৮] বস্তুত এসবই বাক্‌বিন্যাসের মূল উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ পূর্ণতা লাভ করার পরই অলঙ্কারমণ্ডিত হয়েছে। জাহেলী যুগের বক্তব্য উপস্থাপনেও অনুরূপ অলঙ্করণ লক্ষ করা যায়। কিন্তু সেখানে এর বহিঃপ্রকাশ একান্তই স্বতোৎসারিত ও অনিচ্ছাকৃত। বলা হয় যে, যুহায়েরের[৪৫৯] কাব্যে অনুরূপ অলঙ্করণ বিদ্যমান।

হয়ে দাঁড়াল। রাজকীয় ফরমানাদিও সাধারণ ব্যক্তিগত যোগাযোগের অনুরূপ হয়ে দাঁড়াল এবং আরবি ভাষার বাক্‌বৈদগ্ধ্য সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হল। ভাল-মন্দ উভয়বিধ শব্দ একত্র মিশে এককার হয়ে গেল এবং ভাষার স্বাভাবিক শক্তি এর বাক্‌বৈদগ্ধ্য সৃষ্টিতে অপারগ হয়ে উঠল; কারণ তার প্রতি কাহারও লক্ষ ছিল না। বরং প্রত্যেকেই গদ্যে-পদ্যে ব্যবহারযোগ্য বিচিত্র ধরনের অলঙ্কার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে পড়ল এবং যত্রতত্র তাদের ব্যবহার করাকেই একমাত্র কর্তব্য বলে গণ্য করতে লাগল। অথচ অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ্‌রা অন্য বিষয় পরিত্যাগ করে শুধু এ অলঙ্কার প্রীতিকে সর্বদাই নিন্দনীয় মনে করেছেন।

আমি আমাদের উস্তাদদেরকে দেখেছি, তাঁরা অনুরূপভাবে যারা রচনায় অন্যায্য অলঙ্কার প্রীতির পরিচয় দিত, তাদেরকে ভর্ৎসনা করতেন এবং তাদের সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ করতেন; আমাদের উস্তাদ আবুল বরাকাত আল বাল্লাফিকী যিনি ভাষার ব্যাপারে গভীর পাণ্ডিত্য ও সুস্থ আস্বাদ শক্তির অধিকারী ছিলেন, তাঁকে বলতে শুনেছি, 'আমার ইচ্ছা হয়, এভাবে যারা গদ্যে-পদ্যে বিচিত্র অলঙ্কার প্রয়োগের প্রচেষ্টায় লিপ্ত, তারা যেন কঠিন শাস্তি পায় এবং জনসমক্ষে যেন তাদেরকে অসম্মান করা হয়। যাতে তাদের অনুসারীরা অনুরূপ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হতে আগ্রহী না হয়।' তিনি যথার্থই এ প্রকার অলঙ্কারপ্রীতির ফলে বাক্‌বৈদগ্ধ্যের অবলুপ্তি আশঙ্কা করে এ মন্তব্য করেছেন। আমাদের উস্তাদ শরীফ কাজী আবুল কাসেম আস্‌সিবতী, যিনি আরবি ভাষায় সুপণ্ডিত এবং তখন এর চর্চার নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তিনি প্রায়শই বলতেন, 'বিচিত্র ধরনের অলঙ্কার কোন কবি বা লেখকের রচনায় স্বতোস্ফূর্তভাবেই প্রকাশ পেতে পারে; কিন্তু সে যদি এটি ইচ্ছাকৃতভাবে বারংবার প্রয়োগ করে, তাহলে খুবই নিন্দনীয়। বস্তুত এসব অলঙ্কারের দ্বারা বাণীর চাকচিক্য বৃদ্ধি ও সৌকর্য সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এগুলোকে মুখমণ্ডলের তিলের সাথে তুলনা করা যায়; একটিতেই সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং বেশি হলে একান্ত কুৎসিত হয়ে দাঁড়ায়।

এসব গণ্যমান্য গুণীদের সমুদয় বক্তব্যের তাৎপর্য অলঙ্কার সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে, যাতে বাক্‌বৈদগ্ধ্যের বিলুপ্তি না ঘটে। তাঁদের বক্তব্য হতে এটিও বুঝা যায় যে, স্বাভাবিক বাণীরূপ সর্বদা অলঙ্কৃত বাণীরূপ হতে শ্রেষ্ঠ। আমরা এখানে এর রহস্য ও যথার্থ স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছি। এক্ষেত্রে আস্বদই একমাত্র বিচারক। আল্লাহ্‌ই অধিকতর জ্ঞানী এবং তোমাদেরকে তাই শিক্ষা দেন, যা তোমরা জান না।

৪৫৮. যথাক্রমে কোরান; ৯২, ১-২, ৯২, ৫; ৭৯, ৩৭; ১৮, ১০৪।

৪৫৯. সফল কবির পরিচয়ের জন্য বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'আরবি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' দ্র:।

ইসলামী যুগের কবিদের মধ্যে অবশ্য এর বহিঃপ্রকাশ একান্ত স্বতঃস্ফূর্ত ও ইচ্ছাকৃত এবং তারা এক্ষেত্রে চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম যারা এ বিষয়ে দক্ষতা দেখিয়েছেন, তারা হলেন হাবিব ইবনে আউস, আল বুহ্‌তরী এবং মুসলিম ইবনে ওলিদ। তারা সকলেই এমন অলঙ্করণে আসক্ত ছিলেন এবং তাতে চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। বলা হয়, প্রথমে যারা এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন, তারা হলেন বাশশার ইবনে বুর্‌দ ও ইবনে হেরমা। তারা উভয়ে শেষ কবি, যাদের কাব্যের দ্বারা আরবি বাক্‌রীতির প্রমাণ উপস্থিত করা হয়। তারপর তাদেরকে অনুসরণ করে আমর ইবনে কুলসুম, আল ইতাবী, মুনসুর আন্‌নুমায়রী, মুসলিম ইবনে ওলিদ ও আবু নওয়াস এসেছেন এবং তাদের পদাংক অনুসরণ করে উপস্থিত হয়েছেন হাবিব ও আল বুহতরী। এর পর ইবনে আল মুতাজ আবির্ভূত হয়ে সর্বপ্রকার শৈল্পিক অলঙ্করণের সমাপ্তি টেনেছেন।[৪৬০]

আমরা এখানে শৈল্পিক অলঙ্করণ থেকে মুক্ত বাণীর স্বাভাবিকরূপের কিছু উদাহরণ তুলে ধরব। যেমন কায়েম ইবনে যারিহের উক্তি :

> 'আমি আবাসস্থল থেকে বের হয়ে এলাম এজন্য, যাতে
> নির্জনে তোমার সাথে অন্তরের কথা ব্যক্ত করতে পারি।'

কুসাইয়েরের উক্তি :

> 'আমি 'আজ্জা'র জন্য আবেগে আন্দোলিত হচ্ছি, যখন
> আমর ও তার মধ্যকার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।
> যেন আকাশের মেঘের ছায়া প্রত্যাশী কোন লোক,
> যার শিরোপরে তা এসেই অন্তর্হিত হয়ে যায়।'

পাঠক, শৈল্পিক অলঙ্করণমুক্ত এ স্বাভাবিক বাণীরূপের বন্ধনগত দৃঢ়তা ও বিন্যাসগত পরিমার্জনার কথা চিন্তা করুন। যদি এর এই ভিত্তির উপর অলঙ্করণযুক্ত হত, তাহলে বেশি সুন্দর হয়ে উঠত।

অলঙ্কৃত বাণীরূপের উদাহরণ বাশ্‌শার ও হাবিব এবং তাদের পর্যায়ভুক্ত কবিদের সময় থেকে প্রচুর পরিমাণে লভ্য। তারপর ইবনে আল মুতাজ এসে তাকে এমন পরিপূর্ণতা দান করেছেন, যার আদর্শ অনুসরণ করেই পরবর্তী কবিরা অগ্রসর হয়েছেন এবং তাদের তাঁতেই নিজেদের বাণী বয়ন করেছেন।

শাস্ত্রবিদ্‌দের কাছে এ শিল্পের প্রকার বৈচিত্র্য বিদ্যমান এবং এ বৈচিত্র্যের নামকরণে তাদের পরিভাষাও বিভিন্ন। তাদের মধ্যে অনেকেই একে বাক্‌বৈদগ্ধ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেন; কেননা এটি ভাবপ্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। বরং এর দ্বারা বাণীর সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অবশ্য পূর্বসূরি অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ্‌গণ একে বাকবৈদগ্ধ্যের বহির্ভূত বলে মনে করেন। এজন্যই তারা একে সাহিত্যের বিষয়াদির মধ্যে বর্ণনা করেন, যার নির্দিষ্ট কোন আলোচ্য নেই। এটাই 'উমদা' নামক গ্রন্থে বর্ণিত ইবনে রশিকের মত এবং আন্দালুসের সাহিত্যিকগণও এ মত পোষণ করেন।

---

৪৬০. সফল কবির পরিচয়ের জন্য বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'আরবি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' দ্র:।

শাস্ত্রবিদ্‌গণ এ শিল্পকৌশল ব্যাবহারের জন্য শর্তাদি আরোপ করেছেন। তার মধ্যে উক্ত অলঙ্করণ প্রক্রিয়া কোন প্রকার আয়াস ও কষ্ট-কল্পনা ছাড়া সংঘটিত হবে। কারণ স্বতঃস্ফূর্ত হলে তাতে আপত্তির কিছু থাকে না। কারণ বক্তব্য অনুরূপ কষ্ট-কল্পনা থেকে মুক্ত হলে তাতে আতিশয্যের দোষ ঘটে না। কেননা এমন আতিশয্যও তার জন্য কষ্ট স্বীকার বাণীর বাক্‌বিন্যাসগত মৌলিক উদ্দেশ্য সম্পর্কেই উদাসীনতার সৃষ্টি করে। ফলে তা মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় এবং বাক্‌বৈদগ্ধ্যের পর্যায় থেকে সম্পূর্ণ নেমে যায়। তখন বাণীরূপের মধ্যে এ অলঙ্করণ সৌন্দর্য ছাড়া অন্য কিছু অবশিষ্ট থাকে না। বর্তমানকালে সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে এরই প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাক্‌বৈদগ্ধ্যের রসবোদ্ধা ব্যক্তিরা এসব বিষয়ে তাদের কষ্ট-কল্পনাকে বিদ্রূপ করে থাকেন এবং এছাড়া অন্য বিষয়ে তাদের অক্ষমতার নিদর্শন হিসেবেই একে গণ্য করেন।

এ প্রসঙ্গে আমাদের উস্তাদ আবুল বরকাত আল বালফিকী, যিনি বাক্‌রীতি সম্পর্কে বিচক্ষণ ও রসগ্রহিতায় পারদর্শী হিসেবে সুপরিচিত, তাঁকে বলতে শুনেছি, 'আমার মনের একান্ত বাসনা, যারা গদ্যে-পদ্যে অলঙ্কারশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রকরণ ব্যবহারে নিবিষ্টচিত্ত, তারা যদি চরম শাস্তির সম্মুখীন হত এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা হত যে, তারা যেন তাদের শিষ্যদেরকে এ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়, 'যাতে তারা এ শিল্প-কৌশল অনুসরণ করে কষ্ট-কল্পনার মাধ্যমে বাকবৈদগ্ধ্যের কথা ভুলে না যায়।'

শাস্ত্রবিদ্‌দের কাছে এ সম্পর্কীয় শর্তাদির মধ্যে অন্য একটি হল যথাসম্ভব স্বল্প পরিমাণ ব্যবহার। একটি দীর্ঘ কবিতার দুই বা তিনটি পঙ্‌ক্তিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এতেই তার কাব্যের সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাবে এবং তদতিরিক্ত আতিশয্য প্রদর্শন ত্রুটি মাত্র! ইবনে রশিক ও অন্যান্যদের এটাই মত। আমাদের উস্তাদ আবুল কাসেম শরীফ আস্‌সবতী, যিনি সমসাময়িককালে আন্দালুসের আরবি বাক্‌রীতির একজন দক্ষ বোদ্ধা ছিলেন, প্রায়ই বলতেন, "কোন কবি বা লেখকের এ অলঙ্কারশাস্ত্রাদির প্রতি আসক্তি জন্মালে, তার মধ্যে এদের ব্যবহারের আতিশয্য দেখা দিবেই। কারণ এর দ্বারা বাক্‌বিন্যাস পরিমার্জিত ও সৌন্দর্যবিশিষ্ট হয়। বস্তুত এ অলঙ্করণকে মুখমণ্ডলের তিলের সাথে তুলনা করা যায়; একটি বা দুটিই তার জন্য শোভা, বেশি হলে কদর্যতার পরিচায়ক।"

ইসলামী ও জাহেলী আমলের কাব্যের ধারা অনুসরণ করেই গদ্য রচনা আবর্তিত হয়েছে। প্রথম দিকে গদ্য খুবই প্রাঞ্জল ছিল; তার বাক্য ও বিন্যাসাদির মধ্যে একটা সুসামঞ্জস্য সমতুল্যতা এবং কোন প্রকার ছন্দোবদ্ধতা ও শৈল্পিক কৃত্রিমতা ব্যতিরেকেই পর্বাদির বিভাজনের একটা সমধর্মিতা বিদ্যমান ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে বনি বুয়ার লেখক ইব্রাহিম ইবনে হেলাল আস্‌সাবী আবির্ভূত হলেন এবং শিল্প-কৌশল ও অন্ত্যমিল, ব্যবহার করে তাতে চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করলেন। কিন্তু এরূপ গদ্যে সুলতানদের ভাষণাদি রচনা করায় তার কৃত্রিমতার জন্য মানুষ নিন্দা করতে লাগল। তাঁর এরূপ রচনার জন্য উৎসাহবোধের একমাত্র কারণ ছিল এই যে, সংশ্লিষ্ট রাজন্যবর্গ ছিলেন অনারব এবং বাক্‌বৈদগ্ধ্য সৃষ্টির জন্য মূল কারণ খেলাফতের প্রভাব থেকে দূরে অবস্থান করছিলেন। তারপর উত্তরসূরিদের গদ্য রচনায় এ শিল্প-কৌশলেরই বিস্তৃতি

ঘটল, প্রাঞ্জলতার যুগ সকলেই বিস্মৃত হল এবং প্রশাসনিক নির্দেশাদি ও ভ্রাতৃসুলভ যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য রইল না; আরবি রচনা সাধারণ স্তরে নেমে গেল। ভাল-মন্দ মিশে একাকার হয়ে উঠল।

পাঠক, এসবই আপনাকে এ নির্দেশই প্রদান করবে যে, আয়াসসাধ্য ও কষ্ট-কল্পিত অলঙ্কৃত বাণীতে বাক্‌বৈদগ্ধ্যের উপাদানের স্বল্পতা থাকায় তা কখনই স্বাভাবিক বাণীরূপের সমতুল্যতা অর্জন করতে পারে না। বস্তুত রসানুভূতিই এর একমাত্র বিচারক। 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জ্ঞাত ছিলে না।'[৪৬১]

৪৬১. কোরান; ২, ২৩৯।

ঊনষষ্টি পরিচ্ছেদ

[পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিরা কাব্যচর্চার ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন]

জেনে রাখুন, কাব্য ছিল আরবদের ঐতিহ্য ভাণ্ডার; তাতেই তাদের শাস্ত্র, ইতিহাস ও বিচক্ষণতা সংগৃহীত হত এবং আরবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এ কাব্যের জন্য প্রতিযোগিতার মনোভাব পোষণ করতেন। উকাজের মেলায় তারা এর জন্য উপস্থিত হতেন এবং প্রত্যেকেই তার উৎকৃষ্ট সম্পদ বিখ্যাত ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের সামনে পেশ করতেন। এমন কি আরবরা তাদের শ্রেষ্ঠ কাব্যসম্পদ তাদের হজ্জব্রত পালনের স্থান, তাদের পিতৃপুরুষ হযরত ইব্রাহিমের উপাসনাগৃহ পবিত্র কাবার স্তম্ভাদিতে ঝুলিয়ে দেওয়ার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতায় নামত। যেমন—ইমরুল কায়েস ইবনে হুজুর, নাবিগাতু যুবিয়ানী, যুহাইর ইবনে আবু সলমা, আন্তারা ইবনে শাদ্দাদ, তরফা ইবনে আবদ, আলকামা ইবনে আবদা, আল আশা এবং 'ঝুলন্ত সপ্ত কবিতা'র অন্যান্য কবিরা করেছেন। বস্তুত এভাবে কবিতা ঝুলিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি তাদের পক্ষেই সম্ভব হত, যারা গোত্র, গোত্রপ্রীতি ও মুজার জনসমাজে প্রয়োজনীয় প্রভাবসহ কাব্য সম্পদের অধিকারী ছিল। এ কারণেই এসব কবিতার নাম 'ঝুলন্ত কবিতা' হয়ে দাঁড়ায়।[৪৬২]

অতঃপর ইসলামের প্রথমদিকে আরবরা এমন প্রতিযোগিতা থেকে দূরে সরে দাঁড়ায়। কারণ তখন তারা ধর্মীয় ব্যাপার, নবুয়ত ও ওহী নিয়ে ব্যস্ত এবং কোরানের বাক্‌বিন্যাস ও বাক্‌রীতিও তাদেরকে তখন অভিভূত করে রেখেছে। ফলে তারা কিছুকাল নির্বাক বিস্ময়ে তা অবলোকন করেছে এবং তাদের গদ্য-পদ্য সম্পর্কীয় অনুসন্ধিৎসা থেকে বিরত রয়েছে। কিন্তু এরপর তাদের এমন অবস্থা দীর্ঘায়িত হলে জাতি উক্ত বিস্ময়ের সাথে সুপরিচিত হয়ে নবীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। কাব্যের নিষেধাজ্ঞা ও তার বিরোধিতা করে কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি। হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং কবিতা শুনে তার প্রতিদান দিয়েছেন।[৪৬৩] ফলে আরব আবার তাদের কাব্যচর্চায় ফিরে এসেছে। এ সময়ে কোরায়শ গোত্রের নেতৃস্থানীয় উমর ইবনে আবু রবিয়া কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে উন্নত মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় তার কবিতা ইবনে আব্বাসকে শোনাতেন এবং তিনিও তা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করতেন।

এরপর বিখ্যাত রাজন্যবর্গ ও বিরাট সাম্রাজ্য এসে উপস্থিত হল। আরবরাও তাঁদের প্রশংসা কীর্তন করে তাদের কাব্য নিয়ে দরবারে উপস্থিত হতে লাগল। সম্রাটরাও

---

৪৬২. টীকা নং ৪৬০-এর অনুরূপ।

৪৬৩. কবি কাব ইবনে যুহায়ের-এর ঘটনা এর প্রমাণ বহন করে।

কবিদের কাব্যের উৎকর্ষ অনুসারে তাদের গোত্রগত মর্যাদা বিচার করে পারিতোষিক দিতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা এমন কাব্য উপঢৌকনের জন্য লালায়িত থাকতেন এবং এর মাধ্যমে তাঁরা ঐতিহ্য, ইতিহাস, ভাষা ও বাক্‌রীতির গৌরব অনুসন্ধান করতেন। আরবরাও তাদের সন্তান-সন্ততিকে এসব কাব্য কণ্ঠস্থ করতে উৎসাহ দিত। উমাইয়া সাম্রাজ্য ও আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রথম পর্যায়ে এ পরিস্থিতিই বিরাজমান ছিল পাঠক, এ প্রসঙ্গে আপনি সম্রাট হারুনুর রশীদ ও আসমাই-র মধ্যে কবি ও কাব্য সম্পর্কীয় কথোপকথনের যে উদ্ধৃতি 'ইকদ' গ্রন্থ প্রণেতা তার গ্রন্থে তুলে ধরেছেন, তার প্রতি লক্ষ করুন।[৪৬৪] দেখবেন এ বিষয়ে রশীদের জ্ঞানের গভীরতা কত বেশি এবং কাব্যচর্চায় তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহের পরিধি কত ব্যাপক! এ সঙ্গে তিনি বাণীরূপের উৎকর্ষ বিচারে এবং তাদের কণ্ঠস্থ করার প্রাচুর্যে কী পরিমাণ দক্ষতা রাখতেন!

তাঁদের পরে এমন একদল লোক এল, যাদের ভাষা আরবি ছিল না এবং তাদের অনারবত্বের জন্যই তারা আরবি বাক্‌রীতিতে ত্রুটি বহন করত। তারা শিল্পের প্রয়োজনেই এ ভাষা শিক্ষা করত এবং এর দ্বারা কাব্য রচনা করে এমন ব্যক্তিদের প্রশংসা করত, যারা মূলতই অনারব; অন্তত আরবি ভাষার সাথে যাদের গভীর কোন পরিচয় নেই। কবিরাও তাদের কাছে একমাত্র পারিতোষিক ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাশা করত না। যেমন হাবিব, আল বুহতরী, আল মুতানব্বী, ইবনে হানী এবং তার পরবর্তী অন্যান্য কবিরা করে এসেছেন। সুতরাং এর ফলে কাব্যরচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল অলীক স্তুতিবাদ ও সাহায্য প্রার্থনা এবং আমাদের পূর্ব বর্ণনা অনুসারে পূর্বসূরিদের মধ্যে এ কাব্যচর্চায় যে উপকারিতা ছিল, তা বিলুপ্ত হল। এ কারণেই পরবর্তীকালের পদমর্যাদার অধিকারী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা কাব্যচর্চাকে ঘৃণার চোখে দেখতে লাগলেন। অবস্থার এমন পরিবর্তন ঘটল যে, কাব্যচর্চা নেতৃত্বের জন্য ত্রুটি এবং বিরাট পদমর্যাদার জন্য নিন্দনীয় বিষয় বলে গণ্য হতে লাগল। 'আল্লাহ দিনরাত্রির পরিবর্তন করে থাকেন।'[৪৬৫]

---

৪৬৪. ভূমিকা দ্র:।

৪৬৫. কোরান; ২৪, ৪৪।

ষষ্টি পরিচ্ছেদ

[বর্তমানকালের নাগরিক ও বেদুইন আরবি কাব্য]

জেনে রাখুন, কবিতা শুধু আরবি ভাষাতেই বিশিষ্ট নয়; বরং আরবি অনারব সব ভাষাতেই তার অস্তিত্ব বিদ্যমান। পারস্য ভাষায় যেমন কবিরা কাব্য রচনা করেছেন, তেমনি গ্রিক ভাষাতেও। এরিস্টটল তাঁর যুক্তিবিদ্যার গ্রন্থে গ্রিক কবিদের মধ্যে হোমারের কথা উল্লেখ করে তার প্রশংসা করেছেন। হিমিয়ারদের মধ্যেও প্রাচীন কবিরা ছিলেন।

অতঃপর যখন মুজারী বাক্‌রীতি ও তাদের ভাষায় বিকৃতি দেখা দিল এবং তার বিশুদ্ধতা সংরক্ষণের জন্য অনুমানসিদ্ধ ধারা ও কারক-চিহ্নাদির নিয়ম সংকলন করা হল, তখন উক্ত ভাষা অনারব বাক্‌রীতির সাথে মিশ্রণের তারতম্যানুসারে বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করল। এর ফলে আরব গোত্রগুলোর মধ্যে এমন একটি বিশিষ্ট ভাষারূপ জন্ম নিল, যা কারক-চিহ্নাদির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে এবং শাব্দিক তাৎপর্য ও শব্দ গঠনে আংশিকভাবে পূর্সসূরি মুজারী ভাষা থেকে পৃথক। অনুরূপভাবে শহরবাসী নাগরিকদের মধ্যেও এমন একটি ভাষার উদ্ভব ঘটল, যা কারক-চিহ্নাদি, অধিকাংশ প্রচলন ও পদ প্রকরণে মুজারী ভাষারূপ থেকে স্বতন্ত্র এবং বর্তমানকালের আরব গোত্রগুলোর ভাষার সাথেও এর মিল নেই। বস্তুত এ ভাষারূপ বিভিন্ন স্থানের প্রচলনের ধারা অনুসরণ করে বিচিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং পূর্বাঞ্চলের সাধারণ ও নাগরিক রূপের কোন সামঞ্জস্য নেই এবং এ উভয় রূপের সাথে আন্দালুসবাদীদের সাধারণ নাগরিক রূপে বিভিন্নতা বিদ্যমান।

অতঃপর যেহেতু কাব্য স্বভাবতই প্রত্যেক বাক্‌রীতিতে বিদ্যমান এবং যেহেতু হসন্ত ও স্বরান্ত শব্দাবলির সংখ্যা অনুপাতে ও তার বিপরীত ধারায় মাত্রাজ্ঞানের সমতা মানুষের প্রবৃত্তিতে উপস্থিত, সেজন্য একটি বিশেষ ভাষারূপ অর্থাৎ মুজারী ভাষার অনুপস্থিতিতে তার অস্তিত্ব বিনষ্ট হতে পারে না; যদিও জগৎবাসী সকলেই অবগত যে, এ মুজারী বাক্‌রীতির অধিকারীরাই কাব্য রচনায় দক্ষ ও উক্ত বিষয়ে দিক্‌পাল ছিলেন। বরং অনারবত্বের প্রভাবাধীন প্রতিটি আরব গোত্র ও শহরবাসী নাগরিক জনসমাজ তাদের বাক্‌বিন্যাসের ধারা অনুসারে কাব্যচর্চা ও তার যথাযথ উপস্থাপনে মনোনিবেশ করেছে। এক্ষেত্রে আরব বেদুইন এ গোত্রবাসীরা, যারা তাদের পূর্বসূরি মুজার গোত্রের ভাষারীতি থেকে অনারব পরিবেশে স্খলিত হয়ে পড়েছে, তারা এই বর্তমানকালেও তাদের পূর্বসূরি বিশুদ্ধ আরবদের ন্যায় কাব্যকে তার সর্বপ্রকার ছন্দে রূপ দিতে চেষ্টা করছে। তারা কবিতার সব ধারা ও উদ্দেশ্য, তথা—প্রেমানুভূতি, স্তুতি, শোক ও নিন্দার উপস্থাপনার মাধ্যমে তাকে দীর্ঘায়িত করতে উদ্যোগী এবং তার পরিসরের মধ্যে বিষয়

থেকে বিষয়ান্তরে গমনের জন্য উদ্‌গ্রীব। অনেক সময় তারা বক্তব্যের প্রথম দিকেই তাদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে তৎপর হয়ে ওঠে। তাদের অধিকাংশ দীর্ঘ কবিতার আরম্ভ কবির নামোচ্চারণের মাধ্যমে ঘটে। এর পর তারা প্রিয়তমার স্মৃতিচারণে আত্মনিয়োগ করে।

মাগরিবের শহরবাসী আরবরা এ জাতীয় দীর্ঘ কবিতা (কসিদা)-কে 'আসমাই কাব্য' বলে অভিহিত করেন। আরবি কাব্যের বর্ণনাকারী বিখ্যাত 'আসমাই'র প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করেই এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। পূর্বাঞ্চলবাসী আরবরা এরূপ কবিতাকে 'বদবী' (বেদুইন), 'হাওরানী' ও 'কায়সী' বলে ডাকেন। অনেক সময় তারা এতে একটি সরল সুরও সংযোজন করেন। অবশ্য এ সুর সঙ্গীতের কলাকৌশলের অনুরূপ নয়। তারপর তারা উপরিউক্ত সুরের মাধ্যমে সঙ্গীতের ন্যায় কবিতা আবৃত্তি করেন এবং এরূপ সঙ্গীতকেও 'হাওরানী' বলে ডাকা হয়,। বস্তুত ইরাক ও সিরিয়ার প্রান্তবর্তী একটি অঞ্চলের নাম এ 'হাওরান' এবং বর্তমানকাল পর্যন্ত তা আরব-বেদুইনদের অবতরণস্থল ও আবাসভূমি হিসেবে বিশিষ্ট হয়ে রয়েছে।

তাদের মধ্যে আরও একটি বিষয়ের খুবই প্রচলন রয়েছে; তারা কাব্য রচনায় চারটি পঙ্‌ক্তির ব্যবহার করেন। তাদের শেষেরটি অন্ত্যমিলের দিক থেকে প্রথম তিনটি থেকে ভিন্ন হয় এবং অন্ত্যমিলের প্রতি চতুর্থ পঙ্‌ক্তির মধ্যে ঐক্য স্থাপনকে অবশ্য পালনীয় বলে বিবেচনা করা হয়। এভাবে দীর্ঘ কবিতার শেষ পর্যন্ত এ ধারা অনুসৃত হয়ে থাকে। এটি পরবর্তীকালের আরব-অনারবের মিশ্রণজাত কবিদের উদ্ভাবিত চার পঙ্‌ক্তি ও পাঁচ পঙ্‌ক্তির কাব্য রচনার সাথে তুলনীয়। এসব আরব গোত্র অনুরূপ কাব্য রচনায় বাক্‌বৈদগ্ধ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে থাকে। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে দক্ষ ও পরবর্তীকালীন অদক্ষ সব শ্রেণীর কবিই বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমানকালে জ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত বহু লোক, বিশেষ করে ভাষাবিদ্‌রা তাদের এমন বিষয়াদিকে শোনা মাত্রই অস্বীকার করে বসেন এবং সব কবিতা আবৃত্তিকালে তারা একে কবিতা বলে মানতে চায় না। তাদের ধারণা এই যে, এসব কবিতায় ভাষার বিশুদ্ধতা ও কারক-চিহ্ন না থাকায় রসানুভূতির যথার্থ উপাদানের অভাব ঘটেছে। বস্তুত তাদের এমন ধারণা, একমাত্র ঐসব গোত্রের ভাষার যোগ্যতা সম্পর্কে অনবগতিরই ফল। যদি তাদের মধ্যে এ বেদুইন ভাষার যোগ্যতা থাকত, তাহলে তাদের প্রবৃত্তি ও আস্বাদশক্তি অবশ্যই উক্ত ভাষার বাক্‌বৈদগ্ধ্যের সাক্ষ্য দিত! কিন্তু এসত্ত্বেও যদি তাদের রসানুভূতি তার গঠন প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বাধা বিপত্তি মুক্ত না হয়, তাহলে স্বতন্ত্র ব্যাপার। তবেই এ কথা সত্য যে, বাক্‌বৈদগ্ধ্য সৃষ্টিতে কারক-চিহ্নাদির কোন ভূমিকা নেই। বস্তুত বাক্‌বৈদগ্ধ্য বলতে মনোভাব ও তদন্তর্গত প্রসঙ্গের চাহিদার সাথে বক্তব্যের সামঞ্জস্য বিধানকে বোঝায়। এক্ষেত্রে 'উকার' কর্তাকে ও 'আকার' কর্মকে নির্দেশ করুক কিংবা এর বিপরীত কিছু হোক, তাতে কিছুই যায় আসে না। কারণ বক্তব্যের নিদর্শনাদিই তার জন্য যথেষ্ট; যেমন এ গোত্রগুলোর ভাষায় বিদ্যমান। কেননা যে-কোন ভাষাভাষীর কাছে প্রচলিত ধারাই তাদের বক্তব্য নির্দেশ করে। সুতরাং অনুরূপ ভাষাগত যোগ্যতা যদি সুপ্রচলিত ও সুপরিচিত হয়, তাহলেই তার নির্দেশ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ

থাকে না এবং এরূপ বাক্ নির্দেশ যদি মনোভাব ও প্রসঙ্গের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে বাক্‌বৈদগ্ধ্যেও কোন প্রকার ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। এক্ষেত্রে ব্যাকরণবিদ্‌দের নিয়মকানুন খুব একটা লক্ষণীয় ব্যাপার নয়। বস্তুত এসব গোত্রের কাব্য রচনায় কাব্যের রীতি ও বিষয় উভয়ই বিদ্যমান; কেবলমাত্র তাদের শব্দাবলির শেষের কারক-চিহ্নাদিরই অভাব রয়েছে। কারণ তাদের অধিকাংশ শব্দই হসন্তযুক্ত। এজন্যই তাদের বক্তব্যের নিদর্শন থেকেই কর্তা ও কর্ম এবং উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে; কারক-চিহ্নাদির প্রয়োজন হয় না।

তাদের কাব্যের অনুরূপ উদাহরণের মধ্যে আশ্ শরীফ ইবনে হাশেমের বাচনিক যে কবিতাটি বিদ্যমান, তা নিম্নরূপ। এতে কবি আল জযিয়া বিনতে সিরহানের জন্য অশ্রুপাত করে তার গোত্রের সাথে তার মাগরিব অঞ্চলে প্রস্থানের কথা বর্ণনা করছেন।[৪৬৬]

যুদ্ধজয়ী বীর শরীফ ইবনে হাশেম বলছে—যেহেতু
তার উৎপীড়িত হৃদয় তার বেদনার আর্তনাদকারী।
সে দ্রুত সেই কথাই বলতে চায়, কীভাবে তার অন্তর
একটি তরুণ বেদুইনকে কেন্দ্র করে ব্যথা-বেদনায় মুহ্যমান।
সে বলছে, কীভাবে তার অন্তরাত্মা বিদায় বেলার ভোরে
আর্তনাদ করেছিল! আল্লাহ্ তার সংবাদবাহককে ধ্বংস করুন!
যেন মনে হয়, তার হৃদয়কে কেউ তীক্ষ্ণ ভারতীয় ছুরিকার দ্বারা
দ্বিখণ্ডিত করেছি এবং স্মৃতিশক্তিকে বিলুপ্ত করতে চেয়েছে।
যেন ধৌতকারীর হাতে পতিত ভেড়ার করুণ আর্তনাদ
যে তার বন্ধন রজ্জুকে মৃত্যুফাঁসরূপে দৃঢ় সংবদ্ধ করেছে।
যেন তাকে দুইভাঁজ করেছে যে, মাথা ও লেজের অংশ
একত্রে কণ্টকবিদ্ধ এবং অবশিষ্টাংশ নির্মমতায় আকর্ষিত।
দুই চক্ষের অশ্রুধারা বিগলিত, যেন তাদের অবস্থা
জলতোলা চক্রের অবিরল ঘূর্ণায়মানতার সাথে তুলনীয়।
উহা তারকার ন্যায় উজ্জ্বল ফোটায় অনবরত বর্ধনশীল;
যেন আকাশের মেঘমালা থেকে পতিত বৃষ্টির ধারা।
তা 'সাফার নিম্নবর্তী সমতলে ঝর্ণাধারায় প্রবাহিত
এবং দ্রুততায় তা বিদ্যুচ্চমককেও হার মানাচ্ছে।
আমর এ গীত, যা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ডেকে আনবে,
বাগদাদের সব মানুষ, এমন কি নিঃস্বকেও উত্তেজিত করছে।
যাত্রার জন্য আহ্বানকারী উচ্চ কণ্ঠে বলল, প্রস্তুত হও;
মহাজনরা খাতকের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল।
হে দিয়েব ইবনে গানেম! কাফেলার গতিরুদ্ধ কর;
তার নেতা মাযী ইবনে মুকার্রিবের শক্তিকে প্রতিহত কর।
হাসান ইবনে সিরহান তাদেরকে বলল, পশ্চিমে যাও;
পশুপালকে তাড়না কর, আমি তাদের পশ্চাদ্‌রক্ষী;
তারা যাত্রা করল ও তার হাতে অবনমিত বর্শার ফলা

৪৬৬. এ কবিতাটির অনুবাদ করতে গিয়ে আমরা সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্ত হতে পারিনি। কারণ এতে অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা বিদ্যমান।

এবং আল্লাহ্‌র কসম, তারা আক্রমণ করতে সাহস পেল না।
আবেসের যিয়ান—দানশীল আমাকে ত্যাগ করেছে;
সে কখনও হিমিয়ারের জাঁকজমক ও নেতৃত্বে সন্তুষ্ট ছিল না।
সে আমাকে ছেড়েছে, যাকে বন্ধু ও সাথী বলে ভাবতাম
এবং আমার কাছে এমন কোন ঢাল নেই, যা চতুর্দিকে ঘুরাতে পারি।
বেলাল ইবনে হাশেম ফিরে এসে তাদেরকে বলল,
আঞ্চলিক উষ্ণতায় যদি পিপাসার্ত হও শুভ হবে না।
বাগদাদের দ্বার ও তার ভূমিতে প্রবেশ আমার জন্য নিষিদ্ধ;
আমার বাহন তাতে প্রবেশ ও প্রত্যাবর্তনে একান্তই বিমুখ!
ইবনে হাশেমের অঞ্চল থেকে আমার অন্তরাত্মা বিবাগী;
তার রৌদ্র তাপ; নয়তো তার দুঃসহ তাপে মৃত্যু নিকটবর্তী।
অনবরত কুমারী অগ্নি তাতে স্ফুলিঙ্গ বর্ষণকারিণী;
আশ্রয় তাতে জুরজানে শৃঙ্খলাবদ্ধ কয়েদীর ন্যায়।

তাদের অনুরূপ কাব্যের আরও একটি উদাহরণ জানাতী আমীর আবু সুদা আল ইয়াকরিনীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত শোকগাথা। আফ্রিকিয়া ও যাব অঞ্চলে এ আমীর যথেষ্ট দুর্যোগ বহন করে এনেছিল। এ কারণেই তার জন্য শোকের ভাণ করা হয়েছে।

গোত্রের যুবতীগণ বলছে, হায়, সুদা! এবং হাওদাবাহী
উটের কাফেলা সম্মত অবস্থায় তাদের আর্তনাদকে ব্যক্ত করছে।
হে জানাতী খলিফার কবর সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপনকারী!
আমার কাছ থেকে তার বিবরণ গ্রহণ কর; বোকামি করিও না।
তুমি তাকে 'রান' নদীর উচ্চভূমিতে দেখতে পাবে, সেখানে
একটি খ্রিস্টান গীর্জা অবস্থিত এবং তার গঠনসৌকর্য সমুন্নত।
আমি তাকে দেখেছি, যেখানে নিম্নভূমি বালুর পাহাড়ে পর্যবসিত
এবং তার পূর্বদিকে নদী এবং নলবন তার চিহ্ন নির্দেশক।
আহা, আমার অন্তর সেই জানাতী খলিফার জন্য কীভাবে মুহ্যমান;
তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশধারার এক সম্ভ্রান্ত সুসন্তান!
তিনি বীরবর দিয়েব ইবনে গোনেমের দ্বারা নিহত হয়েছেন
এবং তার আহত স্থানগুলো থেকে উন্মুক্ত মশকের ন্যায় রক্ত ঝরেছে।
ওহে জায়েযা! সেই জানাতী খলিফা এখন মৃত্যুর কবলে পতিত;
তুমি যাত্রা করিও না, যতক্ষণ না যাত্রার সময় এসে উপস্থিত হয়।
হায় দুর্ভাগ্য! আমরা তোমাকে ত্রিশ বার বিদায় করেছি
এবং একই দিনে ষোল বার; কী অকিঞ্চিৎকর এ বিদায়!

আরও একটি উদাহরণ শরীফ ইবনে হাশেমের বাচনিক নিম্নরূপ। এতে কবি ও মাযী ইবনে মুকার্রিবের মধ্যকার একটি কোন্দলের বিবরণ বিদ্যমান।

পরাক্রমশালী মাযী আমাকে বলতে আরম্ভ করল,
হে শোকর! আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারিনি।
হে শোকর! আবার দেখ, আমাদের মধ্যে সম্প্রতি অবশিষ্ট নেই;[৪৬৭]

৪৬৭. এখানে রোজেনথালের অনুবাদে নিম্নরূপ:
'হে শোকর! নজদে ফিরে এস এবং ভর্ৎসনা করিও না।
যে ব্যক্তি নিজের ভূমি আবাদ করে, সেই বেঁচে থাকে।'—দুটি পংক্তি বিদ্যমান।

তোমাকে সেই আরব গোত্রের সাথে দেখছি, যারা পরিচ্ছদধারী।
আমরা আমাদের নির্দিষ্ট ভাগ্যের সম্মুখীন হতে যাচ্ছি;
যেমন রন্ধনপাত্রের খাদ্য আলোড়নের সম্মুখীন হয়।
হে শোকর! ইয়াজিদকে তার ভর্ৎসনা আবার ফিরিয়ে দাও,
যাতে উত্তপ্ত হয় এবং এলাকার জীবন পুনরায় ফিরে আসে।
যদি তোমাদের ভূমিতে কণ্টকগুল্ম অত্যধিক উদ্গত হয়;
তাহলে আমরা, আরবরা বেশি উর্বর ভূমি কোথায় পাব!

আরও একটি কবিতায় তাদের মাগরিবে আগম ও জানাতীদের উপর তাদের আধিপত্যের কথা বর্ণিত হয়েছে।

শরীফ ইবনে হাশেমের সাথে আমি কী সুজনকেই না হারিয়েছি।
আমার পূর্বে আর কোন ব্যক্তি কি অনুরূপ কোন সুজন হারিয়েছে?
সে এবং আমি আমাদের গৃহস্থিত গৌরবের মধ্যে অবস্থিত ছিলাম;
কোন্দলে সে আমাকে এমনভাবে হারিয়েছে, যার কথা ভুলতে পারিনি।
তা এমনভাবে এসেছে; যেন আমি পান করেছি সেই মাদকতা,
যা তীব্র মদে বিদ্যমান এবং কোন পানকারীই অভিভূত না হয়ে পারে না।
অথবা আমার তুলনা সেই বৃদ্ধার ন্যায়, যে অন্তর্জালায় মৃত্যু কবলিত,
বিদেশে বিপাকে—তার গোত্র থেকে নির্দয়ভাবে বিতাড়িত;
তার সামনে দুঃসময় স্বয়ং মূর্তিমান, তাকে গ্রাস করতে উদ্যত,
সে এমন বেদুইন গোত্রে অবস্থানরত, যারা অতিথির প্রতি উদাসীন।
এমনিভাবে আমিও আমার উপর আপাতত ভর্ৎসনার অন্তর্দাহে
এমন এক হৃদয়ের করুণ আর্তনাদ তুলে ধরতেছি, যে মর্মান্তিক ভারাক্রান্ত।
আমি আমার গোত্রকে যা করতে আদেশ দিয়েছি প্রাতঃকালে;
তারা দৃঢ়বদ্ধ এবং সকলেই আসবাবপত্রের বোঝা বেঁধে ফেলেছে।
আমরা আমাদের বিপাকের মধ্যে সাত দিন আবদ্ধ অবস্থায় নিস্পন্দ
এবং বেদুইনরাও তাদের তাঁবুর খুঁটিগুলো পুঁততে অবসর পায়নি।
আমরা অনবরত পাহাড়ি ঘাঁটির পরস্পরমুখী অবস্থানে নিরত
এবং আমাদের উপরে অবিরত তীর ও বর্শার বৃষ্টিপাত হচ্ছিল।[৪৬৮]

রিয়াহ-এর একটি শাখাগোত্রের নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম 'যাওয়াবিদা'র সুলতান ইবনে মুজাফর ইবনে এহিয়ার কবিতার উদাহরণ। ইনি আফ্রিকিয়ার আল মোহেদ রাজন্যবর্গের প্রথম আমীর আবু যাকারিয়া ইবনে আবু হেফসের শাসন আমলে মেহেদিয়ার কারাগারে বন্দী থাকাকালে এ কবিতা রচনা করেন।

কবি বলছে, যখন ভোরের আলোকরশ্মি তার ক্লান্তি দূর করে দিয়েছে;
আমার চোখের পাতার পরে তন্দ্রার ছায়াপাত নিষিদ্ধ হয়েছে।
হায়, এ ব্যথা-বেদনায় নিপীড়িত হৃদয়ের সাহায্যকারী কোথায়!
আর এ প্রণয়পাগল আত্মার এ পুরাতন ব্যাধিই-বা দূর করবে কে!
সে ভালবাসে এক হেজাজী, আরবি, বেদুইন কুমারীকে;
একান্ত কোমল প্রাণী, অথচ সে কখনও ধরা দেয় না।
হায়, সে প্রান্তরের জন্য উদ্‌গ্রীব, কখনও গ্রামের অভিমুখিনী নয়;

৪৬৮. এ ছত্রটি রোজেনথালের অনুবাদে নেই।

তার দৃষ্টি সেই বালুময় মরুতে, যেখানে তাঁবুই আবাসস্থল।
বৃষ্টিমুখর দিন ও প্রতিটি শীতজর্জর কাল সে সেখানে সাগ্রহে কাটায়;
সে তাতেই সমর্পিতা এবং এ মরু জীবনেই তার প্রীতি ন্যাস্ত।
বৃষ্টির ফলে সবুজ তৃণভূমির প্রাচুর্যের মধ্যে তার বিচরণস্থল;
উন্মুক্ত প্রান্তরের আলস্য মন্থরতায় তার দেহের শ্রী বৃদ্ধি।[৪৬৯]
সেখানে যতদূর দেখা যায় চক্ষুকে তৃপ্তিদানকারী বিষয়ের সমারোহ;
কারণ সেই ভূমির উপর প্রবহমান মেঘমালা প্রচুর বৃষ্টিপাত করেছে।
আহা কতই না সে অশ্রুত প্রবাহ আর কীভাবেই না আসে তার বুকে
ধাবমান ঝর্ণার কাকলি— তারা একে অন্যের পরিপূর্ণতা দানকারী।
সেই প্রান্তর যেন সজ্জায় সুশোভিতা নব পরিণীতা সুকুমারী;
তার উপরে শোভা পাচ্ছে প্রস্ফুটিত লতাগুল্মের এক বেষ্টনী।
উহা এটি প্রান্তর, সমতল, ব্যাপক, বিস্তৃত, দূরাধিগম্য;
এমন এক চারণভূমি, যেখানে পশুপালের সাথে উটপাখি বিচরণ করে।
সেই প্রান্তরে উটনীর দুধই একমাত্র পানীয়, যা অপরাহ্ণে দুহিত হয়
এবং ভেড়ার মাংসই তার সারাক্ষণের একমাত্র খাদ্য বস্তু।
তাতে দ্বারদেশের কোন প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই সেই রণাঙ্গনের,
যার ভয়াবহতা যুবকের চুলের বর্ণও ধূসর করে তোলে।
আল্লাহ্ এ বৃক্ষাদিশোভিত প্রান্তরকে বৃষ্টির জলে ধৌত করুন,
অনবরত; যাতে তার অন্তর্গত প্রাচীন অস্থিগুলো সজীব হয়ে ওঠে।
এসব কিছুর সমতুল্য আমার ভালবাসাই তার জন্যে যথেষ্ট; হায়,
আমি যদি এ বালুকা প্রান্তরে অতিবাহিত দিনগুলো উদ্ধার করতে পারতাম।
আর সেই রাতগুলো, যখন যৌবনের ধনুর্বাণ আমার করায়ত্ত ছিল;
যখন আমি শর যোজনা করতাম, তার একটিও ব্যর্থ হত না।
আমার অশ্বতরী সর্বদা আমার জিনপোষের নিচে কম্পমান;
আহা সেই যৌবনরূপী জিনপোষ, তার লাগাম ছিল আমার হাতে।
কত না তন্বী তরুণী আমাকে জাগ্রত রেখেছে এবং আমি
মুগ্ধ বিস্ময়ে পৃথিবীর সেরা লাস্যদীপ্তি অবলোকন করেছি।
কত না অন্যতর পীনোন্নত কোমল দেহবল্লরী রমণী,
তাদের আয়ত চোখের ভুরু কৃষ্ণ এবং উল্কির চিহ্ন উজ্জ্বল।
আমার আবেগ তাদের উপর অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করেছে;
এত ঘনিষ্ঠ যে, তারা সেই মিলনকে ভুলতে পারেনি।
সেই আবেগের আগুন অনবরত বুকের মধ্যে জ্বলছে;
এমনভাবে জ্বলছে যে, পানিতে তার তীব্রতা হ্রাস সম্ভব নয়।
হায়, কে তুমি আমাকে মুক্তি দিবার প্রতিশ্রুতি দান করেছিলে;
অথচ এমন এক গৃহে আমার জীবন বিনষ্ট হচ্ছে, যার অন্ধকার আমাকে
অন্ধ করেছে।
আমিও দেখেছি, সূর্যও সামান্য সময়ের জন্য গ্রহণের অধীন হয়;
মেঘমালাও তাকে আবৃত করে, আবার সরে যায়;
সৌভাগ্যের পতাকা ও নিশান আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে
আল্লাহ্র অনুগ্রহে এবং তা বায়ুতে আন্দোলিত হয়ে আসছে।
আমিও দেখছি যুদ্ধের জন্য ব্যাগ্র বীর যোদ্ধাদের দেহাবয়ব;

৪৬৯. এ ছত্রটি রোজেনথালের অনুবাদে নেই।

আমার বর্শা আমার স্কন্ধে স্থাপিত এবং আমি তাদের অগ্রগামী।
'শামিসে'র উপরিভাগে 'এতাকুননৌকে'র সমতল বালুকাভূমি;
আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে আমি তার পাহাড়ী অঞ্চলকে সর্বাপেক্ষা ভাহবাসী।
সেই বালুকার প্রান্তে 'জাফরিয়া'য় আমাদের ঘাঁটি থাকবে
এবং সেখানে যতদিন আমার অন্তর চাইবে, আমি অবস্থান করব।
সেখানে আমরা উদার হৃদয় হেলাল ইবনে আমেরের সাক্ষাৎ পাব।
এবং তার শুভেচ্ছা আমার অন্তরের সব দুঃখ ব্যথা দূর করবে।
পূর্ব পশ্চিমে তাদের বীরত্বের দৃষ্টান্তই সকলে ব্যবহার করে থাকে।
এবং তারা কোন জাতিকে আক্রমণ করলে তার পরাজয় ত্বরান্বিত হয়।
তাদের উপর এবং তাদের আশ্রয়ে লালিত সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক
দীর্ঘকাল ধরে—যতদিন 'খানা'র কবুতরগুলো কূজন করে ফিরবে।
অতএত এটি থাকুক এবং যা গিয়েছে তার জন্য দুঃখবোধ করারও
প্রয়োজন নেই;
কারণ এ পৃথিবীতে এমন কে আছে, যার স্থায়িত্ব অবধারিত হয়েছে।

পরবর্তী কবিদের কাব্যের উদাহরণ। তাদের মধ্যে খালেদ ইবনে হামজা ইবনে উমরের কবিতা। ইনি 'কাব' গোত্রের নেতা ও আবু লায়লের বংশধর। মুহাল্লালের বংশধরের সাথে তাদের যুদ্ধের বিষয়ে ইনি সমালোচনা করছেন এবং প্রতিপক্ষের কবি শিবলি ইবনে সিকিয়ানা ইবনে মুহাল্লালের কাব্যের উত্তর দিচ্ছেন। এতে প্রতিপক্ষের তুলনায় স্বজাতির গৌরব প্রকাশ পেয়েছে।

কবি বলছে এবং সে এখন এক দুর্ভাগা, যে বিদগ্ধ সমালোচকের
গালাগালির দুর্গন্ধ উঁকছে ও তার তীব্রতার সম্মুখীন হচ্ছে।
পয়ঃ প্রণালী প্রবাহিত হলে যে দুর্গন্ধ বের হয়, ঠিক সেরূপ;
অথচ এর জন্যই অতি উত্তম অস্ত্রাদি ও বিবরাদি নির্বাচিত হয়েছে।
বিস্ময়কর, সুনির্বাচিত সব আবৃত্তির উপকরণ, যাতে
হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ প্রজ্বলনের অভিমুখী হয়ে উঠেছে।
যে-কোন সমালোচকের জন্য তার স্তবকগুলো ছেঁকে তোলা
এবং তার পন্থা ও আমার পন্থা বিদগ্ধের কাছে অত্যন্ত দৃঢ়সংবদ্ধ।
আমার এসবের স্মৃতিচারণ, হে শ্রোতৃমণ্ডলী, একটি প্রত্যাঘাত
শিবলির সমস্ত আঘাতের এবং এটাই তার জন্য উত্তর।
হে শিবলী! গর্ভিনী কোন উষ্ট্রীর অভ্যন্তরস্থ ভ্রূণ,
বেদনা লাঘবকারীদের ফুৎকারে যে বের হয়ে এসেছে।
তুমি অহঙ্কার কর, এতে তোমার ত্রুটি নেই; অথচ তুমি নিঃস্বত্ব নও।
যদি সাধারণের তুমি এমন কথা বলেছ, যা তাদেরকে ক্ষুব্ধ করেছে।
মতিন ইবনে হামজার মাতার ব্যাপারে তোমার ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি;
যে ব্যক্তি তাদের সম্ভ্রমের রক্ষক এবং তাদের সমৃদ্ধির সংগঠক।
তুমি কি জান না, এ সেই ব্যক্তি, যে পুনর্গঠিত করেছে
বনি ইয়াহিয়ার বাসনপত্রের রাং ধাতু বিগলিত হবার পর।
বিদীর্ণকারী নেতৃত্বের সে এক, হে শিবলি, অগ্নিগোলক;
তুমি কি এমন ব্যক্তিকে দেখেছ, যে জাহান্নামের আগুনে শরীর তপ্ত করে।
সে অগ্নি নিভেও যায়, সে তাকে আবার উসকে তোলে;

প্রয়োজনে পুনরায় নিভায় বিপুল বিক্রমে আবার জ্বালাবার জন্য।
দুবার নির্বাপিত হবার পর তা পুনরায় দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে
এবং ফেজের মৃত্যুগৃহের দিকে তাতে অনুসরণ করে এসেছে।[৪৭০]
তার বীরত্বের দৃষ্টান্ত নেতৃবৃন্দের কাছে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে।
এবং তাদের গাত্রচর্ম বার্ধক্যের অনুরূপ ঝুলে পড়েছে।
সেই ত একমাত্র ব্যক্তি যার চাহিদা আছে; সেজন্যই সরে থাকে
বনি কাবের পুরুষরা, যারা তার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে আছে।

এ কবিতারই ভর্ৎসনার অন্য একটি অংশ;

হে বালক। তুমি কি দম্ভোক্তি করতে চাও, তাহলে আমি এতে অগ্রণী
কেননা আমার আছে স্তুতির মহাবান্ধন এবং তার ব্যাপক দৃঢ়তা।
হ্যাঁ, আমার সেই মর্যাদা, যা দিয়ে আমি প্রতিটি দলকে বিমুখ করি;
আর সেই তরবারী, যার আঘাত থেকে শত্রু সর্বদা পলায়ন করে।
পাত্রীরা যদি আমাদের কাছে সম্পদের প্রাচুর্য প্রার্থনা করে।
তাহলে আমরা বর্শার ফলকে তাদেরকে লুণ্ঠিত দ্রব্য এনে দেই।
তাদের যৌতুক হিসেবে তারপর আসে ক্ষীণকটি চপল অশ্ব
নীলাভ তার গাত্রবর্ণ এবং বিষাক্ত সাপের জিহ্বা অপেক্ষা দ্রুতগামী।
হে জ্ঞাতি ভ্রাতৃগণ! আমরা অপমানে কখনও সন্তুষ্ট নই; কেননা
আমাদের বাহনগুলো সর্বদাই বন্দীদেরকে বহন করে আনে।
সকলেই জানে যে, মৃত্যু অচিরেই তাদেরকে গ্রাস করবে এবং
সন্দেহ নেই, এ পৃথিবী অতিদ্রুত পরিবর্তনশীল।

অন্যত্র হাওদায় ভ্রমণকারীদের প্রশংসায়—

আমরা মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে গেলাম, শত্রুর ভয় আমাদের ছিল না;
এমন সীমাহীন প্রান্তর, যেখানে আশঙ্কা সর্বদাই বিরাজমান।
শিবলিকে বলে দাও যে, সেখানে চক্ষু পরিচিত দৃশ্যই অবলোকন করে;
বন্যগাভী তারই অনুরক্ত হয়ে ওঠে, যে তাকে আয়ত্তে রাখতে সক্ষম।
তুমি দেখতে পাবে তার অধিবাসীরা প্রাতঃকালেই তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে;
এমন প্রতিটি দুগ্ধবতীপূর্ণ হাওদা, যার দ্বার কখনও রুদ্ধ করা হয় না;
তাতে প্রতিদিন নিহত হয়, এমন লোকের চিহ্নাদি দেখতে পাওয়া যায়
এবং একান্ত উচ্ছৃঙ্খল কামুকের পক্ষেও তাদেরকে চুম্বন করা সম্ভব নয়।

তাদের কবিতায় বিচক্ষণ প্রবচনের দৃষ্টান্ত—

অসম্ভবের অনুসন্ধান তোমার জন্য নির্বুদ্ধিতার নামান্তর এবং
যে তোমাকে নিরাশ করে, তাকে নিরাশ করা একান্তই যথার্থ।
যদি দেখ কোন জাতি তোমার সামনে তাদের দ্বার বন্ধ করে দিয়েছে;
বাহনের পৃষ্ঠে আরোহণ কর, আল্লাহ্ তোমার জন্য অন্য দ্বার খুলে দিবেন।

শিবলির রচনার উদাহরণ; তাতে তিনি 'কাব' গোত্রকে 'বুরজম'-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন।

বুরজমের সন্তান-সন্ততি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের বিরুদ্ধে
সমস্ত পৃথিবী বিপ্লব-বিদ্রোহের অভিযোগ করে ফিরছে।

৪৭০. এ ছত্রটি রোজেনথালের অনুবাদে নেই।

নিম্নের কবিতাটি খালেদের রচনা। ইনি আল মোহেদ নেতা আবু মুহম্মদ ইবনে তাফরাজিনের সাথে তার গোত্রের সখ্যতার জন্য তাদেরকে ভর্ৎসনা করছেন। উক্ত নেতা তিউনিসে সুলতান আবু ইসহাক ইবনে সুলতান আবু ইয়াহিয়ার দ্বাররক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন এবং এ ঘটনা আমাদের নিকটবর্তী সময়েই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

উদার হৃদয় বীর যুবক খালেদ সম্পূর্ণ অবগতির সাথে বলছে,
যেমন একজন যথার্থ বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে এবং যা বলে সত্যই বলে।
একজন সাধুসন্তের মত বিজ্ঞজনোচিত বক্তব্য এবং তাতে
কোন প্রকার দ্বিধা নেই ও আহত ব্যক্তির সমালোচনারও কিছু নেই।
আমি একটি বিচক্ষণ ধারণাকে বহন করছি, কোন প্রকার উদ্দেশ্য
সাধনের জন্য নয়; এমন কি তাতে কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনাও
তিরোহিত।
তা গুপ্তভাণ্ডারের মত আমার অন্তরেই ছিল; আহা, কী উত্তম-ই না ছিল।
কিন্তু যে-কোন চিন্তার ভাণ্ডারই হোক না কেন, তা এক সময়ে প্রকাশ পায়।
আমি যখন তার প্রকাশের জন্য মুখ খুলে দিয়েছি এবং এমন বিষয়াদি
বলছি,
যা আমাদের গোত্রের আত্মীয়-স্বজনেরা এক সময়ে বাস্তবায়িত করেছে।
বনি কাব আমাদের আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী
এবং তারা আমাদের জ্ঞাতি ভাই-ভগ্নি যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলে।
এ দেশ বিজিত হওয়ার পর আমরা তাদের অনেকের প্রতি যথার্থই
বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করেছি এবং সৎপ্রতিবেশী করে নিয়েছি।
তাদের অনেককে তাদের শত্রুদের কবল থেকে রক্ষা করেছি,
এবং তারা সকলেই জানে যে, আমি যা বলছি, তা সত্য।
তাদের অনেকেই আমাদের নানাবিধ আধিপত্যের দ্বারা ভীত সন্ত্রস্ত
হয়েছিল অধীরভাবে; অথচ হৃদয়ের মধ্যে ছিল আমাদের লিখিত অস্বীকার।
তাদের অনেকেই আহত অবস্থায় এসেছে, আমাদের উদার হৃদয় তাদের
ক্ষত আরোগ্য করেছে এবং অভ্যাগতকে দিয়েছে দর্শনীয় উপঢৌকন।
তাদের অনেকেই আমাদের প্রতি বিদ্বেষসহকারে দৃষ্টিপাত করেছে।
আমরা তাদের দুর্ব্যবহারে আমাদের মধ্যে যে নির্বুদ্ধিতা জন্মেছিল, তাও শেষ
হয়েছে বহুবার এবং অনেক বারই তা ক্ষমার যোগ্য বলে গণ্য হয়েছে।
তাদের অনেকেই কোন এক যোগ্য ব্যক্তির কর্মচারীদের সম্পর্কে অভিযোগ
তুলেছিল যে, তারা দরবারে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের দ্বার রুদ্ধ করেছে।
আমরা তাদেরকে তার বিরুদ্ধে রক্ষা করেছি, তাদের প্রবেশ অবারিত হয়েছে
এবং 'বালেকী' ও 'দিয়াবের' পোষ্যের মতের বিরুদ্ধেই তা ঘটেছে।
আমরা সর্বদাই দুর্যোগ এড়িয়ে তাদের উন্নতি কামনা করেছি;
আমরা তাদেরকে দুষ্কর্মের মধ্যে জড়াতে কোন অন্তরালের প্রশ্রয় দেই নি।
আমরা আমাদের স্বদেশ 'তরশিশে'র সামগ্রিক আধিপত্য লাভ করেছি।
তখনই, যখন তার জন্য আমাদের দ্রুতগামী অশ্ব ও স্বীয় শির ন্যস্ত করেছি।
আমরা তেমন সম্পদেই আধিপত্য পেয়েছি, যা আয়ত্তের বাইরে ছিল;
এমন একজন শাসকের অধীনে, যিনি অন্যের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োজিত
ছিলেন।

আমাদের গোত্রের নেতৃস্থানীয়দের নেতৃত্বসুলভ প্রতিরোধেই এটি সম্ভব হয়েছে;
বনি কাব; যাদের মধ্যে কঠোরতা ও কোমলতা সমভাবে বিদ্যমান।
আমরা তাদেরকে প্রতিটি সংঘবদ্ধ শত্রুতা থেকে রক্ষা করেছি এবং
সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতায় আমরা তাদের সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছি।
ফলে তাদের মধ্যে যারা একটি ছাগলছানারও সামর্থ্য রাখত না,
তারাও সর্বপ্রকার সম্পদের অধিকারী হয়ে প্রাচুর্য লাভ করেছে।
তারা মূল্যবান দাসদাসীদের স্কন্ধে আরোহণ করে বেড়াচ্ছে এবং
বিচিত্র ধরনের রেশমি পোশাক পরিধান করে তারা ঘুরছে।
তারা বহুবিধ পশুসম্পদ এমন অবলীলায় ক্রয় করে নিচ্ছে,
যা দুর্মূল্যের জন্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে।
তারা বিচিত্র ধরনের এমন সব প্রয়োজনীয় পশু অর্জন করেছে,
যা একমাত্র দীর্ঘ সময়ের অবকাশেই একত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।
ফলে তারা প্রাচীনকালের বারমেকীদের সমতুল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে
কিংবা দিয়েবের শাসন-আমলে বিখ্যাত হেলালের সমমর্যাদাবান।
বস্তুত তারা সর্বপ্রকার বিপদে আমাদের বর্মস্বরূপ ছিল,
যতদিন না শত্রুর প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা বিস্তার করল।
তারা অন্ধকারের আড়ালে গৃহত্যাগ করল; কিন্তু ভয় করল না
ভর্ৎসনা—অথচ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহ কখনও ভর্ৎসনার অধীন নয়।
তারা স্বগোত্রকে পশুচর্মের আচ্ছাদনে আবৃত করে রাখল;
অথচ তারা যদি বুঝত, তাহলে নিজেরাও কুৎসিত কাপড় পড়ত।
অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে সংকীর্ণমনাও আছে, যে সংবাদ আয়ত্ত করতে পারেনি
এবং তার বুদ্ধি যদি বিনষ্ট না হয়ে থাকে, তবে আমার বুদ্ধিমত্তাই ত্রুটিপূর্ণ বলতে হবে।
সে আমাদের সম্পর্কে এমন সব ধারণা পোষণ করে, যা আমাদের মধ্যে নেই;
অথচ সে আশা করে যে, তার ক্ষমার বিচিত্র পথ বের হয়ে আসুক!
সে নিজে ভ্রান্ত এবং তার সাথে অনুরূপ ভ্রান্ত ধারণায় যারা জড়িত, সকলেই
এবং এটি সুনিশ্চিত যে, যারা অসৎ ধারণা পোষণ করে, তারা নিজেরাই দোষী।
অহো, সেই বীর যুবক আবু মুহম্মদের মৃত্যুতে আমার সান্ত্বনা লাভের উপায় কী!
যে হাজার হাজার মুদ্রা কোন প্রকার গণনা ছাড়াই দান করে দিত।
তার তিরোধানে তার সেই সব কর্মচারী ব্যথিত হয়েছে, যারা তার
আগমনকে সজীবতার নিদর্শনবাহী মেঘমালার আগমন তুল্য মনে করত।
তারা সেই মেঘের ছায়ায় যেসব রাজপথের অনুসন্ধান করেছিল;
এখন তাদের সেই আশার সব কিছুই মরীচিকা বলে বোধ হচ্ছে।
সে যখন দান করত, তখন বুঝতে পারত কতটুকু দিলে যোগ্য হবে;
এমনকি সে যখন অল্প দান করত, তাও যোগ্যতানুসারে সঠিক হত।
আমরা তার ব্যাপারে আর কী সান্ত্বনার আশা পোষণ করতে পারি;
যখন সে নিজেই ধ্বংসের শরাঘাতে ধরাশায়ী হয়ে পড়েছে।
'তারতিশ' তার প্রশস্ত ভূ-পরিবেশসহ কেমন সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে
এবং তার উপর ছিন্নভিন্ন মেঘমালাসহ সূর্যাস্ত এসে দেখা দিয়েছে।

অচিরেই তার স্মৃতি এ অঞ্চল পরিত্যাগ করে যাচ্ছে;
এখানে শুধু তার পানপাত্র, আসবাবপত্র ও সৌধাবলিই দৃশ্যমান থাকবে।[৪৭১]
আয়তলোচনা সুন্দরীগণ তাদের তন্বী দেহবল্লরী নিয়ে
ক্রমশ আবরণ আর আচ্ছাদনের অন্তরালে সরে যাচ্ছে।
তারা ভ্রূভঙ্গি করলে সেও করত এবং তাদের লাস্যে সে-ও হেসে উঠত;
সবই ছিল 'কানুন' আর 'রবাবে'র সমধুর সুর লহরীর দ্বারা মুখরিত।
তারা তাকে বিভ্রান্ত করেছে, কারণ সে তার নিশ্চয়তা বিরহিত ছিল;
অথচ এ সত্ত্বে সে কখনও চিরকালের যুবকের মত আচরণ করেছে।
সে তাদের সাহচর্যেই আনন্দিত জীবনযাপন করেছে; তার আদেশ মান্য হয়েছে
এবং তার উত্তম খাদ্য ও উত্তম পানীয়ের কোন অভাব হয়নি।
কিন্তু ইবনে তাফরাজিনের জন্য সেই অতীত আর ফিরে আসবে না;
বরং সেই প্রেমপ্রীতির পরিবর্তে সে নিরেট মৃত্যুর সুধা পান করেছে।
যদিও তার বুদ্ধিমত্তা ছিল অপরিমেয় ও বিচক্ষণতা ছিল অতুলনীয়,
তবুও সবকিছু সহ-ই সে গহণ গভীর সাগরের তলদেশে ডুবে গিয়েছে।
অভূতপূর্ব কোন কিছুর জন্য উদ্যোগী কর্মীপুরুষের প্রয়োজন।
তেমন মহান পরুষ, যাদের সাহচর্যে মানুষ সুসংবদ্ধ হয়ে উঠবে।
যাদের সংস্পর্শে আমাদের বাজারের পণ্য আবার তেজী হয়ে দাঁড়াবে
এবং সন্নিবদ্ধ বর্শার ফলাগুলো আবার রক্তে লাল বর্ণ ধারণ করবে।
ফলে আমাদের আধিপত্যের উপর হস্তক্ষেপে ইচ্ছুক যুবকরা অনুতপ্ত
হয়ে ফিরবে এবং তারা কখনই তার উত্তরাধিকার লাভ করতে পারবে না।
ওহে রুটি ভক্ষণকারী! যারা তার ব্যঞ্জনকে সুসমঞ্জস করতে চায়
তারা মহাভুল করেছে—বিষের সাথে সুখাদ্য মিশ্রিত করে ফেলেছে।

আলী ইবনে উমর ইবনে ইব্রাহিমের কবিতার একটি উদাহরণ। ইনি বর্তমানকালে 'যুগাবা' গোত্রের শাখা বনি আমেরের নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম। এ কবিতায় ইনি সংশ্লিষ্ট গোত্রের নেতৃত্বলাভে প্রয়াসী তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতৃগণকে ভর্ৎসনা করেছেন।

কারুকার্যমণ্ডিত মোতির ন্যায় কোন শিল্পীর হাতে,
যখন রেশমি সুতার তা সুবিন্যস্ত হতে থাকে।
আমি প্রকাশ করছি অতীত ঘটনাবলির কার্যকারণ,
যখন বিচ্ছেদ তার সাফল্যের জন্য হাওদাবাহী উটের সারি হয়েছিল।
এর ফলে একটি গোত্র দুটি শাখা গোত্রে পরিণত হল এবং বিক্ষিপ্ত
হল তার লাঠি; তার জন্য কোন নির্দেশকারীর সাক্ষাতও আমরা পাইনি।
কিন্তু আমার হৃদয় সেই বিচ্ছেদের বিশেষ দিনটিতে তাদের জন্য
সুতীক্ষ্ণ কাঁটার আঘাতে অনুক্ষণ জর্জরিত হয়েছে।
কিংবা তার মধ্য থেকে সেই স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়েছে, যা কর্মকারের
হাতের বাঁকা হাতুড়ি-নেহাই সৃষ্টি করে থাকে।
কিংবা সেই হৃদয় এমন এক সূত্রধরের হাতে পতিত হয়েছে,
যে বোকার মতো করাতের আঘাতে তাকে খণ্ডবিখণ্ড করছে।
যখন আমি বললাম, চল, আমরা বিচ্ছেদের দুর্ভাগ্য সহ্য করি, তখন
কেউ আমাকে প্রদক্ষিণ করে উচ্চস্বরে বিদায়ের কথা ঘোষণা করল।

---

৪৭১. এ ছত্রটি রোজেনথালের অনুবাদে নেই।

হে আবাসভূমি, যা গতকালও জনবসতিতে পরিপূর্ণ ছিল;
গোত্রের মানুষ ও তাদের সঙ্গী-সাথী এবং দাসদাসীরাও ছিল।
তারা খেলার জন্য অব্যর্থ লক্ষ্যে বাহনাদি ছুটাত এবং
রাতের অন্ধকারে তাদের অনেকের জাগরণ ও অনেকের নিদ্রায় কাটত।
পশুপাল, তাদের একত্র হওয়ার সময় দর্শকদের চক্ষু বিস্ফারিত হত;
যখন তারা সমতলভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চল থেকে ঘরে ফিরত।
অসংখ্য কাক, সেখানকার বৃক্ষের ডালে বসে কা কা করে ডাকত এবং
উন্মুক্ত পশুপালের সাথে বন্য গাভী ও উটপাখি এসে জুটত।
আজ সেখানে পেচকের ক্লান্ত স্বর ছাড়া অন্য কিছু শোনা যায় না;
তারাই পরিত্যক্ত তাঁবুর স্থানগুলো ও পাহাড়ি টিলায় ঘুরে বেড়ায়।
আমরা সেখানে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম;
অথচ আমাদের দৃষ্টি সংকুচিত এবং অশ্রুধারায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠছিল।
কিন্তু তার কাছ থেকে আমার হৃদয় এক উদাস অনুভূতি ছাড়া কিছুই পায়নি
এবং বিচিত্র কার্যকারণে আমার অসুস্থতাই বাড়ছিল; যদিও জানি তা কল্পনা মাত্র।
এরপর তুমি মনসুর আবু আলীর কাছে শুভেচ্ছা পৌঁছে দিও;
বস্তুত তার জন্য শুভেচ্ছার পর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন যোগ্যতার।
বল তাকে, হে আবুল ওয়াফা। তোমাদের দুর্মতির কারণ কী!
তোমরা যে গভীর সাগরের তলদেশেই অন্ধকারে প্রবেশ করছে।
তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সেই সাগর, লাঠির দ্বারা তার গভীরতা মাপা যায় না;
তা সমতল ও পাহাড়ি অঞ্চল সমভাবে প্লাবিত করে দেয়।
কোন প্রকার অনুমানের দ্বারাই তুমি তাতে পথের দিশা খুঁজে পাবে না;
জোয়ারে স্ফীত সাগর কি সাঁতরিয়ে পার হওয়া যায়।
তারা তাতে প্রবেশের মধ্য দিয়ে তোমাদের ধ্বংস কামনা করছে;
কতকগুলো বুদ্ধিহীন দুশ্চরিত্র মানুষ মাত্র।
হায়, দুর্ভাগ্য। তারা পথভ্রষ্টতার স্কন্ধে আরোহণ করেছে, অস্থির চঞ্চল
এবং তাদের এ পার্থিব ঐশ্বর্যেরও কোন স্থিরতা নেই।
তাদের এ দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা, তুমি দেখবে তাদের ধারণারই অনুরূপ;
যেন প্রান্তরের মরীচিকার প্রলোভন, যার কোন অন্ত নেই।
বর্শার ফলায় তারা উচ্চ মর্যাদায় আসীন হতে চায়;
অথচ তা এমন এক স্থান, যার যোগ্যতা তাদের নেই।
মহান নবী, পবিত্র গৃহ ও তার উন্নত শীর্ষ স্তম্ভগুলোর শপথ,
যুগে যুগে প্রতি বছর যার চতুর্দিকে দর্শনার্থী এসে ভীড় জমায়;
যদি আমার জীবনকাল বিস্তৃত হয়, তাহলে এমন রাত আসবে;
যে সময় অতিশয় তিক্ত স্বাদের মদ আস্বাদন করতে বাধ্য হবে।
সেই রাতকে বাস্তবায়িত করতে প্রান্তরীয় জীবন একাগ্র হয়ে উঠবে
এবং প্রতিটি সংকীর্ণ পথ মুখরিত করে তরবারী ঝংকৃত হবে।
প্রতিটি অশ্ব, যা বায়ুর ন্যায় দ্রুতগতি, ধাবিত হবে এবং
তার পৃষ্ঠদেশে সম্ভ্রান্ত বংশীয় একজন যুবককে বহন করবে।
প্রতিটি ধূসর বর্ণের অশ্ব, তার দন্তপাটি উন্মীলিত করে
লাগামের প্রান্তকে মাড়াতে থাকে—ধাবিত হবে।

এ বন্ধ্যা ভূমি কিছু কালের জন্য আমাদের সংস্পর্শে গর্ভিণী হবে।
অতঃপর প্রতিটি পাহাড়ি পথ দিয়ে আমাদেরকে প্রসব করবে।
বীর যোদ্ধাবৃন্দ, সুঠামদেহী উষ্ট্রদল ও অগণিত বর্শাফলক
এবং শত্রুর অবস্থান বিচলিত করে প্রধাবিত হতে থাকবে।
তুমি কি আমাকে হিংসা কর; অথচ আমিই তাদেরকে পরিচালিত করব
আমার তীক্ষ্ণধার বর্শাই যুদ্ধের পতাকারূপে ব্যবহৃত হবে।
আমরা মিলনোন্মুখ দন্তপাটির ন্যায় আক্রমণে তোমাদেরকে উৎপাটিত
করব এবং তোমাদের পূর্বকৃত ঋণ পরিশোধ করতে তোমরা বাধ্য হবে।
কখন সেই দুর্ভিক্ষের দিন, হে আমীর আবু আলী?
যে দিন এমন শিকারীদের সাক্ষাৎ ঘটবে, যারা মাংসের অপেক্ষা করে আছে।
অনুরূপ আবু হাম্মুও অতি সহজেই একটি দুর্বল অশ্ব ক্রয় করেছে
এবং উন্নতমানের উত্তম অশ্বগুলোকে অবলীলাক্রমে যেতে দিয়েছে।
এমন ব্যক্তিবর্গকে ত্যাগ করেছে, যাদের প্রতিবেশী নিরাপদ ছিল
এবং যারা শত্রুর ভয়ে কখনও দুর্বল হয়ে পড়েনি।
তারা বিপদের দিনে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি;
অথচ তারা এখন চিরদিনের জন্য তার নৈকট্য থেকে বিচ্ছিন্ন।
কত না পূর্বরক্তের প্রতিশোধকামী বেদুইনদের প্রতি ভর্ৎসনা জ্ঞাপন করেছে;
এ সমতল প্রান্তর ও পাহাড়ি অঞ্চলের মাঝখানে।
কোন সেই যুবক, যে আমাদের এ দিনে সমতল প্রান্তর অতিক্রম করবে
এবং আমাদের এ ভূমিতে হাওদাবাহী কাফেলার ডুরি হাতে নিবে?
অথচ এক সময় তারা এ ভূমির জন্য প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য বহন করে
এনেছে; তারা ছিল প্রশংসার দোসর ও বিপদে বর্মস্বরূপ।
যখন রাজন্যবর্গ তাকে সন্ত্রস্ত ও উৎপীড়ন করতে এসেছে,
তখন তার প্রকৃতি চঞ্চল হয়ে উঠেছে ও তাতে ন্যস্ত রয়েছে।
এক বিচক্ষণ জিহ্বা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ শান্তি কামনা করছে,
যতদিন ঘুঘু সুরলহরী তুলবে এবং কবুতর কান্নায় বিগলিত হবে।

হাওরানের প্রান্তবর্তী আরব 'নিমর'দের কবিতার উদাহরণ। এটি তত্রস্থ এক মহিলা কবির রচনা। তার স্বামী নিহত হলে তাদের বন্ধুস্থানীয় গোত্র 'কায়সে'র কাছে স্বামীর রক্তের মূল্য আদায়ের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ এ কবিতাটি তিনি রচনা করেন।

গোত্রের এক বীরাঙ্গনা উম্মে সালমা বলছে, এমন এক
প্রিয়জনের কথা তার জন্য যারা শোক প্রকাশ করেনি আল্লাহ্ তাদেরকে
ভীত করুন।
সে সমস্ত রাত জাগরণে কাটায়, দুই চোখে তন্দ্রায় ঘোর আসে না;
তার পার্শ্ব পরিবর্তনের মধ্যে দুর্ভাগ্যের বেদনাই প্রশ্বসিত হয়ে ওঠে।
এটি তারই ফলশ্রুতি, যা তার গৃহে ও পরিবারে সংঘটিত হয়েছে
এবং এক মুহূর্তের ব্যবধানে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে।
হে কায়েস! তোমাদের সকলেই শিহাবুদ্দিনকে হারিয়েছ এবং
তার রক্তমূল্য আদায় করতেও তোমরা নিরুদ্বেগ, যা তোমাদের চুক্তি ছিল।
আমি বললাম, যখন তারা আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য পত্র দিল;
উদ্দেশ্য তা দিয়ে তারা আমার অন্তরের প্রজ্বলিত অগ্নি নির্বাপিত করবে—

'কী লজ্জা। তারা তাদের বাবরী ও দাড়িতে চিরুণী ব্যবহারে নিরত,
অথচ গৌরদেহী তন্বী তরুণীদের সৌন্দর্য সংরক্ষণে তারা উদাসীন।'[৪৭২]

আন্দালুসের 'মুয়াশ্যিহা' ও 'জযল' কবিতা

আন্দালুসবাসীদের মধ্যে যখন কাব্যচর্চা বৃদ্ধি পেল, তখন তার আঙ্গিক ও বিষয় বৈচিত্র্যেও পরিমার্জনা এসে উপস্থিত হল এবং শৈল্পিক সৌন্দর্য সৃষ্টি চরম সীমায় উপনীত হল। উত্তরসূরিগণ এ বিষয়ে এমন এক আঙ্গিকের আবিষ্কার করলেন, যাকে তারা 'মুয়াশ্যিহা' বলে অভিহিত করেন। তারা কবিতাকে স্তবকে স্তবকে গুচ্ছে গুচ্ছে ভাগ করে বিন্যস্ত করলেন। এতে যেমন স্তবকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তেমনি বিভিন্ন ছন্দের বৈচিত্র্যও ব্যবহার করা হল। তারা এরূপ একটি গুচ্ছকে 'বয়েত' বলে আখ্যায়িত করেন এবং এমন গুচ্ছের অন্তর্গত পঙ্‌ক্তিগুলোতে পর্যায়ক্রমে শেষ পর্যন্ত একই ধরনের মাত্রা ও অন্ত্যমিল ব্যবহার করেন। একটি কবিতা এমন সাতটি গুচ্ছ বা স্তবকের অতিরিক্ত হয়

---

৪৭২. রোজেনথালের অনুবাদে এর পর আরও একটি কাব্যাংশ বিদ্যমান; সম্পূর্ণতার জন্য আমরা এর অনুবাদ নিম্নে তুলে দিচ্ছি। মিশরের যুজাম বেদুইনদের একটি গোত্রে 'হুলুবা'র জনৈক কবির একটি রচনা :

এভাবে 'রুদিয়ানী বলেছে এবং রুদিয়ানী সত্যই বলে থাকে;
তার কবিতা সুরচিত সুবিন্যস্ত ও একান্তই মৌলিক।
কে তুমি একটি উটনীর উপর চড়ে আসছ—
সেই উটনী, যা প্রাণ প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ও সুডৌল দেহের অধিকারিণী;
সে এমন এক যুবককে বহন করে; যে শ্রম ছাড়া নিদ্রায় কাতর হয় না;
সেই মহা বিচক্ষণ গুণবানের শপথ! একমাত্র সেই বুঝতে পারে এর স্বরূপ।
তুমি যদি 'হুলুয়া' নামীয় সেই গোত্র থেকে এসে থাক,
যারা যুদ্ধের ময়দানে সর্বদাই চমৎকার দক্ষতা প্রদর্শন করে
এবং বনি মনজুরের আমার স্বগোত্রীয়দের কাছ থেকে—যাদের সান্নিধ্য স্থায়ী।
তারা মানবজাতির প্রতিনিধি, দুর্বলের আশ্রয় ও দুর্ধর্ষ।
আমি বনি রাদ্দাকের কাছ থেকে আমার সমুদয় অভিজ্ঞতা লাভ করেছি;
আমার প্রভু যেন তাদেরকে সর্বপ্রকার পতন হতে রক্ষা করেন।
আমি তোমাকে বলেছি, কাফেলার সাথে বিভ্রান্তির সংবাদ এসেছে।
এক চরম অনৈক্য ও দ্বিধা বিভক্তির সেই সংবাদ।
আমি একা কী করে এ উৎপীড়ন সহ্য করি; অথচ তোমরা দলবদ্ধ
দীর্ঘ কেশরবিশিষ্ট অশ্বে আরোহণ করে এসেছ।
আমি প্রার্থনা করি তোমাদের সকলের সুমতি হোক;
যদিও এর সংসাধনে তোমাদের জীবন ও সম্পদ ব্যয়িত হয়।
আমার পক্ষে সহায়ক উবায়েদ ইবনে মালীকের ন্যায় নেতা বিদ্যমান;
যিনি সম্ভ্রান্ত কুল-গৌরব ও নেতৃত্বের মর্যাদায় সমাসীন।
আমি তার মধ্যে এক প্রকৃত বন্ধু ও মুসলমানদের নেতাকে পেয়েছি;
অথচ আমার স্বগোত্রই আমাকে নানান বিপাকে ফেলেছে।

সেখানে এ ধরনের বহু কবিতা বিদ্যমান। এগুলো আরব বেদুইনের মধ্যে বহুল প্রচলিত। অনেকগুলো গোত্রই এমন কাব্য রচনার ব্যাপৃত। রচয়িতাদের মধ্যে অনেকেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এমন কি সমসাময়িক 'রায়া', 'জুগবা' ও 'সুলাইন' গোত্রের নেতৃবৃন্দ এমন কবিতা রচনার আগ্রহী। অবশ্য এমন অনেকেই আছেন যারা এমন কাব্যচর্চাকে হেয় বলে মনে করেন; যেমন আমরা কাব্য রচনার আলোচনা প্রসঙ্গে এর কারণ বর্ণনা করেছি।

না। প্রতিটি স্তবকের পঙ্‌ক্তি সংখ্যাও বিষয় ও আঙ্গিকের প্রয়োজন অনুসারে সন্নিবেশিত হয় এবং আরবি 'কসিদা' বা দীর্ঘ কবিতার ন্যায় তাতেও তারা প্রণয়-স্মৃতি ও স্তুতির বিষয়বস্তু আলোচনা করেন।

আন্দালুসবাসীরা উক্ত প্রকার কবিতা রচনায় চরম দক্ষতা প্রদর্শন করেছে এবং তাদের মধ্যে সর্বশ্রেণীর লোক এগুলোকে গ্রহণ করেছে। বিদ্বজ্জন ও সাধারণ নির্বিশেষে সকলেই এ কবিতায় সহজগ্রাহ্যতা ও সহজবোধ্যতার জন্য এর গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছে। আন্দালুস উপদ্বীপে যিনি সর্বপ্রথম এ কবিতার প্রচলন ঘটান, তিনি হলেন মুকাদ্দম ইবনে মুআফির আল-কিবাররী। ইনি আমীর আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহম্মদ আলী-মরোয়ানীর শাসন আমলের কবিদের অন্যতম। তাঁর কাছ থেকে 'কিতাবুল ইকদ' রচয়িতা আবু আবদুল্লাহ্ আহমদ ইবনে আবদে রাব্বিহি এ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালের মুয়াশ্যিহা রচয়িতাদের সাথে তাঁদের নাম উল্লেখিত না হওয়ায় তাঁদের মুয়াশ্যিহা কবিতাগুলো বিস্মৃতিতে তলিয়ে যায়।

অতঃপর তাঁদের পরবর্তী পর্যায়ে যিনি এ কবিতায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, তিনি হলেন আব্বাদা-আল-কাজ্জাজ।[৪৭৩] ইনি আল-মারিয়ার শাসক আল-মুতাসিম ইবনে সুমাদিহের আশ্রিত কবি ছিলেন। আলাম-আল বাতলিউসী[৪৭৪] বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবু বকর ইবনে যুহায়রকে[৪৭৫] বলতে শুনেছেন—সব প্রকার মুয়াশ্যিহা রচনাকারী আব্বাদা আল-কাজ্জাজের কাছে ঋণী; তিনিই বলতে পেরেছেন—

পূর্ণিমা চন্দ্র—মধ্যাহ্ন সূর্য—পাহাড়ি কুঞ্জ—কস্তুরীগন্ধ;
আহা কী পূর্ণ—প্রসিত প্রোজ্জ্বল—পত্র শোভিত—মধুর আনন্দ!
নাহিক দ্বন্দ্ব—দর্শনার্থী—প্রীতি আসক্ত—লুপ্ত ছন্দ!!

তাদের ধারণা, ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের সময়ে তৎকালীন মুয়াশ্যিহা রচয়িতাদের মধ্যে কেউই আব্বাদাকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি। বরং তাঁকে অনুসরণ করেই পরবর্তীকালের কবিরা অগ্রসর হয়েছে। তাদের মধ্যে ইবনে আরফা[৪৭৬] উল্লেখযোগ্য; ইনি টলেডোর শাসন আল মামুন ইবনে যুননূন-এর আশ্রিত কবিদের শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন। তাদের ধারণা, ইনি তার রচিত মুয়াশ্যিহার প্রারম্ভে খুবই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, যেখানে তিনি বলেছেন—

সারঙ্গী বাজছে—অপূর্ব সুস্বর—বইছে ঝর্ণা—পূর্ণ উদ্যান।

এবং এ কবিতার শেষে, যেখানে তিনি বলেছেন—

সাহসী হও, আত্মসমর্পণ করিও না; সম্ভবত তাহলেই তুমি মামুন।
ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারবে শত্রু সেনাদলকে

—ইয়াহিয়া ইবনে যুন্নূন।

---

৪৭৩. জীবনকাল খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দী।
৪৭৪. আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবনে কাশেম; মৃত্যু ৬৪২—৪৬ (১২৪৪—৪৮ খ্রি:) হি:।
৪৭৫. মুহম্মদ ইবনে আবদুল মালিক; মৃত্যু ৫৯৫/৯৬ (১১৯৯/১২০০ খ্রি:) হি:।
৪৭৬. ইবনে আরফাশা (?)।

অতঃপর আবৃত বেদুইন মিনহাজাদের শাসন আমলে মুয়াশ্যিহা কবিতা রচনায় একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে এবং তাদের প্রচেষ্টায় অভিনবত্ব দেখা দেয়। উক্ত গোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ শিল্পী ছিলেন আলআমা তালিতুলী।[৪৭৭] এরপর ইয়াহিয়া ইবনে বকীর[৪৭৮] নাম করা যায়। তালিতুলীর সুমার্জিত মুয়াশ্যিহার মধ্যে একটি এই—

কী করে আমি ধৈর্যধারণ করি; পথের নিদর্শন আকুল করে তোলে;
কাফেলা প্রান্তরের মধ্য ভাগে এবং সাধ্বী ও তন্বীদের সাহচর্য বিচ্যুত।

উস্তাদদের মধ্যে অনেকেই বর্ণনা করেছেন যে, আন্দালুসের অনুরূপ কবিতাপ্রিয় লোকেরা বলে থাকে—একবার একদল মুয়াশ্যিহা রচনাকারী কবি শেভিলায় একত্র হয়েছিলেন। তাদের প্রত্যেকের কাছে নিজের রচিত ও শিল্পগুণ সমন্বিত মুয়াশ্যিহা ছিল। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম আলআমা তালিতুলী এগিয়ে এলেন এবং তার বিখ্যাত মুয়াশ্যিহা আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলেন—

হাস্যে বিকশিত মোতি মুখচন্দ্রিমা পূর্ণজ্যোতি
সময় সঙ্কট অতি হৃদয় বিহ্বল মতি।

এটি শোনামাত্রই ইবনে বকী তাঁর মুয়াশ্যিহাটি পুড়িয়ে ফেললেন এবং অন্যান্য কবিরাও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। আলাম আল বাতলিউসী বর্ণনা করছেন যে, তিনি ইবনে যুহরকে বলতে শুনেছেন, আমি কখনও কোন মুয়াশ্যিহা রচয়িতাকে হিংসা করিনি; কেবলমাত্র ইবনে বকীকেই তার এ উক্তির জন্য হিংসা করেছি :

তুমি কি আহমদকে দেখ না, কী অতুলনীয় গৌরবে সে অধিষ্ঠিত;
মাগরিব তাকে এ সমুন্নতি দিয়েছে। হে পূর্বাঞ্চল, তার ন্যায় একজন দেখাও।

উক্ত দুই কবির সমসাময়িককালে মুয়াশ্যিহার স্বভাব-কবিদের মধ্যে আবু বকর আল-আবিয়ায এবং প্রখ্যাত সুরস্রষ্টা হাকিম আবুবকর ইবনে বাজাও[৪৭৯] তাদের অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত বিচিত্র কাহিনীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক সারাগোসার অধিপতি ইবনে তিফলুইত-এর দরবারে উপস্থিত হলে তাঁর গায়িকাদের কেউ তাঁর রচিত সেই মুয়াশ্যিহাটি গেয়েছিল, যার প্রারম্ভ নিম্নরূপ—

বস্ত্রাঞ্চল যতদূরই বিস্তৃত হোক—
কৃতজ্ঞতার সাথে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতাই যুক্ত হবে।

প্রশংসিত ইবনে তিফলুইত এটি শুনে সন্তুষ্ট হলেন এবং যখন কবি এটি এই বলে শেষ করলেন—

আল্লাহ্ বিজয়ের পতাকা উত্তোলন করুন
মহান আমীর আবু বকরের জন্য।

তখন তাঁর কানে এটি প্রবেশ করা মাত্রই চিৎকার করে বলে উঠলেন, আহ্ কী আনন্দ! তিনি তাঁর পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন এবং কঠিন শপথবাক্য উচ্চারণ করে

৪৭৭. মৃত্যু ৫২০ (১১২৬ খ্রি:) হি:।
৪৭৮. মৃত্যু ৫৪০ (১১৪৫ খ্রি:) হি:।
৪৭৯. ষষ্ঠ অধ্যায় দ্র:।

বললেন যে, ইবনে বাজা একমাত্র স্বর্ণের উপর দিয়ে তাঁর ঘরে ফিরবেন। কিন্তু হাকিম ইবনে বাজা এ শপথের অশুভ পরিণাম চিন্তা করে কৌশল অবলম্বন করলেন এবং তাঁর জুতার নিচে স্বর্ণ স্থাপিত করে তিনি পায়ে হেঁটে ঘরে ফিরে গেলেন।

আবুল খাত্তাব ইবনে যহর[৪৮০] বর্ণনা করেছেন যে, আবু বকর ইবনে যুহরের দরবারে আবু বকর আল আবিয়ায নামক পূর্বোক্ত কবির কথা আলোচিত হচ্ছিল; উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন তার সম্পর্কে বিরূপ কী করে বিরূপতা দেখানো যায়, যিনি বলেছেন—

মদ্যপানে আমি স্বাদ পাই না
যদি না কোন তন্বী কোমলাঙ্গী
অথবা অপরাহ্ণ বেলায়
সান্ধ্য পানের কী হল
আহ্ উত্তরে বাতাস কেন
পরিপূর্ণ পল্লব শাখা
এতে হৃদয় বিগলিত
হায় কটাক্ষ, পাপ শুধু পাপ
মোচন করহে তৃষ্ণা
পারে না যে ভঙ্গ করতে
সর্বদাই যে প্রিয়জন
প্রিয়ার উষ্ণ সান্নিধ্যে,

'আকাহ্' ফুলের উদ্যানে বসেও—
আনত হয় প্রাতঃকালে;
এবং বলতে থাকে,
আমার গণ্ডে চপেটাঘাত?
বইছে আনত করে
আমার উত্তরীয় আবৃত করতে?
গমনে আনে বিভ্রান্তি,
হায় বিশ্বোষ্ট, হায় দন্তপাঁতি!
জর্জরিত এ প্রেমিকের
প্রেমের সেই অঙ্গীকার;
সর্বাবস্থায় কামনা করে
অথচ সে দূরাধিগম্য!

তাঁদের পরে আল মোহেদ সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে মুহম্মদ ইবনে আবুল ফজল ইবনে শরফ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আল হাসান ইবনে দুয়াইরিদা[৪৮১] বলেছেন, আমি হাতেম ইবনে সায়িদ[৪৮২]কে এভাবে কবিতা আরম্ভ করতে দেখেছি:

সূর্য চন্দ্রের নৈকট্য প্রয়াসী
মদ্য ও অন্তরঙ্গ সঙ্গী।

ইবনে হরদোসেরটির এরূপ :

হে মিলন ও আনন্দের রাত,
আল্লাহ্‌র কসম, ফিরে আয়।

ইবনে মওহিলেরটি এরূপ :

ঈদ আসে না সৌখিন সজ্জায়
আতর গোলাবের বাসে;
প্রিয়জনের সাথে মিলনের মধ্যেই
যথার্থ ঈদ আসে।

আবু ইসহাক আর্‌রুদিনী[৪৮৩] সম্পর্কে ইবনে সায়িদ বলেছেন, আমি আবুল হাসান সহল ইবনে মালেককে বলতে শুনেছি, রুদিনী একদিন ইবনে যুহরের দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন তার বয়স হয়েছে এবং তিনি প্রান্তরবাসীদের পোশাক পরা ছিলেন। কারণ তখন তিনি 'ইস্তাব' দুর্গে বাস করতেন। ফলে ইবনে যুহর তাঁকে চিনতে পারলেন না।

৪৮০. ইনি সম্ভবত আবু বকর ইবনে দিয়াহ; মৃত্যু ৬৩৩ (১২৩৫ খ্রি:) হি: (?)।
৪৮১. আলমাস ইবনে দুয়াইরদা (?)।
৪৮২. খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ঐতিহাসিক।
৪৮৩. আদ্ দুয়াইনী (?)—রোজেনথাল।

তিনি বৈঠকের শেষ প্রান্তে বসে রইলেন। আলোচনা চলবারকালে এক পর্যায়ে তিনি স্বরচিত একটি মুয়াশ্যিহা আবৃত্তি করলেন; তাতে ছিল :

আঁধার সুর্মা ঝুলছে ভোরের অক্ষিতারকায় ভোর বেলায়;
নদীর বাহুটি ঘিরে সবুজ সজ্জা জড়িত মাঠ মেলায়।

এটি শুনে ইবনে যুহর বিচলিত হয়ে বলে উঠলেন, তুমি এটি বলছ? রুদিনী বললেন, বুঝে দেখুন! ইবনে যুহর বললেন, কে তুমি? রুদিনী তাঁর পরিচয় দিলেন। ইবনে যুহর বলে উঠলেন, উঠে দাঁড়ান; আল্লাহ্‌র কসম, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।

ইবনে সায়িদ বলেছেন, এ কবিগোষ্ঠীর সকলের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন আবু বকর ইবনে যুহর। তাঁর রচিত মুয়াশ্যিহা কবিতা পূর্ব-পশ্চিমের সর্বত্র সুপরিচিত। ইবনে সায়িদ বলেন, আমি আবুল হাসান সহল ইবনে মালেককে বলতে শুনেছি, ইবনে যুহরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, যদি আপনাকে বলা হয়, আপনার কথিত মুয়াশ্যিহাগুলোর মধ্যে কোনটি সর্বাপেক্ষা অভিনব ও শ্রেষ্ঠ, তাহলে আপনি কী উত্তর দিবেন? তিনি বললেন, আমি বলব—

এ আসক্ত ব্যক্তিটির কী হল—সে কেন তার নেশা থেকে সচেতন হচ্ছে না?
আর কেমন ধরনের সে নেশাগ্রস্ত—কোন প্রকার মদ্য পান নেই!
এ ব্যথিত লোকটি কিসের আশা করে—সে কি তার গৃহে যেতে চায়?
আবার কি ফিরে আসবে—নদী তীরের আমাদের দিনগুলো
এবং আমাদের রাতগুলো?—অথবা আমরা ভোগ করতে পারব
সুবাসিত মলয়ানিল—'দারিনের[৪৮৪] কস্তুরীর সুগন্ধ!
অথবা এমন কিছু হবে—এ উৎফুল্ল পরিবেশ থেকে
আমরা জীবন লাভ করতে পারব?—একটি উদ্যান ছায়াদানকারী
তার সুন্দর বৃক্ষরাজি—শাখা পল্লবে পরিপূর্ণ
এবং জলস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে—ভাসিয়ে ও ডুবিয়ে
পতিত ফুলের কুঁড়িগুলোকে।

তাঁর পরবর্তীকালে ইবনে হাইউন প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর বিখ্যাত 'ফজলে' কবিতায় তাঁর উক্তি—

তার শরাঘাত সর্বদাই প্রচণ্ড—সে তা হাতেই নিক্ষেপ করুক কিংবা কটাক্ষ। তিনি তাঁর দীর্ঘ কবিতায় বলেন—

আমার সৃষ্টি লাবণ্যময়, আমার দক্ষতা শর চালনা;
সুতরাং আমি মুহূর্তের জন্যও যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হই না
আমি আমার সম্পদ এ দুই চোখ দিয়ে যা করতে পারি,
আমার হাত শর নিক্ষেপ করেও তা করতে সমর্থ হয় না।

তাঁদের সমসাময়িককালে গ্রানাডার আল মুহর ইবনে ফরসও খ্যাতি লাভ করেন। ইবনে সায়িদ বলেন, ইবনে যুহর তাঁর নিম্নলিখিত উক্তি শুনবার পর—

৪৮৪. পারস্য উপন্যাসের তীরবর্তী একটি প্রাচীন বন্দরের নাম।

আল্লাহ্‌র কসম! কী আনন্দ উৎফুল্ল ছিল সেই দিন—
'হেমসে'র নদীতে সেই স্রোতধারার উপর ভাসমান;
অতঃপর আমরা সেই খালের মুখে ফিরে এলাম
তখন আমরা বোতলের সুবাসিত ছিপিগুলো খুলছিলাম
সেই চিরকালের পরিষ্কৃত তরল পানীয়ের জন্য এবং
বিকালের উত্তরীয় অন্ধকার নিজ হাতে জড়াচ্ছিল।

তিনি বললেন, আমরা এমন একটি 'উত্তরীয়' কেন খুঁজে পেলাম না। একই শহরে উক্ত মুহরের সাথে মুতরিফ নামে এক কবি বাস করতেন। ইবনে সায়িদ তাঁর পিতার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন উক্ত মুহরের কাছে মুতরিফ এসে উপস্থিত হলে তিনি দাঁড়িয়ে সম্মান দেখালেন। মুতরিফ বললেন, দাঁড়াবার কী প্রয়োজন! ইবনে ফরস বললেন, আমি তাঁর জন্য না দাঁড়িয়ে কি থাকতে পারি; যিনি বলেছেন—

অন্তর ক্ষতবিক্ষত অব্যর্থ শরাঘাতে—বল, অভিভূত না হয়ে কি থাকতে পারি!

অতঃপর ইবনে হযমুন 'মরিসিয়া'তে খ্যাতি লাভ করেন। ইবনে রায়েস বর্ণনা করেছেন, একদিন, ইয়াহিয়া আল খযরজী ইবনে হযমুনের বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিজের রচিত একটি মুয়াশ্যিহা আবৃত্তি করে শুনালেন। উত্তরে ইবনে হযমুন বললেন, কোন মুয়াশ্যিহা রচনাকারী যতক্ষণ কষ্ট-কল্পনা থেকে মুক্ত না হবে, ততক্ষণ তাকে কবি বলা যায় না। খযরজী বললেন, তার দৃষ্টান্ত কী? তিনি বললেন, আমার এ রচনার ন্যায়—

হে দূর প্রবাসী, তোমার সাথে মিলনের—কি কোন পথ আছে?
অথবা তোমার প্রেমে আক্রান্ত এ হৃদয়ের—কী কোন মুক্তি আছে?

আবুল হাসান সহল ইবনে মালেক গ্রানাডায় প্রসিদ্ধ হন। ইবনে সায়িদ বলেছেন, আমার পিতা তাঁর কবিতায় চমৎকৃত হতেন;—

পূর্বাশার প্রভাতী প্রবাহ—সমগ্র দিগন্তে সমুদ্রে পরিণত;
ঘুঘুরা পরস্পর ক্রন্দনরত—

তারা কি নিমজ্জনের ভয়ে—পত্রে পল্লবে অশ্রুপাত করেছে?

তখন শেভিলায় আবুল হাসান ইবনে ফজল খ্যাতি লাভ করেন। ইবনে সায়িদ তাঁর পিতার সূত্র থেকে বলেছেন তিনি সহল ইবনে মালেককে বলতে শুনেছেন, হে ইবনে ফজল, মুয়াশ্যিহা রচয়িতাদের মধ্যে তুমি তোমার এ রচনার জন্য গর্ব করতে পার।

হায়, অপেক্ষা সেই সময়ের জন্য, যা চলে গিয়েছে,
চলে গিয়েছে সেই রাত; কামনা বিচ্ছিন্ন ও বিগত হয়েছে।
আমি অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে একাকী পড়ে আছি;
বিক্ষোভের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ তাপে রাত পোহাচ্ছে।
আমি চিন্তায় সেই পরিত্যক্ত স্থানগুলোকে আলিঙ্গন করছি
এবং কল্পনায় বিচিত্র নিদর্শনকে চুম্বন করে ফিরছি।

ইবনে সায়িদ বলেছেন, আমি আবু বকর ইবনে আস্‌সাবুনীকে উস্তাদ আবুল হাসান দাব্বাজের[৪৮৫] সামনে বহুবার তাঁর মুয়াশ্যিহা আবৃত্তি করতে শুনেছি। কিন্তু উস্তাদ

৪৮৫. আলী ইবনে জায়েয; ৫৬৬—৬৪৬ (১১৭০—১২৪৮ খ্রি:) হি:।

কখনও তার এ কাব্যাংশ ছাড়া অন্যত্র তাঁকে এ কথা বলেননি যে, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি চমৎকার!

বিচ্ছেদকামীর ভালবাসার শপথ-প্রতীক্ষার রাতি প্রভাত হয় না;
জমাটবাঁধা ভোর প্রবাহহীন—আমার রাতও মনে হয় আগামীকালহীন—
সত্য হে রাত তুমি চিরস্থায়ী
অথবা ঈগলের পাখা পিঞ্জরাবদ্ধ—আকাশের তারকা গতিবিহীন।

ইবনে সাবুনীর সুন্দর মুয়াশ্যিহাগুলোর মধ্যে এ উক্তি—

সেই প্রেমাসক্ত পীড়িত ব্যথিত ব্যক্তির অবস্থা কী!
হায়, চিকিৎসক তাকে আরোগ্যের পরিবর্তে রোগগ্রস্ত করেছে।
প্রিয়তম তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছ—
ফলে ঘুমও প্রিয়কে ত্যাগ করে তার অনুসরণ করেছে—
ঘুম আমার চোখের পাতা থেকে দূরীভূত; কিন্তু আমি
কাঁদি, তা কেবল স্বপ্নে প্রিয়ার মুখচ্ছবি দর্শনের জন্যই, নিদ্রার জন্য নয়।
আমাকে প্রতারণা করেছে আজকের মিলন
তার সাথে তার ইচ্ছামত; আহা কী বিসদৃশ মিলন!
কিন্তু তার জন্য আমি তাকে ভর্ৎসনা করি না—আমাকে
সে বাস্তবে বা কল্পনায়, যেভাবেই ব্যাহত করুক না।

সমুদ্রতীরবাসীদের মধ্যে ইবনে খলফ আল জাযায়েরী প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর বিখ্যাত মুয়াশ্যিহায়—

ভোরের হাত নিক্ষেপ করেছে—জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ—ফুলের অগ্নিকটাহে।

এবং ইবনে খরয আল বাজাঈর একটি মুয়াশ্যিহার অংশ—

সুসময়ে দন্তপাটি—তোমাকে সংবর্ধিত করেছে মৃদুহাস্যে।

পরবর্তী ময়াশ্যিহা রচয়িতাদের মধ্যে ইবনে সহলের মুয়াশ্যিহা সুন্দর। ইনি শেভিলা ও পরে সিওটায় কাব্যচর্চা করেন। তাঁর রচনার কিয়দংশ—

'হিমা'র হরিণী কি জানে সে কী আগুন জ্বেলেছে
প্রেমিকের মনে, যেখানে সে তার বাসা বেঁধেছে!
এখন তা আগুন আর আলোড়নে ভরা; যেমন
পূবালী বায়ু জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে খেলা করে।

তাঁর ধারা অনুসরণ করে আমাদের সঙ্গী উজির আবু আবুদল্লাহ্ ইবনে আল খতিব মুয়াশ্যিহার বাক্‌বিন্যাস করেছেন। ইতি তাঁর সমসাময়িককালে আন্দালুস ও মাগরিবের কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ইতিপূর্বে তাঁর প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন—

বৃষ্টি তার বর্ষণের দ্বারা তোমাকে সঞ্জীবিত করুক—হে আন্দালুসের মিলনকাল!
বস্তুত তোমার সাথে মিলন নিদ্রাকালীন দুঃস্বপ্ন অথবা ব্যস্ত মুহূর্তের দৃষ্টিপাত।

* * * * *

সময় যখন বিচিত্র আশায় আন্দোলিত করে—লেখনির ধারা বিন্যাসে তা আবর্তিত হয়,

একের পর এক দুইয়ের পর দুই দলবদ্ধভাবে—যেমন নির্দিষ্ট সময়ের হজ্বব্রতীদের অগ্রযাত্রা।
বৃষ্টি যেমন উদ্যানকে ঔজ্জ্বল্য দান করে—ফুলের কুঁড়িগুলো তখন হাসতে থাকে।
যেমন নুমান মাউস্‌সামা থেকে বর্ণনা করে—যেমন মালেক আনাস থেকে—
ফলে তা কারুকার্যময় সৌন্দর্যে বিভূষিত হয়—যার কাছে মহামূল্য ভূষণও লজ্জা পায়।

* * * * *

সেই রাতগুলোতে ভালবাসার রহস্যলীলা—অন্ধকারে আবৃত হত, যদি না মুখে জ্যোতি থাকত;
তাতে পানপাত্ররূপী তারকাপাত ঘটেছে—সরলরেখায় সৌভাগ্যের পরিচয়ে—
এমন এক পরিস্থিতি, যাতে কোন ত্রুটিই ছিল না—শুধু তা চোখের পলকে বিগত হয়েছে।
যখন কিয়দ পরিমাণে তন্দ্রার আমেজ অথবা—যেমন ভোরের আলোর চকিত আভাস—
উল্কার ন্যায় হরণ করেছে অথবা কখনও—নার্গিসের অশ্রু আমাদের উপর পতিত হয়েছে।

* * * * *

দুশ্চিন্তামুক্ত কোন ব্যক্তির কী এমন প্রয়োজন—যাতে উদ্যানের শোভা তার চিত্তে স্থান পায়;
ফুলগুলো সে অবকাশের সুযোগ লাভ করে—তার প্রতারণার ভীতি থেকে নিরুদ্বেগে?
সুতরাং ঝর্ণার জল উপল খণ্ডের সাথে আলাপ করবে—এবং প্রিয় তার সখাসহ নিরালা হবে।
গোলাপকে তুমি দেখবে সৌন্দর্য দর্শনে বিকৃত মুখ—ক্রোধের লালিমায় নিজকে আবৃত করতে
'আস' গুল্মকে মনে হবে বুদ্ধিমান সতর্ক—ঘোড়ার মত কান উঁচিয়ে সে আড়ি পেতেছে।

* * * * *

হে 'ওয়াদিউল গাজা'র[৪৮৬] সমগোত্রীয় ভ্রাতৃবৃন্দ!—আমার হৃদয়ে তোমাদের জন্য স্থান আছে;
তোমাদের জন্য আমার আকুলতায় সমস্ত শূন্য পরিপূর্ণ—তা পূর্ব কি পশ্চিমের তাতে কিছু যায় আসে না।
অতীতের প্রীতিবন্ধন আবার ফিরিয়ে আন—তাহলে দাসকে ব্যাথামুক্ত করতে পারবে।
আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও প্রেমাসক্তকে সঞ্জীবিত কর—যার জীবন শ্বাস-প্রশ্বাসে ক্ষীয়মান।

---

৪৮৬. সম্ভবত গ্রানাডার কোন নদী; তবে উত্তর আরবের একটি স্থানও উক্ত নামে পরিচিত।

তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধায় তার হৃদয় বন্দী—তোমরা কি বন্দীকে ধ্বংস করতে ইচ্ছা কর!

*　　*　　*

আমার হৃদয়ে তোমাদের জন্য একজন অতি ঘনিষ্ট—আশার বাক্যালাপে, অথচ সে বহু দূরে;

তার জন্য চন্দ্র পশ্চিমাকাশে উদীয়মান—তাতে প্রেমাসক্তের দুর্ভাগ্য, অথচ সে ভাগ্যবান।

সৎ ও অসৎ নির্বিশেষে সবই সমান—তার প্রেমে, অঙ্গীকারে ও ভর্ৎসনায়।

তার দুই চোখে জাদু, তার দুই ঠোঁটে মধু—সে শ্বাসের মতই আত্মায় ভ্রমণরত;

লক্ষ্যে স্থাপিত শর আল্লাহ্‌র নামে নিক্ষেপিত—আর আমার হৃদয় হিংস্রতার শিকারে পরিণত।

*　　*　　*　　*　　*

যদিও সে বিরূপ হয়, আশায় নিরাশ করে—তবুও প্রেমিকের হৃদয় আবেগে বিগলিত;

তবুও সে আত্মার পরম আত্মীয়—এবং প্রেমে প্রিয়তমের কোন অপরাধ নেই।

তার আদেশ শিরোধার্য—দৃষ্টান্তস্থল—সেই অস্থিপিঞ্জরের, যাকে বিদ্ধ করেছে এবং হৃদয়ের।

তার দৃষ্টিই তাদের বিচারক দৃঢ়তার সাথে—সেখানে প্রেমিকের দুর্বলতার প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন;

উৎপীড়ক থেকে উৎপীড়িতের প্রতিই তার দয়া—এবং প্রতিদানের ক্ষেত্রে পাপীও নিষ্পাপ সমতুল্য।

*　　*　　*

হৃদয়ের কী হল, যখনই মলয় প্রবাহিত হয়—সে নবীন আবেগের ঈদে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

সে দুশ্চিন্তা ডেকে আনে এবং বেদনা—অথচ এমনি জ্বালার জন্য সে নিয়ত উৎসুক।

'লওহে মাহফুজে' তার জন্য লিখিত ছিল—সেই বাণী—'আমার শাস্তি খুবই প্রচণ্ড'

আমার বক্ষপিঞ্জরে এক বহ্নিমান আবেগ—শুষ্ক খড়ের স্তূপে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি—

আমার জীবনরসের অতি অল্পই অবশিষ্ট—শেষ রাতের অন্ধকার ভোরের দীপ্তির ন্যায়।

*　　*　　*　　*　　*

হে হৃদয়, ভাগ্যের সিদ্ধান্তে আত্মসমর্পণ কর—এবং সময়কে প্রত্যাবর্তন ও অনুশোচনায় কাটাও।

অতীত দিনের চিন্তা পরিত্যাগ কর—সেই সন্তুষ্টি ও ভর্ৎসনার বিগত কাহিনী।

সমস্ত বাক্য সেই সদাতুষ্ট প্রভুতে অর্পণ কর—যিনি সূরা ফাতেহার সাহায্যে আভাস দিয়েছেন।

যে ব্যক্তি বিকাশে ও পরিণতিতে সম্ভ্রান্ত—যে সমষ্টিতে সিংহ সভায় পূর্ণচন্দ্র—
তার জন্য বিজয় অবতীর্ণ হবে, যেমন—পবিত্র আত্মার সাহায্যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে।

অবশ্য পূর্বাঞ্চলবাসীদের রচিত মুয়াশ্যিহাগুলোর মধ্যে কষ্ট-কল্পনার ছাপ স্পষ্ট। তাদের এমন রচনার মধ্যে ইবনে সানাউল মুলকের[৪৮৭] মুয়াশ্যিহাটি সুন্দর। তা পূব-পশ্চিমের সর্বত্র সুপরিচিত লাভ করেছে। তার আরম্ভ নিম্নরূপ—

প্রিয়তম! তোমার মুখমণ্ডলের জ্যোতির যবনিকা উত্তোলন কর,
যাতে দাড়িম্বের কর্পূরে অবস্থিত কস্তুরী দৃশ্যমান হয়।
হে মেঘমালা! গিরিশৃঙ্গকে অলঙ্কারের আবরণে আবৃত কর এবং
তাকে সেই বলয় পরিধান করাও যা স্রোতস্বিনীর ন্যায় বঙ্কিম।

যখন আন্দালুসবাসীদের মধ্যে 'মুয়াশ্যিহা' রচনাধারা প্রতিষ্ঠিত হল এবং সাধারণের কাছে উক্ত রচনার প্রাঞ্জলতা, বাক্‌বিন্যাসের কারুকার্য সাদরে গৃহীত হল, তখন বিভিন্ন শহরের অধিবাসীরা তাদের ধারা অনুসরণ করে মুয়াশ্যিহ রচনায় মনোযোগ দিল। তারা আঙ্গিকের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত ধারা অনুসরণ করলেও প্রত্যেকেই নিজ নিজ নাগরিক ভাষাকেই কারক-চিহ্নাদির বন্ধনমুক্ত করে ব্যবহার করতে লাগল। তারা নতুন করে আরও প্রক্রিয়া আবিষ্কার করল এবং তার নাম রাখল 'জযল'। এ ধারায় কবিতা রচনার পর্যায়ক্রমিক বিকাশ বর্তমানকাল পর্যন্ত চলে এসেছে। তারা এক্ষেত্রে যেমন অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছে, তেমনি অনারবত্ব মিশ্রিত তাদের ভাষায় তাতে বাক্‌বৈদগ্ধ্য ও তার বিচরণক্ষেত্র প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছে।

জযল শ্রেণীর কবিতা রচনার ক্ষেত্রে যিনি সর্বপ্রথম অভিনবত্ব দেখিয়েছিলেন, তিনি হলেন আবু বকর ইবনে কযমান।[৪৮৮] যদিও তাঁর পূর্বে উক্ত কবিতা রচনার ধারা প্রবর্তিত হয়েছিল, তবুও তার পূর্বে তার মাধুর্য প্রকাশ পায়নি তার অর্থের গভীরতাও দেখা দেয়নি এবং তার বাক্‌চাতুর্য খ্যাতিলাভ করেনি। তিনি আবৃত বেদুইন মিনহাজাদের শাসন-আমলে ছিলেন এবং তাঁকে সাধারণভাবে জযল রচনাকারীদের নেতা বলা হয়। ইবনে সায়িদ বলেছেন, আমি তাঁর জযল কবিতা মাগরিবের শহরগুলো থেকে অধিকতরভাবে বাগদাদেই আলোচিত হতে দেখেছি। তিনি আরও বলেছেন, আমি আমাদের সময়ের রচনাকারী নেতৃস্থানীয় আবুল হাসান ইবনে জুহদর আল্ আশবেলিকে বলতে শুনেছি—জযল রচনাকারী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে আর কারও ভাগ্যেই এমন ঘটনা ঘটেনি, যেমনটি শিল্পকর্মের উস্তাদ ইবনে কযমানের জন্য ঘটেছে। একদা তিনি কতিপয় সহচরসহ একটি উদ্যানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি ছায়াকুঞ্জে তাঁরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। তাঁদের সামনে শ্বেতমর্মর নির্মিত একটি সিংহমূর্তি ছিল, যার মুখ থেকে বারিধারা নির্গত হয়ে সুবিন্যস্ত প্রস্তর চত্বরে পড়ছিল। তিনি বললেন,

৪৮৭. হযরতুল্লাহ ইবনে জাফর ৫৭৫—৬০৮ (১১৫০—১২১১ খ্রি:) হি:।
৪৮৮. মুহম্মদ ইবনে আবদুল মালিক; মৃত্যু ৫৫৫ (১১৬০ খ্রি:) হি:।

নিকুঞ্জটি এমন এক চত্বরে সংস্থাপিত—যাকে অলিন্দ বলা হয়;
সেখানে সিংহ একটি অজগরকে গ্রাস করেছে—উরুর ন্যায় স্থূল
এবং এমনভাবে সে মুখ ব্যাদান করেছে—যেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগকারীর হাঁ।
তার মধ্য থেকে অজগর প্রস্তর চত্বরে নেমেছে—গর্জমান অবস্থায়।

ইবনে কযমান যদিও কার্ডোভার অধিবাসী ছিলেন, তবুও প্রায়শ তিনি শেভিলায় আসতেন এবং তার নদীর তীরে সময় কাটাতেন। একদিন এক শুভ সংযোগ ঘটল; জযল রচয়িতা একদল কবি একত্রে মিলিত হলেন। তারা নৌবিহারের জন্য নদীতে ভাসমান হলেন। তখন তাদের সাথে সেখানে ধনাঢ্য পরিবারের একটি সুন্দর বালক ছিল। তারা নৌকায় বসে মৎস্য শিকার করার ফাঁকে ফাঁকে তাৎক্ষণিক অবস্থার ওপর কবিতাও রচনা করেছিলেন। তাদের মধ্যে ইসা আল বালিদীই প্রথম আরম্ভ করলেন—

আমার হৃদয় মুক্তি চাইছে, অথচ যে হারিয়ে গিয়েছে;
কারণ প্রেম তাকে আবৃত করে ফেলেছে—কিস্তিমাত!
তুমিত দেখছ সে কেমন নিঃস্ব ও অস্থির হয়ে পড়েছে;
অনুরূপভাবে সে এক বৃহৎ ব্যথার ভারও বহন করছে।
সে সেই সুরমা-আঁকা আঁখির জন্য উন্মাদ আর তা অদৃশ্য
হয়েই তাকে বিপদে ফেলেছে—হায় সুরমারঞ্জিত আঁখি!

অতঃপর আবু আমর ইবনে যাহের আল্-আশবেলী বললেন—

নিমজ্জিত হয়েছে; আর প্রেম সাগরে যে ঝাঁপ দেয়, সে নিমজ্জিত হয়।
সেজন্যই তুমি তাকে দেখতে পেয়েছ, কী দুর্ভাগ্য, কী জর্জরিত!
সে প্রেমের সাথে বিচিত্র লীলায় লীলায়িত হতে চেয়েছিল;
কিন্তু বহু লোকই এ প্রেমলীলায় আত্মত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

এরপর আবুল হাসান আল মুকরী আদ্দানী বললেন—

একটি প্রসন্ন দিন; তার সব কিছুই চমৎকার—
পানীয় ও মধুর সুখ আমার চারপাশে ভ্রমণরত।
'সফসফে'র শাখায় শাখায় পাখির কল-কাকলী
এবং আমার আধারে একটি মৎস্যের উপঢৌকন।

এরপর আবু বকর ইবনে মারতিন বললেন—

সত্যই তুমি যদি ইচ্ছা কর আমি বারংবার ফিরে আসি
এ পবিত্র নদীতে বিহার করতে এবং শিকার করতে।
প্রকৃতপক্ষে এখানে শিকারের বস্তু এ মৎস্যকুল নয়;
বরং মানুষের সেই হৃদয়, যা বক্ষপিঞ্জরে আবদ্ধ।

অতঃপর আবু বকর ইবনে কযমান বললেন—

যখন সে তার ক্ষুদ্র জাল নিক্ষেপের জন্য আস্তিন গুটায়,
তখন তুমি দেখতে পাও যে মৎস্য তার দিকে ধেয়ে আসছে;
কিন্তু মৎস্যের এবংবিধ আগমন জালে আবদ্ধ হবার জন্য নয়;
বরং তার সেই সুকোমল হস্তদ্বয়ে চুম্বন করার জন্য।

তাদের সম-সাময়িককালে পূর্ব আন্দালুসে মুহলিফ আল আসোয়াদ[৪৮৯] খ্যাতি লাভ করেন। তার সুন্দর জযলগুলোর মধ্যে একটি—

আমি আসক্তির ভয় করতাম; অথচ আসক্ত হয়ে পড়েছি।
এ প্রেম আমাকে এক দুর্গম নিবাসে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।
এর ফলে তুমি সেই উজ্জ্বল শুভ্র গণ্ডদ্বয়কে দেখছ,
যা রঙীন শরাবের ন্যায় রক্ত-লাল হয়ে উঠেছে।
হে রসায়ন শাস্ত্রের অনুসন্ধায়ী! আমার চোখেই তা আছে;
সেখানে দেখতে পাবে রৌপ্য কীভাবে স্বর্ণে পরিণত হয়।

এরপর একটি ভিন্ন যুগের আবির্ভাব ঘটে; তার মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য মুদগলিস।[৪৯০] এ ধারায় তার চমৎকারিত্ব বহু বিস্তৃত। তার বিখ্যাত জযলের একটি অংশ—

বিচূর্ণ বৃষ্টির ধারা নামছে—সূর্যকিরণ আঘাত করে;
তুমি দেখতে পাবে একটি রুপালি—এবং অন্যটি সোনালি।
গাছপালা পান করে মাতাল হচ্ছে—শাখাগুলো নেচে উল্লাস করছে;
আমাদের মধ্যে তা আসতে ইচ্ছুক—কিন্তু লজ্জা পায় ও পলায়ন করে।

তাঁর জযলের আরও একটি সুন্দর অংশ—

সূর্যালোক উদ্ভাসিত হয়েছে এবং তারকাকুল বিভ্রান্ত;
উঠ, চল আমরা আলস্যকে পরিহার করি।
সোরাহী থেকে কিঞ্চিৎ মিশ্রিত শরাব—
আমার কাছে মধু অপেক্ষাও মধুরতর।
কে তুমি আমাকে তোমার ধারণা অনুরূপ আচরণ না করার জন্য ভর্ৎসনা কর;
আল্লাহ্ তোমাকে তোমার বিশ্বাস মতো আচরণ করতে সহায়ক হোন।
সে বলে পানীয় পাপের জনয়িত্রী—
এবং বুদ্ধিকে সে বিকৃত করে ফেলে।
দেখছি হেজাজে যাওয়াই তোমার জন্য বেশি যুক্তিযুক্ত;
আমার সাথে বৃথা বাক্য ব্যয়ের জন্য কে তোমাকে টেনে এনেছে।
যাও তুমি মক্কায় হজ্জ ও মদিনায় যিয়ারত কর
এবং আমাকে আমার এ পানীয়ের মধ্যে নিমজ্জিত থাকতে দাও।
যার শক্তি থাকতেও যা করার কোন অবকাশ নেই,
তার জন্য আকাঙ্ক্ষাই কর্মের চেয়ে মূল্যবান।

তাঁদের পরে শেভিলায় ইবনে জহদর আবির্ভূত হন। তিনি 'মিউরেকা' বিজয়ের[৪৯১] উপর এটি জযল রচনা করে অন্যান্য জযল রচয়িতার চেয়ে কৃতিত্ব দেখেন। উক্ত কবিতার আরম্ভটি নিম্নরূপ—

যারা সত্যকে হিংসা করে, তরবারী তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করবে;
বস্তুত সত্য-হিংসুকদের সাথে আমার কোন সংস্রব নেই।

---

৪৮৯. ইয়াখলাফ (?)—রোজেনথাল।
৪৯০. জীবনকাল খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।
৪৯১. মিউরেকা—মালার্কা বিজয় খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের ঘটনা।

ইবনে যায়িদ বলেছেন, আমি তার সাক্ষাৎ পেয়েছি এবং তাঁর শিষ্য আলমাআমাআকেও দেখেছি। তার একটি বিখ্যাত জযলের আরম্ভ হচ্ছে—

হায়, আমি যদি আমার প্রিয়তমার সাক্ষাৎ পেতাম
এবং তার কানে কানে এই একটি কথা বলতে পারতাম—
কেন সে হরিণীর গ্রীবা গ্রহণ করল
আর কেনই বা সে চকোরের মুখচ্ছবি চুরি করল!

অতঃপর তাঁদের পরবর্তীকালে সাহিত্যবিশারদ আবুল হাসান সহল ইবনে মালেক আবির্ভূত হলেন এবং তাঁদের পরে বর্তমান সময়ে আমাদের বন্ধুস্থানীয় আবু আবদুল্লাহ্ ইবনে আমখতিব উজির এক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি ইসলামী জগতে গদ্য ও পদ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। জযল কবিতাধারায় তাঁর সুন্দর সৃষ্টির অংশ বিশেষ—

মিশ্রিত কর পানপাত্র, পূর্ণ কর, বারংবার আমাকে দাও;
হায়, সম্পদ একমাত্র ধ্বংসের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে!

সুফীসাধকের ধারা অনুসরণ করে রচিত তাঁর একটি কবিতার অংশ। এক্ষেত্রে তিনি 'শশতরী'র ভাববিন্যাস ধারা অনুকরণ করেছেন।[৪৯২]

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়ে বহু বিচিত্র গজল তৈরি হয়েছে;
যারা গিয়েছে, তারা যেন ছিল না এবং যিনি ছিলেন তিনি আছেন।

এমন তাঁর আরও একটি সুন্দর কবিতার অংশ—

তোমার কাছ থেকে দূরে থাকা, হে পুত্র, আমার জন্য পরম বেদনাদায়ক
এবং যখন আমি তোমার নৈকট্য লাভ করি, আমার নৌকা ভাসমান হয়।

উজির ইবনে খতিবের সময়ে 'ওয়াদিআশ'-এর অধিবাসী মুহম্মদ ইবনে আবদুল আজিম খ্যাতি লাভ করেন। তিনিও নেতৃস্থানীয় জযল রচয়িতা ছিলেন। তিনি পূর্বোক্ত মুদগলিসের জযলের—'সূর্যালোক উদ্ভাসিত হয়েছে এবং তারকাকুল বিভ্রান্ত' এ উক্তির ধারা অনুসরণ করে জযল রচনা করেছেন। তাঁর উক্তি—

পথভ্রষ্টতা অবারিত হয়েছে হে চতুর বন্ধুরা।
যখন সূর্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করেছে।
প্রতিদিনই একটি নবীন অমরতা আনয়ন কর;
তাদের মধ্যে কোন অসহনীয় মুহূর্তের প্রক্ষেপ ঘটাইও না।
চল 'জেনিল' নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে তাদের উদ্দেশ্যে যাই—
তার সবুজ গাছপালার সেই স্নিগ্ধ পরিবেশে।
বাগদাদকে ত্যাগ কর এবং নীলের কথাও বলিও না;
আমার কাছে তারচেয়ে উক্ত অঞ্চলই সুন্দরতর।
এমন একটি স্থান, চল্লিশ মাইলের বিস্তৃতিও তার কাছে তুচ্ছ—
যখন তার চতুর্দিকে মাতাল বায়ু বইতে থাকে।
সেখানে তবুও ধূলিবালির কোন চিহ্ন দেখা যায় না;
এমন কি চোখে সুরমা হিসেবে ব্যবহারের পরিমাণও।

---

৪৯২. আলী ইবনে আবদুল্লাহ্; মৃত্যু ৬৬৮ (১২৬৮ খ্রি:) হি:।

কেন তা ভিন্নতর হবে না, কেননা তাতে এমন কোন স্থান নেই
যেখানে মধুমক্ষিকা গুঞ্জরণ করে ফিরে না।

জযল কবিতা রচনার এ ধারা বর্তমানে আন্দালুসের সাধারণ কাব্যকৃতি রূপে পরিগণিত হয়েছে। এ ধারাতেই তারা কবিতা রচনা করে; এমন কি আরবি পনেরটি ছন্দই তারা এমন কবিতা রচনায় ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু তাদের ব্যবহৃত ভাষা একান্তই সাধারণ। এ সত্ত্বেও তারা এসব সৃষ্টিকে 'জযলী' কবিতা বলে অভিহিত করে। যেমন তাদেরই এক কবির বাণী—

এক যুগ, বহু বছর ধরে আমি তোমার চক্ষুকে ভালবেসেছি;
কিন্তু তোমার মধ্যে কোন মায়া, কোন কোমল হৃদয় নেই।
তুমি ত দেখছ, তোমার জন্য আমার হৃদয় কীভাবে
কামারের হস্তধৃত লাঙ্গলের ফাল হয়ে পড়েছে।
অশ্রু ঝরছে, আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে
এবং দক্ষিণে বামে অনবরত হাতুড়ির আঘাত পড়ছে।
আল্লাহ্ খ্রিস্টানদেরকে যুদ্ধে লুণ্ঠনের জন্যই সৃষ্টি করেছেন;
আর তুমি একাই প্রেমিকদের হৃদয় হরণ করে ফিরছ।

এ ধারার কবিতা রচনায় দক্ষতা প্রদর্শনকারীদের মধ্যে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে সাহিত্যিক আবু আবদুল্লাহ্-আল্-লুশী[৪৯৩] খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁর এমন একটি কবিতায় তিনি সুলতান ইবনুল আহমদের প্রশংসাকীর্তন করেছেন। কবিতাটি এই—

প্রভাত হয়েছে, উঠ হে বন্ধু, চল শরাব পান করি;
সঙ্গীতের দ্বারা উজ্জীবিত হবার পর চল আমরা হাসতে থাকি।
ভোরের ধাতুপিণ্ড রংয়ের লালিমা ছড়িয়ে দিয়েছে
রাতের কষ্টিপাথরের উপর; চল পানপাত্র পূর্ণ করি।
তুমি ঐ পানীয়কে দেখতে পাবে বিশুদ্ধ স্বচ্ছ—
রৌপ্য তুল্য; কিন্তু ভোরের লালিমা তাকে সোনালী করে তুলেছে।
তা মুদ্রার মতই মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত;
চক্ষের ঔজ্জ্বল্য তার ঔজ্জ্বল্য থেকেই শোভা গ্রহণ করে।
এই তো দিন, হে সহচর, যথার্থ জীবনধারণের জন্য;
ধনাঢ্য ব্যক্তির জীবনযাপন তাতে, আল্লাহ্ কসম, কী মধুর!
রাত্রিও এরূপ চুম্বন ও আলিঙ্গনের জন্য—
মিলনের শয্যায় অনবরত পার্শ্ব পরিবর্তন করে।
সময় দাতা হয়ে উঠেছে, ইতিপূর্বে সে ছিল কৃপণ;
সুতরাং তার হাত থেকে কোন সৌভাগ্যই যেন স্খলিত হয়ে না পড়ে।
যেমন কেউ অতীতে তার তিক্ততা গলাধঃকরণ করেছে;
কিন্তু এখন তার শরাব পান ও তার সুখাদ্য গ্রহণ করছে।
সমাজরক্ষীরা বলেন, হে সাহিত্যিক! এ কী ব্যাপার—
তোমাকে প্রেম ও শরাবের মধ্যে এমন সৃষ্টিশীল দেখছি কেন!
আমার ভর্ৎসনাকারীরা এ সংবাদে আশ্চর্যবোধ করেন;
আমি বলি, হে বন্ধুরা! এতে আশ্চর্যান্বিত হবার কী আছে!

৪৯৩. মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ; ৬৭৮—৭৫২ (১২৬০—৩৫১ খ্রি:) হি: (?)।

একমাত্র কোমল হৃদয়ের অধিকারীরাই সৌন্দর্যকে ভালবাসে
অন্যথায় তারা আল্লাহ্‌র বিরোধিতা করবে অথবা তাঁর আদেশের।
সৌন্দর্যের যথার্থ স্বরূপ কেবলমাত্র সাহিত্যসেবী কবিরই উপলব্ধ;
এ জন্যই সে কুমারী সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষিত হয় এবং বিবাহিতাকে ত্যাগ করে।
অবশ্য পানপাত্র; তা নিষিদ্ধ। তবে তা নিষিদ্ধ
সেই ব্যক্তির জন্য, যে জানে না কীভাবে তা পান করতে হয়।
যে হাত হিসাবের সংখ্যা বিন্যাসে পারদর্শী হয়;
সে কখনও শব্দের সৌন্দর্যের আকর্ষণ করে আনতে পারে না।
বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল ও আবেগতাড়িত ব্যক্তিবর্গ—
এজন্য পাপ করলে তাদের পাপ ক্ষমার্হ বলে গণ্য হয়।
এক উৎফুল্ল হরিণী, যার সংস্পর্শে জ্বলন্ত অঙ্গার নির্বাপিত হয়;
অথচ আমার হৃদয় তেঁতুলের জ্বলন্ত অঙ্গারে লীলায়িত হয়ে ওঠে।
এমন এক মরু-হরিণী, যে সিংহের হৃদয়কেও বিচলিত করে
এবং তাকে দেখবার পূর্বেই কল্পনামাত্র পালিয়ে যায়।
অতঃপর সে তাদের কাছে আসে, মুচকি হেসে তাদেরকে হাসায়
এবং পূর্বের বিমর্ষভাবের পর তারা আবার উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।
তার মুখচ্ছবি অঙ্গুরীয়ের ন্যায়; উজ্জ্বল দন্ত শোভিত—
জাতির বিচক্ষণ বক্তাও সেই মুখচুম্বনের জন্য ভাষণ দান করে।
আহা, কী মণিমাণিক্যের মালাই না তা, হে অবলোকনকারী।
বিন্যাসকারীর দ্বারা সুবিন্যস্ত; অথচ ছিদ্রযুক্ত নয়।
তার ভ্রূ-যুগল ঘনকৃষ্ণ, বলতে গেলে তুলনাহীন;
কেউ যদি তাকে কস্তুরীর সাথে তুলনা করতে চায়, নিন্দনীয় হবে।
তার চুলের গুচ্ছ কাকের পক্ষতুল্য কৃষ্ণ-অন্ধকার;
আমার বিচ্ছেদের রাত্রিও সেই কৃষ্ণতার দিক থেকে বিরল।
এমন একটি গৌরবর্ণ তনু, যা পীযূষকান্তির সাথে তুলনীয়;
রাখাল কখনও তার ছাগল থেকে এমন দুধ দোহন করে না।
তার রক্তিম স্তন্য যুগল, আমি ইতিপূর্বে দেখিনি,
এমন কোন প্রস্তর-গোলক অথবা ইস্পাত—এমনি সুদৃঢ়।
তার এ স্থূল বক্ষদেশের নিম্নভাগে একটি সূক্ষ্ম কটীতট;
এমন সূক্ষ্ম, কেউ খোঁজ করলে হারিয়ে যাবে।
তা বুঝি-বা আমার ধর্ম থেকেও সূক্ষ্ম, যেমন বলা হয়;
পরীক্ষা করে দেখ, আমি বিন্দুমাত্রও মিথ্যা বলছি না।
তোমার সংস্পর্শে এসে আমার কোন্ ধর্ম ও কোন্ বুদ্ধি অবশিষ্ট আছে!
যে তোমাকে অনুসরণ করবে, সে এ দুটি থেকেই বিচ্যুত হবে।
সে প্রহরীর ন্যায় ভারী নিতম্বের বোঝা বহন করছে—
যখন সে প্রিয়জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং তার জন্য অপেক্ষা করে।
সে যদি সহজে না আসে সর্বনাশ হয় অথবা এমন দুর্যোগ
চোখের পলকে দেখা দেয়, মানুষ এসে ভীড় জমায়।
যখন সে আসে, সাধারণ গৃহও প্রাসাদের ন্যায় মনে হয়
এবং সে ফিরে গেলে তাকে মনে হয় একটি অন্ধকার গুহা।
তোমার গুণপনা বুঝি-বা কোন আমীরের চরিত্র-লিপি,

অথবা বালুকার ন্যায় অজস্র, কার সাধ্য গণনা করে!
যিনি শহরগুলোর স্তম্ভ, বিশুদ্ধ আরবিভাষী
যার বাক্‌বৈদগ্ধ্য মানুষকে আকর্ষণ করে আনে।
তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে একক এবং কর্তব্যপরায়ণতার ক্ষেত্রেও;
এ সঙ্গে অভিনব কবিত্বশক্তি ও রচনার অধিকারী।
তিনি বক্ষের মাঝে বর্শার দ্বারা কী দারুণ আঘাত করেন;
তাঁর চারটি গুণের জন্য আকাশও তাকে হিংসা করে;
এমন কে আছে যে আমার হৃদয়ের ন্যায় তা গণনা করবে।
সূর্য তাঁর ঔজ্জ্বল্যের জন্য, চন্দ্র তাঁর ইচ্ছার জন্য,
মেঘমালা তাঁর দানের জন্য এবং তারকা তাঁর মর্যাদার জন্য।
তিনি দানশীলতার তুরগে আরোহণ করেন ও বল্গা ছেড়ে দেন;
ধনিক-সৈনিক নির্বিশেষে সকলের জন্যই তাঁর এ অশ্বারোহণ।
তাঁর রাজকীয় পোশাকের সুবাসে প্রতিটি দিন সুবাসিত হয়
এবং উচ্চবংশীয় রমণীকুল সে সুগন্ধেই পরিপূর্ণ থাকে।
তাঁর সন্নিধানে যারা আসে, সবার উপরেই তাঁর সম্পদ বর্ষিত হয়;
দূত ও অভ্যাগত কেউই নিরাশ হয়ে ফিরে যায় না।
তিনি সত্যকে প্রকাশিত করেছেন, ইতিপূর্বে তা গুপ্ত ছিল;
অতঃপর মিথ্যার পক্ষেও আর গুপ্ত থাকা সম্ভব নয়।
তিনি সংগোপনে ধর্মভীরুতার স্তম্ভকে নির্মাণ করেছেন;
ইতিপূর্বে সময় তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল।
সাক্ষাতের সময় তুমি তাঁকে সমীহ করবে, যেমন তুমি তাঁকে কামনা কর;
তাঁর মুখচ্ছবি কী গাম্ভীর্যপূর্ণ অথচ কী অমায়িক!
তিনি হাসিমুখে যুদ্ধে অগ্রসর হন এবং যুদ্ধ তখন বিমর্ষভাব ধারণ করে;
তিনিই বিজয়ী,—পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই তাকে জয় করতে পারে।
তিনিই যখন যুদ্ধের তাণ্ডবলীলায় তার তরবারী কোষযুক্ত করেন,
তখন তাঁর আঘাত থেকে রক্ষা পাবার কোন উপায় থাকে না।
তাঁর নাম নবী মোস্তাফা (সঃ)-র নামতুল্য এবং আল্লাহ্
তাঁকে সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য নির্বাচিত ও মনোনীত করেছেন।
তুমি তাঁকে খলিফার ন্যায় দেখতে পাবে, বিশ্বাসীদের নেতা;
তিনি সৈন্যদল পরিচালনা করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রের শোভা বর্ধন করেন।
তাঁর নেতৃত্বের সামনে সকলের শির অবনত হয়ে আসে;
অথচ সকলেই তাঁর হস্তচুম্বন করার জন্য একান্তই উৎসুক।
তাঁর পরিবারে যুগের সব পূর্ণচন্দ্র একত্র হয়েছে;
তাঁর মর্যাদায় ক্রমবর্ধমান,—হ্রাসপ্রাপ্তি কোন লক্ষণ নেই।
তারা সমুন্নতি ও গৌরবে সব থেকে দূরে অবস্থিত এবং
লজ্জায় ও বিনয়ে তারা সবার একান্ত নিকটবর্তী।
আল্লাহ্ তাদেরকে আকাশমণ্ডলের আবর্তন পর্যন্ত স্থায়ী করুন;
যতদিন তাতে সূর্যোদয় ঘটবে ও তারকা দীপ্তি দিবে, ততদিন।
যতদিন এ কবিতা সুরের ছন্দে গীত হতে থাকবে—
হে হারেমের সূর্য! তোমার জ্যোতি অস্তমিত হবে না।

অতঃপর মাগরিবের শহরবাসীরা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে অন্য একটি বিষয়ের আবির্ভাব ঘটাল; তা মুয়াশ্যিহার ন্যায় মিশ্রিত ছন্দের কবিতা। তাতেই তারা তাদের নাগরিক ভাষা ব্যবহার করে তার নাম রাখল 'আরোজল বালাদ' (নগর-ছন্দ)। যে ব্যক্তি প্রথম এ রচনা-রীতির প্রবর্তন করেন, তিনি আন্দালুস থেকে ফেজে এসে বসবাস করছিলেন এবং তার নাম ছিল ইবনে উমাইর। তিনি ময়াশ্যিহার ধারায় এ কবিতা রচনা করলেন এবং তাতে খুব কমক্ষেত্রেই কারক-চিহ্নাদির ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। তাঁর কবিতার প্রারম্ভ নিম্নরূপ—

নদীর তীরে ভোরবেলা উদ্যানের বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট
ঘুঘুর ক্রন্দনধ্বনি আমাকে অশ্রুসিক্ত করে তুলেছে।
ভোরের হাত তখন রাতের আঁধার কালিমা মোচন করেছিল
এবং 'আকাহ' ফুলের দাঁত বেয়ে শিশিরের ঝর্ণা ঝরছিল।
উদ্যানে তার ভোরের অতিথি; কুয়াশা তখন ছিন্নভিন্ন—
যেন কুমারীবালার বক্ষদেশে বিন্যস্ত মণিমানিক্যের মালা।
পানি তোলার চাকগুলো থেকে অশ্রুধারা গড়াচ্ছিল;
যেন ফলের চারিধার বেষ্টনকারী সাপের আনাগোনা।
পরস্পর জড়িত শাখাগুলো যেন পায়ের গোছায় পরিহিত খাড়ু;
এসবই সমগ্র উদ্যানকে ঘিরেছিল একটি চুড়ির ন্যায়।
শিশিরের হাত ফুলকলির ঘোমটা উন্মোচন করছিল।
এবং বায়ু তার কস্তুরী সুবাস বহন করে ফিরছিল।
শুভ্র আকাশ কস্তুরী কাজল মেঘমালায় আবৃত হচ্ছিল।
আর বায়ু তার আঁচল জড়িয়ে তাকে মুছছিল।
আমি দেখলাম একটি ঘুঘু পাতার মাঝখানে ক্ষুদ্র শাখায়
শিশিরের ফোঁটায় তার পাখা-পক্ষ সমস্ত ভিজে গিয়েছে।
সে এক প্রবাসী আশ্রয়প্রার্থীর মত করুণা প্রার্থনা করছে;
নবীন পালক চাদরের ন্যায় তার সর্বাঙ্গ ঢেকে রেখেছে।
অবশ্য তার ঠোঁট লাল ও পায়ের রং-ও মেহেদী-রঙিন;
একটি সুবিন্যস্ত মণির মালায় তার কণ্ঠদেশ আবরিত।
সে শাখার ফাঁকে এক প্রণয়কাতর ব্যক্তির ন্যায় উপবিষ্ট;
একটি পাখা যেন তার তাকিয়া আর অন্যটি গায়ে জড়িয়েছে।
সে তার হৃদয়ের ব্যথা-বেদনা সম্পর্কেই অভিযোগ করছিল;
এজন্যই তার চক্ষু বক্ষস্থানে নিয়োজিত এবং কণ্ঠে আর্তনাদ।
আমি তাকে বললাম, হে ঘুঘু আমার চোখে নেই;
তোমাকেও দেখছি অনবরত কাঁদছ, অশ্রু বর্ষণ করছ।
সে আমাকে বলল, যতক্ষণ অশ্রু শুষ্ক না হয় আমি কাঁদব;
বাকি জীবন অশ্রুহীন কান্নায় চিৎকার করে ফিরব।
একটি শাবকের জন্য, যে উড়ে গিয়েছে আর ফিরে আসেনি;
আমি সেই নূহের কাল থেকে এ কান্না ও ব্যথার সাথে পরিচিত।
এ বুঝি অঙ্গীকার পূরণ আর এরূপই বুঝি বিশ্বস্ততার পরিচয়;
দেখ না আমার চোখের ভুরুগুলো ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে।
কিন্তু তোমরা! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এক বছর ধরে কাঁদে,
বলবে, এ কান্না আর হাহাকার আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে।

বললাম, ঘুঘু হে, তুমি যদি ব্যথার সাগরে এমন ডুবেই থাক,
তাহলে কি আমার জন্যও কান্নায় দীর্ঘশ্বাসে শোক প্রকাশ করতে পার না!
আমার হৃদয়ে যা আছে, যদি তোমার হৃদয়ে তা থাকত।
তাহলে তোমার পায়ের নিচে এ শাখার অবলম্বনও থাকত না।
কত বছর হল, তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি বিচ্ছেদ জ্বালা সহ্য করছি;
ফলে এমন হয়েছে যে আজ আমাকে কোন চক্ষুই দর্শনীয় মনে করে না।
আমার দেহ শীর্ণতা ও রোগের উপসর্গাদির দ্বারা আবৃত হয়েছে;
বিশেষ করে দেহের শীর্ণতাই আমাকে দর্শনার্থীদের দৃষ্টি থেকে লুকায়িত রেখেছে।
হায়, আমার মৃত্যু যদি আসত, তাহলে আমি এখনই মরতাম;
বাস্তবিক যারা মরেছে, তারাই শান্তিতে ঘুমোতে পারছে।
সে আমাকে বলল, যদি আমি এ উদ্যানের পত্রপল্লবে ঘুমিয়ে পড়ি;
আমার ভয় হয়, আমার আত্মাটিও অন্তরে প্রবেশ করবে।
এজন্যই আমি অশ্রুকে রঙিন করেছি, যাতে এ শুভ্র বর্ণের উপর
তা আমার কণ্ঠে অঙ্গীকারের হাত হিসেবে পরকালে ঝুলতে থাকে।
অবশ্য আমার চক্ষুর দিকটি, সে সম্পর্কে সবাই জানে যে,
আমার দেহ ভস্মে পরিণত হলেও তা একটি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিদ্যমান।[৪৯৪]

ফেজবাসীরা তার এ রচনা খুব পছন্দ করল এবং আগ্রহের সাথে আবৃতি করতে লাগল। তারা এ ধারায় কবিতাও রচনা করতে লাগল এবং কারক-চিহ্নাদির ব্যাপারটিতে যেহেতু তারা অভ্যস্ত নয়, সে জন্যই তা পরিত্যাগ করল। এমন কবিতা পঠন-পাঠনের বিষয়টি তাদের মধ্যে বিস্তৃত হল এবং অনেকেই তার রচনায় দক্ষতা দেখাতে সমর্থ হল। তারা তাকে নানা শাখায় বিভক্ত করে 'মযদোয়াজ', 'কাযী', 'মালাবা' ও 'গজল' প্রভৃতি নামে অভিহিত করল। তাদের মধ্যকার জোড় তৈরি ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের ফলে বিচিত্র সব অভিধার সৃষ্টি হল। 'মযদোয়াজে'র মধ্যে ইবনে সুজার রচনাটি উল্লেখযোগ্য। ইনি 'তাজা'র অধিবাসী মাগরিবের বিশিষ্ট কবিদের অন্যতম। কবিতাটি এই—

সম্পদ পৃথিবীর সৌন্দর্য ও আত্মার শক্তি বিশেষ;
এটি অসুন্দর মুখমণ্ডলকেও সুন্দর করে তোলে।
দেখ, যার হাতে পয়সার প্রাচুর্য বিদ্যমান;
তার জন্যই কথা বলার শক্তি ও উচ্চ পদমর্যাদা।
যার প্রচুর সম্পদ আছে, সে ছোট হলেও বড়—
এবং যিনি জাতির গৌরব, দারিদ্র্যের জন্য তিনিও ছোট হয়ে যান।
এজন্যই আমার হৃদয় জ্বলে ওঠে, এজন্যই বিচলিত হয়;
যদি না ভাগ্যের পায়ে ফিরতে হত, তবে তা ফেটে যেত।
ফলে শরণাপন্ন হয়, এমন এক ব্যক্তি—যে তার জাতির নেতৃস্থানীয়,
এমন এক ব্যক্তির, যার কোন কৌলিন্য নেই, সমীহ করার কিছু নেই।
এমন বৈপরীত্যের জন্য ব্যথিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই;
এর দ্বারা বিছানার সাদা চাদরও রঙিন হয়ে ওঠে।

৪৯৪. রোজেনথালের অনুবাদে এর পরও দুটি ছত্র বিদ্যমান।

হায়, লেজগুলো মস্তকের সম্মুখভাগে স্থাপিত হয়েছে
এবং নদী পানপাত্রবাহীর কাছে পানি প্রার্থনা করছে।
মানুষের দুর্বলতা এজন্যই দায়ী, না সময়ের বিকৃতি এরূপ ঘটিয়েছে;
কেউ জানে না কাকে এজন্য ভর্ৎসনায় ব্যতিব্যস্ত করতে হবে।
হায়, যদি এমন হত যে, অমুক অমুকের পিতা হয়ে গিয়েছে;
তাহলে তার জবাব কীভাবে দেওয়া হয়,
আমরা বহুদিন বেঁচেছি, আল্লাহ্‌র দয়া, ফলে স্বচক্ষে দেখলাম,
সুলতানদের আত্মাগুলো কুকুরের চামড়ায় আবৃত রয়েছে।
মহৎ প্রাণের অধিকারীরা দুর্বল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছেন;
তাঁরা যেখানে থাকেন, মর্যাদা থাকে তা থেকে ভিন্ন স্থানে।
তাঁরা এরূপই চিন্তা করেন; অথচ মানুষ তাঁদেরকে ভাবে জ্ঞানবৃদ্ধ,
দেশের মুখপাত্র এবং নেতৃস্থানীয়দের ভিত্তিভূমি।

তাদের রচনাধারার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইবনে সুজার 'মযদোয়াজে'র কতকাংশ—

যে ব্যক্তি সময়ের লাবণ্যে হৃদয় বিকিয়েছে, তার বড় কষ্ট;
সাবধান হে ভাইজান! সৌন্দর্যকে তোমাকে নিয়ে খেলতে দিও না।
তাদের মধ্যে সব সৌষ্ঠবই অঙ্গীকার করেই ভঙ্গ করেছে;
এমন কমই আছে, যার উপর তুমি ও তোমার উপর সে ভরসা করতে পারে।
তারা প্রেমিকদের প্রতি অকৃপণ; কিন্তু অন্যত্র বাধাসৃষ্টিকারী।
তারা ইচ্ছা করে মানুষের অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করতে অগ্রসর হয়।
তারা যদি এক মুহূর্তে মিলনের কথা বলে'ত অন্য মুহূর্তে বিচ্ছেদের কথায় যায়;
যদি অঙ্গীকার করে, তাহলে সর্বাবস্থায় তা ভঙ্গ করতে তৎপর হয়।
কী লাবণ্যময় ছিল সে, আমার অন্তর তার জন্য উন্মুক্ত;
আমার গণ্ডের চামড়া দিয়ে তার জন্য পাদুকা বানিয়ে দিয়েছি।
আমার হৃদয়ের মধ্য ভাগে তার জন্য শয্যা পেতেছি
এবং আমার হৃদয়কে বলেছি, তোমাতে সমাগতজনকে স্বাগত জানাও।
সেজন্য তোমার উপর যে নিপীড়ন আসবে, তা সহজভাবে গ্রহণ কর;
কারণ প্রেমের এ বিভীষিকা তোমাকে অবশ্যই পৌঁছাতে হবে।
তাকে আমার উপর শাসক নিযুক্ত করেছি এবং তার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছি।
আহা, তুমি যদি আমার অবস্থা দেখতে, যখন সে দেখে।
তা তখন জলাশয়ে ভাসমান একটি কাঠখণ্ডের ন্যায় হয়ে যায়;
যা অনবরত ডুবছে, তবু কোরবানীর পশুর ন্যায় পিপাসার্ত।
তৎক্ষণাৎ তার অন্তরের ভাষা আমি বুঝতে পারি এবং
তার ইচ্ছা ব্যক্ত না করলেও আমার বোধগম্য হয়ে ওঠে।
আমি তার ইচ্ছামত সব কিছু আনতে চেষ্টা করি, যদিও তা হয়
বসন্তকালের আঙুর রস অথবা রাত্রিকালের পানীয়।
আমি বাজার থেকে সংগ্রহ করি, প্রয়োজনে ইস্পাহানে যাই;
যখনই সে বলে, আমার এর প্রয়োজন; তখনই বলি, তুমি এটি পাবে।
... এভাবে কবিতাটি শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে গিয়েছে।

এমন 'মযদোয়াজ' রচয়িতাদের মধ্যে তিলমিসানে আলী ইবনে আল-মুয়াজ্জেন খ্যাতি লাভ করেন। অদূর অতীতে 'মেকনাসা'র সীমান্তবর্তী অঞ্চল যারহুনে 'আল কাফিফ' নামে পরিচিত এক ব্যক্তিও এ বিষয়ে দক্ষ ছিলেন এবং তিনি এতে অভিনবত্ব দেখান। তার সুন্দরতম যে রচনাটি আমার স্মৃতিতে অমলিন হয়ে রয়েছে, তা হল সুলতান আবুল হাসান ও বনি মারিনের আফ্রিকিয়ায় গমন এবং কায়রোয়ানে তাদের পরাজয় বরণ সম্পর্কীয় বর্ণনা।[৪৯৫] এ কবিতায় তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ও অন্যদের ভাগ্যে যা ঘটেছে, তার সাথেও পরিচিত করাচ্ছেন এবং এ সঙ্গে তাদের আফ্রিকিয়ায় অভিযান পরিচালনার জন্য নিন্দাও শুনাচ্ছেন। তার কবিতাটি এ ধারার একটি 'মালাবা' জাতীয় রচনা। তিনি তার প্রারম্ভেই এমন একটি বিষয় বর্ণনা করেছেন, যা কবতিার প্রারম্ভ রচনায় বাক্‌বৈদগ্ধ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ও উদ্দিষ্ট বিষয় উপস্থাপনে অভিনবত্বের দাবিদার। পরিভাষায় অনুরূপ সূচনাকে 'বারাআতুল ইস্তেহলাল' বা উত্তম সূচনা বলে অভিহিত করা হয়।

পবিত্রতা তাঁরই, যিনি আমীরদের অন্তরের অধীশ্বর
এবং সবযুগে সবমুহূর্তে তাদের চুলের ঝুঁটি তাঁর হস্তধৃত।
আমরা যদি তাঁর আনুগত্য স্বীকার করি, তিনি মহান বিজয় দান করেন
আর আমরা যদি তাঁর অবাধ্য হই, তাহলে সব অপমানে তিনি শাস্তি দেন।

এভাবে অগ্রসর হয়ে তিনি বিষয় পরিবর্তন করত মাগরিবের সেনাবাহিনী সম্পর্কে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

যদি পার ছাগল হও, কখনও রাখাল হতে যেও না।
কারণ রাখাল তার রাখালী সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।
তাঁর উপর দরুদ পাঠ কর, যিনি আমাদেরকে আহ্বান করেছেন
ইসলাম এবং পরিপূর্ণ সমুন্নত এক জীবন সন্তোষের দিকে।
সত্যনিষ্ঠ খলিফাদের উপর এবং তার অনুগামীদের উপর।
তাঁদের পরে যাকে ভাল লাগে, স্মরণ কর ও সে সম্পর্কে কথা বল।
হে হজব্রত পালনকারী দল, যারা মরুপ্রান্তর অতিক্রম করছে;
তোমরা বিভিন্ন অঞ্চলকে অধিবাসীদের একসাথে বর্ণনা করিও।
ফেজের সৈন্যবাহিনী অতুজ্জ্বল জাঁকজমকপূর্ণ—
বিচিত্র আকাঙ্ক্ষার প্রতীক সুলতান তাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছে?
হে হজযাত্রীগণ, আল্লাহ্‌র নবীর কসম, যাঁর মাজার দর্শন করেছ
এবং সমৃদ্ধির আকর হেজাজের মরুপ্রান্তরে তোমরা অতিক্রম করেছ।
আমি এখন তোমাদেরকে মাগরিবের সৈন্যদল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি;
যা কৃষ্ণ আফ্রিকার মরুদেশে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে এবং
সেই শাসক সম্পর্কে, যিনি দান-ধ্যান তোমাদের পাথেয় সমৃদ্ধ করেছেন
ও হেজাজের মরুপ্রান্তরকে করে তুলেছেন প্রাচুর্যের অঞ্চল।
ভাটার টানের বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়িয়েছেন প্রাচীরের ন্যায় এবং
আশঙ্কা কাতরতার পরিবর্তে আঘাতকে তিনি পর্যুদস্ত করেছেন।
ফলে তারা ধ্বংস হয়েছে ভূমিতলে বিধ্বস্ত 'সদোমে'র ন্যায়;

৪৯৫. উক্ত ঘটনা ১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দে ঘটে।

যেখানে এখন বিচরণশীল হরিণীদের প্রাচুর্য ঘটেছে।
হায়, যদি তিউনিসের পশ্চিমাঞ্চল
এবং মাগরিবের অঞ্চলগুলোর মধ্যে একটি সেকান্দরী প্রাচীর থাকত;
তার পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সুগঠিত,—
তার এটি স্তর লোহার ও অন্য স্তরটি ব্রোঞ্জের নির্মিত হত—
তাহলেও পাখি আমাদেরকে সংবাদ এনে দিত
অথবা বাতাস তাদের একটি মাত্র সংবাদও বহন করে আনত।
কী জটিল সেই বিষয়গুলো আর কী যে মন্দ!
যদিও তা প্রতিদিন আম-দরবারে উচ্চারিত হোক না কেন।
তাদের সংস্পর্শে পাথরেও রক্ত দেখা দেয় ও তা ফেটে যায়;
পাহাড় ধ্বসে পড়ে এবং হরিণীরা ভীত সন্ত্রস্ত দৌড়াতে থাকে।
তোমার অনসন্ধায়ী বুদ্ধির কথা আমাকে বুঝিয়ে বল
এবং একাগ্রচিত্তে তুমি আমার জন্য চিন্তা কর;
এমন কি কোন কবুতর শিখেছে অথবা কোন নর্তক—
সুলতানের কাছ থেকে বিখ্যাত কিছু এবং তাকে চুম্বন করেছে সাতবার!
যথার্থ সতর্ক দৃষ্টির অধিকারী গল্পকারের কাছে প্রকাশ পেয়েছে;
এমন কিছু নিদর্শন যা মিনারে দাঁড়িয়ে বলা যায়!
বরং তারা এমন এক জাতি উলঙ্গ বস্ত্রহীন;
একান্ত মূর্খ, তাদের বাসস্থান নেই— তার সম্ভাবনাও নেই।
তারা জানে না, তারা কীভাবে পরাজয়কে কল্পনা করতে পারে;
অথচ তারা কীভাবে 'কায়রোয়ান' শহরে প্রবেশ করল!
হে মালিক আবুল হাসান! আমরা দ্বারের কাছে পৌঁছেছি
কোন একটি বিষয়ে; চলুন, আমরা তিউনিসের দিকে অগ্রসর হই।
আপনার জন্য আমরাই যথেষ্ট; 'জারিদ' ও 'ঘাবে'র প্রয়োজন নেই।
আপনি এ কৃষ্ণ আফ্রিকিয়ার বেদুইনদেরকে দিয়ে কী করবেন?
আপনি কি উমর ইবনে আল খাত্তাবের কথা শুনতে পাননি?
যিনি 'ফারুক' নামে খ্যাত, যিনি বহু নগরীর বিজেতা ও প্রতারিত।
তিনি ইরাক, হেজাজ ও পারস্য সম্রাটের মুকুটের অধিকারী
এবং তিনি আফ্রিকিয়ার প্রবেশমুখের কিয়দংশ জয় করেছিলেন।
আমার জন্ম বৃথা হোক, যদিও উচ্চারণ করতে খারাপ লাগে;
তবু তিনি বলেছেন, এখানে আমরা ভ্রাতৃবৃন্দ দ্বিধাবিভক্ত হবে।'
এ 'ফারুক' সমস্ত মানব সমাজের 'মণি' স্বরূপ;
তিনিই এ আফ্রিকিয়া সম্পর্কে এরূপ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন।
ফলে আফ্রিকিয়া উসমানের সময় পর্যন্ত স্থগিত ছিল এবং
শুদ্ধ মত এই যে ইবনে যুবায়ের তা জয় করেছেন।
তারাই দ্বারা তার লুণ্ঠিত সম্পদ রাজকোষে প্রবেশ করেছে;
উসমানের মৃত্যু হয়েছে এবং আমাদের উপর বায়ুর গতি ফিরে গিয়েছে।
মানুষ তিনটি নেতৃত্বের অধীনে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল
এবং যারা নিশ্চুপ ছিল, তাদের হাতেই ছিল বাগডোর।
যখন পুণ্যাত্মা মুসলমানদের সময়েই এ অবস্থা হয়েছিল;
তখন আমরা এ আখেরী জামানায় আর কী করব!
নগরবাসীগণ তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকায় এবং

তাদের বুধ ও শনি গ্রহ সম্পর্কীয় ঐতিহাসিক বিবরণে
এরূপ ধারণার সত্যতা প্রমাণে কবিতা উপস্থিত করেন
'সিক্ক', 'সাতিহ' ও ইবনে মেরানার।
তা এই যে, মারিনীরা যদি তিউনিসের প্রাচীরের উপর
নির্ভর করে, তাহলে মূলশুদ্ধ ধ্বসে পড়বে।
আমরা স্মরণ করতে পারি, যা উজিরদের প্রধান—
ইসা ইবনে আবুল হাসান—উন্নত মহান—বলেছেন।
তিনি আমাকে বলেছেন, দেখ, আমিই সেই, যে বুঝতে পারে;
কিন্তু যখন ভাগ্যের পালা আসে, দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যায়।
আমি তোমাকে বলতে পারি, মারিনীদেরকে কিসে এনেছে,
ফেজের রাজধানী থেকে এ 'দিয়াবের' বেদুইনদের দিকে!
আমাদের মালিক ইবনে ইয়াহিয়ার মৃত্যুতে লাভবান হতে ইচ্ছুক;
তিনি তিউনিসের সুলতান ও বহুদ্বারের অধিকারী।

অতঃপর কবি সুলতানের অভিযান ও সৈন্য পরিচালনার শেষ গন্তব্য পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন এবং আফ্রিকিয়ার বেদুইনদের সাথে তাঁর সম্পর্কের বিষয়ও শেষ পর্যন্ত এসেছে। এ বর্ণনায় কবি বিরল অভিনবত্বের সর্বপ্রকার নিদর্শন তুলে ধরেছেন।

তিউনিসবাসীরাও তাদের নাগরিক ভাষায় 'মালাবা' কবিতা রচনার ধারাটি নতুনভাবে বিস্তৃত করেছে। কিন্তু তাদের সৃষ্টির অধিকাংশই অতিশয় নিম্নমানের। এ বিশেষ কারণেই তাদের কোন কবিতার নিদর্শন আমি স্মরণ রাখতে পারিনি।

পূর্বাঞ্চলে 'মুয়াশ্শিহা' ও 'জযল' কবিতা

বাগদাদের সাধারণ মানুষও এক ধরনের কাব্যচর্চা করত; তাকে বলা হত 'মাওয়ালিয়া'। তার অধীনে বিচিত্র বিষয় বিদ্যমান; তাদের কতকগুলোকে তারা 'কৌমা' ও 'কান ও কান' বলে অভিহিত করে। তাদের মধ্যে এক পঙ্‌ক্তির কবিতাও আছে; দুই পঙ্‌ক্তির কবিতাও আছে। তাদের কাছে গৃহীত সব প্রকার বিভেদ সত্ত্বেও তারা তাদের প্রত্যেকটিকেই 'দো-বয়েত' বলে আখ্যায়িত করে। তাদের অধিকাংশ কবিতাই চারটি পঙ্‌ক্তিতে বিন্যস্ত।

মিশরের কায়রোর অধিবাসীরা এ বিষয়ে তাদেরকে অনুসরণ করেছে এবং বিরল দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। তারা তাদের স্থানীয় ভাষায় বাক্‌বৈদগ্ধ্যের সর্বপ্রকার রীতিতে কবিতা রচনায় প্রাচুর্য এনেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অদ্ভুত রচনাশৈলী দেখিয়েছে। আমি সফী আল হিল্লীর[৪৯৬] সংকলন গ্রন্থে দেখেছি; তার উক্তির মধ্যে একটি হল, "মাওয়ালিয়া 'বাসিত' ছন্দে রচিত এবং তার চারটি পঙ্‌ক্তি ও চরটি অন্ত্যমিল বিদ্যমান। তাকে 'সাউত' (সুর) ও 'বয়তান' (পয়ার) বলা হয়। তা 'ওয়াসিত'-এর অধিবাসীদের আবিষ্কার। 'কান ও কান' একই অন্ত্যমিলে রচিত হয়; তার অর্ধপঙ্‌ক্তিগুলোতে বিভিন্ন ধরনের মাত্রা থাকে। কবিতার প্রথম অর্ধপঙ্‌ক্তি তার দ্বিতীয় অর্ধপঙ্‌ক্তির চেয়ে দীর্ঘ হয় এবং তার অন্ত্যমিল 'হরফে ইল্লত' বা আলিফ, ওয়াও, ইয়া বর্ণযুক্ত হয়ে থাকে।

৪৯৬. আবদুল আজিজ ইবনে সারায়া আলী হিল্লী; ৬৭৭—৭৪৯ (১২৭৮—১৩৪৯ খ্রি:) হি:।

কবিতার এমন সৃষ্টিকার্যের আবিষ্কার বাগদাদীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। আমাদের জন্য 'কান ও কান'-এর একটি উদাহরণ—

ভুরুর ইশারায় আমরা যে, কথা বলেছি, তা স্বয়ং প্রকাশ;
মূকের মাতাই শুধু মূকের ভাষা বুঝতে পারে।

সফী আল হিল্লীর বক্তব্য এখানেই সমাপ্ত। আমার স্মৃতিতে তাদের এক কবির যে উক্তিটি বিধৃত রয়েছে, তা অতীব সুন্দর!

এ আমার সজীব ক্ষতস্থান,—রক্ত ঝরছে
এবং আমার হত্যাকারী, হে ভাই—প্রান্তরে ক্রীড়ামগ্ন!
তারা বলল, তোমার রক্তের শোধ নিব,—বললাম, এটি আরও মন্দ।
আমার ক্ষতস্থানে ঔষধ করুক—তা-ই সর্বাপেক্ষা উত্তম।

তাদের অন্য একজনের—

রাত্রিবেলা তাঁবুর দরজায় শব্দ করলাম, বলল, শব্দকারী কে তুমি?
বললাম, বিপদাপন্ন একব্যক্তি, ডাকাতও নই, চোরও নই।
সে হাসল, তার দন্তপাতি থেকে আমার উপর বিদ্যুপাত হল;
আমি আমার অশ্রু সাগরে ডুবে বিভ্রান্ত হয়ে ফিরলাম।

অন্য একজনের—

তার সাথে এমন সময় কেটেছে, যখন সে বিচ্ছেদের আশ্বাস দিতে পারত না;
আমি প্রণয়-জ্বালার অভিযোগ করলে সে বলল, তোমার জন্য আমার চোখ।
কিন্তু যখন অন্য এক সুন্দর যুবক তার চোখ কেড়ে নিল—তখন
আমি তাকে অঙ্গীকার স্মরণ করালে সে বলল, তা তোমার কাছে আমার ঋণ;

অন্য একজন 'হাশিশ' (ভাঙ)-এর বর্ণনায়—

এমন বিশুদ্ধ মাদকতাপূর্ণ, যার নেশা সর্বদাই লেগে থাকে;
সে আমাকে মদ্য, শুঁড়ী এবং পরিবেশনকারিণীর প্রয়োজন মিটিয়েছে।
সে এক প্রবীণা বেশ্যা, তার ছলাকলা আমার মধ্যে আগুন জ্বালায়;
আমি তা আমার আঁতে লুকিয়ে রাখি, কিন্তু আমার চোখ প্রকাশ করে দেয়।

অন্য একজনের—

কে তুমি ভালবাসার সন্তানদের সাথে মিলতে চাও, বাহ্!
বিচ্ছেদের জ্বালা কীভাবে অন্তরকে পোড়ায়, আহাহা-আহ্!
আমার অন্তরে লুকায়িত হুঁ হুঁ; আমার ধৈর্য কী, বাহ্!
আমার চোখে সব ধরা 'কাখ্'; শুধু তোমার অস্তিত্ব, দাহ্!

অন্য একজনের—

আমি তাকে বললাম, যখন বার্ধক্য আমাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে;
'আমাকে একটি ভালবাসার চুম্বন উপহার দাও, হে মা...!'

সে বলল, অথচ সে ইতিমধ্যে আমার অন্তঃস্থলকে দাগে দাগে জর্জরিত করেছে;
'আমি বুঝি না, এ সাদা কার্পাস কী করে একটি জীবিত লোকের মুখ আবৃত করে!'

অন্য একজনের—

সে আমাকে দেখে হাসল; আমার অশ্রুমেঘ বিদ্যুচ্চমকের আগেই ঝরল।
সে ঘোমটা খুলল, পূর্ণিমা চাঁদ পূর্বাকাশে প্রকাশ পেল।
সে চুলের অন্ধকার ছড়াল, হৃদয় তার মধ্যে পথ হারিয়ে বসল।
সে তুলে নিল, ভোরের আভাসে আমরা পথ খুঁজে পেলাম।

অন্য একজনের—

হে কাফেলা চালক! উটগুলোকে যতদূর সম্ভব জোরে হাঁকিয়ে নিয়ে যাও
এবং ভোরের পূর্বেই আমার প্রিয়তমার আবাসে গিয়ে গতি থামাও।
গোত্রের মধ্যে চিৎকার করে বল, কেউ যদি পুণ্য লাভ করতে চাও,
তাহলে জাগ্রত হও এবং বিচ্ছেদের ফলে নিহত ব্যক্তির জানাজা পড়াও।

অন্য একজনের—

যে চোখ তোমার দেহে বিচরণ করত, আজ তা রাত্রিযাপন করে
তারকার দেহ বিচরণ করে এবং অনিদ্রাই তার খাদ্য।
বিচ্ছেদের শত তীর আমার দেহে অব্যর্থ—একটিও ব্যর্থ হয়নি;
হায় আমার সান্ত্বনা, আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রচুর পুণ্য দিন, সে মরেছে।

অন্য একজনের—

আমি ভালবেসেছি তোমাদের সমৃদ্ধ অঞ্চলে, হে নিষ্ঠুর বিলাসীরা;
এমন এক হরিণীকে, যার চিন্তায় সিংহ-হৃদয়ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।
এমন একটি শাখা, নত হলে কুমারীদের হৃদয়ও বিচলিত হয়
এবং যখন সে উত্থিত হয়, পূর্ণিমার চাঁদও তার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।

তারা যাকে 'দো-বয়েত' বলে অভিহিত করে, তার একটি উদাহরণ—

আমি যাকে ভালবাসি, সে স্রষ্টার কসম খেয়ে বলেছে,
সে তার মূর্তিকে ভোরের সাথে সাথে পাঠাবে।
হে আমার প্রণয়ের অগ্নি, তুমি জ্বলতে থাক;
সারা রাত, যাতে সে তার আলো দেখে পথ খুঁজে পায়।

জেনে রাখুন, এসব কাব্য-সামগ্রীতে বিধৃত বাক্‌বৈদগ্ধ্যের আস্বাদ লাভ করতে হলে যে-কোন ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট ভাষার সাথে পরিচিত হতে হবে এবং তার ব্যবহার ও কথোপকথনে ভাষাভাষীদের মধ্যে অধিকতরভাবে মেলামেশা করতে হবে। এর ফলে সেই ব্যক্তির মধ্যে সেই যোগ্যতা দেখা দিবে, যে যোগ্যতার কথা আমরা আরবি ভাষার ক্ষেত্রে বলেছি। এ যোগ্যতা না থাকার কারণেই আন্দালুসবাসীরা মাগরিবের অধিবাসীদের কবিতায় বিধৃত বাক্‌বৈদগ্ধ্যকে বুঝতে পারে না। মাগরিববাসীরাও অনুরূপভাবে আন্দালুসী ও পূর্বাঞ্চলবাসীদের বাক্‌বৈদগ্ধ্য বুঝতে সক্ষম হয় না। আবার

পূর্বাঞ্চলবাসীদের পক্ষেও একইভাবে আন্দালুস ও মাগরিবের বাক্‌বৈদগ্ধ্য অনুধাবন করা সম্ভব হয়। কারণ তাদের নাগরিক ভাষা ও তার বিন্যাস পদ্ধতি বৈচিত্র্যমণ্ডিত। তাদের প্রত্যেকেই নিজ ভাষার বাক্‌বৈদগ্ধ্য উপলব্ধি করতে সক্ষম এবং নিজ ভাষাভাষীদের কবিতার সৌন্দর্য আস্বাদন করতে পারঙ্গম।

'আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্যে জ্ঞানীদের জন্য প্রচুর নিদর্শন রয়েছে।'[৪৯৭]

৪৯৭. কোরান; ৩০, ২২।

উপসংহার

আমরা প্রায় আমাদের উদ্দেশ্যের বাইরে চলে যাচ্ছিলাম; এজন্যই আমরা এ প্রথম গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ে আমাদের বক্তব্যের রাশ এখানে টেনে ধরছি।

আলোচ্য বিষয় ছিল সভ্যতার স্বরূপ ও তাতে জ্ঞাত বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা। আমরা তার সমস্যাবলি আমাদের ধারণা অনুসারে যতদূর সম্ভব বিস্তারিত আকারে উপস্থিত করেছি। আশা করি, আমাদের পরে যিনি আসবেন, যাকে আল্লাহ্ বিশুদ্ধ চিন্তা ও প্রগাঢ় জ্ঞানের দ্বারা সাহায্য করবেন, তিনি এ বিষয়ের সমস্যাবলির আরও গভীরে প্রবেশ করে আমাদের চেয়ে বেশি বিস্তারিতভাবে তা লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হবেন। কোন বিষয়ের যিনি প্রবর্তন করেন, তার উপর তার সব সমস্যা অনুধাবনের দায়িত্ব বর্তায় না। বস্তুত তিনি জ্ঞানের এ শাখাটির আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করেন, তার অধ্যায়-পরিচ্ছেদ বিভক্ত করেন এবং তাতে উপস্থাপনযোগ্য বক্তব্যের আভাস দান করেন। পরবর্তীগণ এসে আরও বহু সমস্যা তার সাথে যোগ করতে থাকেন এবং এভাবে ধীরে ধীরে একসময়ে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। 'আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না'।

গ্রন্থের রচয়িতা আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন—বলছে, আমি 'মুকাদ্দিমা' সংবলিত এ প্রথম গ্রন্থের বিষয় বিন্যাস ও খসড়া রচনা কোন প্রকার পরিমার্জনা ও সংশোধন ছাড়াই সাত শত উনআশি (নভেম্বর, ১৩৭৭ খ্রি.) হিজরির মধ্যভাগে পাঁচ মাসে সমাপ্ত করি। তারপর আমি একে পরিমার্জিত ও সংশোধিত করেছি এবং এর সাথে বিভিন্ন জাতির ইতিহাস সংযুক্ত করেছি। এ সম্পর্কে আমি এ গ্রন্থের প্রথমেই উল্লেখ করেছি এবং আমার এ গ্রন্থ রচনার এটাই উদ্দেশ্য ছিল। 'জ্ঞান একমাত্র মহাপরাক্রমশালী বিচক্ষণ আল্লাহ্র কাছ থেকেই লাভ করা যায়।'

ইবনে খালদুন

তিউনিসিয়ার
স্মারক ডাকটিকিট

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ Arnold J. Toynbee
মুকাদ্দিমা সম্পর্কে বলেছেন
"undoubtedly the greatest work of its kind
that has ever yet been created by
any mind in any time or place."

Bernard Lewis তার *The Arabs in History*
গ্রন্থে ইবনে খালদুনকে উপস্থাপন করেছেন এভাবে
"the greatest historian of the Arabs
and perhaps the greatest
historical thinker of the Middle Ages"